সূচীপত্র

# সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ২৭শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা **বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা** PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৬ই পৌষ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ Thursday, 1st January, 1970

# বেকার সমস্যা ও চাকরির বয়ঃসীমা

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্যের বেকারদের আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। মন্ত্রিসভায় মোটামুটি আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, শ্রমদপ্তর ও উন্নয়ন-দপ্তর যুক্তভাবে ঐ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় পেশ করবেন এবং ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বেকারদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাপারে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বাজার মন্দা হওয়ার দরুণ বহু শিল্প-কারখানায় চাকরিতে নিয়োগ করার মতো নতুন লোক নিষ্প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। উপরন্তু ছাটাই-এর খড়্গাঘাতে অনেককেই বেকার হতে হয়েছে। দেশে যুব-শক্তিকে কাজে লাগানোর কথা যে সময় বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, তখন যুবকরা চাকরির সন্ধানে হা-অন্ন অবস্থায় নিরাশ হয়ে ঘুরে বেড়াবে—সেটাই বা কেমন কথা? আমাদের দেশে কোটি কোটি লোক যেখানে নিরক্ষর ও দরিদ্র, সেখানে প্রকৃত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ দেশে যুবশক্তির অপচয়ের কথা কল্পনাও করা যায় না।

আমাদের দেশের বেকারদের দুই ভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর বেকার নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর বেকার হচ্ছে শিক্ষিতগোষ্ঠী। এই শিক্ষিত-গোষ্ঠীর মধ্যে একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বা বিজ্ঞান বিভাগের ডিগ্রিসম্পন্ন, অথবা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী। বস্তুত লেখাপড়া শেখাটা এখন শিক্ষিত বেকারদের কাছে পণ্ডশ্রম ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং গভীর অর্থ সংকটের ফলে মা-বাপের কাছেও লেখাপড়ার জন্য অর্থ ব্যয়টা অপব্যয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এ-দেশে শিক্ষার ধরণ দেখে একবাক্যে সকলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবেন যে, লেখাপড়া শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনে বোধ হয় অন্য গতি নেই। কারণ, দীর্ঘ বাইশ বছর দেশের মাটিতে স্বাধীনতার হাওয়া বইলেও, সেই হাওয়ায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে নি দেশের অবহেলিত জনসাধারণ। আর সরকার চাকরির পরিবর্তে দেশের যুবসম্প্রদায়কে অন্য জীবিকা গ্রহণের জন্য কোনো সুযোগ করে দিতে পারেন নি। সরকার শুধু মিশ্রশিল্পের বাক্‌চাতুরি করেছেন এবং ঐসব শিল্পে বেকারদের চাকরির সুযোগ এখন আর নেই বললেই চলে। তাছাড়া নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান পত্তনের জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার-গুলির তেমন কোনো গরজ আছে বলে মনে হয় না।

অথচ শিক্ষিত বেকারদের দল ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির বিধান রয়েছে যে, নির্ধারিত বয়ঃসীমার এক দিন বা এক ঘণ্টা ওদিক হলে আর সেই বেকারের চাকরি লাভের তরণীতে বৈতরণী পার হবার উপায় নেই। অর্থাৎ যে সরকার চাকরি দিতে অক্ষম, সে-সরকার শিক্ষিত বেকারদের যথাসময়ে চাকরি দিতে না পারার দায়ে শুধু ভাতে মারছেন না, বয়স হয়ে গেছে এই অজুহাতে তাদের হাতেও মারছেন। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে তারিখ বদলাতে বদলাতে বয়স কখন চব্বিশের সীমা পার হয়ে তিরিশে বা পঁয়ত্রিশে গিয়ে পোঁছয়, সে সম্বন্ধে সরকার যদি অজ্ঞই থাকেন, নিশ্চয়ই তখন বয়োবৃদ্ধির জন্যে বেকারদের দায়ী করা যায় না।

আমরা তাই মনে করি, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির এ ব্যাপারে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত, যাতে নিরুপায় বয়োবৃদ্ধির কারণে বেকার যুবক দল একেবারে হতাশায় ভেঙে না পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব বলে আমাদের ধারণা। শুধু "ডোল" দিয়ে বেকারদের হতাশাকে ঠেকানো যাবে না।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের করার মতো কাজ ছিল এবং এখনো আছে অনেক। (১) শিল্প-মালিকদের আহ্বান জানিয়ে সরকার এ রাজ্যের বেকারীত্ব দূরীকরণে কি করতে পারেন, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন এবং ঐ সম্পর্কে শিল্পমালিক ও সরকারের বক্তব্য জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারতেন। (২) এ রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে সুযোগ রয়েছে প্রচুর, (৩) কুটীরশিল্পের প্রসার ও উন্নতির জন্য সরকার প্রায় কিছুটা করতে পারেন নি। অথচ গান্ধী জন্মশতবর্ষে এই শিল্প সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা হলে সরকার হয়তো কেন্দ্রীয় সাহায্যও পেতেন। (৪) সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জাতের শিল্প গড়ে তোলার যে সুযোগ রয়েছে, এমন বোধ হয় আর কোথাও নেই। তবু সেই অঞ্চল যেন চক্ষুশূল। জানি না, ফরাক্কা বাঁধ হলে কোনো গতি হবে কি-না? অবশ্য ফরাক্কা বাঁধ শেষ হলে তখন আবার ছাটাই-এর ফলে বেকার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার বেকারদের চাকরি দেবার বেলায় প্রায়-নির্বিকার। প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আমেদপুর ন্যাশনাল সুগার মিলটি আবার চালু করা হবে। বিস্ময়ের ব্যাপার, সরকার তা চালু করতে পারেন নি। এই যদি হয় কাজের নমুনা, তাহলে যুক্ত-ফ্রন্টের ওপর লোকের আস্থা ধীরে ধীরে কমে যাবে। কিন্তু প্রতিশ্রুত কাজগুলি ব্যর্থ হওয়ার মূলে কারা দায়ী, তাও জানতে জনসাধারণ ইচ্ছুক।

# আজকের মানুষ

মেলা-উৎসবে সকলেই অংশ নিতে চায় বটে, কিন্তু তার আয়োজনের ভার গ্রহণের আগ্রহ দেখা যায় ক'জনের মধ্যে? বরং বেশির ভাগ মানুষই ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চায়, দায়িত্ব নিজের ঘাড় থেকে সন্তর্পণে অন্যের কাঁধে চালান করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। দায়িত্ব এড়াবার সঙ্গত কারণও অবিশ্যি রয়েছে। বৃহৎ ব্যাপার যেখানে, অনিয়ম-বিশৃংখলার ঝুঁকিও বেশি সেখানে। দায়িত্ব ফাঁকি দিয়ে যাঁরা দূরে থেকে আনন্দের ভাগ নিলেন, তাঁরা কিন্তু সামান্যতম ত্রুটি দেখলেই তীব্র সমালোচনার ঝড় তুলতে ছাড়বেন না। এই বিরূপ সমালোচনা, অপবাদ বদনামের ভয়েই 'ভাল' মানুষেরা কোনো আয়োজনের উদ্যোগীর ভূমিকা নিতে চান না। কিন্তু সেই সংগে একথাও ঠিক যে, সব দেশে, সব পাড়ায় এমন কি যে কোনো বড় ব্যাপারে—সে মড়া পোড়ানোই হোক, আর চাঁদা তুলে অভাবী পিতার মেয়ের বিয়ে দেওয়াই হোক—কিছু লোক সবার আগে এগিয়ে আসে এবং দায়িত্বভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। তারা কারো সমালোচনা-নিন্দের ধার ধারে না। গতরে খেটে, গাঁটের পয়সা খরচা করে বা লোকজনের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে ঠিক তারা কাজ উদ্ধার করে দেয়। আর কী আশ্চর্য, সকল অনুষ্ঠানের শেষে তারা নামও কেনে, প্রশংসাও অর্জন করে অকুণ্ঠ। ফলে সব জায়গাতেই এমনি দু'য়েকজন করে বিবাহ-বিশারদ বা অনুষ্ঠান-বিশারদের উদ্ভব ঘটে, যারা নিজেরা বিয়ে বা অনুষ্ঠান করে না বটে, তবে এদের ওপর ভার দিয়ে উদ্যোক্তারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। বসন্তদাদা পাতিল এমনি একজন লোক যাঁর ওপর অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করে এ আই সি সি-র কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন। বোম্বাইয়ের ইন্দিরাপন্থীরা কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের সমস্ত আয়োজন করেছেন ৫২ বছরের এই যুবক বসন্তদাদা পাতিল।

শ্রীপাতিল হলেন মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে যখন জানিয়ে দেওয়া হল যে, বোম্বাইয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে তাঁদের আপত্তি রয়েছে তখন বসন্ত পাতিলই এগিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ নিলেন এই বলে যে,

বসন্তদাদা পাতিল

অধিবেশন বোম্বাইতেই হবে এবং আয়োজন তিনিই করবেন। একথা সত্যি যে, বোম্বাইয়ের মুকুটহীন রাজা শ্রী এস কে পাতিল এবং তাঁর প্রভাবাধীন বোম্বাই প্রদেশ কমিটি যখন আপত্তি জানিয়েছেন তখন অনুষ্ঠান করতে যাওয়া মানে বিরাট ঝুঁকি নেওয়া। এটাও ঠিক যে, সিণ্ডিকেটপন্থী শ্রীসদোবা পাতিলের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট রয়েছে, বসন্ত পাতিল তার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু বসন্তদাদা পাতিল এ-সুযোগেই এটাই প্রমাণ দিতে চাইলেন, মহারাষ্ট্রে তাঁর সত্যিকারের প্রভাব কতখানি আছে।

বসন্তদাদার অল্প সময়ের মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সব স্তরের মানুষেরই তিনি 'দাদা', তা সে মানুষ কংগ্রেসীই হোক, আর কমিউনিস্টই হোক। কোলাপুরের এক সাধারণ কৃষক পরিবারে বসন্ত পাতিলের জন্ম। লেখাপড়াও বিশেষ করার সুযোগ তিনি পান নি। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যের অভাব তিনি পূরণ করেছেন অভিজ্ঞতার রত্ন-ভাণ্ডার সঞ্চয় করে। মাত্র ২০ বছর বয়সে কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দিয়ে তিনি অল্পকালের মধ্যেই নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। সাংলী জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ পেতে দেরি হয় নি তাঁর, পরে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও হলেন ১৯৬৭ সালে। প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই শ্রীবসন্ত পাতিল রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

বসন্ত পাতিল তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৪২ সালে তিনি ভূমিসংস্কারের দাবিতে যে কৃষক বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিলেন, অতবড় কৃষক বিক্ষোভ বিশেষ দেখা যায় নি। এর পরে তিনি মন দিলেন সমবায় আন্দোলনের দিকে। কারণ তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে দেখতে পেয়েছিলেন যে, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে জমিদার, মিল-মালিক বা সরকারের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের পায়ের ওপরেই দাঁড়ানোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই থেকে মহারাষ্ট্রে বহু সমবায় সমিতির জন্ম দিয়েছেন বসন্ত পাতিল। এবং সমবায় প্রথায় তিনি এখানে বেশ কয়েকটা চিনিকলও খুলেছেন। শর্করাশিল্প ছাড়াও ব্যাংকসমেত অন্য কয়েকটি সমবায় সমিতির সংগেও তিনি জড়িত। শ্রীপাতিল বোম্বাই আই এন টি ইউ সি-র সভাপতি।

একথা ঠিক যে, সম্প্রতি একসংগে একাধিক সমবায় সমিতির সভাপতি থাকা বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় শ্রীপাতিলের ক্ষমতা ও গুরুত্ব খানিকটা খর্ব হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বসন্তদাদা পাতিলের জনপ্রিয়তা কিছু কমেছে বলে মনে হয় না। বরং সিণ্ডিকেট বা আদি কংগ্রেসপন্থী বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের চেয়ে ইন্দিরা-সমর্থক মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস যে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী—এ আই সি সি-র সাধারণ অধিবেশনের বিরাট সাফল্যে তাই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হল না কি?

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

## ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(২০)

### প্ল্যানিং-এর পক্ষে সুভাষচন্দ্রের প্রচার

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি প্রবর্তন করা নামক ব্যাপারটিকে নিজ কীর্তির অন্তর্ভুক্ত করার আত্মপ্রসাদ নিয়ে বসে থাকার পাত্র সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। তার বাস্তব অগ্রগতির জন্য অবিলম্বে প্রচারে নেমে পড়লেন। প্রচারের উদ্দেশ্য—প্রথমত এ ব্যাপারে দেশের মন প্রস্তুত করা, যা এতাবৎকাল খাদির আদর্শে লালিত হয়েছে। খাদিবাদীরা সহজে তাঁদের জীবন ও কর্মদর্শনের এহেন বিরোধিতাকে সহ্য করবেন না, তা তিনি বুঝেছিলেন। কংগ্রেসকে সক্রিয় রাখার জন্যও এই প্রচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার করে ফেলেছে। মন্ত্রিত্ব নিয়ে জনগণের সামনে কোন্ চেহারায় সে দাঁড়াবে? অনেক প্রতিশ্রুতি জনগণকে সে দিয়েছে; ইংরেজ ও তার আমলাতন্ত্র জনগণকে কতখানি দুর্দশার মধ্যে রেখেছে, তা খুলে বলতে তার চেষ্টার সীমা ছিল না। নিজে ক্ষমতা হাতে নেবার পরে কিছু করে দেখানো এখন তার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আর জনগণ সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি দেখতে চায় তা হল—অর্থনৈতিক দুর্দশার সুরাহা। সুভাষচন্দ্র দেখলেন, তা অবিলম্বে করতে গিয়ে এবং কিছু নৈতিক সাধুতার প্রমাণ দিতে গিয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সাক্ষাৎ চমকপ্রদ যে-দু-একটি জিনিস করে ফেলেছে, তা অল্পদিনের মধ্যে বুমেরাং হয়ে ফিরে তাকেই ম...বে। The pros and Cons of Office Acceptance নামক রচনায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নানা অসুবিধার আলোচনাকালে অর্থনৈতিক প্রশ্নটির বিস্তৃত পর্যালোচনা করেন। "ভারতীয় রাজনৈতিককে যেসব বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে হবে সেগুলি হল—দারিদ্র্য, বেকারী, ব্যাধি এবং অশিক্ষা। এইসব সমস্যার সমাধান জাতীয় সরকারই মাত্র করতে সমর্থ যার হাতে যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে। তা করতে সত্যই ইচ্ছা করলে অবিলম্বে আমাদের প্রয়োজন হবে সংগঠন এবং অর্থ। প্রদেশসমূহে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কি ব্যাপকভাবে জাতি গঠনের কাজ শুরু করার উপযুক্ত সংগঠন ও অর্থের ব্যবস্থা করতে পারবে?" পারবে না, সুভাষচন্দ্র পরিষ্কার জানালেন, কারণ উচ্চতর চাকরির সবই ইংরেজ কর্মচারী-দের দ্বারা অধিকৃত, যাদের চাকরিতে হাত দেবার অধিকার

পদে জনকল্যাণমূলক কাজগুলির বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করবে। যদি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করা হয়, তাহলে সংঘর্ষ অনিবার্য, যার পরিণতি স্পষ্ট; আর আত্মসমর্পণ করলে অপরূপ দৃশ্য—সংগ্রামী কংগ্রেস শত্রু ইংরাজ আমলাতন্ত্রের হাতে পুতুল মন্ত্রিগোষ্ঠী!

জনকল্যাণের টাকা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পাবে কোথা থেকে? সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন তুললেন। ইতিমধ্যে সে আবার প্রতিশ্রুত সংস্কারকার্য করতে গিয়ে তহবিল অনেকটা খালি করে বসেছে। "কংগ্রেস দল কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পূর্ব থেকে প্রতিশ্রুত, যা সরকারী আয়ে ঘাটতি ঘটাবে, যার ফলে ব্যাপক আকারে জাতি গঠন কাজ আরম্ভ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। জমির খাজনা কমিয়ে দেবার পরে এবং মাদকবর্জন নীতি গ্রহণের ফলে মন্ত্রিসভা ঘাটতি বাজেটের সম্মুখীন হতেও পারে। অন্য দেশ হলে, অর্থমন্ত্রী অবিলম্বে খরচ কমানোর কাজ আরম্ভ করে দিতেন। ভারতের প্রদেশগুলিতে উচ্চতর চাকরির বেতন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাগুলিকে স্পর্শ করা যাবে না, আর তলার থাকের চাকরিগুলিতে মাইনে এত কম যে, সেখানে অর্থকৃচ্ছ্রতার কোনই সুযোগ নেই। সেনাবাহিনী, রেলবিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, কাস্টমস প্রভৃতি ফেডারেল বিষয় বলে এই সব জায়গায় ছাঁটাই বা এখান থেকে আয় বৃদ্ধি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বাজারে বেশি টাকা ছাড়তেও অধিকারী নয় প্রাদেশিক সরকারগুলি। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে সহজেই অর্থভাণ্ডার পূরণ করা যায় কারণ ভারতে স্বর্ণসঞ্চয় প্রচুর—কিন্তু সে বিষয়টিও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। এই পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা—জাতি গঠন কাজের জন্য বাজারে খুব বেশি পরিমাণে ঋণপত্র ছাড়া। কিন্তু গভর্নর কি প্রদেশগুলির জন্য এই ধরণের ঋণের পক্ষে সুপারিশ করবেন? লর্ড লিনলিথগোর প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকার তার অনুমতি দেবে?...... কিন্তু তা যদি না করা হয় তাহলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সামনে মুখব্যাদান নৈরাশ্যের গহ্বর।"

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকারগুলি খুচরো শুভ কর্মের বেশি কিছু করতে সমর্থ নয়। তার দ্বারা জনগণের স্থায়ী উপকার কতটুকু হতে পারে? সাময়িকভাবে তারা খুশি হলেও অল্পদিনের মধ্যে তাদের খুশির মাত্রা ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাবে। "দারিদ্র্য এবং বেকারীর সমস্যা দূর করা যেতে

সঙ্গে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিস্তার ও ঋণের বন্দোবস্ত চাই। চাই টাকা, অনেক টাকা।"

সুভাষচন্দ্র পরিস্থিতিকে দুইভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন। কংগ্রেস সরকারগুলি অর্থনৈতিকভাবে অনিবার্য ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে—তার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল—পরিকল্পনা-তত্ত্ব বুঝিয়ে তা করতে চাইলেন। উল্টোদিকে কংগ্রেস সরকারগুলি সম্বন্ধেও তাঁর ভয় ছিল। ব্যর্থতা যখন অনিবার্য তখন তার সঙ্গে লড়াইয়ের চেষ্টা ত্যাগ করে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের মধ্যে গদি আঁকড়ে বসে থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, তাও বুঝে-ছিলেন। ব্যর্থতার জন্য নৈতিক অপরাধবোধও ঐসব কংগ্রেসীদের জাগবে না, কারণ গদিতে তারা পরিণীত, আর সকলেই জানে, খাদির দ্বারা বেশি কিছু হওয়া সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র তাই খাদির পালে যন্ত্রের বাঘকে ছেড়ে দিয়ে বলতে চাইলেন—ভারতবর্ষকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থাতে, তা যেন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা-গুলি মনে রাখে।

উল্টোদিকে পরিকল্পনার পক্ষে প্রচারের দ্বারা স্বাধীনতা-আন্দোলনে বেগ সৃষ্টিও করতে চাইলেন—স্বাধীনতার ভাবাবেগমূলক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রশ্নকে জুড়ে দিয়ে। জনগণের সামনে তিনি তুলে ধরলেন—তোমাদের দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুঃখের অপনোদন হতে পারে একমাত্র পরিকল্পিত শিল্পায়নের দ্বারা; সেই শিল্পায়নের পরিকল্পনা কংগ্রেস করেছে; কিন্তু তার সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য অপরিহার্য; সে সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার কখনই করবে না, যতক্ষণ না সেখানে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; সুতরাং লড়াই করো তোমরা জাতীয় সরকারের অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য।

জহরলাল প্রমুখ প্রগতিশীলদের থেকেও সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখানে দেখতে পাচ্ছি। জহরলাল জাতীয় আন্দোলনে খাদির ভূমিকাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে-ছেন। নিশ্চয় খাদি তা পাবার যোগ্য। কারণ জনগণকে তা আত্মনির্ভরতা দেয়, যা সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টির সহায়ক। যতক্ষণ খাদি সত্যই তা করেছে, সুভাষচন্দ্র তার সমর্থন করে এসেছেন। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি দেখেছেন, খাদির আত্মনির্ভরতার সন্তোষ এখন আর সংগ্রামের প্রেরণা দিতে পারছে না, এখন প্রয়োজন দারিদ্র্যও ক্ষুধাকে সংগ্রামের অস্ত্র করা। জাতীয় পরিকল্পনা এবং তার সাফল্যের পথে শাসকদের বাধা সৃষ্টির রূপ দেখিয়ে দিয়ে সেই কাজই তিনি করেছেন। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় তাঁর ঐ উক্তিটি—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্র-শিল্পায়ন প্রয়োজন।১

এই সমস্ত নানা কারণে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর ব্যাপারটিকে একটি আন্দোলনে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে হরিপুরায় সভাপতির ভাষণে পরিকল্পনা-প্রসঙ্গ উত্থাপনের পর থেকেই সুভাষচন্দ্র সভা-সমিতিতে প্ল্যানিং-এর কথা বলতে আরম্ভ করেন। সংবাদপত্রে তাঁর বক্তব্য অল্পস্বল্প বেরিয়েছিল। আমি কিছু কিছু উপস্থিত করছি।

হরিপুরা থেকে ফেরার পথে তিনি বোম্বাইয়ে আসেন। বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বারের শ্রী এম সি ঘিয়া তাঁর সম্মানে ২৬ ফেব্রুয়ারী একটি চা-পান সভার আয়োজন করেন। স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্যার ফিরোজ শেঠনা, স্যার চুনীলাল ভি মেহতা, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বোম্বাইয়ের অর্থমন্ত্রী শ্রী এল বি লাথে প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক উপস্থিত ছিলেন। ব্যবসায়ীদের সমাবেশে সমাজতন্ত্র প্রচারের বৃথা চেষ্টা তিনি করেন নি, কিন্তু না জানিয়ে পারেন নি যে, "সমাজতন্ত্র বিষয়ে তিনি সুদৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন।" তাই বলে এখনি শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা তিনি বলছেন না, সুভাষচন্দ্র জানিয়ে-ছিলেন, তা করার আগে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করা দরকার।

সুভাষচন্দ্রের এই মনোরম সরলতায় ব্যবসায়ীরা

---

১ সুভাষচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করছিঃ

"These fundamental problems, which have not yet been satisfactorily solved by the foremost nations of the day, can be successfully tackled in India only when there is a popular Government in power at Delhi and there is thorough co-operation between the Central and Provincial Governments. Further it is my firm conviction that the financial needs of a backward and impoverished country like India, which has to make up leeway, can never be met by following the principles of conventions of orthodox finance. I can, therefore, visualise a time in the near future when the Congress Ministers, having gone through a substantial portion of their programme of piecemeal reform, will realise that no further progress is possible until a popular Government is installed at Delhi and there is complete transference of power to the people of the country."

এই অংশটি অগাস্ট, ১৯৩৮ সংখ্যার মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত *The Pros and Cons of office Acceptance* প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। সুভাষচন্দ্রের চিন্তাশক্তি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিশেষ পরিচয় প্রবন্ধটিতে আছে। এটি এখনো শিক্ষাপ্রদ। বাংলা দেশে এখন যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন, তাঁরা প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন—তাঁদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরবর্তী সমস্যাগুলির চরিত্র কিভাবে সুভাষচন্দ্র বহু বৎসর আগে বুঝে লিখে গেছেন। অথচ এখনকার বিপ্লবীরা অনেকেই তখন সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করাকেই তাঁদের মুখ্য বিপ্লবকর্ম বিবেচনা করেছিলেন॥

[illegible] "উৎপাদনে নিরত ব্যবসায়ীরা প্রতিক্রিয়াশীল নন", এই মধুবাক্য তাঁরা কতখানি আশ্বাসবোধ করেছিলেন তাও বলতে পারব না, যাই হোক তাঁরা মনোমত কথাও কিছু পেয়েছিলেন—সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য দেশীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের আহ্বান করেছিলেন। অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলেন: "কংগ্রেসীদের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পপতিদের ব্যক্তিগত সংযোগ অধিকমাত্রায় হওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি মুমূর্ষু গ্রাম-শিল্পের পুনরুত্থান চাই, মহাত্মা গান্ধীর নীতির স্বীকৃতিও আমার কাম্য, কিন্তু সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশসমূহে দ্রুত যেভাবে শিল্পায়ন ঘটে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে এ দেশের ব্যবসায়ীরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। এ হল যন্ত্রশিল্পের যুগ। ভারতকে বাস্তববোধ রাখতে হবে—পৃথিবীর অন্য দেশগুলি যে গতিতে চলেছে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতেই হবে।"

সুভাষচন্দ্র এই সভায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের পৃথক স্বাধীন বাণিজ্যচুক্তি থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। (অমৃতবাজার,২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

এই সভার দুদিন পরে, ২৮ ফেব্রুয়ারী শ্রমিক সমাবেশে বলেছিলেন—স্বাধীনতার পরেই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর। ২ মার্চ তারিখের এক জনসমাবেশে জানালেন, দারিদ্র্য সমস্যা দূর করতে পারা যাবে একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থায়; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই বৈজ্ঞানিক পথ। অবশ্য সমাজতন্ত্র আনা কখনই সম্ভব হবে না যতক্ষণ না রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত হচ্ছে।২

এই সব কথা সুভাষচন্দ্র যখন বলছেন, তখনো হরিপুরায় লেপিত তাঁর ললাটের চন্দন-কুঙ্কুম শুকোয় নি—জাতীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে তিনি নিজস্বভাবে কিছু করতে আরম্ভ করেন নি। মে মাসে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন থেকে সে কাজ শুরু করেন। ঐ সম্মেলনের পরে ডরী-অন-শোনে ডালমিয়া নগরীর শিল্পসংস্থাগুলি পরিদর্শন করেন। অনেকগুলি শিল্প—সিমেন্ট, চিনি, কাগজ প্রভৃতি—সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে দেখে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং ভেবে আনন্দিত হন যে, আরও শিল্পসম্প্রসারণের সুযোগ সেখানে রয়েছে। সিমেন্ট কারখানা তাঁকে খুবই খুশি করে, যা ভারতের কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার হওয়া বন্ধ করেছে। তিনি বলেছিলেন, এখন যদিও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম, একদিন আসবে যখন উৎপাদন চাহিদাকে ছাপিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন নিজেদের মধ্যে অযথা প্রতিযোগিতা করে বিদেশী বণিকদের উল্লাস বৃদ্ধি না করেন। "ভারতবর্ষের শিল্পায়নে আমি বিশ্বাস করি, তাই ভারতীয়দের দ্বারা সংগঠিত এই শিল্পের সাফল্য কামনা করি।" ডালমিয়া ফ্যাক্টরি দেখার পরে আসল কথাটা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেছিলেন—"রাজনৈতিক স্বরাজের পাশাপাশি আমাদের শিল্পের স্বরাজও চাই।" (অমৃতবাজার, ২৯ মে, ১৯৩৮)

অক্টোবর মাসে শিল্পমন্ত্রীদের সভা এবং ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশন-এর মধ্যবর্তী সময়ে সুভাষচন্দ্র যে সব জায়গায় সফর করেছেন, সেখানে প্রায় সর্বত্রই পরিকল্পনা ও যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে প্রচার করে বেড়িয়েছেন। শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন শেষ হবার পরে ১৪ অক্টোবর তারিখে সাংবাদিক সভায় যন্ত্রশিল্পায়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পরিকল্পনা কমিটির গঠন ও কার্যবিধি সম্বন্ধে বিবরণ দেবার পরে তিনি একটি বিষয়ে কতকগুলি কথা পরিষ্কার করে নেন। কেন্দ্রীয় সরকার যখন সাহায্য করবে না, তখন এই ধরনের সর্বভারতীয় কমিটি গঠনের অর্থ কি? উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন: "তা হলেও পরিকল্পনা প্রস্তুত করা আশু প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ তার দ্বারা প্রাদেশিক সরকারসমূহের শিল্পবিভাগগুলি উপযুক্ত নির্দেশ ও পন্থা লাভ করবে। তা না পেলে শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে অযথা সমরূপ শিল্পের বৃদ্ধি ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তাছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে যথাযথভাবে স্থির করা সম্ভব হবে না, নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে তারা কোন্ গুরু শিল্পের স্থাপনা করতে পারবে।" সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার কারণে পরিকল্পনাকে সফল করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার; তাহলেও তাঁর ভরসা—"যন্ত্রশিল্পের পরিকল্পনা কমিশন" দেশের শিল্পজাগরণের ইতিহাসে বিরাট ব্যাপার বলে স্বীকৃত হবে।৩

[ক্রমশ]

২ "He paid a tribute to the work carried on by the Congress Ministr.es and declared that inspite of the limitations imposed by the Government of India Act, the ministers had acpuitted themselves well. "If with this small measure of power we can do this much, then with freedom we shall be able to tackle the fundamental problems like unemployment, illiteracy, poverty and disease." Personally, he went on, he believed that such fundamental problems could only be solved through a socialistic approach. Even in capitalist countries they had to adopt socialist methods for tackling such problems." "But socialism must wait", he concluded, "till freedom is won. We must first wrest power and then approach socialism." (A.B.P. March 3, 1938)

৩ "Mr. Bose added that the task will be undoubtedly formidable as co-operation of the Central Government may not be forth coming. Nevertheless, he hoped that the Industrial Planning Commission will be a landmark in the history of industrial regeneration of this country with the help of Provincial Governments and States."
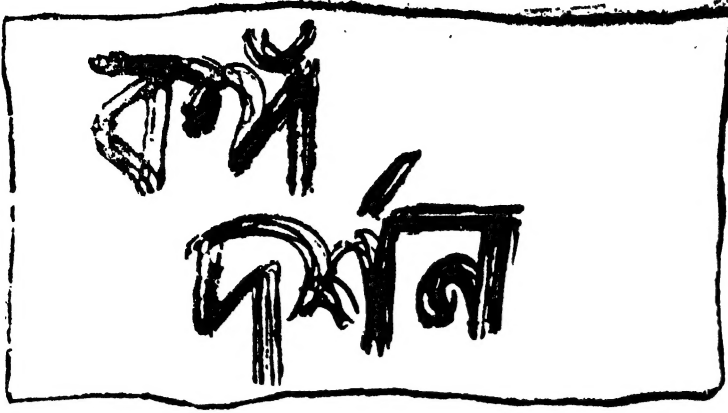
১৯৬৯ সালটা পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে কেটে গেল একটি ইতিহাসবিখ্যাত বছর হিসেবে, যা নানা কারণেই দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সারা ভারত জুড়েই ১৯৬৯ সালটা অশান্ত, তা একটা বিরাট পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটাতে চলেছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা অগ্নিপরীক্ষার সীমানায় তা আপাতত নিয়ে তুলেছে, যার সূত্রপাত ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে। যে সংশয়িত অবস্থার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, ১৯৬৯-এর নির্বাচন সে অবস্থাটাকে একেবারে বদলে দিয়ে যে নতুন পরিস্থিতি গড়ে তুলেছে তাকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের তরফ থেকে অস্বীকার করবার কোন উপায়ই ছিল না, বরং পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের আশাতীত নির্বাচনী সাফল্য এই কথাই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকার দিন ফুরিয়ে গেছে, এখন ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ না করলে চলবে না। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয়বার সাফল্যের ঢেউ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকেও ভেঙে দু'ভাগ করে দিয়েছে, শুধু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বই নয়, ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই। এর পরিণাম কি হবে সেই বিষয়ে কোন মন্তব্য না করেই বলা যায় যে, আজকের ভারতবর্ষের পুরাতন নেতৃত্বের কাঠামো ভেঙে যে নব নেতৃত্বের অভ্যুত্থান হচ্ছে, তার মূলে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের অবদানই সর্বাধিক।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার আজও কিন্তু পরীক্ষামূলক স্তরে রয়ে গেছে, এবং শেষ পর্যন্ত এই যুক্তফ্রন্টের কপালে কি আছে তা বলা শক্ত। ১৯৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনসাধারণ সুনির্দিষ্টভাবে যে রায় দিয়েছে তার মর্যাদা রক্ষা করা অবশ্য প্রত্যেকটি শরিকদলেরই কর্তব্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কতটা রক্ষিত হচ্ছে, তার হিসাব-নিকাশ করার সময় এখন যে পর্যাপ্তভাবে সমুপস্থিত সে কথাটা আর নতুন করে ব্যাখ্যা না করলেও চলে। একথা অবশ্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার নানা বিষয়েই কৃতিত্ব দেখিয়েছে, এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের ক্রিয়াকলাপ সারা ভারতবর্ষকেই নতুন চিন্তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ভূমি সংস্কারের কথা বলা যায়। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কংগ্রেসী আমলে জমির ঊর্ধ্বতম সীমা বেঁধে দেওয়ার আইন হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জোতদারেরা বে-আইনী জমির মালিকানা নিয়ে বসেছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার আড়াই লক্ষ একর বে-আইনী জমি উদ্ধার ও তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করেছেন। এ ছাড়া যে জমিতে চাষ করবে, সেই জমি নিয়ে আইনসংক্রান্ত বিরোধ থাকলেও, সেখানে চাষীই ফসলের হকদার হবে একথা ঘোষণা করেছেন। এই সব দেখে দিল্লীরও বোধ হয় কিছু টনক নড়েছে। তাঁরা কিছু করুন আর না করুন, ভূমি সংস্কারের কথাটাকে আবার নতুন করে তুলতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন বলা চলে।

শিল্প ও শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার রীতিমত সাফল্যলাভ করেছেন বলে মনে করা চলতে পারে। এই একটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট সাফল্যের সঙ্গেই পরিচালিত হয়েছে এবং যেগুলির দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীই লাভবান হতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস সরকার গদিতে থাকলে শ্রমিকশ্রেণীর এই সাফল্য কোন দিনই আসত না, প্রতিটি ধর্মঘট-ই বে-আইনী ঘোষিত হত, কারখানায় পুলিশ যেত এবং শেষ পর্যন্ত সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে শ্রমিকদের আত্মসমর্পণ করতে হত। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই আবহাওয়া বদলে ফেলেছেন, মালিকের তরফে পুলিশ পাঠানো বন্ধ করেছেন, এবং শ্রমিকশ্রেণীর পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের মদৎ জুগিয়েছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যুক্তফ্রন্টের আমলেই সাধারণ মানুষ তার নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। শুধু ভূমি সংস্কার বা শ্রম-বিরোধের ক্ষেত্রেই নয়, অপরাপর বিষয়েও যুক্তফ্রন্ট অল্প সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ভাল কাজ করেছেন। সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন বর্ধিত হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বই দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা মূল্যে অধ্যয়নের সুযোগ দেবার প্রচেষ্টা চলেছে। এ ছাড়া নানা বিষয়ে প্রগতিশীল আইন চালু হয়েছে। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন, অর্থাৎ সব মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে রীতিমত কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন, এবং এটা আশা করা যায় যে, যদি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন শরিক দলগুলি মিলেমিশে কাজ করে, তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকারের সুদিন আসবে।

কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের এত কৃতিত্ব সত্ত্বেও তার ভাবমূর্তি মোটেই উজ্জ্বল হয় নি, বরং সাধারণের চোখে তা বেশ নিচে নেমে গেছে। তার একমাত্র কারণ শরিক দলগুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কাদা ছোড়াছুড়ি। এই জঘন্য বিষয়টা আলোচনা করতে আমাদেরও লজ্জা হয়, অথচ তা না করে উপায় নেই। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার দিন থেকে শুরু করে, সকল শরিক বড় বড় দলগুলি এক মারাত্মক খেলায় মেতেছে। এই খেলার মূল বিষয়টি হল যুক্তফ্রন্ট সরকারের সুযোগে নিজেদের পার্টিগুলির শক্তি বৃদ্ধি করা। এবং তা করার দরুণ শরিকী সংঘর্ষ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটি দলের হাতই শরিকী সংঘর্ষের রক্তে কলুষিত, কিন্তু কেউই নিজের হাতে রক্তের দাগ দেখছেন না, অপরকে দোষারোপ করছেন। প্রত্যেক দলই সমর্থক সংখ্যা পরিমাণের দিক থেকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন, গুণের দিক থেকে নয়। এবং এই সকল 'রাজনৈতিক অশিক্ষিত' ক্যাডাররূপী গুণ্ডাবাহিনী সারা দেশ জুড়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই

যে, নেতারা "প্রত্যক্ষভাবে" তাঁদের ক্যাডার থেকে 'রক্তের বদলে রক্ত' এই নীতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করছেন।

খোলাখুলিভাবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন আছে, আশা করি সংশ্লিষ্ট দলগুলি এতে চটবেন না। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অরাজকতা ও শরিকী সংঘর্ষ রোখবার জন্য কিছুকাল আগে থেকে বাংলা কংগ্রেস এক সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছেন, এবং এই আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। আমরা সর্বদাই মুখ্যমন্ত্রী ও বাংলা কংগ্রেসের পার্থক্য করে থাকি এবং কয়েক সংখ্যা পূর্বে আমরা বঙ্গদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর অনশনের যৌক্তিকতা যে স্বীকার করেছিলাম তার কারণ সেটা মুখ্যমন্ত্রীর অনশন ছিল বলেই, কোন দলবিশেষের প্রোগ্রাম বলে নয়। তার পর গত কয়েক সপ্তাহে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, শরিকী সংঘর্ষ বেশ কিছুটা কমেছে এবং আমরা আশা করেছিলাম যে, অতঃপর ওই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হবে এবং শরিক দলগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার আলোচনা শুরু হবে। কিন্তু এত দিনেও যখন সে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল না, তখন বুঝতে হবে যে, এই আন্দোলনের পেছনে কিছু রাজনৈতিক কারণ আছে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর সৎ অভিপ্রায় ও মনোভাবকে তাঁর দলের কতিপয় নেতা খোলাখুলিভাবে এক্সপ্লয়েট করছেন এবং তাঁকে এমন একটা জায়গায় ঠেলে দিচ্ছেন যেখান থেকে ফেরা অসম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন যে, তিনি একটি অসভ্য সরকারের নায়কত্ব করছেন, তাঁর মনোভাবকে আমরা কিছুটা বুঝতে পারি। কেন যে তা বুঝতে পারি, সেটা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না; কিন্তু তাঁর দলের অপর একজন নেতা যখন বলেন যে, স্বরাষ্ট্রদপ্তর হাতে পেলে তিনদিনে সব ঠিক করে দেব, তখনই মনে দারুণ সংশয় জাগে। তখনই মনে হয় যে, এই আন্দোলনের কোন রাজনৈতিক মতলব আছে, এই শরিকী সংঘর্ষ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ মনোভাবকে সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে।

এর পর অন্যান্য দলগুলির কথায় আসা যাক। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাবের কথা কারো অজানা নয়, কিন্তু সেজন্য তাঁদের স্কেপগোট করাটাও ঠিক নয়, যদিও যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম দল হিসাবে সর্বাধিক অন্যায়-গুলি এঁদেরই নামে অনুষ্ঠিত হয়। সকল অন্যায়ের সঙ্গে নিঃসন্দেহে পার্টির যোগ থাকে না, তা থাকা সম্ভবপরও নয়, কিন্তু যেহেতু সকল বড় বড় দপ্তরগুলি এই পার্টির করায়ত্ত, স্বাভাবিকভাবেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের আপাত সমর্থন এই পার্টির প্রতিই আছে। এমন অজস্র মানুষকে আমরা দেখাতে পারি, যারা কংগ্রেস আমলে ঘোরতর কংগ্রেসভক্ত ছিল, বর্তমানে গলায় লাল রুমাল বেঁধে ঘুরছে। আমরা এমন কয়েকটি অন্যায়ের সুনির্দিষ্ট তালিকা দিতে পারি যেগুলি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নামে হয়েছে, অথচ তা পার্টির অগোচরে, যদিও তার রিফ্লেকশান পরিপূর্ণভাবেই পার্টির ওপর পড়ে। তদুপরি এই পার্টির হাঁকডাক বেশি হবার দরুণ, বিশেষ করে নেতাদের প্ররোচনামূলক উত্তপ্ত ভাষণ ও বক্তৃতাসমূহের দরুণ, এই পার্টির সমর্থকের সংখ্যা যেমন ক্রম-বর্ধমান, ঠিক সেই একই হারে এই পার্টির বিরোধীও আবার অনেকেই হয়ে পড়েছেন। সর্বোপরি শরিকী সংঘর্ষের সিংহভাগ এই পার্টিরই দখলে, প্রায় প্রতিটি সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই এক দিকে না হয় আর এক দিকে সি· পি· এম আছেই। বাংলা কংগ্রেসকে যেমন ধোয়া তুলসীপাতা বলা যায় না, সি· পি· এম-কেও নিশ্চয়ই তা বলা যায় না, ব্যক্তিগতভাবে জ্যোতিবাবু বা হরেকৃষ্টবাবু যতই কর্মদক্ষ হোন না কেন, সি· পি· এম-এর বিরুদ্ধে অপরাপর দলগুলির অভিযোগের কারণ কিছু আছে, যদিও সেই সকল দলের হাতও যে কলুষমুক্ত এ কথা বলা যায় না। খুনের বদলে খুন এই শ্লোগান যে তারা মুখেই বলছে তা নয়, কাজেও পরিণত করছে।

আমরা এখানে বাংলা কংগ্রেস ও সি· পি· এম-কেই বেছে নিয়েছি এই কারণে যে, এই দুইটি পার্টির সমঝোতার ওপরেই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব নির্ভর করে। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে যে যুক্তফ্রন্টের উদ্ভব হয়েছিল ১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে তার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সংকট দেখা দিয়েছে, এ কথাটা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। সত্য বলতে কি বাংলা কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধটা এত মুখোমুখি এসে গেছে যে, উভয়ের একত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কিভাবে ঘটবে সেটা ভেবে ওঠাই মুস্কিল। উভয় তরফের বক্তব্যই খুব স্পষ্ট। সি· পি· এম বলছেন বাংলা কংগ্রেস জোতদারদের দালাল, বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে মিনিফ্রন্ট গড়তে চায়, তাই তারা অযথা সি· পি· এম-এর কুৎসা রটাচ্ছে। বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের পক্ষে আন্দোলন। পক্ষান্তরে বাংলা কংগ্রেসের বক্তব্য সি· পি· এমই ফ্রন্ট ভাঙতে চায়, দেশে অরাজকতা, হত্যা, শরিকী সংঘর্ষ সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী সি· পি· এম। সি· পি· এম প্রশাসনকে রাজনৈতিক স্বার্থে, নিজেদের দলীয় স্বার্থে প্রয়োগ করছে, কাজেই সি· পি· এম-এর নীতি বদল না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রাম চলবে।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের এই প্রবল সংকট, দুই শরিকের উৎকট দ্বন্দ্ব, এই সবের ভেতর দিয়ে ১৯৬৯ সাল কেটে গিয়ে ১৯৭০-এর আবির্ভাব ঘটছে। যে প্রত্যাশা নিয়ে আজ থেকে ন' মাস আগে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টি হয়েছিল, সে প্রত্যাশার অবলুপ্তি ঘটেছে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে। যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তি আজ ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও একটা বিষয় কিন্তু খুবই অদ্ভুত যে, ঠিক এই মুহূর্তে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেবার ঝুঁকিও কেউ নিতে চাচ্ছেন না। তার কারণ যে পক্ষই তা নিন না কেন, তার দ্বারা অপর পক্ষকে শহীদ হতে সাহায্য করা হবে নিজেদের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে। এ ঝুঁকি খুবই মারাত্মক হবে। কাজেই যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে চলছে এবং চলবে, কিন্তু আমাদের আশংকা, তার ভাবমূর্তি যেভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে কি না।

(২৭-১২-৬৯)

**১৯৬৯** সালে ভারত-ইতিহাসের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কংগ্রেস দলের রূপান্তর। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান আধার। দেশের সকল মত এবং পথের মুক্তিযোদ্ধারা কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে অবিরাম এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও কংগ্রেসের সেই প্ল্যাটফরম চরিত্র মোটামুটি বজায় ছিল। স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী নেতার অভাব কখনও ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, কংগ্রেস সংগঠনটি তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। কারণ তাঁদের হাতেই ছিল অর্থভাণ্ডার। কংগ্রেসের নামে ধনিক-বণিকদের কাছ থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করা হত, সেটা বিলি-বণ্টন করতেন এই দক্ষিণপন্থী নেতারাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তায় দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও, দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব গায়ের জোরেই তাঁকে সেই পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তাঁদের অজুহাত হয়েছিল, নেতাজী অহিংসার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা পোষণ করেন না। কাজেই তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি রাখা যায় না। অর্থাৎ কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যরা যাঁকেই সভাপতি নির্বাচিত করুন না কেন, প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী নেতারা অনুমোদন না করলে তিনি সভাপতির আসনে বসতে পারবেন না। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেস বাহ্যত একটি প্ল্যাটফরম বলে প্রতীয়মাণ হলেও আসলে এটা দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল পার্টি ছিল।

নেতাজীর অবর্তমানে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের প্রতিভূ হয়ে ওঠেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কংগ্রেস সংগঠনে তাঁর কোন কর্তৃত্ব না থাকলেও, অসাধারণ জনপ্রিয়তায় তিনি কংগ্রেসকে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গুরুতর গলদের ফলে এদেশে ৭৫টি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রায় রাতারাতি হাজার হাজার কোটি টাকার কারবারের মালিক হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে একচেটিয়া কারবারের ঝোঁক দেখা দেয়। বাণিজ্য-জগতের এই অসাধারণ সমৃদ্ধির ঢেউ কংগ্রেস সংগঠনেও পৌঁছে যায় এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নেহরুর জীবিতকালেই তারা চীনা আক্রমণের সুযোগে তাঁর নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করেছিল। নেহরু সে আঘাত সামলে নিয়েছিলেন এবং পাল্টা আঘাত (কামরাজ পরিকল্পনা) হেনেছিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর পরমায়ু শেষ হয়ে যায়। রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীরা তখন মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে, কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষবশত সেটা সফল হয় নি। ক্ষমতা মধ্যপন্থীদের হাতেই থেকে যায়।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাতিল, কামরাজ, অতুল্য ঘোষ প্রমুখ বড় বড় নেতারা ধরাশায়ী হওয়ায় দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা আবার বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীকে মোরারজীর সংগে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে বাধ্য করেন। মোরারজী ধনিক-বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর সর্বপ্রকার প্রগতিশীল ব্যবস্থায় বাগড়া দিতে সুরু করেন। ইতিমধ্যে দু'টি উপনির্বাচনে পাতিল এবং কামরাজ আবার পার্লামেণ্টে ফিরে আসেন এবং তলে তলে ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা হতে থাকে। ডঃ জাকির হোসেনের আকস্মিক মৃত্যু তাঁদের সেই সুযোগ এনে দেয়। তাঁরা সঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতি করে তাঁর মারফৎ ইন্দিরাকে হটাবার মতলব আঁটেন। ইন্দিরা গান্ধী সেই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে বড় বড় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করে মোরারজীকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে গেল গেল রব ওঠে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সঞ্জীব রেড্ডির শোচনীয় পরাজয় ঘটায় তাঁরা আবার হতমান হয়ে পড়েন। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, কংগ্রেসকে প্ল্যাটফরম রেখে নিজেদের মতলব হাসিল করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন তাঁরা কংগ্রেসকে দক্ষিণপন্থীদের একদলীয় সংগঠনে পরিণত করবার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের বিতাড়নের আয়োজন করতে থাকেন। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে এ-আই-সি-সি'র অধিকাংশ সদস্য নিজলিঙ্গাপ্পাকে কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে হটাবার জন্য তলবী সভা ডেকে তাঁকে বিদায় দেন। অপর দিকে নিজলিঙ্গাপ্পার সাঙ্গোপাঙ্গরা (সিণ্ডিকেট নামে পরিচিত) প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ নেতাদেরও 'কংগ্রেস' থেকে 'বহিষ্কার' করেন। অর্থাৎ এক কংগ্রেস ভেঙে দু'টি পৃথক সংগঠন তৈরি হয়। একটির নেতা ইন্দিরা, চ্যবন, জগজীবন রাম, ফকরুদ্দীন আলী আমেদ প্রমুখ নেতারা। অপরটির নেতা পাতিল, মোরারজী, অতুল্য ঘোষ, কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পা প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতারা। দুই পক্ষই দাবি করেছেন যে, কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য তাঁদের দিকে আছেন। কিন্তু মাথা গুণতির হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর দলটাই ভারী মনে হয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের ওপর মোরারজীর দীর্ঘকালের প্রভুত্বের ফলে বিগত কয়েক বছরে গুজরাট নামক নবগঠিত রাজ্যের অসাধারণ বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত মোরারজীর জন্মস্থানও গুজরাটে। তাই মোরারজীর পদচ্যুতি সেখানকার স্বচ্ছল শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চার করেছে এবং তাঁরা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থটাকে প্রদেশের স্বার্থ হিসাবে প্রচারের সুযোগ পেয়েছেন। স্বভাবতই মোরারজীকে কেন্দ্র করে সেখানে সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সেখানেই তাঁদের বার্ষিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। সম্মেলনে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে প্রচুর জনসমাগম ঘটানো খুব কষ্টকর হয় নি। সেই কংগ্রেসে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের থিসিসের পুনরুক্তি করে নিজলিঙ্গাপ্পা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে "সোভিয়েট ক্রীড়নক" আখ্যা দিয়েছেন এবং ইন্দিরা গভর্নমেণ্টকে উল্টে দেবার সংকল্পও ঘোষণা করেছেন। নিজলিঙ্গাপ্পার বক্তৃতায় এমন ইঙ্গিত আছে যে, তাঁরা ইন্দোনেশিয়ার কায়দায় ভারতবর্ষে ক্যুপ ঘটাতেও পিছ-পা নন এবং ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁরা ড

স্কর্নের মত অবস্থায় নিয়ে যেতে চান। সম্মেলনের আগাগোড়া স্বর্গত নেহরু এবং তাঁর কন্যার বিরুদ্ধে অতি নিম্নস্তরের কুৎসা প্রচার করে দক্ষিণপন্থী নায়করা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বোঝা গেছে তাঁদের রুচি মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়। সংগে সংগে তাঁরা দক্ষিণপন্থী পার্টি-গুলোর সংগে কোয়ালিশনের প্রস্তাবও রেখেছেন। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁরা যে প্রস্তাব পাশ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁরা এই বিচ্যুতি সংশোধন করতে চান। বক্তারা যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে ভারতের পশ্চিম এশীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নীতিও তাঁদের পছন্দ-সই নয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধিদল ভারত সফরে আসায় তাঁদের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার করা হয়েছে। তাঁদের কথাবার্তা শুনে বেশ বোঝা গেছে যে, ভারতবর্ষকে তাঁরা পশ্চিমী গোষ্ঠীর লেজুড়ে পরিণত করতে চান। কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক নীতি অপছন্দ করে যাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে-ছিলেন, তাঁদের আবার কংগ্রেসে (সিণ্ডি-কেটী) ফিরে আসবার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাতে সাড়া দিয়ে আচার্য কৃপালনী গুজরাটের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস থেকে নেতাজী বিতাড়নের অন্যতম প্রধান চক্রী কৃপালনী সেখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন, সোসালিজমের গালভরা ফাঁকা আওয়াজ বন্ধ করে 'ল্যাসে ফেয়ার' নীতি চালু করা হোক। অর্থাৎ দেশে ধনিক-বণিক এবং কায়েমী স্বার্থ-বাদীসম্পন্ন শ্রেণীগুলোকে অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ দেওয়া হোক। সিণ্ডিকেটী কংগ্রেসটিকে সত্যিকারের দক্ষিণপন্থী, রক্ষণশীল এবং মার্কিন অনুগত পার্টিতে পরিণত করবার জন্য মাসানী এবং রঙ্গের সংগে সিণ্ডিকেট নেতাদের আলাপ-আলোচনা চলছে। জনসংঘের বাজপেয়ী এবং মাধোকের সংগেও যোগা-যোগ রক্ষা করা হচ্ছে। রাজাজীও বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছেন।

গুজরাট কংগ্রেসে (সিণ্ডকেটী) যে অর্থনৈতিক প্রস্তাব পাশ হয়েছে, তাতে সমাজতান্ত্রিক কর্মপন্থার গালভরা বুলি অনেক থাকলেও, দেশে একচেটিয়া কার-বারীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে অবলম্বন করা হয়েছে। ভূমি সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে প্রকৃত কৃষকের কোন লাভ হবে না। শুধু কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা হবে।

এককথায় বলা যায়, সিণ্ডিকেট-পন্থীরা কংগ্রেস সংগঠনটিকে রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থী এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অনুগত একটি পার্টিতে পরিণত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দলত্যাগীদের নিয়ে সেই ধরণের একটি পার্টি গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের সমস্ত প্রতি-ক্রিয়াপন্থীরা এখন সেখানে গিয়ে ভিড় জমাবার সুযোগ পাবেন এবং তার ফলে জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাও হয়ত শেষ হয়ে যেতে পারে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন দেশের খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছে, তখন এরকম কোন প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে। কারণ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। দেশের একচেটিয়া কারবারীরা এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অনুচররা উদার হস্তে যে অনুগ্রহ বিতরণ করছে, সেটা তো জলাঞ্জলি যেতে পারে না।

**জনসংঘের বার্ষিক সম্মেলন**

গুজরাটে কংগ্রেসের (সিণ্ডিকেটী) বার্ষিক সম্মেলনের পরই পাটনার চাণক্য-নগরে জনসংঘের বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা দলবেঁধে কংগ্রেস ত্যাগ করে আলাদা দল গঠন করায় (সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস) জনসংঘের নেতারা আশু ক্ষমতা লাভের বাসনায় উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা আশা করছেন, সিণ্ডিকেট দলত্যাগীদের সহা-য়তায় শীগ্‌গিরই ইন্দিরা গভর্নমেণ্টকে উল্টে দেবে। তারপরই সিণ্ডিকেট-জন-সংঘ-স্বতন্ত্র গ্র্যাণ্ড কোয়ালিশন হবে এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পাকা আমটি টুপ করে এসে পড়বে জনসংঘের মুখের মধ্যে। এই দুরাশা তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট আত্ম-প্রত্যয়ের সৃষ্টি করেছে। বাজপেয়ী সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে আমরাই এখন ভারসাম্য রক্ষা করছি। বর্তমানে আমা-দের লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটানো এবং কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করা।" দেখা যাচ্ছে সিণ্ডিকেট এবং জনসংঘের মধ্যে লক্ষ্যের কোন নেই। কাজেই তাদের মধ্যে কোয়ালি-শনের যথোপযুক্ত ভূমি তৈরি হয়েই আছে। সেই ভূমিটাকে আরও উর্বর করে তোলবার জন্য জনসংঘের ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে "জাতীয়তা-বাদী" এবং "গণতান্ত্রিক" শক্তিগুলোকে "কম্যুনিস্ট বিপদে"র ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন হবার আহবান জানিয়ে বলেছেন যে, তারা যেন প্রতিযোগিতার রাজ-নীতি পরিহার করে সহযোগিতার রাজ-নীতিতে সামিল হয়। এই আহ্বানের মূল লক্ষ্য যে সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস তাতে কোন সন্দেহ আছে কি?

সংঘের অর্থনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে "অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের আবির্ভাব অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর।" অর্থাৎ জনসংঘ দেশে ধনিক-বণিকদের অবাধ লুণ্ঠনের স্বাধীনতা দিতে চান। সেখানে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ জনসংঘ বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

জনসংঘের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কম্যুনিজম অতি জঘন্য তত্ত্ব। কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার অর্থ গণতন্ত্রের অবলুপ্তি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কম্যুনিজমের লক্ষ্যের মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পান না। তাদের সংগে তিনি অঘোষিত যুক্তফ্রণ্টে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধীকে "সোভিয়েটের ক্রীড়নক" বানিয়েছেন। জনসংঘ তাঁকে পুরোপুরি "কম্যুনিস্ট" বানিয়ে দিয়েছেন। দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এমন গভীর মতৈক্য বড় একটা নজরে পড়ে না। বোধ হয় সেই কারণেই জনসংঘ তাঁদের প্রতি প্রতিযোগিতার রাজনীতি ছেড়ে সহযোগিতার রাজ-নীতিতে আসতে বলেছেন। পাতিল-সাহেব এতদিন "সমমতাবলম্বীদের" সংগে কোয়ালিশন গঠনের জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। সমমতাবলম্বী কারা, সেটা অনেকেই তখন বুঝতে পারছিলেন না। এখন আর অস্পষ্ট রইল না। সঞ্জীব রেড্ডিকে জেতাবার জন্য নিজলিংগাপ্পা জনসংঘের সমর্থন চেয়েছিলেন বলে গুজব রটেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সেটা গুজব নয়, সত্যি ঘটনা।

আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জন-সংঘ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তাতে

ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয়করণের আহ্বান জানানো হয়েছে। আমরা এতকাল জানতাম ভারতে যিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন, তিনিই ভারতীয়। জনসংঘের প্রস্তাব দেখে মনে হচ্ছে, সেটা আমাদের ভুল ধারণা। ভারতের কোন নাগরিক (তিনি হিন্দুই হোন বা মুসলমানই হোন) যদি পাকিস্তান অথবা অপর কোন দেশের প্রতি অনুগত হন, তাহলে দেশবৈরী হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই দণ্ডনীয়। কিন্তু ভারতীয়কে ভারতীয়করণ হিন্দুকে হিন্দুকরণের মতই একটা আজগুবী তত্ত্ব নয় কি? মধোক বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা দেড় কোটি থেকে নেমে ৯৩ লক্ষয় এসে ঠেকেছে, অপরদিকে ভারতে মুসলমানের সংখ্যা তিন কোটি থেকে বেড়ে ৬ কোটি হয়েছে। তার থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান হিন্দুদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে. কিন্তু ভারতে মুসলমানরা অন্যান্য নাগরিকদের মত সুখে দুঃখে বেড়ে উঠছেন। এই চিত্র ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেরই গৌরব বহন করছে নাকি? পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া খুবই দুঃখের ঘটনা এবং সেজন্য পাকিস্তান নিশ্চয়ই নিন্দনীয়, কিন্তু তাতে ভারতীয় মুসলমানদের অগ্রগতিতে আপত্তি করবার কি আছে?

### বোম্বাইতে কংগ্রেসের (তরুণী সত্যপন্থীদের) অধিবেশন

বোম্বাইতে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। কাজেই তার বিস্তারিত বিবরণ এ সপ্তাহে দেওয়া সম্ভব হবে না। তবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যে ভাষণ দিয়েছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, গরীবের স্বার্থে সমাজে সাম্য এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নমেণ্ট সম্পত্তিবিষয়ক আইন, এমন কি সম্পত্তিবিষয়ক মৌলিক অধিকারও সংশোধন করতে ইতস্তত করবেন না। তিনি বলেছেন, বড়লোকের যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকার আছে, গরীব লোকেরও তেমনি সম্পত্তি অর্জনের অধিকার আছে। আইন অপরিবর্তনীয় নয়। কোন একটি আইন চিরকালের জন্য অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকতে পারে না। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য আইন-কানুনেরও রূপান্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেছেন, দেশের সর্বহারা এবং দরিদ্র জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের হাত থেকে বাঁচতে হলে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গভর্নমেণ্ট একচেটিয়া কারবারের সম্প্রসারণ রোধ করতে বদ্ধপরিকর, তবে বে-সরকারী শিল্পোদ্যোগ বন্ধের কোন ইচ্ছা গভর্নমেণ্টের নেই। কিন্তু বে-সরকারী শিল্পোদ্যোগ ক্ষুদ্র শিল্পেই সীমাবদ্ধ করা হবে। ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই দেশের অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা হবে। কারণ, দেখা গেছে সরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত বড় বড় শিল্প গঠন করা হয়েছে, তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমৃদ্ধি বাড়ে নি এবং সরকারি শিল্পোদ্যোগ ছোট ছোট শিল্পের সম্প্রসারণেও সহায়তা করে নি।

—(২৭-১২-৬৯)

## নববর্ষ---

মরক্কোর রাজধানী রাবাতে তিন দিন ধরে আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের এটা হল পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলন। দু বৎসর আগে খার্তুমে চতুর্থ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এবারের শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আব্দুল গামেল নাসের। উদ্দেশ্য : ইজরায়েলের হাত থেকে অধিকৃত আরবভূমি দখলের জন্য চরম সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্রের সংস্থান।

১৯৬৭-র জুন মাসে ইজরায়েলী আক্রমণ ও বিস্তীর্ণ আরবভূমি দখলের পর আড়াই বৎসর কেটে গেছে। মিশর, জর্ডান, সিরিয়ার অনেকখানি জায়গা ইজরায়েল জোর করে নিজের দখলে রেখেছে। জেরুজালেমের সবটা ইজরায়েলের অন্তর্ভুক্ত করেছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এক ইঞ্চি জমিও ইজরায়েল ফেরত দেয় নি। আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি হলেও, ইজরায়েলী আক্রমণ লেগেই আছে।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রেরিত গান্নার জারিং-এর শান্তি মিশন উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন শান্তিসূত্র বের করতে পারেন নি। নিরাপত্তা পরিষদের সকল প্রস্তাব ইজরায়েল অগ্রাহ্য করেছে। আরব নেতারা বুঝে নিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইজরায়েলের কাছ থেকে সূচাগ্র মেদিনী পাওয়া যাবে না। তাই 'আল ফাতা'র মত গেরিলা বাহিনী তৈরি হয়েছে, শুরু হয়েছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। নাসেরের নেতৃত্বে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র ইজরায়েলের সঙ্গে সম্মুখ সমরের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে। শান্তির সন্ধান শেষ হয়েছে, এবার যুদ্ধ শুরু করতে হবে, এই হল তাদের মনোভাব। সকল আরব রাষ্ট্র মিলিতভাবে যাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে, তার জন্যই এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন।

কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সৌদি আরবের রাজা ফয়জালের নেতৃত্বে একদল মনে করে, এখনই যুদ্ধ শুরু করার কোন প্রয়োজন নেই, আপোষ-আলোচনা চলতে থাকুক। তাঁরা আরও বেশি সৈন্য ও অস্ত্র দিতে রাজী নয়। রাজা ফয়জাল বা কুয়াইত-এর রাজা আমির সাবার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খুব স্পষ্ট। তাই এ'রা ইজরায়েলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যেতে চান না। যতটা পারেন এড়িয়ে চলতে চান। আলজিরিয়ার হুয়ারি বুমেদিয়ান প্রগতিশীল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রভাব তাঁর ওপর নেই। কিন্তু তিনিও এই মুহূর্তে যুদ্ধ চান না। কারণ, যুদ্ধের জন্য যদি আলজিরিয়াকে আরও বেশি অর্থ দিতে হয়, তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে এই মতভেদের ফলে শীর্ষ সম্মেলন আহবান করে

আব্দুল গামেল নাসের

আদৌ কোন লাভ আছে কি না, এই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। অনেকেই আসতে চান নি। তবু শেষ পর্যন্ত সম্মেলন বসেছিল। কিন্তু শীর্ষ সম্মেলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা নাসের নিজেই এ কথা বলেছেন। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের অনীহা দেখে নাসের এত চটে গিয়েছিলেন যে, একবার তিনি রেগে বৈঠক ত্যাগ করে চলে যান। পরে অবশ্য তিনি আবার ফিরে আসেন। তবে তিনি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বলেন : আমাদের স্বীকার করা উচিত, এই সম্মেলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি নুরুদ্দিন আটাসি ও ইরাকের রাষ্ট্রপতি হাসান বকর এমনিতেই সম্মেলনে আসেন নি। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, এই সম্মেলনে কিছু হবে না। শেষদিনের বৈঠকে সিরিয়া, ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেনের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি আবদুল রহমানও ইরিয়ানিও শেষ বৈঠকে যোগ দেন নি।

সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই জাতীয় সম্মেলন শেষে একটি যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। এই প্রথম, আরব শীর্ষ সম্মেলনের পক্ষ থেকে কোন ইস্তাহার প্রকাশ করা হল না। সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন, কোন একটি বিষয়েও রাষ্ট্রপ্রধানরা একমত হতে পারেন নি। সম্মেলনের বাইরে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা মতৈক্য প্রতিষ্ঠার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয় নি।

সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন প্রভৃতি নাসেরের পক্ষে থাকলেও অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র ইজরায়েল সম্পর্কে কিছুটা নরম নীতি গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। অন্তত, কোন বড় যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে তারা রাজী নয়। ফয়জাল আর আমির সাবা তো সাফ বলে দিয়েছেন, তাঁদের তেলের টাকা তাঁরা যুদ্ধের জন্য দেবেন না।

পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, আরব জগতের নেতৃত্ব নিয়ে নাসেরের ও ফয়জালের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, রাবাত শীর্ষ সম্মেলনে তা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আরব জনগণের ব্যাপক অংশ নাসেরের পক্ষে থাকলেও, অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রপ্রধান নানা কারণে নাসেরনীতির সমর্থনে এগিয়ে আসেন নি। তাই বলে তাঁরা যে সবাই ফয়জালের সমর্থক, তাও নয়।

নাসেরও সম্ভবত আগেই বুঝেছিলেন, অন্য আরব রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। তাই তিনি আগে থাকতেই সোভিয়েট য়ুনিয়নে এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন। নাসেরের দক্ষিণহস্তরূপে পরিচিত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি আনওয়ার সাদাতের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ রিয়াদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মহম্মদ ফৌজি। এ'রা সোভিয়েট নেতৃবর্গ

কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ও রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর প্রধান নিকোলাই পডগরনির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ আলোচনা শেষে ঘোষণা করেছেন, ইজরায়েলী আক্রমণের বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামে তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। রাবাত সম্মেলনের পরে তাঁরা সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়েও একটি বিবৃতি দিয়েছেন। প্রকাশ্য বিবৃতিতে সমর্থনের বিস্তৃত বিবরণ না থাকলেও, পর্যবেক্ষকদের ধারণা, আরও বেশি অস্ত্র দিতে সোভিয়েট য়ুনিয়ন রাজী হয়েছে।

এই অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে সোভিয়েট সমর্থনের ওপর ভরসা করে, নাসের এখন সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। একদল পর্যবেক্ষক অবশ্য বলছেন, সোভিয়েট য়ুনিয়ন সাহায্যের সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনই যুদ্ধ শুরু করার পক্ষে মত দেন নি। ওয়াশিংটনে যে চতুঃশক্তি বৈঠক চলছে, তার ওপর তাদের ভরসা আছে। যদি একটা মীমাংসাসূত্র বের হয় এবং উভয় পক্ষকে রাজী করানো যায়, তবে যুদ্ধের প্রয়োজন কি?

রাবাত থেকে আরও একজন নিরাশ হয়ে ফিরেছেন। তিনি 'আল ফাতা' গেরিলা বাহিনীর প্রধান ইয়াসের আরাফাত। সম্মেলন শেষে তিনি বলেছেন, তাঁরা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।

### শান্তির জন্য পোপের আহ্বান

খৃস্টজন্মদিবস বড়দিনে পোপ ভ্যাটিকান তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কাছে ভাষণ দিতে গিয়ে বিশ্বে শান্তিস্থাপনের ওপর জোর দিয়েছেন। ভিয়েতনাম, নাইজিরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য, এই তিনটি প্রধান অশান্তির উল্লেখ করে পোপ বলেছেন, যেভাবেই হোক যুদ্ধের অবসান ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিশ্বের নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক নেতার ওপর ক্যাথলিক ধর্মসংঘের প্রধান পোপের প্রভাব কম নয়। ইতিপূর্বেও পোপ শান্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়েছেন। সমস্যা অবশ্যই কেবল ধর্ম ও বিবেকের নয়, তথাপি পোপের নেতৃত্বে
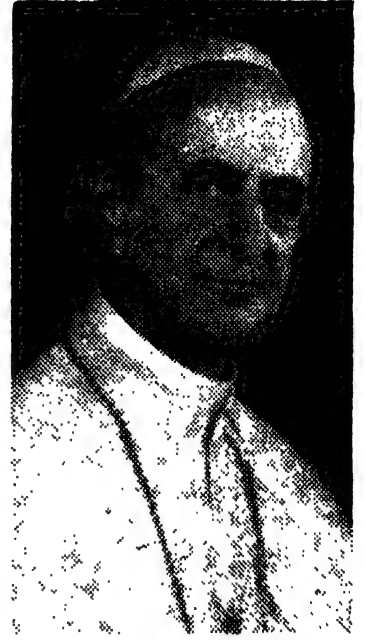
পোপ পল

এক বৃহৎ ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিস্থাপনের পক্ষে জনমত গড়ে উঠলে তার কিছুটা প্রভাব যুদ্ধবাদীদের ওপর পড়তে বাধ্য।

(২৮।১২।৬৯)

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

পাঠকরা আমাদের উনিশ শতকের মধ্যপর্ব সম্বন্ধে অবহিত আছেন,—সেদিন আনন্দর এই কথাটার বিশেষ ইঙ্গিত কী ছিল, তা ঠিক সেই মুহূর্তেই বিশেষভাবে আমার মনে পড়ে নি বটে, কিন্তু পরে একথা বার বার মনে উঁকি দিয়ে গেছে। উনিশ শতকের শুধু মধ্যপর্ব কেন,—তার আদি এবং অন্ত্য পর্বও তো ঘটনাবহুল। শিক্ষা, সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রশাসনের চিন্তা, ধর্মের আন্দোলন, শিল্পকলার প্রতি মনোযোগ—এই সব বিভিন্ন ব্যাপারে উনিশ শতকের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে পাঠকরা তো আগ্রহী আছেন বটেই। কিন্তু সাধারণভাবে সেই সাধারণ আগ্রহের ওপর ভরসা রেখে সত্যিকার স্মরণযোগ্য বাংলা বই-বাছাই যে সহজ নয়,—আনন্দর কথা-মতন অক্ষয়কুমার দত্তের প্রসঙ্গে মনকে এগুতে দিয়েও,—সেই কঠিন দ্বিধা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হোলো না।

কারণ, বড়ো বড়ো চিন্তার ফলে ভাল ভাল বই দেখা দিতে পারে,—এ কথা অবিশ্বাস্য নয়,—কিন্তু খ্রীস্টান-চিন্তা, ব্রাহ্ম-চিন্তা বা হিন্দু-চিন্তা,—এরকম কোনো গুরুভার চিন্তার পর্যায়ভেদ বা স্তরভেদ ধরেই কি আমাদের সাহিত্যের ধারায় স্বাদু, মনোরম, উপভোগ্য বই দেখা দিয়েছে? অনেক পরিশ্রম জমা হয়েছে বটে,—ভাল-মন্দ-মাঝারি নানান বই লেখা হয়েছে ঠিকই,—কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রের অর্থাৎ জ্ঞানের বিশেষ কোনো শাখার চর্চার ভাল-মন্দ-মাঝারি সবরকম বইয়ের তালিকা দেখে যাওয়া তো অন্য ব্যাপার। আমরা কি চিন্তাতরঙ্গিণী জরীপ করতে বসেছি?

বললাম—আনন্দ, আমার দ্বিধা দূর্মর। অক্ষয়কুমার দত্ত আমাদের আলোচ্য সময়ের স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নেই। তাঁর একাধিক বই আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর আয়ুষ্কাল যে ১৮২০ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত, তাও মনে পড়ছে। মনে পড়ছে নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের 'অক্ষয়-চরিত' (ভাদ্র ১২৯৪) বইখানি থেকেই ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় অক্ষয়কুমারের কথা শুরু করেছিলেন। পূর্বস্থলীর কাছা-কাছি চুপী গ্রামে অক্ষয়কুমারের প্রপিতা-মহ প্রথম বাস আরম্ভ করেন। অক্ষয়-কুমারের পিতা ছিলেন পীতাম্বর দত্ত,—জননীর নাম দয়াময়ী। শৈশবে অক্ষয়কুমার ফার্শী এবং সংস্কৃত, দুই ভাষারই পাঠ নিয়েছেন। যখন তাঁর বছর-নয়েক বয়স হয়, তখন খিদিরপুরে এসে তখনকার দুই প্রসিদ্ধ শিক্ষকের কাছে তাঁর ইংরেজি অধ্যয়ন শুরু হয়। তারপর তিনি এক পাদরী-সাহেবের কাছে পড়েন এবং কতকটা তাঁর প্রভাবেও গিয়ে পড়েন। অতঃপর গৌরমোহন আঢ্যের ইস্কুলের কর্তৃস্থানীয় এক সাহেব—হার্ডম্যান জেফ্রয়—তাঁকে গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু এবং জার্মান ভাষা শিখিয়ে-ছিলেন কিছুদিন। অক্ষয়কুমার কিন্তু ছাত্র ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির। বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। এইসব প্রবণতার মধ্যেই মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়—উনিশ বছর বয়সে পিতা পীতাম্বরের মৃত্যু হয়। এরকম দুর্ভাগ্যময়ী ঘটনায় আমাকে যেন বিহ্বল করে দেয়।

পীতাম্বর নিজে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হরমোহন দত্তকে মানুষ করেন। আবার, হরমোহন হন অক্ষয়কুমারের অভিভাবক। হরমোহনের সঙ্গে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বন্ধুত্ব ছিল। গুপ্ত কবির সঙ্গে এই-সূত্রেই অক্ষয়কুমারেরও বন্ধুত্ব হয়। বোধ হয়, সেই প্রভাবেই অক্ষয়কুমার কয়েকটি কবিতা লেখেন। তাঁর সেই কবিতার বই 'অনঙ্গমোহন' কি একালের পাঠকরা কেউ মনে রেখেছেন? বাংলা বইয়ের সেই উনিশ শতকী মধ্যপর্বে,—অক্ষয়কুমারের বইগুলিতে অক্ষয়কুমারের এই ব্যক্তি-জীবনের খবর প্রায় নিশ্চিহ্ন।

ব্রাহ্ম-চিন্তা আর বিজ্ঞান-চিন্তা—এই দুই চিন্তার সূত্রেই অক্ষয়কুমারকে আজ-কাল আমাদের মনে রাখতে হয়। তাঁর বইয়ের কথা ভাবতে গেলে প্রসিদ্ধ 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' [১৮৫১-৫৩] কিংবা 'চারুপাঠ' [১৮৫৩-৫৯], কিংবা 'ধর্মনীতি' [১৮৫৬] বা 'পদার্থবিদ্যা' [১৮৫৬] অথবা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' [১৮৭০-৮৩]—এই সব বিখ্যাত বইয়ের কথাই মনে পড়ে। লোকটি যে চিন্তা-শীল ছিলেন, সে তো সকলেই জানেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বন্ধুত্বে, হরমোহন দত্তের স্নেহে,—ছেলেবেলার মাস্টার সেই পাদ্রী-সাহেবের প্রভাবে তাঁর মন যে কতোদূর আকৃষ্ট হয়েছিল, সে সব বৃত্তান্ত কি তাঁর ঐ সব বইয়ের মধ্যে সোজাসুজি পাওয়া যাবে?

আনন্দ বললে—তিনি যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক হয়েছিলেন, সেও তাঁর সম্বন্ধে একটি দরকারী খবর। ঈশ্বর গুপ্তই তাঁকে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা সেটি। দেবেন্দ্র-নাথের 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'-র (১৮৩৯, সেপ্টেম্বর) নাম বদলে হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। ঐ বছরের শেষদিকে ২৫-এ ডিসেম্বর ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবেই অক্ষয়-কুমার ঐ সভার সভ্য হন। রামমোহনের দেশজাগৃতির চিন্তা কতোটা দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে বর্তেছিল,—দেবেন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী অক্ষয়কুমার বা ঈশ্বর গুপ্ত সে-চিন্তা নিজের নিজের রচনায় কতোটা রেখে যেতে পেরেছেন,—সেই ধারাটা খুঁটিয়ে দেখতে হলে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের রচনা মিলিয়ে দেখবার ইচ্ছে হয়। বই-বাছাইয়ের কাজে এও একরকম সূত্র-নিরীক্ষণ! যদি তাঁর ব্যক্তিমনের খবর খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, [illegible]

ইচ্ছেটা মোটেই অন্যায় নয়,—কিন্তু বই-বাছাই তো মনোনিরীক্ষা নয় শুধু,—বইয়ের নিজস্ব গতিই কি যথেষ্ট নয়?

আমি বললুম—ঈশ্বর গুপ্তের বন্ধু, অক্ষয়কুমার 'প্রভাকর'-সম্পাদকের একটি ইচ্ছে জানিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসুকে। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় সেই চিঠির কথা তুলে দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ। সেই লাইনগুলি পড়ে শোনাতে চাই।

চিঠির অংশটুকু পড়লুম অতঃপর—

প্রভাকর সম্পাদক আপনাকে একটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের সংবাদগুলি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ হইবেন, এবং আপনার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিবেন। ঝক্‌ড়া, মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্বনাশের ব্যাপার আছে, সকলই লিখিয়া দিবেন। বাস্তবিক দেখিবেন, লিখিতে হইলে মনুষ্যের অমঙ্গল সমাচারই অধিক লিখিতে হইবে। এই সকলই লোকের কার্য। ইহাই মর্ত্যলোকের স্বরূপ। এ লোকে আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা!

আনন্দ বললে—এ চিঠির ইংগিত কী?

—ইঙ্গিত এই যে ১২৫৭ সালে,—অর্থাৎ ১৮৪০ খৃীস্টাব্দে, লেখা অক্ষয়কুমারের এই চিঠিতে মর্ত্যলোকের দুঃখের ধারণাটা এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁর যে তখন মাত্র কুড়ি বছর বয়স, সেটা বোঝাই যায় না। কেমন যেন অতিরিক্ত রকম গম্ভীর মনে হয় এসব কথা। কেমন যেন অকালদীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়!

আনন্দ বললে—এ তোমার ছেলে-মানুষী মাত্র! অক্ষয় দত্তের বই কি তোমার ভাল লাগে না?

আমি বললুম—বাঁচালে এই ভাল-লাগার কথা তুলে। সত্যিই আমার ভাল লাগে না। কারণ—বোধ হয়, আমার মনটাই নাবালক। ছেলেমানুষের মুখে বড়ো বড়ো দুঃখের কথা আমার কিছুতেই ভাল লাগে না। এই ব্যাপারটাই আমার কাছে কৃত্রিম মনে হয়।—কিন্তু কোনো পাঠকের মনে আমি আঘাত করলুম না তো?—তুমি এরকম প্রশ্ন আমাকে কেন যে জিগেস করো, আনন্দ?

আবার শব্দ করে হেসে উঠলো আনন্দ। বললে—অল্প বয়সে কি কেউ ভাবুক হয় না? বয়স কম থাকলেই কি সব সময়ে লাফিয়ে বেড়াতে হবে? সংসার কি খুব সুখের জায়গা? খুন-জখম-রাহাজানির খবর চাপা দিতে না চাওয়াটা কি একজন সাংবাদিকের বন্ধুর পক্ষে সত্যিই অন্যায়?

তার এই একরাশ প্রশ্নের জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল না আমার। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে একখানি বই খুঁজেছিলুম।

আনন্দ বললে—কী খুঁজছো?

—নাটক।

—হঠাৎ অক্ষয় দত্তের কথা থেকে নাটকের কথায় কেন?

—দুঃখের কথা যে হাসতে হাসতেও বলা যায়, তারই প্রায় সমকালীন একটা উদাহরণ খুঁজছি।

—কোন্ নাটকে তা আছে? মধুসূদনের প্রহসনগুলি তো অক্ষয়-রাজনারায়ণ পত্র-বিনিময়ের আরো অনেক পরের ঘটনা।

—না, আরো আগের নাটক খুঁজছি।

—বেশ তো, নাটকের ধারাটাই দেখে নেওয়া যাক্ তাহলে। আজকাল বাংলা নাটক লেখাও হচ্ছে,—অভিনয়ের চর্চাও বেড়েছে,—অধ্যাপকরাও অনেকেই বাংলা নাটকের কথা লিখছেন।

এই বলে, সে যেন উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতা দিতে লাগলো—

১৩৬২ সালের ২৫-এ বৈশাখ অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম প্রকাশিত হয়,—১৩৬৭ (কার্তিক-সংক্রান্তি) সালে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়—এবং ১৩৭৪ (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) সালে প্রকাশিত হয় তৃতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে ১৮৫২ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মোট একশ বছরের বাংলা নাট্যধারা গৃহীত হয়; তারপর দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বগ্রন্থের অতিরিক্ত দুটি অধ্যায়ে 'অনুবাদ-নাটক' এবং 'নাট্যশালা' সম্বন্ধে আলোচনা যুক্ত হয়—এবং বইখানি দু'টি খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। আদি অবস্থা থেকে উনিশ শতকের শেষ অবধি ছিল প্রথম খণ্ডের বিস্তার। গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার দল ছিলেন এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে আমাদের শতকের প্রথম ষাট বছর—অর্থাৎ ১৯০০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বাংলা নাট্যপ্রয়াসের আলোচনা জায়গা পায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের 'নিবেদন' অংশে আশুবাবু সমসাময়িক নাট্য-সমালোচকদের মধ্যে ডক্টর অজিত-কুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতি-হাস' (দ্বিতীয় সংস্করণ) বইখানির,—ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্যের বিভিন্ন সন্দর্ভ—এবং ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার' বইখানির উল্লেখ করেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় সংস্করণ) সম্পাদনায় যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে—পূর্বোক্ত 'নিবেদন' অংশে শ্রীজয়ন্তকুমার গোস্বামী, শ্রীবিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শ্রীগোপাল বন্দ্যো-পাধ্যায় সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্তির উল্লেখ ছিল। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন যথাক্রমে এই বইয়ের 'বিবিধ নাট্যকার',—'অনুবাদ নাটক',—'নাট্যশালা' অধ্যায়গুলি রচনার কাজে 'সর্ববিধ সাহায্য' করেন—এবং শেষোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃতলাল বসুর একটি নাটক বিষয়ে আলোচনায় সাহায্য' করেছিলেন।

তৃতীয় সংস্করণে বইখানির আরো কলেবরবৃদ্ধি ঘটে—এবং খণ্ড-বিভাগেরও পুনরায়োজন স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড এইবার পৃথক দুটি খণ্ডে পরিণত হয়—

'প্রথম হইতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ভাগ এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রধানত ১৯০০ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। অর্থাৎ সাধারণভাবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে-যুগকে আদিযুগ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং যাহাকে মধ্যযুগ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।' কলেবরবৃদ্ধির কারণ—কয়েকটি নতুন অধ্যায়-সংযোজন—ইহার প্রথম ভাগে দুইটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় সংযুক্ত করা হইয়াছে—একটির বিষয় গেরাসিম লেবেডেফ এবং আর একটির বিষয় উমেশচন্দ্র মিত্র।' দ্বিতীয় খণ্ডে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা আরো বেড়ে যায়,—অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৭৬—১৯০০) সম্বন্ধে একটি অধ্যায় যোগ করা হয়,—তাছাড়া 'পরিশিষ্ট' অংশেও নতুন সংযোজনা দেখা দেয়।

আমি বললুম—আনন্দ, আমি বইখানি খুঁজে পেয়েছি। বাংলা নাটকের ধারা সম্বন্ধে এতক্ষণ তুমি যা বললে, তা আমি শুনতে পাই নি। অক্ষয় দত্ত মাত্র কুড়ি বছর বয়সে মর্তের দুঃখকষ্ট দেখে হাহাকার করেছিলেন যেভাবে, সে ভাবটা আমার পছন্দ হয় না। সেই গাম্ভীর্য আর দীর্ঘশ্বাসের কয়েক বছর পরে নাটকের পাত্রে রামনারায়ণ যা পরিবেশন করে-ছিলেন, আমি সেই কথাগুলিই খুঁজে-ছিলুম। পেয়েছি,—শোনো এবার।

[ক্রমশ]

**কায়িকশ্রম**

এমন একদিন নাকি ছিল, যখন বাংলা দেশের যুবকরা কায়িকশ্রমের চাকরি নিতে রাজী হতেন না। এখন অবশ্য চাকরির বাজারে ভয়ানক মন্দা। যেদিকে তাকাই সেদিকে বেকারের দল। সেদিন একটি উৎসবে দেখলাম, কিছু বেকার মিলে খুলেছে একটি 'বেকার স্টল'। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে খুশি হওয়া যায়। তবু দুর্ভাগ্যের কথা, তাদের স্টলে খুব বেশি ভিড় হয় নি। কারণ তাদের স্টলে চোখ ধাঁধানো রঙ-চঙের বাহার ছিল না। তবে ক্রেতাদের তারা কোথাও ফাঁকি দেয় নি।

বেকার যুবকদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাময়িক হলেও অভিনন্দনযোগ্য।

পারিবারিক অর্থসংকটে পড়ে আমাদের ঘরের মা-বোনেরাও এখন চাকরির জন্যে হন্যে হচ্ছেন। লেখাপড়া জানলেই এযুগে ভালো চাকরি পাওয়া যায় না। তাই সম্মান বাঁচিয়ে শ্রমমূলক চাকরি নিতে তাঁদের আপত্তি নেই।

দক্ষিণ শহরতলীর একটি ডাকঘরে, সেদিন দেখলাম, ক'জন বোন চাকরি করছেন। তাঁরা মোমবাতি জ্বালিয়ে গালা গলিয়ে কখনো শীলমোহর দিচ্ছেন, কখনো-বা ভর্তি মেল ব্যাগ নিজেরা তুলে নিয়ে মেল ভ্যানে ওঠাচ্ছেন।

বেঁচে থাকাই যে সময় বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন এই ধরণের কায়িকশ্রমের কাজ ঢের বেশি সম্মানজনক—কিন্তু এ ধরণের কাজই বা ক'জন পাচ্ছেন?

**অসহায় বুদ্ধিজীবীর ভাগ্য**

আমাদের জনৈক সহকর্মী তাঁর কাছে লেখা চাকরিতে অবসরপ্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট কবির একটি চিঠি পড়ে শোনালেন। চিঠির কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। কারণ একালের বুদ্ধিজীবীদের প্রাণধারণের সমস্যাও তাতে কিছুটা ব্যক্ত হয়েছে।

আমার দুপুরে কোনো চাকরি জোটে নি। আপনি একটু চেষ্টা না করলে হবে না। আমাকে যা করতে বলবেন করবো। খুব অসুবিধার মধ্যে আছি। মাত্র ৮৪ টাকা পেনশন, সেটা গ্র্যান্ট হতেও তিন মাস দেরি। হলেও দুটো টিউশনির টাকার মতো। অভাব যা তা থেকেই যাবে! নিজের জন্যে বলতে হচ্ছে বলে আমি সংকোচ বোধ করছি। কিন্তু কুমারসম্ভবের শ্লোক মনে পড়ছে—

'স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে॥'

বন্ধুর কাছে দুঃখের কথা বলতে গেলে আপনা থেকেই মনের কবাট খুলে যায়।

"আর কলকাতা মহানগরী মণিময়ী। তার জাদুর জানালা খুলবে না আমাদের জন্যে কোনোদিনই, পথে পথে রাত কাটালেও না। তবু যে কটা দিন বাঁচি, প্রাণধারণের ব্যবস্থা করতেই হয়। কিন্তু কেমন করে তা করা যায় যদি তা জানতাম! অসহায় বুদ্ধিজীবীর ভাগ্য অতি দুঃখজনক।"

**WATGUNG LABOUR SHED/ CORPORATION OF CALCUTTA:**

খিদিরপুরের পান বাজারের কাছে গেলেই আপনি সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে মোছা-মোছা ঐ পঙক্তিগুলি দেখতে পাবেন। নিচে লেখা নির্দেশগুলিও কৌতুককর। যেমন, কোনো ছোঁয়াচে রোগী সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না কিংবা মলমূত্র ত্যাগ করতে পারবে না। ইংরেজীর হুবহু অর্থ যাই হোক ব্যঞ্জনায় ঐ অর্থই প্রকাশ করে। (আরো আশ্চর্য, শ্রমিকদের জন্য ইংরেজীতে লেখা সাইন বোর্ড!)

কিন্তু ওয়াটগঞ্জ লেবার শেড সত্যি কি শ্রমিকদের জন্য না, সেটা ক্যাটল শেড। দেখলে মনে হয়, সেখানে মানুষ দু'দণ্ড দাঁড়াতে পারে না। আর শ্রমিকদের জন্য যদি ঐ 'শেড' হয় তাহলে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মানুষ বলে মনে করেন না।

পরিবর্তন নাকি অনেক দিকেই অনেক কিছু হয়েছে। পৌরসভার কাজকর্ম বোধ হয় মান্ধাতার আমলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে—তা নইলে লেবার শেডের ঐ দশা হয়!

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ক্রীড়ানৈপুণ্যে ভারতীয় জনসাধারণকে এবার হতাশ করলেও, তাদের উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছেন ঈগল ভ্যাকুয়াম বটল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং। ঐ কোম্পানীর মার্কেটিং ম্যানেজার শ্রী আর চিনয় সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন তাঁদের উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য এবার তাঁরা কলকাতা ক্রিকেট টেস্টের ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান শ্রী এন· বিশ্বনাথন, শ্রেষ্ঠ বোলার বিষেণ সিং বেদী এবং শ্রেষ্ঠ ফিলড্সম্যান সোলকারের প্রত্যেককে একটি করে 'সলিড সিলভার ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক' এবং নগদ পাঁচ শত টাকা উপহার দিয়েছেন।

যে টীম রাবার পাবে, সে টীমের প্রত্যেকেই পাবেন ঐ ফ্লাস্ক।

ঐ ধরণের পুরস্কার হকি টীমকেও দেওয়া হবে বলে জানা গেল।

পুরস্কৃত খেলোয়াড়রা কতোখানি উৎসাহিত হয়েছেন তা এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। ফলেন পরিচীয়তে?

**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

সারা জীবন সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী রয়েছেন শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। একালের সাহিত্যে বড় বেশি অভাব দেশের মাটির গন্ধের এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অপরিসীম জিজ্ঞাসার।

তারাশংকরের সাহিত্য ইতিমধ্যে ক্লাসিক পর্যায়ে পৌঁচেছে। এখনো তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতেই ধ্যানস্থ রয়েছেন।

তারাশংকর সাধারণ এবং বিদগ্ধ পাঠকদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রচুর পেয়েছেন। সাহিত্যিকের জীবনে তাই হয়তো শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। পরবর্তীকালে (বিলম্বে হলেও) কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি· লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

এবার সাহিত্য একাডেমি তারাশংকরকে 'ফেলো' নিযুক্ত করছেন। ঐ ধরণের সম্মান প্রদানে কোনো মহৎ সাহিত্যিকের সম্মান আরো বৃদ্ধি পায়, আমরা তা মনে করি না। তবু জাতীয় কর্তব্যবোধেই ঐ সম্মান প্রদান অবশ্যই প্রয়োজনীয়, আর সাহিত্যিক ধন্যবাদের সঙ্গে যখন তা গ্রহণ করেন, তখন তার মূল্যও বৃদ্ধি পায়। শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক 'ফেলো' নিযুক্ত হওয়ায় আমরা আনন্দিত।

—শহরদর্শী

**[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]**

শিক্ষকের নিযুক্ত সরকারী ডাক্তারের প্রমোশনের তালিকা সম্পর্কে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ৩১শে ডিসেম্বর। অনেকেই আপত্তি দাখিল করেছেন এবং তাঁদের সকলের বক্তব্য বিবেচনা করে স্বাস্থ্যদপ্তর চূড়ান্ত প্যানেল প্রণয়ন করবেন।

আমরা এযাবৎ একাডেমিক এ্যাডভাইসরী কমিটি এবং সেলের প্যানেলের পার্থক্যটাই সকলের সামনে তুলে ধরেছি। একই নীতির ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুই কমিটির সুপারিশ দুই রকম হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলেই দস্তুরমত বিভ্রান্তি বোধ করছিলেন। তাতে এমনি একটা সন্দেহই দানা বেঁধেছিল যে, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নীতির চেয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ হয়ত বড় একটা ভূমিকা গ্রহণ করছে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয় বলেই এই আলোচনার সূত্রপাত। যে-সমস্ত সরকারী ডাক্তারের নাম সাপ্তাহিক বসুমতীতে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের কারও সঙ্গেই লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। কারও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করা অথবা কারও অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যোগ্য প্রার্থী যোগ্য পদে নিযুক্ত হলেই বসুমতীর পাঠকসমাজ খুশি হবেন।

সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রমোশন প্রসঙ্গের আলোচনা শুরু হবার পর স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন কোন কর্মকর্তা খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন, কিন্তু তাঁদের মনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা আমাদের পক্ষে বোধ হয় সম্ভব নয়। আমরা আগাগোড়াই একটা সুস্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে বিষয়টা পর্যালোচনা করেছি। ব্যক্তিকে কখনও এর মধ্যে টেনে আনা হয় নি। যেখানে ব্যক্তি এসেছে, সেখানে নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই এসেছে।

আমরা আগেই বলেছি, একাডেমিক এ্যাডভাইসরী কমিটির সুপারিশকেও যেমন আমরা সর্বোত্তম বলে মনে করি না, সেলের সুপারিশকেও সেই সার্টিফিকেট দিতে পারি না।

যে কোন নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে হলে সব প্রশ্নের বিষয় আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হয়। আর সেটা গণতন্ত্রের সর্বসম্মত রীতিও বটে।

এবার আসুন, আমরা আবার সুপারিশের দুই তালিকার তফাৎটা দেখিয়ে দিই।

**প্যাথলজি এবং ব্যাক্টেরিওলজী** বিভাগে সেলের সুপারিশ নিচে দেওয়া হল :

**এসোঃ প্রফেসর :** এন এন সেন, (২) পূর্ণেন্দুনারায়ণ দাস।

**রীডার :** পূর্ণেন্দুনারায়ণ দাস, (২) কালীকুমার ভট্টাচার্য, (৩) নিশীথচন্দ্র গাঙ্গুলী, (৪) অনিলচন্দ্র মুখার্জী, (৫) রণধীর বড়ুয়া।

**সহকারী প্রফেসর :** সুনীলকুমার বিশ্বাস, (২) সুহাসচন্দ্র মৈত্র, (৩) প্রদীপকুমার রাহা, (৪) সুনীলকুমার গুপ্ত, (৫) বরুণদেব চ্যাটার্জী, (৬) আশুতোষ মুখার্জী।

**লেকচারার :** অসীমকুমার মুখার্জী, (২) হিমাংশুকুমার পাল, (৩) দিলীপকুমার ভট্টাচার্য, (৪) মনীষশেখর চক্রবর্তী, (৫) মৃত্যুঞ্জয় বসু, (৬) দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, (৭) বীণাপাণি মুখার্জী, (৮) প্রশান্ত সেনগুপ্ত, (৯) কল্যাণকুমার চৌধুরী, (১০) শচীন্দ্রকুমার চৌধুরী।

একাডেমিক এ্যাডভাইসরী কমিটি এসোঃ প্রফেসরের জন্য একমাত্র এন-এন· সেনের নাম সুপারিশ করেছিলেন। সেলের তালিকায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ দাসকেও রাখা হয়েছে। কমিটির সুপারিশে সহকারী প্রফেসর পদের জন্য যাঁদের নাম ছিল, সেলের তালিকায় তাঁদের মধ্যে দিলীপ ভট্টাচার্য, পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র পাল এবং সুশীল বিশ্বাসের নাম খুঁজে পাওয়া যায় নি। অপর দিকে সেলের তালিকায় সুহাসচন্দ্র মৈত্র এবং প্রদীপকুমার রাহার [illegible] দেখা যায় নি।

[illegible] পদের জন্য কমিটি [illegible] সুপারিশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে [illegible]কুমার ঘোষ, অমিতনাথ [illegible] এবং গীতা তালুকদারের নাম সেলের তালিকায় নেই। সেলের তালিকায় কল্যাণকুমার চৌধুরী, শচীন্দ্রকুমার চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় বসুর নাম আছে, কমিটির তালিকায় ছিল না। কমিটি দিলীপ ভট্টাচার্যকে সহকারী প্রফেসর করতে চেয়েছিলেন। সেল তাঁকে লেকচারারের চেয়ে বেশি কিছু দিতে রাজী নন।

ফার্মাকোলজী বিভাগ একাডেমিক এ্যাডভাইসরী কমিটির সুপারিশ নিচে দেওয়া হল।

**এসোঃ প্রফেসর :**—সীতেশ চন্দ্র লাহিড়ী।

**রীডার :**—স্মৃতিসম্পদ ভট্টাচার্য (২) মধুসূদন দে (৩) জনার্দন দাস।

**লেকচারার :**—প্রশান্তকুমার মুখার্জী (২) সুশান্তকুমার মৈত্র।

কমিটি জনার্দন দাসকে সহকারী প্রফেসর পদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। সেল তাঁকে রীডারের জন্য সুপারিশ করেছেন।

**ফিজিওলজী**

ফিজিওলজীতে সেলের সুপারিশ নিচে দেওয়া হল।

**প্রফেসর :**—পঙ্কজমোহন লাহিড়ী।

**রীডার :**—হরেন্দ্রনাথ ঘোষ (২) অর্চনা বসু (৩) বিজন রায়।

**সহকারী প্রফেসর :**—সুজিতকুমার চৌধুরী (২) পরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী।

**লেকচারার :**—পাঁচুগোপাল ব্যানার্জী (২) সন্তোষকুমার সেন (৩) ভবেশচন্দ্র সামন্ত (৪) আরতি লাহিড়ী (৫) কল্যাণকুমার ঘোষ (৬) চিন্ময়কুমার দত্ত।

পঙ্কজবাবু কিছুকাল অস্থায়ী প্রিন্সিপাল হিসাবে ন্যাশনালে কাজ করেছেন। সেখানে ধর্মঘটের পর পঙ্কজবাবু আবার তাঁর বিভাগে ফিরে গেছেন। কমিটি সহকারী প্রফেসর পদে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেছিলেন। সেলের সুপারিশে তাঁর নাম নেই। কমিটির তালিকায় রীডার পদে বিজন রায়ের নাম ছিল না। সেলের সুপারিশে আছে।

**রেডিওলজী**

রেডিওলজী বিভাগে সেলের সুপারিশ নিচে দেওয়া হল।

**রীডার :**—শক্তিপ্রসাদ সরকার (২) অশোককুমার মুখার্জী।

গতিশক্তি সঞ্চারক
দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম আরাম—এই অভিপ্রায়ে
বাটার খেলার জুতোর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখুন।
কুশন আর্চ আর ইনসোল আকস্মিক আঘাত
থেকে রক্ষা করে। ঘনবুনোট ক্যাম্বিসের আপার;
ক্ষয়শীল সন্ধিস্থলে টেকসই বন্ধনী। ভারী
বাম্পার টোগার্ড। আপার আর জুতোর
তলির অভেদ্য বন্ধন। ঢালাই সোল
আর হিল এমন কৌশলে তৈরি
যা পারতপক্ষে হড়কাবে না।
সব মিলিয়ে, আশ্চর্য সমর্থ সমাবেশ।
সাইজ ০—১০
১২.৯৫
স্নিকার
Bata
সুপার হান্টার
সাইজ ৪—১০
১৭.৯৫
নিউ স্পিডি
সাইজ ৫— ৮ ৪.৫০
৯— ২ ৫.২৫
৩—১০ ৬.৭৫
নিউ টেনিস
সাইজ ০—১০
১২.৯৫
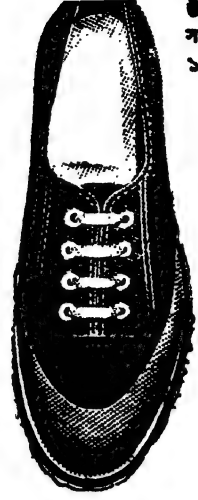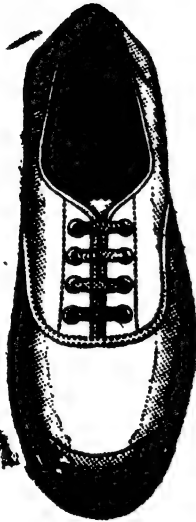
## অপেক্ষায় এবং একা

জয়ন্তী সেন

বিষণ্ণতাকে ঠেলে ঠেলে দরোজার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে
আমি হাজার সুখকে বন্ধুর মত ঘরে ডেকেছিলাম,
তারা আলো জ্বালিয়ে, ফুল সাজিয়ে
আমার সান্নিধ্যে উৎসবের মহড়া দিয়েছিলো।
হাসি খেলা গানের পারদর্শিতায়
সেই সব সুখী মুহূর্তেরা আমাকে ভুলিয়ে রেখে
হাততালি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল এ ওর সর্বাঙ্গে।
একটি সুখ আর একটিকে ডেকে বলল—'সাবাস'।

বুকের মধ্যে খালি, ভীষণ খালি
তবু আমি তাদের আসরে দিনরাত বসে আছি,
তাদের শব্দে আমি নীরবতার অর্থ ভুলে
দাঁড়ে বসা পাখির মুখে বিনরাত অসহ চিৎকার/
টকটকে লাল সূর্যকে ডেকে ওরা
আলো চায়, কারণ আলোই
আমার এবং প্রত্যেকের স্মৃতির আবরণ।
অথচ দরোজার বাইরে সে দাঁড়িয়ে থাকে
অপেক্ষায় এবং একা।

সূর্যের অবর্তমানে আলো জ্বালাতে জানলেও
এই ঘরের নিশ্ছিদ্র দেওয়ালের কোন কোন অংশে গাফিগতি আছে
সে কথা রাত্রি জানে এবং সে নিজেও।
আমাকে একলা পেলে রাত্রি চতুর শ্বাপদের মত
শব্দহীন পদক্ষেপে এগিয়ে আসে,
অতিথিহীন ওলটপালট আগোছালো সেই শূন্য ঘরটিতে
ভেজানো দরোজা ঠেলে আরও একজনকে সঙ্গে করে
যে জানে আমার অস্বীকৃতির মূল্যহীনতা
যে জানে আমি তাই!

## দাঁড়ে বসে টিয়ে রঙ পাখি

শান্তনু দাস

ক্যানভাসে কখনও যদি ছবি আঁকি, হয়তো বা
দাঁড়ে বসা টিয়ে রঙ পাখি
তবে সেই গোড়াতেই নির্ভেজাল 'দ' আঁকতে হয়।
কোন্ দূরে বাল্যকালে শিলেটে শিলেট রঙা পেনসিল
ঘষে ঘষে
ছবি আঁকা হ'ত—
জলছবি স্বপ্নে নেমে আসে।

স্বপ্নগুলো দাঁড়ে রাখি
দাঁড়ে রেখে ভালবাসতে হয়
অথচ কখন যেন ভালবাসা...তা...খে...তা...খৈ
...ডা...য়ে...ডা...য়ে

জটপাকানো বুড়ি হয়ে গেছে,
অথবা আমিও উন্মুভঙ্গ বৃদ্ধ হয়ে আছি
চতুর্দিকে আর্তনাদ, তালগোল রিসিভার শেয়ার বাজারে
দরোজা বন্ধ করলে নির্মম শব্দেরা দেয়াল গড়িয়ে
সোজা নামে।

চালচিত্তির দেখে দেখে বুকটা শুকিয়ে যেন
'ঢাকাই বাখর' হয়ে আছে
কিবা আসে কিবা যায়—
টালার সুইচে যদি হাজার ইঁদুর ঢুকে পড়ে,
ফাঁপরা বুকেতে স্যার
ঠাণ্ডা জলুক রোজ তাড়া করে সকালে বিকালে।

তখনই শব্দগুলো ক্রমশ ময়ূর হয়ে নামে—
নক্সীকাঁথা, বাল্যকাল শিলেটে শিলেট রঙও পেনসিল ঘষে ঘষে
দাঁড়ে বসে টিয়ে রঙ পাখি।

---

**সহকারী প্রফেসর :**—কাশীনাথ দত্ত (২) বিশ্বপতি চ্যাটার্জী (৩) অজিত-কুমার মুখার্জী (৪) অমিয়রঞ্জন সাহু।

**লেকচারার :**—বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা (২) সুধীরকুমার বাগচী (৩) আশুতোষ সেন (৪) দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) সমর-কুমার দে (৬) সঞ্জীবনকুমার বসুরায়-চৌধুরী (৭) ভারতবন্ধু ঘোষ (৮) গোপাললাল শীল (৯) ভোলানাথ ব্যানার্জী (১০) বিজনকুমার মুখার্জী (১১) রাধেশ্যাম সাহা (১২) দেবেশচন্দ্র পাল (১৩) সত্যব্রত পাল।

কমিটি সহকারী প্রফেসর পদের জন্য একমাত্র বিশ্বপতি চ্যাটার্জীর নাম সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু সেন সেখানে আরও তিনটি নাম ঢুকিয়েছেন।

লেকচারার পদের জন্য কমিটির সুপারিশ থেকে প্রভাতেন্দু ব্যানার্জী এবং রমেন্দ্র কুণ্ডুর নাম বদলে সেই জায়গায় বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, সুধীরকুমার বাগচী, আশুতোষ সেন, সমরকুমার দে, সঞ্জীবন বসুরায়চৌধুরী, ভারতবন্ধু ঘোষ, দেবেশচন্দ্র পাল এবং সত্যব্রত পালের নাম ঢুকিয়েছেন।

প্রমোশন রহস্যের ধারাবাহিক আলোচনা এই সপ্তাহেই শেষ হচ্ছে। এই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য-দপ্তর সমস্ত মামলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিবেচনা করবার জন্য আর একটি রিভ্যু কমিটি গঠন করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সেটা নিশ্চয়ই একটা সুলক্ষণ। আমরা শুনেছি, সুপারিশের আলোচ্য দুটি তালিকার বাইরেও প্রমোশনের যোগ্য আরও বহু অফিসার আছেন। এই সুযোগে তাঁদের মামলা-গুলোও বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা আরও শুনেছি যে, গুণাবলী নিয়ে অনেক ডাক্তার এখানে লেকচারার হতে পারছেন না, ভারতের অন্যান্য অনেক মেডিক্যাল কলেজে সেই গুণা-বলী নিয়ে অনেকে বিভাগীয় কর্মকর্তার পদ পেয়ে যাচ্ছেন। প্রতিভাবান তরুণ চিকিৎসকরা কলকাতায় দ্রুত পদো-ন্নতির সুযোগ না পেলে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টা করতে পারেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গের লোকসান ছাড়া লাভ নেই। কাজেই অতি আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তরুণ এবং প্রতিভাবান ডাক্তারদের সুখ-সুবিধা এবং পদোন্নতির দিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

আর কিছুকালের মধ্যেই প্রমোশনের চূড়ান্ত তালিকা রচিত হবে। যাঁরা প্রমোশন পাবেন, তাঁদের আমরা আগে থেকেই অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। যাঁরা এবার প্রমোশনের সুযোগ পাবেন না, তাঁদেরও আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যুক্তফ্রন্ট সরকার চালু থাকলে সকলেই যে যথাসময়ে সকল ব্যাপারে সুবিচার পাবেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। খালি প্রশাসন বিভাগের আমলা-দের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তারা যেন সুবিচারের পথে লালফিতার কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে।

চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করে যাঁরা আর্ত-আতুরের সক্রিয় সেবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা সমাজের ভাগ্যবান অংশ। সেই ব্রতে যদি তাঁরা একনিষ্ঠ থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষের দরবারেই তাঁরা সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করবেন। সেটাই হবে তাঁদের সব চেয়ে বড় প্রমোশন।

॥ সমাপ্ত ॥

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড

আমার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের গোয়েন্দাদপ্তরের তৎপরতা ও অভিনব কর্ম-কৌশলের বিষয় সংবলিত এই বিশেষ অধ্যায়টি এখানেই শেষ করব ইচ্ছা করেছি। যেসব ঘটনা উল্লেখ করে এই ছোট্ট অধ্যায়টির সমাপ্তি, সেটি মাস্টার-দার ফাঁসি হয়ে যাওয়ারও প্রায় দেড় বৎসরকাল পরের ঘটনাবলীর বিবরণী।

মাস্টারদার ধরা পড়ার পর পুলিশ স্বভাবতই যে এই সাফল্যে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিল এবং আমরা যে সেই অনুপাতেই নিরুৎসাহবোধ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। এইরূপ অবস্থার সন্ধিক্ষণে বিপ্লবীদের ও পুলিশের মধ্যে প্রতি-যোগিতা—কে কাকে বিধ্বস্ত করবে। শক্তিশালী সরকারের প্রচণ্ড ক্ষমতা। তারা বহু ছাত্র-যুবককে গ্রামে ও স্বগৃহে অন্তরীণ রেখে তাদের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে নিল। পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের এইরূপ গোপন সাক্ষাৎ অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের মধ্যে কে কত-খানি পুলিশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ছদ্মবেশী বিপ্লবী সেজেছে তা কারও পক্ষে সহজে জানা সম্ভব ছিল না। বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের মিথ্যা ধ্বজা উড়িয়ে কত বিভীষণ যে ছদ্মবেশে দলের সভ্যদের প্রতারণা করতে সমর্থ হয়েছে তার সঠিক হিসেব কে দেবে!

আগেই লিখেছি একটি ঘটনার বা একজন বিপ্লবীর গোপন আস্তানার সন্ধান প্রকাশ হওয়াটা যে কেবল একজনেরই দুষ্কৃতির ফল তা নয়। মাস্টারদার বন্দী হওয়াটা একজনেরই বিশ্বাসঘাতকতায় হয়েছে এবং কেবল একজনই তাঁর সন্ধান দেওয়ার জন্য দায়ী ছিল, তা ভাবলে ঠিক হবে না, তাহলে এই একই দোষে অপরাধী অনেক বিভীষণ নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

যুবকদের স্বগৃহে ও গ্রামে অন্তরীণ রেখে তাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বন্ধুত্বস্থাপন করে দলের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য ফাঁদ পেতে পুলিশ প্রচুর সুফল পেয়েছে।

মাস্টারদার অবর্তমানে সংগঠন যখন নাবিকবিহীন তরণীর মত মহাসাগরের বুকে দিক্‌হারা হয়ে দোল খাচ্ছে, তখন অবশিষ্ট দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের পূর্ণ দায়িত্ব পালনে অক্ষমতাবশত অন্যান্য জেলাতে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। আত্মগোপনকালের নিষ্ক্রিয় জীবন অনেককেই তাঁদের অজ্ঞান্তেই আত্ম-কেন্দ্রিক করে তুলেছিল। এইরূপ একটি জটিল পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের তরুণ-বিপ্লবীরা যখন নেতৃহারা—তখন সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর অন্তরীণ থাকার পর মাস্টার-দার উত্তরসাধক তেজেন্দ্রলাল দত্ত নিজ গ্রামে ফিরে এলেন, তাঁকেও স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হলো।

পাঁচ বৎসর বন্দী জীবনযাপনের পর তেজেন্দ্র যখন চট্টগ্রামে তাঁর স্বগৃহে অন্তরীণ হলেন, তখন মাস্টারদা আর ইহজগতে নেই; কৃষ্ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে যাঁরা ক্রিকেট খেলার মাঠে ইংরেজদের ওপর আক্রমণ চালাতে গিয়েছিলেন, তাঁরাও শত্রুর প্রতি-আক্রমণের মুখে প্রাণত্যাগ করেছেন; ১৮ই এপ্রিল যুববিদ্রোহের দিনে যাঁরা প্রথম সারির যোদ্ধা বলে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জলনাংশের মত যিনি বা যাঁরা বেঁচে ছিলেন এবং তখনও আত্মগোপন করে কাল কাটাচ্ছিলেন—তেজেন্দ্র তাঁদেরও কর্মক্ষেত্রে দেখতে পেলেন না। তাঁরা তখন চট্টগ্রাম ছেড়ে অন্য জেলায় নিরাপদে আত্মগোপন করে থাকার অভিপ্রায়ে চলে গিয়েছিলেন।

মাস্টারদার বৈপ্লবিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য—মৃত্যু সেও ভাল তবু যে নেতৃত্ব দেবে প্রধান সমর-শিবির পরিত্যাগ করা তার পক্ষে একান্ত অনুচিত এবং অমার্জনীয় অপরাধ। মাস্টারদা তাঁর বিপ্লবী সৈনিক-দের নৈতিক বল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কখনও হেড কোয়ার্টার পরিত্যাগ করেন নি। মাস্টারদার অবর্তমানে আজ যখন দৃঢ়-হস্তে হাল ধরার প্রয়োজন, তখনই চট্ট-গ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের এই শোচনীয় পরিণতি।

এই সন্ধিক্ষণে তেজেন্দ্রের স্বগৃহে অন্তরীণ হওয়া যেন অলক্ষ্যে এক বিপ্লবী নায়কের ভাঙা আসরে অবতীর্ণ হওয়া। অনেক নিয়মাবলীর অধীনে থেকে সাংগঠনিক কাজ করা অন্তরীণ অবস্থায় খুব সহজসাধ্য নয়। যাদের নিয়ে কাজ করতে হবে, তাদের মধ্যে যদি একজনেরও নির্বাচন ভুল হয়, তবে সেই বিশ্বাসহন্তা সংগঠনের কর্মোদ্যমের সংবাদ নিশ্চয়ই পুলিশের গোচরীভূত করবে। এই পরি-স্থিতির সম্যক উপলব্ধি তেজেন্দ্রের ছিল। বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথের নানা ভয়-ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তেজেন্দ্র স্থির-

হীনচিত্তে দৃঢ়তার সংগে যুবকদের নৈতিক ও বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন।

সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর কাউকে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে হত্যা করে এবং বিপ্লবীদের পথে যে-সকল ভারতীয় গোয়েন্দা পুলিশ বা দলের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতক দল বাধা-স্বরূপ এসেছে তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা দলের শক্তি অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মাস্টারদার অবর্তমানে কৃষ্ণ চৌধুরীর সংগে ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার তিনজন সদস্য, সাফল্যের সম্ভাবনা একরূপ নেই জেনেও, ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

দলের শক্তি সীমিত। যাঁরা তখনও মাথা নত করতে চাইছিলেন না, তাঁরা প্রায় সকলেই গৃহে অন্তরীণ। তাছাড়া তাঁরা তখন এমন একটা বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন যে, সামান্য একটু ষড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচীর প্রাথমিক আলোচনাও পুলিশের অগোচরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। স্বভাবতই কারও বুঝতে বাকী রইল না যে, অন্তরীণে আবদ্ধ বিপ্লবী যুবকদলের মধ্যেই বিভীষণ উপস্থিত। কিন্তু কে সে বা তারা কারা—যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে? বাস্তবে দেখা যাচ্ছে মাস্টার-দাকে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বিশ্বাসঘাতকের ছিন্ন-শিরের নিদর্শন ও বিভীষণের কর্মোদ্যমকে নিরুৎসাহ করতে সক্ষম হচ্ছে না। স্বার্থের লোভে পুলিশের সংগে বিশ্বাসহন্তারা গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে!

তেজেন্দ্র ও তাঁর সাথীরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দলের আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দাকে খুঁজে বার করতেই হবে এবং তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে গুপ্তচরেরা অন্তত কিছুটা ভয় পায় এবং এইরূপ অবাধ গতিতে শত্রুতা করার সাহস না করে। স্বগৃহে অন্তরীণ থাকলেও ইচ্ছে করলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে মেলামেশা করা যায় এবং বৈপ্লবিক ষড়-যন্ত্রের বাস্তব রূপও দেওয়া যায়। তেজেন্দ্রের নেতৃত্বে যে কয়েকজন বিপ্লবী যুবক তখন সুসংবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা নানাভাবে খোঁজ-খবর করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, দলের কর্মী পরেশ গুপ্তই গোয়েন্দা পুলিশকে রীতি-মত আভ্যন্তরীণ খবর সরবরাহ করে চলেছে।

এক গোপন সভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোল—"পরেশ গুপ্ত পুলিশের চর; তাকে আর অবাধ বিচরণের সুযোগ দেওয়া চলবে না। কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার চাইতে চিরকাল বিকলাঙ্গ করে রাখার ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ, এতে জনসাধারণও তার দুষ্কৃতির বিষয় অবগত হবে এবং এইরূপ একটি আদর্শ শাস্তিতে বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে সেও সমস্ত জীবন অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরবে।" পরেশকে নিভৃতে একাকী পাওয়া খুবই সহজ। দলের গুপ্ত সভায় সে যথারীতি উপস্থিত থাকতো এবং অন্তরীণ আইন লঙ্ঘন করে গোপনে মিলিত হোত বলে ব্যক্তিগত চলাফেরা ও আনাগোনাও পরিচিত লোকের দৃষ্টির অগোচরেই করতো।

তেজেন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে—গুপ্ত-সভার নির্ধারিত দিন, সময় ও স্থান সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে খবর দেওয়ার জন্য পরেশের কাছে লোক পাঠানো হোল। তাকে জানানো হোল—"বোয়ালখালি থানার শ্রীপুর গ্রামে 'কানুর দীঘির' পারে রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে দলের গুপ্ত-সভা হবে—পরেশ যেন সেইদিন সেই নির্ধারিত সময়ে নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত হয়; যুব-বিদ্রোহের একজন বলিষ্ঠ কর্মী, ভবতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৩০ সাল থেকে আত্মগোপন করে আছেন, বিশেষ প্রয়োজনে তিনি তাঁদের সংগে মিলিত হতে আসবেন...।" এই মিলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরেশ গুপ্তের জানবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সে যথারীতি উৎসাহের সংগে সভায় যোগ দিতে চলেছে। সে হয়তো আশা করেছে আজ অনেক নতুন খবর পাবে এবং গোয়েন্দা বিভাগকে সেই সব সংবাদ সরবরাহ করবে। কিন্তু হায় রে পরেশ? তুমি এখনও জান না তোমার অঙ্গ লক্ষ্যে শাণিত অস্ত্রখানি বিপ্লবী যুবকের দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ! কানুর দীঘির পারে তেজেন্দ্র বসে আছেন—ভব-তোষের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করবেন। তেজেন্দ্রের সংগে আরও চার-পাঁচজন সাথী কথা বলছে। এমন সময় দেখা গেল সভায় যোগ দিতে পরেশ গুপ্ত আসছে। আগে থেকেই ঠিক ছিল পরেশের সংগে তারা সামান্য কথাবার্তা চালাতে চালাতে আরও দুজন সদস্য উপস্থিত হবে পরেশকে অতর্কিতে 'দা' দিয়ে আঘাত করবে। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল পরেশ গুপ্তের ডান হাতটি কেটে নিয়ে বাজারে ঝুলিয়ে রাখবে এবং সেই হাতের নিচে বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে —"বিশ্বাসঘাতক পরেশ গুপ্তের এই পরিণাম!"

পরেশ সভায় যোগ দিল। তেজেন্দ্রকে ভবতোষ ভেবে সে প্রণাম করলো। তাদের পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হোল। দু-এক মিনিট কথা বলার পরেই প্রসঙ্গটা হঠাৎ পাল্টে গেল; কথা চললো—"দলের গোপন কথা পুলিশ কি-ভাবে জানতে সমর্থ হচ্ছে? তোমার কি মনে হয়...?" আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল না। সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং যে দুজন সবেমাত্র এসে যোগ দিলেন —এ'দের মধ্যে দুজনের হাতে দুটি ধারালো 'দা' অকস্মাৎ দেহাবরণ হতে বেরিয়ে এলো। আসন্ন বিপদের উপলব্ধিতে পরেশ গুপ্ত চীৎকার করে উঠলো। যদি সময় পেতো তবে সে হয়ত তার সাথীদের কাছে করুণাভিক্ষাও চাইত। কিন্তু সেই সময় ও সুযোগ সে আর পেলো না—চোখের সামনে শাণিত দা'টি ঝলসে ওঠার সংগে সংগেই যেন তার ডান হাতখানি কাঁধ হতে একেবারে ঝুলে পড়ল ও হাতের কয়েকটি আঙুল সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। প্ল্যান ছিল ডান হাতটি সম্পূর্ণভাবে কেটে নিয়ে আসা হবে; কিন্তু অবস্থা বিশেষে সেইরূপ পূর্বপরিকল্পিতভাবে হাতটি আর কেটে আনা গেল না।

মাস্টারদার আশ্রয়স্থলের গোপন সংবাদ, শত্রুকে সরবরাহ করার অপরাধে গুপ্তচরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হয়। তার-জন্য চট্টগ্রামবাসী এমন কি সারা ভারত-বর্ষের লোক বিভীষণ নিধনের জন্য কতই না উল্লসিত হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে এই বিশ্বাসঘাতক পরেশ গুপ্তকে বিকলাঙ্গ করার সংবাদেও চট্ট-গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আনন্দ ও উল্লাসের অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল।

ইংরেজ সরকারের খবরাদি সংগ্রহের একটি সক্রিয় কৌশল ধরা পড়ে গেল। এ পরাজয় মেনে নেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বগৃহে অন্তরীণ যুবকদের মারফৎ সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা বানচাল করার জন্যই পরেশ গুপ্তের ওপর এই আক্রমণ। কাজেই পরেশ গুপ্তকে বিকলাঙ্গ করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে পুলিশ (১) অবিনাশ দত্ত; (২) তেজেন্দ্র দত্ত; (৩) নোয়ার মিঞা; (৪) বিমল বিশ্বাস; (৫) বিমলেন্দু ভট্টাচার্য; (৬) অমূল্য আচার্যকে গ্রেফতার করল। সরকার নিশ্চয়ই কোন তথ্যের ওপর নির্ভর করেই এই ছয়জন যুবককে গ্রেফতার করে—তাঁরা সকলেই তখন স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন।

এই ছ'জনের বিরুদ্ধেও ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়। তিনজন বিচারক নিয়ে ট্রাই-ব্যুনাল গঠিত—জেলা জজ মিঃ ওয়েট—প্রেসিডেন্ট. অবসরপ্রাপ্ত জজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও সদর এস ডি ও।

যাদের বিরুদ্ধে মামলা, তাদের আর্থিক সংগতি তেমন ছিল না। তবু এই ছয়-জন যুবকের অভিভাবকেরা কোন ভাল

# [illegible] সেই গৃহ

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই গৃহ অদ্যেই আছে
কত স্বেদ রক্ত দিয়ে গড়া–
এরই তরে কত অশ্রু ঝরে গেছে কত না ধারায়
মুকুলিত কত প্রাণ ঝরে গেছে পথের ধূলায়;
কত ওমরের প্রাণ বাকী খাজনার ফাঁসে
শেষ হয়ে গেছে;
এরই তরে, সেই গৃহ অদ্যেই আছে।

এখন শীতের শুষ্ক পাতাগুলো ঝরে গেছে শিমুলগাছের
এখনো বসন্ত এসে দুদণ্ড দাঁড়াবে অপাঙক্তেয় গৃহের প্রাঙ্গণে
এখনো শুনতে পাই মাঝে মাঝে পিয়ানোর বাজনা ভঙ্গুর
উৎসবের কোলাহল হাসি কলরোল
মাঝে মাঝে শুনতে পাই আমরা বিধুর।

নিশুতির কৃষ্ণ ঘোর কেটে গেলে পরে
'ভোর ভয়ি' বাজাবে বিষাণ,
তখন শুনতে পাব জরাগ্রস্ত প্রাঙ্গণে আবার
ঢেঁকির পাড়ের শব্দে আনন্দিত গান।

---

আইনজ্ঞকে দিয়ে তাদের পক্ষে মামলা তদ্বির করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবিনাশ দত্তের অবস্থা সচ্ছল না হলেও তাঁর অভিভাবকেরা জমিজমা বিক্রয় বা বন্ধক দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করলেন ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলকাতায় দেশবরেণ্য প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হলেন। আমাদের বিচারের সময় শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট হতে আমরা যে আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিলাম তা চট্টগ্রামের সকলেই জানতেন। সেই ভরসা নিয়েই অবিনাশের দাদাও শরৎবাবুর সাহায্য লাভের আশায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শরৎবাবু প্রখ্যাত শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার জে পি মিত্রকে এই মামলার ভার নিতে অনুরোধ করেন। শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার জে পি মিত্র সাগ্রহে অভিযুক্ত বিপ্লবী যুবকদের সমর্থনে মামলার দায়িত্ব নিলেন।

যথারীতি মামলা আরম্ভ হলো। বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসে এই বিচার প্রহসন—"চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা" নামে সুবিদিত। সাহসের সঙ্গে নিজের মত প্রচারের উদ্দেশ্যে যদি স্বীকারোক্তি করা হয়, তবে সেই স্বীকারোক্তি নিজের বিপক্ষেই শত্রুর হস্তে ব্যবহৃত হয়। অমূল্য চ্যাটার্জী অবস্থা বিশেষে একটি স্বীকারোক্তি করেছিল। ব্যারিস্টার জে পি মিত্র অভিযুক্তদের জানালেন—"স্বীকারোক্তি যদি প্রত্যাহৃত না হয় তবে যে স্বীকারোক্তি করেছে তার তো শাস্তি হবেই এবং অন্যান্যদেরও বিচারে মুক্ত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তাই ট্রাইব্যুনালের কাছে স্বীকারোক্তি যেন প্রত্যাহৃত হয়—কোনরূপ প্রচারের উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে না রাখাই ভালো।" যুবকেরা তাঁর কথা মেনে নিয়েছিল এবং অমূল্য চ্যাটার্জী তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছিলেন।

ট্রাইব্যুনাল বিচারের রায়ে অমূল্য চ্যাটার্জীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোল ও বাকী পাঁচজন বিচারে মুক্তি পেলেন। অমূল্য চ্যাটার্জী যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলেন। সেই আপীলের যথারীতি শুনানী হয় এবং ব্যারিস্টার শ্রী জে পি মিত্রই অমূল্যের পক্ষে সওয়াল করেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরা অমূল্যের দণ্ডাদেশ হ্রাস করে তাকে দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

আমরা তখন আন্দামানে। বাংলা তথা ভারতের নানা স্থান হতে বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামান জেলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। কিন্তু মহান সরকার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে অম্বিকাদাকে মেডিকেল গ্রাউণ্ডে আন্দামান জেলে স্থানান্তরিত করলেন না। অম্বিকাদা সত্যিই খুব অসুস্থ ছিলেন—'টিউবারকুলোসিস' বলে মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট ছিল। সরকার নিজেদের মহানুভবতা প্রচারের উদ্দেশ্যেই অম্বিকাদাকে আন্দামান জেলে স্থানান্তরিত করেন নি। হাইকোর্টে দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হওয়ার পর অমূল্য চ্যাটার্জীকেও আন্দামানে পাঠানো হয় নি। অম্বিকাদার সঙ্গে বাংলাদেশের জেলেই অমূল্য চ্যাটার্জীকে দণ্ডভোগের জন্য রেখে দেওয়া হয়। তাই অমূল্যের সঙ্গে জেলে আমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নি। [ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

জগৎ ডাক্তার একান্তই গাঁউলি ডাক্তার। তবু জীবনে তার বিস্ময়কর চিকিৎসা বা কাটা-ছেঁড়া কম নয়। এও তার মধ্যে একটা। হয়তো তার সাহস, তার সিদ্ধান্ত বা নৈপুণ্যের কাছে এ ব্যাপার নতুন নয়। কিন্তু আর দুটো লোক বিস্ময়াভিভূত হয়ে বসে রইল। আর মাঝে মাঝে ফরমায়েস মাফিক এটা-ওটা হাতের কাছে এগিয়ে দিলে।

ডাক্তার অপারেশন সেরে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, যমুনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে যমুনার টঙ থেকে যখন বেরুলো তখন এই বুনো চরের নিঃঝুম রাত শীতে আর কুয়াশায় ঘনঘোর।

অভিভূত সানো চৌধুরীকে তাড়া দিয়ে ডাক্তার বললে, "চলো চৌধুরী।"—

সানো চৌধুরী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললে, "আমার কি থাকার দরকার হবে?"

"কিচ্ছু না।" ডাক্তার বলল, "যমুনা দরকার হলে খবর দেবে।" তারপর একটু থেমে ডাক্তার বললে, "ছোকরার জ্ঞান আছে টনটনে—এত ছুরি-কাঁচি দিয়ে কাটা-কাটি খোঁচাখুঁচি করলাম—তা একটু শব্দ করল? এ সব ছোকরার জ্ঞান বড় কড়া গো সানো কত্তা। ভয় নেই। সাত দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।"

"লোকে যদি যমুনাকে জিজ্ঞেস করে, কি বত্তান্ত—কার অসুখ?" সানো চৌধুরী খুঁত খুঁত করে বললে, "লোক জানা-জানির একটা ভয় থাকবে ডাক্তার।"

যমুনা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল—ডাক্তার তার দিকে ফিরে তাকাল।

যমুনা বললে, "সে ভয় নাই সানো কত্তা। চেপে রাখতে পারবো।"

সানো চৌধুরী হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার একজোড়া চোখ যমুনার মুখের ওপর নিবদ্ধ করে শুধোলে, "কি বলবি?"

"বলবো—মোর ঘরে এক গোঁসাই এসেছে। লবীন গোঁসাই। উনি মোর লবীন গোঁসাই! আমার মত হতভাগীর ঘরে এসে শয্যা লিয়েছে।" বলতে বলতে গলা ওর কেঁপে উঠল। অস্ফুটকণ্ঠে বললে, "ভালো হয়ে উঠবেন তো ডাক্তার-বাবু?"

ডাক্তার সানো চৌধুরীর মুখের দিকে তাৎপর্যপূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে হাসল। বললে, "হলো?"

সানো চৌধুরী চুপ করে রইল। বিষয়-বুদ্ধির মানুষ সে—সবটা খতিয়ে না দেখে মন তার সুস্থির হয় না।

ডাক্তার বলল, "আপাতত ছোকরা যমুনার ওই নবীন গোঁসাই হয়েই থাক সানো কত্তা। বরং ওর জামা-কাপড়টা বদলে তাড়াতাড়ি ওকে দু-এক প্রস্থ গেরুয়া জামাকাপড়, ঝোলাঝুলি আর গোপীযন্ত্র গছিয়ে দাও। মুখে ওর গোঁফ দাড়ি অল্প হলেও গজিয়ে তো আছেই—দিনে দিনে সেটা বাড়বে বই কমবে না। যদ্দিন থাকে এখানে"—

মন্দ না—ডাক্তারের পরিকল্পনাটা মন্দ না। সব দিক ভেবে সানো চৌধুরী এতক্ষণে মন খুলে হাসলো। বললে, "তবে চলো।"—

বুনো চরের সেই খানা খাল গাড়া গর্ত ভেঙে মধ্যরাত্রি পার করে ফিরে এলো দুজন।

সকালে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে ডাক্তার, "একবার এক গরমের ছুটিতে তোর দাদার সঙ্গে তার এক বন্ধু এসে-ছিল বেড়াতে—মনে আছে তোর মাধবী?"

"খুব মনে আছে।" মাধবী বললে, "দাদার সঙ্গে একই হোস্টেলে থাকতো। রুম-মেট। কেন—তাঁর কি হয়েছে?"

মাধবী প্রশ্নভরা চোখে চেয়ে রইল বাপের দিকে।

ডাক্তার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কৃত্রিম ঔদাসীন্যে বললে, "না—কিছু হয় নি। এমনি...মনে পড়ল হঠাৎ।"...ডাক্তার চুপ করে গেল।

দাদার প্রসঙ্গে বাবা হঠাৎ মাঝে-মধ্যে এমন দু-একটা প্রশ্ন করে বসে—মাধবীর কাছে এটা নতুন নয়। এমন প্রশ্ন মায়ের কাছে করতে সাহস পায় না বাবা। সেখানে দাদার প্রসঙ্গে অদ্ভুতভাবে দুজনে নীরব।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা—সেই ছেলেটার নাম কি ছিল যেন?"

"জীবেন দত্ত।"

"ঠিক ঠিক—জীবেন দত্ত।" ডাক্তার বললে, "ভুলে গেছলাম নামটা।"

"কেন বাবা!" হঠাৎ পর পর জিজ্ঞাসায় মাধবীর কেমন সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলে, "তিনি কি ধরা পড়েছেন?"

"সে আবার ধরা পড়বে কেন?" ডাক্তার উল্টে প্রশ্ন করলে, "সে কি আর তোর দাদার দলের কেউ?"

"তুমি কি যে বলো বাবা!" মাধবী

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
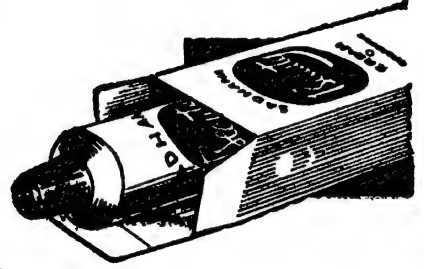
বললে, "সব এক দলের। তুমি জানতে না?"

"আমি কি করে জানব মা!"

"আমি জানি।" মাধবী বললে, "আমাকে দাদা কি যেন রাখতে দিতে চাচ্ছিল—জীবেনবাবুর ঘোর আপত্তি। মেয়েদের ওপর তাঁর ঘোর অবিশ্বাস। ওদের কথার মাঝখানে কখনো-সখনো গিয়ে পড়লে এমন মুখ গোমড়া করে আমার দিকে তাকাত।...সে গোমড়া মুখ আমার বেশ মনে আছে। আমার ভারি মজা লাগত।"...তারপর আবার জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ বাবা, বললো না—তিনি কি ধরা পড়েছেন?"

"ধরা?" ডাক্তার বললে, "নিশ্চয়ই তা হলে কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে থাকবে। ওদের সকলকেই তো প্রায় ধরে ফেলেছে মা। সে কি আর ধরা পড়ে নি?"

মাধবী বললে, "কাগজে কিন্তু তাঁর নাম দেখি নি বাবা।"

ডাক্তার কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যে অবহেলা ভরে বললে, "তুই কি কাগজ খুঁটিয়ে পড়িস? বেরিয়ে গেছে কবে হয়তো।"

"উহু।" মাধবী বললে, "ওসব খবর আমি খুঁটিয়ে পড়ি।"

"তা হলে হয়তো ধরা পড়ে নি।" ডাক্তার তেমনি উদাসীন গলায় বললে, "ওর কথা আজ মনে পড়ছিল। ক'দিন এসেছিল তো এখানে।...নামটা মনে পড়ছিল না।"

প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য ডাক্তার তার ডিসপেন্সারির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

॥ [illegible] ॥

আপাতত আন্দোলনের নামগন্ধও নেই। আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র সেই অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এদিক-ওদিক দু-একজন স্থানীয় খুদে নেতা বা সাহসী সমর্থককে ঘিরে যে দু-একটা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল—তাও আপাতত স্তব্ধ। বহিরাগত স্কুল-কলেজের সেই ভলান্টিয়ার বাহিনী—তারা একেবারে সমূলে উৎপাটিত। তাদের দু'-পাঁচজন যে মাঝে মধ্যে আসা-যাওয়া করত এবং ভেতরে ভেতরে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকেদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল—তাও বন্ধ হয়ে গেছে। ফেরারী সন্ত্রাসবাদীকে ধরার জন্য এ অঞ্চলে ঢোকার সমস্ত প্রবেশ-পথে কড়া-কড়ি ব্যবস্থা। সব কিছুর ওপর দিয়ে থানা পুলিশের যেন একটা রোলার চলে গেছে। আবাদী চর আর গ্রামের পর গ্রাম—সেখানে আন্দোলনের যে ঢেউ ঠেলে এসেছিল একদিন তাকে সবলে যেন আবার ঠেলে বের করে দেওয়া হয়েছে। ফিরে এসেছে সেই পুরাতন স্বাভাবিক নিত্য-কর্মের নিস্তরঙ্গ ধারার জীবন ও দিন। শীতের পাকা ফসল ভরা ক্ষেতে-খামারে উদয়াস্ত ঢিলেঢালাভাবে গা আড়িমুড়ি দিচ্ছে।

তবু বান চলে গেলেও তার চিহ্ন পড়ে থাকে কিছু। তেমনি নানা ক্ষতচিহ্নে ভরা এ চরের জীবন। তার আশপাশের গ্রাম-গ্রামান্তরের জীবন। হঠাৎ সন্ত্রাসবাদী ফেরারী এবং রহস্যময় আফলাই জঙ্গল-টাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন থেকে যেন সচকিত হয়ে উঠেছিল। পবন খাঁর অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরম বেদনায় আবার একবার সে লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে বসল। তার নিজের মানুষের হিসেব। কোথাকার সন্ত্রাসবাদী—কোথায় চলে গেল, কে জানে! উটকো মানুষের হিসেব চোখের বাইরেই থেকে গেল সে। বড় হয়ে উঠল নিজের মানুষের কথা।

এর মধ্যে একদিন কলিমদ্দি নাতিকে দিয়ে ডেকে পাঠাল ছোট মণ্ডলকে। দেখা করে দুটো কথা বলবে। একবার যদি তার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দেয়।

"সে কি কথা! যাব বৈকি। হাজার বার যাব।" খবর পেয়েই মহেশ উঠল। নাতিকে জিজ্ঞেস করলে, "তোর দাদা-জানের শরীর-টরির ভালো তো? হ্যাঁ রে?"—

"হেই সেই একরকম। বসে আছে তো আছে। শুয়ে আছে তো আছে। জ্বরের বার-টার হয় না।"

"চল—দেখি।"

মহেশ এল কলিমদ্দির সঙ্গে দেখা করতে। বিকেলের বেলাটুকু তখন যাই-যাই করছে।

দাওয়ার এককোণে জবুথবু হয়ে বসেছিল বুড়ো কলিমদ্দি।

মহেশ বললে, "আমাকে ডেকেছিলে শেখ?"

"বসো ছোট মণ্ডল।" কলিমদ্দি বললে, "তোমাকে কটা কথা বলবো বলে ডেকেছিলম।"

ক্লান্তকণ্ঠে, আস্তে আস্তে কথাগুলো যেন টেনে টেনে বললে কলিমদ্দি। গলায় আর সে হঠাৎ খ্যাপামির তীব্রতা নেই, কথাগুলোও খ্যাপা পাগলার মতো মনে হয় না।

মহেশ বললে, "বলো কি বলবে।" মহেশ বসলো।

কলিমদ্দি কিছুক্ষণ চুপ করে বোধ করি তার বক্তব্য মনে মনে গুছিয়ে নিলে।

মহেশ বললে, "যা বলবার—মনের কথা খুলে বল শেখ। যা ঘটবার ঘটে গেছে। তোমার পবনাকে মোরা আর ঘুরিয়ে আনতে পারবো না। সে গেছে—কিন্তু আমি তোমার পাশে আছি, মোদের চরের আর সকলেও আছে।"

"আছ—তোমরা সকলে আছ...আমি জানি, সকলে আছ। হেই সেই চরও আছে। সব যেখানে যেমনটি ছিল"—বলতে বলতে বুড়ো হাউমাউ করে উঠল। বললে, "শুধু সে নাই।.. শুধু সে ডাকাত নাই।"—

কথা ঘোরাবার জন্য মহেশ বললে, "আজ তোমার চাচাতো ভাই মকবুল শেখ এসেছিল—তখন যেতে দেখলম।"

বুড়ো চোখ দুটো মুছতে মুছতে কলিমদ্দি বললে, "তাই তো তোমাকে ডেকে পাঠালাম ছোটমণ্ডল।"

"কি বলে তোমার ভাই?"

"সে মক্কা যাচ্ছে—হজ করতে।" কলিমদ্দি বললে, "তার নসীব ভালো ছোট-মণ্ডল। কিন্তু মোর?"

"তুমিও কি যেতে চাও শেখ?"

"ইচ্ছা তো ছিল।" কলিমদ্দি আবার হাউমাউ করে উঠল। বললে, "বউ গেছে—সে-ও গেল। তাদের কচিকাঁচাগুলোকে নিয়ে আমি কি করি! এ চরে যে মোর দম বন্ধ হয়ে আসছে ছোটমণ্ডল।"

মহেশ মণ্ডল নীরবে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বললে, "তোমার চাচাতো ভাইয়ের ঘরে পবনার ব্যাটা-বেটিদের রেখে যেতে পার না?"

"তার কেউ নাই।"

মহেশ খানিক কি ভাবলে। বললে, "মোর উপরে ভরসা করো?"

"তোমাকে ভরসা করবো নি ছোট-মণ্ডল! তবে তোমাকে ডেকে পাঠালম কেন?"

"শুধু আমাকেই বা কেন! এ চরের [illegible] উপর তুমি ভরসা রাখতে পারো। [illegible]—[illegible] [illegible] ডেকে পাঠাই।" বলে মহেশ মুকুন্দকে ডেকে আনবার জন্যে কলিমদ্দির বড় নাতিকে পাঠিয়ে দিলে।

খানিক বাদে মুকুন্দ এসে হাজির হলো।

মহেশ বললে, "কলিমদ্দি শেখ হজ করতে যেতে চাচ্ছে মুকুন্দ। যাওয়ার আগে পবনার ব্যাটা-বেটিদের সে ভার দিয়ে যেতে চাচ্ছে আমাদের ওপরে। তা তুই কি বলিস?"

মুকুন্দ বললে, "আমি সব ক'জনের ভার নিতে রাজী আছি ছোটমণ্ডল।"

মহেশ বললে, "শুনলে শেখ?"

কলিমদ্দি চুপ করে রইল।

মহেশ বললে, ধেন্দার কারো কথা শুনেছস করলে "

কলিমদ্দি আস্তে আস্তে বললে, "আর কারো কথা শুনতে চাই নি ছোটমণ্ডল। তোমার ভরসাই মোর বড় ভরসা।"

"তো যাও তুমি হজ করতে।" মহেশ

জিজ্ঞেস করলে, "হাতে টাকা-পয়সা আছে না দিতে হবে—খুলে বল।"

"তা আছে—তা আছে।" বুড়ো ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে বললে, "টাকা-পয়সা কুলিয়ে যাবে। হে হে—সংসারে মোর দু-দুটো লোক যে কমে গেছে...ফৌতে হয়ে গেছে। তাদের খরচ যে বেঁচে গেল। হে হে"...

বুড়ো আপন মনে হাসতে লাগল অল্প অল্প। হঠাৎ সেই খ্যাপামির ভূতটা যেন তার ঘাড়ে এসে চেপে বসল।

এই লোক যাবে সেই কোথায় না কোথায়! সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রার পথ। মহেশ মণ্ডলের মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। চরের এই পুব প্রান্তে একমাত্র চাষীর ঘর কলিমদ্দির। তারপর হুগলী নদী। একদিন এ দিকটা ছিল বাতিল চরের সামিল—ভাঙন ধরা সর্বনাশা গাঙের মুখে সবটা যেন খাঁ খাঁ করত। তারপর একদিন ভাঙন বন্ধ হলো, পলি জমল নদীর বাঁকের মুখে—মাঝখানের কটা বছরে সেই বাতিল চরে বয়ে গেল সবুজের বন্যা—প্রাণের বন্যা। হাসি-গান-ছেলেপুলের কলকাকলি। আবার কখন লাগল আর এক ভাঙনের অশুভ ছায়া। কলিমদ্দি চলে গেলে সবটা আবার খাঁ খাঁ করতে থাকবে আগের মতো।

ফেরার পথে মহেশ বিড় বিড় করে শুধু বললে, "তুই কি করলি রে মুকুন্দ। ...মানুষটাকে চিনতে পারলি নি!"

পেছনে পেছনে আসছিল মুকুন্দ। বললে, "কি করবো আমি ছোটমণ্ডল—আমি তার গায়ে দেখলম সেই শাড়ি।"...

তার সেই এক কথা।...এই শাড়ির খোঁজে বহুদিন সে একা একা ঢুকে গেছে সুদীর্ঘ, রহস্যময়, নানা কথা উপকথায় ভরা জঙ্গলে। হাতে [illegible] ওদিক ঘুরেছে ব্যর্থ আক্রোশে—সবটা ঘুরে দেখার সুবিধে হয় নি। তখন নয়ন ছিল তবু কাছে। তারপর সে-ও ছিটকে গেছে ঘটনার আবর্তে। অভিমান হয়েছে মেয়েটার ওপর—রাগ হয়েছে, অবিশ্বাসও হয়েছে। ভলু মাঝির কথা নয়ন কিছুই ভাঙে নি তার কাছে! কেন? মনে হয়েছে—সে হেরে যাচ্ছে সবখানে। আর খ্যাপা ক্রোধ বিস্ফোরণের জন্যে জমা হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে। রাতের নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রতিদিন সে দিব্যি গেলেছে—বদলা সে নেবে, বদলা সে নেবে একদিন।

একটা বদলা সে নিয়েছে। পবন খাঁ মরেছে তার হাতে—তার জন্য সে খুবই দুঃখিত। তার আফশোষের সীমা নেই। তবু চরের সকলের চোখের সামনে দিয়ে সেই আধখানা রক্তমাখা শাড়ি হাতে ঝুলিয়ে এনেছে ঘরে। মুখ ফুটে না [illegible] মনে মনে বলেছে—হেই দেখ তোমার চরপঞ্চায়েতের বিচার। সব ঝুট-মুট!...

তবু বুকের চাপা সে ক্রোধের জ্বালা এখনো কমে নি। এখনো জ্বলছে। নয়ন এখনো দূরে। লুকিয়ে চুরিয়ে একটা খবরও কি সে নিতে পারে না কারুর হাত দিয়ে! চর থেকে চরে—গ্রাম থেকে গ্রামে এমন কত লোক তো আসে যায়।

চুলোয় যাক!...মনে মনে বলে—কিন্তু বদলা সে নেবে। এখনো সব কিছুর ফয়সালা হয় নি।

বোধ করি সেই শেষ ফয়সালার দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়নের বাপ স্বয়ং নিমাই মাঝি একদিন মহেশ মণ্ডলের বাড়িতে এসে হাজির হলো। মাঠে কাজ করছিল মুকুন্দ। দেখতে পেল। বুকের রক্ত তার চঞ্চল হয়ে উঠল। যেমন কাজ করছিল মাঠে তেমনি সে কাজ করতে লাগল। ফসল কাটার দিন। কিন্তু মন তার পড়ে রইল মহেশ মণ্ডলের বাড়িতে। কেন এসেছে নয়নের বাপ! তবে কি নয়নকে ফিরিয়ে নিতে বলতে এসেছে? সে কি খুব কান্নাকাটি করছে? ফিরে আসবার জন্যে ছটফট করছে? এমন এক শীতের দিনেই যে শাড়ি খোয়া গিয়েছিল তার—সে শাড়ি ফিরে পাওয়ার ঘটনা হয়তো শুনেছে [illegible]

কিন্তু নিমাই মাঝি মহেশ মণ্ডলকে বললে, "শেষটুকুর জন্যে আবার আসতে হলো ছোটমণ্ডল।"

মহেশ বললে, "কি?—ছাড়পত্র?"

"হ্যাঁ।" নিমাই বললে, "সে তো এখনো পেলমনি। তুমি বলেছিলে—টিপ্ করে পাঠিয়ে দিবে।"

"কি করবো বলো। মুকুন্দ সে কাগজ এখনো টিপ করে দেয় নি।"

"তবে?"

"তা তোমার আটকাচ্ছে কিসে?"

"ওই মেয়্যা মোর ঘরে বসিয়ে রাখতে সাহস হয় না ছোট মণ্ডল। তাছাড়া ঘর-বর যখন জুটে যাচ্ছে—আমি বিয়ে-সাদির ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে চাই।"

"দিবে বৈকি। তুমি ঠিক কথা ভেবেছ।" মহেশ জিজ্ঞেস করলে, "বরটি কে? সেই ভলু মাঝি?"

"নিমাই মাঝি বললে, "সেই বটে। সে নিজেই যেচে এসেছে।"

"ভালো। দিয়ে দাও।" মহেশ বললে, "ওর জন্যে সে এই চরে ঢের জ্বালিয়ে গেছে।"

"তবে তো তুমি তাকে জান ছোট মণ্ডল।" নিমাই মাঝি আস্তে আস্তে বললে, "মোর উপরেও সে নানাভাবে জ্বালাতন শুরু করে দিয়েছে। সে বড় দুর্দান্ত। আর জানই তো—থানা তার সহায়।"

মহেশ মণ্ডল আজ কথা শোনাতে ছাড়ল না। বললে, "আর এই কথাগুলোন যদি আগে বলতে—তাহলে তোমার মেয়্যাকে মোরা এই চরে বৌ করে আনতাম না।"

নিমাই চুপ করে বসে রইল।

মহেশ মণ্ডলও নীরবে মুখ গোমড়া করে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "তোমার মেয়্যা কিছু বলে কি?"

"সে আর কি বলবে ছোট মণ্ডল—খালি কান্নাকাটি করে।" নিমাই কড়া পুরুষ, কড়া বাপ। বললে, "ও ঘর-বর দিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই কাঁচা বয়সে ও আবার বুঝবে কি!"

"বলি বিয়ে-সাদি দিয়ে দিলে পরে গোলমাল করবে না তো তোমার ঝি?"

"কি আর গোলমাল করবে?"

"মানে—ধরো, ছাড়পত্রটা পাও নি তো।"

"ভলু মাঝি রাশভারি লোক—তার বৌ সে সামলে নিতে পারবে মনে হয়। যদি তোমার মুকুন্দ যেয়ে আবার না গোলমাল করে।"

মহেশ চুপ করে আবার খানিক ভাবলে। তারপর বললে, "সে আমরা সামলে নিতে পারবো। তুমি এক কাজ করো—চুকিয়ে দাও বিয়ে-সাদি।"

"তুমি বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"ছাড়পত্র?"

বিরক্ত হয়ে মহেশ মণ্ডল বললে, "রাখুক তাকে ছাতিতে চেপে মুকুন্দ। তোমাকে আমি আর একটা দিয়ে দিব।"

নিমাই মাঝি ঠিক বুঝতে পারল না—ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

গলা নামিয়ে মহেশ মণ্ডল বললে, "বুঝতে পারলে না? সে ছাড়পত্রে তার কেউ টিপ করে দেবে।" মহেশ মনে মনে চটে আছে মুকুন্দের ব্যবহারে। রাগের মাথায় বলে ফেললে, "কেউ না টিপ করে—আমি টিপ করে দেব। মুকুন্দ তার জন্য মামলা করতে যাবে! যাক—দেখি ওর মুরোদ কত! বলে বাপকে এখনো খালাস করে আনতে পারল না—সে করবে মামলা। তুমি নিশ্চিন্তে বিয়ে-সাদি চুকিয়ে দাও নিমাই।" [ক্রমশ]

**হে অতীত কথা কও (প্রথম পর্ব)** : সত্যানন্দ স্বামী : প্রকাশক—সুনীল দাশগুপ্ত, নবভারতী, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২ : দাম ১৬ টাকা।

১৯২৮ থেকে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে যে সব অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে লেখক তারই সমীক্ষা করেছেন এই গ্রন্থে। এই রচনাকে ধারাবাহিক ইতিহাস বলা যায় না। সেই সময়ের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে সে যুগের ইতিহাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে আত্মশোধনের জন্য ইতিহাসের এই পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন।

লেখকের মূল বক্তব্য হল আমাদের দেশের সব সংগ্রাম এবং আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল—গোল টেবিল বৈঠক। তাই আজ মনে হতে পারে সংগ্রামকে এড়িয়ে চলতেই যেন আমরা চেয়েছি। লেখক বলেছেন, 'সংগ্রাম, আন্দোলন ভারতীয় জীবনে সত্য নয়, সত্য গোল টেবিল বৈঠক।' মণ্টেগু চেমসফোর্ড থেকে মাউণ্টব্যাটেন অবধি কোথাও এর ছেদ ঘটে নি।

স্বাধীনতা লাভ করার পর সরকারী ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে, আমাদের স্বাধীনতা এসেছে একমাত্র অহিংস সংগ্রামের ফলে। কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে একথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অহিংস সংগ্রামের নায়ক গান্ধীজী ছিলেন অসামান্য পুরুষ। ভারতের গণচেতনার মূলে তাঁর অবদানের জন্য আমাদের আধুনিক ইতিহাসে তাঁর সাথে তুলনা করবার মত আরেকজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং দর্শনের দিক থেকে পৃথিবী অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। সে বিষয়ে গান্ধীজীর নির্লিপ্ত এবং উদাসীন ভাবটি লক্ষ্য করবার মত। সে সময়ের প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সংগে যে মানুষটির অদ্ভুত পরিচয় ও মনের মিল ছিল তিনি ভারতের ইতিহাসের মুকুটহীন সম্রাট সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজী, জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের যে সব অভিযোগ ছিল সেগুলি ভেবে দেখবার মত। তিনি বরাবর বলেছেন যে, ইংরাজের শঠতাকে আমাদের দেশের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ কোনদিন ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেন নি। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এঁদের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। বাইরের জগতের কাছে নিজেদের দেশের প্রকৃত অবস্থাটি জানিয়ে কোনপ্রকার নৈতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা এঁরা করেন নি। ইংরাজের মিষ্টি কথায় তুষ্ট হয়ে, অথবা ছল-চাতুরীতে ভুলে এঁরা সর্বদাই ঠকেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজকে সমর্থন করে এঁরা মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধের পর ইংরাজ সরকার প্রতিদানে কিছু দেবেন। যুদ্ধ শেষ হলে সে ভুল ভাঙতে বেশিদিন সময় লাগে নি। তা সত্ত্বেও ইংরাজ গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইন দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের আগে আমাদের প্রতারণা করতে পেরেছিলেন। গোল টেবিল বৈঠক ছাড়াও অন্যান্য বহু ঘটনার ভিতর দিয়ে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রচ্ছন্ন ইংরাজ প্রীতির জন্য তাঁরা কোনদিনই ইংরাজকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারেন নি। স্বাধীনতা লাভ করার পরেও কাশ্মীরে যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে মাউণ্টব্যাটেনের অপরিচ্ছন্ন কূটনীতি।

সত্যানন্দ স্বামীর এই গ্রন্থটি আরেকটি দিক থেকেও বিশেষ মূল্যবান। বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী দেশ সেবকদের কঠিন সংগ্রাম ও আত্মদানের ইতিহাস তিনি বড়ই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ইতিহাসসন্ধানী মন উচ্ছ্বাসের বানে ভেসে না গিয়ে, তথ্যপূর্ণ তথ্যগুলি সংগ্রহ করে ভারতের এই বীর সন্তানদের কাহিনী নিপুণভাবে পরিবেশন করতে সাহায্য করেছে। বাংলার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ সমাদর লাভ করবে বলেই আমরা আশা করি।

**সহস্র বর্ষের প্রেম—সুশীল জানা** : বুক এম্পোরিয়াম কোং, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : ছয় টাকা।

ঔপন্যাসিক হিসেবে শ্রীসুশীল জানা খ্যাতি লাভ করেছেন। সম্ভবত এই প্রথম তিনি কাব্য সংকলক হিসেবে পাঠকসমাজে নিজেকে উপস্থাপিত করলেন। সংকলক হিসেবে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে, সহস্র বর্ষের প্রেমের কবিতাগুলিকে তিনি শুধু সংকলকের মতো খুঁজে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন নি, প্রতিটি কবিতার পূর্ব প্রসঙ্গ তিনি উল্লেখ করেছেন, সেই সঙ্গে রসোত্তীর্ণ অনুবাদের মাধ্যমে কবিতাগুলিতে যে স্নিগ্ধতা ও প্রসাদগুণের সঞ্চার করেছেন, তা এক নিমেষে আমাদের মুগ্ধ করে দেয়।

আরো একটি কথা আছে; তা হচ্ছে এই যে, যুগ-যন্ত্রণা এবং নানা সমস্যার কথা এ যুগে উচ্চারিত হচ্ছে, তবু হৃদয়ার্তির কারণে প্রেমের কবিতা সৃষ্টিতে ছেদ পড়ে নি। সে যুগে একালের যন্ত্রণা ও সমস্যা না থাকলেও—সে যুগেও ছিল প্রেমিক হৃদয়ের আর্তি। তাই সহস্র বর্ষের প্রেমের কবিতা প্রেম নিবেদনের নানা ভঙ্গির জন্যে একালের রসিকচিত্তেও গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করবে—এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীজানা প্রেমের কবিতাগুলি চয়ন করেছেন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, মনুসংহিতা, গৃহ্যসূত্র, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, দীর্ঘনিকায়, অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ, ক্ষেমেন্দ্রর বোধিসত্ত্বাবদান, ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, কালিদাসের কুমারসম্ভব ও মেঘদূত, ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক, অমরুশতক, ভবভূতির উত্তররামচরিত, শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য বিজ্জকা, শীলা ভট্টারিকা ও অন্যান্য, গাথা সপ্তশতী, সপ্তশতী, রাজশেখর, সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টর কাদম্বরী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, পিঙ্গল ও সিদ্ধাচার্য সমূহ থেকে। বলা বাহুল্য, আলোচ্য গ্রন্থটির সাহায্যে প্রাচীনকালের প্রেমের কবিতাগুলির সঙ্গে পাঠকদের নিবিড় পরিচয় ঘটবে। সংকলকের অসাধ্য পরিশ্রমের ফলে যা ভাষান্তরে সংকলিত হয়েছে, তার যথাযোগ্য মর্যাদা তিনি অবশ্যই লাভ করবেন। কবিতাগুলিকে অনুবাদের সময় তিনি বিভিন্ন ছন্দের সাহায্য গ্রহণ

করেছেন—যাতে এক-একটি ভিন্ন স্বাদের কবিতা পড়ার সময় মনে ভিন্ন জাতের দোলা, তীব্রতা বা উত্তেজনার দ্বারা চরম বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। যেমন,

"ভোগে শান্তি মেলে কোথা?
স্তব্ধ কাম হয়েছে উন্মন,
যযাতি বলেছে শেষে, পুত্র নাও
তোমার যৌবন॥"
(যযাতির যৌবন)

অথবা,

"মাটিতে ডানার ঝাপটা মেরে
ঈগল যেমন আকাশে ওড়ে
তেমনি আমার বলিষ্ঠ ডানার
ঝাপটায়
আকর্ষণ করে নেব তোমার মন—"
(অথর্ববেদ)

সংকলিত এই কাব্যগ্রন্থটির অঙ্গ-সৌষ্ঠবে আছে প্রাচীন ভারতের কতকগুলির ভাস্কর্যশিল্পের নয়নলোভন ছবি। আশা করি, 'সহস্র বর্ষের প্রেম' রসিকচিত্তকে আকৃষ্ট করবে।

**এই জন্ম, জন্মভূমি—মণীন্দ্র রায়** ৪।৩ বি, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে তরুণ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য : দু' টাকা।

কবি মণীন্দ্র রায়ের একেকটি কাব্যগ্রন্থ বের হলেই পাঠকদের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। মণীন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত কবি, কিন্তু তাঁর কবিতার তীক্ষ্ণতার ও তির্যক ভঙ্গির জন্য তিনি বহু আলোচিত। তিনি শুধু হৃদয়-সর্বস্ব কবি নন, তাঁর কবিতায় থাকে তীব্র আবেগের সঙ্গে সুগভীর মননশীলতা আর তা রাষ্ট্র, সমাজ ও কালের গরল ও সুধা দুই-ই পান করে জটিল জীবনের মন্ত্রোচ্চারণে মুখর। 'এই জন্ম, জন্মভূমি' কাব্যগ্রন্থটি পড়লে মনে হয় যন্ত্রণা যেমন বাংলা দেশের একালের জীবনভঙ্গিতে, ততোধিক যন্ত্রণা সংবেদনশীল কবি মণীন্দ্র রায়ের মনেও। কবি বলেছেন,

"আছি কলকাতায় বেঁচে
আমি তুমি আমরা তো সবাই
আছি বাংলাদেশে, তবু
বেঁচে কতটুকু?

এ একটা অশান্ত দিন,
এ একটা নিঃশব্দ নড়াচড়া।"

তারপর তিনি একে একে টান মেরে তুলে এনেছেন হঠাৎ হোঁচটে স্থির প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি। হায় তবু চোখ দুটোতে কালো দুটো গর্ত—কেউ যেন হাতড়ায় অন্তঃসার।' আর যা চরম বাস্তব, তা হচ্ছে আপিসে, দোকানে, প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘে যারা যাচ্ছে, তারা লাভের পিঁপড়ে। ব্যক্তি জীবনেও মধ্য-[illegible] যুবো মেয়েটা এবং সেই লোকটারই বা কী ভয়ঙ্কর দশা! অথচ এসবই নাকি বাস্তব!

"অথচ কাছেই আছে কিন্তু
আরো একটা গনগনে জীবন,"

'সেখানে তেলকালি-মাখা মানুষ,' 'সেখানে দিনরাত রোদে জলে ভরে উঠছে মাঠের ভাঁড়ার,' সেখানেও শোষণের যন্ত্রে পিষ্ট মানুষের অপরিসীম যন্ত্রণা।

কাব্যগ্রন্থের প্রথম সর্গে কবি অকস্মাৎ যে তোলপাড় শুনেছেন, দ্বিতীয় সর্গে সাধারণ মানুষ কবির অবশ্যম্ভাবী কথায় স্বীকার করেছেন যে, সেদিন আসবে, আসবেই এবং 'হওয়া-না হওয়ার দ্বন্দ্ব ফেটে পড়বে দ্রুত বিস্ফোরণে'। যদিও 'গঙ্গার তরঙ্গ থেকে বড় বেশি দূরে—মুছে গেছে জীবনের টান' তবু 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গ'। তাই যে-কোনো একটি গ্রামের স্বপ্নময় ছবি এই—

"আমি লিচু বকুলের গুলঞ্চের গলাগলি
ভিড়ে
দপ করে হঠাৎ ওকি এক থোবা
অর্কিডের লাল;
সমস্ত সকাল যেন চিত্রার্পিত, শুধু
মানুষেরই হৃদয়ে আকাল।"

আশ্চর্য এবং চিরায়ত সৌন্দর্যেরই এই ছবি। এও তো বাস্তব। তবু যেন আজ স্বপ্নময়। আসল সত্য, স্বাধীন হলেও দেশের মানুষ নিজেকে স্বাধীন বলে ভাবতে পারে নি।

বাংলা দেশের চিরায়ত সৌন্দর্যকে ভুলে বাংলা দেশের মানুষ আজ কোথায়? দ্বিতীয় জীবনই কি আজ তার একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু? অবশ্য এই কার্যকারণ নির্ণয় করেছেন কবি দেশ-কাল সমাজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অপূর্ব সহানুভূতি আবেগময় উচ্চারণ : 'আমি জীবনেরই শরণার্থী'। প্রথম সর্গের শেষদিকে তোলপাড়ের যে তীব্রতা ছিল এবং প্রথম দিকে অন্তঃসারশূন্যতা—চতুর্থ সর্গে সেই তোলপাড়ই 'বদলাচ্ছে তোমারও অন্তঃসার'। প্রশ্নে আবর্তিত মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক অর্থাৎ কবির 'তুমি'—সে যতো রূপেই আবর্তিত হোক, আসলে সে গোটা মানুষ, হাজারে হাজারে তারাই সম্পূর্ণ। যুগসন্ধির কারণেই [illegible] ঐ আবর্তন। তীক্ষ্ণ যুগসন্ধির জন্য যা অনিবার্য—তার মধ্যেও এই জন্ম, জন্মভূমির মৌল সত্যকেই কবি অকপটে তুলে ধরেছেন যা আমাদের মর্মে গিয়ে এক নিমেষে ভেদ করে। ৫৫৯ পঙক্তিতে কাব্যগ্রন্থটি সমাপ্ত। একালে কবিতা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে সুরু করেছে, এ জাতীয় কাব্যগ্রন্থ নতুন আস্বাদ দেবে, সেই সঙ্গে নবজীবনের উপলব্ধি। বহু [illegible] রায়ের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আশা করি, 'এই জন্ম, জন্মভূমি' আলোড়ন সৃষ্টি করবে। বিস্মিত করবে বিদগ্ধ পাঠককে।

## পত্র-পত্রিকা

**পরিচিতি** (শারদীয় সঙ্কলন, ১৩৭৬) —সম্পাদক: সত্য মন্ডল। ৮এ, লেক প্লেস, কলকাতা—২৯। দাম: এক টাকা।

নতুনদের সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে 'পরিচিতি' ভাল লাগল। গল্প ও প্রবন্ধগুলিতে পরিশ্রম ও অনুশীলনের চিহ্ন আছে। লেখকগোষ্ঠীতে আছেন সত্য মন্ডল, হরিহর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, বিমল গুপ্ত, মিনতি মজুমদার, সন্ধ্যা মিত্র, ইন্দিরা মহলানবীশ, সুরুচি দেবী, এস রওশন আলী প্রমুখ।

**ভাবীকাল** (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬) —সম্পাদক: সুধাংশু গুপ্ত। ১১৬।১সি বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা—১০। দাম: দু' টাকা।

এই পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন বনফুল, সুধাংশু গুপ্ত, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। কলেবর ও মান অনুযায়ী দামটা একটু বেশি।

**অপ্সরা**। সম্পাদক—শান্তনু দাস। ৭/১সি ,কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। দাম : ৩·৫০।

সুসম্পাদিত এই শারদ সংকলনটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে বলে আশা করি।

স্বনামধন্য প্রায় সমস্ত লেখকই এ সংখ্যাটি অলংকৃত করেছেন। ৫টি উপন্যাস লিখেছেন—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে মূল্যবান স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এ ছাড়া ৫ সম্পাদকের বৈঠকী গল্পে আছেন—পরিমল গোস্বামী, সাগরময় ঘোষ, প্রাণতোষ ঘটক, সুশীল রায়, মণীন্দ্র রায়। বড় গল্প লিখেছেন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী। বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, চিরঞ্জীব সেন, গোপাল সামন্ত, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য রচনা লিখেছেন—উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, অনিল, শমিত, নির্মলকুমার; সুপ্রিয়া, মাধবী, অঞ্জনা, সন্ধ্যা, অপর্ণা, সুশীল মজুমদার, বিভূতি লাহা, অজয় কর, পীযূষ বসু, সতীনাথ, শ্যামল, মানবেন্দ্র, আরতি, খগরাজ, পরিমল দে, শান্ত মিত্র, হাবিব, সি প্রসাদ। দু-একটি কবিতা থাকলে পত্রিকাটি আরও [illegible]

## চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের আউটডোর বিভাগ

ভারতবর্ষের ক্যানসার চিকিৎসার অন্যতম এবং বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের নাম বহুদূর বিস্তৃত।

এই হাসপাতালের ইনডোর, চিকিৎসা, রোগী ভর্তি ও অন্যান্য ব্যাপারে বহু অভিযোগ, অনুযোগ, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দরবারে গিয়ে পরিত্যক্ত কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী বদলও হয়েছে। নিত্য নতুন ডাক্তারও আসছেন-যাচ্ছেন। কিন্তু সবই বুড়ি ছুঁয়ে পালানোর ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমি জনৈক হতভাগ্য ভুক্তভোগী, সম্প্রতি এই হাসপাতালের আউটডোর বিভাগে গিয়ে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তার সামান্য কিছু বলে অন্তরের জ্বালা ও দুঃখের উপশম চাইছি। আমি একজন সরকারী কর্মী। নিম্নবেতনে বৃহৎ পরিবারের চাহিদার সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম আমার। আমারই পরিবারের একজন মহিলার এই কঠিন রোগ সন্দেহে স্থানীয় ডাক্তারের উপদেশে ব্যাকুল হয়ে বহুদূর থেকে ছুটে আসি এই বিখ্যাত হাসপাতালে। রোগিণী পঞ্চাশ বৎসর বয়সের একজন নিরক্ষর, স্বল্পবুদ্ধি, গ্রাম্য, ভীতু প্রকৃতির মানুষ।

প্রথমদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে লাইন দিয়ে বহু সময় ও ঝঞ্ঝাট পার হবার পর আউটডোর-এর টিকিট পাই এবং কপালগুণে একজন বিখ্যাত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ বড় ডাক্তারের হাতেই পড়ি। তিনি পাঁচ-সাত মিনিট দেখবার পর রোগিণীর রক্ত ও প্রস্রাবের পরীক্ষার কথা লিখে দিয়েই সেদিনের মত বেলা সাড়ে নটা-দশটার মধ্যেই হাসপাতাল ত্যাগ করলেন। তাঁর চলে যাবার পরই দু'-তিনজন কমবয়সী ডাক্তার প্রতিদিনের মত রোগীদের বিলি-বন্দোবস্ত করতে সেখানে বসলেন। এঁরা আউটডোর-এর ভারপ্রাপ্ত এবং বেতনভুক। এঁদের নির্দেশ লেখার অপেক্ষায় আমার টিকিটখানি চাপা পড়ে রইল বেলা বারোটা পর্যন্ত। তারপর আমার ডাক পড়ল এবং তাঁদের একজন ডাক্তার পুনরায় ঐ রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার কথা জানিয়ে, টিকিটে একটি তারিখ লিখে, রোগিণীকে আনতে বলে দিলেন। অথচ ঐ কথাটি তিন ঘণ্টা পূর্বেই জেনেছি এবং টিকিটখানি চাইতে গিয়ে বার দুই ধমকও খেয়েছি।

নির্দিষ্ট দ্বিতীয়দিন রোগিণীকে এনে রক্ত ও প্রস্রাবের নমুনা দেবার জন্যে

(মতামত লেখকের)

দিয়ে যাই। ডাক্তারেরাও পুনরায় তারিখ দিয়ে রোগিণীকে আনতে বলে বললেন যে, ঐ তারিখের আগেই রক্ত ও প্রস্রাবের রিপোর্ট এসে যাবে এবং তা দেখে পরবর্তী করণীয় কি তাঁরা বলবেন।

এর পরের সপ্তাহে নির্দিষ্ট দু'টি তারিখে বহুদূর থেকে রোগিণীকে সঙ্গে এনে, অফিস কামাই করে ট্রেন, বাস, ট্যাকসির খরচা দিয়ে, ফিরে চলে যাই। কারণ ঐ রক্ত ও প্রস্রাবের রিপোর্ট তখনও আউটডোর-এ আসে নি। তৃতীয় তারিখেও যখন রিপোর্ট এলো না তখন ধৈর্যহারা হয়ে প্যাথলজি বিভাগে খোঁজ করে জানতে পারি ঐ নম্বরের রোগিণীর রিপোর্ট চার-পাঁচ দিন আগেই তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ কথা জেনে ডাক্তারদের সামনে কিছু চেঁচামেচি করি। আর তার ফলে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর রিপোর্টগুলি পাওয়া গেল আউটডোরেই একটি টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজপত্রের মধ্যে। দু'জন বিরক্ত নার্স ওগুলো খুঁজে বার করে আমার ওপর আরও বিরক্ত হয়ে বললেন—"আগে বলেন নি কেন।"

সময়টা জুন-জুলাই মাস। গরমে বর্ষায় রোগীরা আউটডোর-এর ভিতর দিককার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, বসে ডাকের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে ঘণ্টা গুণছে। বসবার ঘর দু'টিতে বসবার জায়গা ভর্তি হয়ে যাওয়ায় বাইরের বারান্দার ব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখের কথা সেখানে একখানি লম্বা বেঞ্চ আর দারোয়ানের টুল ছাড়া আর কিছুই নেই। কয়েকজন নিম্ন-শ্রেণীর গরীব রোগী ও রোগিণী বারান্দায় শুয়ে পড়ে আছে। আমরা কয়েকজনে ধরাধরি করে একজন অত্যন্ত কাহিল রোগীকে পাশেই একটা বড় হল-ঘরে এনে পাখার তলায় বসিয়ে দিতে না দিতেই জনৈকা স্টাফ নার্স প্রচণ্ড আক্রোশে চোখ গরম করে এসে আমাদের তাড়িয়ে বার করে দিলেন। তারপর আমাদের মুখের ওপর দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করতে করতে বললেন—'এটা কনফারেন্স রুম। মাসে দু'-তিন বার ব্যবহার হয়।'

না। কিন্তু বারান্দার পাশেই আরেক ছোট ঘরে (ড্রেসিং ঘরের পাশে) একগা রোগিণীকে ঠেসে বসানো হয়েছে যেখা ওই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে সেখানে এ খানি অন্তত পাখার কথা কনফারেন্স রুমের অনেকগুলি বেকার পাখ তুলনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হ

যা হোক, এর পর পুনরায় নির্দি তারিখে বড় ডাক্তারবাবু আ রোগিণীকে বায়প্সি করানোর নি দিলেন এবং যথানিয়মে বেলা বারে নাগাদ টিকিটে পরবর্তী তারিখ লি ছোট ডাক্তারেরা আমাদের ছেড়ে দিলে 'বায়প্সি'র দিন রোগিণীকে এনে লাই বসিয়ে ঘণ্টা দুই পরে ডাক পেলা কেবলমাত্র রোগিণীকে ঘরে ঢু ছোট ডাক্তার কিছুক্ষণ বাদেই আম ডাকলেন। অন্য ডাক্তারদের মধ্যে ই একটু মুরুব্বী গোছের। একটু ফ গোলগাল, বেঁটে এবং ফাইনকাট গে —ডাক্তারটি সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ে আমাকে ধমকে বললেন—"আপ পেসেন্ট বায়প্সি করাবে না বল আজ নিয়ে যান পরের তারিখে আ আনবেন।"

আমি খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে চেঁ উঠলাম—"সে কি! আমি তো বরা প্রথম থেকে আপনাদের বলে আসছি রোগিণী বোকাসোকা, গ্রাম্য, ভ প্রকৃতির মানুষ, কাজেই যা বল আমাকেই বলুন, জিজ্ঞাসা করুন, তার আপনাদের যা করবার করুন। তাছ ইতিপূর্বে রোগিণীর হাসপাতা অভিজ্ঞতা আছে। অনেক আগে বার অপারেশন হয়েও ছিল।"

ডাক্তার হঠাৎ হাত নেড়ে চেঁ রোগিণীকে বলে উঠলেন—"আজ নার একটা অপারেশন হবে, করাবে

রোগিণী ভয়ে আতঙ্কে বলে উঠ "না—না।" ডাক্তারের বলবার ধরণে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—"ও বলছেন কেন, বায়প্সি তো সা ব্যাপার। অপারেশন বলতে ভয়ঙ্কর মনে করছে।"

ডাক্তার রেগে বলে উঠলেন—" লেস্। এই সব লে-ম্যানদের নিয়ে পারা যায় না। যান্—আপনারা যান্। আজ আর কিছু হবে না।"

আমি সকাতরে বলে উঠলাম—"দে ডাক্তারবাবু, যদি একটি বাচ্চা মে রোগিণী হিসাবে আনতাম, তাহলে আপনি আমার কাছ থেকেই সব শুন না বা আপনার যা করবার করতেন দয়া করে আজ আর ফেরাবেন অফিসে অনেক কামাই হয়ে গেছে। প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন ধরে হপ্তায় বারও এসেছি। আমি তো বলছি

রোগিণী একদম ডালহেডেড্ আছে। ওকে কিছু বলতে হবে না।"

এবার ডাক্তার আঁত্‌কে উঠে চোখ কপালে তুলে বলে উঠলেন—"অ্যাঁ কি বললেন তাহলে তো বায়প্‌সি করাই যাবে না। "ইনসেন্" পেসেণ্ট আমরা এ্যাটেণ্ড করি না।"

ঘটনাটা হয়ত গল্পের মত শোনাচ্ছে আপনাদের কাছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার চেনা-পরিচিত দু'-একজনের ঠিকানাও সংগে রেখেছি যাঁরা ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সাক্ষী মানতে পারি। তাঁরাও আমারই মত ভুক্তভোগী এবং হাসপাতালেই তাঁদের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

যা হোক ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি হচ্ছিল। কারণ, 'ডালহেডেড্' আর 'ইনসেন্' কথাটার পার্থক্য বোঝাবার মত সহিষ্ণুতা, ধৈর্য কোনটাই আমার ছিল না। ঘটনার চাপে আমিই ডালহেডেড্ বা ইনসেন্ হয়ে চলে আসছিলাম। কিন্তু ভাগ্যগুণে সিঁড়ির মুখে একজন বহুদিন আগের চেনা ডাক্তারের সংগে দেখা হল। তিনি ঐ হাসপাতালেই এনাস্থেটিস্ট্-এর কাজ করেন। এবং তাঁকেই ধরে করে সেই দিনই অন্য একজন ডাক্তারকে দিয়ে বায়প্‌সি করাই। বলা বাহুল্য রোগিণী তা সহজভাবেই করে, কারণ ঐ ডাক্তারের কথায় একটু সাধারণ সহানুভূতি ছিল।

পরবর্তী অধ্যায় আরও মর্মান্তিক। তবুও আপনাদের আমার কথা অবিশ্বাস না করতে প্রার্থনা করব, কেন না তাতে আমার জ্বালা আরও বাড়বে। এর পরের সপ্তাহে রোগিণীকে দু'দিন ড্রেসিং করাতে হাসপাতালে আসি এবং প্রত্যেকবারই খোঁজ নিয়ে যাই বায়প্‌সির রিপোর্ট এসেছে কি না। প্রায় পনের-ষোল দিন পার হয়ে গেলে ধৈর্যহারা হয়ে আবার সেই চেনা এনাস্থেটিসট্-এর মারফতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি—রিপোর্ট মিসিং। হারিয়ে গেছে। 'আউটডোর'-এ খোঁজা হচ্ছে। কারণ প্যাথলজি বিভাগ আমার রোগিণীর ক্রমিক সংখ্যায় একজন রোগীর (পুরুষ) রিপোর্ট পাঠিয়েছে যার পেটে ক্ষত হয়েছে। আর আমার রোগিণীর গলার গ্ল্যানডে ক্ষত। তবে ভয়ের কিছু নেই। রোগিণীর রিপোর্টও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়ত সংখ্যার একটু আগে-পরে হয়ে গেছে।

এবারে মাথায় আগুন ধরে গেল। ব্যাপারটা সবাইকে জানালাম আশে-পাশে। তারপর ভুক্তভোগী সবাইকে নিয়ে খুব জোর বিক্ষোভ জানালাম। ছোট ডাক্তার ও নার্সেরা এবারে বেশ ঘাবড়ে গেলেন। সেই গোলমুখ দুর্মুখোটি অন্যদের কি যেন বলে পাশের দরজা দিয়ে কেটে পড়লেন নিঃশব্দে। কিন্তু তার পরই হঠাৎ অন্যান্য ডাক্তার ও সিস্টাররা প্রায় একযোগে আমাকে ধমকে উঠলেন—"কে বলেছে. আপনার রিপোর্ট হারিয়ে গেছে। এই তো রিপোর্ট। রোগীর ভিড়ে এরকম একটু-আধটু হয়ে থাকে।"—এই বলে তাঁরা আমাকে একটি কাগজে কিছু লেখা দেখিয়ে বললেন—"এই তো দেখুন না বড় ডাক্তার নোট দিয়ে গিয়েছেন রিপোর্ট দেখে,—আবার বায়প্‌সি করাতে হবে। আপনি পরের তারিখে পেসেণ্টকে আবার আনবেন।"

আমি হতভম্ব হয়ে অতি কষ্টে উচ্চারণ করলাম—"আবার বায়পসি!" জনৈক কমবয়সী ডাক্তার ভারিক্কী গলায় বলে উঠল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবে এবারে অন্যরকম। এবারে কাটিং বায়প্‌সি। ও সব আপনি বুঝবেন না। লে-ম্যান তো।"

প্রথমদিন থেকে প্রায় দেড় মাস হয়ে এসেছে। এতদিনে রোগিণীর অবস্থা বোঝাবুঝির বাইরে। তার ওপর দুর্ভাগ্য এমনিই যে, আগের বায়প্‌সির সেলাই পেকে ক্ষতস্থান ফেঁপে ফুলে একাকার। শেষ পর্যন্ত সেই এনাস্থেটিস্ট্ ডাক্তারের পরামর্শে, ধার-দেনা করে, বাইরের একজন বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে তবে আস্তে আস্তে ঈশ্বরের কৃপায় রোগ আয়ত্তে আসে।

—মোতি সরকার
C/o. শ্রীবলাইচন্দ্র মিত্র
মিত্রপাড়া
পোঃ জয়নগর মজিলপুর
(২৪ পরগনা)

**স্বাস্থ্যবিভাগের প্রমোশন রহস্য প্রসঙ্গে**

সাপ্তাহিক বসুমতীর আমি একজন অতি আগ্রহী পাঠিকা এবং সাপ্তাহিক বসুমতী সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতি দূর করার যে প্রচেষ্টা করছেন, তার জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে জনৈকা মেডিক্যাল অফিসারের নামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সে-সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

প্রথমত তাঁর ভর্তির সময় ১৯৫৫ সালে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে তাঁর জন্যে বিশেষভাবে কোন সিট বাড়ান হয় নি। তৎকালীন সরকারী নথিপত্রই এর সাক্ষ্য দেবে।

দ্বিতীয়ত তিনি পৃথিবীর এবং কমনওয়েলথের অন্যতম খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় কুইনস ইউনিভারসিটি, বেলফাস্ট হতে মেডিসিনে স্নাতকোত্তর (পি এইচ ডি ডিগ্রী) পেয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী বহু ছাত্র এখন কলকাতায় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করছেন—প্রয়োজন হলে তাঁদের নাম ও ঠিকানা দিতে আমি প্রস্তুত।

তৃতীয়ত সেই মহিলা মেডিসিনের প্রফেসার বিশ্ববিখ্যাত ডাঃ গ্রাহাম বুল-এর অধীনেই মেডিসিন বিভাগে পি এইচ ডি করেছেন এবং বেলফাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগেই যথাক্রমে সিনিয়র হাউস অফিসার এবং রেজিস্ট্রারের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক গ্রাহাম বুল-এর প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নিকট নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। এ-ছাড়া উনি বিলাত যাবার প্রাক্কালেও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অধ্যাপক শৈলেন সেনের অধীনে কাজ করেছিলেন। স্নাতকোত্তরের পরে ক্যানাডায় ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের রীন্যাল্ ফেলিঅর্ এ্যাণ্ড কিডনী ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশন ইউনিট-এ কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে তিনি সোসালিস্ট পুল অফিসার হিসাবে এস এস কে এম হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে নিযুক্ত হন। গত চার বছর ধরে তিনি প্রথমে এস এস কে এম হাসপাতাল এবং পরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্পেসালিস্ট ইন মেডিসিন হিসাবে মেডিসিন বিভাগে নিযুক্ত হন। গত ১৯৬৬ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড গিয়ে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ইউরোলজি সম্বন্ধে আবার পারদর্শিতা লাভ করেন। এতে এই-ই প্রমাণিত হয় যে, গত ৯ বৎসর ধরে তিনি মেডিসিন বিভাগেই কাজ করছেন। ফিজিওলজিতে নয়।

সম্প্রতিকালে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ইউরোলজি বিভাগটি স্পেসালিস্ট বিভাগ হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং আমরা মনে করি যে, তাঁর ইউরোলজিক্যাল মেডিসিন, আর্টিফিসিয়াল কিডনী এবং কিডনী ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশন-এর অভিজ্ঞতা নিয়োজিত করবার উপযুক্ত স্থান নীলরতন সরকার হাসপাতাল।

আমার দৃঢ় ধারণা যে, এই মহিলার নীলরতন সরকার হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে নিয়োজন বিজ্ঞানসম্মত এবং এই জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগকে অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি যে, তাঁর মান হিসেবে সরকার তাঁকে উত্তরোত্তর উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত করবেন।

—শ্রীসোনালী গুপ্ত
৩, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা-১৭

# মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান তত্ত্ব ও বিশ্বরাজনীতি / কাশীকান্ত মৈত্র

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ তিন ॥

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ টালবাহানার মধ্যেও সাময়িকভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে সুসংহত করতে সক্ষম হবে এই মার্কসবাদী তত্ত্ব মেনে নিলে কতকগুলি পরিণতির কথা স্বভাবতই মনে আসবে। প্রথমত, এর একটা পরিণতি হচ্ছে এই যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হবার সুযোগ পাবে এবং নিজেদের ভেতরকার বিরোধ যদি এড়াতে পারে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অথবা আর এক ধাপ বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে। এই প্রস্তুত হবার অন্যতম ফল এটাও যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দুর্বল স্থানগুলিকে শক্ত করে নেওয়ার সুযোগ মিলবে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী শিবিরের ওপর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের চূড়ান্ত সাফল্য বা বিজয়-সম্ভাবনাকে স্তিমিত করা বা আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া—কেন না ইত্যবসরে 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' বা বিশ্বপরিস্থিতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য একরকম না-ও থাকতে পারে। আর যে-পরিমাণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব লাভ করে বা দীর্ঘমেয়াদী হবে এবং নিজের ভিত্তিভূমিকে সুসংহত করতে সক্ষম হবে, ঠিক সেই পরিমাণে সেইসব রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট আন্দোলন পিছিয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে এই "টেম্পোরারী স্ট্যাবিলাইজেশনের" যুগটা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনুকূলে হবে না। তৃতীয়ত, এর দ্বারা দুটি পৃথক স্থায়ী দুনিয়াকে মেনে নেওয়া হবে আর অনিবার্য ফলশ্রুতিস্বরূপ জোট-নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রগতিশীল দেশগুলির ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি হবে—জোট-নিরপেক্ষতা ('নন-এ্যালাইনমেণ্ট') পরিত্যাগ করার জন্য। দুই শিবির থেকেই প্রচন্ড চাপ আসবে এইসব দেশের ওপর এবং তাদের [illegible] রাজনীতিতেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আবার জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলিও ('আনকমিটেড নেশন') জোটের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নতুন ভারসাম্য 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' সৃষ্টি করতে পারে—সেটা চাপসৃষ্টিকারী আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপবাদী উগ্রপন্থী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মাতব্বরীর বিরুদ্ধে যেতে পারে। এশিয়া-আফ্রিকার জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির সামরিক শক্তি কম সত্যি, কিন্তু বিশ্বরাজনীতিতে এদের প্রভাব ('ইনফ্লুয়েন্স') অনস্বীকার্য। যুগোশ্লাভিয়ার মতে......

..."In fact if the question of appearance of a qualitatively *completely a new force* in international relations, introducing *a new content* in world politics ... *Time has come for the voice of uncommitted countries to be heard much more strongly than before.*" (Newspaper Borba, 4th June, 1961).

অর্থাৎ গুণগতভাবে বিশ্বরাজনীতিতে জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি একটি সম্পূর্ণ বিশ্বশক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে বলা যেতে পারে এবং এরা নতুন অবদানও জুগিয়েছে বিশ্বরাজনীতিতে। এই সব দেশের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হওয়ার সময় এসেছে।

আজকের বিশ্বে পররাজ্যলোলুপতা, পররাজ্যে সৈন্য প্রেরণ—বলপ্রয়োগের দ্বারা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—সামরিক চুক্তি সম্পাদন, এক দেশের বিরুদ্ধে আর এক দেশকে অস্ত্র সাহায্য, অন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও মাতব্বরীর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ খোলার মুখ্য দায়িত্ব এসে পড়ছে এইসব দেশগুলির ওপর। দুই তথাকথিত আদর্শভিত্তিক পরস্পর-বিরোধী সদা-বিবদমান **শিবিরে গোটা পৃথিবীকে স্থায়ীভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখার তত্ত্বকে এই জোট**-নিরপেক্ষ দেশগুলি মানবে কেন? যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐ পত্রিকায় সরকারী নীতি বিশ্লেষ করে বলা হয়েছে:

"The lack until now of a systematic co-ordination o efforts by countries which ar not committed to blocs ha been well exploited by th bloc powers. By means c various manoeuvres and b using their old methods th colonial, imperialistic, ne colonial and other anti-demo cratic powers have been suc ceeding in many situation...

জোট-নিরপেক্ষ, স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে সংহতি ও গভীর যোগাযোগ না থাকা ফলে দুটি শক্তিজোটই তার সুযোগ নিয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবা অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিশ্বপরিস্থিতি সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থপর উদ্দে সাধনে সফলও হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অ একটা কথা মনে রাখা দরকার। সমাজ তান্ত্রিক গণতান্ত্রিক শক্তির অনুকূ বিশ্বশক্তির ভারসাম্য ঝুঁকে পড়লেই সেটা সোভিয়েট ব্লক-এর অনুকূলে যা এমন কোনই কথা নেই। সর্বহার আন্তর্জাতিকতাবাদের জোরাল প্রবক্তা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে গে স্বীকার করতেই হবে যে, সময়টা এব খুব বড় প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক শিবি চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্ত পিছিয়ে গে যেমন বুর্জোয়া-শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রগু নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে পা আভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তিগুলি (কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট প চালিত) সাময়িকভাবেও দাবিয়ে রা পারে—শুধু লাঠি-বন্দুকের জোরেই ন ক্ষেত্রবিশেষে, "সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী" শ্রমি শ্রেণীকে কিছু কিছু পাইয়ে দিয়ে সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত-শোষিত অসহায় গ্রা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বা রেখে। আর "সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী-জং —শ্রমিকশ্রেণী হালফিলের মার্ক্সব লেনিনবাদীদের পরিচালনায়, স্বাধ ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের নেতৃত্বে ভার মত দেশে মূলত এই শিক্ষাই পেয়েছে সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র-বিপ্লব-শ্রেণী সং এই সব মূল প্রশ্নের সঙ্গে রাজনী কোনই সম্পর্ক নেই,—অর্থনৈতিক দ দাওয়া বা বোনাস আদায় অনা ওপরই যেন ঐ সব তত্ত্বগুলি নির্ভরশ শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ দাবি আদায় হ **হল—গোটা সমাজের কথা অথবা**

নিরক্ষর ক্ষুধিত যে কোটি কোটি মানুষ এই আণবিক যুগেও ঘুঁটের যুগে পড়ে আছেন, দিনে পঞ্চাশ পয়সাও রোজগার করার ক্ষমতা বা অবস্থা নেই—অস্থি-কঙ্কাল-সার হয়ে নগ্ন দেহে পশুর জীবন যাপন করছে—তাদের শোষণ-মুক্তির কথা, তাদের মৃত্যুহীন অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার কথা আগে ভাববার প্রয়োজন নেই! আর বিপ্লবী শ্রেণীর আর্থিক দাবি-দাওয়া মিটলে সেই "বিপ্লবী শ্রেণীই" শাসকগোষ্ঠীকে যখন "প্রগতিশীলতার" ও "গণতান্ত্রিক আচরণের" সার্টিফিকেট দেবেন, তখন পল্লীর ও শহরতলীর বস্তির ওই কোটি কোটি স্তব্ধ নতশির মূক শোষিত বঞ্চিত মানুষের দলও শাসকশ্রেণীর জয়ধ্বনি ক্ষীণকণ্ঠে দিতে থাকে—পাঁচ বছর অন্তর একদিনের গণতন্ত্রের ঘেঁটুপুজোর দিনে সমারোহ করে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে মেহনতী জনতার বিপ্লবী প্রতিনিধি নির্বাচিত করে আসে। পথের ধারের মরণোন্মুখ ভিক্ষুক ব্যস্ত পথচারীকেও জিজ্ঞেস করছে: "বাবা ভিক্ষে চাইছি না। চাঁদে লুনা পৌঁছেছে কি? আমেরিকার লোক চাঁদে নেমেছে তো? তাহলে ব্যাংক জাতীয়করণ সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত হল? বিদেশী ব্যাংকগুলোরও জাতীয়করণ হবে তো? ইন্দিরা গান্ধী মোরারজী দেশাই, নিজলিঙ্গাপ্পাকে ক্ষমতা থেকে হটাতে পেরেছেন কি?" লক্ষ লক্ষ হায়-ভুখা হুঁ-র দল গগনভেদী চিৎকারে জয়ধ্বনি দিচ্ছে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির। ইন্দিরাপন্থীরা যত না আনন্দে আটখানা হয়েছেন তার বহু গুণ বেশি হয়েছেন ভারতের মুমূর্ষু জনগণের প্রতিনিধি বামপন্থীরা! ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হয়ে গেল বোধ হয়। আবার সার্টিফিকেটের পালা—পরস্পর কর্তৃক পরস্পরের প্রশংসাকীর্তন। নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে। তার অনুকূলে নতুন 'ভারসাম্য' তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেক যুগেই নতুন নতুন কায়েমী স্বার্থ তৈরি হচ্ছে।

আবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ঘন ঘন পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে ও আবও দিতে পারে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতিও পালটাচ্ছে—বুর্জোয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে বাধা থাকবে না। যেমন ধরা যাক লেনিন "ইকনমিজমের" বিরুদ্ধে নিজের দেশকে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর কত পরিবর্তনের স্রোতই না বয়ে গেছে রুশ দেশের ওপর দিয়ে। এখন আবার মার্ক্সীয় শাস্ত্র থেকে তোতা পাখীর মতন মার্ক্সবাদী বুলি কপচানোর বিরুদ্ধে রুশ নেতারা সাবধান বাণী শোনাচ্ছেন। এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ, মার্কেট ইকনমি, লাভ-ভিত্তিক ব্যবসায়িক-ভিত্তিক শিল্পনীতি কৃষিনীতির কথা বলছেন খোদ রুশ কমিউনিস্ট অর্থনীতিবিশারদরা। পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়ায় এই সব "পুঁজিবাদী ভাবধারার" ভিত্তিতে সেই সব "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলির অর্থনীতি ঢেলে সাজা হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে আদর্শগত বৈপরীত্যের কথা যত ঘটা করে বলা হচ্ছে, শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও শিল্পোন্নত কমিউনিস্ট বা স্যোসালিস্ট-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুসৃত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে সাযুজ্য বা মিলের দিকটা অর্থাৎ কনভারজেন্ট টেন্ডেনসীজ বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। লাগাম-আলগা আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক বাধাহীন শিল্প-প্রসার ও উৎপাদনবৃদ্ধির হিড়িক ও পরস্পরের ভয়-ভিত্তিক অবিশ্বাস্য সামরিক শক্তিবৃদ্ধির তাগিদের যুগে এই দুটি পরস্পর-আদর্শ-বিরোধী ব্যবস্থার মধ্যে মিলগুলি—কনভারজেন্ট টেন্ডেনসীগুলি চোখের আড়াল করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পুঁজিবাদী মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ গলব্রেথ একেই বলেছেন, "Convergent power of industrialism and technology." আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভূত শিল্প-কারিগরী-বিদ্যা বা কারু-বিজ্ঞান, উৎপাদন পদ্ধতি—আধুনিক পরিকল্পনা—অনিবার্যভাবে দুটি ব্যবস্থাকে একই ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য করছে। যেমন অটোমেশন, কম্পিউটারকে বাদ দিতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া পারে নি। যদিও স্তালিন এক সময় এর বিরুদ্ধে ছিলেন। এ ব্যাপারে রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে; উৎপাদনে বৈষয়িক উন্নয়নে পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে সে-দেশ এগিয়ে যাবেই এই তার অন্যতম লক্ষ্য (আউট ডিসট্যানসিং ইউ-এস-এ)।

'টেম্পোরারী স্ট্যাবিলাইজেশনের' যুগে এই কনভারজেন্ট টেনডেনসীগুলি যত প্রকট হয়ে উঠবে কমিউনিস্ট মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রগুলির "কমিউনিস্ট চরিত্র" সম্বন্ধে পৃথিবীর গোঁড়া মার্ক্সবাদী লেনিনবাদীদের মনে গভীর সংশয় দ্রুত জাগবে। সংশয় জাগবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের "আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব" সম্বন্ধে, গাল-ভরা মন-ভোলান প্রচার সম্বন্ধে, সংশয় জাগবে মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির সার্থকতা সম্বন্ধে। আর যাই হোক শুধুমাত্র কতকগুলি গাল-ভরা তাত্ত্বিক স্লোগান দ্বারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিতদের সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট মানুষদের এক আন্তর্জাতিক মতবাদের পতাকার নিচে অনির্দিষ্টকাল ধরে জমায়েত রাখা সম্ভব নয়। যারা সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে আবদ্ধ হতে চাইবে—তারা চোখে চোখ রেখেই হাত মেলাতে চাইবে।

বিশ্বশক্তি ভারসাম্যের কথা হচ্ছিল। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কথাই ধরা যাক। "সমাজতান্ত্রিক" রুশ দেশ "সমাজতান্ত্রিক" চেকোস্লোভাকিয়ায় "সমাজতান্ত্রিক" ওয়ারশ-চুক্তিজোটভুক্ত "সমাজতান্ত্রিক" পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের "সহযোগিতায়" ৬ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২০শে আগস্ট জোরপূর্বক দস্যুর মত প্রবেশ করে হরণ করল সেই স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশের স্বাধীনতা। সোভিয়েট অনুরাগী অধিকাংশ "সমাজতান্ত্রিক" দেশই রুশ আক্রমণের কঠোর সমালোচনা করেছে। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ও কমিউনিস্ট ফরাসী সাহিত্যিক দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রে এই আক্রমণকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভিয়েৎনাম আক্রমণনীতির সঙ্গে তুলনা করে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। লাল চীন এই অবস্থার সুযোগ নিতে ছাড়ে নি। "শোধনবাদী" চেকোস্লোভাকিয়ার ওপর রুশ আক্রমণকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে এবং রাশিয়াকে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" বলে আখ্যাত করতে কুণ্ঠিত হয় নি। রাশিয়ার এই উলঙ্গ আক্রমণাত্মক আচরণ ও একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে হস্তক্ষেপের ঘটনায় পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শিবির বিভক্ত হয়ে পড়ল প্রকাশ্যেই। যে কমিউনিস্ট চীন তার আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদী আক্রমণাত্মক নীতির জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির কাছ থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল—। সেই ছোট ছোট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও হঠাৎ চীনের 'ভক্ত' হয়ে উঠল—রাশিয়ার নীতি না-পছন্দ এটা দেখাবার জন্য। ফলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তির ভারসাম্য পালটাতে সুরু করল। আবার রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিংশতিতম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের ক্রুশ্চভের লোমহর্ষক ভাষণের পর (১৯৫৬) সে দেশে উদারতা মানবিকতা গণতন্ত্রের যে নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছিল ধীরে ধীরে, তাকে নস্যাৎ করার সুযোগ এসে গেল

ব্রেজনেভ-কোসিগিন নেতৃত্বের কাছে। পুরাতন স্তালিনবাদী নীতি প্রবর্তনের পথ সুগম হতে লাগল ধীরে ধীরে। একদল সমাজতন্ত্রী যখন সোভিয়েট আক্রমণকে সরাসরি "আক্রমণ" বলে অভিহিত করলেন আর একদল সমাজতন্ত্রী বলতে সুরু করলেন—চেকোস্লোভাকিয়ায় রুশ সৈন্য প্রেরণ তো "আক্রমণ নয়"—"no attack but rather necessary international assistance against counter revolution"—"no occupation but prevented a coup and bloodshed." (মস্কো অনুগত রুশ নেতৃত্ব কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া নতুন চেক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জারোমির হারবেক-এর চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে "জাতীয় ছাত্র দিবসের" "ন্যাশন্যাল স্টুডেন্টস ডে"র ভাষণ ১৯শে নভেম্বর, ১৯৬৯)। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকা—দায় ও দায়িত্বের এ এক হালফিলের ব্যাখ্যা! অবশ্য এ ধরণের ব্যাখ্যায় নতুনত্ব কিছু নেই—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে এক শ্রেণীর শিক্ষিত দুধে-ভাতে থাকা রাজনীতিবিদ্ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতে "সিভিলাইজিং মিশন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে গলা ফাটাতে কসুর করেন নি,—মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের অধীনে পরাধীন ভারতবাসী পরম সুখে কালাতিপাত করছেন এ তত্ত্ব প্রচারও তাঁরা করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ-করা ও সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষকে কামানের তোপের খাদ্য করার ঘৃণ্যতম কাজকে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্ সমর্থন করেছিলেন "জনযুদ্ধের" নামে—সেই সনাতনী মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পতাকা উঁড়িয়ে, মাহাত্ম্য-কীর্তন করে,— "সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী" ভারতের প্রলেটেরিয়েট শ্রেণী ঐতিহাসিক ১৯৪২ সালের ভারতের অভ্যন্তরে বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট করে কোন মদত্ দেন নি—যেমন দেন নি কোন নৈতিক সাড়া নেতাজী পরিচালিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ করা অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে। কিন্তু ভারতের "প্রতিক্রিয়াশীল" "রক্ষণশীল" কৃষকসমাজ অনুন্নত শোষিত আদিবাসী সাঁওতাল বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বড় অংশ ছাত্র-যুবক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামে "সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী" যে সক্রিয় কোন ভূমিকা নেয় নি এবং "All for the successful prosecution of the war" সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সাফল্যের জন্য যা-কিছু করণীয় তাই করতে হবে হিংস্র বৃটিশ সরকারের এই নীতিকে মদত দিয়েছিলেন, তার প্রধান কারণও সেদিনের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থবোধে সুড়সুড়ি দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস। দোষ শ্রমিকশ্রেণীর নয়, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নাম নিয়ে যে-সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীরা গোটা সমস্যাকে শুধুমাত্র রুটি-মাখনের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে দেখাতে শিক্ষা ও প্রেরণা দিচ্ছেন—দোষ তাঁদের। আর আমাদের দেশের কোন মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিক নেতা পৃথিবীর অন্যান্য 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কি সে কথা বলেন না। শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব তখনই নিতে সক্ষম হবে কোন দেশে যখন সেই শ্রেণী গোটা সমাজের অবহেলিত শোষিত বঞ্চিত মানুষের বঞ্চনা-দুঃখ-নিপীড়ন-শোষণের যন্ত্রণা নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে, নিজের সাময়িক গোষ্ঠীস্বার্থকে উপেক্ষা করে সমাজের বৃহত্তম শোষিত অংশের জন্য কঠোর পরিশ্রম-ত্যাগ-সংগ্রাম ও দুঃখ বরণের জন্য দীক্ষিত হতে পারবে। আর সমাজের, বিশেষ করে এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে বৃহত্তম শোষিত-অবহেলিত-বঞ্চিত অংশ তো গ্রামে গ্রামে শহরের উপকণ্ঠে বস্তিতে বস্তিতে যুগ যুগ ধরে শৃংখলিত হয়ে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের মূলভিত্তি স্বরূপ কঠোর শ্রম-আদর্শবাদিতা, জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম, চরিত্র ও আত্মত্যাগের বাণী শুনিয়ে গিয়েছেন—আর সেই মহাবাণীকে গ্রহণ করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। মার্ক্স শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তা ছিল মূলত রাজনৈতিক-সামাজিক ও মানবিক। অর্থনৈতিক স্বার্থের চশমা এঁটে তাদের মুক্তির প্রশ্ন তিনি বিচার করেন নি। মহৎ ত্যাগ ও চরিত্র সৃষ্টি ছাড়া পৃথিবীতে কোনদিনই কোন মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। নেতাজী সুভাষও বলেছিলেন জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়—'Blood of the martyr is the seed of the church'! লেনিনও ত্যাগের কথা বলেছিলেন। ক'জন মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিকসমাজের কাছে সে কথা তুলে ধরেন? বর্ধিত বেতন মাগ্গীভাতা-বোনাস পাইয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কারখানার গেটের মুখে কৌটা বাজিয়ে, স্বেচ্ছায় খুশি মনে চাঁদা না দিলে ভয় দেখিয়ে পরিশ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকের পাওয়া পারিশ্রমিকে কিছু অংশ সংগ্রহ করে দলের ফান্ড বাড়াতে পারে, সঙ্ঘশক্তির মাধ্যমে নির্বাচনে ভোট মিলতে পারে প্রচুর, সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-সচেতনতা এড়িয়ে শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতার বিপদ লেনিন বুঝেছিলেন, তাই তিনি "পেশাদারী বিপ্লবীদের" দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার কথা বলেছিলেন (হোয়াট্ ইজ টু বি ডান—লেনিন)।

১৯২০ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে লেনিনের একটি বক্তব্য স্মরণীয়। সেই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে জার্মান কমিউনিস্ট প্রতিনিধি গ্রীস্পিয়েন বক্তৃতা করতে উঠে বলেন যে, জার্মান কমিউনিস্টরা জার্মানীতে বিপ্লব সুরু করতে পারেন, যদি তাঁদের এই ভরসা দেওয়া যায় যে তাদের আর্থিক অবস্থায় এর ফলে খুব অবনতি ঘটবে না। লেনিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন:

> "*I should like to ask whether such a tone is acceptable in a communist Party. This is counter revolutionary.* The standard of living here in Russia is certainly lower than in Germany, but when we established our dictatorship the workers began to hunger more and their standard of living fell still further. *The victory of the workers is impossible without sacrifices*...."

লেনিন জার্মান কমিউনিস্ট প্রতিনিধির দৃষ্টিভঙ্গীতে কমিউনিস্ট পার্টি দৃষ্টিভঙ্গী বিরোধী এবং এমন কি "প্রতি বিপ্লবী" বলে বর্ণনা করেন। বিপ্লবের পর রাশিয়ায় শ্রমিকদের জীবিকার মা নিচে নেমে যায়, তাদের বহু কষ্ট কর হয়েছে স্বীকার করেন এবং বলেন বি ত্যাগে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় অসম্ভব নেতৃত্বের ভিত্তি সর্বপ্রকার অন্যা অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখীনত বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ়সংকল্প।

চতুর্থত, পুঁজিবাদের আপেক্ষি স্থিতাবস্থাতত্ত্ব স্বীকার করে নিলে মা লেনিনের পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশতত্ত্ব

পার্লামেন্ট সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা আর টেকে না। এই যে পুঁজিবাদী শিবিরের স্থিতাবস্থার কথা বলা হয়েছে এটা অবশ্য মার্ক্সিস্ট তত্ত্ববিশারদদের মতে সম্পূর্ণ "সাময়িক" অস্থায়ী। তা তো নিশ্চয়ই নতুবা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ ও সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী চূড়ান্ত বিজয়-তত্ত্ব যে-মূল যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটা দুর্বল হয়ে পড়ে খানিকটা। তা ভিন্ন ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিপ্লবী প্রচেষ্টায় কিছুটা ভাটা পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাহলে এইরূপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যেখানে ধনতন্ত্রবাদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না, বরং সাময়িকভাবে স্থিতাবস্থা রক্ষা করে নিজের বুনিয়াদকে অপেক্ষাকৃত মজবুত করে নেবার সুযোগ পায়, সেখানে একটি বা একাধিক বিশ্ব বিপ্লববাদী কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রের সম্মুখে দুটি সমস্যা বড় হয়ে ওঠেঃ

(১) ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে নিজেকে শক্তিশালী করা, সামরিক প্রস্তুতি আরও ক্ষিপ্রবেগে চালিয়ে যাওয়া।

(২) ধনতান্ত্রিক শিবিরে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করা, তাকে সামগ্রিকভাবে দুর্বল করা বা বিব্রত করা, পুঁজিবাদী শিবির বা জোটভুক্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিকে শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ না দেওয়া; তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করা। লেনিনের ভাষায়ঃ

"We must know how to dispose our forces in such a way that they [ the imperialists ] fall out amongst themselves, because as is always the case...."The case, when thieves fall out, honest men come into their own. ...The practical task of communist policy is to take advantage of this hostility and to incite one against another. Are we not committing a crime against communism ? No. Because we are doing so as a Socialist State which is carrying on Communist propaganda and is obliged to take advantage of every hour granted it by circumstances in order to gain strength as rapidly as possible." [ Speech to Moscow Party Nuchi Secretaries. S. W. VIII 282-284 ]

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সংঘাতের সুযোগ নেওয়া। এককে অপরের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কর্তব্য লেনিনের মতে। প্রতি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে—একদিকে বিরোধ ভাল করে বাধিয়ে দিতে হবে, অপরদিকে খুব দ্রুত নিজের শক্তিবৃদ্ধি করা এই হবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কৌশল। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট বা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলগুলির হবে এই কৌশল, নিজের দেশকে ভেতর থেকে দুর্বল করা অর্থনীতিকে নড়বড়ে অবস্থায় রাখা—কারণ দেশটা নিজেদের হলেও ওটা যে বুর্জোয়া মার্কা। অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া অথবা চীনের শক্তিক্ষয় নীতিগতভাবে। ভারতবর্ষ—"সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র নয় "পুঁজিবাদী" রাষ্ট্র? মার্ক্সীয় নিরিখে বিচার করলে একে "পুঁজিবাদী" রাষ্ট্রই বলতে হবে। যদিও ক্রুশ্চভ ও প্রাভদা এক সময় অ-পুঁজিবাদী 'প্রগতিশীল' কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নয় এমন সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন সম্ভবত নেহেরুজীর দিকে চেয়ে।

মস্কোর অনুগামী তত্ত্বাবিশারদ এদেশে যাঁরা আছেন তাঁরা অহর্নিশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বেপরোয়া শোষণ ও লুণ্ঠনের কথা বলেন, যদিও মস্কো তা মনে করে না। এই ভারতবর্ষের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য কখনও কি এদেশের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা, — ডান-বাম-মধ্যমার্গীই হোন না কেন,— দাবি করেছেন? 'ভারতবর্ষ আণবিক বোমা তৈরি করুক' —এ দাবি করা যাবে না, তাহলে দেশ গোল্লায় যাবে—কিন্তু চীন বা রাশিয়া আণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে এবং নিজ নিজ দেশের সামরিক বাজেটের অর্থ ব্যয়বরাদ্দের অঙ্ক অবিশ্বাস্য পরিমাণে বাড়ালেও কোন সমালোচনার কারণ হবে না। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের এ কৌশল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যতটা প্রযোজ্য, ঠিক ততটা প্রতিটি বুর্জোয়া বা অ-পুঁজিবাদী প্রগতিশীল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যেখান থেকে সুরু করা গেছিল—আবার সেখানে ফিরে আসা যাক। স্তালিনের "ইকনমিক প্রবলেমস্ অফ সোসালিজম্ ইন ইউ-এস-এস-আর" এই প্রবন্ধের কথা বলছিলাম। ঐ প্রবন্ধটিকে লক্ষ্য করে 'প্রাভদা' পত্রিকায় বলা হয়েছিলঃ

"The greatest event in the ideological life of the Party and the Soviet people—"

সোভিয়েট জনগণের জীবনে ও পার্টির মতবাদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লেনিন কিন্তু এক সময় বলেছিলেনঃ

Inspite of the rotting of Capitalism, Capitalism as a whole is growing more rapidly than formerly."

পুঁজিবাদের ভেতর ঘুণ ধরে গেলেও পুঁজিবাদ সামগ্রিকভাবে আগের চাইতে আরও দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করছে। স্তালিনও বলেছিলেনঃ

'Relative stability in a general crisis of capitalism.

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সঙ্কটের মধ্যেও তার আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা চলবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই দুটো বিরোধী কি আজও সমভাবে তত্ত্ব ও তথ্যের বিচারে বহাল থাকবে? যদি সত্যি সত্যি পুঁজিবাদ সংকটকে এড়িয়ে স্থিতাবস্থা রক্ষা করে চলতে সক্ষম হয়, ঘুণ-ধরা পুঁজিবাদ যদি আরও দ্রুততার সঙ্গে আগের চাইতেও ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তুলতে পারে নিজেকে, পুঁজিবাদ যদি পরিকল্পনা দ্বারা নিজের বিকাশ ও উন্নয়নকে 'বুম' ও 'ডিপ্রেশন'কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তাহলে পুঁজিবাদ-বিরোধী কমিউনিস্ট রাশিয়া ও চীনের পক্ষে পুঁজিবাদী শিবিরের সঙ্গে এখনই সরাসরি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ নামাটা হঠকারিতার নামান্তর হবে আর সেটা রণকৌশলের বিরুদ্ধেও হবে। অতএব আপেক্ষিক স্থিতাবস্থার যুগে রাশিয়া ও চীনকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলতেই হবে যতক্ষণ না পুঁজিবাদী শিবিরের ওপর চরম আঘাত হেনে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সমাধি রচনা করতে পারা যায়। তাই এই অন্তর্বর্তীকালীন শান্তি কূটনৈতিক সখ্যতাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হবে মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট তত্ত্ব-বিরোধী।

স্তালিন বলেছিলেনঃ

"...In other words we have not only the stabilisation of Capitalism, we have at the same time stabilisation of Soviet system. Thus we have two stabilisations. On "one pole we find Capitalism stabilising itself, consolidating the position it has reached and continuing its development At the other pole we find the Soviet system consolidating the position it has won and marching forward on the road to victory. Who defeats whom that is the essence of the question."

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্তালিন নিজে বলেছেন দুটো পরস্পরবিরোধী বিপরীত ব্যবস্থা দুই প্রান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কে কাকে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত করবে—সেটা হল মূল প্রশ্ন। তাহলে বোঝা যাবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পুঁজিবাদের উন্নয়ন বিবর্তনের আভ্যন্তরীণ অনিবার্য মূল নিয়মে নব—সংঘর্ষ রচনার মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। তাই এই সংঘর্ষের জন্য কমিউনিস্ট শিবিরকে যদি তাঁরা সত্যি সত্যি মার্ক্সীয় নীতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেই বজায়—লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

॥ এক ॥

ডব্লিউ সি বোনার্জীর সভাপতিত্বে বম্বেতে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৯৩-এর আগস্টে (বিলেত থেকে দেশে আসার ৪ মাস বাদেই) বম্বে থেকে প্রকাশিত কে জি দেশপান্ডে সম্পাদিত ইংরেজী 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ 'নিউ ল্যাম্পস ফর দি ওল্ড' (প্রাচীনপন্থীদের সম্মুখে নতুন আলো) শিরোনামায় কংগ্রেসের সমালোচনামূলক পর পর ধারাবাহিক ১১টি প্রবন্ধ লেখেন (আগস্ট ১৮৯৩—মার্চ ১৮৯৪)। কংগ্রেসের তথা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকায় শ্রীঅরবিন্দের এই অল্পশ্রুতপ্রায় ঐতিহাসিক লেখা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবন্ধগুলো থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে ধরা হলো।

এক: কংগ্রেস নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলতে পারে না—ইংরেজ শাসকদের ভয় পায়। —ইন্দুপ্রকাশ, ৭-৮-৯৩

দুই: কংগ্রেস একটা সভা মাত্র। এই বৃহৎ সভা দেশের জন্যে কোন কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে অক্ষম......।

('the Congress is too unwieldly a body for any sort of executive work . . . ')

কংগ্রেস শুধু মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত। নিচুতলার বিশাল জনসাধারণকে ('দি গ্রেট ম্যাস অব পিপল') স্পর্শও করে নি। ...কংগ্রেস যদি বিরুদ্ধ-সমালোচনা সহ্য করতে না-পারে, তবে যত শীগ্‌গির এটা লুপ্ত হয় ততই মঙ্গল।

('If the Congress cannot really face the light of a free and serious criticism, then the sooner it hides it face, the better.')

—ইন্দুপ্রকাশ, ২১-৮-৯৩

তিন: কংগ্রেসের আদর্শ ভুল। কর্মপদ্ধতি ভুল, নেতারা সম্পূর্ণরূপে নেতৃত্বের অযোগ্য। ...কংগ্রেস জাতীয় ('ন্যাশনাল') আখ্যা পেতে পারে না। ...কংগ্রেস জাতীয় নয় এই বলে যে—তাতে ভারতের জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধিত্ব নেই।

—ইন্দুপ্রকাশ, ২৮-৮-৯৩

চার: কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি আদালতের ওকালতির মত। ......মেটা ও মনমোহন ঘোষ [১৮৯০ সালে কলকাতা কংগ্রেসে মেটা সভাপতির ও মনমোহন ঘোষ অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যানের ভাষণ দেন—সে-প্রসঙ্গেই অরবিন্দ এসব কথা বলছেন] এক ইংল্যান্ডের ইতিহাস ছাড়া ইউরোপের অন্য-কোন দেশের ইতিহাস পড়েন নি, বিশেষত ফরাসী দেশের ইতিহাস। ফরাসী জাতি ধাপে-ধাপে বা ধীরে-ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নি। ফরাসীদের অশিক্ষিত বিশাল জনসাধারণ ও সর্বহারার দল ('দি ভাস্ট এ্যান্ড ইগ্‌নরেন্ট প্রলেটারিয়েট') অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হয়ে ('পিউরিফিকেশন বাই ব্লাড এ্যান্ড ফায়ার') মাত্র ৫ বছরে তেরশ' বছরের অত্যাচার মুছে ফেলেছে। ইতিহাস আমাদের এ-শিক্ষাও দেয়। ...মেটা, মনমোহন ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা কেবল ইংল্যান্ডের আদর্শ ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরে কংগ্রেসকে পরিচালিত করতে ইচ্ছুক। —ইন্দুপ্রকাশ, ১৮-৯-৯৩

পাঁচ: ইংরেজের মন ঘুরপাক খায় হাউস অব কমন্সের চারপাশে; ফরাসীদের থিয়েটার, এ্যাকাডেমি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চারপাশে; আর আমেরিকানদের শেয়ার বাজারের চারপাশে।...ঘটনাচক্রে ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজা হয়েছে, এবং শিক্ষিত ভারতবাসীর ইংরেজভাবাপন্ন হওয়ার এইটেই কারণ।...ইংরেজ চরিত্রের সঙ্গে আমাদের কোন সাদৃশ্য নেই...অথচ ইংল্যান্ডের কাছ থেকে নিয়ে (অনুকরণে) আমরা আমাদের সামাজিক আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এটা পন্ডশ্রম হচ্ছে; আমাদের জাতীয় চরিত্রে এ খাপ খায় না। এটা ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী! কেননা, জাতীয় চরিত্রের বিরোধী আদর্শ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে বর্তমান ভারতবাসী কিছুতেই পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী হতে পারবে না।

—ইন্দুপ্রকাশ, ৩০-১০-৯৩

ছয়: কংগ্রেস মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্যে রাজনৈতিক অধিকার চাইছে। কিন্তু নিচুতলার ভারতবাসীদের কথা ভাবছে না।... সমগ্র মানবজাতি নিচুতলার লোকেদের উত্থানের ওপর নির্ভর করে গণতন্ত্র ও সামাজিক সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে...।

("the whole trend of humanity shaping towards democracy and socialism on the calibre and civilization of the lower class depends the future of the entire race...')

কংগ্রেস এই গণতন্ত্র ও সামাজিক সাম্যবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলছে।... ইংল্যান্ড ও আমেরিকা তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গর্ব করে বটে, কিন্তু এই দুই দেশেই শ্রমিকরা ('লেবর') মূলধনের ('ক্যাপিটাল') মালিকদের প্রতি অতিশয় হিংস্র আক্রোশের মনোভাব পোষণ করে।

—ইন্দুপ্রকাশ, ১৩-১১-৯৩

সাত: মেটা বলেন, সমাজের নিম্নস্তরের সর্বহারাদের দুর্দশা ও অজ্ঞানতা দূর করা অনাবশ্যক এবং সে-জন্যে পরিশ্রম করার এখনও সময় আসে নি।...সর্বহারাদের সম্পর্কে প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু বলে, কিন্তু কেউ কিছু করে না।

(...of the vast unhappy proletariat about which everybody talks and nobody cares.')

...সর্বহারাদের উপেক্ষা করে আমরা এক ঘোর সমাজবিপ্লবের বীজ বপন করছি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, তাঁরাই এ-কাজ করছেন।... যখন কংগ্রেসের মধ্যবিত্তশ্রেণীর ওপর আমাদের কোনই আশাভরসা নেই, তখন এই নিমজ্জমান সর্বহারাদের ওপর নির্ভর করা ভিন্ন নান্যঃ পন্থা।

('..with that distressed and ignorant proletariat,—now that the middle-class is proved

**deficient in sincerity, power and judgement—with that proletariat resides, whether we like it or not, our sole assurance of hope, our sole chance in the future.')**

...সর্বহারাদের উন্নতির জন্যে কংগ্রেস কোন চেষ্টাই করছে না। অন্ধকারে [illegible] এই সর্বহারাদের মধ্য থেকেই [illegible] এক অতি ভয়ংকর বিপ্লব ('টেরিবল্, অ্যফুল, ব্লাডি, ডিজাস্ট্রাস') [illegible] হবে।

কংগ্রেস-রাজনীতিতে আমাদের, নেতৃবৃন্দ জলে বুদ্‌বুদ্ নিয়ে খেলা করছেন ('প্লেয়িং উইথ বাবল্‌স্')। ...অন্য দিকে গভীর সমুদ্রের তলদেশে যে আলোড়ন হচ্ছে এবং যার ওপরে কৃত্রিম সভ্য সমাজের প্রলেপ দেখা যাচ্ছে—তা সমুদ্রের তলদেশের আলোড়নে একদিন ডুবে, ভেসে, মুছে যাবে।

**('..the waters of the great deep are being stirred, and that surging chaos of the primitive man over which our civilized societies are superimposed on a thin crust of convention, is being strangely and ominously agitated.')**

...কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এটা লক্ষ্য করছেন না। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। —ইন্দুপ্রকাশ, ৪-১২-৯৩

আট: মধ্যবিত্তশ্রেণী ('বার্গেস বডি') পরিচালিত কংগ্রেসের, সমগ্র জাতি যে একটা জীবন্ত প্রাণ ('অর্গানিজম'), এরূপ ধারণা নেই। —ইন্দুপ্রকাশ, ৫-১২-৯৩

[ইতিমধ্যে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেস হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন দাদাভাই নৌরোজী।]

নয়: সর্বহারাদের হাতে দেশের চাবিকাঠি ('দি প্রলেটারিয়েট ইজ দি রিয়্যাল কি অব দি সিচুয়েশান')। আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন শক্তি দেখা না-গেলেও সে এক বিরাট জাগ্রত শক্তি ('এ গ্রেট পোট্যানশিয়াল ফোর্স')।

—ইন্দুপ্রকাশ, ৫-৩-৯৪

## ॥ দুই ॥

সাম্যবাদের চিন্তাধারা ইউরোপের অনেক আগে প্রাচীন ভারতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তা রূপায়ণের পথনির্দেশ দেয় ইউরোপ আধুনিক যুগে। ভারতের রেনেসাঁ আন্দোলনের সময় ভারতীয় সাম্যবাদ ভাবনার সঙ্গে তার ইউরোপীয় রূপায়ণ-নির্দেশের যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটে থাকে। এ-প্রবন্ধে তার সবিস্তার আলোচনা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান আলোচনার পটভূমিকা হিসেবে এবং জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস তথা তার অহিংস নীতি, ভারতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব ও পরবর্তীকালের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিষয়ের অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আশা করি।—

১। ১৯১৭ সালের সফল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, তার আগে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব, যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, এবং তারও আগে ১৮৭১ সালের 'প্যারি কমিউন' তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দারুণ এক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

[এই প্যারি কমিউনের চূড়ান্ত বৈঠকে জঙ্গী বিপ্লববাদীরা বামদিকে ও নরমপন্থী বা শোধনবাদীরা ডানদিকে আসন নিয়েছিলেন—এবং সেই থেকে দক্ষিণপন্থী (রাইটিস্ট) ও বামপন্থী (লেফটিস্ট) কথার উদ্ভব।]

২। ১৮৯২ সালে শ্রীঅরবিন্দ কেম্ব্রিজে সন্ত্রাসবাদের ভাবাদর্শে 'লোটাস এ্যান্ড ড্যাগার' নামে এক গুপ্ত-সমিতি পরিচালনা করেন। সে-সময় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী চরমপন্থী রুশ নিহিলিস্ট-নেতা, 'ডকট্রিন অব মিউচুয়াল এইড'-এর উদ্গাতা প্রিন্স ক্রপটকিন লন্ডনে থেকে থাকবেন। ১৮৯০—৯৫ সালে ভগিনী নিবেদিতা যখন লন্ডনে ছিলেন, তখন প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় এবং তিনি ক্রপটকিনের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। পরে ভগিনী নিবেদিতা ভারত থেকে যখন ইউরোপ ভ্রমণে যান, তখন আরেকবার ১৯০৭ সালে লন্ডনে প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শোনা যায়, ১৯০০ সালে প্যারি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রাক্কালে প্রিন্স ক্রপটকিন ও ইউরোপের অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বরোদায় ১৯০২ সালের অক্টোবরে। শ্রীঅরবিন্দের কংগ্রেসের সমালোচনামূলক এই প্রবন্ধগুলো যখন ছাপা হয় (আগস্ট ১৮৯৩—মার্চ ১৮৯৪) তখন স্বামীজী ইউরোপে। কলকাতায় ফিরে আসেন ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে।

দেখা যাচ্ছে, এই একই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দও সোস্যালিজমের কথা বলছেন, এবং তা রূপায়ণে স্পষ্ট খড়্গ ধারণের পথ বাৎলাচ্ছেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজী প্রসঙ্গে বলেছেন—

"The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and strove to develop has not yet finished."
—*Karmayogin*, 1909

পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও তার একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। নেতাজী বলেছেন—

**"Vivekananda's teachings have been neglected by his own followers—by the Ramkrishna Mission which he founded—and we are going to give effect to them."**

এখানে স্বামীজী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কংগ্রেসের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলোর উদ্ধৃতাংশের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে (এবং সে-কারণেই স্বামীজী প্রসঙ্গে এতখানি আলোচনা)।

**সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে ॥** 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব...।'

**"I am a Socialist, not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread."**

**"Socialism of some form was coming on the board."**

**সর্বহারাবাদ ও সর্বহারা-সংস্কৃতি ॥** "...ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, একে একে সকলেরই দিন গিয়াছে, এখন পালা এসেছে শূদ্রের—এতদিন পর্যন্ত যারা সমাজে শুধু অবহেলাই পেয়ে এসেছে।"......"গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর ওপর কোন ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি

# পূর্ব-পাকিস্তানে চাল সংকট

রাহুল বর্মণ

অনেক আশা আর অনেক উদ্দীপনা নিয়ে জন্ম হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাইশ বছর আগে। কিন্তু আজ বাইশ বছর পর দেখা যাচ্ছে এখনও সে সংকটের পথেই। অবস্থা সব দিকেই প্রায় অপরিবর্তনীয়। দুই শাখার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থাই খারাপ। সামাজিক আর অর্থনৈতিক দিকে এই এলাকা এখনও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক পেছনে। সব দিক থেকেই সে বঞ্চিত। একমাত্র পূর্ববঙ্গের সর্বাংগীণ উন্নতির মাধ্যমেই এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব-বাংলার বিক্ষুব্ধ এবং বঞ্চিত জনমানস ফেটে পড়ে গত বছরের প্রথম দিকে, যা স্বৈরাচারী শাসক আয়ুব খানের পদচ্যুতি ঘটায়। নতুন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এসেছিলেন অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় পূর্ব-বঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তো ঘটেই নি বরঞ্চ অবস্থার অবনতি হয়েছে আরো। সমস্যা-জর্জর পূর্ব-বাংলা আজ সংকটের পথে।

পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীরা এখন আরো বিক্ষুব্ধ, আরো সমস্যা-জর্জরিত। বাঙালীর একমাত্র খাদ্য চালের অভাব সর্বত্র প্রকট। চালের মণ ৩০ টাকা থেকে পৌঁচেছে ৫৫ টাকায়। গত কয়েক মাস ধরেই অবস্থা শোচনীয়। পাঁচজন লোকের একটি পরিবারে মাসে চাল লাগে প্রায় তিন মণ। কিন্তু যেখানে একজন লোকের মাসিক আয় মাত্র ১২৫ টাকা সেখানে সম্পূর্ণ অভাব মেটানো কি সম্ভব? এক দিকে চালের দাম বাড়ছে অন্য দিকে অন্যান্য সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দামও আকাশছোঁয়া। ফলে, পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের এখন নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তানে চালের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তবে আশ্চর্য না হওয়াই স্বাভাবিক। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গম—প্রতি মণের দাম ১৭ থেকে মাত্র ২০ টাকা যা যে-কোন পরিবারের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব। ওদের অসুবিধা কম। অবস্থা বেশ ভালো। পূর্ব-বাংলার বাঙালীদের আজ ধারণা ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকার ওদের সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। বাঙালী মানসিকতা আজ আহত। ফলে সর্বত্রই বিক্ষুব্ধের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে, গত বসন্তকাল জুড়ে নানা ধরণের প্রাকৃতিক উপদ্রবের দরুণ পূর্ব-পাকিস্তানে ফসল কম জন্মায়। কিন্তু এই অজুহাত অনেক দিনের। আসল কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ব-বাংলার জনগণকে বঞ্চিত রেখে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় সমস্ত অর্থই ব্যয় করছেন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। বাঁধ আর জলাধার তৈরি একটা অজুহাত মাত্র।

সাম্প্রতিককালে পূর্ববঙ্গে চালের ঘাটতির পরিমাণ ১·৫ মিলিয়ন টনের কাছাকাছি। আমেরিকা, জাপান আর পশ্চিম জার্মানীর কাছ থেকে চাল আর গম এনে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চলছে। তবু অবস্থার উন্নতি হবে কি না তা বলা শক্ত। যা হোক, এই ঘাটতির ফলে পূর্ববঙ্গের বাঙালী জাতীয়তাবাদে আঘাত লেগেছে খুবই। বিক্ষুব্ধের সঞ্চার হচ্ছে সর্বত্র। কেন্দ্রীয় সরকার যে পূর্ববাংলার সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন কিংবা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ তা এখন পাকিস্তানের বাঙালীরা ভালভাবেই জানে। বাঙালী জাতীয়তাবাদকে চেপে রাখার এই নগ্ন স্বরূপ আজ জনমনসে উদ্ঘাটিত। তাই এখন পূর্ব-বাংলার বাঙালীরা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ।

এ ছাড়া পূর্ববঙ্গে চাল ঘাটতির আর একটি কারণ হয়তো সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবাংলায় চলে আসা। দৈনিক প্রচুর পরিমাণ চাল, মাছ এবং ফল পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তান থেকে আসে। তা সত্ত্বেও কলকাতায় জিনিষপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থাকে। দেশ বিভাগের পর থেকেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার মধ্যে জিনিষপত্রের আদান-প্রদান হওয়ার মূল কারণ ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের বিধিনিষেধ। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর যুদ্ধের পর থেকে পূর্ব এবং পশ্চিমবাংলার মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য বন্ধ।

বস্তুত, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য বন্ধ থাকায় এর শিকার হয়েছে পূর্ব-বাংলা। বাইশ বছর আগে যে দেশ বিভাগ হয়েছিল তার কুফলে আজো ভুগছে পূর্ব-বাংলা। ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশ বিভাগ দুই বাংলার অর্থনীতিতে ভাঙন নিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব-পাকিস্তান এই আঘাত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ভবিষ্যতেও পারবে কি না তা বলা শক্ত। চার বছর আগে ভারত-পাক সংঘর্ষের ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এখন তো অবস্থা খুবই শোচনীয়। আসাম সীমান্তে পূর্ববঙ্গের ভেতর গঠিত হয়েছিল চটক সিমেণ্ট কারখানা—ওটা চুনাপাথর পেতো প্রতি টন দশ টাকা দরে ভারত সরকারের কাছ থেকে। সীমান্তের কাছে থাকার ফলে বিশ মাইলের ভেতর থেকে চুনা পাথর সরবরাহ করা হোত। এখন সে ব্যবস্থা বন্ধ, ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর থেকেই (যা অনেক দূরে পড়ে) চুনা পাথর সরবরাহ করতে হয়, কারখানার কাজ চালু রাখার জন্য। এতে খরচ বেশি পড়ে এবং তা অসুবিধাজনকও। চটক সিমেণ্ট কারখানার কাজ চালু রাখার জন্য এখন যে চুনা পাথর সরবরাহ করা হয় তাতে খরচ পড়ে প্রতি টন ৪৫ টাকা। তাই পাকিস্তানী সংবাদপত্রগুলি সরকারের প্রতি এতো বিরূপ। ফলে রাজনৈতিক বিক্ষোভও জন্ম নিতে থাকে।

ন্যাশন্যাল আওয়ামী দলের নেতা মৌলানা ভাসানী এ সম্পর্কে খুবই সচেতন। তিনি কৃষকের স্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এখনও পাকিস্তানের জনমানসে স্মরণীয়। তাঁর ৮৭ বছরের জীবনের ৩০ বছরই জেলে কাটে। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা থাকলেও সাধারণত তিনি ব্যস্ত থাকেন চাল, পাট আর চা শ্রমিকদের নিয়ে। ওদের স্বার্থ লক্ষ্য করাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। দেশের উন্নতির জন্য পশ্চিমী আর্থিক সাহায্য নেওয়ার তিনি পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁর মতে, সে আর্থিক সাহায্য শুধুমাত্র কিছুটি ধনী পশ্চিম পাকিস্তানী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা বেশি। বিদেশী আর্থিক সাহায্যে ওদের ধন-দৌলত বাড়ছে, কিন্তু শতকরা ৯০ জন সাধারণের দুর্দশা পৌঁচেছে চরম পর্যায়ে। তাঁর

মতে এ সব সমস্যার সমাধান একমাত্র সমাজতন্ত্রের পথেই করা সম্ভব।

পাকিস্তানী সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুসারে মৌলানা ভাসানী পিকিং-পন্থী। এ সম্পর্কে তাঁর মত হল: "আমি একজন পাকিস্তানী এবং ঐশ্লামিক সমাজবাদের পক্ষপাতী—চীন পন্থী কিংবা রুশ পন্থী নয়।" তিনি দেশে পার্লামেণ্টারী ধরণের গণতন্ত্র চালু করার পক্ষপাতী, কিন্তু এখন তাঁর মতে পূর্ব-পাকিস্তানে ভোটের চেয়ে বেশি দরকার খাদ্যের। দুর্ভিক্ষ রোধে কেন্দ্রীয় সরকার যদি না এগিয়ে আসে তবে অবস্থা চরমে উঠলেও আশ্চর্য না হওয়াই স্বাভাবিক। এক বছর পর যখন পাকিস্তানে নির্বাচন হবে তখন হয়তো ভোটারের সংখ্যা কম থাকবে প্রায় এক মিলিয়নের মতো।

সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানে তাই দাবি 'ভোটের আগে খাদ্য।' দেশের সামাজিক পরিস্থিতিও আজ অশান্ত। শ্রমিকদের বিক্ষোভ বাড়ছে। হয়েছে ধর্মঘটও। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা আজ পূর্ববঙ্গে মূলধন নিয়োগেও নারাজ। ফলে পাকিস্তানের দুই শাখার মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। এ ছাড়া, পশ্চিম পাকিস্তানের সব ধনিক শিল্পপতিরাই অ-বাঙালী, তাই পূর্ব-বাংলার অধিবাসীদের ধারণা ওরা শোষিত হচ্ছে দু'দিক থেকেই। যা হোক, অবস্থা খুবই উত্তপ্ত। কাজেই আমার মনে হয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের দাবি মেটানো এবং দুই শাখা ভাগ করে দেওয়া। বস্তুত, পূর্ব-বাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আজ একটি বাস্তব ঘটনা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে আগামী দিনে বিক্ষোভের যে প্রকাশ ঘটবে তা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকচক্র রক্ষা পাবে কি না তা বলা শক্ত।



[১৭০২ পৃষ্ঠার পর]

নাই।...ভরসা তোমাদের ওপর—পদমর্যাদা-হীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী, তোমাদের ওপর।"......"যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে; প্রজাদের লুঠছে, শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে।"

"শোষিত জনসাধারণ এক নয়া সংস্কৃতি ('প্রলেটোকাল্ট') নিয়ে আসবে।"

**সমাজতন্ত্র রূপায়ণের পথ ॥** স্বামীজীর মতে, তমোগুণাশ্রিত ভারতে অহিংসারূপ সত্ত্বগুণের আমদানী করলে তা ধোপে টিকবে না। 'মাই প্লান অব ক্যাম্পেন' বক্তৃতায় খড়্গ ধারণের কথা তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন—

"Do you feel that millions of millions of the descendants of gods and sages are starving today?..Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud?..Have you got the will to surmount mountain-high obstacles? If the whole world stands against you, *sword in hand,* would you still dare to do what you think is right?"

॥ তিন ॥

এবার আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সমাজতন্ত্রের তথা সাম্যবাদের ভাবধারা ভারতের মাটিতে নতুন কোন ঘটনা নয়। কাজেই জাতীয় কংগ্রেস যে তা দ্বারা আলোড়িত হবে না, এটা কোন কাজের কথা নয়।

কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্ভবত প্রথম সমাজতন্ত্র ও সর্বহারাবাদের কথা উপস্থাপিত করেন। গয়া কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯২২) সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু বলেন—

"I protest against the concentration of power in the hands of the middle-class. I do not believe that the middle-class will then part with their power. My ideal of Swaraj will never be satisfied unless people co-operate with us in its attainment."

ঐ বৎসরই নভেম্বরে দেরাদুনে এক বক্তৃতায় দেশবন্ধু বলেন—

"I want Swaraj for the masses... I do not care for the bourgeoisie...Swaraj must be for the masses, and must be won by the masses."

১৮৮৫ থেকে ১৯৬৯—এই দীর্ঘ পথে অনেক আবর্তন-বিবর্তনের ভেতর দিয়ে কংগ্রেস বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আবাদি কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ ('সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন'), ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ('ডেমোক্রাটিক সোস্যালিজম') এবং সর্বশেষ 'দশ-দফা কর্মসূচী' (সমাজতন্ত্রের) বাস্তবে কতটা কার্যকরী হয়েছে, তা বিশদ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কংগ্রেসের গোড়াপত্তনের সময়কার শ্রীঅরবিন্দের সেই সমালোচনা এখনও যে কতখানি প্রযোজ্য, সে-বিচারের ভার পাঠকদের ওপর। তবে 'প্রাচীনপন্থীদের সম্মুখে নতুন আলো'-তে কংগ্রেস কম্যুনিস্ট নির্বিশেষে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মুখ যে ঝলসিয়ে যাবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বর্তমানে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত—পরিষ্কার তার দুটি শিবির। সিণ্ডিকেটের স্বরূপ জনসাধারণের জানতে বাকি নেই। কিন্তু ইন্দিরাপন্থী শিবির 'বিবেকের আহ্বানে' সাড়া দেয় কি-না, নূতন সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যকরী করে কি-না, তা দেখার জন্যে সমগ্র দেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। এবং তার ওপর শুধু কংগ্রেসেরই নয়, সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ, এবং দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি আগামী দিনে কী রূপ নেবে—তা নির্ভর করছে।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**॥ সাত ॥**

এইমাত্র যে প্রান্তরটি পিছনে ফেলে এলাম, সেখানে মানুষ সরলভাবে বিশ্বাস করে, এই ত' সেই প্রান্তর যে প্রান্তরে নন্দের বেটা কানাই আলপথে তার বাঁশীটি রেখে, সেই বাঁশী যার সাতখানি ফোঁড়, তার মামীর সুন্দর পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে দিয়েছিলো।

তারপর উজানী সেই দুপুরে অপরূপ গেয়েছিল সেই রহস্যময় গান, 'এ উজান বয়সে মামী উজান বাইয়া যাই, তোমার অংগে অংগ দিয়ে একবার সাঁতার খাই।'

চলেছি ঝুমকোলতার পথে। সকলে বললে, 'যাবেন যান। পথ বড় আঁধার।' কিছুই বলি নি উত্তরে। অন্ধকার হলে যাবো না একথা তো ভাবি নি। শুধু মনে মনে আমার ঝুলির দিকে তাকিয়েছি। সে ঝুলি যে শূন্যই আছে।

খানিকটা পথ গিয়েছি অন্ধকার আমাকে গ্রাস করে নিলে। গ্রাম পার হলেই মাঠ। এবড়ো-খেবড়ো পায়ের দুধারে ছড়ানো। কানের দু'পাশে বাতাস। আমার সংগে সংগেই গাছপালা, বন-ঝোপ। মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় খানিকটা জল চকচক করে। এক সর্বব্যাপী অন্ধকারে চারিদিক ডুবে আছে। কেবল দিগন্তের দিকে ভোরের আভাস। এতোক্ষণে এসে গেছি। অন্ধকার কাকে বলে তা' জানছি। নির্জনতার একেবারে নিজস্ব জগতে চলে এসেছি। পৃথিবীর সব লোক কমতে কমতে একমাত্র আমাতে এসে ঠেকেছে। অন্য সব শব্দ এইখানে এসে চিরকালের মত থেমে গেছে। শুধু শোনা যায় ব্যাঙের ডাক। আর আছে ঝিঁঝি। অনিশেবস সেই ডাক। এই মুহূর্তে শহরে কতো বাস, ট্রাম ছুটছে। হাওড়া ব্রিজে ট্রাফিক জ্যাম। সিনেমা, কাফে, বার থেকে গলগল করে বার হচ্ছে মানুষ, কতো মানুষ। ট্যাক্সি খুঁজছে এসপ্লানেডে দাঁড়িয়ে। পাচ্ছে না। পাগলের মত ট্যাক্সির বাপ-মাকে গালাগাল দিচ্ছে। সবাই হো হো করে হাসছে। গলগল করে ঘামছে। হন্ হন্ করে ছুটছে। হাউ হাউ করে খাচ্ছে। ব্যস্ত, ব্যস্ত, ব্যস্ত। যেন আগে না গেলে এক্ষুণি সব ফুরিয়ে যাবে। এক হাতেই খাবার নিয়ম। দৃশ্যমান দুটি হাতে তো বটেই অদৃশ্য দশটি হাতে প্লেটের পর প্লেট, পেগের পর পেগ উড়িয়ে দিচ্ছে। নিয়ন জ্বলছে, নিভছে। নিভছে, জ্বলছে। কফি হাউসের যুবক-যুবতীরা এই মুহূর্তে বিপ্লব আর কবিতার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে কাপ, ডিস ভেঙে তছনছ করে। গুণ্ডার হাত থেকে ছুরি, বোমা, চেন উঠে আসছে কলেজের ছেলেদের হাতে। অনবরত ফাটাফাটি, মারপিট হচ্ছে সবই নাকি আসন্ন বিপ্লবের জন্যে। কিন্তু এইখানে, এই বিশাল নির্জনে, খাঁ খাঁ ঝিঁঝি-ডাকা প্রান্তরে এ-সবই কেমন অর্থহীন। চলেছি ঝুমকোলতার পথে। কি করে চিনবো? এক-একটা প্রান্তর পার হলেই কালো ঝোপের আড়ালে দেখা যায় ভূতের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানো দু'-চারটি অন্ধকার কুটির। তারই নাম নাকি গ্রাম। তারপর আবার শুরু হল প্রান্তর। সেই প্রান্তর পার হলে আবার দু'-চারটি অন্ধকার কুটির কলাঝোপের আড়ালে। এখানে কি মানুষ আছে? থাকলে কেমন ধরণের মানুষ? এতো অন্ধকারে কি করছে? ইলেকট্রিক না পৌঁছলেও কেরোসিন কি পৌঁছয় না এখানে? যদি পৌঁছয় কোন না কোন একটা লণ্ঠনও তো জ্বালাতে পারে। না। কেরোসিন এখানে বিলাসিতা। ঐটুকু কেরোসিন কিনলেও তো অনেক পয়সা বেরিয়ে গেল! তার থেকে অন্ধকার ভালো। এমনি করে শত শত গ্রাম অন্ধকারে ডুবে আছে। কোথাও আলো জ্বলে না। ভূতের মতন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে একটু নেশা-ভাং করে যে যার ঘরে সেঁধোয়। কেউ কেউ মাতাল হয়ে পথে শুয়ে থাকে। নিজের দাওয়ায় বসে নিজের বাপ, মা, বৌ, ছেলে-মেয়েকে গাল পাড়ে কেউ কেউ। তারপর একসময় ঘুম আসে। এই চলছে দিনের পর দিন।

হঠাৎ কয়েকটি আলোর ফুলকি দেখছি। ভালো করে ঠাওর করে দেখলাম। এগুলো বিড়ির ফুলকি। ঝুমকোলতা গ্রামে যাবার সংগী তাহলে এতোক্ষণে মিললো। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ধরে ফেললাম। গলার স্বরে বুঝলাম বাপ আর ছেলে। খাটতে গিয়েছিলো বালির খাদে। এখন পেট ভরতি 'পাঁচুই' খেয়ে ফিরছে। কথার সুরে তারই মিষ্টি আমেজ।

কথা হচ্ছে সেই জমি নিয়ে যা বলে বলেও গ্রামের লোক কখনো শেষ করতে পারে নি। কবে থেকে জমি নিয়ে কথা তারা আরম্ভ করেছিলো কে জানে। এ সব কথা কি বলা যায়? অনেক কথা এমন আছে যে, বলা যায় না। প্রথম কবে থেকে আমরা আকাশের কথা বলছি? বলছি নক্ষত্রের কথা, নদী আর গাছ, পাহাড় আর সাগরের কথা? কে এসব জানে, কেই বা বলবে? এর একটা মাত্র জবাব আছে তাও এই গেঁয়ো ভাষায়, 'সেই সৃষ্টির আদি থেকে'। হ্যাঁ, সেই সৃষ্টির আদি থেকেই এরা জমির কথা বলছে। কবে এ বলা শেষ হবে তাও কেউ জানে না। বোধহয় সৃষ্টি যেদিন

থেমে যাবে সেদিন। কিন্তু সৃষ্টি কি থামে?

'জমি কি সোজা জিনিষ মশাই?' আমাকে এক প্রবীণ চাষী বলেছিলো, 'ও ভয়ানক ভজকট জিনিষ।' তারপর রহস্যময় ভার ভার গলায় বলেছিলো, 'যখন জমি আমাদের দখলে তখন কাঁধে ওঠে চ্যাটাংদার গামছা, আমরা দুধে ছিলিম তামুক টেনে তর্জা শুনতে যাই, বোয়ের খ্যাঁদা নাকে ঝোলে 'নলুক', কপালে টিকলী সোনা চকমকায়। আমরা গান ধরি, 'মুখেতে মুখ দিয়া, অমৃত ঢালিয়া, তোমারে বুকেতে লইয়া, আদর পাব কত, শরীলে অবিরত, বাপো মাকে যাবো রে ভুলিয়া—, আর জমি যখন বেদখল, তখন দু' চোখের জলে বুকে ভাসে নদী, চাষী ডুকরে কেঁদে ওঠে, বলে আমার মা কুথা রে। আমার পরাণ ধিকিধিকি কাঁদে। পরাণটা জুড়োই কার কাছে রে। আমার মা কুথা রে। ঐ জমিই আমাদের 'জান-মারা।' জমি কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে? এ ব্যাপারে সঠিক কেউ বলতে পারে না। যার যেরকম ধারণা সে সেরকম বলে।

'ঐ মৌরীবাবুর বাড়ির নামোতে যেখানে খয়ের গাছটি যেখানে শীতলপাটিটি বিছানো, তারপর মাশাই চলে গেছে দুরান দুরান দেশে, এতোদূর যে চিঠি পাঠিয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে নাগাল পাবেন না।'

'ইবার ইদিক পানে সমিতির লোকজনেরা আসবে।' বাপকে বলছে ছেলেটা বিড়িতে হুশ করে একটা লম্বা টান দিয়ে।

'ধুর। ইখানে কি পড়া পতিত কিছু আছে? কি করতে সমিতি আসবে? তুই বানের আগুতে ছুটিস।' বাপের গলায় স্পষ্ট অসন্তোষ।

'লুকোনো জমি তো থাকতে পারে।'

'না রে বাপু। লুকোনো কি সোজা? লুকোনো জমি ইখানে নাই।'

'তুমি বাপু কেমন মানুষ। মা টা ঠিক বলে।'

'তোরা যাই বলিস তুদের কথায় আমি নাচছি না।'

'কেনে তোমার আগটা কিসের?'

'ও যাই করো, দিন আর রাত ভোগ থাকবেই। সব একাকার করে দেবে ভগমানের বিধান সিটি লয় গো।'

'ভগমানের বিধান পড়ে পড়ে প্যাদানি খাওয়া?'

'তা' জানি না। কিন্তুক ইটা জানি চৌধুরীর পো আর চাঁড়ালের পো এক হবে না কুনোদিন।'

'কেনে? এক করবো।'

'এক হবে না।'

'কেনে?'

'তা' জানি না।'

হঠাৎ করে আরম্ভ হয়েছিলো। হঠাৎ করে থেমে গেল আলোচনা। আবার যে কে সেই, চুপচাপ। একটা বিড়ির ইচ্ছে হয়। ফস করে দেশলাই জ্বালি। সেই আলোয় দেখতে পেলাম লোকটার মুখ। সর্বনাশের যেটুকু বাকি ছিল তাও শেষ করে, নদীর যে পাড়টা ভাঙছে সেই পাড়ে নিশ্চিন্তে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা, অসম্ভব রেখাজটিল একখানি মুখ। ছেলে প্রশ্ন করলে বাপ হয়ে যার উত্তর জানা নেই, কেবল জানা আছে যার 'ভগমানের বিধেন'।

ঝুমকোলতার পথে বড় আঁধার। কেউ কেউ এ কথা বলেছিলো যখন এ পথে আসি। এখন দেখছি তারা মিথ্যে বলে নি। ঝুমকোলতার পথ অন্ধকার জানতাম। কিন্তু এতো অন্ধকার জানতাম না।

ভগবানের বিধান। বিধি আর ভগবান।

ভগবানকে এরা সেই আদ্যিকাল থেকে এমন টান-বাঁধনে বেঁধে রেখেছে যে, সে এক বজ্র-আঁটুনি।

খোস-পাঁচড়ার দেবতা ঘেঁটুকে নিয়ে কতো রংগ, ব্যংগ—

'আ মরি কি রূপের গঠন,
দেখে গা'টা করছে কেমন
গলা সরু মাজা মোটা
টাক ধরেছে মাথাতে।
কম হয়েছে চোখের জ্যোতি,
নোল হয়েছে বুকের ছাতি
দাঁতগুলো সব নড়তেছে,
চুল নাই চোখের ভুরুতে।'

দেবতাকে নিয়ে ইয়ারকী হচ্ছে—

'সে বছরে খোস হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের গায়ে।'

শিবকে বলা হচ্ছে শিবো হে, এবার সামলাও তোমার বুড়ো এঁড়ে। কোঁচেরা সব সল্লা করে তোমার এঁড়ে দেবে খোঁয়াড়ে। 'তখন বাড়ি বাড়ি মাগন করে জরিমানা দিস রে'।

এই সব রং-তামাসার ভাঁজে ভাঁজে চলেছে কিন্তু অন্য আর এক খেলা—

'সুখ দুঃখ দুই শক্ত জোতা
সেই জুয়ালে আছে যোতা
আশা লাঠির দিচ্ছ গুঁতা ওহে
দিগম্বর।'

গণশার বাপ'টাকে দিয়ে যা' ইচ্ছে তা' করানো হচ্ছে। তাকে কুচনিপাড়ায় ঘুরিয়ে আনা হচ্ছে দামড়া চাড়িয়ে। সে কপ্‌নি পরে ঢুলে ঢুলে গ্যাঁজা খায়। কিন্তু এর ভেতরেই তলে তলে সেই ভক্তি-মাটির বাঁধ বাঁধা হয়েছে যাতে 'পারে যাওয়া যায় হে।'

এদেশের নিরক্ষর চাষীও 'অচিন পাখি', 'অকূল নদী' এসব কথার মানে বোঝে নিজের মত করে। এরা 'বিনি সোনার চূড়ো গড়া'র রহস্য বোঝে। এদেশের মেয়েরাও জানে সেই জল যে জলে বেণী না ভিজিয়ে চান করা যায়।

তেতপ্পর দুপুরে সেই এক আশ্চর্য 'গাবগুবাগুব' যন্তরটি নিয়ে আলপনের মাটির ঢেলা ভাঙতে ভাঙতে মাইলের পর মাইল চলেছে ফকির, দরবেশ, মুখে এক অনবদ্য বৈরাগ্যের গান—

কার বা খাঁচা, কে বা পাখি
ভেবে অন্ত নাহি দেখি
আমার এই আঙিনায় থাকি
আমারে মজাইতে চায়।
আগে যদি যেত জানা
জংগলা কভু পোষ মানে না
তবে উহার প্রেম করোম না
লালন ফকির কেঁদে কয়।

ভগবানের পরই মানে গুরু গোঁসাই। বলে, গুরু গোঁসাই কোন রঙ্গে আমার বেঁধেছ ঘরখানি। যখন মায়ের কোলে ছিলাম তখন মন গেল ধুলো খেলতে। এলো যখন রসাল যৌবন তখন রঙ্গে রঙ্গে দিন কাটালাম। এখন ভবনদীর জোর তুফান। 'চলকে ওঠে পানি।' এ নৌকো আমি আর বাইতে পারি না। ও গুরু, ও দয়াল, তুমি আমার নায়ের কাণ্ডারী হও যে।

ওরা জানে ভগবানের বিধানে চন্দ্র সূর্য ওঠে। জন্ম মরণ হয়। ওরা জানে পরজন্মে পাপ করেছে বলে এ জন্মে বাবুর জুতো খাচ্ছে। আর এমনি নাকি হতচ্ছাড়া কপালের 'লেখন।' এ কেউ পস্তাতে পারবে না।

ভগবান, কপাল বা বিধি, গুরু গোঁসাই—এর পর আছে বামুন, পুরুত। এদেরও বড়ো জাঁক, বড় দাপ। 'ওঁয়ারা দেবতার অংশ' এখনো কেউ কেউ এমন বিশ্বাস করে। বেটা মহাজন, সুদখোর, অনেকের মাটিতে ঘুঘু চরিয়েছে, অনেকের চামড়ায় ডুগডুগি বাজিয়েছে, সবাই জানে এবার আর উদ্ধার নেই, নিশ্চিত হার, কিন্তু একহাঁটু ধুলো পায়ে হাতে সালগ্রাম শিলা নিয়ে কালো, জঘন্য গায়ে ধবধবে পৈতে চড়িয়ে যতো ছোটলোক চাঁড়াল, ক্যাওট, বাগ্দী, সাঁওতালের ঘরে ঘরে গিয়ে এমন করে ভজিয়ে এলো যে, তাতেই কিস্তি মাৎ, ইলিকশানে জিতে গেল। এসব তো এই সেদিনও ১৯৬৬ সালের আগে পর্যন্ত হয়েছে।

এই লোক বলে, 'টিউবওয়েলের জল খাই না হে তোমাদের মত। ওতে গরুর চামড়া আছে। কুয়োরও জল খাই না।

লোকের পায়ের ধুলো উড়ে এসে পড়ে। আমি খাই গংগার জল স্রোতস্বিনী।'

আর সত্যিই, গরুর গাড়িতে চাপিয়ে ঘড়া ঘড়া গংগার জল আনায়। কণ্ঠিধারী এই লোকটিই আবার পরের বাগানের কলা বিক্রি করে দেয়। বিধবাকে ঠকিয়ে জমি বাগাতে ওস্তাদ।

কণ্ঠিধারীর বাড়িতে ভাগের ধানের ডাঁই রোজই একটু একটু কমছে, তা' বাবুকে জিগ্যেস করাতে বাবু রেগে-মেগে বলল, 'ওসব ইঁদুরে-টিঁদুরে খাচ্ছে'। কি রকম ইঁদুর রে বাবা। রোজ কিলো কিলো ধান সাবড়ে দেয়। ত' হরিপদ বাকি ধান বস্তায় বেঁধে পাশের গেরামের তুন্টুপদের ঘরে গিয়ে তুলে আসে।

তারপর আর কিছুই জানে না হরিপদ। বাগানে উদয়াস্ত কাজ করে। একদিন মগরার বাজারে একছড়া কলা বেচতে গেছে। ওখানে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেল কোমরে দড়ি বেঁধে।

থানায় যেতেই থানাদার বলল, 'তুন্টুপদর ঘরের তিন বস্তা কার ধান?'

'আজ্ঞে আমার।'

সরু কলমে লিখতে লিখতে থানাদার বলল, 'থাম বেটা মোটা কলম। ও ধান কার আমরা জেনেছি। তোর বাবু এসে এই দ্যাখ তোর নামে ডায়েরী করে গেছে।'

থানাদার হা-হা করে হাসতে লাগলো।

এই তো ঘটনা। এই তো ইতিহাস। এমনি একটা না। হাজার হাজার।

এদের চরিতামৃত বর্ণনা করলে ঠিক যে কতো পাতার বই হবে বলা মুসকিল। রামায়ণ, মহাভারতের কুঁদো কুঁদো চেহারাকেও হার মানাবে।

অথচ 'ওঁয়ারা দেবতার অংশ'—এ কথা বিশ্বাস করার মত মানুষ গ্রামে পাওয়া যাবে এখনও।

এ পথ কতোদূর চলে গেছে, এই ঝুমকোলতার পথ? এ পথের কি শেষ নেই? অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে চলেছি। হঠাৎ চোখে লাগলো আলোর একটা ঝলক।

পাশের সেই লোকটি বলল, 'লরি'।

দেখতে দেখতে লরিটা চলে গেল দু'ধারে অন্ধকারের ঢেউ তুলে। লোকটা গাইছে—

> 'বিধি রে, তোর কি এই বিবেচনা
> তুমি কারেও হাসাও কারেও কাঁদাও
> কাহারে ভাসাও সায়রে
> আমার বিয়ের রাতি ম'লো পতি,
> কোন বা বিচারে'—

থাক। বিধি মান্দক। ভগবান মান্দক। তবু এখনো সবটা মরে নি লোকটার। এখনো বিচারটা বুঝে নিতে চাইছে।

এরই দিন পনেরো পর তে-ঘড়ির মোড়ে গিয়ে হাজির। কোনকিছু ঠিক ছিলো না। এমনি ঘুরতে ঘুরতে। মানুষ দেখতে বেরিয়েছি মানুষ—সকলে বলছে নতুন কাল এসে গেছে। নেজের চোখে দেখতে এসেছি সে কালটা কেমন আর কোথায়, কতখানি এসেছে।

সেদিন ঝুমকোলতার পথে যে অন্ধকার দেখেছিলাম আজো এ পথে, সেই অন্ধকার তেমনি থম ধরে আছে। চায়ের একটু তেষ্টা ধরেছে। রাস্তার উঁচু পাড় থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আলোর ক্ষীণ রেখা চোখে পড়লো। গড়াতে গড়াতে নামলাম। কাছে গিয়ে দেখি চারদিকে বাঁশবন। কাটা টিনের ঝাঁপ খুলে বসে আছে একজন। লম্ফ জ্বালিয়ে। পাশের ডোবা থেকে মক্ মক্ শব্দ উঠে আসছে। শুনতে পাচ্ছি বাদুড়ের পাখার আওয়াজ। দু'-একটা কাপ, ডিস এদিক-ওদিক ছড়ানো। কিন্তু উনুন জ্বলছে না। এ কিরকম ভূতুড়ে চায়ের দোকান রে বাবা! কাপ, ডিস আছে, দু'-একটা ফাটা বোয়েম-টোয়েমও রয়েছে অথচ উনুনটাই নেই।

লম্ফের লালচে আলোতে লোকটা আমার মুখ-চোখ পড়ে নিলো। একটু হেসে বলল, 'নিজের গরুর দুধ দিয়ে চা। তা' গরুও ম'ল আর মনে করুন দুধও গেল। ও পাট চুকিয়ে দিয়েচি।'

'তা' ঝাঁপ খুলে কি জপ করছো'?

'এই বঁড়শি-টঁড়শি বিক্রি করছি। এই সময়টা খাল-বিলে মাছ মেলাই।'
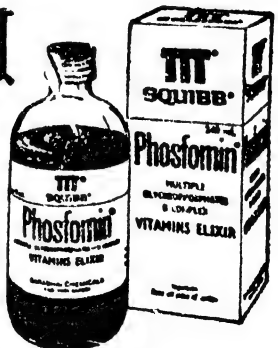
খলবল খলবল করে। সুতো আর বঁড়শির খুব কদর।'

'এই ব'ড়শি আর সুতো বেচেই'—

'না। আমি আবার গো-চিকিচ্ছে করি কি না। যে যাখন ডাকে ত্যাখন যেতে হয়। দূরে গেলে তিন টাকা। আবার এমনও হয় নিলুম না কিছু। আমারি মত অভাবী। নি কি করে বলুন। তেমন তেমন পার্টি পেলাম তো দিলাম মশাই গলায় কোপ মেরে। তা' দোবো না কেন বলুন?'

এই লোকটির এই অদ্ভুত নীতি-জ্ঞানে সায় দেব কি না ভাবছি। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল একটা রসিদ বই কৃষক সমিতির।

'তোমার আবার এসব'— ..

'আজ্ঞে, সবই করতে হয়। সব্বাইকে মেম্বার করে দিইচি। ইস্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আবার আমার আত্মীয়গোষ্ঠী তো মেলাই। যাকে পেরেছি সব বেধড়ক মেম্বার করে দিইচি।'

তারপর মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে লোকটা অনুচ্চ গলায় একটু গুনগুন করে উঠলো, 'পাঁচী গাঁয়ে 'সেলুন' আসিল। চাষীরা সব চলে কাটিল। তাতে বাবুদের খুব খেতি হল। বাবুদের মান চলে গেল গো।'

আচ্ছা! আমাকে ঠোকা হচ্ছে? গোড়া থেকেই কেমন সন্দেহ হচ্ছিলো। লোক-টাকে কোথায় যেন দেখেছি। কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। আরে তাই তো, এই ত' সেই লোক। ঝুম্‌কোলতার পথের সেই অন্ধকারে যে লোকটা ভগবানের বিধেনের কথা বলেছিলো। এই লোকটাই ত' বলেছিলো চৌধুরীর পো আর চাঁড়ালের পো এক হবে না কোনোদিন। দিন আর রাত ভেদ থাকবেই। সব একাকার হযে যাবে সিটি ভগমানের বিধান লয় গো।

'কিগো, চিনতে পারো?'

'আজ্ঞে কোন্ চেনার কথা বলছেন?' ভদ্দর লোকদের ত' একটা চেহারা নয়। নানারকমের চেহারা আছে। তাই চেনা খুব মুসকিল। এখনকার মত আপনাকে চিনতে পারছি। আবার অন্য সময় যখন মাশাই আপনার নুকোনো জমি দখল নিতে যাবো তখন আর আপনি চেনা দেবেন না।'

ওরে বাবা। সাংঘাতিক লোক ত'। কোন কথা থেকে কোন কথা!

তবু আমি বলি, 'আরে দিন পনেরো আগে ঝুম্‌কোলতার পথে তুমি আর তোমার ছেলে বালির খাদ থেকে কাজ করে ফিরছিলে। আমি'...'আমি কেন আমার চোদ্দ গুষ্ঠি কখনো বালির খাদে কাজ করি নি।'

তাহলে এতো ভুল হবে? অবিকল সেই হেঁড়ে গলা। সেই মুখ। মনে একটা খটকা নিয়ে উঠে এলাম ঢালু পথটা বেয়ে ওপরে।

ওপর থেকে শুনতে পাচ্ছি লোকটা গুনগুন করছে, 'চড় কন্যা, নৌকা পরে, হাল ধরিব শক্ত করে, ভয় কোরো না রাজার কুমারী, চার বৈঠা বাইয়া জোরে, পৌছে দিব ঐ পারে, বল, বল, কন্যা, কি নাম তোমার হে।'

বাবাঃ। আবার গান হচ্ছে। কথায় কথায় গান। এতো গান পায় কোথা থেকে।

এর বেশ কিছুদিন পর এই লোক-টাকেই দেখেছিলাম কাশশ্যাওড়ায়। স্বেচ্ছা-সেবকদের বিরাট একটা মিছিল। অধিকাংশেরই খালি গা। হাতে কাঁড়, ধনুক। কারুর হাতে বর্শা। কারুর হাতে লাঠি। গলায় লাল রুমাল বাঁধা। লেফট, রাইট করছে। ডান পা ফেলতে বাঁ পা পড়ে যাচ্ছে। বাঁ পা ফেলতে ডান পা। লজ্জা পাচ্ছে। পাশেরটা দেখে দেখে পা মিলোতে চাইছে।

যে খুশি বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে তার কোন বর্ণনা হয় না। মিছিল ত' নয় যেন ঝোড়ো হাওয়া পাক দিয়ে দিয়ে ফিরছে। ড্রাম বাজছে। বিউগল বাজছে। হুংকার উঠছে। শন শন করে ধুলো উড়ছে। করতাল বাজছে। ঝাঁঝর বাজছে। কারুর হাতে দেখলাম আড়বাঁশ। কিন্তু সকলের একটা জায়গায় মিল। সকলেই পা মেলাতে চাইছে। ডান পায়ের জায়গায় বাঁ পা হয়ে যাচ্ছে। বাঁয়ের জায়গায় ডান পা। কিন্তু এর-তারটা দেখে পা মিলিয়ে নিতে চাইছে। পতাকা উড়ছে, গলায় লাল রুমাল উড়ছে। দড়াদ্দম বোমা ফাটছে, যেন যুদ্ধে যাচ্ছে রণসাজে।

আরে তেঘড়ির মোড়ে দেখা লোকটা না? আশ্চর্য, ও ও এসে জুটেছে এখানে? কোথায় তে-ঘড়ি কোথায় কাশ-শ্যাওড়া? মাঝখানে অনেক পথ। ও এলো কি করে এখানে?

'কি গো, চিনতে পার?' মিছিলের পাশে পাশে চলতে চলতে জিগ্যেস করলাম।

'না।'

'সে কি? এই সেদিনও ত' তোমাকে দেখলাম তেঘড়ির মোড়ে। তুমি সুতো আর ব'ড়শি বিক্রি কর, বলেছিলে। বলে-ছিলে তুমি গো-চিকিৎসক।'

'না মাশাই। আমি ওসব করিটরি না। আমি ইখানকার কিসেন।'

কিন্তু আমার কি এতো ভুল হবে! সেই গলা, সেই মুখ। এই লোকটাকেই আমি দেখেছিলাম ঝুম্‌কোলতার পথে। একেই পেয়েছিলাম তেঘড়িতে। আর এখন এ হাঁটছে কাশশ্যাওড়ায়। সেই একইরকম পাকানো পাকানো চেহারা। মুখটা বেঁকে চুরে গেছে। মাথার কাচা-পাকা চুলগুলো পাগলের মত। ঝুম্‌কোলতা থেকে তেঘড়ি তেঘড়ি থেকে কাশশ্যাওড়া এসব যে অনেক দূরে দূরে।

যতোই দূর হোক এ সেই লোক না হয়ে যায় না। একেই প্রথম দেখি ঝুম্‌কোলতায়, তারপর দেখি তেঘড়িতে, তারপর ক্যাশশ্যাওড়ার এই স্বেচ্ছাসেবক-দের মিছিলে। ওই ত' লোকটা আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়ে হাসছে। কোন সন্দেহ নেই।

সিঁদুর ভরা মেঘের ভেতর দিয়ে ঐ সূর্য অস্ত যায়। লালের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে মাঠে। ছড়িয়ে পড়ছে ধানের ছড়ার মত ওদের গায়ে। উড়ছে ফড়িং এক শীষ থেকে আর শীষে। সাদা প্রজাপতি উড়ছে।

সোনার ঝাঁপির সন্ধান পেয়ে গেছে ওরা। ওরা মার্চ করছে লেফট, রাইট লেফট। [ক্রমশ

# চাঁদের হাসি

## রেবন্ত বসু

আজ একুশে জুলাই মন্দিরার জন্মদিন। একুশ পূর্ণ হয়ে বাইশে পড়ল সে এবার—ছেলেমানুষ নয় যে এই দিনটা নিয়ে মাতামাতি করবে সে। মানুষ যত বড়ো হয় তত সে তার জন্মদিনকে ভুলতে চায়—হয়তো অস্তিত্বের মধ্যে যে আকর্ষণ আছে, সেটা তার কাছে আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসে—এইটাই তার কারণ। বিশেষ করে মন্দিরার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য—তার কপাল মন্দ যে সে এমন এক বাড়িতে জন্মেছে যেখানে অর্থের ব্যাপকতা আছে, নেই মনের: যে বাড়ির লোকেরা এরোপ্লেনে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারে কিন্তু এক মুহূর্ত চোখ বুজে মনের ভেতরে ডুব দিতে জানে না। মন্দিরার বড়ো ভাবনা তার একটা সক্রিয়, দরদী অথচ উদাস মন আছে—যাকে নিয়ে সে গর্বিত, যার জন্য তার বিড়ম্বনা আর অস্বস্তির অন্ত নেই। সে যাই হোক, মন্দিরা ছেলেমানুষ না হলেও বড়োমানুষের অর্থাৎ বড়োলোকের একমাত্র কন্যা—দুটি ছেলের অনেক পরে এই মেয়েটিকে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পেয়েছিলেন তার মা—তাই তার কাছে তার নিজের মূল্য যাই হোক না কেন, তার মা-বাবার কাছে যথেষ্ট। খাপছাড়া মেয়েটাকে তাঁরা বোঝেন না কিন্তু সেইজন্যেই বোধহয় আরো বেশি করে ভালোবাসেন, তাঁদের আশঙ্কাটাকে তাঁরা এই ভেবে দূর করতে চান যে, আর একটু বয়স হলে মন্দিরা আপনিই তাঁদের সংসারের উপযুক্ত হবে। তাই এই স্মরণীয় দিনটি তাঁরা শুধু নিজেরাই স্মরণ করেন না, নিজেদের ও ছেলেমেয়েদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ঘরোয়া পার্টিতে আপ্যায়ন করে তাদেরও প্রতি বছর শুভ তিথিটি স্মরণ করিয়ে দেন।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা হয়েছে—লনে টেবিল-চেয়ার পাতা হয়েছে, সমবেত হয়েছেন নানা বয়সের কটি নরনারী। হারাধন রায় মন্দিরার বাবার বিজনেস পার্টনার—তিনি সস্ত্রীক এসেছেন। এসেছেন শশাঙ্ক চ্যাটার্জী—মন্দিরার বড়দার সঙ্গে যাঁর বিলেতে প্রথম আলাপ—মিসেস চ্যাটার্জীও উপস্থিত। মন্দিরার ছোড়দার বন্ধু সৌমেন ও পরাশর দুজনেই এসেছে। সৌমেনের স্ত্রী মণিকাও এসেছে, পরাশর এখনো বিবাহিত নয়—এ বাড়ির কোনো নিমন্ত্রণ তাই সে নষ্ট করে না।

মন্দিরাকে সে বোঝে না অথবা ভুল বোঝে· মন্দিরার জটিল মনটাকে সে খানিকটা সাহিত্য-পড়া ন্যাকামি বলে মনে করে—কিন্তু এ কথাও তো সত্যি যে, মন্দিরা সুন্দরী, তাছাড়া নিজের ভবিষ্যতের উন্নতির কথাও তো ভাবতে হবে। তার ও মন্দিরার আত্মীয়দের ইচ্ছেটা মিলে গেছে—মন্দিরা এম-এ পাশ করলেই কথাটা পাকা হতে পারে, কার্যে পরিণত হতে পারে। এ ছাড়া এসেছে শোভনা ও যূথিকা—মন্দিরার কলেজের বন্ধু। মন্দিরার আসলে বন্ধু বলে কেউ নেই। কিন্তু ওরা দুজনে মনে করে যে, ওরা ধনীকন্যা মন্দিরার খুব বন্ধু তাই মন্দিরা ওদের হতাশ করতে চায় না। মন্দিরা দোতলার বারান্দা থেকে দেখল আবছা অন্ধকারে সবাইকে কেমন এক-রকম দেখাচ্ছে, নিচে গিয়ে কাছ থেকে দেখলে দেখা যাবে আকৃতি তাদের ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতি নয়, সাংসারিক সচ্ছলতা ও প্রতিষ্ঠার দরুণ তারা সবাই অহংকারী, আত্মকেন্দ্রিক ও লঘু। মন্দিরা যখন নিচে নেমে যাবে সেও ওদের একজন হয়ে যাবে—তাকেও আর আলাদা করে চেনা যাবে না। কথাটা ভাবতে তার যেন কেমন লাগল।

'মন্দিরা কি করছে ওপরে!' যূথিকার গলা শোনা গেল।

'জানি না বাবা মেয়ের কান্ড—সবাই এসে গেছে—তার আর হয় না!' মন্দিরার মা বললেন।

মন্দিরা চট করে সরে গেল বারান্দা থেকে: তারপর নিচে নেমে এলো।

শুভেচ্ছা-বিনিময়ের পর উপহার দেওয়ার পালা। স্বাভাবিক কারণেই, পরাশরেরটাই সবচেয়ে দামী। তারপর চা, কফি, কেক প্যাটিস, স্যান্ডুইচ্‌ সন্দেশ। তারই সংগে খোশ গল্প। অফিসের কথা, যুক্তফ্রন্ট, লেবার-আনরেস্ট, কলেজের পড়াশুনো, ছাত্র ধর্মঘট। মন্দিরা শ্রোতা হয়েছিল, কথা যা বলেছে সে শুধু অপরের প্রশ্নের জবাবে। মিনিট দশেকের মধ্যেই মাথাটা তার যখন প্রায় ধরে এসেছে তখন সে বোকার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য, মানুষ শেষে সত্যিই চাঁদে নামল!'

শোভনা বলল, 'এ প্রায় জানাই ছিল—কত পরীক্ষা করে তবে না পাঠিয়েছে!'

মন্দিরার বড় বৌদি ঘাড় নাড়লেন।

'আমি তা বলছি না।'

যূথিকা বলল, 'ফেলিওর হলে মুখ চুন হয়ে যেত না পৃথিবীর কাছে আমেরিকার!' এবার ছোট বৌদি।

'আমি তাও বলছি না।'

ওঃ প্লিজ, চেঞ্জ দি টপিক—' মন্দিরার এক দাদা বলে উঠলেন বিরক্ত হয়ে : 'সকাল থেকে শুনে শুনে কান পচে গেল।'

হারাধনবাবু বললেন, 'আপিসের লোকগুলোকে তো কাজ করানো দায় হয়ে উঠেছিল—না কি বলেন মিস্টার মিটার?'

মিস্টার মিটার অর্থাৎ মন্দিরার বাবা বললেন, 'ঠিক তাই। হুজুগের রাজত্ব চলেছে—আজ এটা, কাল ওটা। কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ইন্ডিয়া—তা ছাড়া চাঁদ তো আরো কত দূরের জিনিস! আমরা এদিকে হৈ-হৈ করে মরছি!'

'শুধু তাই নয়—!' সৌমেন বলে, 'সায়েন্সের এ-বি-সি-ডি বোঝে না অথচ লোকগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাগজে-পড়া বুলি দিয়ে আলোচনা করছে তো করছেই। এর মধ্যেও আবার পলিটিক্স আছে জানেন তো!'

'কি রকম!' সবাই কৌতূহলী হলো—বিশেষ করে তার স্ত্রী মণিকা।

'অনেকে বলছে, মানুষে চালানো যন্ত্র তো চাঁদে যাবেই, কিন্তু মানুষ ছাড়াই যে "লুনা" চাঁদে পাড়ি দিয়েছে তার কৃতিত্ব অনেক বেশি।'

পরাশর বলল, 'এটা অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষের চাঁদে নামাটা একটা গ্রেট ওয়ান্ডার—এ বিষয়ে আমি মন্দিরার সংগে একমত। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে সেইটেই ভাববার কথা। চাঁদকে যদি আমেরিকা তার যুদ্ধের কাজে খাটায় তাহলে ভবিষ্যৎ সত্যিই অন্ধকার।'

'অন্ধকার।' মন্দিরা পরাশরের শেষ কথাটি আবৃত্তি করল। পরাশর খুশি হলো।

'সবই অন্ধকার—' হারাধনবাবু বলে উঠলেন : 'ব্যবসা-বাণিজ্যের যা অবস্থা—' আলোচনা জমে উঠল। মন্দিরা বাঁচল। চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে সে মাথাধরা ছাড়াবার চেষ্টা করল।

সাড়ে আটটার কিছু আগে তার বন্ধুরা বিদায় নিল। 'আমি একটু আসছি—' বলে মন্দিরা সমবেত অভ্যাগতদের কাছ থেকে সাময়িক বিদায় নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। উঠে এলো সোজা তিনতলার ছাতে—খোলা আকাশের নিচে যেখানে কিছু তারাদের নিয়ে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ আকাশের বুকে ফুটে আছে। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কিছু মেঘও আছে। পাঁচিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল মন্দিরা—এত উঁচু থেকে আবার সবাইকে কেমন আবছা অন্ধকারে একরকম দেখাচ্ছে।

ঐ যে আমাদের বেয়ারা অনন্ত ঘুরছে ট্রে হাতে করে, আরেকটু ওপর থেকে দেখলে ওর ট্রে-টা আর দেখা যাবে না—ওকে তখন আর আমার বাবার সংগে আলাদা করে চেনা যাবে না। আরো ওপর থেকে দেখলে এই নিউ আলিপুর আর বাগবাজার মিলেমিশে এক হয়ে যাবে। তারও ওপর থেকে দেখলে আমেরিকা আর রাশিয়া, চীন আর ভারত বোধহয় সব তালগোল পাকানো বলে মনে হবে। আর্মস্ট্রং-এর চোখ দিয়ে মন্দিরার পৃথিবীকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। চাঁদের আকাশে পৃথিবী ফুটে রয়েছে—ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে—দূর থেকে কে বলবে এই পৃথিবীতে এত পাপ, এত মিথ্যে, এত হানাহানি, ধনী-দরিদ্রে, শাদা-কালোয় এত পার্থক্য!

কিন্তু আর্মস্ট্রং তা জানে, অল্‌ড্রিন তা জানে—তাদের চোখে পৃথিবীকে শুধু সুন্দরই দেখাচ্ছে না, করুণও দেখাচ্ছে, অসহায়ও দেখাচ্ছে। কারণ সে প্রাণের জন্ম দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীকে হয়তো একদিন ধ্বংস করে দেবে, আজ চাঁদের মনেও সে ভাবনা ঢুকেছে হয়তো মানুষ তাকেও ধ্বংস করে তবে নিশ্চিন্ত হবে। মানুষ কেন গভীরভাবে ভাবে না, কেন তার ভাবনাগুলো নিচের ঐ লোকগুলোর মতো এলোমেলো, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন! কেন সে বোঝে না কত ভাগ্যবলে এই অনন্ত বিশ্বে আমরা চেতনা পেয়েছি—কেন সেই চেতনার আমরা সদ্ব্যবহার করি না! আমি কে, আমি কেন—এ সব প্রশ্ন কেন তাকে আলোড়িত করে না—যদি বা করে কেন সেই আত্মজ্ঞান বা আত্মানুসন্ধান মানুষকে ভীত করে না, নম্র করে না, প্রেমিক করে না! কেন আমরা তুচ্ছ কাজ নিয়ে স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব নিয়ে জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু কাটিয়ে দিই—বেঁচে থাকা কাকে বলে সেটা না জেনেই যে আমরা মরে যাই এর চেয়ে বড়ো দুঃখের আর কি থাকতে পারে। মানুষ চাঁদে গেল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ হলো কিন্তু কি সে আগ্রহ—শুধুই হুজুগ, শুধুই অর্থহীন সোরগোল, মানুষ সুখ্যাতি করুন, নিন্দে করুন, ভয় করুন, ঔদাসীন্য দেখান—সব করুন—শুধু ভাবুন না। আমি ভাবতে চাই তাই নিজেকে নিয়ে এসেছি এ নিঃসংগতায়—কি দুর্ভাগ্য আমাদের যে মানুষের কীর্তির কথা চিন্তা করতে আমাদের মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু কতক্ষণ, কতক্ষণ এমন করে থাকব আমি। একটু পরেই ড

আসবে আমার—নিচে নেমে যেতে হবে আমায় ; আমি যে পোষা পায়রা—বেশিক্ষণ উড়তে পারি না, আমার আমায় ফিরে যেতে হবে সোনার খাঁচায়। ওরা ভাবে না, ওরা একবারও ওড়ে না ভাই ওরা সুখী; আমি ভাবি, মাঝে মাঝে স্বাদ পাই অনন্ত আকাশের—তাই আমার ভাগ্যে আর সুখ নেই। শুধু এই সব বিরল সুন্দর মুহূর্তে—

'আরে, তুমি এখানে কি করছ!' পরাশরের গলা শোনা গেল হঠাৎ কাছ থেকেঃ 'আমরা তোমায় কত খুঁজে বেড়াচ্ছি। শেষে তোমাদের মায়া বলল—'

'কেন খুঁজছ আমায়?'

'সিনেমায় যেতে হবে—চলো—সবাই তোমায় ডাকছে। তোমার বাবা খোঁজছেন।'

মন্দিরা মাথা নিচু করে লনের দিকে তাকাল। সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে—তার প্রতীক্ষা করছে—গাড়িগুলো গেটের বাইরে সার দিয়ে অপেক্ষা করছে। পরাশর মন্দিরার আরেকটু কাছে এগিয়ে এল, আবেগভরে বলল, 'সত্যি, তোমায় আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। তার ঠোঁট কামনায় কাঁপতে লাগল।

মন্দিরা একটু পিছু হঠে গেল [illegible], বলে উঠল, 'এখনি চলো [illegible]—দেরি হয়ে গেছে অনেক।'

[illegible] ফাঁকা হয়ে গেল; একটু পরে লনটাও ফাঁকা হয়ে গেল। আয়ারা [illegible] এসে টেবিল-চেয়ার, কাপ-ডিস নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে। [illegible] সদর দরজা বন্ধ করে, দরোয়ান দিল গেটে চাবি লাগিয়ে। নিঃঝুম বাড়িটার মাথার ওপর চাঁদ হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

নিউ আলিপুর থেকে চৌরঙ্গী। সেখানে সিনেমা সেখানে দোকান, সেখানে হোটেল; সেখানে গণিকা, সেখানে মাতাল, সেখানে বিলাসী। তারও মাথায় ওপর চাঁদ।

চৌরঙ্গী থেকে বাগবাজার। সেখানে ঘেঁষাঘেঁষি করা বাড়িগুলো যেন একটা আরেকটার ঘাড়ে চেপে রয়েছে—সেখানে দারিদ্র্য, সেখানে অভাব, সেখানে অবিচার। অথচ আশ্চর্য, সেখানেও আকাশ, সেখানেও চাঁদ—সেখানেও একটি বাড়ির তেতলার ভাঙাচোরা ছাতে দাঁড়িয়ে একটি যুবক আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার নাম অম্লান। অথবা পদ্মলোচনও বলতে পারি—জীবনে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মুখ [illegible] গেছে। অর্থের অভাবে সুযোগের [illegible] মেধাবী হয়েও, অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেও সে আর পড়াশুনো করতে পারে নি, সুপারিশের অভাবে একটা প্রাই-

মারী ইস্কুলেও চাকরি জোটাতে পারে নি; সকাল-সন্ধ্যের দু'টো টিউশনি আছে এই যা ভরসা। বাবা কোনো সওদাগরী অপিসের কেরানী, মা অসুস্থা, সে বড়ো ছেলে, দু'টি বোন অনূঢ়া, ছোটো একটি ভাই শাকের আঁটি। এখন সে ক্লান্ত, বড়ো অবসন্ন। দুপুরে একটা ইন্টারভিউ ছিল, তারা এম-এ পাশ চায়, অম্লান বলেছিল, 'তবে আমায় ডাকলেন কেন, আমি তো লিখি নি আমি এম-এ পাশ।'

সেক্রেটারীবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, 'মিস্টার সেন, ব্যবহারটাকে আরেকটু নরম করুন। অ্যাংগ্রি ইয়াং মেন কবিতায় ভালো, জীবনে নয়—বাস্তবে নয়।'

অম্লান বলেছিল, 'আমি অ্যাংগ্রি নই, আমি হাংগ্রি।'

সেক্রেটারীবাবু হেসে বলেছিলেন, 'বিউটিফুল, হবে আপনার হবে—আপনি কবিতা লেখেন না কেন? এসব কি আপনাদের মানায়?'

কথাটার মধ্যে যতই বিদ্রূপ থাকুক এটা সত্যি যে, অম্লান কবিতা লেখে। কথাটা নতুন করে মনে পড়েছিল তার। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিল এক পত্রিকা অপিসে যেখানে সে মাস তিনেক আগে একটা কবিতা দিয়ে এসেছিল। সম্পাদক তার কথা শুনে বললেন, 'পছন্দ হলে নিশ্চয়ই ছাপা হবে—এবং তার কপি আপনার বাড়ি যাবে।'

'কিন্তু কবে?'

যবে আপনার টার্ন আসবে—অত ব্যস্ত কেন আচ্ছা, এখন আসুন, আমি একটু ব্যস্ত আছি।'

এই করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেল, টিউশনির সময় হলো। ক্লাস ফোরের একটি ছেলেকে বিদ্যার জাহাজ করে এই খানিক আগে সে বাড়ি এসেছে। দু' ঘণ্টা না থাকলে ছেলের বাবা ভারি রাগ করেন। এক-একদিন ছেলেও ঢোলে, মাস্টারও ঢোলে। তবু তাতেও তাদের অভিভাবকের আপত্তি নেই। দু'জনকে কষ্ট দিয়ে তিনি যেন এক আন্তরিক আনন্দ পান। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে অম্লান। ঘরে ঢুকে দেখে মা জ্বরে প্রায় অচৈতন্য। ওষুধ এনেছিল সংগে করে—বোনেরা খাইয়ে দিল। বাবা বসে দোতলার মাধববাবুদের কাছ থেকে আনা কাগজ পড়ছিলেন চশমা চোখে দিয়ে। ছোট্ট ঘরখানাতে যেন দম বন্ধ হয়ে গেল অম্লানের। সামনের বারান্দাটা ঘিরে নিয়ে তার শোবার জায়গা। সেখানে রইল না সে; জামা-কাপড় ছেড়ে পাজামা আর গেঞ্জি পরে সে সোজা একতলা থেকে তিনতলার ছাতে গিয়ে উঠল। এই ছাতটা অবশ্য মাধববাবুদের ভাগে, তবে অনেকদিনের পরিচয়ের দরুণ এখানে তাদের আসা-যাওয়ায় কারো আপত্তি নেই। দরিদ্রকে দরিদ্র না দেখিলে কে দেখিবে! তাছাড়া মাধববাবুর একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে—একটি নয়, অনেকগুলিই আছে—তবে এইটিই বড়ো বলে এবং অম্লানের সংগে তার একটু বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে এই কাহিনীতে সে উল্লেখযোগ্য। নাম তার রেবা। যেমন নাম, তেমনি রূপ, তেমনি গুণ। সবই সাধারণ। তবু অম্লানের তাকে ভালো লাগে কারণ রেবা তাকে ভালোবাসে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা সারাদিন প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হয়ে ফিরে এসে দু'টি বোন কি মাকে দেখে মন ভরে না কোনো যুবকের—যেমন-তেমন হোক, একটু রোমান্স থাকলে মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সে যে এই

পৃথিবীতে শুধুমাত্র আবর্জনা নয় এটা সে শুধু রেবার চোখের ভাষাতেই পড়তে পায়। তারা দুজনে সমগোত্রীয় না হলেও, একে অপরকে না বুঝলেও একে অপরকে খোঁজে। দুজনেই সংসারের গন্ডীতে বাঁধা, দুজনেই বিব্রত, দুজনেই ম্রিয়মাণ—যদিও দুজনের দুঃখের গভীর কারণটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছাতের নিঃসঙ্গতায় অম্লান একান্ত হলো। ঝিরঝিরে হাওয়ায় স্নান করে সে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল। সেখানে একফালি চাঁদ সেখানে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারার ইসারা। ভাবলেও অবাক লাগে ঐ চাঁদে এখনো দু'টি মানুষ বসে আছে; আরো বিস্ময়কর এই যে, মানুষের এই বিরাট কীর্তির ফলে পৃথিবীর মানুষের কারোর কোনো পরিবর্তন হয় নি। রাস্তায়-ঘাটে সে মানুষদের আলোচনা করতে শুনছে চাঁদ নিয়ে, কিন্তু তবুও সেক্রেটারীবাবু তার সঙ্গে অভব্য ব্যবহার করেছেন, সম্পাদকমশাই ঔদাসীন্যে কঠোর হয়ে থেকেছেন, ছাত্রের বাবা লক্ষ্য করেছেন সে ফাঁকি দিচ্ছে কি না, আসার পথে শেয়ালদা স্টেশনের সামনে দেখেছে একটি মেয়ে দেহের ও যৌবনের চমকে লুব্ধ করে প্রৌঢ় পুরুষকে আহবান করে নিয়ে গেছে ট্যাক্সির ভেতরে। তাহলে আর মানুষ কি ভাবল চাঁদ নিয়ে! সে নিজেই বা কি ব্যতিক্রম! সারাটা দিন সে নিজেও কি জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত ছিল না? কতবার সে ভেবেছে গভীরভাবে? তবু আমি সকলের মতো নই—অম্লান ভাবে। এই যে এখন আমি একা হয়ে গেছি এখন তো আমি আর সংসারের কথা ভাবছি না, নিজের তুচ্ছতার কথা একবারও আমার মনে হচ্ছে না। আমি যখন পৃথিবীর নাগরিক তখন আমি আঘাত পাই, বেদনা পাই, অবহেলা পাই। যখন আমি বিশ্বজগতের নাগরিক তখন আমি কবি, আমি ভাবুক, আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্রহ্মান্ডের ব্যাপকতায় ও অনন্ত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ তুচ্ছ, আবার মানুষ বিরাট—যে চাঁদে যেতে পারে, যে আরো এক সৌরজগতে যাবার স্বপ্ন দেখে সে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল, আপন আশায় বলীয়ান, আপন চিন্তায় ঐশ্বরিক। দরকার শুধু ভাবনার, সত্যিকারের ভাবনার। তাহলে রূঢ় বাস্তবকে মনে হবে মূঢ়, নির্বোধ মানুষগুলোর রুক্ষতায় হাসি পাবে, কান্না নয়, বলতে ইচ্ছে করবে : ঈশ্বর, তুমি ওদের ক্ষমা করো। কারণ ওরা নিজেরাই জানে না যে ওরা কি অসীম ক্ষমতার অধিকারী, ওরা জানে না যে কি অমূল্য সম্পদ ওরা নষ্ট করছে, ওরা জানে না যে ওরা অমৃতের পুত্র। অসীমের প্রতি এই যে মানুষের আকর্ষণ, এ কি শুধু একটা বাহ্যিক ঝোঁক, একটা রেষারেষি, একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে—এর স্পর্শ, এর আলোড়ন, এর প্রভাব কেন পড়বে না সমস্ত মানুষের মনের ওপর! চাঁদে মানুষ পা দিয়েছে বলেই কি চাঁদ পদানত হয়েছে—সে এখনো অধরা, এখনো রহস্যাবৃত, এখনো তার শাদা আলো কৌতুকে উজ্জ্বল। মানুষ যদি তাকে ধ্বংস করে ফেলে তবে সে-ই হবে চাঁদের সেরা জয়। অম্লান আরো ভাবে, আরো আরো—ধীরে ধীরে সে মনের অতলে, চেতনার গভীরতম-প্রদেশে ডুব দেয় : উজ্জ্বল মণিমুক্তোর মতো রাশি রাশি দেখা না-দেখা, জানা না-জানা [illegible]তারকা তাকে বিহ্বল করে তোলে...বহিরাকাশে সমস্ত মেঘের আস্তরণ কেটে ছোট্ট চাঁদ প্রশান্ত হেসে অম্লানের কপালে আদর মাখিয়ে দেয়...অম্লান নির্মল থাকে, পবিত্র হতে থাকে, ঈশ্বর হতে থাকে...

'কি ভাবছ ?' পেছন থেকে বলে ওঠে রেবা।

অম্লান চমকায় না—এ যেন তার জানাই ছিল। সে একটু ম্লান হেসে বলে, 'যত অবান্তর এলোমেলো ভাবনা। অন্তত বাস্তবের মানুষ তাই বলবে।'

রেবা বলে, 'বুঝলাম না। স্পষ্ট করে বলো।'

'আজ মানুষ যে চাঁদে নামল তাতে কার কি হলো আর কি হতে পারত তাই ভাবছি।'

'যত সব অবান্তর ভাবনা।'

'দেখলে তো! আমি তো আগেই বলে রেখেছি।'

'না সত্যি বলছি। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি বলো। ওসব বড়োলোক দেশেরই সাজে। ইন্টারভিউ কেমন হলো তাই বলো!'

'ভালো না।'

চাঁদের মুখে মেঘের ছায়া, রেবার মুখেও তাই।—'দেখ, একটা না একটা লেগে যাবেই। তোমাকে কেউ না কেউ একদিন বুঝবেই।' সে নিজেকে ও অম্লানকে সান্ত্বনা দেয়।

অম্লানও মনে মনে তাই বিশ্বাস করে। সেক্রেটারীবাবু না বুঝুন, সম্পাদকমশাই না বুঝুন, ছাত্রের বাবা না বুঝুন, বাবা-মা—হ্যাঁ রেবাও না বুঝুক—কেউ না কেউ নিশ্চয় আছে এই পৃথিবীর মাটিতে, যে তারই মতো ভাবে, যে তাকে হৃদয় দিয়ে বুঝবে। সে বোঝায় হয়তো চাকরি হবে না, বাড়বে না সুনাম, কিন্তু মনের বোঝা লাঘব হবে। এই দুর্গম কুয়াশাবৃত অনন্ত পথে একা যেতে ভয় করে, আরো কেউ আছে—তা তাকে চিনি আর নাই চিনি—সে কথা ভাবলেও মনে বল আসে।

'দাদা, দাদা—' অম্লানের ছোটো বোন দৌড়ে ছাতে আসে—'মা কিরকম করছে—বাবা এক্ষুণি ডাকছে তোমায়।'

'সে কি—' অম্লান ও রেবা একই সঙ্গে বলে। রেবার লজ্জা তার গভীর আন্তরিক শংকার ভেতরে চাপা পড়ে যায়। সব ভুলে সে-ও অম্লানের সঙ্গে নিচে নেমে যায় রুগীর ঘরে। মায়ের অবস্থা দেখে অম্লান দৌড়োয় ডাক্তার ডাকতে। ডবল ভিজিটের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ডাক্তার এসে তার মাকে দেখে ইঞ্জেকশান দিয়ে যান। তাঁর চলে যাওয়ার খানিক পরে মায়ের সাংঘাতিক অবস্থাটা কাটে—চোখ চেয়ে শিয়রে বসা রেবার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে তিনি বড়ো স্বস্তি পান। তাঁকে চোখ খুলে শান্তভাবে তাকাতে দেখে আশ্বস্ত হয়ে এখন চোখ বোজেন অম্লানের বাবা। ছোটোভাইটা ঘুমিয়ে পড়েছিল আগেই, বোন দুটিকেও এবার শুয়ে পড়তে বলে অম্লান। মা ঘুমোলে আর রেবা চলে গেলে সে গিয়ে শুয়ে পড়ে তার বারান্দার বরাদ্দ জায়গাটুকুতে।

রাত গভীর হলো। নিউ আলিপুরের আকাশে চাঁদ হাসছে। সিনেমার শেষে বাড়ি এসে ডিনার খেয়ে ঘরোয়া শাড়ি পরে মুখে ক্রীম মেখে মন্দিরা শুলো তার খাটে। সামনেই খোলা জানলা দি[illegible] মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত রাত্রিটা কি নির্জন, কি নিস্তব্ধ। সমস্ত দিনের শেষে কি প্রশান্ত অখন্ড অবসর। চাঁদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কি যেন একটা মনে হবার ঠিক আগেই মন্দিরা ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত আরো গভীর হলো। বাগবাজারের আকাশে চাঁদ হাসছে। সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ঘুমন্ত মাকে একবার দূর থেকে পরীক্ষা করে অম্লান আবার বিছানায় গিয়ে শুলো। তার একদম চোখের সামনেই মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত রাত্রিটা কি নির্জন, কি নিস্তব্ধ! সমস্ত দিনের শেষে কি প্রশান্ত অখন্ড অবসর! চাঁদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কি যেন একটা মনে হবার ঠিক আগেই অম্লান ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রশস্ত আকাশে নিষ্ঠুর চাঁদের মুখে বিজয়ীর বাঁকানো হাসি। সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র যেন এক পরম পরিহাসের হাসিতে উদ্বেলিত। পরম [illegible] নামায় ঈশ্বরের রহস্য[illegible] অমৃতধারার মতো ঝরে পড়ল। আকাশের ওপারে অগম্য মন্দিরে বসে তিনি অবিরাম বাজিয়ে চলেন তাঁর দুর্বোধ্য মন্দিরা, মুখে তাঁর কঠিন কৌতুকে অম্লান।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ চাল্লিশ ॥

ডুয়ার্সের এক নামকরা বাগানের গেস্ট হাউসের অতিথি হয়ে এসেছিলাম।

গোটা একটি দিনের বিরতি।

গেস্ট হাউসের সৌখিন ঢালাও আরাম-পরিবেশে ছিল না কিছুর অভাব। আদর-আপ্যায়নে ছিল না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবাধ বিস্তার। মুখ থেকে শব্দটি খসাবার আগেই সমস্ত চাহিদার পূর্তি।

অতিথি যদি হতে হয়তো এখানেই। অন্য কোথা অন্য কোনখানে নয়।

সত্য যুগের রাজামহারাজাদের কথা ইতিহাস-কাহিনীতে পড়েছি। তাঁরাও এত সুখে থাকতেন কিনা সন্দেহ।

বড় বড় দরজা-জানালা। সোফা-কৌচ। মূল্যবান মেহগনী-খাট। ড্রেসিং-মিরর। আলনা-আলমারী। ডানলো-পিলোর গদি। ফ্রীজ। রেডিওগ্রাম কিছুরই অভাব নেই।

সেকালের সম্রাটদের বেড়াবার জন্যে ছিল হাতী। দেব-দেবতাদের নিদেন এই সেদিন রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও ছিল রথ। সে-রথের দিন গিয়েছে। এখনও অবশ্য আছে রথ। তবে তার কৌলীন্য আলাদা। সে-রথ চলে তেলে-জলে। মনোরম কার। আর তার নামই বা কত।

এবং তারই একটি সদাসর্বদা প্রস্তুত আমার জন্যে।

অত কিছুর অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। নিতান্ত সাধারণ মানুষ। পরিচয় হতে সংবাদপত্রের লোক জেনে বিনয়-মিশ্রিত কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন ম্যানেজার মিঃ খাঁ। পুনায় না কোথায় বাড়ি ছিল। ভুলেই গেছেন। আজ প্রায় বিশ বছর আছেন বাগানে। স্মার্ট চারু-দর্শন ভদ্রলোক। মধ্যবয়সী। বাংলা ভালোই জেনে গিয়েছেন। জানেন ভারত-বর্ষের আরো এন্তার ভাষা। খইয়ের মত ইংরাজি বলতে পারেন। বিশ্বসংসারে শুনেছি নিজের বলতে নিতান্ত একক।

অকৃতদার এই মানুষটির সংগে আলাপ হয়েছিল শিলিগুড়ির এক প্রসিদ্ধ হোটেলে। আমার পরিচয় পেয়ে সুন্দর বাংলায় বলেছিলেন, আসুন না একদিন। আপনি সংবাদপত্রের লোক।

সংবাদপত্রের লোককে নিজে যেচে নিমন্ত্রণ করছেন? আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম।

কেন? জোড়া-ভ্রূ লাফিয়ে কপালে উঠেছিল মিঃ খাঁর। বলেছিলেন, কেন? সংবাদপত্রের লোকেরা কি বাঘ না ভালুক যে তাদের ভয় করতে হবে? তা ছাড়া জানেন তো ডুয়ার্সেই আছি—বাঘ-ভালুকের দেশ বলতে পারেন—তাঁর পাওয়ারফুল চশমার লেন্স ঝলসাচ্ছিল আলো লেগে। তিনি দামী স্কচ্ হুইস্কির পেগে চুমুক দিচ্ছিলেন থেমে-থেমে। আমার ও-অভ্যাস নেই বলে একটা কোল্ড ড্রিংকে ঠোঁট লাগাচ্ছিলাম।

বললাম, বাঘ-ভালুকদের চাইতেও জানেন তো ভয়ংকর লোক আছে।

You mean the Journalists. I never think so. থেমে থেমে তারপর তিনি বলেছিলেন, আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সুবিধে পেলেই একদিন আসবেন বাগানে।

তার পর যদি আমি ভিতরে ঢুকে বাগানের সব খবরাখবর জেনে নিই?

নেবেন, বলে তিনি প্রসন্ন মুখে মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন, বাগানে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। যতদিন খুশি থাকবেন, যা খুশি জানবেন।

বলেছিলাম, তবে যে শুনি বাগানের কুলি-কামিনদের ওপর অত্যাচার করাই সাহেব-সুবোদের পেশা।

সে তো একশ'বার। সে আর গোপন কথা কী। After all, we extract gold from blood. সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষ তাই করছে।

একটু থেমে বলেছিলেন, তবে কি জানেন যতটা শোনা যায় ততটা কিছুই এখন আর নেই। আমি স্বীকার করি অত্যাচার একদিন খুবই বেশি ছিল। তবে সেদিন বিগত হয়েছে। এখন উল্টে আমরাই তাদের ভয়ে-ভয়ে—অনেক সমঝে কাজে এগিয়ে থাকি।

লাভের ব্যবসা তো আছে।

ব্যবসা থাকলেই লাভের কথা আসে। তবে কিনা যুগের সংগে সংগে মালিক-দেরও পদ্ধতি-বদল করতে হয়। রকমফের আর কী। যে-যুগের যা ধর্ম। আমি তো ম্যানেজার মাত্র। মালিকদেরই এখন অন্যরকম চলবার নির্দেশ আছে।

সে-রাতে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারি নি মিঃ খাঁর সংগে। তার কিছু পরেই তিনি তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে ডুয়ার্সের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। হাতে সময় বেশি ছিল না বলে আফশোস করলেন। বললেন, সাংবাদিকদের আমার খুবই ভালো লাগে। জানেন, এ-ব্যাপারে আমার নিজেরই একটি সুগোপন ইতিহাস আছে। আমি সাংবাদিক হতে চেয়েছিলাম। Yes I cherished the idea from the very boyhood. বলতে বলতে তিনি ঘড়ি দেখছিলেন চকিতে। কথা আর বাড়ালেন না। মাঝখানেই থেমে বললেন, আচ্ছা চলি আমি। বাই-বাই।

সে-রাতের কথা আমার আজো মনে আছে। তিনি কথা থামিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তাঁর ঝকঝকে নতুন সাদা অ্যাম্বাসেডরখানা অপেক্ষা করছিল। হাওয়ায় শীত শীত আমেজ। শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের ওপর দিনের ব্যস্ততার স্রোত মন্দীভূত হয়ে আসছিল। গাড়িগুলি তখনও অল্প-অল্প পরিমাণে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছিল। কিছুক্ষণ আগেই একঝলক বৃষ্টি হয়ে গেছে। মৃদু ঝাপসা আলো-গুলি এধারে-ওধারে। ওদিকে একটা ইঞ্জিনের ঘস্‌ঘস্ শব্দ জংশন স্টেশনে। উত্তরের আকাশে তাকালে চোখে পড়ে এক-রাশ অন্ধকার নিয়ে দাঁড়ানো রাত্রির হিমা-লয়ের বুকে দূরবর্তী শৈলশহরের আলো।

তিনি চলে যেতে অনেকক্ষণ হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম সে-রাতে। তাঁর সোফার গাড়ির দরজা খুলল। তিনি উঠলেন। তারপর দরজা বন্ধ হল। মৃদু একটা শব্দ। স্টার্ট। তারপর একপলকে মিলিয়ে গেল গাড়িটা। গাড়ির পিছনে ছোট লাল পাথরচোখটা হারিয়ে গেল এক মুহূর্তে।

কাল রাত্রে হঠাৎ অতর্কিতে বাগানে এসে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, খবর দিয়ে আসি নি। আমার যাত্রাপর্বে কোনদিন থাকে না পূর্বনির্ধারিত কোনো প্রোগ্রাম। না কোন প্রস্তুতি।

শুনি দেব-দেবতাদের নাকি যা-কথা তাই ছিল কাজ। যা ভাবা সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিপালন। তবে দেবতাদের পক্ষে যা সম্ভব ছিল, একালের সামান্য মানব-সন্তানের পক্ষে তা অত সহজ হবে কেন? ধনবানদের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁরা ইচ্ছেমত অবশ্য যেখানে-সেখানে ফ্লাই করতে পারেন। জলে-স্থলে-আকাশে যেখানে খুশি। আকাশ-পথে বিমান। আর সুন্দরী বিমান-সেবিকাও। এয়ার হোস্টেস শব্দটি অবশ্য তার চাইতেও সুন্দর। জলপথে জাহাজ। মৃত্তিকাপথে দ্রুতগামী মোটর।

আদেশ-পালন করতে বার জুড়ি নেই।

প্রায় আটচল্লিশ মাইল পাড়ি দিয়ে এলাম বাস-সার্ভিসে। ডুয়ার্সে মোটামুটি-ভাবে বাস এখন সুলভ সামগ্রী। সব লাইনেই যাতায়াত করছে। মাঝে মধ্যে ট্যাক্সি-সার্ভিসও আছে। অবশ্য তত সুলভ নয়। এবং সেই সঙ্গে দ্রুতগামী যান হিসেবে ট্রেন। তবে ট্রেনের কিছু স্থিরতা নেই। ভারতবর্ষের ট্রেন-পথে মুষ্টিমেয় দুটি-একটি ছাড়া প্রায় সর্বত্রই এক দশা। এবং যার নাম দুর্দশা।

যাক সে-কথা।

মনে দুশ্চিন্তা ছিল। কি-জানি খাঁ সাহেব আছেন কি নেই। এক বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে তিনি বাগানের চাকরি ছেড়ে দিতেও পারেন।

তাছাড়া অন্য ভাবনাও ছিল। এই সব বড় মানুষদের মন-মেজাজের গতি সর্বদা সমান চলে না। এক বছর আগে এক শীতের রাতে ক্ষণিকের এক হোটেল-সঙ্গীকে কবে কি বলেছিলেন হয়তো মনে নাও থাকতে পারে। তিনি আমাকে না-ও চিনতে পারেন।

এবং না চিনতে পারলেই ভাবনা।

অবশ্য এই দুর্ভাবনাকে আমি আমল দিই নি।

ম্যানেজারের বাংলোয় গিয়ে একটি স্লিপ লিখে বেয়ারার হাতে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবারই কথা। স্লিপ দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই সাহেবরা নিচে নামেন না। অন্তত নামবার কথা নয়। এবং সে জন্যেই, হয়তো ভিজিটর-দের জন্য নানা পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থা আছে। দিশি নানারকমের কাগজ তো আছেই। উপরন্তু লন্ডন-নিউইয়র্ক-রাশিয়ার কাগজও আছে।

কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় নি। বে-লোকটি স্লিপ নিয়ে গিয়েছিল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় তক্ষুণি নিচে নামল। তার চোখ দুটিতে সমীহ করবার ভাব ফুটে উঠেছে।

মাথা হেলিয়ে সে নত হবার ভঙ্গি করল, আইয়ে জি।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ কিনা এই যে একেবারে সোজা-সুজি ওপরে নিয়ে যাবার আদেশ হয়েছে। বাগানের যে-বাঙালীবাবুটি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এতক্ষণ পরে যেন নতুন দৃষ্টিতে আমাকে অভ্যর্থনা করছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত যেন ছিল না অতটা আন্তরিক স্বীকৃতি। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা একটি অত্যন্ত সাধারণ বাঙালী সন্তান যে সাহেবের কাছে অতটা ঈপ্সিত হতে পারে, তা তাঁর পক্ষে বুঝে ওঠা স্বভাবতই ছিল কঠিন।

আমি তাঁকে বিদায় দিয়ে বললাম, আপনাকে ধন্যবাদ।

না, ধন্যবাদ আর কী স্যার। তিনি বিনয়ে কাচুমাচু হলেন, এ তো আমাদেরই কর্তব্য স্যার। আপনি আমাদের এখানে এলেন—

অতঃপর দোতলায় সাহেবের খাস-বাংলোর উদ্দেশ্যে ধীরে-ধীরে উত্থান। ঘোরানো সিঁড়িপথে। ঘুরে-ঘুরে। আমার পথ-প্রদর্শক আবলুস কাঠের মত গাত্রবর্ণ তার সেই বেয়ারা। দু' এক পা ওপরে উঠে-উঠেই সে আমাকে আহ্বান জানাচ্ছিল। দস্তুর মত হাঁপাচ্ছে।— আইয়ে আইয়ে জি।

ভিতরে অপেক্ষা করছিলেন মিঃ খাঁ।

আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে আমার হাতখানা ধরে প্রবল আবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেন, হাউ ডু য়ু ডু?

আমি হাসছিলাম। বললাম, দেখুন কথা রেখেছি কিনা। খুঁজে খুঁজে ঠিক এসে হাজির হয়ে গেছি।

তিনি আমাকে হাত ধরে টেনে সোফায় বসিয়ে নিচ্ছিলেন, নাম দেখেই আপনাকে চিনেছি কিনা। দেখুন চা-বাগানের ম্যানেজারদেরও স্মৃতিশক্তি বলে কিছু আছে তাহলে?

হো-হো করে দরাজ গলায় তিনি হেসে উঠেছিলেন।

পরো একদিনের বিরতি।

গেস্ট হাউস দেখে ভয় লাগছিল। শেষ পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে? আমাকে মানালে হয়! সম্পূর্ণ বিলেতি কেতায় সুসজ্জিত। পান থেকে চুনটি খসবার উপায় নেই।

সেই গেস্ট হাউসের বিছানায় বসেই মিঃ খাঁর জীবনের কাহিনী শুনেছিলাম। চা-বাগানের ম্যানেজারের জীবনেও যে এমন কাহিনী থাকতে পারে তা আগে কবে ভাবা গিয়েছিল।

তিনি নিজেই আমাকে তাঁর জীবনের সে-বিচিত্রকাহিনী পরিবেশন করেছিলেন। আমার পক্ষে তা পূর্ব থেকে অনুমান করাও দুঃসাধ্য ছিল। জানা থাকলেও আমি তাঁকে সে ব্যাপারে অনুরোধ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। সে হত ভয়ংকর রকমের অভদ্রতা।

এক জনশূন্য মধ্যাহ্ন বেলায় সেদিন দুজনে মুখোমুখি বসেছিলাম। বাইরে বড় বড় জানালায় চা-বাগানের থেমে-থাকা সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। সারি-সারি শেড্-গাছগুলি। অনেকটা দূরে দূরে কোয়ার্টার-গুলির সমান-সুন্দর সারি। কারখানা-বাড়ির মস্তবড় চাল। প্রান্তরে মধ্যাহ্ন রৌদ্র ঝলমল করছে। চালের ওপরে বড় বড় করে ইংরেজি অক্ষরে লেখা বাগানের নাম।

আমি তাঁকে বলেছিলাম, খানিক আগে গাড়ি করে আপনার বাগান দেখে এলাম। ভারি সুন্দর আপনার বাগান। একে-বারে ছবির মত।

কিন্তু সব কিছু ছবির মত নয়—আমার কথার মাঝখানেই তিনি হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠে-ছিলেন, আপনি অবশ্য দীর্ঘকাল আছেন ডুয়ার্সে। আপনার অজানা থাকবার কথা নয়।

আপনি এখানে দীর্ঘদিন আছেন—

আছি বলেই আছি। মিঃ খাঁ বললেন, দেখুন, আমাদের জীবনটাই এমনি মজা। সব সময় কি আমরা যেভাবে কল্পনা করি সেভাবেই সবটা ঘটে? আমাদের ওপরেও এক অন্ধ অনিয়ন্ত্রিত শক্তি থাকে, যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের অন্য পথে চালিয়ে দেয়, তাকেই বুঝি ভারতীয় দর্শন বলেছে blind fate. আমি অদৃষ্টবাদী মশায়।

অতঃপর তাঁর জীবনের একটি নেপথ্য পরিচ্ছেদের যবনিকা উত্তোলন।

সোনার চামচে মুখে নিয়ে জন্মান ঠিক কাকে বলে জানা যায় না। কতটা অর্থ-বিত্ত থাকা বোঝায় তার কোন চূড়ান্ত নির্দেশ নেই। বিত্তশালী পরিবারেরই সন্তান হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন মিঃ খাঁ।

একটু বড় হতে জীবনটাকে অন্য রকম কল্পনা করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই। সব ভাই-ই সমান কৃতী। বড়-মেজ দুজনেই ইংরেজ সরকারের বড় কর্মচারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সেজ থাকতেন দিল্লীতে। বড়ভাই ছিলেন এক দেশীয় রাজ্যে। তৃতীয় ভাই আর্মিতে কমিশনড অফিসার। চতুর্থ ভাই ছিলেন দক্ষিণ ভারতে রেলের এক মেডিক্যাল অফিসার।

কিন্তু সব দাদারাই ছিলেন স্ব-স্ব স্বীয় এক্তিয়ারে। সংসারের প্রাচীন বট-

দুকে বলতে তখনও ছিলেন বাবা। কিন্তু বাবারও আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছিল না বলে তিনি স্বাধীনভাবে নিজের বাড়িতে পুনোতেই থাকতেন।

একমাত্র মেজভাই ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটু আলাদা।

ইউনিভার্সিটির সবগুলি পরীক্ষা পাশ দিয়ে মেজদার কাছেই এসেছিলেন তিনি দিল্লীতে।

ভালো টেনিস খেলতেন। অ্যাথলেট্ হিসেবে সে আমলে তাঁর জুড়ি ছিল না। ফলে দাদার জন্যে যতটা নয়, তার চাইতেও বেশি নাম কুড়িয়েছিলেন। সবাই চিনে ফেলেছিল তাঁকে। দিল্লীর সব টেনিস খেলোয়াড়দের কাছেই ছিলেন তিনি সমান প্রিয়পাত্র। সবাই তাঁকে ভালোবাসত। প্রশংসা করত। পরিচয় রাখত। এখনো স্টেটসম্যানের পুরনো কাগজগুলির স্তূপ ঘাটলে তাঁর সম্পর্কে ঝুড়িঝুড়ি প্রশংসা খুঁজে পাওয়া যাবে।

দিন ছিল না। রাত ছিল না। খেলা শুধু খেলা।

এ-ব্যাপারে মেজদার প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না। মেজবৌদিও ভালোবাসতেন তাঁকে। এমন একটি দেওরকে কে না ভালোবেসে থাকতে পারে। কিন্তু খাঁ-কে নিয়ে চিন্তাও ছিল বৌদির। শুধু খেলা নিয়েই কি জীবনটা যাবে? বিয়ে-থা করে ঘরসংসারী কি হতে হবে না? সেটা আর কবে? তার জন্যেও তো ভালো একটা চাকরি-বাকরি চাই।

অন্তত এখনো তো উঠতি বয়স আছে, নামডাক আছে। এইবেলা একটা ভালো চাকরি বাগিয়ে নেওয়া একান্ত দরকার।

তাছাড়া সারা দেশময় একটা পরিবর্তন আসছে। ভারতবর্ষ তখনো অবশ্য স্বাধীন হয় নি। যুদ্ধের শেষ হয় নি বলে অবশ্য একটা আতংক আছে। আগস্ট আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন গান্ধীজী। দেশময় উত্তেজনা। এই ডামাডোলের মধ্যে কখন কি ঘটে বলা যায় না।

তাই সময় মত চাকরিটা গুছিয়ে নেওয়া একান্ত দরকার। মেজদাকে তিনি প্রায়ই এ ব্যাপারে খোঁচাখুঁচি করতেন। তাঁকেও বলতেন, খেলা নিয়ে থাকলেই চলবে নাকি? যাই হোক, এভাবেই চলে গেল দিন। যেমন যায় অগোচরে।

তারপর একদিন এল স্বাধীনতা।

ততদিনে বয়স অনেক এগিয়ে গিয়েছে। এবং ইতিমধ্যে নতুন এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে জীবনে। মার্কিনী এক তরুণী মিস হেলেনের সঙ্গে প্রেম। বড় চাকরি করত মিস হেলেন। অর্থের অভাব ছিল না। মেজবৌদি তখন চুপ করেছেন। চাকরি-বাকরির কথা আর বলেন না। অভিমান।

এতদিন ছিল খেলা। এইবার এলো তার সংগে নতুন খেয়াল। এবং আনন্দ। সময়গুলি যেন ফুলের পাপড়ির মত উড়তে লাগল। স্বপ্নের উচ্ছ্বাসে। শুধু অকারণ পুলকে। দিন নেই রাত্রি নেই। এমন কি যে-খেলা ছিল জীবনের সবচাইতে প্রিয় সামগ্রী, তাতেও এল অবহেলা। প্রেম অন্ধ, তাবৎ জ্ঞানীরাই বলেছেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হয়তো এই যে, প্রেম পারিপার্শ্বিক জগৎ পরিবেশ সমাজ-সংসার সম্পর্কেও প্রেমিক-যুগলকে অন্ধ করে দেয়। মিস হেলেনের তনুভরা ছিল সটান স্বাস্থ্য ও সতেজ যৌবন। আর তার চোখে ছিল অ্যাটলান্টিকের নিবিড় নীল। সেই মেঘমালার দিকে চেয়ে উদাস হলেন মিঃ খাঁ। জগৎ-জীবন ভুললেন।

মদের নেশা কোনদিন ছিল না। বন্ধুদের অনুরোধেও কোনদিন একপাত্র পান করেন নি। মিস হেলেন এলেন যৌবনের দূতী হয়ে। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁর হাতে অমৃত ও বিষ দুই-ই ছিল। প্রেমের সমুদ্রমন্থনে মিঃ খাঁর জীবনে যে এল সেই সাকী, হাতে নিয়ে এল সুরা।

আল্পসের দ্রাক্ষাকুঞ্জে বসে একটি একটি করে সেরা দ্রাক্ষাচয়নে যে অমৃতের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সেরা পান চলতে লাগল খাঁ-র জীবনে। মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা আদমের মূর্তি যেন তিনি। শক্ত-পেশল, বলিষ্ঠ গড়নের যুবক। তাই ইভের আবির্ভাবকে কে করবে নিয়ন্ত্রণ। প্রেম জীবনকে দেয় রমণীয়তা, মদ সেই রমণীয়তাকে দেয় ঈপ্সিত উন্মাদনা। দেয় শিরায়-শিরায় চমক। বাস্তবকে ভোলায়, যৌবন-বেদনাকে করে মদির। সুখস্বপ্নকে করে বিহ্বল। কে এই মদের প্রথম নির্মাণ-কর্তা? যৌবনের দেবতা বলে কেউ যদি থেকে থাকেন তো তিনিই, তিনিই। আর কেউ নন।

সেই সব মধুর মুহূর্তগুলিতে যেন পৃথিবীকে পিছনে ফেলে অনেক দূর চলে যাওয়া। নীলনয়নার নয়নে-নয়নে। অ্যাম্বেসীর কতটুকুই বা কাজ। সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসরের মধুকুঞ্জ রচনা। অর্থের অভাব ছিল না। বাবাই পাঠাতেন। তাছাড়া হেলেনেরও ছিল না অর্থের অভাব। সপ্তাহের ছ'টি দিন চলে যাচ্ছিল দিল্লীর হোটেলে-হোটেলের খানা-পিনায়, নৃত্যে-গীতে, হাস্যে-লাস্যে। বারে-ক্লাবে সোফা-কোচে শয্যায় উপাধানে কোথাও ছিল না কোন বাধা।

মেজদার ছিল তিনটি গাড়ি। একটি আগলাতো সে একাই। হেলেনেরও ছিল গাড়ি। প্রেমে ওড়া বলে একটি কথা আছে বটে। কিন্তু সে নিতান্তই ফাঁকা। ডানা থাকলে তা মিটানো যেতো বটে, কিন্তু তার অভাব মেটাবার জন্যে চাই গাড়ি, বুকে গাড়ি দেয় পাঞ্জাব মেল। অতএব আজ এখানে কাল ওখানে। কোনদিন বা তুঘলকাবাদের পথে দুজনে পাশাপাশি।

হাউ সুইট্! হাউ সুইট্ ইউ ডীয়ার ডার্লিং!

মাই লাভ! মাই লেডি লাভ।

কখনো আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ। কখনো নীরব শত শত নক্ষত্রের আহ্বান। আজ দিল্লী, কাল কাশ্মীরের হ্রদতীরবর্তী স্বপ্নকুঞ্জ। পরশু বোম্বের সমুদ্রতীর।

এবং অবশেষে—

না, গাড়ির চাকা পাংচার্ড হয়ে নয়, একেবারেই থামা। চিরকালের জন্য থামা। প্রেমে পতন। উত্থান যখন আছে পতনও থাকবেই। মার্কিনী ধনীকন্যার বৈচিত্র্যের জন্য চটকা ভাঙার দরকার ছিল। চিরকাল চলতে পারে না একই ছন্দে! নতুনত্ব চাই। চাই অপ্রত্যাশিতের চমক। একটি পুরুষের দীর্ঘ বাহুবন্দীত্বে নেই কোন মাদকতা। অতএব সেটা ত্যাগ করার নামই সভ্যতা।

কেমন যেন নেশাভাঙার মত লাগল। জড়তা। ঔদাস্য। অভ্যস্ত লালিত্য কেটে গেলে যেমন বেসুরো বাজে। কতকটা তাই। ততদিনে হাতের পেশীগুলি হয়েছে দুর্বল। র‍্যাকেটে আর হাত ওঠে না। খবরের কাগজে আর নাম ওঠে না। নেই ফ্যানদের দল।

কিন্তু ভাঙা বুক আর প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের জন্য আর কেউ না থাকুক, একটি বিশ্বস্ত বন্ধু থাকে—সে মদ।

কিন্তু তাই বা জোটে কোত্থেকে! মিস হেলেন ততদিনে দ্রুতগামী জেট্-এ ফিরে গেছেন তাঁর স্বদেশে। সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে দামী স্কচ-হুইস্কির নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রুতি। বয়স বেড়েছে। মেজদা-মেজবৌদি অবশ্য আছেন। অন্য দাদারাও। শুধু বাবা বিগত। চাকরি একটা জুটলেও জুটতে পারত। ততদিনে বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতের বাজার দ্রুত ছেয়ে ফেলছে। মেজদার প্রতিপত্তি ছিল তখনো।

কিন্ত না। বিদেশিনীদের হাত থেকে অন্তত পরিত্রাণ দরকার। দরকার নিরাপদ দূরত্বের।

অতঃপর ডুয়ার্সের চা-বাগান। নবযুগের ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বহু দূরে। অরণ্যের অন্ধকারে। প্রথমে এসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়ে। পরে ম্যানেজার। বিশ বছর চলে গেছে ইতিমধ্যে। জানি না ডুয়ার্সের জলবায়ুতে ভাঙা বুক জোড়া লাগে কিনা। কিন্ত তিনি আছেন এখনো। বসন্তের আগমনে ঝরে ঝরে পড়ে শুকনো জীর্ণ পাতা। শ্যাম্পু-করা চুল নিয়ে খেলা করে এক-আধ ঝলক। তারপর ফিরে যায় হাওয়া। অন্য মনে। [ক্রমশ]

মরিস মেতারলিঙ্ক (১৮৬২-১৯৪৯) জাতে বেলজিয়ান, কাব্য এবং নাট্য-রচনায় একসময় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাংকেতিক নাট্যকার হিসাবে আজও ইওরোপে মেতারলিংকের জুড়ি মেলে না।

মেতারলিঙ্ক এবং পল ক্লডেল (১৯৬৮—ইনি জাতে ফরাসী) দুজনেই সাংকেতিক নাট্যকার। এ'রা দুজনেই স্বীকার করেছেন যে, নাট্যের ক্ষেত্রে ফরাসী নাট্যকার কাউণ্ট ভিলিয়ের দ্য লিল আদাম (১৮৩৮-৮৯) এঁদের গুরু। কাউণ্ট আদাম পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান—তাঁর মাস্টারপিস্ নাটক "এক্সেল" তাঁর মৃত্যুর এক বছর বাদে প্রকাশিত হয়। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৮৯৪ সালে—এটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 'বাইবেল অভ্ সিম্বলিজম' এই আখ্যা দ্বারা অভিহিত হতে থাকে। আদাম ছিলেন ভাগনারের বন্ধু এবং বিশেষ ভক্ত—তাছাড়া ওপেরা এবং সিম্বলিস্টিক ড্রামার যোগসূত্রের প্রবর্তনও করেছিলেন তিনিই। মেতারলিঙ্ক এবং তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্য নাট্যকারও—যেমন হফ্সমানথ্যাল—ওপেরা লিব্রেটি শ্রেণীর নাটক রচনা করে গেছেন।

মেতারলিঙ্ক তাঁর বাবার আদেশে বাধ্য হয়ে আইন অধ্যয়ন করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ঘেণ্টের আদালত-গুলোতে বেশ কয়েকটি কেসে হেরে গিয়ে তিনি আত্মীয়স্বজনকে বুঝিয়েছিলেন যে, আইনজ্ঞ হিসাবে জীবিকার্জন করা তাঁর পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এর অনেক আগে থেকেই মেতারলিঙ্ক কাব্য এবং গদ্য-কবিতা রচনা করছিলেন। তাঁর স্কুলের বন্ধুরা মিলে—এর ভেতর তিনিও ছিলেন—একটি তরুণ বেলজিয়ান কবিগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিলেন—এ'দের ওপর বিশেষ প্রভাব ছিল ফ্রেঞ্চ সিম্বলিস্টদের। শোনা যায় যে, একটি আস্তাবলকে ছাপা-খানায় রূপান্তরিত করেছিলেন এই কবির দল—এখানে একটি হাতে ছাপার মুদ্রাযন্ত্র আনা হয়েছিল। মেতারলিঙ্ক এবং তাঁর একজন বন্ধু এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাঁর প্রথম নাটক 'দি প্রিন্সেস ম্যালেইনের' প্রথম সংস্করণ পঁচিশ কপি ছেপে প্রকাশ করেন। বিখ্যাত সমা-লোচক মিরাব্যো এই নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তাঁর একটি প্রবন্ধে—ফলে মেতারলিঙ্ক রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। সাংকেতিক নাটকের জন্ম-ইতিহাসের এই হল আদিপর্ব।

মেতারলিংক তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন : "ট্র্যাজেডিয়ানরা জীবনের উদ্দাম এবং আদিম প্রবৃত্তিগুলো সম্পর্কেই সচেতন আর সেই কারণেই আমাদের থিয়েটারে নাট্যকলার সঙ্গে জীবনের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। থিয়েটারে ট্র্যাজেডী দেখতে বসলেই আমার মনে হয় আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা মঞ্চের ওপরে এসে অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং নীরসভাবে কথা বলছেন—জীবন সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব অত্যন্ত পাশবিক ধরণের। ট্র্যাজেডীতে কি দেখানো হয়? দেখানো হয় প্রতা-রিত স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করলো, নারী তার প্রেমিককে বিষ দিয়ে মেরে ফেললো, ছেলে বাপের হত্যার প্রতি-শোধ নিল। বাপ ছেলেদের বঞ্চিত করে নিজের স্বার্থসাধন করলো, ছেলেরা বাপকে হত্যা করলো। রাজাদের হত্যা-কাহিনী, যুবতীদের সতীত্বহানি, সাধু ব্যক্তিদের চক্রান্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা এই সব বিষয়বস্তুকেই চিরাচরিত রীতি অনুসারে ট্র্যাজেডীর বিষয়বস্তু করা হয়েছে। অবশ্য রচনাকৌশলে বিষয়বস্তুকে মহীয়ান করে তুলেছেন নাট্যকারেরা। কিন্তু এই মাহাত্ম্যের ভেতর কোন গভীরত্ব নেই—এর ভেতর স্থূল জড়বাদেরই প্রাধান্য। এতে আছে প্রচুর রক্তপাত, অশ্রুবর্ষণ এবং মৃত্যু।"

এই চিরাচরিত রীতির ট্র্যাজেডীর বদলে মেতারলিঙ্ক আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন প্রাত্যহিক জীবনের সত্যিকার ট্র্যাজেডী, যার গভীরত্ব এবং স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ বাস্তবজীবনের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। 'হৈ-হুল্লোড়' জিনিষটা ভয়াবহ নয়, 'নিস্তব্ধতাই' বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারে সব থেকে বেশি কার্যকরীভাবে। মেতারলিঙ্কের 'দি সাইট্লেস', 'দি ইন-ট্রুডার', 'দি ইণ্টিরিওর' প্রভৃতি নাটক পড়লেই এ কথার সারমর্ম বোঝা যায়।

মেতারলিঙ্ক লিখেছেন—"এ-ক-জ-ন প্রতীক্ষারত; তিনি শুনছেন, নিজে অজান্তে মনের গভীরে—আদি-অনন্ত দৈবিক বিধিবিধানপ্রসূত ঘটনাবলী কাহিনী। না বুঝেই এ সবের ভাষ করবার প্রচেষ্টা করছেন মনে মনে নিস্তব্ধ এবং জড় বস্তুসমূহ, যেমন দরজা-জানলা, অথবা আলোর শিখা কণ্ঠস্বর যেন তাঁর অন্তরাত্মার ওপর তাঁর ভবিতব্যের ওপর স্ব স্ব প্রভাব বিস্তারে রত।

আমার তো মনে হয় এই শান্তি উপবিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেক বেশি গভীরভাবে নিজের জীবনকে জেনেছে এবং তাঁর মানবিক সত্তা অনেক বেশি পরিস্ফুট—এ'র সঙ্গে তুলনায় প্রেমিক তার প্রেমিককে দম বন্ধ করে হত্যা করে, যে সেনাপতি বিজয় বৈজয়ন্তীর ধ্বজা উড়িয়ে আসে, বা স্বামী তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত—এদের জীবন আমার অপেক্ষাকৃত অবাস্তব এবং নিকৃষ্ট বলেই মনে হয়।

এখানে বোধ হয় মেতারলিঙ্ক এলিজাবীথান ট্র্যাজেডীর "ব্লাড এ্যান্ড থাণ্ডারের মেলোড্রামাটিক সাহিত্যিক বিস্ফোরণের দিকগুলোর প্রতিই ইঙ্গিত করছেন।

মেতারলিঙ্ক সাধারণ নাটক দু-চারটে লিখেছেন বটে, তবে তাঁর বেশির ভাগ নাটকই সংকেতধর্মী। অর্থাৎ এই সব রচনায় নানা ধরণের ইঙ্গিত ইসারা, আভাস এবং ব্যঞ্জনার লক্ষ আমরা দেখতে পাই। আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় নাটকে যে সব তত্ত্ব, তথ্য, সত্য বা সৌন্দর্য দেখে আমরা মোহিত হই তাছাড়াও আরো গভীরতর, নিবিড়তর চরম এবং পরম সত্য এবং সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে ভেতরে অন্তর্নিহিত ভাবে। ক্রমাগত নিবিষ্টভাবে পড়তে পড়তে আমাদের স্থূল দৃষ্টির আবরণ অপসারিত হয় এবং ক্রমাগত নতুন নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে আমরা বিস্মিত চকিত এবং মুগ্ধ হয়ে যাই।

কার্লাইল বলেছেন : "স্পীচ্ ইজ অভ্ টাইম—সাইলেন্স ইজ্ অভ্ ইটার্নিটি।" এই উক্তিটির সারমর্ম উপলব্ধি করা যায় মেতারলিঙ্কের সাংকেতিক নাটকগুলো পড়বার সময়।

জীবন ছন্দোময়—বস্তুজগতে, ভাব রাজ্যে, প্রকৃতির ভেতর আমরা সব সময় ছন্দের নৃত্য (রিদ্মিক ডান্স) দেখতে পাই। একে ঠিক কবির উদ্ভট কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখন কি জড়বস্তুর বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকেরাও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক বস্তুকেই শেষ পর্যন্ত প্রোটোন এবং ইলেকট্রোন বা পজিটিভ এবং নেগেটিভ

প্রজেস অভ্ ইলেকট্রিসিটিতে ভাগ করা যায়। এরাও আবার স্থাণু নয়—এরাও নৃত্যময় এবং ছন্দোপূর্ণ। সাহিত্যিক বা শিল্পীর কাজ হল এই ছন্দকে তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করা। ছন্দের দ্বারাই স্রষ্টা তাঁর নিগূঢ় চিন্তা এবং অনুভূতিকে একটা রূপ এবং আকার দিতে সমর্থ হন। কত ভাব, কত সত্য, কত উপলব্ধিভূত সৌন্দর্য শিল্পীর মনে উদিত হয়ে, আবার মিলিয়ে যায়। এগুলোকে দীর্ঘসূত্রী না করতে পারলে, অর্থাৎ খানিকটা স্থায়িত্ব না দিতে পারলে সৃষ্টির সার্থকতা আসে না—এইখানেই ছন্দের আবশ্যকতা। কবি বা শিল্পী বা সৌন্দর্যস্রষ্টা যখন ছন্দের বন্ধনের সাহায্যে অনুভূতিলব্ধ ভাবরাশিকে রূপ দিতে ব্যাপৃত থাকেন, অর্থাৎ স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করবার মাহেন্দ্রক্ষণে সমাগত, সেই সময় তাঁর মানসিক অবস্থা একটা অদ্ভুত অবস্থায় থাকে। এই সৃষ্টির পরমক্ষণে তিনি একই সঙ্গে নিদ্রিত এবং জাগ্রত, চেতন এবং অচেতন, সুপ্ত এবং সচকিত। ছন্দের বাহ্যিক সমন্বয়তাই এই নিদ্রা, অচেতনতা বা সুপ্তির দিকে শিল্পীকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। আবার ছন্দের ভেতর অন্তর্নিহিত-ভাবে যে অনুরণন এবং বৈচিত্র্য আছে, তাই তাঁকে জাগ্রত, সচেতন এবং সচকিত করে রাখে। এই না-জাগ্রত এবং না-নিদ্রিত অবস্থার মধ্যে দিয়েই শিল্পিমন একটা অবচেতনতার স্তরে উপনীত হয়। এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, এই অবস্থায় স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়—ইচ্ছাশক্তির পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে শিল্পিমন নিজেকে ব্যাপ্ত, বিকশিত, প্রকাশিত এবং রূপায়িত করে নানা ধরণের প্রতীকের মাধ্যমে। মেতারলিঙ্কের নাটকের সামগ্রিক রস উপভোগ করতে হলে এ সব কথা মনে রাখা দরকার।

মেতারলিঙ্কের জী ব ন দ র্শ নে র সুন্দর আভাস পাওয়া যায় তাঁরই লেখা এ্যানাইহিলেশন প্রবন্ধটি থেকে। এ প্রবন্ধের কিছুটা অংশ আমি এখানে তুলে দিচ্ছি :

Total annihilation is impossible. We are the prisoners of an infinity without outlet. Wherein nothing perishes, wherein everything is dispersed but nothing lost. Neither a body nor a thought can drop out of the universe, out of time and space. Not an atom of our flesh, not a quiver of our nerves will go

'জয়জেল' নাটকের একটি দৃশ্যে মেতারলিঙ্ক

where they will cease to be, for there is no place where anything ceases to be. The brightness of a star extinguished millions of years ago still wanders in the ether where our eyes will perhaps behold it this very night, pursuing its endless road. It is the same with all that we see, as with all that we do not see. To be able to do away with a thing, that is to say, to fling it into nothingness, nothingness would have to exist; and, if it exists, under whatever form, it is no longer nothingness. As soon as we try to analyse it, to define it, or to understand it, thoughts and expressions fail us, or create that which they are struggling to deny. It is as contrary to the nature of our reason and probably of all imaginable reason to conceive nothingness as to conceive limits to infinity. Nothingness, besides, is but a negative infinity, a sort of infinity of darkness opposed to that which our intelligence strives to illumine, or rather it is but a child-name or nick-name which our mind has bestowed upon that which it has not attempted to embrace, for we call nothingness all that escapes our senses or our reason and exists without our knowledge.

এবার মেতারলিঙ্কের কয়েকটি নাটক নিয়ে আলোচনা করবো এবং পরিশেষে তাঁর বিখ্যাত 'দি ইন্‌টিরিওর' নাটকটির বঙ্গানুবাদ আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেব :

(১) দি প্রিন্সেস ম্যা লে ই ন (১৮৮৯) : গ্রিম্‌স্ ফেয়ারী টেইল্‌সের একটি গল্পের ওপর ভিত্তি করে রচিত। কেউ কেউ এ নাটকের সঙ্গে হ্যামলেটের অনেক দিক থেকে মিল দেখতে পান। রাণী গারট্রুডের মত এ-নাটকেও আছেন রাণী এ্যান। ইনি জাটল্যান্ডের সিংহাসনচ্যুতা রাণী—ই য়ে সে ল ম ণ্ডে রাজা হায়ালমারের রাজসভায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। বৃদ্ধ রাজা হায়ালমার তাঁর হাতের পুতুলের মত হয়ে পড়েছেন। এ্যান যুবরাজ হায়ালমারকেও ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় আছেন। রাজা মার্সেলাসের মেয়ে রাজকুমারী ম্যালেইনের সঙ্গে যুবরাজ হায়ালমারের বিয়ে ঠিক হয়েছে। এই বিয়ের ভোজসভায় বৈবাহিক দুই রাজায় বাধলো গণ্ডগোল এবং যুদ্ধ। রাজা হায়ালমার রাজা মার্সেলাসকে বধ করে তাঁর রাজ্য ধ্বংস করে ফেললেন। যুদ্ধ শুরু হবার আগে রাজকুমারী ম্যালেইন যুবরাজ হায়ালমারকে ভুলে যেতে অস্বীকার করায় তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর ধাত্রীর সঙ্গে একটি ঘরে আটকে রাখেন। দেওয়ালের পাথর আলগা করে এঁরা মুক্ত হন এবং ইয়েসেলমণ্ডের প্রাসাদে চলে আসেন। ম্যালেইন আত্মপরিচয় গোপন রেখে এ্যানের মেয়ে রাজকন্যা উগলেনের পরিচারিকার পদ গ্রহণ করেন। উগলেনের সঙ্গে কুমার হায়ালমারের বিয়ে প্রায় স্থির, এমন সময় কুমারের কাছে ম্যালেইন নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। কুমার বাবার কাছে সব কথা বলেন এবং আবার তাঁর ম্যালেইনের সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকঠাক করা হয়। রাণী এ্যান বাইরে ম্যালেইনের সঙ্গে ভাব দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করে ফাঁস দিয়ে দম বন্ধ করে তারপর

ম্যালেইনকে মেরে ফেলা হয়। যুবরাজ হায়ালমার ম্যালেইনের মৃতদেহ দেখে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এ্যানকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে নিজেও আত্মঘাতী হন।

এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় যা তারা বলছে তা ছাড়াও অনেক কথা তাদের বলবার আছে—অর্থাৎ মনের নানা ভাবকে তারা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তবুও অকথিত সব বাণী নৈঃশব্দের ভেতর দিয়েই মূর্ত হচ্ছে। প্রকৃতির বুকে এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও সব কিছুই যেন রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। মানুষ ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক মাত্র—এই কথাই যেন নাট্যকার বোঝাতে চাইছেন। নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করে কোন ফলই পাওয়া যায় না। ম্যালেইন মানবাত্মার প্রতীক—ক্রুর নিয়তির পদদলিত, অবহেলিত শিকার মাত্র। রাজা ও যুবরাজ হায়ালমারও নিয়তির ওপর নির্ভরশীল দুর্বল জীব। এ্যানরূপ অস্ত্রের প্রয়োগের দ্বারাই বার বার নিয়তি পুতুলমানুষদের জীবনে সর্বনাশ ঘটিয়ে থাকে। মানুষ দুর্বল, অসহায় এবং অসমর্থ—নিজের দ্বারা সে পরিচালিত নয়—বাইরের এক অজানা রহস্যময় শক্তিই তাকে পরিচালিত করছে সমস্ত জীবন ধরে ... there is no retribution and no reward ... there is only FATE.

(২) দি সাইটলেস বা দৃষ্টিহীন : এ নাটকটি মেতারলিঙ্ক লিখেছিলেন ১৮৯০ সালে। মৃত্যুর রহস্য নাটকটির একটি প্রতিপাদ্য বিষয় সন্দেহ নেই, তবে জীবন-রহস্য এবং জীবনধারার বৈচিত্র্য ও নানা অভিজ্ঞতার ব্যাপারগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের পার্থিব জীবন যেন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মতই অনিশ্চয়তা এবং অজ্ঞানতার আবরণে ঢাকা।

স্থান—উত্তর দেশের এক বনানী—ওপরে চন্দ্রাতপের মত বিরাজ করছে গ্রহ-নক্ষত্রে খচিত আকাশ। বনের ভেতর বসে আছেন এক বৃদ্ধ ধর্মযাজক—কালো আবরণে তাঁর সর্বাংগ আবৃত। একটা বিরাট শুকনো গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে তিনি বসে আছেন। তাঁর মুখ রক্তশূন্য এবং মোমের মত সাদা—নীল ঠোঁটদুটি আধখোলা—নানা দুঃসহ বেদনাভারে তাঁর চোখ ফেটে রক্ত ঝরবার উপক্রম হয়েছে। চোখের তারা দুটি নিস্পন্দ ও নিথর—দৃশ্যজগৎকে দেখবার শক্তি আর তাদের নেই। সাদা চুল মুখের ওপর পড়ে যেন যাজকের ক্লান্তি এবং অবসন্নতার ভাবটাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। চারদিকে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে—এতে যেন পরিবেশটা বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। যাজকের হাত দুটি হাঁটুর ওপর যুক্তভাবে রয়েছে। তাঁর ডানদিকে ছ'জন অন্ধ পুরুষ বসে আছে—আর বাঁদিকে আছে ছ'জন অন্ধ নারী। এদের মধ্যে তিনজন ক্রমাগত প্রার্থনা করছে এবং কাঁদছে। চতুর্থ নারীর বেশ বয়স হয়েছে। পঞ্চম নারী বাতুল এবং বৃদ্ধা। তার কোলে একটি নিদ্রিত শিশু। ষষ্ঠটি যুবতী এবং সুন্দরী। এরা সবাই কার আসবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছে।

এই সব অন্ধের দল মনে করছে তাদের যাজক ঐখানে তাদের মাঝে উপস্থিত নেই—তাই তারা তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। যাজক সম্বন্ধে তাদের মনে যে সব ধারণা হচ্ছে, তাদের কথাবার্তায় তা প্রকাশ পাচ্ছে—

"উনি বড় বেশি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন!"

"সম্প্রতি বোধহয় ওঁর দৃষ্টিশক্তি বিশেষ ভাল নেই!"

"বোধ হয় যাজক পথ হারিয়ে ফেলেছেন এবং এতক্ষণ ধরে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন!"

অনেকক্ষণ অবধি হেঁটে তারা এখানে পৌঁছেছে—সুতরাং আশ্রয়স্থল থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

যাজক আজকাল শুধু নারীদের সংগেই কথাবার্তা বলেন—তাই ওরাই বলতে পারবে তিনি কোথায় গেছেন।

কিন্তু নারীরাও সে কথা জানে না। যাজক শুধু তাদের জানিয়েছেন যে, শীতের আগে শেষবারের মত দ্বীপটিকে দেখে নেবেন।

ঝড়ে নদীতে বন্যার সৃষ্টি করায় এবং ডাইকগুলো ভেঙে যাবার উপক্রম হওয়ায় যাজক বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। "উনি তবে সমুদ্রের দিকেই গেছেন!"

"সমুদ্র নিশ্চয় এখান থেকে খুব কাছে!" নিজেরা স্তব্ধ হয়ে থাকলেই পাথরের ওপর ঢেউয়ের আছড়ানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে!

এরা নিজেরা এখন কোথায় রয়েছে তাও কেউ বুঝতে পারছে না। কতকাল আগে তারা এই দ্বীপে এসে হাজির হয়েছিল। কেউই এ দ্বীপের মানুষ নয়—সবাই সমুদ্রপারের দেশ থেকে এসেছে। সবাই অন্ধ অবস্থায় এসেছিল। এবার তাদের আশ্রমস্থলের ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল—বারটি ঘণ্টা—কিন্তু অন্ধের দল বুঝতে পারছে না এটা দ্বিপ্রহরের, না মধ্যরাত্রির ঘণ্টাধ্বনি।

সামান্য শব্দেই অন্ধের দল চ[…] এবং সচকিত হয়ে উঠছে। হঠাৎ ক[…] আরম্ভ হল—সমুদ্রের গর্জন খুব কা[…] থেকেই শোনা যাচ্ছে—মনে হচ্ছে এখুনি এসে তাদের সবাইকে গ্রাস করবে। তার[…] এবার এখান থেকে সরে যাবার জন[…] তৈরি হতে লাগল। এইবার শুকনে[…] পাতার ওপর দিয়ে কেউ হেঁটে আসছে[…] মনে হল। এ শব্দ তাদের আশ্রয়স্থলে[…] বড় কুকুরটির পায়ের শব্দ। একজ[…] অন্ধের হাঁটুর ওপর কুকুরটি সামনে[…] পায়ের থাবাগুলো রাখলো। কুকুরটি তার জামায় টান দিতে অন্ধ লোকটি তার অনুসরণ করে নিস্তব্ধ, স্থা[…] যাজকের সামনে এসে দাঁড়ালো এব[…] তাঁর তুহিন-শীতল মুখে হাত দিয়ে অনুভব করলো যে, যাজকের মৃ[…] হয়েছে। কুকুরটি মৃতদেহের কাছ থেকে সরে যেতে রাজী নয়। শুকনো পাতা গুলো এবং ঘূর্ণি হাওয়ায় গোলাকারে ঘুরতে লাগল। বরফ পড়তে শু[…] হল। অন্ধের দলের মনে হতে লাগ[…] যেন তারা পদধ্বনি শুনছে। পদধ্বনি যেন তাদের মাঝে এসে থামল।

এটি সম্পূর্ণ সাংকেতিক নাটক[…] ধর্মযাজক রিলিজিয়ানের প্রতীক[…] মানবজীবনে বর্তমান যুগে ধর্ম মৃ[…] প্রায়। কিন্তু ধর্মই একদিন মানুষকে পরিচালিত করতো—মানুষের প[…] প্রদর্শকের কাজ করতো। চালকে[…] অভাবে আজ আমরা অন্ধকারে প[…] খুঁজে পাই না। যে সীমাবদ্ধ জ[…] জীবনের মাঝে আমরা নিজেদে[…] সীমাবদ্ধ করে রেখেছি, অসীম সাগরের বারিরাশি তার তটরেখা অতিক্রম ক[…] এসে সব কিছুকে সিক্ত করে দিচ্ছে যে সব মানুষের মন শান্ত, স্ত[…] এবং সমাহিত অবস্থার মধ্যে নীত হয়[…] তারাই অসীমের কলরোল শুনতে প[…] এবং শুনে ত্রস্ত, বিস্মিত এবং ক্ষ[…] ক্ষণে চকিত হয়ে ওঠে।

এ নাটকের একজায়গায় আছে [...] অরণ্যের গাছপালাকে ছাড়িয়ে উঠে[…] একটি লাইট হাউসের শিরোদেশ। এ[…] লাইট হাউস জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা—অর্থাৎ অন্ধে[…] দল—আমাদের আশ্রয়স্থল ত্যাগ ক[…] দূরে সরে এসেছি। এখানে আশ্রয়স্থ[…] বলতে সেই মংগলময় অতীতকে বোঝাচ্ছে, যখন ধর্মের নির্দেশে মানুষের জীবনধারা পরিচালিত হোত[…] এদের দলে একমাত্র শিশুটিরই দৃ[…] শক্তি আছে—কিন্তু সে এখনও ক[…] বলতে পারে না। এর দ্বারা ম[…] ভবিষ্যতের কথাই ইংগিতে বোঝানো হচ্ছে।

[ক্রম-

# রূপজগৎ

## চলচ্চিত্র উৎসবের তাৎপর্য

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে অনেকে উৎসবের মর্যাদা না দিয়ে তামাসা বলতে চাইছেন। তামাসা বলার কারণ এই যে, উৎসবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের তেমন লাভ হয় নি। চলচ্চিত্র উৎসবের একটা লক্ষ্য থাকে নিজের দেশের চলচ্চিত্রের মানোন্নয়নে সহায়তা করা। দেশ-বিদেশের ভাল ভাল ছবি দেখে দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রেরণা পাবেন, কলাকুশলীরা নতুন জ্ঞান অর্জন করবেন, দর্শকরা নতুন দৃষ্টিলাভ করবেন, ভাল ছবির সমজদার হবেন ইত্যাদি। উৎসবের অন্য একটি লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে সখ্যতা সৃষ্টি এবং নিজের দেশকে পরিচিত করা। তৃতীয় লক্ষ্য থাকে ব্যবসায়িক। উৎসবকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের ছবির বেচাকেনা হয়। আমরা যেমন অন্য দেশের ছবি কিনব, অন্য দেশগুলিকেও আমাদের ছবি বেচব। বিদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিজেদের দেশের স্টুডিও ও সুযোগগুলি সম্পর্কে অবহিত করা হলে যুক্তভাবে চিত্র-নির্মাণের সুযোগের কথা এসে যায়। তাতে স্টুডিওগুলির কাজের সুযোগ বেড়ে যায়, বিদেশী মুদ্রা লাভ হয় এবং ফিল্ম শিল্পে টাকা লগ্নি বেড়ে যাবার সুযোগ হয়। তার ওপর সেমিনার ইত্যাদির মারফৎ তত্ত্বগত আলোচনার সুযোগও থাকে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক উৎসবে এই লক্ষ্যের একটিও ভালভাবে পূরণ হয়েছে বলা যায় না। শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এমন একটি ছবিকে যে ছবিকে দর্শকদের এক বড় অংশ ভাল ছবি মনে করছেন না। নাৎসীদের ক্ষমতা লাভের পটভূমিতে এক শিল্পপতি পরিবারের ক্ষমতার লোভের পরিণতি নিয়ে ছবির কাহিনী। এই কাহিনীর অঙ্গকে রয়েছে মা ও ছেলেকে নিয়ে এক যৌনতার দৃশ্য। যা অনেক বিদেশীর চোখেও ভাল লাগে নি। এই উৎসবে 'এ' চিহ্নিত ছবিগুলির সংখ্যাধিক্য ছিল এবং এই ছবিগুলি দেখার জন্য ছিল দর্শকদের ভিড়। ফলে চড়া দামে কালোবাজারে টিকেট বেচা হয়েছে দিল্লী শহরে, মারপিট পর্যন্ত হয়ে গেছে। উচ্চপদের সরকারী কর্মচারীদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্ররা এবং সুবিধাভোগী লোকেরা টিকেটের জন্য বেশি ভিড় করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্ন আসে এই 'এ' চিহ্নিত ছবিগুলি ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পে কি সহায়তা করল? বরং বলা চলে গত কয়েক বছর এরূপ ছবি দেখিয়ে সারা দেশের যুবকদের রুচি ও দৃষ্টি খারাপ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু ও বক্তব্য যাই হোক নগ্ন নারী আছে এমন ছবি দেখার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ পাগলের মত ছুটছে। ফলে দেশী ছবির পক্ষে আজ বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই উৎসব ভারতীয় ছবির উন্নতিতে সাহায্য করল কিরূপে? দিল্লীতে উৎসব হওয়ায় প্রতিনিধি ও অতিথিরা ভারতের স্টুডিওগুলি দেখার সুযোগ পেলেন না, 'চলচ্চিত্র বাজার'-এ কম সুবিধা পেলেন না। রাজনৈতিক দিক থেকেও লাভ হয়েছে বলা শক্ত। উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েৎনামের ছবি না আসা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সোভিয়েটের সের্গেই গেরাসিমভ ও ঝর্কি কেন এলেন না সে প্রশ্নও উঠেছে। ভারত যদি সত্যিই নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্র হয়ে থাকে তা হলে ঔপনিবেশিক শৃংখল থেকে মুক্ত দেশগুলির প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখান উচিত ছিল। দিল্লীর উৎসব শেষে বিদেশী প্রতিনিধিদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যাঁদের কলকাতায় আনা যায়। কিউবার 'লুসিয়া' মস্কো আন্তর্জাতিক উৎসবে স্বর্ণপদক লাভ করেছে, অথচ সেই ছবিটি দেখাবার ব্যবস্থা হল না। এই উৎসবে সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সদ্যমুক্ত দেশগুলির সংগে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির চেয়ে মার্কিন তোষামোদের লক্ষণ বেশি দেখা গেছে। অথচ ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক আমেরিকা ও হলিউড।

উৎসবের উদ্যোক্তারা ফিল্ম সোসাইটি, সিনে টেকনিসিয়ান সমিতি এবং দেশের গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির সহযোগিতা গ্রহণ না করায় এই উৎসব যথার্থভাবে একটি গণতান্ত্রিক দেশের উৎসবে পরিণত হতে পারে নি।—একটি আমলাতান্ত্রিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

—সুজন

দিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত গ্রীসের ছবি 'মডেল ৭০'-এর নায়িকা।

## আন্তর্জাতিক উৎসবের কয়েকটি ছবি

**দিল্লীতে** চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয়েছে। মার্কিন-ইতালী যুক্ত ছবি লুচিনো ভিসকণ্টি পরিচালিত 'দি ড্যামড' শ্রেষ্ঠ ছবি বিবেচিত হয়ে 'স্বর্ণ ময়ূর' লাভ করেছে। 'দি ড্যামড'-এর স্বর্ণ ময়ূর লাভে অনেকে আশ্চর্য হয়ে গেছেন। অনেকের মতে এটি ভিসকণ্টির এক নিকৃষ্ট ছবি। বিশেষ করে যে ছবিতে মা ও ছেলের এক বিছানায় যৌনতার দৃশ্য রয়েছে। উৎসবের বিচারকদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিয়েছিল। একজন বিদেশাগত বিচারক নাকি প্রতিবাদে উৎসব বর্জন করে চলে গেছেন। ভারতের প্রতিযোগী ছবি মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' বিচারকদের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে।

দিল্লী উৎসবের পরে কলকাতায় তথ্য ও বেতার দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৮ই থেকে ২৫শে ডিসেম্বর চারটি সিনেমায় ফিল্ম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই চারটি সিনেমায় দিল্লী হতে আগত কয়েকটি ছবি দেখান হয়েছে। ১৮ই ডিসেম্বর মেট্রো সিনেমায় রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এই উৎসব উদ্বোধন করেছেন। সাংবাদিকদের জন্য লেনিন সরণিস্থিত অপেরা সিনেমায় এক বিশেষ শো'র ব্যবস্থা হয়েছিল এই সাতদিন সকালে।

এখানে যে ছবিগুলি দেখান হয়েছে তার মধ্যে প্রতিযোগিতার ছবি তেমন ছিল না। সারা বছর আমরা যে ছবি-গুলি দেখে থাকি তার চেয়ে বেশি উন্নতমানের ছবি ছিল না। তবে যে ছবিগুলি দেখান হয়েছে তার মধ্যে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির ছবি বিষয়-বক্তব্যের দিক থেকে অনেক ভাল। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ছবি কেবল সেক্স ও নৈরাশ্যবাদের ছবি। সমাজতান্ত্রিক দেশের জীবনবোধ আর ধনতান্ত্রিক দেশের জীবনবোধ এই ছবিগুলিতে ধরা পড়েছে। দর্শকদের এটা এক বড় লাভ হয়েছে।

উদ্বোধন দিনে দেখান হয়েছে ফরাসী ছবি 'টু গ্রাব দি রিঙ'। এটি বক্তব্যহীন চরম হতাশাবাদের ছবি। কেবলমাত্র যৌনতার আঙ্গিকে দর্শকদের মন ভোলাবার চেষ্টা ছাড়া এ ছবিতে আর কিছু নেই। পশ্চিম জার্মানীর 'টাট্টু' আর একটি বিশ্বাসহীনতার ছবি। এই ছবিতে এক অনাথ বালক ও বালিকা প্রতিপালিত হয়েছিল, কিন্তু পালক পিতার যত্ন সত্ত্বেও ওরা জীবনের স্বাধীনতা পায় নি। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি পালক পিতাকে হত্যা করে; মেয়েটি শহরে চলে যায়। এই ছবিটি ইতিপূর্বে ইয়ং জার্মান ছবি রূপে কলকাতায় দেখান হয়েছিল। আবার কেন দেখান হল কে জানে? কানাডার 'ডোণ্ট লেট দি এঞ্জেল টু ফল' ছবিটিও দেখান হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবির মধ্যে হাঙ্গেরীর 'ফাদার' কাহিনীর দিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এক কিশোরের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে জাতি ও দেশের ঐতিহ্যের চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা হয়েছে। যৌবনে দেশ-প্রেমের প্রেরণা, কর্তব্যবোধে সুস্থ জীবনবোধের ছবি। পোলিশ ছবি 'ম্যাথুস' এক প্রকৃতি প্রেমিক মানুষের কথা। পাখী ও প্রকৃতি তার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, জীবনের বাস্তব-দিকগুলির প্রতি তার চেতনা ছিল না। সুতরাং বাস্তব জীবনে সে এক অকর্মণ্য মানুষ। পরিণতিতে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। তার প্রেমিকহৃদয়ের আবেদন দর্শকমনে রেখাপাত করে। ছবিটিতে ক্যামেরার কাজ ও কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টি উপ-ভোগ্য। ছোট গল্পের মেজাজে রসোত্তীর্ণ। চে কো স্লো ভা কি য়া র 'ক্যাপ্রিসাস সামার' একটি উপভোগ্য ব্যঙ্গ-চিত্র। তিনজন অবসরভোগীর অকাল বসন্তকে নিয়ে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে—আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্ন তুলে। এই তিনজন বন্ধু নিতান্ত গোবেচ[illegible] মানুষই বটে, কিন্তু সার্কাসের তরু[illegible] প্রতি তাঁরা একে একে তিনজনই কিভ[illegible] আকৃষ্ট হন এবং তার যোগ্য প্রতি[illegible] পান, হাসির রসে সে কাহিনী এখ[illegible] দেখান হয়েছে। পোলিশ-সোভি[illegible] যুক্ত ছবি 'জোশিয়া' এক মিষ্টি মেজা[illegible] কাব্যগাথার মত ছবি। ভয়ঙ্কর যুদ্[illegible] পরে সোভিয়েট বাহিনীর ছোট এ[illegible] দল পোল্যাণ্ডের এক গ্রামে শি[illegible] স্থাপন করেছিল। এই দলের নায়ক [illegible] কাব্যপ্রিয় যুবক। পুশকিনের কাব[illegible] দৃষ্টিতে সে জগৎকে দেখে—উপভো[illegible] করে। জোশিয়াকে এই [illegible] মিলিয়ে ভালবাসল; জোশিয়াও [illegible] প্রতি অনুরক্তা। কিন্তু দুজ[illegible] আবেগ অব্যক্ত। কেবল এই গ্রাম থে[illegible] বিদায় নেবার মুহূর্তে জোশিয়া ছ[illegible] এসে তার প্রেমের অভিব্যক্তি জানা[illegible] ছবিটি আঙ্গিকে, অভিনয়ে এবং বক্ত[illegible] চমৎকার। ছবি দেখার পর দর্শক[illegible] বেদনাভরা মাধুর্য রেখে যায়।

কম্বোডিয়ার ছবি 'টুই লাইট'-এর একটি দৃশ্য

## আয়কর কর্মচারীদের অভিন[illegible] 'মা'

**ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস এণ্ড রিক্রি[illegible]শন ক্লাবের রজত জয়ন্তী উদ্যা[illegible] কমিটির প্রযোজনায় গত ২৩শে ও ২[illegible] ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে দীন[illegible] মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও গর্কির**

দিল্লীতে আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত ফরাসী ছবি 'দি গার্ল অন এ মোটর সাইকেল'-এর একটি দৃশ্য

অভিনীত হয়েছে। ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'মা'র অভিনয়ে আমরা উপস্থিত ছিলাম।

গর্কি'র 'মা' কলকাতায় অন্যতম সর্বাধিক অভিনীত নাটক। এ পর্যন্ত গর্কি'র 'মা' উপন্যাসের সাতটি নাট্যরূপ হয়েছে। প্রথম নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দ্বারিকাদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও অধীর মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালে। সেই বছর ৬ই ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা মঞ্চে বেহালার মায়ামঞ্চ 'মা' মঞ্চস্থ করেছিল; আর মা'র চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন প্রখ্যাতা অভিনেত্রী মলিনা দেবী। তারপরে অনেকে মা'র অভিনয় করেছেন, কিন্তু মলিনা দেবীর 'মা' এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট। ১৯৫৩ সালের পরে মা'র অনেক নাট্যরূপ হয়েছে, সাম্প্রতিক নাট্যরূপ দিলেন আয়কর অফিসের কর্মচারী রণজিৎ মুখোপাধ্যায়। বের্টল্ট ব্রেশট অনুসরণে তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন। কলকাতার অফিস ক্লাবগুলির মধ্যে আয়কর কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক-সংস্থা নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে থাকেন। অভিনয়, পরিচালনা ইত্যাদির ব্যাপারেও তাঁদের সুনাম আছে। নাট্যরূপদাতা এবং নাটক পরিচালক হিসাবে রণজিৎ মুখার্জীর দক্ষতার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সেই পরিচয় আবার প্রত্যক্ষ করা গেল গর্কি'র 'মা' নাটক দেখে। ত্রিশজনের বেশি চরিত্র নিয়ে 'মা' অভিনয় করা অফিস ক্লাবের পক্ষে কম সাহসের কথা নয়। আরো উল্লেখযোগ্য যে, এখানে মা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আয়কর অফিসের কর্মচারী শ্রীমতী নীলিমা দাস। সখের অভিনয় হলেও মা'র ভূমিকাভিনয়ে তিনি প্রশংসনীয় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এই নাট্যরূপটি গোড়া থেকেই একটু চড়া সুরে বাঁধা মনে হয়েছে। মূল উপন্যাসে যেমন ধীরে ধীরে বরফ-গলার মত করে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে: দুই বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্ব তীব্রতর হবার সঙ্গে সঙ্গে মা'র চেতনা বেড়েছে, সাহস হয়েছে, সন্তানদের সহযোগী হয়েছেন এবং চরম পরিণতিতে এক বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে লাল পতাকা হাতে নিয়ে দুর্জয়ী বিপ্লবী শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এখানে মা আরো দ্রুত যেন চেতনায় অগ্রগামী ও বিপ্লবী হয়ে গেছেন। দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে মা'র অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ও উত্তরণের গতি এই নাটকে বড় দ্রুত। হয়ত বর্তমান পরিবেশ বিবেচনায় নাট্যরূপদাতা এই সহজ উত্তরণের পথে গিয়েছেন।

নাটকটি দলগত অভিনয়ে প্রশংসনীয়। আরো কিছুটা রিহার্সাল হলে আরো বেশি সার্থকতার দাবি করতে পারত। মঞ্চ-সজ্জা, পরিচ্ছদ পরিকল্পনা ইত্যাদি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। আলোর কাজ মোটামুটি ভাল, তবে আলো ও ছায়ার ব্যাপারে আরো সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। অন্তর্বর্তী সময়ের এবং পরিবেশ রচনার সঙ্গীতের পরিকল্পনা ভাল হয়েছে। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ করে কোরাস গানে। পরিচালক থিয়েট্রিক্যাল ইনটিমেচি সৃষ্টির জন্য স্থানে স্থানে প্রেক্ষাগৃহকে ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে অভিনয়ে পাভেলের ভূমিকায় রঙ্গিণী সরকার একজন বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত শ্রমিক যুবককে যথার্থভাবে উপস্থিত করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে হরিমোহন মুখার্জী, শিবপ্রসাদ চৌধুরী, ধ্যান দাশগুপ্ত, অলোক চক্রবর্তী, সুভাষ চ্যাটার্জী, সোমনাথ চ্যাটার্জী, রবীন দে, রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, গৌতম গুপ্ত, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, সমতা দে ও মায়া রায় এবং অন্যান্যরা যথাযথভাবে চরিত্র রূপায়িত করেছেন। নাটকের পরিচালনায় ছিলেন রণজিৎ মুখোপাধ্যায়।

## থিয়েটার লাইব্রেরির লেনিন

লেনিনের জীবনী অবলম্বনে ধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত ও নির্দেশিত 'লেনিন' নাটক গত ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তাঙ্গন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। থিয়েটার লাইব্রেরির এই নাটকটি ১৯৬৯ সালের ২২শে এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় ১৪ রজনী অভিনীত হয়েছে। এই নাটকে লেনিনের চরিত্রে অভিনয় করছেন শরদিন্দু মুখার্জী।

### সাজাহান

গত ২৯শে নভেম্বর মহাজাতি সদনে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ই, পি, এম স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক অভিনীত হয়েছে। আলোকসম্পাত, সঙ্গীত ও দৃশ্যপট নাটকের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন শম্ভু ব্যানার্জী। অভিনয় করেছেন ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় নির্মল ঘোষ, সাজাহানের ভূমিকায় সুনীল সেনগুপ্ত সুজা—জে, এন চক্রবর্তী।

### চায় দেওয়ালের গল্প

গত ১২ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল এণ্ড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (চার্চ লেন) সদস্যগণ রঙমহল মঞ্চে 'চায় দেওয়ালের গল্প' অভিনয় করেছেন। নাটকটি দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে। অভিনয়ে প্রশংসা লাভ করেছেনঃ শিবশম্ভু দে দেবকীনন্দন গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক রায়, সুধীন রায়, সুশীল নন্দী, অজয় বন্দোপাধ্যায়, দীপালী ঘোষ। নাটক নির্দেশনায় ছিলেন পুলিনকুমার।

### "শচীমার সংসার"

"বন্ধু", "মহাতীর্থ কালীঘাট" প্রভৃতি বহু সফল ছবির পরিচালক ভূপেন রায় পরিচালিত মালবিকা চিত্রের "শচীমার সংসার" ছবির একটানা বাইশ দিনের সুটিং এন, টি, এক নম্বর স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। সঙ্গীতবহুল ও ভক্তি-মূলক এই ছবিটিতে সুরসৃষ্টি করেছেন—মানবেন্দ্র মুখার্জী। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা ব্যানার্জী, নির্মলা মিশ্র, শ্যামলী মুখার্জী, শুক্লা পালিত, বনশ্রী সেনগুপ্তা ও রত্না রায়।

চরিত্র চিত্রণে আছেন—নিমাই : অসীম-কুমার, নিতাইঃ দিলীপ রায়, অদ্বৈতাচার্যঃ মিহির ভট্টাচার্য, শচীমাঃ সন্ধ্যারাণী, বিষ্ণুপ্রিয়াঃ রুবি ব্যানার্জী, লক্ষ্মীপ্রিয়াঃ নবাগতা সংহিতা রায়, শ্রীবাস : শঙ্কর-নারায়ণ, মালিনীঃ শমিতা বিশ্বাস, হরি-দাসীঃ তরুণকুমার, ঈশানঃ জহর রায়। অন্যান্য চরিত্রে অনেক নবাগত ও নবাগতা।

এস, বি, ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

### "দুটি মন"

সুপর্ণা সেন প্রযোজিত ও পীযূষ বসু পরিচালিত এস, এস, ফিল্মসের "দুটি মন" ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ। বিনয় চাটার্জী রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, আরতি মুখার্জী ও হেমন্তকুমার স্বয়ং।

"দুটি মন" ছবিতে উত্তমকুমার দ্বৈত চরিত্রে রূপদান করেছেন। দুটি অনন্য সাধারণ চরিত্র রূপায়ণে উত্তমকুমার [illegible] স্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর [illegible] রেখে যাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। নায়িকা চরিত্রে আছেন নবাগতা সুপর্ণা [illegible] শ্রীমতী সেন বাংলার চিত্রজগতের নায়িকার অভাব পূরণ করবেন বলে আশা [illegible] যাচ্ছে। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছে[ন] কণিকা মজুমদার, রবীন ব্যানার্জী [illegible] দেবী, অসিতবরণ, পদ্মা দেবী, মি[illegible] ভট্টাচার্য, এন, বিশ্বনাথন, শ্যামল ঘো[ষ] সুখেন দাস, সুব্রত সেন, মাঃ [illegible] শৈলেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। অপ্সরা [illegible] পরিবেশিত ছবিটি বর্তমানে মু[ক্তি] প্রতীক্ষায়।

### 'আবিরে রাঙানো'

পরিচালক অমল দত্তর পরিচা[লনায়] 'আবিরে রাঙানো'-র চিত্রগ্রহণ দ্রুতগ[তিতে] এগিয়ে চলেছেন। চিত্রনাট্য ও সংলাপ [পরি]চালক নিজেই রচনা করেছেন। গান [গেয়ে]ছেন মান্না দে, পিন্টু ভট্টাচার্য, সু[illegible] মুখার্জী ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। [illegible] চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন নবাগতা সু[illegible] অনিল মুখোপাধ্যায় ও বেবী গ[illegible] প্রগতি চিত্রমের ব্যানারে তোলা এ ছ[বির] সহযোগী প্রযোজনার দায়িত্ব বহন ক[রছেন] নকুলেশ্বর সিংহরায়।

## 'যখের ধন'কে চিত্ররূপ দে[বার] উদ্যোগ

মাদ্রাজে সিনে ল্যাবরেটরীর পরিচা[লক] শ্রীধীরেন দাশগুপ্ত বাংলায় একটি চল[চ্চিত্র] প্রযোজনা করছেন। গত ২৪শে ডিসে[ম্বর] পার্ক হোটেলে সাংবাদিকদের কাছে [তিনি] একথা ঘোষণা করেন। বিখ্যাত [illegible] সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের '[যখের] ধন' বইটির তিনি চিত্রস্বত্ব কিনে[ছেন।] সকল বয়সের দর্শকের উপযোগী [এই] ছবিটি নির্মাণ করা হবে উমাপ্রসাদ [illegible] পরিচালনায়। এই তরুণ পরিচা[লক] ইতিমধ্যে ক্ষমতাশীল পরিচালক[রূপে] স্বীকৃতি পেয়েছেন। জানুয়ারী ম[াসের] শেষ সপ্তাহ থেকে ছবির কাজ শুরু [হবে।] প্রযোজক শ্রীদাশগুপ্ত বহু বছর [আগে] কলকাতা থেকে মাদ্রাজ গিয়ে নিজে ল্যাবরেটরীর প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন ব্য[বসায়] সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি [illegible] তামিল, কর্ণাটক ছবি প্র[যোজনা] করেছেন। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এই [তাঁর] প্রথম প্রয়াস।

উৎসবে প্রদর্শিত চেকোস্লোভাক ছবি 'ফ্যানি ওল্ড ম্যান' ছবির একটি দৃশ্য।

**লেনিন ও সোভিয়েত জীবন সম্পর্কে লেখা চিত্রনাট্য পুরস্কৃত**

জর্জীয় লেখক সুলিকো জগেন্তির লেনিন ও আধুনিক সোভিয়েত জীবন নিয়ে লেখা চিত্রনাট্য "জননীর ভাবনা" ('থটস অব এ মাদার') এক চিত্রনাট্য প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে বলে মস্কো থেকে এ পি এন খবর দিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রী পরিষদের চলচ্চিত্র-শিল্প কমিটি ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পী ও কুশলীদের ইউনিয়নের যুক্ত-উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা হয়। জগেন্তি বিখ্যাত "ফাদার অব সোলজার", "দেয়ার আর ইয়ং পিপল ফর ইউ" প্রভৃতি সোভিয়েত চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার।

চিত্রনাট্যে জর্জিয়ার সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। চিত্রনাট্যের শুরু হয় এক প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে। বিপ্লব জর্জীয় কৃষকদের এনে দিল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ—জমি। জীবনের মোড় ঘুরতে আরম্ভ করল। একদিন পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি ছবি ঘরে নিয়ে এল। মানুষের সুখী ভবিষ্যতের ওপর আস্থা ফিরিয়ে এনেছেন এমন এক ব্যক্তির ছবি সেটি। তাঁর নাম ভ্যাদিমির লেনিন। পারিবারিক ছবির অ্যালবামে পরিবারের একজন হিসেবে এ ছবিটি যুক্ত হল। পরিবারের লোকজনের ধারণা লেনিন নামে এই মানুষটি তাদেরই মত জর্জিয়ার এক পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী।

চিত্রনাট্যকার এই কাহিনী রচনায় জর্জিয়ায় তাঁদের নিজেদের গ্রাম এবং তাঁর মা ও দিদিমার স্মৃতিকথা ব্যবহার করেছেন।

## বাংলা দেশ ও ভিয়েৎনামের গলায় একই মালা

গত ১৭ই ডিসেম্বর মহাজাতি সদনের সবক'টা আলো জ্বলে উঠল, পর্দা সরে গেল, করতালি আর শ্লোগান বৃষ্টির মধ্যে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সান্ধ্য-অনুষ্ঠানের সব ক'জন শিল্পী এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার-এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত। নেতা নুয়েন-ভ্যান-থ্যান থান, মাদাম ফান মিন যোগেশ দত্ত, সহ-নেতা নগুয়েন মন হিয়েন (সহনেত্রী)।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পোশাক। তাঁরা লোকনৃত্যের ছন্দে মহাভারত-এর দেশকে মূর্ত করতে চেয়েছেন। তাঁদের ঘিরে ছিলেন বাংলা দেশের অন্যান্য শিল্পী। আর সেই আশ্চর্য মানচিত্রের এখানে-সেখানে সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো ভিয়েতনামের সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আর একজন ছিলেন, তিনি যোগেশ দত্ত। মূকাভিনয়ে ভিয়েতনামের আত্মাকে উন্মোচিত করে কিছুক্ষণ আগেই তিনি সকলকে উদ্দীপ্ত করেছেন। তাঁর পরনে ভিয়েতনামী কৃষকের পোশাক। তাঁর গোটা অস্তিত্বে তখন সেই ভিয়েতনাম—যার এক হাতে লাঙল, অন্য হাতে রাইফেল!

প্রতিনিধিদলের সহ-নেতা, দক্ষিণ ভিয়েতনামের শান্তি সংসদের সহ-সভা-

কমিটির অগ্রণী সদস্য, দলের মধ্যে বয়সে সকলের জ্যেষ্ঠ নুয়েন-ভ্যান-থ্যান দাঁড়িয়েছিলেন মূকাভিনেতার গা ঘেঁষে। শিল্পীদের সকলের হাতে ফুলের তোড়া, গলায় মালা প্রতিনিধিদল একটু আগেই যে মালা তাঁদের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন।

যোগেশ দত্ত হঠাৎ তাঁর মালা খুলে সেটি নুয়েন-ভ্যান-থ্যান-এর গলায় পরিয়ে দিলেন। ভ্যান-থ্যান'এর চোখে-মুখে তখন ভিয়েতনামের কৃষক কথা বলছে। বিপুল আবেগে মূকাভিনেতাকে তিনি বুকে টেনে নিলেন। যোগেশ দত্তের গলায় জড়িয়ে দিলেন মালার অর্ধেকটা। একই মালায় বাঁধা তখন ভিয়েতনামের সংগ্রামী বীর আর বাংলা দেশের শিল্পী। আজ তিনি মূক শিল্পী। কিন্তু একদিন
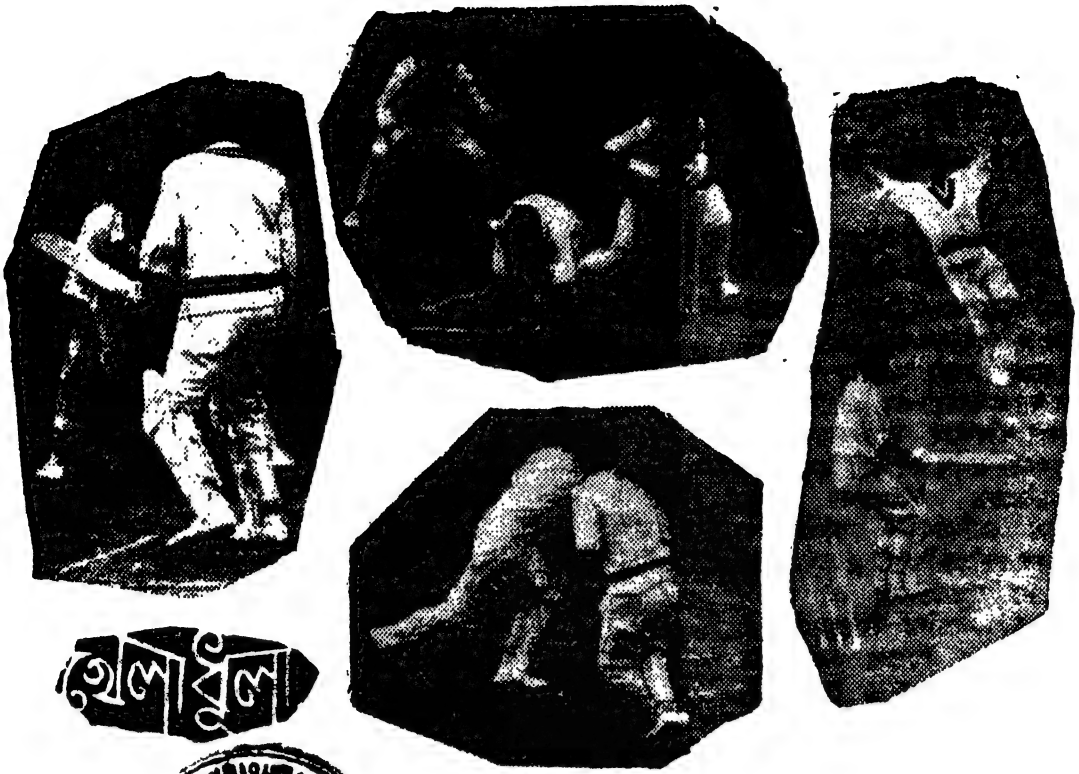
ক্রিকেট কথাটির আভিধানিক অর্থের সংগে এ-যুগের খেলোয়াড় আর ক্রিকেট পরিচালকদের সম্পর্কটা বোধহয় আদায়-কাঁচকলায়। অথচ ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা বলেই পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে ভারত সফররত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক, খেলোয়াড়গণ, ম্যানেজার কিম্বা অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের কর্মকর্তাগণের আচরণ শুধুমাত্র বিস্ময়কর নয়, অকল্পনীয়ও বটে। সফরের শুরু থেকে লরী এবং তাঁর দলের খেলোয়াড়রা ভারতের দর্শক, সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক এমন কি ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের সংগে যে ব্যবহার করেছেন যে-কোন দেশের পক্ষে তা লজ্জার বিষয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হলো অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্তাদের আচরণ আর মন্তব্যগুলো। স্বয়ং ডন ব্র্যাডম্যান বললেন, কাগজে যা ছাপা হয়েছে আমি তার সবটা বিশ্বাস করি না। কলকাতায় খেলার চতুর্থ দিন লরী ফটোগ্রাফার মীরেন অধিকারীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন—কিন্তু মাঠসুদ্ধ লোক যে দৃশ্য দেখতে পেলেন, মাঠে বসেও বেনট সাহেব তা দেখতে পেলেন না। আর সব শেষে বাজার গরম করলেন রিচি বেনো। তিনি বললেন যে, ভারত অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে পারে নি। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে খেলতে হচ্ছে। সুতরাং সফর এখনই বাতিল করে দেওয়া হোক। মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্টের আর দরকার নেই। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের দেশে ফিরিয়ে আনা দরকার এখনই। হায় ক্রিকেট,—তোমার আভিধানিক অর্থও যে ওরা ভুলে গেলো। কিন্তু আমরা তো জানি, লরী এবং তাঁর দল ভারতে এসে যে ব্যবহার করেছেন—একমাত্র ভারতবর্ষ বলেই তাঁরা তার জন্যে বিনা অপমানে ফিরে যেতে পারছেন। কিন্তু আজ আর আমাদের চুপ করে থাকা চলে না। ওঁরা অতিথি ছিলেন, তাই ওঁদের কিছু করা হয় নি। কিন্তু ও'রা যখন আমাদের দেশ তুলে গাল দিতে শুরু করেছেন তখন আমাদেরও উচিত তার ঠিক ঠিক জবাব দেওয়া। সত্যিকারের চিত্রটা আজ বিশ্ব-বাসীর চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। সকলকে জানিয়ে দিতে হবে যে, অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা কতো হীন। তাঁরা শুধু খেলতেই জানেন, ক্রিকেট শব্দের মানেও জানেন না। আজ আমাদের সব থেকে খারাপ লাগছে এই কারণে যে, এইরকম একটা অসংযত দলের খেলা দেখতে গিয়ে বাংলা দেশে সাতটি তরুণ প্রাণ দিলেন। এও যে আমাদের কাছে আর এক রকমের চরম লজ্জা ...

—শান্তিপ্রিয়

ফুটবল ফুটবল

সমস্ত প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের যখন জয়-জয়কার, ঠিক তখনই বোম্বাই-এর রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বিশ্রী-ভাবে হারিয়ে দিল এ বছরের আই· এফ· এ শীল্ড ও লীগ বিজয়ী মোহন-বাগান ক্লাবকে। শুধু হারিয়ে দিল বললে বোধহয় ভুল হবে, প্রথম অর্ধেই ইস্টবেঙ্গল তিন-তিনটে গোল দিয়ে অসহায় করে ফেলেছিল মোহনবাগানকে। এ বছরের আই· এফ· এ শীল্ডের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের যে অবস্থা হয়েছিল রোভার্স কাপের ফাইন্যালে মোহনবাগানকে ঠিক সেভাবেই কোণঠাসা হয়ে হেরে যেতে হলো প্রথম অর্ধেই পর পর তিনটে গোল খেয়ে।

ইস্টবেঙ্গলের এই অবিস্মরণীয় সাফল্যের পেছনে সব থেকে বড় অবদান বোধহয় সুভাষ ভৌমিকের। তিনি একাই দিয়েছিলেন দু'টি গোল। বাকী গোলটি দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেন কাজল মুখার্জী।

ফাইন্যাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল। তবু খেলার প্রথম কুড়ি মিনিট প্রচণ্ড আক্রমণ চালি-

॥ সুভাষ ভৌমিক ॥
মোহনবাগানের বিরুদ্ধে দু'টি গোল করার

য়েও মোহনবাগান গোল করতে পারে নি। ইস্টবেঙ্গল দলের রক্ষণভাগের খেলো-য়াড়রা মোহনবাগানের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে।

কিন্তু তারই ফাঁকে আচমকা কাজল মুখার্জী ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে একটা গোল করে চমক সৃষ্টি করেন। আর তার পরই সুভাষ ভৌমিক পর পর দু'টো গোল দিয়ে খেলাটা পুরোপুরিভাবে নিজেদের অনুকূলে টেনে আনেন।

॥ কাজল মুখার্জী ॥
রোভার্স কাপের ফাইন্যালে কাজলই প্রথম গোল করে এগিয়ে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলকে।

তিন গোলে এগিয়ে থেকে ইস্টবেঙ্গল তখন সহজভাবে খেলছিল। মোহন-বাগানের খেলোয়াড়রা উৎসাহ হারিয়েও শেষ পর্যন্ত জোড়াতালি দিয়ে গোল শোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুবিধে করতে পারেন নি তাঁরা কোন-মতেই।

ওদিকে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা ভৌমিককে দিয়ে আর একটা গোল হ্যাটট্রিক করানোর প্রচেষ্টায় আরো বেশি গোল করার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করেন।

যাই হোক, মোহনবাগানের সামনে এ বছর ছিল 'ত্রিমুকুট' বিজয়ের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন রোভার্স কাপের ফাইন্যালেই হারিয়ে গেলো। এখন বাকী আছে ডুরান্ড কাপের খেলা। দেখা যাক ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান কি করে।

এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে, তখন মাদ্রাজের চীপক মাঠে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচও শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচেও একইভাবে ভারতের বোলাররা দিয়েছেন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় আর ব্যাটসম্যানরা দিয়েছেন অসহনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। আড়াই শ' রানের চেয়ে একটু বেশিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ করিয়ে দিয়ে ভারত সেই দিনই (দ্বিতীয় দিনে) ১৬৩ রানে শেষ করলো তাদের প্রথম ইনিংস।

ভাগ্যিস পাতৌদি ভালো খেলে-ছিলেন! কলকাতায় পাতৌদিকে 'গো ব্যাক, গো ব্যাক' বলে ধ্যারাক করা হয়েছিল। সেই পাতৌদিই মাদ্রাজে গিয়ে রেখে এলেন অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর। পাতৌদি ৫৯ রান না করলে ভারতের যে ভরাডুবি হতো সে বিষয়ে কারো এতোটুকুও সন্দেহ নেই।

তবে এ কথা বলতে আজ এতো-টুকুও দ্বিধা নেই যে, অস্ট্রেলিয়ান দলটি মোটেই খুব একটা শক্তিশালী দল নয়। বোলিং-এ তাঁদের খুব একটা ধার আছে বলে মনে হয় না। ম্যাকেঞ্জি সম্বন্ধে আমরা যা শুনেছিলাম তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি তাঁর মধ্যে। ফ্রিম্যান মোটামুটি। কনোলীর বল কাট করে বলেই ভালো। ম্যালেটের বল ঘোরে ঠিকই, কিন্তু আমাদের স্পিনার-দের সংগে তার তুলনা হয় না। আর ব্যাটিং-এ তো কয়েকজনের সাফল্যের ওপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে পুরো দলটা। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যদি সাহসের সংগে খেলে অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণের মোকাবিলা করতেন, তাহলে

॥ রিচি বেনো ॥
বড় খেলোয়াড় হলেই যে স্পোর্টিং মনো-ভাবের পরিচয় দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। তারই সাম্প্রতিক প্রমাণ রিচি

# এবারের অর্জুন

১৯৬৮ সালে খেলাধূলোয় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করার জন্যে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি· ভি· গিরি সম্প্রতি সাতজন সেরা ক্রীড়াবিদকে অর্জুন পুরস্কার প্রদান করেছেন। এবার যাঁরা অর্জুন পুরস্কার পেলেন তাঁরা হলেন—ক্যাপ্টেন যোগিন্দার সিং, মিস মনজিৎ ওয়ালিয়া, নায়েক সুবেদার গুরুদয়াল সিং, হাবিলদার দেনিস স্বামী, ই· এ· এস· প্রসন্ন, ক্যাপ্টেন বলবীর সিং ও প্রিনসেস রাজশ্রী। এবারের অর্জুনদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হলো :

হয়তো খেলার ফলাফল অন্যরকম হতো..।

**ক্যাপ্টেন যোগিন্দার সিং (সার্ভিসেস)**

জন্ম—১৯৩৮ সালের ১০ই এপ্রিল। এ্যাথলেটিক বিভাগের সেরা প্রতিযোগী। ১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমস-এ যোগিন্দার সিং শট পাটে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। শট পাটে তাঁর জাতীয় রেকর্ড হলো ১৬·৫০ মিটার।

**মিস মনজিৎ ওয়ালিয়া (পাঞ্জাব)**

জন্ম—১৯৪৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। পঞ্চম এশিয়ান গেমস-এ ৮০ মিটার হার্ডল রেসে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ১১·৪ সেকেণ্ডে তিনি ঐ দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।

**নায়েক সুবেদার গুরুদয়াল সিং (সার্ভিসেস)**

জন্ম—১৯৩২ সালের ২২শে এপ্রিল। ভারতীয় বাসকেট বল দলের অধিনায়ক। ১৯৬২ সালে এশিয়ার চতুর্দশীয় বাসকেট বল প্রতিযোগিতায় ও ১৯৬৭ সালে এশিয়ান বাসকেট বল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। সদ্য-সমাপ্ত ব্যাঙ্ককের এশিয়ান বাসকেট বল প্রতিযোগিতায় তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের সদস্য।

**হাবিলদার দেনিস স্বামী (সার্ভিসেস)**

জন্ম—১৯৪৪ সালের ২১শে মার্চ। ১৯৬১ সালে জাতীয় ও সার্ভিসেস চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন ফ্লাই ওয়েট বিভাগে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ফেদার ওয়েট বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশীপও তিনিই লাভ করেছেন।

**ই· এ· এস প্রসন্ন (মহীশূর)**

জন্ম—১৯৪০ সালের ২২শে মে। ইঞ্জিনিয়ার। ভারতের এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অফ স্পিন বোলার। কলকাতা টেস্টের আগে পর্যন্ত ২০টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে লাভ করেছেন ১০৩টি উইকেট।

**ক্যাপ্টেন বলবীর সিং (সার্ভিসেস)**

জন্ম—১৯৪৫ সালের ৫ই এপ্রিল। ভারতীয় হকি দলের হাফ ব্যাক। ১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমস ও ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলেছেন।

**প্রিনসেস রাজশ্রী (বিকানীর)**

জন্ম—১৯৫৩ সালের ৪ঠা জুন। ভারতের কনিষ্ঠতম প্রতিযোগিনী হিসেবে আন্তর্জাতিক স্যুটিং প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্যুটিং চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে যোগ দেন।

# অভিশপ্ত মঙ্গলবার ঃ যা দেখেছি যা দেখি নি

## যা দেখেছি

ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যান ইডেন। বহু সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। ক্রিকেটের বহু রথীদের পদচারণে নিজেকে গৌরবান্বিত করেছে এই ইডেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিনে যা ঘটলো, তার চেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা আমার সামনে আর কখনও আসে নি। মাত্র ঘণ্টাখানেকে যা ঘটে গেলো, কয়েকটি পরিবার তার দাম দেবে চিরদিন তাদের চোখের জলে।

ষোলোই ডিসেম্বর রাত ৪টে। একটু আগেই একটি বালি বোঝাই লরিতে এসে পৌঁচেছি ইডেনে। উদ্দেশ্য ঐ একই, ভারতের খেলা দেখব। ঘুটঘুটে অন্ধকার না হোলেও আলোর অভাব ছিল সারা অকল্যাণ্ড রোডে। যতদূর দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু মানুষ আর মানুষ। অগত্যা ৬, টাকার টিকেটের আশা ছেড়ে এসে দাঁড়ালাম ১৫, টাকার দৈনিক টিকিটের লাইনে। এ লাইনটি ছোট এবং কিছুটা শৃংখলাজড়িত ছিল। বসে বসে আলাপ জমালাম কয়েকজনের সঙ্গে। শীতের ভোরে ভাঁড়ের চা—সত্যি খুবই আরামদায়ক। কয়েক ভাঁড় চা খেলাম পর পর।

পৌনে ছ'টা। হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল ৬, টাকার লাইনে। যা দেখলাম, তাতে মনে হোলো লাইনগুলো সব আর নিজেদের আলাদা না রেখে মিশে যেতে চাইছে একে অপরের সাথে। ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি, উঃ, আঃ ইত্যাদি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কিছু উৎসাহী দর্শক নিজেদের লাইনকে ঠিক রাখবার জন্যে চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। কত লোক ছিল তখন বলা শক্ত। এক ভদ্রলোক বললেন হাজার পনের তো হবেই। কি দেখে বা কোন হিসেবে এই অংকটি উপস্থিত করলেন বলতে পারি না। লাইনগুলো ভেঙে তছনছ। সব লোকই তখন এলোমেলোভাবে সারিবদ্ধ হবার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ ধাক্কা এসে লাগল আমাদের লাইনে। আমরা সব ছত্রভংগ হয়ে পড়লাম। দিশেহারা। আশা-নিরাশার দোলায় দুলছি। টিকিট পাব কি পাব না। যাক্ কিছুটা আশাবাদী হোলাম পুলিশের উপস্থিতিতে। কিন্তু তখন তাঁরা সংখ্যায় এত অল্প যে, তাঁদের পক্ষে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা কতদূর সম্ভব, বুঝে উঠতে পারলাম না। চতুর্দিকে শুধু চিৎকার। কেউ ডাকছেন তাঁর দলছুট ভাইকে, কেউ বা বন্ধুকে, যাকে সঙ্গী করে গত রাতটা কেটেছে।

আমারও লাইন নেই। ফলে নিতান্তই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার আশা জাগলো প্রায় ডজনখানেক ঘোড়সওয়ার পুলিশকে দেখে। ফুটবল মাঠে তাদের লাইন ঠিক রাখার কায়দা-কানুন ও দক্ষতা দেখেছি, তাই ভরসা ছিল এবারেও তারা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু যা দেখলাম, আশ্চর্য হবার পক্ষে যথেষ্ট। তারা সব নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। একজন পুলিশ অফিসারকে (পদাতিক) প্রশ্ন করলাম, এই অবস্থা তাঁরা চলতে দিচ্ছেন কেন? উত্তর যা পেলাম, তা যে কোন শিশুরও হাসির উদ্রেক করে। তাঁরা তখনও পর্যন্ত আদেশ পান নি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে। তাঁরা যখন এলেন তখনই আদেশ নিয়ে এলেন না কেন, বা পেলেন না কেন—তা জানি না।

হঠাৎ পনের টাকার লাইনটা তৈরি হোলো সব নতুন মুখদের নিয়ে। আমরা যারা আগে ছিলাম তাদের কৌলীন্য গেছে—ফলে আর পূর্বস্থলে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মনে হোল। ঠিক করলাম ফিরে আসব বাড়িতে।

পুলিশের এই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা কেউ পছন্দ করে নি এখানে। যাক্ কিই বা করবার ছিল। হঠাৎ শুনলাম দুজন লোক নাকি গেটের সামনে মারা গেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, ৭ টায় সময় ৬, টাকায় গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং তারা সে চাপ সহ্য না করতে পেরেই মারা গেছে। বেশ কিছু লোক আহত হয়েছেন, কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। কিছু লোক মৃতদেহ দুটিকে ঘিরে এ্যাম্বুল্যান্সের আশায় ছিলেন। যাঁরা আহত তাঁদের প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা জনসাধারণই করছিলেন, কোন পুলিশ অফিসারকে ঐ ঘটনাস্থলে দেখলাম না হয়ত তাঁরা আরও বেশি জরুরী কাজে ব্যাপৃত ছিলেন!

হঠাৎ জনতার আক্রোশ তাঁদের কাজে রূপ পেল। সুরু হোলো ইষ্টক বৃষ্টি—জনসাধারণের পক্ষ থেকে অপর দিকে পুলিশ তাঁদের ঢালের আড়ালে লাঠিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছু পরে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ার শব্দ এবং তার অল্প পরেই সবার চোখে জল। ঘণ্টাখানেক চলল এইরকম। সবাই ইতস্তত দৌড়চ্ছেন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে।

তারপর হাত উঁচু করে জনতা আত্মসমর্পণ করলেন পুলিশের কাছে। আবার প্রমাণ দিলেন যে, তাঁরা শান্তভাবেই খেলা দেখতে চান। পনের টাকার লাইন বেশ স্ফীত হয়ে উঠেছে। ছ' টাকার লাইনও আবার নতুন করে গড়ে উঠল। বাদ থাকলেন কয়েকজন, যাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন প্রাণহীন। কয়েকজন আহত, যার মধ্যেও চারজন হারালেন প্রাণ। এ'দের মধ্যে কয়েকজন চির জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে থাকবেন।

যা হোক্ খেলা হোয়েছিল, ভারত হেরেও ছিল। হোমরা-চোমরা সবাই কিন্তু খুব উৎসাহে খেলা দেখলেন কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাঁরা কি করে ভুললেন ছজন শহীদের কথা—তা জানি না। কই তাঁরা তো কেউ অন্তত দু' মিনিটের জন্যে নীরবতা পালনের প্রস্তাব করলেন না। হয়ত এটাই নিয়ম।

—নন্টু বাগচী
৩০/বি, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন
কলিঃ—২

## দায়ী কে ?

আমি একজন ক্রিকেটরসিক, সীজন টিকিটের চেষ্টা করেও পাই নি, তাই দৈনিক টিকিটের জন্য ১৫ই ডিসেম্বর ভোর ৪টায় মাঠে (রঞ্জি স্টেডিয়াম) পৌঁছলাম। তখন টিকিটের জন্য অন্তত ১০ হাজার লোকের এক বিরাট ভিড় ছিল। প্রকৃতপক্ষে সঠিক লাইন বলতে কিছু নেই। ছন্নছাড়া লাইনে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি ও বন্ধুরা লাইনে দাঁড়াবার পরেই পিছনে আরও লোকের সমাগম হয়। ফলে লাইনে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি শুরু হয়, তখন ভোর ৫টা। এইভাবে ধাক্কাধাক্কি ঘণ্টাখানেক ধরে চলতে থাকে। ৬টা নাগাদ লাইন বলতে কিছু থাকল না, সকলেই সামনে এগিয়ে চলেছে। সেই সময় গেটের সামনে বেশ কিছু লোক লাইনে ঢোকার জন্য দাঁড়িয়েছিল। তারা এই সুযোগে লাইনে ঢুকে পড়ল, এই সময় কিছু দূরে ৩।৪ জন পুলিশ থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তখন প্রকৃত লাইন না থাকায় সকলেই গেটের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করায় একটা প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। অশ্বারোহীবাহিনী কাউণ্টার খোলার ১০-১৫ মিনিট আগে আসে। বিশৃংখল জনতাকে সুশৃংখল লাইনে দেবার চেষ্টা না করে সামনের লোকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য এলো-

[illegible] ঘোড়া ছোটায় ও বেটন চার্জ করে। তখন লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিক বিদিক ছুটতে শুরু করে। সামনে ও পেছনে এই চাপের ফলে মাঝখানের লোকেদের তখন দম বন্ধ হবার যোগাড়। তবুও লাইন ছাড়ছি না একটি টিকিটের আশায়। ইতিমধ্যে আরও কিছু পুলিশ আসে। তারা কেবল গেটের সামনেটা ম্যানেজ করতেই ব্যস্ত। তখন কিছু লোক গেট টপকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে এবং পুলিশের বেটন চার্জ ও অব্যবস্থার জন্য পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। জনতা পুলিশের কাছে "বাঁচাও বাঁচাও" বলে কাতর প্রার্থনা জানায়। রাত্রি জাগরণ ও এই চাপের ফলে কিছু লোক সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমারও তখন প্রায় পড়ে যাবার মতই অবস্থা। আমার সামনে জনাকয়েক পড়ে গিয়েও কোনক্রমে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু যারা উঠতে পারল না এই অসহনীয় চাপে, ফলে অন্যান্যরা বাধ্য হয়ে পিছনের প্রচণ্ড চাপে তাদের ভূলুণ্ঠিত দেহের ওপর দিয়ে চলে যায়। তখন তারা "দাদা বাঁচান! মরে গেলুম, মরে গেলুম" বলে আর্ত চিৎকার করে। কিন্তু কেউই তাদের সাহায্য করতে সাহস করছে না নিজেদের পড়ে যাবার ভয়ে। আমি একবার সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে বুঝতে পারলাম, নিজেকে সোজা রাখতে পারবো না, আর মাটিতে একবার পড়ে গেলে কোন রকমেই আর দাঁড়িয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। তাই পিছনের লোকের সংগে হুড়মুড় করে গেটের দিকে এগুচ্ছি। যখন এত কষ্টে গেটের নাগালের মধ্যে এলাম, ঠিক তখনই পুলিশ দল লাঠি চালাতে শুরু করে তখন জনতা ও পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। সামনের জনতা তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে দৌড়তে থাকে। জনতা পুলিশ লক্ষ্য করে ইট, জুতো প্রভৃতি ছোঁড়ে, পুলিশও তখন জনতার দিকে লাঠি হাতে ধেয়ে যায়। ঘোড়া-পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাইনের মধ্যে ঘোড়া ছোটায়। তখন আমিও প্রাণভয়ে দৌড়তে থাকি। তখন কোথায় যাচ্ছি, কিছুই মনে নেই। পরে জনতাই লাইনে শান্তি আনার জন্য হাত তুলে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন আমিও ফিরে আসি। বেশ কয়েকজন লোক একটা পুলিশের লরিতে করে আহত ও নিহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে শুনলাম ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তারপর পুলিশের সাহায্যে তিনটি লাইন তৈরি হয় সুশৃংখলভাবে। এবার যারা লাইনের সামনে দাঁড়াল, মনে হয় বেশিরভাগই পরে আসা লোক। তখন অনেকেই চলে গেছে। ছত্রভঙ্গ জনতা অনেকেই লাইনের লোকেদের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। আমি তখন লাইনে এসে এক চেনাজানার দেখা পাই ও তার সংগে দাঁড়িয়ে পড়ি ও টিকিট পাই। এখন কথা হোল, লাইন যখন এত আগেই হয়েছিল তখন পুলিশী ব্যবস্থা আরও আগে থেকে জোরদার করা উচিত ছিল। তাছাড়া সমস্ত অকল্যান্ড রোডে শালের খুঁটি ও বাঁশের বেড়া দিলে লাইনের মধ্যে বিশৃংখলা হয়তো এড়ানো যেত। এই শোচনীয় মৃত্যুর জন্যে আমার মনটা কেবলই বিষাদগ্রস্ত হচ্ছিল।

—প্রদীপকুমার ঘোষ
বাগবাজার
কলকাতা—৩

## পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল

কাগজে লেখার ভাষা আমার কোনদিন আসে না, লিখতে হবে তাও কোনদিন ভাবি নি। কিন্তু ইডেনের চতুর্থ দিনের খেলায় যে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটল তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাকে লিখতে হল। এই টেস্ট খেলা দেখার জন্য বহুদিন চেষ্টা করে বহু জায়গায় ধর্ণা দিয়েও একখানি টিকিট সংগ্রহ করতে পারলাম না। তাই ঠিক করলাম লাইনেই খেলা দেখব। প্রথম খেলা দেখতে যাই দ্বিতীয় দিন। ওইদিন ভোর পাঁচটায় ইডেনে পৌঁছই এবং লাইন দিই, কিন্তু ভোর ৫-৩০ মিঃ থেকে ৬-৩০ মিনিট পর্যন্ত তিনবার লাইন ভেঙে যায়। এর পর পুলিশের সু-ব্যবস্থায় লাইন সোজা হয় এবং টিকিট পাই। চতুর্থ দিন আমি এবং আমার দুই বন্ধু ভোর চারটায় ইডেনে পৌঁছে লাইন দিই। আমরা পৌঁছে দেখলাম আজকের ভিড় বেশি। এবং কাতারে কাতারে আরো লোক আসছে। যাই হোক জনসাধারণই লাইন ম্যানেজ করছিলেন। যত ভিড় বাড়তে লাগলো ততই চাপ পড়তে লাগলো এবং গণ্ডগোল হতে থাকল। তারপর যখন গেট খুলল তখন সবাই টিকিট পাবার আশায় গেটের দিকে চাপ দিতে লাগল। লাইন বলে তখন কিছুই রইল না। এক বিরাট জনতা গেটের দিকে ধেয়ে গেল। আমি তখন লাইন ছেড়ে ফুটপাথে পুলিশের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দিল এবং পুলিশ জনতাকে গেট থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। এই সময় পেছনের এইরূপ চাপ এবং সামনের পুলিশ এইরূপ অবস্থায় কোন দিকে জনতা না যেতে পেরে লাইন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশকে কাতর অনুনয়বিনয় করতে লাগল। আমিও তার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পুলিশ শুধু জনতাকে লাঠি চার্জ করে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় লাইনে যেতে বাধ্য করল। এমন সময় শোনা গেল লাইনের চাপে ৬-৭ জন মারা গেছে তখন এইরূপ অবস্থায় জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং পুলিশকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। এইরূপ অবস্থা মিনিট পাঁচেক চলার পর পুলিশ লাঠি হাতে তাড়া করলে জনতা পালিয়ে গেল। এরপর আবার পরিষ্কার নতুন লাইন তৈরি হলো। পুলিশ ঐ লাইনকে তেখন নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। কিন্তু কিছু জনতা তখনও উত্তেজিত হয়ে পুলিশের ওপর এবং লাইনের ওপর ইট ছুঁড়ছে। পুলিশ তখন ঐ জনতাকে তাড়িয়ে দূরে সরিয়ে দিল। এর কিছুক্ষণ পরে এই ৮-৩০ মিঃ গেট খুলল এবং আমরা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। কিন্তু এ দুঃখ আমাদের কোন দিন যাবে না যে কি বিশ্রীভাবেই না ৬-৭টি অমূল্য জীবনদীপ নিভে গেল। আমার মনে হয় এটা নাও হতে পারত যদি গোড়া থেকেই পুলিশ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করত।

—ভানু সাহা
৪৬এ, গোপীমোহন দত্ত লেন

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ : ২৮শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

PRICE : 30 Paise

Thursday, 8th January, 1970

# যুক্তফ্রণ্টে বিবাদের অবসান হোক

বাংলা কংগ্রেসের তথাকথিত গণ-অনশন প্রত্যাহৃত হয়েছে—যদিও ঐ আন্দোলন দীর্ঘদিন চলবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

গণ অনশন চলার সময় শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত ও শ্রীমাখন পাল যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে মনোমালিন্য দূর করে পরস্পর দলগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাঁদের সে প্রচেষ্টা তখন কার্যকর হয় নি। মন্ত্রি-মণ্ডলীর কোনো কোনো দায়িত্বশীল সদস্য পরস্পর দলগুলির বিরুদ্ধে যেভাবে গালি-গালাজ সুরু করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল, যুক্তফ্রণ্ট বুঝি ভেঙে যায়। ওখানেই শেষ নয়, শ্রীসুশীল ধাড়া মিনিফ্রণ্ট গঠনের কথা বললেন। সরল সৎ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বর্বর ও অসভ্য সরকার বলতে দ্বিধা করলেন না।

ঐ পরিস্থিতিতে বাংলা কংগ্রেস গণ-আন্দোলন চালিয়ে যাবে, এটাই ছিল ধারণা এবং মিনিফ্রণ্ট গঠন অবশ্যম্ভাবী একথাও কেউ ভাবলেন। কারণ গণ-অনশনের আন্দোলনে আরো দুটি দল—পি, এস, পি ও এস, এস, পি তখন যোগ দিয়েছে।

অকস্মাৎ হাওয়া বইল উল্টোদিকে। ফরওয়ার্ড ব্লকের যে অধিবেশন বসল, তাতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হোল যে, ঐ দল সি, পি, এম-কে বাদ দিয়ে মিনিফ্রণ্ট গঠনের পক্ষপাতী নয়। অন্যদিকে ভাঙন সৃষ্টি হোল বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে। ঐ দলের নেতা সুকুমার রায় সহ কয়েকজন দায়িত্বশীল সদস্য গত ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলা কংগ্রেসের গণ-অনশনের শুধু বিরোধিতাই করলেন না, তাঁদের অভিমতে ঐ অনশন প্রতিক্রিয়াশীলদের প্ররোচনার ফলেই বিপথে চালিত হচ্ছে। একজন সদস্য এমন কথা পর্যন্ত বললেন যে, তিনি অনশনের প্রথম দিকে চাকরি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোক সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য বাংলা কংগ্রেসের শ্রীসুকুমার রায় বলেছেন যে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় গণ-অনশন আন্দোলন সুরু হবার আগে

কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের বিশেষ কোনো নেতার হাতে পড়ে আন্দোলন বিপথে চালিত হয়।

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাংলা কংগ্রেস কর্তৃক গণ-অনশন প্রত্যাহার করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না।

অনশন পর্বের শেষের দিকে এস, এস, পি ঐ আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় দলের কোনো কোনো নেতার এখন মনে হয়েছে যে, এস, এস, পি ঐ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে যথাযথ কাজ করে নি। বলা বাহুল্য ঐ দল এখন সংকটের সম্মুখীন। বিভিন্ন দল যেমন ভেঙে ভেঙে টুকরো হচ্ছে, এস, এস, পি'র গতি এখন সেই দিকে। ঐ দলের নেতা রাজনারায়ণ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে একদা যে সব উক্তি করেছেন, তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তিনি পশ্চিমবঙ্গের ইজ্জত নিয়ে মিথ্যা টানাটানি করেছিলেন।

যাহোক বিভিন্ন ঘটনার ফলশ্রুতিতে এটাই এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন দল যখন ভাঙনের সম্মুখীন, তখন তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণের কাজ কতটুকু করতে পারবেন। অবশ্য ঐসব ভাঙনের মূলে আছে কোনো বিশেষ নেতার অহেতুক জিদ, কারো মধ্যে জন-কল্যাণসাধনের জিগির, কেউ বা সত্যিই জন-কল্যাণ করতে সহৃদয়ভাবে ইচ্ছুক, কেউ বা দলের নেতৃত্ব রক্ষার জন্য অপরের চরিত্র অলীকভাবে হরণ করেন। বস্তুত জনগণ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। শিক্ষিত জনসাধারণ খবরের কাগজ খুলে পরস্পর দলগুলির বিরুদ্ধে গালিগালাজ পড়েন এবং একশ্রেণীর নেতা প্রায় নাম ছাপাবার লোভে ঐসব বাক্য সংবাদপত্রে বিতরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হওয়ার পর সেই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করে আসছি। যুক্তফ্রণ্টের বত্রিশ দফা কর্মসূচী কার্যকর অপেক্ষা সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো কুৎসাপূর্ণ বাক্য বিলি করতেই নেতৃবৃন্দ ওস্তাদ এবং এমন হয়তো কোনো কোনো দলের ধারণা,

আমরা মনে করি, যে কোনো দলের পক্ষে ঐ রকম ধারণা একান্ত গর্হিত। কারণ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যুক্তফ্রণ্টের সমস্ত দলগুলিকে রাজ্য চালাবার দায়িত্ব দিয়েছেন। পাঁচ বছর পর আবার তাঁদের জনসাধারণের সম্মুখীন হতে হবে। তখন জনসাধারণই বিচার করবেন—যুক্তফ্রণ্ট থাকবে কি-না, অথবা কোন্ দলকে তাঁরা বর্জন করবেন বা গ্রহণ করবেন।

তবে বর্তমানে জনসাধারণের ধারণা, কোনো কোনো মন্ত্রিদপ্তর দুর্নীতিমুক্ত নয়। এমন কি সংবাদপত্রে কোনো মন্ত্রীর নামে দুর্নীতির অভিযোগ হলে তিনি বিচার-বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে তা অসত্য প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা করেন না। কোনো দপ্তর সম্পর্কে মন্ত্রীদের মধ্যে অভিযোগ থাকলে মন্ত্রিসভা তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে কি তার সত্যাসত্য বিচার করতে পারেন না? তাই মনে হয়, মিনিফ্রণ্ট গঠন করা বা সরকারকে বর্বর ও অসভ্য বলার আগে মন্ত্রিমহোদয়দের নিজেদের আত্মানুসন্ধান করা উচিত।

গণ-অনশন বন্ধের পর আবার নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সি, পি, এম-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এই সরকার অসভ্য ও বর্বর একথা প্রত্যাহার করতে হবে। বাংলা কংগ্রেসের জনৈক নেতা বলেছেন, তাঁরা কোনো ভুল করেন নি। এই অবস্থার মধ্যে শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে ঐক্য আনার চেষ্টায় রতী রয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতিমতো মুখ্যমন্ত্রী নির্বাক রয়েছেন।

আমরা আশা করছি সমস্ত বিবাদের অবসান হবে এবং যুক্তফ্রণ্ট গঠনের জন্য গৌরবান্বিত মুখ্যমন্ত্রী যুক্তফ্রণ্টকে রক্ষা করবেন। কারণ সব দলেরই তো একমত, যুক্তফ্রণ্ট ছাড়া গতি নেই।

# আজকের মানুষ

ভারতীয় রাজনীতির একটা অনবদ্য উপহার সত্যাগ্রহী অমোঘ অস্ত্রও বটে একটা। এ-অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কখনো রাজনৈতিক, কখনো অর্থনৈতিক, কখনো সামাজিক, কখনো বা স্রেফ ব্যক্তিগত দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহের অস্ত্রটি প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুত গান্ধীজীই অস্ত্রটিকে মহিমামণ্ডিত করে গিয়েছেন। আত্মশুদ্ধির জন্যে, বিরোধী পক্ষ বা কর্তৃপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্যে তিনি সত্যাগ্রহের আশ্রয় কি কম নিয়েছিলেন। তবে সেদিন যদি গুরু-গম্ভীর প্রশ্নে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ করে থাকেন তো আজ প্রশ্নের যেন সে ভাববিচার নেই। আজ নিয়তই এ-দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ছে, যখন কথায় কথায় স্কুল-কলেজে, অফিসে-দপ্তরে, কলে-কারখানায়, মন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বা মন্দিরের দ্বারে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সত্যাগ্রহ মানে ধর্মঘট, আর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সহজে সরাসরি আকর্ষণ করতে হলে যেন অনশন ধর্মঘটই সহজ পন্থা। এইমাত্র সেদিন পাঞ্জাবের সঙ্গে চণ্ডীগড়ের সংযুক্তির দাবিতে ফেরুমন সিং অনশন সত্যাগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এস-এস-পি নেতা শ্রীকর্পূরী ঠাকুর অবশ্য কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনশন ধর্মঘটে নামেন নি, জামসেদপুরের সাতটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার ৩৯ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েই তিনি ধর্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। গত ৪৭ দিন ধরে শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কর্পূরী ঠাকুরের অনশন ধর্মঘটের বয়স হয়েছিল ১৩ দিন। দেখা গেল কর্পূরী ঠাকুরের প্রাণত্যাগের হুমকী সুফল প্রসব করেছে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বভাবতই লেবুর রস পান করে এস-এস-পি নেতাও তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছেন। একে অহিংস আন্দোলন তায় পৌনঃপুনিক সাফল্যই সত্যাগ্রহের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকামী নিগ্রোরা পর্যন্ত সত্যাগ্রহকে তাঁদের আন্দোলনের অন্যতম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

দু' বছর আগেও কর্পূরী ঠাকুর ছিলেন বিহারের জবরদস্ত মন্ত্রী, এবং রাজ্যের প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের পরেই ছিল তাঁর স্থান। অবশ্য উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েই যে কর্পূরী ঠাকুর খ্যাতির আসন প্রথম পেলেন তা নয়,

কর্পূরী ঠাকুর

বিরোধী পক্ষে যখন ছিলেন তখনও বিধানসভার এস-এস-পি দলের নেতার আসনটি তাঁরই ছিল। বস্তুত ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই কর্পূরী ঠাকুর তাজপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন। বিধানসভার ভেতরে-বাইরে তাঁর সমান সমাদর। দলমতনির্বিশেষে বিহারের সকলেরই কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্পূরী ঠাকুর জামসেদপুরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের স্বার্থে অনশন ধর্মঘট করতে এগিয়ে আসবেন—এটা যেন অভাবনীয় ছিল। এ-ধরনের ধারণা জন্মাবার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, এস-এস-পি দলের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ। বামপন্থা, সোস্যালিজমের বুলি আউড়েও তাঁদের সিণ্ডিকেট-পন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখে এস-এস-পি'র ভূমিকা সম্পর্কে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছিল। তারা এভাবে ঘটনাটার ব্যাখ্যা করেছে যে, যেহেতু জামসেদপুরের শ্রমিক অঞ্চলে এস-এস-পি'র কোনো শক্ত ভিত নেই, সেহেতু কর্পূরী ঠাকুর এই সুযোগে দলের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। এখানে এককাল কংগ্রেসই একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে গিয়েছে, তবে গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে জামসেদপুরের দুটো আসনই কমিউনিস্ট পার্টি দখল করেছে। অর্থাৎ শ্রমিকদের মধ্যে দুই কমিউনিস্ট পার্টিরই প্রভাব বেশি। এস-এস-পি দলের দিকে শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই দলনেতা অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছেন বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

দ্বারভাঙ্গা কলেজে পাঠ্যাবস্থা থেকেই কর্পূরী ঠাকুর রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং '৪২ সালের আন্দোলনে যোগ দেন। রাজনৈতিক কারণে শ্রীঠাকুরকে বহু নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। মন্ত্রিত্ব পাবার কয়েক মাস আগেও কংগ্রেস সরকারের পুলিশ শ্রীঠাকুর এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টকে বেদম প্রহার দিয়েছিল। আবার রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেবার জন্যে শ্রী বি পি মণ্ডল তাঁর স্বল্পকালীন মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের আচরণ সম্পর্কে তদন্তের উদ্দেশ্যে মুধোলকর কমিশন নিয়োগ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে কমিশন শ্রীকর্পূরী ঠাকুরের কোন দোষ-ত্রুটি খুঁজে বার করতে পারেন নি, নির্মল দুর্নীতিমুক্ত বলে তিনি প্রশংসাপত্র আদায় করেছেন।

দলের মধ্যে কর্পূরী ঠাকুর একটা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনের অধিকারী। এস-এস-পি দলে অন্তর্বিরোধ রয়েছে সত্যি, কিন্তু শ্রীঠাকুর যোশী কিম্বা রাজনারায়ণ সিং কোনো পক্ষই অবলম্বন করেন নি। এ-নিরপেক্ষতা এবং উপদলীয় কোন্দল থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে রাখতে পারার কারণেই শ্রী এস এম যোশীর পদত্যাগের পর শ্রীকর্পূরী ঠাকুরই এস-এস-পি দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

## ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(২১)

### প্ল্যানিং-এর পক্ষে সুভাষচন্দ্রের প্রচার —(২)

এর পরে সুভাষচন্দ্র নভেম্বর মাসে লখনৌ ও পার্শ্বস্থ অঞ্চলে সফরে গিয়ে নানা সভায় প্ল্যানিং প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন। মোতিলাল স্মৃতি সঙ্ঘ আয়োজিত খাদি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল। সূচনায় সমাজতন্ত্রী নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনায় তাঁর প্রেরণার উল্লেখ করেন। নরেন্দ্র দেব বলেছিলেনঃ

"এই সমিতির আয়োজিত প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন খান আবদুল গফুর খান, দ্বিতীয় বৎসরে শ্রীযুক্ত ভগবানদাস, তৃতীয় বৎসরে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন। এই প্রথম স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন। আটটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গ্রামের কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছে কারণ দেশের সামনে আসল সমস্যা এখন জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সে কাজ কিন্তু স্বাধীন হওয়ার আগে বেশিভাবে করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর— তাঁদের কোনো কর্তৃত্ব নেই, তা না থাকলে বড় কিছু করা সম্ভব নয়, কিন্তু তা হলেও গরীব জনসাধারণের ভার লাঘবের যেটা তাঁরা করতে পারেন, তা করছেনও।

"ইংরেজরা প্রবল প্রচার চালিয়ে বলেছে, ভারত কৃষি প্রধান দেশ। এহেন প্রচারের মূল উদ্দেশ্য—শিল্পে ভারতের উন্নতি চেষ্টাকে খর্ব করা। শিল্প সম্বন্ধীয় প্রয়াসকে তারা সর্বপ্রকারে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এখন পাওয়ায় এক্ষেত্রে কার্যকর কিছু করা সম্ভব হচ্ছে। যুক্তপ্রদেশ সরকার 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রেরণায় কংগ্রেস ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর প্রবর্তন করেছে। উপযুক্ত গবেষণার সুযোগ-সুবিধা এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যাবে।"

সুভাষচন্দ্র তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বিস্তৃতভাবে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার পটভূমিকা এবং পরিকল্পনাযোগে তা কিভাবে দূরীভূত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। খাদি ও শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন বলে বিস্তৃত আলোচনার প্রাসঙ্গিক সুযোগ ওখানে পেয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'খাদি' অপেক্ষা 'শিল্পেই' তাঁর বক্তব্যের বেশি অংশ অধিকার করেছিল এবং শিল্প বলতে তিনি প্রধানত যন্ত্রশিল্পই বুঝেছিলেন।৪

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন ঃ

"আজ দেশের সামনে দুটি প্রধান সমস্যা—দাসত্ব ও দারিদ্র্য।... জনগণের সামনে দারিদ্র্যের চেয়ে বড় সমস্যা আর নেই। পরাধীন হবার পর থেকে প্রতিদিন অবস্থা মন্দতর হয়েছে। দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়তে হবে, তার স্থানে স্বাধীনতার নতুন ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। ভারত একদিন ঐশ্বর্যের দেশ ছিল, বিদেশীরা এসে দেশ অধিকার করে সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে। ফলে ভারত নিঃস্ব। পরাধীনতা গেলেই তবে দারিদ্র্য যাবে।...আমাদের সামনে আজ ধ্বংসমূলক ও গঠনমূলক—দুই ধরণের কাজ উপস্থিত। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে শৃঙ্খল ভাঙতে হবে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই যে ক্ষমতা পাওয়া গিয়েছে গঠনমূলক কর্মে তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে। এই প্রদর্শনী দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে

---

৪ শিল্পায়ন ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব কংগ্রেসের একাংশে সংশয় সৃষ্টি করেছিলই। ২১ নভেম্বর সি এইচ গুপ্ত এম এল এ-আয়োজিত চা-পান সভায় কংগ্রেসীরা তাঁকে জাতীয় পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পের জন্য কী রক্ষাকবচ রাখা হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র উত্তরে শুধু বলেছিলেন, কোন্ শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে প্ল্যানিং কমিশনই তা নির্ধারণ করবে। (অমৃতবাজার, ২২ নভেম্বর)

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্রদের সুভাষচন্দ্র জানিয়েছিলেন, কুটীরশিল্পের কথা অবশ্যই ভুলে যাওয়া হবে না; ভারতে তার স্থান থাকবে, যেমন রয়েছে জার্মানী বা জাপানে।" (পায়োনীয়ার, ২২ নভেম্বর)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানেও তিনি অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কুটীরশিল্পকে বেশি মর্যাদা দেবার কথা বলেন নি।

হবে, সে পথে সবচেয়ে বড় যে-বাধা—সেই দাসত্বকে দূর না করলে উল্লেখযোগ্য কিছুই করা যাবে না।

"এমন একদিন ছিল যখন অর্থনৈতিক অবস্থা কারু-শিল্পের উপর নির্ভর করত। সেদিন আর নেই। এখন বড় কারখানা তৈরী করতে না পারলে পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো যাবে না। এর থেকেই ভারতের মানুষ আজ বুঝতে পারছে, শিল্পায়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ যুগ শিল্পের, শিল্পায়ন চাই-ই, তবে এমনভাবে তা ঘটাতে হবে যাতে তার দোষের দিককে এড়ানো যায়। শিল্পায়ন বলতে কিন্তু কুটীরশিল্পের বিস্তার বোঝাবে না। সত্যকার প্রয়োজন হল যথাযথ শিল্প-পরিকল্পনা, যা নির্ধারণ করবে, কোন্ শিল্পকে কুটীরশিল্পরূপে রাখা যাবে, কোন্ শিল্প বৃহৎ আকারে প্রবর্তিত হবে। এক্ষেত্রে মনে হয় কংগ্রেসের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন যথাযথ নেতৃত্ব দেবে। পৃথিবীর সামনে সোভিয়েট রাশিয়াই সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনা ব্যাপারটিকে তুলে ধরেছে। তার ফলে যেসব দেশ নিজেদের নাৎসী বা ফ্যাসিস্ট বলে থাকে, তারাও পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছে। ভারতকেও একই পথের যাত্রী হতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ-গুলিকে কার্যকরী করতে তিন-চার বছর লেগে যাবে, ব্যাপারটা একদিন-দুদিনের নয়।"

ভারতবর্ষে শিল্পায়ন সম্বন্ধে বাস্তব নানা সমস্যার আলোচনা অতঃপর সুভাষচন্দ্র করেছিলেন। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন কিভাবে বিদেশী জিনিসের আমদানী কমিয়েছে তার উল্লেখ করার পরে রাশিয়া ও তুরস্কের পরিকল্পনার সাফল্যের কথা বলেছিলেন। সেই সঙ্গে, ভারত যদি সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয় তার সামনে কোন্ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তার ছবি এঁকেছিলেন—

"রাশিয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ ছিল, শিল্পে নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় তখন সে। ১৫ বছরের মধ্যে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার থেকেও আমাদের সাফল্য বেশি হতে পারে, কারণ ভারতীয়-দের বুদ্ধি ও প্রতিভা বিরাট। বর্তমানে পরাধীনতাই তাদের সামনে মূল বাধা। যদি দাসত্ব দূর করা যায় তাহলে কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা থাকবে না এবং অর্থনৈতিক অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটবে যে চেনাই যাবে না।...

"উপসংহারে শ্রীযুক্ত বসু মুস্তাফা কামাল পাশার উল্লেখ করেন, যিনি তুরস্কে শিল্প-পরিকল্পনা প্রবর্তন করে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছেন।" (অমৃতবাজারে, ২১ নভেম্বর এবং পায়োনীয়ারে ২০ নভেম্বরের রিপোর্ট থেকে)

সুভাষচন্দ্র একই দিনে অযোধ্যা ছাত্র-সম্মেলনে ভাষণ দেন। প্ল্যানিং-এর কথা সেখানেও উত্থাপন করেছিলেন। ছাত্রসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন বলে পরিকল্পনা-সমস্যার এমন দু-একটি বিষয়ের উত্থাপন করেছিলেন, যার সঙ্গে ছাত্রদের বিশেষ যোগ আছে। স্বাধীনতা দূরবর্তী নয়, এই আশ্বাস প্রথমত তাদের দিয়েছিলেন, কিন্তু সতর্ক করে বলেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়। "আসল কাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরেই আরম্ভ হবে।" ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের ভার ছাত্রদেরই নিতে হবে। ছাত্ররা ছাত্রজীবন পেরিয়ে সেই ভার নেবে, এ ধরনের মনোভাবে সুভাষচন্দ্র কখনই সুখী ছিলেন না—চিন্তাক্ষেত্রে অন্তত অবিলম্বে তাদের সমস্যাটির সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাদের অভিজ্ঞতার অভাব? সুভাষচন্দ্র জানালেন, তথাকথিত অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই তারা মুক্ত দৃষ্টি; সেখানেই তাদের প্রগতিশীলতা।৫ কিছু কিছু মানুষ স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ভেঙে দেবার কথা বলেন। আধুনিক রীতিতে পার্টি গঠনে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন—ছাত্ররা যেন কদাপি ঐ ধরনের চিন্তার প্রশ্রয় না দেয়, কারণ তা রাজনৈতিক আত্মহত্যা হয়ে দাঁড়াবে। জাতীয় পরিকল্পনাকে সফল করবে কে—যদি না সুসংগঠিত দল থাকে? বক্তৃতার শেষে তিনি ছাত্রদের কাছে আমার আবেদন জানিয়ে বলেন, দারিদ্র্য, ব্যাধি, অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামপরিকল্পনায় ছাত্রদের অংশ না নিলেই নয়; যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে থাকার সময়েই এ বিষয়ে তারা সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে যখন তারা বাইরের জগতে অবতীর্ণ হবে,—সেখানে প্রতিদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে সংগ্রাম—সেখানকার জন্য তারা যোগ্যতর মানুষ হবে। (পায়োনীয়ার, ২০ নভেম্বর)

প্ল্যানিং কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশেই হয়েছে তা নয়, ধনতান্ত্রিক দেশও প্ল্যানিং নিয়েছে ক্ষেত্রবিশেষে। এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্ল্যানিং কোন্ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ-ভিত্তিতে প্রস্তুত হবে, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল—তুলে ধরার পক্ষে বাধাও ছিল। আগে দেখেছি, বোম্বাইয়ের বণিক সভায় তিনি সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে সঙ্গত কারণেই বেশি কিছু বলেন নি। তবে ও-ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মনোভাবের কথা জানিয়েছিলেন। লখনৌয় সমাজ-

---

৫ "The third and last point emphasised by Mr. Bose was the problem of reconstruction after the attainment of Swaraj. The progressive signs of the times, accompanied by the international developments made it quite clear that Swaraj would be obtained very shortly. Real work would begin after that. Those fighting to-day must undertake the task of reconstruction along with the new generation. The fact that the student body locked experience should be no bar. They would be in a more advantageous position because they would enter life without prejudice and would have greater chances of success." (Pioneer, Nov. 20

মনের কথা স্পষ্টভাবে জানাবার সুযোগ হয়েছিল। লখনৌ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সোনপুরে কংগ্রেস কর্মী-দের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য স্থাপিত প্রথম সোস্যালিস্ট স্কুলের উদ্বোধন কালে সুভাষ-চন্দ্র খোলাখুলি নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"সমাজতন্ত্র আধুনিক জীবনদর্শন বিশেষ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও তার ফলস্বরূপ ধনতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই এখন চলেছে চীনে ও স্পেনে।......

"সমাজতন্ত্রকে আমি পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করি। মঙ্গলজনক যখন বলছি, তখন এর নীতি আমি স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে গেলে ভারতীয় ইতিহাস ও অন্যান্য জিনিসের মন-স্তাত্ত্বিক রূপের কথা বিবেচনা করতে হবে। স্বাধীন ভারতের সামাজিক পুনর্গঠন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধারাতেই হবে, কোনই সন্দেহ নেই।"৬

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং ঐ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কমার্স ছাত্রগণের কমার্স অ্যাসোসিয়েশন সুভাষ-চন্দ্রকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করে। কমার্স অ্যাসোসিয়ে-শন-প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রে বলা হয়,—কংগ্রেস কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্য মোচনে ব্রতী, সুভাষচন্দ্র সেই কংগ্রেসের সভাপতি,—ছাত্ররা এহেন কংগ্রেসের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। "ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং-এর প্রবর্তন করে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যে নূতন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত বসুকে কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অভিনন্দন জানিয়ে-ছিল।"

সুভাষচন্দ্র উত্তরে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলি রূঢ় সত্য ফুটে উঠেছিল। শিল্পায়ন জীবনে যেসব পরি-বর্তন ঘটাবে, তা সর্বক্ষেত্রে সুখকর নয়।—"শিল্প-বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারত। শিল্পায়ন ঘটে নি এমন সমাজ থেকে শিল্পায়নের সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের কালে কিছু সময়ের জন্য ওলট-পালট ও বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। যাই হোক, শিল্পায়ন পরিকল্পনা পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না কেন্দ্রের ক্ষমতা অধিকার করা যাচ্ছে।"

(প্যায়োনীয়ার, ২২ নভেম্বর)

লখনৌ-এর মহিলা কলেজ, ইসাবেলা থবর্ন কলেজে ভাষণপ্রসঙ্গেও সুভাষচন্দ্র প্ল্যানিং প্রসঙ্গে একই ধরণের কথা বলেছিলেন।৭

কেবল প্রকাশ্য সভাতেই সুভাষচন্দ্র প্ল্যানিং-এর কথা তোলেন নি—বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঘরোয়া সভাতেও তার আলোচনা করেছিলেন। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্ল্যানিং বিষয়ে আগ্রহের কথা আগে বলে এসেছি। রাধাকমল লখনৌয়ে নিজ বাস-ভবনে সুভাষচন্দ্রকে চা-পান সভায় ডেকেছিলেন। সেখানে অনেক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পরিকল্পনার নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। তার মধ্যে রোমান লিপি প্রবর্তন এবং জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথাও ছিল। রোমান লিপির বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব আমরা জানি—রাধা-কমল ও তিনি দুজনেই ঐ লিপি প্রবর্তনের যুক্তিযুক্ততা মেনে নিয়েছিলেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়েও তাঁরা ভিন্নমত হন নি, কারণ, "জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না করলে কোনোপ্রকার পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না।" এই "বিষয়টি দেশের সামনে প্রধান বিবেচ্য বস্তু", তা সুভাষচন্দ্র অকুণ্ঠচিত্তে মেনেছিলেন।

রাধাকমল আরও দুটি প্রধান বক্তব্য উপস্থিত করেন। প্রথমটি হল—পরিকল্পনায় যেন ভারসাম্য থাকে। তার অর্থ, মূল শিল্পগুলির উন্নতির পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্প-গুলির উন্নতিও যেন ঘটানো হয়। দ্বিতীয়ত, সম্প্রসারণ-শীল শিল্পের উপযোগী সামাজিক কাঠামো তৈরি করতে হলে কৃষিজীবীদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। আর

---

৬ "Mr. Bose referred to world conditions and said that Socialism was a modern philosophy of life. The age of Individualism, with its resultant Capitalism was over. At present, the struggle between Capitalism and Socialism was going on in China and Spain.....

"I consider Socialism good for humanity. When I say good, I accept the principle, but its applications in India depend on history and psychology of other factors, for free India, however, social reconstruction must be on the socialistic lines." (A. B. P., Nov., 22; Pioneer, Nov., 22)

৭ "Continuing, Mr. Bose said that it was necessary to start planning immediately to prepare the Country for the coming freedom.

Referring to National Industrial Planning Scheme, Mr. Bose said that it was just a part of the larger programme of National Planning. India was entering the phase of industrial revolution and every revolution resulted in the dislocation of the ordinary persuits of life, unrest and unhappiness. India had to pass through this uncomfortable period. All that could be done was to mitigate the evils of industrial revolution as far as possible. It was thus advisable to have a definite plan." (*Pioneer*, Nov., 23.)

রা বাড়তে পারে যদি উপযুক্ত কৃষি-পরিকল্পনা করা যায়, যাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সংগে খাদ্যশস্য নয় এমন কৃষিজ-পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকবে। (মাদ্রাজ মেল, ২৩ নভেম্বর; অমৃতবাজার, ২৪ নভেম্বর)

লখনৌ থেকে সুভাষচন্দ্র পঞ্জাব সফরে গিয়েছিলেন। সেখানেও প্ল্যানিং-এর বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে সচেষ্ট ছিলেন।৮

১৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশন বসার তিনদিন আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কটন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র, ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং জহরলাল, বল্লভভাই প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের চা-পান সভায় আপ্যায়িত করেন। যন্ত্রশিল্পায়নের দ্বারা অবিলম্বে যাদের লাভবান হবার কথা সেই শিল্পপতিদের সভায় শিল্পায়নের অধিক গুণগান করার পরিবর্তে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। "ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন ও পরবর্তী শিল্পায়নজনিত সমৃদ্ধির কথাবার্তার মধ্যে যেন দেশের স্বাধীনতা নামক সবচেয়ে দরকারী কথাটা চাপা পড়ে না যায়", সুভাষচন্দ্র সতর্ক করে বলেছিলেন আমরা এখনো দাস; আগামী সংগ্রামের জন্য তৈরী হওয়াই আমাদের প্রধান কাজ।"

সুভাষচন্দ্রের চেয়েও ভাবাবহল হয়ে জহরলাল বলেছিলেন ঐ সভায়—"যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমরা অনুভব করতে পারি আমরা সবাই এক, আমাদের মধ্যে জাতিধর্ম বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই, তবেই সাফল্য অর্জন করতে পারব।"

প্যাটেল কথার নন, কাজের মানুষ; বলেছিলেন, আমি কিষাণ; কিষাণ হিসাবে আমি বলছি, দেশের উন্নতির চাবিকাঠি আছে ব্যবসায়ীসমাজের হাতে। তারা যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসে তবেই স্বাধীনতা মিলবে।

সুভাষচন্দ্র চমৎকৃত হয়ে ঐ কথা শুনেছিলেন।

এই সভার প্রায় ৬ মাস পরে, ৭ জুন, ১৯৩৯ তারিখে নারায়ণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকসভায় সুভাষচন্দ্র যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর ধারে-কাছে কোনো বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন না। কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সংগে তখন তাঁর পাকাপাকি বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সুতরাং ঐ সভায় খোলাখুলি বলতে বাধে নি যে, কুটীরশিল্পের পথে দারিদ্র্য ও বেকারী কোনোমতে দূর করা যাবে না। সুভাষচন্দ্র তখন যেসব কথা বলেছিলেন, তার মোট বক্তব্য হয়ত পূর্বের মতই ছিল, কিন্তু সুরে পার্থক্য এসে গিয়েছিল—কংগ্রেসের খাদিনীতির ধর্মরক্ষায় অযথা-প্রয়াসে তাঁকে আর উৎকণ্ঠিত হতে হয় নি। অন্যান্য কথার সংগে তিনি বলেছিলেন:

"ভারতের সামনে এখন বহু সমস্যা—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক; সেইসংগে পরাধীনতা থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক সমস্যা। দারিদ্র্য ও বেকারী ভারতের কাছে এখন প্রধান দুই সমস্যা। দারিদ্র্যের পীড়নে জনগণের মন শুধু সরকারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী নয়, বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সে বিদ্রোহভাবাপন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না। যাদের অন্ন-বস্ত্র নেই তারা সর্বপ্রথম ঐ দুটি জিনিস চায়। সাক্ষাৎ সমস্যার সমাধান হলেই তবে তারা বৃহত্তর সমস্যার ব্যাপারে মন দেবে। সকল সমস্যার সমাধান করতে হলে বিপ্লব অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটানো দরকার। ভারত যদি একসংগে তার সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে তাহলে সে পৃথিবীর কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।"

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কুটীরশিল্প ও বৃহৎ শিল্পব্যবস্থা কোন্ পদ্ধতি অধিক সমর্থ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন:

"আধুনিক যুগে দারিদ্র্য ও বেকারী শুধু কুটীরশিল্প দ্বারা দূর করা কদাপি সম্ভব নয়। দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা একমাত্র পরিকল্পিত যন্ত্রশিল্পায়ন দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব। অনেক সমস্যার সংগেই আমাদের একসংগে লড়তে হবে। তবে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারেই সবচেয়ে জোর দেওয়া দরকার কারণ স্বাধীনতা মানে বৈদেশিক শোষণের অবসান। স্বাধীনতা পাবার আগে গোটা দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করা সম্ভব নয়। এখন আমাদের তাই কর্তব্য হবে শিল্পায়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রাখা। তা যদি করতে পারি তাহলে স্বাধীনতা লাভের পরেই অনতিবিলম্বে সমগ্র দেশের শিল্পায়ন সম্ভব করতে পারব। এই উদ্দেশ্যেই ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়েছে।" (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৮ জুন, ১৯৩৯)

পরিষ্কার কথা। স্বাধীনতা হওয়া মাত্র শিল্পায়ন। পাছে দেরি হয় তার জন্য পূর্বাহ্নে পরিকল্পনা। সুতরাং পরিষ্কার শত্রুতা তাঁর বিরুদ্ধে—গ্রামে গাঁথা স্বাধীন ভারতের কুটীরে কুটীরে চরকার সামগান ধ্বনিত হবে এমন কল্পনা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের পক্ষ থেকে। [ক্রমশ]

---

৮ লাহোর থেকে ৬০ মাইল দূরে বাটালায় সুভাষচন্দ্র প্ল্যানিং-প্রসংগ তুলেছিলেন:

"Concluding his address the Congress President pointed out how the Congress was planning for the future. They had already taken in hand the question of industries and this will have to be followed by planning in respect of all other departments of activity.

"Systematic planning was essential for ordered progress and the Congress had therefore set before itself this task as is done in all progressive countries of the world like Russia and United States." (A.B.P., Nov., 26)

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখন যে কোন্‌ পথ দিয়ে এগিয়ে যায় সে বিষয়ে কিছু আগে থেকে অনুধাবন করার উপায় নেই। পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট উপাধিধারী ব্যক্তিরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একেবারেই অচল। কাজেই সব দিক বিবেচনা করে দিনের পর দিন যে ঘটনা ঘটছে সেটাই লিপিবন্ধ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, এ থেকে পাঠক-পাঠিকারা বরং মর্জিমত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার ভূমিকা নিতে পারেন এবং আমরাও একঘেয়ে মস্তিষ্ক চালনার হাত থেকে রেহাই পাই।

নববর্ষের প্রথম দিন থেকে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী তাঁদের একমাসব্যাপী গণ-অনশন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের নিকট জানিয়েছেন যে, চার বছরের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন না। শ্রীজ্যোতি বসুর কাছ থেকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিয়ে নেবার কোন প্রস্তাবও তাঁর বা তাঁর দলের নেই।

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যুক্তফ্রন্টের নির্দিষ্ট সভা হয় নি, তার কারণ ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্তের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, আগামী ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী যুক্তফ্রন্টের দুই দিবসব্যাপী পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে যুক্তফ্রন্টের সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিরোধ-মীমাংসার সূত্র নিয়ে আলোচনা হবে।

ওই দিন সন্ধ্যায় কার্জন পার্কের একটি বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন : যুক্তফ্রন্টের নেতা শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত অন্য অনেকের সঙ্গে কথা বলে আজ আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। শ্রীদাশগুপ্তের প্রস্তাব হল, চোদ্দ পার্টি বসে আলোচনা হোক, বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা হোক। আমি বলছি, আপনি চেষ্টা করুন এবং সব অতীতকে ভুলে আসুন সকলে বসি। আমরা যুক্তফ্রন্টের চোদ্দ পার্টি আবার ভাই-ভাই হয়ে কাজ করতে চাই। আমি কথা দিয়েছি, ভাষা সংযত করব এবং আমার দৃঢ় ধারণা যত তিক্ততাই সৃষ্টি হয়ে থাক না, একসঙ্গে বসে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টায় কোন বিঘ্ন হবে না, শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের মানুষের এত আশার যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গা কল্পনাও করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে আজ যদি যুক্তফ্রন্ট না থাকে তবে আশা-ভরসার কি থাকবে? যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী কাজ তো একটা দল করে নি—বরং অনেকগুলি দলই করেছে বলা যায়। আমি চাই যুক্তফ্রন্টে বসে সব বিরোধের মীমাংসা হোক।

৩১শে ডিসেম্বরের পরেও যদি এই অনশন সত্যাগ্রহ অব্যাহত থাকত, তাহলে যুক্তফ্রন্ট একেবারেই পতনের মুখে এসে পড়ত। এদিকে ফরোয়ার্ড ব্লক ও সি পি আই-এর পক্ষ হতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁরা যুক্তফ্রন্ট ভাঙবার একান্ত বিরোধী। সি পি এম-কে বাদ দিয়ে কোন মিনিফ্রন্ট গঠনের পরিকল্পনা বা তেমন কোন অভিপ্রায় তাঁদের নেই। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অজয়বাবুর সাম্প্রতিক ভাষণগুলি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, যদিও যুক্তফ্রন্ট ভাঙার কথা তিনি কোন বক্তৃতাতেই বলেন নি। কেরালার পর পশ্চিমবঙ্গে মিনিফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনার কথা বারবার শ্রীসুশীল ধাড়াই প্রকাশ্যে বলেছেন। এছাড়া তিনি এও বলেছেন যে, স্বরাষ্ট্রদপ্তর হাতে পেলে তিনি তিন দিনের মধ্যে সব ঠিক করে দেবেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই সব দায়িত্বহীন উক্তির ফলে প্রচুর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। কতদিনে এবং কিভাবে এ অবস্থা স্বাভাবিক হবে সেটাই চিন্তার বিষয়।

আগেই বলেছি, আমরা কোন রাজনৈতিক ভাষ্য করতে বসি নি। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত আমরাও আশা করব, পুরাতন সকল গ্লানি ভুলে ১৯৭০-এ যুক্তফ্রন্ট নতনভাবে আত্মপ্রকাশ করুক এবং তার ঘোষিত বত্রিশ দফা কর্মসূচী পালনে সচেষ্ট হোক।

## সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীসুকুমার রায়

বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীসুকুমার রায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তাঁকে বাংলা কংগ্রেস সহ-সভাপতি পদ থেকে অপসারণ প্রস্তাব অগণতান্ত্রিক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর তাঁকে অপসারণের কোন অধিকার নেই। তিনি বলেন, শ্রীসুশীল ধাড়া যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চান এবং অনশন সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ভুল পথে নিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় শ্রীসুশীল ধাড়ার ফাঁদে পা দিয়েছেন। শ্রীসুকুমার রায় বলেন, শ্রীসুশীল ধাড়া শিল্পপতি ও কায়েমী স্বার্থের তাঁবেদার হয়ে যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চাইছেন। বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন কোন দল বা সরকারের বিরুদ্ধে হবার কথা ছিল না কিন্তু আন্দোলনকে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে কুৎসার পথে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি বলেন, শ্রীধাড়ার বিরুদ্ধে বাইরে টাকা নেবার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ আছে। শ্রীঅতুল্য ঘোষের দল ছাড়ার সময় যে দুর্নীতি, স্বৈরাচার ও স্বজন-পোষণের অভিযোগ আনা হয়েছিল আজও শ্রীসুশীল ধাড়ার বিরুদ্ধে সেই সকল অভিযোগ আনা যায় এবং তাঁর মতে শ্রীঅতুল্য ঘোষের চেয়ে শ্রীসুশীল ধাড়া আরও বেশি স্বৈরাচারী।

## বেতন কমিশনের সুপারিশ

প্রত্যাশিত বেতন কমিশনের রিপোর্ট তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যথেষ্ট অনুকূলে গেছে। এতে চতুর্থ শ্রেণীর আশী হাজার সরকারী কর্মচারী বেতন মাসে ৫০ টাকা করে এবং চুয়াল্লিশ হাজার করণিকের বেতন মাসে ৪৫ টাকা করে বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। সরকারী বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের জন্য বেতন বৃদ্ধির হার খুবই দরাজ হাতে করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের বর্তমান ৮১টি বেতন হারকে সংশোধন করে ২৯টি বেতন হার চালু করার সুপারিশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কমিশন কলকাতা পুলিশ ও বেঙ্গল পুলিশের মধ্যে ব্যবধান দূর করে এই দুটি অংশকে একত্র করার জন্য অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল দুর্মূল্যভাতাকে মূল বেতনের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার সুপারিশ। এছাড়া পেনসনের পরিমাণ-বৃদ্ধি এবং অন্যান্য নানারূপ ভাতার সংশোধন করার ব্যবস্থাও কমিশন করেছেন।

বলা বাহুল্য, কমিশন যতদূর সম্ভব সরকারী কর্মচারীদের দাবিগুলির প্রতি সুবিচার করারই চেষ্টা করেছেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা স্বভাবতই সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, সুতরাং বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি তাঁরা মেনে নেবেন বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, এই বেতনবৃদ্ধি ন্যায়সঙ্গত, সরকারী কর্মচারীরা নানা কারণেই দীর্ঘকাল থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁদের (অবশ্যই সকলের সম্পর্কে নয়, তবে বেশির ভাগ সম্পর্কে) সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের কিছুটা বেতন বাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ যে বিন্দুমাত্র বর্ধিত হয়েছে তা মোটেই বলা যায় না, বরং তার আরও অবনতি ঘটেছে। এবং সবচেয়ে যা দুঃখের, দুর্নীতি ও ফাঁকিবাজি দূরে হওয়া দূরের কথা, আগে যেটুকুও তাঁদের চক্ষুলজ্জা ছিল আজ তাও নেই। তাঁরা পূর্বের সমস্ত অনাচারকে যুক্তফ্রন্টের নামে দ্বিগুণ করেছেন, কথাটা তিক্ত হলেও অসত্য নয়। তবু আমরা আশা করব, যদি এই বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করা হয়, তাঁরা হয়ত মিনিমাম এফিসিয়েন্সিটুকু দেখাবেন কাজের ক্ষেত্রে, কথায় কথায় কাজ ফেলে ঝাণ্ডা হাতে বেরিয়ে পড়ার শখের বিপ্লবীয়ানাকে ত্যাগ করে কাজে মন দিন। সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান সোভিয়েট রাশিয়াতে বছরে মোট চারদিন পাবলিক হলিডে—নববর্ষ, মহিলা দিবস, মে-দিবস ও নভেম্বর বিপ্লব দিবস—একথাটা যেন তাঁরা স্মরণ রাখেন, শুধু ফাঁকি দিয়ে সমাজতন্ত্র কোথাও বিজয়লাভ করে নি।

করছে না। তাদের বক্তব্য, কুলিরা মাল বহন করা থেকে বিরত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বোনাসের দাবিতে বড়বাজারের কুলিরা বেশ কিছুকাল কর্মবিরতি করেছিল এবং তাদের মজুরীর হার বাড়ানোর সঙ্গত কারণ থাকলেও, তাদের দিয়ে একটি বিপথগামী আন্দোলন চালানো হয়েছিল। বিপথগামী এই কারণেই বলছি যে, ঠিকা কুলি যেহেতু কোন দোকানদারের বাঁধা কর্মচারী নয়, তারা সকলেরই কাজ করে, সেহেতু বোনাসের প্রশ্ন তাদের ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না, তবে তারা দুর্মূল্যের বাজারে মাল বহনের রেট কিছুটা বর্ধিত করার দাবি করতে পারে। যাই হোক তাদের এইভাবে ক্ষেপিয়ে তোলার পিছনে পার্টিবাজি আছে এবং একদা শ্রীজ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটে গেলেও, কতিপয় তথাকথিত শ্রমিক নেতা তাদের আজও নানাভাবে উস্কানী দিচ্ছেন যার ফলে মাল আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে।

কিন্তু এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইউনিয়ন নেতাদের বা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির কি লাভ হচ্ছে জানি না, তবে তার অর্থনৈতিক লাভটি বড়বাজারের ব্যবসায়ীরা পুরোপুরি তুলছে। এই অবস্থায় তারা প্রতিটি পণ্যের দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে যার কোন কারণ নেই। অবশ্য দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। ওরা বলছে যেহেতু কুলিরা মাল বহন করতে অস্বীকার করছে, সেহেতু গুদাম থেকে মাল খালাস করা সম্ভবপর হচ্ছে না, কাজেই সীমাবদ্ধ স্টক থাকার দরুণ মূল্যবৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এটা যুক্তি নয় কু-যুক্তি, আগেও বড়বাজারের এই রকম খেলা আমরা দেখেছি, তখন কুলি সমস্যা না থাকলেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে কোন অসুবিধা হয় নি। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় ডাল নিয়ে এই রকম মুনাফাবাজির খেল চলেছিল। হাওড়া স্টেশনের গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ ডাল জমে থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করে তার ডেলিভারি নেয় নি। এবং আইনের দিক দিয়েও তখন তাদের জব্দ করা যায় নি, কেন না রেলের আইনে নাকি আছে, রেলওয়ে গুদামে ভাড়াটা নিয়মিত দিয়ে গেলেই হল। কাজেই যে কোন একটা মওকা হলেই হল, বড়বাজার দু'পয়সা লুটে নেবে।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু করণীয় আছে। অথচ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিষয়টি যেন এখনও উপেক্ষিত। মন্ত্রিসভার কোন বৈঠকেও বিষয়টি আলোচিত হয় নি। সম্প্রতি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একটি হুঁসিয়ারী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার ফলে অবস্থার কতদূর পরিবর্তন হবে তা বলতে পারা যায় না। নিত্যব্যবহার্য পণ্যসমূহের ওপর এই আকস্মিক মুনাফাবাজিকে রোধ করার মত কোন অস্ত্র কি যুক্তফ্রন্ট সরকারের হাতে নেই? —২।১।৬৯

## মূল্যবৃদ্ধি

নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি বস্তুর মূল্য মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক মূল্যের দ্বিগুণ, কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, মূল্যবৃদ্ধির এই খেলার সূত্রপাত করেছে বড়বাজার। সর্ষের তেলের দাম প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। এমন কি এই শীতের দিনে পেঁয়াজের মত বস্তুরও দাম তার স্বাভাবিক মূল্যের চতুর্গুণ, যদিও ওই বস্তুটির উৎপাদন যে এবারে বিন্দুমাত্র কম হয়েছে, তা মনে করার কোন কারণ নেই। সংবাদে প্রকাশ, গুদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা বস্তু এসে জমে রয়েছে, অথচ সেগুলিকে খালাস করার কোন চেষ্টা বড়বাজারের ব্যবসায়ীরা

স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রমোশন রহস্য আলোচনাকালে আমরা বিভাগীয় আমলাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। কারণ মন্ত্রিসভা সরকারের নীতি নির্ধারণ করেন, কিন্তু সেই নীতির দৈনন্দিন প্রয়োগের ভার থাকে বড় বড় আমলাদের উপর। সেখানে আমলারা যদি অসৎ এবং মতলববাজ হন, তাহলে সরকারী নীতি সুকৌশলে বানচাল করা তাঁদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। আমলাদের মধ্যে যেমন সৎ এবং জনকল্যাণকামী অফিসারের অভাব নেই, তেমনি অসৎ এবং স্বার্থান্বেষীরও অভাব নেই। স্বার্থান্বেষী এবং মতলববাজ অফিসাররা সাধারণত নিজেদের মধ্যে জোট পাকিয়ে বিভাগের সকল স্তরে কাজ হাসিলের ব্যবস্থা করে রাখেন। স্বাস্থ্যদপ্তরেও এই ধরনের একাধিক ক্ষমতালোলুপ গোষ্ঠী আছে বলে শোনা যায়। গোষ্ঠীর কোন একজন ক্ষমতা পেলে বাকী সকলে নানা ভাবে তার ভাগ পেয়ে থাকেন। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে স্বার্থের সংঘাতও অনেক সময় প্রকট হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে, ততক্ষণ সকল গোষ্ঠীই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি মেনে চলেন।

ননীবাবু তাঁর বিভাগের সৎ কেরানীদের কাছে খবর নিলেই উপরোক্ত গোষ্ঠীগুলোর গতিবিধি এবং অপারেশন পদ্ধতি জানতে পারবেন। তাহলে তাঁর পক্ষে গোষ্ঠীপতিদের উপর নজর রাখা সহজ হবে।

'প্রমোশন রহস্য' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনা শেষ হবার পর আমি ভেবেছিলাম স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে চিরকালের মত বিদায় নেব, কিন্তু বাড়ির কাছে আর জি কর কলেজের একটি অভূতপূর্ব ঘটনা আবার আমায় পুরোনো জায়গায় ফিরিয়ে আনল।

গত ৩০শে ডিসেম্বর স্বাস্থ্যদপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী বি ঘোষ এক আদেশ জারী করে জানিয়েছেন যে, আর জি কর হাসপাতালের ফিজিওলজী বিভাগের প্রোফেসর ডাঃ ভোলানাথ মিত্রকে গভর্ণর বাহাদুর ঐ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ করেছেন। ডাঃ এস সি লাহার কাছ থেকে যেদিন তিনি কার্যভার বুঝে নেবেন, সেইদিন থেকেই তাঁর নিয়োগ কার্যকরী হবে।

বিভাগীয় অধ্যাপক থেকে ভাইস-প্রিন্সিপাল হওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু যে কোন পদোন্নতির ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং সিনিয়রিটির প্রশ্নটা নিশ্চয়ই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। ডাঃ মিত্রের ক্ষেত্রে সেটা সঠিকভাবে বিবেচিত হয়েছিল কি? ডাঃ মিত্রকে আমি চিনি না। কাজেই তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পর্কে কোন আলোচনায় যাবার ইচ্ছা আমার নেই। তবে তাঁর চাকরি জীবন সম্পর্কে যে সমস্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য আমার হস্তগত হয়েছে, তাতে তাঁর সিনিয়রিটি সম্পর্কে আমি সংশয়বোধ না করে পারছি না।

ডাঃ মিত্র আর জি কর হাসপাতালের পুরোনো নিয়মকানুন অনুযায়ী চাকরি করেন। কলেজ সরকারী তত্ত্বাবধানে আসবার পর তিনি (নন অপ্‌টি) নতুন নিয়মকানুনের আওতায় আসতে রাজি হন নি। শোনা যাচ্ছে, তাঁর বয়স নাকি ৬০ ধরো ধরো। পুরনো আইনে অবসর গ্রহণের বয়স নির্দেশ করা নেই। কাজেই ডাঃ মিত্রের বয়স যতই বাড়ুক, তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ না করলে তাঁকে রিটায়ার করানো যাবে বিনা সন্দেহ। আইন কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডঃ পি এন ব্যানার্জি অনুরূপ এই আইনের ফাঁকে কতদিন স্বপদে বহাল ছিলেন, তা পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। ভোলানাথবাবু ১৯৬৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরের এক আদেশে ফার্মাকোলজী বিভাগে লেকচারার থেকে রীডার পদে উন্নীত হন। ১৯৬৮ সালের ৮ই আগস্টের এক আদেশে তাঁকে হঠাৎ ফার্মাকোলজী বিভাগ থেকে সরিয়ে ফিজিওলজী বিভাগের কর্মকর্তা করা হয়: সেই আদেশে লেখা আছে,

**M.B. D. Phil), Reader, Department of Physiology ;..shall take over charge as Head of the said Department. . ."**

যে ভোলানাথবাবু ১৯৬৬ সালে ফার্মাকোলজী বিভাগে লেকচারার থেকে রীডার হলেন, তিনি আবার ফিজিওলজী বিভাগে গিয়ে রীডার হলেন কি করে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফিজিওলজী আর ফার্মাকোলজীর ফারাক এত বেশি যে, একই ব্যক্তি এক সঙ্গে দুটি বিভাগ ম্যানেজ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর যদি তিনি ফার্মাকোলজী থেকে ফিজিওলজীতে বদলী হয়ে থাকেন, তাহলে কার আদেশে হয়েছিলেন, সেটা অবিলম্বে প্রকাশ করা উচিত। নইলে লোকের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে।

যাই হোক, ভোলাবাবু ফার্মাকোলজী ছেড়ে ফিজিওলজীর কর্মকর্তা হয়ে বসলেন। তখন সর্ত ছিল, প্রাইভেট প্র্যাকটিশ তাঁকে ছাড়তে হবে। কিন্তু তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিশ ছাড়লেন কিনা তা বুঝতে পারা গেল না। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে ভোলাবাবু ফিজিওলজী বিভাগে প্রফেসর পদে উন্নীত হলেন, কিন্তু সেই আদেশে লেখা হল,

"Governor is pleased to confer the teaching rank of Hony. Professor on Dr. Bholanath Mitra (now working as Hony. Reader, Deptt. of Physiology. .")।

আগের আদেশগুলোয় কোথাও ভোলানাথবাবুকে Hony. (অর্থাৎ অবৈতনিক) বলে উল্লেখ করা হয় নি। হঠাৎ এতদিন বাদে তাঁকে Hony. বলে উল্লেখ করা হল কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে ঠেকছে না কি? ডাঃ মিত্রের নিয়োগপত্রে নাকি লেখা আছে, Dr. Mitra is a wholetime Officer in the graded pay with D.A. এ হেন ব্যক্তি হঠাৎ রাতারাতি সকলের অজ্ঞাতে Hony. হয়ে উঠলেন কি করে? কাগজেপত্রে তো দেখা যাচ্ছে, তিনি যথারীতি বেতন, ভাতা, এমন কি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডও পেয়েছেন। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, ভোলানাথবাবুকে ভাইস-প্রিন্সিপাল নিয়োগ করে শেষ যে আদেশটি ছাড়া হয়েছে, তাতে কিন্ত তাঁকে Hony. বলে উল্লেখ করা হয় নি এবং তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের হেলথ সার্ভিসেস-এর লোক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একজন নন-অপ্‌ট রাতারাতি হেলথ সার্ভিসেসের লোক হলেন কি করে এবং তাঁর Hony.ত্বই বা রাতারাতি কাটা গেল কি করে?

[ শেষাংশ ১৭৪৫ পৃষ্ঠায় ]

[illegible] **তিনটি বড় বড় রাজনৈতিক দল (কংগ্রেস, সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস এবং জনসংঘ) বার্ষিক সম্মেলনে যে কর্মনীতি এবং কর্মকৌশল গ্রহণ করেছেন,** তাতে ১৯৭০ সালে ভারতের রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি কোন্ খাতে প্রবাহিত হবে তার একটা আভাস পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে আমরা সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস এবং জনসংঘের নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। এবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৭৩তম বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কংগ্রেস দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কারা আসল আর কারা নকল তা নিয়ে লোকের মনে সংশয় থাকাই স্বাভাবিক। এ-আই-সি-সি'র অধিকাংশ সদস্য তলবী সভা ডেকে বোম্বাইতে কংগ্রেসের ৭৩তম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করেন। কাজেই আইনানুগভাবে সেটাই জাতীয় কংগ্রেসের আসল বার্ষিক সম্মেলন।

নেহরুর জীবিতকালে কংগ্রেসের আবাডী সম্মেলনে "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে" সমাজ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেটা প্রয়োগ করার কোন চেষ্টা কখনও হয় নি। তার ফলে বিগত কয়েক বছরে ধনী এবং দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার বদলে আরও বেড়ে যায়। দেশের অর্ধশতাধিক বণিক পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর কল্যাণে রাতারাতি ফুলে ফেঁপে মোটা হয়ে ওঠেন এবং একচেটিয়া কারবারের দিকে অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকেন। অপর দিকে দেশের কোটি কোটি মানুষ অভাব-অনটনে ছন্নছাড়া হয়ে দিনগত পাপক্ষয় করতে থাকেন। তার কারণ, কংগ্রেস নেতৃত্বের শক্তিশালী অংশটাই ছিল সমাজতন্ত্রের বিরোধী। ধনিক এবং বণিকশ্রেণীর অনুগ্রহপুষ্ট পাতিল, মোরারজী, নিজলিঙ্গাপ্পা এবং সি. বি. গুপ্ত প্রমুখ জাতীয় নেতারা মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও দেশের অর্থনীতি বণিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেবার পথই প্রশস্ত করছিলেন। সমাজতন্ত্রের অপব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। সরকারী শিল্প-বাণিজ্যের নিন্দাবাদ এবং বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্যের প্রশস্তি করে তাঁরা দেশকে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত করে রক্ষণশীল এবং ধনতান্ত্রিক পন্থায় অটুট রাখবার চেষ্টা করছিলেন। দেশের নবজাগ্রত মানুষ সেই সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে নির্বাচনে কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টা যথেষ্ট ফলবতী হয়। তাতে কংগ্রেসের প্রগতিকামী সাধারণ সদস্যরা দস্তুরমত উদ্বিগ্ন বোধ করতে থাকেন এবং তাঁরা কংগ্রেসের নীতি এবং কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করে দল পুনর্গঠনের কথা ভাবতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে হয় উল্টো প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেস দল জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে দেখে তাঁরা কংগ্রেস দলটিকে একটি পুরোপুরি রক্ষণশীল এবং দক্ষিণপন্থী দলে পরিণত করে 'সমমতাবলম্বী' অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও জনসংঘের সঙ্গে একযোগে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করতে থাকেন। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যরা সেই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে এ-আই-সি-সি'র তলবী সভা ডেকে বেশ কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নেতাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এও বুঝতে পারেন যে, শুধু মুখে সমাজতন্ত্রের জয়ধ্বনি করে আর দেশের মানুষের হৃদয় জয় করা যাবে না। সমাজতন্ত্রের নীতি প্রয়োগ করে লোককে দেখাতে হবে যে, দেশ সত্যিই সমাজতন্ত্রের পথে এগোচ্ছে। তবেই দেশের মানুষ কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্ত থাকতে পারে। নইলে পশ্চিমবঙ্গের মত দেশের সর্বত্রই কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব মুছে যাবে।

তাই বোম্বাই কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে অপব্যাখ্যার আর কোন সুযোগ রাখা হয় নি। কংগ্রেসে অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নই কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সেই উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সমাজের সর্বনিম্ন আয়বিশিষ্ট অংশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং দুর্বলের ওপর প্রবলের প্রভুত্ব বিনাশের জন্য বর্তমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হবে। কংগ্রেসী সমাজতন্ত্র এমনভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা করবে, যাতে দেশে একচেটিয়া কারবারের প্রাধান্য না প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়। বিগত বিশ বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ শক্ত করেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, সেই সব সংস্থাকে আরও জোরদার করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, মিশ্র অর্থনীতিতে বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্যের অস্তিত্ব যথারীতি বজায় থাকবে বটে, তবে কংগ্রেস ঘোষিত সামাজিক লক্ষ্য তাদের মেনে নিতে হবে। বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্যপতিদের সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মত-পার্থক্য থাকতে পারে এবং তাঁরা নিজেরা পৃথক রাজনৈতিক দলও গঠন করতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য দুরকমের হতে পারে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য যে সব অগ্রাধিকার স্থির করা হবে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্যের কর্মসূচী স্থির করতে হবে। সরকারী ও বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্য পরস্পরের পরিপূরকের ভূমিকা নেবে বলে যে কথা প্রচার করা হয়ে থাকে, সেটা বিভ্রান্তিকর। বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্যপতিরা এই বিভ্রান্তির মধ্য দিয়েই নিজেদের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে নিচ্ছেন।

এতকাল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের কথা বললেও কোন্ পথে সেই লক্ষ্যের দিকে এগোনো হবে, সেই কথাটা কখনও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে নি। বোম্বাই কংগ্রেসে সেই পথটাও নির্দেশ করা হয়েছে। সেই পথটা খুব বৈপ্লবিক নয় ঠিকই, তবে বাস্তবানুগ। যেমন ধরুন ১০ দফা কার্যসূচীতে আমদানী-রপ্তানী এবং খাদ্যশস্যের বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু বোম্বাই কংগ্রেসে স্থির হয়েছে যে, বড় বড় কৃষিপণ্যের পাইকারী বাণিজ্য আর অধিকাংশ আমদানী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে এবং রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু এবার এই কর্মসূচী প্রয়োগের সময় অস্পষ্ট রাখা হয় নি। আগামী অর্থনৈতিক বৎসরের

মধ্যেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হবে বলে স্থির হয়েছে। অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তগুলো অতীতের মত অসার প্রতিশ্রুতি মাত্র বলে মনে করবার কোন হেতু নেই। মনে রাখা দরকার যে, প্রগতির পথে এক ধাপ এগোলেই অপর ধাপে এগোবার ভূমি প্রস্তুত হয় এবং পরবর্তী ধাপে পা না বাড়িয়ে উপায় থাকে না। সেই হিসাবে কংগ্রেসের এবারের সিদ্ধান্তগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কংগ্রেসের অর্থনৈতিক প্রস্তাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নতুন ঋণদান নীতির কথাও প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো যাতে সম্পত্তির পরিবর্তে প্রকল্পের ভিত্তিতে ঋণদান করেন, কংগ্রেস তার ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেখানে রাজ্য সরকার অধমর্ণের জামিন দাঁড়াবেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবে ভূমি সংস্কারের বর্তমান আইনগুলো ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে কার্যকরী করবার আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ দেখা দিলে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হবে। প্রস্তাবের এই অংশ সত্যিই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী আমলে জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করে একটা আইন পাশ হয়েছিল। সেই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল বাড়তি জমি মুষ্টিমেয় জোতদারের হাত থেকে উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা। কিন্তু রাজ্যের কংগ্রেস দল জোতদারপুষ্ট থাকায় সেই আইন প্রয়োগ করা হয় নি। আইন পাশের দীর্ঘকাল পরে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা লাভ করে দেখতে পান যে জোতদাররা স্বনামে বেনামে পূর্ববৎ তাঁদের বড় বড় জোত ভোগ দখল করে রেখেছেন এবং কেউ কেউ তার পরিমাণও বাড়িয়ে ফেলেছেন। আর ভূমিহীন কৃষকরা যে শোচনীয় অবস্থায় জীবনযাপন করছিলেন, এখনও সেই অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তখন তাঁরা সেই আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে হাজার হাজার মামলা-মোকদ্দমা এবং ইনজাংশনের সম্মুখীন হন। অর্থাৎ ভূমি সংস্কারের কাজে অগ্রসর হওয়া তাঁদের পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে গ্রামের গরীব কৃষকশ্রেণীও অধৈর্য হয়ে ওঠেন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হবার পর তাঁরা নিজেদের উদ্যোগেই বে-আইনী জমি উদ্ধার করতে সুরু করেন। তাতে কোথাও কোথাও জোতদার এবং কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে হলে ভূমি সংস্কার আইনঘটিত মামলা-মোকদ্দমার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই কংগ্রেস ভূমি ট্রাইবুনাল গঠনের প্রস্তাব রেখে একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে এই প্রস্তাব কার্যকরী করলে কংগ্রেস দলের সততা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকবে না।

দেশের দরিদ্র নাগরিকদের জন্য কংগ্রেস যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেটাও প্রশংসনীয়। স্থির হয়েছে, গ্রামে বেকার সমস্যা মোচনের জন্য সেখানে নানাবিধ কাজকর্ম সৃষ্টি করা হবে এবং প্রত্যেককে গৃহ নির্মাণের উপযোগী জমি দেওয়া হবে। শহরে বস্তি উন্নয়ন এবং গরীবদের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হবে। শহরে যানবাহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং শিশুমঙ্গল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এই সবের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হবে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে সস্তা দরে ঔষধ সরবরাহের একটি কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে।

বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনে সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে, তা প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি প্রস্তাব পাশ হবার আগে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়, অধিকাংশ সদস্যই প্রস্তাবগুলো প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার ওপর বেশি জোর দেন। কেউই চান নি যে, প্রস্তাবগুলো শুধু ফাঁকা কথার ফুলঝুরি হয়ে থাক।

বোম্বাই কংগ্রেসে উত্তর প্রদেশের চিনিকলগুলো জাতীয়করণের প্রস্তাব ওঠায় সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তাতেই তাঁদের "সমাজতন্ত্রবাদের" প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশেই বোধ হয় চিনিকলের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। যুদ্ধের সময় থেকে বছরের পর বছর এই চিনিকলগুলো চিনির কৃত্রিম অনটন সৃষ্টি করে রাতারাতি কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। মূলত এদের টাকাতেই উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস তহবিল উপচে পড়ত। চিনিকলওয়ালাদের পরম প্রিয়পাত্র হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী সি· বি· গুপ্ত। এঁর ৬৩তম জন্মদিনে এঁকে ৬৩ লক্ষ টাকা উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকার প্রায় সবটাই দিয়েছিলেন চিনিকলওয়ালারা। উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বহু সদস্য এই চিনিকলওয়ালাদের কাছ থেকে মাসোহারা পেয়ে থাকেন। কাজেই সেখানে যে মন্ত্রিসভাই গঠিত হোক না কেন, সেটা চিনিকলওয়ালাদের অনুগত হয়ে থাকতে বাধ্য। কিন্তু ভারতে চিনির কারবারের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরাই বলতে পারবেন, এ দেশের চিনি শিল্প জন্মকাল থেকে অসুস্থ এবং তার দুরারোগ্য ব্যাধি মোচনের জন্য চিরকালই জনগণের পকেট কাটতে হচ্ছে। প্রথমে আমদানী চিনির ওপর প্রোটেক্টিভ ডিউটি বসিয়ে দেশীয় চিনি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন সবাই আশা করেছিল সাবালক হলে ভারতীয় চিনি আমদানী চিনির সঙ্গে অনায়াসেই প্রতিযোগিতা করতে পারবে, কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নি। চিনি শিল্প সাবালক হবার আগেই এঁচড়ে পেকে চোরাবাজারের কালোমাণিক হয়ে উঠল। আর চিনি শিল্পের বাড়তি মুনাফা অন্যান্য শিল্পে গিয়ে হাজির হতে লাগল। চিনি শিল্পের আধুনিকীকরণের কাজে কেউ হাত দিলেন না। ফলে উত্তর ভারতের চিনিকলগুলো হয়ে উঠল মাথাভারী। অপর দিকে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে নতুন নতুন চিনিকল গড়ে উঠেছে, তার উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি এবং উৎপাদন পদ্ধতিও কম ব্যয়বহুল। ফলে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উত্তর প্রদেশের চিনিকলগুলোর দম বেরিয়ে যাচ্ছে। তাতে রাজ্যের অর্থনীতিও দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই সেখানে চিনিকল জাতীয়করণের দাবি উঠেছে। কংগ্রেসের বোম্বাই সম্মেলনে সেই দাবি প্রতিধ্বনিত হওয়ায় সিণ্ডিকেটী মোড়লরা প্রমাদ গুণছেন। কারণ চিনিকলগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হলে উত্তর প্রদেশে গুপ্তযুগের (সি· বি· গুপ্ত) অবসান অবশ্যম্ভাবী। কারণ গুপ্তকে মদৎ দেবার কেউ আর তখন থাকবে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে মোরারজী-পাতিলের সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস মুখে যতই প্রগতির কথা বলুক, আসলে তাঁরা বৃহৎ বণিক-

শ্রেণীর আক্রমণের [illegible] নয়।
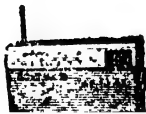
তাই গোড়া থেকেই তাঁদের প্রচেষ্টা হচ্ছে স্বতন্ত্র-জনসংঘের জাতীয় দক্ষিণ-পন্থীদের সঙ্গে একযোগে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়া। সিণ্ডিকেট তাই উত্তর প্রদেশে সি বি গুপ্তের গভর্নমেণ্টকে বাঁচাবার জন্য জনসংঘ এবং এস-এস-পি'র নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এস-এস-পি'র রাজনারায়ণ এবং রবি রায়ের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিণ্ডিকেটী নেতা রামসুভগ সিং ইন্দিরা গান্ধীকে গদিচ্যুত করবার একটা সাধারণ কার্যক্রম স্থির করেন। স্থির হয় যে; কম্যুনিস্ট-বিরোধী এবং সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা রটনার দ্বারা ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টকে আঘাত হানার ভূমি প্রস্তুত করতে হবে। সেই সঙ্গে সম্পত্তিশালী, বিশেষ করে গ্রামের জোতদারশ্রেণীর কাছে গিয়ে প্রচার করতে হবে যে, ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্ট সকলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নেবার মতলব এঁটেছে। জনগণের মধ্যে এই সব এলোমেলো প্রচারকার্য চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ভার দেওয়া হয়েছে রাজনারায়ণজাতীয় নেতার ওপর। সিণ্ডিকেটপন্থীরা আশা করছেন যে, এই বিভ্রান্তির সুযোগে তাঁরা আবার ক্ষমতা দখল করতে পারবেন।

এদিকে মিনু মাসানী স্বতন্ত্র পার্টির প্রেসিডেণ্ট হওয়ায় মার্কিন [illegible] যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। সিণ্ডিকেট কামরাজের মাধ্যমে ইতি-মধ্যেই নাকি বৃদ্ধ রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। রাজাজী নাকি স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে সিণ্ডিকেটের একীকরণের প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু সিণ্ডিকেটের সেনাপতি অশোক মেটা এবং মাসানী এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করছেন না। তাঁরা মনে করছেন, জনগণকে বেকুব বানিয়ে রাখবার জন্য দুই পার্টির পৃথক অস্তিত্বই বাঞ্ছনীয় বেশি। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগও (সি-আই-এ) ইন্দিরা-বিরোধী আন্দোলনে সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। দেশের বড় বড় পুঁজিপতিরা কংগ্রেস এবং সিণ্ডিকেট দুই দলের সঙ্গেই মাখামাখি করে যাচ্ছেন। সরকারী দপ্তরখানায় তাঁদের মাসোহারাপুষ্ট বড় বড় আমলারা তাঁদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে পারবেন বলে তাঁদের ধারণা। তাই এ সব ব্যাপারে তাঁরা কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন। তাছাড়া রাজনৈতিক দল-গুলোর নীতি নির্ধারক স্তরেও তাঁদের বেতনভুক লোকের সংখ্যা কম নয়।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্তমান গতি-প্রকৃতি দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, [illegible] মধ্যে [illegible] এবং দক্ষিণ-পন্থীরা একটি বৃহৎ জোটে সংঘবদ্ধ হয়ে নতুন করে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং তাঁদের সেই প্রচেষ্টায় 'বামপন্থী' বলে পরিচিত এস-এস-পি এবং পি-এস-পি'র কিছু কিছু নেতাকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যাবে।

দেশের বামপন্থী দলগুলো কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের এই জোটবদ্ধ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত আছেন বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যে খেয়োখেয়ি এবং খুনোখুনি চলছে, সেটা দেশের প্রগতিশীল বামপন্থী আন্দোলনকে ক্রমাগতই দুর্বল করে দিচ্ছে। সময় থাকতে তাঁরা যদি সতর্ক না হন, তাহলে দক্ষিণপন্থী জোটের আক্রমণ সামলানো তাঁদের পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়বে। কিন্তু শরিকী বিবাদ এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে যে, দেশের এবং নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলের কথাটা ভাববার অবকাশ বোধ হয় তাঁরা পাচ্ছেন না। তার পরিণাম যে অশুভ সে কথা বলাই বাহুল্য।

—২-১-৭০

## ( সত্যা )গ্রহ সংকট---
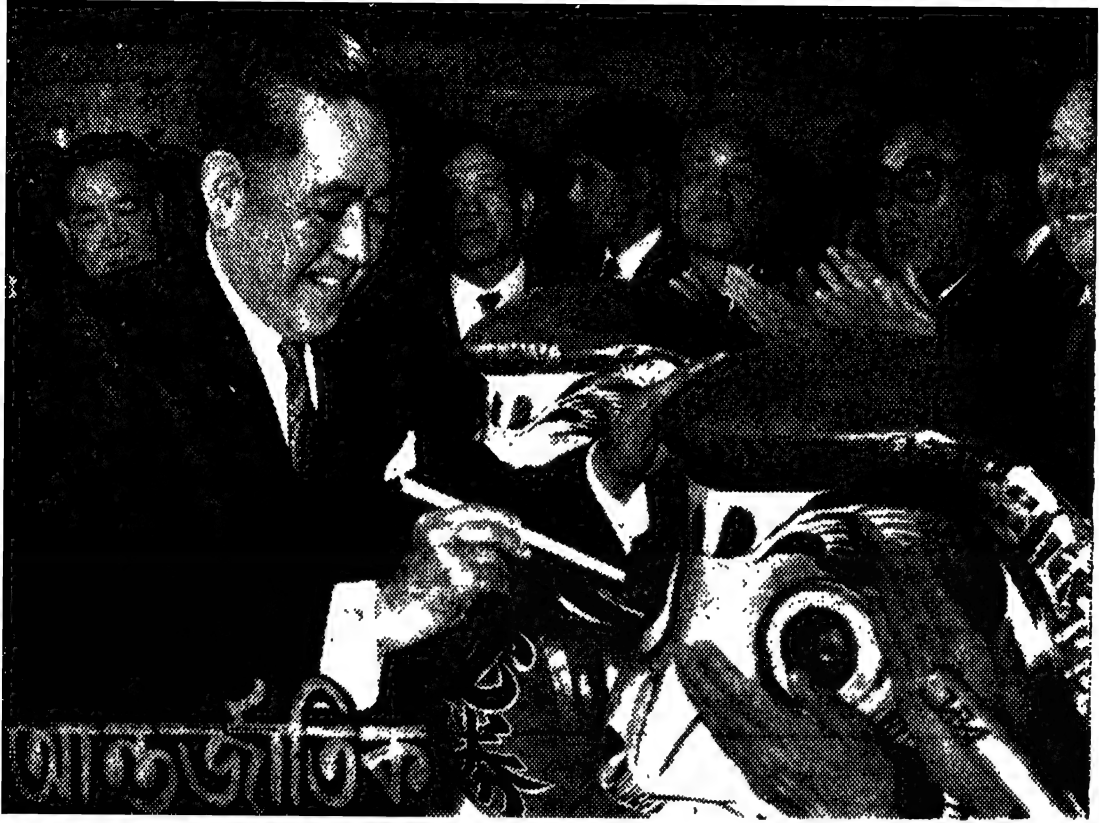
'দারুমা' পুতুলের চোখ এঁকে এসাকু সাটো তার বিজয় উৎসব পালন করছেন।

**জাপান ঃ**

২৭শে ডিসেম্বর জাপানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী এসাকু সাটোর ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে।

জাপানী পার্লামেন্ট ডায়েটের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিসভার (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) মোট ৪৮৬টি আসনের মধ্যে লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। গতবারের তুলনায় লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবার ১১টি আসন বেশি পেয়েছে। মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৭ ভাগ পেয়েছে এই দল। গতবারের চেয়ে আসন ও ভোট, দুইই বেড়েছে দলের।

অন্যান্য দল নিম্নরূপে আসন লাভ করেছে ঃ সোস্যালিস্ট পার্টি—৯০ (মোট ভোটের ২১·৪৪%), বুদ্ধিস্ট কোমিটো পার্টি—৪৮ (১০·৯%), ডেমোক্রাটিক সোস্যালিস্ট পার্টি—৩১ (৭·৭%), কমিউনিস্ট পার্টি—১৪ (৬·৩%) এবং নির্দলীয়—৪। সোস্যালিস্ট পার্টির নির্বাচনী ফলই সবচেয়ে খারাপ হয়েছে। গতবারের চেয়ে তারা এবার ৪৫টি আসন কম পেয়েছে।

বুদ্ধিস্ট কোমিটো পার্টি ও ডেমোক্রাটিক সোস্যালিস্ট পার্টিও দক্ষিণপন্থী দল। এদের সমর্থনের ওপর এসাকু সাটো ভরসা করতে পারবেন। তা ছাড়া কয়েকজন নির্দলীয় সদস্য লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টির সমর্থনে জয়লাভ করেছেন। ফলে, আইনসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাবেন সাটো।

এসাকু সাটো ও তাঁর দলের এই বিরাট সাফল্যের পেছনে ওকিনাওয়া ফিরে পাবার প্রতিশ্রুতি অনেকখানি কাজ করেছে। গত মাসে সাটো ওয়াশিংটনে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে এনেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে ওকিনাওয়া সহ রিয়ুকু দ্বীপপুঞ্জ ফিরিয়ে দেবে। এই ঘোষণার ফলে সাটোর মর্যাদা জাপানে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জাপানীরা এই দাবি জানিয়ে আসছিল।

কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের এই উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সাফল্য জাপানের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও এশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক দিয়ে এক অশুভ ইঙ্গিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি এই বছর শেষ হচ্ছে। ২২শে জুন, ১৯৭০ তারিখ থেকে আরও ১০ বৎসরের জন্য এই চুক্তির মেয়াদ বাড়াবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ আছে। এসাকু সাটো ও তাঁর সরকার এই চুক্তি রাখার পক্ষে। জাপানের বামপন্থীরা, বিশেষ করে ছাত্ররা চুক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু এবারের নির্বাচনী সাফল্যের পর সাটোর পক্ষে নতুন করে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো সহজ হবে। আন্দোলন হয়তো হবে, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে জোর করেই সাটো চুক্তি করবেন। নির্বাচনী ফলের এই ব্যাখ্যা করা হবে, জাপানের জনগণ সাটো সরকারকে এই কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। জাপানের ওপর মার্কিন সামরিক কর্তৃত্ব পুরোমাত্রায় বজায় থাকবে।

ওকিনাওয়া ফিরিয়ে দেবার পরিবর্তে নিক্সন সাটোর কাছ থেকে এই কথা আদায় করেছেন, জাপান এশিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অংশ নেবে। অর্থাৎ, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও সৈন্য সমাবেশ করে কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপে যখন যে দেশে প্রয়োজন হবে জাপান সেখানে গিয়ে হাজির হবে। সোজা কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চৌকিদারের কাজ করবে জাপান।

এখন সাটোর সাহস বাড়বে এই কাজ করার জন্য। জাপানকে নতুন করে যুদ্ধবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার পথ প্রশস্ত হবে। আর এর ফলে, এশিয়ার রাজনীতির ভারসাম্যের পরিবর্তন হবে।

য়ুরোপে পশ্চিম জার্মানী ও এশিয়ায় জাপান, এই দুটি প্রাক্তন যুদ্ধবাদী

প্রসংগকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন তার নিজের সামরিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফল ভয়ংকর হতে পারে।

**সুদান:**

২রা জানুয়ারী খার্তুমে ষাট হাজার উল্লসিত জনতার এক বিরাট সমাবেশে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি গামেল আবদুল নাসের তাঁর দীর্ঘ এক ঘণ্টার ভাষণে ঘোষণা করেন, ইজরায়েলের সংগে চরম সংগ্রামের জন্য এক লক্ষ আরব প্রস্তুত রয়েছে। তারা জীবন বিসর্জন দিয়েও অধিকৃত আরবভূমি ফিরিয়ে আনার জন্য বদ্ধপরিকর।

নাসের দাবি করেছেন, জেরুজালেম ফিরিয়ে দিতে হবে, আর ফিরিয়ে দিতে হবে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের সব জায়গা ও সিরিয়ার গোলান উচ্চভূমি।

নাসের তাঁর ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন না পেলে ইজরায়েল কখনও এভাবে আক্রমণাত্মক নীতি চালিয়ে যেতে পারত না।

প্রসংগত নাসের সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও ফ্রান্সের প্রশংসা করেন। সোভিয়েট য়ুনিয়ন কেবল অস্ত্র দিয়েই আরবদের সাহায্য করে নি। সোভিয়েটের রাজনৈতিক সাহায্য আরবদের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েট সমর্থন তাদের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সকেও নাসের আরবদের মিত্র বলে বর্ণনা করেন।

এই সমাবেশে সুদানের বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল জাফর আল নুমেরিও ভাষণ দেন। তিনিও বলেন, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুদান সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করবে।

রাবাত শীর্ষ বৈঠক ব্যর্থ হবার পর নাসের মুক্তিসংগ্রামের জন্য সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে আলজিরিয়া, লিবিয়া ও সুদান সফর করেছেন। আলজিরিয়ার হুয়ারি বুমেদিয়ান তাঁকে বিশেষ ভরসা দেন নি। কিন্তু তিনি ভাল সাড়া পেয়েছেন লিবিয়ার নতুন বিপ্লবী সরকারের কাছ থেকে। লিবিয়ার বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান কর্নেল মহম্মদ আল্ গাদাফি নাসেরকে অর্থ, অস্ত্র ও লোকবল, সব কিছু দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

**মালয়েশিয়া:**

'এশীয়ানের' (এ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস্) রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠক হয়ে গেল মালয়েশিয়ায়।

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্স্ ও থাইল্যান্ড, এই ক'টি দেশ নিয়ে এই 'এশীয়ান' সংস্থা গঠিত।

'এশীয়ান' পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এবারের বৈঠকের একটা বড় ফল হল—মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনসের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। সাবার ওপর ফিলিপাইনসের দাবি ও হুমকাকে উপলক্ষ করে দীর্ঘদিন ধরে এই দুই দেশের মধ্যে যে মনোমালিন্য চলছিল, তার মীমাংসার জন্য 'এশীয়ানের' নেতারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ঠিক হয়েছে, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনসের নেতারা সাবার প্রশ্ন আলোচনার জন্য অবিলম্বে এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হবেন। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এবারের বৈঠকে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলে এবং বৃটেন এশিয়া থেকে চলে গেলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে সে অবস্থায় 'কমিউনিস্ট আক্রমণের' হাত থেকে কিভাবে নিজেদের রক্ষা করা যাবে, এই কথা ভেবে সবাই চিন্তিত।

অধিকাংশেরই মত হল, নতুন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য নতুন কোন সামরিক জোট গঠনের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকেই নিজের নিজের দেশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, তা হলেই হবে।

থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী থানাট খোমান 'এশীয়ানের' সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে তিনি এর মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানত ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার আপত্তির জন্য তা সম্ভব হয় নি।

(৪-১-৭০)

---

[ ১৭৪৭ পৃষ্ঠার পর ]

ভোলানাথবাবুর যোগ্যতা, দক্ষতা সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও বলা যায় যে, ভদ্রলোকের পদোন্নতির সমস্ত ব্যাপারটাই মাছের গন্ধে ভরপুর। গভর্ণমেন্টের কোন আদেশের সংগেই পরবর্তী আদেশের কোন সংগতি নেই এবং সব কিছুর মধ্যেই একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব রয়েছে।

ননীবাবুর জ্ঞাতসারেই যদি এই সব পরস্পরবিরোধী আদেশ জারী হয়ে থাকে, তাহলে ননীবাবুর কাছে আদেশগুলোর সারমর্ম ব্যাখ্যার দাবি উত্থাপন করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না।

শোনা যাচ্ছে, ভোলানাথবাবুর একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নাকি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ননীবাবুর একজন বিশ্বস্ত আমলা। সেই ভদ্রলোক নাকি ননীবাবুকে ভুল বুঝিয়ে ভোলাবাবুকে ব্যাক করছেন। কথাটা সত্য হলে খুবই পরিতাপের বিষয়। ভোলাবাবুর পদোন্নতিতে কারও আপত্তি থাকবার কথা নয়, কিন্তু অপরের ন্যায়-সংগত দাবি পদদলিত করে যদি তাঁকে উপরে তোলা হয়, তাহলে অন্যান্য ক্যাডারদের মধ্যে গুরুতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যদি কোন অনিয়মিত আদেশ জারী হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে সেটা সংশোধন করা উচিত।

কিছুদিন আগে এই রকম একটি অনিয়মিত আদেশের শিকার হতে চলেছিলেন কল্যাণী হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এই তরুণ চিকিৎসক কল্যাণী হাসপাতালে গিয়ে অনেক চুরি-চামারি ধরেছেন এবং হাসপাতালের অনেক উন্নতিও করেছেন। কিন্তু চুরি-চামারির সংগে জড়িত কিছু অসাধু লোক এঁর বিরুদ্ধে কল্যাণীতে হামলাবাজীতে সামিল হয়। সেই হামলার পেছনে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর হেলথ ডিরেক্টরেটের দুজন পদস্থ আমলার যোগসাজস ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সংগে সংগে সেই আমলারা মন্ত্রীর কান ভাঙিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদাবনতির ব্যবস্থা করে। ননীবাবু নিজে সেই ডাক্তারের সততা এবং দক্ষতা সম্বন্ধে অবহিত থাকা সত্ত্বেও আমলাদের চক্রান্তে তাঁর পদাবনতির প্রস্তাবে নাকি মত দেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি সেই চক্রান্তের কথা বুঝতে পেরে আবার নাকি তাঁকে স্বপদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন। ননীবাবুর এই দৃঢ়তা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। তবে তিনি যদি আরও একটু সজাগ থাকেন, তাহলে আমলাদের চক্রান্ত আগেই ধরে ফেলতে পারবেন।

মনে রাখা দরকার যে, সরকার পাল্টালেও প্রশাসনিক কাঠামোটা পাল্টায় নি। কাজেই সেই কাঠামোর উপর মুহূর্তের নির্ভরতাও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আনন্দ তার বক্তৃতা বন্ধ করতে বাধ্য হোলো আমার প্রস্তাব শুনে। বললে—আমি ভেবেছিলুম, উনিশ শতকের মধ্য-পর্বের নাটকের প্রসঙ্গই আমরা অতঃপর ভেবে দেখবো। যাক, তুমি অক্ষয় দত্তের প্রসঙ্গই এখনো ধরে থাকতে চাও তো? বলো—যা বলবার আছে। কিন্তু রাম-নারায়ণের নাম করলে যেন?—তিনি তো 'নাটুকে রামনারায়ণ'?

আমি বললুম—হাঁ 'নাটুকে রাম-নারায়ণের' কথাই বলতে চাই। অক্ষয় দত্তের চেয়ে বয়সে বছর দুয়েকের ছোটো ছিলেন রামনারায়ণ। মানব-জীবনের দুঃখ-কষ্ট, সীমা-সংকোচ তিনি যে কিছু কম বুঝেছিলেন, তা মনে হয় না। কিন্তু তাঁর প্রকাশের রীতি অনেক বেশি স্বাদু বলে মনে হয়। অক্ষয় দত্ত জ্ঞানী, বিচক্ষণ, পণ্ডিত ছিলেন—একথা মানতে আপত্তি নেই। কিন্তু এই আমাদের বই-বাছাইয়ের কাজে মধুসূদন-বঙ্কিমের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তাঁর নাম উল্লেখ করবার উৎসাহ পাই না।

আনন্দ একটু যেন ধমকের সুরে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—রামনারায়ণ বুঝি মধুসূদন-বঙ্কিমের সমান প্রতিভাধর ব্যক্তি? তুমি তাই মনে করো না কি?

বললে—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই অধ্যবসায়ী গবেষক ছিলেন,—এ কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। কিন্তু সাহিত্য-গুণের তিনি যে অভ্রান্ত সমঝদার ছিলেন, —একথা বলতে আমারও দ্বিধা হয়। রামনারায়ণ সম্বন্ধে তুমি তাঁরই মত মনে রেখেছ তো? আমি জানি তুমি কী বলতে চাও।

আমি বললুম—বোধ হয়, ব্রজেন্দ্রনাথের নিজের কথাগুলি তোমার ঠিক মনে নেই। তিনি লিখেছিলেন—'মাইকেলের মত তিনিও অসাধারণ শিল্পপ্রতিভাবলে প্রাণহীন গতানুগতিকতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলাদেশে যে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারই কবিকীর্তির দ্বারা তাহা সর্ব-প্রথম সার্থকতা লাভ করে। ইহা এক হিসাবে অধিকতর বিস্ময়কর এই কারণে যে, বহুভাষাবিৎ মধুসূদন ইউরোপীয় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দীর্ঘকাল কলিকাতা গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলংকারের একজন অধ্যাপক ছিলেন, ইউরোপীয় বা আধুনিক পদ্ধতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনই পরিচয় ছিল না।"

আনন্দ বললে—দ্যাখো, বাংলা ভাষার প্রয়োগশিল্পী যাঁরা, তাঁদের মন-মেজাজই কেমন যেন ঢিলেঢালা, অত্যুক্তিপরায়ণ। ব্রজেনবাবু মধুসূদনের প্রসঙ্গে ঐ যে লিখেছেন 'ইউরোপীয় জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনের' ব্যাপার,—ওটা কি অত্যুক্তি নয়? মধুসূদন কি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের বা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সমুদ্রে একটিবারও ডুব দিয়েছিলেন বলে মনে হয়? ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থ-নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে ইউরোপ তাঁর নিজের সময় পর্যন্ত জগৎকে কী কী দিয়েছে,—সে-সম্বন্ধে বৃত্তান্ত বা আলোচনাও কি তাঁর রচনায় বিদ্যমান?

আমি বললুম—বৃথা তর্ক ভাল নয়, আনন্দ। আমার উপস্থিত বক্তব্যটা বাধা পাচ্ছে এইসব তর্কে। রামনারায়ণকে মধুসূদনের সঙ্গে এক আসনে বসতে দিতে অন্তত ব্রজেন্দ্রনাথের মতন একজন গবেষকের যে আগ্রহ ছিল, সে তো দেখা গেল? হরিনাভির রামধন শিরোমণি মশায়ের এই ছেলেটি শৈশবেই বাপ-মাকে হারিয়ে বড়ো ভাই প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের কাছে মানুষ হন। অক্ষয় দত্ত যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কাজে ব্যস্ত, রামনারায়ণ তখন তাঁর দাদা এই প্রাণকৃষ্ণের কাছে থেকে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ আবার ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদনা করেন কিছুদিন। ঈশ্বর গুপ্ত রামনারায়ণের গুণগ্রাহী ছিলেন। অক্ষয় দত্তের সঙ্গে রামনারায়ণের মিল শুধু একই কালের মানুষ হিসেবে নয়,—গুপ্ত কবি এই দুজনেরই অনুরাগী ছিলেন। রামনারায়ণ যখন হিন্দু মেট্রো-পলিটন কলেজের শিক্ষক, সেই সময়ে—১৮৫৩ খৃস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বরের 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় ঈশ্বর গুপ্ত রামনারায়ণের প্রশংসা করে কয়েক ছত্র লিখেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ সে-সব ছত্র তাঁর পুস্তিকায় ছেপে দিয়ে গেছেন—দেখেছো নিশ্চয়?

সে বললে—হাঁ, সে কথাগুলি দেখেছি। রামনারায়ণ যে অক্ষয় দত্তের সঙ্গে একই বছরে—১৮৮৬ খৃস্টাব্দে লোকান্তরিত হন, তাও মনে পড়ছে। তিনি যে একজন জাত-মাস্টার ছিলেন, সে-কথাও সত্যি। নাটক লেখা আর পণ্ডিতী করা—এই দুটিই তাঁর প্রিয় কাজ ছিল। কিন্তু তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রকাশের আগেই বাংলার অন্যান্য নাটক বেরিয়ে গেছে—যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তি-বিলাস' এবং তারাচরণ সীকদারের 'ভদ্রার্জুন' দুটিই প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খৃস্টাব্দে। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' বেরোয় ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে। রামনারায়ণ দেখা দেন তার পরের বছরে—১৮৫৪ খৃস্টাব্দে।

আমি বললুম—দু'এক বছর আগে-পরের এই দূরত্ব কিছুই নয়। বাংলার

সমাজ তখন নানা ধাক্কায় বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে মাস্টার এবং নাট্যকারের জীবন তখন যে খুব সুখের ছিল, তা মনে করবার প্রমাণ কই? মনে আছে তো—১৮৫২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারিতে যে নববর্ষ হয়, সেই নববর্ষ মনে রেখেই ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—

গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বস গিয়া বিবিদের ঘেঁসে॥
রাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম্।
ডোন্ট কেয়ার হিন্দুয়ানী ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্॥

—এসব তো উল্টো উদাহরণ দিচ্ছো! এতে তো সুখের ছবি দেখতে পাচ্ছি! একটু পরিহাসের সুর লেগেছে বটে,—কিন্তু এতে দুঃখের ধাক্কা কোথায়?

—ঈশ্বর গুপ্তের কাছে তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর সাহেব-ভক্তির যাবতীয় দৃশ্যই ছিল দুঃখের দৃশ্য। তিনি রামনারায়ণের মতোই সমাজের নানা অনাচার সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। অক্ষয় দত্তের মতো গম্ভীর গদ্যবার্তা নেই এঁদের রচনায়। এঁদের রীতিই অন্যরকম। ঈশ্বর গুপ্ত ঠাট্টা করে লেখেন—

সাড়ী পরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলোক নেটিভ লেডি শেম শেম শেম॥
সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুল্কি॥
ধরে থেকে চিরকাল পায় মহাদুখ।
কখন দেখে না পরপুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দু রামা শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো অন্ধকারে থেকে॥

বললুম—এসব মোটেই ফুর্তির মেজাজে লেখা নববর্ষের রোশনাইয়ের ছড়া নয়। ঈশ্বর গুপ্তের অনেক দুঃখ ছিল যে, তাতে সন্দেহ নেই। 'ছদ্ম মিশনারি'-তে তিনি লেখেন—

কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
মিশনারি ছেলেধরা ছেলে ধরে খায়॥

কৌলীন্যের অত্যাচারে আমাদের সমাজ তখন যে বিপর্যস্ত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। রামনারায়ণ তা দেখিয়ে গেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখে গেছেন—

কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥
দুধে দাঁত ভাঙে নাই শিশু নাম যার
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার॥

আনন্দ বললে—এইসব উদাহরণ কিছুই প্রমাণ করে না। ঈশ্বর গুপ্ত, রামনারায়ণ এবং সেকালের আরো যাঁরা সেকালের নানা ঘটনার দুঃখের দিকটাকেই তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়েছিলেন, তাঁদের নামের তালিকায় অথবা তাঁদের রচনার উদ্ধৃতি পরিবেষণের ফলে কি এই কথাই প্রমাণিত হবে যে, অক্ষয় দত্ত বা ঐ শ্রেণীর অন্যান্য লেখকদের চেয়ে তাঁদের আবেদন বেশি? যদি দুঃখবৃত্তান্তই গুণের নিরিখ হয়, তাহলে আমি এ আলোচনা থেকে সরে দাঁড়াতে চাই। কারণ, আমি তা মানি না।

আমি ফস্ করে বললুম—আমিও তা মানি না।

—তাহলে তুমি এসব বলছো কেন?

—বলছি, আসল কথায় পৌঁছবো বলে।

—সংক্ষেপে বলো সে-কথা।

—একটু উদাহরণ না দিলে কথাটা আকস্মিক আপ্তবাক্য মনে হবে—এই আশঙ্কাতেই কিছু কিছু উদাহরণ শোনালুম।

আনন্দ বললে—এতো সব অবান্তর উদাহরণের দরকার কি? অক্ষয় দত্ত তাঁর বন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের কথাই তো রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছিলেন—'ইহাই মর্ত্যলোকের স্বরূপ। এ লোকে আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা!' এ থেকে দুঃখচেতনাটা পুরোপুরি একটা সাংবাদিক আচরণ মাত্র!

আমি বললুম—কিন্তু সরস।

—ঈশ্বর গুপ্ত গ্রাম্য।

—অক্ষয় দত্ত মন্দগতি।

—ঈশ্বর গুপ্ত তরল।

—অক্ষয় দত্ত কৃত্রিম ছিলেন না, কিন্তু ভারসর্বস্ব।

আনন্দর সঙ্গে যখন এইরকম কথা কাটাকাটি তীব্র হয়ে উঠলো, তখন আমি একখানি বই টেনে নিয়ে তাকে কয়েকটি কথা পড়ে শোনাবার চেষ্টা করলুম—

[ক্রমশ]

॥ এক ॥

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার একটা গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছুদিন আগে কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি কেরালার মত না হলেও, এখানে বিভিন্ন শরিকদলের পারস্পরিক অবিশ্বাস, সংঘর্ষ ও হানাহানি একটা অস্বাভাবিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রত্যেকটি দলই একে অপরের বিরুদ্ধে সমানে বিষোদ্গার করে চলেছে। বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অনশন সত্যাগ্রহ অবস্থাকে আরও সংকটজনক পর্যায়ে এনে ফেলেছে এবং এই উপলক্ষে এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে কুৎসার বাণ ছুঁড়েছে, তার স্মৃতি সহজে নিদ্রিত হবার নয়। এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আমার মনে হয়, যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে বিভিন্ন শরিকদলের অনান্তরিক মনোভাবের ফলে। সকলেই যুক্তফ্রন্টকে নিজ দলের উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করতে চাইছেন, এবং কার্যত তাই করছেন। আজকে যুক্তফ্রন্টের সংকট এই কারণেই, এবং সেই সংকট আনয়নের দায়িত্ব একে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করছেন। যে মৌলিক প্রত্যয়গুলির ওপর যুক্তফ্রন্টের ধারণা প্রতিষ্ঠিত, বা তা হওয়া উচিত, এবং সেগুলি সম্পর্কে প্রকৃত বোঝাপড়ার অভাবের জন্যই এত গণ্ডগোল, সেগুলির ওপর বহুকাল পূর্বে জর্জি ডিমিট্রভ উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছিলেন। সময়োচিত বলেই তাঁর বক্তব্যগুলি এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করছি।

॥ দুই ॥

জর্জি ডিমিট্রভের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর জন্ম বুলগেরিয়ায় ১৮৮২ সালে। ১৯০২ সালে তিনি বুলগেরীয় সোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগদান করেন এবং পরে মার্ক্সবাদে দীক্ষা নেন। ১৯০৯ সালে তিনি বৈপ্লবিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং ওই পদে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালানোর অভিযোগে দণ্ডিত হন। ১৯১৯ সালে তিনি ব্লাগোয়েভের সঙ্গে একযোগে বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন এবং ১৯২১-এ মস্কোয় অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদান করেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে বুলগেরিয়ার ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থানে তিনি নেতৃত্ব দেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হবার জন্য তাঁকে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মানীতে হিটলারের গেস্টাপো কর্তৃক ধৃত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরে রাখা সম্ভবপর হয় নি। ১৯৩৫ সালে তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হন। মহাযুদ্ধের পর বুলগেরিয়া ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে মুক্ত হলে তিনি বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন, এবং যুদ্ধোত্তর বুলগেরিয়ার পুনর্গঠনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও মার্ক্সবাদের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা হিসাবে ডিমিট্রভকে বহু উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ২রা জুলাই ডিমিট্রভ পরলোকগমন করেন।

॥ তিন ॥

আগেই বলেছি, ১৯৩৫ সালে ডিমিট্রভ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের কার্যনির্বাহক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারীর পদে নির্বাচিত হন। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে সেই সময় ফ্যাসীবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, এবং ডিমিট্রভ সেই বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে। তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্যে তিনি বহু দিক সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন, তবে আমরা এখানে যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত বিষয়েই তাঁর মতামত সংক্ষেপে বিবৃত করব।

একজন কমিউনিস্ট হিসাবে ডিমিট্রভ নিশ্চয়ই আশা করেন না যে, যুক্তফ্রন্ট একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার, একটা এণ্ড ইন ইটসেল্‌ফ। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে এটাকে একটা অস্থায়ী ব্যাপার, নিছক দলীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার বলেও মনে করেন না। তাঁর মতে যুক্তফ্রন্টের একটা নিজস্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে, এবং সেই ভূমিকা যাতে সুপ্রতিপালিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্তব্য। প্রগতিশীল বিভিন্ন দল ও সংগঠনের যুক্তফ্রন্টই একমাত্র জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সক্ষম যার সুফল শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেই পরে প্রযুক্ত হতে বাধ্য। সেই অবস্থাতেই যুক্তফ্রন্ট সরকার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে যখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র বহুলাংশে বিপর্যস্ত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যখন জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ—বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী—প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত, অথচ যখন কমিউনিস্ট পার্টির পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে লড়াই করার মত মানসিকতা সকলের গড়ে ওঠে নি।

বিশেষ কোন পরিস্থিতি গড়ে না উঠলে, প্রচলিত সরকারের রাজনৈতিক সংকটকে ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর সরকার গড়ে তোলা যায় না, এবং সেই কারণেই যুক্তফ্রন্ট অনিবার্য হয়ে ওঠে। আসলে যুক্তফ্রন্ট কি, সেটা স্পষ্ট করে না বোঝার ফলে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী উভয় প্রকার বিচ্যুতির সম্ভাবনা থেকে যায়। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার কমিউনিস্ট ও সোসাল-ডেমোক্রাটদের কোয়ালিশন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে সেইটাকেই সত্য বলে মনে করলে তা অতিসরলীকরণের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। ডিমিট্রভের মতে, রাজনৈতিক চরিত্রের দিক থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার একেবারেই পৃথক, কেন না তা ভিন্ন আদর্শের দ্বারা পরিচালিত। সেই আদর্শটি হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের যে বৃহত্তম অংশ শোষণ, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে সংহতি আনা, ব্যাপকতর ও উন্নততর সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করা। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন যুক্তফ্রন্ট ব্যতিরেকে সিদ্ধ হতে পারে না।

সোসাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোন সমঝোতা হতে পারে না—অতি-বামপন্থীদের এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে ডিমিট্রভ বলেছেন যে, আসলে সোসাল-ডেমোক্রাটদেরও বিভিন্ন শিবির আছে, এবং তাদের মধ্যেও প্রগতিশীল অংশ আছে যারা বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করতে চায়। ভারতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে, এবং পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে, ডিমিট্রভের এই বক্তব্য প্রযোজ্য, নতুবা আজ কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হত না। শুধু কংগ্রেসই নয়, সোসাল-ডেমোক্রাটদের অপরাপর শিবিরগুলিও দ্বিধাবিভক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিধাবিভক্ত। সোসাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সর্বদাই যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী থাকবে এবং তারা নানাভাবেই যুক্তফ্রন্ট সংগঠনকে সাবোটাজ করবে, কিন্তু তাদের থাবা থেকে প্রগতিশীল সোসাল-ডেমোক্রাটদের বিচ্ছিন্ন করে আনা সম্ভবপর। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের শরিক সর্ববৃহৎ সোসাল-ডেমোক্রাট দল বাংলা কংগ্রেসের ইতিহাসের দিকে তাকালেই এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। জন্মের পর থেকেই এই দলের একটা অংশ প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের সঙ্গে আঁতাত স্থাপন করেছিল, ভারতীয় ক্রান্তি দল নামে একটি প্রতিক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে মিশেও গিয়েছিল। ঘোষ মন্ত্রিসভার সময়ে এই দলের থেকেই সর্বাধিক দলত্যাগ ঘটেছিল। বাকি অংশটি পরে আবার পূর্ব নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সামিল হয়। বর্তমানে আবার সেখানে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক এই যে সত্যাগ্রহ হয়ে গেল, তার ঘোষিত আদর্শ যতই মহৎ হোক না, তার পিছনে একটি নেপথ্য রাজনীতিও কাজ করেছে, এবং বলাই বাহুল্য তাতে মদত জুগিয়েছে ওই দলের অভ্যন্তরস্থ একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, যারা মুখ্যমন্ত্রীকেও তাদের পথের সামিল করেছে, তাঁর কথাগুলি জেনুইন ফিলিং-এর সুযোগ নিয়ে। এ না মানলে বাংলা কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার সাম্প্রতিক পার্জিং-কে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সব ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে সোসাল-ডেমোক্রাটদের একটা অংশ বৃহত্তর জনসমাজের স্বার্থেই কাজ করতে চায়। গণ-আন্দোলন যত ব্যাপক হবে সোসাল-ডেমোক্রাট শিবিরে ততই প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীলের ফাটলটা বৃদ্ধি পাবে। এবং সেই সঙ্গে গণ-আন্দোলনসমূহকে নিচু থেকে যত গড়ে তোলা যাবে, যুক্তফ্রন্ট ততই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর ভিত্তি পাবে।

## ॥ চার ॥

যুক্তফ্রন্ট সরকারের নির্দিষ্ট কর্মধারা আছে যেগুলির ওপর ডিমিট্রভ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য ও সংহতি আনাই শুধু নয়, ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে বহুমুখী প্রগতিশীল নীতিসমূহকে বাস্তবে কার্যকরী করার দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের। উৎপাদন ও ব্যাংকসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা, পুলিশ-ব্যবস্থাকে বৃহত্তর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা ইত্যাদি বহুবিধ কর্মের তালিকা ডিমিট্রভ দিয়েছেন। সোসাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে আপোষে ক্ষমতাভোগ করা এবং গতানুগতিকভাবে মন্ত্রিত্ব চালিয়ে যাওয়াকে ডিমিট্রভ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ আখ্যা দিয়েছেন, পক্ষান্তরে যারা যুক্তফ্রন্টকে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মানতে না চায় তাদের তিনি বামপন্থী হঠকারী বলেন। যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে যারা খাটো করতে চায় তারা আসলে লেনিনের নির্দেশকেই লংঘন করে যিনি বলেছিলেন শুধু প্রচার ও বিক্ষোভ প্রদর্শনেই জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা গড়ে ওঠে না, তা গড়ে ওঠে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মারফৎ। এই অভিজ্ঞতা যুক্তফ্রন্টই জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করতে পারে, প্রগতিশীল কর্মধারার মারফৎ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে যে, কারা তাদের শত্রু, কারা তাদের মিত্র।

ডিমিট্রভ বলছেন, কমিউনিস্টরা সর্বশক্তি দিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করবে, কিন্তু অবশ্যই এই সংকীর্ণ মনোভাব দ্বারা চালিত হবে না যে, এটা হচ্ছে পার্টির দলবৃদ্ধির হাতিয়ার। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মনোভাবটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের প্রত্যেকটি প্রধান শরিকদলের মধ্যেই খুব তীব্র, প্রত্যেকেই যুক্তফ্রন্টের মূল্যে দলীয় শক্তি বাড়ানোর চেষ্টাই করছেন, তার ফলে অনেক অবাঞ্ছিত এলিমেণ্ট এই সকল দলে ঢুকে পড়ছে; যুক্তফ্রন্টের সাম্প্রতিক যে ইমেজ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মূল কারণ এখানেই। যুক্তফ্রন্টের মূল্যে নয়, যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করেই পার্টির শক্তিবৃদ্ধি সম্ভবপর। যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে সোসাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে হবে, সোসাল-ডেমোক্রাটদের প্রগতিশীল অংশকে বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে। ডিমিট্রভ বলেছেন, এটা আশা করা যায় না প্রগতিশীল সোসাল-ডেমোক্রাটরা দলে দলে রাতারাতি বৈপ্লবিক হয়ে পড়বে, বা কমিউনিস্ট হয়ে যাবে। তাদের অনেকগুলি পরিবর্তনশীল স্তরের মধ্য দিয়ে আসতে হবে, এবং সেটা তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দ্বারাই সম্পাদিত হবে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাত্ত্বিক বন্ধ্যাত্ব দিনের পর দিন প্রকটিত হতে বাধ্য, তাদের শ্রেণীসমন্বয় মতবাদের অসারতা যত স্পষ্ট হবে ততই তারা শ্রমিক আন্দোলনসমূহের নিকটবর্তী হবে, এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শরিক থাকাকালীন এই পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই ত্বরান্বিত হবে।

যে সকল রাষ্ট্রে ফ্যাসীবাদ কায়েম রয়েছে সেই সকল স্থানের যুক্তফ্রন্ট যে সকল রাষ্ট্রে তা নেই সেই সকল স্থানের যুক্তফ্রন্টের চেয়ে পৃথক হবে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের মূল উদ্দেশ্য ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে, সেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি। কেন না তাকে একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় অপরদিকে তাকে কৃষক-শ্রমিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষদের অধিকারসমূহকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ধনতান্ত্রিক অথবা ধনতন্ত্রাভিমুখী রাষ্ট্রে সোসাল-ডেমোক্রাটিক দলগুলির মধ্যে যখনই ব্যাপকভাবে ভাঙন দেখা যায়, তখনই বুঝতে হবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, এবং প্রগতিশীল সোসাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট করার সেটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। কোন একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্ট হলে, বা বিশেষ নীতির ক্ষেত্রে সোসাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিক্রিয়া দেখেই তাদের মধ্যে কারা প্রগতিশীল তা বোঝা যাবে। এই রকম ক্ষেত্রে ধরা যাক ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাংক জাতীয়করণ বা ভূমি সংস্কার, তাদের মধ্যে একদল সোজাসুজি বুর্জোয়া শিবিরে যোগদান

# সকলেই কিছু চাঁদা দিন

বেণু দত্তরায়

সারাদিন আজ জনসভা
প্রার্থনা ও উপবাস আটাত্তর প্রহর নামযজ্ঞ
ঘরে ঘরে আজ শান্তির ললিত ধূপ পুড়বে
মন্দিরে প্রদীপ জ্বলবে
মসজিদে কোরাণ পড়বে
ওদিকে শিশুর হাসি
(আহা নেহেরুজী বড়ো ভালোবাসতেন)

সারাদিন আজ জনসভা
বেকার দালাল পকেটমার ও চাকুরিজীবী
সকলেই কিছু চাঁদা দিন
ভাই-রাদার ও দাদারা
সকলেই কিছু কিছু গুড় ও চিনি দিন
যথারীতি ওদিকে কিন্তু আঠারোটা লাস
এবং বেওয়ারিশ গুলী
ওয়াগানব্রেকাররা যথারীতি ব্যস্তসমস্ত
এবং জনসাধারণ খট্টাঙ্গে ধপাস
স্বেদ-কম্প্র ও বিভূতি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

যদিও কিন্তু শান্তির জন্য কারুরই হাত ওঠে না
বৃষোৎসর্গ মতান্তরে তিল ও তৈলদান
দয়া করে দেশভূমি দেশভূমি বাত ছাড়ুন
ভারতমাতা ধূপ কিনুন
ঘরে গিয়ে জ্বালালেই দেশের পয়সা
দেশে থাকবে
এবং টাকও খুব চকচক করবে।

শুধু কিছু চাঁদা ছাড়ুন, জনসভার জন্য চাঁদা।

# এখন বিস্ফোরণ

শ্যামলেন্দু রায়

এমন প্রদাহ নিয়ে কতোক্ষণ
বেঁচে থাকা?

সমস্ত শরীর রক্ত অসহ্য উত্তাপে
ফুটন্ত পলাশ...উষ্ণ হাওয়া...
রাশি রাশি পাতা ঝরে
পর্ণমোচী বনে

সোনার যৌবন রে...অমন প্রসন্ন বেলা
অন্ধকারে
বঙ্কিম মুহূর্তগুলি করলগ্ন একা এব
কেন হাত বাড়াবি না
করতলে ক্রুদ্ধ ফণা?

অনুক্ষণ ডুগডুগি ডুগ্ ডুগ্
ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ...
অগ্নিকোণে অবিশ্রান্ত
সমস্ত মধ্যাহ্নবেলা সমস্ত প্রহর
মরা হাড়ে বাতাসের স্বর

লাগ লাগ লাগ ভেল্কী লাগ
নির্বিকার ঈশ্বরের মুখে ঘৃণা ছুঁড়ে
এখন বন্দরে হাটে
চোখে চোখে চাপা বিস্ফোরণ।

করবে, আর একদল দোদুল্যমান থেকে কিছু রাজনৈতিক মুনাফা লোটার চেষ্টা করবে, কিন্তু একটি শ্রেণী সত্যই চাইবে যে, ওই নীতিগুলি কার্যকরী হোক। তারা এজন্য দলের মধ্যে সংগ্রাম করবে এবং প্রয়োজন হলে জোট থেকে বেরিয়ে আসবে।

॥ পাঁচ ॥

অতি সংক্ষেপে ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট-তত্ত্ব, অন্তত তার কয়েকটি দিক, আমরা এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের বামপন্থী নেতাদের কেউই ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত নন, তাঁদের দলীয় পত্র-পত্রিকায়, দেওয়ালের পোস্টারে, সভা-সমিতিতে ডিমিট্রভের বক্তব্যসমূহের প্রতিধ্বনি সর্বদাই পাওয়া যায়। তথাপি কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' আছে। যুক্তফ্রন্টের সমর্থক একজন প্রগতিশীল নাগরিক হিসাবে বর্তমান লেখকের মনে হয় যে, ডিমিট্রভের প্রতি লিপ-লয়ালটি থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দলগুলি যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে হয়ত ততটা আন্তরিক নন। যুক্তফ্রন্টের মূল্যে পার্টিকে শক্তিশালী করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করে নয়। নতুবা এত শরিকী হানাহানি ঘটত না। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকবে, না টিকে উপায় নেই বলেই।

কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসন আজ দ্বিধাবিভক্ত, এবং এটাকে নিছক ক্ষমতালোভী দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব বলে মনে করলে ভুল হবে। যদিও একথা মনে করার কোন কারণ নেই, প্রধানমন্ত্রীর সমর্থক গোষ্ঠী রাতারাতি প্রগতিশীল হয়ে গেছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে পালে হাওয়া লেগেছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রেও একটি প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান শিবিরও যে খুব সংহত সেকথা মনে করার কোন কারণ নেই। যে সকল উচ্চশব্দ সৃষ্টিকারী প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে গেলে তাঁর দলেও ভাঙন অনিবার্য, এবং তা না করলেও যাঁরা সত্যই ওই প্রতিশ্রুতিগুলিকে কার্যে রূপায়িত হতে দেখতে চান, তাঁরা বিদ্রোহী হবেন। তাই ডিমিট্রভের তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে এ কথা মনে করার কোন কারণই নেই, বরং আজকের ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনশীল পর্যায়ে ডিমিট্রভের তত্ত্বের উপযোগিতা নতুন করে দেখা দিয়েছে।

## দুই সাংবাদিকের দৃষ্টিতে

॥ এক ॥

**পশ্চিম** বাংলায় যুক্তফ্রন্টের কোনো বিকল্প নেই, একমাত্র রাষ্ট্রপতির শাসন ছাড়া। অথচ যুক্তফ্রন্টের কোনো শরিকদল এমন কি কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর কোনোটিই বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রপতির শাসনকে ডেকে আনার ঝুঁকি নিতে পারেন না। এই পটভূমির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় প্রকৃত অর্থে যুক্তফ্রন্ট না টিকলেও, যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকে থাকবে।

পশ্চিম বাংলায় সি-পি-এম'কে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গড়তে হলে কংগ্রেসকে নিয়ে জোট বাঁধতেই হবে। এটা সোজা অঙ্কের হিসেব। ফ্রন্টের কোনো দল এই মুহূর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন কি না সে তর্কে না গিয়ে প্রথমেই দেখা দরকার কংগ্রেসের পক্ষে কি বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব!

ইণ্ডিকেটীদের কথাই প্রথমে ধরা যাক। কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের সেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। উভয় কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন আজ ইন্দিরাজীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি এখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম দড়ির খেলা চালিয়ে উভয় কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন রাখার চেষ্টা করছেন। কম্যুনিস্ট পার্টি তো বটেই, এমন কি সি-পি-এমও ইন্দিরাজীর এই দড়ির খেলায় তার সঙ্গে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা পরোক্ষভাবে হাত মেলাচ্ছেন। ইন্দিরাজী পশ্চিমবঙ্গে এসেও সি-পি-এম'এর বিরুদ্ধে একটা কথাও যে বললেন না তা থেকেই তাঁর মনোভাব অনেকটা বোঝা যায়। পশ্চিম বাংলায় ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের সাংগঠনিক অবস্থা ভাল না। শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, নিছক সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও সিণ্ডিকেটীদের বিরুদ্ধে এ রাজ্যে তাকে পথ করে নিতে হবে, নতুন কোন সঙ্কট সৃষ্টি তিনি এই মুহূর্তে করতে পারেন না। তাই তাঁর পক্ষে সি-পি-এম'কে বাদ দিয়ে নতুন কোনো সরকারকে এখন মদৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

সিণ্ডিকেটীদের পক্ষে-ও একই কথা প্রযোজ্য। ইন্দিরাপন্থীরা সরকারে আসার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সিণ্ডিকেটীদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে পারেন, এমন কোনো সুযোগ ইন্দিরাজীকে অতুল্য-প্রতাপ এখন দিতে পারেন না। তাই সিণ্ডিকেটী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। বরং বাংলা কংগ্রেসের ভাঙনের ওপর তাঁদের নজর বেশি। বাংলা কংগ্রেসকে ইন্দিরা-পন্থীদের সমভাবাপন্ন হিসাবে ধরে নিয়ে তাঁরা এই দলের ভাঙন সম্পর্কে উৎসাহী।

সুতরাং পশ্চিম বাংলার সিণ্ডিকেটী বা ইণ্ডিকেটী কোনো অংশই রাজ্য সরকারের পতন ঘটানো সম্পর্কে এখন উৎসাহী নয়।

এবার যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলোর প্রশ্নে আসা যাক। বাংলা কংগ্রেসের সি-পি-এম বিরোধী জেহাদের একটি পর্ব সদ্য শেষ হলো। শ্রীসুশীল ধাড়া প্রথমে হয়তো ভেবেছিলেন সি-পি-এম বিরোধী জেহাদে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন তো তিনি পাবেন-ই—এমন কি কেরলের পথে যাওয়ার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থনও তাঁদের দিকে আসবে। ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত এবং কম্যুনিস্ট পার্টির আপাতনীরবতা শ্রীধাড়াকে নিরাশ করেছে।

বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক আন্দোলনকে শুধু সি-পি-এম'কে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের চক্রান্তের অংশ হিসেবে ধরলে ভুল হবে। বাংলা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকটকে প্রতিরোধ করে শ্রীধাড়ার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষক এবং শহরের বড় ব্যবসায়ী (বৃহৎ শিল্পপতি নয়) এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন কংগ্রেস তাদের আশ্রয় দিতে পারে না—বিচ্ছিন্নভাবে তারা যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলে আশ্রয় নিতে চাইলেও শ্রেণী হিসাবে মার্ক্সবাদী দলগুলোকে নির্ভরশীল মনে করে নি। শ্রীধাড়া উপযুক্ত সময়ে আন্দোলন শুরু করে ঐ শ্রেণীকে নিজ দলের ওপর আস্থাশীল করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর যতটা সাফল্যলাভ করার আশা ছিল তা হয় নি, কারণ তাঁরা দেখলো সুশীলবাবুর বক্তব্য সংবাদপত্রে যত ফলাও করে প্রকাশিত হোক না কেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও নবজাগ্রত সাধারণ কৃষকের সঙ্গে ঐ শ্রেণীর লড়াই-এ তারা আশানুরূপ প্রশাসনিক সহায়তা পায় নি।

অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে ভূমিহীন যে সব বৃত্তিজীবী আছেন তাঁরা এবং ভূমিহীন উপজাতি ও তপশীলী সম্প্রদায়ের যে সব লোক শিক্ষিত হয়ে বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হয়েছেন তাঁরা বাংলা কংগ্রেসের এই আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন হিসেবে ধরে নিতে পারেন নি। ফলে তাঁরা শ্রীধাড়ার নেতৃত্বে বিরোধী হয়ে উঠেছেন। শ্রীসুকুমার রায়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহ এই বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। যদিও বাংলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের কেউ প্রকাশ্যে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেন নি, তবু তাঁদের বিদ্রোহের আভাস সুস্পষ্ট। এই অবস্থায় শ্রীধাড়া যাই বলুন না কেন, বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে ফ্রন্ট ছেড়ে যাওয়া আত্মহত্যার সমতুল্য হবে। তাই শ্রীধাড়ারও সুর পাল্টাতে সুরু করেছে।

কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মিনি-

ফ্রন্ট গড়ার চক্রান্তের যত অভিযোগই আনা হোক না কেন, রাজনীতির গতি যাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন তাঁরা সহজেই বুঝবেন কেরলের পথে বাংলাদেশ অগ্রসর হতে পারে না। তাছাড়া কেরলে কংগ্রেসের ওপর মিনিফ্রন্ট সরকারের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। বাংলাদেশে কিন্তু তার কোনো সুযোগ নেই। কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া পশ্চিম বাংলায় সি-পি-এম'কে বাদ দিয়ে সরকার গঠন সম্ভব নয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইন্দিরাপন্থী-দের সংগে কোয়ালিশন সরকার গঠন বাস্তবে রূপায়ণের আগে কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিম বাংলায় এই পথে পা দিতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া সি-পি-এম বিরোধিতার ডিগ্রি নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও মত-বিরোধ আছে। কম্যু-নিস্ট পার্টি-ও গত কয় মাসে পশ্চিম বাংলায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে সংগঠনের শক্তি অনুসারে অংশ গ্রহণ করেছে। কাজেই সি-পি-এম বিরোধিতার নাম করে এই দলের পক্ষে এখুনি শ্রেণী সমঝোতার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া সোভিয়েট রাশিয়াও এখন সি-পি-আই-সি-পি-এম বিরোধকে তুংগে তুলতে চায় না। অবশ্য জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলনের পরে আপাতত সি-পি-আই-সি-পি-এম'এর বিরোধ যে ঠান্ডাস্তরে এসেছে তার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। কিন্তু তখনকার বিরোধ-ও এই দুই দলকে সর্বভারতীয় স্তরে দুই শিবিরে ঠেলে দেবে বলে মনে হয় না। কাজেই কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে পশ্চিম বাংলায় মিনিফ্রন্ট গড়ার পক্ষে উৎসাহ দেওয়া সম্ভব নয়।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সদ্য অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের মিনিফ্রন্টে যোগদানের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক আজ ধীরে ধীরে একটা মার্ক্সবাদী দলে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে। এই দলের মধ্যে আজ নেতৃত্বের সংগ্রাম তীব্রতর। ফেব্রুয়ারী মাসে দলের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনু-ষ্ঠিত হবে। সি-পি-এম বিরোধিতাকে একমাত্র মূলধন করে এগিয়ে যাওয়া এখন আর এই দলের পক্ষে সম্ভব নয়। এদের নিজেদের ঘর সামলাবার প্রশ্ন আছে—নতুন করে দেখা দিয়েছে তত্ত্বের সংগ্রাম যার পরিণতিতে একাংশের সি-পি-এম'এর সংগে জোট বাঁধার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় বামপন্থী চরিত্র বজায় রাখার জন্য-ও ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষে সি-পি-এম'কে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়।

এস-এস-পি'র আভ্যন্তরীণ বিরোধ চরম সীমায়। শ্রীভূপাল বসু বাংলা কংগ্রেসের সংগে অনশনে যোগ দিলেও তাঁর পক্ষে শ্রীনরেন দাসকে ঐ পথে টানা সম্ভব হবে না। কাজেই দল হিসাবে এস-এস-পিও আজ ফ্রন্ট ভাঙার দায় কাঁধে বইবেন না। এস-ইউ-সি যত সি-পি-এম বিরোধী মনোভাব-ই প্রকাশ করুন না কেন, এই দলের পক্ষে যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা সম্ভব নয় তা দলের নেতারা বারংবার ঘোষণা করেছেন।

আর-এস-পি-র সংগে সি-পি-এম-এর অনেক জায়গায় সংঘর্ষ ঘটেছে। গায়ের জোর এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সি-পি-এম দল বৃদ্ধির চেষ্টা করছে আর-এস-পি-ও এ ই অভিযোগ করেছে। কিন্তু সেজন্য তাঁরা সি-পি-এম-কে বাদ দেওয়ার কথা কোনদিনই বলেন নি। আর-এস-পি-র সমালোচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকের। এই দলের বক্তব্য হোল শরিকী সংঘর্ষের ফলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে না। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলে ধনবাদী ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানার পথে এগোনো উচিত ছিল। কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর নির্ভর করা হচ্ছে—সুষ্ঠু নেতৃত্ব দেয়া হচ্ছে না। আর-এস-পি-র মধ্যে এই মনোভাব প্রবল যে, ধীরে ধীরে জনসাধারণ বুঝতে পারছে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। তাই এই দল নিজেদের শক্তি অনুসারে রাজ্যে জঙ্গী আন্দোলন গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সি-পি-এম-এর একটা অংশের মধ্যেও এই মনোভাব প্রবল হচ্ছে। ইছাপুরে রাজ্য প্লেনামে এ প্রশ্ন উঠবে। দলের নেতৃত্ব সাধারণ কর্মীদের এই মনোভাব বুঝেই আজ শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ার কথা বলছেন। কিন্তু আসলে দলের গৃহীত নীতি অনুসারে চলতে হলে সি-পি-এম-এর পক্ষে ফ্রন্ট ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়। কেরলের দিকে তাঁরা উদ্বেগের সংগে তাকিয়ে আছেন। কেরলের অচ্যুত মেনন সরকার প্রতিষ্ঠার পথে গেলে সি-পি-এম-এর পক্ষে বিপদ দেখা দেবে। এখুনি কর্মীমহলে কেরলের নীতি সঠিক কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিগত কয়েকমাসে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সি-পি-এম-এর নাম করে যে সব কাণ্ড ঘটানো হয়েছে তা অনেকক্ষেত্রেই নেতৃত্বের অনুমোদন লাভ করে নি। সি-পি-এম নেতৃত্ব কর্মীদের সংযত করতে চেষ্টা করছেন। এই অবস্থায় সি-পি-এম নিশ্চয়ই নিজেরা ফ্রন্ট ভাঙার কোনো ঝুঁকি নেবেন না।

কাজেই আপাতত ফ্রন্ট সরকার ভাঙার কোনো সম্ভবনা নেই। বিভিন্ন দলের মধ্যেকার বিরোধও মিটবে না—কিছুটা শান্ত হবে, আবার কিছুদিন পরেই বিরোধ দেখা দেবে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংগে সংগে অবশ্য বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ওপর আস্থা কমে যাচ্ছে। আর-এস-পি-র মত দল এটাকে অবশ্য আশার কথা বলে মনে করছেন।

—শ্রীসর্বদর্শী

॥ দুই ॥

দুশ' আশি জন সদস্য বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যুক্তফ্রন্টের দিকে রয়েছেন ২১৮ জন। ১৯৬৭ সালে প্রথম ফ্রন্ট সরকারের দিকে ছিলেন ১৫৩ জন সদস্য। দু' বছর আগে যুক্তফ্রন্টে যৌথ পরিবারের দেয়ালের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই ১৪টি উনুন জ্বলেছে। তাদের নিত্য কলহ-তিক্ততার মধ্যেও কিন্তু গণ-আন্দো-লনের শক্তি, কৃষক ও শ্রমিকের নবার্জিত আশা ও বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে যায় নি। অবশ্য আবর্তিত ঘটনাচক্রের মধ্যে প্রথমে ৫ জন ও পরে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে ১৭ জন 'দেশপ্রেমিক' কম্যুনিস্ট প্রভাবিত সরকার থেকে তাঁদের সমর্থন তুলে নিয়ে-ছিলেন।

দেড় বছর পর বাংলার জনগণ আবার সেই বাম কম্যুনিস্ট প্রভাবিত ফ্রন্ট সরকারকেই বিপুল বিজয়ের বরমাল্য দিয়ে সরকার পরিচালনার জন্য মহাকরণে ফেরত পাঠাল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন সাহেব একেবারে মূক হয়ে গেলেন, পঃ বঙ্গ থেকে ফিরে গেলেন ধর্মবীর। সমস্ত বিপরীত শক্তি ও স্বার্থচক্রকে উপেক্ষা করে প্রসারিত বাহুবলে ও আত্মবলে ফ্রন্ট সরকার এগিয়ে চললো।

আত্মকলহের বীজ কিন্তু ফ্রন্টের ভেতরে থেকে গেল। প্রজা-সমাজতন্ত্রী (ফ্রন্টপন্থী), সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী, বাংলা কংগ্রেস অথবা গোর্খা লীগ এই সব গান্ধীবাদী অথবা শান্তিপূর্ণ-অহিংস পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলির পক্ষে দীর্ঘদিন কি বাম কম্যু-নিস্ট, আর. এস. পি, ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলির সংগে ঘর করা সম্ভব? পথ যে আলাদা দলগুলির তা অজানা নয়। ন্যূনতম কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে তারা কাজ করছে, কিন্তু সেই ন্যূনতম কর্মসূচী রূপায়ণের কর্ম-

ফ্রন্টের পক্ষে নিজেদের মধ্যে কলহ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে।

ফ্রন্ট সরকার কি পড়ে যাচ্ছে? অর্থাৎ বাম কম্যুনিস্ট প্রভাবিত ফ্রন্ট সরকারের মৃত্যু কি আসন্ন? এর সরল উত্তর: না। ফ্রন্ট সরকার চলছে, চলবে।

কারণ: বাংলা কংগ্রেস এবং তার দু'-একটি ছোট ছোট সহযোগী দল (গোর্খা লীগ, পি এস পি-মেদিনীপুর, এস. এস. পি'র জনকয়েক ও ফ্রন্ট বহির্ভূত পি. এম. এল হয়ত অজয়বাবুর হাত ধরে তাঁদের কল্পলোকে যে মিনি-ফ্রন্ট-সরকার আছে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু দু'টি বড় দল যারা রাজ্যের রাজনীতিতে মূলতই বাম কম্যুনিস্টদের প্রভাববৃদ্ধি রোধ করতে চায়, যথা ফরোয়ার্ড ব্লক ও সি পি আই—তারা জানে যে, পঃ বঙ্গে তাদের রাজনীতি করে টিকে থাকতে হবে। যে পথ ও সিদ্ধান্ত তাদের দলের শক্তিক্ষয় করবে, তাদের অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাবে, ঝানু রাজনীতিবিদ্ হিসাবে অশোক ঘোষ ও সোমনাথ লাহিড়ী অন্তত সে পথ নেবেন না।

কাজেই বাম কম্যুনিস্টদের প্রসারিত বাহুবলকে স্তব্ধ করার জন্য তাঁরা বাংলা কংগ্রেসকে এগিয়ে দিয়েছেন। এটা তাঁদের রাজনৈতিক 'স্ট্র্যাটাজি'। দিল্লীর পরিবর্তিত রাজনীতি বাংলা কংগ্রেসের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে। ৩৩ জন সদস্যের নেতা অজয়বাবু—তাঁর ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে আছেন আরো ৪০ জন সদস্য নিয়ে বিরোধী-দল-নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর। অজয়বাবু ইচ্ছা করলে এখনই পঃ বঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এবং বিধানসভায় ৭৩ জন সদস্যের নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। এবং এ ঘটনা ঘটলে গাম্পা-পাতিল-অতুল্যবাবুর কংগ্রেসের চেয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস পঃ বঙ্গে সম্ভবত অধিকতর শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হয়ে উঠবে।

অজয়বাবু কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার পর অতুল্যবাবু বলেছিলেন 'কংগ্রেস থেকে অনেকেই বার হয়ে গেছে, কংগ্রেসের তাতে ক্ষতি হয় নি।' সে কথার জবাব কংগ্রেস-রাজনীতির মল্লযুদ্ধে অতুল্যবাবুর কাছে পরাজিত রথী-মহারথীরা না দিতে পারলেও অজয়বাবু ইচ্ছা করলেই দিতে পারেন। অবশ্য গত দু' বছরে কিছুটা উত্তর তিনি দিয়েছেনও।

অজয়বাবু অনশন শুরু করেছিলেন এবং সে ঘটনার প্রভাব নিশ্চয়ই ফ্রন্ট সরকারের ওপর গিয়ে পড়েছে। দিল্লীতে ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনার পরেই তিনি বলেছিলেন: 'পঃ বঙ্গে মার্ক্সবাদী-দের (বাম কম্যুনিস্ট ও সহযোগী ছোট দলগুলি) বাদ দিয়ে কেরল-ধরনের ফ্রন্ট গঠনের কোন সম্ভাবনা নাই। আমি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন চাই না।'

এদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পঃ বঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা বলতে শুরু করেছেন: রাইটার্স বিল্ডিংসে ফাইলগুলো সব ধুলোর পাহাড়ের আড়ালে ঘুমোচ্ছে।...যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা যদি মনে করেন লোকে বোকা, কিছু বোঝে না, দেখে না, তাহলে তাঁরা বাস করছেন মূর্খের স্বর্গে।...কেউ অনশন সত্যাগ্রহ করছেন, কেউ বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কেউ চক্রান্ত ফাঁস করছেন, কেউ বা শ্রেণী সংগ্রাম ত্বরান্বিত করতে ব্যস্ত। আর এই ডামাডোলের আবর্তে পড়ে বাংলা দেশ ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নেমে যাচ্ছে, বাঙালী তার অজান্তে অলক্ষ্যে অকূল সাগরে ডুবছে। ...বাঁচতে গেলে বাড়তে হবে—এগিয়ে যেতেই হবে।...ইত্যাদি ইত্যাদি।

সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশত নিজে সাংবাদিক বলে সংবাদপত্র মালিকদের পদলেহী মোটা বেতনের সাংবাদিকদের পরিচয়, তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজ ও জীবন-চেতনা, অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁদের মমত্ব প্রভৃতি কোন্ খাতে বইছে তা এই প্রবন্ধকারের একেবারে অজানা নয়।

সম্প্রতি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের উদ্যোগে গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন: এদেশে রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা অধিকাংশ লোভী আর সংবাদপত্রের লোকেরা তাদেরকেই ভাঙিয়ে খায়।

উক্ত রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বর্ণনা দিচ্ছেন তা অর্ধসত্য এবং স্ববিরোধিতাই মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক। বাংলাদেশের লোকেদের রাজনৈতিক চেতনা যে ভারতের সকল রাজ্যের তুলনায় প্রখর এবং তারা যে 'বোকা' নয় সে কথা ১৯৬৭ সালের ও ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের পর প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর 'ডামাডোলের আবর্তে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নেমে যাচ্ছে' কিনা আগামী দিনই তার উত্তর দেবে। আজ শুধু এটুকু বলা যায়, জোতদার ও কলকারখানার মালিকরা তাদের মুনাফার অংকের দিক থেকে কিছুটা পেছনের দিকে নেমে যাচ্ছেন। মিল মালিক ও জোতদাররা যদি বাংলা দেশ হয়, তবে এই 'ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নেমে যাবার' বাণী যাঁরা অমর্ত-লোক থেকে বহন করে এনেছেন তাঁরা ঠিকই বলছেন।

ফ্রন্ট সরকার গত নয় মাসে কিছু কাজ করেছে। চোদ্দ শরিক যাদ তাই-তাই থাকত, তবে জনগণের কল্যাণমূলক কাজ আরো দ্রুত ও আরো ব্যাপকভাবে করা সম্ভব হোত। তা হয় নি। এখন প্রচুর পরিমাণে পার্টিবাজী চলছে। সে পার্টিবাজীতে ফ্রন্টের বড় থেকে ছোট শরিক কেউ কম যায় না।

কিন্তু বাম কম্যুনিস্ট প্রভাবিত এই ফ্রন্ট সরকার কি সাত লক্ষাধিক সুসংগঠিত শিল্প-শ্রমিক-মজুরদের বর্ধিত মজুরী ও বোনাস আদায়ের কাজ ত্বরান্বিত করে তাদের মধ্যে নতুন আশা ও বিশ্বাস এনে দেয় নি? এবং শিল্পে শান্তির পথ প্রশস্ত করে নি? জোতদারদের বেনামী ও লুকোনো তিন লক্ষ একর জমি এই সরকার কি উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষক ও ছোট চাষীর মধ্যে বিলিবণ্টন করে নি? প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯৭০ সাল থেকে সরকার নতুন ১৫ হাজার স্কুল খোলার ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক (১ম ও ২য় শ্রেণী) দেবার সিদ্ধান্ত নেয় নি? সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রতি সরকার কি সহানুভূতির হাত এগিয়ে দেয় নি?

সেকথা থাক। প্রশ্ন হচ্ছে: বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের বৃহৎ পরিবারে কলহ শুরু হয়েছে। ফসল কাটা যতদিন না শেষ হবে ততদিন এই কলহ চলবে। কারণ নানা দলের টিকি নানা জায়গায় বাঁধা পড়েছে, কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য।

এই আত্মকলহ কিন্তু অনিবার্য ছিল না। দলগুলির নিজেদের আচরণ ও কথা-বার্তায় যদি প্রকৃত সদিচ্ছা প্রকাশিত হোত তবে কলহ পরিহার করা যেত। একদিকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের দ্রুত শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা ও অপর দিকে অন্যান্য দলের নিজেদের শক্তির শিবির-গুলি অক্ষত রাখার আপ্রাণ প্রয়াসের মধ্যে যে অশুভ প্রতিযোগিতা চলেছে, তা এখনই বন্ধ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে বাংলাদেশ 'গেলো গেলো' বলে যাঁরা চীৎকার করছেন তাঁরা সত্য পরিবেশন করছেন না, তাঁরাও কতকগুলি বিশেষ দল ও গোষ্ঠীর আর্ত-চীৎকারের প্রতিধ্বনি বহন করছেন মাত্র।

বিধানসভায় বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির সদস্যসংখ্যা হচ্ছে: বাম কম্যুনিস্ট: ৮৩, বাংলা কংগ্রেস: ৩৩, সি পি আই: ৩০, ফরোয়ার্ড ব্লক: ২১, আর এস পি: ১২, এস এস পি: ৯, এস ইউ সি: ৭, এল এস এস: ৪, গোর্খা লীগ: ৪, ওয়ার্কার্স পার্টি: ২, ফঃ ব্লক (মার্ক্সবাদী): ১, কংগ্রেস: ৫৫, পি এম এল: ৩, পি এস পি: ১, আই এন ডি এফ: ১. পি এস পি (মেদিনীপুর): ৪ এবং বাকি

[শেষাংশ ১৭৫৭ পৃষ্ঠায়]

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## আত্মকেন্দ্রিকতার প্রভাব

বাংলাদেশের বৈপ্লবিক ইতিহাস পর্যালোচনায় বিপ্লবীদের হাতে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের প্রতি চরম দণ্ডবিধানের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিপ্লবী ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখতে পাই। কানাইলালের রিভলবারের মুখে দেশদ্রোহী নরেন গোঁসাইয়ের মসীলিপ্ত জীবনের অবসান-কাহিনী জনসাধারণ আজও আলোচনা করে। মাস্টারদার পরিচালিত বিপ্লবী দলের অতুলনীয় শৌর্যবীর্যের জন্য যে হিমাংশু ভৌমিক "রাজা" নামে পরিচিত ছিল তার সবল বাহুর নিষ্পেষণেও বিশ্বাসহন্তা গুপ্তচর যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছে। মাস্টারদাকে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ গুপ্তচরের ছিন্ন শির ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। বিপ্লবীদের হাতে বিকলাঙ্গ দেহ পরেশ গুপ্ত আজও দেশদ্রোহিতার শাস্তির নিদর্শন বহন করছে। দেশের বুকে হতে তবু কি দেশদ্রোহী, বিশ্বাসহন্তা, গুপ্তচরবাহিনীর বিলুপ্তি ঘটেছে? বিশ্বাসভঙ্গ ও "দলের" সঙ্গে শত্রুতা করার অপরাধে সুনিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড ও স্বার্থপরতা, লোভ ও এক "আনন্দজগতের" বিলাসস্বপ্ন মানুষকে তার প্রিয় সাথীদের সমাধি রচনায় বিরত করতে সক্ষম হয় না। আশ্চর্য মানবচরিত্র। আজও যারা তার সাথী, সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে যাদের সঙ্গে বৈপ্লবিক অভ্যুদয়ে সে যোগ দিয়েছে, মুহূর্তে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে শত্রুর চরণে আত্মবিক্রয় করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হয়—এ এক বিচিত্র ব্যাপার! কে কিভাবে মুহূর্তে স্বার্থে অভিভূত হয়ে পড়ে, যদি বিশেষভাবে তার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা না যায়, তবে বহু দেশদ্রোহী—জনসাধারণ ও দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা সম্পূর্ণ গোপন রেখে অনায়াসে নেতৃপদ অলঙ্কৃত করেই যে সারাজীবন কাটিয়ে যেতে পারবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

দেশবরেণ্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ হিসাবে যাঁরা সুপরিচিত তাঁদের প্রত্যেকের জীবনই কি সকল জিজ্ঞাসার ঊর্ধ্বে? সন্দিগ্ধ বিশ্লেষণী মন নিয়ে বিপ্লবী-জীবনের সুরুতেই যে গবেষণার আরম্ভ আজও আমার জীবনে তার সমাপ্তি ঘটে নি। আমার গবেষণার conclusion (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত)—যতীন মুখার্জীর প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের মধ্যে সবাই বেঁচে না থাকলেও কেউ কেউ আজও "নেতার" গদিতে বসে জাঁকজমকে অতীত বিপ্লবী-জীবনের নকল পণ্যে ব্যবসা চালাতে পিছপাও নয়। আর এই মরীচিকার বিভ্রান্তি মুগ্ধ কত সরল সুন্দর নিঃস্বার্থ প্রাণ এই অন্ধকারের পিছনেই অন্ধের মত ছুটে চলেছে।

বিপ্লবীদের খড়্গ মাস্টারদাকে ধরিয়ে দেবার অপরাধে অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদের বিবরণ দেশবাসীর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তারা জানে না যে, মাস্টারদার সন্ধান পাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। যুবকদের স্বগৃহ বা গ্রামে অন্তরীণ রেখে তাদের কাছ হতে মেলামেশার মাধ্যমেই পুলিশ কেবল যে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে তা নয়—অত্যন্ত গুরুতর গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ হয় যদি বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় কাউকে প্রভাবান্বিত করা যায়। বিনাবিচারে বন্দী, বা দশ বছর, বিশ বছর বা পঁচিশ বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত এমন কি আন্দামানে নির্বাসিত—সব "অসূর্যম্পশ্যা রথী-মহারথী" বিপ্লবীদের প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা হতে পুলিশ বিরত হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। আন্দামানের সেলুলার জেলে সবাই যে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী ছিলেন তা নয়। তিন-চার বছরের জেলভোগের দণ্ডপ্রাপ্ত অনেকেও সেখানে ছিলেন। স্বাস্থ্যের অজুহাতেও অনেকে সরকারী ডাক্তারের অনুমোদনে বাংলার জেলে পুনঃ স্থানান্তরিত হয়েছেন। কারও কারও কম মেয়াদ ছিল বলে মুক্তির জন্য বাংলার কারাগারে ফেরৎ আসেন। 'কার কতকাল দণ্ডভোগ ছিল' বা 'কার ফাঁসীর হুকুম হল', সেইরূপ দণ্ডাদেশের বাহ্যিক গুরুত্ব দেখে, বিপ্লবী দলের "নেতাদের" যোগ্যতা বা তাদের সততা বা বিশ্বাসঘাতকতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা যায় না। এমন এমন বিশেষ ক্ষেত্র আছে যে সব ক্ষেত্রে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে কারও শাস্তি বেশি হয়, কারও কম হয়, আর কেউ বা হয়ত মুক্তিও পায়! কারও কারও আবার ফাঁসীর

হুকুম হয়েও High Court-এ প্রাণদণ্ড committed হয়। গ্রেপ্তারের বহু রকমফের, দণ্ডাদেশের বহু তারতম্য চোখে পড়েছে। আন্দামানে নির্বাসন না বাংলার জেলে রাখা—পুলিশ কোন্‌টি শ্রেয় মনে করেছে বহু অভিজ্ঞতায় তাও বুঝেছি। কে কিভাবে মুক্তিলাভ করেছে আপাতদৃষ্টিতে তা কিছু বোঝা যায় নি—যায়ও না। প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করে তবেই পুলিশের এইরূপ বিভিন্ন ধরনের চালের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। স্বভাববশতই এইরূপ চেষ্টার রুচি আমার কখনও ছিল না, আজও নেই।

ধলঘাটের বাড়ির খোঁজ পুলিশ কি করে পায়? আবার সেই কাছাকাছি এলাকায় মাস্টারদার গৈরলার বাড়ির ঠিকানাও কি সেই একই বিশ্বাসঘাতক সরবরাহ করেছিল? আবার যেখানে তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা বন্দী হন ও মিলিটারী পুলিশের গুলীতে দুজন মৃত্যুবরণ করে—গহিরার সেই বাড়ির ঠিকানাই বা পুলিশকে কে দিয়েছিল? সেই সকল বিশ্বাসঘাতক নিজেদের বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়ে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছদ্মবেশে ছদ্ম ভূমিকায় নিজেদের "বিপ্লবী অস্তিত্ব" বজায় রাখবার চেষ্টায় বিশ্বাসঘাতকেরা অত্যন্ত সুকৌশলী। জেলে থাকাকালে পুলিশের খপ্পরে এসে কোন বিপ্লবী "নেতার" কি পরিণতি ঘটেছে তার হদিশ পাওয়া খুবই কঠিন। তবু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তর্পণে সাবধানে এগোতে পারলে ছদ্মবেশী বিভীষণদের দূরে রাখা সম্ভব হলেও হতে পারে।

আমাদের তরুণ বিপ্লবী সাথীরা তখনও যথেষ্ট অভিজ্ঞ হন নি! তখনও তাঁরা আনন্দমঠের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তখনও তাঁরা পেটি বুর্জোয়া স্খলন ও বিচ্যুতি হতে মুক্ত ছিলেন না বলে অনেকেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। একটু অবান্তর হয়ে পড়বে, যদি বলি পেটি বুর্জোয়া বিচ্যুতির প্রভাবে অগ্নিযুগের তরুণ বিপ্লবীরাও ভেসে গিয়েছিলেন; যদি মনে করি যে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করেছেন বলে বর্তমান যুগে বিপ্লবীরা পেটি বুর্জোয়া বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে—তা হলে ভুল হবে বাস্তব ইতিহাসকে উপেক্ষা করা হবে। ক্রুশ্চেভ থেকে আরম্ভ করে তরুণ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীও জ্ঞানের অহমিকা, নেতৃত্বের মোহ, গোপন চক্রসৃষ্টির বাসনা ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার অবৈপ্লবিক বিচ্যুতি হতে মুক্ত নন।

হোক না কেন অগ্নিযুগ বা আজকের বর্তমান—অন্তরে যদি ঐকান্তিক বিপ্লব সাধনা, একনিষ্ঠতা ও সততা না থাকে, তবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পুস্তকাদি চিবিয়ে খেয়ে ফেললেও বিচ্যুতির প্রভাবমুক্ত থাকা সম্ভব নয়। অগ্নিযুগে যাঁরা একনিষ্ঠ হয়ে বিপ্লবী কর্মসূচীর সফলতাই কামনা করেছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থ, অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতার প্রগলভতা—বিচ্যুতির পথে তাঁদের ঠেলে দিতে সক্ষম হয় নি। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবের সঙ্গে অন্তরের গভীরতা ও নিষ্ঠার অভাব যুগের পরিবর্তনেও মানুষের অন্তরের পরিবর্তন আনতে পারে না।

অবিনাশ দত্ত সম্বন্ধে আগে লিখেছি। বর্তমানে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ সরকারী কর্মে নিযুক্ত। 'পরেশ গুপ্তকে' বিকলাঙ্গ করাতে 'চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলার" একজন প্রধান "আসামী"

হিসেবে অবিনাশকে অভিযুক্ত করা হয়। সরকারী কৌঁসুলীর মতে অবিনাশই প্রথমে 'দা' দিয়ে পরেশকে আঘাত করে। এই creditটা অবিনাশ অনায়াসেই নিতে পারত, কিন্তু সে তা করে নি। পরেশ গুপ্তকে কে প্রথমে আঘাত করেছিল তার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম—নিজে কোনরূপ বড়াই না করে অবিনাশ অকুণ্ঠচিত্তে বলেছিল—"প্রথম আঘাত করেছে নোয়ার মিঞা"। অতিরঞ্জিত আত্মপ্রচারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবিনাশের একটি সহজ ও সংযত ভাব লক্ষ্য করেছি। আমার খুব ভাল লেগেছে। কতগুলি ঘটনার বিবরণ দিয়েই অবিনাশ আমাকে প্রায় দশ পৃষ্ঠা লিখে দিয়েছে। তা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিলাম—

"...এই নতুন কৌশলের পরিণতিতে ছাত্রদের উজানমুখী গতি কোন কোন ক্ষেত্রে স্তিমিত হইয়া আসিল। খেলাধুলার প্রতি অনুরক্তি দেখা দিল এবং ক্রমে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যাবিমুখী একটি পরিবেশ সৃষ্টি হইল। এই নতুন অবস্থায় মাস্টারদার অনেক উত্তরসাধক নেতার মধ্যেও ক্রমে উদ্দীপনাহীনতার লক্ষণ দেখা দিল। ফলে এইসব বিপ্লবীদের ক্রমে আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা বড় হইয়া দেখা দিল। এই অবস্থায় কিছু কিছু বিপ্লবী কর্মী চট্টগ্রামের মূল কেন্দ্রস্থল ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন......।"

আগেই লিখেছি—"দলের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—বিশ্বাসঘাতকদের অনুসন্ধান ত্যাগ করে দলের দুজন সভ্য তারকেশ্বরকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে অগ্রণী হলেন। একজন বাধা দিল। তার মতে ফুটুদার (তারকেশ্বরের) বিরুদ্ধে চরম দণ্ড প্রয়োগ করতে হলে সংগঠকদের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকেই সে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। মাস্টারদার অবর্তমানে যে কর্ণধার তার বিরুদ্ধে এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কখনও সবার উপস্থিতি ভিন্ন নেওয়া চলে না।"

সেই দুজন অগ্রণী সাথী তখনকার মত সাময়িকভাবে নিরস্ত হয়েছিল। তারপর সংগঠকদের নিয়ে তারা পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে তারকেশ্বরের বিচারের ব্যবস্থা করলো। দলের নেতৃত্বভার তারকেশ্বরের হস্তে ন্যস্ত—তার বিরুদ্ধে যে কি এক বিরাট চক্রান্ত চলেছে—তার অনুপস্থিতিতেই যে তার বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেই বিচারে যে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হবে—সে তা কল্পনাও করতে পারল না।

তারকেশ্বর যে কেবল মাস্টারদার অবর্তমানেই নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিল তা নয়। ১৯২৪-২৮ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে আমরা যখন জেলে ছিলাম তখনও তারকেশ্বর, অর্ধেন্দু দস্ত, ফণীন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির ওপর নেতৃত্বভার ন্যস্ত ছিল। সেই সময় মুক্তি পেয়ে আমি বাইরে এলাম। গণেশ ও মাস্টারদা তখনও ছাড়া পান নি। আমাদের অবর্তমানে নেতৃত্বভার কাদের হাতে তা জানতে অবশ্য বেশি সময় লাগে নি। গোপন সংগঠনটিকে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণকারীদের খোঁজ পাওয়া সত্ত্বেও আমি ধরা দিলাম না। আমার বিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারী পদ্ধতিতে নিজ দক্ষতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বপ্রথমে অর্ধেন্দু দত্তকে বেছে নিলাম—তার সঙ্গে শর্ত হলো—সে যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বা যেসব কর্মে লিপ্ত আছে তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে—সে যে-ই হোক না কেন, ঘুণাক্ষরে জানতে দেবে না। অর্ধেন্দুর হেফাজতে আমাদের দলের দু-তিনটি রিভলবার পিস্তল গোপনে রক্ষিত ছিল। এই মাপকাঠিতে বিচার করে "তখনকার মত" তার বৈপ্লবিক সততা সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিত হয়ে গোপন বিপ্লবী দলে কেবল আমরা দুজনে আরও গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত হলাম। একেবারে প্রথম থেকেই এইরূপ সতর্ক হয়ে এগিয়েছিলাম বলেই চট্টগ্রামের মত ছোট্ট শহরেও পুলিশকে বোকা বানিয়ে "১৮ই এপ্রিল" সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করা সম্ভব হয়েছিল।

অর্ধেন্দু দত্ত বি, এসসি-তে কৃতী ছাত্র। তারকেশ্বরের সহপাঠী। তারকেশ্বরের প্রতি অর্ধেন্দুর অগাধ বিশ্বাস। মাস্টারদা মুক্তি পেয়ে আসার পর দেখেছি তিনিও তারকেশ্বর, অর্ধেন্দু ও রামকৃষ্ণের ওপরই খুব বেশি নির্ভর করতেন। তাই বলে কেউ যেন মনে করবেন না যে, মাস্টারদা সকল তরুণ বিপ্লবীদের কর্মশক্তি ও নিষ্ঠার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখতেন।

অর্ধেন্দু ও আমার মধ্যে ঐরূপ "গোপন চুক্তি" ছিল বলেই আমি খুব সহজে ধরে ফেললাম কি করে আই-বি ইনস্পেক্টর সারদা ভট্টাচার্য অম্বিকাদাকে বললেন—'..... এদিন আপনাদের রিভলভারটি আসকর খাঁ দীঘির পাড়ে একটি বাড়িতে ছিল। ......'? মূর্খ সারদাবাবু, "মূর্খ অম্বিকাদা! সেই খবরটি আবার স্বয়ং অম্বিকাদা দিচ্ছেন আমার মত একটি "মুখ্যু-সুখ্যুকে"!

আমি অর্ধেন্দুর কাছ হতে খোঁজ নিয়ে জানলাম কোথায় এবং কে সে ব্যক্তি যেখানে সে রিভলভারটি রেখেছিল?

রিভলভারটি এনেছিলাম কার্তুজ তৈরি করার জন্য। চল্লিশ বছর আগে বয়স ছিল অনেক কম—জ্ঞানও বয়সের অনুপাতে সীমাবদ্ধ। তবু জেলে বসে চিন্তা করে মনে মনে (Theory-তে) রিভলভারের কার্তুজ তৈরি করার একটি Design (নক্সা) ঠিক করেছিলাম। ১৯২৪-২৮ সালে জেলে যাওয়ার আগেও আমি রিভলভারের কার্তুজ তৈরি করি—কিন্তু খুব ভাল হয় নি। যুব-বিদ্রোহের পূর্বে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমার কর্মসূচী ছিল—প্রথম দিকে গোপনে কার্তুজ করব ও পরে আস্তে আস্তে আরও অনেককে পরখ করে নিয়ে বৃহত্তম কর্মসূচীতে হাত দেবো।

অর্ধেন্দু মারফৎ ৩৮০ ব্যাসের একটি কোল্ট রিভলভার এনে নিজ বাড়িতেই কার্তুজ তৈরির কাজ আরম্ভ করে সাফল্যলাভ করলাম। আজও মনে পড়ে, কি আনন্দে মন-প্রাণ সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল! এই সংবাদে অর্ধেন্দুও সেদিন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল! তার সেই আনন্দের অকৃত্রিম অভিব্যক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম!

"ষড়যন্ত্রমূলক বৈপ্লবিক কাজের" জন্য অর্ধেন্দুর সঙ্গে "গোপন চুক্তি" করার পর অর্ধেন্দু আমাকে বহুবার বলেছে—"দাদা, আমি বলছি আপনি অনায়াসে তারকেশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারেন। সে আমার চেয়েও অনেক বেশি কর্মঠ; অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে—আমার চেয়েও তার ওপরে বেশি নির্ভর করতে পারবেন। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়—আপনি কখন তার সঙ্গে দেখা করবেন তার জন্য সে অত্যন্ত আগ্রহভরে অপেক্ষা করে আছে।

রিভলভারের কার্তুজ তৈরিতে সাফল্যের পর অর্ধেন্দু বারে বারে বিশেষ করে অনুরোধ করতে লাগল, আমি যেন তারকেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার না করি। তার দৃঢ়বিশ্বাস আমার ও তারকেশ্বরের অবিলম্বে যোগাযোগ ঘটা উচিত এবং পরীক্ষাতে তারকেশ্বরের বৈপ্লবিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারব।

অর্ধেন্দুর অনুরোধে তারকেশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমার চেয়ে কিছুটা লম্বা, সুস্থ, সুন্দর চেহারা, শান্ত দুটি চোখে যেন প্রশ্নভরা মনের ছবি আঁকা! বি, এসসি পরীক্ষার্থী।

তখনকার দিনের চট্টগ্রামের অনন্ত সিং তার সামনে! নিজের বড়াই নিজে করা যে কত অশোভন তার সম্যক্ উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও, কেবল তারকেশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যই এখানে এর অবতারণা। কোন বিপ্লবী তরুণের এইরূপ দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমার চোখে আর পড়ে নি।......আমি সে

যুগের অনন্ত সিং! জমিদারবাড়ি লুঠ, রেল কোম্পানির টাকা করায়ত্তকারী অনন্ত সিং! নাগারখানা পাহাড়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনন্ত সিং! ন'টি মাস ধরে চট্টগ্রামের বুকের ওপর আলোড়ন সৃষ্টি করে মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও অনন্ত সিংহের বিচার চলেছে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের আইনের কূটতর্কে বিপর্যস্ত পরাজিত হয়ে সরকারপক্ষ মাস্টারদা ও অম্বিকাদার সঙ্গে অনন্ত সিংকেও সসম্মানে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তারপর বিনাবিচারে জেলে আটক বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেই অনন্ত সিং শরীরচর্চার জন্য স্থানে স্থানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠাতে মন দিয়েছে। দেখতে দেখতে অনেক ক্লাব গড়ে উঠেছে—ব্যায়াম শিবিরে ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রদর্শনীতে লোহার পাত দোমড়ানো, চলন্ত মোটরগাড়ির গতি রোধ করা, বুকের ওপর দিয়ে ৮০ মণ ওজনের ভারী রোলার চালানো ইত্যাদিতে এই অনন্ত সিং দর্শকবৃন্দের মনে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। তখনও গণেশ তারা মুক্তিলাভ করে নি। অনন্ত সিং ব্যায়ামাগার, শক্তি ও ক্রীড়া প্রদর্শনীতে অন্যান্যদের সঙ্গে বিশেষ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শান্তি-রক্ষার কাজে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকায় গুণ্ডা দমন, প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনন্ত সিংহের কাহিনী সাধারণের মনে সেই সময়ে চমক সৃষ্টি করেছিল।

অনন্ত সিংহকে নিয়ে মাস্টারদার বিপ্লবী সংগঠনের সকলেই গর্বিত। সেই অনন্ত সিংহ তারকেশ্বর দস্তিদারের সামনে উপস্থিত। তারকেশ্বরও অনন্ত সিংহকে নিকট সান্নিধ্যে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করে নি।

তারপর ধীরে ধীরে তারকেশ্বর দস্তিদারের ভিতরের আসল মানুষটির দৃঢ় বৈপ্লবিক মনের দ্বার আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল। আমার তৈরি রিভল-ভারের কার্তুজ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা চলতে লাগল—"......দাদা, অনেকের কাছে অনেক কথা শুনে শুনে হতাশ হয়ে পড়েছি। কাউকে যেন আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। নিজের চোখে না দেখলে আর কোন কিছুতেই আস্থা রাখা সম্ভব নয়। দাদা, আপনি কিছু মনে করবেন না। কোনরূপ অশিষ্টতা প্রকাশ করলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি শুনেছি কার্তুজ তৈরিতে আপনি [illegible]কার্য হয়েছেন। আমার ভয়ানক ইচ্ছে করে [illegible]। নিজে পরীক্ষা করে দেখবার আগে আমি এর কৃতকার্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করতে পারছি না। এ আমার দোষ নয়—বহু ঠকেছি ; বিশ্বাস করে কেবল ধোঁকাই খেয়েছি—আস্থা রাখতে গিয়ে দেখেছি কেবল তাসের ঘরই আমরা তৈরি করেছি। তাই আমার পক্ষে অন্যায় হলেও কোন দ্বিধা না রেখেই আমার মনের কথা খুলে বললাম। আপনার নিজ হাতে প্রস্তুত কার্তুজ কতখানি নির্ভরযোগ্য তা আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চাই......।" তারক আমাকে অবাক করে দিল? আমার অত বিরাট ব্যক্তিত্ব মুহূর্তে সে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে মুখের ওপর বললো—'পরীক্ষা না করে বিশ্বাস করা যায় না—কারও ওপর আস্থা রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়......!' কেবল যে আশ্চর্য হয়েছিলাম তা নয়—মনে হয়েছিল এই তো একজন খাঁটি তরুণ বিপ্লবীর সন্ধান পেলাম ; আমার চেয়েও এই তরুণ বিপ্লবী কত বড়? কত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী? তার বিপ্লবী অন্তরকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম।

একবার অবশ্য একটুখানি অবিশ্বাস ক্ষণিকের জন্য মনের দরজায় উঁকি দিয়ে-ছিল। মনে হয়েছিল—হাতে তৈরি কার্তুজ নির্ভরযোগ্য কিনা—রিভলভার ফায়ার করে পরীক্ষা করতে চায়, এর পেছনে পুলিশের কোন জাল পাতা নেই তো? মানুষ চেনার ক্ষমতা যেটুকু ছিল এবং অর্ধেন্দুর মাধ্যমে তারকের সঙ্গে আমি যেভাবে পরিচিত, তাতে তার সঙ্গে কথা বলার পরও তাকে সন্দেহ করার মত কোন কারণ ছিল না। তবুও তাকে যদি আমি সন্দেহ করতাম, তবে আমিও আমার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বাস্তব জগতের কর্মক্ষেত্রে রিক্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তাম। তারকের সঙ্গে আমার তৈরি কার্তুজ সফলতার সঙ্গে ফায়ার করে দেখলাম। তারপর থেকে তারকেশ্বর আমাকে চিনেছিল এবং আমিও নিশ্চয়ই তার ভেতরের আসল মানুষটিকে আবিষ্কার করেছিলাম।

নিদারুণ বিস্ফোরণে আহত, অর্ধদগ্ধ তারকেশ্বর মুমূর্ষু অবস্থায় আমাকে দেখে বলে উঠলো—"অনন্তদা, আপনি এসেছেন? ...আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি... আর কেউ পারবে না...আপনি আমাকে গুলী করুন... ?" সে এক অসম্ভব পরিস্থিতি! গুরুতরভাবে দগ্ধ তিনজন সাথীকে কোথায় লুকিয়ে রাখবো? তাছাড়া তারকেশ্বরের বেঁচে ওঠার কোন আশাই যেন ছিল না! গণেশ ও মাস্টার-দাকে বললাম—"উপায় নেই? তারককে এই ভীষণ যন্ত্রণা হতে মুক্তি দেওয়া দরকার?" সেই দিন সেই সময়েই তারকের শান্তির জন্য হয়ত আমি তাকে গুলী করতাম আর যদি তাই হোত, তবে চার বছর পরে দলের সাথীরা তার প্রাণ-দণ্ডের আয়োজনে গোপন বিচারের সুযোগ নিতে উৎসাহী হতেন না। কিন্তু সেই সময় বন্ধু গণেশ ঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে আমাকে ঐ ব্যাপারে নিরস্ত করেছিলেন এবং তখনই আমরা অগ্নিদগ্ধ তারক ও অর্ধেন্দুকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম।

[ ক্রমশ ]

---

[ ১৭৫৩ পৃষ্ঠার পর ]

নির্দলীয়। বাম কম্যুনিস্টদের দু'জন সদস্য মারা যাওয়ায় দু'টি আসন শূন্য ছিল। সে দু'টি আসনেই ৩০শে নভে-ম্বর নির্বাচন হয়ে গেছে। দু'টি আসনই বাম কম্যুনিস্টরা ফিরে পেয়েছে।

বিধানসভার ভিতরে রাজনৈতিক দল-গুলির শক্তি যখন এই রকম তখন ৫৫ জন কংগ্রেস সদস্যের প্রায় ৪০ জনই ইন্দিরা-পন্থী বা ইন্দিরা কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে অজয়বাবুকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিলেও বাম কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠন বর্তমানে সুকঠিন। কারণ এই কাজে বাংলা কংগ্রেস বা ইন্দিরা কংগ্রেসকে সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সাহায্য নিতে হবে। সি পি আই বা ফরোয়ার্ড ব্লক পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপে রাজী নয়।

বাংলা কংগ্রেস ও ইন্দিরা কংগ্রেস মার্ক্সবাদীদের বাদ দিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করলে এখনই যাদের সমর্থন পাবে তারা হোল গোর্খা লীগ (৪), পি এস পি (মেদিনীপুর) (৪), পি এম এল (৩), আই এন ডি এফ (১) এবং কয়েকজন নির্দলীয়ের। সর্বভারতীয় নীতির দিক থেকে ইন্দিরা কংগ্রেসকে নিয়ে কোয়ালি-শন সরকারকে এস এস পি (৯) সমর্থন জানাতে পারবে না। আর মার্ক্সবাদী কম্যু-নিস্টদের আচরণে বিরক্ত হলেও শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী দল হিসাবে আর এস পি (১২) ও এস ইউ সি (৭)-র পক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেস (৪০) ও বাংলা কংগ্রেসের (৩৩) নেতৃত্বে গঠিত সরকারে যোগ দেওয়া বা তাকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। কাজেই বাম কম্যুনিস্ট-দের বাদ দিয়ে পঃ বঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন প্রায় অসম্ভব। একমাত্র সম্ভব তখনই যখন সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লক চরম রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে পারবে।

—[illegible] রায়

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

মহেশ মন্ডলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিমাই মাঝি সোজা চলে গেল মাঠের পাশ দিয়ে। মুকুন্দ মাঠেই কাজ করছিল—না একবার ফিরে তাকাল তার দিকে, না ডেকে জিজ্ঞেস করলে দুটো কথা।

মুকুন্দের মনে হলো—নিমাই মাঝি বোধ হয় তাকে দেখতে পায় নি। কাজ ফেলে ছুটল পেছনে পেছনে। নিমাই মাঝি চরের ভেড়ি বাঁধে গিয়ে উঠতে না উঠতে সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুকুন্দ। বললে, "মোর ক'টা কথা ছিল।"

মুকুন্দকে সামনে দেখে নিমাই মাঝির মুখ-চোখ কঠিন হয়ে উঠল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, "তোমার সঙ্গে আবার কি কথা।"—

নিমাই মাঝির ভাবভঙ্গি দেখে আর কথা শুনে মুকুন্দ থতোমত খেয়ে গেল। তবু বললে, "নয়নের যে শাড়িটা খোয়া গিয়েছিল"—

নিমাই মাঝি বাধা দিয়ে বলে উঠল, "সে আমি শুনেছি। সে খুনের শাড়ি নয়নের আর দরকার নাই। তার কাপড়-চোপড় ঢের আছে।"

"সে কথা নয়—সে কথা নয়।" মুকুন্দ বললে, "এই যে . চর-পঞ্চাতের ঝুটমুট সাক্ষী, ঝুটমুট বিচার—আমি বলছি সেই কথা।"

"তুমি বললে কি হবে!" নিমাই মাঝি বললে, "ছোট মন্ডলের কথা ঠেলে কাজ করবার সাহস মোর নাই।—সে হলো চরের বাড়ুয়া।"

"তো ছোট মন্ডল কি বলল আজ?"

বলল—বিয়ে-সাদি আর কোথাও পারলে দিয়ে দাও। তার যখন মত পেয়ে গেছি—দিয়ে দিব।" নিমাই মাঝি পাশ কাটিয়ে এগোতে চাইল। বললে, "আর কোনো বাধা নাই।"

মুকুন্দ চোখ পিট্‌পিট্‌ করে পথ আগলে চেয়ে রইল নিমাই মাঝির মুখের দিকে।—

নিমাই মাঝি বললে, "কথাটথা প্রায় মোর সারা—এখন মোকে আয়োজন করতে হবে।"

"বিয়ে কার সঙ্গে?" মুকুন্দ প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলে, "সেই ভলু মাঝি?"

"হ্যাঁ।"

শুনে মুকুন্দের মাথায় দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠল যেন। বললে, "আমি ছাড়পত্র যদি না দেই?"

"পঞ্চাতের বিচারের চেয়ে কি তোমার ছাড়পত্র বড়!" নিমাই মাঝি বলতে বলতে চলে গেল, "ও ছাড়পত্র তুমি ধুয়ে জল খাও। ইচ্ছা হয় দিবে—না হয় না দিবে।"

নিমাই মাঝি চলে গেল। মুকুন্দ দাঁতে দাঁত চেপে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রাগে, আপমানে, হতাশায় ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে চলল চরের দিকে।

সারা দিন কাজে তার আর মন লাগল না। একটা যন্ত্রণাকে সে বুকের মধ্যে চেপে রাখল কোনো রকমে।

সন্ধ্যেবেলা হাবু এল একটা খবর নিয়ে। বললে, "মস্ত একটা খবর অ মুকুন্দ।"

আবার কি খবর! মুকুন্দ চেয়ে র হাবুর দিকে।

হাবু বললে, "সানো কত্তা ( মহকুমায় গেছল—সেখান থেকে ( এসেছে।"

মুকুন্দ জিজ্ঞেস করলে, "কি?"

"সেই নুনের সময় যা হয়ে গে সে কিছু লয়।" হাবু বললে, "এ বিশ গুণ আন্দোলন হবে।"

মুকুন্দের বিশেষ আগ্রহ দেখা ( না।

হাবু বললে, "বাইরে থেকে ( ভলান্টিয়ারবাবুরা কেউ আসবে না। মোদের থেকে হবে।"

মুকুন্দ চুপ করে রইল। তার অন্যখানে।

"সানো কত্তা বলে দিলে—নাম চর থেকে মোদের অন্তত বিশজন।" হ বললে, "তোর নাম দেই?"

"অদের ভলান্টিয়ার তো সেই পড়ে মার খাওয়া!" মুকুন্দ হঠাৎ গর্ করে উঠল, "তোমার ঘরে আগুন দিে তুমি কিছু করতে পারবে নি। তো বউয়ের উপর অত্যাচার করবে—খবদ হাত তুলতে পারবে নি। তোমাকে মেরে আধ-মরা করে ফেলবে—তবু মরো। ও মোর হবে নি—ও ত পারবো নি হাবু। বলে দিবে স কত্তাকে।"

হাবু খানিক অবাক হয়ে চেয়ে র

...ন্দের দিকে। আস্তে আস্তে বললে, ...হলে তোর মত আর কি!

"না।" খানিক চুপ করে থেকে ...ন্দ বললে, "মোর বুকের ভিতরে জনলে ...ছ হাবু। বাপ মোর এখনও হাজতে।...ন খাঁ শেষকালে মরল কি না মোর ...ত। আর মোর যা হয়ে যাচ্ছে"—বলে ...ম গেল মুকুন্দ। দাঁতে দাঁত চেপে ... করে গেল।

"তা হলে যাই আমি—বলি যেয়ে"— ...বু উঠল।

মুকুন্দ বললে, "আর বুকের জনালা ...ভয়ে যদি বেঁচে থাকি, তখন নাম ...দ।"

হাবু চলে গেল।

শীতের সন্ধ্যা দেখতে দেখতে ঘন- ...র হয়ে এলো। পথ-ঘাট জনমানব- ...ন। চর নিঃসাড়।

চালায় গোঁজা টাঙিটাকে সন্তর্পণে ...মিয়ে এনে গামছায় জড়াল মুকুন্দ ...অন্ধকারে বসে বসে।

হরিদাসী জিজ্ঞেস করলে, "কি করিস ...ই অন্ধকারে বসে বসে।"

মুকুন্দ বললে, "কিছু নয়—তুই তোর ...জে যা।"

খানিক বাদে মুকুন্দ সেই গামছায় ...ড়ানো টাঙিটা গায়ের কাপড়ের মধ্যে ...কেঢুকে বেরিয়ে পড়তে গিয়ে আবার ...ড়ে গেল হরিদাসীর চোখে।

হরিদাসী বললে, "আবার কোথায় ...স?"

মুকুন্দ বললে, "ডাক্তারখানায়। দেরি ...লে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বি।"

"বেশি রাত করিস নি।"

মুকুন্দ মনে মনে বললে, সে কে ...নে—কত রাত।

রাতের প্রহর গড়িয়ে গেল—দুপুরে ...তের শেয়াল ডেকে গেল, তবু দেখা ...ই মুকুন্দের। ডাক্তারখানার আড্ডা বড়জোর ...ত পর্যন্ত চলে, চরের অনেকেই ফিরে ...জাটে—হরিদাসী জানে। তবু, জেগে ...জেগে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মুকুন্দের দেখা ...ই।

ফিরে এল সে অনেক রাতে। ঘুমন্ত ...র তখন শীতের অন্ধকারে নিস্তব্ধ।

পুকুরে হাত-পা ধুতে গিয়ে টাঙিটাকে ...ষে ঘষে পরিষ্কার করল আর বার। ...াকের কাছে নিয়ে শুঁকলো। আবার ...ল দিয়ে ধুলো। তারপর কি মনে ...লো, ডোবার মাঝামাঝি সেটা ছুঁড়ে ...ফেলে দিলে। শূন্য হাতে ফিরে এল ...রে। খানিক দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ— ...অন্ধকারে। কাপড়-চোপড় বদলাল।

হরিদাসী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ...কানো সাড়া-শব্দ নেই।

মুকুন্দ হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারে ...ল শুতে লাগল। পেয়ে গেল। একটা সাদা ভাঁজ-করা কাগজ। উঠোনে ... এসে চোখের সামনে মেলে ধরল কাগজটা। সাদা কাগজের এককোণায় তেল-কালির টিপটা দেখল এক মনে। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাগজটা আবার ভাঁজ করে রাখল।

সেই রাতে গিয়ে ডেকে তুলল হাবুকে।

হাবু ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, "কি ব্যাপার মুকুন্দ!"

"কথা আছে হাবু।" মুকুন্দের গলা যেন কাঁপছে।

"এত রাতে কথা।" হাবু অবাক চোখে তাকাল তার দিকে।

"আছে। চলো দাওয়ায়।"

দাওয়ায় উঠে বসলো মুকুন্দ। হাবুর দিকে সযত্নে সেই ভাঁজ করা কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললে, "এই কাগজটার ভার তোমাকে নিতে হবে ভাই।"

"কি কাগজ!" হাবু জিজ্ঞেস করল।

"সেই যে—ছাড়পত্রের কাগজ।" মুকুন্দ বলল, "টিপ করে দিয়েছি আজ। কাগজটা নয়নের হাতে দিয়ে আসতে পারবে?"

হাবু বললে, "সে তো ছোটমণ্ডলকেই দিতে হয়।"

"না। মোর ইচ্ছা"—মুকুন্দ একটু থেমে বলল, "নয়নের হাতে দিতে পারলে ভাল হয়। পারবে?"

"তা পারব। কিন্তু—" হাবু অবাক হয়ে বললে, "সেই কাগজটার জন্যে এত রাতে মোকে ডেকে"—

সব ভেবেচিন্তে রেখেছিল মুকুন্দ। বললে, "আজ নয়নের বাপ এসেছিল—জান তো?"

"তা জানি।"

"ভদ্দরের সঙ্গে নয়নের আবার"—

"তা-ও জানি।"

"তাই ভাবলম—কাগজটাকে আর আটক রেখে লাভ কি হাবু। শুয়েছিলম—ঘুমাতে পারলম নি। কাগজটা তাই দিতে এলম। নয়নের হাতে দিয়ো। আর যদি সুবিধা না হয়—ছোটমণ্ডলকে দিবে।"

মুকুন্দ আর বসল না। ঝট্ করে উঠে দাওয়া থেকে নেমে, হাবুর উঠোন, ধানের গাদা পার হয়ে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

"মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।" পেছনে বিড়বিড় করে বললে হাবু। তারপর সে-ও শুতে গেল।

মুকুন্দ ঘরের দিকে ফিরে এল বটে, ঘরে কিন্তু আর ঢুকলো না। উঠোনের অন্ধকারে চোরের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সেই অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল তার ছোট উঠোনটুকু। তার পাশে ... ঘরের জোড়া ... দেওয়াল —... ...

...য়েমেয়ের মত হয়ে গেছে। মনে পড়ে- ... একদিন কি যেন বলেছিল? বলেছিল—এ ঘর নয়নবৌয়ের জন্য।

মুকুন্দ আর দাঁড়াল না। দাওয়ার অন্ধকারে একটা ছোট পুঁটলি বেঁধে রেখেছিল আগে থেকে—সেইটে বগলদাবা করে সে চরের ভেড়ি বাঁধ ধরে এগিয়ে চলল সোজা দক্ষিণে...

ঘুমন্ত চরের কেউ জানল না মুকুন্দের এতবড় কাণ্ড। জানতে পারল শেষ রাতে। হঠাৎ থানা পুলিশের দাপা-দাপিতে অবাক হয়ে জেগে উঠল চরের মানুষ।

চরের কিষাণপাড়া ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। খানাতল্লাসীর জন্যে কোনো ঘর বাদ গেল না। না, কোথাও পাওয়া গেল না মুকুন্দকে।

হরিদাসীর চুলের মুঠি ধরে হিড়-হিড় করে ধরে আনলে দীনদয়াল সিং। বললে, "বোল্, হারামজাদী, শালাকে কোথায় ছিপিয়ে রেখেছিস?"

হরিদাসী প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল। চেঁচাতে চেঁচাতে সে যা বললে—তার মানে সে কিছুই জানে না।

দীনদয়াল সিং হুংকার দিয়ে উঠল, শালা খুন করে ঘরে এল—এই তো তার কাপড়, চাদর—এখোনো তাজা রক্ত লেগে আছে! আর তুই হারামজাদী জানিস নি কিছু?"

দাওয়ায় ফেলে গেছে মুকুন্দ তার কাপড় আর চাদর। হরিদাসী তাই দেখে আরও জোরে কপাল চাপড়াতে লাগল।

ছোট মণ্ডল এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, "কাকে সে খুন করল জমাদার সাহেব?"

"হামার দফাদারকে।"—

"দফাদার? কোন্ দফাদার জমাদার সাহেব?"

"তুমি শালা জানো না!" চোখ পাকিয়ে তাকালো মহেশ মণ্ডলের দিকে জমাদার সিংজী, "তোমরা শালা সব জানো। ভদু মাঝিকে খুন করিয়ে শালা কোথায় ভেগেছে—তোমরা সব জানো। সব শালাকে চালান করে দিব।" [ক্রমশঃ]

**পথ কে রুখবে? (বৈশাখ, ১৩৭৬)** মনোজ বসু। গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম—বারো টাকা।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু যখন লেখনী ধারণ করেন তখন পাঠক স্বভাবতই নতুন কিছুর প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। দেশের মাটি ও সাধারণ মানুষের ওপর তাঁর দরদ অসামান্য। তাঁর এই অকপট হৃদয় অভিব্যক্তির জন্যে দেশের মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন। বাস্তব ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে যে কজন কথাসাহিত্যিক নতুন যুগের নতুন দিনের শোষণহীন গ্লানিমুক্ত উদার সমাজব্যবস্থার কথা ভাবেন, বর্তমান হতাশা ও অন্ধকারের মধ্যেও আলোর ইঙ্গিত দেখতে পান ও দেখেন, মনোজ বসু তাঁদের অন্যতম।

বাংলা সাহিত্যে একের পর এক বিস্ময় নিয়ে এসেছে তাঁর লেখা 'ভুলি নাই', 'সৈনিক', 'আগস্ট—১৯৪২', 'মানুষ গড়ার কারিগর', 'বন কেটে বসত' প্রভৃতি উপন্যাস। নতুনত্বে, বৈশিষ্ট্যে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রতিটি উপন্যাসই রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। আলোচ্য উপন্যাস 'পথ কে রুখবে?' যখন দীর্ঘদিন ধরে—'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তা অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করেছে পাঠকবৃন্দের দরবারেই।

একটি দুর্ভাগা জাতির জীবন-যন্ত্রণা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অব্যবস্থিতচিত্ত নায়কদের নিপুণ পাশা খেলায় স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাডক্লিফের ছুরিতে বাংলাদেশ দুভাগ হয়ে গেলো—সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এলো অপরিসীম দুর্দশা। দু'দেশের সাধারণ মানুষ কি পেলো তার শাসকদের কাছ থেকে? উপেক্ষা, অনাহার, দারিদ্র্য, মৃত্যু। রাষ্ট্রযন্ত্রের যূপকাষ্ঠে দুই দেশকে পর করে রাখবার কী আপ্রাণ চেষ্টা! অথচ দুই বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের অন্তরের সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ, অবিচ্ছিন্ন রাখতে চায়—প্রীতি ও সখ্য বজায় রাখতে চায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সংঘটনের মাধ্যমে আজ হোক, কাল হোক বা কয়েক-পুরুষ পরে হোক, আবার মিলিত হতে চায়, এইরকম একটা অম্লান আশার অপরূপ আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়েছেন সাহিত্যিক।

বিশাল পটভূমি। রাজনৈতিক উপন্যাসে সমসাময়িক ইতিহাস ব্যঞ্জনামুখর। পটভূমিতে আছে ফরাসী, রুশ ও নাইজেরিয়া বিপ্লব। কিভাবে ক্ষমতালোলুপ নেতাদের হাতে দেশ দ্বিখণ্ডিত হল, তার আনুপূর্বিক বিবরণ।

বিচিত্র কাহিনী। দুই বাংলার ১,৩০০ মাইল বর্ডার। ঘাট ৫।৭ শ'। ঘাট মানে কিন্তু নদীর ঘাট নয়। র‍্যাকে ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়াই এদেশ-ওদেশ পারাপারের জায়গা। সেই সঙ্গে হরেক রকমের কালোবাজারী কারবার।

এইরকম একটা ঘাট পশ্চিমবাংলার মল্লিকঘাট। শ্রীধর তার মালিক। ওপারে রয়েছে আনোয়ার। ঘাটের দালাল রঞ্জন দত্ত—এপারে সে হয় রঞ্জন, ওপারে নাম তার রমজান। পূর্ববঙ্গের গ্রন্থের অধ্যাপক বীরেশ্বর, নাতনী ফুল্লরা, ফুল্লরার মা লীলা—পূর্ববঙ্গে রয়ে গেছেন এ'রা—সেখানকার সাধারণ মানুষ তাঁদের মাথায় করে রেখেছেন। দুই বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন বিভেদ-বিদ্বেষ নেই। পূর্ববঙ্গের হেমোকান্ত পশ্চিমবঙ্গের আবুল হাসানের সঙ্গে জমি-জমা, ঘর-বাড়ি বদল করে পরস্পর দেশত্যাগী হয়েছেন। দু'জনেই দু'জনের সম্পত্তি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। আছে এদের দরদমাখা কাহিনী। মুর্শিদাবাদের ডাক্তার খলিলুর রহমান এখন পূর্ববঙ্গবাসী। বীরেশ্বরের সুহৃদ ও প্রতিবেশী। রয়েছে বিচিত্র চরিত্র পূর্ববঙ্গের প্রাণখোলা মুসলিম মেয়ে তারাফুলি ও করিৎকর্মা হিন্দু ছেলে

[illegible] প্রীতি, [illegible] ও [illegible]
[illegible]
মানুষকে বাঁধছে। পূর্ববঙ্গে বীরেশ্বরের ছাত্ররা দাঙ্গাবিরোধী। খেটে খাওয়া মানুষ কেন চাইবে দাঙ্গা? এ'রা কেউই দেশ ভাগ মেনে নেন নি। তাই তো মল্লিকঘাট দিয়ে পারাপার হয় অদ্ভুত উপায়ে গভীর রাত্রে—চাঁদ উঠলে গড়িয়ে গড়িয়ে—বিদেশী পুলিশের চোখ এড়িয়ে। আসা-যাওয়া করে চাল, বিয়ের সন্ধানে পাত্র-পাত্রী, এমন কি মড়া পর্যন্ত।

চরিত্র অঙ্কনে মনোজবাবুর মুন্সীয়ানার তুলনা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের লোভী শয়তানতুল্য হরিহর খাঁর দুর্দশা চোখের সামনে ভাসে—মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে যে তার সেফটি ভল্টে যখের ধনের মত ধানের পাহাড় জমিয়ে রেখেছিল। প্রাণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল—ক্ষুধার্ত জনতার রুদ্ররোষ থেকে সে মুক্তি পায় নি। ছোট ছোট চরিত্রগুলিও জলজ্যান্ত। পূর্ববঙ্গে যাত্রাগান করে, প্রমথ বিশ্বাস—লেখক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন তার মধ্যে দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব। হিন্দু-মুসলমান দুটি শিশু টাট্টু ও হাসনা। হিন্দু-মুসলমান এদের মধ্যে কে দাঙ্গা বাধায়, এই নিয়ে যে তর্কাতর্কি—এবং তার যে মীমাংসা—তার মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক সুন্দরভাবে নতুন এক দ্বন্দ্ব-দ্বেষহীন মানুষের শুভ শান্ত সমাজ গড়ার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

জ্বলন্ত সংগ্রাম—খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৬। নরখাদক তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী খাবার না দিতে পেরে গুলী চালাচ্ছে—শহীদ হল নুরুল ইসলাম, ইব্রাহিম, দীনেশ, সুবীর, সন্তোষ, নারায়ণ ইত্যাদি। কচি কচি সব ফলের মত ছেলে। প্রচণ্ড সেই খাদ্য আন্দোলনের আগুনরাঙা দিনগুলোর, আবেগমথিত মৌন মিছিলের জীবন্ত চিত্র এ'কেছেন ঔপন্যাসিক। তৎকালীন সরকার অধিষ্ঠিত থাকলে তাঁদের জঘন্যতম কুকীর্তির সাক্ষ্য এই ইতিহাস নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত করতেন।

আন্দোলনের পথই বা কে রুখবে? মানুষ যে নতুনভাবে বাঁচতে শিখছে। পূর্ববঙ্গ ও শিলচরের ভাষা আন্দোলন মহৎ সাহিত্যরূপ নিয়েছে। দুই বাংলার সংগ্রামী মানুষের মনের ভাষা মুখর হয়ে উঠেছে এই বৃহৎ উপন্যাসে।

এমন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে আমরা কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি। উপন্যাসটি দুই বাংলার পাঠকমহলে আদৃত হবে, আলোড়ন আনবে।

# অন্যগ্রাম অন্যতরংগ

## সমীর মুখোপাধ্যায়

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ আট ॥

'মনোহর মণ্ডল ভাবছে বসে
টাকা বাড়বে কিসে।
গড়গড়াতে তামাক টেনে
খুড়ো খুকুর কাশে॥
আদা হুই ভাবছে বসে
বাঁচা হল দায়।
ডাকাত ভয়ে বন্দুক নিয়ে
সদাই জেগে রই॥
ও ভাই পুলিন্দাতে বেজেছে
ঢোল......
ওপাড়ার ওই পেনীবাবু
হয়েছে কাবু।
টুপা পানার মধ্যে পড়ে
খাচ্ছে হাবুডুবু॥
ও ভাইরে, পুলিন্দাতে বেজেছে
ঢোল.....
শিশু দত্তের বাড়ছে ভুঁড়ি
হচ্ছে কোলা ব্যাঙ।
সূর্য দে ব্যাপার দেখে
লাফায় তিড়িং ত্যাং॥
ও ভাইরে, পুলিন্দাতে বেজেছে
ঢোল......'

'শুনছেন?' উনি তাকালেন আমার দিকে।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম গানখানি। আর তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষের উল্লাস দেখছিলাম। একটা গেঁও বাজার। শুক্রবার শুক্রবার বসে। কাছেপিঠের গ্রাম থেকে মাঠ পেরিয়ে কাদা থপথপে পা নিয়ে সওদা করতে সকলে আসে। এখন [বেচা]-কেনা চলছে জোর। তার মধ্যেই [এক]টা জায়গা বেছে নিয়েছে লোকটা। [তা]রপর নেচে নেচে গাইছে। মাঝে মাঝে [তা]লও দিচ্ছে অংগ হেলিয়ে। দেখতে [দে]খতে ওকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটা [ছো]টখাটো জটলা।

'বলিহারি, বলিহারি ভাই, একবার ঘুরে ফিরে'—আওয়াজ উঠছে।

'হরি হরি বল, হরি হরি বল', এ আওয়াজও আছে।

এরই মাঝে ঢ্যাংড়া ছেলে আবার বাজিয়ে দিচ্ছে সিটি মুখে আঙুল পুরে।

'লোকটা প্রায়ই আসে এদিকে। মুর্শিদাবাদের দিকে ঘর।' উনি ধীরে ধীরে বললেন।

আমি লোকটাকে দেখছিলাম। অনেকটা বানভাসি লোকের মত হতচ্ছাড়া চেহারা। জামা কাপড় তথৈবচ। গালটা চোপসানো বেলুন। গলাটি কিন্তু সরেস। একবারে টাটকা মধু। তাছাড়া কথা-টথাগুলোও বেশ মচমচে, তেলেভাজা।

'মানুষের উৎসাহ দেখেছেন?'

উনি ম্লান হেসে বললেন, 'সেইটেই ত' ভয়ের।'

'ভয়ের?'

আমি ভিড়ের দিকে চেয়েছিলাম। ওনার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। এতক্ষণ ত' বেশ আমার সংগে কথা বলছিলেন। হঠাৎ কি হল? লোকটা ত' খারাপ গাইছে না। তাছাড়া গানের ভাষার মধ্যে বেশ খোঁচা আছে। যার গায়ে লাগার তার গায়ে শুধু লাগবে না। একেবারে বিঁধে যাবে। এই বিঁধে যাওয়া কি উনি চান না?

ঘাড় ফিরিয়ে ওনার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

ভারি বর্ষায় দুর দুর শব্দে মেঘ ডাকার আগে সমস্ত আকাশ ওল্টানো দোয়াতের মত যেমন কালিমূর্তি ধরে তেমনি একটি ভাব ওঁর মুখে।

'মানুষের উৎসাহ ভয়ের কেন? মানুষ উৎসাহ করুক আপনি কি তা' চান না?'

অন্ধকারে ভিনপথে চলতে চলতে যেন গর্তে পড়ে গেছেন, সেখান থেকে উঠতে চাইছেন তবু উঠতে পারছেন না এমনভাব বললেন, 'মানুষ উৎসাহ করুক কেন চাইবো না?'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মানুষের উৎসাহ ভালোবাসেন বলছেন আবার মানুষের উৎসাহ ভয়ের, এ-ও বলেছেন।'

'এ যে পান খেয়ে চুনে মলাম।' বলে অদ্ভুত ভংগিতে উনি হাসতে লাগলেন। 'পান বুঝলাম, কিন্তু চুনটা কই?'

উনি কিছু বললেন না। আমার পাশে পাশে চলতে লাগলেন। এই মানুষটির মস্ত গুণ যে, উনি মিছে কথা বলেন না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভালো ছাত্র ছিলেন। তারপর একটা ইংরেজী কাগজের সম্পাদককে গুলী করতে গিয়েছিলেন এই সন্দেহে দীর্ঘদিন কারাবাস। যে অঞ্চলে উনি বাস করেন সে অঞ্চলে ওঁকে ঘিরে অনেক গল্প আছে। এখানেও কংগ্রেসী যুগে জমির লড়াইকে কেন্দ্র করে ওঁকে ঘিরে অনেক গল্প। এ অঞ্চলটার ধারে-কাছে পাহাড়-পর্বত নেই। বড় বড় বন-জংগল ত্রিসীমানায় নেই। তবু কফিহাউসের যুবকেরা টাটকা টাটকা চে গুয়েভারা আর মাও সেতুঙের বই পড়ে যে গেরিলা যুদ্ধের কথা বলে সেই গেরিলা যুদ্ধের খানিকটা আদল উনি সেদিন এনেছিলেন ওঁর লড়াইয়ে। মাটির তলা দিয়ে প্রকাণ্ড সুড়ংগ কেটে হঠাৎ আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন কয়েকবার।

কথাও বলেন খুব সুন্দর। বয়স অনেক। তবু এই বয়সেও চমৎকার স্বাস্থ্য। দাঁতগুলি মজবুত। হাসলে ঝিকমিক ঝিকমিক করে।

জেলে থাকার কষ্ট সম্বন্ধে একদিন আমাকে হেসে হেসে বলছিলেন, 'ওখানে আর কষ্ট কি। তবে বড্ড মাপা ভাত দেয়। দেখছেন তো আমার শরীরখানা। ঐ মাপা ভাতে কি হবে মশাই আমার। এই ভাত খাওয়া নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে কি হাসাহাসি!'

আমি এ ক'দিনে লক্ষ্য করেছি কথাবার্তায় কখনো 'কমরেড' কথাটি উনি ব্যবহার করেন না। চিঠিপত্রেও দেখেছি। 'ডায়লেকাটসে' বা 'মার্কস একথা বলেছেন', বা আলোচনাতে লম্বা কোটেশন এসব উনি কখনো টেনে আনেন না। আমার আর রাজনীতি পড়াশুনো কতটুকু? কিছুই না। ওঁর সংগে আলোচনা করতে গিয়েও বিশেষ কিছু টের পাই নি। কেবল একসংগে চলতে চলতে বা কবে আড্ডা মারতে মারতে মানুষ সম্বন্ধে, চলতি রাজনীতি সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য করেছেন যে, হঠাৎ হঠাৎ ওরকম মন্তব্য করা যায় না বলেই মনে হয়েছে। জীবন সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান খানিকটা থাকলে তবেই এ ধরনের মন্তব্য করা যায়। এই সেদিন ওঁদের কোন গাঁয়ে যেন মিটিং। যাবেন। অপেক্ষা করছেন বাস ধরবার জন্যে। আমিও ছিনে জোঁকের মত জুটে গেছি।

ভাবটা এই, যেখানে যা পাই। টুকরো টাকরা কোন কিছুতেই আমার আপত্তি নেই। আমার এ শূন্য ঝুলি কিছুতেই ফুরোবে না।

কে একজন উটকো লোক, হাবেভাবে মনে হল ওঁদেরই পরিচিত কেউ, আগে হয়তো ওঁর দলে ছিলেন, এখন পালা বদলে দিক পাশ হারিয়ে বসে গেছে, যাকে 'ফ্রাস্টেটেড' বলে অনেকটা তাই যেন, বলল, আমি শুনলাম, 'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পার হয়ে গেল। আপনার এখনো এই সব ভালো লাগে?'

'কোন সব?'

'এই পার্টি পত্রিকা বিক্রি, পার্টি তহবিল সংগ্রহ অভিযান, এই সব আজেবাজে বক্তৃতা যা' আপনিও বোঝেন না, দেশের জনগণ তো আরো আকাট, চাষী মানুষের ঐক্য-ফৈক্য আর কি!'

'কেন, ভালো লাগবে না?'

'ভালো লাগে?' লোকটা যেন ভূত দেখলো।

আকাশ নীল, নদী মায়ের মত, শিশুর হাসি কি মিণ্টি এসব নিয়েই তো মানুষ, এই সব নিয়েই তো পার্টি, ভালো লাগবে না কেন? এসব কি কখনো পুরোন হয়?'

'এসব তাঁকে আপনার কাছে পুরোন হয় নি. এখনো ভালো লাগে?'

উনি গম্ভীরভাবে নিশ্বাস টেনে ফুসফুস ভরিয়ে ফেলে সুন্দর, সজীব হেসে বললেন, 'ভালো না লাগলে বসে পড়তাম তোমার মত। দেখছো না আমি চলছি আর আমার সংগে যে যেরকম পারছে চলছে।'

তারপর গভীর স্নেহের সংগে ওর থুতনি নেড়ে আদর করে বললেন, 'এরকম করে চললে তো বাঁচবে না। একটা কিছু নিয়ে লেগে থাকো। নাই বা করলে রাজনীতি। একটা লাইব্রেরী-টাইব্রেরী এসবও তো করতে পারো। দেখছো না এদের কত দরকার।'

সেদিনই আমি মানুষটাকে চিনেছিলাম। সত্যি কথাই বলছি, রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁদের আমার বিশেষ ভালো লাগে না। গা দিয়ে কেমন ওঁদের রুটিন রুটিন গন্ধ বেরোয়। খালি ওঁরা জামার হাতা গুটিয়ে ঘড়ি দেখেন। বক্তৃতা দিতে দিতেও। বন্ধুর সংগে কথা বলতে বলতেও। বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে খেতেও। আর কারুর যে সময়ের কোন দাম নেই এটা নাকের কাছে ঘড়ি ধরে বার বার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা। অথচ বক্তৃতায় টাইম নেবেন ঝাড়া দেড় ঘণ্টা। যে কথাটা পনেরো মিনিটে শেষ করা যায় সেটা টেনে নিয়ে যাবেনই ইনিয়ে-বিনিয়ে যতোদূর টানা যায়। বলেন তো সেই একই কথা। সেই খাড়া, বড়ি, থোড় আর থোড়, বড়ি খাড়া। আমি কতোদিন ময়দানের মিটিং-এ গেছি। সব থেকে করুণ অবস্থা সাংবাদিকদের। ওঁদের শুনে শুনে কান পচে গেছে। বড়, লম্বা টেবিলটায় বসে বসে ওঁরা হাই তোলেন। কেউ কেউ ঢোলেন। অনেকে ঘুমিয়েও পড়েন। এতে কোন অসুবিধে হয় না। ওঁরা কি বলবেন সবি তো জানা। একসময় একটু আধটু সর্টহ্যাণ্ডে টুকে নিলেই হল।

উনি ওঁর সগোত্রের একজন নন। কেমন একটু সৃষ্টিছাড়া মানুষ। যেন দার্শনিক হলেই ভালো হত।

পাশে পাশেই হাঁটছি। উনি কোন কথা বলছেন না। মনে হচ্ছে গভীর চিন্তামগ্ন। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'ঐ ডানহাতি দোকানটা দেখেছেন। ঐ যে—'

'হ্যাঁ।'

'ভালো করে দেখুন। লোকটাকে দেখুন যে বিক্রি করছে। মানে যার দোকান।'

দেখলাম লোকটাকে। একটা সস্তা জামা, কাপড়, শাড়ি, মশারির দোকান। আশেপাশে ভিড় খুবই। যার দোকান তার বেশ মজবুত চেহারা রোগা হলেও। মাথার চুলগুলো কোঁচকানো, ঘন। চোখের দৃষ্টি সতর্ক, বুনো বুনো ভাব। পরনে চেকদার লুংগি। গায়ে গেঞ্জি। বার্নিস করা কালো গায়ের রং। হাসলে মুলোর মত দাঁতগুলো বার হয়ে পড়ে। ডান হাতের কব্জিতে ঘড়ি।

'দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'না, দেখেন নি।'

'দেখি নি?'

'আমি যা দেখার কথা বলছি তা দেখেন নি।'

আমরা দু'জনেই দোকানের কাছাকাছি এলাম। ওঁকে দেখে তাড়াতাড়ি দোকানের মালিক ছুটে এলো, বলল, 'কমরেড, এদিকে কোথায়?'

'কমরেড' এই সম্বোধনে উনি বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন হলেন।

'এই, এঁকে সংগে করে একটু দেশগাঁ দেখতে বেরিয়েছি।'

'আজ তো আপনার মিটিং খেজুরেতে।'

'হ্যাঁ।'

'কৃষক সমিতির মেম্বর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে।'

'ভালোই তো।'

'আমার চারটে বিল বই শেষ হয়ে গেছে।'

'তাও ভালো।'

লোকটি বোধহয় তেমন উৎসাহ পেলো না ওঁর কাছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'চলি। খেজুরেতে যাচ্ছি লোকজনকে নিয়ে।'

'আচ্ছা।'

ও চলে যেতে ডান বললেন, 'দেখলেন?'

'হ্যাঁ। বেশ উৎসাহী লোক। তিনচারটি বিল বই শেষ করে ফেলেছেন।'

'আমি সে দেখার কথা আদপেই বলছি না।' ওঁর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি।

একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'ওর দোকানের ভেতরটা দেখুন। ওখানে একটা মাদুর পাতা আছে। ভদ্দরলোকেরা জিনিষ কিনতে এলে সকলে ওখানে বসে। কিন্তু আজ এখন ভদ্দরলোকদের কেউ দোকানে আসেন নি। মাদুরটা খালি। কিন্তু ছোটলোকেরা, এই কথাটা বললে আপনি বুঝবেন তাই ছোটলোকেরা বলছি, ওরা কিন্তু জামা-কাপড়-মশারি কিনতে এসেছে, ওরা এখন মাদুরে বসতে পারতো, কিন্তু বসে নি একজনও। চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ ভদ্দরলোকদের চেয়ে এক পয়সা কম দিয়ে ওরা জিনিষ কিনবে না।'

তাই তো। উনি ঠিকই বলেছেন।

'এইবার মিলিয়ে নিন মেম্বরের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে।'

দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় ওঁর দৃষ্টি। ব্যক্ত তাতে নয়। মেম্বর হু হু করে র নয়। বিল বই একটার পর শেষ করায় নয়। বক্তৃতায়, প্যাম-, পোস্টারে নয়। ওঁর দৃষ্টির শেকড় গেছে একেবারে মাটিতে।

পরিবর্তনের একটা ঢেউ এসেছে যা ঠিক। কিন্তু সেই ঢেউ চৌকাঠ ন্ত এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কবে অবাধ্য হয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে মাদুর সয়ে দেবে? কবে, কবে?'

'হাটের ঐ গানটা মনে পড়ছে?'

'কোন গানটা বলুন তো!'

'ঐ যে টুপা পানার মধ্যে পড়ে খাচ্ছি হাবুডুবু।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'আপনাকে খানিকটা অবসন্ন লাগছে।'

'না। অবসন্ন নয়। কাগজে যা ছেন তাও যেমন ঠিক নয় আবার দের লোকজনদের কাছে যা শুনছেন ও সঠিক নয়। ঘটনাকে পরিষ্কার খের সামনে রাখতে হবে।'

তারপর উনি বলে চললেন সেই না যা পরিষ্কার চোখের সামনে রাখতে।

'এইমাত্র যে লোকটাকে আপনি বলেন এই সেদিনে ১৯৬৭ সালের ও লোকটা ছিলো ভিন্ন ক্যাম্পে। ১৬৬ সালের পর গ্রামের মধ্যেও একটা রবর্তন তখন এসেছিলো। আগে মি দিনের বেলায় এখানে আসতে রতাম না। আমাকে সংগঠনের কাজে গ্রে আসতে হত। চুপি চুপি গ্রামে কতাম। তারপর আমাদের ব্যবস্থা কতো কোন একজনের ঘরে। সেখানে াগে থেকে লোকজন সব বসে থাকতো। াগামীদিনে লড়াইয়ের ছক কেমন হবে া তাদের বোঝাতাম।

১৯৬৬ সালের পর সে অবস্থা আর ইলো না সেই আমি তো দিব্যি সকাল-বলা কাঁধে একখানি হ্যান্ডলুমের ব্যাগ ঝুলিয়ে এ-গ্রামে ঢুকেছি। কোথাও কেউ কছু বলে নি। আমাকে না চেনার কথাও নয়। দশ-বারোখানা গ্রামের র 'বেরোলে'র মাঠে বড় বড় মিটিং হয়ে গেছে।

একদিন সকালবেলা এখানকার দোকানে বসে চা খাচ্ছি, এই লোকটা ঐ কাপড়ের দোকান থেকে হাউই-এর মত ছুটে এসে হঠাৎ আমার জামার কলার চেপে ধরে, বলে, 'শালো, এখানে এসে মামদোবাজী করতে এসেছ। এ শান্তির গেরাম। মানুষ খাচ্ছে, দাচ্ছে, পান্ডুয়ার টকি দেখতে যাচ্ছে। তুমি এসে খুঁচিয়ে ঘা করতে আসছো। এই, দে তো একটা কাটারি। শালোকে আজ কেটেই ফেলবো।' আমি উঠে পড়লাম বেঞ্চি থেকে। তারপর দোকানের ভেতরে সটান চলে গিয়ে, একটা কাটারি ওইখানেই পড়েছিল বোধহয় ভাব কাটবার জন্যে, সেইটে নিয়ে ওর হাতে দিলাম, বললাম, 'কাটো।' বলে কটকট করে ওর দিকে তাকালাম। আমি যে এরকম ধরণের একটা কান্ড করতে পারি ও ভাবতেই পারে নি। আশপাশের লোকও খানিক হতভম্ব। ও-ও মুখে 'রা' কাড়ছে না। আমি অবস্থাটার সুযোগ নিলাম। বললাম, 'দেখুন, কান্ড দেখুন ভদ্দর-লোকের। মাথা-টাথা খারাপ করে ফেলেছেন এই বয়সে। আপনারা একটা ব্যবস্থা করে ওঁকে রাঁচি পাঠিয়ে দিন। টিকিটের ভাড়াটা কি আর করা যাবে আমিই না হয় দোব।' ওরা সকলে হেসে ফেলে। সে যাত্রা আমি রেহাই পাই।

১৯৬৮ সালেও ওকে পোস্টার মারতে দেখেছি দেয়ালে। সেই পোস্টার: ভুলে গেছে বাপের নাম। মুখে খালি ভিয়েতনাম।

তাছাড়া নোংরামিও অনেক। একে মারছে তাকে শাসাচ্ছে। নিজেই নিজের বাড়িতে বম ফাটিয়ে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে। যার-তার বাগান থেকে কলার কাঁদি লোপাট করে হাটে বেচে দিচ্ছে। কিছু বলার হুকুম নেই। মানুষের গলায় তখনো ভাষা ফোটে নি। একটু আধো আধো বুলি মাত্র গলা দিয়ে সরছে।

১৯৬৯ সালে এখানে পার্টি মেম্বর আর সমর্থকদের ঘরোয়া মিটিং করতে এসে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

ওকে বললাম, 'কি হে, তুমি এখানে?'

'আজ্ঞে, ভুল কি মানুষ করে না? তখন ভুল করেছিলাম এখন শোধরাতে চাই।'

সেটা ঠিক। মানুষ ভুল করে। আবার মানুষই তা ঠিক করে। তাছাড়া মাঝের লোকগুলোকে তো আমাদের দিকে টানতে হবে। তাদের ছেড়ে দিতে পারি না একদিন শত্রুতা করেছে বলে।

বললাম, 'ভাব না জেনে ভাবে মোজো না। হুজুকেতে মেতো না। আমার ভাগাই এরকম। কতো এলো। কতো গেল। এসব বসে বসে দেখতে হচ্ছে অনেকদিন।'

ও হাত কচলে বলল, 'আজ্ঞে, আমায় কুচি কুচি করে কেটে ফেল্লেও বেইমানি করবো না। নেওয়ার বেলা কত সন্ধি, নিয়ে করে কপাট বন্দী, আমি সেরকম না।'

ঠিক আছে।

এ অঞ্চল থেকে খানিক দূরে 'মেঘ-জল' বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে অনেকটা জমি, সরকারের জমি, দু-চারজন লোক ভোগ করছিলো অনেক দিন। যারা ভোগ করছিলো তারা কলকাতায় থাকতো। ওদের হয়ে দেখাশুনো করতো যারা তাদের আপনি চিনবেন না বলে নাম বললাম না। অবশ্য নাম না বললেও আপনার না চেনার কোন কারণ নেই। এরা সব জায়গায় আছে। সব যুগে আছে।

১৯৪৭ সালের আগে এরা ছিল হিন্দুমহাসভার লোক। মাথায় চড়াতো গেরুয়া টুপি। কাজের মধ্যে মুসলমান ঠেঙানো। গুন্ডা দিয়ে একে-তাকে খুন করা। তারকেশ্বর, ত্রিবেণী, মাহেশের মেলায় কাটা টিন নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ঘুরে বেড়াতো। তারপর '৪৭ সালের পর গেরুয়া টুপি রাতারাতি খাদি টুপি হয়ে যায়। যে গান্ধীকে মারার জন্যে এদের খুশি সেদিন বাঁধ ছাপিয়ে দেশ ভাসিয়েছিলো, রাতারাতি সেই গান্ধীর শোকে এরা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেললে। সে যাক। তখন থেকেই সরকারী খাস জমি এরা ভোগদখল করছে। কে কি বলবে। ওরা সব। ওরাই রিলিফ সেন্টারের লোক। বি· ডি· ও ওদের কথায় ওঠে বসে। পুলিশ হুকুমের চাকর। ওরাই অঞ্চলের প্রধান। ওঃ, সে ওদের ভারি জম-জমাট দিন গেছে।

যে লোকটার কথা বলছি এই প্রথম আমাদের খবর দেয়, বলে 'করছেন কি বসে বসে কমরেড? অতোখানি জমি পড়ে রয়েছে। চারদিকের গ্রামে কতো অভাবী মানুষ। এক টুকরো পেলে বেঁচে বত্তে যায়। ব্যবস্থা করুন। না হয় আমাকে ব্যবস্থা করতে দিন।'

বারে, চমৎকার তৈরি হয়েছে তো এরই মধ্যে। এ অঞ্চলে আমাদের লোক-জন কম আছে। তারা বসে বসে ভেরেন্ডা ভাজছে। বক্তৃতা করতে বল, হুঁ, তাতে আছে। পোস্টার মারতে বল,

তাতেও পেছপা নয়। মারামারি করতে হল, তাতেও যথেষ্ট উৎসাহ। কিন্তু ঐ কাজের কথাটি বোলো না। বললেই বিপদ। তখন আর কাউকে পাওয়া যাবে না। বলবে জরুরী কাজ আছে বাড়িতে। আসলে কিন্তু জরুরী কাজ তখন পাণ্ডুয়ার সিনেমা হাউসের মধ্যে। সে হিসেবে এ তো অনেক ভালো। অনেক এগিয়েছে। ধাপের পর ধাপ পার হয়ে এগিয়ে আসছে ছাদের দিকে। পড়াশুনোতেও উৎসাহ খুব। একটার পর একটা বই পড়ে ফেলছে। শুধু পড়ে ফেলছে না বুঝে ফেলছে। বুঝে ফেলছে না শুধু, লোককে বোঝাচ্ছে। এদিকে কাজেও যথেষ্ট দড়। তা তো দেখাই গেল।

'হুঁ। নিশ্চয়ই খাস জমি দখল নিতে হবে। তুমিই ব্যবস্থা কর না।'

ওকে বলি।

ও যেন ঠিক এই জিনিষটাই চাইছিলো। তাছাড়া কেমন করে যেন জানতে পেরেছিলো ও কাজের ভারটা ওকেই দেওয়া হবে।

একদিন তীর, ধনুক, বর্শা, লাঠিতে মিছিল সাজিয়ে, ঢোল-ডগর বাজাতে বাজাতে নানারকম স্লোগান উঠিয়ে ওরা 'মেঘজল' গ্রামের জমিতে নিশান পুঁতে দিলো। আগে থেকেই, যারা খাসের জমি ভোগ করছিলো, তারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ গাছে গাছে নোটিশ টাঙিয়ে দেয়। ওরা সেই নোটিশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে, ঐ লোকটাই প্রথম নোটিশ টেনে ছিঁড়ে ফর্দাফাই করে বলে, 'এ সব নোটিশ-ফোটিশ মানি না। এই যদি আইন হয় তবে এই আইনে থুতু।'

তারপর যেই আরেকটা পুলিশভ্যান এলো ওরা সেই ভ্যানের পাশে শুয়ে পড়লো। যদি যেতে হয় আমাদের বুকের হাড়গুলোকে মড় মড় করে ভেঙে গুঁড়ো করে তবে যাও। পুলিশ আর কি করে, সে পুলিশ তো এখন আর নেই, না হলে দু'-চারটি খুন-খারাবি হতই, কিন্তু পুলিশ বিদ্রোহ করে নাম খারাপ করে ফেলেছে। তাছাড়া শালার লোকজনের, বিশেষ এই চাষীভুষীদের মন-মেজাজ দিনে দিনে যেরকম হয়ে উঠেছে তাতে কায়দায় পেলে নির্জনে ঠিক কুপিয়ে মারবে—এই সব সাত-পাঁচ ভেবে পুলিশ নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

ওরা হৈ-হৈ করে জমি দখল নেয়। জমি দখলের পর জমি যখন কুমড়োর ফালির মত ভাগ হবে তখন জানা গেল ও লোকটা এখানে কিছু জমি ভাগে চাষ করতো। তার ঐ জমি ১৯৬৪ সালে সরকারী রেকর্ড হয়। ফলে ওর জমি ঠিকই রইলো। বাকি সকলে যে যেমন পাবার পেল।

জমি পেলেই হবে না, বীজ চাই, সার চাই, লাঙল চাই তবেই তো ধান দলমলিয়ে উঠবে। কে দেবে এতো টাকা, কার আছে? সবই তো উপোষী লোক, দেয়ালে পেছন দিক ঠেকে গেছে সকলের। 'আনো কাঁচি, কাটো পান, বাসরঘরে লাগাও দোকান'—এমন আর কে আছে?

গায়ে খরা লেগেছে এখন ছাতা ধরে কে?

ছাতা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে লোকটা এগিয়ে এলো, বলল, 'আমি বীজ দোব, সার দোব, আমিই তোদের জোগাবো লাঙল। তোরা ফসল উঠলে যে যেমন পারবি দিবি।'

এর আগে ওরা বীজ ফেলেছে কিন্তু ফসল হয় নি। এ জমি যে এতো উর্বর সেদিন জানা যায় নি। কিন্তু উপযুক্ত পুরুষ যখন এলো তখনি জমির সোনার অংগ ভরে উঠলো।

আপনি কখনো কি বর্ষার রাত্রে যখন জমজমাট মেঘে আকাশ ভরা, তখন নিস্তব্ধ খাঁ খাঁ করা, জলে ভরা বিশাল প্রান্তরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন? শুনেছেন হাজার হাজার ব্যাঙ-ব্যাঙানির মক্ মক্ মক্ শব্দ, যেন খুশি আর আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না, অনবরত মক্ মক্ মক্, শেষ আর হচ্ছে না, মাথার ওপর প্রকাণ্ড স্লেটের মত নিকষ কালো আকাশ, বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তর, মাঝে মাঝে বাজ চিরে দিচ্ছে আকাশ, শুনেছেন? মক্ মক্ মক্?

আপনি কখনো দেখেছেন সেই অন্ধকার যে অন্ধকারে আকাশ, মাটি, মাঠ সব একাকার? নির্জন, নিরালোক সেই অন্ধকারে চলতে চলতে কখনো কি থমকে দাঁড়িয়েছেন? দেখেছেন সেই গাছটাকে যাকে ঘিরে জোনাকির নাচ? জোনাকি একটা নয়, হাজার হাজার, হয়তো লক্ষও হবে, ওরা কালো আকাশের নিচে কালো গাছটিকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচছে, দেখেছেন বিরামহীন সেই অবিশ্রান্ত জোনাকির অফুরন্ত অন্তহীন নাচ? তাহলেই বুঝতে পারবেন সেদিন ওদের, এই সব মানুষের ভেতরের কথা। প্রায় একশো দুশো মানুষ নেবে পড়েছে মাটিতে, 'ওরে হুৎ, ওরে হুৎ, হুৎ, হুৎ, করে বলদের ল্যাজ ধরে ক্ষেতে নিড়েন দিচ্ছে. লক্ষ্মীমায়ের আউরি বাউরি বাঁধতে হবে, অনেকদিন মরাই শূন্য, কাল খাকে খেয়ে গেছে। অঘ্রানেতে আসবে আঁটি আঁটি ধান। তখন রাত সকাল সেই ধান মাড়া চলবে। কুলোর বাতাসে কুটো উড়বে রাশি রাশি। ঘুরে ঘুরে, নেচে নেচে গান গাইছে, 'হারে ও আমার কাত্তি শাল, বছর বছর থাকিস রে বহাল। তুই হামাদের মাতাপিতা, তুই হামাদের মাতি ছাওয়াল, সাতপুরুষের জমিন হামার, তিনপুরুষের হাল।'

তারপর একদিন ঐ জমিতে উঠলো রাশি রাশি ধান, অন্য ফসলও ফললো। এ এক নতুন ধরণের মানুষ। ওদের গায়ে গা মিশিয়ে থাকে, চাষের সময় আস্কোট কলাপাতায় থাবড়া হাতে ওদের সংগেই ভাত খায়। মাঝে মাঝে শক্ত মুঠিতে লাঙল ধরে, ওদের সংগেই জমির লড়াইয়ে চলে, এ গাঁ থেকে ও গাঁ, এদেশ থেকে ওদেশ, আলপথ বেয়ে হাজার হাজার মানুষের সংগে আগে আগে নিশান নিয়ে চলেছে আবার যখন ফসল উঠছে তখন নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝেও নিচ্ছে, এক পয়সা ছাড়ছে না, গলায় গামছা দিয়ে আদায় করছে অবশ্য মুখ খুব মিষ্টি; সুদও নেয় না। যখন যার যা দরকার সে ওর কাছে হাত পাতছে। ওর-ও দরাজ হাত, দরাজ দিল। সবাইকে খুশি করে দিচ্ছে। কিন্তু অনেক রাতে মোমবাতির আলোয় ওর সাদা খাতায় এই সব লোকেদের নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে! কে কত ধারে, কি বাবদে ধারে। তার হিসেব কড়াক্রান্তি পর্যন্ত ওতে লেখা আছে।

আসবার সময় দোকানটা দেখলেন ওর? আগে দোকানে খদ্দেরই হোত না। এখন ঐ জমির সংগে যারা জড়ানো, অমন শ' দেড়েক মানুষ, ওরা সবাই ভিড় করছে ওর দোকানে। ও আমায় 'কমরেড' বললে ওকেও আমাকে কমরেড বলতে হবে?

জোতদারকে আমরা তাড়ালাম নতুন আর এক জোতদার তৈরি করবার জন্যে? এর জন্যেই কি জমির লড়াই? আর সব থেকে মুশকিল, এই সব অভাবী কিষেণদের এই লোকটি মা-বাপ! ওরা বলে, দয়ার শরীর। ঐ যে সুদ নেয় না, কাউকে চাবকায় না, চোখ রাঙিয়ে কথা বলে না, ব্যস হয়ে গেল!

বুঝলেন, 'ভয় আমার কোথায়?'

উনি থামলেন। ওঁর মুখে ম্লান ছায়া! কিন্তু তারপর বললেন, 'ঐ গাছটা সব সময় আমার চোখে ভাসে। যখন আকাশ, মাটি, মানুষ সব অন্ধকারে একাকার। তখন চুপ করে একা একা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি গাছটাকে ঘিরে, পাকে পাকে হাজার হাজার জোনাকির অফুরন্ত নাচ।'

রোদ-ধোয়া এই খটখটে দিনের বেলায় বিনি অন্ধকার গাছটিকে ঘিরে অসংখ্য জোনাকির নাচ দেখছেন, যাঁর গলায় স্বর সোনালি ঘণ্টার মত বেজে চলেছে, সবুজ মাঠের এই ক্ষত যাঁর বুকেও ক্ষত করেছে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম যেমন করে সকলে অপলক চোখে ভোরের সূর্যকে দেখে।

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চার ॥

তাহলে লেনিন ও স্তালিনের ব্যাখ্যা অনুসারে নিম্নলিখিত চারটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি আমরা:

(১) দুটো পৃথক পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্র-সমাজব্যবস্থা আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা লাভ করে এগিয়ে যাবে; (২) এই দুই পরস্পর-বিধ্বংসী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাশাপাশি থেকে ক্রমোন্নতির সোপান বেয়ে ওপরের দিকে উঠে যাবে এবং দুটি বিপরীত ব্যবস্থাই নিজেদের সুসংহত করতে পারবে; (৩) এই দুই-এর মাঝখানে একটা সাময়িক ভারসাম্য থেকে যাবে; এবং (৪) পরিশেষে একটি ব্যবস্থা অপরটির ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য স্থাপন করবেই। ("Who defeats whom that is in the ultimate question"—Stalin)

এখন সত্যি সত্যিই যদি পুঁজিবাদ নিজের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পুঁজিবাদী শিবির-ভুক্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি আত্মবিধ্বংসী সংঘর্ষে ধ্বংস হয় তাতে কমিউনিস্ট শিবিরের ভাবনার ও দুশ্চিন্তার কোনই কারণ থাকে না। পুঁজিবাদী শিবির যদি ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ইতিহাসের বুক থেকে চিরতরে মিলিয়ে যায় তাহলে তার 'গুণাগুণ' নিয়ে (যেমন লেনিন বা স্তালিনের রচনার মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে) আলোচনা বা মন্তব্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু দুনিয়াটাকে শোষণমুক্ত করার জন্য কমিউনিস্ট শিবির পুঁজিবাদী শিবিরকে আঘাত হেনে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের বিজয় পতাকা ওড়াতে বদ্ধপরিকর। নতুবা সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট শিবিরের গুণগত উৎকর্ষতা ও বৈপ্লবিক ভূমিকা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে না। আর তা না হলে বিশ্বের মেহনতী শোষিত মানুষেরা এই শিবিরের ও তার ঘোষিত নীতির প্রতি আকৃষ্ট হবে কি করে? যেমন পশ্চিমবাংলা বা কেরলে প্রগতিশীল জনমনের অকুণ্ঠ সমর্থনপুষ্ট যুক্তফ্রণ্টের কোয়ালিশন সরকারগুলির শাসনকালে—প্রগতিশীল জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মেই অথবা অর্থ-নৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের ("ইকোনমিক ডিটারমিনিজম") অনিবার্য পরিণতি-স্বরূপ ভূমিহীন ও গরীব চাষীরা উদ্বৃত্ত চাষযোগ্য সরকারী জমি পায়—তাহলেই তো কোন বিশেষ শরিকী দলের ঘোষিত বা প্রচারিত আদর্শের বৈপ্লবিক কার্য-কারিতা ও গুণগত উৎকর্ষতা প্রমাণিত হবে না সেই অসহায় দুর্গত কৃষক-সমাজের কাছে! তাই জমি বণ্টন করতে গেলে বিশেষ দলের ঝাণ্ডা উড়িয়ে—পাশব-শক্তির প্যারেড করে বিশেষ রঙের রুমাল গলায় বেঁধে—সেই বিশেষ দলের কর্মী-সমর্থকরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে বদ্ধ-পরিকর। তাই শুধু যুক্তফ্রণ্টের প্রগতি-শীলতার জয়জয়কারে তাদের উৎসাহ নেই। যে কথা হচ্ছিল: তত্ত্বের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবির পুঁজিবাদী শিবিরকে পরাভূত করতে চায়। এই বিশ্ব-লক্ষ্য সামনে রাখলে তবেই পুঁজিবাদী শিবিরভুক্ত বুর্জোয়া বা আধা বুর্জোয়া বা অ-পুঁজিবাদী অথবা মার্কিন জোট-বিরোধী অথবা নিরপেক্ষ জঙ্গী অগণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লবী শক্তিদের দিয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে অথবা অনুপ্রবেশের কৌশল ("ইনফিলট্রেশন ট্যাকটিস") মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে করার তাত্ত্বিক ও মানসিক পটভূমি তৈরি রাখা যাবে। কিন্তু অকমিউনিস্ট দেশগুলিতে এই বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালিত হতে পারে সম্পূর্ণরূপে অকমিউনিস্ট বিপ্লব-বাদীদের দ্বারা। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের হাতে যে যাচ্ছে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। লাল চীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে সেই দল বা শক্তিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে ও করতে চাইবে যারা "চীনের চেয়ারম্যান ভারতের চেয়ারম্যান", "চীনের পথ ভারতের পথ" এই ঘোষণার সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে আবদ্ধ থাকবে—যারা ভারতের ওপর চীনের আক্রমণ অনুপ্রবেশকে "মুক্ত অঞ্চল" ঘোষণার নামে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাবে; চীনের সম্প্রসারণবাদী জঙ্গী মনোভাবের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে ছলে-বলে-কৌশলে দুর্বল করে রাখার রাজ-নীতি করবে। সোভিয়েট রাশিয়াও ভারতের বিপ্লবী বা প্রগতিশীল আন্দো-লনের নেতৃত্বে রাখবে মস্কো অনুগত রাজনৈতিক দল ও নেতা নেত্রীদের—যাঁদের কাছে রাশিয়ার সকল কাজ-আচরণ সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে, যাঁরা ভারতবর্ষকে সোভিয়েট রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে পিছু পা হবেন না। ভারতের 'বিপ্লবী' বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে বিশ্ববিপ্লবপন্থী মার্কসবাদী লেনিনবাদী রাশিয়া কোন ভারতীয় বেনেস-ম্যাসারিক-ডুবচেককে কখনই দেখতে চাইবেন না, চাইবেন ভারতীয় সংস্করণের কোন হুসাক-বিলাক-কে। কিন্তু পুঁজিবাদী অ-পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক জোটনিরপেক্ষ দেশ-গুলিতে পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচার-দুর্নীতি—অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক—গোষ্ঠীনিরপেক্ষ শক্তিগুলি—সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, মৈত্রী মানবিকতা গণতন্ত্র দেশপ্রেমের আদর্শ সামনে রেখে। পরিকল্পিত পদ্ধতির পথ বেয়ে বৈষয়িক উন্নয়ন, স্বাচ্ছন্দ্য, দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত সমাজ তাঁরা গড়তে চান। তাই বুর্জোয়া বা "অপুঁজিবাদী" বা জোট-নিরপেক্ষ বা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্যমুক্ত অনগ্র-সর বা আস্তে আস্তে এগিয়ে-চলা দেশ-গুলিতে বিপ্লবী অথবা সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের নেতৃত্ব অমার্ক্সবাদী দলের বা শক্তির হাতে থাকতে পারে। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল ব্যতিরেকেই যে পুঁজি-বাদকে হটিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায় তার একটা বড় দৃষ্টান্ত একালের কিউবা-বিপ্লবের ঘটনাটি। কিউবার বিপ্লব প্রমাণ করেছে সন্দেহাতীত-ভাবে যে অকমিউনিস্টরা 'বিপ্লব' মাধ্যমে পুঁজিবাদকে সামন্ততন্ত্রকে রুখতে পারে সফলতার সঙ্গে। একথা কিউবা-বিপ্লবের নেতা ফিডেল কাস্ত্রো নিজেই বলেছেন। কাস্ত্রো নিজেই লাটিন আমেরিকার দেশ-

গুলিতে কে বা কারা বিপ্লব আনবে সেই প্রশ্ন তুলেছিলেনঃ

"...who will make the revolution in Latin America? The people, revolutionaries with or without a party...."

জনগণ কোন্ দলের নেতৃত্বে বা দল ব্যতিরেকে বা পেশাদারী বিপ্লবীদের সাহায্য ছাড়াই বিপ্লব আসবে? এ সম্বন্ধে মার্কসবাদী দুনিয়ায় আলোড়নসৃষ্টিকারী পুস্তক —"রেভোলিউশন ইন রেভোলিউশন?"— এ-লেখক গেরিলাযুদ্ধতত্ত্বে বিশ্বাসী রেজিস ডেব্রে যে মন্তব্য করেছেন সেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেব্রে বলছেনঃ

"....Fidel Castro says simply that there is no revolution without a Vanguard; that this Vanguard is not necessarily the Marxist-Leninist Party; and that those who want to make the revolution have the right and the duty to constitute themselves a Vanguard independently of these parties. It takes courage to state the facts out loud when these facts contradict a tradition..." (P. 98)

এই ব্যক্তিটি কিন্তু এতদিনের প্রচলিত আঁকড়িয়ে-ধরা কমিউনিস্ট চিন্তাধারা পরিপন্থী। এই মার্কসবাদী লেখক বলেছেন যে, এই সহজ সত্যটি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করার মত সৎ-সাহস থাকা চাই। কাস্ট্রো সেই সাহসই দেখিয়েছেন, তিনি প্রচলিত লেনিনবাদী ট্রাডিশন-কে নস্যাৎ করে দিয়ে নিজের দেশে বিপ্লব করে দেখিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ছাড়াই বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে। এ-চিন্তা মাও-সে-তুং-এর ভাবধারারও অনুকূল নয়। অনেকে হয়ত জানেন না যে, কিউবার কাস্ট্রো-ও গেরিলা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন সেদেশের কমিউনিস্টরা "এ্যাডভেনচারিস্ট" আন্দোলন বলে। শেষে কাস্ট্রোর সাফল্য দেখে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। রাশিয়া ভেনিজুয়েলা কলাম্বিয়ার মত কাস্ট্রো-বিদ্বেষী দক্ষিণপন্থী দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্যও দিয়ে যাচ্ছে। কেন? রাশিয়া লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সম্ভাবনায় আদৌ আস্থাবান নয়, যেমন ছিলেন না স্তালিন বিভিন্ন অনগ্রসর দেশগুলির কমিউনিস্ট বিপ্লবে বিশ্বাসী। মস্কো ফিডেল কাস্ট্রোকে নিজের "অনুগত" বলে আদৌ মনে করে না আর কাস্ট্রোও চীন বা রাশিয়ার তাঁবেদার নন। রাশিয়া নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে লাটিন আমেরিকার দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট-বিরোধী দেশগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে। এর সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

পুঁজিবাদের বিনশনের সাথে সাথে কোন স্বয়ংক্রিয় কায়দায় সোভিয়েট রাশিয়া বা চীনের অনুগত মিত্রশক্তি সেই সব দেশের সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক চিন্তাশয্যা রচিত হলেই কমিউনিস্ট শিবিরের খুশি হবার কোন কারণ নেই—যদি না সেই সঙ্গে সেই সব বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জোয়া বা সামন্ততান্ত্রিক সদ্যমুক্ত স্বাধীন অপুঁজিবাদী পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে কমিউনিস্ট দল কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত হয়। আর ইতিহাসে বহু নজির আছে যে, স্বাধীন বা পরাধীন অনুন্নত দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহায্য করার ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মোড়লরা উৎসাহ দেখান না, যদি না সেই আন্দোলন পরিচালনা করার লাগাম পরিপূর্ণভাবে তাঁদের হাতে থাকে। ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। 'মহান' স্তালিন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের একচ্ছত্র বাদশাহ প্রায় ত্রিশ বছর একাদিক্রমে নিরুপদ্রব থেকেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন সক্রিয় সাহায্য তো দূরের কথা, এমন কি কোন সহানুভূতিসূচক কথাও বলেন নি। গান্ধী-নেহরু ছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে "ল্যাকিস অফ ইম্পিরিয়্যালিজম"—'সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য'—। আর সেই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে পরম সুহৃদের দোস্তি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক তরীতে সাম্রাজ্যবাদীরাও কমিউনিস্ট বিপর্যয়ের দরিয়ায় পাড়ি দিয়েছিলেন। ভারতের মুক্তিকামীরা হলেন সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহী ভৃত্য স্তালিনের কাছে, আর তাঁর সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট সেদিনের মার্কসবাদী-স্তালিনবাদী কর্মী ও নেতারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" বলে চীৎকার করেছে ভারতের প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের বাংলাকে দেশহিতৈষণার অপরাধে চরম শিক্ষা দেবার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে ইংরেজ পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করেছিল—সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সর্বতোভাবে মদত জুগিয়েছিল—ঐতিহাসিক বিয়াল্লিশের "ইংরেজ ভারত ছাড়" এই আন্দোলনের চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ভারতের দুর্বার মুক্তিসংগ্রামকে পঙ্গু করে দেবার জন্য "লীগ-কংগ্রেস এক হও" শ্লোগান তুলে মুসলিম লীগে কমিউনিস্ট দলের মুসলিম কর্মীদের সভ্য হবার পরামর্শ দিয়ে পাকিস্তানের দাবিকে "মুসলমান জাতির" "আত্মনিয়ন্ত্রণের" অধিকার বলে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন, যাঁরা বহির্ভারতে মহাবিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতার লড়াইকে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই স্তালিনের দৃষ্টিতে হলেন কিনা—'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' 'বাম' শক্তি! পরাধীন ভারতের সেদিনের কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র চীনের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন জানিয়ে মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আসে নি কোন সমর্থন চেয়ারম্যান মাওয়ের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি। লাটিন আমেরিকার পুঁজিবাদ শোষিত অনুন্নত অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য-জর্জর দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে রাশিয়া বা চীনের কোন উৎসাহ তো দেখা যায় না—বরং কিছু কিছু লাটিন আমেরিকার বুর্জোয়া, সামন্ততন্ত্র-জর্জরিত দেশের সঙ্গে ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সখ্যতার সম্পর্ক রেখে চলেছে রুশ দেশ আজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অবস্থার সুযোগও নিয়েছে। অসহযোগিতার দ্বারা কিউবাকে কোণঠাসা অবস্থায় রাখার ঘৃণ্য চেষ্টা করে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সংগ্রামী কাস্ট্রো নিজের শক্তির ওপর ভর দিয়েই দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার আজও করেন নি।

মস্কো বা পিকিং তাদের অনুগত দলকে দিয়েই এইসব 'বিপ্লব' সংগঠিত হতে দেখতে চাইবে। তাই তো এমন কি রাশিয়াও কুয়োমিনটাঙ-এর বিরুদ্ধে চীনা কমিউনিস্টদের দীর্ঘ সংগ্রামে কোন মদত দেয় নি। চীনা কমিউনিস্টদের নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর করে দীর্ঘদিনের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। মাও সে-তুং স্তালিনের পরামর্শ উপেক্ষা করেই নিজের দেশে বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন।...... স্তালিন চীনের ভূখণ্ডে কমিউনিজমের কোন ভবিষ্যৎ আছে স্বীকারই করেন নি। চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজের পরামর্শ তিনি মাওকে দেন। গত যুদ্ধের সময় রাশিয়া কুয়োমিনটাঙকে সামরিক সাহায্য দিয়েছে। যা দিয়ে চিয়াং চীনের কমিউনিস্টদের ধ্বংস করেছেন।

গান্ধী-নেহরু হলেন সাম্রাজ্যবাদের দোসর! ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা 'ঝুটা'। আবার সেই মহান স্তালিনের আমলেই তাঁরই বিশ্বস্ত ভারতীয় সাকরেদরা হয়ত তাঁরই নির্দেশে সেই নেহরুজীর কাছে ভারতীয় সংবিধান (১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী) রচিত ●

গৃহীত হবার পরই—তারতের সংবিধানের মধ্যে দিয়ে পরিষদীয়, গণতন্ত্র পার্লামেণ্টারী কায়দায় কার্যকরী করার বৈপ্লবিক মুচলেকা দিয়ে—১৯৪৮ সালের এ্যাসিডথাল্ব বিপ্লব-তত্ত্ব বর্জন করে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলের বৈপ্লবিক কায়াকল্প করেছিলেন। আবার সেই মহান স্তালিন ১৯৫৩ সালে পরলোকগমন করলে, তাঁরাই এদেশে নকল কফিন বানিয়ে খালি-পায়ে শোক-মিছিল করে কলকাতা মহানগরীর পথে পথে ঘুরেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে যখন শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হল, তখনও আসে নি কোন বৈপ্লবিক মদত—নৈতিক সমর্থন—সেই ঐতিহাসিক নবজাগৃতির প্রতি না রাশিয়া, না চীন থেকে। কেন? সেই একই কারণঃ মস্কো ও পিকিং—আনুগত্য যাচাই করতে চায় সর্বাগ্রে শেখ মুজিবর রহমানের ও তাঁর দলের। তারা আগে ...নিকাশ করে দেখবে তাদের নিজ ...তীয় স্বার্থ কি পরিমাণে সিদ্ধ ...। যদি বিপ্লবী শক্তির আনুগত্য ...দ্ধ সুনিশ্চিত না হওয়া যায় এবং ... শক্তিকে সমর্থন করাটা যদি মস্কো ... চীনের জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক না ... তাহলে "বিপ্লব", "সমাজতন্ত্র", "শ্রেণী সংগ্রাম", "সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা" সবকিছু মুলতুবী থাকুক! মস্কো অথবা পিকিং-এর কাছে সামরিক গোষ্ঠী শাসিত মোল্লাতন্ত্রী পাকিস্তান রাষ্ট্রের কূটনৈতিক রাজনৈতিক মৈত্রী বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধনের সাথে সাথে বিশ্বে উপনিবেশবাদ-বিরোধী সম্প্রসারণবাদ-বিরোধী শান্তিবাদী যে নতুন শক্তির উদ্ভব হচ্ছে—সেটা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দুনিয়ার কাছে একটা নতুন পরিস্থিতিরূপে উপস্থিত হয়েছে। সামরিকবাহিনীর নেতৃত্বে 'প্রাসাদ বিপ্লব' সংগঠিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে—নতুন সরকার স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই তো সেদিন লিবিয়াতে সেদেশের রাজা ইদ্রিসকে হটিয়ে এক জঙ্গী 'বিপ্লবী' সরকার স্থাপিত হয়েছে। এইসব হাল-আমলের রাষ্ট্রগুলির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী 'বিপ্লবের' ও "সমাজতন্ত্রের" জয়গান গাইতে শুরু করেছেন—অথচ কমিউনিস্ট বা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলে তাঁরা দাবিও করছেন না। নিজেদের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র প্রমাণের জন্য কেউ বা রাশিয়ার সঙ্গে রাতারাতি বিশেষ বন্ধুত্ব-চুক্তি সম্পাদন করছেন—আবার কেউ রাষ্ট্রসঙ্ঘে লাল চীনের অন্তর্ভুক্তির দাবিকে জোরালভাবে সমর্থন করছেন। মূলত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিবির এইসব রাষ্ট্রগুলির প্রতি কি মনোভাব নেবেন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্বের সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এইসব রাষ্ট্রে আবার ক্ষমতাসীন সামরিক আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী (ব্যুরোক্রেটিক মিলিটারী জনতা) বিরুদ্ধ কোন রাজনৈতিক দলকে বিরোধিতার রাজনীতি করার অনুমতিই দেবে না। যেমন মাওবাদী 'বিপ্লবী' চীন—পাকিস্তানে আয়ুব-ইয়াহিয়া খানের শাসন ও শোষণচক্রের বিরুদ্ধে কোন গণ-আন্দোলনকে সমর্থন করবে না যতদিন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতার চুক্তি রয়েছে—অথচ নিজের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য আয়ুব বা ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের মার্ক্সবাদী বা সমাজবাদীদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনকে দমন করতে হবে নির্মমভাবে। কিন্তু "দুনিয়ার মজদুর এক হও" 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ'—এই সব শ্লোগানে দুই দেশের মার্ক্সবাদী নেতারা কর্মীদের দীক্ষিত, থুড়ি, বোকা বানিয়ে রেখেছেন নিজেদের রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্য। তাই যতদিন সামরিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান চলবে—ততদিন সামরিক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে বিপ্লব প্রস্তুতি বা সংগ্রাম মুলতুবী থাকবে। এই সব সামরিক জঙ্গী রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধেও কি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদীরা বলবেন—"ওদের সঙ্গেও আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য—এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিজয়-নিশান ওদের রাজধানীতে উড়বে—অথবা হয় আমরা টিকে থাকবো, না হয় ওরা টিকে থাকবে এবং এর মাঝখানে হবে প্রচন্ড সংঘর্ষ?" আর যদি সে-কথা সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে ঘোষণা করা হয়, তখনও কি সামরিক রাষ্ট্রগুলির সামরিক নেতারা-শাসকরা পট্টবস্ত্র পরিধান করে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পাঁচালী পাঠ করবেন? শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের শিরণী বিলি করবেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধনতন্ত্রবাদকে ধ্বংস করার পরও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের কয়েক ধরণের নতুন শক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-এর শ্লোগান তুলে যাবে। অতএব পুঁজিবাদ শেষ হলেই আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের কাছে লড়াই-এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাচ্ছে না। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অনিবার্য অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পরস্পর-বিধ্বংসী এক মহাধ্বংসবে মেতে ওঠে আর সেই দাবানলের যদি ধনতন্ত্রবাদের চরম অন্ত্যেষ্টি রচিত হয়, আর সেই সঙ্গে সেইসব ধনবাদী রাষ্ট্রে সেইসব দেশের কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট ভাবাপন্নরা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারেন, তাহলে বিশ্বের সেইসব অঞ্চলে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিজয়-নিশান শোভা পাবে।

অবশ্য এখানে কয়েকটা জিজ্ঞাসা থেকে যাচ্ছে। এটা ভেবে দেখা দরকার আজকের দুনিয়ায় দুটি বা কয়েকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র—আবার তাদের ভৌগোলিক অবস্থান পাশাপাশি নাও হতে পারে,—যেমন বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী,—আত্মবিধ্বংসী লড়াই-এ লিপ্ত হবে—আর সেই লড়াই-এর সময় সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট শিবির নীরব দর্শক হয়ে মজা দেখবে—যুদ্ধের আগুনের একটি ফুলকিও তার গায়ে উড়ে গিয়ে পড়বে না—এটা হবে নিতান্তই কাল্পনিক ব্যাপার। যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ধুরন্ধর কর্ণধারদের সম্বন্ধে বা বুর্জোয়া শ্রেণীর ধূর্তামি ও কুটিল বুদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণা করে এত বিশেষণ বর্ষণ করেছেন সত্যি সত্যি সেইসব ঝুনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়করা বা সেইসব রাষ্ট্রের শ্রেণী-সচেতন বুর্জোয়া শ্রেণী হঠাৎ এত দেউলিয়া হয়ে যাবে না মার্ক্স-লেনিন-স্তালিনের ভবিষ্যদ্বাণীকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত করার জন্য নিজেদের মরণোৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ করবে, এটা একটা অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপার হতে পারে—যুক্তির ধোপে এ বিশ্লেষণ কখনই টিকবে না। এই ধরণের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির আত্মবিধ্বংসী লড়াই আর একটা সম্ভাবনার দিকে ইংগিত করে যার জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ সংকট উদ্ভূত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির আত্মবিনাশকারী যুদ্ধে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম অথবা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিবির নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। সে সম্ভাবনা হল এই যে, যুদ্ধ 'সমাজতান্ত্রিক' বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে তার সংলগ্ন বা নিকটবর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অনুপ্রবেশের পথ খুলে দেয়। সীমান্ত সম্প্রসারণের অপরাধে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া বা লাল চীন সম-অপরাধী। শুধু সাম্রাজ্যবাদের বাইরের মুখোশটা পাল্টাচ্ছে। সম্প্রসারণবাদ যখন কোন প্রগতিশীল তত্ত্ব বা মতবাদের মুখোশ পরে আসরে নামে তখন সেটা হয় আরও মারাত্মক আরও কুৎসিত। কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যুদ্ধ জাহাজে ঝাণ্ডা উড়িয়ে বিদেশী সৈন্য গোলাবারুদ নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পররাজ্য আক্রমণ করলে—পররাজ্য বা তার অংশ জোরপূর্বক দখল করলে সেটা যেমন নির্ভেজাল সাম্রাজ্যবাদ বলে গণ্য হয়, তেমনি কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ফাঁকা

# এখানে এখন

অনিলকুমার আদক

এখানে এখন শুকনো হাওয়া চারিদিকে
কুয়োর জল ক্রমশ মরে যাচ্ছে
পাঁক ফাটছে পুকুরের গাবায়
মানুষের গায়ের চামড়াও সরসতা হারিয়ে
কী-রকম শক্ত হয়ে উঠছে।

হায়-হায়, মাটির ভিতরে কোন্ পোকা
তার ধারালো দাঁতে শিকড় কেটেছে বলে
গাছটি মরে গেল। পাতাগুলি
এখনো তবু লেগে রয়েছে ডালে—শুকনো—
দু-দিন পরেই ওরা ঝরে যাবে।

ফসলহীন মাঠ বেদনায় কাল গুনছে
বস্তুত কাল গুনছে চুপে
সমগ্র পৃথিবী—সবুজহীন বিষন্নতায়—
নীলিমা হারিয়ে আকাশ কেমন ধূসর
সে-ও কাল গুনছে।

হায়-হায়, উদ্‌ভ্রান্ত কবি, এখানে অজ্ঞাতেই
সযত্ন-সঞ্চিত আমার আবাল্য ধৈর্য
আমি হারিয়ে ফেলছি। সংগ্রামের ময়দানে
এখন নামবার জন্য—অনিচ্ছা-সত্ত্বেও
আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

বুলি আউড়িয়ে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার উর্দি পরে বিপ্লব রপ্তানীর নামে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অন্য দেশে প্রবেশ করে সেই দেশের হাজার হাজার বর্গমাইল দখল করলে সেটাও খাঁটি সাম্রাজ্যবাদ বলে নিন্দিত হবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই-এ মত্ত, তখন সংলগ্ন দুর্বল বুর্জোয়া রাষ্ট্রে—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সীমান্তের নিরাপত্তার অজুহাতে অথবা ক্যাপিট্যালিস্ট এনসারকলমেণ্ট থেকে মুক্ত হবার নামে লাল ফৌজ বা মুক্তি-ফৌজ প্রেরিত হতে পারে, সেই সব রাষ্ট্রের 'বিপন্ন' জনগণকে পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে "মুক্ত" করার জন্যে। ইতিহাসে এমনটি ঘটেছে বহুবার। পোল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী নাৎসীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে। আবার ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়াকে ৬ লক্ষ লাল ফৌজ পাঠিয়ে সে দেশের স্বাধীনতা হরণ করে এক রুশ অনুগত তাঁবেদার সরকার স্থাপন করে। 'সমাজতান্ত্রিক' ইস্রাইল ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে মিশর আক্রমণ করেছিল, 'সমাজতান্ত্রিক' চীন স্বাধীন তিব্বতের স্বাধীনতা হরণ করল বিপুল চীনা বাহিনী প্রেরণ করে। এশিয়া ভূখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার তাগিদে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে চাচা নেহরু ও তাঁর ক্লীব দুর্নীতিপরায়ণ পরিষদ ও মন্ত্রণাদাতাদের মোহ ভাঙিয়ে দিয়ে সেই বন্ধু চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বসল। এই সব ঘটনাগুলি ঐ দ্বিতীয় সম্ভাবনার জাজ্বল্য প্রমাণ। শুধু কোন ব্যাপক যুদ্ধ না লাগতেই যদি কমিউনিস্ট চীন এইভাবে পররাজ্য গ্রাসে উদ্যত হয়—এবং প্রকৃতপক্ষে পররাজ্য গ্রাস করে—তাহলে একটা ব্যাপক বড় রকমের যুদ্ধ লেগে গেলে সমাজতান্ত্রিক 'মেষ' ও সাম্রাজ্যবাদী 'নেকড়ে'তে রূপান্তরিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? স্মরণ থাকতে পারে ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তানের ২১ দিনের যুদ্ধের শেষ দিকে কমিউনিস্ট চীন ভারতবর্ষকে আবার আক্রমণ করার হুমকী দিয়েছিল পাকিস্তানের অনুকূলে চাপ সৃষ্টি করার জন্য। আর এই আক্রমণের হুমকীর অজুহাত ছিল ভারত কর্তৃক কল্পিত কয়েক শত চীনের মেষ অপহরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রাজ্য তা আবার মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী এক "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (!) ভেড়া চুরির অজুহাতে পররাজ্য আক্রমণের বা যুদ্ধের হুমকী দিয়েছে বলে বিশ্ববাসীর অন্তত জানা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সেই চীনা আল্টিমেটামের প্রতিক্রিয়া ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ওপর হয়েছিল সেকথা অনস্বীকার্য। বিশ বছরের নাচ-গান পিপেপিপে মদ্য পান—কলটেল মাইফেল—বাজীর খাজনা সেদিন ভারতকে দিতে হয়েছিল। এর পরই রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন শান্তির পায়রা নিয়ে ছুটে এলেন। ভারতের সেদিনের প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন—"পাকিস্তান আবার আক্রমণ করলে ভারতবর্ষ তার সমুচিত জবাব দেবে।" আর চীন আক্রমণ করলে "আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করব" ("উই স্যাল ডিফাইণ্ড আওয়ার ফ্রীডম")। দুটি রাষ্ট্রের জন্য প্রদত্ত ভাষণের সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পঞ্চাশ কোটি লোকের দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন নি চীন পুনরায় আক্রমণ করলে ভারত সমুচিত শিক্ষা দেবে। আর বলবেনই বা কি করে? নেহরুজী ২০ বছরে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ভারতকে গান্ধীবাদ-অহিংসার আফিম খাইয়ে নির্বীর্য করে রেখেছিলেন। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের আদর্শে বিশ্বাসী ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ও আত্মনির্ভরশীল হয়েই শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সাধনা করতে হবে। নান্যঃ পন্থা। গান্ধীবাদের জপমালা হাতে নিয়ে রামধুন গান গেয়ে অথবা মার্ক্সবাদী শান্তিবাদীদের শান্তির পায়রা উড়িয়ে দেশকে বাঁচান যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বড় একটা শিক্ষা এই যে, সব কিছু থাকতেও আদর্শ, উন্নত সভ্যতা, কৃষ্টি-দর্শন-পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য,—বহু জাতি তার জাতিত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে নি। নিকৃষ্ট সভ্যতার জাতির কাছে উৎকৃষ্ট সভ্যতার জাতি পরাভূত হয়েছে। চেঙ্গিস খাঁ তো নৈতিক বা ধর্মবলে বলীয়ান হয়ে বিশ্ববিজয়ে বার হন নি। সভ্যতার সম্পদে নিকৃষ্ট হয়েও হুন, তাতার, মঙ্গোলেরা পৃথিবীর বহু সভ্য জাতিকে বিধ্বস্ত করেছে। উন্নত অস্ত্র শক্তির টেকনলজীর জয়ই হয়েছে। ইতিহাসের অন্যতম এই একটি মহাবাস্তব কঠিন সত্যকে মিথ্যার গোঁজামিল দিয়ে, একজন রাজনীতিবিদ্‌কে ধর্মের অবতারে রূপান্তরিত করার বিকারগ্রস্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াসে, দেশ, দেশের জনগণ দেশের মৌলিক পরিমার্জিত জাতীয় স্বার্থের (এনলাইটেণ্ড ন্যাশন্যাল ইনটারেস্ট) ওপরে এক রাজনৈতিক নেতার,—হলেন-ই বা মহান নেতা,—ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিগত মতামতকে আধিপত্য দান করে,—উপেক্ষা করার প্রচণ্ড মূঢ়তার খাজনা ভারতবর্ষকে আজ দিতে হচ্ছে। এখনও সময় আছে ঐ মোহজাল ছিঁড়ে দেশকে মুক্ত করার। জাতির ঐক্য, জনতার শৌর্যবীর্য—নেতার চরিত্র-প্রেরণা জনতার দীপ্ত স্বদেশ-প্রেম, এসবই জাতির শক্তির উপাদান। সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র এই সব মৌলিক উপাদানগুলির উৎকর্ষতার ওপরই স্থায়িভাবে নির্ভরশীল,—তাদের বিনাশের ওপর নয়। [চলবে]

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ একচল্লিশ ॥

অরণ্যের নিঃস্তব্ধতায় ঘুমিয়ে ছিল ডুয়ার্স।

এই সেদিনের কথা।

গাছপালায় বুনো জংলি-লতায় স্থির-তার এক দুর্ভেদ্য দুর্গ।

সে অরণ্যে দিন-রাত্রি নেই। যোজন-বিস্তার নিবিড় বনাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ শাল, সেগুন, জারুল, মেহগনি ও শিমুলগাছের শ্রেণী ঊর্ধ্ববাহু হয়ে যেন আকাশের দিকে দাঁড়িয়ে উঠছে। কোথাও বা অর্জুন, খয়েরগাছও আছে। খয়ের এ-অঞ্চলে প্রচুর। আর আছে কদমগাছ। বেতের লতার দুর্ভেদ্য দেয়াল। ফণীমনসা। ফার্নের ঘন উৎসার।

গাছ-গাছে সূর্যের আলো পিছলে পড়ে ফিরে যেত। ভেতরে ঢুকতে পেত না, সাহস করে পথ দেখাত না কেউ। দিনের বেলাতেও সেখানে সুস্পষ্ট অন্ধকার জমে থাকত। পাখি-পাখালিরা ভয়ে দম বন্ধ করে অটুট নীরবতা রক্ষা করে চলত। কচিৎ সেই ভয়াবহ স্তব্ধতা চমকে উঠত হিংস্র বন্য পশুর গর্জনে।

আর তার সঙ্গে মিলেছে পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়। পর্বতের পর পর্বত। ঘন পত্রপুটের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে থাকত পাহাড়। লাল রঙ নয় সে পাহাড়ের। কাছে গেলে দেখতে পাওয়া যায় পাথরের পর পাথর। সেই পাথরের গায়, তার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে জংলি বুনো চারা। নিচের দিকে ফার্নবনের ঘন ব্যূহই বেশি। নানারঙা লতা আর পাতা। নানা বর্ণের ফুল ফুটেছে তাতে।

দূর থেকে সেই পাহাড় দেখ আজ। আকাশের গায় নীল রঙের তুলি বুলিয়েছে কেউ। সজীব কোন শিল্পী। ঘন নীল পাহাড় শীতে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয় কত যেন কাছে। একটু ছুটলেই যেন ধরতে পাওয়া যাবে। সেই পাহাড়ে বরফ জমে। শীতকাল। তেখোড় ডিসেম্বরের শীত-রাত্রে তুষারকণাগুলি হিমশীতল হাওয়ায় ঝরে পড়তে থাকে মুক্তার মত। আগুন জ্বালিয়ে সেই দুর্জয় পাহাড়ী শীত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় মানুষকে। সমতলের ডুয়ার্সের বাসিন্দারা চমকে সেই আগুন দেখে পাহাড়ে। অন্ধকারের একটা ঘনগম্ভীর ভালুকের মত ওইদিকে শুয়ে আছে পাহাড়। তার মধ্যে ওকি আগুনের শিখা? প্রথমে বিশ্বাস হতে চায় না। আকাশটায় তবে আগুন জ্বালল কে?

বিস্ময়ে লাফিয়ে ওঠে চোখ। চকচক করে চোখের মণি দুটো।

দ্যাখ দ্যাখ, ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে দেখায় ওরা। আগুনে-পোড়া ভুট্টার খই খেয়ে ঘুমানো শিশুও জাগে। ময়লা ছেঁড়া কাপড়গুলো গা-গতরে ভালো করে ঢেকে-ঢুকে নিচ্ছে। ওরই মধ্যে ফাঁক-টাক পেল তার ভেতর দিয়ে হনহন করে ভেতরে ঢুকে পরশ জানিয়ে দিচ্ছে।

দেখে বাবুরাও। অফিসার-পদস্থ লোকেরা। মাথা-কান ভালো করে মাফলার দিয়ে পেঁচিয়েছে। দেখেন বুড়োরাও। মিত্র-ঘোষ-গুহ-বসু- চ্যাটার্জী- মুখার্জীরা। কোট-বুট-সোয়েটার। লোমের চামড়ার জ্যাকেটও আছে। দামী কম্বল কারুর। ছোটদের ডেকে দেখায়, আয় আয় দেখে যা। পাহাড়ে আগুন লেগে গেছে।

ঘুমছুট চোখে আতঙ্ক শিশুদের। আকাশটাই কি তবে যাবে নাকি পুড়ে ছাই হয়ে? দাদুকে ভয়ে ভয়ে বলে কোন শিশু, আগুন কে লাগালো দাদু?

নতুন যুগের দাদু নিখুঁত উত্তর দিতে পারে না। আমতা-আমতা করে। জানা থাকলে তবে তো দেবে উত্তর। দাদু কি জানে ঠিক কোথায় আগুন জেলেছে এত রাতে? পাহাড়ের ঠিক ওপরে—কত মাইল ওপরেই বা? কে সে? তারই মত বুড়ো থুড়থুড়ে কেউ কিনা কে জানে। পাহাড়েও জন্মমৃত্যু আছে। সেখানেও আছে মানুষের বসতি। মানুষজনের ঘর-সংসার। শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে আসে প্রৌঢ়ত্ব। বার্ধক্য। হয়তো বা তার বার্ধক্য আরো আগেই আসে। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনও আসে তাড়াতাড়ি। তার-পর সেই যৌবন কঠোর কষ্টে, জীবন-যাপনের প্রাণ-ধারণের দাসত্বে কেটে যায় তিলে তিলে। এত তাড়াতাড়ি যে, তারা হয়তো জানতেও পায় না। এক দ্রুতগামী গাড়িতে চড়ে পৌঁছে যায় বার্ধক্যে।

বিশ শতকের ইতিহাস তার সদর দরজা পেরিয়ে দ্রুত দৌড় মারছে একুশ শতকের দিকে। বর্তমান শতাব্দীর শেষে এক গৌরবোজ্জ্বল প্রহর ঘোষণার আর বিলম্ব নেই। সভ্যতার কত চেকনাই দেশে-দেশে। নগরে-বন্দরে। বিজ্ঞানের কত না আশীর্বাদ। বিজ্ঞান যেন ভারত-ইতিহাসের ময়দানবের হাত, সম্ভব করছে অসম্ভবকে। অন্ধকারে জ্বালছে রং-মশালের আলো। ভরসাহীনকে দিচ্ছে ভরসা। পঙ্গুকে করছে সক্রিয়। মরু-ভূমিকে করছে শস্যশ্যামল।

নিউ অর্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, লন্ডন, রোম, বার্লিন, মস্কোর দিকে দিকে কত সুখী-সমৃদ্ধ মানুষ। কত না রঙ-বেরঙের আলো। ভোগ-সুখের কত উপাদান। নতুন কালের ইন্দ্রপ্রস্থ নয়াদিল্লী।

সভ্যতার ঐশ্বর্য সমতলে। বড় মানুষ-দের জন্যই তার যত উদ্বেগ। তার তেলে কলের চাকা আকাশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলার কালে পেরিয়ে যায় কত নদ-নদী-সিন্ধু। কত না পাহাড়-পর্বতের ওপরে কাঁপে আধুনিক সুপারসোনিক বিমানের পাখা। কিন্তু তার দানে আজও পর্যন্ত সমানভাবে উথলে ওঠে নি পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ভান্ডার; ভোগী-মানুষ অবশ্য তৈরি করেছে শৈল-নগরী। বেছে বেছে সেখানে বেড়াতে যায়। ভাণ্ডারকে জুড়োতে আসে। কিন্ত সে তার লাভের লোভের প্রয়োজনে। দীন-দরিদ্রের দুঃখ-মোচনের জন্যে নয়।

ডুয়ার্সের পাহাড়ে-জঙ্গলেও তাই দুঃখী মানুষদের জীবনে আজো বরাভয় হাত প্রসারিত করে নি সভ্যতা। বিজ্ঞানের দান সমভাবে বণ্টিত হয় নি তাদের মধ্যে। তীক্ষ্ণ তুষার-ঝড়ের বিপর্যয়ের মধ্যে আজো তাকে মাথা গুঁজতে হয় পাহাড়-গুহায়। দুর্জয় পাহাড়ী শীতের আক্রমণের

হাত থেকে বাঁচতে জ্বালাতে হয় বৃক্ষকাণ্ড। চাবার তেল জেলে অন্ধকার দূর করতে হয়। বন্য পশুর হাত থেকে ভয়ে ভয়ে আত্মরক্ষা করতে হয় তাদের। পাহাড়ের খাদে কিংবা ক্বচিৎ ঢালু উপত্যকায় কেটে করে কাটতে হয় পাথুরে মাটি। ফসল ফলাবার অকৃপণ সাধনায়। তারপর রাতে জেগে গাছের ওপরে বাঁধা মাচায় উঠে বন্য পশুর হাত থেকে ফসল বাঁচানো ভয়ে ভয়ে। শৈল-নগরীর ক্লাবগুলিতে যখন কেঁপে কেঁপে বাজে সাগর-পারের স্টুডিওগুলি থেকে ভেসে-আসা সুর-তরঙ্গ, রহস্যময় হাসি-গান, সুরেলা বিভ্রম, নিভৃত রাত্রির বারগুলিতে যখন চলে সৌখিন মদ্যপানের জমকালো আড়ম্বর, রাতের অন্ধকারে তখন আদিম পাহাড়ে-পর্বতে হিংস্র আরণ্য-রাত্রির উৎসব চলতে থাকে। ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে-কঁকিয়ে ওঠে শিশু। শক্তহাতে টাঙিটা উঁচু করে ধরে কোনো বায়াসিং কিংবা সোমরা ওঁরাওদের দল।

—এ বাবু তাজ্জব দুনিয়া। গালে হাত দিয়ে বলছিল বুধু ওঁরাও।

ডুয়ার্সের জীবনের অরণ্য মাদকতার গল্প। বুনো হাতীর গল্প। বাঘ-ভালুকের। শুনছিলাম বসে বসে। বুধুর গল্প বলছি পরে।

চৈত্রের শেষ। দুপুরবেলা এসেছি। নাগ্রা-কাটায় এক বন্ধুর বাড়ি গোটা একদিন কাটাতে হল। বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি ডায়না ফরেস্টের সন্ধ্যা

ডায়না। সুন্দর নাম। কে রেখেছিল এমন সুন্দর নামটা? অনেকদিন থেকেই শুনি। ডুয়ার্সে আসবার পর থেকেই শুনি। ডায়না নামের নেশা আমাকে মাতায়।

চৈত্র-শেষের এক শাল-ফুল ঝরানো মধ্যাহ্নে এসে উপস্থিত।

চারদিকে বনে বনে শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে মাতাল বাতাস। অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছে তাণ্ডব। সে এক অসহ্য মাতামাতি। শুধু অবশ্য একা ডায়না ফরেস্টেই নয়, দেখে আসুন সারা ডুয়ার্স দূরে ঘুরে। চোখ বুজে বুজে মনে মনে দেখি, ফাল্গুনের শুরুতেই অনেকদিন বনে বনে শুরু হয়ে গেছে পাতা-ঝরানোর নেশা। শুধু কি বনে-বনেই? না, প্রশস্ত রাজপথের ধারে-ধারে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীর স্বভাবেও একই চিত্র। ময়নাগুড়ি-জল্পেশের পথে পথে দেখে আসুন, দেখে আসুন জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের পথে যেতে যেতে রাস্তার দুধারে। রাজাভাত-খাওয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে দেখুন। দেখুন জয়ন্তীর পথে পথে, সান্তালাবাড়িতে। ভুটানঘাটের মস্ত সেই বাংলো বাড়িটার পাশাপাশি নির্জন শিমুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দেখে আসুন ঝরাপাতার কী অসম্ভব খেলা হতে পারে।

বসন্ত কি শুধু ফোটা ফুলের মেলা রে?

না, তা নয়। ঝরাপাতারও শোভা।

কত রকমারি গাছ শত শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি করে। চমকে উঠতে হয়। এক আলাদা রাজ্য। এক আশ্চর্য পরিবেশ। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। অরণ্যেরও কি রাজসভা আছে? স্তব্ধবিস্ময়ে সমাহিত-চিত্তে সেই নির্জনতা নীরবতা রক্ষা করে চলে সবাই। এদের মধ্যে কে রাজা আর কারা পারিষদ-বৃন্দ বুঝবার উপায়ই নেই।

বহেড়া, বোগারি, বট, চাঁপ, চেস্টনাট, ছাতিম, ডবডাবি, গাম্বারি, ঝাউ, খয়ের, মাদার, লামপাতিয়া, নিম, পলাশ, শিমুল, কদম, শিশু, শাল, শিরীষ, জাম, জল-পাই। কাকে ফেলে কার দিকে তাকাবেন! শীতের হাওয়ার জোরালো তীব্রতায় ডুয়ার্সের বনে বনে ঝরিযে দেওয়া শুরু হয়েছে পুরনো পাতা। অবিশ্রান্ত। এখন শীত চলে গেল। যদিও শীতের টান আছেই। তবু বসন্তে পর্যন্ত চলেছে তার অব্যাহত লীলা। কালোজামপাতা আগেই ঝরেছে। রেনট্রিগাছগুলি সব চুল কেটে ফেলে যেন ধারণ করেছে বৈরাগীর রূপ। বনজারে গাছগুলির উর্ধবাহু শাখা-প্রশাখাগুলি দাঁড়িয়ে কঙ্কালের মত। সারা বর্ষায় নীলচে রঙের ফুল ফুটেছে তাতে। বনকাঞ্চনে অবশ্য লাল-সাদার নেশা। আর শুধু কি বনে বনেই?

ধূপগুড়ির গ্রামাঞ্চলে এক হাটে বেড়াতে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল একদিন। ফড়-ডিপার্টমেন্টের এক কর্মচারীর সঙ্গে গিয়েছি বেড়াতে, রাজবংশী এক বন্ধু। বন্ধুটি কাজে ব্যস্ত। মোষ খুলে নেওয়া একটি ছই-ঢাকা গাড়িতে শুয়ে আছি গাছতলায়। খড়-বিছানো গালিচায় শুয়ে আছি শীতের প্রসন্ন এক দুপুরে। খানিক পরে দেখি একরাশ ঝরাপাতা চাদরে আবৃত হয়ে গেছি। সর্বাঙ্গে শুধু পাতা আর পাতা। শুকনো রসহীন বিবর্ণ পাতা সব।

সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

বিকেলে গ্রামের পথে গাড়িতে ফিরতে ফিরতে দেখি রাস্তার দুধারে শুধু ঝরাপাতার স্তূপ পড়ে আছে।

বছরের পর বছর ধরে উড়ে উড়ে এসব ঝরাপাতা জমেছে মাটিতে। বর্ষার জলে পচে পচে সার হয়ে উঠছে মাটি। নতুন প্রাণ, নতুন রসের জোগান দিচ্ছে মাটিকে।

ভয়াল-ভয়ংকর ডুয়ার্স। একদিকে তার বন্য হিংস্রতা, অন্যদিকে সৌন্দর্য বৈচিত্র্যের অকৃপণ বিস্তার।

ডায়না-ফরেস্টে এসে পৌঁছ[illegible] দুপুরবেলা।

গভীর বন। বনের ভেতরে প্র[illegible] দুঃসাধ্য। ১৫,৩৭৩ একর জমি [illegible] প্রসারিত এক অরণ্য। মানুষজন [illegible] বললেই চলে।

দু-চার ঘর উপজাতিদের বাস।

সারাদিন শুকনো ঝড়োপা[illegible] উড়িয়েছে বাতাস।

রাতে বুধুর সঙ্গে কথা হচ্ছি[illegible] ফরেস্ট গার্ডের ঘরে বসে।

বুধু ওঁরাও বলছিল তার চাক[illegible] জীবনের গল্প। চাকরি-সূত্রে ডু[illegible] সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বিচিত্র। না[illegible] জায়গায় চাকরি করেছে সে। না[illegible] কন্ট্রাক্টরের অধীনে। সেখানে প্রতি প[illegible] পদে প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হ[illegible] প্রত্যেকটি মুহূর্ত অনিশ্চিত।

একবার পড়েছিলাম বাবু বু[illegible] হাতীর পাল্লায়। বুধুর গলা শু[illegible] উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম।

ফরেস্ট গার্ডের ঘরটি মাটি থেকে বে[illegible] খানিকটা উঁচুতে। ভেতরে আসবা[illegible] পত্রের চিহ্ন নেই। একটা চাটাইতে ব[illegible] ছিলাম আমরা। কেরোসিনের ব্যব[illegible] ছিল না। মোমবাতী একটা জ্বলছি[illegible] ঘরে। জানালায় হাওয়া আসছিল অ[illegible] অল্প। মোমের আলোটা কাঁপছিল জানালায় দেখা যাচ্ছিল ঝাপসা বনের গা[illegible] পালার ফাঁকে আকাশে আধখানা চাঁদ তার সঙ্গে সংগতি রেখে একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছিল।

বুধু ওঁরাওয়ের মুখ ভালো দেখা যাচ্ছিল না। মোমবাতীর দিকে পিছন করে বসেছে সে। ফরেস্ট গার্ড একটু দূরে। গন্ধে বুঝতে পারছিলাম খানিক আগে সে বেশ আকণ্ঠ তাড়ি গিলেছে। টকটক মিষ্টি-মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছিল।

বুনো হাতীর পাল্লায়? বুধুর কথার উত্তরে আমি জানতে চাইলাম।

আর বলবেন না বাবু। ডুয়ার্সের বনেজঙ্গলে নানা রকম জীবজন্ত হয়তো আছে। আর হয়তোই বা বলি কেন, আপনি নিশ্চয় জানেন তাদের অভাব নেই।

বুধু হাত আড়াল করে একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল। তীব্র গন্ধটা এক মুহূর্তে আমার শরীর মন চনমনে করে দিচ্ছিল।

তবে যত জীবজন্তই থাক, বুনো দাঁতালের কাছে কিছু নেই।

বুনো দাঁতাল মানে বুনো হাতী।

হাতীদের খুব বিক্রম বুঝি?

তা আর বলবেন না বাবু। এদের

মজো ভয়ংকর জাত কল্পনা করা যায় না।

কেন? সাপ-বাঘ নেই?

বুধু ঘাড় নাড়ল, তা আছে। তবে সাপ-বাঘের হাত থেকেও নিস্তার মেলে। বুনোর হাত থেকে আর রক্ষে নেই।

বাইরে অন্ধকার রাত্রি নয়। আদ্দেকটা চাঁদ। কিন্তু গাছপালার শাখা-প্রশাখায় জড়িয়ে-থাকা অন্ধকার এবং আদ্দেকটা জ্যোৎস্না মিলে পরিবেশটাকে ভয়ংকর করেছে। সেই সঙ্গে বুধুর গলায় গল্প।

তখন ছিলাম চিলাপাতা ফরেস্টের মধ্যে। ফরেস্ট হিসাবে চিলাপাতার যে নাম আছে তা ঠিকই জানেন কর্তা। অতি বড় দুঃসাহসীরও বুক কাঁপে। আজকাল অবশ্য হাসিমারা থেকে তার বুক চিরে রাস্তা বেরিয়ে গেছে সোনাপুরের দিকে। দুধারে ঘন বন। মিলিটারীর কল্যাণে রাস্তাটা হয়েছে। বর্ষায় তোর্সা যখন ফুলে ফেঁপে ওঠে, ফালাকাটা দিয়ে বেরোনো কঠিন হয়ে যায়, তখন এই পথে চলে বাস-ট্রাকগুলি। মিলিটারী তো চলে হরদম। রাস্তার ধারে ধারে বনের গভীর নিস্তার দেখে অতি বড়ো সাহসী ড্রাই-ভারেরও বুক থমথম করে। রাত্তিরে তো ভয়ে-ভয়ে চালায় গাড়ি। কী জানি কখন কী ঘটে কে বলতে পারে!

সেই চিলাপাতা ফরেস্টে তখন পড়েছে আমাদের ক্যাম্প। দ্রুত কাজ করতে হবে। সামনেই বর্ষা। কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশ বর্ষা পড়বার আগেই কাজটা শেষ করতে হবে। তাই সাহেবের ব্যস্ততার আর অবধি নেই।

রাত জেগে জেগে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের। জনা পঞ্চাশেকের মত কুলি। সাহেব নিজেও আছেন ক'দিন থেকে। নাইট-গার্ড আছে চারজন, বাবু। তারা সবাই বন্দুক-রাইফেল চালাতে জানে। যতক্ষণ কাজ চলে ততক্ষণ হ্যাজাক জ্বলে। বনের ভেতরে আর লাইট পাব কোথায়? চল্লিশ-পঞ্চাশটা হ্যাজাকের আলোয় চারদিকটা দিনের মত হয়ে থাকে। তবু যতটা আলোই হোক, তার বাইরেই ঘন বন। তাতে না আছে কোন্ জন্তু। কাজ করতে করতে বুকের মধ্যে ভয় থমথম করে। আলোর বাইরের দিকে তাকানো যায় না। অবশ্য চারদিকে অনেকটা দূর পর্যন্ত ঘেরাও করা আছে। সেখানে হাত পাঁচশ দূরে-দূরে জ্বলে মশাল আগুনকে ভয় করে সব জানোয়ার। তাছাড়া নাইট-গার্ডরা সর্বক্ষণের জন্য রাইফেল নিয়ে তৈরি। কিছু একটা চোখে পড়বে তো তক্ষুণি ফায়ার করবে।

বুধুকে বললাম, বনের ঐইরকম জায়গায় হ্যাজাক জ্বালিয়ে কাজ?

এ আর কি কাজ বাবু? কত সময় আরও গভীর বনের মধ্যে কাজ হয়। ব্যবসা করতে গেলে করতেই হবে।

কুলিরা কাজ করতে রাজী হয়?

পেটের দায় যে বাবু। তাছাড়া বনেই বসতি তাদের। জীবজন্তুকে ভয় পেলে চলবে কেন?

—বল শুনি।

বুধুর কাছে বসে বসে শুনি চিলা-পাতা ফরেস্টের গল্প। এক বনের এলাকায় বসে অন্য বনের গল্প। অবশ্য নামে কী এসে যায়। বনের সব চেহারাই এক। ডুয়ার্সের সব অরণ্যের চেহারাই সমান ভয়ংকর।

বুধু বলে, এখন হয়েছে কি, জায়গাটায় বুনো হাতীর উৎপাত খুব বেশি। আলো জ্বালিয়ে রাখি বলে আসতে পারে না। মশালকে ভয় করে ভীষণ। কিন্তু সে যাই হোক, বুনো জন্তুর আর ভয়-ভিত কি? হুঁসিয়ার না থাকলেই মরণ। কখন কোথা দিয়ে যে—। তবে একটা কথা খুব বুঝতে পারি, রাত্তির আন্ধারে কাছাকাছি এতগুলি মানুষ, এত হুটপাট —এই সব দেখে ক্ষেপে যাচ্ছিল বুনোরা। কিন্তু কিছু করতেও পারছিল না বলে তাদের রাগের আর অন্ত ছিল না। মশালের আলোর বাইরে মাত্র বিশ-পঁচিশ হাত দূরে আমরা দুটো-তিনটে হাতীকে, তাদের মধ্যে একটা বেশ বড়ো—মাঝে-মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। নাইট-গার্ডরা তো দেখতে পেয়েই গুলী চালাবার জন্য রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু খবর
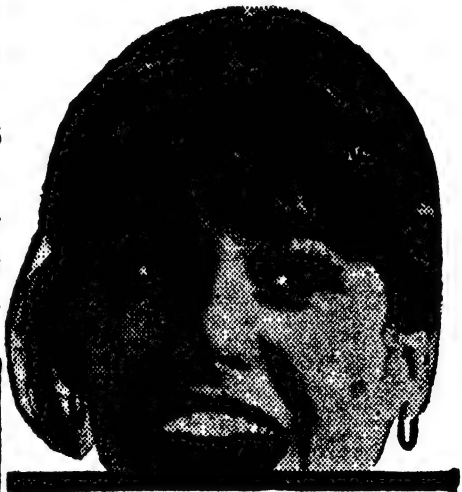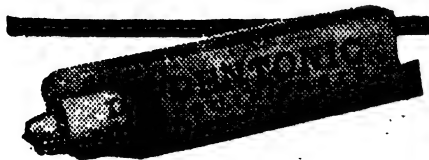
*কণ্টেকদার সাহেব এসে থামিয়ে দিলেন, না, অনর্থক দরকার কী!*

কিন্তু ওরা একেবারে কাছে এসে—নাইট গার্ডরা বলতে গেছে সাহেবকে। কণ্টেকদার বলেছেন, থাক না। ওরা তো এখনো আমাদের কোনো ক্ষতি করছে না।

সাহেবের সঙ্গে কাজ করছি বিশ বছর। বলতে গেলে নিজের লোক মনে করেন সাহেব।

তবু আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, তা অবশ্য করছে না। কিন্তু গতিক ওদের ভালো লাগছে না বাবু—

ভয় সাহেবও পেয়েছেন। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। রাইফেলটা নিজেও তিনি হাতের কাছে রেখেছেন। বড়ো একটা বোতল বার করে ঢকঢক করে গলায় ঢাললেন। মুখে শুধু বললেন, সাবধান থাকো। আমাদের ওপরে হামলা করলেই গুলী ছুঁড়বো—কিন্তু গুলী আর ছুঁড়তে হয় নি। আমরা বুঝি কিছু অসাবধান হয়েছিলাম। কাজ করতে করতে আগের জায়গাটা ছেড়ে নতুন জায়গায় গেছি। একটু দূর দিয়েই পীচ-ঢালা রাস্তা। মাঝে-মধ্যে হেডলাইট জ্বালিয়ে ট্রাকগুলা আসে-যায়। মিলিটারীর গাড়িও আছে। একদিকে একটা ঝিলের মত। ক'টা মস্ত শিমুলগাছ। হাতীগুলোকে ক'দিন আর দেখা যায় নি। তবে দেখা যায় নি বলে তারা যে নেই একথা মনে করা যায় না।

সেদিন হঠাৎ মাঝরাতে এক কাণ্ড। আমরা বুঝি একটু অসাবধান হয়েছিলাম। সারাদিন গেছে ভীষণ পরিশ্রম। নাইট-গার্ড দু'জন একটু বেশি পরিমাণে নেশা করে বুঝি নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল—তাঁবুতে ঘুমোচ্ছে কুলিরা। হঠাৎ মাঝরাত্রে চীৎকার-কান্না শুনে জেগে উঠে দেখি তাঁবুগুলি ভেঙেচুরে পা দিয়ে চেপে চেপে একটা ভয়ংকর কাণ্ড করছে। আমারটাও নড়ছিল, ভাগ্যি ততক্ষণে দেখতে পেয়ে গিয়েছিলাম—। বুধু একটু থেমে বললো, সে যে কী ব্যাপার আপনাকে বোঝানো যাবে না, বাবু। ততক্ষণে দৌড়ে বেরিয়ে গেছি প্রাণ বাঁচিয়ে—শিমুলগাছটার আড়ালে, শব্দ-সাড়া নেই। হাত-পা ঠকঠকিয়ে কাঁপছে।

বুধুকে বলেছিলাম, ক'টা হাতী?

সে কী আর দেখেছি। তবে মনে হল অনেক ক'টা। ছ' সাতটা তো হবেই। তাছাড়া সেই যে বড়ো হাতী ছিল একটা, সেটারই রাগ সবচাইতে বেশি। হাতীর সেই পাগলামূর্তি ভাবা যায় না। এতগুলি তাঁবুর কুলি-মজুরদের মধ্যে জনা সাত-আটেক মাত্র জীবিত ছিল—। নাইট-গার্ডরা কেউ বাঁচে নি। পা দিয়ে চেপে ধরে জন্মের মত শেষ করে দিয়েছিল। একটাকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল অনেক দূরে।

কাজ বন্ধ করে দিলে?

বুধু বলে, কাজ বন্ধ করলে কি আর চলে? কণ্টেকদার সাহেব অবশ্য প্রাণে বেঁচে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাইফেলটা আর কিছু আস্ত ছিল না। টুকরো টুকরো করে ভেঙে ছিল।

অনেক রাত্রে বুধু ওঁরাওয়ের গল্প শেষ হলে ফরেস্ট গার্ডের ঘরের জানলার ধারে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মাঝরাতে গভীর বনের ভেতরের অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। নানা জীবজন্তর আওয়াজ, নানা জংলি পাখির শব্দ উঠছিল প্রহরে প্রহরে। আর তার সংগে তাল রেখে এক-জাতীয় কীটের শিঁ-শিঁ আওয়াজ!

এই আওয়াজ প্রায় ডুয়ার্সের সব বনে বনেই শুনেছি। বেলা দ্বিপ্রহরেও, শব্দটা শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে, কেমন এক জাতীয় ভয়, অন্ধ ভয় গুড়গুড়িয়ে ওঠে, যা ঠিক ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

বুধু ওঁরাও দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। এই বনের মধ্যে জংলা অরণ্যের ধারে সব উপজাতির ঘরে তার জন্ম হয়েছিল, আজ রাত্রে তা যেন মিথ্যে মনে হয়। এই বনের ধারেই তার ঘর আছে, যেখানে আজ দুপুরে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সেই মাটি থেকে উঁচুতে কাঠের ঘরের চালে মানি-প্ল্যান্টের ডগা। দুপুরে মোরগ ডাকছিল। একটা বুনো কাঞ্চনের ডালে লাল ফুল। লালের দুর্মোর নেশা আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। ওঁরাওদের ঘরের যে মেয়েটি সহজ কৌতূহলে আমার দিকে তাকাতে এক ফোঁটাও সংকুচিত হয় নি, বরঞ্চ বুধুকে ডেকে এনে দেবার আগে আমাকে শুধিয়েছে, কাকে চাই? তারপর আমার কথা শুনে বুধুকে ডেকে দিয়েছে। নিজেও দাঁড়িয়ে থেকেছে। কালো মাজা-রঙের মেয়েটি। তার মাথা ভর্তি কালো চুল। চোখের চাউনিটুকু ভারী জীবন্ত।

পরে শুনেছিলাম সেই বুধুর শ্যালিকা। বছরখানেক আগে তার বৌ পালিয়ে যেতে এই শ্যালিকাটিকে নিয়ে ঘর করছে সে মাস তিনেকের ওপরে।

বুধুর কথা আমি ভাবছিলাম। রাস্তার প্রতিটি বিন্দু-বিন্দুতে সে সভ্য জগতের সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মানব-সন্তান। তার না আছে কৌলীন্য। না বংশমর্যাদা। বনের ভেতরেই এক আদি-বাসী মায়ের কোলে তার জন্ম। লেখাপড়া শেখায় নি কেউ। কিন্তু আজ বিশ বছর ডুয়ার্সের মাটিতে মাটিতে সে কাজ করছে কণ্টেকদার সাহেবের সঙ্গে। যার আসল পরিচয় কণ্ট্রাক্টর। এই বিশ বছরে কণ্ট্রাক্টর শুধু তাকে টাকা দেয় নি, দিয়েছে সাহচর্য ও সেবার যোগ্য পুরস্কার। আদিবাসী বুধু ওঁরাওয়ের বুনো রক্তে আজ আর নেই সেই পুরনো মাদকতা। সে আজ নিজের অজ্ঞাতেই সভ্য শিক্ষিত জগতের শরিক হয়ে গেছে।

এ ভাবেই এগোয় সমাজ, সভ্যতা। সভ্যতার পুরনো পালে নতুনকালের হাওয়া। তার পশ্চাতে একটিই মন্ত্র। সেবা, মিলন, সহযোগিতা। সমন্বয়সাধনই তার ধর্ম। কালরাত্রি ভোর হলে আমি যাব চলে, কিন্তু তারপর কোন একদিন এই নারীর গর্ভে তার অনাগত সন্তান নেবে জন্ম। কে জানে সে হয়তো যাবে আরো এগিয়ে। হয়তো বা এই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে বিশ্বসভায় দাঁড়িয়ে।

আমরা হয়তো দেখব না। কিন্তু কোনদিন কেউ দেখবে।

ডুয়ার্স ভয়ংকর, কিন্তু এই ভয়ংকরের মধ্যেই জাগছে সে। আগামী দিনের সুন্দর আত্মপ্রকাশ তার আছে।

(জে, সি, কে, পীটারসন রচিত "Bengal District Gazetteers—Burdwan" পুস্তকের জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীদের কাজের সুবিধার জন্য এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে সরকারী কর্মচারীদের নিকট ইহার বিশেষ মূল্য নাই বলিয়া মনে করি। অতি সাম্প্রতিক প্রাচীন কাহিনী হিসাবে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য রহিয়াছে। উল্লিখিত পুস্তকের প্রকাশ কাল ১৯১০ খৃস্টাব্দ। প্রকাশক বেংগল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো—কলিকাতা—অনুবাদক)

**প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও কর্মচারী**

মীরজাফর খানের সিংহাসনচ্যুতির পর মীরকাশীম খান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ১৭৬০ খৃস্টাব্দে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম সহ বর্ধমান জেলাটি তুলিয়া দেন। এই সময়ে বর্তমান বর্ধমান জেলা, বাঁকুড়া জেলা, হুগলী জেলা এবং বীরভূম জেলার এক-তৃতীয়াংশ লইয়া বর্ধমান জেলা গঠিত ছিল। পরে পশ্চিম বর্ধমান একটি পৃথক জেলায় পরিণত হয় এবং ১৮২০ খৃস্টাব্দে হুগলী একটি পৃথক জেলায় চিহ্নিত হয়। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলার বহুস্থান অন্য জেলার নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং অন্য জেলার কিছু অংশ এই জেলার সহিত সংযুক্ত হয়। সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে বর্ধমান জেলাকে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া এবং আসানসোল—এই চারিটি মহকুমায় বিন্যাস করা হয় এবং জেলার সদর কার্যালয় বর্ধমান শহরে সংস্থাপিত হয়। জেলার সদরে ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টরের অধীনে পাঁচজন ডেপুটি কালেক্টার এবং মাঝে-মধ্যে একজন জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। আসানসোল মহকুমার দায়িত্বে আছেন একজন চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেণ্ট। তাঁহাকে একজন ডেপুটি কালেক্টার এবং একজন সাব-ডেপুটি কালেক্টার সাহায্য করেন। কালনা ও কাটোয়া মহকুমা ডেপুটি কালেক্টারদের সহায়তায় পরিচালিত হয় এবং তাঁহাদের সাব-ডেপুটি কালেক্টারগণ সাহায্য করেন। জেলা বাস্তুকার পূর্ত-বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাঁধ ও সেচ কার্যাদি কলিকাতার সদর কার্যালয় হইতে নর্দার্ন এমব্যাঙ্কমেণ্ট ও ড্রেনেজ ডিভিশন-এর মুখ্য নির্বাহী বাস্তুকার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

**রাজস্ব**

ভূমিরাজস্ব বাদে আয়ের প্রধান প্রধান উৎস হইল প্রমুদ্রা (স্ট্যাম্প), অন্তঃশুল্ক (এক্সাইজ), বিভিন্ন উপকর (সেস্) এবং আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স)। ১৯০৭—০৮ আর্থিক বৎসরে এই খাতে মোট আয় হইয়াছিল ১৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে প্রমুদ্রা খাতে ৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, অন্তঃশুল্কে খাতে ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা এবং আয়কর খাতে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা আদায় হইয়াছিল।

**ভূমিরাজস্ব**

১৯০৮—০৯ আর্থিক বৎসরে রাজস্ব তালিকায় ৫ হাজার ২৭৬টি জমিদারী ও এই বাবদে মোট ৩০ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯১২ টাকার রাজস্বের দাবি উল্লিখিত আছে। উল্লিলিত জমিদারীগুলির মধ্যে মোট ৫ হাজার ২৪টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত এবং ইহাদের প্রদেয় আদায়ের মোট পরিমাণ ৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৬১ টাকা। ১৮৮৭—৮৮ আর্থিক বৎসরে জমিদারীর মোট সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৯৩৭টি। গত ত্রিশ বৎসরে ভূমিরাজস্বের আদায়ের পরিমাণ মাত্র ৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং ১৯০৮—০৯ আর্থিক বৎসরে এই খাতে মোট আদায় হইয়াছিল ৩০ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৯১ টাকা। কিন্তু ইহার মধ্যে পূর্ব পূর্ব বৎসরের বকেয়া আদায় আছে মোট ২২ হাজার ৮৩৪ টাকা। জেলার মোট রাজস্বের ৫৫·১৫ শতাংশ ভূমিরাজস্ব খাতে আদায় হইয়া থাকে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই পার্শ্বে অধিকৃত জমি লইয়া গঠিত এবং বাকী খাজনার দায়ে নীলামে ক্রীত ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন জমিদারীসহ সরকারের মোট ১৫৩টি জমিদারী আছে। এইগুলির মধ্যে ১২০টি বার্ষিক ৬ হাজার ৪৫৭ টাকা খাজনায় কৃষকদিগকে বিভিন্ন মেয়াদে ইজারা দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ৩৩টি সরাসরি সরকারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে।

**প্রমুদ্রা**

জুডিসিয়েল ও নন্‌জুডিসিয়েল স্ট্যাম্প বিক্রয় খাতে ১৮৯৬—৯৭ আর্থিক বৎসরে আয় হয় ৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। ১৯০০-০১ আর্থিক বৎসরে ঐ আয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় মোট ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং ১৯০৭—০৮ আর্থিক বৎসরে আরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং কৃষক ও জমিদারদের মামলার প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁক—এই আয় বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। এই খাতে মোট আয়ের ৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের তিন চতুর্থাংশেরও অধিক আয় কোর্ট ফি স্ট্যাম্পসহ জুডিসিয়েল স্ট্যাম্প বিক্রয় হইতে সংগৃহীত হয়। নন-জুডিসিয়েল স্ট্যাম্প বিক্রয় খাতে মোট ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। প্রায় সমগ্র টাকাই সাধারণ মুদ্রিত স্ট্যাম্প ব্যতীত লবণ ও শুল্কে বন্ধকপত্র এবং আদেয়ক বহনপত্র বিক্রয় হইতে সংগৃহীত হয়।

**অন্তঃশুল্ক**

অন্তঃশুল্ক খাতে ১৮৯০—৯১ সালে মোট আয় হয় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ১৯০০—০১ সালে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় মোট ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। ১৯০৮—০৯ আর্থিক বৎসরে দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। বঙ্গের মাত্র তিনটি জেলা এই আয়ের অংক অতিক্রম করিয়াছে। সমগ্র বিভাগের এই খাতে মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য এই আয়। প্রতি দশ হাজার লোকপিছু নীট অন্তঃশুল্কে রাজস্ব হইল ৪ হাজার ৭০৭ টাকা। প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় ৩ হাজার ১৯১ জনপিছু প্রাদেশিক গড় আয় একই। অন্তঃশুল্ক খাতে মোট রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক দেশীয় চোলাই মদ ও পচাই মদ বিক্রয় হইতে আসে। সাঁওতাল, বাউরী ও বাগদীগণ অধিক পরিমাণে পচাই মদ খায়। একই বৎসরে উপরিবর্ণিত মদ বিক্রয় হইতে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ও ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। বর্তমানে দেশীয় চোলাই মদের উৎপাদন ও বিক্রয় সমগ্রভাবে চুক্তি প্রথায় চালু করা

হইয়াছে। পাইকারীহারে মদ সরবরাহের জন্য কোন একটি চোলাই কারখানা সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। স্থানীয় চোলাই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং কন্ট্রাক্টরদিগের খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স বিতরণ বন্ধ করা হইয়াছে। খুচরা বিক্রয়ের জন্য পৃথক দোকান দেওয়া হয় এবং প্রতিটি দোকান নিলাম মাধ্যমে দেওয়া হয়। খুচরা বিক্রেতাগণ মদের শক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে মদ বিক্রয় করিয়া থাকেন। ১৯০৮—০৯ আর্থিক বৎসরের আগমে দেখা যায় যে, এই বৎসরে দেশীয় চোলাই মদ বিক্রয়ের জন্য মোট ৮২টি খুচরা দোকান আছে অর্থাৎ প্রতি ৩২ বর্গমাইল এবং ১৮ হাজার ৬৮৮ লোক-পিছু একটি মদের দোকান আছে। এই বৎসরেই খাদনের গড় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রতি হাজারে বত্রিশ প্রুফ গ্যালন। বিভাগের যে-কোন জেলার পরিমাণ হইতে এই জেলার পরিমাণ খুব বেশি। বিভাগের অন্যান্য জেলার তুলনায় অন্তঃশুল্ক খাতে বর্ধমান জেলার বর্ধিত রাজস্বের কারণ এই জেলায় অত্যধিক পরিমাণে পচাই মদের ব্যবহার ও বিক্রয়। এই বৎসরে ৩৪খানি দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও পচাই মদ বিক্রয় খাতে আয় হইয়াছে মোট ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা অর্থাৎ সমগ্র প্রদেশের এই খাতে আয়ের প্রায় অর্ধেক। প্রতি দশ হাজার লোক-পিছু চোলাই মদ বিক্রয় হইতে মোট আয় হইয়াছে ৩ হাজার ৬৮৪ টাকা অর্থাৎ বিভাগীয় গড় আয়ের দ্বিগুণের কিছু বেশি। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে ক্রম-বর্ধমান হারে আয় বৃদ্ধির কারণ হইল—নতুন নতুন কোলিয়ারী উদ্বোধন এবং বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকের আগমন।

অন্তঃশুল্কের বাকী রাজস্ব প্রায় সমগ্রভাবে আফিম, গাঁজা, চরস, সিদ্ধি প্রভৃতির বিক্রয় হইতে আসে। ১৯০৮—০৯ আর্থিক বৎসরে আফিম-এর শুল্ক ও লাইসেন্স ফি বাবদ মোট ৯৪ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি দশ হাজার লোকপিছু ৬৪৩ টাকা আয় হইয়াছে। গাঁজা, চরস, সিদ্ধি বাবদ আয় হইয়াছে ৪৭ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রতি দশ হাজারে ৫৭১ টাকা। বিভাগের প্রতি দশ হাজারে গড় আয় হইয়াছে ৩৯৬ টাকা। ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধকরূপে আফিম ব্যবহৃত হয়।

### আয়কর

১৯০৭—০৮ আর্থিক বৎসরে আয়কর খাতে মোট সংগৃহীত হইয়াছে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা এবং ১ হাজার ২৪২ জন এই আয়কর আদায় দিয়াছেন। জেলায় কয়লা শিল্পে অস্বাভাবিক উন্নতি হওয়ার ফলে বর্ধমান, মানভূম ও হাজারী-বাগ জেলার কোলিয়ারী অঞ্চলে নির্ধারণের সংশোধনের জন্য সম্প্রতি এক বিশেষ নির্ধারণীদল নিযুক্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে। সম্ভবত এইরূপ সংশোধনের ফলে এই খাতে আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে।

### নিবন্ধভুক্তি

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩নং আইন অনুযায়ী (বর্তমানে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ১৬নং আইন) এই জেলায় নিবন্ধভুক্তির (রেজি-স্ট্রেশন) জন্য ১৬টি আফিস আছে। জেলা সাব-রেজিস্ট্রার সাধারণত সদর আফিসে যে সমস্ত দলিলদস্তাবেজ উপস্থাপিত করা হয় সেইগুলি নির্বাহ করেন এবং পদাধিকারবলে জেলা রেজিস্ট্রারকে (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) অন্যান্য নিবন্ধভুক্তি আফিসের সাব-রেজিস্ট্রারদের কার্যাবলী তদারকী করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে যে পঞ্চবার্ষিকীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এই পঞ্চবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে ৪৪,৪২৮·৮০ খানি দলিল সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু ১৯০৮ খৃস্টাব্দে যে পঞ্চ-বার্ষিকী সমাপ্ত হইয়াছে তখন গড়ে প্রতি বৎসরে দলিল সম্পাদিত হইয়াছে ৪৪,২৪৫·৮০ খানি। চৌকিদারী চাকরান জমির আপোষনামার ফলেই দলিল সম্পা-দনের সংখ্যা হ্রাস পায়। নিম্নে বর্ণিত তালিকা হইতে জানা যাইবে যে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে প্রতিটি নিবন্ধকরণ আফিসে কত সংখ্যক দলিল সম্পাদিত হইয়াছিল, কত টাকা আয় ও ব্যয় হইয়াছিলঃ

| অফিস | সম্পাদিত দলিলের সংখ্যা | মোট কত টাকা আয় | মোট কত টাকা ব্যয় |
|---|---|---|---|
| বর্ধমান | ৪,২৭৯ | ১৪,৮২২ | ১১,৩৬৫ |
| খণ্ডঘোষ | ২,১৭৪ | ২,১৫৬ | ১,৮৩৯ |
| মেমারী | ৩,১৪০ | ৩,৪৩৮ | ৩,০৩২ |
| জামালপুর | ১,৩১৫ | ১,৩৮৮ | ১,৯২৬ |
| রায়না | ৩,৬৮১ | ৪,০৪৭ | ২,২৮৫ |
| সাহেবগঞ্জ | ২,৬৪১ | ২,৯২০ | ২,৫৩৩ |
| মানকর | ৩,১৮০ | ৩,৬১৯ | ২,০৭২ |
| গুস্করা | ২,১৭১ | ২,৪৩২ | ২,৮২৫ |
| কালনা | ২,৫৪২ | ৩,০৯৮ | ২,৪৯৬ |
| পূর্বস্থলী | ১,৫৪৪ | ১,৯৯৫ | ১,৯৩৬ |
| মন্তেশ্বর | ২,৮৯০ | ৩,৪০৪ | ২,৬৯৫ |
| কাটোয়া | ৩,৩৪৯ | ৪,২৫০ | ২,৪৯৫ |
| কেতুগ্রাম | ৩,১৫২ | ৩,৫৩৩ | ২,১৭৬ |
| মঙ্গলকোট | ২,৮৫১ | ৩,১৪০ | ১,৮২৪ |
| রাণীগঞ্জ | ৪,৪৪৭ | ৬,৫৪৭ | ২,৪৬৪ |
| আসানসোল | ২,৯৫৭ | ৪,৭০২ | ১,৯২৬ |
| —মোট | ৪৬,৩১৩ | ৬৫,৩৯১ | ৪৫.৮৮৯ |

### দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার

জেলা জজের অধীনে আছে দেওয়ানী আদালতগুলি। সদরে পাঁচটি নিম্ন আদালত আছে। এই নিম্ন আদালত-গুলি পরিচালনা করেন একজন সাব-জজ ও মুন্সেফগণ। এতদ্ব্যতীত একজন অতিরিক্ত সাব-জজও আছেন। জেলা জজের অধীনে আসানসোল, কালনা এবং কাটোয়ায় মুন্সেফ আছেন। বর্তমানে আসানসোলে একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ রহিয়াছেন। সম্ভবত অতিরিক্ত মুন্সে-ফের আদালতটি স্থায়িত্ব লাভ করিবে। জেলা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, আসানসোল, কালনা ও কাটোয়া মহকুমার এস-ডি-ও'গণ এবং তাঁহাদের অধীনস্থগণ বিচার করিয়া থাকেন। বেতনভুক আদালতগুলি ব্যতীত বর্ধমান, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কাটোয়া এবং কালনায় অবৈতনিক ম্যাজি-স্ট্রেটদের ন্যায়াসন (বেঞ্চ কোর্ট) আছে।

### অপরাধ

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে এই জেলার চরম অখ্যাতি ছিল। জেলার পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের বন-জঙ্গল হইতে তস্করেরা হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া হতভাগ্য কৃষকদিগের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমান, বীরভূম ও রাজ-শাহীতে দুই হাজার তস্করের এক আকলন করিয়াছিলেন। দেশের অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে এই নরহত্যাকারিগণ দলবদ্ধ হইয়া থাকিত। জনৈক পুলিশ অফিসারকে এই ডাকাত দলের একজন

দলপতিকে [illegible] অর্পণ করা হইলে তিনি এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ও একটি ছোট কামানের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। প্রায়ই এই ডাকাতদলকে স্থানীয় জমিদার অথবা তাঁহার ভৃত্যগণ সাহায্য করিত এবং তাহাদের দুষ্কৃতির সংবাদ গোপন রাখিত। ১৮১৯ খৃস্টাব্দের আকলন পাঠ করিয়া জানিতে পারি ডাকাতিগুলির অর্ধেকই "একজন প্রতাপান্বিত ও অবাধ্য ব্যক্তি" বর্ধমানের মহারাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের জমিদারীগুলিতেই সংঘটিত হইত, কিন্তু তাঁহার জমিদারীতে কোন ডাকাতকেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইত না ও শাস্তিও দেওয়া যাইত না। ঠিক ইহার পর বৎসরেই বর্ধমানের মহারাজা পুলিশকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিবার অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে আদালতে হাজির না হওয়ায় বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বর্ধমান পরগনা ক্রোক করা হয়। ১৮০২ খৃস্টাব্দে জেলা জজ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আকলনে এই সমস্ত অপরাধের মোকাবিলা করিতে আমাদের অফিসারদিগকে কি অসুবিধার মধ্যে কার্য করিতে হয় তাহা বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছেঃ "পুলিশ সংস্থাগুলি সুনিশ্চিতরূপে অপ্রতুল। থানার সংখ্যা কম এবং ইহাদের অধীনে জনবহুল গ্রামগুলিতে কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণের কোন বিধিও নাই। জমিদারের পাইক ও গ্রাম্য পাহারাদারদের নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভের আশা করা বৃথা, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই দুষ্কৃতকারী বলিয়া দেখা গিয়াছে। নরহত্যাসহ ডাকাতি করা অতি প্রচলিত অপরাধ।" পূর্বে রায়না থানা ঠগদের ঘাঁটি ছিল এবং ১৮০২ খৃস্টাব্দে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ঠগদের এই থানাতেই আবির্ভাব ঘটে। ১৮১৭ খৃস্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় পাঁচজন হিন্দু ও তিনজন মুসলমান রমণী সহ ঠগদের মোট সংখ্যা ছিল তিন শত। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ঠগী দমনের পর তাহাদের বংশধরগণ জীবনধারণের জন্য ডাকাতি করিতে থাকে। এখনও তাহাদের সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী প্রচারিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় তাহারা কিরূপ হিংস্র ও শক্তিশালী ছিল এবং সাধারণ মানুষ তাহাদের কিরূপ ভয় করিত। একজন দলপতি "প্রতিদিন দুই বোতল ব্রাণ্ডি সহ তিনটি ছাগলের কাঁচা মাংস এবং পাঁচ পাউণ্ড রুটি ভক্ষণ করিত। অন্য একজন একাকী চারিজন সৈন্যের সহিত লড়াই করিত।" ৩৫ বৎসর বয়স্কা একজন নারী "তাহার স্বামী ও একখানি [illegible] এক [illegible] জমিদারের বাড়ি দুইবার লুণ্ঠন করিয়াছিল।" অন্য একজন ৪৬ বৎসর বয়স্কা মুসলমান বিধবা "একজন ক্যাপ্টেন অথবা কর্নেলের" ন্যায় অশ্বচালনা করিতে পারিত এবং একদা আক্রান্তা হইলে বৃদ্ধ পিতার সাহায্যে দশজন আক্রমণকারীকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করিয়াছিল। এই সমস্ত কাহিনী আজও প্রচারিত হইতেছে। এখনও জেলায় ডাকাতি বেশ হইতেছে, কিন্তু ডাকাতদের সন্ধান করিয়া বাহির করা অতীব কষ্টসাধ্য হইয়াছে। আসানসোল মহকুমায় বহু কোলিয়ারী আছে এবং কোলিয়ারীগুলিতে উত্তর ভারতের বহু শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে। এখানে জনসংখ্যাও ক্রমাগত উঠানামা করিতেছে। উত্তর ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে দুর্বৃত্তদের আত্মগোপন করিয়া থাকা সহজসাধ্য হইয়াছে। আসানসোল এবং বর্ধমানের মধ্যে চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি করা অতি সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। আসানসোল মহকুমায়, বিশেষ করিয়া আসানসোল শহরের চতুর্দিকে ছিঁচকে চুরি ও সিঁধেল চুরি অতি সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে।

নিম্নে বর্ণিত সাতটি ফাঁড়ি সহ ২০টি থানায় এই জেলাকে বিন্যাস করা হইয়াছে।

| থানা | ফাঁড়ি |
|---|---|
| সদর মহকুমা | |
| বর্ধমান | বড়বাজার |
| | বীরহাটা |
| | মুরাদপুর |
| | নূতনগঞ্জ |
| | কেশবগঞ্জ |
| | কাঞ্চননগর |
| সাহেবগঞ্জ | |
| খণ্ডঘোষ | |
| রায়না | |
| সাতগাছিয়া | |
| জামালপুর | |
| আউশগ্রাম | |
| গলসী | |
| মেমারী | |
| আসানসোল মহকুমা | |
| রাণীগঞ্জ | |
| কাঁকসা | |
| আসানসোল | |
| ফরিদপুর | |
| বরাকর | |
| কাটোয়া মহকুমা | |
| কাটোয়া | দাঁইহাট |
| কেতুগ্রাম | |
| মঙ্গলকোট | |
| কালনা মহকুমা | |
| কালনা | |
| পূর্বস্থলী | |
| মন্তেশ্বর | |

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে জেলা সুপারিনটেনডেনট, ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট, ৮ জন ইন্সপেক্টার, ৪৯ জন সাব-ইন্সপেক্টার, ৬৮ জন হেড্ কনস্টেবল ও ৫৫২ জন কনস্টেবল—মোট ৬৭৯ জন লইয়া বর্ধমান জেলার পুলিশবাহিনী গঠিত হইয়াছিল। আয়তন হিসাবে প্রতি ৩·৯ বর্গমাইলে এবং জনসংখ্যা হিসাবে প্রতি ২ হাজার ২৫৭ জনপিছু একজন পুলিশ ছিল। গ্রামাঞ্চলে ১৬২ জন দফাদার ও ৪ হাজার ১৪৪ জন চৌকিদার বর্তমানে নিযুক্ত আছে এবং ইহাদের বেতন যথাক্রমে মাসিক ৬ টাকা ও ৫ টাকা। অতি-সাম্প্রতিককালেও চাকরান জমি ভোগ করিবার সর্তে ফাঁড়িদার, পাইক ও ঘাটোয়াল নামে কথিত বহু গ্রাম্য পাহারাদার নিযুক্ত ছিল। ইহারা প্রাচীন গ্রাম্য পাহারাদারদিগের সর্বশেষ বংশধর। এই গ্রাম্য পাহারাদারদিগকে গ্রাম্যসমাজ অর্থ দিয়া পোষণ করিতেন এবং পাহারাদারগণও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডাকাত, সিঁধেল চোর ও ছিঁচকে চোরদের আক্রমণ হইতে গ্রামবাসিগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করাই ছিল ইহাদের একমাত্র দায়িত্ব। সচরাচর ইহারা কোন না কোন ডাকাত দলভুক্ত থাকিত। ইহাদিগকে অর্থ দিয়া তোষণ করিবার জন্যই গ্রাম্য পাহারাদার নিযুক্ত করা হইত। সুতরাং ইহারা যে "নীচ ও ঘৃণিত" (১) ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের ৬নং আইনে ইহাদের অধিকাংশকে অপসারিত করা হইয়াছে এবং চৌকিদারী ও ঘাটোয়ালী চাকরান জমি গ্রহণ করিয়া সরকার জমিদারদিগকে পুনর্বন্দোবস্ত দিয়াছেন।

বর্ধমানে একটি জেলা কারাগার আছে। এই জেলে ২৭১ জন বন্দী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। সাতটি ব্যারাকে ১৯৫ জন দণ্ডিত আসামী, একটি ব্যারাকে ১৯ জন বিচারাধীন আসামী, একটি ওয়ার্ডে ১১ জন দণ্ডিত নারী আসামী এবং পুরুষ আসামীদের জন্য ৬টি সেল আছে। এতদ্ব্যতীত সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ আসামীদের জন্য ৩৬টি বেডের একটি হাসপাতালও আছে। চারিজন নারী-বন্দীকে নিঃসঙ্গ রাখিবার জন্য একটি ওয়ার্ড আছে। সরিষার তৈল দড়ি, কার্পেট, নেয়ার ফিতা, আটা প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পগুলি চালু রাখা হইয়াছে। ৮৮ জন বন্দী রাখিবার জন্য তিনটি মহকুমায় তিনটি সম্পূরক কারাগার আছে।

অনুবাদক—সুজিত হাজরা

(১) ডাঃ বুকাননস্ "রিপোর্ট অন পূর্ণিয়া", ১৮১০।

**আমি** আমাকে চিনতে পেরেছি।

**কে বলে** নিজেকে চেনা যায় না, চেনা **কঠিন।** একটু চেষ্টা করলেই চেনা যায়। আমায় তো বিশেষ চেষ্টা করতেও হয় নি।

অবশ্যি সকলে স্বীকার করতে চায় **না**; স্বীকার করতে ভয় পায়। তাই সমস্যা বাড়ে। আমার তেমন কোন ভয় নেই।

আমি নাকি সুপুরুষ। অনেকের কাছে শুনেছি। আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখে আমারও মনে হয়েছে, আমি দেখতে খুব খারাপ নই। অনায়াসে সুপুরুষ বলা চলে। আমার সুন্দর ঠোঁটে মাখন হাসি মাখান থাকে, যে দেখে সেই ভুলে যায়। বলতে শুনেছি অনেককে আমার চোখেও নাকি যাদু আছে। চোখের মায়ায় নাকি সবাই মুগ্ধ হয়। এমন দুটি মারাত্মক অস্ত্র থাকলে আর চিন্তা কি। হাসিমাখা ঠোঁট আর মায়াজড়ান চোখ থাকলে জগৎ জয় করা যায়।

আমি নাকি খুব ভালো লোক, দারুণ ভালো এবং ভীষণ পরোপকারী, ইত্যাদি। এরকম অজস্র প্রশংসার টুকরো আমার কানে আসে। এবং আমি মনে মনে হাসি। ওরা জানে না আসলে আমি কি। সত্যিই তো ওরা আমার ওপরটাই দেখেছে, তাই একটা ধারণা গড়ে নিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। ওরা তো আমার মনের মধ্যে ডুবুরি নামিয়ে দেখে নি। তাই ওদের কাছে আমি ধরা পড়ব না।

অথচ আমি জানি, আমি একটা বিরাট ফাঁকির ফুটো নৌকোয় ভেসে চলেছি। সে ফাঁকটা তালিমারা আছে। যে কোন মুহূর্তে ডুবোপাথরের ধাক্কায় ফেঁসে যেতে পারে। তখন আমি অতলে তলিয়ে যাব। কেউ আমায় তুলে ধরবে না, পারবে না, চেষ্টাও করবে না। ওরা পাড়ে দাঁড়িয়ে খুশিতে হাততালি দেবে। চিৎকার করে বলবে—বেশ হয়েছে, কেমন জব্দ! যেমন আমাদের ধোঁকা দিয়েছ— যতক্ষণ ওই তালিটুকু চোখে না পড়ে ততক্ষণই আমার জয়যাত্রা অব্যাহত।

মাঝে মাঝে সত্যিই ভয় হয় আমার, হঠাৎ যদি আমার মুখোশটা খুলে যায়, ভেতরের আমিটা যদি বেরিয়ে আসে, তাহলে? কখনো ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠি। দুঃস্বপ্ন দেখি। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ, মনে হয় বুকের ওপর একটা ভারী পাথর চেপে রয়েছে। আবার হাসি পায় আমার। কি বোকা আমি।

আমার নাকি অনেক গুণ। আমি মিষ্টভাষী, সদালাপী। আশ্চর্য, আমি নিজেই অবাক হই। ওরা এত বোকা, একটু তলিয়ে দেখে না, ভাবে না, ওপরের চমকটুকু দেখেই মতামত খাড়া করে।

আমি জানি, আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ, আমি শিক্ষকতা করি। শিক্ষক হবার যোগ্যতা আমার নেই। পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন করলে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হই আমি, চোখ প্রায় বন্ধ করে নীতিকথা শোনাই, উপদেশ দিই এবং ছাত্রকে হল থেকে বহিষ্কার করে অপরূপ আনন্দ অনুভব করি। কিন্তু কেউ জানে না, আমি নিজে অনুরূপ উপায় অবলম্বন করে পাহারাদারের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে বৈতরণী পার হয়েছি। আমার কৃতিত্ব আমি এদের মত কাঁচা ছিলাম না, প্রহরীর চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলাম। অথচ আজ এদের কাছে আমি আদর্শ শিক্ষক, মহানুভব, প্রায়-মহাপুরুষ।

ছোটবেলা থেকেই আমি অন্যরকম। বৃহৎ সংসারে অনেকগুলি ভাইবোনের মাঝে মানুষ হয়েছি আমি। কিন্তু বরাবরই আমি লক্ষ্য করেছি, আমার প্রতি মা বাবা এবং অন্যান্য সকলের নজর যেন বেশি। এই সংসারে আমার যেন বিশেষ অধিকার। আমার আদর-আব্দার সকলেই সহ্য করে, কারণে-অকারণে বিরক্ত করেছি সকলকে। অশান্তি বাধিয়ে তুলেছি প্রায়ই। ঈর্ষা, দ্বেষ আমার মনে একটু বেশি এবং ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক ও চরম স্বার্থপর হয়ে উঠেছি।

তবু জানি না কেন, প্রায় অনেকেই আমায় প্রশংসা করে। কানে আসে আমার আড়ালে অনেকে আমায় নিয়ে আলোচনা করে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা, তারা মুক্তকণ্ঠে আমার প্রশংসা করে।

অপরের হিসেবের গরমিল আমি দক্ষ হিসাবরক্ষকের মত খুঁটিয়ে দেখি। দু-চার পয়সার হেরফের হলে দুশ' কথা বলি, নীতিজ্ঞান দিই অথচ আমি নিজে যখন কোন সংস্থার টাকাপয়সা নিয়ে কারবার করি তখন দশ-পঞ্চাশের ভেজাল
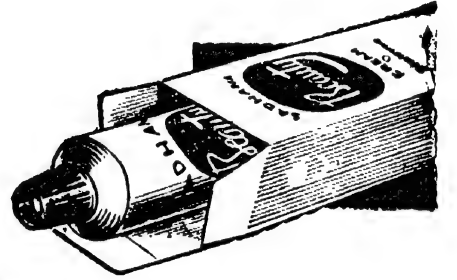
হিসেব অনায়াসে চালিয়ে দিই। আশ্চর্য! বিবেক এতটুকু প্রতিবাদ করে না।

বন্ধুরা যদি সিগারেট অফার না করে, সিনেমা না দেখায়, রেস্টুরেন্টে না খাওয়ায় এবং মাঝে মাঝে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে ভালোমন্দ না খাওয়ায় তাহলে তাদের দু-দশ কথা শোনাই, বিদ্রূপ করি, হুলের আঘাত দিয়ে কথা বলি। কিন্তু আমার কাছে এহেন প্রস্তাব এলে চটে আগুন হয়ে যাই। তবে প্রকাশ করতে পারি না। তখন অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন। ভুবনভোলান হাসি আর মায়াজড়ান চোখের দৃষ্টি তখন মোক্ষম অস্ত্র। ওরা অনায়াসে বশীভূত হয়। আমার ওপর প্রচণ্ড দুর্বলতা ওদের ; রাগ করে না।

অনেকবার নিজেই ভেবেছি, আমি এত কৃপণ কেন! কি হবে এত টাকা জমিয়ে? আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি! কিন্তু ভালো জামাকাপড় কিনে অর্থব্যয় করা বা ভালো ভালো জিনিষ খাবার জন্যে টাকা খরচ করার কথা মনে হলেই গায়ে জ্বর আসে। সখের জিনিষ কেনা তো দূরের কথা। তার চেয়ে টাকা ব্যাঙ্কে জমুক। সুদ জমাবে, টাকা বাড়বে। নিজেকে বোঝাই, চাহিদা বাড়ালেই বাড়ে। ত্যাগই ধর্ম, ত্যাগই মানুষকে সুখী করে, মহৎ করে।

অথচ আমি তো জানি, আমার মত ভোগী খুব কমই আছে। যে কোনভাবে হোক জীবনকে ভোগ করতে চাই। কিন্তু সমাজ আমায় বাধা দেয়। বাধ্য হয়ে সমাজের অনুশাসন আমায় মানতে হয়। মুখোশ ভালো করে এঁটে রাখি।

মডার্ন হতে হলে খেলাধুলো, সিনেমা, রাজনীতির আলোচনা করতে হবে। খেলাধুলো আমি বুঝি না।



সিনেমায় আমার উৎসাহ প্রচুর। হিন্দী-ছবি প্রচণ্ড ভালোবাসি, উদ্দাম লাস্য মাদকতা ছড়ায় মনে, ফাঁক পেলেই গোপনে দেখি, কিন্তু আলোচনার সময় ঘৃণায় নাক কোঁচকাই। তখন ফ্রান্স, ইতালির অত্যাধুনিক ছবির আলোচনা করি বিজ্ঞের মত। ন্যুভেল ভাগ, সিমবল, সাজেশন বুনুয়েল, বার্গম্যান, যেন এ লাইনের আমি একজন অথরিটি। সাধারণ বাংলা ছবির নাম মুখে আনি না। সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল সেন, তপন সিংহ—বাস আর এদিক-ওদিক নয়। যদিও এদের সব ছবি দেখি নি, কিছু দেখেছি, কিছু শুনেছি লোকমুখে, বাকিটা সমালোচনা পড়েছি। এবং যে ক'টি দেখেছি তার মধ্যে আহামরি হবার কি আছে বুঝি নি। মনে হয়েছে অহেতুক এদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করা হয়। আমার তো ভালো লেগেছে সঙ্গম, ভূতবাংলো, লাভ-ইন-টোকিও। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলার উপায় নেই।

ক্রিকেটের 'ক' না বুঝলেও পাতৌদি, বোরদের নাম করতে আমার গলা বুজে আসে। পুরনো খেলার মুখস্থ করা রেজাল্ট চোখ বুজে বলে যেতে পারি। সবাই ভাবে আমি বুঝি ক্রিকেটের বড় সমজদার।

ইংরেজ আমলে প্রকাশ্যে তাদের প্রশংসা করতাম। এখন স্বাধীন দেশে মনে মনে তাদের পুজো করি। তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বেশভূষা, আচার-আচরণ বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে স্মরণ করি, কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হই।

এখন আমি কোন দলের নই। কোন দলের নীতির প্রতি আমার আস্থা নেই, কোন দলকে পছন্দ করি না। কিন্তু মুখে সেকথা প্রকাশ করি না। প্রতি দলের সঙ্গেই আমার সম্প্রীতি। তাঁরা ভাবেন আমি তাঁদেরই। আসলে আমি সবাইকে খুশি রাখতে চাই। এবং বলতে দ্বিধা নেই রাজনীতির ব্যাপারে আমি পরম সুবিধাবাদী। এতে কারো সঙ্গে বিরোধ হবার সম্ভাবনা নেই। বলা চলে আমি প্রোগ্রেসিভ অপারচুনিস্ট। আধুনিক জগতে এ হাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

অনেক সভাসমিতিতে আমি যাই, যেতে হয়। কখনো সভাপতি, কখনো প্রধান অতিথি। কত আদরযত্ন, আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা। গদগদ হয়ে যায় সবাই। আমি বাছাই করা সুন্দর শব্দ সাজিয়ে অভিভাষণ দিই। জীবনে যা করি না, যা বিশ্বাস করি না সেই সব কথা বলি। ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বেদ-উপনিষদ, সৌজন্য, শিষ্টাচার, বিষয়ের শেষ নেই। অনেক নিষ্ঠায় তৈরি করতে হয়েছে বক্তৃতাগুলি।

চোখ বুজে ভাবে বিভোর হয়ে বলে যাই চৈতন্য-বুদ্ধদেব-রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, কোথায় কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সকলেই তন্ময়, অসীম আগ্রহে আমার কথামৃত গলাধঃকরণ করছেন। স্বামী বিবেকান্দ, রবীন্দ্রনাথের বাণী বলি, ব্যাখ্যা করি, আবৃত্তি করি। বাহবা পাই, হাততালি পাই। ভক্তিতে, আবেগে শ্রোতাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বক্তৃতাশেষে চলে অটোগ্রাফের পালা। শুধু সই হলে চলে না, দু-চার লাইনের বাণীও দিতে হয়।

আমার কথা কি বলে শেষ করা যায়! যত ভাবি, তত অবাক হই। মাঝে মাঝে মনে হয় সমুদ্রের বালিয়াড়ির মত নিজেকে মেলে ধরি। মুখোশটা কখনো খুব ভারী লাগে। নিজের সঙ্গে কত আর লুকোচুরি খেলা যায়! কিন্তু না, পারা যায় না। খ্যাতির মোহ বড় মারাত্মক। শেষে বেড়েই চলে। পেয়ে পেয়ে অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছে। আরো চাই, আরো, আরো। তাই সবকথা খুলে বলা যায় না। আবার ভাবি, হাসি পায়—তবে কি আমার বিবেক সজাগ হচ্ছে! না, না ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে শ্বাসরুদ্ধ করে ওকে শেষ করে ফেলতে হবে। সাধারণত প্রকাশ্যে আমি কোন নেশা করি না। বড়-জোর চা, কফি। অথচ আমি খুব অল্প বয়েস থেকেই সঙ্গদোষে নস্যি ও পান-দোক্তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আর একটু বড় হতে বিড়ি ও সিগারেট। হাতে পয়সা না থাকায় বাধ্য হয়ে পকেট হাতড়াতে হয়েছে। সবাই বুঝতে পারলেও সামনাসামনি ধরে ফেলে আমায় লজ্জা দেয় নি। তবে আমি বুঝতাম সবাই সন্দেহের চোখে তাকায় আমার দিকে।

আমি জানতাম নেশা আমায় গ্রাস করতে পারে না। যে কোন নেশা ধরা আর ছাড়া আমার কাছে জলভাত। এক্ষেত্রে আমার সংযম তুলনাহীন। গোপনে আমি প্রায়ই সুরাপান করে থাকি এবং পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকি। তবে মাত্রা ছাড়াই না। কখনো ধরা পড়ি নি। সবাই জানে যে কোন নেশা আমি ঘৃণা করি এবং নেশাখোরদের ছায়া মাড়াতে চাই না।

আমার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আমি অতি অনায়াসে নারীমন জয় করতে পারি। অথচ লোকে জানে আমি খুব নারীবিদ্বেষী। সেজন্য তাঁরা আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। আমার নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাকে কী চোখে দেখি বুঝতেই পারছেন।

এরপরও কি বলা যায় আমি আমাকে চিনি না।

**'সপ্তাহের বোঝা' প্রসঙ্গে**

**'সাপ্তাহিক বসুমতী'র' ২৪শ সংখ্যা, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ তারিখের** সংখ্যাটি পড়লাম। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই লক্ষ্য করছি কৃত্তিবাস ওঝা মহাশয় একটি সুচিন্তিত লাইন অফ্ অ্যাকশনে নিয়ে তাঁর 'সপ্তাহের বোঝা' লিখে যাচ্ছেন এবং সে লাইনটি হ'ল—বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাজনৈতিক দল (সি, পি, এম বাদে) ও কংগ্রেস, জনসংঘ প্রভৃতি দলগুলির তারস্বরে আইন-শৃংখলা ভাঙার জন্য সি, পি, এম দায়ী, জ্যোতি বসু দোটানায় পড়েছেন ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি। অবশ্য তাতে আমার বলার কিছু থাকে না; প্রতিটি পত্রিকা এক-একটি রাজনৈতিক চাল আশ্রয় করে, এটা সর্বজনবিদিত।

ক্ষমা করবেন, আপনাদের পত্রিকাও তার কিছু ব্যতিক্রম নয়। তবে, একটি বিষয়ে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারলাম না। বর্তমান সংখ্যার 'সপ্তাহের বোঝা'র শেষ অনুচ্ছেদে লিখিত—"ঠিক ছিল ৫ই ডিসেম্বর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যাবেন তমলুক শহরে সভা করতে।......আর সেইদিনই তমলুক শহরে হরতাল ডাকা হল......শ্রীদাশগুপ্ত তমলুকে জোর করে সভা করার কথা ভাবলেন না......।" জানি না আপনাদের সাংবাদিক সেদিন তমলুকে ছিলেন কি না। তবে, সি, পি, এম মুখপত্র সান্ধ্য দৈনিক 'গণশক্তি'তে (৭ই ডিসেম্বর '৬৯) প্রকাশিত বড় হরফে "তমলুকে দশ হাজার মানুষের সমাবেশ" এবং তার পরে তার বিবরণ ও সভায় শ্রীদাশগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ লেখা হয়েছে। সেদিনকার কাগজে তারিখটা ৬ই ডিসেম্বর ছিল। ৯ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় ৪র্থ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ভ্রম সংশোধন করে ৫ই ডিসেম্বর করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত ওঝা বলবেন 'গণশক্তি' মিথ্যা বলেছে। তাঁর মানুষের সংখ্যা নিয়ে বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু একটি সংবাদপত্রের শিরোনামা নেহাতই অলীক এটা বিশ্বাস করা একটু কঠিন হবে নাকি? গ্রামে গ্রামে শরিকী সংঘর্ষ চলছে, অরাজকতা চলছে এসব দেখে হয়'ত রসাল আলোচনা হতে পারে অনশনের জন্যই শ্রদ্ধেয় অজয়বাবু দলীয় নেতার ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারেন—এটা যেমন আপনাদের কাছে সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, সেদিন তমলুকে মিটিং হয়েছিল। প্রশ্ন—এটা কি সি, পি, এমকে হেয় করার চেষ্টা নয়? 'কালান্তরের' পক্ষে যা শোভন, দৈনিক বা সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষে তা নয়। আশা করি, ভবিষ্যতে এরকম ভ্রান্ত সংবাদ আপনার পত্রিকায় পরিবেশিত হবে না। নীতি সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই।

—রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
২২/১০, চৌষট্টী ঘাট
বারাণসী

**লেখকের বক্তব্য**

**৫ই ডিসেম্বর তমলুকে হরতাল** হয়েছে এবং সেইদিন তমলুকে শ্রীপ্রমোদ-দাশগুপ্ত যান নি এই কথা সত্য। 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত বিবরণ মত তমলুকে একটি সভা হয়েছিল এই কথাও সত্য হতে পারে, তবে সেই সভায় শ্রীদাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন না। আপনার জ্ঞাতার্থে এইটুকু জানানো যেতে পারে যে, ৫ই তারিখে শ্রীদাশগুপ্ত আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে সি-পি-এম অফিসে সন্ধ্যাবেলায় ছিলেন এবং লেখক ও আনন্দবাজারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে সমস্ত সন্ধ্যা কাটিয়েছিলেন—যার কারণে ৬ই তারিখে 'আনন্দবাজার' ও 'বসুমতী' পত্রিকায় শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে সাংবাদিকদের আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয়। এর পরেও যদি বলা হয় যে, তমলুকের নির্দিষ্ট দিনের সভায় প্রমোদবাবু ছিলেন, তবে অবশ্য কিছু বলার নেই।

—কৃত্তিবাস ওঝা

**এ্যানাটমির শিক্ষকদের প্রসঙ্গে**

**গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের** "সাপ্তাহিক বসুমতী"তে এ্যানাটমির শিক্ষকদের নিয়ে লিখিত আমার পত্রে সন্নিবেশিত কয়েকটি তথ্য কিছু ভুল থেকে গেছে। আমি সেগুলোকে শুধরিয়ে দিতে চাই।

(১) যে তালিকাটি দেওয়া হয়েছে তাতে ২নং কলমে প্রঃ কমল ব্যানার্জীর চাকরিতে জয়েনিং সাল ১৯৪৭ দেওয়া হয়েছে। সেটা ঠিক নয়। কলকাতায় আমার ডাক্তার বন্ধুদের মারফৎ খবরে জানলাম সেটি ১৯৪৮ হবে।

(২) ১৫৭০ পৃষ্ঠায় (৩) আলোচনায় বলা হয়েছে প্রঃ ব্যানার্জী ও ডাঃ মুখার্জী মেঃ কলেজ ও ন্যাশনাল কলেজে অফিসিয়েটিং-রত দু'জনের থেকে ৫।৬ বছরের সিনিয়র। সেটি আংশিক সত্য। অর্থাৎ প্রঃ ব্যানার্জী ওঁদের থেকে ৬ বছরের ও ডাঃ মুখার্জী ২ বছরের সিনিয়র।

(৩) ডাঃ সময় মিত্র এ'দের থেকে বয়সের দিক দিয়ে বড়। তাঁর টিচিং অভিজ্ঞতাও বেশি। কিন্তু চাকুরিতে কনফারমড হয়েছেন পরে। প্রথমে তিনি লোকালি রিক্রুটেড হয়েছিলেন।

এ ধরণের ভুলের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত না থাকায় ও ব্যক্তিগতভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ না থাকায় এ সব ভুল থেকে গেছে। আরও কিছু ভুল থাকলে দয়া করে শুধরে দেবেন।

—নিখিল বসু
কলকাতা—৩৭

*

**১৮ই ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক** বসুমতীতে 'নিয়তির প্রকোপে এ্যানাটমি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক' শিরোনামায় অনুলিপিটি পড়লাম। আমি মনে করি সংশ্লিষ্ট তালিকার সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য যোগ করলে—সেটা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হবে।

ডাঃ নলিনাক্ষ গোস্বামী হচ্ছেন রকফেলার ফাউন্ডেশন স্কলার। উনি ডাঃ ও ভি ব্যাটসন-এর অধীনে আমেরিকায় ৯ মাস কাজ করেন।

ডাঃ সমর মিত্র হলেন, আই-সি-এম-আর স্কলার। উনি ডাঃ শিবতোষ মুখার্জীর অধীনে ১ বছর কাজ করেন।

—সুহাসিনী চক্রবর্তী
বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা-৯

**স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি প্রসঙ্গে**

**আপনার বহুলে প্রচারিত** 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি সম্পর্কে শ্রীমনোরঞ্জন হাজরার কয়েকটি রিপোর্ট এবং তার ওপর বিভিন্ন পাঠকের মতামত পড়লাম। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসছে না, কেন যে স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে এত অভিযোগ, সেই স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রীমহাশয় এ ব্যাপারে একেবারে চুপচাপ। বিশেষ করে সেই মন্ত্রীমহাশয়েরই দল কেরালার মার্কসবাদী নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ঐ দুর্নীতির অভিযোগেই ক্ষমতাচ্যুত করে এক মিনিফ্রন্ট গড়ে তুলেছেন।

একজন নাগরিক এবং যুক্তফ্রন্টের সক্রিয় সমর্থক হিসাবে আপনার পত্রিকা মারফৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমার এই অনুরোধ রাখছি, তিনি যেন উপরোক্ত ব্যাপারে আশু ব্যাপক তদন্তের নির্দেশ দেন এবং তদন্তে প্রকৃত দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

—চামেলী দাঁ,
৯০ই, খটিরবাজার লেন,
মাহেশ, পোঃ রিষড়া (হুগলী)

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

দি ইনট্রুডার (১৮৯০)ঃ মৃত্যুই জীবনকে পরিচালিত করে এবং মৃত্যু ছাড়া জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। মৃত্যুর স্বরূপ যে বোঝে তার কাছে মৃত্যু কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনা নয়—এক রহস্যে ভরা রোমাঞ্চকর ঘটনা। সসীম জগতের দৃষ্টিতে মৃত্যুর রূপ ভয়াবহ—অথচ মৃত্যুর ভেতর দিয়েই সসীমকে অতিক্রম করে অসীমকে পাওয়া যায়। যে সব রহস্যময় অজানা শক্তি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, মৃত্যু তার একটি। এ জাতীয় আর এক শক্তির নাম প্রেম। এই দু'টি কস্‌মিক শক্তির গভীরত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন মেতারলিংক তাঁর কয়েকটি নাটকে।

রহস্যজনকভাবে মৃত্যুর অভ্যাগম বর্ণনাই দি ইনট্রুডার নাটকের বিষয়বস্তু। এ নাটকের গ্র্যান্ডফাদার চরিত্রটি দৃষ্টিশক্তিহীন। দি ইনট্রুডার এবং দি সাইটলেস—এ দু'টি নাটকেই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, আমরা সবাই দৃষ্টিশক্তিহীন। অন্ধের মত আমরা পথ হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি—আমাদের ভেতর বাহ্যত যারা কম দেখে, আসলে তারাই তবু কিছু দেখতে পায়। অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখে দেখার সার্থকতা আসে না—অন্তর থেকে দেখতে পারলেই ঠিকমত দেখা হয়। এই প্রসঙ্গে 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউলের কথা মনে আসে। সে চোখে দেখতে পায় না বলেই ভেতর থেকে দেখতে পায়।

নাটকের গল্পাংশ—এক পুরনো প্রাসাদের একটি অন্ধকার ঘরে দি ব্লাইন্ড গ্র্যান্ডফাদার, দি ফাদার, দি আংকল এবং দি থ্রি ডটার্স বসে আছেন। পাশের ঘরে দি মাদার শুয়ে আছেন। ইনি প্রসূতি এবং অসুস্থা। প্রায় মরণের দ্বার থেকে যেন এঁকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে—ডাক্তার বলেছেন এখন আর বিপদের আশঙ্কা নেই। সবাই একথায় আশ্বস্ত হয়েছেন, শুধু গ্র্যান্ডফাদারের মনে সংশয় রয়েছে—তাঁর ধারণা রোগীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। দি আংকল নবজাত শিশুটি সম্বন্ধেই বেশি চিন্তান্বিত—জন্মের পর প্রায় নড়েচড়ে নি। একবারও কাঁদে নি। যেন মোমে তৈরি শিশু। সবাই সিস্টারের আগমন-প্রতীক্ষায় বসে আছেন। দি এলডেস্ট ডটার জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখছে তিনি আসছেন কিনা। বাইরের পথে সুসজ্জিত গাছপালা—সে বাইরের থেকে বুলবুলের গান, বাতাসের মৃদু-শব্দ, আর গাছের পাতার মর্মরধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। গ্র্যান্ডফাদার বলে উঠলেন যে, তিনি আর বুলবুলের গানের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। দি ডটারের মনে ভয় হচ্ছে অপরিচিত কোন লোক বাড়ির বাগানে ঢুকেছে বলে। কাউকে সে দেখতে পায় নি বটে, তবে নিশ্চয়ই পুকুরের পাশ দিয়ে গিয়েছে—হাঁসগুলো ভয় পেয়েছে এবং মাছের দলের জলের ওপর ঝাঁপিয়ে ওঠার শব্দ পাওয়া গিয়েছে। কুকুরের দল নিস্তব্ধ—এই বাড়ির কুকুরটি তার ঘরের কাছে কুঁকড়িয়ে পড়ে আছে। বুলবুলের কূজন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—চারদিকে মৃত্যুর ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

দি গ্র্যান্ডফাদার বলে উঠলেন—নিশ্চয়ই কোন অপরিচিত শয়তান আমাদের এভাবে ভয় দেখাচ্ছে। বাগানে ফোটা গোলাপের পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে গেল। গ্র্যান্ডফাদারের খুব শীত করছে—অথচ বারান্দার দিকের কাঁচের দরজাটা বন্ধ করা যাচ্ছে না। মিস্ত্রির এসে পরের দিন এই দরজাটা সারিয়ে দেবার কথা। হঠাৎ বাইরে থেকে কাস্তেতে শাণ দেবার আওয়াজ পাওয়া গেল—মালি নিশ্চয়ই তার যন্ত্রপাতিতে ধার দিয়ে ঠিক করে রাখছে। বাতির আলো কমে আসছে—কে যেন এ বাড়িতে ঢুকলো বলে মনে হল—কিন্তু সিঁড়িতে তো কই কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল না। তাঁরা চাকর-ডাকা ঘণ্টি বাজালেন।

দাসীর পায়ের শব্দ শোনা গেল। গ্র্যান্ডফাদারের মনে হল দাসী একা আসছে না—সঙ্গে অন্য কেউ আছে। দি ফাদার দরজা খুলে দিলেন—দাসী সেখানেই অপেক্ষা করে রইল। কই তার সঙ্গে তো কেউ নেই! সে তো একলাই এসেছে! দাসী বললো কেউ বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে নি—নিচের দরজা খোলাই ছিল এবং সে-ই তা বন্ধ করে এসেছে। ফাদার তাকে দরজা নেড়ে আওয়াজ করতে বারণ করলেন। দাসী উত্তর দিল যে, সে দরজা নাড়ছে না। দি গ্র্যান্ডফাদার—যদিও তিনি অন্ধ, তবু অনুভবের দ্বারা আলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারেন—ভাবলেন বোধহয় এরা ঘরের আলো নিভিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া তাঁর মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কেউ এ-ঘরে ঢুকেছে। একবার জিজ্ঞেস করলেন আলো কেন নিভিয়ে দেওয়া হল। তাঁর ভয়ানক আগ্রহ হল পাশের ঘরে গিয়ে রোগীকে দেখে আসবেন—অন্যেরা বাধা দিলেন—কারণ রোগী এখন ঘুমোচ্ছেন। এবার বাতিটি সত্যিসত্যিই নিভে গেল—সবাই জমাট অন্ধকারের ভেতর নিস্তব্ধভাবে বসে আছেন। মাঝরাতের ঘণ্টার আওয়াজ পাওয়া গেল—শেষ ধ্বনিটির সঙ্গে-সঙ্গেই হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল। পাশের ঘরে শিশুটি ভয় পেয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। রোগীর ঘর থেকে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল—ঘরের দরজা উন্মুক্ত হল এবং ওঘর থেকে আলোর শিখা এ-ঘরে এসে পড়ল। প্রবেশপথে দেখা গেল একজন সিস্টার অভ্ চ্যারিটিকে—তিনি সাইন অভ্ দি ক্রশ করে মাদারের মৃত্যু ঘোষণা করলেন।

নাট্যকারের কলাকৌশলে অলৌকিক ঘটনাগুলোকে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কাস্তেতে শাণ দিচ্ছে রিপার ডেথ্ নয়—বাড়ির মালি। আলো নিভে গেল কোন অস্বাভাবিক কারণে নয়—তেল ফুরিয়ে যাওয়াতে। তবু সমস্ত বাস্তব পরিবেশকে ছাপিয়ে উঠেছে এক অতিবাস্তবতার রহস্যময়তা। মৃত্যুর করাল অভ্যাগমকে আরও ভয়াবহ, আরও রহস্যঘন করে তুলেছে সর্বব্যাপী অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা।

সাতটি রাজকন্যা (১৮৯১) ঃ মার্বেল পাথরের তৈরি একটি বিরাট ঘর। চারদিক লরেল, ল্যাভেন্ডার প্রভৃতির পাতা দিয়ে শোভিত। পোর্সিলেনের ফুলের টবগুলোতে লিলিফুল দিয়ে সাজানো। সাদা মার্বেলের সিঁড়ির ওপর সাদা পোষাকপরা সাত রাজকন্যা শুয়ে আছেন—এক-একজন এক এক সিঁড়ির ওপর ফ্যাকাসে সিল্কের তোষকে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। অন্ধকারে জেগে উঠলে এঁরা হয়তো ভয় পাবেন ভেবে একটি রূপোর তৈরি দীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। এই দীপের আলো নিদ্রিতাদের দেহের ওপর পড়ে এক রোমাঞ্চকর স্বপ্নাবেশপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। ঘুমিয়ে থেকেই এঁরা যেন স্বাভাবিক—জেগে থাকবার জন্য এঁরা সৃষ্ট হন নি—এঁরা খুবই দুর্বল এবং কোমল। শান্তি, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠবার জন্যই এঁরা ঘুমের ভেতর দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এখানে আসবার পর থেকেই এই রাজকন্যারা যেন শক্তিহীন, দুর্বল এবং উৎসাহহীন হয়ে পড়েছেন। পূর্ব দেশের এই রাজপ্রাসাদটির সব জায়গাই হিম-

শীতল এবং স্বপ্নের যাদুতে ভরা। রাজকন্যারা গরমের দেশ থেকে এখানে এসেছেন। সূর্যের আলো দেখবার জন্য এ'রা উদ্‌গ্রীব—কিন্তু সূর্যকে এদেশে কখনও ভালভাবে দেখবার সুযোগ ঘটল না—এখানকার আকাশও পরিষ্কার এবং সুন্দর নয়। পুকুরগুলোর পাশে পাশে ওকের এবং পাইনের সারি—সব মিলে এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রাজকন্যারা দেশে ফেরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখানকার সব কিছুই তাঁদের একঘেয়ে লাগে। তাঁরা তাঁদের যৌবনের সাথীর আগমনের প্রতীক্ষা করছেন কিছুকাল থেকে। সময় সময় তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছেন, কখন দূরের কানালে এই সাথীর জাহাজ দেখা দেয়। আবার নিজেরাই তাঁরা বলাবলি করেছেন—"কই— সে তো এল না।"

শেষে তাঁরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনই সে এল। এ'দের এখন জাগিয়ে তোলা যায় কি করে! জানলার বাইরে থেকে আবেগভরা অন্তরে উঁকি দিয়ে সে এ'দের সাতজনকে দেখতে লাগল। এই সাতজনের ভেতর সবচেয়ে সুন্দরী উরশুলা—ছেলেবেলায় এ'রই সঙ্গে খেলা করতে সে সব থেকে বেশি ভালবাসতো। দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই মেয়েটি তার আসবার জন্য প্রতীক্ষা করেছে—এই সুদীর্ঘ সাত বছরের দিনে এবং রাতে।

সাতজনে হাত ধরাধরি করে শুয়ে আছেন। তাঁদের বোধহয় ভয় হয়েছে, নিজেদের ভেতর কেউ যদি হারিয়ে যায়। তবুও তাঁরা ঘুমের ভেতর নড়াচড়া করছেন—কারণ উরশুলার হাত অন্য দুই বোনের হাত থেকে মুক্ত।

অবশেষে মাটির তলার একটি পথ দিয়ে তাঁদের সাথী কুমার এঘরে এসে ঢুকল। সে ঢোকাতে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল এবং ছ'জন রাজকন্যা জেগে উঠে আনন্দধ্বনি করলেন—"কুমার এসেছে।" কিন্তু উরশুলা জাগলেন না—তাঁর দেহ নিথর, নিস্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করবার পরও কুমার না আসাতে এবং আত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে যাওয়াতে, অবসাদে, হতাশায়, ক্লান্তিতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

আমাদের অন্তরদেশই এই রাজপ্রাসাদ। এই নিদ্রামগ্না সুন্দরীদের দ্বারা মানবাত্মাকেই বোঝাচ্ছে। মানবাত্মা কখনও নিদ্রাবেশে পূর্ণ থাকে—কখনো আবার স্বপ্নমগ্ন হয় এবং প্রতীক্ষা করতে থাকে সেই পরমপুরুষের, যিনি জীবনস্বামিরূপে এসে নিদ্রার মোহ দূর করবেন এবং প্রেমাবেশে আত্মাকে পুষ্ট ও প্রাণবন্ত রাখবেন। এই সাতটি কন্যা মানবাত্মার বিভিন্ন দিকের নির্দেশক।

আবার কেউ কেউ সোলার মিথ্ হিসাবেও এ নাটকের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

**পেলিয়াস এট্ মেলিসান্ডা** (১৮৯২): বনানী, পাহাড় এবং ঝরণার সমাবেশে এক স্বপ্নময় কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন মেতারলিঙ্ক। মানুষের জীবনে ভবিতব্য যে কত বড় একটা স্থান অধিকার করে আছে এবং এই ভবিতব্যকে অগ্রাহ্য করা যে আমাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব এই ইংগিতই এই নাটকটি থেকে পাওয়া যায়। এ নাটকের সব চরিত্রই এক অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। জীবনকে বুঝতে হলে বাইরে থেকে দেখলে চলবে না—অন্তর্মুখী হতে হবে—"one is always mistaken unless one shats one's eyes."

**এগ্‌লাভেইন এ্যান্ড সেলিমেট**—রচিত এবং প্রকাশিত ১৮৯৬ সালে। দুটি নারীর ভেতর দিয়ে যেন আত্মার সৌন্দর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখানো হয়েছে। সেলিমেটের সহজ সারল্যকে জ্ঞানের আলোকে উদ্বুদ্ধ করে তুললো এগ্‌লাভেইন নিজের প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধি দিয়ে। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল এই সহজ সারল্যের ভেতরে যে শক্তি লুকিয়ে থাকে, জ্ঞান বা বুদ্ধি তাকে দেখতে পায় না। এবং সে শক্তিকে এঁটে ওঠাও যায় না। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত সেলিমেটই জয়ী হল।

**দ ডেথ্ অভ্ টিন্টাগিলস (১৮৯৪):**—এ নাটকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষ ভাগ্যের বা ভবিতব্যের হাতের ক্রীড়নকের মত। এই ভবিতব্য অজানা অন্ধকারে পূর্ণ এবং চিররহস্যে ভরা। এর বিরুদ্ধতা করবার কোন শক্তিই মানুষের নেই।

**ইন্টিরিওর (১৮৯৪):** এ নাটকের ব্যঙ্গার্থ হচ্ছে: আমাদের জীবনে অতি সহজ এবং সুন্দর পরিবেশ এবং অবস্থার মাঝেও ভবিতব্যের বিধানে নিদারুণ এবং ভয়াবহ ঘটনা ঘটে সব কিছু ওলোট-পালট করে দেয়। এতে বাধা দেবার মত কোন শক্তিই আমাদের নেই। দর্শকের মত আমরা শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখে যেতে পারি। কিছু বলবার বা করবার মত ক্ষমতা আমাদের কোথায়!

মেতারলিঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করে এই নাটকটির বঙ্গানুবাদ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। নাট্যসাহিত্যের ছাত্রদের প্রতি আমার অনুরোধ তাঁরা যেন এই নাটকটি পড়বার সময়, পাশাপাশি রেখে হাউপ্টমানের 'জানেল' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক দুটিও পড়েন। মৃত্যুকে তিনজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী কি চোখে দেখেছেন তা তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন।

**সিস্টার বিয়েত্রিস** (১৯০১): এরকম একটি চমৎকার নাটক আমি খুব কম পড়েছি। কনভেন্টের যাজিকা বিয়েত্রিস

'এরিয়ান এ্যান্ড বার্বে-রিউ' নাটকের একটি দৃশ্যে মিসেস মেতারলিংক

তাঁর প্রেমিক বেলিডরের সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর এই সর্বত্যাগী প্রেমের প্রতিদানে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার পেলেন বেলিডরের কাছ থেকে। কিছুদিন বাদেই সে তাঁকে ফেলে পালায়। এরপর অতি কদর্য এবং বেদনাময় জীবনযাপন করতে হয় বিয়েত্রিসকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে রূপোপজীবিনীর কুৎসিত ব্যবসা করেও জীবনধারণ করতে হয়েছিল। দীর্ঘ পঁচিশ বছর বাদে আবার তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। তাঁর অবর্তমানে ভার্জিন মেরী তাঁর রূপ ধারণ করে বিয়েত্রিসের কাজকর্ম চালাতেন এতকাল। আশ্রমের কেউ জানতেও পারে নি যে বিয়েত্রিস আশ্রম ছেড়ে চলে গেছেন। পঁচিশ বছর বাদে ফিরে এসে সবকিছুই তিনি যথাযথ অবস্থায় দেখতে পেলেন। অন্যান্য যাজিকাদের এবং তাদের প্রধানের বিয়েত্রিসের প্রতি অগাধ এবং প্রগাঢ় ভালবাসা ও প্রীতির ভাব বিদ্যমান। তিনি শত চেষ্টা করেও তাদের বোঝাতে পারলেন না যে, তিনি পঁচিশ বছর বাইরে ছিলেন এবং এই সময়টায় অতি কুৎসিতভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছেন। এই স্বীকারোক্তিকে তারা বিয়েত্রিসের মনের-ভুল ধারণা হিসাবে দেখল। তারা ভাবল—This is only part of the terrible strife about great Saints. সিস্টার বেয়েত্রিস হচ্ছেন মানবাত্মা। আমাদের আত্মা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে—কিন্তু তার পবিত্রতাকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। দেহ পাপে নিমজ্জিত হতে পারে, কিন্তু দেহের পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না।

**আরিয়েন এ্যান্ড ব্লু-বিয়ার্ড (১৯০৭) :** এ নাটকের বক্তব্য হোল : নারী জাতির স্বাধীনতা সবারই কাম্য; কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় যে, অত্যাচারিতা হয়েও নারীরা অত্যাচারীকে ত্যাগ না করে তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে ভালবাসে। দৈহিক বন্ধনটাই বড় কথা নয়—যাদের মন প্রস্তুত নয়, তাদের মুক্তি হবে কি উপায়ে? উপায় যদিও বা আবিষ্কৃত হয়, তাও তারা গ্রহণ করতে আপত্তি করবে।

**জয়জেল (১৯০৩) :** এই নাটকটিতে মানুষের জীবনে ভবিতব্যের প্রভাব, আদর্শ প্রেমের দ্বারা মানুষের ভবিষ্যৎ যে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, এই সব বিষয় দেখানো হয়েছে।

জয়জেল আদর্শ প্রেমের প্রতীক। তিনি ভাল বেসেছেন এবং সেইজন্যই প্রেমিকের সব অপরাধ ক্ষমা করতে পেরেছেন এবং সব নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছেন। প্রেমের জন্য চরম সত্য বা চরম মিথ্যা কোন কথা বলতেই তিনি দ্বিধা করেন নি। ধরণীর ধূলির সন্তান মানুষ কত দুর্বল, কত অসহায়! নিয়ত সে পাপের মধ্যে, মিথ্যার মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে—তবু সে ক্ষমার্হ। লানুসিওর মানবচরিত্রের প্রতীক। পাপ করেও তিনি ক্ষমা লাভ করেছেন—কারণ তাঁর জড়দেহ পাপ করেছে—এ পাপ তাঁর আত্মাকে স্পর্শ করে নি। শেলীর জুপিটারের মত মহাশক্তিশালী হয়েও মার্লিন একটি বিরাট অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক। নাটকটির প্রতিটি ছত্রে ব্যঞ্জনা—এই ব্যঞ্জনা ক্রমাগত আমাদের মনের তারে অনুরণনের সৃষ্টি করে।

**ব্লু-বার্ড :** পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এ নাটকটির অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু এটিকে ঠিক সাঙ্কেতিক নাটক বলা চলে না—আসলে মেতারলিংক এ-নাটকটিকে ফেয়ারী প্লে হেসাবেই লিখেছিলেন। সমালোচকেরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন এটিকে সাঙ্কেতিক নাট্যের পর্যায়ভুক্ত করতে। তা দেখে মেতারলিংক বেশ মজা উপভোগ করেছিলেন। সে যাই হোক এই শিশুনাট্যটি কিন্তু সবসময়েই খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

মনাভান্না নাটকটিও সাধারণ নাটক-সাঙ্কেতিক নাটক হিসাবে এর বিচার করতে গেলে ভুল করা হবে।

এরপর 'দি ইন্টিরিওর' নাটকটি বঙ্গানুবাদ করে আপনাদের কাছে তুলে ধরব।

[ ক্রমশ

## চলচ্চিত্র-শিল্পে সরকারী ভূমিকা

বাংলা চলচ্চিত্র মুক্তিকে সুসংগত করার জন্য যুক্তফ্রন্টের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তার জন্য চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাংলা চলচ্চিত্র সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ ছবির মুক্তির ব্যাপারে জটিলতা। কালোটাকা, ঘুষ ইত্যাদি নানা দুর্নীতি রয়েছে ছবির মুক্তির ব্যাপারে। এই দুর্নীতির জন্য কত প্রযোজক যে মার খেয়েছে, কত ছবি অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় বাক্সবন্দী রয়েছে, সেই লোকসানের হিসাব করলে দেখা যাবে টাকার অংকে তা কোটিকে ছাড়িয়ে গেছে। আর কর্মসংস্থানের দিক থেকে চলচ্চিত্র-শিল্প ক্রমেই দুর্বল হয়েছে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র-শিল্পের ভিত্তি ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার ওপর। মুনাফা লোটার স্বপ্নে জুয়াখেলার মানসিকতা নিয়ে প্রযোজকরা এদেশে ছবির ব্যবসা করতে আসে। তাই নিয়ম-কানুনকে এড়িয়ে যাবার সব রকমের কায়দা এদের জানা আছে। চলচ্চিত্র-শিল্পে অরাজক অবস্থা বহু দিনের। এই অরাজকতার জন্য বাংলাদেশে প্রগতিশীল চিন্তাধারা নিয়ে যাঁরা ছবি করতে এসেছেন তাঁদের যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দীর্ঘ বাইশ বছর যাঁরা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন তাঁরা বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছিলেন। তাঁদের আমলে বাংলা ছবির রিলিজ চেন কমে গেছে, হিন্দী সিনেমার হাউসের সংখ্যা বেড়েছে, কালোটাকায় ছবি মুক্তির প্রথা ইত্যাদির মত দুর্নীতি জন্ম নিয়েছে।

বাংলা চলচ্চিত্রের এক মুমূর্ষু অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার মাত্র নয়-দশ মাস সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখিয়েছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সরকার বাংলা চলচ্চিত্র প্রত্যেক সিনেমায় প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ জারী করেছেন। যদিও বে-পরোয়া সিনেমা-মালিকরা এই নির্দেশ মানছেন না এবং নানা অপকৌশলে এই নির্দেশকে বানচাল করেছেন, তথাপি সাহসের সঙ্গে নির্দেশ জারী করায় সরকারের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। কংগ্রেস আমল থেকে বিদেশী সিনেমাগুলিতে নাইট সিরিজ, রাজনৈতিক গোয়েন্দা সিরিজের যৌনতাপূর্ণ ছবি দেখান হয়েছে। এসব ছবির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের যুবক ও ছাত্ররা সভা মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু দেশের শাসকরা প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নি। এই প্রথম রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী এ সব ছবি প্রদর্শন বন্ধ করার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি গঠন। চলচ্চিত্র-শিল্পের সমস্ত স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে এমন কমিটি গঠন ইতিপূর্বে হয় নি। এই কমিটি যদি ঠিকভাবে কাজ করতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াশীল চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা বাধা সৃষ্টি না করে, তবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে। সেন্সার তারিখ অনুযায়ী চলচ্চিত্র মুক্তির নির্দেশ কালোটাকা বন্ধের একটি কার্যকরী ব্যবস্থা। দৃঢ়তার সঙ্গে যদি এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগান হয়, তাহলে বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট অনেকাংশে কমে আসবে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী তথ্যচিত্র ও সংবাদ-চিত্রের ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন অভিনন্দনীয়। 'মানুষের জয়যাত্রা' 'বড়শূল' 'ভাসা' ইত্যাদি সরকারী ছবিগুলিতে জনমানসের প্রকাশ দেখা গেছে। সরকারী ছবিগুলি কেবলমাত্র সরকারী কাজের স্থূলে প্রচার না হয়ে মানুষের জীবনের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা এতে প্রকাশ করেছে। জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

'প্রতিবাদ' ছবিতে মৌসুমী চ্যাটার্জী। পরিচালনা : তপেশ্বর প্রসাদ

'সমান্তরাল' ছবির একটি দৃশ্যে অনিলকুমার ও অনুপকুমার

'ভাসা' ছবিটি ত' প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচারের একটি শিল্পসম্মত জবাব। কারিগরি দিক থেকেও বারীন সাহা পরিচালিত এই ছবিটি পূর্বের তথ্য-চিত্রগুলির তুলনায় অনেক বেশি বত মানের। 'ইন্টারভিউ' নামের সংবাদ-চিত্রটিতেও নতুনত্ব রয়েছে। এতে প্রমাণ হয় সরকারী উৎসাহের ওপর ছবির উন্নতি অনেকটা নির্ভরশীল। একই টেকনিশিয়ান ও পরিচালক, কিন্তু উপযুক্ত নীতির অভাবে তাঁরা নিজেদের বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারেন না। এই পরিবর্তন ঘটাবার জন্য ব্যক্তি হিসাবে তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য অভিনন্দনীয়। তাঁর কল্পনাশক্তি ও উৎসাহ না থাকলে 'ভাসা' 'বড়শূল'-এর মত ছবি সরকারী তথ্য-চিত্র হতে পারত কি না সন্দেহ আছে। সেন্সারভিত্তিক ছবি মুক্তির ব্যাপারেও তাঁর আগ্রহ ও পরিশ্রমের কথা সকলেই স্বীকার করছেন।

কিন্তু আরো কিছু কাজ করার আছে। বাংলা ছবির প্রয়োজনার ব্যাপারে প্রগতিশীল কাহিনীচিত্রকে উৎসাহ দান, স্টুডিওগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা এবং প্রতিভাবান পরিচালকদের ব্যবসায়ীদের চাপ থেকে মুক্তভাবে ছবি করার জন্য অর্থলগ্নীর ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির বিষয়েও ভাববার সময় এসেছে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অপসাংস্কৃতিক ও সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার ধারক ও প্রচারক বিদেশী ছবির প্রদর্শন বন্ধ করা।

—সুজন।

## প্রতিদান

এস, বি, প্রোডাকসন্সের 'প্রতিদান' একটি সামাজিক কাহিনীচিত্র। এই ছবিতে ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত দেখান হয়েছে। দরিদ্র শিক্ষক পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই দায়িত্ব গ্রহণ করে ছোট ভাইকে মানুষ করার। এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে বড় সখের বেহালা বাজানো বন্ধ করতে হয়, যাত্রাদলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে, বাড়ির চাকরি করে। ভাইয়ের জন্য বই কিনতে অপারগ হয়ে চুরি পর্যন্ত করে। অবশেষে এক সহৃদয়া মহিলার অনুগ্রহে তাঁরই কার-খানায় বয়লারের কয়লা দেবার চাকরি পায়। এত কঠোর পরিশ্রম করে ভাইকে মানুষ করে। ছোট ভাই মহকুমা হাকিমের চাকরি পেলে, তাকে নিজের মনের মত পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার অবসর ঘটে। কিন্তু এমন একটা সময় উপস্থিত হয়, যখন বড় ভাইয়ের এত ত্যাগ ও মমতা সত্ত্বেও দুই ভাইয়ের সম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়। তবে তা ছোট ভাইয়ের পদমর্যাদা আর আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যই এই ফাটল দেখা দিল। এবার শুরু হল বড় ভাইয়ের অজ্ঞাত-বাস। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে ঠেকল তারই বাল্য বান্ধবীর বাড়িতে— কিশোরকাল থেকে যাকে সে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেছে। সেখানে সে জীবনের শান্তি ফিরে পায়। কিন্তু তার খোঁজে খবরের কাগজে ছোট ভাইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে সে ছুটে যায় ভাইয়ের কাছে যাবার পথে এক কারখানায় ধর্মঘটরত শ্রমিকদের ওপর গুণ্ডাদের হামলার মধ্যে পড়ে যায় এবং গুরুতররূপে আহত হয়। দুই ভাইয়ের পুনর্মিলন ঘটে।

ছবিটির কাহিনীবিন্যাস মোটা রেখায় রূপায়িত এবং কষ্টকল্পিত, তাই অভিনয় থেকে আঙ্গিক অত্যন্ত সোচ্চার। শেষ দৃশ্যে আহত অচৈতন্য ভাইয়ের চেতনা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় দুই ভাইয়ের আলিঙ্গন এবং এরকম স্থানে স্থানে আরো অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতার দৃশ্য রয়েছে। একারণে অনুভব করেছি পরিচালকের অক্ষমতা ও কল্পনাশক্তির দুর্বলতা।

অভিনয়াংশে প্রথম পর্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুখেন দাস, সুচেতা ব্যানার্জী ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়াংশে অভিনয় করেছেন কালী ব্যানার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, কাজল গুপ্ত, অনুভা ঘোষ, মলিনা দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা ও জহর গাঙ্গুলী। এই অংশ প্রথমাংশের তুলনায় উপভোগ্য।

ছবিটির কাহিনী রচনা থেকে পরিচালনা সব কাজ একাই সম্পন্ন করেছেন অজিত গাঙ্গুলী।

## মুক্তধারার তিনটি একাঙ্কিকা

মুক্তধারা গত ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এ· বি· টি· এ হলে তিনটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করল। প্রথমটি "কুবেরের মৃত্যু" একটি রূপক। নাট্যকার সুশ্যামল শর্মার কল্পনা ও চিন্তা প্রয়োগে রচিত এই একাঙ্কটি দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করে। দ্বিতীয়টি প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার শেখর চট্টোপাধ্যায়ের "প্রতিধ্বনি"। বর্তমান সমাজের ঘৃণ্য লোভী কালোবাজারীর বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক বক্তব্য। তৃতীয়টি শ্রীকণ্ঠের "চিত্রনাট্য"। (পরেশ ধরের "শুধু ছায়া" অবলম্বনে) আজকের মানুষের সত্যকে গোপনে রেখে মিথ্যা আবরণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার অলীক কামনা। দলগত অভিনয়ের সংহতি স্থানে স্থানে বিচ্যুতি ঘটালেও, প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয়-কৃতিত্ব রয়েছে। ব্যক্তিগত অভি-নয়ে তিনটি নাটকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী

হিন্দী নাটক 'আধে-আধুরে'-এর চরিত্ররূপে নায়িকা সুধা শিবপুরী। পরিচালক—বাসু ভট্টাচার্য।

চরিত্র সৃষ্টিতে পরিতোষ সী'র অভিনয় সেদিনের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। প্রশংসা-লাভ করেছেন : নিমাই দাস, নীহার দাঁ ও ভবেশ কুণ্ডু। অন্যান্য চরিত্রাভিনয়ে ছিলেন নিতাই বর্ধন, দিলীপ সাহা, অসিত ঘোষ, ছন্দা শর্মা, স্বদেশ গুহমুন্সী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, লীলা মিত্র ও সুশ্যামল শর্মা। অমলেন্দু চক্রবর্তী নাট্য-নির্দেশনা ও সঙ্গীত পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

### সায়ন্তনীর একাঙ্কিকা

**সায়ন্তনী** এবার তার পরিচিত তিনটি একাঙ্ক নাটক নিয়ে পর পর কয়েকটি অভিনয় মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছে। তারই প্রাথমিক পর্যায় আগামী জানুয়ারী মাসের ৯ই এবং ২৬শে থিয়েটার সেন্টারে দু'টি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছে। নাটক তিনটি হোল—সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি জেহাদ 'আদাব'; এটি সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছেন মিহির সেন। দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টি হোল জমিদারের বিরুদ্ধে বাগদীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম 'বাগদীপাড়া দিয়ে' এবং সামন্ততান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রভাবান্বিত দু'টি চরিত্রের সংঘাতের পটভূমিকায় একটি প্রহসন 'বিরহী'। শেষোক্ত নাটক দু'টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আন্তন শেকভ্ অবলম্বনে রচনা করেন শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়। নাটক তিনটির নির্দেশনাতেও আছেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়।

### আগ্নেয়গিরি

**উত্তর দরবারী** নাট্য সংস্থা নিয়মিতভাবে বিশ্বরূপা থিয়েটারে প্রতি শনিবার বেলা আড়াইটায় 'আগ্নেয়গিরি' নাটক অভিনয় করছে। নাটকটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে জানা গেল।

### শ্রীচৈতন্য

**ভারতীয়** শিল্পী পরিষদের নৃত্যনাট্য 'শ্রীচৈতন্য' আগামী ১২ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ হবে।

## তরুণ অপেরার 'লেনিন' প্রমোদকর মুক্ত

**তরুণ** অপেরার বিখ্যাত যাত্রাপালা 'লেনিন' প্রমোদকর ছাড় পেয়েছে। সংস্কৃতিজগতে এ সংবাদে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিন মাসের জন্য 'লেনিন' যাত্রাপালাকে প্রমোদকর রেহাই দিয়েছেন। 'লেনিন' যাত্রাপালাটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ও জনাব আবদুল্লাহ রসুল, দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই যাত্রাপালাটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাপ্তাহিক বসুমতী 'লেনিন' যাত্রাপালাকে প্রমোদকর ছাড় দেবার জন্য প্রথম থেকেই মন্তব্য প্রকাশ করছিল। লেনিনের জন্মশতবর্ষে যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই সিদ্ধান্ত অভিনন্দনযোগ্য।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে লেনিনের জীবনকে কেন্দ্র করে যে ক'টি নাটক অভিনীত হচ্ছে তার মধ্যে তরুণ অপেরার 'লেনিন' শ্রেষ্ঠ। তরুণ অপেরা বর্তমানে উত্তরবঙ্গে লেনিন যাত্রাভিনয় করছে এবং এই যাত্রাপালাটির চাহিদা শ্রমিক ও কৃষক অঞ্চলে খুব বেশি। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্কুলের ছেলেমেয়েরাও তরুণ অপেরাকে অভিনন্দন জানিয়ে 'লেনিন' যাত্রাপালা দেখার জন্য আগ্রহ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে।

### মৌসুমী মন

**চৌধুরী** প্রডাকসন নিবেদিত সমর চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিচালিত "মৌসুমী মন" চিত্রটি দ্রুত সমাপ্তির পথে। চিত্রনাট্য ও সংলাপ স্বয়ং পরিচালকের। গত ২০শে ডিসেম্বর দীঘার সমুদ্রতটে শিল্পী শিবানী বোস ও সৌরভ মুখার্জিকে নিয়ে একটি রোমান্টিক দৃশ্য গ্রহণ করেছেন পরিচালক। আগামী মাসে পরিচালক চিত্রের নায়ক-নায়িকা সর্বেন্দ্র ও মিতা চৌধুরীকে নিয়ে আরও দু'টি দৃশ্য গ্রহণের জন্য রওনা হবেন ঘাটশিলায়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিত্রের কয়েকটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন মান্না দে, সবীর সেন, কৃষ্ণা রায়, চন্দ্রাণী

[illegible] প্রধান [illegible] প্রতি-[illegible] গেছেন [illegible]। এবার তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে এঁদের মধ্যে কে সব চাইতে প্রতিভাশালী। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হবে দশ হাজার, সাড়ে সাত হাজার ও পাঁচশো জার্মান মার্ক। প্রতিযোগীদের বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হলে চলবে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছায় জাপান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের তরুণ সংগীত পরিচালকরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছেন। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে আছেন বিখ্যাত সংগীত পরিচালক স্যার জন বারবিরোলি ও সংগীত রচয়িতা উল্ফগাংক ফোর্টনার। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা হলেন বার্লিন ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রার সংগীত পরিচালক হার্বার্ট ফন কারাইয়ান।

'প্যার হি প্যার' ছবিতে ধর্মেন্দ্র ও বৈজয়ন্তীমালা

বার্গম্যানের 'শেম'

মুখার্জী ও সংগীত পরিচালক স্বয়ং সলিল দত্ত। সম্ভবত চিত্রের আরও একটি গানে কণ্ঠ দেবেন প্রতিভাময়ী বম্বের কণ্ঠশিল্পী আশা ভোঁসলে। আরও একটি নতুন মুখ বৈশাখী রায়কে এবং বম্বের লক্ষ্মীছায়াকে দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখতে পাবেন। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা দে, মণি শ্রীমানী প্রমুখ।

**সংগীত পরিচালকদের প্রতিযোগিতা**

এবারে আর গায়ক কিম্বা বাদকদের নয়, খোদ সংগীত পরিচালকদের প্রতি-

আই. বার্গম্যানের ছবি 'শেম' ১৯৬৯ সালের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি বিবেচিত হয়েছে। নিউ ইয়র্কের ন্যাশনাল বোর্ড অব রিভিউ অব মোশান পিকচার্স এই বিচারের আয়োজন করে।

'টোপাজ' ছবির জন্য আলফ্রেড হিচ্‌কক্‌ ১৯৬৯ সালের শ্রেষ্ঠ পরিচালক মনোনীত হয়েছেন। 'গুড বাই মিঃ চিপস' ছবির জন্য বৃটেনের পিটার ওটুল ১৯৬৯

## আধে-আধুরে

আধে-আধুরে' একটি হিন্দী নাটক। দিল্লীর নাট্যমঞ্চে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংগীত নাটক একাডেমি এই নাটকের নাট্যকারকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার দেয়। এই নাটকটি বোম্বাইয়েও প্রশংসিত হয়েছিল। চলচ্চিত্র প্রযোজকদের দৃষ্টি পড়ে নাটকটির ওপর। অংশুমালী নাম দিয়ে এটিকে একটি প্রযোজনা ইউনিট ছবি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পুনরায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্টুডিওতে বাসু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ছবিটি এখন সমাপ্তির পথে। এই ছবিতে অভিনয় করছেন ওম শিবপুরী, অনুরাধা কাপুর, রিচা ভ্যাস, দীনেশ ঠাকুর, সুধা শিবপুরী। এঁরা দিল্লীতে নাটকেও অভিনয় করেছিলেন।

ই, পি, এম, স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজেব (নির্মল সেন), শায়েস্তা খাঁ (সুশান্ত মুখার্জী) ও জীবন আবি (প্রভাত [illegible])

ভালের সেরা নায়ক বলে বিবেচিত হয়েছেন। এই সংবাদ দিয়েছে নিউইয়র্ক থেকে এ-পি।

### লাইপজিগ চলচ্চিত্র উৎসব

পূর্ব জার্মানীর লাইপজিগে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক দলিল ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। যোগ দিয়েছিল ৫০টি দেশের ১০৬৯ জন দর্শক। উপস্থিত করা হয়েছিল ৪২টি দেশের ৩২১টি সিনেমা ও টেলিভিশন ছবি। বিভিন্ন বিভাগে ছয়টি স্বর্ণ ও দশটি রৌপ্য কপোত পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা ছিল। একটি স্বর্ণ কপোত লাভ করেছে কিউবার '৭৯টি বসন্ত' (হো-চি-মিন-এর জীবন অবলম্বনে)। একটি রৌপ্য কপোত লাভ করেছে ভারতের কার্টুন চিত্র জি কে গোখলে নির্মিত 'কাওস'।

...মর চৌধুরী পরিচালিত 'মোহিনী দল' ছবিতে মিতা চৌধুরী।

# সঙ্গীতকথা

## সুরসভার সঙ্গীত সম্মেলন

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের সহযোগিতায় গত ২৫শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সুরসভার উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন কান্তি মৈত্র, গোর বসাক, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভা দাস (বেহালা) ও বেণু চট্টোপাধ্যায় (বাঁশী)। রবীন্দ্রসংগীত ও অন্যান্য লঘুসংগীত পরিবেশনায় ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা রায়, পূর্বা সিংহ, সুমিত্রা বসু, গৌতম বসু, রবীন মুখোপাধ্যায়, শুচিস্মিতা মজুমদার, শাশ্বতী গুপ্ত, মন্দিরা মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা দাশগুপ্ত, সুনন্দা ঘোষ, নন্দিতা দেওয়ানজী, দীপ্তি রায়, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, মমতা ঘোষ, আরতি দত্ত, ইন্দিরা গুপ্ত, আলো বসু, রমা নন্দী, স্বপ্না দাস ও সুস্মিতা রায়চৌধুরী। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন জয়শ্রী লাহিড়ী, শান্তা বসুরায়, রীতা সেনগুপ্ত ও কাবেরী চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গতে ছিলেন কিশোর নন্দী ও দুলাল ভট্টাচার্য। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী।

সুরসভার সঙ্গীত সম্মেলনে নৃত্য পরিবেশন করছেন কাবেরী চট্টোপাধ্যায়।

## নকসীকাঁথার মাঠ

সঙ্গীতালোকের শিল্পী গোষ্ঠী কর্তৃক কবি জসীমউদ্দিনের নকসীকাঁথার মাঠ গত ১৩ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। মৃণাল দাশগুপ্ত কৃত নাট্যরূপটি বলাই দত্তের নৃত্য-নির্দেশনায় ও তরুণ কানুনগোর সঙ্গীত পরিচালনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। দর্শকবৃন্দ নৃত্যনাট্যটি উপভোগ করেন। সাজু, রূপাই, ঘটক ও সাজুর মায়ের ভূমিকায় শান্তা বসুরায়, সাধন গুহ, নারায়ণ সরকার ও সুস্মিতা মিত্রের নৃত্যাভিনয় দর্শকবৃন্দের মনে রেখাপাত করে। সঙ্গীতাংশে আশিষ গুপ্ত ও আরতি দাশগুপ্তার গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে সংস্থার শিল্পীরা বিংশ শতকের গীতিকারগণের একটি মনোজ্ঞ গীতানুষ্ঠানও পরিবেশন করেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন : মেখলা পাল, অণিমা রায়, প্রভাতভূষণ, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজেন রায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দ্বিজেন রায়।

### সংগীতাচার্য হরিদাস স্মৃতি অনুষ্ঠান

গত ৬ই ডিসেম্বর পাথুরিয়াঘাটে মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে হরিদাস স্মৃতি সঙ্গীত সংসদ-এর প্রতিষ্ঠা উৎসব ও স্বর্গত সঙ্গীতাচার্য হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে এক শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী জয়কৃষ্ণ সান্যাল, রাজীবলোচন দে, শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বনমালী দাস।

**মা**দ্রাজ টেস্টেও ভারত হারলো। এবং হারলো বড় বিশ্রীভাবে ভারতবর্ষের লক্ষ-কোটি ক্রীড়ারসিকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে মাত্র ৭৭ রানে। অর্থাৎ ঐ ৭৭টা রান করতে পারলে ভারত জিতে যেতো।

সত্যিকথা বলতে কি মাদ্রাজ টেস্ট একরকম ভারতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ প্রথম ইনিংসে ৯৫ রানে পিছিয়ে থাকাই কাল হলো। প্রথম ইনিংসের ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় ভারত হেরে গেলো। হেরে গেলো ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অসহায় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে রুখে দাঁড়াবার মত মনোবল না থাকার জন্যে।

কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সত্যিই কি এতো দুর্বল? মনে তো হয় না। তাহলে তাঁরা প্রয়োজনের সময় অসহায় হয়ে পড়েন কেন? আমার মনে হয় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তিটা একটু বেশিই। তা ছাড়া হারজিতের চরম মুহূর্তে খেলার অভিজ্ঞতারও দাম অনেক। নতুন এবং তরুণ খেলোয়াড়দের চরম মুহূর্তে মনোবলের ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। ফলে তাঁরা হারিয়ে ফেলেন রুখে দাঁড়াবার মতো সাহস।

তাই সেদিন ওয়াদেকার আর বিশ্বনাথ আউট হয়ে যাবার পর খেলাটা পুরোপুরিভাবে নির্ভর করছিল ইঞ্জিনিয়ার আর পাতৌদির ওপরে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হলো যে, জয়লাভের মুখে এসেও ইঞ্জিনিয়ার আর পাতৌদি অভিজ্ঞের মতো না খেলে অসহায়ের মতো আউট হয়ে ভারতকে ঠেলে দিলেন পরাজয়ের পথে।

ক'বছর আগে বোম্বাই টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতকে ঠিক এই রকম অবস্থারই সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চান্দু বোরদে সেদিন অভিজ্ঞের মতো নিজের উইকেট বাঁচিয়ে রেখে খেলার মতো খেলেছিলেন। আর এক প্রান্তে একটার পর একটা উইকেট পড়ছিল। কিন্তু বোরদে অটল ধৈর্যে আরায় বল মেরে রান করে চললেন। সেই খেলায় শেষ পর্যন্ত ভারত জিতেছিল দু' উইকেটে।

॥ পাতৌদি ॥
পাতৌদি ভারতীয় দলের অধিনায়ক। তাই দলের ব্যর্থতার জন্যে সব দায়িত্ব তাঁরই।

তাই একটা দলে পুরনোদের একেবারে হেঁটে বাদ দেওয়া যে সঙ্গত নয়, তার সাম্প্রতিক উদাহরণ ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মাদ্রাজ টেস্ট। ভারতীয় দলে জয়সীমা কিম্বা বোরদের মতো খেলোয়াড় থাকলে বলা যায় না—ভারত হয়তো ঐ খেলায় জিতেও যেতে পারতো! অনেকেই হয়তো এই বিষয়ে আমাদের সংগে একমত নাও হতে পারেন। তবে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আর একজন যদি মাদ্রাজ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অভিজ্ঞের মতো হাল ধরতে পারতেন তাহলে ভারত নিশ্চয়ই জিততো।

যাই হোক মাদ্রাজ টেস্টে পরাজয়ের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে অধিনায়ক পাতৌদির নবাবের ওপর। সেইটাই স্বাভাবিক। তাই প্রথম ইনিংসে পাতৌদির ভালো খেলাকে কেউ আমলই দিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে পাতৌদি যদি ভালো খেলতে পারতেন, তাহলে আজ যাঁরা পাতৌদির নিন্দায় মুখর, তাঁদের চোখেও তিনি হিরো হয়ে যেতেন।

কিন্তু পাতৌদি তা পারেন নি। আজ তাই তাঁকে নিয়ে উঠেছে বাদ-প্রতিবাদের ঝড়। অনেকেই চাইছেন যে, পাতৌদির কাছ থেকে অধিনায়কের দায়িত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হোক। ধরা যাক হলোও তাই। কিন্তু ভারতীয় দলের নতুন অধিনায়ক হবেন কে? ওয়াদেকার? ওয়াদেকার পাতৌদির চেয়ে বয়সে বড় এবং তাঁর খেলার মানও নিম্নমুখী। মাঝারিয়ানার মধ্যে চিরকাল তিনি সীমাবদ্ধ। জীবনে একটার বেশি টেস্ট সেঞ্চুরী করতে পারে নি। আর অভিজ্ঞতা ও দল পরিচালনায় পাতৌদির আশেপাশেও আসতে পারে না তিনি। সুতরাং......।

ওকথা থাক। ও বিষয়ে বেশি আলোচনা করলে আমাকে নির্ঘা পাতৌদির গোঁড়া সমর্থক বলে ধরে নেওয় হবে। তবে পাতৌদি এবং ভারতীয় দলে আরো কিছু খেলোয়াড়দের বেলোলাপনা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করা হয় এব

খেলোয়াড়দের দায়ী করা হয়—আমি কিন্তু তার বিরুদ্ধে। খেলোয়াড়দের সামলাবার ভার যেকাল ম্যানেজারদের এবং টিম ম্যানেজারের। তাঁরা কেন কড়া হতে পারেন না? তাঁরা কেন ঐ ক'দিন একটু নিয়মশৃংখলা মেনে চলেন না? তাঁরা কেন খেলোয়াড়দের ঘরে মেয়েদের যেতে দেন? তাঁরা কেন খেলোয়াড়দের হোটেলের বাইরে কিম্বা কোথাও যাওয়া-টাওয়ার ওপর কড়া নির্দেশ দেন না?

আসলে ওঁরাও বোধহয় একই পথের পথিক। খেলোয়াড়দের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ওঁরাও হয়তো মজা লোটেন! তা না-হ'লে যেসব খেলোয়াড়রা নিয়ম-শৃংখলা মানেন না, বেলেল্লাপনা করে ঘুরে বেড়ান তাঁদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হয় না কেন! অসংযত খেলোয়াড়দের দল থেকে বাদ দিলেই তো হয়। এই কারণে একজনের ওপরও যদি স্টেপ নেওয়া হয়, তাহলে অন্যেরা সংযত থাকতে বাধ্য হবেন—অন্তত ভয়ে ভয়ে সংযত থাকবেনও।

তাই এই দোষটা শুধু খেলোয়াড়দের ওপর চাপালেই চলবে না। এ অন্যায়ে দোষী তাঁরা ঠিকই—কিন্তু তার দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে ক্রিকেট কর্মকর্তাদের ওপর বর্তাবে।

যাই হোক অস্ট্রেলিয়া থেকে যে দলটা এবার ভারত সফরে এসেছিল, সেটি যে কোনমতেই আহা মরি দল নয়,

॥ ইঞ্জিনিয়ার ॥

**প্রয়োজনের মুহূর্তে কোনদিনই ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ কিছু করতে পারেন নি।**

তার প্রমাণ আমরা বার বার পেয়েছি। কিন্তু আমরা খেলতে পারি নি। অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভ তাদের কৃতিত্বে নয়—আমাদের খেলতে না পারাই তার কারণ।

কিন্তু কেন আমরা খেলতে পারলাম না? তার কারণ কি কি? কোথায় আমাদের খুঁত তা কি খুঁজে বের করা হয়েছে? প্রত্যেক টেস্টেই তো হাজার হাজার টাকা খরচ করে কর্মকর্তা এবং

॥ ওয়াদেকার ॥

**পাতৌদির স্থানে কেউ কেউ ওয়াদেকারকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে চান। কিন্তু সত্যিই কি ওয়াদেকার সব দিক দিয়ে পাতৌদির চেয়ে শ্রেষ্ঠ?**

অভিজ্ঞরা হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু খেলা দেখে এবং হাততালি দিয়েই কি তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সেরেছেন?

আমরা চাই ভারতের এই খেলতে না পারার কারণগুলো তাঁরা ক্রিকেট-রসিকদের সামনে তুলে ধরুন। আমরা জানি প্রত্যেক টেস্ট ম্যাচেই বিজয় মার্চেন্ট, লালা অমরনাথ, ভিনু মানকাদ, সি· ডি· গোপীনাথ, এইচ দানী, দাত্তু ফাদকার প্রমুখের ন্যায় এককালের নামী খেলোয়াড়রা উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁরা এগিয়ে আসুন। এবং প্রত্যেকে আলাদা আলাদা রিপোর্ট দিন। তারপর সেই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে খেলোয়াড়দের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে কোচিং করা হোক।

কারণ আজ সময় এসেছে দিন বদলের পালার। আজ আর সেই গতানুগতিক প্রবাহকে ধরে থাকলে চলবে না। আজ চাই পরিবর্তন এবং সে পরিবর্তন আসবে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই। সুতরাং আজ আর চুপ করে বসে থেকে ভারতীয় দলের পরাজয়ের সমস্ত দোষ পাতৌদি এবং তাঁর দলের খেলোয়াড়দের ওপর চাপালে চলবে না।

আজ এমন একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভারতীয় ক্রিকেটের সত্যিকারের মঙ্গল হয়। তাই আজ আর শুধু সমালোচনা নয়, আজ চাই সত্যিকারের ভালো পরামর্শ। আর সেই পরামর্শের ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশের ক্রিকেট কর্মকর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে আন্তরিকতাপূর্ণ প্রশিক্ষণের জন্যে।

আর তা যদি না হয়, তাহলে ভারতীয় দলের বিদেশ ভ্রমণ বাতিল করে দেওয়া হোক আর বিদেশী দল-গুলোর ভারত ভ্রমণও বন্ধ করা হোক। কারণ আর যাই হোক, এইভাবে বছরের পর বছর দেশের মান-সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা সহ্য করা যায় না। পরিবর্তন আজ তাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

॥ অশোক মানকাদ ॥

**ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে অশোক মানকাদের ওপর আর বিশেষ কিছু আশা করবার আছে কি না সন্দেহ।**

## সরকারী দায়িত্ব

অভিশপ্ত সেই মঙ্গলবারের ঘটনার কথা কি আমরা ভুলে যাচ্ছি? হাব-ভাব দেখে তো সেই কথাই মনে হচ্ছে। অথচ ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে সেদিন সকালে যে কান্ড ঘটে গেলো আর যেভাবে অসহায়ের মতো খেলার মাঠেই ছ'জন এবং পরে হাসপাতালে আরো একজন মারা গেলেন—সে কথা তো ভোলার নয়। খেলার আগে মাঠের বাইরে দৈনিক টিকিটের লাইনে যে মর্মন্তুদ ঘটনা সেদিন ঘটেছিল তার দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সি· এ বি'র নয়। সেখানে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার ছিল পুলিশ বিভাগের। সে বিষয়ে পুলিশ কতোটা কি করেছে তা এখন না বলাই ভালো, কারণ তদন্ত কমিশনের কাজ চলেছে এখন। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের চোখে বড়ই বিভ্রান্তিকর বলে ঠেকছে। মনে হচ্ছে ঐ দুর্ঘটনার ব্যাপারে রাজ্য সরকার বুঝি তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন। সি· এ· বি তবু নিহত ক্রীড়ারসিকদের পরিবারবর্গকে ছ' হাজার টাকা ও তিনজনকে চাকরি দেবার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে একেবারেই চুপ। তদন্ত কমিশন বসানো ছাড়া তাঁরা আর কিছুই করেন নি। কমিশনের রায় যাই হোক না কেন—হত পরিবারবর্গের জন্যে ক্ষতিপূরণ দেবার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই এতোদিনে নেওয়া যেতো। জানি সেদিন যাঁরা অসহায়ের মতো মারা গেছেন তাঁদের পরিবারের কাছে কয়েক হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ কিছুই নয়। তাজা প্রাণের মূল্য টাকায় হয় না। তবু টাকারও মূল্য আছে। তাই আমরা চাই যে, রাজ্য সরকার তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে এই বিষয়ে এগিয়ে আসুন এবং নিহত ক্রিকেট-রসিকদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুন।

কলকাতায় স্টেডিয়াম তৈরি নিয়ে আবার শুরু হয়েছে আলাপ-আলোচনা। খুব শীঘ্রই হয়তো স্টেডিয়াম নিয়ে বাজার গরম হবে। এ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে কলকাতার স্টেডিয়ামের জন্যে তিনটি পরিকল্পনার খবর আমরা পেয়েছি। একটিতে বলা হয়েছে যে, ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট পিচ মধ্যখানে রেখে ১,৮৩,১০,০০০ টাকা খরচ করে স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, এইভাবে স্টেডিয়াম তৈরি করলে তাতে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করা যাবে। তার পরই ক্রিকেটের মাঠ ও পিচ তৈরির জন্যে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে লাভটা হলো কি? আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা যে ধরতে গেলে তখন সবে শুরুই হয়। সুতরাং এই পরিকল্পনাটি নিয়ে মাথা না ঘামানোই বুদ্ধিমানের কাজ। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ওভাল স্টেডিয়াম তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২,৮৯,০০,০০০ টাকা খরচ করে ঐ স্টেডিয়ামের একদিকে ক্রিকেট আর একদিকে ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করা হবে। এই দু'টি পরিকল্পনার চেয়ে তৃতীয় পরিকল্পনাটি অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। এই প্রস্তাবে ৫,০০,৩১,০০০ টাকা খরচ করে দু'টি স্টেডিয়াম তৈরির কথা বলা হয়েছে। এই দু'টি স্টেডিয়ামের একটি থাকবে ক্রিকেটের এবং অন্যটিতে ফুটবল, হকি, প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত স্টেডিয়ামের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা হয়। তবে এ ব্যাপারে আমরা আগেও আমাদের মত প্রকাশ করেছি এবং এখনো বলছি যে, একই মাঠে ফুটবল, হকি আর ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা সংগত নয়। তা ছাড়া বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠ ইডেন উদ্যানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও তো রাজ্য সরকারেরই।

—শান্তিপ্রিয়॥

রনজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব অঞ্চলের খেলাগুলোর আকর্ষণ ধরতে গেলে বিশেষ কিছুই থাকে না। কারণ পূর্ব অঞ্চলের ক্রিকেট খেলার সব কিছুই বাংলা দেশ তথা কলকাতায়। তবু নাম-কা-ওয়াস্তে পূর্ব অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের জন্যে বাংলাকে আসাম, ওড়িশা ও বিহারের বিরুদ্ধে খেলতে হয়। আগে বিহারের অবস্থাও আসাম কিম্বা ওড়িশার মতোই ছিল। তবে এখন বিহার দল অনেক উন্নত। শুধু তাই না, বিহারের এবারের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে, বিহারের বিরুদ্ধে বাংলাকে এ বছর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে।

যাই হোক সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত রনজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় গত বছরের রানার্স আপ বাংলা এক ইনিংস ও ৮০ রানে আসামকে হারিয়ে দিয়েছে। এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততোদিনে রাউড়কেল্লায় ওড়িশার বিরুদ্ধে বাংলার দ্বিতীয় খেলাও শেষ হয়ে যাবে। তবে খেলার আগেই ঐ খেলার ফলাফল সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। আর এ কথাও ঠিক যে, ঐ ফলাফল বাংলার অনুকূলেই যাবে।

যাই হোক কলকাতায় আসামের বিরুদ্ধে খেলায় আসামের ব্যাটসম্যানরা যেমন বাংলার বোলারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন নি, তেমনি বাংলার ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে আসামের বোলাররা পারেন নি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে।

প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে আসাম প্রথম ইনিংসে ১৬২-র বেশি রান করতে পারে নি। সুব্রত গুহ, আর· ভাটিয়া ও দিলীপ দোসীর বোলিং-এর বিরুদ্ধে আসামের ব্যাটসম্যানেরা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। একমাত্র জি মেহেরা কিছুটা খেলেছিলেন। তিনি করেছিলেন ৫৩ রান। বোলিং-এ সুব্রত গুহ ৪৪ রানে ৫টি, দোসী ৫৩ রানে ৩টি ও ভাটিয়া ৩২ রানে ২টি উইকেট দখল করেন।

এর উত্তরে বাংলা ৪টি উইকেট হারিয়ে করে ৩৬৯ রান। মাত্র ৪৪ রানের মধ্যে বাংলা হারিয়েছিল পলাশ নন্দী, রাজা মুখার্জী ও প্রকাশ পোদ্দারের উইকেট। এর পর ৪র্থ উইকেটে অধিনায়ক অম্বর রায় ও শ্যামসুন্দর মিত্র ৩০৮ রান যোগ করেন। অম্বর রায় ১৭৩ রান করে আউট হন। রনজি ট্রফির খেলায় এটি অম্বরের পঞ্চম সেঞ্চুরী। শ্যামসুন্দর মিত্র শেষ পর্যন্ত ১৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। রনজি ট্রফিতে শ্যামসুন্দরের এটি ষষ্ঠ শতরান।

দ্বিতীয় ইনিংসেও আসাম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সুব্রত গুহ ও আর· ভাটিয়ার বলে বি· ভারলি ছাড়া আর কেউ দাঁড়াতেই পারেন নি। দ্বিতীয় ইনিংসে আসাম করে ১২৭ রান। এর মধ্যে ভারলি একাই করেন ৫৮ রান। বোলিং-এ সুব্রত গুহ ৩৭ রানে ৪টি ও ভাটিয়া ৩১ রানে ৪টি উইকেট লাভ করেন।

## গল্প হলেও সত্যি

১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ মেলবোর্নের একটি সকাল!

ব্যাট করতে মাঠে নেমেছেন অস্ট্রেলিয়ার এক তরুণ খেলোয়াড় তার দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে। বিপক্ষে বল করবার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছেন ইংলণ্ডের বোলাররা।

প্রথম ওভারের প্রথম বল ছেড়ে দিলেন ব্যাটসম্যান। বল এল, ব্যাটসম্যান বল ফিরিয়ে দিয়ে একটি রান নিলেন। এমনি করে প্রথম ওভার শেষ হল। এবার দ্বিতীয় ওভার। দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বল। ব্যাটসম্যান অপূর্ব কায়দায় বলটি মারলেন। সমস্ত ফিল্ডারদের ফাঁক দিয়ে বল চলে গেল মাঠের বাইরে, বাউন্ডারী সীমানায়। আম্পায়ার নির্দেশ দিলেন বাউন্ডারীর। উপচে পড়া মাঠ হাততালিতে ফেটে পড়ল। এমনিভাবে আরও বেশ কয়েকটি বাউন্ডারী মারলেন সেই ব্যাটসম্যান। বোলাররা হিমসিম খেয়ে গেল তাঁকে আউট করতে। অবশেষে আউট হলেন ব্যাটসম্যান, তখন তাঁর রান সংখ্যা ১৬৫। বিপক্ষ দলের অধিনায়ক দৌড়ে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

সেই তরুণ ব্যাটসম্যানটি কে? অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারম্যান। এই চার্লস ব্যানারম্যানই বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেটের আসরে প্রথম বাউন্ডারী ও প্রথম সেঞ্চুরী করেন। সেই টেস্টই বিশ্বের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট।

—সুনীলকুমার রায়
বনগ্রাম, ২৪-পরগনা

॥ অম্বর রায় ॥
আসামের বিরুদ্ধে অম্বরের [illegible] রান অনেকদিন মনে রাখার মতো।

॥ শ্যামসুন্দর মিত্র ॥
শ্যামসুন্দর সুন্দর খেলে সেদিন অপরাজিত থেকে করেছিলেন ১৫৩ রান।

॥ সুব্রত গুহ ॥
আসামের বিরুদ্ধে দু' ইনিংসেই সুব্রত করেছিলেন মনে রাখার মত বোলিং।
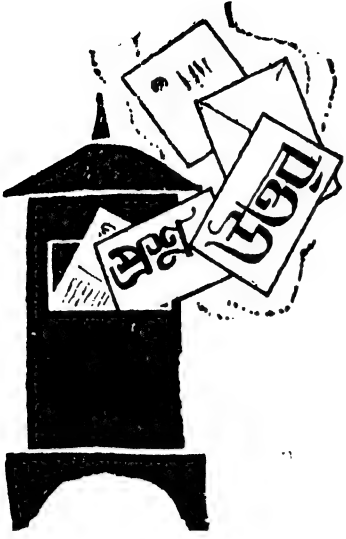
**কমলেশ দত্ত ও নারায়ণ সুর** (চক্রধরপুর, সিংভূম, বিহার)

**প্রশ্ন :** এবারে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের ৪র্থ টেস্ট ম্যাচের সময় অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরীর একজন ফটোগ্রাফারকে ঐভাবে মারার কারণ কি?

**উত্তর :** লরীর অখেলোয়াড়ী মনোভাব ও উগ্র মেজাজই বোধহয় এর কারণ।

**জগন্নাথ মজুমদার** (বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ)

**উত্তর :** ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন বইটিতে 'হিট উইকেট' সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বইটা তো তোমার কাছে আছে বলে জানিয়েছ। একটু ভালোভাবে পড়ে নিও।

এ বছর বিশেষ কিছু বদলায় নি।

**ভবতোষ রায়** (কামাখ্যাগুড়ি হাই স্কুল, জলপাইগুড়ি)

**প্রশ্ন :** আপনাকে যদি বলা যায় যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল, হকি টিম কোনটি তাহলে আপনি বলেন, আপনার সমর্থিত দলটি। আমি জানতে চাই আপনার মতে কোন্ দলটি শ্রেষ্ঠ।

**উত্তর :** সাংবাদিকদের তো বিশেষ কোন দলকে সমর্থন করা উচিত নয়...!

**ক্রীড়া সম্পাদক সমীপেষু,**

গত সপ্তাহের "সাপ্তাহিক বসুমতী"র ক্রীড়া বিভাগে জনৈক প্রশান্ত বসু মহাশয় (আসানসোল) এক পত্র মারফত জানতে চেয়েছিলেন যে, বোম্বাই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত নিউজিল্যান্ডের সকল ব্যাটসম্যানকে ক্যাচ আউট করে সেটা কি টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম? তার উত্তরে জানাই যে, না এটা টেস্ট ম্যাচের ইতিহাসে দ্বিতীয় ঘটনা, গত বছর ভারত যখন নিউজিল্যান্ড সফর করেছিলো তখন ওয়েলিংটনে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ফিল্ডাররা নিউজিল্যান্ডের সকল ব্যাটসম্যানকে ক্যাচ আউট করে এই ব্যাপারে প্রথম নজীর সৃষ্টি করে। এটা ভারতীয় ফিল্ডারদের কাছে একটা কৃতিত্বের নজীর। ফলাফল ভারত ১ম ইনিঃ ৩২৭, নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস ১৮৬। দ্বিতীয় ইনিঃ নিউজিল্যান্ড ১৯৯, ভারত ২ উইঃ ৬১। ভারত ৮ উইকেটে জয়ী।

—দীপকরঞ্জন কর
বেলেঘাটা কলকাতা—১০,

**দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়** (রেলওয়ে কোয়ার্টার, শ্রীরামপুর, হুগলী)

**উত্তর :** তোমার চিঠি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু জায়গা এতো কম যে, এখনি ঐ বিষয় নিয়ে কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে।

**দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়** (করলবাগ, নিউ দিল্লী-৫)

**প্রশ্ন :** জয়সীমা নাকি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একবার ৫ দিনই খেলেছিলেন। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাই।

**উত্তর :** ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলকাতা টেস্টে জয়সীমা খেলার পাঁচ দিনের রোজই কোন না কোন সময় ব্যাট করেছিলেন। এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড। প্রথম দিন খেলার শেষে জয়সীমা ২ রান করে অপরাজিত ছিলেন, দ্বিতীয় দিন তিনি ২০ রান করে আউট হন। তৃতীয় দিন শেষ সময়ে ব্যাট করতে নেমে কোন রান না করে অপরাজিত থাকেন, চতুর্থ দিন সারা দিন খেলে ৫৯ রান করেন আর পঞ্চম দিন ৭৪ রান করার পর আউট হন। অর্থাৎ খেলার পাঁচ দিনই তিনি কোন না কোন সময় ব্যাট করেছিলেন।

**দক্ষিণ কলকাতা ডক্টরস ক্লাবের বার্ষিক প্রতিযোগিতার পর ক্লাবের সভাপতি ডাঃ মুখার্জীর স্ত্রী শ্রীমতী চিন্ময়ী মুখার্জী বিজয়ী প্রতিযোগীর হাতে ডাঃ হেমেন্দ্রমোহন নিয়োগী মেমোরিয়াল শীল্ডটি তুলে দিচ্ছেন।**

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী ( প্রাঃ ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
বসুমতী
সম্পাদিকা
জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ : ২৯শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১লা মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

PRICE : 30 Paise
Thursday, 15th January, 1970

# সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য

পশ্চিমবঙ্গে সমাজবিরোধীদের বাড়-বাড়ন্ত—একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। আমরা ঐ প্রসঙ্গে অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে চাই না। কারণ, ভারত এখনো স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয় নি, বহু রাজ্যে দৈত্যদের উৎপাত সাধারণ নাগরিকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পর্কে আমরা পৃথক-ভাবে আলোচনায় ইচ্ছুক এই কারণে যে, যে-সব দল এখন যুক্তফ্রন্টের মধ্যে রয়েছে, তারা দীর্ঘদিন ধরে সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে বলে এসেছে। আর সমাজবিরোধীরা যদি এই রাজ্যটিকে নিজেদের স্বর্গরাজ্য বলে ধরে নিয়ে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যায়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সুখ-সুবিধা পাওয়ার কথা তো দূরের কথা, যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে।

সমাজবিরোধীরা এমন একটি শ্রেণী, যার অভ্যুদয় হঠাৎ হয় না। নিজেদের স্বার্থ-পূর্তির জন্য এরা দীর্ঘকাল ধরে দক্ষতা অর্জন করে। তারপর দলবৃদ্ধি করে বংশ-পরম্পরায় এরা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিশাপে এদের জন্ম কি না জানি না। তবে ওয়াগন ব্রেকার, ডাকাত এদেশে নতুন নয়। পরিবর্তন শুধু এইটুকু লক্ষ্য করা যায়, অতি গোপনে একদা যারা দুষ্কার্যে রত থাকত, এখন তারা দিবালোকে প্রকাশ্যে খুন-রাহাজানি ও ওয়াগন ভাঙতে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা বোধ করে না।

সমাজবিরোধীরা চিরকাল রাজপক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে, একথা সত্য। কংগ্রেস আমলে যদি তাদের পোয়া বারো হয়ে থাকে, তাহলে যুক্তফ্রন্ট আমলেও ঠিক তাই। এই আমলে পরস্পর দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলছে।

সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক অহিনকুলম্ নয় এ-ও সত্য। চোখের সামনে সমাজবিরোধীরা দুষ্কার্য করে অথচ পুলিশ যেন চোখ বুজে থাকে। খুন-জখম-ডাকাতি যেখানেই হোক পুলিশ মহল তদন্তের ষোল আনাই করে। বাকী যা তারা পায় না তা হচ্ছে সমাজবিরোধীদের পাত্তা! অথচ কোনো মন্ত্রিমহোদয়ের বাড়িতে পান থেকে চূণ খসলে মালসমেত চোর ধরা পড়ে। সেই কারণে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পুলিশ বিভাগের সূত্র অজানা থাকে না—তারা শুধু জনসাধারণের অর্থে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে অভ্যস্ত। ওয়াগন ব্রেকারদের মতো দাগী আসামীরা দিনের পর দিন মাল লুঠ করে নেয়, তাদের যদি ধরার মতো শক্তি না থাকে তাহলে পুলিশ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা কি? খাদ্যবস্তুতে ভেজালদাতা, বে-আইনী মজুতদার—এদের বিরুদ্ধে পুলিশ বিভাগ যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে জনসাধারণ কোন্ বুদ্ধিতে ঐ বিভাগকে প্রশংসা করতে পারে? জনসাধারণকে আইন-শৃংখলাহীনতার দায়ে গুলী করে হত্যা করলে পুলিশের বাহাদুরী প্রকাশ পায় না। পুলিশ বিভাগ সজাগ থাকলে পশ্চিমবঙ্গে সমাজবিরোধীরা পথে-ঘাটে খুন-জখম ও বোমাবাজি করতে কোনোদিন সাহস পেত না। দিন কয়েক আগে দিবালোকে কয়েকজন ওয়াগন ব্রেকার তিলজলা ও পার্ক সার্কাসের মাঝামাঝি জায়গায় ওয়াগন ভেঙে লুঠতরাজ সুরু করে দেয়। এই ঘটনা যে ক'জন ব্যক্তি অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁরা দুর্বৃত্তের তাণ্ডবের মুখোমুখি হতে সাহস পান নি। আমাদের জনৈক প্রতিনিধি ঐ অবস্থা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছেন। ঐখানে ওয়াগন ভেঙে লুঠ করার ঘটনা নাকি নতুন নয়। তবু পুলিশ দুর্বৃত্তদের সন্ধান পায় না কেন, বোঝা মুস্কিল। ঐ বস্তি অধ্যুষিত অঞ্চলে গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা থাকলে আসামী কবে ধরা পড়তো।

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তা কল্পনাতীত। ঘটনার মূলে ছিল, সমাজবিরোধীদের অনাচার। শিলিগুড়ির পথ দিয়ে হাটছিলেন সস্ত্রীক ডাক বিভাগের কর্মী রামবাহাদুর সিরিক। দুর্বৃত্তরা রামবাহাদুরের স্ত্রীকে টিটকারী দিলে তার প্রতিবাদ করেন রামবাহাদুর। ফলে, দুর্বৃত্তদের ডান্ডার আঘাতে হাস-পাতালে রামবাহাদুরের মৃত্যু হয়। পুলিশ আজ অবধি সেখানে দুর্বৃত্তদের ধরতে পেরেছে বলে সংবাদ আসে নি। আরো আশ্চর্য-জনক খবর, ডাক বিভাগের কর্মীর মৃত্যুর জন্য বাঙালী, গোর্খা ও অন্যান্য কর্মীরা সম্মিলিত প্রতিবাদ করলেও, পরে মৃতদেহ নিয়ে যে মিছিল বের হয়, সেই মিছিলেও নাকি পেশাদার দুর্বৃত্ত ও গুণ্ডারা প্রবেশ করে দুর্বৃত্তবিরোধী মিছিলটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার প্রয়াসে বহু অঘটন ঘটায়।

সুতরাং দুর্বৃত্তরা যে অঘটন ঘটাবার জন্য যত্রতত্র সুযোগ সন্ধান করে বেড়াচ্ছে—এটা আর একবার প্রমাণিত হল। আর দুর্বৃত্তদের এই মুহূর্তে যদি সমূলে উচ্ছেদ করা না হয়, তাহলে রাজ্যটা একদিন তাদের হাতেই যাবে—এমন কথা ধরে নেওয়াও যেতে পারে।

এখন একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পি, ডি, এ্যাক্ট বিদায় নেওয়ায় যত কিছু হাঙ্গামার সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুলিশ বিভাগ এখন নিরুপায়। পি. ডি. এ্যাক্ট বিদায় নেওয়ার ফলে সমাজবিরোধীরা ছাড়া পেলেও, তার আগেও তো সমাজবিরোধীদের কার্য-কলাপ বন্ধ ছিল না। মোদ্দা কথা, সমাজবিরোধীদের চিনেও কি কারণে যেন চেনা যায় না!

আমরা আশা করি, যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে অনতিবিলম্বে সজাগ হবেন এবং আমাদের ধারণা, দলগুলি যদি সমাজবিরোধী-দের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকে, তাহলে পুলিশের পক্ষে সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা না করে উপায় থাকবে না।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

রূপকথার একটা রোমাঞ্চকর অধ্যায় রচিত হল জিব্রাল্টার ভূমধ্যসাগরে। ফ্রান্সের শেরবুর্গ বন্দর থেকে পাঁচখানা গানবোট উধাও হয়ে গেল। জাহাজ ক'টা কিনেছিল ইস্রাইল ফ্রান্সেরই কাছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট দ্য গল যখন ইস্রায়েলে সমরোপকরণ প্রেরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, তখন গানবোটগুলো বন্দরে পড়েই থাকে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তি বা বোম্বেটেগিরিতে রেকর্ড স্থাপন করে ইস্রায়েলী নাবিকরা গানবোট পাঁচটিকে জিব্রাল্টার ভূমধ্যসাগরের জল বেয়ে ইস্রায়েলের হাইফা বন্দরে সাফল্যের সংগে ভিড়িয়ে দিয়েছে। সমগ্র নাটকের বিস্ময়কর সাফল্যের জন্যে যাঁর কৃতিত্ব ও প্রশংসা প্রাপ্য, তিনি হলেন এ্যাডমিরাল মর্দে'কাই লিমন, ইস্রায়েলের জন্যে ইয়োরোপে যুদ্ধাস্ত্র কেনার দায়িত্বভার নিয়ে যিনি ১৯৬২ সাল থেকে প্যারিসে বিরাট অফিস জাঁকিয়ে বসেছেন। ফরাসী নিষেধাজ্ঞা এড়াবার জন্যে লিমন যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সেটাও অভিনব। গানবোটগুলো একটা পানামাস্থিত নরওয়ে কোম্পানীকে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়, যে কোম্পানীর একটা অংশীদারের অফিস ইস্রায়েলে। কাজেই ফরাসী বন্দর থেকে পানামা বা অতলান্তিক না গিয়ে গানবোটগুলোর সোজা ইস্রায়েলে পাড়ি জমাতে বাধা কোথায়!

ভয়ানক করিতকর্মা লোক এই লিমন লোকের মানুষটি। ফরাসী সরকার অবশ্য গানবোট উধাও হবার জন্যে লিমনকে দায়ী করে তাঁকে প্যারিস ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কাজ যখন হাসিল হয়েছে, তখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আপত্তি থাকবে কেন? লিমন সাহেবের চাকরি তো আর ফরাসী সরকার নিতে পাচ্ছেন না, বরং স্বদেশে তাঁর জন্যে মোটা পুরস্কারই তো অপেক্ষা করছে।

কিন্তু লিমনকে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী সওদাগর মনে করলে ভুল করা হবে। ইহুদীদের রাষ্ট্র ইস্রায়েল গঠন এবং শক্ত

লিমন

করে তার বনিয়াদ রচনার জন্যে মার্দে'কাই লিমন গোড়া থেকেই নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। ১৯২৪ সালে পোল্যান্ডে লিমনের জন্ম, কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ অংশই কাটিয়েছেন ইস্রায়েলে। মাত্র ২১ বছর বয়সে লিমন একজন নৌ ক্যাপ্টেন হন। সেই সময় ইহুদীদের রাজনৈতিক দলের গুপ্তবাহিনীরও সংগঠক। হিটলার যখন জার্মানী থেকে দলে দলে হাজার হাজার ইহুদী বিতাড়ন শুরু করেন, তখন লিমনের কাজ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণতা এবং দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে তাদের প্যালেস্টাইনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, ভবিষ্যৎ ইস্রায়েলের ভিত্তি স্থাপন করা। এই ইহুদী উদ্বাস্তুদের নিয়েই লিমন আপন সংগঠন গড়ে তোলেন, গঠন করলেন হাগানাহ্ গেরিলা বাহিনী, যে বাহিনী কালক্রমে ইস্রায়েলের সেনাদলে রূপান্তরিত হল। এর পরে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হল ছোট ছোট নৌকোর অধিনায়কত্বের। তাঁরই নেতৃত্বে সেদিন বৃটিশ নিষেধাজ্ঞা এবং প্রহরার দৃষ্টি এড়িয়ে নৌকোয় করে প্যালেস্টাইনে ইহুদী উদ্বাস্তু বয়ে আনা হয়েছিল।

সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার কারণে লিমনকে ইস্রায়েলী নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়কের গৌরবজনক পদ দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে এই পদ থেকে অবসর নিয়ে লিমন নিউ ইয়র্ক যান। এখানে ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে লিমন ইস্রায়েল ফিরলেন প্রতিরক্ষাদপ্তরের জরুরী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেলের পদ অলংকৃত করার জন্যে। পরে তিনি এই দপ্তরে সহকারী সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে উন্নীত হন।

আরব দুনিয়ার বিরুদ্ধে লিমনের যে একটা জাতক্রোধ রয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইস্রায়েলের জন্যে ইয়োরোপে এবং বিশেষত ফ্রান্সে, অস্ত্র সংগ্রহে সেজন্যে তিনি কোনো দুরূহ, এমন কি বোম্বেটেগিরিকেও অন্যায় নীতিবিগর্হিত কাজ মনে করেন নি। সরকার যদি সমস্ত দায়দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আন্তর্জাতিক আইনকে লিমন পরোয়াই বা করবেন কেন!

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(২২)

### প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি

প্ল্যানিং-আন্দোলনের ফল সুদূরপ্রসারী হয়। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল মহলই তাতে নাড়া খেয়েছিল। অবশ্য যাদের উপকারের জন্যই থাকি এই শিল্পায়ন-পরিকল্পনা—সেই কোটি কোটি দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষ তখন কিন্তু এ সম্বন্ধে যে তিমিরে সেই তিমিরে সেই তিমিরেই।

শেষোক্ত কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্ল্যানিং কমিশনে শ্রমিকদের একজন প্রতিনিধি নেবার প্রস্তাব তো পন্ডিত জহরলাল করেছিলেনই! ভারতবর্ষে শ্রমিকরা শ্রমিকের নেতা হন না—শিক্ষিত সজ্জনেরাই নেতৃত্বের দায় ঘাড়ে নিতে বাধ্য হন—তেমন সব শ্রমিক নেতারা পরিকল্পনায় অবশ্যই উৎসাহী ছিলেন। কিষাণ-নেতৃত্বও পেছিয়ে থাকে নি। 'আমি কিষাণ'-রূপী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কথা এখানে বাদ দিচ্ছি, কারণ প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের বিশেষ খবর আমরা রাখি না, কিন্তু ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে গয়ায় অনুষ্ঠিত কিষাণ সম্মেলনে প্ল্যানিংকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে দেখতে পাই, যদিও সেই সঙ্গে কৃষির উন্নতিতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখানো হয় নি বলে অভিযোগও করা হয়েছিল।১

ভারতের বুদ্ধিজীবী মহল প্রায় সর্বাংশে প্ল্যানিংয়ের সমর্থনে ধ্বনি তুলেছিল। সংবাদপত্রগুলির উৎসাহের সীমা ছিল না। ব্যাপারটা কিছু বিস্ময়কর। এই প্ল্যানিং যেখানে গান্ধীনীতির বিরোধী সেখানে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি অতখানি উৎসাহবোধ করল কি করে, অথচ একই সংগে দেখা যায়, গান্ধী-মহিমার ঘোষণায় তাদের উৎসাহে এতটুকু ঘাটতি পড়ে নি। কারণটি স্পষ্ট। ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষেরা গান্ধী-নেতৃত্ব মানলেও গান্ধীনীতিকে কখনই মনে প্রাণে নিতে পারে নি। কিছু সময়ের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনা করে হয়ত ভেবেছিল সত্যই বুঝি তারা খাদিতে স্বয়ংবৃত, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বুঝতে পারল—অহিংসা ও চরকাকে সাময়িক যুদ্ধনীতি (এবং চিরন্তন ধর্মনীতি) ভিন্ন কিছু মনে করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মানুষ বলে তো মানবস্বভাবকে একেবারে উপড়ে ফেলতে পারে না! গান্ধী-আন্দোলনের ব্যর্থতাও ক্রমে অহিংসা ও চরকা সম্বন্ধে শিক্ষিতজনদের মোহমুক্ত করতে থাকে—এবং সাফল্যও! শেষের কথাটি বিস্ময়কর হলেও সত্য। কংগ্রেস আন্দোলন করে যখনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেল, তখনি অনুভব করল যে, গান্ধী-অর্থনীতিকে দূর না করলে ভারতবাসীকে চিরদিন খাদিতে তৈরি কৌপীন পরে দিন কাটাতে হবে। এই সব কারণেই দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিও প্রস্তাবিত যন্ত্রশিল্পায়ন-নীতির সোৎসাহ সমর্থন করছে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিও এ ক্ষেত্রে পেছিয়ে

---

১ "The (Kisan) Sabha welcomes the appointment of the National Planning Commission in the hope that it will place before the country as a comprehensive plan, of agricultural as well as Industrial development in order to raise the standard of living of our masses and help in the solution of the problem of unemployment.

"The Sabha declares that no National Planning which does not provide for constructive crop planning and provide adequate safeguard for the payment of manufactures utilising Indian agricultural product, employment of rural masses and the progressive cheapening of prices for consumers, can be considered capable of solving the problem of poverty and unemployment.

"The Sabha is disappointed to find that its terms of reference do not give equal importance to the need for agricultural development and that its personnel is overwhelming im favour of industrial and commercial interests." (A. B. P., Aprill 11, 1939)

লক্ষ কৃষকের বিরাট সম্মেলন হয়েছিল। সভাপতি স্বামী সহজানন্দ। সাফল্য কামনা করে সুভাষচন্দ্র বাণী পাঠিয়েছিলেন।

থাকে নি। ইংরাজদের বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষে শিল্পের কিছুটা উন্নতি প্রয়োজন; কিন্তু সে উন্নতি এমন কিছু হয়ে না পড়ে যাতে মূলে টান ধরে, সে-বিষয়েও তাদের কাগজগুলি সতর্ক করে দিয়েছিল। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি এতদিন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভড়ং করে এসেছে, অগত্যা তাই কিছু মুখের প্রশংসা করে তাদের মুখরক্ষা করতে হয়েছিল।

প্ল্যানিং সম্বন্ধে বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে কিছু তথ্য এবার দেওয়া যাক।

মডার্ন রিভিউ পত্রিকা শিল্পায়নের উৎসাহী সমর্থক, তা আগেই দেখেছি। সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা ভাষণের "নূতন বস্তু", যা পূর্বে কোনো সভাপতি দেন নি, সেই স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠন-প্রস্তাবকে কিভাবে পত্রিকাটি স্বাগত জানিয়েছিল এবং শিল্পায়নের পক্ষে কিভাবে প্রচার চালিয়েছিল, তাও যথেষ্ট জানিয়েছি। অক্টোবর মাসে (১৯৩৮) দিল্লীতে শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়ে যাবার পরে *The Industrialisation of India* নামক সম্পাদকীয় রচনায় ঐ সম্মেলনে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের ভাষণের প্রশংসা করতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে যে, কংগ্রেস-সভাপতির এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞান কলেজে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে। এ ক্ষেত্রে মেঘনাদ সাহার প্রভাবেরও উল্লেখ পত্রিকাটি করে। ঐ রচনায় মডার্ন রিভিউ যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের তীক্ষ্ন স্পষ্ট উক্তিগুলিকে যত্ন করে চয়ন করেছিল (যথা, 'রাশিয়ার মত বাধ্যতামূলক গতি চাই', 'শিল্পায়ন যদি পাপ হয় তা অনিবার্য পাপ', 'কোনো জাতি একালে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না যদি না শিল্পায়নের পথ নেয়'), এবং সুভাষচন্দ্র যে বিশেষজ্ঞ কমিটি করেছেন তার সদস্য নির্বাচন নীতির প্রশংসাও করেছিল।২ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচিত হবে, নির্ধারিত নীতিও পত্রিকাটির পছন্দসই ছিল। প্ল্যানিংয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ-রক্ষার প্রয়োজনের কথা বলার পরে সে স্বার্থরক্ষিত হবে এই ভরসা প্রকাশ করা হয়েছিল, কারণ, "রাশিয়ায় লব্ধ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ডাঃ এ কে সাহা ও শ্রমিক নেতার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ভি ভি গিরি কমিটিকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।"

মডার্ন রিভিউয়ের সম্পাদক একটি ক্ষেত্রে ধীর বিবেচনাবুদ্ধির পরামর্শ দিয়েছিলেন। "কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু অবশ্যই মার্কা-মারা সোস্যালিস্ট, তাহলেও দেশের বর্তমান অবস্থায় ধনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সংকুচিত হবার কারণ নেই"—পত্রিকাটি বলেছিল—যেহেতু সমাজ-তন্ত্রের আচার্যবরিষ্ঠ মার্কস্ পর্যন্ত অবস্থা বিশেষে ধনতন্ত্রের মূল্য স্বীকার করেছেন। মডার্ন রিভিউ সম্পাদক নিজ সমর্থনে বৃটিশ কম্যুনিস্ট নেতা রজনীনাথ দত্তের লেখা লেনিন-জীবনী থেকে অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন।৩

অমৃতবাজার বা হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের মত জাতীয়তা-বাদী দৈনিকগুলির সমর্থন এক্ষেত্রে প্রচুরভাবে পাওয়া যাবে সহজেই ধরে নেওয়া যায়। দুটি কাগজের কাছেই ব্যাপারটা কংগ্রেসের বিরাট কীর্তি, যা তার কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান শত্রুকুলের চক্ষুরুন্মীলন করে দেবে। উভয়ের মধ্যে কিন্তু হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড অমৃতবাজারের তুলনায় প্রত্যাশায় দ্বিধান্বিত ছিল। সাফল্যের পথে বাধা বিশাল। পত্রিকাটি বলেছিল, সে বাধা দূর করা সহজ হবে না মোটেই—"তা করতে গেলে সর্বোচ্চ ধরণের অর্থনৈতিক রাজনীতিবুদ্ধির প্রয়োজন হবে।" কৃষি ও শিল্পের উন্নতির পরিমাণ-সামঞ্জস্যের প্রশ্ন আছে, যা রাশিয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল, সরকারী আইনের বেড়াজালের বাধাও আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় আশার কথা—পত্রিকাটি বলেছিল—"পথের নিশানা পাওয়া গেছে; স্থির হয়েছে যে, অলস শিথিল বচনের স্থান গ্রহণ করবে প্রচন্ড কর্মোদ্যম এবং জাতির প্রাণশক্তি সুনির্দিষ্ট ও যথার্থই সৃষ্টিশীল কর্মে ব্যস্ত হবার সুযোগ পাবে।" ৪

অমৃতবাজার সুভাষচন্দ্রের "অতীব চিন্তা উদ্রেককারী" ভাষণের সারসংক্ষেপ করার পরে শিল্পমন্ত্রী সম্মেলনের প্রভূত সাফল্যের কথা জানিয়েছিল: "শিল্পমন্ত্রীদের সম্মে-লন বিরাট সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে; অধিবেশনে কার্য-সূচী অনুসৃত হয়েছে খুবই সুশৃংখল পদ্ধতিতে; অনেক-গুলি প্রস্তাব পাশ করেছে সম্মেলন, যার ফলে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়েছে।"৫

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাবশালী বহু পত্র-পত্রিকা

---

২ His (Bose's) choice of the personnel (of the Expert Committee) has much to commend itself. It cannot and should not be contented that all the prominent scientists and industrialists should have been in the Committee." (M. R. *Notes.* Oct. 1938)

৩ "He (Marx) was able to show that Capitalism in its early stages, despite wholesale cruelty and hardship, was nevertheless a progressive force, driving through competition to continual development of the productive forces, enlargement of the scale of production, concentration of capital and increasing of the numbers of prole-tariat." (রজনীপাম দত্তের *Life and Teaching's of Lenin* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

৪ ৭ অক্টোবর, ১৯৩৮-এর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের *Economic Plan for India* নামক সম্পাদকীয় থেকে। প্ল্যানিংয়ের নানা সমস্যার উপর পরদিনই *Developing Industries* নামে আর একটি সম্পাদকীয় বেরোয়।

৫ অমৃতবাজারে ১৮ অক্টোবরের সম্পাদকীয় *National Planning* থেকে।

ন্যাশনাল প্ল্যানিংকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তার সবগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, সে প্রয়োজনও নেই। একটি-দুটি দৃষ্টান্ত মাত্র দেব। পুনার বিখ্যাত 'মারহাট্টা' কাগজ ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের বিশেষ সমর্থক এবং এ-ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ঐ পত্রিকার এতই পছন্দ হয়েছিল যে, কংগ্রেস সভাপতি পদে তাঁর পুনর্নির্বাচনের প্রশ্নে এই বিষয়টিকে সমর্থনের অন্যতম কারণরূপে দাঁড় করিয়েছিল। "তরুণদের হৃদয়দেবতা সুভাষচন্দ্র নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সংযোগ-সেতুস্বরূপ", পত্রিকাটি লিখেছিল—মুক্তকণ্ঠে জানিয়েছিল—সুভাষচন্দ্রই কংগ্রেসের নূতন ও ঐতিহাসিক শিল্পনীতির প্রবর্তক।৬

'কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস পি শর্মা জাতীয় পরিকল্পনার উপরে লিখিত রচনায় অন্যান্য কথার সঙ্গে ভারত সরকারের প্ল্যানিং-বিরোধী নীতির কথা তোলেন। সরকারের বিরোধিতার কারণ—এই ধরণের পরিকল্পনা বৃটিশ বাণিজ্যস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। সুভাষচন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী শাসনের সুযোগ নিয়ে কিভাবে অন্তত প্রাদেশিক ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে চালু করার চেষ্টা করছেন, শ্রীযুক্ত শর্মা সমাদরের সঙ্গে তার উল্লেখ করেছিলেন।৭

অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকাদিতে স্বতঃই আলোচ্য বিষয়ে মন্তব্য করা হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *The Indian Economist* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৭ অক্টোবর তারিখে *Industrial Planning* নামক সম্পাদকীয়তে পরম স্বস্তির সঙ্গে লেখা হয়—"যাক, অবশেষে জাতীয় ভিত্তিতে শিল্প-পরিকল্পনা হতে যাচ্ছে।" "অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কালের ধর্ম। পৃথিবীতে উগ্র অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ এর মূলে। নিজেদের অর্থনৈতিক জীবনের নবভিত্তির জন্য সকল দেশই কোনো না কোনো-প্রকার পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছে। ভারতও উদাসীন থাকতে পারে না।" তবে ভারত যেন এক্ষেত্রে অন্য দেশের অন্ধ অনুকরণ না করে, তার নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা বা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে পরিকল্পনা রচনা করে,—সে সম্বন্ধে সতর্ক করে পত্রিকাটি কার্যকর কিছু প্রস্তাব করেছিল।৮

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত *Commerce* ('A weekly of Indian financial, commercial and industrial progress') আরও গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। এটি ইংরাজ বাণিজ্যিক স্বার্থের সমর্থক। তাহলেও শিল্পমন্ত্রী সম্মেলনের গুরুত্ব পত্রিকাটি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে বলেছিল—দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা ঘটে গেল। অর্থনীতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতে বহু প্রকার এলোমেলো কথা চলে আসছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পমন্ত্রী সম্মেলন যে পরিষ্কার যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে রায়

৬ মারহাট্টার রচনাংশ : "Subhas Babu has been responsible for the reorientation of the industrial policy of the Congress and the Delhi Conference of the Industries' Ministers of the Congress provinces which he called and successfully guided is an historic event. For the first time, during the last eighteen years the attitude of the Indian National Congress towards the industrialisation of our Mother Country has been definitely formulated and National Planning Committee has been appointed which will soon commence its work, under the Presidentship of Pandit Jawaharlal Nehru. In order that the work of the Planning Committee and the Planning Commission which the former has to constitute, should take a definite shape on the lines laid down by him, it is essential that Sj. Bose should be at the helm of the Congress organisation for at least one year more." (১৪ নভেম্বর, ১৯৩৮-এর অমৃতবাজারে উদ্ধৃত)

৭ এস পি শর্মা লিখেছিলেন—"The Industries' Ministers' Conference that recently met at Delhi under the Chairmanship of the Congress President Sj. Subhas Chandra Bose, has rightly emphasised the imperative need for industrialising the country according to a definite plan. This task has always been overlooked by the Government of India presumably because it had to look to British interest also. Any way the fact that the Congress is in office over the larger part of British India has been very opportunely availed by its President to mobilise provincial energies as well as those of Indian States which willing in the cause of rapid and systematic industrialisation of the country." (অমৃতবাজারে ১৯ নভেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে উদ্ধৃত)

৮ এই পত্রিকায় ৭ নভেম্বর তারিখে *National Planning* বলে আর একটি সম্পাদকীয় বেরোয়, যেটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ফাইলে ছেঁড়া থাকায় আমরা ব্যবহার করতে পারি নি।

## পরিত্যক্ত

শক্তিব্রত ঘোষ

কথা ছিল খামার গোয়াল
আকাশ দিয়ে বেঁধে দেওয়ার;
কথা ছিল রাত্রি থেকে
আলো হাতে নিয়ে যাওয়ার;
কথা ছিল এস্‌প্লানেডে।

কথা ছিল মশাল জেলে
নগর-ঘৃত পুড়িয়ে দিলে,
পায়ের চাপে ঘাস মজালে,
পরিণামে কেস্ট মেলে;
কথা ছিল এস্‌প্লানেডে।

কথা ছিল অশ্রুমতী,
ফিরে যাবো শেষ লোক্যালে,
গাড়ি শেষের ইস্টিশানে
বুক পুড়ে যায় অন্তরালে
কথা ছিল খোকার শ্লেটে।

## গতি

অমিয়কুমার হাটি

গতি তো রক্তের মধ্যে, তাকে নিয়ে চলেছে জীবন,
গতির কাছেই করি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ।
যখনি যেখানে যাই, চোখের তারায় স্বপ্ন নাচে।
সে নিয়ে গিয়েছে, যাবে, যতদিন এই প্রাণ বাঁচে
পর্বতে সমুদ্রে বনে, নগরে বা সুদূর পল্লীতে
বসন্ত গ্রীষ্ম বা বর্ষা, শরৎ হেমন্ত কিম্বা শীতে।
পথের ধুলায় শুনি প্রতিধ্বনি, কান পেতে থাকি,
কে আসে কি আসে সামনে, মহাকাল বাঁধে কোন্ রাখী,
প্রবল প্রচণ্ড প্রিয় উচ্চকিত গতির তরঙ্গে
শঙ্কিত হয়েছে বুক? কখনো না। গতি নিয়ে সঙ্গে
বিশ্ব যে বিস্তৃত হয় নক্ষত্রের মিছিলে মিছিলে।
আলোকবর্ষের বার্তা পৌঁছালো, পৌঁছাবে তিলে তিলে।
গতির সওয়ার হই। উড়ে চলি। মুক্ত তার রাশ।
প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর আলোড়িত। উদ্বেলিত শ্বাস।

দিয়েছে তার জন্য পত্রিকাটি যথেষ্ট সাধুবাদ না জানিয়ে পারে নি।৯ সুভাষচন্দ্র "স্বচ্ছভাবে বৃহৎ শিল্প ও কুটীর-শিল্পের সম্পর্কের কথা বুঝিয়ে" শিল্পবিপ্লব ঘটাতে হবে বলেছেন, তার জন্য তিনি এই পত্রিকা কর্তৃক প্রশংসিত হন। পত্রিকাটির মতে, বিশেষজ্ঞ সমিতির সদস্য নির্বাচনও উপযুক্ত হয়েছে, কারণ সদস্যদের নেওয়া হয়েছে অরাজনৈতিক ভিত্তিতে; তাঁদের মধ্যে "নিজস্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ, অর্থনৈতিক আছেন।" একমাত্র ত্রুটি "অভারতীয়দের, বিশেষতঃ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে নেওয়া হয় নি, যদিও বৃটিশ ব্যবসায়ী সমাজ ভারতে শিল্পায়নের জন্য অনেক কিছুই করেছে।" পত্রিকাটি আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, বৃটিশ ব্যবসায়ীরা পরমানন্দে সাহায্য করতে প্রস্তুত, যদি "ব্যক্তিগত মালিকানা ও সমসুযোগের ভিত্তিতে" পরিকল্পনা করা হয়।১০

[ক্রমশ]

৯ "There has been in the country so long a certain amount of loose thinking in certain quarters regarding future economic policy. It has been stated by some that only cottage industries should be developed and that large-scale industrialisation should be avoided. Others have maintained that India is essentially an agricultural country and that the economic improvement of the people should and could be brought about only through developing agriculture. We are glad to note that the Conference has come to the definite conclusion that 'the problems of poverty and unemployment, of national defence and economic regeneration in general cannot be solved without industrialisation.'" (৮ অক্টোবরে প্রকাশিত সম্পাদকীয়—*Delhi Conference and Industrial Planning*).

১০ "We presume that the (British business) Community will only be too glad to extent its co-operation to all genuine attempts to improve the economic prosperity in India on the basis of stimulating private enterprise and ensuing equal opportunities for all those engaged in the process." (২২ অক্টোবরের সম্পাদকীয়—*Industrial Planning for India*).

বর্তমান সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতী যেদিন প্রকাশিত হবে, তখন ১৪ই জানুয়ারীর প্রস্তাবিত যুক্তফ্রন্টের বহুপ্রতীক্ষিত বৈঠকও শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে কোন অঘটন না ঘটলে ১৪ তারিখেই ওই বৈঠক বসছে এটা আশা করা যায়। গত ৭ই জানুয়ারী যুক্তফ্রন্টের সভায় তার পূর্বদিনের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের জের হিসাবেই স্থির হয়েছে যে, ১৪ই জানুয়ারী যুক্তফ্রন্টের সমস্যা নিয়ে যুক্তফ্রন্টের সভা হবে। আর শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার দুজনেই জানিয়েছেন, ১৪ই জানুয়ারী যুক্তফ্রন্টের সভায় সি-পি-এম যোগ দেবে।

বিগত ৬ই জানুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এক বৈঠকে বসে ১৪ই জানুয়ারী যুক্তফ্রন্টের বৈঠকের দিন ঠিক করেন। কিন্তু ওইদিন রাতে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ১৪ই তারিখের সভার কথা শুনে বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বর্বর সরকার কথাটি প্রত্যাহার না করলে শান্তি আলোচনা হবে না। বৃহস্পতিবার ৮ই জানুয়ারী শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীজ্যোতি বসু উভয়েই জানান যে, ১৪ই জানুয়ারী যুক্তফ্রন্টের সভায় সি-পি-এম যোগদান করবে। তবে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন যে, তাঁরা যাবেন, কিন্তু সভায় কি আলোচনা হবে সেই কথা তাঁরা জানেন না। অপর দিকে যুক্তফ্রন্টের আহবায়ক শ্রীসুধীন কুমার বলেন যে, ১৪ই তারিখের সভায় আলোচ্যসূচী ঠিক হয়ে গেছে এবং সকলকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৯ই জানুয়ারীর রাতে শ্রীসুধীন কুমার অকস্মাৎ জানান যে, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলি ১৪ই জানুয়ারী কোন আলোচ্যসূচী ছাড়াই মিলিত হবেন. কেন না আসন্ন ফ্রন্টের বৈঠকের কর্মসূচী নিয়ে মতপার্থক্য থাকার ফলেই এই রকম সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, আলোচ্যসূচী ছাড়া বৈঠক হলেও কোন ক্ষতি নেই, সেখানে ফ্রন্টের সমস্যা ও সংকটের কথাই অনিবার্যভাবেই উঠবে। সি-পি-আই নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর মতে, পর্দার আড়ালে কি হল না হল তাতে কিছু যায় আসে না। যা হবার তা প্রকাশ্য সভাতেই হবে। সি-পি-এম বলতে চাইছেন, ১৪ই জানুয়ারীর বৈঠকটা ফ্রন্টের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বিশেষ বৈঠক নয়। বিভূতিবাবু চেয়েছিলেন ফ্রন্টের সমস্যা নিয়ে দুদিন ধরে একটানা বৈঠক হবে এবং ওই বৈঠকে কি আলোচনা হবে তা নিয়ে একটা খসড়াও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সি-পি-এম পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন ওই বিশেষ বৈঠকে বসতে হলে 'বর্বর' সরকার ইত্যাদি উক্তির ফয়সালা আগে করতে হবে।

মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছে। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার যে ১৪ই তারিখে বৈঠক বসছে এবং ওই বৈঠকেই যুক্তফ্রন্টের বর্তমান সংকট মোটামুটি মিটতে চলেছে। ব্যাপারটি এখন একটি প্রেস্টিজ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। আপাতত সমগ্র বিষয়টি একটিমাত্র ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, তা হচ্ছে ওই 'অসভ্য বর্বর' ইত্যাদি শব্দগুলিকে অস্বীকার করতে হবে। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, যুক্তফ্রন্টের ১৪ই তারিখের বৈঠকে এই শব্দগুলি প্রত্যাহৃত হবে, কেন না মুখ্যমন্ত্রী কখন কোন্ কনটেকস্টে কিভাবে কথাগুলির ব্যবহার করেছিলেন, তা সকলের অজানা। এবং এই কথাগুলি এসেছে খবরের কাগজ মারফত, এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেন্টই পর্যাপ্ত, যিনি আপাতত মুখে চাবি দিয়ে আছেন এবং ১৪ই তারিখের আগে মুখ খুলবেন না এই রকম কথা বলেছেন। এদিকে মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাঁরা এমন কোন কাজ করবেন না, যা যুক্তফ্রন্টের স্বার্থ-বিরোধী। পি সুন্দরায়া কর্তৃক প্রকাশিত বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে তাঁরা চান যে, সি-পি-এম পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিশীল কর্মসূচী অনুসরণ করে চলবেন, এবং যে সব শক্তিগুলি ঘটনাচক্রে ভিন্নমুখী হয়ে পড়ছে, সেগুলিকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে যুক্তফ্রন্টের ভাগ্যাকাশে যে কালো মেঘ জমাট বেঁধে ছিল, তা অপসৃত হবার লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়েছে।

একটি তুচ্ছ ব্যাপার থেকে কিভাবে চারদিকে আগুন ছড়াতে পারে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন স্থানে গত কয়েকদিনের ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। শিলিগুড়ি শহরে কিছু বদমায়েস লোকের হাতে একজন ডাক পিয়নের শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনা থেকে একটা হাংগামার সূচনা হল আর সেটা এমন আকার ধারণ করল যে, ওই শহরে আগুন জ্বলল, লুঠপাট হল, সরকারী সম্পত্তি নষ্ট হল, কাঁদানে গ্যাস ও গুলী চলল, গুলীতে তিনজন মারা গেল, এবং শেষ পর্যন্ত শহরে কারফিউ জারি করে সেখানকার আইন ও শৃংখলার ভার সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে হল।

ডাককর্মী শ্রীরামবাহাদুর সিরকির ওপর আক্রমণ হয় মঙ্গলবার ৬ই জানুয়ারী তারিখে। তিনি হাসপাতালে মারা যান বুধবার ৭ই তারিখে। ওইদিনই শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্ররা মিছিল করে মহকুমার পুলিশ অফিসারের দপ্তরে হানা দেন এবং শ্রীসিরকির মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তাঁরা ওই দপ্তর তছনছ করেন। ওইদিন ডাক কর্মচারীরাও হরতাল পালন করেন। একথা বলতেই হবে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার ভার যাঁদের হাতে ছিল তাঁরা ঘটনার বিস্তার নিবারণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পুলিশ যদি তৎপর হয়ে মঙ্গলবারের ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করতে পারত এবং সংগে সংগে সে-কথা শহরের লোকদের জানিয়ে দিতে পারত তাহলে এত তাড়াতাড়ি এতখানি উত্তেজনা ছড়াত না। বৃহস্পতিবার যখন সারা শিলিগুড়ি উত্তেজিত তখনও দুর্বৃত্তদের ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যখন হাংগামা শুরু হল তখন গোড়া থেকেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত ছিল।

পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ঘটনাটির পিছনে কিছু ব্যক্তির হাত আছে এবং একটি বিষয়কে উপলক্ষ করে পরিকল্পিতভাবেই হাংগামা বাধানো হয়েছে। সমতল থেকে এই হাংগামা পাহাড় অঞ্চলেও ছড়িয়েছে এবং কালিম্পং-এও কারফিউ জারী করে সেখানেও সেনাবাহিনীকে তলব করে আনতে হয়েছে। কারফিউর বেস্টনীতে আবদ্ধ শিলিগুড়িতে অতঃপর কোন বড় রকমের ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু কালিম্পং-এ আক্রমণকারী জনতা পাওয়ার হাউস ভেঙে দিয়েছে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ক্ষতি করেছে, সিনেমা হাউসে ও দোকানপাটে আগুন দিয়েছে।

দার্জিলিং জেলায় গোর্খা ও অন্যান্য

পাহাড়ী উপজাতির লোকেরা এতকাল শান্তিপূর্ণভাবেই পাশাপাশি বাস করে এসেছেন। ইতিপূর্বে এরকম কোন হাঙ্গামা ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই, কাজেই অনুমান করা অসংগত নয় যে, কিছু মতলববাজ ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরেই গোপনে একের বিরুদ্ধে অপরকে প্ররোচিত করেছে, বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, যা আকস্মিক প্রকাশ করেছে একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ করে। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিষয়টিকে গোড়া থেকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন এবং সৈন্যবাহিনী তলব করেছেন। সৈন্যবাহিনী তলবের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি খোলাখুলি জানিয়েছেন যে, অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাবার আগেই সামরিকবাহিনী ডাকা ভাল। কারণ এসব ক্ষেত্রে তথাকথিত ইজ্জতের চেয়ে মানুষের প্রাণ বড়।

উত্তেজনা দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে গোর্খা লীগের একটি বিশেষ ভূমিকা যে আছে—তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার বিশেষ প্রয়োজন। দার্জিলিং-এর পাহাড়ী অধিবাসীদের মধ্যে গোর্খা লীগের যথেষ্ট প্রভাব আছে। সংবাদে প্রকাশ, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ও গোর্খা লীগ নেতা শ্রীদেওপ্রকাশ রাইকে অবিলম্বে দার্জিলিং-এ রওনা হবার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। শ্রীরাই ও আবগারীমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার ইতিমধ্যে শিলিগুড়িতে পৌঁছে গেছেন। অনগ্রসর দার্জিলিং জেলায় যাতে শান্তি ফিরে আসে এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করণীয় আছে।

## সমাজবিরোধী কাজ

পশ্চিমবঙ্গে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের একটি হিসাব প্রকাশিত হয়েছে, যাতে দেখা যায় চলতি বছরের প্রথম দশ মাসে হাওড়া ও শিয়ালদহ জি· আর· পি থেকে ৩৫৮টি ওয়াগন লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া গেছে। ১৯৬৮ সালের ওই সময়ে ওইরূপ লুণ্ঠনের সংখ্যা ছিল ৫৫৮। প্রাপ্ত হিসাব থেকে দেখা গেছে, এ বছরে প্রথম দশ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ৭৩০টি ডাকাতি হয়েছে, গত বছরে এই সময় ৭২৮টি ডাকাতি হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্যে (কলকাতা বাদে) মোট ৪৭টি ডাকাতি হয়েছিল। এগুলির মধ্যে চব্বিশ পরগণা উত্তর অঞ্চলে, পশ্চিম দিনাজপুরে ও জলপাইগুড়িতে ছয়টি করে, হুগলীতে পাঁচটি এবং আসানসোল সাব-ডিভিশন, মেদিনীপুর পূর্ব অঞ্চল, মুর্শিদাবাদ, মালদহ জি· আর· পি·, হাওড়া এবং ট্রাফিক ও রেলওয়ে রেঞ্জে তিনটি করে ডাকাতি হয়। নদীয়া ও বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর পশ্চিম অঞ্চল থেকে কোন ডাকাতির খবর পাওয়া যায় নি।

সংখ্যার দিক থেকে ওয়াগন ভাঙা গত বছরের তুলনায় এ বছর কম হলেও আশ্বস্ত হবার কোন কারণ নেই বা এ কথা বলার কোন যুক্তি নেই যে, অপরাধের মাত্রা কমেছে। বর্তমান নিবন্ধটিতে মূলত ওয়াগন ব্রেকিং-এর ঘটনা সম্পর্কেই কিছু বলা হবে। বস্তুত হাওড়া ও শিয়ালদহ এলাকায় এবং বর্ধমান জেলার বিশেষ করে আসানসোল মহকুমায় ওয়াগন ভাঙা একটি ক্রনিক অপরাধে পরিণত হয়েছে। সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বস্তুত এটি একটি পেশায় পরিণত হয়েছে, এবং এই ওয়াগন ব্রেকারদের দৌরাত্ম্য সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। গত বছরের তুলনায় ওয়াগন ভাঙার সংখ্যা এ বছরে কিছু কম হয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা নিরর্থক। বলাই বাহুল্য, সরকার এ বিষয়ে মোটেই সাফল্য অর্জন করেন নি।

প্রকাশ্য দিবালোকে বুক ফুলিয়ে দিনের পর দিন সমাজবিরোধীরা পুলিশের নাকের ডগাতেই তাদের ওয়াগন ব্রেকিং-এর পেশা চালিয়ে যাচ্ছে। রেলওয়ে পুলিশের এ বিষয়ে বিশেষ সুনাম নেই, বরং বলা চলে, তাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় না থাকলে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। কতিপয় অসাধু কর্মচারীও এদের সংগে লিপ্ত আছে, যারা এদের সংবাদ সরবরাহ করে। বাইরের ব্যবসায়ীদের সংগে এই ওয়াগন ব্রেকারদের যোগাযোগ আছে, এবং সচরাচর দেখা যায় যে, তারা লরি নিয়ে ঘটনাস্থলেই হাজির থাকে এবং খালাসকরা মাল ওই লরিগুলিতে বোঝাই করে নিয়ে সরে পড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের সামনে।

সচেতন জনসাধারণ এই বিষয়ে বরাবরই প্রতিবাদ করে এসেছেন, এবং এমন কয়েকটি ঘটনা আমাদের জানা আছে যেখানে বাধা দিতে গিয়ে বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে জনসাধারণই নিগৃহীত হয়েছেন। এদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, পুলিশ কর্মচারীদের একাংশের এরা স্নেহপুষ্ট। কাজেই চোখের সামনে অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখেও কিছু করার থাকে না, যিনি বা যাঁরা করতে চান তাঁদের প্রোটেকশন দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই, অথচ জনমত এ বিষয়ে খুবই স্পষ্ট।

এই কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আমাদের নিবেদন, যুদ্ধকালীন অবস্থার ভিত্তিতে এই সমাজবিরোধী কাজের নিবৃত্তি ঘটান। প্রচলিত পদ্ধতিতে ওয়াগন ব্রেকিং-এর সমস্যার সমাধান করা যাবে না, এর জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কেন না জনস্বার্থের সংগে ব্যাপারটি বড় ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। আশা করি সরকার এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

## বসুমতী পত্রিকার কার্যালয়ে ডঃ ত্রিগুণা সেন

কেন্দ্রীয় তৈল ও রসায়নমন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন গত ৪ঠা জানুয়ারী বসুমতী পত্রিকার কার্যালয় পরিদর্শনের সময় বসুমতীর কর্তৃপক্ষ ও সাংবাদিকদের সংগে আলোচনা প্রসংগে বিগত কয়েক মাসের বাংলাদেশের বিভিন্ন যুব বিক্ষোভের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংবাদপত্র যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেগুলির বিকৃত পরিবেশন করেছেন, তার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, অধিকাংশ সংবাদপত্র বাংলাদেশের যুব সমাজের বলিষ্ঠতাকে প্রকাশ না করে তার একটা বিকৃত রূপ তুলে ধরে বাংলাদেশ ও জাতীয় চরিত্রের ওপর এক দুরপনেয় কলংক লেপন করার চেষ্টা করছেন।

আলোচনার সময় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ঘটনা এবং সাম্প্রতিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ঘটনার কথা সংবাদপত্রে যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে তিনি তার সমালোচনা করে বলেন যে, বাংলাদেশের কিছু সাংবাদিক বাংলার যুবকদের চরিত্রহনন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ডঃ সেন বলেন, বসুমতী ছাড়া রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা সম্পর্কে যে সংবাদ সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়েছে, তাতে বাংলার যুবকদের সম্পর্কে একটা হীন ধারণা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এসব কিছুই ঘটে নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের উৎসবেও ছাত্ররা সুসংযতভাবে নিজেদের রাজনৈতিক বক্তব্য বলিষ্ঠতার সংগে হাজির করেছেন বলে ডঃ সেন মনে করেন। তিনি বলেন, সমাবর্তন সম্পূর্ণরূপে বানচাল করে দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা তা করেন নি, খুব শৃঙ্খলার সংগেই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এবং কোন সময়েই সমাবর্তনকে বানচাল করে দেবার কোন চেষ্টা করেন নি, অথচ সংবাদপত্রে তাঁদের চরিত্রের এই বলিষ্ঠতাকে তুলে না ধরে তার পরিবর্তে অন্য এক চিত্র পরিবেশন করা হয়েছে।

ডঃ সেন বলেন, দিল্লীতে রবীন্দ্র সরোবরের চেয়েও মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে ওই-ভাবে ফলাও করে সত্য ঘটনা পর্যন্ত পরিবেশিত হয় নি।

ডঃ সেন বলেন, বাংলার ছেলেরা অন্য রাজ্যের ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত মানের, এসব ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়। এখানে ছেলেরা রকে বসে লেনিন-মাও সে-তুং-এর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু দিল্লী, বোম্বাই বা অন্য জায়গায় রকে বসে ছেলেরা সুরার স্বাদ, অভিনেত্রীর দেহ বা মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণায় মত্ত থাকে।

ডঃ সেন মনে করেন যে, বাংলার ছেলেদের এভাবে হেয় করার ফলে বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলা সম্পর্কে সাংবাদিকদের বিভীষিকা সৃষ্টির ফলাফল যুব সমাজকে ভোগ করতে হচ্ছে।

বসুমতী পরিচালকদের পক্ষ থেকে ডঃ সেনকে সম্বর্ধনা জানান শ্রীবিজন সেন ও শ্রীবীরেন দে। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কিছু অমূল্য গ্রন্থ ডঃ সেনকে উপহার দেওয়া হয়।

—১০।১।৭০

davp 69/470
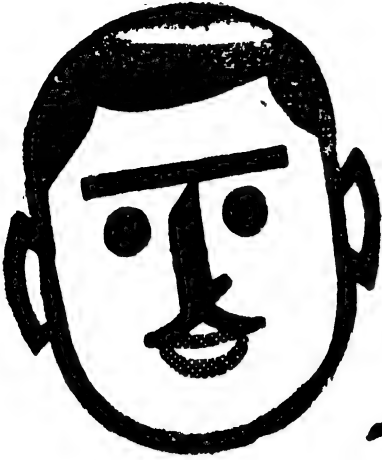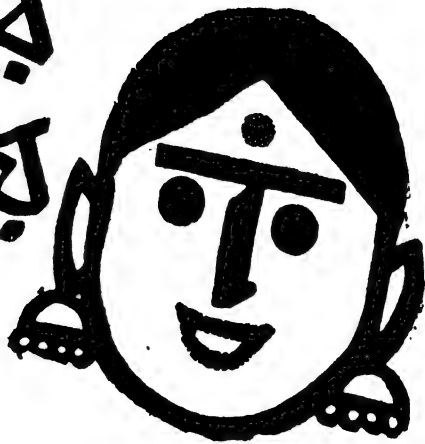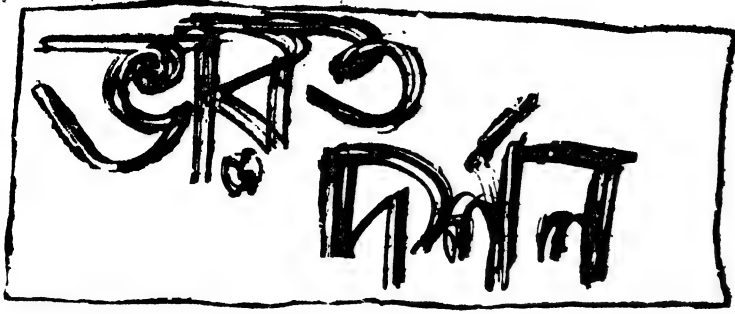
## ইন্দিরা-সরকারের বিরুদ্ধে এস-এস-পি'র জেহাদ

জাতীয় কংগ্রেস দু' ভাগ হবার পর ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো পরিবর্তিত অবস্থায় যে যার রাস্তা ঠিক করে নেবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি সর্বভারতীয় দল হিসাবে স্বীকৃত। অহিন্দীভাষী এলাকায় তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশি নেই ঠিকই, কিন্তু হিন্দীভাষী বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে তাঁরা বেশ শক্তিশালী। পার্লামেণ্টেও তাঁদের সদস্য-সংখ্যা কম নয়। স্বর্গত ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার সোস্যালিস্ট পার্টি এবং প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির মিলনের ফলে এস-এস-পি পার্টি গঠিত হয়েছিল। পরে পি-এস-পি'র কিছু-সংখ্যক সদস্য এস-এস-পি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার পি-এস-পি গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁদের অনেক পুরনো সদস্য এস-এস-পিতেই থেকে যান।



১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস কয়েকটি রাজ্যে গদিচ্যুত হয়েছিল। তখন এস-এস-পি কোন কোন রাজ্যে অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে একযোগে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামিল হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তাঁদের দলের প্রতিনিধি শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র মন্ত্রী হয়েছিলেন। দল হিসাবে এখনও তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টে আছেন, তবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নি, কারণ তাঁদের কয়েকটি সর্ত নাকি যুক্তফ্রন্ট মানতে পারছেন না।

কেন্দ্রে এস-এস-পি দল বিরোধী দলের সঙ্গেই আসন গ্রহণ করে এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জোরালো বক্তা থাকায় পার্লামেণ্টে তাঁদের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। দলের নেতাদের মধ্যে রাজনারায়ণ, মধু লিমায়ে, ফার্নাণ্ডেজ, কর্পূরী ঠাকুর প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নামে সোস্যালিস্ট হলেও এই দলে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর মত একতা নেই। আদর্শ এবং কর্মসূচীর ভিত্তিতে দলের মধ্যে একটা ঐক্য বিরাজ করলেও এঁদের নেতাদের মধ্যে অনেক সময়েই পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা শোনা যায়।

কংগ্রেস দল যতদিন এক ছিল, ততদিন এস-এস-পি'র অন্তর্বিরোধ তত প্রকট হয় নি। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে যখন কংগ্রেস দলে ভাঙন দেখা দিল, তখন এস-এস-পি'র নেতারা মুস্কিলে পড়ে গেলেন। একদল চাইলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দলকে সমর্থন করতে, অপর দল চাইলেন সঞ্জীব রেড্ডীকে ভোট দিতে। দলীয় নীতি হিসাবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করলেও ভোটদানের ব্যাপারে কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঐক্য থাকে নি। দলীয় বিরোধ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। রাজনারায়ণ ফার্নাণ্ডেজ এবং মধু লিমায়ের নেতৃত্বে একদল এণ্টি কংগ্রেসইজমকেই (কংগ্রেসের বিরোধিতা) তাঁদের নীতি হিসাবে প্রচার করতে চাইলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা সিণ্ডিকেটের সঙ্গে এক হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টকে উল্টে দেবার মতলব আঁটতে লাগলেন। কিন্তু এস এম যোশীর নেতৃত্বে অপর দল [illegible] বিরোধী দলের সকলেই যে সেই পার্টি, বিপ্লবী হয়ে উঠবে, তার কোন মানে নেই। দেশের অগ্রগতির জন্য যখন যে ভূমিকা নেওয়া দরকার, সেই ভূমিকাই পার্টির নেওয়া উচিত। 'এণ্টি কংগ্রেসইজম' একটা ধ্বনি হতে পারে, কিন্তু সেটা দলের মূল নীতি হতে পারে না।

রাজনারায়ণ-মধু লিমায়ে-ফার্নাণ্ডেজরা কংগ্রেস-বিরোধী বটে, তবে সেই সঙ্গে তাঁরা কম্যুনিস্ট-বিরোধীও বটেন। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনার পর শ্রীরাজনারায়ণ বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, পরদিন লেক এলাকা থেকে নাকি দুই লরী বোঁসিয়ার ধাপায় পাঠানো হয়েছিল। বিচার বিভাগীয় তদন্তের পর সেই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টকে (তাঁরা নিজেরাও যে ফ্রন্টের শরিক) হেয় করবার জন্যই তিনি যে ঐ দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতি দিয়েছিলেন, সে-কথা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় পুলিশী হামলার পর এই দলের অপর নেতা শ্রীরামানন্দ তেওয়ারী এসেছিলেন অপরাধী পুলিশদের হয়ে ওকালতি করতে। সুযোগ পেলেই এঁরা বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকারের কুৎসা রটনা করে থাকেন এবং সেজন্য আজগুবী কাহিনী বানাতেও পিছপা হন না। রাজ-নারায়ণ কলকাতায় এসে ওঠেন উত্তর প্রদেশের এক ধনী বণিকের বাড়িতে এবং উত্তর প্রদেশের সিণ্ডিকেট নেতা সি, বি, গুপ্ত তাঁর বিশেষ বন্ধু। কি করে গুপ্ত গভর্নমেণ্টকে উত্তর প্রদেশে টিকিয়ে রাখা যায়, সেটাই এখন তাঁর প্রধান রাজনৈতিক ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, কংগ্রেসের ভাঙনের পর এস-এস-পি দল তাঁদের দলের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে বেশ গোলমালে পড়ে গিয়েছিলেন।

শোনপুর সম্মেলনে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণের জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেল সেখানে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা আপোষ প্রস্তাবে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

এস এম যোশী, রামানন্দ তেওয়ারী এবং সরস্বতী অম্মল প্রমুখ কংগ্রেস (ইন্দিরা)-পন্থী সদস্যরা শ্রীমতী গান্ধীর দলের সঙ্গে সহযোগিতার যে প্রস্তাব তুলে-ছিলেন, সেটা তাঁরা তুলে নিয়েছেন। অপর দিকে রাজনারায়ণ প্রমুখ সিণ্ডিকেট-পন্থীরা সিণ্ডিকেটের সঙ্গে সহযোগিতার যে প্রস্তাব করেছিলেন, সেটাও তাঁরা তুলে নিয়েছেন। উপরন্তু উত্তর প্রদেশে বিনা-সর্তে সি বি গুপ্তের গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করার প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়েছে। স্থির হয়েছে গুপ্ত এস-এস-পি নির্দিষ্ট
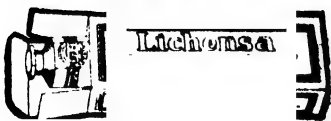
প্রকোর্ট সর্ত গ্রহণের অবেই তাঁর গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করতে পারে। এমন কি ইন্দিরা গভর্ণমেণ্ট যদি সেই সর্ত মেনে নেন, তাহলে তাঁদেরও সমর্থন করা যেতে পারে।

বিহার সম্বন্ধে স্থির হয়েছে যে, এস-এস-পি দলকে মন্ত্রিসভা গড়বার আহবান জানালে তাঁরা নিজেদের কর্মসূচীতে অটুট থেকে যে-কোন দলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করে মধু লিমায়ে বলেন যে, চণ্ডীগড় এবং তেলেঙ্গানা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্ট মস্ত ধাক্কা খেতে চলেছেন এবং সি বি গুপ্ত যদি উত্তর প্রদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর দল ভেঙে যাবে। কেরালার ঘটনার পর সি-পি-এমও ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থনের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত। পশ্চিমবঙ্গেও অবস্থা এমন দাঁড়াতে পারে যে, কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ডি-এম-কেও ইন্দিরার বিরুদ্ধে চলে যেতে বাধ্য হবে। রাজনারায়ণ বলেন, "কেন্দ্রের কংগ্রেস গভর্নমেণ্টকে ওলটাবার জন্য শয়তানের সংগেও আমাদের হাত মেলাতে হবে।"

সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক প্রস্তাবটি যে আকারেই গ্রহণ করা হোক রাজনারায়ণ-মধু লিমায়ের দল সিণ্ডিকেট-জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র পার্টির সংগে হাত মেলাতে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি নামে সোস্যালিস্ট থাকলেও অতঃপর এই দলটিকে চরম দক্ষিণপন্থী পার্টির অগ্রবাহিনী হিসাবে আবির্ভূত হতে দেখলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। তাতে পার্টির বামপন্থী অংশ কিভাবে সাড়া দেন, তার ওপরই নির্ভর করছে দলের ভবিষ্যৎ।

## আবার বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

উত্তর প্রদেশে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে ঘায়েল করবার জন্য সিণ্ডিকেট নাকি এক চমৎকার রণকৌশল স্থির করেছেন। তাঁরা নাকি ইন্দিরার পিসিমা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে ইন্দিরার বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাবেন। বিজয়লক্ষ্মীর কাছে ইতিমধ্যেই নাকি সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জনসঙ্ঘও নাকি শ্রীমতী পণ্ডিতকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সিণ্ডিকেটের ধারণা ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচনে হারাতে পারলে তাঁর দলের মধ্যে যে ভয়ানক বিভ্রান্তি দেখা দেবে, তাতে তাঁদের ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত হবে। সিণ্ডিকেটের এই স্ট্রাটেজিতে বিজয়লক্ষ্মীর সমর্থন পাওয়া গেছে কি না তা এখনও জানা যায় নি।

## চণ্ডীগড় সমস্যা

চণ্ডীগড় শহর কার ভাগে পড়বে তাই নিয়ে হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের মনোমালিন্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আকালী দলের নেতা সন্ত ফতে সিং আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, পুরো চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের হাতে তুলে না দিলে তিনি প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারী জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। তারই ভূমি প্রস্তুতের জন্য আকালী দল তাঁদের পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সন্ত ফতে সিংকে 'ডিক্টেটর' ঘোষণা করেছেন। আকালী মন্ত্রী এবং আইনসভার সদস্যরা সকলেই ফতে সিংয়ের হাতে তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। আকালী দলের ওয়ার্কিং কমিটি চণ্ডীগড় আদায়ের জন্য শিখদের সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। পাঞ্জাবী কংগ্রেসও চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছেন।

অপর দিকে হরিয়ানাও চুপচাপ বসে নেই। সেখানকার শিখ সম্প্রদায়ও চণ্ডীগড়কে হরিয়ানাভুক্ত করবার দাবি জানিয়েছেন। সেখানকার বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট দল এক প্রস্তাব পাশ করে বলেছেন যে, চণ্ডীগড় এবং পাঞ্জাবের হিন্দীভাষী এলাকা ও ভাখরা হরিয়ানাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

পাঞ্জাবের জনসঙ্ঘ প্রস্তাব করেছেন যে, চণ্ডীগড়কে হয় কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাখা হোক, না হয় পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক।

চণ্ডীগড় যার ভাগেই পড়ুক, চণ্ডীগড় আদায়ের জন্য সন্ত ফতে সিং-এর আত্মাহুতির সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনগণের সুবিধা-অসুবিধা, মঙ্গলামঙ্গলের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা উচিত। সেখানে আত্মাহুতি বা অনশনের ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা নীতিসম্মত বলে গণ্য করা খুবই কঠিন। চণ্ডীগড় যে রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হোক তাতে ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই সমান অধিকার থাকবে। কাজেই সেটা নিয়ে অনাবশ্যক সাম্প্রদায়িক অথবা ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করা দেশের পক্ষে সত্যই অতীব বিপজ্জনক।
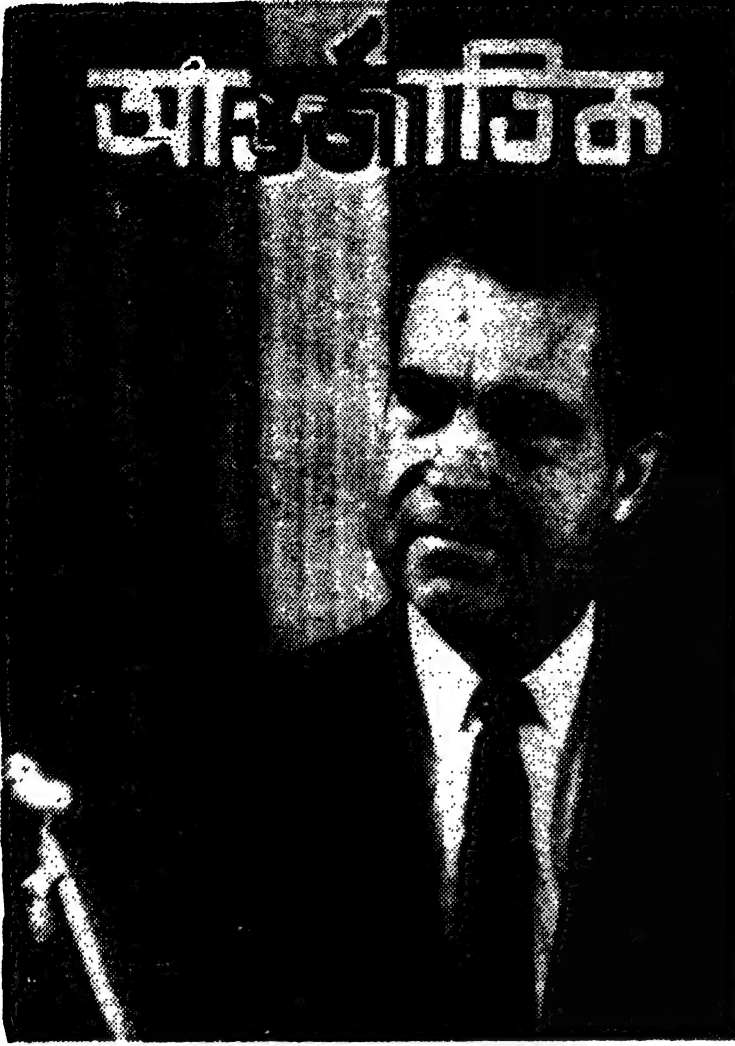
নিকসন কিছুদিন ধরেই চীনের সংগে সম্পর্কের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন।

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:**

**ওয়াশিংটনে** সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ২০শে জানুয়ারী ওয়ারশতে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে আলোচনা শুরু হবে। মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তরের পক্ষ থেকে ৯ই জানুয়ারী এই সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

পোল্যাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ওয়ালটার জে স্টোয়েসেল ও চীনা চার্জ দা অ্যাফেয়ার্স লে ইয়াং এবারের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। বিশ্বের দুই প্রধান শত্রু চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা অবশ্য এই প্রথম নয়। ১৯৫৫-তে জেনেভায় প্রথম দুই দেশের রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়! পরে এই আলোচনা পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন সময় দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১৩৪ বার এই বৈঠক হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে কিভাবে সম্পর্কের উন্নতি করা যায়, সে সম্পর্কে বারে বারে আলোচনা হয়েছে। এত আলোচনা সত্ত্বেও কার্যকরী কিছু অবশ্য এখনও হয় নি।

এবারের আলোচনার ব্যাপারে অনেকেই দেখা যাচ্ছে আশান্বিত। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন যে নতুন এশীয় নীতি গ্রহণ করেছেন, তা ঠিকমত বোঝাতে পারলে, চীনের বৈরী মনোভাব দূর হবে, মার্কিন কর্তৃপক্ষের এই ধারণা। এশিয়ায় যুদ্ধঘাঁটি রাখার, কিংবা চীনকে ঘিরে ফেলার কোন মতলব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই কথা চীনকে বোঝাবার চেষ্টা হবে।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সংগে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিদেশে অবস্থিত মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এখন থেকে অন্যান্য দেশের মত চীনের সংগেও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে। এর ফলে চীনের মনোভাব কিছুটা নরম হয়েছে।

নিকসন কিছুদিন ধরেই চীনের সংগে সম্পর্কের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন। রুমানিয়া সফরের সময় সোসেস্কুর সংগে এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন। রুমানিয়ার সংগে চীনের ভাল সম্পর্ক রয়েছে। সম্ভবত সোসেসকু চীনা নেতাদের সংগে এই ব্যাপারে কথা বলেছিলেন।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, চীন-সোভিয়েট সীমান্ত আলোচনা ব্যর্থ হবার সংবাদ প্রকাশের সংগে সংগেই এবার চীন-মার্কিন আলোচনার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। চীন সব সময় বলে, সোভিয়েট য়ুনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে যোগসাজসে চলে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করছে। অথচ চীন নিজেই এখন সোভিয়েট য়ুনিয়নের সংগে বিবাদ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে ঘনিষ্ঠতা করতে চাইছে। যদি সত্যি সত্যি চীন-মার্কিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাহলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

**নেপাল:**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি স্পিরো টি অ্যাগনিউ নেপাল সফরে এলে ৫ই জানুয়ারী কাঠমাণ্ডুতে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ছাত্ররা আগে থেকেই ঘোষণা করেছিল, অ্যাগনিউ কাঠমাণ্ডু এলে তারা বিক্ষোভ দেখাবে। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্বর আচরণের বিরুদ্ধেই ছাত্রদের এই বিক্ষোভ। কাঠমাণ্ডুর প্রধান বাজারের কাছে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

অবশ্য ছাত্রদের বিক্ষোভের ফলে অ্যাগনিউ'র সম্বর্ধনায় কোন ত্রুটি হয় নি। নেপালরাজের পক্ষ থেকে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদার সংগেই অভ্যর্থনা করা হয়েছে। ক্রাউন প্রিন্স বীরেন্দ্র তাঁর সংগে সংগে ছিলেন।

অ্যাগনিউ তাঁর কাঠমাণ্ডু ভাষণে নেপালের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থার উল্লেখ করে বলেন, ভারত ও চীনের মাঝামাঝি থাকার ফলে উভয়ের সংগেই তাঁকে সদ্ভাব রেখে চলতে হয়। এই ভূমিকা অনুযায়ী নেপালের উচিত, বিপরীত আদর্শের ও বিপরীত স্বার্থের রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজে অগ্রসর হওয়া।

**উপ-রাষ্ট্রপতি অ্যাগনিউ'র এই প্রথম বিদেশ সফর। প্রায় এক বছর হল তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।**

তারপর এই প্রথম তিনি [illegible] করলেন। এশিয়ায় তিনি এর আগে কখনও আসেন নি। ২৩ দিনে অ্যাগনিউ ১০টি এশীয় দেশ সফর করেছেন। তার মধ্যে অনেক জায়গাতেই তাঁর ভাগ্যে বিরূপ সম্বর্ধনা জুটেছে।

অ্যাগনিউ প্রথম গিয়েছিলেন ফিলিপাইনসে। রাজধানী ম্যানিলায় পৌঁছবার সংগে সংগেই ছাত্রদের বিক্ষোভ-মিছিলের সম্মুখীন হন তিনি। ৪০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনসের সৈন্যদের ভিয়েতনামের যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে, এই হল বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে বামপন্থী দলগুলি সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এশিয়ায় মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ।

অ্যাগনিউ এক ফাঁকে ভিয়েতনামও ঘুরে এসেছেন। তবে তা গোপনে। বিক্ষোভের ভয়ে, নিরাপত্তার কারণে, আগে থেকে উপ-রাষ্ট্রপতির সফরসূচীতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের উল্লেখ করা হয় নি।

অ্যাগনিউ নিকসনের নতুন এশীয় নীতির ব্যাখ্যা করেছেন সর্বত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় উত্তেজনা হ্রাস চায় এবং তার জন্য এই অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে মার্কিন সৈন্যও সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু তাইপেতে চিয়াং কাইশেকের সংগে কথা বলার সময় অ্যাগনিউ পরিষ্কার করেই বলেছেন, নিকসন নীতির অর্থ এই নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে যে সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তা তারা পালন করবে না। অর্থাৎ, প্রয়োজন হলে মার্কিন অস্ত্র, সৈন্য, অর্থসাহায্য, সবই পাওয়া যাবে।

**দক্ষিণ ভিয়েতনাম :**

দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নুয়েন ভান থিউ-এর সংগে আইনসভার জোর বিবাদ চলছে।

গত নভেম্বর মাসে নুয়েন ভান থিউ দাবি করেছিলেন, আইনসভার নিম্নকক্ষের তিনজন সদস্যের কার্যকলাপের সমালোচনা করতে হবে এবং আইনসভা সদস্যরূপে তাঁরা যে সব বিশেষ অধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করেন, তা কেড়ে নিতে হবে।

এই তিনজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ : তাঁরা কমিউনিস্টদের সংগে সহযোগিতা করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনাম আইনসভার সদস্য হয়ে কমিউনিস্টদের সংগে যোগসাজস! [illegible] আর কি হতে পারে? থিউ দলিল-দস্তাবেজ পেশ করে প্রমাণ করেছেন, এঁরা সত্যি সত্যি কমিউনিস্টদের সাহায্য করেছেন। এঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ আইন মাফিক ব্যবস্থা নিতে হবে, কিন্তু আইনসভার সদস্যরূপে তা পারা যাচ্ছে না। সুতরাং আইনসভার অনুমতি চাই।

## সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় অনন্ত সিংহের বিপ্লবীযুগের স্মৃতিকথা 'অগ্নি-যুগের একটি অধ্যায়' প্রকাশ করা গেল না।

—সম্পাদিকা

কিন্তু আইনসভার সদস্যরা রাজী নন। থিউ চাপ দেওয়া সত্ত্বেও নন। শেষ পর্যন্ত থিউ সমর্থকরা আইনসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং সদস্যদের আটক করে রেখেছে। থিউ হুমকী দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে সৈন্যবাহিনী আইনসভার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গত সপ্তাহে নিম্নকক্ষ থিউ-এর দাবি [illegible]। [illegible] [illegible] জন্য তিনজন সদস্যকে [illegible] করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু থিউ-এর প্রধান দাবি আইনসভা [illegible] মানেন নি। সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও অব্যাহতি (ইমিউনিটি) ছেড়ে দিতে তাঁরা সম্মত হন নি।

নুয়েন ভান থিউ এখন আইনসভার বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে তিনি সভা করে বেড়াচ্ছেন, কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে।

থিউ-এর বেশি ভয় 'তৃতীয় পক্ষকে' নিয়ে। সেনেট সদস্য ট্রান ভান ডন ও জেনারেল ডুয়াং ভান মিনের নেতৃত্বে আইনসভার বেশ কিছু সদস্য এই তৃতীয় পক্ষ গঠন করেছেন। এঁদের বক্তব্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, কমিউনিস্টও নয়, এঁদের সবাইকে বাদ দিয়ে খাঁটি ভিয়েতনামীদের নিয়ে তৃতীয় একটি পক্ষ গঠন করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে হবে। এই বক্তব্য যথেষ্ট সমর্থন লাভ করছে ভিয়েতনামে। থিউ-এর ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে এঁরা জনসাধারণকে সংগঠিত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

(১১।১।৭০)
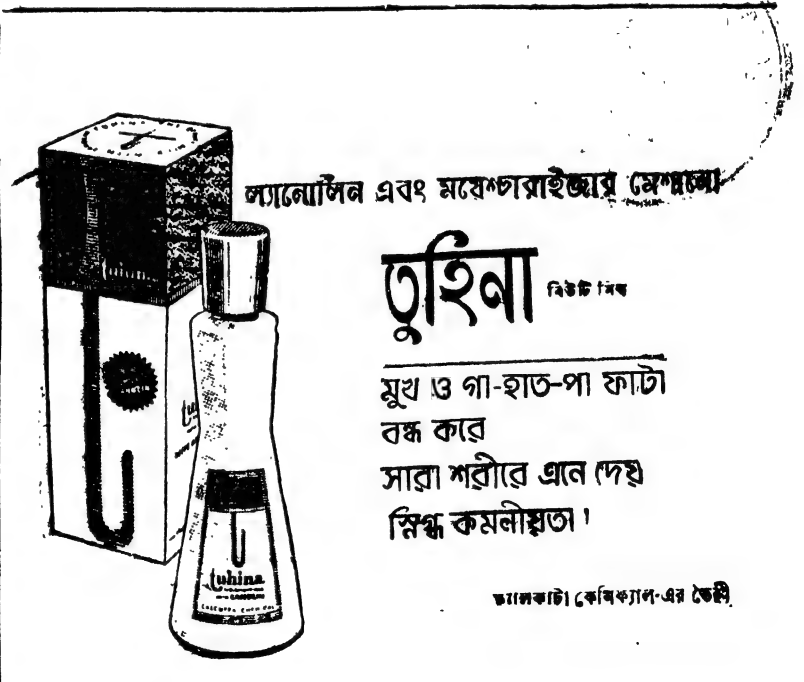
অনেকদিন চুপ করে বসেছিলাম। নয়ন মেলে হালচাল দেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ডাকাত-ডাকাত শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ডাকাত পড়েছে এই কথা শুনে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। ডাকাত কি, ডাকাতি কাকে বলে সেই সম্পর্কে নিজের ছোটবেলার এক ভয়াবহ স্মৃতি আজও আমার মাঝরাতের ঘুম কেড়ে নেয়। একদা আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ে. ডাকাতরা বহু লুঠপাট ও সঙ্গে আমার ভাইদের আধমরা করে রেখে গেছিল—আর আমার নিজের একখানা হাত এখনও জখমচিহ্ন বহন করছে। তাই আবার সেই ডাকাতের কথা শুনেই হাত-পা ঝেড়ে উঠে বসলাম। কি সর্বনাশ! ডাকাত নিয়ে এত হল্লা হচ্ছে, তখন কি চুপ করে বসে থাকা যায়? কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম, না— সত্যকার ডাকাত নিয়ে কোন সমস্যা নয়, সমস্যা দেখা দিয়েছে ডাকাত শব্দটা ব্যবহার ও তার পরিভাষা নিয়ে। সমস্যা মোটেই সেই ডাকাত বা ডাকাতি নিয়ে নয়, যারা গত দুই বৎসরে কলকাতায় পার্ক স্ট্রীট, সদর স্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে ডাকাতি করেছে।

অবশ্য সত্যকথা বলতে কলকাতার এই সব ডাকাতি নিয়ে কেনই বা রাজ্যের পুলিশ বা স্বরাষ্ট্র দপ্তর চিন্তিত হবে—কত আর ডাকাতি হয়েছে, সব মিলিয়ে এক কোটি টাকারও ডাকাতি হয় নি। জাপানের টোকিও শহরে গত বৎসরে কম করে দশ কোটি টাকার ডাকাতি হয়ে গেছে। কাজেই টাকা লুঠের ডাকাতরা মোটেই সমস্যা নয়। সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সি-পি-এম দল সম্পর্কে ডাকাত শব্দটি প্রয়োগ করায়। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ও যুক্তফ্রন্টের দেশে পলিও রোগ সৃষ্টি হয়েছে। কখনও রোগের প্রভাব বাড়ে, কখনও কমে। এই রোগ সম্পর্কে এতদিন শুনে আসছিলাম—এই রোগের মূল কারণ নাকি হল যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি শরিক দল মিনিফ্রন্ট করছে, কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ইন্দিরা-কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সি-পি-এম'কে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গড়ছে—আরো কত কি। বড় বড় ডাক্তাররা এই সব রোগ-তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। শ্রীপি সুন্দরায়া, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্যোতি বসু প্রায় সকলেই একমত হয়ে বলেছিলেন, রোগ ধরা পড়েছে, 'হিপ্ হিপ্ হুররে।'

তারপর বাংলা কংগ্রেস যখন গত ৬ই অক্টোবর রাজ্যব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন এবং তার অঙ্গ হিসাবে অনশন সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করার কর্মসূচী নেন, তখন ডাক্তাররা বললেন—ব্যাস রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে রোগীর রোগের লক্ষণ হুবহু মিলে যাচ্ছে, আর যায় কোথায়?

এই সময় রোগের আর একটা লক্ষণ ডাক্তাররা ধরে ফেললেন। সেটা হল, সি-পি-এম'এর কাছ থেকে তথা শ্রীজ্যোতি বসুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে নেবার চক্রান্ত হচ্ছে। এই ডাক্তারদের একজন শ্রী পি সুন্দরায়া একদা গম্ভীরভাবে দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন—শ্রীজ্যোতি বসুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেন, সি-পি-এম দলের কোন মন্ত্রীর হাত থেকে কোন দপ্তর ছুঁলেই মন্ত্রিসভার মৃত্যু ঘটবে, অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাবে।

তারপর অনেকদিন চলে গেল, বাংলা কংগ্রেস তার আন্দোলন এক মাস করে বিরতি ঘোষণা করল। মাঝে সি-পি-আই, ফরোয়ার্ড ব্লকের অনেক বড় বড় সভা হয়ে গেল, কিন্তু দেখা গেল মিনিফ্রন্টও নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলানোও নয়, শ্রীজ্যোতি বসুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে নেওয়া নয়, ডাক্তারদের সব রোগ নির্ণয় মিলছে না। কত ভবিষ্যদ্বাণী রচনা হ'ল, কাগজে হেড লাইন হয়ে হয়ে বেরিয়ে গেল, দিন তারিখ লগ্ন দিয়ে বলা হল রোগী কবে মরছে, অর্থাৎ সরকার কবে ভাঙছে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কবে পদত্যাগ করছেন।

প্রকৃতপক্ষে সেই অক্টোবর মাস থেকে দিন দেওয়া আরম্ভ হল। সরকার ভাঙছে, সরকার ভাঙলে কি হবে, আবার সি-পি-এম দলের উপর রিপ্রেশন হবে, অতএব যে যার আত্মগোপনের জায়গা স্থির কর অর্থাৎ আত্মগোপনের ঘাঁটি পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু রোগী আর মরে না। এর মধ্যে একজন প্রবীণ নেতা তথা ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি বললেন—অবস্থা যখন এই, তখন একটা চান্দ্রায়ণ করা হোক। এই নেতা হলেন শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত। ঋষি নিবারণ দাশগুপ্ত ধর্মীয় পথে নিদান দিলেন, রোগী সম্পর্কে এইভাবে সংশয় রেখে লাভ নেই—চান্দ্রায়ণ কর, তাতে হয় রোগী বাঁচবে, না হয় মরবে।

সুরু হল সেই চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা। সেই চান্দ্রায়ণ হল এই যে, যুক্তফ্রন্ট নেতারা লোকসেবক দলের দপ্তরে দুই দিনের বৈঠকে বসবেন—সেইখানে সব সমস্যার আলোচনা করে একটা মীমাংসায় আশা চেষ্টা করা হবে। দেখা যাক এ চান্দ্রায়ণে বসার বিধি নিয়েও একটা চান্দ্রায়ণে বসার বিধি নিবেও একটা সমস্যা দেখা দিল। সি-পি-এম দলের প্রধান ঋত্বিক তথা তাত্ত্বিক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন—চান্দ্রায়ণ করতে হলে তো বিধিমত বসতে হবে। অপবিত্র জে

যা মনে তো চান্দ্রায়ণে বসা যায় না। তাই আগে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে চান্দ্রায়ণের আগে পবিত্র হতে হবে, কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় নিজের সরকারকে অসভ্য বর্বর বলেছেন আর সি-পি-এম'কে ডাকাত বলেছেন—এই কথা থেকে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত শান্তি-স্বস্ত্যয়নে বসা যাবে কিভাবে?

খুবই সত্যকথা বলেছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত।

একদিকে ডাকাত বলবেন আবার সেই ডাকাতদের নিয়ে মন্ত্রিসভায় ঘর করবেন—এটা কি করে সম্ভব। তাই সর্বাগ্রে এই কথাগুলি প্রত্যাহার করে নিতে হবে অথবা বলা ভুল হয়েছে স্বীকার করতে হবে, তাহলেই শান্তি-স্বস্তায়ন করা হবে, তাব পরই চান্দ্রায়ণে বসা যাবে।

আমি তখন ভাবতে সুরু করলাম আচ্ছা ডাকাত মানে কি? ডাকাত মানে একটা জানি, যেটার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নিজের রয়েছে। কিন্তু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীঅজয় মুখার্জী যে ডাকাত সমস্যা নিয়ে বিড়ম্বিত, সেই ডাকাত ও আমার জ্ঞাতমত ডাকাত কি এক? এ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় প্রথম যেদিন সি-পি-এম সম্পর্কে ডাকাত কথাটা প্রয়োগ করেন ও যে পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেন, সেই ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই দিনটি হল ১৩ই ডিসেম্বর। বর্ধমান সার্কিট হাউসে বসে আছি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বসে আছেন, সংগে তাঁর নাতনী আর পাশের ঘরে রয়েছি আমি ও যুগান্তর পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক বন্ধু। বেলা তখন ৪টা। হঠাৎ শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নাতনী আমাদের ঘরে এসে প্রায় চিৎকার করে উঠল—ডাকাত—ডাকাত! না না, আমাদের সার্কিট হাউসে নয় বা একদিন আগে কলকাতার চার লক্ষ টাকার ডাকাতির ডাকাত নয়, ডাকাত পড়েছিল এইদিন কয়েক ঘণ্টা আগে আসানসোলে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কাছে আসানসোলে নিমচা কোলিয়ারীর টাকা ডাকাতির চেষ্টার বিবরণ শোনা গেল। ডাকাতেয় সংগে লড়াইয়ে দুই তিনজন মারা গেছে, এর আগের দিনও কলকাতায় ব্যাংক ডাকাতিতে একজন মারা গেছে। এরপর ঠিক পাঁচটার সময় বর্ধমান টাউন হলের ময়দানের সভায় বক্তৃতা দিতে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতা দিতে গিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শরিকী সংঘর্ষ, খুন-খারাপি আর মারপিটের বর্ণনা দিতে লাগলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন—ক্যানিং এলাকায় এক মুসলমান বুড়ি যার একটি বেগুনক্ষেত সম্বল, সেই বেগুনক্ষেতে এক ছোকরা বেগুন চুরি করতে এসে বুড়ির কাছে ধরা পড়ে গেল, বুড়ি বেগুন চোরকে গালাগাল করতেই সেই বেগুন চোর একখানি বল্লম এনে বুড়ির বুকে বসিয়ে দিয়ে বুড়িকে খুন করলো। আর দেখা গেল এই বেগুন চোর যে-সে ব্যক্তি নয়, কোন একটা রাজনৈতিক দলের গলায় লাল রুমাল বাঁধা পার্টির সদস্য। আচ্ছা, এদের সংগে পার্ক স্ট্রীট ব্যাংক ডাকাতি আর আসানসোলের কয়লাখনির টাকা ডাকাতির মধ্যে তফাৎ কতটা? ওরা টাকা ডাকাতি করতে গিয়ে মানুষ খুন করে, এরা বেগুন চুরি করতে গিয়ে মানুষ খুন করে। এই সব লাল রুমাল বাঁধা লোক যারা ধান লুঠ বা বেগুন চুরি করতে গিয়ে মানুষ খুন করে, তাদের সংগে পার্ক স্ট্রীট ডাকাতির ডাকাতদের খুনী হিসাবে কোন তফাৎ নেই। এই ডাকাত দিয়ে পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করা বা পার্টি বাড়ানো চলবে না। এই শুরু হল ডাকাত প্রসংগ। এই প্রসংগ ঘুরে-ফিরে অনেক কথায় পল্লবিত হয়ে আজকের ডাকাতি প্রসংগে এল। তাহলে মূল সমস্যা হল ডাকাতির সংজ্ঞা নিয়ে। যারা শুধু ব্যাংক ডাকাতি করতে মানুষ খুন করে তারা ডাকাত, না যারা পরের ধানক্ষেতের ধান আর বেগুনক্ষেতের বেগুন লুঠ করতে মানুষ খুন করে তারা ডাকাত? হঠাৎ 'যুগান্তর' পত্রিকায় দেখলাম শ্রীজ্যোতি বসুর নামে এক নতুন পাতি প্রকাশিত হয়েছে। ডাকাতের সংজ্ঞা নিয়ে যখন এত গোলমাল, তখন শ্রীবসুর কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বহু বিতর্কিত শ্রীহিরণ্ময় গাঙ্গুলীর ছোট বোন শ্রীমতী ছায়া গাঙ্গুলী সম্প্রতি গৌহাটিতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সংগে দেখা করেন আসামের কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীউমা শর্মার বাড়িতে। শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীমতী ছায়া গাঙ্গুলীকে প্রশ্ন করেন—কি চান আপনারা? ছায়া গাঙ্গুলী: আমাদের দাদা হিরণ্ময় গাঙ্গুলীকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে, এই হত্যার তদন্ত চাই। জ্যোতি বসু: ডাকাতের মৃত্যুর আবার তদন্ত কি? ছায়া গাঙ্গুলী: তিনি (হেনা গাঙ্গুলী) ডাকাত নন, তিনি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, রাজনীতি করতেন। শ্রীজ্যোতি বসু: রাজনৈতিক কর্মী আমরাও, বহুদিন রাজনীতি করছি, আমাদের পকেটে তো রিভলভার রাখবার দরকার হয় না, কিন্তু হিরণ্ময় গাঙ্গুলীর পকেটে রিভলভার থাকতো। রাজনীতি করতে রিভলভার লাগে না, রিভলভার দরকার লাগে ডাকাতের। তদন্তের কিছু দরকার নেই।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিরও প্রথম সারির নেতা—কাজেই শ্রীবসুর এই বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ আরো এই কারণে যে, পশ্চিমবংগ রাজনীতিতে কে ডাকাত আর কে ডাকাত নয়, সেটা নিয়েই একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই ক্ষেত্রে শ্রীজ্যোতি বসু যে কথা বলেছেন তার সার কথা হল রাজনীতি করতে রিভলভার লাগে না, রিভলভার থাকে ডাকাতের কাছে। একইভাবে তো বলা যায়—রিভলভারও মারণাস্ত্র, তলোয়ার, বল্লমও মারণাস্ত্র। কাজেই রাজনীতি করতে যদি রিভলভার দরকার না হয়, তবে সড়কি, বল্লম, তলোয়ারও দরকার হবার কথা নয়। মানুষ খুন রিভলভার দিয়েও হয়, তলোয়ার, বল্লম দিয়েও হয়। শ্রীবসুর পাতি মত রাজনীতিতে রিভলভার পরিত্যজ্য হলে বল্লম, তলোয়ারও পরিত্যজ্য হওয়া উচিত আর সেই পথ ত্যাগ না করে কেউ সড়কি, বল্লম নিয়ে রাজনীতি করলে তাকে ডাকাত বলা যেতে পারে। তাহলে তো শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যের সংগে শ্রীঅজয় মুখার্জীর বক্তব্যে কোন গরমিল নেই। গরমিল নেই ডাকাতের সংজ্ঞা নিয়ে, গরমিল নেই ডাকাতের হাতের অস্ত্র নিয়ে। কাজেই ঐ যারা সড়কি, বল্লম, তলোয়ার নিয়ে জমি দখল করে বা ফসল দখল করে তাদের আর যাই বলা যাক, রাজনৈতিক কর্মী বলা যায় না। কারণ শ্রীবসু তো বলেছেন—রাজনীতি করতে মারণাস্ত্রের অর্থাৎ রিভলভারের দরকার হয় না।
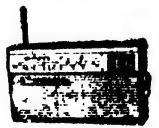
শ্রীজ্যোতি বসু গৌহাটিতে শ্রীমতী ছায়া গাঙ্গুলীকে যে কথা বলে হেনা গাঙ্গুলীকে ডাকাতের বেশি মর্যাদা দিতে রাজী নন, সেই কথা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অগণিত ঘটনা সম্পর্কে বলতে রাজী নন আর শ্রীঅজয় মুখার্জী সম্ভবত সেই কথাটা বলেই আজ রাজনীতিতে কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহকরূপে ধিকৃত হচ্ছেন।

শুধু ডাকাতির ক্ষেত্রেই নয়, ডাকাতের সংজ্ঞা বা অস্ত্র প্রসঙ্গেই নয়, একই রকম আরো অনেক ঘটনায় দেখা যাবে রাজ্য-রাজনীতিতে চাঁচির ডালে জায়গায় জায়গায় ঝাল, জায়গায় জায়গায় নুনের আধিক্য।

মনে পড়ে একদা কলকাতার ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট খেলায় শ্রীসীতেশ রায় নামক এক ব্যক্তি পুলিশের হাতে প্রহৃত হলে সে কি কান্ডই না হয়েছিল। একটু মনে করলে দেখা যাবে কংগ্রেস রাজত্বের কবরের ঘণ্টা বাজাতে যেমন বসিরহাটের নরুল ইসলাম, আর কৃষ্ণনগরের আনন্দ হাইতের মৃত্যু অন্যতম কারণ হয়েছিল, তেমনি ইডেন উদ্যানে শ্রীসীতেশ রায়কে প্রহারের ঘটনাও এই কার্যকারণে ইন্ধন যুগিয়েছিল। কিন্তু আজ দিনের তফাতে পুলিশের অব্যবস্থায় হোক অথবা পুলিশের লাঠিতে হোক, প্রায় আধ ডজন তরুণের যখন মৃত্যু ঘটে তখন জীবিত সীতেশ রায়ের প্রহারের ঘটনার মত আলোড়ন সৃষ্টি হয় না। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন—ট্রেন দুর্ঘটনা হবে বলে কি লোকে ট্রেনে উঠবে না? খুবই সত্য কথা। ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য লোকে ট্রেনে ওঠা বন্ধ করে না সত্য, তবে ট্রেন দুর্ঘটনা হলে রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী অন্তত করেছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ক্রীড়ামন্ত্রী বা পুলিশ-মন্ত্রীর পদত্যাগ বা এই জাতীয় প্রশ্ন কেউ উল্লেখ করতে পারেন না, সাহস পান না, তবে শ্রীপ্রফুল্ল সেন বা শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের আমলে এমন দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হলে শ্রীজ্যোতি বসু কি এই একই কথা বলতেন? আমি হলফ করে বলতে পারি—নিশ্চয়ই এই কথা বলতেন না। এই হল রাজ্যে যে স্ববিরোধিতার রাজনীতি চলছে তারই ফলশ্রুতি। যেখানে রিভল-ভার থাকে বলে হেনা গাঙ্গুলী ডাকাত আর যারা প্রসাদপুর, ক্যানিং-এ তীর, বল্লম, তলোয়ার নিয়ে বেগুনক্ষেতের বাড়ি বা রাজনৈতিক দপ্তরের মানুষ খুন করে, তারা ডাকাত বলে ধিকৃত হয় না। অথচ এই ডাকাত নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়ে রাজ্য রাজনীতির কতই না জল ঘোলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাকাত বলেছেন—এই অভিযোগ তুলে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই গেল, এই গেল করে কতই ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে ডাকাত বলতে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যা বলছেন, যাদের বলছেন—শ্রীজ্যোতিবাবুও তাই বলেছেন। শুধু তফাৎ হল—কথাটা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী বলবেন কেন? "আমার পাঁচু আরবে পাড়ার লোকে কবে ক্যান!"

—১০ই জানুয়ারী, ১৯৭০

# ফলাফল ?---

গ্রম দল
করায়। পশ্চিমবঙ্গে
ও যুক্তফ্রন্টের দেশে পা
হয়েছে। কখনও রোগে
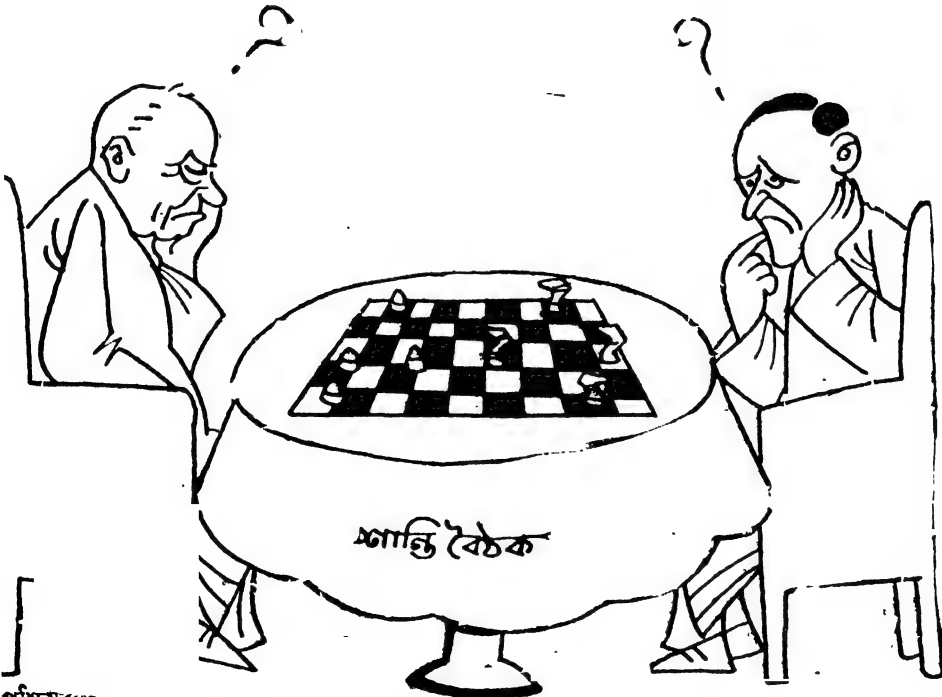
'[illegible]' কোন একটি সাপ্তাহিক পত্র সাহিত্যিকদের ডাক দিয়েছেন সমাজকে দেখবার জন্য। এ পর্যন্ত যাঁরা একে একে সাড়া দিয়েছেন তাঁরা সবাই কথা-সাহিত্যিক। এতে অনুমান করা হয়তো ভুল হবে না যে, আহবানটা একান্তভাবে তাঁদের কাছেই পেঁাছেছে এবং তাঁরাই সমাজকে কি চোখে দেখছেন বলতে চেষ্টা করেছেন।

মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, তবে কি এঁরা এতদিন সমাজকে না দেখেই লিখেছেন? অথবা এককালে দেখেছেন, কিছুকাল দেখা বন্ধ করেছেন? কিন্তু তাঁরা তো লিখেই চলেছেন। যদি আগে তাঁদের কথায় সমাজ প্রতিফলিত হয়ে থাকে, সম্প্রতি কি তা হচ্ছিল না? কৃত্রিম বেদনা সঞ্চার করাও প্রসূতিবিদ্যার একটা রীতি জানি, কিন্তু গর্ভসঞ্চারটা প্রাকৃতিক। আমরা এতদিন শুনে এসেছি, সাহিত্যেও বেদনাই সৃষ্টির উৎস এবং লেখকের পারিপার্শ্বিক অবস্থিতিই ভ্রূণ-ভাবনার সঞ্চার করে এবং বেদনার মধ্যে তার প্রকাশ হয়। অবশ্য দল বেঁধে প্ল্যান করে সাহিত্য-সৃষ্টির কথাও শুনি বটে, কিন্তু তার যে কি হাল একমাত্র মহাকালই সে সাক্ষ্য দিতে পারে। সচেতন লেখক নিশ্চয়ই, কিন্তু সে চৈতন্য লেখকের নিজের মধ্যে: সে তাঁর নিভৃত একান্ত সাধনা এবং এই সাধনালব্ধ শ্রেয়কে যিনি সচেতনে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই সার্থক লেখক। একথা কথাসাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে বেশি করে খাটে। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"র নিন্দাচ্ছলে হলেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এ কথাটি সত্যি যে—

"তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অন্ধতা।"

ঐ সাপ্তাহিকের আহবানে এ পর্যন্ত যাঁরা সাড়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারব না, বাকী সবাই বিস্তর লিখেছেন এবং এখনও দু' হাতে অনর্গল লিখছেন। শরৎচন্দ্র একটা গোটা উপন্যাস লিখে তার বক্তব্য বোঝাবার জন্য ভূমিকা লেখার প্রয়াসকে উপহাস করতেন, গল্পে যা বলতে পারলাম না ভূমিকায় তা বলতে হবে? ওঁরা অবিরাম অক্লান্ত লিখেও সমাজকে দেখার প্রমাণ যদি না দিয়ে থাকেন দু' পৃষ্ঠার একটা নিবন্ধে তা প্রতিপন্ন করবেন? অবশ্য বার্নার্ড শ' তাই করেছেন: নাটকও যত বড় ভূমিকাও তত বড় অথবা আরও বেশি বড়। কিন্তু বার্নার্ড শ'র মতো একাধারে প্রবন্ধ ও নাটক লেখবার প্রতিভা নিয়ে ক'জন জন্মায়? জন্মায় যে না, এ পর্যন্ত ওঁদের যে ক'টি জবানবন্দী পাওয়া গেছে তাতেই প্রমাণ। ওঁরা একে একে আসুন, আমরা একে একে নিরিখ করি। ওঁরা যে আমন্ত্রণপত্র আবাহন পেয়েছেন সেটি এই:

"সমাজজীবনে চারদিকেই আজ অস্থিরতা। ভাঙনের চিহ্ন আজ সর্বত্রই। পরিচিত মূল্যবোধগুলির রূপান্তর ঘটছে আজ দ্রুত। বিরাট এক যুগসন্ধির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছি আমরা। আজকের এই বিপর্যস্ত সময়ের দলিল হিসাবে একালের সাহিত্যিকদের বক্তব্য ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য।"

এ কথা কি যখন তারাশঙ্কর কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা অথবা আরোগ্য নিকেতন লেখেন তখনও প্রযোজ্য ছিল না? তিনি তৎকালীন সমাজজীবনের অস্থিরতা, ভাঙনের চিহ্ন, মূল্যবোধের রূপান্তর ও যুগসন্ধি লক্ষ্য করেন নি বিপর্যস্ত সময়ের দলিল করেন নি তাঁর বইগুলো? আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের মন কোথায় বিচরণ করেছেন দেখুন:

"বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ মনে পড়ছে দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্লকে মনে পড়ছে। ......রবীন্দ্রনাথের গোরা মনে পড়ছে।...... শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী এবং রাজেনের মত বিপ্লবীদের স্বাধীনতাযুদ্ধ শেষ হয়েছে।" এবং "আমার গণদেবতা পঞ্চগ্রামে সাধারণ গ্রামজীবনের সংগ্রামের কাহিনীর শেষে নায়ক দেবু ঘোষ করেছিল......"

কি করেছিল পরে বলব। লক্ষণীয় যে, কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের মন কথাসাহিত্যেই ঘুরপাক খেয়েছে, কেন না, এই ওঁর মানসিকতা। এবং তাঁর কথাতেই স্পষ্ট যে, তাঁর সাহিত্যিক চোখে দেখা তখনকার (বা আজকের) সমাজ তাঁর গল্প-উপন্যাসের কাঠামোতে আবর্তিত হয়েছে, হয়ে চলেছে, হবে। এই তাঁর (কথা) সাহিত্যের উপজীব্য। সে কথা তাঁকে আলাদা করে প্রবন্ধে বলতে হয় না, বলতে গেলেও গল্প, উপন্যাসের কথা মনে পড়ে এবং নিজেও গল্প করে বলতে পারলে বেঁচে যান। কারণ, সেই তাঁর সহজ বলা।

হ্যাঁ, তাই, "দেবু ঘোষ করেছিল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা"। সে পরিকল্পনা কি তাও তারাশঙ্করবাবু উদ্ধৃত করেছেন এবং এই বলে উপসংহার করেছেন: "এই ছিল আমার কল্পনা।" কল্পনা বা পরিকল্পনা যদি অনুক্ত থাকে অথচ কাহিনীর বিন্যাসে অভিব্যক্ত হয়, তবেই তা রসোত্তীর্ণ কথাসাহিত্যের মর্যাদা পায়; নতুবা কোন প্ল্যানিং কমিশনার আর কথা-সাহিত্যিকের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। বক্তৃতার ক্ষেত্রও শহীদ মিনারের নীচে, কথাসাহিত্য নয়, অথচ কণ্ঠবিদারী বক্তৃতা যা করতে পারে না কথাসাহিত্য তা করতে পারে। এবং করতে পারে বলেই জ্যোতি বসু গয়রহের চাইতে তারাশঙ্কর প্রমুখেরা অনেক বেশি শ্রদ্ধেয় ও কালোত্তীর্ণ।

কথাটা তা নয়। কথাটা হচ্ছে, তারা-

শংকর যে কারণে দু' পৃষ্ঠা এই নিবন্ধ লেখার আহ্বান পেয়েছেন সে-কারণ তিনি এতকাল পূরণ করে আসেন নি? এবং আলাদা করে অতিরিক্ত করে জানতে হবে তিনি কি চোখে আজকের সমাজকে দেখছেন? যাই দেখে থাকুন, তা ওঁর লেখাতে ফুটবেই, তিনি এখনও বেঁচে আছেন (বেঁচে থাকুন) এবং লিখে চলেছেন।

তারাশংকর এই নিবন্ধ লিখতে গিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে ঘুরে এসে নিজের সৃষ্টিতে (বা দৃষ্টিতে) এসে পড়েছেন এবং সর্বশেষে তাঁর নৈরাশ্য, তাঁর বেদনা প্রকাশ করেছেন। এই নৈরাশ্য, এই বেদনাও স্রষ্টার নবসৃষ্টির (বা দৃষ্টির) কারণ হবে। আর যদি তা না পারেন, আজ যদি তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে থাকে বা সৃষ্টির লেখনী মন্দগতি হয়ে থাকে তাতেও ওঁর অপরাধ নেই। তিনি যেটুকু দেখেছেন, যেটুকু লিখেছেন তাই আমাদের সম্পদ ও পাথেয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথও স্বীকারোক্তি করেছেন যে, তিনি বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হতে পারেন নি। কেউ হয় না। সেজন্য অভিযোগ করাও বাতুলতা।

কিন্তু কোনো কথাসাহিত্যিককে দিয়ে যদি তাঁর এতাবৎ কালের সমাজ দৃষ্টির বা সাহিত্য সৃষ্টির ভাণ্ডারকে পটভূমিকা করে আজকের এই মুহূর্তের অপরাধ-তালিকা করতে বলা হয়, তবে সাহিত্যিককে বলা হবে কনস্টেবলের কাজ করতে। [illegible] বিশ্বাস, তারাশংকর যখন নিবন্ধশেষে বলেছেন: “দেশ রক্তাক্ত, বিদ্বেষে জর্জর, হিংসায় ক্লিষ্ট, আক্রোশে ক্রূর, শিক্ষা, জ্ঞান মানুষকে প্রেমে-প্রীতিতে উদার করে নি, দলবাদ ও মতবাদের কলহে হত্যাকাণ্ড থেকে অগ্নিকাণ্ড চলেছে অবাধে” ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন তাঁকে যেন আমরা প্রশাসকের নিম্নস্তরে নেমে আসতে দেখি। ক্রাইম স্ট্যাটিসটিকস নিষ্করুণ অনস্বীকার্য; কিন্তু কথা-সাহিত্যিক লিখবেন তাঁর টেকনিককে ‘ক্রাইম এণ্ড পানিসমেন্ট’—দি ইডিয়ট-এ, তাঁর শিল্পকর্মে।

শেষ পর্যন্ত তারাশংকরবাবু এই স্বীকারোক্তি করেছেন: “আমরা সাহিত্যিকেরাও সেই রূঢ় সত্যকে যেন প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছি না।” যদি না পেরে থাকেন, কোনো অনুযোগ করবার নেই। তারাশংকরের পূর্বগামীরা যা “প্রকাশ করতে সক্ষম” হন নি তা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন বলেই তারাশংকর—তারাশংকর। তারাশংকর যা পারছেন না বলে মনে হচ্ছে তা যিনি করতে পারবেন তিনি হবেন পরবর্তী সার্থক কথা-সাহিত্যিক। আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করব। তারাশংকর যাঁকে বলেছেন, “মেঘান্তরালবর্তী সূর্য” তা অপ্রকাশিত থাকবে না।

একদা দুর্গেশনন্দিনী যখন দিক্‌-চক্রবালে উদ্ভাসিত হল তার আগেও বাংলার সাহিত্যাকাশে মেঘ ছিল। তারপর কথাসাহিত্য নানা স্তর পার হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ গল্পের বন্যা নামিয়েছেন, তাদের জাত আলাদা; শরৎচন্দ্র এলেন, তাঁর সৃষ্টিরও জাত আলাদা। তারপর তারাশংকর। বিচিত্র সৃষ্টি; কিন্তু মূলে উপাদান, উপকরণ, রসের উৎস এবং বাংলা সমাজ; সমাজের নিজস্ব গতি আছে, ক্রমাভিব্যক্তি আছে, বিবর্তন আছে; ভৌগোলিক কারণে শুধু নয়, প্রকৃতির কারণেও একটা মৌল বন্ধন থাকে অব্যাহত, অবিচ্ছিন্ন, অটুট। সবটা মিলিয়ে সাহিত্য। আর সহিত শব্দের যদি কোন অর্থ থাকে, তবে তা সমাজেরই সহিত। এর বাইরে যা তা বিকৃত অস্বাভাবিক মূল ও মূল্যহীন।

তারাশংকর যত কথা বলেছেন তাঁর সারাজীবনের তপস্যালব্ধ কথাসাহিত্যে, তার বেশি কি বলতে পারলেন এই দু' পৃষ্ঠার প্রবন্ধে কয়েকটি অনুযোগ ছাড়া? অনুযোগ ছাড়া যেটুকু বলেছেন সেটুকু তাঁর পূর্বসৃষ্টিরই রোমন্থন; এতে সাহিত্যের, কথাসাহিত্যের বা সমাজের সমৃদ্ধি ঘটে না।

তারাশংকর বলেছেন: “আজকের দিনের সমাজের দিকে তাকিয়ে মনে হয় গোটা একটা দেশের মানুষের জীবন যেন পতিত প্রান্তরে পরিণত হয়ে গেল।” এই বলে তিনি সাধক কবি রামপ্রসাদের সেই গানটি উদ্ধৃত করেছেন যেখানে তাঁর আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে: মন তুমি (না কি “মন রে”?) কৃষি কাজ জানো না, এমন মানবজীবন (জমিন?) রইল পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা।

তারাশংকরেরও সেই আক্ষেপ। রামপ্রসাদ আক্ষেপে গান লিখেছেন, তারাশংকরও তাঁর বহু আক্ষেপে, বহু বেদনায় বহু বই লিখেছেন। এই আক্ষেপ মানুষের চিরন্তন। মানুষ অল্পে সুখী নয়, ভূমা চায়। মানুষ পৃথিবীতে থেকে সুখী নয়, চাঁদে শুক্রগ্রহে যেতে চায়। মানুষ প্রকৃতির কাছে নতি স্বীকার করতে চায় না —যা অন্য জীবজন্তুরা করে, সে প্রকৃতিকে বুঝতে ও আয়ত্ত করতে চায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অতলান্ত বেদনাই তার জীবন শুধু আক্ষেপ—লাইট, মোর লাইট। সে ইউলিসিস—দিগন্তে কি আছে দেখ[illegible] তারও পরে, তারও পরে। অভ্রভেদী উদ্ধ[illegible] ঐ হিমশৃঙ্গটা কি দেখে আসব। [illegible] আক্ষেপ থেকে রামপ্রসাদের গান, তারাশংকরের কথাসাহিত্য। হ্যাঁ, তারাশংকরবাবু, দেশ রক্তাক্ত, বিদ্বেষ জর্জর, হিংসা-ক্লিষ্ট, আক্রোশে ক্রূর, প্রেম-প্রীতি-উদার[illegible] নেই, দলবাদ মতবাদের কলহ আছে, নী[illegible] নষ্ট—কিন্ত কি এই দুর্বার গতি, কোথা মানুষ চলেছে? সে তো সাহিত্যিক-কবি, গল্পকার, নাট্যকার—তাঁরাই বলবেন সাহিত্যিক (হ্যাঁ, কথাসাহিত্যিক) আর লক্ষ লোক থেকে আলাদা কিসে? তাঁ[illegible] হৃদয়বত্তায়, তাঁর মমতায়, তাঁর তীব্র অনু[illegible] ভূতিতে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর চাইতেও ব[illegible] দৃষ্টিতে। তাঁরা ঋষি, আর লক্ষ লোক যা দেখতে পায় না তাঁরা তাই দেখেন। লক্ষ লোকে কাবুলিওয়ালা দেখে, কিন্তু [illegible] দেখেছেন কাবুলিওয়ালার হৃদয়ে-রাখা তা[illegible] আত্মজার, “খোকীর” হাতের পাঞ্জা- রবীন্দ্রনাথ ছাড়া? সার্থক লেখক, কবি কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার তিনিই যাঁর দৃ[illegible] চোখই সতেজ অন্তর্দৃষ্টি এবং দূ[illegible] দৃষ্টি। অন্তস্তলে রাখা ছাপটাও যিনি দেখবেন, প্রবহমাণ ঘটনাকে অতিক্রম ক[illegible] অনাগত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী আসন্ন ঘটন[illegible] প্রত্যুষও তিনি দেখবেন। কথাসাহিত্যিকে[illegible] তাই হবে ঋষিদৃষ্টি, তারাশংকরবাবু [illegible] কারণে রামপ্রসাদের গান উদ্ধৃত ক[illegible] বলছেন, তিনি সাধক। ঐ গানেই তিনি ব্যক্ত; যেমন তারাশংকর তাঁর কথাসাহিত্যে ব্যক্ত।

শ্রীমনোজ বসুও এই নৈরাশ্য ও হতা[illegible] প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, বিবর[illegible]

অমৃতে মন্দ ফলে না। বলেছেন সমস্যা-জর্জর দরিদ্র দেশের কথা, বলেছেন চোরা-গোপ্তা ফিকিরের কথা, "অসুখ অশান্তি বরঞ্চ বিস্তর বেড়েছে", বলেছেন বাংলা কেটে দুই বাংলা করার কথা, নীতিহীনতার কথা, বলেছেন ভ্রান্ত নেতৃত্ব, ভণ্ড নেতৃত্ব, লোভী নেতৃত্ব। তারপর?

তারপর ফিরে এসেছেন নিজের চৌহদ্দিতে। সমাজের দিকে তাকিয়ে এবং সমাজ দেখে কি কি লিখেছেন: 'ভুলি নাই' লিখেছি। 'বাঁশের কেল্লা', 'সৈনিক', 'আগস্ট ১৯৪২' ইত্যাদি সংগ্রামের নানা পর্যায়ের কাহিনী। দেশের মানুষ উদ্বুদ্ধ হবেন বলেই 'নূতন প্রভাত' ও 'রাখিবন্ধন' নাটকের রচনা। স্বাধীনতা লাভের পর মহোল্লাসে লিখলাম 'নবীন যাত্রা'। অর্থাৎ, (কথা) সাহিত্যিকের চোখে তিনি যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। কিন্তু—"বৃথা বৃথা!"

তবে কি, মনোজবাবু, এই এক পৃষ্ঠার নিবন্ধটাই সার্থক? আগেকার সব লেখা মিথ্যে হয়ে গেল? উঁহু। এর পরেও তিনি লিখেছেন 'পথ কে রুখবে?' একালের রাজনৈতিক ইতিহাস। যার মূল কথা দেশবিভাগের বেদনা। কিন্তু তার মধ্যে এক বলিষ্ঠ আশা (প্রত্যয়?): "উভয় বঙ্গের আন্তর সৌহার্দ্য আচ্ছন্ন পথ আমাদের কেউ রুখতে পারবে না।" যথার্থই বলেছেন: বাংলা তথা ভারতের অলিখিত ইতিহাসের যে কয়েকখানা পাতা প্রবীণ ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন, লিপিকুশলতা ও সাহিত্যে সিদ্ধিকর্মের চরম স্বাক্ষররূপে বাঙালীর হৃদয়ে চিরকাল তা মুদ্রিত থাকবে। এবং প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন: নিদারুণ মর্মন্তুদ সত্য কেবল ইতিহাসের পাতায় না থেকে যাতে সাহিত্যের মাধ্যমে চিরজীবী হয়ে থাকে আপনি তার ব্যবস্থা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

মনোজবাবু এর চাইতে কি বেশি বলতে পারেন নিবন্ধে? কথাসাহিত্যিক অন্তরালায়িত থেকে পাঠকের যে নৈবেদ্য পান, নিবন্ধের পাদপীঠে এলে তিনি পাঠককেও বিরত করেন।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোনো আঙ্গিকে না গিয়ে স্বধর্ম পালন করেছেন। আরও একটা অতিরিক্ত গল্প লিখেছেন। উপসংহারে লিখেছেন: সময়ের দর্পণ প্রতিবিম্ব ধরে রাখে।

এটি অস্পষ্ট কথা। সময় কি করে সময় জানে; সময় আমাদের সুবিধার্থে একটা নাম। একে ধরে রাখে মানুষের কীর্তি। তার অন্যতম, সাহিত্য—কথাসাহিত্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও গল্প লিখেছেন। বহু গল্প-উপন্যাসের আরও একটা অতিরিক্ত গল্প। এ ছাড়া তিনি করতেনই বা কি—করবেনই বা কি?

এ'দের সবার মধ্যে স্পষ্টতম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তারও কারণ আছে। তিনি শুধু কথাসাহিত্যিক নন; তিনি একজন শিক্ষাবিদ অধ্যাপকও; ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁকে গল্প বললে চলে না, গল্পের মর্মার্থ সাহিত্যের মর্মকেও বুঝিয়ে দিতে হয়। সেই ঋজু পথটিও তাঁর জানা। তাই লিখেছেন:

"এমন কোনো কালই ইতিহাসে নেই—যখন সমস্যা ছিল না এবং সমকালীন শিল্পে-সাহিত্যে (যে রূপেই থাকুক) তা অল্প-বিস্তর নির্দেশিত হয় নি। আরিস্তোফানেসের নাটকেও প্রচুর রাজনীতি এসেছে—বিচার-ব্যবস্থা আর শিক্ষানীতির সমালোচনা রয়েছে, তাঁর আক্রমণ থেকে সোক্রাতেসও নিস্তার পান নি। জীবন আছে, তার সমস্যাও থাকবে—শিল্পী সাহিত্যিক তাকে চিরকাল রূপও দেবেন। কখনো কখনো ওভিদ কিংবা ভিক্তর য়্যুগোর মতো তাঁকে নির্বাসনে যেতে হবে, কখনো বা আঁদ্রে শেনিয়ের মতো প্রাণ দিতে হবে, কখনো ফিলডিংয়ের 'লিটল থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যাবে, কখনো মাকসিম গোর্কীর মতো জেল খাটতে হবে; কখনো সাহিত্যিকের রচনা নিগ্রো ক্রীতদাসত্বের মূল উচ্ছিন্ন করবে, কখনো বাস্তিলের কারাগার চূরমার করবে। সমকালীন চিন্তার সব বিচ্ছিন্ন ধারা-উপধারাগুলো লেখকের মনে এসে সমন্বিত হয়—তিনি তার ব্যাখ্যাতা হন—লেখক-শিল্পীর মধ্য দিয়েই যুগমনন প্রতিফলিত হয়। কোনো লেখক কোনো যুগের থিসিস হতে পারেন, দ্বিতীয় জন হতে পারেন অ্যান্টিথিসিস এবং তৃতীয়জনের সিনথিসিস হতেও বাধা নেই।

"কোনো দেশকে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায়ই হল তার সাহিত্য—এই সদুক্তিটি সুপ্রাচীন হলেও আজ পর্যন্ত সত্য হয়ে আছে। দেশ-কাল-মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস সাহিত্যই লেখে—ইতিহাস লেখে না, রাজনীতি লেখে না, সমাজতত্ত্ব লেখে না, বিজ্ঞানও লেখে না। এরা সবাই আংশিক—ভিক্তর য়্যুগো, স্তাঁদাল আর বোদল্যারকে মিলিয়ে তখনকার ফ্রান্সকে যেভাবে চেনা যাবে—কোন্ ইতিহাসে তা সম্ভব?

"আমি নিজে কোনো মহৎ দ্রষ্টা-স্রষ্টা নই, নগণ্য লেখক মাত্র। কিন্তু লিখি যখন তখন স্বভাবতই কালটাকে দেখি, তার আবর্তের মধ্যে থেকে (কারণ দূরত্বের নিরাসক্ত বিচ্ছিন্নতা আমার পক্ষে সম্ভব নয়) যতটা সম্ভব তাকে বুঝতে চেষ্টা করি।"

পরিচ্ছন্ন কথা। নালিশ নয়, অভিযোগ নয়, নৈরাশ্য নয়, হতাশাও নয়। বরং বলিষ্ঠ প্রত্যয় আছে, সূর্যোদয় হবে। "এই নেতিমূলক অবস্থা কখনো থাকতে পারে না।" কি সেই নেতিমূলক অবস্থা? আগে যে ধ্রুব-প্রত্যয় ছিল, যে মূল্যবোধ ছিল তা থেকে বিচ্যুত কিন্তু নতুন প্রত্যয়ের অবলম্বন, 'ধর্ম' (ধৃ ধাতু থেকে, চমকাবার কিছু নেই!) পাচ্ছে না। পুরোপুরি ধর্মান্তরিতদের বোঝা যায়। কিন্তু মধ্যবর্তী ত্রিশঙ্কু অবস্থা, এর মোহও ঘুচেছে, ওরটাও নিঃসংশয়ে আত্মস্থ করতে পারছি নে, এই নেতিমূলক অবস্থা। এ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তবু "আমি কিন্তু অবিমিশ্র অন্ধকার দেখছি না।"

নারায়ণবাবু বলেছেন, দরকার নেতৃত্বের—রাজনৈতিক নেতৃত্বের। বর্তমান নেতৃত্ব "না পারেন, আর কেউ আসবেন, কারণ ইতিহাস থেমে থাকে না।"

ঠিক। কিন্তু এইখানে একটু বিবাদ আছে সাহিত্যিক নারায়ণবাবুর সঙ্গে। রাজনৈতিক নেতারা বা রাজনীতিকেরা দলবদ্ধ হয়ে গেলে দল নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েন যে, দলের শেকড় ছড়ায় মানসক্ষেত্র অবধি, অনেকে রীতিমত দল-কণ্ডিসন্ড হয়ে যান, মুক্ত মন থাকে না, দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের চাইতেও দলশ্রীর চিন্তায় অবসেসান ঘটে। সে নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় নয়। বার্নার্ড শ'র মতো স্পর্ধা আমার হতে পারে না, বলতেও পারব না যে, রাজনীতিকেরা সমাজের তৃতীয় স্তরের লোক, কিন্তু এটা ঠিক যে, তাঁদের নেতৃত্ব খুব নির্ভরশীল নয়। ভারত বিভাগের মত সদ্য সর্বনাশ এবং বর্তমান ক্রমাবনতির দিকে তাকিয়ে নারায়ণবাবু এটি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, ওঁদের নেতৃত্ব নিরাপদ নয়, অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। সামাজিক নেতৃত্ব, মৌল চিন্তার স্রোত বইয়ে দিতে হবে চিন্তানায়কদেরই—তার মধ্যে সাহিত্যিকের—কবির, কাহিনীকারের, নাট্যকারের—সিংহভাগ। রাজনীতিকেরা সবচাইতে কম পড়েন, কম বোঝেন, কিন্তু বলিষ্ঠ সাহিত্যিকের ক্ষেত্র বৃহত্তর, যে কারণে রাজনীতিকেরা গোয়েন্দার পরামর্শে বই বাজেয়াপ্ত করেন, সাহিত্যিককে জেলে দেন, দড়িতে ঝুলোন বা জনতার নামে লিঞ্চ করেন। অতএব এ নেতৃত্বের ঝুঁকি নিতে হবে চাটুকার নয়, কোনো তত্ত্বদাস নয়, মোহমুক্ত বিদগ্ধ দুঃসাহসী সাহিত্যিককেই। এবং তবেই তাঁর কালকের আজকের পরশুর সমাজ দেখা সার্থক হবে।

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আনন্দ বললে—যথার্থ সত্য যা, তাকে কোনো উদ্ধৃতির জোরে দাঁড় করাতে হয় না। সে আপনিই দাঁড়ায়। রামনারায়ণ আর অক্ষয় দত্তের মধ্যে কোনো তুলনাই চলতে পারে না, কারণ দুজনের পথ এক ছিল না। দুজনে সর্বপ্রকারে আলাদা মানুষ।

আমি বললুম—জীবনের পথ নয়,—সাহিত্যের পথের কথাই ভাবো। জ্ঞানের কথা ছাড়া আরো নানা কথা আছে জীবনে। মৃত্যুঞ্জয়ও জ্ঞানের কথা বলে গেছেন, অক্ষয় দত্ত-ও। বংকিমচন্দ্রও সে-পথে অনেকবার অনেকভাবে হেঁটেছেন তো? বঙ্কিম কি সরসতা পরিহার করেছিলেন?

—রামনারায়ণ কি সেরকম? তাঁর 'নবনাটক' বেরিয়েছিল ১৮৬৬তে,—তার প্রায় বছর-দশেক আগে বেরোয় তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক'। তিনি যে জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন, সে-কথা মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু যে গ্রাম্যতার অভিযোগ ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে কেউ কেউ করে থাকেন, রামনারায়ণ সম্বন্ধেও কি সেই একই রকম অভিযোগ সংগত নয়?

—রামনারায়ণ পৌরাণিক নাটকও লিখে গেছেন, কোনো কোনো সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু ভাবানুবাদও তিনি রেখে গেছেন। সে-সব রচনায়—ঠিক গ্রাম্যতা নয়,—কিছু কিছু বন্ধুরতার চিহ্ন আছে বটে। সে-সব ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস সজ্ঞান,—তাঁকে খুবই সাবধানে লিখতে হয়েছে—অক্ষয় দত্ত যেমন ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ লিখতে গিয়ে তথ্যসন্ধানে, ভাষা-ব্যবহারে খুবই সচেষ্ট ছিলেন।

—সচেষ্টতা সাহিত্যিকের কোনো দুর্বলতা নয়। সচেষ্টতা লেখকমাত্রেরই ধর্ম। কবিই হোন আর নাট্যকার, প্রবন্ধ লেখক বা ঔপন্যাসিকই হোন, সব লেখককেই অল্পাবিস্তর সচেষ্ট হতে হয়।

—সাহিত্য-সৃষ্টির সেই মূল তাগিদের বিশ্লেষণে এগিয়ে গেলে আমাদের উপস্থিত প্রসংগটাই চাপা পড়ে যাবে। অতএব সে-কথা এখন থাক। অক্ষয় দত্তের মধ্যে সানন্দ প্রেরণা আর বিশুদ্ধ কর্তব্যজ্ঞান কী অনুপাতে বিদ্যমান ছিল,—রামনারায়ণের মধ্যেই বা কী পরিমাণে, সে-বিষয়ে এই একটি কথাই যথেষ্ট যে, অক্ষয় দত্ত কেরি-র মতোই একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন,—তাঁর কোনো সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিল না,—অপর পক্ষে রামনারায়ণ ছিলেন যথার্থ একজন সাহিত্যিক।

আনন্দ বললে—কেরি, মৃত্যুঞ্জয়, অক্ষয় দত্ত, রামনারায়ণ—এঁরা প্রত্যেকেই লেখক হিসেবে নিতান্তই মাঝারি মানুষ ছিলেন। সামর্থ্য এবং প্রয়োজনবুদ্ধি এঁদের যখন যে সাজে সাজিয়েছে, এঁরা সেই সেই সাজেই সেজেছেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' আর 'বেণীসংহারে'র বঙ্গানুবাদ—দুই-ই এই বিচারে মাঝারি রচনা মাত্র: মনে পড়ছে—ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—

বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী।
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি।

বঙ্কিমচন্দ্র যা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভাধর লেখক ছিলেন

আমি বললুম—এক নিশ্বাসে
চারজনের নাম উচ্চারণযোগ্য কি না, সে
তোমার নন্দিনী এখানে থাকলে তাঁকে
জিগেস করতুম। নন্দিনীর কাছে কথাটা
জবাব শুনতে পেলে তোমার আর কোনে
সংশয় থাকতো না। কিন্তু তিনি যখ
অনুপস্থিত, তখন আমাকেই বলতে হবে
কিন্তু পাঠকরা আমাকে এবং তোমাকে
ভুল বুঝবেন না তো? ঊনিশ শতকে
মধ্যপর্বের এই প্রসংগটি একালের অ
বাসনায়, ভিন্ন পরিবেশে, পৃথক সংসগে
কি এতক্ষণ টেনে ধরে থাকা ঠিক হচ্ছে

সে বললে—রামনারায়ণের ভক্ত পাঠ
তুমি, পাঠকরা সেটা বুঝবেন ঠিকই, কি
তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি যদি না ঘটাতে চা
তাহলে তাড়াতাড়ি বলো—কেন এই চার
নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা অনুচিত

—অনুচিত এই কারণে যে, ঈশ্বর গু
আর রামনারায়ণ উভয়েই যে-ধরনের
রেখে গেছেন, তাঁদের সেই ধরনটিই পৃথক
কেরি বা অক্ষয় দত্তের সংগে তাঁদের দৃ
মিল ছিল না। শোনো,—ঈশ্বর গু
কবি ছিলেন, কিন্তু কেরি বা অক্ষয় দ
তা ছিলেন না। রামনারায়ণকেও সে-অ
কবি' বলা চলে।

—সেটা কী রকম?

—আমি বললুম:

চিত্রকর দেখে যত বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিতে রঙ লেখে সেই সব
ফলে সে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূ
কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির রূপ
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য চিত্রকর কবি
স্বভাবের পট লেখে স্বভাবের ছবি

কেরি তাঁর 'কথোপকথনমাল
কতকটা তাই করে গেছেন,—অক্ষয়
সেটুকুও করেন নি বা করতে চান
বা পারেন নি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এ
রামনারায়ণ উভয়েই জানতেন—

কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি প্র
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকা
ভাব-চিন্তা, প্রেম-রস আদি বহু
সমুদয় চিত্র করে কবি-চিত্রকর॥

বললুম—শেষোক্ত দুজনেই ছি
'কবি-চিত্রকর'।

সে বললে—ওটা অতিশয়োক্তি।

আমি বললুম—মোটেই না।

—গুপ্ত-কবি বা নাটুকে-রামনার
বড়জোর 'পটুয়া' ছিলেন,—পটুয়া
দক্ষতা হোলো অশিক্ষিত পটুত্ব।

আমি বললুম—এ বিদ্যায় শিক্ষা
অশিক্ষার সীমারেখা ঠিক কোথায় কী

## সন্ধিকালে

সুশীলকুমার গুপ্ত

কি ক'রে জাগাব ওকে শতাব্দীর আলোর গভীরে?
কি ভাবে আবার তার বিশ্বাসের ভগ্ন সেতু বেদী
পাবে প্রত্যাশিত রূপ, ঝঞ্ঝাগ্রস্ত হৃদয়ের নীড়ে
জন্ম নেবে সেই পাখি যে তীরের মতো লক্ষ্যভেদী?

সে এক আশ্চর্য মায়া, থাকে এক প্রাচীন প্রাসাদে।
পরিমিত কপালের প্রান্ত ঘিরে সিঁড়ি-ভাঙা চুলে
দুর্বার রহস্য নামে, নিবিষ্ট আকাশ ওঠে দুলে
চোখের খিলানে যার সন্ধিতে টিপের মতো কাঁদে
মন্দিরের মগ্ন দীপ, হাতের চুনিতে সুনির্জন
কবিতার হৃদ্‌পদ্ম, কানে করুণায় মুক্তারূপে
প্রাগৈতিহাসিক অশ্রু ফুটে থাকে, দেহে চুপে চুপে
খেলা করে পৃথিবীর মৌলিক আদিম নদী বন।

তাকে ফোটাতেই হবে আলোতে এবং তার ভয়
দূর ক'রে পুনরায় মিলিত বিশ্বাসে অভিপ্রেত
সৌভাগ্যে সাজাতে হবে সেই প্রেমে যা পারে নিশ্চয়
নদীতে চড়াতে সেতু, অরণ্যে বসাতে ঘরক্ষেত।

তাকে জাগাতেই হবে যুগের আলোতে। তা না হ'লে
আত্মঘাতী তৃষ্ণালোভে চিন্তাস্বপ্ন সাধ যাবে শ'লে।

## একমুঠো যুঁই

বিশ্বরূপ মণ্ডল

হাতে একমুঠো তাজা যুঁইফুল নিলাম।
কল্পনায় অনুমানে একখানা মালা হলো
চকবেড় ধবধবে সুডৌল মালা
তোমার গলে পরিয়ে দেবো, সাধ ছিলো।

হাতে একমুঠো তাজা যুঁইফুল নিলাম।

মুঠোটা খুললাম; ধবধবে যুঁইগুলো
একরাশ শুঁয়োপোকা হয়ে গেছে;
হাতে বিঁধলো। এমন টাটকা যুঁইগুলো,
আশ্চর্য, কেমন কোরে শুঁয়োপোকা হলো।

তবু আবার হাতটা বন্ধ করলাম—
শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হবে মুঠোর মধ্যে
তারপর উড়ে গিয়ে নূতন ফুল ফোটাবে—
আশায় আশায় আবার হাত খুললাম,

আশ্চর্য, মুঠোভর্তি একরাশ বিবর্ণ শুকনো যুঁই।

ধ[illegible], তা জানি না,—তবে সে ভদ্রলোক একথাও লিখে গেছেন যে—

পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয়।
কবি-চিত্র কিবা চিত্র বিনাশের নয়॥

বললুম—ঈশ্বর গুপ্তের এই ইঙ্গিতটি মনে রেখে রামনারায়ণের কবিত্বের দিকটা ভেবে দেখা ভাল। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্মীদের অনুরোধে তিনি তাঁর ঐ 'নবনাটক' বইখানি লিখেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটের ঠাকুর-বাড়ির গুণেন্দ্রনাথ তাঁকে এই অনুরোধ জানান। গুণেন্দ্রনাথকে এই অনুরোধ জানাবার পরামর্শ দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা কেউই বিবেচনাহীন মানুষ ছিলেন না। এই নাটক লেখা হলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে প্যারীচাঁদ মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় রামনারায়ণকে পুরস্কৃত করা হয়। পরের জানুয়ারি মাসে ঐ ঠাকুর-বাড়িতেই বইখানি অভিনীত হয়।

আনন্দ বললে—সে যাই বলো, কিশোরীচাঁদ মিত্র বোধ হয় ঠিক কথাই লিখেছিলেন। তখনকার 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রিকায় তিনি মন্তব্য করেন—'The plot is poor and destitute of interesting incidents.' তিনি অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন—নাটকের নয়।

বললুম—রামনারায়ণ নিজেও অস্বীকার করেন নি যে, নবনাটকের 'প্লট' তুচ্ছ ছিল,—কিন্তু বহুবিবাহ প্রভৃতি কু-প্রথার বিরুদ্ধে এই নাটক লিখতে গিয়ে তিনি তো ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' বা 'আচার-প্রবন্ধ' ইত্যাদি বইয়ের রীতি মেনে নিয়ে জ্ঞানগর্ভ অন্য কিছু ফেঁদে বসেন নি। শুনেছি, তিনি নিজে নাকি বলেছিলেন—'যারা পলাট নাই, পলাট নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক।'

হো হো করে হেসে উঠে আনন্দ বললে—লেখকরা চিরকালই এবং সব দেশেই অতিরিক্ত সংবেদী,—না না অভিমানী! যাক্ জোড়াসাঁকো নাট্যশালা এখন অতীতের গর্ভে! সেখানে যদি ফিরে যাবার উপায় থাকতো, তাহলে তুমি আমি,—আমরাও একবার না-হয় গিয়ে দেখে আসতুম ব্যাপারটা। কিন্তু আমি বললুম—কিন্তু অভিনয় দেখবার সুযোগ না থাকলেও, বইটা তো হাতের কাছেই বিদ্যমান! তার প্লট যতোই তুচ্ছ হোক, দু'-একটি দৃশ্য তো এখুনি দেখা যেতে পারে। শোনো,—রায়েদের বাড়িতে বহু-বিবাহ-নিবারণী সভায় যেসব ইংরেজি-জানা কেতাদুরস্ত ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে গ্রামের অধিবাসী যুবজনের আলাপ-আলোচনা হয়েছে। একজন ইংরেজি-জানা যুবক তাঁর বন্ধুর প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি এসে পৌঁছোন নি দেখে, গ্রামের যুবককে তিনি বলেন—

—না ভাই তিনি এখনো এলেন না, আমি থিঙক্ করি, তার সে ভেঞ্চর এখনো হ্যাং করছে; তা চল যাই আমরা খানিক ওয়াক করি গে।

এই জগাখিচুড়ি ভাষার নমুনা দেখে গ্রামের যুবকটি মন্তব্য করেছিল—'তোমার আপনার কথার অর্থ আপনি বুঝলে।'

কলকাতার ভদ্রলোক তার জবাবে বলেন—পৈতে গলায় দিয়ে, কপালে তিলক রেখে, দাড়ি ধারণ করা,—এবং কথায় কথায় বাংলার সঙ্গে ফার্শী বুলি মিশিয়ে ফেলা যেমন তখনকার গ্রামের মানুষদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল,—কলকাতায় তেমনি—'আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে দু'-একটি ইংরেজি কথা ইয়ুজ করে থাকি—আমাদের ওরূপ হ্যাবিট বটে।'

আনন্দ বললে—রামনারায়ণের এসব লেখা আমার অপরিচিত নয়। আমিও তাঁর গুণগ্রাহী পাঠক একজন। কিন্তু তিনি বাড়োজোর একজন সাহিত্যিক-পটুয়া ছিলেন। —এই মনোভাবটা আমাকে রাখতে দাও।

আমি বললুম—তথাস্তু। এবার অন্য কথায় এগুনো যাক্।

[ ক্রমশ ]

## দুই সাংবাদিকের দৃষ্টিতে

(মতামত লেখকের)

॥ এক ॥

**পশ্চিমবঙ্গের** জনসাধারণ উৎকট কোন অবস্থা কদাপি বরদাস্ত করেন না এবং যে কোন দলই হোক না কেন, তারা মাত্রার বাইরে গেলেই তৎক্ষণাৎ জনসাধারণের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ভারতের যে কোন প্রান্তের জনসাধারণের চেয়ে অনেক বেশি রাজনীতি-সচেতন এবং সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি একান্তভাবেই দলীয় নেতাদের ইচ্ছানির্ভর নয়। দলীয় সংগঠন যতই দৃঢ় হোক না কেন, সমর্থকের সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেন, অজয় মুখোপাধ্যায়ই বলুন, প্রমোদ দাশগুপ্তই বলুন, কারোরই ক্ষমতা নেই এমন একটা রাস্তা নেবার, যে রাস্তা জনসাধারণের সার্বিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ একান্তভাবেই কামনা করেন যে, যুক্তফ্রন্ট থাকুক এবং সংশ্লিষ্ট সকল দলই মিলেমিশে থাকুক এবং এই যে লাইন, এর বিপক্ষে যিনিই কথা বলবেন, তিনি যত বড় নেতাই হোন না কেন, তাঁর দলের শক্তি যেমনই হোক না কেন, যুক্তফ্রন্টবিরোধী বলে চিহ্নিত হবেন এবং তা একবার হয়ে গেলে, পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে মুনাফা তোলা, হায়! অসম্ভব, তাই যুক্তফ্রন্ট চলছে এবং চলবে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের অনশন সত্যাগ্রহ গোড়ার দিকে সারা পশ্চিমবঙ্গেই বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল, কেন না, তাঁর অনশনের পশ্চাতে কতকগুলি মৌলিক যুক্তি ছিল। এ ছাড়া তাঁর মনোভাব ও সদভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করার কোন কারণ সঙ্গতভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুঁজে পায় নি। কিন্তু ঐ সত্যাগ্রহের অযৌক্তিক দীর্ঘতা, এবং শেষের দিকে কোন কোন নেতার প্ররোচনামূলক বক্তৃতাসমূহ প্রমাণ করল যে, বাংলা কংগ্রেসের এই অনশন সত্যাগ্রহের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে সেই উদ্দেশ্যসাধনের পথে সুকৌশলে লিপ্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কোনদিনও যুক্তফ্রন্ট ভাঙার কথা বলেন নি এবং তাঁর বক্তৃতাসমূহের মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিতও দেন নি। তিনি বার বার বলেছেন যে, যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চাইলে তিনি তা রাইটার্স বিল্ডিংসে বসেই করতে পারতেন। আসলে কয়েকটি কারণে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কার্যস্থলে নিজেকে অত্যন্ত অসুখী মনে করছিলেন এবং তাঁর এই মনোভাবের সুযোগ নেওয়া হয়েছে। শ্রীসুশীল ধাড়া অবশ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি তাঁর মনোভাব গোপন রাখেন নি। এ দপ্তর হাতে পেলে তিনি তিনদিনেই সব দেখে নেবেন, এই সকল কথা তিনি প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেন। এবং এর ফলে বলাই বাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও বক্তৃতাসমূহ যে আবেদন জনমানসে জাগিয়ে তুলেছিল, তা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রীসুশীল ধাড়াই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মিনিফ্রন্টের কথা বলেছেন এবং সুনিশ্চিতভাবে এই উক্তির দ্বারা তিনি যুক্তফ্রন্টবিরোধী কাজ করেছেন।

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের শরিক সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ কেউ পোষণ করে না। এই দলটির প্রতি অন্যান্য সকল দলের আক্রোশের কারণ একটিই। সেটি হচ্ছে এই দলের নেতাদের হামবড়াই ভাব, যেন জনকল্যাণের সকল মনোপলিই এঁদের হাতে। আর সকলেই এঁদের কাছে জনস্বার্থবিরোধী। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। এই সাপ্তাহিক বসুমতীতে, সম্ভবত বিগত সংখ্যায়, জনৈক লেখক একটি প্রবন্ধে এই কথা বলতে চেয়েছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করে পার্টিকে শক্তিশালী করার প্রবণতার বদলে যুক্তফ্রন্টের মূল্যে পার্টির শক্তিবৃদ্ধিই বামপন্থী দলগুলির কাছে অধিকতর কাম্য হয়েছে। প্রত্যেকটি দলই, গোর্খা লীগ, লোকসেবক সংঘ প্রভৃতি আঞ্চলিক দলগুলিকে বাদ দিয়ে, যুক্তফ্রন্টের শাসনকে নিজেদের দলবৃদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সকল পার্টিতেই এমন উপাদান ঢুকে পড়েছে যাতে পার্টিগুলির পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটলেও গুণগত উৎকর্ষ ঘটে নি। জঙ্গী কমরেডদের, কারা এই আখ্যা পেয়েছে তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, সকল দলই সাদরে আহ্বান করছেন, জানি না কেন। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে এরা সর্বাধিক সংখ্যায় ঢুকেছে, যেহেতু বৃহৎ বৃহৎ দপ্তরগুলো ঐ পার্টিরই হাতে আছে। বলা বাহুল্য, এদের বহু অনাচারই পার্টির নামে চলে, সে বাম বা ডান, যে কমিউনিস্ট পার্টিরই হোক, অথবা ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি, এস-ইউ-সি বা যে কোন দলেরই হোক। তবে যেহেতু এই জঙ্গী কমরেডদের সংখ্যা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিরই বেশি, সর্বাধিক অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয় ঐ পার্টিরই নামে, ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই একটা ধারণা দেশময় চালু হয়েছে যে, যাবতীয় অনর্থ এরাই ঘটাচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট অজস্র ভাল কাজ করেছে এবং সেই সকল কাজে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অবদানও বড় কম নেই, কিন্তু এই পার্টির সমর্থকসংখ্যা যেমন বাড়ছে, সেই সংগে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশই এই পার্টির ওপর অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন।

যুক্তফ্রন্টের মূল্যে পার্টিকে শক্তিশালী করার প্রবণতার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী দপ্তরগুলি সংশ্লিষ্ট

মন্ত্রীর পার্টির যেন সম্পত্তি হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গেই লুপ্ত হয়েছে যৌথ দায়িত্ববোধ। বস্তুত কোন একটি দপ্তরের কাজকর্ম আশানুরূপ না হলে, সে বিষয়ে অন্য কোন পার্টি কোন বক্তব্য রাখলে তা যুক্তফ্রন্টবিরোধী কাজ হিসাবে গণ্য হয়। এই সুবিধাবাদী নীতির চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে বর্তমান অবস্থায়। মন্ত্রীরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন এবং এই অবস্থায় কাজকর্ম চালানোও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। যুক্তফ্রন্টের মূল্যে পার্টিকে শক্তিশালী করার যে প্রবণতা দেখা গেছে, তার ফলে শরিকী সংঘর্ষ বেড়েছে। যে এলাকায় যে পার্টির সংগঠনে নেই, সেই এলাকায় সেই পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বাইরে থেকেও লোক আনা হচ্ছে এবং সেই কারণেই আন্তঃ পার্টি খুনোখুনি হচ্ছে। এটা খুব সহজ বুদ্ধির কথা যে, যদি বিবদমান দুটি পার্টি একই এলাকার লোক হয়, স্বাভাবিকভাবেই তারা পরস্পর পরিচিত হবে। এবং সেক্ষেত্রে লাঠি তোলার আগে উভয় পক্ষই তিনবার ভাববে। এবং দ্বিতীয়ত যারা মূলত রাজনীতি-সচেতন পার্টিকর্মী, তারা প্রতিপক্ষের অপর একজনকে খুন করতে পারে না। তারাই মারে, যাদের নিয়মিত ছুরি চালাবার অভ্যাস আছে।

কাজেই সর্বব্যাপী হিংসার তাণ্ডব থেকে অজয়বাবু যে সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিয়েছিলেন তার মধ্যে কোন অযৌক্তিকতা ছিল না, কিন্তু যখনই বোঝা গেল যে, অন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী স্বার্থ, যারা যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চায়, অজয়বাবুকে কাজে লাগিয়েছে তখনই অবস্থার পরিবর্তন হল। যে আন্দোলন গোড়ায় সরকার বা কোন দলের বিরুদ্ধে ছিল না, তা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হল এবং তার ফলে বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের বীজ ক্রিয়া করতে সুরু করল। পক্ষান্তরে বাংলা কংগ্রেসের এই আন্দোলনের শুরু থেকেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও বিষয়টিকে গ্রহণ করল অরাজনৈতিক ও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কেরলের ঘটনার পর থেকেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মাথায় মিনিফ্রন্টের ভূত চাপল, কেন্দ্রে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবার পর, এ রকম একটা বিশ্বাস সি-পি-এমকে গ্রাস করল যে, তাঁদের বাদ দিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনের প্রচেষ্টা হচ্ছে এবং এই ভূতের তাড়নায় তারা প্রলাপ বকে চলল, শুধু বাংলা কংগ্রেসের বিপক্ষেই নয়, যুক্তফ্রন্টের আরও সব শরিক দলের বিপক্ষে এবং তার ফলে অনেককে বাংলা কংগ্রেসের ক্যাম্পে ঠেলে দেওয়া হল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে দুটো পোল হয়ে গেল, একদিকে বাংলা কংগ্রেস অপরদিকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, আর মাঝখানে রইল কয়েকটি দল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রো-এদিক, কেউ কেউ প্রো-ওদিক।

কিন্তু এ অবস্থাটা যে দীর্ঘকাল থাকতে পারে না, সেটা যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি এতদিনে অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে শুরু করেছে। আজ যদি কোন তরফ ফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্ব নেয়, তা নিতে হবে নিজেদের অবলুপ্তির মূল্যেই। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এমন ইঙ্গিত কোনদিন ঘুণাক্ষরেও দেন নি যে, সি-পি-এম যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চায়। শ্রীসুশীল ধাড়া সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার ফলেই দলের কিছুটা অংশ নড়বড়ে হয়ে গেছে। খোলাখুলি বলতে গেলে ফ্রন্ট যদি ভাঙতে হয়, তার দায়িত্ব নিতে হবে হয় বাংলা কংগ্রেসকে, না হয় সি-পি-এমকে। যদি সি-পি-এম এ দায়িত্ব নেয় তাহলে তারা ধিক্কৃত হবে, কেন না, বাংলা কংগ্রেসের সব বক্তব্যই মিথ্যা নয়। আর বাংলা কংগ্রেস এই দায়িত্ব নিলে তারাও ধিক্কৃত হবে এবং সি-পি-এম-এর অভিযোগগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কাজেই যুক্তফ্রন্ট ভাঙার কল্পনা কোন তরফই করছে না এবং তা করার সম্ভাবনাও নেই। অতএব যুক্তফ্রন্ট চলছে এবং চলবে। —ইন্দ্রনাথ আচার্য

॥ দুই ॥

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির আসর বেশ জমজমাট, মুখ্যমন্ত্রী নাকি নিজেই নিজের সরকারকে 'বর্বর সরকার' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর দলের মতে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। নরহত্যা, রাহাজানি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি নাকি প্রাত্যহিক ব্যাপার। পুলিশ এখন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে—এ-কথাও বলা হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বাংলা কংগ্রেস দল সত্যাগ্রহ, অনশন প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগাবার চেষ্টায় রত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং একাধিকবার অনশন করতে কসুর করেন নি।

যুক্তফ্রন্ট খেটে খাওয়া মানুষের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই, ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের সংঘবদ্ধ করার কাজে লেগেছেন। আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর কিছু অংশ তাঁদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতেও সক্ষম হয়েছেন। সব থেকে বড় কথা তাঁরা আজ মাথা উঁচু করে মানুষের মত বাঁচতে চাইছেন। রাজ্য সরকারের ভূমিকা যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনিই হয়েছে। অর্থাৎ সরকার শ্রমিকের পাশে বন্ধু হিসেবেই দাঁড়িয়েছেন। এ ঘটনা বাংলাদেশে একেবারেই নূতন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মানুষের জীবনে স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করার কোনও সুযোগ ঘটে নি। ডাণ্ডা হাতে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের উপর নির্বিচারে। মালিক ও জোতদারের স্বার্থে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পুলিশকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, বর্তমানে পুলিশের ভূমিকা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। এবং যা না হলে সরকারের চরিত্র "বর্বর চরিত্র"ই থেকে যেত, সভ্য হতে পারত না। বাংলা কংগ্রেসের অভ্যস্ত চোখে পরিবর্তিত অবস্থা তাই কিছু নতুন ঠেকছে মনে হয়।

কৃষকদের কথায় আসা যাক। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাংলাদেশে কৃষকসমাজের মধ্যে আজ এক নতুন সাড়া জেগেছে। প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে বাংলা দেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে। জোতদারশ্রেণী এতকাল ধরে গ্রামে যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, কৃষক আন্দোলনের ফলে সেই সাম্রাজ্য আজ চুরমার হতে যাচ্ছে। ভূমিহীন কৃষকদের একাংশ কিছু জমি পেয়েছেন। এবার ফসলও হয়েছে ভাল। রাজনৈতিক দলগুলি ভেবেছিলেন ফসল তোলার সময় গ্রাম-বাংলায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ হবে। সৌভাগ্যের কথা, ফ্রন্টভুক্ত দলগুলি সচেতন থাকায় প্রকৃতপক্ষে বিনা ঝঞ্ঝাটেই ফসল তোলা শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, জোতদারের লুকোনো জমি উদ্ধার করে কিছুসংখ্যক ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ঐ জমি বণ্টন করে আপাতত আমরা দেশের কিছু মঙ্গল করতে পেরেছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে, ভূমিহীন কৃষক জমি পাবার পরেই (তা যত কমই হোক না কেন) মালিকে রূপান্তরিত হল—একথাও অস্বীকার করা চলে না। কাজেই, দশ-বিশ জন জমিদার ও কিছুসংখ্যক জোতদারকে খতম করে যে নতুন কৃষকশ্রেণী তৈরি হল বা হচ্ছে তাঁদের যদি যথাযথভাবে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার আবর্তে নিয়ে আসা না যায়, তাহলে এই নতুন ক্ষুদে জমিদারশ্রেণী একদিন সমাজতন্ত্রের পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করতে পারে। কৃষকসমাজ স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল। ভারতীয় কৃষকরা দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার দিক থেকে কিছু ব্যতিক্রম নয়। কাজেই ভূমিহীন কৃষকদের কিছুসংখ্যককে কিছু

[ ১৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

আপনা নগর কো সাফ রখে"।

নগরের প্রধান প্রধান রাজপথের তেমাথা, চৌমাথা বা পাঁচমাথার এক একটি হরিৎ-ত্রিকোণ আইল্যান্ডের রেলিং ঘিরে শুধু একটি বাণী : আপনা নগর কো সাফ রখে"।

দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। বুঝতে কষ্ট হয় নি, ও শুধু ব্যানারে-লেখা বাণীই নয়, বাণীটিকে কার্যত রূপায়িত করেছেন বারাণসীরই নাগরিকবৃন্দ। কলকাতা থেকে বারাণসী দূরে অন্ত্। তবু কথায়-কাজে সমন্বয় দেখে সর্বাগ্রে মনে পড়েছিল কলকাতারই কথা। ফিরে তাকিয়েছিলাম প্রশস্ত সাফসুফ রাজপথগুলির দিকে। পথে যদি কোথাও ময়লা থাকে তবে তা ঐ ঘোড়ায় টানা টাঙ্গার কল্যাণে। উপায় নেই। অবলা জীব। তবে মনুষ্যসৃষ্ট নোংরা আমার তো অন্তত চোখে পড়ে নি। যদিও পথঘাট জনসমাকীর্ণ। লোকবসতির তুলনায় নগরটিকে তাই সাফসুরত বলতেই হবে। তুলনামূলকভাবে কলকাতার পথঘাট তাই আমার চোখের সামনে উঁকি দিয়েছিল। জানি না, কোনো একান্ত দীর্ঘশ্বাস বারাণসীতে রেখে এসেছি কি না। অথচ নোংরা শহর বলে বারাণসীর একটা প্রখ্যাতি ছিল। উত্তরপ্রদেশে এটি যদি নোংরা হয়, বাংলা দেশের রাজধানী তবে কী! রাজপথ কলকাতার নোংরা-পাহাড়গুলি তাই স্মরণে এসেছে। নিজের নগর সাফা রাখার চিহ্নমাত্র স্মরণ হয় নি। বরং নগরকে কতভাবে নোংরা করা যায়, কলকাতায় তার নিয়মিত কম্পিটিশনের কথাই মনে পড়েছিল। বারাণসী বেড়াতে বেড়াতে কলকাতার অসাবধান নাগরিকের বে-পরোয়া নোংরা স্বভাবের কথাই বারংবার পীড়িত করেছে আমাকে। মনে হয়েছে, আসলে 'আপনা নগর' হিসেবে কলকাতাকে কেউ তো আমরা টানি না, কলকাতার দুরবস্থাও সে কারণেই। 'ভাগের মা' কলকাতার গঙ্গালাভে তাই অত বিড়ম্বনা।

অথচ ও'রা নিজের নগরকে আপনা করেছেন আষ্টেপৃষ্ঠে। যেদিকে তাকান, কেবল হিন্দী। রাস্তার নাম, দোকানের সাইন বোর্ড, গাড়ির নম্বর, হোটেল-রেস্তোরাঁর মেনুবোর্ড—সর্বত্র হিন্দী হরফ হৈ-হৈ করছে। বলছে, এসেছ এসো, তবে হিন্দীটা শিখে এসো। এ আমার নগর, আমার ভাষা না জানলে এখানে তোমার স্থান নেই। ফিরে যাও!

কলকাতায় ঐ আমিত্বটুকু একেবারেই নেই। সর্বভাষার, সর্বভাষাভাষীর অবাধ-স্বাধীন সমন্বয় ক্ষেত্র। 'নিজের নগর' এই বোধটুকু তাই কারও একক নয়। কলকাতা সম্পর্কে সকলেরই যেন একটা বিমিশ্র দায়িত্বহীন বেপরোয়া ধারণা।

বিশ্বনাথ দেবের আশীর্বাদধন্য হওয়ায় বারাণসীও নিত্য নতুন পুণ্যার্থী, ভ্রমণবিলাসী ও ব্যবসায়সন্ধানীর জন্য স্থান সঙ্কুলান করছে ঠিকই, কিন্তু কলকাতায় ভিনদেশীয় পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট ঢের বেশি। কলকাতায় যেমন আছে হরে-কর-কম-বা, তেমনি আছেন হরেক দেশের দেশওয়ালী। কলকাতার ওপর টানটা সেজন্যই বিমিশ্র। তা ছাড়া কলকাতার নিজস্ব বাসিন্দারাও বেপরোয়া. কলকাতা-কেন্দ্রিক শহরতলীর দৈনিক চাপও বে-আক্কেল। কাজেই কলকাতাকে আক্কেল সেলামী গুণে যেতেই হচ্ছে। লক্ষ পদের গুঁতিয়ে-চলা পদধূলি: সহস্র 'হাঁ'র তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠাধর নিঃসৃত পান-পিক শহরের পথঘাট চিত্রিত করছে। নিউ মার্কেটের যতেক পচাই ফ্রী স্কুল স্ট্রীট বুকে করে রেখেছে। শিয়ালদহ-বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ট্রামওয়ের বঙ্কিম ইস্পাত-বেল্ট ডুবিয়ে দিয়েছে পাতায় খোসায় আর পরিত্যক্ত ডাবের মালায়। চৌরঙ্গীর আর সেই চোখ-ধাঁধানো রূপ নেই। বড়বাজারের মহাজনরা ফড়িয়াদের মারফৎ এন্তার স্মাগল্ড গুডস বেচছে ফুটপাথ জুড়ে। বস্তুত গরীব বাঙ্গালীর অন্ন সংস্থানের কোন ব্যাপারই নেই। লিন্ডসের মোড় থেকে এস এন ব্যানার্জীর কিয়দংশে গুঁতো মেরে যে ব্যাপারীকুল ধর্মতলা স্ট্রীটের জ্যোতি সিনেমা হাউস পর্যন্ত ফুটপাত বেদখল করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই যে নিজের মূলধন[illegible] করেন না, তাতে সন্দেহের কারণ নেই। বড়বাজারের [illegible] রাস্তায় [illegible]। কলকাতার মানুষ খুঁড়িয়ে হাঁটেন। কর্পোরেশনে ট্যাক্স দিয়ে রসিদ গ্রহণ করেন। আজব নগরী কলকাতা, সেখানে কে কার জঞ্জাল হঠায়!

চিৎপুর, চীনেবাজার আর বড়বাজারের কোল-ঘেঁষা মহাত্মা গান্ধী রোডের পশ্চিমাংশ [illegible] ঠেলায়, গরুতে ঘোড়ায়, সওদায় ময়লায় হেঁপো রুগীর মতো [illegible] ক্রমাগত। তারই মধ্যে ঠেলে রাখা হল শান্তিপ্রিয় মুক্তিকামী কিবকবি আর শান্তির পলিটিকেল আমদানী-রপ্তানীকারক গান্ধীজীকে। অর্থোন্মত্ত এ দুটি রাজপথে দুজনেই হয়ত হাঁপিয়ে উঠলেন এতোদিনে। গান্ধীজী যাও বা পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আউট্রামের মূর্তি হটিয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনের সুযোগ পেয়েছিলেন, গান্ধীভক্তদের সেটুকুও সহ্য হল না। তাঁদেরই বাপুজীর মূর্তি আড়াল করে তাঁরাই একটা বদখৎ টেন্ট খাটিয়ে ফেললেন রাতারাতি। জমি দখল হল। এখন ভজন আর সুতোকাটা চলেছে। এর দ্বারা কে যে কেমনভাবে উদ্ধার পেয়ে তরে যাবেন বোঝা ভার। সৌন্দর্যটুকু চোখের আড়ালে মার খাচ্ছে এটুকুই কেবল বুঝতে পারি। গান্ধী-রবীন্দ্রের জন্য প্রশস্ত ছায়া-শীতল এ্যাভিনিউ বেছে জায়গা করে দেওয়া যায় কি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা-ও ভাবতে পারেন। আমার নিজের তো খুবই ভাবনা হয় ও'দের দুজনকে অমন দম-শ্বাসরুদ্ধ গলিতে গুঁজে রাখার জন্য। শেক্সপীয়র সরণী যেমন আছে থাক, আপত্তি নেই দুই আচার্যের সার্কুলার রোড জুড়ে অবস্থানে কিন্তু কবি ও গান্ধীজীর পুনর্বাসন প্রয়োজনীয়।

কিন্তু নামতত্ত্ব থাক, কথা হচ্ছে কলকাতার এবড়ো-খেবড়ো নোংরা চেহারা নিয়ে।

পাঁচ মিশেলি নাগরিকের পদার্পণে শুধু যে কলকাতা পঙ্ককুণ্ডে ভোলানাথ সেজেছে, এমন দাবি আপন দোষে চো[illegible] বন্ধ রাখার সামিল। বস্তুত, আমরা যারা কলকাতায় বসবাস করি, সকলেই সম[illegible] দায়িত্বহীন। আপনা নগরকে অধিক[illegible] কুৎসিত করার জন্য প্রত্যেকেই যেন কো[illegible] বেঁধেছি। নাগরিক অসাবধানতায় নো[illegible] পথঘাট থেকে দুসারি বাড়ির দেওয়া[illegible] চোখ তুললেও কলকাতার [illegible] সমবেত অত্যাচারটার সোচ্চার [illegible] মিলবে। বিজ্ঞাপনের এমন অ[illegible] মাগনা জায়গা দুনিয়ার [illegible] কোনো শহরে সুলভ কি না - জানা [illegible] আমার। [illegible] ত্রিকোণ থেকে '[illegible]' বি[illegible] সস্তা হিন্দী ছবির জট শিরটিনা[illegible] [illegible] নর্তকীর কাট-কাটন[illegible]

নায়কের বিভঙ্গমুরারি পোজ ; সার্কাসের বনমানুষের রোমশ নাঙ্গা শরীর; বাঙলা ছবির প্রেমবিহ্বলা নায়িকার আলুথালু চেহারা, কিম্বা স্নেহবিগলিতা জননীর করুণ ঢাউস মুখ-চিত্র—এ সবই ছত্রাকারে ছড়িয়ে আছে প্রাচীরগাত্রে। শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে ভয়ংকর গোলমাল চারদিকে ভেপসে আছে। এমন দিনের দোর নেই, যখন শহর কলকাতার একটি বাড়ির বাইরের দেওয়ালও আর কেউ খরচ করে রঙ করাবেন না। ইঁট-পাটকেলের ভয়ে কাচের দেওয়াল দিয়ে ব্যবসায় ক্ষেত্রকে সুদৃশ্য এবং অন্তর্ভাগ দৃশ্যমান করে তোলার উদ্ভিন্ন চেষ্টা অনেক আগেই অংকুরে খতম হয়ে গেছে। জওহরলাল নেহরু রোডের ওপর একটি বিমান অফিস কাচের ওপর ইস্পাতের পর্দা ফেলে দিয়েছে। উপায় কি!

'এ সিটি অব কনট্রাস্ত'!—বিস্মিত কণ্ঠস্বরে কলকাতা বন্দনা করেছিলেন জনৈক জার্মান পর্যটক।

গ্র্যান্ড হোটেলে পরিচয়। প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেমন দেখলে আমাদের এই শহর?'

উত্তরে সাহেব জানালেনঃ বিচিত্র! এ সিটি অব কনট্রাস্ত!'

সেদিনই এক করুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরেছেন সাহেব। ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়েছিলেন কালীমন্দির সন্দর্শনে। সাহেবের ধারণা হয়েছিল, তিনি শহর থেকে শহরতলীতে ভ্রমণ করে ফিরছেন। দোষ নেই, চব্বিশতলা বাড়ি চোখে সইতে-না-সইতেই আধাতলা টিনের চালা যদি কারও নয়ন-পীড়ার কারণ হয় তবে তিনি যখন জানবেন, মাইল দুয়েকের ব্যবধানে একই শহরে এমনি সাংঘাতিক বৈপরীত্যই স্বাভাবিক তখন কনট্রাস্টটা তাঁকে সজাগ করবে বৈকি। সাহেব দেখলেন, বাইশতলার কোলেই টিনের চালা। সুটেড বুটেড মানুষের গা ঘেঁষে চলেছে পাঙশুটে ভিক্ষুকের পাল। ফুটপাথে জ্বলছে পারিবারিক উনান। হাসপাতালের প্রবেশপথের রাস্তায় প্রসব করছেন ভবঘুরে জননী। রাজপথ পা তুলে দিয়েছে কাণাগলির কাঁধে। রোলস রয়েসের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে হাতে-টানা রিক্সা।

আমাদের চোখে অবশ্য সয়ে গেছে। আমরা জানি, লিন্ডসে স্ট্রীটকে পিছে রেখে দু পা পুবে বাড়ালেই লোংরা কলিন স্ট্রীট আর ওয়েলেসলী। আরও দিকে কোণা মেরে এগিয়ে গেলে বেলেঘাটার আঘাটা কিম্বা ট্যাংরার শুকরবাটি; অথবা আরও কাছে উন্মুক্ত বড় রাস্তার ওপর মৌলালী নীলরতন সরকার হাসপাতালের মাঝে পচা নোংরার পাহাড়।

আবার তাকে ঘিরেই সি আই টি, ভি আই পি-র প্রশস্ত মুক্তি।

এ সিটি অব এভরি মিনিটস কনট্রাস্ট।

মাছি-মশা-খাটালসমৃদ্ধ এ শহর যেন সীমার মধ্যে অসীমকে বেঁধে ফেলেছে।

কাগজে পড়েছিলাম, কোন এক বিদেশিনী শহরে একটি মশার কামড় খেয়ে রাগে-দুঃখে কোর্টে গিয়ে এক নম্বর ঠুকে দিয়েছিলেন তথাকার কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে। আর বর্ষায় একগলা কাদায় ডুবে বছরের পর বছর কলকাতা নির্বিবাদে পৌরপিতা নির্বাচন করে আসছে। এতে পিতৃকুলের শ্রী ফিরেছে কি না অত ঘরের খবর বলতে পারি না, তবে কলকাতা যে হতশ্রী হয়েছে তা নিত্য চাক্ষুষ করছি। ওদিকে যথেষ্ট ট্যাক্সো বৃদ্ধির আনন্দে মশগুলে লালবাড়ি জাঁকিয়ে কাছারি করছেন এস এন ব্যানার্জী রোডে। ক্রিকেট মাঠে পার ক্যাপিটা জোড়া টিকেট না পেলে পৌরপিতৃকুল রাগে বে-হেড হয়ে যাচ্ছেন। শহর নির্বিকার।

কলকাতায় স্মরণীয় সেই সত্যেন দত্তের কবিতাঃ মারী নিয়ে ঘর করি। বাৎসরিক একবার টিকা দানেই কর্তব্য খতম। মাছির তেল অধুনা অদৃশ্য। খোলা খাবার, পাগলা কুকুর নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। পথে পথে ছ' ইঞ্চি গভীর গর্ত দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যু-ফাঁদ পেতে রেখেছে। লাল ত্রিকোণকে উল্টোভাবে ব্যবহার করার ওটা কোনো ষড়যন্ত্র কি না কে জানে। ভয়ংকর এই নয়া মাল্থুসিয়ান মতবাদ।

অবশ্য কলকাতায় 'সাজাব যতনে' ইচ্ছা সফল করা দেবেরও অসাধ্য। অনন্ত কনট্রাস্টকে ভেঙে গড়ে একটা মিল-মিশ ঘটানো যুক্তফ্রন্টে মিষ্টি মৈত্রী গড়ে তোলার চাইতে শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। নজরটা তাই বর্তমানে জওহরলাল নেহরু রোড ও আশপাশে ঘিরে। নিওনে নিকিয়ে উজ্জ্বল করা হচ্ছে রাস্তাগুলি যদিও রেড রোড অধিকতর উজ্জ্বল।

হু হু করে বাইশ-চব্বিশতলা বাড়ি উঠছে নয়নাভিরাম। কিন্তু একই সঙ্গে মনপ্রাণও টাটিয়ে উঠছে আমাদের। কারণ কলকাতা থেকে এবার সপরিবারে বাঙালীর বাস উঠবে। কাজটা ট্যাক্সো বৃদ্ধির চোটে কর্পোরেশন অবশ্য অনেকটা এগিয়েই রেখেছেন। এবার শুধু অট্টালিকার ঠেলা। ঐ আকাশফোঁড়া বাড়িগুলির মালিক মহাজনরা ক্রমে কোঠাবাড়ির বাঙালী মালিকদের গুঁতিয়ে তাড়াবেন। সনস্ অব দি সয়েল ক্রমশ শহরতলীতে পিছিয়ে পড়ছেন, আরও পড়বেন। সেই যে একদিন ইংরেজ বণিকরা এসে ফোর্ট উইলিয়ম আর লালদীঘির (বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) চারধারে পত্তনী গেড়েছিল, ভারতীয় বণিকদের কল্যাণে এবং কর্পোরেশনের সহায়তায় (ট্যাক্স বৃদ্ধির বেহিসেববশত) এই বণিকী পত্তনী আজ বহু দূরে সম্প্রসারিত। সনস্ অব দি সয়েল আর পিচের রাস্তায় জায়গা পাচ্ছেন না। আরও উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে ঠেলতে ঠেলতে তাঁদের এখন লোকাল ট্রেনের সওয়ারে পরিণত করা হচ্ছে। গরীব বাড়ি-মালিকের পড়তি আয় কর্পোরেশনের বিচারে আসে না। বাঙালী মালিক বাঙালীকে ভাড়া না দিয়ে অবশেষে অন্য ভাড়াটিয়ার চাপেও বহু ক্ষেত্রে মালিকানা ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন। ওদিকে ভিটেছাড়া নতুন ইহুদির কলকাতাকে ঘিরে যে বন কেটে বসত বানাচ্ছেন, একদিন বণিকের লোলুপ হাত সেগুলিও গ্রাস করবে। নাকতলা, যাদবপুর, বিরাটি, বাগুইহাটি, হরিনাভি, বারুইপুর যতই গড়ে উঠবে, কলকাতা ততই বে-দখল হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে, কলকাতা এক সময় বঙ্গদেশ নামক একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের রাজধানী ছিল। তখন দেখব, কলকাতায় সবই আছে, নেই বঙ্গভাষাভাষী জনমানবের স্থায়ী বসত।

দোষ আমাদেরও কম নয়। পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব বাঙলার নাম বাঙলা দেশ রাখবার জন্য আন্দোলনে নামছেন। আমরা কলকাতায় সাইন বোর্ডগুলিও বাঙলায় লেখাতে পারলাম না। আমাদের এই ঔদার্য একদিন উদ্যত খড়্গের মতো আমাদেরই ঘাড়ের ওপর নেমে আসবে। তখন আর সংশোধনের সময় থাকবে না হয়ত। অথচ উত্তরপ্রদেশে দেখলাম, হিন্দী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

কলকাতাকে নিজের বলে ভাবতে, সাজিয়ে ধরতে, আবেগ উদ্বেগ কোনটাই আমাদের নেই। আপনা নগর নয়। 'কিস কা নগর?' কলকাতা ঘিরে এটাই প্রশ্ন। একে অপরের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কার নগর এই মহানগরী? কার দায়িত্ব একে মনোহারিণী করে গড়ে তোলার?'

উত্তর নেই।

কলকাতা এমনি গোলমেলে শহর। শহরবাসী আমরা সব কথার সঠিক উত্তর জানি না।

—নিরেন

# মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান তত্ত্ব ও বিশ্বরাজনীতি / কাশীকান্ত মৈত্র

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

[ পাঁচ ]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আপেক্ষিক স্থিতাবস্থাতত্ত্ব মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের এক পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির সম্মুখে এনে হাজির করে। সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার তাগিদে এই সাময়িক আপেক্ষিক স্থিতাবস্থাতত্ত্বের গুরুত্ব ঘোষণা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সামরিক ব্যবস্থাকে মজবুত করতে হবে। আবার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে চরম রূপায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে বিপ্লবের আগুনকে ছড়িয়ে দিতে হবে অথবা বিপ্লব-প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করতে হবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অথবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠী-নির্ভর বা জোট-নিরপেক্ষ অকমিউনিস্ট দেশগুলিতে--আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সংগে চরম হিসেবনিকেশের জন্য ও "সমাজতান্ত্রিক শিবিরের" চূড়ান্ত বিজয় সুনিশ্চিত করার মানসে। পুঁজিবাদী শিবিরের আভ্যন্তরীণ সংকটকে তীব্র ও ঘনীভূত করে তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধাবার অবস্থা সৃষ্টি করে অথবা সত্যি-সত্যি লড়াই বাধিয়ে দিয়ে, আর সেই সংগে ভিতর থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লব বা গৃহ-যুদ্ধের সূচনা করে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমাধি রচনা করতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মার্ক্সীয় "দ্বান্দ্বিক জড়বাদী ব্যাখ্যা" অনুযায়ী অনিবার্য চূড়ান্ত বিজয়ের মার্ক্সবাদী ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ভুলতা প্রমাণিত হবে কি করে? দুটি স্থিতাবস্থার মাঝখানে যে সাময়িক ভারসাম্য বিশ্বরাজনীতিতে দেখা দেবে—সেটা হবে সাময়িকভাবে যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার যুগ। এটা নীতিগতভাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কাল নয়, মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে। যেখানে যুদ্ধকে নীতিগতভাবে পরিহার করা হয়, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সেখানে নৈতিকতা-ভিত্তিক। আর যুদ্ধকে যেখানে এড়িয়ে চলতে হয় "Temporary equilibrium between two Stabilisations"--এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সেখানে সহ-অবস্থান-তত্ত্ব একটি প্রয়োজন-ভিত্তিক, বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক বিকল্প মাত্র, যা মূলত কৌশল-ভিত্তিক। এই যুগে বিভিন্ন আদর্শ-ধর্মী রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে "mistrustful non-belligerence" বলা চলে—সংঘর্ষ হচ্ছে না—তবে, দুটো শিবির কেউই অপরকে বিশ্বাস করছে না, এই যা। দুপক্ষই গোপনে অস্ত্রে শান দিচ্ছে।

ধনতন্ত্রবাদের সাময়িক স্থিতাবস্থার কথা স্তালিন ১৯২৫ সালের চতুর্দশ রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে জোরালভাবে তুলে ধরেন। এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রবক্তার ভূমিকায় তাঁকে নামতে হয়েছিল ট্রটস্কীকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করার জন্যে। ট্রটস্কী রুশ দেশের বাইরে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে মোটামুটিভাবে সকল রুশ বিপ্লবের নেতাই ধরে নিয়েছিলেন যে, রাশিয়ার বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত না হলে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবে। লেনিন নিজেই বলেছিলেন ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ—

> .."without a revolution in Germany we shall perish.."

আবার ঐ বছরের ২৩শে এপ্রিল বলেছিলেন:

> "Our backwardness has thrust us forward and *we shall perish if we are unable to hold out until we meet with mighty support of other Countries."*

এই সব উক্তির মধ্যে অন্যান্য দেশে বিশেষ করে শিল্পোন্নত জার্মানীতে বিপ্লবের গুরুত্বের কথা এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্যান্য দেশের ব্যাপক সমর্থনের অপরিহার্যতার কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সুতরাং লেনিনের লোকান্তরের পর ট্রটস্কী সেই বিপ্লবীতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন মনে করার কোনই কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু স্তালিন ট্রটস্কীর সংগে একমত হতে পারেন নি। তিনি দেখলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের পরও পুঁজিবাদ নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে এবং পৃথিবীর বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে ভাঁটা পড়েছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কৌশল বদলাতে হবে এবং কর্মসূচীও সেইভাবে সংশোধিত করতে হবে। তাঁর পরিভাষায় সেই যুগ ; ছিল একটি "Strategic period" এবং এই কাল-টি অনির্দিষ্ট-কাল হতে পারে। স্তালিনের ভাষায়ঃ

> "The epoch cover a whole *strategic period which* may occupy years or perhaps decades."..*"In the course of this period there will occur, may must occur, ebbs and flows in the revolutionary tide."*

এই অনির্দিষ্টকাল স্থায়ী স্থিতাবস্থার যুগে বিশ্বপরিস্থিতির মূল্যায়নের নামে বিপ্লবী আন্দোলনে কৌশল অবলম্বনের নামে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলবে। আর এটাও বোঝা যায় না বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন পরিস্থিতিতে কখন জোয়ার আসবে কখনই বা ভাঁটা আসবে—সেটা দ্বান্দ্বিক জড়বাদী ব্যাখ্যা বা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ দ্বারা সমর্থিত হবে কি করে? মার্ক্সীয় ক্রমবিকাশতত্ত্বের সংগে এই স্তালিনবাদী ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য কোথায় ও কতটুকু? শ্রেণীসংগ্রাম ও অর্থনৈতিক শক্তির সংঘর্ষই সমাজের বিবর্তনকে একটি নির্দিষ্ট অব্যর্থ ফরমুলা অনুযায়ী চূড়ান্ত পরিণতির দিকে—সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের দিকে নিয়ে যাবে। চেতনাহীন জড় অর্থনৈতিক শক্তি একটি অব্যর্থ অমোঘ নিয়মে ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে চলতে চলতে মধ্যে মধ্যে

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
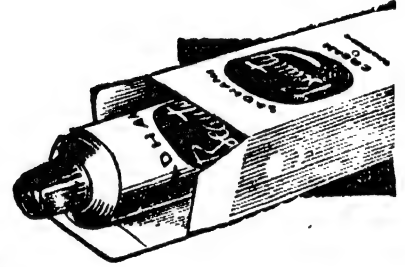
হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে হিসেব-নিকেশ করে বিচার করতে বসবে কখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে জোয়ার আসবে অথবা কখন ভাঁটা আসবে—কোনো যুক্তিতে বা বৈজ্ঞানিক বিচারে এই তত্ত্ব টিকতে পারে না, আর কেই বা স্থির করবে এই 'Strategic period' কখন শুরু হচ্ছে অথবা কখন শেষ হচ্ছে? কখন ভাটা বা জোয়ার আরম্ভ হবে? এই সময় নির্ধারণের ব্যাপারটা কি মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় ক্ষমতা-যুক্ত অচেতন জড় শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই ঘটবে? যদি ডায়েলেক-টিকের অমোঘ ফরমুলা মাফিক উৎপাদন-ব্যবস্থা বা পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অনিবার্য সংঘর্ষ দ্বারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে দল ও ব্যক্তির ভূমিকা থাকে কোথায়? আর এই জোয়ার-ভাঁটা কি পুঁজিবাদী শিবিরভুক্ত সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রে একই ধারায় বইবে? না ইউরোপে যখন বিপ্লবী পরিস্থিতিতে জোয়ার দেখা দেবে, এশিয়ায় তখন ভাটার টান চলবে? ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র যখন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত, তখন স্তালিনের পরামর্শে—সেই জার্মানীতে কমিউনিস্ট বিপ্লব-প্রস্তুতিকে খতম করে প্রতিবিপ্লবী নাৎসীশক্তির উদ্ভবকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হয়েছে। আবার ভারতে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনে প্রচণ্ড জোয়ারের যুগ। তখন আবার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পিবাহকের ভূমিকা নিলেন—জনযুদ্ধের জিগীর তুলে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর ইউরোপে—যখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী-শক্তি সামাজিক ন্যায়বিচার ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার, তখন সেই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী—স্তালিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' করে গোটা দুনিয়াটাকে বিভিন্ন শিবিরের জমিদারীতে ভাগ করে নিলেন এবং পশ্চিম ইউরোপে মুমূর্ষু পুঁজি-বাদকে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিলেন —বিনিময়ে বৃটেন ও আমেরিকা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে রাশিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে —ডায়েলেকটিকের মৌলিক 'অভ্রান্ত' নিয়ম অনুসারে অথবা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের নীতি অনুসারে পরিস্থিতি নির্ধারিত হচ্ছে না—এর পেছনে কাজ করছে রাজ-নৈতিক স্বার্থ,—মতবাদ, দল ও মানুষের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত।

যেখান থেকে শুরু করা গেছিল আবার সেখানে ফিরে আসা যাক। স্তালিন বিপ্লবী পরিস্থিতিতে 'জোয়ার ভাঁটা' (আজকে ওসব কথা বললেই 'শোধনবাদী' হয়ে যাবে—আর মার্ক্সবাদী চলন্তিকায় ওটা সবচেয়ে বড় গাল) তত্ত্বের অবতারণা করে নিজের দলের মতকে নিজের অনু-কূলে আনতে সমর্থ হন। স্তালিন ট্রটস্কীর বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুললেন দলের কাছে যে, পুঁজিবাদ যখন সাময়িক স্থিতাবস্থা রক্ষা করতে পেরেছে এবং অন্যান্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঁটার টান চলছে—তখন রুশ দেশ কি নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করেই নিজের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না? স্তালিন বললেন, নিশ্চয়ই পারবে, যদি ঠিক ঠিক কৌশল অবলম্বন করে এগুনো যায়। এই সময়ের মধ্যে রুশ দেশের শক্তি-বৃদ্ধি করতে হবে। স্তালিন অবশ্য এই ব্যাপারে তাঁর দলকে নিজের সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন।

সাময়িক স্থিতাবস্থা ও বিশ্বে বিপ্লবী আন্দোলনে মন্দা অবস্থা—এই দুটো তত্ত্বকে স্তালিন পাশাপাশি রেখে-ছিলেন এবং সুবিধামত তার প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র মূল্যায়নটিই ছিল রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত। ট্রটস্কীর প্রচণ্ড প্রভাব থেকে সমগ্র পার্টিকে মুক্ত করার জন্য তিনি 'Socialism in one Country' এই তত্ত্বের সারবত্তা ও যথার্থতা দলের কাছে প্রমাণ করলেন। প্রশ্ন থেকে যায় যে, যখন বিপ্লবী আন্দোলনে আবার জোয়ার আসবে,—আর সেটা কবে কিভাবে আসবে তাও অনিশ্চিত, —তখনই বা সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা কি হবে? তখন কি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্ভব হবে সেই সব বুর্জোয়া বা নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে যারা কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরোধিতায় নামবে? ১৯৪৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মার্কিন-সোভিয়েট বন্ধুত্বের জোরাল সমর্থক হেনরী ওয়ালেসের এক বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে 'সানডে টাইমস' পত্রিকার মস্কোস্থিত প্রতিনিধি আলেকজাণ্ডার বার্থ স্তালিনকে প্রশ্ন করেন:—"সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আদর্শগত সংঘাত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আপনি বিশ্বাস করেন—এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-যোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্ভব? উত্তরে স্তালিন বলেছিলেন:

"I believe in it *absolutely*"—

—স্তালিনকে আরও প্রশ্ন করা হয়:

"..Question: "Do you believe that with the further progress of Soviet Union towards Communism, the possibilities of peaceful co-operation with the outside world will not decrease as far as Soviet Union is concerned? *Is "Communism in one Country" possible?*

Answer: I do not doubt that the *possibilities of peaceful co-operation far from decreasing may even grow. "Communism in one Country" is perfectly possible especially in a Country like Soviet Union."*

অর্থাৎ সোভিয়েট দেশ আরও সাম্য-বাদের দিকে এগিয়ে গেলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্ব বিঘ্নিত হবে না কিছু-মাত্র। দুই বিরোধী সংঘাতশীল ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি কমবে তো নয়ই, বরং বাড়বে এবং 'একদেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা' নিশ্চয়ই সম্ভব—বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ায়। অবশ্য পুঁজিবাদী দুনিয়া 'একদেশে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' সম্বন্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছে জিজ্ঞেস করে আশ্বস্ত হতে চায়—যে সোভিয়েট রাশিয়া—নিজের দেশের বাইরে অন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট বিপ্লব রপ্তানী করতে আগ্রহী নয়! এই আশ্বাস পেলেই পরস্পর পরস্পরকে সার্টিফিকেট দেবে। যেমন এই ভারতবর্ষে কেরালা ও পশ্চিম বাংলার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন বৃটিশ পুঁজিপতিরা, চেম্বারস-এর বড় বড় ব্যারনরা, বিড়লাগোষ্ঠী তাঁদের 'বাস্তব-বাদী' দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। এক রাজ্যপাল তো গদগদ হয়ে শপথ নেবার আগেই হোমরাচোমড়াদের এক ভোজসভায়—(আর এ যুগে—মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত চর্চা ও অনুশীলনের স্থানই হল বড় বড় লজ-ক্যালকাটা ক্লাব ককটেল পার্টি-প্রীতি-ভোজের আসর। রক্তাক্ত বিপ্লবের বাণী কত মর্মস্পর্শী হয় যখন তা লাল-পানিকে সাক্ষী করে প্রচার করা হয়!) ঘোষণা করে বসলেন ভারতের বিশুদ্ধ আগ মার্কা মার্ক্সীয় কমিউনিজম নাকি ইউরোপের শিল্পপতিদের প্রশংসা অর্জন করেছে। এরকম প্রশস্তি বিড়লা, পার্সন সাহেবও করছেন। দেশের বুর্জোয়া সোসাইটির ককটেল পার্টিগুলি বিপ্লববাদীদের প্রশংসা-কীর্তনে মুখর। স্তালিনের ওপরের মন্তব্যের সঙ্গে সোভিয়েট

কমিউনিস্ট পার্টির [illegible] বক্তৃতার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে "Strategic period"-এর ইংগিত স্তালিন দিয়েছিলেন—১৯২৫ সালের পার্টি কংগ্রেসে, সেই দম-নেওয়ার সময়টা কতদিন স্থায়ী হতে পারে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলি নতুন জন্ম-যন্ত্রণায় কাতর—বিভিন্ন দেশে অগ্নিগর্ভ বিপ্লব পরিস্থিতি। যুদ্ধোত্তর যুগের সেই কাল-টিকে কোনমতেই বিপ্লবী আন্দোলনে ভাটা পড়ার কাল বলা যায় না। সেইরকম এক আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতিতে স্তালিন পরস্পর-বিরোধী দুই শিবিরের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পূর্ণ-রূপে সম্ভব—এই কথা ঘোষণা করলেন। আবার ১৯৫২ সালের ২রা এপ্রিল ৫০ জন মার্কিন সাংবাদিক স্তালিনকে প্রশ্ন করেছিলেন—

"On what basis is the Co-existence of Communism and Capitalism possible ?"

কোন্ ভিত্তিতে এই সহ-অবস্থান সম্ভব? উত্তরে স্তালিন বললেন—

> "The peaceful co-existence of Capitalism and Communism is *fully possible given the mutual desire to co-operate, readiness to perform the obligations which have been assumed, observance of the principles of equality and non-interference in the internal affairs of other states.*"

তাহলে পরস্পর-বিরোধী এইটুকুই ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পূর্ণ সম্ভব, যদি উভয়পক্ষের সদিচ্ছা থাকে, সহযোগিতা করার মন থাকে এবং আন্তঃ-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমতা ও এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন-রূপ হস্তক্ষেপ না করার সঙ্কল্প থাকে। অনুরূপ বক্তব্য রেখেছিলেন ঊনবিংশতিতম রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে জর্জি ম্যালেনকভ তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে (৫ই অক্টোবর, ১৯৫২) স্বয়ং স্তালিনের উপস্থিতিতে।

[ক্রমশঃ]

[১৪১৭ পৃষ্ঠার পর]

পরিবর্তন করে দিয়ে দারুণ প্রগতিশীল কাজ করবেন—একথা ভাবারও যথেষ্ট কোনও কারণ নেই। তবে বর্তমান দলীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু করাও সম্ভবত অসম্ভব।

মোটামুটিভাবে তাহলে বলা যায়, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে গরীবের মাথা ঘামানোর মত কোনও কারণই নেই—যা এতকাল ছিল। মালিক ও জোতদারের বন্দুক বিশেষের পুলিশ এখন সাধারণ মানুষের ওপর ডাণ্ডা চালায় না। কাজেই, তাঁদের এখন ভয়ের কারণও কম। যে শ্রেণী এতকাল সরকারের সাহায্যে মানুষকে শোষণ করেছে, আজকের পরি-বর্তিত অবস্থায় তাঁরা ও তাঁদের সহ-যোগীরাই "সব গেল! সব গেল!" বলে চিৎকার করছেন। অতএব বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, হয় তাঁরা শোষক সম্প্রদায়ভুক্ত, না হয় ঐ সম্প্রদায়ের অনুগত ভক্ত। এই গেল একদিকের কথা।

অন্যদিকে দেখা যায়, কংগ্রেসের পরা-জয়ের পর ফ্রন্টভুক্ত দলগুলি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগে-ছেন। জমি দখল, ভেড়ি দখল প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে শরিকী সঙ্ঘর্ষ প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও দল এই সঙ্ঘর্ষগুলিকে "শ্রেণীসংগ্রাম" বলে বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করেন এই সঙ্ঘর্ষগুলি দল-বৃদ্ধি ও ভোট পাবার সংগ্রাম ছাড়া কিছুই নয়। জমি বা ভেড়ি দখল করে নিজেদের লোক বসাতে পারলেই দলের শক্তি বৃদ্ধি হল এবং যাঁরা ঐ জমির দখল পেলেন তাঁরা ঐ রাজনৈতিক দলটির অনুগত ভক্ত হয়ে থাকবেন—একথা বলাই বাহুল্য। রাজনৈতিক দল-গুলির আচরণ তাই শরিকী সঙ্ঘর্ষের জন্য অনেকখানি দায়ী। সম্ভবত এই বক্তব্যের পিছনে কিছু যুক্তিও আছে।

রাজ্যের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আমরা দেখছি, বাংলা কংগ্রেস দল সত্যা-গ্রহ করতে এগিয়ে এলেন। সি-পি-এম, সি-পি-আই, এস-ইউ-সি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলির বেশ কিছুসংখ্যক কর্মী ও অনুরাগী আছেন। পারস্পরিক প্রভাব বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে এঁরা সঙ্ঘর্ষের পর্যায় পর্যন্ত উঠছেন। বাংলা কংগ্রেসের কিন্তু নতুন কিছু বলার নেই এবং তাঁদের অনুগামীর সংখ্যাও নগণ্য। মুখ্যমন্ত্রীর সুনাম ছাড়া প্রকৃত-পক্ষে বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক জগতে টিঁকে থাকার মত কোনও মূলধন নেই। বঙ্গেশ্বরের অত্যাচারে কংগ্রেস থেকে কিছু কর্মী ও নেতা বেরিয়ে এসেছিলেন—কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবাই যে "অজয়বাবু"—সেকথাও হলফ করে বলা যায় না। নানা স্বার্থের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে বাংলা কংগ্রেস গঠিত বলে অনেকের ধারণা এবং এ ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভার প্রাক্তন বাংলা কংগ্রেসীদের ঐ চরিত্র আমরা দেখেছি। সুশীল ধাড়া ও সুকুমার রায়ের বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে বাংলা কংগ্রেসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে উঠছে। অতএব শরিকী সঙ্ঘর্ষ, না মালিক-জোতদার চক্রের স্বার্থ, না, শুধু-মাত্র রাজনৈতিক আসরে টিঁকে থাকার তাগিদ—এর কোনটি বাংলা কংগ্রেসকে অনশনের পথে নামিয়েছে—তা ভেবে দেখার কথা। তবে, মুখ্যমন্ত্রীর অনশন দলমত নিরপেক্ষ মানুষের কাছেও একটি মস্তবড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। কারণ, বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্র-তিক আচরণ ফ্রন্টকে এক বিপর্যয়ের মুখে টেনে এনেছে—যা সাধারণ মানুষ মোটেই চায় নি।

ভারতীয় কংগ্রেসের দিকে তাকালে বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক আচরণের কিছু ব্যাখ্যা মিললেও মিলতে পারে। গান্ধী-নিজলিঙ্গাপ্পা দ্বন্দ্বের শেষ অঙ্কে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। ইন্দিরা-পন্থীরা সৌভাগ্যক্রমে প্রগতিশীল বনে গেছেন রাতারাতি। যেমন অন্য রাজ্যে, তেমনি বাংলাদেশেও কংগ্রেস ইন্দিরা বা নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী হয়েছে। ফলে, বাংলাদেশের সিদ্ধার্থবাবু হয়েছেন প্রগতিশীল আর প্রতাপবাবু প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার। রাজনৈতিক নেতারা এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেও সাধারণ মানুষ ঘাসে মুখ দিয়ে চলেন—একথা ভাবারও কোন কারণ নেই। ইন্দিরা-ভূত ঘাড়ে যখন চেপেছে তখন আরও কিছুদিন ভুগতে হবেই। সাধারণ মানুষ জানে যে, ইন্দিরা ও নিজলিঙ্গাপ্পা মোটামুটি একই স্বার্থের প্রতিনিধি এবং ইন্দিরা সরকারের তথাকথিত প্রগতিশীল কাজ-কর্ম নতুন রাজনৈতিক ভোজবাজী যা আগামী ভোটবাজীতে জিতবার কৌশল-রূপে অবশ্যই ব্যবহৃত হবে। ইন্দিরা-পন্থীরা সম্ভবত বাংলা কংগ্রেসের আশীর্বাদ চাইবেন, বাংলা কংগ্রেসও তাই নতুন খেল সুরু করেছেন। অরাজ-নৈতিক বক্তব্য ও আচরণে গোটা-ফ্রন্টকে তাঁরা পথে বসাবার উপক্রম করেছেন। এ হয়ত নতুন নাটকের ভূমিকাও হতে পারে।

আশার কথা, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শিক্ষা আছে। তাঁরা যেমন দলবাজি বা অতিবিপ্লবী বক্তব্যও পছন্দ করেন না, তেমনি ধনিকশ্রেণীর প্রতিভূ কোন বর্ণ-চোরা দলকে আমল দেবেন বলে আশা করাও মিথ্যে।

—[illegible] রায়

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

[illegible] মর্জি-মাফিক প্রতিটি ঘর উথাল-পাতাল করে দিলে সেপাইরা। হাঁড়ি-কলসী, চট-কাঁথা—মায় ধান-চালের ডোল, ধানের গাদা ছড়িয়ে ছত্রখান করে, একে-ওকে জেরা-জবরদস্তি করে মুকুন্দের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। চরের কিষাণপাড়া তল্লাসী শেষ হলো।

বাকি রইল শুধু একটা ঝুপড়ি টঙ। কিষাণপাড়া ছাড়িয়ে সেটা একটু দূরে—চরের এক প্রান্তে, খালের ধারে। যমুনার ঘর।

জমাদার সিংজীর নজর পড়ল সেই দিকে। জনা-দুই সেপাইকে হুকুম দিলে, "যাও—তালাস করো।"

সেপাই দু'জন ছুটল সেই দিকে।

জলে কাদায় পড়ে খাল পার হয়ে পাড়ের ওপর উঠতে-না-উঠতেই যমুনা আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলে। চোখে ঝিলিক-মারা কটাক্ষ, সহসা অঙ্গ দুলিয়ে যেন ঢেউ তুলে দিলে দুরন্ত যৌবনের। হি-হি করে হাসতে হাসতে বললে, "এসো সেপাই দাদা—এসো। আজ কার মুখ দেখে ভোর হলো মোর গ'—এই সকালবেলা দু'-দু'জন এসে হাজির! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে উঠে এসো দাদা—কাল জোয়ারে গাঙ থেকে একটা কুমীর উঠে এসেছে।"

এখন ভাটা। খালে মাত্র হাঁটু-জল। তলায় তরল পলি পচা পাঁকের মতো গিলে ধরে পা। তারই মধ্যে হঠাৎ ভড়কে-যাওয়া সেপাই দুটো হুড়োহুড়ি করে উঠতে গিয়ে—জল-কাদা ছিটিয়ে পরস্পরকে ভিজিয়ে এক্সা করে কোনোরকমে আঁচড়া-আঁচড়ি করে উঠে পড়লে ডাঙায়। হাত-পা ঝাড়তে ঝাড়তে গর্ গর্ করে গাল পাড়তে লাগল দু'জনেই। কে জানে কাকে!

"শালা হারামির বাচ্চা! ইয়ে সিরেফ দিগ্দারী!"......

যমুনা তখন হাসির হিল্লোল তুলে দিয়েছে।

একজন সেপাই গর্ গর্ করতে করতে বললে, "চল্—তোর ঘর তালাস করব।"

যমুনা তেমনি হাসতে হাসতে, চোখ মট্কে বললে, "তালাসের লোক তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছি—আর তালাস করবে কাকে সেপাইজী!" বলে সে দু' পা এগিয়ে বুক ফুলিয়ে ঢং করে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। মিটি মিটি হেসে বললে, "লাও—তালাস করো।"

সে ভঙ্গির সামনে পশ্চিমা সেপাইদের মাথা ঘুরে গেল। বুকের কাছে রক্তের তুফান বয়ে গেল। একজন হাত বাড়াল। একজন হুঁশিয়ারী দিয়ে উঠল।

"হুঁশিয়ার বে! সিংজী......"

পেছনে ঘুরে দেখল—দলবল নিয়ে জমাদার সিংজী ভেড়িবাঁধের ওপর এই দিক পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার আবরণটুকুও নেই। পূবে তখন সূর্য উঠছে।

যমুনা বললে, "কিসের তালাস—কাকে তালাস করছ সিপাইজী?"

একজন বললে, "মুকুন্দ পাইককে।"

আর একজন বললে, "তোর ঘরে ছিপিয়ে আছে কিনা দেখব।"

"আমি ছিপিয়ে রাখব মুকুন্দ পাইককে!" গলা চড়িয়ে দিলে যমুনা, "যারা মোর ঘর জ্বালিয়ে খালের পার করে দিলে তাদের আমি ছিপিয়ে রাখব! তাকে মারি ঝাঁটা। এলে তার মুখে আগুন জেলে দিতম।" গাল পাড়তে পাড়তে যমুনা তুলকালাম বাধিয়ে দিলে। একা।

সহসা তার আর এক রূপ দেখে সেপাই দু'জন ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যমুনা জিজ্ঞেস করলে, "কেন—কি করেছে মুকুন্দ?"

"আরে—উয়ো ভলু মাঝিকে খুন করিয়েসে।"

"বুঝেছি—এ সেই মুকুন্দের বৌকে নিয়ে কান্ড।" যমুনা বললে, "নিমাই মাঝিকে ভলু কিছুদিন থেকে খুব ধম্কি হুম্কি দিচ্ছিল—মুকুন্দের বৌকে সাদি করবে বলে।"

"তু জানিস?"

"ও আর জানি না! আমি চারদিকে ঘুরি—সব খবর জানি।" যমুনা গলা নামিয়ে বললে, "উ জবরদস্তি সাদি করতে চেয়েছিল। তো মুকুন্দ ছাড়পত্র দিলে তো!" চোখ ঘুরিয়ে বললে যমুনা, "আমি সব জানি। তা ভলু মাঝি মরে গেছে?"

"কে জানে—শালা এতক্ষণে মরে গেছে কি না। মহকুমা হাসপাতালে লিয়ে গেছে।"

আর একজন বললে, "তো চল

তালাস শেষ করি। সিংজী দাঁড়িয়ে আছে—দেখছে।"—

অগত্যা যমুনা বললে, "বিশ্বাস না হয়—চল দেখবে, আমি আর মোর গোঁসাই ছাড়া আর কেউ আছে কি না। গোঁসাইয়ের আবার ভারি ব্যামো। দু'দিন আসতে না আসতে হেই ঘটি ঘটি রক্তবমি করছে। ডাক্তার বললে—ভারি খারাপ ব্যামো। হেই যে সেবা করছি—মোকেও নাকি ধরতে পারে"

"হায় রাম!" একজন সেপাই জিজ্ঞেস করলে, "কাশ আছে?"

"লোকটা কেশে কেশে মরে গেল সিপাইজী।" যমুনা চোখে আঁচল ঘষে বললে, "মোর কপালে কোনো গোঁসাই টিকবে নি সিপাইজী।"

সেপাই দুজন সভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

যমুনা কুঁড়ের সামনে এসে ঝুঁকে দেখিয়ে দিলে—বললে, "হাই দেখ মোর গোঁসাই শুয়ে আছে। হাই দেখ—মোর ঘর।"

সিপাই দুটো একবার হেঁট হয়ে উঁকি মেরে দেখলে—গেরুয়া বাস পরিহিত একটা লোক, মুখে গোঁফ-দাড়ি। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

যমুনা চোখ পিট্‌পিট্‌ করে বললে, "ভিতরে যেয়ে দেখবে? আগেই বলেছি বাবু—গোঁসাইর মোর ছোঁয়াচে ব্যামো, কিছু হলে দোষ দিয়ো নি। হাই দেখ—মাথার কাছে ছোট জলচৌকির উপরে ওষুধের শিশি সার সার। বড় সাংঘাতিক ব্যামো সিপাইজী!"......

"ঠিক বাৎ।"

কুঁড়ের ভেতর সেপাই দুটো আর ঢুকল না।

একজন বিড় বিড় করে বললে, "ইয়ে বহুৎ ভারি বেমারী।"

"জরুর।" আর একজন তাল দিয়ে বললে, "ঘুষো মৎ।"

"চলো ভাই।"

"শালা মুকুন্দো বিলকুল ফেরার।"

লোক দুটো বক্‌ বক্‌ করতে করতে সন্তর্পণে খাল পার হয়ে ফিরে চলে গেল। যমুনার গোঁসাই সম্পর্কে তাদের কোনো কৌতূহল নেই। জমাদার দীনদয়াল সিংয়েরও না। অমন ঢের ঢের গোঁসাই কোথা থেকে না কোথা থেকে এসে এই মেয়েটার ঘরে আড্ডা গাড়ে—গান গায়, নেশা ভাঙ্‌ করে। বৃত্তি মাধুকরি। এ তারা জানে।

॥ একুশ ॥

কাটা ঘা শুকিয়ে এসেছে। রোদে পিঠ দিয়ে দাওয়ায় বসে ছিল জীবেন দত্ত।

ছোট্ট কুঁড়ের নিচু দাওয়া—প্রায় খাল পাড়ের সমান্তরাল। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা ঘাসকুটো কোথাও নেই, ধুলো কাদা কোথাও নেই—সবটা নিকানো-ছোপানো। কুঁড়ের আশপাশে দু'-চারটে গাছ-গাছালি। ওই ছোট্ট দাওয়াটুকুতে বসে চরের সবটুকু প্রায় দেখা যায়।

যমুনার নিকানো উঠোনে বড় বড় দু' জোড়া পায়ের চিহ্ন। এখনো কাদার দাগ লেগে আছে। জীবেন দত্তের সতর্ক চোখ তাই দেখছিল।

যমুনা পাথরের বাটিতে গরম চা এগিয়ে দিলে।

জীবেন আঙুল দিয়ে পায়ের চিহ্নগুলো দেখিয়ে দিলে। বললে, "ওই দেখ।"

যমুনা এতক্ষণ চেপেই ছিল—হয়তো চেপেই যেত। কি জানি—এই অবস্থাতেই হয়ত হাঁটা দিলে লোকটা। কাদা-মাখা পায়ের সেই দাগগুলোর দিকে থম্‌থমে চোখে চেয়ে মনে মনে নিজের মতিভ্রমকে গাল পাড়লে যমুনা—কেন ওগুলো সে লোকটার ঘুম ভাঙার আগে মুছে দিতে পারল না।

যমুনার হাব-ভাব দেখে জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "কারা এসেছিল যমুনা দিদি?"

যমুনা বললে, "পুলিশ।"

গম্ভীর মুখে জীবেন কি যেন ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত একটু হাসল। বললে, "তাহলে সন্ধান পেয়ে গেল।"

যমুনা বললে, "তোমাকে খুঁজতে আসে নি গোঁসাই।"

"তবে?"

"সে আর একজন।"

"কে?"

"তোমার পবন খুঁকে যে মেরেছিল।"

"সেই মুকুন্দ—গোবিন্দের ছেলে! সে আবার কি করল দিদি?"

"একটা চৌকিদারকে খুন করেছে।"

"চৌকিদার!" জীবেন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

"লোকটা ভারী দুর্দান্ত—ভারী অত্যাচারী ছিল গোঁসাই। সে ঢের কথা।" যমুনা বললে, "তার জ্বালায় মুকুন্দ ঢের জ্বলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও ঢের লোককে জ্বলতে হয়েছে।"

"এখন মুকুন্দ—"

"শুনলাম তো—ফেরার।" যমুনা বললে, "আজ ভোর রাত থেকে চর উথাল-পাথাল করে দিলে পুলিশ এসে—পায় নি তাকে। ওরা মোর ঘরেও এসেছিল খুঁজতে খুঁজতে, তুমি তখন ঘুমোচ্ছলে গোঁসাই।"

"ভাল করি নি।" জীবেন বললে, "আমাকে ডেকে একটু সাবধান করে দিতে হয় যমুনা দিদি।"

"তুমি কি করতে?"

"কি করতাম?"

জীবেনের মুখে সহসা কথা জোগালো

না। ভাবতে লাগল—সত্যিই তো, কি করতো সে! চার দিকে ফাঁকা মাঠ—আর ছোট্ট এই একটু কুঁড়ে: এর মাঝখানে কোথায় কি করতে পারত সে।

যমুনা হেসে বললে, "তার চেয়ে তুমি ঘুমিয়েছিলে নিশ্চিন্তে—সেই মোর সুবিধে হয়েছিল বোঝাতে।"

"আমাকে দেখে গেছে?"

"ও মা গ'—বিছানায় ঘুমিয়ে আছ, দেখবে নি!"

"কি বললে তাদের যমুনা দিদি?"

"সে তোমাকে শুনতে হবে নি গোঁসাই।"

হঠাৎ কেমন একটা গরম হল্‌কার প্রবাহ যেন বয়ে গেল এই মাঠের দেশের গাঁউলি মেয়েটার সর্বাঙ্গ দিয়ে। মুহূর্তে নিজেকে সে সামলে নিলে। আস্তে আস্তে বললে, "কি আর বলব। বললাম—নবীন গোঁসাই।"

নবীন গোঁসাই বটে! নিজের বেশ-বাসের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল জীবেন—দস্তুরমত গেরুয়া বসন, গেরুয়া মেরজাই, একটা গেরুয়া আলখাল্লাও ঝুলছে কুঁড়ের ভেতরে। গলায় এক ছড়া তুলসীর মালা বেঁধে দিয়েছে যমুনা। গালে হাত বুলিয়ে দেখল—দাড়ি-গোঁফও মন্দ গজায় নি।

নিজের বেশবাসে হাত ঘষতে ঘষতে জীবেন হেসে বললে, "এ তুমি আমাকে মন্দ সাজাও নি যমুনা দিদি।"

"আমি সাজাই নি গোঁসাই।" যমুনা বললে, "সাজিয়ে-গুছিয়ে এনে দিয়েছে সানো কত্তা। বুদ্ধি দিয়েছে ডাক্তারবাবু। জামা-কাপড়গুলো গেরুয়া রঙে কে রাঙিয়ে দিয়েছে—কে জানে! না হলে এই কি তোমার গেরুয়া পরার বয়স গোঁসাই—না গেরুয়া পরা তোমার সাজে?"

"কেন যমুনা দিদি?" জীবেন দত্ত হাসল।

"ভদ্রলোকের বেটা তুমি—এসে পড়লে এই হতভাগীর ঘরে। না হলে কোথায় ছিলে তুমি—আর কোথায় ছিলম আমি!" আবার সেই উত্তাপের হল্‌কায় চোখ-মুখ জ্বালা করে উঠেছে যমুনার।

জীবেন বললে, "ঠিক জায়গায় এসে পড়েছিলাম।"

"এ কি তোমার ঠিক জায়গা হলো গোঁসাই!" যমুনা বললে, "মোর কি চালচুলার ঠিক আছে? ই মোর হাঘরে বষ্টমের টঙ্—আজ আছে কাল নেই। সারাদিন কাটে মোর পথে পথে—দুয়ারে দুয়ারে—"

"আমাদেরও ঘর-দুয়ার নেই যমুনা দিদি।" জীবেন হেসে বললে, "চাল নেই—চুলো নেই, সংসার নেই—সাধ নেই। জীবনের মায়া নেই—লোভও নেই।" একটু থেমে গম্ভীর গলায় বললে, "সেদিন হয়তো ওই খালের এক হাঁটু কাদার মধ্যে পড়েই মরে যেতম—যদি কাছাকাছি তোমার ওই কুঁড়েটা না থাকতো। মরতে আমি ভয় পাই না। না, মরতে আমাদের ভয় করতে নেই দিদি।" জীবেন কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে বললে, "তবু, তোমার নবীন গোঁসাই বেঁচে গেল। ঠিক জায়গায়—ঠিক লোকটির হাতে পড়ে। এই সেবা কে করত! আজও তো, পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারতে? দিব্যি ঘুমোচ্ছিলাম।"

"মোকে দিদি বলে ডাকলে কেন গোঁসাই!" বলেই ঝট্ করে যমুনা সরে গেল সামনে থেকে। কি জানি কেন, চোখ ভিজে এসেছিল তার জীবনের কথা শুনতে শুনতে। কুঁড়ের ভেতরে গিয়ে আঁচলে চোখ মুছল।

কোথা দিয়ে কেমন করে যে পরিচয় হয় এক-একটা মানুষের সঙ্গে! বিচিত্র মানব সংসার। জীবেন দত্ত ভাবছিল। ভাবছিল এই যমুনার কথা। ভাবছিল সেই পবন খাঁর কথাও। সে-ও বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে তাকে—শুধু আশ্রয় আর খাদ্য দিয়েই নয়, জীবনও দিয়ে। সেদিন সে যদি জঙ্গলে না থেকে যেত, যদি পাগলার মতো ছুটোছুটি করে গোটা পুলিশ দল-টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না রাখত, যদি তারই গায়ের সেই খাঁকি জামাটা তাকে সে পরতে না দিত...

বড় আপশোষ হয় জীবনের।...

তবু জঙ্গলের ভেতরে ছোঁড়া এলো-পাথাড়ি রাইফেলের গুলী একটা এসে লাগল তার পায়ে। ধানক্ষেতে। মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে শুয়েছিল সে—ওপরে ঝুঁকে পড়া শীষ্‌ভরা ধানগাছ।

পুরনো কথা ভেসে যায় ছবির মত।

যমুনা এসে জিজ্ঞেস করলে, "আর একটু চা দেবো গোঁসাই? আরও চা আছে।"

"দেবে?" অন্যমনস্ক জীবেন বললে, "দাও।"

যমুনা আরও খানিকটা গরম চা ঢেলে দিলে পাথরের বাটিতে।

জীবেন বললে, "তুমি আমার গরীব দিদি। এই চা-টার জোগাড় তুমি না করলেও পারো দিদি।"

"এ সব আমার নয় গোঁসাই।" যমুনা বললে, "সানো কত্তা সব যেমন দেয়—যেমন বলে, আমি তেমনি করি।"

চায়ে চুমুক দিয়ে জীবেন একটা তৃপ্তির শব্দ করে বললে, "চা তৈরিটাও কি চৌধুরীমশায় শিখিয়ে দিয়েছেন?"

"না গোঁসাই।" যমুনা হেসে বললে, "ওটা আগে থেকে জানতম।" "উনিও খেতে ব্যাক?"

"না—" যমুনা একটু থমকে গিয়ে তারপর বললে, "আর একজন খেত।"

"কে?"

প্রশ্নটা লঘু। কথার পিঠে কথা এসে যাওয়ার মত। তবু যমুনা সহসা উত্তর দিতে পারল না। উত্তর দিতে গিয়ে কে যেন সহসা তার গলা চেপে ধরল। সে তার অন্ধকার অতীত। এ লোকটার কাছে সে-সব মেলে ধরতে তার দ্বিধা—তার সঙ্কোচ। তবু বলতে হবে কিছু। জীবেন তার দিকে চেয়ে আছে।

যমুনা করুণ গলায় বললে, "আগে মোর আখড়া ছিল গোঁসাই—বাউল বষ্টম ঢের আসত। সে আউড়া মোর জঙ্গলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। সে সব ঢের কথা—সে শুনে তোমার কাজ নাই।"

জীবেন আর কোনো প্রশ্ন করলে না। কিন্তু নীরবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সেই উজ্জ্বল প্রশান্ত দৃষ্টি—সেই দীর্ঘায়ত চোখ—নিষ্পাপ তারুণ্যে ভরা মুখ, সেখানে যেন পৃথিবীর সদ্যোজাত কৌতূহল। যমুনা আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নিলে।

কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যে আপাতত কোনো রকমে একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, "সেই ভলু মাঝি—চৌকিদার, যাকে খুন করে মুকুন্দ ফেরার হয়ে গেল গোঁসাই, শেষমেস তার জন্যেই মোর আখড়া শেষ হয়ে গেল।"

জীবেন চুপ করে শুনছিল। চা খাচ্ছিল।

যমুনা অন্যমনে বললে, "ভালই হয়েছে গোঁসাই—সে পাপ চুকেবুকে গেছে।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জীবেনের শূন্য চায়ের বাটিটা তুলে নিয়ে যেতে যেতে বললে, "যাই—এবার মোর বেলা হলো। গেরাম ঘুরে মোর পেটের জোগাড় করতে হবে।"

পেছন থেকে জীবেন বলে উঠল, "এইটে আমার ভালো লাগে না যমুনা দিদি।"

যমুনা ঘুরে দাঁড়াল। বললে, "কোনটো?"

"এই ভিক্ষে।"

"তবে আমি কি করব গোঁসাই!" অবাক চোখে তাকিয়ে রইল যমুনা বোষ্টমী।

"আমি যাকে দিদি বলেছি—সে ভিক্ষে করবে!" জীবেন বিষণ্ণ গলায় বললে, "আমার কেমন দুঃখ হয়।"

"তোমার দুঃখ হয় গোঁসাই!"

গলা কেঁপে উঠল যমুনার। আবার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

[ক্রমশঃ]

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**॥ নয় ॥**

**বেশ** হতো যদি এই পুকুরের ওপর আধেক ঝুঁকে পড়া জংলা বাঁশবন, বটের ঝুরি নাবা অশ্বত্থের মর্মর, বিল আলো করে থাকা সবুজ কচুরিপানার সাদা-বেগুনি ফুলের ছটা, সারি সারি কলা-গাছের ছায়া-নিচোল, শীত-কম্পিত অলস, মন্থর দুপুর, এই সব নিয়ে নিজের মনে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারতাম।

ঐ যে দু'পাশে সোনা ছড়ানো ক্ষেত তার মাঝ দিয়ে আল, ওর রহস্যই কি কম! সেই একরকমের আছে, না, নিজের সংগে নিজের খেলা, সেই খেলা খেলতে খেলতে ও কোথায় যেন চলে যায় সবুজ ছড়াতে ছড়াতে, ওর এই চলে যাওয়াটা কি ভালো যে লাগে তা কেমন করে বলি!

একটা পগারের ওপর শতরঞ্চি পেতে আমি চুপ করে ছায়ার নিচে বসে আছি। আমার পায়ের কাছে আলুর ক্ষেত। কাল বুনে গেছে আলু আজ পাশে পাশে বুনবে পেঁয়াজ। দূরে ডোঙা নিয়ে ছেঁচ দিচ্ছে একজন। তার কালো, ঘামেভেজা চকচকে পিঠ উঠছে নাবছে, আরো দূরে কয়েকটি তাল গাছ, তাদের একটার গা অনেকখানি জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠতে চাইছে বুনো লতা, ধান ক্ষেতে সাদা আর হলুদ প্রজাপতি, পাতার ফাঁক দিয়ে এসেছে একটু রোদ্দুর, সেইখানে অনেক সকালের শিশির, কাছেই একটা গাভী ঘন নিবিড় ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে নিঃশব্দে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে, আমবাগান থেকে ভেসে আসছে ডাক উদাস ঘুঘুর, এই সব নিয়ে হয় না, লেখা যায় না?

অথবা ধান ক্ষেত। এই কিছুদিন আগে যার ছিলো শ্যাম-শরীর, আজ যার সোনার অংগ, ওমা কেমন লুটিয়ে আছে মাঠের হাওয়া লেগে, ঢেউ-এর পরে ঢেউ, সোনার ঢেউ যতোদূর চাই। কোথাও এতোটুকু ফাঁক নেই আর ঠিক এমনি সময় পশ্চিমের বিশাল আকাশ বেয়ে যদি সূর্য অস্তে যায়, তাহলে? মাঠের সোনায় আর আকাশের সোনায় কিরকম একখানা গান তৈরি হতে পারে?

কতোদিন নিস্তব্ধ রাত্রে যখন জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে চারিদিক, আমি একা একা পথে পথে চলেছি মাইলের পর মাইল। কখনো দু'পাশে নিবিড় বন, গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে পথের ওপর ফুটে উঠেছে জটিল নকসা, জ্যোৎস্নারও যে গন্ধ আছে আমি জানতাম না, কিন্তু প্রায়ই টের পাই জ্যোৎস্না উঠলেই একটা তীব্র বুনো গন্ধ, আর তখন ঘরে থাকি না, কে যেন আমাকে নিশির ডাকের মত ডেকে নিয়ে যায় মাইলের পর মাইল। মাতালের মত যেতে যেতে এক এক সময় সাম্বিৎ এলে চোখে পড়ে এক-একটি খড়ের ছাউনি, এই অদ্ভুত রাতটায় ছেলেকোলে একজন মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কারুর মুখে কোন কথা নেই, পাশে দাঁড়িয়ে আছে গরু, সেও চুপচাপ, হয়তো পথের ওপরই ধুলোর ওপর বসে একজন বৃদ্ধ এই জ্যোৎস্না দেখছে, কেউ কোন শব্দ করছে না, শুধু দেখে যাচ্ছে। এদের এই নিস্তব্ধতা, এই শান্ত হয়ে দেখে যাওয়াটা নিয়েই কি আমি লিখে যেতে পারি না? আমার ভীষণ ইচ্ছে করে অন্ধকারে বাতাবী লেবুর গন্ধ আর তার গায়ে চাদরের মত জড়ানো জোনাকি নিয়ে কিছু একটা লিখে ফেলতে। কিন্তু লেখা আর হয় না। কতোদিন আরম্ভ করেছি একটা দু'টো লাইন। সংগে সংগে তার ওপর পড়েছে কালোছায়া।

কি করে আমি লিখি? আমি তো শান্ত হতে চাই কিন্তু কি দেখে শেষ পর্যন্ত শান্ত থাকবো? ঐ তো জাঙালের ওপর দিয়ে আগে আগে চলেছে দু'জন ধ্বজা নিয়ে, পেছন পেছন কাতারে কাতারে মানুষ, কেউ কেউ আবার জগঝম্প বাজাচ্ছে, মেয়েরাও আছে, বছরে একদিন নয়, মাসে একদিন নয়, প্রায় প্রত্যেকদিন। অথচ এও তো ঠিক আমি শান্ত হতেই চেয়েছিলাম, নিবিষ্ট হতেই চেয়েছিলাম, প্রতিদিন অমর সূর্যোদয় আর অফুরন্ত সূর্যাস্তের রূপে মুগ্ধ হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বার-বার যখনই যেদিকে তাকিয়েছি দেখেছি মিছিল চলেছে—মিছিল, যখনই কারুর সংগে দু'টো মনের কথা বলতে গেছি অমনি শুনেছি শ্লোগানের শব্দ, যখনই খুব ভালো লেগেছে পথে পথে একা একা হাঁটতে, দেখেছি ছুটে আসছে পুলিশের ভ্যান। যখনই চিনতে এসেছি 'মানুষ', তখনই বুঝতে হয়েছে 'ধান', আর তাতে কি নিষ্পাপ রক্ত! এ তো রক্ত!

অমনি বুকের মধ্যে খুলে গেছে খিল, ঢুকে পড়েছে মিছিল, মনের কথা কাউকে বলতে গিয়েও জড়িয়ে দিয়েছি তার সংগে শ্লোগান, একা একা নির্জন রাস্তায় চলতে চলতে কখন উঠে বসেছি পুলিশের গাড়িতে! কেন কেন এমন হয়। আমি তো এসব চাই নি।

না। এসব চায় নি সনাতন মণ্ডলও সত্যি, কোনদিনই চায় নি। তিন ক্লা পর্যন্ত 'পড়েছেন'। হেমবাবু বলে ছিলেন, মোটা কলম ধরমা যা। স

স্কুলমে তোর কাজ নাই। ব্যস, সনাতন বই-পত্তর নিয়ে হেমবাবুর মুখের ওপর সেই যে ছুড়ে দিয়ে এলো তারপর আর স্কুলমুখো হয় নি। হাতে কাটারি নিয়ে কলাবাগানে ঢুকে 'এ'টে' রেখে যাতে 'তেউড়' রস পায়, বাকিটা কেটে ঘাড়ে করে বয়ে এনে বাপের 'ছামুতে' নাবিয়ে দিয়ে বলেছে, খুব হল বকমারি পড়তে গিয়ে। এই লাও।

বাপ ছাঁদনদড়ি নিয়ে বেরুচ্ছিলো, দুধ দুইতে। 'কলে' বিড়ি ধরিয়ে বললে, ইবার থেকে তো এই বিড়ি-ফিরি তো ধরবে, তা আমার ছামুতে আর ফক্ ফক্ করে খেও নি। আড়ালে-আবডালে খেও সুপুত্তুর হয়ে।

তারপর চলে গেল হন হন করে। খুশি হল কি দুঃখ পেল বোঝা গেল না। তারপর গাঁ-এ ঢুকে পড়লো 'সোঁত'। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল বোঝা গেল না।

পর পর চারটে ইলেকশনে খাটলো সনাতন। বাবুরা চোখ রাঙিয়েছিল। বলেছিলো, জুতোর বাড়ি মারবো শুয়ার কী বাচ্চা। ব্যস, 'অস্ত' গরম হয়ে গেল। সনাতন মণ্ডলের 'অস্ত', সে তো যা-তা নয়। আমার নামে নারী হরণ, মনে করুন, রেপ কেস, সনাতন আমাকে বলল, ওঁয়ারা কতো মোলালেন, মামলা চলল, ওঁয়াদের সঙ্গে আমি পারবো ক্যানে, ইদিকে ট্যাকার ছেরাদ্দি আর উ-দিকে, বাচ্চা ছেলের মত সনাতন ককিয়ে উঠলো, বৌ মরে গেলে মনে করুন বৌ হয়, ছেলে মলে ষষ্ঠী জননী ছেলে পাঠ্যে দেন, কিন্তু আমার করকরে তিন বিঘে জমি। মশাই আমি কাউকে বিশ্বেস করতাম না, নিজে ভিজে গামছা পরে মা লক্ষ্মীকে মনে করে মাঠে 'ডাক সনকোন' বেঁধে দিয়ে আসতাম, ছেলেরা মানকচু জড়ানো ফল লুট করে নিতো বলে আলে আলে তাড়া করতাম, সেই জমি মশাই হাতছাড়া হয়ে গেল, এ যে কি দুঃখু! সনাতন মণ্ডল আমার সামনে বুকে থ্যাবড়া থ্যাবড়া হাতে চাপড় মেরে ডুকরে উঠলো।

ঐ শালা ইলেকশন হল কাল! কেন যে মরতে ভিড়েছিলাম!

সনাতনের দীর্ঘশ্বাস।

তার পরই আমার দিকে ফিরে বললে, আপনি ক্যানে এখানে এয়েছেন আমি তা জানি। আমাদের কথা লিখবেন কাগজে, তাই তো।

তাই।

কি লিখবেন? সনাতন অতোবড়ো মানুষটা, মাথার সব চুল পেকে গেছে, একেবারে শিশুর মত হেসে হেসে বলল, কি লিখবেন? হেঁ হেঁ। ওই আমরা

এই ভ্যাঁ, ভ্যাঁ, এই বলে জিভ দিয়ে মুখের ভেতর একটা অদ্ভুত শব্দ করলো। তারপর, শালার গরু বলে একটা চওড়া খিস্তি করে বললে, এই সব?

আমি অবাক হয়ে বাংলা দেশের চাষীকে দেখছিলাম। কোন সংকোচ নেই, কোন লজ্জা নেই, কতো স্বচ্ছন্দে খিস্তি করে দিলে। অতোবড়ো মানুষটা, মুখের ভেতরে কিরকম একটা অদ্ভুত শব্দ করলো, তার জন্যে কোন কুণ্ঠা নেই। আশ্চর্য, এখনো শিশুর মত হাসছে, বলছে, বলুন না, বলুন না, কি লিখবেন? একটু আগেই নিজের ঘরের দাওয়ায় বৌ-এর সামনেই বলেছে নারীহরণ আর বয়েসী ছেলের সামনেই বলেছে 'রেপ কেস'-এর গল্প। আমি কি লিখবো? এ ধরনের মানুষকে নিয়ে কিছু লেখা কি আমার কর্ম? আমার এ সরলতা আছে? ওরকম গালাগাল অতো নিষ্পাপভাবে আমি দিতে পারি?

আচ্ছা। হঠাৎ সনাতন মণ্ডল ব্যস্ত হয়ে পড়লো, আপনি তো গেরামেই আছেন। আমার আবার একটা কাজ আছে। আপনি এয়েচেন দেখা করতে। অথচ আমাকে যেতে হবে।

কোথায়?

আজ্ঞে একটা মিটিন। কিষক সমিতির। তালে যাই, কি বলেন? কালকে আসুন না। কোন কাজ নেই। সমস্ত দিন গপ্প করা যাবে। গরীবের বাড়িতেই যাহোক কিছু মুখে দেবেন।

সনাতন মণ্ডল চলে গেল। যাবার সময় হাঁসের ঘরে 'ছেকল' তুলে দিতে ভুললো না।

আর আমি পথে নেবে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, কোনটা সত্যি সনাতন মণ্ডলের, ইলেকশন করবার জন্যে তিন বিঘে জমি হারানোর দুঃখ, না এই 'কৃষক' সমিতি? একবার বলল, এই সব করতে গিয়েই আমি মশাই 'সব্বো-সান্ত' হনু। আবার পরক্ষণেই নতুন করে 'সব্বোসান্ত' হবার জন্যে উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে। বিচিত্র হে বিচিত্র!

আমি দেখেছি বেলগাছে বেল হয় আর তা সময়ে পাকেও। মানুষ তা খায়। কিন্তু এই 'কৃষক' সমিতি এদের কি দেবে? সনাতন মণ্ডল যা বলল সে তো এক দীর্ঘশ্বাসের কাহিনী, কিন্তু তা সত্ত্বেও সনাতন মণ্ডলেরা আবার ঐ দিকেই ছুটছে কেন? আমি নতুন লোক, আমার সংগে দু'দণ্ড কথা বলারও ফুরসৎ নেই, এতো তাড়া?

সনাতন মণ্ডলেরা ছুটছে, আগুনের দিকে তাকিয়ে দেখছি, ধ্বজা হাতে ছুটেছে। কোথায় ছুটছে এরা? যে ধ্বনী

আমি জানি না। বিচিত্র হে বিচিত্র!

একটা ব্যাপার বরাবর দেখছি।

আমি কখন থেমে থাকি তখন সবই থেমে থাকে। আমি থেমে আছি। সংগে সংগে থেমে আছে পথ। সংগে সংগে থেমে আছে বন-ঝোপ। চুপচাপ আকাশ দেখছে পুকুর। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তালগাছ। স্তব্ধ, অনড় হয়ে বসে আছে দু'পাশের ধানক্ষেত। কিন্তু আমি যখন থেমে থাকি না তখন আর এক ব্যাপার। এটা ম্যাজিক কি না জানি না, কিন্তু এরকম অনবরতই ঘটছে। অনেক-দিন বসে আছি চুপচাপ। পায়ের কাছে রোদ্দুর। দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া। সদ্য চান করে এসেছি। সামনে এক কাপ গরম চা আমারই প্রতীক্ষারত। গায়ে একটা কিছু জড়িয়ে মাদুর বা চ্যাটাই যখন যেরকম জোটে তাতে হুমড়ি খেয়ে বসে লিখে যাচ্ছি। লিখেই যাচ্ছি। নড়ি না। এরকম দিনের পর দিন হয়। তারপর এক-একদিন কিরকম এক অদ্ভুত হাওয়া বয়। বুকের ভেতরই সম্ভবত। মনটা ছটফট ছটফট করে। চোখ দুটো চরকির মত পাক খায়। পা দুটো যেন কুমোরের চাকের মত ঘুরতে থাকে। তখন মনে হয়, দুঃ শালার লেখা, আমার থেকে তো বড় লেখক, আমি যে শহরে থাকি, সেই শ্রদ্ধেয় দয়াল শা' মশায়। উনি রোজ নিয়ম ক'রে শীত-গ্রীষ্ম নেই, মামলা-মকদ্দমা নেই, পুজো-পার্বণ নেই—লিখেই যাচ্ছেন, লিখেই যাচ্ছেন। খেরোবাঁধানো খাতায়, কষ কালিতে, চমৎকার হাতের লেখায়, একবারে গণেশের কলম। ভাবতে হয় না, মাঝে মাঝে অভিধান পড়তে হয় না, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে এদেশী ট্যাসকে ইতালীর দ্রাক্ষালতা হিসেবে চালানো পার্ক স্ট্রীটের কোন অভিজাত রেস্তোরাঁর টেবিলের নিচে গড়াগড়ি খেতে হয় না, মাঝে মধ্যে বড়বাজার নামক বিখ্যাত জায়গার অজস্র অলি-গলিতে সপ্তাহে একদিন কিলবিল করাই যথেষ্ট আর তারপর হুড়-হুড় করে ঘাড় হেঁট করে লিখে যান, প্রথমে শ্রীশ্রীকালীমাতা সহায়, তলায় মেরে দেন লম্বা লম্বা দু'টি ড্যাস আর তারপর, কি বললে, পাঁচ-ফোড়ন? কতো? দু'শো, কালজিরে একশো, মটর ডাল, মটর ডাল কতো? মুখে মুখে এই সব চলছে, কানে শোনার আগেই ঘসঘস চলছে কলম, মাঝে দু'-তিন মিনিট ব্রেক, ওই এবেলা এক ভাঁড় চা, ওবেলা এক ভাঁড় চা, দশ-বারোটি বিড়ি, ব্যস, ঘাড় হেঁট করে স্বয়ং গণেশ লিখে চলেছেন উদয়াস্ত, এ'র চেয়ে আমি কিসে বড়?

অতএব আর লেখা নয়, খুব হয়েছে। ঐ যে যারা সারারাত জ্যোৎস্নায় আর

শিশিরে ভিজেছে তাদের কাছে ছুটছে ইঁদুর, এদিক-ওদিক তাকাবার ভংগি কি অপূর্ব, এইবার কুটকুট করে ধানের শীষ কেটে পিট্টান দেবে উচ্চমত টিবি-টায়, ওর খোঁদলে রাখবে ধান, তারপর আসবে নেংটিপরা হাড়হাভাতে মানুষ, ক্ষেতের কাজ যখন সারা, ইঁদুরের সঞ্চয় চুরি করে নিয়ে যাবে বজ্জাত ধানচোর, অতএব আর কি পারি বসে থাকতে, চলো চলো, আবার পথে।

আর তারপরই শুরু হয় সেই ম্যাজিকটা। ডুগ ডুগ ডুগ। এক আজব মাদারী কা খেল্। আমি চলছি, সংগে সংগে চলছে পথ। ডুগ ডুগ ডুগ। চলছি। সংগে সংগে চলছে বনঝোপ। ডুগ ডুগ ডুগ। চলছি। সংগে সংগে চলছে সেই পুকুর, যেখানে ঘটি ডোবে না। আমি যতো চলছি ততো উধাও হচ্ছে আকাশ। আমার সংগে সংগে চলছে তাল, তমাল। চলছে ধানক্ষেত। এখন চলছে তাল-বনানী গ্রাম। ডুগ ডুগ ডুগ। এক আজব মাদারীকা খেল।

কারা যায়? এও কি ম্যাজিক? মাটি ফুঁড়ে এলো? এদেরই না একটু আগে দেখেছি 'সোনঝরা' গ্রামে? এখন এরাই যাচ্ছে 'তালবনানী'র ভেড়ীর ওপর দিয়ে? আবার এই গ্রামটা পার হলেই ওদের দেখা পাবো 'বগা'য়? ডুগ ডুগ ডুগ। বাজনাটা বেজেই চলেছে। বেজেই চলেছে। বা রে মাদারীওয়ালা। পয়লা নম্বরের ভেল্কীবাজ। এতো সব মানুষ কোথায় ছিল? কোনদিন তো দেখে নি কেউ। সব গ্রামেই কি এরা আছে? ঐ একই রকম ঝোড়ো হাওয়ায় দুলছে? বলছে না, পতিত জমি দখল করো, দখল করো, দখল করো, দখল রেখে চাষ করো, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ? সকলের এক ভাষা এ কেমন করে হয়? কোথায় চলেছে এরা? কেন? অন্য গ্রামে আর একদল যেখানে গেছে?

ঠিক না? ঠিক। আমি পার্টি দেখি না, দল দেখি না, মত বুঝি না, মতলব জানি না, কিন্তু আমি এদের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি। যেন অনেকদিনের ঘুম এদের হঠাৎ ছুটে গেছে। গরুর গাড়ির চাকায় কাদার পাঁকে এতোদিন আটকে ছিল। বলদ দুটো কাঁধের ককুদ দিয়ে ঠেলে তুলেছে। গরুর গাড়িটা পাঁক থেকে উঠেছে। আর তারপর আবার সেই ডুগ ডুগ ডুগ। শুরু হয়ে যাচ্ছে ম্যাজিক। গরুর গাড়ি ছুটছে মোটরের মত। সোঁ সোঁ, এক দমে সাত শো মাইল, এনে দিচ্ছে সাত শো সকাল. আমি এদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই সকাল দেখি, হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে অনেকের, অনেক দিন পর, সূর্যোদয় হচ্ছে, মানুষের সূর্যোদয়, আমি দু'হাত তুলে প্রণাম করি স্তু জবাকুসুম শংকাশম্ কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্, সমস্ত দিগন্ত জুড়ে এতোবড়ো সূর্য এর আগে কখনো কল্পনাতেও আনতে পারি নি। মুক্তির আনন্দে মানুষ পাগল হয়ে গেছে।

কিন্তু আলে শুধু কুলেখাড়া গাছই গজায় না, যা রোগের পথ্য, সেখানে আছে আলকেউটে। সজনে গাছে শুধু সজনে ফুলই নেই, আছে শুঁয়াপোকা। সরু সুতোর লাইন টেনে শূন্যে ঝুলছে। তোমার ঘাড়ে পড়তে পারে, পড়তে পারে পাতে। এই শুঁয়াপোকা আছে সর্বত্র।

জি. টি. রোডের ধারে এই রকম একটা শুঁয়াপোকার ডেরা দেখেছিলাম। দোকানটা এমন কিছু বড়ো নয়। কিন্তু তবু বড়ো বলতে হয়। গ্রামের তুলনায়। সন্দেহ কি, চায়েরই দোকান। অবিকল সেই রকমই। হোগলার বেড়া। মাথায় খড়ের ছাউনি। সেই দু'-তিনটে ছ্যাদলা-পড়া কাপ। ডিসের বালাই নেই। কোনটার আবার হাতলভাঙা। দশ-বিশটা মাটির ভাঁড়। আমি বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। দেখি লোক ঢুকছে অনবরত। প্রথমে নজরে আসে নি। তারপর দেখলাম। একটা বিশেষ ছাপ আছে লোকগুলোর গায়ে। সারা রাত না ঘুমুলে যেমন এক ধরনের অবসাদের সংগে একটা রুক্ষতা ফুটে ওঠে তেমনি।

ভেতর দিকটা বড়ো। একটু আড়াল করা। সেখানে আস্তে, গলা নাবিয়ে কি সব নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। এতোক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ কিছু মনে হয় নি। হঠাৎ একজন লোক সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি

কোথায় যাবেন? হ্যাঁ। বাস ধরবেন? হ্যাঁ। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে? আপনারা তো কেউ কথা বলছেন না। চা খাবেন? উনুন তো নেভানো। আচ্ছা, দাঁড়ান। ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাদের এখানে বুঝলেন কি না চা-খোর লোক বেশি নেই। ভাত খেতে পায় না মশাই তো চা খাবে। ব্যস। কথা ঐ পর্যন্ত। তারপর ঘণ্টাখানেক চলে গেছে। বসেই আছি। বসেই আছি। চা এলো। পয়সা দিলাম। কোথায় আর যাবো। তখনো বসে আছি। খানিক পর। একটা বাস চলে গেল। সেই লোকটা উঠে এলো, বললে, কি গেলেন না? না-ও। চলে গেল লোকটা ভেতরে। একটু অন্ধকার মত হল। বেলা হেলে পড়েছে। বসে আছি। আবার একটা বাস হুস্ করে চলে গেল। লোকটা লক্ষ্য করলো আমাকে। তারপর কাছে এসে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে নির্বিকারভাবে বলল, এতেই রাজী হয়ে যান।

ভয়ানক চমকে উঠলাম, বললাম, কিসের রাজী হয়ে যাওয়া?

আপনি তো সবই জানেন। লোকটা হাসছে। হ্যারিকেনের আলোয় দাঁত দেখা যায়। আমিও হাসলাম। বললাম, আমি অন্য লোক। উঠে এলাম। পথ। পথে চলছি। শুনুন। পেছন থেকে ডাক এসেছে।
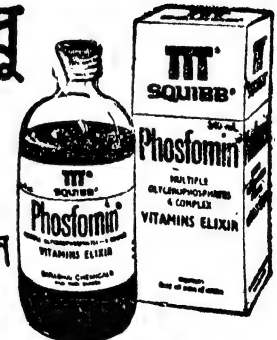
ওখানে কেন গেসলেন? গেলেই বা। ওটা যে ভীষণ নটঘটে জায়গা। যতো সব বাজে, ফালতু লোকের ভিড়। কিন্তু ভয়টা কিসের? ভয় নেই? একটু অন্যরকম মনে হলে একবারে জ্যান্ত সমাধি। তার মানে? সোজা কথায় স্বর্গোধাম। ওরা সব ওয়াগন ব্রেকার। এখানে? যাবে আর কোথায়? আমাদের মধ্যেই ত' ছিল। আমাদের মধ্যেই আছে। ভবিষ্যতে? ভবিষ্যতেও থাকবে। লোকটির কণ্ঠস্বর অবিচলিত, দ্বিধাহীন। এইবার গলা এলো। বললে, ওরা আছে চোলাই মদের কারবারে। ওরা আছে চোরা-চাল চালানে। ওরা আছে ওয়াগন ভাঙায়। কেন থাকবে না মশাই? এমন স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে ত' কোথাও নেই। ওরা আছে মিছিলে। মিছিলে? কেন, মিছিল কি দোষ করলো? যা আছে তাতে ওরা থাকবে। মিছিল যখন আছে তখন মিছিলে থাকবে না কেন। বলুন। এ একেবারে অকাট্য যুক্তি। মানে এ যুক্তি আপনি ফাটাতে পারবেন না।

মিছিল যারা চালান তাঁরা এদের ঢুকতে দেন? ঢুকে গেলে কি করবে মশাই? আপনি ত' বলছেন বেশ। মিছিলে একটা বেপরোয়া লোক জুটে গেল। এটা ত' দরকার। যেমন কান্ড কারখানা চারদিকে ঘটছে, যান এ গ্রামের ভেতরে, কান পেতে শুনুন। ঠন্ ঠন্ ঠন্। গরম, আগুনে ঝলসানো ইস্পাতের পাতের ওপর হাতুড়ি পড়ছে। এর আর কামাই নেই। সকাল সাতটায় যান। ঠন্ ঠন্ ঠন্। বিকেলে যান। তখনো তাই। অনেক রাতে যান। তখনো ঠন্ ঠন্ ঠন্। তৈরি হচ্ছে মশাই। বললাম, হেঁসো, তীরের ফলা, কোদাল। ডান্ডায় ঝান্ডা উবে গেছে। এখন সেখানে ইস্পাত গোঁজা। চকচকে রোদে সে সব ঝকঝক করে। তা' এদের জন্যেও ত এই সব বেপরোয়া লোক দরকার।

এরা ত' সাংঘাতিক।

সাংঘাতিক হলেই বা আপনি কি করছেন? কি করে একে ঠেকাবেন? এদেরও ত' আত্মরক্ষা করতে হবে। না হলে ত' ঢুকে দেবেন পি ডি এ্যাক্টো। যা একখানা গরমেন্ট ফেঁদেছেন। উপায় আছে দলে না ঢুকে? আগে দলের বাইরে থেকে মস্তানী করতো। এখন যেখানে যে দল বলবান সেখানে সে দলে ঢুকে মস্তানী করছে।

দলের নেতারা?

দু' চার জায়গায় বাদ দিন। বাকি বেশির ভাগ জায়গায় নেতারা অসহায়।

আপনি ঠিক জানেন?

হলপ করে কি করে বলি। আমি ত' ভগবান নই।

তাহলে আপনি কে? আমি যে ঠিক কি আমি তা জানি না। আমাকে ছোট-লোকও বলতে পারেন না। ভদ্দরলোকও নয়। তবে? ছোটলোকের মত আমার আস্পদ্দা নেই লুকোনো জমি দখল করতে। ভদ্দর লোকদের মত আমার উৎসাহ নেই 'সব গেল গেল' রব তুলতে। আমি মশাই মাঝের লোক। আমি যে ঠিক কি আমি তা' জানি না। কিন্তু হঠাৎ লোকটি চুপ করলো অন্ধকার। চলছি। মনে করলাম পাশেই আছে। বোধ হয় দেশলাই ধার করছে। অথবা নস্যির কৌটো খুঁজছে পকেটে। তাই চুপ করে আছে।

কি, কিছু বলছেন না ত' আর?

কোন উত্তর নেই। আবার সেই ঝাপসা অন্ধকার। পাশে ভালো করে তাকালাম। নেই। পেছনে তাকালাম। নেই। সামনে তাকালাম। নেই। যাঃ বাবা। উধাও হয়ে গেল নাকি? এ আবার কি ধরনের লোক? 'কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন' বলেই অদৃশ্য হল? কি সেই কথা যা' লোকটা বলতে চেয়েছিল অথচ বলল না? আমি ভাবতে ভাবতে চলেছি। ভাবছি আকাশ পাতাল। এখানে এসে নানারকম মানুষ দেখছি। কিন্তু এরকম মানুষ কখনো কল্পনা করি নি। কেন পালালো? ভুত নয়। হাতে হাত লেগেছে। পায়ে এক-আধবার পা লেগে গেছে। কেন না আমাকেও চলতে হচ্ছে সাবধানে। পথে রেখে চোখ যতোটা সম্ভব। হোঁচট খাবার আয়োজন ত' নেহাৎ কম নেই এখানে। সে সব কথা থাক। কি কথা লোকটা বলতে গিয়ে বলল না? কেন বলল না? অনেক খুঁজলাম মনে মনে। না পেয়ে যখন সব ছেড়ে দিলাম তখন এসে গেছি একেবারে খোলা মাঠে। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কলাগাছ পড়ে আছে নাকি? দেখ লোকের কান্ড। তিন হাত লাফিয়ে সরে গেলাম। এখন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না উঠেছে। ধারালো করে উঠেছে চাঁদ। কুয়াশা ভাসছে মাঠে। সে আলোয় দেখলাম একটা লোক, আলের ওপর শরীরের খানিকটা, মুখটা গুঁজড়ে পড়েছে, ধানক্ষেতের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়েছে, পিঠে বল্লম গাঁথা, রক্ত তখনো বেরুচ্ছে, কেউ কোথাও নেই, অতোবড়ো বিরাট মাঠ, আতংকে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। আবার তাকালাম। ঝান্ডাটা পড়ে আছে কাদায়। রক্তে ভেজা ঝান্ডা। কি কথা লোকটা বলতে চেয়েছিল? কি কথা? আজ রাত্রে, এই নিঃশব্দ, পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায়, উন্মুক্ত মাঠে, নির্জনে, কুয়াশায় তা' আমি নাই জানলাম। ম্লান ও বিষণ্ণ-ভাবে, আমি ঝান্ডার দিকে তাকালাম। অক্টোবর বিপ্লবের রক্ত-লাঞ্ছন পতাকা। এ পতাকা যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল সে আর নেই। সে মরেছে। এ পতাকা ত' এভাবে ফেলে রাখতে নেই। কাউকে না কাউকে কোনদিন না কোনদিন একে বহন করতে হয়। আমি সেই নির্জন জ্যোৎস্নায় অপরূপ এই পরিস্থিতিতে পতাকাটিকে কাঁধে তুলে নিলাম।

[ক্রমশ]

**মায়া কাজল:** অলকা উঁকিল। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা—৬। মূল্য: সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীমতী অলকা উঁকিলের এই গীতি-আলেখ্য মানবিকতার রসসিক্ত। যে ধরনের গতানুগতিক বিশ্বাস এবং ভাবধারাকে সম্বল করে অনেকেই গীতি-আলেখ্য রচনায় হাত দেন, শ্রীমতী উঁকিল তা করেন নি। তিনি তাঁর আন্তরিকতা, সততা ও কল্পনার সাহায্যে আজ থেকে দু' যুগেরও কিছু আগে এদেশের নির্যাতিত মানুষের আসল রূপটি কেমন ছিল তাই কথা ও সুরের রঙে এঁকেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় সে-সময়ের কথা তুলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"দু' যুগ আগে সেসব কি দিনই না গেছে। কলকাতার রাস্তায় আমাদের হাঁটতে হত মড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। আকাশ বিদীর্ণ হত 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' চীৎকারে।" কথা ও সুরের ঐশ্বর্যে এই গীতি-আলেখ্যটির মঞ্চ-সাফল্য সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আলেখ্যটির শেষভাগে স্বরলিপির অংশটি এবং মঞ্চ-নির্দেশ বিশেষ মূল্যবান।

**Essays on Agricultural Geography: (A Memorial Volume to Dr. B. N. Mukherjee): Edited by Bireswar Banerjee D. Litt: Published by the Editor. Price: Rs. 40 or $6.00.**

পরলোকগত ডঃ বি এন মুখার্জী একজন খ্যাতনামা ভৌগোলিক এবং কৃতী শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তিনি অকালে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে প্রকাশিত এই কৃষিবিষয়ক ভূগোলের গ্রন্থটিতে একাধিক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃষি-বিষয়ক ভূগোলের ক্ষেত্রে নানাবিধ গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য এই গ্রন্থটিতে স্থান লাভ করেছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। সারা বিশ্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কৃষিকার্যের গুরুত্ব দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। ফলে যেসব সমস্যা সৃষ্ট হচ্ছে তা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। ভারতবর্ষ এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে আজ এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নতির জন্য নানা প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আজ আরম্ভ হয়েছে। প্রাচীন রীতিকে পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফসল ফলানোর গুরুত্ব আমরা এখন উপলব্ধি করেছি।

বর্তমান গ্রন্থটিতে কৃষির মূল সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে। জল সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মাটির ক্ষয়রোধ, কৃষিকর্মের ব্যবস্থাপনা, কৃষি সংঘ গঠন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এইসব গবেষণার ফলে আমাদের কৃষিবিজ্ঞানের দিগন্ত বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে একথা অনস্বীকার্য।

গ্রন্থটির সম্পাদক ডঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের সুপণ্ডিত অধ্যাপক। তাঁর ডি-লিটের জন্য রচিত থিসিসের বিষয় ছিল 'Agriculture in West Bengal.' এ ছাড়া বহু অমূল্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি আমাদের ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি অমূল্য সংযোজন।

**মাটির কুটিরে:** মিহাইল সাদোভেয়ানু (অনুবাদ—অমিতা রায়): সাহিত্য আকাদেমী, নিউ দিল্লী। মূল্য: ৩·৫০।

আজকের দিনে মিহাইল সাদোভেয়ানু রুমানিয়ান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। সে দেশের বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি ও তার সাথে সহজ-সরল পল্লী-জীবনের অদ্ভুত আলোআঁধারি ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। তাঁর কারণ তিনি সে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও মর্মজ্ঞ।

বাংলা ভাষায় সাদোভেয়ানুর রচনা এই প্রথম অনূদিত হল। এই ছোট উপন্যাসটির ঘটনাস্থল সভ্যজগতের অনেক দূরে রুমানিয়ার প্রত্যন্ত-প্রদেশের এক অনাবাদী জলাভূমি। আইন-কানুন সেখানে ছিল না, ছিল শুধু বর্বর জমিদারের প্রচণ্ড লোভ। মাটির বুক চিরে ফসল ফলাবার জন্য বুভুক্ষু কৃষকদের সে নিয়োগ করত। তার বিরাট প্রাসাদের পাশে মাটির কোটরে পশুর মত গাদাগাদি করে তাদের সে থাকতে দিত। উন্মূল, উদ্বাস্তু এই মানুষগুলো ছিল জমিদারের পাইক-পেয়াদার শিকার। অথচ বিনা প্রতিবাদে সমস্ত উৎপীড়নকেই তারা ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিত। একদিন নিৎসা নামে এক যুবক এদের মাঝে এসে পড়ে তরুণী মার্গিওলিৎসার প্রেমে পড়ে এদের বিচিত্র জীবনযাত্রার অংশীদার হয়ে রইল। ভাগ্যতাড়িত হলেও তার কণ্ঠে ছিল বিদ্রোহের সুর। আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য এবং কর্তব্যের খাতিরে সে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করতে কুণ্ঠিত হয় নি। কাহিনীর সুন্দর পরিণতির সাথে নিৎসা মার্গিওলিৎসার পবিত্র প্রেমের অপূর্ব বিবরণ পাঠকের মনে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করবে।

**রামায়ণী প্রেমকথা** (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক: প্রফুল্ল গ্রন্থাগার; ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম: সাড়ে ছয় টাকা।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রামায়ণ-মহাভারতকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন, হিমালয় পর্বত যেমন, এই দুটি মহাকাব্যও তেমনি যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করছে। এদের থেকে উপাদান সংগ্রহ করে যুগে যুগে সৃষ্টি হচ্ছে অপরূপ সব সাহিত্য!

আচার্য ত্রিবেদীর কথার সারবত্তা নতুন করে উপলব্ধি করা গেল এই সেদিন, 'রামায়ণী প্রেমকথা'র পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ পড়বার সময়। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শ্রীসুধাংশুরঞ্জন ঘোষ রামায়ণের কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রকে বেছে নিয়ে যেভাবে গল্পরস জমিয়ে তুলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষার প্রয়োগ এবং প্রাচীন যুগের আদিরসপ্রধান কাহিনীকে যুগোপযোগী করে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস এই গ্রন্থটিকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। তবে ক্রিয়াকে এগিয়ে দেবার প্রবণতা জায়গায় জায়গায় বড় বেশি প্রকটভাবে চোখে পড়ে। এদিক দিয়ে লেখক আর একটু সংযত হলে পারতেন।

'রামায়ণী প্রেমকথা'র অধিকাংশ কাহিনীতেই প্রাচীন যুগের অদ্ভুত-আশ্চর্য পরিবেশ জমিয়ে তোলার জন্যে লেখককে সাধুবাদ জানাই; এবং এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বলি, 'রাবণ ও রম্ভা'য় জ্যোৎস্না-প্লাবিত কৈলাস-পর্বতের অনুপম পটভূমিকায় রম্ভার অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য এবং দৃপ্ত ও কামোন্মত্ত রাবণের চিত্র সুন্দর ফুটেছে। 'বিশ্বামিত্র ও মেনকা'য় পুষ্কর হ্রদের তীরে শান্ত-স্তব্ধ আরণ্যক আশ্রম-পরিবেশে মেনকার প্রতি বিশ্বামিত্রের প্রেমসঞ্চার, উভয়ের গার্হস্থ্য জীবন-যাপন এবং পরিশেষে গর্ভবতী মেনকাকে বিদায় দিয়ে বিশ্বামিত্রের পুনরায় যোগসাধনায় রত্নী হওয়ার চিত্র এক কথায় অনবদ্য। 'ইন্দ্র ও অহল্যা' এ-গ্রন্থের আর একটি সুগ্রথিত কাহিনী। নিষিদ্ধ-প্রেমের মর্মস্পর্শী চিত্র এটি। ব্রহ্মা কর্তৃক অপরূপা অহল্যার সৃষ্টি, অহল্যার প্রতি ইন্দ্রের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং পরিশেষে ইন্দ্রের কাছে গৌতম-পত্নী অহল্যার আত্মদান বর্ণনার গুণে এখানে অসাধারণ শিল্পোৎকর্ষমণ্ডিত। এ-কাহিনীর একেবারে শেষাংশে ইন্দ্র ও অহল্যার প্রতি মহর্ষি গৌতমের অভিশাপ-প্রদানের চিত্রটি অতি অল্প কথায় জীবন্ত।

'লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলা'য় ঠিক জীবন্ত হয়ে ওঠে নি কাহিনী। পরিবেশ ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। 'বিশ্রবা ও কৈকসী' প্রসঙ্গেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তবে এই সামান্য কিছু দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'রামায়ণী প্রেমকথা' যে একালের একটি বিশিষ্ট গল্প-সংকলন, এ-বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

**নির্জন সংলাপ** : (১৩৭৫)—নিশিনাথ সেন। নাভানা। ৪৭ গণেশ এ্যাভেনিউ, কলকাতা-১৩। দাম : দু' টাকা পঞ্চাশ।

২৯টি কবিতার সমষ্টি। বেশির ভাগ তানপ্রধান ছন্দে বা গদ্যে লিখিত। বুদ্ধদেবীয় কতকগুলি বস্তাপচা যৌন শব্দের যত্রতত্র প্রয়োগ। বাংলা কবিতা এখন এ সব ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আলো বিষয়ক কবিতাগুলি এবং 'বিশ্ব-শান্তির স্বপক্ষে' ভাল লেগেছে। হৃন্ময় শব্দটির বহুল প্রয়োগ (এমনকি এক কবিতায় একাধিক বার) শব্দটিকে অকেজো করে তুলেছে।

**শুকনো জল**—কেদার ভাদুড়ী। ডিলাইট বুক কোং, ১৭৩।৩ বিধান সরণি। দাম—তিন টাকা।

তরুণ কবি কেদার ভাদুড়ীর কাব্য-গ্রন্থ 'শুকনো জল' বেশ কিছুটা প্রতি-শ্রুতির স্বাক্ষর নিয়ে সমুপস্থিত। অনেক-গুলি কবিতা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কাহিনীর কোন চরিত্রের তাৎপর্যকে গ্রহণ করে উৎসারিত। বিবরণপ্রধান কবিতা বন্ধ হবার অবকাশ রাখে। এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাটিতেও কবিমনের আর একটা দিক উদ্ঘাটিত।

**অনন্ত স্বপ্নের মাঝে তুমি মিশে আছ**—মৃণাল হালদার। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ১১।এ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—আড়াই টাকা।

কবি মৃণাল হালদারের এই কাব্য-গ্রন্থটির সব ক'টি কবিতাই রোমান্টিক অভীপ্সার উদ্দেশ্যে সমর্পিত। কবি তাঁর মানসীকে সমস্ত রকম পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ভেতর উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেও রোমান্টিক মানসিকতার নিদর্শন সুস্পষ্ট। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

**ভজনমালা**—শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদার। গ্রন্থ-প্রচার, ২০এ, গোবিন্দ সেন লেন, কলকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

গান্ধীজীর প্রিয় ভজন গানগুলির স্বরলিপি প্রকাশ করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষদস্তিদার। গান্ধী-শতবর্ষে এই সঙ্কলনটির প্রকাশ সঙ্গীতপিপাসুর একটা চাহিদা মেটাবে বলেই মনে হয়। প্রারম্ভে হিন্দী উচ্চারণ করবার পদ্ধতির সংযোজন গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

## পত্র-পত্রিকা

**পার্থসারথি**—১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৭৬) : সম্পাদক—শ্রীপ্রীতি-কুমার ঘোষ কর্তৃক বসাক ট্রেডিং কোং, ৩০, রাজকুমার মুখার্জী রোড, কলকাতা—৩৫ হইতে মুদ্রিত ও তৎ-কর্তৃক ৫/এ, অক্ষয় বোস লেন, কলকাতা—৪ হইতে প্রকাশিত : বার্ষিক চাঁদা ৪·০০ টাকা মাত্র, ষাণ্মাসিক ২·২৫ পঃ।

পার্থসারথি ধর্মবিষয়ক পত্রিকা। দশ বছর ধরে নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে এই পত্রিকাটি এই সত্যই প্রমাণ করেছে যে, আজকের দিনেও বস্তুবাদই জীবনদর্শনের একমাত্র পথ নয়। ধর্ম ছাড়াও ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা এই পত্রিকাটির অন্যতম লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দের 'রূপান্তর-যোগ' একটি অমূল্য রচনা। এ ছাড়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দের 'দৈব ও পুরুষকার', শ্রীরঘুনন্দন দাসের 'বাঙালী কোন্ পথে' এবং শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীঅরবিন্দের যোগ সমন্বয়' (সংক্ষিপ্ত) কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং মননশীল রচনা। এই সংখ্যার অন্যান্য রচনাগুলিও সুলিখিত। এই শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা আমাদের মনের গভীরতর চিন্তাগুলিকে

**হোমশিখা**—সম্পাদক : কালীপ্রসাদ বসু। হোমশিখা প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রি, কৃষ্ণনগর। দাম : ১·৫০।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত হলেও লেখাগুলি সুনির্বাচিত এবং নতুন লেখকরাও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। লিখেছেন রামজীবন ভট্টাচার্য, কালীপ্রসাদ বসু (উপন্যাস), বন্দে আলী মিয়া, মনোজিৎ বসু, রণজিৎকুমার সেন, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, বোম্মানা বিশ্বনাথম্ প্রমুখ।

**তন্দ্রা**—সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সন্তোষপুর গভঃ কলোনী, মহেশতলা, ২৪ পরগনা। দাম : এক টাকা।

তন্দ্রা সাহিত্যগোষ্ঠী কর্তৃক ত্রৈমাসিক মননশীল সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত। উপন্যাসোপম বড় গল্প, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি সুখপাঠ্য।

**নবাংকুর**—সম্পাদনা : বিকাশচন্দ্র দাস। ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪। দাম : এক টাকা।

এতে লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, অধ্যাপক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ ও উমা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

**উষক**—সম্পাদক : স্বামী শংকরানন্দ। অভেদানন্দ একাডেমি অব্ কালচার, ৭৩ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-৫। দাম : আড়াই টাকা।

পত্রিকাটি বৃহদাকার নয়; কিন্তু আলোচিত ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলি মূল্যবান। প্রাচীন ভারতের শিলালিপি ও শিল্পশাস্ত্র, আফ্রিকায় ভারতীয় লোক-কাহিনী, আর্মেনিয়াতে ভারতীয়গণ প্রভৃতি প্রবন্ধ গবেষণামূলক। তবে পত্রিকাটির মূল্য বড় বেশি।

**সিংহাসন**—সম্পাদক : পূর্ণেন্দু ভর দ্বাজ। কাকদ্বীপ, ২৪ পরগনা দাম : ৫০ পয়সা।

কবিতা ও কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ এ[illegible] উপজীব্য। সুগত চৌধুরীর প্রবন্ধটি প্রশংসনীয় হলেও তা অসম্পূর্ণ। অরু[illegible] ভট্টাচার্যের চিঠিতে স্পষ্টবাদিতার জ[illegible] উল্লেখ্য।

**অরণি**—সম্পাদক : অরবিন্দ ঘোষ ১৯৩, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-[illegible] দাম : ১·৫০।

সুপাঠ্য রচনা ও আঙ্গিক সৌষ্ঠ[illegible] 'অরণি' সাহিত্যরসিকদের পরিতৃপ্ত করবে। এতে রয়েছে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ দাস ও ক[illegible] চৌধুরীর প্রবন্ধ তিনটিতে তথ্য ও ত[illegible] সমাবেশ রচনাগুলিকে মূল্যবান করেছে

# কালিদাসের কাব্যে তিলোত্তমা-উপাখ্যান

**কালিদাসের** বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ। তাঁর অতুল উপমার কথা জগদ্বিখ্যাত। উপমাযোগে বর্ণনাগুলি মনোহারিণী। জনপ্রিয় উক্তি "উপমা কালিদাসস্য" তাঁর অসামান্য কল্পনা-শক্তিরই পরিচয় দেয়।

কল্পনার রসে কাব্যকে রসময় করে তোলার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্য কবিকে গ্রহণ করতে হয়েছে। অলংকারের ক্ষেত্রে যে বস্তুগুলিকে উপমানরূপে ব্যবহার করা যায় তাদের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষভাবে লোকের জ্ঞানগম্য, যেমন চন্দ্র, সূর্য, পদ্ম প্রভৃতি; কতকগুলিকে আবার জানা যায় পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে। 'উর্বশীর মত সুন্দরী' বলামাত্রই অনন্ত-যৌবনা, অপূর্বশোভনা, বিদ্যুৎচঞ্চলা উর্বশীর ভুবনমোহিনী রূপ মানস-লোকে ভেসে ওঠে। জনসমাজে উর্বশীর অসামান্য রূপের এই প্রসিদ্ধির মূলে আছে উর্বশী-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কাহিনী।

সংস্কৃত কাব্যে, বিশেষ করে কালিদাসের কাব্যে পুরাণ-কথাসাহিত্যের বহু প্রয়োগ দেখা যায়। কখনো অলংকারের প্রয়োজনে, কখনো কাব্যের সৌন্দর্য-সম্পাদনের ইচ্ছায়, কখনো বা নায়ক-নায়িকার উৎকর্ষসাধনের বাসনায় প্রাচীন কাহিনীগুলির সমাবেশ ঘটেছে কবির কাব্যে। যে হতভাগ্য এই কাহিনীগুলির সঙ্গে পরিচিত নয়, কাব্যের সম্পূর্ণ রসাস্বাদনে সে বঞ্চিত।

মেঘদূতে যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনায় কবি লিখছেন—

> তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা
> পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা
> নিম্ননাভিঃ।
> শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা
> স্তনাভ্যাং
> যা তত্র সাদ্যুবতিবিষয়ে
> সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতোঃ ॥১

তন্বী, শ্যামা, সূক্ষ্মাগ্রদন্তা, পরিণত-বিম্বফলস্বরূপ অধরোষ্ঠবিশিষ্টা, কৃশ-মধ্যা, ভীতহরিণীর দৃষ্টিসম্পন্না, গভীর নাভি, নিতম্বভারে মন্দগামিনী, স্তনগৌরবে ঈষদবনতা, যুবতি-নির্মাণব্যাপারে বিধাতার আদিসৃষ্টি-স্বরূপা যে নারী যক্ষপুরীতে অবস্থিতা, মেঘ তাঁকে দেখবে।

১—মেঘদূত, উত্তরমেঘ, শ্লোক-সংখ্যা ২২।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে শকুন্তলার রূপমুগ্ধ দুষ্মন্ত বলছেন—

> চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগাঃ
> রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
> স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
> ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ
> তস্যাঃ॥২

শকুন্তলা রূপে অতুলনীয়া। তাঁর রূপদর্শনে মনে হয় বিধাতা যেন মনে মনে রূপসমুচ্চয়ের দ্বারা তাঁকে গড়ে তুলেছেন। তিনি যেন বিধাতার অপরা৩ স্ত্রীরত্নসৃষ্টি।

প্রতিবার যা'র সঙ্গে তুলনা করে কবি তাঁর নায়িকাদের উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করেছেন, কে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী, অভিনবযৌবনা রূপসী?

মহাভারতে তিলোত্তমার উপাখ্যান পাওয়া যায়। অপরূপা তিলোত্তমা রূপ-জগতের তারকা। অনুশাসন পর্বে মহেশ্বর পার্বতীকে বলছেন—

> তিলোত্তমা নাম পুরা ব্রহ্মণা
> যোষিদুত্তমা।
> তিলং তিলং সমুদ্ধৃত্য রত্নানাং
> নির্মিতা শুভা॥৪

পুরাকালে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা জগতের সুন্দরতম রত্নগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা-সংযোগে তিল তিল করে এক অভূতপূর্বা যোষিত্বিশেষের সৃষ্টি করেন। উত্তম রত্নসংযোগে তিল তিল করে গড়া সেই রমণীর নাম তিলোত্তমা। তবে কি মেঘদূত ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের উপরি উক্ত শ্লোকদ্বয় এই তিলোত্তমার প্রতিই কবির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করে?

মহাভারতের আদিপর্বে দেখা যায় তিলোত্তমার স্রষ্টা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, ব্রহ্মা নয়। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা অতিশয় নৈপুণ্যসহকারে যে মহতী সুন্দরী নারীর সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই তিলোত্তমা।৫ ব্রহ্মা কেবল সেই মনোরমার নামকরণ করেছিলেন মাত্র।৬

তিলোত্তমা-সৃষ্টি সম্বন্ধে আদি-পর্বের এই ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য। ব্রহ্মা সমগ্র জগতের স্রষ্টা। তাই তিনি স্বয়ং তিলোত্তমাকে সৃষ্টি না করলেও অনুশাসন পর্বে মহেশ্বর স্রষ্টা হিসেবে তাঁরই নামোচ্চারণ করেছেন। বস্তুত বিশ্বকর্মাই তিলোত্তমার স্রষ্টা।

মেঘদূত ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের উভয় নায়িকাই যুবতি, নবযৌবনা। মৃগাক্ষী যক্ষপত্নীর কোমল তনুযষ্টি বিরহের যাতনাসহনেও অসমর্থ। বিরহজ্বালায় তাই তিনি যেন শিশিরমথিতা পদ্মিনী। উদ্ভিন্ন-যৌবনা শকুন্তলাও যেন অনাঘ্রাত পুষ্প, অলূন কিশলয়। সুতরাং তিলোত্তমার সঙ্গে এই নবযুবতিদ্বয়ের সৌন্দর্যগত সাম্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, মহাভারতে বা পুরাণ-কথাসাহিত্যে তিলোত্তমার বর্ণনা সর্বদা যোষিত্রূপে করা হয়েছে৭, যুবতিরূপে নয়। যৌবনেরও স্তরভেদ আছে। যে রমণী নবযৌবনা, যৌবনের নিকুঞ্জে সদ্য প্রস্ফুটিতা, তিনি যুবতি। যৌবনের আনন্দলোকে কিয়ৎকাল অবস্থিতা তরুণী হলেন যোষিৎ। সদ্য বিকশিত ফুলের মধ্যে যেমন এক নিষ্পাপ মাধুর্য থাকে যুবতির সৌন্দর্যেও তেমনই এক অকলুষ সৌকুমার্য থাকে। যুবতির এই নিটোল সৌন্দর্য যোষিতের মধ্যে পাওয়া যায় না। নারী তা'র যৌবনের সূচনা-কালে যেমন সৌন্দর্যের বিচিত্র সুষমায় মণ্ডিত হয় এমন আর কখন হয় না।

২—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, দ্বিতীয় অঙ্ক, শ্লোক-সংখ্যা ৯।

৩—এখানে 'অপরা' শব্দের অর্থ 'অদ্বিতীয়া' (অবিদ্যমানা পরা যস্যাঃ সা), 'অন্য' বা 'পৃথক্' নয়।

৪—মহাভারত, পুনা সংস্করণ, অনুশাসন পর্ব, ১২৮·১।

৫—মহাভারত, আদিপর্ব, ২০৩·১৭—

> সা প্রযত্নেন মহতা নির্মিতা
> বিশ্বকর্মণা।
> ত্রিষু লোকেষু নারীণাং
> রূপেণাপ্রতিমাভবত্॥

৬—মহাভারত, আদিপর্ব, ২০৩·১৭—

> তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং
> যদ্বিনির্মিতা।
> তিলোত্তমেত্যতস্তস্যা নাম চক্রে
> পিতামহঃ॥

৭—মহাভারত, আদিপর্ব,
২০৩·১১—

> পিতামহং নমস্কৃত্য তদ্বাক্য-
> মভিনন্দ্য চ।
> নির্মমে যোষিতং দিব্যাং চিন্তয়িত্বা
> প্রযত্নতঃ॥

ও মহাভারত, অনুশাসন পর্ব,
১২৮·১—

> তিলোত্তমা নাম পুরা ব্রহ্মণা
> যোষিদুত্তমা।
> তিলং তিলং সমুদ্ধৃত্য রত্নানাং
> নির্মিতা শুভা॥

যক্ষপ্রিয়া ও শকুন্তলার সৌন্দর্যের উৎকর্ষসাধনের জন্য কালিদাস যে সুন্দরীর উল্লেখ করেছেন তিনি কেবল যুবতিই ন'ন, তিনি নবযুবতি, যোড়শী। মেঘদূতের শ্লোকস্থিত 'শ্যামা' শব্দটি এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করে।৮ কে এই অনিন্দিতা রূপসী?

মৎস্যপুরাণে বিধাতার আর একটি স্ত্রীরত্নসৃষ্টির কাহিনী পাওয়া যায়।৯ সেই অলোকসামান্যা যুবতির নাম শতরূপা। পুরাকালে লোকসৃষ্টির জন্য বিধাতা তাঁর দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর পবিত্র দেহের দুইভাগের এক ভাগ পুরুষরূপে ও অপর ভাগ স্ত্রী-আকারে পরিণত হয়। পুরুষার্ধে ব্রহ্মা স্বয়ং অবস্থান করেন। তাঁর স্ত্রীরূপার্ধ শতরূপা নামে বিখ্যাত হয়। এই শতরূপাই সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা স্বদেহসম্ভূতা সেই নারীকে আত্মজা-রূপে কল্পনা করলেও সেই মনোরমার রূপাতিশয্যে আসক্ত হয়ে কামশরে জর্জরিত হয়ে পড়েন। কন্যার রূপে বিমোহিত ব্রহ্মা স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করে কন্যাসংগমেচ্ছায় সেই অনিন্দিতা শতরূপার পাণিগ্রহণ করে কামাতুর প্রাকৃতজনের ন্যায় সেই লজ্জিতা ললনার সংগে শতবর্ষকাল কমলগর্ভে রমণ করেন। দীর্ঘকাল পর তাঁদের এক পুত্রসন্তান জন্মায়। নাম তা'র স্বায়ম্ভুব মনু।

ব্রহ্মার স্বকন্যা-রমণের এই উপাখ্যান অল্পাংশে বামন পুরাণেও পাওয়া যায়।১০ কিন্তু অন্যান্য অনেক পুরাণে১১ এই উপাখ্যান ভিন্নভাবে বর্ণিত। সেখানে ব্রহ্মা কন্যাসম্ভোগ করছেন না। যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীরূপে তাঁর দেহ দ্বিধাবিভক্ত হলেও পুরুষার্ধের নামকরণ হয়েছে স্বায়ম্ভুব মনু ও স্ত্রীরূপের শতরূপা। বিরিঞ্চি-কন্যা শতরূপা স্বায়ম্ভুব মনু কর্তৃক বধূরূপে হয়েছেন স্বীকৃতা। জগতে প্রাণিবৃন্দের আদি মাতা ও পিতা যথা-ক্রমে এই শতরূপা ও স্বায়ম্ভুব মনু।

মৎস্য ও বামন পুরাণে শতরূপা একাধারে চতুর্মুখের কন্যা ও ভার্যা। অন্যান্য পুরাণে তিনি ব্রহ্মার কন্যা হ'লেও স্বায়ম্ভুব মনুর ভার্যা।

কয়েকটি পুরাণে শতরূপা-উপাখ্যানের উভয় বিবরণই বর্ত-মান।১২

এই শতরূপা শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। যুবতিরূপেই তাঁর জন্ম ও স্বয়ং বিধাতাই তাঁর জন্মদাতা। তাই তিনি যুবতিনির্মাণব্যাপারে বিধাতার আদি সৃষ্টি।

'যুবতি' শব্দ 'যু' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। 'যু' ধাতু মিলনার্থ দ্যোতক। তার ব্যাকরণগত অর্থ 'যুক্ত হওয়া' বা 'যোগ করা'। শতরূপা কেবল যোড়শীই নয়, তিনি সর্বথা পুরুষের মিলন-যোগ্যা। সুতরাং সব দিক থেকেই তিনি 'যুবতি' শব্দের উপযুক্তা।

কালিদাসের কাব্যে কোথাও শত-রূপার নামোল্লেখ নেই সত্য। তথাপি মেঘদূতের 'যুবতিবিষয়ে আদ্যাসৃষ্টিঃ' ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের 'স্ত্রীরত্ন-সৃষ্টিরপরা' যে শতরূপাই সে কথা অনস্বীকার্য। উপরি উক্ত কারণসমূহ তারই প্রমাণ।

কুমারসম্ভবে কালিদাস লিখেছেন—

স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্তেঃ
সিসৃক্ষয়া।
প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ
স্মৃতৌ॥১৩

সৃষ্টিকরণাভিলাষে বিধাতা যে স্বীয় মূর্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, সেই স্ত্রী-পুরুষ বিধাতারই অংশস্বরূপ, এবং তাঁরই যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের জনকজননী বলে খ্যাত।

এই স্ত্রী-পুরুষই শতরূপা ও স্বায়ম্ভুব মনু।

মনুও অনুরূপ শ্লোকে এই দুই নরনারীর প্রতিই ইংগিত করেছেন—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন
পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং তু
বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥১৪

শতরূপা-উপাখ্যানের সংগে কালিদাস যে বিশদভাবেই পরিচিত ছিলেন ও তৎ-কালীন লোকসমাজেও যে এই উপাখ্যানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল কালিদাসের কাব্যে উক্ত উপাখ্যানের সমীচীন ব্যবহার সেই কথাই ব্যক্ত করে।

—বন্দনা চট্টোপাধ্যায়

---

৮—'শ্যামা' অর্থে মল্লিনাথ বলেছেন "শ্যামা সৌকুমার্যগুণসম্পন্না"। 'রতি-রহস্য' গ্রন্থে 'শ্যামা' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

"শীতে যা চোষ্ণগাত্রী স্যাদুষ্ণে
সংস্পর্শশীতলা।
প্রকৃত্যা সুকুমারাঙ্গী সা শ্যামা
সংপ্রকীর্তিতা॥"

কিন্তু মেঘদূতের আলোচ্য শ্লোকে 'শ্যামা' শব্দের এই দুই ব্যাখ্যাই অর্থহীন। 'শ্যামা' শব্দের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করলে শ্লোকস্থ 'যুবতিবিষয়ে' শব্দটি নিরর্থক হয়ে পড়ে। টীকাকার মহিমসিংহগণির ব্যাখ্যা স্বীকার করলে সব দিক রক্ষা হয়। সেই ব্যাখ্যা এইরূপ—

"অপ্রসূতা ভবেচ্ছ্যামা তন্বী চ
নবযৌবনা।"

আরও দ্রষ্টব্য—

"অপ্রসূতা ভবেচ্ছ্যামা শ্যামা
যোড়শবার্ষিকী।
শ্যামা চ শ্যামবর্ণা চ শ্যামা
মধুরভাষিণী॥

৯—মৎস্যপুরাণ, ৩.২—১২, ৩০—৪৫।

১০—বামন পুরাণ, ৪৯.২—৬।

১১—বায়ু পুরাণ, ৫৭.৫৫—৫৭, ৯.৬৩—৮০।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৯.১৫ এবং ৩২—৪০।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫০.১—১৪।

কূর্ম পুরাণ, ১.৮.১—১০।

বিষ্ণু পুরাণ, ৩৭.১—১৫।

লিঙ্গ পুরাণ, ১.৫.১৫—১৬; ৭০.২৬০—২৭৬।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্ম খণ্ড, ৮.১২—১৫।

গরুড় পুরাণ, ৫.১৯—২০।

সৌর পুরাণ, ২৬.১—৯।

মহাভাগবত পুরাণ, ৩.৫১—৫৯।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, মধ্যম খণ্ড, ২.১৩—১৯।

কালিকা পুরাণ, ২৫.৫৩—৫৮।

১২—ব্রহ্ম পুরাণ, ১.৫১—৫৫; ২.১—৫; ১৬১.৩৩—৩৪।

পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড, ৩.১৬৬—১৭৮; ১৬.১০—১১।

অগ্নি পুরাণ, ১৭.১৬; ১৮.১।

ভাগবত পুরাণ, ৩.১২.৫০—৫৩; ৬.১৮.৩০।

দেবী-ভাগবত পুরাণ, ৩.১৩.-১১—১৬; ৮.১.৩৪; ১.১৯; ৯.১.১২৭; ১০.১.৬—৮।

হরিবংশ, হরিপর্ব (নিমাইচন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৩১), ১.২৯—৪৪; ২.১—৫; ভবিষ্য পর্ব ২০৫.১৮—২৫।

১৩—কুমারসম্ভব, ২.৭।

১৪—মনুস্মৃতি, ১.৩২।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ বিয়াল্লিশ ॥

সেণ্ট্রাল ডুয়ার্সের এক ডাকবাংলোয় থেমেছি। রাত্রিটা কাটিয়ে যাব বলে। কিন্তু ঘুম আসে না। কোথায় ঘুম?

রাত দুপুরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই শালবনে-দেবদারুবনে বাতাসের ঝড় বইছে।

অশ্রান্ত অশান্ত ঝড়। যেন রাবণের চিতা ফুঁসছে। ফুঁসছেই ফুঁসছেই। শুনতে শুনতে ভয় জাগে। ঘুম আসে না। ঘুম পালিয়ে যায়।

জানালার ধারে উঠে বসব-বসব ভাবি। বসা আর হয় না। ক'টা দিনের অফুরন্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত। ঘুম আসলে বাঁচি। কিন্তু ঘুম আসে না।

দামাল বাতাসের অশান্ত মত্ততায়—উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপছে রাত্রির আকাশ। একরাশ পাতা উড়িয়ে নিচ্ছে বন থেকে। বনান্তরে।

চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় উঠে বসি। খোলা জানালায় রাত্রির ডুয়ার্স। রাত্রির রহস্যময় ডুয়ার্স।

ওইদিকে আছে পাহাড়। অরণ্যের অন্ধকার সারি-সারি ওইদিকে। হিংস্র জীব-জন্তু। প্রতি পায়ে-পায়ে মৃত্যু আর ভয়।

অন্যদিকে কিন্তু এসে পড়েছে সভ্যতার আলো। মানুষ ও মানুষের সভ্যতা। ডুয়ার্সের বেশির ভাগ অঞ্চলেই দলে-দলে এসে পড়েছে মানুষের স্রোত। দোকান-বাজার, হাট-বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্য। পতিত অঞ্চলগুলিতেও এসে মানুষ বসতি তুলেছে। রাস্তায় যেতে যেতে দেখি ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি। এখানে-ওখানে। ছাপোষা মানুষের কুটির। দরমার বেড়া, মাটির ভিত। আলকাতরায় রং-করা পুরনো টিনের চাল। টালির চালও আছে। পূর্ব বাংলায় খড়ের চাল তত বেশি চোখে পড়ে না।

সাধারণ মানুষের বাড়ি। একটি ঘরই যথেষ্ট। বেড়া নেই, আব্রু নেই। ছন্নছাড়া অবস্থা। উঠোন বলতে কিছু নেই। গাড়িতে যেতে যেতে চমকে চোখে পড়ে কাল যেখানে ছিল জলা-জংলা বা গাছের আবাদ, আজ সেখানে চালের ওপরে লতিয়ে উঠছে লাউয়ের ডগা বা পুঁই মালঞ্চ। কচিৎ কখনো এক-আধটি বৌয়ের উৎসুক চোখও চকিতের জন্য চোখে পড়ে।

মাঝে মাঝে নদী, জলস্রোত। বাঁধের উঁচু পাড়ে সুন্দর সুন্দর বাংলোবাড়ি দেখা যায়। কাঠের উঁচু উঁচু পাটাতনের ওপরে সুন্দর বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি মাটি থেকে উঠেছে ওপরে। বেশ খানিকটা ওপরে। বারান্দায় রেলিং। তা-ও কাঠের। কাঠের দেয়াল। তাতে রঙ করা। রঙিন টিনের চাল। অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে।

এ-রকম না হোক, কাঠের বাড়ি আগেও ছিল। ডুয়ার্সের সাবেক বাড়ি সবই নির্মিত হ'ত কাঠ দিয়ে। জঙ্গলে তো কাঠের অভাব নেই। কাঠ আর শুধু কাঠ। সেই কাঠের বড় বড় খুঁটি মাটিতে পুঁতে অনেক উঁচুতে তোলা হ'ত ঘর। বড় বড় জানালা-দরজা। চারদিকে দিন-রাত্রি দেখা যেত না। শুধু গাছপালা আর বুনো-জঙ্গলে-ঘেরা পৃথিবী। অরণ্যের হিংস্র প্রাণী চলে বেড়াত চারদিকে। এত মানুষ তখন কোথায় ছিল? আসে নি এ স্রোত পূর্ব-বাংলা থেকে। তখন ভয়ে ভয়ে থাকত মানুষ। ঘর বল, বাড়ি বল সব ওই মাটি থেকে দশ-বারো হাত উঁচুতে।

আজ পিচ-বাঁধানো রাস্তা চকচক করছে ডুয়ার্সে। কাঁচা রাস্তা আর নেই বলা চলে। বনের আবাদ সরে গেছে দূরে-দূরে। তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে নতুন যুগের পরিবহণ। গরু আর মোষের গাড়ি গ্রামে-গ্রামাঞ্চলে আছে বটে, হাটে-বাজারে এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা ব্যবহার করে বটে, আসলে মোটরগাড়িরই রাজত্ব। সুশ্রী চকচকে বাসগুলি যাত্রী বোঝাই করে চলেছে। জানালার ধারে তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার বসেছে সামনে স্টীয়ারিং হুইল-এ হাত রেখে। দু' ধারে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে চাষী-বস্তী. বাজার, চা-বাগান। বাগানের সুন্দর সুন্দর কোয়ার্টার। সারিবন্ধ কুলী ব্যারাক। ওদিকে ম্যানেজারের সুদৃশ্য বাংলো। কারখানা-বাড়ির চোঙ দেখা যাচ্ছে। ভোরে ভোঁ বাজল। দলে দলে মেয়ে ও পুরুষেরা টুকরি-কাঁধে চলেছে বাগানের দিকে। মাঝে-মধ্যে পেট্রল-পাম্প। সভ্যতা চলেছে তেলে ও কলে। ডুয়ার্সের রাস্তার ধারে ধারে তেলের স্টেশনগুলিই বলে দেয় আজকের ডুয়ার্স কোন্ পথে চলেছে। বড় বড় তৈল কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। সাইনবোর্ডগুলি চলমান গাড়িতে বসেই চোখে পড়ে।

মোটর বাসগুলো চলেছে দ্রুতবেগে। ডুয়ার্সের এক প্রান্তের সাথে অপরেক প্রান্তের যোগাযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যে এই গতি। গতির আবেগে থরথরিয়ে কাঁপছে ঘুরন্ত চাকার সাথে তাল রেখে স্পীডোমিটারের কাঁটা। সরকারী বাসগুলো পদস্থ। কৌলীন্য বিকিরণ করতে করতে চলেছে। উত্তরবঙ্গ পরিবহণের প্রধান কার্যালয় কোচবিহার। কোচবিহারকে কেন্দ্র করে চলেছে নানা দিকে। আগে শুধু যেত কোচবিহারের বিভিন্ন মহকুমাগুলিতে। ওদিকে মাথাভাঙার কাছাকাছি নদীর এপারে গিয়ে দাঁড়াত। আর দূর রাস্তা বলতে বোঝাতো জলপাইগুড়ির উদ্দেশে যাত্রা। কোচবিহার থেকে বেরিয়ে সোনাপুর হয়ে গাড়ি বেরিয়ে যেত ফালাকাটার দিকে। সোনাপুরের পর থেকেই তোর্সার আক্রমণের চিহ্ন পরিস্ফুট। বার বার ভেঙেছে তোর্সা। বিরাট অঞ্চলকে গ্রাস করে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে। দিগন্তবিস্তৃত বালি আর বালি-জমি। বর্ষায় পারাপার করতে হ'ত শিলতোর্সা নদীতে। পেট্রল-বোট ছিল নদীতে। জলের তীব্র স্রোত।

জলপাইগুড়ি থেকে ডুয়ার্সে আসবার দিনগুলির কথা মনে হয়। সে বেশিদিন আগের কথা নয়। পনেরো-বিশ বছর আগের কথা ছেড়েই দিলাম। এই সেদিনের কথা। জলপাইগুড়ি থেকে এক তিস্তা নদীতেই তিন-চারটি খেয়াঘাট পেরিয়ে ভাঙা ট্যাক্সী

চড়ে আরো কত কী করে আসতে হয়েছে বার্নিশে। বার্নিশ ঝজরে বাসে উঠতে হয়েছে। ঝরঝরে পুরনোকালের বাস। বন্দি। রাস্তায় দাঁড়াত পঞ্চাশ বার। সরু একফালি পীচ-বাঁধানো রাস্তা। একটার বেশি বাস চলবার উপায় নেই। উল্টোদিক থেকে কোন গাড়ি আসলেই নামতে হ'ত কাঁচা রাস্তায়। আর সে কী ধুলো! ধুলোয় অন্ধকার হ'ত সব। সাতটা রুমাল নাকে চেপে সেই ধুলো কিছুতেই কাটতে চায় না।

আর গাড়ির ঝাঁকুনিতে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার ব্যবস্থা! গাড়ির সংখ্যাও ছিল সীমিত। আর সে-গাড়িরও যে চেহারা তাকে মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রী বলাই সঙ্গত। গাড়ি চলেছে, আর তাতে মানুষ-মুর্গী-ছাগল-বোঝাই এক বিকট অবস্থা। এবং তার গতিও ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কমতির দিকে। অনেক সময় গাড়ি থামলে আর চলতেই চাইত না। সেল্ফ-স্টার্টার কাজ না দিলে এ্যাসিস্ট্যান্টকে বার বার করে হ্যান্ডেল মারতে হ'ত এবং গাড়ির তথাপি পাদমেকং ন গচ্ছামি দশা।

ঘটাং ঘটাং শব্দ করে চলেছে গাড়ি। প্রাণপণ গলায় চীৎকার করছে এ্যাসিস্টান্ট। —ময়নাগাড়ি, ময়নাগাড়ি—ধূপগুড়ি—বীরপাড়া—বীরপাড়া—জটেশ্বর—ফালাকাটা।

গাড়ির ভেতরে তিলধারণের স্থান নেই। লোক আর লোক। বসে একদল। দাঁড়িয়ে একদল। বসে-থাকাদের ঘাড়ের কাছে হুমড়ি-খেয়ে-থাকা আরেক দল। প্রত্যেক ঝাঁকুনির সংগে সংগে পরম এন্তেকাল স্মরণ করছে। তবু বাইরে কেউ-একজন হাত তুলতে-না-তুলতেই বিনীত বশম্বদের মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে গাড়ি।

কোথায় যাবেন? আসুন, আসুন—ধূপগুড়ি, না ফালাকাটা?

ফালাকাটা? চলে আসুন—চলে আসুন।

এ্যাসিস্ট্যান্টের হাত বগলের তলা দিয়ে দরজা-পথে একটু পরেই সার্কাসের প্যাটার্নে গাড়ির এক-পাল মানুষের ওপর উজিয়ে এল আকটা। পাটের দড়ি দিয়ে প্রায় সংগে সংগেই গাড়ির দরজাটা বেঁধে ফেলতে-ফেলতে এ্যাসিস্ট্যান্ট আবার চেঁচাচ্ছে—ধূপগুড়ি, ধূপগুড়ি! গয়েরকাটা, বীরপাড়া। বলা বাহুল্য, গাড়ি ততক্ষণ আবার ছুট-ছুট।

চোখের সামনে মনের পটে ভেসে ওঠে ডুয়ার্সের রাস্তাগুলি। কত রাস্তা গিয়েছে কতদিকে। ওই রাস্তার ধারে-ধারে কত উঠতি জনপদ। বাজার-বন্দর। একালের কত নাম ভাসে মনের পর্দায়। দোমহনী, ময়নাগুড়ি, সিঙ্গিমারী, তেকাঠালী, হলহলিয়া, ধারাইগুড়ি, চূড়াভাণ্ডার। জলঢাকা পোল ছিল। লোহার ইস্পাত দিয়ে বানানো। শক্ত সুদৃঢ়। দূর থেকেই চোখে পড়ত লাল রংটা। আজ পাল্টে গেছে জলঢাকা পোল। মস্ত ভারী কংক্রীটের থাম। অনেক চওড়া হয়েছে আজ। জলঢাকা পোল, চক মৌলালী, ধূপগুড়ি, দেওমালি, আংরাভাসা, গয়েরক্যটা, বাতাবাড়ি, টিলাবাড়ি, ধূপঝোরা, শালবাড়ি, মঙ্গলবাড়ি, সাঁতকাইয়া। ওদিকে একালের বন্দর চালসা। কাঠের বিখ্যাত ব্যবসা-কেন্দ্র। চালসার ওপরে মেটেলী। মেটেলীতে আবার রেল লাইনও আছে। খুটিমারি, দলগামারি, তেলিপাড়া, এখেলবাড়ি, বানারহাট, বীরপাড়া, দলমোহর, কীলকট, ইংডন, নাথুয়া, মালবাজার, রাসঝোরা, নাগরাকাটা, বড়দীঘিহাট, ফালাকাটা, থালঝোরা, চাম্পাগুড়ি, ক্যারণ, শুলকাপাড়া, লংকাপাড়া, হান্টুপাড়া।

নামের পর নাম মনে আসে। চরতোর্সা, শিলবাড়ি, পলাশবাড়ি, বেলতলীহাট, মাদারিহাট, হাসিমারা, মধুবাগান, হ্যামিল্টন, কালচিনি, গারোপাড়া, রাজাভাতখাওয়া, দমনপুর হয়ে আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ার থেকে রাস্তা গেছে রাজাভাতখাওয়া হয়ে—পাকা রাস্তা। জয়ন্তী, সান্তালবাড়ি হয়ে বক্সা। আবার ওদিকে কামাখ্যাগুড়ি-শামুকতলা, কুমারগ্রাম-দুয়ার।

আজ রাস্তার ধারে ধারে মানুষ। মানুষজনের বসতি। দোকানপাট। রাতদুপুরে সাঁ-সাঁ বেগে এক সরকারী ট্রাক চরে এসে উপস্থিত ময়নাগুড়িতে। কত বছর হয়ে গেল। ওদলাবাড়ির কাছে চেকপোস্টে গাড়ি থামিয়েছিল পুলিশ। ডুয়ার্সের ডিসেম্বর মাসের তীব্র শীত-রাত্রি। কুয়াশা চাদরের মত ঝরছে দু'ধারে। ঠাণ্ডা কনকনে হিমশীতল হাওয়া ছুটে-ছুটে এসে বুকের পাঁজরগুলি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। রাস্তার ওপরে আড়াআড়িভাবে নামিয়ে দিয়েছে বাঁশ। শীতের কম্বল গায়ে-মাথায় চাপানো পুলিশটা এল অবছা একটা মূর্তির মত। গাড়ির মধ্যে বুকে পড়ে কি দেখল নিজেই জানে। হয়তো চোরাই কোন জিনিস পাচার হচ্ছে কি না দেখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ক্লিয়ারেন্স দিল। আড়া-আড়িভাবে রাখা বাঁশটা উঠল।

পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে তারপর রাতদুপুরে ময়নাগুড়ি। এত রাতে ময়নাগুড়িতে কোন খাবার পাওয়া যাবে কি না মনে ভাবনা ছিল। পেটে চিনচিনে একটা ক্ষিদের মোচড় অনেকক্ষণ থেকে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু না, আলো ঝলমল করছে ময়নাগুড়ি। এত রাতেও কিছু কিছু দোকানপাট খোলা।

হোটেল পাওয়া গেল। খানা-ও। ভাত, মাছের ঝোল, মসুর ডাল, একটা তরকারী। পেট ভরে খেয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে একটি ধরিয়ে আবার ওঠা গেল গাড়িতে। সোজা রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে অতঃপর দ্রুত ফালাকাটা।

রাত দুটো। রাস্তার ধারে-ধারে আলো। পেট্রল পাম্পে এত রাতেও জেগে আছে কর্মচারী। পোস্ট আপিসের ধারে একটা বাড়িতে হচ্ছে থিয়েটারের রিহার্সেল। হ্যাজাক জ্বলছে একটা। একদল যুবকের কলকণ্ঠে বাড়িটা সজাগ। একটি সবল উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল, আমি শুধু লুণ্ঠনমানসে গিরি-নদী অতিক্রম করে এই বাংলায় ছুটে আসি নি। ঐতিহাসিক কোনো পুরুষচরিতের ভূমিকা বোধ হয়।

রাস্তা ধরে রাত্রির আস্তানার দিকে যেতে যেতে শুনেছিলাম। আজো স্পষ্ট মনে আছে। আজ আর সেদিন নেই ডুয়ার্সের। অতীতের ভয়াল অরণ্য সরে গেছে দুঃস্বপ্নের মত। হিংস্র প্রাণিকুল মানুষকে ছেড়ে দিয়েছে জায়গা। নতুন যুগ এসে পড়েছে ডুয়ার্সে। নতুন মানুষ।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসেছে বর্ধিষ্ণু বাজারে-বন্দরে। মাইলের পর মাইল চলে গিয়েছে টেলিফোনের তার। দূর হয়েছে নিকট। পর হয়েছে আপন। উত্তরবঙ্গ পরিবহণের রাষ্ট্রীয় বাস স্টেশনগুলি। দাঁড়িয়ে আছে দুটি-একটি প্রাইভেট বাস। ইদানীং আবার রেল স্টেশনও হয়েছে।

অবশ্য রেল লাইন আগেও ছিল। মিটার গেজ লাইন। বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেল লাইন ছিল এখানে। রাত্রি জেগে ভূগোলের পড়া মুখস্থ করতে গিয়ে পেয়েছি বি, ডি, আর-এর নাম। পাহাড়ের ঠিক পাদদেশে দার্জিলিং-সীমান্তে ছিল বি, ডি, আর-এর বাগরাকোট স্টেশন। এটি ছিল পশ্চিমাঞ্চল শাখার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তিস্তার পারে-পারে ছিল বার্নিশ ঘাট স্টেশন। প্রায় এক মাইল লম্বা শাখা লাইন ছিল এখানে। জলপাইগুড়ির বিপরীত দিকে ছিল তিস্তার পূর্ব-

প্রান্ত। রেলওয়ে কোম্পানীর কর্তৃত্বে ছিল তিস্তার ওপরে ফেরী সার্ভিস। বি, ডি, আর-এর পূর্ব-প্রান্তিক স্টেশন ছিল চালসা। চালসা থেকে মেটেলিহাট পর্যন্ত মেটালড্ রোড আছে আজো। অনেকগুলি চা-বাগানের মাঝামাঝি ছিল বি, ডি, আর-এর ডামডিম স্টেশন। এখানে ছিল ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অধিবাসীরা ম্যালেরিয়ায় ভুগত খালি। বার্নিশ থেকে প্রায় ন' মাইল দূরত্বে ছিল বি, ডি, আর-এর দোমহনী স্টেশন। রেল-ওয়ে ওয়ার্কশপও ছিল এখানে। তোর্সার পশ্চিম প্রান্তে ছিল মাদারিহাট স্টেশন। বি, ডি, আর-এর পূর্বাঞ্চল শাখা দক্ষিণ ফালাকাটার সঙ্গে যোগসূত্র রাস্তাটি এখনো আছে। উত্তরে হাণ্টুপাড়া চা-বাগান ও বাজার। বি, ডি, আর-এর বিখ্যাত জংশন স্টেশন ছিল মালবাজার। এখান থেকেই পূব-দিকে রেল লাইন গিয়েছিল মাদারিহাটের দিকে। দার্জিলিং সীমান্তবর্তী বাগরাকোটের দিকে পশ্চিমে গিয়েছিল বি, ডি, আর-এর রেল লাইন। দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল বার্নিশ স্টেশনে। বার্নিশ তখন জংশন। এই পথেই গাড়ি যেত লালমণিরহাটে। বি, ডি, আর-এর পূর্বপ্রান্তিক শাখায় ছিল নাগরাকাটা স্টেশন। লাটাগুড়ি থেকে বি, ডি, আর-এর ছোট্ট একটি শাখা লাইন গিয়েছিল রামসাহীহাট স্টেশনে। জলঢাকা নদীর পশ্চিমের পারে অবস্থিত রামসাহীহাট। পশ্চিমে তার তণ্ডু ফরেস্টের গভীর বনাঞ্চল। ডায়না ফরেস্টও এর সঙ্গে। বি, ডি, আর-এর মাদারীহাট স্টেশন তৈরি হবার আগে পর্যন্ত জলঢাকার পূর্বদিক প্রান্তবর্তী চা-বাগানগুলির কাজকর্ম চলত রামসাহীহাট স্টেশনে। ১৯০৬ সালে এই অঞ্চলে প্রবল বন্যার তাণ্ডব ঘটল। ভয়াবহ ধ্বংসলীলার কথা মনে হয়।
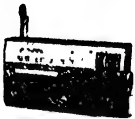
আজ নেই বি, ডি, আর। বদলে গেছে নতুন কালের চালচিত্র। রামসাহীহাটকে এখন বেঁধেছে সুন্দর পিচ-চকচকে রাস্তা। চালসা, নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি—যেখান থেকে খুশি এখন চলে যেতে পারো সেখানে।

কথাপ্রসঙ্গে মনে হল। বিখ্যাত শিকারী নলুবাবুর মুখে শুনেছিলাম একদিন। এই অরণ্যেই তাঁর জীবনের স্মরণীয়তম বাঘ শিকারের ঘটনা।

বাঘ আছে বুঝি ওখানে?

নেই? বাঘ কোথায় নেই বলুন? ফালাকাটার পাঞ্জাবী হোটেলে বসে চা আর বিখ্যাত প্যাঁড়া-সহযোগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে করতে বলেছিলেন নলুবাবু, ডুয়ার্সে বড়-রকমের বাঘ প্রায় সব বনেই আছে। তবে বিশেষভাবে ডায়না ও জলঢাকা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটির গেম্-সুটিং রেঞ্জ বলে বেশ খ্যাতি আছে। বাঘেদের অতি প্রিয় আস্তানা এটি।

এইখানেই বাঘের হাতে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল নলুবাবুকে। তবু তিনি হাল ছাড়েন নি। বাঘের বিশাল থাবা তখন তাঁর ঘাড়ের বাঁদিকে সমুদ্যত, তবু তিনি বেপরোয়ার মত রাইফেলের ট্রিগার টেনেছিলেন। আর সেই টানেই মোক্ষম কাজ হয়েছিল। গুলীতে বাঘের খুলি ফুটো হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেও অবশ্য সাংঘাতিক আহত হয়েছিলেন। তারপর বেশ কদিন হাসপাতালে যমে-মানুষে যুদ্ধ চলেছিল।

এখনো আছে তার স্মৃতি। নলুবাবু অবশ্য এখন আর শিকারী নন। এখন তিনি কণ্ট্রাক্টর। নলুবাবুর কাঁধের পাশে সেই বাঘের আলিঙ্গনের স্মৃতি আছে আজো। সার্টের কলার সরিয়ে দেখালেন সেই সাক্ষ্য।

দেখতে ভয় হয়। বুকের ভিতরে গুড়গুড় একটা শব্দ উঠতে শুনি।

বাঘ এখনো আছে ডুয়ার্সে। বাঘ কেন, নানা হিংস্র প্রাণীই আছে। কিন্তু তারাও ভয় করে মানুষকে। মানুষকে ভয় না করে কে! আজ বদলে গেছে ডুয়ার্স। মানুষ জয় করেছে প্রকৃতিকে। অরণ্যকে দূরে সরিয়েছে। সেই অরণ্যেও চলেছে অবিশ্রাম বসতি বিস্তারের প্রচেষ্টা।

মানুষের বংশ বাড়ছে হাজারে-হাজারে। লাখে-লাখে। বাঁচবার জন্যে বসতি চাই। জীবনধারণের জন্যে। প্রাণ-ধারণের জন্যে চাই ঘরের ছাদ। চাই জমি-ক্ষেতি, ফসল ফলাবার প্রয়োজনে। মানুষের বংশ যে বাড়ছে। জমির জন্যে অন্তহীন তাই ক্ষুধা। জমি চাই, আরো জমি। আরো উর্বরা ফসলক্ষেত্র। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আশ্রয়। অরণ্য আদৌ থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনেই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে।

নলুবাবু বলছিলেন, এখনো আছে—ভবিষ্যতে আর ভালো গেম-সুটিং রেঞ্জ একটিও থাকবে কিনা সন্দেহ। শিকারীদের তখনকার অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। তবে হ্যাঁ, অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে মানুষকে। না বাঁচিয়ে তার উপায় নেই। এখনই দেখুন না কেন—বৃষ্টি কত কমে গেছে এখানে।

হ্যাঁ, বৃষ্টির সঙ্গে আছে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক। আর শুধু কি বৃষ্টিই? এক অর্থে ধরতে গেলে মানুষের ইতিহাস তো সমৃদ্ধিরই ইতিহাস। এই সমৃদ্ধির মূলে জলসিঞ্চন করে তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। সেই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনেই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে অরণ্যকে। সভ্যতার অগ্রগতির জন্যে চাই কাঠ। কাঠ তো শুধু কাঠ নয়। কাঠেই তৈরি হচ্ছে ঘরের খুঁটি, আসবাবপত্র, রেলওয়ে স্লিপার, দেশলাই বাক্স, কাঠি, রেলওয়ে কোচ। ডুয়ার্সের অফুরন্ত বনজ-সম্পদ সেই কাঠের যোগান দিচ্ছে সারা দেশকে। চা আর কাঠই হচ্ছে ডুয়ার্সের সমৃদ্ধির চাবীকাঠি। আর তাই সরকারী প্রচেষ্টার হাত হয়েছে প্রসারিত। তৈরি হয়েছে নানা আইন-কানুন। পুরাতন বনাঞ্চলকে সংরক্ষণেই শুধু নয় তার কর্তব্যের শেষ, নতুন আবাদও করতে হচ্ছে তাকে। ডুয়ার্সের পথে যেতে-যেতে চোখে পড়ে সেই পুরানো বন। তার পাশাপাশি নতুন আবাদের দৃশ্য।

বাংলোয় শুয়ে থাকতে-থাকতে ভাবি অতীতের ডুয়ার্স। এই বাংলোই কি ছিল? কিছুই ছিল না। অন্ধকার অরণ্যে ছিল না মানুষ বসতির কোনো চিহ্ন। শত শত মাইল বিস্তৃত ভয়ংকর পর্বত-তরঙ্গের তলায় ছিল জীবন্ত যমপুরী ডুয়ার্স। গিরিসংকটের দুর্গমতা ছিল প্রতি পায়ে পায়ে। ভয়াল গম্ভীর বিষম জলাভূমি। মরণের জীবাণু কিলবিল করত সেই ভয়াল জলাভূমিতে। সর্বনাশের নেশা তার আকাশ-বাতাসে। বিষাক্ত ক্রিমি-কীট আর দুর্দান্ত ব্যাধি-বীজাণু। বৎসরের পর বৎসর বুনো কীটেদের বংশ বিস্তার, জংলি মশকের অফুরন্ত আহ্বান। সেই সঙ্গে রাত আর দিন বৃষ্টি আর বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

আজ বাংলোয় শুয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে না। খোলা জানালা পথে বাতাসের অফুরন্ত শাঁ-শাঁ। শাল দেব-দারু বন ফুঁসছেই, ফুঁসছেই।

[ ক্রমশ ]

## আলস্টার না আল্সার ?

আল্স্টারের রাজধানী বেলফাস্ট। ভৌগোলিক বিচারে আলস্টারের অবস্থিতি তৃতীয় দুনিয়ায় নয়, প্রথম দুনিয়ায়, সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ ইউরোপে. গতকাল যে "সাম্রাজ্যবাদের দিগ্বলয়ে সূর্য অস্ত যেত না", যে সসাগরা ধরিত্রীর সর্বপ্রধান মালিক ছিল, তারই মর্মকেন্দ্র গ্রেটব্রেটনের খিড়কী দরজার পাশেই। কিন্তু আলস্টার যে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের অংশ, সেখানকার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস প্রায় বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমবয়সী, যদিও ইমন্ ডি ভ্যালেরা রাজনীতিতে প্রগতিশীল ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও তিনি ফ্যাসিবাদী জোটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি—হয়তো আমাদের নেতাজীর মতই তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রেটব্রিটেনের শত্রু ফ্যাসিবাদী জোটের সাহায্য পাওয়া যাবে।

ফ্যাসিবাদী ত্রিমূর্তির পরাজয়ে রাহুস্পর্শ সারা দুনিয়ার ঘাড় ছেড়ে গিয়ে, আবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গগনে। হাতী খানায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। এ ক্ষেত্রে হাতী নয় সিংহ খানায় পড়ে নি, জরার কবলে পড়ে তার দাঁত পড়ে গিয়েছে ও থাবার নখ আগের মত ধারালো নেই। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় তার অধীন জাতিগুলি শিকল পরার ছলে শিকল পরে. তার শিকল বিকল করবার বজ্র-সংকল্প ঘোষণা করে অবতীর্ণ হল জীবন-মরণ সংগ্রামে। সিংহ এরে বৃদ্ধ, তার তার জমিদারীগুলি সারা দুনিয়াময় ছড়ানো। একদিক সামাল দিতে গেলে অন্য দিক ফস্কে বেরিয়ে যায়। তার ওপর আর একটি বিশাল ধনিষ্ঠ দেশ—এক সময়ে যা ঐ সিংহেরই থাবার তলায় ছিল—তার বিভিন্ন জমিদারী ঠাকুরাতে সুরু করেছে। "বিশ্বমানবের মুক্তি ও গণতন্ত্ররক্ষার মহাসংগ্রামে" সে জয়ী হয়েও জয়ী হল না; তাকে দস্তখৎ দিতে হল অতলান্তিক সনদে এবং শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত সমস্ত পরাধীন দেশ ও উপনিবেশকে স্বাধীনতাদানের ঘোষণায়। সুতরাং বুড়ো পশুরাজের ক্রমশ পশ্চাৎ-অপসরণ করতে করতে নিজের আস্তানায় গিয়ে বসে গজরানো ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার মুরোদ নেই। তবু মরিয়া না মরে রাম! তার থাবা যতদূর পৌঁছায় সেটুকু অন্তত সে প্রাণপণে টেনে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। নেই মামার চেয়ে কানামামাও ভাল. এটা তো ঠিক! উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের অবস্থিতি সিংহের থাবার পাল্লার মধ্যে। তাই থেকেই আলস্টারের বর্তমান মুক্তি-আন্দোলনের নতুন বলে বলীয়ান হয়ে নতুন করে আত্মপ্রকাশ।

রাজধানী বেলফাস্টের অবস্থা অনেকটা সায়ংগনের মত। রাত দশটার পরেই আলস্টারে কোন মানুষ বাস করে বলে মনে হবে না। সবাই বাসায় ফিরে গিয়ে খিল এঁটে শুয়ে পড়ে। রাজপথ নিথর, নিস্পন্দ. জনহীন—শুধু মোড়ে মোড়ে ৪-৫ জন বৃটিশ মেশিনগান ও সঙ্গীন-বন্দুকধারী প্রহরার রোঁদে টহল দিচ্ছে। তাদের পিছন দিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও বিভিন্ন মহল্লা।

ভোরবেলা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত শীর্ষক (নিত্যনৈমিত্তিক) — "ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গন্ডগোল, পরিস্থিতি গুরুতর, সৈন্যদল প্রস্তুত।" এই ধরনের শীর্ষক আমাদের দেশে কিছু নতুন নয়। রাতে রাতে 'খবর' বেরোয়: "অমুক মহল্লায় গতরাত্রে তিন হাজার কমলাসেনার হানা। আর এক মহল্লায় তাদের আর একটি দলের রাস্তায় শহরবাসীদের খাড়া-করা ব্যারিকেড-ভাঙবার চেষ্টা পণ্ড।" মজার কথাটা এই যে, শ্রীকাকুলম ও তেল্লিচেরির মতই ঐ হানাদাররা কোথাও কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু "অত্যুগ্র" বাম-পন্থী মাওবাদী ইস্তাহার ফেলে পালায় ঠিক যেমন ১২ই স্টেট ব্যাঙ্কে ডাকাতি করে ডাকাতরা মাওবাদী কিছু কাগজপত্র ছুঁড়ে দিয়ে পকেট থেকে লাল রঙের রুমাল বার করে গলায় বেঁধে কেটে পড়ে। তারা স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক আত্মপরিচয় দিয়ে চলে যায়, ধরা পড়ে না, অনেকটা আগেকার আমলে ডাকাতরা যে নোটিশ (চিঠি) দিয়ে ডাকাতি করত সেই গোছের। যাক এই কমলাসেনারা কারা? এরা অনেকটা শিব-সেনা বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমতুল্য। এদের সঙ্ঘচালক রেভারেন্ড পাইসলি আপাতত অতলান্তিকের ওপারে আস্তানা গেড়ে "অত্যুগ্র"-দের বাপের শ্রাদ্ধ করছেন এই বলে যে, উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে এরা "কিউবার দ্বিতীয় সংস্করণের" জন্য ষড়যন্ত্র করছে।

এবার আসল কথা পাড়া যাক। আলস্টার ও উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে যা ঘটছে তার সঙ্গে সদ্য-অতীত ও বর্তমানের কতকগুলি ঘটনার হুবহু মিল আছে, যেগুলির মধ্যে একটির ভুক্তভোগী আমরা—ভারতবাসীরা। এই ঘটনাগুলি যে সূত্রে একত্রে গাঁথা তার নাম "ডিভাইড এট্ ইম্পেরা" অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা শাসন করা (প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে)। এই সূত্র সম্বল করেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মহাযুদ্ধের পরে বহু সাম্রাজ্য ও উপনিবেশকে "বিনাযুদ্ধে", "স্বেচ্ছায়" স্বাধীনতা ভিক্ষা দিয়েছে। আজকের ভারত ও পাকিস্তান এই সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের প্রথম ও বৃহত্তম দৃষ্টান্ত। যার অভিশাপ থেকে আমরা আজও মুক্ত নই। এই শাপকে বাজারে চালানো হচ্ছে বর বলে। "স্বেচ্ছায় মুক্তিদানের" দাক্ষিণ্যের স্বরূপ বোঝা যাবে যদি আমাদের মনে থাকে যুদ্ধের অন্তিমে জাতিসঙ্ঘের উদ্বোধনী অধি-বেশনে বৃটিশ ভারতের ভারতীয় প্রতিনিধি বৃটিশের ওকালতি করার পর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ মলোতফ কী জবাব দেন। বিষয়বস্তু ছিল সমস্ত জাতিকে স্বাধীনতাদান। মলোতফ বলেন, "এখানে যিনি ভারতের হয়ে কথা বললেন তা

আসল ভারতীয় জনগণের মনোভাবের প্রতিফলন নয়। কিন্তু এ বিষয়ে সোভিয়েত সরকার নিঃসন্দেহ যে, খুব নিকট ভবিষ্যতে আমরা আসল ভারতের কণ্ঠস্বর এই বিশ্বসভায় শুনতে পাব।" সঙ্গে সঙ্গে মিঃ অ্যান্থনী ইডেন উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, ভারতের প্রশ্ন "বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার" তাতে হস্তক্ষেপ বৃটেন বরদাস্ত করতে রাজী নয়। মিঃ মলোতফ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেন যে, ভারত ভারতীয় জনগণের ঘরোয়া ব্যাপার, বৃটেনের নয়। এবং মহাযুদ্ধের যে লক্ষ্যগুলি মিত্রপক্ষ একবাক্যে মেনে নেন তার সঙ্গে মিঃ ইডেনের বক্তব্যের কোন সঙ্গতি নেই। পৃথিবীর পরাধীন জাতিগুলিকে প্রতারণা করার জন্য যুদ্ধে এত রক্তক্ষয় করা হয় নি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা ত্যাগ করে ভারতকে ধর্মের ভিত্তিতে এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত করে যাতে দুটি খণ্ডের মধ্যে হরদম বিরোধ-বিবাদের উপলক্ষের আবির্ভাব হয় এবং বৃটেনকেই সালিশী করার জন্য ডাকতে হয়। দ্বিতীয়ত, ধরুন নাইজিরিয়া। ঐ দেশটিকেও "স্বেচ্ছায়" স্বাধীনতা "দান করা" হয় দেশটিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, যাতে বায়াফ্রা ও নাইজিরিয়ার মধ্যে বিরোধ বাধে এবং সেই বিরোধকে মুসলিম উত্তরের সঙ্গে খৃস্টান পূর্বের দ্বন্দ্ব বলে বর্ণনা করা যায় দুনিয়াকে ধোঁকা দেবার জন্য। নাইজিরীয় সরকার বৃটিশের তাঁবেদার হিসাবে বায়াফ্রায় জাতি উৎসাদনের লড়াই চালাচ্ছে, বায়াফ্রানদের স্বশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে বৃটিশ একচেটিয়া কারবারীদের সেখানকার অজস্র খনিজ সম্পদ শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে। তৃতীয়ত, ধরুন সুদানের কথা। সেখানে সিংহ মার্কা সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণাংশে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা উস্কে তুলে জগৎকে শোনাচ্ছে সুদানের অন্তর্দ্বন্দ্ব আসলে মুসলিম উত্তর ও সানিমিস্ট দক্ষিণের মধ্যে বিবাদের পরিণাম। চতুর্থত, ঘানা। নক্রুমার প্রশাসনে দুর্নীতি ছিল নিশ্চয়ই এবং অনুন্নত দেশমাত্রেই তা আছে। কিন্তু নক্রুমার শাসনব্যবস্থা যে মোটামুটি গণতান্ত্রিক ছিল এটা অনস্বীকার্য (লুমুম্বার কঙ্গোর মত)। তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ঐ বৃটিশ সরকারের "দানসত্র" থেকেই তিনিও বিনাযুদ্ধে স্বাধীনতা "উপহার" পান। যতদিন তিনি বৃটিশের এঁকে দেওয়া গণ্ডী অতিক্রম করেন নি (চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিতে বৃটিশের আপত্তি ছিল না) ততদিন বৃটেন চুপচাপ ছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া একবার চালু হলে তাকে গণ্ডিবদ্ধ রাখা কঠিন। কাজে কাজেই নক্রুমা বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের ওপর অল্প-স্বল্প ঘা দিতে বাধ্য হন। তখনই বৃটিশের টনক নড়ে, তখনই সুরু হয় অর্থনৈতিক চাপ। তাতেও ফল হল না দেখে সামরিকবাহিনীর সাহায্যে তাঁকে উৎখাত করা হয়।

### ইউরোপীয় বান্টুস্তান

আফ্রিকায় এখনো বৃটিশ প্রভুত্ব বেনামে বজায় আছে আয়ান স্মিথ-শাসিত দক্ষিণ রোডেশিয়ায়, ভেরউড-শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায়। জ্যাম্বিয়া বৃটিশ মহাজনী মূলধনের কোম্পানীগুলির সম্পত্তিতে হাত দিতে চেষ্টা করছে বলে তাকে শাসানো হচ্ছে। ছোট্ট দ্বীপ আঙ্গিলায় মুক্তির দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পাঠানো হয়েছে বৃটিশ পল্টন। দ্বীপটির গুরুত্ব প্রধানত সামরিক ঘাঁটি হিসাবে। তবে যেটা নিয়ে বৃটিশের সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা, সেটা হচ্ছে তার বিদেশে লগ্নী মহাজনী মূলধনজাত কায়েমী স্বার্থ। সেটি যেখানেই বিপন্ন হয় সেখানেই 'বাধে' ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, "অত্যুগ্রদের" কর্মতৎপরতা (যেমন মালয়, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি) এবং সেগুলি বৃটেনের "ঘরোয়া ব্যাপার।" বৃটিশের আধা-উপনিবেশ উত্তর আয়াল্যাণ্ডের অবস্থিতি সুদূর আফ্রিকায় নয়, সুয়েজের পূর্বে এশিয়ায় নয়, ক্যারিবিয়ান সাগরেও নয়, খাস পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলানিকেতন ইউরোপে। কিন্তু নাইজিরিয়া, ঘানা, জ্যাম্বিয়া বা আঙ্গিলার সঙ্গে তার কোন মৌল পার্থক্য আছে কি? না, বিন্দুমাত্র না, কারণ সেখানেও বৃটিশ একচেটিয়া কোম্পানীগুলির পসার একটুও কম নয়। এইখানেই হচ্ছে আলস্টারে বিক্ষোভের মূল।

উত্তর আয়াল্যাণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন ও'নীল জনগণের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে বৃটিশ সরকারের কাছে কিছু অধিকারের জন্য আর্জি পেশ করার ফলে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকরি যায় এবং তাঁর গদিতে বসানো হয় বৃটিশের ষোল আনা হাতের পুতুল মেজর চিচেস্টার ক্লার্ককে, যিনি অস্ত্রের ছাড়া অন্য কিছুর ভাষা ব্যবহার করেন না। তিনি দরাজ হাতে বৃটিশ সৈন্য ডেকে এনে মুক্তি সংগ্রাম দমনের জন্য লাগান। বহু লোক হতাহত হওয়ার পর আইরিশ সরকার প্রশ্নটি জাতিসংঘের (ডিবেটিং সোসাইটি) স্বস্তি পরিষদে উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পক্ষ এই বলে সেটি উড়িয়ে দেন যে, ওটা "বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার" এবং মিঃ ক্লার্ক প্রকাশ্যে দোষ চাপান 'অত্যুগ্রদের' ঘাড়ে। "অত্যুগ্ররা" যদি বৃটিশ একচেটিয়া ধনিকরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তারা কি নিন্দনীয়, না প্রশংসার্হ? এই সঙ্গে আরো প্রচার করা হচ্ছে যে, উত্তর আয়াল্যাণ্ডের অধিবাসীদের শতকরা ৭৫ জন প্রোটেস্ট্যান্ট্ এবং ২৫ জন ক্যাথলিক। আইরিশ সাধারণতন্ত্রের অধিকাংশ লোক ক্যাথলিক বলে তাদেরই প্ররোচনায় উত্তর আয়াল্যাণ্ডে আসলে ধর্মীয় বিরোধ সুরু হয়েছে অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মতলব পরিষ্কার।

### উত্তর আয়াল্যাণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বৃটিশ যখন আয়াল্যাণ্ডের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয় তখনই (ঠিক পাকিস্তানের মত) তার উত্তরাংশের ৬টি জেলা বিচ্ছিন্ন করে বৃটিশ কমনওয়েল্থভুক্ত করে নেয় স্থানীয় মীরজাফরদের সহযোগিতায় এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের দাবির ওজুহাত দিয়ে। সেই অংশটিই আলস্টার যা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জরা-কুঞ্চিত দেহে আলসারস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে,—আয়ারল্যাণ্ডের অখণ্ডতা পুনরুদ্ধৃত না হওয়া পর্যন্ত আরোগ্য হবে না।

# শখের ছবি

নির্মলেন্দু গৌতম

শীলার সখ মিটিয়ে ছবি তুললো সমীর।

ছবি তুলবার জন্য আজ খুব ভোরবেলায় উঠেছে শীলা। উঠেই চা করে সমীরকে ডেকে তুলেছে। সমীর উঠে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, তখনও ঠিক সকাল হয় নি। তখন কুয়াশার মতো একটা অন্ধকার সরে সরে যাচ্ছিলো আকাশ থেকে।

সমীর শীলাকে গতকাল বলেছিলো, সকালবেলায় তাকে নিয়ে নদীর ধারে যাবে ছবি তুলতে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে শীলার কয়েকখানা ছবি তোলবার ইচ্ছে অনেকদিনের। অনেকদিন বলেছেও শীলা। কিন্তু অকারণেই এ্যাদ্দিন ছবি তোলা হচ্ছিলো না। গতকাল আপিস থেকে ফেরবার সময় সমীর ফিল্ম কিনে এনেছে। তখুনি অবশ্য শীলাকে বলে নি। কল্যাণবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে আসবার সময় নির্জন রাস্তায় এসে যখন সমীরের গা ছুঁয়ে চলতে চলতে শীলা ছবি তুলবার কথা আবারও বলেছিলো, তখনও সমীর বলে নি যে, ফিল্মের রোলটা তার পকেটে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বালিশটা বুকে চেপে শুয়ে সমীর শীলার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'আমার সার্টের বাঁ পকেটে যা আছে বের করো তো।'

চুলগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিলো শীলা। সমীরের কথায় শীলা হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলো। এগিয়ে সমীরের বাঁ পকেটে হাত ডুবিয়ে দিয়ে ফিল্মের বাক্সটাকে বের করেছিলো সঙ্গে সঙ্গে। বের করে দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিলো শীলা।

'কালকেই ছবি তুলবে তো!' সমীরের দিকে তাকিয়ে শীলা শুধিয়েছিলো।

সমীর বলেছিলো, 'তোমার যা ইচ্ছে।'

'তাহলে কালই যাবো। মর্নিং ওয়াকও হবে, ছবি তোলাও হবে।'

বলে পা ঝুলিয়ে সমীরের গা ঘেঁষে খাটের ওপর বসেছিলো শীলা। বলেছিলো, 'বাব্বা! কদ্দিন বলবার পর ফিল্ম এলো!'

সমীর কিছু না বলে আস্তে আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া সামনের খোলা জানালাটার মধ্য দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিলো। উজ্জ্বল একটা আলো জ্বলছিলো ঘরের মধ্যে। সমীর শীলার মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলো একসময়। একেবারে ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছিলো শীলাকে।

শীলা ফের বলেছিলো, 'কালকে একটু সকাল সকাল উঠতে হবে কিন্তু।'

'তার মানে আজ রাত্তিরে আর ঘুমোতে দিচ্ছো না।'

শীলা হেসে ফেলেছিলো সমীরের কথায়।

একটু পরে শীলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেটটা জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে গভীর সুখে বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে পড়েছিলো সমীর।

শীলা গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে গাইতে তারপর অনেক কাজ করেছিলো। স্পষ্টই টের পাচ্ছিলো সমীর, তারপর হঠাৎ একটা সুখকর ভাবনা ভাবতে ভাবতে সমীর ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম ভেঙেছে শীলার ডাকেই। শীলা ঘুম থেকে উঠে শাড়ি-টাড়ি গুছিয়ে সামনের জানালা দু'টো খুলে মশারি গুছিয়ে ডেকেছিলো সমীরকে।

সমীর যখন এসব কথা ভাবছে, শীলা তখন নদীর পাড় ঘেঁষে খানিকটা এগিয়ে একটু কম জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। আকাশে অফুরন্ত রোদ্দুর খেলা করছে। দূরে, ওপারে বেশ খানিকটা ঝক্‌ঝকে বালুচর। সেই বালুর চর ছাড়িয়ে খানিকটা উঁচুতে বহুদূর পর্যন্ত মাঠ। মাঠের পরে নীল

এবং কালোয় মেশা মোটা রেখার মতো গাছপালা। তার মধ্যে মধ্যে নিশ্চল সুপারী গাছ ঠিক ছবির মতো দাঁড়িয়ে। এরই মধ্যে শীলাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

এদিকটা খানিকটা নির্জন। ঘড়ির দিকে চোখ রাখলো সমীর। সাতটা বাজে। ক্যামেরাটা বন্ধ করে সমীর সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে শীলার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছু সময়। তারপর বললো, 'এবার ফিরে যাই চলো।'

শীলা বললো, 'এখন মনে হচ্ছে ছবি তোলার চাইতে বেড়ানোটাই বেশি ভালো লাগলো।'

সমীর দ্রুত একবার চারদিকে তাকিয়ে বললো, 'আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।'

জল ছপ্ ছপ্ করতে করতে শাড়ি খানিকটা ভিজিয়ে উঠে এলো শীলা।

'ছবিগুলো নিশ্চয়ই ভালো হবে, কি বলো?' শীলা শুধালো।

সমীর বললো, 'আজ বিকেলেই দেখতে পাবে।'

'একখানা ফিল্ম্ রেখে দিলে কেন বলো তো? আর কারও ছবি তুলবে নাকি?'

'দেখি কার ছবি তোলা যায়।' সমীর একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর পা ডোবানো ঘাস আর ভাঁট-পিটুলীর মধ্য দিয়ে সরু মেটে রাস্তাটার দিকে চলতে থাকলো।

শীলা পেছনে পেছনে আসছে। কিন্তু নরম ঘাসের জন্য শীলার ভিজে শাড়ির খস্ খস্ শব্দ ছাড়া আর অন্য কোনো শব্দ আসছে না।

সিগারেটটা অর্ধেক টেনেই ছুঁড়ে ফেলে দিলো সমীর। ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিলো।

একখানা ফিল্ম্ রেখে দিয়েছে সমীর। এখন দিয়ে শীলার ছবি নয়, সমীর অন্য কিছুর ছবি তুলবে। অন্য কিছুর ছবি তুলবার কথাটা ভাবতেই সমীর চারদিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকালো। গাছপালা, আকাশ, নদী, বালুর চর সব আশ্চর্য রকম দেখাচ্ছে। রৌদ্র টল্‌মল্ করে সমস্ত কিছুকে আরো উজ্জ্বল, আরো স্পষ্ট করে তুলেছে।

বস্তুত শীলার ছবি তুলতে-তুলতেই হঠাৎ নদী, আকাশ, গাছ-পালার দিকে তাকিয়ে সমীরের মনে হয়েছে সে যেন আরো কিছুর ছবি তুলতে চায়। এই চাওয়াটাই সমীরকে ক্রমে সম্মোহিত করেছে। সমীর শেষ ফিল্‌ম্‌খানায় তাই শীলার ছবি তোলে নি। বলেছে, 'শেষ ফিল্‌ম্‌খানা থাক। এতে তোমার ছবি তুলবো না।'

'সে কি, কার ছবি তুলবে!' অবাক হয়ে শুধিয়েছে শীলা।

সমীর যে কার ছবি তুলবে সমীরের নিজের কাছেই তো তা স্পষ্ট নয়। কাজেই কী করে সমীর বলবে, কার ছবি তুলবে। শুধু নদীর ছবি নয়, শুধু আকাশের ছবি নয়—অথচ তাদের সবার ছবি। এই যে নীলে-সবুজে-হলুদে মেশা একটা বিস্তীর্ণতা, এই বিস্তীর্ণতাই সমীরকে সম্মোহিত করেছে। সমীর তো তারই ছবি তুলতে চায়।

সুতরাং শীলার কথার উত্তর দিতে পারে নি সমীর।

শীলা বলেছে, 'তোমার মধ্যে একটা ছেলেমানুষ আছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো কারো ছবিই তুলবে না।'

সমীর শীলার দিকে নয়, নিজের দিকে তাকিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। স্পষ্টতই সমীরের মধ্যে ছেলেমানুষ আছে একটা। এই ছেলেমানুষের কাছে আত্মসমর্পণে সুখও আছে। নিজেকে আরো বড়ো আরো দীপ্ত করে তুলতে ভেতরের এই ছেলে-মানুষটির হাতে হাত রাখতে হয়। সমীর যদি সব সময় তার হাতে হাত রাখতে পারতো!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে সমীর পায়ে পায়ে সরু রাস্তায় উঠে এসেছে। শীলা তার পাশে। বড়ো একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ সবুজ পাতার ছায়া ফেলে রেখেছে কাছাকাছি। শীলা এগিয়ে তার ছায়ায় দাঁড়ালো। ছায়ার মতো স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে শীলাকে।

সমীর ক্যামেরাটা বের করে দূরে নদীর ওদিকে সেই মোটা রেখার মতো বনের দিকে তাকালো। তার পর ক্যামেরায় চোখ রেখে দেখলো জায়গা-টুকু। মাত্র একটা ফিল্‌ম্ আছে ক্যামেরায়। একটার বেশি ছবি তুলতে পারবে না সমীর। খানিকটা অসহায়-ভাবে ক্যামেরার সেই ছবির দিকে সমীর তাকিয়ে রইলো।

শীলার গলা ভাসলো, 'ছবি তুলছো নাকি?'

মৃদুস্বরে বললো সমীর, 'উঁহু!'

ক্যামেরা থেকে চোখ তুললো সমীর। শীলার দিকে তাকিয়ে দেখলো, শীলা ছায়ায় ডুবে আছে। মনে হলো প্রশ্নটা শীলা করে নি। প্রশ্ন করেছে অন্য কেউ। মনে হলো, যে ছবি তুলতে সে একটা ফিল্‌ম্ রেখেছে সে ছবিটা এতোক্ষণ তার ক্যামেরায় প্রতিফলিত হচ্ছিলো না। সেই নীলে-হলুদে-সবুজে মেশানো রঙের প্রাচুর্য তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে নি। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো সমীরের কপালে। সমীর ক্যামেরাটা বন্ধ করে রুমালে কপাল মুছলো।

শীলা ছায়ার গভীর থেকে বললো, 'এদিকে এসো। সেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছো রোদ্দুরে।'

সমীর ফিরে শীলাকে দেখলো। তারপর আস্তে আস্তে সেই ছায়ার নিচে এসে দাঁড়ালো সমীর। শীলার পাশে। রৌদ্র তেমন তীব্র নয়। তবু ছায়ায় এসে ভালো লাগলো সমীরের।

গাছের ডালে ডালে অজস্র পাখীর নাচানাচি। গাছের সবুজ পাতার দিকে মাথা উঁচু করে তাকালো সমীর। পাতার সামান্য ফাঁক দিয়ে বহুদূরের আকাশ চোখে ধরা পড়লো। পাখীগুলিকে অসম্ভব সুখী এবং চঞ্চল মনে হলো সমীরের। মুগ্ধ হয়ে গেলো সমীর। সবুজে-নীলে আলোর রুপালীতে পাখীর ডাকে ক্রমে যেন বিপুল হয়ে উঠতে থাকলো চারদিকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সমীর সেদিকে ক্যামেরা তুলে ধরলো। একটা মাত্র ফিল্‌ম্। সমীর তারই মধ্যে নিজের হৃদ্‌স্পন্দন যেন শুনতে চায়।

সমীর ক্যামেরায় চোখ রেখে কিন্তু শাটার টিপতে পারলো না। দেখলো তার দেখাটুকু অনেক ছোটো একটা চারকোণা অংশ হয়ে গেছে। বিষণ্ণ হলো সমীর। ফের পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো।

শীলা বললো, 'এবার যাবে?'

সমীর বললো, 'যাবো। একটু দাঁড়াও।'

'আমার কিন্তু চায়ের জন্য ছটফট করছে মনটা।' শীলা বললো।

বিষণ্ণভাবে হাসলো সমীর। বললো, 'আমারও।'

ক্যামেরা বন্ধ করে সমীর কাঁধে ফেললো। তারপর শীলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'নাও, চলো, ফিরে যাবো এবার।'

'ছবিটা তুলে নিলে পারতে।' শীলা বললো।

সমীর শীলার কথার উত্তরে কি বলবে তা স্পষ্ট করে ভাবতে পারলো না। শীলাকে কি করে বলবে সে কোন্ ছবি তুলতে চায়। উপলব্ধিটুকু সমুদ্রের মতো বিশাল, আকাশের মতো বিস্তৃত। অনন্ত-কাল ধরে বললেও সেই উপলব্ধিটুকু প্রকাশের কথা ফুরোবে না। এ জন্যেই

মানুষ দ্বিতীয় ছবি আঁকতে রঙের বাটিতে তুলি ডোবায়। নিজেকে বার বার ভেঙে চৌচির করে।

ভাবতে ভাবতে কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো সমীর।

দু'জনে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলো। সেই ছায়া পেরিয়ে রৌদ্রের মধ্যে নামলো দু'জন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রোদের তাপ যেন একটু বেশি লাগলো সমীরের।

চলতে চলতে শীলা বললো, 'অনেক ছবি তুলেছো আজকে। ছবিগুলো দেখবার জন্য খুব কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু।'

সমীর একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেটের কাঠিটা ঘাসের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে বললো, 'আমারও কৌতূহল হচ্ছে।'

'তোমার সেই ফিল্মটাতে ছবি না তুললে আজকে ধুতে দেবে কি করে?'

সিগারেটটা নামিয়ে সমীর আবার চারদিক তাকালো। এতো ছবি এতোক্ষণ তুলেছে অথচ একটা ছবি তুলতে পারছে না সে! একটা ছবি তোলার জন্য সমীর এতো ভাবছে! খানিকটা বিপন্নভাবে সমীর সিগারেটটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে হাঁটতে থাকলো।

সরু রাস্তাটা পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় এলো দু'জনে।

শীলা বললো, 'একটা রিক্সা পেলে ভালো হতো।'

'এদিকটায় রিক্সা পাওয়া শক্ত। বেশি প্রোজন আসে না। বিশেষ করে এই সকাল বেলায়।' সমীর বললো।

শীলা কিছু না বলে খানিকটা ক্লান্ত-ভাবে হাঁটতে থাকলো।

বড়ো রাস্তা হলেও দু'দিকে সবুজ এবং বিরাট বিরাট গাছ দাঁড়িয়ে, তারপর খানিকটা মাঠ। মাঠের পরেই কিছু বাড়ি।

শীলা সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের বাড়ি যদি অমনি কাছে হতো?'

সমীর বললো, 'হয় নি বলে বেঁচে গেছি। আমার আপিস আর বাজার তাহলে কদ্দুর হতো ভেবেছো?'

শীলা বললো, 'তখন আবার মনে হতো বাড়িটা যদি আপিস আর বাজারের কাছাকাছি হতো।' বলে হাসতে থাকলো শীলা।

সমীর সেই ছোটো মাঠ, বাড়িঘর, তার ওপরের আকাশ এবং রৌদ্রের উজ্জ্বলতাটুকু, তারই মধ্যে অন্য একটা স্বাদ পেতে চেষ্টা করলো। আশ্চর্য, সমীরের মনে হলো, সে তার মধ্যে ক্রমে ডুবে যাচ্ছে। ক্যামেরার গায়ে হাত রাখলো সমীর। সেই নীল-সবুজ-হলুদ তাকে যেন ভুলিয়ে দিচ্ছে সব। ক্যামেরা কাঁধ থেকে নামিয়ে সমীর দাঁড়ালো। চোখ রাখলো ক্যামেরার। শাটারটা তার আঙুলে। একটুখানি টিপলেই ছবি উঠবে।

কিন্তু তবু সমীর ছবি তুলতে পারলো না। একরাশ পাখী কোথায় যেন ডেকে উঠলো। মৃদু বাতাসে পাতায় পাতায় আশ্চর্য একটা শব্দ যেন শুনতে পেল সমীর। ক্যামেরা থেকে সমীর চোখ তুললো। তার ছবির মধ্যে গোটা পৃথিবীটাই যেন বাদ পড়ে যাচ্ছে।

শীলা নিবিড় একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওপর দিকে চোখ রেখে সম্ভবত পাখীর বাসা দেখছিলো। সমীর ক্যামেরা থেকে চোখ তুলতেই বললো, 'ছবি তুললে নাকি?'

'নাহ্!'

'বুঝতে পারছি, ওই ফিল্মে তুমি ছবি তুলতে পারবে না আর।' হাসলো শীলা।

ফের পাখীর একরাশ ছানা কোথায় ডেকে উঠলো। ফের মৃদু বাতাসে পাতায় পাতায় আশ্চর্য একটা মর্মরধ্বনি যেন শুনতে পেলো সমীর।

মৃদু গলায় শীলার দিকে তাকিয়ে সমীর বললো, 'নাও, চলো এবার।'

দু'জনে ফের হাঁটতে থাকলো।

'ক'টা বাজলো বলো তো?' শীলা শুধালো।

'সাতটা দশ।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সমীর বললো।

শীলা বোধহয় রোদের দিকে তাকিয়ে বেলাটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করলো।

সমীরের ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছিলো। বার কয়েক সিগারেটটা টেনে সেটা পথের ওপরই ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

হাঁটতে হাঁটতে সমীর নিজের কাছে নিজেই যেন বিস্ময় প্রকাশ করলো। ছবি তুলতে গিয়ে কখনো গোটা পৃথিবীর কথা ভাবে নি সমীর। সমীরের মনে হচ্ছে পৃথিবীর খণ্ড খণ্ড ছবি তুলেই এতোদিন সুখ পেয়েছে সে। সে সুখের মধ্যে সমীর আর ফিরে যেতে পারবে না।

এমন একেকটা ক্ষণ আসে, যখন হঠাৎ সবাই কোনো এক আশ্চর্য আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেই ক্ষণ আমাদের যা দেয় গোটা জীবন দিয়ে আমরা তা ধরে রাখি। সমীর ভাবলো।

খানিকটা এগিয়ে একটা রিক্সা পাওয়া গেলো।

শীলা বললো, 'আর হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছে না। দেরিও হয়ে গেছে। রিক্সায় যাই চলো।'

সমীরেরও হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না। রিক্সাকে ডেকে উঠে পড়লো।

পথ প্রায় ফাঁকাই। রিক্সা দ্রুত ছুটতে থাকলো।

শীলার কপালের ওপর আলগা চুল উড়ছে বাতাসে। শাড়িটা শরীরের সঙ্গে লেগে আছে। শীলাকে খুব সুখী মনে হলো সমীরের।

'অনেকক্ষণ হলো বেরিয়েছি কিন্তু।' শীলা বললো।

সমীর বললো, 'এখন, এই ফেরার সময় মনে হচ্ছে সে কথা।'

শীলা হাসলো। বললো, 'তাই-ই মনে হয়।'

বাড়িতে পৌঁছে শীলা দ্রুত শাড়িটা পাল্টে নিলো। সমীর ক্যামেরাটা নামিয়ে একটা চেয়ারে বসলো।

শীলা ঘর থেকে বেরুবার সময় বললো, 'তুমি একটু বোসো, আমি চা করে আনি। উফ্, চায়ের জন্য সেই কখন থেকে ছটফট করছি।'

সমীর বললো, 'খিদেও পেয়েছে কিন্তু।'

শীলা হেসে বললো, 'আগেই তো বলেছিলুম, সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে যাই। নদীর ধারে বসে খাওয়া যেতো তাহলে। তখন তো ঠাট্টা করেছিলে।' শীলা আর দাঁড়ালো না।

জানালা দিয়ে কিছুটা আকাশ, কিছু গাছপালা, কয়েকটা উড়ন্ত পাখি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে সমীর দুঃখ বোধ করলো। এই কিছু দেখায় সুখ নেই বলে অহরহ সবাই বাইরে দাঁড়াতে চাই, দাঁড়াই। আরো বিস্তৃত, আরো প্রকাণ্ডভাবে দেখতে চাই চারদিককে।

এই গভীর উপলব্ধি একটা ছোটো ছবির মধ্যে কি করে সমীর ধরে রাখবে! তাকে ছবির মধ্যে টুকরো করে দেখায় নিশ্চয়ই সুখ নেই, মহত্তম আনন্দ নেই। তাহলে ছবিতে ধরে পৃথিবীকে আমরা অবলীলায় ভুলে যেতে পারতুম। সমীরের ইচ্ছে হলো, সেই নদীর তীরে বালুর ওপর পিঠ দিয়ে আকাশের দিকে চোখ রেখে সে অনন্তকাল শুয়ে থাকে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠলো সমীর। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ফিল্মটা গুটিয়ে ফেললো। তারপর ক্যামেরা থেকে ফিল্মের রোলটা বের করে আঠালো কাগজটা দিয়ে এঁটে দিলো সেটা।

শীলা ঘরে ঢুকলো। রোলটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কার ছবি তুললে শেষ পর্যন্ত?'

'কারো ছবি তুলি নি।'

'কারো ছবি তোলো নি তো ফিল্মটা বের করলে যে!' অবাক হলো শীলা।

সমীর আস্তে আস্তে হাসলো। কিছু বলতে পারলো না। পকেট থেকে পেন বের করে ফিল্মের রোলের গায়ে নিজের নাম লিখতে থাকলো।

শীলা বললো, 'আমি জানতুম, ফিল্মটায় তুমি ছবি তুলতে পারবে না।'

সমীর তবু কিছু বললো না। ফিল্মটা গুটিয়ে সমীর এখন দারুণ স্বস্তি পাচ্ছে।

(মতামত লেখকের)

### 'সাপ্তাহিক বোঝা' প্রসঙ্গে

২০শে কার্তিক, '৭৬ সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৯শ সংখ্যায় কৃত্তিবাস ওঝার 'সাপ্তাহিক বোঝা' প্রসঙ্গে আমি বক্তব্য রাখতে চাই। দয়া করে এটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

ওঝা মশায় অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে দিল্লীর সিণ্ডিকেটপন্থীদেরকে ও কেরলের সি পি আই (এম)কে এক লাইনে এবং ইন্দিরাপন্থী ও সি পি আইকে এক লাইনে দাঁড় করিয়েছেন। এটাই তো ওঝা মশায়দের রাজনৈতিক লাইন। তবুও যেহেতু তিনি একজন সমালোচক, সেজন্য সমালোচনাটা একপেশে হলে পাল্টা বক্তব্য উত্থাপন করতে হয়।

ওঝা মশায় বলেছেন, দুর্নীতির প্রশ্নে কেরলের যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটেছে—সত্যই কি তাই? তা নয়। এর কারণ খুঁজতে আরও পিছনে যেতে হবে। যখন কেরলের খাদ্য পরিস্থিতির বিষয়ে মার্কসবাদীরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান দেন এবং গোপালন-নাম্বুদ্রিপাদ যখন সংবিধান বিষয়ক বিবৃতি দেন তখন থেকে এর উৎপত্তি—এই দুটি বিষয়েই সি পি আই বিরোধিতা করে এবং সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। তৎকালীন সি পি আই (এম)-এর নেতৃবৃন্দের বিবৃতিই তার প্রমাণ।

আরও কারণ সি পি আই কর্তৃক যে শ্রেণী সহযোগিতার রাজনৈতিক লাইন গৃহীত হয়েছে, তার সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর শ্রেণী সংগ্রামের রাজনৈতিক লাইনের দ্বন্দ্বের মধ্যে।

এখন ওঝা মশায় কথিত দুর্নীতির কথাটাই যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় তা হলেও সি পি আই-এর নেতৃত্বে মিনিফ্রন্ট কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েই কেরলের যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটিয়েছেন তা অবশ্যই স্বীকার্য। প্রমাণ—বিধানসভার ভোটের ফল। মিনিফ্রন্টের পক্ষে ৬৯ এবং যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ৬০। অর্থাৎ এই ৬৯ কোথা থেকে এল? এর মধ্যে কংগ্রেস ৯ এবং কেরল কংগ্রেস ৫ মোট ১৪ জন নাই কি (?) ৬৯ থেকে ১৪ জন বাদ গেলে যুক্তফ্রন্টের পতন হতো কী? যুক্তফ্রন্টের সভায় দুর্নীতির বিষয়ে ঐ মিনিফ্রন্টের প্রস্তাব নিশ্চয়ই সংখ্যালঘিষ্ঠ সমর্থিত। তাই যুক্তফ্রন্টের বাইরে বিধানসভায় কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে চক্রান্তের কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা অন্যায় কিছু বলেন না।

এ ঘটনা ঢাকবার জন্য ওঝা মশায়রা কুযুক্তির অবতারণা করবেন তাতে বিচিত্র কী!

তিনিই বলেছেন—ইন্দিরাজী মনোপলি ক্যাপিটালিস্টদের বিরুদ্ধে নন-মনোপলি ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে নিয়ে সমাজতন্ত্র করবেন আর সি পি আই শ্রেণী সহযোগিতার রাজনীতি নিয়ে ইন্দিরাজীর পিছনে মদৎ যোগাবেন তবেই না সমাজতন্ত্র হবে—তাই না?

ওঝা মশায় শ্রেণী সহযোগিতার মন্ত্রে শ্রেণী সংগ্রামের বিষ ঝাড়ুন ক্ষতি নেই, কিন্তু বৃথা কুযুক্তির অবতারণা করে কিছু ধোঁকা দেওয়া যায়—তার বেশি কিছু নয়।

ওঝা মশায় সি পি আইকে সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন—তাঁরা আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের স্বীকৃত পার্টি এবং ভারতের সব প্রদেশগুলোতেই এদের শক্তি বেশি আর—সি পি আই (এম)-এর বিশ্বের বাজারে কল্কে নেই—ভারতে কেবল পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে শক্তিশালী আর ২।১টা প্রদেশে কিছু আছে। ওঝা মশায় নিজের যুক্তিতেই স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন যে, সি পি আই (এম) যেখানে শক্তিশালী, সেখানেই শক্তিশালী বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট হয়েছে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলোই তো তাই এত শক্তিশালী। আর যেখানে সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পার্টি শ্রেণী সহযোগিতার রাজনীতি নিয়ে সি পি আই (এম) অপেক্ষা একটু বেশি শক্তিশালী, সেখানে কিন্তু শক্তিশালী বামপন্থী ফ্রন্ট হয় না। দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর শক্তি ক্রমেই বেড়ে যায়। আবার দক্ষিণপন্থী দলের নেতৃত্বে গঠিত সরকারে অংশ গ্রহণ করেও শ্রেণী সেবা করে চলে।

তাই তো আমরা দেখি ফ্রান্সে বিপ্লব হয়েও হয় না। ইতালীর অবস্থাও তাই। আর সোভিয়েতের কাছে সামরিক সাহায্য পেয়েও মিশর ক্ষুদ্র ইসরায়েলের কাছে মার খায়। অপর দিকে দেখি কিউবা ও ভিয়েতনামের সংগ্রামী উত্থান।

ওঝা মশায় দয়া করে বলুন না—একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে একজন প্রগতিশীল, অপরজন প্রতিক্রিয়াশীল কীরূপে হন?

আর বাড়িয়ে লাভ নেই। লোককে বোকা বানাবার পূর্বে শতবার ভাবুন ও সত্যকে সত্য বলে ঘোষণা করুন।

মৃগেন সরকার
পোঃ সাঁইথিয়া
বীরভূম

### যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব

সাপ্তাহিক বসুমতীতে যে সমস্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব বাহির হয়, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ৮ই জানুয়ারী "যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধটি ডঃ নরেন ভট্টাচার্য এত চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যাহা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। যখন ভারতবর্ষে একটা রাজনীতির অনিশ্চয়তা ও কেন্দ্রে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত, ঠিক সেই সময় ডঃ ভট্টাচার্য যে রাজনৈতিক তত্ত্ব জনসাধারণের সামনে রাখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

—রঞ্জিতকুমার ঘোষ
২০/বি, গৌরীবাড়ী লেন
কলিকাতা।

### স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীতে শ্রীসুনীল ঘোষের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন সংক্রান্ত ধারাবাহিক রচনাগুলো প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৯৬৭ সালের 'একাডেমিক এ্যাডভাইসারী কমিটির' সুপারিশের তালিকা থেকে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি· সুর রায়চৌধুরীর নাম ছিল। 'সেল' নাকচ করে দেওয়ায় তাঁর নাম প্যানেল থেকে বাদ পড়েছে।

গবেষক ও লেকচারার ডাঃ সুর রায়চৌধুরীর নাম ইতিমধ্যে অনেকের কাছে সুবিদিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর শ্বেতিরোগের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার ও সংসদে তাঁর লেখা একটি "শিশুরোগ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান" প্রবন্ধ অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামে জনসাধারণের ও চিকিৎসকদের মধ্যে চর্মরোগ ইত্যাদি সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে বক্তৃতা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এগুলি প্রয়োজন। বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগ তাঁর জন্যই খ্যাতি অর্জন করেছে।

আশা করি, স্বাস্থ্যদপ্তর ডাঃ সুর রায়চৌধুরী সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন, অন্ততঃ জনস্বার্থে এবং একাডেমিক এ্যাডভাইসরী কমিটির সুপারিশের দিকে তাকিয়েও।

—জনৈক চিকিৎসক

# ইন্‌টিরিওর মরিস মেতারলিঙ্ক

**চরিত্র ঃ**

বাগানে—বৃদ্ধ
বিদেশী
মার্থা } বৃদ্ধের দুই নাতনী
ম্যারী
কৃষক
জনতা

বাড়িতে—
বাবা }
মা } এরা সব মূক চরিত্র
দুই মেয়ে }
শিশু }

[একটি পুরনো বাগান—বাগানটি ভর্তি উইলো গাছ। বাগানের পেছনে একটি বাড়ি—তার নিচের তলার তিনটি জানলা দিয়ে দেখা যাবে আলো জ্বলছে—[illegible] অস্পষ্টভাবে আরও দেখা যাবে সন্ধ্যা সময় পরিবারের সবাই আলোর চারপাশে বসে আছেন। চিমনির কোণার দিকে বাবা বসে আছেন। মা টেবিলের ওপর কনুই ভর দিয়ে শূন্যতার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় রয়েছেন। সাদা পোষাক পরিহিত দুটি যুবতী মেয়ে এমব্রয়ডারীর কাজ করছে—তাদের চোখে স্বপ্নাবেশ, মুখে মৃদু হাসির ছটা। সমস্ত ঘরটিতে শান্তির ভাব বিরাজ করছে। শিশুটি ঘুমিয়ে আছে—তার মাথাটি মায়ের বাঁ হাতের ওপর রয়েছে।

ঘরের লোকেরা কেউ যখন উঠে দাঁড়াচ্ছেন, হাঁটছেন বা কোনরকমের অঙ্গভঙ্গি করছেন—দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে এসব দৃশ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে একটা গাম্ভীর্য এবং মন্থরতা—একটা আধ্যাত্মিক স্বচ্ছ আবরণের ভেতর দিয়েই যেন ঘরের সব দৃশ্য বাগানের লোকদের কাছে মায়াময় অবস্থায় পরিস্ফুট হচ্ছে।

বৃদ্ধ এবং বিদেশী সন্তর্পণে বাগানের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে।]

**বৃদ্ধ**—আমরা বাগানের সেই অংশটায় এসে হাজির হয়েছি যে-দিকটা বাড়িটার পেছন দিকে। এখানে ও'রা কেউ আসেন না—বাড়ির সব দরজাগুলো হচ্ছে অন্যদিকে। ওগুলো এবং জানলার খড়খড়িগুলো সব বন্ধ। বাড়ির এদিকের জানলায় খড়খড়ি নেই, আমি আগেই আলো দেখতে পেয়েছিলাম......এখনও ওরা বাতির আলো জ্বালিয়ে ঘরে বসে আছে। ভালই হয়েছে, আমরা এখানে আসবার সময় ওরা শুনতে পায় নি। মা বা মেয়েরা বাড়ির বাইরে এসে হাজির হলে আমরা কি করতাম বল দেখি?

**বিদেশী**—এখন আমাদের কর্তব্য কি?

**বৃদ্ধ**—আমার প্রথমে জানা দরকার ওরা সবাই ঘরের ভেতর আছে কিনা। হাঁ, দেখছি চিমনির কোণের দিকে বাপটি বসে আছেন। উনি কিছুই করছেন না—হাঁটুর ওপর হাত দুটি পাতা। ওদের মা টেবিলের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে বসে......

**বিদেশী**—মা'টি আমাদের দিকেই চেয়ে আছেন।

**বৃদ্ধ**—না, ও'র দৃষ্টি শূন্যতার ওপর নিবদ্ধ। উনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না। আমাদের আড়াল করে রেখেছে গাছগুলোর ছায়া। কিন্তু আর সামনের দিকে এগিয়ো না...ওখানেই মত মেয়েটির অন্য বোন দু'জনও রয়েছে। ওরা ধীরে ধীরে এম্‌ব্রয়ডারীর কাজ করছে। ছোট শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের কোণার ঘড়িটায় ৯টা বেজেছে......ওরা ওদের বিপদের বিষয় কিছুই জানতে পারে নি। ওরা কেউ কথা বলছে না।

**বিদেশী**—আমরা কি বাপুটির দৃষ্টি আকর্ষণ করবো—কোন সঙ্কেতের সাহায্যে? তিনি এদিকেই মুখ ফিরিয়েছেন। কোন একটি জানলায় গিয়ে নক্ করবো কি? ওদের ভেতর যে-কোন একজনকে তো ব্যাপারটা অন্যদের আগে শুনতে হবে......

**বৃদ্ধ**—কাকে আগে বলবো বুঝতে পাচ্ছি না......আমাদের খুব সাবধানে কাজটা করতে হবে। বাপটি বৃদ্ধ এবং অসুস্থ—মায়ের স্বাস্থ্যও সেই রকম—বোন দুটির বয়স অল্প...মেয়েটিকে এরা সবাই যেমন গভীরভাবে ভালবাসতো তেমন আর কাউকে বাসবে না। এদের মত সুখী পরিবার আমি আর কখনও দেখি নি। ......না, না! জানলার কাছে যেও না—জানলায় হবে। অনেক ভাল হয়, আমরা যদি সহজভাবে ব্যাপারটা ওদের জানিয়ে দিই—যেন এই ঘটনাটা দৈনন্দিন আর পাঁচটা ব্যাপারের মত। আমরা খুব দুঃখিত এমন ভাব দেখাবো না—তাহলে ওরা ভাববে ওদের নিজেদের দুঃখটাকে আমাদের দুঃখকেও ছাপিয়ে না তুললে চলবে না—সেক্ষেত্রে কি করা উচিত তা ওরা ভেবে ঠিক করতে পারবে না......বাগানের অন্য দিকটায় যাওয়া যাক, চল। দরজায় গিয়ে নক্ করবো, এমন ভাব দেখাবো যেন কিছুই ঘটে নি। আমিই প্রথমে ভেতরে ঢুকবো—আমাকে দেখলে ওরা অবাক হবে না। আমি মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি—কিছু ফুল বা ফল সঙ্গে থাকে উপহার হিসাবে—এক ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা ওদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসি।

**বিদেশী**—আমাকে আপনি সঙ্গে নিতে চান কেন? একলা যান—আমি অপেক্ষা করবো, আপনি ফিরে এসে আমাকে ডাকবেন। ওরা এর আগে আমাকে কখনও দেখে নি—আমি এখানকার বাসিন্দাও নই—এখানকার পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম বলেই......

**বৃদ্ধ**—আমার একলার ব্যাপারটার দায়িত্ব নেওয়াটা ঠিক হবে না। বিপদের বার্তা একজন গিয়ে ঘোষণা করলে ব্যাপারটা বড় বেশি ভয়াবহ, সুনিশ্চিত এবং মারাত্মক বলে মনে হয়। এইসব কথাই এখানে আসবার সময় ভাবছিলাম......একলা গেলে প্রথমেই ব্যাপারটা আমাকে বলতে হবে। দু'-একটি কথায় সব ঘটনাটা ওরা জেনে নেবে। আমার আর বিশেষ কিছু বলবার থাকবে না। একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা বর্ণনা করবার পর যে স্তব্ধতা বিরাজ করে সেটা আমার বড় ভয়াবহ মনে হয়। হৃদয়টাকে যেন কেউ ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে গেলে খবরটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলবো। যেমন ধর—ওদের জানাবো যে মেয়েটিকে কিভাবে প্রথম দেখতে পাওয়া গেছিল...মেয়েটি নদীর জলে ভাসছিল, হাত দুটি যুক্ত হয়ে ছিল......

**বিদেশী**—হাত দুটি যুক্ত অবস্থায় ছিল না, ওর দু'পাশে ভাসছিল।

**বৃদ্ধ**—দেখছ তো, ইচ্ছে না থাকলেও কথার পিঠে কথা এসে যায়। অ[illegible] ফলে দুর্ঘটনার তীব্রতাও খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসে। আমি যদি একলা যাই—তখন আমাকে সোজা সুজি ব্যাপারটা বলতে হবে—আর তার ফল হবে মারাত্মক—এরপর কি

[illegible] জানেন। কিন্তু আমরা যদি দু'জনে মিলে জাগাজাগি করে ওদের সব কথা জানাই, ওরা আমাদের কথা শোনবার দিকেই মন দেবে, আর তাহলে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ ধাক্কাটা অতোটা লাগবে না। ভুলে যেও না মেয়েটির মা ওখানে থাকবে, তার জীবনীশক্তি কিন্তু প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে......প্রথম দুঃখের দমকটা অনাবশ্যক কথার স্রোতে খানিকটা নিস্তেজ হয়ে আসাই সব দিক দিয়ে ভাল। এই জন্যই যাদের জীবনে দুর্ভাগ্য আঘাত হানে তাদের চারপাশে লোকজন জড় হয়ে নানারকম কথাবার্তা বলে তাদের মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে রাখাই উচিত। এমন কি যারা বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন নয়, তারাও শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে এসে, নিজেদের অজান্তেই, শোকের কিছুটা তীব্রতা কমিয়ে দিয়ে যায়—অর্থাৎ তারা যেন শোকের কিছুটা অংশ নিজেদের জন্য নিয়ে যায়। শোকটাকে যেন হাওয়া বা আলোর মত বিনা প্রচেষ্টায়, নিঃশব্দে ছড়িয়ে দিয়ে হাল্কা করা হয়।

বিদেশী—আপনার কাপড় ভিজে চপচপে হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ—তোমারও কোটময় কাদা লেগেছে... আসবার সময় পথে আমার নজরে পড়ে নি, ভয়ানক অন্ধকার ছিল তো।

বিদেশী—আমি কোমরজল অবধি নদীতে নেমেছিলাম।

বৃদ্ধ—আমি আসবার অনেক আগেই কি তুমি মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলে?

বিদেশী—কয়েক মুহূর্ত আগে। আমি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছিল। নদীর ধারে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছিল। আমি নদীর তীর ধরে হাঁটছিলাম—নদীর জলের ওপর আমার দৃষ্টি—রাস্তার তুলনায় নদীর ওপর যেন খানিকটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল—এই সময় একগুচ্ছ নলশরের পাশে একটা অদ্ভুত কিছু দেখলাম...কাছে গেলাম, এই সময় দেখতে পেলাম মেয়েটির কেশগুচ্ছ প্রায় বৃত্তাকারে তার মাথার পাশে ভেসে উঠেছে, আর জলের স্রোতে এদিক থেকে ওদিকে সরে সরে যাচ্ছে......

[ঘরের ভেতর মেয়ে দুটি জানলার দিকে মুখ ফেরাবে।]

বৃদ্ধ—ওর বোন দুটির কেশগুচ্ছ তাদের কাঁধের ওপর দুলছে দেখতে পেলে?

বিদেশী—ওরা আমাদের দিকে মাথাটা ফিরিয়েছিল—বোধ হয় আমি একটু জোরে কথা বলছিলাম। [মেয়ে দুটি
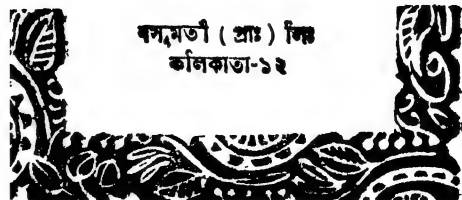
আবার যেভাবে ছিল সেইভাবে মাথা ঘুরিয়ে বসবে।] আবার ওরা ফিরে বসেছে। আমি কোমর অবধি জলে নেমেছিলাম। তারপর ওর হাতটা ধরে ফেললাম এবং সহজেই ওকে পাড়ে টেনে তুললাম। বোনদের মতই মেয়েটি খুবই সুন্দরী ছিল......

বৃদ্ধ—আমার তো মনে হয় মেয়েটি বোনেদের থেকেও ঢের বেশি সুন্দরী ছিল... বুঝতে পারছি না আমি সাহস হারিয়ে ফেলছি কেন......

বিদেশী—কি ধরণের সাহসের কথা বলছেন? মানুষের পক্ষে যা সাধ্য তা আমরা করেছি। মেয়েটি ঘণ্টাখানেক আগেই মারা গেছিল।

বৃদ্ধ—সকালবেলায় মেয়েটি বেঁচে ছিল। সে যখন গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন আমার সঙ্গে দেখা। যে নদীতে তাকে দেখতে পেয়েছিলে তারই অপর পারে সে তার গ্র্যান্ড-ফাদারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে সেকথা সে বলতে পারলে না......সে যেন মনে হল আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু বোধ হয় সাহস পেল না, হঠাৎ সে চলে গেল। এখন কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে—অবশ্য তখন কোন কিছুই আমার নজরে আসে নি!—সে যেন মৃদুভাবে হেসেছিল—যে ধরণের হাসি লোকে হাসে যখন তারা মৌন থাকতে চায়, অথবা ভয় পায় লোকে তাদের বুঝতে পারবে না......কোন কিছু আশা করতেও যেন সে ভয় পাচ্ছিল। তার চোখ দুটি যেন আবৃত হয়ে ছিল, আমার দিকেও ভালভাবে সে চেয়ে দেখে নি।

বিদেশী—কয়েকজন কৃষকের কাছে শুনলাম সে সারা বিকেল নদীর ধারে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারা মনে ভেবেছিল সে ফুলের খোঁজ করছিল......এমনও হতে পারে যে তার মৃত্যুটা......

বৃদ্ধ—কেউ বলতে পারে না. ....কে কতটা জানে? বা জানতে পারে? মেয়েটা ছিল এমন ধাতের যারা সহজে মুখ-ফুটে কথা বলতে চায় না। যারা অনেক কারণেই জীবন সম্বন্ধে আস্থা হারিয়ে ফেলে। যেভাবে ঐ ঘরটাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছ, তেমনভাবে তো আর মানুষের আত্মার ভেতরটাকে দেখা যায় না। ওরা সবাই ওই ধরণের—মুখে হাল্কা কথা বলে, কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে, ওদের ভেতর কোনও অ-সাধারণ মনোভাব আছে। এই রকম কারোর সান্নিধ্যে অর্থাৎ যে ঠিক এ-জগতের মানুষ নয় এবং যার আত্মা পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে না—তুমি মাসের পর মাস কাটিয়ে যাও, তুমি হয়তো অত ভেবে-চিন্তেও তার সব কথার জবাব দিতে পারবে না, শেষে দেখবে পরিণতিটা কি দাঁড়ায়। ওরা যেন প্রাণহীন পুতুলের মত, আর সমস্ত সময় ওদের অন্তরে নানা ধরণের চিন্তা দেখা দেয় এবং মিলিয়ে যায়। ওরা নিজেরাও সেগুলোকে ঠিকমত বুঝতে পারে না। ওই মেয়েটিও অন্য পাঁচজনের মত বাঁচতে পারতো, মারা যাবার দিনের আগে অবধি সে-ও বলতে পারতো: "স্যার, অথবা মাদাম, আজ সকালে বৃষ্টি হবে", অথবা, "আমরা লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি; টেবিলে আমরা তেরোজন বসবো", বা "ফলটা এখনও পাকে নি।" এরা মৃদু হাসতে হাসতে ঝরে-পড়া ফুলের কথা বলে, এবং অন্ধকারের ভেতর ওরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। স্বর্গের কোনও দেবদূতও দেখতে আসে না—যা তাদের ভালভাবে দেখা উচিত। আর মানুষেরা তো কিছু বুঝতেই পারে না—যখন সব শেষ হয়ে যায় তখনই তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে।......কাল সন্ধ্যায় ঐ মেয়েটাও বোনেদের মত বাতির আলো জেবলে ঐ ঘরে বসে ছিল। এই ব্যাপারটা না ঘটলে আমরা এখানে আসতাম না, ওদের এভাবে দেখবার সুযোগও হোতো না—অথচ এমনভাবে ওদের দেখতে পাওয়াটাও কম কথা নয়। ......মৃত মেয়েটিকেও যেন এই প্রথম নতুন করে জানছি... আমাদের একঘেয়ে সাধারণ জীবনটাকে ঠিকভাবে জানতে গেলে একটা নতুন কিছু ঘটা দরকার। দিবারাত্রি যারা আমাদের পাশে থাকে তাদের আমরা ভালভাবে জানতে চেষ্টা করি না—যখন মৃত্যু এসে তাদের ছিনিয়ে নেয় তখনই বুঝতে পারি কি হারালাম! ওই যে ছোট্ট মেয়েটা চলে গেল—ওর আত্মাটাও ছিল ক্ষুদে এবং বিস্ময়ে ভরা—দীন শিশু, দেহ-মনে সরল এবং পবিত্র, অন্তহীন আত্মা। কি জানি ও কি সব কথা বলতো, কি সব কাজ করতো!

বিদেশী—দেখুন, নিস্তব্ধ ঘরে বসে ওরা মৃদু মৃদু হাসছে......

বৃদ্ধ—ওদের মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই—ওই মেয়েটির তো আজ সন্ধ্যায় ফিরে আসবার কথা নয়।

বিদেশী—ওরা চুপচাপ বসে আছে—হাসছে। ঐ দেখুন, ওদের বাবা মুখে আঙুল রেখে কি ইঙ্গিত করছেন...

বৃদ্ধ—মায়ের বক্ষলগ্ন ঘুমন্ত শিশুর দিকেই উনি দেখাচ্ছেন......

বিদেশী—পাছে শিশুটির ঘুম ভেঙে যায় এই ভয়ে মা মাথা তুলতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছেন না।

বৃদ্ধ—মেয়ে দুটি কিন্তু সেলাইয়ের কাজ বন্ধ করেছে। একটা তুহিনশীতল মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছে......

বিদেশী—ওদের সাদা সিল্কের গুটিগুলো পর্যন্ত মাটিতে পড়ে গেছে......

বৃদ্ধ—সবাই শিশুটিকে দেখছে......

বিদেশী—ওরা জানে না যে আমরা ওদের দিকে চেয়ে আছি......

বৃদ্ধ—আমাদের দেখছে......

বিদেশী—ওরা চোখ তুলেছে......

বৃদ্ধ—অথচ ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না......

বিদেশী—ওদের দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরা বেশ সুখী, তবুও যেন কিসের একটা অভাব রয়েছে—কিসের অভাব তা অবশ্য আমি বলতে পারবো না......

বৃদ্ধ—ওরা মনে করে বিপদ ওদের ধারে-কাছে আসবে না। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, জানলাগুলোও অর্গলাবদ্ধ। পুরনো বাড়িটার দেওয়ালগুলোকে ওরা আরও পাকাপোক্ত করে নিয়েছে—ওকের তৈরি বড় তিনটে দরজাতেও খিল লাগিয়ে দিয়েছে। আগে থেকে যা দেখা যায় তা সবই ওরা দেখে নিয়েছে......

বিদেশী—আগেই হোক, পরেই হোক খবরটা ওদের বলতে হবে। কেউ বলে হয়তো আচমকা ঘটনাটা ওদের জানিয়ে দিতে পারে। আমরা যে মাঠে মেয়েটির মৃতদেহটা রেখে এসেছিলাম সেখানে কৃষকের দল ভিড় জমিয়েছিল—তাদের ভেতর কেউ এসে যদি ওদের দরজায় নক্ করে......

বৃদ্ধ—মার্থা ও ম্যারী ছোট্ট শবদেহটির পাহারায় আছে। কৃষকেরা গাছের ডালপালা দিয়ে একটি শববাহী যান তৈরি করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আমি আমার বড় নাতনীকে বলে এসেছি তাড়াতাড়ি করতে এবং যে মুহূর্তে ওরা শব নিয়ে রওনা হবে, আমাদের এসে জানাতে। নাতনী আসা অবধি অপেক্ষা করা যাক—ও আমার সঙ্গে যাবে......এভাবে এখান থেকে ওদের না দেখতে পেলেই ভাল হত। ভেবেছিলাম আমাদের অন্য কিছু করবার থাকবে না, শুধু এসে দরজায় নক্ করলেই চলবে—সহজভাবে আমরা গিয়ে ঢুকবো এবং অল্প কথায় ঘটনাটা বলবো...কিন্তু কতক্ষণ ধরে যে ওদের দেখছি, ল্যাম্প-লাইটের আলোতে ওদের জীবন-যাত্রার ছবি......

[ ক্রমশ ]

# রঙ্গজগৎ

## ১৯৬৯ সালের ছবি

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের বিশেষ উল্লেখ থাকবে। সারা দেশের যেমন ক্ষমতার রদবদল হয়েছে, তার প্রতিফলন চলচ্চিত্র শিল্পে পড়েছে। তবে তা শিল্পগত—ছবিতে নয়। ১৯৬৯ সালে ২৭টি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। ১৯৬৮ সালে করেছিল ১৮টি। এ বছর সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' রাষ্ট্রপতি পুরস্কার স্বর্ণপদক লাভ করেছে। শিশু চলচ্চিত্রে শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী পরিচালিত 'হীরের প্রজাপতি' শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ-পদক লাভ করেছে। এই দুটি বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের সঙ্গে ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম'-এর বিশেষ সম্মান লাভ উল্লেখযোগ্য। ছবিটি পুরো বাংলা না হলেও—বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯৬৯ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যা সমাধানে চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি গঠন, সেন্সার তালিখ অনুযায়ী চলচ্চিত্র মুক্তির ব্যবস্থা, চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সরকারী কমিটিগুলিতে গণসংস্থা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রহণ ইত্যাদি। সরকারী তথ্যচিত্র ও প্রচার চিত্রগুলির বিষয়, বক্তব্য ও আঙ্গিককে পরিবর্তন। যার ফলে 'ভাসা' 'বড়শূল' ইত্যাদির মত ছবি দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন। এসব বিষয়ে গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৬৯ সালে ব্যবসায়িক দিক থেকে সর্বাধিক সাফল্যের দাবি করতে পারে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। এই ছবিটি 'একটানা একশ' সপ্তাহ চলেছে এবং এখনো দর্শকদের আগ্রহ রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে : সাবরমতী, চিরদিনের, বিবাহবিভ্রাট, দুরন্ত চড়াই, নতুন পাতা, তিন ভুবনের পারে, দাদু, তের নদীর পারে, শেষ থেকে শুরু, পিতাপুত্র, গুপী গাইন বাঘা বাইন, শুকসারী, পরিণীতা, চেনা অচেনা, আঁধার সূর্য তীরভূমি, বনজ্যোৎস্না, পান্না-হীরে-চুনী, কমললতা, মন নিয়ে, অশ্নিযুগের কাহিনী, মা ও মেয়ে, মায়া, অপরিচিত, প্রতিদান, আরোগ্যনিকেতন, বালক গদাধর। অরণ্যের দিনরাত্রি হাউসে এসেও বিভ্রান্ততার জন্য প্রদর্শিত হতে পারে নি, তবে মফস্বলের কোন কোন সিনেমায় প্রদর্শিত হয়েছে। কাজেই এই ছবিকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে ধরা যেতে পারে না; তবু একথা সত্যি যে, মফস্বলের দর্শকরা ছবিটি দেখেছেন।

'বালক গদাধর' ভক্তিমূলক, 'গুপী গাইন...' ফ্যান্টাসী, 'অগ্নিযুগের কাহিনী' দেশাত্মবোধক; এ ছাড়া আর সব ছবি সামাজিক বিষয়-নির্ভর। বারীন সাহার 'তের নদীর পারে' ছবির মধ্যে নতুনত্ব দেখা গেছে। যেমন আঙ্গিকের দিক থেকে তেমন বিষয়বস্তুর দিক থেকে। ব্যবসায়ের দিক থেকে সফল না হলেও এই ছবিতে পরিচালকের নতুন চিন্তা ও সাহসের প্রকাশ রয়েছে। দীনেন গুপ্তের 'নতুন পাতা' ছবিটিও মিষ্টি মেজাজের জন্য ভাল লেগেছে এবং এ ছবিতে রুচিবোধের পরিচয় আছে। 'তিন ভুবনের পারে' এবং আরো কয়েকটি ছবিতে পাড়ায় পাড়ায় রকবাজ ছেলেদের সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য এই রকবাজ ছেলের দল সৃষ্টির জন্য দায়ী। উপযুক্ত ব্যবস্থায় এরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর লেখক এবং পরিচালকরা কেবল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে যান নি। ফলে ছবিগুলিতে মনোরঞ্জক ভূমিকা যত বেশি, শিক্ষামূলক ভূমিকা সে তুলনায় নিতান্ত কম।

এই ছবি ক'টিতে তবু যাহোক বর্তমান সমাজ জীবনের একটা ছায়া পড়েছে। অন্যান্য ছবিগুলি সমাজ ও দেশ বিচ্ছিন্ন—আকাশচারী। গত ক' বছরে দেশের উপরে কত ঘটনা ঘটে গেল, কত পরিবর্তন হল, কিছু কিছু গঠনমূলক কাজও হয়েছে কিন্তু কোন ছবিতে তার চিহ্নমাত্র নেই। তাই ছবিগুলি দেখবার সময় বুঝা যায় না বাংলাদেশের কোন্ কালের ঘটনা, কোন্ যুগের মানুষ নায়ক-নায়িকারা। কলকাতার রাজপথে উপস্থিত হলে একজন সাধারণ মানুষের যে অভিজ্ঞতা হয়—কোন ছবিতে তার প্রতিফলন নেই। একমাত্র 'তিন ভুবনের পারে' ছবিতে দেখেছিলাম সামান্য বাস্তব পরিচয়। গত ক' বছরে শ্রমিকের জীবনে, কৃষকদের জীবনেও বিরাট আলোড়ন এসেছে। বড় বড় আন্দোলন হয়েছে। অধিকার বোধ জন্মেছে—কিন্তু ছবিতে তার প্রতিফলন দেখা যায় নি। এমন কি আমরা রাস্তায় বার হলে যখন দেখি রাজপথের দু'পাশের দেওয়াল ভর্তি স্লোগান ও পোস্টার; চলচ্চিত্রে কলকাতার দৃশ্যে রাজপথ অন্যরকম। সেখানে বাস্তব জীবনের কোন প্রকাশ নেই। গত বছরেও চিত্রনাট্যের কাহিনী সেই মান্ধাতার আমলের বড় লোকের ছেলেমেয়েদের প্রেম, কোন বড়লোক গুন্ডার মনে প্রেমের উদয়, অথবা এক মেয়েকে নিয়ে ত্রিকোণ প্রেম-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। এরা সকলেই উচ্চমধ্যবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। অথচ অগণিত মানুষ হচ্ছে মেহনতি মানুষ—। তারা সমাজের নায়ক; গতি পরিবর্তন করে দিচ্ছে ওরা। কিন্তু কাহিনীকারদের কাছে তারা এখনো নায়কের স্বীকৃতি পাচ্ছে না। চিত্রনাট্যে গ্রামাঞ্চলও একেবারে উপেক্ষিত: তাই গত বছরের ছবিতেও স্টুডিওতে সাজানো গ্রামের দৃশ্য দর্শকদের দেখতে হয়েছে।

পরিচালকদের ভেতর নতুনদের মধ্যে কিছুটা কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। পুরাতনদের কয়েকজনের ছবি দেখে মনে হয়েছে ওদের সসম্মানে এখন অবসর গ্রহণ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবি কলাকৌশলগত, বিশেষ করে চিত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে।

১৯৭০ সালে আমরা নতুন ছবি, সমাজ জীবন ও সমস্যার বাস্তব ছবি দেখার আশা রাখি; এই ছবি করতে এগিয়ে আসবেন নতুন নতুন পরিচালক ও প্রযোজক।

ওস্তাদ দবীর খান
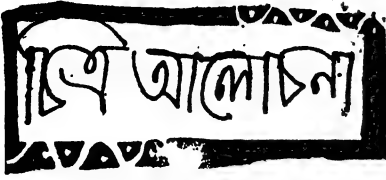
## চলচ্চিত্রে পূর্ব জার্মানী

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম 'ডেফা'। পূর্ব জার্মানীতে চলচ্চিত্র-শিল্প জাতীয় সম্পত্তি। সাম্প্রতিক অতীত ও বর্তমান নিয়ে বিচিত্র চলচ্চিত্র এখানে নির্মিত হয়ে থাকে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা চেষ্টা করছেন দেশের বহুমুখী জীবনের বিকাশকে ছবিতে প্রতিফলিত করতে।

১৯৬৭ সালে নির্মিত হয়েছে যেসব ছবি তার মধ্যে আছে এমন দুটি ছবি, যার মধ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক তৎপরতার প্রতিফলন দেখা গেছে। একটির নাম "মেশিখটেন ইয়েনের নাখট্" (সেই রাতের কাহিনী)। এই ছবিতে চারজন পরিচালক উপস্থিত করেছেন ১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের চারটি ঘটনা, যেদিন পশ্চিম বার্লিনের ... জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমান্তকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। সীমান্ত সুরক্ষিত করার পটভূমি কী, ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। দেখান হয়েছে বহু মানুষের আচরণ ও গতিবিধি যা সেই রাতের ঘটনাবলীর পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক। দেখান হয়েছে একজন শ্রমিককে, ফ্যাসিস্ট বুলেটে ত্রিশ বছর আগে যার প্রাণের বন্ধু নিহত; একজন মেয়েকে, বাপ-মায়ের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীতে চলে যেতে যে রাজী হয় নি। একজন শ্রমিককে, যুদ্ধের পরে রাইফেল হাতে নেবার কথা ভাবলেই যার বিতৃষ্ণা আসত কিন্তু সীমান্ত রক্ষা করতে ও পুরনো একজন রাজনৈতিক কর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে যে অনায়াসে আবার রাইফেল তুলে ধরে আর এই রাজনৈতিক কর্মীটির চেষ্টায় বিপথগামী একটি ছেলের সম্বিৎ ফিরে আসে। এই চারটি ঘটনাই দেখানো হয়েছে একান্ত বিশ্বাস-যোগ্যভাবে।

অপরটির নাম 'ব্রোট এন্ড রোজেন' (রুটি ও গোলাম)। যুদ্ধের শেষ থেকে ছবির শুরু। গেওর্গ লেনডাউ এক সময়ে ছিল শ্রমিক, পরে সৈনিক, ছবি শুরু হতে দেখা যাচ্ছে গৃহাভিমুখী যুদ্ধবন্দী জার্মানীর কোন জায়গায় চলন্ত ট্রেন থেকে সে লাফিয়ে পড়ে ও নতুন জীবন শুরু করে। যেখানে সে লাফিয়ে পড়েছিল সেটা বর্তমান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এলাকা। লেনডাউ নিজের স্থান খুঁজে পায়, নতুন রাষ্ট্রে স্থিতি লাভ করে, শেষ পর্যন্ত লাভ করে কর্মের উপলব্ধি, কর্ম থেকে মতাদর্শগত চেতনায়।

কুমারী মঞ্জুষা বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্য ইণ্টালী সংগীত সম্মেলনে কথক নৃত্য প্রদর্শন করে।

দুটি চলচ্চিত্রে সোভিয়েতের সঙ্গে গণতান্ত্রিক জার্মানীর বন্ধুত্বের তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। এই বন্ধুত্ব আজ পূর্ব জার্মানীর জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। একটি ছবির নাম "ডী ফাহনে ফন ক্রিভয় রগ" (ক্রিভয় রগের পতাকা)। ছবিটিতে বলা হয়েছে অটো ব্রোসভোসকি ও তার পরিবারের কাহিনী। দেখানো হয়েছে তামা-খনির মালিকদের সঙ্গে মানস্ ফেল্ড খনি শ্রমিকদের বিরোধ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি। অপরটি "ইখভার নয়েনৎসেন" (আমি ছিলাম উনিশ)। ছবিটিতে দেখান হয়েছে একজন তরুণ জার্মানকে, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের শেষ দিনগুলিতে যে দেশে ফিরে আসছে। এ এক বিশেষ ধরনের ফিরে আসা, কেন না গ্রেগর হেকের-এর পরনে রয়েছে সোভিয়েত লেফটেন্যান্টের পোশাক। সে লালফৌজের সদস্য। যাদের সঙ্গে

বেদুইন-এর 'ঝিঁঝি পোকার কান্না' নাটকে সুনীল সাহা (আগরওয়ালা) ও মানসী সোম (সরমা)।

গুরু বাগচী পরিচালিত স্যাডো মুভিজের 'সমান্তরাল' ছবিতে অনিল চ্যাটার্জী ও মাধবী মুখার্জী।

তাদের জীবনদান তা সফল হবেই।
জার্মান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যারা প্রতিনিধি, সমর্থক ও দালাল তাদের বিপজ্জনক প্রকৃতি চলচ্চিত্রে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এই সমস্ত ছবি ছাড়াও ডেফা স্টুডিওতে মুখ্যত সমকালীন বিষয় নিয়ে তোলা হয়েছে আরো কয়েকটি ছবি। বিষয়গুলি উপস্থিত করা হয়েছে প্রধানত হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়ে। যেমন "ভির লাসেন উন্স শাইডেন" (আমরা বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চলেছি)। বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত এই বিবাহ-বিচ্ছেদটি আর ঘটে নি। যেমন "লেবেন্স্ৎসু সোয়াইট" (জোড়বাঁধা জীবন)। এ ব্যাপারটি অবশ্য ঘটেছিল। যেমন "মাইনে ফ্রয়েনডিন সিবিলে" (আমার মেয়ে বন্ধু সিবিল)। শেষ পর্যন্ত সিবিল আর শুধু মেয়ে বন্ধু থাকে নি। এই ছবিগুলি বিভিন্ন অংশের মানুষের জীবন ও চিন্তাধারার ওপর আলোকপাত করেছে, যদিও খানিকটা মজা করার ঢঙে। আরো দুটি ছবির নাম "হোখ্ৎসাইট নাখ্ট ইম রেগেন" (বৃষ্টির রাতে বিয়ে) ও "হাইসের জোমের" (উত্তপ্ত গ্রীষ্ম)। এ দুটি ছবিতে ঘটেছে নাচ, গান ও বর্ণাঢ্য দৃশ্য সমাবেশ।

ডেফা স্টুডিওতে অন্য আরেক ধরনের ছবি তোলা হয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। "ডের রিভলভার ডেস কর্পোরালস" (কর্পোরালের রিভল-

তার দেখাসাক্ষাৎ হয় তারা কেউ তাকে আপনজন ভাবে না। মুক্তিপ্রাপ্ত কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসে সে, যাদের জগৎ তার জগতের খুব কাছাকাছি। সংস্পর্শে আসে খুনীদের, নিপীড়িতদের। আর ক্রমেই বেশি বেশি করে উপলব্ধি করে তার পুরনো কিন্তু এখনো পর্যন্ত নতুন স্বদেশে নতুন জীবন শুরু করাটা কতখানি দুরূহ। ছবিতে মর্মস্পর্শীভাবে দেখান হয়েছে বর্তমান জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন কিভাবে হয়েছে।

জার্মানীতে দুই মৌল সামাজিক শক্তির সংগ্রাম দেখান হয়েছে "ডী টোটেন ব্লাইবেন য়ুঙ্ক" (মৃতরা থাকে তরুণ) ছবিতে। আনা জেগার্সের একই নামের বহু প্রশংসিত উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি। কাহিনীর সময়কাল ১৯১৮ সালে জার্মান নভেম্বর বিপ্লব থেকে ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবাদের ধ্বংস পর্যন্ত। লাল নাবিক এরভিন, তার ছেলে হানস্, হানস্-এর প্রণয়িনী মারীর জীবন অনুসরণ করে কাহিনীটি রূপায়িত। তাদের জীবনের পরিণতি নিশ্চিতভাবেই এই বক্তব্য তুলে ধরেছে যে, যে-আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্য

ডেফার 'জোড়বাঁধা জীবন' ছবিতে একটি দৃশ্যে আলব্রেক্ত ম্যুলার ও মারিতা বোয়েমে

ভার) চলচ্চিত্রটি তোলা হয়েছে প্রধানত দশ থেকে চোদ্দ বছরের দর্শকদের জন্য। এতে দেখান হয়েছে বাতিস্তার বেতনভুক সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিউবার বীরদের সংগ্রাম। রেড ইন্ডিয়ানদের ওপরে তোলা ডেফার চলচ্চিত্রও এই পর্যায়ে পড়ে। ডেফার চলচ্চিত্র কর্মীরা সজাগ থাকেন যাতে এসব ছবির মাধ্যমে রেড ইন্ডিয়ানদের পক্ষে দাঁড়ান যায়, এবং নির্যাতিত জাতির পক্ষে কথা বলা যায়। এ জাতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে পড়ে "ডী স্পুর ডের ফ্যালকেন" (ফ্যালকেনের যাত্রাপথ) ও চিনগাখগুক-ডী গ্রোসে শ্লাঙ্গে (প্রকাণ্ড সাপটি) ইত্যাদি। শেষোক্ত ছবিটি জেমস ফেনিমোর কুপারের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি।

ডেফা স্টুডিওতে আরো কয়েকটি চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে শিশুদের ও যুবাদের জন্য। যেমন "ডের টাপফেরে শ্লুলশ্ভেনৎসের" (স্কুল পালানো ক্ষুদে বীর) "ডী নাখট ইন গ্রেনৎসভাল্ড" (সীমান্তের জংগলে রাত্রি) ও "টুরলিস আবেনটয়ের" (তুরলির অ্যাডভেঞ্চার)।

১৯৬৮ সালে তোলা হয়েছে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৭০ মিঃ মিঃ ডেফা রঙীন চলচ্চিত্র "হাউপটমান ফ্লোরিয়ান ফন ডের অয়েলে" (মিলের ক্যাপটেন ফ্লোরিয়ান)। এই চলচ্চিত্রটি সিনেমাস্কোপে দেখান চলে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হচ্ছে তৃতীয় দেশ যেখানে ৭০ মিলিমিটারের চলচ্চিত্র নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রপাতির আয়োজন আছে।

## আগ্নেয়গিরি

উত্তর দরবারী আয়োজিত ও মঞ্চস্থ 'আগ্নেয়গিরি'—স্টেইনবেকের একটি লেখাকে অবলম্বন করে নাট্যে রূপায়িত। নাটকটি মঞ্চস্থ হল সম্প্রতি বিশ্বরূপায়। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায়। স্টেইনবেক এখন সাম্রাজ্যবাদ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আগেকার লেখায় বোঝা যায়, তিনি নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের পক্ষে ছিলেন। আগ্নেয়গিরির কাহিনী এই যে, জার্মানরা একটা দেশ অধিকার করল। স্বাধীনতা হারাল সে-দেশের মানুষ। চলল জার্মান সৈন্যদের অত্যাচার। অধিকৃত দেশের মেয়রকে তারা মেয়র পদে রেখে নিজেরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হল। অথচ প্রচার করা হল যে, সবই মেয়রের আদেশে হচ্ছে। জার্মান শাসকদের হুকুমে সাধারণ নাগরিক ও খনির শ্রমিকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। লোকে মেয়রকে জার্মানবাহিনীর মনে করল।

জার্মান সৈন্যদের মধ্যেও এমন একজন আছে যুদ্ধ যার ভালো লাগে না, বিদ্রোহীদের হাতে তার মৃত্যু বাঞ্ছিত হলেও তা গভীর সহানুভূতির সৃষ্টি করে। ক্ষুধার জ্বালায় শ্রমিকের সদ্য

বিধবা ও অন্তঃসত্ত্বা নারীর জীবনযন্ত্রণা মর্মন্তুদ হলেও পরিণতিতে যে বিদ্রোহের ঝড় তার মধ্যে দেখানো হয়েছে তা যেমন নাটকীয়, তেমনি অত্যন্ত মানবিক।

অভিনয়ে দলগত নৈপুণ্যই স্বীকার্য। একথা বলা উচিত যে, পেশাদার নট-নটীদের চেয়ে এঁদের নৈপুণ্য কোন অংশে কম নয়। কারো কারো বাচনভঙ্গীতে কখনো কখনো অহেতুক দ্রুততা বা মন্থরগতি পরিহার্য। উচ্চারণে বিদেশীয়ানাও দু'-একবার শ্রুতিকটু লেগেছে। তবে এ সব ত্রুটি অনায়াসে শোধনযোগ্য। মঞ্চ নির্দেশনার কাজ সুপরিকল্পিত। দেশমুক্তির সংগ্রাম যে কী ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারবেন।

## সান্ধ্য আসরের নাট্যানুষ্ঠান

গত ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা 'সান্ধ্য আসরের" সভ্যবৃন্দ স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে শৈলেশ গুহনিয়োগীর "ক্লান্ত রূপকার" নাটকটি অভিনয় করেন। এই সংস্থার শিল্পীরা দলগত অভিনয়-দক্ষতার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পান। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন জ্যোৎস্নাময় বাসু (রণজিৎ), দত্তা মুখার্জী (সাধনা), অলোকা গাঙ্গুলী (নন্দিতা), শিবানী ভট্টাচার্য (মীরা)। আলোকসম্পাত নাটকোপযোগী। মঞ্চসজ্জা সুন্দর।

## ঝিঁঝিপোকার কান্না

গত ২১শে ডিসেম্বর 'বেদুইন' শিল্পিবৃন্দ অনিন্দ্য-এর ঝিঁঝিপোকার কান্না নাটকটি নির্মল ভৌমিকের পরিচালনায় বিনানী হলে অভিনয় করে। একটি মানসিক চিকিৎসাগারকে কেন্দ্র করে সমাজ ব্যবস্থার প্রধান দোষকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে এই নাটকে। অভিনয় করেছেন সর্বশ্রী অজিত ভট্টাচার্য, নির্মল ভৌমিক, নকুল দাস, মরালেশ সেনগুপ্ত, বরুণ দাস, শান্তি মল্লিক, মানসী সোম, সুস্মিতা সেন, সুনীল সাহা, দিলীপ দত্ত, দীনেশ চন্দ্র প্রমুখ।

### রাজকুমারী

লোকনাথ চিত্রমন্দিরের নতুন ছবি 'রাজকুমারী'র চিত্র গ্রহণের কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে শুরু

হয়েছে। গত মাসে বোম্বাইতে এই ছবির সঙ্গীত গ্রহণ করা হয়েছিল। সলিল সেন ছবির কাহিনী রচনা করেছেন এবং পরিচালনা করছেন। ছবির প্রধান দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও তনুজা। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন ছায়া দেবী, দীপ্তি রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, তরুণকুমার, ভানু ব্যানার্জী, জহর রায় প্রমুখ। ছবিতে সাতটি গান থাকবে। গানগুলির সুর দিয়েছেন রাহুল দেববর্মণ। গানগুলি গেয়েছেন কিশোরকুমার, লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

### মাল্যদান

পরিচালক অজয় কর 'মাল্যদান' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ করছেন। চিত্রলিপি ফিল্মস্-এর নামে অজয় কর ও বিমল দে'র প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান' গল্প অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। বৈদ্যবাটিতে গঙ্গার পাড়ে একটি পুরাতন বাড়িতে ছবিটির চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশ যে, এই বাড়িতে একসময় রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন ছিলেন। বৈদ্যবাটির পরে সিউড়ীতে আর এক দফে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া যথাক্রমে যতীন ও কুরাশী এবং সাবিত্রী চ্যাটার্জী পটল-এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ভানু ব্যানার্জী, শৈলেন মুখার্জী, গীতা দে। হেমন্ত মুখার্জী সংগীত পরিচালনায় আছেন।

অজয় কর পরিচালিত 'মাল্যদান' ছবিতে নন্দিনী মালিয়া

## ওস্তাদ দবীর খানের সম্বর্ধনা

গত ৩১শে ডিসেম্বর একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টস্ ভবনে প্রখ্যাত বীণকার ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খান সাহেবকে সম্বর্ধনা জানান তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা।

এই অনুষ্ঠানে প্রথমে ওস্তাদ দবীর খান ও সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরবাহার ও বীণায় দ্বৈত যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন ইমন রাগে।

পরবর্তী শিল্পী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে ভূপালী রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরী গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

সর্বশেষ শিল্পী শ্রীমণিলাল নাগ সেতারে কৌশিক কানাড়া পরিবেশন করেন।

সঙ্গতে ছিলেন শ্রীঅমলেশ চ্যাটার্জী, শ্রীচন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী প্রমুখ।

## রবীন্দ্রসদনে লোকনৃত্যোৎসবের আয়োজন

বাংলার লোকনৃত্যশিল্পের ব্যাপক প্রসার ও মানোন্নয়নের প্রয়াসে রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আগামী ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী '৭০ প্রত্যহ দু'টি করে এই অনুষ্ঠান পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। উৎসবে পুরুলিয়ার মুখোশ নৃত্য ছৌ এবং দার্জিলিং জেলার নেপালী, লেপচা, লামা, তিব্বতী প্রভৃতি নৃত্য প্রদর্শিত হবে। এই উৎসবের ব্যাপারে প্রকৃত লোকশিল্পী আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, উপজাতি কল্যাণ পরিষদ এবং পঞ্চায়েৎ মন্ত্রণালয় বিশেষভাবে সহযোগিতা করছেন। এই ধরনের নৃত্যোৎসব শহর কলকাতায় অভিনব এবং চিত্তাকর্ষক হবে বলে আশা করা যায়।

## 'লেনিনের আহ্বান' নৃত্যনাট্য

'লেনিন-শতবর্ষ' উপলক্ষে বাংলাদেশেই প্রথম লেনিন বা অক্টোবর বিপ্লবকে কেন্দ্র করে মঞ্চে নাটক, যাত্রা, নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্প্রতি সংগঠনী মঞ্চে সংগীতা গোষ্ঠী তাদের নৃত্যনাট্য "লেনিনের আহ্বান" কৃতিত্বের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে।

রুশদেশে ১৯১৭ সালে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তার নেতা মহান লেনিনের ডাকে বলশেভিক পার্টি ও রুশ্ দেশের শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এই নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু। গ্রন্থকার ও নির্দেশক শ্রীঅহীন্দ্র ভৌমিক সমবেত নৃত্য, গীত, মূকাভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

নৃত্যনাট্যটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন—সর্বাণী ভট্টাচার্য, বীথি, কল্পনা, মাধবী, দিলীপ ঘোষ, বিদ্যুৎ দত্ত, ধীরেন বিশ্বাস, মাণিক রায়, সুবোধ চক্রবর্তী প্রমুখ। সংগীতাংশে ছিলেন কবীন্দ্র চ্যাটার্জী, বাবুল বসু, সমর চক্রবর্তী, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য ও রবি বিশ্বাস। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শ্রীদিলীপ ঘোষ।

# জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার পরে

সন্তোষকুমার শীল

সম্প্রতি সমাপ্ত বিংশতিতম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় সেনাদল ৮৪-৫৬ পয়েণ্টে রাজস্থানকে পরাজিত করে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মহিলা ও কিশোর বিভাগের খেলাটি হয় মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের মধ্যে। উভয় বিভাগেই মহারাষ্ট্র মহীশূরকে পরাজিত করে এবারেও গতবারের মত জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এবারের জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গের বাস্কেট এসোসিয়েশনের মাঠে। এই নিয়ে তিনবার এই অনুষ্ঠান কলকাতায় হলো। এবারের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে মোট ১৬টি দল, মহিলা বিভাগে মোট ১২টি দল এবং কিশোর বিভাগে মোট ১৪টি দল অংশ গ্রহণ করে। গুজরাট প্রতিযোগিতায় নাম দিলেও কোন দলকে খেলতে পাঠায় নি। খেলাগুলি লীগ ও নক আউট প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়।

## পুরুষ বিভাগ

পুরুষ বিভাগের ফাইন্যালে উঠেছিল সেনাদল ও রাজস্থান। উল্লেখযোগ্য, এবারেই রাজস্থান দল সর্বপ্রথম ফাইন্যালে খেলে রানার্স আপ হয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৫০ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় রাজস্থান দল প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিল। তখন এই দলের নাম ছিল রাজপুতানা। নামকরা খেলোয়াড়দের কথা তুললে রাজস্থানে চারজন সর্বভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন, অপরপক্ষে সেনাদলে ছিলেন মাত্র একজন। এদিক থেকে চিন্তা করলে রাজস্থানেরই শীর্ষস্থান লাভ করার কথা, কিন্তু দলীয় সংহতি, উন্নত ক্রীড়াশৈলী ও অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে খেলে সেনাদল তাদেরকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। এই নিয়ে সেনাদল মোট ১২ বার এই সম্মানের অধিকারী হলো, তন্মধ্যে ১১ বার একটানা। গতবার তারা ফাইন্যালে রেলওয়ের কাছে হেরে যায়, কিন্তু এবারে জিতে তারা তাদের জাতীয় বিজয়ীর সম্মান পুনরুদ্ধার করে।

পুরুষ বিভাগের এই খেলায় সেনাদল বিশেষ আকর্ষণীয় ও উন্নত মানের খেলা দেখায়। এদের বাস্কেটিং যেমন ছিল নিখুঁত, তেমনি ছিল [illegible] অফুরন্ত দম। তবে একক খেলোয়াড় হিসেবে ওমপ্রকাশের কৃতিত্ব সর্বাধিক। এই ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা খেলোয়াড়টি নিজেকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে দাবি করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পয়েণ্ট-সংখ্যা ২৪ এবং পরে চারটি ফাউল করে তিনি বিশ্রাম নেন। এ ছাড়া হরি দত্ত এবং এম· এম· সিং-এর কৃতিত্বও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরি দত্তের অভ্রান্ত লক্ষ্য এবং এম· এম· সিং-এর তৎপরতার সঙ্গে সঠিক বল যোগানোই সেনাদলকে জয়ী করে তোলে।

অপরপক্ষে, রাজস্থানের খেলা ছিল অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। তাদের মধ্যে একা খুসীরাম সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। তিনিই রাজস্থানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়। তবে তাঁর একার পক্ষে সেনাদলের তিনজনকে সামলানো সম্ভব ছিল না। এমনটি আশাও করা যায় না। তবুও তিনি যে উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে তাঁকে আলোচ্য জাতীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতার 'শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়' হিসেবে অভিহিত করা যায়।

সেনাদলের পক্ষে ওমপ্রকাশ (২৪), হরি দত্ত (১৭), নাথু সিং (১৮), এম আমেদ (১২), এম এম সিং (২) এবং রাজস্থানের পক্ষে খুসীরাম (২৮), বিষ্ণু শর্মা (১৪), এস কাটারিয়া (১৪), রঘুরাজ (৫), এম ভি সিং (৪) ও টি নাইডু (১) পয়েন্ট করেন।

এই বিভাগে পাঞ্জাব দল তৃতীয় ও রেলওয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

### মহিলা বিভাগ

মহিলা বিভাগের ফাইন্যাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় মহারাষ্ট্র এবং মহীশূরের মধ্যে। মহারাষ্ট্র মহীশূরকে ৪৭-৩৪ পয়েন্টে পরাজিত করে পর পর চারবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। তবে সামগ্রিকভাবে এই ফাইন্যাল খেলাটি তেমনি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। কোন পক্ষই দলগতভাবে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে মহারাষ্ট্রের ধুরধনা নায়ার এবং মহীশূরের এ সি পুষ্পার খেলা ছিল কিছুটা উন্নতমানের। তাঁরা দুজনে ছিলেন এই খেলার প্রাণস্বরূপ। অবশ্য উপরন্তু দুজনই ছিলেন দু' দলের অধিনায়ক। দুজন দুজনকে চোখে চোখে রেখেছেন, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ করেছেন। ফলে খেলাটি কখনও কখনও দৃষ্টিসুখকর এবং তীব্র উত্তেজনামূলক হয়ে উঠে। এককভাবে মহারাষ্ট্রের ধুরধনা নায়ার ১৯ পয়েন্ট লাভ করেন এবং পাঁচটি ফাউল করে কোর্ট ত্যাগ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যই মহারাষ্ট্রের জয়কে সুনিশ্চিত করে।

মহারাষ্ট্রের ধুরধনা নায়ার (১৯), এম গাভাসকার (১২), চন্দ্র খোরা (৬), সি প্রাইস (৪), জে পাই (৪) ও এম কাটরাক (২) এবং মহীশূরের পুষ্পা (১৩), গিরিজা (৮), মোহিনী (৬), ফিলিপ (৫) ও পুনাপ্পা (২)।

এই বিভাগে বাংলা দল তৃতীয় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়। অপরদিকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে হরিয়ানা।

### কিশোর বিভাগ

এই বিভাগেও মহারাষ্ট্র দল ফাইন্যালে মহীশূরকে ৯৪—৬৯ পয়েন্টে হারিয়ে জাতীয় বাস্কেটবলে পঞ্চমবার বিজয়ীর আখ্যা লাভ করে। তবে এই খেলাটি মোটেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি, কেন না খেলার শুরু থেকেই মহারাষ্ট্র দল মহীশূরকে কোণঠাসা করে রাখে। বলতে গেলে মহীশূর দল মহারাষ্ট্রের কাছে দাঁড়াতেই পারে নি। মহারাষ্ট্রের কিশোর ক্যাপ্টেন টমাস ফার্নাণ্ডেজের কৃতিত্ব সর্বাধিক। তাঁর সুন্দর সঠিক নেতৃত্বই মহীশূরের এই বিপর্যয়ের মূলে কারণ বলা যেতে পারে। টমাস ফার্নাণ্ডেজ আগামী দিনে ভারতীয় বাস্কেটবলের একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা বলা যায়।

মহারাষ্ট্রের পক্ষে টমাস ফার্নাণ্ডেজ (৩০), রসিদ খাঁ (৩০), সরিয়াতুল্লা (১২), মকমুদ মিয়াজী (৮), রজক কাজী (৮), ভি নিয়াজ (৮), এস সোনী (৪) ও সুব্রহ্মণ্যম (২) এবং মহীশূরের পক্ষে কে ভি রাবণ (১৮), রাজেন্দ্র (১৪), মুরলী (১৪), জি নাগরাজ (৮), জি রাজ (৫), প্রভাকর (৪), বিজয় কুমার (৪) এবং অনিল কুমার (২) পয়েন্ট লাভ করেন।

এই বিভাগেও বাংলা দল তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অপরপক্ষে কেরালা দল লাভ করে চতুর্থ স্থান।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বিংশতিতম বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। কোনরকম মতবিরোধ দেখা দেয় নি। অবশ্য বাস্কেটবল আইনের দশম ধারা অনুযায়ী বাংলা ও মহীশূরের (মহিলা) মধ্যে সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া প্রতিযোগিতার শান্ত-সুন্দর পরিবেশটি সর্বদিক থেকেই ছিল বড় মনোরম। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল এসোসিয়েশন সম্পাদক শ্রী জে সি দত্ত সকলের প্রশংসা লাভ করেন।

### কলিঙ্গ পুরস্কার

ওড়িশা দল কোন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে না পারলেও সুশৃঙ্খল দল হিসেবে কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করেছে। আমার মনে হয়, এটাও একটা মস্ত বড় পুরস্কার। কেন না, খেলাধুলোয় যদি নিয়মশৃঙ্খলা বজায় না থাকে, তাহলে খেলাধুলোর মান কোনদিনই বাড়বে না। আমি দেখেছি, বেশির ভাগ দলই নিয়মশৃঙ্খলা মানত না। অধিক রাত্র অবধি তারা ক্যাম্পের বাইরে থাকত। এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের কাছ থেকে একই উত্তর আসতো —"আমার রিলেটিভ এসেছে"। এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়। ক্যাম্পের এই আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও ওড়িশা দল যে সুশৃংখলতার পরিচয় দিয়েছে এবং ফলস্বরূপ কলিঙ্গ পুরস্কার পেয়েছে, তা সত্যই প্রশংসনীয়। এমনিভাবে অন্যান্য দল যদি শৃংখলা মেনে চলতো, তাহলে বাস্কেটবলের মান আরও উন্নত মানের হতো বলে আমার ধারণা।

১৯৭০ সালে জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা উত্তরপ্রদেশের আগ্রা শহরে অনুষ্ঠিত হবে বলে বাস্কেটবল এসোসিয়েশন সম্পাদক শ্রীপালিওয়াল জানিয়েছেন।

### পুরুষ বিভাগ (বিজয়ী)

সেনা দল—১৯৫৭
" —১৯৫৮
" —১৯৫৯
" —১৯৬০
" —১৯৬১
" —১৯৬৩ (মে)
" —১৯৬৩ (ডিঃ)
" —১৯৬৪
" —১৯৬৫
" —১৯৬৬
" —১৯৬৮ (জাঃ)
" —১৯৬৯

### মহিলা (বিজয়ী)

মহারাষ্ট্র—১৯৬৭
" —১৯৬৮ (জাঃ)
" —১৯৬৮ (ডিঃ)
" —১৯৬৯

### কিশোর (বিজয়ী)

মহারাষ্ট্র—১৯৫৯
" —১৯৬১
" —১৯৬৭
" —১৯৬৮
" —১৯৬৯
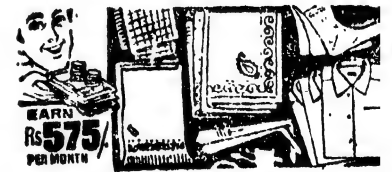
# কম্পোজিট স্টেডিয়াম

শেষ পর্যন্ত হয়তো ইডেন উদ্যানে কম্পোজিট স্টেডিয়ামই তৈরি হতে চলেছে। অর্থাৎ এ কথাটা আর একবার স্পষ্ট হলো যে ক্রীড়ারসিক, ক্রীড়াবিদ এবং খেলা-প্রেমিকদের মতামত সরকার তোয়াক্কা করেন না। মুখে জনগণ জনগণ বলতে দ্বিধা নেই—কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা করেন ঠিক উল্টোটাই। ইডেন উদ্যানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির সিদ্ধান্তটি অন্তত সেই কথাই তো প্রমাণ করছে। আসলে এটা একটা লোক দেখানো করতে হয় করা গোছের, টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি প্রসংগে বাংলাদেশের সেরা ক্রীড়াবিদদের মতামত আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছি। তাঁদের বেশির ভাগই ইডেন উদ্যানে ফুটবল, ক্রিকেট আর হকি খেলা একসংগে চলতে পারে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সেই মতামতের সংগে সকলেই দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি। ফুটবল এবং ক্রিকেট মাঠের মাটির পার্থক্য থেকে আরম্ভ করে অনেক করে অনেক টেকনিকাল অসুবিধার কথা বলেছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের মতামতের ওপর এতোটুকুও গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন-বোধ করছেন না মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিম্বা যুক্তফ্রন্ট সরকার। সত্যি কথা বলতে কি ফাঁকতালে বাহাবা কিনতে চান। এ কথার যৌক্তিকতা হিসেবে একটা কথাই বলা যায় স্টেডিয়ামের তিনটি পরিকল্পনার মধ্যে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসংগে বলা হয়েছে যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে ফুটবল খেলা চলতে পারে। কিন্তু তার পরেই ক্রিকেট খেলার জন্যে মাঠ এবং পিচ তৈরির জন্যে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ টানা-হেঁচড়া করে কোন রকমে লীগের খেলা পর্যন্ত ইডেনকে পাওয়া যেতে পারে। আই এফ এ শীল্ড (খেলার সময় বদলালে অন্য কথা) খেলার সময় ইডেনের স্টেডিয়াম কাজে লাগবে না। তাহলে লাভটা কি হচ্ছে? শুধু তাই নয়—ইডেন উদ্যানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম হবে বলে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। কম্পোজিট স্টেডিয়াম বলতে বোঝাবে এমন একটি স্টেডিয়াম যেখানে সমস্ত খেলাধুলার ব্যবস্থাই থাকবে। শুধু ফুটবল, ক্রিকেট কিম্বা হকি হলেই চলবে না, সেখানে রাখতে হবে এমন ব্যবস্থা যাতে এ্যাথলেটিক, জিমনাস্টিক, ওয়েট লিফটিং, কুস্তি, সাঁতার, সুইমিং পুল থেকে আরম্ভ করে সব ব্যবস্থাই থাকবে। ইডেনের অতোটুকু জায়গায় এতো কিছু কি সম্ভব? আসলে ইডেনে কম্পোজিটের নামে কম্বাইন্ড স্টেডিয়াম গড়ার ইচ্ছে ক্রীড়ামন্ত্রীর। এই প্রসংগে স্টেডিয়াম কমিটি সম্বন্ধে শুধু একটি মন্তব্য করতে চাই। ঐ কমিটিতে রাজনৈতিক দলগুলোর লোকদের ওপর বেশি জোর না দিয়ে এমন দু'একজন ক্রীড়াবিদ কিম্বা ক্রীড়াসাংবাদিককে স্থান দিলে ভালো হতো—যাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গেছেন এবং সেখানকার স্টেডিয়াম দেখেছেন। এই প্রসংগে আমরা শ্রীপংকজ গুপ্ত ও শ্রীবেরী সর্বাধিকারীর নাম উল্লেখ করতে পারি। স্টেডিয়াম কমিটি যিনি করেছেন তাঁর কাছে ওঁরা হয়তো অবাঞ্ছিত। কিন্তু কলকাতায় স্টেডিয়াম তৈরির ব্যাপারে এঁদের পরামর্শের মূল্য অনেক। একথা বোধহয় স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রীও জানেন। তিনি কি এই বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখবেন?— শান্তিপ্রিয়

## ফুটবল-ফুটবল

ক্রিকেটের মরশুম এবার যেন একটু তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে আসছে। টেস্ট ম্যাচের আসর শেষ হবার সংগে সংগে ক্রিকেটের আকর্ষণও শেষ। তবে রণজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রাথমিক খেলাগুলো এখন সবে শেষ হচ্ছে। ওদিকে হকি লীগের খবরও এসে গেছে। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে কলকাতায় বসবে হকি খেলার আসর।

কিন্তু হকি মরশুম শুরু হতে না হতেই ফুটবলের খবর বাজার গরম করে। এবার যেন একটু আগেভাগেই ফুটবল এসে যাচ্ছে সবার সামনে। প্রশ্ন ছিল লীগ ফুটবলের কি গতি হবে? সুপার লীগের অপ্রয়োজনীয় প্রথা কি এবারও বজায় থাকবে? সত্যি কথা বলতে কি লীগ ফুটবলের আকর্ষণ গত বছর সুপার লীগ একেবারে শেষ করে দিয়েছিল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি দলগুলোর কাছে সাধারণ লীগের কোন মূল্যই ছিল না। তাই খেলার আকর্ষণও গিয়েছিল কমে।

তাই এ বছর অনেকেই আশা করেছিলেন যে, ডাবল লীগের খেলা আবার বুঝি চালু হবে। কয়েকটি দলের প্রতিনিধিরা সভায় সে প্রস্তাবও রেখেছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ কিছুই হয়নি। বাংলা-ফুটবলের সবচেয়ে বড় কর্তাব্যক্তিদের সিদ্ধান্তই বহাল থাকলো।

অর্থাৎ আসছে মরশুমেও বসবে দুটি লীগের আসর—সাধারণ লীগ এবং সুপার লীগ। তাছাড়া প্রতি বিভাগে নাকি দলের সংখ্যাও বাড়বে! এইটাই আসল—দল না বাড়ালে কি আর নিজেদের কার্যসিদ্ধি হয়! তবে সাধারণ ফুটবলরসিকদের কাছে একটা সুখবর আছে সেটি হলো—এবারের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্ন নির্ভর করবে সাধারণ লীগ ও সুপার লীগের মিলিত পয়েন্টের ওপর। তাই আশা করা যায় যে, সাধারণ লীগের খেলাগুলোতেও বড় বড় দলগুলো এবার একটু মন দিয়ে খেলবে। আর যাই হোক খেলার আকর্ষণ তাহলে অন্তত কিছুটা বজায় থাকবে।

## সমাচারদর্পণ

ইটালীর ৬২টি সংবাদপত্রের ক্রীড়া সাংবাদিকগণ ১৯৬৯ সালের শ্রেষ্ঠ পেশাদার খেলোয়াড়ের নির্বাচনে টেনিস খেলোয়াড় রড লেভারকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথম স্থান দিয়েছেন। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন ব্রাজিলের ফুটবল খেলোয়াড় পেলে। এ্যামেচার এ্যাথলেট হিসেবে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছেন আমেরিকার বিল টুমে।

"'খেলার রাজা ক্রিকেট' মজার ঘটনার বুঝি বা শেষ নেই। এমনি একটি ঘটনার কথাই বলছি।

১৯৩২ সালে ইংল্যান্ডের সেট্‌লহামে সাসেক্স ও গ্লসেস্টারের মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা চলছিল। ঐ খেলাটিতে একসময় সাসেক্সের এ· মেলভিল ব্যাট করছিলেন। হঠাৎ একটি বলকে তিনি সজোরে হিট করলেন। বলটি গ্লসেস্টারের ফিল্ডার টি· গডার্ডের সামনে দিয়ে তীব্রগতিতে বাউণ্ডারী সীমানার ধারে এগিয়ে চলল। উপায়ান্তর না দেখে গডার্ড তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথার টুপিটি খুলে নিয়ে তা দিয়েই বলটিকে সেখানে থামিয়ে দিলেন। আম্পায়াররা গডার্ডের এই আইনবিরুদ্ধ কাজ দেখে কি শাস্তি দেবেন তৎক্ষণাৎ তা স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে মেলভিলকে তাঁরা পাঁচটি রান দেওয়াই ঠিক করলেন। আর ঠিক তখন থেকেই ক্রিকেটের আইনে কোন ফিল্ডার বিপক্ষের ব্যাটস্‌ম্যানের মারা কোন বল টুপি দিয়ে থামালেই তার শাস্তিস্বরূপ ব্যাটস্‌ম্যানকে 'পাঁচ রান দেওয়ার' আইনটিও চালু হয়ে গেল...।"

—সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
হালিশহর-গোলাবাড়ি
২৪ পরগনা।

১৬৯ সালের প্রেস ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় ক্রীড়া বিভাগে চিত্র সাংবাদিক শ্রীঅশোক মিত্রের তোলা এই ছবিটি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। ১৯৬৮ সালে তোলা ছবির ওপরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রতিযোগিতাটি।

**অলোক রায়চৌধুরী** (মতিগঞ্জ, বনগ্রাম)

**প্রশ্ন :** বিশ্বনাথ, সোলকার, ওয়াদেকার, প্রসান্ন ও বেদীর পুরো নাম জানতে চাই।

**উত্তর :** দু'-তিন সংখ্যা আগেই প্রকাশ করা হয়েছে, দেখেছেন নিশ্চয়ই!

**সুভাষরঞ্জন দত্ত** (নেতাজী বিদ্যাপীঠ, ট্রাংগুলার কলোনী, গোহাটি—১২)

**প্রশ্ন :** নিউজিল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে জয়সীমাকে দলে স্থান দেওয়া হলো না কেন?

**উত্তর :** নতুন খেলোয়াড়দের জন্যে পুরনোদের যে জায়গা ছেড়ে দিতেই হয়।

**অনিলচন্দ্র দাস** (হালিশহর, মান্না-পাড়া, ২৪ পরগনা)

**প্রশ্ন :** ভারতের অধিনায়ক পাতৌদির খেলার মান একেবারে নেমে গেছে। এটা কি অধিনায়ক হবার দরুণ, না অন্য কোন কারণে?

**উত্তর :** পাতৌদির খেলার মান সত্যিই কি একেবারে নেমে গেছে...?

**মনতোষ করগুপ্ত** (নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ বারাসত, ২৪ পরগনা)

**উত্তর :** কলকাতায় এলে দুপুর দুটোর পর তুমি বসুমতী অফিসে আমার সংগে দেখা কোর। তোমার বই-এর ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবো।

**গৌতমকুমার দে** (নিউ কোয়ার্টারস, দমদম বিমানবন্দর)

**উত্তর :** ডন ব্রাডম্যানের 'হাউ টু প্লে ক্রিকেট' বইটিতে ক্রিকেট খেলা শেখার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ছবির সাহায্যে প্রত্যেক মার ও বোলিং করার কায়দা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যা আপনার ভালো লেগেছে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

**জলদ চট্টোপাধ্যায়** (শিলদা, মেদিনী-পুর)

**উত্তর :** তৃতীয় টেস্টে লরী অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস সূচনা করতে এসে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন—বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে এ ঘটনা নতুন নয়—লরীর পূর্বে অনেকেই এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

এর আগে আপনার আর কোন চিঠি পেয়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না!

**সব্যসাচী ভট্টাচার্য** (শঙ্কর বসু রোড, কলকাতা—২৭)

**প্রশ্ন :** অবস্ট্রাক্টিং দি ফিল্ড ও হ্যান্ডল্ড দি বল নিয়ম দুটি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

**উত্তর :** অসুবিধে সৃষ্টি করার জন্যে আউট : ধরা যাক একটা ক্যাচ উঠলো। ফিল্ডসম্যান সেটি ধরতে চেষ্টা করছে সেই সময় যাতে ফিল্ডার ক্যাচটি লুফতে না পারে সেইজন্যে তার সামনে গিয়ে ব্যাটসম্যান যদি তার ক্যাচ লোফায় অসুবিধে সৃষ্টি করে বা এমন কাজ করে যাতে ফিল্ডার ক্যাচটি ফেলে দেয়—তাহলে আবেদন জানালে আম্পায়ার অবস্ট্রাক্টিং দি ফিল্ড নিয়ম অনুসারে সেই ব্যাটসম্যানকে আউট দিতে পারেন। তবে এ ধরনের ঘটনা সাধারণত ক্রিকেট মাঠে ঘটে না।

'হ্যান্ডল্ড দি বল' অর্থাৎ বলে হাত দেবার জন্যে আউট হবে দু'জন ব্যাটসম্যানের যে কেউই যদি খেলা চলার সময় বলে তারা হাত দেয়। কোন ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যান বলে হাত দেবে না। তবে প্রতি-পক্ষ দলের অনুরোধে ব্যাটসম্যান হাত দিয়ে ধরে বল ফেরত পাঠাতে পারে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যা আপনাদের খুশি করতে পেয়েছে জেনে আনন্দিত হলাম।

কালুদা আর নেই। মাত্র ক'দিন আগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া-সাংবাদিক পৃথ্বীশ্বর মিশ্র আমাদের ছেড়ে গেছেন। বয়েস তাঁর হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মৃত্যুর সংগে বয়েসকে আমরা যেন সব সময় ঠিক মানিয়ে নিতে পারি না। তাই মৃত্যু মাত্রেই দুঃখের, মৃত্যু মানেই কষ্টের। তবু এই দুঃখ এবং কষ্টের মাঝে সান্ত্বনা এই যে, কালুদার কীর্তি শুধু মাত্র বাংলা দেশেই নয়, সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার সংগে ক্রীড়ারসিক মাত্রেই পরিচিত। কালুদা কি করেছেন না করেছেন তার ফিরিস্তি দিতে যাওয়া সীমিত সীমার মধ্যে অসম্ভব। কারণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কর্মকর্তা হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব থেকে আরম্ভ করে কলকাতার এরিয়ান ক্লাবের কিম্বা ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনের মাথা হিসেবে কালুদা এমন অনেক কিছুই করে গেছেন যা চিরকাল আমাদের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তাই কালুদা অমর। তাঁর কাজের মধ্যেই তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন আমাদের মধ্যে......।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসদকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৩০শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৮ই মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
Thursday, 22nd January, 1970

# নেতাজীর জন্মদিনে

স্বাধীনতালাভের পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে পরিণতি হয়েছে, তাতে জনসাধারণের মোহভঙ্গ ঘটেছে, সুদীর্ঘ জীবন-মরণ সমস্যায় প্রচণ্ডরকম অভিজ্ঞতা লাভের পর। সাধারণ মানুষ যা আশা করেছিল, তা পায় নি এবং দেশের একশ্রেণীর স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি যা আশা করে নি তার চেয়ে বহুগুণ বেশি পেয়েছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টের সীমা কল্পনাতীতভাবে বেড়েছে।

দেশের এই বর্তমান অবস্থায় একটি জিনিস মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়েছে এবং সে জিনিসটি হচ্ছে দলবাজী। দিন যতোই এগিয়ে চলেছে—দল ততোই বেড়ে চলেছে। প্রায় সব দলই সমস্বরে চীৎকার করে যে, তারাই একমাত্র প্রগতিশীল দল। আর সেই চীৎকারের মধ্যে দল বাঁচাতে গিয়ে জনসাধারণের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির কথা তাঁরা প্রায় ভুলে যান। অবশ্য একেবারেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে রাজনীতি-সচেতন ভারতের নাগরিকরা এখন একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে যে, মূল ক্ষমতা এখন তাদেরই হাতে। তবু একথাও ঠিক যে, তাদের মধ্যেও মতান্তর বর্তমান। সুতরাং বিভিন্ন দল-উপদলের কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। একদা জাতীয় কংগ্রেস দলের জনসাধারণের ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে, কংগ্রেসের সেই প্রভাব এখন জনগণের মধ্যে নেই। জনকল্যাণের কাজে কংগ্রেসের সেই আত্মোৎসর্গ আছে কি না—সে প্রশ্নেই কংগ্রেস এখন দ্বিধাবিভক্ত। দুটি দলই নিজেদের জনকল্যাণকামী বলে মনে করে। তবে দেশের ভাগ্য এখন নির্ভর করছে ক্ষমতাসীন দল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর। অন্যদিকে এও লক্ষণীয় যে, বিরোধী কংগ্রেস দলও নিজের দলবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে তাদের মিতালি কাদের সঙ্গে, আশা করি, জনসাধারণ তা বিবেচনা করে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

দল-উপদলে মুখরিত এই দেশে সত্যিকারের জনকল্যাণ কতটুকু সম্ভব—এই প্রশ্ন আজ অবান্তর নয়। বিভিন্ন দলগুলির মূল লক্ষ্য যদি জনহিত হোত—তাহলে আমরা বুঝি না, কেন তাদের মধ্যে মতগত ঐক্য সম্ভব হয় না।

অবশ্য দল-উপদল বা দলাদলি হঠাৎ গজিয়ে ওঠে নি। তবু সেগুলি বহু শাখা-উপশাখায় বিস্তারিত। ১৯২৩ সালেও কংগ্রেসের মধ্যে পরিবর্তনের পক্ষপাতী ও 'পরিবর্তন-বিরোধীদের' উদ্ভব হয়েছিল। তবু সামগ্রিকভাবে প্রায় সকলেই সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন। শুধু আশ্চর্য হতে হয় আজ এই কথা ভেবে যে, দেশ স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে কোনো কোনো দল পেছনে হটিছে।

জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা যখ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন এটা আশা ছিল যে, দলের ঊর্ধ্বে থেকে নেতৃ বৃন্দ এমন আদর্শ স্থাপন করবেন, জনসাধারণকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ ও অনু প্রেরিত করবে। কিন্তু কোথায় সে আত্মত্যাগ, সংযম ও নিবিড় ভালোবাসা গভীর আবেগ? দলাদলির আবর্তে পড়েও যিনি দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশ মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

তাই আজ জনসাধারণ কামনা ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বের—যিনি কালজয়ী ভালোবাসায় মানুষে হৃদয়ে শ্রদ্ধার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর জন্মদিন পালনের জন্য কোনোরক আহ্বানের প্রয়োজন হয় না। স্বতঃস্ফু প্রাণের টানে তারা নিবেদন করে তাদে প্রণাম।

আমরাও আশা করি, একালের শিশ যুবকদের জন্য নেতাজীর কর্মদীপ্ত জীব কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচারিত হবে। ত আদর্শে অচঞ্চল এই দেশে প্রতিষ্ঠা লা করবে সত্য এবং সুন্দর। সেই কা আমরা সকলেই যেন কায়মনোবা আত্মনিয়োগ করতে পারি—নেতাজী জন্মদিনে আমাদের এই প্রার্থনাই হোক

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

শোকের চিহ্ন কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান, কালো ব্যাজ ধারণ। ওজুকু শোক প্রকাশ করেছেন কালো দাড়ি রেখে। ১৯৬৬ সালে ইবো উপজাতীয়দের গণহত্যার প্রতিবাদে এবং মৃত সগোত্রীয়দের প্রতি শোক জানাবার জন্যে ওজুকু সযত্নে শ্মশ্রু বর্ধন করছিলেন। কিন্তু সংকল্পে অটুট থেকেও তিনি লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলেন না। দাড়ি অবশ্যি ওজুকু বাঁচাতে পেরেছেন, কিন্তু মানরক্ষা করতে পারেন নি। তবে ওই দাড়িই তাঁকে বাঁচিয়েছে। ফেডারেল আক্রমণের মুখে ওজুকু যখন বিয়াফ্রা ছেড়ে পালিয়ে যান তখন দাড়িই ছিল তাঁর পালাবার প্রধান সহায়ক। দাড়ির ট্রেড মার্ক দেখিয়ে নির্দোষ পাদ্রী সেজেই তিনি নিঃশব্দে শান্তভাবে বিয়াফ্রা ত্যাগ করে গিয়েছেন।

শান্তই ছিলেন অবশ্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল চুকুইমেকা ওদুমেগু ওজুকু। অন্তত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলতে গোড়ায় কিছুই ছিল না। বিরাট বড়লোকের ছেলে। নাইজেরিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী লাগোস স্কুলে পড়ছিলেন ওজুকু। মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হলো বিলেতের সেরা স্কুলে—আফ্রিকার ছেলেমেয়েরা যে-স্কুলের ত্রিসীমানায় পৌঁছনোর কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না. প্রথমে সারের সেই সুবিখ্যাত এপসম পাবলিক স্কুলে, পরে অক্সফোর্ডের লিঙ্কন কলেজে। কৃষ্ণকায় আফ্রিকান হওয়া সত্ত্বেও ওজুকু বিলেতে ফূর্তি করেছেন সাদা চামড়ার সাহেবদেরই মতো।

অক্সফোর্ডে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে নাইজেরিয়ার ওজুকুর খ্যাতি ছিল. যদিও পরীক্ষায় সাধারণ মানের ছাত্রের চেয়ে বেশি কিছু ভাল ফল করতে পারেন নি। তাছাড়া বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। বস্তুত বিতর্কে সেদিনকার উৎসাহ অনুশীলনই পরবর্তী জীবনে তাঁকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সহায়তা করেছে।

খেলাধুলার মধ্যে অক্সফোর্ডে থাকাকালীন রাগবিতেই ওজুকু কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন বেশি। এ ছাড়াও মোটর রেস। সরকারের একজন বড় অফিসারের পদ নিয়ে ওজুকু কর্মজীবন সুরু করেন, কিন্তু সেই বিলাসের জীবন চলতে লাগল। তারপরে তিনি দেখলেন একমাত্র সেনাবাহিনীই এমন এক ফেডারেল সংস্থা যা শেষ পর্যন্ত অটুট থাকবে অথচ সংগঠন হিসেবে সবচেয়ে শক্তিশালী, ওজুকু অফিসার শিক্ষার্থী হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন এবং শিগ্‌গিরই লেফটেন্যান্ট কর্ণেল খেতাবে ভূষিত হলেন।

ইবোরা আজ পর্যন্ত, সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে তারা ফেডারেল রাষ্ট্রপ্রধান গোবোনের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, ওজুকু গোড়ায় ফেডারেল রাষ্ট্রদেহ থেকে বিয়াফ্রার অঙ্গচ্ছেদ চান নি; বরং গোবোন-ওজুকু আলোচনা একদিন প্রায় সাফল্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছেছিল। পূর্বাঞ্চলের ইবো উপজাতীয়দের ওপর উত্তরাঞ্চলের নাইজেরীয়দের অত্যাচারের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ইবোরা যেন ছিল নাইজেরিয়ার ইহুদী—কোন উপজাতিই এদের প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতো না। সর্বক্ষেত্রে ইবোদের উন্নতি, তাদের উচ্চতর মান, প্রাধান্য নাইজেরিয়ার বাকি সমস্ত উপজাতির পক্ষে ছিল অসহ্য। তাই ফেডারেল সরকার গঠিত হলেও কিছুদিনের মধ্যেই ইবোরা উপলব্ধি করতে পারলো তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন

ওজুকু

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কয়েকজন সেনা ও অফিসারকে খুন করায় পক্ষে পাঁচজন ইবোর সামরিক অফিসারের কোনো দাবি নেই। কিন্তু সেদিনই সূচনা হলো ইবোর সঙ্গে বাকি নাইজেরিয়ার লড়াই। ওজুকু ২৯ হাজার বর্গমাইল বিয়াফ্রায় স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিলেন, ঘোষণা করা হলো বিয়াফ্রা ফেডারেল সরকারকে মানে না, তার থেকে আলাদা সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, যার প্রধান হলেন ওদুমেগু ওজুকু স্বয়ং।

ফেডারেল সরকারে ওজুকু ছিলেন ইবো-প্রধান পূর্বাঞ্চলের গভর্নর। রাষ্ট্রপ্রধান হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁর কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, গর্বিত সংগ্রামী ইবো উপজাতির রাষ্ট্রনায়কত্ব গ্রহণ করতে হল। এই তিরিশ মাস ইবোদের লাঞ্ছনা, দুর্গতির সীমা ছিল না। কারণ ফেডারেল সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিয়াফ্রার কোনো তুলনাই হয় না। প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে বিয়াফ্রাকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ফেডারেল সরকার বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য পেয়েছে, কিন্তু ওজুকু বিয়াফ্রার জন্যে চারটি আফ্রিকান রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু আদায় করতে পারেন নি। এমন কি বহিঃরাষ্ট্র থেকে খাদ্য আমদানী করতেও তিনি বাধা পেয়েছেন ফেডারেল সরকারের কাছে। ফলে বিয়াফ্রায় নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ, যার শিকার হয়ে প্রতিদিন গড় হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে।

অবশ্য ফেডারেল সরকার বিয়াফ্রার বা ইবোদের এই দুর্দশার জন্যে ওজুকুকেই দায়ী করেছেন। ওজুকু ছিলেন বিয়াফ্রানদের মুক্তির প্রতীক। ফেডারেল প্রচার দপ্তর বলতেন ওজুকু হলেন আফ্রিকার ক্ষমতাপাগল হিটলার। প্রচার দপ্তর ওজুকুর দৈত্যের মত দেখতে চেহারার কত লাখ কপি ফটো তুলেছেন তার হিসেব নেই। সে ছবি নাইজেরীয়দের যুদ্ধের প্রেরণা জোগাতে নয়, রাস্তায় ফেলে তার ওপর দিয়ে সৈন্যদের সবুট পায়ে মাড়িয়ে যেতে!

ওদুমেগু ওজুকু বিদায় নিয়েছেন, তাঁর বিয়াফ্রা গঠনের স্বপ্ন বানচাল হয়ে গিয়েছে যদিও তিনি একবারের জন্যেও বলেন নি যে, যুদ্ধে বিয়াফ্রা জিতবে, তবে অস্তিত্বের লড়াই আমাদের করতেই হবে। ভীরু, কাপুরুষের মত ওজুকু নিজে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন এবং ইবোদের বিপদের মুখে ফেলে গিয়েছেন স্বার্থপরের মত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইবোরা [illegible] কখনো ওজুকুর

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(৩৬)

### প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি (২)

ইংরেজ বাণিজ্য-স্বার্থের সমর্থকদের মূল কথাটা ঐখানে গিয়ে ঠেকেছিল—শিল্পায়ন তো বেশ, কিন্তু মোটে বেশ নয় যদি সমাজতান্ত্রিক ধারায় হয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলির সকল লেখায় ঐ আশংকা ও আর্তনাদ ফুটে উঠেছিল। বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থের সমর্থক 'কমার্স' পত্রিকার পক্ষে তাই মারাত্মক কথা হল—কংগ্রেসী সরকারগুলি মূল শিল্পের কারখানা তৈরি করতে এবং মূলধনী দ্রব্যের ('ক্যাপিটাল গুডস্') উৎপাদনে মনোযোগ দিতে চায়। সর্বনাশ! ও-পথ একেবারে ভাল নয়। পত্রিকাটি লিখেছিল, ভারতের উচিত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে মন দেওয়া; সে কৃষিজাত পদার্থ ও কাঁচামালকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত শিল্প তৈরি করুক—তার দ্বারা যে দু'-চার পয়সা পাবে তা দিয়ে বিদেশে তৈরি মাল কেনার সামর্থ্য অর্জন করুক—তারই নাম তো শিল্পায়ন! বৃটিশ স্বার্থের একেবারে নগ্ন চেহারা। অথচ এই লেখাতেই দু'-চার লাইন আগে কৃষি ও কুটীর-শিল্পের বদলে যন্ত্রশিল্পের নীতি গ্রহণ করায় কংগ্রেসকে প্রশংসা করা হয়েছে! পাঠকগণ ক্ষমা করবেন, প্রস্তাবিত শিল্পায়ন সম্বন্ধে বৃটিশ এবং তাদের অনুগত ভারতীয় বাণিজ্যপতিদের আসল মনোভাব ধরা পড়েছে বলে কমার্স পত্রিকার ৮ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত *Delhi Conference and Industrial Planning* নামক সম্পাদকীয় থেকে বড় অংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না:

"The Conference has recommended the starting of key industries and the manufacture of capital goods. We are of the opinion that the attention should be directed in the first instance towards the manufacture of consumption goods, leaving aside for the timebeing the manufacture of capital goods. Even among the former class, immediate consideration should be given to such of those industries which can utilise the agricultural products and the raw materials of the country. Mr. Bose has suggested that through industrialisation India should give effect to a policy of autarky. We demur to that suggestion. Through industrialisation we visualise that the purchasing power of the people would become increased considerably, as a result of which they would be in a position to purchase from abroad such goods as India does not and cannot manufacture to a far greater extent than at present. Thus, as a result of industrialisation, we visualise a greater flow of trade between India and the other countries. Besides, it should be recognised, that the prosperity of India depends to a considerable extent upon its ability to sell abroad certain primary commodities which its produces in abundance. Such presupposes its willingness to purchase goods from abroad to an adequate extent—and without such mutual flow of goods and services through the channels of internation trade, the prosperity of the primary producers of the country cannot be ensued. Therefore, our suggestion to the contemplated Commission would be that attention should be first directed towards the manufacture of consumption goods and here too to such goods as could make use of India's agricultural products and raw materials."

অসহ্য মুরুব্বিয়ানা ও ততোধিক দুষ্টবুদ্ধির অনবদ্য দৃষ্টান্ত। 'কমার্স' পত্রিকার মুরুব্বিরা অনুগ্রহ করে ভারতকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করেছে—গভর্নর নামক বৃদ্ধটি সিন্দবাদ নামক জনগণের ঘাড়ে অবশ্য থেকেই গেছে—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যা ঘটেছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

এর বেশি কিছু ঘটতে পারে না—গভর্নর ও আমলাতন্ত্র-শাসিত অর্থনীতির প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যাকে বলছ চলবে—ভারতের পক্ষে এই যথেষ্ট। অথচ সুভাষচন্দ্রের মতলব শিল্পে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা। সে কি? তা কখনো হয়? তার দ্বারা কি অর্থনৈতিক বিশ্বাত্মবোধ ক্ষুণ্ণ হবে না? শ্রেষ্ঠ নীতি আদান-প্রদানের। ভারতের গৌরব—সে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের কাঁচামাল উৎপন্ন করে। সেগুলি প্রবাহিত হোক বিদেশে এবং বিনিময়ে সেখান থেকে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য আসুক। প্রাথমিক উৎপাদক-দের প্রতি সহানুভূতিময় বেদনায় অস্থির হয়ে পত্রিকাটি না লিখে পারে নি—যদি কাঁচামালগুলি যথেষ্ট পরিমাণে চালান দেওয়া না যায়, ওদের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে কি করে?

বিশ্বাস করা শক্ত, ১৯৩৮ সালেও এ ধরনের কথা লেখা হয়েছিল। বিশ্বাস করা শক্ত, এই ধরনের অর্থনৈতিক বদবুদ্ধি ধরে ফেলে সুভাষচন্দ্র বুদ্ধিমান ও প্রগতিশীল বলে গণ্য, এবং আরও বিশ্বাস করা শক্ত, তবু তা সত্য, 'কমার্স' পত্রিকার ঐসব কথার মধ্যে কোনো মন্দ মতলব থাকতে পারে তা বুঝতেও অসমর্থ ছিলেন বহু দেশনেতাই।

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—ভারতের তিন প্রধান শহরের (এবং বাণিজ্য কেন্দ্রের) তিন প্রধান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রের বক্তব্য অতঃপর পরীক্ষা করা যায়। কলকাতাই বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থের মুখ্য কেন্দ্র এবং স্টেটসম্যান পত্রিকা সেই অধিকারে যতপ্রকার অহংকৃত মন্দবুদ্ধি সম্ভবপর, তার প্রায় একচেটিয়া মালিক। ভারতীয়দের জন্য সে একেবারে ইংলন্ডের ইংরাজীতে উপদেশ বর্ষণ করত নিয়মিত। ভারতীয়দের কৃতিত্ব-বিশেষে বাহবা দেবার মত কর্তা-ভাব তার ছিল, এবং ছোট ব্যাপারে (যদি তা তাদের কফিনের ছোট পেরেক না হয়) নজর দেবার মত ছোট নজর তার ছিল না। সুতরাং স্টেটসম্যান শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়ে যাবার পরে অবশ্যই একটি সম্পাদকীয় লিখেছিল (২৭ অক্টোবর—*An Industrial Survey*)—তাতে কংগ্রেসের কিছু পিঠচাপড়ানি ছিল১২, সমঝেও দিয়েছিল বাড়াবাড়ি করার বিরুদ্ধে। বোম্বাইয়ে মোটর গাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা, ভারতের তদানীন্তন অবস্থায় 'too speculative a scheme'। ভারতীয়রা ওসব বড় বড় ব্যাপার করবে কি করে যেখানে ভারতীয় শ্রমিক ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকের তুলনায় নিতান্ত অদক্ষ? কতখানি অদক্ষ, উৎপাদনে তারা কতখানি শ্লথ, তা দৃষ্টান্ত-যোগে পত্রিকাটি দেখিয়ে দিয়েছিল।

স্টেটসম্যান একটি বিষয়ে বিশেষ প্রশংসা করেছিল। পরিকল্পনা-মানচিত্রে দেশীয় রাজ্যগুলোকে গ্রহণ করায় তারা "শিল্প-কাঠামোর মধ্যে স্থানলাভের সুযোগ পেল, যার ফলে নিজেদের এবং ভারতের মংগলের জন্য অসমীক্ষিত সম্পদের সন্ধান ও ব্যবহার করতে তারা সমর্থ হবে।"

মাদ্রাজ মেল অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক। দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকায় কংগ্রেস নীতিকে অল্প-বিস্তর সমর্থন করার বিবেচনাবুদ্ধি তার ছিল। তেসরা অক্টোবর তারিখে *The Industrial Conference* নামক সম্পাদকীয়তে সুভাষচন্দ্রের ভাষণের খোলাখুলি প্রশংসা করার পরে গান্ধী-নীতির বিরোধী সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি যে ভারতের পক্ষে প্রগতির সূচনা করল, তাও স্পষ্টভাষায় লিখেছিল। "শিল্পমন্ত্রীদের সভায় সুভাষ-চন্দ্রের ভাষণ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের যোগ্য", "প্রশংসনীয়-ভাবে তা স্বচ্ছ।" ঐ বক্তৃতা পড়ে মাদ্রাজ মেল এতই খুশি হয় যে, সুভাষচন্দ্রের সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতকেও সাময়িকভাবে ক্ষমা করেছিল:

"Of course, it must be read in connection with Mr. Bose's socialist background, but nobody who does not recall in horror from the mere suggestion of State intervention in the industrial and economic field, should be frightened of it, simply on that account."

প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধী-নীতির বিরোধিতা করার মত মানুষ কংগ্রেসের মধ্যেও আছে দেখে পত্রিকাটি চমৎকৃত:

"The speech is important, because it indicates that in the Congress there are men, including the one now occupying the office of President, who do not share Mr. Gandhi's thoroughly retrograde economic ideas, who see that this country cannot possibly revert to a village economy but must advance in company with the rest of the world and even, if necessary, by forced marches."

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ভারতের সকলের জন্য উপযুক্ত আহার, বাসস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের জন্য এমন অবসরের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা সাংস্কৃতিক কাজ করার সুযোগ পায়। কিভাবে তা করা সম্ভব—নিশ্চয় ব্রাহ্মণ্য ত্যাগাদর্শের দ্বারা নয়—পত্রিকাটি লিখেছিল যথেষ্ট তিক্ততার সঙ্গে;—"যারা বিলাসের ধারে-কাছে কখনো আসেনি, অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে যারা জন্মায়

১২ "The formation of a National Industrial Planning Committee is a development to the credit of Congress. The project to make as a begining an industrial map of India may appear ambitions but such a survey is both a necessary and a wise approach to the future planning of India's industrial development."

এবং মুরে" তাদের জন্য ত্যাগাদর্শ? কুটীরশিল্পের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থনও পত্রিকাটি জানিয়েছিল, যিনি বলেছিলেন, কুটীরশিল্পকে যদি থাকতে হয় যন্ত্রশিল্পকে বড় জায়গা ছেড়ে দিয়েই থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সমালোচনা করা হয়েছিল ডাঃ সৈয়দ মামুদের বক্তব্যের, যাঁর মতে, কারখানার সঙ্গে লড়াইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কুটীরশিল্পকে 'সংরক্ষণ' করতে হবে।—

"Unfortunately however, a jarring note was immediately struck by Dr. Syed Mahmud who, in his memorandum,..stated that cottage industries could not properly develop if they had to compete against big factories. Protection was, therefore, necessary not only against foreign competition, but, against internal competition also."

সুভাষচন্দ্রেরও মৃদু সমালোচনা করা হয়েছিল 'মূল শিল্প' প্রবর্তনের কল্পনাবিলাসকে প্রশ্রয় দেবার জন্য, কিন্তু সমালোচনা নয়, সমাদরই আলোচ্য সম্পাদকীয়ের মূল বস্তু, যার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের চমৎকার সারসংক্ষেপ করার পরে বলা হয়—কংগ্রেস-সভাপতি যা বলেছেন সেসব কথা আমরা বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছি।

মাদ্রাজ তখন যথেষ্ট শিল্পোন্নত নয়। অপরদিকে বোম্বাই ভারতের প্রধান শিল্পাঞ্চল—অন্তত দেশীয় শিল্প-প্রয়াসের দিক দিয়ে। বোম্বাইয়ের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা টাইমস অব ইণ্ডিয়া তাই প্ল্যানিং সম্বন্ধে কংগ্রেসের (এবং সুভাষচন্দ্রের) দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্তি করেই কর্তব্য শেষ করতে পারে নি। প্রশংসা কিছু অবশ্যই করেছিল[১৩] কিন্তু সংশয় ও সমালোচনার পরিমাণ অনেক বেশি। সমালোচনা কেবল বৃটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের অসুবিধার কথা ভেবে নয়, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থচিন্তা করেও, কারণ বোম্বাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত পার্শী ও গুজরাটিদের দ্বারা পরিচালিত। কংগ্রেস সরকারের অর্থ-নীতির অসঙ্গতির নিন্দা করে পত্রিকাটি বলেছিল, একদিকে সরকার বলছে ব্যবসা-বাণিজ্যে আরও টাকা বিনিয়োগ করো, তার জন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে সরকার ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, লাভ বেঁধে দিচ্ছে, শ্রমিকদের মাইনে যথেচ্ছ বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের জন্য ব্যাধি-বীমা প্রবর্তন করতে ও সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করতে বলছে।

সবচেয়ে আশঙ্কা, আতঙ্ক বলাই উচিত, পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিল সমাজতান্ত্রিক নীতিতে প্ল্যানিং নিয়ন্ত্রিত হবে এই কথা শুনে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় স্তম্ভ বিদীর্ণ হয়ে প্রশ্ন ছুটতে লাগল। এতদিন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিল্পপ্রতিষ্ঠা হচ্ছিল, কোনো কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিবেচনা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছিল—এখন কি তার থেকেও এগিয়ে যাওয়া হবে? সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তার পথ নেওয়া হবে? সরকার কি মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বিদ্যুৎশিল্পের অ্যালকোহল প্রস্তুতের মত ভারী শিল্প প্রবর্তনের ভার নেবে—তার সমস্ত আর্থিক ঝুঁকি শুদ্ধ, তাই যদি হয় করদাতাদের খোলাখুলি সে কথা জানানো হোক, তারা জানুক যে, শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কতখানি মূল্য তাকে দিতে হবে। মূল্য যথেষ্টই দিতে হবে, কারণ ব্যাপারটা লাভজনক হবে না। তা ছাড়া যে সর্বাত্মক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের কথা বলা হচ্ছে, তা কোন্ ধরনের হবে—জার্মান মডেলের, না সোভিয়েট মডেলের? এই সব রাশি রাশি প্রশ্ন ও দুশ্চিন্তা এই সম্পাদকীয় রচনায় ফুটে উঠেছিল।[১৪]

২০ ডিসেম্বর তারিখে এই পত্রিকাটি আর একটি

---

১৩ "A Conference at Delhi of Industries Ministers from seven Congress provinces has served to focus attention upon a subject of growing importance. The industrialisation of India, preferrably on a plan sponsored by the Government and backed by State-aid, is coming to be regarded almost as a panacea for all the country's economic ills. The attitute of practical men towards these far-reaching proposals must be one of general approval...."
(*Plan for Industry*, October 8, 1938)

১৪ "Are we now to go beyond this, to commit ourselves to a system of national Socialism in which onus of risk will be taken over from the private investor, and Government will virtually guarantee such large scale schemes as the manufacture of motor cars and power alcohol? If so, let us define our attitude at the outset. Let the taxpayer know whether he is to be called upon to shoulder the burden of potential loss in these and other directions, and let the consumer be told frankly that India's aim is self-sufficiency and he must be prepared to pay the price. If the State is to assist industry let us be assured that it will share in the profits as well as indemnify industrialists against loss. Is the object in view totalitarianism on the German model or State control of the Soviet type? If neither of these two extremes is desired, the Planning Commission should lay down limits beyond which possibly uneconomic schemes will not go.....Economic realism is an essential element in economic planning."
(*Plan for Industry*

সম্পাদকীয় লেখে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধেই। এর মধ্যে সাধারণভাবে সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন জানিয়েও সরকারের বেহিসেবি খরচ এবং বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির লুণ্ঠন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের সমালোচনার প্রতিবাদ করা হয়। তা করতে পত্রিকাটি বাধ্য ছিল, কেন, না বললেও চলে। এই লেখাতেও পুনর্বার অবাস্তব পরিকল্পনায় উন্মত্ত না হতে অনুরোধ জানানো হয় এবং কংগ্রেস যে নানাভাবে শিল্পপতিদের টাকা কেড়ে নিচ্ছে, সে বিষয়ে অভিযোগ করা হয়।১৫

সুভাষচন্দ্রের প্ল্যানিং নীতির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া গভীর ও মারাত্মক হয়েছিল অন্যত্র। মেঘনাদ সাহার সঙ্গে কুমারাপ্পার সংঘর্ষ, যাতে অমৃতবাজারের মতে সাহার দিকেই শিক্ষিত মানুষের সমর্থন ছিল১৬—তার থেকেই বোঝা গিয়েছিল সুভাষচন্দ্রের আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীবাদী এবং স্বয়ং গান্ধীজীর মনোভাব কি ধরনের হবে। যন্ত্রশিল্প, প্ল্যানিং ইত্যাদির কথা যতদিন বাতাসে ভাসছিল, ততদিন ঐসব আকাশকুসুমের প্রতি যথোচিত অবজ্ঞা এবং কিছু কিছু বায়ুতাড়না করেই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের একগুঁয়ে চেষ্টায় যখন ব্যাপারটা ভূমিলাভ করল, তখন আর উদাসীন থাকা গেল না। অক্টোবরে শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনের পর থেকেই গান্ধীবাদীদের প্রতিবাদ দানা বাঁধতে শুরু করে। ব্যাপারটা এই ধরনের হবে অনুমান করে সুভাষচন্দ্র অক্টোবর-ভাষণে কুটীরশিল্পকে যথেষ্ট তোয়াজ করেছিলেন। কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। চিঁড়ে ভিজোবার জন্য আরও কিছু করার প্রয়োজন ছিল—অথচ কুটীরশিল্পের জন্য সাধুবাক্যের বেশি কিছু দেবারও ছিল না তাঁর। বোম্বাইয়ে প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধনী ভাষণে তা-ই তিনি দান করেছিলেন খাদিপন্থীদের সন্তোষবিধানের জন্য:

"গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি কোনো কোনো মহলে একটি আশংকা লক্ষ্য করেছি: ১৯২১ সাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত নিখিল ভারত কাটুনী সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের উদ্যোগে খাদি উৎপাদন ও কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্য যে-চেষ্টা চলে আসছে, তার উপর আমাদের বর্তমান শিল্পবিষয়ক পরিকল্পনার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি জাতীয় হবে? দিল্লীতে উদ্বোধনী ভাষণে আমি যা বলেছিলাম, তা এখানে স্মরণ করতে অনুরোধ করছি। আমি সেখানে পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম, কুটীরশিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত বিরোধ নেই। বস্তুতঃ আমি শিল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলাম—কুটীরশিল্প, মাঝারি শিল্প ও বৃহৎ শিল্প; এবং আমি এই তিন শ্রেণীরই শিল্পের বিকাশের উপযোগী পরিকল্পনার পক্ষে বলেছিলাম। শুধু তাই নয়, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনে আমরা নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের জন্য একটি আসন্ সংরক্ষিত রেখেছি এবং ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটিতেও অনুরূপ একটি আসনের ব্যবস্থা করা যায়। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের উদ্যোক্তারা কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনকে ফাঁসিয়ে দিতে চান, এই কথা বললে কিংবা এমন আশংকা বোধ করলেও আমাদের প্রতি গভীর অবিচার করা হবে।

"সকলেই জানেন, কিংবা তাঁদের জানা উচিত যে, ইউরোপ বা এশিয়ার সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন জার্মানী বা জাপানে, যথেষ্ট সংখ্যক কুটীরশিল্প আছে এবং তারা বৃদ্ধির পথে। তাহলে আমাদের মত দেশের ক্ষেত্রে আমরা আশংকা বোধ করি কেন?"

সুভাষচন্দ্রের এই স্বস্তিবচনের পটভূমিকায় কি ছিল, সমসাময়িক তথ্যযোগে তা দেখিয়ে দেওয়া যায়। খাদি সম্বন্ধে কংগ্রেস মহলে অবহেলার কথা শুনে ১৯ নভেম্বর 'হরিজনে' অত্যন্ত কঠোর ভাষায় লেখা এক প্রবন্ধে গান্ধীজী বলেন—(ঐ সময়ে সুভাষচন্দ্র যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে সারাদেশে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন) জনৈক পত্রলেখক তাঁকে জানিয়েছেন, মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে প্রার্থী দেবার সময়ে কংগ্রেস-নিয়মাবলীর খাদি-ধারা মনে রাখা হয় না। খাদি-ধারী উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় না বলেই ও-জিনিস করতে হয়—একথা মনোনয়নদাতারা বলে থাকেন। আবার অনেকের মতে, স্বরাজ ও খাদির মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। ক্রুদ্ধ ও ব্যথাহত গান্ধীজী বলেন—যাঁরা নীতি মানবেন না তাঁদের বিদায় দেওয়াই ভাল।

১৫ "With the general sense of their (Bose and Nehru's) remarks there will be no disagreement. But Mr. Bose was somewhat wide of the mark in his accusation about money being "squandered" by Governments of the past on hydro-electric development, and in his criticism of so-called "foreign" concerns which have taken the initiative in putting India's natural resorces to practical use."

(*National Planning*, Dec. 20, 1938)

১৬ "Be it said that in this controversy Dr. Saha had a far larger number of supporters, of whom the Congress President was one, than his critics." (A.B.P., Ed., Oct. 18, 1938).

সংবাদপত্রের (অমৃতবাজার, ২০ নভেম্বর, ১৯৩৮) শিরো-নামা সহ কিছু সংবাদ উদ্ধৃত করছিঃ

**Congress and Khadi**

**Irregularities that Pain Gandhiji**

**Damaging Reports from Provinces**

**Gandhiji Advises Wholesale "Purge" of those Who Fail to Obey Constitution**

"I have not hesitated to say, and I make bold to repeat now, that without Khadi there is no Swaraj for the millions, the hungry and the naked, and for the millions of illiterate women....

"I have letters from Bombay, U.P., Bengal and Sind bitterly complaining that the Khadi clause of the Congress Consitution 'is honoured more in the breach than in the performance'....

"Is there no connection between Swaraj and Khadi ? Were the Congressmen who made themselves responsible for the Khadi clause in the Constitution, so dense that they did not see the fallacy which is obvious to some critics ?

"But my argument has perhaps no force with many Congressmen when anarchy reigns supreme among them."

মাদ্রাজ মেলের ১২ ডিসেম্বর তারিখের রিপোর্ট থেকে গান্ধীজীর বিচলিত মনোভাবের চেহারা আরও দেখা যায়। ওয়ার্ধায় ১১ ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমি প্ল্যানিং কমিটি নিয়ে জনচিত্তে যেসব প্রশ্ন উঠেছে তা নি আলোচনা করে। অনেকেই নাকি মনে করতে শুরু করেছে অতঃপর কংগ্রেস কুটীরশিল্পে আর উৎসাহ দেবে না ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করেছিল, জনমনের এইসব ভ্রান্ ধারণা দূর করা অতীব প্রয়োজন। নতুন কোনো প্রস্তা নেবার আগে মহাত্মা গান্ধীর কাছে ব্যাপারটি উপস্থি করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।১৭

শুধু খাদি নয়, ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার ভবিষ্য সম্বন্ধেও গান্ধীপন্থীদের মধ্যে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার অনুশীলনের জন্য ওয়ার্ধা আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বিষয়ে গান্ধীজীর আলো চনার বিষয়বস্তু 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "(নতুন) কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের ফলে যদি কংগ্রেসের নীতির বদল হয়, তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার কী হবে?" উত্তরে গান্ধীজ জানান, এই ভয় ভিত্তিহীন। সভাপতি নির্বাচনের ফলে যদি কংগ্রেস-নীতির পরিবর্তন হয়ও, তা কিন্তু ওয়ার্ধ পরিকল্পনাকে স্পর্শ করবে না। যদি সত্যই কিছুকে প্রভাবিত করে, তা কংগ্রেসের উচ্চতর রাজনীতি ছাড়া অ কিছু নয়।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, খাদিপন্থীরা সুভাষচন্দ্র পুনর্নির্বাচন প্রশ্নকে কোন্ চোখে দেখেছিলেন।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলে **"দেশের শিল্পায়নের পরিকল্পনা উপস্থিত করা হলে কংগ্রেসের বর্তমান আদর্শ বা লক্ষ্য শিল্পায়ন নয়। বোম্বাই গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে তার লক্ষ্য কুটীরশিল্পের পুনরভু** দয়। শিল্পায়নের বিস্তৃত পরিকল্পনা কিষাণদের সাম উপস্থিত করে জনজাগরণ আনা সম্ভব নয়। ওর ফলে তাদের তহবিলে এক আধলাও পড়বে না। কিন্তু এ বছরের মধ্যে নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ ও নিখি ভারত কাটুনী সংঘ তাদের ভাঁড়ে বহু লাখ টাকা তুলে দেবে।" (অমৃতবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯)

---

১৭ Planning Commission

**Will It Affect Village Industries ?**

**Working Committee Discussion**

...Interesting discussion appears to have taken place among members regardi certain wrong impressions created in the public mind by the appointment of the A India Planning Commission.

It was pointed out that the appointment of this Commission has led to the beli in certain quarters that village industries need not be encouraged.

It was emphasised that this wrong impression in the public mind should removed. Ultimately it was decided that the matter should be referred to Mr. Gand bebore any resolution is passed." [(*Madras Mail*, Dec. 12. 1938]

আমরা আগেই দেখেছি, শিল্পায়ন পরিকল্পনার দ্বারা দরিদ্র কৃষকদের আশু লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই, সুতরাং ঐ পরিকল্পনা অর্থহীন—এই সমালোচনা প্রতিহত করবার জন্য সুভাষচন্দ্র কিভাবে নানা স্থানে বক্তৃতাদির দ্বারা শিল্পায়নের পক্ষে প্রচার করেছিলেন। একমাত্র শিল্পায়নের দ্বারাই ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব, এই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য।

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এ আন্দোলনের সঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রোমান লিপি প্রবর্তন-প্রস্তাব জড়িয়ে গিয়েছিল, সুভাষচন্দ্র যার প্রবল সমর্থক। গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯) এক প্রবন্ধে রোমান লিপি প্রবর্তন প্রস্তাবের বিপক্ষেও দৃঢ় আপত্তি জানালেন।[১৮]

সুভাষচন্দ্র কুটীরশিল্প সংরক্ষণের যত প্রতিশ্রুতিই দিন, গান্ধীপন্থীরা তাতে শান্ত হন নি; চরকার চাকার উপর ভারতমাতাকে স্থাপন করে যাঁরা তার ঘর্ঘরকে জাতীয় সঙ্গীত করে তুলেছিলেন, তাঁরা সুভাষচন্দ্র নামক জনৈক উগ্রবুদ্ধি (এবং ভ্রান্তবুদ্ধি) অর্বাচীনের মুষ্টিভিক্ষায় কদাপি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। ক্ষোভ গুমরে উঠতে লাগল, বিশেষত যখন দেখা গেল, এই ব্যাপারটি অপর-পক্ষে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচন-প্রার্থী হলেন, তখন প্ল্যানিং প্রকল্পে তাঁর কার্যাবলী কংগ্রেসের উচ্চবর্গের কাছে তাঁকে সমর্থনের অযোগ্য করে তুলেছিল। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন:

"১৯৩৮-এর অক্টোবরে দিল্লীতে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রী-দের সম্মেলনে (যাতে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম) ন্যাশ-ন্যাল প্ল্যানিং কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সাধারণ সম্পাদক সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন মুখ্য সদস্য সেখানে উপস্থিত থাকলেও এবং কেউ বেসুরো আওয়াজ না তুললেও, মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠমহল এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেন নি এবং ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটিকে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা সৃষ্ট গ্রামোদ্যোগ সংঘের উদ্দেশ্য ও কর্মের পথে কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান করেছিলেন। কেউ কেউ আরও এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করলেন, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি মহাত্মার সারা জীবনের সাধনাকে নষ্ট করে দেবে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ-নামায় আর একটি বিষয় যুক্ত হল।

(ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় ৪ নভেম্বর তারিখের প্রবন্ধ *Looking Back*)[১৯] [ক্রমশ]

১৮ ঐ রচনায় গান্ধীজী বলেছিলেন, একমাত্র দেবনাগরী লিপিই সারা ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সেই সঙ্গে উর্দু বা ফারসী লিপিও চলবে যতক্ষণ না মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় বৈজ্ঞানিক জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেবনাগরীর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিচ্ছে। গান্ধীজীর মতে 'ভাবাবেগ ও বৈজ্ঞানিকতা' রোমান লিপির বিরুদ্ধে। ঐ লিপির একমাত্র সুবিধা ছাপার ও টাইপের ব্যাপারে; কিন্তু তার উল্টোদিকে রয়েছে ঐ লিপি শিখতে লক্ষ লক্ষ লোকের অসীম কষ্ট। যেসব মানুষ দেবনাগরীতে বা অন্য প্রাদেশিক লিপিতে নিজেদের সাহিত্য পড়বে, রোমান লিপিতে তাদের কোনই সুবিধা হবে না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু, এমন কি মুসলমানের পক্ষেও দেবনাগরী শেখা সহজসাধ্য, কারণ প্রাদেশিক লিপি-গুলির অধিকাংশই দেবনাগরী থেকেই এসেছে। গান্ধীজী মুসলমানদের কথা বলেছিলেন এইজন্য যে, বাঙালী মুসল-মান এবং তামিল মুসলমানদের মাতৃভাষা যথাক্রমে বাংলা ও তামিল। মুসলমানদের উর্দু শেখার অতিরিক্ত আরবীও শিখতে হতে পারে কোরান পড়বার জন্য। হিন্দুরা যদি শাস্ত্র পড়বার জন্য সংস্কৃত শিখতে চায়, তাদের দেব-নাগরী সেজন্য শিখতে হবেই। রোমান লিপি শিখতে হতে পারে একমাত্র ইংরেজী শেখার প্রয়োজন হলে। জনগণের উপর এই লিপি একটা চাপানো বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং চাপানো জিনিসমাত্রে জনগণ ঝেড়ে ফেলবে জনজাগরণ ঘটলেই। গান্ধীজী মনে করেছিলেন, জনজাগরণ আশাতীত দ্রুতভাবে ঘটে গেছে, যা রোমান লিপিকে অবাঞ্ছিত ব্যাপার করে তুলেছে।" (অমৃতবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯)

রোমান লিপি প্রবর্তনের বিরোধিতা গান্ধীজী জীবনের শেষ পর্যন্ত করে গেছেন। তাঁর মতে ইংরেজের সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিজয়কে বজায় রাখা হবে ঐ লিপি চালু করলে। একথা তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের এস এ আয়ারকে (এপ্রিল, ১৯৪৬) বলেছিলেন। (টেন্ডুলকরের "মহাত্মা", ৭ম খণ্ড)

১৯ একই জাতীয় কথা সুভাষচন্দ্র অন্যত্র বলেছেন। যেমন, *The Indian Struggle*—1935-42-এর মধ্যে—"Later in the year (1938), he (the writer) launched the National Planning Committee for drawing up a comprehensive plan of industrialisation and of a national development. This caused further annoyance to Mahatma Gandhi who was opposed to industrialisation."

১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী লিখিত *Forward Bloc—its Justification* রচনায় লিখেছেন—"The third item in the charge-sheet was my sponsoring and subsequent inauguration of the National Planning Committee which, in the view of the Gandhiites, would give a fillip to the large-scale production at the sacrifice of village industries, the revival of which was a very important item in the Gandhian constructive programme."

২৩শে জানুয়ারী সময়ের নিয়মানুযায়ী এ বছরে আবার ঘুরে এল। বাঙালীর কাছে এই দিনটির একটি বিশেষ মূল্য আছে, কেন না তা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন হিসাবে চিহ্নিত। বাঙালী তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে নেতাজীর স্থান যে কি, তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। নেতাজীর প্রতি বাঙালীর চিরন্তন আগ্রহের কারণ নিঃসন্দেহে ব্যক্তিপূজা বা বীর-পূজা নয়। আসলে নেতাজী আজ একটি প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছেন, অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রতীক, অচলায়তন সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহের প্রতীক। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যিনি স্থবির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, ভারত থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে অপসারিত করার জন্য যিনি নিজের পথ নিজে করে নিয়েছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যিনি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সংযোগ করেছিলেন, সেই মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ যে চিরন্তন হবে সেটাই স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয় গত বাইশ বছরে ভারতীয় নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণকে আকর্ষণ করতে পারে নি, ভারতের বিপুল জনসম্পদকে সৃষ্টিমূলক কাজে নিযুক্ত করতে ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে জনচিত্তে যে হতাশা দেখা দিয়েছে, তার ফলে সুভাষচন্দ্রকে আরও বেশি করে সকলেরই মনে পড়ে। সুভাষচন্দ্র অতিমানব নন, তথাপি জনসাধারণ গত বাইশ বছরের পুঞ্জীভূত হতাশায় সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করেন যে নেতাজী যদি বেঁচে থাকতেন, যদি তিনি ফিরে আসতেন, যদি তিনি দেশের কর্ণধার হতেন, তাহলে দেশের রূপ নিশ্চয়ই পাল্টে যেত, কেন না তাঁরা দেখেছিলেন একমাত্র নেতাজীই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য গতিশীলতার সঞ্চার করেছিলেন, পেশাদার শৌখীন রাজনীতিবিদ্দের বন্ধ্যা নীতির ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দিয়ে আপামর জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন—ভারতের মাটিতে যা এক অভিনব বিষয়, যা পূর্বে কেউ কল্পনা করে নি। আজও যে জনসাধারণের বিরাট অংশ বিশ্বাস করেন যে নেতাজী এখনো জীবিত আছেন এবং তিনি ফিরে আসবেন, এই বিশ্বাস গড়ে ওঠার কারণই হচ্ছে আজ ভারতের মানুষ নেতাজীর মত ব্যক্তির নেতৃত্বই প্রত্যাশা করেন, যে নেতৃত্ব দৃঢ়হস্তে ভারতের বর্তমান চেহারার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই এই ২৩শে জানুয়ারী দিনটিকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে বাংলাদেশে একটি অদ্ভুত চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, বাঙালী যেন এই দিনটিতে নতুন করে তাঁকে পেতে চায়।

## যুক্তফ্রণ্ট সংবাদ

গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শন এই বলে আরম্ভ করা হয়েছিল যে, আগামী সপ্তাহে যখন সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশিত হবে তখন ১৪ই জানুয়ারী তারিখের যুক্তফ্রণ্টের প্রস্তাবিত বৈঠকটি হয়ে যাবে এবং জনসাধারণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন, কেন না ফ্রণ্টের অন্তর্বিরোধের সংবাদই যদি প্রতিদিনের সংবাদপত্রের একমাত্র সংবাদ হয় এর চেয়ে বিড়ম্বনাকর আর কিছু নেই। অনুরূপ এ সপ্তাহের বঙ্গদর্শনেও আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী ২১শে জুলাই তারিখে প্রস্তাবিত বৈঠকটি বসবে, তবে সে আশাটা কতদূর সফল হবে ওই দিনটি পার না হলে আর বলতে ভরসা হচ্ছে না।

১৪ই জানুয়ারীর বহু আলোচিত সভাটি বাতিল হয়েছে। ওই দিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক চলাকালে যুক্তফ্রণ্টের আহবায়ক শ্রীসুধীন কুমার পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তীকে জানান যে, যুক্তফ্রণ্টের প্রস্তাবিত সভাটি লোকসেবক সংঘের দপ্তরে হবে। এই সংবাদ প্রকাশিত হলে শ্রীসুশীল ধাড়া জানান যে এইভাবে স্থান পরিবর্তনের কোন যুক্তি নেই। তাঁরা পূর্বঘোষিত স্থানে, অর্থাৎ সি পি আই অফিসেই যাবেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, সি পি এম, আর এস পি, লোকসেবক সংঘ প্রভৃতি প্রথম স্থানে এবং সি পি আই, সি দ্বিতীয় স্থানে জমায়েত হন। অতঃপর উভয় স্থানের মধ্যে টেলিফোনের যোগাযোগ হয়। উভয় স্থানের বৈঠকই বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং আগামী ২১শে জানুয়ারী নতুন করে বৈঠকের দিন ধার্য করা হয়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, যদিও বুধবারের সভাটি বাহ্যত ভুল বোঝাবুঝির কারণে বাতিল হয়ে গেল, কিন্তু এই সভা সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কিছু অবকাশ থাকলেও, যুক্তফ্রণ্টের বড় দলগুলি জেনে ও বুঝেই আলাদা-আলাদা বাড়িতে বসেছিলেন এবং নিজ নিজ স্থানে বসেই ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে একটা বড় দরের সংঘর্ষ ও শক্তি-পরীক্ষা এড়িয়ে গেলেন। এই সভা বানচাল হওয়া বা বানচাল করার একমাত্র সুফল হল এই যে, যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলি আরও সাতদিন সময় পেলেন, যে সময়ে তাঁরা নিজেদের বিবাদ ও বিরোধ মিটিয়ে ফেলার বা নতুন আপোস আলোচনা করে পরবর্তী যুক্তফ্রণ্টের সভার মোকাবিলা করতে পারবেন।

## শহর-সম্পত্তির উপর কর

রাজ্য মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর করধার্যের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল উদ্যম। এই কর পুরোপুরি সংগৃহীত হলে বছরে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত আয় হবে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশন এলাকা থেকে এই আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। বিধানসভার আগামী বৈঠকে এ সম্পর্কে একটি বিল উঠবে। যে সব সম্পত্তির মূল্য বারো হাজার টাকার কম, প্রস্তাবিত কর থেকে তারা অব্যাহতি পাবে। বারো হাজার টাকা থেকে পনের হাজার টাকা পর্যন্ত সম্পত্তির উপর শতকরা সাড়ে সাত ভাগ কর ধার্য করা হবে। ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার পর্যন্ত মূল্যের সম্পত্তির উপর কর বসবে শতকরা দশ ভাগ এবং ২৫ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে শতকরা সাড়ে বারো ভাগ। পৌরসভার

মূল্যায়নের উপর এই কর ধার্য করা হচ্ছে।

আমরা সরকারের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই কর ছাড়াও শহরাঞ্চলের সম্পত্তি থেকে সরকার অন্যভাবেও কিছুটা আয় করতে পারেন। কলকাতা শহরের বুকে যে কয়েক হাজার বহুতলবিশিষ্ট অফিস বিল্ডিং রয়েছে সেগুলির উপর সরকার বিশেষ প্রত্যক্ষ-কর বসাতে পারেন। এই এক-একটি অফিস বিল্ডিং থেকে মালিকেরা প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা ভাড়া বাবদ আদায় করেন। তা ছাড়া বহুতলবিশিষ্ট এই সমস্ত বিল্ডিং তৈরি করতে, হিসাব একটু এদিক-ওদিক করে অনেক কালো টাকা সাদা করা যায়। এক কোটি টাকা ব্যয় করে যদি খরচ পঞ্চাশ লাখ টাকা দেখানো যায়, তাহলেই পঞ্চাশ লাখ কালো টাকাকে সাদা টাকায় সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর করা সম্ভব। এবং এই সমস্ত বিল্ডিং ভাড়া দেওয়া হয় স্কোয়ার ফুট হিসাবে। একটি বহুতলবিশিষ্ট অফিস বাড়ির ভাড়া বাবদই মালিকের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে উঠে আসে। এছাড়া বহুতলবিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়িগুলির ওপরেও বিশেষ ধরণের কর বসানো যায়, যেগুলি তৈরি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভাড়া দিয়ে মাসিক মোটা টাকা লাভ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লোয়ার সার্কুলার রোড ও বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে এই ধরণের বাড়ি আছে যার ফ্ল্যাটের সংখ্যা ১০০টিরও বেশি এবং প্রতিটি ফ্ল্যাটের ভাড়া যেখানে মাসিক ৫০০ টাকার উর্ধে। অর্থাৎ এই একটি বাড়ি থেকেই মালিকের আয় মাসে পাঁচ লাখ। এইরকম বাড়ির সংখ্যা কলকাতায় অগণ্য, এগুলির উপর প্রত্যক্ষ কর বসিয়ে সরকার মোটা টাকা পেতে পারেন যা জাতীয় উন্নয়ন কার্যে ব্যয় করা চলতে পারে। আশা করি যুক্তফ্রন্ট সরকার বিষয়টিকে ভেবে দেখবেন। আর তাছাড়া স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী এই বাড়িগুলি কি জাতীয়করণ করা যায় না?

## এ কোন্ ধরণের নৈরাজ্য?

আকস্মিক কর্মবিরতির ঘোষণা দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহকে পঙ্গু করে দেওয়াটা কিভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে, এবং এইরকম কাজ যারা করে তাদের কোন্ যুক্তিতে প্রশ্রয় দেওয়া হয় সেটা ভেবে ওঠাই দুষ্কর। দাবি-দাওয়া সকল শ্রেণীর কর্মীরই থাকে এবং তা আদায় করার অনেক পদ্ধতিও আছে। কিন্তু আন্দোলনের নাম করে হাসপাতাল অচল করে দেওয়া, দিনের পর দিন হাজার হাজার মানুষের লাঞ্ছনা ঘটানো, শহরে দুধের যোগান বন্ধ করে দেওয়া এগুলি যে কোন্ জাতীয় শ্রম-আন্দোলন, সেটা তথাকথিত শ্রমিকদরদীরা জানাবেন কি? অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহে, যেমন হাসপাতাল, পরিবহণ, দুগ্ধ প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে আকস্মিক কর্মবিরতির যে ক্রেজ শুরু হয়েছে, বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের আমলে এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের দলেরই ইউনিয়নের দ্বারা, তার ফলে সাধারণ মানুষকেই যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেওয়া হয় সেটা বুঝিয়ে বলে তথাকথিত শ্রমিকদরদীদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্য আমাদের নয়। আমরা সরাসরি যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে জানতে চাই, আন্দোলনের নামে এই জাতীয় বদ্যামি তাঁরা আর কতকাল সহ্য করতে রাজী আছেন এবং এইভাবে হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়ে, দুধের যোগান বন্ধ করে দিয়ে, তারা মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করছে তার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া থেকে সরকার বিরত আছেন কেন? পৃথিবীর কোন্ সভ্যদেশে এই জাতীয় কর্মপন্থাকে সহ্য করা হয়?

গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে বেলগাছিয়া ডেয়ারীতে একশ্রেণীর কর্মীর কর্মবিরতির ফলে কলকাতা ও শহরতলীতে দুধের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অথচ তার কোন কারণ ছিল না। সরকারী দপ্তরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে মাস্টার রোল-এ প্রায় আড়াই হাজার দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী আছেন। তাঁদের ১২০১ জনকে পর্যায়ক্রমে সরকারী কর্মী হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়ে গেছে। শ্রমিক-কর্মচারীরাও জানেন। তথাপি বিনা নোটিশে এই ধরণের কর্মবিরতি অভূতপূর্ব। আরও মজার এই যে পরে হরিণঘাটাতেও এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে, বিনা নোটিশে এই ধরণের হঠাৎ ধর্মঘটের কোন যুক্তি নেই। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, এটা অত্যন্ত অনুচিত, অবাঞ্ছনীয় ও অপরাধমূলক ব্যাপার হয়েছে। আশ্চর্য এই যে এই ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া তাঁর আর কিছু করণীয়ও নেই। কিছু করতে গেলে আবার তা কারো কারো বিভাগে 'হস্তক্ষেপ' হয়ে যাবে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন যে পার্টির তালুকদারি সেই পার্টি চটবে। অতএব হজম করে যাও।

এই তো গেল একদিক। এদিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও এলাহী ব্যাপার চলছে। বুধবার ১৪ই জানুয়ারী থেকে রোগী ভর্তি বন্ধ, শুক্রবার থেকে দেড় হাজার চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী ধর্মঘটে নামেন। কল্পনা করতে কি পারা যায়, কোন সভ্যদেশে হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, গুরুতর অসুস্থ রোগীদের অন্য হাসপাতালে সরানো হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজে রোগীরা চাপা পড়ে ... অথবা বেঘোরে মরতে হবে, আউটডোরও বন্ধ। সাপ্তাহিক ছুটি, ছাঁটাই ইত্যাদি ৪০ দফা দাবি আদায়ের জন্যই নাকি এই ধর্মঘট। আমাদের জিজ্ঞাস্য, এগুলি কি অন্য কোন উপায়ে আদায় করা যেত না? এর জন্য কি রোগীদের উপর এই অমানবিক আচরণ অবশ্যম্ভাবী ছিল? যুক্তফ্রন্ট সরকার তো শ্রমিকদরদী হিসাবে পরিচিত। যে পার্টিদের ইউনিয়ন তাঁদেরই তো সরকার। কাজেই অনায়াসেই অন্য পথ নেওয়া যেত। সব কথা সব সময় খুলে বলা যায় না, কিন্তু এটা কি সত্য নয়, যাঁরা আজ এভাবে এতগুলি রোগীকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, যাঁদের অবিবেচক কার্যের ফলে কয়েকজন রোগীর প্রাণহানি ঘটতে পারে, তাঁরা সত্যিই কি এমন কিছু কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় কদাপি দিয়েছেন, যাতে তাঁদের আন্দোলন সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে? চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের ওপর আমাদের নিঃসন্দেহে কোন আক্রোশ নেই, কিন্তু একথাটা কি অস্বীকার করা যায় যে, পয়সা খরচ না করলে সরকারী হাসপাতালগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগযন্ত্রণায় কাতর রোগীর পক্ষে একটা বেড-প্যানও পাওয়া সম্ভব হয় না?

কথায় কথায় হাসপাতালে কর্মবিরতি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন একটা ছুতো পেলেই হল, কখনো রোগীর আত্মীয় বনাম চিকিৎসকের বিরোধে তামাম চিকিৎসক বাহিনী কর্মবিরতি করছেন, কখনো নার্স-চিকিৎসক বিরোধে ধর্মঘট হচ্ছে, কখনো চিকিৎসক-নার্স বনাম কর্মীদের বিরোধে তা হচ্ছে, আবার কখনো কখনো একদল কর্মীর সঙ্গে আর একদল কর্মীর বিরোধের ফলে তা ঘটছে। কিন্তু এ অবস্থাটা কতদিন সহ্য করা চলতে পারে? যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে গত কয়েক মাসে কলকাতার সরকারী হাসপাতালগুলিতে নানা ধরণের অস্বাভাবিক ও গর্হিত কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঙ্গুর হাসপাতালের ঘটনাও সহজে ভোলবার নয়।

আসলে অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহ বানচাল করে দিয়ে দাবি আদায় একটি অপরাধমূলক পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলিকে আইন করে বন্ধ করাই সঙ্গত। আন্দোলনের নানা পন্থা আছে, কারখানার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য হতে পারে হাসপাতালের ক্ষেত্রে তা হতে পারে না। আশা করি, ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিগণ এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে দ্বিধা বোধ করবেন না।

## কেরালায় মেনন সরকারের পরমায়ু

**কেরালায়** অচ্যুত মেননের (সি-পি-আই) নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট (ক্ষুদ্র) মন্ত্রিসভা বিধানসভায় ভোটের জোরে কুপোকাত হবে বলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতারা যে দাবি করেছিলেন, সেটা প্রথম ধাক্কায় ব্যর্থ হয়েছে। জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে আইনসভার শীতকালীন অধিবেশন সুরু হয়েছে। প্রথম দিন রাজ্যপালের ভাষণের সময় সি-পি-এম সদস্যরা তুমুল হট্টগোল করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বটে, তবে তাতে আইন-সভার কাজে তেমন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নি। রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানাবার প্রস্তাব আইনসভায় অগ্রাহ্য হলে মন্ত্রি-সভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হতেন। কাজেই উভয় পক্ষই সেই শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু সম্মুখ সমরে দেখা গেল সি-পি-এম মুখে যতখানি শক্তির বড়াই করেছিলেন, কাজে সেই শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। রাজ্যপালকে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবটি ৭৭-৫৫ ভোটে আইনসভায় গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ আইনসভার মোট ১৩৩ জন সদস্যের মধ্যে ৫৫ জনের বেশি সদস্যের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারেন নি। সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছেনঃ সি-পি-আই (২১), মুসলিম লীগ (১৪), আই-এস-পি (১১), আর-এস-পি (৬) এবং সেই সঙ্গে কেরল কংগ্রেস (৫), নব কংগ্রেস (৪), আদি কংগ্রেস অর্থাৎ সিন্ডিকেটী কংগ্রেস (৫) কে-কে-পি (১), কর্ণাটক সমিতি (২) ও নির্দলীয় (৪)।

বিরোধী পক্ষে ভোট দেনঃ সি-পি-এম (৪৯), এস-এস-পি (৪), কে-টি-পি (১) এবং নির্দলীয় (১)।

আইনসভার তিনজন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন এবং দুটি আসন শূন্য আছে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ (সি-পি-এম) মন্ত্রিসভা ওল্টাবার জন্য সিন্ডিকেটী কংগ্রেসের সমর্থন নিতেও অনিচ্ছুক ছিলেন না—কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁরাও নাম্বুদ্রিপাদকে সমর্থন করেন নি।

কেরালায় অচ্যুত মেননের সরকার কায়েম হবার আগে সেখানে কি কি ঘটনা ঘটেছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হচ্ছেঃ প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং মালাবার নিয়ে নতুন কেরালা রাজ্য গড়ে ওঠবার পর থেকে রাজনৈতিক সংকট সেখানকার নিত্যকার ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে সেখানে পাঁচবার রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করতে হয় এবং সর্বসমেত মোট দশটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। অর্থাৎ কোন মন্ত্রিসভাই গড়ে আঠারো মাসের বেশি টেঁকে নি। একমাত্র ১৯৫৭ সালের কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট ২৮ মাস স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে "গণ-অভ্যুত্থানের" কাল্পনিক অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই গভর্নমেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সেই গভর্নমেন্টকে কেন্দ্রীয় সরকার বে-আইনীভাবে উচ্ছেদ করায় সারা দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশংকা দেখা দিয়েছিল। যাই হোক, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সাতদলীয় যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেস দলকে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী করে আবার ক্ষমতালাভ করে। সি-পি-এম দলের ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ হন সেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কর্ণধার। সেই যুক্তফ্রন্ট সরকার একনাগাড়ে একত্রিশ মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করে, কিন্তু ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে তার পরমায়ু শেষ করে দেন। তখন রাষ্ট্রপতির শাসন অনিবার্য হয়ে উঠলে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা মিলে অচ্যুত মেননের নেতৃত্বে আর একটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন। অচ্যুত মেনন স্থানীয় আইনসভার সদস্য নন। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়। নতুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় সি-পি-এম যোগদান করে নি এবং গোড়া থেকেই তারা এই মন্ত্রিসভার বিরোধিতা দলের সহায়তা ছাড়া মেননের মন্ত্রিসভা টিকতে পারে না। মেনন অবশ্য গোড়াতেই ঘোষণা করেছিলেন যে, কংগ্রেসের সহায়তা নিতে হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। দেখা যাচ্ছে, সি-পি-এম দলই হিসাবে ভুল করেছিলেন। ভোটাভুটিতে প্রমাণ হল, কংগ্রেসের সমর্থন না নিয়েও অচ্যুত মেননের গভর্নমেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল কেন? তার জবাব পেতে হলে আরও একটু ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। আসলে শরিকী-বিবাদই প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের অপমৃত্যুর কারণ। দুই কমিউনিস্ট পার্টির অহি-নকুল সম্পর্কই এই শরিকী-বিবাদের মূল উৎস। ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে ভাগ হবার পর ১৯৬৫ সালে কেরালায় মধ্যকালীন নির্বাচন হয়েছিল। উভয় কমিউনিস্ট পার্টিই যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা মুখে স্বীকার করলেও সেই নির্বাচনে তাঁরা যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারেন নি। সি-পি-এম, মুসলিম লীগ এবং এস-এস-পি এক নির্বাচনী আঁতাতে সংঘবদ্ধ হন এবং তাঁরা কোন সাধারণ কার্যক্রমের ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট করতে রাজী না হওয়ায় সি-পি-আই এবং আর-এস-পি পৃথকভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মন্ত্রিসভা গঠনের উপযোগী সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেউই পান না। ফলে রাষ্ট্রপতির শাসন যথাপূর্বং বলবং থাকে এবং ১৯৬৭ সালে সমগ্র দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় কেরালা রাজ্যেও সাধারণ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয়। বামপন্থীরা ১৯৬৫ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি ১৯৬৭ সনে আর করেন নি। নির্বাচনের আগেই তাঁরা সাতটি দল মিলে নির্দিষ্ট কার্য-ক্রমের ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এবং কংগ্রেসকে একেবারে কুপোকাত করে দেন। সি-পি-এম দলের নেতা নাম্বুদ্রিপাদের মুখ্য-মন্ত্রিত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় এবং সারা দেশের প্রগতিশীল মানুষ নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে বিরোধ পাকিয়ে উঠতে লাগল। মন্ত্রীরা প্রকাশ্যেই পরস্পরের সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। যুক্তফ্রন্টের শরিকরাও পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠতে লাগলেন। সেই কাদা ছোড়া-ছুড়ির মধ্যে দেখা গেল মন্ত্রীদের সকলের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এমন কি নাম্বুদ্রিপাদের মত সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতাও তার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। দুর্নীতির অভিযোগে একজন মন্ত্রী পদচ্যুত হলেন। বাকিদের সম্বন্ধে কি করা হবে তাই নিয়ে সি-পি-এম দলের সঙ্গে অন্যান্য দলের গুরুতর মতভেদ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত বিধানসভায় জনস্বাস্থ্যমন্ত্রী মিঃ উইলিংডনের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। উইলিংডন সি-পি-এম দলের লোক নন। তিনি কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট উচ্ছেদের প্রধান নায়ক ফাদার ভড়ক্কমের দলের লোক। কিন্তু যেহেতু তিনি সি-পি-এমের প্রতি অনুগত, সেই হেতু সি-পি-এম দলের সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সি-পি-এম-এর পলিট ব্যুরোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাম্বুদ্রিপাদ ঘোষণা করলেন যে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে ঠিকই, তবে শুধু উইলিংডনের বিরুদ্ধে নয়। মন্ত্রী গোবিন্দন নায়ার এবং টমাসকেও সেই তদন্তের সম্মুখীন হতে হবে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যদি আইনসভায় গৃহীত না হয়, তাহলে তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবেন। কিন্তু তিনি সি-পি-এম মন্ত্রী-দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে নীরব হয়ে রইলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত-ফ্রন্টের ৫টি দলের ৭ জন মন্ত্রী নাম্বুদ্রি-পাদের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন এবং কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁদের নিজ নিজ দলের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন। নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। তার পরের ঘটনাবলী ওপরেই বর্ণনা করা হয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে বামপন্থী রাজ-নৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শের পার্থক্যই যে শরিকী-বিবাদের মূল কারণ, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক দলই অপর দলকে ঘায়েল করে বড় হবার সুযোগ খুঁজছেন এবং প্রত্যেকেই ভাবছেন, একমাত্র তাঁরাই সাচ্চা বামপন্থী, অন্য শরিকরা সবাই নকল বামপন্থী অর্থাৎ বর্ণচোরা প্রতিক্রিয়াপন্থী। ভাবটা এই রকম: "দেশের যদি মঙ্গল করতে হয়, তাহলে আমি একাই করব, অন্য কাউকে করতে দেব না। কেউ করতে এলে তাকে মেরে হটিয়ে দেব।" যুক্ত-ফ্রন্ট যদি ইতিহাসের একটি অপরিহার্য পর্যায় হয়, তাহলে সেটাকে এড়ানো কোন দলের পক্ষেই সম্ভব হবে না। যাঁরা নিজেদের একাই একশ' ভাবছেন, তাঁরা যদি গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় কোন শিক্ষালাভ না করে থাকেন, তাহলে অন্যত্রও কেরালার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। সেটা দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে যে দস্তুরমত ক্ষতিকর হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

## শান্তির সন্ধানে !

বায়ফ্রার আত্মসমর্পণের সংবাদে নাইজেরিয়ার জনসাধারণ আনন্দ করছে
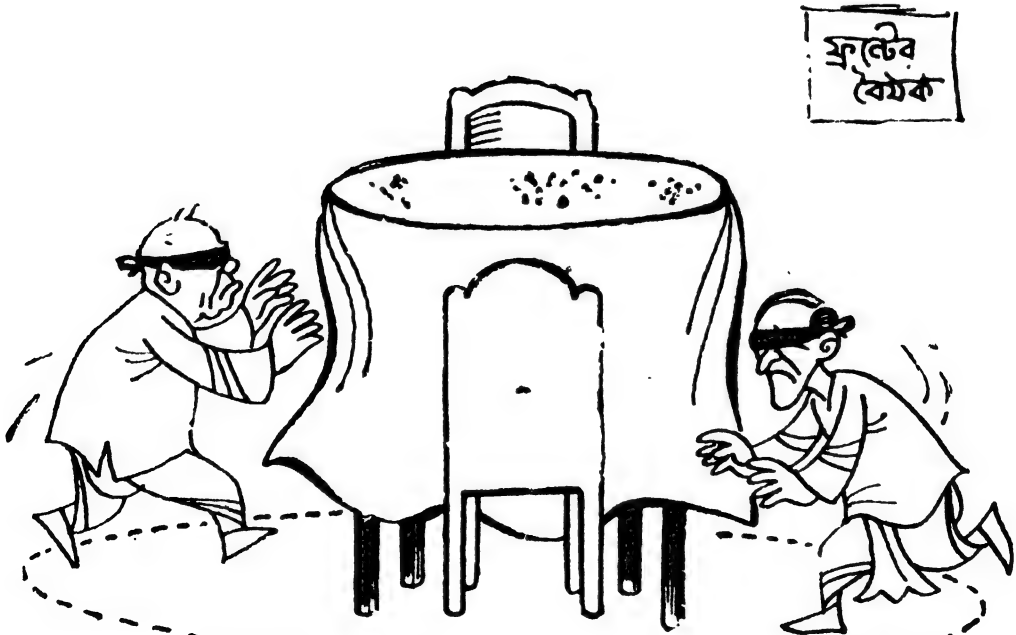
[illegible] ত্রিশ মাসব্যাপী 'বায়ফ্রা' অবসান ঘটেছে। ১২ই জানুয়ারী আ[illegible] ষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের অবসান ঘোষণা হয়েছে এবং বায়ফ্রার অস্থায়ী প্রধা[illegible] মেজর জেনারেল ফিলিপ এফিয়ং ও না[illegible] জিরিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি[illegible] মোরিন ক্যাণ্ডার কর্নেল ওবাসান[illegible] দুজনে আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বা[illegible] করেছেন। বিদ্রোহী বায়ফ্রা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সৈন্যদলের কাছে পরা[illegible] স্বীকার করল।

বায়ফ্রার যুদ্ধ নাইজিরিয়ার ক্ষেত্রে কেবল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ [illegible] আফ্রিকার ইতিহাসে এত রক্তাক্ত ও বীভ[illegible] সংঘর্ষ এর আগে কখনও আর হয় নি। আড়াই বছরের এই গৃহযুদ্ধে বায়ফ্রার মে[illegible] ৮০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৩০ লক্ষ মারা গেছে। এবং এদের অধিকাংশই মারা গেছে অনাহারে, মহামারীতে, পুষ্টিহীনতায়। পোকামাকড়ের মত হাজারে হাজারে নারী ও শিশু পথে-ঘাটে পড়ে পড়ে মরেছে।

নাইজিরিয়ায় সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ও সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ইবো উপজাতি অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চল প্রদেশের সামরিক গভর্নর জেনারেল ওদুমেগুউ ওজুকুয়ো সমগ্র নাইজিরিয়ার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রসমবায় (কনফেডারেশন) প্রতিষ্ঠা ও পূর্বাঞ্চলের জন্য পৃথক মর্যাদা দাবি করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হাউসা উপজাতির হাতে অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠের মতই খৃস্ট-ধর্মাবলম্বী ইবো উপজাতির লোকেরাও নিরাপদ বোধ করে নি। কিন্তু নাইজিরিয়ার সামরিক প্রধান ও নতুন রাষ্ট্রপতি ইয়াকুবু গওয়ান রাষ্ট্রসমবায়ের প্রস্তাবে রাজী নন, তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে। তবু ইয়াকুবু গওয়ন ও ওদুমেগুউ ওজুকুয়োর মধ্যে আবুরিতে (ঘানা) অনুষ্ঠিত আলোচনা বৈঠকের পর স্থির হয়, পূর্বাঞ্চল বা বায়ফ্রা এলাকার জন্য বিশেষ কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু ইয়াকুবু গওয়ন রাজধানী লাগোসে ফিরেই সব সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নেন। এদিকে ১৯৬৬ সালে নাইজিরিয়ার উত্তরে ক[illegible] হাজার ইবোকে হত্যার ফলে পূর্বাঞ্চ[illegible] ইবোদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিক্ষো[illegible] সঞ্চার হয়। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ওদুমে[illegible] ওজুকুয়োর নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চল নাইজি[illegible] থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্বতন্ত্র স্বা[illegible] রাষ্ট্র বায়ফ্রার প্রতিষ্ঠা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই নাইজিরিয়ার যু[illegible] রাষ্ট্রীয় সরকার এই অবস্থা মেনে নি[illegible] পারে না। বিচ্ছিন্নতার অর্থ রাষ্ট্রের সার্ব[illegible] ভৌমত্বকে অস্বীকার। তাই সর্বশক্তি দি[illegible] এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইয়াকুবু গওয়নে[illegible] সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হাজা[illegible] হাজার যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য বায়ফ্রা দখলে[illegible] জন্য যাত্রা শুরু করে।

বিদ্রোহী বায়ফ্রার সৈন্য, অস্ত্র, খাদ্য সবই কম। তাই নাইজিরিয়ার আক্রম[illegible] প্রতিহত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। একের পর এক তাদের ঘাঁটি ছাড়তে হয়। তাদের সৈন্যদল পিছু হটতে বাধ্য হয়। রাজধানী এনুগু যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যরা দখল করে নেয়। তবু যে এতদিন ধরে বায়ফ্রার লোকেরা লড়াই চালাতে পেরেছে, তার কারণ, ইবোরা কিছুতেই হাউসাদের সঙ্গে একত্র থাকতে রাজী নয়—তাদের ভয়, হাউসাদের হাতে পড়লে তাদের সবাইকে মরতে হবে। তাই যে-ভাবে হোক, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা লড়েছে। কিন্তু খালি হাতে আর কতদিন লড়বে? অস্ত্র ফুরিয়েছে, সৈন্যসংখ্যা কমেছে। তারপর খাবার অভাবে, চিকিৎসার অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে। অসহনীয় অবস্থা! যে বিদেশী সাহায্যের ওপর ওজুকুয়ো ভরসা করেছিলেন তা তিনি পান নি। এমন কি আনার অসুবিধার জন্য বুভুক্ষু অসুস্থ নর-

ইয়াকুবু গওয়ান

নারীর জন্য বিদেশী সেবা-প্রতিষ্ঠানের দেওয়া খাবার ও ওষুধও বিশেষ আনা যায় নি। এ ব্যাপারে আফ্রিকা ঐক্য সংস্থার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বায়ফ্রাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। ১১ই জানুয়ারী যেদিন বায়ফ্রার শেষ রাজধানী ওয়েরির পতন হল এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে বায়ফ্রার শেষ সম্পর্কের সূত্র উলি বিমানবন্দর যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সৈন্যদের হাতে চলে গেল, সেদিনই বোঝা গেছে, এবার 'গৃহযুদ্ধ' শেষ হল।

বিদ্রোহী বায়ফ্রা নেতা ওদুমেগুউ ওজুকুয়ো দেশত্যাগ করেছেন। তিনি সপরিবারে জাম্বিয়া গিয়েছেন। যাবার আগে অবশ্য বেতারভাষণে তিনি বায়ফ্রা-বাসীদের আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, নতুন সুযোগের সন্ধানে তিনি বিদেশ যাচ্ছেন। 'ঈশ্বরের কৃপা' হলে তিনি আবার ফিরে আসবেন।

ওদুমেগুউ ওজুকুয়ো দেশত্যাগের সময় বায়ফ্রার শাসনভার সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল ফিলিপ এফিয়ং-এর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। এফিয়ং ক্ষমতা গ্রহণের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আত্ম-সমর্পণ করেন এবং বায়ফ্রার সকল সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশ দেন।

আত্মসমর্পণের সংবাদে ভীতসন্ত্রস্ত প্রায় দশ লক্ষ ইবো দেশত্যাগ করেছে। হাউসাদের হাতে তাদের নিস্তার নেই, এই ভয়ে তারা কাঁপছে। আরও বহু লক্ষ মানুষ বনে-জঙ্গলে যে-যেখানে পেরেছে লুকিয়েছে।

নাইজিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াকুবু গওয়ন বিদ্রোহ দমনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, সাধারণ বায়ফ্রাবাসীর কোন ভয় নেই। তাদের ওপর কোনরকম নির্যাতন করা হবে না। নাইজিরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরূপে তারা অন্যদের সঙ্গে সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে। যদি কোন নাইজিরীয় সৈন্য বায়ফ্রার কারও ওপর কোন নির্যাতন করে তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইয়াকুবু গওয়ন অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলেছেন, যেসব ব্যক্তি বায়ফ্রার বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে, তাঁদের অধিকাংশই এখন দেশের বাইরে।

আফ্রিকা ঐক্য সংস্থা (অরগানিজেশন অব আফ্রিকান য়ুনিটি, বা ও-এ-য়ু) উপজাতীয় কলহের দরুণ কোন একটি অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা সমর্থন করে নি। কারণ, একবার বায়ফ্রার স্বাধীন অস্তিত্ব মেনে নিলে বহু আফ্রিকীয় দেশেই বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখা দেবে। ইতি-মধ্যেই নানা ধরনের উপজাতি ও জাতীয় বিরোধ বিভিন্ন দেশে রয়েছে। তবে আফ্রিকা ঐক্য সংস্থা, বিশেষ করে ইথিও-পিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি নাইজিরীয় গৃহযুদ্ধের একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন। অনেক-গুলি বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন কাজ হয় নি। আজ গৃহযুদ্ধের অবসানে আফ্রিকার নেতারা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন।

নাইজিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বেশ ভাল রকমের ছিল। বৃটেন ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে। অঢেল বৃটিশ ও সোভিয়েট অস্ত্র পেয়েছে ইয়াকুবু গওয়নের সরকার। বিপরীত দিকে ফরাসী ও মার্কিন সরকারের সমর্থন ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী বায়ফ্রার দিকে। তবে অস্ত্র প্রেরণের অসুবিধার জন্য খুব একটা অস্ত্র পাঠাতে পারে নি তারা। তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ বায়ফ্রার দিকে নজর ছিল সকলেরই।

---

**সবিনয় নিবেদন**

**স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় হরপ্রসাদ মিত্রের "বই বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা" ও 'অগ্নিবর্ণ'-এর "তিমির প্রান্ত ভূয়ার্স" প্রকাশ করা গেল না।**

**—সম্পাদিকা**

---

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট, পোপ পল, সবাই ইয়াকুবু গওয়নের কাছে আবেদন করেছেন, বায়ফ্রার লোকেদের ওপর যেন কোন নির্যাতন না হয়। আশা করা যায়, গওয়ন একথা মানবেন। ইতি-মধ্যেই তিনি সেই মত নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথম দিকে ইয়াকুবু গওয়ন বিদেশী সেবা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতেও রাজী হন নি। বায়ফ্রায় বড় রকমের একটা দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আসন্ন, এই আশঙ্কায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেবা-প্রতিষ্ঠান খাবার ও ওষুধ পাঠাতে চায়। কিন্তু ইয়াকুবু গওয়ন বলেছিলেন, এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বায়ফ্রার বিচ্ছিন্ন-তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তাই এদের সাহায্য নেওয়া হবে না। আর তাছাড়া, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আশঙ্কাও অমূলক। যেটুকু করার তা নাইজেরীয় সরকারই করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জনমতের কাছে ইয়াকুবু গওয়ন মাথা নত করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রেরণের অনুমতি দিয়েছেন।

গৃহযুদ্ধ অবসানে আশ্বস্ত নাই-জিরিয়ার লক্ষ লক্ষ মুসলমান ও ক্রিশ্চিয়ান মসজিদ ও গীর্জায় বিশেষ উপাসনায় যোগ দিয়েছে।

**সোভিয়েট য়ুনিয়ন :**

সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রস্তাবিত য়ুরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানে তাদের আপত্তি নেই। সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র লিওনিদ জামায়াতিন ১৩ই জানুয়ারী মস্কোর এক সাংবাদিক সম্মে-লনে এই কথা বলেন।

জামায়াতিন জানান, ডিসেম্বর মাসেই সোভিয়েট য়ুনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের এই মনোভাবের কথা জানিয়ে দিয়েছে। ওয়াশিংটনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আনাতোলি দবরিনিনের মারফৎ মার্কিন সরকারকে এই কথা জানানো হয়েছে। পূর্ব য়ুরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও একই কথা বলা হয়েছে।

য়ুরোপে ঠাণ্ডা লড়াই-এর উত্তেজনা হ্রাস এবং শান্তির সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য, পশ্চিমীদের 'ন্যাটো' ও কমিউনিস্ট-দের ওয়ারশ' গোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, ওয়ারশ' চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে য়ুরোপীয় নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনার জন্য এক সম্মেলনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ব্রাসেলসে 'ন্যাটো'-র অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রপ্রধান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এই সম্মে-লনের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নি। অনেক রাষ্ট্রই এই সম্মে-লনের পক্ষে। এখন কিভাবে এই সম্মেলন হবে, তাই বিবেচনার বিষয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র য়ুরোপীয় শক্তি নয়। সেই হিসাবে কোন য়ুরোপীয় সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ডাকার কথা নয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে নিরাপত্তার আলোচনা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেঁকে বসলে হয়তো 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর অনেক য়ুরোপীয় রাষ্ট্রই সম্মেলনে যোগ দিতে রাজী হবে না। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে বসাই ভাল।

এই কারণেই সোভিয়েট য়ুনিয়ন এই মনোভাব গ্রহণ করেছে। সবাইকে নিয়েই আলোচনা করা যাক।

ওয়ারশ' গোষ্ঠীর প্রস্তাব, এই বৎসরের মাঝামাঝি এই সম্মেলন হোক।

(১৮-১-৭০)

"ছায়ার সাথে লড়াই করে গাত্রে হইল ব্যথা"। এই লড়াইও যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্র এই গায়ের ব্যথা। আগে যখন স্বর্গত সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল বইয়ের পাতা খুলে এই কবিতা পড়তাম, তখন কত না আনন্দ পেতাম। কিন্তু সেই কিশোর মনে কখনও ভাবিনি, রাজ্যের রাজনীতিবিদদের রচনা সেই আবোল-তাবোল নতুন করে পড়তে হবে, আর ছায়ার সঙ্গে লড়াইয়ের বাস্তব দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে। সুকুমার রায় বেঁচে নেই, বেঁচে নেই সুকান্ত, বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই নজরুল ইসলাম, যিনি আর কিছু না হোক, হাঁক দিয়ে বলবেন—দে, গরুর গা ধুইয়ে। এই কালের কবিরা—যে যত বড়ই হোন না কেন, কেউ কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত, সুকুমার রায়, সুকান্ত বা নজরুল-এর পর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কবিতা রচনা করছেন না। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় যত ভাল কবিতাই লিখুন না কেন, তাঁরা আজ পর্যন্ত আজকের রাজ্য রাজনীতি নিয়ে এমন কোন কবিতা লিখলেন না, যা ঐ সুকুমার রায়ের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা হতে পারে। সেই কবে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন—"তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর 'পর রাগ করো, তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো।" সুকুমার রায়ের পর একমাত্র অন্নদাশঙ্কর রায়ই ধেড়ে খোকাদের কীর্তি-কাহিনী লিখেছেন। সুকুমার রায়ের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ আর অন্নদাশঙ্কর রায়ের ধেড়ে খোকাদের কান্ড—দুই মিলিয়ে যে ছবি, সেই ছবি হল আজকে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও নেতৃবৃন্দের বাস্তব ছবির একাংশ। তাই এই কালের কবিদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা দয়া করে একটু রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির দিকে তাকান। খবরের কাগজের কার্টুনিস্টরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, আপনারা এসে লেখনি ধরুন, গৌড়জন কাব্যের মাধ্যমে রাজ্য-রাজনীতির রস গ্রহণের সুযোগ লাভ করে ধন্য হোক। কারণ খবরের কাগজের রিপোর্টার আর ভাষ্যকার কেউই সঠিক রসে প্রকৃত অবস্থা পরিবেশন করতে পারছেন না।

গত তিন-চার মাস ধরে রাজ্য রাজনীতিতে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে—অভাবনীয়, অকল্পনীয় যুদ্ধ—অসাধারণ যুদ্ধ। যুদ্ধ করছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, যুদ্ধ করছেন শ্রীজ্যোতি বসু, যুদ্ধ করছেন শ্রীসুশীল ধাড়া, যুদ্ধ করছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। বনবন করে ঘুরছে জিহবার তলোয়ার, কাটা পড়ছে একের পর এক মুন্ডু। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাঠ-ময়দান, প্রান্তর। চিল, শকুন, কাক লোভার্ত হয়ে নেমে আসছে আকাশ থেকে, শৃগাল-কুকুর ছুটে আসছে বন-বাদাড় ভেঙে। মচ্ছোব লেগে গেছে রক্ত-মাংস গলিত শবের। কিন্তু ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে যোদ্ধারা যখন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের টেবিল ঘিরে বসছেন, তখন দেখা যাচ্ছে, ছায়া শুধু ছায়া, যুদ্ধ নেই, কাটা মুন্ডু নেই, গলিত শবের পূতিগন্ধ নেই—আছে টেবিলে সাজানো সুগন্ধী বাহারের ফুল, হাতে তলোয়ার বা মারণাস্ত্র নেই, আছে কাঁটা-চামচ আর মালপোয়া পিঠে, পেসট্রি, প্যাটিস্, কেক, চপ, চানাচুর। আগুন নেই, আছে ধোঁয়া—যে ধোঁয়া শুধু শিবির প্রজ্বলন বা অগ্নিকান্ডের নয়—গরম কফির। শুধু আছে গাত্রে ব্যথার চিহ্ন—যে চিহ্নগুলি বহন করছে নিত্য দিনের খবর কাগজগুলি। গত চার মাসে যে দৃশ্য দেখেছি—এ হল তার সঠিক চিত্র। ছায়ার সঙ্গে লড়াইয়ের সামান্য বিবরণ।

সব কথা বলবার আগে একটা কথা আবার বলে কথা সুরু করতে চাই। কারণ যত কথাই লেখা হোক আর বলা হোক, সেই কথাটাই হল আসল কথা। সেই কথাটা হল যুক্তফ্রন্ট সরকার ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা। প্রকৃতপক্ষে প্রভাতী সংবাদপত্রে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের অমৃত বাণীসমূহ পাঠ করে দেশবাসী শুধু বিভ্রান্ত নন, তাঁরা অনেক সময় বুঝেই পান না—কোন্টা আসল আর কোন্টা নকল, কোন্টা সত্য আর কোন্টা মিথ্যা—সরকার আছে, কি সরকার নেই। কাজেই সরকার সম্পর্কে অবস্থাটা বলে নিয়ে অন্য কথা বলা ভাল। কারণ পাঠকদের সকলেরই মনে আছে, বড় বড় কাগজের বড় বড় সাংবাদিকরা গত অক্টোবর মাস থেকেই সরকার সম্পর্কে ক্রমাগত ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছেন—সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সার কথা হ'ল, সরকার থাকছে না, সরকার ভেঙে যাচ্ছে

ইত্যাদি ইত্যাদি। কথনও কখনও সরকার কবে যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, তার দিন তারিখও অনেকেও বলে দিয়েছেন। কিন্তু একমাত্র সাপ্তাহিক বসুমতীই সেই অবস্থার মধ্যে প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরে বসে এসেছেন—না, সরকার যাচ্ছে না, সরকার যাবে না, সরকার চলবে। কিন্তু কেউ কেউ বলতে পারেন—মশায়, এটা কি সরকার চলা হ'ল, এর নাম কি সরকার চলা বলে? কি সব বলছেন অজয়বাবু? কি বলছেন জ্যোতিবাবু? এর পর সরকার চলছে বলেন কি করে? আমি এই ব্যাপারটার একটা পরিষ্কার ধারণা পাঠকদের দিতে চাই। সরকার থাকছে—সরকার ভাঙছে না—এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু কিভাবে থাকছে সেই সত্যটা বুঝে নেওয়া দরকার।

সরকারের থাকা-না-থাকা সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণ প্রধানত দেখা দেয় একটি কারণে। সেই কারণ হল, যাঁরা রাজ্যের প্রশাসন-শীর্ষে আছেন, তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে, সরকার সম্পর্কে, এমন কি একে অপরের সম্পর্কে যে সব কথা বলেন—সেইগুলো শুনেই সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় আসে। যেমন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বললেন—"সরকার অসভ্য, বর্বর।" শ্রীজ্যোতি বসু বললেন—"মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন লণ্ডভণ্ড করে দিতে চক্রান্ত করছেন, মন্ত্রিত্বের লোভে তিনি এত নিচুতে নেমেছেন কল্পনা করাও যায় না।" শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তও বললেন—"মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় নিজেকে কুকুর বলেন—উনি জোতদারের কুকুর। সরকার ভাঙবার চক্রান্ত করতে গান্ধীবাদী নেতার হাত নিসপিস করছে।" শ্রীসুশীল ধাড়া বললেন—"মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির অনমনীয় মনোভাবই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের প্রথম থেকে ঐক্য রক্ষার বাধাস্বরূপ হয়েছে, আর এই মনোভাবই যুক্তফ্রন্টকে চূড়ান্ত ভাঙনের মুখে এনে দিয়েছে।"

অন্য সকলের কথা বাদ দিলেও মাত্র এই চারজন নেতার গত চার মাসের বক্তৃতা যদি আমরা মনে রাখি, তবে মনে হবে সরকার নেই, সরকার থাকবার অর্থ নেই। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে—সরকার ঠিকই চলছে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঐকমত্যের কোন অভাব নেই। বাইরে যত তর্জন-গর্জন, চুলোচুলি হোক না কেন, সরকারী তক্তে বসে সকলে ভাই-ভাই। এই ব্যাপারটাই বোঝা দরকার। কখনও মনে হতে পারে, এ'রা মন্ত্রিত্বের চেয়ারে বসে থাকলে ডাঃ জ্যাকিল, কিন্তু ময়দানে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এ'রা সকলে মিঃ হাইড। আমি কিন্তু এই মতে বিশ্বাসী নই। আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই—বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা আমার কাছে কোন বিস্ময়ের নয়, কোন অভাবনীয় নয়। এবং পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাবে। কেউ বলতে পারেন—না, তা কি করে সম্ভব? কেউ বলতে পারেন—না না মশায়, এইভাবে চলার চেয়ে না চলা ভালো। এই কথার সহজ জবাব হল—এইভাবে চলা যদি অসম্ভব হয়, তবে সম্ভবটা কি? চোদ্দ পার্টি এক সঙ্গে বসে সরকার চালাচ্ছে—এটা কবে কোথায় সম্ভব হয়েছে? সমগ্র বিশ্বের রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার হল সবচেয়ে বড় ও বিস্ময়কর এক্সপেরিমেণ্ট। এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে জগতে কত রকমের দুর্ঘটনা ঘটেছে—সেটা বোমা বানাবার এক্সপেরিমেণ্ট হোক, আর চন্দ্র জয়ের এক্সপেরিমেণ্টই হোক। আকাশ জয়ের পরীক্ষায় অনেক মানুষ যেমন প্রাণ দিয়েছে, তেমনি বানর-কুকুরও প্রাণ দিয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ চাঁদে গেছে, চাঁদ জয় করেছে। এই ক্ষেত্রেও তাই। এত বড় যে পরীক্ষা চলছে, সেই পরীক্ষার যদি একটা বানর, একটা কুকুর মরে, তবে বিস্ময়ের কি আছে? পশ্চিমবঙ্গে যে চোদ্দ পার্টি সরকার চালাচ্ছে তা

আছেই হিংসা আছে, অহিংসা আছে, মাওবাদ-লেনিনবাদ আছে, কাস্ত্রো আছে, গান্ধী আছে, নেতাজী আছে—কে নেই আর কি নেই? তাঁরা সকলে বসে এক [illegible] চালাবেন। কোনো সংকট ও সংঘর্ষ দেখা দেবে না? তবে কি সংকট ও সংঘর্ষ দেখা দেবে স্বামী-স্ত্রীর সংসারে? কিন্তু শুধু স্বামী-স্ত্রীর সংসারেও কি সব সময় শান্তি থাকে—তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টাই গলা জড়িয়ে চাঁদ, আকাশ, ফুল দেখে দিন কাটাতে পারেন? পারেন না। রাজ্যের অনেক মন্ত্রী একদিন এই প্রসংগে একটা ভাল কথা বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—দেখুন, আমাদের মন্ত্রিসভা হল ছোটলোকের সংসার। এই ছোটলোকের কাজ হল—দিনভরে স্বামী-স্ত্রী সংসার চালাতে পরিশ্রম করে আর দুইজনে চুলোচুলি, একে অপরের বাপান্ত করে। কিন্তু বৎসরান্তে দেখা যায়, ছোটলোক গিন্নী দিব্যি সুন্দর একটি শিশু উপহার দিয়েছে। নতুন শিশুর জন্মে ঐ দিনভরের চুলোচুলির কোন চিহ্ন নেই। তাই আমরা দিনভরে মাঠে-ময়দানে যে যাকে যতই গালি দিই, যতই বাপান্ত করি—রাজ্যের মানুষকে নতুন শিশু, অর্থাৎ সুখ, সমৃদ্ধি, আনন্দ দিতে আমাদের এই চুলোচুলি কোন বিঘ্ন ঘটাবে না। এই সত্যটা বোঝা থাকলে অনেক কিছুই পরিষ্কার মনে হবে। যেমন ধরুন, গত ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি আড়াইটার সময় মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় কয়েক শত মাইল পথ অতিক্রম করে কয়েক গণ্ডা জনসভা করে কুলটি পৌঁছলেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার যেমন বিস্ময়ের, মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের এই সভাও তেমনি বিস্ময়ের। শীতের রাত আড়াইটার সময় কয়েক হাজার মানুষ বসে আছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনতে। সেই দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই সভাতেই রাত্রের শেষ প্রহরের বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী বললেন—গৃহস্থের প্রভুভক্ত কুকুর যেমন শীতের রাতেও গৃহস্থের ঘুম ভাঙিয়ে গৃহস্থকে চোর-ডাকাত থেকে সজাগ করে দেয়, আমিও রাজ্যের জনগণের সেই প্রভুভক্ত কুকুরের মত সজাগ করে দিতে এসেছি। মুখ্যমন্ত্রী বললেন—আপনারা আমাদের হাতে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ঘুমিয়ে থাকবেন না, আপনারা আমাদের মনিব। যদি আমরা ভুল করি, তবে কান ধরে গদি থেকে নামিয়ে দেবেন।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন—মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে কুকুর বলছেন, কিন্তু তিনি

[শেষাংশ ১৮৭৬ পৃষ্ঠায়]

# উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র

## নির্মল বসু

**নেতাজী** সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম করেছেন। ভারতের বুক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করেছে, সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম, বিশেষ করে তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই ও আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শেষ আঘাত হেনেছে, এবং ভারতের স্বাধীনতাকে সম্ভব করেছে।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র কেবলমাত্র ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদের অবসান চান নি, বিশ্বের সর্বত্র তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান কামনা করেছেন। যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করেছে, সুভাষচন্দ্র সেখানে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন: "আমাদের সংগ্রাম কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, এই সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তবে ব্রিটিশ শক্তিই হল এই সাম্রাজ্যবাদের মূল স্তম্ভ। তাই, আমরা কেবল মাত্র ভারতের জন্য নয়, বিশ্বমানবতার জন্য লড়াই করছি।"

হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, সকল সাম্রাজ্যেরই পতন অবশ্যম্ভাবী।

আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সুভাষচন্দ্র সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখায় বারে বারে তিনি সিন্ ফিন্ ও অন্যান্য আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন। ডি ভ্যালেরার প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আরবদের মুক্তি সংগ্রামকে সুভাষচন্দ্র সমর্থন করেছেন। প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিভেদনীতি সম্পর্কে তিনি বারে বারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। মিশরের নাহাশ পাশার নেতৃত্বে পরিচালিত ওয়াফদ দলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেস সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের আমন্ত্রণে ওয়াফদ দলের এক প্রতিনিধি দল যোগ দিয়েছিলেন।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আচরণের তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। পরবর্তীকালে সংগ্রামকৌশল হিসাবে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য, সুভাষচন্দ্র জাপানের সমর্থন নিলেও, চীনের ওপর জাপানী আক্রমণকে সুভাষচন্দ্র সমর্থন করেন নি। এর বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন (মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭-এ 'জাপান'স রোল ইন দি ফার ইস্ট' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বেই কংগ্রেস কমিটি চীনে দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য মেডিক্যাল মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত করে।

অপর দেশের স্বাধীনতালাভে সুভাষচন্দ্র সর্বদা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্মার স্বাধীনতাপ্রাপ্তিতে উল্লসিত হয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের ১৫ই আগস্ট সিঙ্গাপুরের ফারের পার্কে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, এবং স্বাধীন বার্মা ও তার নেতাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বার্মার স্বাধীন সরকার ও জনসাধারণের সহৃদয় সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সুভাষচন্দ্র এই আশা প্রকাশ করেন যে উভয়ের শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

সীমান্ত গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র

উভয় দেশের জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করবে।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের ফলে কেবলমাত্র ভারতেই বৃটিশ শাসনের বুনিয়াদ ভেঙে পড়ে নি, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদেশী শাসনের ভিত্তি কেঁপে উঠেছে, সর্বত্র মুক্তি-আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটির পর একটি দেশের স্বাধীনতা লাভের পেছনে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ তারিখে বার্মার পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকিন নু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নিকট লিখিত পত্রে এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন, কেবল ভারত নয়, সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় সমগ্র পূর্ব এশিয়া স্বাধীনতা লাভ করবে। নু'র আশা সফল হয়েছে।

উপনিবেশবাদের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের পেছনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থ রয়েছে, এবং উপনিবেশবাদের অবসানের ফলে পুঁজিবাদের অবসানও ত্বরান্বিত হবে, সুভাষচন্দ্র এ কথা বলেছেন। এ দিক থেকে তাঁর মতের সঙ্গে লেনিনের চিন্তাধারার পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। হরিপুরা ভাষণে তিনি উপনিবেশবাদ ও বিশেষভাবে বৃটিশ উপনিবেশবাদ সম্পর্কে লেনিনের মতের আলোচনা করে বলেছেন, উপনিবেশের শোষণের ওপরেই বৃটেনের অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণী টিকে আছে। ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তির ফলে বৃটেনের পুঁজিবাদী শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এবং পরিণতিতে বৃটেনেও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং, উপনিবেশবাদের অবসান ভিন্ন বৃটেনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ভারত তথা অন্যান্য দেশের ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রাম তাই কেবলমাত্র সেই সব দেশের স্বাধীনতার জন্যই নয়, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও তারা সংগ্রাম করছে।



---

[১৮৭৪ পৃষ্ঠার পর]

কার কুকুর? কুকুর তো বড়লোক পোষে, মুখ্যমন্ত্রী জোতদারের কুকুর। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যের একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা, সবচেয়ে বড় দলের বড় নেতা। তিনি মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমার কিছু বলার ধৃষ্টতা থাকা উচিত নয়। তবে একটা কথা কিন্তু আমি জানি, **সেই কথা হল—মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে এই প্রভুভক্ত দীনতম সেবকরূপে পরিচয় আজই প্রথম দিচ্ছেন না, ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বা গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই কথা বলেই রাজ্য থেকে ভোট কুড়িয়ে যুক্তফ্রন্টের ভাণ্ডার ভর্তি করেছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে কুকুর সাজে বহু বক্তৃতাই দিয়েছেন যেখানে সি-পি-এম দল নেতারা অনেকে পাশে বসে শ্রোতাদের সঙ্গে এক হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা উপভোগ করেছেন।** কিন্তু আজ সেই দলের সেই কথা সহ্য করতে পারছেন না অনেকে। এই কথাটা শুধু উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, বহু সময় হয়, যখন "যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা"। আজ যুক্তফ্রন্টের সেই অবস্থা। গত নির্বাচনের সময় আরামবাগের গোরহাটিতে এক জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুশীল ধাড়া। সেই সভাতে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তও বলেছিলেন—আমরা যদি জমি সংক্রান্ত সরকারী নীতি বা ফ্রন্টের নীতি না মানি, তবে সুশীলবাবুরা আমাদের ছাড়বেন কেন? কিন্তু আজ কেউ কি কল্পনা করতে পারেন, শ্রীসুশীল ধাড়া আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। অথবা আজ বোধ হয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসুও এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে অসাড় বোধ করবেন।

এই অবস্থা থেকে রাজ্য রাজনীতির সঠিক মূল্যায়ন কি হতে পারে—সেটা বুঝতে পারলে অনেক ঝামেলা কমে যাবে। **এই সব অবস্থা অনুশীলন করলে বোঝা যাবে—আজ প্রকৃতপক্ষে সরকার ও যুক্তফ্রন্ট দুটো আলাদা অস্তিত্বের প্রাঙ্গণে বা মঞ্চে পরিণত হয়েছে। সেই আলাদা আলাদা হলে—আজ সরকার চলবে, তখন ভাই-ভাই, আর যখন ফ্রন্ট চলবে, তখন ঠাঁই-ঠাঁই। ফ্রন্টের ভাইরা মন্ত্রিসভায় এ**[সে] **ঠাঁই-ঠাঁই করবে না। গত বৎসর** [যুক্ত]**যুক্তফ্রন্টের পরিচালনা করতে যেয়ে যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলি এই পথ গ্রহ**[ণ] করেছেন যে, তাঁরা ফ্রন্টে থেকে দলে[র] নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, রাজ[-]নৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লড়া[ই] করবেন, এক দল আর এক দলকে উকুনে[র] মত নখে পিষে মেরে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করবেন। ফ্রন্টে রাজনৈতিক হিস্যা নি[য়ে] চুলোচুলি হবে, কিন্তু মন্ত্রিসভায় তা[র] আঁচ লাগবে না। তাই তো দেখা যায় যে ১৪ তারিখে যুক্তফ্রন্টের যখন সভা হয় না পরন্তু দুই বাড়িতে ভাগ হয়ে যুক্তফ্রন্টে[র] ভাঙা চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে, তখন তা[র] পরের দিন অর্থাৎ ১৫ তারিখে রাজ[্য] মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যপালের ভাষ[ণ] রচনা নিয়ে কোন মতবিরোধই দেখা দে[য়] না। পরন্তু শ্রীসুশীল ধাড়া যে সাজেশা[ন] দেন, শ্রীজ্যোতি বসু তার স্পিরিট নি[য়ে] ভাষণে কিছু সংযোজন করেন। আবা[র] যাঁরা বাইরে শ্রীসুশীল ধাড়া সমর্থক ব[লে] খ্যাত, তাঁরাই শ্রীধাড়ার আইন-শৃংখলা গত কোন একটা প্রশ্নে শ্রীজ্যোতি বসু[র] অপেক্ষা বেশি দ্বিমত পোষণ করেন।

তাই এখন যুক্তফ্রন্ট একটা নতু[ন] পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলবে। তার আর[ও] স্পষ্ট রূপ ধরা পড়বে বিধানসভার অধি[-]বেশনে, সেখানে দেখা যাবে বিরোধ[ী] দলের আক্রমণ থেকে সরকারকে রক্ষা[য়] শ্রীজ্যোতি বসুর সবচেয়ে বড় সহায়[ক] হবেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, আর শ্রীঅজ[য়] মুখোপাধ্যায়ের মাথায় সব বড় ঢাল ধরবে[ন] শ্রীজ্যোতি বসু। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার আ[র] শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—এখানে হরেকে[ষ্ট] আর বিশ্বনাথ রূপেই পরিচিত হবেন কেউ কারো কাছে শোধনবাদী নন, ডাঙ্গ[া-]পন্থী নন, উভয়ই এক সরকারের কর্ণধার শ্রীসুশীল ধাড়াকে দেখা যাবে শ্রীজ্যোতি বসু আর শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার দুই জনে[র] পাশে বসেই শ্রীসিদ্ধার্থশংকর আর শ্রীমত[ী] আভা মাইতির আক্রমণ থেকে রক্ষা কর[তে] দুই হাতে তরবারি ঘোরাচ্ছেন। রাজ্যে যুক্তফ্রন্টের ঝগড়া দেখে যাঁরা সরকারে[র] ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচলিত অথবা উল্লসিত তাঁরা কেউ উল্লসিত হবেন, কেউ হতাশ বিচলিত হবেন।

তাই বলছিলাম এই লড়াই হল ছায়া সঙ্গে লড়াই, যে লড়াইতে গাত্র ব্যথা সার। তবে গাত্র ব্যথা যারা লড়াই ক[রে] তাদের হয় না, হয় যারা এই লড়াইয়ে[র] দর্শক তাদেরই বেশি।

—১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭[০]

[illegible] রাতের অন্ধকারে বৃটিশ জাঁদরেল কলকাতা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মহিনিষ্ক্রমণের পাড়ি দিয়েছিল বিশ্বজোড়া অদ্বিতীয় মহাপুরুষের ডামাডোলে উপেক্ষা দিয়ে, কলকাতার বুকে সে রাস্তার নাম নেতাজী সরণী নয়, আজও সে রাস্তাটি বিদেশী [illegible]—এলগিন রোড। অথচ এলগিন রোডই ভারতের প্রথম ফ্রিডম রোড।

বৃটিশ প্রভুর নজরবন্দী সুভাষ বোস ঐ এলগিন রোডের বাড়ি থেকেই প্রথম স্বাধীন ভারতবাসীরূপে পা ফেলেছিলেন সারা পৃথিবীতে। এলগিন রোডই উপহার দিয়েছিল ভারতের প্রথম স্বাধীন সর্বাধিনায়ককে। যিনি শূন্য হাতে ফকিরের বেশে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে উল্কার মতো ধেয়ে চলেছিলেন, সাক্ষাৎ করেছিলেন শক্তিশালী বৃটিশ শত্রুর সঙ্গে। উদ্দেশ্য, বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বৃটিশ বৈরীদের নিঃশর্ত সাহায্য বাইরে থেকে ভারত আক্রমণ করে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করা। কিন্তু সেদিন এলগিন রোডের সেই বীর যুবকের আহ্বানে নিস্তেজ ভারতবাসী সাড়া দিতে পারে নি। ভারতের ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতারা বরং নেতাজীর মহৎ উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে গণবিভ্রান্তির চেষ্টাই করেছিলেন। কারণ তাঁরা সর্বত্যাগী সৈনিকের উজ্জ্বল ভাস্বরতায় নিজেদের ম্রিয়মাণ হতে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। আপোষে দেশ ভাগ করে ক্ষমতালাভের উগ্র নেশায় যখন চোখে সবেমাত্র আরাম আর সুনিদ্রার আবেশ ধরবে, তখন দুর্দান্ত বিপ্লবীর উৎপাত তাঁদের তটস্থ করেছিল। বৃটিশের দাক্ষিণ্যের শীতল ছত্রতলে বসে ওঁরা কুচক্রী বানাতে চেয়েছিলেন তাঁকেই, সমগ্র দেশ যে প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্রকে ছাড়া দ্বিতীয় কারুকে অবিসম্বাদী 'নেতাজী' বলে মেনে নিতে পারল না।

এই অক্ষমতা ঢাকবার জন্য সবচেয়ে যে বড় অপবাদ এলগিন-রোড-পলাতক মহান বিপ্লবী নেতার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, তা হল, সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ত শক্তির তাঁবেদার হয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছেন; খাল কেটে কুমীর ডেকে আনছেন তিনি। কিন্তু অঙ্গারকে শতেকবার জলে ধুলেও যেমন তার রঙ ফর্সা হয় না, হীরেকে তেমনি অন্ধকারে চেপে ধরলেও তার ঔজ্জ্বল্যে ঘাটতি আনা সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত সূর্যের তেজ ইনমানে বগলদাবা করতে পারে নি। এলগিন রোডের ঝড় বৃটিশ যুযুকে ভারতের ভিটেছাড়া করে ছেড়েছিল। তথাপি চিরকাল 'আনস্ক্রুপিউল্যাস'দের (অর্থাৎ বিবেকবর্জিতদের) কপালই ভাল। তাই নেতাজীকে নিজেদের মধ্যে চাইলেও আমরা তাঁকে পেলাম না। গদী দখল করে নবাবী আলবোলায় আসর জাঁকিয়ে বসলেন অন্যানারা।

এলগিন রোড এলগিন রোড হয়েই পড়ে রইল। নেতাজী ভবনে একটা নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো তৈরি হল মাত্র। বিপ্লবের জন্মভূমি কলকাতা বিপ্লববিমুখ সুবিধেভোগী বিজনেসম্যানের হাতে বিকিয়ে গেল।

এখন এলগিন রোডের অনাতর ইজ্জত নেই। এলগিন রোড বললে বুঝি, পয়সাওয়ালা পসারওয়ালাদের ব্যয়বহুল বাসস্থান বুকে করে পড়ে-থাকা একটা নিশ্চুপ বোবা রাস্তাকে, যার উত্তরে হিন্দুস্থান হোটেল স্বাধীন ভারতের হঠাৎ-বিত্তের নয়া নজীর।

নেতাজীকে ঘিরে একদিন আবেগের বান ডেকেছিল, এখন সবে ধন নীলমণি কলকাতা ছাড়া নেতাজীকে অন্যত্র বিস্মরণের পালাই চলেছে। এই মানসিকতার মূলেও সম্ভবত একজাতীয় হীনমন্যতাই ক্রিয়াশীল। ২৩শে জানুয়ারী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকাশিত দৈনিক পত্রপত্রিকাগুলি পর্যন্ত 'অবিচুয়ারী' ঢঙে কোয়ার্টার কলমেরও কম স্থানে নেতাজীকে জায়গা দিয়ে থাকে। সে কাগজ যদি আবার কম্যুনিস্ট ঘেঁষা হয়, নিদেন পক্ষে কৃষ্ণমেনন (বা ইদানীংকালে ইন্দিরা গান্ধীর) সমর্থকও হয়, তবে তো সেখানে নেতাজীর জন্য চিঠি লিখে জায়গা আদায় করতে হবে। এই অপ্রিয় কাজটি 'মিত্রেন'কে স্বয়ং করতে হয়েছে দিল্লীর 'পেট্রিয়ট' কাগজে ভারতের একমাত্র খাঁটি 'পেট্রিয়ট' [illegible] জন্য স্থানসংকুলানের উদ্দেশ্যে [illegible] করে। ওঁরা নেতাজী সম্পর্কে মাত্র [illegible] জায়গা দিয়েছিলেন মিত্রেনের প্রতিবাদ-পত্র ছেপে। নেতাজীর লালকেল্লা জয়ের স্বপ্ন যে অসমাপ্তই রয়ে গেছে, ওঁরা তা জানেন।

কিন্তু মরুকগে, ইতিহাস অস্বীকারকারীদের ব্যর্থ চেষ্টা ঘিরে তো আর আমার বক্তব্য নয়। আমাকে কলকাতার দিকেই চোখ ফেরাতে হবে। এই কলকাতাই কি নেতাজীকে ক্রমশ বিস্মৃত হচ্ছে না?

দুটি ঢাউস প্রস্তরমূর্তি অবশ্য রাজভবন আর শ্যামবাজারের মোড়ে কলকাতা পৌরসভার ঋণশোধের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু কলকাতার ইতিহাসে ঐ দুই প্রস্তরমূর্তি নিয়ে কর্পোরেশনের কীর্তিও খুব শ্রুতিসুখকর নয়। দেশে হরিপুরা, ত্রিপুরী থেকে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে পলিটিক্স অনেকই হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র নেতাজী হওয়ার পরও গান্ধীবাদীরা তাই তাঁকে স্বীকার না-করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন বার বার। কিন্তু দেশবন্ধুর ভক্তিমুগ্ধ সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের অনেক বেশি করণীয় ছিল, কর্তব্য আছে। সেই কর্পোরেশনের মেয়র অল্ডারম্যান কাউন্সিলররা শ্যামবাজারের মূর্তি নিয়ে কত কাণ্ডই না করেছিলেন। রাজভবনের সামনেও 'বড়া তেজী' পুরুষের মূর্তিকে ঘিরে ঢের পলিটিক্স হয়েছিল। লালবাড়ি কাঁপিয়ে কংগ্রেসী ক্ষমতাচক্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছিলেন তদানীন্তন বিরোধী কাউন্সিলররা। শ্যামবাজারের মূর্তির সঙ্গে প্রাক্তন মেয়র

গোবিন্দবাবু আর শেষ পর্যন্ত নিজের নাম জড়িয়ে রাখার সুযোগ পান নি। কর্তাদের কৃতিত্বে নেতাজীর মূর্তিকে অবশেষে প্রকান্ড লাঙ্গুলবিশিষ্ট একটি ঘোড়ার পিঠে ঢের টালবাহানার পর খেবড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলগিনের বীরপুরুষ শ্যামবাজারে থতিয়ে পড়েছেন।

তবু কলকাতা দু'-দুটি বড় সাইজের মূর্তি পেয়েছে, যার দুটিই অল্পবিস্তর ডিফেক্টিভ। যাক এইটুকুও যে হয়েছে, সে-ও আমাদের ভাগ্য। কারণ সেই যেবার শাহ নওয়াজ নেতাজীর জন্মবারে শোভাযাত্রার পুরোভাগে হিরো হয়েছিলেন; কলকাতা হয়েছিল নেতাজীময় সেবারই: তারপর শোভাযাত্রার সেই বিরাটত্ব কবে ক্রমে ক্রমে শীর্ণকায় হয়ে এসেছে। কলকাতার গগন-মনে অনুরণন তুলে মঙ্গল শঙ্খের পুণ্যমুহূর্ত ঘোষণাও ক্ষীণস্বর হয়েছে। ঘরে ঘরে পতাকা ও নেতাজী বন্দনা, ভোর সকালের প্রভাত ফেরী, সহস্র কণ্ঠের জয়হিন্দ্ এবং লাউড স্পীকারে কদম কদম বড়ায়ে যা গীতি গত দু'-এক বছর কলকাতাকে আর উৎসবমুখর করছে না।

এ বছর অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে ময়দানে নেতাজী প্রদর্শনীর বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। জানি না সে জিনিস কেমন হবে। অবশ্য বিশ্বাস করা যেতে পারে, ইন্ডাস্ট্রীয়াল এক্জিবিশনের মতো নিছক একটা লোক-ঠকানো পয়সা-ওঠানো ব্যবসায় মেলা মাত্র হবে না ওটা। কেন না নেতাজীর হাতে গড়া ফরওয়ার্ড ব্লকই ঐ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা। নিশ্চয় আর যাই থাক, প্রদর্শনী নেতাজী-হীন হবে না, যেমন হয়েছে ইন্ডাস্ট্রীয়াল এক্জিবিশন। সেখানে শিল্প (ইন্ডাস্ট্রী) বা সংস্কৃতির নামগন্ধ নেই। তবু তাকে বলা হয়েছে ইন্ডাস্ট্রীয়াল এন্ড কালচারাল এক্জিবিশন।

ফরওয়ার্ড ব্লক একটা মহৎ ব্যাপারে হাত দিয়েছেন।

কর্পোরেশন কস্মিনকালেও মনপ্রাণ থেকে কো-অপারেশন করলেন না ২৩শে জানুয়ারী সমস্ত কলকাতাকে সাজিয়ে উৎসবমুখর করার জন্য। অথচ সি আর দাশ, জে এম সেনগুপ্তের পর সুভাষচন্দ্রের মতো মেয়র কর্পোরেশন আর কবে পেয়েছে? প্রশাসনিক ক্ষমতা, সব ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণের মেজাজ তাঁর মতো আর ক'জনার ছিল? কর্পোরেশনের তদানীন্তন কর্মিবৃন্দ সুভাষচন্দ্রকে এক্সিকিউটিভ অফিসাররূপে পেয়েই বুঝেছিলেন এমন একজন এসেছেন যিনি রাস্তা সাফাইকাব থেকে ছোট-বড় প্রতিটি কর্মচারীর অভাব-অভিযোগ নিয়ে প্রকৃতই চিন্তিত। সুরাহাও করেছিলেন অনেক অভিযোগের অত্যল্পকালের মধ্যেই। কর্মিবৃন্দ তাই এক্সিকিউটিভ অফিসার সুভাষ বসুকে (১৭-৫-২৪ থেকে ১৮-৫-২৭) ১৯৩০ সালের অগাস্ট মাসে মেয়ররূপে পেয়ে আশা-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন।

'৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে টাউন হলে মেয়র সুভাষচন্দ্রের সেই ব্যক্তিত্বের প্রতি যে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন কর্পোরেশনের জমাদার, পিওন, মেনুয়াল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন অন্তরের সমস্ত দরদ মিশিয়ে, তা প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

"Sir, when you were the Chief Executive Officer of the Corporation, your sympathy for the labour staff for giving them relief, materialised itself in the establishment of stores and free medical dispensaries.

Sir, under your strong and efficient administration we felt ourselves happy and secure... we also gratefully recollect that you have saved many of us from injustice and oppression.

Sir, on your release from Jail and being installed in the Mayoral chair, you... enquired into the grievances of the subordinate staff...."

সুভাষচন্দ্র, বাংলার মুকুটবিহীন রাজা, কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ছিলেন এমনিই প্রিয়, এমনিই দরিদ্র-বরদী।

তারপরও কত মেয়র এসেছেন গেছেন। কে মিউনিসিপ্যালিটির মনে অমন করে ছাপ রেখে যেতে পেরেছেন কে? কর্পোরেশনের ঢের উন্নতির মূলে সুভাষচন্দ্রের দান নথিবদ্ধ আছে। কর্পোরেশন ইতিপূর্বে যাদের জমিদারিতে পরিণত ছিল তাঁরা চাপে পড়ে নেতাজীর জন্য যেটুকু করেছেন সেই স্বল্পোদ্যোগকে সংশোধন করে নিতে পারতেন কর্মিবৃন্দ নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করে। অফিস কাছারি মায় পুলিশ স্টেশনে প্যান্ডেল বেঁধে কর্মীরা পুজো করেন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। কর্পোরেশন কর্মীরা উদ্যোগ গ্রহণ করলে নেতাজী স্মরণে প্রতি বছর কলকাতা আর একটি বিরাটাকার উৎসব-উদ্যোগে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেতো।

২৫শে বৈশাখ কলকাতা যেভাবে জলসা জমিয়ে তোলে, ২৩শে জানুয়ারীর আবেদন ততটা সার্বিক নয় কেন? নেতাজীকে সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দেশপ্রেমিক বলে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে আমাদের কোথায় বেধেছে? গান্ধীবাদীরা ভেবেছেন, সুভাষের জয়ে গান্ধীর পরাজয়? কম্যুনিস্টরা তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলেই জানেন? সোস্যালিস্টরা নেতাজীর সোস্যালিজমকে গ্রহণযোগ্য জান[illegible] করেন না?

কিন্তু আজ কি তিনি সে সমস্ত[illegible] প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নির্ভীক সর্বত্যাগী দেশ[illegible] প্রেমের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হন নি[illegible] সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মত ও পথের পার্থক[illegible] স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতের প্রথম স্বাধী[illegible] সেনাপতি নেতাজীকে বীরত্ব, দেশপ্রেম[illegible] ত্যাগ, বিশ্বাস ও যৌবনধর্মের মূর্ত সবচে[illegible] প্রতীক বলেই জেনেছি আমরা। গান্ধীজী[illegible] কর্মধারা চিন্তাধারা নিয়ে প্রভাবম[illegible] রাজনীতির ছাত্ররা একদিন হয়ত ভারম[illegible] মনে বিশ্লেষণে বসবেন। সেদিন হয়[illegible] অনেক মোহভঙ্গের অবকাশ মিলবে। কি[illegible] সুভাষচন্দ্র যেদিন এলগিন রোড ছেড়ে[illegible] ছিলেন সেদিনই সব তর্কের শেষ হয়েছে[illegible] ইতিহাস তাঁর 'ফেলিওর'-এর ও[illegible] মুহূর্তের জন্য বিব্রত হওয়ার সুযে[illegible] পাবে মাত্র, কিন্তু নেতাজীর দেশপ্রে[illegible] মধ্যে কোনও খাদ, কোনও অভিসা[illegible] কোনও স্খলন, পতন, ত্রুটি আবিষ্ক[illegible] করতে সক্ষম হবে না। নেতাজীর কীর্তি[illegible] দেশকালের সীমারেখা টেনেও আবদ্ধ ক[illegible] সুযোগ নেই। তিনি মুক্তিকামী মানু[illegible] সমস্ত শুভবুদ্ধি এবং তেজোময় স[illegible] আদর্শ প্রতীক।

স্বার্থান্ধ মানুষ তথাপি নেতাজ[illegible] ক্রমশ কলকাতার ঘন্টাকয়েকের প্রোগ্রা[illegible] মধ্যে আবদ্ধ করতে চেয়েছে, দেশপ্রে[illegible] অভাব কত গভীর হলে তবেই এটা সম্ভ[illegible]

কিন্তু তাও যদি হয় তবু খেদ [illegible] কারণ কলকাতাই তো ভারতের চোখ[illegible] নাক কান পঞ্চেন্দ্রিয়। কলকাতাই বিপ্ল[illegible] জন্মস্থান, লড়াইয়ের ময়দান, নবচে[illegible] সতেজ মাটি। এই কলকাতাই রাজা[illegible] মোহন থেকে শুরু করে নেতাজী প[illegible] সবুজ সতেজ বিপ্লবীর উপহার স[illegible] ধরে আসছে উনিশ শতকের গোড়া থে[illegible] এক শতাব্দীকাল কলকাতার ইতি[illegible] ভারতের ইতিহাস। ঠিকমত মূর্তি[illegible] সাজিয়ে ধরলে কলকাতা মিউনি[illegible] পরিণত হতে পারে।

বিশ্বাস আছে, সেই কলকাতায় [illegible] জানুয়ারী মত-পথ-নির্বিশেষে ঘরে[illegible] পালিত হবেই ক্ষণকের বিভেদসৃষ্টি[illegible] বিভ্রান্তির অবসান ঘটলে। দেশপ্রেম[illegible] কোন বিপ্লবীয়ানাই সার্থক হয় না। সবের শুরুতে এলগিন রোড কালী[illegible] মতই একটি পীঠস্থান, সর্বদেশের মতের দেশপ্রেমিকদের পীঠস্থান। দু[illegible] দেশপ্রেমিক মানুষ কলকাতায় সর্বাগ্রে মালা হাতে যাবেন এলগিন[illegible] কারণ প্রচারের ধোপে সত্যকে [illegible] করে সাফ করে ফেলা যায় না।

(১৭-[illegible]

[ডিকেন্স তাঁর রচনার মধ্যে এমন একটি বই লিখেছিলেন যাকে "এ টেল অফ টু সিটিজ -এর মতই আরেকটি অপূর্ব সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এমন কি, সেই বই-খানিকে বলা যেতে পারে "এ টেল অফ এ্যানাদার সিটি বা এ্যানাদার ওয়ার্ল্ড।" সত্যিই সে কাহিনী অন্যজগতের, সে জগৎ বিস্ময়ের কুজ্ঝটিকায় সমগ্র সভ্য-সমাজের কাছে অস্পষ্ট। তাই বইখানি যখন বেরোয় তখন ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত চমকে গিয়েছিল। কেতাদুরস্ত টিপ্-টপ ইংল্যণ্ডের ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষ —সেখানে এ কোন্ এক নতুন জগৎ যাদের অলিভার টুইস্ট দেখিয়ে দিল। সেই ডোয়াকিন্স, চার্লে বেটস, ফ্যাগিন আর মংকসের কাহিনী—এ যেন আজও চোখের সামনে জলজ্বল করছে;

তারপর সওয়া শতাব্দী ধরে গোটা ইংলণ্ডের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে গোটা পৃথিবীরও। কিন্তু অলিভার টুইস্ট রয়ে গেছে তেমনিভাবেই সারা পৃথিবীতে। ইংলণ্ডের সেই 'পুওর ল' আমাদের দেশের চাইল্ড ডেলিকোয়েন্সী, ভ্যাগরাণ্ট আইন প্রভৃতি সবই ঠিকঠাক চলছে। অনেক দেশে এদের নিয়ে অনেক সাহিত্য হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশে তেমন কোন প্রচেষ্টা এসব নিয়ে চোখে পড়ে নি। কখনো-সখনো আমাদের দু-একটা ছোট গল্পে কিংবা উপন্যাসের কোন পার্শ্বচরিত্রে এদের আমরা দেখতে পেয়েছি বটে, কিন্তু তাতে গোটা জাতটা যে অনুপ-স্থিত থেকে গেছে, সেকথা বলা বাহুল্য-মাত্র। অবশ্য সেলুলয়েডের মাধ্যমে দু-একটা চেষ্টা যে ইতিপূর্বে হয় নি তা নয়, তবে ভাল জিনিসের সার্থক অনুকরণ হলে মন যত খুশি হয়, ততখানি খুশি করতে পারে নি সেগুলি।

এদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, জোট বাঁধা নারকীয় জীবনযাপন, প্রেম-ভালবাসা, হিংসা-দ্বেষ, জীবিকা সংস্থানের অবিশ্বাস্য সব ঘটনায় সাধারণের ঔৎসুক্য থাকতে পারে, কিন্তু আসলে সভ্যসমাজের কাছে এরা একে-বারেই অপরিচিত। তাই কোথায় এদের জীবনধারার উৎস, আর কোথায়ই বা এর শেষ, আর কেনই বা এদের জীবনে এই অভিশাপ এবং পথই বা কোথায় সবকিছু প্রতিকারের—সেসব কথাই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে এই রচনাটিতে। রচনাটি লোকের জবানীতে বলা হয়েছে এতে গল্প বা উপন্যাসের সুর বেজে উঠে, কিন্তু আসলে এটি অসংখ্য অভি-শপ্ত মানুষের প্রতিনিধিমূলক কতকগুলি সমাবেশ এবং সেই সমাবেশের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে অবহেলিত অন্ধ সমাজবিরোধী জগতের একটি চিত্র। পাঠকসমাজের কাছে এটি উপস্থাপিত করলাম —লেখক ]
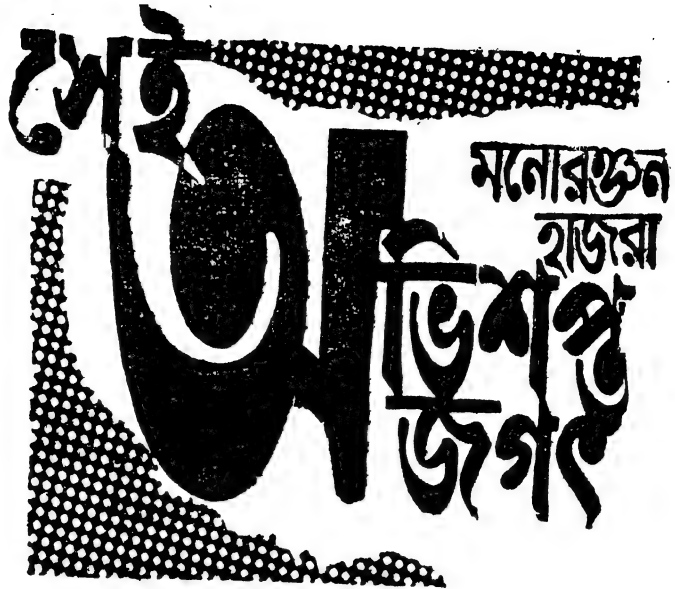
**বিচিত্র এ জীবনের ধারা।**

কখন কোথায় থেকেছি তারও যেমন ঠিক নেই, তেমনি যখন যেখানে থেকেছি সেখানকার মানুষগুলোকেও ভুলতে পারি নি। তারা আজও সবাই যেন আমার চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের কাউকে হয়তো ঠিক ঠিকভাবে বুঝেছি, নয়তো বুঝতে পারি নি। হয়তো কাউকে কাছে টেনেছি, কাউকে টানতে পারি নি। তাছাড়া এ অহংকারও আমার নেই যে, আমিই ছিলাম সব মানুষগুলোকে বোঝা-না-বোঝার কিংবা কাছে টানা-না-টানার দায়িত্বে। বরং বলতে পারি, দায়িত্ব আমার মত ছিল তাদেরও। আমিও তাদের যেমন আকর্ষণ করেছি, তারাও তেমনি আকর্ষণ করেছে আমাকে। তারা ও আমি একাকার হয়েই আমাদের বোঝাপড়া, তারা ও আমি একা-কার হয়েই আমাদের জানাজানি। তাই জীবনের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন যেখানে গিয়ে পড়েছি তখন এই একই নিয়মে মানুষের সঙ্গে আমার মেলামেশা হয়েছে, আমি তাদের জেনেছি, তারাও জেনেছে আমাকে। আমিও তাদের ভাল-বেসেছি, তারাও ভালবেসেছে আমাকে।

মোটকথা বলা যায়, মানুষ যখন যে পরিবেশেই থাকুক আর যত সুরই তার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠুক, একটি সুর তার মধ্যে একেবারে পৃথক—সে হল ভাল-বাসার সুর। এ সুর সহজ, এ সুর সুন্দর, হাজারো প্রাচীরের বাধা-নিষেধের মধ্যে এ সুরের লহর উৎসারিত বাষ্পের মত শূন্যলোকের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ে দিকে-দিগন্তরে।

সে সময়টা পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম বিশেষ একটা কারণে। সেকথা সময় এলে বলা যাবে। কিন্তু পথে বেরিয়েছিলাম এটাই সত্যি। বাড়ির চৌকাঠ পার হলেই যে পথ, সেই পথই তো বিসর্পিল গতিতে গিয়ে সারা পৃথিবীকে ছুঁয়েছে। তাই সে পথের যাত্রী হিসাবে গতিও ছিল আমার বিসর্পিল।

প্রথমেই যে ঘটনাটা ঘটল, সে এক অদ্ভুত ঘটনা। বলতে পারা যায় এই ঘটনা থেকেই যে জগতের কথা আমি বলতে সুরু করেছি, সেই জগতে আমার যাত্রা। দূর মফস্বল শহর থেকে যাচ্ছি কলকাতায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে ট্রেন। হঠাৎ কানে এসে লাগল গানের একটা কলি :

'আমি অন্ধ এক তোমার দ্বারে
পেটের দায়ে ভিক্ষা চাই।'

গানের সুরকে অনুসরণ করতেই সর্বপ্রথমে যা চোখে পড়ল তাতে হঠাৎ যেন বিস্মিত হয়ে গেলাম। নিরাভরণা এক কিশোরী তার কৈশোরের সমুদ্র-কল্লোলকে সামান্য একখানি বস্ত্রের চক্রপাকের মধ্যে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে একখানা লাঠির অগ্রভাগ ধরে এগিয়ে আসছে। কিশোরীর চোখে কোন অচেনা জগতের মায়া জড়ানো। কপালের সামনে তার একপাকের গিঁটবাঁধা কুন্তলের চূর্ণিত বিস্রস্ততা। শুধু আমারই নয়, চলন্ত ট্রেনের সেই কামরার সকল যাত্রীরই দৃষ্টি নিবদ্ধ তার দিকে। মেয়েটির লাঠির পিছন দিকটা ধরে আসছিল এক অন্ধ গায়ক। কণ্ঠে তার তেমনিভাবেই গান :

'হ'রে নিয়ে চক্ষুনিধি অন্ধ করেছেন বিধি
তোমরা না বাঁচালে আর
কে বাঁচাবে ভাই
আমি অন্ধ এক তোমার দ্বারে
পেটের দায়ে ভিক্ষা চাই।'

যাত্রীরা অনেকেই অন্ধের হাতে দুটো-একটা পয়সা দিলে। আমিও দিলাম। ট্রেনটা ছিল এক্সপ্রেস। মাঝে কোথাও আর থামবে না—থামবে গিয়ে একেবারে শিয়ালদায়। সমস্ত কামরাটা ঘোরা হয়ে গেলে অন্ধটি একজায়গায় বসল। কিশোরী মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল পাশে। ইতস্তত সে কখনো কারো দিকে, কখনো বা উদাসভাবে ধাবমান ট্রেনের বাইরে ফেলে-আসা গাছপালা ঘরবাড়িগুলোর দিকে তাকাতে লাগল।

মেয়েটিকে কেন্দ্র করে তখন আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে পড়েছে। আমি ভাবছিলাম, হয়তো বাবা অন্ধ, হয়তো তাদের আর কেউ নেই—এমনি করেই ভিক্ষার দ্বারা তাদের জীবিকার সংস্থান করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি বড় হয়েছে। বাবা অন্ধ, কোথাও কোন দুর্বৃত্ত প্রকৃতির মানুষ যদি মেয়েটিকে অসহায় পেয়ে তাকে কোন নির্যাতন করে কিংবা তাকে কোনভাবে প্রতারিত করে, তাহলে কি হবে? প্রভাতের সদ্যবিকশিত অনাঘ্রাত পুষ্পের মত অমন সুন্দর একটি মেয়ের জীবন তাতে নরকের পঙ্কে ডুবে যেতে পারে। এইসব ভাবতে ভাবতে মেয়েটির সঙ্গে আমার কয়েকবার চোখা-চোখি হয়ে গেল। গভীর বিস্ময়-মাখা তার চোখ—সে চোখে তার কি ভাষা তা সে-ই জানে। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম, মেয়েটির প্রতি অহেতুক কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। জানি না তার অর্থ কি। তার বয়সের সঙ্গে তখন আমার পার্থক্য খুব বেশি নয়। তাছাড়া সহানুভূতি, মমতা আর ঔৎসুক্য এমন সীমান্তপ্রান্তে টেনে নিয়ে যায়, যেখানকার রেখাটুকু পার হলেই অন্য কিছু দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বলতে বাধা নেই, সে বিষয়ে তখন আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। কিন্তু বয়সটা তখন এমনই যে, রঙীন রোমাঞ্চময় পরিবেশ মনে মনে সৃষ্টি করে নিতে ভাল লাগে—ভাল লাগে কল্পনার অবশ্যম্ভাবী কোন পরিণতির কথা ভাবতেও। কে জানে মনের অবচেতন স্তরে তেমন কোন প্রক্রিয়া আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল কিনা।

হ্যাঁ, মনে আমার সেই প্রক্রিয়াই কাজ করেছিল। শিয়ালদা স্টেশনে নেমে যখন সকল যাত্রী যে-যার চলে যেতে ব্যস্ত, তখন আমি কেন অন্ধ গায়ক ও সেই মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম তা আমি নিজেই ভেবে পেলাম না। প্লাটফরম পার হয়ে স্টেশনের বিরাট চত্বরে একজায়গায় মেয়েটি অন্ধটিকে নিয়ে এসে বসালো। তারপর দু-ভাঁড় চা এনে অন্ধকে এক ভাঁড় দিলে, নিজেও এক ভাঁড় খেল।

হঠাৎ আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

মেয়েটি আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখল আমাকে। আমার মুণ্ডিত-মস্তক। পরণে গেরুয়া, গায়ে গেরুয়ার চাদর, কাঁধে ঝুলছে গেরুয়ার পুঁটলি। সম্ভবত মেয়েটি আমার গেরুয়া দেখে সন্তুষ্ট নয়, কারণ বয়সটা আমার গেরুয়ার অনুকূল বলে সে মানতে রাজী নয়। কেমন একটা সন্দেহমিশ্রিত দৃষ্টিতে সে আমায় পাল্টা প্রশ্ন করলে, 'আপনি না ট্রেনে আসছিলেন?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

এবারে তার কথায় সায় দিয়েছি দেখে সে যেন আমাকে খানিকটা বিশ্বাস করল। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সাধু?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যিকারের সাধু?'

'হ্যাঁ।'

জবাবটা তাকে দিলাম বটে, কিন্তু আমি তো জানি সে জবাব আমার কতখানি মিথ্যে। আমি তো সাধু নই। গেরুয়া পরে সাধু সেজে আমি তো পথে বেরুই নি সমাজ-সংসার পরিত্যাগ করে জীবনের মোক্ষলাভ করার উদ্দেশ্যে। সাধু সাজা আমার শুধুমাত্র পরিচয় গোপন করার জন্য। তাই সেই সূত্রে আমাকে কিছু কিছু মিছে কথা বলতেই হবে, উপায় নেই। আমি সত্যিকারের সাধু শুনে মেয়েটি এতক্ষণ যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মেঘ ও রৌদ্রের দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলছিল, বর্তমানে যেন তার কিছুটা কেটে গেল বলে মনে হল। সে অনেকটা নির্ভয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের ঠিকানা জানতে চাইছিলেন কেন?'

'এমনিই কৌতূহল, বোন।'

'বো-ন' অস্ফুটস্বরে মেয়েটি আপনা-আপনিই যেন বলে উঠল। তারপর বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'আমাকে আপনি বোন বললেন?'

'কেন—কোন অপরাধ করেছি কি?'

'না না', মেয়েটি বললে, 'এতদিন পথে পথে রেলে-স্টেশনে, বাসে-ট্রামে গড়ের মাঠে ভিক্ষে করে বেড়িয়েছি, কেউ তো কোনদিন আমায় এমন করে বোন বলে ডাকে নি।'

'কি বলে ডেকেছে এতদিন তোমায়?'

'সে ভাষা আপনি বুঝবেন না।'

বললাম, 'তুমি না বললেও আমি বুঝতে পারি।'

মেয়েটি সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বুঝতে পারেন?'

'কেন পারবো না', বললাম, 'সকালের সদ্যফোটা ফুলের মত তুমি। এ লোভের পৃথিবীতে সবাই যে তোমাকে মর্যাদা দিয়ে দেখবে বোন—একথা আমি বিশ্বাস করব কি করে! তাই আমি এসব বুঝতে পারি।'

হঠাৎ মেয়েটি এসে আমার হরিণের চামড়ার জুতোজোড়ায় ঢাকা পা দুটোর ওপরদিকে হাত দিয়ে বললে, 'আমরা যেখানে থাকি সেখানে আপনি যাবেন?'

কিছু বলার আগেই হঠাৎ নজরে পড়ল অন্ধ লোকটা পিট্ পিট্ করে যেন আমার দিকে তাকালো। মেয়েটির প্রতি গভীর স্নেহে কথাটা কল্পনা করতে আমার খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু তবু আমার মনে হল সে নিশ্চয়ই আমাকে দেখছে ভাল করে এবং সত্যি-সত্যিই সে দেখতে পায়। আমি মেয়েটির কথার উত্তর দেওয়ার বদলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কিন্তু অন্ধটি দেখা গেল রীতিমত চালাক। সে যে সত্যি-সত্যিই অন্ধ সেটুকু আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস মায়া?'

মায়ার দৃষ্টি তখন আমার দিকে নিবদ্ধ। সে কি বলবে সেও যেন ভেবে পেল না, আর আমিও তাদের ওখানে যাব কি যাব না, সেকথাও বলতে পারলাম না। কিন্তু দুজনের কাছেই দুজনের প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল যেন আপনা আপনিই।

মায়া নতমুখে বললে, 'এই আমাদে[র] আসল রূপ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইনি কি তোমা[র] বাবা?'

'না।'

'তবে।'

'আপনি এ জগতকে বুঝতে পারবে[ন] না।'

কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু এ[…] সম্বন্ধে কম কথা তো শুনি নি ছেলেবে[লা] থেকে। কাজে কাজেই মনে মনে অস্প[ষ্ট] একটা ধারণা ছিলই। তারই অভিজ্ঞত[া…] বললাম, 'একেবারেই যে জানি না তা [নয়] তবে বাকিটা তুমি আমায় বলবে, এ অ[…] আমি করি।'

'দাদা কেউই আমরা কারো নই,' [ম…] বলতে লাগল, 'অথচ আমাদের পরস্প[র…] না হলেও পরস্পরের চলে না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'লোকটি সত্যিই অন্ধ?'

'আপনার কি মনে হল?'

'মনে হল ও অভিনয় করছে।'

'এরপর আমার আর কিছু ব[…] নেই।'

'কিন্তু এমন করে লোককে ঠক[…] কি দরকার বলতো?'

'দাদা সে অনেক কথা,' মায়া ব[…] 'কই আপনি তো বললেন না, [...] যেখানে থাকি সেখানে আপনি [...] কিনা?'

'আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আ[…] তোমাদের ওখানে যাই তবে তো[…] ওখানে লোকজন ভয় পাবে না?'

'তা হয় ভ' পাবে। কিন্তু সাধু-সন্নিসি মানুষকে পেলে মোটমাট লোকের চালও লাগবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় পাবে আবার ভালও লাগবে কি রকম?'

মায়া বললে, 'প্রথমটায় ভয় পাবে আমাদের ওখানকার মানুষ চোর-জোচ্চোর বলে। কিন্তু ভাল লাগবে এই জন্যে যে, আপনি তো তাদের সত্যিই কোন ক্ষতি করবেন না!'

'না তা আমি পারবো না।'

'সেজন্যে সাধু-সন্নিসি মানুষের সঙ্গ তাদের কাছে ভালই লাগবে।'

মায়া ঠিকই বলেছিল।

সেদিন আমি ওদের জগতে চলে এসেছিলাম। চলে আসার পর বুঝতে পেরেছিলাম ভয়ও ওরা পেয়েছিল, ভালও ওদের লেগেছিল। অদ্ভুত ওদের জগৎ। মহানগরীর উপকণ্ঠে আঁকা-বাঁকা পথ পার হয়ে, অলি-গলি ঘুরে বিরাট এক বস্তি। গোলকধাঁধার মত বিস্তীর্ণ এক এলাকায় পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে দু-একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। কাঁচা রাস্তা, কাঁচা বাড়ি, খোলার ছাউনি, পাশে পচা নর্দমা। আরও ভেতরে গেলে ছোটখাটো একটা শ্যাওলা পড়া মাঠ। মাঠের উত্তরদিকে নোনাধরা ইটের একটা পায়খানা। তার চারপাশের দেওয়ালে শিকড় ছড়িয়ে উঠেছে গোটা কতক অশ্বত্থ, বট আর নিমের চারা। চটের একটা পর্দাও দেখা যায় শতজীর্ণ অবস্থায়। একেবারে দক্ষিণে একটা টিউবওয়েল। কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে তার চারপাশটা। শুধু তাই নয়, একপাশে ছাইয়ের গাদা, ছেঁড়া কলাপাতা আর ভাঙা ভাঁড়ের স্তূপীকৃত গাদা। টিউবওয়েলটায় বাসন মাজা থেকে মোষ নাওয়ানো সবই হয় বোধ করি। দাঁতনের ছিবড়ে, গয়ের সিকনি কোন কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

ভোর না হতেই পিলপিল করে এখানকার মানুষগুলো এদিকেই আসে, কারণ সকলেরই দরকার জলের। তাই ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় টিউবওয়েলের হাতল নাড়ার ঘটাং ঘটাং শব্দ।

বস্তির অসংখ্য খোপে অসংখ্য মানুষ। এ মানুষকে সভ্যসমাজের মানুষ চেনে না। অদ্ভুত এদের ভাষা, অদ্ভুত এদের জীবনযাত্রা। কে যে ঠিক কি উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তা ঠিক বোঝাও যায় না, জানাও যায় না। অথচ মানুষগুলো যেন সদাই ব্যস্ত, সদাই কি একটা করছে যেন।

মায়া আর অন্ধ গায়কের সঙ্গে আমি এসেছিলাম। আসার দু-একদিনের মধ্যেই এ অবস্থাটা আমার চোখে পড়েছিল।

প্রথম আসার দিনটিতে এসে যে বিস্ময় আমার চোখে লাগে সে যেন ভোলার নয়। বস্তির মধ্যে আসতেই অন্ধ লোকটা মায়াকে বললে, 'তাহলে মায়া তুই যা।'

মায়া বললে, 'কিন্তু যাব কি শুধু হাতে?'

'ঐ দ্যাখ ভুলে গেছি' বলে অন্ধ লোকটা তার ফতুয়ার পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে মায়ার হাতে দিলে। তারপর বললে, 'কাল ঠিক সময়ে আসবি তো?'

মায়া বললে, 'মাকে বলতে হবে।'

'আবার বলতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

অন্ধ বললে, 'আচ্ছা তাহলে তাই—'

মায়া আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'দাদা চলুন।'

আমি মায়ার কথামত পা ফেলতে লাগলাম বটে, কিন্তু বারবার পিছন ফিরে দেখতে লাগলাম অন্ধ গায়ক সোজা চলে যেতে লাগল। এই লোকটাই যে ট্রেনে অন্ধ সেজে ভিক্ষা করছিল, এখানে দেখলে কস্মিনকালেও কারো মনে হবে না। পরবর্তী সংখ্যায় এদের জীবনের অন্য কথায় আসব।

[পূর্বানুবৃত্ত]
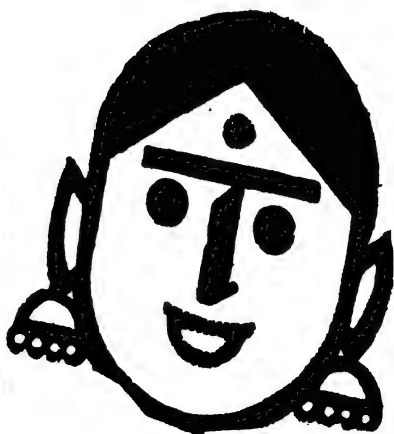
এমন কথা যমুনাকে জীবনে কেউ কখনো বলে নি। জীবন তার কন্দরে উপত্যকা। সেখানে মিষ্টি কথা—ভালো কথা—সোহাগের কথা যে সে শোনে নি—তা নয়। কিন্তু এ লোকটির ভাষা আলাদা—আবেদন ভিন্ন জাতের। তার মেয়েলী হৃদয়ের গভীরে কোথায় কোন প্রত্যাশী, টান্-টান্ বাঁধা তারে জীবনের কথাগুলো মৃদু আঙুল বুলিয়ে যেন ঝংকার তুলে দিলে। চোখ তার আপনি ভিজে এল।

জীবেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "দুঃখ হবে না যমুনা দিদি! তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, দয়া আছে—মনের জোর আছে। একলাই টেনে চলেছ জীবন। তোমার অনেক গুণ। কিন্তু সে জীবন তোমার কোন্ কাজে লাগল?"

কোন্ কাজে লাগল? কি জবাব দেবে? হঠাৎ যমুনা যেন সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে তার সঠিক জবাব খুঁজে পেল না। তার এতটা—বিচিত্র—ঘটনা-সংকুল জীবনের মধ্যে ঠিক বলার মত একটা কাজ খুঁজে পেল না। শেষটা যেন হাতড়ে হাতড়ে করুণ গলায় বললে, "কেন গোঁসাই, আমি সকলের ঘরে ঘরে ঠাকুর-দেবতার নামগান করে বেড়াই।"

"ঠাকুর-দেবতা তোমায় কি দিল?"

মনের মধ্যে আবার হাতড়াতে লাগল যমুনা। কবে কেমন করে মায়ের ধারায় জীবন মিশে গেছে অন্য জীবনে—কি পেল—না পেল, তার হিসেব সে কোনো দিন করে নি। আজ তার কঠিন—কদিনের প্রিয়—শ্রদ্ধেয় বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন দিশাহারা হয়ে গেল।

জীবেন বললে, "তোমার মুখেই শুনেছি যমুনা দিদি—এই ঝুপ্ড়ির মাটিটুকুও তোমার নিজের নয়। চৌধুরীদের বড়রতফ তোমায় দয়া করে থাকতে দিয়েছে। ওঠ বললেই ওঠো। গলা ফাটিয়ে মুষ্টিভিক্ষা পাবে তবে খাবে। এই তো?"

বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল যমুনা।

জীবেন দেখছিল একদৃষ্টে : চোখ দুটো বড় শান্ত—নির্বোধ, সেই পলি-মাটির স্নিগ্ধ কান্তি, বেঁটেখাটো রোগা রোগা চেহারা, আর কেউ নয়—শুধু প্রকৃতির অকৃপণ দান উজাড় করে দেওয়া ওর সর্বাঙ্গে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এমন কত কোটি আছে? সাধু শ্রমণকে ঘিরে কোনোকালে হয়তো এর একটা দান মহিমা, ধর্ম মহিমা ছিল। আজ শুধু বৃত্তি। টিকে আছে গ্রাম লোকালয়ে। কাল চলে গেছে তার মেদ-মজ্জা রং জৌলুস নিয়ে—পড়ে আছে শুধু কঙ্কালটা। সেটা কোথাও ভয়াবহ—কোথাও বড় করুণ।

যমুনার স্তব্ধ বোকা বোকা মুখটার দিকে চেয়ে জীবেন হেসে বললে, "আজ থেকে ভিক্ষে তোমার বন্ধ যমুনা দিদি, চৌধুরী মশাই যা পাঠান—তাতেই তোমার-আমার চলে যাবে।"

যমুনা বললে, "সে-ও তো ভিক্ষে [illegible] গোঁসাই। সানো কর্তা আর ডাক্তা[illegible] বাবু তোমার জন্যই পাঠান—মোর জ[illegible] নয়।"

জীবেন বললে, "ঠিক। আম[illegible] তাঁদের অন্নই বা এমনি এমনি খাব কেন[illegible] আমরা তাঁদের কাজ করে দেবো।"

"কাজ!" যমুনা বললে, "আ[illegible] ওই গান গাওয়া ছাড়া কি জানি! জ[illegible] তো কোনো কাজ শিখি নি গোঁসাই।"

"ওই গানই তুমি গাইবে যমু[illegible] দিদি হাটে, গঞ্জে—ঘরে ঘরে।" জী[illegible] বললে, "তবে সে গান আমি শি[illegible] দেবো।"

যমুনা সকৌতুকে বললে, "তু[illegible] গান জান গোঁসাই! কি গান?"

জীবেন হেসে বললে, "সে আমা[illegible] ফাঁসির দড়ির গান—দেশের স[illegible] দুঃখের গান।"

"স্বদেশী গান!"

"হ্যাঁ, সেই গান।"

যমুনা চুপ করে কি একটু ভাব[illegible] তারপর বললে, "বেশ—শিখিয়ে [illegible] গোঁসাই। আজ থেকে আমি তা-ই গাই[illegible] এই লোকটাকে যেন কিছু দিতে প[illegible] আনন্দে সে আত্মহারা। তারপর [illegible] ভয় পেয়ে বললে, "কিন্তু কেউ সন্দেহ করে—ঠাকুর-দেবতার গান হঠাৎ আমি এ সব গান গাই কেন? তোমার ওপর সন্দেহ এসে পড়ে?"

জীবেন হেসে বললে, "পুলিশ [illegible]পাবে? তা এক কাজ করো—[illegible]

দু'-একটা ঠাকুর-দেবতার গান, সেই বিনন্দ রাখালের গান আমাকে শিখিয়ে দিয়ো। ওরা এলে সে গান জুড়ে দেবো। তোমার নবীন গোঁসাইটি সেজে বসে তো আছিই।"

যমুনা বললে, "মস্করা নয় গোঁসাই—বিপদ আছে।"

"বিপদ আছে বলে কি আমরা আমাদের কাজ করবো না দিদি!" জীবেন বললে, "আপাতত এই গান তোমার কাজ। আমাদের দুঃখের কথা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দাও দিদি। পারবে না? ভয় করে?"

"নিজের জন্য আমার ভয় নাই গোঁসাই।—আমার কি আছে?" যমুনা গাঢ় গলায় বললে, "আমি পারব। শিখিয়ে দাও।" তারপর একটু থেমে বললে, "কিন্তু গোঁসাই—সে-গান শুনে লোকে যদি ভিক্ষা দেয়? মোকে সবাই যে ভিখারী বস্টম বলেই জানে।"

জীবেন ভাবতে ভাবতে বললে, "সে ভিক্ষে নিয়ো দিদি—নইলে লোকে সত্যি হয়তো সন্দেহ করবে।"

যমুনা হেসে উঠল। বললে, "ঠাকুর-দেবতার নাম গেয়ে ভিক্ষা করায় দোষ আর তোমাদের স্বদেশী গানে দোষ নাই গোঁসাই?"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই মেয়েটার কথার সামনে জীবেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "না দিদি—এ ভিখারী নাম তোমার ঘোচাব। আমি ভাবছি।"—

আজকের সকালটা যেন কি! যমুনার অন্তর যেন কানায় কানায় ভরে উথলে উঠতে চায়। এ সুখ—অসহ্য।

জীবেন সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হয়তো কিছু ভাবছিল। তাই সে দেখতে পেলে না—একজোড়া ক্ষুধার্ত দৃষ্টি কেমন করে তার শান্ত চোখের গভীরে থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে জানতেও পারে নি—তার অসুস্থ শয্যার পাশে কেমন করে সে চোখ রাতের পর রাত তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। যেন মরূদ্যানের আড়াল থেকে উঁকি মারা একটা দুস্তর তৃষ্ণার্ত মরুভূমি।

তার একতারা, তার ঝোলাঝুলি ...দিন ঝোলানই রইল। যমুনা বাইরে ...রুল না।

যমুনা বললে, "মোর এতদিনের ...ন জোড়া কাজ কেড়ে নিলে ...সাই—এখন বলো কি করি।"

"গল্প করো যমুনা দিদি"— ... বললে, "তোমাদের চরের ... ।"

"সে তো সব তোমাকে বলেছি।" ...সব বলেছে যমুনা—শুধু নিজের অন্ধকার অংশটুকুর কাছে থেমে গেছে। এই লোকটার সামনে কে যেন তার গলা চেপে ধরেছে। কি জানি—যদি এ ঘৃণা-ভরে চলে যায়!

জীবেন বললে, "আচ্ছা—সেই যে হাবুর মামু, কি নাম যেন বলেছিলে—তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি?"

"পাবে কি? ওই মুখপোড়া ভলু মাঝি তাকে মেরে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে—এ মোর খাঁটি কথা।" যমুনা বললে, "ভিক মাগতে আমি ঢের জায়গায় যাই। এখান থেকে বেশ একটু দূরে—তা হবে কোশ দুই, গিয়ে শুনেছিলম—একটা লাস নাকি এসে ঠেকেছিল, গায়ে ফতুয়া। কাক-শকুনে ঠুকরে খাচ্ছে। ই হলো তোমার নিখোঁজ হবার দু'দিন পরের ঘটনা।"

"তোমাদের সানো কত্তার তাঁতঘর?"

"তারপর সব ভুণ্ডুল হয়ে গেল। সেপাই পুলিশ এসে সব ভেঙে দিয়ে গেল।" যমুনা বললে, "সানো কত্তা ক'কুড়ি চরখা তৈরি করিয়ে কাকে কাকে সব দিয়েছিল—তা সে-সব কোথায় গেল কে জানে।"

"তোমাকে দেয় নি?"

আবার সেই তার নিজের কথা।

যমুনা একটু থতোমত খেয়ে বললে, "আমি কাঙাল ফকির গোঁসাই—মোকে দিবে কেন।"

জীবেন বললে, "আমি তো শুনেছি—ওদের ওই কাঙাল ফকিরদের জন্যে চরখা। যা হোক—তারা সুতো কেটে পেট চালাতে পারবে।"

যমুনা বললে, "তা ছাড়া আমি কি আর সুতো কাটতে জানি!"

জীবেন বললে, "আমি যদি শিখিয়ে দি?"

যমুনা অবাক চোখে তাকাল জীবেনের দিকে। বললে, "তুমি সুতো কাটতেও জান গোঁসাই?"

জীবেন হেসে বললে, "একদিন জানতাম। তারপর একদিন তাকে আছড়ে ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।"

"কেন গোঁসাই?"

যমুনার কৌতূহল দেখে জীবেন হাসল। বললে, "সে অনেক কথা যমুনা দিদি—তুমি বুঝবে না।"

যমুনা বোঝেও না—লোকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওই মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবে, অনেক সময় ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না। আবার যখন কথা সুরু করে—তখন যেন আর থামতে চায় না। এমনি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এ চরের সব মানুষের সব কথা তার জানা হয়ে গেছে।

প্রথম কয়েক দিন ছিল তার নড়াচড়া একদম বারণ। তারপর কাটা ঘা একটু একটু সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে

এসে বসেছে দাওয়ায়। তার সংগে সংগে তার চিন্তা আর চঞ্চলতা যেন বেড়ে গেছে ঢোঁৎ।

একদিন বলে বসল সে, "ইচ্ছে করে—চরের কিষাণপাড়ার দিকটা একবার ঘুরে আসি। কোথায় সেই পবন খাঁর ঘর, কোথায় সেই ভিখনের ঘর! কোথায় তোমাদের সেই বাড়ুয়া মহেশ মন্ডল থাকে—কোথায় বা গোবিন্দ মুকুন্দের ঘর!"

"খবর্দার—খবর্দার গোঁসাই!" যমুনা প্রায় আঁৎকে উঠে বললে, "ডাক্তার আর সনো চৌধুরী তা হলে আর মোকে আস্ত রাখবে নি।" একটু থেমে বললে, "তাদের হুকুম না পেলে তোমার একটি পা-ও আর নড়া চলবে নি।"

জীবেন হাসল—বললে, "ওঁদের হুকুম বড় কড়া।"

যমুনা মাথা ঝাঁকি দিয়ে জোর দিয়ে বললে, "সে মোকে মানতেই হবে।"

"খাল পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না? এই তো বিকেল হয়ে এল।"

"দেখার কি আছে গোঁসাই?"

"দেখতাম তাদের ঘরগুলো।" জীবেন বললে, "তোমার দাওয়া থেকে কিছুই দেখা যায় না। সামনে শুধু মাঠ আর মাঠ। কত দিন যে মানুষজন, ঘর-দোর দেখি নি।"

ওর আগ্রহ দেখে যমুনার মন বোধ করি একটু নরম হলো। বললে, "তো চল। গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে গোঁসাই-ফাঁকায় যাওয়া চলবে নি।"

"রাজি। চল—"

যমুনার কাঁধে ভর দিয়ে উঠল জীবেন—তার কাঁধে ভর দিয়েই এক-পা এক-পা করে হাঁটতে লাগল। কাটা পায়ে ভালো করে জোর এখনো ফিরে আসে নি।

যমুনার একটা হাত পরম আগ্রহে জড়িয়ে ধরেছে তার কোমর।

জীবেন হেসে বললে, "ভয় নেই যমুনা দিদি—পড়ব না। অত জোরে আর চেপে ধরতে হবে না।"

যমুনা কথা বললে না। বুকের ভেতরে তখন তার ঝড় বইছে। শুধু একটা ঢোক গিলে বললে, "না—পড়ে যাবে।"

একটা গাছপালার আড়াল দেখে এসে দাঁড়াল ওরা।

আকাশ ছেয়ে বিকেলের আলো তখন আবছা হয়ে আসছে। জীবেন পরম আগ্রহে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল —দূরের চর...কিষাণপাড়া—মাঠে তখনো কারা যেন হাঁটু গেড়ে বসে ধান কাটছে। কোথাও বোঝা উঠছে মাথায় মাথায়।

জীবেন একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে বললে, "এই তোমাদের সেই চর!"...

বড় শান্ত—বড় স্নিগ্ধ মনে হয় জীবেনের। এখানে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে—মনেই হয় না। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "বলো—পবন খাঁর ঘর কোন্‌টা?"

"সেই একদম পুবে। প্রায় গাঙের কাছাকাছি।"

"তার বৌ মরেছে কোথায়?"

"সে তো দেখা যাবে না গোঁসাই। এই খাল যেখানে গাঙের মুখে গিয়ে মিশেছে—".

জীবেন অনুমানে একদিকে তাকিয়ে রইল নীরবে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, "আর গোবিন্দ-মুকুন্দের ঘর?"

"হোই যে জোড়া নারকেলগাছ দেখা যায়—ওর তলায়। পাশাপাশি প্রায় হাবুর ঘর। আর ওই যে বড় চালা—সব ঘরগুলোর ওপরে, ওই ছোট মন্ডলের ঘর।"

সন্ধ্যে হয়ে আসছে—অস্পষ্ট হয়ে আসছে সব। তবু সেই দিকে চোখ মেলে সাগ্রহে দেখতে লাগল জীবেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, "আর সেই বাঁশবন...যেখানে ভিখন মলঙ্গী মরেছে আগুনের বেড়াজালে?"

"সে তো দেখা যাবে না গোঁসাই—অন্ধকার হয়ে এল, না হলে তার বাঁশ-গাছের ডগা দেখা যেত। সে আরও পচ্ছিমে।"

"নুনের ক্যাম্প বসেছিল কোথায়?"

"হোই পুবে—প্রায় পবন খাঁর ঘরের কাছাকাছি। এই খাল এঁকে-বেঁকে চলে গেছে সেই দিকে।"—

"হাবুর মামু—"

"তাকে তাড়া করে গেছল সেই দক্ষিণে...হোই জালপাই জঙ্গল বরাবর... ওদিকে শুধু আবাদ—আবাদ—আবাদ। জনপ্রাণী নাই গোঁসাই।"...

এ চরের পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—দাগ...দাগ...দাগ...রক্তের দাগ... আত্মাহুতির দাগ...লড়াইয়ের দাগ। জীবেন সেই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে দীপ্ত চোখে চেয়ে চেয়ে যেন সেই দাগগুলো দেখতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "পবন খাঁর বাপের সংগে দেখা করার বড় ইচ্ছা হয় দিদি।"

যমুনা বললে, "সে আর হবার নয় গোঁসাই। হেই ক'দিন আগে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে যেতে দেখলাম। হজ করতে গেল। কে জানে—আর ফিরবে কি না।"

"সে-ও চলে গেল!" জীবেন খানিক চুপ করে থেকে গাঢ় গলায় বললে, "মুকুন্দের সংগেও দেখা হলো না। ছোকরাকে দেখার বড়ো ইচ্ছা ছিল।"

যমুনা বললে, "চল গোঁসাই—অন্ধকার হয়ে গেছে।"...

জীবেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "চল।"

জীবেন নিঃশব্দে তার চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেল। সেখানে তখন ঝড় উঠেছে। এ যেন নানা দিক থেকে উদ্দাম বেগে ছুটে এসে চেতানো পালে লেগেছে হাওয়া। তারপর হঠাৎ কথা বলে উঠল। বললে, "আজ তো তুমি ডাক্তারখানায় যাবে দিদি?"

"মোকে তো রোজ যেয়ে সব বলতে হয় গোঁসাই।"

"ডাক্তারখানায় লোক থাকে অনেক?"

"তা থাকে। তবে মোর সংগে কথা হয় সব শেষে।"

"আজ এক ফাঁকে তাকে বলো—খবরের কাগজ পড়ার বড় ইচ্ছে হয়েছে।"

যমুনা বললে, "ই আবার তুমি বিপদের ঝামেলা বাড়াচ্ছ।"

জীবেন হেসে বললে, "বিপদ আমার ভাই। আশ্রয় যখন দিয়েছ দিদি—সেও আমার সংগে আছে। খবর কাগজটা আমার চাই-ই।" একটু থেমে আবার বললে, "চৌধুরী মশায়ও আসেন নি অনেকদিন।"

"আমারও দেখা হয় কম গোঁসাই।" যমুনা বললে, "কি জানি আবার কি হবে! গ্রাম-চর ঘুরে ঘুরে সব ভলান্টিয়ার জুটাচ্ছেন।"

"ভলান্টিয়ার!" জীবেন আগ্রহভরে আরও কিছু শুনতে চাইল—বললে, "কেন! কি হবে?"

যমুনা হেসে বললে, "সে কি আমাকে বলবে গোঁসাই! আমি যেন জায়গায় যাই—কথাটা শুনতে পেয়েছি।"

কেমন একটা উত্তেজনা ফেটে পড়ে জীবেনের গলায়। বললে, "আমি তাঁর সংগে দেখা করতে চাই। যেমন করে হোক—তাঁকে বলতেই হবে।"

যমুনা ওর ভংগী দেখে হেসে ফেললে। বললে, "আচ্ছা—আচ্ছা, বলবো।"

"আজই।"

"দেখা হলে তো।"

জীবেন আবার দাওয়ায় চেপে বসতে যাচ্ছিল—যমুনা বললে, "আর বাইরে নয় গোঁসাই—খুব শীত পড়েছে। এবার ঘরে চলো।"

জীবেন হেসে ফেলে বললে, "ভারী বেকায়দায় পেয়ে আমাকে প্রায় বন্দী করে ফেলেছ দিদি—না হলে দেখতে, এতক্ষণে তোমাদের সানো কত্তাকে যেখান থেকে হোক, খুঁজে বার করতাম।"

জীবেনকে শক্ত করে ধরে আছে যে হাতটা—সেটা বোধ করি সহসা কেঁপে উঠল। করুণ গলায় যমুনা বললে, "আমি তোমাকে বেঁধে রাখবো—সে জোর মোর নাই গোঁসাই।" [ক্রমশ]

# ভারতপথিক সুভাষচন্দ্র

// শিশির দাশ //

'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—ছাত্র জীবনে অধ্যয়নই হল তপঃ-সাধনা। সেই প্রথায় সুভাষচন্দ্রকেও বিদ্যাধ্যয়ন-তপস্যায় ব্রতী হতে হয়েছিল, আর সে তপস্যায় তাঁর একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সীমা ছিল না। সে তপস্যা সার্থকতার বিপুল সম্ভাবনা জাগিয়েছিল সুভাষচন্দ্রের তীক্ষ্ম বুদ্ধির তেজে। তিনি তাতেও কিন্তু মনে তৃপ্তি পান নি—সব সময় তিনি আকুল—মন যেন তাঁর আরও কিছু চায়—কি সে চায়, তা যেন ঠিক উপলব্ধি করতে পারতেন না।

কটকে কৃতী পিতার স্নেহাশ্রয়ে এবং মায়ের আদরের নীড় থেকে সুভাষচন্দ্র সেখানকার স্কুল থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে সসম্মানে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এই সময়ই বাংলার বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁর জীবনকথা ও বাণী সকলের অন্তরালে তাঁর মনকে এক নব সেবাধর্মে দীক্ষিত করে তোলে। পিতা তখন তাঁকে পাঠালেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাধ্যয়নের জন্য। লেখাপড়া চলতে লাগলো, মনের মতো সঙ্গীও জুটলো। এইসব সঙ্গীদের সাথে প্রায়ই তাঁর কথা হতো—পরীক্ষা-পাশের পর কী? হয় বড় চাকুরী, না হয় ব্যারিস্টারী-ওকালতি কিম্বা ডাক্তারী অর্থাৎ টাকা রোজগার—কিন্তু তাতেই কি জীবনের সার্থকতা। তার চেয়ে দেশের সেবা—অনাথ, আর্ত, দুঃখী-গরীবকে দেখা এবং ধর্ম-সাধনা করব আমরা। সুভাষচন্দ্র শুধু এই আলোচনা করেই ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না। মনের অশান্তি তাঁর বাড়লো—এক নতুন শক্তি যেন তাঁকে আকর্ষণ করতে লাগলো। অবশেষে একদিন তিনি সন্ন্যাসী হলেন—পরণে গৈরিক বাস ও সর্ববিষয়ে কৃচ্ছ্রতা-সাধন।

কিন্তু গুরু চাই—যিনি দেবেন তাঁকে সত্যিকারের পথের সন্ধান, তাঁর মনের অশান্তি করবেন দূর। গুরুর সন্ধানে তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করলেন—কত গিরি-পর্বতে গেলেন—হরিদ্বার, লছমনঝোলা, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লী, আগ্রা, বেনারস প্রভৃতি স্থান ঘুরে কোথাও মনের মতো গুরুর সন্ধান পেলেন না। যে সর্বত্যাগী কর্মযোগী সন্ন্যাসীর নিকট তাঁকে কর্মযোগের দীক্ষা নিতে হয়েছিল—সে গুরু তখন কলকাতার প্রধান বিচারালয়ে রাজসিক অর্থ-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে আবার লেখাপড়ায় মন দিলেন এবং ভালভাবেই ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজেই বি-এ পড়তে লাগলেন। লেখাপড়ায় খুব অনুরাগ, সতীর্থরাও তাঁকে ভালবাসেন। সহসা এই সময়কার একটি ঘটনা তাঁকে কলকাতায়, বিশেষ করে ছাত্রমহলে সুপরিচিত করে দিল—এমন কি, সেই ঘটনা তাঁর নিজের জীবনেও একটা স্থায়ী এবং গভীর প্রভাব রেখে গেল। কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক মিঃ ওটেন শাসকের জাতি, তিনি এদেশবাসীকে যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্য করতে চান না—তারা যেন ক্ষুদ্র কীটাণু-কীট। ক্লাশে এলে তাঁর সে অবজ্ঞা প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশ পেতো। একদিন মিঃ ওটেন খুব বেশি অকথা-কুকথা বলায় ছাত্রেরা করলো ধর্মঘট—যার নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি বললেন—'এ অপমান সহ্য করলে মানুষ বলে পরিচয় দেবার আর আমাদের কিছু থাকবে না।' প্রিন্সিপাল জেমস সাহেবের মধ্যস্থতায় দু'পক্ষের ক্ষমা প্রার্থনায় সে গোলযোগ মিটল। কিন্তু কতদিন। কিছুদিন যেতে না যেতেই মিঃ ওটেন আবার নিজ রূপে প্রকাশ পেতে লাগলেন। বাঙালী জাতিকে অকথা-কুকথা বলে আবার একদিন দিলেন গালাগাল। যে বাংলাদেশে বসে, বাঙালীর টাকায় উদর-পূর্তি, বিলাস-ব্যসন ইত্যাদি, সেই বাঙালীর নিন্দা সুভাষচন্দ্র সহ্য করতে পারলেন না। অধ্যাপক ওটেনকে তাঁর ইতর স্পর্ধার উপযুক্ত জবাব দিলেন।

বাঙালীর ছেলে—সে তোলে সাহেবের গায়ে হাত! অধ্যাপক ওটেনকে কে মেরেছে, তা এখনও প্রকাশ পায় নি, অথচ বিনা-বিচারে শাস্তি ভোগ করেছেন

সুভাষচন্দ্র। মানুষকে, বিশেষ করে গুরু-স্থানীয় ব্যক্তিকে প্রহার করা যে অত্যন্ত গর্হিত, এ-বিষয়ে কোন মতদ্বৈধও থাকতে পারে না। তাহলেও বিশ্বের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যা ব্যক্তিনির্বিশেষে খাটে—কেউ যদি অপরকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করে, তাহলে অপরেও তাকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করবে। এমন কি, কেউ যদি গায়ের জোরে তাল ঠুকে মাথা দিয়ে দেয়াল ভাঙতে চায়, নির্জীব দেয়ালও তার মাথা ভাঙতে চেষ্টা করে। কেউ যদি প্রতিধ্বনিকে বলে—'তুই বর্বর', প্রতি-ধ্বনিও তাকে বলে—'তুই বর্বর'। বিশ্বে এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে নিয়ম আছে, তার হাত থেকে কারুর নিষ্কৃতি নেই। অধ্যাপক ওটেন নিজেই নিজেকে এই নিয়মের অধীন করে ফেলে-ছিলেন। শিষ্যের যে গুরুকে ভক্তি করা উচিত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু গুরুর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটি যতই অপদার্থ, অভদ্র বা দুষ্ট হোক—তাকে ভক্তি করে তার বাধ্য থাক, এ অতি উচ্চ-ধরনের উপদেশ হলেও—সে ক্ষেত্রে ভক্তি ও বাধ্যতা কি স্বাভাবিক? একপক্ষের আচরণ ও মনোভাব যদি গুরুর মত না হয়, তথাপিও অন্যপক্ষের আচরণ শিষ্যের মত হবে—এটা কি আশা করা যায়? মোট কথা, ইংরেজ অধ্যাপক যদি নিজেকে উৎকৃষ্ট ও প্রভু জাতীয় এবং ছাত্রকে নিকৃষ্ট ও দাস জাতীয় বলে মনে করেন—তাহলে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক যথাযোগ্য হতে পারে না। তাই সুভাষচন্দ্রের সজীব মন ও সচেতন ব্যক্তিত্ব ভয়ে অসাড়তা অবলম্বন না করে এই অবমাননার প্রতিবিধানের জন্যই রুখে দাঁড়িয়েছিল।

বিশ্বে যে ঘাত-প্রতিঘাত আছে, মানুষের ঝগড়া-বিবাদেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। অসভ্য সমাজে বা অনুন্নত-ভাবে শাসিত দেশে একজন যদি আর একজনকে প্রহার বা অপমান করে—তাহলে আক্রান্ত বা অপমানিত ব্যক্তিও প্রহার বা অপমান করে তার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু এটা কি বাঞ্ছনীয়? সভ্য সমাজে বা উন্নত প্রণালীতে শাসিত দেশে, আইনই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আঘাতের প্রতিঘাত করার দায়িত্ব বহন করে—এটাই বাঞ্ছনীয় এবং এই জন্যই আইনের, বিচারকের বা শাসনকর্তার সমদর্শী হওয়া প্রয়োজন। আইনের চক্ষে—শুধু কাগজে-কলমেই নয়; মাঠে-ঘাটে, রাস্তায়, রেলগাড়িতে, অফিস-আদালতে, কল-কারখানায়, স্কুল-কলেজে সর্বত্রই সকলের সমান ব্যবহার পাওয়া দরকার। সুতরাং বিজ্ঞ ও বিবেচক নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদরা এই সমস্ত বিষয়কে দৃষ্টিপথে রেখেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন, যার ফলে ক্রমান্বয়েই ব্যক্তি-গত প্রতিশোধের অভ্যাস ও প্রবৃত্তি কমে গিয়ে তার স্থানে আইন-নির্দিষ্ট প্রতি-বিধান ও প্রতিঘাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব আইন যেখানে অ-পক্ষপাতের প্রতি-বিধানের ভার নেয়—সেইটেই আদর্শ দেশ, জাতি ও সমাজ। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টিত হওয়া সর্বত্রই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহা, গুপ্ত আক্রমণ ও আঘাত করে ভয়ে ভয়ে থাকাটা মনুষ্যত্ব বিকাশেরও অন্তরায়—অতএব অতীব গর্হিত। এই সমস্ত অসঙ্গতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল যখন সুভাষচন্দ্রকে ডেকে গর্জন করে বললেন—'কলেজের সমস্ত ছেলের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে উচ্ছৃংখল, তাই কলেজ থেকে তোমাকে বিতাড়িত (রাস্টিকেট) করা হল'। সুভাষচন্দ্র কোন কথা না বলে স্বচ্ছন্দচিত্তেই কলেজ ত্যাগ করে চলে এলেন।

এই ঘটনার পর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একচ্ছত্র সম্রাট স্যার আশুতোষ বুঝলেন—এ ছেলে তো নোট মুখস্থ করা নির্জীব প্রাণী নয়। এর আছে মন, সজীব মন, সে মনে আছে তেজ—এ মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রবন্ধু আশুতোষের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র আবার কলেজে পড়ার অনুমতি পেলেন এবং স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে বি-এ পড়া শুরু করলেন। কিন্তু এই ঘটনা একদিকে যেমন সুভাষচন্দ্রকে কলকাতার ছাত্র ও উচ্চ মহলে সুপরিচিত করে দিল, আর একদিকে তিনি পেলেন জীবনকে সার্থক করে তোলবার পথ-নির্দেশ। এই ঘটনা সম্পর্কে পরে সুভাষচন্দ্র নিজেই বলেছেন—"সদাচরণের দিক থেকে বিচার করলে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন নিষ্কলঙ্ক নয়। সেদিনের কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন কলেজের অধ্যক্ষ ডেকে কলেজ থেকে আমাকে 'সাসপেন্ড' করা হল বলে আদেশ জানালেন। তাঁর সেদিনের কথাগুলি এখনো আমার কানে বাজছে—'কলেজের সমস্ত ছেলেদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে উচ্ছৃংখল।' সেদিনটা সত্যিই আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমার জীবনের অন্য সব আনন্দ নিষ্প্রভ হয়ে যায়, আমার জীবনে এই প্রথম নীতি এবং স্বাদেশিকতার বাস্তব-ক্ষেত্রে কঠোর পরীক্ষা হয়ে গেল। আমি যখন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বড় হলাম, তখন আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা চূড়ান্তরূপে স্থির হয়ে গিয়েছে।"

স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় দর্শন বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এম-এ পড়তে পড়তে সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাত চলে যান। ১৯২০ সালে মাত্র আট মাস পড়াশুনার পর তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করে আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ সহ বি-এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এই সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতবাসীর ওপর বৃটিশ সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের পর ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে গঙ্গা-যমুনা-নর্মদা-কাবেরীর তীরে তীরে এক নবজীবনের স্পন্দন দেখা দিল। বিশেষ করে বাংলাদেশে তখন এক নতুন ভাবের রক্তপ্রভাত নেমে এলো। ভাবোন্মত্ত বাংলাদেশ জাতীয় মনুষ্যত্বের সন্ধানে এদিক-ওদিক খুঁজছিল—সহসা এক অতি-বিলাসীর স্বর্ণসৌধচূড়ায় তাঁর আগমন-জ্যোতি দেখা দিল। সর্ব মোহ, সর্ব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে চিত্তরঞ্জন পথে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দাঁড়ালেন। বাঙালী উল্লাসভরে গেয়ে উঠল—স্বাগত হে দেশবন্ধু! স্বাগত হে রাজভিখারী!

সুভাষচন্দ্র বিলাতে বসেই অন্তরের অন্তস্তলে সে আহ্বান শ্রবণ করলেন। আই-সি-এস পরীক্ষায় পাশের পর তিনি দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ-দান করে দেশসেবার সুযোগ লাভের এমন উন্মুখ হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লিখলেন—"আপনি বাংলাদেশে আমাদের সেবা-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আজ আমি উপস্থিত হয়েছি আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার আমার বিশেষ কিছুই নেই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর। আমার আর কিছু দেবার নেই। আমি আজ প্রস্তুত, আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।"

সুভাষচন্দ্র নিজেকে দেশমাতৃকার চরণে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করবার অদম্য প্রেরণা অন্তরে অনুভব করেই সযত্নে অর্জিত আই-সি-এস পদ ত্যাগ করেই ভারতে চলে আসেন। প্রথম যৌবনে সুভাষ-চন্দ্র সন্ন্যাসের প্রেরণায় যে গুরুর সন্ধানে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—বিলাত থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সে গুরু তাঁরই অপেক্ষা করছেন। সুভাষ-চন্দ্রও ভক্ত, শিষ্য ও সাথী হিসাবে সেদিন দেশবন্ধুর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন—বাংলাদেশে স্বদেশসেবার আয়োজনে এক নতুন যুগের সূচনা হল।

বিদেশী শিক্ষা বর্জন করে জাতীয় শিক্ষার ধারা প্রবর্তনের জন্য দেশবন্ধু যে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠানের আয়োজন

করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে প্রথমেই তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। কর্মযোগী সন্ন্যাসী এতদিন পরে কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পেলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশবন্ধুর প্রধান সহচররূপে গণ্য হলেন। ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করার পর প্রথমেই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে কারারুদ্ধ হলেন—অগ্নি-দীক্ষার ব্রতে এই তাঁর প্রথম আত্মাহুতি। কারামুক্তির পরেই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু তাঁর নবগঠিত স্বরাজ্য দলের মুখপত্ররূপে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সুভাষচন্দ্র তখন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তরূপে স্বরাজ্য দলের এই পত্রিকার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বঙ্গীয় স্বরাজ্য দল কলিকাতা কর্পোরেশন দখল করলে সুভাষচন্দ্র এই নবগঠিত কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ছ'মাস পরেই সুভাষচন্দ্র ভারতরক্ষা আইনানুসারে কারারুদ্ধ হয়ে সুদূর মান্দালয় জেলে নির্বাসিত হন। মান্দালয় জেলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে এবং ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যই ১৯২৭-এর এপ্রিল মাসে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর এক সহকর্মী বন্ধুর পত্রোত্তরে লিখেছিলেন—"রাজনীতির স্রোত ক্রমশ যেরূপ পঙ্কিল হয়ে আসছে, তাতে মনে হয় অন্তত কিছুদিনের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়ে দেশের কোন উপকার হবে না। সত্য এবং ত্যাগ এই দুটি আদর্শ রাজনীতিক্ষেত্রে যতই লোপ পেতে থাকে, রাজনীতির কার্যকারিতা ততই হ্রাস পেতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ, কখনও পঙ্কিল; সব দেশেই এরূপ ঘটে থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাংলাদেশে যাই হোক না কেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সেবার কাজ করে যাও। তোমার মনের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তা তুমি বুঝতে পেরেছ কি না জানি না, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণারও প্রয়োজন। কাজের ভিতর দিয়ে যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরূপ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরের সংযম না হলে বাইরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটি কথা, নিয়মিত ব্যায়াম করলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করলেও সদ্বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হয়ে থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুটি—(১) রিপুর ধ্বংস—প্রধানত কাম, ভয়, স্বার্থপরতা জয় করা; (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।"

মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই আবার দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি পূর্ণ সামরিক পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন এবং নিজেই সেই বাহিনীর 'জেনারেল অফিসার কমান্ডিং' হন। কলিকাতা কংগ্রেসের পর তিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রস্তাব নিয়ে 'স্বাধীন সঙ্ঘ' গঠন করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সভার পরিচালকরূপে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে 'দেশগৌরব' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি বার বার কারারুদ্ধ হয়ে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে সমগ্র ভারত তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে এবং ভারত গভর্নমেন্ট তখন তাঁকে ভারত ত্যাগ করে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যেতে দিতে সম্মত হন। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত ত্যাগ করে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রার সময় তিনি বলেছিলেন—"বাংলা মরিলে কে বাঁচিবে? বাংলা বাঁচিলে মরে কে?" এ প্রাদেশিকতার বাণী নয়, আত্মরক্ষার বাণী। বাস্তবপক্ষে, আজকের এই দুর্দিনে জাতিকে বাঁচতে হলে বাংলার যুবশক্তিকে সুভাষচন্দ্রের এই বাণীকে সফল করে তুলতে হবে।

১৯৩৬ সালে ভারত গভর্নমেন্টের বিনা অনুমতিতেই আইন অমান্য করে ভারতের বোম্বাই শহরে পদার্পণ করা মাত্রই আবার ১৯১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল এবং কিছুদিন বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করার পর তাঁকে কার্শিয়াং-এ অন্তরীণ করে রাখা হল। ১৯৩৭ সালে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে কিছুদিন ডালহৌসীতে থেকে চিকিৎসার পর পুনরায় বিলাত গমন করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে ফিরে এলেন—দুঃখ-দৈন্যজয়ী বীরের মাথায় তাঁর স্বদেশবাসী জাতীয় গৌরবের শ্রেষ্ঠ মুকুট পরিয়ে দিলো। তার পরের বছরে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালেও তিনি পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে পুনরায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করে তিনি নতুন দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। তখন বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন—তাই তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে একত্রিত করে স্বাধীনতা লাভের চরম সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করে বিশ্বযুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে। কিন্তু বামপন্থীরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তখন এগিয়ে আসতে পারলো না।

ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের কল্পনায় স্বাধীন ভারতের যে চিত্র উজ্জীবিত হয়েছিল, তার রূপরেখা তুলে ধরে তিনি বলেছিলেন—"আমরা চাই ভারতের রূপান্তর। আমাদের সমস্ত জাতীয় জীবন—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত—সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এই নবজন্মের ও স্বাধীনতার নবপরিকল্পনার উদ্বোধন চাই। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আমরা চাই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক—যে-কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন—স্বাধীনতার তাৎপর্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি মানুষ—সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক—সমান হয়ে জন্মায়। তাই জীবনকে উন্নত করে গড়ে তোলবার সুযোগও সকলের সমান হওয়া প্রয়োজন।"

ভারতে সমাজবাদী চিন্তাধারা প্রথম যাঁরা প্রচার করেন এবং সমাজবাদী আদর্শে জনমানসকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন, সুভাষচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি চেয়েছিলেন—'সমাজবাদী লোকতন্ত্র'—তাই সমাজবাদ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছিল করাচী নওজোয়ান সভার অভিভাষণে—"যে আদর্শ আমাদের সম্মিলিত জীবন গড়ে তুলতে হবে তা হল—ন্যায়, সমতা, স্বাধীনতা, অনুশাসন ও প্রেম। এই পঞ্চনীতিই হল সমাজবাদের সার কথা।" এই সমাজবাদকেই আমি ভারতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। বিদেশ থেকে আমরা আলো ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবো। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, অন্য দেশকে আমাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা চলবে না। অন্য দেশ থেকে আমরা যা অর্জন করবো, তাকে অনুধাবন করে আমাদের জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করব।......মোট কথা, ভারতবর্ষের নীতি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয়।"

১৯৪১ সাল—বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে চলেছে। স্বগৃহে অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র—অর্গলবদ্ধ গৃহে পূজার্চনা, ধ্যান-ধারণায় মগ্ন। রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান

# তুমি যদি

দুর্গাদাস সরকার

তুমি যদি দেখতে এসে ঃ
হৃদ্‌পিণ্ড ভাগ হয়েছে।
বড়াই করে বাদুড় পুষছে।
ভাগ হয়েছে মানুষগুলি।

নামাবলী গায়ে ঢাকা।
বুকের মধ্যে ভালোবাসা
কোথায় গেল কেউ জানি না।
খুলি ভর্তি লম্বা বুলি।

হাসপাতালে রক্ত রাখছে।
রক্ত নিচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে।
কতটুকু দিলাম রক্ত
সে-কথাটাই বেবাক ভুলি।

আইনকানুন সবই আছে।
মার খাচ্ছে মরা লোকে।
কে যে কখন কার হয় ভক্ত,
মুখে তবু চোস্ত বুলি।

জন্ম থেকে শুনছি সবাই—
আসবে, আসবে, আসছো তুমি...
কেউ জানি না আসবে কি না।
দাঁড়িয়ে হাসে স্বাধীন শূলী।

আসছে, আসছে, আসবে ঠিকই
নতুন কালের নবজাতক,
যার মাঝে আজ তোমার আকাশ
তরুণের সেই স্বপ্নগুলি।

করলেন তিনি ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতা দিবসে। ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি ক্ষিপ্র গ্রহের মত কাবুল হয়ে 'দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু' অতিক্রম করে চক্রশক্তির দেশ রোম হয়ে জার্মানীতে গমন করেন এবং হের হিটলার কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়ে জার্মানীতেই 'নেতাজী'রূপে পরিচিত হলেন। তারপর অক্লান্ত পরিশ্রমে আধুনিক রণ-কৌশল আয়ত্ত করে—যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আরও রহস্যজনকভাবে রণ-বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের তলদেশ দিয়ে টোকিওতে উপস্থিত হন। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে এসে ডাক দিলেন এশিয়ার নেতাজী—গড়ে তুললেন এক বিরাট শক্তিশালী 'আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্র' ও তার সেনাবাহিনী 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। অদ্ভুত, বিস্ময়কর, অথচ বাস্তব সত্য! মহাশক্তিধর 'ভারত-পথিক' মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র—হাতে তাঁর জ্বলন্ত মশাল, মুখে তাঁর অগ্নিবর্ষী ভাষা—'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' অলৌকিক কর্মতৎপরতা, অসামান্য দার্ঢ্য—দুর্লভ শৌর্যবীর্যের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর বুকে একটা আলোড়ন তুলে—ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে সসৈন্যে ভারতের পূর্ব সীমান্তে কোহিমায়, ইম্ফলে এসে ভারতের বিজয়কেতন উড্ডীন করেন। ভারতের বিরোধী দলগুলিকে স্তব্ধ করে অজ্ঞাত স্থান হতে বেতারে ভেসে-আসা নেতাজীর কণ্ঠস্বর—দুর্গম অরণ্য ও পর্বতের ভিতর দিয়ে তাঁর সৈন্য চালনা—হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালীতে কোন পার্থক্য না রেখে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা—এই তো ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বীর-বাণীর প্রধান আকর্ষণ—এই তো শ্রেষ্ঠ দেশসেবী মহান কর্মযোগীর কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন।

'ভারত-পথিক' বলতে আমাদের যা মনে আসে, তা হল এই ভারতবর্ষেরই নিজস্ব এক বিশেষ মূর্তি। এই ভারতবর্ষ একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ; বিশ্বভুবনের যিনি পরম দেবতা তাঁরই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর পর্বতে, অরণ্যে, মরু-প্রান্তরে, সাগরসঙ্গমে, নদীতটে এই ভারতের পরিব্রাজক। ভারতবর্ষের সেই পরিব্রাজকের রূপটি আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষের পুরাতন ঋষিদের মধ্যে—দেখতে পাই বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য-বিবেকানন্দের মধ্যে আর দেখতে পাই ভারতের অগণিত নর-নারীর অন্তহীন তীর্থযাত্রীর অব্যাহত ধারার মধ্যে। ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্র তাঁর পনের বছর বয়স থেকেই জীবনের সুনির্দিষ্ট অর্থ ও লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলেন—'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সনাতন ভারতবর্ষকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন; তাই আঠার বছর বয়সেই নিজের জীবনের সার্থকতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"Embodiment of the past, product of the present and prophet of the future."—নিজের এই ভাবমূর্তিই কিশোর বালকের ধ্যানে ধরা পড়েছিল, অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—ত্রিকালের মধ্যে বিস্তারিত ভারতবর্ষকেই নিজের অস্তিত্বের গণ্ডূষে ধরবার অগস্ত্য-পিপাসা।

বিস্তারিত ভারতবর্ষের সেবার দুর্বার আকর্ষণই সুভাষচন্দ্রকে তাঁর কুসুমিত জীবনের ভোগ-বিলাসের আহ্বান বিসর্জন দিয়ে রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে টেনে এনেছিল। কেন তিনি রাজনীতি গ্রহণ করলেন, নিজেই তার উত্তর দিয়ে বলেছিলেন—"রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করি নি। নিজের জীবনকে পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারতমাতার চরণে অঞ্জলি নিবেদন করবো—এই আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এই আদর্শই আমার জীবনের জপ-তপ ও স্বাধ্যায়।"

তাই তো ছিলেন তিনি জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাবয়ব প্রতিমূর্তি—ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্র। দৃষ্টিপথে তাঁর ভারতের অতীতের সমুজ্জ্বল ইতিহাস, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ—বেরিয়ে পড়লেন তিনি ভারত-আত্মার সন্ধানে। চলেছেন ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্র—পথ চলতে চলতে 'দুর্গম গিরি-কান্তার' লঙ্ঘন করে, 'দুস্তর পারাবার' অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন ভারত-আত্মার সেই একনিষ্ঠ সাধক। ডাক দিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র সমগ্র এশিয়াবাসীকে—দিলেন তাদের মুক্তির মন্ত্র। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিকে—এগিয়েই চলেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র—লক্ষ্য তাঁর ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। ডেকে বললেন তিনি ভারতবাসীকে—"আমার আদর্শ দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি।"

আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই শুভ জন্মদিনে তাঁর আত্মত্যাগ ও দেশ-সেবার আদর্শকে অনুধাবন করে বুঝতে হবে—"রাজনীতি পেশা নয়, স্বদেশ ও সমাজসেবার মহান আদর্শ।"

—জয়হিন্দ!

কয়েকটা যুগ ধরে বাংলা দেশে একটা বৈপ্লবিক 'রিলে রেস' হয়েছিল; সেটি একান্তভাবে বাংলারই এবং তার শেষ সংযোগ বা যোগসূত্র ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজী বিমান-দুর্ঘটনা বা প্লেন-ক্র্যাশে পড়েছিলেন কি না, এ বিতর্ক যাঁরা জীইয়ে রাখতে চান রাখুন, কিন্তু বাংলা দেশের ক্র্যাশ ঘটেছে এখানেই; বৈপ্লবিক রিলে রেসের সংযোগ বা যোগসূত্রটি এখানেই ছিঁড়ে গেছে, বিলীন হয়ে গেছে। অথবা বাংলা দেশ আজ শূন্যে বিরাজ করছে; কোনো মানচিত্রেই তার অস্তিত্ব নেই; ভৌগোলিক মানচিত্রে তো নেই-ই, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক চিন্তাক্ষেত্রেও নেই। আজ এরণ্ড-দ্রুমের স্পর্ধিত আস্ফালন বাংলা দেশকে পৃষ্ঠপোষকতার রৌদ্রহীন ছায়াতলে রেখেছে।

সর্বতোভাবে ভিক্ষার্থী ও নোঙর-হীন মুষ্টিমেয় বাঙালীর 'হোমল্যান্ড' পশ্চিম বাংলা উত্তরাধিকারসূত্রছিন্ন; এর শুধু জীবনধারণের অন্নবস্ত্র, তেল-নুন, বিলাস-ব্যসনের আসবাবসামগ্রীই নয়, মনের খোরাক আদর্শ-চিন্তাও আমদানী করতে হয় ভিনপ্রান্ত বা বিভুঁই থেকে। এই জিরজিরে দৈন্যের কঙ্কাল-চেহারা বাংলা দেশে দীর্ঘকাল দেখা যায় নি। আমরা যে শুধু ঐতিহ্য-সূত্র হারিয়ে ফেলেছি তাই নয়, পাঠগুলো ভুলেও গেছি। আমরা যাদের কাছে নতুন পাঠ নিয়েছি একথা বলতে যে, আমাদের স্বদেশের বিপ্লবীরা ছিলেন স্বপ্নচারী নির্বোধ অ্যানার্কিস্ট, সেই বিদেশী শিক্ষকদের নামেই ডাকতে চাই নিজেকে, নিজের সন্তানদের; বলি, আমার নাম তোমার নাম ওঁদেরই নাম ; তরুণ যুবকদের প্যারেডে দাঁড় করিয়ে বলি, তোমার ব্রিগেডের পরিচয় এদেশের কারও নামে হতে নেই, এদেশে মানুষ, "বিপ্লবী" মানুষ, জন্মায় নি কোনকালেও। চেষ্টা করে ওদের অভিশপ্ত পিতৃকুলও ভুলিয়ে দিতে চাই।

মাঝে মাঝে অবশ্যই চমকে উঠি যখন গুরুমুখে এদেশেরই কোনো মহাপুরুষের নামোচ্চারণ ঘটে এবং তখনই কেবল মতির পট পরিবর্তন হয়। সেই অন্ধকার যুগেও এমনি হয়েছিল, আমাদের শাসকশ্রেণী বা শাসক জাতির কোনো পণ্ডিত আমাদের পূর্বপুরুষের পরিচয় এনেছেন সামনে। আমাদেরও নাকি কিছু দর্শন, কিছু শাস্ত্র, কিছু সাহিত্য, কিছু গৌরব ছিল কোন আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহে আচ্ছাদিত। তাঁরাই খুঁড়ে এনে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন—সত্যি করে ভাস্কো-ডি-গামা নন। কেবল তখনই সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল দর্পণ নিজেকে দেখে নেবার। ঠিক তেমনি দেখা গেছে, এযুগেও যখন বিদেশী নতুন শিক্ষকেরা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বুর্জোয়া আবর্জনায় নিক্ষেপ করার মানুষ নন, রামায়ণ-মহাভারত অপাঠ্য নয়, দলভুক্ত না হলেও কোন কোন লেখক বা ব্যক্তিকে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসানো যায়, কেবল তখনই সংশয়াচ্ছন্ন বিস্মিত বিশ্বাস ও জিজ্ঞাসা জন্মেছে মনে। কিন্তু ঝিনুকে-খাওয়া অভ্যাস ছাড়া দায়! যেটুকু বলা হল ঐটুকুই, কেন না, এর বেশি মুখ বাড়াতে ভয়, পাছে মুখ পোড়ে। চিন্তার দাসত্ব এর চেয়ে নিচু স্তর পেতে পারে না! সুতরাং, ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ দেশের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত শুচিবাইয়ে হাতে-পায় ঘা হয়, সর্বদাই আতঙ্ক বিচ্যুতির। অন্বেষণে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় ভয়।

রিলে রেসের শেষ সূত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্যন্তও আমরা এত খাদে পড়ি নি। সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী এরণ্ডারণ্যে শূন্যগর্ভ সেই সব বাচালদের কণ্ঠই সোচ্চার যারা শত্রুপক্ষের বুকে মুখ রেখে সুভাষকে বলেছে কুইসলিং, নয়তো বলেছে................

কি বলেছে সেই পচা খেউড় ঘাঁটতে চাই নে। কেন না, শুনেছি, চতুর চোরেরাও জনতার সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে পালানো চোরের পেছন ছোটে। দুর্নাম জপধারীরাই যে কোন-না-কোন বিদেশী রাষ্ট্রস্বার্থের বেতনভুক্ চর এই সত্যটা আবডাল দিতেই সোরগোলের ধূলিজাল সৃষ্টি করেছিল, যাতে চক্ষুষ্মানও চোখ চেয়ে ওদের স্বরূপ দেখতে না পায়। তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিতালি ছিল পবিত্র এবং পবিত্র ছিল তাদের সাহায্যে স্বদেশবাসীর হনন। যে-আয়নায় ওরা ধরা পড়েছিল বিদেশী রাষ্ট্রস্বার্থের শাদাপোষাকী প্রহরীরূপে সেই আয়নায়ই দেখতে চেয়েছিল ওরা সুভাষচন্দ্রকেও। হাওয়া ছিল ওদের অনুকূল, তাই ওদের ব্যাধিগ্রস্ত বিকৃত দেহও সেদিন প্রচারের পালিশে বার-বনিতার রূপ নিয়েছিল। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য, কুষ্ঠ ঢাকা যায় না।

তবু সেই লুকোচুরি, সেই ঐতিহ্য অস্বীকারের জলকেলি চলেছে আজও; তাই ওরা তড়িঘড়ি যুবচিত্তকে একেবারে বাংলার ঐতিহ্যের বিরোধী প্যারেডে সামিল করতে তৎপর—মাঠে-ময়দানে। কিছুমাত্র লজ্জা বা কৃতজ্ঞতা থাকলে এই কৃতদাসদের বিভীষণবাহিনীগুলোর লাল ফানুসেও রাজা রামমোহন, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, বিপ্লবী রাসবিহারী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র নাম অঙ্কিত করতে পারত। শুনেছি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরেরা এদের ভীড় বাড়িয়েছেন, কিন্তু তাঁরাও বিস্মৃত হয়েছেন আধুনিক বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লকে, বিনয়-বাদল-দীনেশ, জালালাবাদের আত্মদানী, ফাঁসি-মঞ্চের প্রদ্যোৎ, সূর্য সেনকে। মহৎ আদর্শে প্রাণ উৎসর্গের তালিকা কিছু সামান্য নয়, কিন্তু এদের অশ্রদ্ধার চোখের ছানিতে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। বঙ্গমাতা অতিমাত্রায় সহিষ্ণু, তাই কৃতঘ্নদের এখনও অঙ্কাশ্রয়ে রেখেছেন।

ওরা বলে প্রতিক্রিয়া। হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। আজকের শূন্যে বিরাজমান বাংলার মাটিতে পা পড়বেই—আজ রুশ-

[illegible] আফসোস ও আত্মনিগ্রহই চলুক। সেদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্রে এসে যে একান্ত বাংলার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের রিলে রেস বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাই অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যে আগ্রাসনে ওরা বাংলার লাঞ্ছনা ঘটিয়েছে সেই দুর্বার আগ্রাসনেই ওরা ঘেরাও হয়ে লিকুইডেটেড হবে; সবাই বিনা খেসারতে পার পাবার মতো স্ট্যালিন-নেহরুর ভাগ্য নিয়ে জন্মায় না। আজ চোখধাঁধানো বিপরীত চিত্র দোদুল্যমান থাকলেও ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিতে সেই অনাগত পরিস্থিতির লক্ষণও ভ্রূণাবস্থায় দৃশ্যমান। সেদিন আর কোন নেতাজী-সমকক্ষ স্পিয়ারহেড, নেতাজীবাহিত উত্তরাধিকার দায় নিয়ে ছুটবে উত্তরপুরুষকে লক্ষ্য করেই।

চারদিকে 'চিতরি-বান্দো'র মধ্যেও আজ সময় হয়েছে সেই বাংলার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সূত্রটি ধরিয়ে দেওয়ার। এর সংক্ষিপ্ত মূল কথাটি এই যে; একদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অন্যদিকে রাসবিহারী বসুর প্রসারিত স্নেহস্নিগ্ধ বাহু সুভাষচন্দ্রে হস্তান্তরিত করেছে রা ম মো হ ন-বিদ্যাসাগর-অ র বি ন্দ-রবীন্দ্রের সমন্বিত ঐতিহ্য। এই সত্য সুভাষচন্দ্রের জীবনে জ্বলন্ত। এই সব মহামনীষীদের প্রেরণা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অনায়াস উৎসারিত।

সুভাষচন্দ্র নিজে বার বার এ সত্য স্বীকার করেছেন, তাঁর জীবনীকারেরাও বলেছেন। এই সেদিন (২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯) স্টেটসম্যানে পদ্মালয় দাস 'দি বয় ফ্রম কটক' শিরোনামায় লিখেছেন এ কথাই। সতীশচন্দ্র মিত্রের একটি কথা তিনি উদ্ধৃত করেছেন। মিত্র বলেছেন :

> "He would often read out extracts from the writings of Swami Vivekananda and Rabindranath"

কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে পড়ার সময় সুভাষ যে "ব্রিগেড" গড়েছিলেন, মিত্র ছিলেন তারই এক সেনা। সুভাষ যে যোগ-ব্যায়াম করতেন, শ্মশানে ঘুরে বেড়াতেন, রোগীর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করতেন, তীর্থ ও গুরুর সন্ধানে ফিরতেন—এ কথারও তিনি উল্লেখ করেছেন। সুভাষের মধ্যে বাঙালী তথা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ গুণের বিকাশ দেখেই রবীন্দ্রনাথ সুভাষকে নেতা পদে বরণ করেছিলেন :

"বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির [illegible] যখন [illegible] পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের [illegible] শাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, [illegible] দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হাজে দাঁড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ দেহে রোগের মতো তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ করে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল করে তোলে।

"সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি—তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি, তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।"

আজ কবিগুরুর দীর্ঘ সেই চিঠির এই ভগ্নাংশটুকুও কি নির্মম সত্যরূপে মনকে অশান্তিতে ভরে দেয়। [illegible] [illegible] হয় না [illegible] [illegible] করতেও মহত্ত্বের প্রয়োজন হয়। এবং এই কারণেই আপন [illegible] ক্ষুদ্রচেতারা যখন মহতের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর তখন একদিকে সুভাষচন্দ্র যেমন অপরিমেয় শ্রদ্ধায় কবিগুরুর হাতে "মহাজাতি সদনে"র ভিৎপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশযাত্রায় পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথ অপরিসীম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রে তিনি অনাবিল আস্থায় যে নেতৃত্ব ন্যস্ত করেছিলেন 'নেতাজীর' মাহাত্ম্যে তা পরম সত্য হয়ে উঠেছিল প্রবাসে—মাতৃভূমির অন্তরে রক্ত-মালয়ে মাতৃভূমির মুক্তিলগ্ন ত্বরান্বিত করতেই। দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ নেতাজীর সে গৌরব-কাহিনীর সংবাদ শুনে যান নি।

যেমন দেখে যান নি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর স্নেহপুত্তলী সুভাষচন্দ্রের পরিণত রাজনৈতিকের প্রোজ্জ্বল মূর্তি। যৌবনে আই-সি-এসের নিশ্চিন্ত জীবনের চাইতেও দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্বত্যাগী দধীচি দেশবন্ধুর দরিদ্র সংগ্রামীজীবন বেশি আকর্ষণযোগ্য মনে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে লিখলেন :

"আপনি বাংলা দেশে আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক। তাই আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার আমার বিশেষ কিছু নেই; আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের তুচ্ছ শরীর। আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কাজের আদেশ দিন।"

সুভাষচন্দ্রের জীবনীকার, "মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র" লেখক শিশির দাশ লিখেছেন : "১৯২১-এর এপ্রিল মাসে তিনি আই-সি-এস পদ প্রত্যাখ্যান করলেন—বৃটিশ বুঝল, ভারতবর্ষের ৩[illegible] কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি লোকও আছে, যিনি জাতীয় আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ চাকরি আই-সি-এস পদ ত্যাগেও দ্বিধা করেন না।"

এবং এই কারণেই, তথাকথিত [illegible] সরকার, বৃটিশ সরকার এবং বৃটিশ [illegible] সব চাইতে বিস্ময়ের বিষয়, স্বদেশের আপসকামী রাজ্যাভিলাষী নেতারা সুভাষচন্দ্রকে কখনো ক্ষমা করেন নি। এহেন এক জাত-বিদ্রোহী মানুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে প্রত্যক্ষ দে[illegible] লিখলেন :

"আজও তাঁর বিরাট মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে। কলিকাতা [illegible] নেতা যে মিঃ দাশের কাছে আ[illegible] রাজনৈতিক কারণে [illegible] যে[illegible]

বিতাড়িত ছাত্ররূপে পরামর্শ নিতে এসেছিলাম, এঁকে সেই লোক মনে হল না। যে মিঃ দাশ দিনে হাজার টাকা উপার্জন করতেন, এঁকে সেই লোকও মনে হল না। তাঁর বাড়িতেও এখন আর সে রাজপ্রাসাদের জৌলুষ নাই। কিন্তু যে মিঃ দাশ সব সময় তরুণের বন্ধু ছিলেন, তরুণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যিনি বুঝতেন, তাদের দুঃখে সমবেদনা জানাতেন—ইনি সেই মিঃ দাশ। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম এই একটি মানুষ যিনি তাঁর উদ্দেশ্য এবং কর্ম-পদ্ধতি জানেন এবং বোঝেন। তিনি তাঁর সর্বস্ব দান করেছেন এবং অপরের সর্বস্ব দাবি করবার অধিকারও অর্জন করেছেন। তারুণ্য তাঁর কাছে দোষ নয়, তারুণ্য তাঁর কাছে ধর্ম। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ হল, আমিও মনস্থির করতে পারলাম। আমি বুঝলাম এতদিনে নেতার সন্ধান পেয়েছি। স্থির করলাম তাঁকেই অনুসরণ করব।"

এ শুধু কথার ছলে কথা নয়। সুভাষচন্দ্রও নিজ জীবনে "তাঁর সর্বস্ব দান করেছেন এবং অপরের সর্বস্ব দাবি করবার অধিকারও অর্জন করেছেন।" কোনো ব্যক্তিত্বের যাদু এই, এই যাদু-বলেই সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা দেশে বলিষ্ঠ তারুণ্যকে ঘরছাড়া করে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিয়োগ করতে পেরেছিলেন এবং নেতাজীর ব্যক্তিত্বেও এই যাদু কিভাবে অপরের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ খানের বয়ানে তা প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে :

'বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দুই এঞ্জিনবিশিষ্ট একখানি জাপানী বিমান এসে আমাদের সামনে বিমান ঘাঁটিতে নামল। নেতাজীকে দেখবার জন্য আমাদের আর তর সইছিল না—এক এক সেকেণ্ডকে মনে হচ্ছিল এক এক ঘণ্টা।......

"গৌরবব্যঞ্জক মূর্তিতে খাড়া হয়ে মাথা তুলে মধুর স্মিতমুখে নেতাজী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যে দেখছে সে-ই মুগ্ধ হচ্ছে। আমরা তাঁর দিকে চেয়ে ভাবছিলাম—হ্যাঁ, এইবার আমরা আমাদের ঠিক নেতা পেয়েছি—ইনিই আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিতে পারবেন।" (আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী, পৃঃ ১৪২-৪৩)

দেশবন্ধুকে দেখে সুভাষচন্দ্র যে কথা বলেছিলেন এ তারই প্রতিধ্বনি এবং যে-দেশবন্ধুকে দেখে সুভাষচন্দ্রে যাদু প্রভাব বিস্তারিত হয়েছিল সেই দেশবন্ধুর জীবনে আর এক ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়েছিল: তিনি শ্রীঅরবিন্দ।

১৯৩৮ সালে এলগিন রোডে পরিমল গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের ফোটোগ্রাফ।

"আজ যে অপরাধে ইনি অভিযুক্ত, মনে করবেন না যে, এই বিচারালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই তার মীমাংসা হয়ে যাবে। অরবিন্দ আজ মানব ইতিহাসের বিচারশালায় দাঁড়িয়ে আছেন। আজ আমি শুধু এই কথাটাই এখানে বলতে চাই যে, আজকের এই বাদানুবাদ যেদিন অতীতের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে, ভবিষ্যতের সেই অনাগত দিনে—আমি অত্যন্ত জোর দিয়েই বলছি—আজ যিনি আসামীরূপে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিন তিনি আর অপরাধীরূপে এইভাবে চিত্রিত হবেন না। দেশপ্রেমের চারণ কবিরূপে, জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারূপে, মানবপ্রেমিকরূপে—দেশের লোকেরা, পৃথিবীর লোকেরা এঁকে সম্মান করবে। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই যেদিন এঁর বাণী ভারতের সমুদ্রতট ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে—প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে সারা বিশ্বের মানুষের প্রাণে।" (মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ৬৩)

মাণিকতলা-মুরারিপুকুর অথবা আলিপুর বোমার মামলায় ব্যারিস্টার মিঃ সি আর দাশ সওয়াল করছিলেন। যেসব ডায়লেকটিকস-গর্বান্ধ শরিকী সংঘর্ষে শ্রেণী-সংগ্রাম দেখেন, তাঁদের নির্বোধ দৃষ্টিসম্মুখে এই দৃষ্টান্ত রেখে বলা দরকার যে, এরই নাম ঋষিদৃষ্টি, মুক্ত-স্বচ্ছ ডায়লেকটিকস। একটা বোমার মামলার আসামীর মধ্যে যিনি সুদূর ভবিষ্যতের শ্রীঅরবিন্দকে আবিষ্কার করতে পারেন, তিনিই তো দূরদর্শী। এবং এই শ্রীঅরবিন্দই বা কে? বাংলা দেশে সেকালে তারুণ্য-মথিত বর্শাগ্র, যে তারুণ্যকে, যৌবনকে উদ্বোধিত জাগ্রত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই পূতাগ্নিবাহীর শেষ তারুণ্য প্রতীক।

নেতাজী স্বয়ং এই অগ্নিসন্তান বিবেকানন্দ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত :

"এইরকম বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালীর মনকে যেমন আকৃষ্ট করে এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বে-হিসাবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী।...বকধার্মিকদের উদ্দেশ করে তিনি বলতেন, ফুটবলের মধ্য দিয়ে মুক্তি আসবে, গীতার মধ্য দিয়ে নয়।...... স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে সংগ্রামী, —সেই জন্যই তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক,—তিনি তাই দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। শক্তি শক্তি শক্তির কথাই উপনিষদ বলেছেন, স্বামীজী এই কথাই বার বার বলেছেন।...আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছুই বলা হবে না।"

যেমন বলা হবে না নেতাজীর বিষয়ও। সব ধারা এসে মিশেছে এই বাংলার শেষ নায়কে। বিবেকানন্দ তাঁর

রক্তধারায় অনুপ্রাণিত, সেই তেজ, সেই দীপ্তি, সেই মনীষা।

"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষে গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্র সৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।"

চারিত্রপূজায় বিদ্যাসাগরচরিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই শেষ কথাটি আমি একটু বিস্তৃততর ক্ষেত্রে নেতাজী-চরিত আলোচনায় প্রয়োগ করতে চেয়েছি। "পূর্বপুরুষ" বলতে আমি শুধু রামজয় তর্কভূষণ—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বংশপরম্পরা অথবা দাশরথি—মহাপতি—হরনাথ—জানকীনাথ বসুর বংশতালিকাও বুঝি নে; আমি বাংলা দেশের এই এক বিশেষ ভৌগোলিকক্ষেত্রে যে ব্যক্তিত্বের বংশধারা প্রবাহিত, সেই ধারা অনুসরণেই পূর্বপুরুষ বলতে বুঝি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রাসবিহারী, দেশবন্ধুকে। বৈষয়িক বিচারে এঁরা কেউ কেউ নিঃসন্তান, কিন্তু এঁদের ব্যক্তিত্বের উত্তরাধিকার উত্তরপুরুষে হস্তান্তরিত হয়েছে, হয়েছে নেতাজী পর্যন্ত। বিদ্যাসাগর-চরিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথই বলেছেন :

"যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের।...আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশ-ভূষায়, আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূল পত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।"

এই ধারা। "ভারতপথিক রামমোহন রায়" থেকে এই অনুসৃত ধারা, বাংলা দেশের এই উত্তরাধিকার :

"সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেন না তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই 'অতীত-কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের মুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্ব-মানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহা-জাতীয়তায়।" (রবীন্দ্রনাথ)

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে এবং সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত এ কথাগুলো কি অপরূপ মাধুর্যে সত্য!

মেজর জেনারেল শা নওয়াজ খান লিখেছেন : "ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবরূপে যাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তি তাঁর প্রকৃত লিপি-চিত্র অঙ্কন করবে—এ কি সম্ভব? আমার ত' মনে হয় এ শুধু দুঃসাধ্য নয়—এ অসম্ভব।

"এ কথা আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যে মুহূর্তে আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর চরিত্র আমার মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। নেতাজীকে আমি মানুষ, সৈনিক ও রাজনীতিজ্ঞ—এই তিনরূপে দেখেছি, কিন্তু এখনও ঠিক করে বলতে পারি না—এই তিনের কোন্ রূপে তিনি সবচেয়ে বড় আর কোন্‌টাতে ছোট।

"মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধুর মত, সাথীর মত। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের তিনি নেতা—কিন্তু হাবভাবে কোন দিন তিনি তাঁর প্রভুত্ব জাহির করেন নি। তিনি নিত্য কঠোর জীবনযাপন ও অমানুষিক পরিশ্রম করতেন; আবার সবার দুঃখ-কষ্টের ভাগও গ্রহণ করতেন। তিনি আজাদ হিন্দ দলের প্রত্যেক লোকের খোঁজ-খবর নিতেন।

"জাপানীদের সঙ্গে নেতাজীর সম্বন্ধ শেষে কি গিয়ে দাঁড়ায়—এ নিয়ে প্রথম প্রথম আমরা খুবই মাথা ঘামিয়েছি।......অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম নেতাজী কারো কাছে নতি স্বীকার করার লোক ন'ন, দেশের সম্মান তিনি কোন কিছুর পরিবর্তে খোয়াতে রাজী ন'ন।

"ধর্ম সম্বন্ধীয় বা প্রাদেশিক ভেদা-ভেদ তাঁর কাছে কিছুমাত্র ছিল না। এসব তিনি আমলই দিতেন না। হিন্দু, মুসলিম, শিখ সবাইকে তিনি সমচোখে দেখতেন এবং তাঁর এই ভাবই সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

"নিজের কাজ, ব্যক্তিগত জীবন বলে তাঁর কিছু ছিল না।

"ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর মেয়েদের তিনি নিজের সন্তানের মত দেখতেন।

"তাঁর কড়া হুকুম ছিল—তাঁর নিজের খাদ্য যেন ঠিক সৈন্যদের খাদ্যের মত হয়।

"ভয় কাকে বলে নেতাজী তা জানতেন না, জীবনের কোনপ্রকার সুখ-সম্ভোগের জন্যও তিনি বিন্দুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। কোন দৈবশক্তি রক্ষাকবচ দিয়ে যেন তাঁকে ঘিরে রেখে দিয়েছিল,—আমি বহুবার দেখেছি অল্পের জন্য তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন।" (আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী, পৃঃ ১—১৮)

এই অমৃত-ধারা; এ পথে মৃত্যু নেই; অমৃতস্য পুত্রাঃ, আপাতদৃষ্টিতে ভাগ্যবতী বঙ্গমাতার পুত্র-পরম্পরা নেতাজীতে অবরুদ্ধ। তবু কে জানে এই গভীর তমসা বিদীর্ণ করে দেখা দেবে না বিপ্লবী বাংলার ঐতিহ্যবাহী নেতাজীর উত্তরপুরুষ?

# মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান তত্ত্ব ও বিশ্বরাজনীতি / কাশীকান্ত মৈত্র

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ ছয় ॥

স্তালিনের কথামত যদি সোস্যালিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট-ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্ব ও সহযোগিতা দুই বিরোধী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের সদিচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল হয়, তাহলে মার্ক্সীয় ডায়েলেকটিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে যায়। তাহলে যুদ্ধ বা শান্তির মূল প্রশ্নটি মানুষের ইচ্ছানির্ভর (dependent on human will)।

ঊনবিংশতিতম রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে ম্যালেনকভ বলেন:

> "..Peaceful Co-existence and Co-operation of Capitalism and Communism are quite possible provided there is a mutual desire to Co-operate, readiness to carryout the commitments and adherence to principle of equal rights and non-interference in the internal a[illegible]irs of other States."

স্তালিনের মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া অনুষ্ঠানে ম্যালেনকভ আবার ঘোষণা করলেন লেনিন ও স্তালিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্ব। লেনিন-স্তালিন যে কথা বলেছিলেন তারই পুনরুক্তি করেছিলেন ক্রুশ্চেভ আরও জোরালভাবে, বোধ হয় আরও আন্তরিকতার সঙ্গে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা গোঁসা করলেন ক্রুশ্চেভের ওপর, কুৎসা বর্ষণ করলেন, কিন্তু স্তালিনের ও লেনিনের বিভিন্ন সময়ের উক্তিগুলির কথা বেমালুম ভুলে গেলেন কি করে? কোন্ যুক্তিতে স্তালিন খাঁটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী হলেন আর ক্রুশ্চেভ 'শোধনবাদী' হলেন? হয়ত লেনিন জীবিত থাকলে তাঁকেও উগ্র-মার্ক্সবাদীরা 'শোধনবাদী' বানিয়ে ছাড়তেন। চীনাপন্থী কমিউনিস্টরা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করেন এবং স্তালিনকে অন্যতম মহান লেনিনবাদী গুরু বলে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা কি ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে স্তালিন সম্পর্কে লেনিনের শেষ রাজনৈতিক দলিলটি পড়ে দেখবেন?

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের যে ব্যাখ্যা মাওবাদী চীনা কমিউনিস্টরা করেন, সেটা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে স্বীকার করতে হয় স্তালিন পাকা শোধনবাদী। স্তালিন-ম্যালেনকভ শান্তিপূর্ণ সহযোগিতাকে পারস্পরিকতা, সদিচ্ছা—পারস্পরিক দায়িত্ব-পালনের ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তাহলে বিশ্ববিপ্লব তত্ত্ব, শ্রেণী-সংগ্রাম কি মুলতবি থাকবে? অথচ স্তালিন নিজেই আবার বলেছিলেন:

> "Therefore the development and support of revolution in other countries is an essential task of the victorious revolution. *Therefore the revolution in the Victorious Country must regard itself not as a self-sufficient entity but as an aid, as a means of hastening the victory of proletariat in other Countries.*"
>
> (Problems of Leninism)

এটা কি শুধু মুখের কথা, না অন্তরের অন্তস্তল থেকে নিঃসৃত গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা? অন্য দেশের বিপ্লবীদের মন ভোলানোর জন্যই এইসব বিপ্লবী তত্ত্বকথার ফাঁকে চুপিসারে নিজের দেশকে সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী করে তোলার রাজনৈতিক কৌশল কি এটা? আবার এও সত্য, শান্তিপূর্ণ বিশ্ব-পরিস্থিতি থাকলে "নিজের দেশে সমাজতন্ত্র"—শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করান যায়—যুদ্ধের টানা-পোড়েনে আটকিয়ে গেলে নিজের দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন বা বৈষয়িক উন্নয়নের কাজগুলি মুলতবি থাকে। এ কথাটা স্তালিনের মত ক্রুশ্চেভ ও কোসিগিন ভাল করেই বুঝেছেন।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্বন্ধে স্তালিনের ওপরের মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য হল অন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বিঘ্নিত না করা কোন প্রকারে। এই মনোভাব অবলম্বন করলে সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি ("সোসিয়ালিস্ট ফাদারল্যান্ড") কর্তৃক অন্যান্য দেশে সর্বহারার শ্রেণীবিপ্লবকে মদৎ দেওয়া বা তাকে ত্বরান্বিত করার প্রশ্নটিও অর্থহীন বাক্য-সমষ্টি বা নিছক ধোঁকাবাজি হয়ে দাঁড়ায়।

সোজা প্রশ্ন: অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সর্বহারাদের বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত ও সফল করতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অথবা কমিউনিস্ট চীনের কোন বিশেষ দায়িত্ব ও ভূমিকা ছিল, আছে ও থাকবে কি না? সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি রুশ দেশের (এশিয়া ভূখণ্ডে চীন) যদি এই "ওয়ার্ল্ড মিশন" সত্যি-সত্যিই থাকে, তাহলে দুই বিপরীতধর্মী ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কি করে সম্ভব হবে? অকমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিই বা স্তালিনবাদী ও মাও সে-তুঙপন্থীদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের স্বপক্ষে প্রচারিত বিবৃতিগুলিকে মৌখিক মূল্যে কি করে গ্রহণ করে নেবে? শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান যদি শুধুমাত্র পারস্পরিক সদিচ্ছা, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ওপরই নির্ভর করত অথবা একে অন্যের 'জমিদারীতে' হস্তক্ষেপ করবে না—এই ধরনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রতি নৈতিক আনুগত্যই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে বিশ্ব-বিপ্লবের ধ্যান-ধারণা বা স্বপ্ন পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তত্ত্বের বিচারে সেটাও সম্ভব নয়। রুশ দেশে স্তালিনের উত্তরসাধকরা নিস্তালিনীকরণের ("ডি-স্তালিনাইজেশন") নীতি গ্রহণ করলেও বহির্বিশ্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক মিশন বা ভূমিকার কথাটা অস্বীকার করেন না তত্ত্বের দিক থেকে। রুশ কমিউনিস্ট নেতারা উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন। বিশ্ব-বিপ্লবের কথা বললে পশ্চিমী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হবেন, আবার বিশ্ব-বিপ্লবের কথা ঝাঁঝালো সুরে অবিরাম না বললে চীনা কমিউনিস্ট নেতারা "শোধনবাদী" বা "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের

দোসর" বলে গাল বর্ষণ করবেন এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দেশগুলিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন-বিরোধী করে তুলতে প্রয়াসী হবেন। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী স্তালিন নিজেও জানতেন ছেলে-ভোলানো গানের মত বিশ্ব-বিপ্লবের কথা বলে যেতে হবে, যাতে করে অনুন্নত-মুক্তিকামী দেশগুলি চেয়ে থাকে মস্কোর দিকে, কিন্তু নিজের দেশকে অর্থাৎ রাশিয়াকে আরও শক্তিশালী করার জন্য—বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান—বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন পরিস্থিতিতে ভাটা-পড়া এবং 'একটি দেশে আগে সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ("সোসিয়ালিজম ইন ওয়ান কান্ট্রি") প্রয়োজনীয়তা—এই সব তত্ত্বকথার জাল বুনেছেন। অন্যান্য দেশে বিপ্লব সংগঠিত ও ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে স্তালিনের কি মনোভাব ছিল সে সম্বন্ধে চিন্তাশীল খ্যাতনামা লেখক—যুগোশ্লাভ ফ্যাসীবিরোধী মুক্তিযুদ্ধের অনন্য নায়ক এবং সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়ার অন্যতম স্রষ্টা মিলোভান জিলাস তাঁর এক পুস্তকে বলেছিলেন:

> "His position was only conditional and arose only when the resolution went beyond the interest of Soviet State. He felt instinctively that the creation of revolutionary centres outside Moscow could in danger its supremacy in world Communism and of course that is what actually happened. *That is why he helped revolutions only upto a point as long as he could control them—but he was always ready to leave them in the lurch whenever they slipped out of his grasp.*" (Conversations with Stalin)

বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের চাবিকাঠি থাকবে মস্কোর হাতের মুঠির মধ্যে। "সোসিয়ালিজম ইন কান্ট্রি" এই শ্লোগানের পেছনে রয়েছে সেই জাতীয় মূল আকাঙ্ক্ষাটি প্রচ্ছন্নভাবে। একাধিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন একটি দেশের মনোপলী বা একচেটিয়া কারবার হবে না—আর বিশেষ করে কমিউনিজম যখন মনোপলীর বিনাশের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। স্পেনের বিপ্লব—চীনা বিপ্লব—গ্রীসের বিপ্লব অথবা যুগোশ্লাভিয়ার বিপ্লবে মস্কোর ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা কমিউনিস্ট চীন সর্বহারার বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে তখনই যখন সে-দেশ আশ্বস্ত হবে যে, সে-রাষ্ট্রের সকল বিপ্লব রুশ নেতৃত্বের বা পিকিং-এর হাত ধরেই চলবে।

আর শুধু কি সোভিয়েট বা চীনা নেতৃত্বের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর বিশ্ব-বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে? সেটাও ভেবে দেখা দরকার। অন্যান্য বুর্জোয়া বা অকমিউনিস্ট দেশে বিপ্লবী কমিউনিস্টরা অথবা তাঁদের সমর্থকরা নিজ নিজ দেশের পরিস্থিতিতে কি করবেন সে সম্বন্ধে মার্ক্স-লেনিন-স্তালিন-মাও সে-তুঙ-এর বক্তৃতা ও রচনাবলীতে যেসব উপদেশ-নির্দেশ আছে, তা তাঁরা সাচ্চা মার্ক্সবাদী হিসাবে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হবেন। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে বা জোটনিরপেক্ষ অকমিউনিস্ট দেশগুলির কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতারা লেনিনের "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" ("স্টেট অ্যান্ড রিভলিউশন") পুস্তকে লিপিবদ্ধ জ্বালাময়ী উক্তিগুলি হঠাৎ প্রয়োজন বুঝে মস্কো বা পিকিং-এর স্বার্থে বিস্মৃতই বা হবেন কেন? "মুক্তিকামী" দেশগুলির কমিউনিস্টরা—তা তাঁরা যত দল-উপদলেই বিভক্ত হোন না,—যথা মার্ক্সবাদী-বিপ্লববাদী-শোধনবাদী বা উগ্রপন্থী হঠকারী,—স্মরণ করতে পারেন লেনিনের দু-একটি উক্তি:

> "....liberation of the oppressed class is impossible not only without a violent revolution but also without the destruction of the apparatus of the State power which was created by the ruling class."
>
> (State and Revolution —Lenin.)

আবার

> The Bourgeois State does not wither away according to Engels but it is "put an end to" by the proletariat in the course of the revolution ... It can not be replaced by the Proletariat State—the dictatorship of the proletariat through withering away but as a general rule through a *violent revolution....the necessity of systematically fostering among the masses this ("the inevitability of revolution" and just this point of view about violent revolution lies at the root of the whole of Marx's and Engel's teaching."* (State and Revolution).

বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা-প্রশাসনিক কাঠামো-পুলিশ-সেনাবাহিনী সব ভেঙে তছনছ করে তার জায়গায় হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার শ্রেণীরাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। পুরাতন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ, কর্মচারী, বিচারব্যবস্থা এগুলোকে টিঁকিয়ে রেখে সর্বহারার একনায়কত্বে সর্বহারাদের রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় না। এ এক আপোষহীন বিপ্লবী মনোভাবের কথা বলেছিলেন লেনিন। (লেনিন বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীকে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার ভিত্তিকে উৎপাটিত করতে হবে, চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে—"শ্যাটার", "এক্সটারপেট", "আটারলি ডেস্ট্রয়") এই সময়কার যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হবে তার কি ভূমিকা হবে? এই নতুন রাষ্ট্রের রূপ হবে লেনিনের ভাষায়:

> "In reality this period inevitably becomes a period of *unprecedentedly violent class war in unprecedentedly acute forms*, and therefore the State during this period must inevitably become a State that is democratic *in a new way* (for the proletariat and the poor in general) and dictatorial *in a new way* (against the bourgeoisie)."

এই সময়ে হিংসাত্মক শ্রেণীসংগ্রামের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতায় অতীতের সব নজীরকেই হার মানাবে—সর্বহারার শ্রেণী-রাষ্ট্রের এটা হল টেস্ট। কিন্তু লেনিন নিজেই কি নিজের দেশে অক্টোবর বিপ্লবের পর সমগ্র দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের ও নিজের দলের হাতে পাবার পর নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে পেরেছিলেন? অবস্থার চাপে তিনি ১৯২১ সালে নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচী ("নিউ ইকোনমিক পলিসি") প্রবর্তন করে নিজের নির্দেশকেই নাকচ করেছিলেন। এই কর্মসূচী "একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার" তত্ত্বকে রূপায়িত হবার পথ সুগম করে দিয়েছিল। কিন্তু কোন কোন জোট-নিরপেক্ষ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা লেনিনের
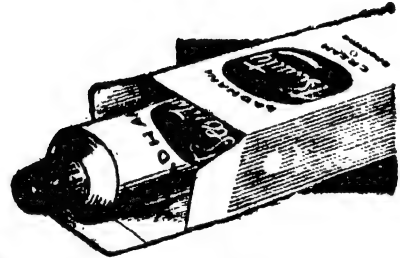
'বিপ্লবী' বক্তব্যগুলিকে রূপ দেবার জন্যে জঙ্গী মনোভাব অবলম্বন করে যদি বলেন: 'লাগাতার সংগ্রাম চালাও—গণতান্ত্রিক নির্বাচন বা পার্লামেন্টারী প্রথায় সমাজতন্ত্র আসবে না,—সর্বস্তরে হিংসাত্মক শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর কর—নির্বাচন বর্জন কর' ইত্যাদি, তাহলে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের দিক থেকে কি বলার আছে—সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জানা দরকার। সে ব্যাখ্যা কিন্তু দেওয়া হয় না। গালাগালিই তাত্ত্বিক যৌক্তিক বিশ্লেষণের স্থান দখল করেছে এ-যুগে। আর এই আক্রমণাত্মক শ্লেষাত্মক কটূবাক্যের কাগজিক লড়াই-এ দু' পক্ষই লেনিনের শব্দকোষের সাহায্য নিচ্ছেন। মার্ক্স-লেনিনবাদের জঙ্গীনীতি অনুসরণকারীদের কোণঠাসা করার একটা চেষ্টা হয় তাদের "সি আই এ এজেন্ট" অথবা "হঠকারী" আখ্যা দিয়ে। অপর দল পাল্টা গালি নিক্ষেপ করে বলছেন: ওরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক নয়া শোধনবাদী। অবশ্য পৃথিবীর মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিবির বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হচ্ছে। কোন কোন অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রে এই জঙ্গী লেনিনবাদীরা সেই দেশের কমিউনিস্ট বা গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারেন। তাঁরা সব সময় মস্কো বা পিকিং-এর কথা নাও শুনতে পারেন। তাঁরা যদি সেই সব দেশের সশস্ত্র সংগ্রামে এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক গণ-সংগ্রামে নেমে পড়েন তখন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানবাদী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী জাঁদরেল কোন এক সমাজতান্ত্রিক দেশ কি মনোভাব নেবে সেই অকমিউনিস্ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অন্তর্বিপ্লবে এবং যদি সেই অকমিউনিস্ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র (যেমন ধরা যাক রুশ বা চীন রাষ্ট্র) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন তাহলেই বা সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংগে আন্তঃ রাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি মনোভাব নেবে, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকথার সংগে সামঞ্জস্য রেখে বোঝা বা জানা দরকার। আন্তর্জাতিক চুক্তির যদি কোন পবিত্রতা থেকে থাকে, তাহলে সেই সংঘর্ষযন্ত্রণা-কাতর অকমিউনিস্ট বা বুর্জোয়া রাষ্ট্র যদি আভ্যন্তরীণ অন্তর্বিপ্লবকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করে তার নিজের পুলিশ-মিলিটারী-আইন দিয়ে—যেমন ১৯৬৪ সালে ইন্দোনেশিয়াতে ঘটেছিল—তখন কি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী রাশিয়া বা চীন হস্তক্ষেপ করবে সহ-অবস্থানের চুক্তি লঙ্ঘন করে? অন্তর্বিপ্লবকে কি অর্থ-অস্ত্র-বসদ দিয়ে সাহায্য করবে? যদি না করে তাহলে কি সেটা নীতিগত-তাত্ত্বিক কারণে? না আন্তর্জাতিক অবস্থার বাস্তববাদী ('প্রাগমেটিক') মূল্যায়ন ও নতুন তথাকথিত "ব্যালান্স অব ফোর্সেস"-এর নয়া-বিচারের ভিত্তিতে? না 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়া বা চীনের জাতীয় পার্থিব স্বার্থের মূল্যায়নের ভিত্তিতে? নীতিগতভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে—বিপ্লবের স্বার্থে এই সব অন্তর্বিপ্লবে মদৎ দিতে হবে। লেনিনের ভাষায় যে-দেশে "সর্বহারার বিপ্লব" "সফল" হয়েছে ('ভিক্টোরিয়াস') সে-দেশের কাজ হবে:

> "...the utmost possible in one country for the development, support and awakening of the revolution *in all countries* (Selected Works, Vol. VII).

আবার যদি এই অন্তর্বিপ্লবে কোনরকম সক্রিয় সাহায্য বাইরে থেকে না করা হয়—বিপ্লবের আগুনকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য না করা হয় তাহলে অকমিউনিস্ট বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জঙ্গী লেনিনবাদীরা—"সাচ্চা কমিউনিস্টরা" বলতে পারবেন এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই সেকথা বলতে পারবেন তত্ত্বের বিচারে যে, বিশেষ বিশেষ 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন।

লেনিন তাঁর বিখ্যাত রচনা "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" ('স্টেট এ্যান্ড রিভলিউশন') গ্রন্থে যে জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখেছিলেন তা কি পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের কোন 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বা কমিউনিস্ট দল কার্যকরী করেছেন? ১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান ডকট্রীন ঘোষিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ-কাঠামোকে মজবুত করতে সাহায্য করেছিলেন সেইসব দেশের স্তালিনবাদী-মার্ক্সবাদীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর ইউরোপের কোন্ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী দল বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার প্রশাসন-পুলিশ-মিলিটারী-সরকারী কর্মচারী সব কিছু তছনছ করে সর্বহারার বিপ্লবী শ্রেণীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রস্তুতি নিয়েছেন? খ্যাতনামা মার্ক্সবাদী পণ্ডিত আইজ্যাক ডয়েটশারের একটা মন্তব্য নিচে উদ্ধৃত করা যাক্:

> "If you study post-war history of Europe, you will see that in the post-war Conservative Clericalist Governments of France and Italy, the Communists sat as junior partners. They disarmed their own Communist resistance. *They urged the workers to behave moderately, not to demand high wages, to help capitalism in its reconstruction. There would have been no restoration of Capitalism in Western Europe without Stalin.* And we were told that Communism, that Russia, was planning subversion. *If the Russian Government, if Stalin's Government, was plotting anything, it was plotting the restoration of capitalism in Western Europe...*" (Myths of the Cold War—By Isaac Deutscher, from Containment and Revolution—Edited by David Horowitz).

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী ও ইতালীর কমিউনিস্টরা পুঁজিপতিদের সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরা শ্রমিকদের জঙ্গী নীতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন নি, বরং তাদের কিছুটা নম্র আচরণের পরামর্শ দিয়ে এসেছেন—বেশি মজুরীর জন্যও আন্দোলন করতে উৎসাহিত করেন নি পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য। ডয়েটশারের মতে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রবাদের পুনরভ্যুত্থান সম্ভবই হতো না স্তালিনের সাহায্য ব্যতিরেকে। ডয়েটশার বলেছেন, তবু বলা হচ্ছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শিবির থেকে) যে রাশিয়া নাকি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-সমাজব্যবস্থাকে উৎপাটিত করার জন্য নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! রুশ সরকার অথবা স্তালিন যদি ষড়যন্ত্র করে থাকেন তা হোল—পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র।

আবার চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েট গোষ্ঠীভুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে শাসনক্ষমতায় কমিউনিস্টদের সংগে কমিউনিস্ট-বিরোধীরাও অংশীদার ছিলেন। ট্রুম্যান-নীতি ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ও ইতালীর ধনতান্ত্রিক

[ শেষাংশ ১৯০১ পৃষ্ঠায় ]

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

চোখে পড়ছে শুকনো পাতা-জড়ানো কলাগাছের সারি, ঘুঁটের চাক-বাঁধা বট-গাছ, ধুলোর ওপর থেবড়ে-বসা মায়ের বুকের বোঁটা-টানা উদোম ছেলে, পাটকাঠি ছড়ানো পুকুর, ভুঁই আলো করা হলুদ ছড়ানো সর্ষেক্ষেত, মাটিতে শুয়ে আছে এমন নীচু এক-একটা চায়ের দোকান, জল-জমা ছোট ছোট ডোবায় 'আঁটোল' হাতে গাঁয়ের লোক। বাসের মধ্যে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে এইসব দেখছি।

দেখছি সবুজের অন্তহীন নদী। যেই বনঝোপ আসছে, বাঁশের ঝাড় আছড়ে পড়ছে আর্সিতে, ফাঁক-ফোকর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দু'-একটা গাঁ, ভাবছি, ও হয়তো নাগালের বাইরে চলে গেল, আর দেখা যাবে না, কিন্তু তা নয়। আবার সেই পথ, সে পথের দু'ধারে জলা, জলার দু'ধারে ধান, ধান আর ধান, অফুরন্ত হাওয়ায় দুলছে।

বাসের মধ্যে কান পাতলেও সেই একই গল্প, ধানকে ঘিরেই, আসন্ন যুদ্ধে এ-ধান কার পক্ষে যাবে, সেসব কথাই নেই। আর তো মাত্র ক'টা দিন, কার্তিক মাসের শেষ হতে চলল, তারপরই ষাঁড়াষাঁড়ির বান, এখন কিন্ত সকলে নিশ্চিন্ত, এদের মুখ দেখে বোঝাই যাবে না এরাই হবে আর দু'দিন পরে ক্ষমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বী।

'আলভাঙার ভ'য়ে এবার ছেঁচটা সময় মত পড়লো নি গা।'

'তবুও কতক কতক হয়েছে ন' কত্তা।'

'তুমি কি বলো বেয়াই!' (আহা, বেয়াই-এর কি ছিরি! খালি গা, ভাঁটার মত দুটো চোখ, কোমরে আছে কি নেই একটা করো ছেঁড়া ন্যাকড়া, জাত কিষেণের একটাই জাতীয় পোষাক, হাতে একটা হাট থেকে খরিদ-করা জ্যান্ত, ডানা ঝটপট মুরগী।)

'আমি কি বলবো গো। আমার ইবার রুয়ে অব্দি মন ভালো নেই। নাগাড়ে একটা কিষেণ লাগিয়েছিনু। সে বেটাকে ভোলা কান্ট ভাগিয়ে নে গেছে বেশি মজুরীতে, বুইলে!'

এতোদিন অন্য ভাষা শুনেছি। এখন শুনছি আরেক ভাষা। কি রকম এসব লোক? সেই ধান আর জমি, জমি আর কিষেণ, কিষেণ আর গরু, গরু আর লাঙল, ঘুরে-ফিরে সেই একই কথা, পৃথিবীতে কতো কান্ড হচ্ছে, শহরে তরুণেরা আক্রোশে ফেটে পড়ছে, পার্ক স্ট্রীটে জমকালো ক্যাবারেতে মানুষ দু'-হাতে ফুর্তি কিনছে, মুখের সবুজ মুছে মেয়েরা উড়ছে, পুড়ছে, শিল্পীরা হারি-কিরি করছে দলে দলে। একটা মানুষও সনাক্ত করা যাচ্ছে না, নিজেরই তৈরি ক্ষেত থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে রক্তধারা, পাঁচিলে দাঁড়ানো মানুষের চোখে তবু দেখার কৌতুক, সে নেমে এসে রক্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছে না, বলছে বিষাদ-জড়ানো গলায়, এই ক্ষত সত্য, এ থাকবে, এই রক্ত সত্য, কেন না মাতৃগর্ভে একে আমি পেয়েছিলাম, আর এরা, কবে একদিন পৃথিবীতে ভোরবেলা হয়েছিলো, সেই ভোরে জীর্ণ খড়ের ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসেছিলো, বিশাল আকাশের নিচে উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা রহস্যময় প্রান্তরে বীজ বুনেছিলো, তারপর একদিন ফলেছে অপরিচিত মাটিতে ধান, লণ্ঠনের লালচে আলোয় শীতে, শিশিরে ভিজে কাস্তে চালিয়ে খামার ভরিয়েছে, সেই জন্ম-জন্মান্তের স্মৃতি ওরা আর ভুলতে পারছে না, তাই সব কথার খাঁচার ভেতরে সেই একই ঘুমিয়ে-থাকা পাখি, এই বাসের মধ্যেই তো কতো কান্ড, কাঁধে চামড়া-ঝোলানো কণ্ডাক্টরের 'টিকিট, টিকিট' চীৎকার এক-একটা স্টপেজে থামতে-না-থামতে হুড়মুড় করে নামা ভিড়, অদ্ভুত ধরণের ব্যস্ততা, এর মধ্যে সামনের সারিতে তিনটি মানুষ, দু' পায়ে হাঁটুভর্তি কাদা, নির্বিবাদে, খুব নিবিষ্ট হয়ে কি কথা বলছে! কি আর বলবে, সেই ধান আর গরু, গরু আর কিষেণ, সেই কিষেণ আর লাঙল, ঘুরে-ফিরে সেই একই খেলা—

'আলভাঙার ভুঁয়ে ইবার ছেঁচটি যদি সময়মত পড়তো......'

কি রকম বুঝছেন? বাস ভরতি গরীব-গুর্বো, খালি গা না হলে চিট-ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি, হাতে পায়ে খড়ি, পোড়া খড়ের মত লম্বা চুলো, এদের সংগে আবার কি কথা। পাশেই বসে আছেন একজন আমার গায়ে গা দিয়ে, আমারই মত চোখে চশমা, মোটামুটি ফর্সা ধুতি, পাটভাঙা হাফশার্ট, পকেটে পেন গোঁজা, খুব আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন, ও'কেই জিজ্ঞেস করলাম।

উনি যেন মুখিয়েই ছিলেন।

বললেন, আর বোঝাবুঝি! ভায়ের সংগে ভাইকে লাগিয়ে দিচ্ছে। একে শাসাচ্ছে, ওকে শাসাচ্ছে, ভুঁই থেকে জোর করে দল বেঁধে ধান কেটে নিচ্ছে, লুঠ করছে পুকুরের মাছ, বাঁশঝাড়ে কোপ মারছে, সব যেন মামার সম্পত্তি, শুধু একটা ধ্বজা যোগাড় করলেই হল, অমনি কোথা থেকে ছুটে গেল দু'শো-পাঁচশো হাঘরে, হাভাতে, কারুর হাতে কাস্তে, কারুর ডাণ্ডা, কারুর বল্লম, কেউ বা হাতে নিয়েছে কাঁড়, ধনুক। সব চলল, মামার পুকুর, মামার জমি, মামার বাঁশঝাড়ে ধ্বজাটি পুতে দিতে, যদি কেউ কিছু বলে, তাহলে তাকে চোখ দুটো কোঁচপানা করে বলবে, চুপ মেরে থাকুন। আমরা সমিতির নোক। এতোদিন আমাদের চুষেছেন, এবার আমরা আপনাদের চুষবো।

বলেন কি?

কেন, কাগজে দেখছেন না কি কাণ্ড ওরা করছে! এবারে যুক্তফ্রণ্টকে ভোট দিয়েছিলাম, এই নাক মলছি, কান মলছি, আর ওসবে গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা নেই। ঘাট হয়েছে মশাই, আমার জমি, আমার পুকুর, আমার কলাবাগান, তবু চোর হয়ে আছি, কোন কিছু বলার উপায় নেই। ও-আমলে এমন ছিলো না। ভাবলাম যুক্তফ্রণ্ট জিতলো, ভালোই হল। এক রাজা সব সময় থাকাও ঠিক নয়, এক খাবার তা সে যতোই ভালো লাগুক খেতে, তারও বদল হওয়া দরকার, না হলে অরুচি ধরে যাবে। তা' এ কি কালসাপকে ঘরে ডেকে আনলাম, এ যে আমার সঙ্গে আমার কিষেণের লাগিয়ে দেয়, আগে আমার চোখে চোখ রেখে ওরা কথা বলতে পারতো না, এখন আমিই ওদের চোখে চোখ রাখতে পারি না। এমনি একা একা আছে ত' ভালোই আছে। কোন গোলমাল নেই। কিন্তু যেই দু'-চারজন জুটলো একসঙ্গে, অমনি কি যে ভূতের মন্তর ওরা আওড়ায়, ব্যস, তখন আর চেনাই যায় না, ভালো করে কথা বলতে গেছি ত' শুনিয়ে দেবে চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি, কি হম্বি-তম্বি, যেন মাথাটা এখ্খুনি কেটে নেবে। এ কি সর্বনাশ হল বলুন দেখি?

শেষের দিকে ওঁর গলায় শুধু হাহাকার। ওঁর কথার কি জবাব দোব বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকদের আর গাঁয়ের কিষণ তেমন মানছে না, এর জন্যে যে তুলনাহীন কষ্ট উনি পাচ্ছেন তার কি কোন জবাব হয়? এই ত' সেদিনও দেখেছি ওদের কুঁকড়ে-মুকড়ে থাকতে। সামনে চেয়ার রয়েছে, ডাক্তারখানা, ওরা জানে ওখানে যারা বসবে তারা ভদ্রলোক, তার মত ছোটলোক যারা তারা কি চেয়ারে বসতে পারে? তারা বসবে মাটিতে উবু হয়ে, এক পাশে। চেয়ার খালি থাকলেও তাই, চেয়ারে না বসবার অধিকারকে ওরা একটা অভ্রান্ত নীতির মত মেনে এসেছে। পয়সা হয়েছে ধান বেচে, বুক পকেটে নোটের তাড়া উপচে পড়ছে, সিনেমা দেখার ইচ্ছে, কিন্তু তাহলেও কি ফার্স্ট ক্লাসের দামী গদি-আঁটা সীটে বসতে পারে ওরা? কেউ ওদের নিষেধ করে নি, নিষেধই বা করতে যাবে কেন? এমনি ত' বসবে না, দস্তুর মত টিকিট কেটে বসবে, কিন্তু ওরা দামী, নামী সীটের দিকে যায় না, পকেটে পয়সা থাকলেও ফোর্থ ক্লাসে গিয়ে বসে সোয়াস্তি পাবে। ইস্ত্রী করা জামা যে এক-আধবার গায়ে দেয় নি, তাতেও কতো লজ্জা, কেন না এসব শুধু যে অভ্যাস নেই তা' নয়, ওরকম জামা যে 'বাবু'রা গায়ে দেয়। এ কি ওরা পারে, ওদের মানায় না, বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকেই যে এই সব চলে আসছে। এমন কি আমার ধারণা, ধারণাই বা বলি কেন, বদ্ধমূল বারণা যে, ওরা যে লেখাপড়া করে না, অসম্ভব দারিদ্র্য আর অন্যান্য কারণ থাকলেও, তার ভেতরে এ কারণটাও আছে ওসব লেখাপড়া-টড়াও ওদের মানায় না। মানায় না কারণ ওসব ত' 'বাবু'দের ছেলেরা করে। যা যা বাবুদের ছেলেরা করে তাই তাই কি ওরা করতে পারে? সে যে ভয়ানক অন্যায়, তাতে পাপ অর্শাবে, ভগবানের এই রকমই বিধান, এই চলে আসছে।

কিন্তু দিনটা হঠাৎ কেমন বদলে গেল। এই বদলটাকে বাসের এই ভদ্রলোক মেনে নিতে পারছেন না, কষ্ট পাচ্ছেন। আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। উনি কি চুপ করে গেলেন একবারে? বাইরের দিকে মুখ করে আছেন কেন? মন খারাপ হল? নিজেকে একা, বিচ্ছিন্ন ভাবছেন? আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, একবারে চুপ করে গেলেন যে!

না। চুপ করা-করির কি আছে? নিক, সব লুটেপুটে নিক। আর নিলেই কি হল? জমি দখল নিচ্ছে। নিলেই হয়ে গেল? চাষ ওঠাতে হবে না? বীজের জন্যে কার কাছে যাবে? কে দেবে লাঙল? কে দেবে ধার-কর্জ? কে দেবে সারের খরচা?

ভদ্রলোকের দুঃখ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু উনি এখনো এক অসম্ভব স্বপ্নের মধ্যে। নইলে ওনাকে বলা যেত পাশের গ্রাম পলাশপুরে আমি কি শুনে এলাম। এই রকম করে ওদের জব্দ করবেন? সেদিন কি আর আছে? মুরাদ বক্স, রাইস মিলে কোটি কোটি টাকা খাটছে (সাধারণ ধরনের একটা ধান-কল, কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐ 'কোটি কোটি টাকা'র কথাই বলেছিলো। অনেক, অনেক টাকাকে ওরা এইভাবেই উল্লেখ করে বলে কোটি কোটি। কতো টাকা সে কি লেখা-জোখা আছে মশাই, মেলাই, বেস্তর টাকা, কোটি কোটি, বুঝলেন!), তা' অমন পাঁচশো 'কিষক' ধান শুকনো, সেদ্ধ করছে, 'ফারায়ে' কাজ করছে। তা' উনি, মানে মুরোদ বক্সো, ধরমদাস সরকারকে ধান 'ভাচা' দিতেন নাগাড়ে, গাঁয়ের গরীব-গুর্বোদের বোঝাতেন 'এ্যালাউন্স' ('এ্যানাউন্স' কথাটির গ্রামে খুব চলন) করে, কি, না, আমি কন্ট্রোল রেটে দিচ্ছি, এই 'স্ট্যাম্পু' করা কাগজ দিয়ে দিনু ধরমদাসকে, ও ট্রাকে করে মাল নিয়ে যাচ্ছে, গাঁয়ের চাল বাইরে পাচার হচ্ছে বস্তায় বস্তায় আর এদিকে তখন হাহাকার ছুটছে 'কিষক'দের মধ্যে। মাঝে মাঝে লরী আটক করা হয়, ড্রাইভার 'স্ট্যাম্পু' করা কাগজ দেখায়, বলে 'কনটোল রেট', 'গরমেণ্টোকে সাপ্লাই দিচ্ছি, পথ ছাড়ো। সব জেনেও ছেড়ে দিতে হয়, কেন না এই সব লোক যারা লরী আটক করতো তারা খবর পেয়েছিলো চাল ব্ল্যাক হচ্ছে। কোথা থেকে আর খবর বেরুবে খবর দিতো ধানকলে যেসব 'কিষক' কাজ করতো, তারাই এসে এসে বলে যেত চুপি চুপি, কিছুতেই কিছু করা যায় না, লরী আটক করলে এক্টা না একটা ছুতো দেখায়, নানা রকমের মিথ্যে কাগজ দেখায়, ওরা বুঝতেও পারে না, কি সব ইংরিজী-ফিংরিজীতে লেখা আগডুম-বাগডুম অক্ষর। এদিকে চোখের ওপর দিয়ে বস্তা বস্তা চাল উধাও হয়ে শহরের বাজারের দিকে ছুটছে...ছুটছে...একদিন ওরা করলো কি, এই দু'-এক মাস আগে, ওরা পুলিশে খবর দিলো, কাছাকাছি ফাঁড়িতে নয়, কেন না ওরা জানে এখানকার ফাঁড়িতে খবর দিল কিছুই হবে না, ফাঁড়ি কোন এনকোয়ারি করবে না, ফাঁড়ির পুলিশদের সঙ্গে 'বাবু'দের অগাধ ভালোবাসা, ধান-কলের বাবুদের সঙ্গে পুলিশবাবুদের গেলাসে গেলাসে ঠেকাঠেকি, ঠুনঠুন। এখান-ওখান থেকে মেয়ে সাপ্লাইও চলে নিজেদের ভেতর। তাই ওরা এখানকার ফাঁড়িতে আর গেল না, জোট বেঁধে সমিতির ধ্বজা নিয়ে ওরা গেল ওদের এম-এল-এ'কে সঙ্গে নিয়ে একবারে সদরের পুলিশ ফাঁড়িতে, বলল, সার, হাজার হাজার লুকোনো বস্তা আছে মুরোদ বক্সোর, আমরা সব জানি, জানি কোথায় লুকোনো আছে, কিছু আছে ঘরের ভেতরে, কিছু আছে গোয়ালে লাটবন্দী, কিছু আছে ওদের নাগাড়ে কিষেণদের ঘরের ভেতরে, সব ধরিয়ে দোব। সার, আপনি এনকোয়ারি করুন। বলে ডায়রী করে ওরা চলে আসে, তারপর বলা যায় না হয়তো কাকেই খবরটা মুরোদ বক্সোকে পৌঁছে দিতে পারে, শালা পুলিশ লাইনের মধ্যে ওদের হাতের লোকও থাকতে পারে, সে হয়তো আগেভাগে সাইকেল ছুটিয়ে খবরটা জানিয়ে দিয়েও যেতে পারে। মুরোদ বক্সোর এঁটো খেয়ে মানুষও ত' অনেক, সুতরাং তাড়াতাড়ি ওরা ফিরে এসে মুরোদ বক্সোর বাড়ি, ওর প্রকাণ্ড বড় গোয়ালঘর, ওর ধানকল সমস্ত 'ঘরোয়া' (ঘেরাও) করে ফেলে, যেন রাতারাতি মাল সরাতে না পারে। সব দেখে-শুনে ত' মুরোদ বক্সোর চক্ষুস্থির, বুদ্ধিমান লোক, ব্যবসা করে খায়, পুলিশ আসবার আগেই সকলের পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে ওর 'নাচে'র সামনেই কতক ধান এমনিতে বিলি করে দিলো, কতক বেচে দিলো কন্ট্রোল রেটে কৃষক সমিতির কাছে, তারা খাতা থেকে হিসেব-পত্তর পর্যন্ত দেখিয়ে দিলে ওদের এম-এল-এ'কে।

এখন হেসে ছাড়া কথা বলে না, মনের ভেতরে লক্ষ সাপ পাক খাচ্ছে, কিন্তু মুখে এখন কথায় কথায় মধু ঝরছে, সমিতির লোক দেখলে কি খাতির, বাপজান, বাপ আমার, ছাড়া কথা নেই, নেহাৎ বয়েসটা গেছে, না হলে যেন কৃষক সমিতির মধ্যে ওই ঢুকে যেত, ধ্বজার রঙটা দেখতে নাকি এখন মুরোদ বক্সোর খুব ভালো লাগে!

বলবো নাকি এই গল্পটা? হয়তো উনি সব জেনেও মনে ওরকম অসম্ভব দুরাশা পুষছেন। আমি শহর থেকে গ্রামে এসে এ খবর পাচ্ছি গণ্ডায় গণ্ডায়। আর উনি গ্রামেরই লোক। উনি কি পান নি? তা' হতেই পারে না।

আপনার নিজের জমি গেছে?

তবে আর কপাল চাপড়াচ্ছি কার জন্যে? নিজের না গেলে আমার কচুটা। নইলে পাক না গরীব-গুর্বোরা একটু-আধটু জমি। জমিদারের খামারের সব ধান লুট হয়ে যাক না, তাতে আমার কি? আমারটা না গেলেই হল।

লুকোনো জমি, না বেনামি?

তার মানে? ভদ্রলোক বিলক্ষণ চটে উঠলেন। এসব আমি কি জানি? আমি বেনামি করেছি, না জমি লুকিয়ে রেখেছি? কে কবে কোন্ পূর্বপুরুষ এসব করেছে তার জন্যে আমি ত' দায়ী হতে পারি না। জন্মে ইস্তক দেখে আসছি যে জমি আমার, হঠাৎ দেখি সেখানে ধ্বজা পুতে দিয়ে গেল সমিতির লোকেরা, বলুন দুঃখটা হয় কি না। জিগ্যেস করলাম, বললে, আমরা মশাই কিছু জানি না, জে এল আর ও অফিসে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে এ জমি লুকোনো বলে। ইচ্ছে হলে দেখে আসতে পারেন।

গেলুম হন হন করে। জমি বলে কথা। গিয়ে সত্যিই দেখি তাই।

তাহলে ওরা অন্যায়টা করলো কোথায়?

মশাই দেখছি আমাকে জেরা করতে লেগেছেন। মশায়ের কি করা হয়? নেতা-টেতা নাকি?

আজ্ঞে না। আমি সবিনয়ে বললাম, হতে চাইলে আর দিচ্ছে কে? ওরা আর ভদ্দরলোকদের নেতা করতে চাইছে না। বলছে, ভদ্দরলোকদের দূরে নমস্কার। বলে আমি দু'হাত ওঁর উদ্দেশ্যে কপালে ঠেকালাম।

এরকম একটা নমস্কারের পর উনি আর কি করে আমার সঙ্গে কথা বলেন? মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুটন্ত ভালো ভালো দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

বাস থেকে আমরা কিন্তু একই জায়গায় নামলাম।

উনি আমার আগে আগে যাচ্ছেন। হঠাৎ পেছন ফিরে একটু বক্র হেসে বললেন, মশায়ের বোধহয় জমি-টমি নেই?

না।

তাই এই রকম। বলে একটু মুচকি হেসে দ্রুত বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। খোঁচাটা নিঃশব্দে হজম করা ছাড়া উপায় রইলো না। তা ছাড়া ওঁকে দোষ দেওয়া যায় না। আমি কি সঠিক জানি, আমি যদি ওঁর মত অবস্থায় পড়তাম, এই গ্রামেই যদি আমায় থাকতে হত, আমারও থাকতো কিছু লুকোনো জাম, তখন আমি কি করতাম? এই রকমই কি খানিকটা করতাম না? এই রকম বক্র একটু হেসে আর একজনকে কি বলতাম না, মশায়ের বোধ হয় জমি-টমি নেই? তাই এইরকম। আমিও ত' ভদ্রলোক।

দেখতে দেখতে সামনে এসে গেল একটা চায়ের দোকান। এই দেখছি এ অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে। এক-একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ পার হয়েই গ্রাম, গ্রামের সীমান্তে একটা চায়ের দোকান, এই চলছে। এখানে দোকান করার

]ই মানে। গাঁয়ের মধ্যে ল থাবে এমন কে আছে? 'বাব্'য়া ওদের দোকানে খতে যাবেন কেন? ওঁদের বাড়িতেই ন্দোবস্ত। এই দু'টো লোক বাস থেকে ', তাছাড়া চলেছে বাস, লরী; ড্রাই-রাও মাঝে মাঝে গলা ভিজোয়। বোঝাই গাড়ি যাচ্ছে আসছে। তারাও ]। যা দু-দশটা খদ্দের জুটে যা' দশ পয়সা হয়।

দোকানের মাটির পাঁচিলে আঁকাবাঁকা রে আলতা দিয়ে লেখা একটা পোস্টার, দশী কিষক আনা চলবে না।

'কিষক' এই বানানটা এরকম রই লেখা। বুঝলাম যাদের ব দরকার তাদেরই কেউ া লিখেছে। আরও বুঝলাম, আমি ঠক জায়গায় এসেছি। চায়ের কথা গ আমি চুপ করে বসে থাকি। দেরই আমার দরকার। কিন্তু কি বে আরম্ভ করবো? যে কথা বলছিলো, ] আমার দিকে একবার তাকালো. রপর যাকে বলছিলো তার দিকে ফিরে লল, এখন ত' মেলাই ফুটোনি। গেল নেও ত' চুপ মেরে থাকতিস। মুখে রা' কাড়তিস না।

যাকে বলা হল, তার সাদা, ময়লা গঞ্জিতে একটা পেন গোঁজা, সে হেসে বললে, ত্যাখন খাপের ভিতরি ছিনু। এখন খাপ খুলে বেইরে পড়েচি।

তাকিয়ে দেখলাম, তাই বটে। খাপখোলা তলোয়ারের মতই চেহারা বটে। তালপাতার সেপাই বললেও কম বলা হয়। লোকটা যেন সটান-দাঁড়ানো একটা কঞ্চির ডগা। বাতাসে দুলছে। নাম জিজ্ঞেস করাতে নাম বলল, গুলিরাম কান্ট। কাষ্ঠ না কান্ট ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আপনি?

বললাম, এই ঘুরতে ঘুরতে এসে গেলাম। দেশ-গাঁয়ের খবর নিচ্ছি। মানুষ নাকি ভীষণ হন্যে হয়ে গেছে। একটু আগেই একজন বলছিলেন, খুব লুটপাট হচ্ছে, এ ওর জমির ধান কেটে নিচ্ছে, বাঁশের ঝাড়কে ঝাড় লোপাট হয়ে যাচ্ছে. পুকুরের মাছ এ ও লুটেপুটে নিচ্ছে, শুধু দরকার একটা ধ্বজার, ব্যস।

কে, কে একথা বলেছে আপনাকে? ওরা এতোক্ষণ নিজেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো। হঠাৎ সকলে সচকিত হয়ে ঘুরে বসলো আমার দিকে, নির্নিমেষ ওদের দৃষ্টি। যেন দারুণ অপমান করা হয়েছে। মুখের ওপর সপাটে চালানো হয়েছে চাবুক।

কে, কে, এ কথা বলেছে?

হেসে বললাম, হ্যাঁ, আমি নামটা বলে দি। আর তোমায় হেঁসো নিয়ে গিয়ে তার মাথাটা নাবিয়ে দিয়ে এসো। বলেছে বাসের একজন লোক।

ভদ্দরলোক?

হ্যাঁ।

ওরা ত' বলবেই। গুলিরাম কান্টের চোখ দু'টো দপদপ করে জ্বলে উঠলো। এখন আর তালপাতার সেপাই নয়। সত্যিই খাপখোলা তলোয়ার। ও যেন বিচারকের আসনে বসেছে। ময়লা, ছেঁড়া একটা গেঞ্জি। ফুটো, ধুলোমাটি লাগা চেক চেক লুঙি। বুকের কাছে পেনের ক্যাপটা আটকানো। আমি সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম। মনে হল চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি, ফর্সা ধুতি, পাঞ্জাবীর মার্কামারা ভদ্রলোক আমি, আজ আমার বিচার।

ওরা ত' বলবেই। তবে শুনুন এই বাবুমশাইদের বেত্তান্ত। কি আর বলবো? এমনি কত্তো কতো। বলতে বলতে মুখে 'ফেকো' পড়ে যাবে তবু শেষ হবে না। এখানে সকলেরই একই অবস্থা। একটা, দু'টো এমনি গল্প সকলেই বলতে পারবে বুঝলেন? ভাগে-ভূতোয় করে খাচ্ছিলাম পুটু মল্লিকের। সেই যে জমিটা সামনে বারে...বলে গুলিরাম কাণ্ট সকলের দিকে তাকালো।

ও, ওই জমিটার কথা বলচো, ভাসার মাঠের জমি...

হ্যাঁ। 'ক্রেন' (ক্যানেল) ত্যাখনো হয় নি। এখন যেখেনে 'ক্রেন' সেখানে ডাঁইড়ে পুটু মল্লিক আমাকে বললে, উরে বাসরে, তুই কি করে দিবি, হ্যাঁরা, তোর কাছে পাবো আমি দু'শো ট্যাকা, ত' একটা কাজ করতে পারিস, তোর জমিটা লিখে দে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো, বললাম, বলচেন কি গো, পেত্যেকবার মোটা মোটা খড় বিক্রির ট্যাকা ধরে দিচ্ছি গেল তিন সন ধরে. সে ত' কবে শোধ হয়ে গেছে মশাই. পুটু তাই শুনে মুখ-খানাকে বিতিকিচ্ছি করে. পায়ের হাটু দু'টো, আহা-হা —হারে, বাপের সুপুত্তুরে রে, কবেই শেষ করে দিয়েচেন. বলে হেলে-দুলে নাচিযে লম্বা একটা খিস্তি গেয়ে দিলে, তারপর গেঁজে থেকে একটা অনেক দিনের তেলচিটে কাগজ বার করে বললে, ওসব ন্যাকামি ছাড়ো, বুঝলে? তোমার কোন বাবাই তোমায় বাঁচাতে পারবে নি। জেল খাটাবো। এই যে কাগজখানা আছে এখানে, এই কাগজখানা কি মিছে বলচে? আমি বেরাম্ভন, আমি মিছে বলচি? ওরে, মাতার ওপর এখনো চন্দ সুজ্জ আছে, বেটা চাষার পো চাষা. তোর মাতার ওপর বজ্জপাত্ত হবে, তুই, তুই, মরে যাবি রে বেটা,...

তারপর?

তারপর আর কি? জমিটা

এত' জুলুম।

তবে আর শুনেছেন কি মশাই? মাঠে কাস্তে হাতে গিয়ে দেখি তার আগেই পুটু মল্লিকের নাগাড়ে কিষেণেরা খ্যাচ-ঘ্যোঁচ আমার ভাসার মাঠের ধান কাটছে।

তুমি কোন হিসেব রাখো নি? কতো টাকা দিয়েছো পুটুকে?

হিসেব কি রাখবো? হিসেবটা কি আমি জানি? এমন আন্দাজে আন্দাজে একটা হিসেব আছে। সেটা ত' ও মানলোই না।

কিন্তু ও তো ঠিকও বলতে পারে।

না। ও ঠিক বলতে পারে না। ওরা ঠিক বলতে পারে না। একসংগে যেন ওৎ পেতে ছিলো। হঠাৎ যেন ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো সকলে।

ওরা কখনো ঠিক বলে নি। এই আতানু রহমান, তোর বেত্তান্তটা বল তো ও'য়াকে। ওর মশাই 'রসনে' বাড়ি।

আতানু রহমান আমার দিকে তাকালো, গলার স্বরে স্পষ্ট বিষণ্নতা, চোখ দু'টো যেন সব সময় দূরের দিকে তাকানো, কেমন একটু বিপন্ন ভাব।

বললে, আবাদ খরচা যেমন দেবার দিয়েছেন। দিলো একশো ট্যাকা, বললে, তারপর, তোর ঠেঁয়ে একশো আশী পাবো, কোন লিখিত-পড়িত বন্দোবস্ত তো নেই, বাবু নিজেই কোর্ট, নিজেই থানা, যা বলবে তাই, যতো মিছে আমরাই বলি। আমরা যে লোটোনোক। আর সব সাঁচা কথা বাবু বলে। কেন না, বাবুরা যে বড়নোট, খামারে ধান ঝাড়তে এসে ভেবেছিনু নিজের ভাগেরটা পাবো, কিছুই পেনুনি, থ্যাঙরা আর কুলো নিয়ে শেষে ঘরে চলে আসি।

......এমন সময় বেজে উঠলো ঘন্টা, ঢং ঢং ঢং, ক্রমাগত বাজছে, ক্রমাগত বাজছে, কারা যেন খুব কাছে বাজাচ্ছে, ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর কাঁধের গামছা কোমরে শক্ত করে বেঁধে হনহন করে দু'জন পথে বেরিয়ে পড়লো হন্তদন্ত হয়ে।

কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, কি ব্যাপার? ঘন্টা বাজলো কেন? আর এ দু'জনই বা কোথায় গেল, তোমরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলে যে!

গুলিরাম বললে, মাঠের ধারে আমগাছে ঘন্টা বেঁধে রাখা আছে। কোন গেরামে কিছু হলে রাখাল ছেলেরা মাঠে যারা গরু চরাচ্ছে, তারা ঘন্টা বাজিয়ে জানান দেয়। এর'ম বন্দোবস্ত অন্য গেরামেও আছে। যাতে রাতারাতি সব নোক তৈরি হতে পারে।

ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার এখনো জানি না। তবে তৈরি হতে হবে।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গুলিরাম বাইরের দিকে এসে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে একটা মিছিল বেরিয়ে পড়েছে। ডুগ ডুগ ডুগ। কে যেন ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়েছে আর ওরা কিসের নেশায় এই দুপুরে ছুটো-ছুটি করছে। আসছে মিছিলটা আমগাছের ছায়ায় ছায়ায়। গভীর করে ধুলো উড়ছে। ধামসা বাজছে, মাদল বাজছে, হাওয়া বইছে, অদ্ভুত দৃশ্য। ঝদের বাড়ির একটা মেয়েছেলে, দৌড় দেওয়ার ভঙ্গিতে আগে আগে আসছে, তার ডুরে শাড়িটা এখান-ওখান ছেঁড়া। ওসবে তার গ্রাহ্যই নেই। একটা কূল-হারানো নদীর মতই চেহারা। চোখ দুটো ধবক ধবক করে জ্বলছে। সে যে কি বলতে বলতে যাচ্ছে কিছু বোঝার উপায় নেই, মনে হচ্ছে কাকে শাপ-শাপান্ত করছে। যেন কাকে পেলে এক্ষুণি কাঁচাই ছিঁড়ে খাবে।

আওয়াজ উঠছে মিছিল থেকে, পণ্ডু সরকারের মুণ্ডু চাই, মুণ্ডু চাই, মুণ্ডু চাই, পণ্ডু সরকারের বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই। কিষক সমিতি, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। দুনিয়ার কিষক এক হও, এক হও, এক হও। মিছিল ছুটছে, অবাধ্য ঢেউ, ফুঁসছে, গজরাচ্ছে।

তার মাঝেই গুলিরাম একজনকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে র‍্যা. সে বললে, দুনিদি পণ্ডু সরকারের বাড়ি বেগার দিতে গেছলো। সেখেনে ডোবার সামনে বাবুর বড় ছেলে, ঐ ষেটোর খুব লপেটো চালচলন, দুনিদির হাত ধরে টানাটানি করেছেল, তা আমাদের দুনিদি সে-ধরণের মেয়েছেলে লয়, ওর হাত এঁচড়ে কেমড়ে দিয়ে কিষক সমিতিকে এসে যেই না বলা, আমরাও অনেকদিন তক্কে তক্কে ছিনু। পণ্ডু সরকার শালো ধরাকে সরা দেখে, শালোর বেস্তর জমি! অমনি বেইরে পড়েছি। দুনিদি আজ আমাদের লীডর, নেতা, বুঝলে? দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি পেছিয়ে পড়ে গেনু, চনু, তোমরা আসছ তো!......

বলতে বলতে ছুটে-যাওয়া মিছিলে ও ভিড়ে গেল। গুলিরামও ছুটলো ওর পিছুপিছু হনহন পায়ে। আর আমি বেঞ্চিতে বসে বসেই দেখলাম।

মাঠ ভর্তি ধানের মধ্যে এতোক্ষণ যারা রোদে গা ডুবিয়ে কাজ করছিলো হঠাৎ এধার-ওধার থেকে একটা-দুটো, দশটা-বিশটা, তিরিশটা তাদের কালো কালো মাথা জেগে উঠলো। ডুগ ডুগ ডুগ, কে যেন ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়েছে, আলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে মিছিল অজগরের মত। ওরা যে কেমন পেয়েছে, কারুর হাতে হেঁসো, কারুর কাস্তে, কেউ একটা বাঁশ, কেউ রাখাল ছেলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পাচনবাড়ি, মাঠের মধ্যে এক জায়গায় ইঁট পোড়ানোর জন্যে ইঁট রাখা আছে, কেউ সেই ইঁট ভেঙে ভেঙে গামছায় বেঁধে নিচ্ছে আর তারপর দুদ্দাড় ছুটছে। মাঠের গরু থাক মাঠে, জমির ধান থাক জমিতে, পরে দেখা যাবে। সব ছুটছে। ধানের বিশাল সমুদ্দুরে দুলে উঠছে কালো কালো মাথায়, ওদিকে আমগাছে থেকে ঘণ্টা বাজছে, ঢং ঢং ঢং, দূর গ্রাম থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টার আওয়াজ, আকাশে কিচিরমিচির করতে করতে বিস্তর পাখি উড়ে যাচ্ছে। এতো দূর থেকেও শ্লোগান শোনা যাচ্ছে, পণ্ডু সরকারের মুণ্ডু চাই, কিষক সমিতি জিন্দাবাদ, দুনিয়ার কিষক এক হও। আর দেখা যাচ্ছে নিশানের মত সেই হেঁকো-ডেকো দুনিদির ডুরে শাড়ির প্রান্ত, পত্ পত্ করে উড়ছে।

ফিরছি। সেই একই বাস। বাসে সেই একই মানুষ। মানুষের সেই একই কথা। সেই ধান আর জমি, জমি আর লাঙল, গরু আর খড়, সেই ঘুরে-ফিরে গরুর গাড়ির চাকার মত একই গল্প। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে কতো কাণ্ড হচ্ছে, পূবের সূর্য পশ্চিমে উঠছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় রং বদলে যাচ্ছে, ওরা কিন্তু স্থির, নিশ্চল, নির্বিকার ভঙ্গিতে নদীর মত, আকাশের মত, বৃক্ষের মত একই ভাষায় সৃষ্টির সেই আদিকালের বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছে। শুনতে শুনতে কেমন ঝিমুনি লাগে, যেন অদ্ভুত ধরণের এক রূপকথা। এ যেন শেষ হয়েও শেষ হয় না। আঁকাবাঁকা জটিল দেহের গড়ন, বয়েসের আর অভাবের ভারে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। তবু চোখ দুটোতে খুশির ঝলক। কে জানে ধানের সংগে কাজ করলে ওরকম ধারালো চোখ হয় কি না। আমি তো তাই দেখছি, একটু, সামান্য কোন খুশির সংবাদ পেলে ওদের সমস্ত অঙ্গ হেসে ওঠার সংগে সংগে চোখগুলোতে যেন খুশির বান ডেকে যায়। ভারি অদ্ভুত এইসব অভিজ্ঞতা! হ্যাঁ, হচ্ছে, সেই কথা, শুরু হয়ে গেছে, সেই কাদামাখা পা, থ্যাবড়া থ্যাবড়া গড়ন, কোমরে আছে কি নেই গুটোনো একটা ছেঁড়া টুকরো, কথা বলছে পরস্পর নিবিষ্ট হয়ে, কি কথা? কি কথা আবার! সেই যে, যে-কথা আদ্দিকাল থেকে বলে আসছে......

কাত্তিক শালটো এবার ভারি খোলতাই হয়েছে বটে।

দো বেগুনের বীজটা ছইড়ে দাও। না হলে 'নাবি' হয়ে যাবে।

আর ছেঁচে কি হবে কাত্তিক মোড়ল? ও শুধু মনকে বুঝোনো, বুঝলে......

হঠাৎ নজরে পড়ে গেল, কোমরে গোঁজা রয়েছে একটা লাল মত কিছু।

আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি?

আজ্ঞে 'চেন্নো'। সমিতির নেতা আমাদিগে বলল, যেখানেই যাও এই 'চেন্নো'-টা লে যাও। বলা যায় না, কে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে জোতদারের গুণ্ডো। বলে আমাদের এটা দেয়া করালে।

রুমাল। লাল রুমাল। চিহ্ন দেওয়া। কোন পার্টির প্রতীকচিহ্ন হবে আর কী।

তিনি আরো বলে দিলে, যেখানেই যাও এই চেন্নোটা ছেড়ো নি। আমিও মশাই যা বলে দিয়েচে তাই করি। চেন্নোটা ছাড়ি না।

না। ছেড়ো না। যাও। চিহ্ন নিয়ে। কাছ থেকে দূরে। দূর থেকে আরো দূরে। চিহ্ন নিয়ে নিয়ে যাও। রুমাল। একখানা লাল রুমাল। না। ছেড়ো না। তোমরা ছেড়ো না।

[ চলবে ]

---

[ ১৮৯৬ পৃষ্ঠার পর ]

কোয়ালিশন সরকার থেকে কমিউনিস্টরা বহিস্কৃত হলেন। পূর্ব ইউরোপের "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলিতেও বহু দলীয় শাসনব্যবস্থাকে ('মাল্টি-পার্টি গভর্নমেন্টস') ভেঙে দিয়ে উগ্র স্তালিন-বাদীদের ও মস্কোর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল—যেমন পশ্চিম ইউরোপে মার্কিন পুঁজিপতিদের প্রভুত্ব সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় হল। এখন মার্ক্সবাদী-লেনিন-বাদীদের কাছে প্রশ্ন তাঁরা কি লেনিনের নির্দেশমত কাজ করেছিলেন? না করে থাকলে তার কারণ কি? প্রত্যেক দেশের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা তাঁদের প্রয়োজন ও সুবিধামত লেনিনের বক্তব্য ও চিন্তা-ধারার ব্যাখ্যা করে নিজেদের সম্পূর্ণ অমার্ক্সবাদী-অলেনিনবাদী কার্যকলাপ ও আচরণকে সমর্থন করে যাবার চেষ্টা করেন।

[ ক্রমশ ]

লতিকা খোলা জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে ওদের কান্ডকারখানা তন্ময় হয়ে দেখছিল। হৈ-হৈ-হৈ-হৈ হুল্লোড়বাজী। কেউ তেল মাখছে, কেউ কুয়ো থেকে জল তুলে মাথায় ঢালছে, কেউ সাবান মাখছে এবং তদবস্থায় গান গাইছে অথবা নাচছে অথবা তাড়া করছে এ ওকে। হাসছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে। লতিকার বুঝতে বাকী নেই, কী লজ্জার কথা, খোলা জানালার সামনে সে এসে দাঁড়ানো মাত্রই ওদের হুল্লোড় ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অথচ জানালার কাছ থেকে সে যে সরে আসবে বা প্রথমেই যেমন ভেবেছিল, দড়াম করে শব্দ করে জানালার পাল্লাটা বন্ধ করে দেবে—এ দুটোর কোনটাতেই তার মনে সায় নেই।

মোট পাঁচটা ছেলে। বিশ্বাসদের পোড়ো-খোড়ো বাড়িটার নতুন ভাড়াটে। গতকাল ভরদুপুরে যখন ওরা মোট-ঘাট নিয়ে ঝুপ ঝাপ্ নামল একটা লরি থেকে, তখন লতিকার এবং তার মায়েরও মনে হয়েছিল মন্দের ভাল। কিন্তু তার পর থেকেই লতিকা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে, মানুষ তো নয়, ভূত সব। যতক্ষণ থাকে ঘরে, কেবল চেঁচামেচি, দাপাদাপি, ঝাঁপাঝাঁপি। নাচ, গান আর হাসি হৈ-হৈ। এবং এ সবের জোয়ার-ভাটায় তারও যে একটা ভূমিকা আছে সে কথাটা—যদিও ভাবতে লজ্জা, ছি ছি, ছোঁড়াগুলো একেবারে যাচ্ছেতাই, লতিকা ইতিমধ্যেই মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। তবু তার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াটা এই রকম—ওরা ইতর অসভ্য তো তার কী যায়-আসে! পাশের বাড়ির ভাড়াটে, জানালা খুললেই চোখে পড়বে। কী দায় পড়েছে তার জানালার পাল্লা বন্ধ করে বসে থাকার! মরুক না ওরা। বিশ্বাসদের নিচু পাঁচিলঘেরা খোড়ো বাড়িটায় পা বাড়ায় নি কখনও সে। বরাবরই তালা বন্ধ দেখে আসছে। ঝোপ হয়েছিল, জঙ্গল হয়েছিল, চামচিকের আড্ডা হয়ে উঠেছিল। অন্তত চামচিকের চেয়ে তো ভাল। কথাটা ভেবে সে মনে মনে হেসেই অস্থির।

—কী ওখানে করছিস রে খুকি!

লতিকা শিউরে উঠল, মা এসে দাঁড়িয়েছে কখন একেবারে তার পাশটিতে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে গড় গড় করে বলে ফেলল, কী ভাড়াটে যে বসিয়েছে বিশ্বাসরা! একেবারে অসভ্য ছোটলোক।

—তোর লজ্জা করে না হতচ্ছাড়ি! প্রচন্ড রাগে দাঁতে দাঁত চেপে কথা ক'টা উচ্চারণ করল তার মা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে দমাদ্দম দমাদ্দম করে জানালার পাল্লা ক'টা বন্ধ করে দিল। তার উদ্দেশে চাপা গর্জন তুলে শাসালো, ফের যদি তোকে কখনও দেখি এখানে—

ছেলেগুলোর ওপর খুব রাগ হল লতিকার। ভালভাবে ভদ্র প্রতিবেশী হয়ে বাস করতে শেখে নি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কিন্তু সিদ্ধান্তে এল, মায়ের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। লতিকা তখন শিলে বাটনা বাটছিল। তার মা মল্লিকা রান্নাশালে আঁচ ধরাচ্ছে। তুলসীর ঝোপটা সবেমাত্র কড়া রোদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে একটু চনমনে হতে সুরু করেছিল, উঠতি আঁচের ঘন ধোঁয়া এসে তার ওপর চেপে বসল। তবু কয়লার ধোঁয়া আর তুলসীপাতার গন্ধতে মিলে প্রায় নিস্তব্ধ বিকেলটাকে আশ্চর্যরকমের জীবনগন্ধী করে তুলেছে, লতিকা যেটা ভালই উপভোগ করতে পারছে। বাটনা বাটা সেরে সে একটু বাইরে বেরোতে পারে, মায়ের তাতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। মা তার একটু রাগীই, আর কিছু নয়।

ভাল কথা, মাকে দেবার মত একটা সংবাদ হঠাৎ তার জিভের আগায় উজিয়ে এল। তিড়িং করে একটা লাফ মেরে সে মল্লিকার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, জান মা, ওরা না দাদার মতই ইলেকট্রিক লাইনে কাজ করে!

আঁচে হাঁড়ি চাপিয়ে মল্লিকা একটু অন্যমনে বসেছিল। লতিকার কথা শুনে ভুরু কুঁচকে তাকালো, লতিকা ব্যাখ্যা করে বলল, ঐ বিশ্বাসদের বাড়ির ভাড়াটেরা গো। ওরা তো এখানে ইলেকট্রিক লাইন টানবে বলেই এসেছে।

মল্লিকা নিস্পৃহভাবে বললে, তা কী হয়েছে!

বিচ্ছিরি ব্যাপার, লতিকা ঢোক গিলতে বাধ্য হল। বলল, না, তাই বলছিলুম।

সে বেরিয়ে এল। মায়ের ওপরে তার বেশ অভিমান হল। কেন তা সে জানে না।

বসে বসে সে কথাই ভাবছিল মল্লিকা, মাণিক তার শেষ পর্যন্ত কি এই অবস্থায়ই পৌঁছেছে! কথাটা মেনে নেওয়া কঠিন। ব্যথায় তার মন টন্‌টন করে উঠল। চাকরি পাবার পর মাণিক একবার মাত্র এসেছিল মাস ছয়েক আগে। দু'দিন ছিল। মুখে শুধু চাকরিরই কথা।

—জান মা, প্রথমেই দরকার গর্ত খোঁড়ার। না, গর্ত খোঁড়া নয়, সার্ভে করা। ধর, মাঠের ওপর দিয়ে এইচ্ টি লাইন যাবে। টানতে হবে একদম সোজা, নাক বরাবর নাকের সিধে। কোথাও না একটু আঁকে-বাঁকে, এ্যাঁ! সার্ভের রড আছে। মানে লাঠি। পর পর তিনটেকে পুঁতে দিয়ে যেই দেখতে পাবে একদিন থেকে সব ক'টা মিলে এক হয়ে গেছে, অমনি বুঝবে লাইন একদম সিধে, লাঠির বদলে মানুষকে দাঁড় করিয়েও হয়। যাক,

না—এসব হ্রস একরকম সোজা কাজ। তার পর গর্ত খোঁড়া। দু ফুটের গর্ত। রোদে পুড়ে পুড়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে মাটি। শাবলও গাঁইতি। তার পর কোদাল আর শাবল। সমান মাপে ওপরের দিক থেকে সরু করে করে নিচের দিকে কেটে যেতে হবে। এক এক গাড্ডা খুঁড়তে একদিন তো বটেই, দেড় দিনও লেগে যায়। হ্যাঁ, বাহাদুরে বটে হাজারিবাগের ছেলেরা। বেলা বারোটার মধ্যেই একটা আস্ত গাড্ডা ফিনিশ্‌। আচ্ছা, ধর যদি গাড্ডা খুঁড়তে খুঁড়তে তোমার জল তেষ্টা পায়, কী করবে?

মাণিকের কথার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছিল মল্লিকা। সে এতক্ষণ ধরে শুধু মাণিকের কথা বলার ধরনটাকে উপভোগ করছিল। ভারী মজা লাগছিল তার। মাণিক যত না বলছে, তার চেয়ে বেশি করে মাথা নাড়ছে। এ যেন সেই মাণিক, যে তার বাবার কাছ থেকে শেখা কোন একটা গল্প তাকে শোনাতে বসেছে। তেমনি করে ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আঁটো চুল আর একটু বেশি রকমের পুরু ভুরুর নিচে তার চকচকে চোখ দুটো গল্প বলার ক্লিষ্টতার হুটোপুটিতায় একবার একবার কুঁচকে উঠছে, একবার একবার বড় বড় হয়ে উঠছে।

—কী করবে তখন? মাণিক প্রশ্নটা আর একবার তুলেই বলে চলল, তোমার সঙ্গে নেই জলের কলসী বা ঘটি। কাছাকাছি গ্রাম বলতে মাইল দুয়েক দূরে। মাঠের মাঝখানে কেউ তোমার জন্যে একটা কুয়ো খুঁড়ে রাখে নি বা পুকুর কেটে রাখে নি। কী করবে?

ততক্ষণে প্রশ্নটায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পেরেছে মল্লিকা। মজা করে বললে, তুই-ই বলে দে না।

—তখন তোমাকে একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে। একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে। ফুট চারেক গর্ত খোঁড়া হয়ে গেলেই দেখতে পাবে গাড্ডার তলার মাটি ভিজে ভিজে লাগছে। দেখবে বালি মাটির ওপরে চিক্‌ চিক্‌ করে জল ভেসে উঠছে। হুটোপাটি না করে শুধু সবুর কর। দেখবে সেই জল এক আঁজলা পরিমাণ হয়ে উঠেছে এক মিনিটেই। ব্যস, এইবার সেই জল তোল আর খাও। একেবারে অবাক জলপান।

মল্লিকা শিউরে উঠেছিল। তীব্র উৎকণ্ঠায় আর অবিশ্বাসে বলে উঠেছিল, হ্যাঁ রে সত্যি!

—সত্যি, সত্যি, সত্যি! একেবারে তিন সত্যি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখবে চল। তর্ক করে জিতে যাওয়ার আনন্দে আটখানা হয়ে মাণিক জবাব দিয়েছিল।

সেই তার ভাবনার সুরু। সেই থেকে মাস ছ'য়েক মাণিক আর বাড়িতে আসে নি। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছে, সপ্তায় সপ্তায় চিঠি দিয়েছে। ইলেকট্রিক লাইন টানতে টানতে একটু একটু করে আরও দূরে সরে গেছে তার কাছ থেকে। সেই থেকে মাণিকের জন্যে তার হাজার শঙ্কা, একটু গর্বও। এই গর্ব তার মনের অতলে একটুকরো মাণিকের মত কোথায় যে পড়ে রয়েছে তা সে নিজেকেও জানতে দিতে অনিচ্ছুক। তার অন্তরের উত্তাল উদ্বেগের অন্তহীন ঢেউগুলোকেই সে শুধু তার নিত্যকার ভাবনায় গুণে চলেছে। আশ্চর্য! এতে সে ক্লিষ্ট হয় না, ব্যথা বোধ করে না। কখনও কোন চিঠিতে মাণিককে অমন নির্দেশ দিতে পারে না—ফিরে আয়। না হয় তুই বাড়িতে বেকার হয়ে বসে থাক। বসে থেকে থেকে এ-সংসারের অনশনের অর্ধাশনের মুহূর্তগুলোকে আবার ফিরিয়ে আন। আমি আর সইতে পারি না রে মাণিক। আমার সোনা, আমার দুলাল—

কিন্তু বিশ্বাসদের পোড়োবাড়ির হতচ্ছাড়া ভাড়াটেরা আসা অবধি কোন্‌ সুচতুর হৃদয়হীন চোরে যেন তার মনের অতলে পড়ে থাকা মাণিকখণ্ডকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ফন্দি করছে। মল্লিকা তা টের পেয়েও কাউকে কিছু বলতে পারছে না। কারও বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারছে না। শুধু শঙ্কা, সম্ভবত অচিরেই সে সব হারাতে চলেছে। ফিরে পাবে সে পথ অলক্ষ্য।

লতিকা এসে বললে, মা, কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ-টারাপ নাকি? সর সর হাঁড়িতে একটু জল ঢেলে দাও। ভাত যে পুড়ে গেল।

মল্লিকা কোন উত্তেজনা বোধ করল

না। ক্লান্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখল, সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এই মুহূর্তে তার মনে হল, সে বুড়ো হয়ে গেছে। নাবন্ত সন্ধ্যায় ধূসর রং-এ তার অস্তিত্ব একাকার হয়ে গেছে। লতিকার চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাওয়া অনুচিত, এ ধরনের কিছু একটা ভেবে সে অবশ্য সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইল।

চোখে ঘুম আসছিল না। মল্লিকা এক সময় আস্তে আস্তে বললে, লতি ঘুমিয়ে পড়লি? লতিকা খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে তারা দেখছিল। তারাদের কথাই সে ভাবছিল। অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল, না। মল্লিকা হাই তুলতে তুলতে ঘিষঘিষে গলায় তাকে নির্দেশ দিল, ঘুমিয়ে পড়, রাত হয়েছে।

নিশ্বাস সহজ হয়ে আসতে আবার বললে, চারুর মা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সে লতিকার পিঠের দিকে ঘুরে পাশ ফিরল।

দেওয়াল-গিরির সামান্য আলোয় এই যেন সে প্রথম দেখতে পেল, লতিকা বেশ স্বাস্থ্যবতী। লতিকার চুল আপাতত এলোমেলো, কিন্তু সুপ্রচুর। লতিকার আবরণ বালিকার কিন্তু অবয়ব অভ্রান্তভাবে নারীর। অজানা এক আশঙ্কায় বিষাদে ক্লিষ্ট হতে হতে সে অবশ্য অভ্যাসবশে প্রায় নিঃশব্দে তিনবার থুক্ থুক্ করল। লতিকা তা শুনতে পেল কি না কে জানে। মল্লিকার কানে এল, বাইরে কত অন্ধকার দেখ না।

মল্লিকা বলল, হুঁ। লতিকা মুখ না ফিরিয়েই বলল, কত তারা দেখ আকাশে। মল্লিকা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, নে, এবার ঘুমিয়ে পড়। রাত হয়েছে। লতিকা কিছু বলল না। মল্লিকা চোখের পাতা বন্ধ করল। মাণিকের চিঠি পড়ে তার কিন্তু মনে হয় না সে বদলে গেছে এতটুকুও। বলতে কি, তার চিঠিগুলো থেকেই সে আবিষ্কার করেছে সেই মাণিককে, যার জন্যে তার অন্তর গর্বিত।

ক্লাশ টেনে পড়তে পড়তে মাণিক পড়া ছেড়ে দিল। বাংলায় চিঠি লেখার রীতি তার অনায়ত্ত হতে পারে না। কিন্ত কই, মাণিক তো তাকে একবারও লিখল না—শ্রীচরণেষু! কী বিচিত্র রোমাঞ্চ যেদিন সে পোস্টকার্ডে প্রথম মাণিকের চিঠি পেল, 'মাগো, ভালভাবে পৌঁচেছি। কাজে জয়েন করেছি। কোন অসুবিধা হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি। এ কোন চিরদিনের রোমাঞ্চ মাণিকের প্রতি চিঠিতে বারে বারে মূর্ত হয়ে ওঠে! যেন চিঠি নয়, মাণিকের কণ্ঠস্বর।

মল্লিকা চোখ বুজে থেকে একটা আবেশ অনুভব করল। জীবনের কথা মনে পড়ল। মাণিককে চিঠি লিখতে শিখিয়েছিল জীবনই। লতিকা তখনও হয় নি, মাণিক সবে পাঁচ-ছ' বছরের। বাপের বাড়িতে গেছল সে মাণিককে নিয়ে। জীবন এমন অবস্থায় ফি হপ্তায় দু'খানা করে চিঠি লিখত তাকে। সেবারে মাণিককেও লিখল একখানা, ধরে ধরে গোটা গোটা করে—খোকন আমার সোনা, আমাকে চিঠি দিতে ভুলো না। সেই থেকে যতবার যতদিন মাণিক মামার বাড়িতে থাকত, তাকে চিঠি লেখার সংগে সংগে মাণিককেও জীবন একখানা করে চিঠি লিখত। লতি বড় হতে লতিকেও। প্রথম প্রথম ওদের চিঠি হত খুবই ছোট, তারটা বড়-সড়। কালে কালে ওদের চিঠি বড় হতে থাকল, সেই অনুপাতে তারটা ছোট হয়ে এল। তারপর একদিন তার আর ওদের চিঠি সমান সমান হয়ে উঠল। তারপর সে তার অনুযোগ ওঠাবার আগেই জীবনের চিঠি লেখার হাত চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

ব্যথার স্মৃতিগুলো মল্লিকার আবেশকে স্বচ্ছতর করে তুলল। নাঃ, লতি বুঝি এতক্ষণে ঘুমিয়েই পড়েছে। মাণিক হবার পর এক সময় সে লক্ষ্য করেছিল, জীবন যেন তার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছে। ব্যাপারটা আগাগোড়া বোধগম্য। এক মুখে কত চুমু খাবে জীবন! ঘুম থেকে উঠে প্রথম চুমু মাণিকের ঠোঁটে, ইস্কুলে বেরোবার সময় বিদায়ী চুমু মাণিকের কপালে, ইস্কুল থেকে ফিরে—মাণিক ভাল করে হাঁটতে শেখার পর থেকে রোজই ওর ফেরার সময়ে ওকে দূর থেকে দেখতে পেলে 'বাপী এসেছে', 'বাপী এসেছে' করে এগিয়ে যেত—বৈকালী চুমু মাণিকের মাথায়। সুতরাং তার হিস্যায় ঘাটতি ঘটবেই। তবু সে মুখে অনুযোগ করতে ছাড়ে নি। অপরাধীর মত, অসহায়ের মত জীবন কৈফিয়ৎ দিত, ওকে চুমু খাওয়াও কি তোমাকে খাওয়া নয়! একই কথা, একশ'বার যা না শুনলে তৃপ্তি নেই। জীবন কিন্ত শেষ বিদায়ের চুমু কারও অংগে এ'কে দিয়ে যেতে পারে নি। একটা চরম হাহাকারের ঝোড়ো হাওয়ায় মল্লিকার সব আবেশ এক লহমায় তছনছ হয়ে গেল। সে লতিকার কাছে একটু সরে গিয়ে তার গায়ে হাত রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করল।

বিজ্ঞানের দিদিমণির অসুস্থতার কারণে এক পিরিয়ড আগে ছুটি হয়ে গেছল। লতিকা ঘরে ফিরে দেখল মা কোথায় বেরিয়েছে। শীত শেষের অপরাহ্ণে তাদের বাড়িটা কেমন যেন বেজায় শূন্য দেখাচ্ছে। কেমন যেন নিষ্প্রাণ, পরিত্যক্ত। উঠোনের মাঝ বরাবর উঁচু পাঁচিলের ওপারে জ্যাঠাইমার বাড়ি থেকে প্রাণের কোন লক্ষণ কানে এল না। বৌদি হয়তো এখনও ঘুমুচ্ছে তোতনকে নিয়ে। সমীররা নিশ্চয় এখনও ফেরে নি ইস্কুল থেকে। এমন কি বিশ্বাসদের বাড়ির ভাড়াটেদের হিহি হাহাও কানে আসছে না। বই রেখে লতিকা ওপরের ঘরে চলে এল। সংকোচ হল, তবু জানালার পাল্লাটা একটু ফাঁক করল। ছেলেগুলো রয়েছে। গোল হয়ে বসে আছে। একজন কী যেন বলছে। লোকটা অচেনা। ছেলেগুলো মনোযোগ দিয়ে সম্ভ্রমের সংগে তার কথা শুনছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে। কারও হাতে সিগ্রেট। সবাইয়ের দৃষ্টি একদিকে, ঐ লোকটার মুখের দিকে। এমন কি সে যে পাল্লাটা খুলল, তবু কেউ চেয়ে দেখল না তার দিকে। বোঝা যায়, কেউ তা খেয়াল করল না।

লতিকা অবাক হল। মিটিং হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু কিসের মিটিং যে ছেলেগুলো তার দিকে ফিরে তাকালো না পর্যন্ত! যে লোকটা কথা বলছে লতিকা তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল। ওদেরই মত। কোন পার্থক্য নেই। তবে কথা বলতে বলতে লোকটা মাঝে মাঝে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। থেকে থেকে বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুষি কষাচ্ছে। লোকটার রং কালো। কপাল উঁচু মত। মাথার রুক্ষ চুল কেবল ওল্টানো, কোন পারিপাট্য নেই। গায়ে একটা আধময়লা চীনে সার্ট হাতা গোটানো। হাতে একটা ঘড়ি। লোকটার দোহারা গড়নে কেমন একটা পাথুরে ভাব। লতিকা তার কথা শুনতে চাইল।

—বন্ধুগণ, আপাতত আপনারা পাঁচজন। কনস্ট্রাকশনের পুরো গ্যাং এলে হবেন বড় জোর বিশজন। কিন্তু এই বিশজন আপনারাই তো সব নন। সারা বাংলাদেশের ক্যাম্পে ক্যাম্পে, সাপ্লাই-এ সাপ্লাই-এ এমনি করে বিশজনে বিশজনে আমরা হলাম দশ হাজার। আমরা একা নই, আমাদের একা অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করার সাধ্য কারও নেই। আমরা যদি বুকের রক্ত জল করে পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে বিজলী বাতি জেলে দিতে পারি, আমরা পারি সেই বাতিকে নিভিয়েও দিতে।

লতিকা লক্ষ্য করল, লোকটা বলে চলেছে গড় গড় করে। কোথাও তার ঠেকছে না, কোথাও কথা জড়িয়ে যাচ্ছে না। কথাগুলো আশ্চর্য ধারালো, বলার তালে তালে স্বরের মৃদু ওঠানামায় ঝকমক করছে। লতিকা মনোযোগ না দিয়ে পারল না।

—আমরা যে মেহনত দিয়ে, যে ঐক্য

HAZELINE SNOW
HAZELINE SNOW
HAZELINE SNOW

য়ে বাংলাদেশের গ্রামের পর গ্রামকে, হরের পর শহরকে বিজলী আলোর তার য়ে একসূত্রে যুক্ত করতে পেরেছি, সেই ক্য দিয়ে অনায়াসে পারি ছাঁটাইকে রোধ রতে। আপনারা সাহস রাখুন, লড়াইয়ের য়দানে নেমে পড়ার জন্যে তৈরি থাকুন। খবেন, কারও সাধ্য নেই একজনকেও টাই করতে পারে। কী ঘৃণার কথা, কী জ্জার কথা, কী অমানুষিক বর্বরতা! নস্ট্রাকশনের শেষে যখন বাড়িতে বাড়িতে ক এক করে জ্বলে উঠবে বিজলী বাতি, খন আমাদের কনস্ট্রাকশনের হতভাগ্য র্মীদের জীবনে নেমে আসবে ছাঁটাই আর বকারীর কালো অন্ধকার। এই বর্বরতা চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দেবার হিম্মৎ আমাদের আছে কিনা, বন্ধুগণ, তা আমরা প্রমাণ করে দিতে চাই।

লোকটার কালো মুখ উত্তেজনায় গনগনে হয়ে উঠেছে দেখতে পেল লতিকা। তার সামান্য ভাঙা ভাঙা গলার স্বর মনে হল যেন কানে বুকে গোটা শরীরে এসে ধাক্কা মারছে। ওদের পাঁচজনের মত সেও একদৃষ্টিতে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—বন্ধুগণ, এ আমাদের কারও একার দায় নয়, আমাদের সবাইয়ের যৌথ দায়, এ আপনার দায়, আমার দায়, আমাদের সবাইয়ের দায়। আপনার হাতের মুঠো, আমার হাতের মুঠো, আমাদের সবাইয়ের মুঠোতে মিলে একটিমাত্র হাতের মুঠো, এ কথাটা বারে বারে মনে করিয়ে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। তৈরি থাকুন লড়াইয়ের ময়দানে নামার জন্যে। জানবেন, নিশ্চয় করে জানবেন—আমরা জিতবই। আমাদের হার নেই। মেহনতি মানুষের হার নেই।

লোকটা এবার থামল।

—কী বলছে রে ওরা!

লতিকা খুব ঘাবড়ে গেল। ঘাড় না ফিরিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে সে তার মায়ের মতিগতি বুঝতে চেষ্টা করল। মল্লিকা বলল, কিছু খাস্ নি তো ইস্কুল থেকে এসে! নেমে আয়, হেমন্তে শিউলি ফুল ঝরে পড়ার মত শান্ত স্নিগ্ধ লাগল মায়ের কণ্ঠস্বর। লতিকার আশ্চর্য লাগল। কেন যেন পরিপূর্ণ এক নিশ্চিন্ত-তাকে বুকে নিয়ে সে মল্লিকার পিছু পিছু নিচে নেমে এল।

মল্লিকা তাকে খেতে দিয়ে বলল, মাণিক আজ একটা চিঠি দিয়েছে রে। ধর।

লতিকা লক্ষ্য না করে পারল না, মায়ের হাত যেন খাপছাড়াভাবে কেঁপে উঠল। খেতে-খেতেই সে বাঁ হাতে পোস্টকার্ডটা নিয়ে পড়তে লাগল—

'মাগো, এর পরে আর আমার চিঠি বোধহয় পাবে না। আমাদের কনস্ট্রাকশনের কাজ শেষ হয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছি, আপাতত আমাদের নাকি আর কাজ নেই। আমাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হবে। অনেককেই করা হবে, তবে আমি তো নতুন, এক বছরও হয় নি। তাই আমার ছাঁটাই হওয়া প্রায় নিশ্চিত। সুতরাং আমার চিঠি নয়, এরপর হয়তো আমি নিজেই গিয়ে হাজির হচ্ছি তোমাদের কাছে। মন ভাল নেই। তোমাকে বেশি কিছু লিখতে পারছি না। এমনটা ঘটবে, এ কখনও ভাবি নি। জান তো সব কষ্ট হাসিমুখে সয়েছি। এখন আমরা দিন গুণছি, কবে ছাঁটাই হয়। অসহ্য। তোমাকে বোঝানোর সাধ্য আমার নেই। দেখি, সবাই মিলে চেষ্টা করছি যদি ছাঁটাই রোখা যায়। আমার শরীর ভাল আছে। খবরটা তোমাকে এখনই দিতাম না। কিন্তু তোমাকে না দিতে পারলে আমি যে দমবন্ধ হয়ে মরে যাব। মাগো, ভেবো না তুমি। খারাপই হোক ভালই হোক, আমি তো আছি। ওরা বলছে, আমরা সবাই আছি। মন খারাপ করে থেকো না। তুমি মন খারাপ করে থাকলে আমার সব বল শেষ হয়ে যাবে। আর আমি তা জানতে পারবই। প্রণাম নিও।

ইতি—মাণিক

ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ, তবু লতিকা লক্ষ্য করল, দাদা এই প্রথম চিঠিতে তার কথা লিখল না। আচমকা তার বিশ্বাসদের বাড়ির বক্তা লোকটার পাথুরে মুখখানা মনে পড়ে গেল। সে মায়ের দিকে তাকালো। মা ঘাড় হেঁট করে বসে আছে। যেন অগাধ নৈরাশ্যে আর দুশ্চিন্তায় সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। লতিকা হঠাৎ ধমক লাগালো, কী হচ্ছে মা! দাদা কী লিখেছে ভুলে গেলে বুঝি! মল্লিকা জবাব দিল না। কোন কিছুকে সে যেন প্রাণপণে চেপে রাখতে চাইছে। লতিকা আরও সাহস সংগ্রহ করল। তিরস্কারের সুরে বলল, ছি, ছি, তুমি অত ভেঙে পড়ছ কেন? দ্যাখ, দ্যাখ, আমার দিকে চেয়ে দ্যাখ। সঙ্গে সঙ্গে লতিকা বুঝতে পারল সে একটা আস্ত গাড়লমক, কেন না সে টের পেল, দু' ফোঁটা চোখের জল সর-সর করে তার গাল বেয়ে নেমে আসছে, যা মুছে ফেলতে তার হাতই উঠল না।

কতক্ষণ কাটল লতিকার মনে ছিল না। এক সময় তার কানের নিচে মল্লিকার বুকের স্পন্দন বড্ড বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে তার মাথাটা মায়ের বুক থেকে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে বললে, ওদের ডাকব মা?

মল্লিকা জবাব না দিতে সে আবার বললে ওই বিশ্বাসদের বাড়ির ওদের। মল্লিকা এবারও জবাব দিল না। লতিকা তখন উঠে গেল। দ্রুতপায়ে নিজেদের বাড়ির পাঁচিল পার হয়ে বিশ্বাসদের বাড়ির দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। একটু থামল। বেশি কিছু না ভেবেই দরজাটা ঠেলে ফাঁক করল। সে দেখতে পেল ওরা পাঁচজন তাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। যে লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছিল সে এখন চুপ-চাপ বসে সিগারেট টানছে। লতিকা তর-তর করে এগিয়ে গেল। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বলল, মা আপনাদের ডাকছে।

ওরা কিছু বলবার আগেই সে টের পেল আর বুকে বেজায় ঢিপঢিপ করছে। সে হাঁপাচ্ছে। একটু কাঁপছে। আর সে দাঁড়াতে পারল না। ঘুরে দাঁড়াল। যেমন এসেছিল আর তেমনি তরতর করে হেঁটে ফিরে এল।

ওরা কিন্তু এল। পাঁচজনেই। মল্লিকা প্রশান্ত গাম্ভীর্যে লতিকাকে হুকুম করল, বসতে দে লতি। লতিকার কানে ধরা পড়ল, মায়ের গলা সামান্য কেঁপে উঠল। সে মাদুর পেতে দিয়ে ওদের বলল, বসুন।

ভীরু ভীরু পাঁচটি ছোকরা। লতিকার হাসি পেল। সে তাকালো মল্লিকার দিকে। মল্লিকা ওদের কাছটিতে আগে বসল, হাসবার চেষ্টা করে শুধোলো, তোমরা কি মাণিকের সঙ্গে কাজ কর?

প্রশ্নটা বেয়াড়া, তা লতিকার কানে ধরা পড়ল এবং সে দেখতে পেল, ওরা পাঁচজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। লতিকা তখন একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, আমার দাদা না, আপনাদের মতই ইলেকট্রিক লাইনে কাজ করে।

—কোথায়? কী নাম? প্রায় পাঁচ-জনে মিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

এবার উত্তর দিল মল্লিকা।

—যা তোমাদের কাজ বাবা, স্থির থাকার তো উপায় নেই। এখন আছে রঘুনাথপুরে। নাম মাণিক।

—রঘুনাথপুরে! ও, এইচ টি'র কাজ। ওখানে এল টির কাজ তো এখনও শুরু হয় নি, বলাজে সবচেয়ে ঢ্যাঙা, ওদেরই মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক ছেলেটা। কিন্তু মাণিকের নাম তার শোনা বলে মনে হল না। সে ভুরু কুঁচকেই থাকল। সবচেয়ে কম বয়েসী ছেলেটা, যে এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করে বসেছিল, চকিতে একবার মুখ তুলে বলল, কবে ঢুকেছেন তো।

—এই মাস আষ্টেক। মল্লিকা উত্তর দিল।

মনে হল ছেলেটা স্মৃতিমন্থন করছে। কিন্তু তার এক লহমার জন্য মুখ তুলেই মুখ নামিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে মল্লিকা অনুভব করল আর বুকের ওপর দিয়ে যেন কিছু কোমল করাঙ্গুলির পরশ চমক দিয়ে গেল।

তার মুখ দিয়ে একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বেরিয়ে এল, কী নাম তোমার বাছা? বড় লাজুক দেখছি তো তুমি।

লাজুক না হাতী! লতিকাও ছেলেটাকে লক্ষ্য করছিল। ওদের দলের মধ্যে সেরা বিচ্ছু। কাঠ-লম্বা মুরুব্বিমত লোকটার পিছনে সদাই লেগে থাকে। দুষ্টুর রাজা। অবশ্য এইমাত্র ওর মুখ তোলা আর মুখ নামানোর ভঙ্গিটা, তার মনে হল, কচি কলাপাতার কাঁপনের মত কোমল সুন্দর মনোহর।

ছেলেটা মুখ না তুলেই একটু চিন্তিত-ভাবে বললে, খুব নতুন তো, চিনি না মনে হচ্ছে।

ঢ্যাঙা লোকটা ওর হয়ে মল্লিকার প্রশ্নের জবাব দিল, ওর নাম অনাই। ভাল নামটা কী যেন রে তোর, অনিন্দ্য? তাই না?

অনাই একটু মুচকি হাসল। কাজের কথাটা পাড়া দরকার। লতিকা শুধোলো, কিসের মিটিং হচ্ছিল আপনাদের?

—ও, তুমি বুঝি দেখে ফেলেছ? মুরুব্বি একগাল হেসে বলল, আমাদের ইউনিয়নের মিটিং। ও বুঝবে না। মল্লিকা বলল, তোমরা বুঝি ছাঁটাই হচ্ছ?

সবাই একসঙ্গে ঘুরে চাইল তার মুখের দিকে। মল্লিকা ভেবে পেল না, এর পর কী বলবে। অনাই আস্তে আস্তে বলল, আপাতত আমাদের এই পাঁচজনের মধ্যে বোধ হয় কেউ না। আমরা পুরনো, তার ওপর এইমাত্র এসেছি এখানে কন-স্ট্রাকশন শুরু করব বলে।

—তা হলে? মল্লিকার বুকের ভিতরটা এবার ভীষণ ঢিপঢিপ করতে লাগল।

—ছাঁটাই হবে নতুনেরা।

মল্লিকা চোখে আঁধার দেখল। মাণিক তো তা-ই লিখেছে।

—তবে আপনারা মিটিং করছিলেন যে! লতিকা ফস্ করে বলে ফেলল।

—করবই তো। আবার নরম এক ভঙ্গিতে ঘাড় তুলল অনাই, অবশ্য মল্লিকার দিকে তাকিয়ে। একটুকরো দরদী হাসিতে তার নরম মুখের ভাব অপরূপ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। সে বলল, নতুনরা বুঝি আমাদের কেউ নয়? নতুন পুরনো মিলেই তো আমরা। আমরাও একদিন নতুন ছিলাম না? সে একটুখানি থামল। মাটির দিকে চোখ নামালো। আবার বলতে থাকল, এক-একটা কনস্ট্রাকশন শেষ করে ছাঁটাই-এর ভয়ে আমরা রাত্রে ঘুমোতে পারতাম না, খেতে রুচি হত না আমাদের। কেবলই ভাবতাম আবার বেকার হয়ে পড়ব? কোথায় কাজ পাব এরপর?

লতিকা লক্ষ্য করল, ওর কচি কলা-পাতার মত ভাবটা এই ক'টা কথার মধ্যেই চলুদ হয়ে গেল, তারপর লাল, তারপর মনে হচ্ছে নীল হয়ে উঠছে। মুরুব্বি বলল, আমরা ভয়ে কেঁচোর মত হয়ে যেতুম।

—দিনরাত নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করতুম, কী করে ছাঁটাই রোখা যায়, বলল আর একজন।

—তারপর আমরা আমাদের হাতের মুঠোকে শক্ত করলুম, অন্য আর একজন বলল।

—সেই মুঠো দেখে ওরা ভেগে গেল, এবার দলের শেষ ছেলেটা বলল।

—এখন আমরা আর কেঁচো নই, আমাদের ফণা আছে, মুরুব্বি তার নিজস্ব ভঙ্গিতে একগাল হেসে বলল।

—আমরা ইউনিয়ন করেছি, নতুন হোক পুরনো হোক, একজনও যাতে ছাঁটাই না হয়, অনাই বলল দূরের দিকে তাকিয়ে।

মল্লিকার মনে হল কয়েকটা মুহূর্ত যেন সে এক ঘোরের মধ্যে ছিল। দেখল তার অন্তর নিঃশঙ্ক হয়ে উঠেছে। এক-বার মনে হল ছেলেগুলোকে আপ্যায়ন করা উচিত। কিন্তু কথাটা কিছুতেই সে ওঠাতে পারল না। কোথায় যেন বাধছে। বাড়িতে চায়ের পাট নেই, চারুর মাকে ডেকে-হেঁকে চা আনতে পাঠাতে হবে—কারণটা এত স্থূল নয়। মাণিকের কথাও যে আবার পাড়বে এদের কাছে, তাও অনাবশ্যক মনে হল।

মুরুব্বি গোছের মানুষটা এবার বলল, উঠি তা হলে মাসীমা! আমাদের ইউনিয়নের নেতা আবার ও-ঘরে একলা বসে আছে। এখন আছি তো আমরা। তখন দেখবেন জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

—হ্যাঁ, আছি তো আমরা, একসঙ্গে জনা-দুই-তিন বলল এবং উঠে দাঁড়াল।

অনাই-ও বলল ঐ একই কথা, আছি তো আমরা।

তারা বেরিয়ে গেল।

মল্লিকা লতিকাকে সাংসারিক কথাই বলল,—এবার আঁচটা তুলে ফেলি, খুকি, না কি, তুই ধরাবি আজ! তার গলার স্বর ঈষৎ কাঁপা-কাঁপা অথচ খুশি-খুশি শোনালো। আসলে সে ভাবনার স্থিরতা পাচ্ছে না।

কেউ তার লুকোনো মাণিককে কেড়ে নিচ্ছে না, রাত্রে শুয়ে শুয়ে মল্লিকা এটুকুই আগে স্থির করতে পারল। ছেলে-গুলো চলে যাওয়ার পর সে যেন নির্ভয় হয়ে গেছে। চারুর মা শুতে এলে তার সঙ্গে মাণিকের সম্পর্কে এলোমেলো কত কী বকেছে। লতিকার বিয়ে দেওয়ার ভাবনা এখন থেকে ভাবতে হবে, প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে সে কথাও বলেছে চারুর মাকে। এখন আবার তার মনে হচ্ছে, লতিকা তার অন্ধের যষ্টি। মাণিকের বউ ঘরে না এনে লতিকার বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। লতিকা তার লক্ষ্মী মেয়ে, পড়াশুনোয় কত ভাল! ফি বছর ফার্স্ট হয়, ইস্কুলের মাইনে লাগে না। মাণিক বলে, চাকরি যখন একটা পেয়েছি মা, লতি পড়ুক। ও তো পড়ে ওর হিম্মতে, আর দু' বছর পরে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে যাক্। জীবন বলত, মাণিককে আমার মত মাস্টার করব না, ডাক্তার করব। দেখো তুমি। ঐ একটা পেশা, মনুষ্যত্ব আর অর্থযোগ দুই-ই যাতে সিদ্ধিলাভ করে। আশ্চর্য! এই প্রথম জীবনের স্মৃতিতে তার অন্তরে হাহাকারের ঝোড়ো হাওয়া পাক খেয়ে উঠল না। বরং মাণিককে বা লতিকে তার গর্ভাধার থেকে মুক্তি দিয়ে যে বিচিত্র বোধে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকাত তাদের দিকে বা পরে তাদের উদ্বেগপাণ্ডুর ভয়-বিহ্বল জনকের দিকে, তেমনি একটা বোধের অস্তিত্ব কয়েক মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট করে সে তার চেতনায় ফিরে পেল। হঠাৎ সে লতিকাকে বলল, ওদের অনাই ছেলেটার বয়েস খুব কম, তাই না রে!

—দাদার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে মনে হয়, লতিকা জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জবাব দিল।

—ছেলেটা বেশ! মল্লিকা আবার বলল।

—দেখে তো মনে হল, ওরা সব্বাই বেশ ভালো, লতিকা বলল।

—তা অবিশ্যি, স্বীকার করল মল্লিকা। মাণিক ডাক্তার হয় নি, হবেও না কোন দিন। সে গাঁইতি চালায়, কোদাল চালায়, শাবল চালায় আর ছাঁটাই-এর ভাবনায় তার মুখে অন্ন রোচে না, চোখে ঘুম আসে না। অনাই-এর মত সে রেগে ওঠে, হাত মুঠো করে, অথচ সেই মুঠো ফস্কে তার কাজটা যাতে না পালিয়ে যায়, সে দিকে তার নজর। তার বাবার সাধ-মত যে মাণিক ডাক্তার হয়ে উঠতে পারল না, পারবেও না, তার এ কি রীতি? এবং কেন? মল্লিকা এই মুহূর্তে কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারল না, যেহেতু তার মনের অতলে লুকোনো মাণিকখণ্ডটা হঠাৎ যেন তার চোখের তারার সামনে এসে তার দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। প্রগাঢ় এক প্রসন্নতার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে সে লতিকাকে বলল, ওদের আর সাড়া-শব্দ পাই না কেন, ওরা কি ঘুমিয়ে পড়ল?

লতিকার উত্তর কানে এল, আকাশটা কী আঁধার, কিন্তু কত তারা দ্যাখ মা!

মল্লিকা চোখ বুজে গলার মধ্যে হাসি লুকিয়ে বলল, তোর ঐ এক ধান্দা, শুধু তারা, তারা আর তারা।

লতিকা ধড়মড় করে ঘুরে শুয়ে ছোট্ট মেয়ের মত দু' হাতে তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

## ইনটিরিওর মরিস মেটারলিঙ্ক

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

[ ম্যারীর প্রবেশ ]

ম্যারী—ঠাকুর্দা, ওরা আসছে।

বৃদ্ধ—তুমি বসেছ? ওরা কতদূরে?

ম্যারী—শেষ উৎরাইয়ের পাদদেশে এসে ওরা পৌঁছেছে।

বৃদ্ধ—নীরবে ওরা এগিয়ে আসছে।

ম্যারী—আমি ওদের বলে এসেছি মৃদু-কণ্ঠে প্রার্থনা জানাতে। মার্থা ওদের সঙ্গেই রয়েছে।

বৃদ্ধ—ওদের দলে কি অনেক লোক আছে?

ম্যারী—শবযানের চারপাশে সারা গ্রামের লোক এসে জড় হয়েছে। ওরা অনেক-গুলো লণ্ঠনও নিয়ে এসেছে। আমি ওদের বলেছিলাম আলোগুলো নিভিয়ে ফেলতে।

বৃদ্ধ—ওরা কোন্ পথ দিয়ে আসছে?

ম্যারী—ছোট রাস্তাগুলো ধরে ওরা এগোচ্ছে। ওরা খুব ধীরে ধীরে আসছে।

বৃদ্ধ—সময় হয়েছে......

ম্যারী—আপনি কি এদের জানিয়েছেন ঠাকুর্দা?

বৃদ্ধ—ওদের দেখেই তোমার বোঝা উচিত আমরা ওদের কিছুই বলি নি। ওই দেখ ওরা এখন বাতির আলোয় বসে আছে। ভাল করে দেখ বৎসে, নজর করে দেখঃ মানবজীবনের রহস্য সম্বন্ধে তোমার খানিকটা ধারণা হবে—

ম্যারী—কি শান্তিময় পরিবেশের ভেতর ওরা রয়েছে! আমার মনে হচ্ছে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ওদের দেখছি।

বিদেশী—ঐদিকে তাকিয়ে দেখ। আমি দেখলাম ওই বোন দুটি যেন চমকে উঠলো।

বৃদ্ধ—ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে......

বিদেশী—আমার মনে হয় ওরা জানলার কাছে আসছে।

[ এইবার একজন বোন প্রথম জানলার কাছে আসবে। অন্যটি তৃতীয় জানলার সামনে দাঁড়াবে। জানলার কাচে ওরা হাতের পাতা রাখবে এবং সামনের অন্ধ-কারের দিকে চেয়ে থাকবে। ]

বৃদ্ধ—মাঝের জানলাটার কাছে কেউ এলু না।

ম্যারী—ওরা বাইরের দিকে চেয়ে আছে—ওরা শোনবার চেষ্টা করছে......

বৃদ্ধ—বড় মেয়েটা কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে হাসছে।

বিদেশী—অন্য মেয়েটির চোখ দুটিতে আতঙ্কের ভাব।

বৃদ্ধ—সাবধান! কে বলতে পারে আত্মা দেহকে কেন্দ্র করে চারপাশে কতোটা ব্যাপ্ত হতে পারে......

[ এর পর কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। ম্যারী ঠাকুর্দার বক্ষলগ্ন হয়ে তাঁকে চুম্বন করবে। ]

ম্যারী—ঠাকুর্দা!

বৃদ্ধ—কেঁদো না বৎসে! আমাদেরও সময় আসবে।

[ কিছুক্ষণের স্তব্ধতা ]

বিদেশী—ওরা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে......

বৃদ্ধ—বেচারীরা! হাজার হাজার বছর এভাবে তাকিয়ে থাকলেও ওরা কিছু দেখতে পাবে না—রাত্রির অন্ধকার নিকষ কালো। ওরা এদিকে চেয়ে আছে—অথচ ওদের দুর্ভাগ্য এগিয়ে আসছে অন্যদিক থেকে।

বিদেশী—ভালই হয়েছে ওরা এদিকে চেয়ে আছে। কারা যেন মাঠের দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

ম্যারী—আমার মনে হয় ওই দলটা—ওরা এখনও এতদূরে যে আমরা স্পষ্টভাবে ওদের দেখতে পাচ্ছি না।

বিদেশী—ওরা ঘোরা-পথে আসছে—ওদের আবার উৎরাইতে চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে।

ম্যারী—ওঃ, ওদের দলে কত লোক জড় হয়েছে। আমি যখন ওখান থেকে আসি তখনও শহরতলী থেকে কাতারে কাতারে লোক এসে জমায়েৎ হচ্ছিল। ওরা সত্যিই খুব ঘুরপথে আসছে...

বৃদ্ধ—তা হলেও শেষ পর্যন্ত এসে যাবে। আমিও এখন ওদের দেখতে পাচ্ছি—মাঠ পার হয়ে আসছে—ওদের এত ছোট দেখাচ্ছে যে ঘাসপাতার সঙ্গে প্রায় মিশে রয়েছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে যেন চাঁদের আলোর শিশুরা এখন ওদের দেখছে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। যদিও মেয়ে দুটি এদিকেই চেয়ে আছে, ওদের পেছন থেকে ওদের দুর্ভাগ্য পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। ওদের ক্ষমতা নেই যে তাকে ওরা থামিয়ে রাখবে—আর যারা দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছে তাদেরও দুঃসংবাদকে ঠেকিয়ে রাখার শক্তি কোথায়! দুঃখে তাদের অন্তর ভরা, তবু তাদের এগিয়ে আসতে হচ্ছে......

ম্যারী—বড় মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে ঠাকুর্দা।

বিদেশী—ওরা জানলা থেকে সরে যাচ্ছে...

ম্যারী—ওরা মাকে চুমো খাচ্ছে......

বিদেশী—বড় মেয়েটি শিশুটিকে না জাগিয়ে তার কোঁকড়া চুলে হাত বুলোচ্ছে।

ম্যারী—ওদের বাবা চান তাঁকেও ওরা চুমো দেয়।

বিদেশী—আবার সব চুপচাপ হয়ে গেছে...

ম্যারী—মেয়ে দুটি মার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিদেশী—বাবার দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে বড় ঘড়িটার পেন্ডুলামে......

ম্যারী—ওরা প্রার্থনা করছে—কি জন্য তা ওরা নিজেরাই জানে না......

বিদেশী—ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন নিজেদের আত্মার বাণী শুনছে ব্যগ্রভাবে।

[ কিছুক্ষণের স্তব্ধতা ]

ম্যারী—ঠাকুর্দা, আজ ওদের দুর্ঘটনার কথাটা আর বলবেন না।

বৃদ্ধ—তুমিও কিন্তু ক্রমশ সাহস হারিয়ে ফেলছ। আমি জানতাম ওদের দেখাটা তোমার পক্ষে ভাল হবে না। আমার বয়স হোল প্রায় তিরাশি বছর, অথচ এই প্রথম জীবনের বাস্তব দিকটা সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল। জানি না ওই বাড়িতে ওরা যা কিছু করছে, আমার কাছে তা এত অদ্ভুত এবং গভীরতাপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে কেন। ওখানে ওরা বসে রয়েছে রাত্রির প্রতীক্ষায়, ওদের সামনে বাতি জ্বলছে—আমরাও এইভাবেই নিজেদের বাড়িতে সময় কাটাই। অথচ আমি যেন অন্য এক উচ্চ জগৎ থেকে ওদের পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছি—আর এর কারণ, একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটেছে যা আমি জানি—কিন্তু ওরা জানে না...তাই না? তোমাদের এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? হয়তো আরও এমন কিছু আছে যা আমরা [illegible] প্রকাশ করতে পারছি না এবং সেই জন্য আমাদের চোখে জল আসছে। এ-কথা আমার জানা ছিল না যে, জীবনে

এ ধরণের দুঃখ আছে—অথচ যারা জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে চায় তারা এত ভয়াবহ আঘাত পেতে পারে। যদি এই দুর্ঘটনাটা নাও ঘটতো তা হলেও এতোটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ওদের বসে থাকতে দেখলে আমি ভয় পেয়ে যেতাম। জাগতিক ব্যাপারে ওদের মনে বড় বেশি আত্মবিশ্বাসের ভাব। ওখানে ওরা বসে রয়েছে—কয়েকটি সামান্য কাঁচের প্যান ওদের সংগে ওদের শত্রুর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। বাড়ির দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ওরা ভাবছে আর কোন কিছু ঘটবে না। ওরা জানে না অন্তরাত্মার মাঝেই যত আপদের সৃষ্টি হয়। বাড়ির দরজার বাইরেই পৃথিবীর সীমারেখা টানা যায় না। নিজেদের ক্ষুদ্র জীবনের সম্বন্ধে ওরা কত নিশ্চিন্ত! ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না যে, অন্য অনেকে ওদের নিজেদের থেকেও ওদের জীবন সম্বন্ধে বেশি জানে। আমার মত একজন হতভাগ্য বৃদ্ধ—ওদের বাড়ির থেকে মাত্র দু' পা দূরে আমি দাঁড়িয়ে আছি—ওদের সমস্ত সুখ যেন আমার হাতের মুঠোয় ভরে রেখেছি—মুঠোটা খুলতে আমার যেন ভয় করছে......

ারী—ঠাকুর্দা, ওদের প্রতি করুণা করো...

দ্ধ—বৎসে! ওদের প্রতি আমাদের অনুকম্পা আছে—কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে কারোর মনে এতটুকু করুণার লেশমাত্র নেই।

ম্যারী—ব্যাপারটা ওদের কাল জানিও ঠাকুর্দা। দিনের আলোয় বললে ওরা অতটা দুঃখ পাবে না।

বৃদ্ধ—হয়তো তোমার কথাই সত্যি, বৎসে—রাত্রে এসব নিয়ে না ঘাটাই ভাল। আর দুঃখের সময়ও দিনের আলোটা মিষ্টিই লাগে......কিন্তু কাল সব শুনে কি বলবে? দুর্ভাগ্যে মানুষকে হিংস্র করে তোলে। যাদের জীবনে দুর্ভাগ্য আসে তারা অন্যের আগে সে খবর জানতে চায়—অপরিচিতরা তাদের আগে সে-কথা জানবে, এটা তারা পছন্দ করে না। কথাটা আজ গোপন রাখলে মনে হবে আমরা যেন ন্যায্য পাওনা থেকে ওদের বঞ্চিত করেছি।

বিদেশী—কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে—আমি প্রেয়ারের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি।

ম্যারী—ওই দলটা আমাদের এখানে এসে গেছে।

[মার্থার প্রবেশ]

মার্থা—আমি এসে গেছি। ওদের পথ দেখিয়ে আমি এখানে নিয়ে এসেছি—আমি ওদের বলেছি রাস্তায় অপেক্ষা করতে। (শিশুদের চীৎকার শোনা যাবে।) বাচ্চাগুলো এখনও চীৎকার করছে। আমি ওদের আসতে বারণ করেছিলাম—কিন্তু ওরা দেখবে বলে এসেছে—ওদের মা'রাও আমার নিষেধ মানে নি। সব ঠিকঠাক আছে তো? ওর আঙুলে যে ছোট্ট আংটিটা ছিল আমি সেটা নিয়ে এসেছি। আমি নিজের হাতে ওকে শবযানে শুইয়ে দিয়েছি। ওর দিকে দেখলে মনে হবে ও ঘুমোচ্ছে। ওর চুলটা নিয়েই মুস্কিলে পড়েছিলাম—কিছুতেই ঠিকভাবে গুছিয়ে দিতে পারছিলাম না। কিছু মার্গারিট ফুল দিয়ে ওকে সাজিয়ে দিলাম—দুর্ভাগ্যবশত অন্য কোনরকম ফুল পাওয়া গেল না। তোমরা এখানে কি করছ? ওদের ওখানে যাও নি কেন? (জানলার দিকে তাকিয়ে।) ওরা তো কাঁদছে না! ওরা—তোমরা ওদের দুর্ঘটনার কথা বলো নি!

বৃদ্ধ—মার্থা, মার্থা, তোমার অন্তরে জীবনীশক্তির বড় বেশি প্রাচুর্য—তুমি বুঝতে পারছ না......

মার্থা—কেন বুঝতে পারবো না? (কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলবে) ঠাকুর্দা, ওদের না জানিয়ে কাজটা ভাল করেন নি......

বৃদ্ধ—মার্থা, তুমি জান না......

মার্থা—আমি গিয়ে ওদের দুঃসংবাদটা জানাবো।

বৃদ্ধ—বৎসে, এখানে একটুক্ষণ অপেক্ষা কর—খানিকটা সময় দাও।

মার্থা—ওদের জন্য আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে! আর ওদের এভাবে অপেক্ষা করিয়ে লাভ নেই......

বৃদ্ধ—কেন?

মার্থা—তা জানি না, কিন্তু আর দেরী করা সম্ভব নয়।

বৃদ্ধ—এখানে আমার কাছে এস বৎসে...

মার্থা—ওরা কি ধৈর্যশীল!

বৃদ্ধ—তুমি আমার কাছে এস......

মার্থা—(ফিরে) আপনি কোথায় রয়েছেন ঠাকুর্দা? আমার খুব খারাপ লাগছে, আপনাকেও আর দেখতে পারছি না। আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কি করবো......

বৃদ্ধ—আর ওদিকে চেও না। ওরা সব কিছু জানুক......

মার্থা—আমি আপনার সঙ্গে যাব......

বৃদ্ধ—না, মার্থা, তুমি এখানেই থাক। তোমার বোনের পাশে দেওয়ালের গায়ে লাগানো এই পুরানো পাথরের বোঁচটায় বস, ওদিকে দেখো না। তোমার বয়স অল্প, এসব দেখলে সহজে ভুলতে পারবে না। তুমি তো জান না প্রিয়জনের মৃত্যুখবর শুনে লোকের মুখের চেহারাটা কি ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক হয়ে ওঠে! হয়তো ওরা কেঁদে উঠতেও পারে......ওদিকে ফিরো না। হয়তো কেউ কোন সাড়া-শব্দ করবে না—সেদিকে কিন্তু ফিরে চেও না। আগে থেকে কেউ বলতে পারে না দুঃখ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। দু'-একটা কান্নার আবেগ অন্তর থেকে উপচে পড়া—এই তো সাধারণ নিয়ম। এ ধরনের কান্না শুনে আমি নিজেই জানি না আমি কি করবো—এ তো ঠিক পার্থিব ব্যাপার নয়। বৎসে, আমি যাবার আগে আমাকে চুম্বন কর।

[প্রার্থনার গুঞ্জনধ্বনি ক্রমশ কাছে আসতে থাকবে। ভীড়ের এক অংশ বাগানে ঢুকে পড়বে। নিস্তব্ধ পদধ্বনি এবং ফিসফিসানি শোনা যেতে থাকবে।]

বিদেশী—(ভীড়ের প্রতি) এখানে দাঁড়াও—জানলার কাছে যেও না। ও কোথায়?

একজন কৃষক—কে?

বিদেশী—অন্যেরা—শবনাহীরা।

একজন কৃষক—ওরা গাছপালার মাঝের পথ দিয়ে সোজা বাড়ির দরজার দিকে আসছে।

[বৃদ্ধ চলে যাবেন। মার্থা ও ম্যারী বেঞ্চের উপব বসবে—তাদের পেছনটা জানলার দিকে থাকবে। ভীড়ের ভেতর থেকে গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাবে।]

বিদেশী—কেউ আওয়াজ কোরো না, কথাবার্তা বোলো না।

[ঘরে দুই বোনের ভেতর যে বেশী লম্বা সে উঠে দাঁড়াবে, দরজার দিকে যাবে, দরজার খিলে হাত দেবে।]

মার্থা—মেয়েটি কি দরজা খুলছে?

বিদেশী—না, দরজাটা ভাল করে আটকে দিচ্ছে।

[কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।]

মার্থা—ঠাকুর্দা ঘরে ঢোকেন নি?

বিদেশী—না। মেয়েটি আবার তার মায়ের পাশে গিয়ে বসলো। অন্যেরা স্থির হয়ে আছে। শিশুটি এখনও ঘুমোচ্ছে।

[কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।]

মার্থা—আমার ছোট্ট বোনটি, দেখি তোমার হাত দু'টি।

ম্যারী—মার্থা! [ওরা আলিঙ্গন এবং পরস্পরকে চুম্বন করবে।]

বিদেশী—ঠাকুর্দা নিশ্চয় নক্ করেছেন। ওরা সবাই একসঙ্গে মাথা তুলেছে—ওরা পরস্পরের দিকে চাইছে।

মার্থা—হায়, হায়! আমার ছোট বোনটি! আমি নিজেও কান্না সামলাতে পারছি না।

[মার্থা ম্যারীর কাঁধে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে।]

বিদেশী—ঠাকুর্দা নিশ্চয় আবার নক্ করেছেন। বাপটি দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। উনি উঠে দাঁড়িয়েছেন...

মার্থা—ম্যারী, আমিও ও-ঘরে যাব। ওদের এভাবে একলা থাকতে দেওয়া উচিত হবে না।

ম্যারী—মার্থা, মার্থা! [মার্থাকে যেতে বাধা দেবে।]

বিদেশী—বাপটি দরজার কাছে গিয়েছেন—তিনি খিল খুলছেন—অত্যন্ত সন্তর্পণে।

মার্থা—হায়, হায়! তোমরা দেখতে পাচ্ছ না......

বিদেশী—কি?

মার্থা—শববাহকদের....

বিদেশী—ওদের বাবা দরজাটি অল্প খুলেছেন। লনের একটা কোণ এবং ফোয়ারাটি ছাড়া আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বাপের হাতটি দরজার গায়ে—উনি এক পা পেছিয়ে এলেন—উনি যেন বলছেন, "ও, আপনি!" বাবা তাঁর হাত দু'টি তুললেন। যত্নের সঙ্গে দরজা বন্ধ করলেন। তোমাদের ঠাকুর্দা ঘরে ঢুকেছেন......

[লোকের ভীড় এবার জানলার কাছে এসে হাজির হয়েছে। মার্থা এবং ম্যারী উঠে দাঁড়ালো এবং অন্যদের সঙ্গে জানলার কাছে এসে হাজির হল। দেখতে পাওয়া গেল বৃদ্ধ ঘরের ভেতর ঢুকছেন। বোন দু'টি উঠে দাঁড়ালো, মা'ও উঠলেন এবং আর্মচেয়ারে শিশুকে শুইয়ে দিলেন—বাইরে থেকে ঘুমন্ত শিশুকে দেখা যাবে। মা এগিয়ে যাবেন এবং বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁর হাত ধরবার আগেই হাত ফিরিয়ে নেবেন। বাপের মুখে বিস্ময়ের মৃদু হাসি ফুটে উঠবে। বৃদ্ধের দৃষ্টি গিয়ে পড়বে জানলার দিকে।]

বিদেশী—বৃদ্ধ ওদের দুঃসংবাদটা দিতে সাহস পাচ্ছেন না। উনি আমাদের দিকে চেয়ে আছেন।

[ভীড়ের ভেতর মৃদু গুঞ্জনধ্বনি।]

বিদেশী—গোলমাল কোরো না!

[বৃদ্ধ জানলা দিয়ে বহু লোককে মুখ দেখতে পেয়ে চোখ সরিয়ে নেবেন। বোন দু'টির একজন তাঁকে আর্মচেয়ারে বসতে বলবে—তিনি বসবেন এবং কয়েকবার কপালের ওপর হাত বোলাবেন।]

বিদেশী—উনি বসে পড়েছেন......

[ঘরের অন্যেরাও বসবে—দেখে মনে হবে বাপটি খুব কথা বলে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ মুখ খুলবেন—তাঁর কণ্ঠস্বর সবার মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিন্তু বাপটি তাঁর কথায় বাধা দেবে। বৃদ্ধ আবার কথা বলতে শুরু করবেন—ধীরে ধীরে সবাই এবার সচকিত এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবে। হঠাৎ মা চমকে উঠবেন এবং দাঁড়িয়ে পড়বেন।]

মার্থা—হায়, হায়! মায়ের কাছে ব্যাপারটা বোধহয় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে!

[সে ফিরে দাঁড়াবে এবং হাত দিয়ে মুখ ঢাকবে। ভীড়ের ভেতর আবার গুঞ্জনধ্বনি উঠবে।]

বিদেশী—কেউ গোলমাল কোরো না। বৃদ্ধ এখনও ওদের ব্যাপারটা বলেন নি......

[মা উৎকণ্ঠাভরে বৃদ্ধকে প্রশ্ন করছেন দেখা যাবে। বৃদ্ধ দু'-চার কথায় জবাব দেবেন। হঠাৎ অন্যেরাও উঠে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকবে। তারপর বৃদ্ধ স্বীকৃতিসূচক মাথার ভঙ্গী করে দুর্ঘটনার সত্যতা ব্যক্ত করবেন।]

বিদেশী—উনি ওদের দুঃসংবাদটা জানিয়ে দিয়েছেন—হঠাৎ সবাইকে বলে ফেলেছেন।

ভীড়ের লোকেরা—বৃদ্ধ খবরটা ওদের বলেছেন! ওদের সব জানিয়ে দিয়েছেন!

[বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াবেন—দরজার দিকটায় ইঙ্গিত করবেন। মা, বাবা, বোনেরা দরজার দিকে ছুটে যাবে। দরজাটা খুলতে বাবার একটু কষ্ট হবে। বৃদ্ধ মা'র যাওয়ায় বাধা দিতে চেষ্টা করবেন।]

ভীড়ের লোকেরা—ওরা বাইরে যাচ্ছে! বাইরে যাচ্ছে!

[ভীড়ের মধ্যে হুলুস্থুল শুরু হবে। সবাই বাড়ির বাগানের অন্য দিকে ছুটে যাবে। এখানে শুধু বিদেশী দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘরের ভেতরকার সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে যাবে। দূরে দেখা যাবে তারায় ভরা আকাশ, চাঁদের আলোয় স্নাত বনভূমি এবং ফোয়ারা—ঘরের মাঝে আর্মচেয়ারে শিশুটি শান্তিতে ঘুমোতে থাকবে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।]

বিদেশী—শিশুটি কিন্তু জাগে নি।

[সে বেরিয়ে যাবে।]

॥ যবনিকা ॥

## শীতের উৎসব দিনে

শীতের মরশুমে কলকাতা আনন্দ-উৎসবে জমজমাট। রঙ-বেরঙের পোষাক-পরা নরনারী ও ছেলেমেয়ে পথে পথে খুসীর মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চড়ুইভাতির দলগুলি হৈ হৈ করতে করতে শহরতলী আর গ্রামের দিকে, গঙ্গার পাড়ে আনন্দের হাট বসাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বড়দের সঙ্গে করে চিড়িয়াখানায় ভিড় জমাচ্ছে। যাদুঘর আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে দলে দলে মানুষ আসছে দূর গাঁ থেকে, আনন্দের সঙ্গে রয়েছে তাদের জ্ঞানের পিপাসা। ফুলের মেলা, আর চারুচিত্র প্রদর্শনী সমানতালে আসর জমিয়েছে। শীতের আনন্দ-উৎসবে অনেক বিদেশী এসেছেন, ভূটিয়ারা পথে পথে গরম কাপড় ফিরি করছে। শীতের অঞ্চল থেকে আরো কত মানুষ কলকাতায় এসেছে। আর এসেছে পাহাড়ী হ্রদের পাখি। যারা বলে কলকাতায় নাকি মেয়েরা নিরাপদে চলাতে পারে না—তারা অবাক হয়ে দেখে রাত এগারটা পর্যন্ত ট্রামে-বাসে মেয়েরা বাড়ি ফিরে আসছে—সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস দেখে।

এবার কলকাতায় এসেছে তিনটি সার্কাস। সার্কাসগুলিতে ভিড় হচ্ছে দর্শকদের। এক-এক সার্কাস এক-এক রকমের আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। একটা দেখলে মনে হয় আর একটা দেখি ; সেখানে নতুন কিছু আছে কিনা। থিয়েটারগুলিও সেজেগুজে বসেছে। স্টার, বিশ্বরূপা, মিনার্ভা, রঙমহলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসর জমিয়েছে মুক্ত অঙ্গন। কাশী বিশ্বনাথও আসর জমাবার চেষ্টা করছে। এই ছয়টি নিয়মিত থিয়েটারের বাইরে রয়েছে মহাজাতি সদন, রবীন্দ্র সদন, ইনফরমেশন সেন্টার, শিক্ষায়তন হল ও রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে নানা রকমের অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র নাটক ও গানের আসর, বিদেশী নাটকের (অনুবাদ) অভিনয়, সঙ্গীত সম্মেলন। ভারতের নানা অঞ্চলের সঙ্গীতশিল্পীদের এইত কলকাতায় আসার সময়। কলকাতায় গান না গেয়ে কোন শিল্পীই যে খুসী হতে পারেন না। সমজদার শ্রোতা এখানে অনেক। রবীন্দ্র সদনে এসেছে পাহাড় অঞ্চল থেকে আর পুরুলিয়া থেকে লোক-নৃত্য শিল্পীর দল।

এই শীতের উৎসবের আরো তাৎপর্য দেখা যায়। নাটকগুলির মধ্যে লেনিন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে কলকাতার মানুষ যে কত আগ্রহী, তার প্রকাশ দেখা যায় নাট্যমঞ্চে। কলকাতায় লেনিন-জীবন নিয়ে চারটি নাটক আর একটি নৃত্যনাট্য অভিনীত হচ্ছে। এই নাটকগুলি দেখতে দর্শকের ভিড় যথেষ্ট। কলকাতার নাট্যমঞ্চে সারা বিশ্বমানবের কথা প্রতিফলিত। এখানে নাটকে দেখা যায় ভিয়েৎনামের সংগ্রামী মানুষকে, এখানে নাট্যমঞ্চে দেখা যায় নাৎসী জর্মানীর অবরোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মানুষের কথা, দেখা যায় রুমানিয়ার সমাজজীবন, আর মানবতার শত্রু হিটলারের প্রতি পরিহাসে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ে। সিনেমাগুলি সমানভাবে আনন্দের ডালি সাজিয়েছে। বর্তমানে চারটি বাংলা ছবি শুধু বাঙালীদের নয়, অবাঙালীদের আকর্ষণ করছে। তার সঙ্গে বিদেশী ছবি, হিন্দী ছবির সমাবেশ। ফিল্ম সোসাইটিগুলিও বসে নেই, ফরাসী ছবি দেখতে না দেখতে আসছে চেকোস্লোভাক ছবি। এই হল শীতের কলকাতার আনন্দময় চিত্র। যে যত কথাই বলুন না কেন, কলকাতায় কোন ভিন্ন রাজ্যের লোক এলে তাঁর চোখে লোকের ভিড় আব এই আনন্দের পসরা ছাড়া আর কি পড়বে?

আরো চোখে পড়বে প্রতিদিন কোন না কোন মিছিল। মজুর, কেরানি ছাত্র ও বেকারের মিছিল। যারা জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারছে, দাবি করতে শিখেছে। শীতের কলকাতার মাঝরাতে ফুটপাতে আরো দেখা যাবে একদল মানুষ উত্তাপ কামনা করছে—আগুন জেলে। আনন্দের সমারোহে ওরাই একমাত্র নিরানন্দ।

—সুজন

দুটি মন ছবিতে অপর্ণা সেন

হিন্দী ছোট ছবি 'গুপচুপ'এ কল্যাণী ঘোষ ও নিপন গোস্বামী।
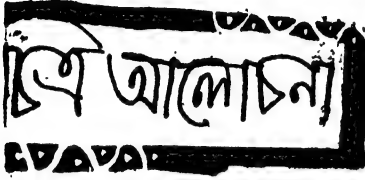
**সমান্তরাল**

(পরিচালনা : গুরুদাস বাগচী)

ম্যাজো মুভিজের 'সমান্তরাল' একটি মৌজিক কাহিনী চিত্র। প্রশান্ত চৌধুরী লিখিত কাহিনীর প্রধান চরিত্র কমলা এক মাতৃসদনের নার্স। একদিন সে ছিল কলেজের ছাত্রী। গরীব মামার সংসারে আশ্রয় পেয়েছিল। পাশের বাড়ির বড়লোকের ছেলে রতন তাকে ভালবেসেছিল; ঘটনাক্রমে তাদের বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু সে বিয়ে রতনের বাড়িতে স্বীকৃতি পেল না। তাই এই মাতৃসদনে নার্স হবার পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। এই কমলা একটি সন্তানকে পালন করে। সে কুমারী হলেও সকলে জানে মিঠু তারই ছেলে। তার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের গোপন কথা জানা গেল সুনন্দা এই হাসপাতালে ভর্তি হবার পর। সুনন্দা তার স্বামী রতনকে সব কথা জানিয়ে দিয়ে মৃত্যুর পথে পাড়ি দিতে চাইল। কিন্তু কমলার জন্য তাও সম্ভব হল না। আর রতন কমলাকে দেখে তার অতীতের ভুলের বোঝা হাল্কা করতে চাইল। কিন্তু সময় তখন পেরিয়ে গেছে। শুধুমাত্র স্মৃতিটুকু তাদের জীবনে মধুময় হয়ে রইল।

এই কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নির্মল দে। পরলোকগত নির্মল দে রচিত চিত্রনাট্যকে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার দায়িত্ব পালন করেছেন গুরুদাস বাগচী। এইরূপ কাহিনী বাংলা চলচ্চিত্রে নতুনত্বের দাবি করতে না পারলেও অভিনয়গুণে এবং দৃশ্যবৈচিত্র্যে ছবিটি দর্শকদের ভাল লাগবে। এই ছবিতে ম্যাসেঞ্জোর অঞ্চলের পাহাড় অঞ্চলকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অভিনয়ে কৃতিত্বের দিক থেকে মাধবী চক্রবর্তীর (মুখার্জী) ওপর ছবির সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করেছে। কারণ তিনি কাহিনীর প্রধান চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন। কৃতিত্বের দিক থেকে কালী সরকারের কথা দর্শকরা মনে রাখবেন। এই ছবিতে তাঁর জীবনের শেষ অভিনয় কিনা জানি না। একজন দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ধনীর চরিত্রে কমল মিত্র সার্থক অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে অনিল চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, পদ্মা দেবী, আশা দেবী, প্রেমাংশু বসু, বাণী গাঙ্গুলী, প্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ যথাযথভাবে কাহিনীকে পরিণতিতে পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন। ললিতা চ্যাটার্জী যথাযথ অভিনয় করেছেন, তবে তাঁর চরিত্রটি হিন্দী ছবির ছকে তৈরি। তার দায়িত্ব পরিচালকের। ছবির আলোকচিত্রের কাজ (দিলীপরঞ্জন মুখার্জী) ও সম্পাদনা (গোবিন্দ চ্যাটার্জী) প্রশংসনীয়। শ্যামল মিত্র পরিচালিত সঙ্গীতের কাজ ভালই বলা চলে।

**আরোগ্য নিকেতন**

অরোরার 'আরোগ্য নিকেতন' কলকাতার চিত্রগৃহসমূহে মুক্তিলাভ করেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে এবং ছবিটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। 'এ যুগ মরার যুগ নয়, এ যুগ বাঁচার যুগ' এটি হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দান। কবিরাজ মশাই যে রোগীর নাড়ীর স্পন্দনে তাঁর নিদান হেঁকে বেড়াবেন—সে যুগ আজ অস্তমিত। এই পারস্পরিক সংঘাতকে অবলম্বন করেই এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। কবিরাজ মশাই নাড়ীর স্পন্দনেই মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেতেন। আর তরুণ ডাক্তার কবিরাজ মশাইয়ের এই নিদান হাঁককে অমানুষিক বলে অভিহিত করলেন। রোগীকে শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত আশা দেওয়াই হচ্ছে চিকিৎসকের প্রধান ধর্ম। এই দ্বন্দ্বই কবিরাজ মশাইয়ের শেষ জীবনকে বিষাদময় করে তুলেছিল। এই মূল বক্তব্যকে চিত্ররূপায়ণ করতে গিয়ে উপন্যাসের কাহিনীর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। অযথা কয়েকটি রোমান্টিক দৃশ্যের অবতারণা করে কাহিনীর মূল বক্তব্যের প্রাধান্যকে দুর্বল করা হয়েছে। কবিরাজ মশাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিকাশ রায়। তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। তরুণ ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় প্রাণবন্ত। মায়ের ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতার অভিনয় মনে ছাপ রাখার মত। অন্যান্য ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়, জহর গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, ছায়া দেবীর অভিনয়ও প্রশংসাযোগ্য। বিজয় বসু ছবিটির পরিচালনা করেছেন।

**চিত্রবহের 'গুপচুপ'**

কথাসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এবং শ্রীমতী রায়ের বিশিষ্ট উপস্থিতির মধ্যে অন্নদাশঙ্করেরই একটি ছোট গল্পের ওপর নির্মিত 'চিত্রবহ' প্রযোজক সংস্থার 'গুপচুপ' হিন্দী তথ্যচিত্রটি ১৩ই জানুয়ারী রক্সি মিনিসোচার থিয়েটারে প্রদর্শিত হ'ল।

দুই রীলের ছোট ছবি 'গুপচুপ'কে তথ্যচিত্র হিসেবে অবশ্য অভিহিত না করাই ভালো। কারণ প্রযোজক-চিত্রনাট্যকার অমিতাভ রায় কিম্বা তরুণ পরিচালক দেবকুমার বসু তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে একটি নিটোল গল্পকে হাজির করে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছেন এবং সে কারণে 'গুপচুপ'-এর বিশেষ উল্লেখ প্রাপ্য। ১৯৩৪ সালে যখন ভারতে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না, অন্নদাশঙ্করের গল্পটি তখনই অধিক সন্তানোৎপাদনের দায়িত্বহীন অবিমৃষ্যকারিতা সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছে। তরুণ প্রযোজক-পরিচালকদ্বয় তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে এই গল্পটি সংগ্রহ করেছেন এবং মামুলী বিজ্ঞাপনের ঢঙে না সাজিয়ে শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের

ক্ষেত্রে দম্পতিকে নিয়েই প্রথম যাত্রা শুরু করেছেন।

বেকার যুবক বনওয়ারী শ্বশুর মশাইয়ের অর্থে প্রতিপালিত সংসারে সন্তানের সংখ্যা বর্ধন করতে নৈতিকভাবে মন থেকে সায় পায় না। কিন্তু এই দায়িত্বহীন কাণ্ডের অনৌচিত্য সম্পর্কে স্ত্রীকে সচেতন করতে গিয়েও বারংবার ব্যর্থ হয়। কেন না ইন্দু তার মায়ের প্রভাবে স্বামীকে ধরে রাখার উপায় হিসেবে সন্তানবতী হওয়ার মধ্যেই তার নারীত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করতে চায়। শেষে স্বামীকে অধিক সন্তানের জনক হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণে বিমুখ দেখে কোনও সাধুপ্রদত্ত প্রসাদী গ্রহণ করে, তবু পরিবার পরিকল্পনার কোন বৈজ্ঞানিক উপায় গ্রহণ করতে তার মন সায় দেয় না। প্রসাদীর অপগুণে অবশেষে ইন্দু মরণাপন্ন হ'য়ে পড়লে প্যারিপার্শ্বিক জগৎ ইন্দুর এই এ্যাক্সিডেন্টের জন্য দায়ী করে স্বামী বনওয়ারীকে। ব্যর্থ বনওয়ারী সামাজিক কুসংস্কারের কাছে পরাজয় স্বীকার করে সংসার ত্যাগকেই শেষ মুক্তি হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের মধ্যে গল্পটিকে উপস্থাপনা যেমনি প্রশংসার্হ, চরিত্র-রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথাযথ চরিত্রায়ণের জন্যও তেমনি প্রশংসার দাবি রাখেন কম-বেশি প্রত্যেক শিল্পীই। বনওয়ারীর ভূমিকায় নিপণ গোস্বামী ব্যর্থ বেকার যুবকের মূক অসহায়তাটুকু ভালই ফুটিয়ে তুলেছেন। কল্যাণী ঘোষ, অজিত পাত্রের অভিনয় চরিত্রানুগ এবং লেডী ডাক্তারের ভূমিকায় তৃপ্তি রায়কে চমৎকার মানিয়েছে।

তরুণ পরিচালক গল্পনির্ভর স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান সন্তানের পরিবর্তে এ্যাক্যুইরিয়মে মাছের প্রতীক গ্রহণ, শেষ দৃশ্যে একটি স্টীল শর্ট ব্যবহার, জনারণ্যে হারিয়ে-যাওয়া বনওয়ারীর লঙ শর্ট এবং দায়িত্বহীনতার ফসল শিশুদের সারবন্দী একটি ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত আয়ার হেফাজতে শুইয়ে রাখার দৃশ্য পরিকল্পনাগুলি সুন্দর।

## লেনিনের ডাক

লেনিন জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের নাট্য সম্প্রদায়গুলি প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনটি নাটকের কথা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এই তিনটির মধ্যে তরুণ অপেরার 'লেনিন' প্রমোদকরমুক্ত হয়েছে। এবারে চতুর্থ নাটকের কথা আলোচনা করছি। মিনার্ভা থিয়েটারে চতুর্থ নাটক অভিনীত হচ্ছে লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'লেনিনের ডাক'। ১৯১৮ সালে লেনিনের জীবনের কয়েক মাসের ঘটনা এই নাটকের বিষয়বস্তু। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরে এখানে লেনিনকে দেখা যাচ্ছে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে আর একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল গৃহশত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছেন, সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দেশ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বলশেভিক পার্টি এবং রাশিয়ার জনগণের জীবনে তখন এক ভয়ংকর সংকটজনক অবস্থা। একদিকে প্রতিবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ আর একদিকে জনগণের অশেষ দুর্গতি, দুর্ভিক্ষের অবস্থা। এই দুর্ভিক্ষ জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশক্তির সৃষ্ট। এই পরিস্থিতিতে লেনিনের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, মানবতাবোধ, নেতৃত্বের ও সংগঠনের ক্ষমতাকে প্রকাশ করা নাটকের উদ্দেশ্য।

এই নাটকের লেখক ও পরিচালক উৎপল দত্ত। নাটক রচনায় তিনি মূলত লেনিনের সেক্রেটারী লিডিয়া ফতিয়েভার স্মৃতিকথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই নাটকের মূল চরিত্র লেনিন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন লিডিয়া ফতিয়েভা, জেরজেনস্কি, স্তালিন, বুখারিন প্রমুখ। আর সংযোজিত হয়েছে চিরন্দায়া নামের একটি গ্রামের মানুষ, কৃষকনেত্রী আকুলিনা. সেই গ্রামের জমিদার, সৈন্যাধ্যক্ষ ও ধর্মযাজক আফানাফ। গ্রামের এই অংশ ইতিহাস-আশ্রিত—কাল্পনিক।

প্রথম অংশের তাত্ত্বিক ও সংগঠক লেনিনের চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখান হয়েছে দ্বিতীয়াংশে, যেখানে স্তালিনের নেতৃত্বে কৃষকরা অস্ত্রধারণ করেছে, গেরিলাবাহিনী গঠন করে সামন্ত-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। ইতিহাসের দিক থেকে এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু নাট্যকারের মাথায় 'অস্ত্রই বিপ্লবের নিয়ামক শক্তি' কথাটা এমন মোহ সৃষ্টি করেছে যে, অত্যন্ত হাস্যকর উপায়ে কৃষক রমণী আকুলিনার যুক্তি দিয়ে বুখারিনকে কাবু করা হল। যদিও স্তালিনকে দিয়ে একবার বলা হয়েছে 'জনগণই আসল শক্তি', কিন্তু পরে বার বার 'অস্ত্রই নিয়ামক শক্তি' কথাটার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রসংগক্রমে ভারত ও চীনের উল্লেখ করে তার পরে থিয়েট্রিক্যাল ম্যাজিক-এ ট্রেন দেখিয়ে গেরিলাদের হাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের মৃত্যুর পর লেনিনের বক্তৃতার মাধ্যমে যেভাবে রাশিয়ার গেরিলা যুদ্ধ আর ঔপনিবেশিক মুক্তি-সংগ্রামকে একাকার করে ফেলা হয়েছে তাতে বলা চলে, নাট্যকার লেনিনকে ভুলভাবে উপস্থিত করেছেন। কারণ ১৯১৮ সালে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের কালে কৃষকদের হাতে অস্ত্র দেওয়ার কথা উঠতে পারে, কিন্তু সে সময় ভারত বা চীনে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখলের কথা নয়। কারণ ভারতে বা চীনে তখন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব গড়ে উঠে নি—তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাল। সুতরাং 'অস্ত্রই নিয়ামক শক্তি' কথাটা ধরে নিয়ে ১৯১৮ সালে লেনিনকে দিয়ে সব দেশে একইভাবে

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'মুক্তি স্নান' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষাল।

বিপ্লব শুরু করার ডাক দেওয়ার অর্থ লেনিনকে ট্রটস্কি বানিয়ে দেওয়া। নাট্যকার বোধ হয় হাততালির মোহে অত ভাবতে পারেন নি।

নাটকের যে অংশে লেনিনকে গুলী করা হল—সেই অংশে যখন তুমুল উত্তেজনা দেখানো উচিত ছিল, তখন দেখা গেল লেনিনের মত লোককে গুলী করা সত্ত্বেও জনগণের কোন প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ নেই; দ্রুত একজন ডাক্তার বা স্ট্রেচার বাহকরা মঞ্চে আসে না। লেনিন অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে—কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে গেলেন। শিল্পেন্দ্রিয়জ ম্যাজিক কেবলমাত্র গেরিলা যুদ্ধের জন্য, পৃথিবীর মানুষের সবচেয়ে ভালবাসার ও বিশ্বাসের জনকে গুলী যখন করা হয়েছিল সে সময়ের অবস্থাটি কি কোন বইতে লেখা নেই? নিশ্চয় তা এমন নিরুত্তাপ অবস্থা ছিল না।

অভিনয়ের কথা যদি বলা যায়, তবে লেনিনের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মেক-আপের দিক থেকে যত সার্থক হয়েছেন, লেনিনের ব্যক্তিত্ব, লেনিনের কথা বলার বৈশিষ্ট্য, তাঁর মুখে সেই বিখ্যাত দুষ্টুমিমাখা হাসি এবং ছটফট-করা ভাব এই অভিনয়ে কোথায়? সোভিয়েট ইউনিয়নে নাকি মাত্র দুজন অভিনেতা আছেন যাঁরা লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন। তাঁদের অভিনয় আমরা ফিল্মে দেখে থাকি। পশ্চিম বাংলায় চারজন লেনিনের ভূমিকাভিনেতা হয়েছেন। কিন্তু কারো লেনিন লেনিন নয়। সত্যবাবুর কাছে আমরা কিছুটা বেশি আশা করেছিলাম। 'লেনিনের ডাক' নাটকে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন আকুলিনাবেশী শোভা

পীযূষ বসু পরিচালিত 'দুটি মন' ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন।

সেন। প্রথম অঙ্কে মঞ্চে তাঁর উপস্থিতির পর থেকেই নাটকটি জমে উঠে। আফনাফির ভূমিকায় অভিনয় থাকলেও উৎপল দত্ত যাজকদের মাধ্যমে ধর্মীয় মোহের মুখোশ খুলে ধরেছেন। লিডিয়া ফতিয়েভার চরিত্রে অপর্ণা সেন যথাযথ অভিনয় করেছেন। মারিনার চরিত্রে জয়া ভট্টাচার্য কিছুটা আড়ষ্ট। গ্রামের দৃশ্যে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে রুণু চৌধুরী, মৃণাল ঘোষ, অরূপ বক্সী, শংকর ভট্টাচার্য, অলক দে, পরেশ গোস্বামী, বিমল দাশগুপ্ত, তিনু ঘোষ, রুদ্র রায়, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ চক্রবর্তী, অশোক চক্রবর্তী, পিনাকী রায়চৌধুরী, জীবন রায় প্রমুখ যথাযথভাবে চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন। সেই তুলনায় পলাশ দাসের স্তালিন, শান্তনু ঘোষের বুখারিন ব্যক্তিত্বহীন। অবশ্য এই চরিত্রগুলিকে যথাযথভাবে উপস্থিত করা বড় পাকা অভিনেতার কাজ। জেরজেনস্কির অভিনয় করেছেন অসিত বসু। দলগত কাজে লিটল থিয়েটারের সুনাম আছে, এই নাটকে তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

তাপস সেনের আলোকসম্পাত ও সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জার কাজ যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ। নাটকে কয়েকটি রুশ লোকসঙ্গীত ও বিপ্লবের গানের প্রয়োগ রয়েছে, কিন্তু মাইকে শব্দের তীব্রতার জন্য গানগুলির তাৎপর্য অনুভব করা যায় না। গ্রামের দৃশ্যে একটি লোকনৃত্য যোগ করা হয়েছে। কিন্তু নাচটি দেখে মনে হয়েছে, এই নাচটি সংযোজন না করলেই ভাল ছিল। কারণ প্রাণশক্তিতে ভরা, উদ্দীপনা ও ক্রীড়াময় এই রকম রাশিয়ান নাচ যে কিরকম তা আমরা কলকাতায় দেখেছি। সুতরাং নিষ্প্রাণ অনুকরণ দেখিয়ে কি লাভ? তবে অনুশীলন করলে বোধহয় ভাল করে দেখান যায়। নাটকে লেনিন-সহধর্মিণী ক্রুপস্কায়ার একবার হলেও উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল; অন্তত গুলী করার পরে আরোগ্যোত্তর সময়ে।

সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে কাবেরী বসু ও শর্মিলা ঠাকুর।

## সংগঠনীর নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার অনুষ্ঠান

গত ৮ই জানুয়ারী উদয়পুরে 'সংগঠনী' আয়োজিত ২৪ পরগণা একাংক নাটক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

## মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীতরুণ সেনগুপ্ত ও আবগারীমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হ'ল :—

সামগ্রিক নৈপুণ্যে—প্রথম "কুশীলব" (সাগর মোহনায়), দ্বিতীয় "ইউনিয়ন ব্যাংক এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন" (অন্য নাটক), তৃতীয় "করবী" (জীবন-মৃত্যু)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শ্রীসন্তোষ মিত্র (হিল্লোল), শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—শ্রীমতী সবিতা ব্যানার্জী (পি· এন· বি এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব), শ্রেষ্ঠ পরিচালক—শ্রীপিলু মজুমদার (জাগরণ সংঘ), শ্রেষ্ঠ টাইপ চরিত্রাভিনেতা—শ্রীগোবিন্দ ব্যানার্জী (কুশীলব), শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনেতা—শ্রীসরোজ রায় (তরুণ সংঘ), শ্রেষ্ঠ টীম ওয়ার্ক—"কুশীলব" (সাগর মোহনায়), শ্রেষ্ঠ মৌলিক একাংক রচয়িতা—শ্রীশ্যামলতনু দাশগুপ্ত (সাগর মোহনায়)। তা' ছাড়া অভিনয়ে বিশিষ্টতার স্বীকৃতিস্বরূপ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয় :—

সর্বশ্রী বিষ্ণু চক্রবর্তী, অজিত ঘোষ, দীপক মুখোপাধ্যায়, সুবোধ মিত্র ও সীতারাম কাপুর।

মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দু'দিনব্যাপী এক সঙ্গীত আসর বসেছিল গত ২৬, ২৭ ডিসেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে। অনুষ্ঠান শুরু হয় রাজীবলোচন দে'র পাখোয়াজ লহরার মাধ্যমে। পাখোয়াজ লহরায় শ্রীদে'র কুশলতা প্রশংসনীয়। 'মারু বেহাগ' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান শিবানী মুখার্জী। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বাঁশীতে 'বাগেশ্রী' রাগ রূপটি ফুটিয়ে তোলেন প্রণব মুখার্জী। আলাপ ও রাগ বিস্তারে শিল্পগত আঙ্গিক রচনা করেছেন নিভা দাস। ইনি 'মালকোষ' ও 'হংসধ্বনি' রাগ পরিবেশন করেন বেহালায়। 'নায়কী-কানাড়া' রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনান বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় মূকাভিনেতা হিরন্ময়ের মূকাভিনয় দিয়ে। তিনি 'নুইসেন্স ইন ক্যালকাটা' ও 'রিক্সাওয়ালার আত্মকাহিনী' ফিচার দু'টি পরিবেশন করেন। এদিন শ্যামলী চক্রবর্তী 'ইমন' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীরা এ দেশের 'রাগ-সঙ্গীত' কি রকম শিক্ষালাভ করছে তার নিদর্শন পাওয়া যায় এ সম্মেলনে। আলি আকবর খাঁর আমেরিকান ছাত্র মিঃ মনটিনো সরোদে 'দরবারী-কানাড়া'য় আলাপ ও 'চন্দনন্দন' রাগে গৎ বাজিয়ে শোনান। এ'র সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন সলিল চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ চক্রবর্তী 'কৌশিকী-কানাড়া' গেয়ে শোনান। জি, এন, গোস্বামী বেহালায় 'সৌরাষ্ট্র-ভৈরব' ও 'ভৈরবী' বাজিয়ে মুগ্ধ করেন। 'বাগেশ্রী'র করুণ রূপের আবেদন প্রকাশ করলেন প্রদ্যোৎ ব্যানার্জী। রামনরেশ মিশ্রের 'আহিরী ভৈঁরো' রাগটি আনন্দ দিয়েছে। তবলায় সহযোগিতা করেন সন্দীপ দেব। মায়া চ্যাটার্জীর কথক নৃত্য ছিল এদিনের অন্যতম আকর্ষণ। নৃত্যের আসরকে মনোগ্রাহী করে তোলেন পণ্ডিত নানকু মহারাজ ও পুত্র প্রকাশ মহারাজ।

# ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যাবেন যাঁরা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বছর অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার পরিপ্রেক্ষিতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-গামী ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে। তাই আজ রোভার্স আর ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পরে এই বিষয়টি নিয়ে ক্রীড়া-রসিকদের যেন আর আলোচনার অন্ত নেই।

তবে এ কথা আজ আর কারো বুঝতে বাকী নেই যে, এবারের ভারতীয় দল গঠনে নবাগত অর্থাৎ নতুন খেলোয়াড়দের ওপরই জোর দেওয়া হবে বেশী। সেইটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়রা যেভাবে খেলেছেন তার তুলনা মেলা ভার।

যাই হোক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দল গঠন প্রসংগে প্রথমেই আসবে অধিনায়ক প্রসংগটি। অর্থাৎ ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবেন কে? এ বিষয়ে এখন দু'টি মত। একদল চাইছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক পরিবর্তন, আর একদল চাইছেন পাতৌদির নবাবকেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে রাখতে।

এ বিষয়ে আমরা বেশি কিছু বলবো না। কারণ আগেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তবে এ কথা ঠিক যে, দল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতায় পাতৌদি আজো সেরা। সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের যোগ্য অধিনায়ক পাতৌদি ছাড়া আর কেউ নন।

যাক ও কথা। অধিনায়কের পর ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী দলের সূচনা-কারী ব্যাটসম্যানদের নিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। ভিনু মানকাদের ছেলে অশোক মানকাদের ওপরে অনেকেই বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যের পর অশোক মানকাদ একটার পর একটা ইনিংসে দিয়েছেন ব্যর্থতার পরিচয়। তাঁর খেলায় দেখা গেছে অনেক দুর্বলতার ছাপ। সুইং বোলিং-এর বিরুদ্ধে তাঁর অসহায়তা

॥ পাতৌদি ॥

ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে পাতৌদির ওপরেই কি পড়বে দল পরিচালনার ভার?

খুব বেশি করে চোখে পড়েছে। তা ছাড়া সেই খোঁচামারা রোগও তাঁর মধ্যে বড় বেশিভাবে বিদ্যমান। তাই মনে হয় যে, এই দুর্বলতাগুলো যদি না তিনি শুধরে নিতে পারেন, তাহলে অশোক মানকাদ দলের সূচনাকারী ব্যাটসম্যান হিসেবে একেবারেই অচল হয়ে যাবেন। ফারুক ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করা বোধহয় ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তাঁর খেলার ধরণ অনেকটা সেই লাগলে ছক্কা না লাগলে ফক্কা গোছের। চেতন চৌহানও এখনো পর্যন্ত বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। অর্থাৎ ভারতীয় দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান সমস্যা রয়েই গেলো। অথচ ভারতীয় দলে দু'জন সত্যিকারের ভালো ওপেনিং ব্যাটসম্যানের প্রয়োজন আজ সব থেকে বেশি।

ওপেনিং ব্যাটসম্যানের মতো দু'জন ভালো ওপেনিং বোলার না হলেও আর চলে না। সুব্রত গুহর ওপর আমাদের অনেক আশা ছিল। সুব্রতর বলের পেস হয়তো খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু সুব্রতর হাতে বল ঘুরতো ভালো, অর্থাৎ সুব্রত ভালো সুয়িং করাতে পারেন। আউট আর ইন দু'টো সুয়িংই আছে তাঁর হাতে। তবু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদম সুবিধে করতে পারেন নি সুব্রত।

তাই মনে হয় যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দলে সুব্রতর চান্স পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে রনজী ট্রফির খেলায় সুব্রত খুবই ভালো বল করছেন। শেষ খেলাগুলোতেও যদি তাঁর বল এমনই কার্যকরী হয়, তাহলে হয়তো তাঁর কথা আবার নতুনভাবে চিন্তা করবেন ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা। সেদিক দিয়ে অবশ্য ছোট অমরনাথ নিশ্চিন্ত। মাদ্রাজ টেস্টে তাঁর বোলিং সাফল্যই তাঁকে নির্বাচিত করবে। তবে ভারতীয় দলের পেস বোলার হিসেবে একটা নতুন নামও সকলের শোনার সম্ভাবনা আছে খুব বেশি।

এর পরে আসবে উইকেট রক্ষকের প্রশ্ন। ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ভারতের এক নম্বর উইকেট রক্ষক। তবু তাঁর খেলায়

আগের সেই জৌলুস কেন আর নেই। কি ব্যাটিং, কি উইকেট কিপিং—দুটি ক্ষেত্রেই ইঞ্জিনিয়ার সেই আগের মত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছেন না। অথচ বুধি কুন্দরণের কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। কুন্দরণের ব্যাটিং এখনো বেশ ভালো। কুন্দরণের সেই মারকুটে ব্যাটিং-এর ধারা এখনো সেই রকমই আছে। তাছাড়া উইকেটের পেছনে নিপুণতার দিক দিয়ে কুন্দরণ কোন অংশেই ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে কম যান না।

অথচ ভারতীয় ক্রিকেটে কুন্দরণ উপেক্ষিত। কুন্দরণ কোনদিনই, জানিনে কেন, ভারতীয় ক্রিকেট কর্মকর্তা ও খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের সুনজরে পড়েন নি। খেলোয়াড় হিসেবে কুন্দরণ যেমন ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে কোন অংশে কম নন, তেমনি বয়েসের দিক দিয়েও তিনি ইঞ্জিনিয়ারের কাছাকাছি। তবু কুন্দরণ উপেক্ষিত, তবু কুন্দরণকে ভুলে গেছেন ক্রিকেট কর্মকর্তারা, তবু কুন্দরণকে ভুলে যাচ্ছি আমরা। তাই ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় হয়তো দেখবো কুন্দরণের নামও কেউ করছেন না। অন্য কেউ হয়তো ইঞ্জিনিয়ারের সংগে যাবেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে।

এর পরেই আমাদের কাছে আসবে অম্বর রায়ের মনোনীত হবার কিম্বা না হবার প্রশ্নটি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, অম্বর রায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করাব সুযোগ পাবেন।

॥ কুন্দরণ ॥

কেন জানিনে, কুন্দরণ কোনদিনই ভারতীয় ক্রিকেট কর্মকর্তা ও খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের সুনজরে পড়েন নি।

তার জন্যে অবশ্য রনজী ট্রফির বাকী খেলাগুলোয় অম্বরকে ভালো খেলতেই হবে। তাঁর সাম্প্রতিক সেঞ্চুরী দুটি তাঁকে এ বিষয়ে এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। অম্বর রায় সম্বন্ধে আজ শুধু একটা কথাই বলার প্রয়োজন। টেস্ট ম্যাচগুলোকেও যদি

॥ অম্বর রায় ॥

ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দলে অম্বর রায়ের মনোনীত হবার সম্ভাবনা কোন অংশেই কম নয়।

অম্বর রনজী কিম্বা দলীপ ট্রফির খেলাগুলোর মতো সহজভাবে নিতে পারেন—তাহলে টেস্ট খেলাতেও অম্বর রায় নিশ্চিত সাফল্য লাভ করবেন। টেস্ট ম্যাচ বলে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া কিম্বা আত্মবিশ্বাস হারানো মানেই ব্যাট করতে নেমে অসহায় হয়ে যাওয়া। এই বিষয়ে অম্বর রায়ের আরো বেশি সচেতন হওয়ার দরকার বলেই মনে হয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যাওয়া সম্বন্ধে সব থেকে বেশি নিশ্চিন্ত বোধহয় সোলকার, বিশ্বনাথ, ভেংকটরাঘবন, বেদী আর প্রসন্ন। ওয়াদেকারের নামও অবশ্য এই নিশ্চিন্তের তালিকায় ফেলা যেতে পারে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে এঁরা সকলেই মোটামুটিভাবে সাফল্য লাভ করবেন এ কথাও বলা যেতে পারে। তবে বিশ্বনাথ সম্বন্ধে একটা কথা বলার প্রয়োজন সব থেকে বেশি। বিশ্বনাথকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রাডিশন ভেঙে একটা সেঞ্চুরী করতেই হবে। যে সব ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী করেছেন, তাঁরা আর কেউই দ্বিতীয় শতরান করতে পারেন নি। এই তালিকায় আছে লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, কৃপাল সিং, আব্বাস আলী বেগ আর হনুমন্ত সিং-এর নাম। এই তালিকায় যাতে বিশ্বনাথের নামও না ওঠে

তার জন্যে বিশ্বনাথকে আপ্রাণ চেষ্টা করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আর একবার শতরানের মুখ দেখতেই হবে।

উপেক্ষা এবং অবিচার ভারতীয় ক্রিকেটের একটি অতি পরিচিত ব্যাধি। ওঁরা যে কার ওপর কখন সদয় এবং কার ওপর রুষ্ট তা বোঝা দায়। সম্প্রতি ভীষণভাবে উপেক্ষা এবং অবিচার করা হচ্ছে চন্দ্রশেখরকে। অথচ মাত্র দু-এক বছর আগেও আমরা জানতাম যে, চন্দ্রশেখর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেগ স্পিন বোলার। অবশ্য সিদ্ধান্ত বা এ ঘোষণা ভারত থেকে করা হয় নি। ভারতীয় দলের ইংলণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় চন্দ্রশেখরের বোলিং-এর ধরণ এবং তাঁর বোলিং-সাফল্য দেখেই ঐ দুটি দেশ থেকেই ও কথা বলা হয়েছিল। এর পর চন্দ্রশেখর অবশ্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুখ সেরে গেছে অনেকদিন। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার সংগে একটি আঞ্চলিক খেলায় তিনি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছিলেন। তবু টেস্ট খেলার সুযোগ পান নি তিনি। তাই আজ তাঁর প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো বা তাঁকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দলে স্থান দেওয়াও হতে পারে।

মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় দলটিতে এঁদের মনোনীত হবার সম্ভাবনাই বেশি—পাতৌদি (অধিনায়ক), ওয়াদেকার, অশোক মানকাদ, চেতন চৌহান, জি আর বিশ্বনাথ, একনাথ সোলকার, এম অম্বরনাথ, ভেংকটরাঘবন

[শেষাংশ ১৯২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

॥ চন্দ্রশেখর ॥

উপেক্ষা আর অবিচার ভারতীয় ক্রিকেটের একটি অতি পরিচিত ব্যাধি। সম্প্রতি এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয়েছে চন্দ্রশেখরকে।

# খেলাধুলো

## আপনি আচরি ধর্ম

কথায় বলে আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি অধর্ম করি তাহলে অপরকে শেখাবো কি? কারণ আর যাই হোক, মুখে বড় বড় কথা এবং নীতি জ্ঞান দিয়ে নিজেরা যদি উল্টো কাজটাই করি তাহলে যাদের উদ্দেশ্যে বড় বড় কথা বলা কিম্বা নীতি-জ্ঞান দেওয়া তাদের অবস্থাটা কি রকম হবে একবার ভেবে দেখা দরকার। সম্প্রতি ভারতবর্ষে এবং তারই ক্ষুদ্র রাজ্য বাংলা দেশে খেলাধুলোর জগৎ নিয়ে যে সব কান্ড কারখানা চলেছে, তাকে আর যাই হোক খুব একটা স্বাভাবিক অবস্থা কিছুতেই বলা যায় না। এই তো সেদিন হাওড়া স্টেশনে এক কেলেঙ্কারী কান্ড হয়ে গেলো। কটকে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বাংলা দলের কয়েকজন কর্মকর্তা (খবরে প্রকাশ) মাতাল হয়ে সেদিন যে কান্ড করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। কলকাতা ছাড়ার আগেই যদি ওঁদের ঐ অবস্থা হয়, তাহলে কলকাতার বাইরে ওঁরা আরো যে কতোটা বেপরোয়া হয়ে উঠবেন সে কথা কল্পনাও করা যায় না। আর আমরা কিনা ওঁদেরই হাতে আমাদের ছেলে, মেয়ে, ভাই-বোনদের ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি! এর পর এবং ওঁদের অবস্থা দেখে বাংলার প্রতিযোগীরা যদি উৎসাহিত হয়ে রাশ ছাড়া ঘোড়ার মতো ঘুরে বেড়ান, তাহলে তাঁদের কতোটা দোষ দেওয়া যেতে পারে? আজকাল হামেশাই খেলোয়াড়দের বেলেল্লাপনা নিয়ে নানা রকম রসপূর্ণ খবর পরিবেশন করা হয়। খেলোয়াড়দের এই আচরণ অমার্জনীয় ঠিকই। কিন্তু খেলোয়াড়দের সামলাবার ভার যাঁদের ওপরে তাঁরাও যদি ঐ একই দোষে দোষী হন, তাহলে তার চেয়ে দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় কি হতে পারে! অথচ সেদিকে নজর নেই কারো। যদি থাকতো, তাহলে হাওড়ার মতো জনবহুল স্টেশনে ঐ কেলেঙ্কারী কান্ডর নায়ক যাঁরা, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন এখনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি? দৈনিক পত্রিকায় এই খবরটি তো অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে আমরা কি বুঝবো? খেলোয়াড়দের সংযত করার আগে, খেলোয়াড়দের দোষ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়ার আগে, আমাদের নিজেদের অনেক বেশি সংযমী হওয়ার দরকার—এ কথাটা কি আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হবে ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশের খেলাধুলো জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের......? —শান্তিপ্রিয়॥

শেষ পর্যন্ত বিহারকেও ইনিংসে হারিয়ে দিলো বাংলা। আর যাই হোক, বিহারের এই ব্যর্থতা অন্তত প্রত্যাশিত ছিল না। আসাম ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে বিহারের খেলা দেখে সকলেই আশা করেছিলেন যে, বাংলার বিরুদ্ধেও বিহার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবে।

কিন্তু কোথায় কি? বাংলার বোলারদের বিরুদ্ধে বিহারের ব্যাটস্‌ম্যানরা মোটে মাথা তুলেই দাঁড়াতে পারেন নি। অসহায়ের মতো তাঁরা আউট হয়ে গেলেন সুব্রত গুহ, দিলীপ দোসী প্রমুখের বলে। আর ব্যাটিং-এ বাংলার অধিনায়ক অম্বর রায় একাই একশ'। ১৩৩ রান করে অম্বর বাংলাকে ইনিংস জয়ের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

আসাম, উড়িষ্যা এবং বিহারের বিরুদ্ধে এবার বাংলা খুব সহজেই জিতেছে। প্রত্যেকটি খেলায় বাংলা ইনিংসে জিতেছে। যাই হোক, এইবার বাংলা দলকে আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে। গত বছর বাংলা রনজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠে হেরে গিয়েছিল বম্বের কাছে।

এবারও কি বাংলা ফাইন্যালে উঠবে? যদি ওঠে, তাহলে আশা করা যায় যে, বম্বের বিরুদ্ধে বাংলার খেলোয়াড়রা প্রাণ দিয়ে খেলবেন। বম্বে দল শক্তিশালী ঠিকই, কিন্তু তাদের সেই আগের শক্তি এখন বোধহয় আর নেই, কারণ রনজি ট্রফির প্রথম দিককার একটা খেলায় বম্বে এবার হেরেছে। তাই বম্বে যে এবারও ফাইন্যালে উঠবে, এ কথা আজ আর হলফ করে বলা যায় না।

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। তবে আমরা চাই যে, বাংলা আর একবার রনজি ট্রফি জয় করুক। সেই কবে মান্ধাতার আমলে বাংলা একবার রনজি ট্রফি জিতেছিল—সে কথা আমরা সকলে ভুলতে বসেছি। তাই ভুলে যাবার আগে আমরা চাই, বাংলা আর একবার জিতুক...!

ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান নাম প্রত্যাহার করে নিলো। ইস্টবেঙ্গল আগেই হেরে গিয়েছিল। ডুরাণ্ড কাপ বাংলা দেশে নিয়ে যেতে দেবো না বলে একদল উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। রোভার্স কাপ তাঁরা ধরে রাখতে পারেন নি, কিন্তু ডুরাণ্ডকে পারলেন। অথচ ডুরাণ্ড কাপ জেতা এবার রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আহতের তালিকা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় বাংলা দেশ এবার সে চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারলো না। যাই হোক এ চ্যালেঞ্জ তোলা রইল, এর জবাব আসছে বছর মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গল নিশ্চয়ই দেবেন।

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার আসর বসেছে বোম্বাই-এ। এই প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগে ভারতেরও দুটি দল যোগ দিয়েছে। পাকিস্তান কিন্তু অংশ গ্রহণ করছে না। খেলার ধারা দেখে মনে হয় যে, ভারতের ডার্ক ব্লু দলটিই শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হবার সম্মান অর্জন করবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

* * *

এবারের হুগলী কুমার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছেন বাঁশবেড়িয়ার 'সন্তান সংঘের' সভ্য সমীরকুমার রায়। উত্তরপাড়া কলোনী এসোসিয়েশন এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন।

* * *

কাশীপুরের আর, বি, আর স্পোর্টিং ক্লাব পরিচালিত বার্ষিক শিক্ষণ শিবির (মুক্তবায়ু) গত ২৪শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেওঘরে অনুষ্ঠিত হলো। ৭০টি ছেলেমেয়ে এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করে। সমাপ্তি দিবসে মাননীয় শ্রীযুক্ত এল, পি, সিন্‌হা এস-ডি-ও মহাশয় শি বি র বা সী দে র অভিবাদন গ্রহণ করেন ও সমষ্টি ব্যায়াম, পোলড্রিল, ডাম্বল ড্রিল, কুচকাওয়াজ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। দলটি গত ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতা ফিরে আসে। দেওঘরে এই শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন শ্রীজয়গোপাল ভট্টাচার্য।

## গল্প হলেও সত্যি

মাত্র দুদিনের টেস্ট খেলা! বিশেষ করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুদেশ যখন খেলছে! শুনতেও অবাক লাগে। খেলাটি অবশ্য ছিল পাঁচদিনের।

১৯২১ সালের মে মাসে নটিংহামে বসেছে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ম্যাচের আসর। টসে জিতে ইংল্যাণ্ড শুরু করল ব্যাটিং। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জে· এম· গ্রেগরীর মারাত্মক বোলিং-এর জন্যে (৫৮ রানে ৬টি উইকেট) ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১২ রানের বেশী করতে পারলো না। প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া করল ২৩২ রান (ডব্লু বার্ডসলে করলেন ৬৬ রান)।

কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ডকে বিধ্বস্ত করল অস্ট্রেলিয়ার বোলার ই· এ· ম্যাকডোন্যাল্ড (৩২ রানে ৫টি উইকেট)। ফলে মাত্র ১৪৭ রানে শেষ হল তাদের দ্বিতীয় ইনিংস। বাকী রান করতে অস্ট্রেলিয়াকে আর কোন উইকেট হারাতে হয় নি। আর মাত্র দুদিনেই শেষ হয়ে গেল প্রথম টেস্ট ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া জিতল ১০ উইকেটে!

* * *

১৯৪৮ সালে লীডস্ মাঠে চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষে ইংল্যাণ্ড মোট ৪০৩ রানে এগিয়ে থেকে ৮ উইকেটে ৩৬৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করল। জিততে হলে অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে এক দিনে ৪০৪ রান। আবার পঞ্চম দিনের খেলা, তাড়াতাড়ি রান করতে উইকেট পড়বে। তা ছাড়া এক দিনে ৪০৪ রান করাও অসম্ভব। কিন্তু ক্রিকেট খেলায় অসম্ভব বলে কিছু নেই। পরদিন বিজয়লক্ষ্মী যেন ভর করল অস্ট্রেলিয়ার দিকে। ঝড়ের গতিতে রান উঠল ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে। আর ৪০৪ রান করতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হল মাত্র তিনটি উইকেট।

সেই অভাবনীয় রানের বন্যায় ইংল্যাণ্ড হার স্বীকার করল ৭ উইকেটে।

—শুকদেব মুখোপাধ্যায়,
মিরহাট, বৈদ্যপুর, বর্ধমান
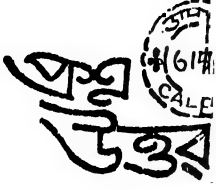
**নবীন্দ্রচন্দ্র বণিক** (চকর চৌমুহনী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা)

**উত্তর :** আপনার প্রশ্নের উত্তর সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যায় নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

নিম্নলিখিত পত্রদাতাদের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করা হচ্ছে :

**পরিতোষ নাগ** (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি), **শঙ্কর বসু ও সুভাষ দত্ত** (পান্ডু, গৌহাটি-১২); **ইন্দ্রজিৎ, অপু ও টেনো** (ডি গুপ্ত লেন, কলকাতা-৫০), **জীবন ও তপনজ্যোতি ঘোষ ও দেবদাস ভট্টাচার্য** (লক্ষ্মী ইউনিয়ন বিদ্যালয়, জোড়হাট-২), **অসীম সরকার, তপু, শিখা ও অসিত** (রেলওয়ে কোয়ার্টার, নৈহাটী), **অঞ্জন ব্যানার্জী** (ব্যানার্জীপাড়া রোড, কলকাতা-৪১), **সমীর দাশ** (**শাঁখরাইল হাই স্কুল**), **সুকুমার সরকার** (দুর্গাপুর-৫), **স্বপনকুমার ভট্টাচার্য** (**ডানকুনি, হুগলী**), **সোমনাথ সমাদ্দার** (**নেতাজী কলোনী, বরাহনগর**), **হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র** (সুভাষপল্লী, **শিলিগুড়ি**)।

**চন্দনা অধিকারী** (মহারাজা নন্দকুমার রোড, বরানগর)

**উত্তর :** আপনি পাতৌদিকে C/o. দিল্লী ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, ফিরোজ শা কোটলা, নিউ দিল্লী এই ঠিকানায় ও বিশ্বনাথকে মহীশূর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, হায়দ্রাবাদ এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন। আর লরীকে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সাপ্তাহিক বসুমতীতে খেলোয়াড়দের জীবনী তো প্রায়ই প্রকাশ করা হয়।

আপনি অন্য প্রশ্নটির উত্তরের জন্যে সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যা দেখুন।

**হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র** (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

**প্রশ্ন :** ক্রিকেট খেলায় কোন ব্যাটসম্যান লেগের দিকে (সন্দেহজনক) একটি ক্যাচ দিলেন, ক্যাচটি ধরতে পারলে ব্যাটসম্যানকে আউট দেবার দায়িত্ব বোলার প্রান্তের আম্পায়ারের। কিন্তু লেগ আম্পায়ার কি বোলার প্রান্তের আম্পায়ারের পরামর্শ ছাড়া আউট দিতে পারেন?

**উত্তর :** পারেন ঠিকই, তবে দেন না। তিনি যদি আউট সম্বন্ধে নিশ্চিত হন তাহলে বোলার প্রান্তের আম্পায়ারকে ব্যাটসম্যানকে আউট দেবার কথা বলবেন। এইটাই প্রচলিত প্রথা।

**তাপস ঘোষ** (সাদিপুর, বর্ধমান)

**প্রশ্ন :** এ বছরে ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান কে কে এবং শ্রেষ্ঠ বোলার কে?

**উত্তর :** ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, অশোক মানকাদ, চেতন চৌহান বেশির ভাগ খেলায় ভারতীয় দলের ইনিংস সূচনা করেছিলেন।

প্রসন্ন আর বেদী এ বছরে ভারতের শ্রেষ্ঠ বোলার।

**পরিতোষ সিংহরায়** (বেড়ম, কোটালপুকুর, সাঁওতাল পরগনা)

**উত্তর :** ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের সম্পূর্ণ স্কোর বোর্ড জানাতে গেলে যে অনেক জায়গা লাগবে। আপনার যদি খুব দরকার থাকে তাহলে সংগে টিকিট দিয়ে চিঠি দেবেন—ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে জানানো হবে।

**অরবিন্দকুমার পালিত** (ডাঃ কে ডি মুখার্জী রোড, বেহালা)

**উত্তর :** চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম : কয়েক সংখ্যা আগে উত্তম সরকার ও পীযূষ পালের প্রশ্নের উত্তরটি একটু অন্য রকম হবে। কারণ এ বছর মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত তার শেষ খেলায় সিঙ্গাপুরকে তিনটি গোল দিয়েছিল। গোল তিনটি করেছিলেন—গুরুকৃপাল সিং, হাবিব ও ইন্দর সিং।

**সমীরকুমার রায়** (চন্দননগর সি· সি· ক্লাব, চন্দননগর)

**উত্তর :** পাতৌদি সম্বন্ধে আপনি যা জানতে চেয়েছেন তা সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যায় পাবেন। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর সাক্ষাৎকারের ফলাফল পরে জানানো হবে সুযোগ মত।

[ ১১১৭ পৃষ্ঠার পর ]

**অম্বর রায়**, বি এস বেদী, এস **প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর**, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, বুধি **কুন্দরণ** (কিম্বা অন্য কোন উইকেটরক্ষক)। **এ ছাড়া** অশোক গান্দোত্রা ব্যাটসম্যান হিসেবে, সুব্রত গুহ কিম্বা পেস বোলার হিসেবে হঠাৎ যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে, তাঁদের যে-কেউ ভারতীয় দলের পক্ষে সফরের জন্যে মনোনীত হতে পারেন।

জানি নে ভারতীয় খেলোয়াড় নির্বাচকমন্ডলী এই তরুণ দলটির সংগে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কাউকে নিতে চাইবেন কিনা। চাইলে বোধহয় সবার আগে উঠবে দিলীপ সারদেশাই, আবিদ আলী, এম এল জয়সীমা কিম্বা রুসি সুর্তির নাম। বোরদেকে কেউ আবার নতুনভাবে ফিরে পেতে চাইবেন বলে তো মনে হয় না।

দেখা যাক কি হয়। তবে যাই হোক না কেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের আগে ও পরে একটানা অনুশীলন শিবিরের ব্যবস্থা করতেই হবে। আর এই শিবিরে এমন কোচ রাখতে হবে, যাঁরা পেস বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খোঁচা মারা রোগটা অন্তত কিছুটা সারিয়ে তুলতে পারবেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল শক্তিশালী ঠিকই, কিন্তু আগের মতো ঠিক ততে টা শক্তি যে আজ আর তাদের নেই, একথা বোধহয় না বললেও চলে। তাই মনে হয় যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি সংযত হয়ে জান লড়িয়ে খেলেন, তাহলে বলা যায় না খেলার ফলাফল কি হবে। তবে তার আগে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং এবং ব্যাটিং-এর দুর্বলতাগুলোই দূর করা দরকার।

**সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন**
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

# সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ ঃ ৩১শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 29th January, 1970

# আত্মত্যাগের পথেই প্রজাতন্ত্রের সার্থকতা

ভারতের জনজীবনে ছাব্বিশে জানুয়ারী, প্রজাতন্ত্র দিবস একটি পরম পবিত্র স্মরণীয় দিন। অন্যান্য বছরের মত এ বছরও এই দিনটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হয়েছে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম আমাদের কাম্য ছিল, কিন্তু সংগ্রামের শেষ সেখানেই ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের মানুষের দৈন্য দূর করার সংকল্প ছিল দেশপ্রেমিকদের চিত্তে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হলে দেশ-শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ভারতের নাগরিকদের ওপর। ভোটের মাধ্যমে নাগরিকরা সে কাজ সুচারুরূপে পালন করতে পারবে কি না, সে প্রশ্ন তখন অনেককেই বিচলিত করেছিল। যে দেশে শতকরা প্রায় ৭৫ জন নিরক্ষর, সে দেশে গণতন্ত্র সফল হওয়া সম্ভব নয়—এমন ধারণা হয়তো অনুচিত ছিল না। তা ছাড়া আমাদের শাসনতন্ত্রেও সর্বজনীন শিক্ষাদানের ব্যাপারে সময় নির্দিষ্ট করা থাকলেও তা ফলপ্রসূ হয় নি। সংকল্প বাক্য সার্থক হয় নি—একথা ঠিক। এতদ্‌সত্ত্বেও দেখা গেল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের কতকগুলি রাজ্যে অধিকাংশ জনসাধারণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিমুখ হয়েছে। গণতন্ত্রের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসের আলোচনা করে তার আরো আগেকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, নিরক্ষর ব্যক্তিরা সবরকম অপবাদ অগ্রাহ্য ক'রে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেই রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিয়েছে। বরং সে পরিচয় দিতে অক্ষম হয়েছে রাজনৈতিক ... দলগত শক্তি তখন কম ছিল না। জওহরলাল নেহরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো দৃঢ়চেতা ব্যক্তিরা সাধারণের চোখে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তবু সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেয়েছিল ভিন্ন তরুছায়ার আশ্রয়।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বহু রাজ্যে মিলিত হোল এবং তারা যুক্তফ্রন্টের আকারে কতকগুলি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। তারপর জনসাধারণ এই আশাই করেছিল যে, সুদীর্ঘকাল ধরে শ্রুত প্রতিশ্রুতিগুলি হয়তো এবার কার্যে পরিণতি লাভ করবে। কিন্তু ভারতের রাজনীতি যেমন বিচিত্র, আরো বিচিত্র দলীয় নীতি। কংগ্রেসের বিরোধিতার নামে এতোদিন যাঁরা বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, এখন তাঁরাই বা কি করছেন! কোন্ দলের সুস্পষ্ট নীতি কি, তাই তো ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে সময় সংগ্রাম সুরু করেছেন, তখন কোনো কোনো দল তাঁর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেই মুক্তির পথ খুঁজছেন। অথচ সেই সব দল নাকি প্রগতিশীল। আরো হাস্যকর ব্যাপার হয় তখনই, যখন এক-একটি রাজ্যে সর্বভারতীয় কোনো কোনো দলের এক-এক রকম নীতি লক্ষ্য করা যায়। এই নীতি জনস্বার্থপন্থী, না দলীয় সুবিধাবাদের নীতি—তা একদিন অবশ্যই প্রমাণিত হবে। কিন্তু জনসাধারণ এখন চায় শিক্ষা এবং দু মুঠো খাবার। সারা দেশের এখন যেদিকেই দৃকপাত করা যায়, সেখানেই বেকার। গ্রামময় ভারতে গ্রামগুলির যতই বড়াই করা যাক, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতার দিকে তাকালেই স্বপ্নভঙ্গ হয়।

ভারতের মতো অনগ্রসর দেশে কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যাপক নয়। কৃষি বিপ্লবের কথা বলা হয়, কিন্তু আজও সেই লাঙলের জয়জয়কার এবং কলকারখানা যে পরিমাণে সম্প্রসারিত হওয়া দরকার, তার কতটুকুই বা হয়েছে! শ্রমিক ও মালিকগোষ্ঠীর বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে যাতে কোনোরকম সঙ্কট সৃষ্টি না হয়, এটাই আমাদের কাম্য এবং শ্রমিকরা যেমন মালিকের ভালোমন্দের দিকে লক্ষ্য রাখবেন, তেমনি মালিকরাও শ্রমিকদের কল্যাণে উদারতার পরিচয় দেবেন—আমাদের এই আশা সত্ত্বেও সে আশা সর্বত্র সিদ্ধিলাভ করে নি।

ভারতের প্রজাতন্ত্রের উৎকর্ষ নিহিত সকলের কল্যাণের মধ্যে এবং সে-কল্যাণ সম্ভব হবে—যদি প্রত্যেকেই সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন। আর সকলের কল্যাণসাধন সম্ভব হলে ভারতে তখনি প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে দেশবাসী যে সংকল্প গ্রহণ করেছেন, আমরা আশা করি, নবভারত নির্মাণে তা ব্যর্থ হবে না। কিন্তু সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে দেশের জন্য আত্মত্যাগ। সেই ত্যাগের মন্ত্র কি আমরা কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করতে পেরেছি?

# আজকের মানুষ

বিচিত্র ভারতের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ঘটনাও উল্লেখ পাওয়া যায়, অপুত্রক রাজার মৃত্যুতে অজ্ঞাতকুলশীল বালককে প্রত্যন্ত দেশ থেকে ধরে এনে শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করা হয়েছে। বিহারের সরকারী গদি আজ কার্যত শূন্যই রয়েছে প্রায় চারমাস ধরে। জনপ্রিয় বা জননির্বাচিত সরকারের বদলে এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। তাই খোঁজা হচ্ছে উত্তরাধিকারীকে, সরকারের নেতৃত্ব দেওয়া যায় যাঁকে!

বলা বাহুল্য, দাবিদারের কোনো অভাব ঘটে নি। সেদিন পায়ে রাজ্য ও রাজমুকুট সঁপে দেবার জন্যে মনোনয়ন দেওয়া হতো, আজ নিকষ গণতন্ত্রে অত সহজে কাজ মেটার উপায় নেই। সিংহাসন বা রাজ্যের জন্যে অবশ্যি সেদিনও রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়েছে। রাজ্য খণ্ডিত হয়েছে, সিংহাসনেও পালা করে একাধিক রাজা বসেছেন। লড়াই আজও চলছে, এজমালি শাসন আজও অব্যাহত রয়েছে, যদিও রকমফের ঘটেছে তার যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে। বিহারে সরকার গঠনের দায়িত্ব নেবার জন্যে কতজনই এগিয়ে এসেছেন। সর্দার হরিহর সিং আগে থেকেই লাইনের পুরোভাগে রয়েছেন, তারপর সেই দাবিদারের সারি উজ্জ্বল করেছেন রামানন্দ তেওয়ারী, দারোগা রাই। সর্দার হরিহর সিং এবং দারোগা রাই উভয়েই কংগ্রেসপ্রার্থী—তবে প্রথমোক্ত জন সংগঠনপন্থী, দ্বিতীয় জন ইন্দিরা-সমর্থক। যিনি একদা পুলিশ কনস্টেবল ছিলেন এবং কালক্রমে বিহার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশমন্ত্রীর পদ লাভ করেন, সেই রামানন্দ তেওয়ারী এস-এস-পি দল থেকে কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব করার দাবি পেশ করেছেন। বিহারের ৩১৮টি আসন-বিশিষ্ট বিধানসভার এস-এস-পি'র আসনসংখ্যা ৫৩। শ্রীহরিহর সিং এবং

দারোগা রাই

শ্রীদারোগা রাই দুজনেই ৭০-৭২ জন কংগ্রেস এম-এল-এ তাঁদের দলে রয়েছেন বলে দাবি করছেন।

অপেক্ষাকৃত তরুণ সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল দারোগা রাই [illegible] আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আসেন। '৪২-এর আন্দোলনে তিনি [illegible] [illegible] অন্যতম ছাত্রনেতা। তখন তরুণ সমাজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মত প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেদিনকার সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির জীবন ও কর্মধারা মুক্তি-পাগল যুবসম্প্রদায়কে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তরুণ দারোগা রাই সহজেই নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন সমাজতন্ত্রের সেই জীবনস্রোতে। ১৯৪৮ সন পর্যন্ত দারোগা রাই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু যখন মূল কংগ্রেস থেকে সি-এস-পি বেরিয়ে এল, তখন দারোগা রাই পুরনো সংগঠন ছাড়তে রাজি হলেন না।

স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাই নতুন করে দেশ ও গণসংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাও দ্রুত বেড়ে গেল। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই তিনি বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-মন্ত্রিসভায় তিনি পেয়েছিলেন উপমন্ত্রীর পদ এবং বিনোদানন্দ ঝা-মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯৬৩ সালে যখন কামরাজ পরিকল্পনায় শ্রীঝাকে পদত্যাগ করতে হয়, তখন নেতৃত্বের জন্যে শ্রীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু বর্ণগত বিরোধের কারণে নির্বাচিত হতে পারেন নি।

শ্রীদারোগা রাই কংগ্রেস-প্রধান শ্রীজগজীবন রাম এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার আশীর্বাদ লাভ করেছেন। তিনি বিহারে প্রগতিশীল সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন, রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগোর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। তবে বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলীয় অবস্থা আজ এমন অনিশ্চিত যে, কোন কোয়ালিশন সরকার যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করা দুরূহ কাজ।

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(২৪)

### প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি (৩)

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গান্ধীজী পছন্দ করেন নি, একথা স্বয়ং গান্ধীজীই পত্রযোগে তাঁকে জানিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে লেখা এক চিঠিতে গান্ধীজী নানা রাজনৈতিক বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মতপার্থক্যের কথা জানাবার পরে বলেছিলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও "আমরা নিজেদের মধ্যে পার্থক্য আবিষ্কার করেছি।" ১৩ এপ্রিল তারিখে গান্ধীজীর পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বিষয়টিকে স্পষ্ট করে নিয়েছিলেন—

"আপনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সহযোগিতার কোনোপ্রকার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে আপনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে যুক্ত করেছেন, তার কারণ, সম্ভবতঃ আপনি ভারতের জন্য প্রস্তুত আমাদের শিল্পবিষয়ক পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন না, যদিও আমরা (যন্ত্র) শিল্পবিস্তারের সঙ্গে উপযুক্ত কুটীরশিল্পের প্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছি।"

ন্যাশনাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে গান্ধীজী কতখানি বিরক্ত ছিলেন, তা দেখা যায় জহরলালকে লেখা ১৯ আগস্ট, ১৯৩৯ তারিখের পত্রে :

"প্রিয় জহরলাল, ভাবছিলাম, অন্য সময়ের অভাবে ওয়ার্কিং কমিটির সমক্ষেই প্ল্যানিং কমিটি সম্পর্কে কিছু বলব কি না তোমায়। আজ সকালে তোমার সঙ্গে কথা-বার্তার পর শংকরলাল এসেছিলেন এখানে। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁকে এই বিষয়ে লেখা কৃপালনীর একটি চিঠির প্রতিলিপি। কৃপালনী এ-ব্যাপারে যেসব আপত্তির কথা তুলেছেন তাতে আমার সায় আছে। সত্যি বলতে, কমিটির কার্যকলাপের উপযোগিতা আমি বুঝে উঠতে পারিনি কোনোদিন। আর এর কাজকর্মের বিবরণ ওয়ার্কিং কমিটিকে ঠিকমত জানানো হয় কি না, তাও জানি না! এর অসংখ্য সাব-কমিটিগুলির অস্তিত্বের সার্থকতা আমি বুঝতে অক্ষম। আমার মনে হচ্ছে, প্রভূত অর্থ এবং প্রচুর সময় এমন একটি কর্মে ব্যয়িত হচ্ছে, যার ফল একেবারেই কিছু হবে না, কিংবা খুব সামান্য কিছু হবে—এই হয়

গান্ধীজীর বক্তব্য এত স্পষ্ট যে, বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এইটুকু বললেই চলবে, একমাত্র গান্ধীজীর পক্ষেই এই চিঠি লেখা সম্ভবপর, যাঁর নিজস্ব আদর্শবাদের প্রবলতা তাঁকে সহজেই বাস্তব সত্য সম্বন্ধে অন্ধ রাখতে পারত; সত্যই রেখেছিল, নচেৎ কারো পক্ষে বলা বা ভাবা সম্ভবপর ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির দ্বারা কিছুই হবে না বা অতি সামান্যই হবে? গান্ধীজীর কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু গান্ধীভক্ত কৃপালনী কি অতখানি নিশ্ছিদ্র আদর্শবাদী ছিলেন? গান্ধীজীর মনোভাবে সুভাষচন্দ্র বিস্মিত হন নি, এমন কি কৃপালনী প্রমুখ গান্ধীবাদীদের কুটীর-শিল্পভিত্তিক তাত্ত্বিক ধারণা তাঁকে আশ্চর্য করে নি, তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন কৃপালনী প্রভৃতির দুমুখো আচরণে। পূর্বে উদ্ধৃত সুভাষচন্দ্রের রচনাংশ থেকে দেখেছি, দিল্লীতে শিল্পমন্ত্রী সম্মেলনে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃপালনী সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্ল্যানিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়—কোনো বেসুরো কথা সেখানে ওঠে নি। এই পটভূমিকায় কৃপালনীদের পরবর্তী আচরণ স্বতঃই সুভাষচন্দ্রের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

কংগ্রেসের বড় কর্তাদের মধ্যে পণ্ডিত জহরলাল প্ল্যানিংয়েব উৎসাহী সমর্থক। প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতিত্ব স্বীকার করে তিনি দীর্ঘদিন পরিশ্রম করেছেন এবং তার বাস্তব কিছু ফল দেশকে দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। জহরলালকে সভাপতি করার জন্য সুভাষচন্দ্রের আগ্রহের বাস্তব কারণ কী ছিল, সেকথা আগে বলা হয়েছে। ব্যাপারটাকে সফল করতে হলে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের বিশ্বাসভাজন কাউকে এর সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেওয়া দরকার। জহরলাল তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী মানুষ। সুভাষ-গঠিত ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ের বিরোধিতা গান্ধীপন্থীদের কাছ থেকে যে এসেছিল, তার পিছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল। ও-জিনিসটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ওর পিছনে রয়েছে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর মতাবলম্বীরা। দেশকে যন্ত্র-শিল্পের মালিকত্ব দেওয়ার অর্থ নেতৃত্ব বদলের পথ খুলে দেওয়া। খাদির উপর গান্ধীবাদীরা নেতৃত্ব গড়ে তুলেছেন। তাঁরা গান্ধীবাদে [illegible]

জাতীয়-ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে, বাহ্যত কুটীরশিল্পের প্রতি অনুরাগকে ত্যাগ করলে।

কিন্তু যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের নেতৃত্ব যদি সমদলীয় কেউ গ্রহণ করেন? সেক্ষেত্রে আপত্তি অধিকাংশের ক্ষেত্রে নিছক মৌখিক হয়ে দাঁড়াবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জহরলাল যখন স্বাধীনতা-উত্তর কালে যন্ত্রশিল্পায়নের জন্য প্রয়াসী হলেন, তখন কোনো বড় প্রতিবাদ গান্ধীবাদী বৃহৎ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আসে নি, কারণ, পণ্ডিত জহরলাল গান্ধীজীর ঘোষিত উত্তরাধিকারী, এবং পণ্ডিত জহরলাল জানেন গান্ধীকে মাথায় তুলে রেখে, গান্ধী-আকাঙ্ক্ষিত কুটীরশিল্পকে বড় হাতে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে, কিভাবে স্বকার্যসাধনে অগ্রসর হতে হয়। তাছাড়া একালে গান্ধী-বাদী বৃহৎ নেতৃত্বের বড় সহায় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষপাতী হয়ে গিয়েছে, কারণ, সুভাষচন্দ্র-জাতীয় গোঁড়া সমাজতন্ত্রীরা বিদায় নেবার পরে শিল্পায়ন ধনতান্ত্রিক পথে হবে, এটা বুঝতে তাঁদের অসুবিধা হয় নি।

জহরলাল কিভাবে সকলকে সন্তুষ্ট করে চলতেন, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই কৃষ্ণ কৃপালনীকে লেখা ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ তারিখের একটি পত্রে। জহরলাল ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতিত্ব স্বীকার করলেও তার অন্যতম উদ্যোক্তা মেঘনাদ সাহার কথাবার্তা একদম পছন্দ করেন নি। ডঃ সাহা কৃষ্ণ কৃপালনীকে লেখা এক চিঠিতে যথারীতি খুব চড়া ভাষায় শিল্প ব্যাপারে এবং শিল্পে বিদেশী শোষণের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের শোচনীয় অজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, "কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বড় বড় শিল্পপতিদের (বিদেশীরাও এর মধ্যে আছেন) হাতের পুতুল"—এ পর্যন্তও বলেছিলেন। গান্ধীনীতি সম্বন্ধে জহরলালের অভিমতের কথাও ডঃ সাহা ঐ পত্রে লিখেছিলেন, পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠকে গান্ধীনীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেকথাও এবং জহরলালের দাবির কথা তিনি কুমারাপ্পার চেয়ে গান্ধীজীর মত বেশি বোঝেন। ডঃ সাহার এই সব কথার তীব্র প্রতিবাদ জহরলাল করেছিলেন। যে মনোভাব নিয়ে অধ্যাপক সাহা চিঠিটি লিখেছিলেন, জহরলালের মতে, তা "বৈজ্ঞানিকও নয়, পক্ষপাতহীনও নয়।"

কৃষ্ণ কৃপালনীকে লেখা উক্ত পত্র থেকে পরিকল্পনা বিষয়ে জহরলালের মনোভাব যা পাই, তার মূল কথা নিম্নোক্ত প্রকার :

(১) জহরলাল বৃহৎ শিল্পকে দেশের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য মনে করেন। "আমি ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ শিল্পের পক্ষে।" "কোনো দেশ বা জাতি বৃহৎ শিল্পের সহায়তা বাদ দিয়ে প্রগতির পথে চলতে পারে, এ আমি ভাবতেই পারি না।" বৃহৎ শিল্প না থাকলে জীবনযাত্রার মান উঁচু হবে না, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অবলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে যাবে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য বৃহৎ শিল্প অত্যাবশ্যক। অন্যান্য নানা বিষয়ের জন্যও। তাছাড়া বিস্তৃতভাবে কুটীরশিল্প গড়ে তোলার জন্য যে-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রয়োজন, বৃহৎ শিল্পের সাহায্য ভিন্ন সেই শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

(২) কিন্তু বৃহৎ শিল্প থেকে অনেক দোষ এসেছে। শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার মতে, একালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বৃহৎ শিল্পসমূহ হিংসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং তাতে বণ্টনের সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। কুমারাপ্পা তাই বলতে চান, কুটীরশিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নতির সঙ্গে বণ্টনের ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে, এবং তাতে হিংসার ভাব কম থাকবে। জহরলাল কথাগুলিকে অল্পাধিক পরিমাণে স্বীকার করেন। তবে তাঁর মূল বক্তব্য—হিংসা ও অবিচারের জন্য বৃহৎ শিল্প দায়ী নয়, দায়ী উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা। সেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে সমাজ-তন্ত্র প্রবর্তনের দ্বারা লুপ্ত করতে পারলে বৃহৎ শিল্পের কুফল রোধ ও সুফল ভোগ করা সম্ভব।

(৩) ভারতের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প ও কুটীরশিল্পের সহ-যোগিতা জহরলাল চান। বৃহৎ যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্পের প্রবর্তন ও প্রসারে উৎসাহ দিয়ে শিল্পায়নের দিকে ভারতের এগিয়ে যাওয়া কাম্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশে ব্যাপকভাবে কুটীরশিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না।

কিন্তু জহরলাল জানিয়েছেন, তিনি কুটীরশিল্পবাদী-দের দলে নন। তাদের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করতে পারেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারেন না।

অতীব যুক্তিযুক্ত কথাবার্তা; সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে জহরলালের বক্তব্যের সবিশেষ ঐক্য; কেবল সুভাষ-চন্দ্রের চাঁছাছোলা ভাষা এখানে নেই, যা কিছু বলছে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ রাখে না। অপরদিকে, সর্পরূপেও জহরলাল ভেকের মুখচুম্বনের লোভ কখনো ত্যাগ করতে পারেন নি। সুতরাং বলেছেন :

"কংগ্রেস কখনই বৃহৎ শিল্পের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেনি, কিন্তু একাধিক কারণে (আমি নিজে সেগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করি) কুটীরশিল্পের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ শিল্পের পক্ষে; কিন্তু তবুও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে আমি গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সমর্থন করে এসেছি। আমার মনে এই দুইয়ের মৌলিক পার্থক্য নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না কখনই, যদিও দুটিরই বেড়ে ওঠার কয়েকটি দিক নিয়ে চিন্তাগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বৈকি মাঝে মাঝে। এ ব্যাপারে গান্ধীজীর মতের প্রতিনিধিত্ব হয়ত খুব বেশিদূর করতে পারব না আমি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই দুইয়ের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য সংকট এতাবৎকাল ঘটেনি।"

জহরলালের অসীম ক্ষমতা, তিনি বৃহৎ শিল্পের পক্ষপাতী থেকেও তার সঙ্গে কুটীরশিল্পের মৌলিক পার্থক্য কখনো অনুভব করেন নি। যাই হোক, কংগ্রেসের এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে জহরলাল অতঃপর কি বলেছেন দেখা যেতে পারে :

"একথা সত্য যে, কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল—বৃহৎ শিল্পগুলি স্বাধীনভাবে কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, কাজেই কুটীরশিল্পের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বিষয়টির বিচার করতে হবে। আমাদের সংগঠন ছিল একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ অবস্থায় বৃহৎ শিল্পকে উৎসাহদানের অর্থ ছিল ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত কায়েমী স্বার্থকেই উৎসাহ দেওয়া। এর মধ্যে বিদেশী কায়েমী স্বার্থও আছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল শুধু নিষ্ক্রিয় ও বেকার মানুষদের কাজ জুগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, অসংখ্য মানুষের অবসরকেও কাজে লাগানো; ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তোলা। কংগ্রেস এ ব্যাপারে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে।"

চমৎকার, প্রায় অখণ্ডনীয় কথাগুলি যেন! কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়েছে এখানেও তাই, পণ্ডিতজী নিজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস কখনই বৃহৎ শিল্পের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করে নি। তিনি যখন বলছেন, তখন সম্ভবত লিখিতভাবে তা করে নি। কিন্তু সত্যিই কি করে নি? চরকার দ্বারা মুক্তি—এই তত্ত্ব কি বৃহৎ শিল্প-মানসিকতার বিরোধিতা নয়? গান্ধীজী কি ১৯৩২ সালে অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে দিয়ে খাদি প্রচার ও অস্পৃশ্যতা নিবারণকেই কংগ্রেসের তৎকালীন আদর্শ বলে ঘোষণা করেন নি এবং কংগ্রেস বলতে কি গান্ধীজীকে বোঝাত না? জহরলাল বলেছেন, তিনি খাদি গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সমর্থন করেছেন এবং তার সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের মৌলিক পার্থক্য অনুভব করেন নি। যদি না করে থাকেন, সে তাঁর মনের গুণ, এবং তিনি যে বলেছেন কার্যক্ষেত্রে কুটীরশিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ এতাবৎকাল ঘটে নি—তার কারণ না বললেও চলে—সে সংঘর্ষ ঘটাবার মত শক্তি 'এতাবৎকাল' গান্ধীজীর অনুগত কংগ্রেসে দেখা যায় নি। অথচ পণ্ডিতজী যখন এই পত্র লিখেছেন, তখন সেই সংঘর্ষ শুধু শুরু হয় নি, তার হতভাগ্য শিকার হতে হয়েছে সুভাষচন্দ্রকে।

জহরলালের আর একটি বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যায়। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল বৃহৎ শিল্পগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তাই সে কুটীরশিল্পে উৎসাহ দিয়েছে। তাই নাকি? বৃহৎ শিল্পগুলি যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তিসম্পন্ন, তখন নিশ্চয় আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, স্বাধীনতাপূর্বকালে কটি বৃহৎ শিল্প নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল? আর—স্বাধীনতার পরে বৃহৎ শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্য 'সংরক্ষণ' নামক খুঁটি ধার দেবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাছাড়া কুটীরশিল্প যদি নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা না রাখে, তাহলে তাকে অপরের পা ধার দেবার দরকারই বা কি?

না, এক্ষেত্রে পণ্ডিতজী কংগ্রেসের মহিমা রক্ষা করতে গিয়ে কংগ্রেসের অনেক অবৈজ্ঞানিক ধারণার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসী আন্দোলন ও কংগ্রেসী প্রচার স্পষ্টতঃই বৃহৎ শিল্পের বিরোধিতা করেছে।

তবে খাদি আন্দোলনের পক্ষে তাঁর একটি যুক্তিতে সারবত্তা আছে। কংগ্রেস বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ভার তার হাতে ছিল না, এক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে উৎসাহদান করলে কায়েমী স্বার্থকেই জোরদার করা হত। তার পরিবর্তে ভারতীয় জনসমাজে আত্মনির্ভরতা জাগিয়ে তোলার জন্য খাদির প্রবর্তন।

ঠিক, তবে এখানেও পণ্ডিতজী নিজের চিন্তার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছেন। প্রশ্ন করা যায়, কংগ্রেস কি পণ্ডিতজীর দৃষ্টিতে চরকাকে নিয়েছিল—না কি চরকাকে ধর্ম করে তুলেছিল? গান্ধীজী বলেছিলেন, চরকাই আমার একমাত্র উত্তর। পণ্ডিতজীর কাছে চরকা একটি উত্তর—একটি সময়ের জন্য। পুনশ্চ জানাতে পারি; স্বাধীনতাপূর্বে কংগ্রেস বলতে পণ্ডিতজী অপেক্ষা গান্ধীজীকেই বেশি বোঝাত।

পণ্ডিতজী বলেছেন, ক্ষমতাপ্রাপ্তির পূর্বে বৃহৎ শিল্পে উৎসাহদানের অর্থ কায়েমী স্বার্থকে উৎসাহ দেওয়া। তাই যদি হয়—ভারতের উন্নতির জন্য বৃহৎ শিল্প প্রয়োজন, একথা বললে যদি কায়েমী স্বার্থ বলশালী হয়ে ওঠে—তাহলে বোধহয় কথা বন্ধ করে দিতে হবে।

আর একটি কথা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ তারিখে জহরলাল কৃষ্ণ কৃপালনীকে যখন উল্লিখিত চিঠিটি লিখেছেন, তখন তিনি জানতেন, তিনি অসম্পূর্ণ সত্য লিখছেন; তার পক্ষে অন্য প্রমাণ না দিয়েও ১৯ আগস্ট, ১৯৩৯ তারিখে তাঁকে লেখা গান্ধীজীর চিঠিটিকে (যা অল্প পূর্বে উদ্ধৃত করেছি) দেখিয়ে দেওয়া যায়—তার মধ্যে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে গান্ধীজীর কী অপরিসীম বিতৃষ্ণা। পণ্ডিতজী ঐ চিঠিখানি পত্রগুচ্ছে না ছাপলেও পারতেন। তাছাড়া আরও ধরে নিতে পারি, পণ্ডিতজী কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য হরিজনে গান্ধীজীর লেখাগুলি পড়ে উঠতে পারতেন না। নচেৎ ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসের 'হরিজন' থেকে (পূর্বে উদ্ধৃত) গান্ধীজীর শিল্পায়ন সম্বন্ধে অভিমত জানতে পারতেন, যাতে গান্ধীজী স্পষ্টই বলেছেন, কংগ্রেসের লক্ষ্য শিল্পায়ন নয়—কুটীরশিল্পের বিস্তার। কংগ্রেসের চরিত্ররক্ষার এবং মেঘনাদ সাহাকে আক্রমণ করার উৎসাহে পণ্ডিতজী তাঁর সুবিখ্যাত সাধুতার প্রতি সুবিচার করেন নি।

[ [illegible] ]

**২১শে জানুয়ারী** বিধানসভা অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের ভাষণ নানা কারণে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বর্তমান রাজ্যপালের এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় উদ্বোধনী ভাষণ, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, নানান কারণে এই ভাষণে রাজ্যপাল কি বলবেন তা নিয়ে জনমনে বিশেষ ধরনের ঔৎসুক্য ছিল। গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন নিয়ে তুমুল জল ঘোলা হয়েছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তীব্রভাবে, এই বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর মধ্যেও মাঝে মাঝে রীতিমত বোঝাপড়ার অভাব দেখা গেছে। কাজেই অনেকেরই আশংকা ছিল, কিভাবে রাজ্যপালের ভাষণে এই পরস্পরবিরোধী ধারণাসমূহের সামঞ্জস্য ঘটবে। কিন্তু রাজ্যপাল বিষয়টিকে সঠিকভাবে যে অনুধাবন করতে পেরেছেন, এটাই বিস্ময়কর।

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ভারতজোড়া অপপ্রচারের জবাব রাজ্যপালের ভাষণে পাওয়া যায়। এই অপপ্রচারের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু মানুষের মনে বিভ্রান্তি এসেছে, কোন কোন রাজনৈতিক দলও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, পশ্চিমবঙ্গে সব কিছু ঠিকই চলছে। তা নিশ্চয়ই নয়। আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা এখানে রীতিমত আছে। কিন্তু যে দৃষ্টিকোণ থেকে সেই বিষয়টিকে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত করা হয়, তা ঠিক নয়।

ঠিক এই কথাটাই স্পষ্টভাবে রাজ্যপালের ভাষণে ফুটে উঠেছে। বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এই বলে সূত্রপাত করেছেন যে, সারা ভারতে যে পদ্ধতি রূপ পাচ্ছে, ফ্রন্ট সরকার তারই অংশ। চোদ্দটি রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত সরকার যে একটি অভিনব এবং জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব পরীক্ষা, এই মূল্যবান সত্যটি রাজ্যপালের ভাষণে পরিস্ফুট হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট দলগুলির নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে একটি স্থায়ী ও প্রগতিশীল সরকার দেবার জন্য যে সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, সেটা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন। রাজ্যপালের মতে, মাঝে মাঝে বাধা-বিপত্তি দেখা দিয়েছে—এটা আদৌ আশ্চর্যজনক নয়। যুগোপযোগী এবং জনগণের প্রয়োজনানুগ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দ কার্যক্রমের সন্ধানকল্পে ভুল-ভ্রান্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া অনিবার্য।

পুলিশ প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনে পুলিশের কাজে নতুন বিন্যাস শুরু হয়েছে। জনগণের ন্যায়সংগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ন্যায়সংগত গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য নয়, পুলিশকে জনগণের স্বার্থে কাজ করতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, কতকগুলি বড় ধরনের অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যদিও কতকগুলি অপরাধ অব্যাহত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেছেন ঃ যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সমন্বয়সাধনের প্রয়াস চলছে, তারও নিজস্ব অসুবিধা এবং নিশ্চয়তা আছে। অর্থনৈতিক মন্দায় সামান্য উন্নতির ভাব লক্ষ্য করা গেলেও সে উন্নতি সমহারে কিংবা দ্রুত হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডারের ওপর নির্ভরশীল বলে উন্নতির ধরনও হয়েছে শ্লথ। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রাজ্যের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে বেকারত্ব এক দারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনৈতিক অসুবিধা, নাগরিক উন্নয়নে গতিহীনতা, এমন কি অবক্ষয় পশ্চিমবঙ্গে আজ দারুণ সমস্যারূপে দেখা গেছে। এই রাজ্যের তীব্র

যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে রাজ্যপাল বলেছেন যে, সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কৃষির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। খাদ্যোৎপাদনের দুই বৎসরের একটি জরুরী কর্মসূচী রূপায়ণ হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রথম বৎসরের ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন লক্ষ্য ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন।

স্বাভাবিকভাবেই এই রাজ্যের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থার ওপর বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের প্রভাব পড়েছে। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের খাদ্যাভাব সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট সরকার ওই অবস্থার সামাল দিয়েছেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। সরকারের পিছনে জনসমর্থন ছিল বলে ১৯৬৯-এ খাদ্যের সংগ্রহ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৬৯ সালে রেশনে মাথাপিছু চাল ও গমের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে সংশোধিত রেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশের জন্য প্রতি সপ্তাহে কিছু পরিমাণেও তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা যে এই প্রথম একটি রাজ্যের সমগ্র জনসাধারণকে রেশন দোকান থেকে কোন-না-কোন প্রকারে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভূমি সম্পর্কের কাঠামোর উপর কৃষি উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল বলে রাজ্যের অর্থনীতিতে ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সুতরাং বর্তমান আইনগুলির ত্রুটি ও শৈথিল্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বর্তমান অধিবেশনে যথোচিত বিল উত্থাপনের অভিপ্রায় যুক্তফ্রন্টের আছে। এই সব বিলের উদ্দেশ্য হবে কৃষি ও অকৃষি জমি, উভয় ক্ষেত্রে পরিবার পিছু মোট জোতের সীমা নির্ধারণ, বিপদে পড়ে দরিদ্র চাষীদের দ্বারা হস্তান্তরিত জমির পুনরুদ্ধার এবং দরিদ্র জমির মালিকের বৈধ স্বার্থ উপেক্ষা না করে বর্গাদারদের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের কিছু প্রকৃত অধিকার প্রদান। বর্তমান ভূমি সংস্কার আইনগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কারের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগ কর্তৃক সংগঠিত যথাযথ অভিযানের ফলে জমির সীমা সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে দখলে রাখা প্রায়

করা হয়েছে এবং তা ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষিজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সরকারের অপরাপর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রাজ্যপাল জানিয়েছেন যে, সমবায় ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার উন্নয়নের প্রগতিশীল কর্মনীতি অনুসরণ করে চলেছেন। খেলাপী ঋণের পরিমাণ বর্তমান দাবির শতকরা ৭০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ২৫-এ দাঁড় করানোর জন্য কঠোর ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল পরিবর্তনসমূহের প্রচলন করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্র পুরুলিয়া জেলায় অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের সমগ্র গ্রামীণ এলাকা এই ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। অবৈতনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রশ্নটি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। এই রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের জন্য যথোচিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ নবগঠিত শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত উপদেষ্টা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া যুক্তফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ ও কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্প—এই উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নকল্পে কাজ করে যাচ্ছেন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উপায়, গতি ও পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার ভারত সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন। এই রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজ করছেন। সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে বেতন কমিশন সম্প্রতি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার তা বিবেচনা করে দেখছেন। এগুলি ছাড়া রাজ্যপালের ভাষণে আরও দুটি বিষয় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বরাদ্দ নিতান্তই কম এবং বৈষম্যমূলক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কলকাতার সমস্যাবলী শুধু একা রাজ্যের দায়িত্ব নয়, এ বিষয়ে সর্বাধিক করণীয় কেন্দ্রের, কিন্তু সে কর্তব্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পালন করার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

রাজ্যপাল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের সত্যকার অবস্থা যে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন সেই জন্য পুনরায় তাঁকে ধন্যবাদ জানানো আমাদের কর্তব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েকটি বড় বড় পত্রিকায় রাজ্যপালের ভাষণ যথাযথভাবে পরিবেশিত হয় নি, শুধু তাই নয়, এমন সব শিরোনামা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে যা বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যমূলক। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেন না কোন কোন সংবাদপত্র স্পষ্টতই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বহুকাল ধরেই উঠে-পড়ে লেগেছে এবং বিভিন্ন নেতার অসতর্ক উক্তির ফলে তাদের সুযোগও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই নিবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা যা বলেছি, রাজ্যপালের এই ভাষণই এই সব অপপ্রচারের মুখের উপর জবাব, যা পশ্চিমবঙ্গের সত্যকারের চিত্রটি সকলের সামনে তুলে ধরে অনেক বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতেই সাহায্য করবে।

## অমার্জনীয়

১৯৬৯ সালের ১লা জুলাই বিধানসভায় পুলিশী হাঙ্গামার পর ১৯৭০ সালের ২১শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে বিধানসভার মেন করিডরে গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিগ্রহের অভূতপূর্ব ঘটনার নিন্দা করার ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। এই অপকর্মের নায়ক-নায়িকারা হচ্ছে বেলেঘাটা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে তারা ধাক্কা দেয়, তাঁর জামা ধরে টানে এবং তাঁর প্রতি অশ্লীল বাক্যও প্রয়োগ করে। মুখ্যমন্ত্রীর অপরাধ এই যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের বক্তব্য শুনতে রাজী হন নি। তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, এখন তো অধিবেশন শুরু হচ্ছে, আমি ফিরে এসে আপনাদের বক্তব্য শুনবো ও স্মারকলিপি গ্রহণ করব।' এই কথায় তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওই ইতর কান্ডের সূত্রপাত করে। বলাই বাহুল্য, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এসেছিল এবং তাদের পিছনে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন শক্তি এই অপকর্ম করতে মদৎ যুগিয়েছে। এই ঘটনার পূর্বে এবং পরে তারা যে শ্লোগান দিয়েছে, তা রাজনৈতিক। মনে আছে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেও রাইটার্স বিল্ডিংসে সরকারী কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা করেছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রীর অপরাধ ছিল এই যে, তিনি তাদের বিপক্ষ একটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। এরকম বেয়াদবি বিধানসভার ভিতরে বা বাইরে কোথাও সহ্য করা যায় না। পিছনে যুক্তফ্রন্টের কোন শরিক দল আছে, কাজেই অপকর্ম করলে আমাদের কোন ভয় নেই—এই জাতীয় বিশ্বাস এই সব অপকর্মে প্ররোচিত করে। সে যাই হোক, আমাদের জিজ্ঞাস্য, বিধানসভার অভ্যন্তরে এমন একটা কান্ড ঘটে গেল, কিন্তু এ বিষয়ে একজনকেও গ্রেপ্তার করা হল না কেন? যে সব পুলিশ অফিসার গেটে কর্তব্যরত ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নাকি বলেছেন, "আমাকে মেরে ফেললে, আপনারা কি কালো ব্যাজ পরে শোক প্রস্তাব নেবেন, না সিকিউরিটির কাজ করবেন?" যা ঘটেছে তাকে গুন্ডামী ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। কোন দাবি আদায়ের জন্য বা কোন বক্তব্য রাখার জন্য নির্দিষ্ট রীতি আছে। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আছে বলে কি যে কোন ধৃষ্টতামূলক আচরণকেই সহ্য করতে হবে? উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্যে প্রকাশ যে কোন কারণে বেলেঘাটা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল এবং তারা তারই প্রতিবাদ করতে এসেছিল। পুলিশ পাঠানোর যৌক্তিকতা সম্পর্কে রায় দেবার মালিক নিশ্চয়ই ঐ হামলাকারীরা নয়। কোন হিসাবে এরা পার পেয়ে গেল, সেইটাই আমরা বুঝতে পারছি না। সুস্থ আন্দোলন এক জিনিস, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা আন্দোলন নয়, একটি অপরাধমূলক ঘটনা। ভবিষ্যতে যাতে এইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

## প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস পশ্চিমবঙ্গে যথারীতি পালিত হয়েছে। উৎসবের কোন সমারোহ হয় নি, শুধু এ বছরেই নয়, বিগত কয়েক বছর ধরেই। ২৬শে জানুয়ারী দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়, কেন না ভারতের সংবিধান যা ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করেছে, তা এই দিনটির সঙ্গেই সম্পর্কিত। তথাপি এই দিনটি, তার শত পবিত্রতা সত্ত্বেও, জনমনে বিশেষ কোন আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারছে না বিগত কয়েক বছর ধরে। তার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, সংসদীয় গণতন্ত্র সব কিছু থাকা সত্ত্বেও গত বাইশ বছরে ভারতের সাধারণ দরিদ্র মানুষের বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নি, অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হয়েছে, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দুস্তর হয়েছে, সারা দেশটা দুর্নীতি ও অনাচারে পূর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া এই অবস্থার প্রতিকার করতে কিছুটা সাংবিধানিক অসুবিধাও আছে। আমাদের সংবিধানের নানা অসুবিধার কথা দিনের পর দিন প্রকাশিত হচ্ছে, কাজেই সাধারণ মানুষ সংবিধানের মধ্যে বিশেষ কোন আশা-ভরসা খুঁজে পায় না। সংবিধানে কেন্দ্রের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

## বিহার এস এস-পি'র সঙ্কট

এস-এস-পি পার্টি শোনপুর সম্মেলনে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, কাগজে-কলমে তার বয়ান যাই থাকুক না কেন, লক্ষ্যটা ছিল যেন-তেন প্রকারে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টকে ওল্টাতে হবে, উত্তর প্রদেশে সি বি গুপ্তের গভর্নমেণ্টকে টিকিয়ে রাখতে হবে এবং বিহারে সিণ্ডিকেট ও জনসংঘের সঙ্গে একযোগে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠন করতে হবে, তাতে কোন কোন মহল ঠাট্টা করে বলেছিলেন, অতঃপর এস-এস-পি সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টির পরিবর্তে সংযুক্ত সিণ্ডিকেট পার্টি নামেই পরিচিত হবে। কিন্তু এ সব ঠাট্টা-তামাসায় কান দেবার লোক রাজনারায়ণ-মধু লিমায়ে নন। তাঁরা নিজেরে লক্ষ্যে অটুট থাকেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে তাঁদের অনুগামীরা জনসংঘ-স্বতন্ত্র-সিণ্ডিকেটের সঙ্গে আঁতাত করার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তদনুযায়ী গত সপ্তাহে বিহারে জনসংঘ, স্বতন্ত্র সিণ্ডিকেট এবং এস-এস-পি দল নিয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং সিণ্ডিকেট দলের নেতা হরিহর সিং ঘোষণা করেন যে, এস-এস-পি দলের রামানন্দ তেওয়ারী সর্বসম্মতিক্রমে সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। (শ্রীতেওয়ারী আগে বিহারে কনস্টেবলের চাকরি করতেন। ১৯৪৬ সালে এক পুলিশ বিদ্রোহে নেতৃত্ব করে তাঁর চাকরি যায়। তখন তিনি সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে বিহারে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলে শ্রীতেওয়ারী সেই মন্ত্রিসভায় পুলিশমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।) এই সংযুক্ত বিধায়ক দল একটা সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিহারে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠনের জন্য চেষ্টা করবেন বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু দলের সাধারণ কর্মসূচী তৈরি হবার আগেই দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে। রামানন্দ তেওয়ারী দলের নেতা হবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জনসংঘ জানিয়ে দিয়েছে যে, "এস-এস-পি'র মুখ, মন এবং হৃদয় পরিষ্কার" না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আর এস-এস-পি দলের সহিত আলোচনায় বসতে রাজি নন।

অপর দিকে এস-এস-পি-র অপর নেতা ভুবনেশ্বর রায় ঘোষণা করেছেন যে, সিণ্ডিকেট-জনসংঘ-স্বতন্ত্র সঙ্গে যোগ দিয়ে তেওয়ারী যে গভর্নমেণ্ট গঠন করতে চাইছেন, আইনসভার অধিকাংশ সদস্য তাতে সহযোগিতা করবেন না।

ভুবনেশ্বর রায়ের এই ঘোষণার পর সংযুক্ত বিধায়ক দলের হতাশা দেখা দেয়। বিহার জনসংঘের সেক্রেটারী কৈলাশপতি মিশ্র এক লিখিত বিবৃতিতে জানান যে, "এস-এস-পি'র যে সব নেতা গভর্নমেণ্ট গঠনের কথা বলবার জন্য জনসংঘের নেতাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা কখনও প্রকাশ করেন নি যে, তাঁরা এস-এস-পি'র গোষ্ঠীবিশেষের প্রতিনিধি মাত্র। এস-এস-পি দলের মধ্যে ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থনের ব্যাপার নিয়ে এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে সারা ভারতবর্ষেই এস-এস-পি দ্বিধাবিভক্ত।" শ্রীমিশ্র যা বলেছেন, তার মধ্যে কোন অতিকথন নেই। কংগ্রেস দল দু-ভাগ হবার ফলে এস-এস-পি গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। এঁদের নেতারা মুখে বলছেন কংগ্রেস এবং সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস দুই-ই প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু কার্যকালে দেখা যাচ্ছে তাঁরা একচেটিয়া কারবারীদের মুখপাত্র স্বতন্ত্র পার্টি, সাম্প্রদায়িক জনসংঘ এবং রক্ষণশীল সিণ্ডিকেট দলের সঙ্গে এক পাতে বসে খাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। সেটা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এস-এস-পি সদস্যরা হজম করতে পারছেন না। রাজনারায়ণ-ফার্নাণ্ডেজ—মধু লিমায়ের গোষ্ঠী যে আসলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির লেজুড় হয়ে এস-এস-পি'র চেহারা পাল্টে দিতে চলেছেন, তাতে এস-এস-পি'র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই দলের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাই তাঁদের কথাবার্তাও অনেক সময় উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। হরিহর সিং যখন সাংবাদিকদের ডেকে ঘোষণা করলেন যে, সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হয়েছে এবং রামানন্দ তেওয়ারী সর্বসম্মতিক্রমে তার [illegible] বলেছেন, [illegible] কথা বলেই এস-এস-পি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস এম যোশী ঘোষণা করেছেন যে, সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয় নি। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা সুরু করবার জন্য চার দলের মধ্যে একটা আঁতাত হয়েছে মাত্র।

ওদিকে পার্টির সেক্রেটারী ফার্নাণ্ডেজ সুরাট থেকে তার করে জানতে চেয়েছেন, "সাধারণ কার্যক্রম স্থির হবার আগেই সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত হল কি করে? এটা শোনপুর সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।"

সংযুক্ত বিধায়ক দল বিধিসম্মতভাবে গঠিত হোক বা না হোক, স্বতন্ত্র-জনসংঘ-সিণ্ডিকেট নিয়ে বিহারে মন্ত্রিসভা গঠন করা যে এস-এস-পি'র পক্ষে খুব সহজ হবে না, সেটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। রামানন্দ তেওয়ারী সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে বিহার এস-এস-পি'র ভাঙনের পথই প্রশস্ত করেছেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের মত এস-এস-পি-ও দু-ভাগে ভাগ হতে চলেছে। বাংলাদেশে অবশ্য সেটা আগেই ঘটে গেছে। রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য যদি অস্পষ্ট থাকে এবং নেতাদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিই যদি দলের নীতি বলে চলতে চায়, তাহলে সেই পার্টির সংহতি বেশিদিন বজায় রাখা সম্ভব নয়। মনে হয়, বর্তমানে এস-এস-পি দল এই ব্যাধিতেই ভুগছে।

## পারমাণবিক বোমা ও ভারত

ভারতবর্ষ পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত পারমাণবিক বোমা তৈরি করবে না বলে স্থির করেছে। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আমলেই সরকারের এই নীতি ঘোষিত হয় এবং স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলেও এই নীতি পুনরনুমোদিত হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং পি-এস-পি'র কিছু সদস্য চান যে, ভারত পারমাণবিক বোমা তৈরি করুক। সম্প্রতি এঁদেরই এক ইংরাজী দৈনিক হঠাৎ খবর ছাড়েন যে, ভারত সরকার না কি পারমাণবিক বোমা তৈরির খরচ নিয়ে গবেষণা করছেন। তাতে জনসাধারণের মধ্যে ঐ রকম একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, গভর্নমেণ্ট বোধহয় পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে তাঁদের পূর্বনীতির পরিবর্তন করতে চাইছেন। কিন্তু ধারণাটা অমূলক। পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র জানিয়ে দিয়েছেন যে, সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি। তিনি জানিয়েছেন যে, ভারত

পারমাণবিক বোমা তৈরি করবে না বলে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সেই সিদ্ধান্ত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা বোঝাপড়ার ফল নয়। ভারত শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করবে।

সরকারের এই ঘোষণায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারত পারমাণবিক বোমা যখন তৈরি করবে না, তখন তার খরচপত্র নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে এ সম্পর্কে একটি ভিত্তিহীন সংবাদ ফলাও করে ছাপা হল কেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কিছুকাল আগে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে পারমাণবিক সাহায্য লাভের মতলবে রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে, ভারত পারমাণবিক বোমা প্রায় তৈরি করে ফেলেছে। কাজেই সে ব্যাপারে পাকিস্তানের বন্ধুরা যদি তাকে ভারতের সমকক্ষ হতে সাহায্য না করে, তাহলে সে একেবারে মারা পড়বে। পাকিস্তানী অপপ্রচারের সেই ধুয়ো ভারতের সংবাদপত্রে প্রতিধ্বনিত হতে দেখে দেশবাসী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছেন। দেশের অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে এই ধরনের বে-ফাঁস সংবাদ প্রচার যে আসলে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, সেটা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়। আমাদের মনে হয়, সংবাদটি কোন্ সূত্র থেকে প্রকাশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া সরকার।

## পাঞ্জাবের সমৃদ্ধি

পাঞ্জাবের আয় ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৩·৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে রাজ্যপালের ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সমগ্র দেশের উন্নতির হারের চেয়ে পাঞ্জাবের উন্নতির হার ৮ গুণ বেশি। কেন্দ্রীয় সংখ্যাতত্ত্ব সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (১৯৬৮-৬৯) মাত্র ১·৮ শতাংশ।

পাঞ্জাবের গড় মাথাপিছু আয় ১০০০ টাকার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

১৯৬৭-৬৮ সালে পাঞ্জাব রাজ্যের আয় হয়েছিল ১১৪৬ কোটি টাকা। ১৯৬৮-৬৯ সালে হয়েছে ১৩০২ কোটি টাকা। পাঞ্জাবে বর্তমান লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ মাথাপিছু গড় আয় হাজার টাকার কিছু বেশি। এটা সমগ্র ভারতের গড় মাথাপিছু আয়ের দ্বিগুণেরও বেশি।

## ধানবাদে বীভৎস কাণ্ড

গত ২১শে জানুয়ারী ধানবাদের রাজপথে মেয়েদের সঙ্গে অশোভন আচরণের ব্যাপার নিয়ে দুই দলের মধ্যে গুরুতর দাঙ্গা হয় এবং স্থানীয় পলিটেকনিক হোস্টেলের ছাত্ররাও তাতে জড়িয়ে পড়ে। সেই দাঙ্গায় বহু লোক খুন-জখম হয়েছে। একটি জলাশয় এবং হোস্টেলের প্রাঙ্গণ থেকে এ পর্যন্ত মোট ১১টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দাঙ্গা থামাবার জন্য এক হাজার সামরিক পুলিশ নিয়োগ করতে হয়েছিল। নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশের জন্য ২২শে জানুয়ারী ধানবাদে সম্পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। রাস্তায় মেয়েদের সঙ্গে অশোভন আচরণ ইদানিং ছোট-বড় সহরের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং সে ব্যাপারে ছাত্রদের জড়িত থাকা আরও লজ্জার ঘটনা। এই ধরনের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এরকম বীভৎস হত্যাকাণ্ড আগে কখনও হয়েছে বলে শোনা যায় নি। যে জলাশয় থেকে অধিকাংশ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে আরও মৃতদেহ আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাই সমগ্র জলাশয়টি ছেঁকে ফেলা হচ্ছে। যাঁরা এই নারকীয় হত্যালীলার নায়ক, তারা আর যাই হোক, মানুষ নামের অযোগ্য। অবিলম্বে তাদের খুঁজে বার করে চরম শাস্তি দেওয়া দরকার। আর ধানবাদের শান্তিরক্ষার ভার যাঁদের উপর ছিল, তাঁদের বিরুদ্ধেও অবিলম্বে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। ধানবাদ বর্তমানে রাজ্যপালের শাসনাধীন। পশ্চিমবঙ্গের শরিকী সংঘর্ষ দেখে যাঁরা প্রতিদিন গেল গেল রব তুলছেন, ধানবাদের ঘটনায় তাঁদের নীরবতা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ।

**ব্র্যান্ডট্ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী**

**পশ্চিম জার্মানী :**

পশ্চিম জার্মানীর সংসদ বান্ডেস্টাগে চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ডট্ যে বক্তৃতা করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ফ্রি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠনের পরে গত অক্টোবর মাসে বান্ডেস্টাগের উদ্বোধনী ভাষণে উইলি ব্র্যান্ডট্ কয়েকটি সাধারণ কথা বলেছিলেন। কিন্তু এইবারই প্রথম তিনি নতুন সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেলেন।

উইলি ব্র্যান্ডট্ পূর্ব য়ুরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। ইতিমধ্যেই তিনি সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও পোল্যান্ডের সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করেছেন। এতদিন ধরে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্বাধীন জার্মাণ সরকার যেভাবে কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে বিরোধ করে উত্তেজনা বজায় রেখেছে, নতুন সরকার তার পরিবর্তন চায়।

উইলি ব্র্যান্ডট্ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী। অক্টোবর ভাষণেও তিনি একথা বলেছিলেন। তবে সম্প্রতি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (পূর্ব জার্মানী) রাষ্ট্রপতি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ওয়ালটার উল্‌ব্রিখ্‌ট্ পূর্ব জার্মানীকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান ও পশ্চিম বার্লিনের ওপর থেকে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের (পশ্চিম জার্মানী) কর্তৃত্ববিলোপের যে প্রস্তাব করেছেন, উইলি ব্র্যান্ডট্ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ব্র্যান্ডট্ প্রশ্ন করেছেন : পূর্ব জার্মানী একটি পৃথক রাষ্ট্র হতে পারে, কিন্তু একে তাঁরা বিদেশ বলে মানবেন কি করে? দুই জার্মানীর ঐক্য পশ্চিম জার্মানীর জনগণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে কোন বোঝাপড়া করা উইলি ব্র্যান্ডটের পক্ষে মুশকিল।

তা সত্ত্বেও উইলি ব্র্যান্ডট্ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করা হবে না, এই মর্মে চুক্তি করা হোক। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতার জন্যও তিনি উল্‌ব্রিখ্‌ট সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

পশ্চিম জার্মানী পূর্ব জার্মানীকে পৃথক একটি রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করতে রাজি না হওয়ায় উল্‌ব্রিখ্‌ট স্বাভাবিক-ভাবেই ক্ষুব্ধ। তবে তাঁর পক্ষে বল-প্রয়োগ না করার চুক্তি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করাও শক্ত।

কমিউনিষ্ট জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহের অর্থ এই নয় যে, পশ্চিম জার্মানী উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) ছেড়ে দেবে, কিম্বা পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন হবে। উইলি ব্র্যান্ডট্ তাঁর বক্তৃতায় পরিষ্কার বলেছেন, পশ্চিমী জোটের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানী যে সম্পর্ক এখন রয়েছে, তা পুরোপুরি বজায় রাখা হবে। ব্র্যান্ডট্ এ কথাও ঘোষণা করেছেন, এই মাসেই তিনি ফ্রান্সে গিয়ে রাষ্ট্রপতি জর্জ পম্পিদুর সঙ্গে কথা বলবেন। পশ্চিম জার্মানী কমিউনিস্ট-দের সঙ্গে ভিড়ে গেলে ফ্রান্সের ভয়ের সঙ্গত কারণ আছে। ফ্রান্স একটু বিচলিতও। তাই ব্র্যান্ডট্ ছুটছেন প্যারিস, পম্পিদু ও তাঁর মন্ত্রীদের বোঝাতে, ভয়ের কিছু নেই, পশ্চিম জার্মানী তাদের বন্ধুই রয়েছে। ব্র্যান্ডট্ মার্চে যাবেন ব্রিটেন, আর এপ্রিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হ্যারল্ড উইলসন ও রিচার্ড নিক্সনকেও তিনি বোঝাবেন, চিন্তার কোন কারণ নেই।

পশ্চিমী জোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেও পূর্ব জার্মানী, সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা সম্ভব, উইলি ব্র্যান্ডটের সরকার এই কথা মনে করেন। সরকারের নীতি এইভাবেই তৈরী করা হয়েছে।

বিরোধী দলের নেতা প্রাক্তন চ্যান্সেলার কুর্ট কিসিংগার ব্র্যান্ডট্ সরকারের নীতির সমালোচনা করে বক্তৃতা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা সবাই নতুন পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

**পোল্যান্ড :**

২০শে জানুয়ারী ওয়ারশ'তে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে পূর্ব ঘোষণা-মত আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮-এর জানুয়ারীর পর এই প্রথম আবার দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হ'ল। ১৯৫৫ সালে জেনেভায় চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম আলোচনা বৈঠকের পর এই নিয়ে ১৩৫ বার বৈঠক হ'ল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আলোচনা করেন পোল্যান্ডে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়ালটার স্টোয়েসেল, আর চীনের পক্ষে ছিলেন চীনা চার্জ দ্য-অ্যাফেয়ার্স লি ইয়াং। দুজনের মধ্যে এক ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়। পুনরায় কবে আলোচনা

হলেও তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক হয় নি : তবে শীগ্‌গীরই আবার দু'পক্ষ মিলিত হবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই রাষ্ট্রদূত নিজেদের সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেবেন।

ওয়ারশ আলোচনার বিবরণ গোপন রাখা হয়েছে। তবে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে কাজের কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, একথা উভয় পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে চায় যে, তাইওয়ানকে (ফরমোজা) অস্ত্র সাহায্য দেওয়া তারা কমিয়ে দেবে, সেখান থেকে যুদ্ধ ঘাঁটিও তারা ধীরে ধীরে সরিয়ে আনবে। পরিবর্তে চীনকেও কথা দিতে হবে, তাইওয়ানকে 'মুক্ত করার' কোন চেষ্টা তারা করবে না। অর্থাৎ, চীন ও তাইওয়ান, দুইই পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র-রূপে থাকবে, এই অবস্থা চীনকে মেনে নিতে হবে। উভয় পক্ষের মধ্যে এই বোঝাপড়া হয়ে গেলে, অন্যান্য সব বিষয়ে সম্পর্কের উন্নতি সম্ভব হবে। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিরাট সুযোগ রয়েছে।

তবে চীনের পক্ষে তাইওয়ানকে মেনে নেয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

এদিকে চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার সম্ভাবনায় সোভিয়েট যুনিয়ন খুবই চিন্তিত। চীন যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে না পড়ে, তার জন্য সোভিয়েট যুনিয়ন চীন-সোভিয়েট সীমান্তবিরোধের বিতর্কিত কিছু অঞ্চল চীনকে দিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছে। কিন্তু তাতে চীন বিশেষ নরম হয় নি। সীমান্ত আলোচনা এখন বন্ধ রয়েছে।

কেবল চীন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, সোভিয়েটের ভয়, জাপানও এদের সঙ্গে যোগ দেবে। জাপানের এসাকু সাটো সরকার খুব বেশি মার্কিন-ঘেঁষা হলেও চীনের সঙ্গেও তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পিকিং, টোকিও, ওয়াশিংটন আঁতাত হয়ে গেলে এশিয়া তথা দূর প্রাচ্যে সোভিয়েট কূটনীতি মার খাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

**ইজরায়েল :**

আরবদের প্রশ্নে ইজরায়েলের সবাই-এর মনোভাবই খুব কঠোর, যুদ্ধ ছাড়া তারা আর কিছু বোঝে না, এই সাধারণ ধারণা। কিন্তু আরব নীতির প্রশ্নে ইজরায়েলী নেতাদের মধ্যে বেশ ভাল রকম মতপার্থক্য আছে। আর মাঝে মাঝেই এই পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির নবনির্বাচিত সেক্রেটারী-জেনারেল আরি ইলিয়াভ সাংবাদিকদের কাছে যে মন্তব্য করেছেন, তা দেখে মনে হয়, আরবদের সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসার জন্য নেতাদের মধ্যে এক শক্তিশালী অংশের আগ্রহ রয়েছে।

আরি ইলিয়াভ

আরি ইলিয়াভ পরিষ্কার বলেছেন, আরবদের সঙ্গে মিটমাট করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, তাঁদের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, ইজরায়েলের অধিকাংশ মানুষই তাঁর এই মতের সমর্থক, তবে তাঁরা এখন নীরব। ইলিয়াভের ভাষায় এরাই হ'ল সাইলেণ্ট মেজরিটি'। তবে বেশি দিন তারা চুপ করে থাকবে না। মুখ তাদের খুলতেই হবে।

ইলিয়াভ বলেছেন, তাঁরা অপরের জমি দখল করতে চান না। বাধ্য হয়ে তাঁরা জেরুজালেম দখল করেছেন, ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু এই-খানেই শেষ। আর নতুন কোন জায়গা নেবার ইচ্ছা তাঁদের নেই।

ইলিয়াভ বলেছেন, প্যালেস্টাইনের আরবদের পৃথক জাতিরূপে স্বীকার করতে হবে, এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেও যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে।

ইলিয়াভ আরও বলেছেন, ইহুদী আন্দোলনের তিনটি প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে মাত্র একটি পূর্ণ হয়েছে—ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর দুটি লক্ষ্য হল: বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে যে-সব ইহুদী ইজরায়েলে আসতে চায়, তাদের আসার সুযোগ করে দেওয়া এবং ইহুদী ঐতিহ্য অনুযায়ী একটি নতুন সমাজ গঠন করা। এই দুটি লক্ষ্য এখনও অপূর্ণ। ইলিয়াভের বক্তব্য, তাঁরা যদি প্রতিনিয়ত আরবদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকেন, তবে এই দুটি কাজের দিকে নজর দেবেন কখন?

তাই যুদ্ধের অবসান চাই, আরবদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছনো চাই। অর্থাৎ, প্রয়োজন হলে, অধিকৃত আরব জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আরি ইলিয়াভের এই মনোভাব অন্য নেতাদের আগের থেকেই জানা ছিল। জেনে-শুনেই তাঁরা ইলিয়াভকে দলের প্রধান কর্মকর্তা পদে নির্বাচন করেছেন। এটাও নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী মশে ডায়ানের নীতি এই 'শান্তি নীতির' সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষ পর্যন্ত ইলিয়াভ ও তাঁর শান্তিকামী সহকর্মীরা ইজরায়েলের নীতিকে কতটা পাল্টাতে পারবেন, তা এখনই বলা শক্ত।

২৫-১-৭০
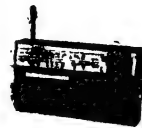
রবিবার এই লেখা যখন শেষ করছি, তখন সি-পি-আই দপ্তরে রাজ্য যুক্তফ্রন্টের বৈঠক বসছে। কাজেই এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন হয়ত দেখা যাবে সমগ্র রাজ্য রাজনীতির চেহারা বদলে গেছে। এই মুহূর্তে বসে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে সেটা বলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নৌকা যখন ডোবে, অথবা ঘর যখন পোড়ে, তখন তার সংগে পাল্লা দেওয়া খুবই কঠিন কাজ—, আজ সেই ঘর পুড়ছে, সেই নৌকা ডুবছে স্বর্গত নাট্যকার —শ্রীশচীন সেনগুপ্ত তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে একটি অতি সুন্দর "ডায়লগ" ছিল। চক্র-চক্রান্তে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে গদী থেকে হটাতে, তাকে খুন করতে দিবারাত্র শল্যপরামর্শ করছে মির্জাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ। সেই সময় গোলাম হোসেন বলছেন—"বাঙালী দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না"। শচীন সেনগুপ্ত নেই, নেই নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য রবি রায় কিন্তু সিরাজদ্দৌলা নাটকের এই কথাটা আজও একই ভাবে বেঁচে আছে। কারণ বাঙালী সম্পর্কে এই কথা শুধু একদিনের জন্য, একটি নাটকের জন্য, একটি কালের জন্য সত্য নয়—সত্য সর্বকালের জন্য। আমরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝি না।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝলো না সি- পি- এম, বুঝলো না বাংলা কংগ্রেস বুঝলেন না শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বুঝলেন না শ্রীজ্যোতি বসু। যদি এ যাত্রা যুক্তফ্রন্ট বেঁচে যায়, যদি যুক্তফ্রন্টের দাঁত রক্ষা পায়, তবে সেই দাঁতকে অকালে ফেলবার জন্য নড়িয়ে ফেলা হয়েছে, মাড়ি থেকে আলগা করে দেওয়া হয়েছে। সেই দাঁতের কোন জোর নেই। দাঁতের শোভা যদিও আছে, কিন্তু সেই দাঁতের হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবার শক্তি নেই। প্রকৃত অবস্থা হল রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট এখন নিতান্তই দৈবের উপর বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকলে থাকবে। কারণ মন ভেংগে ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে যুক্তফ্রন্ট তার প্রকৃত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। শক্তি শুধু ঐক্যের নয়, শক্তি শুধু সমঝোতার নয়, পরিস্থিতি মোকাবেলায় শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কোন দল বা কোন দলনেতা নেই, যিনি সাহস করে একে অপরকে একটা কথা বলতে পারেন। আজ আর কেউ কাউকে মোকাবেলা করতেও সাহস পায় না, কেউ কাউকে কোন উপদেশ বা অনুরোধ করতেও সাহস পায় না। অর্থাৎ সমগ্র পরিস্থিতি হল কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির রাজনৈতিক দিক অপেক্ষা মানসিক দিকের প্রাধান্য বেশী।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মানসিক অবস্থা হল এই যে, আর সি-পি-এম এর সংগে একসংগে কাজ করা সম্ভব নয়। সহ্য তো ওদের অনেক করেছি, সাতমাস একটা কথাও বলি নি। লোকে আমাকে হাবা গোবা বলেছে, ঠুঁটো জগন্নাথ বলেছে, সর্বতোভাবে আপোষ করে চলেছি, কিন্তু কি ফল হয়েছে তার? শ্রীজ্যোতি বসু ক্রমাগত অগ্রাহ্য করেই চলেছেন—বিধানসভায় যেদিন পুলিশ হামলা করলো সেইদিন পাশের ঘর থেকে হরেকৃষ্ণ কোঙার পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছলেন, বিজয় বাবু আর রাম চাটার্জী জানলা টপকে চলে গেছলেন, কিন্তু আমি পাশের ঘরে ছিলাম; অথচ সেই পুলিশদের সম্পর্কে যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় এল, তখন জ্যোতি বাবু আমার সংগে একবার পরামর্শ পর্যন্ত করলেন না। তারপর তিনি আমার মুখ্যমন্ত্রিত্বের অধিকারকেই চ্যালেঞ্জ করে জানালেন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী সমপর্যায়ের একজন মন্ত্রী ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর সেই ১৯৬৭ সালে যেমন রাইটার্সে তাঁরই ঘরের সামনে অপমান করলো সরকারী কর্মচারীরা, চুপ করে ছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু। আর ২১শে জানুয়ারী আইনসভায় তাঁরই ঘরের সামনে নিগ্রহ করলো কতকগুলো ছেলে-মেয়ে, পুলিশ কোন ব্যবস্থা করলো না। শুধু পুলিশ কেন, যুক্তফ্রন্টের সভায় যখন এসে তারা হামলা করলো, তখনও তো যুক্তফ্রন্টে কোন সর্বসম্মত প্রস্তাব উঠলো না মুখ্যমন্ত্রীকে নিগ্রহের নিন্দা করে? কই, বিধানসভাতেও তো সর্বসম্মত প্রস্তাব উঠতে পারতো। আমাকে নিগ্রহের প্রস্তাব কি আমাকেই তুলতে হবে? আমার মর্যাদা রক্ষার জন্য কি আমাকেই হুকুম জারি করতে হবে? মন্ত্রিসভায় আমার প্রধানত্ব যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, মন্ত্রিসভার বাইরে যদি আমার মর্যাদা হানি হয়, তবে কার সংগে বন্ধুত্ব—কার সংগে সহযোগিতা—কার সংগে সমঝোতা? অতএব যেখানে যে পথে চললে আমার মর্যাদা থাকে, আমার প্রধানত্ব থাকে, সেই পথেই যাবো।

শ্রীঅজয় মুখার্জী একদিন তাঁর মন ভাঙবার ইতিহাস বলতে গিয়ে বলছিলেন—কেউ জানে না, কাউকে বলি নি, আজও আপনারা লিখবেন না। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভা গড়া নিয়ে আর স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে যখন টানা-পোড়েন চলছে, তখন জ্যোতি বাবু আমার সংগে একদিন দেখা করে একটা অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীবসু বলেছিলেন—আপনি কিছু ভাববেন না—আমি যা করব, আপনার সংগে পরামর্শ করেই করবো, বাইরে যা হোক, আপনার সংগে আমার সমঝোতা থাকবে। যে দায়িত্ব যাঁর ওপরই থাক না কেন, মন্ত্রিসভা চলবে আমাদের যৌথ [illegible], মনের মিলে। কই, সেই কথা তো আজ জ্যোতি বাবুর মনে নেই—তাইতো তিনি আমার অনশনকে উপহাস করে বলেন—চারটে চাল বাঁচবে, অনশন ভংগের পরে বললেন—ক্ষিধে লেগেছে, তাই খেয়েছি।

কিন্তু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মনের এই কথার সংগে একই ভাবে প্রশ্ন আছে শ্রীজ্যোতি বসুর মনে।

শ্রীজ্যোতি বসুও একই ভাবে চিন্তা করেন। আমার দল ৮০ জন সদস্য নিয়ে, অজয়বাবুর দল ৩৩ জনকে নিয়ে, তবু ৮০ জনের অধিকার ছেড়ে ৩৩ জনের নেতাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছি। হ্যাঁ, বিশ্বাসও করেছি অকুণ্ঠভাবে, তিনি গান্ধীবাদী পুরাতন চিন্তার মানুষ, বহু কাজই প্রগতিশীল মনে চালানো যায় না—তবু তো মেনে নিয়েছি। মেনে তাঁকে নিয়েছি— এই কথা জেনেও যে, ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর তিনি আমাদের জন্য সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত প্রস্তুত করেছিলেন—

[১৯৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

[পূর্বানুবৃত্তি]

আনন্দ বললে—অন্য কথা মানে কোন্ কথা? রামনারায়ণের প্রসঙ্গ থেকে এখন কি আমরা একেবারে অন্য প্রসঙ্গে এগিয়ে যাবো? অর্থাৎ অন্য কালে,—অন্য লেখকের কথায়?

আমি বললুম—পুরোপুরি অন্য প্রসঙ্গে সরে যেতে পারলে ভাল হোতো? বোধহয়, সেই প্রস্তাবই তোমার মনে জেগে উঠছে? তাই কি?

সে যে অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল, সেটা আমার চোখের ভুল নয়। সে যা ভাবছিল, আমিও তা কতকটা অনুমান করেছিলুম। বললুম—উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর আমরা পেরিয়ে এসেছি। বাংলা বইয়ের ভাষা বদলাতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন, দীনবন্ধু—একে একে কতো যে লেখক দেখা দিলেন! নতুন ইংরেজি-শিক্ষিত শহুরে বাঙালী তখন কথায় কথায় ইংরেজি বুকনি দিতে সুখ পেতো। রামনারায়ণের নাটকে তো তারই নজীর দেখা গেল। মধুসূদনও তা দেখিয়ে গেছেন।

সে বললে—বহুজনের মুখস্থ-করা নামগুলোতেই আমরা আটকে আছি। বই-বাছাইয়ের কাজে এরকম চোখে ঠুলি বেঁধে হাঁটা নিষিদ্ধ।

—তার মানে?

—তার মানে, আমাদের আরো অনেক নাম মনে পড়া উচিত।

—পড়বে,—যথাসময়ে মনে পড়বে।

—যথাসময়ে বলতে কী বোঝো?

—যেভাবে আমাদের এই আলোচনা এগুচ্ছে সেই ভাবটাই তো সময়ানুক্রম মেনে চলার ভাব।

—তাহলে অক্ষয় দত্তের কথা হোলো, রামনারায়ণের কথাও উঠলো,—রাসসুন্দরীর কথা মনে পড়ছে না কেন?

—রাসসুন্দরী কি ঐ সময়ের মানুষ?

—তিনি তাঁর নিজের জীবন-চরিত লিখতে বসে জানিয়ে গেছেন—'১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল।'

—তাহলে তাঁর জন্মকাল তো ১৮০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দে গিয়ে দাঁড়ায়—অর্থাৎ অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির খুবই কাছাকাছি সময়ের মানুষ ছিলেন তিনি।

—যদিও তাঁর 'আমার জীবন' লেখা হয়েছিল তাঁর ঐ ৮৮ বছর বয়সে—গত শতাব্দীর শেষ দশকে।

আমি বললুম—তাই তো। কিন্তু অক্ষয় দত্ত আর রামনারায়ণের প্রসঙ্গ থেকে তাঁর প্রসঙ্গে চলে যাওয়াটা তবু কি আকস্মিক মনে হয় না? তিনি বরং এ-আলোচনায় আরো অনেক পরে দেখা দিতে পারেন,—সেই যখন তাঁর 'আমার জীবন' লেখা হয়েছিল, তখন,—সেটাই 'যথাসময়' হোতো।

আনন্দ বললে—উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালীর সমাজ অনেক বদলে গিয়েছিল। তখন আমাদের অন্তঃপারি-

আগেকার মন-মেজাজ নিয়েই তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী নন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বইখানির ভূমিকায় লিখে গেছেন—

'বিশেষ কুতূহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোন ভাল কথা পাইব, সেইখানে পেন্সিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেন্সিলের দাগে গ্রন্থকলেবর ভরিয়া গেল।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আরো একটু কথা বলতে দাও—

'লেখাপড়া শিখিবার তাঁহার কোন সুবিধা ঘটে নাই। তখনকার কালে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখা দোষের মধ্যে গণ্য হইত। তিনি আপনার যত্নে বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মপিপাসাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে উত্তেজিত করে।'

আমি বলে বসলুম—রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' আমি পড়েছি। বইখানির সাহিত্যমূল্য তুচ্ছ,—তবে হাঁ, আমাদের সামাজিক দলিল হিসেবে তাঁর ঐ বইখানির কতকটা দাম আছে বই কি। দীনেশচন্দ্র সেন বড়োই আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনিও ও-বইয়ের সাহিত্যগুণের কথা তোলেন নি,—তিনি লিখেছিলেন—

'এই জীবনীখানি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা প্রাচীন হিন্দুরমণীর একটি খাঁটি নক্সা। যিনি নিজের কথা সরলভাবে কহিয়া থাকেন, তিনি অলক্ষিতভাবে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়া যান।'

আনন্দ যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সে-কথা আগেই বলেছি। রাসসুন্দরী সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের এই উদ্ধৃতি শুনে সে বললে—দ্যাখো, দীনেশচন্দ্রের এই উক্তিতে কি রাসসুন্দরীকে খাটো করা হয়েছে? যাঁর যেমন অভিজ্ঞতা, তিনি সেইভাবেই লিখবেন। রাসসুন্দরীই বলো, আর রামনারায়ণের কথাই বলো—তাঁরা নিজেদের কালে নিজেদের জগৎকে যেভাবে পেয়েছেন, সেইভাবে প্রকাশ করে গেছেন। অতএব এই বই বাছাইয়ের কাজে রাসসুন্দরীর বইখানিও স্বীকার্য।

হঠাৎ এক কথা থেকে অন্য কথায় ঝাঁপ দিয়ে সে বললে—রবীন্দ্রনাথ কি বাংলা ভাষাতত্ত্বের মার্কা-মারা অধ্যাপক ছিলেন?

বললুম—এ-কথা বলছো কেন?

বলছি, কারণ, শুধু সোজাসুজি কোনো সূত্রেই ঠিক বোঝানো যায় না। রাসসুন্দরী ইতিহাস লিখতে বসেন নি, কিন্তু তাঁর বই আমাদের সমাজের একটা বিশেষ কালপর্বের একরকম দলিল হয়।

আলোচনা দেখে আমাদের ভাষাবিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধায় নত হয়েছেন। জানো তো সে-কথা?

অনুমান করলুম এ-দিনের আলোচনা অতঃপর অন্য পথে এগুবে।

সে বলতে লাগলো—ভাষা-সম্পর্কিত উপলব্ধির কথাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রসংগে ছোটো একটি প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

'আধুনিক ভারতে ভাষানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে ইহা একটি শ্লাঘনীয় আত্মপ্রসাদের কথা যে, রবীন্দ্রনাথের মত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কবি, শাব্দিকগণের অগ্রণী হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।'

বললে—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'কবি',—শব্দচিত্রকার',—'ভাষাশিল্পী'। সুনীতিবাবু তাঁকে 'বাক্‌পতি' বলে সংবর্ধিত করেন।

আমি বললুম—এ ভালোই হোলো—আজ বরং উনিশ শতকের মধ্যপর্ব উহ্য থাক। রাসসুন্দরী সম্বন্ধে তোমার মনোভাব আমি বুঝেছি, ও-বিষয়ে তোমার সংগে আমার কোনো মতানৈক্য ঘটে নি।

সে বললে—সুনীতিবাবু তাঁর সেই 'বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখেন—

'রবীন্দ্রনাথ ভাষাবিজ্ঞান-ব্যবসায়ীর মত অনুশীলন-রীতি বা পরিপাটি অবলম্বন করিয়া ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন নাই।'

তবু রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বইখানির গুরুত্ব কি সামান্য? শোনো সুনীতিবাবুর কথা—

'শব্দতত্ত্ব'র প্রবন্ধাবলী হইতে দেখা যায়, পূর্বে বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যতটুকু অনুশীলন হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তখন সে সমস্তটুকুর সহিত পরিচিত ছিলেন। উপরন্তু তিনি আধুনিক বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে এবং বাঙ্গালার ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, প্রথম চিরতরে এই-সব বিষয়ে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।'

এই সূত্রগুলির বিষয়ভেদ দেখিয়ে—অর্থাৎ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি লেখেন—

যেমন বাঙ্গালার স্বর-সঙ্গতির সূত্রগুলি; বাঙ্গালার ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রকৃতি—ইহারই আধারে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার এই শ্রেণীর শব্দগুলির এক অতি চমৎকার আলোচনা করেন ('ধ্বনিবিচার', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা; 'শব্দ-কথা' ১৩২৪, প্রথম প্রবন্ধ)। বাঙ্গালা নাম ও সর্বনাম শব্দের তির্যক রূপ সম্বন্ধে এবং এইরূপ আরও কতকগুলি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বাদ দিতে পারা যায় না।১

আমি বললুম—আজ আর রাসসুন্দরীর প্রসংগে ফিরবো না আমরা। রবীন্দ্রনাথের কথাই চলুক। কিন্তু তুমি আজ হঠাৎ এক কথা থেকে অন্য কথায় এলে কেন?

আনন্দ বললে—কেন যে আসতে হয়, সে কি ব্যাখ্যা করা দরকার? সাহিত্যের চলতি-পথেই যাদের আনাগোনা বেশি, তাঁরাও কি দৃষ্টান্ত দেখাতে কম উৎসাহী? আর, আমরা তো বাজার-চলতি পাঁজির হিসেব মেনে চলছি না,—মোটামুটি সময়-ধারা মেনে, যখন-যেমন দরকার সেইভাবেই চলেছি আমরা। 'সাহিত্যগুণ', 'সাহিত্যগুণ' রব তুললে ব্যাপারটা বুঝে দেখবার জন্যে যোগ্য দৃষ্টান্তের জন্যে এদিকে-সেদিকে ঘুরতেই হয়। পথ তো ঠিক সরলরেখায় চলে না। রাসসুন্দরীর বইয়ে সমাজ-বিবরণ, আর, রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টিতে শব্দবিজ্ঞান—দুই-ই যেন অভাবিত আগন্তুক!

উৎসাহের সংগে সে বলতে লাগলো—রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথ বিশী পদ্মার প্রসংগই শুধু তোলেন নি,—'এপিক' আর 'লিরিক'-এর প্রভেদ বোঝাতে গিয়েও নদী আর শাখা-নদীর উদাহরণ দেখিয়েছেন। বই-বাছাইয়ের কাজটাই এইরকম,—কেবলই এক কথা থেকে অন্য কথায় নিয়ে যায়!

আমি তার কথা বেশ মন দিয়ে শুনছি দেখে সে কথাটা বিশদ করলে—১৩৩৮ সালে ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষদ থেকে দেশব্যাপী রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় 'কবি-প্রশস্তি' নামে ডিমাই মাপের পঁচাশি পৃষ্ঠার যে বইখানি বেরোয়, তাতে প্রমথনাথ বিশীর 'চৈতালি'-সম্পর্কিত আলোচনা ছাপা হয়। সেই আলোচনায় তিনি দেখান যে, 'সোনার তরী'তে এবং 'চিত্রা'য় ছিল বর্ষাঋতুর পদ্মার পটভূমি, আর, রবীন্দ্রনাথের চৌত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা 'চৈতালি'তে যে পদ্মাকে দেখা যায়, সে নদী শীত-শেষের। শুধু তাই নয়, —এই নদী-প্রসংগ ধরেই তিনি লেখেন যে, রবীন্দ্রনাথ যখন পদ্মার বুকে ছিলেন, তখন তাঁকে ঠিক 'নিবিড়তমভাবে পান নাই', 'চৈতালি'তেই পদ্মাকে তিনি 'যথার্থভাবে' লাভ করেন।

'মহাকাব্য' আর 'লিরিক' নাম দুটি প্রমথবাবুর সেই প্রবন্ধে এই সূত্রেই দেখা দেয়। তিনি লেখেন—"বড় নদী যেন একখানা মহাকাব্য—তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না; শাখানদী যেমন একখানা লিরিক কবিতা—দুইবার আনা-গোনা করিলেই মুখস্থ হইয়া যায়।"

'ছিন্নপত্রে'ও পদ্মার প্রসংগ দেখা গেছে। পদ্মা আর ইছামতী—দুই নদীর প্রকৃতিভেদ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে যে উল্লেখ ছিল, প্রমথবাবু সেই উক্তিটুকু এই সূত্রে তুলে দেন—

"পদ্মার মত বড় নদী এতই বড় যে, সে যেন ঠিক মুখস্থ করে নেওয়া যায় না, আর এই কেবল ক'টি বর্ষা-মাসের দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোট বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে। পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী;—তার শান্ত জল-প্রবাহের সংগে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী

আনন্দ বললে—শোনো প্রমথবাবুর মন্তব্য—'কবি এই শাখানদীতে আসিয়াই পদ্মাকে প্রেয়সীরূপে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন। নদীতীর ও নদী উভয়ের সংগেই তাঁর সম্বন্ধটি এখানে ব্যক্তিগত।'

আমি বললুম—এই তো আবার একটা সংকটে এসে পড়লুম। 'ব্যক্তিগত' কথাটারই বা তাৎপর্য কি? 'সোনার তরী'তে, 'চিত্রা'য় কবি কি পদ্মাকে 'ব্যক্তিগত' অর্থাৎ পার্সোনাল বা ইন্টিমেটভাবে পান নি?—কিন্তু থাক এই সংকটের কাঁটা,—আমরা আজকের এ আলোচনায় বেশ খানিকটা বিরতি উপভোগ করেছি,—এবার ফিরতে হবে।

[ক্রমশ]

১ 'বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ': রবীন্দ্রনাথ—দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (মে, ১৯৬১); পৃষ্ঠা ১—৫।

## তেরশ টাকায় কলকাতা

: আমাদের কলকাতা কেমন দেখছ?

আমার প্রশ্নের উত্তরে পাতলা নরম চেহারার মার্কিন যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল: দি মোস্ট সিভিলাইজড্ সিটি ইন ইন্ডিয়া! অর্থাৎ ভারতে সবচেয়ে সভ্য মহানগরী।

বটে! বটে! টেবলের বিপরীত কোণ থেকে একেবারে কাল প্লাঙ্গের কনুয়ের ডগে লাফ দিয়ে উঠে এসেছিলাম প্রবল উত্তেজনায়। মার্কিন যুবক কি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মূল্যবান বাণী সম্পর্কে কোনই খোঁজখবর রাখে না? বললাম: ব্যাখ্যা কর! আর মনে মনে বললাম, তোষামোদি করার জায়গা পাও নি ছোকরা! সমুদ্দুর ডিঙিয়ে সদর স্ট্রীটে এসে আস্তানা গেড়েছ। এখন মিষ্টি কথার বোল বাজিয়ে কলকাতার একটা কাগজ-অফিসে এসেছ আসর জমাতে? কিন্তু না। ভুল ধারণা কয়েক মুহূর্তের আলাপেই ভেঙে গেল। বুঝলাম, তোষামোদি পথের পথিক নয়, ইন্ডিয়া সম্পর্কে অল্পকালেই বেশ খানিকটা গুছিয়ে ভেবেছে সে। বক্তৃতার ফোয়ারা ছোটাচ্ছে মুখের ওপর। মনে তার যেমনটি বেজেছে, মুখেও সে তেমনটিই বাজাচ্ছে।

বললে: কলকাতার মানুষকে আরও কেন ভালো লাগল জানো? এরা লালমুখো বিদেশী দেখলেও ভ্রূক্ষেপ করে না। কী-যেন-দেখছি মেজাজ নিয়ে সবিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায় না পথের ওপর। বরং সমানে সমানে আলোচনায় নামে। কম্প্লেক্স নেই। (এইখানে সাহেব ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সের উল্লেখ করেছিল।) বললে: কিন্তু ঐ কমপ্লেক্স দেখেছি কলকাতার বাইরে। তারা যেন মিশতে গিয়ে কোথায় বাধা পায়। ব্যবহারটা সহজ হয় না। কিছুটা 'হার্স' কর্কশ হয়ে ওঠে।

ব্যস, এই পর্যন্তই। আর বেশি বলব না। তাও তো আমি অনেক রেখে-ঢেকে রিপোর্ট করছি। নচেৎ সিস্টার স্টেটের ভ্রাতা-ভগ্নীরা খামকা উল্টোপাল্টা ভাবতে পারেন। এবং আমার আদপেই কোন তিক্ততা কাম্য নয়।

নয় তো কাল প্লাঙ্গের উক্তিগুলি উদ্ধার করলাম কেন? কারণ আছে। সাদা আর স্পষ্ট কারণ। প্লাঙ্গ নিজে সাংবাদিক। দেখেছে মার্কিনী একজন সাংবাদিকের দৃষ্টিতে। অবশ্য 'ওহায়ার' 'সান পেপারস' বা 'মেট্রো পেপারসে'র করেসপন্ডেন্ট বলেই নয়, আমার কাছে প্লাঙ্গের মূল্য একজন শিক্ষিত বিদেশী সতর্ক দর্শক হিসেবেই। তার উক্তিটুকু মুখবন্ধ করে আলোচনায় নামার সুযোগ তাই ছাড়তে পারলাম না। কলকাতা নিয়ে কত যে কেচ্ছা-কেলেংকারী, কিন্তু বিদেশীর চোখে সে কলকাতা কেমন? না, মোস্ট সিভিলাইজড। পক্ষে সওয়ালে নেমে শ্লোক গুছিয়ে তোলার আগেই এই হালতম কোটেশনটি কুড়িয়ে পেলাম। ছড়িয়ে ধরব না কেন?

*　　*　　*

তা ছাড়া এই বিদেশী যুবকটি কি একটুও বাড়িয়ে বলেছে? লালমুখো বিদেশী দেখার অভ্যাস তো কলকাতার আজ বলে নয়, ভ্রূণাবস্থা থেকেই। যখন কলকাতা কলকাতাই হয় নি। ছিল ঠ্যাঙাড়ে আর বুনো জানোয়ারের আড্ডা। আজও যেমন, সেদিনও তেমনি বাঙলা দেশটাকে নিয়ে দিল্লীর মাথা ব্যথা ছিল না। ঔরংগজেব ব্যস্ত ছিলেন চারদিকে দুর্বিনীত দমনে। ঢাকার মসনদে বৃদ্ধ মকরধ্বজ নবাব ইব্রাহিম খাঁ পুঁথি ঘাটেন আর বুঁদ হয়ে পড়ে থাকেন। হার্মাদ দস্যুদের ঠেকানো তাঁর মতো সুখী নবাবের কম্ম নয়। তাই জব চার্নককে সুদূর মাদ্রাজ থেকে তিন হাজারী খাজনার বিনিময়ে বাঙলাদেশে ফিরিয়ে আনলেন তিনি। বৃদ্ধের আহম্মকি আর বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের বাঙলা সম্পর্কে 'কোনমতে বেঁচে থাক নবাবী নজরানা' মনোভাব চার্নকের নৌকো সুতানুটির ঘাটে ভিড়তে সাহায্য করল। শায়েস্তা খাঁ যাঁকে শায়েস্তা করে তাড়িয়েছিলেন, তিনি সদলবলে ফিরে এলেন জংলা বনভূমি চার্নকস্বপ্ন সুতানটিতে। ব্যারাকপুর থেকে বৌবাজার-শিয়ালদার মোড়ে (আজকের বসুমতী অফিসের কোলের গোড়ায়) তামাক সেবনরত এই চার্নক সাহেব থেকে আরম্ভ করে গণ্ডা গণ্ডা সাহেব সন্দর্শনেই কলকাতা শাঁসে-রসে ভরে উঠল। কাল প্লাঙ্গদের দেখে তাই সে কলকাতার আঁখিপল্লবে বিস্ময়ের যাদু না ধরাই তো স্বাভাবিক। কাল প্লাঙ্গের কথা তাই অবিশ্বাস্য নয়।

কিন্তু কাল প্লাঙ্গ তার থিসিস নিয়ে সদর স্ট্রীটেই সুখে থাক, আমি বলব কলকাতার কথা।

যে কলকাতা ইংরেজদের কাছে বিকিয়ে গেছল মাত্র তেরশ টাকায়। জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের শরিকানি পিঠেভাগের ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে বণিক ইংরেজ তেরশ' টাকায় কিনে নিয়েছিল তিন তিনটে গ্রাম, আজ যেগুলো একত্রে কলকাতা, বনকাটা বসত। সুতানুটি, ডিহি কলকাতা আর গোবিন্দপুর। অবশ্য শুধু তেরশ' বললে ভুল হবে। কারণ গ্রাম তিনখানি খরিদের অনুমতি এসেছিল মকরধ্বজ ইব্রাহিমের নাতি নয়া নবাব আজিম ওসমানের কাছ থেকে। অনুমতি আদায়ে ইংরেজরা ষোল হাজার মুদ্রা ইনভেস্ট করেছিল দূরদৃষ্টি নিয়ে। মোট খরচ সুতরাং ১৭,৩০০ টাকা। কিন্তু নিট মূল্য ঐ তেরশই। সে-ই কলকাতার কাল হল, আবার সে-ই কলকাতায় একাল প্রবেশ করল। বন কেটে তৈরি হল বসত। সুতানুটি রূপ নিল উত্তর কলকাতার আনপ্ল্যানড সিটি-রূপে। বণিক ইংরেজ স্বাধীন ভারতের পূব কোণে প্রেসিডেন্সী পেতে বসল, প্রেসিডেন্ট চার্নক-জামাতা চার্লস আয়ার। ভারতবর্ষে সেদিন এমন কেউ ছিল না

যে, বিদেশীর বুকের ভার মাটি-মায়ের বুক থেকে নামিয়ে দেবে। বরং স্বয়ং দিল্লীশ্বরও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, যাক, পূর্বদিকে পাহারাদারও বসানো গেল, আবার ইজারার টাকায় রাজকোষও ভরল। এখন নবাব আমি; তবে বিদেশী দস্যুর হাত থেকে তালুক রক্ষার দায়িত্ব বিদেশীর ওপরেই রইল। অর্থাৎ নাকের বদলে নরুণ মিলল। এর পর নাসিকায় সর্ষপ তৈল মর্দনের এমন সহজ ব্যবস্থায় আয়েসী ভারতীয় শাসকদের অন্তরে বড় পুলক। আহাম্মক যদি নবাব হয়, দেশে দুর্গতি। কিন্তু দেশরক্ষকরা যদি দেশপ্রেমহীন স্বার্থান্ধ ডাকাত হয়, তবে সে দেশের আর রক্ষা নেই। দেশকে ভালবাসি, তাই স্বদেশ রক্ষা করব, এই জিদটুকুর অভাবে এত বড় সোনার দেশ ছারেখারে গেছল। কিন্তু সে যুগে স্বাধীনতা শিক্রর জন্য সাধারণ মানুষের ভূমিকা আদৌ ছিল না। জায়গীরদারের জমিদারিতে, নবাবের রাজত্বে সাধারণ প্রজাবৃন্দ ছিল উৎপাদনের যান্ত্রিক উপাদানমাত্র, শোষণের বেওয়ারিশ শিকার। প্রজা দোহনেই রাজনীতি। আমার দেশ বলতে মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়। অশিক্ষা, উৎপীড়ন আর দারিদ্র্যের মধ্যে সে ভাবনার স্থান ছিল না কোথাও; বিদেশী দস্যুর দস্যুতা কিংবা বিদেশী বণিকের মনিবীয়ানা বোধ হয় তাই অত সহজ হয়েছিল তখন। অবহেলিত কলকাতায় ইংরেজের প্রেসিডেন্সী ক্রমে পৃথিবীর মোটা একভাগ জমি দখল করে নিল। বিদেশী একদল সৈনিক এসে নামল সুদূর ভারতের জাহাজঘাটায়। না ধারে, না ভারে। খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত কোনটা নিয়েই রুখতে পারে নি সেই বিদেশী অনুপ্রবেশ। স্রেফ চালাকির দ্বারা, আর ভারতের প্রভুকুলের প্রজাবৃন্দ সম্পর্কে অবহেলার জন্যই ক্ষুদে ভূখণ্ডের বণিক জাতি হল ভারতেশ্বর, অথচ বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়ার দোষটা সামগ্রিক হলেও, সেই বজ্জাৎ মীরজাফরের লালসার কাহিনীই ইতিহাস জুড়ে রইল। বাকি ভারত দেশ বিক্রয়ের কলঙ্ক থেকে গা বাঁচিয়ে নিল সাবধানে। অথচ গভীরভাবে ভাবলে দোষটা একা সিরাজেরও নয়, আবার মীরজাফরেরও নয়: হিংসেহিংসী আর ক্ষমতার লোভ, যা ছিল গোটা ভারতেই রবরবা; দোষী সেই স্বার্থান্ধতা। প্রত্যেক আঞ্চলিক প্রধানই এই ব্যাধিতে রুগ্ন। দেশ আর দেশের মানুষ নজরে নেই। ভিন দেশী মুসলিমদের ভারত বিজয়ও ঐ দুর্বলতায় রন্ধ্রপথে। কয়েকজন স্বাধীনতাপ্রিয় রাজা রাণাই ছিলেন ওরই মধ্যে ব্যতিক্রম। আর প্রজারা? কোনদিন তারা কি ভাবতে পেরেছিল দেশটা তাদের? দেশের ভালমন্দে তাদের ভালমন্দ? না, সেদিনও পারে নি, আজও পারছে বলে ঘটনাপ্রবাহ সাক্ষ্য দিচ্ছে কই?

ইংরেজ তাড়িয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। সেই প্রজাতন্ত্রের জন্য রক্ত আর নির্যাতনে খেসারত দিল এই কলকাতা '৪২-এর আন্দোলনে। বাঙলা উজাড় করে কলকাতার রাজপথে কঙ্কালের স্তূপ জমা হয়ে উঠল '৫০-এর মন্বন্তরে। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে। তারপর ভায়ের হাতে ছুরি খেয়ে '৪৬-এর অগাস্টেও শ'য়ে শ'য়ে লাস পড়ল কলকাতার অলিতে-গলিতে। বাঙলা ভাগ আর রেফ্যুজি পুনর্বাসনে কলকাতা কাহিল। দেশভাগের জন্য আর সবের মতো মার খেল বিজনেস, তালগোল পাকিয়ে গেল সুস্থ স্বাভাবিক জীবনগতি। তবু কলকাতা বেঁচে আছে। অনেক প্রাণ বলি দিয়ে, ছিন্ন মানচিত্র মাথায় নিয়ে ভারত হয়েছে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। ইংরেজ বণিকে সাজিয়েছিল ডিহি কলকাতা; ভারতীয় বণিকে আজ তাকে গুছিয়ে নিচ্ছে। প্রজাতন্ত্র আদায় করতে (যদিও স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীন সত্তার) ১৮০০ শতক থেকে কলকাতার ক্রমজাগ্রত অবদানই যে মূল শক্তি, মুখ্য প্রেরণা, ইতিহাস তা অস্বীকারের পথ পায় না। কলকাতার পূবের আলো নিয়েই তো আলোকিত হয়েছিল ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি। কে অস্বীকার করবে?

হিন্দু কলেজের সংস্কারমুক্ত ছাত্র আন্দোলন তো নবভারত গঠনেরই স্বপ্নাঙ্কুর। এলেন ডিরোজিও, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন। এলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্ররা। কলকাতায় ন্যাশনালিজমের সূত্রপাত। তারপরও কত নাম, শত নাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষের বিদ্রোহ। স্যার আশুতোষের পক্ষ থেকে দামাল ছাত্রদের আশ্রয়। সাহেব-গুবোকে ভাঙিয়ে, সাহেবী শিক্ষাকে আত্মসাৎ করেই আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত বেকার যুবককে বিদ্রোহী করে ছেড়ে দিল বিক্ষুব্ধ কলকাতার পথে পথে।
সেই তখন, তখন থেকেই সুরু হ'ল স্বাধীনতার জন্য অকুতোভয় সংগ্রাম। প্রভাব সংগ্রাম। অবশ্য এমন কথা কখনই বলছি না যে, প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র কলকাতারই দান কিংবা কেবলমাত্র বাঙলাদেশেরই বুকে প্রজাতন্ত্রের জন্য রক্ত ঝরেছিল। তবে একথাও ইতিহাস অস্বীকার করতে পারবে না কোনদিন যে, কলকাতাই স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত। প্রজা [illegible] কলকাতা, রাজা [illegible] কলকাতা। সুতানুটিতেই ইংরেজের আগমন আবার কলকাতার কাছেই তার ওপর প্রচণ্ড ধাক্কা। গতবারেই তো বলেছি, এগিন রোডই প্রথম ফ্রিডম রোড অথবা রোড টু ফ্রিডম। এবারেও তার পুনরাবৃত্তি করছি। গান্ধীজী মাথায় থাকুন।

কিন্তু আর জায়গা নেই। এ প্রসঙ্গে পরে আসব। কলকাতার আসল চরিত্রই তো এইখানে। বারে বারে এ প্রসঙ্গে আসতেই হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে তারই সামান্য ভূমিকা।

*    *    *

কিন্তু যে কথায় শুরু করেছিলাম... সেই কাল প্লাজের কলকাতা-দর্শন। মোস্ট সিভিলাইজড ইজ ক্যালকাটা।

অর্থাৎ কলকাতার বুকে ভারতের যে নয়া সিভিল জীবনের শুরু, আজও তার রেশ চলেছে একই তালে। কলকাতার নিজস্ব চরিত্র এতটুকু নিষ্প্রভ হয় নি।

মিছিলে-মিটিং-এ সরব কলকাতা আজও বিদেশীর চোখে উজ্জ্বল, প্রশংসমান, প্রদীপ্ত, ভাস্বর। কলকাতা বেঁচে আছে। তার বুকের ধুকপুকুনি বড় বেশি করে বাজে। তাই সে আজব নগরী, তাই সে দুঃস্বপ্ন নগরী।

প্রজাতন্ত্রের আবহাওয়ায় লক্ষ্য করছি, প্রজাসাধারণ প্রজামুক্তির জন্য কলকাতার বুকেই সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সেটা গেল অন্তরের কথা। বাইরের রূপটাও পাল্টাচ্ছে। মনুমেন্ট হয়েছে শহীদ মিনার। লালদীঘি হল বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। রাস্তাঘাটের নাম পাল্টে যাচ্ছে। পুলিশ-পল্টন সমীহ করতে শিখেছে দেশের ছেলেমেয়েকে।

নিজের ভাগ্য নিজে গড়ার জন্য পা ফেলছে কলকাতা। সময়টা বড়ই সতর্কতার দাবিদার। এই মুহূর্তে অসতর্ক হলেই অঘটন। কলকাতা আরও একটু সতর্ক হোক, যেন আর একটা নেতৃত্ব দানের মহড়ায় ভ্রান্তির অবকাশ না থেকে যায়।

তেরশ টাকায় বিকিয়ে-যাওয়া কলকাতা যেন নতুনতর কোন নপুংসকতা অথবা দুরভিসন্ধির ফাঁদে পা না দেয়। প্রজাতন্ত্রের পুণ্য প্রভাতে কলকাতার বুকে এই শপথবাক্যই উচ্চারিত হোক।

—২২।১।৭০

**দুই ]**

[illegible] গাড়িকটি চলে যেতে এসে উঠলাম মায়াদের বাড়িতে।

আহা, সে তো বাড়ি নয়—উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব-পশ্চিমে কতকগুলো খুঁটি দিয়ে মাথার ওপর একটা টালির চাল খাড়া করা শুধু। তারপর বাঁশের ওপর কাদা ধরিয়ে দেয়াল, তারি একদিকে দুটো আওয়াজী জানলা আর বিপরীত দিকে একটা ফুট পাঁচেকের মত দরজা। ঘর-খানার পরিসর কতখানি তা বোধ হয় না বললেও চলবে। বড় জোর তাতে কাপড়-চোপড়ের আলনা, হাঁড়ি কলসী বাসনপত্র রেখে মেঝেতে গোটা চার-পাঁচ মানুষ শুতে পারবে পাশাপাশি। রান্না করে ওরা তোলা উনুনে বাইরে ফুট তিনেকের মত চওড়া দাওয়ায়।

দাওয়াটাও দেখলাম ভাড়া দেয়া হয় রাতে।

মায়ার পিছু পিছু আমি আসছিলাম। দাওয়ার সামনে এসেই মায়া ডাকল, 'মা-আ!'

'আয়,' ঘরের ভেতর থেকে সাড়া এল।

মায়া চট করে ঘরে ঢুকে পড়ে মাকে সম্ভবত আমার আগমনবার্তাটা জানিয়ে দিলে। ওর মা বেরিয়ে এলেন। বছর চল্লিশ বয়সের একটি বিধবা মহিলা। যেন কোন তপস্যাক্লান্ত জীবনের লক্ষ্যহারা অবশেষ তিনি। অফুরন্ত রূপ ছিল বোধ করি কোনকালে, কিন্তু আজ আর তা ঠাহর করা যায় না, মহাকালের নির্মম তুলিকায় তা আচ্ছাদিত। তিনি ঘর থেকে এসেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যেন আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। প্রসন্নতার চিহ্নলেশহীন মুখমণ্ডলে তাঁর মনের ছবিখানি আমিও যেন মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করে নিলাম। মায়ার দৃষ্টিও বোধ হয় এই দৃশ্য থেকে অন্য দিকে নিবদ্ধ হতে পারল না।

ওর মায়ের মনের ভাবটা এই, মায়া কিনা শেষ পর্যন্ত বাড়িতে টেনে নিয়ে এল আমার মত একটা মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়াপরা মানুষকে! আমি যদি খাঁটি গেরুয়াবাদী হই তবে সেখানে মায়ার ভবিষ্যৎ কোথায়? সংসারের মাথায় অন্তহীন ফাঁকির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যাওয়া ছাড়া মায়া আর কি-ই বা করতে পারবে? আবার অন্যদিকে আমি যদি তা না হই তবে আমি তো শুধু তাঁদের পরিবেশে নতুন একটি প্রতারকের সংখ্যাই বাড়াবো এবং তার ফলে তাঁর কন্যার জীবন-শকট চলবে কোন্ রাস্তা ধরে?
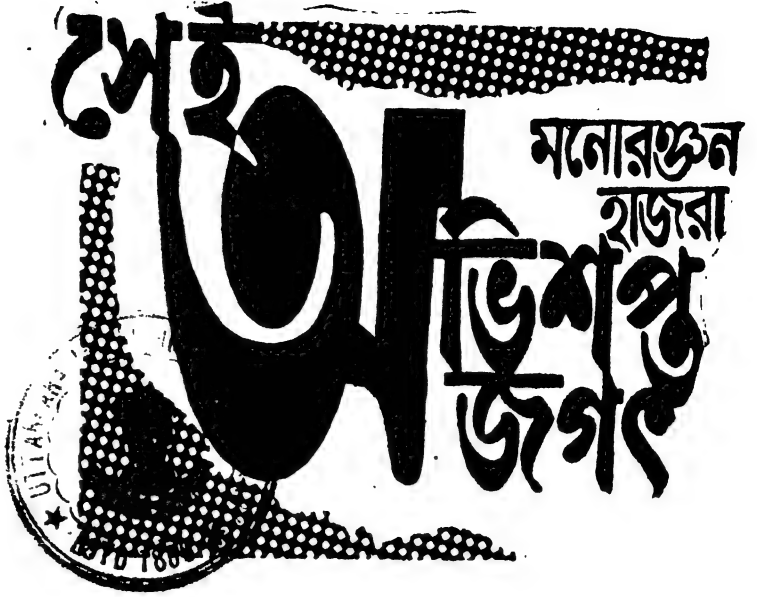
মায়ার মায়ের মানসিকতার এই ক্ষণিক অভিব্যক্তিটুকু যারপর নাই আমার মনটাকে নাড়া দিলে। এখানকার এই অভিশপ্ত আবেষ্টনীর মধ্যে মা তাঁর মনের ডানা দিয়ে আড়াল করে রাখতে চান মেয়েকে এবং বলা বাহুল্য যে সেটা অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই চান। আমার পরনে গেরুয়া দেখে মা বিভ্রান্ত হন নি। বাস্তবিক সেদিন আমি যেন প্রত্যক্ষ করলাম গেরুয়ার ট্র্যাজেডী। আসল কথা গেরুয়াকে কেউই বিশ্বাস করে না—না উঁচু তলার মানুষ, না নিচুতলার। অবশ্য এও দেখা যায় যে উঁচুতলার মানুষেরাই আবার মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে গেরুয়া-বাদীদের ছেড়ে দেয় সাধারণ মানুষের মাঝখানে, আফিম খাইয়ে তাদের ঝিমিয়ে রাখার জন্যে। নিচুতলার লোকেরা কিন্তু জীবনের দুর্বিষহ কঠিন বাস্তবে পড়ে তাকে আমল দিতে পারে না, তাই তারা বিশ্বাসও করতে চায় না। তবে গেরুয়াকে যদি কেউ বিশ্বাস করে তবে সে মধ্য-শ্রেণীর কিছু মানুষ—যারা উঁচুতলারও নয়, নিচুতলারও নয়। গেরুয়ার একটা অলৌকিকতা আছে বলে তারা বিশ্বাস করে এবং সেই অলৌকিকতায় তারা মনে করে যদি তারা উঁচুতলার নাগাল ধরতে পারে কোনরকমে তবে সেটা হবে তাদের জীবনের পক্ষে আশীর্বাদ এবং এ ছাড়া তা যদি নাও ঘটে তবে সেও হবে মন্দের ভাল, যদি গেরুয়ার প্রভাবে তাদের নিচে নেমে যেতে না হয় অবস্থার ফেরে।

যাই হোক, মায়ার মা সেই মুহূর্তে আমাকে ভালভাবে গ্রহণ করলেন না এবং মেয়ের প্রতি যেন একটু বিরক্তিই প্রকাশ করলেন তিনি। তবু ভয় আছে, সে ভয় সংস্কারের—সাধু-সন্ন্যাসী মানুষকে অশ্রদ্ধা করলে যদি কোন অকল্যাণ হয়! তাই তিনি আমাকে নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিলেন এবং মায়াকে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে বললেন।

তখন বেলা বিশেষ ছিল না। তাই বলে দিনের আলো যে তখনই নিভে গিয়েছিল এমন নয়। ঘরে ঢুকতে দেখলাম অন্ধকার, অজস্র অন্ধকার। তারই মাঝে মেঝেয় একখানা চট পেতে মায়া আমায় বসতে দিলে। তারপর বললে, 'আপনি বসুন দাদা—আমি চা নিয়ে আসি।'

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, চা আনতে হবে না।'

'কেন?'

'চা আমি এখন খাব না।'

'কখন খাবেন তাহলে?'

'পরে।'

'তাহলে এখন একটু জল খান—দুটো মিষ্টি নিয়ে আসি।'

'না না, ওসব করতে যেও না।'

'কেন দাদা', এবার মায়া বললে, 'গরীব বোনের খরচ হবে বলে খাবেন না?'

'না, ঠিক তা নয়', আমি বললাম, 'প্রথমত আমি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার অতো লোভ নেই আমার। দ্বিতীয়ত তোমাদের এখানে যখন আমি এসেছি খেতে তখন আমাকে হবেই। তাই অতো তাড়াতাড়ি করার কি আছে বোন?'

সম্ভবত আমার এই 'বোন' সম্বোধনে মায়ার মায়ের মনে সঞ্চিত মেঘটা কেটে গেল। ঘরের দরজার সামনে এসে তিনি বললেন, 'তা হলেও যখন এসে পড়েচো এখানে—একটু জল তো তোমাকে খেতেই হবে!'

'সেটা কি পরে হলে হয় না মা?'

মায়ার মা কেমন যেন নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। বুঝলাম জলখাবার খাওয়ার প্রসঙ্গ থেকে মা যেন ছিটকে কোথায় কোন দূরে চলে গেলেন। কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল মা, মায়া ও আমার মধ্যে। তীব্র অনুভূতি-প্রবণ মেয়ে মায়া—সে বুঝতে পারল পরি-

স্থিতিটা। আমার পক্ষে সে সময় কোন কিছু উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। কারণ আমি তখনও ওদের সব কিছু সম্পর্কে ছিলাম অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত। মায়া তাই সেই অবস্থার আবরণ উন্মোচন করে দিলে একটি কথায়, 'আপনিমা বলে ডাকতে আমার দাদার কথা মনে পড়ে গেছে মায়ের।'

আমি মায়ার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালাম। পরক্ষণে মায়ের দিকেও দৃষ্টি পড়ল। দেখলাম মায়ের দু' গালে তখন মুক্তোর মত অশ্রুধারা। তখনই সংক্ষেপে মায়া জানালো আমায় সমস্ত ব্যাপারটা। বাবা মারা গেলে দারিদ্র্য আর অনাহারে, আত্মীয়স্বজনের অহেতুক আক্রমণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে লাঞ্ছিতা মাকে একদিন ছেলেমেয়েদের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। তারপর তিনি এসে উঠে-ছিলেন এইখানে—এই অভিশপ্ত বস্তির রাজ্যে। এই রাজ্যের সম্রাট যে লোকটা সেই লোকটা সেদিন ভার নিয়েছিল তাদের ভরণপোষণের। দাদার বয়স তখন বছর পনেরো-ষোল হয়ে। উঠতি সা-জোয়ান সুন্দর চেহারা দাদার। শুধু অনাহারের রুক্ষ-কালো স্পর্শ ছিল তার চোখে-মুখে। খণ্ডিত-সম্রাটের করুণায় কয়েকদিনের মধ্যেই মা ও মায়ার সঙ্গেই দাদাও ফিরে পেল তার হৃত শক্তি ও রূপ। কিন্তু সেই [illegible] সর্বনাশের পথ। খণ্ডিত-সম্রাটের হাতে তখন সে সম্পূর্ণ বন্দী। সেদিন মা-ও বোঝেন নি, দাদাও বোঝে নি—এ কোন্ জগতে এসে নীড় বেঁধেছে তারা। প্রথম প্রথম দাদা পুলিশের হাতে ধরা পড়ত, দু' মাস তিন মাস করে জেলে থাকত, আবার বাড়ি ফিরে আসত, আবার জেলে যেত। কিন্তু তারপর কি যে হল—এক খুনের মামলায় তার বছর দশেক জেল হয়ে গেল। সেই থেকে সে জেলে। তাই যখন এ বাড়িতে দাদার মতই আরেকজন মাকে 'মা' বলে ডাকল, আবার যখন একজোড়া ভাই-বোনের স্নেহ-ভালবাসা প্রত্যক্ষ করা গেল তখন মায়ের মনটা ভারাক্রান্ত না হয়ে উঠবে কেন? আর দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত সেই অতীত কাহিনীর নিঃশব্দ প্রকাশে অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টিই বা হবে না কেন?

মায়ার মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমি রীতিমত চমকে উঠলাম আর তার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্রতি আমার সমস্ত সহানুভূতি, সমস্ত আবেগ যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। এ মা তো অসৎ নন, এ মা তো জীবনের যাত্রাপথে এই অভিশপ্ত পরিবেশকে বাসনা-কামনার অগ্নিদগ্ধ অতৃপ্তি নিয়ে বরণ করে নেন নি—গোটা দেশ ও জাতির গলিত সমাজের ধাক্কায় তিনি ছিটকে এসে পড়েছেন এখানে। আমি মনে মনে মাথা নোয়ালাম তাঁর পায়ে।

নিমেষের মধ্যে আমি বুঝে নিলাম এ মায়ের সংগ্রামী জীবনের শেষ বোধ করি আজও হয় নি। এই পরিবেশ থেকে এখনও তিনি চেষ্টা করছেন মেয়েটাকে কোনরকমে বাঁচাতে। তাই হয়তো অন্ধ-গায়ক-সাজা লোকটার সঙ্গে ভিক্ষা করতে পাঠিয়ে দেন তাকে মাত্র দৈনিক দুটো টাকা রোজগারের আশায়। তবু তো এটা মন্দের ভাল। তবু তো এতে সর্বনাশের পথ থেকে মেয়েটাকে দূরে রাখা যাবে!

এবার মাকে বুঝতে আমার আর কোন অসুবিধা হল না। মেয়েকে সাধু-সন্ন্যাসী ধরে আনতে দেখে মায়ের বোধ হয় মনে হয়েছিল, মায়া তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সোজাসুজি কোন পথ ধরতে চাইছে এবং সে পথে সন্ন্যাসী যদি প্রতারক হয় (যা হওয়া তাঁর কাছে স্বাভাবিক) তবে মেয়েটার যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে, সেই কথা ভেবেই মা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি এবং মেয়ের ওপরেও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন মায়ার সঙ্গে আমি ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছি, তখন তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন এবং শুধু আশ্বস্তই নয়, তিনি তাঁর বুকে কারারুদ্ধ সন্তানের শূন্য স্থানটিতে আমাকে স্থানও দিয়ে ফেললেন। আর তারই প্রকাশ দেখা গেল তাঁর ঐ কান্নায়।

অনেক কথা হল এর পর মায়ের সঙ্গে।

কথাটা বলে রাখি আগে। আমার থাকা-খাওয়ার জন্য আমি তাঁকে কোন খরচ করতে দেব না, এটা আমি স্থির করেই রেখেছিলাম এবং জোর করে আমি তাঁকে সে জন্য কয়েকটা টাকাও হাতে দিয়েছিলাম। কিন্তু চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তিনি বলেছিলেন, 'এমনি করে একদিন আরেকজনের টাকা হাতে করে নিয়ে সর্বনাশ করেছিলুম বাবা! শেষ-কালে তুমি, তুমি দেখো বাবা...' এর পর আর তিনি বলতে পারেন নি, কেঁদে উঠে-ছিলেন আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে। আমিও চোখের জল রোধ করতে পারি নি—সজোরে তাঁর হাত দুটো চেপে ধরে বলে-ছিলাম, 'সেদিন আপনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, ঠকেছিলেন—কিন্তু আজ আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছে মা। তা ছাড়া আজ যেটা আপনার ভয় সেটা আপনার মায়ার সম্পর্কে। কিন্তু মা, মায়া তো আমার কাছে আর কেউ নয়, পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটা বোন। ঘটনাচক্রে একদিন

আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। পথে কুড়িয়ে পাওয়া এই মেয়েটির কথা আমার মনে থাকবে।'

মায়া ছেলেমানুষের মত বলে উঠেছিল, 'যেতে দিলে তো!'

মা কান্নামুখেই হেসেছিলেন।

অতঃপর কথা চলল এগিয়ে।

মা জিগ্যেস করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

বললাম, 'নাই বা জিগ্যেস্ করলেন মা!'

'বাপ-মা আছেন?'

'আছেন।'

'তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তাঁরা দুঃখু করবেন না?'

'সেটা তো খুব স্বাভাবিক মা।'

'তা হলে তোমার কি এটা উচিত কাজ হয়েছে বাবা?'

'সাংসারিক মানুষের দৃষ্টিতে ঠিক হয় নি—কিন্তু আমি তো সংসারী মানুষ নই মা—তাই আমার দিক থেকে কি আমি ঠিক করি নি?'

মা এর কি উত্তর দেবেন? দুঃখ-জ্বালায় নির্যাতিত জীবনের চক্ররেখায় চলতে চলতে তিনি চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছেন। অন্ধ পুত্রস্নেহ আর কন্যা-স্নেহের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যে তাঁর আপন জগৎ। সে জগতের বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি কেমন যেন নিষ্করুণ বিশুষ্ক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তবে আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে, 'কি জানেন, গেরুয়া পরেছি বলেই আমি ঠিক গেরুয়া-মার্কা সন্ন্যাসী নই। জীবনের চলার পথে সংসারকে ফাঁকি দিয়েও আমি সন্ন্যাসী হতে চাই নি—শুধু একটি উদ্দেশ্যই আমার জীবনে আছে, সে কথা সময় এলে আপনাকে আমি বলে যাব মা। এখন যেন আমায় ভুল বুঝবেন না।'

মা কথাগুলো স্থিরভাবেই শুনলেন। মায়াও শুনল। মা কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মায়া বলে উঠল, 'তা হলে সে উদ্দেশ্যটা আপনার কি?'

বললাম, 'সেইটেই তো এখন বলতে চাইছি না।'

কথায় কথায় সেদিন রাত হয়ে গেল অনেক। রাত্রির অভিশপ্ত জগৎ। অদ্ভুত সব চিৎকার, শব্দ, মাতালের প্রলাপ, গান, হুল্লোড় আর কাতরানি সবই চলেছে এক [illegible] রাজেনের মত। মায়াদের সেই একটিমাত্র ঘর। একদিকে শুয়েছেন মা তাঁর স্নেহের কন্যাকে বুকে নিয়ে, আমি শুয়েছি আরেক পাশে। আমার গেরুয়ার পুঁটুলিতে ছিল কম্বল। তাই বিছিয়েই আমার শয্যা। আমি নাকি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ। আমাকে এই কম্বল-শয্যাতেই মানায়!

নতুন জায়গা। নতুন পরিবেশ। অনেক রাত হয়েছিল ঘুম আসতে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না—ঘুম ভাঙল একেবারে নারীকণ্ঠের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আগেই বলেছি মায়াদের দাওয়াটা রাতে ভাড়া দেয়া হত। ভাড়াটে যে সে হচ্ছে পাঁচির মা। পাঁচির মা তার বছর সাতেকের পাঁচি আর কোলের খোকাটাকে নিয়ে রাতে এখানে ঘুমোয়। ভাড়া দেয় মাসে পাঁচ টাকা। সে চিৎকার করে বলছে, 'ডাইনি মেয়েছেলেকে আর আমি ছেলে দোব না, দোব না, দোব না!'

আরেকটি মহিলা বলে উঠল, 'আমি ডাইনী ভালখাকি? তোর ছেলেকে আমি কি না খাওয়াই! সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তিন টাইম তিনপো দুধ খাওয়াই। দুটো করে ছ'টা সন্দেশ খাওয়াই, কলা, পেঁপে কিছু বাদ দিই না। আর তুই বলবি আমায় ডাইনী?'

ডাইনী না তো কি, পাঁচির মা বললে, 'দ্যাখ্ দিকি মাগি ছেলের পাছাটা খিম্‌চে খিম্‌চে নখ বসিয়ে দিয়িছিস্ কি রকম? ছেলেকোলে সোহাগ করে বাবুদের কাছ থেকে পয়সা চাই নি, তখন কি তোর খেয়াল থাকে ছেলেকে কতখানি খেমচালি? মাগো, বাছার পাছাটা একেবারে দাগড়া-দাগড়া হয়ে গ্যাছে।'

প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলাটি বললে, 'তাহলে তুই ছেলে দিবি না?'

'না না না', পাঁচির মা চিৎকার করে উঠল।

ঘরের ভেতরে মায়া আমাকে বললে, 'বুঝতে পারছেন দাদা ব্যাপারটা?'

বললাম, 'অন্ধ গায়ক যদি তোমাকে দু' টাকা রোজে নিয়ে যেতে পারে, ছেলে ভাড়া নিয়ে ওই বা ব্যবসা চালাতে পারবে না কেন?'

'ধরেছেন তো ঠিক দেখছি।'

এই সেই জগৎ, যে জগতের রহস্য আজও অজানা।

(চলবে)

[১১৩৪ পৃষ্ঠার পর]

কোন কথাই মনে রাখি নি। কই, তিনি তো আমায় বিশ্বাস করতে পারলেন না? মালদার গাজোল থানার ও-সিকে বদলীর আদেশ দিয়েছি। তিনি যদি আমায় বলতেন, তাহলে কি আমি শুনতাম না? তিনি নিজে আদেশ দিয়ে আমার আদেশ নস্যাৎ করে দিলেন। এমন কি সরকার পরিচালনা-বিধির ২১ (৩) ধারা প্রয়োগ পর্যন্ত করলেন। কেন এমন হবে? এতো ঠিক ১৯৬৭ সালের মত করছেন তিনি। সেই দিনও যেমন পে-কমিশনের সদস্য নিয়োগে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন, এখানেও তো সেই একই অবস্থা। শুধু কি তাই, সরকারকে অসভ্য, বর্বর বলে পরোক্ষে তো আমার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন—তবে আর কিসের সমঝোতা? কিসের সৌজন্য?

এই দুই মনের সঙ্গে আরো দুটো ভাবনা এগিয়ে চলেছে। বাংলা কংগ্রেস ভাবছে সি-পি-এম কোনভাবেই নিয়ম মেনে শান্তভাবে যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবে না। বিপাকে পড়লে সাময়িকভাবে হয়তো মেনে নেবে, কিন্তু পরেই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কাজেই এখনই যদি ফয়সালা করা না যায়, তবে আর কোন দিন বাগে আনা যাবে না, রাজ্য জাহান্নামে যাবে।

বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে সি-পি-এম-এর ভাবনা হল—ওরা সরকার ভাঙতে, আমাদের বাদ দিয়ে সরকার গড়তে বদ্ধপরিকর। যত সমঝোতা হোক, আমরা যত মেনে নিয়ে মানিয়ে চলবার চেষ্টা করি না কেন, ওরা আমাদের সরকার থেকে বাদ দেবেই—শুধু অপেক্ষা করছে সময় ও সুযোগের।

দুই পক্ষের দুই নেতা আর দুই পক্ষের দুই দলের এই মানসিক পরিস্থিতি সংক্রামিত হয়েছে তাদের অনুগামী অন্য দলের মধ্যেও কমবেশী করে। সংক্রামিত হয়েছে দলের সদস্য কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে—তাই আজকের ফারাক দুস্তর থেকে দুস্তরতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুই পক্ষই দাঁত থাকতে দাঁতের মর্মটা বুঝছেন না—দাঁতটি পড়লে হয়ত বুঝবেন, কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকবে না।

মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী দু'জনেই বলছেন—আসুন আলাপ-আলোচনায় বিরোধ মীমাংসা করি, কিন্তু পারছেন না এগিয়ে আসতে। ঠিক একইভাবে বিধানসভা বসলো কিন্তু বসলো না যুক্তফ্রন্ট পরিষদীয় দলের কোন সভা। এই ট্রাজেডী চলেছে এবং এই ট্রাজেডির মধ্য দিয়েই হয়ত সরকারের পতনের ঘণ্টা বাজবে, কিন্তু আরো কথা আছে, সে কথা আগামী-বারে বিস্তারিতভাবে বলবো। (চলবে)

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

॥ বাইশ ॥

অচল পা সচল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন ছুটেছে আরও জোরে। বিশেষ করে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে জীবেন দত্ত—যার নানা ঘটনা, নানা কথা তার আশাবাদী বিপ্লবী রক্তকে চঞ্চল করে তোলে। একদিন কাউখালির সেই অরণ্য-বাসে বিনিদ্র এক রাতে, পরিত্যক্ত সেই বাতিঘরের গম্বুজ থেকে তন্দ্রায় নিঝুম দূরের অন্ধকার গ্রাম-গ্রামান্তরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে হয়েছিল-- অতিকায় দানব একটা এ দেশের ওই সব গ্রামে গ্রামে তার অঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। সেদিন প্রশ্ন ছিল—কেমন করে জাগবে সে? তাদের মত কতজনের আত্মদানে সে জেগে উঠবে? আর আজ, চরের এই একান্তে, যমুনার এই অন্ধকার ঝুপড়ি টঙের মধ্যে থেকে মনে হয়—সেই দানবটা যেন অঙ্গ আড়ামোড়া দিয়ে জাগছে —অন্তত এই চরে।

সেদিন রাতে যমুনা ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এসে তার আঁচলের তলা থেকে এক-গোছা নতুন-পুরনো খবরের কাগজ বের করে দিলে।

জীবেন সাগ্রহে হাত বাড়ালো।

যমুনা বললে, "পড়া শেষ হলে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছে গোঁসাই।"

"তা পুড়িয়ো—পুড়িয়ে ভাত রেঁধো।" জীবেন হেসে বললে, "আগে তো পড়ি।"

কতদিন পরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে এই যোগাযোগ!

যমুনা দেখলে—লণ্ঠন টেনে নিয়ে লোকটা কাগজের সেই ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর-গুলোর মধ্যে মুহূর্তে যেন হারিয়ে গেল। আঁচলের তলা থেকে কাগজের গোছা বার করতে গিয়ে কখন যে তার বুকের আঁচল খসে পড়েছে—লোকটাও চোখ তুলে এক-বার দেখে নি, সে নিজেও না। তাড়াতাড়ি কাপড় সামলে কুঁড়ের বাইরে বেরিয়ে এল।

অন্য লোক। অন্য জগতের লোক।...

সে হারিয়ে গেছে। সুদূরে বিশ্ব—কত বিচিত্র জাতি-উপজাতি যেন এক সঙ্গে কলরব করে উঠেছে তার চোখের সামনে। সেখানে নানা উত্থান-পতন—শিবিরে শিবিরে নানা সাজ-সজ্জার খবর। ইটালি... জার্মানী...আয়ারল্যান্ড...রাশিয়া। মুসোলিনী ক্ষমতাসীন...জার্মানীর ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন...হিটলার চ্যান্সেলার। ইংল্যান্ডের ইন্ধন। ফ্রান্সের বিক্ষোভ। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুসম্পূর্ণ...অন্তর্ঘাতী কার্য-কলাপের দায়ে ইংল্যান্ডের ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম মেট্রোপলিটান 'ভিকার্স'। আন্ত-র্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দায় আমেরিকার 'নিউ ডিল'। বাঁচার তাগিদে সেখানে চীৎকার—পাল্টা চীৎকার। ভারতবর্ষের কণ্ঠ শুধু রুদ্ধ। সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্তব্ধীভূত। তার নেতারা কারারুদ্ধ। তার সব প্রতিষ্ঠান—অনুষ্ঠান বেআইনী। তার অফিস তালাবন্ধ। তার সম্পদ-সম্পত্তি—ফান্ড মায় কাগজ-পত্র—সব বাজেয়াপ্ত। তাদের নিজেদের বিপ্লবী দলও ছিন্নভিন্ন—অনেকে যাবজ্জীবনের মতো বন্দী। গুজরাট থেকে বাংলা, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা—চেপে বসেছে ইংরেজের পীড়নযন্ত্র। জেলে ঢুকেছে এক লাখ বিশ হাজারেরও বেশি। সত্যাগ্রহী নেতাদের সব আপস প্রস্তাব ইংরেজের উদ্ধত বুটের তলায় লাঞ্ছিত—পিষ্ট। আলো কই? আলো কোথাও নেই।

যেমন করে চারদিকের জমাট অন্ধকার এই ছোট কুঁড়েটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে, তেমনি একটা আশাশূন্য, উদ্দেশ্য-শূন্য, পথ্যাশূন্য অন্ধকার যেন জীবেনকেও ঘিরে ধরে। এর পর কোথায় যাবে, কি করবে? সারা রাত একটা খাপছাড়া উদ্ভট দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল।

ভোরের আগেই তার ঘুম ভাঙলো। বাঁশের দরজা হাট করে খোলা। বোধ করি ওটা বন্ধ করে দিতে যমুনা ভুলেই গেছে। নিত্যকার মতো শুয়ে আছে দরজা আগলে কাঁথা মুড়ি দিয়ে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। কিন্তু কর্তব্যে তার ত্রুটি নেই।

জীবেন দুর্বল পা-টা টেনে ওঠবার চেষ্টা করলো।

তাতেই যেটুকু শব্দ হলো—যমুনা জেগে গেল। বলে উঠল, "থাম থাম গোঁসাই—মোকে ধরতে দাঁও।"

"পারব।" জীবন উঠে দাঁড়াল। বললে, "দেখি নিজে হেঁটে।"

সন্তর্পণে পা ফেলল—তারপর আরও এক পা। হতাশ চোখে চেয়ে রইল যমুনা। ওকে একটু ধরা—সেটুকুও বুঝি আজ থেকে চুকে-বুকে গেল। মাত্র মুহূর্ত কয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা আড়ষ্টের মত—তারপর হঠাৎ ওর কি হলো কে জানে, পাশে এগিয়ে গিয়ে কোনো নিষেধ-মানা না শুনে এক হাতে চেপে ধরলে জীবনের কোমর।

জীবন বললে, "আর ধরবার দরকার নেই।"

যমুনা বললে, "আমি ধরলে ঘেন্না হয় গোঁসাই? বলো—সত্যি বলো—"

আশ্চর্য! মেয়েটা কেঁদে ফেলেছে।

জীবন অবাক। হঠাৎ এই কান্নার মাথামুণ্ডু সে কিছুই ভেবে পেলে না। যমুনার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, "ছিঃ যমুনা দিদি! দিদিকে কেউ ঘেন্না করে?"

"কিসের দিদি গোঁসাই। তুমি কে—আমি কে!" যমুনা ঢোক গিলে বললে, "আমি কাঙাল—ফকির।"...

জীবন বললে, "তারাই আমার দিদি। এখন চলো—আমায় একটু দাওয়ায় বসিয়ে দাও।" বলে ওর কাঁধে একটা হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল।

জীবনকে এক কোণায় বসিয়ে দিয়ে যমুনা বললে, "বাইরে বড্ড ঠান্ডা যে গোঁসাই!"

"এই বাইরে—দাওয়ায়, তুমি যে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিলে দিদি!"

"মোর কথা বাদ দাও গোঁসাই। মোদের সব সয়ে গেছে।"

"আমারও অভ্যাস আছে। ও শীত-গ্রীষ্ম — ঝড়-জল — পথ-বিপথ — সব।" জীবন হেসে বললে, "দিনের পর দিন না খেয়েও। ও শুধু তুমি একাই বড়াই করে বলতে পারো না—আমিও পারি। বুঝলে—সে সব তুমি যদি শোনো যমুনা দিদি—"

একজন হয়তো সব ছেড়ে বেরিয়েছে—আর একজনের কিছুই নেই। একজনের অনশনের কঠিন পণ—দুঃসাধ্য কঠিন ব্রতের পথ, আর একজনের ভিক্ষার অন্ন—জুটলে খায়, নয় তো নেই। দুটো যে এক নয়—এ যমুনা বোঝে, জীবন যতোই বলুক। সে অনেক সময়ে এই লোকটার কিছু কিছু জীবন-কথা শুনে যেমন বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে—তেমনি করে চেয়ে রইল।

জীবন বললে, "আজ থেকে তুমি ঘরে—আমি বাইরে। এই ঠান্ডায় তুমি শুয়ে থাকতে পারো আর আমি পারবো না! এইখানে আমি দিব্যি শুয়ে থাকতে পারবো।"

যমুনা হাত জোড় করে বললে, "দোহাই গোঁসাই, তুমি দেশের ভাল করতে বেরিয়েছ—করো, আমার আর ওই ভালো-টুকু করতে হবে নি। যাই হোক, তোমাকে নাড়া-চাড়া করছি বলে সানো কত্তা আর ডাক্তারবাবু তবু একটু মুখ তুলে চেয়েছে। তুমি বাইরে শুয়েছ জানলে মোর এই ঝুপড়ি টুকুও আর থাকবে নি। রক্ষা করো গোঁসাই। যাই—তোমার গরম জল আনি।"

যমুনা গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

জীবন বসে রইল দূরে আবাদের দিকে চেয়ে। একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। এরই মধ্যে মাঠের মানুষ নেমে পড়েছে মাঠে। দূর থেকে দেখা যায়—কালো কালো মূর্তিগুলি, যেন খুদে খুদে পোকার মত—দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়েছে সারা মাঠে। ধান কাটছে, বোঝা বাঁধছে—বোঝা তুলছে। যেন একটা দ্রুত কাজের সাড়া। সারা মাঠের ধান এখনো ভালো করে পাকে নি। কোথাও কোথাও হলুদ রং ধরেছে মাত্র। তাকেই কাঁচা-পাকায় তোলার যেন একটা তাগিদ।

বসে বসে তা-ই শুধু অলসভাবে দেখা আর মনে মনে পথ খোঁজা। কি করবে জীবন দত্ত?

এক সময়ে জীবন জিজ্ঞেস করলে, "চৌধুরী মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যমুনা দিদি?"

যমুনা বললে, "না। তাঁর কাজে তিনি মেতে আছেন। শুনলাম ঘুরছেন পরগণায় পরগণায়। ডাক্তারখানায় রোজ আর আসেন না। গ্রামে গ্রামে শুনি, এক কথা—ভলান্টিয়ার।"

জীবন সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, "কিন্তু কি হবে! কিছু শুনেছ?"

যমুনা শুকনো গলায় বললে, "চরের লোক মোকে বিশ্বাস করে নি—শুনবো কি করে গোঁসাই! তবে কিছু একটা হবে। তার তোড়জোড় চলছে—বুঝতে পার। হাই দেখ—চাষীরা ধান ভাল করে পাকতে না পাকতে কেমন করে বোঝা বেঁধে ছুটছে।"

"দেখছি।"—

জীবন আস্তে আস্তে টেনে টেনে বললে। বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটা মানুষ—যেন অন্ধকার থেকে কথা বললে। আপশোস করে বললে, "চৌধুরী মশাই অনেক দিন আসেন নি।"

"খবর তো দিয়ে এসেছি গোঁসাই।" তারপর একটু থেমে বললে, "লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতে হয় তাঁকে। হুটর হুটর করে আসা তো তাঁর ভালো নয় গোঁসাই। মোর দিক থেকেও বটে—আবার তোমার দিক থেকেও বটে।"

"আমার দিক থেকে কথাটা বুঝলাম।" জীবন খুব সহজ সরল কৌতূহলে জিজ্ঞেস করে বসল, "তোমার দিক থেকে কেন?"

এ যেন খিকানো আগুনে অনবরত খোঁচা। যেন ভরা কলসীতে অনবরত আঘাত। আজ ভোর হলো কি কুক্ষণে! যমুনার চোখ ফেটে জল উছলে পড়ল। ধরা গলায় বলে ফেললে, "আমি ভালো নয় গোঁসাই—ভালো নয়। সবাই বলে। তিনি মানী লোক—মোর ঢের বদনাম। ঢের!...তুমি কেন এসে পড়লে মোর ঘরে!...সব দিকে তুমি তালগোল পাকিয়ে দিলে মোর।"

মেয়েটা যা-ই হোক, তার কান্নাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে জীবন নিঃশব্দে হাসল একটু। সে বড় বিশ্বাসের হাসি। সকৌতুকে বললে, "তবে কি আমাকে এবার চলে যেতে বলছ যমুনা দিদি।"

যমুনা চোখ মুছে চুপ করে রইল। একটু বাদে আস্তে আস্তে বললে, "একদিন চলে যাবেই তো গোঁসাই।"

"কোথায়?"

"যেখানে তোমার নিজের লোকেরা থাকে।"

"নিজের লোক!" বোধ করি নিজের মনের তলায় ডুব দিয়েছিল জীবন। জবাব দিতে তাই দেরি হলো। আস্তে আস্তে বললে, "সেই নিজের লোক খুঁজতে খুঁজতে, অনেক ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে এখানে ছিটকে এসেছি যমুনা দিদি। নিজের লোকই খুঁজছি। কে জানে—তারা কেউ এখানে আছে কি-না!"

কি জানি—কি বুঝল যমুনা। বললে, "কথায় মোকে ভুলিওনি গোঁসাই। হেথায় তোমার নিজের লোক কেউ নাই।"

"কে জানে!" রহস্যময় হেসে জীবন

# তেইশে জানুয়ারী/সুভাষচন্দ্রকে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

তুমি,
পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখো—
পাঁচ-সাত নয়,
গুনে গুনে গুণবান চোদ্দ শরিক,
কাছে-দূরে
কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে,
আমরা।
প্রমোদ-জ্যোতি-সুশীল-অজয়,
আমরা সকলে এখন

এবং—

কংগ্রেস 'হালফিল', কংগ্রেস 'বুনিয়াদী',
বোম্বাই, আমেদাবাদী,
ত্রিবান্দ্রামও ইত্যাদি—
সারাটা ভারতবর্ষময়,
বিপ্লব আর সমাজতন্ত্রকে
নয়-ছয়
একটা মস্ত পাহাড়ী শামুকের পিঠে চাপিয়ে—
টেনে-হিঁচড়ে, গড়িয়ে-গড়িয়ে
আমরা কয়েকটা ক্ষুদে পিঁপড়ে
কী ভয়ানকভাবে আজ এগিয়ে নিয়ে আসছি!

তুমি,
পাঁচমাথার ঐ বাঁধানো চত্বরে
হতবাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো—
কোনো কথা বলো না।
ঐ মরা ঘোড়ায় চ'ড়ে,
স্রেফ্ পাথর হয়েই থেকো—
খবরদার নড়ো-না চড়ো-না।

কারণ,
এই তেইশে জানুয়ারী,
একটা টনক নড়ারই দিন,
রেগে ওঠারই সময়।
দিল্লী থেকে বাংলা,
ইন্দিরা-পাতিল, প্রমোদ-অজয়—
দেখতেই পাচ্ছো,
আমরা প্রত্যেকে এখন
কী ভীষণ বিপ্লব-বিপ্লব করছি।
সমাজতন্ত্রকে চেঁচে-ছুলে খাপ্‌সুরত করছি।
কোনো গোলযোগ না হয়!

দেখছ ত' বরাবরই—
এবারও এই তেইশে জানুয়ারী,
ঠিক বেলা বারোটা দশ মিনিটে,
তোমার বয়েসের পিঠে—
হিসেব করে তেমনিই তোপ দাগা হবে।
মেয়েরা বাড়ি-বাড়ি
আরও জোরে শাঁখ বাজাবে।
বাচ্চারা মিনি-ফ্রকে, যুবকেরা চোঙা প্যান্ট প'রে—
বিগ্‌ল ফুঁকে,
তোমার জন্য টাট্‌কা মালা নিয়ে যাবে।

তুমি,
পাঁচমাথার ঐ মোড়ে,
ফ্যালফ্যাল ক'রে,
শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখো—
না, কোনো কথা বলো না।
নিশ্চয়ই কিছু বক্তৃতাও করবো,
উপায় নেই না ক'রে;
ঐ মরা ঘোড়ার পিঠে সামিল হ'য়ে
স্রেফ্ পাথরের মতই থেকো—
ভুলেও ন'ড়ে উঠো না।

বললে, "কাল সারা রাত সেই নিজের লোকেদের সন্ধান করেছি যমুনা দিদি। কোথায় যাই?" হেসে বললে "যদি তাড়িয়ে দাও তো চলে যাই থানায়। কতদিন আর ভূতের মতো লুকিয়ে-চুরিয়ে থাকি! আমাকে পেলে নিশ্চয়ই তারা তোমার চেয়ে আজ খুশি হবে যমুনা দিদি।"

"ও কথা আমি যদি বলে থাকি—হেই গোঁসাই, মুখে মোর পোকা পড়বে—পোকা পড়বে। আমি ঘাট মানছি। ঘাট মানছি।" বলতে বলতে যমুনা যেন জীবনের ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাল। বলতে বলতে গেল, "আমি তোমাকে কোনোদিন যেতে বলবোনি। সে সানো কর্তা আর ডাক্তারবাবু—যেদিন যেতে বলবে, তোমাকে যেতে হবে।"

এই গ্রাম্য মেয়েটা—কে জানে কি ওর অতীত, হয়তো নিন্দার, হয়তো ঘৃণার। তবু ওকে ভালো লাগে জীবনের। এ যেন জীবনের নতুন একটা আস্বাদ। ওর সেবা, ওর নীরব উষ্ণ স্পর্শ, ওর সতর্ক প্রহরা—মাঝে মাঝে ওর করুণ-কাতর হীনমন্যতা—সব মিলিয়ে ও যেন তার একটা আবিষ্কার।

সূর্য উঠে পড়েছে দিগন্তের বন-রেখা ছাড়িয়ে। দূরে—জেলা বোর্ডের রাস্তায় কিছু লোকজন দেখা যায়। বোধ-করি আজ হাটবার। কামার চলেছে—কুমোর চলেছে, সব্জীচাষী চলেছে মাথায় পসরা নিয়ে। জেলে চলেছে, কাঁধে জাল—হাতে খালুই। সারি দিয়ে চলেছে হাটুরে। মাঠের এখানে-ওখানে কর্মরত কিষাণ। দূরে কিষাণপাড়ায় উঠেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—ভেসে চলেছে হিমেল উত্তুরে হাওয়ায়। অনেক দূরের কোনো খামারবাড়ি থেকে ভেসে আসে কচিৎ কখনো এক-আধটা কুকুরের ডাক অথবা মোরগের তীক্ষ্ণ চিৎকার। আবার মিলিয়ে যায় দিগন্ত থেকে দিগন্তজোড়া জমাট নিঃশব্দতায়। আর কোনো সাড়া নেই—চাঞ্চল্য নেই। কেমন একটা সীমাহীন, অর্থহীন শূন্যতা যেন অসহায় সত্যের মত জীবনের সামনে থম্ থম্ করছে। এর মধ্যে সানো কর্তার পরগণায় পরগণায় ঘোরা—আর ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহের আয়োজন কেন, কি উদ্দেশ্যে—জীবেন ভেবে পায় না। তার কোনো চিহ্ন, কোনো চাঞ্চল্য তার চোখে পড়ে না।

দিন গেল অলস চিন্তায়। সেদিন রাতের অন্ধকারে এসে দাঁড়াল সানো চৌধুরী। বাইরে থেকে ডাকল, "যমুনা!"

গলা শুনেই চিনতে পেরেছে যমুনা। ধড়মড়িয়ে বাঁশের আগড় খুলে বাইরে এল।

[ ক্রমশ ]

**(১) শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভূমিকা**
**(২) শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌ (প্রথমঃ স্কন্ধঃ)**
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ। সাধনা প্রেস, ৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা (১) ১॥৮+৩১২ (২) ২/০+৯৬৮॥ মূল্য : (১) ১৮·৫০ (২) ৪০·০০ টাকা।

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথের পরিচয় বিদগ্ধজনের কাছে জ্ঞাপন করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি ৯২ বৎসর বয়সেও অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ মেধা-শক্তির সাহায্যে এখনো পর্যন্ত দুরূহ সংস্কৃত ও মধ্যযুগের কাব্য-গ্রন্থগুলির সম্পাদনা-কার্যে যেভাবে ব্রতী রয়েছেন, তা আমাদের কাছে চরম বিস্ময়কর হলেও পরম আনন্দদায়ক ব্যাপার। বলা বাহুল্য, তাঁর ঐ কাজের জন্য তাঁর কাছে সমগ্র বাঙালী জাতির ঋণ অপরিসীম এবং উক্ত সম্পাদিত গ্রন্থগুলি যে কোনো ভাষায় অনূদিত হলে সে-ভাষাতেও অক্ষয় সৃষ্টি হিসেবে সংযোজিত ও সঞ্চিত হবে।

উপরি উক্ত সম্পাদিত গ্রন্থগুলির সামান্য পরিচয়ও এই স্বল্পপরিসর স্থানে দেওয়া অসম্ভব, একথা প্রথমেই স্বীকার করা উচিত। আর যে-সব মূল্যবান গ্রন্থ তিনি সম্পাদনাকালে ব্যবহার করেছেন, শুধু সেগুলির নামোল্লেখ করতে গেলেই কয়েক পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হয়। অন্তত একথা বলা যায়, ঐ গ্রন্থগুলির যে কোনো দশটি যদি কেউ পড়ে একটি নতুন বই লেখেন, তাহলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট হয়ে যাবেন। অতএব আমরা একথা সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহের জন্য ডঃ নাথের সম্পাদিত উপরি উক্ত গ্রন্থ দুটি পাঠকের কাছে মহামূল্যবান গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভূমিকায় বেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ অপৌরুষের কি না ডঃ নাথ তা' বহু প্রমাণ-সহ উল্লেখ ও আধুনিক বিরুদ্ধমত প্রসঙ্গ, বোপদেব সম্পর্কিত অপবাদ। এই অংশে পুরাণ সম্পর্কিত বহু তথ্যের আলোকপাত যেভাবে করা হয়েছে, তা অবশ্য জ্ঞাতব্য। বিশেষভাবে মহাভারতের সৃষ্টি সম্পর্কিত আলোচনা গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করে। তারপর পাই, শ্রীমদ্‌ভাগবতের লক্ষণ সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সম্পাদকের চুলচেরা বিচার। তবে বহু তত্ত্বের আকর ঐ গ্রন্থ হলেও—ভবিষ্যৎ ব্যাপার নিয়েই শ্রীভাগবতের প্রবৃত্তি যা আরম্ভ। তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রধানভাবে উল্লেখ্য এবং যা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত তা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে ভক্তির স্বরূপ, সাধনভক্তির প্রকারভেদ, গুরু-প্রসঙ্গ, জীবতত্ত্ব, জীবের একমাত্র জিজ্ঞাস্য প্রভৃতি। কলির-প্রসঙ্গে জানা গেল, "...সুতরাং কলিযুগের এখনও ৪,২৬,৯৩২ বৎসর বাকী।" 'ধর্মের নবরূপায়ণ' আলোচিত অংশে জড়বাদীদের প্রভাব, বিজ্ঞান ও ঈশ্বর সম্পর্কিত মতামতে অনেকেই দ্বিমত প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় ভক্তি-মার্গে শাস্ত্রবচনের ওপর নির্ভর করে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভূমিকা পাঠের পর শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌ প্রথম স্কন্ধ পড়লে পাঠকরা প্রায় প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে তত্ত্বগুলির মুখোমুখি হবেন। স্কন্ধের প্রতিটি শ্লোকের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় সম্পাদক মহাশয় যে কি পরিমাণ শ্রমদান করেছেন, তা কল্পনাও করা যায় না। তবে সেই শ্রম—দুর্লভ পাণ্ডিত্য থাকার ফলেই সম্ভব হয়েছে। শ্লোকগুলির প্রথমে দেওয়া হয়েছে অন্বয়, পরে অনুবাদ, তারপর ব্যাখ্যা। শ্লোকে ব্যবহৃত এক-একটি শব্দের বা বর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে এমন যুক্তিপূর্ণ সহজ-সরল আলোচনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ঐভাবে সম্পাদক মহাশয় প্রায় হাজার উনবিংশ অধ্যায়ের গৌর-কন্দর্পা মন্দাকিনী টীকা সমাপ্ত করেছেন।

জানা গেল, ডঃ নাথ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম খণ্ডের সম্পাদনার কাজে ব্রতী রয়েছেন। আমরা আশা করি, তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের সম্পূর্ণ সম্পাদনার দ্বারা বাংলা সাহিত্য ও বৈষ্ণব দর্শনের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করবেন। পরিশেষে সুযোগ্য প্রকাশককে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কারণ যে ব্যয়বহুল কাজে 'সাধনা প্রকাশনী' আত্মনিয়োগ করেছেন, বাংলাদেশে তা আদর্শস্থানীয়। কোনো-রকম ব্যবসাবুদ্ধি থাকলে প্রকাশক মহাশয় এমন ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ করতেন না।

সর্বশেষে বলা উচিত, এই ধরণের গ্রন্থসমূহ প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এবং বর্তমানে সরকার অন্তত পাঠাগারগুলিকে আলোচ্য গ্রন্থগুলি ক্রয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন। সাধারণ জ্ঞানান্বেষী পাঠকদের পক্ষে অধিক মূল্যের গ্রন্থ ক্রয় সব সময় সম্ভব নয় বলেই পাঠাগারগুলি জ্ঞানবিতরণের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করবেন বলে আমরা মনে করি। যে-কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্পাদিত গ্রন্থগুলি 'সম্পদস্বরূপ' বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না।

দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃহদাকার গ্রন্থ দুটির ছাপার কাজ ও কাগজ উৎকৃষ্ট। জ্যাকেট সহ বোর্ড বাইণ্ডিং উচ্চমানের।

**মহাজীবন** : (১৯৬৯)। মাখন গুপ্ত। সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি। সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম : এক টাকা।

গান্ধীজীর জীবনের ওপর ভিত্তি করে কতকগুলি গান, কবিতা ও কথা দিয়ে রচিত একটি গীতিকাব্য। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ।

**চিকিৎসক সমাজ** : (সম্মেলন ও পর্যটনসংখ্যা, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা ডিসেম্বর, ১৯৬৯) সম্পাদক : ডাঃ অমল ঘোষহাজরা। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

'চিকিৎসক সমাজ'-এর সম্মেলন ও পর্যটনসংখ্যাটি পাঠকদের আনন্দ দান করতে পারবে বলে আমরা মনে করি। অধিকাংশ রচনাই ডাক্তারদের। চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন শঙ্কু মহারাজ, হরি গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ অমিয়কুমার হাটি, রত্নাবলী, ডাঃ এস সি বড়ুয়া, ডাঃ বঙ্কিম চ্যাটার্জী, ডাঃ টি, রামদাস পাই, ডাঃ সদানন্দ পাল প্রমুখ। ডাঃ অরুণকুমার দত্তর রচনাটি ভাল লাগল। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন ডাঃ অরুণ চক্রবর্তী, কবিরাজ কৃষ্ণচৈতন্য

# দুই পথ ঃ কোন্‌টা আজকের বাস্তব?

তুষার চট্টোপাধ্যায়

দশ-বারো বছর আগেকার কথা। কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করার জন্য কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র চলেছে। সেই সময় চীন-প্রত্যাগত একজন বন্ধুর সংগে কথা হচ্ছিল। চীনে থাকার সময় একজন চীনা-বন্ধুর কাছে কেরলের অবস্থা বর্ণনা করায় চীনা-বন্ধুটি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কেরল গভর্নমেণ্ট কেন তার ফৌজ দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারে না? বন্ধুটি যখন জবাব দেন যে, রাজ্য-গভর্নমেণ্টের ফৌজ থাকে না, তখন চীনা-বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করেন ঃ কমিউনিস্ট পার্টিরও ফৌজ নেই কি? ভারতের পরিস্থিতিতে কঃ পার্টির কোনো ফৌজ গড়ে ওঠে নি বা গড়ে ওঠা বোধহয় সম্ভবও নয়—বন্ধুর এই জবাবে চীনা-বন্ধুটি অবাকই হয়েছিলেন।

ঘটনাটা উল্লেখ করলাম ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে চীনের মানুষের অজ্ঞতা জানানর জন্য। উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, চীনের অভিজ্ঞতা থেকে চীনের মানুষের এই রকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এবং চীন-বিপ্লবের গোটা ইতিহাসটাই হচ্ছে একটানা সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস। একের পর এক অঞ্চলে কমিউনিস্ট সরকারের ভিত্তি দৃঢ় হয়ে এবং কুয়োমিনটাং-এর সশস্ত্র প্রতিরোধকে সশস্ত্র কমিউনিস্ট বাহিনী দিয়ে পরাস্ত করেই চীনের বিপ্লব এগিয়েছে। লালফৌজই হচ্ছে চীন কঃ পার্টির অগ্রগতির প্রধান শক্তি। তাই চীনের মানুষের কাছে অগ্রগতির সংগ্রাম মানেই যে সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রাম হবে, তাতেই আর আশ্চর্য কি?

এই প্রসংগে চীনের ইতিহাসের কিছু কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। হু চিয়াও-মু রচিত 'চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিশ বছর' বইতে বলা হয়েছে, "চীন-বিপ্লবে যুদ্ধই হল সংগ্রামের প্রধান রূপ এবং সেনাবাহিনীই সংগঠনের প্রধান চেহারা।" "সাধারণ অবস্থায় লালফৌজ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করবে এবং যুদ্ধের সময় শত্রুকে ঘেরাও করে নিঃশেষ করবার জন্য প্রবলতর শক্তি সমাবেশ করবে—এই হবে লড়াইয়ের প্রধান কায়দা।" "১৯৩০-এ সারা দেশে লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা ৬০,০০০-এ পৌছল। আর মধ্যে ৩০,০০০-এর বেশি কিয়াংসি প্রদেশের কেন্দ্রীয় এলাকায়। ১৯৩০-এ এবং তার কিছু পরে ফুকিয়েন, আনহুই, হোনান, শেনসি, কানসু ও অন্যান্য প্রদেশে এবং কোয়াংতু প্রদেশের হাইনান দ্বীপেও বিপ্লবী ঘাঁটি বিস্তৃত হয়ে পড়ল। লালফৌজের দ্রুত অগ্রগতিতে চিয়াং কাইশেক দারুণ একটা ধাক্কা খেল। ১৯৩০-এর শেষাশেষি চিয়াং কাইশেক কেন্দ্রীয় এলাকায় লালফৌজকে ঘেরাও করার এক অভিযানে এক লাখ সৈন্য পাঠায়। এর মধ্যে দেড় ডিভিশন (২০ হাজারেরও বেশী) লালফৌজের হাতে খতম হল এবং চিয়াং কাইশেকের ফিল্ড কমাণ্ডার হল বন্দী। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারীতে চিয়াং কাইশেক আবার ২ লাখ সৈন্য পাঠায়। এ-অভিযানও পর্যুদস্ত হল। লালফৌজ ৩০ হাজার সৈন্য বন্দী করল এবং ২০ হাজার ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র দখল করল।" ইত্যাদি। স্বভাবতই লালফৌজের এই শক্তি কুয়োমিনটাং-এর সৈন্যদলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইতিহাসে বলা হয়েছে, "কুয়োমিনটাং-এর ২৬ রুট আর্মিকে পাঠান হয়েছিল লালফৌজকে আক্রমণ করতে। তার মধ্যে ১০ হাজার সৈন্য লালফৌজের বিজয়ে প্রভাবিত হয়ে ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে কিয়াংসি প্রদেশে লালফৌজের সংগে যোগ দেয়। এই সব বিজয়ের দরুণ লালফৌজের শক্তি বেড়ে চলল।" এর পরে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে ১৯৩৪-এ কেন্দ্রীয় লালফৌজকে কিয়াংসি প্রদেশের ঘাঁটি ত্যাগ করে ঐতিহাসিক দীর্ঘযাত্রা (লং মার্চ) করে উত্তর শেনসিতে পৌছতে হয় সেখানকার লালফৌজের সংগে মিলিত হয়ে আরো শক্ত ও স্থায়ী ঘাঁটি তৈরী করার জন্য। তার পরের ইতিহাস হচ্ছে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কুয়োমিনটাং-এর সংগে চুক্তি হয়ে মিলিতভাবে জাপ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা। লালফৌজের এই শক্তির জন্যই নিরুপায় হয়ে চিয়াং কাইশেককে স্বীকার করে নিতে হল তাকে এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন ৮ম রুট আর্মি ও নয়া চতুর্থ সেনাবাহিনীর উপর জাপ-প্রতিরোধের সবচেয়ে কঠিন অংশের দায়িত্ব এল। এই দায়িত্ব পালন কিভাবে হয়েছিল তা সকলেই জানেন। মুক্ত এলাকায় ও গেরিলা এলাকার জনসংখ্যা পৌছল ১০ কোটিতে। প্রতিটি [illegible] কঃ পার্টির [illegible] নেতৃত্বে জাপ-বিরোধী জনগণের সশস্ত্র ফৌজ ছিল। এইভাবেই এই জাপ-প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিণত হয় মহান জাতীয় বিপ্লবে, যার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসঘাতক কুয়োমিনটাং-এর উচ্ছেদ হয় ও জনগণতান্ত্রিক চীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনের এই ইতিহাস মহান ও গৌরবময়। এ-ইতিহাসের এক বিশিষ্ট ধারা রয়েছে, যা চীনের মানুষের অস্থি-মজ্জায় মিশে রয়েছে। চীনের মানুষ সেই ধারায় ছাড়া -বিপ্লবের সাফল্য যে ভাবতেই পারবে না, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

কিন্তু ভারতের মানুষকে ভারতের পরিস্থিতির বিকাশধারার মধ্যেই তো বিপ্লবী পথ বেছে নিতে হবে, বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করতে হবে। এবং চীনের পথ না হলেও, সেটা যদি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করারই পথ হয়, তবে তার মধ্যেও চীন-বিপ্লবের অনেক শিক্ষা কাজে লাগাতে পারা যাবে। যারা মনে করে হুবহু চীনের পথ অনুসরণ না করলেই বুঝি চীন-বিপ্লবের শিক্ষাগুলি বর্জন করা হচ্ছে, তারা ভুল করে। কেন না, গণ-ফৌজের একটানা সশস্ত্র সংগ্রামের বিশেষ শিক্ষাটা ছাড়াও আর একটা শিক্ষা আছে চীন-বিপ্লবের। তা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনসাধারণের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার শিক্ষা। চীন-বিপ্লবের শক্তি কারা, এই প্রশ্ন তুলে সেই সময় মাও সে-তুং বলেছিলেন, "চীন দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া।" চীন-বিপ্লবের পর্যায়টা কি, সে-কথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের বর্তমান নীতি হল পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা, উচ্ছেদ করা নয়। আর পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া হল জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে একাধারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও তার সংগে সংগ্রাম করার প্রক্রিয়া এবং তাকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া।" গণ-ফৌজের সংগ্রামটা হচ্ছে রূপ, যা চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে অপরিহার্য হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের অন্তর্বস্তু হল এই শ্রেণীবিন্যাস, যাকে কাজে লাগানই প্রয়োজন বিপ্লব সাধনের জন্য। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই অন্তর্বস্তুকে কাজে লাগানর জন্যই যদি আমাদের দেশের ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন সংগ্রাম-রূপ গড়ে ওঠে, তবে তাতে চীন-বিপ্লবের

শিক্ষা বর্জন করা তো হয়ই না, বরং তার মূল শিক্ষাকেই গ্রহণ করা হয়।

চীনের পরিস্থিতির থেকে ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির তফাৎটা কোন্ দিক থেকে? বাহ্যত দেখলে হয়ত অনেকের ধারণা হবে যে, এখানে যেহেতু গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেস-আন্দোলনের ধারার একটা জাতীয় প্রভাব গড়ে উঠেছে, সেই হেতু সশস্ত্র সংগ্রামের পথটা এখানে বাস্তব হয়ে উঠতে পারে নি বা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সে-পথ অনুসৃত হলেও তা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু এটা হল মনগড়া ধারণা। এই মনগড়া ধারণা নিয়েই অনেকে বলেন যে, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পথই ভারত গ্রহণ করেছে, এখানে বিপ্লবী পরিবর্তনও এই পথেই হবে। এরই সংগে তাঁরা মেলাতে চান সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে এগোবার কথাকে। এরই সঙ্গে মিল রেখে উচ্চারিত হয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা, যার থেকে তফাৎ করা হয় কমিউনিস্ট পন্থার সমাজতন্ত্র গঠনের। হিংসা বনাম অহিংসার প্রশ্নও এই প্রসঙ্গেই ওঠে। কিন্তু এ সবই হল অবস্থার শুধু বাইরেটা দেখা. ভিতরটা নয়।

এ কথা ঠিক যে, গান্ধীজীর পথের একটা ব্যাপক জাতীয় প্রভাব আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এখানের ঐতিহাসিক ধারাটা গান্ধীবাদ দ্বারাই নির্ণীত। তা যদি হত, তবে একমাত্র গান্ধীজীর পদ্ধতিতে ছাড়া আর কোনো পদ্ধতিতে সংগ্রাম এখানে হত না। কিন্তু মোটেই তা নয়। বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ব্যাপকতা সৃষ্টির দিক থেকে গান্ধীজীর পথের বিশিষ্ট ভূমিকা থাকলেও সেটা জনসংগ্রামের অন্যতম একটা পদ্ধতিই হয়েছে, একমাত্র পদ্ধতি হয় নি। ঐতিহাসিক নিয়মেই জন-সংগ্রামের ধারা গড়ে তুলেছে জনসাধারণই, গড়ে তুলেছে তাদের সংঘশক্তি ও চেতনার ভিত্তিতেই। সে-সংগ্রামের মধ্যে গান্ধীজীর পদ্ধতিও আছে, আবার গান্ধীজী কর্তৃক সম্পূর্ণ অস্বীকৃত যে-পদ্ধতি, তাও আছে। তা যদি না হত, তাহলে আইন-অমান্য বা অনশন সত্যাগ্রহ থেকে আরম্ভ করে ধর্মঘট ও জঙ্গী প্রতিরোধ পর্যন্ত সকল পদ্ধতিই গণ-সংগ্রামে দেখা দেয় কেন? আসলে, একমাত্র গান্ধী-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী স্বল্পসংখ্যক মানুষ ছাড়া ব্যাপক জনসাধারণের কাছে সংগ্রাম-পদ্ধতিটা বরাবরই হয়েছে অবস্থা-নির্ভর এবং তাই অধিকাংশ গণ-সংগ্রামের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সংগ্রামটা আরম্ভ হয় অনেকটা গান্ধীপদ্ধতিতে, কিন্তু সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে তা জঙ্গী রূপ নেয়। গান্ধীজী কি বলেন না-বলেন, সে-প্রশ্ন না তুলেই বা গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোনো কার্পণ্য না করেও, জনসাধারণ তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে একটি লক্ষ্য নিয়ে—প্রতিপক্ষকে কিভাবে বেশী আঘাত করা যায়। কৃষক ও শ্রমিক-সংগ্রাম ছাড়াও গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনও এইভাবেই এগিয়েছে। এটাই হচ্ছে গণ-সংগ্রামের প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারা। গণশক্তির আঘাতের ব্যাপকতা ও তীব্রতাই হচ্ছে সংগ্রামের মাপকাঠি।

তা হলে চীনের পরিস্থিতির থেকে ভারতের পরিস্থিতির তফাৎটা কী? সে-তফাৎ দেখতে হবে বুর্জোয়া শ্রেণীর বস্তুগত অবস্থানের দিক থেকে চীনে ২০-এর দশকের প্রথম থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল না। তাই বিপ্লবী শক্তির ভূমিকাই তখন থেকে প্রধান হয়ে উঠেছে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে এগোতে হয়েহে গণতন্ত্রের চরম অভাবের অবস্থার কায়দায়, অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের শক্তি-সঞ্চয়ের পথে। ইংরাজ-শাসনাধীন ভারতে অবস্থাটা এক দিক দিয়ে এরকম হলেও, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশিষ্ট প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল ইংরাজ-বিরোধী আন্দোলনে। যতদিন কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে নি, ততদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি এবং ততদিন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও একমাত্র বিপ্লববাদীদের শক্তিটাই লোকের চোখে পড়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী এসে যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিলেন, তখন কংগ্রেসের মাধ্যমে বুর্জোয়া-শ্রেণী হয়ে দাঁড়াল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পরিচালক এবং গান্ধীজীর বিশেষ পদ্ধতির ফলে জনসাধারণের বিরাট অংশও আকৃষ্ট হল সেই আন্দোলনে। অর্থাৎ, একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকাটাই হয়ে দাঁড়াল অগ্রগতির প্রধান উপাদান। যদি তখন শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত শক্তি খুব বেশী হত, তাহলে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা ছাড়িয়েও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাই হত প্রধান। কিন্তু সে-পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী তখন ওঠে নি। কাজেই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক পথটাই জাতীয় অগ্রগতির পথ হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। অর্থাৎ, বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিকগুলিই হয়ে দাঁড়াল দেশের ভবিষ্যৎ রচনার ভিত্তির প্রধান উপাদান। কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচী, তার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির মধ্যেও এটাই স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেও এই ইতিবাচক দিকগুলির পূর্ণ ব্যবহার ও পূর্ণ রূপায়ণই হয়ে দাঁড়াল প্রধান দায়িত্ব। এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পরিহার করে গৃহযুদ্ধের পথে যাওয়ার ভিত্তিটা কোথা থেকে আসবে?

চীনের পথ গৃহযুদ্ধের পথ এবং গৃহযুদ্ধের পথ মানেই কম-বেশী সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। বুর্জোয়া-গণতন্ত্রকেও যখন শাসকশ্রেণী গ্রহণ করতে পারে না এবং একমাত্র স্বৈরতন্ত্রের পথটাই যখন শাসকশ্রেণী বেছে নেয়, তখনই গৃহযুদ্ধের পথ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। চীনে সেই অবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু ভারতে সে-পথ শাসকশ্রেণীকে নিতে হয় নি। কেন না এখানে বুর্জোয়াশ্রেণী আগে থেকেই যথেষ্ট সংগঠিত হওয়ায়-শাসন-ব্যবস্থা এসেছে তাদেরই হাতে এবং তাই বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের মধ্যেই তার শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার কৌশল প্রয়োগ করতে পেরেছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তার দুর্বলতাই হোক, আর সামন্ততন্ত্রের অবশেষকে জিইয়ে রাখাই হোক, এ-পদ্ধতি চলেছে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের মধ্যেই। সুতরাং এখানে সংঘাতটা বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের মধ্যেই, বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির মধ্যে নয়। সেইজন্যই তো এখানে বিপ্লবী শক্তি গণতান্ত্রিক পথেই সংগ্রাম সংগঠিত করতে পারছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকেও ব্যবহার করতে পারছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ এটা বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের উপর নির্ভরতা নয় কি? না, তা নয়। এটা বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ মাত্র। এ সুযোগ থাকত না, যদি সংঘাতটা হত সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সরাসরি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বা একেবারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। তখন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী গণতন্ত্র পরিহার করে মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাত। কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে আজকের সংঘাতটার মূল কথা সমাজতন্ত্র নয়, মূল কথা হচ্ছে ধনতন্ত্রের পথের ক্রমবর্ধমান সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—যে-সংকটের আবর্তে শুধু শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনতাই পড়ে নি, পড়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই অংশও—যারা একচেটিয়া পুঁজির দ্বারা বিপর্যস্ত। এই বস্তুগত অবস্থার জন্যই শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে গণতন্ত্র পরিহার করা আজ সম্ভব নয়; বরং একচেটিয়া পুঁজি, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের স্বৈরাচারী পথের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার দিকে তারাও আগ্রহী। কেন না, সেই পথেই একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণ থেকে তারা বাঁচতে পারে। এই সংঘাতটাই আজ

সুযোগ পেয়েছে কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায়। নিজলিঙ্গাপ্পা-গোষ্ঠী ও তার সংগে মিলিতভাবে স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতির মরিয়া হ'য়ে ষড়যন্ত্র চলেছে শাসননীতি ও শাসন-ব্যবস্থাকে স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার, আর কংগ্রেসের অন্য অংশ চেষ্টা করছে মোটামুটিভাবে গণতন্ত্রের পথটা বজায় রাখার এবং তারই জন্য তারা চেষ্টা করছে বামপন্থী শক্তিকে মিত্র হিসাবে পাওয়ার। ইন্দিরা-কংগ্রেসের মধ্যে সবাই যে সত্যিকারের গণতন্ত্রী, এমন মনে করা যায় না। সকলেই যে শেষ পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রীদের বিরোধী থাকবে, তাও বলা যায় না। তবু সংঘাতের বর্তমান চরিত্র যা, তা স্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্রের সংঘাত হিসাবেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে এবং এই সংঘাতে স্বৈরতন্ত্রের পক্ষকে পরাজিত করা ও গণতন্ত্রের পক্ষকে জয়ী করাই বিপ্লবী শক্তির, শ্রমিকশ্রেণীর কাজ। এ-কাজ করতে পারাটাই আজকের সাফল্য, এ-কাজ করতে না পারাটাই হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের পথ খুলে দেওয়া, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের পথ খুলে দেওয়া। সুতরাং, আজকের ভারতের পরিস্থিতিতে গৃহযুদ্ধ স্বৈরতন্ত্রীদেরই আকাঙ্ক্ষিত পথ, যে-পথে তারা প্রগতির শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে চরম আক্রমণ চালাতে পারবে। সেইজন্যই স্বৈরতন্ত্রী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন আজকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

কিন্তু শুধু এই দুই পথের বাস্তবতা-অবাস্তবতা বোঝাটাই যথেষ্ট নয়, বিশদ কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের দিক থেকে বাস্তবের উপযোগিতা-অনুপযোগিতার অনুধাবন আরো বেশী জরুরী।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, গৃহযুদ্ধের পথটাই বাস্তব, তাহলে ভারতের মতো বিরাট দেশে সে-পথের প্রস্তুতি কিভাবে হতে পারে, কিভাবে তার বস্তুগত উপাদান সমাবিষ্ট করতে হয়, তারও হিসাব-নিকাশ করতে হয় চীনের দিকে চেয়েই। ১৯৩০ থেকে চীনের ইতিহাসের যে ঘটনাগুলির উল্লেখ আগে করা হয়েছে, তার সংগে মিলিয়ে দেখলে ভারতে তার কতটুকু প্রতিফলন দেখি? জনগণের বিরাট অংশের কার্যত ও নৈতিক সমর্থন না থাকলে এরকম প্রস্তুতি হয় না। শুধু গেরিলা-যুদ্ধের কায়দা (তার জন্যও জনসমর্থন দরকার) একটা ছোট ভূখণ্ডের মধ্যে কার্যকর হতে পারে, কিন্তু বিরাট দেশে হয় না। তার ভিত্তি হিসাবে চাই লাল-ফৌজ। নিজস্ব লাল-ফৌজ না থাকলে হয়ে ওঠা ছাড়া এ-পন্থীদের সংগ্রাম পরিণতি হতে পারে না। কিন্তু সেনা-বিদ্রোহও হয় একমাত্র তখনই, যখন দেশ হিসাবে অথবা দেশের একটা বড় অংশ হিসাবে সংগ্রামী শক্তির অনুকূলে শাসন-ক্ষমতার একটা ওলট-পালটের অবস্থা হয়। চীনে কুয়োমিনটাং সরকারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট-শক্তির ক্ষমতা এতদূর এগিয়েছিল বলেই সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুয়োমিনটাং সেনা-বাহিনীও কমিউনিস্টদের দিকে চলে গিয়েছিল। আমাদের দেশে উগ্রপন্থীরা তো দেশের শাসন-ক্ষমতার বর্তমান সংকটকে শুধু দূরে থেকেই চেয়ে দেখছে, তাকে ব্যবহার করার কথাই তাদের নেই। সুতরাং, মুখে যতই ক্ষমতা দখলের সশস্ত্র লড়াই বলা হোক না কেন, উগ্রপন্থীদের সমস্ত আক্রমণাত্মক সংগ্রাম-গুলো সীমাবদ্ধ বিক্ষোভ-সংগ্রামের চরিত্র ছাড়া অন্য চরিত্র অর্জন করতে পারে না এবং তাই ক্ষমতা দখলে তার পরিণতিও হতে পারে না। যে নিপীড়িত জনতা উগ্রপন্থীদের নেতৃত্বে সংগ্রামে এগিয়ে যান, তাঁদের আমি ছোট করছি না। নিপীড়িত জনতার বিক্ষোভ ও দাবীর সংগ্রাম চলবেই, তার বিভিন্ন জঙ্গী রূপও দেখা দেবেই। কিন্তু তাকে আজকের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিকাশ-ধারার বিকল্প পথ হিসাবে ধরে নেওয়াটাই হচ্ছে ভুল। ঠিক এই জন্যই উগ্রপন্থীরা তাঁদের জঙ্গী সংগ্রামের মধ্যে মানুষকে টানতে পারলেও নির্বাচন-বয়কটের শ্লোগানে মানুষকে টানতে পারে নি।

অন্য পথ, অর্থাৎ বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের বাস্তব অবস্থাকে পূর্ণ ব্যবহার করে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে চলাটাই যদি আজকের পরি-স্থিতিতে বিপ্লবী শক্তির দিক থেকে বেশী বাস্তবসম্মত বলে মনে করি, তাহলে কর্মকৌশলটাও এমন হওয়া দরকার, যাতে অগ্রপদক্ষেপ সম্ভব হয়। অগ্রপদক্ষেপ মানে কি? শুধু গণ-সংগ্রামের প্রসারটাই যথেষ্ট নয়। আজকের মূল সংঘাত যা, সেই সংঘাতের মধ্যে জনতার পক্ষে আসতে পারে এমন সমস্ত শক্তির সমাবেশও দরকার। গণ-সংগ্রাম বাদ দিয়ে শুধু সংসদীয় কায়দায় এই শক্তি-সমাবেশ করলে তাতে অগ্রপদক্ষেপ হয় না। কেন না, তাতে পরিস্থিতির নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়াশ্রেণীই এবং অগ্রগামীশ্রেণী তথা বিপ্লবী শক্তি হয়ে পড়বে তার লেজুড়। আবার যদি এই শক্তি-সমাবেশের দিকটাকে অস্বীকার করে শুধু অগ্রগামীশ্রেণী ও বিপ্লবী-শক্তির সংগ্রামকেই একমাত্র উপাদান মনে করে তাদের মিত্র হিসাবে দাঁড়াতে পারে যারা, তারা দূরে সরে যাবে এবং মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে ক্রমশ অবস্থার চাপে তারা অগ্রগামী শক্তির বিরোধী হয়ে উঠবে। এই অবস্থাটাই তো স্বৈরতন্ত্রীরা চায়। অগ্রগামী বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী এক জায়গায় দাঁড়াতে পারলেই গণতন্ত্র আর থাকতে পারে না, স্বৈরতন্ত্রের পথই খুলে যায়।

বাস্তবের দিকে চেয়ে দেখা যাক। কেন্দ্রে শক্তি-বিন্যাসটা কি রকম? সিণ্ডিকেট-স্বতন্ত্র-জনসংঘ জোট সংখ্যা-লঘু। আবার, তার বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে দেখলে তারাও সংখ্যালঘু। এর মধ্যে আছে তিন ধরনের শক্তি : কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীশক্তি, অ-কংগ্রেসী গণতন্ত্রী শক্তি, আর কংগ্রেসের ভাঙনের ফলে সিণ্ডিকেট-জোট-বিরোধী ইন্দিরা-গোষ্ঠী। কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শক্তি যতই সংহত হোক না কেন, যদি সিণ্ডিকেট-জোট-বিরোধী অন্য দুই শক্তিকে কাজে লাগাতে না পারে, তাহলে সিণ্ডিকেট-জোটের চক্রান্তকে পরাস্ত করার মতো শক্তি-সংহতি গড়ে ওঠে না তো বটেই, অধিকন্তু অবস্থার মোড় অন্যদিকে ঘুরে যায়, অর্থাৎ সিণ্ডিকেট-জোটেরই শক্তি-বৃদ্ধির পথ খুলে যায়। কারণ, গণতন্ত্রী শক্তির সকল অংশের অবস্থান কখনও স্থির-নিশ্চিত থাকে না, তার মধ্যে দোদুল্যমান অংশও আছে, যারা ক্ষমতা-ভারসাম্যের ওঠা-নামার প্রভাবে পড়ে। ইন্দিরা-গোষ্ঠীর সিণ্ডিকেট-বিরোধিতা সাধারণভাবে নীতিগত হলেও, তার মধ্যেও এমন অংশ থাকা স্বাভাবিক যারা বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতাদ্বন্দ্বের বাইরে যেতে চায় না এবং তাই অনুকূল ভার-সাম্য না দেখলে যারা সরে যেতে পারে। একমাত্র শক্তি-সমাবেশের প্রভাব ও গতি-বেগই এই সমস্ত শক্তির বেশি অংশকে টেনে নিয়ে যেতে পারে সামনের দিকে এবং বিচ্ছিন্ন করতে পারে অন্য অংশকে। তা না হলে ঠিক উল্টোটাই হয়ে যেতে পারে। সুতরাং প্রধানত সিণ্ডিকেট-জোট-বিরোধিতার ভিত্তিতেই কেন্দ্রে শক্তি-সমাবেশের চেষ্টা না হলে, স্ট্যাটাস-কো'ও রক্ষিত হবে না, সিণ্ডিকেট-জোটের শক্তিবৃদ্ধি হবে। এই শক্তিবৃদ্ধি সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় না পৌঁছলেও রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেবার মতো অবস্থায় পৌঁছান অসম্ভব নয়। ইন্দিরা-সরকার থাকছে কি থাকছে না—এটা বাহ্য প্রশ্ন, মূল প্রশ্ন হচ্ছে রাজনীতির মোড় ঘুরে যাওয়া, শক্তিবিন্যাসের পরিবর্তন হওয়া সিণ্ডিকেট-জোটের অনুকূলে। সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে সমূহ বিপদ।

সুতরাং, যে-কারণে বুর্জোয়া-গণ

# ছাব্বিশে জানুয়ারী

**বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

একথা বলি না, হাড়গিলে
আর পেঁচা এখনো সম্রাট!
যার মাছ নিয়ে গেছে চিলে
এখনো সে ঘরের কপাট
কপালের রক্তে করে লাল,
একথা বলি না আজকাল।

তবু স্বাধীনতা যেন দূরে
নক্ষত্রের মতো আজো শোভা!
দেখি তাই কোকিল, কুকুর
ঊর্ধ্বে চেয়ে প্রার্থনার বোবা
কথা খোঁজে। চারদিকে হুজুর
দেখে জন্মভূমি বলে, 'তৌবা!'

শুনি চাষী একগুচ্ছ ধান
ঘরে তুলসে কর্কশ আওয়াজ:
যেন কার সাজানো বাগান
থেকে চুরি ক'রেছে আনাজ,
ন্যাসপাতি! শ্রীদাম সুদাম
তাই উন্মাদ : 'হারাম!...হায় রাম!'

শুনি আর দেখি—বুকে বাজে
উৎসবের মাদল, দামামা ;
স্বপ্নগুলি রাজপুত্র সাজে
রাজকন্যা যখন দেয় হামা।
'কন্যা! কবে হাঁটি হাঁটি পা?'—
রক্তে যে ময়ূর নাচে না!

---

করছি, সেই কারণেই গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপকতম সমাবেশের দায়িত্ব পালনও অপরিহার্য। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা হয় না। এইখানেই সঠিক কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের প্রশ্ন। যুক্তফ্রণ্টের যে নীতি আজ অনুসৃত হচ্ছে, সেটা বাস্তব অবস্থার প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত। সে-নীতি পরিত্যাগ করলে পথটাই হয়ে যায় ভিন্ন, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের পথের দিকেই ঘটনার গতি চলে যায়। সশস্ত্র সংগ্রাম কী সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, সেটা প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হচ্ছে গৃহযুদ্ধের পথ আজকের পরিস্থিতিতে স্বৈরতন্ত্রের শক্তিকেই সাহায্য করবে। সেইজন্যই যুক্তফ্রণ্টের নীতি ও তার কর্মকৌশলের গুরুত্ব আজ এত বেশি।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকে বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক শক্তি-বিন্যাসের যে তারতম্য রয়েছে, তার প্রতি-ফলন তো বিভিন্ন রাজ্যের যুক্তফ্রণ্টে নিশ্চয়ই হবে। অর্থাৎ, সব রাজ্যে যুক্ত-ফ্রণ্টের রূপ একই হবে না। ঠিকই। পঃ বাংলা ও কেরলে যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে কমিউনিস্ট শক্তির যে প্রাধান্য, বিহার, উঃ প্রদেশ প্রভৃতির যুক্তফ্রণ্টে তা হবে না। অর্থাৎ, কোথাও বিপ্লবী শক্তির হাতেই যুক্তফ্রণ্টের প্রধান পরিচালনা-দায়িত্ব, কোথাও বিপ্লবী শক্তি এতটা এগুতে পারে নি, আবার কোথাও যুক্তফ্রণ্টের জন্য শক্তি-সমাবেশ করার চেষ্টাই করে যেতে হবে এখনও। বিভিন্ন রাজ্যের এই বিভিন্ন অবস্থা সত্ত্বেও কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট নীতি ও কর্মকৌশলের লক্ষ্যটা বর্তমানে হবে একই, অর্থাৎ, সর্বভারতীয় শক্তিবিন্যাসকে যুক্ত-ফ্রণ্টের অনুকূলে ব্যবহার করা, যাতে কেন্দ্রে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা যায়। কেন না, যতক্ষণ না কেন্দ্রে রাজ-নৈতিক পরিবর্তন করা যাচ্ছে, ততক্ষণ অগ্রগামী রাজ্যের বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনটাও [illegible] পদে কেন্দ্রের বাধা ও চক্রান্ত রাজ্যকে বিপর্যস্ত করবে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে চেয়ে অগ্রগামী রাজ্যের রাজনীতি অপেক্ষা করে থাকবে। অগ্রগামী রাজ্য নিশ্চয়ই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে কেন্দ্রের বাধা ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু এই সংগ্রাম সফল হতে পারে তখনই, যখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার অনুকূলে শক্তি-সমাবেশ ঘটে। সেইজন্যই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের, অর্থাৎ কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিবর্তনের চেষ্টা বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে শুধুমাত্র রাজ্যের রাজনৈতিক অগ্রগতির কথা ভাবা যায় না। তাই অগ্রগামী রাজ্যগুলিরই বেশি দায়িত্ব কেন্দ্রের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া।

এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত যদি না থাকে, তাহলে কর্মকৌশলটাও ভিন্ন হতে বাধ্য। অর্থাৎ, তাতে কর্মকৌশলটা অবধারিতভাবেই হয়ে দাঁড়াবে শুধুমাত্র রাজ্যভিত্তিক। যেখানে বিপ্লবী শক্তির যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, সেখানে এইরকম প্রবণতা আসতে পারে যে, শুধুমাত্র বিপ্লবী-শক্তি বা শ্রেণীশক্তির ভিত্তিতেই যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা উচিত। কেন না, তাতে অগ্র-পদক্ষেপটা বেশি দৃঢ় হবে, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনও বেশি মূলগত হবে। এই প্রবণতা থেকেই আসে এই ধারণা যে, কেরলের পর পঃ বঙ্গ, পঃ বঙ্গের পর অন্য রাজ্য, এইভাবেই বুঝি বিপ্লব এগিয়ে যাবে আমাদের দেশে এবং তাই রাজ্যের ক্ষমতাটা যত বেশি নিরঙ্কুশ-ভাবে বিপ্লবীশক্তির হাতে আসে, ততই ভাল। কিন্তু এই ধারণার মধ্যে একটা মস্তবড় ফাঁক আছে। একটা রাজ্যের বিপ্লবী শক্তিবৃদ্ধি আরেকটা রাজ্যকে প্রভাবিত করে ঠিকই। কিন্তু সে-প্রভাব দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির অগ্রগতির [illegible] ধারায় নয়। কেরল ও পঃ বঙ্গের বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনটা এসেছে শুধুমাত্র বিপ্লবীশক্তির জোর হিসবেই নয়, সর্বভারতীয় শ্রেণীবিন্যাসের পরি-বর্তন ও রাজনৈতিক রূপান্তরের অংশ হিসাবেও। কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতা বিলোপের ও একটা প্রগতিশীল বিকল্পের অবস্থাটা হয়েছে কংগ্রেস-বিরোধী সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির এগিয়ে যাবার ফলেই। পঃ বঙ্গের কথাই ধরি। কংগ্রেসের বদলে একটা প্রগতিশীল বিকল্প সৃষ্টির জন্য পঃ বঙ্গে যদি ব্যাপকভিত্তিক যুক্তফ্রণ্টের পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত না হত, তাহলে কি কমিউনিস্ট শক্তিও এখানে এত এগুতে পারত? কাজেই, রাজ্যের পর রাজ্যে বিপ্লবী শক্তির বৃদ্ধিটা নির্ভর করে কতটা সঠিকভাবে বর্তমান পরিস্থিতির মূল সংঘাতকে কাজে লাগাতে পারা যাবে, কতটা সার্থক-ভাবে গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ করা যাবে, তারই ওপর। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে যদি শুধুমাত্র বিপ্লবী শক্তির হাতে ক্ষমতা আনার দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে ধরা হয়, তা হলে তার ফল হবে পরিস্থিতির সম্ভাবনাকেই নষ্ট করা এবং জোর করে ঘটনাধারাকে বিপ্লবী শক্তি বনাম গণতান্ত্রিক শক্তির সংঘাতের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, ঘুরে-ফিরে সেই গৃহযুদ্ধের পথেই এসে যেতে হয়। গৃহযুদ্ধের পথকে যদি বর্তমান পরি-স্থিতির শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ নয় মনে করি, তা হলে কর্মকৌশলটা নিশ্চয়ই এমন হলে চলবে না, যাতে সেই পথেরই দরজা খুলে যায়। তাই যুক্ত-ফ্রণ্টের নীতি অনুসরণ করাটাই যথেষ্ট নয়, সঠিকভাবে অনুসরণ করাই দরকার। তা না হলে রাজনীতির মধ্যে পদে পদে স্ব-বিরোধিতার সংকট দেখা দেবে এবং [illegible] হবে পশ্চাদ্গতি।

# মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান তত্ত্ব ও বিশ্বরাজনীতি / কাশীকান্ত মৈত্র

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

॥ সাত ॥

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যখন শান্তি-পূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলেন, তখন তাঁরা জাতিগত স্বার্থ সংরক্ষণের বা সংবর্জনের হাতিয়াররূপে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না। আবার যুদ্ধের অপরিহার্যতার কথা যখন বলেন, তখন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সম্ভাব্যতা বা বাস্তবতা অস্বীকারও করেন না। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও যেমন মুখে অহর্নিশ বকধার্মিকের মত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলে চলেছে, আবার সাথে সাথে পৃথিবীর কোণে কোণে সামরিক ঘাঁটি একের পর এক নির্মাণ করে চলেছে —স্বাধীন দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে আর্থিক-কারিগরি সাহায্য দেবার নামে তাদের কলোনীতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছে, দুটো শিবিরের আচরণ একই প্রকারের। শুধু মতবাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হয়ে থাকে। এক পক্ষ সমাজতন্ত্র বা কমিউ-নিজমের প্রসার ও সুপ্রতিষ্ঠার জন্য, অপর পক্ষ গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা নিয়েছেন।

ধনতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে কখন কি রকম সম্পর্ক হবে, সেটা নির্ভর করবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সামরিক শক্তির ওপর, নির্ভর করবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বা কোন বিশেষ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংকট, সামরিক ক্ষমতার ওপর। সর্বোপরি রয়েছে "জাতীয় স্বার্থের" (ন্যাশান্যাল ইন্টারেস্ট) প্রশ্ন। শেষের এই বিষয়টি এত প্রাধান্যলাভ করে যে, অন্য সব তর্ক ঢাকা পড়ে যায়।

যেমন ১৯৬০ সালে রাশিয়ার আকাশে মার্কিন বৈমানিক পাওয়ারস্ চালিত একটি U—2 গোয়েন্দা-বিমান অনুপ্রবেশের ঘটনায় উত্তেজিত রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ যে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়েছিলেন, প্যারিস শীর্ষ শান্তি বৈঠক বর্জন করে

বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে 'সমুচিত শিক্ষা' দেবার প্রচণ্ড হুমকী দিয়েছিলেন—সেই শক্তিমান ক্রুশ্চেভ কিন্তু আবার কিউবার প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির হুমকীর সামনে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের দোহাই দিয়ে সোভিয়েট মিত্র রাষ্ট্র কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি-গুলি ভেঙে দিয়ে এবং ক্ষেপণাস্ত্রগুলি (মিসাইলস) সরিয়ে নিয়ে এলেন। ১৯৬০ সালের বহু-প্রতীক্ষিত শীর্ষ শান্তি সম্মেলন বয়কট করে সোভিয়েট রাশিয়া সেদিন যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ১৯৬২ সালে ভ্রাতৃপ্রতিম 'সমাজ-তান্ত্রিক' দেশ কিউবাকে আণবিক আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতির প্রশ্নে সেই যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯৬০ সালের শীর্ষ শান্তি সম্মেলন বয়কট করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের হুমকী দেখিয়ে 'সমাজতান্ত্রিক' সোভিয়েট রাষ্ট্র দেশপ্রেমেরই এক বলিষ্ঠ নজির স্থাপন করেছিলেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়ো-জন। রুশ আকাশে একটি গোয়েন্দা-বিমানের অনুপ্রবেশেই যদি সোভিয়েট দেশ, সে-দেশের কমিউনিস্টরা ও জনগণ অতটা উত্তেজিত হয়ে থাকতে পারেন, তা হলে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট চীন কর্তৃক নগ্ন ভারত আক্রমণে হাজার হাজার ভারতীয় জোয়ান হত্যা করে কয়েক সহস্র বর্গ মাইল ভারতীয় জমি জোরপূর্বক দখল করার ঘটনায় নীতিগতভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয় জনগণের মনে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ ধিক্কার ও ঘৃণা সঞ্চারিত হতে পারে, সেটা অনুমান করা যেতে পারে। নিশ্চয়ই ক্রুশ্চেভের বা রুশ কমিউনিস্টদের চাইতে বহু গুণ বেশি উত্তেজিত হবার কারণ ভারতীয়দের ছিল ও আছে। যে-মার্কসবাদী দল লেনিনের মতে বিপ্লবী প্রগতিশীল জনগণের 'ভ্যানগার্ড'-এর

ভারতে—সেই দুর্যোগের দিনে এ দেশের অবিভক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল জন-গণের সেই ঘৃণা, ক্রোধ, ধিক্কার ও বিদেশী আক্রমণ হটিয়ে দিয়ে পররাজ্য-কবলিত ভারতীয় অঞ্চলকে আক্রমণমুক্ত করার ব্যাপারে কোন্ ভূমিকা নিয়েছিলেন বা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

রুশ কমিউনিস্টদের কাছে সোভিয়েট দেশকে (সোভিয়েট ফাদারল্যান্ড) প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যদি মহত্তম মূল্যবোধ-রূপে ('ভ্যালু') বিবেচিত হতে পারে—ভারতীয় জনগণের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষকে কতটা গভীরতার সঙ্গে ভালবাসা—মহত্তম মূল্যবোধ ও অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য হবে না কেন? এ প্রশ্নের জবাব কি? নিজের 'মা'-কে জানতে গেলে কি ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার পড়ে জানতে হবে? দেশকে যাঁরা শোষণ, অবিচার, দুর্নীতি ও উৎপীড়নমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর—তাঁদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এই দ্বৈত-নৈতিকতা (ডাবল্ স্ট্যান্ডার্ড অব মরালিটি) সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। নিজের 'মা' গরীব দীন-দুখিনী বলে কি তাঁর অপমানে সন্তান ক্ষুব্ধ ব্যথিত হবে না? স্ফীতকায় ঔদ্ধত্যের জবাব দেবে না সে?

আবার কিউবা ও U—2 গোয়েন্দা বিমানের প্রশ্নে ফিরে আসছি।

রুশ আকাশে মার্কিন গোয়েন্দা-বিমানের অনুপ্রবেশ যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, তেমনি এই ঘটনা রুশ জাতির, আত্ম-অভিমানের ওপর প্রচণ্ড আঘাতও বটে। আর রুশ কমিউনিস্টরা রুশ জাতি বহির্ভূত কোন সত্তা তো নন! রুশ প্রধান-মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ যুক্তরাষ্ট্রকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর কমিউনিস্ট দেশ জাতীয় আত্মমর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় সার্ব-ভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে-কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত—বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও পিছ-পা নয়। কিন্তু সেই গোয়েন্দা-বিমানের অনুপ্রবেশের প্রশ্নে বিশ্ব-যুদ্ধ বাধলে পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী-পুঁজিবাদবিরোধী রাষ্ট্র-গুলির ও সেই সব রাষ্ট্রের কোটি কোটি জনগণের কি পরিণতি হবে, সে-কথা ভাববার প্রয়োজন জাতীয়তাবাদী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রুশ নেতৃত্বের ছিল না। যেমন প্রয়োজন ছিল না হিটলার-স্তালিনের ১৯৩৯ সালের মৈত্রী চুক্তি ("রবারস্ প্যাক্ট") সম্পাদনার পূর্বে স্তালিন কর্তৃক ইউরোপের, বিশেষ করে শক্তিশালী সেদিনের জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বা পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির মতামত গ্রহণের অথবা ঐ কুখ্যাত চুক্তির পরিণামস্বরূপ জার্মান কমিউনিস্ট অথবা ইউরোপীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি হবে সে কথা ভাববার। শুধু

[illegible] "সাম্রাজ্যবাদী" ও "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে অনিবার্য কারণেই (বেসিক লজ অব ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম) সংঘর্ষ বাধবার তাত্ত্বিক কারণেই হয়েছে বলে মনে করার অথবা বিশ্বাস করার হেতু নিশ্চয়ই থাকত না।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ, আত্মমর্যাদাবোধ, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার যুক্তিই সেই দেশের সেদিনের রুশ নেতৃত্বকে ঐ বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করতে সাহস জুগিয়েছিল অথবা ঐ বিপজ্জনক ঝুঁকি নেবার প্রবণতা জুগিয়েছিল। ক্রুশ্চেভ মনে করেছিলেন ১৯৬০ সালে বিশ্বরাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য অন্য দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে, যদি না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বেপরোয়া রুশ আকাশ-সীমানা লঙ্ঘনের (ওপেন ডিফাইয়্যান্স) ব্যাপারটিকে বিশ্বরাজনীতিতে মর্যাদার প্রশ্নে (প্রেস্টিজ ইস্যু) দাঁড় করান যায়। আমেরিকাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, রাশিয়ার হাতে এমন মারণ অস্ত্র আছে যে, যুদ্ধে সেগুলি প্রয়োগ করে পশ্চিমী শক্তিজোটকে শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে। তাই ক্রুশ্চেভ মনে করেছিলেন U–2 গোয়েন্দা-বিমানের অনুপ্রবেশ একটা আকস্মিক—হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়, এটা একটা পরিকল্পিত প্ররোচনামূলক কাজ। বিশ্বের বিভিন্ন মুল্লুকের সর্বহারাদের নানাবিধ ভাবনা ভেবেই সেদিন এই বিপদসঙ্কুল পথে সেই বীর নেতা পা বাড়ান নি, একথা বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না। মার্কিন U–2 বিমানের অনুপ্রবেশের ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন বলেই বিবেচিত হবে। মার্কিন ইতিহাসবিশারদ ডি, এফ, ফ্লেমিং বলেছেন:

"As principle of international law was more firmly established than the right of a nation to control plane-flights over its air space. It was fixed in multilateral treaties going back to 1919 and had never been questioned. By *flying more than thirty U—2 target mapping flights over Soviet Union United States had deliberately struck the principle of national sovereignty as damaging a blow as it could suffer in peace time.*" (The Cold War and its Origins, 2 Vols.).

আবার কিউবার প্রশ্নেও সেই জাতীয় স্বার্থের (ন্যাশন্যাল সেলফ্ ইন্টারেস্ট) প্রশ্ন অন্যরূপে দেখা দিয়েছিল। সোভিয়েট নেতা সেদিন বুঝেছিলেন তাঁর দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রক্তস্নান সেরে উঠে নতুন উদ্যমে সমৃদ্ধির সোপান বেয়ে দ্রুতবেগে ওপরের দিকে এগিয়ে চলার সংকল্প নিয়েছে—নতুন স্তালিনোত্তর যুগের জটিল আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে রুশ দেশকে--বৈষয়িক উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে (ওভারটেকিং ইউ-এস-এ) নিয়ে যাবার মূল প্রশ্নটি ছিল ক্রুশ্চেভের কাছে আরও বড় প্রশ্ন। তাই কিউবার জন্যে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া সমীচীন বলে সেদিন বিবেচিত হয় নি। কারণ, বিশ্বযুদ্ধ বাধলে সমস্ত দায়-দায়িত্বের বোঝা এসে পড়বে রাশিয়ার কাঁধে। রুশ দেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-ব্যুরোক্রাট-সিভিলিয়ানরা আর একটি 'সমাজতান্ত্রিক' ছোট্ট দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভ্রূকুটির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কেনই বা একটা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেবে—তা সে-যুদ্ধ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের অনিবার্য সংঘাততত্ত্বের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিলেও? আর রুশ দেশকে তো বোঝানও শক্ত হবে। রুশ-আকাশে গোয়েন্দা-বিমানের অবৈধ অনুপ্রবেশ নিঃসন্দেহে রুশ জাতির আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে রুশ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ নাগরিকদের মন চাঙ্গা করে তোলাটা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।

তা ছাড়া সামরিক বিশেষজ্ঞ ও কূটনীতিবিশারদরা জানেন, কিউবাতে রাশিয়া গোপনে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের (আই সি বি এম) ঘাঁটি স্থাপন করেছিল কমিউনিস্ট ছোট ভাই কিউবাকে আমেরিকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার তাগিদে আদৌ ততটা নয়—যতটা রুশ দেশের সামরিক নিরাপত্তার জন্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তুরস্কের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন ব্যবস্থার পাল্টা জবাব হিসাবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ক্রুশ্চেভ ১৯৬২ সালের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট (মিসাইল ক্রাইসিস) কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমত আমেরিকাকে তুরস্ক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি সরিয়ে আনার জন্য এবং দ্বিতীয়ত জার্মান সমস্যার (বার্লিন ক্রাইসিস) রুশ সর্তে সমাধানের জন্য। কিউবার কমিউনিস্ট নেতা ফিডেল কাস্ত্রোর এ রাজনীতি বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তাই তিনি ক্রুশ্চেভের কিউবা থেকে পশ্চাদপসরণের তীব্র সমালোচনা করতে ছাড়েন নি সেদিন। ১৯৬২ সালের কিউবা সঙ্কটের মুখে অক্টোবরে "সমাজতান্ত্রিক" চীনের ভারত আক্রমণের সময় নির্বাচনটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া হবে কি না, সেটা মূলত নির্ভর করছে সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন দলের জাতীয় স্বার্থ কিভাবে কতটা পরিপূরণ করা যায় জাগতিক পরিস্থিতি বিচার করে তারই মূল্যায়নের ওপর। এর সঙ্গে মাকর্সবাদ-লেনিনবাদের সম্পর্ক কোথায়?

আবার প্রেসিডেন্ট কেনেডি সেদিন যে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন—কিউবাকে রণতরী দিয়ে আবেষ্টিত করে—১৯শে অক্টোবর—ব্লকেড রচনা করে—সেক্ষেত্রেও তিনি বা তাঁর দেশ অন্য কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতামত নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ যুদ্ধ সুরু হলে গোটা বিশ্ব প্রলয়ংকরী ধ্বংসের মাতনে মেতে উঠত—কোন দেশই বাদ পড়ত না। সেদিন কিউবাকে নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকা এক মস্ত 'পাওয়ার-পলিটিক্সের' খেলায় মেতেছিলেন। কেন না কিউবা বা তুরস্কের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি—আণবিক যুদ্ধের যুগে একটা চূড়ান্ত সামরিক কৌশলের সাফল্যের ব্যাপার বলে মনে করার কোনই কারণ নেই। এ সম্বন্ধে David Horowitz মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"Henry Kissinger, for one, had warned the previous summer that the time when all of the soviet union's missiles could be destroyed by a counterforce blow was limited. Dispersal, hardening of bases and the development of missile-firing submarins would make it impossible in the future to know where all of an enemy's missiles were, and hexce to be free from a devastating retaliatory blow.'

(From 'yalta to vietnam'—a penguin special—P. 388-389)

অর্থাৎ ডুবোজাহাজ থেকে যখন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যাবে, তখন আক্রান্ত কোন দেশ জানতেই পারবে না শত্রুপক্ষের সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র কোথায় সঞ্চিত হয়ে আছে এবং তাই বিধ্বংসী প্রতি-আক্রমণের হাত থেকে আণবিক যুগের যুদ্ধে রেহাই পাওয়া যেতে পারে না। এটা রুশ কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর ভালভাবেই জানতেন। তবু দুই দেশই স্নায়ুযুদ্ধে চাপের রাজনীতি থেকে জাতীয় প্রেস্টিজ বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছিলেন—

"...this sudden clandestine decision to station strategic weapons for the first time outside of soviet soil—is a deliberately provocative *unjustified change in the status quo which can not be accepted by this country, if our courage and our Commitments are ever to be trusted again by either friend or foe.*" (Oct. 22, 1962 T. V. Address to the Nation)

ঠাণ্ডা যুদ্ধে সোভিয়েট সামরিক তৎপরতা প্রতিহত করতে পারলে আমেরিকার "বন্ধু" রাষ্ট্রের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির দাম থাকে না, ফলে তাদের আস্থা হারাতে হবে, আর শত্রুরাষ্ট্রও তাকে পরোয়া করবে না। এর মধ্যে আমেরিকার নিজস্ব নিরাপত্তা সম্বন্ধে আতঙ্কিত বোধ করার কোন ইঙ্গিত ছিল না। তবু এই ঝুঁকি নিতে হল। তার ফলে গোটা বিশ্বও যদি ধ্বংস হয়ে যায় যাক। ক্রুশ্চেভও এক ঢিলে একাধিক পাখী মারতে গিয়েছিলেন—নিজের সর্তে জার্মান প্রশ্নের সমাধান, মার্কিন সামরিক ও আণবিক যুদ্ধ প্রস্তুতির পাল্টা জবাব দিয়ে আমেরিকাকে সাবধান করে দেওয়া, কিউবার মত ছোট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে দেখিয়ে দেওয়া বিপদের দিনে একমাত্র রাশিয়াই সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলার জন্য পাশে এসে দাঁড়াতে পারে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সোভিয়েট জোট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরপেক্ষতার ভূমিকা গ্রহণ করার প্রবণতাকে রুখে দেওয়া। অবশ্য পাওয়ার পলিটিকসের নীতি-বর্জিত লড়াই-এ ক্রুশ্চেভ সেদিন পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯৬০ সালে শীর্ষ শান্তি সম্মেলন ভেঙে দিয়ে ক্রুশ্চেভ (সামিট্ কোলাপ্‌স্) যে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং যে-কোন সম্ভাব্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার যে সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন, তা যে-কোন দেশ-প্রেমিকের কাছে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এখানেও মস্কো-পন্থীদের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার। প্রশ্নগুলি তুলতে গিয়ে রুশ-চীন তাত্ত্বিক লড়াই-এর পটভূমির কিছুটা উল্লেখ প্রয়োজন।

চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আচরণের সমালোচনা করে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে যে ঐতিহাসিক চিঠি দিয়েছিলেন, তার একটি অংশ নিম্নে উধৃত করছি। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চিঠির জবাবে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি বললেন:—

"We would like to ask the Chinese Comrades who offer to build a wonderful future on the ruins gold world destroyed by thermo-nuclear war if they have consulted this matter with the working class of the countries where imperialism dominates..."

মস্কোর এই জবাব পড়ে স্বভাবতই মনে হবে, রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ভ্রাতৃপ্রতিম সমচিন্তাসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের ও এমন কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট দল বা জনগণের মতামতের চিন্তাভাবনার ওপর। অর্থাৎ কিনা যে-সব দেশের ওপর পুষ্পক রথ থেকে বর্ষিত হবে আণবিক ফুলঝুরি—আণবিক বিশ্বযুদ্ধ বাধান হবে কিনা—এই সিদ্ধান্ত নেওয়া না-নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই সব দেশের জনগণের মতামত গ্রহণ করা দরকার। যাঁরা আণবিক যুদ্ধের দ্বারা বর্তমান পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়ে মনুষ্যসমাজের জন্য এক অসামান্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করার কথা বলেন—তাঁদেরই তাই সর্বাগ্রে যে মনুষ্যসমাজের হিতার্থে বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন—তাঁদের মতামত নেওয়া একান্ত দরকার। নিঃসন্দেহে এ এক খুব মানবতা-সিঞ্চিত, উদারপন্থী হৃদয়গ্রাহী বলিষ্ঠ বক্তব্য। কিন্তু ১৯৬০ সালে প্যারিস শান্তি শীর্ষক বর্জনের সময় যে ঝুঁকি সেদিন রুশ প্রধানমন্ত্রী নিয়েছিলেন, তার পরিণতিও বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াতে পারত—যদি না সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সম্পূর্ণ অবৈধ কাজের মুখোস খসে পড়ায় আন্তর্জাতিক মর্যাদা আরও নষ্ট করে রুশ নেতৃত্বের হুমকীতে সংযত হয়ে পশ্চাদপসরণ না করতেন। সেদিন কিন্তু রুশ নেতাদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের "শ্রেণী সচেতন" শোষিত জনগণের মতামত গ্রহণ করার কথা মনে উঁকিও দেয় নি। কেন? এর জবাব রুশ কমিউনিস্ট দলই দিতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬২ সালের অক্টোবরে কিউবার অবরোধ ঘোষণা করে যে আণবিক বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রেও অন্য কোন 'মিত্র' পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতামত-পরামর্শ না নেওয়ায় মার্কিন মুলুককে সমালোচনা হয়েছিল। জেমস্ রেস্টন ১৯৬২ সালে কেনেডির এই ঝুঁকি নেওয়ার রাজনীতির ঔচিত্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন:

"...many diplomats within the alliance still think it was wrong to confront Kruschev publicly with the choice of fighting or withdrawing, *especially since the security of many other unconsulted nations was involved.*" (New York Times, October 27, 1962)

নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ সমালোচক C. L. Sulzberger এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন:

"...This calculated risk has presumably been taken for the calculated reasons previously analyzed. Washington seems to feel this is the time to check and reverse Kruschev's cold war offensive. *We have opted to force the issue ourselves without prior approval of our allies and there are going to be uneasy diplomatic moments.*" (New York Times, Oct. 23, 1962)

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্বের আলোচনায় ১৯৬০ সালের প্যারিস শান্তি শীর্ষ বৈঠকের ব্যর্থতা এবং কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট—এই দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা পররাষ্ট্র নীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই হোক অথবা কোন সম আদর্শসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশকে "পুঁজিবাদী আবেষ্টনী" বা আক্রমণের হুমকীর প্রতিরোধ রচনার ক্ষেত্রেই হোক, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু, তার ওপর কিছুটা আলোকসম্পাত করবে। কিউবাকে অথবা যে-কোন গণতান্ত্রিক দেশকে নিজের অধ্যবসায়, সাধনা ও শক্তির ওপরই দাঁড়াতে হবে। পরের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করার মত মূঢ়তা ও নিস্ফল ভিক্ষুকতা আর কিছুই হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, যাত্রার দলের নকল রাজার চাইতে আসল মানুষের দাম অনেক বেশি। বিপদের দিনে আণবিক ছাতা খুলে ধরে রাশিয়াও কিউবা বা অন্য দেশকে রক্ষা করতে আসবে না—আসবে না আমেরিকাও আণবিক ছাতা খুলে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে। পাকিস্তানের চীন-মোহমুক্তি ঘটতেও বেশি দেরী হবে না।

[ক্রমশ]

বইয়ের আকার যদি সাহিত্যের মানদণ্ড হয়, তবে বলতে হবে বাংলা সাহিত্য ছোট হয়ে গেছে। কেন না, মিনি বুক বাংলা বই প্রকাশনার সর্বশেষ স্টান্ট। একজন বয়স্ক মানুষের হাতের তেলোয় রাখবার মতো বই। স্কেল দিয়ে মেপে দেখেছি ৪·৭ × ৩॥ ইঞ্চি।

এটা লেখবার পর চোখে পড়ল ৩॥ × ২ ইঞ্চি পরিমাপের মাসিক পত্রিকা।

কিন্তু এ এক আকস্মিক আবির্ভাব, তবে অভূতপূর্ব নয়। ছোট আকারের বই আগেও বেরিয়েছে। বরং, বইয়ের আকার দিয়ে মাপলে বলতে হয়, বাংলা সাহিত্য স্থূল থেকে স্থূলতর হচ্ছে। পুরো বিঘত বাড়িয়ে বই না ধরতে পারলে সে আজকাল আর বই-ই নয়, তাতে প্রকাশকের পোষায় না, লেখকের পোষায় না অথবা একের পোষায় না বলে অপরেরও পোষায় না, পড়তা পড়ে না। স্থূলাঙ্গ হলে খদ্দেরও দু' পয়সা দিতে রাজী, বেচলে সবারই দু' পয়সা থাকে, লেখকের কিছু হয়, প্রকাশকের ভালই হয়, সম্ভবত দপ্তরীরও এক লটে কিছু ওঠে। লাইব্রেরীর আভিজাত্য বাড়ে, যে পড়ে সে পড়বার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একটা এচিভমেন্ট! ডিমাই সাইজের পাঁচশ' থেকে হাজার পৃষ্ঠার থান-ইট-সম অঙ্গসৌষ্ঠবে উপহারোপযোগী বই দেখলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

ঠিক তারিখ ধরে বলা যাবে না, কেন না, সে এক শ্রমসাধ্য রিসার্চের ব্যাপার। তবে মোটামুটি বলা যায়, বিশ-পঁচিশ বছর আগে রেওয়াজ ছিল ক্রাউন সাইজের বড়জোর দু'শ'-আড়াইশ' পৃষ্ঠার বই। বেশির ভাগ বই, কথাসাহিত্য, দশ থেকে পনেরো ফর্মার মধ্যেই শেষ। বড় আকার বলতেই ছিল রামায়ণ, মহাভারত, নয়তো কোনো সাহিত্যের ইতিহাস কি রাজনৈতিক ইতিহাস। স্থূলকায় বই বড় একটা দেখাই যেত না, ডিমাই সাইজের তো নয়ই। যদ্দুর মনে পড়ে, যুদ্ধকালে কাগজের অভাবে ডিমাই আর খুব ছোট টাইপ প্রচলিত হয়েছিল। ছোট টাইপের বদলে ছোট বই বড় করবার তাগিদে, পাইকাই এখন ফ্যাসান হয়েছে, ফুটনোটে পর্যন্ত বর্জাইস ব্যবহার করতে প্রকাশকের অনীহা। বই ছোট হয়ে যাবে। যুদ্ধকালের ডিমাই টিকে গেছে, স্থায়িত্ব পেয়েছে, আভিজাত্য পেয়েছে। আজকে ক্রাউন সাইজ অভাবনীয়।

কিন্তু যাঁদের পুরনো বইয়ের সংগ্রহ আছে, সবটাই ইঁদুরে কাটে নি বা ফুটপাথের পসরায় নামে নি, তাঁদের বই সাজাতে গিয়ে এই বৈষম্য চোখে পড়ে। গল্প বা গল্পের বই এককালে অপ্রিয় ছিল না, কিন্তু একালের প্রকাশকেরা বলেন, পাঠক গল্প চায় না, চায় উপন্যাস এবং বড় উপন্যাস। অমনি লেখক মহলে গল্প ছেড়ে উপন্যাস লেখার হিড়িক পড়ে যায়।

আগে একটা ধারণা ছিল যে, সব পুজোর মধ্যে কালীপুজো যেমন কঠিন, সব লেখার মধ্যে উপন্যাস লেখাও তেমনি কঠিন। কিন্তু দেখা গেল, সর্বজনীন প্রসাদাৎ কালীপুজো যেমন লক্ষ্মীপুজোর মতো সহজ হয়ে গেছে, গল্পলেখকও তেমনি ঔপন্যাসিক হয়ে গেছেন। গল্পের টেকনিক বা কাঠামো আর উপন্যাসের প্যাটার্ন বা বয়নশিল্প এক নয়। কিন্তু প্রকাশকের তাগিদে এবং লেখকের জীবনযাত্রার তাগিদে সব একাকার হয়ে গেল। এমন খবরও আমার জানা আছে যে, প্রকাশক লেখকের গল্প প্রত্যাখ্যান করে কোন একটা গল্পকেই টেনে-বুনে বাড়িয়ে-ছড়িয়ে উপন্যাস করবার উপদেশ দিয়েছে। গল্প যখন বিকোবেই না, তখন লেখকও সাশ্রু নয়নে সার্থক একটি গল্পকে কিম্ভুত-কিমাকার এক উপন্যাসের আকার দিতে বাধ্য হয়েছেন।

অথচ দৃষ্টান্তের অবধি নেই; পাঁচটা গল্পের সংকলন পাইকায় ২২২ পৃষ্ঠার বই, ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এ ৫ টাকায় ১৬টা সংস্করণ বিকিয়েছে।

এমনিতেই শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও সুরসিক প্রকাশকের সংখ্যা কম। কোন লেখার যথার্থ মূল্যায়ন করবার বিচারজ্ঞান রাখে এমন প্রকাশকের সংখ্যা বিরল, তার ওপর রাতারাতি অথবা 'ওয়ান ফাইন মর্নিং' দোকানে ক্রেতার কিউ দেখতে চায় বলে তারা সাহিত্যের ন্যূনতম মাত্রাজ্ঞানটাও হারিয়ে ফেলে। এ খবর অনেকেরই জানা, আচমকা কারও একখানা বই বাজারে ধরে গেলে সব প্রকাশক ঐ লেখককে গিয়ে ধরে—একখানা তাকেও লিখে দিতে হবে এবং এজন্য অতি-কৃপণ প্রকাশকও অভাবনীয় ঔদার্যবশে আগাম দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সাহিত্যের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা একথা সমর্থন করবেন যে, 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-খ্যাত অবধূতের পেছনে এক শ্রেণীর প্রকাশকের কি আন্দাজ ম্যারাথন রেস হয়েছে—এখন যেমন চলছে সমরেশ বসুর পেছনে।

বই 'ছবি' হলে তো কথাই নেই, কোন একটা পুরস্কার পেলে ভালে রাজতিলক। লেখকদের নিয়ে প্রকাশকদের এমন একটা দুরন্ত রেস চলেছে যে, গোটা ব্যাপারটাতে বেগই প্রধান এবং এই বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয় পাঠককেও, নইলে 'অমুক বইটা পড়েছিস্?' এর জবাব দিতে না-পারার লাঞ্ছনা সইতে হয়। আজকাল কোন লেখকের পক্ষে ধীরে সমগ্র প্রাণ-মন দিয়ে কোনো সৃষ্টির সাধনায় বসার উপায় নেই। যে যতই জিনিয়াসের বড়াই করুন না কেন, এখনও একথাই অবিসম্বাদিত সত্য যে, ঐ প্রতিভার মাত্র এক শতাংশ প্রেরণা ('ইনস্পিরেশন'), ৯৯ শতাংশ শ্রম ('পারস্পিরেশন')।

কিন্তু বোম্বাই ছবির মতো রাতারাতি বড়লোক হবার এবং করবার তাগিদে প্রকাশকেরাই একটা সহজ ছকের ইঙ্গিত দিয়ে দেন। লেখকের প্রথম "বাজিমাতের" সৃষ্টিকালেও যে স্বকল্পল, কুণ্ঠা, দ্বিধা, সংযম, সমাজচেতনা ছিল, তা থেকে সীতাহরণকালে আভরণ নিক্ষেপের মতো ক্রমশ ভারমুক্ত হতে হয়।

এই নিদারুণ ট্রাজেডির পর শক্তিমান লেখক এই বলে অটো-সাজেসসান দিতে বা আপন ভোলাতে থাকেন যে, পাঠককুলের মুখপাত্ররূপে প্রকাশক যখন একথা বলছে এবং আমার বাঁচবার দ্বিতীয় পথ যখন কেউ খুলে দিচ্ছে না তখন এই বৃত্তি বা প্রবৃত্তি আদৌ অন্যায় নয়। আর ন্যায়-অন্যায়ের বিচারটা করছেই বা কে? যারা করছে তারাও তো পূতিগন্ধময় সংস্কারগ্রস্ত বৃদ্ধ জরদ্গব। অসমর্থ বৃদ্ধ জটায়ুর পাখা না কাটলে অপহারক রাবণের পথ নিষ্কণ্টক হয় না, নিষ্কণ্টক হয় না কালজয়ী রামায়ণ রচনার রাজপথ। সমাজের ভেতরে ভেতরে ক্ষুধা, পুষ, নিষ্করুণ অস্ত্রোপচারে তা বের করে দিতে হবে। এবং নিভৃত করেই মানুষ কিছু

ক্রিয়াকে অসুন্দর করে রেখেছে। তা আলোকের পাদপীঠে আনতে হবে।

ঘরছাড়ারা অথবা কালাপাহাড়েরা চিরকাল এই মর্মান্তিক যুক্তি দিয়ে এসেছে এবং 'আর্টের জন্যই আর্ট'—এই বালাখল্যের আধবুলির আড়ালে আত্ম-রতির তৃপ্তি পেয়েছে। যে-মেয়েরা ঘর ছেড়ে বহুপদসেবী হয়, তাদের সম্পর্কে একই ধরনের সর্বজনীন গল্প শোনা যেত। শাশুড়ি বা মদ্যপ স্বামীর অত্যাচারে অথবা বালবৈধব্যের দুঃসহ যন্ত্রণায় কিম্বা প্রেমের অভিসারে প্রতারিত সে বারবনিতা হয়েছে এবং সমাজের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। এর কোনটাই অসম্ভব নয়, কেন না, অন্তঃপুরের এ পীড়ন ও যন্ত্রণা অনস্বীকার্য সত্য, সুতরাং, এই অবাঞ্ছিত পরিণতিও বাস্তব-বিরোধী নয়; কিন্তু এই সর্বজনীন গল্পের আড়ালে যারা প্রবৃত্তিবশে, রিপুর তাড়নায় বাণিজ্যে নামে, তারাও পার পেয়ে যায়। শক্তিশালী লেখক যখন প্রথম লেখেন, তখন অত দাক্ষিক জমা হয় না, জমা হতে থাকে প্রকাশক প্রসাদাৎ অনায়াস সাফল্যে এবং পরিশেষে জেদের বশে। তখন এই সব যুক্তি পেশ করেন।

সুতরাং, বই চাই, ডিমাই সাইজের বড় বই চাই, পাঁচশো হোক, সাতশো হোক, পাঠককে যেন টানে, যেন বই না ছেড়ে অফিস কামাই করে এবং তার চোখ-মুখ-সর্বাঙ্গে মেঘরৌদ্রের খেলা অবিরাম সুড়-সুড়ি দিয়ে যায়, যেন তাকে ভাবতে না হয়। সব কিছু খোলসা করে সিনেমার মতো যেন অনর্গল রীলমুক্ত হতে থাকে কম অন্তরালায়িত শব্দবাবচ্ছেদ।

এককালে বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রায় হতই না। পত্রিকায় নিশ্চয়ই একগাদা বইয়ের বিজ্ঞাপন থাকত; কিন্তু তথাকথিত অভি-জাত লেখক-প্রকাশকের নাক-সিটকোনো বটতলার বই। অভিজাত প্রকাশকদের বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরোতো কচিৎ কখনো। প্রকাশক হিসেবে এককালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্সের প্রচন্ড নামডাক ছিল, ক'টা বিজ্ঞাপন তাঁরা দিতেন নিজে-দের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ছাড়া? এবং 'প্রবাসী'র সংগে বিনিময়ে পরস্পরের বইয়ের একপাতা করে বিজ্ঞাপন ছাড়া? পুস্তক তালিকা তাঁরা একটা ছাপতেন এবং আমি দেখেছি, মফস্বলের লাইব্রেরীতে ঐ তালিকা যত্নের সংগে সংরক্ষিত থাকত আবার অর্ডার দেবার সময় ওটা দেখে নেবার জন্য। আর কোনো কোনো প্রকাশক বা বুকসেলার ছিলেন, যাঁরা অনেকেই এখন হতশ্রী এবং যাঁরা জেগে আছেন, তাঁরা কোনো একটা সুনামে এবং মধ্যগত যাঁরা খুবই জেগে আছেন, তাঁরা বিজ্ঞাপনে। একটা ফুল-পেজ বিজ্ঞাপন মানে, এমনই [illegible] একটি সাপ্তাহিকেই এ-বিজ্ঞাপন দিলে সাড়া পাওয়া যায়—যার আদি ইতিহাস আমি জানি যে, ওর কৈশোরে অনেক নামকা-ওয়াস্তে রেটে ছাপবার লোভ দেখিয়েও প্রকাশকদের বিজ্ঞাপনে সম্মত করাতে পারে নি। আজ সেই সাপ্তাহিকই দুহাতে বারণ করছে আর রেট চড়াচ্ছে। এই চড়া রেটে যে প্রত্যেক সপ্তাহে ফুল-পেজ বিজ্ঞাপন দিতে পারে, তার কি পরিমাণ আমদানী হলে এই সামর্থ্য পায়?

বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, কেন না, ফোর্ড কোম্পানী বা বার্মা শেল, টাটাকেও বিজ্ঞাপন দিতে হয় এবং যত বড় বিজ্ঞা-পন, তত আমদানীর চান্স। হতে পারে এক শ্রেণীর বড় কোম্পানীর ওটা একটা আয়করে ফাঁকি দেবার এবং সংগে সংগে জানান দিয়ে থাকার উপায়ও বটে, কিন্তু বইয়ের বাজারে এখনো বড় কোম্পানীর "সুদিন" আসে নি। তবু বিজ্ঞাপনটা মাস্ট। যারা পারে না তারা লাস্ট। বিজ্ঞাপনেই পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকার বই ধুলোঝাড়া হয়ে বিক্রি হচ্ছে, ক্রেতারা কড়ি দিয়েই কিনছে এবং বিজ্ঞা-পনের দড়িতে বাঁধা পড়ছে। নাকের ডগায় বড়, তার বড়, তারও বড় বিজ্ঞাপন বলছে, কিনুন, তৃতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে এল, হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। পুরো এক পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন, একবার নয়, দু'বারও, কয়েক-বারও—একই সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনের অলংঘ্য নিয়মেই পাঠককে বা লাইব্রেরীকে তা কিনতে হয়; অবিজ্ঞাপিত বইয়ের খবর তারা রাখবে কি করে?

কিন্তু তাও হয়। অবিজ্ঞাপিত বইয়েরও বিক্রি হয়—যেমন হয়েছিল সেক্স-পীয়ার গ্রন্থাবলী; চারশ' বছর পরেও। একটা ছোট্ট দোকানেও শুনেছি দৈনিক ৩০।৪০ কপি বিক্রি হয়েছে; ক'দিন হুলস্থুল। কোথাও বিজ্ঞাপন দিতে হয় নি। লোকে খুঁজে কিনেছে। ৬ টাকায় সেক্সপীয়ার ওয়ার্কস ফুটপাথে ঢেলেও। তেমনি হয় পেঙ্গুইন, পেলিকান সিরিজের বই এবং আরও হরেক রকমের ইংরিজী বই। ডিমাই নয়, স্থূল নয়, কিন্তু তাবৎ নামকরা নাম-না-জানা বিদেশী বই, দরকারী বই, দর্শন, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান হরেকরকম রঙচঙে সস্তা বই—পনেরো-পঁয়তাল্লিশ নয়, পাঁচখানা বই বইতে কুলী লাগে না, ছোট্ট পোর্টফোলিওতেই ভরে যায়। বাসে খুলে পড়া যায়, দাঁড়িয়ে পড়া যায়, ছোট্ট সস্তা ভাল বই। ওরা ঢেলে দিচ্ছে, হাত বাড়িয়ে ওরা কিনছে। কারা? বাঙালী পাঠকেরাই। এ বইয়ের নতুন দোকান উঠেছে গজিয়ে, পাতাবাহারের মতো তার হাতছানি।

কিন্তু আসুন বইয়ের পাড়ায়, শুনেছে [illegible] [illegible] [illegible]; কেন [illegible] [illegible] বিন্দুক [illegible] [illegible] মুক্তিপ্রার্থী [illegible] [illegible]। সং-অসৎ প্রকাশকেরা [illegible] সিকি-বাট্টা কিছু নেই। আপনার চোখের সামনে চার ইঞ্চির মিনি বুক আর এখন ইটাকৃতি বইয়ের ৩০ পয়সা বনাম ৩০ টাকা একাকার হয়ে যাবে। আপনাকে বিরক্ত দেখলে কেউ একটু সংশোধনী দিয়ে বলবে; ভাগ্যিস দু-একখানা স্কুলের বই ছিল।

স্কুলের বইয়ের যে কি হাল তা প্রকাশান্তরা। কিন্তু এমন একটা দিগন্ত-ব্যাপী আর্তনাদ সর্বাংশে মিথ্যে হতে পারে না; [illegible] লোকসানী কারবারে কেন কেবল দোকান উঠে যাচ্ছে এ সত্যি নয়। একটা অতুলনীয় দু'-একখানা স্কুলের বই বেচে সারা বছর সপরিবারে স-দোকান। কেউ টিকে আছে—একথা ভাবতে ভয় লাগে, কেন না, স্কুলের বইয়ে অস্বাভাবিক শিশুবধ্য মার্জিন না থাকলে এমন কথা অবিশ্বাস্য। তবু সংকট নিশ্চয়ই কোথাও আছে, কেন না, প্রকাশকমাত্রেই ভাল অভিনেতা নয় বা অনুতভাবীও নয়। সংকট আছে, তবে সে কি, কোথায় এবং কাকে কি ভাবে তা বিঁধছে, জানতে পারলে বলা যেত।

একদিন ছিল, যখন প্রকাশকেরা পাঁচ-সিকের বেশি বইয়ের দাম করতে সাহস পেতেন না, বিক্রি হবে না বলে। একটা এক হাজারের প্রথম সংস্করণ আট বছরেও বিক্রি হয় নি, এমন দৃষ্টান্ত আছে অনেক। লেখকেরা ভয়ে ভয়ে 'চোর' হয়ে থাকতেন। দ্বিতীয় সংস্করণ হলে ছেলের আই-সি-এস হবার আনন্দ পেতেন। আর আজ-কাল? বিজ্ঞাপনদাতাদের ঘোষণা যদি সত্য হয়, (অসত্যই বা হবে কেন?) তবে শুনে বিস্ময় লাগে যে, এখন তিন মাসে একটা সংস্করণ শেষ হয়ে যায় এবং একটা বইয়ের সতেরো/আঠারোটা সংস্করণ হয় তিন-চার বছরে। এবং এ সংস্করণ মাত্র এক হাজারের নয়, বাইশ শ'র এক-একটি সংস্করণ। দামও এখন পাঁচসিকে মাত্র নয়, দশ টাকার নিচে বড় একটা নয়। দশ বছর আগে পাঁচ টাকাই ছিল আকাশ-চুম্বী। এখন চন্দ্র-শুক্রাভিযানের কালে এই বইয়ের গড় দাম পনেরো থেকে পঁয়-তাল্লিশ। কম করে পনেরো টাকা বইয়ের তিন মাসে বা তিন মাস অন্তর সংস্করণ কেন হয় না, হতাশা বা বই-বাজারের সংকট কি সেখানে?

পাঁচসিকের কালে বরং পাঁচসিকেকেও বীট ডাউন করার জন্য নানা সিরিজ বেরোতো; হয়তো দু আনা, তিন আনা সিরিজ কথাসাহিত্যের ঠাঁই হত না, কিন্তু চার আনা, আট আনা, বারো আনা, এক টাকা সিরিজের বই বেরিয়েছে খুব [illegible];

সংখ্যায় নয়। পুরেনো লাইব্রেরীগুলোয় এখনও সম্ভবত এদের নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয় নি। কাগজ ও ছাপা-বাঁধাই নিঃসন্দেহে ছিল এখনকার তুলনায় সস্তা, কিন্তু খদ্দেরের রাজ্যও ছিল সংকীর্ণ। সস্তা সিরিজগুলোই জ্বলন্ত প্রমাণ যে, অনিচ্ছুক পাঠককেও বই কেনার জন্য প্রলোভিত করা হত। কোথাও কোথাও একটা অতিরিক্ত বই গিফ্‌টও দেওয়া হত। সুতরাং, কস্টিং নয়, সেকালের তুলনায় একালে খদ্দেরের বিস্তার ঘটেছে অনেক। জমিদারদের ব্যক্তিগত বিলাসের লাইব্রেরীর বদলে রাষ্ট্র-সাহায্যে গণ-লাইব্রেরীর আবির্ভাব ঘটলেও ব্যষ্টিগ্রাহকও কিছু কম নয়।

কিন্তু সেকালে পাঁচসিকের প্রকাশকেরা কস্টিংয়ের জন্যই হোক, কি মুনাফার মার্জিন বাড়াবার জন্যই হোক, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আড়াই টাকায় দাম তুলে ভাবনায় পড়তেন। পাঁচ টাকা দাম ধরলে উদ্বেগের অন্ত থাকত না। কিন্তু কখন যে দামের বাজারে বিপ্লব ঘটে গেল তার একটা সঠিক তারিখ দেওয়া মুস্কিল। মোটামুটি কালটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের বা যুদ্ধ-প্রচেষ্টার দাক্ষিণ্যে পাঁচ-ছ' বছর ধরে রাম-শ্যাম-যদু-মধু হরেকরকম কাজ পেয়েছে এবং নারী-পুরুষনির্বিশেষে অনেকের হাতে অঢেল টাকা এসে পড়েছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাসিক বই 'পদ্মা নদীর মাঝি' এই প্রথম দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দেখে এবং বহু কালপুরুষ লেখক কালাতিপাতের উপযোগী বইয়ের চল দেখতে পেলেন। এবং এই বোধ হয় প্রথম যখন দলীয়-রাজনীতি-সচেতন সাহিত্যরসিককুল আদর্শাত্মীয়ের বই নিয়ে কীর্তন শুরু করলেন। তার নীট ফল হল, অন্তত বুক-প্যারেডের জন্যও কোন কোন বইয়ের সংস্করণ-স্রোত বইতে লাগল। পাঠকের রাজ্যে পপুলেশান এক্সপ্লোশান ঘটল। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষ চাষী মরে গিয়ে বৃহত্তর চাষীসমাজকে নির্বীর্য করে দিয়ে গেল বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিই হোক, কি এমপ্লয়মেন্টস্ফীতিই হোক, বাবুদের হাতে আলগা পয়সার আমদানীতে মন্বন্তর কোনো বিঘ্ন ঘটায় নি।

দ্বিতীয় যুদ্ধ লেগেছে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে; কিন্তু পণ্যদ্রব্যের দাম '৪৩-এর দুর্ভিক্ষকালেও আজকের মতো বাড়ে নি। আজ চালের দাম ৬০ থেকে ৮০ টাকায় নামা-ওঠা করে এবং মোটামুটি সবাই খেয়ে বেঁচে-বর্তে আছে রেশনকে অবলম্বন করে; তখন ১৬ টাকায় চালের দর বেঁধে দেওয়ায়ই লোকের চোখ কপালে উঠেছিল, কেন না চালের দাম ছিল ৩।৪ টাকা; কয়লা সাত আনা মণ, সরষের তেল ছ' আনা সের, মাছ আট আনা। আমরা ভোগ করেছি, কিন্তু আজ সে-কথা স্বপ্নের মতো মিথ্যে মনে হয়। মনে পড়ে, সেই যুদ্ধকালে সর্বপ্রথম কালোবাজারের নাম শোনা গেল, ব্ল্যাক-মার্কেটের বাংলা। প্রথমটায় মনে হত, এও বুঝি ব্ল্যাক-আউটেরই কোন দোসর এবং নিষ্প্রদীপের মধ্যেই এ কারবার হয়। পরে জ্ঞানোদয় হতে বোঝা গেল, ওটা খোলা বাজারেরই একটা স্পর্ধিত নাম। এবং এই কালোবাজারের প্রসাদে অনেকের হাতেই এলো কালো টাকা। সৎ মানুষের দেখা আর পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ লোকেরই হাত নিসপিস করে, কি করে পয়সা জমে; খাবার বা অন্য দ্রব্য লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ছাড়লে, খাঁটি জিনিসে কৌশল করে ভেজাল দিতে পারলে যে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়—যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে এই দিব্যচক্ষু খুলে গেল লোকের।

এর সর্বনাশা প্রভাব বাংলাসাহিত্য-ক্ষেত্রে বা প্রকাশনাক্ষেত্রে পড়ে নি, এমন কথা বলতে দ্বিধা জাগে। সাহিত্য ও সাহিত্যের সুলভ প্রচারের লক্ষ্য ছিল কতটুকু এবং এই মওকায় কষে দাম নেবার প্রবৃত্তিই বা ছিল কতটুকু, চুলচেরা বিচারের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এই প্রথম লেখকেরা ভালো (কালো?) পয়সার মুখ দেখতে লাগলেন। লিখলে পয়সা পাওয়া যায় এবং লিখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, সৌখীনতা নয়, এটাও একটা প্রফেশান বৃত্তি হতে পারে, এমন একটা তথ্যাশ্রয়ের নবাবিষ্কার ঘটল। যেসব আজকেরও নামকরা লেখক সেকালে প্রকাশকের খুপরিতে আধখানা মামলেট আর হাফ কাপ চা খেয়ে অথবা ভিক্ষাপাত্রে দশটি টাকা পেয়ে পরিতৃপ্ত থাকতেন, তাঁরা যেন অকস্মাৎ লটারীর টাকা পেতে লাগলেন, এক সঙ্গে কয়েকটা দশ টাকার নোট গুণতে পেয়ে আলাদীনকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। অনেক লেখকই হাল আমলে দুটো খেয়ে স্বাস্থ্য ফেরাতে পেরেছেন, বাড়ি, গাড়ি করেছেন, কেউ কেউ ইনকাম ট্যাক্সকেও একটা নুইসেন্স মনে করছেন। হঠাৎ যেন স্বপ্ন সত্য হয়ে গেছে। সেই শক্কুর (বা ছাতুর) কলসীটা স্বপ্নঘোরে পায়ের লাথিতে ভাঙে নি, কলসী ভরে টাকা এসে পড়েছে গায়ে। তাঁরাই চোখ রগড়ে রগড়ে অভাবনীয় বাস্তব দেখলেন, বইয়ের সংস্করণ হয় এবং একটা নয়, দুটো-তিনটে এবং আরও আরও।

একাধিক সংস্করণ বা বহু সংস্করণ নিঃসন্দেহে কোনো বইয়ের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। বই ভালো কি মন্দ তার মানদণ্ড অবশ্য আলাদা। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায়ই দুর্গেশনন্দিনীর তেরটি সংস্করণ হয়েছিল। এখনও কোনো কোনো বইয়ে তেরো সংস্করণ হয়। বেশিই হয়। কিন্তু বঙ্কিমকালের এবং একালের জনপ্রিয়তায় গুণগত পার্থক্য আছে। দুর্গেশনন্দিনী, বলতে গেলে, ইংরাজী শিক্ষিত নব্য বাঙালীদের কাছে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য বইয়েরও সংস্করণ হয়েছে, এত নয়। স্মরণ রাখা দরকার, এখনকার মত বইয়ের বিজ্ঞাপন-প্রাচুর্য তখন ছিল না; কিন্তু মাতৃভাষায় উপন্যাস রসগ্রাহীর অভাবও ছিল না। তবু বলতে হবে, পাঠকের সংখ্যা এত ছিল না এবং বইয়ের সংখ্যাও এত ছিল না। পরবর্তীকালে উক্ত পুরুষদের এই কালোত্তীর্ণ রসসৃষ্টির ব্যাপক পরিবেষণ হয়েছে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অত্যন্ত সুলভ প্রচার-ব্যবস্থায়। কে অস্বীকার করবে বসুমতী সাহিত্য মন্দির উদ্যোগী না হলে বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠকসমাজও সংকীর্ণতর হয়ে যেতে পারত। শরৎচন্দ্রের বহুল প্রচারও বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের উদ্যমেই হয়েছে। আজ অবিশ্যি এঁদের ভিন্ন জাতীয় গ্রন্থাবলীও সমাদৃত হচ্ছে।

এই গ্রন্থাবলীও সম্ভবত ওঁরাই প্রথম প্রবর্তন করেন। এখন বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী থেকে সুকান্ত গ্রন্থাবলীও পাওয়া যায়। আলাদা আলাদা বই ছেড়ে গ্রন্থাবলীর প্রকাশনও এখন একটা রেওয়াজ। এনথলজি বা সঙ্কলনের আকৃতি নিয়েছে অনেকের প্রক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত লেখা এবং এখানেও প্রকাশকের ব্যবসায়িক লক্ষ্যটাই বড়। একই লেখকের "শ্রেষ্ঠ" নির্বাচিত লেখার স্থূলকায় সঙ্কলনও হচ্ছে। ছাপা-বাঁধাই-প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয়, উপহারের পক্ষে উপযোগী।

সাদামাটা কভার ছেপে বই বেচব, সাধারণ প্রকাশকের সেদিন নেই। শরৎবাবুর বই ওভাবেই বেঁচেছেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স এবং এখনও বেচেন বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বই। কিন্তু এর বাইরে বড় বাজারে বহুবর্ণ প্রচ্ছদপটই বইয়ের প্রথম ও অর্ধেক আকর্ষণ, শো-কেসে দেখেই যেন খদ্দের প্রলুব্ধ হয়। বই যাই হোক, ওর অঙ্গসজ্জা হওয়া চাই ঝকঝকে তকতকে। প্রকাশকরা বলেন, প্রোডাকসনই আসল, বই যাই হোক।

এমনিতর অনেক প্রকাশকের তীব্র প্রতিযোগিতা; ভাল বইয়ের বিক্রী হয় না, আদর হয় না, সংস্করণ হয় না—এমনও নয়। সাহিত্যের অগ্রগতিও আলাদা কথা। অনেক বই বেশ বেশি দামেই বিক্রী হচ্ছে, সংখ্যায়ও কম নয়। ইংরাজী বই দেদার বিক্রী হচ্ছে। ভালো বই পেলেই লোকে কিনতে খোঁজে। লোকের পড়ার আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা বেড়েছে। তবে সঙ্কটটা ঠিক কোথায়?

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ এগার ॥

'আমরা বসে বসে অপেক্ষা করছি। কিন্তু ইতিহাস কারুর জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

হ্যারিকেনের ল্যালচে আলোয় চোখ দুটো সরু করে কৃষক আন্দোলনের নেতা আমাকে একটা অতি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন।

'বসে বসে অপেক্ষা করছেন?'

'নয়তো কি।' এম-এল-এ আসেন ফোলিও ব্যাগ নিয়ে। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, 'কোটা কেমন উঠছে?' দ্বিতীয় প্রশ্ন, কৃষক সমিতির মেম্বর কিরকম বেড়েছে?' তৃতীয় প্রশ্ন, 'জপী কর্মী কেমন জোগাড় হচ্ছে?'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। তাঁর ওঠবার সময় হয়। আবার একটা মিটিং আছে দু মাইল দূরে। যে এসে নিয়ে যাবে, সে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে জানান দিচ্ছে, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং। খালি মিটিং, মিটিং, মিটিং। খালি কথা, কথা, কথা।'

'তা' আপনারা যদি এসব অপছন্দ করেন ত' বলেন না কেন? পার্টির নেতার বিরুদ্ধে কিছু বলা কি বেআইনী?

'না, তা' নয়। বলেছিলাম ত'! বলেছিলাম, কোটা কোটা করছেন। বলছেন, লেভি ঠিক মত সংগ্রহ হচ্ছে না কেন? বলছেন, পার্টি পত্রিকা বেশি বিক্রি হচ্ছে না কেন? অর্থাৎ কোটা পূর্ণ হওয়াটাই লক্ষ্য? পত্রিকা বেশি বিক্রি হওয়াটাই লক্ষ্য?'

এম-এল-এ ভদ্রলোক কি বললেন?'

'বললেন, টাকার ত' প্রয়োজন আছে। পত্রিকা বেশি বিক্রি কি খারাপ?'

বললাম, 'বলুন কতো টাকা দরকার? অঞ্চলপ্রধান, গ্রাম অধ্যক্ষ, বড় জোতদার, তেজারতি কারবার করেন এমন মহাজন, এরা ত' মুখিয়েই আছে টাকার থলি নিয়ে। একবার আপনি মুখের কথা ছাড়ুন। হুড় হুড় করে এসে যাচ্ছে টাকা। আর পার্টি পত্রিকা বিক্রির ব্যাপারটার ভার নেবার জন্যেও এরা তৈরি। এরা নিজেরাই দশ-বারোখানা করে পত্রিকা কিনে নিয়ে পার্টিকে কৃতার্থ করে দিতে পারে। কিন্তু তারপর? তারপরের কথাটি কি ভেবে দেখেছেন? অঞ্চলপ্রধান, মহাজন, গ্রাম অধ্যক্ষকে এর পরও কি প্রগতিশীল বলবেন না?'

'এম-এল-এ কি বললেন?'

'বলবেন আবার কি। বললেন, আমি ঠিক ওভাবে ভেবে দেখি নি। আপনি ঠিক বলেছেন। ঠিক আছে, চালিয়ে যান।'

'ভালো কথাই ত' বলেছেন।'

'ভালো কথা ওঁরাই ত' বলবেন। সবাইকেই হাতে রাখতে চান। সবাইকেই কথা দেন। সবাইকেই বলেন, আমি তোমার জন্যে চেষ্টা করবো। সবাইকে দেখলেই হাসেন। কখনো চটেন না। কখনো রেগে ফেটে পড়েন না। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন। এ'রা ভালো লোক। ভালো ভালো কথা বলেন।'

'কিন্তু আপনার কথার ধরনে মনে হচ্ছে, আপনি যেন এসব পছন্দ করেন না?'

'আপনি ব্যাংগ করছেন, না বুঝেও বুঝতে চাইছেন না?' উনি তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

আমি হাসলাম। নিরুত্তর রইলাম। হাত নেড়ে [illegible]

'এদের শুধু লক্ষ্য কি জানেন, ইলেকশন। ধবধবে সাদা আদ্দি উড়িয়ে, হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে সেই বাড়িটিতে যাওয়া, লোকে আর খবরের কাগজে, যাকে বলে বিধানসভা! আর কোন লক্ষ্য নেই। অথচ আমাদের নিজস্ব ঘরোয়া মিটিং-এ কতো বড়ো বড়ো কথা, কি লম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতি!'

'আপনি আপনার পার্টির নেতার নামেই নিন্দে করছেন? তাও আবার এমন একজন লোকের সামনে, আপনাদের ভাষায় এমন একটি শ্রেণী'র প্রতিনিধির কাছে, যে শ্রেণী ভোল পাল্টাতে ওস্তাদ!'

তারপর গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে আড় চোখে ও'র দিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি কি এম-এল-এ হয়ে এ অঞ্চলে দাঁড়াবেন, এটা ঠিক করেছিলেন? নমিনেশন পান নি?'

উনি একটু চুপ করে গেলেন। আমি প্রতি মুহূর্তে প্রমাদ গুণতে লাগলাম। হয়তো আমার অধিকারের সীমারেখা অতিক্রম করে গেছি। আমি ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে নেব কি? এমন সময় সেই আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটলো। উনি হঠাৎ ছাদ ফাটিয়ে হো হো করে তুমুল অট্টহাস্য করে উঠলেন। পাশের ঝোপ থেকে অতর্কিতে ওনাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু উল্টে উনিই আমাকে বস্তাবন্দী করে ফেললেন। কিন্তু এমন ফাঁদ পেতেছিলাম, যাতে ছিলো নিশ্চিত মৃত্যু'র প্রতিশ্রুতি। কি হল? আমার অনেকদিনের পুরোন অস্ত্রে কি আবার নতুন করে শাণ দেওয়া দরকার?

উনি নম্র, অনুত্তেজিত, শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমরা একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। অনেকদিন পার্টি করছি। [illegible]

শেষ দিন পর্যন্ত করে যাবো। এই পার্টি লড়াই দিতে পারবে বলে এতে এসে-ছিলাম। আজো চাইবার মত একটি জিনিসই আছে পার্টির কাছে। লড়াই।'

'লড়াই?' তিনটি অক্ষরের এই শব্দ উনি কি শুদ্ধভাবেই না উচ্চারণ করলেন। আমি বিস্মিত হয়ে ও'র মুখের দিকে তাকালাম। আমরা সবাই অন্যরকম চাই। আমি নিজেও তো কতো কি চাই। চাই না? কিন্তু এ কেমন ধরনের চাওয়া? ও'র দিকে আবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম। স্পষ্ট মনে হল ও'র টেবিলের পাশেই পড়ে রয়েছে রাইফেল। নির্দেশ পেলেই টোটা-ভর্তি রাইফেল উনি নিমেষে কাঁধে তুলে নেবেন। অথচ এমনিতে ততো ভয়ংকর মানুষ তো নন। অত্যন্ত রোগা, হাড় বের-করা জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। শুধু চোখ দুটিতে কিছু বিশেষত্ব আছে। ও দুটো সব সময় চঞ্চল, প্রাণবন্ত, কিসের এক উত্তেজনায় অহর্নিশ দপ্ দপ্ করছে।

টেবিলের ধার থেকে উনি অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালেন। হাত দুটি পিছমোড়া। হ্যারিকেনের আলোয় একটা বিরাট ছায়া-মূর্তি'র আকার ধারণ করেছেন।

'এম-এল-এ জঙ্গী ক্যাডার খুঁজছেন? আমাকে বলে দেবেন কে সমাজ-বিরোধী, আর কে জঙ্গী ক্যাডার?'

বিদ্যুতের তাপ আছে। কিন্তু মানুষের কথার মধ্যে এতো তাপ, এতো জ্বালা যে থাকতে পারে, আমি জানতাম না।

ঘুরতে ঘুরতে আমারো কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিছু কিছু ঘটনা, মানুষ, আমিও জানি বৈকি। কে কেমনভাবে ঘাপটি মেরে কোথায় আছে, আমিও সনাক্ত করতে পারি বৈকি! কিন্তু ও'র মুখে শোনাই ভালো।

'জানেন, সেদিন এক জায়গায় গিয়ে-ছিলাম। কৃষক সমিতি করি। শুধু চেয়ে আর বেনামী জমি উদ্ধার করলেই তো কাজ শেষ হ[illegible] গেল না। একজন এসে সন্ধান দিলো 'বল' নেবেছে।'

'বল?'

'হ্যাঁ, বল।' আমি বললাম, 'দু'-চারজনকে খবর দাও।'

দু'-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে ছুটে গিয়ে একটা ঝোপে লুকিয়ে রইলাম। তখন ও আসছিলো 'বল' নিয়ে একটা রিক্সা থেকে নাবিয়ে।

গোল হয়ে ঘিরে ফেললাম। দেখলাম ও একবার মাত্র আমার মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত হল না। একটার পর একটা 'বল' নাবাতে লাগলো।

'কি মশাই, নিজেকে কি ভাবছেন?' আমাদের [illegible] একজন খোঁচা দিলো।

'কি আবার নতুন করে ভাববো? বল, ব্লাডার নিয়ে কারবার করি, সবাই তো জানে।'

'খুব যে আস্পর্ধা হয়েছে? লজ্জা করে না? ইতরের মত কাজ করো, আবার নাক তুলে তুলে কথা বলছো?'

'লজ্জা? কি বললেন কথাটা? লজ্জা?' বলে লোকটা নির্লজ্জের মত হাসল।

'কার লজ্জা'?

লজ্জার কথা বললে আপনিই লজ্জা পেয়ে যাবেন। লজ্জার কথা বলবেন না।'

ওর কথায় কান দিলাম না আর। ও এখন 'ভাইতে'র সদার সেজেছে। অনেক ঠাট-ঠমক ওর জানা। অনেক কেরামত। সুতরাং ব্লাডারগুলো সমস্ত বাজেয়াপ্ত করে রিক্সাঅলাকে বললাম, 'চলো থানায়।'

'শুনুন!' হঠাৎ পেছন থেকে ও বিকট চীৎকার করে উঠলো।

'নিয়ে যাচ্ছেন নিয়ে যান। কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানবেন না? আপনি কোন-দিনই টের পেতেন না, কিরকম করে মাল নিয়ে কোথায় গুদোমজাত করছি। এই দু' বছর একনাগাড়ে করে গেছি। টের পেয়েছেন? আজ এ-কলাবাগানে, কাল ও-বাঁশবনে। রোজ তো একই জায়গায় থাকি না। কারবারও আমার এক জায়গায় নয়। এই নাম বলে বলে দিচ্ছি। এই দুখীরাম, খাদন, বলাই, যারা আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, কৃষক সমিতি করে, বড় বড় কথা বলে, জোতদারকে নাকি খতম করতে হবে, দেশ থেকে শোষণ তুলে দিতে হবে, এই সব বড় বড় লম্বাই-চওড়াই বাত হাঁকায়, ওদের জিজ্ঞেস করবেন কার মদের গন্ধ ওদের মুখে? নাম ধরে ধরে বললাম। ওরা সব আপনার ঝাণ্ডার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। কথাটি বলছে না। অস্বীকার করুন, গলা ফাটিয়ে বলুন, ওরা, ওই দুখীরাম, খাদন, বলাই আপনার দলের নয়।

আমি বজ্রাহতের মত ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সাহস হল না খাদন, দুখীরাম, বলাই-এর দিকে তাকাতে। আমি জানি ওরা একটু-আধটু 'গাছ-পানি' বা চোলাই খায়। কিন্তু ঘটনার এ-দিকটা আমি ভেবে দেখি নি। আমি ভাবতে পারি নি যে, নিজে চোলাই টেনে কখনো বেআইনী চোলাই কারবার তোলা যায় না! অথচ এটা ভাবাই তো ছিল স্বাভাবিক! মাথা আমার হেঁট হয়ে গেল।

আরো শুনবেন?

এ্যাই রাখোহরি, চুপো। চুপো বলছি। এ্যাই।

খাদন, দুখীরামরা 'রাখোহরি' নামে ব্লাডার ব্যবসায়ীকে থামাতে চাইলো।

চুপ করো! আমি ধমক দিলাম ওদের। [illegible] আমি [illegible] এ তল্লাটে ব্যবসা খুললাম, তখন দেখলাম ওরাই মস্তান পার্টি। ভাবলাম, ওদের যদি হাতে রাখি, তাহলে কারবারটি আমার বেশ জমাট করে চলবে। ওদের 'ফিরি'তে দিতে লাগলাম। এ পর্যন্ত চলছিলো ভালোই। কিন্তু ওরা বেলেল্লাপনা করতে লাগলো। আমি মদ বেচি বটে, কিন্তু কোন শালা বলতে পারবে না, রাখো কোন দিন একফোঁটা চেখে দেখেছে। তাছাড়া আমিও স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে ঘর করি। ওরা মদ খেয়ে টং হয়ে এ তল্লাটে মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করলো। পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে, কি গা ধুতে মেয়েরা গেছে, ওরা টিটকিরি দিতো। কোমর দুলিয়ে 'ভাইতে' গাইতো। এটা আমার সহ্য হোল না। আমি মদ বেচি বটে, কিন্তু নজর আমার নীচু নয়। আমি ঠিক করলাম এ পাপ আমি আর রাখবো না। সমস্ত কারবার এখান থেকে গুটিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো। দু'-চারদিন থেকেই 'ব্লাডার' আর ওদের 'ফিরি'তে দিচ্ছি না। তাই বাবুদের রাগ হয়েছে। ওরা সেজন্যে আপনাকে খবর দিয়েছে। যদি 'ফিরি'তে দিতাম তাহলে আপনি হাজার চেষ্টা করলেও কিছু করতে পারতেন না।'

কৃষক আন্দোলনের নেতা চুপ করলেন। তারপর এক অদ্ভুত অসহায়, বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'এরাই সব আমাদের জঙ্গী ক্যাডার। হু হু করে নাকি কৃষক সমিতি বাড়াতে হবে। ওপরতলার তাই নির্দেশ। কিন্তু কাদের নিয়ে?'

'আপনি এসব তো আপনার পার্টিতে তুলতে পারেন?'

'আমি একথা বলেছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন।'

'আমাকে ওরা বলে আমার মন নাকি

পরেনো। আমি বুঝি না নতুন কালের হাওয়া। ডানপিটে, ডেসপারেট ছেলেরা এধার-ওধার দু'-চারটে অন্যায় কাজ করলেও তাদের যদি পার্টিতে রাখা যায়, তাহলে প্যার্টিই তাদের দোষ ধুয়ে দেবে একদিন।'

'কিরকম করে?'

'লড়ায়ের সামনে ছেড়ে দিয়ে।'

কিন্তু আমি কি করবো, আমি বুঝতে পারি না।

ওরা যা' বলছে সেটাও ঠিক, আবার ওদের জন্যে যে পার্টির বদনাম হচ্ছে সেটাও তো মিথ্যে নয়। কি করছে জানেন? সেদিন পরেশ ঘোষকে ধরেছিল রাস্তার মোড়ে। পরেশ ঘোষ তার 'হাল কিষাণ'কে মুখ খারাপ করেছিলো। এই দুখীরাম পরেশ ঘোষের কান ধরে কুড়ি বিঘোত নাকে খৎ দিইয়েছিল ওর ছেলে-বৌ-এর সামনে। কেউ কিছু বলতে পারে নি। কেন না দুখীরামের সাতপুরুষ মাপ। সে কৃষক সমিতির লোক। জঙ্গী মনোভাব দেখানো হল ঠিক, কিন্তু মনে মনে সমস্ত গাঁ আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। বাপের বয়েসী মানুষকে সামান্য অপরাধে ছেলের বয়েসী যদি তার পরিবারের সামনে, গোটা গ্রামের লোকের সামনে নাকে-খৎ দেওয়ায়, তার মানে কি সাংঘাতিক! এর নাম বিপ্লব! এর নাম জঙ্গী মনোভাব! যে-দিন আসছে সে-দিন এতো সুখ থাকবে না। সেই ভয়ংকর দিনে বন্ধু বলে আমরা কাদের দিকে হাত বাড়াবো, এমনি করে গ্রামের মানুষকে যদি চটিয়ে দি? পরেশ ঘোষের শাস্তিটা কি যথেষ্ট বাড়াবাড়ি হল না? জোতদার হলেও লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া কি উচিত?

শুধু এই নয়। জোর করে জরিমানা ধার্য করছে। কে কোথায় অন্যায় করছে, ওরা বলছে, তোমায় এ্যাতো এ্যাতো দিতে হবে। না দিলে গর্দান যাবে। ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। তারপর, এরকম খবরও আমার কাছে আছে, সেই টাকায় পাঁঠা কিনে ভোজ দেওয়া হয়েছে। মদ খাওয়া হয়েছে। 'ভাইতো' নাচা হয়েছে।

'কিন্তু এরকম ঘটনাই কি সব?'

'না, সব নয়। কিন্তু যেখানেই এরকম ঘটনা ঘটছে সেখানেই এই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। সমাজ-বিরোধীরা জঙ্গী কর্মী, না জঙ্গী কর্মীরা সমাজ-বিরোধী। আপনি কি করবেন?'

'আপনারা বাধা দিন।'

'কিভাবে বাধা দোব? দলের মধ্যেও দ্বিমত। তা ছাড়া মনে করুন, কেউ যদি আমার পার্টির পোস্টার দেয়ালে মারে, আমার পার্টির মিছিলে ঢুকে পড়ে, আমার পার্টির হয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে, সে চাঁদা যদি পার্টি-ফাণ্ডে জমা দেয়, তা হলে আমি কেমন করে তাকে তাড়াই?

'কিন্তু লড়াই হলে তো সব ঠিক হয়ে যাবে!'

আমি অন্যমনস্ক হয়ে বলি।

'হ্যাঁ, লড়াই।'

ও'র চোখ দুটি আবার জ্বলে উঠলো। যেন ঐ তিনটি অক্ষর ও'কে শান্ত করলো।

উনি হাত পিছমোড়া করে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছিলেন এদিক থেকে ওদিকে। ও'র কণ্ঠে অসহায়তা ফুটে উঠছিলো। যেন, বুঝি সব কিন্তু কিছুই করা যাবে না, এই যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিলেন।

কিন্তু যেই 'লড়াই' শব্দটা আমার মুখ ফসকে বুলেটের মত বেরিয়ে গেল, উনি যেন তাতেই পথের নিশানা খুঁজে পেলেন। আমি কি ভেবে বলেছি? বলি নি। আমি শুধু ও'র কথার প্রতিধ্বনি করেছি। কিন্তু তিনটি অক্ষর দিয়ে তৈরি শব্দ ও'কে টেবিলের ধারে টেনে নিয়ে এলো। উনি পরিত্যক্ত চেয়ারে এসে বসলেন। টেবিলের ওপর শীর্ণ দু'খানি হাত প্রসারিত করে হঠাৎ উৎসাহীর মত, আমি জানতে চাই নি, তবু আমাকে ভিয়েতনামের গল্প বলতে লাগলেন, 'জানেন ভিয়েতনামে'......

গল্প শুনতে শুনতে আমার যেন মনে হল আমার আহত স্বদেশেরই কথা যেন নতুন করে শুনছি। মনে হল ভিয়েতনামের নদী, জল, হাওয়া ভেদ করে ও'র সজীব, প্রাণবন্ত চোখ ঠিক খুঁজে বার করেছে সেই সব মুক্তি সেনানীদের, যারা আজ রাত্রে জানুয়ারীর ভয়ঙ্কর শীতে মেকং নদীর অববাহিকার কাঁটাতারের বেষ্টনীর মধ্যে নিদ্রাহীন পরিখায় জেগে আছে।

[ ক্রমশঃ ]

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ তেতাল্লিশ ॥

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো পাশের ঘরে। স্যুইচ টেপার শব্দ। কাঠের পার্টিশনের ফাঁকে খানিকটা আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ল এ-ঘরেও। বুঝতে পারছি, পাশের ঘরে বুড়ো নেপালী দারোয়ানের ঘুম ভেঙেছে। উঠেছে কোন প্রয়োজনে। সর্বনাশ, এত রাতে বাইরে যাবে নাকি? বাইরে যাবার চেষ্টা করার মধ্যেও বিপদ আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ সন্ধ্যার কিছু আগে আমি এ-বাংলোতে আসবার পরই তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। এ-নিয়ে আমি তাকে বলেছিলাম, তোমার নাম কি?

সে তার নাম বলেছিল, ভক্তবাহাদুর রাই।

তা ভক্তবাহাদুর, কতকাল আছ তুমি এখানে?.

ভক্তবাহাদুর যা বলল তাতে জানা গেল, আজ প্রায় ন'-দশ বছর আছে সে এখানে।

ন'-দশ বছর! বল কী!

ভক্তবাহাদুর সরকারী বন বিভাগের কর্মচারী। চাকরিতে ঢুকেছে প্রায় বিশ-বাইশ বছর হয়ে গেল। প্রথমে ঢুকেছিল জলপাইগুড়িতে। সেখান থেকে রাজাভাতখাওয়া, পরে বক্সা হয়ে অবশেষে এখানে এল।

এই নির্জন বাড়িতে একা একা তুমি থাকো কি করে?

আমার কথা শুনে সে হাসল।

ঘরের ভিতরে একটা ডেকচেয়ারে আমি বসেছিলাম। বেতের চেয়ার হলেও কাঠটা দামী এবং বেশ ভারী। আমার হাতে ছিল চায়ের পেয়ালা। তা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছিল। একটু আগে ভক্তবাহাদুর বেশ যত্ন করে আমার জন্যে বানিয়ে আনল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি তার ছোট-ছোট দু'টি চোখ ও রেখাঙ্কিত মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম।

এই বনের মধ্যে নির্জন বাড়িতে তোমার ভয় করে না?

ভক্তবাহাদুর আমার কথায় কি ভেবেছিল জানি না। তেমনি উদাসীন গলাতেই বলেছিল, কিসের ভয়?

এই ধরো, বনের মধ্যে একা-একা...

না সাহেব, ভয়ের কিছু নেই। ভয়-ডর করলে চলবেই বা কেন?

এখানে হিংস্র জীবজন্তু আছে তো?

তা আছে।

আমার অবশ্য জানাই ছিল। এখানে আসবার আগে আজ বিকেলেই এখানকার ফরেস্ট বীট অফিসার তরুণবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছেই জেনেছিলাম সব। জেনেছিলাম এখানকার ভয়াল-গম্ভীর অরণ্যের কথা। হিংস্র পরিবেশ। তিনিই আমাকে রাত্রিটা এখানে বিশ্রাম নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

এসে যখন পড়েছেন, নতুন মানুষ, যাবেন কোথায় আপনি? আমার অবস্থা তো দেখছেন—

না, না—বাংলোর ব্যবস্থাই আপনি করে দিন, আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ইচ্ছে থাকলেও তাঁর ওখানে থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাঁর কোয়ার্টারটি ছোট। তাছাড়া অল্প কিছুদিন হল তিনি বিয়ে করে এসেছেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিরুপদ্রব প্রশান্তি বিঘ্নিত করা উচিত নয়।

ডাকবাংলোয় আপনার অবশ্য কষ্ট হবে না। বিছানাপত্র সবই আছে। চৌকিদারকে ডেকে আমি বলে দিচ্ছি। শুধু খাওয়া-দাওয়াটা সেরে যাবেন এখানে।

বলা বাহুল্য, তাতেও আমি রাজী হই নি। কিন্তু তাঁর আগ্রহাতিশয্যে তা টেকে নি। অবশেষে তিনিই একটা সমাধানের সূত্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

চৌকিদারের হাতে টিফিন ক্যারিয়ারে আপনার খাবার পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সাবধান, নতুন মানুষ আপনি। তাই বলেই দিচ্ছি, রাতে কিছুতেই বাইরে যাবেন না।

ভয়-ভীত আছে বুঝি?

না, ভয়-ভীত বলে না। বনের মধ্যে তো—অনেক হিংস্র জীবজন্তু আছে তো?

ভক্তবাহাদুরকেও শুধিয়েছিলাম সেই একই কথা।

এই বনের মধ্যে একা-একা থাকতে তোমার ভয় করে না?

না সাহেব, ভয় করে না।

জীবজন্তুরা—

কথা শেষ করতে পারি নি। তার আগেই ভক্তবাহাদুর বলেছিল, তবে অবশ্য এক-আধটু সাবধানে থাকতেই হয়।

রাত-বিরেতে চলাফেরা কর না?

করতেই হয়। আমি এখানকার চৌকিদার যে! বাইরের আলো জ্বালিয়ে রাখি। আলোকে সব জীবজন্তুই ভয় করে।

আচ্ছা বাহাদুর, ওরা কোনরকম ক্ষতি করতে চেষ্টা করে না?

তা করে সাহেব। তবে তাদের সুযোগ দেব কেন? একটু থেমে সে বলল, একবার-দু'বার সামনেও পড়েছি।

বল কি!

ভক্তবাহাদুরের মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই। সে বলল, একবার পড়েছিলাম গণ্ডারের সামনে। আরেকবার রাজাভাতখাওয়া থাকতে ভালুকের সামনে পড়েছিলাম।

ভালুক! চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে আমার হাত কেঁপে উঠেছিল। খানিকটা চলকে বুঝি নিচেও পড়ল। কিন্তু তার চোখ স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

রাত বেশ অন্ধকার ছিল সেদিন। বীট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে দেরিও হয়েছিল বেশ। সাহেবের বাড়ির সামনেই বাগান। তার পাশ দিয়ে বাইরে যাবার রাস্তা। তারকাঁটার বেড়ার পাশে-পাশেই। খানিকটা এগিয়ে একটা রাধা-চূড়া গাছ। গাছটার কাছাকাছি যেতে না যেতেই মনে হল কেউ যেন দাঁড়িয়ে। কে? বোধ করি গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরোতে যাচ্ছিল কি বেরিয়েই গিয়ে-

দুলল—এমন সময় হঠাৎ ছায়াটা নড়েচড়ে উঠল—চোখ দুটোও যেন চকচক করছে—

তারপর?

বুঝতেই পারি নি সাব—যখন বুঝে ফেলেছি যে ওটা ভালুক তখন আর নড়বার উপায় নেই—প্রায় দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠেছে ওটা—দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে—প্রায় দু' হাতের মধ্যে। সামনে এসে পড়তেই—হঠাৎ বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই—সাহেবের ফাইলটা ছিল হাতের মধ্যে, ঝটিতি কি করলাম, সেটা তুলে দিলাম ওর দিকে এগিয়ে।

তারপর?

কি করেছি না করেছি ভালো আমি বলতেও পারি না সাব! তারপর দেখি কি ফাইলটা ওর দু' হাতের থাবায়। সামলে ওঠবার আগেই আমি এক দৌড়। বলতে বলতে হাসছিল ভক্তবাহাদুর। কুতকুতে চোখ দুটো ছাড়া আর কোনখানে সে হাসি বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। একটু পরে বলল, তবে এখন আর ভয় পাই না।

কি কর যদি সামনে পড়ে?

তার কোমরে গোঁজা অস্ত্রটা দেখাল ভক্তবাহাদুর। ভোজালিটা দেখালো আমাকে। চকচক্ করছে সেটা। বলল, এটা চালিয়ে দিই।

মনে মনে আমি ভাবছিলাম। কী সাংঘাতিক চাকরি! প্রতি পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে চলতে হয়। ডুয়ার্সে এমন ফরেস্ট তো কতই আছে। আর সেই ফরেস্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আছে এমনিতর চৌকিদার অসংখ্য, প্রাণ হাতে করে যাদের চলতে হয় প্রতি পদে পদে।

বীট অফিসারকে শুধিয়েছিলাম, আপনার এ-চাকরি ভালো লাগে?

হাসছিলেন উনি। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলছিলেন, দেখুন মিস্টার, চাকরি হচ্ছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। এখানে ভালো-মন্দের প্রশ্ন ওঠেই না। একটা চাকরি—সে যত বিপজ্জনকই হোক না মশাই—কে দিচ্ছে আপনাকে?

সে কথা সত্যি। আমি ভাবছিলাম।

তা ছাড়া দেখুন, ভয়াল হোক, বিপজ্জনক হোক, এক হিসেবে এ চাকরি অফিসে কলম চালানোর চাইতে অনেক ভালো। অনেকটা স্বাধীন তো। মাথার ওপরে অবশ্য রেঞ্জার সাহেব আছেন—ডি-এফ্-ও, এ-এফ্-ও। তবে কি জানেন, তাঁদের সঙ্গে তত দেখাটা আর হচ্ছে কোথায়? বেশির ভাগ সময়টাই কাটে বনে বনে। এ একরকমের ভালোই মশাই! চারদিকের দুনিয়ার চেহারাটা একবার দেখুন তো! বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের কী কাড়াকাড়ি! এঁটো পাতা নিয়ে ঘেয়ো কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করে বেঁচে থাকা। সে তুলনায় ঢের বেশি ভালো আছি।

আচ্ছা, এখানকার জীবনে একঘেয়েমি আছে তো?

Silver tonic is the best tonic মশাই! বলে হো-হো করে বেশ জোরে হেসে উঠেছিলেন বীট সাহেব, মাইনে অবশ্য বেশি পাই না, তবে অভাবও খুব একটা নেই। তা ছাড়া এইরকম চাকরি করতে করতে কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গেছে। বাইরে গেলেই ভালো লাগে না। এই তো মশাই, বিয়ে করতে গিয়েছিলাম দশ দিনের ছুটি নিয়ে। সাহেব হাসছিলেন। বললেন, বিয়েতে দশ দিনের ছুটি কি হবে? আমি তবু ইতস্তত করছিলাম। ছুটি তো পাওনাই আছে, তবে দিতে এত ওজর-আপত্তি কেন সাহেবের? কিন্তু গিয়ে মশাই—বলব কী আপনাকে! তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসতে পথ পেলাম না। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

তা হলে জঙ্গলের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বলুন!

বলুন জংলি হয়ে গেছি! দরাজ হাসির গলা বীটবাবুর।

বীট অফিসারের কথা অস্বীকার করা কঠিন। শহরের বাইরে এই বনের মধ্যে চাকরি নিয়ে কাটিয়ে দিতে দিতে এক-আধটু জংলি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কি? সংসারে-সমাজে গেলেই তখন আর থাকতে ইচ্ছে করে না। পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করে এই লোকালয়বর্জিত বনের মধ্যে।

তবু তো শহরের সঙ্গে যোগ না রাখলে চলে না, আমি তাঁকে বলে-ছিলাম, বনের এই নির্জনতা যতই মোহময় হোক না কেন, আসলে কি জানেন, শহর থেকে যদি একদিন আলো না আসে! ধরাই যাক, পাওয়ার হাউস ফেল করল!

সে-কথা একশ'বার সত্যি। বীট অফিসার আমাকে বলেছিলেন, খাবার-দাবারের অবশ্য তেমন অভাব হয় না। ফরেস্টের ভিতরেই জমি চাষ করে চাষীরা। সস্তায় চাল পাই তাদের কাছ থেকে। এই তো ধরুন, পাঁচ টাকা কেজি চাল খেলেন আপনারা। আমরা কিন্তু আঠারো আনা-পাঁচ সিকে কেজিই খেয়েছি। দুধ একেবারে খাঁটি। বটপাতার কষের মত আঁটাল ঘন দুধ। এতটুকু জল পাবেন না ওতে। বস্তির লোকেরাই বিক্রি করে যায় খুশিমনে। খবরের কাগজ আসে সন্ধ্যাবেলা। অবশ্য মাইল আটেক দূরে একটা চার স্টলে নামিয়ে যায় কাগজটা। বাসের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

রোজ ঠিকমত পান?

প্রায়ই পাই না। তা ছাড়া বর্ষায় তো এই মাইল আটেক পথ ভেঙে কাগজ আনতে যাওয়া ভয়াবহ ব্যাপার! তাতেও চলে যায়। কিন্তু যেদিন আলো না থাকে, সেদিনকার কথা কল্পনাও করা যায় না। মনে হয় একটা গোটা রাক্ষসের পেটের মধ্যে তলিয়ে বসে আছি। এই কোয়ার্টার দেখছেন—অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

বাহাদুরকে আমি সাহেবের কথার সত্যতা পরখ করতেই বলেছিলাম, হ্যাঁরে, এখানে তোদের কেমন লাগে?

বাহাদুর যা বলল, তার অর্থ সে বেশ ভালোই আছে। তবে হ্যাঁ, জীব-জন্তুর ভয়-ভীত এক-আধটু আছেই।

তোমাদের সাহেব বলছিলেন, অন্ধকার রাত্রে নাকি খুব সাংঘাতিক দেখতে হয়।

তা হয় বটে। তবে সাহেবেরও তো রাইফেল আছে। শিকারে খুব ভালো হাত সাহেবের।

বল কী!

বাহাদুর বলল, তবে কি জানেন, সাহেব বলেন, নিতান্ত দরকার না হলে বনের প্রাণী শিকার করা ভালো নয়। বনের মধ্যে তারা তো থাকবেই। এ হল গিয়ে তাদেরই দেশ!

যদি তোমাদের অপকার করে?

অনেক সময় অপকার কিছু না করলেও যে তাদের অযথা খুঁচিয়ে তোলা হয়, সেই গল্প বলল বাহাদুর। উদাহরণ দিল আগের সাহেবের।

এইখানে ছিলেন সাহেব। কলকাতা না কোথায় বাড়ি। অল্প বয়স। কিন্তু দেখতে-শুনতে ছিল আগুনের পারা। সাহেবের মত। তাঁকে তো বুনো হাতীই মারল।

সংক্ষেপে জানা গেল ব্যাপারটা। খুবই শোচনীয় ব্যাপার। এখানে হাতীর খুবই উৎপাত। যখন-তখন হাতী বেরোয় রাতে। আর সে কী যেমন-তেমন হাতী। বুনো হাতী সব। তাদের মর্জি-মেজাজ ভয়ংকর। কল্পনাও করা যায় না। আর অনেক সময় এক সঙ্গে পাঁচটা-ছটা, আটটা-দশটা হাতীও থাকে যূথবদ্ধভাবে। রাতে আসে ফরেস্টের ধান-ক্ষেতে। কাঁচা শস্য খেয়ে পদভরে মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে লোপাট করে দিয়ে চলে যায়। বনের মধ্যে তাই মাঝে মাঝে গাছের ওপরে থাকে মাচা। মাটি থেকে অনেকটা ওপরে। সন্ধ্যারাতের আগেই বস্তির চাষীরা সেই মাচার ওপর চড়ে বসে। সারারাত জেগে ক্ষেত রক্ষা করে। তীর-ধনু দিয়ে, ভাঙা ক্যানেস্তারা বাজিয়ে তাড়িয়ে ফেরে ওদের। দুর্দান্ত

রাগী লোভী চোখদুটো জ্বলে জ্বলজ্বল করে।

সে-রাতে খেয়ে-দেয়ে সবে ঘুমিয়ে পড়তে গিয়েছিল সাহেব। অন্ধকার রাত। তারপর সেদিন বনের মধ্যে আলো জ্বলে নি। ঘরঘুটি অন্ধকার। বনের ভিতরে অন্ধকার রাতে তো বটেই, দিনেও বাজে ঝিঁঝির একঘেয়ে করতাল। সে-রাতে আকাশে মেঘ ছিল। গাঢ় কৃষ্ণমেঘ। সন্ধ্যা থেকে টুপটুপ করে বৃষ্টিও পড়তে সুরু করেছিল। অন্ধকারের সূচীভেদ্য আচ্ছন্নতাকেই আরো বেশি ভয়ংকর করে তুলছিল পাতায়-পাতায় একরাশ বৃষ্টি ও বাতাসের মত্ততা।

চোখ বুজে বুজে হয়তো ঘুমেরই স্বপ্ন দেখছিলেন সাহেব। জানালাগুলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে হল একটা করাতে ঘষে ঘষে কাঠের বেড়া কেউ কাটছে। স্পষ্টই বুঝতে পারলেন সাহেব। চোর! চোর ছাড়া আর কিছু নয়। ওকে মনের মত একটা শাস্তি দেওয়া দরকার। দেখা যাক আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। চোরের ভ্রূক্ষেপও নেই। কাঠের দেয়াল কেটে ফেলে বুঝি ভিতরে ঢুকে পড়বার মতলব। কান খাড়া করে শুনলেন সাহেব। হ্যাঁ, স্পষ্ট। তাতে আর কোন ভুল নেই।

মনে হচ্ছে রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু ঘর থেকে বেরোনোও বিপজ্জনক। খুবই বিপজ্জনক কাজ। এই অন্ধকার শীতের রাত্রে বাইরে যখন দুর্জয় বাতাসের বেগ। তবু শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাটাই জয়ী হল। খুবই সুযোগের রাত্রি সন্ধান করেছে চোর। করাতের ঘর্ষণের সংগে সংগে কেঁপে উঠছে যেন গোটা বাড়িটাই।

বিছানা থেকে উঠে সোজা নেমে এলেন সাহেব দরজা খুলে। হাতে বন্দুকটা নিতে অবশ্য ভুল করেন নি। পাশের ঘরে ঘুমিয়েছিল বাহাদুর। তখন ওখানেই থাকত সে। সাহেবের রান্না করে দিত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটল। খুবই বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছিলেন সাহেব। অন্তত একবার দেখে নিয়ে নিচে নামা উচিত ছিল ওঁর। অথবা তাঁর ভাগ্যেই ছিল ওই।

কি হয়েছিল? নিরুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্নটা করেছিলাম বাহাদুরকে।

বাহাদুরের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছিল। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। চা খাওয়া আমার হয়ে গিয়েছিল।

বাহাদুর বলল, আসলে চোর ছিল না ওটা। ছিল একটা দাঁতাল হাতী, সাহেব!

প্রায়ই ওটাকে দেখা যেত ওখানে। সেদিন এসে শক্ত কাঠের খুঁটিতে গা চুলকাচ্ছিল। আর তাইতেই অমন শব্দটা হচ্ছিল। সামনে গিয়ে পড়তে না পড়তেই, যা হবার হয়ে গেল। মস্ত দাঁত উঁচু করে তেড়ে এল। তারপর হয়ত শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ধারালো দাঁতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। প্রাণ ছিল না সাহেবের। পরদিন সকালে পাওয়া গেল রক্তমাখা লাশটা। বন্দুকটা পর্যন্ত ভেঙেচুরে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছিল।

অত রাত্রে আলো জ্বলে উঠতে দেখে চমকে শুধোই, কে?

পাশের ঘরে বাহাদুরের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বললাম, কি ব্যাপার, বাহাদুর?

হঠাৎ মনে পড়ল সাব! আপনার টেবিলে খাবার জল রাখা হয় নি।

ও-ঘর থেকে খুব পরিষ্কার গলা ভেসে আসল।

জলের আমার দরকার নেই, বাহাদুর! তুমি শুয়ে পড়ো। ঘুমোও নি এখনো?

বাহাদুর বলে, আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম, সাব! বেশ ভারী অনুতপ্ত গলা।

সেজন্যে ভেবো না। ঘুম তো সারা-জীবনই আছে। তুমি অসুস্থ। নাও, নাও, শুয়ে পড়ো।

ও-ঘরে আলো নিভল। বাহাদুর কি ভাবল কে জানে। সে আর কোন কথা বলল না। হয়তো এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সত্যি-সত্যি সে ঘুমিয়েছে। আহা ঘুমাক! বড় ধকল গেছে আজ ওর ওপরে। আমার জন্যে ব্যস্ততা গেছে। ছুটি নিয়েও বিশ্রাম নিতে পারে নি। অথচ পারত অনায়াসেই। চা খাইয়ে খানিক বাদে যেতে হয়েছে বীট অফিসারের বাংলোয়। সেখান থেকে আমার জন্যে খাবার বয়ে আনতে হয়েছে।

বলেছি, এই বনের মধ্যে এত রাত্রে আবার যাবে?

বাহাদুর হেসে বলেছে, ভয় করবেন না সাব! আমি যাব আর আসব। আমার খুব অভ্যাস আছে।

যাই বলুক সে, আমার দুশ্চিন্তা কাটছিল না। আমার জন্যে এই বনের মধ্যে যাবে? তার ওপরে তুমি অসুস্থ!

আপনি দরজাটা বন্ধ করে বসুন সাব!

লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে নিয়ে সে বড় বড় পায় বেরিয়ে গিয়েছিল।

আজ এতক্ষণ পরে গাঢ় রাতে বাহাদুর আলো জ্বালিয়ে আবার ঘুমোবার উদ্যোগ করলে আমি অন্ধকার বিছানার ওপরে আলো জেলে উঠে বসলাম। আমার ঘুমই আসছিল না। আর ঘুম যদি না-ই আসে, তবে অনর্থক চোখ বুজে শুয়ে থাকার সার্থকতা কী!

তার চাইতে এই ভালো। আমি জেগে থাকব। বরাতজোরে যদি কপালে সুযোগ এসেই থাকে, তার পূর্ণ ব্যবহার করব। রাত জেগে-জেগে খোলা জানালায় দেখব অরণ্যকে। অন্ধকার জীব-জগৎকে। এ সুযোগ রোজ আসে কি জীবনে? তা যদি না আসে তো এ রাতকে ব্যর্থ করে দেবার কোনো মানেই হয় না।

জানালাটা খুলে দিয়ে বসলাম। বনের ফুসন্ত হাওয়ার তোড় হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে।

[ ক্রমশ ]

মালতী চলে যেতে মুকুন্দ একটা বিড়ি ধরায়।

তক্তপোষটায় আধশোয়া অবস্থায় বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মালতীর প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে থাকে।

মালতীর সংগে মুকুন্দর পরিচয় হয়েছিল বহুদিন আগে। শুধু পরিচয় নয়, নিবিড় ঘনিষ্ঠতাও। ভিক্টোরিয়ার মাঠে গংগার ধারেও তারা বেড়িয়েছে। তারপর অবশ্য অনেক জল বয়ে গেছে গংগার বুক দিয়ে। জমা পড়েছে অনেক মেঘেমাটি মুকুন্দর স্মৃতিপটে। তাই আজ হঠাৎ মালতীকে দেখে চমকেই গিয়েছিল মুকুন্দ। কিন্তু মালতী চলে যেতে পুরনো দিনের সব ঘটনাই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে—নড়েচড়ে বেড়ায়।

মালতীর যৌবন তখন প্রাণবন্যায় চঞ্চল, আর মুকুন্দ সবে এসেছে গ্রাম থেকে। আর ধুতিটা তখনো হাঁটুর কাছেই আটকে থাকত—পায়ের পাতা ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারত না। তখনো ক্লাশের সব মেয়ের কাছেই সে একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু—মুখরোচক আলোচনার বিষয়।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত ক্লাশে তখন 'প্রোডাকটিভিটি ও পার্সোনাল ইনসেণ্টিভ' পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। অধ্যাপক দাশগুপ্তের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছে মুকুন্দ। সোজা দাঁড়িয়ে জড়তাহীন কণ্ঠে বলে, 'স্যার, এ সব হচ্ছে সমস্যাটার ধনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। আসল সত্যি নয়। শ্রমিক যদি বুঝতে পারে যে তার পরিশ্রমে তৈরি করা সম্পদ দেশের পাঁচজনের মংগলে ব্যবহৃত হবে, তা হলে সে স্বার্থপরের মত ব্যক্তিগত লাভ চাইবে না।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'আমি বলছি, শ্রমিকের ইনসেণ্টিভ টাকায় নয়, তার আসল ইনসেণ্টিভ পাঁচজনের মংগল কামনায়।'

ক্লাশশুদ্ধ সবাই থ' মেরে গিয়েছিল।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত শুধু সুপুরুষ নবীন অধ্যাপক মাত্র নন, অধ্যাপনায়ও যথেষ্ট খ্যাতিমান। বাইরের অনেক কলেজ থেকেও ছেলেমেয়েরা আসে তাঁ[র] বক্তৃতা শুনতে।

মুকুন্দর কথা শেষ হতেই চাপা এ[ক] গুঞ্জনও শুরু হয়েছিল প্রথম সারির ছা[ত্র]দের মধ্যে। একটা বিক্ষোভও।

সব গুঞ্জন, বিক্ষোভ থামিয়ে দি[য়ে]ছিলেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত, 'মুকুন্দ, আ[মি] এখানে যা পড়াই সেটা য়ুনিভার্সি[টি] সিলেবাস অনুযায়ী; ছাত্ররা য[াতে] পরীক্ষায় বেশি নম্বর পায় সেদিকে ন[জর] রেখে। এগুলো আমার নিজের ব[ক্তব্য] নয়। যাক্‌গে, ক্লাশের শেষে তুমি আম[ার] সংগে দেখা করো।'

মুকুন্দ দেখা করেছিল অধ্যাপক দাশ[গু]প্তর সংগে। শুধু সেদিনই নয়, আ[রো] অনেক দিন।

কথাটা রটে যেতে বেশী সময় লা[গে]নি। কিছুদিনের মধ্যেই সকলের বিশ্বা[স] দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, একার অনা[র্স] পরীক্ষায় মুকুন্দ ফার্স্ট ক্লাশ পাবেই।

মুকুন্দর নোট নেবার জন্য তখ[ন] ছাত্রদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে অনেকের মত মালতীও তখন তা[র] সান্নিধ্যে যেতে চেষ্টা করেছে। তা[র] লক্ষ্য অবশ্য শুধু খাতার পৃষ্ঠার মধ্যে সীমায়িত থাকতে পারে নি; সেই-[ই] আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেছে মুকুন্দকে কফি হাউসে। তারপর ধাপে ধাপে মেট্রো সিনেমায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে, গংগার তীরে। গান শোনা মালতী। সেই গানের সুর স্পন্দ জাগাত মুকুন্দর হৃদয়েও।

মুকুন্দর ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া সম্বন্ধে সবাই যেমন নিশ্চিন্ত ছিল, তেমনি নিঃসংশয় হয়েছিল মুকুন্দ-মালতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। মেয়ে মহলে কেউ কেউ হয়ত দুঃখিত হয়েছিল মালতীর টেস্‌ট্‌ দেখে, হতাশ কিছু স্মার্ট ছেলেও। দেবেশও। তবু কিন্তু মালতীর হৃদয়ের দীপশিখা কম্পিত হতে কেউ দেখেনি তখন।

মুকুন্দ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা দেবেশদা আজকাল আসে না?'

'হুঃ!' প্রচণ্ড ঘৃণা ঝরেছিল মালতীর কণ্ঠে, 'বামন হয়ে চাঁদে হাত-দেবার সাধ! একটা হা-ঘরের ছেলে!'

বিস্মিত হয়েছিল মুকুন্দ! ব্যথিতও।

'আমার বাড়ীর অবস্থাও ত ভাল নয় মালতী!'

তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল মালতী, 'তোমার যা আছে, কজন তা পায় বল? আমি হলফ্‌ করে বলতে পারি তোমার ট্যালেণ্টই তোমার গলায় ভাগ্যলক্ষ্মী মালা পরিয়ে দেবে।'

মালতীর কথায় কতটা ভরসা পেয়েছিল মুকুন্দ তা সে নিজেও বলতে পারবে না। কিন্তু একটা বিশ্রী অনুভূতি যে তার হৃদয়কে ভারী করে রেখেছিল, সে কথাটা আজও তার মনে আছে।

টেস্ট পরীক্ষার ফল বের হতে প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল মুকুন্দর উপর দিয়ে। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। মুকুন্দকে ডেকে বোঝালেন, 'পরীক্ষায় নম্বর পেতে হয় সিলেবাসের বাঁধা ছকেই, তোমার নিজস্ব বিশ্বাস বা ব্যাখ্যা প্রচারের সময় পরীক্ষার পর। ডোণ্ট ফরগেট মুকুন্দ, টেস্টে তুমি আমাদের ডিসাপয়েণ্ট করেছ, আমরা কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্টের দিকে চেয়ে আছি।'

মালতীও করুণ চোখে তার দিকে চেয়েছিল। বলেছিল, 'ভগবানের দেওয়া মেধা দিয়ে নিজের জীবনটাকে গড়ে তোল। এলোমেলো পথে চলে কি লাভ?'

'লাভ-লোকসানের কথা ত কোনদিন ভাবিনি মালতী!'

'দয়া করে একটু ভাবো মশায়!'

ভেবেছিল মুকুন্দ।

ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। মালতীও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছকবাঁধা পথেই হেঁটেছিল মুকুন্দ। আরো দুটো বছর এম-এ'তেও ফার্স্ট হয়েছিল সে।

সে সব আজ ক'বেকার কথা!

আর একটা বিড়ি ধরায় মুকুন্দ।

আসল গোলমালটা কিন্তু লাগে তার পরেই। নিশ্চিন্ত সুখের ছকবাঁধা পথে চলতে আর রাজী হয় নি মুকুন্দ। অধ্যাপক দাশগুপ্তকেও সে বলেছিল, 'এবার ত স্যার আমার সময় হয়েছে, আমার নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজের মত প্রচারের।'

নীরব থেকেছিলেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত।

মালতী কিন্তু নীরব থাকতে পারে নি: ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলেছিল, 'আই· এ· এস·. আই· ই·. এস. পরীক্ষাও ত পরীক্ষা!'

'ও-সব দাসত্বের শৃংখল গলায় জড়াবার কম্পিটিশান আমার জন্য নয়।'

'তবে? তবে কি করতে চাও তুমি?'

'গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে বলে বেড়াতে চাই—যা আমি বিশ্বাস করি। প্রমাণ করতে চাই নিজের বিশ্বাসকে বাস্তব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে।'

'কি বলছ তুমি? ঐ সব গেঁয়ো ছোটলোকদের মধ্যে জীবনটা শেষ করবে?' দারুণ ঘৃণা ঝরে পড়েছিল মালতীর কথায়। মুকুন্দের মনে পড়ে, মালতীর গলায় এ ধরনের সুর আরো একবার সে শুনেছিল।

'ওরাই ত আমার দেশবাসী। ওদের অগ্রাহ্য করলে যে নিজেকেই অগ্রাহ্য করা হয়।'

'এ সব ছাইপাঁশ আমি বুঝি না। ভাল একটা চাকরি না করলে জীবন চলবে কি দিয়ে?'

'গরীব দেশের ছেলে আমি, দারিদ্র্য আমার নিত্য সহচর। আমি তাকে ভয় পাই না।'

'কিন্তু আমি ত পাই।'

অনেকক্ষণ নীরবে মালতীকে দেখেছিল মুকুন্দ। তারপর বলেছিল, 'অবুঝ হয়ো না মালতী, ক্ষুদ্র স্বার্থ-পরতার পংকে আমি নিজেকে বিসর্জন দিতে পারব না।'

'আমিই বা কি করে দারিদ্র্যের সংগে আপস করব? অসম্ভব!'

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মুকুন্দ। তার সব কথা যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর ধীরে ধীরে বলেছিল মুকুন্দ. 'তোমার স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কাঁটা হয়ে আমি থাকতে চাইনে।'

মুকুন্দর কথা শুনে কেঁদেছিল মালতী।

চোখের জল মুছতে মুছতেই চলে গিয়েছিল মালতী।

সত্যি, মালতীর পথ আটকে দাঁড়ায় নি মুকুন্দ। মনে মনে অবশ্য সে ভেবেছিল, মালতীর মন থেকে যেদিন বর্ষার মেঘগুলো কেটে গিয়ে শরতের নীল আকাশ দেখা দেবে, সেদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে মালতী।

কিন্তু—

এসব অনেক পুরানো কথা।

আজ এ সব ভাবতে ভালো লাগে না মুকুন্দর। তবু সব ঘটনাই আজ যেন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে চায়।

মালতী কিন্তু সত্যি আবার এসেছিল।

মুকুন্দ তখন সব গুছিয়ে নিয়ে গ্রামে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেছিল মালতী, 'সত্যি তা হলে তুমি নির্বাসনে চললে?'

'হ্যাঁ, গাঁয়ের কোলেই ফিরে যাচ্ছি।'

মালতীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল মুকুন্দ। মালতী সেই যে গোঁজ হয়ে বসেছিল, আর কিন্তু চোখ তোলে নি। তারপর এক সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বলেছিল, 'বড় নিষ্ঠুর তুমি!'

আর একটা মুহূর্তও দাঁড়ায় নি মালতী—ছুটে চলে গিয়েছিল।

মুকুন্দর পরিষ্কার মনে আছে, মালতীর চোখের জল তাকে সেদিন টলাতে পারে নি। অবশ্য মালতী চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

তারপর?

তারপর থেকে ক্রমাগত সে খেটে চলেছে গ্রামের কিষাণ-মজুরদের মধ্যে ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে। আর চেষ্টা করেছে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তার বক্তব্য জানাতে।

নিজের কাছে লুকোতে পারে না মুকুন্দ যে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মালতীর মুখটা উঁকি দিত তার মনে। সে ভাবত মালতী নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তার ভাংগা কুঁড়ে একদিন ভরে উঠবে মালতীর গন্ধে।

তখনো কলকাতায় মুকুন্দর আস্তানা ছিল এই মেসটাতেই। মাঝে মাঝেই আসত মুকুন্দ।

মালতী কিন্তু আর আসে নি।

এর পর মালতীর সংগে মুকুন্দর দেখা হয়েছিল নাটকীয়তার মধ্যে।

প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে মুকুন্দ তখন জেলের কয়েদী। কি একটা কারণে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন জেলটা পরিদর্শন করতে। সংগে স্ত্রীও ছিলেন। মালতী কিন্তু সেদিন মুকুন্দকে চেনে নি; চিনতে চায় নি। মুকুন্দর অবশ্য চিনতে ভুল হয় নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাম দেবেশ। গ্রামে থাকতেই শুনেছিল

মুকুন্দ যে, দেবেশ আই· এ· এস· পাশ করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চলে যেতে দু-একজন রাজকর্মী হাল্কা রসিকতা করে বলেছিল, 'যাই বলুন দাদা, সাহেবের স্ত্রীটি কিন্তু সত্যি রূপসী।'

'আর বেশ স্মার্টও।'

মুকুন্দ চুপ করেই ছিল। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফোড়ন কাটার ঢঙে একজন বলেছিল, 'মুকুন্দদাকে কিন্তু গ্রাহ্যই করল না।'

'গ্রাহ্য কিরে, বল তাচ্ছিল্য করেছে—অনেকটা যেন ডেলিবারেট্‌লি!'

মুকুন্দ তখনো কারো কথার জবাব দেয় নি। সেদিনও এমনি একটি বিড়ি ধরিয়েছিল।

এসব আজ বেশ কয়েক বছর আগের কথা।

মুকুন্দ ভেবেছিল যে, এসব কথা বুঝি হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। আজ কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে তার সে ধারণা ভুল। সব কথাই জ্বল জ্বল করছে স্মৃতির মণিকোঠায়।

তবু আজ দিন বদলেছে। বদলেছে দেশের জনসাধারণ।

এবারের ইলেকশানে মুকুন্দদের পার্টি জিতেছে। অনেকেই বলেছিল মুকুন্দকে অর্থ বা শ্রম বিভাগের মন্ত্রী হতে। মুকুন্দ রাজী হয় নি। তবু দেশের সবাই জানে মন্ত্রিসভা মুকুন্দর একটি কথাও ফেলতে পারে না। মুকুন্দ যা বলে, মন্ত্রিসভাকে তাই করতে হয়। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুকুন্দর মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

আজও সব পত্রিকায় তার ফটো ছাপা হয়েছে। দুপুরে মেসের ঘরে বসে বসে সেই সব দেখছিল মুকুন্দ, আর মনের মধ্যে বিচিত্র ভাব বয়ে যাচ্ছিল। এতদিন পর্যন্ত এই পত্রিকাগুলো তাকে সমাজদ্রোহী প্রমাণ করতে কি চেষ্টাই না করেছে! আর আজ? তার প্রশস্তি গাইতে কম্পিটিশান লাগিয়েছে, প্রতিদিন তার ফটো ছাপছে।

এমনি সময় দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢোকে মালতী।

দৈনিক পত্রিকাগুলো থেকে মুখ না তুলেই বলেছিল মুকুন্দ, 'বোসো।'

'তবু চিনতে পারলে যা হোক!'

গলার স্বর শুনে চমকে গিয়েছিল মুকুন্দ।

চোখের কাছ থেকে পত্রিকা সরাতে যে দৃশ্য সে দেখল তার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না সে। মালতী ততক্ষণে তার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশের মধ্যে মুখটাকে অনেকটা গুঁজে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে—ঠিক এম· এ· পড়ার দিনগুলোর মত।

'মালতী যে!'

'হ্যাঁ, ভূত নয়।'

'হঠাৎ?'

'কেন, আমার কি আসা নিষেধ?'

'না, ঠিক তা নয়, তবে—'

'আমায় তুমি বাঁচাও,' মুকুন্দর কথা শেষ করতে না দিয়েই মুকুন্দকে চমকে দিয়ে বলে মালতী, 'এভাবে আমি আর জ্বলতে পারছি না!'

'কেন? দেবেশদা ত ভাল চাকরিই করে?'

'তবু বিশ্বাস করো মুকুন্দ, এতটুকু সুখ আমি পাচ্ছি না।'

মালতীর দেহে, সাজ-সজ্জার মধ্যে দুঃখের প্রকাশ খুঁজতে চেষ্টা করে মুকুন্দ। ভালো লাগে মালতীর। অনেকটা যেন তার অজান্তেই গায়ের আঁচল খসে পড়ে। কয়েক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে মালতীর চোখ দিয়ে।

ঝাপসা হয়ে যায় মুকুন্দর চিন্তা-শক্তি।

মালতী ভাবে, ফার্স্ট রাউণ্ডে সে জিতেছে।

আবার সে কথা বলে, 'জ্বলছি, কেবলি জ্বলে জ্বলে খাক হচ্ছি—বিশ্বাস কর, একটা মুহূর্তের জন্যও শান্তি বা সুখ পাচ্ছি না।'

'কেন? দেবেশদা ত' ভাল ছেলে, বড় চাকরি করে।'

'আমি ওকে ডিভোর্স করতে চাই।'

'কি বলছ মালতী?' আরও একবার চমকায় মুকুন্দ।

মালতী তেমনি চুপ করে শুয়ে থাকে।

কিছুটা সময় নীরবে কেটে যায়।

নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলে মুকুন্দ, 'দেবেশদার আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তোমাকে। জান ত' ওর বিরুদ্ধে করাপশানের চার্জ এসেছে। হয়ত ওর চাকরি থাকবে না। এ সময় যদি তুমিও ওকে ছেড়ে দাও ত' বেচারা কোথায় গিয়ে একটু সান্ত্বনা খুঁজবে?'

'সান্ত্বনা?' ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মালতী, 'একটা লোক দেশের ক্ষতি করবে, চুরি করবে, তাকে সান্ত্বনা দেব আমি? না মুকুন্দ, তা আমি পারব না।'

মালতীকে যেন নতুন করে দেখে মুকুন্দ।

একটু ভেবে বলে, 'দেবেশদাকে ত' আমি জানি—খুব ভালো ছেলে। যে অন্যায় সে করেছে, তা কেবল তোমাকে খুশি করবার জন্য। ওর প্রতি তোমারও একটা দায়িত্ব আছে।'

'ও সব আমি জানিনে।' ঘৃণায় নাক কুঁচকে বলে মালতী, তাই বলে আমি ত' একটা কোরাপ্টেড বেকারকে নিয়ে ঘর করতে পারিনে।'

আবার চুপ করে মালতীর দিকে চেয়ে থাকে মুকুন্দ।

তার সে দৃষ্টির কি অর্থ মালতী বুঝেছিল সেই জানে। মুকুন্দর চোখে চোখ রেখে ধরা গলায় বলেছিল, 'মুকুন্দ একদিন যা হতে পারত, আজ কি তা হতে পারে না?'

মুকুন্দর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়। সব ক'টা স্নায়ু যেন জ্বলে ওঠে। মুকুন্দর মনে হয় মালতীর চোখেও তখন কামনার আগুন। সেদিকে তাকিয়ে মুকুন্দ বলে, 'আমি ত' আজও সেই ছোটলোকদের মধ্যেই আছি—'

'ছিঃ!' মালতীর গলায় নিবিড় অনুতাপ জড়ানো অনুযোগ, 'নিজেকে ছোট কর না, তুমি আজ নেতা—দেশবরেণ্য!'

'এ ত' ক্ষণস্থায়ী। নেতৃত্ব যেদিন চলে যাবে, সেদিন ত' আমার পরিচয় জেলখাটা কয়েদি ছোটলোক বই আর কিছু থাকবে না। সেদিনও ত' তুমি আবার—'

'না, না মুকুন্দ, তুমি আমায় বিশ্বাস করো।' কান্নায় ভেঙে পড়ে মালতী।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসে মুকুন্দর ঘরে।

মুকুন্দর মুখের দিকে করুণভাবে চেয়ে থাকে মালতী। বিশ্রী লাগে মুকুন্দর। সমস্ত শরীরটা যেন রি রি করে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে বলে, 'আমার একটু তাড়া আছে মালতী, একটু বের হতে হবে।'

তবু মালতী উঠতে চায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে মালতী। তারপর হঠাৎ বলে, 'দেবেশকে কি কিছুতেই বাঁচাতে পারো না মুকুন্দ?'

এতক্ষণ যে ভাবনাটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মুকুন্দকে, সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চেয়ে থাকে মালতীর দিকে—অনেকক্ষণ।

মুকুন্দর মনে তখন পুঞ্জীভূত

নীরবতা। মালতী তার করুণ মিনতি-ভরা চোখ দুটো অপলকভাবে আটকে রাখে মুকুন্দর চোখে।

চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বলে মুকুন্দ, 'আমি কি করে বাঁচাবো? বাঁচাবার মালিক আদালত।'

মালতী আর দেরী করে না. ব্যাগটা কাঁধে ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তেমনি ধরা গলায় অস্ফুট স্বরে বলে মালতী, 'বড় নিষ্ঠুর তুমি!'

মালতীর নিষ্ক্রমণ পথের দিকে বোকার মত চেয়ে থাকে মুকুন্দ। বুঝতে পারে না, কেন এসেছিল মালতী। মুকুন্দকে কাছে পেতে—দেবেশকে বাঁচাতে—না, স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা তার জীবনের আশ্রয়টিকে অটুট রাখতে? জ্বলন্ত সীসার একটা স্রোত যেন ওঠানামা করতে থাকে তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে।

একটা বিড়ি ধরায় মুকুন্দ। বিশ্রী একটা গন্ধ ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে বিড়িটা।

### অতীশ এ্যান্ড টিবেট প্রসঙ্গে

গত ৯ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর ২৬ সংখ্যায় গ্রন্থমেলা 'অতীশ এ্যান্ড টিবেট' মূল্যবান গ্রন্থটির পরিচয় দেওয়ার জন্য সমালোচককে ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটি এখনও দেখিনি কিম্বা পাঠ করার সৌভাগ্য হয় নি। গ্রন্থটির পরিচয় পেয়ে পাঠ করার জন্য মন উদ্গ্রীব হয়ে আছে। এবং লেখিকাকে অসংখ্য সাধুবাদ জানাই।

সমালোচক মহাশয় এক জায়গায় লিখেছেন "এতাবৎকাল তাঁর (দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ) সম্বন্ধে যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত সেকেন্ডহ্যান্ড তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে রচিত।"

সমালোচকের উপরিউক্ত মন্তব্যটি যথার্থ নয়। আমরা কি তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত সুবিখ্যাত তিব্বত পর্যটক রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস ও মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়দের এত শীঘ্র বিস্মৃত হব? এঁদের দুজনকে বাংলা তথা ভারতে তিব্বতী আলোচনার প্রবর্তক বলা যায়।

শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম টিবেটিয়ান ইংলিশ ডিক্‌শনারী রচনা করে তিব্বতী ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করে দেন। তিনিই প্রথম তিব্বতী সূত্র থেকে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশের জীবনচরিত রচনা করেন। 'লাইফ অব অতীশ' নামে ১৮৯১ সালের 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' পত্রে তা' প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিব্বতী সূত্র থেকে রচিত অসংখ্য প্রবন্ধ তাঁর সুবিখ্যাত আকর গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়ান পণ্ডিতস ইন দি ল্যান্ড অব স্নো' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তৎকালীন বাংলা সরকারের দোভাষী ছিলেন। তিনি দু'বার তিব্বত পর্যটন করেন। দু'বারই তিব্বতের প্রাচীন বিহারসমূহের গ্রন্থাগার থেকে বহু তিব্বতী পুঁথি সংগ্রহ ও অনুবাদ করেন। তিব্বতী সূত্র থেকে তাঁর বিখ্যাত 'হিস্টরি অব দি মেডিয়ীভ্যাল স্কুল অব ইণ্ডিয়ান লজিক' গ্রন্থটি রচিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তিব্বতী সূত্র থেকে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ সম্বন্ধে অনেক নতুন, অনেক অপরিজ্ঞাত তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁর এই দানের মূল্য অতুলনীয়।

আশা করি, সমালোচক মহাশয় এই সব তথ্যকে 'সেকেন্ডহ্যান্ড' তথ্য বলবেন না। এছাড়া আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পত্রে অধিক বাহুল্য।

আশা করি, সাধারণের জ্ঞাতার্থে আপনার সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় এর যথাযথ উত্তর কিংবা পত্রটি প্রকাশ করে ভুল সংশোধন করে নিলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

—মাণিক নন্দী
কলকাতা-৩৬

### সমালোচকের বক্তব্য

পত্রলেখক শ্রীমাণিক নন্দীকে ধন্যবাদ—যিনি বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তৃততর আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন। ডঃ অলকা চট্টোপাধ্যায়ের 'অতীশ এ্যান্ড টিবেট' গ্রন্থটির সমালোচনাকালে আমি লিখেছিলাম যে, এতাবৎকাল দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ সম্বন্ধে যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা মূলত সেকেন্ড-হ্যান্ড তথ্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে রচিত। এর অর্থ এই নয় যে, পূর্বে কেউ মূল তিব্বতী সূত্র অনুসরণে কাজ করেন নি। ওদেশের কথা বাদ দিলেও বিগতযুগে এদেশেও তিব্বতীচর্চার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল, যার সূচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র দাস। কিন্তু সত্য বলতে কি, দীর্ঘকাল ধরেই সে চর্চার ধারা প্রায় রুদ্ধ এবং সেই কারণেই ডঃ অলকা চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি সম্পর্কে আমরা ওইরূপ মন্তব্য করেছিলাম।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এদেশে তিব্বতীচর্চার মূল উৎস রায়-বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস, যিনি শুধু তিব্বতী-ইংরাজী অভিধানই প্রণয়ন করেন নি, পত্রলেখক উল্লিখিত গ্রন্থে দীপঙ্করের ওপরেও উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করে-ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র দাস ব্যবহৃত উপাদানগুলি প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। তাঁর পক্ষে দীপঙ্করের জীবনী সংক্রান্ত সকল উপাদান সংগ্রহ করা বা তাঁর নামে প্রচলিত সকল রচনা দেখার সুযোগ হয় নি। দীপঙ্করের নিজস্ব রচনা ও তাঁর সংক্রান্ত তিব্বতী রচনাসমূহের সংখ্যা শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায়ের হিসাব অনুযায়ী ২১৯টি, সবগুলি অবশ্য পাওয়া যায় না এবং প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে শরৎচন্দ্র দাসের কাছে সেগুলি আরও দুষ্প্রাপ্য ছিল। পথপ্রদর্শকের সম্মান অবশ্যই শরৎচন্দ্র দাসের প্রাপ্য, কিন্তু তাঁর "অতীশ-জীবনীর" ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়।

সব কথা খুলে বলা যায় না এবং বলাও বোধ হয় শোভন নয়। আমি যখন বলেছিলাম যে, এতাবৎকাল দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশের সম্পর্কে যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা মূলত সেকেন্ডহ্যান্ড তথ্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে রচিত—আমি কিছু লেখকের কথা বলতে চেয়ে-ছিলাম—যাঁরা মূলত শরৎচন্দ্র দাস কৃত অতীশ-জীবনীকে মূলধন করে নিজেদের মৌলিকত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এই বিচারে শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায়ের রচনাকে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়েছে। তার কারণ, লেখিকা শুধু যে তিব্বতী ভাষায় সুপণ্ডিত তাই নয়, তাঁর রচনায় ব্যবহৃত উপাদানগুলিও পুরাতন তথ্যগুলির চর্বিতচর্বণ নয়। এই প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থটি সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করছি: There have been here and there occasional studies of Atisa, but nothing could be mentioned as being worthy of such a great personality has as yet appeared. We have to thank Prof. Aloka Chattopadhyaya for filling—and filling in a quite worthy manner—this great lacuna in Indological and Tibeto-Buddhist Studies... Mrs. Chattopadhyaya has in a way resuscitated and given a new lease of life to Indo-Tibetan studies, which were re-started in India during the last decade of the 19th century by Sarat Chandra Das of illustrious memory.

পত্রলেখক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের কথা তুলেছেন। তাঁকে সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তিব্বত-তত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ সম্পর্কে তিনি কোন উল্লেখযোগ্য আলোক-পাত করেন নি। সতীশচন্দ্র শরৎচন্দ্র দাসের নিকট তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর তিব্বতী চর্চা মূলত বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে তাঁর 'হিস্টরি অব দি মেডিভ্যাল স্কুল অব ইণ্ডিয়ান লজিক' নামে একটি রচনা এবং ১৯২১ খৃস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত

তিব্বতীয় অব থীনিকাল লাইফ' প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যথা, 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি'-তে প্রকাশিত 'দিগ্‌নাগ ও তাঁর প্রমাণ সমুচ্চয়' (১৯০৫), 'তিব্বতে রক্ষিত ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র', 'ন্যায়প্রবেশ', 'দিগ্‌নাগের হেতুচক্র' (১৯০৭), 'জার্নাল অব দি বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটি'-তে প্রকাশিত 'কালিদাসের সমকালীন দার্শনিক দিগ্‌-নাগ' (১৮৯৬), 'ন্যায়দর্শনের বিকাশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব' (১৮৯৮), 'ন্যায়-দর্শনের বৌদ্ধ রূপ' (১৯০০), জার্নাল অব দি মহাবোধি সোসাইটিতে প্রকাশিত 'দিগ্‌নাগের জীবনী' (১৮৯৯), 'হিন্দু ন্যায়দর্শনের উপর বৌদ্ধ প্রভাব' (১৯০২), ইত্যাদি।

মাণিকবাবুর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে অবশ্যই একমত যে, শরৎচন্দ্র দাস এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এদেশে তিব্বতী-চর্চার পথপ্রদর্শক এবং তাঁদের অবদানের মূল্যও ঐতিহাসিক। কিন্তু নানা কারণে এখানে তিব্বতচর্চায় ভাটা পড়েছে, পণ্ডিতবর বিধুশেখর শাস্ত্রীর পরলোক-গমনের পর তা আরো প্রকটভাবে চোখে পড়ে। ডঃ অলকা চট্টোপাধ্যায় লিখিত বর্তমান গ্রন্থটি অন্ধকারের মধ্যে আলোক-স্বরূপ, বিশেষ করে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশের জীবনীকে উপলক্ষ করে তিনি যে মৌলিক তথ্যাবলীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছেন, তাতে মনে হয়, যেন তিব্বতী-চর্চা আবার নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। লেখিকাকে এই জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানানোই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর পূর্বসূরীদের অস্বীকার করা নয়, এখানেই মাণিকবাবু সম্ভবত আমাদের ভুল বুঝেছেন।

### 'সপ্তাহের বোঝা' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর ২৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত "বোঝা" পড়লাম। ভাল লাগল। ভাল লাগে একথা বহুবার বলেছি। "বোঝা" পড়ে সোজা কথায় কিছু বলে-ছিলাম। আপনি সেগুলির কিছু কিছু প্রকাশও করেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

ভারতীয় দণ্ডসংহিতায় মেকলে সাহেব ৩৯১ ধারায় ডাকাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু ডাকাত কাকে বলে তার কোন সংজ্ঞা নেই। ডাকাত মানে শ্রীওঝা ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছেন, দীর্ঘদিনের আইন ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতায় তার বেশি কিছু বুঝি নি।

ডাকাতি বুঝাতে গেলে প্রথমে "রবারী" বলেছেন: "In all Robbery there is either theft or extortion." "In Dacoity when five or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a Robbery, and persons present and aiding such commissions or attempt, amount to five or more, every person so committ-ing, attempting or aiding, is said to commit 'Dacoity'."

সুতরাং নিপুণ শিল্পী শ্রীওঝা সামান্য বেগুন চুরি হতে আরম্ভ করে পার্ক স্ট্রীটের ডাকাতি পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহকে সাবলীল ভঙ্গিতে টেনে নিয়ে গিয়ে সহজাত কুশলী হাতে ডাকাতির যে নিখুঁত আইনানুগ বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে হলফ নিয়ে বলতে পারি ওঝা মশাই যদি আইনজীবী হতেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি আইন ব্যবসায়ের প্রথম সারিতে স্থান পেতেন।

শ্রীওঝার দীর্ঘজীবন এবং আপনার সাপ্তাহিক বসুমতীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—শ্রীঅমিয়কুমার সাঁই
সিনিয়র এ্যাডভোকেট
বর্ধমান আদালত

### 'সপ্তাহের বোঝা' প্রসঙ্গে

গত ২৯ সংখ্যা (১৫ই জানুয়ারী) সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত কৃত্তিবাস ওঝার 'সপ্তাহের বোঝা' প্রবন্ধটি পড়লাম। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে মর্মাহত হলাম। মর্মাহত হলাম এই কারণে, তাঁর লেখা প্রবন্ধটি বড়ই একপেশে। পশ্চিমবঙ্গের স্ববিরোধিতার রাজনীতির ফলশ্রুতির যে চিত্রটি তিনি তুলে ধরবার অবকাশ পেয়ে-ছেন, প্রশ্ন করি তিনি নিজেও কি তার থেকে মুক্ত? তা যে মোটেও নয়, তা তাঁর পক্ষপাতদোষে দুষ্ট লেখা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পক্ষপাতদুষ্ট এই কারণেই বলছি যে, কোন একটা বিশেষ দলকেই তিনি দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন সমগ্র প্রবন্ধটিতে তিনি 'ডাকাত' শব্দটির ব্যাখ্যা বা পরিভাষার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু যেমন, 'অসভ্য' ও 'বর্বর' কথাগুলিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। ট্রেন দুর্ঘটনা হলে রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন—স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী অন্তত তাই করেছিলেন, কেন না, ট্রেন দুর্ঘটনা হওয়া তাঁর দপ্তরেরই গাফিলতির ফল হিসাবে ধরে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে যে সরকার 'বর্বর' এবং 'অসভ্য', সেই সরকারের মুখ্য-মন্ত্রীর উচিত ছিল না কি মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ ত্যাগ করা?

যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে 'বড় বড় ডাক্তারেরা' যে রোগ প্রণয়ন করেছিলেন বা উপমুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নেবার যে কথা বলেছিলেন, তাকে এক কথায় উড়িয়ে দেয়া চলে না। ঐ ধরনের একটা আশা বা আকাঙ্ক্ষা কোন কোন দলের বা দলনেতার মনে বাসা বেঁধে-ছিল, তার প্রমাণ শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রীর উক্তি। তিনিই কোন এক জায়গায় ভাষণদানকালে ঐরূপ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, কেরালার মত পশ্চিমবঙ্গেও মিনিফ্রন্ট হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়—তাছাড়া তিনি এও বলেছিলেন যে, তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতে পেলে কোন এক পার্টির বিপ্লব তিন দিনেই খতম করে দিতে পারতেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, যে দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলার কথা সারা বাংলা জুড়ে যিনি রটনা করে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি নিজের দপ্তরের দুর্নীতির আওতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে 'হলধর পটলের' সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলিই এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত করবে। কেবল তাই নয়, তাঁদের দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার ফলে দলের একজন প্রভাবশালী নেতার মুখ দিয়েও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ে। যাক সে কথা। আমার কথা কৃত্তিবাস ওঝা মশাই ঐসব তথ্য আলোচ্য প্রবন্ধে সুনিপুণভাবে এড়িয়ে তাঁর মনোমত দলকেই একেবারে ধোয়া তুলসীপাতারূপে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার মতে কোন দলই ধোয়া তুলসীপাতা নন, সুতরাং যুক্তফ্রন্টের সাফল্য-অসাফল্যের ভার একই দলের ওপর বা তাদের কার্যকলাপের ওপর না দেখিয়ে সমগ্র দলের ভাল-মন্দের বিচার করেই যেন 'সপ্তাহের বোঝা' ভরান, নতুবা তাঁর বোঝা আমাদের কাছে অর্থাৎ পাঠকবর্গের কাছে এক 'অকারণ বোঝা' হয়েই দাঁড়াবে।

সমরকুমার সেন

## এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

**ইওরোপের** থিয়েটার সম্বন্ধে যাঁরা সামান্য খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁদের কাছে গর্ডন ক্রেগের নাম অপরিচিত নয়। ইংলন্ডের বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরী হলেন তাঁর মা। সুতরাং জন্ম থেকেই ক্রেগের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগ ছিল।

১৮৭২ খৃস্টাব্দে এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগের জন্ম হয়। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে তিনি স্যার হেনরী আরভিং-এর দলে যোগদান করেন। আট বছর তিনি এখানে অভিনেতা হিসাবে কাজ করেছিলেন।

প্রধানত অভিনেতার দৃষ্টিতেই ক্রেগ থিয়েটারের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন—একথাটা অনেকেই ভুলে যান।

লাইসিয়াম থিয়েটারের গ্রীষ্মাবকাশের সময় (এখানে মালিক ছিলেন আরভিং—ক্রেগ ১৮৮৯-৯৭ সাল অবধি এখানে অভিনেতা হিসাবে যুক্ত ছিলেন।) ক্রেগ অন্যত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—এর ভেতর ফার্সিক্যাল চরিত্র থেকে শুরু করে সেক্সপীয়ারের নাটকের প্রধান প্রধান ভূমিকাও ছিল। ১৮৯৪ সালে হেয়ারফোর্ডে তিনি প্রথম হ্যামলেট চরিত্রে নামেন। তার আগে তিনি রোমিওর রোলেও কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এর পর সুযোগ পেলেই হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

১৮৯৭ সালে বেন গ্রীট কম্পানী ওয়েস্টমিনস্টারে অলিম্পিক থিয়েটারে অভিনয় করছিলেন। অভিনেতা নাটকম্ব গোল্ড হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সিজনের শেষ ছটি প্রদর্শনীতে হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য গ্রীট ক্রেগের কাছে টেলিগ্রাম করলেন : "আজ রাত্রে হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবে?"

ক্রেগ এ বিষয়ে আবশ্যকীয় অনুমতি চাইলে আরভিং জবাব দিয়েছিলেন, "দি রেডিনেস ইজ অল।"

হ্যামলেট, মারকিউচিও, রোমিও, পেত্রুচিও, ম্যাকবেথ, রিচমন্ড, বিওনডেলো, মাস্টার ফোর্ড, ক্লডিও, গ্র্যাসিয়ানো, ক্যাসিও প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করে [illegible]

ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার সমস্ত গুণাবলীই তাঁর ছিল—সুকণ্ঠ, ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্নবুদ্ধি, উচ্ছৃংখলতা এবং মুভমেন্টের ছান্দিক সৌন্দর্য। ছেলেবয়স থেকেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকাতে তাঁর নাটিক-প্রতিভা যেন অতি স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

বার্নার্ড শ তাঁর সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দিয়ে সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তরুণ অভিনেতা হিসাবে ক্রেগ তাঁর কমেডী "ইউ নেভার ক্যান টেল"-এ ভাল অভিনয় করবেন। কিন্তু গর্ডন ক্রেগ সেই সময় অন্য জায়গায় হ্যামলেটের রোলের রূপায়ণে ব্যস্ত ছিলেন। হ্যামলেটের ভূমিকা ছেড়ে শ-এর নাটকে অভিনয় করতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। এই সময় কিন্তু স্টেজ ম্যানেজমেন্টের কথা ক্রেগের মনে স্থান পায় নি। তিনি তাঁর অভিনয়ের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এর কিছুকাল বাদে গ্র্যাণভিল বার্কার ফ্রোম্যান-বার্কার-ব্যারী-শ গ্রুপে অভিনেতা হিসাবে যোগ দেবার জন্য ক্রেগকে বার বার অনুরোধ জানান। ক্রেগ কিছুতেই রাজী হলেন না।

তাঁর ডিজাইন করবার ক্ষমতা তখনও বিশেষ মূর্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যেখানেই যখন থাকুন, আঁকবার সুযোগ পেলেই তিনি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি কখনও কোনও স্কুল অভ আর্ট-এ যোগ দেন নি। একজন পেন্টারের কাছ থেকে তিনি উড-কাটিং-এর সার কথাগুলো জেনে নেন। বছর ছয়েক বা আটেক বাদে এই বিদ্যাটি আর তাঁর কাছে ঠিক সখের পেশা ছিল না—তখন তিনি মঞ্চাভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন—এই পেশা থেকেই যৎসামান্য রোজগার করে জীবিকা চালাতেন।

১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রথম আক্সব্রিজে স্টেজ প্রডাকসনের প্রচেষ্টা করেন—de Musset's On ne badine pas avec-এর এডাপটেশনে তিনি পার্ডিক্যানের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন।

প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার সব রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও ১৮৯৭ সাল থেকে ক্রেগ অভিনয় ছেড়েছেন। এ নিয়ে তাঁর মা এলেন টেরীর কম দুঃখ ছিল না। ছেলের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "স্টেজে অভিনয় করবার জন্য যে সব গুণের দরকার তার সবই ওর কাছে ছিল প্রকৃতিদত্ত—এমনটা আর কারোর ভেতর দেখি নি। ও যেন অ-সচেতনভাবেই সব কিছুই ঠিকভাবে করতো—আমি সেই সব টেকনিক্যাল ব্যাপারের কথাই বলছি—যা শিখতে বছরের পর বছর ধরে আমাদের পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরবর্তী জীবনে ও যে সব কাজ করেছে তার জন্য আমার গর্ববোধ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ও যে অভিনয় ছেড়ে দিল তার জন্যও আমার কম কষ্ট হয় নি।" সত্যিই, ক্রেগ অভিনয় থেকে অবসর নেওয়াতে রঙ্গমঞ্চ একজন ভাল অভিনেতাকে হারালো।

বহুদিন থেকেই ক্রেগের মনে স্টেজ সম্পর্কে একটা অসন্তুষ্টির অনুভূতি হচ্ছিল—রঙ্গমঞ্চের যে রূপ নেওয়া উচিত তা হয় নি, একথা তিনি অন্তর থেকে উপলব্ধি করছিলেন। ১৯০৬-৯ সালের ভেতর ক্রেগ স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, থিয়েটারকে তার পুরানো ঐতিহ্য হিসাবে গড়ে উঠতে হলে আগাগোড়া সব কিছু বদলাতে হবে। অন্য কেউ এমন দুঃসাহসিকভাবে এ সমস্যাকে দেখেন নি। ক্রেগ বুঝতে পেরেছিলেন যে, থিয়েটারের আমূল সংস্কারের জন্য একটা বিপ্লবের দরকার। কিন্তু এ বিপ্লব আসবে কিভাবে? ১৮৯৭-৯ সাল পর্যন্ত ক্রেগ বুঝতে পারেন নি এ বিষয়ে ঠিক কি করতে হবে। কিন্তু নিজে কোন্ পথে চলবেন তা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল। আট পাউন্ড সাপ্তাহিক মাইনের অভিনেতার চাকরী তিনি ছেড়ে দিলেন এবং প্রায় সম্পূর্ণ বেকার হয়ে গেলেন। খবরের কাগজে এবং জার্নালসে ড্রয়িং করে অতি সামান্য রোজগার হোত। আদর্শ এবং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য এ সময় তিনি নানা দিক নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। এর পর ভবিষ্যতে আর কোন ম্যানেজমেন্টের অধীনে চাকরি করেন নি।

লন্ডনে তিনি তাঁর বন্ধু কম্পোজার মার্টিন শ'র সহযোগিতায় যে চারটি প্রডাকসন করেছিলেন তা হচ্ছে এই—

১৯০০—পার্সেলস ওপেরা ডিডো এ্যান্ড এনিয়াস গিভন বাই দি পার্সেল ওপরেটিক সোসাইটি এ্যাট হ্যাম্পস্টেড।

১৯০১—দি মাস্ক অভ লাভ (ফ্রম পার্সেলস ডাওক্লিসিয়ন) এ্যান্ড এ রিভাইভাল অভ দি ডিডো এ্যান্ড এনিয়াস এ্যাট দি করোনেট থিয়েটার, নটিং হিল গেট।

১৯০২—হ্যান্ডেলস এসিজ এ্যান্ড গ্যালেসিয়া এ্যান্ড এ রিভাইভাল অভ দি মাস্ক অভ লাভ এ্যাট দি গ্রেট কুইন স্ট্রীট থিয়েটার উইথ মার্টিন শ।

লরেন্স হাউসম্যানস বেথলেহেম এ্যাট দি ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট, সাউথ কেনসিংটন, এ্যান্ড পার্ট অভ দি প্রোডাকসন (থ্রি সিনস) অভ রোজেস সোর্ড এন্ড সং এ্যাট দি স্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরী থিয়েটার।

১৯০৩—ইবসেনস দি ভাইকিংস এ্যাট হেলজিল্যান্ড এ্যান্ড সেক্সপিয়ার্স মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাথিং ফর এলেন টেরী এ্যাট দি ইম্পিরিয়াল থিয়েটার।

ডব্লিউ বি ইয়েটস তাঁর "আইডিয়াজ অভ গুড এ্যান্ড ইভিল" বইতে লিখেছিলেন: "গর্ডন ক্রেগের রক্তবর্ণ (পারপল) ব্যাকক্লথ পশ্চাদ্‌পট হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় মনে হচ্ছিল ডিডো এবং এলিয়াস যেন সীমার প্রান্তরেখা ছাড়িয়ে অসীমকে গিয়ে স্পর্শ করেছেন।" হেনরী নেভিনসন করোনেট থিয়েটারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর নোট বইতে লেখেন—"দ্যুতি, সৌন্দর্য এবং চমৎকারিত্বের দিক দিয়ে 'ডিডো এবং দি মাস্ক' তুলনাবিহীন। রক্তবর্ণ, ধূসরবর্ণ এবং সবুজের সংমিশ্রণে মহৎ এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন ক্রেগ রঙ্গমঞ্চের ওপর—পশ্চাদ্‌পট রয়েছে বিরাট রক্তবর্ণের ব্যাকক্লথ—এটির দ্বারা ইটারনিটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সংগীত এক কথায় অতি মনোরম—তবে এ সংগীত যেন দি মাস্কে আরও রসঘন এবং পূর্ণতা পেয়েছে। দুঃসাহসিক রঙের সমাবেশ। White figures and greys and greens, with but rare touches of red, the more brilliant for their variety."

কাউন্ট কেসলার, যিনি পরে ক্র্যানাখ প্রেস হ্যামলেট ছাপাবার ব্যবস্থা করেন—[এ বইটি থেকে কয়েকটি ছবি এই প্রবন্ধের বিভিন্ন জায়গায় তুলে দেওয়া হবে] অনেক দিন বাদে ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে দেখা নাটকগুলো সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন:

"বোধ হয় ১৯০০ সালে (আসলে ১৯০৩ সালে) ক্রেগ তাঁর মা এলেন টেরীর জন্য স্টেজ সিনগুলো তৈরি করেন। লন্ডনের রঙ্গজগৎ এ সব দৃশ্য দেখে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হয়ে যায়। কারণ এগুলো ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা ধরনের এবং সহজ সরল। বাস্তবতার সঙ্গে এ সব দৃশ্যাবলীর কোন সাদৃশ্য বা যোগাযোগ ছিল না। মাইনিনজেন কম্পানী এবং ইংলন্ডে বীয়রবম ট্রি রঙ্গমঞ্চকে আর্টস এবং ক্রাফটসের একটি শাখাতে পরিণত করবার চেষ্টায় ছিলেন—একিউরেট হিস্টোরিক্যাল ডিটেইল ফুটিয়ে তোলাই

১৯০১—এ্যাসিস এ্যান্ড গ্যালেসিয়া: শরের পোষাক

দর্শকেরা দেখলো ইবসেনের দি ভাইকিংসে ক্রেগ ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে শুধু পর্দার ব্যবহার করেছেন এবং প্রপার্টি হিসাবে ততটুকুই প্রয়োজন হয়েছে—যা এ্যাকসনের পরিস্ফুটনে একেবারে অপরিহার্য: 'মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাথিং-এ' একটি তীব্র সূর্যের আলোর রেখা এসে মঞ্চের ওপর পড়ে—এই আলোর রেখাটি হাজার রকমের রঙের সৃষ্টি করে। এটা সম্ভব হয় এই কারণে যে, আলোর রেখাটি একটি অদৃশ্য রঙীন-কাচে তৈরি জানলার কাচের ভেতর দিয়ে এসে স্টেজে পৌঁছয়।"

আসলে কাউন্ট কেসলার যা দেখেছিলেন তা হচ্ছে একটি জ্বলন্ত বড় ক্রশের ওপর থেকে বিক্ষিপ্ত এক আলোকরশ্মির ধারা। এই ধারাটি ক্রশের নানা রঙের সঙ্গে মিশে নানাদিকে স্টেজের ওপর এসে বিভিন্ন জায়গায় ছিটকে পড়তো। মঞ্চের দু দিকের পর্দায় থাম আঁকা থাকতো। এগুলো ভাঁজে ভাঁজে জ্বলতো। সমস্ত ব্যাপারটাই অতি সহজভাবে করা হয়েছিল। কিছুকাল আগে 'মাচ এডোর' প্রডাকসনে আরভিন যে গরজাস সেটিং-এর অবতারণা করেছিলেন, ক্রেগের সেটিং ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

'দি ভাইকিংসে' অবশ্য কার্টেনস ছাড়াও আরও অনেক কিছু ছিল। একটি গুলোর ওপর দিয়ে অভিনেতাদের হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসতে হোত। আর একটি দৃশ্যে ছিল এক বিরাট প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু মঞ্চের সাবেকী ফ্লাইজ, উইংস, বর্ডারস এবং আপ-স্টেজের পেন্ডেড ব্যাকক্লথ অপসারিত হয়েছিল—ফুটলাইটও প্রায় বর্জিত হয়েছিল—আলো ফেলা হয়েছিল ওপর থেকে। পোষাক-পরিচ্ছদের পরিকল্পনা করা হয়েছিল শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীতে। ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটন করাবার জন্য নয়—সমগ্র দৃশ্যের সমতা বজায় রেখে। অর্থাৎ সব দিক থেকেই মঞ্চপ্রয়োগ রীতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটালেন গর্ডন ক্রেগ।

স্টেজের মুভমেন্টের সঙ্গে সমতা রেখে বর্ণসমাবেশ করা হয়েছিল ক্রেগের এই সব প্রডাকসনে। সুতরাং এই ১৯০০-৩ সালে ক্রেগ যা শুরু করেছিলেন, তারই পরিণত রূপ পরে দেখা গিয়েছিল ডায়াঘিলেভের রাশিয়ান ব্যালেতে। ক্রেগের থিয়েটার ছিল অত্যন্ত মিউজিক্যাল এবং পোয়েটিক। এক বিশেষ ধরনের এফেক্ট আনবার জন্য তিনি 'দি ভাইকিংস'-এ যে সব পোষাক ব্যবহার করেছিলেন, তাতে আটটি বিভিন্ন ধরনের ধূসর রং ছিল। ক্রেগ মৃদু জাতের ধূসর এবং বাদামী রং ভালবাসতেন। এ ছাড়া বড় বড় সেমি-

পরিস্ফুট এবং [illegible] [illegible]। লণ্ডন টাইমস-এ লিখেছিল—

The scenic simplicity and severity were impressive, harmonious in colouring, broad and massive in design.

লরেন্স হাউসম্যানের 'বেথলেহেমে' ক্রেগ মেষপালকদের হেসিয়ানের পোষাক পরিয়েছিলেন। এ বস্তুটি এর আগে কখনও থিয়েটারে ব্যবহৃত হয় নি। তা ছাড়া ক্রেগ স্টেজটিকে ঠেসে দিয়েছিলেন চটের ছালা এবং বেড়া দিয়ে। এগুলোর ওপর কড়া আলো এসে পড়াতে মনে হোত যেন ভেড়ার পাল। এসব ১৯০২ সালের ব্যাপার। ক্রেগ ঐ সময়ে যা করেছিলেন, রাইনহার্ট স্বপ্নেও তখন পর্যন্ত সে সব বিষয় চিন্তা বা ধারণা করতে পারেন নি।

ক্রেগের এই সব প্রাথমিক প্রভাকসনের খুব কম সংখ্যক ডিজাইনই পাওয়া যায় —তবে এখানে বেথলেহেমের যুবক মেষ-পালক, এ্যাসিস এবং গ্যালেসিয়ার শবের পোষাকে সজ্জিত লোকটি ইত্যাদির ছবি দেওয়া হবে পাঠকদের অবগতির জন্য।

খুব এলাহী কাণ্ড-কারখানা করে ক্রেগ দৃশ্যপটাদি দিয়ে মঞ্চসজ্জা করতেন ভাবলে ভুল হবে। তিনি ঠিক এর উল্টোটাই করতেন। কত সহজভাবে এবং অবান্তর জিনিসকে বাদ দিয়ে মঞ্চকে অভিনয়ের জন্য তৈরি করা যায়, সেদিকেই ছিল তাঁর দৃষ্টি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মঞ্চাভিনয়কে অযথা-বন্ধনের বা বোঝার চাপ থেকে মুক্ত করা। সব বিষয়েই তিনি ছিলেন অরিজিন্যাল। যা কিছু করতেন নিজের চিন্তা এবং ইচ্ছা-মতই—কখনও অন্যের অনুকরণ করতেন না। এজন্য আবার তাঁর কাজের অনেক সমালোচকও ছিল। তাঁর 'এ্যাসিস এবং গ্যালেসিয়া' ও 'দি মাস্ক অভ লাভ' সম্পর্কে কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল—"পোষাকপত্রগুলো কোনও সময়ে বাস্তব জীবনে কোনও দেশে ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। দৃশ্যগুলোর সঙ্গেও সিসিলির বা অন্য কোন জায়গার কোনো মিল নেই।" অর্থাৎ এ সবই ছিল গর্ডন ক্রেগের কবি-মানসের মৌলিক সৃষ্টি।

ক্রেগ চেয়েছিলেন সিরিয়াস থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তখনকার দর্শকেরা চাইতো মঞ্চসজ্জায় অতিরিক্ত রকম বাস্তব-ধর্মী বাহুল্যের। ক্রেগ দর্শকদের এই বিকৃতরুচির পরিবর্তনের কোন রকম প্রচেষ্টা করেন নি। তাঁর একমাত্র উদ্যম ছিল এই বিকৃতরুচির পরিমার্জনের। কিন্তু এই কারণেই ইংলণ্ডের সাধারণ দর্শক সে সময় ক্রেগকে অন্তর থেকে গ্রহণ [illegible] না। [illegible] প্রধান

ক্রেগ—রোমে ১৯১৯ সালে

সৃষ্টির দিক থেকে নাটকটি গুণীজনের কাছ থেকে চরম মর্যাদা পেল, কিন্তু সাধারণ দর্শক নাটকটি নিল না। মাচ এডোর বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটল। ফলে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হল। যে থিয়েটার এপ্রিল মাসে খোলা হয়েছিল, অর্থাভাবে জুন মাসেই তাকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন ক্রেগ। সরকার বা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোন অর্থ-সাহায্য বা অন্য কোনরকমের সহানুভূতি ক্রেগ পান নি। আর সত্যিকার বড় শিল্পী যদি এ জাতীয় সাহায্য না পান, তা হলে তিনি শিল্পসৃষ্টি করবেন কি করে?

ইওরোপের অন্যান্য জায়গায় কিন্তু বড় শিল্পীর সত্যিকার কদর ছিল। এই জাতের শিল্পীকে সমাজের উপকারী নাগরিক এবং সংস্কারক হিসাবে শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখানো হোত। নানাভাবে সাহায্যও করা হোত সরকারের তরফ থেকে। সেন্ট্রাল ইওরোপ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং রাশিয়াতে অনেক মিউনিসিপ্যাল এবং স্টেট থিয়েটার ছিল। এই সব রঙ্গমঞ্চে নিয়মিতভাবে রেপারটরী পদ্ধতিতে নাটক দেখানো হোত, অর্থাৎ এই সব দেশে নাগরিক জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবেই মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ছিল। বোধ হয় এই সব কারণেই রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে ক্রেগের চিন্তা-ধারণা, মতামত এবং কার্যপদ্ধতি কন্টি-নেন্টেই সাদরে গৃহীত হয়েছিল এবং বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু নিজের দেশ ইংলণ্ডে তিনি কোনদিনই বিশেষ কল্কে পান নি।

[এখানে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক [illegible] [illegible] পায় নি, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-নাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, নেতাজী, ঐতি-হাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি সবাই শিশিরকুমারের প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ দর্শক তো তাঁকে প্রায় দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে। কিছু কিছু লোক অবশ্য তাঁর সঙ্গে অনেক শত্রুতা করেছে। তবে বড় প্রতিভাকে চিরকালই শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়। সেজন্য খেদ করে লাভ নেই। আমি যেজন্য শিশির-কুমারের কথা তুললাম, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। সম্প্রতি শিশিরযুগেরই এক নট তাঁর আত্মজীবনীতে পরোক্ষে শিশির-প্রতিভার প্রতি কটাক্ষ করতে শুরু করেছেন। শিশিরবাবুদের সময়ে এই ভদ্রলোকের মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর অভিনেতা আমার বিশেষ চোখে পড়ে নি। লোকটির একশ্রেণীর দর্শকের কাছে খানিকটা জন-প্রিয়তা ছিল। তার কারণ হল এই—ভদ্রলোক চিরকালই থিয়েটারের মঞ্চে যাত্রার অভিনয় করে এসেছেন। যাত্রাকে আমি ছোট করে দেখতে বলছি না। যাত্রা এবং থিয়েটারে অনেক তফাৎ। যাত্রার আসরে থিয়েটার করলে সেটা বেখাপ্পা লাগবে। তেমনি রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার না করে যদি যাত্রা করা হয়, সেটাও অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। তবে এ ভদ্রলোক কিছুটা পপুলারিটি লাভ করলেন কিভাবে? এর কারণ আমাদের দেশে দর্শক এখনও ঠিকমত তৈরি হয় নি বলে। ভদ্রলোক আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন যে, শিশিরবাবু নাকি দিগ্বি-জয়ীতে নাদিরের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে আলমগীরের ছাপমুক্ত হতে পারেন নি। তারপর ভদ্রলোক খুব বিজ্ঞভাবে মন্তব্য করেছেন যে, বড় অভিনেতার খুবই সচেতন থাকা উচিত—যাতে একটি রোলের অভিনয়ভঙ্গী অন্য রোলকে প্রভাবিত না করে। প্রথমত কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। শিশিরবাবু সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভঙ্গিতে আলমগীর এবং নাদিরের ভূমিকায় অভি-নয় করতেন। এমন কি একই চাণক্যের ভূমিকায় বিভিন্ন দিনে বিভিন্নভাবে শিশিরকুমারকে অভিনয় করতে দেখেছি।

তা ছাড়া ভদ্রলোক আর একটা ভুল করেছেন—শিশির-প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। এ ভদ্রলোকের বিদ্রূপ মন্তব্যে শিশির-কুমারের প্রতিষ্ঠা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না—ভদ্র-লোকের ক্ষুদ্রচিত্তপূর্ণ মনোভাবটাই সবার কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়বে।]

# লোকসংগীতের একাল না আকাল?

## মুরশিদ

পুজোর পর মুরশিদ আর এই আসরে হাজিরা দিতে পারে নি। সেজন্য পাঠকদের কাছে প্রথমেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি। তাঁরা যেন না ভাবেন যে, লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার সব বলা শেষ হয়ে গেছে। মোটেই না। সবে সুরু করেছিলাম মাত্র। নিত্য নতুন প্রশ্ন বাংলা লোকসঙ্গীতের সামনে এসে দেখা দিচ্ছে। সে তুলনায় কতটুকুই আলোচনা করতে পেরেছি?

পুজোর "ফেসটিভ সীজনে"র জের আরেক পুজো অবধি থাকে। পুজোবাজারী সাহিত্যের দুর্গন্ধ সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব ছড়িয়ে পড়তে পারে না—কারণ এখনো তাঁরা নিরক্ষর। কিন্তু পুজোবাজারী সঙ্গীতের চোলাই মদের চালান শ্রুতির গলিপথে সর্বত্র। সারা বৎসরের বাংলা আধুনিক সঙ্গীতের উৎকট, বিকট ও সঙ্কটের সুমধুর নির্যাস হলো পুজো রেকর্ডের গান। এই আধুনিকের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসঙ্গীতকে বিচার না করলে সুবিচার হবে না। তাই পাঠকরা মাপ করবেন—এবার যদি গ্রাম্য মুরশিদ আধুনিক গীতের সামান্য আলোচনা করার দুঃসাহস দেখান।

আমার সামনেই রয়েছে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের সুকণ্ঠ ও সুকণ্ঠীর আলোকচিত্রশোভিত এবারকার জবরজঙ শারদ অর্ঘ্য অর্থাৎ রেকর্ড সঙ্গীতের ক্যাটালগটি। কথা ও সুরের শুভ মিলনে হয় গান। কাজেই একটি ছেড়ে আরেকটির আলোচনা অসম্পূর্ণ। কিন্তু আজকের অধিকাংশ আধুনিক গীত আর কথা ও সুরের মিলনে বিশ্বাসী নয়—এরা রাজপথে স্বৈরাচারী। এরা হিপির "জীবনদর্শনে" বিশ্বাসী। যদি কোথায়ও কথায় শালীনতা থাকে, তবে সুরে, লয়ে ও মিউজিকের উন্মত্ততায় তাকে অশ্লীল করে তোলা হয়। আজকের সমাজের শিক্ষিত শিল্পী-সাহিত্যিকের মধ্যে গণমনবিচ্ছিন্নতা থেকে যে চরম হতাশা ও উদ্দেশ্যহীনতা এবং অন্যদিকে অর্থগৃধ্নুতা দেখা দিয়েছে, তা থেকেই এ সব অপসঙ্গীতের উৎপত্তি।

বৈপ্লবিক গণচেতনায় যে গীতিকারের জন্ম—তিনি যখন গণবিমুখতার স্রোতে ভেসে যান, তখন কথায় ও সুরে যে পলায়নী বৃত্তি, আত্মজিজ্ঞাসার আকারে তা আত্মপ্রকাশ করে। একদা এইচ, এম, ভি'র আধুনিক গানে যাঁর ছিন্নমূল "কোন এক গাঁয়ের বধূ"র গোপন চোখের জল শুধু বাংলা নয়—সমস্ত ভারতবর্ষের মন ভিজিয়েছিল এবং আধুনিক গীতে নতুন পথ রচনা করেছিল—সেই সলিল চৌধুরী আজ কি নিঃশেষিত? তিনি কেবল নিজের শূন্য হৃদয়টাকেই দেখতে পাচ্ছেন?—চিত্রতারকা বিশ্বজিতের কণ্ঠে এবার তাঁর পুজোর গান:

> "কেন এমন আর কেন অমন
> কেন যে বাঁচা কেন মরণ
> সময়ের নৃত্যের তালে দিয়ে তাল
> কেটে গেল জীবনের কাল
> শুধু জানি কী জানি না।"

আবার এই পুজোর রেকর্ডেই হেমন্তকুমারের কণ্ঠের জন্য সলিল চৌধুরী যে গান দিয়েছেন, তাতে আছে:

> "আমি পথ খুঁজিনাকো
> পথে মোরে খোঁজে
> মন যা পেলে বুঝে
> না বুঝে তা বোঝে
> আমার চতুর্পাশে
> সব কিছু যায় আসে
> আমি শুধু তুষারিত
> গতিহীন ধারা।"

এই প্রচণ্ড চলমান জীবনে "তুষারিত" সলিল চৌধুরীর গানের সুরটাও কিন্তু তুষারিত। সে তো গেল তুষারিত জীবনের আত্মবলোকনের নিঃসঙ্গতা। কিন্তু যাঁরা তাঁর 'জুনিয়ার'—তাঁর মতো একাধারে বাণী ও সুর সংযোজনার দক্ষতা নেই—তাঁদের কোন ভাব বা ভাবনার বালাই নেই। তাঁদের জীবনে "মারিজুয়ানা"র নেশা। যা খুশি লিখে যাও, যা খুশি সুর লাগাও, নতুন যুগের ভৈরবীচক্রের ওঁ হ্রীং ক্লীং। কথা যতো হবে হিং টিং ছট, সুর তত হবে উদ্ভট। সুর নিয়ে এই অসুরবৃত্তি ধুতিপরা পিতা শচীনদেব বর্মণের পক্ষে সম্ভব নয়—কাজেই এবার পুজোয় ছুঁচোলো জুতোর ছন্দে পুত্র রাহুলদেব বর্মণ এগিয়ে এসেছেন 'পপ' মার্কা আধুনিক গাইতে:

> "মনে পড়ে রুবি রায়, কবিতায় তোমাকে
> একদিন কত করে ডেকেছি
> আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে
> তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি।"

ত্রিপুরার গোমতী নদীর তীরে যে পিতার কণ্ঠে সুরের তরঙ্গ জন্মলাভ করেছিল এবং কলকাতা মহানগরীকে ভাসিয়েছিল—আজ তাঁর সন্তান বম্বে 'মেরিনড্রাইভে'র প্রেমের গান গাইতে গেলে পিতার সুরে কি প্রেম নিবেদন সম্ভব? তার ওপরেও টেক্কা মেরেছেন রাণু মুখোপাধ্যায়। একেবারে নির্ভেজাল বাংলা পপ্। রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যে লালিত এবং গণনাট্যের ঐতিহ্যে পালিত শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার হবার পরও আধুনিকে চেষ্টা করেও যে গায়কী আয়ত্ত করা অসম্ভব—তাঁর সুকন্যা দ্বারা সেটা সম্ভব হয়ে উঠেছে। রাণু মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পিতার গলার 'মেলডি'র রেশটুকুও নেই, আছে কেবল সুরের হুল্লাহুপ্। সেটাই তার সাফল্য। লেবেলটা অবশ্য পিতার। গানটা হলো:

> "কুচকুচে কালো সে জাতে স্প্যানিয়াল
> তুলতুলে গা যেন রেশমি রুমাল।"

বাণী রচনা করেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনাটি খারাপ নয়। ছন্দ ও পদলালিত্যের গতি আছে। বক্তব্য বিষয়টিও সুস্থ। যদি কিশোরদের জন্য হয়—তবে মোটরের চাকায় পড়ে আদরের স্প্যানিয়াল 'বুসি বল'-এর মৃত্যু ওদের মন হয়ত স্পর্শ করতো। কিন্তু ভি বালসারার সুরসম্পাতে, মিউজিকের মাতলামোতে এবং সর্বোপরি রাণু মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের বিটলেমিতে নিহত রচনার কঙ্কালের ওপর গড়ে উঠেছে একটি বাঙালী 'পপ্ সং'। শুনতে শুনতে মনে হয় বহু প্লেনপাইপ

ও মিনিস্কার্ট টুইস্ট করতে করতে,—পরে একেবারে 'শেক' করতে করতে গাইছে ঃ

"'বুসি বল', 'বুসি বল' তুমি যে আমার
বুসি বল বুসি বল আমিও তোমার..."

অন্যান্য গানগুলোতে এমন উত্তেজক দ্রব্য না থাকলেও কথার ভেল্কি আছে—যেমন আছে অর্থহীন বিদেশী পপ্ গানে ঃ

"Mathy told hathy
about a thing she saw,
Had two big horns
and a wooly jaw.
Wooly, bully, bully, bully."

"নিশি রাতে বাঁশী তার সিঁধকাঠি হয়ে
চুপি চুপি ঘরে এসে বাজে রয়ে রয়ে..."

এ গানটিরও রচয়িতা পুলকবাবু। বৈষ্ণবসাহিত্যে কিংবা লোকসাহিত্যে বাঁশীর ছড়াছড়ি, কিন্তু কোথায়ও বংশীধারী বাঁশীকে সিঁধকাঠিরূপে ব্যবহার করতে শোনা যায় নি। পুলকবাবুর এ উপমাটি একেবারে মৌলিক! পল্লী-কবি রসিকতা করে লিখেছিলেন ঃ

"ওরে রে রসিক বঁধু তুই বড় ছটফট্যা
(তুমি) দিনে থাক কদমগাছে,
রাত্রে আস ঝাপ কাট্যা।"

বাঁশীকে সিঁধকাঠি করা যায় জানলে পল্লীকবি ঝাপ কাটার ঝক্কিটা নিশ্চয়ই নিতেন না।

আরেকজন রচয়িতা—সুনীলবরণ লিখেছেন ঃ

"প্রেম শুধু এক মোমবাতি..."

সুনীলবাবুকে ধন্যবাদ, আজকের প্রেমের এমন অনবদ্য জ্বলন্ত উপমাটির জন্য। কিন্তু সব চেয়ে সার্থক বাণী-কার হলেন সর্ব নৈবেদ্যে কাঁঠালীকলা শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়।

"কতবারই আমি মনকে তো শুধালাম
মালতী কি মাধবী ভুলে গেছি নাম
এইটুকু আজ শুধু মনে পড়ে ;
শেষ দেখা সেই রাতে
আজ তুমি নেই সাথে।"

নামটা ভুলে গেলেও প্রেমটা মোম-বাতির মত জ্বলে জ্বলে গলে গলে গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।

ডনকুইক্‌শটের ডুলচিনিয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। আজকের আধুনিক গান হলো এই সব হতপ্রেমিক পাগলদের অর্থহীন প্রলাপ। এটা আমার কথা নয়। স্বীকারোক্তি শুনুন এবারের একটি পূজোর গানে ঃ

"আমায় সবাই পাগল বলে
কত বোঝায়, কত সান্ত্বনা দেয়
তোমরা হাসছ?
আজ যে তোমরা হাসবেই
আচ্ছা কখনো ভালবেসেছ?"

এই গানটির কথা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর ঃ রাহুলদেব বর্মণ, গান ঃ আশা ভোঁশলে!—ত্র্যহস্পর্শ সংযোগ।

এই আশা ভোঁশলেই গতবার পূজোয় বাংলার একটি কুৎসিততম গানের কণ্ঠরূপ দিয়েছিলেন। সেটারও বাণীকার গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার এবং সুরকার রাহুলদেব বর্মণ। সেই গানটি হলো ঃ

"এই এসো না—কাছে এসো না, প্লীজ,
আসবে না?"

বোম্বের গানে 'দিল', 'মহব্বৎ' বা 'পেয়ারের' ছড়াছড়ি দেখে যে বাঙালী শিক্ষিতশ্রেণী খুব হাসাহাসি করে থাকেন, তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন—এ ধরনের রাস্তার মোড়ে কুৎসিত ইসারা দেওয়া গান বোম্বেও বের করতে পারে নি। বোম্বেকে পিছনে ফেলেছে আধুনিকের কলকাতা। অথচ এদের সহ্য করা হচ্ছে 'ঘরের ছেলে' বলে কি?

গত আগস্ট মাসে বেতার জগতে শ্রীমতী সুলোচনা মুর্ম্মু নামে এক 'আদিবাসী কন্যা' রীতিমত এক চাঞ্চল্য-কর চিঠি লেখেন। বেতার কর্তৃপক্ষ এটা প্রকাশ করে যে 'স্বাধীন সাংবাদিকতার' ও আত্মসমালোচনার সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সেদিক দিয়েও এ চিঠিখানা সত্যি চাঞ্চল্যকর। যদিও কোনো কোনো লোকসংগীত শিল্পীর মূল্যায়নে—মুর্শিদ তার সাথে একমত নন, তথাপি চিঠির মূল বক্তব্যের প্রতি মুর্শিদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। সুলোচনা মুর্ম্মু প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন, "প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি একজন আদি-বাসী কন্যা। অশিক্ষিতা বলিতে পারেন।" তারপর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মিন্টু ঘোষ প্রমুখ আকাশবাণীর কিছু পাকা-পাকি চুক্তি করা রচয়িতার গানের বাণীর বিশ্লেষণ করে প্রশ্ন করেছেন "এগুলি কি গান—না ইয়ার্কি?" চিঠির শেষে শ্রীমতী মুর্ম্মু আশা ভোঁশলের গাওয়া "এই এসো না, প্লীজ" গানটির উল্লেখ করে উপসংহারে লেখেন "সম্পাদক মহাশয়, আমি আদিবাসীর মেয়ে। এ গান মা-বাবার নিকট বসিয়া শুনিতে আমারও লজ্জা করে। আপনি হয়ত বলিবেন, শ্রোতাদের অনুরোধ, কি করা যায়। উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করি, শ্রোতারা যদি কু-প্রস্তাব করিয়া কোনদিন কোন অনুরোধ করিয়া বসে, তবে কি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন?"

১—১৫ ডিসেম্বরের বেতার জগতে এক বঙ্গদেশীয় হিপি শ্রীমতী মুর্ম্মুর জবাব দিয়েছেন। আমি আক্রোশমূলক কুৎসা গাইছি না। শ্রী যাযাবর হিপি, ফুটপাথ, পার্ক স্ট্রীট—এই নামে ও ঠিকানায় 'এই এসো না, প্লীজ' মার্কা গানের স্বপক্ষে বেতার জগতে একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। হিপিরা হিপি গানের স্বপক্ষে বলবেন এ তো স্বাভাবিক কথা। তবে বলিহারি, বেতার জগতের 'নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা'। কিন্তু যাযাবর হিপির ঠিকানাটা বোধ হয় ভুল ছাপা হয়েছে—আকাশবাণীর জায়গায় পার্ক স্ট্রীট। শ্রীমতী মুর্ম্মুর মতো বিবেকবতী শ্রোতা বাংলায় আছেন এটাই আমাদের কাছে আশা ও আনন্দের কথা।

যাক, আসল কথায় আসা যাক। পূজোর আধুনিক গানের যে সামান্য আলোচনা করা হলো—এই পরিপ্রেক্ষিতেই পূজোর লোকগীতির বা লোকাধুনিক গানের বিচার করতে হবে। কারণ এই নেশাতুর শ্রোতাদের জন্য একই টেবিলে লোকসংগীতও পরিবেশন করা হয়। গ্রামোফোন কোম্পানী শিল্প করছেন না—ব্যবসা করছেন। ট্রেড্ লেবেল বদলাবার ঝক্কি তাঁরা নেবেন কেন? কাজেই একই দল 'গ্লেমর' শিল্পীকে বারে বারে হাজির করেন। কিন্তু লোকসংগীতের বেলায় একমেবাদ্বিতীয়ম শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী। এই কৃতিত্ব অন্য কেউ অর্জন করতে পারেন নি। এবার পূজোয় যথারীতি তাঁর দু'-খানা গান রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। এখানে তারই সামান্য আলোচনা করবো। একটি লোকসংগীতের রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়, আরেকটি নাকি সংগৃহীত।

প্রথমেই বলে রাখি, কাঁঠালের যেমন আমসত্ত্ব হয় না, তেমনি একজনের রচনা আরেকজনের সুরদানে কোনদিন লোক-সংগীত হয় না। রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন-বাবুর আর সুরশিল্পীর। এ ব্যাপারটা লোকসংগীত রচনার ধারার সম্পূর্ণ বিরোধী কথা। পরবর্তী সময়ে ভণিতার যুগ এলেও লোকসঙ্গীত কোনোদিনই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারে নি। লোক-সঙ্গীতের কথা-সুর-শিল্পী ধারাবাহিক-তার প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। সুর কোনো একক সৃষ্টি নয়। এক আঞ্চলিকতার বাঁধনে সে বাঁধা। যিনি খাঁটি গ্রাম্য রচয়িতা, কথা ও সুরে তাঁর কোনো দ্বৈতভাব আসতেই পারে না। পল্লী ধারাবাহিকতার বাইরে যদি শহরে বসে একজন লোকসঙ্গীতের কথা দেন, অন্যজন সুর দেন—তবে একজন কথা-চোর, অন্যজন সুর-চোর হতে বাধ্য। ইতি-পূর্বে [illegible] রেকর্ড সঙ্গীতে কথা অমুক,

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
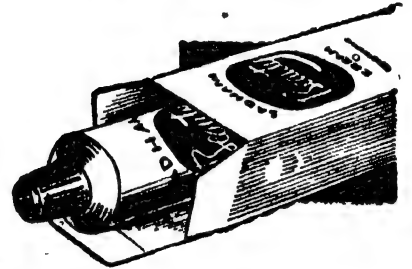
সুর তমুক বলে লোকসংগীতের নামে অনেক অচল টাকা চালানো হয়েছে। আরেকটা কথা—প্রচলিত কোনো আঞ্চলিক সুরে কোনো গান রচিত হলে—সেই আঞ্চলিক সুর কারও ব্যক্তিগত সৃষ্টি হতে পারে না। খাঁটি ভাটিয়ালী সুরে গান লিখে যখন কোনো শিল্পী সুরসংযোজনায় নিজের নাম দেন, তখন তাঁর অপরাধ সমার্জনীয়। লোকসংগীতের কথায় ব্যক্তিগত সংযোজন থাকলেও সুরটা একটা সামগ্রিক সৃষ্টি। কোনো কোনো প্রতিভাশালী পল্লীগীতিকার একটা বিশেষ গায়কী বা ভংগীর প্রচলন করেন, কিন্তু সেটাও সামগ্রিক সৃষ্টি। ঘরে বসে জনসমাজের গ্রহণ-বর্জনের বাইরে—ব্যক্তিগত খামখেয়ালীতে ঐসব স্টাইলের সৃষ্টি হয় নি। লোকসংগীতের ধারাবাহিকতা ও সমসাময়িকতার যোগসূত্রটা ধরে রেখেছে অগণিত জনসাধারণ। সেখানে ব্যক্তি রচনা ও সমষ্টিগ্রাহ্যতা এবং রচনার নব নব সংযোজন এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথা। এজন্যই "A folksong composes itself" —এই কথাটায় লোকসংগীতের 'অপৌরুষেয়' চরিত্রের অভিব্যক্তিটা চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে।

গৌরীপ্রসন্নবাবুর রচনাটা হলো :

"সুজন রে—মানুষ চেনা দায়
ভবের এই নাট্যশালায়।
সবাই হেথায় মুখোস পরে
জীবনপালায় নাটক করে—
রং মেখে মুখ বদলে ফেলে
তাতেই সুখ পায়......"
ইত্যাদি।

গানের মুখটা শুনে মনে হলো চেনা-চেনা। প্রায় ৭।৮ বছর আগে পূর্ব-পাকিস্তানের মহম্মদ আলি সিদ্দিকীর একটি রেকর্ড ছিল :

"মন রে ভবের নাট্যশালায়
মানুষ চেনা দায়।"

পরের কথা আমার মনে নেই : হয়ত পরের রচনা গৌরীপ্রসন্নবাবুর নিজেরই। গানের মুখটা পেলে ল্যাজটা লাগানো সহজ হয়ে যায়। যেমন :

"সবাই হেথায় মুখোস পরে
জীবনপালায় নাটক করে..." ইত্যাদি।

আসল বিচারটা সুরের দিক থেকে। সে কথায় পরে আসছি। দ্বিতীয় গানটি নাকি সংগৃহীত! গানটি হলো :

"ঝিকু ঝিকু করি রে
এক চোখে নিদ্রা তাহার
আরেক চোখে জাগে
দেখি না দেখেছে কি
দেখে নি আমারে...।"

এই গানটি সংগৃহীত লোকগীতি ; অর্থাৎ শহুরে রচয়িতার untouched by hand বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু রচনাটার মধ্যে লোকসংগীতের স্বাভাবিক রচনার কথা, ভাব ও সুরের কোনো সংগতি পাচ্ছি না।

'আনামজল গাগরী তার ভাসায়েছে জলে' কথাটায় খটকা লাগলো। পূর্ব-বঙ্গের লোকসংগীতে কাঁখে বা কাঙ্খের কলসী শুনতে পাই সর্বদা—'আনামজল গাগরী শুনি নি।' পূর্ববঙ্গে আনাম শব্দটা কোনো কোনো অঞ্চলে 'পুরা' বা 'সম্পূর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। তা হলে আনামজল গাগরী ভাসে কি করে? তা ছাড়া কলসীর জায়গায় এভাবে গাগরী ব্যবহার দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই গানের প্রথম কলিতে "ঝিকু ঝিকু করি রে" শব্দের অর্থ কি? গোয়ালপাড়া, গৌরীপুরের একটি গান জানি :

"ঝিক ঝিক কড়ি রে
আঞ্চলে বান্ধিয়া রে
যায় নীলমন গৌরীপুরের হাটে,
নীলমন নীলাইও না।..."

এখানে 'ঝিক ঝিক' অর্থ 'চকচকে'। চকমকে পয়সা অঞ্চলে বেঁধে নীলমন গৌরীপুরের হাটে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গেও 'ঝিক ঝিক কোনো সময় চিকমিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'ঝিক ঝিক করে চলা'—যেমন রেলগাড়ী—সর্বত্র সমান অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু এই 'ঝিকু ঝিকু'র অর্থ কি? শিল্পী যদি দয়া করে জানান—কোন্ অঞ্চলের এবং কার কাছ থেকে এই গীতটি সংগৃহীত, তবে মুরশিদ খুব উপকৃত হবেন।

সুরের দিক দিয়ে যদিও 'মানুষ চেনা দায়' গানটিতে পূর্ববঙ্গের সুরের প্রকৃতিটা রাখবার চেষ্টা আছে—এই "ঝিকু ঝিকু করি রে" গানটির সুরে কোনো জাতকুলের চিহ্নমাত্র নেই। আর মিউজিকের মার খেয়ে গায়কী তো গলদ্‌ঘর্ম। পপ্ মিউজিকের টেম্পোর সংগে সমান তালে চলতে গিয়ে লোকসংগীতকেও আজ নিতম্ব দোলাতে হচ্ছে।

কিন্তু এই পুজোর হৈচৈ-এর মধ্যেও আধুনিক গীতের ফাঁকে শচীনদেব বর্মণ একটি লোকসংগীত গেয়েছেন। গানটি অতি পুরোনো। শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা অঞ্চলে এই গানটি বহুদিন যাবৎ প্রচলিত। হঠাৎ শচীনদেবের কণ্ঠে এই গানটি নির্ভুল সুরে শুনতে পাওয়া—ভূত-বেতালের রাজত্বে—রীতিমত চমক-লাগা ব্যাপার। শচীনদেব বর্মণের আর আগেকার কণ্ঠ নেই, তবু বড়ো শালিকের সুরে কিন্তু ভেজাল নেই।

তবে "শুকা চাই" এই আঞ্চলিক intonation থাকা শব্দটার উচ্চারণে পূর্ববঙ্গের 'চ'-এর জায়গায় বিশুদ্ধ 'চ'-এর উচ্চারণ করে গানের পরিভাষাটা একটু ক্ষুণ্ণ করলেও সুরে, গায়কীতে ও মিউজিকে গানটিকে অক্ষত রেখে শচীনদেব আবার প্রমাণ করেছেন—বোম্বের স্টুডিওর স্টেরিওফার্নকে সুর-ঝঙ্কার নিয়ে কারবার করলেও যখনই শচীনদেব "দ্যাশের মাটি"তে পা ফেলেন তখন সত্যি দেশী হয়ে যান। কিন্তু E. P. রেকর্ডে ৩টা আধুনিকের মাঝখানে স্যান্ডুইচ্ করে লোকসংগীতটাকে ঢোকানোতে মনে হয়—তিনিও এ গানটিকে যেন সসঙ্কোচে 'রাজেন্দ্রসংগমে দীন যথা' বলে চালু করতে চেয়েছেন :

'সুবল বল মুল চাই
কেমন আছে কমলিনী রাই
আমি যার কারণে বৃন্দাবনে
(রে সুবল)
কান্দিয়া সদাই বেড়াই।"

পুজোর হট্টগোলের হাটে এই গানটি কিন্তু হারিয়ে গেছে। কেউ উচ্চারণও করে না।

প্রত্যেক দেশের সংগীতেরই একটা National image আছে। এই জাতীয় সাংগীতিক চিত্রকল্পটি বাণীনিরপেক্ষ সুরসৃষ্টি। দেশের ধ্রুপদী ও লোক-গীতির ধারার সার্থক সমন্বয়েই এই চিত্রকল্পটি তৈরী হয়। Innovation বা নতুন উদ্ভাবন মূলে প্রবাহ থেকে রস গ্রহণ করেই সম্ভব। অতীতের বাংলা আধুনিক গান মূলত এই জাতীয় প্রবাহ থেকেই জন্ম নিত। কিন্তু আজকের আধুনিক গীত যেমন হ্রেষা-রবে তাকে অস্বীকার করছে, তেমনি লোকসংগীতও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে—একচেটিয়া ধনপতি manufactured music হিসাবে মুনাফা কামাই করছে। এই মর্মান্তিক অবস্থার জন্য কোনো বিশেষ শিল্পীকে কেবল দোষ দেওয়া হবে ভুল, আজকের শ্রোতারা তার চেয়ে কম দোষী নন।

আর মজার ব্যাপার—এই শ্রোতাদের অধিকাংশই আবার বামপন্থী দলগুলির অনুগামী। বিশেষত স্কুল-কলেজের ছাত্রদল—যারা অধিকাংশই রাজনীতিতে বামমার্গী—তারাই পপ সংগীতের সব চেয়ে গুণগ্রাহী। শ্রোতারা সুর চায় না, চায় গুণগ্রাহী। শ্রোতারা সুর চায় না, চায় সুরা আর গায়করা গান গান না, গলা বেচে খান। বাংলা সংগীতের এমন সংকট আগে আর আসে নি।

# চলচ্চিত্র জগতের বার্তা

দিল্লী থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইতে চলচ্চিত্র জগতে একস্ট্রা হিসাবে কাজ করেন এমন কয়েকজন তরুণীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আরো কয়েকজনকে খোঁজ করছে; তারা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য পালিয়ে চলে গেছে। এই সংবাদে আরো বলা হয়েছে, ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ আছে। তারা দিনের বেলা এসব তরুণীর স্বামী পরিচয় দেয়, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে এই তরুণীদের অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে অর্থ উপার্জন করে। সাধারণ হোটেল, রেস্টুরেন্ট এদের পাপ কাজের কেন্দ্র।

এই যে অতিরিক্ত শিল্পী বা একস্ট্রা—এরা সর্বত্র ফিল্ম স্টুডিওর আশেপাশে ঘুরে থাকে। যখন কোন ছবিতে ছোটখাটো অংশ বা জনতার দৃশ্যের প্রয়োজন হয় তখন এদের কাজে লাগান হয়। এদের কাজের যেমন নিশ্চয়তা নেই, তেমনি মজুরীর স্থিরতাও নেই। সাধারণত প্রোডাকশন ম্যানেজার অথবা এক শ্রেণীর দালালের সাহায্যে এরা কাজ পায়। এই একস্ট্রাদের পাওনা অর্থের একটা অংশ দালালরা আত্মসাৎ করে। ভবিষ্যতে কাজ পাবার অথবা আরো বড় ভূমিকায় স্থান পাবার আশায় ওরা চুপ করে থাকে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় না। অনেক একস্ট্রা শিল্পীর দুর্ভাগ্যের কথা ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকে-উপন্যাসেও একস্ট্রাদের জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী বলা হয়েছে। বোম্বাই-এর এই ঘটনা তারই আর এক দৃষ্টান্ত মাত্র।

ফিল্ম জগতের প্রলোভন বড় মোহময়। রুপালী পর্দায় মুখ দেখাবার হাতছানিতে পতঙ্গের মত অনেকে ছুটে আসে, অনেকে দালালের পাল্লায় পড়ে কল্পনার শূন্যে সৌধ নির্মাণ করে, তার পরে চরম লাঞ্ছনা মাথার নিয়ে হারিয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ফিল্মে শিল্প-মর্যাদা অপেক্ষা ব্যবসার দিকটাই বড়। সুতরাং এই একস্ট্রাদের কোন গুণাবলীর মাধ্যমে নিয়োগ করার নিয়ম নেই, এদের কাজ দেবার কোন পদ্ধতি নেই, এরূপ বাড়তি শিল্পীদের কোন তালিকাও নেই। কাজেই যতদিন এই অরাজক অবস্থা চলতে থাকবে, ততদিন দালালদের কবলে এদের পড়তে হবে। বোম্বাই-এর এই বাড়তি শিল্পীরা একদিন নায়িকা হবার লোভে পড়ে ফিল্ম জগতে এসেছিল, কিন্তু ছবিতে এত কাজ কোথায়? তাই বছরে একটা-দুটো ছবিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেনি। তখন দালালরা উপস্থিত হয়েছে ছল-চাতুরী নিয়ে ওদের সর্বনাশের পথে নামবার জন্য। তারই পরিণতি এই মর্মান্তিক ঘটনা।

ফিল্ম স্টুডিওগুলিতে এখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছে। টেকনিশিয়ান ও শিল্পীরা ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হচ্ছেন। এই বাড়তি শিল্পীরাও যদি সংগঠিত হতে পারত তা হলে বোধ হয় অনেকে এই অপমানের জীবন থেকে বাঁচতে পারত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটা বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি চালু আছে। অভিনয় শিক্ষার শিক্ষালয় থেকে যাঁরা পাশ করেন, তালিকানুসারে তাঁদের অভিনয়ে সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং সেখানে কারো উমেদারী করার বা দালালের পাল্লায় পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। যোগ্যতা অনুসারে যে-যার কাজ পায়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে সব ব্যাপারে অরাজক অবস্থা। এই অরাজকতা দূর করতে না পারলে শিল্পীরা বা বাড়তি শিল্পীরা তাঁদের শিল্পীর জীবনের সম্মান রেখে বাঁচতে পারেন না। এই গণতান্ত্রিক চেতনার যুগে শিল্পীদের অসম্মানের কথা ভাবা যায় না। তাই স্টুডিও সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং বাড়তি শিল্পীদের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, যাতে যোগ্যতা অনুসারে সকলে কাজ পায়। প্রত্যেক প্রোডাকসন ইউনিট এবং স্টুডিওতে বাড়তি শিল্পীদের তালিকা থাকা দরকার। নতুবা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভিশাপে বোম্বাই-এর মত আরো অনেককে পাপের বলি হতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা শিল্পীরা—বাড়তি অথবা প্রয়োজনীয় হোন না কেন, সকলকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

'মুক্তিস্নান' ছবির একটি দৃশ্যে ললিতা চ্যাটার্জী।
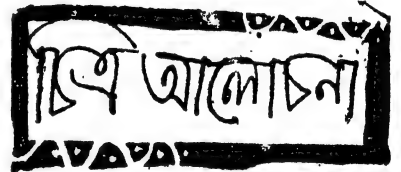
### অরণ্যের দিনরাত্রি

সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক ছবি "অরণ্যের দিনরাত্রি"। শ্রীরায় তাঁর চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু করেছিলেন দরদী কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্তি 'পথের পাঁচালী'কে অবলম্বন করে। এই প্রথম ছবিতে তিনি প্রায় রাতারাতি বিশ্ব-পরিচিতি লাভ করেছিলেন। 'পথের পাঁচালী' ছিল বাঙালীর জীবন-গাথা। সেই ছবিতে যে প্রতিভার প্রকাশ হয়েছিল, তা আরো বিকশিত হয়েছিল 'দেবী'তে। বাঙালী দর্শক সানন্দে তাঁকে বরণ করেছিলেন, তাঁর জন্য গর্ববোধ করেছেন। দুই দশকের শেষে সেই একই চলচ্চিত্রস্রষ্টা তাঁর ছবির অবলম্বন-

পাধ্যায়কে যিনি এখন পর্যন্ত সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের মর্যাদা লাভ করেননি। 'পথের পাঁচালী' থেকে যে পরিচালক 'দেবী'তে এগিয়েছিলেন তাঁকে প্রগতির অভিযাত্রীরূপে কল্পনা করাই স্বাভাবিক। তাঁর কাছে আশা ছিল চলচ্চিত্রে তিনি নিজস্বতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথে তিনি সৃষ্টি করবেন মহৎ ছবি। কিন্তু সে পথে তিনি অগ্রসর হন নি। মহৎ সৃষ্টির জগৎ থেকে টিকেটঘরের দিকেই তাঁর আকর্ষণ ক্রমে বেড়েছে। বোধ হয় তারই পরিণতি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' বাঙালীর জীবন-অভ্যস্ত উপন্যাস নয়, বাঙালী জীবনের কাহিনীও নয়। বিশেষ একটা মুড বা সাময়িক মানসিকতাকে নিয়ে এর কাহিনী। চারজন যুবক দৈনন্দিন রুটিনবাঁধা জীবন ও নিয়মের এক-ঘেয়েমী থেকে বাঁচবার জন্য ডাল্টনগঞ্জ বা সাঁওতাল পরগণার কোন অঞ্চলে চলে এল নিজেদের মোটর হাঁকিয়ে। পূর্বে অনুমতি না নিয়ে দারোয়ানকে ঘুষ নিতে বাধ্য করে তারা ফরেস্ট ডাকবাংলো দখল করল। দারোয়ানের চাকরি যাবার ভয় থাকলেও পীড়াপীড়িতে এবং নিজের অসময়ের প্রয়োজনে টাকাটা নিল। এই চারজন শহুরে যুবক দারোয়ানের নীতি-বোধ ও আইনের ভয়কে পরাস্ত করার জন্য আনন্দ বোধ করল। তার পরে সন্ধ্যায় তারা গেল শুঁড়িখানায়। সেখানে প্রচুর দেশী মদ পান করল। মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করল, টুইস্ট নাচল। শুঁড়িখানায় তাদের নজরে পড়ল সাঁওতাল যুবতী ডুলিকে। সকালে পরিচয় হল স্থানীয় ধর্মযাজক ত্রিপাঠী পরিবারের সঙ্গে। সেই পরিবারের বিধবা পুত্রবধূ জয়া আর কলেজে পড়া কন্যা অপর্ণা তাদের আকর্ষণ। তারপরে এই নিয়ম ভাঙার দলের হরিকে দেখা গেল ডুলির বৈধব্য ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে দশ টাকার বিনিময়ে বনের মধ্যে শৃংগাররত; একাকিত্বের সুযোগে বিধবা জয়া সঞ্জয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়—কিন্তু সঞ্জয়ের সাহসে কুলোয় না সুযোগ গ্রহণের; কিন্তু অসীম ও অপর্ণা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—তারা কলকাতায় ফিরে দেখা-সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেয়। তার-পরে এই দুই মহিলার হঠাৎ কলকাতায় যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, সুতরাং এই চার যুবক আর সেখানে থাকার যুক্তি পায় না।

নবতরঙ্গ অথবা ইয়ং যাই বলুন, ইউরোপে এ ধরনের ছবি আজকাল তরুণ পরিচালকরা করছে। ছোট গল্পের মেজাজে বিশেষ একটা মুড এসব ছবির অবলম্বন। যৌন ভাবভঙ্গী, নগ্ন

কথাচিত্রের 'কস্তুরী মৃগ' ছবিতে সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও গীতা দে

নারী, এমন কি শৃংগার দৃশ্য দিয়ে ছবির আঙ্গিক ভরাট হয়ে থাকে। বাঙালী জীবনের অভ্যস্ত চিন্তাজগৎকে তেমন করে ভাঙবার সাহস না থাকলেও শ্রীরায় ইউরোপের 'ইয়ং' রীতিতে যে উৎসাহিত হয়েছেন, এই ছবিতে তা বুঝা গেল। তাঁর ছবির প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এমন চারজন যুবক, যারা কোন রকমেই বাঙালী যুবকদের প্রতীক হতে পারে না। ওদের কোন সমস্যা নেই, একমাত্র সমস্যা নিয়মের একঘেয়েমী। ওদের মানসিকতা আরো বুঝা যাবে স্মৃতির খেলায়, যারা মার্ক্স, মাও সে-তুঙ-এর সঙ্গে অতুল্য ঘোষের নাম সমপর্যায়ে উচ্চারণ করে। ওদের মধ্যে হরি প্রেমের ক্ষেত্রে পরাজিত, এই অরণ্য পরিবেশে তাই সে মেয়ে শিকারের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। শ্রীরায় চমৎকার বিপরীত পরিবেশের সঙ্গতি দেখিয়েছেন:

সাঁওতাল মেয়েরা যখন শুঁড়িখানায় মদ খাচ্ছে, তার বিপরীতে দেখা গেল অভিজাত মেয়েরা ককটেল পার্টিতে মদ খাচ্ছে। বিধবা ডুলি টাকা পেয়ে দেহ দান করছে, অপরদিকে শিক্ষিতা জয়া নিঃসঙ্গতা ও বৈধব্যের জ্বালায় সঞ্জয়কে প্রলুব্ধ করছে ভোগের জন্য। মানসিকতায় দু'জনই এক—এই বোধ হয় পরিচালকের বক্তব্য। সত্যজিৎ রায়ের এই নায়ক-নায়িকারা সমাজ ও নৈতিকতা সম্পর্কে সাধারণ বাঙালীদের মত নয়, এরা দেহবাদী। আবার এদের নীতি-বোধের অসারতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, চুরির মিথ্যা সন্দেহে হরি অপমান করে তাড়িয়ে দেয় লখাকে, অথচ হরি একটি সাঁওতাল মেয়েকে চুরি করে ভোগ করে। লখা হরিকে শাস্তি দেয় মাথায় আঘাত করে। এরকম যে সব যুবকের মানসিকতা, তাদের কিছু

শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে অপর্ণাকে দিয়ে। অপর্ণা বার বার বলছে, জোর করে ডাকবাংলো নেওয়া ঠিক হয় নি। দারোয়ানের স্ত্রী যে মরণাপন্ন, তার খোঁজ না নিয়ে কেবল নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখা ঠিক হয় নি। এসব কথা বললে কি হবে! এই অপর্ণাই ফরেস্ট রেঞ্জারকে মিথ্যা কথা বলে ওদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাই বলছিলাম, সত্যজিৎ রায়ের এবারের নায়ক-নায়িকাদের চিন্তা ও নীতিবোধ স্বতন্ত্র, ওরা জীবন-বিচ্ছিন্ন। ইউরোপের ক্ষয়বাদী তথা-কথিত 'ইয়ং' মানসিকতা এ ছবির আশ্রয়—যে মানসিকতায় মানুষের প্রতি বিশ্বাস, ভালবাসা ও আশাবাদের উত্তাপ নেই, আছে কেবল রিপুর তাড়না, মানুষকে টেনে নামাবার ছলা-কলা। এই 'ইয়ং' রীতির ছবির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ যৌন রসের যোগান থাকা দরকার—ইউরোপের তুলনায় সম্ভব না হলেও যৌনরসের মেজাজ সৃষ্টিতে সত্যজিৎবাবু কৃতিত্বই দেখিয়েছেন।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' নাম শুনে আশা জেগেছিল হয়ত বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ছবিটি মনোরঞ্জন করবে। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে মুখ্য বিষয় নয়, প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষগুলির প্রতিও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ পায় নি। তবে সত্যজিৎবাবু পাকা পরিচালক, তাঁর পরিচালনাগুণে হাল্কা মেজাজে পরিহাসের পরিবেশে টুকরো টুকরো হাসির কথায় ছবিটি স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করেছে। যেমন 'ইয়ং' ছবি-গুলি হয়ে থাকে।

ছবিটির অভিনয়, সঙ্গীত ও দৃশ্য পরিকল্পনা ইত্যাদি সব দিক থেকে সার্থক। সম্পাদনায় এবারও দুলাল দত্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আবহ-সঙ্গীত ছবির মেজাজ প্রকাশের সহায়ক হয়েছে এবং নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে।

অভিনয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, শর্মিলা ঠাকুর এবং সিমি যথাযথভাবে চরিত্রগুলি উপস্থিত করেছেন। এঁদের মধ্যে কাবেরী বসুর সার্থকতা একটু বেশী করে বলা যায়। অভিনয়ে আরো আছেন পাহাড়ী সান্যাল, অপর্ণা সেন, প্রেমাশীষ সেন, সমর নাগ, ননী গাঙ্গুলী প্রমুখ আর বাচ্চা দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি কিশোর-কিশোরীরাও অভিভাবকদের সঙ্গে দেখতে যায়, কিন্তু এ ছবিতে দর্শকদের মন্তব্য আর ছবির আঙ্গিকে অনেক অভিভাবক অপ্রস্তুত বোধ করছেন। ছবির প্রথম দিন সান্ধ্য প্রদর্শনীতে সত্যজিৎবাবু নিজেই শুনেছেন দর্শকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তাই বলছি, সত্যজিৎবাবু বাঙালীর জীবনের ছবি করুন।
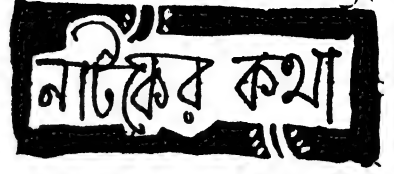
## বরাহনগরে নাট্যোৎসব

রবীন্দ্রনাথ ও সেক্সপীয়র—বিশ্ব-সাহিত্যের দুই বন্দিত নাট্যকারের দুটি বিখ্যাত নাটক অভিনীত হল বরাহনগর রবীন্দ্র ভবনে। অভিনয় করলেন বরাহ-নগর পৌর প্রতিষ্ঠানের কমিশনার, কর্মী ও রবীন্দ্র ভবন কমিটির সদস্যরা।

৯ জানুয়ারী অভিনীত হল রবীন্দ্র-নাথের 'শেষরক্ষা'। দলগত অভিনয়ে নাটকটি সার্থক। পরিচালক তমাল লাহিড়ী দক্ষতার সঙ্গে নাট্য পরিচালনা করে একটি সুন্দর প্রযোজনার দৃষ্টান্ত রাখেন। তমাল লাহিড়ীর 'গদাই' সার্থক-সুন্দর, তবে তিনি কিছুটা সংযত হলে অভিনয় আরো সুন্দর হত। 'ইন্দুমতী'র চটুল-সুন্দর চরিত্র চিত্রণে নীলিমা চক্রবর্তী মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিমল রায়ের 'বিনোদ' ও শিবশঙ্কর ঘোষালের 'চন্দ্রকান্ত' বিশিষ্টতা দাবী করে। এ ছাড়া কল্যাণী মুখার্জী, হিরণ মৈত্র, গোপাল

মস্কো মিউজিক্যাল চিলড্রেনস্ থিয়েটারে 'উলফ্ এণ্ড সেভেন কিডস্' নাটকের একটি দৃশ্যে। অভিনেতা ওলেগ চাপ্রিকভ এই দৃশ্যে জন্তুকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

**এইচ, এম, ভি'র সম্বর্ধনার উত্তরে জনপ্রিয় শিল্পী মান্না দে গ্রামোফোন কোম্পানীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন।**

দা, দ্বিজেন মান্না, শিশু ভট্টাচার্য প্রমুখ অভিনয়ে দক্ষতা দেখান।

'ওথেলো' (বাংলা নাট্যরূপ সুনীল চ্যাটার্জী) অভিনীত হল ১০ জানুয়ারী। অভিনয়গুণে নাটকটি দর্শকমনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছে। নাম-ভূমিকায় চন্দ্র রায় এক কথায় অপূর্ব। তিনি 'ওথেলো' চরিত্রে অসামান্য দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। 'ওথেলো' চরিত্রের দ্বন্দ্ব তাঁর অভিনয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি চরিত্রটিকে যথাযথ বুঝতে পেরেছেন এবং দর্শকরা তাঁর অভিনয়দক্ষতায় মুগ্ধ। 'ইয়াগো'বেশী কিরণ মৈত্র কুটিলতা প্রকাশে একটু সংযত হলে অনন্য হয়ে উঠতেন। বিমল রায়ের 'কেসিও' ও যূথিকা ভট্টাচার্যের 'ডেসডিমোনা' অভিনয়-দক্ষতায় উজ্জ্বল। 'রোডারিগো'র চরিত্রে শিবশঙ্কর ঘোষাল সুন্দর। এ ছাড়া গৌর ব্যানার্জী, গৌর মুখার্জী, জলদবরণ পাল, গোপাল দা, প্রমথ দেবনাথ, শিশু ভট্টাচার্য প্রমুখ অভিনয়ে অংশ নেন।

নাট্য পরিচালনার কৃতিত্ব কিরণ মৈত্রের।

## আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাব

সম্প্রতি আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় স্টার থিয়েটারে। সভাপতির ভাষণে শ্রী পি, ভি, কৃষ্ণমূর্তি বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার সংগে তাঁর হৃদ্যতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি কলকাতার আকাশবাণীর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রশংসা করেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাঁর ভাষণে বলেন যে, যাঁরা শত শত মানুষের আনন্দ বিধানে কর্মব্যস্ত, রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাধ্যমে তাঁরা যখন মঞ্চে উপস্থিত হন নিজেদের প্রতিভা নিয়ে, তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যমণ্ডিত। কলকাতার আকাশবাণীর ছোট-বড় প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি যেরূপ সহজ-সরলভাবে মিশে একটা নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একথাও শ্রীভদ্র বলেন। রবীন্দ্রসংগীতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন শ্রীস্বপন গুপ্ত। ক্লাবের সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন শ্রীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর অভিনীত হয় ক্লাবের সদস্যগণ কর্তৃক 'নীল-দর্পণ'। ঐ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকাটিতে কয়েকটি মূল্যবান লেখাও উল্লেখযোগ্য।

## বঙ্গে বর্গী

সম্প্রতি ওয়ালফোর্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের পঞ্চবার্ষিক মিলন উৎসব উপলক্ষে স্টার থিয়েটারে নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বঙ্গে বর্গী' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। শচীন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় নাটকটি উপস্থিত সকলকে যথেষ্ট আনন্দ দিতে সমর্থ হয়। চোখে লাগার মতো অভিনয় করেছিলেন সিরাজের ভূমিকায় কালীপদ দত্ত, মোহনলালের ভূমিকায় সলিল মুখার্জী, ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় নবনী রায় ও মীর-জাফরের ভূমিকায় কমল মুখার্জী। স্ত্রী-চরিত্রে সাধনা পাল, রুবি মিত্র, মীরা বসু ও জ্যোৎস্না মণ্ডলের অভিনয় ভাল। এ

ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন অসীম মিত্র, শ্যামল দে, সলিল ঘোষ, অরুণ ঘোষ, অমূল্য দাশ, অরুণ চ্যাটার্জী, অবনী রায়, মণীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ সরকার, দিলীপ বিশ্বাস, কেশব সরকার ও পংকজ ব্যানার্জী।

### নীচের পৃথিবী

অগ্রদূত নাট্য সংস্থার 'নীচের পৃথিবী'র পুনরভিনয় হচ্ছে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে। কলকাতার এক অখ্যাত বস্তিজীবনকে ভিত্তি করে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর আঙ্গিকে নাট্যরচনা করেছেন সুনীল ভঞ্জ। নাট্য পরিচালনা করছেন জ্ঞান মুখোপাধ্যায়।

### হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি বীরভূম জেলার হাটতলা পূজা কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে এককভাবে হর-বোলার ডাক পরিবেশন করেন। কণ্ঠে বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের অনুকরণ বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। সরলা মেমোরিয়াল হলে 'চিলড্রেন্স হার্ট' নাটকে নেপথ্যে শব্দ সংযোজনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। অর্ডনান্স ক্লাবের অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করে শ্রোতাদের আনন্দদান করেন।

### তরুণ অপেরার 'লেনিন'

লোয়ার আসাম ও ডুয়ার্স অঞ্চলে 'লেনিন' অভিনয় করে তরুণ অপেরা কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেছে। নাটকটি উত্তরবঙ্গে এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, একই দিনে দুই বা তিনটি অভিনয় করতে হয়েছে। প্রমোদকরমুক্তির পর দর্শকদের মধ্যে চাহিদা দারুণ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 'লেনিন'-এর পুনরভিনয় শুরু হবে ২০শে মাঘ করিমপুর থেকে।

### চৈতালী

আর, ডি, বনশলের সাম্প্রতিক ছবি 'চৈতালী' চিত্র গ্রহণের শেষ পর্যায়ে

উপস্থিত হয়েছে। বিশ্বজিৎ আর তনুজাকে প্রধান ভূমিকায় নিয়ে বসন্ত চৌধুরী, মনোমোহন (বোম্বাই), জহর রায়, তরুণকুমার, শৈলেন মুখার্জীর সহভূমিকায় ছবিটির কাহিনী গঠিত। পরিচালনা করেছেন সুধীর মুখার্জী।

চৈতালীর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শচীন দেববর্মণ। শিলং, দার্জিলিং, কালিম্পং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিতে আবহসংগীত রচনা করা হয়েছে। সত্যনারায়ণ এই ছবির জন্য নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন।

### ঘরে বাইরে

চৈতালীর কাজ শেষ হলে আর, ডি, বনশাল রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং এ, কে, চ্যাটার্জীর 'নাচনহাটির জন সাহেব' কাহিনীকে চিত্ররূপ দেবেন। এ দু'টি ছবি পরিচালনার দায়িত্ব কাকে দেবেন তা শীঘ্র ঘোষণা করা হবে।

### মৌসুমী মন

চৌধুরী প্রোডাকসন্সের 'মৌসুমী মন' ছবির কাজ সমাপ্তির পথে। ছবিটি পরিচালনা করছেন সমর চৌধুরী। ছবিতে নেপথ্য সংগীতে অংশগ্রহণ করেছেন মান্না দে, সুবীর সেন, কৃষ্ণা রায়, চন্দ্রাণী মুখোর্জী, অনিল দত্ত। অভিনয়ে রয়েছেন— সর্বেন্দ্র, মিতা, অজিতেশ, শিবানী, জহর রায়, গীতা দে, মণি শ্রীমানী এবং বোম্বাই-এর লক্ষ্মীছায়া।

### ভারত সরকারের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী সম্মানিত

সম্প্রতি খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৬৮ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। এই উপলক্ষে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আয়োজিত এক ভোজসভায় গ্রামোফোন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভাস্কর মেনন মান্না দে'কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ঐ সভায় ১৯৬৯ সালে পূজার রেকর্ডের সেরা শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, লতা মঙ্গেশকর, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং আশা ভোঁসলেকেও সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সভায় বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে ইংলণ্ড হতে আগত ই-এম-আই ফরেন সার্ভিসেস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি, এন, ব্রোডিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষে মান্না দে'কে একটি সোনার সরস্বতী মূর্তি উপহার দেন। তা ছাড়া তিনি পূজার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রত্যেককে রূপার তৈরি রেকর্ড উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন।

## সংবাদ কণা

### সোভিয়েত চিলড্রেন্স থিয়েটার

নভেম্বর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন দুর্ভিক্ষে ও গৃহযুদ্ধে দুর্বিষহ অবস্থা, তার মধ্যেও চিলড্রেন্স থিয়েটার গঠিত হয় পেট্রোগ্রাডে (লেনিনগ্রাড)। তার পরে আরো চিলড্রেন্স থিয়েটার গঠিত হয়। বর্তমানে সোভিয়েতে চিলড্রেন্স থিয়েটারের সংখ্যা ৪৫টি, পাপেট থিয়েটার ১০০। এই চিলড্রেন্স থিয়েটারগুলিতে সোভিয়েতের ২৭টি ভাষায় নাটক অভিনীত হয়।

### চলচ্চিত্র নির্মাণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুক্ত উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও কৃৎকৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েত চলচ্চিত্র কমিটি সম্প্রতি "সোভিনফিল্‌ম্‌" নামে একটি নতুন চলচ্চিত্র সংস্থা গঠন করেছেন।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন সোভিয়েত ফিল্ম স্টুডিও ও বিদেশী ফিল্ম সংস্থার মধ্যে পৃথকভাবে যেসব চুক্তি হত, এখন থেকে এই নবগঠিত কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে তা আরও সুষ্ঠুভাবে হবে বলে "সোভিনফিল্‌ম্‌" বোর্ডের সভাপতি সের্গেই কুজনেৎসভ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন।

কিছুকাল আগে থেকেই এ সহযোগিতার সূত্রপাত হয় ও বিশিষ্ট সোভিয়েত পরিচালক সের্গেই ইউতকেভিচ পোল্যান্ডের চলচ্চিত্রকুশলীদের সহযোগিতায় তাঁর প্রশংসনীয় "লেনিন ইন পোল্যান্ড" ছবিটি তোলেন। সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতায় তোলা হয় "এ জার্নি বিয়ন্ড থ্রি সিস", সোভিয়েত-পোলিশ সহযোগিতায় "জোসিয়া", সোভিয়েত-ইতালীর সহযোগিতায় "দে ওয়্যার গোয়িং টু দি ইস্ট", সোভিয়েত-জি, ডি, আর সহযোগিতায় "আই ওয়াজ নাইনটিন", সোভিয়েত-ফরাসী সহযোগিতায় "থার্ড ইউথ" প্রভৃতি ছবি।

এখন নির্মীয়মাণ যুক্ত উদ্যোগের ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিবেদিত সোভিয়েত-জি, ডি, আর-এর ছবি "এ স্লিপ টু এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড", সোভিয়েত-হাঙ্গেরীর ছবি "গেট হোল্ড অব দি ক্লাউডস" ও সোভিয়েত-সুইডিশ ছবি "ম্যান ফ্রম দি আদার সাইড"।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে সোভিয়েত-বুলগেরীয় ছবি "স্টোলেন ট্রেন", জি, ডি, আর-এর "প্রফেসর ম্যামলক" ছবির খ্যাতনামা পরিচালক কনরাড ওলফ ও লেনফিল্ম স্টুডিও-র যুক্ত উদ্যোগে ফয়েখট ভানগারের বিখ্যাত উপন্যাস "গোয়া"র চিত্ররূপ নির্মাণের প্রস্তুতি চলেছে।

ভারতের আরণ্যক জীবন নিয়ে এক চিত্তাকর্ষক তথ্যমূলক ছবি তুলছেন বিশিষ্ট সোভিয়েত পরিচালক আলেকজান্দর জগুর্দি, খাজা আহমদ আব্বাস রচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে তোলা ছবির নাম হবে "দি ব্ল্যাক মাউনটেন"।

ইতালীর এক স্টুডিওর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত পরিচালক সের্গেই বন্দেরচুক তুলেছেন "ওয়াটারলু" ছবি। বিখ্যাত ইতালীর পরিচালক ভিত্তোরিও ডে-সিকা "সানফ্লাওয়ার" ছবির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে দৃশ্য গ্রহণের কাজ এবং ছবিটির কাজও শেষ করেছেন।

### লেনিন একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ লেনিন জন্মশতবার্ষিকী যুব উৎসব উপলক্ষে একাংক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হবে। সারা পশ্চিম বাংলার যে-কোন অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেনিনের জীবনের যে-কোন অংশ, অক্টোবর বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই প্রভৃতি সম্পর্কে রচিত নাটক অগ্রগণ্য। আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। নিয়মাবলী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি, ১০৭, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৪—এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

# আত্মহনন

ভারতীয় ফুটবল জগতে একটা অদ্ভুত সময় এসেছে। এই অভাবনীয় পাল্লাস্বাতকে শুধু একটা কথাতেই প্রকাশ করা যায়—আত্মহননের প্রচেষ্টা। কলকাতা তথা বাংলা দেশ ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান। ক্রিকেটে যেমন বম্বে, ফুটবলে তেমনি বাংলা আজো সবার সেরা। কিন্তু বাংলার এই প্রাধান্য আজ যেন সকলে সহজে মেনে নিতে পারছেন না। তাই চেষ্টার পর চেষ্টা চলেছে বাংলাকে কোণঠাসা করার। কিন্তু সেটা যে কতো ভুল, কতো অবাস্তব এবং কতো অসম্ভব তার প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া গেছে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের খেলার ধারা আর খেলার ফলাফল দেখে। তবু শিক্ষা হলো না তাঁদের, যাঁদের সবার আগে নিজেদের দুর্বল এবং অসহায় অবস্থার কথা বোঝার দরকার ছিল। তাঁরা তাই মনে মনে বড় বেশী আশা করে বসেছিলেন যে, এ বছর রোভার্স আর ডুরাণ্ড কাপ কলকাতায় নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। ওঁদের ধারণা—আই· এফ· এ শীল্ড যেন কারচুপি করে কলকাতায় রাখা হয়! তাই বদলা নেওয়া হবে রোভার্স আর ডুরাণ্ড কাপের খেলায়। কিন্তু বড় তাড়াতাড়িই তাঁদের সেই স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। দেখা গেলো সব বাধা অতিক্রম করে কলকাতারই দু'টি দল রোভার্স কাপের ফাইন্যালে উঠে বসেছে। অর্থাৎ রোভার্স কাপ রোখা গেল না। এবারও রোভার্স কাপ গেল কলকাতায়। তাই রোভার্সের পর ডুরাণ্ড এলো বাংলা দেশের দলগুলোর কাছে অনেকটা চ্যালেঞ্জের মতো। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের ঠিক জবাব এবার যেন দেওয়া গেলো না। ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলো, আর মোহনবাগান আহত খেলোয়াড়দের সংখ্যাধিক্য ও কর্তৃপক্ষ খেলার দিন পরিবর্তন করতে সম্মত না হওয়ায় প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলো। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের খেলোয়াড়দের মারমুখী আচরণের জন্যে এবং অযথা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে খেলার জন্যে মোহনবাগানের নামকরা খেলোয়াড়দের অনেকেই আহত হয়েছিলেন। তবু আমরা বলবো যে, অতিরিক্ত খেলোয়াড় দিয়েও একটা দল মোহনবাগানের মাঠে নামানো উচিত ছিল। (খবরে প্রকাশ যে, আহত খেলোয়াড়দের বাদ দিয়েও মোহনবাগান দল গঠন করতে পারতো।) দুর্বল দল নিয়ে মোহনবাগান যদি বি. এস. এফের কাছে হারতো, তা হলে কারো কিছু বলার থাকতো না। অন্তত প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে অন্যদের যে সব কথা বলার সুযোগ দিয়েছে মোহনবাগান, তাঁরা অন্তত সে সব কথা বলতে পারতেন না। যাই হোক, ভারতীয় ফুটবল জগতে বাংলাকে কোণঠাসা করতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের দেশে বাতুলের সংখ্যা অনেক বেশী বলেই ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ ভেবে বড় ভয় হয়। —শান্তিপ্রিয়॥

## ফুটবল-ফুটবল

গুর্খা ব্রিগেড এবারও ডুরাণ্ড কাপ লাভ করলো। প্রথম দিন অমীমাংসিত থাকার পর ডুরাণ্ড ফাইন্যালের দ্বিতীয় দিনে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এক গোলে হেরে গেলো গুর্খা ব্রিগেডের কাছে। যোগ্য দল হিসেবে গুর্খা ব্রিগেড ডুরাণ্ড কাপ লাভ করেছে। তবে সেমিফাইন্যাল খেলায় মোহনবাগানের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াটাই বোধ হয় এবারের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সব চেয়ে বড় ঘটনা।

ইস্টবেঙ্গল হেরেছিল পাঞ্জাব পুলিশের কাছে। আবার পাঞ্জাব পুলিশকে হারিয়ে গুর্খা ব্রিগেড উঠলো ফাইন্যালে। ওদিকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জন্যে মোহনবাগানের খেলা দু' দিনেও কোন মীমাংসা হলো না। রোভার্স কাপ খেলার সময় থেকেই মোহনবাগান দলে আহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তার উপর বি. এস. এফ-এর খেলোয়াড়দের দৈহিক শক্তিপ্রকাশ করে খেলার জন্যে মোহনবাগান শিবিরে আহতের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়।

দলে আহত খেলোয়াড়ের সংখ্যাধিক্য এবং পর পর তিন্দিন খেলার চাপ সহ্য করা সম্ভব নয় দেখে মোহনবাগান খেলার দিন পিছোবার জন্যে আবেদন জানায়—কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হলো না, কারণ ডুরাণ্ড ফাইন্যালের সমস্ত আয়োজন তখন সম্পূর্ণ। তাই শেষ মুহূর্তে মোহনবাগান প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলো।

এর চেয়ে কোন রকমে একটা দল গঠন করে মোহনবাগান যদি মাঠে নামতো বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে খেলতে, তা হলে অনেক ভালো হতো। সে খেলায় মোহনবাগান হয়তো হারতো, কিন্তু সে পরাজয়ে পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যেতো না—সে পরাজয় হতো গৌরবের, খেলে এবং হেরে সকলকে দেখিয়ে দেওয়া যেতো ফুটবলের উন্নত কলা-কৌশল এবং অযথা দৈহিক শক্তি প্রকাশ করে খেলার মধ্যের মূল পার্থক্যটা আসলে কোথায়।

আমরা এ বিষয় নিয়ে কিছু লিখতাম না। কিন্তু আজ আর না লিখেও উপায় নেই। কারণ, মোহনবাগানের এই নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া নিয়ে বাংলার বাইরের কয়েকটি নামী কাগজে বেশ বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। আজ যখন ভারতীয় ফুটবলে বাংলাকে কোণ-ঠাসা করার চেষ্টা চলছে, ঠিক তখনই এই ধরনের বিরূপ সমালোচনার ঢেউ আমাদের পক্ষেও সহ্য করা সহজ এবং সঙ্গত নয়। তাই আমরা আই. এফ. এ. আর বাংলা-দেশের দলগুলোকে আহ্বান জানাই এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যে। ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান বাংলাদেশের সুনাম, সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং প্রাধান্য বজায় রাখার দায়িত্ব এখন বাংলাদেশের দলগুলোরই। আমরা আশা করবো যে, বাংলাদেশের দলগুলো ফুটবল মাঠে এই চ্যালেঞ্জের ঠিক ঠিক জবাব দিতে সমর্থ হবেন...।

### গল্প হলেও সত্যি

১৯৩৮ সাল। ব্র্যাডম্যান তাঁর দল নিয়ে এসেছেন ইংল্যাণ্ডে। এর আগের দু'টি টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে এ্যাসেজ রেখেছিল তাদের দখলে। ১৯৩৮ সালের টেস্ট সিরিজের ১ম ও ২য় টেস্ট শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। তৃতীয় টেস্ট বৃষ্টির জন্য একেবারে শিকেয় লটকেছিল।

চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিয়েছে পাঁচ উইকেটে। সুতরাং পরাজয় এড়াতে হলে ইংল্যাণ্ডকে পঞ্চম টেস্টে জয়ী হতেই হবে। এই পঞ্চম টেস্টের জন্য ইংল্যাণ্ডের যে এগারজন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, তার মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন ইয়র্কসায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট ক্লাবের। এর আগে কোন দিন ইংলণ্ডে কোন একটি কাউণ্টি দল থেকে এত বেশী খেলোয়াড় নেওয়া হয় নি।

এই পাঁচজন হলেন এল হাটন, এম লেল্যাণ্ড, এ উড, এইচ বেরিটি, ডবলিউ ই বাউজ। দলের সাত উইঃ ৯০৩ রাণের (অতিরিক্ত ৫০) মধ্যে ইয়র্কসায়ারের চারজনই করেন মোট ৬১২ রাণ। (হাটন ৩৬৪, লেল্যাণ্ড ১৮৭, উড ৫৩, ভেরিটি ৮ নট আউট) বাউজ ব্যাট করেন নি।

আর অস্ট্রেলিয়া দলের দু' ইনিংসের মোট ১৬টি উইকেটের মধ্যে ইয়র্কসায়ারের খেলোয়াড়েরাই ১০টি উইকেট পান। —পরিতোষ নাগ

বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি

জনতার উল্লাসের মধ্যে বিজয়ী গুর্খা ব্রিগেডের খেলোয়াড়েরা ডুরাণ্ড কাপটি হাতে নিয়ে মাঠ পরিক্রমায় চলেছেন। মুখে তাঁদের সাফল্যের হাসি।

কটকে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতি-যোগিতার জিমন্যাস্টিকের বালিকা বিভাগে বিজয়িনী বাংলার অসীমা গল।

মাত্র কয়েকদিন আগে কটকে শেষ হয়ে গেল চতুর্বিংশতিতম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর। এবারের এই প্রতিযোগিতায় ভারতের অনেক নামী প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন নি। ফলে প্রত্যাশিত উন্নত মানের আশা অনেকটা অপূর্ণই থেকে গেল।

পাঁচ দিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানে মাত্র ১৮টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে আবার পনেরোটাই গড়েছে ছোটরা বাকী মাত্র তিনটি রেকর্ড হয়েছে বড়দের বিভাগে। তাই এ্যাথলেটিকের মান সম্বন্ধে আজ অনেকের মনেই আবার সন্দেহ জেগেছে। এমনিতেই আমরা এ বিষয়ে আছি যথেষ্ট পিছিয়ে, এর ওপর যদি আমরা আরো পিছিয়ে পড়ি তা হলে আর দেখতে হবে না।

যাই হোক, এবারের ক্রীড়ানুষ্ঠানে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয় রেকর্ডটি করেছেন পাঞ্জাবের কিষেণ সিং। পঞ্চাশ কিলোমিটার ভ্রমণে তিনি রেখেছেন অভাবনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ৪৬·৪ সেকেণ্ডে তিনি পার হয়েছেন ঐ দূরত্ব। আগের জাতীয় রেকর্ডটিকে তিনি ৬ মিনিট ৪৩ সেকেণ্ড উন্নত করেছেন।

মহীশূরের মেয়েরা ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড়ের হিটে সময় নিয়েছিলেন ৪৯·৩ সেকেণ্ড অর্থাৎ জাতীয় রেকর্ডকে তাঁরা ১ সেকেণ্ড কমিয়ে এনেছেন। কিন্তু ফাইন্যালে তাঁরা সে মান বজায় রাখতে পারেন নি।

সিনিয়ার বিভাগের বাকী রেকর্ডটি করেছেন সার্ভিসেসের যোগিন্দার সিং। সটপুটে তিনি জাতীয় রেকর্ডকে ·০৬ মিটার উন্নত করতে সমর্থ হয়েছেন।

মহীশূরের পি ভাম্মোদকর মহিলাদের মধ্যে সেরা এ্যাথলিটের সম্মান অর্জন করেছেন। চারশো ও আটশো মিটার দৌড়ে ভাম্মোদকর লাভ করেছেন স্বর্ণ-পদক।

জুনিয়ার বিভাগে এবার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে উড়িষ্যা। বালক ও বালিকা দুটি বিভাগেই এবার তারা লাভ করেছে অনেকগুলি করে স্বর্ণপদক।

বাংলার প্রতিযোগীরা যথারীতি ব্যর্থতার পরিচয়ই দিয়েছেন। কয়েকটি স্বর্ণপদক অবশ্য বাংলার ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে বাংলা যে কতো পিছিয়ে, তা আর একবার বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করা গেল কটকের চতুর্বিংশতিতম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে।

এবারের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক বিজয়ী বাংলার তিন প্রতিনিধি। বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছেন সত্যশ্রী ব্যানার্জী (পোল ভল্ট), মধ্যখানে সুব্রতা পাল (লৌহবল নিক্ষেপ) ও ডান দিকে আর শেঠ (২০০ মিটার দৌড়)।

ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। ফুটবলে বরাবরই বাংলার অগ্রণী ভূমিকা। ক্রিকেটে যেমন বোম্বাই-এর শ্রেষ্ঠত্ব, হকিতে যেমন পাঞ্জাবের প্রাধান্য, ফুটবলে তেমনি বাংলাই সেরা।

কিন্তু কিছুকাল ধরেই বাংলাকে হেয় করার এক গভীর চক্রান্ত চলছে। আর তাই কিছুদিন আগে মারডেকাগামী ভারতীয় দলে বাংলার যোগ্য খেলোয়াড়দের দাবি অগ্রাহ্য করে নির্লজ্জভাবে বাংলার বাইরের প্রাধান্য বজায় রাখা হয়েছিল।

ফলাফলও হাতেনাতেই পাওয়া গিয়েছিল। কোচ জার্নাল সিং, অধিনায়ক ইন্দর সিং এবং বহু অযোগ্য খেলোয়াড় সমন্বিত এবং শোভিত ভারতীয় দলটি মারডেকায় সর্বনিম্ন স্থান দখল করেছিল।

ইতিমধ্যে বাংলা সন্তোষ ট্রফি জিতে এনেছে নামী ও দামী খেলোয়াড় ছাড়াই। রোভার্সও বাংলার ঘরেই এসেছে। শুধু তাই নয়, ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলই বাংলার।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত থামে নি। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এক নামী ক্রীড়া-সাপ্তাহিকে একটি ভারতীয় দল গড়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাতে সর্বতোভাবে ওদিককার প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্বাচিত সেই দলে ষোলজনের মধ্যে বাংলার চারজনের ঠাঁই মিলেছে। এঁরা হলেন প্রসাদ, সুধীর কর্মকার, প্রশান্ত সিনহা ও হাবিব। বলতে বাধা নেই, এই দল নির্বাচন আমাদের মনঃপূত হয় নি। কারণ আমরা একথা বিশ্বাস করি না যে, ভারতীয় ফুটবল দলে বাংলা থেকে এর চেয়ে বেশি চান্স পাবার কেউ নেই।

গোলরক্ষক হিসেবে বলাই দে বর্তমানে নিঃসন্দেহে সেরা। শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, ওরা বলাই দেকে বিশেষভাবে হেয় করতে চেয়েছে। এ ছাড়া ভবানী রায়, শান্ত মিত্র, নঈম, অশোক চ্যাটার্জী এবং কাজল মুখার্জীকে বাদ দেওয়া চলে না।

ওরা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চেয়ে মফৎলাল ও ভাস্কো ক্লাবকে, বিশেষত মফৎলালকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে। মফৎলালের প্রশংসায় ওরা পঞ্চমুখ। এই পত্রিকা মফৎলালের ডেরেক ডিসুজা, রণজিৎ থাপা, অমরবাহাদুর, ভূপিন্দার সিং, টিকারাম, ফার্ণাণ্ডেজ, জয়রাজন, নাইডু, অর্থাৎ গোটা দলের প্রায় সবার সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখলেও ভুলেও কিন্তু বাবলু বিশ্বাস কিংবা শঙ্কর মুখার্জী সম্বন্ধে কিছু লেখে নি। অথচ এরা দুজনেই মফৎলালের নিয়মিত নির্ভরশীল খেলোয়াড়। কাজেই এতে যদি বাংলা ও বাঙালীকে হেয় করার চক্রান্ত দেখতে পাই, সেটা কি একেবারেই মিথ্যে?

ওরা সম্ভবত ভেবেছিল লীডার্স'র কাছে ইস্টবেঙ্গল হারবে আর ভাস্কোর কাছে মোহনবাগান। আর মফৎলাল যে 'রোভার্স' জিতবেই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিলো না ওদের মনে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল অন্যরকম হওয়ায় ওরা আর রাগ চেপে রাখতে পারে নি। ওদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

রেফারী ও লাইন্সম্যানের বিরূপ সমালোচনা করে ওরা কয়েকটি খেলার নজীর টেনে আনলেও কলকাতার কোন টিমের সপক্ষে কিছু বলে নি। অথচ যতদূর জানি, দস্তুরমতো রেফারীর বিতর্কিত সিদ্ধান্তেই বি এন আরকে পর পর দুদিন নিশ্চিত জয় হাতছাড়া করতে হয়েছিল। কিন্তু এসব করে ফুটবলে বাংলার প্রাধান্য খর্ব করা যাবে না। আর আমরাও ওদের মতো অতো ছোট হতে পারব না। ভালো দলকে ভালো বলতে আমাদের এতটুকু দেরি হবে না। আমরা সব সময়েই মফৎলাল কিংবা ভাস্কো ক্লাবের প্রশংসা করে থাকি।

[শেষাংশ ১১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

—পবিত্র সমাদ্দার

ঘটনা তিনটির হেড লাইন হওয়া উচিত:—"মেডেন ওভারের রাজা তিন বোলার।" কেন না:—

* ১৯৪৯ সালে গ্লস্টার্সশায়ার ও সামারসেট দলের মধ্যে একটি কাউণ্টি খেলায় পরবর্তী দলের একজন খেলোয়াড় এক ইনিংসে বোলিং করার সময় পর পর ১৮টি মেডেন-ওভার লাভ করেন। সেই খেলোয়াড়টির নাম—এইচ, র‍্যাচেল।

*

* ১৯৫৬-৫৭ সালে ডারবান মাঠে ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার একটি টেস্ট খেলার আসর বসে এবং টেফিল্ড নামে দঃ আফ্রিকার একজন বোলারের দেওয়া পর পর ১৩৭টা বল থেকে কোন ইংরেজ ব্যাটস্‌ম্যানই রাণ করতে পারেন নি।

*

* এবারে বাপু নাদকার্ণী। মাদ্রাজের কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সম্প্রটিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নাদকার্ণী ক্রমান্বয়ে একুশ ওভার মেডেন লাভ করেন, অর্থাৎ পর পর তাঁর ১২৬টা বল ছিল রাণহীন, ঘটনাটা ১৯৬৩-৬৪ সালের।
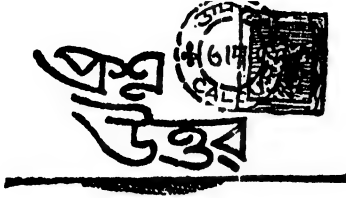
**সঞ্জীবকিশোর রায়** (মালকী, শিলং—১)

**উত্তর :** কোন খেলায় যদি একটি দল এক গোলে এগিয়ে থাকে এবং তার পর মাঠে দর্শকদের উচ্ছৃংখল আচরণের জন্যে যদি খেলা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে খেলাটির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ট্যুরনামেন্ট কমিটি। খেলা বন্ধ রেখে ঘটনা সম্বন্ধে রিপোর্ট করা ছাড়া রেফারীর আর বিশেষ কিছু করার নেই।

**খোকন মল্লিক** (কলকাতা)

**প্রশ্ন :** ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে যাঁরা টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন তাঁদের নাম জানতে চাই।

**উত্তর :** অতো জায়গা পাওয়া মুশকিল। আপনি যদি বিশেষ কোন দলের বিরুদ্ধে ভারতের ক'জন ব্যাটসম্যান শতরান করেছেন জানতে চান—তাহলে জানাবেন—জানিয়ে দেবো।

**শক্তিপদ ভট্টাচার্য** (গো পী কৃ ষ্ণ গোস্বামী লেন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা)

**প্রশ্ন :** বল ব্যাটে লেগে ব্যাটসম্যানের দিকের বোলিং ক্রীজ অতিক্রম করার আগেই যদি উইকেট রক্ষক বলটা ধরে ফেলেন তাহলে কি ব্যাটসমান আউট হবে?

**উত্তর :** হবে।

**সুভাষরঞ্জন দত্ত** (ট্রাঙ্গুলার কলোনী, পাণ্ডু, গোহাটী—১২)

**প্রশ্ন :** বোলার বল করলো আর ব্যাটসম্যান শুধুমাত্র যে কোন হাত দিয়ে বলটা মারলো। এ ক্ষেত্রে কি ব্যাটসম্যান আউট হবে?

**উত্তর :** আপনার প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারছি না। ব্যাট থাকতে ব্যাটসম্যান কেন হাত দিয়ে বল মারবে? যাই হোক, খেলার সময় কোন ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যান বলে হাত দেবে না। দিলে 'হ্যাণ্ডল্‌ড্ দি বল' নিয়ম অনুসারে আউটের প্রশ্ন উঠবে।

**গৌতমকুমার দে** (দমদম বিমান বন্দর, নিউ কোয়ার্টারস, কলকাতা—৫২)

**উত্তর :** ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীতে আলোচনা করা হয় দেখেছেন নিশ্চয়ই। এল-বি-ডব্লিউ নিয়মটি ছবি দিয়ে আগে একবার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময় মতো নতুন সংযোজনটিও (এল-বি-ডব্লিউ-এর) বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

**বরুণ বাগচী** (বানারহাট বাজার)

**প্রশ্ন :** ভারতীয় দলনায়ক পাতৌদি—সারদেশাই, জয়সীমা, বোরদে প্রমুখের মত ব্যাটিং-এ ভয়ানক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, সুতরাং তাঁদের মতো পাতৌদিরও দল থেকে বাদ পড়া উচিত নয় কি?

**উত্তর :** কি জানি !

**খাস্নু, পলাশ, দীপা, ধান্তু ও বড়দি** (ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

**উত্তর :** আপনাদের প্রশ্নের আংশিক উত্তর সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যায় পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

---

[ ১৯৮৩ পৃষ্ঠার পর ]

আমরা জানি, ওরা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়। আর তাই তো কায়মনোবাক্যে চাই ও'রা আই-এফ-এ শীল্ডে খেলতে আসুন। ও'রা শীল্ডে খেলতে আসেন না। দোষ কর্তৃপক্ষের। দায়ী ওদের উন্নাসক ভাবও।

তবু কলকাতার দল যদি ওখানে গিয়ে কৃতিত্ব দেখায়, সেটা ওদের কাছে সহনীয় হয় না কেন? বাংলার জয় ওদের প্রাধান্য স্থাপনের অন্তরায় হবে বলে কি?

পরিশেষে শুধু এটুকু বলতে চাই ফুটবলের পীঠস্থান বাংলাকে তার আসন থেকে কোনরকম চক্রান্ত করে নামানো যাবে না। আর আমরা তা সহ্যও করব না।

## প্রসন্নর শত উইকেট লাভের হিসেব

(ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার সবগুলো খেলা ধরা হয় নি)

প্রসন্ন টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম উইকেট লাভ করেন ১৯৬২-৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের সংগে খেলায় পঞ্চম টেস্টে মিলবার্নকে আউট করে।

প্রসন্ন টেস্ট ক্রিকেটে ৫০টি উইকেট লাভ করেন ১৯৬৮ সালে নিউজিল্যাণ্ডের সংগে দ্বিতীয় টেস্টে ডাউলিংকে আউট করে।

প্রসন্ন টেস্ট ক্রিকেটে ৭৫টি উইকেট লাভ করেন ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের সংগে প্রথম টেস্টে হ্যাডলীকে আউট করে।

প্রসন্ন টেস্ট ক্রিকেটে ১০০টি উইকেট লাভ করেন ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার সংগে তৃতীয় টেস্টে শিহানকে আউট করে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট পর্যন্ত (১৯৬৯) প্রসন্নের বোলিং হিসাব নীচে দিলাম।

| বিপক্ষ দল | টেস্ট | বল | মেডেন | রাণ | উইকেট | ৫টি উইকেট | ১০টি উইকেট | এ্যাভারেজ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইংল্যাণ্ড | ৪ | ১০৯৫ | ৩৭ | ৪৭৫ | ১০ | — | — | ৪৭'৫০ |
| ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ | ২ | ৭৬২ | ৩৪ | ৩৪৬ | ৮ | — | — | ৪৩'২৫ |
| নিউজিল্যাণ্ড | ৭ | ২৩৭২ | ১৩০ | ৮৮৪ | ৪৪ | ৩ | — | ২০'০৯ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ৭ | ২৫৯৭ | ৯১ | ১০৬৮ | ৪১ | ৪ | — | ২৬'০৫ |
| মোট :— | ২০ | ৬৮২৬ | ২৯২ | ২৭৭৩ | ১০৩ | ৭ | — | ২৬'৯২ |

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র
শিলিগুড়ি

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী ( প্রাঃ ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
|  |

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

৭৪ বর্ষ : ৩২শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২২শে মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 5th February, 1970

# অন্তিম দশায় যুক্তফ্রণ্ট

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট এখন অন্তিম দশায় এসে পৌঁছেচে, এ-কথা অত্যুক্তি নয়। গত শুক্রবারে যুক্তফ্রন্টের পাঁচ ঘণ্টা-ব্যাপী বৈঠক হয়েছে। দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সমর্থক বহু সাধারণ মানুষ সুখবর শোনার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সে বৈঠকে বহু আলাপ-আলোচনার মধ্যে সঙ্কট অতিক্রম করার জন্য যখন বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ের দু'-একটি শব্দের হের-ফেরের জন্য সম্ভবত সমস্ত আলোচনার ভরাডুবি ঘটে এবং দায়িত্বশীল নেতারা সভাস্থল ত্যাগ করেন। ফলে, সেদিনের বৈঠকে যুক্তফ্রন্ট ভাঙে নি, কিন্তু পরবর্তী ঘটনা যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা যে ভাঙনের দিকে, তার ইংগিত দেয়। গত রবিবারের সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা চিঠিটি নতুন ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। সেই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অধিকারের প্রশ্নই শুধু তোলেন নি, তিনি উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে গোপন তথ্য প্রকাশ করার দায়ে সংবিধানগত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

বিবাদ-বিসম্বাদে রত যুক্তফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখার জন্য বেশ কিছুকাল ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত ও শ্রীমাখন পাল। তখন একদিকে যেমন ঐক্য-প্রচেষ্টা চলছিল, আর একদিকে কয়েকটি দলের নেতা নিজেদের ইচ্ছেমতো সেই ঐক্য-প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য এমন সব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, যা সাধারণ মানুষকে খুশি করতে পারে নি। কারণ যুক্তফ্রন্টের বদলে অন্যরকম ফ্রন্ট জনসাধারণের মনোমতো হবে কিনা সেই জাতীয় প্রশ্ন ছিল। তারপর উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা পত্রও অবাঞ্ছিত ছিল। এর পরের ঘটনায় সুরু হোল পত্রে পত্রে লড়াই এবং পরস্পর অধিকারের প্রশ্ন এবং শিকেয় তোলা থাকল যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক গৃহীত বত্রিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের কথা। অধিকারের প্রশ্ন যে উঠবে না, তা আমরা বলছি না। তবে যুক্তফ্রণ্ট জনসাধারণকে বত্রিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের কথা বলে ভোট ভিক্ষা করেছিল। আর মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে অধিকার সংক্রান্ত কোনো কথা না উঠলেও পরবর্তীকালে সেই প্রশ্ন যেহেতু উঠছে, তার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল যুক্তফ্রণ্টের সভায়। আমরা কল্পনা করতে পারি না, দায়িত্বশীল নেতারা এখন কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যর্থ হয়ে এবং অন্যান্য কাজ স্থগিত রেখে কিভাবে কাগজে লড়াই সুরু করে দিয়ে যুক্তফ্রন্টের গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারেন। বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে আমরা এটাই আশা করেছিলাম যে, দায়িত্বশীল নেতারা এমন কিছু করবেন না, যাতে চোদ্দটি দলের যুক্ত-ফ্রণ্ট ভেঙে পড়ে!

এতোদিন যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলি, যতো দোষ নন্দ ঘোষ—এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে তাদের চোখে শত্রুভাবাপন্ন দলগুলিকেই যুক্তফ্রণ্টে ফাটল সৃষ্টি করার দোষে দায়ী করে আসছিল। এখন দেখা যাচ্ছে দলগুলির নিজেদের স্বার্থই বড় হয়ে উঠেছে এবং জনসাধারণকে আপ্তবাক্য শুনিয়ে এখন আর ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তার অর্থ এই যে, তাঁর দল যুক্তফ্রন্টের ভাঙাগড়ার খেলায় নিরপেক্ষ থাকতে চায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যুক্তফ্রণ্টকে বিপুল ভোটে জয়ী করায় যুক্তফ্রণ্ট শাসন চালিয়ে যাক এটাই তাঁদের কাম্য। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছেন যে, রাজ্যগুলির রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে তিনি অনিচ্ছুক। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতিতে শরিকদলগুলিই এখন পরস্পর মারমুখী হয়ে উঠেছে—এর জন্য বাইরের কেউ দায়ী নন একথা বলাই বাহুল্য। যুক্তফ্রণ্ট রক্ষা পেতে পারে যদি অবিলম্বে দলবাজী ত্যাগ করে বত্রিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য মন্ত্রিসভা তৎপর হন এবং যুক্তফ্রন্টের সভায় মন্ত্রিদপ্তরের অধিকার-সংক্রান্ত প্রশ্নের ফয়সালা করা হয় ঠাণ্ডা মাথায়। আমাদের দেশে যুক্তফ্রণ্টের কথা আগে কেউ ভাবেন নি, সুতরাং পারস্পরিক অধিকারের প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নি। এখন সে প্রশ্ন উঠেছে, অতএব তার নিষ্পত্তি হোক এই কথা মনে রেখে যে, যুক্তফ্রণ্ট ছাড়া আর গত্যন্তর নেই এবং সে যুক্তফ্রণ্ট হবে প্রগতিশীল ও জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

জনকল্যাণের প্রশ্নেই কেন্দ্রে আজ কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল প্রগতিমূলক কাজের জন্য সংগ্রাম সুরু করেছেন। অন্যদিকে একই সুরে সুর মেলাচ্ছে দক্ষিণপন্থী চরম প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি। কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধীর স্থায়িত্বই একমাত্র প্রগতির পথে জয়যাত্রার সূচনা করতে পারে—এই দৃঢ় ধারণায় পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকার তাঁকে সমর্থন করে আসছে। এ-ব্যাপারে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় মতানৈক্য আছে বলে আমরা মনে করি না। বরং বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত যুক্তফ্রণ্টের বুনিয়াদ আলগা হলেই অন্যত্র বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। বস্তুত এই কারণেও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের উচিত ঐক্য রক্ষা করা।

তবু পুনরায় একথা বলতে হচ্ছে, যুক্তফ্রণ্ট এখন অন্তিম দশায় এসে পৌঁছেচে। এই পরিস্থিতিতে কেউ কেউ এখনো কোরামিন হাতে নিয়ে চিকিৎসকের মতোই অপেক্ষা করছেন। আমরা তাঁদের ধৈর্যের প্রশংসা করি। তবে যুক্তফ্রণ্টের নীতি এখন আত্মপ্রবঞ্চনার নীতি, জনসাধারণকে প্রতারণার নীতি। তা থেকে তাদের মুক্তির আশা কতটুকু তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

'যেদিন যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনাকে ভাষা দিতে পারবো না, সাধারণ মানুষের মর্মকথাকে মূর্ত করে তুলে ধরে গণদেবতারে প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অক্ষম হবো, সেদিন যেন এই লেখনী আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদায় নিই'—বলেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমুখোপাধ্যায়কে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেছেন। কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকরা শ্রীমুখোপাধ্যায়কে এ-উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানালে তিনি জবাবে ওই কথাগুলো বলেন।

পূর্ব-বাংলার ফরিদপুরে এক সাধারণ পরিবারে ১৯০৪ সালে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত খেতে হয়েছে, পড়াশুনো বিঘ্নিত হয়েছে। কিন্তু স্কুলজীবন থেকেই কাব্যচর্চা করতেন, প্রবন্ধাদি রচনায় শিক্ষকদের বিস্ময় উৎপাদন করতেন। খবরের কাগজ পড়ার নেশাও ছেলেবেলা থেকেই। পরিবারের নিদারুণ আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে বিবেকানন্দবাবুর আর কলেজে পড়া হয় নি, ম্যাট্রিক পাশ করেই কলকাতার অজানা জনসমুদ্রে অন্নের খোঁজে পাড়ি জমাতে হয়।

কিন্তু পাড়াগাঁ থেকে সদ্য-আসা এই ছোকরাকে চাকরি দেবে কে? আনন্দবাজার পত্রিকায় শিক্ষানবিশীর সুযোগ পেলেন তরুণ বিবেকানন্দ—বিনা ভাতায়। পরে প্রুফ-রীডারের পদে উন্নীত হলেন। সংবাদপত্র-জগতে এলেন ১৯২৫ সালে, যদিও তখন প্রুফ-রীডারকে সাংবাদিক বলে গণ্য করা হতো না। বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের লোক চিনতে ভুল হয় নি। সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে 'বিবেক' (এ-নামেই সত্যেন মজুমদার শ্রীমুখোপাধ্যায়কে ডাকতেন) সেদিন যে বিশেষ রচনাগুলো লিখতেন তার যথাযোগ্য মর্যাদাও সম্পাদক সত্যেন মজুমদার দিয়েছিলেন। বিশেষত বিদেশী সংবাদ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিবেকানন্দবাবু বেশি আগ্রহ নিয়ে পড়াশুনো করতেন এবং তার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা লিখতেন। তারপর থেকে তিনি আনন্দবাজারে নিয়মিত লীডার বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে সুরু করেন এবং সম্পাদনেয় মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেন।

এ-খ্যাতিই তাঁকে ১৯৩৭ সালে এনে দিলো সর্বোচ্চ পদ—সম্পাদক, পত্রিকার নাম যুগান্তর। দীর্ঘ ২৫ বছর যুগান্তরের সম্পাদক হিসেবে তিনি যে কত যুগান্তকারী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন, তার কোনো হিসেব নেই। সংবাদ বিশ্লেষণ করার অননুকরণীয় ভঙ্গী, রাজনৈতিক অনুসন্ধিৎসা—সর্বোপরি তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার কারণে দেশের ভৌগোলিক গণ্ডী ছাড়িয়ে বিবেকানন্দবাবু বিদেশেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ বিজ্ঞানভিত্তিক। তাঁর লেখার একটা নিজস্ব স্টাইল রয়েছে, বিশ্লেষণমূলক, অনুভূতিমূলক এবং ব্যান্টার বা বিদ্রূপাত্মক লেখায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর যুদ্ধ সম্পর্কিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও রচনাদি সুধী ও সরকারী মহলে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সম্পাদক হিসেবে বিবেকানন্দবাবু রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। তাঁর খ্যাতি প্রধানত এজন্য যে, তিনি অন্যায়,-অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের মুখপাত্র হয়ে নির্ভীক ক্ষুরধার লেখনী ধারণ করেছেন, বৃটিশ বা কংগ্রেস সরকারের রক্তচক্ষু তাঁকে ভীত করতে পারে নি, তাঁর কলম স্তব্ধ করতে পারে নি।

১৯৬৩ সালে বিবেকানন্দবাবু প্রধান সম্পাদক হিসেবে দৈনিক বসুমতীতে যোগ দেন। সম্প্রতিকালে ১৯৬৬ সালের পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলনের সময়ে তিনি যে একের পর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি পাঠক জনতাকে হীরে-জহরতের মত অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে সংগ্রহ করতে দেখা গিয়েছে। বস্তুত বামপন্থী নেতারা তখন কারান্তরালে থাকায় বাংলা দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতার ভূমিকা সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ই নিয়েছিলেন। যুক্তফ্রন্টের নেতারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এখানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের জন্য অনুকুল রাজনৈতিক আবহাওয়া শ্রীমুখোপাধ্যায়ই তাঁর জ্বালাময়ী লেখার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছিলেন।

সাংবাদিক বিবেকানন্দের বুকের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে এক কবিসত্তা, মূলত তিনি কবিই। তাঁর 'শতাব্দীর সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থ বিদগ্ধজনের উচ্চ-প্রশংসিত। তাঁর জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ বাগ্মিতা। তাঁর ভাষণ শোনার জন্যে মিছিল করে সভায় লোক আসে, অথচ তিনি কোন রাজনৈতিক দলনেতা নন। তাঁর অন্য গ্রন্থ রুশ-জার্মান যুদ্ধ, জাপান যুদ্ধের ডায়েরি, সোভিয়েট-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি।

সমাজতন্ত্রে অবিচল বিশ্বাস এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার কারণে তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়েছেন। নিখিল ভারত শান্তি সংসদের সদস্য হিসেবে তিনি কয়েকবার বিশ্ব সম্মেলনে ইয়োরোপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানও তিনি সফর করেছেন। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ তিনি একাধিকবার অলংকৃত করেছেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বহুদিন আগেই বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের হৃদয়-রাজ্যর আসন লাভ করেছেন, মানুষকে বৈপ্লবিক আদর্শ ও চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করেন বলে তিনি বিপ্লবী সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন দীর্ঘকাল পূর্বেই। ভারত সরকার সুস্থ ও সুষ্ঠু জাতীয় জীবন গঠনে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অবদানের স্বীকৃতি দিলেন 'পদ্মভূষণ' সম্মানের মাধ্যমে। দেশবাসীর আন্তরিক অকৃত্রিম ও অফুরন্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা যিনি পেয়ে গিয়েছেন তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয় সম্মান কি অমূল্য কিছু? সরকার শ্রীমুখোপাধ্যায়কে সম্মান দিয়ে নিজেরাই সম্মানিত হলেন নাকি?

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

## ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(২৫)

### প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি (৪)

ইতিহাস পণ্ডিত জহরলালের উপর অকৃপণ হস্তে প্রাপ্য এবং অপ্রাপ্য সম্পদ বর্ষণ করলেও একটি ক্ষেত্রে কিন্তু বঞ্চনা করেছে—ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের পূর্বাবধি সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সুভাষ-গঠিত প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতিত্ব নিতে হয়েছিল সুভাষচন্দ্রেরই অনুরোধে। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রগতিশীলতার অগ্রদূত পণ্ডিতজী প্রবর্তকের সম্মান পেলেন না! এই অভাবের পূরণ তাঁকে করতে হয়েছে প্ল্যানিং ব্যাপারে যথা-সম্ভব সুভাষচন্দ্রের অনুল্লেখ-চেষ্টার দ্বারা। সে জিনিস সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পরে নিরঙ্কুশ আনন্দে করা গিয়েছে—ভারতে তাঁর বর্তমান থাকার সময়েও ঐ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি ঘটে নি। প্ল্যানিং কমিটি গঠনের সময় থেকেই কংগ্রেসী বড়কর্তাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ বেধে ওঠে, যার জন্য কংগ্রেসী কর্তারা বছর না পুরোতে সুভাষ-চন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে সাফল্যের সঙ্গে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। এইকালে প্রগতিশীল জহরলাল রক্ষণশীল প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখকে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান ভ্রাতৃত্ব দান করেছিলেন। প্ল্যানিং কমিশনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই জহরলাল তার থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব মুছে ফেলতে সচেষ্ট হন। এই কাজে তিনি কমিটির সদস্যদের অধিকাংশের কাছ থেকে উদ্দীপনা পেয়েছিলেন, কারণ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা সুভাষচন্দ্রের উগ্র রাজ-নীতিতে বিরক্তবোধ করতে আরম্ভ করেছিলেন। হরিবিষ্ণু কামাথকে প্ল্যানিং কমিটির সেক্রেটারী পদ থেকে বিতাড়ন সুভাষ-বিতাড়নের অন্যতম প্রকাশ।

১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে হরিবিষ্ণু কামাথ আই-সি-এস থেকে পদত্যাগ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমে পড়তে চান। এ ব্যাপারে আর এক আই-সি-এস-ত্যাগীকে অধিনায়ক তিনি নেতারূপে বরণ করেছিলেন।(২০) নেতা সুভাষচন্দ্রের মতই এই অনুগামীর রক্তও যথেষ্ট উত্তপ্ত ছিল। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যেভাবে চিত্তরঞ্জনের দ্বারা কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হয়ে সংগঠনের ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করে-ছিলেন, সেইভাবে সুভাষচন্দ্র কামাথকে প্ল্যানিং কমিটির সম্পাদক করে দিয়ে দেশসেবার দায়িত্বের রূপ বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই কাজ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে কামাথ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাতেই তাঁর প্রেরণা প্রশমিত হয় নি, অন্তত সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন প্রসঙ্গে জহরলাল-সুদ্ধ কংগ্রেস হাইকম্যান্ডকে সমালোচনা করার মত শক্তি অবশিষ্ট ছিল। জহরলালের পক্ষে এতটা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। 'চাণক্য' ছদ্মনামে এক প্রবন্ধযোগে তিনি পূর্বেই জানিয়েছেন, তাঁর মধ্যে ডিক্টেটর হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। পণ্ডিতজীর সেই অসাধারণ আত্মদর্শনের সত্যতা সন্দেহ না রেখে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল, যখন তিনি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করার অপরাধে কামাথকে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করালেন। সমকালীন সংবাদপত্রে এই বিষয়ে নেহরু-কামাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি আমরা ভবিষ্যতে যথাস্থানে উপস্থিত করব, এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, পণ্ডিত নেহরু সর্বদাই অভিজাত, আক্রোশের প্রকাশেও—নেহরুর অভিজাত শীতল আক্রোশের চমৎকার নমুনা আমরা পত্রগুলি থেকে পেয়ে যাই।

২০। "Mr. H. V. Kamath, who recently resigned from the Indian Civil Service, met the Congress President (Bose) at Jubbulpore, from where he travelled with him to Bombay." (*Times of India*, May 11, 1938)

"It is understood that Mr. H. V. Kamath, an I.C.S. Officer, who recently resigned from the Central Provinces, will be in charge of the National Planning Committee Office in Bombay." (Do—Dec. 23, 1938)

## ন্যাশন্যাল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড

কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার পরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে স্বতই কংগ্রেস-প্রবর্তিত ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেস নেতৃগণের প্রতিক্রিয়াশীল সংগ্রামবিমুখ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে ধাবিত হচ্ছিলেন—কিন্তু স্বভাবতই বাংলা দেশকে তাঁর দুর্গভিত্তি করতে হয়েছিল। কংগ্রেস-কর্তারা শত চেষ্টা করেও বাংলা কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রের আধিপত্য দূর করতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্র কাজের ব্যাপারে কখনই স্থির থাকতে পারতেন না। সরকারী কংগ্রেসের কর্তৃত্ব হারাবার পরে সাময়িক-ভাবে বাংলা দেশেই যখন প্রধান কর্মকেন্দ্র রচনা করলেন, তখন এই প্রদেশের জন্যও একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজে উদ্যোগী হলেন। বাংলা দেশের জন্য তাঁর বেদনার সীমাও ছিল না। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকারকারী এই প্রদেশটিতে কংগ্রেস সরকার গঠন করতে পারে নি। তার ফলে সর্বভারতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে এই প্রদেশের কোনো যোগ ছিল না। বাংলা দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ শাসন কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে সহযোগিতা করবে, তাও আশা করা যায় না। তা ছাড়া বাংলা দেশ বৃটিশ বণিক-স্বার্থের ভিত্তিভূমি। তাদের লুণ্ঠনে অসুবিধা ঘটাতে পারে, এখন যে কোনো পরিকল্পনাতে তা যৎপরোনাস্তি বাধা দেবেই। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও শিল্পসংগঠনের জন্য বাংলা সরকার অবশ্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল এবং সেই কমিটির গঠন এই 'অকংগ্রেসী প্রদেশের শিল্পায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংগঠন বলে অভিনন্দিতও হয়েছিল, কিন্তু সেইকালে ঐ কমিটি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে নি, বিশেষত বাংলা দেশের শক্তিশালী কংগ্রেসের সহযোগিতা যখন সেই কমিটির সঙ্গে ছিল না।(২১)

শিল্পোন্নত বাংলা দেশের শিল্প পরিচালনায় এবং মালিকানায় বাঙালীর কোনো স্থান নেই, এই অর্থনৈতিক অসঙ্গতি দূর করার জন্য সুভাষচন্দ্র নিজ বাসভবনে (৩৮/২ এলগিন রোড) ১৯৩৯ সালের ১লা ডিসেম্বর একটি ঘরোয়া সভা ডাকলেন। "দেশের, বিশেষত বাংলা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে ঘটানো যায় সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই" সভা ডাকা হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও ব্যবসায়ী সভায় উপস্থিত ছিলেন। "জন-জীবনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধন করে কিভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যায়", —তাই সভায় আলোচিত হয়েছিল। স্থির হয়, সর্বস্তর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে অদলীয় কমিটি গঠন করা হবে।(২২)

সুভাষচন্দ্র যখন এই কমিটি গঠন করেছিলেন, তখন তাঁর এই প্রয়াসে শান্তভাবে সানন্দে উৎসাহ দেখাবার মেজাজ দেশবাসীর ছিল না। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে তখন তাঁর কঠিনতম সংঘাত চলেছে, শক্তিশালী কংগ্রেস নেতারা তাঁকে লাঞ্ছিত করার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করছেন, সে বিষয়ে বিপুল সাফল্য তাঁরা অর্জন করেছেন, সুভাষচন্দ্রও মরিয়া, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটপূর্ণ, যুদ্ধ বেধে গেছে, তার সুযোগ নিতেই হবে—এমন সময়েও তিনি তাঁর মনের একাংশ সংগঠনের জন্য রাখতে পেরেছিলেন, সেটাই বিস্ময়কর; ধ্বংস ও গঠন একসঙ্গে করতে হবে,—তাঁর এই

২১। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার ১৯৩৮, নভেম্বর সংখ্যায় *Industrial Survey of Bengal* নামক সম্পাদকীয় রচনা থেকে জানতে পারি, বাংলা সরকারের ঐ কমিটিতে সদস্য ছিলেন—ডাঃ জে পি নিয়োগী, ডাঃ জে ঘোষ, অধ্যাপক এস কে মিত্র, ডাঃ এন এন লাহা, মিঃ এম এ ইস্পাহানী, মিঃ রাজশেখর বসু, মিঃ বি এস বিড়লা, মিঃ এস সি মিত্র, মিঃ জে এন সেনগুপ্ত। কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ডাঃ জন মাথাইয়ের।

কংগ্রেসের ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের বহির্বর্তী, বিদেশী শিল্পপ্রয়াসে কেন্দ্রভূমিস্বরূপ এই প্রদেশের শিল্পোন্নতির জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে মডার্ন রিভিউ বর্তমান প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছিল:

"Though the personnel of the Congress Committee appointed for the purpose of National Industrial Planning shows that President Bose wisely selected the members irrespective of their political affiliations, if any (or none at all), it is not impossible that political caste conventions stood in the way of the non-Congress Industries Ministers being invited to the Delhi Conference. But non-Congress provinces cannot afford to and must not lag behind the Congress provinces in the development of industries, particularly Bengal, which, so far at least as the sons of the soil are concerned, is backward in industrial enterprise. Hence, the industrial survey of Bengal to be undertaken by the Committee appointed for the purpose is a welcome and urgently needed move. The personnel has been well chosen."

২২। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। সংবাদ শিরোনামা ছিল—Bengal's Economic Development : Proposal for formation of a Non-Party Board.

৪ ডিসেম্বর তারিখে ঐ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে *A welcome Idea* নামে সম্পাদকীয় লেখা হয়।

আহবান যে, শুধু অপরের জন্য নয় নিজের জন্যও, তা তখন প্রমাণ করেছিলেন। ১৯৪০ সালের ৮ মে তারিখে সুভাষ-চন্দ্রের বিবৃতিতে "ন্যাশন্যাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড" গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। এই সংস্থাকে তিনি কদাপি ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান মনে করেন নি। বাংলা দেশের তৎকালীন আর্থিক দুর্দশা, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর উপযুক্ত অংশগ্রহণের সমস্যা সমাধানের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের কথা এক বিবৃতিযোগে সুভাষ-চন্দ্র জানিয়েছিলেন। ঐ দীর্ঘ বিবৃতিটির অনুবাদ দিয়ে "ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" নামক অতি দীর্ঘ অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি করব।

সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি—

"জনগণ একথা জেনে অনুগ্রহবোধ করবেন যে, সম্প্রতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য আমি পর পর দুটি সম্মেলন ডেকেছিলাম। এই দুটি সম্মেলনেই কলকাতার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সাধারণ মত ছিল—যদি জনজীবনের বিভিন্ন অংশের প্রতি-নিধিদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় ও সহযোগিতা থাকে তাহলে দেশের, বিশেষত বাংলা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি দ্রুততর হবে। তাই স্থির হয় "ন্যাশন্যাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড" নামে একটি দলনিরপেক্ষ সংস্থা অতঃপর গঠিত হোক। ঐ সংস্থায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, জনজীবনের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও থাকবেন। দ্বিতীয় সম্মেলনে সংস্থার স্মারকলিপি, নীতি-নিয়ম প্রভৃতি আলোচিত ও গৃহীত হয়। এইভাবে "ন্যাশন্যাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড" গঠিত হয়েছে, যার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল দেশের বিশেষত বাংলা দেশের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন, এই বোর্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাঁরা উৎসুক, তাঁরা বিপুল সংখ্যায় এর সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হোন। তা হলেই তবে এককালে সারা দেশ জুড়ে কার্যকরিভাবে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হবে। ইদানীং কয়েক বৎসর ধরে এই দেশ অর্থনৈতিক মন্দার যে গহ্বরে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি করছে, সেখান থেকে দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষকে উদ্ধার করবার দায়িত্ব নিতে পারবে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অবিলম্ব প্রয়োজনীয়তার কথা না বললেও চলবে। নেহাৎ উপরে বসে আছেন এমন দু'-একটি মানুষ ছাড়া দেশের বাকি লোকের অবস্থা অতি শোচনীয়—তাঁদের আশা-ভরসা, সহায়-সম্বল নেই। পেটের জ্বালায় গভীর হতাশায় অনেকেই আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। জনগণ এখন জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি, প্রাণপণে তাঁরা বাঁচার লড়াই করছেন। একথা সত্য যে, ভারত স্বাধীন হবার আগে এই ধরণের গুরুতর সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই বলে মধ্যবর্তীকালে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা না করার পক্ষেও কোনো যুক্তি নেই। আসুন, সমস্যার সমাধানে আমরা সকলে সম্মিলিত হয়ে একযোগে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করি। এই পর্যায়ে আশার একটি ক্ষীণ রেখাও জনগণকে বেঁচে থাকার ও লড়াই করে যাওয়ার শক্তি দেবে।

জনগণ জানেন যে, জাতীয় কংগ্রেসে আমার সভাপতিত্ব-কালের প্রথম বছরে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়েছিল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের সমীক্ষা সেই কমিটি করে যাচ্ছে। এই 'ন্যাশন্যাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড স্থাপনের উদ্দেশ্য অবিলম্বে কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। স্বীয় কার্যকালে এই বোর্ড ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির কাছ থেকে সহ-যোগিতা আশা করে। এই বোর্ড একই উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট অন্য যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

নিম্নে বোর্ডের কার্যাবলীর খসড়া পরিকল্পনা দেওয়া হল। জনসাধারণের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা ও মতামত আহবান করা হচ্ছে।"

বোর্ডের উদ্দেশ্য জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি, অর্থাৎ জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি, যা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারাই ঘটতে পারে।

(১) কৃষির উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন:

(ক) জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে মরা বা মজা নদী ও খালের সংস্কার; কোথাও সেচের জল সর-বরাহের জন্য, কোথাও বা জমা জল নিকাশের জন্য নতুন জলপথের সৃষ্টি; উপযুক্ত সার সরবরাহ; চাষের পদ্ধতির এবং নানাপ্রকার কৃষিজ উৎপাদনের উন্নতির জন্য প্রয়াস;

(খ) ক্ষেতের উৎপাদনের সর্বাধিক ফল যাতে কৃষক লাভ করে তার ব্যবস্থা করা;

(গ) আইনের দ্বারা চাষের জমির আরও টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া রদ করা; ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্বৃত্ত জমিকে অতি ক্ষুদ্র, অর্থনৈতিকভাবে লাভহীন জমির মালিককে দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

(ঘ) চাষের জন্য সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় সমবায় সমিতি স্থাপন করা; এই সমিতিগুলি উন্নত ধরণের চাষের উপযোগী বীজ ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ ও সরবরাহ করবে;

(চ) কৃষিজ উৎপাদন থেকে লব্ধ আয় যথাসম্ভব সঞ্চয় করবার জন্য কৃষিজীবীদের শিক্ষা দেওয়া। এই সঞ্চয়, চাষ না হলে বা নষ্ট হলে তাদের সাহায্য করবে। পরিবারের উপায়ী মানুষের কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা তার মৃত্যু হলে তার নিজের বা পরিবারের অন্য সকলের জীবনধারণের জন্যও এই সঞ্চয় সহায়তা করবে।

'ক', 'খ', 'গ'—এই তিন ধারায় বিষয়গুলি মাত্র

# যন্ত্রণা এবং সুখ

সমরজিৎ ঘোষ

এখন কেবলই এক স্পাইরাল হয়ে,
এক কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে আসা।
অনেক অনেক দিন, ক্যানভাসে আঁচড় পড়ে নি
চেতলায় একই ভালবাসা।
আসলে এখন আমি সত্যান্বেষী-ঋষির আগ্রহে
অনাবৃত যৌবনকে করেছি কামনা।

কিন্তু কাউকে অবারিত করতে, হাতে পেন ফুটে রক্ত;
পাশব যন্ত্রণা নয়, না-জানা-যন্ত্রণা।
যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে এক নিরুদ্বিগ্ন সুখ,
হয়তো সে সমাপ্ত তিরিশে।
যন্ত্রণার রক্ত মেখে, যন্ত্রণাই সুখ
এখন এ প্রারম্ভ ঊনিশে।

সরকারিভাবেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর। বর্তমান সরকারের নড়াচড়ায় খুবই সময় লাগে। সেই জন্য এই বোর্ড দ্রুত কাজের জন্য ধারাবাহিক প্রচারকার্য চালাবে; সেই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে সভা-সমিতির আয়োজন ও পুস্তিকা বিতরণ করবে এবং সংবাদপত্রে লেখালেখি করবে।

'ঘ' এবং 'ঙ' ধারার বিষয়গুলির জন্য সরকারী অনুদান প্রয়োজন। বহু প্রত্যাশিত সেই দান কিন্তু মিলছে না। উপরি উক্ত পদ্ধতিতে এক্ষেত্রেও বোর্ড প্রচারকার্যের দ্বারা দাবি আদায়ে সচেষ্ট হবে।

'চ' ধারার জন্য অল্প টাকার জীবন বীমার ব্যবস্থা এবং টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা করা দরকার; বোর্ড সে ভার নিজেই নেবে।

(২) শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য ঐসব বিষয়ে তথ্য সরবরাহ, কারিগরি জ্ঞান ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দান করার প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও সরকারী সাহায্য আবশ্যক। সরকারী সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে বোর্ড নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করবে:

(ক) একটি 'ইনফরমেশন ব্যুরো'র প্রতিষ্ঠা, যা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণ করবে;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যাবলীর বিকল্প হিসাবে যুবকদের শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবে;

(গ) একটি বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করবে, যার উদ্দেশ্য—

(এক) অনুমোদিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ডিবেঞ্চার জমা রেখে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান;

(দুই) স্বদেশে এবং বিদেশে ব্যবসা চালাবার জন্য অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের অর্থ সাহায্য;

(তিন) আংশিক বা পূর্ণ অর্থ সাহায্যের দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় বিপণন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, উত্তর ভারতে যার শাখা থাকবে; এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য দেশ-বিদেশের বাজারে স্থানীয় শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়;

সরকার যদি সহযোগিতা করে, তাহলে এই প্রতিষ্ঠান পাট উৎপাদকদের কাছ থেকে কাঁচা পাটের সমগ্র উৎপাদন বিপণনের ভার গ্রহণ করতে পারে;

(চার) কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য আংশিক অর্থ সাহায্যের দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় শিল্প সমিতি স্থাপন, যার শাখা থাকবে গ্রামে ও শহরে উভয়ত;

(ঘ) অনেক বিদেশী রাষ্ট্র যা করেছে সেই ধরণের ভারী ও মূল শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করতে আন্দোলন চালাতে হবে;

(ঙ) অধিকসংখ্যক মানুষের মধ্যে ব্যবসা বণ্টনের জন্য উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সংগে আলোচনা চালাতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বোর্ড সূচনায় নিম্নের কাজ-গুলি করবে:

(১) একটি প্রচার-উপসমিতি গঠন;

(২) একটি সংবাদ উপসমিতি গঠন;

(৩) ব্যাংক বা ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট জাতীয় একটি বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বন; সেই সঙ্গে একটি বৃহৎ ইনসিওরেন্স কোম্পানীও; ঐসব প্রতিষ্ঠানে দেশের প্রতিটি অংশের প্রতিনিধিরা থাকবেন, এবং

(৪) অবাঙালী শিল্প-মালিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলা দেশে তুলা, লবণ, চিনি ও অন্যান্য যেসব খুচরা জিনিস পাঠান সেগুলি যাতে তাঁরা অনুমোদিত বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে বণ্টন করেন, সে সম্বন্ধে তাঁদের প্রণোদিত করবে।

উপরে কথিত কার্যপরিকল্পনা প্রয়োজনবোধে সংশোধনের পরে বোর্ডের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক গৃহীত হতে পারে। ঐ কার্যকরী সমিতি উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য সমিতিভুক্ত হলেই সংগঠিত হবে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এম-এল-এ (বাংলা) বোর্ডের আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর অফিসের স্থান—কলিকাতায় ২, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের দোতলায় (উত্তর-পূর্ব কোণে)। [ক্রমশ]

**কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষের সঙ্গে ময়দানে নেতাজী প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখছেন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু**

৩০শে জানুয়ারীর বহু প্রতীক্ষিত যুক্তফ্রন্টের বৈঠক পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী নিষ্ফল আলোচনার পর তুমুল উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছে, কিন্তু ফলাফল কিছুই হয়নি। ফ্রন্ট এখনো ভাঙেনি বটে তবে কোন বোঝাপড়াই হয়নি বড় শরিকদের মধ্যে। যুক্তফ্রন্টের মৃত্যু ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এই নেতারা, যাঁরা একদা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা এখন যুক্তফ্রন্টের মৃতদেহের উপর শকুনির মত কাম ড়াকামড়ি করছেন। সরকারী কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে, আমলাদের পোয়া বারো। মন্ত্রীরা নাম-কা-ওয়াস্তে দফতরে আসছেন, সরকারী কাজকর্ম বলতে গেলে কিছুই নেই। শুধু আমলাদেরই পোয়া বারো নয়, কোন কোন রাজনৈতিক দল ও নেতাদেরও তদ্রূপ অবস্থা। তাঁরা হাতের সুখে গড়ছেন, পায়ের সুখে ভাঙছেন, সংবাদপত্রে তাঁদের শ্রীমুখের উল্টোপাল্টা ভাষণ ও বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছে,—একটা রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলার এত চমৎকার মওকা তো বড় একটা পাওয়া যায় না! বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নেতারা প্রতিভা ও বিজ্ঞতার দিক থেকে খুব উঁচু মানের হন না, এ কথাটাও এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এঁরা এখন প্রচণ্ড মওকা পেয়েছেন এবং এই সুযোগে দলীয় স্বার্থ যতখানি হাসিল করা যায়, সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছেন এবং এর জন্য কোনরকম চক্ষুলজ্জার ও যে প্রয়োজন আছে তাও তাঁরা ভুলে গেছেন। পশ্চিমবাংলার মানুষের সকল প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটেছে। এর জন্য যুক্তফ্রন্টের সব ক'টি বড় দলই কম-বেশী সমভাবে দায়ী। যুক্তফ্রন্ট নাকি এখনো চলছে, তবে এটা চলা বলে না। সাধারণ মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কতদিন এভাবে ছিনিমিনি খেলবেন তা সংশ্লিষ্ট দলনেতারাই জানেন, আমরা কিছু বলতে অক্ষম।

## বাংলা ভাষায় সরকারী কাজ

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, খুব শীঘ্রই সরকারী কাজ-কর্ম বাংলা ভাষায় চালু করা হবে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক মাস পর রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত একবার গৃহীত হয়েছিল, এবং এর পরেও বেশ কয়েকবার এ সম্পর্কে অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, শুধু মন্ত্রিসভাতেই নয়, বিধানসভাতেও। কিন্তু কার্যকর কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত কিছু হয় নি। যাই হোক, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন যে, প্রত্যেক মন্ত্রীর সঙ্গে একজন করে বাংলা স্টেনো দেওয়া হবে। বাংলা টাইপ মেশিন আরও ক্রয় করা হবে, কয়েকটা নতুন পদও সৃষ্টি করা হবে। এই ব্যাপারে অর্থদপ্তর সমস্ত বিভাগকে সার্কুলার দিয়ে জানাবেন যে, কোন বিভাগ যদি একটি টাইপ মেশিন ক্রয় করতে চান তা বাংলা মেশিন হতে হবে, দুটো হলে একটা বাংলা একটা ইংরাজী, তিনটে হলে দুটো বাংলা একটা ইংরাজী। শ্রীভট্টাচার্য বলেন, আইন বাংলায় না হলে, আদালতের রায় বাংলায় না হলে অসুবিধা আছে।

বিলম্বে হলেও যে এ বিষয়ে যৎ-কিঞ্চিৎ হতে চলেছে, সেটাও আনন্দের কথা। বস্তুত ইংরাজীকে বাদ দিয়ে কিভাবে সরকারী কাজকর্ম চালানো যায়, সে বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ ইতিমধ্যেই পথ দেখিয়েছে। উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরাজীর প্রয়োজন থাকলেও সাধারণভাবে তার কোন প্রয়োজন নেই, পৃথিবীর কোন সভ্য দেশই মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বিদেশী ভাষায় সরকারী কাজকর্ম চালায় না। বিশেষ করে যখন জনসাধারণের বেশীর ভাগ অংশেরই ইংরাজী সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, তখন সরকারী কাজে তা ব্যবহৃত হলে তার দ্বারা অনেক বিভ্রান্তিরই অবকাশ ঘটে। সাধারণ ব্যক্তির কাছে কোন সরকারী চিঠি বা নোটিশ এলে তার মর্ম বুঝতে এর-ওর দুয়ারে ছুটে বেড়াতে হয়। তা ছাড়া

সাধারণ মানুষ, গ্রামবাসী ইত্যাদি যদি কোন কাজের জন্য কোন অফিসে যায়, তাকে যদি কোন দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করতেও বলা হয়, ইংরাজী না জানার অভাবে তাকে অসুবিধায় পড়তে হয়। এই সেদিন দেখলাম, কৃষি ঋণের জন্য কয়েকজন চাষী একটি ব্যাংকে এসেছেন। সংশ্লিষ্ট ফর্মগুলি ইংরাজীতে লেখা হওয়ার দরুণ সেগুলি হাতে পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত অস্বস্তি ও উদ্বেগের সম্মুখীন হলেন। এই সমস্ত কারণে কাজকর্মেরও অযথা দেরী হয়। শুধু সরকারী স্তরেই নয়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার ব্যবহার আবশ্যিক করা উচিত।

এ ছাড়া স্কুল-কলেজগুলি থেকেও যত শীঘ্র ইংরাজী তুলে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। প্রাথমিক থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজীর ব্যবহার আছে, এবং ইংরাজী শিক্ষাদান পদ্ধতি শুদ্ধভাবে লিখতে বা বলতে কেউই শেখে না। অনাবশ্যক এই বোঝা রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। একটি ছাত্র তার পাঠ্য সময়ের দুই তৃতীয়াংশ ইংরাজীর জন্য ব্যয় করে, এবং তা করেও তার বরাতে শতকরা তিরিশ-পঁয়ত্রিশের বেশী নম্বর জোটে না। কাজেই ইংরাজীকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তার জায়গায় অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় পাঠ করা উচিত, তাতে ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞানের পরিধিও বাড়বে, এবং বিদেশী ভাষার অর্থ না বুঝে মুখস্থ করার পরিবর্তে মাতৃভাষায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পেয়ে তার শিক্ষায় আগ্রহ জাগবে। বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য, হিন্দীর মত অনুবাদের বোকামী না করে, সর্বাধুনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে বাংলায় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে অবিলম্বে আদেশ দেওয়া উচিত। যাঁরা বলেন যে, বাংলা ভাষায় এগুলি করা যাবে না, তাঁরা ভন্ড এবং কিছুই জানেন না, তাঁরা সম্ভবত নিজেদের বিষয়গুলিই ভাল বোঝেন না। ভাল প্রকাশক জুটলে বা সরকার বই প্রকাশের দায়িত্ব নিলে এবং অনুগৃহীত ধামাধরা লোকেদের দিয়ে না লেখালেই ভাল এবং উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক অনায়াসেই পাওয়া যাবে। পরিভাষা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ইংরাজী টার্মগুলিকেই বাংলা বলে মেনে নিলেই চলবে। ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসকে না হয় বাংলাতেও ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস বলা গেল, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

অবশ্য ইংরাজী যে একেবারেই থাকবে না, সে কথা বলছি না। ইংরাজী

শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য

শিক্ষার জন্য তিন বছরের পাঠ্যক্রমকে ভিত্তি করে এখানে-ওখানে ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে কোন অসুবিধাই নেই। যার দরকার সে শিখে নেবে, এবং অনেকেই শিখবে, বরং ভালভাবে শিখবে। কলকাতায় ফরাসী, জার্মান, রুশ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। তিন বছরের কোর্স এবং শিক্ষার্থীরা তিন বছরের মধ্যেই উক্ত ভাষাগুলির যে কোনটি যথেষ্ট ভালভাবে আয়ত্ত করে নেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক; কাজেই চোদ্দ বছর রগড়েও যেখানে আমরা একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডের ইংরাজী শিখতেও অসমর্থ হয়ে পড়ি, সেই আমরাই আবার এইসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে তিন বছরে ফরাসী বা জার্মান যাই শিখি না কেন, ইংরাজীর চেয়ে ভালই শিখি। কাজেই এই রকম তিন বছরের বৈজ্ঞানিক পাঠক্রমযুক্ত ইংরাজী শিক্ষায়তন খুললে অনেকে সেগুলিতে আগ্রহের সংগে যোগদান করবে। তারা শিখবেও আরও ভাল করে, কেন না তারা নিজেদের গরজে শিখতে যাচ্ছে। এখান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষান্তে সার্টিফিকেটকে বাড়তি যোগ্যতা হিসাবে গ্রহণ করা চলবে। ফরাসী জার্মানের উদাহরণ দেওয়ার দরকার নেই, আমাদের মৃতকল্প টোলগুলি তিন বছরে যেমন সংস্কৃত শিখিয়ে দেয়, ইস্কুলের চার বছর ও কলেজের তিন বছর, মোট সাত বছরেও অত ভাল শেখা যায় না।

কাজেই ইস্কুল-কলেজ থেকে ইংরাজী তুলে দিলেই দেশটার সর্বনাশ হবে বলে যাঁরা আর্তনাদ তোলেন তাঁরা ঠিক করেন না। ইংরাজী উঠে গেলে ছাত্রদের ঘাড় থেকে ফালতু বোঝা নেমে যাবে এবং যে সময়টা তারা ইংরাজীর জন্য অপব্যয় করে সে সময়টায় তারা অপরাপর অনেক বিষয় আনন্দের সংগে শিখতে পারবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইংরাজীকে মাথায় ওপর রেখে মাতৃভাষার উন্নতি করব, এই রকম সংস্কারটাই পরস্পরবিরোধী ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এভাবে কোনদিনই মাতৃভাষার উন্নতি সম্ভবপর নয়। কাজেই সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রচলনের দাবি আরও জোরদার হওয়া উচিত।

## ঐতিহাসিক ভ্রান্তি স্বীকার

সম্প্রতি কলকাতা ময়দানে 'নেতাজী প্রদর্শনী'তে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট মূল্যায়ন ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান অনস্বীকার্য। নেতাজী ফ্যাসিস্ট শক্তির সংগে হাত মিলিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, যথার্থ দেশপ্রেমিকের মতই। বিলম্বে হলেও নেতাজীর মূল্যায়নে যে কমিউনিস্টরা ভুল করেছিলেন এই স্বীকৃতির জন্য আমরা শ্রীজ্যোতি বসুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পূর্বে কমিউনিস্টদের বক্তব্য ছিল যে, নেতাজী ফ্যাসিস্ট জাপানের সহযোগিতায় ভারতবর্ষকে একটি ফ্যাসিস্ট উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা করে-

ছিলেন। তাঁরা নেতাজীকে কুইসলিং আখ্যা দিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বর্তমান বক্তব্যটি প্রমাণ করছে যে, নেতাজী সম্পর্কে কমিউনিস্ট মূল্যায়ন ভুল ছিল। শ্রীবসুর বক্তব্য সি-পি-এম-এর সিদ্ধান্তের প্রতিফলন কিনা জানি না, তবে সি-পি-আইও বোধ হয় নেতাজী সম্পর্কে ধারণা পাল্টেছেন, কেন না এবারের সাপ্তাহিক 'কালান্তরে' মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী শিরোনামায় নেতাজীর একটি প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয়েছে, কোন কমিউনিস্ট পত্রিকায় এই জাতীয় নেতাজীর প্রতিকৃতি যে সসম্মানে প্রকাশিত হবে সেটা আগে কল্পনা করা যেত না।

সংক্ষেপে একটু পুরাতন প্রসঙ্গ আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সারা ভারতেই প্রবলভাবে বৃটিশবিরোধী তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব প্রকট হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালের আগস্ট-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, এ ছাড়া সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহের বীজ দানা বেঁধে উঠেছিল। এ ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশশক্তি যখন বেকায়দায় পড়েছিল তখন ভারতবর্ষের কোন কোন নেতা সঙ্গতভাবেই আশা করেছিলেন যে, এই হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দুর্বর্ণ সুযোগ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই সময় জাপানে গিয়ে আই-এন-এ সংগঠন করেছিলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র অভিযানের দ্বারা তিনি এদেশ থেকে বৃটিশ শক্তির উৎখাত করবেন। দেশের অভ্যন্তরেও বিপ্লব ও বৃটিশবিরোধী মনোভাব তখন খুব প্রকট, এবং কংগ্রেসও অ্যান্টিওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ যখন সংকটের সম্মুখীন, ভারত থেকে সেই শক্তি যেন কোন প্রকারেই সাহায্য না পায়। কিন্তু কেউ কেউ উল্টো দিক চিন্তা করেছিলেন। যেমন মানবেন্দ্রনাথ রায় ভেবেছিলেন যে, এই যুদ্ধ গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসীবাদের যুদ্ধ এবং ফ্যাসীবাদী দৈত্য যখন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই এই শত্রুকে পরাজিত করার জন্য বিনাসর্তে ইংরাজের সংগে সহযোগিতা করা উচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়া জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হলে কমিউনিস্টরাও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসে এবং তারাও বলে যে, ফ্যাসীবাদবিরোধী এই জনযুদ্ধে আপাতত ইংরাজকে সাহায্য করা উচিত। কংগ্রেসও গোড়ার দিকে বৃটিশের সংগে অসহ-যোগিতা করলেও শেষ পর্যন্ত একই লাইনে আসে এবং তারাও বৃটিশের সংগে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে।

ফলে যুদ্ধকালে সারা দেশ জুড়ে যে তীব্র বৃটিশবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, আগস্ট-বিপ্লব ও অপরাপর ঘটনায় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তার সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয় নি। তারপর পঁচিশ বছরেরও বেশি পার হয়ে গেছে, এখন নতুন করে সে-যুগের কর্ণধারার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এখন মনে হয় সেদিনের সেই বৃটিশবিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও অপরাপর দলগুলি যদি দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের সংগঠন করত, এবং সেই সংগে যদি বাইরে থেকে সুভাষচন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টা যুক্ত হত, তাহলে আমরা সহজেই ওই সময়েই স্বাধীনতা আদায় করে নিতে পারতাম, স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদেরও যথেষ্ট অবদান থাকত, এবং তাদের উপেক্ষা করে মন্ত্রিসভা গঠন করা যেত না, ফলে আজ তারা যে অবস্থায় এসেছে এর চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় তারা আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেই আসতে পারত। তাদের সেদিনের ভুল নীতি পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি করার পরিবর্তে তা কমিয়ে দিয়েছে। বৃটিশের সংগে সহযোগিতার অতি উৎসাহে তারা সুভাষচন্দ্রকে দেশ-দ্রোহী আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি। কাজেই এতদিন পরে যদি সে ভুলের স্বীকৃতি কমিউনিস্টদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুখ দিয়ে ঘটে তাহলে সেটা আনন্দেরই কথা। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হিটলারের সংগে চুক্তি করে স্ট্যালিন যদি কোন অন্যায় না করে থাকেন, দেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনে ফ্যাসিস্ট শক্তির সংগে হাত মিলিয়ে সুভাষচন্দ্রও নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় করেন নি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-কোন পথই গ্রহণ করা অন্যায় নয়, যদি উদ্দেশ্য সাধু হয়।

## চা-ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সমস্যা

কলকাতায় উত্তরবঙ্গ ও আসাম থেকে যে চা আসে, সেগুলি কয়েকটি গুদামে জমা রাখা হয়, বেশির ভাগটাই বামার লরী এন্ড কোম্পানীর গুদামে জমা পড়ে। এই সব গুদাম থেকে ছয়টি ব্রোকার কোম্পানী মারফত এই চা নীলাম করা হয়। এই সকল চা-এর গুদাম ও ব্রোকার কোম্পানীতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। প্রথমত, এই সকল ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকেরা স্থায়ী নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিকাপ্রথায় কাজ চালানো হয়। যেমন বামার লরী কোম্পানীতে যে সকল শ্রমিক চা-ব্যবসায়ের সংগে সম্পর্কিত তাঁরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হয়েও কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে মজুরী পেয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত সবেতন ছুটি বলেও তাঁদের কিছু নেই, ওভারটাইমের কথা দূরে থাক, এই সব কর্মীদের কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। দৈনিক বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা আবশ্যিক কাজের সময়। প্রভিডেন্ট ফান্ডেরও কোন ব্যবস্থা নেই। এই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার চায়ের বাজারের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা কতকগুলি দাবি তুলেছেন। যেগুলি হচ্ছে সমস্ত শ্রমিক ও "বাবু"-দের একটি স্বীকৃত ইউনিয়নভুক্ত করা ও চাকুরীর স্থায়িত্ব, সবেতন ছুটি, ওভারটাইম, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও নিম্নতম মজুরী নির্দিষ্ট করা। আশা করি যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমদপ্তর এদিকে নজর দেবেন।

## চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের ভাগে

বহু টানা-হেঁচড়ার পর শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে চণ্ডীগড় শহর পাঞ্জাবের ভাগেই পড়বে। তার বদলে হরিয়ানা পাবে ফিরোজপুর জেলার তুলা ফসল-সমৃদ্ধ এলাকা, ফাজিলকা এবং আবোহার শহর। ভাগাভাগির হিসাব-নিকাশে হরিয়ানা আরও ১০৪ থেকে ১১৫ খানা গ্রামও পেয়ে যাবে বলে মনে হয়। চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের ভাগে পড়ছে বটে, তবে আপাতত পাঁচ বছর শহরটা কেন্দ্রশাসিত এলাকা হয়ে থাকবে।

হরিয়ানা নতুন রাজধানী তৈরি করবার জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে পাবে ২০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১০ কোটি টাকা হবে অনুদান এবং বাকী ১০ কোটি টাকা ঋণ। আগামী পাঁচ বছর হরিয়ানার রাজধানী পাঞ্জাবের মত চণ্ডীগড়েই অবস্থিত থাকবে। তারপর তারা নতুন রাজধানীতে উঠে যাবে।

হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের মধ্যে পার্টিশন নিয়ে এখনও যে সব বিরোধ রয়েছে, সেগুলো মীমাংসার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে। সম্ভবত সুপ্রীম কোর্টের একজন জজই হবেন তার চেয়ারম্যান। সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার সীমানা পুনর্নির্ধারণের সময় ফাজিলকা-আবোহার কমিশনের বিবেচ্য বিষয় হবে না। ঐ এলাকা চূড়ান্তভাবেই হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত হবে বলে স্থির হয়েছে। চণ্ডীগড়ের আশপাশের যে গ্রামাঞ্চল কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আছে, সেটা ভাষার ভিত্তিতে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। ফাজিলকা-আবোহার এলাকার সঙ্গে হরিয়ানার সরাসরি সংযোগ সাধনের জন্য চার ফার্লং লম্বা এবং এক ফার্লং চওড়া একটি এলাকাও হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের ভাগে পড়ল বটে, কিন্তু তার বদলে হরিয়ানা যা পেয়েছে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার মূল্য কিছু কম নয়। ভাকরার সেচ ব্যবস্থায় ফিরোজপুর জেলায় যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছে। সেখানে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হচ্ছে। কাজেই সেই এলাকার একটা বড় অংশ (ফাজিলকা-আবোহার এলাকা) হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত হওয়া হরিয়ানার পক্ষে সত্যিই ভাগ্যের কথা।

পাঞ্জাব-হরিয়ানার বিরোধ মীমাংসার এই ফর্মুলা সারা ভারতে স্বস্তির ভাব এনে দিলেও হরিয়ানার কোন কোন মহলে যথেষ্ট অস্বস্তি সৃষ্টি করছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হরিয়ানায়
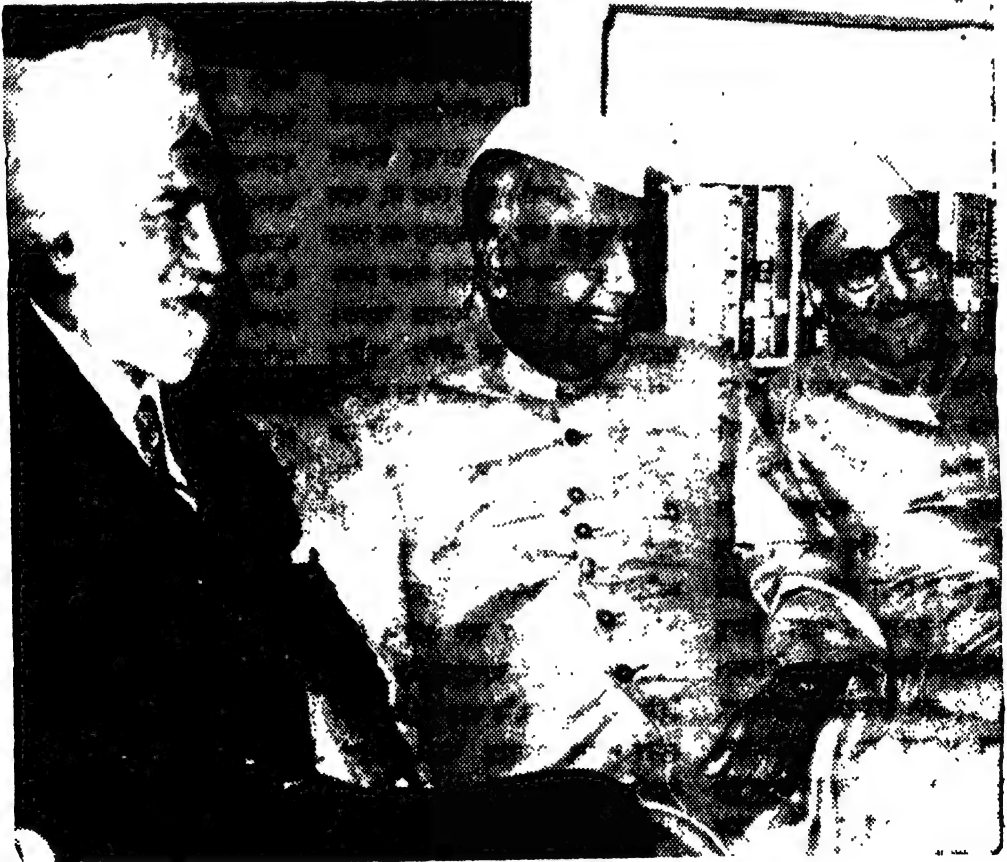
পাঞ্জাব-হরিয়ানার বিরোধ মীমাংসার ফর্মুলা নিয়ে আলোচনারত শ্রীচাবন, শ্রীগুরনাম সিং ও বংশীলাল

সোনাপত, রোটক, জিন্দ, যমুনানগর, ভিওয়ানী এবং হিসারে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়, সেটা হিংসাত্মক ক্রিয়া-কলাপের রূপ পরিগ্রহ করে এবং সর্বসমেত মোট ৮টি এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী তলব করতে হয়। সিন্ডিকেট কংগ্রেস এবং জনসংঘের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিক্ষোভে অংশ-গ্রহণকারীরা বহু জায়গায় রেলের সম্পত্তি এবং অন্যান্য বে-সরকারী সম্পত্তি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। পুলিশের গুলিবর্ষণে বেশ কয়েকজন মারাও গেছে।

অবশ্য এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথিকৃৎ পাঞ্জাব। সেখানে সন্ত ফতে সিং চণ্ডী-গড়ের দাবিতে অনশন অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয় এবং তাতে বহু সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীরা ভাটিণ্ডাগামী পাঞ্জাব মেল লাইনচ্যুত করে দিয়েছিল। ফাজিলকা-আবোহার এলাকা হরিয়ানার ভাগে পড়ায় তার প্রতিবাদে পাঞ্জাবীরা অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে অবস্থিত আকালী তক্ত আক্রমণ করেছিল। এ রকম ঘটনা এর আগে কখনও ঘটে নি। নর্দার্ন রেলের ট্রেন চলাচল বহু জায়গা-তেই বন্ধ রাখা হয়েছিল।

যাই হোক, সন্ত ফতে সিং অনশন ত্যাগ করেছেন এবং আত্মাহুতির সিদ্ধান্তও বাতিল করেছেন। সর্বদলীয় কমিটি (পাঞ্জাবের) কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বটে, তবে ফাজিলকা-আবোহার এলাকা হস্তান্তরের প্রস্তাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

পাক-ভারত সীমান্তবর্তী ফাজিলকার অধিবাসীরা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছেন।

পাঞ্জাব কংগ্রেসের (সিন্ডিকেট) কর্ম-কর্তা মিঃ জইল সিং দাবি করেছেন যে, ফাজিলকা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী গুর-নাম সিংয়ের পদত্যাগ করা উচিত। অপর দিকে হরিয়ানা বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা রাও বীরেন্দ্র সিং দাবি করে-ছেন যে, চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতিবাদে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালের পদত্যাগ করা উচিত।

যাই হোক, ঘটনার গতি যে পথে এগোচ্ছে, তাতে মনে হয়, ভাগাভাগির এই সিদ্ধান্ত হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব উভয়ের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হবে।

## [illegible]পনা

চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন নিয়ে গত কিছুকাল যাবৎ বিভিন্ন মহলে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, তারই পরি-প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন পরি-কল্পনার আয়তন সামান্য বৃদ্ধি করেছেন। গত সপ্তাহে পরিকল্পনা কমিশন চূড়ান্ত-ভাবে স্থির করেছেন যে, চতুর্থ পরি-কল্পনায় মোট ২৪, ৮৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এটা আগের খসড়ার বরাদ্দের চেয়ে ৪৫৭ কোটি টাকা বেশী। এবারের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রায়ত্ত লগ্নীর ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং প্রাইভেট লগ্নীর ক্ষেত্র সামান্য সংকুচিত করা হয়েছে। প্রাইভেট কর্পোরেট সেক্টর (যৌথ কারবার) সংকুচিত করা হয় নি। সংকুচিত করা হয়েছে অন্যান্য প্রাইভেট কার্যক্রমের ক্ষেত্র।

এবার প্রাইভেট সেক্টরে লগ্নী বরাদ্দ হয়েছে ৮৯৮৪ কোটি টাকা। এখানে আগের খসড়ায় বরাদ্দ ছিল ১0,000 কোটি টাকার সামান্য কিছু কম।

অপর দিকে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে লগ্নী বরাদ্দ হয়েছে ১৫,৮৭১ কোটি টাকা। আগের খসড়ার চেয়ে এটা ১৪৮১ কোটি টাকা বেশী।

পরিকল্পনায় যে বাড়তি লগ্নী বরাদ্দ হয়েছে তার বেশীরভাগটাই ব্যয় রাজ্যের পরিকল্পনায়। অর্থাৎ রাজ্যগুলো পরিকল্পনায় লগ্নী বৃদ্ধির যে দাবী জানিয়েছিলেন, সেটা অংশত পূরণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল বলেছেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ লাভের সুযোগ ঘটায় পরিকল্পনায় লগ্নীর পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির হার সাড়ে ৫ শতাংশের পর্যায়ে রাখাই পরিকল্পনার লক্ষ্য। পরিকল্পনার মূল খসড়া পরিবর্তন করে নতুন খসড়ায় ছোট ছোট কৃষক, ভূমিহীন কৃষক এবং অনুরূপ স্বল্প আয়ের মানুষদের উন্নতির জন্য বিশেষ লগ্নীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া পশ্চাৎপদ এলাকার উন্নয়নের দ্বারা অন্যান্য এলাকার সমকক্ষ করে তোলবার কার্যক্রমও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নতুন অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে আছে বোকারো কারখানার ইস্পাত উৎপাদন ৪0 লক্ষ টনে উন্নয়ন, ভিলাই ইস্পাত কারখানা সম্প্র-সারণ, আসাম তৈল শোধনাগার এবং পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানা সম্প্রসারণ ও নির্মাণ, দ্বিতীয় কেবল কারখানা নির্মাণ, কাগজ ও সিমেন্ট কর্পোরেশন সম্প্রসারণ এবং ডায়েরী শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ।

ছোট মোটরগাড়ী নির্মাণের পূর্ব পরিকল্পনা বর্তমান খসড়ায় বাতিল করা হয়েছে।

চূড়ান্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নি। কাজেই সেটা বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, এতে গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষদের জন্য কিছু করবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেটা নিশ্চয়ই আশার কথা।

## ক্রুড তেলের দাম কমল

এতদিন ভারতবর্ষে খনিজ তেলের কারবার ছিল বিদেশী বণিকদের এক-চেটে। সেটা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে ভারত গভর্নমেণ্ট ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী নামে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানী খুলে তেলের কারবারে নামেন এবং গত কয়েক বছর তাঁদের কারবার যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। এদেশে যে তিনটি বিদেশী কোম্পানী এই কারবারে লিপ্ত, তারা হচ্ছে এসো, ক্যালটেক্স এবং বার্মাশেল। এই কোম্পানীগুলো তাদের নিজেদের সূত্রে বিদেশ থেকে ক্রুড আমদানী করে এদেশে কারবার করে থাকে। তারা ক্রুডের যে দাম দেয়, সেটা আন্তর্জাতিক বাজার দরের চেয়ে বেশী। তাই ভারত সরকার তাদের ক্রুডের দাম কমাবার অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন। সে অনুরোধ রাখতে বিদেশী কোম্পানীগুলো অস্বীকার করে। তখন ভারত সরকার তাদের ক্রুড কেনার বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ হ্রাস করেন। সঙ্গে সঙ্গে বার্মাশেল কোম্পানী ক্রুডের দাম কমিয়ে দিয়েছে। তারা ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে তারা ক্রুডের দাম ব্যারেল পিছু ১·২৮ ডলার করে নেবে। এখন তারা নেয় ১·৩৪ ডলার। অপর দুটি কোম্পানী যদিও এখন দাম হ্রাসের প্রস্তাব মেনে নেয় নি কিন্তু ভাব-গতিক দেখে মনে হচ্ছে তারাও দাম কমিয়ে দেবে।

ক্রুডের দাম গত ১৬ বছরে ৬বার কমেছে। এবার কমলে হবে ৭বার। ১৯৫৪ সালের আগে ক্রুড অয়েল কেনা হত ২·0৪ ডলার (ব্যারেল পিছু) দরে।

ক্রুডের দাম কমছে বলে পেট্রল ব্যবহারকারীরা কিন্তু লাভবান হবেন না, তৈল শোধনাগার চুক্তি অনুযায়ী দাম হ্রাসের সমস্ত লাভটা পাবেন গভর্নমেণ্ট।
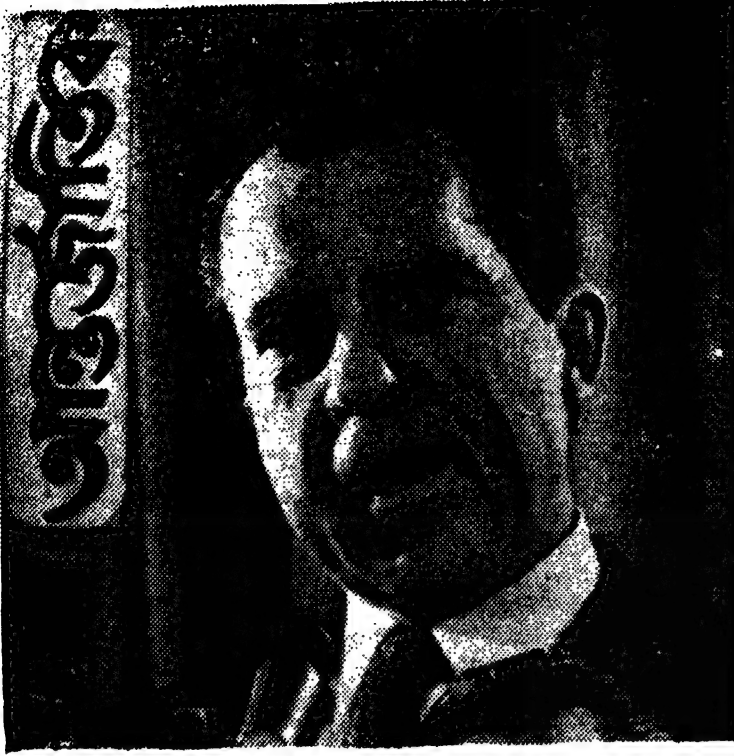
নিকসন কর্তৃক উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকী

**ইরাকঃ**

সামরিক অভ্যুত্থান ইরাকের ইতিহাসে নতুন কোন ঘটনা নয়। ১৯৫৮ সালে ইরাকী সৈন্যবাহিনীর প্রধানেরা নুরি এস-সাদের হাত থেকে জোর করে ক্ষমতা দখল করেন। তারপর থেকে কয়েকবারই এখানে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি জেনারেল আহমেদ হাসান আল-বকরও ১৯৬৮ সালের ১৭ই জুলাই সৈন্যবাহিনীর জোরেই ইরাকের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সবই ইরাকের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাইরের কারও হস্তক্ষেপ কোন অভ্যুত্থানের পেছনে ছিল না।

কিন্তু গত সপ্তাহে ইরাকে যে অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয় এবং সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, তার পেছনে বিদেশী হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে।

ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই অভ্যুত্থানের পেছনে ইরান, ইজরায়েল ও মার্কিন সি-আই-এ'র হাত ছিল।

যাঁরা ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ ইরাকী সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রসিদ মোহসেন ও কর্নেল মাহাদি সামারাই। বেশ কয়েকজন কর্নেল ও ক্যাপ্টেন এঁদের সংগে ছিলেন। তা ছাড়া প্রায় ৫০ জন বেসামরিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই চক্রান্তে অংশ নেন।

ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত প্রধানত বাগদাদের ইরানী দূতাবাসের মাধ্যমে করা হয়। দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী দাউজ তাহের ছিলেন চক্রান্তের প্রধান মন্ত্রণাদাতা। ইরানী দূতাবাসের সহযোগিতায় ইজরায়েল ও সি-আই-এ'র লোকেরা কয়েক হাজার মেশিনগান ও প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্রোহীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

তবে ইরাক সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ আগে থেকেই চক্রান্তের খবর জানতে পারে। তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাই যখন মধ্যরাত্রে চক্রান্তকারীরা রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে প্রবেশ করে, তাদের সহজেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় এবং সব চক্রান্ত ফাঁস করে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি আহমেদ হাসান আল-বকর ঘোষণা করেছেন, চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতি-মধ্যেই দু'শ'র ওপর ব্যক্তিকে চক্রান্তের সংগে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চক্রান্তের প্রধান প্রধান নায়ক-দের বিচার করে প্রকাশ্য স্থানে গুলী করে মারা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রীও আছেন।

ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকের সর্বত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে সাতিল আরব নদীর ব্যাপার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, ইরাকের উত্তরাঞ্চলে কুর্দ উপজাতির বিদ্রোহের পেছনেও ইরানের উস্কানি রয়েছে। তাই এবারের চক্রান্তের খবর ফাঁস হবার পর ইরানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছে। বাগদাদে ইরানী দূতাবাস সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়েছে। বাগদাদ, কারবালা, নাজিফ প্রভৃতি স্থানে বহু ইরানী নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ইরাকী সরকার সেনাবাহিনীর প্রধান-দের হাতে থাকলেও এঁরা বামপন্থী বাথ সোস্যালিস্ট পার্টির সংগে যুক্ত। বাথ সোস্যালিস্টরা ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে তাঁরা নাসেরের চেয়েও কড়া। তাই এঁদের উচ্ছেদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদাররা চেষ্টা করবে, এ খুবই স্বাভাবিক।

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ**

যাঁরা ভেবেছিলেন, রিচার্ড নিকসনের নেতৃত্বে মার্কিন সরকার যুদ্ধের পথ বর্জন করে ধীরে ধীরে শান্তির পথে অগ্রসর হবে, তাঁদের ধারণা যে কত ভ্রান্ত তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। ৩০শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি নিকসন এক টেলি-ভিশন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, মার্কিন সরকার উত্তর ভিয়েতনামের ব্যাপারে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবে। নিকসনের বক্তব্য, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র যখন দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য অপসারণ করছে, তখন উত্তর ভিয়েতনাম নতুন করে যুদ্ধপ্রচেষ্টা বাড়াচ্ছে। উত্তর ভিয়েতনাম যদি তার জঙ্গী মনোভাব ত্যাগ না করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাধ্য হবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আর, নিকসন হুমকী দিয়েছেন, "এ কাজ করার মত শক্তি আমাদের আছে।"

লিবিয়ার কাছে ফ্রান্স ১০০টি মিরেজ জেট বিমান বিক্রি করায় নিকসন খুব চটেছেন। লিবিয়া ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। সুতরাং, ইজরায়েলকে আরও সামরিক সাহায্য দিতে হবে। ইজরায়েলকে আর কি কি সামরিক সাহায্য দেয়া যায়, ৮০ দিনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে বলে নিকসন তাঁর টেলি-ভিশন সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন।

চীনের সম্ভাব্য পরমাণু আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও জোরদার করার কথাও বলেছেন নিকসন। রাষ্ট্রপতি নিকসন বলেছেন, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ও তার প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিত্র-দের, বিশেষ করে জাপান ও ফিলি-

পাইনসকে চীনের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করা হবে। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে চীন বড় রকমের একটি পরমাণু শক্তিতে পরিণত হবে। তাই এখন থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং, চীন, ভিয়েতনাম, পশ্চিম এশিয়া, প্রতি ব্যাপারেই নিকসন সরকার একই নীতি অনুসরণ করবেন।

লেসোথো :

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী দেশ লেসোথো—পূর্ব নাম বাসুটোল্যান্ড। এতদিন ব্রিটেনের অধীন উপনিবেশ ছিল, ১৯৬৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে নতুন নাম হয়েছে লেসোথো। পাহাড়-পর্বতের দেশ। লোকসংখ্যা ন'লক্ষের মত। রাজধানী মাসেরু।

৩০শে জানুয়ারী এখানে এক ক্ষমতা দখলের পর্ব হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী লেবুয়া জোনাথান সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন। রাজা মশোওশো'কে তিনি গদিচ্যুত করেছেন। রাজা এখন স্বগৃহে অন্তরীণ। দেশের সংবিধান বাতিল করা হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোষণার সংগে সংগে লেবুয়া জোনাথান এই কাজ করেছেন। নির্বাচনে জোনাথানের দল পরাজিত হয়েছে। বিরোধী কংগ্রেস পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। আইনসভার মোট ৬০টি আসনের মধ্যে ৩২টিতে জয়লাভ ক'রে এই দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

ক্ষমতা না ছাড়ার জন্যই লেবুয়া জোনাথান এই বেআইনী কাজ করেছেন। রাজার ক্ষমতা কেড়ে নেবার অজুহাত হিসাবে জোনাথান বলছেন, দেশের রাজনীতিতে নিরপেক্ষ থাকবেন বলে রাজা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি তা রাখেন নি। নির্বাচনে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন, এবং কংগ্রেস পার্টিকে ভোট দেবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই অবস্থায় রাজার সিংহাসনে থাকার কোন অধিকার নেই।

আসলে গোলমালটা অন্য জায়গায়। এতদিন লেবুয়া জোনাথানের সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের সংগে আপোষের নীতি অনুসরণ করে এসেছেন। দেশের অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গের তা পছন্দ নয়। প্রথম নির্বাচনের রায়ের মধ্য দিয়েই তারা জোনাথানের দক্ষিণ আফ্রিকা তোষণ নীতির বিরোধিতা করেছে। তারা চায় আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সংগে একসুরে কথা বলুক লেসোথো। শ্বেত বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের মতই তারাও লড়াই করতে চায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের পাশে দাঁড়াতে চায়।

এতেই জোনাথান ও তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার মুরুব্বীরা বিচলিত। নির্বাচনে যাঁরা জয়লাভ করেছেন, তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরামর্শে ও তাদের সাহায্যের ভরসায় জোনাথান ক্ষমতা দখল করেছেন। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ভরস্টার সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করেছেন।

কংগ্রেস পার্টির নেতা ডঃ নিটসু মোখেহেল, পার্টির সভাপতি আউদা খাসু প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস পার্টি সহজে এই ব্যবস্থা মেনে নেবে না। নানা স্থানে বিক্ষোভ সুরু হয়েছে। বিক্ষোভ দমনে গুলীও চালাতে হয়েছে।

(১-২-৭০)

## সমস্যা বাড়ছে—

'গোলেমালে গোলেমালে পিরীত
করো না
পিরীতি কাঁঠালের আটা,
আটা লাগলে পরে ছাড়ে না।
পিরীতি যোগডুমুরের ফুল
আলোকলতার মূল
সন্ধান না জানতে পারলে
সদাই করবে ভুল।
চিটে গুড়ে পিঁপড়ে পড়লে
পিঁপড়ে নড়তে চড়তে পারে না।'

**শুক্রবার** রাত্রে যুক্তফ্রণ্টের সভা যখন চলছে এবং রাত্র যখন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, তখন আমার সাংবাদিক বন্ধু ডঃ মুখার্জী এই গানখানি শুনিয়ে বললেন—চিটে গুড়ে পিঁপড়ে পড়েছে, আর নড়বার উপায় নেই, অতএব যুক্তফ্রণ্ট টিকে গেল। প্রকৃতপক্ষে শুক্রবার যুক্তফ্রণ্টের সভা বসবার আগে পর্যন্ত রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ ছিল অনন্ত, অতি বড় আশাবাদীও যুক্তফ্রণ্টের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গত কয়েক দিনে বাংলা কংগ্রেস নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছিল, যেটা হল 'পয়েণ্ট অফ নো রিটার্ন'। অর্থাৎ যেখানে গেলে আর ফেরা যায় না। আর সি-পি-এম দলও ধরে নিয়েছিল সরকার চলে যাচ্ছে, তাকে রক্ষার আর পথ বা উপায় অবশিষ্ট নেই। প্রকৃতপক্ষে এই দুই দলের মনোভাব এমন একমুখো গতিতে চলছিল যে, যে গতির সামনে কোন বাঁধই আর বাঁধ হিসাবে কাজ করতে পারতো না। কিন্তু এর মধ্যে একটা ব্যতিক্রম অতি হঠাৎ দেখা দেয়। এই ব্যতিক্রম হল যে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আর উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উভয়েই কেন যেন বড় বেশি সংবেদনশীল হয়ে উঠলেন, কেন যেন দুই জনেই বড় বেশি আপোষপন্থী হয়ে উঠলেন। তাই পরিস্থিতি হল এমন যে, শ্রীসুশীল ধাড়া ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যত বেশিই রাশ টানুন না কেন, এই দুই নেতা কিন্তু একটু পিছন ফিরে তাকাতে আগ্রহী হলেন।

২৫শে যুক্তফ্রণ্টের সভায় যুক্তফ্রণ্টের আপোষ প্রস্তাব ও আপোষের মনোভাব যুক্তফ্রণ্টের জীবন-প্রদীপে যতটা তেল দিয়েছিল, বাস্তবে কিন্তু সেই তেল উপে গেছিল নানা কারণে। ২৫শে সভা হল, ঠিক হল আর মারামারি, হানাহানি নয়—কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের সভা শেষ হয়ে বাইরে বেরুতেই দেখা গেল লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেছে, আর তারপর কয়েকদিন ধরে জেলায় জেলায় শরিকী হানাহানি একেবারে উদগ্রভাবে প্রকাশিত হল। সব দলই সব দলের সংগে মারামারি করলো। কথা হয়েছিল কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন কুৎসা করবে না, কিন্তু সভার পরদিনই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলে বসলেন—অজয়বাবু যুক্তফ্রণ্টের নেতাই নন। যুক্তফ্রণ্টের কোন নেতাই নেই। কিন্তু, তার আগের দিনই যুক্তফ্রণ্টের সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব হয়েছে—অজয় মুখার্জী দি লিডার অফ দি ইউনাইটেড ফ্রণ্ট এ্যান্ড চীফ মিনিস্টার ......কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের সভায় অজয়বাবু লিডার অফ দি ইউনাইটেড ফ্রণ্ট বলা হলেও প্রমোদবাবু বললেন—কে নেতা, কিসের নেতা—তারপর আবার ছাগলের বাট দেখিয়েও দিলেন। আর শ্রীসুশীল ধাড়া, তিনিও কিন্তু তাঁর একই গোঁ নিয়ে বললেন—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী। যুক্তফ্রণ্ট থাক বা যাক জানি না, মিনিফ্রণ্ট হয় হোক, পরোয়া নেই—হয় সি-পি-এম-এর আত্মসমর্পণ, না হয় যুক্তফ্রণ্ট ছত্রখান।

শুক্রবার যুক্তফ্রণ্টের সভার আগে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা শ্রীসুশীল ধাড়াকে বললেন (প্রতিবাদ হবে, তাই তাঁদের কারো নাম করবো না)—কি চান আপনি? কি করবেন আপনি? আমরা কিন্তু সরকারের সঙ্কট করে কোন কিছু করতে রাজী নই, সেটা জেনে রাখুন। শ্রীধাড়া তাঁদের জানিয়ে দিলেন—আমরা আর পারবো না, আমরা আর পারছি না—কাজেই যা হবার হবে। এইদিন রাত্রে কিন্তু সি-পি-এম দলের নেতারা আরো দৃঢ় বিশ্বাসে সরকার ভাঙলে কি করা হবে তার প্রস্তুতি চালিয়ে গেলেন। শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার অনেক রাত জেগেও সরকারী ফাইল সই করলেন, কারণ তাঁরা জেনেছেন, বুঝেছেন—কালই সরকারের শেষ দিন।

সরকারের শেষ দিন শুক্রবার, আর এই শেষ হবে যুক্তফ্রণ্টের সভায়, তাই সি-পি-এম রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটা সভা ডাকলো—জমায়েত করলো জরুরী সময়ের কমরেডদের। সি-পি-আই অফিসেও মজুত করা হল বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এই বাহিনীর সংখ্যা কত—সেটা শুধু একটা হিসাবে বোঝা যায় যে, সি-পি-আই অফিসে সভার দিন স্বেচ্ছাসেবকরা তেরশত পিস টোস্ট খেয়েছিল।

সভা বসবার কয়েক ঘণ্টা আগে সি-পি-এম দল থেকে এক শেষ আবেদনপত্র বিলি করা হল সেক্রেটারিয়েটের নামে। এই আবেদনে বলা হল—সরকার ভাঙলে জনগণের রায় অস্বীকার করা হবে, সেই কাজ যেন কেউ না করে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কিন্তু সকাল থেকে এক ভিন্ন পথে চললেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের জীবনে গান্ধীজীর জীবনের জন্ম ও মৃত্যু

দুইটি দিন এক অদ্ভুত দিন। তাঁর জীবনে এক চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন। ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর তিনি একটা কিছু ভেবে সমস্ত দিন চলে, শেষ মুহূর্তে অন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আবার ১৯৭০ সালে গান্ধীজীর মৃত্যুদিনেও তিনি অন্যরকম কিছু ভেবে শেষ মুহূর্তে মনকে ফিরিয়ে আনলেন। গান্ধীজীর জন্ম ও মৃত্যুদিনে শ্রীমুখোপাধ্যায় সকালে গান্ধীঘাটে যান, দুপুরে পার্ক স্ট্রীটে গান্ধীজীর মূর্তির পাদদেশে যান—এটা হল বাঁধাধরা কর্মসূচী। কিন্তু যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেটা কিন্তু বাঁধা-ধরা কর্মসূচীমত হয় না। তাই শুক্রবার যুক্তফ্রন্টের সভায় যাবেন না, এটাই ছিল অবধারিত, অন্ততপক্ষে শ্রীসুশীল ধাড়া এটাই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ সময়ে দেখা গেল শ্রীমুখোপাধ্যায়ই যুক্ত-ফ্রন্টের সভায় যেতে শ্রীসুশীল ধাড়াকে প্রায় বাধ্য করলেন।

যুক্তফ্রন্টের সভা বসলো, সভা চললো অদ্ভুত সুন্দরভাবে। কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু সভার শেষে হঠাৎ শ্রীজ্যোতি বসু জানতে চাইলেন এবার তো সব মিটে গেল, এইবার অজয়-বাবু বলুন, তিনি কেন সরকারকে অসভ্য বর্বর বলেছেন। শ্রীবসুর এই প্রশ্ন ছিল খুবই নির্দোষ। অর্থাৎ তিনি যেন তাঁর একটা কৌতূহল মিটিয়ে নিতে চান। কিন্তু এই কথাতেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে এবং প্রায় শেষ রাত্রে দেখা গেল অজয়বাবু আর জ্যোতিবাবু মনের রাজ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত রাজ্যে বাস কর-ছেন। অজয়বাবু বললেন, তাঁর কথা তিনি বিধানসভায় বলবেন। শ্রীজ্যোতি বসু বললেন—তিনিও বিধানসভায় তাঁর কথার প্রতিবাদ করবেন। আর সভা থেকে যাবার সময় দুই পক্ষই জানিয়ে দিলেন এতক্ষণ যা আলোচনা হয়েছে, সব বরবাদ হয়ে গেল।

অনেকদিন আগে আমি লিখেছিলাম, আমরা তেলের শিশি ভাঙলে পরে খুকুর ওপর রাগ করি, কিন্তু ধেড়ে খোকারা ভারত ভেঙে ভাগ করলেও মেনে নিই। এ হল সেই ট্রাজেডি। অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবু যুক্তফ্রন্টের একমাত্র রক্ষাকর্তা এই কথা অস্বীকারের কোন অবকাশ নেই—কিন্তু এই দু'জনই ভারত ভেঙে ফেললেও মেনে নেন, অথচ আবার তেলের শিশি ভাঙলে অসহ্য বোধ করেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় যুক্তফ্রন্টের সভা ভাঙলো কি ইস্যু নিয়ে? ইস্যু হল একটা প্রস্তাবে—২৫শে যুক্তফ্রন্টের সভার পর যারা হাঙ্গামা করেছে ও ২৯শে বিধানসভা ভবনের সামনে একটি ছাত্র শোভাযাত্রা যে ধ্বনি দিয়েছে, তার নিন্দা করা হবে। আপোষ-আলোচনা করে বিধানসভার সামনে ছাত্র শোভাযাত্রা কাদের, কোন দলের সব কিছু উহ্য রাখা হল। কোন দলের নাম করা হল না, এমন কি দিনের উল্লেখ পর্যন্ত করা হবে না, তা সত্ত্বেও শ্রীজ্যোতি বসু সেই প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না। আর শ্রীঅজয় মুখার্জিও বললেন, কোনক্রমে ঐ প্রস্তাব পাশ না হলে কিছু মেনে নিতে পারি না।

যেখানে শ্রীজ্যোতি বসু মন্ত্রিভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটি বিবেচনার আশ্বাস দেন, থানাভিত্তিক কমিটি আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করেন, যেখানে সভা-শোভাযাত্রায় অস্ত্রবহনে সকলে সংযত হবার প্রতিশ্রুতি দেন, যেখানে শ্রীজ্যোতি বসু ডাক ছেড়ে বলতে পারেন যুক্তফ্রন্টের কাউকে তিনি জোতদার ও জোতদারের দালাল মনে করেন না, তখন একটা দিন-তারিখহীন দল-সংগঠন-নামহীন প্রস্তাবের চারটে লাইন সহ্য করতে পারেন না। আবার শ্রীঅজয়

**************************

**সবিনয় নিবেদন**

**অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় হরপ্রসাদ মিত্রের 'বই বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা' ও 'অগ্নিবর্ণ'-এর 'তিমিরপ্রান্ত ডুয়ার্স' প্রকাশ করা গেল না।**

**—সম্পাদিকা**

**************************

মুখোপাধ্যায় সর্বংসহ শিবের মত সব কিছু মেনে নিয়ে যখন সব কিছু বজায় রাখতে অভূতপূর্ব ধৈর্যের পরিচয় দেন, তখন চার লাইনের একটা ঠুনকো প্রস্তাব না হলে সব অচল হবে ধরে নিয়ে অধৈর্য হন—, এ হল ঐ তেলের শিশি ভাঙলে অসহ্য হওয়ার সামিল।

কিন্তু কি চান অজয় মুখার্জি, কি চান শ্রীজ্যোতি বসু? এই অতি সাধারণ প্রশ্ন দুটোর জবাব কিন্তু সহজে দু'জনের কেউ দিতে পারবেন না। শ্রীঅজয় মুখার্জি যদি চান রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলে রাজ্যের ভাল হবে, সি-পি-এম-এর নামে যে অরাজকতা চলছে সেটা বন্ধ হবে, সি-পি-এম-কে বাদ দিলেই ভাল নতুন সরকার হবে তবে সেটা কোন ক্রমেই বাস্তবসম্মত নয়। **বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙলে রাজ্যে নতুন কোন ভাল সরকারের আশা চিরতরে লুপ্ত হবে। ১৯৬৭ সালে রাজ্য দুটো ফ্রন্ট মানুষ সহ্য করেছে, কিন্তু ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট তৈরি হবার পর সেই ফ্রন্ট ভাঙা কারো সহ্য হবে না। কার দোষ, কে বেশি দোষী—সেই বিচার অনেক দূরের কথা। কিন্তু মানুষ মনে রাখবে ফ্রন্ট ভেঙে গেল, এই নেতারাই ভাঙলেন। কাজেই ফ্রন্ট ভাঙা নেতাদের কেউ আর জনগণের নেতা বলে মনে করবেন না।**

শ্রীজ্যোতিবাবুকেও জবাব দিতে হবে। জবাব দিতে হবে যে, তাঁর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, তিনি সবচেয়ে বড় দলের নেতা—কিন্তু কেন তিনি পারলেন না গুণ্ডাবাহিনীকে সায়েস্তা করতে? কেন পারলেন না মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ অটুট রাখতে? কেন পারলেন না মানুষের ধন-জীবন-মানের নিরাপত্তা রক্ষা করতে? মানুষের মনে নিরাপত্তা থাকবে না, খুন-জখম, রাহাজানি বন্ধ হবে না, অথচ সরকার থাকবে—সেই সরকারকে অসভ্য বললে সহ্য হবে না এবং সেই কারণে সরকার ভেঙে যাবে, এটাও মানুষ মেনে নেবে না। কাজেই সরকার ভাঙলে লোকে শুধু মনে করবে—অজয়বাবু সরকার ভাঙলেন আর জ্যোতিবাবু তাঁর সব দায়িত্ব পালন করে সরকার রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, এই কথা সহজে কেউ মেনে নেবে না। কাজেই সরকার ভাঙলে মানুষ একটা কথাই সব চেয়ে আগে বলবে—অজয়বাবু জ্যোতিবাবু রাজ্যের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে সরকার গঠন করেও সরকার রক্ষা করতে পারলেন না। গলাবাজী করে দোষ যার ওপরেই চাপানো হোক না কেন, কেউই নিজেকে মানুষের কাছে নির্দোষ সাধু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা ও সরকার ভেঙে পড়ার দায়-দায়িত্ব দু'জনকেই নিতে হবে। আবার বর্তমানে যেভাবে সরকার চলছে, সেভাবে চলবারও কোন অর্থ নেই। যদি সরকার চালাতে হয়, তবে সরকারকে সরকারের মত করে চালাতে হয় আর যদি পথে-ঘাটে বিপ্লবের মহড়া দিতে হয়, তবে রাইটার্স বিল্ডিংস ছেড়ে মাঠে-ময়দানে নামতে হয়। কিন্তু গাছেরও খাবো তলারও কুড়াবো, পথে বসে মলমূত্র ত্যাগ করবো আবার পথিককে চোখ রাঙাবো—এই কাজগুলি একসঙ্গে চলে না। সংসদীয় গণতন্ত্রে "যেমন বেণী তেমন রবে, চুল ভেজাব না—" এমন নীতির কোন অবকাশ নেই, সংসদীয় গণতন্ত্র হল চিটে গুড়—এখানে নামলে নড়া-চড়া যাবে না, গুড়ের মধ্যেই থাকতে হবে।

॥ তিন ॥

ঝগড়া পাঁচির মার আর থামছে না যেন।

বিছানা ছেড়ে সবাই আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভোরের অন্ধকার তখন প্রভাতী আলোয় স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। দেখলাম দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে একটি মহিলা। এই মহিলাটিই পাঁচির মার খোকাকে নিতে এসেছিল। মাথায় কাপড় দেয়া সিঁদুরের টিপ পরা অল্প বয়সী মহিলাটি। পরনে অত্যন্ত সাদাসিধে একখানা শাড়ী। পাঁচির মা একটা শত-জীর্ণ মশারি থেকে আধখানা বেরিয়ে এমনভাবে ফুঁসছে যে, দেখলে মনে হবে হাতের কাছে যদি সে কিছু পায় তো এখুনি তা ছুড়ে মারবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ মহিলাটিকে।

মা বললেন, 'দ্যাখ পাঁচির মা, তুই ছেলে না দিস্ না দিবি, কিন্তু তুই এই সাত-সকালে মেনকাকে গাল পাড়বি কেন বল্ তো?'

'গাল কি সাধে বেরোয় মাসি! পাঁচির মা তার ছেলেটাকে মশারির ভেতর থেকে প্রায় একরকম হেঁচকা টান দিয়েই বের করে ফেললে। তারপর বললে, 'দ্যাখো দিদি বাছার পাছাটা!'

সবাই তাকিয়ে দেখল সত্যিই ছেলেটার পাছায় দাগড়া দাগড়া দাগ।

মেনকা বললে, 'দ্যাখো তো মাসি, দ্যাখো ভাল করে ও দাগ খিমচি কাটার দাগ, না ওগুলো মুতকুড়ি? পেটে ধরলেই ছেলের মা হয় না। নিজে সারারাত ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোবে, ছেলেকে তুলে মোতাবে না, সারারাত মুতো কাঁতায় পড়ে থাকবে ছেলে—হ্যাঁগা, তাতে মুতকুড়ি হবে না মাসি? কিসের মায়া বলদিকি ভাই! তা না হলে ছেলের মর্ম আমরাও বুঝি!'

পাঁচির মা সহসা রণে ভঙ্গ দেবার মানুষ নয়। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ছেলের মর্ম তুই কি বুঝবি লা—ধরিচিস পেটে, না ধরতে পারবি?'

এবার মা ধমক দিলেন পাঁচির মাকে। তারপর বললেন, 'এই সাতসকালে এসব কথা তুলে তুই তোর মতই আরেক হতভাগিকে এমন করে ইতরের মত ঘা মারবি কেন বল্ তো? আমি তো দেখি মেনকার মত মেয়ে আমাদের এ তল্লাটে নেই—পক্ষাঘাতে পড়ে থাকা স্বামীকে নিয়ে সে তো ভিক্ষে-সিক্ষে করে যা হয় করে বাঁচিয়ে রেখেছে। ছেলেপুলে ওর হয় নি, সে ওর কপালে নেই। কিন্তু তোর মত তো ও ভেসে বেড়ায় নি?'

মায়ের এই একটা কথাতেই যুগপৎ দুটি বিবদমানা নারীর সম্পর্কে আমার একটা স্বচ্ছ ধারণা হয়ে গেল। বিশেষ করে মেনকা সম্পর্কে আমি কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। যেমনি বিচিত্র তার জীবন, তেমনি বিচিত্র তার জীবিকা। তবু তার মধ্যে জীবনকে দুরারোগ্য সংক্রামক আবহাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখার কি অক্লান্ত প্রয়াস!

পাঁচির মা মায়ের কথার ওপর, বিশেষ করে তার সম্বন্ধে মায়ের ভেসে বেড়ানো উক্তির প্রশ্নে কি যেন একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলো। সবে সে বলে উঠেছে, 'দ্যাখো মাসি', ঠিক সেই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল—পাঁচির মার খোকাটি 'মাতি' 'মাতি' করে মেনকার দিকে দুহাত বাড়িয়ে মায়ের কোলে ছটফট করে উঠল।

মেনকা স্থির থাকতে পারল না। দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। ছেলেটা তেমনি করে পুনরায় হাত বাড়িয়ে আরও ছটফট করে উঠল। অকস্মাৎ জীবনী পরাজয়ের মোহানায় দাঁড়িয়ে পাঁচির মা আর স্থির থাকতে পারল না—বসিয়ে দিলে ছেলের পিঠে প্রচণ্ড একটা চাপড়। ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে উঠল, 'মা-তি-ই-ই-ই!'

'আহা হতভাগি, ওকি করলি? আহা-আ, আ!' চেঁচিয়ে উঠে মা ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে কেড়ে নিলেন পাঁচির মার কাছ থেকে। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে মার কোল থেকে মেনকার দিকে হাত বাড়াতে লাগল। মেনকা এগিয়ে আসতেই ছেলেটা তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে তার কান্না গেল থেমে এবং মুখে ফুটে উঠল শিশুর সেই মিষ্টি বোল, 'মাতি তলো—!'

মা বলে উঠলেন, 'আরে বিট্‌লে—'

মায়া ও আমি হেসে ফেললাম। পাঁচির মা সম্পূর্ণ পরাজিত। তবু পরাজয়কে বিস্ময়ের আবেগে মেনে নিয়ে সে বলে উঠল, 'আশ্চর্য! ছেলে যেন আমার নয়।'

মা বললেন, 'ওরে পাঁচির মা, শিশুরা হোল অন্তর্যামী—ওরা বুঝতে পারে সব।'

পাঁচির মা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল শুধু। মেনকা পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে জয়ের আনন্দে হাসিমুখে ছেলে কোলে চলে গেল।

আমরা ঘরের ভিতরে চলে আসছিলাম। হঠাৎ দাওয়ার নিচে সেই অল্প গায়ক একটা চাদর গায়ে এসে বলে উঠল, 'মা-সি-ই-ই!'

মা তাকে দেখে বলে উঠলেন, 'কি ভানু, কি খবর?'

'মায়াকে নিতে এলুম মাসি!'

'মায়া যা-বে-না!'

ভানু বললে, 'যাবে না ও, আমি আগেই বুঝেছিলুম। এই যে দাদাবাবুকেও দেখছি সামনে। মায়া কাল আমার দাদাবাবু ধরে এনেছে। এখন কি আর তার ভানুদাকে কোন কাজে লাগবে?'

মায়া বললে, 'কী আবোল-তাবোল বকছ ভানুদা?'

'আবোল-তাবোল কী। আমরা যে ওস্তাদের রাজত্বে বাস করছি—সেখানে কি এসব কথা অচল মায়া? তবে দাদাবাবুই জানেন আর যাই-ই করো, তাদ বাজপাখীর মত নজর থেকে তুমি কস্মিনকালে না কোন-দিন।'

মা বললেন, 'ভানু, সব কথার একটা সীমা আছে।'

'তা আমিও জানি মাসি।'

'তবে?'

'তবে আর কি। ও সাধু-সন্নিসি দেখে মন গলবে না ওস্তাদের। তা তার সাগরেদ বসন্তকেও তো জানো?

দরকার হলে সে পারে না, এমন কোন কাজ নেই।'

মা বললেন, 'তাতে আমার কী!'

'তাতে তোমার কি নয় মাসি', ভানু বলতে লাগল, 'মায়ারই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। এই ধরো, বসন্ত বা ওস্তাদ যদি টের পায়, মায়া অন্য কোথাও ভিড়ছে, তা হলে এখুনি তারা মায়াকে টাইট দিয়ে দেবে।'

মা এবার রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'সেই ভয় দেখিয়েই কি তুমি মায়াকে নিতে এসেছো?'

'না মাসি!' এর পর সংগে সঙ্গে ভানু গায়ের চাদরটা খুলে দু'হাত মেলে ধরে বললে, 'এই দ্যাখো—মায়া যে যাবে না সে জেনেই আমি এই ব্যবস্থা করে এসিচি।'

আশ্চর্য! দেখলাম একখণ্ড উত্তরীয় বাঁধা গলায়। তাতে ঝুলছে একটা চাবি। অর্থাৎ যেন কোন গুরুজন মারা গেছে। আর তাই সে কাছা গলায় করেছে। আমাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে ভানু অতঃপর বলে উঠল, 'মাতৃ দায় বলে আজ থেকে ভিক্ষে করব—কাজেই মায়া না গেলেও আমার কোন অসুবিধে নেই। কিন্ত মায়া করবে কি?'

মা চুপ করে গেলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না। সব কথার শেষ কথা —মায়া করবে কী! এই কথাটাকেই তিনি কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সেইখানে সেই সকালবেলায় দাঁড়িয়ে প্রভাতের ক্রমবর্ণায়মান আকাশের মত আমার মনের দিগন্তে যেন কোন এক ক্রমবর্ণায়মান জগৎ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে লাগল। যে রাজত্বে বাস করে এরা, সে রাজত্বে আছে সম্রাট আর সে সম্রাটকে বলে এরা ওস্তাদ। ওস্তাদের সাকরেদ আছে—সে সাগরেদের নাম বসন্ত। ওস্তাদের বাজপাখীর মত নজর। সে নজর থেকে মায়া ফস্কাবে না। তার ওপর বসন্ত—দরকার হলে সে পারে না এমন কোন কাজ নেই। সহসা বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ভয়ের শিহরণ সুরু হল। ইতিপূর্বে মায়ার দাদা প্রসঙ্গে এই সম্রাট বা ওস্তাদের কথা শুনেছি। তখন তা শুনে কিন্তু আমি এতখানি ভয় পাই নি—যা এখন পেলাম। এমনিতরো এক ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে মা কি পারবেন তাঁর স্নেহের কন্যাটিকে মনের ডানা দিয়ে আড়াল করে রাখতে? মন আমার হু হু করে উঠল। না, না, মা কিছুতেই পারবে না।

ভানু তখনও যায় নি। যাবার সময় সে শুধু বলে উঠল, 'মাসি যতই যা করো, এই শর্মাকে তোমার দরকার হবেই—মায়া যখন ছোট্ট এতটুকু, তখন থেকে আমিই ওকে দেখিচি আর দরকার হলে আমিই ওকে রক্ষে করতে পারব। আর কেউ নয়—'

মা বললেন, 'ভানু, এসব কথা তো আমি বলি নি তোমায়! মায়া যাবে না কেন সে তুমিও বোঝো, আমিও বুঝি। একটা ভদ্দরলোকের ছেলে, হতে পারে সন্নিসি, সে এসেছে আমার বাড়ীতে। তাকে রেখে মায়ার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'আমিও তো সেকথা বলি নি মাসি!' ভানু বললে, 'যদি মায়ার মনে সন্নিসির গেরুয়ার মত রঙ ধরে থাকে, তা হলে যে তার রক্ষে নেই, আমি শুধু সেই কথাটাই বলতে চেয়েছি।'

'কি বলছ ভানু' মা বললেন, 'ওদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক।'

ভানু প্রায় এক বিঘৎ জিব কেটে বলে উঠল, 'আরে তোবা তোবা, এতক্ষণ বলতে হয়। সন্নিসি ঠাকুর আমার দাদামণি। ছিঃ ছিঃ, আমি শুধু এতক্ষণ আসমানেই ঘুসি ছুঁড়িচি।'

এবার মায়া বললে, 'মানে?'

'মানে তুই বুঝতে পারলি না! তোর বয়স হয়েছে। এখন তোর মনে কত রঙ লাগবে। সে রঙে ডগমগ হয়ে তুই কি আর আমায় দেখতে পারবি? আমি সেই কথাটাই বলতে গেসলুম। এখন দেখছি শালা একেবারে উল্টো!'

'কেন তোমার মনে এসব কথা উঠছে বলদিকি?'

'মনটা মানুষের এমনিই রে!' ভানু বলতে লাগল, 'যাকে স্নেহ করা যায় ভালবাসা যায়, অপরে সেখানে নাক গলাতে এলে বড় কষ্ট হয় রে, বড় কষ্ট হয়। হ্যাঁরে মায়া, আমি কি তোকে ফেলতে পারব কখনো? তুই বুঝিস না আমাকে? তোর দাদা শংকর আর আমি, আমরা যে পরস্পর দুটো ভায়ের মত রে! যাক, আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে—আমি চলি!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'দাদামণি—ভাই কিছু মনে কোরো না—ভুল করে আমি তোমার সম্বন্ধে ওসব কথা ভেবিচি।'

ভানু চলে যেতে আরেক অনুভূতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। এক নোংরা অভিশপ্তময় জগতে এরা বাস করে, কিন্ত কি অদ্ভূত সব মানুষ। নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই এদের অন্যান্য মানুষের মত। সেখানে একটুও তফাৎ নেই। যাকে স্নেহ করা যায়, যাকে ভালবাসা যায়, অপরে সেখানে নাক গলাতে এলে বড় কষ্ট হয় রে, বড় কষ্ট হয়—এই সহজ সত্য কথাটা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে এ তো আমরা অহরহ দেখি। মা তার পুত্রকে স্নেহ করে এবং সে স্নেহের তুলনা হয় না, কিন্তু যেই পুত্রবধূ আসে ঘরে, যেই সে পুত্রবধূ স্বামীকে তার আরও বেশি কাছে টানতে চায়, সেই মা তার সব কিছু যেন চলে যাচ্ছে বলে হাহাকার করে ওঠে, ক্ষুব্ধ হয়, যত রাশ টেনে ধরতে চায়, তত যেন হারাবার ভয় হয়। অনেক স্ত্রীকে এ অবস্থায়ও পড়তে দেখা যায়, স্বামী যখন অন্য মেয়ের সংগে মেলামেশা করছে তখন সে কিছুতেই তা সহ্য করতে পারছে না। তার একান্ত ভালবাসার পাত্রের ওপরে অপরে ভাগ বসাচ্ছে—এ সে সহ্য করবে কি করে? বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও তাই। তাই ভানুর কথাটায় তার ওপর মনটা আমার কেমন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। গতকাল হতে অন্ধ সাজা থেকে আজকের কাছা গলায় করে তার ভিক্ষা উপার্জনের চেষ্টা—এ দেখে তার যে লোক ঠকানো চরিত্র—সে চরিত্রে যে এমন মাধুর্য আছে—এ আমি ধারণাও করতে পারি নি। এখন এই মুহূর্তে সেটুকু প্রত্যক্ষ করে মনটা যেমন প্রসন্ন হয়ে উঠল, তেমিনই এক স্নিগ্ধ-সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আমি যেন এক অন্য লোকের সন্ধান পেলাম।

আমার মনের প্রসন্নগম্ভীর প্রতিচ্ছবি বোধ করি আমার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছিল এবং মা ও মায়া দুজনের কাছেই তা ধরা পড়েছিল, তাই দুজনেই ওরা একসংগে ঘরে যাবার জন্য আমাকে ইংগিত করলেন।

আমি ঘরে এলাম। ওরাও আমার পিছুন পিছুন এলেন।

পাঁচির মা তখনও গজ গজ করছিল। বিরক্তি যেন তার থামার নয়। গজ গজ করতে করতে বললে, 'সাত বছরের বুড়ো মেয়ে, রোজ রোজ বিছানায় মুতবি?'

পাঁচি নাকি সুরে বললে, 'আমি নাকি —ভাই তো!'

'হারামজাদি, ভাই যদি মুতবে তো তোর জাঙিয়া ভিজে কেন?'

'হ্যাঁ, বলেছে ভিজে?'

'কি—কি এটা?' বোধ হয় পাঁচির জাঙিয়া ধরে পাঁচির মা গোটাকতক হেঁচকা টান মারলে। পাঁচি বললে

'এ রকম করলে আমি পালাবো!'

'পালাবি কোথায়—পালা না!'

# ঠিক নেই

জগন্নাথ চক্রবর্তী

কখন বারোটা বাজবে ঠিক করা আছে
কাঁটায় কাঁটায়,
যখন মাথায় সূর্য, পথ রোদপোড়া
যখন তৃষ্ণার জিভ গণ্ডূষের প্রতি,
ছায়াশূন্য পথের পাদপ—
সময় ঠিক করা আছে সব।
কখন শিমুল ফুটবে আদিগন্ত মাঠে
রেল লাইনের ধারে জলের কিনারে
কনকচাঁপার গাছ ছড়াবে সৌরভ
ঠিক করা আছে।
কখন খড়কুটো দিয়ে বাসা বাঁধবে সে-আদেশ
পাখির রক্তের মধ্যে বাজে,
কখন ডিম পাড়ে মাছ ঢেউয়ের আড়ালে
সময় নির্দিষ্ট আছে তার,
যেমন বৃক্ষের ত্বকে বয়সের ঠিকুজি উদ্ধৃত
তেমনি সময়কাল ঠিক করা থাকে।
কখন রেডিও খুলে দিনের খবর,
নদীতে বন্যার স্ফীতি আকাশে মৌশুমী,
কখন নামবে চাঁদে মহাকাশযান
এবং মানুষ যাবে গ্রহান্তরে,
গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা আকাশে পূর্ণিমা
সময় ঠিক করা আছে সব।

ঠিক নেই শুধু তার
যার নাম কাল।
সে কখন চোখের মোমবাতি
ফুঁ দিয়ে নেভাবে এসে, নিয়ে যাবে দৃশ্যের আড়ালে—
ঠিক নেই, কিছু ঠিক নেই।
যেমন ঠিক নেই
কখন বুকের মধ্যে আরেক বুকের ইচ্ছা
ছড়াবে গোলাপ,
কখন হঠাৎ
কালের ঘড়িরা চুপ,
চোখে চোখ হৃদয়ে হৃদয়
প্রথম দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বা চতুর্থ প্রহরে
দিনে কিংবা রাতে, শীতে অথবা বৈশাখে
কিছু ঠিক নেই।
মৃত্যু আর প্রেম
একই রূপ,
কখন গলায় দেবে মালা
কখন সমুদ্রে নিয়ে যাবে
ঠিক নেই।

---

'পালাবই তো!' দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম পাঁচি ভোঁ ভোঁ করে দৌড় দিলে কোথায়। পাঁচির মা গজ গজ করতে করতে বলতে লাগল, 'পালা না, মরগে না—তোর সেই বুবাটা, কাণাকড়ির মুরোদ নেই যে মিন্সেটার, সেই তো সম্বল তোর। মোল্লার দৌড় মসজিদ। যাবি কোথায়, তিন কুলে সব খেয়ে বসে আছিস। সেখানেই তো যাবি। তা সেখানে কি তোকে দু-মুঠো দেবে, সেখানে আছে জাঁহাবাজ মাগি, সোহাগিনী সুন্দরি! দেবে মুড়ো ঝাঁটা মুখে গুজে! আবার এলতলা, বেলতলা—সেই পাঁচির মার হেঁচতলা—যাবি কোথা লো হারামজাদি!'

এর পর মা বললেন, 'দেখলে তো বাবা এখানে আমরা কি সুখে থাকি?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

মা বললেন, 'মায়া, যা এবার তোর দাদার চা-টার ব্যবস্থা কর! সেই ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে বেচারী শুধু ঝগড়াই শুনছে।'

বললাম, 'তাড়াতাড়ি করতে হবে না। আমি মুখটুখ ধুই মা! তারপর চা খাব।'

চা-টা খাওয়ার পর বেলা বেড়ে চলল। নিয়মিত অভ্যাসের বশে মায়াকে দিয়ে একখানা খবরের কাগজ আনিয়েছিলাম। সেটাই তন্ন তন্ন করে পড়ছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে কেমন করে যেন রটে গিয়েছিল মায়াদের বাড়ী এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী এসেছে। এখানে যারা আসে তাদের ওপরটাকে কেউ বিশ্বাস করে না। ভিতরে সে কী—সেইটাই সবাই জানতে উৎসুক। তারই জন্যে দুজন একজন করে লোক আসছিল মায়াদের বাড়িতে। মা দাওয়ায় তোলা উনুনে রান্না করছিলেন। মায়া মাকে সাহায্য করছিল টিউবওয়েল থেকে জল এনে দিয়ে, তরকারি কুটে, বাটনা বেটে।

লোকে আসছিল আর মাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'সাধুটি কে গো?'

মা বলছিলেন, 'সাধু সাধুই—সাধু আমাদের আবার কে হতে যাবে!'

কয়েকবার কয়েকজন স্ত্রীলোক আর পুরুষও উঁকি দিয়ে আমাকে দেখে গেল। আমিও তাদের মুখ তুলে তুলে কয়েকবার দেখলাম। সকলের মুখেই কেমন একটা অনুসন্ধিৎসু ভাব! এর পর একটি মুখ আমার নজরে পড়ল—যে মুখখানা শুধু আমাকে একবার দেখেই চলে গেল না—ঘরের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে এসে ঢুকে পড়ল। সুন্দর একটি যুবক। বয়স হয়তো আমার চেয়ে বছর পাঁচ-সাতেক ছোট হবে। হয়তো সতেরো-আঠারো। আমি তার চোখের দিকে তাকাতে, সেও নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। সে এসে আমাকে প্রণাম করল।

এ রাজ্যে এমন সহবৎ আছে! বিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম। তারপর বললাম, 'বোসো।'

ছেলেটি বসল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নাম ভাই তোমার?'

'মন্টু।'

'হঠাৎ আমার কাছে কি মনে করে এলে মন্টু?'

'এমনই। শুনলুম যে, আপনি একজন সাধু—আমাদের এখানে এসেছেন, তাই এলুম।'

'সাধু শুনেই এলে?'

মন্টু ঘাড় নেড়ে জানালো, 'হ্যাঁ।'

বললাম, 'একটু খোঁজ নিলে না—আমি সত্যিকারের সাধু, না ভণ্ড সাধু?'

'ভণ্ড হবেন কেন?'

'তোমার কি বিশ্বাস হল, আমি ভাল সাধু?'

'সেই মনে করেই তো এসেছি!' মন্টু আরও বললে, 'ভণ্ড সাধু হলে কখনো খবরের কাগজ পড়তেন না।'

'তুমি লেখাপড়া করো?'

'না।'

'কি করো?'

মন্টুর মুখে বেদনামিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল আমার প্রশ্নে। বেশ বুঝতে পারলাম, এই অভিশপ্ত জগতে আবার এমন একটি চরিত্র পেলাম—যাকে পরবর্তী সময়ে এক অদ্ভুত ধরনের বলে মনে হতে পারে।

(চলবে)

ভাগ্যান্বেষণের পথে কোনও সোনার গলি খুঁজে পান নি বিভূতিবাবু (পথের পাঁচালীর নয়, আমার জনৈক বন্ধুবর)। লক্ষ্মীর বরলাভের মোহে বিভূতিবাবু বার বার ঠকেছেন ও ঠেকেছেন এবং অবশেষে বুঝেছেন : সরস্বতীর গলিতে লক্ষ্মীর ঠিকানা খুঁজতে হলে 'ভুলভুলাইয়া'য় ঢুকে বেরিয়ে আসার হিম্মৎ রাখতে হয়। নচেৎ সামনে নির্ঘাৎ লালবাতি পথ রুখে দাঁড়াবে। সেই সরস্বতীর গলিতে লক্ষ্মীর আরাধনার জায়গা কলেজ স্ট্রীটের বই পট্টি। অন্তত প্রতীকী অর্থে তাই-ই। কারণ বই-এর ব্যবসা বললেই কলকাতা শহরে যে গলিপথ স্মরণে আসে, সেটা কলেজ স্ট্রীট। বন্ধুবর ঠিক অমনি এক গলিপথে পা ফেলেই বেবাক ফেঁসে গেছেন। বর্তমানে মাণিকবাবুর দিবা-রাত্রির কাব্যের মাস্টার মশায়। কিতাব-পত্রিকার প্রেমে পড়ে শুধু ছাই, শুধু ছাই। ঘর বাঁধাও হল না, প্রেম করাও হল না। নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি মাত্র।

সেই তাঁকেই একদিন মুরুব্বি পাকড়াও করেছিলাম ভুল করে। পথের মাঝে হেঁকে বলেছি : বিভূতিবাবু যে! আরে দাদা, একটু আমাদের দিকেও নজর দিন! কোন্ যৌবন-সমাগমে একটা কিতাব মহানুভব প্রকাশকের নজরে পড়ে ছেপে বার হয়েছিল, তার পরও গন্ডাখানেক পুস্তক করেছি, কিন্তু পুস্তকস্থ করার চান্স আর মিলছে না। আপনার তো ঐ বাজারে বেশ দহরম মহরম। যদি...

উত্তরে কপাল কুঁচকে সতর্ক সারমেয়র মতো আমার চোখে কিসের যেন গন্ধ শুঁকলেন বিভূতিবাবু। পরে হাতের চেটো চ্ছত্রাকারে উল্টে ধরে বললেন : উপন্যাস? নাঃ, কেউ ছাপছে না। থান ইঁট দু'চারটে অবশ্য কাটে। লাইব্রেরী সেল আছে। জীবন ফেঁটিয়ে অথবা ইতিহাস উল্টিয়ে ধরলেও বা এক কথা। ওসালে ছোট এবং উপন্যাস,—ওসবের কোনো মার্কেট নেই।

একটু থেমে গলা খাটো করে বিভূতি-বাবু পুনশ্চ যা বললেন, তাতে রীতিমত আমার বাক্য-স্থিব। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলাম যখন বিভূতিবাবু বল-ছিলেন : বই-ফই আর কাটবে কী করে মশায়! দেশময় যা কাটছে তা হ'ল লটারী। সারপলস বাজেটের নগণ্য অংশে কেউ কেউ বই কিনে পড়তেন। দু'চার জায়গায় উপহারও দিতেন। লটারী এসে দখল নিয়েছে' সেই বিলা-সিতাটুকুরও।

লটারী! বাস্তবিক শহর কলকাতার ওপর এই নূতন উপদ্রবটি সব সময় পথ আগুলিয়া আছে বটে। তবে ওটির পেছনে এমন মারাত্মক পুস্তকঘটিত সমস্যা আছে, কৈ বিভূতিবাবুর মতো তা তো কখনো মনে হয় নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আর একজনের কথা। একটি মাসিক পত্রের সম্পাদকও একই কথা বলছিলেন সখেদে। বলছিলেন : কলকাতার মার্কেটে ছোট ম্যাগাজিনের এমনিতেই চাহিদা কম। পাকিস্তান হয়ে পুরো বাঙলার বাজারটাই তো আট ভাগের তিন ভাগ। ভরসা মফস্বল। ইদানীং স্টল থেকে যাও-বা দু'চার কপি উঠত, লটারীর কল্যাণে তা-ও কমছে ক্রমশ। এবার অফিসে তালা ফেলতে হবে।

আমল দিই নি কথা কটি। ভেবে-ছিলাম, রচনার রেট কমাবার জন্য ওটা ওনার সম্পাদকীয় চতুরালি মাত্র। কিন্তু বিভূতিবাবু তো আর আমার লেখা পয়সা দিয়ে কিনতে যাচ্ছেন না, তবে? লটারীর লগুড় বস্তুতই কি বই-বাজারে এইভাবে মুগুর ভাঁজছে? অসম্ভব কেন? বাজারের যে কোন আঘাত তো আগে এসে ধাক্কা দেয় বই-বাজারেই। ইতিপূর্বে বই-জগতের শুভাশুভে একটা উল্লেখ্য অংশ ছিল শুভ-বিবাহের। কিন্তু ইদানীং বিবাহোপলক্ষেও সৌখীন এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীই লোকে সংগ্রহ করেন। কলকাতায় মার্কেট পায় না বই আর ছোট পত্রিকা। সরস্বতীর প্রতি লক্ষ্মীর লাঞ্ছনা এখানে দুয়োরাণীর ওপর সুয়োরাণীর মতো। কলকাতার বাজারে কিছু সেক্স, কিছু ফিল্মী কাগজ কাটে। কাটে দু'চারটে সাপ্তাহিক; ফ্রন্ট আমলে তাও আবার অধিকাংশই রাজনৈতিক।

: ভাগ্য মানেন? আমার চিন্তাজাল ছিঁড়ে প্রশ্ন আসে।

বিভূতিবাবুর প্রশ্নে ফিরে তাকিয়েছি। ঘাড় নেড়ে কবুল করেছি : মানি। ঐ যতটুকু লোকে বলে, 'গড ডিজপোজেস', ততটুকুই। তা ছাড়া নিরুপায়। ভাবি এক, সে যে করায় আর এক! সাঁইত্রিশ বছর এই ভেল্কিই দেখে আসছি' জনান্তিকে ভাগ্য মানি বৈ কি।

: যাক, স্বীকার করলেন। অস্বীকার করাটাই আজকের ফ্যাশন। বিভূতিবাবু গম্ভীর হলেন : এই আমাকেই দেখুন, কর্মের লাঙ্গুল ধরে ঢের 'ঘোড়া পাক' খেলাম, হাত-পা'ও অনেক ছড়েছি। এখন সর্বাঙ্গে ঘা।

সামান্য কৌতুক করার লোভ সামলাতে না পেরে প্রশ্ন করলাম : টিকেট কেনেন? ঐ লটারীর?

: কিনি। হতাশ জবাব বিভূতি-বাবুর : কলেজ স্ট্রীটে কফি খাওয়ার যে ব্যায়রামটা রোজগার করেছিলাম, এখন সেটা টিকেটে ট্রান্সফার করেছি। কে জানে ভাগ্য হয়ত ঐখানেই ঘাপটি মেরে বসে আছে। আপনি কেনেন?

বললাম : না! ভাগ্য মানলে টিকেট কিনব কোন্ দুঃখে। ভাগ্যে থাকলে টিকেট আপনিই নাকের ডগে মাছির মতো উড়তে থাকবে।

হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে কেমন একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ালেন বিভূতিবাবু। হয়ত আমার বাক্যসমষ্টি

হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করলেন কিয়ৎকাল। পরে একটা চাপা শ্বাস ধীরে ধীরে মুক্ত করে বললেন : ভালই করেন। তবে আমি রাজ্য সরকারগুলোর মতোই অর্থ-নৈতিক সমস্যায় ডুবে গেছি। আমাকে লটারী খেলতেই হচ্ছে। নিজের চেষ্টায় যখন কিছুই হল না, তখন সরকার বাহাদুর যে মুষ্টিমেয় লাখোপতি সৃষ্টির লটারী মেসিন বসিয়েছেন, শিথিল দেহ তাইতে চাপিয়ে মাসের পর মাস বিমোহিত হই। আখেরে হয় নধর লাখোপতি, নয় ছিবড়ে হয়ে বের হয়ে আসব। তবু, আমি আপনাকে এ্যাপ্রিসিয়েট করি, এখনো জুয়ায় ফুসলে নিতে পারে নি। বেঁচে থাকুন!

বিভূতিবাবু শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেলেন। মূর্তিমান হতাশা। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে আমিও পথ ধরলাম। হতাশাভরা কলকাতার রাজপথ; সামনে-পেছনে-আশে-পাশে ফ্রাসট্রেশন এক্সপ্লয়েট করে যে শহরের আকাশ-বাতাস অধিকার করেছে লাউড স্পীকার। যেখানে বিজ্ঞাপনের বোরখা ঢাকা অ্যামবাসাডার গাড়ি থেকে অবিরত প্রলোভন : আসুন! আপনাকে দিচ্ছি এক টাকায় লাখ টাকা। দু' টাকায় ছ' লাখ টাকা। আজও যদি আপনি আপনার টিকেট সংগ্রহ না করে থাকেন, তবে আমাদের মোবাইল কাউন-টারের সাহায্য নিন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ আর অন্যান্য রাজ্যের খেলা। সুযোগ হারাবেন না। কে বলতে পারে আপনার ভাগ্যে কী আছে?

না, কেউ পারে না। তবে আমি বলতে পারি, গোটা জাতির ভাগ্যে বর্তমানে ফাটকাবাজি আছে। হতভাগা মানুষগুলোকে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখায় যে অপদার্থ সরকার, সে সরকারেরও সবটুকুই ফাটকাবাজি। অমন যে পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালার প্রগ্রেসিভ (?) সরকার, তা তারও নসীব ফাটকাবাজিতেই নাচছে। রাজধানী কলকাতা ডুব মেরেছে জুয়োয়। কাঠের ঘোড়ায় চেপে রূপসী কলকাতা লটারীর ফাঁসে লাট খাচ্ছে।

শহর কলকাতার ফুটপাথ—গণৎকার-দের প্রতিপত্তি ইদানীং অনেক কমে এসেছে। ফুটের ওপর বিজনেস আর বিজিনেসের ভিড়। বেঁচে থাকুন জ্যোতিষ সম্রাট কিম্বা রাজজ্যোতিষী মহাশয়রা। কলকাতার কিন্তু ঘুম ভাঙছে। তাবিজ-মাদুলী ছেড়ে সে এখন কাঠের ঘোড়ায় লাখ টাকার স্বপ্নবিলাসী। পথে পথে ভাগ্যান্বেষী লটারী-দালালদের লাল সালু কিম্বা জোর বক্তৃতার সতর্কবাণী : মাত্র আর একটি দিন বাকি! রাত পুরোলেই লাখ টাকা!

এ সুযোগ পাবে না আর, এসো ভাই কি দাম দেবে! লটারী লিবে গো, লটা—রী—ই!

খেলছে। কলকাতা খেলছে। হুটো-পাটি, লুটোপুটি করেই খেলছে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-বুড়ি বাদবিচার নেই। চোখে গগলস শর্মিলা ঠাকুররা তো বটেই, জপের মালা হাতে ইন্দির ঠাকরুণরাও কালীঘাট-ফেরৎ এক-আধবার খেলে নিচ্ছেন। ট্যাক্স-ট্যাক্সো নেই। পুলিশী হামলা নেই। দেদার জুয়ো। টাকায় না কুলোয় তো পয়সায় খেলো। মাত্র দু' পয়সার লটারী। ব্যাপারটার হাঁক : মাত্র দু' পয়সায় আপনি পাচ্ছেন একটি কেরোসিন স্টোভ অথবা ইলেকট্রিক হীটার, না হলে টেবল ল্যাম্প কিম্বা কাঁচের বাসন, নিদেনপক্ষে প্লাসটিকের খেলনা। আসুন, মাত্র দু' পয়সা!

এবং আসছেনও পথিককুল। গোল হয়ে দাঁড়াচ্ছেন ফুটপাথ জুড়ে। এ জুয়োয় গণ্ডগোল নেই। ভাগ্য প্রসন্ন হলে কাঁচ কিম্বা প্লাসটিক পাবেনই। বাকি মাল দর্শনী মাত্র। দু' পয়সায় বিকোয় বলে সন্দেহের কারণ অবশ্যই থাকতে পারে। কারণ এক এক লটে যে পরিমাণ দু' পয়সার টিকেট বিক্রী হয়, তাতে বাকি কোনো আইটেমের 'কস্ট প্রাইস'ই ওঠে কিনা সন্দেহ। বিকোবে কেমন করে? তবু জুয়ো-জিয়ানো কলকাতার ফ্যাশনে প্রত্যেকেই অন্তত দু' পয়সার খেলওয়াড় বনতে পারেন। সে সুযোগ অবারিত।

সত্যি, বিচিত্র দেশ! এতো লোক নিয়মিত এতো রাজ্যের লটারী খেলছেন। ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাচ্ছেন সরকারের স্পেশাল বাসে চেপে। উত্তেজনা বোধ করলে মাঠের ঘাস, পথের গাড়িও পড়-পড়িয়ে পড়ছে। বিলিয়ার্ডের টেবলে চলছে মোক্ষম মারের পরীক্ষা। যুক্তফ্রন্ট ভাঙা-গড়া নিয়ে জুয়ো। বন্ধ ঘরে তিন তাস, খোলা মাঠে 'ফিস'। এবার শুধু পথিপার্শ্বস্থ দেওদার বৃক্ষতলে গাঁজা-আফিম - চণ্ডু - চরস - বাঙলা - বিলিতী সহযোগে পুরানো কলকাতার চেহারা ফিরিয়ে আনার মেহনতটা বাকি আছে। 'মুক্ত মেলা'র যদৃচ্ছার নাকি পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। দুঃখ নেই। তামাম কলকাতা কাঠের ঘোড়ায় দোল খেয়েছে। এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে!

হ্যাঁ, লটারী বিদেশী বণিকের রাজত্বেও হয়েছিল। কলকাতার সমস্যাকে সামনে রেখেই জন্ম হয়েছিল কলকেত্তিয়া লটারীর। সেটা ১৭৯৩ সাল। কলকাতার স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে প্রথম ক্ষেপেই বত্রিশ টাকা দরে দশ হাজার সরকারী লটারী বিক্রী হয়ে যায়। লব্ধ অর্থের দশ পারসেন্ট বরাদ্দ ছিল কলকাতারই স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য। ১৮০৫ থেকে পাক্কা বার বছর লটারী খেলে কলকাতা উপহার পেয়েছিল, টাউন হল, বেলেঘাটা খাল, ইলিয়ট রোড আর ছোট-বড় পুষ্করিণী। ঐ বার বছরের মাথায় একটা লটারী কমিটিও গঠিত হয়েছিল। সেটা ১৮১৭ সাল। উদ্দেশ্য, হাসপাতাল, পুষ্করিণী, রাস্তা, ড্রেনের উন্নতি এবং নব-সংস্থান। এইভাবে খেলা চললে এবং ১৮৩৬ সালে লটারী কমিটি পাততাড়ি না গুটালে আজ বোধ হয় সি এম পি ও-র সুপারিশ নিয়ে মাথায় হাত পড়ত না কারো। মাত্র একশ কোটি টাকার ফর্দ। তা হলেই কল-কাতার হুড় হুড় করে উন্নতি হবে। বাসভবন, যানবাহন, বস্তি বিলোপ, হুগলী নদীর তৃতীয় সেতু, টিউব রেল—সব হয়ে যাবে। কিন্তু কাঠের ঘোড়া দোলে, দোল খাওয়ায়, ছোটে না। সি এম পি ও প্ল্যানও এক ঠাঁই রহে চিরস্থির। অথচ লটারীই তো দিয়েছে আজকের কলেজ স্ট্রীট আর বিধান সরণীকে। হেস্টিংস আর ওয়েলেসলী (কিরণশঙ্কর রায় আর রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড) দুটো রাস্তাই লটারীপ্রসূত। আজাদ হিন্দ বাগ, গোলদীঘি এবং সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার লটারী না হলে উত্তর-মধ্য কলকাতার শোভা বর্ধনে ইতস্তত করত হয়ত বা।

১৯৬১ সালে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞ নিয়ে যে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের সৃষ্টি, আজ ১৯৭০ সালে সে কৈশোরে পদার্পণ করছে। কিন্তু সুপারিশকৃত একশো কোটি সি-এম-পি-ও প্ল্যান টেবলস্থ ফাইলবন্দী। ওদিকে শহর কলকাতার ট্রাম-বাস যেন জি টি রোডে দেখা ছাগল বোঝাই ট্রাক। শহরের ওপর একটা বিশেষ রুটের বাস পেতে যে সময়, তাতে শিয়ালদা থেকে ক্যানিং ইলেকট্রিক ট্রেনে বারেক চক্কর দিয়ে আসা যায়!

এতৎ সত্ত্বেও কলকাতা খেলছে। কেরানী-মাস্টারের মাস বাজেটে টান ফেলেও বিভিন্ন রাজ্যের টিকেট সংগ্রহের জন্য মিলছে আশাতীত সাড়া। কাঁচা পয়সার বাবুদের সম্পর্কে বক্তব্য নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। কলকাতার কাঁচা পয়সা 'বারে' বেলেল্লাপণায় নয়ছয়। কিন্তু লোভী সংসারীরও যে লটারীতে নজর রেখে দিন দিন ফাড ভাণ্ডু কমছে। উল্টো পিঠে অবশ্য বলা যায়, বেকারীর যুগে লটারী একটা নয়া অকুপেশন। শহরের বুকে

[ শেষাংশ ২০১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

# পশ্চিমবঙ্গ : সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

## চার মন্ত্রীর দৃষ্টিতে

১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরে ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে বিশ-বছরের একচেটিয়া কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়েছিল। কিন্তু ভারতের আটটি রাজ্যে সদ্য নির্বাচিত সেই অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে সেদিন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। যার ফলে নির্বাচনের অব্যবহিত পরে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্পষ্টতই অকংগ্রেসী সরকারগুলির প্রতি প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে দল ভাঙাভাঙি, সাংবিধানিক সংকট অথবা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ত্বরান্বিত করে কোন কোন রাজ্যে সরকারের পতন ঘটানোও হয়েছিল। সেই রাজনৈতিক জুয়াখেলা থেকে পশ্চিমবঙ্গও রেহাই পায় নি। বিধানসভা সদস্যদের চমকপ্রদ দলত্যাগ, আভ্যন্তরীণ কলহ সেদিন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে যে ধূম্রজালের সৃষ্টি করেছিল তা অনেকেরই মনে আছে। অবশেষে ওই বছরই নভেম্বর মাসে সংখ্যালঘিষ্ঠতার অজুহাতে পশ্চিম বাংলার প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হয়েছিল।

তারপর ১৯৬৮ সালে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি বাস করেও পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরা ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে সেই অগণতান্ত্রিক চক্রান্তের সমুচিত জবাব দিয়ে বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শাসনক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরে গঠিত যুক্তফ্রন্ট থেকে ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের আগে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী হয়েছিল। অন্তত যুক্তফ্রন্টের নেতারা তাই বলেছিলেন। জনসাধারণও নিশ্চয়ই তাই বুঝেছিলেন, কেন না নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের যে অন্যতম স্লোগান ছিল: 'যুক্তফ্রন্ট যুক্ত নয়, ভোটের সময় এক হয়'—এই শ্লোগানে তাঁরা কখনই কর্ণপাত করেন নি। অথচ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সকল আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের অবমাননা করে নবপর্যায়ে গঠিত সেই শক্তিশালী যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দলীয় কলহ আজ এত তীব্র ও নগ্ন হয়ে উঠেছে যে, যে কোন মুহূর্তে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটতে পারে।

বাংলা কংগ্রেস তথা মুখ্যমন্ত্রীর অনশন সত্যাগ্রহের পরও পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তন হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তিনটি পথ খোলা আছে—(১) পদত্যাগ করা, (২) সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর গ্রহণ করা কিংবা (৩) উপ-মুখ্যমন্ত্রীর সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে লঘু করে দেখা।

এদিকে সি-পি-এম নেতৃবৃন্দ কেবল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন এবং মিনি-ফ্রন্টের ক্ষমতা হাতে নেবার সময় থেকে বাংলাদেশেও একটি মিনিফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের কথা বলে আসছেন। তাঁদের মুখে এবং মুখপত্রে তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রস্তুত থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে। রাজ্য বিধানসভার বৃহত্তম দল সি-পি-এম-এর কণ্ঠে যেটা হুঁশিয়ারি হওয়া উচিত ছিল, সেটা যেন শোনাচ্ছে একটা আর্তনাদের মতন। সংগে সংগে দলের নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন—যুক্তফ্রন্ট আছে কোথায়? এটা তো একটা পারস্পরিক খিস্তি-খেউড়ের প্ল্যাটফর্ম। বাংলা কংগ্রেসের সংগে প্রত্যক্ষ খেউড়ের পাল্লায় এঁরা আবার সি-পি-আই'এর নেপথ্য-ভূমিকা দেখতে পাচ্ছেন। এঁদের বক্তব্য হলো, "কমিউনিজমের তিলক-কাটা দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা অজয়বাবুকে কুৎসা রটনায় লেলিয়ে দিয়েছে। একদিকে সি-পি-এম যুক্তফ্রন্ট ভাঙার এবং মিনিফ্রন্ট গঠনের চক্রান্তের অভিযোগ আনছেন বাংলা কংগ্রেস সহ ফ্রন্টের কয়েকটি ছোট দলের প্রতি, অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস একই অভিযোগ এনে বলছেন, সি-পি-এম কিছু বাংলা কংগ্রেস এম-এল-এ'দের ভাঙিয়ে এনে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের চক্রান্ত করছেন।

ফ্রন্টের যাঁরা নেতা, তাঁরা কেউই ছেলেমানুষ নন। অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু, সুশীলবাবু, অশোকবাবু, মাখনবাবু, সোমনাথবাবু প্রত্যেকেই বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদ। একে অপরকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে যে পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষা করা যায় না, এই সহজ সরল কথাটা তাঁদের না বুঝবার কথা নয়। তবু আজ বাংলা দেশের জনপ্রিয় সরকার যুক্তফ্রন্টে অস্থিরতা কেন? কেন একটা দলের সংগে আর একটা দলের এত ব্যবধান? কেন এই পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং আত্মকলহ? এভাবে মনের সংগে নিরন্তর লুকোচুরি করে কি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

এই হলো বর্তমান অবস্থা। এই চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমীক্ষা চালানোই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সেজন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের কয়েকজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী সমেত সমাজের বিভিন্ন স্তরের রাজনীতি-সচেতন মানুষের কাছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এই বিতর্কিত রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন রাখবো। তাঁদের বক্তব্য এবং স্বাধীন চিন্তার কথা অতঃপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। বর্তমান নিবন্ধের প্রথম সাক্ষাৎকার হলো রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের

সংগে। সকলেই জানেন, লোক ... সঙ্ঘের এই প্রবীণ নেতা যুক্তফ্রন্টের সাম্প্রতিক সংকট মোচনের শুভ ইচ্ছায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সে ভূমিকা আসলে একটি শান্তি-দূতের ভূমিকা। উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিবদমান দু'টি বড় পার্টি হলো সি-পি-এম এবং বাংলা কংগ্রেস। শ্রীদাশগুপ্ত মনে-প্রাণে পুরোপুরি গান্ধীবাদী। কাজেই এই দু'টি বিবদমান পার্টির সংগে তাঁর বা তাঁর দলের নীতিগত মিল না থাকারই কথা। তা সত্ত্বেও তিনি যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। মহাকরণে শ্রীদাশগুপ্তের ঘরে পাশাপাশি দু'টি ছবি দেখেছি—তার একটি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীর এবং অন্যটি উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর। এ ছাড়া গান্ধীজীর ছবি ত' আছেই। সেই অনাড়ম্বর ঘরের মধ্যে সব মিলিয়ে এই প্রবীণ মানুষটিকে দেখে মনে হয়েছিল শান্তির দূতই বটে।

ঘরে ঢুকেই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। আমার সম্ভাব্য সকল প্রশ্নগুলি উনি আগে শুনে নিলেন। তারপর বললেন—যুক্তফ্রন্টের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। কাজেই কমপ্লিকেটেড প্রশ্নগুলির মধ্যে আমি যেতে চাই না, যাওয়া সংগতও হবে না। তবে মিনিফ্রন্ট সম্পর্কে যে প্রশ্ন রেখেছেন, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই—বাংলাদেশে মিনি-ফ্রন্ট হবার সম্ভাবনা নেই। হতে পারে না। বর্তমান যুক্তফ্রন্টের শরিক কিছু কিছু দলের পারস্পারিক বিরোধ যদিও জনসমক্ষে কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তথাপি আমার মনে হয় এই বিরোধ থাকবে না। উপরন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি সরকারের যে পাঁচ বছর কার্যকাল রয়েছে, বর্তমান সরকার সেই কার্যকাল পর্যন্ত নিশ্চয়ই জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজ করে যাবেন। চৌদ্দ দলের একটি যুক্ত মোর্চায় নীতিগত বিভেদ বা বিবাদ-বিসংবাদ কোন অভিনব ঘটনা নয়। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতির অবসান ঘটবেই। কেন না যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি সকলেই বাংলা দেশের জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য আগ্রহী—এক বছরে তাঁরা তার নজীরও স্থাপন করেছেন। আমার বিশ্বাস, জনগণের কল্যাণ করবার এই যে মনোবৃত্তি—এইটাই যুক্তফ্রন্টকে আপাত প্রতীয়মান দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে সাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

প্রশ্ন করলাম : যুক্তফ্রন্টই কি বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের একমাত্র পথ?

উত্তরে উনি বললেন, অন্য রাজ্যের কথা জানি নে, কিন্তু বাংলা দেশে এটাই আমার মতে একমাত্র পথ বা সূত্র। *It is the only solution.*

—কিন্তু ফ্রন্টের মধ্যে এই আত্ম-কলহের কারণ কি বলে আপনার মনে হয়?

—আপনার নিশ্চয়ই কিছুদিন আগে যুক্তফ্রন্টে গৃহীত সেই ৭-দফা কর্মসূচীর কথা মনে আছে। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর সেই ৭-দফা কর্মসূচীর মধ্যে এর কারণ বিশদভাবে বলা হয়েছে। এর থেকে নতুন করে অন্য কোন কারণ নির্দেশ করবার নেই।

আসবার সময় প্রশ্ন করলাম : বুধবারের (৩০শে জানুয়ারী) প্রস্তাবিত বৈঠক কতটা সফল হবে বলে মনে করছেন?

একটু হেসে শ্রীদাশগুপ্ত বললেন : কি করে বলব—গুণতে ত' জানি না। একটু যেন চিন্তার রেখা কপালে দেখা গেল—বললেন—*There are so many odds.*

**শ্রীদেওপ্রকাশ রাই**
উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের আত্মকলহ বা শরিকী সংঘর্ষের মূল কারণ কি কি বলে আপনার মনে হয়?

—দুটো কারণ আমার মনে হয়। প্রথম এবং প্রধান কারণ হল বিবদমান প্রতিটি দলই ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে নিজের নিজের দলের প্রভাব বাড়ানোর কাজে লেগেছে। শাসন-ক্ষমতায় থাকার জন্য যে সুবিধা ও সুযোগগুলি তাঁদের আছে, সেগুলির অপব্যবহার করে এই পথেই তাঁরা প্রতি-পত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয়ত, এই যুক্তফ্রন্ট কোন রাজ-নৈতিক মতাদর্শভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট নয়। এটা স্পষ্টতই একটি কর্মসূচীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়িত করতে গেলে কিছু আদর্শগত ত্যাগ স্বীকার প্রত্যেক দলেরই করা উচিত। সংঘাতটা এখানেই। আদর্শগত ত্যাগস্বীকারে কেউই প্রস্তুত নন। কিন্তু সংঘর্ষ এত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হবে, এটা আমরা কেউই ভাবি নি। রাজ্যের সবচেয়ে বড় দল সি-পি-এম-এর ওপর এই সংঘাতের দায়-দায়িত্বও সবচেয়ে বেশি। ক্যাবিনেটের মতবিরোধ অনেক ক্ষেত্রেই ওঁরা মাঠে-ময়দানে জনসভায় প্রকাশ করে দিয়ে অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছেন। উত্তর বাংলায় আর-এস-পি'র সংগে আমা-দের দলের কয়েকটি সংঘর্ষ হয়ে যাবার পর আমরা একটা মোটামুটি বোঝাপড়ায় এসেছি। দার্জিলিং এখনও পর্যন্ত শান্ত। কিন্তু জলপাইগুড়ির চা-বাগান এলাকায় কিছু কিছু সংঘর্ষ হচ্ছে। সি-পি-এম-এর সংগে আমরা কোন সমঝোতায় পৌঁছতে পারি নি। কিন্তু সংঘাত দলীয় ভিত্তিতে যাদের সংগেই হোক না কেন—আসলে শ্রমিকের সংগে শ্রমিকের সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্রমিকেরাই। এটা খুব চিন্তার ব্যাপার।

—কিন্তু এই শরিকী সংঘর্ষকে আপনি শ্রেণী-সংগ্রাম বলবেন কি?

—না। এটা কোনক্রমেই শ্রেণী-সংগ্রাম হতে পারে না। চা-বাগানের একদল মজুর আর একদল মজুরকে মারছে। এই আত্মকলহের নাম শ্রেণীসংগ্রাম? বরং সারা বাংলাদেশে যে শ্রেণীস্বার্থের একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, যেটাকে শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি বলা যায়, সেই আবহাওয়া আজ নষ্ট হতে চলেছে। এখনও জোতদার বা মহাজনেরা খুব সুখী।

—আপনি কি মনে করেন থানা বা অঞ্চলভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে এই সব সংঘর্ষ অনেকাংশে এড়ানো যেত?

—হ্যাঁ।

—রাজ্যের শরিকী সংঘর্ষ এবং তৎসহ সমাজবিরোধীদের চিরাচরিত ক্রিয়া-কলাপের বাহুল্য রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করেছে বলে মনে করেন কি?

—আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামান্য অবনতি হয় নি, একথা বলা যায় না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন বা নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, একথা বলা যায় না। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে যেখানে যেখানে সংঘর্ষ হয়েছে, সে সকল জায়গায় সাময়িকভাবে নিশ্চয়ই আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়েছে। আর সমাজবিরোধীরা এই দলীয় সংঘর্ষের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে। বর্তমানে পি. ডি. অ্যাক্ট না থাকায় তারা পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে।

—আপনি কি তাহলে পি. ডি. অ্যাক্ট থাকলেই ভাল হতো বলে মনে করেন?

—না, আমি সেকথা বলছি না। পি. ডি. অ্যাক্ট থাকুক এটা আমরা চাই না। আমি যেটা বলতে চাই—তা হলো এই, সমাজবিরোধীদের সম্পর্কে সরকারকে নিশ্চয়ই কিছু ভাবতে হবে। কারণ এরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দলে ঢুকে পড়ছে। এই পরি-স্থিতিতে অবশ্য বিকল্প কোন আইন প্রণয়ন করলেও তা কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা শক্ত। তবু ব্যাপারটা খুব জরুরী বলে সরকারের চিন্তা করা প্রয়োজন।

—আপনি পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'অসভ্য' সরকার বলে মনে করেন কি?

—না, সরকারী ক্ষমতায় বসে আমি সেই সরকারকে অসভ্য বলতে পারি না। একমাত্র পদত্যাগ করার পরই আমি বলতে পারি সরকার কতটা অসভ্য বা কতটা সভ্য।

—বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অনশন সত্যাগ্রহের ফলে রাজ্যের তথাকথিত হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়েছে কি?

—আমি বা আমার দল সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী নয়। সত্যাগ্রহের ফলে এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি না। তবে এই অনশনের ফলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে বলেই মনে হয়। কারণ ভারতবর্ষে আজও অনশনের প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে পড়ে।

—যুক্তফ্রন্টের কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলছেন, কেরলের মত পশ্চিমবাংলায়ও একটি মিনি-ফ্রন্ট গঠিত হতে চলেছে। এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?

—এসব কথা সি-পি-এম দল এবং তাঁদের দলীয় মুখপত্র বলছে বটে। তবে আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। কেউই এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আমার বা আমার দলের কাছে আসেন নি।

**শ্রীভবতোষ সোরেন**
**বনমন্ত্রী**

প্রঃ—যুক্তফ্রন্টের আত্মকলহ বা শরিকী সংঘর্ষের কারণ কি? থানা বা অঞ্চলভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে কি এই সংঘর্ষ এড়ানো যেত?

—সম্ভবত এড়ানো যেতো না। কারণ এই সংঘাত অনেকটা ইনএভিটেবল হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য এজন্য যুক্তফ্রন্টকে যে দায়ী করা চলে না, তা নয়। আমরা কোন 'এগ্রিড প্ল্যান' নিয়ে অগ্রসর হতে পারি নি। একবার তো এই সংঘাতের প্রশ্ন নিয়ে বৈঠকও বসেছিল। সাত দফা প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কি হলো? বৈঠকও শেষ হলো—পরদিন প্রসাদপুরে তিনজন কমিউনিস্ট কর্মীও নিহত হলো। আসলে একটি বিশেষ দলের আগ্রাসী মনোভাবই এই সংঘর্ষের মূল কারণ বলে আমরা মনে করি। থানা বা অঞ্চলভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট হলেও সম্ভবত এই মনোভাবের পরিবর্তন হতো না।

প্রঃ—এই আগ্রাসী মনোভাবের অভিযোগে যুক্তফ্রন্টের বিবদমান অন্য দলগুলিকেও কি অভিযুক্ত করা চলে না?

—না। হয়ত ঘটনার আবর্তে কখনও কখনও অন্য দলকেও হিংসার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখতে হবে—কে প্রথম শুরু করেছে। আক্রমণ এবং প্রতিরোধ-আক্রমণ তো এক কথা নয়।

প্রঃ—কিন্তু এই পারস্পরিক দলীয় সংঘর্ষ যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি কি?

—করেছে, এখনও করছে। আমরা ত' স্পষ্ট বলেছিলাম যে, এমন চলতে থাকলে ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়িত হতে পারে না। কিন্তু কি হলো? সংঘাত বন্ধ হলো না। মার্কসবাদীরা এই সংঘর্ষকে শ্রেণীসংগ্রাম বলে চালাতে চাইলেন। এই সংকীর্ণ দলবাজীকে কিভাবে মার্কসিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীসংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা করা যায়, আমরা জানি না। ওঁরা যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করতে চাইলেন। বললেন, যুক্তফ্রন্ট আছে কোথায়? ওঁরা চাইলেন একটি 'শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট'। *That concept itself is a negation to the present United Front.* তবুও বর্তমান যুক্তফ্রন্টকে তাঁরা মানতে রাজী নন। তবে 'শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট' বলতে কি বোঝায় এবং কাদের নিয়ে তা গঠিত হবে, সে ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবত প্রমোদবাবুরা বলতে পারবেন।

প্রঃ—বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অনশন সত্যাগ্রহের ফলে রাজ্যের তথাকথিত হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়েছে বলে মনে করেন কি?

—এই সত্যাগ্রহের ফলে সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমরাও করি নি। সারা রাজ্য জুড়ে লাল পতাকা কিভাবে একটা লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সে আপনারাও জানেন। এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন, অন্যদিকে মানুষের মনে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে পড়ছিল। এটা ঠিক যে, আমরা এটা চাই নি। তাই আমরা বলেছিলাম, এই অবস্থা চলতে থাকলে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবো। কিন্তু যাঁরা শরিকী সংঘর্ষের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের গ্রীন্ সিগন্যাল দেখতে পেলেন, তাঁরা এটা বন্ধ করতে চাইলেন না। তাঁরা চানও না। কাজেই সত্যাগ্রহের ফলে সমস্ত মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে, এরকম দুরাশা আমাদের ছিল না। কিন্তু 'ইট ইজ ডেফিনিটলি এ স্টেপ'।

প্রঃ—কিন্তু শরিকী সংঘর্ষের ফলে মূলত ২৪ পরগনা, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বেশ কিছু লোক হতাহত হলেও সারা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তেমন আশংকাজনক নয়। আর চুরি, রাহাজানি প্রভৃতি সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ তো রাজ্যপালের আমলে রেকর্ড-সীমা অতিক্রম করেছিল। যদিও যুক্তফ্রন্টের আমলে ওই সব অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল বলে সবাই মনে করেন, তথাপি সামগ্রিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে একথা কি বলা যায় না যে, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃংখলা ভেঙে পড়ে নি?

—রাজ্যপালের আমলে আইন-শৃংখলা বজায় ছিল বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ ছিল—একথা আমরা কখনও বলি নি। বরং যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ও জনমত গঠন করেছি। কিন্তু এবারের অবস্থা একটু অন্যরকম। এবার এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা পলিটিক্যাল এবং যা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করেছে। এর ব্যাপকতা অনেক বেশি।

প্রঃ—আপনি কি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'অসভ্য সরকার' বলে মনে করেন?

—এটা মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব মন্তব্য। মন্ত্রী পর্যায়ে কোন বৈঠকে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি।

**ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য**
**কৃষিমন্ত্রী**

প্রঃ—যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ কলহ তথা শরিকী সংঘর্ষ আজ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠেছে। এর কারণ কি? গ্রামাঞ্চলেও সর্বস্তরে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে কি শরিকী সংঘর্ষ এড়ানো যেত?

—শরিকী সংঘর্ষের অশুভ সূচনা হয়েছে রাজ্যের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গোঁয়ার্তুমির দ্বারা। রাজ্য বিধানসভায় ওঁদের শক্তি সর্বাধিক—মন্ত্রিসভায় ওঁদের হাতে প্রধান প্রধান আটটি দপ্তর, যার ফলে ওঁরা কথায় ও কাজে রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্বকেই নস্যাৎ করে দিতে চাইলেন। আমরা চেষ্টা করেছিলাম

ওদের সংগে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসার জন্য। যে-কারণে 'ফরোয়ার্ড' ব্লক' শরিকী-সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গোড়ার দিকে কোন বক্তৃতা ও বিবৃতির ঝড় সৃষ্টি করে নি। কিন্তু ওঁদের অনমনীয় মনোভাবের ফলে কোনরকম বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হলো না। যার ফলে একদিন আমাদেরও সিদ্ধান্ত নিতে হলো, 'টুথ্ ফর টুথ্, আই ফর আই'। আমার মনে হয়, এই অনমনীয় জংগী মনোভাবের কারণ হলো সি-পি-এম'এর 'পারভারশন অফ থিংকিং'। তাঁদের ধারণা, যেন রাজ্যের ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদেরই দয়ায় শাসন ক্ষমতায় এসেছে। অতএব, আজ তাঁরা যদি দয়া প্রত্যাহার করে নেন তবে ওই ছোট দলগুলি ক্ষমতাচ্যুত হবে এবং অস্তিত্ব হারাবে। অবশেষে ও'রাই নিরংকুশ ক্ষমতা লাভ করবেন। এই আশায়ই সম্ভবত তাঁরা বর্তমান সরকারকে ভেঙে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের স্বপ্ন দেখছেন। এই স্বপ্নই তাঁদের শরিকী সংঘর্ষের পথে টেনে এনেছে। এই আগ্রাসী মনোভাবের পরিবর্তন না হলে যুক্তফ্রন্ট তা যে-কোন স্তরেরই হোক না কেন, ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের এটা ভাল করে অনুধাবন করা দরকার এবং সম্মিলিতভাবে সি-পি-এম-এর উপর তার মনোভাব পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন।

—এই শরিকী-সংঘর্ষকে আপনি 'শ্রেণীসংগ্রাম' বলে মনে করেন কি?

—শোষিত শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ হল এক সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম। যাঁরা এটাকে শ্রেণীসংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা করতে চান, তাঁরা জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে চান।

—প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অধিকারের লড়াই এবং গ্রামাঞ্চলে দলীয় সংঘর্ষ যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি কি?

—নিশ্চয়ই করেছে এবং এর ফলে জনমনে যুক্তফ্রন্টের 'ইমেজ' নষ্ট হচ্ছে।

—রাজ্যব্যাপী হানাহানি এবং সমাজবিরোধীদের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপের ফলে রাজ্যের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে কি?

—কিছুটা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের কাছে প্রত্যহ প্রচুর অভিযোগ আসছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বিপন্ন বোধ করছেন। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখা অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সামান্য বৃদ্ধির কারণ হল সমাজবিরোধীরা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে থেকে কাজ হাসিল করছে। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের মধ্যে এরা সুবিধা মত এসে প্রবেশ করছে এবং বেশির ভাগ সমাজবিরোধীরাই বড় দল সি-পি-এম-এর আশ্রয়প্রার্থী। কারণ তারা জানে, বড় গাছের তলাতেই ছায়া বেশি হবে।

—কিন্তু ক্ষমতাসীন সকল দলের মধ্যে যদি অল্পাধিকতর সমাজবিরোধীদের অনুপ্রবেশ ঘটে, তা হলে সেই বিরাট সমাজ-বিরোধী বাহিনীর হাত থেকে যুক্তফ্রন্টের মুক্তির কোন পথ থাকবে কি?

—এটা বলা খুবই শক্ত। এ কথা ঠিক যে, পার্টির আশ্রয়ে যদি সমাজবিরোধীরা প্রশ্রয় পেতে থাকে, তবে ওদের কন্ট্রোল করার পথ পাওয়া মুশকিল।

—শরিকী সংঘর্ষে প্রধানত ২৪ পরগনা, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গোটা পশ্চিমবঙ্গ শরিকী-সংঘাতে বিপর্যস্ত বলে মনে হয় কি?

—এই সংঘর্ষের যেটা প্রতিক্রিয়া, সেটা সারা পশ্চিমবঙ্গের জনমনেই প্রভাব বিস্তার করে। আর এই সংঘর্ষ কেবল তিনটি জেলাতেও সীমাবদ্ধ থাকে নি বলে আমি মনে করি। হাওড়া এবং মালদাতেও সংঘর্ষ হয়েছে। তবে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, সি-পি-এম-এর সংগঠন শক্তি যেখানে দুর্বল, সেখানে এই সংঘর্ষ ঘটে নি।

—বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যাগ্রহ জনমনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে? এর ফলে কি দলীয় সংঘর্ষ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ কমেছে?

—আমার মনে হয়, বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যাগ্রহ মানুষের মনে একটা ভাল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সংঘর্ষ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের মাত্রাটাও কমেছে। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক খেলোয়াড়ের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে এই অনশন সত্যাগ্রহ।

—আপনি কি পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'অসভ্য' বলে বিবেচনা করেন?

—সরকার অসভ্য হতে যাবে কেন? মুখ্যমন্ত্রী অনেক দুঃখেই এই সরকারকে 'অসভ্য' বলেছেন। এতে যে তাঁর নিজেরও মর্যাদা খর্ব হয়, সেও তিনি জানেন। তবুও তিনি কেন এমন কথা বলেছেন, সে কথা আপনাদেরও অজানা থাকবার কথা নয়।

প্রতিবেদন: সাগর বিশ্বাস

[২০০৮ পৃষ্ঠার পর]

অনেকেই দু' পয়সা কামিয়ে করে খাচ্ছেন। যাঁর যেমন ক্যাপিটাল। কেউ কেউ এমন ফেঁপেছেন ও ফাঁপবার আশা রাখেন যে, তেমন জুৎসই জায়গা পেলে লটারী দোকান নাকি দশ-বিশ-পঁচিশ হাজার সেলামী গুণেও জমিয়ে বসছে। বিধানচন্দ্র রায় কলকাতাকে টাপা আর স্টেট বাস দিয়েছিলেন, কলকাতা এখন কাঠের ঘোড়া পেয়েছে। চাপো, দোলো, দোলাও, না হয় নাগরদোলায় ঘুরপাক খাও। তারই মধ্যে সেয়ানা লোকে লাখ পঞ্চাশ কামিয়ে নিক। কলকাতার ধুলোমুঠিই তো সোনামুঠি। যে জানে, সে-ই কুড়ায়। যে জানে না, তারও উপায় আছে। ভোর সকালে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে স্যাঁকরা দোকানের জমাট ধুলো নর্দমা থেকে কুড়িয়ে-ছেঁকে সোনার কণা খুঁজে বেড়ায় সে। কিন্তু যাঁরা তত দূর নামতে নারাজ, বড়বাজার পর্যন্ত দৌড়াতে অক্ষম; শেয়ার মার্কেট যাঁদের দেখে মুখ ফিরিয়ে বলবে, 'সরি'! ঘোড় দৌড়ের মাঠ দূর থেকে দেখেই যাঁরা দিশাহারা, তিন তাসের আড্ডায় বসতে যাঁদের বানপ্রস্থগামী প্রপিতামহের সতর্কবাণী স্মরণ হয়, —তাঁদের জন্য ঐ নির্দোষ কাঠের ঘোড়ার ব্যবস্থা Lot-err বা 'লট আর' ই (সমষ্টিগত ভুল অথবা রং নাম্বারের খেলা)।

কিন্তু বেল পাকলে যেমন 'কাকের কী', লটারীর বাড়বাড়ন্তে তেমনি কলকাতার কী? অথচ দ্রৌপদী কলকাতার বহুভাগ্যা কন্যাগুলি লটারীর কেষ্ট ঠাকুরও কুঁচি দিয়ে গুছিয়ে দিতে পারতেন। নিদেনপক্ষে ময়দানের ঘাস ফুটো টিনে ঢেকে দেশের বিভিন্ন নেতার নামে মেলা বসিয়েও সেদিন বছরের রোজগারে কলকাতার হতশ্রী ফিরিয়ে ধরা যেত। আর সব কিছু ফেল করলে, অগুন্তি পুজো-প্যাণ্ডেলের খরচের ওপর ট্যাক্স ধরলেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা।

শহরটা দোল খাচ্ছে, দোল খাক। ১৯১১ সালে যেদিন তামাম ভারতের রাজধানী কলকাতা দিল্লীর টিকেট কেটে ট্রেনে চেপে বসেছিল, সেদিনই তার নসীবে লাল কালির ঢেঁড়া পড়ে গেছে। এখন সে লুঠের ময়দান, একদিন যা ছিল হরির লুঠের দরদালান। এখন তার চোখ অশ্বঘোষদের ঘোষণাপত্রে ঢুলু ঢুলু। উপায় কি? আখের ফেরাতে আহম্মকদের ঘোষণাই যে তুলসী-গঙ্গাজল সহ সেব্য।

২৯-১-৭০

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

'কই—নবীন গোঁসাই কোথায়।" বলতে বলতে সানো চৌধুরী তার দীর্ঘ দেহটা ঝুঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

লণ্ঠনের আলোয় খবরের কাগজ পড়ছিল জীবেন—হঠাৎ সানো চৌধুরীকে দেখে জখমি পা'টাকে টেনেটুনে উঠতে যাচ্ছিল—সানো চৌধুরী বলে উঠল, "আরে বসো বসো। এই তো দিব্যি সেরে উঠেছ। তা জরুরী এত্তেলা কেন গোঁসাই?"

সস্মিতমুখে জীবেন বললে, "আপনিও আমাকে ওই বলে ডাকবেন!"

"আপাতত।

"প্রতাপ আমার বন্ধু। নিবারণও।"

"আমরা জানি।" সানো চৌধুরী সে সব প্রসঙ্গ যেন জোর করে চাপা দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, "আপাতত—আমি সানো চৌধুরী—তুমি আমাদের নবীন গোঁসাই, অন্তত যতদিন এ চরে আছ। তারপর ভালোয় ভালো—নিরাপদে তোমাকে বিদায় দিয়ে আমাদের নিষ্কৃতি।"

জীবেন হাসলো নিঃশব্দে। বললে, "ভালোয় ভালোয় কোথায় আমাকে বিদায় দেবেন কাকাবাবু?"

"উহুঁ—সানো কর্তা!" সানো চৌধুরী জীবেনের অন্তরঙ্গ সম্বোধনটাকে সংশোধন করে দিয়ে বললে, "হুঁশিয়ার হও গোঁসাইজী। অভ্যাস বড় খারাপ বস্তু।" তারপর বললে, "কি বলছিলে যেন—কোথায় বিদায় দেবো? কেন!"

জীবেন ম্রিয়মাণ গলায় বললে, "কাল ডাক্তারখানা থেকে যমুনা দিদি কতকগুলো নতুন-পুরাতন খবর কাগজ এনেছিল। দেখলাম—আমাদের জেলা শহরের সব ঘাঁটি পুলিশ জেনে গেছে।"

সানো চৌধুরী বললে, "শুধু জেলা শহর নয় গোঁসাই—সারা জেলা। আর শহরের তো কথাই নেই। প্রত্যেকের নামে কার্ড দেওয়া হয়েছে। রং তিনটে—শাদা, সবুজ, লাল। সবুজ আর লালের বিপদ যে-কোনো মুহূর্তে। বিশেষ করে চৌদ্দর ওপরে ছাত্ররা সব লাল।"

"কাল থেকে তাই ভাবছিলাম।" জীবেন বিষণ্ণ গলায় বললে, "কাগজ পড়তে পড়তে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। এ যেন কেমন হয়ে গেল! আন্দোলন বলে কোনো কিছুর খবর কোথাও একটু পেলাম না। লর্ড অর্ডিন্যান্সের* পর নতুন বড়লাট এসে যেন ভারতবর্ষের গলা চেপে ধরেছে। আমরা কি চিৎকার করেও উঠতে পারছি নে?" উত্তেজনায় জীবেনের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল।

সানো চৌধুরী সংযতকণ্ঠে বললে, "তুমি কি এই সব কথার জন্যে ডেকে-ছিলে গোঁসাই?"

হতাশকণ্ঠে জীবেন বললে, "আমি বিচ্ছিন্ন চৌধুরী মশাই—কতদিন হলো, আমি সব থেকে ছিটকে গেছি—অন্ধকারে যেন পথ হাতড়াচ্ছি। সেদিন যমুনাদি'র মুখে শুনলাম হঠাৎ—আপনি কিসের জন্যে নাকি ভলান্টিয়ার যোগাড় করছেন। তাই ভাবলাম—আপনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি।"

আলো-অন্ধকারে দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল যমুনা। তার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে সানো চৌধুরী বললে, "হুঁ—শয়তান বেটি শুনেছে — হলে:

"কথাটা সত্যি:

"বলছি।" সানো চৌধুরী মুচকি হেসে বললে, "সবাই বেটিকে বলে—সাক্ষাৎ ডাইনী, কোথায় কি হচ্ছে সব জানে।" তারপর যমুনার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, "যমুনা, দরজা টেনে দিয়ে একটু বাইরে যা দেখি!"

নীরবে যমুনা বাঁশের আগড় টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সানো চৌধুরী তার ফতুয়ার ভেতর পকেট থেকে কতকগুলো ছাপা কি কাগজ টেনে বার করলে। ফেলে দিলে জীবেনের সামনে। বললে, "পড়ো—বুঝতে পারবে।"

লণ্ঠনের আলোয় সামনে কাগজগুলো মেলে ধরে জীবেন সবিস্ময়ে বলে উঠলো, "সাইক্লোস্টাইল!"

সানো চৌধুরী বললে, "এ্যান্ডারসনী দাপটে ওদের আর উপায় কি বলো

* অসংখ্য ordinance খ্যাত লর্ড আরুইনের জনপ্রিয় ভারতীয় নামকরণ।

গোঁসাই। ডাক্তারের ছাপা খবর কাগজে যা না পেয়ে হতাশ হয়ে—হয়তো নিষিদ্ধ এই কাগজগুলোয় তেমন কিছু খবর পেয়ে তোমার আশা ফিরবে।"

জীবেন দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল নিষিদ্ধ সাইক্লোস্টাইল বুলেটিনগুলোর ওপরে। হঠাৎ এক সময়ে সে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, "আন্দোলন! বারদৌলিতে খাজনা বন্ধ!"

"হ্যাঁ গোঁসাই—হাজার হাজার চাষী খাজনা না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। বলদ-গরু, ঘর-সংসার—সব নিয়ে পথে নেমেছে।" সানো চৌধুরী বললে, "সময় মতো পড়ো—বিহার, উত্তরপ্রদেশও খাজনা বন্ধ করেছে।"

"আপনি কি এইজন্যেই—"

"এই জন্যেই আমাদেরও ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ গোঁসাই!" সানো চৌধুরী বললে, "আমাদের এ অঞ্চলেও চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ করা হবে। তার আগে—", একটু থেমে সানো চৌধুরী বললে, "একটা কাজ শুধু তোমার জন্যে আটকে আছে।"

"আমার জন্যে!" জীবেন অবাক হয়ে সানো চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"হ্যাঁ, তোমার জন্যে।" সানো চৌধুরী বললে, "এ অঞ্চল থেকে নিরাপদে তোমাকে আগে আমাদের পার করে দিতে হবে।"

জীবেন চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

সানো চৌধুরী বললে, "এমন জায়গায় তুমি এসে পড়েছ গোঁসাই—থানা পুলিশের কাছে যার সুনামের আর অন্ত নেই।"

"ইতিমধ্যে তারা একদিন এসেও গেছে চৌধুরী মশাই!" জীবেন হাসল।

"শুনেছি।" গম্ভীরমুখে যমুনাকে ইঙ্গিত করে বললে, "ডাইনী বেটি সামলে নিয়েছে কোনোরকমে।" তারপর একটু থেমে আবার বললে, "কিন্তু সে ঝুঁকি আমাদের বেশিদিন আর নেওয়া উচিত নয়। আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে এখানে কি ঘটবে বলা যায় না। সে বিপদের মধ্যে আমরা তোমাকে রাখতে চাই না।"



"কিন্তু আমি যদি না যাই?" জীবেন নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

রসিকতা ভেবে সানো চৌধুরী হেসে বললে, "তা হলে দিব্যি হয়। এ চরে তো অনেক দুষ্কর্মই ঘটে গেছে—তুমি ধরা পড়লে এখানকার থানা অফিসারের আর একটা কৃতিত্ব বাড়ে।"

জীবেন বললে, "কৃতিত্ব তার বাড়ে—বাড়ুক, সে ভয় করি নে। তবে কথাটা আমি কাল থেকে সত্যি সত্যি ভাবছি চৌধুরী মশাই!"

জীবেনের বলার ভঙ্গি গম্ভীর।

সানো চৌধুরী সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। না—সে মুখে রসিকতার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। বললে, "বলো কি গোঁসাই—তাও কি সম্ভব?"

জীবেন বললে, "আমি কি আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে?"

"তুমি!" সানো চৌধুরী একটু থেমে আস্তে আস্তে বললে, "কিন্তু আমরা তো বন্দুক-পিস্তল নিয়ে লড়াই করবো না! বলতে পারো—এ আমাদের হারার লড়াই, মরার লড়াই।"

"আমরাও জিতি নি, আমরাও একে একে অনেক মরেছি।"

"কিন্তু তোমার দল—তোমাদের মতাদর্শ?"

জীবেন বললে, "কেউ বা আপনাদের পন্থায় বিশ্বাস করে না—কেউ বা আবার আত্মাহুতি দিয়ে সেই আন্দোলনের গণ-দৈত্যটাকে জাগাতে চেয়েছে। যখনি সে আন্দোলনের উপরে অত্যাচারের বন্যা নেমেছে—তখনি পিস্তলের মুখে অত্যাচারীর আমরা যথাসাধ্য বিচার করেছি। আপনাদের সঙ্গে আমাদের এই তফাৎ।"

সানো চৌধুরী বললে, "কিন্তু এবার যে আমাদের পালানোর লড়াই গোঁসাই! ট্যাক্স আমরা দেবো না—তাড়া খেয়ে বনে-জঙ্গলে আমরা কোথায় ছুটবো, ঠিক নেই।"

"তাড়া খেতে খেতে আমিও একা একা ছুটে এসেছি অনেকদূর, সঙ্গের বন্ধু আমার কোথায় ছিটকে গেছে জানি নে। তাড়া খেয়ে এমনি আ/ও ছুটতে হবে কতদিন একা একা কে জানে!" জীবেন একটু ম্লান হেসে বললে, "তাই ভাবছি—তাড়া যদি খেতেই হয় তা হলে এবার না হয় সকলের সঙ্গে থেকেই তাড়া খাই।"

"কি জানি—বুঝতে পারছি নে হে গোঁসাই!" সানো চৌধুরী বললে, "ডাক্তারের সঙ্গে ব্যাপারটা পরামর্শ করি।"

বোধ করি সে দ্বিধার কথা কানে গেল না জীবেনের। বললে, "এ চরের অনেক কথা শুনেছি আমি যমুনাদির কাছে। শুনে শুনে মনে হয়েছে—সেজন্য একদিন এই আত্মাহুতির পথে পা বাড়িয়েছিলাম—তা বোধ করি বৃথা হয় নি।"

উজ্জ্বল বিস্ময়াহত চোখে সানো চৌধুরী এই তরুণ সন্ত্রাসবাদীর ভাব-গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জীবেন বললে, "ইচ্ছে হয়—ওদের মধ্যে থাকি, ওদের মধ্যে কাজ করি।"

"খবর্দার—খবর্দার!" সানো চৌধুরী বললে, "আগে পরামর্শ করি।"

জীবেন হাসল। বললে, "আপনিও বাধা দেন—যমুনাদিও বাধা দেয়।"

সানো চৌধুরী বললে, "রাত অনেক হলো—আজ আমি উঠি।"

জীবেন সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, "আবার আপনার কবে দেখা পাবো?"

"ঠিক সময়েই পাবে।"

সানো চৌধুরী চিন্তিতমুখে বাঁশের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণে ভেতরে এসে ঢুকলো যমুনা। সারা মুখে তার ক্ষোভের ছায়া যেন কালো মেঘের মত থমথম করছে।

জীবেন হেসে বললে, "চৌধুরী মশাই তোমাকে অনেকক্ষণ বাইরে বসিয়ে রেখেছে দিদি।"

করুণ গলায় যমুনা বললে, "মোর সামনে কি সব কথা বিশ্বাস করে কওয়া যায় গোঁসাই! আমি তাঁর বিশ্বাসের যোগ্য নই।"

জীবেন বললে, "তুমি শুধু আমার বিশ্বাসের যোগ্য।"

জীবেন চেয়ে চেয়ে দেখলে—একটা নীরব অপমান যেন বন্ধ দরজার ওপারে এতক্ষণ এই মেয়েটার মুখে কালির তুলি বুলিয়ে গেছে। জীবেন গাঢ় গলায় জোর দিয়ে বললে, "এবার যাতে ও'রা তোমায় বিশ্বাস করেন—সেই কাজ করতে হবে দিদি! জানো—ওরা আমাকেও ঠিক বিশ্বাস করে না।"

যমুনা ওদের দল, মত, আদর্শ—তার সূক্ষ্ম বাদ-বিবাদ কিছুই বোঝে না। রাগ করে শুধু বললে, "তোমাকেও বিশ্বাস করে না!"

"না।" জীবেন হাসিমুখে বললে, "আমি তোমাদের সানো কর্তার ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লেখাতে চেয়েছিলাম। তা বললেন—ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করি। বুঝলে?"

যমুনা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল—মনে হলো না, সে কিছু বুঝেছে।

জীবেন গা ঝাড়া দিয়ে আপন মনে বলে উঠল, "না বিশ্বাস করুক—আমরা আমাদের কাজ করে যাব দিদি! এ কাজ তো কেউ কারুকে দেয় না—এ আমাদেরই হাতে করে তুলে নিতে হবে। তোমার দেশ—তোমার চর পড়ে আছে তোমার সামনে।" তারপর একটু থেমে বললে,

তুমি আমাদের গান শিখবে বলেছিলে মনা দিদি—এসো, আজ সে গান শিখিয়ে দই। আগে তুমি বেরিয়ে পড়ো। গেয়ে সানাও—দেশের মানুষ কি বলে।"

যমুনা বোষ্টমীর আজ সে আখড়াও নই—তার জৌলুষ-হল্লাও নেই। তবু রাত্রে তার এই ঝুপড়ি টঙের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন পরে আবার সুরের তরঙ্গ উঠল। বৈষ্ণবীর মধ্য তীক্ষ্ম—গানের গলা অপ্রত্যাশিত। জীবনে দু'-একবার গাইতে না গাইতেই জানা সে গান অবলীলায় আয়ত্ত করে নিলে।

দূরে কিষাণপাড়া ঘুমন্ত। চর জোড়া হিম অন্ধকার। শোনার কেউ নেই। শুধু এ চরের আদিগন্ত ব্যাপ্ত দূরের নিঃসাড় আকাশ একটা চাপা সুরতরঙ্গে বোধ করি এই প্রথম শুনলো দুটি নাম—

অভিরামের দ্বীপ চালান মা

ক্ষুদিরামের ফাঁসি!

...এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি!...

## ॥ তেইশ ॥

শুধু মহেশের ব্যাপারটা ভালো লাগে নি। বেশ কিছুদিন থেকে সে লক্ষ্য করছিল—ডাক্তারখানায় যমুনার যাতায়াত। চুপচাপ তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে—সকলের শেষে ডাক্তারের সঙ্গে কি দু'-চারটে কথা বলে। কখনো ওষুধ নেয়—কখনো নেয় না।

একদিন সানো চৌধুরীকে জিজ্ঞেসই করে বসেছিল, "ওই ডাইনী হারামজাদী ডাক্তারখানায় আসে কি করতে সানো কত্তা?"

সানো চৌধুরী থমথমে মুখে বলেছিল, "বোধ হয় কারোর অসুখ।"

"অর আবার আছে কে? অর সেই চাঙড় বৈরাগী তো তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে!" মহেশ বলেছিল, "আবার কেউ জুটল নাকি!"

সানো চৌধুরী তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল, "কে জানে!"

মহেশ জেনে ফেলেছিল। চরের ছোট মণ্ডল—চোখ যেন মাকড়সার। চারদিকে ঘুরছে। জেনেছিল—সেই মুকুন্দের খানাতল্লাসীর সময় যমুনার ঘরে নবীন গোসাই নামে কে আবার একটা এসে জুটেছে। তার তারি ব্যামো! বাঁচে কি না বাঁচে।

"বটে! তা ইটির বয়স কত?"

খবর যোগাড় করেছিল সেপাইদের কাছ থেকে। তারা বলেছিল, "তা হোবে—জওয়ান মরদ হোবে। তবে কিনা মু সে খুন গিরতা। বহুৎ ভারি বিমার।"

মহেশ গর্‌গর্‌ করে বলেছিল, "ঠিক হয়েছে। ও ডাইনী হারামজাদী ক'দিনেই জখম করে দিয়েছে লোকটাকে। ও সব পারে।"

তারপর যখন জানতে পারল স্বয়ং ডাক্তার তার চিকিৎসা করছে—তখন সে আর থাকতে না পেরে হাবুর কাছে রাগে ফেটে পড়েছিল। "ডাক্তারবাবু ই আবার এক ধোগের বাসা জীইয়ে রাখল। আমি হলে শালাকে এক পান ওষুধে সাফ করে দিতম।"

সানো চৌধুরীকেও গর্‌গর্‌ করে বলেছিল, "ডাইনী হারামজাদী লাই পেয়ে যাচ্ছে সানো কত্তা। ডাক্তারবাবু এক নতুন গেরো বাধিয়ে রাখছে।"

একান্ত নিস্পৃহ গলায় সানো চৌধুরী বলেছিল, "তা অসুখ হয়ে পড়েছে—কি আর করবে ডাক্তার। তবে তুমি চোখ রাখ ভালো করে। লক্ষ্য রাখো—কেউ যেন না যায় ওদিকে। শুনেছি অসুখটাও খারাপ—ছোঁয়াচে। আর মেয়েটাও যাতে না ঢোকে তোমাদের পাড়ায়।"

"বলেছি না—ঠ্যাং ভেঙে দেবো!" মহেশ বলেছিল, "সেদিন থেকে হারামজাদী বেটি আর খালের এপাশে পা দেয় নি। ঠিক শায়েস্তা করে দিয়েছিলম—শুধু ডাক্তারবাবু আবার এ একটা কি করে দিলে।"

শুধু ডাক্তার নয়, অপার বিস্ময়ে একদিন মহেশ মণ্ডল স্বচক্ষে দেখলে—স্বয়ং সানো কর্তা চলেছে যমুনার ঘরের দিকে, চরের সোজা রাস্তা এড়িয়ে—অনেকটা ঘুরে। রাত তখন অনেক। নিজের চোখকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারল না। ডেকে সাড়া দিতেও তার লজ্জা করতে লাগল।

লজ্জায়-ক্ষোভে ঘরে ফিরে গিয়ে হাবুর মায়ের কাছে মনের জ্বালা জুড়োলে, "মানুষকে বিশ্বাস নাই হাবুর মা—শেষকালে কি না সানো কত্তা......!"

হাবুর মা খানিক থ' হয়ে থেকে বললে, "অত বড় একটা লোক! বয়সও তো হয়েছে!"

"ও হারামজাদী ডাইনী যাদু জানে।" মহেশ বললে, "ও এক-একটা কোথা থেকে বৈরাগী জুটিয়ে আনে—আর দেখতে দেখতে কি তুক্‌-তাক্‌ লাগিয়ে দেয়। দেখ—আগের দু'-দুবার হিসেব করে দেখ।"

ভেবে ভেবে হাবুর মা বললে, "কিন্তু ডাক্তারের কাছে যমুনা ওষুধ আনতে যায় তো?"

মহেশ বললে, "তাতে কি হয়েছে!"

হাবুর মা বললে, "এমন হতে পারে—সানো কত্তার হাতে ডাক্তার হয়তো কোনো ওষুধ-টষুধ পাঠিয়েছে। ডাক্তারকে মোরা জানি—রোগীর উপর ঝোঁক পড়ল তো যাস, নিজে যেয়ে ওষুধ নিয়ে হাজির হবে।"

মহেশ বললে, "ডাক্তার দেবতা! কিন্তু মোর মনে হচ্ছে—ও ওষুধ-টষুধ সব ছল হাবুর মা! হারামজাদী যমুনা এবার ওপরে বিষ ঢেলেছে—শিরে সর্পাঘাত।" একটু থেমে আবার বললে, "তো আমিও তেমন গুণিন্‌। এই তোমাকে বলে দিলম হাবুর মা, এবার বিষ আমি একেবারে ঝেড়ে বার করে দিব।"

হাবুর মা গুম্‌ মেরে বসে রইল।

মহেশ বললে, "সাবধান—কথাটা যেন এখন দু'-কান না হয়। আরও দু'দিন দেখি।"

[ক্রমশ]

দাবী—দাবী—দাবী! কয়েক মাস পর পর এদের বেতনের হার বাড়ছে, তবুও এদের খাই মেটে না। যত্ত সব খিঁচুনে-ওয়ালা পার্টি!

দৈনিক সংবাদপত্র পরিবেশিত খবর এবং বিভিন্ন মন্ত্রীর ভাষণ ও প্রতিশ্রুতি থেকে জনসাধারণের মধ্যে অধ্যাপকদের সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা হওয়া অমূলক নয়। বাস্তব অবস্থাটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বাধীনতা লাভের পর এই বাইশ বছর ধরে বেসরকারি ও গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজগুলির অধ্যাপকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগের আগে পর্যন্ত বেসরকারি কলেজের অধ্যাপকদের বেতনহার ছিল ১৫০, থেকে ৩৫০ টাকা। কোন কোন কলেজে বেতন শুরু হত ১২৫ টাকা থেকেও। সহজেই অনুমেয় যে, ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে স্বাধীন ভারতে ঐ বেতনে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ন্যূনতম ব্যয় মেটানোও সম্ভব ছিল না। তাই বাস্তব চাহিদার তাগিদে অধ্যাপকরা একাধিক কলেজে পার্টটাইম অধ্যাপনার উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যেই সংসার প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতি হিসাবে যে কেবলমাত্র অধ্যাপকদের মধ্যেই একটা অধ্যাপকসুলভ মনোবৃত্তি গড়ে উঠছিল তা নয়, শিক্ষার মানও নেমে যাচ্ছিল। আরও একটি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল—শিক্ষিত যুবকদের এমপ্লয়মেন্ট পোটেন-সিয়ালও কমে যাচ্ছিল, কেন না নূতন অধ্যাপকের প্রয়োজন হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন কোন পার্ট-টাইম অধ্যাপকদের দিয়েই কাজটা চালিয়ে নিতে। অভাবগ্রস্ত অধ্যাপকরাও এই অশুভ প্রয়াসের শিকার হতেন। অবস্থাটা চলছিল ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের তের বছর পর্যন্ত, যদিও ঐ সময়ের মধ্যে অন্যান্য চাকুরির ক্ষেত্রে বেতন ও মহার্ঘভাতার যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছিল সরকারি প্রচেষ্টায় অথবা আন্দোলনের ফলে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন বা ইউ-জি-সি) এদিকটায় দৃষ্টিপাত করেন এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর অধ্যাপকদের জন্য, তিনটি বেতনহার [জুনিয়ার লেকচারার: ২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, সিনিয়ার লেকচারার: ৩০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা এবং বিভাগীয় প্রধান: ৪০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা] সুপারিশ করেন। যদিও ঐ বেতনহার-গুলি তেমন কিছু উচ্চমানের নয় (বিশেষত অধ্যাপকদের শিক্ষাগত মান ও কর্তব্যের দায়িত্ব বিবেচনায়), তবুও রাজ্য সরকারগুলি এই বেতনহার চালু করতেও বহু টালবাহানা করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্য মেনে নিলেন। স্থির হল যে, কলেজের বেতনহার ও ইউ-জি-সি'র বেতনহারের পার্থক্য বাবদ যে টাকাটা লাগবে, সেটা দেবেন রাজ্য সরকার, অবশ্য প্রথম পাঁচ বছর ঐ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের বেশির ভাগই দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। ইউ-জি-সি-র ঐ সুপারিশের সঙ্গে একটি শর্তও ছিল—কোন অধ্যাপক সপ্তাহে ছয় পিরিয়ডের বেশি পার্টটাইম অধ্যাপনা করতে পারবেন না। ইউ-জি-সি-র ঐ বেতনহার চালু হয় ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে।

পার্টটাইম অধ্যাপনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ থেকে যদিও অধ্যাপকরা বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হলেন, তবুও তাঁরা ইউ-জি-সি'র ঐ সুপারিশ বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন প্রধানত দুটি কারণে—(১) স্বাধীন ভারতে অধ্যাপকদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সেই প্রথম সরকারি প্রয়াস এবং (২) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অধ্যাপকদের জন্য 'রিজনেবল' বেতনহার চালু হল।

ইউ-জি-সি'র সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যাপকদের পার্টটাইম অধ্যাপনার সুযোগ যদিও সঙ্গে সঙ্গেই সংকুচিত হয়ে গেল, কিন্তু কলেজের বেতনের সঙ্গে ইউ-জি-সি'র বেতনের পার্থক্য বাবদ প্রাপ্য টাকাটা অধ্যাপকরা মাসের শেষে ত' পেলেনই না, কবে যে পাবেন তাও স্থির জানতে পারলেন না। সবাই অনুমান করলেন যে, সরকারি টাকা কলেজে পাঠানোর ব্যাপারে কিছু প্রশাসনিক সমস্যার জন্য হয়ত প্রথম প্রথম এই অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক পদ্ধতিটা ঠিক হয়ে গেলে নিশ্চয়ই মাসের শেষে পুরো বেতনটা পাওয়া যাবে। গভীর দুঃখের বিষয়, ১৯৫৭ খৃস্টাব্দের অনিশ্চয়তা ১৯৭০ খৃস্টাব্দেও দূর হয়নি, অবস্থা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। সরকারের দেয় টাকা কোনও কোনও কলেজে পৌঁছয় বছরে চারবার (অর্থাৎ অধ্যাপকরা মাসান্তে বেতন পান সেই ১৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা বেতনহার অনুযায়ীই এবং ইউ-জি-সি-কৃত বেতন-হারের জন্য প্রাপ্য টাকাটা পান তিন মাস পর পর), কোনও কলেজে বা পৌঁছয় বছরে তিনবার। এই যে তিনবার বা চারবার সরকারের টাকাটা কলেজে পৌঁছয়, তারও কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। অর্থাৎ অতি দোর্দণ্ড প্রতাপ-শালী অধ্যক্ষকেও তাঁর অধীনস্থ অধ্যা-পকদের কাছে করুণভাবে এই ব্যাপারে তাঁর অসহায় অবস্থা অকপটে স্বীকার করতে হয়। এখানে আর একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে—যে প্রশাসনিক কর্তা মাসান্তে বা কোন নির্দিষ্ট তারিখে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রাপ্য বেতন দিতে পারেন না। তিনি কোন্ অধিকারে অধীনস্থ কর্মচারীদের করণীয় কর্তব্য পুরোপুরি নিষ্ঠাভরে করতে বলবেন? অর্থাৎ কলেজের প্রশাসনিক ব্যাপারে একটা বিশৃঙ্খলা এনে দেওয়া হচ্ছে সরকারি গাফিলতির জন্য।

যাই হোক, অধ্যাপকদের কথাতেই ফিরে যাই। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় অধ্যাপকদের বেতনহার পরি-বর্তন করেন এবং দুটি হার সুপারিশ করেন—(১) জুনিয়ার লেকচারার: ৩০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা এবং (২) সিনিয়ার লেকচারার: ৪০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিলেন যে, কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে শতকরা ২০ জন সিনিয়ার লেকচারার হবেন; কিন্তু কোন্ ভিত্তিতে ঐ সিনিয়ার লেক-চারার নির্বাচিত হবেন তা বলে দিলেন না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই সুপারিশ মেনে নিলেন দুটি শর্তে—(১) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় যে সব কলেজ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো এই বেতনক্রমের আওতার বাইরে থাকবে এবং (২) পুরানো কলেজ-গুলিতেও ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের পর নূতন সৃষ্ট পদে যে সব অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরাও এই বেতনক্রম পাবেন না।

গোড়া থেকেই বিভিন্ন হারের বেতন-ক্রম চালু করার কৌশলে অধ্যাপকদের বিভিন্নগোষ্ঠীতে ভাগ করে রাখার যে অপপ্রয়াস রয়েছে, তা নিশ্চয়ই বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে বোঝাতে হয় না। তবে অধ্যাপকদের মধ্যে বহু বর্ণ সৃষ্টি করার প্রয়াসটা চরমে উঠল ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে উপরে বর্ণিত অবস্থার মধ্য দিয়ে। আর যখন কেন্দ্রীয় সরকার সিনিয়ার লেকচারার

মনোনয়নের জন্য কোন নির্দিষ্ট নীতি বেঁধে দিলেন না। তখন ভিন্ন ভিন্ন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী নিয়ম ঠিক করে নিলেন এবং অধ্যাপকদের মধ্যে মর্জিমত মেহেরবানি বিলাতে লাগলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। ইউ-জি-সি'র সুপারিশ-কৃত বেতনহার (অর্থাৎ ২০০-৫০০ ইত্যাদি) এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধিত বেতনহারের (অর্থাৎ ৩০০-৬০০ টাকা ইত্যাদি) মধ্যে যে টাকার পার্থক্য, সেটা প্রাথমিকভাবে কলেজ-গুলিতে পাঠিয়ে দিতে হবে রাজ্য সরকারকে, যদিও তার মোটা একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার পরে রাজ্য সরকারকে পাঠিয়ে দেবেন।

ইউ-জি-সি'র বেতনহার বাবদ অধ্যাপকদের প্রাপ্য টাকা কিভাবে রাজ্য সরকার অধ্যাপকদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন, তা আগেই বলা হয়েছে। ইউ-জি-সির বেতনহার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকৃত নূতন বেতনহারের পার্থক্য বাবদ প্রাপ্য টাকা অধ্যাপকরা যে কবে এবং কিভাবে পাবেন, তা সম্ভবত কেউ জানেন না। হঠাৎ হঠাৎ কিছু কিছু অধ্যাপক বর্ধিত বেতন-হার বাবদ প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন।

অধ্যাপকদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য সৃষ্টির যে অদ্ভুত প্রয়াসের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকরা কিন্তু গোড়া থেকেই সে সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য আন্দোলন করতে থাকেন এবং রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন যে, সকল অধ্যাপকের জন্যই ৩৫০ টাকা থেকে ৯৫০ টাকার একটি বেতনক্রম চালু করা হোক। তদানীন্তন কংগ্রেসী রাজ্য সরকার কিন্তু অধ্যাপকদের এই কথা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেন এবং অধ্যাপক-দের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে [কেন্দ্রী]য় সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী [বেতন]হার দুটি চালু করলেন।

[১৯৬৭] খৃস্টাব্দে যখন পশ্চিম-[বঙ্গে] যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত [হল] তখন অনেকের মতই [অধ্যা]পকরাও আশান্বিত হয়ে উঠে-[ছিলে]ন। অধ্যাপকদের আশার পেছনে বিশেষ কারণও ছিল। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্ত্রী হবার আগে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য শিক্ষা-মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবর্গ তাঁর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করেন এবং শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক সমিতিকে আশ্বাস দেন যে, তিনি নিশ্চয়ই শিক্ষক সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী একটি বেতনহার চালু করবেন। জনশ্রুতি যে, তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী এবং যুক্তফ্রন্টের উপমুখ্যমন্ত্রী নাকি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীভট্টাচার্য মহাশয়কে বলেছিলেন, শিক্ষক সমিতির দাবি পূরণের পথে অর্থমন্ত্রক সর্বতো-ভাবে সাহায্য করবেন। তবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল অধ্যাপকের জন্য একটি বেতনক্রম চালু করতে পারেন নি।

রাষ্ট্রপতির শাসনকালে শিক্ষাসচিব বা রাজ্যপাল বলেন যে, দুটি বেতনহারের পরিবর্তে একটি বেতনহার চালু করা একটা মস্ত নীতিগত ব্যাপার, তাই কেবলমাত্র নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই সম্ভব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

অধ্যাপকদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ পরীক্ষা বর্জন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশের পথ খুঁজতে লাগল।

১৯৬৯ খৃস্টাব্দে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর শ্রীসত্যপ্রিয় রায় শিক্ষামন্ত্রী হলেন। তখন আরও একবার অধ্যাপকরা আশান্বিত হয়ে উঠলেন। শ্রীরায় শুধুমাত্র একজন প্রাচীন শিক্ষকই নন, বাংলা দেশের শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। অধ্যাপক-দের আশা আরও বেড়ে গেল যখন ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী নবনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ঘোষণা করলেন যে, (১) সকল অধ্যাপকের জন্য একটি বেতন-হার চালু করা হবে এবং (২) এ বাবদ যে সমস্ত অধ্যাপক কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন পাচ্ছিলেন না তাঁরাও পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রি-সভার এই সিদ্ধান্তকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জানালেন। অধ্যাপকদের প্রস্তাবিত পরীক্ষা বর্জন আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল।

শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ শিক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই বিবিধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন।

২৬শে মার্চ, ১৯৬৯ তারিখে শিক্ষক সমিতির নেতারা শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরায়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেন:

(১) কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা [যেমন বাড়ি ভাড়া, সিটি এলাউন্স ইত্যাদি] পেয়ে থাকেন, রাজ্যের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের সেই সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

(২) কলেজের সকল ডিমনস্ট্রেটর জন্য ২৫০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকার একটি বেতনক্রম চালু করতে হবে এবং যে সমস্ত বি-এসসি পাশ ব্যক্তি ল্যাবরেটরি এসিস্ট্যান্টের পদে নিযুক্ত হয়েও প্র্যাকটি-ক্যাল ক্লাসে ডিমনস্ট্রেটরদের কাজ করেন, তাঁদের ডিমনস্ট্রেটর বলে স্বীকৃতি দিতে হবে।

(৩) লাইব্রেরিয়ান ও ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরদের জন্য ঘোষিত বেতনক্রম অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(৪) বিভাগীয় প্রধানদের প্রশাসনিক ভাতা দিতে হবে।

(৫) ইউ-জি-সি'কৃত বেতনক্রমের জন্য যে টাকাটা সরকার অধ্যাপকদের দিচ্ছেন, সে টাকার উপর শতকরা ৮½ হিসাবে অধ্যাপকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগ-কর্তার অংশ বাবদ সরকারকে দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপকদের সমস্যা-গুলিও মন্ত্রিমহোদয়কে জানান। স্পনসর্ড কলেজের সমস্যাগুলো আরও মর্মান্তিক। ঐ সমস্ত কলেজে কোন নূতন অধ্যাপকের পদের প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকারের শিক্ষা অধিকারের অনুমোদন নিতে হয়। কোন স্পনসর্ড কলেজ নূতন পদের জন্য শিক্ষা অধিকারে অনুমোদন চাইলে সাধারণত শিক্ষা অধিকার কলেজ কর্তৃপক্ষকে এক বছরের জন্য অস্থায়ি-ভাবে ঐ পদে একজন অধ্যাপক নিয়োগ করতে বলেন। একাদিক্রমে বছর দুই-তিন ঐ অস্থায়ী পদে অধ্যাপক নিযুক্ত থাকলে শিক্ষা অধিকার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐ পদটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে অর্থবিভাগের বিবেচনার জন্য পাঠান। অর্থবিভাগ ঐ পদটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলে শিক্ষা অধিকার ঐ নূতন পদটি অনুমোদন করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর সময় লেগেছে। কিন্তু যতক্ষণ

পর্যন্ত না ঐ পদটি পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতিতে শিক্ষা অধিকার কর্তৃক সরকারিভাবে অনুমোদিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ অস্থায়ী পদে নিযুক্ত অধ্যাপকটিও অননুমোদিত বা 'আন-এ্যাপ্রুভড্' অধ্যাপক বলে বিবেচিত হন এবং কোন 'আন-এ্যাপ্রুভড' অধ্যাপকই কেন্দ্রীয় সরকারকৃত বেতনহার পাবেন না, অর্থাৎ তিনি পাবেন ইউ-জি-সি'কৃত ২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকার বেতনক্রম [ প্রসঙ্গত গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজের ন্যূনতম বেতনক্রম বর্তমানে এটাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি স্পনসর্ড কলেজেই বিপুল সংখ্যক 'আন্-এ্যাপ্রুভড' অধ্যাপক আছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শ্রীরায়কে অনুরোধ করেছিলেন স্পনসর্ড কলেজের এই আন-এ্যাপ্রুভড অধ্যাপকরা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত বেতনক্রম পান তার ব্যবস্থা করতে।

অধ্যাপকদের এই দাবিগুলি এত ন্যায়সঙ্গত যে, শ্রীরায় নীতিগতভাবে সব স্বীকার করে নেন এবং আশ্বাস দেন যে, তাঁর সাধ্যমত অধ্যাপকদের দাবিগুলি তিনি নিশ্চয়ই মেটাবেন।

যদিও ২৭শে ফেব্রুয়ারী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং ২৬শে মার্চ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর দীর্ঘ আলোচনা হয়, তা হলেও কিন্তু আগস্টের আগে কোন গভর্নমেন্ট অর্ডার বের হয় না। ৮ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ একটি গভর্নমেন্ট অর্ডার জারী করেন।

[ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের অর্ডার নং
1645—Edu (cs)

1645—Edn (cs)
dated 8th Aug, 1969 দ্রষ্টব্য ]।



আপাতদৃষ্টিতে ঐ সরকারি হুকুমনামার বলে অধ্যাপকদের জন্য একটি বেতনহার চালু হল বটে, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, একই প্রারম্ভিক বেতন ও শেষ বেতনের সীমার মধ্যে দুটি বেতনহার চালু রইল। তবে এই আদেশের ফলে সকল অধ্যাপকই ৮০০ টাকায় পৌঁছবার স্বপ্ন দেখতে পারবেন।

কিন্তু ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের পর যে সকল অধ্যাপক নূতন পদে নিয়োজিত হয়েছেন, তাঁরা এই বর্ধিত বেতনহার পাবেন কেবল ১লা এপ্রিল, ১৯৬৯ থেকে। অর্থাৎ ঐ অধ্যাপকরা কিছুটা বঞ্চিত থেকেই গেলেন, যদিও তাঁদের কোন অপরাধ নেই। কোন্ নীতির উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন? এবার আসে বকেয়া বাবদ প্রাপ্য টাকার হিসেব মিটিয়ে দেবার কথা। শ্রীরায় বলেছিলেন যে, ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের পুজোর আগেই সকল অধ্যাপকের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, আজ পর্যন্তও অনেক অধ্যাপকই তাঁদের প্রাপ্য বকেয়া টাকা পান নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ২৬শে মার্চ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে শ্রীরায়ের যে সব বিষয়ে কথা হয়েছিল, তার একটিও কিন্তু ৮ই আগস্টের সরকারি হুকুমনামায় স্থান পায় নি।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে অধ্যাপকরা এক গণ-ডেপুটেশন নিয়ে যান রাইটার্স বিল্ডিংস-এ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। সেখানে শ্রীরায় বলেন যে, অধ্যাপকরা বকেয়া টাকা না পাওয়ার জন্য দায়ী অর্থ-দপ্তর, কেন না অর্থদপ্তর এখনও ফাইলগুলো ছাড়েন নি; আবার পরদিন অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি বলেন যে, শিক্ষা-দপ্তর সমস্ত অধ্যাপকের কেসগুলোই অর্থদপ্তরে পাঠান নি। দোষ শ্রীরায়েরই হোক বা শ্রীমুখার্জিরই হোক, সেই অধ্যাপকরা কিন্তু আজও বঞ্চিত।

অধ্যাপকদের আর্থিক দুর্দশার এখানেই শেষ নয়। সরকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মহার্ঘভাতার জন্য বেসরকারি কলেজের অধ্যাপকদের মহার্ঘভাতা দেন। ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার ঐ ভাতাকে বাড়িয়ে মাসিক ১১০ টাকা করেন। সেজন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ঐ মহার্ঘভাতাও অধ্যাপকরা প্রতি মাসের শেষে পান না; সাধারণত তিন মাস অন্তর অন্তর পান, কখনো বা ছয় মাস পরও পান।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, সরকারি এবং প্রায় সব বাণিজ্যসংস্থার সকল শ্রেণীর কর্মচারী কতকগুলো সুখ-সুবিধা, যেমন—বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা বাবদ ভাতা বা বিনামূল্যে চিকিৎসা, কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানসন্ততিদের শিক্ষা বাবদ ভাতা ইত্যাদি পান; বেসরকারি কলেজের অধ্যাপকরা কিন্তু তার একটাও পান না।

সব মিলিয়ে বাস্তব পরিস্থিতিটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম—একজন যদি এমন একটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন [ অধ্যাপক হবার জন্য নিম্নতম শিক্ষাগত মান—অনার্স স্নাতক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ]—যে কলেজের নিজস্ব বেতনহার ১৫০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা এবং কলেজের মহার্ঘভাতা সাড়ে সতের টাকা, তা হলে প্রতি মাসের শেষে তিনি পাবেন মোট ১৬৭½ টাকা; যদিও বর্তমান হিসাব অনুযায়ী তাঁর প্রাপ্য ৪২৭½ টাকা [ বেতন : ৩০০ টাকা, কলেজ মহার্ঘভাতা : ১৭½ টাকা এবং সরকারি মহার্ঘভাতা : ১১০ টাকা ]। অর্থাৎ অধ্যাপক ভদ্রলোকটির যা প্রাপ্য তার অর্ধেকেরও কম তাঁকে পেতে হবে প্রতি মাসের শেষে এবং বাকী প্রাপ্য টাকাটা যে তিনি কবে পাবেন, সেটা তিনিও জানেন না, তাঁর কলেজ কর্তৃপক্ষও জানেন না। এই হচ্ছে ১৯৭০ খৃস্টাব্দে স্বাধীন ভারতের বেশির ভাগ অধ্যাপকের অবস্থা।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এই অচল অবস্থা কবে পর্যন্ত শেষ হবে? তীব্র আন্দোলন ছাড়াই কি অবস্থা পরিবর্তিত হবে? অধ্যাপকদের যদি দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন করতে হয় ত তাঁরা কিভাবে সে আন্দোলন করবেন? শুধুমাত্র অধ্যাপক-আন্দোলনের দ্বারাই কি এই অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব, না কি বৃহত্তর জনসাধারণের সর্বব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন হবে?

(পূর্ব

(আট)

কার্ল মার্ক্স যখন কমিউনিজমের চূড়ান্ত সাফল্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন—তখন তিনি কোন নৈতিক তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে কমিউনিজমের পক্ষে রায় দেন নি। কমিউনিজম নীতিগতভাবে ধনতন্ত্রবাদের চাইতে উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা, এ-প্রশ্ন তাঁর তত্ত্বের মধ্যে ছিল না। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীতে হবেই, কেন না পুঁজিবাদের গর্ভেই পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ লুকানো রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনিবার্য গতিতে পুঁজিবাদেরই সমাধি রচনা করবে। ডায়েলেকটিক্স অবলম্বন করে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন 'থিসিস' (স্থিতি) ও এ্যান্টি-থিসিসের (প্রতিস্থিতি) সংঘাতের মধ্যে দিয়েই একটা সিনথিসিস বা সমন্বয় জন্ম নেবে। আর মার্ক্স তাঁর ডায়েলেকটিক্স তত্ত্বের সংগে তাঁর এক-রৈখিক প্রগতিতত্ত্ব জুড়ে দিয়ে ব্যাখ্যার দ্বারা দেখাতে চাইলেন—এই দ্বন্দ্ব-উদ্ভূত সমাজটি অবশ্যই অধিক প্রগতিশীল হবে। এই একরৈখিক প্রগতিতত্ত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলেই নীতিতত্ত্বের আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি। সমাজতন্ত্র অথবা কমিউনিজম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবেই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের মূলসূত্ররূপে আর সেটা উন্নততর ও অধিক প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থারূপে গণ্য হবেও। মার্ক্স আসলে পুঁজিবাদের বিবর্তনের মূল নিয়মটি আবিষ্কার করে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নই তিনি তোলেন নি। সমাজবিবর্তনের ঐতিহাসিক সূত্র আবিষ্কার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিতরই তাকে উচ্ছেদ করার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর এই অন্তর্বিরোধের ফলেই অন্যান্য যুগে অন্যান্য সমাজব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনিভাবেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সমাজতন্ত্র প্রচলিত হবে।

"Socialism *must* come because historical necessity the objective laws of human history, the forces of production are bringing us everyday closer and closer to it." (Marx).

অর্থাৎ সমাজতন্ত্র অবশ্যই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। মনুষ্যসমাজের ইতিহাসের জৈবিক নিয়মাবলী—উৎপাদন ব্যবস্থা ও শক্তিগুলি প্রতিদিনই আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নিকটতর করছে।

একরৈখিক প্রগতিতত্ত্ব মার্ক্স গ্রহণ করেছিলেন বলেই কোন নীতিতত্ত্বের আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি। সমাজতন্ত্র অথবা কমিউনিজম যখন অনিবার্য পরিণতিস্বরূপে আসছে—তখন সেটা তো প্রগতিশীল হবেই, যেমন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে উন্নতধরনের ও প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থারূপে গণ্য হয়ে এসেছে। সমাজে যে শ্রেণী সংঘর্ষ চলেছে তাতে যে-পক্ষে সর্বহারা শ্রমিক-শ্রেণী সামিল হবে, সে পক্ষ যে ন্যায়ের পক্ষ বা প্রগতিশীল, এ তর্কেরও এতে কোন স্থান নেই। অবশ্য মার্ক্সের উত্তরসাধকরা সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম নীতিগতভাবে প্রগতিশীল ও উন্নততর ব্যবস্থা বলেই প্রচার করেছেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, মার্ক্সের এমন অনেক রচনা আছে—যার উৎস বা প্রেরণা ডায়েলেকটিক্স-এর কচকচি নয়—মানবিক মূল্যবোধ—নিপীড়িত মানবের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি। আবার তাঁর উত্তরসাধকদের কাছে তাঁর মানবিক মূল্যবোধের দিকটা উপেক্ষিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট দুনিয়া বুঝতে পেরেছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিবর্তনের মৌলিক নিয়মের Fundamental Laws in the development of Capitalism-এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। তাই কমিউনিজম অথবা সমাজতন্ত্রকে উন্নত প্রগতিশীল ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করে তার দ্রুত প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর জন্য প্রস্তুতির কথা বলা হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ডায়েলেকটিক্স-এর অমোঘ সূত্র অনুযায়ী লড়াই-এর সূত্রপাত অনিবার্যভাবে যে হবেই, এ কথা কমিউনিস্ট তত্ত্ববিশারদরা মুখে বললেও মনে মনে বিশ্বাস করেন না। লড়াইকে বিপ্লবের থেকে পৃথক করে তাঁরা দেখেন না। এই ধরনের যুদ্ধে তাঁদের একটা বৈপ্লবিক স্বার্থ আছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রদের সংগে যুদ্ধ সুরু হলে শেষে সেনাবাহিনীর পেছনে বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান হবেই—শ্রেণী সংগ্রাম জোরদার হবে।

তা হলে এক অদ্ভুত পারিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছেঃ—

"সর্বহারার একনায়কত্বের" দেশে সমাজতন্ত্রকে সার্থক রূপ দেবার জন্যে এবং সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ শক্তিশালী করবার জন্যে—সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের বৈষয়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে ধনতন্ত্রবাদের "আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা" থিয়োরীর আশ্রয়ে ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের সংগে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলতে হচ্ছে। আবার "কমিউনিস্ট বিপ্লবের" আগুনকে অন্য দেশে ছড়িয়ে দেবার জন্য, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বিনাশ ত্বরান্বিত করার জন্য বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কাছে, শোষিত জাতির কাছে নিজেদের বৈপ্লবিক চরিত্র, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রেণী-চেতনা, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আদর্শের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা দেখাবার জন্য মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য চেয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন না এই সব যুদ্ধ সেই সব বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট-অনুগামীদের "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহবিপ্লবে রূপান্তরিত কর"—এই শ্লোগান কার্যকরী করার মাধ্যমে সেই সব দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে সাহায্য করতে পারে। এই দুটো মনোভাবের মধ্যে কি সামঞ্জস্য আছে? আর এই দুটো মনোভাবের কোনটা কখন প্রাধান্য পাবে, সেটা নির্ধারণ করবে কে বা কারা?

মার্ক্স ছিলেন দার্শনিক—কমিউনিস্ট রণকৌশল ট্যাকটিক্স বা স্ট্রাটেজী নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা তো তাঁর নয়। তাই তিনি সুবিধা মত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও অনিবার্য যুদ্ধের কথা বলেন নি। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে উপসংহারে

তাঁর মন্তব্য ও আহ্বান যে বৈপ্লবিক রোমাণ্টনা জাগায়, কর্মী ও পাঠকের মনে তা অনস্বীকার্য। তার সংগে সহ-অবস্থান তত্ত্ব খাপ খায় কি? তিনি বলেছিলেন :—

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible over-throw of all existing Social Conditions. Let the ruling classes tremble at communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win."

অর্থাৎ কমিউনিস্টরা তাদের মনোভাব ও লক্ষ্য গোপন করতে ঘৃণাবোধ করে। সমস্ত প্রচলিত সমাজব্যবস্থা বলপূর্বক উৎখাত করেই তাদের লক্ষ্য সফল হতে পারে। শাসক শ্রেণীরা ভয়ে কাঁপুক কমিউনিস্ট বিপ্লবের কথা ভেবে। সর্বহারা শ্রেণীর শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু খোয়া যাবার ভয় নেই—গোটা বিশ্ব তারা জয় করবে পুঁজিবাদী শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে।

লেনিনের রচনা "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের অন্তিম পর্যায়" প্রকাশিত হবার পর গোটা মানবজাতি একটা প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে রক্তস্নাত হয়ে এল। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও পুঁজিবাদ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত না হয়ে নূতন কলেবর ধারণ করল,—নূতন শক্তি সঞ্চয় করে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সংগে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অতীতের উপনিবেশগুলি একে একে স্বাধীন হতে লাগল। বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, জাপানের অধীনস্থ কলোনীগুলি স্বাধীন হল। কিন্তু পুঁজিবাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ উপনিবেশ হারিয়ে ভেঙে পড়ল না। যেমন ধরা যাক হল্যাণ্ডের কথা। সেই সাম্রাজ্যবাদী দেশ ইন্দোনেশিয়াকে খুইয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে তো পড়ল না। সে দেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ আসতো তার প্রধান উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া থেকে। ভারত-পাকিস্তান, সিংহল-মালয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কামধেনু হারিয়ে পুঁজিবাদী ব্রিটেনের শ্রমিক-শ্রেণীর জীবিকার মান ও আয় কমে তো নি-ই—বরং অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উপনিবেশগুলি যখন ছিল তখনকার তুলনায়, উপনিবেশগুলি হারিয়ে ইংলণ্ডের শ্রমিক-শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। [illegible] দেশের অর্থনীতিতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও প্রচণ্ড বৈষয়িক উন্নতি বিশ্বের সকল দেশের, এমন কি পুঁজিবাদী আমেরিকারও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র জার্মানী বিধ্বস্ত হয়েছিল—লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব জার্মানীর সীমান্ত পার হয়ে পশ্চিম জার্মানীতে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ সেই পশ্চিম জার্মানী পৃথিবীর উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান এশিয়ার তার উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য খুইয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি পঙ্গু হয়ে পড়েছে? সমগ্র এশিয়ায় বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপান অসামান্য সাফল্য ও উৎকর্ষতা দেখিয়েছে। মার্কিন পুষ্পক রথ থেকে বর্ষিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রেম ও মানবতার উপহার—আণবিক বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত বিহ্বল জাপান আজ এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত দেশ। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প-রাষ্ট্র। এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে সে-দেশ আর্থিক সাহায্য ও কারিগরি সাহায্য দিচ্ছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এই অভূতপূর্ব পুনরুজ্জীবনের মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা কি আছে? অন্ধ গোঁড়ামির ঠুলি পরে দেখলে হবে না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও দুর্বলতার প্রকৃত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রাম পদ্ধতি ও অগ্রগতি নির্ভর করবে প্রধানত এই বিরুদ্ধ শক্তির সঠিক মূল্যায়নের ওপর। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন-ভাবধারার প্রভাব আজ কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

সমাজবিপ্লবের কথা যাঁরা ভাবেন—নতুন দিনের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য তো নির্ভর করবে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক শক্তির সঠিক মূল্যায়ন ও বিশ্লষণে অবজেকটিভ কনডিশনস, সমাজ ও জাতির ভাবগত মানসিক পরিস্থিতি, সাবজেকটিভ সিচুয়েশন ও সর্বোপরি বলিষ্ঠ—নিস্পৃহ বিচক্ষণ নির্লোভ আদর্শবাদী নেতৃত্ব—লিডারশিপ। সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে চাই সুস্পষ্ট আদর্শ—সমাজতন্ত্রের বা আদর্শের ব্যাখ্যা উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা ও নির্দেশ,—কেন না আইডিয়লজি ও স্ট্রাটেজীর মধ্যে চাই সম্পূর্ণ বনিবনা, বোঝাপড়া, কোনরকম বৈপরীত্য থাকলে চলবে না। সর্বোপরি চাই দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। এই সব শক্তির সমন্বয় না ঘটলে বিপ্লব [illegible] আন্দোলনের ধাক্কাকে নিরপেক্ষ করলে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। বিপ্লবের সামনে ছিল না কোন সুস্পষ্ট আদর্শ, ছিল না আইডিয়লজী ও স্ট্রাটেজীর মধ্যে আদর্শ ও সংগ্রাম পদ্ধতির মধ্যে আদৌ কোন বোঝাপড়া। সর্বোপরি ছিল না সঠিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। অথচ ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে এবং ১৯৪০ সালে রামগড়ের আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র। সেদিনের স্বার্থপর-সঙ্কীর্ণতাবাদী নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলগুলি কর্ণপাত করে নি বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সাবধানী হুঁশিয়ারীতে। ভারতের অভ্যন্তরে সুরু হল সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী "ভারত ছাড়" আন্দোলন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করতে হবে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক' 'প্রগতিশীল' নেহরুজী (ভারতের একজন কমিউনিস্ট নেতা তো তাঁর স্মরণে 'Gentle Colossus' বই-ই লিখে ফেললেন। অবশ্য নেহরুজী দেখে যেতে পারলেন না—এই যা!) ও তাঁর ভাবধারায় বিশ্বাসী নেতারা সেই লড়াইয়ের দামামা বাজাবার প্রাক্ মুহূর্তে ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে—এখন কি আমাদের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের ডাক দেওয়া উচিত? ইংরেজ বড্ড বিপন্ন ও বিব্রত! এই সময় লড়াই-এর ডাক দেওয়ার অর্থই হল নাকি ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে মদৎ জোগান। নেহরুজী যে সর্বাগ্রে ফ্যাসি-বিরোধী! ভারতবর্ষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে ফ্যাসিস্টদের নাকি সুবিধা হয়ে যাবে! আসলে সুভাষচন্দ্রের ভূত ঘাড়ে চেপেছিল দক্ষিণপন্থী নেতাদের। তাই নেহরুজী ওদের অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে বিব্রত না করার পক্ষপাতী ছিলেন। আর সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে থেকে বলে চলেছেন: আঘাত হানো সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির ওপর—বিদেশী ডাকাতের দল দেশজননীর বুকে চেপে বসে তার রক্তমোক্ষণ করছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জোরদার করসেইটাই হল প্রকৃত বামপন্থা। বিশ্বযুদ্ধে বিব্রত ইংলণ্ডের পূর্ণ সুযোগ ভারতের দেশভক্তদের নিতে হবে, ওদের অসুবিধা আমাদের সুযোগ। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, পরাধীনতার যুগে বামপন্থার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। [ Meaning of Leftism,—Netaji ]

অবশ্য নেহরুজী ও আজাদের বক্তব্য সংখ্যাধিক্যের ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্টরা (তখন অবিভক্ত দল) নেহরুজীকে-আজাদকে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে প্রচার করেন এবং তাঁরা যাদের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলে

করেন সেই সময় [illegible]
প্যাটেল-আচার্য কৃপালনী প্রমুখেরা আগস্ট বিপ্লবে সেদিনের জাতীয় কংগ্রেসকে সংগ্রামী ভূমিকা নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। নেহেরুজী তখন ভারতের কমিউনিস্ট শিবিরের সবচেয়ে বড় ভারতীয় বামপন্থী নেতা,—সব চেয়ে বড় "ফ্যাসি-বিরোধী" জননেতা কেন না তিনি সুভাষ-বিরোধিতায় একজন প্রথম সারির জেনারেল ছিলেন। ভারতের সেই রক্ত-ঝরার দিনগুলিতে ভারতের সর্বহারার বিপ্লববাদী-মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট দলের মনোভাব সেই সময়কার সেই দলের সরকারী দু'একটি বিবৃতি থেকেই উপলব্ধি করা যাবে। ভারতের বর্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায়কে ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস আগে ভাল করে পাঠ করা দরকার—দেশকে জানা দরকার—স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনানী সৈনিক-শহীদদের জানা দরকার। জানা দরকার গান্ধীবাদীদের বিভিন্ন সময়ের ভূমিকার কথা। বামপন্থার মুখোশ পরে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে-ছিলেন তাঁদের জানা দরকার।

১৯৪২ সালের বৈপ্লবিক করেঙ্গা-ইয়ে-মরেঙ্গা সংগ্রামে তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সি যোশী ২৩শে আগস্টের (১৯৪২) "পিপলস ওয়ার"-এ ("জন-যুদ্ধ") এক আবেদন প্রসঙ্গে লেখেন:

**"ধ্বংসকার্য প্রসঙ্গে"**

> ..গভর্নমেন্টের কাজে উত্তেজিত হইয়া আমাদের দেশপ্রেমিকরা ভারতের স্বাধীনতার নামে জাতির দেশরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকরী উপকরণগুলি নষ্ট করিতে উদ্যত।...ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা লইয়া হেলাফেলা করা, ভারতীয় জনবাহন ব্যবস্থা অচল করার অর্থ ফ্যাসিস্ট শত্রুর সাহায্য করা, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা নয়।
>
> "উহার অর্থ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে" "ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বসিয়া থাকিতে পারে না" মৌলানা আজাদের এই ওজস্বিনী ভাষণের প্রত্যেকটি কথা ভুলিয়া যাওয়া।...
>
> সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশপ্রেমিক-দের কাছে আমাদের আবেদন এই: ধ্বংসকার্য হইতে বিরত হও, উহাতে ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে ফ্যাসিজমেরই লাভ হইবে। সমস্ত দল ও সংগঠনকে একত্র করিবার কাজে আত্মনিয়োগ কর........
>
> ইহাই তোমাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য, কারণ তোমরাই দেশের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মী।"

বিবৃতি প্রদানকারী নেতার নামটা উহ্য থাকলে—মনে হবে স্বভাবতই কোন বৃটিশ স্বরাষ্ট্র সচিবের আবেদন যেন। দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী সংগ্রামের নির্লজ্জ বিরোধিতারই নামান্তর নয় কি? হঠাৎ ইংরেজ প্রভুদের প্রেমে গদগদ হয়ে গান্ধীজীর চাইতেও বেশী উগ্র অহিংসবাদী হয়ে গেলেন সেদিনের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব-বিপ্লবীরা। কবে কোন্ দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব সংগঠিত ও সফল হয়েছে পারস্যের গালিচা-মখমল-বেছানো মাঠে-ময়দানে? সিল্কের দস্তানা হাতে, চুনট-করা কোঁচা-লোটান ধুতি—গিলেকরা পাঞ্জাবী—জরীর কাজ-করা নাগরা চটি পরে—মুহুর্মুহু তার ওপর পদচারণা করে বড় বড় বক্তৃতার তুফান ছুটিয়ে? সাম্রাজ্যবাদীদের লুটের মাল,—তল্পি-সঞ্চিত পুঁজি রক্ষার জন্য—দু'শ বছরের ইংরেজ শাসিত-শোষিত পরাধীন ভারতবাসীর "আত্মরক্ষা" বা "দেশরক্ষা ব্যবস্থার" প্রাধান্যতত্ত্ব আবি-ষ্কার করা হল—কেন না জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত সোভিয়েট রাশিয়ার "জাতীয় স্বার্থ" যে জড়িত ছিল। অথচ ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ডের একাংশ গ্রাস করার পর নাৎসী জার্মানী যখন ফরাসী দেশ আক্রমণ করে—কয়েক দিনের লড়াই-য়েই সে দেশের স্বাধীনতা হরণ করে গোটা ফরাসী দেশকে দখল করে নিল তখন ফরাসী দেশের শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি—বীভৎস নাৎসী আক্রমণকে রুখবার কোন চেষ্টাই করে নি--বরং প্রকাশ্যে সাহায্য করেছিল। সেদিন তো ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি ফরাসী জাতির "আত্মরক্ষা" বা "দেশরক্ষা ব্যবস্থা"-কে জোরদার করার জন্য কোন চেষ্টাই করে নি? কেন? তখন নাৎসী জার্মানী ও লেনিনবাদী-স্টালিনবাদী সর্বহারাদের 'পরিত্রাতা' রাশিয়া অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ। তখন এ-যুদ্ধ ছিল "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"। ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা থোরে রাশিয়ায় পলায়ন করলেন। আর ইতিহাসের "নিন্দিত"-"দক্ষিণপন্থী" ফরাসী নেতা জেনারেল দ্য গল্ দেশের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করে গেলেন। যাঁরা দেশের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাঁরা হলেন দেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্রযুবক মেহনতি মানুষের বন্ধু—মুক্তিপথের ভ্যানগার্ড!—আর যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালালেন অমিত বিক্রমে নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে—যুদ্ধোত্তর ইওরোপে ফরাসী দেশকে নতুন মর্যাদা ও শক্তি দানের কাজে নেতৃত্ব নিলেন,—মার্কিন ও ইংরেজদের প্রভুসুলভ মনোভাব ও আচরণের সমুচিত জবাব দিয়ে গেলেন, নাই বা হল তাঁর চিন্তাধারা "বামপন্থী-দের" অনুকূলে, তিনি পুঁজিপতিদের দালাল, 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'দক্ষিণপন্থী' রূপেই পরিচিত হলেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ—লাল সেলাম,—লাল সেলাম।

পি সি যোশী ও তাঁর সমগ্র দল পরাধীন ভারতের দেশরক্ষার জন্য নিপীড়িত মুমূর্ষু ভারতবাসীর "আত্ম-রক্ষার" জন্য কি অসীম উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ও সেদিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থনে তাঁর বিপ্লবী লেনিনবাদী দল জনমত তৈরী করতে লেগে গিয়ে-ছিলেন। অথচ স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ব্যাপক উলঙ্গ আক্রমণে বিপন্ন হল, তখন স্বাধীন ভারতের "দেশরক্ষা" বা "আত্মরক্ষা ব্যবস্থা" শক্তিশালী করার জন্য সেদিনের অবিভক্ত কমিউনিস্ট দলই বা কি করে-ছিলেন? এই আক্রমণকে সরাসরি নিন্দা করতেও তাঁরা পারেন নি। সমাজ-তান্ত্রিক চীন তো কখনো আক্রমণ করতে পারে না! অথচ "সমাজতান্ত্রিক" রাশিয়া যখন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে বসল তখন "সমাজতান্ত্রিক" চীন সেই সময় রাশিয়াকে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" বলে নিন্দা করেছে সরাসরি। এই 'স্বাধীনভাবে' চিন্তা করে মতামত ব্যক্ত করতে যদি 'সমাজতান্ত্রিক' চীনের কোন বাধা না থাকে—তাহলে ১৯৬২ সালে ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিই বা কেন চীনকে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" বলে ধিক্কার দিতে পারলেন না? আসলে চীনা কমিউনিস্টরা সর্বাগ্রে চীন-পন্থী-দেশভক্ত। সব চিন্তার ওপর প্রাধান্য পায় তাদের স্বদেশ-চিন্তা--চৈনিক জাতীয়তা-বাদ।

পি সি যোশী ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পরই ভারতের কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে প্রসঙ্গত বলেন :—

> "...কংগ্রেসসেবী সহকর্মীদের কাছে আমরা নিম্নলিখিত কথার মর্ম অনুধাবন করিতে ও দেশপ্রেমিক কর্তব্য স্থির করিতে আবেদন জানাইতেছি :
>
> (১) কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দো-লনের আহ্বান জানায় নাই। নির্বাচিত একমাত্র নেতা কোন নির্দেশ দিবার পূর্বেই গ্রেফ্তার হন।
>
> (২) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি

জনতা প্রেফ্তার হইলে আইন অমান্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই।

(৩) কংগ্রেস বা মহাত্মাজী কেহই বিশৃংখলা বা নিরর্থক হিংসার জন্য আবেদন জানান নাই। এই কাজগুলি কংগ্রেস ও জাতীয়তা-বিরোধী।" [কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস—পূরণচন্দ্র যোশী; পৃষ্ঠা ৩৮, প্রকাশক ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা।

স্বাধীনতা সংগ্রাম বা গণ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে হঠাৎ একরকম সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী? এই ধরনের চিন্তাধারা কি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার সংগে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ? রণক্ষেত্রে জেনারেল বন্দী হয়ে গেলে—বা আহত হলে সেনাবাহিনী হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, সামরিক নিয়ম-কানুনের কেতাব খুলে প্রেরণা নেবে? বিপ্লব হবে কোনরকম বিশৃংখলা হবে না এ কিরকম কথা? রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবে নাকি তাই হয়েছিল? হিংসাত্মক কাজে প্রাপ্ত বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রতি এত ঘোর আপত্তির কারণ কি? বিশেষ করে মার্ক্স নিজেই যখন বলেছিলেন—বিপ্লব করতে গেলে রক্তপাত ঘটে থাকে—এই হিংসা বা ভায়োলেন্স প্রগতির ধাই মা—"মিডওয়াইফ অফ প্রগ্রেস"? এরই বা কারণ কি? রাশিয়ার স্বার্থে প্রয়োজনমত অনেক শিক্ষা ভুলতে হয়, অনেক ঢোক গিলে কথা বলতে হয়।

আবার গান্ধীজী ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লিন্‌লিথগোকে এক চিঠিতে লেখেন :

"গত ৯ই আগস্টের পর যে-সব ব্যাপার ঘটিয়াছে আমি নিশ্চয়ই তাহার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি কি ভারত সরকারকেই উহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করি নাই?..... আপনি হয়ত নাও জানিতে পারেন যে কংগ্রেস কর্মীদের যে-কোন হিংসাত্মক কাজের আমি খোলাখুলি ও দ্বিধাহীন সমালোচনা করিয়াছি।"

মৌলানা আজাদ ও সমস্ত রকমের হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেন। কমিউনিস্ট পার্টি সেদিনের কংগ্রেস নেতাদের এইসব বিভ্রান্তিকর স্বার্থবোধক বিবৃতি ও উক্তিগুলি ইস্তাহার করে ছাপিয়ে বিলি করেছেন,—নিজেদের দলীয় প্রচার পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য—জনতাকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম-বিমুখ করে তোলা। এই গণ-মুক্তি সংগ্রামের পেছনে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সমর্থন যে নেই—সেই তত্ত্ব প্রচার করা হল কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে—এইসব বিবৃতিগুলির নানা ব্যাখ্যা দিয়ে।

আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য বিশৃংখলা সৃষ্টি—হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়া বা তাতে প্ররোচনা দেবার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা হুঁশিয়ারী শুনিয়েছিলেন—এবং ঐ সব কাজ "জাতীয়তা বিরোধী" এ কথা তাঁরা প্রচার করেছিলেন—। স্বাধীন ভারতের যুক্তফ্রন্ট সরকার শাসিত পশ্চিম বাংলায় বিশৃংখলা সৃষ্টি অরাজকতা হিংসাত্মক কার্যকলাপের ব্যাপক বিস্তৃতির বিরুদ্ধে আজ মার্ক্সবাদীরা—দক্ষিণ-মধ্য-বাম ও উগ্র—কেউই মুখ খুলছেন না কেন? এর কি মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা আছে?

আগেই বলেছি সুভাষচন্দ্রের বহির্ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের সংবাদে নেহরুজী ও সেদিনের "বিপ্লবী" মার্ক্সবাদীরা ভীত ত্রস্ত ছিলেন। নেহরুজীর দু-একটি উক্তি তুলে ধরা যাক।

"বহু বৎসর পূর্বেই সুভাষ বসুর সংস্রব আমরা ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বিস্তৃত হইয়াছে এবং আজ আমরা পরস্পর হইতে বহু দূরে। বেদনার সহিত এ কথা আমাকে অনুভব করিতে হইতেছে, যে-পথ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন সে পথ একেবারেই ভুল......তাঁহার নীতি কার্যে পরিণত হবার উপক্রম হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহার বিরোধিতা করিব। কারণ বিদেশ "হইতে যে-কোন শক্তি আসুক না কেন তাহা প্রকৃতপক্ষে জাপানের হাতের পুতুল হইয়াই আসিবে।"

সম্মুখ যুদ্ধ করিবে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী [ইংরেজের সৈন্যবাহিনী] আর আমরা গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করিব।" [১২ই এপ্রিল, ১৯৪২]

দেশবাসী নিশ্চয়ই আজও ভুলে যান নি ১৯৬২ সালে চৈনিক আক্রমণের সময় শেরোয়ানীর বুক পকেটে লাল গোলাপফুল গুঁজে হাতে ছড়ি নিয়ে কি অপূর্ব দেশরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন—এবং কি নেফা রণাঙ্গনে, কি সেলা উপত্যকায়, কি বমডিলা—তেজপুরে গেরিলা যুদ্ধের কত আয়োজনই না করেছিলেন। বৃটিশ উপনিবেশ শৃংখলিত পরাধীন ভারতের প্রতিরক্ষার যে উদ্যোগ-আয়োজন চেষ্টা ইংরেজ করেছিল, স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী-প্রতিরক্ষামন্ত্রী দেশের প্রতিরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থাও করেন নি।

১৯৪২ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ ও কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের সুভাষ-সমর্থনের বিরোধিতা করে সেদিন কমিউনিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী যা বলেছিলেন—তা তুলে ধরা যাক একবার। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর "স্বাধীনতা সৈনিকদের প্রতি" পত্রে বলেছিলেন :

"নেহরু কারামুক্তির পর হয়ত সুন্দর সুন্দর বিবৃতি দিবেন এবং মার্কিন সংবাদদাতারা হয়ত তাহা সোৎসাহে লুফিয়া লইবেন। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য ও সৌন্দর্য থাকিলেও কোন মূল্যই থাকিবে না। মহৎ কথায় পূর্ণ বিবৃতি দান করিয়া এবং প্রধান জাতিগুলির প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করিয়া জওহরলাল যাহা করিতে পারিবেন তাহার চেয়ে কারাগারে থাকিয়া তিনি চার্চিল-রুজভেল্টগোষ্ঠীকে অনেক বেশী বেকায়দায় ফেলিতে পারেন......অচল অবস্থাই আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি।" [অক্টোবর ১৯৪৩—দ্বিতীয় পত্র]

জয়প্রকাশ বললেন :

"রুশ-জার্মান চুক্তি কিংবা জাপ-চীন সন্ধি, বৃটিশ বাহিনীর গুরুতর পরাজয় এবং ভারতের মাটিতেই যুদ্ধের বিস্তার প্রভৃতির ন্যায় আন্তর্জাতিক অবস্থার বিরাট কোন পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের পক্ষে বড় একটা "কিছু করা সম্ভব নয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করি না।" জয়প্রকাশের "এই সব বিবৃতি, চিঠি এবং সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন সেদিনের কমিউনিস্টদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছিল।

সেদিনের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এক পুস্তিকায় এইসব কাজের তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন :

"সোজা কথায় তাহাদের (কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের) নীতি ছিল এই : ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাইয়া যাও, সুভাষ বসুর নির্দেশ পাইবামাত্র বিপ্লব করিবার জন্য প্রস্তুত হও, বসুর বাহিনীই আমাদের হইয়া কাজ সমাধা করিয়া দিবে।" এবং অতি চতুরতার সহিত সুভাষ বসুর প্রভু তোজোকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হইয়াছে। নীতিহীন সুবিধাবাদের জন্য সুভাষ বসু কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া-

ছিলেন কংগ্রেস-ভক্তরা একথা জানেন। সেই সুভাষ বসুকে দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশ পরাইয়া পুনরায় অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসার জন্য জয়প্রকাশ এই বলিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন :

"সুভাষ বসুকে বিভীষণ বলিয়া নিন্দা করা খুবই সহজ......কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ তাহাকে নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক এবং জাতীয় সংগ্রামের অগ্রণী যোদ্ধা বলিয়াই জানে। তাঁহার মত লোক দেশকে বিক্রয় করিবে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।"

জয়প্রকাশের এই মন্তব্যে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যিনি দেশের জন্য সর্বস্ব দিলেন সেই মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে নাকি জয়প্রকাশ 'দেশ-প্রেমিকের ছদ্মবেশ" পরিয়েছিলেন—তাঁকে মুক্তিপথের অগ্রদূত বলে ঘোষণা করায় আর যাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে গোটা দেশকে বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিলেন—শ্রমিক শ্রেণীকে বর্ধিত বেতন ও ভাতার লোভ দেখিয়ে সংগ্রাম-বিমুখী করে রেখে মনপ্রাণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধযন্ত্র-কে চালু রাখার কাজে অনুপ্রাণিত করে-ছিলেন, তাঁরাই নাকি স্বাধীন ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থার আজকের ভানগার্ড!

# বর্ধমান জেলায় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পত্তন কাহিনী

জে. সি. কে পীটারসন

(জে. সি. কে পীটারসন, আই-সি-এস রচিত "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স—বর্ধমান" পুস্তকের লোক্যাল সেলফ্-গভর্নমেন্ট শীর্ষক অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা হয়েছে। অধ্যায়টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে এই জেলার তিনটি পৌরসভার জন্ম-শতবর্ষ গত বৎসর ৩১শে মার্চ উত্তীর্ণ হয়েছে। এই তিনটি পৌরসভার শতবর্ষপূর্তি "আনঅনার্ড এ্যান্ড্ আনসাঙ্" অবস্থায় অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের গোড়াপত্তনের কাহিনী এরই মধ্যে রয়েছে।—অনুবাদক।)

### বর্ধমান জেলা বোর্ড

পৌর এলাকাগুলি বাদে জেলার আয়তন হইল ২ হাজার ৬৬৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা হইল ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৪৩ জন। এই এলাকার রাস্তা, পুল, ফেরী ও খোঁয়াড় রক্ষণ ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যবিধান ও পানীয় জল সরবরাহ এবং চিকিৎসার সাহায্য প্রভৃতি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জেলা বোর্ড এবং তাহার অধীনস্থ লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটিগুলির উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। (উল্লেখ্য, জেলা বোর্ড ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপূর্বে ইহাকে বলা হইত জেলা রোড্ রিপেয়ার্স কমিটি।—অনুবাদক) চেয়ারম্যান সহ ১৯ জন সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হইলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্। বাকী ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ৬জন নির্বাচিত এবং ১২ জন সরকার মনোনীত। মনোনীতদের মধ্যে ৪ জন পদাধিকারবলে নিযুক্ত। জেলা বোর্ড পুরাপুরি প্রতিনিধি-স্থানীয় (!) বলা যাইতে পারে। বর্তমান বোর্ডের ৬জন সদস্য, উকিল অথবা মোক্তার, ৬জন সদস্য সরকারী কর্মচারী, ৪জন জমিদারদের প্রতিনিধি এবং ৩জন বিবিধ হিসাবে পরিগণিত।

### আয়

১৯০২-০৩ আর্থিক বৎসরে যে দশ বৎসর শেষ হইয়াছে, এই সময়ে বোর্ডের গড় বার্ষিক আয় ছিল ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা এবং ১৯০৬-০৭ আর্থিক বৎসরে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। প্রধানত পথকর হইতে ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, খোঁয়াড় হইতে ৯ হাজার টাকা, ফেরী ঘাট হইতে ৯ হাজার টাকা, অন্যান্য উৎস হইতে আসিত ৬০ হাজার টাকা এবং সরকার দিতেন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। সরকারের নিজস্ব কার্যগুলির মধ্যে যেগুলি জেলা বোর্ডকে সম্পন্ন করিতে হইত, সে বাবদ প্রাপ্য অর্থও সরকারের প্রদত্ত অর্থের অন্তর্গত। প্রারম্ভিক স্থিতি বাদে ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এই আয়ের মধ্যে ছিল পথকর বাবদ ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, জেলা বোর্ড কর্তৃক সরকারের নিজস্ব কার্য সম্পাদন বাবদ প্রাপ্য অর্থ সহ সরকারের প্রদত্ত অংশ ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, ফেরীঘাট বাবদ ১০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য খাত বাবদ ৩১ হাজার টাকা। সব জেলা বোর্ডের ন্যায় বর্ধমান জেলা বোর্ডেরও প্রধান আয় হইল পথকর বাবদ টাকা। করা-রোপণ দুর্বহ ছিল না। জনসংখ্যার অনুপাতে মাথা পিছু ছিল দুই আনা।

### ব্যয়

১৯০২-০৩ আর্থিক বৎসরে যে দশ বৎসর শেষ হইয়াছে, এই সময়ে বার্ষিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। তন্মধ্যে পূর্তখাতে মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। শিক্ষাখাতে ৫১ হাজার এবং মেডিক্যাল সাহায্যখাতে ৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৯০৬-০৭ আর্থিক বৎসরে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বার্ষিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। তন্মধ্যে সরকারের নিজস্ব কার্যের ব্যয় সহ জেলা বোর্ডের প্রধান প্রধান খাতে অর্থাৎ পূর্তখাতে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, শিক্ষাখাতে ৬০ হাজার টাকা এবং মেডিক্যাল সাহায্যখাতে ১০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে মোট ৩লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ইহার মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা সরকারের নিজস্ব কার্য সহ জেলাবোর্ডের পূর্তখাতে ব্যয় হয়; শিক্ষা ও মেডিক্যাল সাহায্য এই দুইটি প্রধান খাতে যথাক্রমে ৫৫ হাজার ৩৫ টাকা ও ১২ হাজার ৮৫৭ টাকা ব্যয় হয়।

যাতায়াতের যোগাযোগ সংরক্ষণ ব্যাপারে জেলা বোর্ডের আয়ের অধিকাংশ অর্থই ব্যয়িত হয়। জেলা বোর্ডকে বর্তমানে ২০৩ মাইল পাকা রাস্তা ও ২৯৮ মাইল কাঁচা রাস্তা ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের ৬৫৪ মাইল রাস্তাও মেরামত করিতে হয়। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর রাস্তা রক্ষণ ব্যাপারে যথাক্রমে মাইল পিছু ৩২৭ টাকা, ৬৭ টাকা ও ১৪ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জেলা বোর্ডের উপরে আন্তঃ রাজ্য রাস্তা রক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। এই বাবদে যাবতীয় খরচ সরকার বহন করিয়া থাকেন। বোর্ড নিজস্ব তহবিল হইতে ৮টি মধ্য বিদ্যালয় (মিডল স্কুল) পরিচালনা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ৭৮টি মধ্য বিদ্যালয়, ২১৮টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এক হাজার পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অনুদান দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থা-পনা ও ব্যয়ের হিসাব তদারকী করিবার জন্য বোর্ড ১৪ জন ইনস্পেক্টিং পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের পরিচালনায় বর্ধমান শহরে একটি টেক্নি-ক্যাল স্কুল আছে। বর্ধমান পৌরসভা ও বঙ্গীয় সরকার যথাক্রমে বার্ষিক দুইশত চল্লিশ টাকা ও তিন শত টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে মেডিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য খাতে বোর্ডের মোট আয়ের ৬ শতাংশেরও অধিক ব্যয় হইয়াছিল। দশটি স্থায়ী ও পাঁচটি অস্থায়ী ডিস্পেন্সারী জেলা বোর্ডের নিজ অর্থে চালু আছে। এতদ্ব্যতীত চারিটি পৌরসভা পরিচালিত চারিটি ডিস্পেন্সারীকেও জেলা বোর্ড অনু-দান দিয়া থাকেন। এই ব্যয়ের মধ্যে মহামারী দেখা দিলে জনসাধারণকে মেডি-ক্যাল খয়রাতী সাহায্য দিবার খরচও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। জেলা বোর্ড বর্ধমান শহরে একটি পশু চিকিৎসালয়ও নিজ ব্যয়ে পরিচালনা করিয়া থাকেন।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা। কলিকাতা
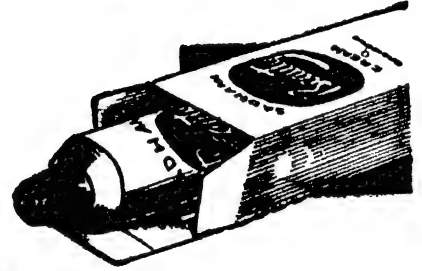
### লোকাল বোর্ড

জেলা বোর্ডের অধীনে এই জেলায় চারিটি লোক্যাল বোর্ড আছে এবং জেলার চারিটি মহকুমার প্রতিটি গ্রাম্য রাস্তা, খোঁয়াড়, ফেরীঘাট এবং প্রাথমিক শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাহাদের উপরে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য জেলা বোর্ড হইতে ইহাদিগকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়। বর্ধমান লোক্যাল বোর্ড ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এবং বাকী তিনটি প্রত্যেকে নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত। সদস্যদিগের দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং বাকী সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। বর্ধমান লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আসানসোল, কাটোয়া ও কালনা লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারে নির্বাচিত মহকুমা শাসকগণ, কিন্তু বর্ধমান লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান একজন বে-সরকারী ব্যক্তি।

### ইউনিয়ন কমিটি

এই জেলায় বর্তমানে মেমারী, মানকর, শ্রীখণ্ড, শ্রীবাটী, বৈদ্যপুর এবং বাগনাপাড়া —এই ছয়টি ইউনিয়ন কমিটি আছে।

| ইউনিয়ন কমিটির নাম | আয়তন (বর্গমাইল হিসাবে) | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| মেমারী | ১২ | ১০,৩২৩ |
| মানকর | ১২ | ১০,৪৭৩ |
| শ্রীখণ্ড | ৮ | ৮,৫০০ |
| শ্রীবাটী | ১০ | ১১,০০০ |
| বৈদ্যপুর | ১০ | ৫,৯২২ |
| বাগনাপাড়া | ১০ | ৭,১৬০ |

প্রান্তীয় অনুসূচীতে ইহাদের প্রত্যেকের আয়তন ও জনসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতি কমিটি নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং নিজ নিজ এলাকাধীন গ্রামগুলির রাস্তাঘাট তদারক করিবার দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। এ যাবৎ ইউনিয়ন কমিটিগুলি কর্মদক্ষতার বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারে নাই। তাহাদের আয়-ব্যয়ের পরিমাণও বহু বৎসর ধরিয়া নামে মাত্র রহিয়াছে। সম্প্রতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের সংশোধন করিবার ফলে ইউনিয়ন কমিটিগুলির কর্মপরিধি যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে জনহিতকর কার্য ইহাদের নিকট হইতে আশা করা যাইতেছে।

### পৌরসভা

বর্তমানে জেলায় বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, দাঁইহাট, রাণীগঞ্জ এবং আসানসোল—এই ছয়টি পৌরসভা আছে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে বর্ধমান পৌরসভা স্থাপিত হইয়াছে ; কালনা, কাটোয়া দাঁইহাট পৌরসভা ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১ এপ্রিল তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাণীগঞ্জ পৌরসভা স্থাপিত হইয়াছে ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে এবং জেলায় দ্বিতীয় বৃহত্তম পৌরসভা আসানসোল সম্প্রতিকালে অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

### বর্ধমান পৌরসভা

বর্ধমান পৌরসভার আয়তন হইল ৮·৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৮ হাজার ৬৯১ জন। তন্মধ্যে ৮ হাজার ৭৬ জন অর্থাৎ ২০·৮৭ শতাংশ রেটদাতা। ২২ জন কমিশনার লইয়া পৌরসভা গঠিত। ১৫ জন নির্বাচিত এবং ৭ জন সরকার মনোনীত। সরকার মনোনীত কমিশনারগণের মধ্যে দুইজন পদাধিকারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ১৯০২-০৩ আর্থিক বৎসরে যে দশ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে পৌরসভার বাৎসরিক গড় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। ১৯০৬-০৭ আর্থিক বৎসরে আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। ১৯০৮-০৯ আর্থিক বৎসরে আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। আয়ের প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে জমি ও বাড়ির মূল্যমানের উপরে শতকরা ৭½ টাকা হারে রেট ধার্য করিয়া আদায় হয় ৪১ হাজার টাকা ; জল সরবরাহ খাতে আদায় হয় ২৬ হাজার টাকা ; ময়লা নিষ্কাশন (কন্‌জারভেন্‌সী) খাতে আদায় হয় ১৮ হাজার টাকা এবং
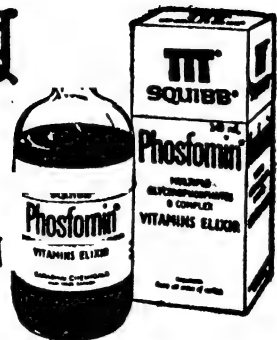
সরকারী অনুদান ও অন্যান্য উৎস হইতে আয় হয় মোট ১৫ হাজার টাকা। করের পশ্চাদ্‌ভার ও মাথাপিছু আয়ের পশ্চাদ্‌ভার ছিল যথাক্রমে দুই টাকা আট আনা নয় পাই ও তিন টাকা পাঁচ আনা ছয় পাই। ঐ বৎসরেই ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। নিম্নলিখিত খাতে প্রধানত ঐ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল :—

| | | |
|---|---|---|
| সংস্থা ব্যয় | ৭·৪১ | শতাংশ |
| আলো | ৪·৪৬ | „ |
| জল সরবরাহ | ১৫·৫৩ | „ |
| জল-নির্গম | ১·০৬ | „ |
| মেডিক্যাল | ১১·০৮ | „ |
| পূর্ত কার্যাদি | ১৫·০৭ | „ |
| শিক্ষা | ৬·৬৯ | „ |

পূর্বে বর্ধমান এই প্রদেশের অন্যতম স্বাস্থ্যকর ও উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু ১৮৬২ ও ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে এক সর্বনাশা মহামারী জেলাটিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। এই সাংঘাতিক বৎসরগুলিতে অর্ধেকের অধিক শহরবাসী মহামারীতে প্রাণ হারাইলেন অথবা শহর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। যদিও শহরের স্বাস্থ্য-পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তথাপি শহরের জল-নির্গম ব্যবস্থা শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে এবং বৎসরের কয়েকটি ঋতুতে জ্বরের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অধিকাংশ গৃহের জল-নির্গমের ব্যবস্থা না থাকায় এঁদো ডোবায় পরিণত হয় ও গৃহনির্মাণের জন্য উত্তোলিত মাটির খানায় এই সমস্ত গৃহের জল জমিয়া থাকে। বহু ক্ষেত্রে সত্যই এইগুলি নোংরা জলাধারে পরিণত হয় এবং স্বাভাবিক জল-নির্গমের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া থাকে। পরিশেষে এই-গুলি জনস্বাস্থ্যের ভয়াবহ বিপদের উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের জল নিকাশের জন্য এক পয়ো-নালীর পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ব্যয়ভারের জন্য মহারাজা ৫০ হাজার টাকা এবং বঙ্গীয় সরকার সম পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, কিন্তু পৌরসভার আর্থিক সঙ্গতি এমন নহে যে, শীঘ্র এই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করিতে পারিবেন।

পৌর প্রশাসনের সার্থক বৈশিষ্ট্য হইল তাহার ওয়াটার ওয়ার্কস। ১৮৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয়ে ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মিত হয়। এই ব্যয় বাবদে সরকার ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করেন এবং জুজুটিতে অবস্থিত পৌরসভার পুরাতন স্লুইসটি খরিদ করিয়া সরকার দিলেন ১১ হাজার টাকা। বর্ধমানের মহারাজাও সম পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিলেন। বাকী ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ টাকা ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। বর্তমানে ঋণের প্রায় সমগ্র টাকাই পরিশোধ করা হইয়াছে। ইহার পরিচালনার দায়িত্ব পৌরসভার একটি বিশেষ সাব-কমিটির ওপরে ন্যস্ত হইয়াছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সিভিল সার্জন, সুপারিনটেনডেনট্ অব পুলিশ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জনৈক ইঞ্জিনীয়ার লইয়া এই বিশেষ সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। দামোদর নদ হইতে জল সরবরাহ করা হয়। শহরের প্রায় আড়াই মাইল উত্তর-পশ্চিমে পাম্পিং স্টেশন রহিয়াছে। প্রতিদিন গড়ে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার গ্যালন পরিস্রুত জল সরবরাহ করা হয়। ১৯০৮-০৯ আর্থিক বৎসরে এই খাতে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬ হাজার ও ১৮ হাজার টাকা। উৎকর্ষতার বিচারে সরবরাহকৃত জল উত্তম, কিন্তু গ্রীষ্মে যখন দামোদরের জল নিচে চলিয়া যায় তখন মাঝে মাঝে বাঁকা নদী হইতে জল সরবরাহ করা হয়। বৎসরের এই সময়ে এই নদীটি প্রকৃতপক্ষে একটি জল-নিকাশী সরু নালার মত আকার ধারণ করে। দুই কূলের যাবতীয় গ্রামের ময়লা জলও এখানে আসিয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত নদীর জলও অপর্যাপ্ত। দামোদরের জল অবিরত সরবরাহ সুনিশ্চিত করিবার জন্য জল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিচে নদীবক্ষে একটি বাঁধ নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনাটির প্রস্তাব প্রায়ই উত্থাপিত হইতেছে, কিন্তু ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার পথে পদে পদে ইঞ্জিনীয়ারিং বাধা আসিতেছে। এই ব্যাপারে ব্যয়ের পরিমাণও পৌর আইনে মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা পৌরসভাকে দেওয়া হয় নাই। এই দুটি সত্ত্বেও একথা বলা যাইতে পারে যে, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা শহরবাসীর পরম উপকারে আসিয়াছে। সম্প্রতিকালে শহরবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির মূলে রহিয়াছে এই পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা। কেবলমাত্র বাঁকা নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ করা যাইতেছে না এবং এই অঞ্চলে জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রসারিত করিবার জন্য একটি প্রকল্প আলোচনাধীন রহিয়াছে।

### রাণীগঞ্জ পৌরসভা

গত আদম সুমার আকলনে রাণীগঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ হাজার ৩৯৮ জন। ইহার মধ্যে ১ হাজার ৬৯৫ জন অথবা ১০·৩ শতাংশ রেটদাতা। পৌরসভার মোট কমিশনার সংখ্যা ১২ জন। তন্মধ্যে ৮ জন নির্বাচিত ও ৪ জন মনোনীত। শহরটি কর্মমুখর বাণিজ্য-কেন্দ্র। একটি ক্ষুদ্র রেলওয়ে কলোনী ব্যতীত এই শহরে মেসার্স বার্ণ এ্যাণ্ড কোম্পানীর পটারী কারখানা আছে। এই কারখানায় প্রায় এক হাজার কর্মী নিযুক্ত আছে। আরও আছে বেঙ্গল পেপার মিলস্ এবং কয়েকটি তৈল ও ময়দার কল। পূর্বে এই শহরটি কয়লাশিল্পের কেন্দ্র ছিল। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অদ্যাবধি শহরের সন্নিকটে এগরায় অবস্থিত রহিয়াছে এবং শহরের অতি নিকটে কয়েকটি চালু কয়লা খনিও রহিয়াছে। শহরটি ঘনবসতিপূর্ণ ; প্রায় সমস্ত গৃহই ইঁট নির্মিত এবং রাস্তাগুলিও চমৎকার। বহু ব্যক্তিগত ও

সরকারী কূপ হইতে শহরবাসী জল সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং জল সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্য পৌরসভা শহরের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি পুষ্করিণীও ইজারা লইয়াছেন। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮ হাজার ৫২৮ টাকা এবং ২১ হাজার ২৪৯ টাকা। প্রধানত ভূ-সম্পদের বার্ষিক মূল্যায়নের ওপর ৭½ শতাংশ টাকা হারে রেট ধার্য এবং ময়লা নিষ্কাশন খাতে রেট ধার্য করণে আয় হয়। মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ ময়লা নিষ্কাশন এবং প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মেডিক্যাল সাহায্য খাতে যায়। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া আয় ও ব্যয়ের দুই মুখ সমান হইয়া আসিতেছে। কোন নতুন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিবার সাধ্য পৌরসভার নাই।

### কাটোয়া পৌরসভা

১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১লা এপ্রিল কাটোয়া পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১২ জন কমিশনার লইয়া পৌবসভা গঠিত হয়। আটজন কমিশনার নির্বাচিত এবং চারিজন সরকার মনোনীত। সরকার মনোনীতদের একজন পদাধিকারে থাকিতেন। পৌরসভার মোট আয়তন এক বর্গমাইল। মোট জনসংখ্যার ২ হাজার ৩৮৫ জন অর্থাৎ ৩৩·০৩ শতাংশ রেটদাতা ছিলেন। জনসংখ্যার মাথাপিছু গড় কর-হার ছিল ১টাঃ ২আঃ ২ পাই। ১৯০৬-০৭ আর্থিক বৎসরে যে পঞ্চবর্ষের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, এই সময়ে পৌরসভার বার্ষিক গড় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ হাজার ২০০ টাকা ও ১০ হাজার ৮০০ টাকা। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভিক স্থিতি বাদে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৫০০ টাকা। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে আয়ের প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে রেটদাতাদের আর্থিক অবস্থা ও সম্পত্তির আয়ের ওপরে শতকরা বারো আনা হারে রেট ধার্য করিয়া আয় হয় ৪ হাজার ৭০০ টাকা এবং ময়লা নিষ্কাশন খাতে আয় হয় ২১ শত টাকা।

একই বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ঋণ পরিশোধ, অগ্রিম দাদন ও আমানত বাবদ ২ হাজার ৪০০ টাকা বাদে ১৩ হাজার টাকা। ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতের মধ্যে ময়লা নিষ্কাশন ও মেডিক্যাল সাহায্য খাতেই ব্যয় হয় যথাক্রমে ৩৯·৫৯ ও ১১·৮৩ শতাংশ। পৌরসভার একটি ডিসপেনসারীও আছে। রাস্তাগুলির প্রায় সবই পাকা এবং রাস্তার ধারে ধারে পাকা নালা আছে। ৭৭ হাজার টাকা ব্যয়ে শহরের জন্য একটি জল-নির্গম প্রকল্প প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং পৌরসভার আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিবার সংগে সংগেই কার্যারম্ভ হইবে।

### কালনা পৌরসভা

১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১লা এপ্রিল কালনা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত। ১৫ জন কমিশনার এই পৌরসভা পরিচালনা করিয়া থাকেন। ১০ জন নির্বাচিত কমিশনার এবং ৫ জন সরকার মনোনীত কমিশনার। এই পৌরসভার মোট আয়তন দুই বর্গমাইল। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে জনসংখ্যার মাথাপিছু করভার ছিল গড় ১টাঃ ১৩ আঃ ৭ পাই। ১৯০৬-০৭ আর্থিক বৎসরে যে পঞ্চবর্ষের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, এই সময়ে বার্ষিক গড় আয় ও ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪ হাজার ও ১৩ হাজার ৯০০ টাকা। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে মোট আয় ছিল ১৫ হাজার টাকা ; আয়ের প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে জনসাধারণের ওপর কর ধার্য করিয়া আসিয়াছিল ৪ হাজার ৯০০ টাকা ও ময়লা নিষ্কাশন খাতে আসিয়াছিল ৩ হাজার ৫০০ টাকা। ঐ একই বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৪ হাজার ৭০০ টাকা ও ২ হাজার ১০০ টাকা যথাক্রমে ময়লা নিষ্কাশন ও রাস্তা মেরামতী খাতে ব্যয় হইয়াছিল। সহকারী স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে শহরের জল নির্গমের একটি প্রকল্প প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং এই বাবদে মোট ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ধরা হইয়াছে ৩৬ হাজার টাকা। শহরের উত্তরাংশ ঘনবসতিপূর্ণ। এই অংশের রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা দক্ষিণাংশ অপেক্ষা ভাল। দক্ষিণাংশের পতিত জমি, পরিত্যক্ত বাস্তু বাটী, মজিয়া যাওয়া পুষ্করিণী এবং জঙ্গালে পরিপূর্ণ খানাডোবাগুলি এই শহরের ব্যবসায়ের পতন ও বৈষয়িক উন্নতির ক্ষীয়মান অবস্থার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বর্তমানে অবশ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পৌরসভাও এ কারণ ভবিষ্যতে সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করিতে পারে।

### দাঁইহাট পৌরসভা

১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১লা এপ্রিল দাঁইহাট পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২ জন কমিশনার লইয়া পৌর পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। ৮ জন কমিশনার নির্বাচিত এবং চারিজন সরকার কর্তৃক মনোনীত। মনোনীত কমিশনারদিগের মধ্যে একজন পদাধিকারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ১৯০০ খৃস্টাব্দে কয়েকখানি পল্লীগ্রাম পৌরসভার সহিত যুক্ত হইবার ফলে বর্তমানে ইহার মোট আয়তন হইয়াছে দুই বর্গমাইলের স্থলে চারি বর্গমাইল। মোট রেটদাতার সংখ্যা হইল ১ হাজার ২৭৩ জন, অর্থাৎ জনসংখ্যার ২২·৬ শতাংশ। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে মাথাপিছু করের পশ্চাদ্ভার ছিল ৭ আনা ১০ পাই। প্রারম্ভিক স্থিতির ৭৯৩ টাকা বাদে ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে মোট আয় হয় ৪ হাজার ৮৭০ টাকা। এই আয়ের প্রধানত জনসংখ্যার মাথাপিছু রেট ধার্যে মোট ২ হাজার ৩৭৯ টাকা ও ময়লা নিষ্কাশন খাতে ৪২৯ টাকা আসে। এই আর্থিক বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৭৪৩ টাকা। প্রধানত সংরক্ষণ, ময়লা নিষ্কাশন, মেডিক্যাল সাহায্য ও পূর্ত খাতে যথাক্রমে মোট ব্যয়ের ১৫·৬ শতাংশ, ৩১·৬ শতাংশ, ২৪·৩ শতাংশ এবং ১১·২ শতাংশ ব্যয় হয়। ভাগীরথী হইতে শহরবাসী জল সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং গ্রীষ্মে ভাগীরথীর স্রোত না থাকায় তীব্র জলাভাব ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। পৌরসভা একটি দাতব্য ডিসপেনসারী পরিচালনা করিয়া থাকেন।

### আসানসোল পৌরসভা

জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম পৌরসভা হইল আসানসোল পৌরসভা। ১২ জন কমিশনার এই পৌরসভা পরিচালনা করিয়া থাকেন। ১২ জন কমিশনারই সরকার মনোনীত। ইহার মধ্যে সাতজন পদাধিকারে নিযুক্ত। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে পৌরসভাটি স্থাপিত হয় এবং ১৯০৪ খৃস্টাব্দে অতিরিক্ত ১·৪৮ বর্গমাইল ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে পৌরসভার আয়তন হইল ৩·৭৩ বর্গমাইল। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে রেটদাতার সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৩১২ জন, অর্থাৎ জনসংখ্যার ১২·৮ শতাংশ। করপশ্চাদ্ভার ছিল জনসংখ্যার মাথাপিছু ১টাঃ ২ আঃ ১ পাই। ১৯০৬-০৭ আর্থিক বৎসরে যে পঞ্চবর্ষের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এই সময়ে বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার টাকা। ১৯০৭-০৮ আর্থিক বৎসরে প্রারম্ভিক স্থিতি বাদে আয় ছিল মোট ২৪ হাজার টাকা। শহরবাসীদের স্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যায়নের ওপরে শতকরা সাড়ে সাত টাকা হারে রেট ধার্য করিয়া ১৪ হাজার টাকা, ময়লা নিষ্কাশন বাদে রেট আদায়ের ৫ হাজার ৯০০ টাকা আয় হয়। একই আর্থিক বৎসরে মোট ব্যয় হয় ২৬ হাজার টাকা। মোট আয়ের ১২·০৪, ৫৬·০ এবং ১৩·০৬ শতাংশ যথাক্রমে জল-নির্গম, ময়লা নিষ্কাশন ও পূর্ত কার্যে ব্যয় হইয়াছে। জল-নির্গম ও জল সরবরাহ প্রকল্প দুইটি প্রয়োজনীয় অর্থ পাইলেই পৌর কর্তৃপক্ষ অবশ্যই কার্যকর করিতে অগ্রসর হইবেন।

অনুবাদক—ললিত হাজরা

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ বারো ॥

রামকেষ্ট মিত্তির, অঞ্চলের 'পেধান', উনি বসেছেন চেয়ারে। ওনারই প্রায় গা ঘেঁষে অন্য চেয়ারগুলিতে বসে 'আছেন' আর বলা গেল না, চিরকালের অভ্যস্ত ভাষাই ব্যবহার করি, বসে 'আছে' 'কিষক সমিতি'র অক্ষরজ্ঞানবর্জিত. কাঁকরের মত খরখরে কারু মণ্ডল, বিসাই ঘোষ, নেত্য-পদ হালদার, হলধর পান। সামনে টেবিলের মাঝখানে মাইক। আশেপাশে, মাটির ওপর থেবড়ে বসেছে তা অমন শ' পাঁচেক লোক।

রামকেষ্ট মিত্তিরের বিরাট বপু। মাছি পেচ্লানো চিক্কন গাল। আব-অলা প্রকাণ্ড মাথা। গায়ে চটকদার প্রিন্স কোট। তার ওপর ভাঁজ করে রাখা নক্সাদার, মূল্যবান কাশ্মীরী শাল। মিহি ধুতির নীচে বাহারে জুতোর আনকোরা পালিশ। আর তাঁর পাশে কারু মণ্ডলের চেহারা একটা বিচিত্র কনট্রাস্ট। এখন চেহারার বর্ণনাটা দিতে হয়। কেননা, এখুনি এখানে একটা মল্লযুদ্ধ হবে। গাঁয়ের ভাষায় 'আষুতির নড়ই।' হবে দুজনের মধ্যে। সুতরাং—

বেঁটে-খাটো গুলবাঘের মত চেহারা। বার্নিশ-করা কুচকুচে কালো রং। মাথার চুল যেমন ঘন তেমনি কালো। চোখের ওপর ভ্রূ দুটোও ঘন আর কালো। চ্যাপ্টা নাকের নীচে বিশাল একখানি গোঁফ। সেখানে দু'-চারটি শাদার ছিটে দেখা গেলেও সেটিকে বলা উচিত ষণ্ড গোছের মানুষের উপযুক্ত গোঁফ। চোখ দুটো রক্তবর্ণ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এ ডাকাতটা এ চেয়ারে কেন? কিন্তু পা দু'খানি পাদুকাবিহীন, মোটা ধুতি হাঁটুর নীচে পর্যন্ত নাবেনি, গায়ে গেঞ্জী বা জামা আছে কিনা বোঝা যায় না। প্রকাণ্ড একটা মোটা চাদরে সবটা ঢাকা। ওমনি ওরাও। বিসাই ঘোষ, নেত্যপদ হালদার এরাই শুধু নয়, যারা মাটিতে থেবড়ে বসেছে তাদের বেশভূষো, কথা বলার বিশেষ ভংগি, মুখে ডান হাতখানা রেখে থুতু ফেলা সব একরকমের। রাম-কেষ্ট মিত্তির, যেমন ভারিক্কী চেহারা, তেমনি ভারিক্কী ভংগিতে চেয়ারে বসেছেন বটে, কিন্তু ওঁর ঐ মাঝে মাঝে চোখ পিট পিট করা, কারু মণ্ডলের ঠ্যাংটা (মণ্ডলের আবার চেয়ারে বসলে ঠ্যাং দোলানো অভ্যেস।) গায়ে ঠেকে যাওয়ায় মুখে একটা অদ্ভুত বিরক্তি প্রকাশ, ঘন ঘন হাই উঠলে আচমকা 'তারা তারা' বলে তুড়ি মারা এবং আশে-পাশে তাকিয়ে ভদ্রশ্রেণীর কাউকে বিশেষ অনুসন্ধান করেও খুঁজে না পাওয়ার অনিশ্চিত ভংগী—এসব দেখে মনে হচ্ছিলো, যদিও বেশ সম্ভ্রম আর আড়ম্বরের মধ্যেই উনি বসে আছেন প্রায় সম্রাটের মত, কোথাও একটা গোলমাল করে ফেলেছেন, কিন্তু গোলমালটা যে কোথায় সেটা ধরতে পারছেন না, কেমন এক ধরনের জ্বর হয়েছে ওঁর, যা থার্মো-মিটারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নাড়ীতে লেগে রয়েছে।

কেন এরকম মনে হল তা সঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু ওঁর দিকে তাকিয়ে এটাই মনে হচ্ছিলো, এ সভায় উনি যেন আসতে চান নি। ওঁর জাতের কেউ নেই এখানে। আমি অবশ্য ওঁর জাতেরই লোক, মানে ভদ্রলোক, তবে ইতিমধ্যেই উনি জেনেছেন আমার টানটা আবার এই সব নেত্যপদ হালদার, হলধর পান, বিসাই ঘোষের সংগেই। আমাকে. প্রথম যেদিন অঞ্চলের অফিসে ওর সংগে দেখা হল, ভেবেছিলেন আমি রিপোর্টার। বললাম, না রিপোর্টার নই। আমি এসেছি গ্রাম দেখতে। গ্রামের মানুষকে জানতে।

উনি এ সংবাদে খুশিই হয়েছিলেন প্রথমে। বিগলিত হেসে বলেছিলেন, গ্রামে আর মানুষ কই। আমি বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা। আমার নাম হয়তো খবরের কাগজে পড়ে থাকবেন।

ওঁর নাম কাগজে বার হয়। কয়েক-বার দেখেছি। বিধানসভার একজন ভূতপূর্ব এম-এল-এ। এবারকার নির্বাচনে হেরেছেন। ভালো বক্তা হিসেবে সুনাম আছে। এ অঞ্চলের একজন কেষ্ট-বিষ্টু। কিন্তু ওঁর বলার উৎকট ভংগি বিজ্ঞাপন-দাতাদেরও লজ্জা দেয়। রংচটা ঠোঁটে চটচটে লিপস্টিক লাগানোর মত ব্যাপার। হেসে বললাম, আমি খবরের কাগজ পড়ি না। কাগজে ফিউডাল লর্ডদের বক্তৃতা ছাপা হয়। কিন্তু আপনা-দের এখানের কৃষক সমিতির নেতা কারু মণ্ডলের কথা ছাপা হয় না। আমার কথাটা উনি শুনলেন। কিন্তু ওঁর মগজে ঢুকলো যেন একটু দেরিতে। সাধারণত বোকারাই অহংকারী হয়। দেখলাম অহংকার দেখানোর মত দ্বিতীয়বার আর বোকামি করলেন না।

তা' এসেছেন যখন তখন আমার বাড়িতেই না হয় আহার পর্ব সারবেন। নাকি, আপত্তি আছে?

না। আপত্তি কিছু ছিলো না। তবে ঘোষ মশাই আগে বলেছেন তাই।

কে, ঘোষ মশাই?

বিসাই ঘোষ।

ও গুয়োর বেটা আবার কি খাওয়াবে? দূরে মশাই! ওর নিজের

খেলে ভাত জোটে না। আপনি অন্যান্য লোকের পাল্লায় পড়েছেন।

তা' হোক। আমি বিনীতভাবেই ওঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।

একটু আগে 'খবরের কাগজ পড়ি না' ইত্যাদি বলে যে খোঁচা দিয়েছিলাম নতুন বিস্ময়ের কাছে এসে রামকেষ্ট মিত্তির সেটা ভুলে গেলেন। উনি যাকে 'গুয়োর বেটা' বলেন, আমি তাকে 'আপনি', 'মশাই' সম্বোধন করছি। বিস্ময়টা এইজন্য। আরও বিস্ময়—ওর ঘরে ভাত খেতে চেয়েছি। 'প্রধান' বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। যেন সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিষ, অদ্ভুত কিছু, এই প্রথম দেখছেন। হঠাৎ হেসে উঠলেন অট্ট মাতালের মত।

এই শহরের আপনারা, আপনাদের আমি বুঝতে পারি না। এই সব লোক-গুলোকে নিয়ে কেন যে নাচানাচি করেন, এতে কি রস পান আপনারাই ভালো বলতে পারবেন। আমরা ধান করি, পাট করি, ডাল করি, আলু বসাই, ওদের আমরা যতো ভালো করে জানি, আপনারা মোটেই তা' জানেন না। ওদের এখন ওসকাচ্ছেন। ওরাও ভাবছে কি হনু। সব এক ছটাক, দেড় ছটাক করে জমি পাচ্ছে। ভাবছে এ সবি রাখতে পারবে। ওদের কৃষক সমিতি নাকি ডান্ডার জোরে এ সব রাখবে। যার লাঙল নেই, কৃষক সমিতি তাকে লাঙল দিচ্ছে, যার বীচ নেই, তাকে বীচ দিচ্ছে, যে কিছু দিতে পারছে না, সে গতর দিচ্ছে। কিন্তু এ সব ক'দিন। ক'দিনের এ ডব-ডব্যানি বলতে পারেন? দিনকাল এমন থাকবে না। মাথার ওপর চন্দ্রসূর্য আছে। এখনো গংগায় জোয়ার-ভাঁটা খেলে, পেয়ারা গাছে আম ফলছে না, পেয়ারাই হচ্ছে, আদ্যিকাল থেকে যে রকমভাবে চলছিলো সব সেরকমভাবেই চলছে। এমন কি ঐ গুয়োর বেটা, ম্লেচ্ছটা, মুখে যে বলে ঈশ্বর বড়লোকদের, ঈশ্বর মানি না, ওর ছেলেটার যেবার মায়ের দয়া হল সেবার ওকেও ওলাই-চন্ডীতলায় পিদীম জেলে দিয়ে আসতে দেখেছিলাম।

মানুষ তবুও কিন্তু অনেক বদলে গেছে রামকেষ্টবাবু!

ওদের মানুষ বলছেন? দেখবেন দু'-এক বছরের মধ্যে। এখন একধরনের লংকাকান্ড দেখছেন। তখন আর এক-ধরনের লংকাকান্ড দেখবেন। এ তার কাছে কিছুই নয়। সেই লংকাকান্ডে হনুমানেরও ল্যাজ পুড়বে। কোন শালা বাদ যাবে না। যাদের ক্ষ্যাপাচ্ছেন, তারাই সেদিন আপনাদের মত ক্ষ্যাপাদের রে রে করে তাড়া করবে। একবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। সেদিন কেঁদেও কূল পাবেন না। আর সে দিন বেশি দূরেও নয়। এ যা' করছেন, এ আগুন লয়ে খেলা। ভালো কাজ করছেন না। ভালো কাজ করছেন না গো! ভুল। ভুল করছেন। গুণে গুণে এর মাশুল দিতে হবে।

রামকেষ্ট মিত্তির তারপর চাপা গলায় সাপের মত হিস্ হিস্ করে বললেন, খুব সাবধান।

ওঁর গলার স্বরের উগ্র উঁচুনীচু, কথার বাঁকে বাঁকে বিচিত্র নাটকীয় ভংগী, বিধাতাপুরুষের মত ওঁর অলংঘনীয় নির্দেশ, অস্পষ্ট প্রতিহিংসার দাঁতচাপা আক্রোশ, নিয়মের সমান্তরলতায় অখন্ড বিশ্বাস, অমংগলের একটা কটু, বুনো গন্ধ, সমস্তই আমাকে একটু একটু করে গ্রাস করেছিলো, মনে আছে।

ওঁর কাছ থেকে উঠে আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম হয় ইন্দোনেছিয়া, নয় ভিয়েতনাম। একটা হবেই। কিন্তু কোন্‌টা হবে এটাই প্রশ্ন। রাস্তার ডান-দিকের ফুটপাতে ফুটে উঠছে মস্তান। বাঁদিকের ফুটপাতে ফুটে উঠছে বিপ্লবী। ডানদিকের ফুটপাতের অধিকাংশকে যদি বাঁদিকের ফুটপাতে নিয়ে আসতে পারে, তবে হবে ভিয়েত-নাম। আর বাঁদিক থেকে লোক ভাগিয়ে যদি ডানদিকের ফুটপাতে তুলতে পারে, তবে ইন্দোনেশিয়া। কোনটার সম্ভাবনা প্রবল?

রামকেষ্ট মিত্তিররা ইতিহাস পড়ে না, ইতিহাস জানে না, কিন্তু একরকমের ইতিহাস এরা তৈরী করে। এদেরি কালো হাতে ইন্দো-নেশিয়া রচিত হয়! বিসাই ঘোষ, নেত্যপদ হালদার, হলধর পান, কারু মন্ডল—এরাও ইতিহাস জানে না, ইতি-হাস পড়ে না। তবে এরাও অন্যধরনের ইতিহাস তৈরী করে। তার নাম ভিয়েতনাম। কিন্তু কোন্‌টা আগে?

হয় ইন্দোনেশিয়া, নয় ভিয়েতনাম। হয় ভিয়েতনাম, নয় ইন্দোনেশিয়া। এই গাঁয়েই পাশাপাশি দু'টি পোস্টার দেখেছিলাম। পোস্টার দু'টিকে আপাতত সরল চোখে চ্যাংড়ামি ব'লে হাল্কা করা গেলেও পোস্টার দু'টি যে অদ্ভুত তা' মানতেই হয়।

একটাতে লেখা ছিলো, ভুলে গেছে বাপের নাম, মুখে খালি ভিয়েতনাম। আর একটা, ভুলে গেছি বাপের নাম, ভুলবো নাকো ভিয়েতনাম।

আমি এ দু'টোকেই গম্ভীরভাবে নিয়েছি। আমার কাছে হাল্কা মনে হয় নি। গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। 'এ আগুন লয়ে খেলা' রামকেষ্ট মিত্তির ভুল বলে নি।

কোন সন্দেহ নেই—যা তৈরী করা হচ্ছে তার নাম আগুন। আগুনের স্বাভাবিক ধর্ম পুড়িয়ে মারা। কিন্তু কাকে পোড়াবে? আর সেটাই হচ্ছে এখনকার প্রশ্ন।

চুপ। গোটা সভাটা আশ্চর্যভাবে চুপ করে গেছে।

রামকেষ্ট মিত্তির, অঞ্চলের 'পেধান' উঠেছে বারো বছর পর এই প্রথম সকলের সামনে। আরো কী, রামকেষ্ট মিত্তির নিজে হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে সবাইকে ডাক দিয়েছে। বলেছে গাঁয়ের মানুষের সুখ-দুঃখ গাঁয়ের মানুষকেই বুঝে নিতে হবে। আমাকে দিয়ে তোমরা যে কাজ করাতে চাও, তা' যদি ভালো হয়, আমি সাধ্যমত করবো।

চুপ। কোন কথা নয়। রামকেষ্ট মিত্তির গলা ঝাড়ছে। বারো বছর পর জনতার সামনে দাঁড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। হাড় কাঁপানো শীত। হলে কি হয়, রামকেষ্ট মিত্তির ঢক ঢক করে গ্লাস-শুদ্ধ জল খেয়ে ফেলল।

সন্দেহ হতে পারে, জলটা গ্লাসে শুধু রামকেষ্ট মিত্তিরের দরকার লাগবে মনে করেই রাখা।

ঘামছে রামকেষ্ট মিত্তির। যতোই শীত থাক, বারো বছর পর এই প্রথম এরকম একটা অদ্ভুত কান্ড করতে গেলে, মানে লোকের সামনে দাঁড়াতে গেলে ঘামা ছাড়া আর কী উপায় আছে। হাঁ, যাকে বলে গলদঘর্ম অবস্থা, রামকেষ্ট মিত্তিরের তাই হয়েছে।

রামকেষ্ট মিত্তির বলছেন, আমার কিছু কিছু দোষ আছে। এটা আমি আপনাদের পাঁচজনের সামনে স্বীকার করছি। দোষ নেই এমন কে আছে। স্বয়ং যে ভগবান তাঁরও দোষ হয়। তিনিও ঠিক ঠিক ন্যায়বিচার করেন না। অবশ্য আমাদের মত মানুষের তা' বলতে নেই। কিন্তু আমার কি কেবল শুধুই দোষ? বলা হচ্ছে, প্রধান হিসাবে আমি নাকি সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমি নাকি দেশের জন্যে, মানে এই গাঁ ক'খানির জন্যে কিছুই করি নি। একথা শুনলে শেয়ালেও হাসবে। আমি......আমি, রাম-কেষ্ট মিত্তির বক্তৃতার এইখানে এসে কথা হাতড়াতে লাগলেন, তারপর খুঁজে পেয়ে বললেন, আমি পীচের রাস্তা করিয়েছি, রাস্তা ছিলো না, এ অঞ্চলে ডাক্তার ছিলো না, হাসপাতাল ছিলো না, এসব আমারি আমলে হয়েছে, পর পর একটা স্কুল, একটা কলেজ আমি এখানে করেছি, চাষীরা যাতে কৃষিঋণ পায়, গরীব মানুষেরা যাতে রেশন পায়, এসব আপনারা বলুন, কে, কে এসব করেছে? আমি বসে থাকতে পারি না। সবাই আমাকে কাজ-পাগলা বলেন। আপনারা পাঁচজনা আশীর্বাদ করুন, যাতে কাজে

ফাঁক থাকতে থাকতেই [illegible] পারি। আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন আপনাদের চাকর হয়ে থাকতে পারি। আপনারা আমার মনিব। যখন দেখবেন আমি কাজ করছি না তখন কান ধরে তাড়িয়ে দেবেন। বলবেন, যা বলদ। মাঠে চরগা যা।

তারপর আরো—আরো অনেক কথা বলে গেলেন রামকেষ্ট মিত্তির। বক্তৃতা যে বেশ ভালোই দিচ্ছেন, বক্তৃতার মাঝ-পথে এসে সেটা উনি ধরতে পারলেন এবং যতোই বক্তৃতার শেষ অংশে আসছিলেন, ততোই ওঁর গলার স্বরে প্রত্যয় ফুটে উঠছিলো। প্রত্যেকটি শব্দকে উনি এমন কেটে কেটে ব্যবহার করছিলেন, যেন শব্দগুলো এক-একটা ইঁট, আর সেই এক-একখানি ইঁট দিয়ে যেন সাতমহলা একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছে। শব্দের সাতমহলা, জেল্লাদার বাড়ি, বক্তৃতার শেষে তাই একটা কিছুর আশা উনি খুব তীব্রভাবে করছিলেন, একটা প্রচণ্ড উল্লাসের হাততালি, কিন্তু সে সব কিছুই হল না, উনি বক্তৃতার শেষ লাইনটি সমাপ্ত করে কেমন একটু হতভম্ব হয়ে মাইকের সামনে থমকে দাঁড়ালেন তার পর সবটা বুঝতে পেরে চেয়ার হাতড়াতে লাগলেন।

এই যে চেয়ার! নেতাপদ হালদার চেয়ারটা এগিয়ে দিলো। প্রধান ধপাস করে বসে পড়লেন, বসার মধ্যে এমন এক ভংগী যে হাসি পায়।

এবারে কিষক সমিতির নেতা কারুবাবু কিছু বুলবেন।

মাইকের সামনে কারু মণ্ডল এসে দাঁড়ালো। এই দাঁড়ানোর যেন প্রতিধ্বনি উঠলো চারিদিকে। বসে থেকে অনায়াসে কারু মণ্ডলকে দেখা যাচ্ছিলো। সকলে কিন্তু উঠে দাঁড়ালো কারু মণ্ডলকে দেখতে। একটা হৈ-চৈ উঠলো।

এই যন্তরটার সামনে, কারু মণ্ডল মাইকটাকে দেখালো, এই দু-চার বার দাঁড়িছি। আমার পাটা তাই কেমন কাঁপেছে। বলে কারু মণ্ডল সরলভাবে হাসলো। সে হাসিরও প্রতিধ্বনি উঠলো চারিদিকে। কারু মণ্ডলের পা কাঁপে, কথাটা মুখে-মুখে একটা বিশাল তরংগের মত হয়ে গেল।

কিন্তুক জোতদারের গুলীর সামনে কখনো এ বুক কাঁপে নি, মাইরি! আবার মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কারু মণ্ডল নির্ভীক, ঝকঝকে গলায় হেসে উঠলো।

একবার হরি হরি বল, জোর বলেছে, গোটা সভাটা যেন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে উঠলো। আর ঠিক সেই সময় আমি তাকালাম রামকেষ্ট মিত্তিরের দিকে। প্রকাণ্ড হাতীর মত চেহারা নিয়ে জোৎকা চেয়ারে বসে আছে বটে, ভয়ে ভয়ে বসে আছে। ওর নাম খড়ি দিয়ে লেখা ছিলো একটুক্ষণ আগেও, এখন কে যেন ঝাড়ন দিয়ে মুছে দিয়েছে।

সূর্যও নয়, চাঁদও নয়, কারু মণ্ডল কথা বলছে, যেন বজ্র আর বিদ্যুৎ, বোধের অতীত এক বিস্ময়ের মতন ওকে দেখাচ্ছে, যেন পাণ্ডুয়ায় দেখা সেই মিনার, তেমনি গর্বিত, তেমনি দৃপ্ত ভাবভঙ্গী, এ কোথায় ছিল এতোদিন, মাইকের সামনে একে ত' কখনো দেখি নি!

আমি পেরথম পেধানের কথা দিয়েই বলি, কি বলেন। উনি বলোছেন, উনি খুব কাজের লোক। সবাই এ কথা নাকি বলাবলি করে। তা' উনি কাজের লোক বটি। কি কাজ? কি কি কাজ? কারু মণ্ডল থামলো। মুখে ফুটে উঠলো অদ্ভুত ধরনের হাসিটা।

উনি ইলেকটিরি এনেছেন গাঁয়ে। একথাটা খুব সতি। কি সত্যি কি না! নিজের ছুঁই যেমন নিজের কাছে সত্যি তেমনি সত্যি এই ইলেকটিরির ব্যাপারটা। কিন্তুক কে কে ইলেকটিরি পেয়েছে? এবে [illegible] এক, পেধান নিজে। রাত্তিরবেলা [illegible] দূর থেকে পেধানের আলোজলা তিনতলা দেখা যায়। এ কি ইলেকটিরি! দুই, ছিরু পাল, যার জমির লেখাজোখা নেই, তুমি এ গাঁয়ের [illegible] দিয়েই হাঁটো, বলতে পারবে না এ জমিটো ছিরু পালের নয়, ওরার দালান-কোঠায় ইলেকটিরি ঝোলে, আর কোর্টে গিয়ে আমাদের মাথা কাটে আমাদেরি গাঁয়ের ছেলে এ্যাডভোকেট পঞ্চানন মুখুজ্জ্যে, ওর ঘরে ইলেকটিরি। ব্যস। হ'য়ে গেল। গাঁয়ে আর কারু ঘরে ইলেকটিরি নাই। সকলের ভরসা আকাশের ডিব্রি। বটে কি না!

ঠিক, ঠিক বুলেছো মোড়ল, এ হক কথা। তুমুল সোরগোল উঠলো সভায়। কারু মণ্ডল হাত তুলে সভা শান্ত করলো।

তা'পর একটা ইস্কুল, একটা কলেজের কথা। তুমি পেধান, পেধানের উপযুক্ত কাজই করেছো এ দু'টো করে দিয়ে। কি—না, দেশের লোক মুখ্যু হয়ে থাকবে? তা' হ'তে পারে না পেধান

বে'চে থাকতে, কি বল! বলে আবার কারু মণ্ডল চুপ। সমস্ত সভাও চুপ।

আবার ফিচেল ধরনের একটু হাসলো। গোটা সভাটাও মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর সংগে হাসলো। ব্যাপার না বুঝেই। নিশ্চয়ই কারু মণ্ডল এমন একটা কিছু বলবে, যাতে হেসে তারা কুল পাবে না। হাসতে হাসতে পেটের ভাত ঘুলিয়ে উঠবে।

উনি, পেধানের দিকে আঙুল তুলিয়ে কারু মণ্ডল বলল, ইস্কুল, কলেজ করে দিয়েছেন। এসব করতে কতো ট্যাকা মেরেছেন তা' আমি ধরছি না। ওঁয়ার ট্যাকামারা বিদ্যে আমি ধরে ফেলবো এতো বিদ্যে আমার নেই। আমি কোন'রম শট্‌কেটা বলতে পারি।

ওঁয়ার ইস্কুল-কলেজে কারা পড়ে? যাদের জন্যে করেছেন তারা পড়ে। আমার মেয়ে ক্ষেন্তি পড়ে? না। তোমাদিগের ছেলে-মেয়ে? না। বাবুদিগের ছেলে-মেয়েরা পড়ে। যেতি আমাদের ছেলে-পিলেরাই না পড়তে পেল, তবে পেধান ইস্কুলই করুক আর নন্দমাই করুক, তাতে আমাদের কি যায় আসে? বলে মণ্ডল একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নিলো। শালা, জোর বলেছে, বানচোত মোড়লটা কি খচ্‌ড়া হে, কেমুন হেসে হেসে পেটে ছুরি চালায় গ, আগুন-চোর বটি. আগুন চুরি করো্য কথা বলে, গোটা সভাটা জুড়ে এ ধরনের কথার হুলুস্থুল। এমনিতে এ ধরনের মানুষগুলো একটু কথন-উদাসী, কঠিন সংসার এদের নীরব করে রেখেছে, তা ছাড়া আছে মাটি আর আকাশ, এদের সম্মোহন। নিস্পন্দ, নিথর নক্ষত্র, ধুসর হাওয়ায় কাঁপা অন্ধকার, অন্ধকারে উদ্ভাসিত জোনাকি, প্রান্তরের ঝিঁঝিঁ, প্রত্যুষের কোমল আলো এদের সামনে ত' মানুষের বিশেষ কোন কথা থাকে না।

এখন ওরা কথা বলছে। আকাশ, নক্ষত্র, অন্ধকার, প্রান্তর ওদের কথা শুনছে নির্বাক হয়ে। ওরাও কখনো এ ধরনের মানুষ আগে দেখে নি।

না। প্রধান মারা যায় নি। আধশোয়া অবস্থায় ছিলো। এবার চেয়ারের দুদিকের হাতল শক্ত করে ধরে খাড়া হয়ে বসেছে। সেই কথাটাই দেখছি সত্যি। কথার মত কথা বলতে পারলে মরা মানুষও জ্যান্ত হয়ে ওঠে। কি কুক্ষণেই না আজ প্রধান সভা ডেকেছিলো!

সেই চরাটার কথা মনে আছে পেধান? আজ বারো বছর তার ধান তোমার পেটে। মনে আছে? মাইকের ভেতর দিয়ে কারু মণ্ডল কথা বলে উঠলো ভয়ংকর গলায়। কি না করেছি ঐ চরাটার জন্যে। গাঙের গভ্‌ভে ডুবে ছেল। একদিন দেখলাম দুধের সরের মত চর জেগেছে। কেরমে কেরমে সেখানে পলি পড়ল, ঘাস হল, একটু একটু ছোট-খাটো বন হল। আমি, ছিদাম, হাতেমতাই মণ্ডল, রহিম সেখ, চারু পান পরামশ্য করলাম চরে চষবো। ধান বুনবো না। পেটো জমিও করবো না। আলু বসাবো না, পে'য়াজ বুনবো না, বুনবো রবিশস্য। মটর, কলাই, সরষে। চর আলো করে থাকবে। আর বীজ ফেলবো লাউ, কুমড়ো, ফুটির। রোজ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখতাম আসছে। নৌকোয় বোঝাই হয়ে লাউ, কুমড়ো, ফুটি আসছে ভারে ভারে। আর তৈরী করবো আখের ক্ষেত। গুড় কিনে খেতে পারি না। ঘরে তৈরী করবো। সেই গুড় বিক্রি করবো গঞ্জে, শহরে। দু' পয়সা কামাবো। এসব আমাদের কথা। আমি, ছিদাম, হাতেমতাই মণ্ডল, রহিম সেখ, চারু পানের কথা। দিব্বি কেটে বলছি, কুনোদিন. ভাবিনি কিষক সমিতি করবো। দিব্যি করে বলছি কুনোদিন ভাবিনি বাবুদের চোখ রাঙাবো। দিব্যি কেটে বলছি কুনোদিন ভাবিনি আন্দোলন করবো। আমরা দুটি খেতে চেয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম, বাবু গ, তোমরাও খাও, আমরাও খাই। আমরা কুনোদিন খেয়োখেয়ি চাই নি। এ সাঁচা কথা। সেই চরাটার কথা মনে আছে পেধান?

'পেধান' নড়েচড়ে বসলো চেয়ারে। কথা বলতে পারছে না। অন্ধকার নেবে গেছে। অন্ধকারে সব একাকার। 'পেধান'কে দেখা যায় না। কেবল কানে যায় চেয়ারের নড়াচড়ার শব্দ। 'পেধান' নড়েচড়ে বসছে চেয়ারে। অঞ্চলপ্রধান। ছত্রিশটা, আটত্রিশটা গায়ের মাথা। তিনকোঠা বাড়ির মালিক। চারশো বিঘে জমির হকদার। বি-ডি-ও, এস-ডি-ও, ডি-এম-ও'র বন্ধু, যিনি কেউ কিছু বলতে এলে 'জুতো মারবো' ছাড়া কথা বলতে পারতেন না এই ক'দিন আগেও, তাঁর মুখে এখন কথা নেই. এখন কাঠের ঠাকুর হয়ে বসে আছেন চেয়ারে, চেয়ারটা অস্বস্তিতে নড়াচড়া করছে।

টেবিলের সামনে কে একটা পেট্রোম্যাক্স বসিয়ে দিয়ে গেল।

কারু মণ্ডল বলল, তার অদ্ভুত আমেজী গলায়, আমরা রোজ সকালে পাঁচ মাইল পথ হে'টে যেতাম নাঙল, গরু নে। ডোঙায় নাঙল চাপাতাম। গরুর গলার দড়ি ধরে সাঁতরে যেতাম চর। তার আগে বন কেটেছি। এ্যাতো এ্যাতো বিছে, সাপ মেরেছি। বীজ ফেলেছি। জমিকে মোলাম করেছি ননীর মত। ফসল ফলিয়েছি। চাষার বেটা চাষার মনে আশা, ফসল বিক্রিসিক্রী করে খুকোর মায়ের নাকে একটা নথ দুবো, খুকার পা দুখানি বড় খালি খালি, পায়ে দুব দুখানি রুপোর হারছড়া, আমাদের রহিম ঠিক করেছিলো সাতক্ষীরে থেকে ওর পছন্দ করা বৌ নে আসবে, এমনি সব কত স্বপন। সকালবেলা একদিন উঠে দেখি ঘর পুলিশ ঘিরে ফেলেছে, কিছু জানি না, বুঝি না, পুলিশ বল্লে চল, ত' চইলতে লাগলাম। মাইল দুয়েক হে'টে এলম, গাঁয়ের লোক যে যেখেনে দেখে, সেই বলে, কি রে, কোমরে দড়ি ক্যানে, চুরি করেছিস নাকি? কি বলবো, মাথা নীচু করে চলি, কে পেত্যয় যাবে চুরি করি নি তবু চুরির দায়ে ধরা পাড়চি? থানায় এলম। এসে দেখি ছিদাম, রহিম, ছিরু সবাই এক জালে ধরা পড়েছে। একে একে শুধোলাম, কিরে, কিছু জানিস? কেউ কিছু বলতে পারলে না। কি বলবে? কেউ ত' জানে না, কেন পুলিশ ধরে নে' এলো। খানিক পর এলেন পেধান। মস্‌ মস্‌ করে জুতো পায়ে। সে চলার ভংগি কি। যেন দাঁতের নীচে গরম পাঁপর ভাজা। মস্‌ মস্‌। হাইরে বাপ, মরে যাই। আবার মস্‌ মস্‌। পেধান চলে গেল ধুলোয় কোঁচা লুটিয়ে। বেরিয়ে এলেন থানার বড়বাবু। ইদিক-উদিক তাকিয়ে বললেন, যদি দু'-চার টাকা করো্য ছাড়ো, তা হলে ছেড়ে দিতে পারি। বাবু, তা' অন্যায়টা কি? আমরা কি করেছি?

চুপ কর শুয়োর বেটা। দারোগা খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে এলো, যেন কাঁচাই মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাবে, পরের জমিতে চাষ দিয়েছে আবার বলে অন্যায়টা কি? পরের জমি কুথায় হল? ওতো চর। কারুর জমি ছেল নি।

না। দারোগাবাবু হাতের বেত নাচিয়ে বুললেন, চর বন্দোবস্ত নিয়েছে তোমাদিগের পেধান, রামকেষ্ট মিত্তির। হাই বাপ, আমরা কিছুই জানতাম না। কবে থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছেন পেধান? তোমাদিগের পেধানকে শুধোও ক্যানে দারোগা দাঁত বার করে হাসতে লাগলো

হঠাৎ বলতে বলতে চুপ করে গেল কারু মণ্ডল। দু মিনিট চুপচাপ। গোটা সভা স্তব্ধ। ছুঁচ ফেললে শোনা যায় সবাই কান খাড়া করে আছে। এইবার কি বলে কে জানে। এইবার আর কোন নোতুন বজ্রপাত হয়।

এই সেই পেধান। ইনি খুব কান পাতলা লোক। খুব ভালো লোক। ব আঙুল দেখিয়ে গোটা সভার দৃ 'পেধান'-এর দিকে আকৃষ্ট করলো কারু মণ্ডল।

সেদিন একটা ফসলেরও দাম দেয় নি একটা ফলও নিজে হাতে আমাদিগে তু

দেয় নি। [illegible] [illegible] দিন, [illegible], এই ফুটিটো ভারি সোয়াদ। দে না বাপু বাড়িতে।

বজ্রকণ্ঠে হাঁক পাড়লো কারু মণ্ডল, না। দেয় নি। আমাদের হক্কের ফসল দেয় নি।

মার শালোকে, শালোকে পুঁতে ফ্যাল, শ্যালো এখনো বেঁচে আছে, ড্যাব ড্যাব করে তাক্কে তাক্কে দেখছে ড্যাকরাটা। মার, মার। সভার মধ্যে সে এক বিরাট হাঁক-ডাক। সত্যি, 'পেধান'কে এই মারে ত' এই মারে।

কারু মণ্ডল দু' হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বলল।

তুমরা চুপ করো। ওকে মারাই উচিত। কিন্তুক তবু আমরা ওকে মারবো না। ওর গায়ে কেউ হাত দেবে না। এখনো আমার অনেক কথা বাকি। চুপ করুন গ' আপনারা! আপনারা না সমিতির লোক? শুদুমুদু হৈ-চৈ করছেন? আপনারাই পাঁচজনা আমাকে নেতা করেছেন। আপনারা আমার কথা শুনবেন না?

হৈ-চৈ আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে এলো। অন্ধকারে কয়েকটি বিড়ি জ্বলে উঠলো। টেবিলের ওপর পেট্রোম্যাক্সের আলো দেখা যায়। সামনে একটা অন্ধকার ছায়ার মত দাঁড়িয়ে কারু মণ্ডল। কারু মণ্ডলের মুখ দেখা যায় না। চোখও দেখা যায় না। তবু মনে হয় চোখ দুটি ধবক্ ধবক্ জ্বলছে।

উনি, 'পেধান'-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে কারু মণ্ডল বলল, বলেছেন, উনি খুব কাজের লোক। কি কাজ? রিলিফের সময়, পে-মাস্টার, ভটচাযি পুরুত, ঐ যার বোয়েব খুব ছুঁচিবাই, ইস্কুলের টিচার শচীনবাবু, লাইবারীর ভবকেষ্ট, ঐ যারা আমাদিগের মত মুখ্যু নয়, পেটে বিদ্যে লড়েচড়ে, তেনারাও বলেছেন, উনি খুব কাজের লোক। সোজা কথা নয়, এতো সব মান্যি-গণ্যি লোক বলছে সাথন, কি বলছে, বলেছে, হ্যাঁ, অন্যায়-টন্যায় করেছে বটে, তবে দেশ-গাঁয়ে ওর'ম অন্যায়টা আর কে না করে বল, তবু বাপু মানুষটা খুব কাজের বটে! তোখন কারু মণ্ডল, বেটা চাষার বেটা চাষা, মুখ্যু সুদ্দার, চোখ রাঙিয়ে বললেই কি সত্যি হবে!

কারু মণ্ডল আবার চুপ করে রইলো খানিক। সভা আবার স্তব্ধ। মাথার ওপর অঘ্রাণের হিম। অগণিত মানুষ বসে আছে খোলা আকাশের নীচে। পথ চলতি খড়ের গাড়িও দাঁড়িয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে গেছে দু-চারটে সাইকেল। এমন অদ্ভুত সভা এ তল্লাটে এর আগে কেউ কখনো দেখে নি। এ এক নূতন 'কবি' আর 'তরজার' আসর। এ আসরের মূল গায়েন কিষক সমিতির নেতা কারু মণ্ডল।

হাঁ, হবে। বজ্রকণ্ঠে হাঁক পাড়লো কারু মণ্ডল। গলার দাপটে যেন বায়ু-স্তর কেঁপে উঠলো। চঞ্চল হয়ে উঠলো সভার লোকজন।

আমি বলছি হবে। কারুর জানতে বাকি আছে বাগ্দীপাড়া আর ডোমপাড়ার মেয়েগুলো একটাও ভালো নেই কেন? কার, কাদের ভোগে যায়?

মার শালোকে, পুঁতে দে হোগ্লার বনে, ছোটলোক কম্নেকার, ওরা আবার ভদ্দরলোক, পেড়ে ফেল। সভার সে এক উন্মাদ অবস্থা। লোক একবারে হন্যে হয়ে উঠছে। যেন 'পেধান'কে চিবিয়ে খাবে। ঝম্ ঝম্ করে বেজে উঠলো খঞ্জনী, কেউ বাজালো বিউগল, যারা সংগে এনেছিলো কাড় ধনুক, তারা তাই নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, লাঠির ডগা থেকে ধ্বজা খুলে জনকতক এগিয়ে গেল সামনে, আমিও এগিয়ে গেলাম ভিড় ঠেলে। ভিড়ের চাপে, কারুর হাতের ঠেলায় টেবিলের ওপর পেট্রোম্যাক্সটা উল্টে গেল, সেটা টেবিলে পড়ে দু'বার ভক্ ভক্ করে জ্বলে নিভে গেল, আরো কাছে গিয়ে দেখি কারু মণ্ডল দু' হাতের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে আছে 'পেধান'কে, আর ওরা চেঁচাচ্ছে, ছেড়ে দাও মণ্ডল, না হ'লে মাইরি আমরা তুমাকে ছাড়বো নি, তুমি জান না ও কি করেছে। শুদু ডোম-বাউড়ী লয়, আমাদের ঘরের বৌ-ঝিদের নিয়েও টানাটানি করেছে, তুমি ছেড়ে দাও, ওর ওষুধ ধোলাই, এ ছাড়া আর কিছু নয়। তুমুল হট্টগোল। হঠাৎ কারু মণ্ডল ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল। গা থেকে চাদরটা খুলে ফেলে দিলে। অতো শীতেও জামাটা খুলে ফেলে সামনে এগিয়ে এসে বললে, নে, মার আমাকে, মারতে মারতে আমাকে মেরে ফ্যাল, আমার মড়ার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে গিয়ে পেধানকে মারতে পারবি, তার আগে লয়। বলে হুংকার দিয়ে উঠলো কারু মণ্ডল।

ওর ওই ভীম মূর্তি দেখে সকলে 'কারু খেপেছে হে, কারু খেপলে রক্ষা নাই' বলতে বলতে সামনে থেকে সরে এলো, 'ও শালো একাই দশটা নোকের মহড়া নিতে পারে', 'কেন যে মাইরি কারুটা পেধানের দালালি করছে'...... 'হাতের সুখটা মাইরি হোল না'...... 'এই পিঠে গুণে গুণে পেধান জুতো মেরেছে, বলেছে পেরথম জুতো যিটা মারলম সিটা তুর ঠাকুদ্দার মুখে, যিটা নরকে গেছে গেল সন, এইবার যিটা মারলম সিটা তুর বাপের মুখে, তুর বাপ কিনা সঠিক জানি না', বলে হেসেছে 'হিঃ'। ততক্ষণে আবার পেট্রোম্যাক্স জ্বলেছে টেবিলে, মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কারু মণ্ডল, ধীর-স্থির, সংযতভাবে বলতে আরম্ভ করেছে, ওকে মারাই উচিত। তবু আমরা ওকে মারবো না। ওর কান ইচ্ছে করলে মুলে দিতে পারি। মাথা ন্যাড়া করে দিতে পারি। পিঠে দু' ঘা ঘুঁষি মারতে পারি। পাটায় যেমন করে ধান ঝাড়ে, তেমনি করে পাটার ওপর ওকে ঝাড়তে পারি। ওকে এক কিলো লংকা জোর করে খাওয়াতে পারি, তাতে কি হবে, বলুন গ' আপনারা? না হয় ইসব করলেন, তারপর? এতে আমাদিগের সমিতি বেড়ে যাবে, নামযশ হবে, না ওর পিঠটা যদি দেয়ালের দিকে ঠুকে দি তবে কাজ হবে! ও চরিত্তহীন লম্পট। তাই বলে আমরা চরিত্তহীন হবো! লম্পট হবো! উদের বাড়ির বৌ-ঝিদের নে টানাটানি করবো! এই কি শিক্ষে! দেশ গাঁয়ের বাপ-ঠাকুদ্দা, ডাকপুরুষের বচন, রামায়ণ, মহাভারত এই সব আমাদের শিখিয়েছে?

শুনুন আপনারা। পেধান সভা ডেকেছে কেন সেটাই ত' ভুলে মেরে দিয়ে-চেন। আবার সামনে অঞ্চল পঞ্চায়েতের নিব্বাচন। তাই এখুন ভালো মানুষ সাজার ইচ্ছে। আমি বাপু অনেক দোষ করেছি। কিন্তু কাজের লোক ত' বটি। তোমরা আমাকে একেবারে বজ্জন কোরো না। এই সব কাঁদুনি গাইবার জন্য এই সভা। এটা মনে রাখবেন। আর একটা কথা। কাল সকালে ধলাচিতের মোড়ে জমায়েত আছে। এখান থেকে ভিন ভিন গাঁয়ের মানুষ লাইন করে যাবে পেধানের চুরি করে রাখা বত্রিশ বিঘের ধান তুলতে। পেধানকে এখখুণি পেড়ে ফেলা সোজা, ধান তোলা সোজা নয়। দেখবেন পেধানের চুরি করা ধান আগলাতেও পাছে গণ্ড-গোল হয় তাই দু' গাড়ি পুলিশ আসবে।

সভা ভেঙে গেল। সবাই যে-যার পথ ধরলে। কৃষক সমিতি ধ্বজা নিয়ে লাইন সাজিয়ে চলে গেল। আমি একা সেই পরিত্যক্ত খোলা জায়গাটায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চিত্রার্পিতের মত। হয় ইন্দোনেশিয়া, না হয় ভিয়েতনাম। ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে। কোন্‌টা আগে? কোন্‌টা সত্যি? 'পেধান' যে কথা আমাকে বলেছিলো, যে ইঙ্গিত দিয়েছিলো, সেটা, না কৃষক সমিতির কারু মণ্ডল এই মাত্র যে ইঙ্গিত দিলো সেটা? আমি কেমন করে বলি! ঘড়ির পেণ্ডুলাম কিন্তু নির্ভুল নিয়মে দুলছে। হয় ইন্দোনেশিয়া, না হয় ভিয়েতনাম। হয় ভিয়েতনাম, না হয় ইন্দোনেশিয়া।

[ ক্রমশ ]

রবীন্দ্র গুহ

**তখন** ঠিক বিকেল নয়, দুপুরও নয়, দুপুর এবং বিকেলের মাঝামাঝি একটা সময়। আমরা রোজকার মত সুধীরের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এমন সময় তারা এলো—সুধীরবাবু আছেন, সুধীরচন্দ্র সরকার? শ্রীযুক্ত যোগেন—

সুধীর বলল—হ্যাঁ, বসুন। আমারই নাম সুধীর সরকার। যোগেনবাবু আমার বাবা—

—কি সৌভাগ্য, বসব বৈকি, নিশ্চয়ই বসব—

তারা খুশি হয়ে আসন গ্রহণ করল। এবং আমাদের দিকে একপলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল—তা এরা?

সুধীর বলল—আমার বন্ধু।

অন্যপক্ষ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই কাউন্টারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—সুরেন, ছ' কাপ চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে আয় তো। দৌড়ে যা।

সে ঘড়ির দিকে তাকাল। বুঝি বা একটু অন্যমনস্ক হল। নবাগত অতিথিদের দিকে ফিরে সবিনয়ে বলল—আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি—

কথা শেষ করে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই সদর রাস্তায় নেমে গেল সে। সেই যে গেল আর ফিরে এলো না।

চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খেতে খেতে তারা বলল—বন্ধু যখন, আপনারা হয়ত সবই জানেন। একটা সম্বন্ধের ব্যাপার নিয়ে এসেছিলাম আমরা। তা আমাদের আর কিছু দেখার নেই। ছেলে নিয়ে কথা, ছেলে ভালো হলেই ভালো। টাকাকড়ি যোগেনবাবুর যথেষ্ট আছে জানি, ঈশ্বরের কৃপায়, বুঝলেন কিনা, আমাদেরও মোটামুটি, মানে—

হেঁ হেঁ করে হাসছিল তারা। আমরাও হাসতে হাসতেই তাদের যাবতীয় কথা শুনছিলাম।

হঠাৎ তাদের খেয়াল হল, কথায় কথায় অনেক বেলা বয়ে গিয়েছে। সকলে ব্যস্ত
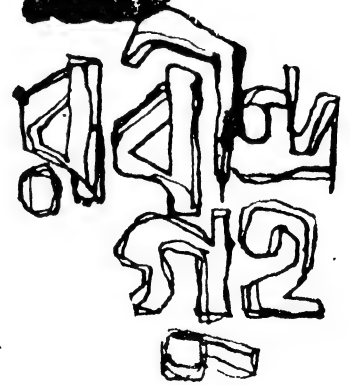
হয়ে উঠল—কি আশ্চর্য, সুধীর বাবাজীবন তো ফিরল না এখনো!

আমরা বললাম—ভালোমানুষ, হয়ত লজ্জা পেয়ে থাকবে। কিন্তু আপনারা তাই বলে—

—না না, সেকি কথা। খুব আনন্দ পেলাম, খুব খুশি হয়েছি আমরা।

তারা উঠল—আচ্ছা চলি।

সুধীর এসব কিছুই জানল না, সে তখন তিনটের লোকালে।

আর ক'টা স্টেশন পরেই কাঁচরাপাড়া। সেখানে হাসপাতালের খোলা জানালার পাশে শুয়ে আকাশ দেখছে সুধা। অস্থির চঞ্চল চোখে বার বার দূরে সড়কের দিকে তাকাচ্ছে। ওই সড়ক ধরেই সাইকেলে চড়ে আসবে সুধীর। ক্রমশ যত কাছাকাছি হবে, দৃষ্টিতে আকুলতা বাড়বে। সুধীর চোখে চোখ পড়তেই হাওয়ায় হাত দুলিয়ে হাসবে।

সব দিন অবশ্য হাত খালি থাকে না, কোন দিন ফল-টল থাকে, বই থাকে, ফুল থাকে।

একদিন কথায় কথায় সুধা রজনীগন্ধার নাম করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সুধীর শুধিয়েছিল—তোমার ভাল লাগে?

সম্ভবত একটু আবেগ দিয়েই বলেছিল সুধা—খুব।

সেই থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একগুচ্ছ রজনীগন্ধাও আসে রোজ। সুধা বলে—রোজ রোজ ফুল আনো কেন? একদিন দু'দিন পর পর এনো, রজনীগন্ধা শুকোয় না।

সুধীর হাসে। ঠাট্টা করে বলে—আমিই বা রোজ রোজ কেন আসি, আমার টানটাও তো মরে না।

সে কথা শুনে রেগে ওঠে সুধা—আহা, কি যে কথা। কার সঙ্গে কি তুলনা।

এসব অনেক পরের কথা।

প্রথম দিককার ঘটনা কিছুটা বলে রাখা প্রয়োজন।

দুপুরবেলা একদিন সুধীর এলো আমাদের বাড়ি। ঘরে পা দিয়েই ব্যস্ত কণ্ঠে বলল—বেশি সময় নেই, তিনটের লোকাল ধরতে হবে। শোন্, একটা বই দে তো।

—বই! কি বই?

—গল্পের বই। প্রেমের গল্প-টল্প হলেই ভালো হয়।

সুধীর গল্পের বই চাইছে, তায় আবার প্রেমের গল্প! বেশ অবাক হলাম। বললাম—তুই তো ওষুধের ব্যবসা করিস্, বই-টই পড়ার বাই তো তোর ছিল না কোন কালে?

সুধীর বলল—এখনো নেই, তবু একটা বই চাই।

—কেন?

—একজনকে দেব।

—কাকে?

—সুধাকে।

—সুধাকে মানে?

বিস্ময়ে হতবাক হলাম আমি।

সুধীর হেসে উঠল—মানে তোর বোনকে। শালা গর্দভ—নে, দে তাড়াতাড়ি।

অনেকক্ষণ আমার চোখের পলক পড়ল না। তেমনি সরল কণ্ঠে সুধীর বলল—তা মজা বেশ, তুই আমার হবু শালা, তোর সঙ্গে রসিকতা করতে পারি। তবে বলি শোন, সুধার সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে—অর্থাৎ ভালবাসা। এই দ্যাখ্—বিশ্বাস না হয়, তোর বোনের লেখা প্রেমপত্র দ্যাখ—

নীল একখানা কাগজ চোখের সামনে তুলে ধরল সুধীর। আদ্য অক্ষর প্রিয়, তার পর সু—শুধু সু। সবশেষের অক্ষরও সু—মানে সুধা। আমার পিসতুতো বোন সুধা। গত আট মাস ধরে যে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে ক্রমে ক্রমে পাংশুবর্ণ হয়ে এসেছে।

মস্ত বড় সংসার অথচ একমাত্র রোজগারী মানুষ পিসেমশাই। ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তবু, ওরই মধ্যে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। বড়-ছেলে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছিল, ছোটটি পলিটেক্নিকে, সুধা তৈরি হচ্ছিল বি-এ পার্ট টুর জন্য। এমন সময় এই কাণ্ড। প্রথম প্রথম ঘুষঘুষে জ্বর, বুকে ব্যথা, কাশি—তারপর হঠাৎ একদিন কাশির সঙ্গে চাপ চাপ রক্ত উঠল। ডাক্তার দেখল, এক্সরে তোলা হল, এবং এই সব করতে গিয়ে যা খরচা হল, তাতে দু'চোখময় অন্ধকার দেখলেন পিসেমশাই। টাকার অভাবে ছোট ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আনা হল পলিটেকনিক থেকে, নিজে আপিসের পর গোটা তিনেক টিউশনি ধরলেন। তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের দয়া-দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায়ও থাকতে হত।

সেদিন মাকে নিয়ে সুধাকে দেখতে যাচ্ছিলাম, বৌবাজারের মোড়ে সুধীরের সঙ্গে দেখা। যত দূর মনে পড়ে এর আগে দু'একবার ওকেও বলেছি ঘটনাটা তাই একরকম জোর করেই ও আমাদের সঙ্গ নিল। আমি আপত্তি তুলেছিলাম।

সুধীর মানল না। হেসে বলল—ভয় নেই রে, আমরা ওষুধ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি, আমাদের কোন রোগ ছোঁবে না—

শুনে মা বললেন—বেশ তো, চলুক না। বড়লোক মানুষ, দেখে আসবে দুঃখে পড়লে মানুষ কত কষ্টে থাকে।

টালির ছাওয়া বস্তির ভিতর দুখানা মাত্র ঘর। খোলা উঠোনের মধ্যে বারোয়ারী কল, দোর ছুঁয়ে নর্দমা গিয়েছে। সুধার জন্য অবশ্য আলাদা একখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঝাজরানো দেয়াল, নীচু দরোজা, আর ঠিক মাথার কাছে একটি-মাত্র জানালা।

সন্ধ্যে নাগাদ পিসেমশাই এলেন। ঋজু শীর্ণ শরীর, ময়লা কাপড়, অসম্ভব ক্লান্ত। তবু ঘরে পা দিয়ে হাসলেন—তোরা এসেছিস!

আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটা টুল এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, তিনি বাধা দিলেন—থাক থাক, তুই বোস, আমাকে এখুনি বেরোতে হবে ফের।

তিনি এগিয়ে গিয়ে সুধার মাথায় একখানা হাত রাখলেন—কেমন আছিস মা?

সুধা প্রাণপণ হয়ে হাসল—খুব ভালো বাবা।

মুহূর্তে পিতা-পুত্রীর মধ্যে কত কি যে জানাজানি হয়ে গেল। উভয়ে উভয়ের সবচেয়ে নিকটতর অধিকারের মধ্যে এসে গেল যেন।

পিসেমশাইয়ের মুখখানা অনেক প্রফুল্ল দেখাল এই সময়, অনেকটা সতেজ আর প্রাণময়।

তিনি বললেন—যাই, সেই ওষুধটা আবার খুঁজতে হবে আজ। কি যে

হয়েছে, একটা জিনিস যদি সহজে পাওয়ার উপায় আছে বাজারে।

—কি ওষুধ?

সুধীর জানতে চাইল। আমি এই সময় তাড়াতাড়ি পিসেমশাইয়ের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম। এবং বেশ উৎসাহ নিয়ে বললাম—ভালোই হয়েছে, প্রেস্ক্রিপশনটা ওকে দেখান তো, ওদের মস্ত ওষুধের ব্যবসা, ঠিক জোগাড় করে দিতে পারবে।

সত্যি সত্যি ওষুধটা সংগ্রহ করে দিয়েছিল সুধীর। সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা। মাঝে মাঝেই শুনতে পেতাম সুধীর নিয়মিত সুধাদের বাড়ি যাতায়াত করে। অনেকরকম ওষুধ-টসুধ নিয়ে যায়। প্রয়োজনে পিসেমশাইও ছুটে যান।

এরও প্রায় মাস তিনেক বাদে কে যেন এসে বলল—কাঁচরাপাড়া টি-বি হাসপাতালে একটা বেড পাওয়া গেছে, সুধীরই নাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছে—

খবরটা শুনে বেশ ভাল লাগল।

এই রকমই স্বভাব সুধীরের। কারো জন্য কিছু করা—বিশেষ করে এমন কিছু করা যা সবাই করতে পারে না—এমনি কিছু করার প্রতি তার ছিল চিরকালের নেশা। ছোটবেলায় কত গরীব বন্ধুদের সাহায্য করেছে ও।

আর শুধু কি তাই, অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটাতেও ওস্তাদ ছিল সুধীর। একবার এক গ্রীষ্মের দিনে ও প্রস্তাব করল, সবাই মিলে কার্জন পার্কে বসে তামুক খাবে।

যেমন কথা তেমনি কাজ। নতুন একটা গড়গড়া কেনা হল, সুগন্ধি অম্বুক কেনা হল। সবাই গায়ের জামা-গেঞ্জী খুলে উদোম শরীরে পার্কে বসে তামুক খেলাম। সেকি ফূর্তি সুধীরের। বার বার বলছিল—গ্রামের জীবন—বুঝলি না—আহা কি মজার!

তবু, সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। —এটা নিশ্চয়ই ভালো হচ্ছে না। সুধার শরীরময় মারাত্মক রোগ, বাঁচার নিশ্চয়তা নেই। তা ছাড়া ওরা অসম্ভব নীচুর মানুষ, একেবারে ধুলো-মাটির, ওদের সঙ্গে—

দু'একবার ভেবেছি, বন্ধু হিসাবে অন্তত সতর্ক করে দেব সুধীরকে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।

এরই মধ্যে আর একদিন শুনলাম, কাঁচরাপাড়া থেকে সুধাকে নিয়ে আসা হচ্ছে যাদবপুর হাসপতালে। সুধীরই সব বন্দোবস্ত করেছে। কাঁচরাপাড়া থেকে এতটা পথ কিভাবে নিয়ে আসা যায়, তাই নিয়ে এখন আলোচনা চলছে।

দুপুরবেলা সুধীর আমার আপিসে এলো—চল্, পরামর্শ আছে, খুব জরুরী।

রাস্তায় নেমে দেখলাম অসম্ভব ভিড়।

সুধীর বলল—বড্ড গন্ডগোল চারদিকে, চল্ মনুমেন্টের চুড়োয় উঠব, ওখানে বসে আলোচনা হবে।

আমার হাসি পেল—পাগল ছেলে! শিখর থেকে পৃথিবী দেখতে চাস?

সুধীর চেঁচিয়ে উঠল—ঠিক তাই। শিখর থেকে সবাইকে দেখব, সবাই আমাকে দেখবে। অধঃতে শুধুই অন্ধকার, অধঃতে কেউ কারো নয়।

যাই হোক, কাঁচরাপাড়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত টানা ট্যাক্সি করে নিয়ে আসা হল সুধাকে। পথে আসতে আসতে অনর্গল কথা কইছিল সুধীর। কবিতায় হাসিঠাট্টা করছিল।

সবই ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছিল, তবু আমার মনে প্রশ্ন—অতঃকিম! ঝড় উঠবে কোন দিক থেকে?

সুধার যে ভাইটিকে পলিটেকনিক থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছিল, তাকে আবার ভর্তি করে দিল সুধীর। পিসেমশাইকে অনেক অনুরোধ করল টিউশনির সংখ্যা কমাতে, কিন্তু তিনি তাতে রাজী হলেন না। তিনি আগের মতই রইলেন, চোখে-মুখে তেমনি বিষন্নতা, ক্লান্ত শীর্ণ শরীর। ব্যবহারে শুধু সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। আগে যেমন শত অবসাদের মধ্যেও আপিস থেকে সরাসরি ছুটে আসতেন বাড়িতে, সুধার ঘরে পা দিয়ে হাসতেন, মাথায় একখানা হাত রেখে শুধাতেন—কেমন আছিস মা?

চোখে-মুখে স্বাচ্ছন্দ্য ফুটিয়ে বলত—খুব ভালো বাবা।

তেমন দৃশ্য আর দেখা যায় না আজকাল। আপিস থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে বা যে কোন কারণেই হোক, নিয়মিত আর সুধার কাছে যাওয়া হয় না। মাঝে মাঝে টেলিফোন করেন, খুব দরকারী হলে যান, নতুবা সরাসরি বেরিয়ে পড়েন টিউশনির উদ্দেশ্যে।

এইভাবেই দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল।

একদিন সুধীর এসে খবর দিল—এই, শোন্, সুখবর আছে।

—কি সুখবর?

—তোর বোন, মানে—বলেই সুধীর চোখ টিপল—মানে আমার—ভালো হয়ে গেছে।

—সত্যিই?

সুধীর বলল—হ্যাঁ, এই দ্যাখ্ চিঠি।

আবার চিঠি, সুধার চিঠি। প্রথম এবং শেষ অক্ষর—দুই-ই সু।

সুধীর হাসল—বুঝলি না তো, শোন তবে বলি। শ্রীমতী ব্যাপারটা চেপে রেখেছিল, আজ এই চিঠির মধ্যে জানাল। আর মাত্র একটা মাস, এই একটা মাস ওকে আর শুয়ে বসে কাটাতে হবে না। হাসপতালের কাজকর্ম করবে, ইচ্ছা হলে বাইরেও আসতে পারবে—বেড়াবে, ফূর্তি করবে। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানিস্?

—কি?

ওসব কিস্যুটি না। পুরোপুরি ছুটি পেলে তবেই ও বাইরে আসবে। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে আসবে, অন্যরূপে অন্য জগতে—

কল্পনার সে ছবিটাও বিস্তারিত করে শোনাল সুধীর। নতুন বাসা নেবে ওর জন্য, নতুন পরিবেশ গড়ে তুলবে, সেখানে পুরনো দিনের কোন চিহ্ন থাকবে না। সর্বত্র সুখ, সর্বত্র খুশি।

তবু, আমি ভাবছিলাম—অতঃ কিম্!

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা মাস। সুধীর তৈরি হয়েই ছিল। একতলা একটা বাড়িতে দুটো ঘর ভাড়া নিল। পিসেমশাই কোন ব্যাপারেই মুখ খুললেন না—হাঁও না, নাও না।

সব জিনিসপত্তর [illegible] করে নতুন বাড়িতে নিয়ে আসা হল।

সুধা যেদিন আসবে, সুধীর সকাল থেকে সারাটা দিন হন্তে হয়ে ঘুরল শহরময়। কত কি যে কেনাকাটা করল তার সীমা নেই। তবু সাধ মেটে না।

বিকেলের দিকে আমাদের বাড়ি এলো সুধীর। বললে—চল্ আমার সঙ্গে।

ক্রমশঃ

—সুধাকে আনতে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলাম—আজ বরং তুই একা যা।

সুধীর সে কথায় কান দিল না।

গাড়িতে উঠে অবাক—এত প্যাকেট কিসের?

সুধীর বলল—ওতে জামাকাপড় আছে সুধার। সব নতুন, পুরনো যা‌কিছু তা হাসপাতালেই রেখে আসতে বলব।

গদীতে হেলান দিয়ে হাসল সুধীর। ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। অথচ চোখের দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্ন খুশি ও তৃপ্তি।

ব্যাপারটা এমন কিছু না, তবু অসম্ভব ভাল লাগছিল। ভালবাসা কি মধুর! এত সুখ, এত শান্তি। এ গল্প শুনে যে কোনো মেয়ে হিংসা করবে সুধার ভাগ্যকে।

কি আছে সুধার? না ঐশ্বর্য, না রূপ, না অন্য কিছু। তবু তার জন্য এমন একজন আছে—যে সারাক্ষণ তারা মন-প্রাণ দিয়ে তাকে মহীয়সী করবে! ভাবতে অবাক লাগে বৈকি!

সুধা এসে ট্যাক্সিতে বসল। আমি চমকে গেলাম, যদিও শীর্ণ শরীর, ধূসর পাণ্ডুর একখানি মুখ, তবু কি প্রাণময়!

সবুজ রঙের সুন্দর একখানি শাড়ি পরেছে সুধা এবং সবুজ রঙের ব্লাউজ।



ট্যাক্সির কোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসল, সুধীর ওর একখানা হাত ছুঁল, কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু বলা হল না। সুধীর আরো ঘনিষ্ঠভাবে ঝুঁকল, কাছাকাছি হতে চাইল। সুধা নিজেকে গুটিয়ে নিল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সুধীর বলল—এত তাড়াতাড়ি নয়। একটু বেড়ানো যাক—পূব, পশ্চিম, যেদিকে খুশি—

একাই অনর্গল কথা কইছিল সুধীর, ছিন্নভিন্ন অসংলগ্ন।

নতুন বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই। একরকম বরণ করেই তারা ঘরে তুলল সুধাকে। কাছাকাছি পিসে-মশাইকে না দেখে অবাক হলাম।

এরপর সুধীরের সঙ্গে খুবই কম দেখাসাক্ষাৎ হত। মাঝে মধ্যে খবর পেতাম, ওরা ডায়মণ্ড হারবার বেড়াতে গিয়েছে কিম্বা মাইথন অথবা সোনারপুর। একবার মুর্শিদাবাদ গেল, তিন দিনের প্রোগ্রাম। যাবার আগের দিন সুধীর নিজে এসে খবরটা জানিয়ে গেল।

—অনেক দিনের ইচ্ছা জানিস, খুব বেড়াব। নৌকো নিয়ে নদীর বুকে ভাসব—

ভেবেছিলাম ও হয়ত এরপর বলবে—চল্ তুইও, যাবি?

কিন্তু না, সুধীর সেরকম কোন অনুরোধ করল না।

পরের দিন ওরা চলে গেল। এবং কি মর্মান্তিক, দুদিনের মাথায় হঠাৎ হার্ট-ফেল করে মারা গেলেন পিসেমশাই। সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে যথারীতি আপিসে গিয়েছিলেন, পাঁচটা পর্যন্ত ভালমানুষের মত কাজও করেছেন, অথচ টিউশনিতে যাবেন বলে ট্রামে উঠে বুকে একটা ব্যথা অনুভব করলেন। সেই ব্যথা আর কমল না। ক্রমশ বাড়তে লাগল। শেষে রাত ঠিক দশটার সময় হার্টফেল করলেন।

সুধারা যাবার সময় কোন ঠিকানা রেখে যায় নি।

ফিরে যখন এলো তখন সব শেষ।

এরও প্রায় দিন দশেক বাদে সুধীরের সঙ্গে আবার দেখা। অত ফুর্তিবাজ ছেলে অথচ কি দারুণ বদলে গেছে। এলোমেলো পোষাক, বিভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি।

আমি দ্বিধান্বিত কণ্ঠে শুধালাম—কিরে, কি হয়েছে, শরীর খারাপ?

নতস্বরে সুধীর বলল—না।

—তবে?

—সুধাকে হাসপাতালে রেখে এলাম—সুধীরের কণ্ঠস্বরে কান্নার ছোঁয়া।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কোন কথা খুঁজে পেলাম না আমি।

সুধীর বলল—ক'দিনের অনিয়ম, তার ওপর এতবড় একটা শক, ওকে বোধহয় আর বাঁচান যাবে না—

আমি সান্ত্বনা দিতে চাইলাম—কি যে বলিস্ অত ভাবছিস্ কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন একসঙ্গে আমরা সুধাকে দেখতে গেলাম। সুধাকে একটা কেবিন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তবু আমাদের ওর কাছে যেতে দেওয়া হল না। সুধীরকে ক্রমশ অসম্ভব ম্লান ও হতাশ দেখাচ্ছিল; দৃষ্টিতে করুণ বিষণ্ণতা। ও বলল—তুই চলে যা, আমি আজ থাকি এখানে, কখন কি দরকার হয়।

—কি পাগলামি করছিস্—আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম—এখানে থাকবি কোথায়। আর থেকেই বা কি করবি তুই? ডাক্তাররা রয়েছে—

সুধীর বাধা দিয়ে বলল—না না, তবু আমার থাকা উচিত।

শুধু সে রাতের জন্য নয়, পুরো একটা সপ্তাহ সুধীর রাতদিন হাসপাতালের গেটের কাছে বসে রইল। কি খেল, কখন ঘুমাল, কেউ জানল না। সাত দিনের দিন মারা গেল সুধা।

এই ঘটনার পর আমি অনেক চেষ্টা করেও সুধীরের মুখোমুখি হতে পারি নি। ওর সেই শোকবিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি আমাকে ভয়ানক পীড়িত করত। বুকের মধ্যে সবকিছু গোলমাল হয়ে যেত। নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতুম।

একদিন আপিস থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে আসছিলাম। হঠাৎ মুখো-মুখি ওর সঙ্গে দেখা। চমকে উঠলাম। ফ্যাকাসে মুখে হাসল সুধীর।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাচ্ছিস্?

সুধীর বলল—তোর কাছে।

অবাক হলাম। আমার কাছে তো এ উল্টো পথে কেন? কিন্তু সে কথা আর বললাম না।

সুধীর বলল—বড্ড গণ্ডগোল চারদিকে তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল দীর্ঘ দিন আগের সেই ঘটনা, কাঁচরাপাড়া থেকে সুধাকে কিভাবে নিয়ে আসা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিল সুধীর, অনর্গল কথা কইছিল, হাসছিল। পথে নেমে বলেছিল—বড্ড গণ্ডগোল চারদিকে চল, মনুমেণ্টের চূড়োয় উঠব, ওখানে বসে আলোচনা হবে—

কিন্তু আজ তেমনভাবে কথা বলল না, ব্যস্ততা দেখাল না। মন্থর পায়ে হেঁটে যেতে যেতে নতস্বরে বলল—চল অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে, মনুমেণ্টের নিচে একটু বসি।

# এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

১৯০৪ সাল—ক্রেগ লণ্ডনে একটি ছোট্ট স্টুডিয়োতে বাস করছিলেন। এ সময় তিনি কয়েকটি মাস্ক এবং মাইমো-ড্রামা রচনা করেছিলেন। অবশ্য তিনি জানতেন, এগুলোকে মঞ্চস্থ করবার কোনই আশা ছিল না। হঠাৎ একদিন লেসিং থিয়েটারের ডক্টর ব্রাম্-এর কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল জার্মানীতে গিয়ে অট্-ওয়ের 'ভিনিশ প্রিজার্ভডের' হফ্‌স্‌মান্স-থেলের ভার্সানটি প্রডিউস করবার জন্য। অগাস্ট মাসে তিনি বার্লিন রওনা হলেন। ভাইমারে প্রথম দেখা হল কাউণ্ট কেস্-লারের সঙ্গে। কেস্‌লার হফ্‌স্‌মান্স-থেলের নাটক 'দি হোয়াইট ফ্যানের' থেকে পাঁচটি চিত্রের উড-এনগ্রেভিং-এর কাজ দিলেন ক্রেগকে। ক্রেগের সঙ্গে কেস্-লারের দীর্ঘ সহযোগিতার শুরু হল এইভাবে। কেস্‌লার সম্পর্কে ক্রেগ পরে লিখেছিলেনঃ

He was a stranger, one who liked good books, good printing, and liked them new. To him, while old books of the 13th and 3rd century were good, books of the day were even better .... All the time he went unceasingly here and there, placing sums of money in one branch of art after another. Wood engraving—Painting—the Stage—Publishing—Printing—Type cutting—Paper making—Literature—Sculpture—Music—there was nothing in the Arts that he missed. He braced up all these things by the sole means in his power, not by little occasional bursts of anxious sympathy and dabbling in them himself, but by a trim personal attention given to seeing them braced up. For him I made, in 1905, these five wood blocks, four of which were published by the Insel Verlag in Leipzig in 1907.

১৯০৫ সালে ইওরোপে ক্রেগের প্রতিভার প্রতিষ্ঠা হতে আরম্ভ হয়েছিল। সারা জার্মানী এবং ভিয়েনায় তাঁর কাজের প্রদর্শনী করা হচ্ছিল।

ক্রেগ যখন 'ভিনিশ প্রিজার্ভডের' ডিজাইনগুলো করতে ব্যস্ত—এটি

প্রডিউস্‌ড্ হয়েছিল লেসিং থিয়েটারে—এলিয়নোরা ডুজে তাঁকে ইটালী থেকে লিখলেন তাঁর ইলেক্‌ট্রা প্রডাকসনের জন্য ডিজাইনগুলো করে দিতে। ক্রেগের নির্দেশে এই সব ডিজাইন তৈরি করলেন সিন-পেণ্টার ইম্‌পেকোভেন এবং বার্লিনের একজন কস্টিউমিয়ার। তারপর ডিজাইন-গুলো ডুজেকে ইটালীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই সব ডিজাইনের সহজ সরল ভাব এবং শান্ত সৌন্দর্য আজকের দিনেও শিল্পীদের বিস্মিত এবং মুগ্ধ করে দেয়। তবে ইলেকট্রার ডিজাইনগুলোকে ডুজে কাজে লাগান নি—বোধ হয় ম্যানেজমেণ্টের তরফ থেকে বাধা এসেছিল।

এর এক বছর বাদে ডুজের সঙ্গে ক্রেগের দেখা হয় এবং ডুজে ক্রেগকে আমন্ত্রণ জানান ইটালীতে এসে ফ্লোরেন্সের পারগোলা থিয়েটারে ইব্‌সেনের 'রজমার্স-হোম' নাটকের প্রডাকসন সুপারভাইজ করতে। ক্রেগ একটি দৃশ্য আঁকলেন বেগুনী নীল রঙের—তাতে দুটি ওপ্‌নিং ছিল—একটি দিয়ে পার্কের দৃশ্য এবং অপরটি দিয়ে একটা লম্বা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছিল। ক্রেগকৃত এই সেটিংটিরও সৌন্দর্য ছিল সহজ সরলতায় এবং সু-সমন্বয়ে। প্রথম রাতে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা স্যালভিনি। তিনি স্টলে বসেছিলেন। কার্টেন উঠল। স্যাল-ভিনি আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—'বেল্লা! বেল্লা!' অর্থাৎ বিউটিফুল!

এর পর যখন ডুজে নিসে আবার এই নাটকটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন, ক্রেগকৃত দৃশ্যটিকে ম্যানেজমেণ্ট নৃশংস-ভাবে কেটেকুটে ফেললেন—অর্থাৎ এখান থেকে, ওখান থেকে ফিট দুয়েক করে কেটে ফেলে দৃশ্যটিকে ছোট করে ফেলা হল—যাতে নিসের ছোট রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যটিকে ঠিকভাবে খাটানো যায়। এর ফলে ঐ দৃশ্যটির সমস্ত সমতা এবং সমন্বয়ের ভাব নষ্ট হয়ে গেল। ক্রেগ এ নিয়ে প্রতি-বাদ জানাতে ডুজে লিখে পাঠালেন—"ওরা আজ তোমার দৃশ্যটি নিয়ে যা করেছে, বছরের পর বছর আমার আর্টকেও সেই দুর্ভোগই সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এটা কি একটা জবাব?

ক্রেগের একটি ছোট পুস্তিকা—'দি আর্ট অভ্ দি থিয়েটার' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। এতেই প্রথম তাঁর আই-ডিয়াগুলো সুগঠিত আকারে পাওয়া যায়। এতে ডিরেক্টর এবং প্লে-গোয়ারের সংলাপের মাধ্যমে ক্রেগ তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। লণ্ডন টাইমস লিখেছিল, ক্রেগের প্রধান বক্তব্যগুলো অগ্রাহ্য করবার মত কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্রেগ বলে-ছেন, থিয়েটারে যদি তিনজন বা চারজনের ওপর একটি প্রদর্শনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা হলে no visual unity, no harmony of movement, lighting and colour with action, music and speech, to produce a supreme theatrical effect, is possible. His first plea had been for unity of production under one man and this was the practical actor speaking out of his own experience.

ক্রেগের 'আর্ট অভ্ দি থিয়েটারের' মূল বক্তব্যগুলো তুলে দিচ্ছি—

প্রশ্ন—আর্ট অভ্ দি থিয়েটার বলতে কি বোঝা যায়?

উত্তর—আর্ট অভ্ দি থিয়েটার বলতে অভিনয়, নাটক, দৃশ্যাদি বা নৃত্যকে বোঝায় না—এ সবের সংযোগের ফলেই নাট্যশিল্পের সৃষ্টি হয়।

এ্যাক্‌সন (অভিনয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে এই এ্যাক্‌সন), সংলাপ (নাটকের আঙ্গিক), রেখা এবং রং (যা দৃশ্যকে হৃদয়গ্রাহী করে) এবং নৃত্য—এর যে-কোন একটি, অন্য কোনটির থেকে বেশি কৌলীন্যের দাবি করতে পারে না। অবশ্য একদিক থেকে দেখতে গেলে এ্যাক্‌সনকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হয়। পেইণ্টিং-এর ক্ষেত্রে যেমন ড্রয়িং-এর প্রাধান্য, মিউজিকের বেলায় মেলোডির, তেমনি আর্ট অভ্ দি থিয়েটারের ক্ষেত্রে এ্যাক্‌সনের। আর্ট অভ দি থিয়েটারের সৃষ্টি হয়েছে এ্যাক্‌সন, মুভমেণ্ট এবং নৃত্যের সংমিশ্রণে।

ড্রামাটিক পোয়েম ও ড্রামা—এ দুয়ের মধ্যে কোন মিল নেই। প্রথমটি লেখা হয় পড়ে রস উপলব্ধি করবার জন্য। নাটক পড়বার জন্য লেখা হয় না। নাটকের সার্থকতা মঞ্চ-প্রয়োগে। মঞ্চে অভিনয় দেখেই নাটকের রস উপলব্ধি করা যায়।

*জেসচার (ভঙ্গি)—নাটকে অপরিহার্য। ড্রামাটিক পোয়েমের আবৃত্তির সময় একে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।*

[ Gesture is the language of the hands. It is speech in action. সাধারণ নিয়ম অনুসারে আবৃত্তির সময় জেসচারকে বাদ দেওয়া হয়। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে (আবৃত্তিকেও অভিনয়ের শ্রেণীতেই ফেলতে হয়) সব থেকে বড় কথা হল there are rules which follow no rules. নাট্যাচার্য শিশিরকুমার আবৃত্তি করবার সময় জেসচারের সাহায্য নিতেন এবং তাঁর মত মহান্ শিল্পীর ক্ষেত্রে ঐ জেসচার মোটেই অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করতো না। ]

নৃত্যশিল্পের থেকেই নাট্যশিল্পের জন্ম, কাব্য থেকে নয়।

গতি, সংলাপ, রেখা, বর্ণ এবং ছন্দের সংযোগেই নাট্যকার তাঁর নাট্যের সৃষ্টি করেন। এই পাঁচটি উপাদানের সুকৌশল প্রয়োগে তিনি আবেদন করেন আমাদের দর্শন এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে। প্রাক্তন নাট্যকারেরা ছিলেন মঞ্চেরই সন্তান। আধুনিক নাট্যকারদের সম্বন্ধে একথা খাটে না। প্রাক্তন নাট্যরচয়িতাদের কাছে যে সত্য ছিল জলের মত সহজ—আজকের নাট্যকার তাকে এখন পর্যন্ত বুঝতে শেখেন নি। প্রাক্তন নাট্যকার বেশ ভালভাবেই বুঝতেন যে, যখন তিনি বা তাঁর সহকর্মীরা এসে দর্শকদের সামনে দাঁড়াবেন, তারা সবচেয়ে বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠবে—তিনি বা তাঁরা কি বলেন তা শোনবার থেকেও, তিনি বা তাঁরা কি করেন তাই দেখবার জন্য। প্রাক্তন নাট্যকার বেশ ভালভাবেই জানতেন যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছেই আবেদন করা যায় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এবং কার্যকরীভাবে। মানুষের নানা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দেখবার ক্ষমতাটাই যে সবচেয়ে প্রখর, একথা বলাই বাহুল্য। মঞ্চে এসে দাঁড়ানোর সংগে সংগেই অভিনেতা দেখতে পান যে, সমবেত দর্শকের ক্ষুধিত এবং কৌতূহলভরা জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টি এসে পড়ছে তাঁর ওপর। তাঁকে এবার কথা বলাতে হবে—গদ্য কিম্বা পদ্য—কিন্তু সব সময়েই গতিযুক্তভাবে। কাব্য-গতিরই নাম নৃত্য, আর গদ্যপূর্ণ গতিকে বলা হয় ভংগি। প্রথম নাট্যকার ছিলেন নৃত্যশিল্পের সন্তান অর্থাৎ চাইল্ড অভ দি থিয়েটার। কবি তার জনক নন অর্থাৎ কাব্য থেকে নাটকের উদ্ভব নয়—নাটকের জন্ম নৃত্য থেকে।

আধুনিক নাট্যকারের স্রষ্টা হচ্ছেন চাইল্ড অভ দি পোয়েট। কিভাবে দর্শকদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি করা যায়, এই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। অথচ আজকের

হ্যামলেট ও ডেমন—১৯০৯

দিনের দর্শকও থিয়েটারে যায় প্রধানত দেখতে, শুনতে নয়। আধুনিক দর্শকও প্রধানত চান চোখের পরিতৃপ্তি। যদিও কবি বারবার আবেদন জানান যে, চোখের থেকে দর্শককে বেশি ব্যবহার করতে হবে তার কানকে।

কবি মঞ্চের অন্দরমহলের লোক নন, সে দাবি একমাত্র নাট্যকারের।

আজকাল নাটক এবং নাট্যকারও যেন বদলে গেছেন। নাটকের ভেতর আর সেই ব্যালান্স বা সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় না। গতি, বাক্য, ছন্দ এবং দৃশ্যাদিতে কতকগুলি নাটক দেখি বাক্‌সর্বস্ব, আর কতকগুলিতে দৃশ্যপটাদির আধিক্য। আগেকার মিরাকাল এবং মিস্ট্রি প্লেগুলোই ছিল মঞ্চাভিনয়ের জন্য আদর্শ নাটক। এগুলোর তুলনায় সেক্সপীয়ারের নাটকগুলো একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। হ্যামলেট ঠিক মঞ্চাভিনয়ের উপযোগী নাটক নয়।

সেক্সপীয়ারের নাটক পড়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, তাদের সংগঠনে এমন বিরাটত্ব এবং সম্পূর্ণতা রয়েছে যে, মঞ্চ প্রয়োগে সে সম্পূর্ণতার প্রতি কিছুতেই সুবিচার করা সম্ভব নয়। সেক্সপীয়ারের সময় তাঁর নাটক মঞ্চে অভিনীত হত বলেই এই সব নাটক মঞ্চোপযোগী এ একটা যুক্তিই নয়। দি মাস্কস্, দি প্যাজেন্টস—এগুলিই হচ্ছে হাল্কা এবং সুন্দর ধরনের মঞ্চোপযোগী নাটক।

নাটক যখন প্রধানত দেখবার জন্যই সৃষ্ট, তখন শুধু পড়ে তার রস উপলব্ধি করা সম্ভব নয়—কারণ সেটা তার একটা অসম্পূর্ণ রূপ।

একমাত্র মঞ্চাভিনয়ের ভিতর দিয়েই নাটক সম্পূর্ণতা লাভ করে।

হ্যামলেট পড়ে একথা কেউ বলবে না যে, নাটকটি একঘেয়ে বা অসম্পূর্ণ, পড়ে বেশ ভালভাবেই এর সম্পূর্ণ রস উপলব্ধি করা যায়। অথচ এ নাটকটির অভিনয় দেখে অনেকেই খুশি হতে পারেন না।

There are many who wil feel sorry after witnessing a performance of the play, saying, "No, that is not Shakespeare's Hamlet." When no further addition can be made so as to better a work of art it can be spoken of as 'finished'—it is complete.

হ্যাঁ, হ্যামলেট নাটকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেক্সপীয়ার তাঁর অননুকরণীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে যখন এর শেষ কথাটি যোগ করেন, তখন থেকেই নাটকটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং সার্থক। এর মধ্যে এমন কোন কিছুর অভাব নেই—যা আমরা অভিনয়ের সময় ভংগি, দৃশ্যাদি, সাজসজ্জা বা ছন্দের দ্বারা ভরে তুলতে পারি।

[ এ সংখ্যায় ক্রেগের কয়েকটি ডিজাইনের একটি প্রকাশ করা হলো—Designs used in the Two Cranch Press Editions of 'Hamlet' prepared by Count Kessler, Weimer

[ ক্রমশ

# সম্মানিত শিল্পী

১৯৭০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের বহু শিল্পীকে সম্মান জানান হয়েছে। নাট্যকার, অভিনেতা, সংগীতশিল্পী, ভাস্কর, চিত্র পরিচালক এই সম্মানিত তালিকায় রয়েছেন, যাঁদের পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীরা এই সম্মানিতদের মধ্যে আছেন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চারজন শিল্পী আছেন। এই চারজনের মধ্যে পদ্মভূষণ সম্মান পেয়েছেন নাট্যপরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীশম্ভু মিত্র, শান্তিনিকেতনের ভাস্কর শ্রীরামকিঙ্কর বেজ। পদ্মশ্রী পেয়েছেন সংগীতশিল্পী শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক এবং চিত্র পরিচালক শ্রীঋত্বিক ঘটক।

অন্যান্য রাজ্যের বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে আছেন পদ্মভূষণ : সংগীত শিল্পী শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর (পুণা), নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী কমলা (মাদ্রাজ), তবলিয়া শ্রী এ, জি, থিরাকাওয়া (লখনৌ); পদ্মশ্রী পেয়েছেন—সেতারী শ্রীআবদুল হালিম জাফর খান, সংগীতজ্ঞ শ্রীরামচতুর মল্লিক (দ্বারভাঙ্গা), নৃত্যগুরু অমুবি সিং (মণিপুর), বাঁশীবাদক শ্রী টি, আর, মহালিঙ্গম, নৃত্যশিল্পী শ্রীবেদান্তম সত্যনারায়ণ শর্মা, চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীরাজেন্দ্রকুমার, নৃত্যশিল্পী দময়ন্তী যোশী, চলচ্চিত্র পরিচালক এজরা সীর। এই শিল্পীরা সকলেই সুপরিচিত, শিল্পের ক্ষেত্রে এ'দের সাধনা এবং কৃতিত্ব স্বীকৃত। সুতরাং এই সম্মান দানে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের সম্মানিতদের মধ্যে একটি নাম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই নাম শ্রীঋত্বিক ঘটক। নামটি প্রকাশের সংগে সংগে এক মহলে বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে, কারণ তাঁরা আশা করেন নি যে, শ্রীঘটককে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেবে, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও বক্তব্যের সংগে যাঁরা পরিচিত। আর এক মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং এই মানসিকতাকে তাঁরা ঢেকে রাখেন নি, বিবৃতি দিয়ে প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে উপস্থিত হয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন এক বিবৃতিতে বলেছেন শ্রীঋত্বিক ঘটককে পদ্মশ্রী দেওয়া ঠিক হয় নি, কারণ তিনি গান্ধীজীর বিরোধী। এই বিবৃতির মধ্যে একটি মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে, যে মানসিকতা গত বাইশ বছর বাঙালী জাতির উপর চেপে বসেছিল। যখন মানুষের গুণের স্বীকৃতি অপেক্ষা মতামতটাকে বড় করে দেখা হয়েছে এবং মতামতের জন্য অনেক গুণীর গুণ অস্বীকৃত হয়েছে। নিজেদের মতের সংগে না মিললে তিনি আর গুণী নন এবং রাষ্ট্রের সম্মান পাবারও অধিকারী নন। এ'দের এই মানসিকতার দরুন রাষ্ট্রীয় সম্মান সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এক বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। তাই রাষ্ট্রের সম্মান পেলেও তাঁদের অনেকে জনগণের সম্মান পান নি। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে বরফ গলতে শুরু করেছে। এই গতি যতই ধীর হোক কিছুটা যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তা শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রীঋত্বিক ঘটকের পদ্মশ্রী লাভে দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনটা সেন মশায়দের অসহ্য মনে হয়েছে বলে তাঁরা অন্ধকারে আর্তনাদ করছেন।

কিন্তু কথাটা অনুগ্রহের নয়। রাষ্ট্র কাউকে অনুগ্রহ করছে না। এই শিল্পীরা সকলেই নিজেদের প্রতিভায় জনস্বীকৃত। জনগণই তাঁদের শিল্পীর স্বীকৃতি ও সম্মান দিয়েছেন। রাষ্ট্রের কাজ হল জনগণের স্বীকৃতিকে মেনে নেওয়া। রাষ্ট্র যদি নিরপেক্ষভাবে একাজ করতে না পারে তা হলে রাষ্ট্রের সম্মানও জনগণের স্বীকৃতি লাভ করে না। জনগণের স্বীকৃতি না পেলে কোন সম্মানেরই অর্থ থাকে না। জনগণের স্বীকৃতিই সর্বোচ্চ সম্মান। রাষ্ট্র এই জনস্বীকৃতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রীয় সম্মানের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করছে মাত্র। যদি যথার্থ নিরপেক্ষভাবে এবং মতামতনির্বিশেষে গুণী সম্মান না হতে পারে তবে ব্যক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রের সম্মান অধিকতর। এতে রাষ্ট্রীয় সম্মানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এবারের সম্মান তালিকায় যদি সত্যিই কোন পরিবর্তনের সূচনা হয়ে থাকে এবং কেন্দ্রীয় শাসকরা যদি পুরাতন নীতির পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভব করে থাকেন তবে তাতে শাসকবর্গের লাভই বেশী হবে। কারণ গত বাইশ বছরে রাষ্ট্রের শাসকদের সংগে জনগণের তফাৎ বেশ কিছুটা বেশী হয়েছে। এই তফাৎ যত শীঘ্র দূর করা যায় ততই ভাল।

ভারতের এই গুণী শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় সম্মান আনন্দের কথা: আমরা প্রত্যেক সম্মানিত শিল্পীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। —সুজন।

'বেটি' ছবির প্রধান চরিত্রে নন্দা
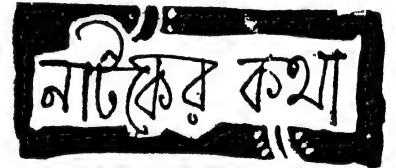
## সন্ধ্যানীড়-এর ব্রেশট্‌-সন্ধ্যা

নাট্য সংস্থা 'সন্ধ্যানীড়'-এর উদ্যোগে গত ২৪শে জানুয়ারী শ্রীশিক্ষায়তন হলে এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে "ব্রেশট ইভনিং" নামের এই সন্ধ্যাটি পরম আনন্দময় মনে হয়েছে। বার্টল ব্রেশট্‌ নামটি বর্তমানে কলকাতার নাটকের দর্শক মহলে সুপরিচিত। ব্রেশট্‌-এর গোটা ছয়-সাত নাটক কলকাতার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ব্রেশট সম্পর্কিত আলোচনাও সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ব্রেশট্‌-এর গানের সংগে পরিচয় ঘটে নি। এ ব্যাপারে সন্ধ্যানীড়-এর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ইতোপূর্বে এই সংস্থা এরূপ একটি সন্ধ্যার আয়োজন করে-

ছিলেন। কিন্তু এদিনের সন্ধ্যাটি ছিল আরো উপভোগ্য, আরো ভাবময় এবং তত্ত্বপূর্ণ। শ্রোতাদের কাছে এই সন্ধ্যাটির বুদ্ধিদীপ্ত আবেদন ছিল।

সন্ধ্যাটিতে পরিবেশিত হয়েছে ব্রেশট্-এর গান—যে গানগুলিতে বার্টল ব্রেশট্-এর জীবন ও আদর্শ উদ্ভাসিত হয়েছে। ব্রেশট্-এর কবিতা ও ছন্দোময় গদ্য। ব্রেশট্-এর পাশে রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করে মাঝে মাঝে সাম্যবাদী ব্রেশট্-এর সঙ্গে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের ভাবসংগতি দেখান হয়েছে এবং শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'যেথায় থাকে সবার অধম......সেইখানেতে চরণ তোমার রাজে' গান গেয়ে।

ব্রেশট্-সন্ধ্যা'র গ্র ন্থ না-কৃ তি ত্ব শ্রীঅশোক সেনের। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ব্রেশট্ সম্পর্কে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীসেন সর্বাগ্রগণ্য। তিনি যথার্থভাবে এই গ্রন্থনায় ব্রেশট্‌কে প্রকাশ করতে পেরেছেন। ব্রেশট্ নিজে বড়-লোকের ঘরের সন্তান হয়েও আভিজাত্যের সমস্ত মোহ ছিন্ন করে সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন এবং পৃথিবী থেকে শ্রেণী-শোষণ, অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান ঘটিয়ে মানবসমাজকে সত্যিকার সভ্যতার পথে এগিয়ে দেবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এই ভাবমূর্তি শ্রীঅশোক সেন সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। এই সঙ্গে শ্রীসেন যে রবীন্দ্র-নাথকে উল্লেখ করেছেন, তাও তাৎপর্য-পূর্ণ।

সন্ধ্যানীড়-এর 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকে সুখময় সেন ও দিলীপ দে

শ্রীঅশোক সেনের এই গ্রন্থনাকে কণ্ঠে যাঁরা ব্যক্ত করেছেন ভাবব্যঞ্জনাময় স্বর, সুর ও ছন্দে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনতা রায়। শ্রীমতী রায়ের সুললিত আবৃত্তিতে ব্রেশট্-এর বাণী শ্রোতাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। সংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী নয়নিকা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী ছন্দনা রায়, শ্রীদীপঙ্কর দাশগুপ্ত ও শ্রীপ্রভাতভূষণ। ব্রেশট্-এর গানগুলির অনুবাদ-কৃতিত্ব কবি দুর্গাদাস সরকারের। অনুবাদ প্রাঞ্জল ও ব্রেশট্ কাব্য-মেজাজের সঙ্গে সার্থক। কিন্তু প্রভাতভূষণের সংযোজিত সুর সে অনুপাতে তেজোদ্দীপ্ত হলে ভাল ছিল। প্রারম্ভে একজন জার্মান যুবক গীটার সহযোগে ব্রেশট্-এর কয়েকটি গান গেয়ে শোনান। তাঁর গানগুলি শ্রোতাদের উদ্দীপ্ত করে। পশ্চিম জার্মানী থেকে আগত হলেও তিনি ব্রেশট্ সংগীতে অনুরাগী।

নির্মল মিত্র পরিচালিত 'প্রথম বসন্ত' ছবিতে লিলি চক্রবর্তী ও অনুপকুমার

এই 'ব্রেশট্‌-সন্ধ্যা'র সভাপতিত্ব করেন জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রতিনিধি মিঃ এ, রেভার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁরা এই অনুষ্ঠানের জন্য সন্ধ্যানীড় এবং শ্রীঅশোক সেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই মনোরম ব্রেশট্‌-সন্ধ্যার পরে বিপরীতধর্মী নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটের নাটক 'ওয়েটিং ফর গোডো' অভিনীত হয়। চরিত্র রূপায়ণে অভিনেতারা সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

আধুনিক গানের শিল্পী দিলীপ চক্রবর্তী কাকদ্বীপ কলেজে অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

## সুদূর মফস্বলে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ

নাট্য আন্দোলনের ঢেউ শুধু এই শহর কলকাতার কয়েকটি নাট্যসংস্থার ভেতরেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, গ্রামবাংলার সুদূর মফস্বলেও গিয়ে যে পৌঁছেচে তার জোয়ার, তার প্রমাণ বালুরঘাট শহরে 'মুক্তাংগন' প্রতিষ্ঠা। কলকাতা শহর থেকে শত শত মাইল দূরে এক মফস্বল শহরেও মুক্তাংগন প্রতিষ্ঠার শুভ সংবাদ শোনা গেল। বালুরঘাটের প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'ত্রিতীর্থ'ই দুঃসাহস দেখিয়েছে এই 'মুক্তাংগন' মঞ্চ স্থাপনের। জমি দান করেছেন উদারচেতা সংস্কৃতিবান পরলোকগত গোবিন্দলাল ঘোষের বৃদ্ধা মাতা। সম্প্রতি শীতের এক দুপুরে এই অশীতিপর বৃদ্ধাই এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই 'মুক্তাংগন' মঞ্চের দ্বার উন্মোচন করেন। বালুরঘাটের এককালের খ্যাতনামা অভিনেতা নৃপেন ভট্টাচার্য মঞ্চের যবনিকা সরিয়ে দিতেই প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অভিনেতা নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ত্রিতীর্থের' এই নাট্যপ্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

প্রত্যেক আঘাতেরই যে প্রতিঘাত আছে, মহাজ্ঞানী নিউটনেরই সেই উক্তির অমোঘ সত্যতা এবং অত্যাচার ও অবিচার থেকেই শক্তির জাগরণ হয়, এই কথা বলে বালুরঘাটের বহু সুপ্রাচীনকালের স্থায়ী মঞ্চের কর্তৃপক্ষদের অসহযোগিতার কথা উপস্থিত অগণিত নাট্যামোদী দর্শকদের কাছে ব্যক্ত করেন অধ্যাপক নির্মলেন্দু তালুকদার। পরিশেষে তিনি আরও বলেন, স্থায়ী মঞ্চ সহজলভ্য হলে হয়তো এই 'মুক্তাংগন' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হতো না। এই মুক্তাংগনের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ত্রিতীর্থের সভ্যরা 'পুতুল খেলা' এবং অজিত দে'র 'বৃষ্টি বৃষ্টি' মঞ্চস্থ করেন। পুতুল খেলা নাটকে বীথি সরকার বুলুর ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। তা ছাড়া তপনের ভূমিকায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য চরিত্রে অমিতাভ সেনগুপ্ত, প্রভাস সমাজদার, নির্মলেন্দু তালুকদার, পুষ্প সমাজদার, ছানা গুহ, কুমারী মৌমিতা সমাজদার ও ইন্দ্রনীল সরকার সার্থক রূপদান করেছেন। মঞ্চ পরিকল্পনা, আলোকসম্পাত, আবহ সঙ্গীত এবং নাটকের অন্যান্য খুঁটিনাটির প্রতি পরিচালকের সদাসতর্ক দৃষ্টির আভাস আছে। পুতুল খেলার মত একটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিল নাটক সার্থক হয়ে উঠেছে প্রতিটি সভ্যের আন্তরিকতার জন্যেই! প্রখ্যাত নাট্যকার শম্ভু মিত্র এই নাট্যসংস্থার শুভ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

'বৃষ্টি বৃষ্টি' নাটকে সর্বশ্রী ছানা গুহ, অমিতাভ সেনগুপ্ত, বিমলেন্দু

(১) বালুরঘাটে মুক্তাংগন মঞ্চ উন্মোচন করা হচ্ছে (২) 'পুতুল খেলা' নাটকের শিল্পিবৃন্দ

তালুকদার, সুধার দে, রতন ঘোষ, কুমারী রীতা দাশগুপ্ত, মীনা মুখার্জী, ধীরেন ঘোষ, ভোলা মুখার্জী, ... সাহা এবং বাদ্যকরের ভূমিকায় কানাই দত্ত অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

## প্রজাপতি

গত ২২শে ডিসেম্বর আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের প্রযোজনায় পুনর্মিলন অনুষ্ঠান মঞ্চে শক্তিপদ রাজগুরু রচিত 'প্রজাপতি' নাটক অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেছেন দীনেন রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ধীরেন দত্ত, দর্পেশ চক্রবর্তী, প্রাণশঙ্কর গোস্বামী, শম্ভু বসু, সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, গোপাল পাত্র, বেবী মুখার্জী, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, দীনেন রায়। মঞ্চ ও আলোকসম্পাতে ছিলেন অলোক দত্ত ও অশোক দে।

## সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পে লেনিনের ভাবমূর্তি রূপায়ণ

সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পে লেনিনের ভাবমূর্তি রূপায়ণের কাজ আজও চলেছে। চলচ্চিত্রে লেনিনের মহান ঐতিহাসিক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের পুনঃসৃষ্টির জন্য সোভিয়েত চিত্র-পরিচালকরা কাজ করে চলেছেন।

লেনিনের জীবনের তথ্যমূলক দৃশ্যাবলী সহ তোলা "চিরজীবী লেনিন" ছবিটির এক নতুন সংস্করণ সম্প্রতি মস্কোতে দেখানো হয়েছে: লেনিনের জীবদ্দশায় সোভিয়েতে ৩৮টি ফিল্ম তোলা হয়, তার মধ্যে ২০টির সন্ধান এখন পাওয়া গেছে। এইসব উপাদানের সুযোগে পরিচালক মিখাইল রম ও মারিয়া স্লাভিনস্কাইয়া এই নতুন সংস্করণটি তুলছেন। ছবিতে ১৯২১ সালের নভেম্বরে ক্রেমলিনে লেনিনের জীবনের দৃশ্যাবলী রয়েছে।

১৯২৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিক উপলক্ষে আইজেনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত "অক্টোবর" ছবিটি তোলেন। এই ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন একজন সাধারণ শ্রমিক নিকানদ্রোভ। তাঁর সংগে লেনিনের চেহারার খুব মিল ছিল।

এর পরে সোভিয়েত চলচ্চিত্রে লেনিনের ভূমিকায় খ্যাতি অর্জন করেন বিখ্যাত অভিনেতা শ্চুকিন ও স্ত্রাউখ। সোভিয়েত দেশ ও বিদেশে লেনিনের জীবনের ঘটনা নিয়ে তোলা ছবি "৬ জুলাই" দেখান হয়েছে। ছবিটি তুলেছেন পরিচালক ইউলি কারাসিক।

শক্তি চ্যাটার্জী পরিচালিত 'উত্তরণ' ছবিতে পার্থ মুখার্জী ও সুচেতা ব্যানার্জী

বর্তমানে মসফিল্ম স্টুডিওতে পরিচালক ভিক্তর আজারোভ তুলছেন "আগামী কালের দিকে একটি ট্রেন" ছবিটি। এর বিষয়বস্তু হল ১৯১৮ সালের মার্চ মাসের একটি দিন, লেনিন ও সোভিয়েত সরকারের নেতৃবৃন্দ যখন পেত্রোগ্রাদ থেকে মস্কোয় রাজধানী স্থানান্তরিত করে নিয়ে যান। রুশ ফেডারেশনের জনগণের শিল্পী নিকোলাই জাসুখিন এই ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

লেনিনের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যমূলক ফিল্ম উদ্ধারের আরও কাজ ইতিমধ্যে চলেছে।

**লিপজিগ উৎসবে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন**

সম্প্রতি লিপজিগে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সোভিয়েত চলচ্চিত্র বিরাট সাফল্যলাভ করেছে। এ খবর দিয়েছে এ· পি· এন। লিপজিগ উৎসবে তথ্যমূলক ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির প্রতিযোগিতা হয়।

উৎসবে কয়েকটি সোভিয়েত চলচ্চিত্র অনেকগুলি পুরস্কার জয় করে। সোভিয়েত চলচ্চিত্র-পরিচালক রোমান কারমেন আন্তর্জাতিক বিচারক-মণ্ডলী প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হন। রোমান কারমেন ইতিপূর্বে লেনিন পুরস্কার ও জার্মান গণ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে বিভূষিত হয়েছিলেন।

উৎসবের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার "গোল্ডেন ডোভ" তিনটি সোভিয়েত ছবি অর্জন করে। এগুলি হল: "দি ট্রেন টু দি রেভোলিউশন", "হোয়াই ইজ স্নো হোয়াইট" ও "এ্যানিমেল ল্যাংগুয়েজ"।

**লেনিন শতবর্ষ স্মরণে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা**

পশ্চিমবঙ্গ লেনিন শতবার্ষিকী যুব-উৎসব উপলক্ষে সংগীত, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, সাহিত্য, আলোক-চিত্র প্রভৃতির এক বিরাট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। নাম দিবার শেষ তারিখ ২০শে ফেব্রুয়ারী। আবেদনপত্র ও নিয়মাবলী সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি, ১০৭, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪ ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

**সমাপ্তপথে**

সুজাতা মুভিজের পৌরাণিক বাংলা ছবি "দক্ষযজ্ঞে"র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। রমেশ নাইডু ছবিখানির প্রযোজনা করেছেন ও সুর দিয়েছেন। যুগল মিত্র ছবিটির পরিচালক। গান লিখেছেন: শ্যামল গুপ্ত। সংলাপ: অরূপ রায়। নেপথ্য কণ্ঠে: আশা ভোঁসলে, নির্মলা মিশ্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রদীপ দাশগুপ্ত ও গীতা মুখার্জী। ধর্মপ্রাণ হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য দর্শনীয় সতীর বাহান্ন পীঠস্থানের দৃশ্যাবলী এতে চিত্রায়িত হয়েছে। এ ছাড়া দেবীর দশমহাবিদ্যার দৃশ্যাবলীর রঙীন ছবিখানি তুলতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছে। বালাজী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

সদন। ৬, এন্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মজহারুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত। পরিবেশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: দশ টাকা।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল কৃষক আন্দোলনের সংগে দীর্ঘকাল ধরে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছেন, সুতরাং তিনি বাংলার কৃষকসভার যে ইতিহাস লিখেছেন তা অভিজ্ঞতামূলক বাস্তব ইতিহাস বলা যায়।

ভারত তথা বাংলার সত্য ইতিহাস আজো রচিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন না। কারণ, প্রথমত সেখানে গণমানুষের সুখ-দুঃখ ও আন্দোলনের ইতিহাস অনুপস্থিত, দ্বিতীয়ত যাঁরা ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির লোভে পুঁথিপত্রের ওপর নির্ভর করেন, অন্যরা শুধুমাত্র সমকালীন সরকারের মুখরক্ষা করেন।

অবশ্য ঐ জাতীয় ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্য অনেক বেশি ঐতিহাসিক তথ্যের পক্ষে নির্ভরশীল। যেমন, নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্য ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক সেকালের নকল ইতিহাসের মুখোস খুলে ফেলেছিল। যাহোক কিছুদিন আগেই রসুল সাহেবের 'আবাদ' উপন্যাসটি পড়ে ও অভিনবত্ব লক্ষ্য করে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ ঐ উপন্যাসে কৃষকদের সংগ্রাম-কাহিনীই উপজীব্য। আমরা আশা করেছিলাম, রসুল সাহেব কৃষকসভার ইতিহাস রচনা করে তার আন্দোলন ও সংগঠনের তথ্যমূলক ইতিহাস তুলে ধরে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সন্ধি ঘটাবেন। তিনি তা করেছেন, সেজন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়ে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য, কিন্তু লেখক কোনো রাজনৈতিক পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পক্ষপাতমূলক ইতিহাস রচনা করেন নি।

কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলনের কথাই গ্রন্থটিতে প্রধানভাবে স্থান পেয়েছে। গত ৩৪ বছরের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের জীবনমরণ সমস্যা, বঞ্চনার মধ্যে অগ্রগতির কাহিনী পুংখানুপুংখরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলনের ধরণ ও চরিত্রও সুস্পষ্টভাবে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। কৃষক ও খেতমজুরদের রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের সংগে শাসকগোষ্ঠী সম্বন্ধে তাদের ধারণা, সাম্প্রদায়িকতা, সামন্তবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের কাহিনী লেখক যেভাবে বিবৃত করেছেন

তার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়, গ্রন্থটিকে পূর্ণাংগ রূপ দেবার জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, উপকরণ সংগ্রহে লেখকের প্রচন্ড রকমের প্রচেষ্টা। আন্দোলনের সংগে জড়িত থাকলেই, সব সময়, দলিলপত্র, পান্ডুলিপি, প্রচারপত্র প্রভৃতি রক্ষার জন্য অংশগ্রহণকারীরা মনোযোগী হন না। লেখক বহু উৎপাত সহ্য করেও সে সব রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছেন। তবু লেখক অভাব অনুভব করেছেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত এই কয়েক বছরের বেশ কিছু প্রামাণ্য কাগজপত্রের (বড়া অধিবেশনে সভাপতি পরিষদের থিসিস ও গঠনতন্ত্র সহ)। ঐগুলি কারো কাছে থাকলে লেখকের কাছে পাঠাবার জন্য আমরাও অনুরোধ করছি। তাহলে গ্রন্থটি ঐ প্রসংগে উদ্ধৃতিমূলক ও আরো তথ্যভিত্তিক হবে বলে আমাদের ধারণা।

বলা বাহুল্য, এই মূল্যবান গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিচয় স্বল্পপরিসর স্থানে দেওয়া অসম্ভব। তবু বলা দরকার, বাংলার কৃষকসভার ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে রসুল সাহেব প্রথমেই আন্দোলনের ঐতিহ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে আছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ওয়াহাবী কৃষক বিদ্রোহ, ফারায়েজী কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলচাষীদের বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্যের ও মোপলার কৃষক অভ্যুত্থান প্রভৃতি। 'সংগঠনের সূচনা' অধ্যায়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক। এরপর আছে কৃষক সভার লক্ষ্য, সম্মেলনগুলির কর্মতৎপরতা, কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে তাদের প্রভাব, কৃষিবিপ্লবের জন্য বছরের পর বছর সংগ্রাম ও শৌর্যবীর্যের অপূর্ব কাহিনী। অবশ্য পাশাপাশি দলিল সহ পেশ করা হয়েছে স্যোসালিস্ট কর্মীদের বিচ্ছিন্নতা ও আভিজাত্যের মোহের ঘটনা, জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থরক্ষার কথা, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির কারণ, বঙ্গভংগের ফলে বিশৃংখলা সৃষ্টির আশঙ্কার কথা। এমন কি, গ্রন্থটিতে গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কৃষক শ্রেণীর ভূমিকার ইতিহাসও নিপুণভাবে বিশ্লেষিত। পরিশিষ্ট অংশে কৃষক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম, সম্মেলনের স্থান ও তারিখও উল্লেখিত। এই ধরণের গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত নতুন ইতিহাস লিখিত হোল একথা অনায়াসে বলা যায়। খালেদ চৌধুরী অংকিত প্রচ্ছদচিত্রটিও অতুলনীয়।

**Works of V. I. Lenin and Works on V. I. Lenin Published in India (A selected bibliography 1870–1970). Information Branch of the USSR Consulate General in Calcutta, 1/1, Wood Street, Calcutta-16. (November, 1969).**

ইংরাজীতে সংকলিত আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জীর প্রারম্ভে লেনিনের জীবনের ঘটনাপঞ্জী স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থপঞ্জীতে রয়েছে (১) ভারতে প্রকাশিত লেনিনের রচনার ইংরাজী অনুবাদ, (২) অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী, কানাড়া, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু ও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত লেনিনের রচনা, (৩) এ ছাড়া ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত লেনিন সম্বন্ধীয় রচনা এবং (৪) বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেনিন সম্পর্কিত রচনা। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লেনিনের রচনা বা লেনিন সম্পর্কিত রচনা ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়েছে সর্বাধিক।

# কোথায় চলেছি

আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসরে ভারত পিছিয়ে পড়ছে। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট কিম্বা টেনিস থেকে আরম্ভ করে সব বিষয়েই আমরা দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি। ফলে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সংগে পাল্লা দিতে গিয়ে আমাদের দুর্বলতা, আমাদের অসহায়তাই সবচেয়ে বেশীভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। অথচ সেই দুর্বলতা, সেই অসহায়তা দূর করার জন্যে এতোটুকুও চেষ্টা নেই কারো। আমাদের খেলোয়াড়রা, আমাদের কর্মকর্তারা সবার আগে নজর দেন নিজের সুখ-সুবিধের দিকে, কি পাবেন না-পাবেন সেই হিসেব মেলাতেই ব্যস্ত তাঁরা, কর্মকর্তারাও ঐ একই ব্যাপারে বড় বেশী কর্মকুশল। তাঁরা কর্মকর্তা সেজে দেশ-বিদেশে বেড়াতে যান, স্ফূর্তি করেন আর বাড়ী ফেরার সময় নিয়ে আসেন গাদা গাদা জিনিষপত্র। কেন ভারত ভালো খেলতে পারলো না, অন্য দেশের খেলোয়াড়দের সংগে আমাদের দেশের খেলোয়াড়-দের তফাৎ কোথায়, খেলোয়াড়রা কেন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের দুর্বলতা কোথায়—এই সব অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো হয় তাঁরা দেখেন না, না হয় তো বোঝেন না, তাই রিপোর্টও দিতে পারেন না ঠিক মতো (আদৌ দেন কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে)। তারপর যখন এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা, পর্য্যালোচনা এবং সমালোচনা শুরু হয় তখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে শুরু করেন। বেশী দূরে যাবার দরকার নেই, মাত্র কিছুদিন আগেই এই রকম একটা ঘটনা শুরু হয়েছিল—যার রেশ এখনো পত্র-পত্রিকার পাতায় বিদ্যমান। আজ তাই আমাদের শুধু একটা প্রশ্ন করারই আছে—এইভাবে কি আমাদের খেলাধুলার মান উন্নত হবে? তাই যদি কর্তৃপক্ষের ধারণা না হয়, তাহলে তাঁরা এদিকে নজর দেন না কেন? হকি খেলায় পিছোতে পিছোতে ভারত আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছে, যেখান থেকে অলিম্পিকের সোনার মেডেল ফিরে পাওয়া শুধু মুশকিলই নয়, রীতিমত কষ্টকর। টেনিসে কৃষ্ণাণ-জয়দীপের খেলা পড়ার সংগে সংগে বিশ্ব টেনিসের আসর থেকে ভারত অনেকটা পিছিয়ে এসেছে। ফুটবলের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারত কোনদিনই বিশেষ কিছু করতে পারে নি। ক্রিকেটে ভারত আজো 'একটু সাফল্য আর বেশীর ভাগ ব্যর্থতার' রাজত্বে বাস করছে। তা হলে আমাদের অবস্থাটা কি? আমরা চলেছি কোথায়? আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে পাল্লা দিতে গিয়ে আমরা কি কেবল দিনের পর দিন পিছিয়েই পড়বো? এ বিষয়ে আমাদের খেলোয়াড়দের এবং ক্রীড়া-কর্তৃপক্ষদের কি কোন দায়িত্ব নেই? যদি থাকে, তা হলে সে দায়িত্ব আমরা পালন করছি না কেন? —[illegible]

# ক্রিকেটের খবর

ভারতে সফররত সিংহল স্কুল দল বনাম ভারতীয় স্কুল দলের চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট খেলা ইডেন উদ্যানে অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। পাঁচটি টেস্ট সিরিজের এই খেলায় মোট চারটি টেস্ট হয়েছে। এতে সিংহল স্কুল দল এ পর্যন্ত ১—০ ম্যাচে এগিয়ে আছে। বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রথম এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় সিংহল স্কুল ভারতীয় স্কুলকে ১ ইনিংস ও ৯১ রানে পরাজিত করে। এখন আর মাত্র একটি টেস্ট বাকী। ৩০শে জানুয়ারী হতে মাদ্রাজে পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলা শুরু হয়েছে। আর ৩রা ফেব্রুয়ারী সিংহল স্কুল দল স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবে।

সদ্য-সমাপ্ত চতুর্থ টেস্ট খেলাটি দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। এখানে তাই বিশেষ করে এই টেস্টের কথাই বলবো। এ খেলাতে সিংহল স্কুল দলের ছেলেরা সব বিষয়েই বেশ প্রাধান্য দেখিয়েছে। ভারতীয় স্কুল দল ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং, এই তিনটি বিষয়ের একটিতেও তাদের সমকক্ষ হতে পারে নি। ভবিষ্যতে সিংহল স্কুল দল যে সিংহল দলের ক্রীড়ামান উন্নত করে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে তা আমি হলপ করে বলতে পারি।

এই টেস্ট প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই সিংহল স্কুল দলের অধিনায়ক এম· উইটিমুনির কথা বলতে হয়। তাঁর ব্যাটিং ও বোলিং এক-কথায় অদ্ভুত। তিনি অফ স্পিন বল করে ৬২ রানের বিনিময়ে ভারতীয় দলের ৩টি উইকেট পান। অপর পক্ষে ব্যাটিং করে ২৪১ মিনিট উইকেটে অবস্থান করে ১২টি বাউণ্ডারীর সাহায্যে ১০২ রান করেন। এই সিরিজের এটাই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী।

ভারতীয় স্কুল দলের অধিনায়ক রবি ব্যানার্জীর কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। তিনি মিডিয়াম পেস সুইং বল করে ১১০ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট পান ও ব্যাটিং করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪ রান করেন। এর মধ্যে ছিল ৮টি চিত্তাকর্ষক বাউণ্ডারী।

দিল্লী স্কুলের ছাত্র এস· এস· সুদ সর্বাপেক্ষা বেশি রান করলেও তাঁর খেলায় তেমন জৌলুস দেখা যায় নি। কিন্তু হায়দ্রাবাদের মহম্মদ আলী ইকবাল ও দিল্লীর হংসরাজের খেলায় ক্রিকেটের সহজাত নিপুণতা দেখা যায়। আশা করা যায়, তাঁরা একদিন ভারতীয় টেস্ট দলে স্থান পাবেন। তাঁদের নয়নাভিরাম খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

কিন্তু একটি কথা না লিখলে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হচ্ছে, ভারতীয় দলের সেই আদি অকৃত্রিম ফিল্ডিং ব্যর্থতা। দাদারা অর্থাৎ ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা যেমন ইডেন উদ্যানে অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং-এ ব্যর্থতা প্রকাশ করেছিলেন, ভাইয়েরাও তাই করেছেন। কিন্তু ক্রিকেট খেলতে গেলে সব-চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় ফিল্ডিং। ফিল্ডিং যদি ভালো না হয়, তবে ভারতীয় ক্রিকেটের মান কোনদিনই বিশ্ব-পর্যায়ে পৌঁছবে না। অতএব এখন হতেই এটার পরিবর্তন আশু প্রয়োজন।

**সংক্ষিপ্ত রান-সংখ্যা**

**ভারতীয় স্কুল—১ম ইনিংস—১৮১** (অনিল মাথুর ৪১। এ· জয়াভীরা ২০ রানে ৪ উইঃ)

**সিংহল স্কুল—১ম ইনিংস—৯ উইঃ ২৯৬ ডিঃ** (এম· উইটিমুনি ১০২। আর· ব্যানার্জী ১১০ রানে ৪ উইঃ ও অনিল মাথুর ৬২ রানে ৪ উইঃ)

**ভারতীয় স্কুল—২য় ইনিংস—৮ উইঃ ২৭৭** (এস· এস· সুদ ৭৪; আর· ব্যানার্জী ৪৪। এ· জয়াভীরা ৭৬ রানে ৪ উইঃ)

**খেলা অমীমাংসিত।**

—সন্তোষকুমার শীল

# গল্প হলেও সত্যি

১৯৪৪ সালের লীগের খেলা তখন প্রায় শেষের দিকে। মহামেডান ক্লাব তখন এক পয়েন্টে মোহনবাগানের চেয়ে এগিয়ে আছে। মোহনবাগান-মহামেডানের ফিরতি খেলা। লীগ চ্যাম্পিয়ান হতে হলে মোহনবাগানকে এই খেলায় জয়ী হতেই হবে। খেলা প্রায় শেষ হতে চলল, তবু কোন দল গোল দিতে পারল না। মহামেডানের দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা। খেলা শেষ হতে তখন আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। হঠাৎ মহামেডানের একজন খেলোয়াড় "হ্যাণ্ডবল" করলে। হ্যাণ্ডবল হল গোল থেকে ঠিক ৩৫ গজ দূরে। রেফারী বল বসিয়ে দিলেন। মারতে এগিয়ে এলেন সুদর্শন এক যুবক। বিপক্ষ দলের নামী খেলোয়াড়রা গোল ও বিপক্ষ দলের ফরোয়ার্ডদের ঘিরে দাঁড়ালেন। রেফারী বাঁশী বাজালেন। যুবক দৌড়ে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে মারলেন বল। বলটি চকিতে গোলে প্রবেশ করে জালে আটকে গেলো। অভিজ্ঞ গোলকীপার "ইসমাইল" তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। জানেন এই যুবকটি কে?

পরে যিনি ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় হিসেবে অভাবনীয় সুনাম অর্জন করেছিলেন, সেই "মান্না", পুরো নাম শৈলেন মান্না।

—দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়
২২/এফ রেল কোয়ার্টার
শ্রীরামপুর

॥ সম্বরণ ব্যানার্জী ॥
জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাংলা দলের অধিনায়ক।

# রাষ্ট্রীয় খেতাব পেলেন দুই স্পিন বোলার

এবারের রাষ্ট্রপতি খেতাব পেয়েছেন যাঁরা তাদের মধ্যে আছেন ভারতের দুজন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়। ভারতের যে দুই স্পিন বোলার ভারতীয় দলের আক্রমণের প্রধান নায়ক, সেই বেদী আর প্রসন্নকেই এ বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি দিয়েছেন পদ্মশ্রী উপাধি।

দিল্লীর লেগ স্পিন বোলার বি. এস বেদীর জন্ম ১৯৪৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। তিনি ইংল্যন্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলেছেন এবং এরই মধ্যে দখল করেছেন ৫৫টি উইকেট। বেদীর বোলিং আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভিনু মানকাদের কথা। বেদীর বোলিং এ্যাকশন অনেকটা ভিনু মানকাদেরই মতো। বেদীর ফ্লাইট যেমন দেখার মতো, তেমনি আচমকা গুগলী বল দিয়ে ব্যাটসম্যানদের বিপদে ফেলতে বেদী ওস্তাদ। বেদীর লেংথ, ডাইরেকশন এবং এ্যাকিউরিসি এতো নিখুঁত যে, বাঘা-বাঘা ব্যাটসম্যানরাও তাঁকে সমীহ করে খেলেন। এই মরশুমের দিল্লী টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের প্রধান কারণই হলো বেদী এবং প্রসন্নর মারাত্মক বোলিং। তাঁদের সেই যৌথ সাফল্যের স্মৃতি ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে।

* মহীশূরের ডান হাতি অফ ব্রেক বোলার ই. এস. এস প্রসন্নর জন্ম ১৯৪০ সালের ২২শে মে। তিনি খেলেছেন ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। আর এরই মধ্যে দখল করেছেন একশ'রও বেশী উইকেট। ভারতীয় ক্রিকেটের গোলাম আমেদের পরে এতো ভালো অফ স্পিনার আর দেখা যায় নি। আশা করা যায় যে, প্রসন্ন ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সুভাষ গুপ্তের সবচেয়ে বেশী উইকেট পাবার রেকর্ড খুব শীঘ্রই ভেঙে নতুন রেকর্ড স্থাপন করবেন। প্রসন্নকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অফ ব্রেক বোলার হিসেবে আজ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রসন্ন একজন ইঞ্জিনীয়ার। অবিবাহিত। তবে যতোদূর মনে হয়, তিনি শীঘ্রই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন—সম্ভবত কলকাতাই হবে তাঁর শ্বশুরবাড়ী।

যাই হোক, ভারতের এই দুই সেরা বোলার রাষ্ট্রীয় খেতাব পাওয়ায় ক্রীড়া-রসিক মাত্রেই খুশী হয়েছেন। তবে আমাদের আরো অনেক বেশী প্রত্যাশা। আমরা চাই বেদী ও প্রসন্ন আরো ভালো খেলুন—বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন।

দীর্ঘ ৪৯ বছর লড়াই করার পর ইংলণ্ডের মেয়েদের ফুটবল খেলা স্বীকৃতি লাভ করলো। এই স্বীকৃতি লাভের জন্যে ১৯২১ সাল থেকে দু' পক্ষের মধ্যে চলছিল তীব্র সংঘাত। ১৯২১ সালে মহিলাদের ফুটবল খেলার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন। এতো-দিন পরে তাঁরা মত বদলেছেন। তবু এখনো যেন সকলে পুরোপুরিভাবে সায় দেন নি। এখনো অনেকের মতে, ফুটবল মেয়েদের খেলা নয়। তবু ইংলণ্ডের মেয়েরা এবার ফুটবল খেলবেন। তবে আলাদা মাঠে তাঁদের খেলতে হবে।

বাংলার দুই ছেলে অলোক মুখার্জী আর ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী সাইকেলে করে বেরিয়েছেন বিশ্ব ভ্রমণে। পৃথিবীর অনেক দেশ পার হয়ে এই মাসের মাঝা-মাঝি নাগাদ তাঁরা গিয়ে পৌঁছেছিলেন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোয়। রিও-ডি-জেনিরো ছেড়ে এখন তাঁরা আবার সাই-কেলে চেপে এগিয়ে চলেছেন তাঁদের নির্ধারিত সফরসূচী অনুযায়ী।

রাশিয়ার ভ্যারিলি ব্রুমেল যোগ হয় আবার আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে আসবেন। ১৯৬৩ সালে ৭ ফুট ৫½ ইঞ্চি লাফিয়ে ব্রুমেল বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে তিনি উচ্চ লম্ফনে পেয়েছিলেন স্বর্ণপদক। আর তার পরের বছরই এক ভয়ঙ্কর মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ব্রুমেল খেলার জগতের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন। আবার তিনি ফিরে এসেছেন আর জানা গেছে যে, এখন তিনি সাত ফুটেরও বেশি লাফাতে সমর্থ হয়েছেন।

**ফেব্রুয়ারী** মাসের প্রথমেই কলকাতায় আরম্ভ হচ্ছে জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্যে পুরুষদের সিংগলসে ৬২ জন, ডাবলস-এ ৩২ জন, মিক্সড ডাবলসে ১৮ জন, মহিলাদের সিংগলসে ৩২ জন, ডাবলসে ১৭ জন নাম দিয়েছেন। এ ছাড়া আছে বালকবালিকাদের সিংগলস ও ডাবলস প্রতিযোগিতা এবং প্রবীণ খেলোয়াড়দের সিংগলস ও ডাবলস প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এ বছরের বাছাই খেলোয়াড়দের (পুরুষদের সিংগলসে) তালিকায় সবার ওপরে স্থানলাভ করেছেন রেলওয়ের দীপু ঘোষ। এ ছাড়া যাঁদের নাম পর পর ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন সতীশ ভাটিয়া, দীনেশ খান্না, রমেন ঘোষ, অতুল প্রেমনারায়ণ, গৌতম ঠক্কর, সুরেশ গোয়েল ও ফিরোজ চৌধুরী। ডাবলস বাছাই-এ আছেন যথাক্রমে সতীশ ভাটিয়া ও ফিরোজ চৌধুরী, দীপু ঘোষ ও রমেন ঘোষ, সুরেশ গোয়েল ও সি· ডি· দেওরাজ এবং গৌতম ঠক্কর ও আসিক পারাপিয়া।

[ ২০৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

## প্রবীর সেন

**গত ২৭শে জানুয়ারী** দুপুরবেলায় হঠাৎ মারা গেলেন ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার উইকেট রক্ষক পি সেন। উইকেট রক্ষক হিসেবে এক সময় বিশ্বের সুধিজনের প্রশংসা অর্জন করলেও প্রবীর সেন ছিলেন আমাদের গর্ব করার মতো আদর্শ ক্রিকেট খেলোয়াড়। প্রথম বাঙালী খেলোয়াড় হিসেবে তিনিই পেয়েছিলেন ভারতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। বাঙালীদের কাছে টেস্ট ক্রিকেট জগতের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনিই।

পি সেনের বয়েস বেশী হয় নি। মাত্র ৪৪ বছর বয়েসে মারা গেলেন তিনি। তবে সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো যে, মৃত্যুর আগে, অর্থাৎ সোমবার দিনও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন একটি প্রদর্শনী ম্যাচে। খেলোয়াড় খোকন সেন খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আর বেশীদিন বাঁচলেন না। অথচ ওঁর কাছ থেকে জানার এবং নেবার ছিল আমাদের অনেক।

পি· সেন কিন্তু খুব একটা বেশী টেস্ট খেলেন নি। অংশগ্রহণ করেছেন মাত্র ১৪টি টেস্ট খেলায়। খেলেছেন ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। মাত্র ১৪টি টেস্ট খেললে হবে কি—এই ১৪টি টেস্টের মধ্যেই তিনি দেখিয়েছেন অভাবনীয় কৃতিত্ব।

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডন ব্রাডম্যানকে স্টাম্প-আউট করে প্রবীর সেন দু হাতে কুড়িয়েছিলেন সকলের প্রশংসা। সেই বছরই মেলবোর্ন টেস্টের এক ইনিংসে ৪জন ব্যাটসম্যানকে ক্যাচ আউট করে পি· সেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব আর একভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫১-৫২ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে ৫জন ব্যাটসম্যানকে স্টাম্প-আউট করে পি· সেন সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু উইকেট রক্ষক হিসেবেই নয়, মোটামুটি ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবেও পি· সেনের খ্যাতি ছিল। রনজি ট্রফির খেলায় সেঞ্চুরীও করেছেন তিনি। আর তাঁর মোট সংগ্রহ হাজারের ওপর রান।

পি· সেন যে এতো তাড়াতাড়ি আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে যাবেন, এ কথা কেউ কোনদিন ভাবতেই পারেন নি। পি· সেন আর নেই, কিন্তু তাঁর কীর্তি চিরকাল আমাদের মধ্যে অমর হয়ে থাকবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার গডার্ড স্লিপের মধ্য দিয়ে কাট করছেন। গডার্ড নিজস্ব [illegible]
[illegible]

**রতনকুমার ঘোষ** (ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলকাতা)

**প্রশ্ন :** ভিনু মানকাদ, সুভাষ গুপ্তে, বাপু নাদকার্নী, দাত্তু ফাদকার, চাঁদু বোরদে, গোলাম আমেদ ও সেলিম ডুরানীর বোলিং এভারেজ জানতে চাই।

**উত্তর :**

| | বল | মেডেন | রান | উইকেট | গড় |
|---|---|---|---|---|---|
| ভিনু মানকাদ | ১৪৬৮৬ | ৭৭৭ | ৫২৩৫ | ১৬২ | ৩২ ৩১ |
| সুভাষ গুপ্তে | ১১২৮৪ | ৫৯৯ | ৪৪০২ | ১৪৯ | ২৯·৫৪ |
| বাপু নাদকার্নী | ৯২৬৫ | ৬৬৭ | ২৫৫৯ | ৮৮ | ২৯ ০৭ |
| রামাকান্ত দেশাই | ৫৫৯১ | ১৭৯ | ২৭৬২ | ৭৪ | ৩৭ ৩২ |
| দাত্তু ফাদকার | ৫৯৭৫ | ২৭৭ | ২২৮৪ | ৬২ | ৩৬·৮১ |
| চাঁদু বোরদে | ৫৬৪৮ | ২৩৭ | ২৪১৭ | ৫২ | ৪৬ ৪৮ |
| গোলাম আমেদ | ৫৬৫০ | ২৫৩ | ২০৫২ | ৬৮ | ৩০ ১৭ |
| সেলিম ডুরানী | ৫৯৫৪ | ২৯৭ | ২৪৩৭ | ৭১ | ৩৪·৩২ |

**দীনবন্ধু মুখার্জী** (ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা—৬০)

**উত্তর :** 'ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে উৎসাহিত হলাম।

জয়সীমা টেস্ট খেলায় ৩টি সেঞ্চুরী করেছেন।

**শীতল, বিশ্বদেব ও উত্তম বটব্যাল** (ভক্তাবাধ, বাঁকুড়া)

**প্রশ্ন :** ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে ক'টি টেস্ট খেলা হয়েছে? তার মধ্যে ভারতের জয়, পরাজয় ও ড্র-এর সংখ্যা কতো?

**উত্তর :**

খেলা — ভাঃ জয় — ভাঃ পরাজয়— ড্র
৩৭ — ৩ — ১৮ — ১৬

**সলিল মুখোপাধ্যায়** (ধোবাপাড়া, হুগলী)

**প্রশ্ন :** সোবার্স কি কোন টেস্টে শূন্য রানে আউট হয়েছেন?

**উত্তর :** মনে হয় হয়েছেন। তবে কার বিরুদ্ধে, কোন্ সালে আমার মনে নেই। কারো জানা থাকলে যদি জানান, তাহলে আপনাকে জানিয়ে দেবো।

**কাজলকুমার পান** (দিগপার, বাঁকুড়া)

**প্রশ্ন :** ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফির বিজয়ী রাজ্যের নাম জানতে চাই।

**উত্তর :**

১৯৪৪ : দিল্লী
১৯৪৫ : বাংলা
১৯৪৬ : মহীশূর
১৯৪৭ : বাংলা
১৯৪৮ : খেলা হয় নি
১৯৪৯—৫১ : বাংলা
১৯৫২ : মহীশূর
১৯৫৩ : বাংলা
১৯৫৪ : বম্বে
১৯৫৫ : বাংলা
১৯৫৬—৫৭ : হায়দ্রাবাদ
১৯৫৮—৫৯ : বাংলা
১৯৬০ : সার্ভিসেস
১৯৬১ : রেলওয়ে
১৯৬২ : বাংলা
১৯৬৩ : বম্বে
১৯৬৪ : রেলওয়ে
১৯৬৫ : অন্ধ্র
১৯৬৬ : রেলওয়ে
১৯৬৭—৬৮ : মহীশূর।

**জগন্নাথ মজুমদার** (বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ)

**উত্তর :** 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই বিভাগে পুরোন দিনের খেলাধুলার মজার মজার ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়। আগে আমরা নিজেরাই ঘটনাগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করতাম, তখন কারো নাম থাকতো না। কিন্তু বর্তমানে পাঠক-পাঠিকারাই [illegible] দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁরা [illegible] ঘটনার কথা লিখে আমাদের [illegible] পাঠান। সুতরাং সেগুলো [illegible] কিছু কিছু প্রকাশ করা [illegible] যিনি ঘটনাটা লিখে পাঠিয়েছেন তাঁর নামটাও যে প্রকাশ করার দরকার। সেই জন্যে নাম দিয়েই ঐ লেখাগুলো ছাপা হয়।

**চন্দন, মনোহর, [illegible], অশোক** (বেলদা, মেদিনীপুর)

**প্রশ্ন :** টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সবচেয়ে কম রান কতো? কোন সালে এবং কার বিরুদ্ধে?

**উত্তর :** যতদূর মনে পড়ছে ১৯৫৮-৫৯ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঢাকা টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৭৬ রানই তাদের সবচেয়ে কম রান।

[ ২০৪৭ পৃষ্ঠার পর ]

মহিলাদের সিঙ্গলস বাছাই-এ আছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ান দময়ন্তী সুবেদার, শোভা মূর্তি, রফিয়া তিলক ও জে· সি· ফিলিপস। মহিলাদের ডাবলসে বাছাই তালিকায় স্থান পেয়েছেন শোভা মূর্তি ও মরিন ম্যাথিয়াস এবং দময়ন্তী সুবেদার ও জে· সি· ফিলিপস।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী ( প্রাঃ ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৩৩শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৯শে মাঘ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 12th February, 1970

# যুক্তফ্রণ্ট যাক আর থাক

**যুক্তফ্রন্ট যুক্ত** আছে, নামমাত্র। পরস্পর কলহে মত্ত যুক্তফ্রন্টের ওপর জনসাধারণ এখন বীতশ্রদ্ধ। শুধু বাইরে রাজনৈতিক ফ্রন্টে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মত-বিরোধ প্রকাশ পায় নি, বিধানসভাতেও তার ঝড় বয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ভোটাভুটির ব্যাপারে বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দল এবার যুক্তফ্রন্টের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে কোনোরকম ভোটের দাবী করে নি। এই করুণাও যুক্ত-ফ্রন্ট-মন্ত্রিসভার কপালে ছিল!

যুক্তফ্রন্টের প্রতি সাধারণ মানুষের আশা ও ভরসা ছিল এবং সে আশা-ভরসা বিরাট ছিল বলেই মোহভঙ্গ হতে বিলম্ব হয় নি। যুক্তফ্রন্ট যুক্ত থেকে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িতে মত্ত থাকবে আর প্রশাসনের দফা রফা হবে—এই কথা ভেবে দুঃস্থ জনগণ যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেয় নি। জনসাধারণ আশা করেছিল, দীর্ঘ দুই দশকে যে গলদের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে, তা অপসৃত হবে। তারা পাবে দু' মুঠো অন্ন, বসবাসের যোগ্য আশ্রয়স্থল, বেকাররা পাবে চাকরি, প্রশাসন হবে দ্রুতগতি-সম্পন্ন ও পরিচ্ছন্ন এবং দুর্নীতিহীন। আরো একটি বিষয়ে সাধারণ মানুষ যুক্ত-ফ্রন্টকে গদীনসীন করে সান্ত্বনা পেয়েছিল যে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য-বৃদ্ধি পাবে না এবং যখন তখন দাম বাড়াবার অছিলায় কোনো জিনিস বাজার থেকে হঠাৎ উধাও হবে না।

অবশ্য ভোট ভিক্ষার আগে যুক্তফ্রন্টের নেতারা বত্রিশ দফা কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিল—তাতে দৈন্য দূরীকরণের অনেক মন্ত্রই লিপিবদ্ধ আছে। তা নিয়ে কাজও সুরু হয়েছিল, কিন্তু যজ্ঞ বোধ চলছে দক্ষযজ্ঞের পালা। একদা সতীর ছিন্ন দেহ যে-যে স্থানে পড়েছিল, সেই সব জায়গা পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের দক্ষযজ্ঞের পালায় পীঠস্থান গড়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা তো নেই-ই, বরং তা পরিহাস-জনক এক ফ্রন্টরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। তবে শক্তিধর জনসাধারণ অন্যায়কে ক্ষমা করে না। তাই যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলে তার জন্য অপরাধী দল-গুলিকেও ক্ষমা করবে না। কারণ তারা জানবে, ঐ দলগুলি তাদের আশা ধূলিসাৎ করেছে, স্বপ্ন চূর্ণ করেছে।

যুক্তফ্রন্ট জনকল্যাণকর কাজ কিছুই করে নি—একথা আমরা কখনো বলি নি, এখনো বলছি না। কিন্তু জনকল্যাণকর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, এমন বেহিসেবী শরিকী কোন্দল করার অধিকার যুক্ত-ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলিকে কে দিল?

যুক্তফ্রন্ট যখন শাসনভার গ্রহণ করে, তখন দেখা গেছিল, স্বার্থপর চক্র-গুলিতে একটা ভীতির ভাব। আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের মধ্যে। তারপর একদিকে যেমন দুঃস্থদের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা হচ্ছিল, তখন পরস্পর শরিকী দ্বন্দ্বে পশ্চিমবঙ্গ পরিণত হোল সমাজ-বিরোধীদের সুখের স্বর্গে! কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি, অনবরত সেই গগনবিদারী চিৎকার—অন্যায় দূর করবো, অপশাসন নিশ্চিহ্ন করবো?

যুক্তফ্রন্ট যাক, আর থাক,—জনগণ অবিভাজ্য এবং অখণ্ড। তাদের ঠকানো যায় না। দীর্ঘ দু' দশক ধরে যারা ধুঁকছে, ঐ অবস্থায় আরো না হয় কিছুদিন ধুঁকবে। কিন্তু ঘটনা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয় না। তাই যে কারণে থেকে মুক্তি দিয়েছে, একই কারণে অপরাধী দলগুলিকে চিনে নিতে তাদের ভুল হবার কথা নয়। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের নেতারা অন্তত এই কথাটুকু যদি না বোঝেন, তাহলে তাঁদের ভাগ্য একদিন ভরাডুবির অন্তিমকালে অসহায়ের মতো মিথ্যাই দুই হাত ছুড়বে। কেউ তখন তাঁদের রক্ষা করবে না।

একদিকে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা হাতে পেয়ে নেতারা শরিকী-দ্বন্দ্বে মত্ত, অন্য-দিকে রুজি-রোজগারহীন বেকারদের নিয়ে পরিবারে পরিবারে নেমে আসছে দুঃসহ অর্থনৈতিক সংকট। পে-কমিশন বসিয়ে-ছিলেন রাজ্য সরকার নিজেই, এখন রিপোর্ট পেয়ে তাদের উষ্মা বেড়েছে। পে-কমিশনের রিপোর্টই প্রমাণ করে যে, রাজ্যের কর্মচারীরা সুখে নেই- যদিও কর্মচারীদের কর্ম-তৎপরতা সম্বন্ধে অভিযোগ রয়েছে। দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে হু হু করে প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে! এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হবার মূল কারণ এই যে, মূল্য বাড়াবার জন্য যারা পাঁয়তারা খোঁজে, তারা দেখে-শুনে বুঝেছে যে দলগুলি কলহমত্ত, অতএব তাদের পক্ষে এখনই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। তেল থেকে বেগুনের ব্যাপারী এখন সবাই একদলে। আর একদলে থেকে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি এখন খণ্ড-বিখণ্ড। মধ্যখানে জনসাধারণ চরম দুরবস্থায় বসে হিসেব কষছে। তা থেকে কে রক্ষা পাবে আগামী দিনের ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে।

সম্পাদকীয়—

# আজকের মানুষ

একদিনে রোম নগরী তৈরী হয় নি, কিন্তু চোখের পলকে নাগাসাকি হিরোসিমা উড়ে যেতে পারে। গড়া আর ভাঙায় এইটুকুই তফাৎ। বর্তমান ভারতের এখন ভাঙার মেজাজ। তবে সে ভাঙন বস্তুতই ভাঙনের জয়গান গাইছে কি না, এই মুহূর্তে তার সঠিক হিসাব জানে না। এ কি ভাঙার নেশাই ভাঙছে, নাকি রাজনীতির পাকচক্র ভাঙছে? এ ভাঙনে গড়ার প্রতিশ্রুতি আছে, নাকি শুধু ভাঙার মতলবই হামা দিচ্ছে! সাধারণ মানুষ এ কথার জবাব জানেন না। অ-সাধারণ নেতারা জানেন, বস্তুত ভাঙছে কেন? মতবাদ, নাকি শুধুই নেতৃত্বের মতানৈক্য! কিম্বা স্বার্থ?

কম্যুনিস্ট পার্টি ভেঙেছে অনেক দিন। কংগ্রেস সম্প্রতি। ভাঙনের সঙ্গে সম্পত্তির বিনিময় হচ্ছে, নির্বাচনী প্রতীকেরও। কিন্তু একই সঙ্গে ভাঙছে সাধারণের স্বার্থ। শ্রেণী-সংগ্রাম টুকরো টুকরো হয়ে পার্টি ব্যানারের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। কৃষক আর একটি শ্রেণী নয়, মজুরও তাই; কর্মচারীরা এবং সাধারণ মানুষ। শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীতর। শ্রেণীতর পার্টি স্বার্থের নিচে শ্রেণীস্বার্থ পর্যুদস্ত। সুতরাং নিত্য নতুনভাবে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্ল্যান তৈরী হচ্ছে ভাঙা ভাঙা পার্টির অফিসে। ভাল না মন্দ, এ ভাঙন এগিয়ে দেবে না পিছনে টানবে জানি না। জবাব দেবে ভবিষ্যৎ।

কিন্তু সম্প্রতি শান্তারাম সবলরাম মিরাজকর যে জবাব দিলেন তা চাঞ্চল্যকর। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রবীণ ট্রেড য়ুনিয়ন নেতা পার্টির সিদ্ধান্তকে তোয়াক্কা না করে তাঁর নেতৃত্বাধীন ১৫০ জন মার্ক্সিস্ট ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ডেলিগেট নিয়ে গেলেন গুন্টুরে এ আই টি ইউ সির জুবিলী বৎসরের অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে। অভাবনীয় ব্যাপার। দলের সিদ্ধান্ত এ আই টি ইউ সির বাৎসরিক অধিবেশন বয়কট কর। কিন্তু মিরাজকর তা পারলেন না। পারলেন না নিজের হাতে-গড়া এই পঞ্চাশৎ বৎসরের ভাঙনের মুখে অসহায়ভাবে ছেড়ে আসতে। ডিনামাইটের পাতা সুতোয় পা চেপে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় খ্যাত ৭০ বছরের প্রবীণ নেতা এগিয়ে গেলেন অকুতোভয়ে। মিরাজকরের ভূমিকা অতঃপর কী ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? যিনি অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য, যিনি পার্টি ভাঙার সময় মার্ক্সবাদীদের সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিলেন, আজ জীবন-সায়াহ্নে তিনি কার মুখের দিকে তাকিয়ে এ আই টি ইউ সিকে অভগ্ন রাখতে চাইছেন!

অথচ নীতির সঙ্গে রফা করার

মিরাজকর

নজীর মিরাজকরের সুলভ নয়। নয় বলেই একদিন পার্টির ভাঙন মেনে নিয়েই হয়েছিলেন 'মার্ক্সবাদী'। নয় বলেই নীতিগত কারণে ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস পার্টি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; যদিও ১৯২৭ সালে এ দল তাঁকেই সাধারণ সম্পাদকরূপে নির্বাচিত করে। ১৯৫৮ সাল থেকে একনাগাড়ে এ আই টি ইউ সির সভাপতিরূপে শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে আসছেন মিরাজকর। শ্রমিক-স্বার্থে যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে এতটুকু দ্বিধা করেন নি তিনি।

প্রতিনিধিরূপে প্রথম এ আই টি ইউ সির অধিবেশনে গেছলেন। তারপর কত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও সংস্থাটিকে আরও বেশি শ্রমিকের দাবি আদায়ের হাতিয়ার করে তুলেছেন। নিজের হাতেগড়া এই সর্ব-ভারতীয় সংস্থা কি উত্তেজনার বশে পরিত্যাগ করা যায়। মিরাজকর পারলেন না। পারলেন না আরও অনেক শ্রমিক সংস্থা।

সংকটকে বাড়িয়ে তোলা সহজ, সমাধান খুঁজে বার করাটাই কৃতিত্ব। মিরাজকর সেই কৃতিত্ব কেমনভাবে প্রদর্শন করবেন দুনিয়ার শ্রমিক তা উদ্বিগ্ন চিত্তে লক্ষ্য করবে এর পর।

মিরাজকর ঐক্য চান। এস এ ডাঙের সঙ্গে একদিন তাঁর পথচলা শুরু হয়েছে, লক্ষ্য শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ। এস এ ডাঙে আজও এ আই টি ইউ সি জাঁকিয়ে আছেন। মিরাজকর তাঁর আকর্ষণ এড়াতে পারেন নি। মন্দ লোকের ইঙ্গিত উদ্ধার করে এখানে বলা সঙ্গত নয় যে, ব্যক্তিগত কারণেও শ্রীডাঙের সঙ্গে মিরাজকরের সম্পর্ক আজ অবিচ্ছেদ্য। বরং বলা ভালো মিরাজকর চান শ্রমিক ঐক্য বজায় রেখে মালিক তরফের আঘাত ঠেকাতে। কিন্তু ঐ প্রশ্নেই সি-পি-এম সন্দিগ্ধ। কারণ সি-পি-এম-এর বিশ্বাস, এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব আজ আপস-প্রয়াসী। মালিকের সঙ্গে আপসে শ্রমিকের স্বার্থ টিকবে না। মিরাজকর এ প্রশ্ন কেমনভাবে ফয়সালা করবেন তিনিই জানেন। তবে তাড়াহুড়ো সংকটকে ঘনিয়ে না তুলে ঐক্যের চেষ্টায় হয়ত শ্রমিকদের বিরাট কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না।

মিরাজকর দলের সিদ্ধান্তের বিপরীত কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ। কর্মপ্রচেষ্টাকে খতিয়ে বিচার করাই হয়ত সি-পি-এম-এর পক্ষে সঙ্গত হবে। এ ক্ষেত্রে একটু ধৈর্য হয়ত দলীয় নেতৃত্ব ধারণ করবেন, অন্তত সেটাই আকাঙ্ক্ষিত।

মিরাজকরের সামনে আজ তবু একটি প্রশ্ন প্রজ্বলন্ত। তা হল, কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর কৃষক ফ্রন্ট, যুব ফ্রন্ট ইত্যাদি সর্বত্রই নীতিগত ভাঙনকে সহ্য করল, শ্রমিক ফ্রন্টের ঐক্য কি বস্তুতই অনিবার্য? মিরাজকর ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, কিন্তু প্রবীণ নেতা। তাঁর নিশ্চয় অন্যান্য ফ্রন্ট সম্পর্কেও বক্তব্য ছিল। শ্রমিক ফ্রন্টের প্রশ্নেই বা তিনি নিজস্ব সিদ্ধান্তে এলেন কেন? এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে। উত্তর মিরাজকর

# বারট্রাণ্ড রাসেল

### চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় যেন গ্যেটে বলেছেন, ইতিহাসের [illegible] প্রধানত [illegible] চিহ্নিত করা যায়। বিশ্বাসের আর অবিশ্বাসের যুগ। বিশ্বাসের যুগ উজ্জ্বল, সফল, গতিশীল; যে যুগে অবিশ্বাসের আধিপত্য তা অনুজ্জ্বল ও বন্ধ্যা; সেই অধ্যায়গুলি ইতিহাসের পশ্চাদ্‌পটে থাকে। লোকে ভুলে যায়।

মানুষের বেলাতেও এই শ্রেণীবিভাগ প্রয়োগ করা যেতে পারে। জীবনে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁরা সকলেই একটা-কিছু গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন। কোনো কিছুতেই যাঁদের বিশ্বাস নেই তাঁরা ভেসে যান, তলিয়ে যান জীবনের আবর্তে। রাসেল পুরনো ঐতিহ্যের নোঙর ছিঁড়ে যখন নতুন পথে চলতে চাইলেন তখনই অভিযোগ উঠল, তিনি স্কেপ্‌টিক, সংশয়বাদী, কিছুতেই আস্থা নেই। কিন্তু রাসেলের জীবন, রচনা ও কাজের সঙ্গে পরিচয় থাকলে আজ কেউ তাঁকে সংশয়বাদী বলবার অবকাশ পাবেন না। বরং তাঁর জীবনের প্রায় অর্ধাংশ প্রত্যয়ের প্রভায় দীপ্ত। সেই বিশ্বাসের দীপ্তি পাঠক উপলব্ধি করেন তাঁর লেখায়। মতের পার্থক্য হতে পারে; কিন্তু এই বিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে রাসেল অনায়াসে পাঠককে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের ওপরে লেখা বইগুলির জনপ্রিয়তার এটি অন্যতম প্রধান কারণ।

রাসেল যা লিখতেন তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন। সেখানেই তাঁর বিশ্বাসের জোর। ১৯৩৭ সালে রাসেল নিজের যে মৃত্যু-বার্তা রচনা করেছিলেন তাতেও এই দিকটার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনাগুলি বাঁধা পথ ধরে চলে না বটে, কিন্তু তাদের তিনি জীবনে অনুসরণ করেন এবং সেই জন্য কিছু কৃতিত্বের দাবি তাঁর প্রাপ্য।

যা প্রচার করা যায় তা জীবনে গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যৌন আচরণ সম্বন্ধে রাসেলের মতামত ছিল বিপ্লবাত্মকরূপে উদার। পরীক্ষামূলক বিয়ের প্রবর্তন করবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শান্ত ও সুস্থ হবে যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা দেওয়া যায়,—এই ছিল তাঁর মত; ব্যভিচার বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হওয়া উচিত নয়, বলতেন রাসেল। এই সব মতবাদ শুধু "ম্যারেজ অ্যান্ড মর্যাল্‌স"-এর পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ ছিল না; নিজের জীবন সেই অনুসারে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রাসেলের বান্ধবী ছিলেন বেশ কয়েকজন এবং তাঁদের সম্পর্ক তাঁর স্ত্রীকেও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ডোরা রাসেলের এক প্রণয়ী, তাঁদের বাড়িতেই কিছুকাল থেকেছেন। ডোরা নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর চারটি সন্তানের মধ্যে মাত্র দুটির পিতা রাসেল। যদিও তাঁদের মধ্যে পরে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তথাপি রাসেল স্ত্রীর প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে ঈর্ষান্বিত হন নি। এর প্রমাণ দুজনের মিলিত উদ্যমে বই লেখা, স্কুল পরিচালনা, ইত্যাদি।

যদিও রাসেল বছর তিনেক বয়সের মধ্যেই মা-বাবাকে হারিয়েছেন, তথাপি তাঁদের উদার মতবাদের প্রভাব পড়েছে তাঁর জীবনে। বাবার নাম লর্ড অ্যাম্বার্লি, মার নাম কেট। রাসেল তাঁদের তৃতীয় ও শেষ সন্তান। জন্মের তারিখ ১৮ই মে, ১৮৭২। শ্রীমতী অ্যাম্বার্লি কনিষ্ঠ ছেলের বর্ণনা দিয়ে মাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে বার্ট্রাণ্ডকে 'আগ্‌লি' বলা হয়েছে। কিন্তু খুব পোক্ত দেহ। পরিবারের ডাক্তার বলেছিলেন, সচরাচর এমন দেখা যায় না।

বার্ট্রাণ্ডের বয়স যখন মাত্র দু' বছর তখন তাঁর মা ও দিদির মৃত্যু হয় ডিপথেরিয়ায়। বাবা কিছুদিন থেকে মৃগী রোগে ভুগছিলেন; বছর দেড়েক পরে তিনিও মারা যান। উইলে তিনি বার্ট্রাণ্ড ও দাদা ফ্রাঙ্কের দায়িত্ব দিয়েছিলেন দুই ফ্রী-থিঙ্কার বন্ধুর ওপরে। কিন্তু লর্ড অ্যাম্বার্লির পিতা লর্ড জন রাসেল আদালতে আবেদন করে দুই নাতিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বছর দুই পরেই ঠাকুর্দার মৃত্যু হলো। বার্ট্রাণ্ডকে মানুষ করেছেন ঠাকুমা লেডি রাসেল।

জন রাসেল ছিলেন লিবারেল পার্টির অন্যতম নেতা। ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এবং পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে উদার নীতি সফল করবার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। লেডি রাসেলের স্বামীর আদর্শে গভীর আস্থা ছিল। আয়র্ল্যাণ্ডের হোম রুল আন্দোলন সমর্থন করে এবং বিদেশে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিনকার রক্ষণশীল ইংরেজ-সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। মা-বাবাও ছিলেন প্রচলিত সংস্কার থেকে মুক্ত। লর্ড অ্যাম্বার্লি জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা প্রার্থী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এমন বিরূপ প্রচার শুরু করলেন যে, ভোট পাওয়া কঠিন হয়েছিল।

বার্ট্রাণ্ড বাড়িতেই পড়তেন, স্কুলে ভর্তি করা হয় নি। সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল না। দাদা বয়সে একটু বড়, প্রকৃতি অন্যরকম। সঙ্গী বই আর ঠাকুমা। শৈশব একা কেটেছে বলে মন অন্তর্মুখীন হতে পেরেছে, এই ছিল বার্ট্রাণ্ডের ধারণা। মনের বিকাশের জন্য নিঃসঙ্গতা আবশ্যক। নিউটন সম্বন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেনঃ চিন্তা-সমুদ্রের নিঃসঙ্গ নাবিক। সকল চিন্তানায়ক সম্পর্কেই কথাটি সত্য।

বারো বছর বয়সে জন্মদিনে ঠাকুমার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন বাইবেল। ঠাকুমা বাইবেল থেকে দুটি উদ্ধৃতি নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন। একটি হলোঃ 'দাউ শ্যাল্ট নট ফলো এ মাল্টিচিউড টু ডু ইভিল; এবং আর একটিঃ 'বী স্ট্রং, অ্যান্ড অব এ গুড কারেজ; বী নট আফ্রেইড, নিদার বী দাউ ডিসমেইড।' এই দুটি উপদেশ তাঁর মানসিকতাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

আঠারো বছর বয়সে রাসেল কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৩ সালে তিনি র‍্যাংলার হলেও পরীক্ষার ফল তেমন ভালো হয় নি। গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। যদিও প্রথম নামতা মুখস্থ করতে বসে তিনি কেঁদেছিলেন, পরে কিন্তু গণিতের প্রেমে পড়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বলেছেন, নিঃসঙ্গ কিশোর-জীবনে গণিতের প্রতি মন আকৃষ্ট না হলে হয়তো আত্মহত্যা করতে হতো। গণিতের সূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল, তাই ফল ভালো হয় নি। এমন আঘাত পেয়েছিলেন রাসেল যে, গণিতশাস্ত্রের সবগুলি বই তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

কলেজে প্রথম যখন এলেন তখন রাসেল ছিলেন মুখচোরা, লাজুক। ক্রমশ তাঁর সংকোচ কেটে গেল, সভা-সমিতিতে নিয়মিত বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এই সময় পরিচয় হলো অ্যালাইস পীয়ারসল স্মিথের সঙ্গে। অনাত্মীয়া মেয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় প্রেমে পরিণত হতে বিলম্ব হলো না। এ বিয়েতে ঠাকুমার মত ছিল না। ১৮৯৪ সালে তাঁদের বিয়ে হলো; স্ত্রী বয়সে পাঁচ বছরের বড়।

রাসেল এগারো থেকে আটত্রিশ বছর

গবেষণা করেছেন। এর পর আরম্ভ করেছেন দর্শনশাস্ত্রের চর্চা। তার পরে দেখতে পাই সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ। রাসেলের প্রথম বই বের হয় ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে, বইটির নামঃ 'জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্রাসি'। ১৯১০-১৯১৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'প্রিনসিপিয়া ম্যাথমেটিকা' তিন খণ্ডে অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সহযোগিতায়। এই বিরাট গ্রন্থ মানব মনীষার স্তম্ভ-স্বরূপ।

১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে রাসেল ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালাবার জন্য তাঁর চাকরি যায়। জরিমানার টাকা না দেওয়ায় রাসেলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর একটি অভিযোগে তাঁকে ছয় মাসের জন্য জেলেও যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর সমর্থন ছিল নাৎসীবাদকে পরাজিত করবার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের ওপর বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু নিউ ইয়র্কে অধ্যাপকের পদ লাভের পর একজন নাগরিক এই নিয়োগের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করে। কারণ শিক্ষকের যেরূপ চরিত্রবল থাকা দরকার রাসেলের তা নেই। তাঁর লেখা বইগুলি—lecherous, salacious, libidinous, lustful, venerous, erotomaniac, approdisiac, atheistic, irreverent, narrominded, untruthful and bereft of moral fibre.

বিচারে তাঁর নিয়োগ বাতিল হয়ে যায়। আইনস্টাইন এ ব্যাপারে ব্যথিত হয়ে চার লাইনের এই কবিতাটি লিখেছিলেন :

> It keeps repeating itself
> in this world fine and honest
> The parson alarms the populare
> The genius is executed.

১৯৪৪ সালে ইংলণ্ডে ফিরে আসবার পর রাসেলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরোধিতা না করায় এই পরিবর্তন। ট্রিনিটি কলেজ তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে। এই সময় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়।

১৯৩১ সালে দাদা ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যুর পর বার্ট্রান্ড পারিবারিক সম্পত্তি ও লর্ড উপাধি লাভ করেন। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করলেন না। লর্ড পরিবারের ছেলে হলেও প্রায় ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে লিখে জীবিকার্জন করতে হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সরকারের বিরাগভাজন হবার ফলে সম্মানজনক এবং অর্থকরী পদ লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বদেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করতে কার্পণ্য করে নি। ১৯৪৯ সালে সরকার তাঁকে ভূষিত করলেন অর্ডার অব মেরিট দিয়ে।

কিন্তু তাঁকে সম্মানিত করেছে পৃথিবীর সকল দেশের লোক। কারণ যখনই পৃথিবীর যে-কোনো দেশে কোনো অত্যাচার-অবিচার ঘটেছে তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। সমকালীন ইতিহাসের গতি তিনি অনুধাবন করে চলতেন সাগ্রহে। য়ুরোপ, রাশিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় ভ্রমণ করে তিনি লাভ করেছিলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান সেই সব দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে।

১৯৫০ সালে রাসেল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন 'in recognition of his great services to the cause of humanity and freedom of thought.' নোবেল কমিটির একজন সদস্য আরও বলেছেন যে, দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর সমগ্র রচনাবলী সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা। আজকের জড়বাদের যুগে তাঁর রচনা স্বাধীন চিন্তার শিখা প্রজ্বলিত করে রেখেছে। তা ছাড়া "His whole life's work is a stimulating defence of the reality of common sense."

রাশিয়া, চীন, ভারত, পোর্তুগাল এবং সর্বশেষে ভিয়েতনাম সম্বন্ধে রাসেল বিশেষরূপে আগ্রহান্বিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ছিল পূর্ণ সমর্থন। তিনি ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতিত্ব করেছেন। গান্ধীজীর সব নীতি তিনি মানতেন না, কিন্তু মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে এবং তিনি যে 'মহাত্মা' তাও স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর জীবনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, গান্ধীজী প্রথমবার আফ্রিকায় পৌঁছে ভারতীয় বলে যে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে। না হলে ছেলেবেলা থেকে ঐ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কোনো আভাস পাওয়া যায় নি। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাসেল বলেছেন :

"To build him up psychologically from European [illegible] Christian saints with mediaeval ecclesiastics, adding to both, however, something of the sweetness of St. Francis."

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ নাৎসী কিংবা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে সফল হতো কি না সে সম্বন্ধে রাসেল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শেষ জীবনে আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিজে লণ্ডন শহরে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন। ১৯৬৩ সালে কমিটি অব হাণ্ড্রেড-এর সভাপতিত্ব পদ ত্যাগ করবার সময়ও তিনি বলেছেনঃ "I am still a beleiever in mass civil disobedience." নিশ্চয়ই গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত থেকে এ বিশ্বাস তিনি পেয়েছেন।

১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করবার পর এ বিষয়ে তিনি জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লেখেন তাতে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। চীনের প্রতি রাসেলের পক্ষপাত ১৯২১ সালে সে দেশ ভ্রমণের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। 'দি প্রবলেম অব চায়নায় (১৯২২)' চীন সম্বন্ধে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার অনেকগুলি যে সত্য তা এখন দেখা যায়। তাঁর চোখে চীনারা আর্টিস্টের জাত; আর্টিস্টের যেসব দোষ-ত্রুটি থাকে এই জাতটারও তাই আছে। তিনি বলেছিলেন, দারিদ্র্য চীনকে বলশেভিজমের পথে নিয়ে যাবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার চীনের জনসাধারণ কোনো অভিযোগ না করে নীরবে সকল পীড়ন সহ্য করেছে। কিন্তু এরাই ভবিষ্যতে সমাজবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অদম্য গতিতে এগিয়ে যাবে; হয়তো দেশের সীমানার বাইরে প্রভুত্ব বিস্তারের লিপ্সাও জাগবে। নিজেদের শক্তিতেই চীনারা প্রাধান্য লাভ করবে, বাইরের কোনো শক্তির সমর্থন প্রয়োজন হবে না। সাম্প্রতিককালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়িতে তিনি একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন।

প্রায় একশ' বছরের ঘটনাবহুল জীবনের মোটামুটি পরিচয় দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। রাসেল সম্বন্ধে সর্বাগ্রে যে কথাটি মনে পড়ে তা হলো, তিনি ছিলেন এক অসামান্য জীবন-শিল্পী। জীবনকে ভালোবেসেছিলেন গভীরভাবে। তাই সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকলেও জীবন তাঁর কাছে কখনো দুর্বহ হয় নি। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, মানুষ কেন অসুখী হয় তার নানা কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু একঘেয়েমির ক্লান্তি যে সুখের কত বড় শত্রু তার যথার্থ গবেষণা হয় নি। এক-[illegible]

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার স্মৃতিভবনের শিলান্যাস করছেন শ্রীমতী গান্ধী

শেষ পর্যন্ত কি পশ্চিমবঙ্গে অবধারিতভাবে যুক্তফ্রন্ট শেষ হতে চলেছে? উপরি-উক্ত প্রথম লাইনটি দিয়ে বিগত কয়েকটি সংখ্যারই বঙ্গদর্শন আরম্ভ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু যে-কোন বিশ্বাসেই হোক লাইনটি লিখতে গিয়েও লিখি নি। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার ওই নির্মম সত্যটিকে কথার আড়ালে চেপে রাখা যাবে না, যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ ফাটলের মূল এত গভীরে যে, তা জোড়া লাগানোর কোন উপায়ই নেই। আজকে এ কথা সকলেই স্বীকার করছেন, যুক্তফ্রন্ট বলে আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই, যুক্তফ্রন্ট বিযুক্তফ্রন্টে পরিণত হয়েছে।

দায়ী কে—বাংলা কংগ্রেস না মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, এ প্রশ্ন অবান্তর। অন্তত সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে, তবে কেউ যে কারোর চেয়ে কম যায় না, সেটা আপাতত পরিষ্কার। তার চেয়েও যা পরিষ্কার তা হচ্ছে, এই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দলের স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিকিয়েছে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে নেতারা কোন্দল করছেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন কটূক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে লোকচক্ষে নিজেদের হেয় করা ভিন্ন তাঁরা আর কিছুই করেন নি।

গত ৫ই জানুয়ারী বিধান অধিবেশনে এই প্রসঙ্গে যুক্তফ্রন্টের স জনৈক সদস্য যা বলেছেন তা প্রণি যোগ্যঃ তিনি বলেন, যুক্তফ্রন্টের শ কালে আমরা ধ্বংসের পথে চলেছি। এগার মাসে আমরা এমন উস্কানিম দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তৃতা জনসাধার শুনিয়েছি—যার ফলে সারা দেশের ে আজ উত্তেজিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উঠেছে। বাংলা দেশের এই দায়িত্বজ্ঞ হীনতার জন্য আজ এখানকার প লক্ষ লোক বেকার। তারা আজ বলি হ যুক্তফ্রন্টের কার্যকলাপের ফলে অনে গুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান উঠে যাবার ম অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই অ নিজেদের সরিয়ে নিয়ে গেছে, কয়েক কোম্পানী পশ্চিম বাংলায় কারখানা খুলে অন্য রাজ্যে খুলেছে। লক্ষ ল বাঙালী ছেলের কর্মসংস্থানের সুযে আমরা হারিয়েছি এবং প্রতি মুহূর্তে হারাচ্ছি। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এর জন্য বিশেষভা দায়ী। তিনি বলেন, যে কেরলে নাম্ব দ্রিপাদ মন্ত্রিসভা রাজ্যে শিল্প বিস্তারে জন্য বিড়লাকেও ডেকেছে, আর আমাদে যুক্তফ্রন্ট বাঙালী ব্যবসাদারদের উচ্ছে করে চলেছে।

উক্ত সদস্য আরও অভিযোগ করে এই সরকারের মন্ত্রীরা কেউ কেউ আদা লতের রায় সম্বন্ধে অনেক সময় অনে কথা বলে থাকেন, কিন্তু এই আদালতে বিচারপতি শ্রীশম্ভুচন্দ্র ঘোষের রবীন্দ্র সরোবরের রায় যুক্তফ্রন্টের স্বপক্ষে ছিল বলে সেটিকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। তবে কি আদালতের রায় যুক্তফ্রন্টের বিপক্ষে গেলেই তা মন্দ, স্বপক্ষে এলে ভাল? এ নীতি কি সুবিধাবাদী নয়? বিধানসভায় শুকর-ছানার মত গাদা গাদা আইনের জন্ম দেওয়া হচ্ছে। আদালত না থাকলে কে বা কোন্ প্রতিষ্ঠান তার ব্যাখ্যা করবে? মন্ত্রী? সরকারী কর্মচারী? মানুষে মানুষে বিরোধ, রাজ্য সরকারের সঙ্গে নাগরিকের বিরোধ হলে নাগরিক যাবে কোথায়? আদালত না থাকলে কেনই বা এত আইন বিধিবদ্ধ করা হচ্ছে? শরিকী সংঘর্ষকে যাঁরা শ্রেণী-সংঘর্ষ বলে চালাতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—শ্রেণী-সংগ্রাম যদি আপনারা চান, তা হলে তা থামাবার জন্য দফায় দফায় বৈঠক কেন? আসলে এ সব হল দল বৃদ্ধির চেষ্টা ও শক্তির দম্ভ প্রকাশ। দলীয় মন্ত্রীর দপ্তর আজ কার্যত হয়ে উঠেছে মন্ত্রীর পার্টির জমিদারী। মনে হচ্ছে যে, সরকারী কর্মচারিগণও আজ যেন দপ্তরের মাথায় অধিষ্ঠিত মন্ত্রীর দলের সদস্য।

বলাই বাহুল্য উক্ত সদস্যের বক্তব্য

চেহারাটাই ফুটে উঠেছে। যৌথ দায়িত্ব-বোধ যেখানে অস্বীকৃত, সেখানে সহনশীলতা থাকতে পারে না, প্রতিটি দপ্তরই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের দলীয় জমিদারীতে পরিণত হয় এবং সে বিষয়ে কোন কথা বলতে গেলেই তা অধিকারে হস্তক্ষেপের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, যুক্তফ্রন্টের শাসন প্রবর্তিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য ও শ্রমিক জীবনে অভূতপূর্ব জাগরণ এসেছে, কিন্তু এই জাগরণকে দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়েই শরিক দলগুলি অনর্থ ঘটিয়েছেন, শুরু হয়েছে হানাহানি, সরকারী দপ্তরগুলি মন্ত্রীরা দলীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন, ফলে বত্রিশ দফা কর্মসূচীও শিকেয় উঠেছে।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এর চেয়েও শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গে কার্যত এখন কোন সরকারই নেই, প্রত্যেকটি বিভাগই চলছে অত্যন্ত গতানুগতিক ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনভাবে। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি অবস্থাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন, যেখান থেকে আর এগিয়েও যাওয়া যায় না, পিছিয়েও আসা যায় না। আজ যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায় তবে বিকল্প ব্যবস্থা কি? বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া বলছেন মিনিফ্রন্ট। এই একজন মন্ত্রীই প্রকাশ্যভাবে মিনিফ্রন্টের কথা এখানে-ওখানে বলে বেড়িয়েছেন। হয়ত অনেকেই মনে মনে এ কথা ভাবছেন। কিন্তু শুধু মিনিফ্রন্ট তো গঠিত হলেই চলবে না, তাকে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে হবে এবং যদি মাঝখানে তা ভেঙে যায় তা হলেই সর্বনাশ, মিনিফ্রন্টের শরিক দলগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন, কাজেই এটা বড় কঠিন ঝুঁকি, তাই অনেকের মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও বাস্তব ও দলীয় অবস্থা বুঝে এ ঝুঁকি নিতে অনেকেই নারাজ, কাজেই সরকার অসভ্য ও বর্বর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে না থেকে উপায় নেই, বাংলা কংগ্রেস সহ অনেক দলেরই যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে এবং সেখানে থাকা সম্পর্কে এই মনোভাব।

সি-পি-এম-এর অবস্থাটাও খুব সুখকর নয় এবং তাঁরাও যে নীতি গ্রহণ করেছেন সেটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। বাংলা দেশে নিজেদের প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ সচেতন এবং তাঁরা মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মিনিফ্রন্ট গঠিত হলে রক্তগঙ্গা বইবে। তাঁদের আগ্রাসী নীতির পরিবর্তন না করলে শেষ পর্যন্ত কিন্তু মিনিফ্রন্টের জয় হবে। যে ভুলটা তাঁরা কেরলে করেছেন তার কি পুনরাবৃত্তি এখানেও হবে? খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, যুক্তফ্রন্ট এখন আর নেই, বিভিন্ন দলের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য তার মৃতদেহটাকে এখনো পর্যন্ত কবরস্থ করা হয় নি। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে দুটি শক্তি পোলারাইজড হয়ে গিয়েছে। সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, শুধু বাদ সাধছে কয়েকটি দল, যারা আশঙ্কা করছে মিনিফ্রন্ট যদি না টেকে তাহলে তারা নির্মূল হয়ে যাবে, কাজেই তারা শ্যাম ও কুল দুদিকই রাখার চেষ্টা করছে। যদি সি-পি-এম তার আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে এবং আন্তরিকভাবেই সমঝোতা ও সহযোগিতার পথে আসে, তা হলে এই সব দলগুলি তার অনেক নিকটবর্তী হবে। কিন্তু যদি সি-পি-এম তার আগ্রাসী মনোভাব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে ওই মধ্যবর্তী দলগুলিকে অনিবার্যভাবেই মিনিফ্রন্টের শিবিরে ঠেলে দেওয়া হবে। সি-পি-এম-এর আগ্রাসী নীতি যদি ওদের মিনিফ্রন্টে যেতে বাধ্য করে, তা হলে কিন্তু ওই ফ্রন্ট টিকে যাবে কেরলের মত, দাশগুপ্ত মহাশয়ের রণহুংকার তখন আর কার্যকর হবে না।

আমাদের বক্তব্য হল, দুতরফই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে শুধু যে যুক্তফ্রন্টেরই সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন তাই নয়, নিজেদেরও সর্বনাশ তাঁরা নিজেরা ডেকে আনছেন। তাই বর্তমান নিবন্ধের সর্বশেষ অংশে একটি তথাকথিত অরাজনৈতিক উপদেশ পরিবেশন করছি। আশা করি সংশ্লিষ্ট দলগুলি ভেবে দেখবেন। ভারতবর্ষে বিপ্লব আসবার বহু দেরী, আদৌ তা আসবে কি না সন্দেহ, ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক পরিবেশ এমনই বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন স্তরভুক্ত, যে আপাতত তেমন কোন দুরাশা পোষণ না করাই ভাল। পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কমিউনিস্ট বা ওই ধরনের পার্টিগুলির কৃতিত্ব এমন কিছু আহামরি নয়, তাদের আবেদন ভারতের দু-একটি রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অতি সম্প্রতি কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু প্রেরণা এসেছে। এবং সর্বহারার বিপ্লব এ দেশে যেদিন আসবে তা রণেনবাবুদের বা প্রমোদবাবুদের ঘাড়ে ভর করে আসবে না। আপাতত সংসদীয় গণতন্ত্র ছাড়া কোন গতি নেই, আর বর্তমান নেতারা বরাবর ওই আবহাওয়াতেই কাটিয়ে এসেছেন, নির্বাচনটাই তাঁদের হাড়ে সহ্য হয়, ওতেই তাঁরা অভ্যস্ত। কাজেই দৌড় যখন ওই ভোটের আসর পর্যন্তই, তখন নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি না করে, অনর্থক শক্তির অপব্যয় না করে, সংসদীয় রীতিতেই বত্রিশ দফা কর্মসূচী পালনে তৎপর হোন, তাতে আখেরে প্রত্যেক দলেরই লাভ হবে। আন্তরিকতা থাকলে এই কাঠামোর মধ্যেও অনেক কিছু করা যায়। এবং গোড়ার দিকে, যখন মন্ত্রিসভার মধ্যে একটা টীমওয়ার্ক ছিল, তখন যুক্তফ্রন্ট যে কিছু করতে পারে নি তা নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিও আমাদের একটি নিবেদন আছে। তাঁর সততার খ্যাতি আছে, যে সততার মধ্যে কোন সিলেক্টিভিটি থাকা উচিত নয়। কাজেই কোন বিশেষ দপ্তরের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে সকল দপ্তরের প্রতিই তা রাখা উচিত, সেই সকল স্থানে ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে কি না। স্বরাষ্ট্র দপ্তর সি-পি-এম-এর স্বার্থে কাজ করছে মেনে নিলেও এ কথা কি বলা যায় যে, এই অপবাদ থেকে শিল্প-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেচ, আইন দপ্তরগুলি মুক্ত? দু-একজন ছাড়া প্রত্যেকটি মন্ত্রীই নিজের পার্টির স্বার্থে ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণও আছে। আর গণ্ডগোলটা সেইখানেই। এখনো সময় আছে সাবধান হবার এখনো অবস্থার সামাল দেওয়া সম্ভবপর, যদি সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকে।

### সংগ্রহনীতি

সত্য বলতে কি বেশ কিছুকাল ধরেই যুক্তফ্রন্ট সরকার না থাকার অবস্থায় থাকার দরুণ এমন একটি অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের নানাপ্রকার গভীর সমস্যাই বঙ্গদর্শনে আলোচিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদিও ইতিপূর্বে আমরা নানা সমস্যা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনার সুযোগ পেয়েছি, যা ইদানীং পাচ্ছি না। তার কারণ, সরকারই যেখানে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত টলমল করছে, সেখানে সরকারী নীতি সম্পর্কে আলোচনা করার মত মানসিক অবস্থা যে থাকে না সেকথা বলাই বাহুল্য। যদিও যুক্তফ্রন্ট সরকার বরাবর বলে আসছেন যে, তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থ দেখবেন, কার্যত, একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, জনগণের প্রতি মুখে তাঁরা অনেক ভাল ভাল কথা বললেও বাস্তবে যে নীতি তাঁরা গ্রহণ করেছেন তা জনস্বার্থবিরোধী। নিত্যব্যবহার্য পণ্যসমূহের দাম গত কয়েক মাসে দ্বিগুণ হয়েছে, এ বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার নীরব দর্শকমাত্র। এ সব তুচ্ছ বিষয়ে বোধ হয় তাঁদের মাথা ঘামানোর সময় নেই, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য কি করে পার্টির স্বার্থ দেখা যায়।

একথা সকলেই জানেন এবারে ধানের ফলন ভাল হয়েছে এবং ১৯৬৯ সালে যে চালের দাম মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি তার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার অনেক কৃতিত্বের দাবি করেছেন, যদিও সেই কৃতিত্বটা উপরি পাওনা কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ

আছে। সে যাই হোক, ১৯৭০-এ ১৯৬৯-এর পুনরাবৃত্তি হবে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা সম্ভবত মূর্খের স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন, কেন না এবারে পর্যাপ্ত ফলন হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৯-এর পুনরাবৃত্তি না হয়ে ১৯৬৭-র পুনরাবৃত্তিই আশংকা করা যাচ্ছে। এর কারণ, এখনো পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট সংগ্রহনীতি অবলম্বন করা হয় নি। এ সব বিষয়ে দৃষ্টি দেবার অবকাশ মন্ত্রীদের নেই। ইতিমধ্যে সমস্ত ধানই গোলায় উঠে গেছে, অথচ তা সংগ্রহের কোন ভাল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি, যথাস্থানে লেভীর নোটিশও দেওয়া হয় নি, সংগ্রহকারী অফিসারদের কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নি। উপরন্তু এই ক্ষেত্রে সরকারের দূরদর্শিতা ও কর্মক্ষমতার অভাবের সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু চাল-কল ও এক শ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ঐ কলওয়ালারা মোটা ঘুষের বিনিময়ে অফিসারদের সাহায্যে নিকৃষ্ট ও নিম্নস্তরের চাল সর্বোৎকৃষ্ট চালের দামে সরবরাহ করছে। এবং ওই নিম্নস্তরের চালই রেশন দোকান মারফত বিক্রয় করা হবে এবং জনসাধারণকে তা কিনতে বাধ্য করা হবে সর্বোচ্চ মূল্যে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যাঁরা শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মঙ্গলের মনোপলি নিয়ে বসে আছেন, সেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা এ বিষয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করছেন না, পারস্পরিক কটূক্তি বর্ষণ করেই রাজকার্য সমাধা করছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমরা অতিবড় সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এই অপদার্থতার বিরুদ্ধে মুখ না খুলে পারছি না।

**মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিরক্ষা**

বিগত ৫ই জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতার দিলখুষা স্ট্রীটে একটি হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বর্তমান যুগ অতীতের মহৎ ব্যক্তিদের ভুলে যেতে বসেছে। বিলম্বে হলেও মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু যে করা হচ্ছে, তার জন্য উদ্যোক্তারা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের যোগ্য। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও, রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ও বাংলা দেশে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং উদাহরণ সংযোগে দেখান যে, সেই যুগে কংগ্রেসের নেতাদের নিকট দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকের কথা বলতে গিয়ে অশ্বিনীকুমার কিভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও মহাত্মা অশ্বিনীকুমার সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন।

## নেতাজী প্রদর্শনী

(বিশেষ প্রতিনিধি)

**ফরওয়ার্ড** ব্লক তাঁদের নবম সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ময়দানে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করা এবং ভারতবর্ষে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মূল বক্তব্যকে জনসাধারণের নিকট তুলে ধরা এই প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য। গত ২৩শে জানুয়ারী পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীহেমন্তকুমার বসু এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় দিক। কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ এইগুলি জন-সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। চরমপন্থী রাজনীতির আদর্শ বাংলা দেশে কিছু নূতন নয়। শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের সময় থেকেই চরম-পন্থী রাজনীতি বাংলা দেশের তরুণ-দের বিপ্লবী আন্দোলনের পথে নিয়ে গেছে এবং এই বিপ্লবীরা যেসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছেন, তা প্রতিটি বাঙ্গালীর কাছেই কৌতূহলোদ্দীপক। এই মণ্ডপটি উদ্বোধন করতে গিয়ে বাংলা দেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু নেতাজী সুভাষ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। বিলম্বে হলেও জ্যোতিবাবু যে তাঁর দলের ভুল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন সেজন্য দেশবাসী নিঃসন্দেহে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন।

সিরাজ মণ্ডপে মুর্শিদাবাদ নবাব প্রাসাদ থেকে বিভিন্ন রকম জিনিস আনা হয়েছে। মুর্শিদকুলী, আলিবর্দী ও সিরাজের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস দর্শককে চমকিত করে। সিরাজের ব্যবহৃত কেদারা, তরবারি, কুঠার, বন্দুক, পতাকাদণ্ড প্রভৃতি এই মণ্ডপটির বিশেষ আকর্ষণ। এই মণ্ডপটির উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেছেন খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা মোল্লা জান মহম্মদ। এই মণ্ডপ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রদর্শনীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নির্মল বসু বললেন, "সিরাজ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের ফলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সিরাজ ও নেতাজী এই দুই বীরকে একসঙ্গে জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। ইংরেজেরা সিরাজকে কলঙ্কিত করতে যে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' তৈরী করেছিলেন সেই মনু-মেন্ট অপসারণের আন্দোলন সুভাষচন্দ্র সুরু করেন। 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের আন্দোলন আমাদের স্বাধী-নতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নেতাজী প্রদর্শনী উপলক্ষে সিরাজের শৌর্য-বীর্য ও পুরাতন
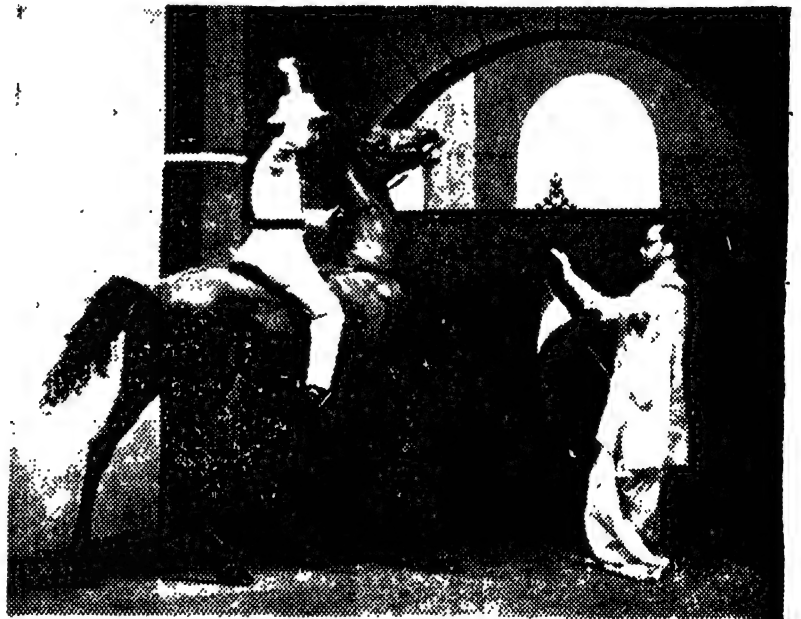
**ছাব্বিশে জানুয়ারী ১৯৩১ মেয়র সুভাষ চন্দ্র স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে মার খাচ্ছেন।**

বিপ্লবীদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র
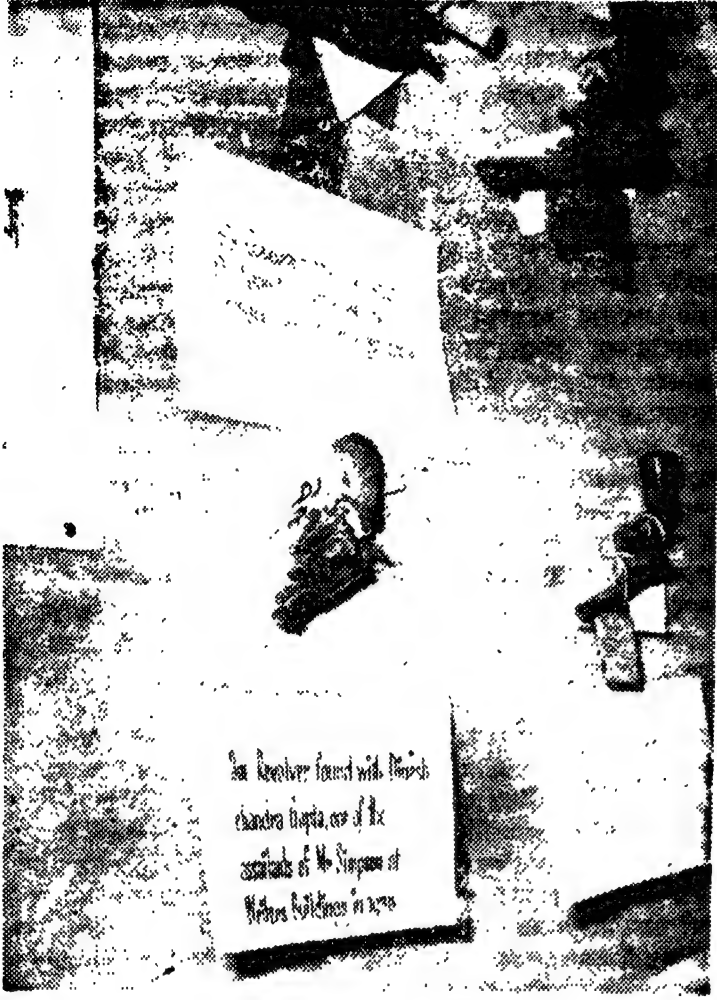
ইতিহাসের কাহিনী তুলে ধরার ফলে দেশে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আরও শক্তি-শালী হবে।"

নেতাজীর জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন করে ৬০টি প্যানেলে নেতাজী-মণ্ডপ সুসজ্জিত হয়েছে। কৃষ্ণনগরের প্রখ্যাত শিল্পী কার্তিকচন্দ্র পাল ও তাঁর সহকর্মীরা এই মূর্তিগুলি গড়েছেন। এই মণ্ডপটি দর্শকদের নিকট খুবই উপ-ভোগ্য হয়েছে। এরই পাশে আছে নেতাজীর জীবনী অবলম্বনে একটি সুন্দর ফটোগ্রাফের প্রদর্শনী। শৈশব থেকে সুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনী ফটোর মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করেছেন কর্তৃপক্ষ। এটি নিশ্চয়ই উপভোগ্য হয়েছে। তবে আরও একটু দৃষ্টি দিলে হয়তো আরও ভাল হত। এর পরেই দ্রষ্টব্য হল 'পোস্টার প্রদর্শনী'। সুভাষচন্দ্রের অর্থ-নীতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তা, সোভিয়েটে পরিকল্পনার উদ্ভব, সুভাষচন্দ্র কর্তৃক ভারতে জাতীয় পরি-কল্পনা কমিটি গঠন ইত্যাদি বিষয় পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া আর একটি 'পোস্টার প্রদর্শনী'ও আছে। প্রদর্শনীটির শিরোনাম হল, 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।' সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চিন্তাই শুধু করেন নি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধেই সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ড, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি কিভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন—তা এই প্রদর্শনী মারফত দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কিভাবে শক্তিশালী হয়েছিল—তাও দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। ভিয়েৎনাম, কিউবা, আরব দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশে যে সংগ্রাম চলছে—তাও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর পরি-চালনায় যে মণ্ডপটি তৈরী হয়েছে, তাতে সুভাষচন্দ্রের লেখা অনেকগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে। এ চিঠিপত্রগুলি সত্যই আকর্ষণীয়। ৩১শে নভেম্বর, ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে সুভাষ-চন্দ্র শরৎচন্দ্র বসুকে যে ঐতিহাসিক পত্রটি লিখেছিলেন তা পাঠ করলে বর্তমান কংগ্রেস দলের নেতাদের চরিত্র বুঝতে একমুহূর্ত বিলম্ব হয় না। পত্রের একটি অংশ এইরূপঃ

"The more I think of Congress politics, the more convinced I feel that in future we should devote more energy and time to fighting the High Command. If power goes into the hands of such vindictive and unscrupulous persons when Swaraj is won, what will happen to this Country? If we don't fight them now, we shall not be able to prevent power passing into their hands."

এই মণ্ডপটিতে নেতাজীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, তাঁর লেখা গ্রন্থ ও তাঁর সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থও আছে।

এ ছাড়া লেনিন মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। এই মহাবিপ্লবীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষেই এই আয়োজন। সোভিয়েট দূতাবাস প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে লেনিনের বিভিন্ন চিত্র দিয়ে সাহায্য করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ, ভারতীয় রেলওয়ে, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও স্টল দিয়েছেন। সাধারণ প্রদর্শনীতে আমোদ-আহ্লাদের জন্য যে সব আয়োজন হয়ে থাকে তা এখানেও আছে।

প্রতিদিন প্রদর্শনীটি দেখতে আস-ছেন অসংখ্য লোক। নেতারাও আসছেন একে একে। প্রধানমন্ত্রীও এসেছেন, রাষ্ট্রপতিও সম্ভবত আসবেন। ফরোয়ার্ড ব্লককে ধন্যবাদ এই কারণে যে, তাঁরা এই প্রদর্শনীটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই করেন নি। দলমত-নির্বিশেষে বিভিন্ন জননেতাকে তাঁরা এখানে নিয়ে এসেছেন। সুভাষচন্দ্রের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাঁরা যে ভুলে যান নি—এ জন্য সাধারণ মানুষ খুশী না হয়ে পারেন নি। প্রদর্শনীটি এক কথায় অত্যন্ত সুন্দর। সম্ভবত বর্তমান অবস্থায় এ ধরনের একটি প্রদর্শনীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। দেশের মানুষ স্বল্পকালের জন্য হলেও স্বদেশী ভাব-স্রোতে অবগাহন করে নিজেদের কৃতার্থ করার সুযোগ পাবেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রদর্শনীটি অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

## বিহার-পরিস্থিতি

বিহারের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী কে বি সহায় প্রমুখ ছয় জন সদস্যের (কে বি সহায়, মহেশপ্রসাদ সিংহ, সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, অম্বিকা-শরণ সিংহ, রামলক্ষ্মণ সিং যাদব ও রাঘবেন্দ্রনারায়ণ সিং) বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে বিহারের তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার যে কমিশন নিয়োগ করেছিল, তার রায় বেরিয়েছে। তদন্তে ছয় জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীটি এল ভেঙ্কটরামা আয়ারের নেতৃত্বে এক সদস্য সমন্বিত এই কমিশন বিহারের রাজ্যপালের কাছে তার তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেছেন। তদন্ত কমিশন কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের অন্যতম যে গুরুতর অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে, সেটি হল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে বি সহায় তাঁর দুই পুত্র ও একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নামে একটি খনির ইজারা মঞ্জুর করেন। শ্রীমহেশপ্রসাদ সিংহ একটি ঠিকাদার সংস্থার কাছ থেকে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার মত উৎকোচ নিয়েছেন বলে কমিশন রায় দিয়েছেন।

* * *

এস-এস-পি নেতা শ্রীরামানন্দ তেওয়ারী আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও এস-এস-পি দলকে নিয়ে সদ্য-গঠিত সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতৃপদ ত্যাগ করেছেন। ফলে, সংযুক্ত বিধায়ক দল কার্যত ভেঙে গেছে এবং নব কংগ্রেসের দারোগা রাইয়ের নেতৃত্বে বিহারে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

## এ-আই-টি-ইউ-সি'র গুন্টুর অধিবেশন

এ-আই-টি-ইউ-সি'র বহু বিতর্কিত গুন্টুর অধিবেশন শেষ হয়েছে। মার্ক্স-বাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সরকারীভাবে এ অধিবেশন বর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত এস এস মিরাজকর, মহম্মদ ইসমাইল প্রমুখ প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতার নেতৃত্বে কয়েকজন মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট নেতা ও কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। শ্রীমিরাজকর এ-আই-টি-ইউ-সি'র নতুন কার্যকরী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অবশ্য শ্রীমিরাজকরকে দল থেকে বহিষ্কৃত করেছেন।

## গুপ্ত মন্ত্রিসভার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আদি কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত (সি বি গুপ্ত) নিজের মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখার জন্য এমন কোন কৌশল নেই, যা অবলম্বন করছেন না। এদিকে ১১ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভার অধিবেশনে নব কংগ্রেস ও বি-কে-ডি যুক্তভাবে গুপ্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ক শুরু হওয়ার পূর্বেই অনাস্থা প্রস্তাবের উপর যাতে ভোটাভুটি আহ্বান করা হয়, তার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। বি-কে-ডি দলের নেতা শ্রীচরণ সিং বলেছেন গুপ্ত মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্য তিনি শপথ নিয়েছেন। আদি কংগ্রেসের নেতা ডঃ রামসুভগ সিং চরণ সিংয়ের চ্যালেঞ্জে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিধান-সভার অধিবেশন শুরু হবার পূর্ব-মুহূর্তে তিনি ব্যাপকভাবে দলত্যাগের আশংকা করেছেন যদিও দলত্যাগ রোধে তিনি সর্বতোমুখী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। জনসঙ্ঘ, এস-এস-পি দলের নেতারাও বসে নেই।

**পশ্চিম এশিয়া:**

সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ও ফরাসী রাষ্ট্রপতি জর্জ পম্পিদুর কাছে পৃথক পৃথক চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, ইজরায়েল যদি আরব-জগতের ওপর হামলা বন্ধ না করে, তবে সোভিয়েট য়ুনিয়ন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। পাল্টা আক্রমণ বা যুদ্ধের পথে অগ্রসর হবার জন্য আরব দেশগুলি যে চেষ্টা করছে, সোভিয়েট য়ুনিয়ন না থেকে আর তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবে না।

আলেক্সি কোসিগিন তাঁর চিঠিতে বলেছেন, প্রতিদিন যেভাবে ইজরায়েল আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, বর্তমানে তা বিপদসীমায় এসে পৌঁছেছে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষে এ অবস্থায় আর নীরব দর্শকের মত বসে থাকা সুন্দর নয়।

কূটনীতিবিদদের ধারণা, এই চিঠির অর্থ সোভিয়েট য়ুনিয়ন আরবদের আরও বেশি করে অস্ত্র সাহায্য দেবে। কোসিগিন অন্তত নিক্সনকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইজরায়েলকে নিবৃত্ত না করে, তবে সোভিয়েট য়ুনিয়ন আরবদের অস্ত্র সাহায্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে।

কোসিগিনের চিঠির প্রতিক্রিয়া সর্বত্র শুরু হয়েছে। ওয়াশিংটন, লন্ডন ও প্যারিসে পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তারা এই চিঠির বিষয় ভাল ভাবে বিবেচনা করে দেখছেন। রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন অবশ্য কোসিগিনকে সতর্ক করে দিয়েছেন, আরবদের জন্য সোভিয়েট অস্ত্র সাহায্য বৃদ্ধি করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইজরায়েলকে বেশি করে সাহায্য দেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে আরও বেশি অস্ত্র সাহায্য দেবে, এতে বিস্মিত হবার কি আছে। ইজরায়েলের আসল জোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সাহায্যই তার বীরত্ব, তার যত লম্ফ-ঝম্প। সম্প্রতি কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল নিক্সন সরকার পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে শান্তির কথা বলায়। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার থেকে শুরু করে অন্যান্য ইজরায়েলী নেতারা সবাই ভাবছিলেন, এ কি হল? মার্কিন সরকার আরবদের সঙ্গে আপোষ চায়! কিন্তু, না, এ সন্দেহ দূর হয়েছে। মার্কিন ইহুদী নেতাদের কাছে নিক্সন পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইজরায়েল নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি—ইজরায়েলের স্বার্থে যা করা প্রয়োজন সবই করবে তাঁর সরকার। ইজরায়েলের সাহায্যের পরিমাণও বাড়ানো হবে। প্রধান মার্কিন ইহুদী সংস্থাসমূহের সভাপতিদের সংঘের (Conference of Presidents of Major American Jewish Organisation) প্রতিনিধি দলকে এই আশ্বাস দিয়েছেন নিক্সন। গোল্ডা মেয়ার তেল আভিভ থেকে ২৬শে জানুয়ারী যে সরকারী বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে নিক্সনের এই প্রতিশ্রুতির উল্লেখ আছে। ইজরায়েলী নেতারা খুশি। এতে তাঁরা আরও প্রশ্রয় পাবেন। আরবদের বিরুদ্ধে আরও জোর আক্রমণ চালাবেন। আরো মার্কিন অস্ত্র যখন আসবে, তখন আরও আক্রমণ চালাও।

একদিকে মার্কিন সাহায্য, আর অপর দিকে সোভিয়েট সাহায্য—দুই পক্ষই অস্ত্র শানাচ্ছে। এই অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে বড় রকমের সংঘর্ষ সুরু হয়ে যেতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট কিন্তু এখনও আশা ছাড়েন নি। তিনি নাসেরকে সংযত থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। চতুঃশক্তি বৈঠকের ওপর তাঁর এখনও ভরসা আছে। 'ফরাসী রাষ্ট্রপতি জর্জ পম্পিদু শীগগীরই ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। সেখানে তিনি নিক্সনের সঙ্গে আরব-ইজরায়েল বিরোধ নিয়েও আলোচনা করবেন। উ থাণ্ট আশা করছেন, এই আলোচনার ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে।'

**ফ্রান্স:**

ফ্রান্স সম্প্রতি লিবিয়াকে ১০০টি মিরেজ জেট বিমান বিক্রয় করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমী দেশগুলি খুব চটেছে। অবশ্যই এই সব জিনিষ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

[illegible] ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর প্রতিরক্ষা কমিটির কাছে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেবরে বলেছেন, আগামী চার বছরে ফ্রান্স লিবিয়াকে আরও সমরোপকরণ দেবে।

দেবরে বলেছেন, ফ্রান্স এই সাহায্যের বিনিময়ে লিবিয়ার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে, প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশে চাদে বিদ্রোহীদের কোন সাহায্য দেবে না লিবিয়ার বর্তমান বিপ্লবী সরকার। তিউনিসিয়ার ব্যাপারেও নাক গলাবে না লিবিয়া। চাদ ও তিউনিসিয়া, দুই-ই ফ্রান্সের একান্ত অনুগত।

আসলে তেলের স্বার্থে লিবিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের এই মৈত্রী-সম্পর্ক। বছরে ফ্রান্স লিবিয়া থেকে ২০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের জিনিষ আমদানী করে, আর এর প্রায় সবটাই তেল। ফ্রান্সে তেল সরবরাহকারীদের মধ্যে আলজিরিয়া আর ইরাকের পরেই লিবিয়ার স্থান। আলজিরিয়ার সঙ্গে বর্তমানে ফ্রান্সের কিছুটা মনোমালিন্য সুরু হওয়ায়, তেলের জন্য লিবিয়ার ওপর তার নির্ভরতা বেড়েছে। তা ছাড়া ফ্রান্স প্রতি বছর প্রায় ৩৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের জিনিষ লিবিয়ায় বিক্রি করে।

সুয়েজ খাল হাতছাড়া হবার পরেও পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায়, অর্থাৎ সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ফরাসী অর্থনৈতিক স্বার্থ যথেষ্ট রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ইজরায়েল-ঘেঁষা ও আরব-বিরোধী নীতি অনুসরণ করে এই স্বার্থ রক্ষা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, যেভাবে আরব জগতে সোভিয়েট প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতেও বিচলিত বোধ করার কারণ আছে। তাই ফ্রান্স আরবদের সামরিক সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ করেছে। আরবদের মন জয় করতে হলে এখন সবচেয়ে ভাল পথ সামরিক সাহায্য-দান।

[২০৫৪ পৃষ্ঠার পর]

দেন নি। বিয়ে করেছেন চারবার; শেষ বিয়ে হয়েছে আশি বছর বয়সে। নানা বিষয়ের বই লিখেছেন প্রায় পঁচাত্তরটি: গণিত, জ্যামিতি, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান, গল্প ইত্যাদি। লেখা ছাড়া করেছেন অধ্যাপনা, সভায় এবং বেতারে বক্তৃতা, দেশভ্রমণ, সত্যাগ্রহ। তাঁর লেখা ও বক্তৃতা পাঠক ও শ্রোতাকে খুঁচিয়ে প্রতিবাদে মুখর করে তুলত। প্রতিবাদ কোনো পক্ষকেই ঝিমিয়ে পড়তে দিত না। অবশ্য প্রতিবাদের তীব্রতা তাঁর শেষ জীবনে ছিল না। কারণ রাসেলের যেসব মতবাদ তাঁর প্রথম জীবনে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, শেষ জীবনে দেখেছেন সমাজ তাদের মেনে

[illegible] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আণবিক অস্ত্র বন্ধ ও বিশ্ব-শান্তির জন্য রাসেল সংগ্রাম করেছেন লিখে, বক্তৃতা দিয়ে এবং সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করে।

এই অম্লান জীবন-শিখার মূল প্রেরণা তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য,—দেহের এবং মনের। রাসেল বলেছেন, স্বাস্থ্য ভালো রাখা নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিধিনিষেধ ছিল না তাঁর। যা ভালো লেগেছে তাই খেয়েছেন। স্বাস্থ্য নিয়ে না ভাবা স্বাস্থ্যরক্ষার সব-চেয়ে ভালো পথ। তাঁর একটি অভ্যাস সুস্থ দেহ সুস্থ রাখবার কারণ। সেটি দৈনিক বেড়ানোর অভ্যাস। প্রতিদিন তিনি দশ পনেরো মাইল হাঁটতেন।

রাসেলের বড় পরিচয় লেখক হিসাবে। শুধু দার্শনিক নন তিনি। দর্শন ছাড়াও অনেক বিষয়ের ওপর বই লিখেছেন। প্রথম গল্পের বই বের হয় ১৯৫৩ সালে—স্যাটান ইন দি সুবার্বস্ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ'। পরের বছর বের হয় আর একটি গল্পের বই। 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথ-মেটিকা' ছাড়া প্রায় সব বই-ই সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের উপযোগী করে লেখা। কঠিন বিষয়কে এমন প্রাঞ্জল করে বলবার দক্ষতা কম লেখকেরই আছে। চিন্তার স্বচ্ছতার জন্যই রচনা এমন সাবলীল হতে পেরেছে। কোনো বিষয় লিখতে বসার আগে রাসেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য কি হবে তা সম্পূর্ণ ভেবে নিতেন। লেখা শুরু করলে পাণ্ডুলিপিতে একটিও কাটাকুটি হতো না, পরিবর্তন বা সংশোধন কিছু করতেন না। পুরনো বইয়ের নতুন সংস্করণেও সাধারণত কোনো বদল হোতো না। লেখকদের তিনি বল-তেন, ভেবেচিন্তে যা লিখবে তা আর পরিবর্তন করবে না, বিশেষ করে অন্যের কথায়।

হেগেল, কাণ্ট প্রমুখের মত রাসেল কোনো দার্শনিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর চিন্তার বনিয়াদ গড়ে উঠেছে সমকালীন ইতি-হাসের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে। আজকের সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন মানব-সভ্যতার ঐতিহ্য এবং মানব-কল্যাণের আদর্শ সামনে রেখে। রাসেল বলেছেন, "Science is what you know, philosophy is what you don't know."

লেখার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কি দিতে চেয়েছেন? "I want to stand at the rim of the world and peer into the darkness beyond, and see more than others have seen, of the strange shapes of mystery that inhabit that unknown night....I want to bring back into the world of men some little bit of new wisdom."

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন কি, কি পেতে পারি দর্শন থেকে? রাসেল বলেছেন: দর্শন আমাদের শেখাতে পারে—"how to live without certainly, and yet without being paralysed by hesitation, is perhaps the chief thing that philosophy, in our age, can still do for those who study it."

রাসেল চেয়েছেন, রাষ্ট্রের নাগরিকরা চিন্তাশীল হবে, নিজস্ব চিন্তার সাহায্যে পথ ও কর্তব্য স্থির করবে, গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবে না। তিনি চিন্তার

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

স্ফুলিঙ্গ বিকীরণ করেছেন যাতে পাঠকের অন্তরে মানস-প্রদীপ প্রজ্বলিত হতে পারে। সমাজের স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা স্বাধীন চিন্তার বিরোধিতা করে:

"Men fear thought more than they fear anything else on earth—more than ruin, more even than death. Thought is subservive and revolutionary, destructive and terrible; thought is merciless to privilege, established institutions and comfortable habits; thought is anarchic and lawless indifferent to authority, careless of the well-tried wisdom of the ages...Thought is great and swift and free, the light of the world, and the chief glory of man."

এই জন্যই সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতারা আমাদের বুলি শুনিয়ে, ধ্বনি শিখিয়ে, বিধিনিষেধ আরোপ করে স্বাধীন চিন্তার পথ থেকে দূরে রাখতে চান। এই জন্যই রাসেল বলেছেন, বিবেকের নির্দেশ মেনে চলবার জন্য রাষ্ট্রের বা অন্য যে কোনো কর্তৃত্বের আদেশ অমান্য করবার অধিকার মানুষের থাকা উচিত।

স্বাধীন চিন্তার ওপর জোর দিয়ে রাসেল ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সমাজ বা গোষ্ঠীকে নয়। তাঁর কম্যুনিজম বিরোধিতার প্রধান কারণ রাশিয়ায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ছোট করে দেখা। ডিমোক্রাসির বদলে স্ট্যালিনের আমলে প্রায় ডিক্টেটর-শিপ এসে গেছে। ফেবিয়ান সোসাইটির সক্রিয় সদস্য হিসাবে সমাজবাদের ওপরে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। কার্ল মার্ক্স-এর রচনাবলী পড়ে এবং ১৯২০ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করে কম্যুনিজমের ওপর তাঁর বিশ্বাস চলে যায়। তাঁর মনে হয়েছে, মার্ক্স-এর চিন্তাধারা ঈর্ষা ও ঘৃণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক প্রয়োজনকেই সবচেয়ে বড় করে দেখা হয়েছে। মানুষের জীবনের অন্য দিক-গুলি উপেক্ষা করে শুধু অর্থনৈতিক জীব হিসাবে তাকে দেখলে কম্যুনিজম এবং ক্যাপিটালিজমের দ্বন্দ্ব কখনো শেষ হবে না, পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। কম্যুনিস্টরাও যে জীবনের অন্য দিকগুলি অস্বীকার করতে পারে না তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রাসেল।

রাশিয়ায় এক অপেরা হাউসে ট্রট্-স্কির সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি রাসেলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যে যুদ্ধের বিরোধিতা করে, শান্তির কথা বলে, এ দেশে তার স্থান নেই।' তারপর নাটকে যখন একটি মধুর প্রেমের দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে তখন সেই কট্টর কম্যুনিস্ট নায়ক আবিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই প্রেম হলো আন্তর্জাতিক ভাষা।'

রাশিয়ার প্রতি বিরূপ ছিলেন বলে একথা কেউ যেন মনে না করেন আমে-রিকার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে তিনি বারবার তীব্র আক্রমণ করেছেন। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীতে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আমেরিকাও তাই করতে চাইছে।

স্বাধীন ব্যক্তি-মানস গড়ে তুলতে হলে চাই উপযুক্ত শিক্ষা। তাই রাসেল স্ত্রী ডোরার সঙ্গে একটি স্কুল পরিচালনা করেছেন শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার

[ শেষাংশ ২০৭১ পৃষ্ঠায় ]

এখন বুঝি চলেছে শুধু শবদেহ আগলাবার রাজনীতি। শবদেহ এখনও গলিত হয় নি, এখনও শবদেহ থেকে দুঃসহ গন্ধ বেরিয়ে আসছে না। মৃতের পরমাত্মীয়রা দেহটি আগলে আছেন, কিন্তু মৃত যতই আপন, যতই হৃদয়ের আত্মীয় হোন না কেন, একবার মৃতদেহ থেকে গন্ধ বেরুতে শুরু করলে তখন আত্মীয়-পরিজনরা মৃতদেহ ফেলে পালাবেন। সম্ভবত এখন এই দৃশ্যটি দেখবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি আর একটা কথা এখনও বলছি—মৃতের আত্মীয়রা কিন্তু এখনও বেশ অনেকদিন মৃতদেহকে আগলে রাখতে চাইবেন। কারণ এই মৃত হল শরিকী বিবাদের দংশনে মৃত। সর্প দংশনে মৃতব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে মৃত হলেও সেই মৃতকে কেউ সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে নিয়ে দাহ করে না, পুড়িয়ে ছাই করে না, অথবা কবর দিয়ে মাটিতে ঢেকে দেয় না। সর্প দংশনের পর বহুপ্রকার ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক করে মৃতের শরীর থেকে বিষ বের করবার চেষ্টা হয়—তারপর কোন ফল না হলে মৃতদেহকে অবিকৃতভাবে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আবার এই ভাসমান মৃতদেহ কখনও যে প্রাণ পায় না এমন নয়। বহু সাপে-কাটা রোগী বেশ কয়েকদিন জলের ওপর ভেলায় ভেসে থেকে বেঁচে উঠেছে—এমন নজীর নেই তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট হল মৃতদেহ, আর যুক্তফ্রন্ট শরিকরা হলেন মৃতের আত্মীয়। শরিকী বিবাদরূপী সর্প দংশনে এই যুক্তফ্রন্টরূপী আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতীকের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশ হল এক অভিনব রাজনীতির উৎসভূমি। সে শুধু আজকেই নয়—বাংলা দেশে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি নিয়ে যা চলছে, এমন ঘটনা শুধু আজই প্রথম নয়, বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে সারা ভারতের চোখের ঘুম কেড়ে নেবার খেলা অতীতেও বহুবার প্রত্যক্ষ করা গেছে। এই গেল, এই গেল, তখন কি হয়, এমনি সব ঘটনা বহুবার বাংলাদেশ সারা ভারতকে উপহার দিয়েছে।

এতদিন যে অবস্থা চলছিল, সেটা প্রায় সহনীয় হয়ে উঠেছিল। সকলেই ভাবতেন যুক্তফ্রন্ট ঝগড়াও করবে আবার ক্ষমতায়ও থাকবে, নিজেরা মারামারি করবে, আবার দেশের মানুষের ভালও করবে, এই পথে বুঝি চলবে। কিন্তু বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হতেই অবস্থার মোড় ঘুরে গেল। একদিকে ভিতরে যুক্তফ্রন্টে অসহনীয় অবস্থা আর বিধানসভায় অসহনীয় অবস্থা—এই দুই-এ মিলে রাজ্যের মানুষের মনের অবস্থা আরো অসহনীয় করে তুললো। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী যুক্তফ্রন্টের সভা বসলো, কিন্তু সেই সভায় বাংলা কংগ্রেস এল না। কেন এল না, তার একটা জবাব অবশ্য বাংলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। চিঠির কয়েক শত শব্দই শেষ কথা নয়। বাংলা কংগ্রেস সভায় কেন যোগদান করলো না বা যোগদান না করে কি অভীষ্ট লাভ করলো, সেটা ভেবে দেখবার কথা।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা কংগ্রেস তার নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ঘরে ও বাইরে যে চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে, যুক্তফ্রন্টের সভা বর্জন হল সেই চাপেরই একটা অঙ্গ। বাংলা কংগ্রেস ভাবছে—সে যত সংকট সৃষ্টি করবে, যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলি তত বেশি আত্মসমর্পণ করবে। আজকের পরিস্থিতি হল এমন যে, বাংলা কংগ্রেস সরকার ভেঙে বেরিয়ে যেতে চাইছে, আর অসহায় স্ত্রী সংসারত্যাগোন্মুখ স্বামীকে নানা সাধ্য-সাধনায় ছলা-কলায় মান-অভিমান-কান্না-চোখের জলে স্বামীকে ঘরে আটকে রাখতে চাইছে। স্ত্রী যত হাতে-পায়ে ধরে বলছে—ওগো তুমি বিবাগী হয়ে যেয়ো না, তুমি চলে গেলে কি হবে সংসারের, কি হবে তোমার নাবালক শিশুদের, স্বামী তত হাত-পা ছুঁড়ে বলছে—কুলটা স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করা চলবে না, পোষাবে না। আমি চলে যাব, যেদিকে দুই চোখ যায়। স্ত্রী চোখের জল মুছে তার মধ্যেই বলছে আমি জানি। আসলে তুমি আমার চেয়ে নব কংগ্রেস সুন্দরীর সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাও, তাই তোমার এত ছটফটানি। বেশ এই যদি তোমার বাসনা, চলো কোর্টে, জনগণের কাছে তার রায় নাও, তারপর যা হবার হবে। কিন্তু স্বামী বলছে—না কোর্টে কেন যাবো—আমি তো সংসার ত্যাগ করতে বা ভাঙতে চাই না—আমি চাই তুমি তোমার কুলটা স্বভাব ত্যাগ করো—স্বৈরাচার মনোভাব ত্যাগ করো, তবেই সংসার চলবে।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের এই হল এক সঠিক অবস্থার রূপ।

সকলি নিবে কেড়ে
তবুও দিবে না ছেড়ে
ফেলিলে একি দায়ে
কাঁদালে তুমি মোরে
ভালবাসারই ঘায়ে।

এই কান্না আর ভালবাসার দায়ই চলছে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিতে। এখানে সব কিছু কেড়ে নিয়েও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না—কান্না আছে, আবার ভালবাসার দায়ও আছে।

বেশ কিছুদিন চললো মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী আর শ্রীজ্যোতি বসুর চিঠি চালাচালি। ইংরাজী ভাষার আবরণে ঢাকা দুই জনের পত্রগুলি পাঠ করলে কোন পাগলও বলবে না এদের আর একদিনও একসঙ্গে সরকার চালাবার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এত ক্রোধ, এত অবিশ্বাস, এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ এই পত্রগুলিতে আছে, যা থাকবার পর আর যা হোক, একসঙ্গে সরকার চালিয়ে দেশের কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব বলে চালানোই বোধ হয় যুক্তফ্রন্টের অন্যতম সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব। শুধু পত্র নয়—গত ৫ই ডিসেম্বর বিধানসভায় যে ঘটনা ঘটে গেল, তার পরও কি কোন সভ্য ও শালীন সরকার গদী আঁকড়ে থাকতে পারে? কিন্তু আছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলেছিলেন কোন্ কারণে, এই শব্দ সত্য কি মিথ্যা, তার মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু ৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বারবেলায় বিধানসভার ঘটনায় প্রমাণ করে যে, অভিধান মত এই সরকারকে সভ্য বলা বোধ হয় কোন অসভ্যের পক্ষেও দুঃসাধ্য। তবে একটা গ্রাম্য কথা আছে—এক কান কাটা যায় গ্রামের বার দিয়ে, কিন্তু যে দুই কান কাটা, সে যায় গ্রামের মধ্য দিয়ে। শ্রীসুশীল ধাড়া মহাশয় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে নারীদেহ উলঙ্গ করার যে বর্ণনা দিচ্ছিলেন এবং অন্য সব নৃশংস ঘটনার বিবরণ পেশ করছিলেন, তা শুনে তো এই কথাই মনে হবে যে, সরকারে থেকে এই দুশ্যের

দর্শক না হয়ে বাইরে গণ-আন্দোলন করে তিনি এই পাপ-অনাচারের প্রতিকার করুন না, জনমত গঠন করে এই সব অপকর্ম ও দুষ্কর্ম রোধ করুন না। আর শ্রীজ্যোতি বসু—তিনিই বা কেন মুখ্যমন্ত্রীর এত অবিশ্বাস অনাস্থার পাত্র হয়ে সরকারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পদ আঁকড়ে থাকেন। রাজ্যের যে-সব কাজ অনেকে মনে করছেন নীতি-বহির্ভূত, অন্যায়, আর তিনি বা তাঁর দল মনে করছেন—সবই গণ-জাগরণের ফলশ্রুতি, তবে বেশ তো, সরকারে থেকে, পদ না আঁকড়ে থেকে সেই গণ-আন্দোলন সরকারের বাইরে-থেকেই করুন না।

সকলেরই ভাব হল গাছেরও খাবো, তলারও কুড়াবো। বাংলা কংগ্রেস সব দিক সরকারকে অচল করে দেবার, সরকারে থেকে সরকারের বিরোধিতা সমান যুদ্ধ চালাবে—কিন্তু সরকার চলতে দেবে না। আবার সি-পি-এমও দিবা-রাত্র ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র করে চিৎকার করবে, কোন অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রতি-বিধান করবে না, সরকার কিছু নয়, পরিষদীয় গণতন্ত্র কিছু নয়, বিপ্লবই সব বলবে, কিন্তু সরকারের মায়া ছাড়বে না। কেন এমন হবে? বাংলা কংগ্রেস সরকারে থাকবে, সরকারে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে অনশন করবে—সরকারকে অসভ্য বর্বর বলবে, কিন্তু বলবে না—সরকারে থেকে জনগণের মঙ্গল করতে পারছি না, তাই জনগণের মধ্যে গিয়ে লড়াই করে সরকারকে শোধন করার বা জনগণের মঙ্গলের চেষ্টা করবো। একই কথা সি-পি-এম সম্পর্কে বলা যায়। সি-পি-এম'এর বক্তব্যে মজা আরো বেশি। বড় বিপ্লবী দল, কিন্তু তাদের কথা হল—তাদের হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর না থাকলে সরকার ভেঙে যাবে, সব কিছু অচল হবে, তাদের বাদ দিয়ে সরকার হলে দেশে আগুন জ্বলবে। অর্থাৎ সি-পি-এম যদি সরকারে না থাকে, বা শ্রীজ্যোতি বসু যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না থাকেন, তবে দেশকে রসাতলে পাঠাতেও তাঁরা পিছপা হবেন না। কেন? বাংলা দেশের সাড়ে চার কোটি মানুষের ভাগ্য কি একটি দলের হাতে একটি দপ্তর থাকার উপর অথবা একটি দলের সরকারে থাকার উপর নির্ভর করবে? যত গর্জে, তত বর্ষে না—এই কথা সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, কিন্তু এই গর্জন কি একটি মার্ক্সবাদী দলের তথ্যানির্ভর? সি-পি-এম ও বাংলা কংগ্রেস দুই দলই যদি মনে করে তারা একসঙ্গে কাজ করতে পারছে না, দেশের মানুষের মঙ্গল করতে পারছে না, তারা যে-কোন একজন তো বলতে পারে—বেশ আমি বিদায় নিচ্ছি, তোমরা সরকার চালাও। অথবা এই কথাও তো হতে পারে—বেশ, সি-পি-এম মন্ত্রিসভা করুক। আমরা সমর্থন করবো—অন্যায় হলে সমর্থন করবো না। অর্থাৎ বিবদমান যে-কোন একটি দল আপোষে সরকার থেকে নেমে আসুক। আবার এমনও হতে পারে যে, বেশ বাংলা কংগ্রেস ও সি-পি-এম দুই জনেই সরকার থেকে সরে যাক, অন্যরা সরকার করুক, দেখা যাক তাতে কি হয়। বাংলা কংগ্রেস ও সি-পি-এমকে বাদ দিলেও সরকার হতে পারে ও সেই সরকারের পতন কংগ্রেসের ৫৫ জনকে দিয়ে হবে না। কিন্তু সেই পথে কেউ যেতে চান না। এ'রা বিরোধের মীমাংসা করবেন না, মীমাংসার সূত্র মেনে নিলেও তা কার্যকরী করবেন না, অথচ সরকারে থেকে সরকারের বারোটা বাজাবেন। যুক্তফ্রণ্টের সংকটমোচনেও এই একই ফরমুলা হতে পারে। সি-পি-এম ও বাংলা কংগ্রেসকে ছাড়াই যুক্তফ্রণ্টের ১২ দল বৈঠকে বসে একটা কর্মসূচী ঠিক করুক এবং বলুক এই কর্মসূচী বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে, রূপায়িত করতে হবে। আর এই নীতি যিনি মানবেন না, তাঁর যুক্তফ্রণ্ট ত্যাগ করা ভাল। এইভাবে শক্ত হাতে যদি আজও যুক্তফ্রণ্টের অন্য শরিকরা হাল ধরেন, তবে ঐ সাপে কাটা যুক্তফ্রণ্ট রোগী হয়ত বেঁচে উঠতে পারে। নইলে আর ক'দিন পরে মৃতদেহ থেকে গন্ধ বেরুতে শুরু করবে, তখন কিন্তু যত আদরের হোক না, জনগণের মৃত সন্তান যুক্ত-ফ্রণ্টকে ফেলে সকলকেই পালাতে হবে!

(বি)যুক্তফ্রণ্ট।
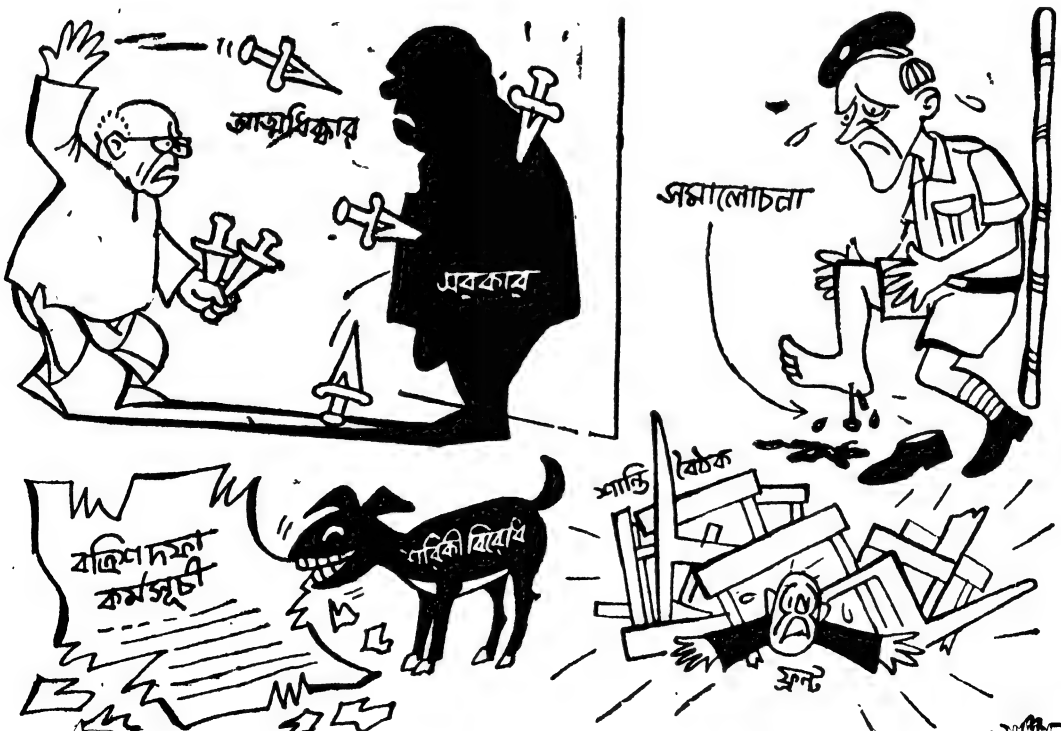
**কলকাতা**—৯০নং পাথুরিয়াঘাটা, দোতলা বাড়ি। বর্তমান মালিক মুর্শিদাবাদ নশীপুর জাফ্রাগঞ্জের মোহান্ত গোবিন্দ আচারিয়া (গেন্দু মহারাজ)। তৎকালে ছিল বিবিধ রুজিরোজগারের আস্তানা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একদল দর্জি, নিচের তলায় কাঁচি ও কল চালিয়ে দিন গুজরান করত। একপাশে খাটা-পায়খানা ও প্রস্রাবের ব্যারাক। দুর্গন্ধে আবহাওয়া তীব্র। পাশ দিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ি—অস্বাভাবিক খাড়াই। উপর অংশ পাশের বাড়ির আওতায় দিনের বেলাতেই বেশ অন্ধকার। তা ছাড়া উঁচুতে দুটো ধাপ ভেঙে হাঁ করা। কসরৎ করে উঠানামা করতে হয়। অন্যমনস্ক বা অপটু হলেই বিপদ।

১৯১৪ সালের এক দুপুর। বাড়ির প্রায় সব ঘরই কর্মমুখর। দোতলায় গুহার মত একটা ঘর। চটমোড়া কাঠের চেয়ারে উপনিষদের বই খুলে একজন বসে। দৃষ্টি একই পাতার উপর নিবদ্ধ। মনে হচ্ছে দম বন্ধ করে ডুব দেওয়া অবস্থা। আশেপাশে ছিটিয়ে পড়ে আছে সেক্সপীয়ার, ম্যাক্সমূলার, বেদ ইত্যাদি। ধোলা চাদর-ঢাকা চেয়ারে ধোঁয়াটে রং-এর লোকটা যত্নে শায়িত শালগ্রাম শিলার মত দেখাচ্ছে।

নিচতলায় হঠাৎ এলোমেলো আওয়াজ। বুটের গটগট ও বন্দুকের ঘোড়ার অনুচ্চারিত কটাকট শব্দ। উপর তলায় আসন্ন অবস্থার ছায়া পড়েছে। মানুষটা এর মধ্যে তৈরি। সুপরিচিত বন্ধু চার্লস টেগার্টের অবিস্মরণীয় স্নেহ-সম্ভাষণ—"হ্যালো যতীন! ইউ আর হিয়ার!" (কি হে যতীন, তুমি এখানে)। তারপর কি হল কে জানে। প্রেমালাপ এইখানেই ইতি। নিচ থেকে আসা লোকটা উপরেই থাকল—উপরের লোক নামল সিঁড়ি আগলে কয় আঁটি টমি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শিকার সামলাবার তাকে ঘাঁটি নিয়েছিল। তাদেরকে দেখা গেল হয় খাটাপায়খানার উপরে-নিচে, নয় বাহির ফটকে যে-দল পাহারা দিচ্ছিল, তাদের মাঝ দিয়ে পথ করে সাইকেলারোহী অবলীলাক্রমে বার হয়ে গেল দু' হাতে পিস্তল ছুঁড়ে। পরের দিন দৈনিক অমৃত-বাজার পত্রিকায় চোখেলাগা সংবাদ প্রকাশ হল, "যতীন ইজিলি সাইকেলড্ এ্যাওয়ে (যতীন অনায়াসে সাইকেলে সরে পড়ল)।

শক্তিসাধকের চোখের মোকাবেলাতে গোরার দল একান্ত অসাড়।

এর কিছু আগেই পাথুরিয়াঘাটা ডাকঘরের ও গার্ডেনরীচের ডাকাতি যতীন মুখুজ্যের নেতৃত্বাধীনে হয়েছিল এবং সক্রিয় সহকারী নেতা ছিলেন নরেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য—উত্তরকালে যিনি প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন এম এন রায় পরিচয়ে। সেই থেকেই নরেন্দ্র দেশত্যাগী।

বেশ ক' বছর আগে সম্ভবত ১৯০৬—নদীয়া জেলার হলুদবেড়ে গ্রামে যে সশস্ত্র

যতীন মুখার্জী

ডাকাতি হয়, তাতে যতীন মুখুজ্যের পরোক্ষ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ ছিল। প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঐ জেলার বেগুনিয়া গ্রামের শ্রীমন্মথ বিশ্বাস। সাহচর্য দিয়ে-ছিলেন নোয়াখালির নরেন ঘোষচৌধুরী। সঙ্গে হরপ্রসাদ কর ও তাঁর কনিষ্ঠ অবলা।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ডাকাতির ইতিহাসে হলুদবেড়ে অভিযান পয়লা

॥ দুই ॥

১৯১৪। জুন মাসের ২ তারিখ। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের দোতলা আর এক বাড়ি। অবিনাশ চক্রবর্তীর কন্যা গণেশ-জননীর বিবাহবাসর। বর ঘোড়াদহ নিবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল। ইনি যতীনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মেহেরপুরের উকিল ও জননায়ক প্রসন্ন সান্যালের অনুজ। অবিনাশ ১৮১৮।৩নং রেগু-লেশনের প্রথম দিকের বলি—তখন তিনি মুন্সেফ। সেই অবস্থাতেও যতীনের সঙ্গে নিবিড় ও নিভৃত যোগাযোগ। পুলিশের হিসাব ছিল মাটির তলার মানুষটা হয়ত দুই পক্ষের টানে বিবাহ মণ্ডপে অন্তত উঁকি দিয়ে যাবে। হিসাব ভুল হয় নি। বিবাহের শাস্ত্রবিধেয় কাজ নিচে উঠানে চলছে: ছাদে আহারের আনন্দ ভরপুর। তেজস্বী মানুষটা হাল্কা রসিকতার রস ঢেলে কার্নিস ঘেঁষে ঘুরছেন পরিবেশনের খবরদারিতে। সেখান থেকে বিবাহের অনুষ্ঠানও দেখছেন। হঠাৎ হৈ-চৈ। গোরা পল্টন বাড়ি ঘিরেছে। নিশ্চয়ই যতীনকে ধরবে। প্রসন্ন সান্যাল ও অবিনাশ চক্রবর্তী বিচলিত বিব্রত। কিছু আগেই একবার বলেছিলেন যতীনের আর থাকা উচিত নয়। না এলেই ভাল হোত। অঙ্গভঙ্গি-নৈপুণ্যে যতীন তো হেসেই অস্থির। ঝাঁকে ঝাঁকে বন্দুক পিস্তল উঁচিয়ে সাদা সৈন্য প্রতি ঘরে ঢুকছে, বার হচ্ছে। ছাদ, উঠান, পায়খানা তোলপাড়। মুখে একই কথা, "হয়ার ইজ হি?" (সে কোথায়?) বাড়ির সকলেও অবাক। সত্যিই তো লোকটা গেল কোথায়? সারা রাতের ব্যর্থ অভিযান সেরে পল্টনের দল খোঁয়াড়ি ভাঙতে ভাঙতে কেটে পড়ল। তাদের সেদিনকার ফেল মারা লিখিত বিবরণের উপর নাকি টেগার্ট সাহেবের ব্যঙ্গ মন্তব্য ছিল "ম্যাজিসিয়ানস্ ভ্যানিশিং ট্রিক" (যাদুকরের অন্তর্ধানের খেলা)। পরে জানা যায় যতীন মুখুজ্যে তিন বাড়ির পায়খানার উপরে বাঁশ রেখে পথ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। হৈ-চৈ হওয়ার আগেই কার্নিসের পাশ থেকে এগিয়ে আসা গোরাদের লক্ষ্য করে চকিতে বাঁশের পর বাঁশ টপকিয়ে শেষ পায়খানার ছাদে। পিছনের পাইপ বেয়ে অন্ধকার পথে যেখানে নামলেন সেখানে একজোড়া সাদা চামড়া। এরা তাঁরই নিজস্ব লোক। সৈন্য সেজে ঠাঁই পাহারায়। পল্টনরা নিজের লোক ভেবে সেদিকে আলগা রেখেছিল। অবশ্য ওরা ভুল না করলে খণ্ডযুদ্ধ হোত। এরা প্রস্তুত ছিল, তাছাড়া আশেপাশে অন্য ব্যবস্থা ছিল।

॥ তিন ॥

এর কিছু পরে ও বালাশোর পর্বের আগে, চৌরঙ্গী এলাকার ইংরাজ অধ্যুষিত
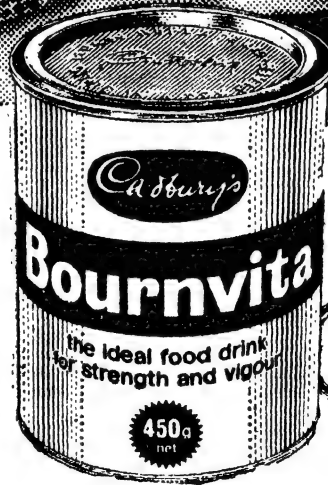
"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান চৌকশ।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ।

**ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—**
**শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে**

গ্র্যান্ড হোটেল, গ্রীষ্মের দুপুর। এক নাতিদীর্ঘ কাফ্রী এককোণে পাখার তলায় বড় একপট চা নিয়ে কাপে একটু একটু ঢালছেন, খাচ্ছেন। মনে হয় তাঁর মুখ্য প্রয়োজন গরমের হাত থেকে ঠাণ্ডায় কিছু সময় কাটান। অনুরূপ প্রয়োজনেই ঐ টেবিলে এসে বসলেন শ্বেতকায়া এক মহিলা।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। বেয়ারা দু'বার ঘুরে তৃতীয়বারে কাপ পট সরিয়ে নিল। বিলের দেয় মায় টিপ শোধ হল। ইতি-মধ্যে দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হয়ে থাকবে। মহিলার সম্ভ্রম-সংযত সম্বোধন—"আর ইউ নট ইন মাই হ্যান্ডস নাউ ?" (তুমি কি এখন আমার হাতে নও ?)। পকেটস্থ পিস্তলে হাত রেখে কাফ্রীর ক্ষিপ্র শান্ত উত্তর—"বাট বিফোর দ্যাট ইউ আর ইন মাই হ্যান্ডস" (কিন্তু তার আগে তুমি আমার হাতে)। দু'জন—চার্লস ও যতীন—দুই দরজা দিয়ে দুই দিকে অদৃশ্য। ইংরাজ ধুরন্ধর বাঙালী বিপ্লবীকে কিরূপ স্নেহ-শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার পরিচয় জানা দরকার। বুড়ি বালামের পুণ্যভূমে সহকর্মী ও স্বক্ষেত্র রক্ষাকল্পে আমরণ সংগ্রামী গুলীবিদ্ধ বাংলার শের শেষ নিশ্বাসে চিরমুক্ত। তার আগে তার দেহ ইংরাজ শক্তি স্পর্শ করতে পারে নি। টেগার্ট কলকাতা এসে ভারাক্রান্ত মনে লাটের সামনে হাজির। পুলকবিহ্বল লাট অভ্যর্থনা জানিয়ে বল্লেন, "আই হিয়ার যতীন হ্যাজ বীন ব্যাগড", উঃ "ইয়েস, ইয়োর এক্সলেন্সী, বাট এলাস! নট এ্যালাইভ" (শুনছি যতীন গ্রেপ্তার—উঃ, হাঁ, হুজুর, কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবিতাবস্থায় নয়)।

॥ চার ॥

আরো আগে। ইনি তখন সরকারের স্টেনোগ্রাফার। বাংলার প্রধান সচিব হুই-লারের নিজস্ব দপ্তরে। ছুটিতে পৈতৃক গ্রাম কুষ্টিয়ার কয়া গ্রামে এসেছেন। একটা ছিঁচকে বাঘ উৎপাত চালাচ্ছিল, বেহিসাবি সাহসে একটা ধারাল হাতিয়ার হাতে তিনি মোকাবেলায় এগিয়ে গেলেন। অতর্কিত আক্রমণে ব্যাঘ্র-বাহাদুর উপর হাতের একটা গোটা পেশী চিবিয়ে নিল; পায়ের হাড় কামড়ে চূর্ণ। একটুও না ঘাবড়ে তিনি শেষ পর্যন্ত বাঘটাকে ধরাশায়ী ও নিষ্প্রাণ করলেন। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। কলকাতাতে আসতে হল। ২৭৫নং আপার চীৎপুর রোডে মাতুল ডাঃ হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় থাকেন। অস্ত্রোপচার করতেই হল। বিনা ক্লোরোফরমে গ্রহণ করলেন—সহজ সরলভাবে—যেন নাপিতের হাতে দাড়ি কাটা। সেই সময় দেখা গেল স্কুল-কলেজ পড়া ও সদা পড়া ছেড়ে দেওয়া ৩০০।৪০০টি যুবক শুশ্রূষা ও পাহারার জন্য মোতায়েন। সকলের মুখে বড়দা। বাঘে খেয়ে বাঘা যতীন। তার অনেক আগেই তিনি বাংলা দেশের একমাত্র ও একচ্ছত্র বড়দা।

লালবাগের বহুদিনের বাসিন্দা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনব্যবসায়ী দুর্গাপ্রসন্ন চট্টো-পাধ্যায় আর এক মামা। এখানে যতীনের হামেসাই যাতায়াত ছিল। অজ্ঞাত গুপ্তাবস্থায় সময় পুত্র-কন্যা সহ পত্নী ইন্দুবালা সেখানে তাঁর বাড়িতে ও পরে পাশের বাড়িতে দীর্ঘদিন ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ অনেকদিন সত্য বলে গ্রহণ করেন নি। গা-ঢাকা অবস্থায় যতীন নানাবিধ ছদ্মবেশে এসে দেখা দিয়ে যেতেন। কখনও কাবুলিওয়ালা, কোন সময় একচোখ কানা ভিখারী সেজে। এম-পি হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (যতীনের আর এক মামার ছেলে) সে সময় লাল-বাগে থেকে মুর্শিদাবাদ নবাব স্কুলে পড়তেন, উত্তরকালে তাঁর কাছে সুভাষ-চন্দ্র এই সব ছদ্মবেশের কথা আগ্রহে শুনতেন।

এক পুলিশ অফিসার যতীনের অনুচর সেজে যতীনের গতিবিধির সন্ধানে এলে যতীনের মাতৃতুল্যা দিদি বিনোদবালা বলেছিলেন, "বেশি চালাকি করো না, আমি বড়দার বড়দি!"

॥ পাঁচ ॥

সরকারী চাকুরির থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বড়দা এখন ঠিকাদার। যশোহর-ঝিনাইদহ লাইট রেলওয়ে প্রস্তুতিপর্ব। তিনি কণ্ট্রাক্ট যোগাড় করেছেন—তিনিই সব কিন্তু তাঁর নামগন্ধ নেই। প্রকাশ্য অংশীদার প্রসন্ন সান্যাল, অজয় ওরফে গোপাল মল্লিক। যা কিছু কাজ সব বড়দা। এই সময় তাঁকে প্রায়ই ৮০ মাইল পর্যন্ত প্রত্যহ সাইকেল চালাতে হোত। আধা বা পুরো প্যাণ্ট, মাথায় এক টুপি—যতীনদার সেই সময়ের চলতি ছবি। গরমের একদিন পায়ে ৮০ মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে লালবাগে এসে দেখেন দুপুরে ঘর-দোর সব বন্ধ। ধাক্কা-ধাক্কি করে উঠালেন। যৌবনে পা দেওয়া দুই মামার দুই ছেলে মনুরা ও বেনুরা মেঝেতে ঘুমুচ্ছিল, তাদের দু'কথা শুনালেন, শয্যা ছাড়ালেন। বসে পড়লেন উপনিষদ গ্রন্থ নিয়ে। বেশ কয়েক ঘণ্টা তন্ময় উচ্চারিত অধ্যয়ন। গরমে গায়ে একফোঁটা ঘাম নেই।

নগেন্দ্রনাথ মৈত্র বয়স ৭৩—এখন মুর্শিদাবাদ নশীপুরে থাকেন। সারা জীবনে মেহেরপুরে মাতুল প্রসন্ন সান্যালের কাছে থাকতেন। সেই সময় বড়দার সান্নিধ্যে। কিছু সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। বড়দা একদিন সাইকেল-ক্লান্ত হয়ে এসে তেঁতুলের সরবৎ ফরমায়েস করেন।

প্রসন্ন সান্যালের স্ত্রী (আমার খুড়ি-মা) বড় গ্লাসে এক গ্লাস দিয়েছিলেন। উনি বল্লেন ওটুকুতে কি হবে? এক বালতি চাই। তাই এল এবং পেটেও গেল। সেই দিনই স্নানের সময় তিনি নাকি জলভরা বড় বালতি একহাতে তুলে মাথায় ঢেলেছিলেন।

॥ ছয় ॥

গোপন পথে বড়দা। তখন বেশ অর্থ-কষ্ট। টাকার চাহিদা ও চাপ চারদিক থেকে। কণ্ট্রাক্টরের অর্থ কিছু পাওয়া যায় কিনা সেই সন্ধানে মেহেরপুর এসে-ছেন। রাত্রে প্রসন্ন সান্যালের মুসাফের-খানায় টানা ফরাসে যতীন মুখোমুখি; নগেন মৈত্র প্রমুখ। বাহির দরজা বাহির থেকে তালা বন্ধ যাতে মনে হয় ঘরে কেউ নেই। ভিতর দিকে অন্য দরজা দিয়ে যা কিছু। নিশীথে সমস্ত দুনিয়া যখন অচেতন মহাপুরুষ ভোলা গিরির মন্ত্রপূত বীর শিষ্য তখন তাঁর নিত্যকর্মে। গভীর থেকে উচ্চারণ করে চলেছেন, উপনিষদের মর্মকথা:

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ
পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা-
বশিষ্যতে।

অর্থাৎ পূর্ণ থেকে পূর্ণ বহির্গত হলে পূর্ণ থেকে যায়। ইংরাজের বুলেট বাঘা যতীনকে সরিয়েছে। তবু বাংলার বড়দা এখনও বাঙালীর বড়দাদা হয়েই আছেন।

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ধারাবাহিক নিবন্ধ 'সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ও 'মিত্রেন'-এর ফিচার 'শহর কলকাতা' প্রকাশ করা গেল না, এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যায় রচনা দুটি যথারীতি প্রকাশিত হবে। —সম্পাদিকা

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আনন্দ বললে—ফিরবো, এখানে ফিরবো; কিন্তু প্রমথ বিশীর আলোচনায় ঐ 'ব্যক্তিগত' শব্দটায় সমস্যা আমাকেও বিশেষ ভাবিয়েছে। এখানে সে-প্রসঙ্গ যখন কথায়-কথায় উঠলোই একবার, তখন আমার মনের ভাবটা আমি না বললে শান্তি পাবো না।

আমি বললুম—নিবৃত্ত হও আনন্দ,—তোমার-আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের আলোচনার জায়গা নয় এটা,—পাঠকরা অসন্তুষ্ট হবেন।

সে বললে—কখনোই না। পাঠকরা এটুকু ধৈর্য দেখাতে কার্পণ্য করবেন না। তাঁরা এই জীবিত বর্তমানেই বিদ্যমান। কালের সব হাওয়াই তাঁদের গায়ে লাগছে। চুরি-ডাকাতি, সংঘাত-সংঘর্ষ, প্রবল-দুর্বলের যৌথগতি—সবই তাঁরা ঘটতে দেখছেন,—বড়ো বড়ো আদর্শের পতন এবং পুষ্টি, দুই-ই তাঁদের নজরে পড়ছে। সাহিত্যের কথায়,—শিল্পের আরো নানা প্রবাহের কথায় তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন কেন? বরং এসব কথা তাঁরা আগেকার তুলনায় আরো খুঁটিয়ে দেখতে চান একালে। একালের পাঠক সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার ওপর আমাকে নির্ভর করতে দাও।

আমি অপ্রস্তুত বোধ করে বললুম—আমি তো আমাদের পাঠকদের গ্রাহিকা-শক্তি সম্বন্ধে কোনো দোষ দেখাবার চেষ্টা করি নি আনন্দ,—বলছিলুম কি,—তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি যাতে না ঘটে, সেই দিকে আমাদের বিশেষ নজর থাকা দরকার।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিন্তামণি' পড়েছ?

—পড়েছি।

—তা হলে সেকালের পাঠকের সঙ্গে একালের পাঠকের পার্থক্য বুঝতে অসুবিধা হবে না। শোনো—'চিন্তামণি' একখানি বিরক্তিকর বই।

বললুম—সে কী? আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশক হিসেবে দিনু ঠাকুরের নামে সে-বই প্রকাশিত হয় যখন,—সেই সুদূর ১৩২৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত,—এই প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'চিন্তামণি' সম্বন্ধে এতো বিরক্তির ভাব কোনো পাঠকই তো জানান নি!

—সৌজন্য অনেককেই বাধা দিয়েছে বোধ হয়,—আর বাকি যাঁরা, তাঁরা অনেকেই হয়তো পাঠক হিসেবে ছিলেন উদাসীন। সাধারণত এইরকমই ঘটে থাকে।

আমি এসব শুনে মর্মাহত বোধ করলুম।

প্রত্যয় এবং পরিতৃপ্তির অকুণ্ঠিত প্রসন্নতা দেখা গেল আনন্দর চোখে-মুখে।

আমার দিকে তার বড়ো বড়ো দুই চোখের দৃষ্টি মেলে সে বললে—পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার বাংলা-বইয়ের পাঠক দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐ বইয়ের 'হারামণির অন্বেষণ' এবং 'সার সত্যের আলোচনা' পড়বার সময় পেতেন,—কিন্তু আজ আর মানুষের হাতে অফুরন্ত সময় নেই। দীর্ঘশ্বাসও হ্রস্ব করতে হয় একালে। তারপর, সত্যিই কোনো লেখা পড়ে কিছু পাওয়া দরকার,—পাঠকের এ-প্রত্যাশা অসংগত বলা ঠিক হবে না। দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐ 'হারামণির অন্বেষণ' মূলত দুটি প্রশ্নের আলোচনা বটে,—একটি প্রশ্ন—কি আছে,—দ্বিতীয়টি—কি চাই; তিনি উত্তরও দিয়ে গেছেন,—বলে গেছেন—আছে সত্য,—চাই মঙ্গল। কিন্তু তাঁর সেই আলুথালু দার্শনিক মেজাজকে বলা যেতে পারে—না দার্শনিক, না সাহিত্যিক! তখনকার পাঠক সৌজন্যবোধেই পড়েছেন সে-সব,—এখনকার পাঠকের অতো সময় কোথায়?

বললে—সে তুলনায় রাসসুন্দরীর লেখা অনেক স্বাদু,—তাতে পাঠকের বিরক্তির সম্ভাবনা কম।

আলমারি থেকে দুখানা বই টেনে এসে বললে—শোনো রাসসুন্দরীর গদ্য—

> অহো কি আক্ষেপের বিষয়! মেয়েছেলে বলিয়া কি এতই দুর্দশা! চোরের মত যেন বন্দী হইয়াই থাকি, তাই বলিয়া কি বিদ্যা শিক্ষাতেও দোষ? সে যাহা হউক, এখনকার মেয়েছেলেগুলো যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়। এই লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের কত কষ্ট হইয়াছে!

বললে—এ আজ থেকে অনেকদিন আগেকার গদ্য বটে, কিন্তু এই সব কথায় মধ্যে কোনো ভাণ নেই, বাহুল্য নেই, আড়ম্বর নেই। আজকের পাঠকও এসব পড়লে বিরক্তি বোধ করবেন না। সেকালের পরিচয়টুকু অকৃত্রিম মনে হবে তাঁদের।—দ্যাখো, কৃত্রিমতাই লেখকের শত্রু। কী জানি কেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের 'চিন্তামণি' আমার কৃত্রিম মনে হয়। আমি কারো মনে আঘাত দেবার জন্যে একথা বলছি না,—কিন্তু শোনো এবার দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐ বইয়ের কয়েক ছত্র নমুনা,—আচ্ছা ধরো, তিনি যখন 'বিজ্ঞান-রাজ্য' আর 'মনো-রাজ্যের' পার্থক্য বোঝাতে চেষ্টা করেন, কিংবা 'ব্যবহারিক সত্তা', 'প্রাতিভাসিক সত্তা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তাঁর সেই তত্ত্বব্যাখ্যানের মেজাজটি মন্দ লাগে না,—আমি সে সব উদ্যোগকে কৃত্রিম বলছি না,—তিনি যখন বলেন—'যোগ দুই প্রকার, প্রতিযোগ এবং সংযোগ'—তখন সময় থাকলে, পাঠক জানতে চেষ্টা করবেন কোন্‌টার কী ইঙ্গিত,—এও কৃত্রিমতা নয়। কিন্তু শোনো তাঁর এই ছত্রগুলি—

আমি বেশ শক্ত হয়ে বললুম—থাক্‌ আনন্দ। দ্বিজেন্দ্রনাথের কোনো রচনাই আমার 'কৃত্রিম' মনে হয় নি,—তুমি ও-কথা

# [illegible]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কঙ্গোর হরিৎ বৃক্ষ, তুমি
শাখায় শিকড়ে ফুলে ফলে
হিরণ্ময় ; ছিলে
আজীবন অমল কিশোর।

বোলিভিয়া[illegible] ছিল তোমার রাজার বাহু
প্লাবিত প্রেমে, করুণায় ; ছিল [illegible]
[illegible] যেথা নিষ্ঠুরতা, ধর্ষ পাপ [illegible]
সূর্য অস্তে গভীর আঁধার।

তোমার মৃত্যুও হীরা ; তার শোক
কঙ্গো থেকে ভিয়েতনাম আশ্চর্য তোরের মতো
অনির্বাণ।

দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখালেও আমি তা মানতে পারবো না। তিনি তাঁর 'হারামণির অন্বেষণ' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছিলেন—

ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত।
আপন মুলুকে সবারই জিত।

তাঁর মুলুক যে তাঁরই ছিল এবং সেখানে যে তাঁর হার হয় নি, জিতই ঘটেছে,—এ আমি বিশ্বাস করি।

আনন্দ চুপ করলো বটে, কিন্তু একটি দংশন-সহযোগেই সে চুপ করলে। বললে—দ্বিজেন ঠাকুর না ছিলেন যথার্থ দার্শনিক, না সাহিত্যিক। কিন্তু একালের পাঠক যদি তাঁর তত্ত্বব্যাখ্যানের চেয়ে রাস[illegible] বেশি পছন্দ করেন, তা হলে [illegible] ব্যক্তিগত রুচির জন্যে কোনো পাঠকেরই দোষ দেওয়া যাবে না।

আমি বললুম—এটা কোনো সংগত মন্তব্যই নয়। 'ব্যক্তিগত' শব্দটা আজ অকারণে বারবার এসে পড়ছে!

সে বললে—যাঁদের 'চিন্তামণি' পছন্দ হয়, পাঠক হিসেবে তাঁরা নিশ্চয় হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি-এ মহাশয়কেও মনে রাখতে ভোলেন নি?

বললুম—কে হেমেন্দ্রনাথ সিংহ?

—১৩১৬ সালে 'আমি' নামে তাঁর একখানি বই বেরিয়েছিল। রাসসুন্দরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ইত্যাদির আমলেই এই বাংলাদেশে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পরেও আরো কিছু কিছু লিখেছিলেন তিনি। উপনিষদ, গীতা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বাইবেল, ফাউস্ট, প্লেটো, সক্রেটিস ইত্যাদি নানা সূত্র তিনি দেখেছেন, বুঝেছেন। তাঁর লেখার চালচলনও মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আজো যে-পরিমাণে জীবিত, হেমেন্দ্রনাথের কোনো ক্ষীণ স্মৃতিচিহ্নও কি সে-অনুসারে কোথাও দেখা যায়?

বললুম—প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব নিয়তি আছে বই কি।

সে বললে—সে নিয়তি পাঠকের ব্যক্তি-রুচির ওপর নির্ভর করে।

বললে—যে-কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইয়ের কথা বলছি না এখানে। বছর ষাটেক আগে চুণীলাল বসু বাংলায় 'খাদ্য' নামে একখানি বই ছেপে বার করেন। সারদাচরণ মিত্র, বিনয়কৃষ্ণ দেব ইত্যাদি গণ্যমান্য কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেই সেই প্রবন্ধগুলি দেখেছিলেন। কিন্তু আজ সে-বই সেই সব বিশেষ বিশেষ পাঠকের ব্যক্তিগত আগ্রহের বাইরে ছিটকে পড়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে! তাই বলছিলুম—ব্যক্তিগত রুচিকে ছোটো ছোটো সময়ের সীমা পেরিয়ে যাবার জোর দেওয়াটা পাঠক-পক্ষেরই বিশেষ কর্তব্য। দ্যাখো—লেখক তো লিখে ফেলেই দায়মুক্ত হন, কিন্তু উপযুক্ত পাঠক না থাকলে রচনা হারিয়ে যায়। আমরা তো সেই চিন্তার ঝোঁকেই বই বাছাইয়ের কাজে নেমেছি।

আমি বললুম—তা তো বটেই, কিন্তু চুণীলাল বসুর 'খাদ্য', রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' আর দ্বিজেন্দ্রনাথের 'চিন্তামণি'—এরা তো এক ধরনের বই নয়। বইয়ের রাজ্যে—রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে, আমরা কি বলতে পারি অন্তত দু' ধরনের বই আছে,—এক 'ওষধি', আর এক—'বনস্পতি'? ওষধি চেনবার জন্যে যে-ব্যক্তিগত নিমিত্ততা দরকার হয়, সেটা অপেক্ষাকৃত স্থূল বলতে পারি কি? 'বনস্পতি' চেনবার ইন্দ্রিয় আরো গভীর!

বললুম—চুণীলালের 'খাদ্য' যে তথ্য-সন্ধানী আগ্রহের ফল, দ্বিজেন্দ্রনাথের 'চিন্তামণি' কি ঠিক সেই একই স্তরের আগ্রহের দান?

আনন্দ বললে—আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি বটে, তবু তোমার এই কথার জবাব দেওয়া দরকার। কিছুদিন আগে শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তীর একখানি বই দেখেছিলুম আমি—'সমাজ-সংস্কারক রঘুনন্দন'। বইখানির মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, রঘুনন্দনের স্মৃতি সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা বেরোয় নি। ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বাচস্পতি মশায়ের উপদেশে এবং আরো কয়েকজন অধ্যাপকের উৎসাহে শ্রীমতী চক্রবর্তী তাঁর এই বইখানি রচনা করেন। এই বইয়ের 'অবতরণিকা'য় নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মশাই নিজে লেখেন যে, পূর্বসূরিদের সঙ্গে রঘুনন্দনের পার্থক্য, রঘুনন্দনের উদারতা, তাঁর কঠোরতা প্রভৃতি বিষয়ে লেখিকার এই বই সত্যিই শ্রদ্ধার যোগ্য। অর্থাৎ 'বাংলা ভাষায় এইরূপ আলোচনা-গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই।' এখন, কথাটা এই যে, বাণী চক্রবর্তীর এই বই তা হলে কোন্ পর্যায়ে পড়ে?

বললুম—বইটি আমি পড়ি নি।

—পড়ে দ্যাখো, ১৩৭২ সালের বই ওখানা,—তখন থেকে প্রায় চার-পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল ইতিমধ্যে। দেশের যে সব পাঠক আজকাল ঐতিহাসিক ধারা সম্বন্ধে চেতনার কথা বলেন, তাঁদের সকলেরই ও-বই পড়ে দেখা উচিত। ও-বইয়ে 'সাহিত্যগুণ' নেই,—আছে তথ্য সমাবেশ,—আছে পরিশ্রমের পরিচয়। বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই লেখিকা স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তির কথা লিখেছেন। পরে ধীরে ধীরে তন্ত্র, বেদ, স্মৃতির সম্পর্ক দেখিয়েছেন। রামায়ণ-মহাভারতের আমল থেকে তিনি এগিয়ে এসেছেন আমাদের আরো কাছের সময়ে,—সেন রাজাদের আমল থেকে একেবারে খ্রীস্টাব্দের ষোড়শ শতক পর্যন্ত। দ্বিজেন ঠাকুরের 'চিন্তামণি'র সঙ্গেই কি এ-বইয়ের একত্র অবস্থান ঘটবে, না কি চুণীলালের 'খাদ্য' বইখানার সঙ্গে?

আমরা দুজনেই সমস্বরে হেসে উঠলুম। আনন্দ যোদ্ধার মতো বিজয়-গর্বে উদ্ভাসিত। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না সে কী বলতে চায়। শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধগুলিতে সে ঠিক যা চেয়েছিল, তা পায় নি। কিন্তু আমি তার কথা মানবো কেন? আমার পাঠক-মন আমাকে আরো সব নানা বইয়ে ঘুরতে দিক। সে-পথে আনন্দ আমার সতচর যে, তাতে সন্দেহ নেই। [ক্রমশ]

॥ চার ॥

মন্টুর মুখে বেদনামিশ্রিত হাসি দেখে আমি বলে উঠলাম, 'তুমি অমন করে হাসলে কেন বলো তো? আমি তো তোমায় শুধু লেখাপড়া না-করে কী করো, তাই জিজ্ঞেস করেছি!'

ঘাড় নিচু করে সে বললে, 'সে ঠিক বলার মত কিছু নয়।'

'কি এমন কাজ করো যে, তা বলার মত নয়?'

মন্টু শুধু আমার দিকে লজ্জা-ভীত-দৃষ্টিতে তাকালো, কোন জবাব দিতে পারল না। বোধ করি, জবাব দেয়ার মত তার তখন কিছু ছিলও না। কারণ, সে যে কাজ করে তা লোকের কাছে প্রকাশ করার মত নয়। আর যদিও না কোন সময় কোন লোকের কাছে তা প্রকাশযোগ্য হয়, তবে তা আমার মত সন্ন্যাসী মানুষের কাছে একেবারেই নিষিদ্ধ। এটা আমি তখন জানতে পারি নি, জেনেছিলাম পরে। সেদিন, সেই মুহূর্তে সে আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় করে খাওয়া-দাওয়া হলে আবার আসবে বলে চলে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'এসো।'

সে চলে গেলে মায়াকে জিজ্ঞাসা ... কেমন বলো তো মায়া?'

'... কেমন দেখলেন?'

'... দেখে তো আমার খুব বুদ্ধিমান ... হল।'

'... ঠিক। তা ছাড়া ওর অনেক-...।'

'...?'

'... আর বসন্ত ওরা দুজনেই ... ভালবাসে।'

... গুণের পরিচয় দিলে মায়া। ... বসন্ত তাকে ভালবাসলেই ... গুণ আছে বুঝতে হবে—ঠিক এ ধরণের কথা আমি তার কাছে আশা করি নি। বরং এতে তার গুণ সম্পর্কে মনে একটা বিশ্রী ধারণা হয়ে গেল। কারণ অনুভব করলাম সে গুণ কখনো সদ্গুণ হতে পারে না। তবে মন্টুকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে ছেলেটাকেও আমি অন্যভাবে অর্থাৎ খারাপভাবে দেখতে পারি নি। তাই অনুসন্ধিৎসুর মত জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কেন ওরা ভালবাসে তা জানো কী?'

'না, তা জানি না।'

সত্যিই কেন যে ওরা ওকে ভালবাসে তখন বুঝি নি, বুঝেছিলাম পরে। মায়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মন্টুর আর কে আছে?'

'এক মাসি ছাড়া ওর আর কেউ নেই।'

'এখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি করেন?'

এবার মায়া উত্তর দিলে না, দিলেন মা। তিনি বলে উঠলেন, 'বাবা এখানে যে পোড়াকপালীরা এসে বাসা বাঁধে, তাদের জীবনে কাজকর্মের কি কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে, না তারা সহজভাবে দিন কাটাতে পারে? তাদের বেঁচে থাকার জন্যে এমন কিছু করতে হয়, যার পরিচয় দেবার মতও কিছু থাকে না, আর ইচ্ছে করলেও তারা তা থেকে সরে যেতে পারে না।'

মায়ের কথায় কেমন সন্দেহ হল মন্টুর মাসি সম্পর্কে। হয়তো সত্যিই পরিচয় দেবার মত কোন কাজ তিনি করেন না। আর করবেনই বা কি করে? এ রাজ্যে তাঁর ইচ্ছার দাম দেবে কে? এখানে সম্রাট আছে, এখানে আছে তার মন্ত্রী। সম্ভবত তাদের খেয়াল-খুশি ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়।

আহারাদির পর আবার খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছিলাম। ভাবছিলাম বাকিটা শেষ করে ফেলব, এমন সময় মন্টু এসে হাজির হল। বললাম, 'কি খবর মন্টু?'

মন্টু তেমনি ধীর-স্থির সলজ্জভাবে আমার দিকে এগিয়ে এল।

বললাম, 'বোসো।'

সে বললে, 'না, বসব না।'

'কেন?'

'আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবো—মাসি বলে দিলে।'

'সে কি!' অবাক হয়ে আমি বললাম।

মন্টু বললে, 'মাসি বলছিল, আপনি সাধু-সন্ন্যাসি মানুষ, আমাদের বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়লে আমাদের জীবন সার্থক হবে।'

আমি হাসতে হাসতে মা ও মায়ার দিকে তাকালাম। তারপর মন্টুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মন্টু তোমার মাসির ধারণা ভুল। আমি কোন পেশাদার সাধু নই।'

মায়া হেসে বলে উঠল, 'দাদা পেশাদার সাধুটা কি?'

'বুঝলে না কথাটা? যারা সাধুগিরির ব্যবসা করে আর কি!'

'সাধুগিরির আবার ব্যবসা আছে নাকি?'

'আছে বলেই তো বললাম', বলে আমি মন্টুর দিকে তাকালাম। মন্টুর মুখে-চোখে দেখলাম, এক অদ্ভুত নিষ্ঠা। সম্ভবত সাধু বলে সে আমাকে দেখতে চায় নি, মানুষ বলেই সে আমাকে দেখেছে এবং মাসি-কে গিয়ে হয়তো সেই কথাই বলেছে। মাসি তাই এই মানব-দুর্ভিক্ষের জগতে মানুষ হিসাবেই আমাকে দেখতে চেয়েছেন। তাই হয়তো আমাকে নিয়ে যাবার এই তাগিদ।

কিন্তু আশ্চর্য হলাম অন্য কথা ভেবে। এই রাজ্যে মানুষের যা পেশা বা জীবিকা, সে পেশা বা জীবিকার প্রতি আগ্রহে এদের কি ভয় বলেও কিছু নেই? এমনও তো হতে পারে, আমার মত গেরুয়া পরে বা ছদ্মবেশে কোন গোয়েন্দাও তো আসতে পারে? এমনি করে আমার মত ধীরে ধীরে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে তারপর সবশুদ্ধ ওদের ধরপাকড় করে জেলে নিয়ে যেতে পারে। এদের জীবন ও জীবিকা যদি সভাজগতের অনুমোদিত রাস্তা ধরে না চলে, তবে তো এদের ভয় পাওয়ারই কথা আমার মত উটকো আগন্তুককে দেখে। কিন্তু, তথাপি এরা আমাকে এত আপন করে নেয়ার জন্য

ব্যগ্র হয়ে উঠছে কেন? তবে কি মানুষের মনোরাজ্যে পেটের ক্ষুধার মত, দেহের ক্ষুধার মত, মানুষের ক্ষুধাও আছে—যে মানুষকে মন দিয়ে ওরা ক্ষুধা মেটাবে? কে জানে—এই হয়তো মানুষের জীবনে চিরন্তন সত্য, শাশ্বত, বাস্তব!

আমি অস্বীকার করলাম না মন্টুকে। বললাম, 'চলো মন্টু আমি যাব তোমাদের বাড়ি!' কিন্তু কথাটা বলার সংগে সংগেই নিজের কানে আমার কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল। আরও বেখাপ্পা লাগল আমার গেরুয়াটা। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, যে গেরুয়া আমি পরেছি নিজের পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে, তার যেন আর কোন প্রয়োজনই নেই আমার কাছে। এই গেরুয়া পরে মন্টুর সংগে আমি পথ দিয়ে যাব—দুসারি লোক আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। এখানকার পরিবেশে সবাই কি তারা আমায় সাধু বলে ভাববে? বরং তারা মনে করবে, এই রাজ্যেরই আমি কোন ভণ্ড তপস্বী, মানুষকে ঠকিয়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য ভেক ধরেছি এই গেরুয়ার। অথচ সত্যিই আমি সাধু নই—আমি যা আমি তা-ই—কিন্তু সে পরিচয়ও আমার ঢাকা পড়ে যাবে তাদের চিন্তার পলেস্তারায়। তাই আমার মনে হল গেরুয়াটা যেন আমি ত্যাগ করতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু উপায় নেই।

মন্টু ইতিমধ্যে উৎসাহিত হয়ে বললে, 'তা'হলে চলুন—'

আমি মায়ার দিকে তাকালাম। মায়াদের এখানে এসে উঠেছি আমি, নেহাৎই ঘটনাচক্রে। তবুও তাদের এখানে এসেই আমার মন্টুর সংগে পরিচয়। এখন মায়াদের দূরে সরিয়ে রেখে যদি মন্টুদের ওখানে আমি পৃথকভাবে হৃদ্যতা স্থাপন করতে যাই, তবে সেটা তাদের প্রতি আমার অবজ্ঞাই প্রকাশ পাবে। অথচ সেরকম কিছু করা আমার মনের অভিপ্রায় নয়। তাই আমি মায়াকে বললাম, 'মায়া চলো ঘুরে আসি মন্টুদের বাড়ি থেকে।'

মায়া রীতিমত খুশি হয়ে উঠল। সে যেন মনে মনে এইটুকুই আশা করছিল। আমার কথায় সে পরম উৎসাহভরে বলে উঠল, 'চলুন।'

সেই বস্তির আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার মত পথ। ঘুরে ঘুরে আমরা চলতে লাগলাম। মাত্র মিনিট দুই-তিনের পথ। তবু মনে হল যেন অনেক দূরে এসে পড়লাম। মায়াদেরই অনুরূপ একখানা ঘরের দাওয়ার সামনে এসে মন্টু খুশি মনে ডেকে উঠল, 'মা—সি!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নাকে তিলক কাটা এক মধ্যবয়সী বৈষ্ণবী মহিলা। তিনি বেরিয়ে আসার মধ্যে শুধু মুহূর্ত-মাত্র, হঠাৎ আমি বিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'রা-ণী-দি!'

'বি-জ-ন!' তিনিও চিৎকার করে উঠলেন।

আরও একটা মুহূর্ত। রাণীদি ছুটে এসে আবেগের সংগে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। হঠাৎই আমি কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাঁর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তাকালাম, মায়া আর মন্টুর দিকে। ওদের চোখে তখন গভীর বিস্ময়। ওরা নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছে, রাণীদি আমার পূর্ব পরিচিত এবং বহুদিন অদেখার পর আজই বোধ করি যবনিকা উঠল সর্ব-প্রথম।

বাস্তবিক ওদের সে বিস্ময় আদৌ অমূলক নয়। শুধু ওদেরই বা বলব কি—এ বিস্ময় তো আমারও। কত দিন, কত বছর পার হয়ে গেছে, হঠাৎ এমন অবস্থায় আমি রাণীদিকে দেখব, এ তো আমিও কোনদিন ভাবি নি। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে রাণীদি বললেন, 'চ চ ঘরে চ।' তারপর একরকম ঠেলেঠুলে রাণীদি আমায় তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর ডাকলেন, 'আয় মায়া, আয় মন্টু। মন্টু, বিজন তোর মামা হয়রে—প্রণাম কর মামাকে!'

মন্টু প্রণাম করল আমাকে।

ঘরের ভিতরটা রাণীদির এক অপূর্ব সুষমায় পূর্ণ। একদিকে কৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্তি। সামনে একটা চৌকি। চৌকির ওপরে ধূপদানিতে জ্বলছে ধূপ। সামনে জড়ো করা অজস্র ফুল। পাশে চন্দনের বাটি আর চন্দনপিঁড়ি। ঘরের একদিকে একখানা তক্তাপোষ। তাতে সুন্দর একটি শুভ্রশয্যা পাতা। একদিকে আনলা, আলমারী, নিচে জল-চৌকিতে বাসন আর তৈজসপত্র। ঘরের উপরদিকটায় শুভ্র চাদরের চাঁদোয়া। সবটাই ভিতরটা সুরুচির পরিচয়ে পরিচ্ছন্ন।

মন্টু আমাকে প্রণাম করে উঠতেই রাণীদি বললেন, 'বিজন এখানে এই নরককুণ্ডে তোর সংগে আবার কখনো দেখা হবে, এ আমি কখনো ভাবি নি!'

'আমিও ভাবি নি রাণীদি!'

'কিন্তু এ তোর কি রূপ রে,' এবার রাণীদি মেয়েদের স্বাভাবিক শাসক-মূর্তিতে ফুটে উঠে আমাকে বললেন, 'তুই সন্ন্যাসি হতে গেলি কোন দুঃখেরে?' তারপর বললেন, 'আচ্ছা আগে বোস, তারপর বলছি।'

শুভ্র বিছানার ওপর বসতে বসতে আমি বললাম, 'দুঃখে কি মানুষ সন্ন্যাসি হয় রাণীদি?'

'দুঃখে নয়তো কি', রাণীদি বললেন, যাক্‌গে আগে বল্ [illegible]বাবু কাকিমা সব কেমন আছেন- আর আর ভাইবোনেরা?'

'সবাই ভাল আছেন।'

'কাকাবাবুর, শরীরটা বেশ ভাল?'

'বুড়ো হয়েছেন তো?'

'কাকিমা তেমনিই পরোপকার করে বেড়ান?'

'মা আমার দেবী ভগবতী। বিপদ-আপদ কারো দেখলে তেমনিভাবেই ছুটে যায়।'

'আহা মা—অমন মানুষ হয় না।'

আনন্দের উচ্ছ্বাসে রাণীদির মনের সবগুলো দরজা যেন একসংগে খুলে গেছে। অনর্গল তিনি অতীতের দিন-গুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

'কতদিন পরে তোর সংগে দেখা হল, বল্ তো বিজন?'

'প্রায় বারো বছর পরে।'

'বারো বছর—আহা-আ একটা যুগ।'

হ্যাঁরে বিজন! তোর মনে পড়ে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে তুই ঘুমোতিস?

বললাম, 'পড়ে।'

'রাণীদিকে না দেখতে পেয়ে তোর কষ্ট হয়েছিল প্রথম প্রথম?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে তোরা আমাকে ভুলে গেলি বল্‌তো?'

বলতে যাচ্ছিলাম, রাণীদি তোমায় তো আমরা ভুলি নি, তুমিই আমাদের ত্যাগ করে চলে এসেছিলে। কিন্তু পাছে মন্টু বা মায়ার মনে বেচারার চলে আসা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে পড়ে, সেই ভেবে আমি বলতে পারলাম না। কিন্তু রাণীদি দেখলাম, সে প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই করে দিলে। তিনি বললেন, 'আমি জানি গো জানি। তোরা সবাই ভেবেছিলি রাণীদি মেয়েছেলে হয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে, তখন সে জাহান্নামের পথ ধরেছে। তাই অসতী কুলটা মেয়ের আর কে খবর রাখবে বল্?'

বললাম, 'রাণীদি এ কথা কেউ যে মনে করে নি, তা নয়। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, আমি কোনদিন তা মনে করি নি।'

রাণীদি বললেন, 'ঠিক বলচিস্?'

'হ্যাঁ রাণীদি।'

রাণীদি হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর সেইভাবেই বললেন, জানি না মানুষের মন অন্তর্যামী কিনা, মন্টুর কাছে যখন তোর কথা শুনলাম, তখন কেবলই আমার মনে হচ্ছিল যে আমার খুব আপনজন এসেছে মায়াদের বাড়িতে। শুধু বার বার মনে হচ্ছিল হয় তো কোনদিনই আমার কথা কেউ জানবে না, জানতে চাইবেও না তবু যদি কোন আপনার লোককে সকল খুঁ

জানিয়ে যেতে পারি। তাতে আর কিছু না হোক, বংশের কলঙ্কটা মুছে যাবে।'

'কিন্তু আমি তো জানি রাণীদি তুমি কলা-কনী নও।'

'সব কথা তুই জানিস?'

'জানি।'

'কি করে জানলি?'

'মনে নেই তোমার—আমার হাতের লেখা ভাল বলে সন্দেশ রসোগোল্লা খাইয়ে তুমি জামাইবাবুকে চিঠি লেখাতে আমাকে দিতে?'

'সে সব কথা তোর মনে আছে?'

'সব মনে আছে। কিছুই আমি ভুলি নি।'

'যাক গে, কি কথায় সব কি কথা এসে যাচ্ছে' বলে একটা উদ্গত দীর্ঘ-শ্বাসকে বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে রাণীদি বললেন, 'ওরে মন্টু, মামাকে জল দে—বহুদিন পরে ওকে আমি পেয়েছি। ওকে আমার ঠাকুরের প্রসাদ দিই।'

এবার দুষ্টুমি করে বলে উঠলাম, 'প্রসাদ আমি খাব না।'

'কেন?'

'আমি মিষ্টি খেতে পারি তোমার হাতে। ঠাকুরের প্রসাদ আমি খাব না।'

সেই এক প্রশ্ন, 'কেন?'

'ঠাকুরের চেয়ে আমার দিদির প্রসাদ আমার কাছে অনেক সত্যি।'

'সে কি রে, অমন কথা মুখে আনিস্ নি, পাপ হবে!'

'তোমার ঠাকুরের কি পাওয়ার আছে যে আমায় পাপ দেবে?'

'ছিঃ ছিঃ অমন কথা মুখে আনিস্ নি বিজন। এতে তো তোর সাধু হওয়াই ঘুচে হয়ে যাবে!'

'আমি তো সাধু নই!'

'তবে গেরুয়া পরিচিস্ যে?'

'শিগ্‌গিরই পরা ছেড়ে দেবো।'

'রাণীদি আমাকে পেরে না উঠে শেষ পর্যন্ত বললেন, তুই ঠিক ছেলেবেলার মতই আছিস বিজন—একটুও যদি বদলে থাকিস্? যাক, তোকে ঠাকুরের প্রসাদ খেতে হবে না, আমিই তোকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি নিজে হাতে। মন্টু যা তো বাবা একবার'......তারপর আঁচল থেকে পয়সা খুলে মন্টুকে দোকানে পাঠালেন রাণীদি।

মন্টু চলে যেতে রাণীদি সস্নেহে বললেন, 'তোদের বাড়িতে এই দস্যিটা কি করে এল রে?'

মায়া তার যথাযথ বিবরণ দিলে। রাণীদি বললেন, 'তা-ই। চিরটাকাল ও এমনিই। কারো হাঁকডাক বারণ কিছু শোনে না। তাই হয়তো কারোকে না বলে সোজা ও বেরিয়ে পড়েছে সাঁন্নাসি সেজে। তারপর কৌতূহল হয়েছে, তোর আমায় চলে এসেছে তোমাদের বাড়িতে—এ দেখবে এখানে কি আছে।

ঠিক বলেছো মাসি।'

একেবারে মিথ্যে বলেন নি রাণীদি। প্রথম দিকটা সত্যি না হোক্, শেষদিকটা যে সত্যি সে তো আর আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। কিন্তু আশ্চর্য, কতদিন পরেও রাণীদি আমাকে মনে রেখেছেন, একেবারে ঠিক ঠিকভাবে মনে রেখেছেন ভেবে আমি যার-পর-নাই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি। আমার স্বভাবটি পর্যন্ত তিনি ভোলেন নি।

ইতিমধ্যে মন্টু এসে পড়ল মিষ্টি কিনে নিয়ে।

ছোট্ট একখানি ঘর। সেখানে আড়াল করার কিছু নেই। রাণীদি মন্টুর হাত থেকে মিষ্টির ঠোঙাটা নিয়ে চৌকির ওপর থেকে একখানা রেকাবি তুলে নিলেন। তারপর মিষ্টিগুলো রেকাবিতে ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

বললাম, রেকাবিতে করে আমি তো খাব না রাণীদি। তুমি কি আমায় কুটুম পেয়েছো। আমি তোমার ভাই নই?'

রাণীদি হেসে বললেন, 'আমি কি সেই কথাই বলছিরে পাগলা! মিষ্টিগুলো একটা জায়গায় তো ঢালতে হবে। আয় না, আমি তোকে খাইয়ে দিচ্ছি।'

'এই তো আমার দিদির কথা।'

'তুই যে ঠিক সেইরকমই আছিস্ এ তো আমি তোকে আগেই বলিছি। আয় নে—'

আমি বিছানার বসে মুখ বাড়িয়ে হাঁ করলাম। রাণীদি টুক্‌টুক্ করে সন্দেশগুলো আমার গালে ফেলে দিতে লাগলেন আর আমি খেয়ে যেতে লাগলাম।

মিষ্টির ঠোঙা মাসিকে দিয়ে ইতি-মধ্যেই জলের গ্লাস হাতে মন্টু পাশে দাঁড়িয়েছিল। সব মিষ্টিগুলো শেষ করবার আগে আমি মন্টুর দিকে জলের গ্লাসের জন্য হাত বাড়ালাম। মন্টু এগিয়ে আমাকে জল দিলে। জল খাবার পর রাণীদিকে বললাম, আমি আর খাব না।' এবার মায়া আর মন্টুকে দাও—'

মায়া ও মন্টু দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'না, না।'

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তা হয় না—আমি বলছি খেতে তোমাদের হবেই।'

অগত্যা রাণীদিকেও বলতে হল, 'নে তোরা খা।'

রাণীদি সম্ভবত আমাকে খাওয়ানোর তৃপ্তিটা ভাল করেই অনুভব করেছিলেন। তাই তারই আবেগে তিনি বলে উঠলেন, 'বিজন কতদিন পরে তুই আবার আমার হাতে খেলি বল্ তো?'

'রাণীদি এ-ও সেই বারো বছর পরে। তুমি যাকে একটু আগে বল্‌লে একটা যুগ!'

হ্যাঁ একটা যুগই বটে।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাঁর বুক থেকে বাইরে আছাড় খেয়ে পড়ল। সম্ভবত অনেক অতীতের কথা মনে পড়ে মনটা তাঁর হু হু করে উঠল। মানুষের জীবনে কোথায় যে কোন [illegible] সূত্র থাকে, আর কোথায়ই বা থাকে না, আবার মিলনসূত্র তা [illegible] জানতে পারে না। [illegible] সত্যি! [ক্রমশঃ]

---

[ ২০৬১ পৃষ্ঠার পর ]

জন্য। সে সময় রাসেল ফ্রয়েডের এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন যে, ছেলেবেলার অবদমিত কামনা-বাসনা পরবর্তী জীবনে মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করে। সুতরাং পরবর্তী জীবন যাতে সুস্থ ও সুখী হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাসেল তাঁর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের যা খুশি তাই করবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। এই পরীক্ষা থেকে তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রদের বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা আছে বলে সেখানে প্রতিভার এত বিকাশ দেখা যায়।

বর্তমান কালের নির্মম নিরানন্দ পরিবেশে বাস করেও কি করে সুখ ও শান্তি জয় করা যায় তার পথ বলে দিয়েছেন রাসেল তাঁর 'দি কংকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস' গ্রন্থে। এখানেও দেখা যাবে সুখ বা অ-সুখের জন্য ব্যক্তিরই প্রধান দায়িত্ব।

রাসেল তাঁর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ অনবদ্য আত্মচরিতের ভূমিকায় বলেছেন :

**Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life : the longing for love, the search for knowledge; and the unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a way-ward course, over a deep ocean of anguish, reaching to the very verge of despair."**

কিন্তু হতাশার সমুদ্রে ডুবে যান নি, যেমন ডুবে মরেন নি নরওয়ের সমুদ্রে এরোপ্লেন ভেঙে। বিশ্বাস তাঁকে বাঁচিয়েছে বারবার। আইনস্টাইনের কথা দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই : "আই রিগার্ড ইট অ্যাজ ফরচুনেট দ্যাট সো আবিড্‌ অ্যান্ড ব্রুট্যাল এ জেনারেশন কেন কেউম দিস্ ওয়াইজ, অনারেবল, বোল্ড অ্যান্ড হিউমারাস্ ম্যান।"

**কিশোর কবি সুকান্ত** (মহালয়া, (১৩৭৬)--সুবোধ চক্রবর্তী, কাঠালপল্লী, চাকদহ, নদীয়া। দাম : তিন টাকা।

কিশোর কবি সুকান্তের স্বল্পস্থায়ী জীবনের নানা কাহিনী ও তাঁর কাব্য সাধনার কিছু পরিচয় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপিত করে সুবোধ চক্রবর্তী আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ২১ বছরের জীবনে সুকান্ত সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর দিকে চাইলে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আজন্ম দারিদ্র্য পীড়িত এই নির্ভীক বিদ্রোহী কবি ছিলেন জনগণের সত্যিকার স্বতঃস্ফূর্ত কবি—সৌখীন মজদুরী ছিল না তাঁর কাব্যে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার কথা, পরিবেশ, নম্রঋজু, তেজোদৃপ্ত চরিত্রের কথা, সমসাময়িক কালের কিছু তথ্য-বহুল ঘটনা, সমাজ-সাহিত্য ও রাজ-নীতিতে তাঁর বিশিষ্ট অবদান সুবোধ-বাবু বিশদভাবেই অঙ্কন করেছেন, যার ফলে কিশোর কবি সুকান্তের একটি সামগ্রিক চিত্র পাঠকের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। সুকান্ত সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের কাছে গ্রন্থটি মহামূল্য বিবেচিত হবে।

**মুক্তিপথ**—মাস্টারমশাই। প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়চৌধুরী; ৬৯/১ ডাক্তার লেন, কলকাতা-১৪। দাম : পাঁচ টাকা।

'মুক্তিপথ' বইটি পড়ে লেখকের প্রতি শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে মনটা ভরে উঠল। শ্রদ্ধা এই জন্যে যে, আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ মনীষীরা অনেক সময় যা বলতে সাহস করেন না, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সাহস করে তা বলেছেন। আর এই জন্যে সহানু-ভূতি যে, লেখকের সব প্রচেষ্টাই না 'অরণ্যে রোদন'-এর সামিল হয়। 'বার্ধক্যের শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ করে এই মুক্তিপথ' প্রকাশ করার আসল উদ্দেশ্য না ব্যর্থ হয়।

বাংলার তরুণ সমাজের দরবারে এ বইটির কি ঠাই হবে? প্রশ্নোত্তরে লেখা 'বাঙালীর মুক্তিপথ' তরুণরা কি পড়বে?

যাতে সবাই পড়ে, সেজন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি লেখক। নাট্যাকারে বক্তব্য বিষয়টিকে তিনি এখানে উপ-স্থাপিত করেছেন। দৃশ্যের পর দৃশ্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে মূল বক্তব্যকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে দিতে চেয়ে-ছেন। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, এ বই হয়তো অনেকেই পড়বে না। এ নাটক অভিনয় করতে অনেকেই সাহস করবে না হয়তো। কারণ, সস্তায় কিস্তি মাৎ করার কোনো কায়দাকানুনই এ লেখক জানেন না, নিষিদ্ধ প্রেমের মনোরম চাটনি, যৌন-বিকৃতির উত্তেজক মশলা, ককটেল পার্টিকে ঘিরে নাচ-গান-হুল্লোড়ের তুফান এবং এমন কি বাস্তবতার নাম করে অতি সস্তায় কিছু মকরধ্বজ—কিছুই তিনি সরবরাহ করতে পারেন নি। তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীরা নেহাৎই সেকেলে এবং একে-বারেই বৈচিত্র্যহীন বলে অনেকের মনে হবে। অনেকেই 'মুক্তিপথ'-এর লেখক মাস্টারমশাইকে আড়ালে হয়তো বিদ্রূপ করতেও ছাড়বেন না। কিন্তু তবু, দেশের এই দুর্দিনে এ বইটি যদি ভুল করেও কেউ পড়ে ফেলেন তো ক্ষতির বদলে লাভেরই মুখ দেখবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

**রজনীগন্ধা** (১৩৭৬)—চন্দ্রগুপ্ত, সেকেন্ড ফিডার রোড, বাঁকুড়া।

রজনীগন্ধার ৬৬টি মিষ্টি গীতি-কবিতা পড়তে এবং আবৃত্তি করতে বেশ ভাল লাগে। রজনীগন্ধার মতোই সুন্দর গন্ধ বিতরণ করেছেন ছদ্মনামধারী কবি। জীবনের নানা হাটে বিচিত্র সব অভিজ্ঞ-তার মধ্যে দিয়ে চলে চিরন্তন প্রেমের অনুভূতিতে কবির চিত্তলোক উজ্জ্বল হয়েছে। কবিতাগুলি খুব বড় নয়—৮ লাইনের, কোনটি বা চার লাইনের। সুধী কাব্যরসিক বইখানি পড়লে আনন্দ-আস্বাদ লাভ করতে পারবেন। কাব্য-গ্রন্থটির কোন মূল্য উল্লেখ করা হয় নি।

**বিশ্বভারতী পত্রিকা**—সম্পাদক : ডক্টর সুশীল রায়। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য : দেড় টাকা।

অবিসম্বাদিতভাবে একটি বিস্ময়কর ঘটনা : বিশ্বভারতী পত্রিকার মতো বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা ২৫ বর্ষ অতিক্রম করে ১৩৭৬-এর শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় ২৬ বর্ষে পদার্পণ করেছে। প্রথম বর্ষে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে একাদশ বর্ষ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বাদশ থেকে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত পুলিনবিহারী সেন। সপ্তদশ বর্ষে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ। দ্বাবিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন ডক্টর সুশীল রায়।

বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রকা-শিত লেখাগুলিকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাই সমস্ত লেখা প্রকাশিত হবার আগে পাণ্ডুলিপিগুলিকে নির্ভুল করে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার দায়িত্ব নির্ভর করে সম্পাদকের ওপর। বর্তমানে ডঃ সুশীল রায় পূর্বসূরীদের মতো সে কাজে নিপুণ যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁর লেখকখ্যাতির সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে সুযোগ্য সম্পাদনার খ্যাতি।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে আছে, রথীন্দ্র-নাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি চিঠি। সম্পাদকপ্রদত্ত প্রসঙ্গ পরিচয়ের সাহায্যে চিঠিগুলির অভ্যন্তরে সহজেই প্রবেশ করা যায়। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মনোমোহন ঘোষ-সম্পর্কিত দুটি লেখা এবার রয়েছে। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের ভাষণের উদ্ধৃতি, দ্বিতীয়টি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ প্রস্থান ও পঞ্চম পুরুষার্থ দার্শনিকভিত্তির ওপর জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ। শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের গানে বিলাতি সংগীতের প্রভাব' বিশেষ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীর মূল্যবান প্রবন্ধ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এবারের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ষ ১ থেকে বর্ষ ২৫-এর সূচীপত্র সংকলন। সংকলন করেছেন সুবিমল লাহিড়ীর সাহায্য নিয়ে মানবেন্দ্র পাল। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, গ্রন্থপরিচয়, স্বরলিপি প্রাসঙ্গিক চিত্রগুলিও মূল্যবান।
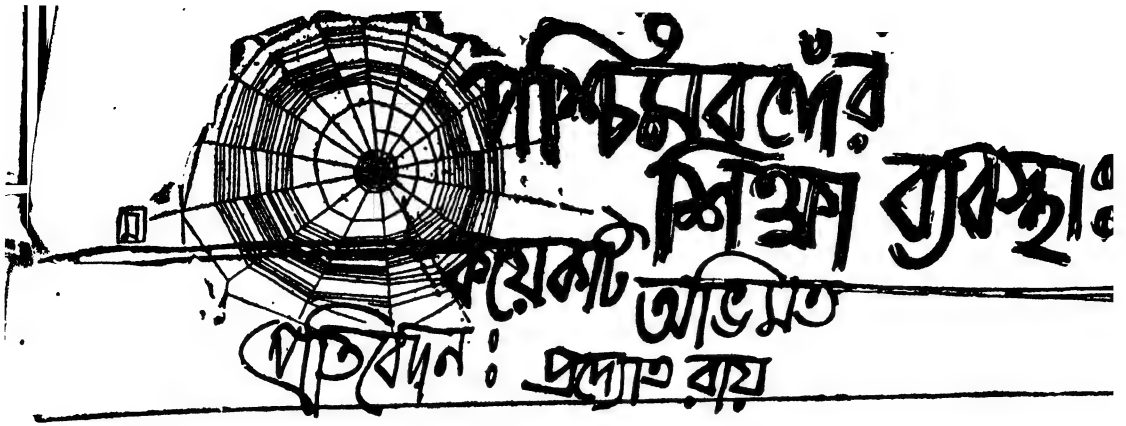
**যুক্তফ্রন্ট** সরকার গঠিত হবার পর বাংলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। সরকার এমন কিছু নতুন নিয়ম-কানুন করেছেন —যা সবাইকে খুশি করতে পারে নি। পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কোন পরিবর্তন আনতে পারেন নি। পরীক্ষার মরশুম সুরু হয়েছে। পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করা একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। এর বিরুদ্ধে কিছু করা দরকার—বলছেন সবাই। কিন্তু নতুন পথের সন্ধান পাচ্ছেন না শিক্ষাবিদগণ। এদিকে প্রহসন চলছে—সম্ভবত আগামী দিনেও চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, একজন গবেষণারত ছাত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সম্পাদককে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'চারটে প্রশ্ন করে তাঁদের মতামত পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম।

প্রঃ যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি বর্তমানে বাংলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনতে পেরেছে কি?

উঃ **শ্রীঅনিলকুমার সরকার** (অধ্যাপক): যুক্তফ্রন্টের এখনও পর্যন্ত সর্বাঙ্গীন কোন শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। পরিবর্তন তো আসেই নি, বরং শিক্ষা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বশ্রেণীর লোকই একটা confusion-এ ভুগছে।

**শ্রীগীতা হালদার** (গবেষণারত ছাত্রী): Basic Structure কিছুই পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতির প্রগতি এবং বাস্তব মূল্যায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শিক্ষা ক্ষেত্রের কেন্দ্র-বিন্দু, শিক্ষক সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি কিছুটা হয়েছে—যার দ্বারা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান কিছুটা হলে ছাত্রদের প্রতি তাঁরা বেশি নজর দিতে পারবেন। প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলিতে যোগ্য শিক্ষকের দরকার। তা না হলে গুণগত পরিবর্তন আসবে না। পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রগতির মানদণ্ড হিসেবে ধরে না নিয়ে, আমাদের দেশে সম্ভাব্য ও প্রাপ্ত উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোবৃত্তি না নিয়ে।

**শ্রীউৎপল তালুকদার** (ছাত্র নেতা): নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমরা বিগত বাইশ বছর কংগ্রেসী শাসনে দেখেছি যে, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শহর কেন্দ্রিক ছিল। তার ফলে দেশের বেশিরভাগ কৃষকই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। যুক্তফ্রন্ট গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছে। শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা যাতে বিনা বেতনে পড়তে পারে, ফ্রন্ট সরকার তার ব্যবস্থা করছেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল এই যে, কংগ্রেসীরা যে ধনতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, ফ্রন্টের সঠিক হস্তক্ষেপের ফলে তা আজ ভাঙতে চলেছে। এক বছরের মধ্যে ফ্রন্ট সরকারের এই কাজ নিশ্চয়ই অনেকখানি এবং সেই জন্যই অভিনন্দনযোগ্য।

প্রঃ কাগজে দেখছি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১১০টি বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি ভেঙে দিয়ে সরকার এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করেছেন। এতে কি শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র রক্ষিত হল?

উঃ **শ্রীঅনিলকুমার সরকার**: এখানে সংখ্যাটা কিছু নয়। প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়েছে কি-না, সেটা তা ছাড়া এতো খবরের কাগজে দেখা সংখ্যা। কাজেই এ সম্বন্ধে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। অনেকক্ষেত্রে স্কুল কমিটিগুলো যে অবস্থায় ছিল, তাতে সেগুলো ভেঙে দেওয়াটাই উচিত হয়েছে। এখন নতুন স্কুল কমিটি গড়াটা সত্যই গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়েছে কি-না সেটা নির্ভর করে প্রতিটি কমিটির ক্ষেত্রে।

**শ্রীগীতা হালদার**: বিদ্যালয়গুলির সামগ্রিক উন্নতির জন্য যদি এ-কাজ করা হয়ে থাকে তা হলে আমি মনে করি, সরকার কিছু অন্যায় করেন নি। কিন্তু শিক্ষায়তনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলিকে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়, তাহলে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

**শ্রীউৎপল তালুকদার**: কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছে। সর্বোপরি যে ঘটনাগুলি সমস্ত স্তরের মানুষের সামনে শুভজনক সেগুলি নিশ্চয়ই গণতন্ত্র রক্ষা করেছে। তবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে যে-সব এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করেছে তা অবশ্যই নিন্দনীয়।

প্রঃ উপাচার্যদের অনেকে বলছেন, শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। এ-কথা কি যথার্থ? শিক্ষার মান উন্নয়নের উপায় কি?

উঃ **শ্রীঅনিলকুমার সরকার**: Average ছাত্রদের ক্ষেত্রে মান যে নেমে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে ভাল ছাত্রদের সংখ্যা বেড়েছে এবং তাদের মান কোন অংশেই কমে নি। অর্থাৎ ভাল ও সাধারণ ছাত্রের মধ্যে মানের ব্যবধান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা জটিল সমস্যার। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে এ সমস্যা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সুতরাং দু'চার কথায় বা আংশিকভাবে এ সমস্যার সমাধানের পথ দুরূহ।

**শ্রীগীতা হালদার**: 'শিক্ষার মান' এ শব্দটাই আপেক্ষিক। সুতরাং স্থান, কাল, পাত্রের বিচারে, দেশ থেকে দেশে কাল থেকে কালে শিক্ষার মান বিভিন্ন ধরনের। গাণিতিক কঠোরতা নিয়ে এখানে বিচার করা চলে না: একটা উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পন্ন দেশের শিক্ষার মানের সঙ্গে একটা অর্ধ-উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পন্ন

দেশের শিক্ষার মানের তুলনা করা কাম্য নয়। আমাদের দেশে যে হারে ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে, সেই হারে আদর্শ-শিক্ষক এবং উপযুক্ত উপকরণের শোচনীয় অভাব। তাই বাস্তব পরিস্থিতির পটভূমিতে বিচার ক'রে দেশের শিক্ষার মান নিম্ন —একথা বিদগ্ধজনোচিত উন্নাসিকতা ছাড়া কিছু নয়; চাই প্রকৃত শিক্ষা-বিদের সহানুভূতিসম্পন্ন দরদী বিচার।

শ্রীউৎপল তালুকদার: কখনই নয়। শিক্ষার মান যথেষ্ট উচ্চ। তবে একে আরও ভাল করার জন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক আরও ভাল করতে হবে এবং শিক্ষকদের ছাত্রদের অসুবিধাগুলি সহৃদয়তার সঙ্গে বোঝা উচিত। উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলেই শিক্ষার মান উন্নত হয়। উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা অতীতেও ছিল না, আজও প্রচলিত হয় নি। এ ব্যাপারে দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি ফেরান উচিত। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা উচিত।

শিক্ষা সম্পর্কে যে নীতি গ্রন্থের আছে, সে নীতিকে যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে অনেকাংশে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরি-বর্তন আসবে। কিন্তু সমাজব্যবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন না হলে এর সঠিক রূপায়ণ সম্ভব নয়। আজকের ভারতবর্ষে উৎপাদনমুখী শিক্ষার শ্লোগান আগামী দিনের সমাজ পরি-বর্তনের ক্ষেত্রে একটি বড় হাতিয়ার।

শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে গেলে যে অসুবিধাগুলি সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হল এই যে, ছাত্রদের অসুবিধাগুলিকে উপেক্ষা করার মনো-বৃত্তি। আমরা তাই বলছি যে, ছাত্ররাই ছাত্রদের অসুবিধার কথা তুলে ধরতে পারে। ছাত্রদের বিষয়ে নীতি নির্ধারক কমিটিগুলিতে (সিণ্ডিকেট, সিনেট, স্কুল ও কলেজের পরিচালক সমিতি) ছাত্র প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্যক। এখন এ ব্যবস্থা চালু নেই। ফলে ছাত্র-দের অসুবিধার কথা ছাত্ররা বলতে গেলেই আমলাতন্ত্রের মুখপাত্র উপাচার্য-গণ আৎকে উঠে বলছেন যে, শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। আসলে ছাত্র আন্দোলন হল বস্তা পচা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুস্থ সমাজ তৈরি করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ।

প্রঃ পরীক্ষা আজ আর পরীক্ষা নয়, একটা মস্ত বড় প্রহসন। এর প্রতিকার করবেন কেমন করে?

উঃ শ্রীঅনিলকুমার সরকার: ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে, সারা বছরের Progress-এর ভিত্তিতে ছাত্রদের মান নির্ধারিত হওয়া উচিত। বছর শেষে একটি পরীক্ষার ভিত্তিতে মান নির্ধারণ অনুচিত।

শ্রীগীতা হালদার: বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা যে প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে সেজন্য শুধুই ছাত্রসমাজের বেপরোয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিই দায়ী নয়—কর্তৃপক্ষেরও সমান দায়িত্ব আছে। যদি ছাত্রদের মনে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগাতে হয় তা হলে তাদের মনে পরীক্ষা পদ্ধতির স্বচ্ছতা সম্বন্ধে, অর্থাৎ ন্যায় নিষ্ঠার প্রতি ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে হবে এবং সেইজন্য বহু সময় তাদের তরুণ-ধর্মজনিত স্বভাবসুলভ অনেক উদ্ধত প্রশ্নেরও সমাধান সুষ্ঠুভাবে করা উচিত। যদি ছাত্র সম্প্রদায় বুঝতে পারে যে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, সত্যকার ন্যায়নিষ্ঠা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তিহীন, তাহলে তাদের দুর্নীতিমূলক উপায় গ্রহণের প্রবণতা অনেক কমে যাবে। আশা করা যায় বর্তমানের রণক্ষেত্রের ন্যায় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি আগামী দিনের নিয়মানুবর্তী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হবে।

শ্রীউৎপল তালুকদার: পরীক্ষার্থী-দের মধ্যে বর্তমানে যে অ-পরীক্ষার্থী সুলভ মনোভাব দেখা যাচ্ছে তা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। সুস্থ ছাত্র আন্দোলন বা প্রকৃত ছাত্র কখনই একথা বলে না যে অসৎ উপায়ে পরীক্ষায় পাশ কর এবং একটি অভিজ্ঞানপত্র সংগ্রহ কর। বর্তমান অবস্থার প্রতিকার করতে হলে কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রতিটি শিক্ষায়তনে পাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পড়িয়ে দেওয়া উচিত এবং পাঠক্রমের বাইরে কোন প্রশ্ন দেওয়া উচিত নয়। টিউশন বজায় রাখতে গিয়ে কিছুসংখ্যক ছাত্রকে পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন যোগান না দেওয়া শিক্ষকদের একান্ত কর্তব্য। পরীক্ষার্থীদের গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত অন্যায়। ছাত্রদের জন্য গ্রন্থাগারে অধিক সংখ্যায় প্রয়ো-জনীয় গ্রন্থ রাখা উচিত। পাঠ্য-পুস্তকের দাম কমান উচিত।

প্রঃ প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই একটি করে ছাত্র সংস্থা আছে। এই সংস্থাগুলির পক্ষে ছাত্রদের অসৎ উপায় অবলম্বন করতে নিষেধ করা উচিত নয় কি?

শ্রীগীতা হালদার: রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজ নিজ ছাত্র সংস্থা-গুলিকে সততার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে না। রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যখন সংগ্রামের জন্য যখন উদাত্ত আহবান জানায়, তখন সততার প্রশ্নেই যদি তাদের উপর যোগ্যতা না পাওয়া যায়—এই আশংকা। যদিও সততা, নিষ্ঠা, সমাজ-সেবা ইত্যাদি ছাত্রজীবনের কতকগুলি অপরিহার্য কর্তব্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলির সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু কূটনীতির মৌলিক বিরোধ।

মানুষের বিভিন্ন সত্তা আছে বলেই বিভিন্নক্ষেত্রে তার ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। একজন ছাত্রেরও শিক্ষা সত্তাকে তার রাজনীতিক সত্তার গ্রাস হতে দেওয়া উচিত না, কারণ, বৃহত্তর অর্থে প্রকৃত রাজনীতির ব্যাপ্তি অনেকখানি যেখানে তার প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে কোন সংঘাত নেই। সর্বোপরি সৎ ছাত্র সমাজ যে কোনো দেশের অমূল্য সম্পদ।

শ্রীউৎপল তালুকদার: কোন ছাত্র সংগঠনই একথা বলে না যে, ছাত্ররা অসৎ উপায় অবলম্বন করুক। বরং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (১৪৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) পরি-চালিত বিভিন্ন ছাত্র সংসদগুলি পরীক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট অটোনমাস ছাত্র সংসদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আন্দোলন সুরু করেছে। প্রমাণস্বরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ঐশ্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের নাম করা যেতে পারে। এই আন্দোলনের চাপে ছাত্র 'অবজারভার' নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ একই-ভাবে মনোবিজ্ঞান বিভাগেও আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং সেই আন্দোলনে জয়লাভ করে প্রমাণ করেছিল যে ছাত্র ফেডারেশনের ছেলেরা পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আগামী দিনেও আমাদের এ লড়াই চলবে।

তবে একথা ঠিক যে, বিভিন্ন ছাত্র সংস্থা মঞ্চ থেকে অসৎ উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে সুস্থভাবে পরীক্ষা দেবার জন্য ছাত্রদের আহবান জানান হয় নি। তবে একথাও ঠিক যে, এ ব্যাপারে শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই চলবে না, শিক্ষক ও অধ্যাপকদেরও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে এবং সুস্থ ছাত্র সমাজ তৈরি করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

প্রঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, এ, বি, টি, এ ও ছাত্র সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্ত

[শেষাংশ ২০৭৭ পৃষ্ঠায়]

[পূর্বানুবৃত্তি]

## দুই মন্ত্রীর দৃষ্টিতে

**শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য**
**তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী**

—সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে যে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, তার সূত্রপাত হয়েছে প্রধানত যুক্তফ্রন্টের অংশীদার দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে গঠিত যুক্তফ্রন্টের এই শরিকী সংঘর্ষের মূল কারণ কি?

—সংঘর্ষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেটা আমার চোখে প্রথম ও প্রধান কারণ বলে ধরা পড়ে, সেটা হলো রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দূরদৃষ্টির অভাব। আমরা (ওয়ার্কার্স পার্টি) নির্বাচনের আগে যখন যুক্ত-মোর্চা গঠনে সম্মতি দিয়েছিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের একটা সাধারণ মঞ্চ এবং তার একটা কর্মসূচী প্রণয়নের উপরও জোর দিয়েছিলাম। দুঃখের হলেও সত্য যে, তখন আমাদের পরামর্শ গ্রাহ্য হয় নি। আজকের সমস্যাটা তাই সংগ্রামের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি নিয়ে। কি কি বিষয় নিয়ে কিভাবে কোন্ পর্যায়ে গণ-আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত হবে এ সম্পর্কে কোন যুক্তসিদ্ধান্ত নেই। ফলে, যা হবার হচ্ছে। প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে আন্দোলন চালাচ্ছেন এবং আন্দোলন দ্বারা চালিতও হচ্ছেন।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। অথচ বর্তমানে কেন্দ্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে, সেই মিলিত আন্দোলনের কর্মসূচী চাপা পড়ে গেছে। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের নেতারা তাঁদের কর্মীদের কাছে আশু করণীয় কোন কর্মসূচী রাখতে পারছেন না—যার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের সংহতি বৃদ্ধি হতে পারে। তাই এখন একমাত্র অবজেকটিভ হয়েছে দলবৃদ্ধি করা, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে ঈর্ষা, দম্ভ, অসহিষ্ণুতার ক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়ে চলেছে। এটা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা অবস্থার বিশ্লেষণ। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের ৯ দফা প্রস্তাবে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার সঙ্গেও আমরা একমত। বিভিন্ন দলের মধ্যে সমাজবিরোধীদের অনুপ্রবেশ অবস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে জটিল করে তুলেছে। ব্যক্তিগত রেষারেষি কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবাদে রূপ নিয়েছে। কিন্তু কোন কোন দলের মত আমরা একথা বলতে চাই না যে, এই সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ও সংঘর্ষের সকল দায়িত্ব মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির।

—আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, যুক্তফ্রন্টের এই তথাকথিত শরিকী সংঘর্ষের ক্ষেত্র থেকে আপনার দল (ওয়ার্কার্স পার্টি) মুক্ত ছিল। এ ক্ষেত্রে কি নীতি আপনাদের সামনে ছিল, যার ফলে এই ব্যাপক সংঘাতের ক্ষেত্র থেকে আপনার পার্টি নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে?

—প্রথমত, আমরা গোড়া থেকেই সতর্ক ছিলাম। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কেউ যাতে আমাদের দলে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য আমরা সাবধানতা অবলম্বন করেছি। এ জন্য আবেদনকারীর কাছে অনেক সময় আমাদের অপ্রিয় হতেও হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কর্মীদের প্রতি সংযত থাকার যে নির্দেশ আমরা দিয়েছি, তা পালিত হয়েছে। কোথাবিশেষে প্রতি-পক্ষের সঙ্গে একটা পারস্পরিক বোঝা-পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সংঘাতকে এড়িয়েছি।

—শরিকী সংঘর্ষ প্রধানত গ্রামাঞ্চলেই বেশি সংঘটিত হয়েছে। আপনার কি মনে হয় গ্রাম বা অঞ্চলভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট হলে এই সব সংঘর্ষ অনেকাংশে এড়ানো যেত?

—না। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, যে দল যেখানে শক্তিসম্পন্ন, অন্যান্য দল সেখানে তার বিরুদ্ধে জোট-বদ্ধ হয়। এতে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। মিলিত আন্দোলনের ক্ষেত্র না থাকলে কমিটি করে কি হবে? কমিটির ফলে নতুন নতুন সংঘর্ষও সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের সাধারণ শত্রু কে—সেই সম্পর্কেই আমাদের মতপার্থক্য ঘোচে নি! কেউ কেউ ভাবছেন, কেন্দ্রে ইন্দিরা সরকার আমাদের শত্রু নয়, কেউ কেউ—এমন কি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত কোন কোন দল কংগ্রেসের এক বা একাধিক অংশের সঙ্গে মৈত্রীর কথাও বিবেচনা করছেন। এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে গ্রামভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট কমিটি কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে?

—এই সব শরিকী সংঘর্ষকে আপনি 'শ্রেণী-সংগ্রাম' বলবেন কি?

—প্রত্যেকটা ঘটনাই প্রত্যক্ষত শ্রেণী-সংগ্রাম বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক আলোড়ন ও অস্থিরতার পিছনে নিশ্চয়ই একটা শ্রেণী-সচেতনতা তথা শ্রেণী-সংগ্রামী মনোবৃত্তি কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে আজ আমাদের যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও মতভেদ আছে। এ-ক্ষেত্রে দুটি মত: (১) সাংবিধানিক আইনগত শান্তিপূর্ণ এবং আমলাতান্ত্রিক

ব্যবস্থার মাধ্যমেই পরিবর্তন আনা যাবে। (২) জনগণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কোন পরিবর্তনই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আনা যাবে না। পরিবর্তনের সংগ্রামের মধ্যে জনসাধারণকে লিপ্ত করতে পারলেই সত্যিকারের পরিবর্তন সম্ভবপর। এখন, এভাবে জনগণকে লিপ্ত করতে গেলে কোথাও কোথাও শান্তি-বিঘ্নিত অবশ্যই হতে পারে এবং সংবিধান লঙ্ঘিত হতে পারে। সেই ঝুঁকি নিয়েই এগুতে হবে। আমরা মনে করি, প্রথমোক্ত মত হল বুর্জোয়া-পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর মত। আর দ্বিতীয় মতটি হল শ্রমিক-শ্রেণীর মত। এই দু'টি মতের সংঘাত নিশ্চয়ই শ্রেণী-সংগ্রামের অন্তর্গত।

—রাজ্যব্যাপী শরিকী-সংঘর্ষ এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের ফলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে মনে করেন কি?

—না। তবে সব জায়গার খবর বলতে পারব না। আজকাল খবর এত প্রকারে আসে এবং এতভাবে প্রকাশিত হয় যে, তা নির্ভরযোগ্য নয়। যে সকল স্থানে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, সেখানকার কথা জানি না। কিন্তু যে সকল স্থানে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, সে সকল স্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেক উন্নত। বিশেষ করে কসবা, দুর্গাপুর, বর্ধমান, হুগলী ও মালদহ জেলার বিভিন্ন স্থান। আইন-শৃঙ্খলার একটা দিক হল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। সাধারণ মানুষ বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক বেশী নিরাপদ। কিন্তু বহু লোকের নিরাপত্তাবোধটাই কারো কারো কাছে নিরাপত্তার অভাববোধ।

—যুক্তফ্রন্টের কিছু কিছু দায়িত্বশীল নেতা এই রাজ্যে কেরালার মত একটা মিনি-ফ্রন্ট গঠিত হতে চলেছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন। এই তথ্য কতদূর সত্য?

—মিনি-ফ্রন্ট গঠন করার কথা কেউ কেউ যে ভাবছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, রাজনীতিতে নাকি কিছুই অসম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গেও যে মিনি-ফ্রন্ট হতে পারে না, তা-ও নয়। তবে কংগ্রেসের সহযোগিতা ভিন্ন তা সম্ভব হবে না এবং এই কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রশ্নে মিনি-ফ্রন্টের উদ্যোক্তা দলগুলি তাদের সহযোগীদের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি করতে পারছে না বলেই বোধ হয় সে প্রচেষ্টা বিলম্বিত হচ্ছে।

—বর্তমানে সংকট যেভাবে ঘনীভূত [illegible]

সরকার ভেঙে যেতে পারে বলে অনেকের ধারণা। সে ক্ষেত্রে আপনার দলের ভূমিকা কি হবে?

—আমার দল যুক্তফ্রন্টে ঐক্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও সংযমের পরিচয় দিয়েছে। আমরা যুক্তফ্রন্টের বিকল্প কোনো ক্ষুদে ফ্রন্ট গঠিত হোক, এটা চাই না। কাজেই কংগ্রেসের সংগে সহযোগিতার রাস্তা আমাদের দল বরদাস্ত করবে না। কারণ, আমরা মনে করি—সেটা হবে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

**শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার**
**আবগারী মন্ত্রী**

—১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু, ন'মাস পরে সেই সরকারের পতন হয়। সেবারে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের প্রাবল্য, খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির পথ ধরে। ১৯৬৯ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্ট অনেক শক্তিশালী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও, সংকট এবারও দেখা দিল। এবারের সংকট মূলত যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংকট। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরীক দলের পারস্পরিক সংঘর্ষের পথ বেয়েই এই সংকট ঘনীভূত হল। নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে গঠিত যুক্তফ্রন্টের শরীক-দলের মধ্যে এই ব্যাপক সংঘর্ষের কারণ কি?

—যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্যই এই সব শরিকী সংঘর্ষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ৩২-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থে সংগঠিত দল থাকায়, মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীগত সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের রূপেই এই সব তথাকথিত শরিকী সংঘর্ষের মধ্যে প্রতিফলিত। নীচের তলার কৃষকেরা যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে খাস ও বেনামী জমি দখলের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, তখন কৃষক-বিরোধী শক্তি চেষ্টা করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে থেকে, তাদের শ্রেণী-স্বার্থ সংরক্ষণ করতে।

কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি যদি ৩২ দফা কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সক্রিয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন, তবে এই মতপার্থক্য কমে যেতে বাধ্য। নীচু তলার রাজনৈতিক কর্মী থেকে একেবারে টপ লীডার পর্যন্ত এমন একটা প্রতিভঙ্গির [illegible]

সরকার, যাতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সব কিছু হতে পারে। তা না হলে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ বা কুৎসা রটনা করে আসল সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কেননা *every action has an equal and apposite reaction.* কুৎসার ফলে কুৎসারই উদ্ভব হয়। পুলিশ দিয়ে যদি দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করা যেত তাহলে কংগ্রেসের পতন কখনই হতো না।

—নিম্নস্তরে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে এই সকল সংঘর্ষ অনেকাংশে এড়ানো যেত বলে মনে হয় কি?

—তা মনে হয় না। কেননা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে—ফুড এণ্ড রিলিফ্ কমিটিতে যুক্তফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হচ্ছে না। সেখানে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা বিভিন্ন দলের নামে হয়ে চলে আসছে। আসলে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রটা বড় কথা। দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বন্দ্বটাই আসল সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সুফল পাওয়া যেতে পারে। কমিটি কোন ফ্যাক্টর নয়!

—আচ্ছা, আপনি তো বর্ধমান জে[illegible] থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি! বর্ধম[illegible] ধান উৎপাদনে বাড়তি জেলা, যেখা[illegible] ২৪ পরগণা ঘাটতি জেলা। অ[illegible] জমি বা বড় জোতের মালিক বর্ধমা[illegible] আছে। অথচ ধানকাটা নিয়ে শরি[illegible] সংঘর্ষ ২৪ পরগণার তুলনায় বর্ধম[illegible] কিছুই হয় নি, বলা যায়। ধান-ক[illegible] সংঘর্ষ যদি মূলত জোতদারের স[illegible] কৃষকের সংগ্রাম হয়, তবে বর্ধমানের [illegible] সংঘর্ষ থেকে মুক্ত থাকার কারণ কি?

—বর্ধমানে আমাদের দল বৃহত্ত[illegible] সারা বর্ধমান জেলায় ২৫টি বিধান[illegible] আসনের মধ্যে আমাদের দল পে[illegible] ১৭টি আসন। কৃষি এলাকাতে অন[illegible] দলের আধিপত্য একেবারেই নেই ব[illegible] চলে। যার ফলে সংঘাতের কোন প্র[illegible] ওঠে না। তবে শিল্পাঞ্চলে পুরোপ[illegible] এই অবস্থা না থাকায় কোথাও কো[illegible] সামান্য সংঘর্ষ হয়েছে।

—কৃষি ও শিল্প এলাকাতে এই শরিকী সংঘর্ষকে আপনি শ্রেণী-সং[illegible] বলে মনে করেন কি?

—গ্রামের ক্ষেতমজুর, ভাগচ[illegible] এককথায় সমাজের শোষিত জনসা[illegible] আজ শ্রেণী-সচেতনভাবে জোতদ[illegible] বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। শহরে শ্র[illegible] সংঘবদ্ধ হচ্ছে শিল্পপতি বা একচে[illegible] পুঁজিপতির বিরুদ্ধে। শক্তির বৈপরী[illegible] [illegible] এ জাতীয় সমস্ত সংঘর্ষের

# তোমাকে চিনে

(বার্ট্রান্ড রাসেলের To Edith-এর ভাবানুবাদ)

জয়ন্তী সেন

শান্তির অম্লান স্নিগ্ধ স্পর্শ খুঁজে হাজার বছর
পেয়েছি দুর্বার জ্বালা, উন্মাদনা, আরও তারপর
নিঃসঙ্গ প্রহরে মন ক্লান্ত শীর্ণ একা তৃষাতুর,
ব্যথার বিদ্যুৎ ছন্দে ঝঞ্ঝাদীপ্ত জীবনের সুর।

এখন আসন্ন শীতে আন্তমের অবসন্ন পথে
চিনেছি তোমাকে, তাই শান্তি এলো বিষন্ন শরতে
উচ্ছ্বাসে উদ্বেল কম্প্র; চিরন্তনী প্রেম ও জীবন
স্পষ্টবাদী গোধূলির অনুভবে চিনে নিলো মন।

এখন ঘুমের মত মৃত্যু যদি আসে তো আসুক
নিশ্চিন্তে নিস্তব্ধ হবো বুকে ধরে পূর্ণতার মুখ।

কারণ বলে আমরা মনে করি। সুতরাং মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একে শ্রেণী-সংগ্রাম বলতে কোন বাধা নেই।

—শরিকী সংঘর্ষ এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের ফলে রাজ্যের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বিপন্ন হয়েছে বলে মনে হয় কি?

—না। আমি তো ১৯৩৮-৩৯ সাল থেকে রাজনীতি করছি। এর থেকে ঢের বেশি অস্বাভাবিক অবস্থা আমরা দেখেছি। বেশি দিনের কথা নয়—১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময়কার বিভীষিকার কথাও বেশ মনে আছে। কিন্তু সেদিনও ল' এন্ড অর্ডার নিয়ে এত হৈ-চৈ হতে দেখি নি। আজ সারা বাংলাদেশে একটা অভ্যুত্থান ঘটছে; সে অভ্যুত্থান হল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের অভ্যুত্থান। এদের অভ্যুত্থানে যারা ভয় পায়, তারাই আইন-শৃংখলা বিপন্ন বলে চীৎকার করে। আমি তো সারা বাংলাদেশ ঘুরলাম। ফাঁসিদেওয়াতেও মিটিং করেছি। অথচ কখনও তো আমার কোন পুলিশ পাহারার প্রয়োজন হয় নি। আইন-শৃংখলা না থাকলে একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারের পক্ষে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করা সম্ভবপর? তবে কোথাও কোথাও যে সাময়িকভাবে পরিস্থিতির সামান্য অবনতি হয় নি, সে কথা বলবো না। শরিকী সংঘর্ষ যেখানে যেখানে হয়েছে, সেখানে সাময়িকভাবে একটু অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বৈ-কি! যুক্তফ্রন্ট একটি একান্নবর্তী পরিবারের মত। এখানে ঝগড়াঝাটি থাকাও যেমন স্বাভাবিক, আপোষও তেমনি স্বাভাবিক। তবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধীরা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে হাঙ্গামার সূত্রপাত করছে।

—কিন্তু যুক্তফ্রন্টের সমস্ত দলে যদি এইভাবে সমাজবিরোধী অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে ক্রমবর্ধমান এই সমাজবিরোধী করতে যুক্তফ্রন্টের সামনে কোন পথ থাকবে কি?

—আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে ওদের অনুপ্রবেশ ঘটা খুব শক্ত। কারণ, চার আনার বিনিময়ে এই দলের সদস্য হওয়া যায় না। তবে শুনেছি অন্যান্য দলে স্থান পেতে ওদের তেমন কষ্ট হচ্ছে না। তবে অন্যান্য দলনেতাদের উপর আমাদের এই আস্থা আছে যে, তাঁরা নিশ্চয়ই গুরুত্ব বিবেচনা করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

—সম্প্রতি যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংকট এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে, যে-কোন মুহূর্তে সরকার ভেঙে যেতে পারে বলে অনেকেরই ধারণা। একটা মিনি-ফ্রন্টের গুজবও শোনা যাচ্ছে। বিধানসভার বৃহত্তম দল হিসেবে এই ভাঙনকে রোধ করবার সর্বাধিক দায়িত্বের কথা নিশ্চয়ই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল অস্বীকার করতে পারবেন না। এই তীব্র সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের ভূমিকা কি?

—কোন কোন নেতা মিনি-ফ্রন্টের কথা প্রায়ই বলে থাকেন। রাজনীতিতে নাকি কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য তাঁদের সে প্রচেষ্টা কতটা স্বার্থক হবে, বলা যায় না। বিধানসভার বৃহত্তম দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমরা কখনোই অস্বীকার করি নি। আমরা একথা বারবার বলেছি—পশ্চিমবঙ্গের জনগণের ম্যান্ডেট হলো ৩২ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টকে কাজ করতে হবে! সেই ম্যান্ডেটকে অগ্রাহ্য করে যাঁরা বিকল্প উপায়ের কথা ভাবছেন, তাঁরা জনগণের প্রতি বিশ্বাস-ভঙ্গের অপরাধী হবেন। আজ ইন্ডিকেট-সিন্ডিকেট সমেত আমাদের সহযোগী কিছু কিছু দলও অনেক কথা নিরন্তর বলে চলেছেন। কিন্তু আমাদের সহনশীলতা এবং ঐক্যপ্রচেষ্টা প্রমাণ করবে যে আমরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বজায়

[২০৭৪ পৃষ্ঠার পর]

সংস্থা গঠন করে এবারের পরীক্ষার মরশুমে যাতে অন্যান্যবারের মত অবস্থা সৃষ্ট না হয় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

**উঃ শ্রীঅনিলকুমার সরকার:** এই তিনটি সংস্থা যৌথভাবে ও আন্তরিকতার সংগে চেষ্টা করলে শিক্ষা জগতের বর্তমান অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন আনা সহজসাধ্য। একমাত্র এরাই এ-কাজ করতে পারেন।

**শ্রীগীতা হালদার:** এ ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, বহু ক্ষেত্রে এই সমস্ত সংস্থাগুলির সংগে ছাত্র সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এবং এদের মাধ্যমে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হতে পারে।

**শ্রীউৎপল তালুকদার:** প্রত্যেকেরই শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করার জন্য ও সুস্থভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য চেষ্টা করা উচিত। পরীক্ষামূলকভাবে আপনার বক্তব্য চিন্তা করা দরকার এবং মনে করি এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একটি সুস্থ অবস্থা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক।

প্রঃ আপনারা এ সম্বন্ধে কিছু ভাবছেন কি?

**উঃ শ্রীউৎপল তালুকদার:** আমরা ভাবছি। তবে শেষ কথা এই যে, বর্তমানে শিক্ষা বিভাগ যে দলের হাতে আছে, তারা স্বরাষ্ট্রের মত শিক্ষা বিভাগকেও দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে। এর ফলে দেখতে পাই যে, সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে যে কাজ এখনই করা দরকার তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং তার ফলস্বরূপ আমলাতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে না। অথচ যার পরিবর্তন বর্তমানে সব থেকে প্রয়োজনীয়। আমরা আবেদন করি যে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে দল বাড়াবার কাজে না লাগিয়ে সার্বজনীন উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হোক।

[চলবে]

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

সানো চৌধুরীর গোপন যাতায়াতের ঘটনা মহেশ মন্ডলকে মন-মরা করে রাখল ক'দিন। মন যখন ভাঙে—বিশ্বাস যখন ছুটে যায়—বোধ করি এমনিই হয়। সানো চৌধুরীর ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে নতুন আর এক ধাক্কায় সেদিন হাটে গিয়ে মহেশ আবার বিমূঢ় হয়ে গেল।

হাটের একপ্রান্তে ঝুরিনামা বুড়ো বটগাছের তলায় কে যেন গান ধরেছে—

মা গো! যায় যেন জীবন চলে;
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম' বলে।

গলাটা চেনা-চেনা মনে হয়। সারা হাটের মানুষ যেন ভেঙে পড়েছে সেই দিকে।

আসন্ন চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের কথা জানে মহেশ। জানে গোপন ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠনের প্রস্তুতি। চর আর গ্রাম-গ্রামান্তর যেন একটা চাপা উত্তেজনায় দম বন্ধ করে আছে। সমস্ত মানুষের মনে কেমন একটা অনিশ্চিত চনমনে ভাব। এমন দিনে এই গান। হাটুরে দোকানী পসারি হাঁ করে শুনছে সে গান।

মহেশও ভিড়ের ভেতরে ঢুকে উঁকি দিল—এমন দিনে কে ধরেছে এই নতুন ঢঙের গান! এ অঞ্চলে এমন গান হাটে-বাজারে আর কখনো শোনে নি মহেশ।...

আগায় বেত মেরে কি 'মা' ভুলাবে?
আমি কি মা'র সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি:
কে পালাবে মা ফেলে?

যমুনা বৈষ্ণবী তন্ময় হয়ে গান গাইছে। হাতে তার সেই একতারা।

মহেশ যেন তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। বিড়বিড় করে বলে উঠল, "ডাইনী বেটি!.. ভেক না হলে ভিখ্ মিলে না। হারামজাদী জানে—কখন কোন গানে মানুষ ভুলবে।"

কথাটা খাঁটি। ঝন্ ঝন্ পয়সা পড়ছে যমুনার সামনে। শ্রোতার ভিড় আর সরে না। একটা গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল, "আর একটা গান গা যমুনা।"

"ডাইনী মাগী যাদু করে ফেলেছে লোকগুলোকে।"...

রাগে গর্ গর্ করতে করতে মহেশ ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসছিল কিন্তু থম্‌কে দাঁড়াল আবার সকলের শেষে। এ কোন নতুন নাম—নতুন গান—নতুন কথা! কার দ্বীপ চালান...এ কার ফাঁসি!...

এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

"কে অভিরাম? কে ক্ষুদিরাম?" মহেশ বললে, "হারামজাদী খুব বনিয়েছে গো!"

কুমোর বললে, "বনাবে কেন? ক্ষুদিরাম সাক্ষাৎ মোদের জেলার লোক।"

কামার বললে, "সেদিন মহম্মদপুরের হাটেও অর গান শুনেছিলম।"

তাঁতীরা বললে, "সেদিন যমুনাকে জিজ্ঞেস করেছিলম—এ গান শিখলি কোথা? বলল—শহরে গেছলম।"

"তবে শহরে শিখে এসেছে।"

"হারামজাদীর ভেল্কি—ভেল্কি।"—

ভেল্কিই বটে। গলা তো নয়—যেন বুক কুরে খায়। সে গলার তীক্ষ্ণ তরঙ্গ যেন ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ছে সারা হাটে। কথায় কথায় একটা নতুন ইতিহাস যেন তার পাতাগুলো একটা একটা করে মেলে ধরতে লাগল। মহেশ মণ্ডল নড়তে পারল না। তার চরেও অনেক মৃত্যু অনেক অত্যাচার অঘটনের ইতিহাস ঘটে গেছে। গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কথা মনে পড়ে যায়। মহেশ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল। বোধ করি তার মত আরও অনেকে। এ অঞ্চলের সর্ব অঙ্গে আঘাতের দগ্‌দগে চিহ্ন। সেই দাগে যমুনা সেদিন জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে গেল।

হাট থেকে ফেরবার পথে হাব বললে, "ছোট মন্ডল।"

মুখ গোম্‌ড়া করে মহেশ পথ চলছিল। বললে, "কি।"

"আচ্ছা—হেই কথাটা কি সত্যি ফলবে?"

"কোনটা?"

"হেই যে বলল—দশ মাস দশ দি পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে?"...

ওরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। নান কথায়, গানে, যাত্রায়, পাঁচালীতে শু এসেছে—আত্মার বিনাশ নেই। নতু নতুন দেহ আশ্রয় করে কোথায় কো মাতৃজঠরে আবির্ভাব ঘটছে তার দে দেশান্তরে। মহেশ বললে, "হতে পারে।"

"তা হলে সে জন্মেছে আবার?"

"জন্মেছে।"

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সামনে অন্ধকার। পেছনে-পাশে অন্ধকারের সমুদ্র। সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে হাবুর মনে হয়—অবিনাশী সেই দামাল ছেলেটাকে ফাঁসি দিয়েও লাল বাঁদরগুলো মারতে পারে নি। কে জানে—কতবার ওরা ফাঁসি দিয়েছে আর কতবার সে মা-মাসির ঘরে জন্ম নিচ্ছে বার বার। কে জানে শেষবার তাকে কেউ ধরতে পেরেছে কি-না! মাঠ-প্রান্তর, নদী-নালা—অগম বন-জঙ্গল পার হয়ে সে ছুটে চলেছে!...

এ দেশে তাকে একেবারে শেষ করা যায় না!...

মহেশ ভাবছিল—সানো চৌধুরী যমুনার ঘরে ওই ঘোর অন্ধকারে আঘাটা দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে যায় কেন? তবে কি...

কে জানে—যমুনার এই ভেল্কি লাগানো গানের পেছনে কে আছে!

এবার তার তিন নম্বর বিস্ময়ের ধাক্কা।

সানো চৌধুরীর চরে গতি-বিধি সম্পর্কে তার তীক্ষ্নদৃষ্টি সজাগ ছিল। কিন্তু থেকে কি হবে—একদিন সানো চৌধুরী স্বয়ং বলে বসলো, "ছোট মণ্ডল, কথা আছে—বসে যাও।"

ডাক্তারখানার ভিড় তখন ভেঙে গেছে। চরের দু-চারজন ছেলে-ছোকরা ছিল তখনো—তারাও বিদেয় হয়ে গেল। রাতও হয়েছে বেশ। ডাক্তারও ঘরের পথ ধরল। যাওয়ার সময় কি যেন একটু কথা হলো সানো চৌধুরীর সঙ্গে।

মহেশ এইটুকু শুধু শুনতে পেল—ডাক্তার বললে, "যাও।"

সানো চৌধুরী মহেশকে বললে, "চলো ছোট মণ্ডল।"

অন্ধকারে ওরা দুজন এগিয়ে চলল বড় সড়ক ধরে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—কি করছে বুঝতে না পেরে মহেশ অদম্য কৌতূহলে বললে, "কোথায় যেতে হবে সানো কত্তা?"

সানো চৌধুরী বললে, "এই তো তোমাদের চরে।"

ওরা জেলা বোর্ডের বড় সড়ক ছেড়ে চরের নাবাল বাঁধে নামল। খানিকটা এগিয়ে ডান দিকে ঘুরল সেই খালের দিকে।

মহেশ বুঝল—চরের কিষাণ পাড়া ওদিকে নয়, ওদিকে সেই যমুনার টঙ। মহেশ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। যমুনার নতুন গানের রহস্য এবার সে বুঝতে পেরেছে।

সানো চৌধুরী হঠাৎ বললে, "তুমি তো জানো ছোট মণ্ডল, ঢের দিন থেকে চরের মানুষজনদের নিয়ে আমার একটা ইস্কুল করার ইচ্ছা ছিল।"

"[illegible] সানো কত্তা।"

"সেই ইস্কুলটা এবার করতে হবে।"

"কর।" মহেশ বললে, "কিন্তু ইদিকে যাচ্ছি কোথায়?"

"সেই ইস্কুলে?"

"ইস্কুলে!" মহেশ বললে, "যতদূর মনে হয়—রাস্তা মোর ভুল হয় নি। এদিকে তো সেই ডাইনী হারামজাদী যমুনার টঙ! আর কে আছে?"

"আপাতত সেইখানে আমাদের ইস্কুল।"

মহেশ আর রাগ চেপে রাখতে পারল না—ফেটে পড়ে বললে, "সেই বোস্টমী হারামজাদী"...

"সে হারামজাদীরও পড়ার দরকার আছে ছোট মণ্ডল।" সানো চৌধুরী মৃদু একটু হেসে বললে, "কঠিন মাস্টারের হাতে পড়ে সে-ও পাঠ নিয়েছে। তার গান শুনেছ?"

"হারামজাদী ভেল্কি লাগিয়ে দিয়েছে।"

"হ্যাঁ, আমি যা ঘুরে ঘুরে ঢের দিন থেকে পারি নি—সে কদিনে করে দিয়েছে।"

কথায় কথায় এসে পড়ল ওরা যমুনার ঘরের সামনে।

বাইরে থেকে সানো চৌধুরী ডাকল, "যমুনা!"

বোধ করি তখন সে রান্না করছিল। বাতাসে রান্নার গন্ধ। গলা শুনে বাঁশের দরোজা খুলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। এবং সানো চৌধুরীর সঙ্গে আজ মহেশকে দেখে দরজা ছেড়ে দিয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

"এসো মহেশ।" বলে সানো চৌধুরী মাথা হেঁট করে নিচু দরজা গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মহেশ পেছনে পেছনে গিয়ে, থতমত খেয়ে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সামনে এক রীতিমত গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, মুখভরা গোঁফদাড়ি। মাথায় জটা নেই বটে—তবে চুলগুলো
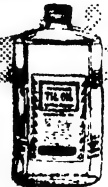
বেশ বড়সড়, অবিন্যস্ত। সানো চৌধুরীর পেছনে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে দেখে সে-ও যেন কেমন হতচকিত।

সানো চৌধুরী বললে, "ইটি তোমার প্রথম ছাত্র নবীন গোঁসাই।"

জীবেন মুহূর্ত কয়েকের জন্য সানো চৌধুরীর চোখে চোখ রেখে যেন একলহমায় বুঝে নিলে অবস্থাটা। নিঃশব্দে একটু হেসে বললে, "এসো বাবা।"......

সানো চৌধুরী মুখ টিপে হেসে বললে, "ওকে একটু ধর্মকথা শোনাও গোঁসাই। এ রকম ঢের ক'টি শিষ্য তোমার এ চরে জুটে যাবে। ও-ই সব একে একে জুটিয়ে-টুটিয়ে আনবে।"

মহেশ বোকা-বোকা চোখে চেয়ে রইল।

তবু ধূর্ত সে কম নয়। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে তার আড়ষ্টতা কাটিয়ে আশপাশে আড়চোখে চেয়ে দেখে নিলে—গোঁসাইজীর গাঁজার কল্কে কোথাও আছে কি-না। কারণ, সেই 'হারামজাদী ডাইনী যমুনা ছুঁড়িকে' এখনো তার বিশ্বাস নেই। একটা ভালো মানুষকে কোথায় কি ভাবে সে যাদু করে ফেলেছে কে জানে!

সানো চৌধুরী বললে, "এ হলো চরের ছোট মণ্ডল গোঁসাই—মহেশ মণ্ডল।"

"ছোট মণ্ডল!—মহেশ মণ্ডল!"

উজ্জ্বল চোখে চেয়ে জীবেন মহেশের একটা হাত চেপে ধরল।

"তুমি সেই ছোট মণ্ডল!"

মহেশ সংকোচে এতটুকু হয়ে গেল। কে জানে—কি বলেছে সানো চৌধুরী তার অচেনা এই লোকটাকে! কেনই বা বলেছে—তাও সে জানে না। এ লোকটাকে অত কথা বলবারই বা কি আছে! কি মনে আছে সানো কর্তার কে জানে। মনটা তার খুঁত খুঁত করতে লাগল। যমুনার এই সব বৈরাগী বোষ্টমের চরিত্র কি সানো কর্তার জানা নেই?

সানো চৌধুরী বললে, "আমি আর ডাক্তার ক'দিনই ভাবছিলাম। যাই হোক—একটা ঠিক করেছি। ঢের দিন থেকে আমার ইচ্ছে ছিল, একটা ইস্কুল করি। আমাদের সেই কাজে একটু সাহায্য করো গোঁসাই।"

সানো চৌধুরীর চোখে চোখ রেখে জীবেন অর্থপূর্ণকণ্ঠে বললে, "এই কাজ।"

"হ্যাঁ।" সানো চৌধুরীও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "তুমি অনেক জানো—অনেক ঘুরেছ। চরের মানুষগুলো কোথাও যায় নি—কিছুই জানে না। তবে প্রাণ দিতে জানে—সে তুমি শুনেছ। তোমার ধর্মজ্ঞান ওদের একটু দাও বাবাজী—যাতে ওরা মানুষ হয়।"

জীবেন চোখ নামিয়ে মাথা নীচু করে সানো চৌধুরীর কথাগুলোর গভীরতর অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। জিজ্ঞেস করলে, "ওদের কিষাণ পাড়ায় যেতে পারি?"

সানো চৌধুরী হাঁ-হাঁ করে উঠল। বললে, "একেবারে না—একেবারে না। ওরা আসবে। ওই ছোট মণ্ডল জুটিয়ে আনবে। গুরু কি আর শিষ্যের কাছে যায় গোঁসাই? শিষ্যরাই তোমার কাছে আসবে।" তারপর মহেশের দিকে চেয়ে বললে, "কি ছোট মণ্ডল, আসবে না?"

আবার যেন কেমন ধাঁধাঁ মনে হচ্ছে সবটা মহেশের। সে হাঁ-ও করলে না—হুঁ-ও করলে না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—এই গেরুয়াধারী বৈরাগী কী শেখাবে তাদের!

সানো চৌধুরী হেসে বললে, "যমুনার আখড়ার এককালে নাম-ডাক ছিল। ওই ছোট মণ্ডল একদিন তাকে ভেঙেচুরে আগুন দিয়ে ছাই করে দিয়েছে। আবার নতুন করে সে আখড়া ও-ই গড়ে দিক। আর একটা কথা কি জানো? এখানে তোমার বিদ্যে দানে কেউ সন্দেহ করবে না গোঁসাই।" বলে সানো চৌধুরী চোখ টিপে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

শেষ মন্তব্যটুকু শুনে চোখ জ্বলে উঠল মহেশের। তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে তাকিয়ে এই গোঁসাইটিকে যেন চেনবার চেষ্টা করতে লাগল।

"আজ এবার তবে চলি গোঁসাই। চলো মহেশ।" সানো চৌধুরী উঠে পড়ল। দু-এক পা গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। বললে, "এই দেখ, ক'দিনের বুলেটিন-গুলো এনেছিলাম—দিতেই ভুলে যাচ্ছিলাম।" বলে একগোছা কাগজ পকেটে থেকে বের করে তুলে দিলে জীবেনের হাতে।

মহেশ সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কাগজগুলোর দিকে।

সানো চৌধুরী ঠেলা দিয়ে বললে, "চলো যাই।"

মহেশ নীরবে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সানো চৌধুরীর পেছনে পেছনে।

অনেকক্ষণ তার মুখে কথা নেই। নীরবে অনুসরণ করে চললো সানো চৌধুরীকে। বিমূঢ়—বিস্ময়াহত।

সানো চৌধুরী একাই কথা বলে চলেছে। তার বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা—ইস্কুলের কথা। মানুষ হবে চরের গোঁয়ার জংলী বরা।

সানো চৌধুরী বললে, "আর এই গোঁসাই লোকটি খুব ভালো। এ তোমার সেই যমুনার আগের বৈরাগী বোষ্টম-গুলোর মত নয়।—ঢের কথা জানে, ঢের জায়গায় ঘুরেছে—ঢের জিনিস দেখেছে।—তোমরা খুশি হবে।"

খুশি তো হবে কিন্তু লোকটা কে? মহেশের মনের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই একটা কথা। মহেশ বললে, "ভালো লোক—সে বুঝেছি, না হলে তুমি আর ডাক্তার যমুনার ঝুপড়ি পর্যন্ত ছুটবে কেন?"

"লোকটার বড় অসুখ করেছিল। যমুনা যেয়ে কেঁদে পড়ল।"

"হ্যাঁ, ও হারামজাদী ডাইনীকে প্রথম ডাক্তারখানায় যেতে দেখলম—পবন খাঁ যেদিন মরে গেল তার পরের দিন থেকে।" মহেশ সানো চৌধুরীর মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে বললে, "মোর বেশ মনে আছে সানো কত্তা। পুলিশ জঙ্গল ঘেরাও করল—তারপর এই গোঁসাইটির আমদানি।"

সানো চৌধুরী অত কথায় গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বললে, "হবে। মত মনে নেই।"

ধূর্ত মহেশ। জিজ্ঞেস করলে, "সত্যি-কথা বলো সানো কত্তা—গোঁসাইটি কে? মোকে বিশ্বাস না হয়—সে অন্য কথা।"

"তোমাকে বিশ্বাস করব না মহেশ!" সানো চৌধুরী ওর কাঁধে হাত রাখল। "সব কাজে তুমি আমার সহায়-সম্বল।"

"তবে খাঁটি কথাটি বলো।" মহেশ বললে, "মোর মনে হচ্ছে—এ সেই! যাকে ধরার জন্য থানা পুলিশ—"

সানো চৌধুরী চাপা গলায় বললে, "চুপ্।"

মহেশ চুপ করে গেল।

সানো চৌধুরী বললে, "আমরা শুধু জানি—পুলিশ জেলা তোলপাড় করে যাকে খুঁজে পায় নি—আমরাও তাকে দেখি নি। ও আমাদের চরে যমুনার নবীন গোঁসাই।"

একদিন সেই সানো চৌধুরীর মত মহেশও বললে, "কিন্তু যমুনাকে বিশ্বাস—"

"ওর গান শুনেছ তো? ও আমর কেউ বলি নি।"

"বুঝেছি। নবীন গোঁসাই!"

"ওর প্রথম চেলা যমুনা।" সানো চৌধুরী বললে, "আর আজ তোমাকে ঠেকিয়ে দিয়ে এলাম। তোমার সাহায্য ছাড়া এ ইস্কুল হবে না মহেশ।"

"কিন্তু এই বয়সে মোরা কী পড়বো—কী শিখবো সানো কত্তা?"

"সে যে শেখাবে—সেই জানে।" সানো চৌধুরী বলল, "তাদের জন্য যে লোক ঘর-সংসার সব ছেড়ে বেরিয়েছে—সে ভালো জানে, তাদের নিয়ে সে কি করবে। কি শেখাবে।"

"ধর্মকথা?"

"ওটা আড়াল।" সানো চৌধুরী বললে, "পারবে না সকলকে জোটাতে?

(ক্রমশ

ও বছরের ডিসেম্বর-শেষে একটি সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রের বিনোদন-সংখ্যায় শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রী দুর্দান্ত এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বেশ খেটেখুটে লেখা, আবেগ দিয়ে লেখা। যেমন জোরালো স্টাইল তেমন জোরালো বক্তব্য। অথবা বক্তব্যই দিয়েছে স্টাইলের বলিষ্ঠতা। প্রবন্ধটির শিরোনামা ছিলঃ অশ্লীলতা অথবা চুম্বন অথবা নগ্নতার পক্ষে।

চমকাবার মতো। স্পর্ধা ও দুঃসাহসের নিঃসংশয় পরিচয় রাখবার মতো। গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে লাঠি-সড়কি-বাল্লম নিয়ে দল বেঁধে-চলা, অপর মানুষের দলকে আক্রমণ করা, সহসা টেনে নিয়ে এসে দিবালোকে হত্যা করা এখন সমাজের গা-সহা হয়েছে বলে শুনেছি। নাগা জাতি নয়, নাগা-সন্ন্যাসীরা মিছিল হয়ে চলার ধর্মীয় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠামাত্র নয়, আচরণে সত্য করে দেখাই জানি। তবু হিপি-বিটলেদের মতো বে-আবরু গাঁজারুদের কথা শুনে একটা চমক লাগেই। তাদেরও মুখপত্র প্রচারপত্র আছে, এও আজ আর অজানা নয়।

কিন্তু নামধারী রাজনৈতিক ঘাতক, উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী বা বেসামাল হিপিরা বৃহত্তর সমাজের বাইরে; মঞ্চের খাঁচা আর প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান-সপক্ষের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যা করে, তা প্রেক্ষাগৃহের উপভোগ্য, তা অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই মানায়, অর্থবিত্তের সীমাহীন প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাদের স্থান অদৃশ্য সমাজ-সীমার এক প্রান্তে; তাই অভিনয়শেষে প্রেক্ষাগৃহের গার্হস্থ্য মনটি আসে ফিরে সচৈতন্যে।

আজ অবশ্য, হয়তো এখানেও সেই গণতান্ত্রিক ধারণার প্রভাব পড়েছে, মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান দুস্তর আর নয়, মঞ্চ-প্রেক্ষাগার একাকার করে ফেলার থ্রি-ডায়মেনসান টেকনিকের এখন কিছু প্রবল প্রয়োগই চলছে। হঠাৎ যদি কেউ প্রেক্ষাগৃহ থেকে অভিনয়ে যোগ দিয়ে বসে এবং দর্শকের মাঝখান থেকেই মঞ্চে গিয়ে মঞ্চস্থ নাটকের একটা ভূমিকা-সূত্র টানে, বিশেষ কেউ অবাক হয় না। যাত্রাকে ঘিরে চারপাশেই মানুষ বটে এবং যাত্রার আসর দর্শকের মধ্যেই বটে, তবু ওর আসরের এক ঘেরাওস্বাতন্ত্র্য থাকে এবং সাজঘরের তাঁবু, যাতায়াতের একটা করিডরও থাকে। যাত্রাভিনেতারাও সেদিক থেকে দর্শক-সমাজের কেউ নয়।

কিন্তু বৃহত্তম সমাজের মধ্যে থেকেই কেউ যদি উচ্চকণ্ঠে বলেঃ আমি অশ্লীলতার পক্ষে, আমি চুম্বনের পক্ষে, আমি নগ্নতার পক্ষে, তবে স্পর্ধিত দুঃসাহসী ব্যক্তিটির দিকে তাকাতেই হয়। গল্পে-উপন্যাসে আভাষে-ইঙ্গিতে ইনিয়ে বিনিয়ে নয়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। কোনো বিষয়ে বলিষ্ঠ প্রত্যয় না থাকলে বক্তব্যে এই ঋজুতা আসে না।

পত্রীমশাই তাঁর প্রবন্ধে চিরাচরিত প্রথামতো অতীতের ভান্ডার থেকে, আমাদের বহু শ্রদ্ধেয় উপকরণ থেকে তাঁর যুক্তির বাণ জোগাড় করেছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে গোপিনীদের বস্ত্রহরণ হয়ে কোনারক/খাজুরাহো পর্যন্ত, মায় মা কালী, কিছু বাদ রাখেন নি। কিন্তু হাল্কা চটুল বিন্যাস নয়! তারপর তিনি যে উপসংহারটি করেছেন, তা কিন্তু ওঁর সলজ্জসতর্ক মনটাই, অভিনয়-শেষে নিরাভরণ মুখ্য অভিনেতার আবির্ভাবের মতো, পাদপ্রদীপে প্রকাশ করে দিয়েছে। বিনম্র ভদ্র র‍্যাশানাল চেহারা। তথাকথিত শ্লীলতা-অশ্লীলতার সংজ্ঞা পরিস্ফুট হতে পাঠকের মনে সংশয় জাগতে পারে—তিনি কি সেই প্রখ্যাত আইনজীবীর গল্পের মতোই অপরপক্ষের সওয়াল করলেন না?

"অশ্লীলতাকে আমি ভয় পাই না"। পত্রীমশাই বলেছেন, "ভাবিও না। যেহেতু কেউ অশ্লীলতায় আকৃষ্ট হতে চাইলে তাকে রোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের রক্তে অথবা কব্জিতে এমন কালা-পাহাড়ী দুঃসাহস ও দুর্বার শক্তি নেই যে, ভারতবর্ষ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো তাকে। সেটা করতে গেলে আমাদের বেদবেদান্ত উপনিষদ রামায়ণ-মহাভারত এই প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পোড়াতে হয়। খাজুরাহো কোনারকের মূর্তিমন্ত ভাস্কর্যরাশিকে শাবল-গাইতি ও হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙতে হয়। কালিদাস, জয়দেব, ভারতচন্দ্রকে তুলে দিতে হয় কর্পোরেশনের জঞ্জাল-ফেলা গাড়িতে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎসায়নের কামসূত্র ইত্যাদিকে উপরে কাঁটা নিচে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলতে হয় সতেরো হাত গর্তে। দেশ থেকে বন্ধ করতে হয় সমস্তরকম পুজো-আচ্চা। কারণ, তার মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে অশ্লীলতা। পুজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে এই যে ঘটস্থাপনা, অষ্টদল পদ্ম, এই যে ঘটের গায়ে সিঁদুর-পুত্তলিকা, সর্বতোভদ্রমন্ডলের জ্যামিতিক ছক, এই সবের মূলেও রয়েছে নারী-জননেন্দ্রিয়, এবং মানবীয় প্রজনন পদ্ধতির পুণাঙ্গ নকল। সরকারী ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর প্রতীক হিসেবে আমরা রোজ যে লাল ত্রিভুজটি দেখি, সেটিও ঐখান থেকে আহৃত বা গৃহীত। তন্ত্রেত ত্রিভুজ। নারী-জননাঙ্গের বিমূর্ত প্রতীক। এবং সর্বশেষে প্রত্যেক মানুষের বুক থেকেই কেটে নিতে হয় তার হৃদয়ের আধখানা, যেহেতু অন্যান্য যাবতীয় মহৎ অনুভূতির মত; যৌনানুভূতির প্রথম স্পন্দনের ঐটিই গর্ভাগার।

"না, এটাই শেষ কর্তব্য নয়। এর চেয়েও সুকঠিন কিছু আছে। তা হচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। আজ যদি ভারতবর্ষের সমস্ত সাহিত্যিকজীবনের বিপুল গম্ভীর রহস্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে শুধুমাত্র তাইচুং ধানের চাষাবাদ বিষয়ে রচনায় ধ্যানস্থ হন, তবুও ভারতবর্ষকে অশ্লীলতামুক্ত করা যাবে না। সাগরপারের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, চলচ্চিত্র ঐ বস্তুকে এদেশের আকাশে, বাতাসে, নিশ্বাসে ব্যাপ্ত করে রাখবে। কারণ আজ আমরা একই সংগে একটা নিজস্ব জন্মভূমি এবং একটা গোটা পৃথিবীর বাসিন্দে। হো চি মিন কিংবা মাও সে-তুংকে আমরা চোখে দেখি নি। তাঁদের সম্পর্কে শুনি কিংবা পড়ি কেবল। কিন্তু আমাদের দেশে বহু যুবকের রক্তে তাঁদের আদর্শ তাঁদের জীবন্ত উপস্থিতির সমতুল্য। তাই দেয়ালে দেয়ালে পড়ি 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান'।

একজন সচেতন মানুষ যদি তেমনি করে বলে—পৃথিবীর যাবতীয় পাপ, অশ্লীলতা, যৌনতাও আমাদের, সে কি মিথ্যাচারী?

"তা ছাড়া শিল্পী হিসেবে আমি ভয়ানক আশাবাদী। প্রতিদিন এত দারিদ্র্য, শোষণ, শাসন, আর্তনাদ, কান্না, হত্যা, রক্তপাত, অশ্লীল দারিদ্র্য, উৎকট বড়মানুষি, অসম বন্টন ও সামাজিক অসাম্যের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও পৃথিবীর সব মানুষ যেমন এর বিরুদ্ধে এখনো এবং এখুনি বিপ্লবী অথবা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নি, ঠিক তেমনিভাবেই বিশ্বাস রাখা যায় যে, মাত্র খানকতক উপন্যাস কি চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা পৃথিবীর অথবা ভারতবর্ষের অথবা বাংলা দেশের সব মানুষকে নরকে টেনে নিয়ে যেতে এখনো এবং এখুনি একেবারেই অক্ষম।

"'Nothing human alien to me' এইটিই নাকি মার্কসের সবচেয়ে প্রিয় কথা। এই কথাটি প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রথম উচ্চারণ এবং শেষ উক্তি হতে অপরাধ কোথায় ?"

অশ্লীলতার পক্ষপাতী কোনো ব্যক্তির কথা এ নয়। তার মানে এ নয় পত্রী-মশাইর সওয়ালে কোনো বিশেষ পাড়ার খিস্তি-খেউর প্রত্যাশিত ছিল। পত্রী-মশাইর মনের একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা অথবা একটি বিষণ্ণ মানুষের মনই এতে অভিব্যক্ত হয়েছে। মানুষের বিচ্যুতি অপরাধে সেই বেদনা, সেই বিষণ্ণতা। মানুষ দেবতা না হয় ক্ষতি নেই, মানুষ দেব-দেবতার চাইতেও মহত্তর, সম্ভবত ভগবানের চাইতেও; কেন না দেব-দেবতা বা ভগবান মানুষেরই আবিষ্কার। মানুষের ভেতরে এমন একটা অসীম সত্তা আছে এবং আসলে যে-অসীম সত্তারই বিক্ষিপ্ত প্রকাশে লোকোত্তীর্ণ কোনো অনাদি-অনন্তের ভাবনা-অনুরক্তি ব্যষ্টি মানুষকে আপ্লুত করে তোলে তাকে কোথাও খাটো ছোটো হতে দেখলে, আদর্শপুত্তলীকে পানোন্মত্ত অবস্থায় নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখার মতো তার বেদনার অন্ত থাকে না। সে মানুষের দৃষ্টি এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স—সে মানুষ বলবে আমিই সেই; তার দৃষ্টিতে অপরাধীদের কারাগারও স্বর্গোদ্যান হয়ে উঠবে, যখন সে ঐ ঘাতক, ঐ চোর, বদমাস, ধর্ষণকারী কুশ্রী দেহটাকে ভেদ করে মানুষটা বের করে নিয়ে আসতে পারবে। নানা সামাজিক কারণে ঐ অতি তুচ্ছ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে মানি, কিন্তু তার চাইতেও বড় কঠিন সংঘাত-দ্বন্দ্ব আছে তার মনে, সেই মানুষটি বারে বারে নিজেকে আগলাতে চায়, কিন্তু কিছুতেই নাগাল পায় না তার নিজস্ব অনেক অনেক বড় সত্তাকে; সে কেবল দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়। মহৎ শিল্পকর্ম ছুটেছে সেই অনির্দেশের পেছনে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয় ইর্‌র‍্যাশানাল পশু, মানুষ নয়। মানুষ পথের কুকুর-কুকুরীকে ছাড়িয়ে এসেছে বলেই সে মানুষ। অথবা একদিন সেই যে গুহা থেকে প্রকৃতির বন্য মানুষটি বেরিয়ে এসেছে, আর তো সে সেখানে ফিরতে পারে না, আজ সে যে চন্দ্রলোক জয় করেছে, জয় করতে ছুটেছে শুক্রগ্রহ। এবং করবেই। মানুষের ওপর মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে না কেউ, এই পৃথিবীর এভারেস্ট নয়, পৃথিবীর বাইরে চাঁদও নয়, মানুষের পা পড়বেই তার ওপর। আসতেই হবে মানুষের পায়ের নীচে। সামান্য প্রকৃতির ডাকে সাড়া নয়, প্রকৃতিকে সাড়া দিতে হবে তার ডাকে, প্রকৃতিকে সে করবে হাতের বল্গায় আবদ্ধ —যেমন করে ম্যামথের যুগ অতিক্রম করেছে, হাতীকে ফেলেছে খাদায়, বাঘকে করেছে সার্কাসের বেড়াল, নির্ভয়ে সহাবস্থান করেছে সাপের রাজ্যে, অতলান্ত সমুদ্ররাজ্যের বুক চিরে চিরে এগিয়েছে, দুর্গম মেরুকে করেছে সুগম। এত বড় মানুষ, যে মানুষের থেড় পায় না কেউ, সে নেবে একটা অতি তুচ্ছ যৌনাভিসারের স্বত? অশ্লীলতার, কদর্য নগ্নতার যাদ কোনো অর্থ থাকে তো শুধু—উধাও মানুষকে টেনে নিয়ে এ এক ক্ষুদ্র বন্দিশালার সেলে আবদ্ধ করার চেষ্টা। মানুষ কখনো এতে তৃপ্ত থাকতে পারে না, থাকবে না।

আমার মনে অনেক সময় এমন আশঙ্কাও হয়েছে যে, অশ্লীলতা নগ্নতা নিয়ে এই যে ঢক্কানিনাদ মাঝে মাঝে শোনা যায়, এ কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারবারী-দের যোগসাজসের ব্যাপার নয় তো? এই যেমন আতস পুড়িয়ে কোনো ব্যবসায়ীর পণ্য বিজ্ঞাপনের স্বার্থে অশ্লীল বিউটি কনটেস্ট? না, সী-বীচে ওদের বিবসনা দাঁড় করিয়ে অঙ্গ-সমীক্ষার উত্তেজনাকে আমি অশ্লীল বলছিনে; আমি বলছি, যে মনুষ্যত্বের অন্তহীন মূল্য, তার এই লাঞ্ছনাকেই আমি বলছি অশ্লীল। পয়সা ছড়ালে বারবনিতা পাওয়া যায়, মডেল পাওয়া যায়, ব্যালে গার্ল পাওয়া যায়, বিউটি কনটেস্টে কতকগুলো মেয়ে-মানুষকে পাওয়া যাবে এতে লেশমাত্র বিস্ময়ের কারণ নেই। অবমাননাই বেদনার কারণ। এখানে দ্রৌপদী কাঁদছে, মানবাত্মা কাঁদছে। মানুষকে বিবস্ত্র করার, আদিম অরণ্যে পশু করে তোলবার কি ভয়াবহ অর্থকরী ষড়যন্ত্র! আমার একবার এমনি একটা বিউটি কনটেস্টের রিপোর্ট করবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল, সেই প্রশস্ত হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খানাপিনা ও বলড্যান্সও দেখতে হল, দেখতে হল কয়েকটি মেয়ের সুন্দরী প্রতিপন্ন হবার মর্মান্তিক আকুতির দৃশ্যও। তারপর দেখলাম, প্রতিপন্ন সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার কপোলে জনৈক মহারাজার লালসাময় চুম্বন-পুরস্কার। আমার ভারতীয় মনের সংস্কারই শুধু নয়, সমগ্র মনুষ্যত্ব-বোধ বিদ্রোহ করেছিল। বহু বছর আগের কথা, সম্ভবত ঐ সূচনা কোথাও আপত্তি হয় নি, বিজ্ঞাপনদাতার সোনার আংটায় সংবাদ-সাহিত্যের কেশা-কর্ষণ করে ছিলেন। এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু আজ বছরে ক'টা এমন বিউটি কনটেস্ট হয়? অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার রাজনৈতিক স্বার্থান্ধ বিক্ষোভ-কারীরা ক'টা ডিমনসট্রেশান করেছে এ অনৈতিক জলসার সামনে,

সম্প্রতি কয়েকটি মামলার কথা শুনছি। বিচারাধীন মামলা, অতএ মন্তব্য নিষিদ্ধ। করবও না। কিন্তু সব মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে আ সেগুলো পুরোনো সিনেমার মতো ম আসে। আমার জীবনের যে কালটি ব সমুদ্ররাজ্যের বুক চিরে চিরে এগিয়ে সেকালেও ঢাকা-কলকাতার একদ অপরিণত অশ্লীল লেখকের উদ্ভব হ ছিল। প্রগতির নামে তারা কালিকল

অশ্লীলতার কল্লোল তুলতে চেয়েছিল; কেন না, তারা সংগ্রামী জীবন থেকে পলাতক সুবোধ বালক; বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে, কটাক্ষে সেকালে তপ্ত তারুণ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে কোনো ঝুলন্ত শাড়ি-সেমিজের দিকে, এরা ওরা অনেকের দিকে, পাড়া-বেপাড়ার প্রাচীর ও প্রান্তর একাকার করবার আয়াসের দিকে। ব্যর্থ লেখনীর অশ্লীলতা ছিল ঐ কুৎসিত প্রচেষ্টার মধ্যে, সেকালে মরণজয়ী দৃপ্ত যৌবন, উদ্ভিন্ন মনুষ্যত্বকে খাট ছোট করার ষড়যন্ত্রে। বাংলাদেশে ১৯০৫-এর, ৮-এর, ১০-এর জের চলেছে। গলায় ফাঁসির দাগ নিয়ে অনেক ক্ষুদিরাম জন্মেছে বাংলার ঘরে ঘরে। ১৪।১৫, ওরা বেরিয়ে পড়েছে। অহিংস অসহযোগের ছ'মাসী স্বরাজের ব্রত উত্তীর্ণ হতে বৃটিশ অত্যাচারের বর্শাফলক টেগার্ট কপালগুণে মিঃ ডে'র মৃত্যুতে দ্বিজ হলেন। গোপীনাথের ফাঁসি হল। ১৯০৫-৮-এর লাভা-প্রবাহ বয়ে চলেছে দুর্নিবার ১৯২১ পার হয়ে ৩০ থেকে ৩৪। বৌদ্ধ, মাংসাশী তান্ত্রিকদের আধুনিক সাহিত্য তাদের গতিরোধ করতে পারে নি, ওদের যাত্রা-পথের তাপস্পর্শে ঐ মররিড সাহিত্য পুড়েঝুড়ে গেছে। এরা আদালতে নাকে খৎ দিয়ে এসেছে, কেন না, এদের কোনো মেরুদণ্ড, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ই ছিল না—আদালতে তখন আর এক দল বিচারক-পুলিশদের বুক কাঁপিয়ে দিচ্ছে জয়ধ্বনিতে, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ওরা। পলাতক সাহিত্যিকদের কাঁচা অশ্লীল সাহিত্য এই তারুণ্যকে স্পর্শও করতে পারে নি। অশ্লীলতার প্রশ্ন তখনই দারুণ উচ্চারিত হয়ে ওঠে, যখন আদর্শহীনতা জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। জাতির চিন্তা হয় নিরবলম্ব; তখনই দেহ-প্রকৃতি বড় হয়ে ওঠে।

১৯৪৬-এর সম্ভাব্য বিপ্লব যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখনই বাংলা তথা সারা ভারতে পারাবিষের দশদগে ঘা ফুটে বেরোলো। দ্বিজাতিতত্ত্বের মার হল সুরু, যার সমাপ্তি আজও হয় নি, কবে হবে কেউ হলফ করে বলতে পারে না। বৈপ্লবিক বাংলায় জাত হয়ে গেল দুটো, ভোগোলিক ভাগ হল দুটো, মানসিকতায় ভাগ হল দুটো। এই ভগ্নাংশের কোনো সান্ত্বনা ছিল না; জোড়া লাগাবার মতো কোনো আদর্শও চোখে পড়ল না; বরং, উল্টোরথই হল নিয়ম, জাতীয়তা নয়, বিজাতীয়তা। সাহিত্যিকেরা কেউ কেউ রিপোর্টাজ করলেন। কিন্তু দুর্বিপাকের মহাকাব্য রচনা করতে পারলেন না। বাঙালী সত্তা, তার বিদ্রোহী রূপ, তার অপরাজেয় আকৃতি লেশমাত্র প্রতিফলিত হল না। আধুনিক সাহিত্যের বৌদ্ধ-যুগীয় তন্ত্রাচার ঢুকল মাথায়, গঙ্গায় সোনাজলের বিস্বাদের মতো আদি মন বিবর খুঁজে বেড়াতে লাগল, নয় তো প্রজাপতির উড়নচণ্ডীরূপ নিল। 'সাম্য-বাদী ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনব' পত্রীমশাই যে সাপ্তাহিকে লিখেছেন, সেই সাপ্তাহিকের তাই ছিল পণ এবং অনেক সাহিত্যিককেই তারই পাতায় পাতায় দাসখত লিখিয়েছেন। পজিটিভ জাতীয় সত্তার উদ্বোধনী পথ না পেয়ে অশ্লীলতা নিয়ে বন্ধ্যা বিতর্ক তুলল। মহাকালের উপেক্ষায় তাও আসছিল থিতিয়ে, এমন সময় খোসলা কমিটির নামে আবার বেল-গাছিয়া-বেলেঘাটার খোলা নর্দমাগুলো উঠল ঘুলিয়ে।

তার আগে যে সব বিতর্ক হয়েছিল, তাকে উপলক্ষ করে আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা জেগেছিল। যাঁরা অশ্লীলতার নিন্দাবাদ বা জিন্দাবাদ করেন, তাঁরা কি সকলেই অশ্লীল বইগুলো পড়েন? জিন্দাবাদ যাঁরা করেন তাঁদের বোঝা যায়। তাঁরা হয়তো প্রকাশকের চর, নয়তো লেখকের পৃষ্ঠকণ্ডূয়নের সোদরপ্রতিম অথবা সেই পতঙ্গধর্মী, যা টাটকা মাছে বসে না—পচা মাছে বসে। কিন্তু যাঁরা নিন্দাবাদ করেন তাঁরাও তো নিশ্চয়ই অশ্লীল সাহিত্যের নিয়মিত পাঠক। নতুবা তাঁরা সংশ্লিষ্ট বইগুলো সম্পর্কে রায় দেন কি করে? অথবা তাঁরা যদি অপরকে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করার দায়-দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তবে সে অধিকারই বা তাঁদের কে দিল? অথচ সব্বাইকে পড়ে নিয়ে অশ্লীল বলে ঘোষণা করতে বলা যায় না; তাতে লেখক-প্রকাশকের কাজটা হাসিল হয়ে যায়।

এটা আমার কাছে একটা ভিসাস সার্কেল মনে হয়। না পড়লেও কিছু বলার অধিকার জন্মায় না, পড়লেও আমি তা আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারিনে। পটাসিয়াম সায়ানেড খেয়ে তবে বোঝে ওতে মানুষ মরে কি না। একটি বালখিল্য রাজনৈতিক কর্মী-কাম-রিপোর্টার আমাকে তার যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব বোঝাচ্ছিল। যথেষ্ট মুরুব্বিয়ানার সুরে বলেছিল, ও যে টিঁকবে না, তা সবাই জানত। তবে সরকার গড়লে কেন? জনতার চাপে। অর্থাৎ, জনতার তোমরা নেতা নও, জনতার লেজ ধরেই চলে তোমার নেতারা। সে দুম্ করে বললে, না, এক্সপিরিয়ান্স। অর্থাৎ, আগুনে হাত পোড়ে কিনা তা প্রত্যেক শিশুরই নাকি হাত পুড়িয়ে বোঝাতে হবে; ইতিহাস থেকে কোন পাঠ নয়। বলেছিল, হ্যাঁ তাই। অর্থাৎ, কেউ যদি এসে বলে বনে বাঘ, সবাইকে গিয়ে বাঘের মুখে পড়তে হবে। সাবাস্!

অর্থাৎ, এই তত্ত্বানুসারে মানতে হয়, সবাইকে সব পড়ে জানতে হবে। স্বীকার করব আমার কিছু সংস্কার আছে। পিউরিটান। কোন রকম মাদকদ্রব্যের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণই হল না। অকারণ অশ্লীল বইও আমি পড়িনে। বেছে বেছে বই পড়তে গিয়ে যদি (ইংরাজী-বাংলা) কোনো বইয়ে আমার সংস্কারমতো অশ্লীল অংশ পড়ে যায়, একটু বিব্রত ও লজ্জিত হই, কিন্তু সমগ্র বইটার সৃজনশীলতার কথা ভাবি, ভাবি তার টোটাল এফেক্ট নিয়ে। কিন্তু কেউ যদি বলে, বইটা অশ্লীল, সাবধান হই; শুধুমাত্র অশ্লীলতা বোঝবার জন্যই, বা ঐ সামান্যকে অসামান্য করবার জন্যই সে বই পড়িনে। আরও স্বীকার করব সিনেমা পত্রিকাগুলোর দেদার বিক্রী জানি আজকাল নাকি বড় বড় লেখক তাঁদের আশীর্বাদ করছেন এবং নিজেরাও অর্থ-ধন্য হচ্ছেন, তবু ওসব পড়ার অভ্যাস করে উঠতে পারি নি। হয়তো সংস্কারবশতই তাতে এই লাভ হয়েছে অন্য বই-পত্রিক পড়বার অবকাশ জুটেছে।

সিনেমায় কি হবে না-হবে তা নিে নিশ্চয়ই একদল মাথা ঘামাবেন; কি সাহিত্যই মূল কথা, সে যদি অশ্লীল নগ্নতা চুম্বনে নামে তবে কোনো কিছু কেই বাধা দেওয়া যাবে না। আর য সাহিত্যে কোনো বলিষ্ঠতার পরিচয় কে দিতে পারেন, তরুণ সমাজের কাছে রা নৈতিক, সামাজিক, এমন কি, ধর্ম কোনো আদর্শ প্রবলতর করে তুল পারেন, তবে পত্রীমশাইর কথাই ঠিক—দ একখানি স্খলিতপদ উপন্যাস গল্প চিত্র বৃহত্তর সমাজকে নরকে টানতে পার না। সামাজিক মনটা চাই সাফ। আম এখনও বিশ্বাস, বেশির ভাগ লোক সাউ ভূমালক্ষ্মী, নিজের দেহকে ছাড়ি স্কাইলার্ক হতে চায়, কিন্তু পৃথিবী

# মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী ণ শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান তত্ত্ব ও বিশ্বরাজনীতি / কাশীকান্ত মৈত্র

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

॥ নয় ॥

যুদ্ধ ও বিপ্লব পাশাপাশি হাত-ধরে চলে। যুদ্ধ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে তৈরি হয়েছিল এক আগ্নেগর্ভ পরিস্থিতি। সে সময় ইউরোপের কমিউনিস্টরা সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ দেশে বিপ্লবী সরকার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন—আর সেই সব বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি ছিল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমর্থন। অক্টোবর বিপ্লবের পর নিজের দেশে গৃহযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও লেনিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংগঠিত করার কোন সুযোগই নষ্ট হতে দেন নি। যুদ্ধ নতুন সুযোগ এনে দিয়ে থাকে, বিশেষ করে পরাধীন দেশের কাছে। বিপ্লবী দলকে তার সুযোগ নিতেই হবে। তাই ভারতবর্ষে ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বৃটিশ সরকারকে ছয় মাসের চরমপত্র দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি সে সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউরোপে আগামী ছয় মাসের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। সেই যুদ্ধে যুক্তরাজ্য জড়িয়ে পড়বেই—তার সুযোগ ভারতের মুক্তিসংগ্রামীদের নিতেই হবে। কোন্ যুক্তিতে বিশ্ববিপ্লবতত্ত্বে বিশ্বাসী সেদিনের ভারতের 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণবিপ্লবে অংশ না নিয়ে তার বিরোধিতা করলেন? এত ব্যাপক আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হল সুস্পষ্ট আদর্শ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে, কল-কারখানায় নিযুক্ত, বিশেষ করে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত কল-কারখানা শিল্পসংস্থায় শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব ও সংগ্রামবিমুখতার জন্য। সর্বোপরি ছিল নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতা। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে বিপ্লবীদের বীরত্ব, অপরিসীম দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের তুলনা মিলবে না। তাঁরা হিসেব করে অন্য দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, দিনক্ষণ দেখে নিজের দেশের বিপ্লবের কথা ভাবেন নি।

'বিনা অস্ত্র বিনা সহায় লড়তে হবে—
ধূলির 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে
হবে'

এ মহৎ চিন্তা নিয়েই সেই সব মহাপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দল অন্ধকারের বুকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কেতাবী নিয়ম বা ডায়েলেকটীকের নিয়ম অনুযায়ী বিপ্লব করার কথা তাঁরা ভাবেন নি। আর পৃথিবীর কোন্ দেশেইবা সে ধরণের বিপ্লব হয়েছে আজ পর্যন্ত? ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন চরম বিপর্যয়ের একমাত্র লক্ষ্যই হওয়া উচিত ছিল—সেই লুণ্ঠনকারী বীভৎস সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবার পথ প্রশস্ত করা। নিরস্ত্র পরাধীন ভারতবাসীদের পক্ষে এককভাবে সারা বিশ্বে বিস্তৃত এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত করা কখনই সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল নিজেদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইকে জোরদার করে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসকে দুর্দমনীয় করে তোলা। আর সে যুগে সেটাই ছিল সাম্রাজ্যবিরোধী শক্তিগুলির ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কিন্তু তবু 'অনিবার্য সংঘর্ষ তত্ত্বে' বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা সেদিন, সংঘর্ষ শুরু হয়ে প্রকট আকার ধারণ করা সত্ত্বেও, কেন তার চরম পরিণতির জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপ দিলেন না? কেন তাঁরা দেশবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিলেন?

হয়ত বলা হবে—আক্রমণকারী দুর্ধর্ষ নাৎসী শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলায় জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যস্ত 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি' সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বহারা-প্রলেটারিয়েট-কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের জীবন-মরণ সংগ্রামে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করাই ছিল সেই সময় ভারতের শোষিত-নিপীড়িত পরাধীন সর্বহারাশ্রেণী-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-ছাত্র-যুবকদের দায়িত্ব বা কর্তব্য। আর যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর বৃটেন, রাশিয়া, আমেরিকা একজোট হয়ে জার্মানী-ইতালীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, সেই কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর,—ভারতের শোষিত প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর নাকি বিদ্রোহ করার অর্থ প্রকারান্তরে, পরোক্ষভাবে—রাশিয়ার অসুবিধা সৃষ্টি করা। সেটা তো হতে যুক্তি বলে বিবেচিতও হয়, তাহলে সোভিয়েট প্রলেটারিয়েট শ্রেণী-কৃষক-বুদ্ধিজীবী বা সে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কি সেই একই যুক্তিতে সেদিন বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে সেদিনের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মার্কিন ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চাপ দেওয়া উচিত ছিল না—ভারতের স্বাধীনতা সর্বাগ্রে ঘোষণা করার জন্যে? সোভিয়েট রাশিয়ার এই রাজনৈতিক ও সামরিক চাপকে উপেক্ষা করার কোন ক্ষমতাই চার্চিল সরকারের ছিল না সেদিন। কোন মার্কসবাদী দেখাতে পারবেন কোন দলিল উদ্ধৃত করে যে, স্তালিন বা রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে কুটোখড়টি তুলে বা মুখের বচন দিয়েও কোন সাহায্য করেছেন? স্তালিন ছিলেন বাস্তববাদী কট্টর লেনিনবাদের 'উত্তরাধিকারী'। নিজের দেশের জাতীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু তিনি আমলই দিতেন না।

সোভিয়েট রাশিয়া বাঁচলে তারপর বিশ্ব-বিপ্লব ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার প্রশ্ন। তাহলে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার (প্রলেটারিয়ান ইন্টারন্যাশনালিজম) সাধনা হবে একতরফা?

স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার "বিপ্লবী", "শ্রেণীসচেতন" প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর স্বার্থে ভারতের ৪০ কোটি মানুষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে দাসত্বের জোয়াল বইতে হবে। বিদ্রোহ করে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে ভারতের বৃটিশ ক্রীতদাসদের যুদ্ধক্ষেত্রের কামানের "তোপের খাদ্য"রূপে ব্যবহারের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে স্বাধীনতার দাবি করার অর্থ—ফ্যাসিবাদের সহায়তা করা! 'সংঘর্ষবাদী' ভারতের কমিউনিস্টরা সে সময় জাপানী ফ্যাসিস্টদের রুখবার জন্য শহরে শহরে

তন্ত্রের দাবিতে মিছিল করে বেড়িয়েছিলেন। অথচ জাপানে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আণবিক বোমাবর্ষণের পূর্ব-মুহূর্ত অবধি সোভিয়েট রাশিয়া অক্ষশক্তির এশীয় বড় শরিক ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিল। রাশিয়া ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট এশিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী তোজো রাশিয়ায় অবস্থিত জাপ রাষ্ট্রদূত মারফৎ সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মলোটভের কাছে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের গোপন ইঙ্গিত পাঠান—হিরোসিমা-নাগাসাকীতে আণবিক বোমাবর্ষণের প্রায় এক মাস আগেই। স্তালিন সর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের পক্ষে মন দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অবশ্য এ প্রস্তাবকে কোনই আমল দেন নি। অপর দিকে গ্রেট বৃটেন, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের জন্য জাপানকে ২৬শে জুলাই (১৯৪৫) এক চরমপত্র দিল। এই চরমপত্রের কথা মলোটভকেও জানিয়ে দেওয়া হল। এদিকে ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া এক অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ তখনও। ২৯শে জুলাই মলোটভ স্তালিনের নির্দেশে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁর স্বরাষ্ট্র-সচিব বার্নস-এর সঙ্গে জাপান আক্রমণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। ইয়াল্টা সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি হয়েছিল—রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

কি আশু কারণে রাশিয়া জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত অনাক্রমণ-চুক্তি ভঙ্গ করে জাপানের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, সে বিষয় আলোচনার জন্য স্তালিন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অথচ ভারতের স্তালিনভক্তরা (১৯৪২-৪৫) বক্তৃতার তুফান তুলে জাপ-ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার কাজেই বেশি ব্যস্ত হয়েছিলেন। এই দুই আচরণ কি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও পরস্পরবিরোধী নয়? এই দুটো দেশের কমিউনিস্টদের আচরণের কোনটির মধ্যে কি রাজনৈতিক সততা বা আন্তরিকতার বাষ্পমাত্র ছিল?

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে স্তালিন জার্মানীর মতিগতি দেখে নতুন বন্ধু খুঁজছিলেন। তিনি যুগোশ্লাভিয়া ও জাপানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়লেন। ৬ই এপ্রিল ১৯৪১ যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, অথচ সেই দিনই জার্মান বিমানবাহিনী বেলগ্রেড শহরে বোমাবর্ষণ করে গেল। স্তালিন তখন জাপানের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মাৎসুয়োকাকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করলেন—অনুরূপ অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদনের জন্যে। জাপান তখন দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ ও আমেরিকার ঘাঁটিগুলি আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। তাই সাইবেরিয়ায় বিরাট রুশ সেনাবাহিনী বন্ধু দেশের সেনাবাহিনী হিসাবে অবস্থান করলে জাপানের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে। স্তালিন মাৎসুয়োকাকে বলেছিলেন— "I am a convinced adherent of the Axis and an opponent of England and America."

অর্থাৎ 'আমি একজন জোরাল অক্ষশক্তির ভক্ত এবং ইংরেজ ও আমেরিকার বিরোধী।'

বিদায় নেবার প্রাক্কালে রেলপথের স্টেশনে এসে মাৎসুয়োকাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে যান এবং বলেন— "We are both Asiatics."

অর্থাৎ 'আমরা উভয়েই এশিয়াবাসী।'

(Rise and Fall of Stalin—Page 566).

চীনের কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনটাং-পন্থীরা এশিয়াবাসী হয়েও আক্রমণকারী জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রাম করছে সেই সময়। ভারতের কমিউনিস্টরা দেশের "স্বাধীনতা"র দাবিকে মুলতুবী রেখে এশীয় শক্তি জাপানের ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে গেরিলা ঢং-এ যুদ্ধ করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে রাইফেল ভিক্ষা করে ভারতের বিভিন্ন শহরের পথে পথে মিছিল করছেন—আর কমিউনিস্ট দুনিয়ার সর্বহারাদের প্রেরণার উৎস—সোভিয়েট রাশিয়া এশীয় শক্তি হিসাবে অক্ষশক্তির বড় শরিক ফ্যাসিস্ট জাপানের জন্য বন্ধুত্বে বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই হল সত্যিকারের চেহারা।

যে রাশিয়া অক্ষশক্তির প্রধান ফ্যাসিস্ট জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করে গেল ১৯৪১ সালের ২১শে জুনের পর থেকে বিশ্বযুদ্ধ-সমাপ্তি পর্যন্ত, সেই রাশিয়াই সেই অক্ষশক্তিগোষ্ঠীভুক্ত ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি রক্ষা করে চলল ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত। এর পেছনে আদর্শের কোন প্রেরণা নেই, কোন মতবাদ নেই—আছে রুশ জাতীয় স্বার্থের তাগিদ। জাপান যাতে রাশিয়াকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বিপন্ন না করে, এশিয়াবাসী স্তালিন এশিয়াবাসী মাৎসুয়োকার সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, এই যা!

ভারতের বৃহত্তম আগস্ট গণ-বিপ্লবের পটভূমিতে সেদিনের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তথাকথিত "ফ্যাসীবিরোধী" গালভরা বিভ্রান্তিকর শ্লোগান যে কত অন্তঃসারশূন্য ছিল, গোটা দেশকে ফ্যাসীবাদ-বিরোধিতার অছিলায় সাম্রাজ্যবাদী-যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য ভারতবাসীর মনে যে মানসিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল, সেটা বোঝাবার জন্যে ওপরের ঘটনাগুলি তুলে ধরা হল, মাত্র। ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লব সফল হলে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হতো না, ৬ লক্ষ নরনারী কুৎসিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলিও হতো না। স্বাধীন অবিভক্ত ভারতবর্ষ বিশ্বরাজনীতিতে নতুন শক্তিরূপে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এশিয়া ভূখণ্ডে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হোত। ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বকে জীইয়ে রেখে, একক অপরের বিরুদ্ধে সুচতুরভাবে উস্কানি দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র যে নীতিহীন কূটনীতির খেলা খেলেছে, নতুন সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে, তা চিরতরে বন্ধ হোত। সর্বোপরি ভারতের রাজনীতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্টদের ভূমিকা বুঝতে হবে। পররাষ্ট্র-নির্ভর মতবাদ ও রাজনীতি গোটা দেশকে কি বিপর্যয়ের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে, ভারতের মত দেশের সচেতন দেশবাসীর সে বিষয়ে সজাগ হবার সময় এসেছে। স্তালিন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছেন, ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। আবার জার্মানীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হবার পর, ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি বলবৎ রেখেছিলেন ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত। ইয়াল্টা সম্মেলনে স্তালিন এক-যোগে জাপান আক্রমণের প্রতিশ্রুতি রুজভেল্ট ও চার্চিলকে দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি না দিয়ে থাকলে স্তালিন কি করতেন সেটা অনুমানসাপেক্ষ। এই চুক্তির বিরুদ্ধে কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা স্তালিনবাদী কি কিছু বলেন?

না। তাহলে ভারতের স্বাধীনতার জন্য দুই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নেতাজী সুভাষ জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলে, সেটা দুনিয়ার মার্কসবাদী ও কমিউনিস্টদের কাছে সমালোচনার বস্তু হয়েছিল কি করে? ভারতের কমিউনিস্টরা যখন সুভাষচন্দ্রকে অক্ষশক্তির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অপরাধে মুক্তি-যুদ্ধের সেই অনন্য সেনানায়ককে 'ফ্যাসিস্ট' বলে অভিহিত করেছিলেন, তখন 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক সেই ফ্যাসিস্ট জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে অনাক্রমণ-মৈত্রী চুক্তি স্থাপনের

বিরুদ্ধে কোন কথা বললেন না কেন? স্তালিন যদি হিটলারের সঙ্গে অথবা ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে ফ্যাসিস্ট না বনে গিয়ে থাকেন, সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য দুই সাম্রাজ্য-বাদের লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সখ্য স্থাপন করলে তিনি ফ্যাসিস্ট হয়ে যাবেন কোন্ যুক্তিতে? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জার্মান ও জাপ সাম্রাজ্যবাদের যেমন সেদিন চরম শত্রু ছিল, তেমনি শত্রু ছিল ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীদের। সুতরাং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সংগ্রাম চালিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনীতি। আবার ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর কমিউনিস্ট রাশিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে উভয় পক্ষের সে সময়ের সাধারণ শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ লেনিনের নির্দেশে ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সঙ্গে। এই চুক্তির সর্ত বলশেভিক রাশিয়া আদৌ মেনে নেবে কিনা এ নিয়ে সেদিন
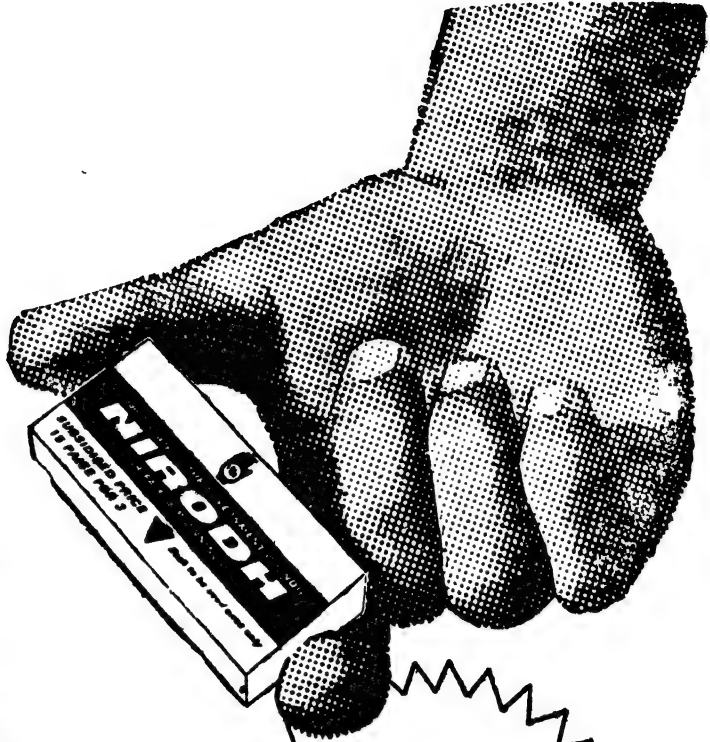
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দারুণ বিভেদ দেখা দিয়েছিল। লেনিন দেশের পরিস্থিতি উপলব্ধি করে প্রথম থেকেই জার্মান সর্তেই সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ট্রটস্কী ছিলেন এর বিরুদ্ধে।

> "When the Soviet delegation heard the German terms, General Skalon, one of the Soviet experts, committed suicide on the spot. Another Soviet delegate Prof. Pokrovsky said with tears in his eyes : How can one speak of peace without annexations if Russia is being deprived of territories equal in size to approximately eighteen provinces ?....." (Lenin—by David Shub).

অর্থাৎ এই চুক্তি হলে রাশিয়ার বিপুলায়তন জমি জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে—আনুমানিক প্রায় ১৮টি প্রদেশের আয়তনের সমতুল্য সোভিয়েট ভূখণ্ড এই চুক্তির ফলে বলশেভিক রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। জার্মান সরকারের কাছ থেকে চুক্তির সর্তগুলি শুনেই সেনাপতি স্ক্যালন তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করেন। এই আলোচনার সময় রুশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন ট্রটস্কী ও বুখারীন। এঁরা দুজনেই এই সর্ত-ভিত্তিক চুক্তির বিরোধী ছিলেন। এই চুক্তির প্রশ্নে সোভিয়েট সরকার দ্বিধা-বিভক্ত হবার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। লেনিনের যুক্তি ছিলঃ জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা রাশিয়ার নেই। সেনাবাহিনী রণক্লান্ত। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অর্থই হবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের হাত শক্তিশালী করা। এখনই জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি না হলে আরও বেশি ক্ষতির কারণ ও অপমানজনক সর্তে শেষে রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী জার্মান সরকারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে হবে। লেনিনের ভাষায়ঃ

> "To continue the war under such conditions would be equivalent to strengthening German imperialism. Peace would then have to be signed anyway but its terms would be much worse because we would have no choice in the matter. Undoubtedly the peace which we are now compelled to sign is a rotten one but if war should break out again our government would be wiped out and peace would be made by some other government."

লেনিনের গভীর আশংকা ছিল যে, শান্তি-চুক্তি জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত না হলে, বলশেভিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে। তাই লেনিন নিজেও সে-দিন তাঁর মতবাদ মার্কসবাদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন নি—যা করেছিলেন তিনি সেদিন, তা তাঁর দেশেরই স্বার্থে। লেনিনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় তীব্র বিক্ষোভ পার্টির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। লেনিনের পক্ষে ছিলেন স্তালিন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভোটাভুটি হয়—ট্রটস্কীর প্রস্তাবের অনুকূলে ৯টি ভোট পড়েছিল আর লেনিনের দিকে পড়েছিল ৭টি ভোট। লেনিন সোজাসুজি ট্রটস্কীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলে-ছিলেনঃ

> If the German demand overturn of the Bolshevik government, then, of course, we would have to fight. All other demands can and should be granted. We have heard the statement made that "the German are going to take Livonia and Estonia. We can very well sacrifice these for the sake of the revolution. If they demand the removal of our troops from Finland, well and good. Let them take revolutionary Finland, Livonia, Estonia, we still retain the revolution. I recommend that we sign the peace terms offered to us by the Germans. If they should demand that we keep out of the affairs of the Ukraine, Livonia and Estonia, we shall have to accept those terms too." (Lenin Collected Works, Vol. XXII, Pp. 198-9, 258, 607).

অর্থাৎ যদি জার্মানরা বলশেভিক সরকারের পতন চায়—সন্ধির সর্ত হিসাবে তাহলে অবশ্যই আমরা লড়াই করব। তাছাড়া অন্য সব দাবি মেনে নিতে হবে। জার্মানরা লিভোনিয়া, এস্তোনিয়া দখল করতে চায় শোনা যাচ্ছে। বিপ্লবের স্বার্থে এই সব রাজ্যের কর্তৃত্ব আমরা পরিত্যাগ করতে পারি। তারা যদি ফিনল্যান্ড থেকে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অপসারণ দাবি করে, সেও সই। তাদের বিপ্লবী ফিন-ল্যান্ড, লিভোনিয়া, এস্তোনিয়া নিতে দাও— তবু বিপ্লবকে রক্ষা করতে পারা যাবে। জার্মানরা যে শান্তি-চুক্তির সর্ত পাঠিয়েছে, তা গ্রহণের অনুকূলে আমি মত দিচ্ছি।

কোন লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী কি এর জন্যে লেনিনের সমালোচনা করেছেন? লেনিন পরে বলেছিলেনঃ

> "We took advantage of the hostility between the two imperialisms in such a way that in the long run both lost."

অর্থাৎ দুইটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লড়াই-এর সুযোগ আমরা নিয়েছিলাম এমনভাবে যে, পরিশেষে দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই পরাজয় ঘটেছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগ নিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য। তিনি লেনিনের মত কোন শান্তি-চুক্তিতে সই করারও ইঙ্গিত দেন নি—বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে নিঃসর্ত আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র স্তালিনবাদীদের মত কোন গোপন চুক্তি হিটলার-তোজোর সঙ্গে করেন নি- যেমন স্তালিন করেছিলেন হিটলারের সঙ্গে রূঢ়-বাস্তবতাবোধ ও আদর্শবাদের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বাস্তবতাবোধ তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে দুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘাতে সুযোগ নেবার প্রেরণা জুগিয়েছিল—তাঁর আদর্শবাদ তাঁকে নাবিকের দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের মত অসীম দুর্যোগে কূলহীন সমুদ্রে পথ দেখিয়েছে। তাই অক্ষশক্তি সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক মৈত্রী কোনরকম স্বার্থপর লোলুপতার দ্বারা কলুষিত হয় নি। হিটলার—তোজোর নির্দেশে তিনি ও তাঁর মহান ফৌজ কোন কাজ করেন নি। তোজোর কোন দাক্ষিণ্য তিনি নেন নি।

যে-দেশে জন্মেছি—রাজনীতি-অর্থ-নীতি-সমাজনীতি-কৃষ্টি সেই জন্মভূমি অবলম্বন করেই গড়ে উঠবে। নিজে দেশকে, দেশের সার্বভৌমত্ব, পরিমার্জিত মানবতাবোধপুত উজ্জ্বল জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা-অবহেলা করে তথাকথিত ম বাদের নামে, কল্পিত আন্তর্জাতিকত নামে অন্য দেশের দিকে চেয়ে থাকা নিছ ভিক্ষুকতারই নামান্তর। [ চলবে

# অন্য গ্রাম অন্য তরংগ

## সমীর মুখোপাধ্যায়

**[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]**

**সকালবেলা থেকেই** চীৎকার, চেঁচামেচি। বনের ধারে যে পাশে রোদ্দুর সেদিকে পিঠ দিয়ে মাদুরের ওপর শুয়ে লিখছিলাম। একটু আগে কুন্তী থেকে স্নান করে এসেছি। বেশ লাগে। বিশেষ এই শীতকালে। কাঁচের মত জল। দিগন্তের বোঁটা একটু একটু করে লাল হচ্ছে। চারিদিক শান্ত, নির্জন। প্রান্তর থেকে হাত-পাঁচেক উঁচুতে দাঁড়ানো দীর্ঘ ধোঁয়ার রেখা। তার ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট-ভাবে দেখতে পাওয়া যায় খেজুর আর তাল গাছের বিচিত্র অংগভংগী। ঘাসে, গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা শিশির। এসব দেখতে দেখতে, এসব ছুঁতে ছুঁতে আমি কুন্তীর বুকে নাবছি। জীবনে কতো-বড়ো সৌভাগ্য থাকলে এমন করে স্নান করা যায়। আঃ, মুক্তি, সাঁতার কাটছি জল ভয়ংকর ঠান্ডা, কিন্তু কি ভীষণ আরাম, বুকের ছটা জলে, জলে ধোঁয়া, একটু আগে আকাশের একদিকটায় অন্ধকার থমকে ছিল, আর একটা দিক নির্মল স্বচ্ছ এইবার আলোয় ভরে যাচ্ছে সম্পূর্ণ আকাশ, রীতিমত ঘোষণা করে সূর্য উঠছে, ভাগ্যিস আমি এখানে এসে-ছিলাম। স্নান করার মধ্যেও যে এতো তৃপ্তি, এতো আনন্দ, এতো ভোগ আছে এ কি আগে আমি জানতাম। মনে পড়ছে একটা অন্ধকার ঘর, যাকে বলে বাথরুম, কোনদিন মিউনিসিপ্যালিটি কৃপা করলে জল আসে, কোনদিন আসে না তাও বাঁধা বালতির জল, সেখানেও লাইন, সাতটার সময় ছোটভাই স্নান করবে, সে ডেলি প্যাসেঞ্জার, যাবে কোলকাতায়, তার জন্যে ঐ সময়টা ছেড়ে দাও। সাতটা পনেরো, দাদা যাবেন, ওঁকে ছেড়ে দিতেই হবে, কেন না স্নান করেই উনি বাজার যাবেন, তারপর এসে প্রাইভেট টিউশ্যানী, এমনি পর পর সকলেই আছে, আমিও আছি, আমারও আছে নির্দিষ্ট' টাইম। সে টাইম অতিক্রম করা চলবে না, জল ইচ্ছেমত বেশি ব্যবহার করা চলবে না, ঝট করে ট্যাপটা খুলে কলের মুখে গা পেতে দিতে হবে, জল ছোট হয়ে সি—সি শব্দ করতে করতে পড়বে, কি জানি এতোদিন এই-রকম স্নান করা কি করে সহ্য করে-ছিলাম। এই উন্মুক্ত দিগন্তের নীচে রক্ত ছড়ানো আকাশের তলায়, বিশাল কুন্তীর কাকচক্ষু জলে স্নান করে, সাঁতার কেটে যে আনন্দ পেলাম তারপর একদিন চুপিচুপি শহরে ফিরে বাথরুম নামে ঐ অদ্ভুত খাঁচাটার মধ্যে ঢুকতে গেলে কিরকম লাগবে না ?

হয়তো একদিন সবই সহ্য হয়ে যায়। রেশনের বরাদ্দের মত ছোট আকাশ, লোহার রেলিং দেওয়া ছোট মাঠ যাকে বলে পার্ক, পায়রার খোপের মত ছোট বাথ-রুমেও অভ্যস্ত হয়ে যাবো। কোনদিন মনেও হয়তো পড়বে না কল দিয়ে খুব সরু করে জল পড়ে; স্নান করতে গেলেও হাঁটু দুমড়ে বসে বেঁটে হতে হয়, সেখানেও আছে নির্দিষ্ট টাইম, সে টাইমও আবার পেতে গেলে—লাইন। কিন্তু এসব কি লিখছি আমি। চিৎকার আর চেঁচা-মেচিটা যে ক্রমশ বাড়ছে। পেন আর কাগজ রইলো পড়ে। উঠে পড়লাম গলায় মাফলারটা জড়িয়ে। কী ব্যাপার, না, সোনা ঘোষ চেঁচাচ্ছে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে, তাকে ঘিরে ছোট একটা জটলা। সোনা ঘোষ বলছে, আমি ছাড়বো না তুমি যেই হও। ধানকলের মালিক হয়ে-ছেন। দু' দুটো কোল্ড স্টোরেজ আছে। ঘানি আছে। লাইনে বাস চলে দুটো। ওসব মানবো না। আমাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া আমি ঘোচাবো। যদি আমার সমিতি কিছু না করে তা'লে সে শালার সমিতির নেতার মাথায় ডান্ডা মারবো। দেখি কে আমাকে রোখে। আমি বাংলা দেশের মানুষ। সব মানুষ আমার পেছনে। তা ছাড়া রয়েছে সরকার। এ আগেকার বাইশ বছরের ভুতুড়ে সরকার নয়। যদু শালা দোষ করলো ত' মধুকে নিয়ে টানাটানি। এ আমাদের সরকার। আমি যদি ন্যায্য হই ত' সরকার ঠিক পাশে এসে দাঁড়াবে। আমি জিগ্যেস করি, তোদেরি জিগ্যেস করছি, নিশ্চয় কেউ এর মধ্যেই জোতদারের দালাল আছিস, জিগ্যেস করিস তোর সেই জোতদার বাপকে, আমি কি তার ক্যাশ লুটেছি, টাকা মেরেছি, বিনা কারণে শালা-বাঞ্চোৎ বলেছি ? যদি না বলে থাকি তবে শালা আমাকে তাড়াবে কেন ? না। সেটি হবে না। কাঁদুনী-ফাঁদুনী নয়। সে সব জমানা পাল্টে গেছে ধন। এখন তুমি মেরেছ ইঁট আমি মারবো পাটকেল। আমারও একচিলতে জমি আছে। এটা আজই আমি বেচে দোব। কাগজ ছাপাবো জোতদারের নামে। দেয়ালে পোস্টার মারবো। সমিতিতে খবর দোব। এ সমিতি যদি না পারে অন্য সমিতিকে খবর দেব। এ পার্টি যদি না পারে অন্য পার্টি আসবে। বলে দিস তোরা সবাই, সোনা কাউকে ছাড়ে না। সোনা জলঢোঁড়া নয়। জাত কেউটে। হুঁশিয়ার।

দীর্ঘ বক্তৃতা। লোক জমিয়ে ফেলেছে। সোনার এ মূর্তি কখনো দেখি নি। এমনিতে গাঁয়ের মানুষ যেমন হয় আর কি। কিন্ত এখন দেখছি অন্যরকম। ও যেন শুকনো, খাঁ খাঁ মাঠের রোদে ফাটছে। অথচ এই সোনাকেই কাল চিকণ সুরে গান গাইতে দেখেছি দোকানতলায়।

তারপর আমায় দেখতে পেয়ে সোনা বলল, আপনি ত' শিক্ষিত মানুষ। লেখেন-ফেকেন। একটু মুসাবিদা করে দেবেন ত'। বেশ ঝাললংকা মাখিয়ে। শালার বড্ড তেল হয়েছে। ঘুঘু দেখেছো এখনো ফাঁদ দেখো নি। আমার ঘর চেনেন ত'।

ছিদামের সঙ্গে একদিন দেখে এসেছিলাম।

যাবেন সময় করে।

যাবো।

এ হয়ে গেছে সকালে। এখন কিন্তু অন্ধকার। অন্ধকারে যেতে যেতে সোনার কথাগুলো কানে বাজছিলো। দোকান-তলার আলো এখান থেকে আর দেখা যায় না। সকালে এইখানেই কোথাও ছায়াবট মর্মরিত হচ্ছিল। এই নিকষ অন্ধকারে এখন সে সব দেখা যায় না। দু' পাশের স্তব্ধ বনভূমি থেকে উঠে আসছে আর্দ্র গন্ধ। ঝিঁঝি ডাকছে। কোথা থেকে অবিরল জলের কলকল শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারের বুকচিরেই যেন শব্দটা উঠে আসছে। অনেক দূর থেকে, যেন দিগন্তের অন্য পাড়ে, নিরন্তর একটা ভট্ ভট্ ভট্ ভট্ শব্দ, পাম্পেরই হবে, গাঁয়ের লোকেরা বলে 'দমকল', সেই দমকলের ধাতব শব্দ এই ঘন, জমাট অন্ধকারকে সচকিত করে তুলছে। এরকম অন্ধকার সম্মোহন জানে। কতদিন এইরকম অন্ধকারে, এর চেয়েও গভীর রাতে নিঃসংগ, একা একা বেরিয়ে পড়েছি। কোন কিছু পাবো বলে নয়, কোন গন্তব্য নেই, কোন এনগেজমেন্ট নেই, কেউ বলে নি আসতে, তবু একা একা দীর্ঘ দীর্ঘ মাইল অন্ধকারে হেঁটে গেছি, হেঁটে যেতে ভালো লেগেছে, কি জানি কিসের টান, জন্মের অন্ধকারের কোন ঋণ কিনা জানি না, কোন তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই, যেন অন্ধকারকে একটু একটু করে বুঝে নিতে চলে গেছি কত-দূরে। মাথার ওপর গাঢ় কুয়াশায় আচ্ছন্ন বড় বড় অস্পষ্ট তারা, পথের দু' পাশের বাঁশবন থেকে উঠে আসা জোনাকীর খই ছড়ানো পথ, হঠাৎ কোথাও কচি ছেলের আর্তনাদের মত কোন পাখির চীৎকার। দু'একটা খড় বোঝাই লণ্ঠন ঝোলানো গরুর গাড়ি, চকিতে চলন্ত লরীর তীব্র, হিংস্র হেডলাইট—এ সমস্তই দৃশ্য অদৃষ্টের মত ক্রমাগত আমাকে টেনে নিয়ে গেছে আরও দূরে অন্ধকারে। আমার মধ্যেও আছে এক অন্ধকার সেখানেও আছে এক রক্তমাখা স্বর, লরীর হেডলাইটের মত তীব্র, হিংস্র এক জ্বালা। তাই এই অন্ধকারে হাঁটতে আমার অসুবিধে হয় না।

এবার চড়াই-এর পথ। পচা, পুরোন আবছা একটা প্রকাণ্ড, ভাঙা দেয়ালের আভাস। একপাশে বুনো আগাছার জঙ্গল। মধ্যে একফালি সুঁড়ি পথ। বিচিত্র নয়, এইখানেই হয়তো শুয়ে আছেন মহানাগ চন্দ্রবোড়া। সাবধানে হাততালি দিতে দিতে চলেছি। দিন দশেক আগে ছিদামের সঙ্গে এইদিকে এসেছিলাম। সোনা ঘোষের ঘরটা মনে আছে।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বাসনা আর খেজুরপাতা দিয়ে তৈরি আগড়টা ঠাহর করে বুঝলাম এসে গেছি।

সোনা, সোনা আছো?

কে ডাকেন গো। একটা মেয়েলি ভয়ত্রাসে গলা। আপনি কে গো? বনঝোপের আড়াল থেকে একটা লম্ফ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো।

আমি। হন হন করে লতাজটিল পথটা অতিক্রম করে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ও, আপনি। সোনা ত' নেই। ও অনেকক্ষণ বেইরেছে। এখনো ফেরে নি। তাই ভাবছি।

আমি যাই। সোনাকে বলবেন।

না। না। যাবেন কেন? ভেতরে আসুন। আমি ভেবেলাম বুঝি জয়কেষ্ট দাদা, তা' ভালোই, নাচদুয়ারে ডাঁইড়ে রইলেন কেন? ভেতরে আসুন। আজ আমাদের বড় বিপদ।

বিপদ? আমি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মহিলাটির মুখের দিকে তাকালাম। বয়েস আন্দাজ তিরিশের ওপর। চোখগুলো বড় আর গোল গোল, হ্যাঁ, গরুর চোখের মতই, বিপদ বলে কিনা জানি না, একটা অসহায় ভাব থমকে আছে। মানুষটা মোটা-সোটা। ওইটুকু আসতেই যেন হাঁফিয়ে পড়লো। কিন্তু কথা বলে চলেছে অনর্গল।

বসুন। কোথায় যে বসতে দি। এই একখানা চেয়ার। কোথায় আর বসবেন, ঐখানেই বসুন। আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করি বলুন। এই দেখুন না, মা তিনদিন হল গত হয়েছেন। আমার শ্বশুরবাড়ি পাক্কা ছ' কোশের রাস্তা। সোনা গিয়ে খবর দেয়। রান্না সবেমাত্তর চড়িয়েছি। চাল কটা জলে ছেড়ে দিইচি। সোনা বললে, দিদি চ। মা মারা গেছে। বাস। রইলো পড়ে সব। ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ঐ অবস্থাতেই কোনক্রমে চলে এনু। আপনার জামাই (ইতিমধ্যেই আমি আপনজন হয়ে গেছি, অদ্ভুত কাণ্ড) জানেও না তখনও। ছেলেমেয়েরা বললে, কোথায় যাচ্ছি মা? আমি বলনু সে গেলে পরে বুঝবি। ঐ যে সব গরু-চোরের মত বসে রয়েছে। বলেই সোনার দিদির খিল খিল হাসি।

ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে একটা বড় খাট। পায়া নেই। আট-দশখানি ইঁট পর পর সাজিয়ে উঁচু করা হয়েছে। তার তলাতে একটা রং-চটা টিনের তোরংগ, একটা বেল্লো-ফাঁসা হারমোনিয়ম, একটা কাটা টিনের প্রকাণ্ড কৌটো, আরশোলা আর ইঁদুরের নেপথ্য সংসার। দেয়াল জুড়ে জয়তারা, বিষহরি, বব্বা ষণ্ডেশ্বর, গোরক্ষনাথ, ধর্মঠাকুর, দুর্গা প্রভৃতির সিঁদুর লেপা পট। আর তার ঠিক নিচেই খাটের ওপর গায়ে এক-একখানা চটের মত বস্তু জড়ানো দু'তিনটে মাংস-পিণ্ড ড্যাবাড্যাবা চোখ মেলে জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে।

দাঁড়ান চা করি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, না, না।

তা' কি হয়। তা ছাড়া ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মেজটা তখন থেকে চা খাবো-খাবো করছে। এর মধ্যে তিনবার হয়ে গেছে। কি-ই বা খাবে? কি দোব? চা-ই খাক। এটি আবার ভীষণ ভীতু। দেকুন না, খাট থেকে নাবতে পাড়ছে না। তিনদিন হয়ে গেল। সকাল-বিকেল ভাত খায় না। কিন্তু যাই রাত্তির হল অমনি খাটে চড়ে বসবে। তারপর নাবায় কার সাধ্যি। ওর ধারণা, দিদ্‌মা ঘাড় মটকাবে। বলেই খিল খিল করে হেসে উঠলো সোনার দিদি।

আপনি ভাবছেন এসে কি ভুলই করেছি। দেখা করতে এসেছিলেন সোনার সঙ্গে। কিন্তু এরকমটা ত' আর ভাবেন নি। ভালোই করেছেন এসে। দিন না সোনাটার একটা ব্যবস্থা করে। বয়েস হল চব্বিশ-পঁচিশ। উপার্জন লবডংকা। বাগান নেই, একচিলতে ধেনো জমি নেই, ছোঁড়াটার আবার বুদ্ধিও নেই, হুজুকে মেতে আছে। কিষক সমিতি করছে। আজ এ গেরাম। কাল ও গেরাম। আমি বলি, হাঁ রা, এই কল্লেই চলবে? বিয়ে-থা করতে হবে না? মা নেই। এখন ত' আমিই ওর মা। ওর জন্যে বড্ড ভাবনা আমার। বিয়ে দেব। ছেলে-পিলে হবে। বউ ভিটেতে সকালে জল-ছড়া দেবে। গোয়ালে আঁজাল দেবে। তুলসীতলায় ডাঁইড়ে মা, বাপ যাতে শুনতে পায় তার জন্যে দু' হাত তুলে শাঁক বাজাবে। ইচ্ছে করে না বলুন, তা নয়, খালি এ গেরাম, ও গেরাম রণপায়ে ঘুরছে, বললে বলে, না দিদি, আমার আর বাঁধনে জটড়ো না, ওতে কোন সুখ নেই, দেখলে না বাবাটা কেমন বেঘোরে মারা গেল, মায়ের একটা চিকিচ্ছে পর্যন্ত করতে পারলাম না, তার চে এই ভালো, আমি খুব ভালো আছি, শুনে আমার চোখে জল, বলুন ত', এ কেমন ধারা? ঐ যে ব্যা—ট্টা গেলো, দেখলেন এই গাঁয়ের

ব্যাভারটা. এখানে আমরা জন্মেছি, গাঁয়ে আছে সুষ্যি জ্যাঠা, কতো পয়সা, দু' তিনটে লরী, একশো বিঘে ধেনো, তা ছাড়া মনে করুন বাপ-মায়ের কল্যাণে বলতে নেই চোদ্দ বিঘে বাগান, সেখানে কলাটা, আমটা, তা ছাড়া পোকুর খান পাঁচেক, মালক্ষ্মী ঢেলে দিয়েছেন, জ্যাঠা জ্যাঠা করি, না হয় নাই হল নিজের জ্যাঠা, তবু তো গ্রাম সম্পকের, একটু বিপদের দিনে দাঁড়ানো উচিত ছেলনি, আপনিই বলুন। ঐ ছেলে সোনা কি করে একা? কি বা ওর রোজগার। আমি কি করবো। ঘাট-কাঁধ চারজনা আর ব্রাহ্মণ নিয়ে একজন। এই পাঁচজনকে খাইয়ে দোব, এর বেশি, আমিও গেরস্ত মানুষ, আমার সংসারটিও ত' কম না, তাছাড়া (এইখানে মাথায় ঘোম্‌টা টানলো) আপনার জামাই, সত্যি কথাই বলবো, রোজগার মন্দ করে না। কিন্তু একটু কিপ্টে, উঠতে বসতে খালি খোঁটা দেয়, সব যেন আমি সোনাকে বিলিয়ে দিচ্ছি। অবশ্য মানুষটার দোষ নেই, সোনার যদি অবস্থা ভালো হত, তা হলে ত' এসব খরচা লাগতো না, তা ছাড়া সত্যি কথাই বলবো, বিয়ে অব্দি জামাই আপনার একটু যত্ন-আত্তি পায় নি। বছর ঘুরলে একখানা নরুন পেড়ে ধুতি পায় নি, ওর ত' একটু রাগ থাকবেই, তা ছাড়া মনে করুন, পর......

আরো কতক্ষণ সোনার দিদি আমাকে নীরব শ্রোতা পেয়ে এরকম বলে যেত আমি জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আরেক-জন, দুঃখের মত মুখ, মহিলাই ঢুকলো, ভেতরে। সঙ্গে তারও ছেলে দুটি।

কই রে, কামিনী, সোনা এখনো এলো নি? ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে, হঠাৎ দু'পা পিছিয়ে জিভ কেটে মাথায় এতখানি ঘোমটা ঝুলিয়ে দিলে।

তা' দেখে সোনার দিদি কামিনী খিল খিল করে হেসে বললে, ওনাকে দেখে ঘোম্‌টা টানছো পিসী? উনি সোনার বন্ধু।

পিসী বলল, তা হোক বাপু। বলে একটা চট পেতে দুটি ছেলেকে দু' দিকে বসিয়ে নিজে মাঝখানে বসলো।

কি রকম ধারা গেরামের ব্যাভার বল ত' পিসী?

তা' সত্যিই। এখানে ত' ধনীর অভাব নেই। একবারটি কেউ সামনে এলো নি। আমি সোনাকে বলনু, হাঁ রা, কি করবি? যা' ঘোষেদের ঠেঁয়ে। ঘাটখরচার ট্যাকাটা চা গিয়ে। সোনা বললে, দূর দূর, পিশাচ, ওরা পিশাচ। ওরা দেবে ট্যাকা? পেলে আরো শুষে নের। টাকা আমি জোগাড় করেছি। কিষক সমিতিকে গিয়ে
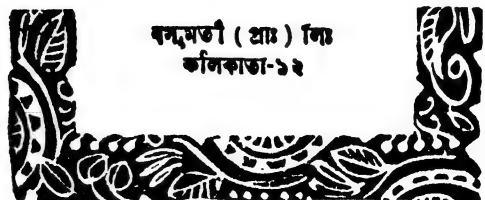
বন্ধু। ওরা এর-তার কাছ থেকে টাকা তুলে দিয়েছে। যারা মড়া বইবে তারা এখন আবার সময় বুঝে বোতল চাইছে। মরে যাই লজ্জায় সে কথা শুনে। তা' কি হবে বল। সোনার দিদি বললে, যে কাজের যে ধারা। এই সময় কাঁধ-ঘেটোদের মদ দেওয়া রীতি। বাপ-ঠাকুর্দার কাল থেকে চলে আসছে। ওদের দোষ কি। কিন্তু সোনা ওদের মদের কথা শুনে জ্বলে গেল। বললে, এই তোমরা কিষক সমিতি করেচো? দেকচো ঘাট-খরচা তুলতে আমার প্রাণান্ত আর তোমরা মদ চাইছো? ওসব হবে-টবে না। সব দু'খানা করে গরম সিংগাড়া আর চা পাবে আর এক-খিলি করে পান। বুঝলে? বলে সোনার দিদি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

তারপরেই গম্ভীর হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে, রাত অনেক হল, সোনা ত' এখনো এলো নি। ওমা, দেকুন কান্ড। আপনাকে ত' চা-ই দেওয়া হয় নি।

মোটা শরীর নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠোনের উনুনে বসানো কেটলি হাতে চলে এলো।

প্লেট নেই। হাতলভাঙা কাপে চা দিলো।

মন কিছু করবেন না। শুদু চাই দিলাম। তারপর, পিসীর দিকে ফিরে, যদিও পিসী চলে যাচ্ছিল না, সে ইচ্ছেই তার ছিলো না, সোনার দিদি বলল, ও পিসী, তুমি চলে যেও না গো। এই নাও। চা টুকুন ধরো দিকি। এই ছেলে, তুই রো একঢোঁক চালিয়ে দে।

আমাকে আবার কেন, না না, ওকে না, ওর চা বারণ, বরং ওটাকে দাও। পিসী নিজেই চাদরের আড়াল থেকে নিজের কাপটি এগিয়ে দিলো। তাকিয়ে দেখলাম। দুঃখের মত মুখ। পরের বাড়িতে চা খেতে এসেছে তার জন্যে লজ্জা। অথচ নিজের কাপটা ঘর থেকে নিয়ে আনতে ভোলে নি। আরও তাকিয়ে দেখলাম সোনার দিদির ছলনাটুকু।

'ও পিসী তুমি চলে যেও না।'

কিন্তু সোনা আসছে না কেন ক্রমশই এই প্রশ্নটা কঠিন হচ্ছিল। রাত বেড়ে গেছে অনেক। ঝিঁঝির শব্দ আরো জোর বেড়েছে। বাইরে নিকষ অন্ধকার। বাঁশঝাড়ে কাক শালিক নড়ছে। দূরে থেকে ভেসে আসছে একটানা সেই শব্দটা, ভট্ ভট্ ভট্ ভট্, পাম্পের শব্দ, এতো রাতে মাঠে কে কাজ করছে কে জানে! কিন্তু সোনা আসছে না কেন?

সোনার দিদি বলল, অনেকক্ষণ হয়ে গেল, বোধ হয় রাত ন'টা হবে। বেইরেছে বেলাবেলি। তা তিন-চার ঘন্টা হয়ে গেল। কি কান্ড বলুন ত'।

আমি যাই কামিনী। পিসী উঠে পড়লো ছানা দুটোকে নিয়ে। এই ত' পাশেই। দরকার পড়লে একটা হাঁক পাড়িস। বুড়ি শাউড়ীকে আবার তেল মালিশ করতে হবে। আমার হয়েছে জ্বালা।

যাবে? যাও। আহা, তোমরা তবু আসো, গাঁয়ে আপন বলতে এখন দেকচি খালি তোমরাই। নইলে সবাই ত' জানে কামিনী তিনদিন হল গাঁয়ে এয়েচে। কই কেউ ত' এলো নি। ভাবলো, এলেই বোধ হয় ট্যাকা চেয়ে বসবো মা মরেছে বলে, ছিঃ ছিঃ, ধিৎকারে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। তা' যাও, আবার এসো।

বালাই ষাট। আসবো না কেন? থাক বাছা সাবধানে।

বলতে বলতে পিসী চলে গেল।

আর ঠিক সেই সময় সোনা ঢুকলো।

ওমা, এ কিরে, সোনার দিদি, অমন যার কথায় কথায় হাসি, ডুকরে কেঁদে উঠলো, এ কি হয়েছে রে! দেখলাম সোনার সারা মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। চোখ দুটি শুধু খালি। জামায় কাপড়ে রক্ত।

সোনা হাসছে। বলল, আপনাকে আসতে বলেছিনু। দেরি হয়ে গেল। এক জায়গা থেকে কিছু ট্যাকা পাবো। ছেরাদ্দ-শান্তি ত' করতে হবে। ফিরছি। আলের ধারে ঘাপটি মেরে ছেল। মেরে দিলে ডান্ডা।

কে মারলো, কে?

কে আর? জোতদারের লোক। আপনাকে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু তার আর দরকার নেই।

কেন?

ওসব লিখে-টিখে কিছু হবে না। এর ওষুধ আলাদা। লালঘোড়া।

সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি। কেরোসিনও মজুত। আপনি ঘরে বসেই টের পাবেন আকাশ কতটা লাল হল। আমি যাচ্ছি।

আর, অপেক্ষা করলো না সোনা ঘোষ। খাটের ভেতরে ঢুকে গেল ইঁদুরের মত। কোথায় অন্ধকারে মুখ গুঁজড়ে ছিল বল্লমটা। সেটা টেনে বার করলো। তারপর বল্লমের খোঁচাটা হাত দিয়ে পরখ করে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, চলবে।

আর দাঁড়ালো না। দমকা হাওয়ার মত ছুটে বেরিয়ে গেল ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথাটা নিয়ে। এতোক্ষণ থম ধরে বসে-ছিল সোনার দিদি। যেন ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইছিল। হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

কি হবে বলুন ত'? এ কি সর্বনেশে অলক্ষণে কান্ড? এখনো যে মায়ের কাজ বাকি আছে। তাকালাম সোনার দিদির দিকে। ও যেন ঘূর্ণি-ভয়াল তীব্র নদীর সেই তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, যার পাড় ভাঙছে অনবরত। শেষ সর্ব-নাশের কূলে বসে এ কার হাহাকার? একটু আগেও এই ঘরে শোক ছিল। আজ তিনদিন হল সোনা আর সোনার দিদির মা, উঁচু খাটের ওপর বসে থাকা গায়ে চট বিছোনো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দিদিমা মারা গেছে। অদূরে হ্যারিকেনটা জ্বলছে। ফাটা কাঁচের ভেতর তার রক্তাভ আলোটা যেন নিশি পাওয়া। ফাঁক দিয়ে গল গল করে কালো ধোঁয়া উড়ছে। একটু আগেই কথা হচ্ছিল সোনার একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা। দিদি নিজের ইচ্ছের কথা জানাচ্ছিল। সোনাকে সংসারী দেখতে তার বড় সাধ। তার বিয়ে হবে। দামাল দুষ্টু হেঁকো-ডেকো দু' দশটা ছেলে হবে। সোনার বউ তুলসীতলায় এমন করে পিদীম তুলে ধরবে যাতে সোনা আর সোনার দিদির মরা বাপ আর মা আকাশ থেকে তা' দেখতে পায়, আর তারপরেই এই কান্ড।

কি হবে? আমি ত' কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ও ফিরে আসবে ত'?

জানি না। জানি না সত্যিই ফিরে আসবে কিনা। বা ফিরেই এলো হয়তো, যেন না ফিরলেই ভালো হত। অথবা অন্য লোকের খুনখারাপির রঙ মেখে আসবে কিনা, এই মুহূর্তে কোনটাই সঠিক বলা সম্ভব নয়। সোনার দিদিকে আমার জানানোর মত কোন ভাষা নেই। মাটি কাঁদে। মাটি মা। কৃষক তার ছেলে। মায়ের বুক থেকে ছেলেকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ধর্ষিতা মাকে তার ছেলে ফিরিয়ে দিতে হবে। আজকের সময়ের এটাই একমাত্র শপথ। সোনার দিদিকে এ কথা বলবো কি? সোনার দিদি শুনবে?

অতো রাতেও অন্ধকার পথ দিয়ে, শুনতে পেলাম, কারা সব 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে যাচ্ছে, ধকধক করে জ্বলছে তাদের হাতের মশাল, ভূমিকম্প এই ত' সবে শুরু। সোনার দিদিকে কাঁদতে হবে বৈকি। কতো কিছু ঘটতে পারে, কতো কিছু ঘটে। কি এসে যায়।

[ ক্রমশ ]

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ চুয়াল্লিশ ॥

অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে আছি। অন্ধকার ঘর। কিন্তু জানালা খোলা। চোখ মেলে দেখছি এক প্রকার স্লেট-পাথরের মত নিথর কালো আকাশ। সেখানে আলো নেই। এ রজনী অমাবতী। অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ আজ। গাঢ় অন্ধকার হলেও একরকম আলো বনের মাথায় আকাশটাকে আবছা-আবছা করে তুলেছে। অরণ্যের অন্ধকার গাঢ়তম। ওপরের আঁধার যেন অনেকটা ফিকে। অরণ্যকে মনে হচ্ছে মস্ত এক গুহাজীবী প্রাণী যেন। অথবা সারা পৃথিবী-জোড়া এক অন্ধকার নৌকো নোঙর করে আছে।

বনের ভিতরে রাত্রির এই চেহারার অভিজ্ঞতা আমার কাছে আশ্চর্য। যারা চিরকাল আলো দেখেছে, এমন কি রজনী গভীরেও চোখ-ধাঁধানো সভ্যতার আয়োজন, নানা সৌখিন রঙিন আলোর দীপাবলীতে যাদের চোখ অভ্যস্ত—তাদের কাছে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সভ্যতার নিওন আলোর কৃত্রিমচ্ছটা এখানে বিস্ফারিত হাসি হাসে না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত কলকাতায় থাকতে পথে পথে ঘুরেছি। দেখেছি কত উজ্জ্বলতা উচ্ছলতার কলশব্দ। কিন্তু বনের ভিতরে অন্ধকারে এই বন-বনান্ত গাছ-পালা, শাখা-প্রশাখা, লতা-পাতা নিয়ে এক অপরিচিত জগৎ। তিমিরে ডুবে গেছে গাছপালা। কোন গাছপালার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আলাদা করে চিনবার উপায় নেই।

কিন্তু বনের ভিতরে—আশেপাশে যেন বাতাসের ঝড় বইছিল। অফুরন্ত এক হাওয়ার দোলায় চারদিককার সব গাছ-গাছালির পাতাপত্র থরথরিয়ে কাঁপছিল। যেন জলসা বসেছে আজ রাত্রে গভীর বনের ভিতরে একান্তে। সেই সভায় যোগ দেবার সাধ্য নেই শিক্ষিত সভ্য মানুষের। প্রকৃতির জগৎ থেকে নির্বাসিত সে।

জানালায় বসে বসে ব্যাকুল বিস্ময়ে ওই চিত্র দেখতে লাগলাম। মাঝে মাঝেই বনের ভিতর থেকে ছুটে ছুটে এসে দুরন্ত হাওয়া আমার বিছানা মশারি কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। জোনাকি জ্বলছিল-নিভছিল অজস্র। উত্তর বাংলার এই বনগুলির মধ্যে জোনাকির প্রাচুর্য চোখে পড়ে। যেন লক্ষ-লক্ষ তুবড়ি জ্বলেছে। তারই স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাচ্ছে অন্ধকারে। আর সেই জোনাকির আলো অন্ধকারকে আরো গাঢ়তর করে তুলছিল।

একটা জোনাকি উড়ে ঘরের মধ্যে চলে এল। এত উপরেও তার অনায়াস বিচরণ। মনে মনে ভাবলাম ওই জোনাকিটি বুঝি ভুল করে তার সঙ্গী-দের থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এখন আলোর চঞ্চল বিন্দু জ্বালিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আমি বাংলোর খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে বসে আছি। বনের ভিতরে কেমন একরকমের গন্ধ। সেই গন্ধ সম্পূর্ণ নতুন। নানা পত্র-পুষ্প নানা লতাপাতার মিশ্রিত গন্ধ যে ওটা। তাকে আলাদাভাবে ধরা সম্ভব নয়।

আমার হঠাৎ লাটুবাবুর কথা মনে এল। শিলিগুড়ির লাটুবাবু। বন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ওঁর। ঘুরেছেন সারাজীবন নানা অরণ্য অঞ্চলে। ভারত-বর্ষের বাইরেও ছিলেন এককালে। বর্মা থেকে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে আসেন যুদ্ধের কালে। জাপানীদের আক্রমণের কালে। সেই লাটুবাবুর কথা মনে হচ্ছে। অরণ্যেরই মানুষ একজন। বর্মার বনাঞ্চল সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য বই রিটায়ার্ড কনসারভেটার জেনারেল অব ফরেস্ট জেমস্-ই-পীকক্-এর বইখানার লাইনের পর লাইন উনি মুখস্থ বলতে পারেন অনায়াসে। বন-জঙ্গলের অনেক কিছুই ওঁর নখদর্পণে। নানা অঞ্চলের নানা ফরেস্টের খুঁটিনাটি তাঁর ডায়েরীতে।

জানেন পর্ণমোচী বৃক্ষ কাদের বলা হয়? পুরু পাথরের লেন্সে জ্বলজ্বলে চোখ, নাকে দুর্জয় লোমওয়ালা ভদ্র-লোকটি হয় তো চারমিনারের ছাই জোরে বাতাসে ঝরিয়ে ফেলে জানতে চাইলেন।

পর্ণমোচী? আমার হয়তো তখন আকাশ-পাতাল খোঁজার পালা।

দেয়ার য়্যু আর্ ভুগোলে খুব ভালো ছিলেন দেখছি। খালি ক্লাশ পালিয়েছেন মশাই। জোরে হেসে উঠে তিনি নিজেই আমাকে সংশোধন করে দিলেন, আমাদের দেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে গ্রীষ্ম-কালের উষ্ণতা ও বৃষ্টি পেয়ে পেয়ে যে-সব গাছগুলি খুবই তাড়াতাড়ি বড়ো হয় শীতকালে তাদের পাতা ঝরে পড়ে বলে এ-জাতীয় বৃক্ষকে বলা হয় পর্ণমোচী বৃক্ষ।

একটু থেমেই আবার বলা সুরু হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলের জল-বায়ু হচ্ছে উষ্ণ ও আর্দ্র।

তাই কি?

ইয়েস, অবকোর্স। আর জানেন কী. সেই উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে গাছপালা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়। ডালপালাগুলি খুবই ছড়ায়, আর পাতাও হয় চওড়া। এদের পাতা কিন্তু সব একসাথে ঝরে পড়ে না।

কথার মধ্যিখানেই বলি, ইজ ইট? আর কীই বা বলব!

প্রায় সবসময়ই এদের কিছু না কিছু পাতা ঝরছেই। জন্মও হচ্ছে নতুন পাতার। এদেরই বলা হয়েছে চিরহরিৎ মানে চিরসবুজ বৃক্ষ! মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ কি কি হয় বলুন তো?

আপনিই বলুন।

বাবলাগাছ চেনেন? বাবলা, খেজুর, ফণিমনসা আর পান্থপাদপ নামের এক-শ্রেণীর কাঁটাগাছ। কী সুন্দর নামটা এই পান্থপাদপ, না?

বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বীকৃতি।

সংস্কৃত শব্দ এই পান্থপাদপ। শব্দের মত সুন্দর অর্থটাও দেখুন। পান্থ মানে তো পথিক জানেনই। পাদপ মানে, পা অর্থাৎ শিকড় দিয়ে যা পান করে। কি অর্থ দাঁড়াল? অর্থাৎ কি না গাছ। ডিকশ্যনারী খুলুন—দেখতে পাবেন লেখা রয়েছে ম্যাডাগাস্কাব দ্বীপের বৃক্ষবিশেষ। এর দেহে আঘাত করলেই নির্মল জল বার হয়। শুধু ম্যাডা-গাস্কার না মশাই—।

কথাপ্রসঙ্গে নানা খবর দেন তিনি অক্লেশে। এক কথায় অরণ্য সম্পর্কে তিনি একজন "মোভিং এনসাইক্লো-

পিডিয়া।" তাঁর কাছেই প্রথম জেনেছি পাইন, ফার, লার্চ, দেবদারুজাতীয় বৃক্ষ কোথায় জন্মে বেশি। কোন ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু তার কারণ। তিনিই বলেছিলেন, একদিন এশিয়ার উত্তর অংশের কোন প্রকাণ্ড বনকে বলা হতো "তৈগা।" সেখানকার বনের কাঠে তৈরি হয় নানারকম আসবাবপত্র। গাছের কোমল অংশ দিয়ে তৈরি হয় কাগজের মণ্ড ও সেলুলয়েডের জিনিস-পত্র। এই সব গাছের রস থেকেই পাওয়া যায় ধুনো, রজন, আলকাতরা জাতীয় অনেক জিনিস। এশিয়ার উত্তর সীমায় তুন্দ্রা অঞ্চলের যে অংশে দু'-তিন মাস বরফ গলে যায়, সেখানে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই জন্মায় উইলো, রুকরোজ প্রভৃতি গুল্ম, আর কিছু শৈবাল। তাঁর কাছ থেকেই একদিন নোট করে নিয়েছিলাম, হিমালয়ের পাদদেশে আছে মৌসুমী অঞ্চলের চিরহরিৎ বন। তিন হাজার থেকে সাত হাজার ফুটের উচ্চতায় জন্মায় পর্ণ-মোচী বৃক্ষের অরণ্য। তার উপরে বারো হাজার ফুট পর্যন্ত আছে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন। তারপর আরো উপরে গেলে ষোল হাজার ফুটের উচ্চ অংশে জন্মে সামান্য গুল্ম ও তৃণ। তারও উপরে গেলে শুধু বরফপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নেই।

শুধু এই থেকে নয়, নিজের জীবন থেকেও অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলে-ছিলেন লাটুবাবু। কবে কোথায় কোন্ বনে গিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশে, দক্ষিণ ভারতে, ছোটনাগপুরের অরণ্যে। আসামের উত্তরাঞ্চলেও পরিভ্রমণ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ডুয়ার্সের ফরেস্টও কি ঘুরেছেন?

লাটুবাবু বলেছিলেন, সে কী এক-বার? বহুবার ঘুরেছি।

তারপর তিনি বলেছিলেন, ডুয়ার্সে কতগুলি ফরেস্ট আছে বলতে পারেন?

বলেছিলাম, আপনিই বলুন। আমি শুনি।

ডুয়ার্স বলতে কোন্ জায়গাটা বুঝি আগে তার একটা হিসেব করা যাক। ইংরাজ অধিকারের আগে পর্যন্ত অবশ্য এখানকার নাম ডুয়ার্স ছিল না তা বলাই বাহুল্য। ডুয়ার্স বলতে বুঝি জলপাই-গুড়ির সদর মহকুমার অন্তর্গত ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, ধুপগুড়ি, মাল ও মেটেলি। এবং আলিপুরদুয়ার মহকুমার মাদারিহাট, ফালাকাটা, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রামদুয়ার।

এই পর্যন্ত বলে একটু থেমেছিলেন লাটুবাবু। তারপর আবার নতুন করে একটি সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে ঘন ঘন টান মারতে লাগলেন। মনে মনে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম ও'র

তারপর তিনি বলতে শুরু করে-ছিলেন।—ময়নাগুড়িতে আছে রামশাহি ফরেস্ট। মানুষজন নেই বললেই চলে। সরকারী একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই ফরেস্টের এলাকা হচ্ছে দু' হাজার চারশ' বিরানব্বই একর। আপার তণ্ডু ফরেস্ট উনত্রিশ হাজার ন'শ' উনপঞ্চাশ একর জমি নিয়ে। লোকবসতি এক হাজারের মত। লোয়ার তণ্ডু ফরেস্টে ন'হাজার ছ'শ' একর জমি। নাগরাকাটায় ডায়না ফরেস্ট পনেরো হাজার তিনশ' তিয়াত্তর একর জমি। রামশাহি ফরেস্টের খানিক অংশ পড়েছে ধুপগুড়িতে। এক হাজার দু'শ' একর। মোরাঘাট ফরেস্ট এগারো হাজার তিনশ' সাতষট্টি একর। ধুপগুড়ি এলাকার অধীনে গোসাইরহাট ফরেস্ট আঠারোশ' ছিয়াত্তর একর। মালে মালহাটি ফরেস্ট মাত্র তিনশ' কুড়ি একর নিয়ে একেবারেই জনবসতিহীন এলাকা। আপালচাঁদ ফরেস্টের মাত্র চারশ' পঞ্চান্ন একর জমি। চ্যাংমারি ফরেস্টের জমি ন'শ' আঠারো একর। এ ছাড়াও পশ্চিম এবং পূর্ব টোটগাঁও যথাক্রমে ন'শ' আঠারো ও এগারোশ' তেষট্টি একর জনবসতিহীন এলাকা। মেটেলিতে আছে লোয়ার তণ্ডু ফরেস্টের ন'হাজার চারশ' একুশ একর জমি। মাদারিহাটের তিতি ফরেস্ট সাত হাজার সাতশ' পনেরো একর জনবসতি-হীন। এই অঞ্চলের হলাপাড়া ফরেস্ট, খয়েরবাড়ি ফরেস্ট, ডুমচি ফরেস্ট এগুলিতে যথাক্রমে তিন হাজার তিনশ' চুয়ান্ন একর, চার হাজার পাঁচশ' বারো একর ও দু' হাজার ন'শ' চৌষট্টি একর জমি আছে। এগুলি অবশ্য পুরোপুরিভাবে জন-বসতিহীন নয়। ফালাকাটা অঞ্চলে দল-গাঁও ফরেস্ট এক হাজার একশ' একাত্তর একর জমি নিয়ে। কালচিনি এলাকায় উত্তরবড়ঝাড়, গাবুরবাস্রা, নীলপাড়া, ভুতুরি, বক্সা হিল ফরেস্ট, পানবাড়ি ফরেস্ট, রাজাভাতখাওয়া প্রভৃতি ফরেস্ট আছে। প্রথমটিতে একুশ হাজার ছ'শ' একান্ন একর জমি, দ্বিতীয়টিতে আছে এগারো হাজার ছ'চল্লিশ একরের মত জমি, তৃতীয়টিতে তিনশ' চুরানব্বই একর, চতুর্থটিতে তিন হাজার সাতশ' পঁচিশ একর, পঞ্চমটিতে আছে পঁচিশ হাজার সাতশ' বিরানব্বই একর। পানবাড়ি ফরেস্ট বক্সা অরণ্যেরই এক্সটেনশন, ত্রিশ হাজার দুই শ' দুই একর। রাজাভাত-খাওয়া ফরেস্টও তাই। সর্বসমেত উনষাট হাজার একশ' উনপঞ্চাশ একর জমি নিয়ে। আলিপুর অঞ্চলে দক্ষিণ বড়ঝাড় ফরেস্টের এলাকা চব্বিশ হাজার চারশ' আটচল্লিশ একর নিয়ে। টুর্সা ফরেস্টে ছ' হাজার আটশ' উনত্রিশ একর, শালকুমার ফরেস্টে বারোশ' তেতাল্লিশ একর। কুমারগ্রাম-দুয়ার অঞ্চলে রায়ডাক ফরেস্ট পঁচিশ

হাজার সাতাশ একর এলাকা, ধুমপাড়া ফরেস্টে সাত হাজার চারশ সাঁইত্রিশ একর এলাকা, ভাল্কা ফরেস্টে ন' হাজার দু'শ ষোলো একর এলাকা।

অন্ধকার রাত্রে ডাকবাংলোয় একাকী জেগে থাকি।

মনে মনে ভাবি লাটুবাবুর কথা। এগুলি সবই সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চল। অতীতের সরকারী নথীপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে দেখেছি আমি নিজেও। সব চাইতে প্রথমে সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চলরূপে ঘোষিত হয়েছিল আপালচাঁদ ফরেস্ট। ক্যালকাটা গেজেটের বিজ্ঞপ্তি ঘোষিত হয়েছিল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর। সেই প্রাথমিক সূচনা। ইংরাজ শাসকদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এ-ব্যাপারে। এই বনাঞ্চলগুলি গড়ে তুলতে তাঁদের কম শ্রম ও সময় ব্যয় হয় নি। ১৮৮৯—৯৫ খৃষ্টাব্দকালে Survey and Settlement of the Western Duars সংক্রান্ত রেকর্ডে দেখছি এই বনাঞ্চল-গুলি ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন চিন্তার সুস্পষ্ট প্রকাশ—"..if the rates for timber and other forest produce were reduced, and if more facility was afforded to the public for obtaining timber without trouble and delay, managers of tea gardens and others would not be compelled, as they are at present, to supply their requirements of wood for tea boxes by procuring it from Japan and Burma, or of fuel, by burning Ranigunge Coal."

এই সব অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্যে যে সব পরামর্শ রাখা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি দেখতে পাচ্ছি, বনের ভিতরে মোষের গাড়ি যাবার উপযুক্ত রাস্তা বানানোর কথা হয়েছিল। "Opening of good cart roads leading into every forest." ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ পালটে গেছে যুগ। বনের ভিতরে আর গরু বা মোষের গাড়ির রাস্তা না, সোজাসুজি চলে যাচ্ছে পীচ-বাঁধানো রাস্তায় ভারী-ভারী ট্রাকগুলি। একেবারে বনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। গাড়ি বোঝাই হচ্ছে কাঠখণ্ডে। যতক্ষণ না বোঝাই হচ্ছে, চোঙাপ্যান্ট পরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে অথবা একটা গাছে ঠেস দিয়ে ঘন ঘন সিগারেট টেনে যাচ্ছে ড্রাইভার। ড্রাইভারের হাতে হাতঘড়ি। হাতে উল্কিতে নাম লেখা। গায়ে সিল্কের ডোরাকাটা রেশমী গেঞ্জী।

বোঝাই হয়ে মাইলের পর মাইল দ্রুতবেগে অতিবাহন। ডুয়ার্সের রাস্তায় রাস্তায় এ-দৃশ্য প্রতিদিন দেখতে পাওয়া যাবে। বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড চাপিয়ে শাঁ-শাঁ বেগে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি।

এ-জিনিস কোনদিন কল্পনাও করা যেত না।

বসে বসে বনের দৃশ্য দেখছিলাম। বাংলো তো নয়, যেন বসে আছি ভাসমান জাহাজের ডেকচেয়ারে। আজ রাত্রে এই বনের ভিতরে আমি অতিথি। যার তিথিজ্ঞান নেই, সেই তো অতিথি। আমিও তাই এসেছি। তিথি-নক্ষত্র সময়-লগ্ন বিবেচনা না করেই এখানে আমার উপস্থিতি।

এই ডুয়ার্সেই কতদিন এসেছি। কতদিন আছি এখানে। দরকারে-অদরকারে শত শত বার গেছি এর ভিতর দিয়ে। বিস্ময়ভরা উদ্‌গ্রীব দুই চোখ দিয়ে দেখেছি বনের সারল্যকে। তার প্রকৃতিকে। তার অফুরন্ত বিস্তার। এমন করে ভিতরে ঢুকে দেখতে পাব কে ভেবেছিল। এই মুহূর্তে বনের ভিতরে কত কি ঘটছে। কত জীবজন্তু তাড়া করছে শিকার-সন্ধানে, কত প্রাণী জীবিকা-সন্ধানে অন্যের প্রাণ সংহার করছে তা কি কেউ ভাবতে পারে। আদিম অরণ্য যে আদিম জীবনেরও লীলাভূমি। মুহূর্তে মুহূর্তে তার ভিতরে কত কী অংক অভিনীত হয়ে চলেছে কে তা বলতে পারে।

আমি বসে বসে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে এক সময় হাওয়া জুড়িয়ে এল। তখনো বসে আছি বিছানায়। তেমনি জানালা খোলা। কত কী নাম-না-জানা পাখি ডাকছে। কতই না বিচিত্র তাদের কাকলী। আর সেই সঙ্গে অফুরন্ত ঝিঁঝি ভরা নীরবতা, মাঝে মাঝে বন্য পশুর হিংস্র আওয়াজ কানে আসছিল। চমকে উঠছিলাম। কিন্তু চোখের সামনে কিছুই দেখছিলাম না। কিন্তু আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় নয়ন-মন সচেতন হয়ে উঠছিল। পাশের ঘরে ভক্তবাহাদুর অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। খুব অনেকটা কান পাতলে হয়তো তার বিলম্বিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। আহা ঘুমোক বেচারী। অসুস্থ। আজ বিকেল থেকে তার উপরে রাত্রি পর্যন্ত ওর কিছু পরিশ্রম গেছে। আমি যতবার ওকে সে-কথা বলেছি, ততবার বিনীতভাবে সে আমার কথার উত্তরে মাথা নেড়েছে। বলেছে, নেহি, নেহি জী।

হয়তো এ-কোন পরিশ্রমই নয়। ওদের চাকরিতে হয়তো আরো পরিশ্রম করতে হয়। কন্ট্রাকিস্ট জীবন। বিস্তর পরি-শ্রম করতে হয়। বাহাদুর বলেছিল, রাত্রে আমরা নিদ যাই না, সাব।

বল কী! জেগে থাক?

জেগে থাকতে হয়। পাহারা দিতে হয়, সাব।

আর, দিনে কি কর?

রাত্রে পাহারা দিতে গেলে দিনে ঘুম হয়, সাব।

দিনে কি ঘুমাও?

না, প্রায় রোজই ঘুম হয় না। মাঝে মধ্যে ঘুমাই।

এতে শরীর খারাপ হয় না?

বাহাদুর আমার এ-কথার জবাব দেয় নি। হয়তো প্রয়োজন মনে করে নি। শরীর খারাপ নিয়ে তাদের ভাবনা থাকার কথা নয়। তবে কথায় কথায় জেনেছিলাম আজ তার ছুটি ছিল। ছুটি নিয়েছিল অসুস্থতার জন্যে। পরশু রাত থেকে জ্বর এসেছে বলে সাহেবের কাছে গিয়েছিল ছুটি নিতে। ছুটি নিয়েও ছিল। মাঝের থেকে আমি এসে পড়তে আমাকে নিয়ে খানিকটা পরিশ্রম গেল।

এখানে কি তুমি একাই থাক?

না, আরো ক'জন আছে। তবে তাদের আলাদা-আলাদা জায়গা আছে। সেখানে পাহারা দিতে হয়।

বলেছিলাম, এত পাহারার ব্যবস্থা কেন, বাহাদুর? বনে কি এমন আছে যার জন্যে অত পাহারা দিতে হয়?

বাহাদুর বলেছিল, সে সবই সরকারের মর্জি। সরকারের নোকরি করে বলেই তার কথা মানতে হয়। নইলে বেইমানি করা হয়।—তবে হাঁ, এখানে ভি পাহারা লাগে। বহুৎ কিসিমের চোট্টা আদমি আছে সাব। বনের ভিতরে কেউ আসে সরকারী কাঠ কেটে নিয়ে পালিয়ে যেতে।

বল কী! শুনে আমার চোখ কপালে উঠেছিল।

জী, সাব।

কি করে নেয়?

বাহাদুর বলেছিল, এত বড় ফরেস্ট আছে সাব। গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে কাঠ কেটে নিয়ে গেলে বনের মধ্যে কার মালুম হবে, সা'ব? অমন কত হয়।

কিছুক্ষণ আমার মুখে কথা ফোটে নি।

তাছাড়া, বাহাদুর বলেছিল, বহুৎ আদ্‌মি চুরি করে হরিণ শিকার ভি করতে আসে সা'ব্।

সরকারী কানুনে হরিণ শিকার মানা?

জী, সা'ব্।

বনের দিকে তাকিয়ে এইসব ভাবছিলাম। একটা কথা আছে, মানুষ এবং সভ্যতা সৃষ্টি করেছে শহর, ভগবান বানিয়েছেন গ্রাম। অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি ভগবানের হাতে। সেই প্রকৃতিকে [illegible] প্রয়োজনে। সভ্যতা বিস্তারের আয়োজনে ও প্রয়োজনে। তার উপকরণের তাগিদে। মাটির তলা খুঁড়ে তাল তাল সোনা আনছে উপরে। নানা মূল্যোবান ধাতু ও তৈল। তেমনি বনকে ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়েছে মানুষ। নির্মম হস্তে ছেদন করছে কুঠারে। গজ ফিতে দিয়ে মাপছে। মার্কা পড়ছে গাছের গায়ে। বিনিময়ে আসছে টাকা।

বনের ভিতরে শুধু কাটাই হচ্ছে না গাছ, নতুন আবাদও হচ্ছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলিতে সরকারের এক লাভের ব্যবসা এগুলি। নির্দিষ্ট দিনে ডাকা হচ্ছে গাছ। চলে আসছেন পেটমোটা মাড়োয়ারী ও বেঁটে ভুটিয়া। ফর্সা হলুদ গাত্রবর্ণ মেচিয়া সুলেমান সিংও আছেন তাদের সঙ্গে। মজফ্‌ফরপুর বা দ্বারভাঙ্গার মাহাতো কিংবা সুদূর পাঞ্জাবের ভগবাম সিং, এমন কি রাজবংশী বাঙালী সম্প্রদায়ের জনৈক বর্মণও তাতে বাদ যায় না। কোমরের খুতিতে একরাশ টাকা বেঁধে বিকানীরের আগরওয়ালাও আসেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা চকচক করছে। ব্যবসা মানেই যে তাঁর কাছে পবিত্রতা, তাই চন্দনের ফোঁটায় অন্তরাত্মার শুভ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে।

তারপর একদিন নির্দিষ্ট সময়মত আসে ট্রাক। গলায় রঙিন রুমাল বাঁধা হাতে উল্কিওয়ালা ড্রাইভার বসে থাকে স্টিয়ারিং হাতে। অথবা বনের মধ্যে একটা সদ্য পাতিত কাষ্ঠখণ্ডের উপরে বসে টানে চারমিনারের ধোঁয়া। ট্রাক বোঝাই হয়ে তারপর গাড়ি চলে যায়। গোঁ গোঁ আওয়াজ ছড়ায় কাঠ-বোঝাই গাড়িটা। যেন বা আর্তনাদ করছে।

গালে হাত দিয়ে গদির উপরে বসে আছে দ্যাখ গিয়ে ডুয়ার্সের কোন কালুরামজী। ছ' মিলের মালিক। মস্ত ছ' মিল। একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ডকে চেরাই করা হচ্ছে উপরে। না, কোন মেঘ নয়। বর্ষণক্লান্ত সজল হাওয়ায় ঝরিয়ে দিচ্ছে না রাশি রাশি কোন কদম্বরেণু। পরিবর্তে তার ঝরে পড়ছে চেরাই কাঠের অজস্র গুঁড়ো। মনে মনে টাকার হিসেব কষছেন কালুরামজী। বর্ষা এসে পড়তে এখনো বেশ বাকি। সবে বসন্তের হাওয়া দিয়েছে বনে বনে। কিন্তু বসন্তের গন্ধে ভরে না তনু-মন। তার দৃষ্টি সজাগ। কণ্ট্রাক্টের মিস্তিরিগুলিকে বিশ্বাস নেই। একটু আনমনা হয়েছে তো কাজে ফাঁকি দেবে।

ভাবছি। বসে থাকতে-থাকতে রাত ফিকে হচ্ছে। অন্ধকার গাছপালার রঙ আবছা হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে। ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কত কী পাখি ডাকছে আরো। অরণ্যের রাত ভোর হতে বিলম্ব নেই। [ক্রমশ]

সীসাকলের কারখানার ঘণ্টা বাজলো—ঢং ঢং ঢং—। শব্দটা সকলকে মনে করিয়ে দিল—ঘড়িতে এখন সকাল আটটা। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট লোহার দরজাটা খুলে গেল। দলে দলে এসে হাজিরাখাতায় সই করে কাজে যোগ দিল কর্মীরা। তাদের মধ্যে বাবুও আছেন কিছু, বাকী সব শ্রমিক।

সেই শ্রমিকদের একজন ক্ষুদিলাল। অসাধারণ পরিশ্রম করবার মতো এক-সময় তার অটুট স্বাস্থ্য ছিল। ইদানীং সেই স্বাস্থ্যের অবশিষ্টমাত্রও নেই। তবু কাজ তার চিরকালের নেশা, কাজে ডুবে থেকে শরীরের কথা তার মনেই আসে না।

একসময় তার সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে সহকর্মী বিনোদ আর ইয়াকুব বলে: 'মরা হাতী লাখ টাকা। কাজ দেখালি বটে তুই ক্ষুদিলাল!'

উত্তরে ক্ষুদিলাল বললো: 'কাজে এসে কাজ না দেখালে চলবে কেন ভাই? হাত গুটিয়ে বসে থাকলে মনিবই কি পয়সা দেবে? তা ছাড়া কাজেরও তো একটা ইজ্জত আছে! কাজ না করে ফাঁকি দিলে আসল লোকসানটা কার, দেশেরই তো!'

বিনোদ বললো: 'ওঃ—একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। আরে, পেটে খেলে তবে তো পিঠে সইবে! তুই, আমি, ইয়াকুব—আমাদের নিয়েই তো দেশ। তার আগে মালিকের মুনাফার কথাটা একবার ভাব।'

ইয়াকুব আরও খানিকটা যোগ করে বললো: 'তোর, আমার, সবার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ—সেই ভোর থেকে সন্ধ্যে অবধি খেটে আমরা কি পেট পুরে দুটো খেতে পাচ্ছি?'

ক্ষুদিলাল বললো: 'না, পাচ্ছি না। মেহনতের পয়সায় এ বাজারে আর কুলোয় না। কিন্তু সীসাকলের কাজ ছেড়ে দিলেই কি মেহনত কমবে—না কম মেহনতে পেট ভরবে? ঐ তো নুরুল আর সেকেন্দার ছাতার বাঁটের স্বাধীন কাজ ধরলো; তাদেরই কি চলে? তবু এখানে মালিকের কাছে আর্জি-পেশের সুযোগ আছে, বোনাস আছে—'

বাধা দিয়ে ইয়াকুব বললো: 'বলে যা, মুখের তো কোনো ট্যাক্সো নেই, বল, আর কি কি আছে বল? তুই তো আবার শান্তিবাদী, অহিংসার পথ ছাড়া চলিস না। মালিক দেখছি দত্তবাবুর যায়গায় তোকেই এবারে সুপারভাইজার করে দেবে।'

শুনে সকৌতুকে এবারে অদ্ভুত এক খল্‌খল্‌ শব্দে হেসে বিনোদ বললো: 'সংগ্রাম আমাদের চাই, সংগ্রাম আমরা করবোই। আমাদের দাবীর মধ্যে দত্ত-বাবুর অপমানও তবে অবশ্যই যুক্ত থাকবে।'

ইয়াকুব বললো: 'কি বলিস ক্ষুদি-লাল, থাকবে তো?'

উত্তরে ক্ষুদিলাল কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলো না, সেই মুহূর্তে গেটের বাইরে অসংখ্য মানুষের একটা বিরাট মিছিল যাবার শব্দ পাওয়া গেল। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো আকাশ। তারপর আওয়াজটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে কারখানার ভিতরটা কেমন এক অদ্ভুত স্তব্ধতায় থম্‌ থম্‌ করতে লাগলো।

খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিল ক্ষুদিলাল। এবারে তাকিয়ে দেখলো—বিনোদ আর ইয়াকুব ইতিমধ্যে তার সামনে থেকে সরে পড়েছে। হয়তো বাইরের ধ্বনিতে প্রাণ পেয়ে সেদিকেই এগিয়ে গেছে।

আবার নিজের কাজেই মন দিতে যাচ্ছিল ক্ষুদিলাল। ইতিমধ্যে সুপারভাইজার দত্তবাবু তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাঝখানে দুদিন কাজে আসতে দেরী হওয়ায় তাঁর কাছে কটূক্তি শুনতে হয়েছে ক্ষুদিলালকে। ভেবেছিল—আজ সে সবার আগে এসে হাজিরা দেবে, কিন্তু পারে নি। আজ সাতদিনের উপর ঘরে মেয়েটা প্রবল জ্বরে ভুগছে। ফুলি তার বড় আদরের মেয়ে, ক্ষুদিলালকে আসতে দিতে চায় নি কাজে। কিন্তু না এসেই বা উপায় কি? এখানে এলে দু'-চারজনের কাছে তবু দু'-চার টাকা ধার মেলে। নইলে ফুলির ওষুধ-পথ্যও যে বন্ধ!

দত্তবাবু বললেন : 'কি, ব্যাপার কি তোমার ক্ষুদিলাল? হাজিরা দিতে তো দিব্যি গাফিলতি করতে শুরু করেছ দেখছি।'

নিচু গলায় ক্ষুদিলাল শুধু বললো : 'কদিন মেয়েটার খুব জ্বর যাচ্ছে বাবু।'

সঙ্গে সঙ্গে অমনি খিঁচিয়ে উঠলেন দত্তবাবু : 'তবে আর কি, ছুটি নিয়ে ঘরে বসে মেয়ের মাথায় জলপট্টি দাও গিয়ে। ছেলে-মেয়ের জ্বরের জন্যে অফিস-কারখানার কাজ তো আর আটকে থাকতে পারে না!' বলে সঙ্গে সঙ্গে কোথায় একদিকে উধাও হয়ে গেলেন তিনি।

চিরকালের কাঠখোট্টা মানুষ দত্তবাবু। আগে ছিলেন পার্চেজার, এখন সুপারভাইজার হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে এর আগে দু'-দুবার শ্রমিকেরা ক্ষেপে উঠেছে, কিন্তু মেজাজ তবু নরম হয় নি দত্তবাবুর। সাধে কি তাঁর অপসারণ চায় সবাই? এখানে কারুর কাজই তাঁর মনে ধরে না। এরকম সুপারভাইজারের অধীনে কদিন কাজ করা চলে?—ভাবতে গিয়ে হঠাৎ ফুলির কথাটা বড় বেশী মনে পড়ায় বুকের ভিতরটা যেন কেমনই করে উঠলো ক্ষুদিলালের। মনে মনে ভাগ্যবিধাতার উদ্দেশ্যে একবার বললো : 'শিশুর কণ্ঠ সংসারে যে-পাষাণের বুকে গিয়ে বাজে না, সে বুক তুমি কত শক্ত লোহা দিয়ে গড়ে দিয়েছ ভগবান?' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিয়ে কাজের মধ্যে আবার মনটাকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলো ক্ষুদিলাল।

এমনি করেই সারাদিন কেটে গেল। তারপর একসময় ছুটির ভেঁপু বাজলো।

গেটের সামনেই দেখা হয়ে গেল জগন আর মণ্ডেশ্বরের সঙ্গে—। ক্ষুদিলালকে এতদিন তারা পেয়ার করে এসেছে। অনেকদিনের বন্ধুত্ব। নিজেদের অভাব নিয়েও ক্ষুদিলালকে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু ধার দিয়েছে। বলেছে : 'তোর পথই আমাদের পথ।' অর্থাৎ—শান্তির পথ, অহিংসার পথ। এখানে শ্রমিক ইউনিয়ন যে পথে চলে, যে কথা বলে, তাতে মন আশ্বস্ত হতে চাইলেও ভয়টা কম নয়। কখনও গুরুতর কিছু একটা ঘটলে সংসার নিয়ে সবাইকে যে ভেসে পড়তে হবে!

কিন্তু ভেসে পড়তেই বুঝি চায় তারা! আজ কথা বলতে গিয়ে জগন আর মণ্ডেশ্বর স্পষ্ট বললো : 'তোর মতো ঢিমেতালে চলে কিছু হবে না। ইউনিয়নেই আমরা নাম দিয়েছি। মালিকের কাছ থেকে দাবী আদায়ের ঐ একটাই পথ। পেটে ক্ষিদে নিয়ে কখনও শান্তিবাদী আর অহিংস হয়ে চলা যায় না। অভাব মেটাতে হলে সংগ্রাম চাই। সেই সংগ্রামের ডাকে এবারে তুইও ঝাঁপিয়ে পড়।'

আজও ক্ষুদিলাল হয়তো তাদের কাছে দু'টো টাকা চাইতো। কিন্তু হলো না। তার আগেই ভিড়ের মধ্যে তারা এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল ক্ষুদিলালের সমস্ত চেতনার উপর একটা কঠিন শরাঘাত করে।—একটুকাল স্তব্ধ হয়ে

জগন্ আর মণ্ডেশ্বরও শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে আর রইল না? তবে কি ওরাই ঠিক? ওদের সকলের পথই যখন এক, তখন ক্ষুদিলাল নিজেই কি ভুল করছে?

ভাবতে ভাবতে একসময় ঘরে ফিরে ফুলির শিয়রে এসে বসে পড়লো সে। অলক্ষ্যে তার চোখ ফেটে বুঝি একবার জল এলো! এখনও জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ফুলির। দু'টো টাকা ধার পেলে ফুলির জন্যে কিছু ফল কিনে আনতে পারতো ক্ষুদিলাল।—অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে একসময় গা ধুতে উঠে গেল সে।

রাত্রে তার মুখ থেকে সব শুনে ক্ষুদিলালের বউ মতিয়া বললো : 'সবাই একসঙ্গে যেখানে হাত মিলিয়েছে, সেখানে তুমি যাবে কেন? গেলে সে সংসারের দুঃখ ঘোচে! এদিকে মেয়েটা ভুগে ভুগে মরতে বসেছে, আর তুমি আছো নিজের গোঁ নিয়ে। শান্তি না হাতী, অহিংসা না পোড়াকপাল!'

এবারে প্রায় চিৎকার করে উঠলো ক্ষুদিলাল : 'মতিয়া, বউ, শেষ পর্যন্ত তুইও একথা বলতে পারলি? তোর কাছে আমার জীবনের বিশ্বাসটা কিছু নয়, টাকাটাই সব?'

মতিয়া বললো : 'তা নয় তো কি! খেটে খেটে জীবন দিলে, পেলে কি তার পরিবর্তে? সংসারে যার টাকা নেই, তার আবার বিশ্বাস আর আদর্শ কি?' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল মতিয়া।

ক্ষুদিলাল নির্বাক। মতিয়ার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। জগন, মণ্ডেশ্বর, ইয়াকুব, বিনোদ, মতিয়া—ওরা সব আজ এক হয়ে গেছে। তবে সে নিজেই বা বাকী থাকে কেন? কেন সকলের বিদ্রূপ আর বঞ্চনায় এমনি করে শুধু ক্ষত হচ্ছে সে? কেন?

ভাবতে ভাবতে কখন্ একসময় রাত্রি প্রভাত হলো। তারপর বেলার দিকে তাকিয়ে আবার প্রতিদিনের মতো কারখানার পথ ধরলো ক্ষুদিলাল।

এসে দেখলো—সবাই আজ আগুন হয়ে উঠেছে।

ইয়াকুব এসে চোখের সামনে একখানি কাগজ মেলে ধরে বললো : 'নে, সই কর এখানে ক্ষুদিলাল!'

ক্ষুদিলাল জিজ্ঞেস করলো : 'কিসের সই?'

বিনোদ বললো : 'মালিককে আমরা চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিচ্ছি, হয় আমাদের পুরো দাবী তাঁরা মেনে নেবে, নয় তো আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবো।'

ক্ষুদিলাল একটুকাল কি ভাবলো, তারপর বললো : 'সইটা আপাতত থাক।
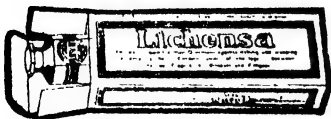
সবার হয়ে এর আগে ম্যানেজারের সামনে কি আমিই গিয়ে দাঁড়াই নি? বলি নি—আমাদের কোয়ার্টার চাই, চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই, বাড়তি মাগ্‌গীভাতা চাই, রেশনে সস্তা চাল-ডাল চাই?'

ইয়াকুব বললো: 'কিন্তু কথা দিয়েছিল কি ম্যানেজার?'

বিনোদ বললো: 'কাল আমাদের সেই কথা আদায়ের দিন; হয় কথা দেবে, নয় তো সব কিছু আমরা অচল করে দেবো।'

শ্রমিকদের এ প্রস্তুতি আজকের নতুন নয়। মালিকের অসহযোগিতায় তিলে তিলে বিক্ষুব্ধ হয়ে তবে তারা এই পথে এগিয়েছে। তাদের দাবীর পক্ষে ক্ষুদিলালও অন্যতম এক নায়ক। অথচ ওরা সকলে যে পথে যেভাবে আন্দোলনে নেমেছে, সে পথে ঠিক ওভাবে বিরোধ করতে সে রাজি নয়। হিংসার পথ কখনও শুভ হয় না।—এই প্রসঙ্গে হঠাৎ বুঝি মতিয়ার কথাটা আর একবার মনে পড়ে গেল ক্ষুদিলালের: 'সংসারে যার টাকা নেই, তার আবার বিশ্বাস আর আদর্শ কি?' নিজের মনেই একবার চিৎকার করে উঠতে চাইল ক্ষুদিলাল: 'অভাবের মধ্যেই তো মানুষের কঠিন সত্যের পরীক্ষা। সত্যে যে বিশ্বাসী, তার আদর্শ কখনও মরে না।'

একটুকাল থেমে ক্ষুদিলাল বললো: 'এভাবে সংগ্রাম করাটা বোধ করি উচিত হবে না ইয়াকুব। লড়াইয়ের এ রাস্তাটা ঠিক কাজের রাস্তা নয়। হিংসায় শুধু হিংসাই বাড়ায়, তাতে শান্তি আসে না।'

কথাটা বিনোদের ভালো লাগলো না, বললো: 'মালিকই কি বাধ্য করে নি আমাদের এ পথে নামতে?'

কিন্তু এ কথার জবাব দেওয়াটা খুব সহজ নয় ক্ষুদিলালের পক্ষে। তার নিজের অভাব এখানে আর কারুর অভাবের চাইতে কম নয়। অভাবের বিরুদ্ধে জীবিকার লড়াইয়ে সেও যে সৈনিক! কিন্তু তার সংগ্রাম হাতিয়ার নিয়ে নয়, তার সংগ্রাম অহিংস সত্যাগ্রহের সংগ্রাম। তার বিশ্বাস—এ সংগ্রামের জয় একদিন হবেই।

কিন্তু ক্ষুদিলালের সে-পথে কেউ গেল না।

পরদিন ছুটির ভেঁপু বাজতেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো গিয়ে মালিক-গোষ্ঠীর ওপর। তারা প্রতিশ্রুতি চায় তাদের দাবী আদায়ের। হয় প্রতিশ্রুতি, নয় সংগ্রাম।

কিন্তু মালিকপক্ষ যে-সব প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হলেন, তাতে শ্রমিকরা রাজী হলো না। ডাক এলো ধর্মঘটের। পরদিন সকাল থেকে সীসাকলের কারখানার দরজা বন্ধ।

শ্রমিকদের পিকেটিংয়ে আর ইন্‌কিলাব-ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো চারদিক। মালিকশ্রেণীও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলেন না। তাঁরা পুলিশে খবর দিয়ে নিজেদের তৈরী রেখেছিলেন।

ম্যানেজারের গাড়ী এসে একসময় গেটে পৌঁছাতেই ঘিরে ধরলো সবাই। হয় গাড়ী নিয়ে ফিরে যান ম্যানেজার, নইলে গাড়ীর চাকা এখানেই অচল হয়ে যাবে। কিন্তু চাকা অচল না হলেও চারদিক থেকে অসংখ্য ইঁট-পাথর এসে গাড়ীর দরজা-জানালা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল। আর সেই মুহূর্তেই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো কয়েকখানি পুলিশ-ভ্যান। টিয়ারগ্যাসে ছেয়ে গেল চারদিক। বোমা ফাটলো দুম্‌দাম্ কিছু, সেই সঙ্গে গর্জে উঠলো পুলিশের রাইফেল। কিছু লোক আছাড় খেলো, কিছু লোক জখম হলো, আর যারা পারলো—হুড়মুড় করে ছুটলো।

শুধু ছুটতে পারলো না একটি প্রাণী। জনতার একপাশে একান্তে অপেক্ষা করছিল সে তার আদর্শ আর কর্তব্যের সংঘাতকে বুকে চেপে। সেই বুকের পাঁজর বিদ্ধ হয়ে সহসা ফিনকি দিয়ে তখন রক্ত ছুটছিল। সে আর কেউ নয়, ক্ষুদিলাল।

হঠাৎ তাকে লক্ষ্যে পড়ে যেতেই ছুটে এসে ক্ষুদিলালকে পুলিশের রাইফেলের রেঞ্জ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলো বিনোদ আর ইয়াকুব। জীবিকার লড়াইয়ের সংগ্রামে আদর্শগত মতবৈষম্যটাই তাদের কাছে বড় নয়, তার চাইতেও বড় হচ্ছে সহকর্মী হিসেবে তারা একই নিয়তির ক্রীড়নক। কিন্তু পারলো না তারা ক্ষুদিলালকে সরিয়ে নিতে। গুলীবিদ্ধ পাঁজরে ততক্ষণে সে মাটিতে একেবারে মিশে গেছে। কাতর-কণ্ঠে শুধু একবার শেষবারের মতো সে উচ্চারণ করলো: 'বিনোদ, ইয়াকুব, ও পথ আমাদের পথ নয়, ও পথে কখনও শান্তি আসে না; আমাদের জীবন থেকে এখনও ও পথ অনেক দূরে।'

কিন্তু আর বলতে পারলো না। হঠাৎ চোখ দুটো তার স্থির হয়ে গেল, থেমে গেল বুকের স্পন্দন।

বিনোদ আর ইয়াকুব একবার চিৎকার করে উঠতে গেল: 'ক্ষুদিলাল, তুই চলে গেলি ক্ষুদিলাল?'

কিন্তু কথা বুঝি তাদের আল-জিভের নিচে হারিয়ে গেল। বেদনাকাতর দৃষ্টি মেলে শুধু বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তারা ক্ষুদিলালের মৃত্যুপাণ্ডুর মুখখানির দিকে॥

গত ২৫শে ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল লিখিত 'মুখোমুখি দুই গান্ধী' প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যেহেতু লেখাটি পাকিস্তান কিভাবে সৃষ্টি হোল সেই তথ্যসমৃদ্ধ এবং যেহেতু তা হয়েও বর্তমান যুবমানসের 'পাকিস্তান কেন সৃষ্টি হোল আর যদি বা তৎকালীন নেতৃবৃন্দের অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতার নিদর্শন হিসাবেই হয়, তবু আজও কেন নতুন নেতৃবৃন্দ, স্বাধীন যুবকবৃন্দ, ভারত পাকিস্তানের সার্বিক একতার চেষ্টায় উজ্জীবিত নয়?—এই ভাবনার এক অসম্পূর্ণ উত্তর, সেইজন্য আমি ব্যক্তিগত-ভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে এমন অনেক কারণ আছে যে, সেই নিয়ে বহু বাক্-বিতণ্ডা হয়েছে। বহু বড় বড় বই লেখা হয়েছে। কারা এর সমর্থনে এবং কে কে এর ভীষণ বিরোধী ছিলেন তার কিছু কিছু তথ্য রাজনৈতিকভাবে সচেতন যুবকের পক্ষে জানা কিছু অসম্ভব নয়। ২৫-৩০ বছরের বর্তমান ভারতের যুবক-বৃন্দ পাখতুন নেতা সীমান্ত গান্ধীর নামই মাত্র শুনেছেন। শুনেছেন তাঁর প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের বলদৃপ্ত কার্যাবলীর বিবরণ। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টি হলো এবং তৎকালীন ভারতের সুযোগ্য নেতৃবৃন্দ তাঁরা পাকিস্তান তৈরি করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তাঁরা সীমান্ত গান্ধীকে ঠেলে দিলেন 'নেকড়ের মুখে'। সীমান্ত গান্ধী শুরু করলেন নেকড়ের থাবা থেকে নিজেদের ছিনিয়ে আনবার অনিবার সংগ্রাম ২০ বছর ধরে। আজও তাঁর সংগ্রাম থামে নি। তিনি পাকিস্তান বলে কোন আলাদা রাষ্ট্র অন্তঃকরণ দিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি দেখলেন—মুসলমানদের জন্য যদি পাকিস্তান হয়, তবে পাখতুনদের জন্যই বা কেন পাখ-তুনিস্তান হবে না? তাই তিনি দাবি করলেন স্বাধীন পাখতুনিস্তানের। তাঁর সেই দাবি আজ স্বীকৃত হয়েও অস্বীকৃত।

কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন বহু-দিন ধরে আমায় উত্যক্ত করেছে যে, ভারত স্বাধীন হোল ঠিকই তবুও যে অসংখ্য ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য অসংকোচে প্রাণবলি দিয়েছেন দেশমাতৃকার চরণে, নির্যাতিত হয়েছেন অনেকে দেশকে বন্ধন-মুক্ত করার জন্য এবং তাঁদেরই কেউ কেউ পরে মন্ত্রী হয়েছেন—তাঁরা কেন দেশ-ভাগকে স্বীকার করে নিলেন? পাকিস্তান তো শুধু জিন্না, মহাত্মা গান্ধী বা নেহরু মেনে নেন নি! আমার মনে হয়, সেইসময় সমগ্র জাতি এমন এক বিহ্বলতায় আত্মমগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, অসহায়ের মতো দেশভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁদের গতি ছিল না। অথচ একথা আজ ঐতিহাসিক মত বলে স্বীকৃত যে, গান্ধীজী স্বয়ং এর বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি—"We may not feel the full effect (of partition) immediatly but I can see clearly that the future of Independence gained at this price is going to be dark. I pray that God may not keep me alive to witness it." বেদনাদায়ক হলেও, তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা যে সে সময়ে কি পরিমাণ খেই হারিয়ে ফেলেছিল, তা বর্তমান ঐতিহাসিকদের বিচার করা উচিত।

আজ সীমান্ত গান্ধী আমাদের মধ্যে এসেছেন। হিংসায় মত্ত, অর্থের লোলুপ-তায় লুব্ধ, গদির লোভে লালায়িত ভারতের নেতাদের দেখে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। তিনি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, গান্ধীজীর ভারত আজ এ কোথায় নেমেছে! স্বাধীন ভারত কোন নীতির বালাই রাখে না। ২৪ বছর আগে আমেরিকা যে জাপানে একটা বোমা ফেলে দেশটাকে পংগু করে দিয়েছিল, আজ সেই জাপান সমগ্র পৃথিবীর মাঝে সম্মানের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর সবগুলো দেশই নিজেদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অনেক উন্নত এক এই অভাগা ভারতবর্ষ ছাড়া।

আজও আমরা দুমুঠো চাল বা গমের জন্য পরদুয়ার-করাঘাত করে চলেছি—আমাদের স্বাধীন হবার ২২ বছর পরেও এক প্রধান বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নই বলে। সারা বিশ্ব আমাদের অবাক বিস্ময়ে দেখছে আর ভাবছে আমাদের কৃতিত্বের কথা। এরই মধ্যে আমরা সাড়ম্বরে গান্ধী শত-বার্ষিকী পালন করছি সীমান্ত গান্ধীকে আমাদের মধ্যে ডেকে এনে। তিনি এসে আমাদের দুঃখে, দৈন্যে, হতাশায় অশ্রু-মোচন করছেন। সত্যিকারের মহামানব তিনি। নিখাদ তাঁর দেশপ্রেম এবং তাঁর বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ অনেক দূরের লোককে কাছে টেনেছে। কিন্তু আজ আমাদের শুধুমাত্র একজন গান্ধীর গলায় মালা পরিয়ে আর একজনকে জয় বাহবা দেবার জন্য ডেকে আনারই কি উপযুক্ত সময়?'

স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও কি আমাদের চোখের ঠুলি খুলবে না? সীমান্ত গান্ধী আজ আমাদের মধ্যে এসে আমাদের সম্বিত ফেরানোর চেষ্টা করছেন, যেটা অন্তত ১৫ বছর আগে করা উচিত ছিল আমাদেরই দেশনেতাদের এবং তাঁদের আবেদন, কর্মপদ্ধতি যদি নিষ্কলুষ হতো, আন্তরিক হতো, আমাদের বিশ্বাস—আজ আমাদের এ চরম দুর্দশা হ'ত না।

নেতারা শুধু স্বাধীনতা নিয়ে আর গদি নিয়েই আত্মতৃপ্ত হলেন। আজও কি কোন নেতা চিন্তা করেন—দেশভাগ আমরাই করেছি আর আমরাই পারি এই বৈষম্য দূর করতে? পাকিস্তান হয়েই কি সব সমস্যার সমাধান হয়েছে? লেখকের "ভৌগোলিক ব্যবধান অতিক্রান্ত হয়ে দৈহিক পুনর্মিলন হবে কিনা সেটা বড় কথা নয়।" এই কথাটার ওপর আমি জোর দিতে চাই, যেটা লেখক সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। আমি বলতে চাই সেই-টেই বড় কথা এবং শেষ কথা। এবং এ ভাবনাকে রূপ দিতে গেলে আমাদের প্রত্যেককে ফিরে যেতে হবে প্রাক্-স্বাধীনতার যুবমানসের চৈতন্যায়। আবার আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের সুপ্ত সৎ চেতনা—দেশপ্রেম। জানি না হয়তো ছোটমুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে—তবুও অন্তর থেকে আমি বলছি যে, মানুষের জৈব প্রবৃত্তিই মানুষের সার্বিক পরিচয় নয় এবং যেদিন আমরা আত্ম-কেন্দ্রিকতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, স্বার্থ-পরতাকে দু'পায়ে দলে, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মাটির ডাকে সাড়া দেব! সেদিন আমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারবো যে আমরা কেউই তুচ্ছ নই। আমরাই সৃষ্টি করতে পারি আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। সীমাহীন আমাদের ক্ষমতা। মনে রাখতে হবে ইতিহাসকে: ইটালিও একদিন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং আবার যুক্ত হয়েছিল। জার্মানীও তাইই হয়েছিল। ইতিহাস বলে, রাজনীতি বড় নয়—মানুষই বড়। এ চেতনা আজ হয়তো অবাস্তব মনে হবে। জানি, এ স্বপ্ন বড় কঠিন আঘাত দেবে, কিন্তু তবুও আমরা কি চাই না আমাদের জন্মভূমিকে অবিচ্ছিন্ন দেখতে? আমরা কি চাই না—ওপারের চাষী, মজুর সাধারণ মানুষকে ভাই বলে ডাকতে, আপন করে পেতে? সংগ্রামী ভারতবর্ষ কি সংগ্রাম ভুলে গেছে? আমরা কি পারি না, আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞায়, অটল অধ্য-বসায়ে, আজ না হলেও শতবর্ষ পরে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ভৌগোলিক ব্যবধান মুছে দিতে?

**শ্রীদীপঙ্কর ভট্টাচার্য**
**রাণীপার্ক, কলকাতা-৫৬**

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

আর্ট অভ্ দি থিয়েটার বইতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ক্রেগ আরও যেসব রঙ্গমঞ্চ এবং প্রযোজনা বিষয়ক আলোচনা করেছেন তা নিচে তুলে দেওয়া হল ঃ

প্লে-গোয়ার—তাহলে বলা যেতে পারে বই আকারে নাটকের ভেতর সম্পূর্ণতা থাকে না?

স্টেজ ডিরেক্টর—ঠিক তাই ; এবং মঞ্চ-প্রয়োগ ব্যতিরেকে সে সম্পূর্ণতা আসে না। শুধুমাত্র পড়ে বা আবৃত্তি শুনে সত্যিকার নাটককে অসম্পূর্ণ এবং আর্টলেস্ বলে মনে হবে। কারণ সার্থক শিল্প হিসাবে প্রতিপন্ন হতে হলে একে মণ্ডিত করতে হবে বর্ণ, রেখা, গতিচ্ছন্দ এবং দৃশ্যসজ্জার পটভূমিকায়। তুমি যখন বল যে আধুনিক মঞ্চে অভিনয় দেখেও তুমি তৃপ্তি পাও, তখন আমার কি মনে হয় জান? শুধু অভিনয় শিল্পেরই বিকৃতি ঘটে নি, সেই সংগে আমাদের দর্শকদের মধ্যেও একদলের রুচিবিকৃতি ঘটেছে। স্টেজ ডিরেক্টরের সংগে অভিনেতার সম্পর্কটা কি রকম জান? কণ্ডাক্টরের সংগে তাঁর অর্কেস্টার যে সম্বন্ধ বা প্রকাশকের সংগে তাঁর মুদ্রকের যে সম্পর্ক অনেকটা সেই রকম।

প্রশ্ন—স্টেজ ডিরেক্টরের আসল কাজটা কি? তার শিল্পপ্রতিভা নির্ভর করে কিসের ওপর?

উত্তর—স্টেজ ডিরেক্টর হচ্ছে নাটকের ভাষ্যকার। নাট্যকারের হাত থেকে নাটকটি নেবার সময় সে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, টেক্সট অনুসারেই সে নাটকটির ভাষ্য দেবে মঞ্চপ্রয়োগের ভেতর দিয়ে। তারপর সে নাটকটি পড়তে সুরু করে—প্রথম পাঠের সময়ই তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে নাটকটির সংগে জড়িত সমস্ত বর্ণ-বৈভব, সুর, গতি এবং ছন্দ, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে।

একটা কথা এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার। নাটকে যে সব স্টেজ ডিরেকসন্স, দৃশ্যবর্ণনা ইত্যাদি দেওয়া থাকে, এ সবকে প্রযোজক সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেন। কারণ মঞ্চের যা কিছু কলাকৌশল তা হচ্ছে তাঁরই আয়ত্তে এবং এ বিষয়ে নাট্যকারের কাছ থেকে তাঁর কিছুই জানবার দরকার হয় না। উদাহরণ হিসাবে হ্যামলেটের প্রথম দৃশ্যটা নেওয়া যাক। এর সুরু হচ্ছে এইভাবে—

Ber—Who's there?
Fam—Nay, answer me ; stand and unfold yourself.
Ber—Long live the king.
Fran—Bernardo?
Ber—He.
Fran—You came most carefully upon your hour.
Ber—'Tis not struck twelve, get thee to bed, Francisco.
Fran—For this relief much thanks, 'tis botter cold. And I am sick at heart

হ্যামলেট—সেকেণ্ড গ্রেভ ডিগার ১৯১৩

Ber—Have you had quiet guard?
Fran—Not a mouse stirring.
Ber—Well, good night.
If you do meet Horatio and Marcellus,
The rivals of my watch, bid them, make haste.

এইটুকুর ভেতর থেকেই স্টেজ ডিরেক্টার যথেষ্ট নির্দেশ পাচ্ছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখন রাত বারটা—খোলা আকাশের তলায় কথা-বার্তা হচ্ছে—এই সময়টায় কোন একটি প্রাসাদের প্রহরী বদল হচ্ছে—এই রাত্রিটিতে খুবই ঠাণ্ডা পড়েছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা এবং ভয়ানক অন্ধকার—

এ ছাড়া আর কোনও স্টেজ ডিরেকসনের প্রয়োজন নেই।

প্লে-গোয়ার—তাহলে পৃথিবীর বিখ্যাত নাটকগুলোতে যে স্টেজ-ডিরেকসন্স দেওয়া থাকে তার সবই কি নিরর্থক?

স্টেজ-ডিরেক্টর—পাঠকের পক্ষে নয়, কিন্তু প্রযোজক এবং অভিনেতার পক্ষে তাই বটে।

প্লে-গোয়ার—কিন্তু শেক্সপীয়ারও তো...

স্টেজ-ডিরেক্টর—শেক্সপীয়ার কদাচিৎ স্টেজ-ম্যানেজারকে এই সব নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নাটকে যে সব ডিরেকসন্স দেখতে পাবে তার প্রথম থেকে শেষ অবধি হচ্ছে এডিটরদের দুর্বল চিন্তাশক্তির অভিনব আবিষ্কার। এই সব সম্পাদক, যেমন—মিঃ ম্যালন, মিঃ ক্যাপেল, থিওবোল্ড প্রভৃতি, প্রমাদবশত এই সব নির্দেশের দ্বারা শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির যে ক্ষতি করেছেন, তার মাশুল দিতে হয় আমাদের মত লোকদের, একমাত্র যারাই মঞ্চ পরিচালনার জন্য দায়ী। শেক্সপীয়ার নিজে ভালভাবেই জানতেন যে, নাট্যকারের পক্ষে স্টেজ-ডিরেকসন দেওয়ার কোন যুক্তি বা সার্থকতা নেই। তিনি এ কথাও বুঝতেন যে ও কাজ হচ্ছে মঞ্চকুশলী স্টেজ-ম্যানেজারের এবং দৃশ্যাদি পরিকল্পনার দায়িত্ব তারই ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। ডিরেক্টরের প্রথম কাজ হচ্ছে আগাগোড়া নাটকটি পড়ে ফেলা এবং নাটকটি সম্বন্ধে

একটা গ্রেইট ইম্প্রেশন নেবার চেষ্টা করা; এর ফলে নাটকটির সমস্ত রঙ, রস, ছন্দ এবং গতির দিকটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এবার কিছু সময়ের জন্য নাটকটি সরিয়ে রেখে দিয়ে ঐ সব রঙ, রস, ছন্দ, গতির সমাবেশে মানসপটে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে নাটকটির সম্বন্ধে যে ইম্প্রেশন সে করেছে। তারপর সে দ্বিতীয়বার নাটকটি পড়তে বসবে এবং এ সম্বন্ধে তার মানসপটে যে পরিবেশটি সৃষ্টি হয়েছে তাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখবে। দ্বিতীয়বার পড়বার পর সে দেখতে পাবে যে সব ধারণাগুলো তার মনে বেশ স্পষ্টভাবে রেখাপাত করেছিল সেগুলো যেন মন থেকে সরে যাচ্ছে। এবার এ সব সম্বন্ধে সে নোট করে রাখবে। হয়তো এই সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যাদি এবং ভাবধারা সম্বন্ধেও বর্ণ এবং রেখা বিষয়ক কিছু কিছু আভাস তার মনে জেগে উঠবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে মনকে কার্যকরী করবার আগে নাটকটি অন্তত দশ-বারোবার পড়া উচিত।

প্রশ্ন—আচ্ছা, দৃশ্য পরিকল্পনার ব্যাপারটা কি সিন পেন্টারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত?

উত্তর—আধুনিক থিয়েটারের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভুল ব্যবস্থা। "এ" লিখলে একটি নাটক এবং "বি" দায়িত্ব নিলে মঞ্চের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করতে। স্পিরিট অভ্ এ প্লে-র ঠিকমত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কতটা সূক্ষ্ম শিল্পকৌশলের দরকার তা তো জান? আর এর জন্য প্রধানত দরকার নাটকটির ভাবধারার সমতা রক্ষা করা। আর এই সমতা বজায় রাখতে হলে সব কাজের সব-রকম দায়িত্ব কি 'বি'-এর ওপর

হ্যামলেট—গোস্ট ১৯১২

দেওয়াই উচিত নয়? তা না করে "সি", "ডি" এবং "ই"-র ওপর যদি কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে এই সমতা আসবে কোথা থেকে? প্রডাকসন সম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা বা দেখবার ধরণটাই যে "বি" বা "এ'র" থেকে অন্যরকম হবে। সেক্ষেত্রে "ইউনিটি অভ্ দি স্পিরিট অভ্ দি প্লে" বজায় থাকবে কি করে?

বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আলোর খেলা আমরা দেখতে পাই, আমাদের স্টেজ ম্যানেজার কখনও সেই আলোককে মঞ্চে ব্যবহার করেন না। এ ধরনের চেষ্টা করাটাও ভুল—কারণ এ ব্যাপারটাই অসম্ভব। প্রকৃতিকে অনুকরণের প্রচেষ্টা না করে আভাসে-ইঙ্গিতে তার সৌন্দর্য এবং প্রাণ-পূর্ণতার দিকটাই স্টেজ-ম্যানেজার আলোকসম্পাতের কৌশলে মঞ্চে প্রতিভাত করবার চেষ্টা করবেন।

বিভিন্ন ক্রাফ্ট্সের সমন্বয়েই নাটকের সৃষ্টি হয়। সুতরাং নাটকের উন্নতি সাধন করতে গেলে প্রথমেই আমাদের ভালভাবে বুঝে দেখতে হবে যে এ সব ক্রাফ্ট্সের একটি বা দুটির উন্নতি করতে পারলেই ভাল নাটক পরিবেশন করা যাবে না। একই সঙ্গে প্রত্যেকটি ক্রাফ্টের উন্নতি সাধন এবং এগুলির সু-সমন্বয় হলে তবেই মঞ্চশিল্পের উন্নতি সাধন সম্ভব হবে। এজন্যে মঞ্চকে যাঁরা ভালভাবে গড়তে চান, মঞ্চের সব দিকগুলোকেই তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিখতে এবং জানতে হবে।

The art of the Theatre as I have already told you, is divided up into so many crafts, acting, scene, costume, lighting, carpentering, singing, dancing etc., that it must be realised at the commencement that ENTIRE, not part reform is needed; and it must be realised that one part, one craft, has a direct bearing upon each of the other crafts in the theatre and that no result can come from fitful uneven reform, but only from a systematic progression. Therefore, the reform of the Art of the Theatre is possible to those men alone, who have studied and pract'sed all the crafts of the theatre.

আগামী দিনের মহাশিল্পী যে সব জিনিসের প্রয়োগ-কৌশলে তাঁর মাস্টারপিসেস সৃষ্টি করবেন তা হচ্ছে "এ্যাকসন", "সিন" ও "ভয়েস"।

এ্যাকসন বলতে আমি ভঙ্গী ও ছন্দ, গতির গদ্য ও কাব্যরীতিকে বুঝি।

সিন বলতে বুঝি যা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে—যেমন আলো, নটনটীর পোষাক-পরিচ্ছদ এবং দৃশ্যাদি। ভয়েস অর্থে নাটকের পাত্রপাত্রীর সংলাপ বা গান। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা উচিত অনেক তথাকথিত নাটকে সংলাপের ভাষা এমনভাবে রচিত হয়, যা পড়বার পক্ষে সমীচীন, কিন্তু মঞ্চে ব্যবহারের উপযোগী নয়। [ক্রমশ]

# অশ্লীল ছবির ব্যবসা

নিউ টাইমস্ পত্রিকায় 'নিউ ইয়র্কের জীবন' নামে একটি রিপোর্টাজ প্রকাশিত হয়েছে। এতে নিউ ইয়র্কের জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই রিপোর্টাজে চলচ্চিত্র সম্পর্কে মন্তব্য আছে। সে সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

নিউ ইয়র্কের একটি সিনেমা হলে 'আই এ্যাম কিউরিয়াস' নামের সুইডিস ছবিটি দেখান হচ্ছিল। ছবিটি পৃথিবীর বহু দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে অশ্লীলতার দোষে। এই ছবি 'আই এ্যাম কিউরিয়াস' দেখতে এক সিনেমায় গিয়েছিলেন জ্যাকুলিন কেনেডি তাঁর বর্তমান স্বামী এরিস্টটল ওনাসিসকে নিয়ে। ছবিটি কিছুক্ষণ দেখার পর জ্যাকুলিনের মত মহিলার পক্ষেও আর বসে থাকা সম্ভব হল না। তিনি স্বামী ওনাসিসকে ফেলে হল থেকে বেরিয়ে এলেন। বৃদ্ধ জাহাজ ব্যবসায়ী ধনকুবের ওনাসিস কিন্তু সেই আদিরসের আস্বাদন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন না। জ্যাকুলিনকে অনুসরণ করল এক যুবক এবং গায়ের কাছে ঘেঁষে আসতেই জ্যাকুলিন তাকে যুযুৎসুর একটা প্যাঁচ মেরে ফেলে দিল। মার্কিন-মুলুকে নাকি—মেয়েরা এখন জোর যুযুৎসু শিখছে পথে-ঘাটে, সিনেমা হলে আত্মরক্ষা করতে।

'আই এ্যাম কিউরিয়াস'-এর মত ছবি দেখানোর বিপদ এখানে। এ রকমের ছবি দেখার পর দর্শকদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার প্রকাশ আজকের নিউ ইয়র্কে ভয়াবহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ এরূপ ছবির ব্যাপারে মার্কিন চিত্র ব্যবসায়ীদের উৎসাহ। 'নিউজ উইক' (আমেরিকা) পত্রিকায় একটা সংবাদ বেরিয়েছে কিভাবে অশ্লীল ছবিতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। রাশ মায়ার নামে এক যুবক যুদ্ধের সময় ফটোগ্রাফার ছিল। যুদ্ধের নৃশংসতা ও যৌনক্ষুধার মধ্যে তার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। ব্যক্তি-জীবনের কথায় জানা যায় এই মায়ারের মা ছয়বার বিয়ে করেছে। তের বছর বয়সের পরে সে তার বাবাকে দেখে নি। যুদ্ধ থেকে বিকৃত মন নিয়ে ফিরে এসে সে বিভিন্ন সিনেমা, সেক্স ও মহিলাদের পত্রিকার জন্য মেয়েদের ছবি তুলে ছাপিয়ে রোজগার করতে থাকে। বন্ধু-বান্ধবদের চাঁদায় এই লোকটি 'দি ইমমোরাল মিঃ টিজ' নামে একটি ছবি করে। এই ছবিতে দেখান হয়েছে একজন দাঁতের রোগী এনাসথেসিয়ার ঘোরে প্রত্যেক তরুণীকে নগ্ন দেখছে। ছবিটিতে মায়ারের প্রায় দশ লক্ষ ডলার আয় হয়। এ দেখে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স-এর মত বিরাট সিনেমা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মায়ারকে ডেকে ঠিকা চুক্তিতে ছবি করতে বলে। তার ফলে মায়ার 'মোটর সাইকো', 'ফাস্টার পুসিক্যাট', 'কিল কিল'-এর মত ছবি করে। এ সব ছবির গল্প গড়ে ওঠে বিকৃত যৌনতা, সমকাম এবং আরো যত অস্বাভাবিক কুৎসিত যৌন ব্যাপার আছে তা নিয়ে। এ রকমের ছবি করে মায়ারের নাম হয়েছে 'কিঙ অব ন্যুডিস'। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স মায়ারকে আর একটি ছবি করতে দিয়েছে। ছবির নাম 'ডল'। এই ছবির একটি দৃশ্যের যা বর্ণনা বেরিয়েছে তা এখানে লেখার যোগ্য নয়।

ইউরোপ ও আমেরিকার সিনেমার জগতে গত কয়েক বছর ধরে সংকট চলছে। ওদের যারা নামকরা পরিচালক তারা শূন্যগর্ভ ব্যবসায়িক ছবির জগতের বাইরে যেতে পারছে না। অথচ তাতে এত খরচ পড়ে যে, সে টাকা উঠিয়ে আনার মত নিশ্চয়তা থাকে না। তাই বড় বড় ফিল্ম কোম্পানীগুলি এই পথ নিয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগ করে ছবি করছে। এই ঠিকাদাররা কম পয়সায় নতুন নতুন মেয়েদের দিয়ে ইচ্ছামত বিষয় ও ভঙ্গিতে ছবি তোলে। বড় তারকাদের নিয়ে এ সব করাতে হলে অনেক টাকা দিতে হয়। কিন্তু এ সব কাজে নতুন মেয়েদের যৎসামান্য দিলেই চলে। তার পরে দেশে-বিদেশে ধীরে ধীরে এই ছবি দেখিয়ে মুনাফার অঙ্কটা বড় হতে থাকে। যৌনবিষয়ক ছবি দেখার উৎসুক দর্শক সব দেশেই আছে। কিন্তু মুনাফার জন্য এই যে বিকৃত যৌনতার ব্যবসা তার একটা প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় আছে। মার্কিন দেশের এক মিনিটের অপরাধ তালিকা প্রতিদিন তার প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু মার্কিন ও ইউরোপের সিনেমা ব্যবসায়ীরা চায় এই রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। তাই ভারতের মত দেশেও মায়ারদের ছবি আসছে নানা রকমের নতুন রীতির নামের লেবেল এঁটে। ওদের কাছে নীতি ও সমাজ অপেক্ষা মুনাফা বড়। কিন্তু এই ব্যবসায়ীরা জানে না যে এ সব ছবি ওদেরই মত্তা-পরোয়ানা।

—সুজন।

ঋত্বিক ঘটক
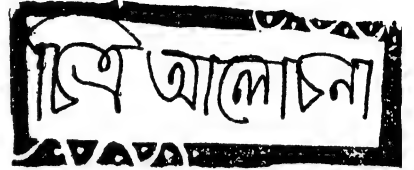
## বেটি

রঙিন ছবি 'বেটি'র নায়িকা সুধা—মা-মরা মেয়ে। মাতৃহীন সংসারে ছোটকাল থেকে সে সংসারের কাজ মাথায় নিয়ে আদর্শবতী কন্যার ভূমিকা পালন করছিল। পাড়া-প্রতিবেশীর অনুরোধে বাবা পুনর্বার বিয়ে করলে এই শান্তির সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। সুধা বড় হয়, অফিসে চাকরি করে কিন্তু সৎমা ও বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। বাবা তার জন্য পাত্র ঠিক করে, তার জন্য ৪০ হাজার টাকা পণ দিতে বাড়ি বিক্রয় করে। একটা ফটো বিভ্রম সৃষ্টি করে। রাজেশের সঙ্গে সে প্রেম করে তার বাবার স্থির করা পাত্র মনে করে। কিন্তু পরে বুঝতে পারে সে ভুল করেছে--স্থির করা পাত্র রাজেশ নয়, তার বন্ধু। এদিকে সৎমা'র চক্রান্তে পণের টাকা চুরি হয়ে যায়। সুতরাং বিয়ে ভেঙে যায়। অসুস্থ বাবাকে নিয়ে সুধাকে পথে বার হতে হয়। ওদিকে রাজেশও বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত রাজেশের মা'র মধ্যস্থতায় সুধা ও রাজেশের মিলন হয়।

এক কর্তব্যনিষ্ঠাবতী কন্যার কথা বলা হয়েছে। এই কাহিনী বলতে গিয়ে যথার্থ হিন্দী ছবির ভঙ্গিতে আঙ্গিক রচনা করা হয়েছে। যা শিক্ষিত দর্শক-মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা উচিত নয়: নাচে, গানে, স্থূল অভিনয় ও দৃশ্যাদিতে যথার্থ কৃত্রিমতার এই রঙিন ছবিতে

কয়েকটি বহির্দৃশ্য সুন্দর। অভিনয় করেছেন নন্দা, সঞ্জয়, কিশোর সাহু, শ্যামা, সুলোচনা, মধুমতী, শবনম, রাজেন্দ্রনাথ, বেবি সরিকা প্রমুখ।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন হরমেশ মালহোত্রা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সোনিক ওমি।

## ঋত্বিক ঘটকের নতুন তথ্যচিত্র

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীঋত্বিক ঘটক আবার ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। অসুস্থতার জন্য তিনি অনেকদিন ছবি করতে পারেন নি। মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ আর, এম, ব্যানার্জীর চিকিৎসাধীনে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে আবার ছবির কাজে লেগেছেন। সুমনা ফিল্মসের পক্ষে শ্রীসুধীর করণ প্রযোজিত 'মুখোস ও মানুষ' নামে একটি ছোট প্রামাণিক ছবি তিনি নির্মাণ করেছেন। এই ছবি হবে পুরুলিয়ার ছৌ নাচকে অবলম্বন করে। শুধুমাত্র নাচের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক না হয়ে ছবিটিতে এই নাচের শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক কৃষক জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা যুক্ত হবে। এদিক থেকে আশা করা যায় ছবিটিতে নতনত্বের স্বাদ পাওয়া যাবে।

## বিশ্ব চলচ্চিত্রের গতি-প্রকৃতি শ্রীঘটকের মতামত

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীঋত্বিক ঘটক এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ৬১, লেনিন সরণিতে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীঘটক দীর্ঘদিন অসুস্থতার পরে আবার নতুন করে চলচ্চিত্র রূপায়ণ প্রয়াসে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বিশ্ব চলচ্চিত্রের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ইউরোপ আমেরিকার ছবি বর্তমানে শূন্যতার আবর্তে রয়েছে। তারা নতুন কিছু দিতে না পেরে যৌনতা ও খুন-খারাপির কাহিনীকে আশ্রয় করেছে। সুইডিস পরিচালক বার্গম্যান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, বার্গম্যান একজন দক্ষ কারিগর, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। তিনি ভঙ্গি দিয়ে দর্শক ভোলান কিন্তু ওঁর ছবিতে বক্তব্য নেই। রোমান পোলানস্কি, ফেলিনো প্রমুখ সম্পর্কে তিনি তেমন আগ্রহ দেখালেন না, বরঞ্চ বললেন ওঁরা ছলনা-চাতুরী আশ্রয় করেছেন। ইউরোপ আমেরিকার ছবিতে এই অন্তঃসারশূন্যতার কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

শ্রীঘটক বললেন, আদর্শ ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে ভাল ছবি করা যায়। তিনি জাপানের মাদাকাওয়াকিতার উক্তি স্মরণ করে বললেন, যন্ত্রপাতির অভাবের মধ্যেও বাংলা দেশ ভাল ছবি তৈরি করে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমৃণাল সেন, শ্রীতাপস সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মৃণাল সেন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন; দেখা গেল চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁর আর শ্রীঘটকের মধ্যে বেশ দূরত্ব রয়েছে। শ্রীসেন মনে করেন ছবিতে সমাপ্তি টানা ঠিক নয়, শ্রীঘটকের মতে ছবি এমনভাবে শেষ হবে যাতে দর্শকরা স্পষ্ট একটা বক্তব্য অনুধাবন করতে পারেন।

শ্রীঘটককে প্রশ্ন করা হয়েছিল পদ্মশ্রী সম্মান সম্পর্কে তাঁর মতামত কি? তিনি বললেন, এই সম্মানকে তিনি ব্যক্তির দিক থেকে মনে করেন না, এতে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্রের একজন প্রতিনিধি হিসাবেই পদ্মশ্রী গ্রহণ করেছেন।

নান্দীকার প্রযোজিত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'তিন পয়সার পালা' নাটকে ভিখারীর চরিত্রে সুবীর দত্ত, অজিতেশ শেঠ, অলক ভট্টাচার্য, পল্লব মুখার্জী, রণজিৎ চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীযুক্ত [illegible] পুরুলিয়াতে 'মুখোস ও মানুষ' ছবির কাজ করছিলেন সেখানে জননেত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ তাঁকে এই সংবাদ প্রথম জানান এবং মাল্যভূষিত করে অভিনন্দন জানান।

## তিন পয়সার পালা

কলকাতায় বার্টল্ট ব্রেশট চর্চা উল্লেখযোগ্যভাবে চলছে। বছর তিনের মধ্যে প্রায় ছয়টি ব্রেশটের নাটক অভিনীত হয়েছে। ব্রেশট-এর গানের অনুষ্ঠান এবং পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নাটকের দর্শকরা বার্টল্ট ব্রেশট নামের সঙ্গে এবং তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হয়েছেন। সারা ভারতে এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ অনেক এগিয়ে আছে। এর জন্য কৃতিত্ব প্রগতিশীল অপেশাদার কয়েকটি নাট্য-সংস্থার। ভারত-পূর্ব জার্মান মৈত্রীর ব্যাপারে এই নাট্য-প্রচেষ্টা সহায়ক হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বার্টল্ট ব্রেশট নাটকের সাম্প্রতিক সংযোজন 'তিন পয়সার পালা'। বার্টল্ট ব্রেশট-এর থ্রি পেনি অপেরা বিশ্বময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই পর্যায়ে তাঁর কয়েকটি নাটক রয়েছে। তার মধ্যে একটি নাটক বাংলায় রূপান্তর করেছেন অভিনেতা-পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তিন পয়সার পালা' নাম দিয়ে। মূল নাটক অবলম্বন করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় শতবর্ষপূর্ব বাংলার পটভূমিকায় একটি কাহিনী উপস্থিত করেছেন। এই কাহিনীর নায়ক মহীন্দ্র নামের একজন সমাজবিরোধী। তার বিপরীতে আছে একজন তথাকথিত ভদ্রলোক—যতীন—যে আশ্রমের নামে ভিক্ষুক পোষে এবং প্রায় সাতশ ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ অর্থে সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি। সমাজের দু-রকমের চেহারার মানুষের সঙ্গে দেখান হয়েছে শাসক দলকে। এই দলের প্রতীক বটকৃষ্ণ দারোগা; যে মহীন্দ্রের সহায় এবং বিনিময়ে অর্থলাভ করে থাকে। এই তিন চরিত্রের লোকের সঙ্গে দেখা গেছে তিন রকমের নারী-চরিত্র। যতীনের স্ত্রী মালতী, যতীনের কন্যা পারুল ও বটকৃষ্ণের কন্যা লতু—যারা মহীন্দ্রের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত আর জ্যোৎস্না ও কয়েকজন বারবনিতা।

শিয়ালদহ সাউথ রোডের বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী উত্তমকুমারকে কণ্ঠশিল্পী ললিতা ধরচৌধুরী তাঁর গাওয়া বসন্ত বন্দনা গানের রেকর্ড উপহার দিচ্ছেন।

নাটকীয় রস ও দ্বন্দ্ব জমে ওঠে এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে একটা বক্তব্য প্রকাশ পায়, যখন মহীন্দ্র যতীনের কন্যা পারুলবালাকে লুকিয়ে বিয়ে করে। এই দ্বন্দ্বের ফলে বটকৃষ্ণের সহকারী মহীন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু মহীন্দ্র বটকৃষ্ণ দারোগার কন্যা লতুর সহযোগিতায় পালিয়ে যায়। লতুকে মহীন্দ্র গোপনে বিয়ে করেছিল। যতীন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুতরাং আবার মহীন্দ্রকে ধরা হল বারবনিতা জ্যোৎস্নার কথার সূত্র ধরে। বিচারে মহীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম হল; মহীন্দ্র ঘুষ দিয়ে, জেল পালাবার জন্য টাকার যোগাড় করতে লাগল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যতীন ঘোষণা করল মহীন্দ্রকে রাজাদেশে ক্ষমা করা হয়েছে, পরবর্তীকালে রায়সাহেব, রায়বাহাদুর ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত হয়ে সমাজের সে একজন মান্যব্যক্তি হয়েছিল।

তথাকথিত ভদ্রলোকদের গোড়ার কথা এই।...একশ' বছর আগে যে মহীন্দ্ররা লুট-পাট ও খুন করে, বারবনিতার ঘরে রাত্রিবাস করে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েছে, তারাই আজও দাপট করছে আরো একটু ভদ্র চেহারা নিয়ে; যে যতীনরা সেদিন ভিক্ষুক নিয়োগ করে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছিল, তারাই আজ কলকারখানায় শ্রমিকদের ঠকিয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে রয়েছে। সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের মুখোস উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা রয়েছে—এই নাটকে। কিন্তু থ্রি পেনি যেমন তিন পয়সা নয়, তেমনি বার্টল্ট ব্রেশট আর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জাতের শিল্পী নন। ব্রেশট-এর নাটকে শোষক

শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা অছে এই নাটকে তা যৌনরবের মিশ্রণে মানবিকতায় এসে দাঁড়িয়েছে, শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যালটুকু বাদ দিয়ে আলুনী স্বাদ লাভ করেছে।

পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি যেভাবে পরিবেশন করেছেন, তাতে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রয়েছে। অপেরার রীতিতে, তামাসার ভঙ্গিতে নাটকটি বিস্তার লাভ করেছে। অভিনয়ে লোকনাট্যের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। নাচে, গানে, সেকেলে পোষাক এবং সংলাপে একটা কালকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। মুখোস ব্যবহার করা হয়েছে—বিশেষ ই শিল্প ধ র্মি তার। সঙ্গীতে লোকগীতির ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। এসব দিক থেকে নাটকটিতে দর্শক কিছু নতুনত্বের স্বাদ পাবেন। এই নতুনত্বের জন্য দর্শকরা শেষ দৃশ্য পর্যন্ত প্রচন্ড কৌতূহল নিয়ে নাটকটি উপভোগ করেছেন।

অভিনয়ে মহীন্দ্রের চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীনরূপে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নার ভূমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্য, মালতীমালারূপে লতিকা বসু এবং বটকৃষ্ণ-চরিত্রে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পারুলবালার ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় প্রশংসনীয়। মহীন্দ্রের দলের সদস্যদের চরিত্রে পশুপতি বসু, রাধারমণ তপাদার, রণজিৎ ঘোষ, মৌলীন্দ্র আচার্য, পুরোহিতের ভূমিকায় অরুণ চট্টোপাধ্যায় এবং ভিক্ষুকের ভূমিকায় পল্লব মুখার্জী, সুধীর দত্ত, কালিকা শেঠ, অলক ভট্টাচার্য যথাযথ অভিনয় করেছেন। প্রচারপত্র-বাহকের ভূমিকা নিয়েছেন রণজিৎ চক্রবর্তী।

থিয়েটার সেন্টারে সহায়িকা মহিলা সমিতির অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী তাম্রবতী সান্যাল কথক নৃত্য প্রদর্শন করে প্রশংসা লাভ করেছে।

আবিরে

অমর দত্ত পরিচালিত প্রগতি চিত্রমের 'আবিরে রাঙালো' ছবির এক-টানা আটদিনের স্যুটিং ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্প্রতি সম্পন্ন হয়। চিত্র-নাট্য সংলাপ পরিচালক অমল দত্তেরই। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপদান করেন নতুন শিল্পী অনিল, সুচন্দ্রা, সলিল ঘোষ, বিমলেন্দু, মন্মথ মুখার্জী, বেবী গুপ্তা, দেবপ্রসাদ ও গীতা দে। নেপথ্যে কণ্ঠদান করছেন মান্না দে, পিন্টু ভট্টাচার্য ও সুজাতা।

লেনিন সম্পর্কে শোস্তাকোভিচের সংগীতমালা

খ্যাতনামা সোভিয়েট সুরকার দিমিত্রি শোস্তাকোভিচ লেনিন সম্পর্কে এক সংগীতমালা রচনার কাজ শেষ করেছেন। পুরুষ কণ্ঠের সম্মেলক, মিশ্র সম্মেলক ও একক-কণ্ঠে এগুলি গীত হবে। মস্কো থেকে তাস—এ· পি· এন এ খবর দিয়েছেন।

সম্প্রতি সোভিয়েট বেতার ও টেলিভিশনের কর্মীদের এক সভায় শোস্তাকোভিচ তাঁর লেনিন-সংগীতমালা সম্পর্কে বলেন। এই সংগীতমালার কবিতাংশ কবি ইয়েভগেনি দলমাতো-ভস্কির রচনা। শোস্তাকোভিচের বহু সুরসৃষ্টির সংগে ইতিপূর্বেও কথা সংযোগ করেছেন কবি দলমাতোভস্কি।

সারা-ইউনিয়ন বেতার ও টেলি-ভিশনের সম্মেলক ও একক সংগীত-গোষ্ঠী ও গুস্তাভ এরনেসাকিসের পরি-চালনায় এস্তোনিয়ার পুরুষকণ্ঠে সম্মেলক গোষ্ঠী সর্বপ্রথম শোস্তাকো-ভিচের এই লেনিন সংগীতমালা পরি-বেশন করবেন।

এ বছরের এপ্রিল মাসে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোতে ও লেনিনের জন্মস্থান উলিয়ানভস্ক শহরে এই অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

'ধরতি' ছবির নায়িকা ওয়াহিদা রহমান

চেকোস্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব

সিনেক্লাব ক্যালকাটা চেকোস্লোভাক দূতাবাসের এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের সহযোগে পঞ্চম চেকো-স্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করছে। আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী হতে এই উৎসব শুরু হবে। উৎসবে নিম্নোক্ত ছবিগুলি দেখান হবে : ডেইজিস—ভেরা ছাইটিলোভা; স্কিড—রাইনিচ; দি বেস্ট এইজ—পাসুসেক; দি ফ্যানি ওল্ড ম্যান—কারেল কাচিনা; আওয়ার ফানি ফ্যামেলি—বালাসেক; স্ট্রিকলি সিক্রেট ফার্স্ট পারফরমেন্স—মার্টিন এরিক; দি রেন্ড অব দি প্রিস্ট—ইভাল্ড স্কোম।

পুরুলিয়ায় 'মুখোস ও মানুষ' তথ্যচিত্রের চিত্রগ্রহণকালে জননেত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ শ্রীঋত্বিক ঘটককে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য অভিনন্দন জানান। ছবিতে বাঁ-দিক থেকে শ্রীসুশীল করণ, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও শ্রীঋত্বিক ঘটক।

### নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সংগীত প্রতিযোগিতা

নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সংগীত প্রতিযোগিতা বালিগঞ্জস্থিত "অভয়চরণ বিদ্যামন্দির"-এ বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬০০ জনেরও অধিক প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

### নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় নীচের ছবিগুলি দেখাবে তারিখ অনুযায়ী।

১০।২ : মাটির মনিষ—মৃণাল সেন,
১৮।২ : উইন্ডো টু দি স্কাই,
২৭।২ : ফারেনহিট ৪৫১।

## তরুণ অপেরার 'লেনিন'

লেনিন জন্ম-শতবর্ষে তরুণ অপেরার যাত্রা পালা 'লেনিন' উত্তরবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই যাত্রা-দল উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে এসে আবার পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠানব্যস্ত রয়েছে। আগামী ১লা ও ২রা ফাল্গুন আরামবাগ ও কাঁথিতে 'লেনিন' অভিনয় হবে। আগামী মার্চ মাসে 'লেনিন' যাত্রার দেড় শত রজনী অভিনয় উপলক্ষে মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

## বৈতানিকের রবীন্দ্র-নাট্যোৎসব

বিশ বছরের সাধনার ফসলের অর্ঘ্য নিয়ে "বৈতানিক"-এর শতাধিক শিল্পী আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে রবীন্দ্র-সদনে আয়োজিত রবীন্দ্র-নাট্যোৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হচ্ছেন।

এবারের নাট্যোৎসবের বিশেষত্ব হল রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটির নাট্যরূপ পরিবেশন। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে এবং পরীক্ষামূলকভাবে নাটকটিকে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হবে। রবীন্দ্রনাথের গীত ও বাণীর ছায়ায় 'শকুন্তলা নৃত্যনাট্যটি' মঞ্চস্থ করা হবে। এবারের অনুষ্ঠানে "সামান্য ক্ষতি" কবিতাটির নাট্যরস সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠবে নৃত্যনাট্যের মধ্যে। আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল রবীন্দ্র-অঙ্গনের শিল্পীরা "বাল্মীকিপ্রতিভার" নৃত্যনাট্যটিকে অপেরার ঢঙে মঞ্চস্থ করবেন।
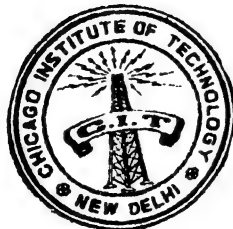
## ভাঁওতা

আজ যে বিষয়ে লিখতে বসেছি সে বিষয়ে যে কোনদিন লিখতে হবে তা ভাবতেও পারি নি। সত্যিকথা বলতে কি, এ কথা লিখতে গিয়ে আমরা লজ্জায় মাটির সংগে মিশে যাচ্ছি। মনুষ্যত্ব হারিয়েছি আমরা অনেক আগেই, কিন্তু আমরা যে দিন দিন এতো অমানুষ হয়ে পড়েছি, তা ছিল কল্পনাতীত। প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার মধ্যে তফাৎ অনেকখানি। কিন্তু যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তার কথা ভুলে গিয়ে সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করা, কিম্বা নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুচতুর প্রচেষ্টা যে কতো বড় অন্যায় তা বোধহয় বলে বোঝানো যাবে না। আজ তাই অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে হত পরিবারবর্গের কথা ভেবে আমাদের এই বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে। গত ডিসেম্বর মাসে ইডেন উদ্যানে খেলা দেখতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন সাতজন যুবক। (খেলার মাঠের বাইরে ছ'জন আর হাসপাতালে আরো একজন।) সেন-কমিশন এখনো দিচ্ছি-দেবো করেও কোন রিপোর্ট দেন নি। তাই ঐ সাতটি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়ার জন্যে দায়ী কারা সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ঐ অভাবনীয় ঘটনার পর যুক্তফ্রন্ট সরকারের মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী এবং সি· এ· বি কর্তৃপক্ষ জন-চিত্ত জয়ের জন্যে অনেক কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্রীড়ামন্ত্রী ও সি· এ· বি কর্তৃপক্ষ এ কথাও বলেছিলেন যে, 'তিন দিনের মধ্যে কয়েক জনকে চাকরি করে দেওয়া হবে।' সি· এ· বি কর্তৃপক্ষ নিহতজনের পরিবারকে ছ' হাজার করে টাকা দিচ্ছেন বলে খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর এ'দের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতির কতোটা কি হলো সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতাম না। ভেবেছিলাম ভদ্রলোকের কথার মতো ওঁরাও মর্যাদা দেবেন নিজেদের প্রতিশ্রুতির। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি আমাদের সেই ভুল ভেঙেছে। দিনকয়েক আগে আমাদের দপ্তরে ঐ দুর্ঘটনায় নিহত দু'জনের বাড়ি থেকে এসেছিলেন কয়েকজন। সি· এ· বির বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ গুরুতর। তাঁরা বলছেন, টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, সি· এ· বি কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন আসতে বলে তাঁদের রীতিমত হয়রানি করছেন। আমরা জানতে চাই, এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সি· এ· বি কর্তৃপক্ষের কি বক্তব্য? ক্রীড়ামন্ত্রীর কথা ছেড়ে দিলাম। উনি শুধু কথার জোরেই বাজী মাৎ করতে চেষ্টা করেন, কাজের কাজ কিছুই করেন না। কিন্তু সি· এ· বি কর্তৃপক্ষ হৃদয়হীন এই রকম আচরণ করার মতো দুঃসাহস কোথায় পেলেন ভেবে পাচ্ছি না। সি· এ· বি'র ঐ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু সে দায়িত্ব যখন তাঁরা আগ বাড়িয়ে মাথা পেতে নিয়েছেন তখন তাঁদের তা পালন করতেই হবে। সি· এ· বি কর্তৃপক্ষকে তাই সচেতন করে দিই যে, দেওয়া প্রতিশ্রুতি এখনই রক্ষা করুন তা না হ'লে আর যাই হোক, বাংলা দেশের ক্রিকেট-রসিকরা তাঁদের ক্ষমা করবেন না। ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা তো ক্রিকেট-শহীদ। তাই আমাদের আবেদন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়াদপ্তর, ক্রীড়ামন্ত্রী ও সি· এ· বি কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসুন, নিজেদের দেওয়া কথার মর্যাদা রক্ষা করুন। তা না হলে' এর ফল ভুগতেই হবে।

—[illegible]
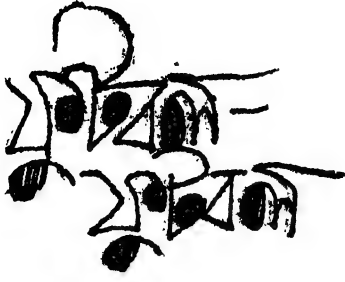
চেক ফুটবল দল ইন্টার প্রতিশ্রুতা কলকাতায় খেলতে আসছে। চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী মোহনবাগান মাঠে তাদের খেলা। এই খেলাটা নিয়ে প্রথমে একটু জোট পাকিয়েছিল। আর তাও সরকারী মনোভাবের জন্যে। রাজ্য সরকার ক্রীড়া-মন্ত্রীর পদ যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন ক্রীড়াদপ্তরকে তো কিছুটা কাজ দেখাতে হবে। কিন্তু কাজ দেখাতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা যে অকাজ করে বসছেন, সে কথা আজ বোধ হয় নতুন করে না বললেও চলে। কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়াদপ্তরের কার্যকলাপের কথা আজ আর কারো জানতে বাকী নেই।

যাই হোক, রাজ্য সরকার যে শেষ পর্যন্ত তিনটি সর্তসাপেক্ষে চেক দলের খেলার অনুমতি দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। এই তিনটি সর্ত হচ্ছে, এই খেলার জন্যে সরকারকে আড়াই হাজার টাকা দিতে হবে। আরো বেশী দাবী করলেও আপত্তি হতো না। দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, খেলার টিকিটের দাম—পাঁচ টাকা, তিন টাকা আর এক টাকা করতে হবে। আই· এফ· এ'র কাছে এ সর্ত তো রীতিমত সুখের। কারণ সরকারী নির্দেশ না থাকলে তাঁরা হয়তো টিকিটের দাম আর একটু কমই করতেন। আর তৃতীয় সর্ত হচ্ছে যে, এই খেলাটির জন্যে পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। এ সর্ত আরোপ করার কোন প্রয়োজন ছিল কি না সন্দেহ। কারণ কলকাতায় কোন বড় খেলাই পুলিশের অনুমতি ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না।

সুতরাং সরকারের এই তিনটি সর্ত যে কতো হাল্কা সে প্রশ্ন না তোলাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তবে কলকাতায় যে চেক দলের খেলা হবে এই জন্যেই অর্থাৎ বাংলা দেশের সাধারণ ফুটবল রসিকরা খুশী।

এই প্রসংগে আর একটা বিষয়ের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক বছর জাতীয় ফুটবল প্রতি-যোগিতায় সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী দলের তেহরাণে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ হয়। এবার বাংলা পেয়েছে সে সুযোগ। কিন্তু বাংলা দলের তেহরাণে যাওয়া কিম্বা না যাওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আই· এফ· এ'র ফাইন্যান্স কমিটির ওপর। আমরা আশা করবো যে, আই· এফ· এ এই সফর অনুমোদন করবেন এবং বাংলা দল তেহরাণে যাবে।

বাংলা তেহরাণে যদি যায় তাহ'লে এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাংলা দলের খেলোয়াড়-রাই বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এইটাই প্রচলিত প্রথা এবং আমরা চাই, এই প্রথা যেন বজায় থাকে। অর্থাৎ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণকারী বাংলা দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ই যেন তেহরাণে যাবার সুযোগ পান। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগে এবং চেনা-জানার সুবাদে কেউ যেন কাউকে ডিঙিয়ে দলে ভিড়তে না পারেন—এইদিকে নজর রাখার জন্যে আহ্বান জানাই আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষকে। জানি নে, আমাদের এই আহ্বান কতোটা কার্য-করী হবে। কারণ রক্ষকই যে আমাদের দেশে সাধারণত ভক্ষকে পরিণত হন। সুতরাং......।

কিছুদিন আগে জব্বলপুরে [illegible] আন্তঃরেল হকি প্রতিযোগিতার আসর। এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে নর্দার্ন রেল [illegible] হারিয়ে [illegible] নর্দার্ন [illegible] ও [illegible]। ছবিতে নর্দার্ন রেল দলের খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে।

ইডেন উদ্যানস্থ ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে শেষবার আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। বিচারপতি শ্রী এন সি তালুকদার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ছবিতে বিচারপতি শ্রীতালুকদারের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বাম পাশে বাংলা ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীভবানীশংকর মুখার্জীকে দেখা যাচ্ছে
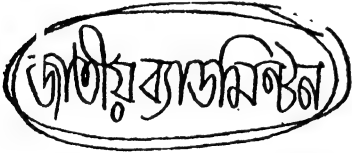
কলকাতায় এ বছরের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নামকরা প্রতিযোগীরা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেবার জন্যে অনেক আগেই কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আগে তাঁরা শেষ করেছেন আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার পালা।

এবারের আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার পুরুষদের বিভাগে রেলওয়ে দল চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে খুব সহজে পশ্চিম বাংলাকে হারিয়ে দিয়ে। এই নিয়ে রেল দল মোট পাঁচবার এই সম্মান অর্জন করলো। মাঝে গত বছর তারা এই সম্মান পায় নি। কিন্তু তার আগে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তারা একটানা চারবার পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছিল।

মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র দল এবারও চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। আর জুনিয়ার বিভাগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর গতবারের বিজয়ী মহারাষ্ট্রকে ২-১ ম্যাচে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে দিল্লী।

পুরুষ বিভাগের সিংগলস খেলাগুলোয় রেল দলের খেলোয়াড়দের সংগে বাংলার খেলোয়াড়রা কোন সময়ই পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন নি। রেল দলের রমেন ঘোষ ১৫-৪, ১৫-১ পয়েণ্টে পশুপতি দাশকে, সুরেশ গোয়েল ১৫-১১, ১৫-১১ পয়েণ্টে বৈদ্যনাথ দাশকে এবং দীপু ঘোষ ১৫-৮ ও ১৫-৫ পয়েণ্টে অনিল সোম্থিকে হারিয়ে দেন।

মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের শোভা মূর্তি ১১-৪, ০-১১ ও ১১-৬ পয়েণ্টে কেরলের জে· সি· ফিলিপকে এবং রফিয়া লতিফ ১১-৫, ১১-২ পয়েণ্টে সুশি জনকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার বিভাগে বালকদের সিংগলসে দিল্লীর মালবিন্দার ধীলন ১৫-৫, ১১-১৫ ও ১৫-৫ পয়েণ্টে মহারাষ্ট্রের ভাজিকদারকে হারিয়ে দেন। কিন্তু বালিকাদের সিংগলসে মহারাষ্ট্রের মরিণ ম্যাথিয়াস ৮-১১, ১১-০, ১১-৫ পয়েণ্টে দিল্লীর বিজয়লক্ষ্মী নায়ারকে হারিয়ে দেবার পর খেলার ফলাফল সমান সমান হয়। কিন্তু শেষ খেলায় বালকদের ডাবলসে দিল্লীর মালবিন্দার ধীলন ও মনোহর পাল সিং ১৮-১৭, ১৮-১৩ পয়েণ্টে মহারাষ্ট্রের এস পাঞ্জাবী ও এ ভগতকে পরাজিত করে দিল্লীকে ২-১ খেলায় জিতিয়ে দেন।

## অজানা খবর

সম্প্রতি লণ্ডনে পরীক্ষামূলক "এল বি ডবলিউ" নিয়মের প্রবর্তনের ফলে অনেক আম্পায়ার খেলা থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন বলে লণ্ডনের "ক্রিকেট আম্পায়ার এসোসিয়েশন" আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

এই নতুন নিয়মানুযায়ী কোন ব্যাটসম্যান যদি অফ স্ট্যাম্পের বাহিরে উইকেটগামী বলকে না খেলে পা দিয়ে প্রতিরোধ করেন তাঁকে "এল বি ডবলিউ" আউট হয়ে উইকেট থেকে সরে পড়তে হবে।

এসোসিয়েশনের পত্রিকা "হাউজ দ্যাট"-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, টেস্ট ক্রিকেট ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের একটি সংক্রামক ব্যাধি সারাবার জন্য নতুন করে নিয়মের পরিবর্তন করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টায় আইনের কিন্তু ভুলত্রুটি নেই।

উক্ত পত্রিকায় বলা হয়েছে, নতুন নিয়মের বাড়তি ঝুঁকি বহন করা আম্পায়ারদের সম্ভব হবে না। সাধারণত আম্পায়ারদের দায়িত্ব অনেক বেশী। এই নতুন নিয়ম চালু হলে অনেক ক্রিকেট খেলোয়াড় খেলবেন না স্থির করেছেন বলে উক্ত পত্রিকায় বলা হয়েছে।

যদি নিয়ম-প্রণেতারা আম্পায়ারদের দায়িত্ব সম্পর্কে সহানুভূতি না দেখিয়ে অহেতুক নিয়ম পরিবর্তন করতে থাকেন, তাহলে অনেক নামকরা ও কীর্তিমান আম্পায়ার খেলা থেকে সরে পড়তে বাধ্য হবেন।

—নির্মলকুমার ঘোষ
জলপাইগুড়ি

[ ২১১২ পৃষ্ঠার পর ]

**রঞ্জা সান্যাল ও পৃথা বিশ্বাস**
(গোলমুড়ি ফ্লাট, জামসেদপুর—৩)

**প্রশ্ন :** পাতৌদির টেস্ট ক্রিকেটে সংগৃহীত মোট রান সংখ্যা ও ইনিংস প্রতি গড় রান কতো?

**উত্তর :** সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যায় আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আছে। একটু দেখে নেবেন।

আপনাদের অপর প্রশ্নটির উত্তর আগেই দেখেছেন নিশ্চয়ই।

# খেলাধুলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

## সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যে-কোন খেলায় শিক্ষণীয় দু'টি বিশেষ দিক আছে। একটি শরীর গঠনের জন্য শরীরচর্চার দিক, অপরটি খেলার পদ্ধতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশনের জন্য ক্রীড়াকুশলতার দিক। পূর্বেই বলেছি, উভয়ে অংগাংগিভাবে জড়িত এবং মূল্যবান। কারণ, শরীর ঠিক উপযুক্তরূপে গঠিত না হলে ক্রীড়াকুশলতা সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। অতএব কারো গুরুত্বই কম নয়।

শরীরচর্চায় নিহিত আছে এনাটমি, ফিজিওলজি, ডায়েট্রী, ফিলজফি প্রভৃতি। এছাড়া আছে আবহাওয়ার প্রশ্ন, যার গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়। উক্ত বিজ্ঞানগুলির সম্বন্ধে শিক্ষকদের সম্যক জ্ঞান না থাকলেও, অন্ততপক্ষে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। অন্যথায়, শরীরচর্চায় উপযুক্ত ফল পাওয়া তো সম্ভব নয়ই, এমন কি, কুফল হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যদি প্রশ্ন করেন 'সকলেই কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে'? আমি বলব—বর্তমানে সকলেই। অতীতে কিছু ব্যতিক্রম ছিল।

একটি খেলোয়াড়ের উত্থান ও পতনের উদাহরণ দিয়ে বিজ্ঞানগুলির প্রয়োজনীয়তার মোটামুটি আভাস দিলাম। অবশ্য, নির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন থাকলে বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকে। ধরুন :—একটি খেলোয়াড় উচ্চতায় প্রায় ৬' ফুট। বলিষ্ঠ গঠন, গতিবেগ ক্ষিপ্র, পায়ের মার জোরালো, হেড ভাল। বল ধরা, দেওয়া এবং নেওয়া ভাল। এক কথায় একটি ভাল খেলোয়াড়। কলকাতার প্রথম বিভাগে খেলে সুনাম হল। কলকাতার নামকরা ক্লাবের কর্ণধারেরা এবং কোচেরা হলেন তার প্রতি যত্নবান। এমন কি সর্বভারতীয় দলেও নির্বাচিত হল সে। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, দুর্ভাগ্যবশত উক্ত খেলোয়াড়টির আশানুরূপ খেলা হচ্ছে না। মনে হল যেন খেলার অবনতি হচ্ছে। কোচেরা এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষ যত্ন নিলেন। খেলোয়াড়কে উন্নতির জন্য যথাযথ উৎসাহ এবং উপদেশ দিলেন। খেলোয়াড়টি প্রথম প্রথম ততটা গ্রাহ্য না করলেও ক্রমে সে-ও উপলব্ধি করলো এবং উন্নতির জন্য যত্নবান হল। তবু, কোন সুফল হল না। দেখা গেল—পায়ের মার, ধরা বা দেওয়া ও নেওয়া ইত্যাদি প্রায় সবই ঠিক আছে, শুধু ক্ষিপ্রতা হ্রাস পেয়েছে। ক্ষিপ্রতা বাড়াবার আগ্রহে অধিক অনুশীলন চলল। ফলে, ক্ষিপ্রতা আরো কমতে লাগল। এবার সবাই হাল ছাড়লেন। নামকরা ক্লাবে ঠাঁই হল না। কোচেরা আর যত্নবান নন। এইভাবে অকালে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেল। একমাত্র ক্ষিপ্রতার অভাবে একটি খেলোয়াড় নষ্ট হল। কারণ, ক্ষিপ্রগতি যে কোন বিপক্ষ তাকে পরাভূত করতে লাগল। অথচ এই গতিবেগ বাড়াবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম সে করেছে, দিনের পর দিন! তবু, কেন এমন হল এইটি হল প্রশ্ন?

কেন এমন হল? কোচেরাই বা এর প্রতিকার করতে পারলেন না কেন? ২২।২৪ বছর বয়সের যুবক? ফুটবল খেলার উপযুক্ত বয়স! এই বয়সে স্বাভাবিকভাবেই শরীরের উন্নতি হয়ে থাকে—তবু, কেন এই অঘটন ঘটল? একমাত্র বিজ্ঞানই এর প্রকৃত উত্তর দিতে পারবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের দ্বারাই এর প্রতিকার করা সম্ভব হবে। এ এক প্রকারের রোগ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শরীরচর্চা ও শরীরের পরিচর্চাই হল এর চিকিৎসা।

এখন, দেখা যাক উক্ত বিজ্ঞানগুলির কোনটির অন্তর্গত এই রোগটি? অথবা একাধিক কারণে এই অবনতি? বর্তমান অবস্থা—শরীরের গঠনের কোন অবনতি হয় নি বরং মেদ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মেদ বেড়েছে কিন্তু মেদশক্তি কমেছে ঠিক একথাও বলা চলছে না। কারণ, পায়ের মারের জোর কমে নি। কমেছে শুধু ক্ষিপ্রতা। এবার 'এনাটমি ও ফিজিওলজি' বিদ্যার মাধ্যমে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই ক্ষিপ্রতা হ্রাসের কয়েকটি কারণ হতে পারে? যথা :—অত্যধিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত বীর্যক্ষয় ও রক্তক্ষয়, অত্যধিক ঘাম ইত্যাদি আরো দু-একটি। এবার ফিলোজফি বা সাইকোলজি এবং সেক্সোলজির বিদ্যার মাধ্যমে প্রশ্নাদি করে এবং সামগ্রিক অবস্থার বিচার-বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে প্রকৃত কারণটি কি? প্রয়োজনবোধে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সাথেও পরামর্শ করা উচিত হবে। যে মুহূর্তে সঠিক কারণ জানা গেল সেই মুহূর্তেই ডায়েট্রি এবং আবহাওয়ার অবস্থা বিবেচনা করে পরিচর্যা আরম্ভ করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত সঠিক পরিচর্যার দ্বারা ক্ষিপ্রতা উদ্ধার করা কঠিন হবে না।

**অরিন্দম দাশগুপ্ত** (সিউড়ী)

**উত্তর :** না।

**হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র** (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

**প্রশ্ন :** একটা বাম্পার বল পিচের মধ্যিখানে পড়ে ব্যাটসম্যান ও উইকেট রক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে বাউণ্ডারী সীমানা পার হয়ে গেল—কোন খেলোয়াড় স্পর্শ করার আগেই। এ ক্ষেত্রে কি হবে জানাবেন?

**উত্তর :** কি আর হবে, বাই হিসেবে অতিরিক্ত রানের সংগে চার রান যোগ হবে।

**জীবনজ্যোতি, বিপ্লব ঘোষ ও দেবদাস ভট্টাচার্য** (জোড়হাট, আসাম)

**প্রশ্ন :** ক্রিকেট টেস্টে কোন্ বাঙালী খেলোয়াড় সর্বাপেক্ষা বেশী টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন?

**উত্তর :** পংকজ রায়।

**ভোলানাথ ব্যানার্জী, পরি ও নির্মল** (নৈহাটী, ২৪ পরগণা)

**প্রশ্ন :** অশোক মানকাড়, ইঞ্জিনীয়ার, ওয়াদেকার, বেদী ও প্রসন্নর ঠিকানা জানতে চাই।

**উত্তর :** ঠিকানা লেখা থাম দিয়ে সি· এ· বি অফিস, ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা-২১—এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন। ওঁদের কাছ থেকে যদি উত্তর না পান, তা হ'লে মানকাড়, ইঞ্জিনীয়ার ও ওয়াদেকারকে C/o. ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বম্বে, ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম, বম্বে—এই ঠিকানায়, বেদীকে C/o. দিল্লী ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন, ফিরোজশা-কোটলা, নিউ দিল্লী ও প্রসন্নকে মহীশূর ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

**পরিতোষ নাগ** (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

**উত্তর :** তোমার চিঠির উত্তর তো প্রায়ই দেওয়া হয়। যাই হোক, তোমাকে ব্যক্তিগতভাবেও উত্তর দেওয়া হলো।

—সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১) "প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় চতুর্থ উইকেটের ৫৭৭ রান যে কোন উইকেটে সেরা পার্টনারশিপের রেকর্ড। আর এ রেকর্ডের অধিকারী দু'জন কৃতী ভারতীয় খেলোয়াড়। ১৯৪৭ সালের ৭ই মার্চ, বরোদা বনাম হোলকারের একটি খেলায় (রঞ্জি ট্রফি) বরোদার পক্ষে ভি, এস, হাজারে (২৮৮) এবং গুল মহম্মদ (৩১৯) চতুর্থ উইকেটে এই রান করেন। কোন জুটি এ পর্যন্ত এত বেশী রান আর করতে পারেন নি।"

* * *

(২) "১৯০২ সালে সেটলহামে সাসেক্স ও গ্লাসেস্টারে একটি প্রথম শ্রেণীর খেলায় সাসেক্সের এ মেলভিল একটি বল সজোরে হিট করলে গ্লাসেস্টারের টি, ডব্লিউ গর্ডাড তাঁর মাথার টুপি দিয়ে ঐ বলটিকে থামালেন। গডার্ডের ঐ আইন-বহির্ভূত কাজের জন্য মেলভিলকে পাঁচ রান দেওয়া হল। এ রকম ঘটনা কিন্তু ক্রিকেট ইতিহাসে সেই প্রথম।

* * *

(৩) অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেটার ক্লিমহিল ১৯০১-২ সালের ইংগ-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে পর পর তিনটি ইনিংসে যথাক্রমে ৯৯, ৯৮ ও ৯৭ রান করে দুর্ভাগ্যবশত আউট হয়েছিলেন প্রত্যেকবারই।"

**এম· জি· সেন** (গড় জয়পুর, পুরুলিয়া)

**প্রশ্ন :** যে-সব দেশ সরকারী ও বেসরকারী টেস্ট খেলায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে, সেই তালিকায় সিংহল স্থান পাবে কি?

**উত্তর :** না।

**মনীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন, কলকাতা-২৯)

**প্রশ্ন :** কোন ব্যাটসম্যান যদি খেলতে গিয়ে আহত হয়ে ফিরে আসে, তবে কি পরে সে আবার খেলতে পারবে?

**উত্তর :** পারবে।

**মৃদুলকান্তি দে** (গৌহাটি-১১ নামবাড়ী কলোনী)

**উত্তর :** আপনি আর একটা লেখা পাঠাবেন।

**হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভবেন্দ্রনাথ** (এরিয়া—৫, মাইথন)

**প্রশ্ন :** এ বছর ভারতে খেলতে এসে এবং ব্যাট করতে নেমে আর ফিল্ডিং করার সময় অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী, ম্যালেট, কনোলী প্রমুখরা যে আচরণ করেছিলেন, তার কোন তুলনা নেই। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই ধরনের আচরণ আর কোন দেশের খেলোয়াড়রা করেছেন কি? যদি করে থাকেন তাহলে তাঁদের নাম জানতে চাই। আর যদি লরীর দল প্রথম হন, তা হলে অখেলোয়াড়ী আচরণে তাঁরা নিশ্চয়ই রেকর্ড স্থাপন করলেন।

**উত্তর :** ঠিক তাই। লরী এবং তাঁর সহখেলোয়াড়দের এই অখেলোয়াড়ী মনোভাব কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে এটি একটি নতুন রেকর্ড।

আমাদের দপ্তরে প্রতিদিন প্রচুর চিঠি আসে, আর জমেও আছে অনেক। তাই অনেক সময় উত্তর পেতে আপনাদের বেশ দেরী হয়ে যায়, আশা করি, আমাদের এই অসুবিধাটুকু আপনারা বুঝবেন।

[ ২১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র





এম. বি. সরকার
এ. সরকার এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৩৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 19th February, 1970

# একুশে ফেব্রুয়ারী

২১শে ফেব্রুয়ারী একদিকে বেদনার দিন, আর একদিকে গভীর আনন্দের দিন। মা- ভাষা বাংলাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বরকত, সালাম, জব্বার ঐ দিনটিতে মরণের ভয় তুচ্ছ করে, অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে বাংলার মাটি ও বাংলার জলে ভালোবাসার প্রতিদানে তাঁরা রক্ত ঝরিয়ে ডাক দিয়েছিলেন—বাংলার যতো ভাই-বোন, তোমরা এসো, সংকল্প গ্রহণ করো, তোমাদের মাতৃভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করো। তারপর তাঁরা শহীদ হয়েছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ভাই-বোনদের কাছে তাঁদের সে আকুল আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে পাকিস্তান সরকার উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও সমান মর্যাদায় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই, একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদের রক্তে বিধৌত হলেও সেই বেদনার মধ্যে গভীর আনন্দ যে, বাংলাভাষার মর্যাদা অস্বীকার করতে পাকিস্তান সরকার সাহস পান নি।

একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণ করে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা সভা করেন, পত্র-পত্রিকায় দু-চারটা প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের সারা গায়ে যখন হিন্দীর লেবেল এঁটে দেওয়া হচ্ছে, তখনো আমরা নির্বিকার। ডাকঘরে, মুাজিয়মে, আকাশবাণীতে, রেল-স্টেশনে অর্থাৎ সরকারী যে-কোনো আপিসে মুখ বাড়ালেই দেখতে পাওয়া যাবে হিন্দীর পরোয়ানা সর্বত্র। আমরা হিন্দী ভাষার বিরোধী নই। কিন্তু হিন্দীর আগ্রাসী মনোভাবের আমরা ঘোরতর বিরোধী। আর আমরা চাই সংবিধানে স্বীকৃত ভাষাগুলির জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্র- ভাষারূপে সম মর্যাদা। পশ্চিমবঙ্গেই যদি কেন্দ্রীয় সরকারী আপিসগুলিতে বাংলা-ভাষাকে (এবং যা এখানকার মাতৃভাষা) কোণঠাসা করে রাখা হয়, তা হলে ভাষা না জানলে মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে বা প্রশ্ন করতে অধিকারী নন। সংসদে ইংরেজির সঙ্গে একমাত্র হিন্দীর দাপটই এতোকাল স্বীকৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতের প্রচণ্ড আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে কিছুদিন আগে সংসদে তামিল ও তেলুগু ঠাঁই পেয়েছে।

আমাদের মাতৃভাষার এই নিদারুণ অবহেলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কী করেছে? শুধু একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণ করলে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয় না, বরং অপমানই করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষানীতির কথা কিছুটা জানা গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বাংলা, নেপালী ও সাঁওতালী ভাষার মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন এবং ঐ ভাষাগুলির মধ্যে অনগ্রসর সাঁওতালী ভাষার উন্নতিবিধানে দৃঢ়সংকল্প। এ কি শুধু কাগ- লমের কথা, না, সম্ভাব্য সত্যি ঘটনা? বাংলাভাষার জন্যে তো এখন নতুন করে উন্নতি বিধানের প্রয়োজন নেই, তা হলে বাংলাভাষায় সরকারী কাজ সামগ্রি- ভাবে আজও চালু হয় নি কেন? সাধারণ মানুষ আজও একটা আবেদন বাংলাভাষায় পাঠাতে ভয় পায়—পাছে ইংরেজিতে না পাঠালে কর্তামহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করে। ইংরেজদের ফেলে যাওয়া আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আজও ইংরেজির প্রতি এমন মোহ জড়িয়ে আছে যে, বাংলায় লেখা কোনো নাগরিকের দরখাস্ত তাঁদের শ্রদ্ধান্বিত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। প্রতিটি দপ্তরে আমরা বাংলাভাষায় সরকারী কাজ দেখতে চাই। সবচেয়ে আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যাল- গুলিতে কাজকর্ম এখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষায় চালু করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু সেখানেই তাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় নি। তারপরও এসেছে অনেক ঝড়-ঝাপটা। বাংলাভাষার বিরুদ্ধে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ। রবীন্দ্র সংগীত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের রেডিওতে। কিন্তু জনতার দুর্বার আন্দোলনে সরকারী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। তারপর বাংলাভাষা ও তার সংস্কৃতিকে হিন্দু ঘেঁষা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন পাকিস্তান সরকার। ঐ সরকারের কোনো ষড়যন্ত্র সাফল্যলাভ করে নি। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে যতো বেশি বাংলা-বিরোধী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে, তারা ততো বেশি ভালোবেসেছে বাংলাভাষা, বাংলা দেশের সমস্ত মানুষকে। পূর্ব পাকিস্তানে একালে যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, তা বাংলাভাষার ইতিহাসের এক গৌরব-জনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

তবু বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ভাবের আদান-প্রদান নেই বললেই চলে। পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্ট সাহিত্য এখানে আসে না, এখানের গ্রন্থও সেখানে যায় না। ভারত ও পাকিস্তান সরকার মাঝে মাঝে মিটিং বসালেও এ ব্যাপারে উদাসীন এবং তা কি ইচ্ছাকৃত?

পূর্ব পাকিস্তানে আগামী একুশে ফেব্রুয়ারীতে যে ঘটনা ঘটবে বলে শোনা যাচ্ছে, তাও প্রমাণ করবে যে, সেখানের মানুষ কী গভীরভাবে ভালোবাসে তাদের জন্মভূমিকে, তাই পূর্ব পাকিস্তান—এই নাম মুছে ফেলে তারা আবার জন্মভূমিকে ডাক দেয় বাংলা দেশ বলে।

# আজকের মানুষ

উপজাতি সর্দার লেবুয়া জনাথন একটা ছোটখাট অভ্যুত্থান ঘটালেন লেসোথোয়। দেশে সদ্য-অনুষ্ঠিত নির্বাচন তিনি বাতিল করে দিয়েছেন, সংবিধান বাতিল ঘোষিত হয়েছে, বিরোধী দল-নেতাদের গ্রেপ্তার করেছেন। এমন কি লেসোথোর রাজা মোশোইশোয়েকে পর্যন্ত সিংহাসনচ্যুত করে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়েছে। দেশের সমস্ত ক্ষমতা এখন জনাথন স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। কেন তিনি এ-কাজ করলেন? এত ক্ষমতা তিনি পেলেন কোথায়? জনাথন অজুহাত হাজির করেছেন, আফ্রিকায় গণতন্ত্র অচল, এখানে অন্যরকম শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা দরকার। সেটা জনাথনের স্বৈরাচারী শাসন কিনা, সেটা অবশ্য তিনি খুলে বলেন নি। তবে এ-ক্ষমতার অধিকারী জনাথন হতে পেরেছেন গত পাঁচ বছর ধরে প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করার কারণেই।

সামান্য অবস্থা থেকে লেবুয়া জনাথন উল্কার বেগে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছেন। ঝুঁকির জোরে যতটা নয়, বুদ্ধি ছল-চাতুরীর ততটা সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন। প্রোটেস্ট্যান্ট পরিবারে জনাথনের জন্ম, শিক্ষাদীক্ষাও প্রোটেস্ট্যান্ট স্কুলেই। কিন্তু বড় হয়ে তিনি ক্যাথলিক বনে যান। ১৯ বছর বয়সে জনাথন কয়লা-খনিতে শ্রমিকের কাজ করতে যান কিন্তু জনাথনের জন্ম উপজাতি সর্দারের ঘরে—শ্রেণীর বিচারে সে-সর্দার যত তুচ্ছই হোক না। এই জন্মসূত্রের কারণেই প্যারা-মাউন্ট বা সর্বোচ্চ নেতা তাঁর প্রশাসনে যোগদানের জন্যে জনাথনকে আহবান জানালেন ১৯৩৭ সালে।

সামান্য কেরানীর চাকরি নিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ১৯৪০ সালে জনাথন সর্দারের পদে উন্নীত হলেন, তার কিছুদিন বাদে প্যারামাউন্ট রিজেন্টের উপদেষ্টা দেশের শাসন সংস্কার কমিটিতে জনাথনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবশ্যই জুটলো, সংবিধান কমিটিরও সদস্যপদ পেয়ে গেলেন তিনিই অনায়াসে।

ক্ষমতার কিছুটা স্বাদ পাবার পর জনাথন পুরোদস্তুর রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্যে নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন। একদিন তিনি রাজতন্ত্রের মস্ত বড় সমর্থক ছিলেন, তখন রাজানুগ্রহও তাঁর ওপর অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে জনাথন বাসুতো ন্যাশনাল পার্টির পত্তন করলেন বটে, কিন্তু পরের বছর সাধারণ নির্বাচনে তিনি এবং তাঁর দল প্রচণ্ড মার খেলো কংগ্রেস পার্টির কাছে। তবে সুচতুর জনাথন রাজার মাথায় হাত বুলিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত হন।

১৯৬৫ সালের নির্বাচনে অবশ্য জনাথনের দলই জয়ী হলো—যদিও মাত্র হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৬ সালে বাসুতোল্যান্ড যখন ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেলো, নতুন নাম হলো তার লেসোথো। তখন স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবার গৌরবও তিনিই লাভ করলেন।

কিন্তু জনাথন এমনই একটি দেশের সরকার-প্রধান যার অধিবাসীরা তাঁকে চায় না। বস্তুত জনাথনই লেসোথোকে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বেচে দিয়েছেন। বর্ণবিদ্বেষনীতির কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সমগ্র আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের চোখে ঘৃণার পাত্র। কিন্তু জনাথন সেই দক্ষিণ আফ্রিকাকেই তার মুরুব্বি হিসেবে মাথায় তুলে নিয়েছেন। ফলে বিরোধী কংগ্রেস দল জনাথন-বিরোধী শ্লোগান তুলেছে। জনাথনের নীতি যে জনগণ বাতিল করে দিয়েছে তার প্রমাণ নির্বাচনের ফলাফলের

লেবুয়া জনাথন

মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি রাজাও তার রাজ্যকে এ-ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভোরটারের হাতে সঁপে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ। কিন্তু জনাথন এখন রাজতন্ত্রবিরোধী। তাই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অপরাধে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও অন্তরীণ করেছেন। জনাথন আজ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন সমস্ত বিরোধীকে বাহুবলে স্তব্ধ করে দিয়ে। কিন্তু জনতা যাঁর পেছনে নেই,

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## বসু ও জিন্না

স্বাধীনতার আগে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রধানত যে দুই ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, যার পরিণতিতে দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা ঘটেছে, বিচিত্র কথা, তাঁরা দুজনেই গুজরাটি। তাঁদের একজনের নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অন্যজন মহম্মদ আলী জিন্না। গান্ধী হিন্দু, জিন্নার পিতামহ জন্মে হিন্দুই ছিলেন। উভয়েই বেনিয়া বংশের।১ গান্ধীজী কৌতুকপূর্ণ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে নিজেকে বেনিয়া বলতেন, জিন্না কখনো সেভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, জানি না। কিন্তু বেনিয়াগিরি বলতে প্রচলিত ভাষায় যা বোঝায় জিন্না তাতে গান্ধীকে পরাস্ত করেছিলেন—ইংরেজের সঙ্গে বিনা যুদ্ধে, শুধু দর কষাকষির দ্বারা এবং বক্তৃতা মঞ্চ থেকে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচারের দ্বারা তিনি পাকিস্তান ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।

গান্ধী ও জিন্না ভিন্ন স্বাধীনতা-যুদ্ধের শেষ পর্বে আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ছিলেন, যাঁদের একজন সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ভারতের আশু স্বাধীনতার তিনিই কারণ, এবং নেহরু-শিষ্য লালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেছিলেন, তিনিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। স্বাধীনতার আলোচনা যখন চলছিল, তখন ইংরেজ, ভারতীয় সকলের উপর, জিন্নার উপরও, তাঁর বৃহৎ ছায়া পড়েছিল।২ পাঠকের নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হয় নি, আমি সুভাষচন্দ্র বসুর কথাই বলছি। ১৯৩৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র ও জিন্না কয়েকদিনে বহু ঘণ্টা ধরে মুখোমুখি বসেছিলেন—তিক্ত হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বসু-জিন্না আলোচনার বিষয়বস্তু ও পরিণতি আলোচনা করব। তার আগে ১৯৩৮ অবধি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস সংক্ষেপে বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনাধিকার বিস্তৃত হওয়ার প্রথম পর্বে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ সম্বন্ধে ছিল ঔদাসীন্য ও বিরূপতা। ইংরেজও এই পর্যায়ে মুসলমানদের বিষয়ে কোনো পক্ষপাত দেখায় নি। সিপাহী বিদ্রোহের (বা বিপ্লবের) সময়ে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল৩—মুসলমানেরা লড়েছিল একটি স্বপ্নের আশ্রয়ে—তাদের হৃত সাম্রাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন—তার ফলে মারাঠাদের কাছ থেকে পেনশনভোগী মুঘল সম্রাট মুসলমানদের কাছে প্রতীক-মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ সেই স্বপ্নের প্রাসাদ

---

১ লিওনার্ড মোসলে 'দি লাস্ট ডেজ অব দি বৃটিশরাজ' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "Though Jinnah was actually born in Karachi, his background was the same as Gandhi's. Both their families were Gujeratis from Kathiawar ... Jinnah's grandfather was a Hindu. He was from the same caste as Gandhi's family, the Vaisya."

২ মাইকেল এডওয়ার্ডস 'দি লাস্ট ইয়ার্স অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে, আজাদ হিন্দ কীর্তি ভাবতে প্রচারিত হলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তার উল্লেখ করে বলেছেন—"The ghost of Subhas Bose, like Hamlet's father, walked the battlements of the Red Fort, and his suddenly amplified figure over-awed the conferences that were to lead to independence.

"The spectre of Subhas Bose also frightened Jinnah. Once again Congress and the Hindu masses seemed to have been galvanized out of their torpor."

সাংবাদিক দুর্গা দাস তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত 'কার্জন থেকে নেহরু' গ্রন্থে লিখেছেন, জিন্না শা' নওয়াজকে নিজ দলে যোগদানের জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন। জিন্না জানিয়েছিলেন, শা' নওয়াজ যদি বাকি দুই অভিযুক্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন (শা' নওয়াজ মুসলমান, বাকি অভিযুক্ত সেহগল হিন্দু, ধীলন শিখ), তাহলে তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থন করবেন। শা' নওয়াজ এই প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে কিয়ানী প্রভৃতি জিন্নার প্ররোচনায় ধরা দিয়েছিলেন দেখতে পাই।

ভেঙে পড়িয়ে দিল।৪ এবং তারপরে যে অত্যাচার সে শুরু করল, তাতে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা লাঞ্ছিত হল বেশি। তারা নিরুপায় ঘৃণায় নিজেদের গুটিয়ে নিল একেবারে; পাশ্চাত্য জীবন ও শিক্ষার সঙ্গে কোনো যোগ রাখল না; ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে বিশেষ গেল না; সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যে গত স্বপ্নের রোমন্থনে ব্যাপৃত রইল।

ইংরেজ-অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা, বিশেষত বাঙালী হিন্দুরা, সাগ্রহে সেই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যেও এগিয়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাবান সমাজ ও ধর্মসংস্কারকের প্রভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল কর্মে ও ধর্মে, তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় যখন সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নানাদিকে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাচ্ছে, শাসকদের কাছ থেকে দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করছে, মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু বীরত্ব কাহিনী নিয়ে জাতীয় গৌরবসাহিত্য রচনা করছে, তখন সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় পুষ্ট মুসলমান-মনের একাংশ 'আমরা আল্লার কৃপার শাসকজাতি এবং মুসলিম ভিন্ন অপর সকল দেশই শত্রু দেশ'—এই আক্রোশপূর্ণ স্বপ্নে বিভোর ছিল,৫ অপর কিছু অংশ কালপ্রয়োজন বুঝে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে, উন্নতির ফলাস্বাদে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর নায়কত্ব করেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

মুসলিম সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে স্যার সৈয়দ আহমদের স্থান সর্বাগ্রে। তিনি বুঝেছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করেই মাত্র মুসলমানদের উন্নতি সম্ভবপর হবে; ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় অতি প্রয়োজন। সেজন্য তিনি মুসলিম শাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, ইসলাম ও খৃস্টধর্মের মধ্যে মূলগত ঐক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, মুসলমান নারীর অবরোধ এবং পর্দাপ্রথাকে আক্রমণ করেছিলেন, এমন কি তুরস্কের খিলাফতের প্রতি আনুগত্যও স্বীকার করেন নি। (নেহরুর 'ভারত আবিষ্কার')

স্যার সৈয়দের প্রধান কীর্তি আলিগড় কলেজ। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য কলেজটি করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে নবজাগ্রত জাতীয়তার বিরোধিতা এবং ইংরেজ-রাজানুগত্য বৃদ্ধিও উদ্দেশ্য ছিল। কলেজটির অন্যতম ঘোষিত নীতি—"বৃটিশরাজের যোগ্য প্রজারূপে ভারতীয় মুসলমানদের তৈরী করা।" জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের দূরে রাখার সর্বপ্রকার চেষ্টা এই কলেজ মারফৎ স্যার সৈয়দ করেছেন,৬ জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে এই উগ্র অভিজাত মানুষটি প্রবল বিদ্বেষ ও

---

সাম্রাজ্য উদ্ধারের জন্য। হিন্দুরা যথেষ্টভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে না, এ ধরণের বহু অভিযোগ মুসলমান পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, কিন্তু রাজপুত, মারাঠা বা শিখদের পক্ষে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপারে সাহায্য করাও সম্ভব ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে বহু সংগ্রামে তারা ঐ শাসনকে বহুলাংশে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করে ফেলেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে হিন্দু-মুসলমান সংঘাতও ঘটে ছিল। ডঃ মজুমদার তাঁর 'হিস্টরি অব ফ্রিডম মুভমেণ্ট' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এইসব তথ্য দিয়েছেন।

৪ নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' দ্রষ্টব্য।

৫ এ, কে মজুমদার 'অ্যাডভেণ্ট অব ইনডিপেনডেন্স' গ্রন্থে লিখেছেন: "The Muslims tenaciously clung to the idea that they were the conquering race and therefore the ruling race by divine grace. This conception led to the other, namely that the Muslims can only live in Islamic country (*Dar-ul-Islam*), all other countries being enemy territory (*Dar-ul-Harb*).

আরবের ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের অনুকরণে ভারতবর্ষে ১৮২০ বা ১৮২১ খৃস্টাব্দে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তার মূলে দৃষ্টিভঙ্গিই উপরিউক্ত প্রকার ছিল। রায়বেরিলির সয়ীদ আহমদ এই আন্দোলনের প্রবর্তক। তিনি বিরাট দল গঠন করতে পেরেছিলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিতানায় ছিল আন্দোলনের হেড কোয়ার্টার্স, আন্দোলন পশ্চিম উত্তর এবং পূর্ব ভারতের অনেক জায়গায় ছড়িয়েছিল। পাঞ্জাবে শিখেরা মুসলমান-ধর্মস্থান অপবিত্র করেছে, এই অভিযোগে সয়ীদ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, ১৮৩১ খৃস্টাব্দে চার বছর যুদ্ধের পরে তাদের হাতে নিহত হন। শিখদের হাত থেকে পাঞ্জাব ইংরাজ অধিকার করে নিলে ওয়াহাবিরা ইংরেজদের সঙ্গে ধারাবাহিক সংঘর্ষ চালিয়ে যায় এবং অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ শাসককে হত্যা করতে সমর্থ হয়। বাংলার তিতু মীর এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বহু হিন্দুর ধন-প্রাণ ও ধর্ম হরণ করতে পেরেছিলেন।

সয়ীদ আহমদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ডঃ রমেশ মজুমদার লিখেছেন:

"His fundamental creed was that India being *Dar-ul-Harb* (enemy country) it was incumbent upon the Muslims either to destroy the British power, or to migrate to some other Muslim country. His ultimate object was the liberation of India from the hands of the English and Indian infidels which was an obligation of all Muslims for this purpose he wrote to the Nizam of Hyderabad, and even to some Muslim rulers outside India."

আতঙ্ক ছিল,৭ যা ক্রমে তাঁকে কেবল সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থক করে তুলেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল বলেছেন, স্যার সৈয়দ হিন্দু-বিরোধী বা সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাকামী ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি কিছু কমও ছিলেন না।৮ স্যার সৈয়দ-প্রতিষ্ঠিত আলিগড় কলেজ পরবর্তীকালে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান হয়েছিল, সে বিষবৃক্ষের বীজ রোপনে ও তার মূলে জলসিঞ্চনে স্যার সৈয়দের সচেতন অভিপ্রায় কিছু কম ছিল না। এ-কাজে ধারাবাহিকভাবে ইংরেজ শিক্ষকেরা সযত্ন সহযোগিতা করে গিয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠ

---

আসন চাইছিল। এধারে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু। সুতরাং নির্বাচন মানে হিন্দু-প্রাধান্য, তা সহ্যাতীত। তাই সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান মিলনের ধ্যানেতে কখনো যোগ দেন নি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনব্যবস্থা হলে মুসলমানেরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে ইংগিতও তিনি করেছিলেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগঠিত করার জন্য স্যার সৈয়দ ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন থিয়োডোর বেকের সহযোগিতায়। ঐ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি তাঁর জীবনীকার, পুলিশ অফিসার গ্রাহামকে বলেছিলেন: "I have undertaken a heavy task against the so-called National Congress, and have formed an Association." এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য, "to dissiminate such news to the members of the Parliament which would prove the hollowness of the Congress claim to represent all sections of Indian opinion." (এ, কে, মজুমদার)।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দে আলিগড়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সভায় সৈয়দ আহমদ যদিও ইংলণ্ড ও ভারত উভয়ত্রই আই-সি-এস পরীক্ষা হোক, এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, তবু পরে আবার তার বিরোধিতা করেন, কারণ তার ফলে হিন্দুরা বড় চাকরিতে প্রাধান্য পেয়ে যাবে। সুরেন্দ্রনাথ স্যার সৈয়দের কংগ্রেস-বিরোধিতা সম্বন্ধে দুঃখ করে বলেছিলেন: "The Mahomedan community, under the leadership of Sir Syed Ahmad, had been aloof from Congress. They are working under the auspices of the Patriotic Association in opposition to the National movement. Our critics regarded the Congress as a Hindu Congress and the opposition papers described it as such. গোখলেও একই ধরণের দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

সৈয়দ আহমদের মতে: "The ultimate object of the Congress was to rule the country; and although they wished to do it in the name of all people of India, the Muslims would be helpless as they would be in a minority." এক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা স্যার সৈয়দের পক্ষে ধর্মকার্য, তা তিনি বহুভাবে করেছিলেন। ফল সম্বন্ধে এম, নোমান লিখেছেন: "No Mussalman of note since then (1887-88) joined the Congress except one or two. Even Syed Ahmed Khan's co-religionists who differed from his views on relgions, educational and social matters, and opposed him violently, followed him in politics and preserved their isolation from the Congress." (ডঃ রমেশ মজুমদার)।

৭ স্যার সৈয়দ আহমদের কংগ্রেস-বিরোধিতার অন্যতম কারণ, তিনি ভাবতেই পারেন নি সাধারণ লোকে বি-এ, এম-এ পাশ করার জোরেই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বসতে পারবে। "কল্পনা করুন, ভাইসরয় এইসব লোককে 'আমার সহকর্মী', 'আমার মাননীয় বন্ধু' বলছেন!"—স্যার সৈয়দ আঁতকে উঠে বলেছিলেন। "যেসব ডিনারে বা সরকারী অনুষ্ঠানে ডিউক বা আর্লদের মত মহামান্য ব্যক্তিরা থাকবেন, সেখানে ঐসব লোককে আমন্ত্রণ ভাইসরয় কদাপি করতে পারেন না।" (এ কে মজুমদার)

৮ জহরলাল স্যার সৈয়দের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে লিখেছেন—"He was in no way anti-Hindu or communally separatist. Repeatedly he emphasised that religious differences should have no political or national significance. 'Do you not inhabit the same land? He said. 'Remember that the words Hindu and Muhomedan are only meant for religious distinction—otherwise all persons whether Hindu or Muhomedan, even the Christians who reside in this country are all in this particular respect belonging to one and the same nation'."

জহরলালের চুনকামকে ডঃ রমেশ মজুমদার তথ্যের হাতুড়ি ঠুকে অনেক জায়গায় চটিয়ে দিয়েছেন। ১৮৮৩-এ এক বক্তৃতায় স্যার সৈয়দ বলেছিলেন, ভারত বহু জাতির দেশ। আরও বহু স্থানে একই কথা বলেছেন। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেছিলেন, তার একজাতীয়তার প্রচার বাস্তব বিরোধী—They do not take into consideration that India is inhabited by different nationalities....I consider the experiment which the Indian National Congress wants to make fraught with dangers and sufferings for all the nationalities of India, specially for the Muslims. The Muslims are in a

নূরপাত করেছিলেন কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত ২৪ বছরের তরুণ ইংরেজ থিয়োডোর বেক, যিনি ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে এই কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যোগদান করেন।৯

ভারতের জাতীয় জীবনে আলিগড় কলেজের ভূমিকা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর রচনাংশ উদ্ধৃত করা যায়ঃ

"আলিগড় কলেজের ঐতিহ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিক দিয়েই সংকীর্ণ। দেশীয় রাজা, বড় জমিদার প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিরাই এই কলেজে অছি ছিলেন। সরকারী মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ইংরেজ প্রিন্সিপ্যালগণের পরিচালনায় কলেজটি জাতীয়তা-বিরোধী, কংগ্রেস-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা বৃদ্ধি করে চলেছিল। কলেজটির মুখ্য লক্ষ্য, নীচু থাকের সরকারী চাকুরির জন্য শিক্ষাদান। সেজন্য সরকার-ঘেঁষা মনোভাব দরকার এবং আরও দেখা দরকার—জাতীয়তা বা রাজদ্রোহিতার সঙ্গে যেন কোনো সম্পর্ক না থাকে। আলিগড় কলেজ গোষ্ঠীই নূতন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব করেছে, এবং প্রায় প্রতিটি মুসলিম আন্দোলনকে কখনো সামনে থেকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিছন থেকে প্রভাবিত করেছে। এদের চেষ্টাতেই প্রধানতঃ মুসলিম লীগের অভ্যুদয়।" ('ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থ) ক্রমশ]

minority, but they are a highly united minority. At least traditionally they are prone to take the sword in hand when the majority oppresses them."

সৈয়দ আহমদ ১৮৮৬ সালে বাৎসরিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, সমস্ত উত্তর ভারতে নানা সভা-সমিতির জাল বিস্তার করা; ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি সহযোগে কাজ করে মুসলমানের স্বার্থহানির সম্ভাবনাকে দূর করবে কঠিন হাতে, এবং "by the vigorous work of one generation the tide of misfortune may be turned and *Muhomedan Nation* may be set moving on the tide of progress abreast of all the other Nations of India."

আলিগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে অন্যান্য কথার সঙ্গেঃ

"The grant of representative institutions bassed on democratic principles of appointment to high offices by open competitive examination in India would be detrimental to Muslims as they would be subject to Hindu domination which is far worse than British rule.....

"As the Muslim interests are quite safe in the hands of the British, the Muslims should interest themselves in cultural development and avoid politics except in so far as it is necessary to counterbalance the mischief of Hindu political agitator."

৯ থিয়োডোর বেক, ডঃ রমেশ মজুমদারের মতেঃ সৈয়দ আহমদের বন্ধু, নিয়ামক ও দার্শনিক। বেক ১৮৮৩-তে আলিগড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন, মারা যান ১৮৯৯-তে। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর এক বছর পরে। ডাঃ এ কে মজুমদারের মতে : স্যার সৈয়দ গোড়ায় জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ ছিলেন না, বেকের প্রভাবেই তাঁর পরিবর্তন হয়। কোয়েকার সম্প্রদায়ের এই যুবকটি কি জন্য অত্যন্ত গোঁড়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচারক হয়েছিলেন, তার কারণ নির্ণয় করা যায় নি, এবং কেনই বা তাঁকে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়েছিল, তাও অজ্ঞাত। এ কে মজুমদারের অনুমান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজে বেকের গতিবিধি ছিল এবং ঐ সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের ও তাদের সন্তোষবিধানের জন্যই স্যার সৈয়দ বেকের উপর অতখানি নির্ভরশীল হয়েছিলেন

বেক কেবল আলিগড়ের অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষতাই করেন নি, 'ইনস্টিটিউট গেজেটে'র পরিচালন ভারও নিয়েছিলেন। "এই পত্রিকাতে তিনি বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার জন গরল ঢেলে দিতেন। সংখ্যার পর সংখ্যায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ ছেপে গেছেন, যার মূল বক্তব্য, ভারতবর্ষ এক বা একাধিক জাতির বাসস্থান, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ভারতে অচল, তা যদি কখনো মঞ্জুর করা হয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সর্বাত্মক প্রভু হয়ে বসবে, যে-রকম, কোনো মুসলমান সম্রাট পর্যন্ত হতে পারেন নি।" ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতে কিছু গণতন্ত্রসম্মত শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেবার কথা ইংলন্ডে ওঠায় বেক আলিগড় কলেজের একদল ছাত্র জুটি দিল্লী যান, সেখানে জুম্মা মসজিদের গেটে তাদের দাঁড় করিয়ে ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রায় ২১ হাজার সই জোগাড় করে কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের ধাপ্পা দিয়ে বলেছিলেন, হিন্দুরা গো-হত্যা বন্ধ করতে চায়, তারই প্রতিবাদে স্বাক্ষর সংগ্র করা হচ্ছে। মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য এবং কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারের জন্য প্রধানত বেকের উদ্যোগে 'ইউনাইটে ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব আপার ইন্ডিয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বেক কিভাবে হিন্দু ও মুসলমানকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তার নমুনা পাই তাঁর এ উদ্ধৃতিতে :

"The objective of the Congress is to transfer the political control of the countr from the British to the Hindus....It is imperative for the Muslim and the British unite with a view to fight these agitators and prevent the introduction of democrat

একই বিষয়ের বার বার পুনরুক্তি করা শুধু যে লেখকের পক্ষই কষ্টদায়ক তাই নয়, পাঠকবর্গের কাছেও তা যে অতিশয় বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়, সে কথা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা অনেক, তা জনসমক্ষে তুলে ধরাও প্রয়োজন, নতুবা বঙ্গদর্শন নামক ফিচারটিরই কোন তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু যেখানে বা যে-দেশে কোন সরকার আছে বলেই মনে করা যায় না, এ রকম অবস্থায় কোন বিষয় নিয়ে স্থিরচিত্তে কিছু চিন্তা করাও সম্ভবপর নয়। এবং সেই হিসাবে অনিবার্যভাবেই একটি বিষয়ই প্রাধান্যলাভ করে, তা হচ্ছে এই সরকারের ভবিষ্যৎ কি, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। সাপ্তাহিক বসুমতীর কত মূল্যবান পৃষ্ঠাই যে এজন্য অপব্যয়িত হয়েছে তার সংখ্যা নেই। অথচ সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করে উপাই নেই, কেন না এ ছাড়া খবরই বা কোথায়? সংবাদপত্রগুলির অধিকাংশ অংশই সরকারের অস্তিত্ব সংক্রান্ত জল্পনা-কল্পনায় পূর্ণ, যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতিই সেখানে শোভা পাচ্ছে। এদিকে কার্যত কোন সরকার যে নেই তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে নানাভাবে। বিযানসভার অধিবেশনের সময়ও আশা করা গিয়েছিল যে, বাইরের সংশ্লিষ্ট দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে কটূক্তি করলেও বিধানসভার মধ্যে তাঁরা পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখে একত্র 'মুভ' নেবেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। বিধানসভার বাইরের কদর্যতা বিধানসভার ভিতরেও চেপে বাখা যায় নি। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ভোটাভুটির ব্যাপারে বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলনেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় কোন দাবি না তুলে যুক্তফ্রন্টের ওপর করুণা প্রদর্শন করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। কপালে এও ছিল!

সমস্যার সমাধান করা দূরে থাকুক, যুক্তফ্রন্টের নেতারা একের পর এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে যাচ্ছেন এবং সেগুলির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। এঁরা শুধু দায়িত্বহীনই নন, সেই সংগে আদর্শভ্রষ্টও বটে। তিন-চার মাস আগে যুক্তফ্রন্টের সামনে যে সমস্যা ছিল, তার সংগে আজকের সমস্যার কোন তুলনাই হয় না। যেখানে এক বালতি জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে দিলে চলতো, সেখানে সকল তরফই জলের পরিবর্তে সেই অগ্নিতে অল্পাবিস্তর ঘৃতসিঞ্চন করেছেন, যার ফলে সেদিনের ফুলকি আজ দাবানলে পরিণত হয়েছে এবং তা সকলকেই গ্রাস করতে উদ্যত। অথচ গোড়াতে সমস্যাটা এমন কিছু জটিল ছিল না। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হবার সংগে সংগেই সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে এই সুযোগে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করার একটা ব্যাপক প্রবণতা দেখা যায়। প্রত্যেক দলই নিজেদের সমর্থক বৃদ্ধি করার এবং যে সকল স্থানে যে সকল দলের সংগঠন নেই, সেই সকল স্থানে সেই সকল দলের সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করে দেন। দলের জনশক্তি বাড়ানোর এই পরিকল্পনায় স্বার্থসম্পন্ন ও অসামাজিক লোকেদেরও সাড়া পাওয়া যায় এবং তারা বিভিন্ন দলে ঢুকে পড়ে। কোন কোন দল অবশ্য দাবি করেন যে, চার আনার মেম্বার তাঁদের দলে হওয়া যায় না, কিন্তু সেই দলের সমর্থক থাকতে, সেই দলের হয়ে কাজকর্ম করতেও কোন বাধা নেই এবং বাধা নেই দুষ্কর্ম করেও দলের প্রোটেকশান পেতে। এভাবে যখনই এক দলের এলাকায় অপর দলের সংগঠন গড়ে উঠতে যায় তখনই সংঘর্ষ, অর্থাৎ শরিকী সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে, যার পরিণাম এখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। ফসল কাটার মরশুমে গ্রামে গ্রামে এই রকম শরিকী সংঘর্ষ বারে বারে ঘটছে এবং প্রত্যেক শরিকই দাবি করেছে যে, তারা ক্ষেতমজুরের দাবির জন্য সংগ্রাম করেছে এবং তারা ছাড়া বাকি সকল দলই জোতদারদের দালাল, তারা জোতদারদের হয়েই কাজ করেছে।

এর পর থেকেই ধীরে ধীরে অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। বাংলা কংগ্রেসের চাঞ্চল্যকর প্রস্তাব গ্রহণ ও মুখ্যমন্ত্রীর অনশন থেকেই এই জটিলতার সূত্রপাত। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এই সত্যাগ্রহ কোন ব্যক্তিবিশেষের, দলবিশেষের বা সরকারের বিরুদ্ধে নয়, সর্বব্যাপী যে হিংসার মনোভাব দেখা গেছে তারই বিরুদ্ধে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই এই বিষয়ে তীব্র রিয়্যাক্ট করেছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহ শিবিরকে কার্জন পার্কের চিড়িয়াখানা বলে অভিহিত করেছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই সত্যাগ্রহ মোটামুটিভাবে জনচিত্তে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। বাংলা কংগ্রেসের কর্তব্য ছিল এখানেই ছেদ টানা। আমাদের স্মরণে আছে, সেই সময়ের বঙ্গদর্শনে একবার লেখা হয়েছিল, কোথায় থামা দরকার তা নিশ্চয়ই সুশীলবাবুদের জানা উচিত, কিন্তু সেখানে ছেদ না টেনে বাংলা কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারযুদ্ধে নামিয়ে দিয়ে অবস্থাকে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দিল। লেবু অত্যধিক কচলালে তেতো হয়ে যায়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। একইসংগে উল্টো দিক থেকেও সমানে কর্দম নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের মধ্যবর্তী দলগুলি এই সময় একজোট হয়ে উভয় পক্ষের ওপরই তীব্র চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তাঁরা অসহায়ের মত কোন-না-কোন শিবিরে যোগদান করলেন। একপক্ষ প্রো-বাংলা কংগ্রেস, অপরপক্ষ প্রো-সি-পি-এম। এতাবৎ ঝগড়াটা পার্টিস্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমশ তা সরকারীস্তরেও চলে এল। সংঘর্ষ শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে। গাজোলের ও. সির বদলীর ব্যাপার নিয়ে তার সূত্রপাত এবং পরিণামে ব্যাপারটি সাংবিধানিক একটি গুরুতর প্রশ্নও তুলে ধরল: মন্ত্রিসভার ওপর মুখ্যমন্ত্রীর সামগ্রিক কর্তৃত্ব কি অবিসংবাদিত, না কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী সমশক্তিধরদের মধ্যেই সর্বপ্রথম?

এ তো বাইরের দিক, একটা ভেতরের দিকও একই সংগে রয়ে গেছে। প্রশ্নাতীত সততার দাবি যুক্তফ্রন্টের সকল মন্ত্রীই আজ করতে পারেন না—যে কথাটা বারংবার আমরা বলেছি। প্রায় প্রতিটি দপ্তরই সেই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পার্টির জমিদারী হয়ে গেছে এবং সেই হিসাবে প্রায় প্রতিটি দপ্তরে পূর্বতন কলুষ বিদূরিত হওয়া দূরে থাক, পার্টিবাজির সুযোগে নতুন আর এক ধরনের কলুষের উদ্ভব হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক মন্ত্রীর দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে অপর মন্ত্রী কোন

মন্তব্য করতে পারবেন না, করলে তা অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে বা যুক্তফ্রণ্ট ভাঙার চক্রান্ত হিসেবে আখ্যা পাবে, এইটাই কার্যত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন কি মুখ্যমন্ত্রীও কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। যদি কোন মন্ত্রী বা তাঁর দপ্তরের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে তা হজম করে যেতে হবে নতুবা সংশ্লিষ্ট পার্টি চটবে। এ যেমন একদিক, অপর দিকে দলীয় অনুপ্রেরণায় এক পার্টির মন্ত্রী অপর পার্টির মন্ত্রীর ছিদ্র অন্বেষণে বিষম ব্যস্ত। কেন না, তা নিয়ে সোরগোল তুলতে পারলে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সুনামে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সহাবস্থান সরকারকে একটা শূন্যতার দিকে অবিরাম ঠেলে দিচ্ছে। রাইটার্স বিল্ডিংস অচল। আমলাদের উপর নির্ভর করে কোনক্রমে কাজকর্ম চলছে। অথচ কত আশাই না দেশবাসীকে দেওয়া হয়েছিল, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন, দুর্নীতিহীনতা, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস, কত কি!

যুক্তফ্রণ্টের সমালোচনা করছি না, আমরা শুধু দেখাতে চাইছি যে, ভেতরে ভেতরে অবস্থাটা কেমন হয়ে রয়েছে। কিভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে সমস্যার সংখ্যা একের পর এক বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। যুক্তফ্রণ্টের বিগত কয়েকটি বৈঠক ইচ্ছা করেই ভণ্ডুল করা হয়েছে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সেটা হচ্ছে এই যে, যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলি কে যে কি চান, তা বোধ হয় নিজেরাই জানেন না। একের বিরুদ্ধে অপরের এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও দলীয় স্বার্থে কেউই যুক্তফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবতে পারছেন না। বাংলা কংগ্রেস এবং মার্কস-বাদী কমিউনিস্ট পার্টি উভয়েই মনে করছে যে, একে অপরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কাজ গুছিয়ে নেবে। বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, তাঁরা ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পদত্যাগ করবেন। বর্তমান অবস্থায় এই হুমকিতে তাঁরা কিছু বার্গেন করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

## নারকেলডাঙা

গত ২৬শে জানুয়ারীর পর থেকেই নারকেলডাঙা, বেলেঘাটা ও মানিকতলা অঞ্চলে সন্ত্রাসের যে রাজত্ব সমানে চলে আসছে, তার বিরতি হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এই সন্ত্রাসের রাজত্বেরই একটি উগ্র অভিব্যক্তি দেখা গেছে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার। প্রায় সারাদিন ধরে সি-পি-এম ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থকদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ থামাতে পুলিশকে বেপরোয়া গুলী ও কাঁদানে গ্যাস চার্জ করতে হয়। দু' সপ্তাহের অধিককাল ধরে যে হাঙ্গামা এই অঞ্চলে চলছে, তাকে শরিকী সংঘর্ষ হিসাবে বর্ণনা করা সত্ত্বেও এবং দুই শরিকের নেতাদের হাঙ্গামা বন্ধ করার সদিচ্ছা ঘোষণা করা সত্ত্বেও যখন তা বন্ধ হচ্ছে না, তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, আসলে এই হাঙ্গামা রাজনৈতিক ভেকধারী সমাজবিরোধীদেরই সৃষ্টি। স্বভাবতই এ প্রশ্ন লোকের মনে জাগে যে, এই হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য পুলিশের তরফ থেকে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না কেন? কোন রাজ-নৈতিক দলের তকমা বুকে এঁটে যদি সমাজবিরোধীরা বোমাবাজী করে, তা হলে কি তাদের সমাজবিরোধী বলে গণ্য করা হবে না? যারা প্রকাশ্যে বোমা, পটকা ছুঁড়ছে, ঘর-বাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে, বেপরোয়া মানুষ খুন করছে, তাদের রাজনৈতিক কর্মী বলা যায় কি করে? অথচ সি-পি-এম এবং ফরোয়ার্ড ব্লক উভয়েই স্বীকার করছেন যে, এটা শরিকী সংঘর্ষ। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে মাথা ফাটাফাটি করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে, পেশাদার সমাজবিরোধীরা লাঠিবাজি, বোমাবাজি করে বিরোধী পক্ষের লাস নামিয়ে জঙ্গী কমরেড উপাধি পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিজেরাই হিসাব দিয়েছেন যে, ১৯৬৯ সালে এই হয়েছে। এর সঙ্গে অ-রাজনৈতিক খুনের সংখ্যা যোগ করলে তা মোট কত দাঁড়াবে? শুধু কলকাতাতেই নয়, সর্বত্রই মারামারি ও খুনোখুনি যেরকম প্রবল হয়ে উঠেছে, তাতে উদ্বেগ বোধ না করে পারা যায় না। এমন দিন খুব কমই যায়, যেদিন কোন-না-কোন অঞ্চল থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা খুনের খবর না আসে। বোমা, পটকা এবং ছোরা-ছুরির ব্যবহারটা নিতান্ত মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার সময় সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করার কথা শুনিয়েছিলেন, কিন্তু কার্যত যুক্তফ্রণ্টের আমল তাদেরই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস আমলে গুণ্ডা ও মস্তানদের সাহায্যে রাজনৈতিক খেলা খেলবার যে কুখ্যাত ট্রাডিশনের সৃষ্টি হয়েছিল, আজও যুক্তফ্রণ্টের আমলে তা সমানে চলছে। শরিকী সংঘর্ষের কারণেই হোক বা অন্যান্য যে-কোন কারণেই হোক, মানুষের জীবন ছিনিমিনি খেলার বিষয় নয়, অথচ পশ্চিমবঙ্গে নরহত্যা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা যেন নিতান্ত ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে। অথচ এই ব্যাপারের উপর যে ধরনের গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যুক্তফ্রণ্টের দলগুলি আদৌ তা দিচ্ছেন না। বলতে দ্বিধা নেই, কম-বেশী অধিকাংশ দলই আজ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছেন এবং সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, এটাই স্থূল সত্য।

## বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা

বসুমতী পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মীদের উদ্যোগে সম্প্রতি ভারত সভা হলে প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মভূষণ' লাভের জন্য এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা সভার উদ্বোধন করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। মঙ্গলাচরণ করেন শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য। শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অনুরণিত হয়ে ওঠে 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে'। কাজী সব্যসাচী ও সবিতাব্রত দত্তের আবৃত্তিতে সাংবাদিক ও কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্মিলিত প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচয় পেয়ে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাসের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের সুর-মূর্ছনায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ভারতে যে ক'জন প্রথম শ্রেণীর ও খাঁটি সাংবাদিক আছেন, বিবেকানন্দবাবু তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁকে সম্মান দেখিয়ে সরকারই সম্মানিত হয়েছেন। ভারত সরকার ভাল কাজ তো অনেক সময় করেন—এটা তার মধ্যে একটি।'

প্রধান অতিথির ভাষণে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেকানন্দবাবুর শক্তিধর লেখনীর কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে তাঁকে ভগীরথের সংগে তুলনা করেন এবং বলেন যে, 'পদ্মভূষণ' সম্মান নিতান্তই উপলক্ষ মাত্র। বাংলার মানুষের যে শ্রদ্ধা সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত ছিল—এ উপলক্ষে তাই প্রকাশ পেয়েছে।'

শ্রীমনোজ বসু বলেন যে, বাংলা দেশের মানুষ বহু আগেই বিবেকানন্দকে সম্মান জানিয়েছে। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া শ্রীমুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানান 'বিদ্রোহী লেখক' বলে। ডেপুটি মেয়র মণি সান্যাল বলেন যে, 'অবিচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে প্রেরণা যুগিয়েছেন।' গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধারূপে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানান কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, 'ভারত সরকারের উচিত ছিল বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে 'ভারতরত্ন' সম্মানে সম্মানিত করা।'

সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষে শ্রীমতী জয়ন্তী সেন শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, 'যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, যিনি কোনো শক্তির অনুগ্রহ কিংবা নিগ্রহের কথা চিন্তা না করে স্বাধীনভাবে এগিয়ে গেলেন, সেই স্বাধীনচেতা সাংবাদিক বিবেকানন্দকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।'

---

**'বাংলা প্রবর্তন সপ্তাহ'**

**পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরে প্রধানভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য 'বাংলা প্রবর্তন সমিতি' ২১শে থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বাংলা প্রবর্তন সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।**

---

সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি সংসদ সদস্য শ্রীঅশোককুমার সেন শ্রীমুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, আজ বড় আনন্দের দিন এজন্য যে, সংবাদজগতে উৎকর্ষ স্বীকৃতিলাভ করল। নির্ভীক সমালোচনার পুরস্কার একদিন-না-একদিন হবেই—তাই হলো। তিনি আরো বলেন যে, সংবাদপত্রের ওপর বা স্বাধীন চিন্তার ওপর কখনো হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করি নি। তবে সংবাদপত্রের সংগে সংগে পাঠকদেরও স্বাধীনতা প্রয়োজন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয়। বসুমতীর সহকর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে একটি মানপত্র অর্পণ করা হয়। বসুমতীর ছোটদের সংসদ শ্রীমুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে মাল্যভূষিত করা হয়।

শ্রীঅন্নদাশংকর রায় সভাপতির ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের কথা বলে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, 'তিনি যে পথে আছেন', সেই পথে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপবিত্র গংগোপাধ্যায়, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা দেশের বহু গুণীজন।

## ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও নতুন সমস্যা

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ইন্দিরা সরকারের ব্যাংক জাতীয়করণ অবৈধরূপে গণ্য করা হয়েছে। কনস্টিটিউশন বেঞ্চের এগারোজনের মধ্যে একজন বিচারক অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

বেছে বেছে মাত্র চোদ্দটি ব্যাংক জাতীয়করণ এবং যথাবিহিত ক্ষতিপূরণ দান না করা বিচারের দৃষ্টিতে একপেশে ও মৌল অধিকার বহির্ভূত। বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায় কিন্তু দুটি যুক্তিরই বিপরীত যুক্তি স্বীকার করেন। তাঁর মতে মাত্র চোদ্দটি ব্যাংক জাতীয়করণের দ্বারা কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, এমন অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক। তিনি বলেন, ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাসে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব। তা ছাড়া যে ১৪টি ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়েছে সেগুলি অপর তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলির সঙ্গে সমশ্রেণীভুক্ত নয়। যে ব্যাংকগুলির মজুত ৪৫ থেকে ৫০ কোটি টাকা, তাদেরই পরিচালনভার গ্রহণ সরকারের কর্তব্য। আর ক্ষতিপূরণের জন্য ন্যায়সংগত নীতি সংসদের আইনে গৃহীত হয়েছিল।

তা ছাড়া বিচারপতি শ্রীরায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও তুলে ধরেছেন। তা হল, জনস্বার্থে কোনটা অনুকূল আর কোনটা নয়, তা শুধু আইনসভারই বিচার্য।

কিন্তু ১০—১ মতপার্থক্যে ব্যাংক জাতীয়করণ আইনটি অবৈধ বলে গণ্য হওয়ায় ইন্দিরা সরকারের সামনে ব্যাপারটি নতুন করে বিবেচনার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। সংকট ত্রাণে তাই অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে এবং আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারীর বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই আসবে ব্যাংকের প্রশ্নটি।

কেন্দ্রীয় সরকারের সুবিধে এই যে, ব্যাংক জাতীয়করণ প্রশ্নে ইতিপূর্বে কেন্দ্র স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন পেয়েছিলেন এবং এবারেও পাবেন বলে আশা করা যায়। এমন কি প্রগতিশীল দলগুলি আরও এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। দুই কম্যুনিস্ট পার্টি অবিলম্বে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি মৌল অধিকার থেকে বাদ দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেছেন। এই প্রশ্নে সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে তরুণ তুর্ক দলের অন্যতম নেতা শ্রীমোহন ধারিয়ার বক্তব্যেও। পি-এস-পি সহ অন্যান্য দল সুপ্রীম কোর্টের রায়কে নৈরাশ্যজনক এবং সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ বলে পাকে-প্রকারে বর্ণনা করেছেন।

স্বতন্ত্র দল মালিক স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছুকেই সমর্থন জানাতে অক্ষম। জনসঙ্ঘ যেন ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে চেয়েছে এবং ব্যাংক জাতীয়করণের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চঞ্চল দ্রুততা ছিল বলে উল্লেখ করেছে। সংগঠনী কংগ্রেসের এস কে পাতিল ও মোরারজী দেশাই জনসঙ্ঘের সঙ্গে একযোগে একই অভিযোগ উপস্থিত করে বলেছেন, তাড়াঘাড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফল এমনই হয়।

ওদিকে কিন্তু সমগ্র দেশে হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। ব্যাংক কর্মচারীরা সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। দাবি, সমস্ত ব্যাংকই রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় বলা যেতে পারে, সুপ্রীম কোর্টের রায় ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকামী জনগণের কাছে নতুন আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রেখে গেছে। অতঃপর দেশী-বিদেশী সমস্ত ব্যাংকের জাতীয়করণের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠলে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে জনসমর্থন পুনরায় বিপুল ও উদ্বেল হবে। এক হিসেবে বিচারালয়ের রায় তাই শাপে বর হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকও সার্বিক জাতীয়করণ (ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে) কতদূর সম্ভব তার হিসাব-নিকাশে বসে গেছেন। চাপাই থাকত, সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধ রায় তাকেই রীতিমত সোচ্চার করে দিল। সেই যে বলে, শত্রুরূপে তিন জন্মে সাধনায় সিদ্ধি, বন্ধুরূপে সাত জন্ম—সেই শাশ্বত বাণীই যেন বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে হাতে-কলমে পরীক্ষিত হতে চলল। সঙ্গে সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ার অনুকূলে আরও একটি দাবি সংযোজিত হয়ে গেল, তা হচ্ছে, সম্পত্তির অধিকারগত অনুচ্ছেদের বিলোপ ঘটানোর দাবি। শ্রীমতী গান্ধী, অতএব, যথার্থ ইচ্ছুক হলে সমর্থন লাভে যে তাঁর এতোটুকু বেগ পেতে হবে না, তা ভালো রকমই বোঝা যাচ্ছে।

তবে সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টির ওপর হস্তক্ষেপ করতে হলে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের জোরে সংশোধনী আনতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যাংক সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়নের ওপর কোন বাধা আরোপ করেন নি।

ব্যাংক জাতীয়করণ সম্পর্কে গান্ধী-সরকারকে প্রধানত যে অভিযোগ আক্রমণ করেছে জনসঙ্ঘ তথা সংগঠনী কংগ্রেসের পাতিল-মোরারজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে তা হল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রীমতী গান্ধী তাড়াঘাড় ব্যাংক জাতীয়করণ করায় ব্যাপারটি সুরক্ষিত হতে পারে নি।

কথাটা অসত্য নয়। আবার বিশেষ ইঙ্গিতটুকুও সর্বথা গ্রাহ্য নয়। ইঙ্গিত বোধহয় এই যে, গাম্পাগোষ্ঠীর ওপর টেক্কা দেওয়ার জন্যই শ্রীমতী গান্ধীকে হঠাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়: বিশেষত মোরারজী দেশাইকে অর্থমন্ত্রক থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যও সেই সঙ্গে ছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এমনটা হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন শ্রীমতী গান্ধীকে অপসারণের জন্যও বন্ধ-দোর সভায় গাম্পাপন্থীরা উত্তেজিত বৈঠক করেছেন। কিন্তু দেশের প্রগতিপন্থী জনমতের চাপে তাঁদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। অতঃপর ছুতো-নাতায় ক্ষমতাচ্যুতির জন্য ক্রন্দন তাঁরা করে যাবেন ঠিকই, তবে তার দ্বারা জনমতকে বিভ্রান্ত করা হয়ত আর সম্ভব হবে না।

আসলে দেশের রক্ষণশীল গোষ্ঠী নতুন সমাজব্যবস্থার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাউকে কোথাও পাদমেকং এগোতে দিতে নারাজ।

আর্থ-সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন তবে বদমতলবী রক্ষণশীল গোষ্ঠীর বাধা উত্তরণের জন্যই তাঁকে তা গ্রহণ করতে হয়েছিল। দেশের প্রগতি

[শেষাংশ ২১৩৩ পৃষ্ঠায়]

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :**

ধমক দিয়েছে। আদুরে বখে-যাওয়া ছেলেকে স্নেহাতুর মা যেমন সোহাগের ধমক দেন, এ-ও ঠিক তেমনি স্নেহমাখা ধমক। গত সপ্তাহে ইস্রায়েলী বিমান গিয়ে মিশরের আবু জবল কারখানায় প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করে এসেছে যার ফলে ৭০ জন কারখানার অসামরিক শ্রমিক নিহত হয়েছে এবং প্রায় শ'খানেক আহত হয়েছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েলীরা মার্কিন ফ্যান্টম জঙ্গী বোমারু বিমানে চেপে এসেছিল। আরো অভিযোগ বিমান থেকে রকেট, বোমা এবং নাপাম বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। ইস্রায়েলী প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে এ অজুহাত দেখানো হয়েছে বিমানটা কারিগরি কৌশলগত ভুলের জন্যে অসামরিক এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছিল। ঘটনাটি রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষক প্রধান লেফটেনান্ট জেনারেল অড বুলকে জানানো হয়েছে।

ইস্রায়েলের এই নতুনতম আক্রমণের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। ইস্রায়েল সামরিক লক্ষ্যবস্তু ছেড়ে অসামরিক অঞ্চলে আক্রমণ সুরু করলো কেন? আবার সুরু করেছে এমন এক মুহূর্তে যখন আরব খন্দে শীর্ষ সম্মেলনে নতুন করে লড়াইয়ের সংকল্প উচ্চারিত হয়েছে। কায়রোতে অনুষ্ঠিত এ-সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছে সংযুক্ত আরবের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নাসের, জর্ডানের রাজা হুসেন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট নুরুদ্দিন এল আতাসি, ইরাকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সুদানের বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান। সম্মেলনে স্থির হয় যে, ইস্রায়েলের হাত থেকে আরবভূমি পুনরুদ্ধারের জন্যে সকল রকম প্রচেষ্টা চালানো হবে।

অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর ইস্রায়েলী আক্রমণের প্রতিশোধ নেবার জন্যে মিশরের দু'লাখ লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা দাবি জানায় বোমা, বুলেট দিয়ে ইস্রায়েলকে আক্রমণ হানতে হবে।

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্সের কাছে যে নোট পাঠিয়েছিলেন তাতে বিশেষ ফল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েট অনুরোধকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। ইস্রায়েলের যুদ্ধোন্মাদনা প্রশমিত করার কোনো চেষ্টাই আমেরিকার নেই, বরং অধিকৃত আরবভূমিগুলি কী করে ইস্রায়েল দখলে রাখতে পারে তারই জন্য উদারভাবে সাহায্য দিয়ে চলেছে। ইতিপূর্বে ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন অস্ত্রভিক্ষার জন্যে। পশ্চিম এশিয়ায় অস্ত্র পাঠানোর ওপর গত ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের সময় থেকে নিষেধাজ্ঞা চালু আছে। কিন্তু ইস্রায়েল যেভাবে ক্রমাগত আরব রাষ্ট্রগুলির ওপর—সংযুক্ত আরব, সিরিয়া, জর্ডানের ওপর আক্রমণ হেনে যাচ্ছে তাকে যদি অবিলম্বে বন্ধ করা না হয় তবে পশ্চিম এশিয়াকে কেন্দ্র করে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার আশংকা রয়েছে। কোসিগিনের পত্রের মর্মই ছিল এটা। ইস্রায়েল আঘাতের পর আঘাত করে আরবদের মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে; বোঝাতে চাইছে যে, বর্তমান আরব নেতৃত্ব যুদ্ধ ঠেকাতে অক্ষম, তাই আরব জাতিদের উচিত বর্তমান নেতৃত্ব অস্বীকার করে ইস্রায়েলের শর্তে শান্তি বৈঠকে বসুক। কিন্তু ইস্রায়েলের শর্তে শান্তি আলোচনায় কোনো আরব কি রাজী হবে?

অন্যদিকে ইস্রায়েলী বাড়াবাড়ি বন্ধ করা না হলে বড় রকমের যুদ্ধ কি এড়ানো সম্ভব হবে?

**ব্রিটেন : রঞ্জনের হয়রানি**

কুমারী রঞ্জন বৈদের ভোগান্তি ও হয়রানির চূড়ান্ত হলো। তবুও সান্ত্বনা ব্রিটিশ সরকার ওকে ঠাঁই দিয়েছেন। বরাবরের জন্যে অবশ্য নয়, রাণী এলিজাবেথের তিন মাসের অতিথি রঞ্জন বৈদ। সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক মনোভাবের অধিকারী বলে যাঁরা নিজেদের জাহির করেন, নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে তাঁরা কত নিচেই না নামতে পারেন তার প্রমাণ দিলেন ইংরেজরা কুমারী রঞ্জনের সঙ্গে ব্যবহারে।

একুশ বছরের তরুণী ভারতীয় বংশোদ্ভূত রঞ্জন বৈদ কেনিয়ায় বসবাস করছিল। মা-বাবা তার মারা গেছেন, এক আত্মীয়ের সঙ্গে সে নাইরোবিতে ছিল। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রঞ্জন ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রবেশপত্রের আবেদন করেছিল। কমনওয়েলথভুক্ত দেশের নাগরিক হিসেবে রঞ্জনের ব্রিটেনের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। মার্চ মাসে তাকে কেনিয়া সরকার জানিয়ে দেন যে, তাকে সেখানে চাকরি করতে দেওয়া হবে না।

রঞ্জন তার ভাই শান্তিলালের সঙ্গে ব্রিটেনে মিলিত হবার জন্যে নাইরোবি ত্যাগ করে। সঙ্গে রয়েছে তার ব্রিটিশ পাশপোর্ট। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়ে দেয় যে, পাশপোর্ট যথেষ্ট নয়, ব্রিটেনে ঢুকতে হলে তার প্রবেশপত্র চাই। এই বলে তাকে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে ফেরত পাঠায়। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে সে করবে কী। বাধ্য হয়ে তাকে নাইরোবিতে ফেরত যেতে হল। সেখান থেকে জোহানেসবার্গ, আবার নাইরোবি, তারপর এথেন্স, সেখান থেকে আবার ফ্রাঙ্কফুর্ট—কারণ কেনিয়া সরকারও রঞ্জনকে আর ফেরত নিতে অরাজী, যেহেতু সেখানে পুনঃপ্রবেশ সার্টিফিকেট তার নেই। এক সপ্তাহ ধরে প্রায় ২০ হাজার মাইল রাস্তা রঞ্জনকে এ বিমান থেকে সে বিমানে, এ দেশ থেকে সে দেশে শাটলককের মতো ঘুরে বেড়াতে হল, বিশ্রামের অবসরটুকুও পেল না। শেষ পর্যন্ত গত সপ্তাহে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব জেমস কালাগান রাজী হয়েছেন রঞ্জনকে তিন মাসের মেয়াদে ব্রিটেনে ঢুকতে ও থাকতে দিতে।

লন্ডনের হিথ্রো বিমানঘাঁটিতে এসে যখন রঞ্জন তার দাদা শান্তিলালকে দেখতে পেল তখন কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। দৌড়ে গিয়ে অপেক্ষমাণ দাদার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অঝোরনয়নে কাঁদতে লাগল। সাংবাদিকদের শান্তিলাল জানায় যে, তার বোন এক সপ্তাহ ধরে রোজ আর

[ শেষাংশ ২১৩৩ পৃষ্ঠায় ]

**কাঁচা** ফোঁড়া নিয়ে ঝঞ্ঝাট সবচেয়ে বেশি। ফোঁড়া ওঠবার আগে তাকে এ্যান্টিব্যাকটিন দিয়ে বা চুন দিয়ে অথবা আধুনিক কোন ট্যাবলেট বা পেনিসিলিন ইঞ্জেকসন দিয়ে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আবার পেকে গেলে সেই ফোঁড়াকে নানাভাবে ফাটিয়ে পুঁজ বের করে দেওয়া যেতে পারে। পাকা ফোঁড়া ফাটাতে অনেক ওষুধ আছে। তোকমারী লাগান, গরম ঘি লাগান, বহরের ননী লাগান, ফোঁড়া গলে যাবে। যদি মোটা চামড়ার ওপর ফোঁড়া হয়, তবে মাইনর অপারেশন করলেও পুঁজ বেরিয়ে যাবে—দেহ বিষমুক্ত হবে। এই সহজ ব্যাপারটা বোঝা কোন মুস্কিল নয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড হল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ও তার দলনেতারা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না বলে কাঁচা ফোঁড়া নিয়ে এমন সব কাণ্ড করছেন যে, তাতে হিতে বিপরীত হতে চলেছে। কেউ ভাবছেন, এক্ষুণি ঐ কাঁচা ফোঁড়াকে টিপে সব পুঁজ বের করে দেহকে রোগমুক্ত করবেন। কেউ ভাবছেন, ওষুধ ইঞ্জেকসন যা করার, এক্ষুণি করে ফোঁড়াকে শেষ করবেন। এর ফল হচ্ছে বিপরীত। কাঁচা ফোঁড়ার ওপর ছুরি চালাবার ফলও বিপরীত হচ্ছে, আবার টিপে পুঁজ বের করতে গিয়ে ফোঁড়া আরো দগদগিয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে যে বিষ ও রোগ মুক্ত করতে কাঁচা ফোঁড়াকে নিয়ে হাঙ্গামা করা হচ্ছে, তাতে ফোঁড়া আরো বিষাক্ত হয়ে উঠছে, রোগীর অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠছে। রাজ্যের রাজনীতিতে বর্তমানে যা চলছে এবং যুক্তফ্রন্টের দুই প্রধান দল সি-পি-এম ও বাংলা কংগ্রেস যা করছেন সেটা ঐ কাঁচা ফোঁড়া টিপে পুঁজ বের করবার চেষ্টারই ফল।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি—যাঁরা কম্যুনিস্ট এবং মার্কসবাদী বলে নিজেদের চিহ্নিত করেন, তাঁরা ভারতবর্ষের এক প্রান্তে, পশ্চিমবঙ্গে—না হয় দুই প্রান্তে—পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল বিধানসভায় কিছু আসনের সংখ্যাধিক্য পেয়ে ধরে নিলেন—ফোঁড়া পেকে গেছে, এইবার শ্রেণী-সংগ্রামের ছুরিতে শোষণ, পুঁজিবাদ, কায়েমী স্বার্থ, মতান্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত জাতীয় সব পুঁজ বের করে দাও। ভারতের সমাজদেহ রোগমুক্ত হয়ে সাম্যবাদের পথে গিয়ে নবকান্তি হয়ে উঠবে। আর বাংলা কংগ্রেস—পশ্চিমবঙ্গে নিতান্ত কংগ্রেসী ঝগড়ার ঔরসে জন্মলাভ করে বিধানসভায় কিছু আসন পেয়ে ধরে নিল—ফোঁড়া পেকে গেছে, অতএব এক্ষুণি টিপে সমাজদেহ থেকে সব হিংসা, হিংস্রতা, দলবিশেষের আগ্রাসী নীতির সব পুঁজ বের করে দাও। এই দুই পক্ষের কাউকেই এই কথা বলার স্পর্ধা রাখি না যে, তাঁরা ভুল করছেন। কিন্তু একটা কথা হয়তো বিনীতভাবে বলা যায়—সি-পি-এম দলনেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত নিঃসন্দেহে একজন খাঁটি মার্কসবাদী ও সাচ্চা কম্যুনিস্ট এবং ভারতের আর পাঁচজন কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে তাঁর মৌলিক তফাৎ অনেক—সে ব্যক্তিগত জীবনধারণেই হোক আর পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রেই হোক এবং শ্রীদাশগুপ্তের এই বৈশিষ্ট্য ক্রমেই ধরা পড়ছে ও প্রতিভাত হচ্ছে। তাই তো 'নিউ স্টেটসম্যান' তার গত ৩১শে জানুয়ারীর সংখ্যায় বলেছে—১৯১৭ সালে লেনিন এবং ১৯৪৯ সালে মাও সে-তুং নিজের দেশে যে প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আজকে তাঁর দেশে লেনিন, মাও সে-তুং-এর তুল্য জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী। আবার শ্রীসুশীল ধাড়া মহিষাদলের একজন বিধানসভা সদস্য, নিতান্তই গ্রাম্য রাজনৈতিক জীবনে যিনি পরিচিত, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে যাঁর কানাকড়ি মূল্য ছিল না—সেই ব্যক্তি নিজের সংগঠন-শক্তি ও পরিশ্রমে রাজ্য-রাজনীতির প্রথম সারিতে চলে এলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত কংগ্রেসী মহীরুহের পতন ঘটিয়ে রাজ্য থেকে কংগ্রেসকে প্রভাবহীন, শক্তিহীন বৃদ্ধ জরদ্গবে পরিণত করতে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। এই দুজনেই কিন্তু মূল হিসাবে ভুল করলেন। যে ভুলের ফসল আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কুড়োতে হচ্ছে। আজকে রাজ্য-রাজনীতির যে সংকটজনক পরিণতি ও পরিস্থিতি, তার মূলে আছে এই দুজন অতি বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতার কাঁচা ফোঁড়া টেপার ফলশ্রুতি।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। ৩২-দফা কর্মসূচী নিয়ে ফ্রন্ট সরকার কাজ সুরু করলো। চোদ্দটি পার্টি চোদ্দ ভাই হয়ে রাজ্যের জনজীবনে নতুন আশার আলো ফোটালো। নতুন সূর্যের আবির্ভাব ঘটালো—কিন্তু সেই অভিষেকের বর্ষপূর্তির মুখে দাঁড়িয়ে (১৯৬৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আগামী ২৫শে তার বর্ষপূর্তি হবে) কি ছন্নছাড়া রূপ, কি হতাশার রূপ, কি দৈন্যের রূপ, কি অনৈক্যের রূপ চোখে পড়ছে! যদিও এই কথা সত্য—সারা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটছে সেটা কোন অভিনব বা অস্বাভাবিক নয়, তবু পশ্চিমবঙ্গ বিহার বা উত্তরপ্রদেশ নয়—তাই কথাটাও মনে রাখা দরকার।

এই কথা আজও মিথ্যে হয়ে যায় নি যে, বাংলা দেশ ভারতবর্ষকে বহুক্ষেত্রে পথ দেখাবার যোগ্যতা রাখে। এই তো সেদিনও এসেছিলেন

এ-যুগের শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমী, আজীবন সংগ্রামী জননায়ক আবদুল গফফর খাঁ বাংলা দেশে ঘুরে ঘুরে বারে বারে মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন—'বাংলা দেশ হল নেতাজী আর রবীন্দ্রনাথের দেশ, বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠত্ব ও পথদ্রষ্টার ভূমিকা পালনের দিন শেষ হয় নি।'

[ সীমান্ত গান্ধীর কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। সীমান্ত গান্ধী শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বারে বারে দুটি নাম উচ্চারণ করেছেন, সেই দুটি নাম হল গান্ধীজী আর সুভাষচন্দ্র। কেন জানি না, সীমান্ত গান্ধী কোন অবস্থাতেই নেহরুজী সহ অন্য কোন নেতার কথা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। অনুসন্ধিৎসুরা সীমান্ত গান্ধীর কয়েক মাস ভারত ভ্রমণের বক্তৃতাগুলো পড়ে দেখুন, দেখবেন তিনি গান্ধীজী আর নেতাজী ছাড়া অন্য কারো কথা বড় উল্লেখ করেন নি। ]

শুধু তাই নয়, কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় সীমান্ত গান্ধী নাম উল্লেখ না করেও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন, সেটাও মনে রাখবার মত। সীমান্ত গান্ধী যে কথা বলেছিলেন, তার মর্মকথা হল—পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজ্য, যার দিকে সারা ভারত তাকিয়ে থাকে। এখানকার মানুষ ও সরকার সম্পর্কে তিনি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন বারে বারে। এইবার শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীসুশীল ধাড়া বলুন—তাঁরা নয় মহামতি গোখলের কথা 'আজ যা বাংলা ভাবে, ভারত তা আগামী কাল ভাববে' সেই কথা পুরনো হয়ে গেছে বলে বাতিল করে দিলেন, কিন্তু সীমান্ত গান্ধীর সদ্য বলা কথাগুলো কি তাঁদের মনে নাড়া দেয় না?

না, নাড়া দেয় না। তাই শ্রীসুশীল ধাড়া ক্রমাগত জেহাদ ঘোষণা করে সর্বশেষে পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করে সরকারের অন্তিম মুহূর্তকে ত্বরান্বিত করেন আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যব্যাপী যে শরিকী সংঘর্ষ আর হানাহানি সেই সঙ্গে আওয়া ও নাদা বাহিনীর হাতে মানুষের ধন-জীবন-প্রাণের সব অনিশ্চিত চলে যাওয়াকে শ্রেণী-সংগ্রাম, জনতার জাগরণ বলে চালাবার চেষ্টা করেন।

শ্রীসুশীল ধাড়ার কাছে যদি প্রশ্ন করা যায়—রাজ্যের বর্তমান দুঃসহ অবস্থার অবসানে আপনি অনশন সত্যাগ্রহ আন্দোলন করলেন, এখন পদত্যাগ করতে চলেছেন, কিন্তু তাতে মূল সমস্যার সমাধান কতটা হবে? সরকার ভেঙে দিয়ে নতুন কোন সরকার যদি গঠিত হয় এবং তারা যদি সি-পি-এম'কে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার নীতিও গ্রহণ করে, তাতেও কি মনে করেন—বাংলা দেশে শান্তির রাজত্ব কায়েম হবে? আর শরিকী সংঘর্ষ হবে না, আর হানাহানি হবে না, মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ফিরে আসবে? আমি বিনীতভাবে বলতে চাই—যদি সরকার ভেঙে দিয়ে বা কোন একটা দলকে সরকার থেকে বাদ দিয়ে বা একজন মন্ত্রীর হাত থেকে দপ্তর কেড়ে নিয়ে ভাবেন—মূল সমস্যার সমাধান হবে, তবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় কি বলতে পারেন—রাজ্যে বর্তমানে যা চলছে, তাতে সত্যই কি শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা জনতার জাগরণে সাম্যবাদের পথ প্রশস্ত হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলে খুবই অন্যায় করেছেন বলে আপনি মনে করেন। কিন্তু শুধু একবার বলুন—সেই আলিপুরদুয়ারের আর-এস-পি—সি-পি-এম হাঙ্গামা, আর-এস-পি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া, প্রসাদপুরে সি-পি-আই'এর তিনজন কর্মী হত্যা অথবা আসানসোলে সি-পি-আই, সি-পি-এম দলের মধ্যে যা চলছে অথবা কোচবিহারে ফরোয়ার্ড ব্লকের সি-পি-আই'এর শ্রীদেবী নিয়োগীকে মারা থেকে বেলেঘাটা-নারকেলডাঙায় সি-পি-এম ও ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে যা চলছে অথবা ক্যানিং, কুলতলি প্রভৃতি এলাকায় সি-পি-এম ও এস-ইউ-সি দলে যা চলছে—সেই মারাত্মক ঘটনাগুলো বহাল থাকলেও কি বলতে হবে সরকার চলছে এবং এই সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলা অন্যায়!

সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলা যদি অন্যায় হয়, তবে রাজ্যে যে হানাহানি, খুনখারাপী ও জনজীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে, তাকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলা কি আরো অন্যায় নয়? সব পার্টি সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য যে, গত এক বৎসরে কোন পার্টিই মারপিট, দাঙ্গা, হামলা, গুণ্ডামী, রাহাজানি, এমন কি মেয়েদের শালীতা রক্ষা না করার অপরাধে একজন কর্মীকেও দল থেকে বের করলেন না; তবে এই কথা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি করে বলতে চাই এই কারণে যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই পরিস্থিতিকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলে চালাবার চেষ্টা করছেন না। তাই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ফোঁড়ার যে লক্ষণ দেখে ভাবছেন ফোঁড়া পেকে গেছে, এইবার টিপলেই পুঁজ বেরিয়ে যাবে, সেটাও যেমন ভুল, তেমনি শ্রীসুশীল ধাড়া যে লক্ষণ দেখে ভাবছেন জনগণ জেগে গেছে, এইবার টিপলেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির অনাচারের পুঁজ বেরিয়ে যাবে, সেটাও ভুল। অথচ দুজনেই সেই ভুলের পথেই চলেছেন বলে আমাদের মত ছা-পোষা, ক্ষুদ্র বুদ্ধির মানুষ ছোট মুখে বড় কথা বলতে পারছে।

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেও যুক্তফ্রন্টের সমস্যা তথা রাজ্য-রাজনীতির সংকট বাড়বে বই কমবে না। আবার সি-পি-এম—তার নাম নিয়ে যে সকল ক্যাডার জোরজুলুম, মারপিটের পথ নিয়ে পার্টির সঙ্গে রাজ্যের ভরাডুবি ঘটাচ্ছেন, তাঁদের সংযত করার অথবা শায়েস্তা করার পথ গ্রহণ না করে আবো প্রশ্রয় দিলে শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনটাই ত্বরান্বিত হবে না। —১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

**॥ পাঁচ ॥**

**রাণীদির সঙ্গে** আমার কতদিনের **সম্পর্ক এবং তা যে কত** নিবিড় তা মায়া **বা মণ্টু কারোর কাছেই আর** অস্পষ্ট রইল **না।** মায়া সম্ভবত মনে করল সে থাকলে রাণীদি আর আমার মধ্যে হয়তো কথা-বার্তার কিছু অসুবিধা হবে অথবা যেখানে গভীর হৃদয়াবেগের প্রশ্ন ও বিস্ময় জড়িত, সেখানে তার থাকাটা বেমানান হয়ে পড়বে —তাই তার কেমন যেন উঠি-উঠি ভাব দেখা গেল। তা ছাড়া তার মধ্যে আরও একটা কথা তোলপাড় করে উঠছিল বোধকরি এবং সেটা আর কিছুই নয়, রাণীদির সঙ্গে আমার এমন নিবিড় পরিচয়ের খবরটা সে মাকে না দিয়ে থাকবে কি করে? তাই হঠাৎ সে বলে উঠল, 'দাদা, আপনি গল্প করুন—আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

আমি তার কথামত হঠাৎই যেন ঘাড় নেড়ে দিলাম। মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে মণ্টুও পা-পা করে বেরিয়ে গেল। কে জানে, সেও হয়তো মায়ার মত কিছু ভেবেছে। কিংবা হয়তো একথাও সে ভেবেছে, বড়রা যেখানে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করে, সেখানে ছোটদের থাকতে নেই। মণ্টুর সহবৎ শিক্ষার এ পরিচয় আমি আগেই পেয়েছিলাম।

ওরা চলে যেতে রাণীদি বললেন, 'মণ্টুটা আর মায়াটা—ওরাও কেমন যেন খুশি হয়ে উঠেছে তোর আর আমার পরিচয় দেখে।'

'তাই তো দেখছি!'

রাণীদি এবার বিছানায় আমার সামনে মুখোমুখি বসে পড়ে বললেন, 'এখন বল্ তো বিজন, আমাকে এখানে এইভাবে দেখে তুই কি মনে করলি?'

'মনে আমার অনেক কথাই হয়েছে। কিন্তু তুমি বলো তো—এমন করে তিলক কেটে তুমি বৈষ্ণবী হলে কি করে?'

রাণীদি মৃদু হেসে বললেন, 'তুই গেরুয়া পরে সন্নিসি হয়েছিস্ যেমন করে!'

আমি বললাম, 'আমি তো সন্ন্যাসী হয়েছি নিজের পরিচয় গোপন করার জন্যে!'

'পরিচয় গোপন করার জন্যে?'—রাণীদির চোখে-মুখে কেমন যেন একটা জিজ্ঞাসু ভাব ফুটে উঠল এবং তারই প্রকাশ দেখা গেল তাঁর পরবর্তী প্রশ্নে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি বলছিস?'

'হাঁ।'

হঠাৎ যেন রাণীদি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তারপর কেমন যেন একটা চাপা যন্ত্রণায় বলে ফেললেন, 'তোর মত যদি ওকথাটাও আমি বলতে পারতুম রে বিজন, তা হলেও বোধ হয় শান্তি পেতুম!'

বুঝলাম, কোথায় যেন রাণীদির একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়েছে। ঘরে তাঁর কৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্তি। ধূপ, চন্দন আর

আমোদিত। নাকে তার তিলক। অনেকদিনের পোষমানা রূপ তাঁর শরীরে জড়ানো, অবাধ্য উচ্ছলতায় এখনও সে রূপ ঠিকরে পড়ে। এ অবস্থায় আমার মত পরিচয় গোপন করার জন্য তিনি বৈষ্ণবী সেজেছেন —একথা বলতে পারলেও রাণীদি শান্তি পেতেন—এ কথার অর্থ কি? তা হলে কি বৈষ্ণবী হওয়ার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল না—অথচ বৈষ্ণবী সাজতে বাধ্য হয়েছেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে? না আরও কিছু আছে তাঁর জীবনে?

রাণীদি কেমন যেন এক যন্ত্রণার আবেগে বলে উঠলেন, 'এ জীবনে বিজন, অনেক জ্বালা। তুই যখন এখানে এসেছিস্, তখন সবি জানতে পারবি একে একে—কেন আমি বৈষ্ণবী হয়েছি। কিন্তু একটা কথা তুই আমাকে বল ভাই!'

'কী বলো!'

'হ্যাঁরে, তুই কখনো তোর রাণীদিকে ঘৃণা করবি না?'

বললাম, 'ঘৃণা করব কেন রাণীদি?'

'যদি কোনদিন বুঝতে পারিস তোর —তাহলেও কি তুই ঘৃণা করবি না আমাকে?'

'না। কখনই না।'

বস্তুত মানুষকে ঘৃণা করতে আমি শিখিনি কখনো। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আর নজরুলের যুগে মানুষ হয়েছি আমি। এ যুগে মানুষকে তো ঘৃণার শিক্ষা দেয়া হয় নি—এ যুগে অবারিত উদার আকাশ, দিকহারা, কূলহারা সমুদ্রের অপরিমেয় প্রশস্ত -প্রশান্ত রূপ, এ সবই তো ছায়া ফেলে যেত জীবন-সরোবরের তীরে তীরে। আমি যে জেনেছি মানুষকে ঘৃণা করা মহা পাপ; আমার মনের এ ধারা রাণীদির জানার কথা নয়। তাই নিশ্চিন্তভাবে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বলিস কিরে, তবুও তুই আমায় ঘৃণা করবি না?'

'বলেছি তো রাণীদি', আমি বললাম, 'মানুষ মানুষকে ঘৃণা করলে কেন বলো তো?'

আমার পাল্টা প্রশ্নে রাণীদি কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তুই অনেক লেখাপড়া শিখেছিস, অনেক কথাও তুই জানিস। সব কথা আমি তোকে গুছিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু মানুষ তো মানুষকে ঘৃণাও করে!'

'তা করে হয়তো। কিন্তু কেন তা করে, সে কি তুমি কোনদিন তলিয়ে দেখেছ?'

'মানুষ যদি নরককুণ্ডে নামে, যদি সে পাপ করে, তবে মানুষ তাকে ঘৃণা করবেই।'

'সেখানেই তো আমার মন সায় দেয় না রাণীদি!' আমি প্রশ্ন করলাম, 'পাপ কি মানুষ নিজে করে—না, মানুষের পাপ করার জমি তৈরি করে রাখা হয় বলেই মানুষ পাপ করে?'

রাণীদি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন শুধু, 'কি জানি, আমি এসব ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

বাস্তবিক, পাপ আর পুণ্য, এর কোন সঠিক সংজ্ঞা আমি আজও খুঁজে পাই নি। তবে এই কথাটুকু আমি জানি, পাপই হোক আর পুণ্যই হোক, কোন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তা অনুষ্ঠিত করে না—পাপ-পুণ্য মানুষের সামাজিক পরিবেশের অবদান। যে সমাজে লোভ আর হিংসা, শাসন আর শোষণ, ধনী আর দরিদ্র, উঁচু আর নিচু থাকবে, সে সমাজে পাপ আর পুণ্য দুই-ই থাকবে। পুণ্যলাভ করবে তারা, যারা থাকবে সমাজের ওপরতলায়, আর পাপ করবে তারা, যারা থাকবে নিচু তলায়। তাই পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা কি হবে আমার কাছে এবং তা আমি স্থির করবই বা কোন্ মাপকাঠিতে, সেকথা আমার কোনক্রমেই বোধগম্য হয় না। আর যা আমার কাছে
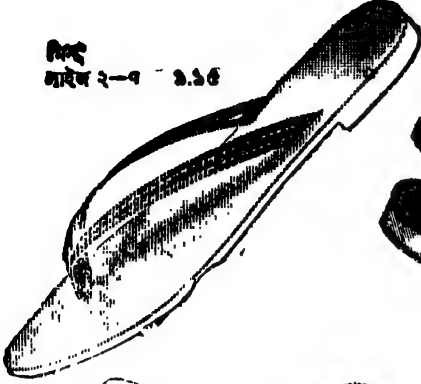
সাইজ ২—৭ ৯.৯৫
সাইজ ০—৬ ৬.৮০
৭—১০ ৭.৯৫
১১—১ ৯.৯৫
সাইজ ৫—৮ ৮.৯৫
৯—১২ ৯.৯৫
Bata
সেবা
সাইজ ২—৭ ১৪.৯৫
আসুন
বসন্ত মেলায়
পথ চলতে পায়ের আরাম, চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম
মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব স্যান্ডাল বা চপ্পলে নিজেকে
আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন।
সুঠাম, কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর মজবুত সোল—
প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম। স্টাইলের বহুমুখী
বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে
স্যান্ডাল ও চপ্পলের নানাবিধ সুদর্শন নকশা।
কো ভাডিস
সাইজ ৪—১০ ২৬.৯৫
ফ্রেসএয়ার
সাইজ ৪—১৩ ১৫.৯০
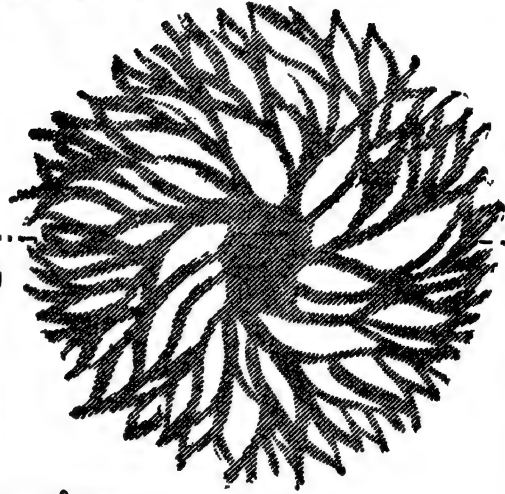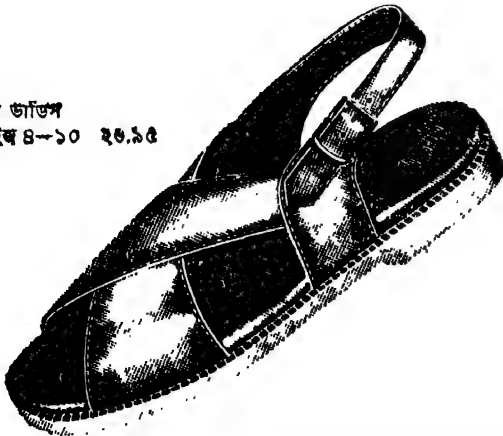
পাপ পুণ্যের কুকাজ-সুকাজের পারমাপ করব, এ মূর্খামি আর যেই করুক, আমি অন্তত করতে পারব না। ঘৃণার বেলাতে সেই একই কথা আমার মনে উদয় হয়।

আমি যখন এই সব কথা ভাবছিলাম, তখন বাইরে থেকে কে যেন এক মহিলা রাণীদিকে ডাকল, 'দিদি।'

'কে!' রাণীদি সাড়া দিয়ে বাইরে গেলেন।

ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে কৃষ্ণ-রাধিকার মূর্তির সামনে ধূপগুলো পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই তার গন্ধ অন্তর্ধান করে কেমন যেন একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে সেটুকু খেয়াল করি নি। এখন বেশ তীব্রভাবে সেটা অনুভব করলাম। বাইরে শুনতে পেলাম রাণীদিকে সেই মহিলাটি বলছে, 'সর্ষে-ভোর কটা গুলি দাও দিদি, তা না হলে আমার হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না—সবগুলো একেবারে পেটফেটে মরে যাবে।'

রাণীদি বললেন, 'চুপ কর পোড়ারমুখি, ঘরে আমার ভাই আছে।'

'ভাই ?'

'হ্যাঁ,'

'দেখি দেখি', বলে মহিলাটি ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আশ্চর্য—দেখলাম কাঁধের ওপর দুটো আর হাতের সঙ্গে দুই বগলে দুটো—মোট চারটে বিড়াল মহিলাটির সঙ্গে। মহিলাটিকে দেখতে অনেকটা পাঁচির মার খোকাকে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় যে মেনকা, তার মত। বয়সও প্রায় তেমনিই হবে। একটু আগে তো কটা আফিমের গুলি যে হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নার জন্যে সে চাইছিল—সেই বহুমূল্য জীবগুলি বোধহয় তার কাঁধের আর বগলেরই হবে বলে অনুমান করলাম। আমি অবাক হয়ে তার হীরে-মুক্তো আর চুনী-পান্নার দিকে তাকালাম।

মহিলাটিও তাকালো আমার দিকে এবং আমারই মত বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'ও দিদি, এ যে সন্নিসি।'

'সন্নিসি তা কি হয়েছে?' রাণীদি বললেন, 'সন্নিসি হলে আর ভাই হতে নেই আমার ?'

'তা কেন?'

রাণীদি তারপর আলমারির নিচে রাখা একটা তোরঙ্গ খুলে তা থেকে একটা কৌটো খুলে চারটে সর্ষে ভোর আফিমের গুলি তুলে নিয়ে বললেন, 'আয় মাধু, তোকে বিদেয় করি আগে—'

মাধু হাত বাড়িয়ে আফিমের গুলিগুলো নিয়ে আবদারের সুরে বললে, 'বিদেয় করবে কেন দিদি—ভাই পেয়েছো বলে?'

রাণীদি তোরঙ্গ বন্ধ করে মাধুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, মাধুর কাজ মিটে গিয়েছিল। তাই সেও তেমনিভাবে হেসে বলে উঠল, 'নাও ভাই নিয়ে তুমি গপ্প করো তবে'...তারপর সে চলে গেল।

তখন ঘরের মধ্যে আগেকার সেই বিশ্রী গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। গভীর রাতে ম্যাগনোলিয়া ফুলের গন্ধের উৎসটা যেমন লাগে, যেমন লাগে সোঁদাল ফুলের চটচটে আঠার গন্ধ, ঠিক তেমনি একটা তীব্র গন্ধ। এইমাত্র রাণীদি তোরঙ্গ খুলে আফিমের কৌটো থেকে হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নার জন্যে যে আফিম বের করে দিলেন, এই গন্ধটার সেই কৌটোর গন্ধের সঙ্গে যেন কেমন মিল রয়েছে বলে মনে হল। হঠাৎ গভীর এক সন্দেহে আমার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারই আবেগে আমি বলে উঠলাম, 'রাণীদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'কি কথা রে ?'

'তোমার ঘরে এ কিসের গন্ধ বলো তো?'

ঝটিতি রাণীদি তাকালেন কৃষ্ণ-রাধিকার যুগল মূর্তির দিকে। ধূপগুলো নিভে গেছে! তাই তো!' আমার দিকে অসহায়ের মত তাকালেন তিনি। মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটা যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে গেল, যা আমার চোখ ছাড়া আর কারো চোখে কোনদিন পড়বে বলে মনে হয় না। তাই তাঁর যন্ত্রণাকে লাঘব করবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'রাণীদি আমি সব বুঝতে পেরেছি। আর কিছু তুমি আমার কাছ থেকে লুকোতে যেও না।'

রাণীদি তেমনিভাবেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার পর সহসা আমার দুই কাঁধের ওপর দুখানা হাত রেখে প্রবলভাবে চাপ দিয়ে বলে উঠলেন, 'তোর রাণীদিকে তুই বুঝতে পেরেছিস ?'

মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা। ভেঙে পড়লেন যেন একেবারে আমার কাছে। টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল আমার কপালে, গালে, বুকের ওপর গেরুয়ায়। তাঁর দুটো হাত ধরে এরপর বসালাম বিছানার ওপর। বসতে বসতে রাণীদি বললেন, 'ওরে বিজন, কতদিন এমন করে কাঁদতেও পারি নি আমি!'

'জানি রাণীদি', সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'তুমি কেঁদো না। আমি বুঝতে পারছি, সমস্ত অতীতটা ভেসে উঠছে তোমার চোখের সামনে। তুমি ভাবছ তুমি কি ছিলে আর কি হয়েছ। মনটা তোমার হু হু করে উঠছে। কিন্তু এ পথ তো তুমি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছো!'

'তা নিয়েছি!'

'তবে ?' যে পথ মানুষ স্বেচ্ছায় বেছে নেয় সে পথের যত দুঃখ, যত কষ্ট সে তো তোমার যন্ত্রণা নয়, সে তো তোমার সাধনার সোপান দিদি।'

'হ্যাঁ, এ পথে আমি এসেছিলাম ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু আমি তো পারলুম না। আমি হেরে গেলুম ভাই—আমি হেরে গেলুম।'

রাণীদি বিছানার ওপর উপুড় হয়ে মাথা রাখল। তারপর কেমন অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

রাণীদির ঘরে কৃষ্ণ-রাধিকার যুগল মূর্তি। সামনে একটা চৌকি। চৌকির ওপর ধূপদানিতে জ্বলে ধূপ। সামনে জড়ো করা থাকে অজস্র ফুল। পাশে থাকে চন্দনের বাটি আর সুবাসিত চন্দন পিঁড়ি। রাণীদির নাকে থাকে তিলক। এই পরিবেশে কে না তাঁকে মনে করবে তিনি পরম বৈষ্ণবী এবং তিনি তাঁর জীবনকে সঁপে দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বেদীতলে? অথচ এইটাই সত্যি নয় তাঁর জীবনে। তাই আমি প্রথমে আসতেই আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন, 'ওরে, তোর মত যদি পরিচয় গোপন করার কথাটাও বলতে পারতুম বিজন, তাহলেও বোধহয় শান্তি পেতুম। হ্যাঁ, শান্তি এতে মানুষ পায় না। কারণ এই ধরনের কাজ—এটা পরিচয় গোপন করা নয়, এটা সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা। প্রবঞ্চক কখনও মনে শান্তি পায় না।' বুঝলাম রাণীদির দুঃখটা কোথায়, জ্বালাটা কোথায়।

একদিন রাণীদির বুকের মাঝে শুয়ে ছেলেবেলায় আমি মানুষ হয়েছি। স্নেহে, যত্নে, আদরে, আবদারে তিনি আমাকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। কে জানে, আজ হয় তো আমার পালা—তাঁকে সেগুলি শোধ দিতে হবে জীবনের এই নতুন রূপান্তরের দিনে। তাই ছোটবোনকে যেমন করে সস্নেহে সান্ত্বনা দিতে হয় দুঃখের দিনে, তেমনি করে উপুড় হওয়া রাণীদির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'ছেলেমানুষের মত কেঁদ না রাণীদি—ওঠো।'

কান্না কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল বোধকরি। একটুখানি উঠলেন তিনি। আবার আমি বললাম, 'ওঠো, চোখ মোছো—মণ্টু বা মায়া এসে পড়লে কি মনে করবে বলো তো? মনে করবে, অতীতে তুমি হয়তো এমন কিছু অন্যায় করেছো বা অপরাধ করেছো, যা তুমি আজ আর ভুলতে পারছ না। তারা তোমায় অন্যভাবে ভাববে।'

এবার সম্পূর্ণভাবে উঠে বসে তিনি বললেন, 'ভাববার আর কিছু নেই বিজন।'

'ওরা সব জানে ?'

'মায়া জানে না। মণ্টু জানে।'

বললাম, 'এ ঘরে গন্ধ যা বেরিয়েছে তাতে তো মনে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে স্টক করেছো!'

'হ্যাঁ।'

'কত হবে ?'

'মণ তিনেক হবে।'

'কে এসব করে?'

'মণ্টু ছাড়া আমার আর কে আছে বল?'

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'মণ্টু আফিম স্মাগল করে?'

রাণীদি আমার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর একটা বাক্সর ওপর থেকে দেশলাইটা নিয়ে নতুন কতকগুলো ধূপকাঠি জেবলে দিতে গেলেন ধূপদানিতে। আমি অবাক হয়ে মন্টুর কথা ভাবছিলাম। অমন সুন্দর সুঠাম চেহারার ছেলেটা, ভাব-ভঙ্গী সহবতে অমন চৌকস—সে ছেলে আফিম স্মাগল করে! কে জানে, এই জন্যেই হয়তো মায়া বলেছিল, ওস্তাদ আর তার সাগরেদ বসন্ত খুব ভালবাসে। হ্যাঁ, সে সময় আমার মনে হয়েছিল, এই যদি তার গুণের পরিচয় হয়, তবে সে গুণ কখনো সগুণ হতে পারে না। এখন দেখছি আমার সে ধারণা আদৌ ভুল নয়।

ধূপ জেবলে রাণীদি বললেন, 'চা খাস তো বিজন?'

'চা খাব না কেন?'

'তবে বোস্, চা করি। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি?'

'না। তুমি কি মনে করো, আমি খুব খাইয়ে মানুষ? আসতেই মিষ্টি-ফিষ্টি একগাদা খাওয়ালে!'

বেলা তখন পড়ে আসছিল। চায়ে চুমুক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মণ্টু এসে পড়ল। স্বভাবসুলভ মিষ্টি হেসে বললে, 'ঠিক সময়েই এসে পড়েছি মাসি।'

'হ্যাঁ বাবা। আসল তাল যদি ফস্কাও।'

মণ্টু তক্তাপোষের নিচে থেকে এক-জোড়া কাপ-ডিস বের করে রাণীদির সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দাও।'

রাণীদি কেটলি থেকে চা ঢেলে দিলেন মণ্টুর কাপে। মণ্টু চা খেতে যেতে বললে, 'মামাবাবু এখন এখানেই থাকবেন তো?'

'এখানে মানে?'

'আমাদের বাড়িতে?'

'তোমাদের বাড়িতে জায়গা কোথায়? জায়গা করো, তারপর থাকব।'

'ঠিক বলছেন তো?'

এমন সময় মায়া ঢুকে বললে, 'কি হয়েছে—আমার দাদাকে কে কি বলছে?'

মণ্টু বললে, 'আমি বলছি—এখানে থাকতে হবে মামাবাবুকে।'

'ইস্', মায়া বললে, 'বললেই হল অমনি। দাদা এসেছে আমাদের বাড়ি। সেখানে আমি আছি, মা আছে। আমাদের মত না নিয়ে কেউ দাদাকে নিতে পারবে না।'

'তাই হবে—তাই হবে', এবার রাণীদি হাসতে হাসতে বললেন। আমি বললাম, 'শেষকালে দেখো ভাগের মা যেন গঙ্গা পায়।' বললে, 'দাদার কি সুন্দর কথা!'

রাণীদি হাসলেন।

এরপর সেদিনের মত বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা তখন সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়েছে। রাণীদি দাওয়ায় এসে বললেন, 'কাল এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি বিজন—সকাল সকাল আসবি।'

'তুমি যখন খাওয়াবে তখন আসতে তো হবেই।'

মায়া বললে, 'নেমন্তন্নটা পাকা করে নিলেন দাদা!'

রাণীদি বললেন, 'তুইও আসিস না নেমন্তন্নয়।'

'আমাকে তো আগে বল নি,' মায়া অনুযোগের ভঙ্গীতে বললে। রাণীদি বললেন, 'নাই বা আগে বললুম—পরে বলছি বলে তুই আসবি না?'

'বাঃ রে আমি সেকথা বলেছি নাকি? নিজের ভাইটিকে আগে বলতে পারলে আর—'

'থাম থাম পোড়ারমুখি। ভাই আমার কত গুণের জানিস্?'

'জানি।'

এরপর আবার সেই পথ। সেই আঁকা-বাঁকা। সেই গোলকধাঁধার মত। দুটো বাড়ির পরই একটা ছেঁচাবেড়ার ঘর, সামনেই দরজাটা। সেখানে আসতেই দেখলাম, সেই মাধু—যে রাণীদির কাছে গিয়েছিল তার হীরে-মুক্তো-চুনি-পান্নার জন্যে সর্বভোর আফিমের গুলী আনতে। মাধু বসে রয়েছে তার মহামূল্য সম্পদ-গুলিকে আগলিয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাকে, 'ওরা তোমার রোজ আফিম খায়?'

'হ্যাঁ।'

'কেন খাওয়াও বলো তো?'

'আপিম খেলে আর কোথাও যাবে না ওরা।'

'কোথাও যাবে না?'

'না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এত বিড়াল পোষ কেন?'

'বিড়াল বড় উপকারী দাদা।'

বিড়াল খুব উপকারী এ তো কই কখনো শুনি নি। তবে, হ্যাঁ—একথা ঠিক গৃহস্থ মানুষেরা ইঁদুরের উৎপাতে মাঝে মাঝে বিড়াল পোষে বটে, কিন্তু খুব যে একটা উপকারী প্রাণী হিসাবে লোকে বিড়ালকে দেখে তা তো মনে হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাধুকে, 'এগুলো তোমাদের কি উপকারে লাগে বলো তো?'

'উপকারে লাগা', মাধু এবার দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আপনি বোস্টুমীদির ভাই—'

'হ্যাঁ।'

'আপনি এখানকার সবকিছু জানেন?'

'জানি।' লাগে তা তো আপনার জানা উচিত।

মাধু এবার মায়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিরে মায়া বল্ না!'

'তুইই বল্ না দিদি!'

মাধুর ভাব দেখে মনে হল, সে ঠিক মনখুলে আমাকে সব কথা বলবে কি না, সম্ভবত সেই কথাই ভাবছিল। তাই তাকে আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'অনেক কথাই তোমাদের এ রাজ্যের আমি জানি। কিন্তু বিড়াল-টিড়াল এসব ব্যাপার তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া তুমি আমাকে নির্ভয়ে সব কথা বলতে পারো। আমি তোমাদের বোস্টুমীদির ভাই এবং মায়ারও আমি দাদা হই।'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

'এখন মায়াদের বাড়ি আছি। তারপর হয়তো এখানেই আর কোন বাড়িতে থাকব।

মাধু এবার আমার কথায় নিশ্চিন্ত হল যেন। সে বললে, 'বিড়াল যে কত উপকারী মায়া তো সেকথা জানে। ওর দাদা শঙ্করকে তো এই হীরের দিদিমা কোহিনূরকে দিয়ে এসেচি।'

'শঙ্কর তো জেলে আছে।'

'হ্যাঁ, জেলেই তাকে দিয়িচি।'

'সেখানে সে কোহিনূরকে নিয়ে কি করবে?'

এবার মাধু একটু হাসল।

ইতিপূর্বে আমিও জেল ঘুরে এসেছি কয়েকবার। সেখানে অবিশ্যি দেখেছি—অনেক কয়েদীই বিড়াল পোষে। দীর্ঘকাল যাদের জেলে থাকতে হয়, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি মানুষের সহজাত যেসব মানবিক গুণ, সে সব প্রকাশের পক্ষে তাদের আর কোন অবলম্বন থাকে না, তাই বিড়ালকে কেন্দ্র করেই তারা তা মিটায়। কিন্তু তাছাড়া আর বিড়ালের কি উপ-কারিতা আছে তা তো তেমন করে দেখি নি কোনদিন।

মাধু বলল, 'এসব বেড়াল আমার তালিম দেয়া আপিম খাওয়ানো বেড়াল। জেলখানায় ওস্তাদের লোকেদের এরা খুব সাহায্য করে।'

'কি রকম?'

'জেলখানার য-কোন ছোট ফোঁকর, তা সে নর্দমাই হোক, আর জানলার ঘুলঘুলি হোক, ফুস করে গলে যেতে পারে। অনেক সময়ে এদের গলায় চিঠি বেঁধে দিই আমরা, আর সে চিঠি ঠিকভাবে পেঁছিয়ে গিয়ে মালিকের কাছে। তাছাড়া গাঁজা, আপিম, চরস, কোকেন এদের গলায় বেঁধে দিয়ে জেলের ভেতর চালানও করি আমরা।'

সেইখানে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় মাধুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম তার কথা শুনে। এই অভিশপ্ত জগতের রহস্যকাহিনী যেন ধীরে ধীরে আমার কাছে ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের মত

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এবার যাঁদের মতামত উপস্থিত করছি, তাঁদের মধ্যে একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, একজন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যজন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রী। এঁরা সকলেই দীর্ঘকাল শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত আছেন। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক এঁদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট। এই সব বক্তব্যে প্রগতিশীলতার অভাব যেমন আছে—তেমনি আছে যথেষ্ট দায়িত্ববোধের পরিচয়। আশা করি বক্তব্যের নূতনত্ব শিক্ষানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

**প্রশ্ন**—ফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে কোনও পরিবর্তন আনতে পেরেছে কি?

**শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু (অধ্যাপক)**—শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের বেশি অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এই পরিবর্তন সামান্য। মূলগত কিছু নয়।

**শ্রীমতী ননীবালা বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষয়িত্রী)**—পঠন-পাঠনের দিক থেকে কোনও পরিবর্তন আসে নি। তবে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বেশি অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। শুনেছি মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত ও সুশৃংখল করার জন্য বহু পুরাতন পরীক্ষককে আর এবার খাতা দেখার সুযোগ দিচ্ছেন না। বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকেই সেই বিষয়ের খাতা দেখতে দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীর নিরাপত্তা বেড়েছে। শিক্ষকরা এখন ৬৫ বছর পর্যন্ত চাকুরী করতে পারবেন।

**শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুন্সী (প্রধান শিক্ষক)**—১৯ ও ২০শে ফে. ১৯৬৯ সালে ফ্রন্ট যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে, তার একটিও কার্যকরী করা হয় নি। আগে যা ছিল—শিক্ষা ব্যবস্থা আজও তাই আছে। আমার মনে হয়, অবস্থা আগের থেকেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে খারাপ হয়েছে। বিদ্যালয়ে ঘেরাও-এর প্রয়োগ হচ্ছে। বিদ্যালয়ে ঘেরাও ইত্যাদি আমি মোটেই পছন্দ করি না।

**প্রশ্ন**—আচ্ছা, বিদ্যালয়ে ঘেরাও হয় কেন?

**শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুন্সী:** বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নানারকম দুর্নীতি আছে। এই দুর্নীতির কোনওরকম প্রতিকার না হওয়ায় ছাত্র ও অভিভাবকেরা ঘেরাও-এর পথ নিচ্ছেন।

**প্রশ্ন**—অভিভাবকরাও ঘেরাও করেন?

**শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুন্সী:** কয়েকটি ক্ষেত্রে হয়েছে।

**প্রশ্ন**—বর্তমানকালের ছাত্রদের মান সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

**শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু:** ১৮।১৯ বছর শিক্ষকতা করছি। আমার নিজের ধারণা যে সাধারণ মান নেমেছে। আগের তুলনায় খুব ভাল ছেলে পাচ্ছি না। তবে ক্লাশে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে ছেলেদের আগের তুলনায় মনোযোগ কোনও মতেই কম নয়। জানলার তলায় বোমা ফাটলেও ছেলেরা ক্লাশ ছেড়ে যাচ্ছে না। এটাও একটা ঘটনা যে এখন ছেলেরা ছুটি চায় না।

এখনকার ব্যবস্থায় নবম শ্রেণী থেকে ছেলেদের যে কোর্স নিতে হয়—সেটা তাদের গুণানুসারে তারা পায় না বা নেয় না: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের তাগিদে নেয়। পরে সেই শিক্ষাপথ থেকে সরে আসার আর উপায় থাকে না। আগে ছেলেরা দশম শ্রেণীর পর বিজ্ঞান বা কলা নির্বাচন করত। অনেক ভাল ছেলেই বিজ্ঞান নিয়ে দু' বছর পড়বার পরে নিজের মন বা রুচি অনুযায়ী কলা-বিভাগে আসত। এবং সেহেতু আমরা আমাদের বিভাগে সব থেকে ভাল কিছু ছেলে পেতাম। এখন ছেলেরা শুধু নোট বা পরীক্ষা সহায়ক বইগুলির বাইরে কিছু পড়তে চায় না। ফলে মোটামুটি একটা সাধারণ মান বজায় আছে বটে, তবে নিজস্ব চিন্তার দীপ্তি দেখা যাচ্ছে না।

**প্রশ্ন**—বর্তমানের পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া উচিত নয় কি? 'প্রাইভেট' পরীক্ষা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

**শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু:** পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। এটা বৃটিশ পদ্ধতিতে—যাকে অর্থনৈতিকভাবে নিতান্ত অনগ্রসর দেশগুলি বহু কাটাছাঁটা করে বহু আগে নিয়েছিল এবং এখনও বজায় রেখেছে।

প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা রাখা হবে কি না হবে সেটা একটা বৃহৎ সমস্যা। এবং তার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রশ্ন যুক্ত। উচ্চ শিক্ষার জন্য এই ব্যাকুলতার মূলে গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদই প্রধান। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার চরম নমুনা এখানে পাই। অধিকাংশই এম-এ পাশ করতে চায়, যদি সেই সার্টিফিকেটটা বুকে এঁটে স্কুল ফাইন্যাল বা তারও নিম্নযোগ্যতার চাকুরী তারা যোগাড় করতে পারে।

প্রাইভেটের সঙ্গে রেগুলার ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে সমপর্যায়ে বিবেচনা করা রেগুলারদের প্রতি ঘোরতর অবিচার। বর্তমানে অন্তত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনার্স পাশ করে আসতে হয়। তারপরে দু' বছর বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের কাছে পড়তে হয়। এর ফলে যতখানি

---

**সবিনয় নিবেদন**

স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় হরপ্রসাদ মিত্রের 'বই বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা', সুশীল জানার 'সাগর সঙ্গমে' এবং কয়েকটি নিয়মিত ফিচার ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা গেল না। —সম্পাদিকা

---

তারা জানতে পারে, পরীক্ষায় ফেল হয় না। প্রকাশ করতে পারে—তবু তার মূল্য যথেষ্ট। কিন্তু বেশির ভাগ প্রাইভেট ছাত্ররা কতকগুলি প্রশ্ন মুখস্থ করে, তার বাইরে কিছু না জেনে, ঐ প্রশ্নগুলি পরীক্ষায় এলে পাশ, না এলে ফেল করে—উভয়ে কখনও সমপর্যায়ের হতে পারে না। যদি ক্লাশে অধ্যাপনার কোনও মূল্য আমরা দিই—তা হলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—ঐ অধ্যাপনার ভিতরে যারা আসতে পারল না তারা কখনই যারা আসতে পেরেছে—তাদের সমতুল নয়।

**শ্রীমতী ননীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ** পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। সব স্কুলগুলিকেই সরকারী স্কুল করা উচিত। সরকারী স্কুলের সুযোগ-সুবিধা সব স্কুলকেই দিতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে লাইব্রেরী ল্যাবরেটরী প্রভৃতির বেশি সুযোগ দিয়ে ছাত্রদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। 'কিউমুলেটিভ' রেকর্ড রেখে তার ভিত্তিতে ছাত্রের ফলাফল নির্ধারিত হওয়া উচিত।

শিক্ষককে কখনই একাধিক বিষয়ে পড়াতে দিয়ে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। একাধিক বিষয় পড়াতে হলে কোনও বিষয়েই সুষ্ঠুভাবে পড়ানো যায় না।

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য কখনও রেগুলার ছাত্রদের সমপর্যায়ের প্রশ্ন করা উচিত নয়। প্রাইভেট ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে—তাতে স্কুলের এবং মধ্য-শিক্ষা পর্ষতের লাভ হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনও উপকার হয় না। পরীক্ষার মান যে নেমে যাচ্ছে—তাতে সন্দেহ নেই।

**শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুন্সী ঃ** পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। খানিকটা 'অবজেক্টিভ টাইপ' পরীক্ষা হওয়া উচিত। ৩ মাসে অন্তত একটি পরীক্ষা নিতে হবে। এবং এই পরীক্ষা-গুলির ফলাফলের ভিত্তিতেই ছাত্রের মান নির্ণয় করা দরকার।

বর্তমানে পরীক্ষার নামে যে প্রহসন চলছে, আমি মনে করি শিক্ষকরাই এ অবস্থার জন্য দায়ী। শিক্ষকরা যদি ভাল করে পড়ান তবেই এটা বন্ধ হবে। দুঃখের বিষয় শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই টিউশনী করেন, ছাত্রদের 'সাজেসশন' দেন। এ ছাড়াও পরীক্ষা ক্ষেত্রে নানারকম দুর্নীতি আছে।

আমি মনে করি না যে স্কুল বা কলেজ পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফিকেট দিলে ভাল হবে। এ ব্যবস্থা কখনই প্রচলিত হওয়া উচিত নয়। প্রশ্ন করবেন বোর্ড বা [illegible]। খাতাও ও'দেরই বিচার করে দেখতে হবে। সবার বড় কথা পরীক্ষা যে প্রকৃতই পরীক্ষা, ছাত্রদের কথা বুঝতে দিতে হবে। কাজেই পরীক্ষা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করা উচিত।

**প্রশ্ন**—মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রায় ২০০টি স্কুলের কমিটি বাতিল করে অ্যাড-মিনিস্ট্রেটর বসিয়েছেন। এটা কি গণতান্ত্রিক হয়েছে?

**শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুন্সী ঃ** ১৯৫০ সালে প্রথম মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ তৈরি হয়। শ্রীঅপূর্ব চন্দ, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, ডঃ ত্রিগুণা সেন তখন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পর্ষৎকে বাতিল করা হল ১৯৫৪ সালে। তারপর একাদিক্রমে ১০ বছর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পর্ষৎ পরিচালনা করে-ছেন। ১৯৬৩ সালে যে নতুন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ আইন তৈরি হল—তার ফলে এক অ-গণতান্ত্রিক পর্ষৎ গঠন করা হল—এবং সেই পর্ষৎও ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অক্ষম হল। বিদ্যালয়গুলিতে দুর্নীতির স্রোত বইতে থাকল। এরই ফলে শিক্ষকদের নেতা ও বর্তমানের শিক্ষা-মন্ত্রী দুর্নীতি রোধের জন্য শিক্ষা পর্ষৎ মারফৎ বহু স্কুলের পরিচালক সমিতি বাতিল করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেছেন। এ পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রশ্ন থাকে, কেন তিনি ঐ দুর্নীতি-গ্রস্ত পরিচালক সমিতিগুলির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি? শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ প্রসঙ্গে অনেকের মনেই নানারকম প্রশ্ন উঠছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অধিকাংশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরই যুক্ত—এও একটি সংশয়ের কারণ।

**শ্রীমতী ননীবালা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ** অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ কিছু চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়। যে সব স্কুলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসানো হয়েছে, সে সব স্কুলে নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ ছিল।

**প্রশ্ন**—ছাত্রসংস্থাগুলি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

**শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুন্সী**—ছাত্রসংস্থা-গুলি এখন আর ছাত্রদের সং হতে বলছে না। এর মূল কারণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়া এদের আর কোনও লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। সমাজ-সেবামূলক কাজে আগ্রহ অনেক কমে গেছে।

**শ্রীমতী ননীবালা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ** এতে ছেলেরাই বেশি মাতামাতি করে। মেয়েদের স্কুলে বা কলেজে ইউনিয়ন থাকলেও তা তেমন জোরদার নয়।

## ভারতবর্ষ

[২১২৪ পৃষ্ঠার পর]

শাল চেতনাও এই কাজে সর্বতোপ্রকারে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজও তরুণ প্রগতিপন্থীরা প্রস্তুত। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধীকে লক্ষ্যচ্যুত করার যে-কোন প্রচেষ্টাও তাঁরাই সমবেতভাবে রুখবেন। আর সে আওয়াজ এখনই উঠেছে। সেই সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টিও যদি সংবিধানে সংশোধিত আকার গ্রহণ করতে পারে, তাহলে শ্রীমতী গান্ধীর উপযুক্ত সদিচ্ছা থাকলে বরং আরও অগ্রগতিই সম্ভবপর হবে। সেক্ষেত্রে দেশের রক্ষণশীলগোষ্ঠী হয়ত হাত কামড়াতেই বাধ্য হবেন। "প্রিভি পার্স" সংক্রান্ত মামলারও একটা দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হবে।

চোদ্দ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে। অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পি সি শেঠী পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন, ব্যাংক জাতীয়করণ প্রশ্নে সরকার এক পাও পিছিয়ে যাবেন না।

শাপে বর। আর এক লাভ এই যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন কেবল-মাত্র ১৪টিই নয়, দেশী-বিদেশী সমস্ত ব্যাংক জাতীয়করণের হাওয়া বইছে। এমন কি অর্থমন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শ-দাতা কমিটির অধিকাংশ সদস্যই দাবি করেছেন, বিদেশী ব্যাংক সমেত সকল ব্যাংককেই রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণীত হোক।

---

## আন্তর্জাতিক

[২১২৫ পৃষ্ঠার পর]

কফি খেয়ে রয়েছে, ৪৮ ঘণ্টা তার ঘুম হয় নি। তাই সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত।

ব্রিটেন নিজের নাগরিকদের, ব্রিটিশ পাশপোর্টধারীদের সঙ্গে এ জঘন্য ব্যবহার করছে কেন? কেন দায়িত্ব পালনে এ অনীহা! এশীয়দের প্রতি এ মনোভাবের প্রধান কারণ কি এই নয় যে, কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে জন্মানো তাদের পক্ষে অপরাধ হয়েছে? মানবতাবোধের দিক থেকেও রঞ্জনকে কি আরো আগে প্রবেশাধিকার দেওয়া যেত না?
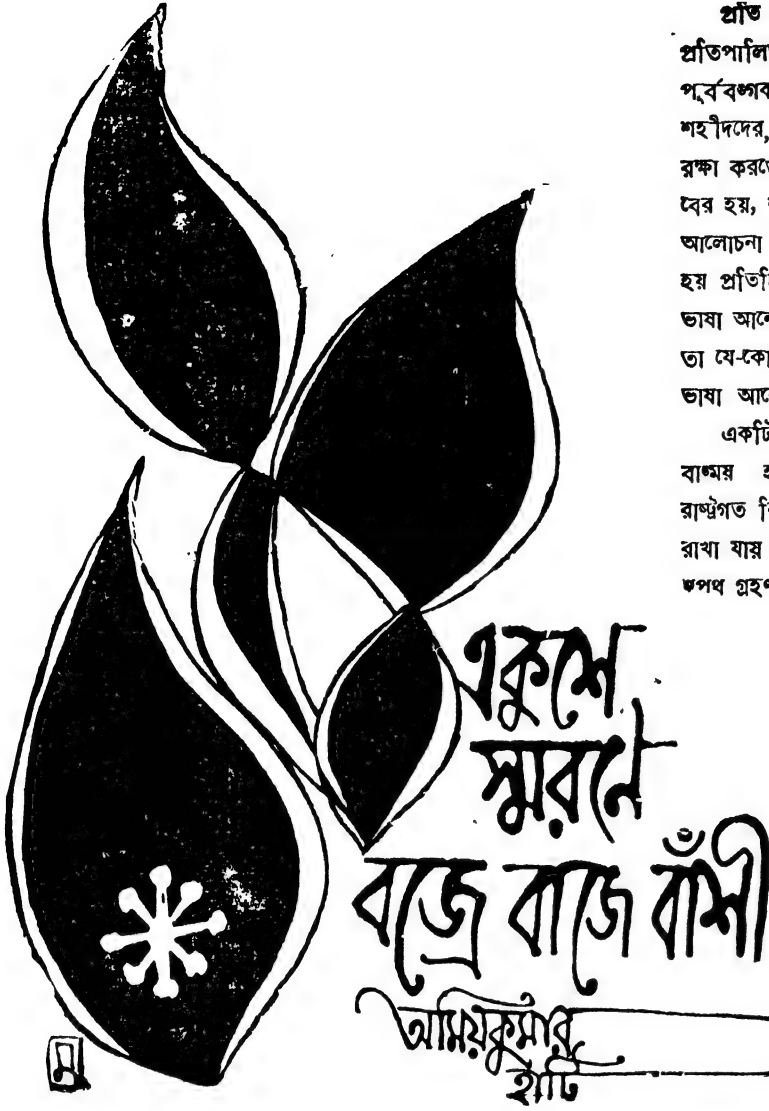
আগুনঝরা, রক্তক্ষরা দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২। মধুর মুখর ভাষা, মুখের ভাষা, মাতৃভাষা কেড়ে নেবার জঘন্য চক্রান্ত করেছিল স্বার্থান্বেষী শাসক, একটি জাতির সংস্কৃতিকে হত্যা করে তাকে চিরতরে মূক, ম্লান ও পঙ্গু করে দেবার জন্যে। সে হীন ষড়যন্ত্রকারীর দল মুখের মতো জবাব পেয়েছিল। যথেচ্ছাচার, বীভৎস দমননীতি ও ধর্মের বুলি আউড়েও তারা রেহাই পায় নি। শত শহীদের আত্মদান নিষ্ফল হয় নি। পূর্ববঙ্গের মানুষ বীরের মতোই তাঁদের মায়ের সম্মান রক্ষা করেছেন। মাতৃভাষার মর্যাদা কেমনভাবে রাখতে হয়, জগৎবাসীকে তা জানিয়েছেন। দিনটি পূর্ববাংলার আত্মপ্রতিষ্ঠার দিন, পূর্ববঙ্গবাসীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ়ীকরণের দিন। স্মরণীয়, বরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী।

শুধু পূর্ববঙ্গবাসীদেরও নয়, পশ্চিমবঙ্গের জনগণেরও উচিত যথোচিত সাড়ম্বর শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার সঙ্গে এই দিনটি পালন করা। আমাদের প্রতিবেশী ভাইরা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে সাহস দেখিয়েছেন, যে আত্মবলিদান দিয়েছেন, যে বিজয়লাভ করেছেন, তা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে, নতুন করে দেশজননীকে, দেশের ভাষাকে

প্রতি বছর এই দিনটি পূর্ববঙ্গে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিপালিত হয়। একটি চেতনার জোয়ার বয়ে যায়। পূর্ববঙ্গবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন সেই সব শহীদদের, যাঁদের আত্মত্যাগ তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে পেরেছেন। এই উপলক্ষে শহরে, গ্রামে মিছিল বের হয়, শহীদ বেদী নির্মাণ করা হয়, আয়োজন করা হয় আলোচনা চক্রের, জনসভার। অসংখ্য কবিতা, প্রবন্ধ লেখা হয় প্রতিটি পত্র-পত্রিকায়। ১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন নিয়ে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, একত্র করলে তা যে-কোন মহাকাব্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন মহাকাব্যের বিষয়বস্তুই।

একটি জাতির ইতিহাস এই একটি তারিখকে ঘিরে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, নতুন পথ আর গতি পেয়েছে। রাষ্ট্রগত বিদ্বেষের ধুয়া তুলেও প্রাণশক্তিকে অবদমিত করে রাখা যায় নি। প্রতি বছর এই দিনটিতে নতুন করে তাঁরা শপথ গ্রহণ করেন মাতৃভাষাকে বুকে আগলে রাখার জন্যে।

দুই বঙ্গের মধ্যে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এখনও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান কার্যত বন্ধ। ওখানকার পত্র-পত্রিকা, উপন্যাস, গল্প, কবিতার বই আসা বন্ধ হয়ে গেছে। ওদেশেও এখানকার বইপত্র সম্ভবত একরকম নিষিদ্ধ। আমরা ইচ্ছা করলে ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী, রাশিয়ান—যে-কোন ভাষার বইপত্র যোগাড় করতে পারি—কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাংলা বই সংগ্রহ করা দুষ্কর। এর মতো দুর্ভাগ্য আর কি আছে? অথচ একটি আশ্চর্যের কথা, যে সব খবর, বই বা পত্র-পত্রিকা কোনরকমে এখান-ওখান থেকে সংগ্রহ করতে পারছি, সেগুলি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে, দুই বাংলার সংস্কৃতিক প্রবাহের গতি একই দিকে প্রবহমান—একে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রশক্তিরই নেই। কিভাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক তথা মানসিক যোগাযোগ সহজ ও সাবলীল করা যায় ও অক্ষুণ্ন রাখা যায়, সেই প্রশ্ন দুই বাংলার বুদ্ধিজীবীদের সামনে রাখছি।

আয়ুবশাহীর নাভিশ্বাসের সময় এবং তার পরে গত বছরে গণ-আন্দোলনের ঢেউ-এ উত্তাল হয়ে উঠেছিল পূর্ব-বঙ্গ। সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়েছিল। পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের সজীবতা ও জনমানসের সঙ্গে তার যোগসূত্রই দেখতে পাই এইসব রচনার মধ্যে। যে সব কবি পূর্ববঙ্গে এখনও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পান নি বা যাঁদের নামের সঙ্গে আমরা খুব বেশি পরিচিত নই, সেই রকম কয়েকজন কবির প্রতিভাদীপ্ত সতেজ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ওদেশের প্রগতিবাদী কয়েকটি পত্র-পত্রিকায়। এঁদের কণ্ঠে একই সুর অনুরণিত হয়ে উঠেছে—

(১) ......'প্রহর

প্রতীক্ষারত নিশ্চিত ধ্রুবতারা তাই—
প্রসূত রক্তের সাথে মিতালী পাতাই।'

(২) 'আর
দিকে দিকে
মিছিলের কোলাহল
আর আছে
রক্ত শপথ মুখে মুখে।'
('একুশের রাজপথ'—জহুরুল আলম চৌধুরী)

(৩) 'গণমুক্তির বিশ্বাসে আমরা প্রস্তুত
মিছিলে মিছিলে চমকায় বিদ্যুৎ।'
('আমরা প্রস্তুত'—গোলাম কিবরিয়া)

স্নেহময় 'মা'কে আবেগে আপ্লুত কবিরা স্মরণ করেছেন—

(১) 'অসহ্য উজ্জ্বল জ্যোতিতে শুধু ভাস্বর হয়েছিলো—
স্নেহময় আমার মায়ের মুখ'
('আমার মা—রক্ত কপোতের জন্য'—সাঃ মঃ হেদায়েতউল্লাহ)

(২) 'ভোরের প্রথম সূর্য থেকে
জোছনার বানে ভেসে যায়—এদেশের প্রাণবন্ত
আকাশের তারা
জীবনের ছোঁয়া লাগে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের সোনালী
ফসলে
আর সহস্র শিশুর কণ্ঠে ডেকে ওঠে মা! মা!'
('একুশের ইতিবৃত্ত'—মুহম্মাদ আব্দুল হান্নান)

(৩) ...'তোমাকে ভুলতে পারে না
এদেশের কোটি সন্তান।
তোমার সম্মান বাঁচাতে তাই—
জীবন বিসর্জন দেয় বাংলার বীর
শহীদ বরকত, ছালাম জব্বার,
নাম না-জানা আরো অনেকে।'
('বাংলা মায়ের ভাষা'—আবদুস শহীদ)

বহু কিশোর কবিতা লিখছে একুশে ফেব্রুয়ারীকে নিয়ে। এ যে বীর প্রণামের দিন—বীর হবার জন্যে শপথ নেওয়ার দিন! এই রকমের অনুপ্রেরণা দেখেছি ভিয়েৎনামের শিশুদের মধ্যে। চাচা হো চি মিনের নামে তারা ছড়া লেখে, গান বাঁধে, স্মরণ করে তাদের সংগ্রামী পূর্বসূরীদের। আমাদের দেশের কিশোর কবিরাও বীর-বন্দনায় মুক্তকণ্ঠ। পূর্ববঙ্গের এক কিশোর কবির কণ্ঠ শোনা যাকঃ

| | | |
|---|---|---|
| 'আজ একুশে | মায়ের ভাষা | জীবন পণ |
| শহীদ দিবস | প্রাণের আশা | মোদের পণ |
| রক্ত ওঠে | কেড়ে নিলে | মোদের মন |
| উড়ছে কপোত | সাহস তোমার | সুনির্ভীক |
| নিচ্ছে শপথ | ছিঁড়ে যাবে | নতুন গান |
| শক্ত ঠোঁটে | গাঙ-চিলে | নতুন প্রাণ— |

মুখর আজ চতুর্দিক'
('একুশের ছড়া'—আলতাব আলী হাসু)

"নিনাদ" নামে একটি একুশের সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯-এ। প্রকাশক হিলালউদ্দীন। এতে সেখানকার সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ এবং ওদেশের কবিদের কয়েকটি অতি অপূর্ব কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁদের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য কিরকম, অনুধাবন করা যাক—

'সংগ্রামের ভাষা মাতৃভাষা' প্রবন্ধে মালেকা বেগম উপসংহারে বলছেন—"আঘাত আসবে নতুন করে মুখের ভাষা কেড়ে নেবার, আঘাত আসবে এই মুখের ভাষা যারা জিইয়ে রেখেছে তাদেরকে সংগ্রাম থেকে সরিয়ে রাখার। কিন্তু সংগ্রাম আজ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা জানায়, সেই অবহেলিত জনগণ আর তার সংগ্রামের ভাষা মুখের ভাষাকে শতমূল্যে বিস্ফোরিত করে দেবে।"

প্রখ্যাত সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত 'ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত' প্রবন্ধে লিখছেন—"বাংলা ভাষা আন্দোলন আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। গত ১৮ বছরের পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের ধ্রুবতারার মতো পথ দেখিয়েছে। ভবিষ্যতেও ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের ধ্রুবতারা থাকবে।"

সৈয়দ আবু জাফর মূলে যাবার চেষ্টা করেছেন, 'গণ-অভ্যুত্থান ও এগার দফা প্রতিষ্ঠার পথ' প্রবন্ধে বলছেন—"...রাষ্ট্রক্ষমতা স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে যতক্ষণ থাকবে, সে পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামকে খুবই জোরদার রাখতে হবে। নিছক কথায় কাউকে বিশ্বাস করে বসে থাকা যায় না।"

আব্দুল হালিম 'সমাজতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ছাত্র সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা—কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের কলুষ পরিবেশে তা সম্ভব নয়। সে সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে।"

আনিসুজ্জামান তাঁর '২১শে ফেব্রুয়ারী' শীর্ষক প্রবন্ধে এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন—"বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার কর্মসূচী ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারীর একমাত্র লক্ষ্য। এমন কর্মসূচীভিত্তিক একটি দিন একটি জাতির ইতিহাসে যুগান্তরের কাল বলে বিবেচিত হল কেন? তার কারণ এই যে, ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত ছিল কতকগুলি মূল নীতির প্রশ্ন। সেই মূল নীতিগুলিই আমাদের জাতীয় জীবনে তরঙ্গ তুলেছে বার বার, প্রশ্ন তুলেছে, সমাধান খুঁজেছে, মীমাংসা পেয়েছে।...২১শে ফেব্রুয়ারী একই সঙ্গে সংস্কৃতি চেতনার প্রকাশ ও বিকাশের দিন। তাই, ১৯৫২ সালের পর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে-কোন চক্রান্তই ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্যে আরবী ও রোমান হরফের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, হরফ সংস্কারের প্রচেষ্টাও সাধারণের সমর্থন পায় নি। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশবাসী সচেতন হয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে এই সদাজাগ্রত মনোভাবই রবীন্দ্র-বিরোধী সকল কর্মকৌশলকে পর্যুদস্ত করেছে।...এ জন্যেই মনে হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী শুধু কর্মসূচীভিত্তিক আন্দোলনের দিন নয়, তা আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার দিন, আত্মসাক্ষাৎকারের

দিন, আত্মবিশ্বাসের দিন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শুভ সূচনার দিন। ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবিস্মরণীয় রক্তবর্ণ দিন।"

এই সঙ্কলন পুস্তিকাটিতে যে কবিতাগুলি রয়েছে, তার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য পংক্তি থেকে অনুবাদ করা হায়দার আলীর কবিতাঃ

—'তুমি নিজের বুকের দরদের উষ্ণতা আনো
আমি কবিতার আগুন নিয়ে আসছি—
আমি অন্ধকার রাতে বুকে জ্বলবো—
এ রাতকে জ্বালিয়ে দেবো।

(অনুবাদক—মাহম্মদ আল জা

মাসুদ আহমেদ মাসুদ করছেন শহীদের স্মৃতি-তর্পণ—

'তোমরা জেগে আছো দেওয়ালের মতো—
তোমরা গান গেয়ে গেয়ে ছড়িয়ে আছো।
তোমাদের জন্যে আমার ভালবাসা সকল সফল'

('নিহত একজনের উক্তি')

শুভ রহমান স্মরণ করছেন সেই গণ-জোয়ারকে—

'সারাটা শহর মিছিল মিছিল, সারা ময়দান গণ-জোয়ার
লাঠির বুটের গুলীর জবাবে আছড়ায় সারা দেশ
সারা পথে পথে ভয়াল ভ্রূকুটি গুলীর গ্যাসের ধোঁয়ার।'

('কালোর আলোর ফাগুন')

মতিউর রহমান ঘোষণা করছেন, সেদিনের বিক্ষুব্ধ ঊর্মির গান আজও প্রেরণা জোগাচ্ছে—

'সেদিন শহরের বিক্ষুব্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় ছিল
ঊর্মির গান। সে গান হৃৎপিণ্ডে দিয়েছিল
ক্রুদ্ধ ঢেউ-এর তাল।
সে গান আজও ছড়ায় অগ্নিস্রোতের বান।

('সেদিন শহরে',

কাজী হাসান হাবিবের চেতনায় জেগে উঠেছে জন্মভূমি—

'তুমি আমার চেতনায়, আমার সত্তায় অতলান্ত উচ্চারণ
অনবরত তোমাকে ঘিরে মনে হয়—সূর্যের তাপে আমি
সঞ্চারিত।
ছায়া ছায়া স্মৃতি, পাখীদের মিছিল, উপমায় আনর্ন্দেয়ন
তুমি আমার জন্মভূমি।' ('প্রতীক্ষার দহনে')

মনোয়ার নিজেকে ঋণী ভেবে প্রস্তুত হচ্ছেন—

'এ পথে অনেক ঋণ রয়ে গেছে বাকী
এ পথ আমার পথ
কিছু তার শোধ দেব আমি।'

('একুশের পথ')

শামসুর রহমানের 'পুলিশ রিপোর্ট' নামে দীর্ঘ কবিতাটিতে আছে—তাজা তরুণের রক্ত দু'হাতে মেখে ব্যারাকে ফিরে এসে পুলিশ কিছুতে তার হাত থেকে রক্তের দাগ মুছতে পারছে না, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই—

'মুছোতে পারি না আমি কিছুতেই

[illegible]
কেমন উৎকট গন্ধ জেগে রয় সকল সময়
আমার দু'হাতে আর সমস্ত শহরে।
সারাটা শহর যদি কেউ দিত ঢেকে
অজস্র সুগন্ধি ফুলে, তবে দু'টি হাত গোপনে লুকিয়ে
রাখতাম সুরভিত ফুলের কবরে সর্বদাই।'

সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একুশে স্মরণে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেছেন—"বজ্রে বাজে বাঁশী"। প্রতিনিধি স্থানীয় ১৭ জন কবির কবিতা আছে এটিতে। এই সুসংকলিত কাব্যগ্রন্থটির পূর্বাভাসে বলা হয়েছে—"ঊনসত্তরের একুশে সংগ্রামের নতুন প্রেরণা নিয়ে বাংলার জনমনে দীপ্ত আভার আলোক সঞ্চার করেছে। একুশের ভাষা-সংগ্রাম আর বাঙালী সংস্কৃতির স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামও বর্তমানে এক অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকা আজকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নতুন সংগ্রামের দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করবে।"

কয়েকটি কবিতায় কবিরা স্বৈরাচারী জঘন্য শাসনের ভয়াল মুখোশ খুলে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, ইতিহাসের ধারায় বিচার করেছেন সময়কে, অত্যাচার আর অত্যাচারীর অন্তিমকাল ঘোষণা করেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেঃ—

(১) 'তোমার ছোঁয়ায় খরায় পুড়ে গোটা দেশ যে
মাঠ হয়েছে আজ
সেই মাঠেতেই নীলাম হচ্ছে তোমার মাথার তাজ।
হয়ত এখন বর্গী মুখের আদল
নিজের মুখে চিনতে পেরে—
বুকে বাজছে বিসর্জনের মাদল।'

('ইতিহাসের নীলাম'—সিকানদার আবু জাফর)

(২) সিংহাসনে ক্যানিউট—
চারপাশে চাটুকার অমাত্যের ভীড়;
হুজুরের ক্ষমতা অসীম, এবার আদেশ দিন
ফিরবে সমুদ্র তরঙ্গ মৌলি।
......অনেক দূরের গ্রাম থেকে
শহরে এসেছিল
শহীদ মিনারে ফুল দেবে তারা
সহসা অবাক হল চেয়ে,
অবাক হবারই পালা—
এখন প্রতিটি হৃদয় সংগীনবিদ্ধ
প্রতিদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী

('শেষ সংবাদ'—সন্তোষ গুপ্ত)

(৩) ইতিহাস
সব হিংস্র ষড়যন্ত্র
করে দেয় ফাঁস
ইতিহাস
জঘন্য বদমাশ

('মৃত হিটলার বলছেন'—আখতার হুসেন)

সেদিন কথায় কথায় অপর্ণা দেবী বলছিলেন—
"বাড়ীর গিন্নির সবদিকে নজর রাখতে হয়, তাই নিজের শরীরটা আগে ঠিক রাখা দরকার।"
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink for strength and vigour
450g
Bensons-144 Ben

(৪) দ্যাখো আর দেরী নেই—
এখুনি নামবে যেন সাঁড়াশীর মত
সেই মন্দ্রিত আক্রোশ
ধরবে সিংহের হিংস্র অবাধ্যতা দিয়ে
সেই সব কাপুরুষ প্রহরীকে যারা
অরণ্যকে না পুড়িয়ে পোড়ায় শ্যামল শস্যক্ষেত।
('অরণ্য পোড়ানোর গান'—এনামুল হক)

আশ্চর্য মমতায় সেই দামাল ছেলেগুলোর কথা বলছেন শামসুর রহমান, যারা ঘরের বন্ধনে ধরা দেয় নি, হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। লাঠিতে ভর করে বুড়ো অর্থাৎ জরাজীর্ণ অচলায়তনের কর্তা ভেবেছে, এসব পাগলামি নাকি?

'কেন সে দেয় না ধরা', ভাবেন লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ো,
নইলে কেউ বুঝি
মিটিঙে মিছিলে যায় যখন তখন? সব পুঁজি
খোওয়ায়; জ্বরের ঘোরে তাড়ায় বনের মোষ,
জীবনের সকালবেলায়
গোলাপের মতো প্রাণ জনপথে হারায় হেলায়?
(ছেলেটা পাগল নাকি?)

মাতৃভক্ত বীর শহীদদের কথা ভাবতে গিয়ে আহত স্বদেশের জন্যে চেতনায় শুধু জ্বালাই ধরে নি, (১) তাঁরা জেনেছেন, সেই আগুনের কুঁড়িগুলি
আজ মঞ্জরিত (২),
ফুল হয়ে শহীদরা সকলের বুকের মধ্যে
ছড়িয়ে পড়েছেন,
জনে জনে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন অমৃতের স্বাদ (৩)—

(১) চেতনায় এখনও জ্বালা ধরায়
কতিপয় নিহত কোরক,
অথচ অমরতার উজ্জ্বল উদ্যানে
যাবোই এমনি এক চিন্ময় চেতনা
সফল গান হয়ে গেল স্বদেশের কণ্ঠেঃ
আহত স্বদেশ এখন আন্দোলিত
উদ্বেলিত স্বদেশ এখন
শবাধার সামনে রেখে
প্রতিজ্ঞায় আতপ্তঃ
ছিন্ন কুসুমের মালা কণ্ঠে তার
অমরতার চেতনায় উজ্জ্বল এখন
আহত স্বদেশ আমার॥
('আহত স্বদেশ'—মোজাম্মেল হোসেন)

(২) হুঁড়ি তো নয়, একরাশি ফোস্কা
কিশলয়গুলি মঞ্জরিত
যেন সারি সারি দীপ।

এবার কুঞ্জকাননে
সমীরণও বইলো প্রভাবেই।
('বসন্ত'—আহমদ নফীস কাসমী
অনুবাদঃ রমেশ দাশগুপ্ত)

(৩) সেই ফুলের যাদুতে
আমি আর আমি থাকব না
আমি হব আমরা
আমি হব সকলের।

এরই নাম দেশপ্রেম
এরই নাম অমৃত।

তুমি ফুল হয়ে
আমাকে,
আমাদের সবাইকে
অমৃতের স্বাদ দিয়ে গেল।
[ 'নক্ষত্র যখন ফুল হবে'—
(কিশোর শহীদ মতিয়ুরকে)
—শহীদুল্লা কায়সার ]

জেগে উঠেছে নতুন সখ্য—
...প্রিয় লক্ষ্মীন্দর।
প্রিয় বেহুলা!
গাঙুড়ের জল। থেকে থেকে
অনেক ইচ্ছে জমে ওঠে মনে। আমৃত্যুদিন পর্যন্ত
আবার মনে রাখার মত কিছু।
নতুন সখ্যের সাথী হওয়া।
('একটি শোকসভা থেকে'—মাহমুদ আল জামান)

সৌভ্রাতৃত্বের অমর বাণী উচ্চারণ করছেন বেগম সুফিয়া কামাল—
...এই আজ এতদিনে
শোকে দুর্দিনে ভাইরে ভাই নিল চিনে
...জাগ্রত জনগণ
সেই যে শোণিতরক্তিম পথে চলে আজ অগণন।
('জাগ্রত জনগণ)

পথ কি? বাঁচবার অধিকার আদায় করা—সংগ্রাম—মিছিল—

(১) ...'আমাদের এ শতাব্দী শুধু সংগ্রামের
তাই তো প্রতিদিন পথে পথে
মিছিলে মিছিলে আমরা কণ্ঠ তুলি
ওদের বুলেট বুকে এসে বিঁধে
বাঁচবার অধিকার আদায় করতে গিয়ে
আমরাই যুগে যুগে
শুধু রক্ত দিয়েই লিখে রাখি
আমাদের দেশের ইতিহাস
সংগ্রামমুখর জীবনের রূপকথা।'
('গর্বিত দেশের পাঁচালী'—বেবী মওদুদ)

অথবা,

(২) ...নতুন চরের প্রতি নদী-খাওয়া পাড়ের কিষাণ
যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাঁই অধিকার তার
তোমার মস্তকে তেমনি তুলে আছি ন্যায়ের নিশান
দয়া ও দাবীতে দৃঢ় রক্তবর্ণ পতাকা আমার...
(সোনালী কাবিন—আল মাহমুদ)

# একুশে ফেব্রুয়ারী

**কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত**

'ভাষা আমার বাংলা ভাষা,
দেশ আমার বাংলা দেশ।'
চতুর্দিকের তোবড়ানো দম্ভে
ধ্বংসধ্বসের বিবর্ণতা।
একবার বেরিয়ে আসতেই
হিংস্রতার মুখোমুখী
তুমি জ্বলে উঠলে
মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে।

চোখের জল শুকিয়ে কখন বারুদ,
জেগে উঠলো ত্রিভুবন
মেঘলা ধলেশ্বরীর তীরে,
চট্টগ্রামের পাহাড়ে,
ঢাকা রংপুর বরিশালের
নাগরিক জীবন-যন্ত্রণায়।
পূর্ববাংলার নয়া যৌবন
রক্তচক্ষুকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
দামামা বাজিয়ে ডাক দিল।

বছরে বছরে আজও শপথে অঙ্গীকারে
নতুন করে' রক্ত চলাচলে
একুশে ফেব্রুয়ারী॥

---

এই মৃত্যুই নতুন করে সকলের জন্যে এনে দেবে বাঁচার আশ্বাস (১), তাঁদের বরাভয় কণ্ঠে শাশ্বতকাল জেগে থাকবে আনন্দের গান (২)—

(১) ...এখানে কি সমস্ত যন্ত্রণার হবে অবসান,
এখানে কি কামনার পাখীগুলো বেদনার
দাবানলে আর কোনদিন পুড়ে ছাই ছাই হবে না?
তাই এই মৃত্যু আবার নতুন
করে বাঁচার আশ্বাস
তোমার আমার এবং সকলের জন্য।
('আসন্ন মৃত্যুতে জিজ্ঞাসা'—বেলা ইসলাম)

(২) ...তোমাকে খুঁজেছি
মাতৃহারা
অনাথ শিশুদের বিদ্যালয়ে
তোমাকে,
তোমাকে খুঁজেছি
সে দলে—
দৃপ্তকণ্ঠে যারা
ধ্বংসের বন্যায়
শাশ্বত কাল—
আনন্দের—
আনন্দের গান গাইছে
মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দৃপ্ত পদচারণায়।
('একদিনঃ তোমাকে খুঁজেছি'—শান্তিপ্রিয় চৌধুরী)

পূর্ববঙ্গবাসীর কাছে এই দিনটির মতো এমন উজ্জ্বল দিন আর নেই—

...'তাই আজ নিত্য নব প্রেরণার উৎস সুধা হোক।
একটি উজ্জ্বল দিন একটি মণিবর্ণ আলো
এবার সবার প্রাণে কিমাশ্চর্ব প্রদীপ জ্বালালো।'
('মণিবর্ণ'—মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান)

প্রবীণ কবিও আশীর্বাদ জানাচ্ছেন, অভয় দিচ্ছেন—

'হবে হবে জয় তোমাদের হবে জয়—
তোমাদের খুনে রঙিন হইয়া জনমিবে বরাভয়।'
('একুশের গান'—জসীমউদ্দীন)

সর্বশেষে উদ্ধৃত করছি 'ঐকতান'-এর কবি দিলওয়ারের ঘোষণা করল, সার্থক হল মায়ের মেঠো ঘরের অগণন সব্যসাচীর সংগ্রামী অভিলাষঃ

নদী ও বৃষ্টির জলে যে দেশে শস্যেরা অফুরানঃ
দ্বৈমাত্রিক সেই দেশে সাহসী একুশে অনির্বাণ।
সূর্য বলেঃ এই দেশে একদা প্রলুব্ধ কিছু লোক
নারকী ক্ষমতা নিয়ে ভাগ্যের জুয়ায় মেতেছিলো,
এবং যখন তারা চরম তৃষ্ণার মায়ালোকে,
সহসা আপন মাকে জুয়ার পেরেকে গেঁথেছিলো।
কুলাঙ্গার লোকগুলো লোলুপ ইচ্ছের বিষ ঢেলে
সেদিন ঘোষণা করেঃ "আমরা হবোই ইডিপাস,
জননী উর্বশী হোক, সোনার হরিণে ছাড়বো না
কলংক ছড়াবে কে সে? আমরা রচিবো ইতিহাস।"
অথচ বুঝেনি তারা সেদিন মায়ের মেঠো ঘরে
অগণন সব্যসাচী শাণিত তীরের সূচীমুখে
লিখছিল অবিরাম বাক্য সে অমোঘঃ প্রতিশোধ।
ক্ষমা নেই দুঃশাসন যদিও বিধাতা তোর বুকে।
সূর্য বলেঃ তারপর একদা বিস্ময়ে দেখি আমি
আমার রশ্মিরা ম্লান, ক্যামন স্তিমিত হয়ে গেছে।
নিম্নে দেখি সমুদ্ধত সংগ্রামী একুশে ফেব্রুয়ারী,
সব্যসাচী প্রতিজ্ঞায় রশ্মির শোণিত বয়ে গেছে।
উজ্জ্বল বন্ধুত্বে আমি জড়িয়ে নিলাম তারে বুকে,
সে এখন অনির্বাণঃ তিমির বিনাশে আছে সুখে।
দ্বৈমাত্রিক এই দেশে একুশে মায়ের অবিনাশ,
দিগন্ত বিস্তৃত পটে সার্থক সংগ্রামী অভিলাষ॥

ফলতঃ শুধু বাক্যাড়ম্বর, আবেগ বা উচ্ছ্বাস নয়, এই সব কবিতা প্রজ্জ্বলিত আশার আলো দেখাচ্ছে, জাতির ইতিহাসের মহা গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তরের কালের কথা কইছে—ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি, দেশমাতৃকার প্রতি, তাজা প্রাণগুলোর প্রতি অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ করছে, কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলছে, শোষক ও স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ভীমগর্জনে ফুসে উঠছে, আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগাচ্ছে, আগামী দিনের বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হবার আহ্বান জানাচ্ছে।

পূর্ববঙ্গবাসীরা যথার্থ বলতে পারেন,—

পদ্মা-মেঘনা, বুড়িগঙ্গা-কর্ণফুলী, সাগর-হাওড়, পাহাড়-সমতল, গ্রাম-শহর জুড়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গ গর্জে উঠেছে সেদিন—'জান দিমু, জবান দিমু না। প্রাণ দেব, তবু মুখের ভাষা ছাড়ব না।

আয়ুবের বেসিক ডেমোক্রেসির অনেক বছর আগে, লীগ সরকারের আমলে বেসিক প্রিন্সিপলস্ কমিটি ঘোষণা করল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। একমাত্র উর্দুই। খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবও সমর্থন করলেন সম্ভবত এই ভেবে যে, ইসলামী তমদ্দুনকে রক্ষা করতে হলে বাঙলা নয়, উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা দরকার। দেওয়ালের লিখন সেদিন কেউই পড়তে পারেন নি—না খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব, না লীগ সরকার। মুহূর্তে সজাগ হল যুব-ছাত্রসমাজ, কারণ "ওরা আমার মুখের কথা কাইরা নিতে চায়।"। কিন্তু না, কিছুতেই না। জান দিমু, জবান দিমু না।

"কইতো যাহা আমার দাদায়
কইছে তাহা আমার বাবায়
এখন কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্য কথা শোভা পায়।
সইমু না আর সইমু না
অন্য কথা কইমু না
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান
এই জানের বদলে রাখুম রে ভাই
বাপ-দাদার জবানের মান।"

এ শুধু কোন এক কবির কথা নয়, শুধু কথার কথা নয়, এ প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার বুকের রুধির মেখে সত্যে পরিণত। জান দিয়েই জবানের মান রেখেছে ঢাকার ছাত্রসমাজ ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারী—ঢাকার পথে পথে ধ্বনি বাংলা ভাষায়, বাংলা ভাষার জন্য। মুখের ভাষা, ভালবাসার ভাষা, আ মরি বাংলা ভাষা, সে ভাষার স্বীকৃতি চাই। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

পুলিশের লাঠি, গুলীতে তাজা খুন ঝরল রাজপথে বসন্তের পলাশ-শিমুলে সেদিন লাল নয়,—লাল সেদিন ঢাকার রাজপথ। এবং তাজা খুনে। বসন্তের গোধূলি আকাশ সেদিন আগুন-রাঙা নয়, আগুন-রাঙা সেদিন যুব-ছাত্রের চোখ। এবং প্রতিজ্ঞায়।

..."এত রক্ত। রক্ত রাঙিয়ে
দিয়েছে সমস্ত প্রান্তর। ইতিহাস
লিখেছে বুকের রক্ত দিয়ে।"

বুকের রক্ত দিয়ে নয়া ইতিহাস রচনা করলেন—"আবুল, বরকত, সালাম, রফিকউদ্দীন, জব্বার"। "কি আশ্চর্য, কি বিষম নাম! একসার জ্বলন্ত নাম।"

প্রাণ হারালেন ছাব্বিশজন যুবক, আহত হলেন চারশ'র বেশি যুব-ছাত্র।

গ্রামে-শহরে, নগরে-বন্দরে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের আত্মার আত্মীয় হল এই এক সার জ্বলন্ত নাম। বাহুতে বাহু, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সর্বস্তরের মানুষ শহীদদের মনের ইচ্ছা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন, সয়েছেন অত্যাচার, জয় করেছেন কুচক্রীর প্রলোভন, মিথ্যা করেছেন মতলববাজদের মিথ্যা প্রচার। শুধু ঢাকা-রমনা নয়, রাজশাহী-বগুড়া, যশোর-পাবনা, চট্টগ্রাম-খুলনা, রংপুর-কুষ্টিয়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ, অসন্তোষ। আর দাবী—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

ঘরে ঘরে মুখের ভাষার জন্য বুকের রুধির ঢালতে প্রস্তুত হল কত পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠীকে মেনে নিতে হল এই দাবী। উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেল।

শহীদদের স্মৃতিই ঐক্যবদ্ধ করেছে সর্বস্তরের মানুষকে; ঐক্যবদ্ধ করেছে লীগ-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে। এমন কি পতন ঘটিয়েছে পূর্ববঙ্গে লীগ সরকারের—এ কথা অবিশ্বাস্য হলেও ঐতিহাসিক সত্য।

"রচিয়াছে ভাষা যারা রক্তের অক্ষরে
বিশ্বের সভায় যারা শোণিত স্বাক্ষরে
লিখিয়া রাখিয়া গেল মান :
একুশের এই দিনে তাহাদের জানাই
সালাম।"

॥ দুই ॥

সেদিন আর আজ! ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে পদ্মা-মেঘনায়। ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। লীগ সরকারের পতন ঘটিয়েছে যে সম্মিলিত মোর্চা—সেই মোর্চাও ব্যর্থ হয়েছে; সামরিক অভ্যুত্থান ও আয়ুব খানের প্রবেশ; '৬৪-র ভয়াবহ দাঙ্গা, পাক-ভারত যুদ্ধ; আয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভ ও ইয়াহিয়া খানের আবির্ভাব—নানা ঘটনারাজি আন্দোলিত করেছে পূর্ববঙ্গের প্রাত্যহিক জীবনকে।

পশ্চিম পাকিস্তানের 'উপনিবেশ' পূর্ববঙ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ বেড়েছে বই কমে নি। শোষণও চলেছে অব্যাহত গতিতে। তাই দারিদ্র্য দিনে দিনে প্রকট হয়েছে; শিক্ষার বিস্তারও নাম মাত্র।

'সোনালী সুতা'র দেশ পূর্ববঙ্গ আজও সমৃদ্ধি উন্নতির পথে না এগিয়ে দারিদ্র্য অশিক্ষার অন্ধকারে ভগ্ন স্বাস্থ্য

ওদের ভবিষ্যৎ
গ'ড়ে তুলতে
শেখান!
ওদের কোন ভাবনাচিন্তা নেই।
ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো?
ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে শেখান।

# স্ববিরোধিতার উন্মুক্ত প্রাচীর

জলিতা ভৌমিক

স্ববিরোধিতার উন্মুক্ত প্রাচীর আমরা হাতড়াই
রোমহর্ষক গোয়েন্দাকাহিনীর অপরাধী নায়কের মতো।
দেশমাতৃকার জন্য আমরা লড়াই করেছি
কিন্তু মাতৃভাষাকে মুক্তি দিতে পারি নি।
সেই ক্রোধে সমস্ত শরীর রী...রী...করছে।
আমাদের মুখের ভাষা
সাপের মতো শুধু ফোঁস ফোঁস করে।
শব্দমুখর সাপ তবু তো নিজের অধিকারে অবিজিত।
আমরা কুন্ডলী পাকিয়ে
আধিপত্য স্বীকার করে
কাকে
ধিক্কার
দিতে
দিতে
আত্মকণ্ডুয়নে নিমগ্ন।

ভাই বরকত, বন্ধু সালাম, প্রিয় জব্বার
তোমাদেরি ভাষা আমার স্তব্ধকণ্ঠে।
তবু আমি প্রাণ দিতে পারি নি।
বারবার একুশে ফেব্রুয়ারি আমার বুকে শূলবিদ্ধ করে।
জানি, আমার এই লজ্জা ক্ষমা করবে না উত্তরপুরুষ।
সেদিনও

পদ্মা থাকবে প্রমত্তা
মেঘনার বুকে গান গেয়ে যাবে মাঝি
তোমাদের বিদ্রোহী কণ্ঠের ভাষায়
মুক্ত আকাশ-তলে॥

সুযোগ নিয়ে কট্টর প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচার, তবু ২১শের শপথ ভোলাতে পারে নি। লাঠি, গুলী, 'এবডো'র খাঁড়া, হিন্দুস্থানের 'চর বলে ঘোষণা আর ইসলাম বিপন্ন, এ ধ্বনি তুলেও ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহ্যকে হত্যা করা সম্ভব হয় নি।

তাই এ যুগের কবি-সাহিত্যিক তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ। ভঙ্গী দিয়ে না ভুলিয়ে, সাধনার দ্বারা, পাকা ফসল তারা ভরে তুলেছেন সাহিত্যের গোলা ভান্ডার। চর্যাপদ থেকে সুরু করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ পেরিয়ে হাল আমল পর্যন্ত সাহিত্যের নবমূল্যায়ন করছেন পন্ডিত আর তরুণ গবেষকরা।

অন্যদিকে লোক-সাহিত্য নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা সুরু হয়েছে, সুরু হয়েছে সংগ্রহ—প্রতি জেলার ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, বাউল, সারি, জারি গান সংগ্রহ হয়েছে, লৌকিক অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি পত্রিকা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা' এবং 'ইতিহাস' পত্রিকা দুটির অবদানও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

একদা খাজা শাহাবুদ্দিন সাহেব পাক-বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্য ইসলামী সাহিত্য নয়, এবং নয় বলেই তা ইসলামী 'তমুদ্দন'-বিরোধী, অতএব তা পরিত্যাজ্য—এ ধোঁকাবাজীতে পূর্ব-বঙ্গের যুব-ছাত্র ও সাধারণ মানুষ ভোলেন নি।

রবীন্দ্র-বিরোধী নানা প্রচার সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, আর তাই ঘোষণা করেছেন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কিছুই থাকে না—যার মূল্য চিরকালীন।

আন্দোলনের জন্যই সম্ভব হয়েছে পাক-বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পুনঃ-প্রচার। জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান দাবী জানিয়েছেন 'বিশ্বভারতীর' অনুমতি নিয়ে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করতে হবে।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতেও সরকারী উপেক্ষা সত্ত্বেও, লীগ-সমর্থক গোঁড়া পত্রিকাগুলির অপপ্রচার সত্ত্বেও, শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বত্র রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

দু বছর আগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাক-ভারত উপমহাদেশের পাঁচজন কবি—গালিব, মধুসূদন দত্ত, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে পাঁচদিনব্যাপী যে সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়, পাক-বেতার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র, মধুসূদন দিবসের কোন কর্মসূচী প্রচারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। শাসক-গোষ্ঠীর অনুদার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর এটি আর একটি দৃষ্টান্ত।

জনাব তোফাজ্জল হোসেন ও 'ইত্তেফাক' পত্রিকা, 'সংবাদ' পত্রিকা, প্রগতিশীল যুব-ছাত্রগোষ্ঠী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা বার বার প্রতিবাদ করেছেন এই ভেদবুদ্ধি, সংকীর্ণতার—শাসকগোষ্ঠীর উৎপীড়ন রক্তচক্ষু সত্ত্বেও।

দুই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান বন্ধ। অথচ দুই বাংলার মানুষেরই আগ্রহ আছে সীমান্তের অপর পারের সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক-ভাস্কর্য আর সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে। কিন্তু সরকারী বিধি-বাঁধনের নিষেধে এ চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণতা লাভ করছে না—অতৃপ্তই থেকে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশক ও লেখককে বঞ্চিত করে, পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় লেখকদের প্রচুর বই প্রকাশ করেছেন কিছু প্রকাশক। পূর্ববঙ্গের পাঠকরা, এ বঙ্গের সাহিত্য সাধনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, এতেই পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রকাশক-লেখক খুশী।

কবি জসীমউদ্দীন কলকাতায় বলেছেন, সংস্কৃতির আদান-প্রদান হোক, নিষেধের বেড়া উঠে যাক।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমীদেরও তাই বক্তব্য।

একুশের প্রার্থনা—দুই বাংলার মানুষই যেন একে অপরের সাহিত্য আস্বাদন করতে পারে, সাহিত্য-সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যেন প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচার আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে পরাস্ত করতে পারে।

আমেদাবাদের কলঙ্কজনক ঘটনা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে '৬৪-এর পুনরাবৃত্তি এবার হয় নি, আর সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, যুব-ছাত্র, অধ্যাপকবৃন্দ, পূর্ব পাকিস্তান নয়, বাংলা দেশ—এই নামকরণের দাবী জানাচ্ছেন—এ দুটি ঘটনা নতুন ইতিহাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

রাতের পাখীর ডানা ঝাপটানি শুধু অন্ধকার আর অস্থিরতারই সূচনা করে না, নতুন প্রভাতেরও সূচনা করে।

একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার জন্য আক্ষরিক অর্থে—অন্তিম রক্তপাত ঘটেছিল পূর্ব বাংলায়।

পশ্চিম বাংলায় এই দিনটিতে কোথাও কোথাও সেই শহীদদের স্মরণানুষ্ঠান পালিত হয় প্রতি বছরে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী, জব্বার, রফিউদ্দিন, বরকত-রা রক্ত দিয়ে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে গেছে।

পূর্ব বাংলায় আবদুল হাই, শহীদুল্লাহ সাহেবরা যে দায়িত্ব পালন করে গেলেন, পশ্চিম বাংলায় তেমন কোন ঐকান্তিক নেতৃত্ব নেই বাংলা ভাষার স্বপক্ষে কাজ করে যাবার। হয়ত পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দেবার প্রয়োজন হয় নি, সেইজন্য পশ্চিম বাংলার বোধশক্তি কিছুটা অসাড় হয়ে আছে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণানুষ্ঠানে, সভাপতি বা প্রধান অতিথি জাতীয় আসন অলংকৃত করতে পেলে পশ্চিম বাংলার অনেক নাম-করা সাহিত্যিকই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন। যদিও এঁরা বাংলা ভাষাতে লিখেই বাড়ি তুলেছেন এবং সভাপতি হয়ে পূর্ব বাংলার ভাষা-শহীদদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাও করেন। মনে পড়ে রাজশেখর বসু অনবদ্য ভাষায় সাহিত্যিক-দের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ঃ "তুবড়ি, পটকা বা রেডিও তৈরি করতে পারলেই বিজ্ঞানী হওয়া যায় না, গীতার ব্যাখ্যা বা অবতারতত্ত্ব লিখলেই দার্শনিক হওয়া যায় না। তেমনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা সমালোচনা লেখেন, শুধু এই কারণেই কাকেও সাহিত্যিক বলা চলে না।"

যাক্ ও কথা। বরকতরা এঁদের কাছে কোন প্রত্যাশা রেখে মরে নি।

এখন প্রশ্ন হল, বাংলা ভাষার জন্য আমরা কি করতে পারি আর পশ্চিম বাংলায় একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করা কর্তব্য কি না।

বাংলাদেশে কিছু কিছু হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত জনমত আছে; ছায়ার সংগে কুস্তি করে কিছু লোক গায়ের ব্যথায় ভোগেন। এইরকম একজন মহাপণ্ডিত সম্পাদকের লেখা উদ্ধৃত করা যাক্ ঃ

"অন্যের অর্জিত গৌরবে আহ্লাদ-কীর্তন করবার দুটি সুবিধে রয়েছে। প্রথমত, তার জন্য ব্যক্তিগত কোনো খরচ নেই। দ্বিতীয়ত, ওই পরস্মৈপদী গৌরবকে নামাবলী করে আমার বুকের দুর্বল খাঁচার প্রাণিকে ঢেকে রাখা চলে। পূর্ব বাংলার একুশে ফেব্রুয়ারী রক্তক্ষয়ী ভাষা-আন্দোলনের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে যে এক ধরনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সূচীত হয় তা অনেকটা এই জাতীয়। এই সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা দেউলে মনোবৃত্তিকে সুকৌশলে আড়াল করতে পারি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কিয়ৎ পরিমাণে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতি জাতীয় অকর্তব্য তার দৃষ্টান্ত।

"কিন্তু এর একটা মারাত্মক প্রতি-ক্রিয়াও আছে। সেইটে এই ঃ পশ্চিম-বঙ্গীয় এই জাতীয় বাড়াবাড়ি দেখে ওদেশের সরকারের তরফে ঘোষণা কর-বার সুবিধে হয় পূর্ব বাংলার ভাষা-সংগ্রাম ভারতীয় এজেন্ট দ্বারা পরি-চালিত। ...কাজেই আমাদের বিনীত উপদেশ ঃ এদেশে এ ধরনের ন্যাকামো যত কম হয় ততই প্রতিবেশী বন্ধুদের প্রতি যথেষ্ট উপকার করা হবে।"

না চাইলেও এই ধরনের সম্পাদকরা উপদেশ দেবেনই! কাল্পনিক ভূতের সংগে লড়াই করার ক্ষমতা এঁদের অসীম।

একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মরণানুষ্ঠান অন্যের অর্জিত গৌরবের আহ্লাদ-কীর্তন নয়। এই দিন আমরা আলোচনা করতে পারি একটা স্থায়ী গঠনমূলক কর্মসূচীর। বাংলা ভাষার জন্য একদিনে কিছুই করা যায় না। কোন ভাষার জন্যই নয়। রুশ বিপ্লবের পরও সেই রুশ ভাষাই আছে, চীন বিপ্লবের পর চৈনিক ভাষাই রয়েছে, ফরাসী বিপ্লবের পরেও ফরাসী ভাষাই রয়েছে। আসলে ভাষার জন্য আমরা কি করতে পারি তা নির্ভর করছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, আমাদের ঐক্যের ওপর, আমাদের যোগ্যতার ওপর, আমরা কি করতে চাই, তার ওপর। বাস্তবে দেখছি বাংলা ভাষায় শাণ দেওয়া হচ্ছে অপরকে গাল দেবার জন্য, কুৎসা প্রচারের জন্য। তাই বোধ হয় একুশে ফেব্রুয়ারী আত্মশ্লাঘা হবার কীর্তন নয়, একান্ত বেদনার হাজার দায়িত্ব স্মরণ করার দিন।

এই দিনটিতে আমরা নানান আলো-চনা করতে পারি।

বাংলা দেশে কতজন মানুষ আজও বাংলায় নামটুকুও লিখতে পারে না। এ বছর আমরা কতজনকে বাংলায় সাক্ষর করতে শেখাবো? কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ত' প্রায়ই নানান উদ্ভট কারণে বন্ধ হয়। এই কারণে হোক্ না এক সপ্তাহের জন্য? পঞ্চাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, প্রত্যেকে আটজনকে বাংলা অক্ষর চেনাবার দায়িত্বে বেরিয়ে আসুন, দেখুন, চার লক্ষ মানুষ এক সপ্তাহেই বাংলা ভাষায় নাম লিখতে পারছে। টাকা চাই? বাংলা দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এক মাস হিন্দী আর ইংরেজী সিনেমা দেখা বন্ধ করে দেখুক না, এক লক্ষ টাকা মুঠোর ভেতর থাকবে। শক্ত কাজ? মাও সে তুং লং-মার্চের মধ্যেই কি করে সৈনিকদের অক্ষর শিখিয়েছিলেন??

একুশে ফেব্রুয়ারী আমরা স্মরণ করতে চাই যে, পূর্ব বাংলার সংগে আমাদের দূরত্ব বেড়েই চলেছে।

কিন্তু কোন্ সংগত কারণে?

রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক—কোন্ সূত্র ধরে এর সদুত্তর পাওয়া যায়? যদি পি. সি. সরকার সারা বিশ্বে ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া দেখাতে পারেন, তবে পূর্ব বাংলায় পারেন না কেন? আমেরিকায় পণ্ডিত রবি-শঙ্করের ছাত্র রয়েছে অথচ পূর্ব বাংলায় নেই কেন? পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত বই আমেরিকা-ইংলণ্ডে দেখা যায়, কেন কলেজ স্ট্রীটে পাওয়া যায় না? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন ঢাকার সংগে ম্যাচ্

# একুশে র

উমাপদ নাথ

জিরাফের মতো উৎকণ্ঠ হয়ে
রাতের সামিয়ানা ঠেলে
উঠে উঠে উঠে-
এদিকে সেদিকে যদি খ‍ুঁজি খ‍ুঁজি খ‍ুঁজি
তথাপি আর দেখতে পাবো না
সেই হারিয়ে-যাওয়া তারাগ‍ুলোকে
জ্বলছিলো যারা এমনি এক
একুশে ফেব্রুয়ারির রাতে।

উলঙ্গ বিদ্বেষের এক বিষাক্ত তুফান
নির্লজ্জ গর্জনে
নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলো এক আশ্চর্য
আলোর গান
যা ঝরে পড়ছিলো
সেই জোয়ান তারাগ‍ুলো থেকে।

জিরাফের মতো ঘাড় উঁচু করে
আকাশের বুটিতে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে
অনেক অনেক খ‍ুঁজেও
তাদের দেখছি নে আজ :

ন্যাংটো নোংরামর খোলা ছোরায়
এবং তার গোল গোল অগ্নিল রক্তাক্ষরে
যে ইতিবৃত্ত লেখা ছিলো, তা থেকে
তাদের নাম খারিজ হলেও

তারা যে-নিশান উড়িয়ে মিলিয়ে গেলো
যে-গান গেয়ে গেয়ে লুকিয়ে পড়লো
যে-সকাল ছড়িয়ে দিয়ে গিয়ে ঢুকলো
নিঃশব্দ রাতের পাতালে
তা হারাবার নয়, হারায় না।

ফিরে ফিরে একুশে ফেব্রুয়ারিতে
পূর্ববাংলার আকাশে নয় শুধু,
যেখানে যতো মানুষ আছে
তাদের অবিরাম হৃদয়ের আকাশে
সে তারারা জ্বলতে থাকে দপ্ দপ্ দপ্।

দেশে যেতে পারেন, কেন পারেন না পূর্ব বাংলায় শিল্প উন্নয়নে হাত মেলাতে? শিয়ালদার মোড়ে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্র কেন পাওয়া যায় না? ফাঁসির আসামীদেরও আত্মীয়-স্বজনকে দেখবার, কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু উভয় বাংলার আত্মীয়-স্বজনের সে সুযোগও নেই কেন? নজরুলের জন্ম-দিনে ওপারের বন্ধুরা কেন আসতে পারেন না?

রাষ্ট্রনীতিবিদরা বলুন? প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্ব, নৈকট্য, কোন্ কারণে কাম্য নয়?

অর্থনীতিবিদরা অংক কষে দেখুন না? একটা কমন মার্কেট, অবাধ বাণিজ্যিক লেনদেন—নদী, স্থলপথ থেকে বাৎসরিক আয়—দেখুন অংক কষে, ওরা আর আমরা দু'পক্ষই জিতছি, কেউই হারছি না। কাগজেই কষে দেখুন, শুল্কের প্রাচীর তুলে দিয়ে অবাধ যাতায়াত চালু করলে বাজার কত বেড়ে যায়, ক্রেতা-বিক্রেতার অভাব হয় না।

ভেবে দেখুন, ইংলণ্ডের লোক ফ্রান্সের বাজার থেকে একটা জিনিস কিনছে, তাই দেখে কি গুপ্তচর বলে চারপাশে লোক জমা হয়ে যাবে? ওরা ত' এককালে একশ' বছর ধরে যুদ্ধ করেছে পরস্পরের বিরুদ্ধে?

আচ্ছা, কয়েকটা কাল্পনিক ছবি আঁকছি। অনুগ্রহ করে কেউ বুঝিয়ে দিন, এর মধ্যে কোন্‌টা অসহ্য লাগছে।

(১) আচার্য সত্যেন বসু ঢাকায় গেছেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তক লেখার জন্য একটি কর্মসূচী উদ্বোধন করতে...
(২) সত্যজিৎ রায়ের আগামী ছবির আউটডোর স্যুটিং হবে কুশিয়ারা নদীর ওপারে, এই বইয়ের নায়ক-নায়িকা সন্ধান করতে সত্যজিৎবাবু পটুয়াখালিতে পৌঁচেছেন...
(৩) রংপুর কলেজের ছাত্ররা বনফুলকে টানাটানি করছে সাহিত্য-সভায় নিয়ে যাবার জন্য, অথচ ঐ দিনে বনফুলের পাবনা যাবার কথা...
(৪) পূর্ব বাংলার উদিয়মান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় আফতাব আলি, ওয়াই, এম, সি-এতে শ্রীদীপক ঘোষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন...
(৫) 'সংবাদ'-এর সম্পাদক কতকগুলি পুরনো ব্লক খুঁজতে এসেছিলেন বসুমতীর অফিসে...
(৬) রাজা হোসেন এবং শানহাজ বেগম এসেছেন শ্রীমতী ইন্দুবালার কাছে পুরনো কয়েকটি সুরের তালিম নিতে...
(৭) মুজিবর রহমান জনতা টোব্যাকোর পাঁচ প্যাকেট 'মিতালী' সিগারেট পাঠিয়েছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে, প্রমোদবাবুর জন্য...

মনে পড়ছে কি যে কবি জসীম-উদ্দিনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়ে-ছিল?

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কত বই সংগৃহীত হল, সে সংখ্যা আমাদের শিক্ষার মাপকাঠি নয়।

আমরা কি করে দিন কাটাই, সেটাই আমার শিক্ষার ব্যারোমিটার।

একুশে ফেব্রুয়ারী আত্মসমীক্ষার দিন, শক্-থেরাপির দিন।

(পূর্বানুবৃত্তি)

## দুই মন্ত্রীর দৃষ্টিতে

গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ অচলাবস্থা এবং শরিকী সংঘর্ষ নিয়ে অনেক শান্তি-মিশন, অনেক আপস বৈঠক হয়েছে, অনেক বিবৃতি, পাল্টা-বিবৃতি, অনেক নিবন্ধ, অনেক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। অনেক আপস প্রস্তাব করা হয়েছে, অগ্রাহ্য করাও হয়েছে অনেক। অনেক শান্তির কথা বলা হয়েছে, অশান্তির কারণ ঘটানোও হয়েছে অনেক। 'সকালে উঠে যাঁরা সারাদিন ভাল হয়ে চলবার প্রার্থনা করছেন' তাঁরাই দ্বিপ্রহরে মানুষের শান্তিভঙ্গ করছেন! রাজধানীতে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে—আর নয়, এবার মারামারি থামাও, এসো, সবাই ভাল হয়ে চলি। পরক্ষণে সংবাদপত্র মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছে নতুন সংঘর্ষের কথা, নৃশংস হত্যাকান্ডের কথা। পশ্চিম দিনাজপুরের কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে কোন্ কার্তিক দাসকে কুপিয়ে কাটা হলো, এমন কত খবর সংবাদপত্রও তুলে ধরতে পারে নি। তবু এমন আজও ঘটছে। সারা রাজ্যে একদিকে চলেছে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী-ছাত্র-শিক্ষকের মিছিল : যুক্তফ্রন্ট ভেঙো না, আর একদিকে চলেছে যুক্তফ্রন্টপ্রিয় তথা গণতন্ত্রপ্রিয় কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের আবেদন: জনগণের চোখে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তি ম্লান হচ্ছে, আপনারা এই আত্মঘাতী লড়াই বন্ধ করুন। রাজ্যের অগণিত সাধারণ মানুষ চায় কাজ, বহু বৎসরের বঞ্চনার বেদনা তাদের নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে। তাই তো দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি বাস করেও তারা তাদের অধিকার বিস্মৃত হয় নি। তত্ত্বগত লড়াই আর সংবিধানের কচকচির কোন মূল্যই তাদের কাছে নেই। জনগণের রায় অগ্রাহ্য করে, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে পুনরায় যাঁরা গণ-আদালতের সামনে যাবার প্রবণতা দেখান, তাঁদের বুকের পাটার বাহাদুরি আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু জনগণের সম্ভাব্য রায় সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাঁরা নিঃসন্দেহ নন। জনগণ তাঁদের কতটা প্রসন্ন চোখে দেখবেন, সেকথা কেবল ভবিষ্যৎই জানে।

তবু এত মানুষের এত আবেদন, এত চিৎকার সব ব্যর্থ হতে বসেছে। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে—যুক্তফ্রন্টের নেতারা 'কানে দিয়েছেন তুলো, পিঠে বেঁধেছেন কুলো'। একটা কথা অনেক নেতার মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে, আমরা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি নি—তাই এই সংঘর্ষ। সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বেই যদি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি উঠতে না পেরে থাকেন, তবে নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করবার অধিকার আছে কি? দলীয় সংকীর্ণতায় অন্ধ হয়ে তাঁরা আজ কি হারাতে বসেছেন, সেকথা তাঁরা জানেন কি না বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু জনসাধারণ জানে তারা কি হারাতে চলেছে। তাই এত মিছিল, এত আবেদন-নিবেদন।

এই পরিস্থিতিতে পাঠকদের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংকট আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্বয়ং বিধাতাও বোধহয় বলতে পারবেন না কতক্ষণ এর পরমায়ু আছে। এই অনিশ্চিত অবস্থায় একটা ঝুঁকির মধ্যে এই ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার চালাতে হচ্ছে। এই লেখা যখন পাঠকদের হাতে পৌঁছবে, তখন হয়তো দেখা যাবে, এই সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে মনে রেখেই যেন সহৃদয় পাঠক-সাধারণ এই সাক্ষাৎকারগুলির ধর্ম ও মর্ম অনুধাবন করবার চেষ্টা করেন।

**শ্রীকানাই ভৌমিক**

**[ সমবায়মন্ত্রী ]**

সাক্ষাৎকার—৬ই ফেব্রুয়ারী

—শরিকী সংঘর্ষের পথে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সংকট আজ যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। ৩২-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট সরকারের মধ্যে এই সংঘাতের কারণ কি?

**—৩২-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই আমরা জনগণের কাছে আসার সুযোগ আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করবো। আজ একক কোন পার্টি সরকার গঠনে সমর্থ নয়। কাজেই সংঘবদ্ধ শক্তিই কংগ্রেসের বিকল্প। ফ্রন্টের অভ্যন্তরে যখন এই সংঘবদ্ধ দৃষ্টির পরিবর্তন করবার প্রচেষ্টা হয়েছে, তখনই সংঘাত বেঁধেছে। অথচ এটা বন্ধ না হলে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রশস্ত না হলে যুক্তফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ভেঙে যেতেও পারে। সি পি এম একটা নেতৃত্ব গ্রহণ করবার চেষ্টা না করলে এই সব সংঘর্ষ হয়ত ঘটতো না। ফ্রন্টের সভায় এই সংঘর্ষ বন্ধ করবার ওই অনমনীয়তার জন্যই। এইজন্য আমরা দুটো প্রস্তাবের ওপর জোর দিয়েছি—প্রথমত, মন্ত্রিসভায় ঐক্য, দ্বিতীয়ত, থানাভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট।**

—থানাভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট হলেই কি মতবিরোধ এড়ানো যাবে?

**—হয়তো যাবে না। কিন্তু সে মতবিরোধ তত্ত্বগত হবে না। ঘটনাগত বিচার-বিশ্লেষণই হবে নিচু পর্যায়ের এই যুক্তফ্রন্টের কাজ। একটা বিশেষ ঘটনার ওপর তদন্ত-সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে নিশ্চয়ই মতবিরোধের প্রশ্ন ওঠে না। তা যদি হতো, তবে কখনো কোন তদন্ত কমিটি**

—কোন কোন রাজনৈতিক দল শরিকী সংঘর্ষকে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীসংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে আপনার কি মত?

—মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে শরিকী সংঘর্ষ একটা হঠকারী বিচ্যুতি। এটা যুক্তফ্রন্টকে দুর্বল ও আদর্শচ্যুত করার পন্থা। এরই নির্মম ফলশ্রুতিই তো আজ সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। মার্ক্সবাদী শ্রেণী-সংগ্রাম কখনও কায়েমী স্বার্থবাদীদের উল্লসিত করে না। যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ তথা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে কায়েমী স্বার্থবাদীরাই খুশি হচ্ছে বেশি। এটাকে যাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা একটা শ্রেণীসংগ্রামবিরোধী চিন্তাধারা নিয়েই আছেন।

—যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধ দায়িত্বশীল নেতা পশ্চিমবঙ্গে কেরলের মত একটি মিনি-ফ্রন্ট সরকারের কথা ভাবছেন। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের কোন বিকল্প সরকার সম্ভব বলে আপনি মনে করেন কি?

—পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার বৃহত্তম দল সি পি এম যে একদলীয় শাসনের স্বপ্ন দেখছে, বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা তারই মর্মান্তিক ফলশ্রুতি। এ প্রসঙ্গে আমাদের নীতি বহু-ঘোষিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে কি রাজ্যে, কি কেন্দ্রে, যুক্তফ্রন্টের কোন বিকল্প আছে বলে আমরা মনে করি না। তাই যুক্তফ্রন্ট বজায় রাখাই আমাদের লক্ষ্য।

কেরলের তথাকথিত মিনিফ্রন্ট সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে। যুক্তফ্রন্ট থেকে যদি কোন রাজনৈতিক দল স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসে, তা হলে যারা রইলেন তাঁরা যুক্তফ্রন্ট না হয়ে মিনিফ্রন্ট হন কোন শব্দ অনুযায়ী? কেরলের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে এখনও তাঁদের সরকারে যোগ দেবার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ওঁরা যোগ দিচ্ছেন না। উপরন্তু বর্তমান সরকারকে খারিজ করবার জন্য ওঁরা প্রয়োজন হলে সিণ্ডিকেট-কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবেন বলে হুঁশিয়ারী দিচ্ছেন। কেরলের তথাকথিত মিনিফ্রন্ট তো যুক্তফ্রন্টেরই কর্মসূচীর ওপর ভিত্তি করে সরকার চালাচ্ছেন। তবে তাঁরা যুক্ত না হয়ে মিনি হলেন কি করে? যাঁরা বেরিয়ে গেলেন, তাঁরা আসলে যুক্তফ্রন্টেরই বিরোধী নন কি?

—পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগিতা ভিন্ন এ ধরনের বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না বলে অনেকের ধারণা। এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব যে একেবারে হতে পারে না, তাও বর্তমান পরিস্থিতিতে জোর করে বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে আপনাদের দলের ভূমিকা কি হবে?

—আমাদের লক্ষ্য যুক্তফ্রন্ট বজায় রাখা। অতএব কংগ্রেস সহযোগিতায় বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসে না। বর্তমান রাজনৈতিক পোলারাইজেশনের যুগে আমরা বিশ্বাস করি, এমন গণতন্ত্র-প্রিয় অনেক লোক আছেন, যাঁরা যুক্তফ্রন্টের বাইরে অথচ যুক্তফ্রন্টের শত্রু নন। যুক্ত-ফ্রন্ট যত এগোবে, এঁরাও তত দ্রুত আমাদের মধ্যে আসবার সুযোগ পাবেন। বর্তমান যুক্তফ্রন্ট এভাবেই গড়ে উঠেছে। কাজেই এ শক্তিকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

৩২-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা সরকারী ক্ষমতায় এসেছি। গণতন্ত্রে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন সর্বদাই থাকে। এই ৩২-দফা কর্মসূচী রূপায়ণে যাঁরা আগ্রহী নন, তাঁদের যেমন যুক্তফ্রন্ট বর্জনের আশঙ্কা থাকে, তেমনি এই কর্মসূচী রূপায়ণে আগ্রহী এমন অনেককে আবার যুক্তফ্রন্টে গ্রহণ করবার আশাও থাকে। আমরা যুক্তফ্রন্টের নীতির ওপর দাঁড়িয়ে সরকারী ক্ষমতায় আছি, কংগ্রেসের সহ-যোগিতার আশায় নয়। আমাদের এই নীতিকে কেউ সমর্থন করলে তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই গণতন্ত্রে নেই।

—সম্প্রতি বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি এম-এর বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মন্তব্য : কমিউ-নিজমের তিলককাটা দক্ষিণপন্থী কমিউ-নিস্টরা অজয়বাবুকে কুৎসা রটনায় লেলিয়ে দিয়েছেন। এই অভিযোগ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

**এইরে—সর্দি লাগল!**

এবার গা ম্যাজম্যাজ করবে, নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হবে, গলাব্যথা করবে,—তারপর সর্দি বসলেই মুস্কিল!

## এক্ষুনি ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন! বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না!

সবে সর্দি লেগেছে! এখনই এর একটা ব্যবস্থা করুন!
তা না হলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি—অযথা কষ্ট ভোগ করতে হবে।
সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, তাহলে কোনও কষ্ট পেতে হয় না—বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না। আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,—যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে। খুবই সহজ কাজ। তেতো বড়িও গিলতে হবে না, বিচ্ছিরি মিক্সচারও খেতে হবে না।
ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে, সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

১) 
বাইরে থেকে গায়ে

২) 
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ করে তোলে।

**সব সময়ে মনে রাখবেন।**

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায় বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

**সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!**

কুৎসাই রটনা করেছেন, আরও করবেন। এটা নতুন কিছু নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি। শ্রমিকের আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী শ্রমিকশ্রেণী এই কুৎসার উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন। যাঁরা একদা চীনের গুণকীর্তন করে কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাই আজ বলছেন—চীনের পথ ঠিক নয়। যাঁরা অহরহ শ্রমিকের কল্যাণের জন্য আহার-নিদ্রা বিসর্জন দিচ্ছেন, তাঁরাই এ আই টি ইউ সি ভাঙতে উদ্যত হচ্ছেন—শ্রমিক-নেতা মিরাজকরকে বহিষ্কার করেছেন। এই ভুল রাজনীতির ফলেই তো নকশাল-বাড়ি গ্রুপের জন্ম। এই ভুলের মাশুল তাঁদের এমনি করেই দিতে হবে। আমাদের দুঃখ এখানে যে, তার জন্য সাময়িকভাবে শ্রমিকশ্রেণী তথা সাধারণ মানুষকেও অনেক ক্ষতি সইতে হবে।

—আপনি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'অসভ্য' বিবেচনা করেন কি?

—না। সরকার অসভ্য হবে কেন? যুক্তফ্রন্টের আমলে কয়েকটি ঘটনা হয়তো ঘটেছে, সভ্যতার যার পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করলেই তো সমস্যার সমাধান হয় না।

**শ্রীযতীন চক্রবর্তী**

**[ পরিষদীয় মন্ত্রী ]**

সাক্ষাৎকার—৭ই ফেব্রুয়ারী

—১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ১৯৬৯ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্ট অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আজ যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দলীয় কলহ তাকে এক অনিবার্য ভাঙনের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই আত্মকলহের পরিণাম সম্পর্কে ফ্রন্ট নেতারা নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। তবুও দিনের পর দিন এই আত্মঘাতী কলহ চলবার কারণ কি?

—দলীয় সংকীর্ণতাই এর প্রধান কারণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে গঠিত যে দলগুলি এই যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল—তার মধ্যে একদিকে যেমন শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী দল ছিল, তেমনি অন্যদিকে শ্রেণীসমন্বয়ে বিশ্বাসী দলও ছিল। ৩২-দফা কর্মসূচী এই দলগুলিকে একত্র করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার এবং দেশবিভাগজনিত সমস্যায় জর্জরিত এই রাজ্যের সাধারণ মানুষগুলির কিছু কল্যাণসাধনই ছিল সেই ৩২-দফা কর্মসূচীর মূল কথা।

সেই কর্মসূচীতে একথাও আমরা বলেছিলাম যে, এই রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় [illegible] করবো। কিন্তু আমরা আজও তা করতে পারি নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কেন আমরা পারলাম না? কি বাধা আমাদের সামনে ছিল? এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই, বাধা যা ছিল তা অন্তরের। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত প্রতিটি দলই জানতেন, এখনও জানেন সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে কাজ করার বাধা কতটা এবং কি প্রকৃতির। কিন্তু এক্ষেত্রে বাস্তবিকপক্ষে যেটার অভাব দেখা গেল, সেটা হলো সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমাম কাজ করবার একটা বড় মনোভাব। আমরা কি পারতাম না রাস্তাঘাট বা স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে কিংবা জনস্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের বহু অব্যবস্থা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করতে? কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়ে নানাভাবে প্রতিটি দল তার প্রভুত্ব বিস্তারের কাজেই সর্বাধিক সময় নষ্ট করতে ব্যাপৃত হয়ে পড়লো। অপ্রিয় হলেও এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে না যে, দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে আমরা উঠতে পারি নি।

—শরিকী সংঘর্ষ প্রধানত গ্রামাঞ্চলেই বেশি হয়েছে। আপনার কি মনে হয় গ্রামাঞ্চলে থানা কিংবা অঞ্চলভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব সংঘর্ষ অনেকাংশে এড়ানো যেতো?

—না। কেন না, প্রত্যেক থানাতেই ফ্রন্টভুক্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। এর ফলে থানা কমিটি হলে সেখানে কায়েমী স্বার্থের দালালশ্রেণীর অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতো। আর নিচু-স্তরে সেই অবস্থা হলে সংঘর্ষ কিছুতেই এড়ানো সম্ভব হতো না। মুখ্যমন্ত্রী-উপ-মুখ্যমন্ত্রী যতই সাংবিধানিক ঝগড়া এবং অধিকারের লড়াই করুন না কেন, মন্ত্রিসভায় কিন্তু তাঁদের সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয় না, রাজনৈতিক বিতর্ক ব্যক্তিগত রেষারেষিতে পৌঁছয় না। কিন্তু এ ব্যাপার নিচুতলায় হলে সংঘর্ষ অনিবার্য।

—পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে যথেষ্ট হৈ-চৈ হয়েছে এবং হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে এ রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে বলে আপনার মনে হয় কি?

—আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে মানুষের ধারণা এখন কিছুটা বদলেছে। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে এক বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী আইনের শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে দেশের কায়েমী স্বার্থের সেবকদেরই সেবা করে এসেছে। যুক্তফ্রন্ট সর্বপ্রথম চেয়েছিলো এই একচেটিয়া সুবিধাবাদের অবসান করতে। কারখানা বন্ধ করবার অধিকার মালিকের থাকবে অথচ শ্রমিকের পারে না। হাজার হাজার বিঘা জমিতে যারা নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ী করে রাখলো, এক সময় পুলিশ তাদের পেছনেই দাঁড়াতো বলে আজও দাঁড়াবে, এও তো চলতে পারে না। যুক্তফ্রন্ট চেয়েছিলো এইসব অধিকারের মোকাবিলা করতে। জনতার মধ্যে তাই একটা মুক্তির আলোড়ন দেখা গেছে। জনগণের এই সংগ্রামী আন্দোলনকে রক্ষা করার ব্রতই ছিল যুক্তফ্রন্টের। আজ যদি সেই ব্রত প্রতিপালিত না হয়, দলীয় স্বার্থে সরকারী দপ্তর ব্যবহৃত হয়, তবে সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। তবু যুক্তফ্রন্টের পতনোন্মুখ পরিস্থিতিতেও সবকিছু ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে আন্দোলনমুখী মূল সুর বজায় আছে।

—কিন্তু জনগণের মধ্যে আইন লংঘন করবার একটা সাধারণ ঝোঁক লক্ষিত হচ্ছে না কি?

—তা হচ্ছে। দীর্ঘকালের বন্ধনদশা থেকে মুক্তির পর আচারে-আচরণে একটু বাড়াবাড়ি হওয়া অসম্ভব নয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আমরা সাহেবদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতাম? সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি সেদিন ইংরেজ সৈনিকদের ঘৃণা করতো, অবজ্ঞা করতো, কখনো অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতো। আজকের ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম। এ ছাড়া এর সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নটাও জড়িয়ে আছে।

—পশ্চিমবঙ্গে কি একটি বিকল্প সরকার গঠিত হতে চলেছে? রাজনৈতিক অচলাবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙনের মুখে। সে ক্ষেত্রে আপনার দলের ভূমিকা কি হবে?

—মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল ব্যতি[রেকে] একটা মিনি-সরকারের কথা কিছু[দিন] দিন থেকে শোনা যাচ্ছে বটে। তবে আমার মনে হয়, কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া এ ধরনের কোন বিকল্প সরকার গঠিত হওয়া সম্ভব নয়। আর কংগ্রেসের সমর্থনে কোন বিকল্প সরকার গঠিত হলে আমার দল (আর এস পি) তা সমর্থন করবে না।

—কিন্তু আপনার দল কেরলে অনুরূপ সরকারকে সমর্থন জানায় নি কি?

—কেরলের অবস্থাটা একটু অন্য রকম। সেখানে মিনি-ফ্রন্ট কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিবেচনা করে আমরা সেই সরকারের প্রতি আমাদের সমর্থন রেখেছি। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রচেষ্টা জনগণের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের সামিল। তার আগে যুক্তফ্রন্টের আ[বার] একবার জনগণের আদালতে যাওয়া

**দাদাগিরি টু ড্যাডাইজম**

ইদানীং কথাটা শোনাই যায় না। অথচ তখন, মানে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গায়ে গায়ে চল্লিশের দশকে, দাদাগিরি ফলানোর অভিযোগ ক্ষুব্ধ ছোট ভাই-দের মুখে মুখে হরদম ঘুরত। সে-দিনের অনেক সখেদ-স্মৃতি ছত্রিশ বসন্ত পার করে আজও বেঁচে আছে আমার আহত মনের কোণায়। দুঃখ আছে। দুঃখ আছে, কারণ, চপেটাঘাত-সহযোগে কর্ণমূল মর্দনের দেদার পরওয়ানা দাদারাই সেকালে ভোগ করেছেন একচেটিয়াভাবে।

একবার পাড়ার এক গুন্ডা ছেলের হাতে নিগৃহীত হওয়ার পর ক্ষুব্ধ আক্রোশে মনের ঝাল মেটাচ্ছিলাম একটি আধুনিক সাহিত্যিক শব্দ উচ্চারণ করেঃ শালা! লক্ষ্য করি নি আট বসন্ত আগে জন্মগ্রহণের অধিকারে যিনি প্রায়শই "দাদাগিরি ফলান," তিনি তখন আমারই পিছনে উপস্থিত। আচমকা কর্ণমূলে প্রচন্ড হ্যাঁচকা টান এবং দাদার গর্জনঃ আর কখনো বলবি? মানে বুঝিস?

আর একবার ছাদের সিঁড়িতে লুকিয়ে বসে শরৎবাবুর উপন্যাস পড়ছি, পড়বি তো পড় ফিউডাল লর্ড দাদা-বাবুর হাতেই "কট" এবং 'আউট'। ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে বললেঃ পিপুল পেকেছে?

উপন্যাস রসাস্বাদের গোপন পুলকে কাজে কাজেই ইস্তফা দিতে হল। মনে আছে, ম্যাট্রিকুলেশনে উপন্যাসের নামে ডেভিড কপারফিল্ডের একটা "মিনি" সংস্করণ পাঠ্য পেয়ে ভেবে-ছিলাম, ফিউডাল দাদাকে এক হাত দেখে নেব এবার। বিশেষ স্থান চীৎকার করে রীডিং পড়তাম। শব্দগুলি ইংরেজি, তাই আপত্তি হত না। কিন্তু ফিউডাল দাদার আবলুস কালো মুখটাও রাঙা হয়ে উঠত শুধু "লভ" শব্দে জোর দিয়ে উচ্চারণ করছি শুনলে। দেখতাম, জব্দ দাদাবাবু তাঁর বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক নিয়ে উঠে যাচ্ছেন। পিতৃদেবের সামনে "লভ" শব্দ উচ্চারণ তিনি গর্হিত কর্ম মনে করতেন। অথচ উপায় নেই। টেক্সট বুক আওড়াচ্ছি, বকবে এমন মুরোদ কৈ? কী যে প্রতিহিংসার আনন্দ তখন আমায় উত্তেজিত করত! মনে মনে বলতাম, মজা বোঝো এবার। তোমার কলেজ নোট বুকে ক্লাশ নোটের বদলে রবি ঠাকুরের প্রেমের কবিতার কোটেশনগুলো কি লুকিয়ে দেখি নি নাকি? "মঞ্জুলিকা, কতই বা তার বয়স" লিখে 'মঞ্জুলিকা' শব্দে কালি বুলিয়ে বোল্ড টাইপ করেছে। উপায় নেই, নয়ত আমিও [illegible] লেজে। আর

কিনে কেবল মেয়েদের ছবি আঁকছ। তুমিই কিনা আমাকে শাসন করার মাস্টার! একশ'বার ডেভিডের লভ এ্যাফেয়ার তোমারই কানের কাছে চীৎকার করে পড়ব। কাঁচকলা করবে আমার। বস্তুত সেই আমার প্রথম ঘোষিত বিদ্রোহ অত্যাচারী দাদার বিরুদ্ধে।

এরপর যুগ পাল্টে গেল। দেশ পার্টিশন্ড হল। দেখলাম, কলকাতার পথে পথে দাদারা ছোটদের তফাৎ রেখে নিজেরা সাবধানে আপন চক্রে সরে থাকছেন, সম্ভ্রম বাঁচাচ্ছেন। দুটো স্পষ্ট ভাগ হয়ে গেছে এবং তারও পরে "দাদাগিরির" জায়গায় আর একটি শব্দ শোনা গেল, "ড্যাডাইজম"। সেটা স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ। হোমরা-চোমরা দাদাদের আধুনিক সাহিত্যিক ভাষায় "গ্যাস" দিয়ে চতুর ছোট ভায়েরা আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। উল্টো-ভাবে দাদাদের হম্বি-তম্বি লোপাট। তাঁরা কনিষ্ঠতরদের হাতিয়ে নিতে উদ্গ্রীব। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অনুজ বাহিনীর নেতা বনার উদ্দেশ্যে পাল্টা তোষামুদি তাঁদের পক্ষ থেকেও অপ্রতুল নয়।

সাহিত্যিক দাদা স্তাবক বাহিনী নিয়ে নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছেন। রাজনৈতিক দাদা গুন্ডাবাহিনী গড়ে এলাকা কন্ট্রোল করছেন। মাস্টার-প্রফেসর দাদারা ছাত্রবাহিনী হাতে রেখে কোনরকম নিশ্চিন্ত চাকরি বজায়

মস্তান দাদারা ছোকরা বাহিনীর দাপটে ছোটো ছোটো হের হিটলার বনছেন।

দাদাদের এই আত্মসমর্পণে দেখতে দেখতে পুরো কলকাতার চেহারাটাই গেল পাল্টে। ক্রমশ দেখলাম, দাদা আর ভায়েরা একই সঙ্গে রোয়াক দখল নিয়ে দিদিদের "সিটি" সহযোগে আপ্যায়িত করেন। দিদি ও বোনেরা বাঁকা ভ্রূ বাঁকিয়ে, হরিণ চোখ হাঁকিয়ে মিঠে প্রত্যুত্তরে তরুণ মনে হুতাশন আবেগ-উদ্বেগের সঞ্চার করে সমগ্র এলাকার হাওয়া দুলিয়ে এনট্রান্স-এক্সিট করছেন সকাল-বিকাল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বড়জোর ইলোপমেণ্ট। তবে শ্লীলতা-হানির অভিযোগে লোকাল থানার ডায়রী হররোজ মসীলিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা বেলঘরিয়ার আগে ব্যাপক নয়। সেদিন ডাঃ বিধান রায়ও কলকাতাকে বেঁধে রাখতে পারেন নি। কিন্তু হুড়মুড় করে সে যুগও ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। বেকারী, গৃহসমস্যা, আর্থিক সংকট সমস্ত সমাজের ঝুঁটি ধরে প্রবল বেগে নাড়া দিল। সদ্য স্বাধীন তরুণ সম্প্রদায় হতাশা এবং ব্যর্থতায় দিশা-হারা। অপিচ সুবিধাবাদী নেতারা পথ বাতলানো দূরের কথা, আপন-স্বার্থে তরুণ সমাজকে বিপথগামিতায় উৎসাহিত করে চললেন। ভবিষ্যৎটা কেউ একবার ভাববার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। দরকার কি, গদীতে বসে নিজের এবং নিজ অধস্তন পঞ্চ পুরুষের পেটপুজোর

রামই তো জাতীয় মুক্তি। জাতীয় মুক্তির অর্থ যদি কেবল দেশোন্নতিই হয় তবে হিমালয়প্রমাণ দায়িত্বের বোঝা বইবার জন্য ভোটে জেতার অত কসরৎ কে করেন? প্রকৃত দেশসেবকরা আপন-গুছানী রেসে তাই ক্রমশ ধাক্কা খেতে খেতে পিছনে পড়ে গেলেন। নেতা হলেন তাঁরা, তরুণ বাহিনীকে যাঁরা পুরে নিতে পারলেন হাতের মুঠোয়। এজন্য বেকারি দূরীকরণ কিম্বা অশিক্ষা বিতাড়ন বন্ধ রইল। দেশের ছেলেরা মানুষ হলে দেশের কথা চিন্তা করবে। ওদের সমস্ত রকম চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে রাখো। সমস্যায় সমস্যায় বেঁধে ফেলো। নয়ত—দুষ্টামিতে ফসলে আনো। তাই বাঁধনের পাকে পাকে জড়িয়ে তারা কামধেনু নয়া নেতা দাদা-দের মুখাপেক্ষী হোক, কুমতলবের সঙ্গী হোক। ওদের জন্য কোনোরকম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। তাহলে ছোঁড়ারা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ওদের জন্য যথেচ্ছাচারের পথ খুলে দাও। পুলিশের খাতায় নাম তুলে বেঁধে ফেলো। পালাবার পথ থাকবে না। ওদের এক ধরনের ছাড়া ক্রীতদাস কর।

এ টোপ যারা গিললো, ওগরাবার আর ক্ষমতা নেই। উপায় হলেও ভাড়াটে গুন্ডামীর চক্র থেকে বার হওয়ার পথ নেই। তাছাড়া যতক্ষণ প্রশাসনিক প্রশ্রয়ে দাপট চালানো যায়, ততক্ষণ দাপটের আনন্দ আকর্ষণও তো আছে। ওরা জাল কেটে বার হতে পারল না। আজও পারে নি। যারা "ড্যাডাইজম" করে ক্ষমতাবান দাদা পাকড়াতে পারল, পাড়ায় পাড়ায় তারাই হল শান্তিরক্ষক: যারা ততদূর পারল না কিন্তু ধমনীতে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ উচ্ছৃত হওয়ায় নিজেরাই ক্ষুদে হিটলার বনতে চাইল, মারা পড়ল তারাই।

সেই একই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। তরুণ সমাজকে এক্সপ্লয়েট করার সেই একই চাতুর্য আজ পাঁচ শরিকে ভাগ করে নিয়েছে বলেই বিবাদ শরিকানী সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে।

আমরা সাবধানে সরে থাকি। বয়স বাড়ছে। অনেক দেখলাম, দেখছি। বুঝলাম, বুঝছি। সুতরাং যে পালায়, বাঁচে সে-ই—ঋষিবাক্য শিরোধার্য। দেশোদ্ধারে আর কাজ নেই।

থালিয়ে এলাম পরশু রাত্রে। বসুমতী অফিস থেকে ফিরছি। পাড়ায় প্রবেশের মুখে অনুজদের জটলা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম।

: ব্যাপার কি?

: দারুণ ব্যাপার দাদা! ওরা পাইপগান, স্টেনগান চালিয়ে দেবে বলেছে। মাঠে আমরা পুজো করতে গেলে প্যান্ডেল জ্বালিয়ে দেবে। আমরাও দেখে নেব কত হিম্মৎদার। এখন তো আর ওদের দাদারা নেই।

: তোমাদেরই বা মাঠে পুজোর কি দরকার? তোমরা তো দিব্বি গলির মোড়ে দুর্গা ঠাকুরের নামে উৎসব করলে। সরস্বতীর মেলাটাও সেখানেই হতে পারত।

: উৎসব! মেলা?

: বারোয়ারী তলায় উৎসবই হয়। ওটাকে পুজো বলে হিন্দুর দেব-দেবীকে নাই বা ছোট করলাম।

ছেলের দল নড়ে-চড়ে দাঁড়াল। স্পষ্ট উদ্ধত বিরক্তি চোখ-মুখে। মনে মনে প্রমাদ গণনা করলাম আমি। তারপর ভাবলাম, যা থাকে কপালে, মন খোলসা করেই বলব। এককালে পাড়াতে দাদাদের ভয় করেছি, আজ পাড়াটে অনুজ-দের ভয়-ভক্তি করতে হয়। মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো। কিন্তু আমার বিদ্রোহী বক্তব্য আর ওষ্ঠচ্যুত করার সময় পেলাম না। দ্বিতীয় বিদ্রোহ চাপা পড়েই রইল।

বিশ শতকের সাতের দশকের ইয়ং বেঙ্গল আঁটা টেরিলিন প্যান্ট-ব্রিচেসের ঘর্মাক্ত সুবাস ছড়িয়ে দিল সারা পাড়ায়। কোত্থেকে একদল মিডিয়েটরও এসে জুটে গেলেন। এঁদের চিনি। এঁরা রাজ-নীতিক দাদা।

আমাকে দেখেই কেউ কেউ বললেন: আরে দাদা, আপনি থাকতে আপনার পাড়ায় এসব গোলমাল! পুজো নিয়ে পীস ব্রেক করা, পাইপগান......কি সব হচ্ছে.........

: ঠিকই হচ্ছে।—হাসলাম: পুজো যেখানে পুতুল খেলা, পুজোর সংগে যেখানে বিশ্বাস ও ভক্তি যুক্ত নেই, আছে প্যান্ডেল, মাইক, লাউড স্পীকার, প্রতিমার আর্ট—সেখানে পুজোটা সার্কাস, নয় ফিয়েস্তা। পাশাপাশি দুটো ফেরিয়ালা মার্কেটে দুই ব্যাপারী একে অপরকে হটিয়ে দিতে চায়; ময়দানে পাশাপাশি একাধিক "ফেয়ার" 'এক্সিবিশন' বসালো হলে অন্তর্দাহন আর শরিকানী বিবাদ বাধে। বারোয়ারী পুজোটাও সেই স্তরে এক জাতের ব্যবসা হয়েছে। বিবাদ তো অবশ্যম্ভাবী। ঠেকাবে কে? দেখেন নি, দুর্গাপুজোর ওপর মেয়রের প্রাইজ ঘোষিত হওয়ার সংগে সংগেই জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল? রাস্তা-ঘাটে বাস-ট্রামের গায়ে পড়েছিল বিজ্ঞাপনী পোস্টার: আমাদের প্যান্ডেলে আসুন। প্রতিমা-শিল্পী অমুক।

: মেয়র শৃংখলা চেয়েছিলেন।

: ঘুষ দিয়ে?—হাসলাম।

: আপনিও যদি এসব কথা বলেন.........

: কথা বলব না, এমন কথা তো দিই নি।

উৎসাহী শান্তিরক্ষকরা এরপর পাতলা হয়ে সরে গেলেন আশ-পাশে। বুঝলাম, কথাটা মন ভরাতে পারে নি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম বাড়ির দিকে। স্ত্রী উৎকণ্ঠিতা। তাড়াতাড়ি হাত ধরে ঘরে নিয়ে বলল: তুমি আবার গোলমালে গেছো? ছেলেরা কেউ তোমার সম্মান রাখবে? সরে এসো।

একদিন দাদার ভয়ে পাড়াটে মাতব্বরির আবহাওয়া থেকে সরে গেছি, আজ অনুজদের ভয়ে অনুরূপ সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। কারণ, "ড্যাডাইজম"-এ শ্রদ্ধা নেই, দল নেই আমার। দাদা বনতেও অপারগ। স্পষ্ট কথা মুখে এলে কষ্ট করে তা চেপে রাখতে পারি নি।

রাতটা হয়ত নিশ্চিন্তেই কাটতে পারত। কিন্তু কপালে নেই।

একদল অনুজ এসে হাঁক দিল।

বেরিয়ে আসতে নিচুস্বরে বললে: অমুকদা জীপ নিয়ে এসে ওদের আচ্ছা করে শাসিয়ে গেছে। বলেছে শান্তিভঙ্গ হলে ছিঁড়ে ফেলবে। ঠিকমত সমঝে দেবে যদি ওরা অমুকের গায়ে হাত দেয়। এবার একটা লাগল, দেখে নেবেন।

আর কিছু দেখবার বাসনা নেই। সারা বাংলা দেশের চেহারাটাই চোখের ওপর দেখতে পেলাম কলকাতার এক-চিলতে গলির মুকুরে। যে দাদা জীপে চড়ে এলেন, তাঁর কর্মোৎসাহ শান্তি-রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা এবং দলপ্রাণতা প্রশংসার্হ বটে। যাঁরা পাইপগান চালাবেন বলে শাসালেন এককালে তাঁদের দাপটে দিশেহারা বোধ করেছি আমরা, এখনও পাড়ায় তাঁরা অশান্তির কারণ এবং যে অনুজটিকে রক্ষার জন্য অমুকদার

আগমন, আমার থেকে কেউ বেশি জানে না যে, সে আদৌ কোনো দল করে না। ইদানীং "ড্যাডাইজমে" দীক্ষা নিচ্ছে। বেকায়দা বুঝলে সরে যাবে।

বললাম ঃ দল কর, দেখোশোনার হবে। তোমরাই তো ভরসা। ইয়ং বেঙ্গল!

কিন্তু একটা ভয় তবুও রয়ে গেল। সত্যিই যদি দলীয়রা টের পান, এখানে একটা দলাদলি পাকিয়ে উঠছে, সমগ্র বিধানসভা হুমড়ি খেয়ে এসে পড়বেন। একটা লাস পড়লে পাঁচটা পার্টি এসে মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করে সনাক্ত করে যাবেন তাঁদের সমর্থক বলে। হিসেবের খাতায় টিক বাড়াবার জন্য সবাই চাইবেন শবটাকে স্বদলীয় বলে চিহ্নিত করতে। মিছিল আর পুষ্পস্তবকে পাড়াটা ঢাকা পড়বে। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা ছুটে আসবেন ক্যামেরা নিয়ে এবং হয়ত যাকে দেখতে নারি, তাকেই হত্যাকারী সাজানো হবে।

অপিচ প্রতিবেশিকুল আকুল হয়ে বোঝবার চেষ্টা করবেন, ব্যাপারটা পাড়াতুতো। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বাদ দিন স্যার। মড়া আটকাবেন না। পরকালের ব্যবস্থা করতে দিন!

কেউ কোনো কথা গ্রাহ্যও করবেন না। মন্ত্রীরা বিবৃতি দেবেন। ফ্রন্টের বৈঠক বসবে। বারোয়ারী পুজোর মেলা প্রাঙ্গণে তৈরী হবে শহীদবেদী। ওদিকে শহীদ সুপুত্রের বাড়িতে কিন্তু বিমর্ষ ক্রন্দন, বুকফাটা বেদনায় হাহাকার করে উঠবে তখন, যখন এ্যাসেমব্লি ফ্লোরে চলবে তীক্ষ্ণ কৌসুলী-বিবাদ।

আমি আবার কলম নিয়ে বসব। লিখব ঃ উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে শহীদ কলকাতা, আর কত শহীদ তোমার প্রয়োজন! এখনো সময় আছে। ধীরভাবে, স্থির হয়ে একবার তুমি নিজের শ্রীহীন দীনদশার দিকে তাকাও। শহরটা গোরস্থান হওয়ার আগে সামলে নাও। সেম সাইডে প্রমত্ত হয়ে কালিদাসের মতো নিজের ডালে নিজেই কুড়ুল চালিও না! দাদাগিরি, ড্যাডাইজম, কোনটাই তোমাকে বাঁচাবে না কলকাতা। তুমি নিজের চেহারা ফেরাও। তোমার বুকে বসে যারা তোমারই দাড়ি ওপড়ায়, উপড়ে ফেল

বারোয়ারী কলকাতায় অত্যাচার থামাও। আর কিছু না পারো, ট্যাক্স বসাও প্যাণ্ডেল মেপে, মাইক হিসেব করে, সাজ-সজ্জা, বিজলী বাতির বাহুল্যের ওপর। হুগলী নদীর পলিমাটি আর্টের প্রতিমা গচ্ছিত করে দিন দিন মোটা হচ্ছে, আর কিছুটা টেনে হুগলী নদীর তৃতীয় সেতু বেঁধে ফেলো। রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে যাঁরা নাগরিক অসুবিধার সৃষ্টি করেন, তাঁদের কাছ থেকে খেসারত ওঠাও নতুন রাস্তা নির্মাণের জন্য ক্যালকাটা ইনপ্রুভমেণ্ট ট্যাক্স বসিয়ে!

—১৩।২।৭০

তার সান্নিধ্যেই তো আছি। শত শত আলোক-বর্ষের ওপারে বিরহী হয়ে-ওঠা কোটি কোটি নক্ষত্রের তুলনায় খুব ধারেকাছেই তো আছি তার।...সে সূর্য, আর আমরা পৃথিবীর মানুষ। ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্বের হিসেবে আমাদের মধ্যকার দূরত্বটা তেমন বেশি কিছু তো নয়! কিন্তু তবু মন মানে না যেন। সূর্যের সঙ্গে দূরত্বের ফারাকটা আরও কিছু কমিয়ে না আনলে দূরাভিসারী মানুষের কাছে অনেক কিছুই যেন অজানা থেকে যায়; প্রতিবেশী গার্জেন-নক্ষত্রটির রকম-সকমের ঠিক যেন হদিস মেলে না। তাই নতুন উদ্যোগ-আয়োজন হচ্ছে আজ। সূর্যের বেশ খানিকটা কাছে রকেট পাঠিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে।

সম্প্রতি জানা গেছে, ১৯৭৪-৭৫ সালে দু'টি রকেট যাবে সূর্য-সান্নিধ্যে। সূর্যের ২ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল কাছে যাবে ওরা।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, একথা যদি স্মরণে রাখি তো দেখবো, এই কাছে যাওয়ার অর্থ হল, এদের মোট দূরত্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পাড়ি দেওয়া।

এ বড় কম কথা নয়,--বলছেন বিশেষজ্ঞরা. কাছে থেকে সূর্যকে দেখার অভূতপূর্ব এক সুযোগ পাওয়া যাবে এ থেকে ; আর এ সুযোগ সৃষ্টি করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর ফেডারেল রিপাবলিক। যুক্তরাষ্ট্র উৎক্ষেপ করবে রকেট: আর সে রকেট তৈরি করবে জার্মানী। স্বয়ংক্রিয় অনেক রকম যন্ত্রপাতি থাকবে ওদের মধ্যে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া ও ইটালীর বিজ্ঞানীদের গড়া সব যন্ত্রপাতি।

মোট দশ রকমের পরীক্ষা হবে সে-সময় এবং সূর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা সেই সব পরীক্ষার দৌলতেই রাতারাতি বদলে যাবে। আমরা সূর্যের কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নতুন সব তথ্য জানতে পারবো। ঐ মহাকাশযানগুলো সৌর-বায়ু, বিশ্বজাগতিক বিদ্যুৎ ও চুম্বক-ক্ষেত্র, কসমিক রশ্মি এবং কসমিক-কণিকাদের নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এমন সব অদ্ভুত-আশ্চর্য পরীক্ষা চালাবে, আমরা এতকাল যা' নাকি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

অবশ্য এই প্রকল্পকে সাফল্যমণ্ডিত করা দুরূহ খুবই। কেন না, এ ক্ষেত্রে তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে বিদ্যুৎ-শক্তিকে যথাযথভাবে চালু রাখার উপযোগী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং মহা-কাশযানকে ঠিক পথে চালনা করা চাঁদে-মামার চেয়েও দশ গুণ কষ্টসাধ্য কাজ।

কিন্তু তবু, এ-কাজে মানুষ যে একদিন সফল হবে, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমাদের; এবং সন্দেহ মোটে নেই বলেই সূর্য সম্পর্কে সম্প্রতি আমরা নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি।

আমরা ভাবছি, সূর্য অন্য সব নক্ষত্রের তুলনায় কত কাছে আমাদের! কেন না, সূর্যের ঠিক পরেই যে নক্ষত্রটি আছে, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। অর্থাৎ, সূর্যের তুলনায় পৃথিবী থেকে ২ লাখ ৭০ হাজার গুণ দূরে সে।

এর চেয়েও দূরবর্তী অনেক নক্ষত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিত্য-সহচর। এত দূরে আছে এরা যে অতি বড় শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলেও আলোকবিন্দুর চেয়ে বড় মনে হয় না এদের। অথচ আকারে-প্রকারে এরা কিন্তু সূর্যেরই গোত্রীয়। ঠিক সূর্যেরই মতো আগুনের গোলক এরা, গ্যাসের পিণ্ড।

সূর্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল। মোট ১৩ লক্ষ পৃথিবীকে সে তার জঠরের মধ্যে পুরে রাখতে পারে। আর সেই জঠর বরাবর সূর্যের ঠিক মাঝখানটা দিয়ে যদি একটা রেখা টানা যায় তো সেই রেখার ওপর ১০৯টি পৃথিবী লাইন করে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু এ তো গেল কল্পিত লাইন। আসলে সূর্যের দেশে এমন কিছু কি আদৌ আছে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যা চোখে পড়বে?
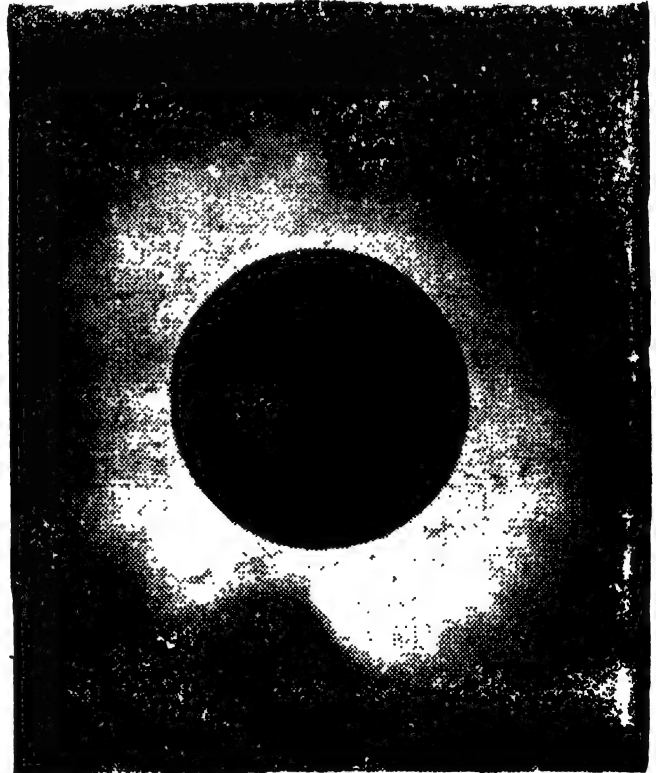
বিশেষজ্ঞরা বলছেন,—না, নেই। সূর্যের উপরিভাগটা অসমতল, এবড়োখেবড়ো। অবিরাম যেন পরিবর্তনের ঝড়-তুফান চলছে সেখানে। অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট বিচিত্র সব ধূসর চিহ্ন থেকে থেকে সেখানে আবির্ভূত হচ্ছে এবং থেকে থেকেই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। ঐ চিহ্নগুলোকে দেখে স্পষ্টই ধারণা হচ্ছে যে, কঠিন কোনো পদার্থের গায়ে ওরা নেই, আছে দারুণ তপ্ত এমন কোনো গোলকের গায়ে, শুধু-মাত্র গ্যাসই নাকি যার মূলধন।

এদিকে মূলধনও স্থির হয়ে নেই মোটে, টগবগ করে ফুটছে সারাক্ষণ; এবং এই ফুটুনির আভাসটা সে দিচ্ছে রাশি রাশি বুদ্‌বুদের মধ্য দিয়ে।

বুদ্‌বুদগুলোও অচিরস্থায়ী খুব; এই আছে, এই নেই যেন। যেন মিনিট কয়েকের খেলা খেলে নতুনদের জন্যে স্থান
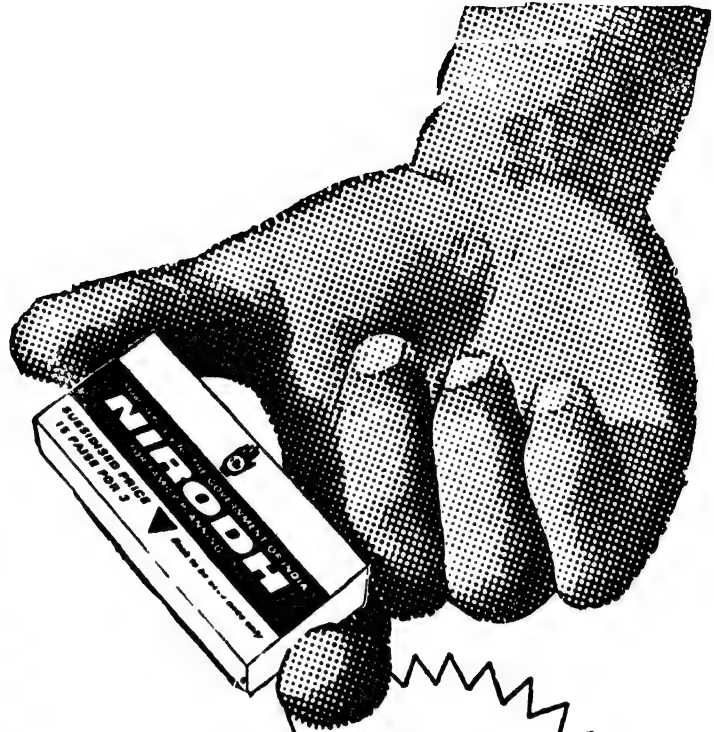
করে দেওয়া ওদের কোটি বছরের রেওয়াজ। ওদেরই জন্যে যেন সূর্যের ওপরটাতে অদলবদল চলল সেই আদ্যিকাল থেকে।

ওরা কত বড়?—সূর্য-সান্নিধ্যে রকেট পাঠাবার আগে কেউ কেউ শুধোচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন,—বড় ওরা খুবই। ২০০ থেকে হাজার মাইল অবধি ওদের ব্যাস। সংখ্যায় সাধারণত ওরা ১০ থেকে ২০ লক্ষের মধ্যে।

আশেপাশের গ্যাসপুঞ্জের তুলনায় উজ্জ্বল দেখায় ওদের। মনে হয়, সূর্যের ভিতর-বাহির এলাকা জুড়ে যে সব গ্যাস-প্রবাহ চলছে, তাদেরই দৌলতে ওদের দ্যুতি।

প্রবাহগুলোর এক একটার এক এক-রকম তাপাংক। বিজ্ঞানীদের মতে, এই তাপাংকের হেরফেরের জন্যেই ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য ঘটে এবং বুদ্‌বুদগুলোকে দেখি আমরা। আর সূর্যকে আমরা সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখি তার মাঝখানটিতে। তার কিনারার দিকে এগোই যত, উজ্জ্বলতা ততই কমে আসে: ততই ধূসর কিছু কিছু আবরণ সূর্যের ওপর ছায়া ফেলে যেন।

কিন্তু কেন ফেলে? এত যার ঐশ্বর্য, তারও বক্ষে রিক্ততার চিহ্ন কেন আবার?

বিজ্ঞানীরা বলছেন,—আবার কেন! সূর্যের দেশে আলোকাভিসার এক এক জায়গায় এক এক রকম বলে। সে দেশের মাঝখানটি থেকে আলোক আসে বলে সরাসরি। অপরদিকে কিনারাগুলো থেকে যে আলোক আসে, তার উৎস হল অপেক্ষাকৃত শীতল এলাকা। এ ছাড়া, এই কিনারা থেকে নির্গত আলোক সূর্যের মাঝামাঝি এলাকার আলোকের তুলনায় সৌর বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত বেশি পথ অতিক্রম করে। এবং আসল অতিক্রমণটা যা'ই হোক না কেন; আমাদের চোখের হিসেবে অন্তত করে। আর চোখও সৌর-দেহের ঐ গাঢ় কালো দাগগুলোকে ঠাওর করে ঠিক। সৌর-কলঙ্কদের ঠিকই চিনে নেয়।

কিন্তু তবু সৌর-কলঙ্ক নয়, সূর্যের আলোঝলমল ওপরটাই নিয়ত মুগ্ধ করে আমাদের এবং আমরা সূর্যের ঐ অংশটাকে বলে থাকি 'ফটোসফীয়ার' বা 'আলোর গোলক'। এই গোলকের তলায় আছে সূর্যের ভেতর-মহল। একে চোখে দেখি নে আমরা, এর ছবিও তুলতে পারি নে; শুধুমাত্র জল্পনা-কল্পনা করি একে নিয়ে। অনুমান করি, ব্যাস এর দু' লক্ষ মাইল এবং এ অংশটিতেই উৎপন্ন হয় সৌরশক্তির বেশির ভাগটুকু। তাপমাত্রা এখানে ২ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এখানকার উপাদানগুলো এমন ঠাসাঠাসি করে আছে যে, প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এদের ওপর গিয়ে পড়ছে হাজার হাজার টন চাপ।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সূর্যের তাপ ও আলোকের শতকরা ৯৮ ভাগই এই অংশটি থেকে উৎপন্ন হয়; এবং তারপর সেই শক্তি ক্রমশ পাতলা হয়ে-আসা সৌর-দেহ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই যে বাইরেকার আচ্ছাদন, একেই বলা হয় 'ফটোসফীয়ার'। তাপমাত্রা ভেতর-মহলের তুলনায় খুবই কম এখানে; মাত্র ৬ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আর এ ছাড়া, চাপও খুব কম। এমন কি পৃথিবীর বায়ু-চাপের একশো ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। এখানেই সৃষ্টি হয় সৌর-কলঙ্ক বা বুদ্‌বুদজাতীয় কণিকাকার সেই অদ্ভুত দাগগুলো।

এই 'ফটোসফীয়ার'-এর ওপরে আবার আছে সৌরবায়ুমণ্ডলের আরও দু'টি এলাকা। সচরাচর আমরা ওদের দেখতে পাই নে। কারণ, দিনের আকাশে ছড়িয়ে-থাকা আলোকের পৃষ্ঠপটে বড় বেশি অস্পষ্ট হয়ে থাকে ওরা। এমন কি 'ফটোসফীয়ার'-এর ওপরতলাকার 'রঙীন গোলক' বা 'ক্রমোসফীয়ার'ও থাকে অস্পষ্ট। 'ক্রমোসফীয়ার'-এর সৃষ্টি যে-সব গ্যাস দিয়ে, খুবই নাকি পাতলা ওরা। এত পাতলা যে, চাপ ওখানে পৃথিবীর বায়ুচাপের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগও নয়। অথচ এই 'ক্রমোসফীয়ার'কে ঘিরেই যুগে যুগে রচিত হয়েছে কত অপরূপ সূর্যবন্দনা। কারণ, মূর্তিমান আলোক-তীর্থ আছে ওখানে। রকমারি আলোক ওখান থেকেই কলোচ্ছ্বাসা ঝরণা হয়ে কখনও, আবার কখনও ভৈরব-ভীষণ শিখা হয়ে সূর্যদেহের দূর-দূরান্তরে ছুটে আসে। তবে 'ক্রমোসফীয়ার' নিজে কিন্তু স্থূলকায় নয় মোটেই। তার রাজিটা হাজার কয়েক মাইলের চেয়ে বেশি চওড়া নয়।

এই চওড়ার দিক দিয়ে অবিশ্যি সবাইকে টেক্কা দিয়েছে 'করোনা'। এ আছে 'ক্রমোসফীয়ার'-এর ঠিক ওপরে এবং এর মূলধন বলতে ভীষণ পাতলা সব গ্যাস।

সূর্য থেকে কম করে চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ মাইল অবধি ছড়িয়ে আছে এই 'করোনা'। তবে এত পাতলা এ যে এর রাজির মোট আয়তনের সঠিক হিসেব নেয়া সাধারণ অবস্থায় একরকম অসম্ভব। হিসেবটা শুধুমাত্র পরিপূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়েই নাকি নেয়া চলে।

এদিকে হিসেবনবীশ বিজ্ঞানীরা চুপচাপ বসে নেই। 'করোনা'র বেলায় হোঁচট খেলে কী হবে, আসল সূর্যের হালচাল ধরে বসেই বুঝে নিচ্ছেন ও'রা। বলছেন,—পৃথিবীর কায়দায় না হলেও অক্ষরেখার ওপরে সে ঘুরছে ঠিক। তবে পৃথিবীর বেলায় সবগুলো জায়গা একই গতিবেগে ঘোরে; কিন্তু সূর্যের বেলায় ঘোরে ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগে। কারণ, পৃথিবীর মতো কঠিন নয় সূর্য; কোটি কোটি টন গ্যাসকে সম্বল করে বায়বীয় বরং।

এই বায়বীয় পদার্থরা সূর্যের নিরক্ষীয় অঞ্চলে যে গতিতে ঘোরে, মেরু অঞ্চলে ঘোরে তার চেয়ে অনেক ধীর গতিতে,—সৌর-কলঙ্কের গতি দেখে বিজ্ঞানীরা বলেন। এ-সম্পর্কে ওঁদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হল, সূর্যের নিরক্ষীয় অঞ্চল একবার ঘুরপাক খেতে সময় নেয় ২৫ দিন; আর মেরু অঞ্চল নেয় ৩৩ দিন। মেরু ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের মাঝা-মাঝি এলাকাগুলো এই একই কাজের জন্যে ২৮½ দিন করে সময় নেয়।

এদিকে সৌর-কলঙ্ক নিয়েও নিত্য নতুন গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। হামেশাই বলছেন,—কলঙ্ক ওরা নামেই। নামেই ওদের গায়ে কালোর লেবেল আঁটা। আসলে কালো ওরা মোটেই নয়, উজ্জ্বল বরং, আশেপাশের সব এলাকার তুলনায় ওদের তাপমাত্রা দু-তিন হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম বলেই ঐরকম দেখায় ওদের। আয়তনের দিক থেকে ওদের এক একটি গোটা তিরিশেক পৃথিবীর সমান।

এক পৃথিবীর মাপে সূর্যের 'ক্রমোস্‌-ফীয়ার' থেকে বেরিয়ে-আসা আগুনের জিহ্বাগুলোকে বোঝানো যেতে পারে বরং। ওরা সাধারণত আট-দশ হাজার মাইল অবধি হয়ে থাকে। যদিও শুধু-মাত্র সূর্যের কিনারাতেই দেখা যায় ওদের, আসলে ওরা কিন্তু ছড়িয়ে থাকে সারা সূর্য জুড়ে।

খুবই ক্ষণস্থায়ী ওরা। বড় জোর দশ মিনিট ওদের আয়ু। দেখতে দেখতে অগ্নিময় সূর্য-গর্ভে সমাধি লাভ করে ওরা এবং পরক্ষণেই আবার নতুন রূপ ধরে সমাধি থেকে জেগে ওঠে।

এই জেগে-ওঠা আর এই মিলিয়ে-যাওয়া যুগ-যুগান্ত কাল ধরে চলছে; এবং আরও হাজার হাজার কোটি বছর ধরে চলবে। কারণ, সূর্য হল একটা বিরাট-বিপুল পারমাণবিক যন্ত্র। অতি ক্ষুদ্র বস্তু থেকে অতি প্রচণ্ড শক্তি প্রতি-নিয়ত উৎপাদন করছে সে। তার তাপ-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হতে এখনও অনেক দেরী।

এখন তার সম্পর্কে শেষ কথা,—সে চলছে, চলবে।

## আ মরি, বাংলা ভাষা !

**রবীন্দ্র-সংগীত শুনছিলাম। পশ্চিম-বাংলা তথা ভারতবর্ষে এ কোনো সংবাদ নয়।** যদি বলি, পাকিস্তান (ঢাকা) রেডিওতে রবীন্দ্র-সংগীত শুনছিলাম, তবে সেটা নিঃসন্দেহে একটা সংবাদ। কিন্তু এদ্দিনে এ-সংবাদও পুরোনো হয়ে এল। তবু এই সংবাদ তাৎপর্যে চিরঞ্জীব, উপলব্ধিতে প্রাণময়। অদূর অতীতের পটভূমিকায় এ-সংবাদ গভীর অর্থবহ।

রেডিওতে শুধু নয়, সমগ্র পাকিস্তানেই রবীন্দ্র-সংগীত ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু অতি-সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড হয়েছে, বাজারে ছাড়া হয়েছে, রেডিওতে চলছে এবং বিশ্ব-জগৎকে বিস্মিত করে খবর বেরিয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলায় অথবা সদ্য-প্রস্তাবিত "বাংলা দেশে" রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশনার দুর্নিবার উদ্যোগ চলেছে। পূর্ববঙ্গবাসীদের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পুনর্বাসন সুনিশ্চিত।

হিন্দু-বিদ্বেষের অগ্নিগর্ভজাত পাকিস্তানরাজ বা রাষ্ট্রকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরেছিল মোল্লাতন্ত্র; কল্পনা ছিল, এক ধর্মসূত্রে গোটা পাকিস্তানকে বাঁধতে গিয়ে সব ভাষাভাষীকেই একাকার করে দেবে, কি পূর্ব, কি পশ্চিম পাকিস্তান একই উর্দু ভাষায় কথা কয়ে উঠে দুই বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক খণ্ডে মিলনসেতু গড়বে।

কিছুকাল মনে হয়েছিল তাই বা। ১৯৪৭-এ পাঞ্জাবে যা সুরু হয়েছিল তা পশ্চিম পাকিস্তানে অন্যান্য প্রদেশেও তাই হল। হিন্দুরা সম্পূর্ণ নির্মূল ও উচ্ছেদ হল। বাকি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৫০-এ তাও রেহাই পেল না। এখানেও হিন্দু উৎসাদন হতে লাগল। বহু লক্ষ হিন্দু মার খেয়ে মার বাঁচিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, অন্যান্য রাজ্যের রুক্ষ প্রান্তরে, অনাদরে, অরণ্যে, প্রশাসনের গলীমুখে, আন্দামানে, দণ্ডকারণ্যে মরে-বেঁচে বেঁচে-মরে এসে পড়তে লাগল। পশ্চিম পাকিস্তানীদের আসল মতলবটা তখনও ধোঁয়াসায় লুকানো ছিল। খেয়াল হয় নি কারও অখণ্ড ভারতে উর্দুভাষী উত্তরপ্রদেশীয় মুসলিম নেতারা যে আগ্রাসন সুরু করেছিল, পাঞ্জাবের রক্তস্নানে তারই বিষময় জের চলছে। প্রথম কিস্তিতে হিন্দু মেরে-তাড়িয়ে বঙ্গভাষী বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাসের এ এক জহ্লাদী কৌশল। যে-হিন্দুরা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য জানালো, ঐ বিপজ্জনক মাটিও অসম্মানে কামড়ে পড়ে রইল, তারাও অব্যাহতি পাবে না—ঐ এক জন্ম অপরাধে, ধর্মপার্থক্যে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেও নয়। দফায় দফায় হিন্দু-নিধনের আড়ালে সমগ্র পাকিস্তানে বঙ্গভাষীর সংখ্যাধিপত্য টেনে নামানো হতে লাগল।

কিন্তু মার্কসীয় দ্বন্দ্বপ্রগতি অনুসারে এই এক ভাষাভাষী পাকিস্তান পরিকল্পনার মধ্যেই যে অসামঞ্জস্য ছিল, তাই একদিন আকস্মিক বিস্ফোরণে প্রকাশ পেল। একান্তভাবে এক মুসলিম রাষ্ট্র পেয়ে পাকিস্তানের যাবতীয় স্বার্থান্বেষীরা হিন্দু-পূর্ববঙ্গের শূন্যস্থান পূরণ করতে লাগল। অনেক পরে বাঙালী মুসলমানদের উপলব্ধি হল, এই পশ্চিমারা কেবল পাকিস্তান হাসিলে বাঙালী মুসলমানের মদৎ চেয়েছিল তাই নয়, এরা চেয়েছিল বাঙালীকে তার ভাষা ছাড়াতেও। ক্রমশ কঠোরতর ভাষায় পূর্ববঙ্গ দখলদারী এই পশ্চিমারা দাবী প্রতিষ্ঠা করল ঃ একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তান-স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্না তখনও বেঁচে। তিনি স্বয়ং ঢাকায় এসে ঘোষণা করে গেলেন, উর্দু, উর্দু, উর্দু—উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা।

বেদনার সংগে স্মরণ করতে হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের, জিন্নার এই দুঃসাহস যুগিয়েছিলেন অখণ্ড ভারতে বাঙালী মুসলমানেরাই। মনে পড়ে, আমাদেরই সংগীসাথী মুসলমানেরা কেবল যে বাংলা ভাষা সংস্কারে, আরবী-উর্দুর আতিশয্য ঘটাতে উঠেপড়ে লাগলেন, তাই নয়, বাংলা ভাষার প্রতি এক অস্বাভাবিক ঘৃণায় তাঁদের পরস্পরের মধ্যে উর্দু ভাষায় আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। শুধু যে তাঁরা ধর্মেই আমাদের থেকে পৃথক তাই নয়, ভাষায়ও তাঁরা পৃথক, এমন একটা বিজাতীয় জেদ তাঁদের পেয়ে বসেছিল। এক শ্রেণীর স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়েও সুকান্ত ছাড়া কবিগুরু মানতে চাইত না, শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি উর্দুকবি ইকবালকে তাঁদের একমাত্র কবি এবং তাচ্ছিল্যের বাংলায় বিষাদ-সিন্ধু একমাত্র পাঠ্যপুস্তক বলে ঘোষণার জ্বালা লক্ষ্য করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্নিপরীক্ষা শুধু নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই সেকালে অমুসলমানী বলে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। শুচিবাই এমন মাত্রা ছাড়িয়েছিল যে, স্বধর্মী কাজী নজরুলেরও যথেষ্ট লাঞ্ছনা হয়েছিল।

কিন্তু জিন্না ও পশ্চিমা পাকিস্তানীরা যখন এই মনোভাবকেই সর্বাংশে মুসলিম সুকঠিন বাস্তবে রূপায়িত করতে চাইলেন তখন অকস্মাৎ ঘটল বিস্ফোরণ। হিন্দু-মুক্ত মুসলিম পূর্ব বাংলা এক অপ্রত্যাশিত প্রত্যয়ে বলে উঠল, না। না, এ আমার পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষা, তিস্তার ভাষা, মায়ের ভাষা, মাতৃভাষা। ধর্ম নিশ্চয়ই পবিত্র, মাতৃভাষা পবিত্র নয় কেন? সেই ইউ·পি, পাঞ্জাবের একাধিপত্যকামীদের রক্তচক্ষু শেষবারের মতো জ্বলে উঠল। উর্দুর পাশে বাংলার সমমর্যাদা, রাষ্ট্রভাষার দাবীতে শেষবারের মতো ওরা কামান দাগল। বাংলা দেশ ঢাকায়, রক্ত ঝরল বাঙালীর প্রাণময় দেহ থেকে। বাঙালীর সত্তা আবারও বিংশ শতাব্দীর পঞ্চ দশকে বিদ্রোহ করল। ধর্ম পবিত্র, ভাষা পবিত্র। পূর্ব বাংলার তারুণ্যে এই অভাবনীয় রুদ্ররোষ দেখে ধর্মীয় ঐক্যের রজ্জুধারীরা কপাল কুঞ্চিত করল। কিন্তু এরূপ ভুল করার নয়। এর পরও চেষ্টা হয়েছে এই শক্তিকে হিন্দু-নিধনে লাগাবার, চেষ্টা অসফল হয়েছে এমন নয়, তবু বাঙালী মুসলমানকে আর ভোলানো গেল না আ মরি বাংলা ভাষাকে। ধর্ম নিশ্চয়ই, ভাষাও নিশ্চয়ই; ধর্ম বিচারের, বুদ্ধির, ভাষা অন্তরের, হৃদয়ের, প্রতি কণা রক্তের। অবিচ্ছেদ্য—অবিচ্ছেদ্য।

সুতরাং, বরফ গলতে লাগল। মাতৃভাষায় ফিরে এসে বাঙালীরা যেমন দুর্জয় হয়ে উঠতে লাগল, পশ্চিমীরা তেমনি থেকে থেকে পিছু হটতে লাগল। পাকিস্তানে দুটি রাষ্ট্রভাষা সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেল। অথবা বলা যায়, বাংলা ভাষাই প্রতিষ্ঠা পেল, কেন না, উর্দুর প্রতিষ্ঠা ছিল নিঃসংশয়।

তবু বাধা রইল। শুচিবায়ু কঠিন রোগ; বিদ্বেষ দীর্ঘায়ু। যে বঙ্গভাষী অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান, তার অবশিষ্টাংশ নিয়ে পশ্চিম বাংলা এবং তার বুকে সমগ্র বাংলা সাহিত্য। পাকিস্তানে শাহীবদল হয় তো ভারত-বিদ্বেষ যায় না বাঙালী-দ্বেষও নিঃশেষ হয় না। আমেরিকা, চীন, সমগ্র বিশ্ব আসুক, তাদের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সব আসুক, ভারত থেকে এক কণাও যেন ভারতীয় না আসে। সেখানে দুর্লংঘ্য চীনা প্রাচীর, ম্যাজিনো-সিগফ্রিড লাইন। ব্যবসা নয়, বাণিজ্য নয়, সংবাদ নয়, সাহিত্য নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষতি হয় নি কিছু, ওখানে একই ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া গান, ওপারে গাইলে এপারে ছড়ায় না, যেমন ছড়ায় পূর্ব-পশ্চিম বাংলায়। তাই এখানে আষ্টে কড়া-কড়ি। এখানে ওরা একই ভাষায় কথা বলে এবং সে-ভাষা পশ্চিমাদের দুর্বোধ্য। তাই বেশী খবরদারি। এর অলি-গলি, নদী-নালা বন্ধ—কোনক্রমেও যেন "বাংলা" না অনুপ্রবেশ করে।

কিন্তু ভেতরের অন্যুত্তাপকে উপেক্ষা করা মুশ্কিল। পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিষ্ঠাবান স্রষ্টারা আবির্ভূত হতে লাগলেন। বাংলা ভাষার সৌভাগ্য, কাজী নজরুল মুসলমান বলে প্রথম পঙক্তি পেলেন—যাঁর আসন এপারে-ওপারে সমান সমান। নজরুল ভাগ হয় নি বলে এপারের কবিরা উল্লাসও করেছেন।

কিন্তু নজরুলের সত্তা বাঙালী বিদ্রোহের সত্তা। নজরুল যেখানে সত্য, বাঙালী বিদ্রোহের সত্তা সেখানে সত্য। নজরুল যেখানে সত্য, সাম্প্রদায়িকতাও সেখানে অস্থায়ী। জানি, পাকিস্তানী রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা নজরুলের গজল বা প্রেমসংগীতের সীমা ছাড়াতে চান নি; কিন্তু নজরুল এক সমগ্র, কান টানলে মাথা আসবে, সাতিল আরব শুধু নয়, জাতির নামে বজ্জাতি আর জাত জালিয়াতের জুয়োখেলা ধরা পড়বেই। সমগ্রভাবে নজরুলকে না মেনে পূর্ব বাংলার রেহাই নেই, নিস্তার নেই। তবে—তবে এই ধূমকেতুকে যিনি আশীর্বাদ করেছিলেন সেই রবীন্দ্র-নাথকেই রুখবে কে? আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যই বা পড়বে কে?

নজরুলের মতই গান দিয়ে, 'ভাঙার গান' 'বিষের বাঁশী' দিয়ে নয়, রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে ঐ বাঁধভাংগা সুরু। রবীন্দ্রসংগীত (যেহেতু ওটা ভারতীয়, অতএব হিন্দু) নিষিদ্ধ করেছিল আয়ুবশাহী; কেবল শিলাইদহের কবি-ভবন অনাদরে বিলোপ নয়, পদ্মাতীরে ব্যারাজ তুলেছিল আয়ুবশাহী; খেয়ালও ছিল না কীর্তিনাশা পার ভাঙে; যখন ভাঙে তখন তাকে কেউ আটকাতে পারে না। আয়ুব গেছেন, ইয়াহিয়া খান এসেছেন, দুই-ই জাঁদরেল সেনাপতি। কিন্তু 'পদ্মার ঢেউরে' কে আটকাবে?

লুকিয়ে গোপনে মৃদু চাপা কণ্ঠে যে রবীন্দ্রসংগীত হত তা প্রথমে বাঙালী অনুষ্ঠানে নিল প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ, তারপর হল সরকারী বেসরকারী দুটো গানের সেক্টার, সরকারী সেক্টারে যখন রবীন্দ্রসংগীত টেবুবু, বেসরকারী সেক্টারে তখন রবীন্দ্রসংগীতের ঢেউ। সে ঢেউ পদ্মার ঢেউয়ের মতই সরকারী সেক্টারের রেডিওপ্রবাহে মারতে লাগল আঘাত। রেডিওর বেড়া ভাঙল। নতুন সংবাদ রচনা হল। তাই কান পেতে শুনেছিলাম, শুনছি আজও। নজরুল-রবীন্দ্রের জুড়িগাড়ী চলছে, তার পেছনে আধুনিক বাঙালী গান।

না, আরও চাই। সংগীতেই রবীন্দ্র-সাহিত্য সীমিত নয়। তাঁর বিস্তার বিচিত্রগামী। চাই রবীন্দ্র রচনাবলী। রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের মতো স্পষ্ট দিবালোকে যথাবিধি উদ্যোগ-উদ্যম করে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তার চাই পূর্ব বাংলায়। এজন্য নিয়ম-কানুন ডিঙিয়ে বিশ্বভারতীর সংগে বন্দোবস্ত করতে হয়, করতে হবে। দাবী উঠছে ক্রমশ উচ্চগ্রামে। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের ধ্বনি যদি দূরাগত থাকে থাক, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পদধ্বনি সুনিশ্চিত—সে যে আসে আসে আসে।

আর আমরা? সেদিন পশ্চিম বাংলার এক প্রখ্যাত দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে সংগত কারণেই এই কাতরোক্তি শোনা গেল : "কিন্তু বাঙ্গালীর (এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালীর) মাতৃভাষাপ্রীতি নিজ রাজ্যেই এখনো সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করেনি। শিক্ষার সকল স্তরে ও সর্ববিধ বিষয়ে মাতৃ-ভাষাকে মাধ্যম করার কথা উঠলেও বাঙ্গালী পণ্ডিতরাই (আবার বলি, পশ্চিম বাংলার পণ্ডিতরাই) গলা ফুলিয়ে সর্বাগ্রে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। বলেন, ওতে সর্বনাশ হবে।"

(বন্ধনীর কথাগুলো আমার)

সম্পাদকীয় নিবন্ধটির শিরোনামা ছিল : "চতুর্বর্গ ভাষা শিক্ষণের ছক"। তাতে খবর ছিল : "কেন্দ্রীয় সরকার ৪টি রাজ্য-ভাষা শেখানর জন্যে ৪টি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রস্তাব করেছেন। ...কিন্তু প্রস্তাবিত ৪টি ভাষা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কোন্ কোন্ ভাষা স্বীকৃতিলাভ করবে, তা এখনো বলা হয় নি।

"ঘোষণাটির বয়ান দেখে বোঝা যাচ্ছে হিন্দী এবং দক্ষিণের একটি ভাষা (সম্ভবত তামিল গৃহীত হবেই), তার-পর আর ২টি কি কি ভাষা হবে? সাহিত্য-সম্পদ ও শাব্দিক ঐশ্বর্যের কথা ধরা হলে বাংলার ঠাঁই অবশ্যই অনস্বীকার্য।"

কিন্তু কার কাছে এ অনস্বীকার্য? আত্মতুষ্ট বাঙালী ছাড়া আর কোনো অবাঙালীর কাছে তো নয়ই, পশ্চিম বাংলার পণ্ডিতদের কাছে যে সাহিত্য-সম্পদ ও শাব্দিক ঐশ্বর্যে পশ্চিম বাংলায়ই বাংলার ঠাঁই অনস্বীকার্য নয়, একথা ঐ নিবন্ধেই স্পষ্টতঃ স্বীকৃত। কঠোরতর ভাষায় বললে বলতে হয়, পশ্চিম বাংলায়ই বাংলা ভাষার প্রতি মমতা নেই, শ্রদ্ধা নেই। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত-পারে পূর্ব বাংলায় যারা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসে, মাতৃভাষার গৌরবে অপরের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কাঁদে না, তারা রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। পক্ষান্তরে, নিবন্ধ-লেখকের স্মরণে থাকতে পারে পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গভাষী মুসল-মানেরা যখন মাতৃভাষার জন্য প্রাণোৎসর্গ করেছেন তখন পশ্চিম বাংলার ঐ পণ্ডিতেরা—ব্যক্তিত্বহীন রা জ নী তি ক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের একটা বড় অংশ—বঙ্গ-বিহার মার্জারকে আদরে কোলে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে-ছিলেন; অর্থাৎ যেখানে পূর্ব পাকিস্তান উর্দুর আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষায় আত্ম-দান করছে সেখানে পশ্চিম বাংলার পণ্ডিতবর্গ তুচ্ছ লাভের আশায় আগ্রাসী হিন্দীর আধিপত্য-মুখে মাথা গলিয়ে দিতে প্রস্তুত। বাংলা ভাষা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রমর্যাদা দিয়েছে তারাই যারা কোন একটা ভৌগোলিক অস্তিত্বকে বাঙালীর হোমল্যান্ড বলে মিথ্যা গর্ব করেনি।

নির্বোধ মোহান্ধ ছাড়া কে অস্বীকার করবে পূর্ব পাকিস্তানের রক্ত দানেই পশ্চিম বাংলার "বাংলা" বেঁচে গেছে? নতুবা মিথ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার 'রাষ্ট্রভাষা' হিন্দীর নির্মম স্টীম রোলার এদ্দিনে পশ্চিম বাংলার বঙ্গভাষা

# রঙের ভিতরে

([illegible])

[illegible]

রঙের ভিতরে ছিল হৃৎপিণ্ড, রক্তের ভিতরে
থামে না কী ডানদিকেও, বামদিকেও, আর যদি বাংলার
পূবে না পশ্চিমে?

চুলের ভিতরে থাকে যেরকম পরচুলা, গার্হস্থ্য চালচুলো,
গ্রামের নাচের ঘরে রহিমের মুদ্রা আর রাক্ষস মুখোস,
খড় এবং খড়কুটো, নীড় এবং রক্ষিতা ফুলদানি?

পেটিকা ও কপাটিকা খুলে ফেলা, বাম এবং দক্ষিণ নিলয়!
কার জন্যে চুরি করি, যে সে বলে চোর!
কোন্ ঘর থেকে আমি কোন্ ঘরে চলে যাই,
ঘর থেকে সে কোন্ উঠোনে,
কীর্তনীয়া, সে কোন্ অঙ্গনে—
কর্দমে পিচ্ছিল।

শঙ্খবণিকের হাতে করাতের আসা-যাওয়া,
তুমি কী বলেছো তাকে ভালোবাসা, মিল।

গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিত এবং যার পথ কুসুমাস্তীর্ণ করতে চেয়েছিল দীর্ঘায়ু ঐ পণ্ডিতরাই? পূর্ব বাংলার ঐ বাঙালী সত্তাকে লক্ষ্য করেই পশ্চিম বাংলায় হিন্দীর স্টীম-রোলার স্তিমিত-গতি হয়েছিল। কিন্তু স্বীকার করা দরকার, সে-গতি একেবারে রুদ্ধ করে দেবার প্রতিরোধ-শক্তি পশ্চিম বাংলার তারুণ্যে সেদিনও ছিল না, আজও নেই। মার্জারকে উপলক্ষ করে যে নির্বাচন ফলাফল দেখা গেছে তা নিতান্তই রাজনৈতিক: নতুবা বাঙালী নামধেয় যে-নির্বাচনপ্রার্থীরা প্রশাসনে ভীড় জমান তাঁদের অনেকেরই নোঙর পড়ে আছে অবঙ্গভাষীদের কৃপাপাত্রতলায়। সেখানে "বঙ্গ" কথাটাও অশ্রদ্ধেয় ও সমাকুণ্ঠিত।

নিবন্ধ-লেখক চরম হতাশায় যখন এই সত্যোচ্চারণ করলেন যে, "কেন্দ্রীয় সরকার নিজে অগ্রণী হয়ে কিছু করলে বাংলা ভাষা স্থান পাবে, নইলে তার আশা কম," তখন আমাদের এই করুণ অসহায়তা, অপদার্থতার মধ্যে যে অপরিমেয় লজ্জা আছে তাও কিন্তু অনুচ্চারিত রইল না। পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা, নজরুল-রবীন্দ্রকে ফিরে পায় নি; অথবা এই ভারতেই যে তামিল ভাষার স্বীকৃতি সম্পর্কে নিবন্ধ-লেখক নিঃসংশয় হয়েছেন তাও তো করজোড় নিবেদনে পাওয়া নয়। হিন্দী-প্রাধান্যের অতিদম্ভে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আপাতত নয়। পট্টি শ্রীরামালুর আমরণ অনশন যখন সত্য হল এবং অন্ধ্র রাজ্যের দাবীদাররা করল মারণযজ্ঞও, তখন তেলেগু ভাষাভাষী অন্তত অন্ধ্র রাজ্য স্বীকৃত হল। পুরোনো বিবর্ণ সংবাদপত্রের পাতাগুলো উল্টালে নিবন্ধ-লেখকের আজও মনে পড়বে, কেন্দ্রের প্রাণঘাতী, হিন্দীর আর্যাবর্তজয়ী রথ গতিরুদ্ধ হল দাক্ষিণাত্যে। কেন্দ্রের জেদ, হিন্দীসূত্রে বেঁধে দেন সমগ্র ভারত। একখণ্ড কালো-মেঘের মতো দেখা দিয়ে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম মাদ্রাজের আকাশ ফেলল ছেয়ে, মেঘগর্জনে বলল, বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী সরকারের মতই রক্তপাত ঘটালো কেন্দ্রীয় হিন্দীস্থানী সরকার এবং জন্ম দিল রক্তবীজের বংশকে। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের মতই মানতে হল, হিন্দী জবরদস্তি নয় এবং চলবে ইংরাজীও। পাল্টাতে হল সংবিধানও। কাজাঘাম ওখানেই ছাড়ে নি। কেন্দ্রের নেপোলিয়ান-বাহিনীকে মাদ্রাজ-ছাড়া করেছে, কংগ্রেসের পাট চিরকালের জন্য গেছে চুকে, এখন আর ম্যাড্রাস বা মাদ্রাজ নয়, তামিলনাড়ু। এবং এর শেকড় এত গভীরে যে, হিন্দীর কোনো আশাই নেই। হিন্দীর সংযম এখানে বাধ্য হয়ে।

অর্থাৎ, স্বীকার করা দরকার, কেন্দ্রের কৃপায় নয়, প্রতিরোধে সামর্থ্য-হীন ও বিভীষণ-কণ্টকিত মরণোন্মুখ পশ্চিম বাংলার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বেঁচেছে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানের ও দাক্ষিণাত্যে কাজাঘামীদের রক্তপাত ও আত্মদানে। এই কারণেই, ভারতে যদি ভাষা-শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হয় তবে "তাতে দক্ষিণের একটি ভাষা (সম্ভবত তামিল) গৃহীত হবেই।" এবং বাংলা গৃহীত হবেই না। তার কারণও নিবন্ধ-লেখক স্বয়ং বলেছেন: "বাঙালীর বিশ্বমনস্কতা আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা সব ক্ষেত্রের মত এ জায়গাতেও তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখবে।"

এই বিশ্বমনস্কতা বা বাংলা ভাষার প্রতি মমতাহীনতার জ্বলন্ত উদাহরণ ইডেন নামক উদ্যানে কেন্দ্রীয় হিন্দী সরকারাধীন রেডিওর আস্তানাটি। আলোচ্য দৈনিকেই খান দুই চিঠি বেরিয়েছে এই অনুযোগ করে যে, জনৈক বাংলা-জানা বিদেশীর সঙ্গে ওঁদের একজন গেছলেন রেডিও অফিসে। পদস্থ বাঙালী-অবাঙালীদের নামের ফলকে বাংলার চিহ্নমাত্র নেই, তাতে আছে প্রসারমান হিন্দী সাম্রাজ্যের জ্বালাময়ী শিখা ও অস্তমান ইংরাজীর কিরণরেখা। বাংলা-জানা বিদেশী বাঙালী সহচরকে প্রশ্ন করেছিলেন, মাতৃভাষার প্রতি তোমাদের এ অবহেলা কেন? হতভাগ্য সঙ্গীটি কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি। পত্র-লেখকেরা আরও প্রশ্ন করেছেন: এখানে তো কত বাঙালী অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, বক্তা ও রাজনীতিক আনাগোনা করেন, তাঁদের চোখে এটা পড়ল না? কেউ এর প্রতিকারের চেষ্টা করলেন না?

এই মানসিকতার একটা জবাব দিয়েছি—হিন্দীভাষী বিহার তথা ভারতের সঙ্গে বঙ্গভাষী পশ্চিমবাংলার মার্জারে বাঙালী পণ্ডিতবর্গের আগ্রহ; দ্বিতীয় জবাব—সর্বস্তরে বাংলা ভাষার পক্ষপাতী স্বচ্ছদৃষ্টি বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর পণ্ডিত-সমাজে লাঞ্ছনা; তৃতীয় জবাব—১৮৯৭ খৃস্টাব্দে রাজসাহী সম্মিলনীতে বাংলা ভাষার প্রতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের উন্নাসিকতায় এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কটাক্ষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি।

পশ্চিমবাংলায়ই যদি বাংলা ভাষার এই হেনেস্তা হয় তবে তা অন্যত্র সমাদর পায় না বলে অভিমান জানাবো কার কাছে? যার আত্মসম্মানবোধ নেই তাকে সম্মান করবে কে? হিন্দী লেখনের ওপর কাজাঘামীদের আলকাতরার লেপন নয়, বাঙালী অতি ভদ্র, কিন্তু বাঙালী যে আলকাতরার পোচ নিজের মুখেই লাগিয়ে চলেছে।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ তের ॥

**কুন্তী** নদীর ধারে নির্জন অরণ্যে জ্যোৎস্না নেমেছে। অরণ্য বটে, তবে ভেতরটা ফাঁকা। আগে আগে চলেছে বলাই। পেছনে আমি। পাশের গ্রাম থেকে দুটি সাইকেল জোগাড় করা গেছে। মুগ্ধ, বিহ্বল প্রেমিকের মত চলেছি। আর সকলের মত আমারো কিছু কিছু দুঃখ আছে। সে সব দুঃখ স্বাধীন, নির্বিকার। তারা আমাকে দুঃস্বপ্নের মত মাঝে মাঝে হানা দিয়ে ফেরে। আত্ম-হত্যার প্রলোভন দেখায়। অলৌকিক দড়ি এগিয়ে দেয় যার গলায় ফাঁস। আর আমি টেবিলের ওপর দু' হাতের ভাঁজে মুখ লুকিয়ে থাকি। ডিকেন্টারে মদের ফেনার চারপাশে খাঁজকাটা গেলা-সের গায়ে মাছি হাঁটে। মনে হয় কতোদিন হাসপাতালে আছি। আমার হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক (যদি এখনো কিছু থেকে থাকে) কে যেন সেলাই করে দিয়ে গেছে। সর্বাংগে অসহ্য যন্ত্রণা। সেই এঁটোমুখ কুকুরটাকে মনে পড়ে, যে নর্দমার ধারে ধারে ঘোরে, তারপর ক্লান্তিতে ঝিমোয়। কিন্তু আজ তারা কোথায়? সেই সেলাইকরা হৃৎপিণ্ড, সেই অবসন্ন কুকুর, খাঁজকাটা গেলাসের গায়ে হাঁটা মাছি? রহস্যময় রাত তার সম্পূর্ণ রূপকথা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় জংলা গাছের গোড়ায় জমাট অন্ধকার কিন্তু ডালপালায় ভেঙে পড়েছে আদিম, বুনো জ্যোৎস্না। পতংগের ধ্বনি উঠছে অবিশ্রান্ত। পাশ দিয়ে বাঁশপাতার ওপর সড়সড় করে রাতচরা সাপ চলে যাচ্ছে। এর আগে কতো কথা দুজনে বলতে বলতে আসছিলাম। হঠাৎ কথা বলতে বলতে কিরকম থেমে গেছি। এই অপরূপ অরণ্যে, অপরিচিত জ্যোৎস্নায় নিভৃত, নির্জন কিছু মনে পড়ে যায়। হায়! কাল সকাল হবে। তখন আর এ অরণ্যকে এতো রহস্যময় লাগবে না। একে অরণ্য বলেই মনে হবে না। মনে হবে এক হতচ্ছাড়া জংগল, যার কিছুই দেবার নেই শরীরের কাঠখানা ছাড়া। হায়।

সাইকেলটা কিসে যেন আটকে গেল। পড়ে গেলাম।

'কি হল?' পেছনে মুখ ফেরালো বলাই।

—'পড়ে গেলাম।'

'এঃ। আপনাকে তো বলাই হয় নি। এই এখান থেকে আরম্ভ হল বালি। বালি মানে আপনার চূনবালি নয়। ধুলোবালি। সাবধানে চালাবেন।'

'বলাই—আমি যথেষ্ট সাবধান কিন্তু এ মাটি আমাকে আর এক ইঞ্চি যেতে দিচ্ছে না।'

'আপনি তো এখানকার মানুষ নন। শহরের লোক। এখানকার মাটি আলাদা। সাইকেল চালাবার নিয়ম-কানুনও আলাদা। আপনি আমার ঠিক পেছন পেছন আসুন।'

আমি তো তাই করেছি। আমি কখনো বলাই, কখনো দুখী বাউরী, কখনো সানা পান এমনি কারুর পিছন পিছন ঢুকেছি। কাউকে খুন করি নি। কোন গুরুতর অন্যায় করেছি বলে মনে করতে পারি না। কেন না, বড়ো রকমের কোন পাপ আমার মত ভীতু, কাপুরুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। তবু বারে বারে আমার মনে হয়েছে, আমি অনধিকারী, এখানের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। না হলে পায়ের তলার বালি সেও আমায় বেকায়দায় ফেলে? এক ইঞ্চি জমি পার হতে হিমসিম খাওয়ায়? অথচ দৈবক্রমে যদি আমি এখানকার মানুষ হতাম, তাহলে সবটাই তো অন্যরকম হত!

ঝুপসিমত গাছের তলায় ওরা হয়তো দিনের শেষে কোঁচড়-ভরা মুড়ি চিবুচ্ছে। ওদের মাঝখানে থেবড়ে বসেছি। ওরা কিছু জিগ্যেস করে নি। সন্দেহজনকভাবে তাকায় নি। শুধু আড়চোখে চেয়েছে, আর তারপর ওদের মধ্যে একজন বলেছে, বুঝলে জ্যাঠা, সিদ্‌নে আড়াই পণ ঘুঁটে লিয়ে বাঁকের দু'পাশে ঝুইলে নে যাচ্ছি, বুঝলে? ওই তোমার পলাশনগরের শর্ষেপাড়ার গিন্নীমা দেখতে পেয়ে বলল, কি রে, হবে নাকি আট আনায়? বল্লু, বারো আনা লাগবে।

'শুনে মাঠাকরুণ কি বললে জানো, বললে, পরশু দিন তুমি আড়াই পণ আমাকে আট আনায় দেলে, আর আজ্ঞ বলছো বারো আনা, কি ব্যাপার বল দিনি?

'আজ্ঞে, সে আমি লয় মা—বাবু। তো গিন্নীমা বললে, ঠিক তোর পারা চেহারা। ঐ রকমই তো, হোঁৎকাপারা গড়ন। জুলজুলে চোখ। খ্যাঁদা নাক। তোরা কি যমজ?

'হাই মা, যমজ হবো ক্যানে? দ্যাখো শালা, শহরের কিত্তি দ্যাখো! আমাকে যমজ বাইনে দিলে! এখন কি করবে করো।'

ওর কথা শেষ হয়ে গেলে ও শূন্য আকাশে চোখ তুলল কিন্তু বাকি সকলে তাদের দৃষ্টিটা আমার দিকে ঘুরিয়ে নিলে। অর্থাৎ আমাকে 'ঠোকা' হল।

কিন্তু আমিও তো সেরকম ভাত নই যে 'একফুট' জলে সেদ্ধ হবো!

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আচ্ছা, এখানে একধরনের ধানের নাম শুনেচি, তার নাম জ্যাঠো, সেটা কি?'

জ্যাঠো? মনে করুন, ওটা একটা দেওয়া নাম। তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তাই। পেরথমে ফুলিয়ে উঠবে। তা'পর ওর মধ্যে জমবে দুধ শিউলীগোলার মত। তা'পর শিশির পেয়ে পেয়ে শক্ত হবে দুধটো ত্যাখন, মনে করুন, ফসলটা তৈরি হয়ে গেল।'

'আচ্ছা, অন্য জায়গায় যে 'আগুরি' বলে আর একটা ধানের নাম শুনেছি'।

'হ্যাঁ। ঐ জ্যাঠোও যা আগুরিও তাই। আগুরি মানে আগে আগে বাড়ে। তা এ্যাতো সব জেনে কি করবেন মশাই? ধেনো জমিটমি কিনবেন নাকি?'

'না, না। এমনি জিগ্যেস করছি।'

'এমনি কি কেউ জিগ্যেস করে মশাই?'

ওরা সকলে আবার আমার দিকে দৃষ্টিটা ফেরালো। যাতে থাকে সন্দেহ, কিছু বিষ, সেই দৃষ্টি।

ভাবখানা, শহরের আপিস, কোর্ট-কাছারিতে কাজ করো। সেখানে গরীব-গুর্বোদের ঠকাও। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙো। ঘুষঘাস নাও। ডাইনে-বাঁয়ে নামাও। আবার এখানে মরতে তোমার শনির দৃষ্টি পড়ছে কেন? দুনিয়া থেকে আমাদের ফাঁকা করে একা একা তোমরা সব ভোগ করতে চাও? ওরা বিশ্বাস করে না শহরের লোক এমনি এমনি ওদের ধানের কথা জিগ্যেস করে।

'মশাই, জমি আমাদের জান। কোমর-ভাঙা নুলো ভিখিরীটা দেখছেন হুই অশথতলায়, ওর একছটাক জমি আছে। ওতে হাত দিন। দেখবেন, ও-ও বিঁদে নে তেড়ে আসবে এ'ড়ে গরুর মত।'

'বিঁদে? সেটা আবার কি?'

'বিঁদে কাঠি। জমিতে উটি ভারি উপকারী বস্তু। আবার ইদিকে বাপের পিণ্ডি দিতেও লাগে। ওর উপরি মালসা বসানো হয়। তা হ্যাঁ মশাই, কি লাভ আপনার এসব জেনে? আমরা গাঁয়ের মুখখু-সুখখু মানুষ। 'আমাদের এই সব যন্তরগুলোও আমাদের মত মুখখু-সুখখু। এদের নাম জেনে আপনি কি করবেন মশাই?'

জিগ্যেস করলে সবাই হয়তো বলবে। কিন্তু সব বলার শেষে সেই আদিম সন্দেহটুকু রাখবেই। কেন, কিসের জন্যে এতো জানাজানি? আমি বারে বারে দেখেছি, আমাকে ওদের মধ্যে দেখামাত্র অস্বস্তি হয়েছে। আমি যতো-বার ওদের খালি গা'টা দেখে নিতে গেছি ততোবারই ওরা কাপড়ের খুঁটখানি মেলে ধরে একরকম করে আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

'জমি জিনিসটে অদ্ভুত।' ছিদাম হুঁকোতে কড়া এক টান মেরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছে, 'এর জন্য আমরা সব পারি। বলুন না আপনাকে খুন করতে, মাথা ফাটাতে বলুন, করে দোব।'

'না, না। আমি এরকম তোমাদের বলতেই বা যাবো কেন আর তোমরাই তা' করতে যাবে কেন?'

'কতায় বলচি। ধাবু ঝান কি। আপনি হয়তো দশ আঁটি খড় চাইচেন চালটা ছাইবার জন্যে। আপনাকে থাকলে এমনি এমনি দিয়ে দিতে পারি। কিন্তুক আপনি যদি এক ইঞ্চি আলের ভিতে কাটেন তালে খুন-খারাবি পয্যন্ত হয়ে যাবে।'

'এক ইঞ্চি মাটির জন্যে?'

'লয় কেন? বলি লয় কেন? মাটি কি মাগের মত যা' তা' জিনিস? উটি খুব জ্যান্ত পদাখ। আপনার, আমার শরীলের মত। আমি ক্ষেতভর্তি ফসলটা ফলালাম।

'কি ধান হয়েছে মাইরী, আ-হা, চোক জুড়োয়. মাঠের গা-গতরে রনরনে যৈবন, যেন পুয়া যেবতী, চোক ফেরানো যায় না. দেহ এই টলে টলে পড়ে, এই টলে টলে পড়ে, তারপর কোর্ট থেকে ফিরো এসে কি দেকলাম, আমার জমিটো ন্যাড়া করে কারা ধান লুটে নে গেছে। আমার যেবতী বৌ সে হয়ে গেল অসতী. তার সকল শেষ হয়ে গেছে, ত্যাখন চাষীর কান্না শুনলে যে আপনি, ডুকরে কেঁদে উঠবেন মশাই!'

অন্যরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো। কিন্তু ধানের কথা হতেই, আমি লক্ষ্য করছিলাম, ওরা কখন কথা থামিয়ে ফেলেছে। ওরা ছিদামের সঙ্গে কখন নিঃশব্দে মিশে গেছে। ছিদামের গলার স্বরে উত্তেজনা। ওর চোখে জল আসার আগের ভিজে ভিজে ভাব। এ একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎ।

'দুৎ। তুই একটা ঝান কি।' ওরা বলে উঠলো। যেন এটা ওদের কাছে ওদের গর্ব, এই জমির জন্যে আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না, কিন্তু আমি বাইরের লোক, শহরের 'মাল', এটা আমার কাছে দেখালে মান যায়। ছিদামের এই কান্নায়—স্পষ্টই দেখলাম ওরা বিরত।

এ জগতে আমি কি একা একা টকতে পারি? এখানকার ধুলোবালি কেন আমাকে এক ইঞ্চি জায়গা দেবে? আমি তো এদের কেউ নই। ধান নিয়ে, জমি নিয়ে যে ধাক্কা-ধাক্কিটা লেগেছে তার আবেগ, বুকফাটা কান্না, ভালোবাসা আর আদর্শ—এ সব আমার মত ঠগবাজ শহুরের পক্ষে বোঝা কি এতোই সহজ?

'আমি এসেছি এখানে বি. ডি. ও অফিসরু হয়ে। নিজে কাস্মিনকালে লাঙল ধরি নি। ধানগাছ দেখেছি ট্রেনের জানালা থেকে। অথচ হ্যাট-কোট-টাই পরে চাষীকে নতুন নতুন প্রথায় চাষ শিখিয়েছি। আমি এসেছি থানা-পুলিশ-দারোগা হয়ে। অপরাধ করেছে রাম, আমি যদুকে কোমরে দড়ি বেঁধে লক্-আপে পুরে দিয়েছি মোটা টাকার ঘুস খেয়ে।

প্রায় এইরকমই একটা গল্প আসতে আসতে বলাই বলেছিলো, 'এই আমার কথাই ধরুন। জানেন ত' লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ান হয়ে কতো আর উপায় করি। তবে এ গ্রামটা শহর থেকে খুব কাছেই, তাই পড়াশুনোর রেওয়াজটা আছেই। কিন্তু এতে আমার চলে না। আমি কলাটলা বেচাবুচি করি।

'এই সিদুনে আমি বাজারের সামনে মাল নিয়ে রেকসা থেকে নাবাচ্ছি, মালটা সব নাবাইওনি, পেছন থেকে দারোগা এসে বললেন, বলাই, রাস্তার মাঝখানে মাল নাবিয়েছো। পাঁচ আইনে পড়ে গেছ।

'দারোগাবাবু আমাকে চেনেন। আমার লাইব্রেরীতে মাঝে মাঝে অবসর থাকলে বই নিতে আসেন, এসে বলেন, বেশ কড়া দেখে একটা ডিটেকটীভ বই দিও ত' হে বলাইচরণ, আজকাল আবার তোমাদের মত ছেলে-ছোকরাদের 'চরণ' বলার রেওয়াজ নেই, বেশ, না হয় নাই বললাম বলাইচরণ, বলাইকুমারই বলি দাও, একখানা বেশ টাইট দেখে।

'তখন ওনার ভিন্ন মূর্তি'।

'এখন কিন্তু একেবারে অন্যরকম। আমি বললাম, আজ্ঞে বড়বাবু, আমি ত' এখনো মালটা সব নাবাই নি। বললেন ত' যেটুকু নাবিয়েছি সেইটুকু রেকসাতে তুলে নিচ্ছি। তাছাড়া এখানে বসে মাল বেচতামও না। আপনি ত' জানেন আমি কোণে বসে বেচি।

'না, না, কোন কথা নয়, কোন কথা নয়। আমাকে আজ যেমন করে হোক দু-পাঁচটা কেস পাঠাতেই হবে। তোকে পুলিশ কোর্টে যেতেই হবে।

কেউ ঠেকাতে পারবে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও না। এই বে, বলে পেনে করে খস-খস করে লিখে একটা চিরকুট আগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার ডেট, তেরোই জুলাই। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে।

'আমিও ১৩ই জুলাই কোর্টে গিয়ে জরিমানা দিয়ে চলে এলাম।

'তারপর বিষ্যুদবারের দিন হাট-তলায় অন্যাদিনের মত মাল বেচতে গেছি, দেখি সামনেই দারোগাবাবু আর সেদিনকার মত রাস্তার ঠিক মাঝখানেই আমাদের দখিনপাড়ার নন্দ, ঝুড়ি-ভর্তি মাল নিয়ে থেবড়ে বসে।

'আমি লক্ষ্য করে চলেছি। চোখ ইসারা করছি নন্দকে। এই রে, আমার মত নন্দকেও না পাঁচ আইনের প্যাঁচে ফেলে। নন্দটা কি বোকা! ইসারাও বুঝতে পারছে না! আবার ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসছে?

'ও হরি, দারোগাবাবু নন্দের কলা-গুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন, মুখে বেশ পাকা কাঁঠালের মত হাসি, খুব গন্ধ ছাড়ছে, বললেন, জিনিসটা বুঝলি নন্দ ভালোই তৈরি করেছিস। সলিড মাল। তা' দর কিছু কমা বাপু।

'নন্দ বলল, আজ্ঞে পড়তায় পোষানো চাই ত'!

'ও ঠিক পোষাবে। নে, নে, ব্যাগে পুরে দে। সদর থেকে ফিরে এসে আরো আট আনা দোবখন।

'নন্দ আর করে কী, ব্যাগটা ভর্তি করে দিলো। আমি ঠিকই লক্ষ্য করে যাচ্ছি। কান্ড দেখে সামনে এলাম, হেসেই বললাম, রাস্তার মাঝখান থেকেই মালটা কিনলেন? দারোগাবাবু বোধহয় পাঁচ আইনে পড়ে গেলেন।

'খোঁচাটা এমনি যে, ঠিকই বিঁধলো, চামড়া পুরু হলেও। উনি বিরক্ত হয়ে কাঁচা-পাকা গোঁফ নাচিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, হুঃ, পাখ্‌না গজিয়েছে। ব্যবস্থা একটা হবেই। বুঝলে, তোমার হয়ে এসেছে।



'ব্যবস্থা অবশ্য উনি আর করে উঠতে পারেন নি। জমির লড়ায়ে কার হয়ে দালালি করে টাকা খেয়েছিলেন। তখন কিষেণরাই ওঁর ব্যবস্থা করে দিলো। কাঁড় খেয়ে উনি এখন হাসপাতালে।'

আমি কখনো দেশদরদী সেজে দিনের পর দিন চাষীদের সংগে মিশেছি। চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে এর ঘরে, ওর ঘরে চ্যাটাইয়ে বসে মিটিং করেছি। মাঝে মাঝে মিটিং-এ টেনে নিয়ে গিয়ে রুটি-গুড় খাইয়েছি। ওরা ফিরে এসেছে ঘরে। কখনো জমির ছোট-খাটো জায়গায় লড়ায়ে জিতেছে। হেরেছেই বেশি। হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কোন কারণে যখন শহরে আমার বাড়িতে এসেছে ওই দুখী বাউরী কি রাম আদকদের কেউ, ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখেছে আমার গ্রীল দেওয়া বিরাট গেট, দোতলা, তিনতলা দালান, আমার ঘরে ঢুকে দেখেছে চমৎকার ইংলিশ খাট, খাটে বিরাট গদি, ওপর দিকে তাকিয়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে, মাথার ওপর ঘুরছে ফ্যান, খেতে বসেছে আমার সংগেই, খেতে খেতে দেখেছে কানাভাঙা কাঁসার পাত্র নয়, চকচকে, মুখ দেখা যায় পেতলের সুদৃশ্য থালা, বাটি, সুন্দর লাইনিং-করা কাচের কাপ-ডিস, আমাদের বাড়ির বৌ-ঝিদের ফর্সা গা-গতর, ঘরের ভেতরেও স্লিপার পায়ে তাদের আলতো পা ফেলে হাঁসের মত চলা, কাঁধ, পেট, পিঠ খোলা সেই আশ্চর্য জামা, দেখে অবাক হয়ে গেছে। এ সব মিলিয়েই ত' আমি, এই সব মিলিয়েই ত' আমার দেশসেবা, এর একটিও ত' বাদ দেওয়া যায় না।

আজ আমি দেশব্রতী নই, দারোগাবাবু নই, বি· ডি· ও· অফিসার নই। কিন্তু তবু তো ওদেরি জ্ঞাতি-গোত্রের। রক্তে রক্তে ওদের সংগেই ত' আমার যোগ। আমি মাটিতে থেবড়ে বসতে চাইলেও ওরা আজো ওদের মত মাটিতে থেবড়ে বসতে দেয় না। আসন-খানি এগিয়ে দেয়।

এ একটা অদ্ভুত জগৎ। এ জগতে কি আমি একা একা ঢুকতে পারি? গজে তরকারী বেচে নিতাই সাঁপুই। বোল শুনবেন ওর? অবাক হয়ে যাবেন। তরকারী বেচ্ছে। কিন্তু মুখে সুর ভাঁজছে সর্বদা। শুনবেন, ও কিরকমভাবে কথা বলে?

'খুব ত' গেরামে গেরামে ঘুরচেন? মেলাই জিনিস দেখলেন। দেখেছেন আমার গোপ-কিশোরীকে? দেখেছেন আমার রতি-নায়ককে? তরকারী বেচি আমি। মুলো, বাঁধাকপি, বেগুন। এই দেখুন, তরকারী বেচনদারের চোখে জল।

'হা-হা শশিমুখী—, দেখুন আর গাইতে পাচ্ছি না। লিখবেন, আপনি ত' লেখক, এক অদ্ভুত তরকারী বেচনদারের কথা, লিখবেন, সে গোটা পদ কোন গানের গাইতে পারে না। আধখানি, সিকিখানি গায়। তাও পারে না, গাইতে গেলেই তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নাবে। এই দেখুন, ফের আরম্ভ করছি হা-হা শশিমুখী— পারলাম না।'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম নিতাই সাঁপুই-এর মুখের দিকে। তার হা-হা ধ্বনিতে সত্যিই টলমল করে উঠলো চোখের জল। এ কোন চোখ? এ কেমন জল!

আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছি। কিন্তু খদ্দের এসে গেছে। এই অদ্ভুত, অশেষ রসের রসিক এতক্ষণে আরম্ভ করে দিয়েছে, 'কি বললেন, দু' আনা, না, পারবো না। মাইরি মরে যাবো। তিনটে মুলো চার আনা, আমার কেনা দাম।'

বাস এসে গেছে। আমাকে যেতে হবে।

'রাধা গোবিন্দ। আবার আসবেন।'

আমি সত্যি কথাই বলি, 'আর আসা হবে না।'

'আসবেন না? এই শেষ দেখা? নিতাই সাঁপুইকে কিন্তু ভুলবেন না। এ কথাটি কিন্তু মাইরী লেখা চাই যে মহা পাষন্ড নিতাই সাঁপুই গোটা পদ গাইতে পারে না। গাইতে গেলেই তার চোখ দিয়ে ঝরে জল! লিখবেন। রাধা গোবিন্দ।'

এই নিতাই সাঁপুইকেই আমি কিন্তু আর একবার দেখেছিলাম। সেদিনও গলায় কণ্ঠির মালা ছিলো কি না জানি না, তবে ঐ গলায় দেখেছিলাম লাল রুমাল। হাতের লাঠি নিয়ে অন্যদের সংগে মেঘের মত গলায় 'কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ', 'পতিত জমি দখল করো', 'দখল রেখে চাষ করো' ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে। জীবন কি অদ্ভুত—না! তাই ত' এতো রস!

আমার বড়ো ইচ্ছে হচ্ছিলো চলন্ত বাস থেকে নামি। নেমে নিতাই সাঁপুইকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বলি, 'কি গো, চিনতে পারো? একদিন তুমিই না আমাকে গান শোনাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলে? এখন তোমার গলায় কোন্ গান? হাতে লাঠি নিয়ে গলায় লাল রুমাল বেঁধে রাধা-বিরহ শোনাবে নাকি?'

জানি না, নিতাই অপ্রতিভ হত কি না। হয়তো হত। হয়তো হত না।

কিন্তু তাতে আমার কি আসে-যায়! আমার এই পাওয়াখানি কি কম? এই যে নিতাইকে দু'রকম করে দেখে গেলাম, যে বললে রাধা গোবিন্দ, সেই একটু পরে বললে ইনক্লাব জিন্দাবাদ?

* * *

প্রফেসরের মুখ গম্ভীর। আঙুলের ফাঁকে কড়া চুরুট নিঃশব্দে পুড়ে যাচ্ছে। টেবিলের এক পাশে লেনিনের বই। অন্য পাশে একটি ইংরেজী সিনেমা পত্রিকা।

উনি চিন্তামগ্ন।

'পৃথিবী তোমাদেরি। পৃথিবী আমাদেরও। কিন্তু অবশেষে তোমাদেরি। তোমরা যারা বীর, সাহসী, উচ্ছল...... তার কথা বলুন ত'? বিপ্লব একটা উৎসব, কে বলেছেন জানেন?'

এ কি রে বাবা! প্রফেসর ভদ্রলোক এমন উৎকট ভংগিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, যেন আমাকে ওঁর কাছে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে আর উনি পদে পদে ভুল ধরে ফেলছেন আমার।

'না। আমি ঠিক জানি না। তাছাড়া কে কি বলেছেন সব কি মনে রাখা যায়?'

'না, মনে রাখাটা অন্যায়।' প্রফেসরের মুখে অটুট গাম্ভীর্য। ভদ্রলোক আমার বয়সে বড়ো। কিন্তু এমন কিছু বড়ো নয়। কিন্তু ভাবখানা দেখাচ্ছেন, যেন আমার জ্যাঠামশাই। এ জ্যাঠা ত' মহা ঠ্যাঁটা!

'বলেছেন মনীষী মাও সে-তুঙ।'

'মনীষী?'

'নয় তো কি? এইরকম করে শুনেছেন কাউকে কথা বলতে? বলেছেন এক লেনিন। আর এইমাত্র একজন। আপনারা, বাংলাদেশের লেখকেরা অদ্ভুত। হয়তো বলে বসবেন মাও সে-তুঙের নামটাই জানেন না।'

কি জবাব দোব? বললাম তাড়াতাড়ি, 'আমি বাংলাদেশ কেন, কোন দেশেরই লেখক নই। লিখছি এইমাত্র। লিখলেই কি লেখক হওয়া যায়?'

'এ কথা কটা লোক মনে রাখে'! গম্ গম্ করে উঠলো প্রফেসর ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর। ঠোঁটে ফুটে উঠলো তাচ্ছিল্যের হাসি। সে হাসির কাছে মাছি আর আমি এক হয়ে গেলাম। চুরুটটার দিকে তাকালাম। ওটা কিন্তু পুড়ছে।

'এ একটা অদ্ভুত দেশ। কেউ কিছু মনে রাখে না। নেতারা নেতাদের কথা মনে রাখেন না। লেখকেরা লেখকদের কথা মনে রাখেন না। ছাত্রেরা ছাত্রদের কথা মনে রাখে না। কেউ কিছু মনে রাখে না। কারুর কোন দায়িত্ববোধ নেই। যার যা খুশি, সে তা' করতে পারে। আমি একটা কলেজের ইংরেজীর প্রফেসর। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'এখান থেকেই যাতায়াত করি। কলেজে নির্বাচন। একপক্ষ বলছে নির্বাচন হতে দোব না। আর একপক্ষ বলছে নির্বাচন করতে হবে। তাতে আমার আপত্তি নেই।'

আমি ওঁর দিকে চাইলাম। ওঁর ভাবখানা হচ্ছে, ওঁনার আপত্তি থাকা বা না-থাকার ওপর ছাত্রদের নির্বাচন বয়কট করা অথবা নির্বাচনে যোগদান আটকে যাচ্ছে। কোন কথা বললাম না। শুধু বললাম, 'বলে যান।'

'দু' পক্ষই তৈরি। সে এক রণক্ষেত্র। ঘন ঘন বোমা ফাটছে।'

'কতোগুলো ফেটেছিলো?'

'কে জানে কতো? যে পক্ষকেই জিগ্যেস করি সে পক্ষই বলে আত্মরক্ষার জন্যে নাকি তারা প্রস্তুত হয়ে এসেছে। শুনলে অবাক হবেন, ছাত্ররাই শুধু নয়, ছাত্রদের বাপেরাও এতে অংশ নিয়েছেন।'

'কতোগুলো বোমা ফেটেছিলো?' ফের প্রশ্ন করলাম।

'ঐ যে বললাম, ঠিক জানি না। কেউ বলল তিরিশটা, কেউ বলল পঞ্চাশ। ঠিক বলতে পারবো না।'

'কজন মারা গেছে?'

'ঐখানেই ত' মজা। এতো বোমা ফাটলো, এতো বুম বুম শব্দ হল। কিন্তু মজা হচ্ছে, কোন পক্ষেরই কেউ মারা যায় নি।'

'মজা কেন?'

'মজা নয়? প্রফেসর হয়ে আমি কি চাই ছাত্র মারা যাক? সে কথা নয়। কথাটাকে অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। এই ত' সেই বয়েস, যে বয়েসে কেউ প্রাণ দেয়, কেউ প্রাণ নেয়। এই বয়েসেও ওরা কতো হিসেবী। উভয় পক্ষেই যেন গোপন চুক্তি আছে তুইয়ো দু'টো ফাটাবি, আমরাও দু'টো ফাটাবো, খুব আওয়াজ হবে, যার আওয়াজ বেশি হবে, সেই জিতবে। কিন্তু আমি যখন ছাত্র ছিলাম, আমার মনে আছে, এসপ্লানেড ইস্টের কাছে পুলিশের কর্ডন। হাতে পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। পুলিশ ওয়ার্নিং দিলো। আমরা থতমত খেলাম। কে বলল, কাওয়ার্ডস্। আমরা এগিয়ে গেলাম। পুলিশ বলল, চার্জ। দু'জন লুটিয়ে পড়লো। সেদিন আমরা বোমা বোমা খেলা খেলি নি। পুলিশের কাছে প্রাণ দিয়েছি। পুলিশকেও আচ্ছা করে পিটিয়েছি। বুঝলেন, আদর্শের জন্যে রক্তদানে পুণ্য আছে। মাও সে-তুঙের কথা কেন বললাম জানেন? এরা মাও সে-তুঙ পড়েছে। মাও সে-তুঙ চোখে দেখে নি।'

'কে দেখেছে?'

এই অতর্কিত, আপাতত অসতর্ক প্রশ্নে উনি যেন হোঁচট খেলেন। এক পলক আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। তারপর বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন টেবিল চাপড়ে, 'ইয়েস, আমি দেখেছি।' বিপ্লব ত' একটা উৎসব, এ কথার মানে আমি বুঝি, আমি চোখের ওপর দেখতে পাই কমরেড মাও সে-তুঙ বিজয়ের পর ঢুকছেন ইয়েনানে। বিরাট মঞ্চ। সামনে লক্ষ লক্ষ লোক। সবাই একজনকে দেখার জন্যে পাগল, উন্মত্ত। ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠলেন চেয়ারম্যান। লক্ষ লক্ষ লোক জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। মাও হঠাৎ দু'হাত দিয়ে চোখ চাপা দিলেন। আনন্দে কেঁদে ফেললেন তিনি। এ ছবি, এ দৃশ্য আমি রোজ দেখতে পাই। মনীষী মাও সে-তুঙ কি এই যুবকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, পৃথিবী তোমাদের, পৃথিবী আমাদেরও কিন্তু অবশেষে তোমাদেরি, তোমরা যারা সাহসী, বীর, উচ্ছল......'

আমি, প্রফেসর ভদ্রলোকের আবেগ যতোক্ষণ শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ চুপ করে রইলাম। আবেগের কাছে আমি অসহায়। বিশেষ, সে আবেগ যদি মহত্ত্বের প্রতারণা নিয়ে আসে। যখন দেখলাম ওঁর উত্তেজনা থেমে গেছে, টেবিলের পেপারওয়েটটা নিয়ে খেলতে চাইছেন, কাঁচের ভেতর কালো খাঁজকাটা, চৌখুপি ফুলগুলো দেখছেন, তখনই আগের মত অতর্কিতে, আপাতত অসতর্ক ভংগিতে জিগ্যেস করলাম, 'একটু আগেই ত' আপনি বলছিলেন, এখানে যে যা' খুশি করতে পারে। কারুর কোন দায়িত্ববোধ নেই। লেখক লেখকের কথা মনে রাখেন না। নেতারা নেতাদের কথা মনে রাখেন না। ছাত্ররা ছাত্রদের কথা মনে রাখে না। বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ। বলছিলাম।'

'একটা কথা কিন্তু বললেন নি।'

'কি বলুন ত'!'

'প্রফেসররাও প্রফেসরদের কথা মনে রাখেন না।'

'কেন? কেন এরকম বলছেন?'

টেবিলে ওঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করলাম। দু'খানি বই তুলে নিলাম হাতে। একখানা লেনিনের জীবনী। আর একখানা ইংরেজী সিনেমা পত্রিকা।

'এ দু'টো আর কতোকাল পাশাপাশি রাখবেন? ছাত্রদের বয়স কম। তাদের মধ্যে অনেক গোঁজামিল থাকতে পারে। থাকা উচিত নয়। তবু থাকতে পারে। কিন্তু আপনি ত' ছাত্রদের মত

বয়সী নন। আপনার ছাত্রের পিতা হবার মত বয়েস। আপনার ঘরে এ কি দেখছি, লেনিন আর এই নোংরা নিউড সিনেমা পত্রিকা, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেন!'

ঘরে বজ্রপাত হলেও প্রফেসর অতো চমকাতেন না। উনি হাঁ হাঁ করে কি বলতে গেলেন। কিন্তু আমি কখনো আর সুযোগ দিই? অতো বোকা আমি নই। হন্ হন্ করে পা চালালাম। প্রায় ছুটতে ছুটতে অনেকটা চলে এলাম। সব জোচ্চর। সব জোচ্চর। সব কটা শলাকাটা।

আমি যেমন চরিত্রহীন, এই প্রফেসর তেমনি চরিত্রহীন। তেমনি চরিত্রহীন এই ছাত্রেরা। জানি না এ'কার দোষ। এ কার পাপ। কিন্তু এই চলে আসছে। এর যেন শেষ নেই। সমাপ্তি নেই।

* * *

ভট্ ভট্ ভট্ ......

কে একজন, রুস্তম রুস্তম চেহারা, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, ধুলো উড়িয়ে এলো। মোটর সাইকেলটা টানতে টানতে গাছের গোড়ায় রাখলো। পকেট থেকে টার্কিস রুমাল বার করে মুখখানা এমন হিংস্রভাবে মুছলো, যেন মুখের ওপরকার চামড়াটা লোকটা আর রাখবে না। চামড়ার নিচেকার মাংসের মত, বুলডগের মত মুখটা, গনগনে লাল হয়ে উঠলো।

'এসব চলবে না, বুঝলেন, এসব চলবে না।'

মাসখানেক আগে ব্যান্ড বাজিয়ে জমি দখল নেওয়া হয়ে গেছে। মাসখানেক পর কালকে ব্যান্ড বাজিয়ে চাষের ফসল কিষাণেরা তুলে নিয়ে গেছে। সরকারকে যা' দেবার তা' দিয়েছে। অসময়ের জন্যে কিছু ধান, কিছু ধান বিক্রির টাকা কৃষক সমিতির হাতে তুলে দিয়েছে। বাকিটা যার ভাগে যেমন পড়েছে, তেমনি নিয়ে ঘরে তুলেছে। চাষা-চাষানীর মুখে হাসি ফুটেছে। এমন কিছু ফসল নয়, তাতেই যেন আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে মাটির দাওয়ায়। সবাই বেশ খুশি খুশি। কিন্তু হঠাৎ খবর পেল, যেতে হবে, তাদের দখল-রাখা জমি বেদখল হতে চলেছে। দ্যাখ কান্ড! চলো, চলো সব, গেল সব পিলপিল করে।

কি ব্যাপার? না তাদের যেনো জমির গায়ে চারদিকে চারটে খুঁটি কে বা কারা পুঁতে রেখেছে। একটা অন্য ধরনের ফ্ল্যাগও উড়ছে পত পত্ করে। তাদের ফ্ল্যাগ নয়। তারা খুব চেনে।

কৃষক সমিতির নেতা বলল, 'কি ব্যাপার? কি বলছেন গো আপনি?'

চামড়ার জ্যাকেট পরা বলল, 'বুঝতে না পারার কি আছে? ওটা আমি, আমরা দখল নিয়েছি। ওটা ওপড়ানো চলবে না। চললে রক্তগংগা বইবে। আমাকে চেনেন ত'!'

নিশ্চয়। কে না চেনে তোমাকে ধন। তুমি খোলা রাস্তায় পা ফাঁক করে বোতল টানো, 'পেটো' চালাও, ছুরি মারো, ছেনতাই করো, মেয়েদের দেখলে, ও মাই ডার্লিং, ডার্লিং, আভি আ যা, বলো, ভয় দেখিয়ে ভোটের সময় ভোট ভাঙাও, গুরুজনদের মুখের সামনে খিস্তী করো, মায়ের হাত থেকে সোনার বালা খুলে নিয়ে অক্লেশে চলে যাও স্যাকরার দোকানে, বাপকে বলো কিপ্ট, তোমারই দীর্ঘ ছায়া পড়েছে আজ কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সহজভাবে, ভদ্রভাবে কথা বলতে পারো না, প্রিন্সিপ্যালের টেবিল উল্টে দিয়ে কথা বলো, তোমার সেই বিখ্যাত টি সার্ট, দুনলা প্যান্ট আর ছুঁচোলো জুতো কোথায় না দেখা যায়, সিনেমার কাউন্টারের সামনে তুমি আছো অবিন্যস্ত চুলে, তুমি ঘুরেছো গভীর রাত্রে রেল লাইনের ধারে ধারে ওয়াগন ব্রেকারের দলে, তুমিই চালের কালো কারবারী, তোমারই ক্লান্ত, দীর্ঘ, অবিন্যস্ত ছায়া পড়ে প্রেমচাঁদ পল্লীতে, সোনাগাছিতে, পার্ক স্ট্রীটে, মফস্বল শহর আর পল্লীর আনাচে-কানাচে, এমন কি বাংলা উপন্যাসের মধ্যেও তোমার কালো, কর্কশ, কুৎসিত ছায়া, বাংলা পপ মিউজিকেও তুমি জায়গা পেয়ে গেছ, তোমার সেই মূর্তি, চোয়াড়ে, গালের হনু বার করা, সরু পাকানো গোঁফ, প্যান্টের হিপ পকেটটায় হয় বোমা, নয় চোলাই-এর বোতল, মুখে উড়ন্ত দাড়ি, তোমাকে না চেনার উপায় কি, তুমি অতলনীয়, ১৯৭০ সালের বাংলাতেও তুমি টুইস্ট নাচছো।

কৃষক সমিতির নেতা এতোক্ষণ খুব তড়পাচ্ছিলো, কিন্ত চামড়ার জ্যাকেটকে দেখে একেবারে গোটালো কেন্নাই।

'তোমরা গোলমাল কোরো না। আমাদের নেতারা কি বলেছেন তোমরা ত' সব জানো। উনি একটা শরিক পার্টির লোক। উনি জায়গাটা দখল করেছেন। আমরা ত' মারামারি করতে পারি না।'

লসো সাঁওতাল এতোক্ষণ বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে সব কান্ডকারখানা দেখছিলো। ও কিছুই বুঝতে পারছিলো না। ব্যাপারটা এতো কেউমেউ করছে ক্যানে গো? হয়েছেটা কি? কই এতো-দিন ত' ও কাণ্ডা আমরা দেখি নি? এখন উড়ে এসে জুড়ে বসলে চলবে ক্যানে?

'তোমার দলটা কি বটে!'

চামড়ার জ্যাকেট আকাশের দিকে মুখ তুলে বেশ মেজাজের সঙ্গে তার দলটার নাম করলো।

'আর সব লোক কই তোমার আজ্ঞায়'

'লোকটা [illegible] আজ্ঞাল, এখন আমিই এখানে আছি। পরে লোকজন হবে। ওখানে আমি পার্টি অফিস খুলবো।'

তারপর হঠাৎ দাঁত কড়মড় করে বলল, 'অতো কৈফিয়ৎ দিতে পারি না বেটা সাঁওতাল?'

'কি বললি!' লসো সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে সোজা, তীরের মত ছুটে গিয়ে সেই রুস্তম-মার্কা লোকটার কলার চেপে ধরলো, 'শালো, এখানে ধানের গোড়া রয়েছে। এ গেয়ান আপনার হোল নি। ঐখানে কেউ অপিস করে? অপিস আমায় দেখাচ্ছো? তুমি শালো দোকান খুলবে? উসব পার্টি-ফার্টি বাজে। এক ইঞ্চি জায়গাও দখল নিতে দোব না।'

'এই লসো ছেড়ে দে', সকলে লসোকে ছাড়িয়ে আনলো। লোকটা ছাড়া পেয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়লো। তারপর কোন কথা না বলে মোটর সাইকেলে গিয়ে উঠল। স্টার্ট দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর যখন দেখলো সব রেডি, তখন পকেট কোথা থেকে একখানা ভোজালি বার করে দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা, হাম দেখ লেংগা'

'সব শালাই দেখ লেংগা! ফের আসিস তোকে জ্যান্তে কবর দুবো। তবে আমার নাম লসো। লসো সাঁওতাল।'

চামড়ার জ্যাকেট আর দাঁড়ালো না। বাতাসে শব্দ হল, ভট্ ভট্ ভট্ ভট্। ধুলোর ভেতর দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে গেল মোটর সাইকেল।

কলেজের ঘটনাটি আমার চোখের সামনে ঘটে নি। আমি শুনেছি। তবে এটা আমি চোখের ওপরই দেখলাম। কে কাকে শেখাবে? শুনেছি বিভিন্ন দলের ছাত্ররা নাকি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, তারা নাকি গ্রামের কিষাণকে শেখাচ্ছে। কিন্তু আমার ত' মনে হল, গ্রামের কিষাণ-দের আর শেখাবার কিছু নেই। ওরাই এবার ছাত্রদের শেখাক। আগামী দিনের ইতিহাস কিষাণের কাস্তেতেই ঝলকাচ্ছে, ছাত্রদের বোমার মধ্যে নয়, আজ কিংবা কাল কিংবা অদূর ভবিষ্যতে এ কথাই সত্য হবে। কেন না, লসোর কথাই সত্যি, এক ইঞ্চি জমিও আমি দোবো না। এই হচ্ছে লসোর সাফ কথা। অন্যায় করে, ঠকিয়ে কোন শালা রেহাই পাবে না। লসোর গলায় ইতিহাস কথা বলছে' সংস্কৃতির পচা ভাত খাওয়া ছাত্ররা তলিয়ে যাবে সড়ঙ্গে। তারা খালি তর্ক করবে বসে বসে। পোস্টার কে কতো সুন্দর করতে পারে, তার পাঁয়তারা করবে। প্রফেসর সাজাবে লেনিন আর নিউড সিনেমা পত্রিকা পাশাপাশি। সবুজ ধানের উজ্জ্বল বিবরণ তখন ঘটাবে বিস্ফোরণ বিপ্লবের জন্য। [ক্রমশঃ]

যার ভেতরে আব্দুলকে ঢুকিয়ে দেয়া হল তার নাম লক-আপ। এই কিম্ভুত নামটা ও মাত্র কয়েক মিনিট আগেই জানতে পেরেছে। চেয়ারে বসে যে হোত্‌কামতন লোকটা ঘুম-ঘুম চোখে ওর নাম, বাবার নাম, বয়স, ঠিকানা কতো কী আরো হিজিবিজি লিখে নিল—তার মুখে এই বিচিত্র শব্দটা বারকয়েক পটকার মতো আওয়াজ করছিল। আব্দুল তাকিয়ে দেখল ছোট্ট একটা ঘর। তিন-দিকে উঁচু দেয়াল। ছাদের ঠিক নিচে—দেয়ালের গায় ছোট্ট একটি ঘুলঘুলি। জেল সম্পর্কে আবছা আবছা একটা ধারণা ওরা ছিল। তা হলে এ-ই বুঝি জেল। আর জেলের ইংরেজী নাম বুঝি লক-আপ। বুকটা টিপ্‌ টিপ্‌ করছে অনেকদূর থেকে ভেসে আসা ঢোলের মতন। মাঘের শুরু—তবুও ভেতরে ভেতরে আব্দুল এতোক্ষণ ঘামছিল। হোত্‌কা লোকটার জেরায় জেরায় সমস্ত শরীরে জ্বরের কাঁপুনি লাগছিল। এখন যেন একটু থিতিয়ে এসেছে ভয়-ভয় ভাবটা। শীত করছে একটু একটু।

কোনো বছরই দিন-চারেকের বেশি ও রোজা থাকতে পারে নি। আর তার ফলেই, আব্দুল ভাবলো, এই ভোগান্তি। আব্দুল ভাবলো, ও মুসলমান বলেই হিন্দু পুলিশগুলো ওকে আটক করেছে। হরি কিংবা গোপাল কিংবা ওরকম কোনো একটা হিন্দু-নাম যদি হঠাৎ বলে ফেলত, তবে নিশ্চয়ই ছাড়া পেত ও। পরনে তো আর লুঙ্গি ছিল না যে চিনতে পারত। দোষ ও করেছে বটে—সব জেনে-শুনেই এ লাইনে কাজ নিয়েছে—কিন্তু হিন্দু হলে কি দয়া না করে পুলিশ-গুলো থাকতে পারত? নইলে বাড়ির কথা—মা-র অসুখের কথা জানিয়ে ও তো আর কম কাকুতি-মিনতি করে নি।

লোহার শিকের দরজাটা বাইরে থেকে তালা মেরে পুলিশটা চলে গেছে। হোত্‌কা লোকটা টেবিলে মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে। আলো জ্বলছে ও-ঘরে। এ-ঘরে পাতলা অন্ধকার। ঘরময় অনেক-গুলো ছায়া। দেখলেই বোঝা যায় বসে বসে ঝিমুচ্ছে—একজন আরেকজনের কাঁধে কিংবা পিঠে হেলান দিয়ে। সারা ঘরে আছড়ে পড়ছে নাকের ফোঁস ফোঁস শব্দ। বসার মতন জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না আব্দুল। যেখানে বসতে যায়—সেখানেই মানুষ। অনেক চেষ্টার পর কোনোক্রমে ও শরীরটা রাখতে পারল দুটি ঘুমন্ত শরীরের মাঝখানে। এবং বসতে না বসতেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল আম্মা-র শুকনো মুখ, রোগা শরীর, মরা-মরা চোখ দুটো—নোংরা বিছানা। নিমেষে যেন [illegible] হয়ে গেল ঘরটা। অন্ধকার মুছে গেল, ঘুমন্ত ছায়ারা অদৃশ্য হল, থেমে গেল সমবেত নাকের ফোঁসফোঁসানি। স্পষ্ট দেখতে পেল, আম্মা—ওর আম্মা ছটফট করছে বিছানায়। সন্ধ্যা থেকে ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে গেছে যে, আম্মা-র কথা ও এতক্ষণ ভাবতেই পারে নি। এখন মনে পড়তেই সমস্ত শরীর বেয়ে কান্না নামল। ঝর-ঝর করে জল পড়তে থাকল দু'চোখ থেকে। বুক ঠেলে বেরিয়ে এল "আম্মা—আম্মা"। আব্দুল যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—বিছানা ছেড়ে ওঠার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে আম্মা। পারছে না। শুয়ে শুয়ে ভাঙা গলায় চীৎকার করছে—"আব্দুল—আ-ব-দু-ল!" হঠাৎ হাজার হাজার কথা জলোচ্ছ্বাসের মতো ভাসিয়ে

নিয়ে গেল আব্দুলকে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার ধারে বেলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আম্মা এসে রোজ ডাক দেয়—"আব্দুল—আব্দুল!" হাঁসগুলোর দেখাদেখি ফিরলে "তই তই—আয় আয়" করে গলা ফাটিয়ে ডেকে আনত। এই তো ক'দিন আগের কথা—সন্ধ্যায় পরেও বাড়ি এল না ছাগলটা। প্যাকাটির মশাল জেলে বনে-বাদাড়ে খুঁজতে খুঁজতে অস্থির হয়ে পড়েছিল আম্মা। রাত কত হল কে জানে? থানার বাইরের মাঠে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল পুলিশ-গুলো। আম্মা হয়তো এখনো ডেকে চলেছে—"আব্দুল—আ-ব-দু-ল!" কিন্তু সাড়া দেবে কে? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হয়তো মরেই গেছে। "বুকে হাঁটু গুঁজে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল আব্দুল।

"এই ছোঁড়া, চুপ কর"—একটা ভয়ঙ্কর কর্কশ গলা বাজ পড়ার মতন কড়কড় করে উঠল।

"উঁ—উঁ—আম্মা" হঠাৎ থমকে গেলেও সমস্ত বুক তোলপাড় করে কান্না নামছে অঝোরে।

"ন্যাকামি রাখ—আম্মা তোকে কোলে নিতে আসবে র‍্যা?"—নড়েচড়ে বসল দেয়ালে হেলান দেয়া ছায়াটা। "বিড়ি আছে?"

"উঁ উঁ"—ফুঁপিয়ে তুলল আব্দুল।

"তোর কান্নার নিকুচি করেছে হারাম-জাদা। যা বলছি জবাব দে। নইলে গলা টিপে মারব।"

"আমি বিড়ি খাইনে।"

"তবে কী খাও? আম্মার দুধ খাও?" খিঁচিয়ে উঠল ছায়াটা। তার-পর সব চুপচাপ। সেই আবছা অন্ধকারে একজন মানুষ। সেই ফোঁস-ফোঁস শব্দের একঘেয়ে উঠানামা। আবারো কান্না আসছে আব্দুলের। খানিক কাঁদতে পারলে ভালো হত। কিন্তু পারছে না। দারুণ ভয় করছে। মুখ খিঁচানো ধারাটা যদি হঠাৎ গলা টিপে দেয়? ডাকাত-টাকাতও হতে পারে। আর জেল মানেই তো চোর-ডাকাতের আড্ডা। ও-ঘরে আলো জ্বলছে। কয়েকটা সাদা পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। একজন বুড়ো লোকটা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। দেয়াল-ঘড়ির শব্দ হচ্ছে টিকটিক টিকটিক। দু-একটা মশা ভনভন করছে কানের কাছে। শীতকাল—তাই রক্ষে। নইলে মশার জ্বালায় হয়তো মরেই যেত না। শীত-কাল—কিন্তু শীত করছে না। অন্ধকারে পাশের লোকটার মুখ অব্দি ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না। আম্মাকে কিন্তু আব্দুল দেখতে পাচ্ছে ঠিক। চোখ বুজেও। এতদূরে থেকেও যেন ও স্পষ্ট দেখছে ওর আম্মা জবাই করা মুরগীর মতো ছটফটাচ্ছে। উঠবার ক্ষমতা নেই। খালি এপাশ-ওপাশ করছে বিছানায়। গায়-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে দাদি। রমজানের ফুপু বসে আছে চুপচাপ। "মোর আব্দুলকে এনি দাও"—আম্মা কাঁদছে। দুধার চোখ থেকে পানি পড়ছে অঝোরে।

এই লক-আপে বসে আব্দুল যে আম্মার জন্য দুঃখ পাচ্ছে আর ওর জন্য আম্মা যে কেঁদে কেঁদে মরে যাচ্ছে—এ সব কিছুর জন্যই ও দায়ী করল হিন্দুদের। কয়েক বছর আগে ঈদের সময় এই হিন্দুরাই তো মেরে ফেলেছে আব্বাকে। আবছা আবছা মনে আছে। আব্দুলের তখন বয়সই বা কত! আব্বা বেঁচে থাকলি, আব্দুল ভাবলো, আম্মার অসুখির জন্যি মোর রোজগার করতি হত না। রোজগার করতি না হলি চাল নে আসতি হত না কলকাতায়। আর কলকাতায় না এলি পুলিশের হাতে পড়ে এই লক-আপে আসতি হত নাকি? যুক্তিগুলো এইভাবে পর পর দাঁড় করাল আব্দুল। আসলে হিন্দুরা কাফের—গুণ্ডা—বদমাস। ঘৃণায় কুঁচকে এল নাক। সিদ্ধান্তটা দানা বাঁধতেই একটা অসহায় রাগ হেঁটে বেড়াতে লাগল ওর সারা শরীরে।

ছাগল, হাঁস, মুরগীতে বাড়ি বোঝাই করেছিল আম্মা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি আপ্রাণ খাটত। বলত, "সাতডা লয়—পাঁচডা লয়—মোর মোটে একডা। দুধ, ডিম বেচি আব্দুলকে মুই নেকাপড়া শেখাব, মানুষ করব।" এভাবে খাটতে খাটতে একদিন অসুখ করল। গা করল না। ক্রমে বিছানা নিল। শেষে আব্দুলই ডেকে আনল ভোলা ডাক্তারকে। কিন্তু ওষুধ কেনার টাকা কোথায়? গোটা তিনেক মুরগী বিক্রী করে চালাল ক'দিন। তার পর একদিন ডাক্তার বলল—ওষুধে হবে না—পথ্যই বড় হবে। আম্মা বুঝি আর বাঁচে না! করিম মিঞা ছোলা-বিক্রী চালান। আসলাম টাকা দিল। সেটা নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আব্দুলকে।

একদিন ডিসটিক্ট করেছিল বুকটা। হাত-পা সেঁধিয়ে দাঁড়াল পেটের ভেতর। জলতেষ্টা পাচ্ছিল বার বার। আজদিনের খোঁচা খাবার মতন মাঝে মাঝে চমকে উঠছিল। যেন পরীক্ষার সময় পাশের ছেলের খাতা দেখে নকল করা। ইংরেজী পরীক্ষার দিন আব্দুলের ঠিক এরকম মনে হয়। ইংরেজীতে বড্ড কাঁচা কিনা ও। কিন্তু আম্মার কথা মনে হতেই দুরন্ত এক সাহসে টগবগিয়ে উঠেছিল। আম্মাকে আব্দুল খুব ভালবাসে। বিদ্যাসাগরের মতন। উঁহু—তার চাইতেও বেশি। ভগবতী দেবীর কথা রাখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ঝাঁপ দিয়েছিল উত্তাল দামোদরে। আর আম্মাকে বাঁচা-বার জন্য ও পারবে না এই চাল কডা বিশেদার পানের দোকানে পৌঁছে দিতে? আম্মাও কি ওকে কম ভালোবাসে নাকি? আব্বা মারা যাবার পরই তো চাচা নিকে করতে চেয়েছিল আম্মাকে। আম্মা রাজি হয় নি। চাচাকে নিকে করলে আম্মাকে এত খাটতে হত?

"ঐ শোরডারে নে ঘর করলি মোর আব্দুলের নেকাপড়া হবে? লাঙল চষাতি চষাতি ছেলেডারে মেরি ফেলাবে না!"......আম্মা যখন খালার কাছে বল-ছিল তখন হঠাৎ শুনতে পেয়েছে আব্দুল। সেদিন দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল আম্মার কোলে। আম্মার জন্য প্রাণ দিতেও আব্দুল রাজি। "হে আল্লা—খোদাতাল্লা—হে পীর রসুল—আম্মা যেন না মরে। মুই সিন্নি দেব খোদাবক্স পীরির দরগায়। মোর আম্মাকে ভালো করি দাও"—হাঁটুতে মুখ গুঁজে আব্দুল হঠাৎ বিড়বিড় করে প্রার্থনা জানাল।

ক'দিন বেশ স্ফূর্তিতেই কাটল। রোজ তিনটে করে নগদ টাকা। আম্মাও ক্রমে সেরে উঠছিল। কিন্তু আজকে হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! উল্টোডাঙায় গাড়ি থেকে নামতেই সাদা পোষাক পরা দুটো লোক বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে অতর্কিতে ধরে ফেলল ওকে। সংগীরা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। ঝিমঝিম করে উঠল মাথাটা। দু'চোখে নেমে এল অন্ধকার। একটা বিশাল হাতের থাবার মধ্যে আব্দুল কাঁপতে লাগল বলির পাঁঠার মতো। "আমাকে ছেড়ে দ্যান বাবু... আম্মা নালি মরি যাবে। মুই ছাড়া মোর আর কোন লোক নেই"..... বেহুঁশ রোগীর মতো বিকারের ঘোরে মাথাটা পর্যন্ত এলিয়ে দিয়েছিল আব্দুল।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও

একটা ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে বসল আব্দুল। ঘুমে জড়ান চোখের পাতা ছড়িয়ে দিল চারদিকে। ঘরের ছায়াগুলি জলজ্যান্ত মানুষ হয়ে গেছে। কথা বলছে সবাই। কেউ কেউ বিড়ি খাচ্ছে। ঘুলঘুলি দিয়ে রোদ্দুরের লালচে আভা আছড়ে পড়েছে উল্টোদিকের দেয়ালে।

"তোর নাম কী র‍্যা?" আধশোয়া লোকটা জিজ্ঞেস করল একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে।

"আব্দুল—আব্দুল হোসেন।"

"অাঁ—সক্কাল বেলায় মোছলমান! রাম! রাম!"—ওর ভঙ্গিতে হো-হো হাসি উঠল সারা ঘরে।

"যা না শলা নেড়ের বাচ্চা—ঐদিকে বস না গে—দেখছিস না তোর জাতভাই আছে!" আব্দুল তাকিয়ে দেখল—লুঙ্গি পরা দুজন লোক জুলু জুলু করে ওর দিকে চেয়ে আছে।

"চোপ্ শালা—এখানে এসেও তোর জাত গেল না? লপসী খাস নি নাকি? বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভুলিয়ে দেয় তো জাত!" —কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল ষণ্ডাগুণ্ডা মতন একজন। গলার স্বরে রাত্রির সেই কথা-বলা ছায়াকে সনাক্ত করল আব্দুল।

"ওর জন্য গঙ্গাজল রেখে দিয়েছে দারোগা সাহেব। দু-বেলা ধরেয়ে-ধরে জাত খাবে"—ফোড়ন কাটল আরেকজন।

"লোতুন বুঝি? ঘর্ঘর আওয়াজ করল ষণ্ডা লোকটি।

"আর কওন লাগব না! দেইখাই বোঝন গ্যাছে! সাইক্কাৎ চাউলের ক্যাস!"

আব্দুল অবাক হল। এতক্ষণ ঠিক নজরে পড়ে নি। যে কথা বলল, মনে হল, ওর চাইতেও বয়সে সে ছোট।

"তোর বুঝি চাল"—ষণ্ডা লোকটির গলায় আবারো ঘর্ঘর আওয়াজ।

"আইজ্ঞা, হ কর্তা"—বলেই নিজের মাথায় তাল ঠুকে গান ধরল—"মেরে মন্ কি গঙ্গা—তেরে মন্ কি যমুনা—আ-বোল্ রাধা বোল্"—

"বাঃ বেড়ে মাল মাইরী! তোর নাম কী রে?"

"আইজ্ঞা রতন!" আবার সুর চড়াল —"বোল্ রাধা বোল্ সঙ্গম হোগা কি নেহি! মেরে মন্ কি......"

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠল আব্দুল। আম্মা কি এখনো বেঁচে আছে?

"কী রে কান্দস ক্যান?" রতন এগিয়ে এল সাপের মতন এঁকেবেঁকে।

"ভয় পাইতাছস্ বুঝি? আরে আমি তো আগেও দুইবার ঘুইরা গেছি। কিছু হইব না। চাইর-পাঁচ দিন পর ছাই দিব। এই আব্দুল—আব্দুল কান্দি না।" আব্দুলের কাঁধে হাত রাখল রতন।

"আম্মা মরি যাবে—মোরে না দিখ্‌লে আম্মা বাঁচবে না৷"

"ক্যান—তর মায়ের কী হইছে?"

"অসুখ।"

"আর কেউ নাই বাড়িতে? বাবা...

"না—মুই ছাড়া আম্মার আর কে নেই"—চোখ ডলতে ডলতে বুক কাঁপি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আব্দুল।

"যা—বাব্বা"—আব্দুলের পিঠে এ চড় মেরে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ রতন। "আমারও তো কেউ নাই। ত তবু তো মা আছে।"—একটু থে আবার বলতে লাগল, "পাকিস্তানে তো জাতভাইরা বাবারে কাইটা ফেলাইছে.... হিঃ হিঃ, আমার তখন ল্যাংটা বয়স! আ মায় মইরা গেছে এই দ্যাশে আইসা...এক ভাই আছিল...মায়ের লগে লগে সেইটা শালা সঙ্গে গ্যাছে, হিঃ হিঃ হিঃ...."

একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁ উঠল আব্দুল। রতনের মুখের দি তাকিয়ে থাকল ফ্যালফ্যাল করে। কান্না মোচড়গুলি যেন শুকিয়ে কাঠ। ঘরটা যেন অদ্ভুত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। হাঃ করে উঠল আব্দুলের বুক। হিন্দু স্থানের হিন্দুদের মতন পাকিস্তানে মুসলমানরাও তবে কাফের! ওর মাথা হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে গেল এতদিনের পুষে-রাখা চিন্তাটা হঠা যেন কাঁচের বাসনের গ ভেঙে গেল। রতনের দিকে তাকা লজ্জা করছে। যেন ওর নিজে অপরাধ! কাফের বলে আলাদা এ জাত আছে তবে! হিন্দুস্থান-পাকিস্ দুজায়গাতেই আছে। ওদের দুজ আব্বাকেই খুন করেছে ওরা। আ দুজনাকেই আটকে রেখেছে লক-আ কান্নায় ঝাপসা হয়ে আব্দুল তা রতনের দিকে। নিজের-মুখের আদ ও যেন দেখতে পেল রতনের মুখে কোনো তফাৎ নেই। ঠিক যেন নিজে ছায়া দেখছে আয়নাতে। রতনকে জ ধরে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উ আব্দুল

## এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ক্রেগের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে ইংলণ্ডের অনেকদিন দেরি হয়েছিল—কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য দেশ কিন্তু এ বিষয়ে ইংলণ্ডের মত পেছিয়ে ছিল না। অবশ্য অভিনয়ের ব্যাপারে চিরকালই ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ফ্রান্স-জার্মানী-রাশিয়ার তুলনায় অনেকটাই নিচের স্তরের। বিশেষত আমেরিকা—মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে আমেরিকান নট-নটীদের অভিনয়ের তুলনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত আমেরিকান প্রডিউসার-ডিরেক্টর ও সমালোচক কেনেথ ম্যাকগোয়ান লিখেছিলেন: We have certain actors who can out do in some single performance any player of the Moscow Art Theatre except perhaps Katchaloff ; but their number is very few indeed, their range is unbelievably limited, and the great bulk of our players hardly know the art of acting—in the sence that these Russians know it.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

I am ready to assert that any Russian company of the first quality, any German company of the same grade, even the Comedie Francaise could show us fundamentally the same lesson in proficient acting which the Moscow Art Theatre displays and which almost none of our own actors can possibly learn....

অতএব আমেরিকানরা যে নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী, একথা কেউ বলবে না। কিন্তু আমাদের অহীন্দ্রবাবু সে কথা স্বীকার করবেন না। সম্প্রতি নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর এক আত্মজীবনীতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সম্পর্কে নানাভাবে বিষোদ্গার করতে শুরু করেছেন। শিশিরকুমারের আমেরিকাতে গিয়ে অসাফল্যের কথাও তিনি লিখেছেন। প্রথমত অহীন্দ্রবাবু বোধহয় জানেন না যে, শিশিরবাবুর দলের অভিনয় সম্বন্ধে আমেরিকার কাগজে যথেষ্ট ভাল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, চেরকাশভ এবং পুডোভকিন যখন কলকাতায় এসে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখেন তখন তাঁরা নাট্যাচার্যের অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যান। তা ছাড়া অন্য দেশের লোকে কি বললো, সেটাই বড় কথা নয়—এদেশের নাট্যরসিকেরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন যে, গিরিশচন্দ্রের পর রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের মত প্রতিভার আর আবির্ভাব ঘটে নি। এ বিষয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ আমার নেই—তবে একটা কথা এখানে অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়কে জানিয়ে রাখি—আমেরিকা শিশিরবাবুকে কি-ভাবে গ্রহণ করেছিল তা দিয়ে শিশির প্রতিভার যাচাই হয় না। যাঁদের মতামত এ বিষয়ে প্রামাণ্য—যথা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুনীতিকুমার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথ—সেগুলো যেন চৌধুরী মশায় পড়ে দেখেন। শ্রীইন্দ্র মিত্রের 'সাজঘর' বইটিতে এই সব মতামত তিনি একত্রিতভাবে দেখতে পাবেন।

আর একটি কথা—গর্ডন ক্রেগের উপর বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করে 'আর্ট থিয়েটার' সম্বন্ধে লিখবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু নাট্যাচার্য সম্বন্ধে অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়ের নোংরা উক্তিগুলোর একটা প্রতি-বিধান হওয়া দরকার মনে করি। তাই ক্রেগের পর আমি শিশিরকুমার সম্বন্ধে কয়েকটি লেখা দিয়ে নটসূর্য মশায়ের উক্তিগুলোর যথাযথ উত্তর দেব। ইতিমধ্যে তিনি নাট্যাচার্য সম্বন্ধে যথেচ্ছ বিষোদ্গার করুন এবং প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করুন যে গিরিশ-যুগের পর তিনিই বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের একমাত্র নটগুরু।

আবার ক্রেগের কথায় ফিরে আসি। জার্মানীর ম্যাক্স রাইনহার্ট রাসের অধীনে

হ্যামলেট : এ্যান্ গ্র্যান্ড্ ১৯১২

হ্যামলেট : দি এ্যাক্টরস্ ১৯২৭

ডয়েটশে থিয়েটারে কাজ করছিলেন। ১৯০২ সাল থেকে রাইনহার্ট স্বাধীনভাবে ক্লাইনস থিয়েটারে (বার্লিনে) প্লে প্রডিয়ুস করতে শুরু করেন—তিনি ক্রেগের রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক চিন্তাধারাকে আগ্রহের সংগে কার্যকরী করে তুলতে লাগলেন নিজের সব প্রডাকসনে। ক্রেগের 'আর্ট অব দি থিয়েটার' যখন প্রকাশিত হল, রাইনহার্ট তখন ব্রামের হাত থেকে ডয়েটশে থিয়েটারের নাট্য পরিচালনার ভার নিয়ে নিয়েছেন। রাইনহার্টের পরিচালনাধীনে ডয়েটশে থিয়েটারের প্রডাকসনে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা গেল। কারণ তিনি শুরু করলেন ক্রেগের মৌলিক থিওরীগুলোর সুযোগ্য ব্যবহার করতে। রাইনহার্টের পর জার্মানীর অন্যান্য সব রঙ্গমঞ্চেও ক্রেগের থিওরীগুলো কার্যকরীভাবে গৃহীত হলো।

প্রচলিত থিয়েট্রিক্যাল ডিজাইনের মূলে গিয়ে ক্রেগ আঘাত হেনেছিলেন—মঞ্চের উপর অভিনেতা এবং তার পরিবেশ সম্পর্কে তিনি বললেন—আমি চাই the three dimensional 'place', rather than the two dimensional 'scene'. বড় আকারের জানলা-দরজা, ঘনায়মান ছায়ার ব্যবহারেও যে নাটককে কত আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেকথাও ক্রেগ প্রচার করলেন। স্যোডোজের ঠিকমত ব্যবহার আজও পর্যন্ত ভারতীয় স্টেজে হয় নি। অবশ্য লাইটিং-এর ক্ষেত্রে কতটুকুই বা আমরা এগিয়েছি! রেলগাড়ির আলো দেখলেই আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। লাইটিং-এর সাহায্যে মঞ্চে মার্ভেলের সৃষ্টি করা যায় —কিন্তু আমাদের দেশে ভাল লাইটিং মানে ম্যাজিক দেখানো।)

ক্রেগ বলেছেন যে, অয়েলে হারপার্স মান্থলি ম্যাগাজিনে (১৮৯৫) কতকগুলো রোম্যান থিয়েটারের ড্রয়িং দেখে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং তিনি বুঝতে পারেন লার্জ ওপ্নিংস এবং ডীপ স্যাডোজের কি বিরাট মার্টিক সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেসের বিরাট দরজাগুলো এবং ফোর-পোস্টার বেডগুলোও তাঁর স্মৃতিতে জাগ্রত হয়ে ওঠে—তিনি উপলব্ধি করেন যে এসবের দ্বারা মঞ্চে এক রহস্য-রোমাঞ্চময় পরিবেশের সৃষ্টি করা যেতে পারে। ছেলেবেলায় হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেসের কাছাকাছি একটি কটেজে ক্রেগ কিছুদিন ছিলেন—তখনই ওসব জিনিস তিনি দেখেছিলেন। ক্রেগের নোটবুকে এই হ্যাম্পটন কোর্টের অনেক রেফারেন্স আছে। ১৯০৩ সালে তাঁর মামা ফ্রেড টেরীর মিউজিক-ড্রামা 'সোর্ড এ্যাণ্ড সং'-এর জন্য ক্রেগ কয়েকটি সিন তৈরি করেন। এই প্রসংগে তাঁর নোটবুকে এন্ট্রি করেছেন—"Then came the first of the Tall Beds seen so often at Hampton Court."

সেরলিও ছিলেন একজন ওল্ড ইটালীয়ান মাস্টার—আর্কিটেকচারের ওপর তাঁর রচিত দুটি বই (১৫৪৫) ক্রেগ লণ্ডনে কিনেছিলেন ১৯০৩ সালে—এ দুটিরও বিরাট প্রভাব পড়েছিল ক্রেগের ওপর। পরে যখন তিনি তাঁর 'দি মাস্ক' পত্রিকা প্রকাশ করেন—তার প্রথম সংখ্যাতে সেরলিওর ঐতিহাসিক বিবরণী সহ রেনেসাসের ইতালীয়ান থিয়েটারের ট্র্যাজিক, কমিক এবং স্যাটায়িক (প্যাস্টোরেল) সিনগুলোর বিবর লেখেন এবং মনে উডকাটগুলোও ছেপে দেন—এর আগে এ বিষয়ে ইংরাজীতে কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু সেরলিওর সেকেণ্ড বুকটি নিয়ে তিনি কাজ করেন নি—প্রথম বইটিই (জ্যামিতিক ডায়াগ্রাম সহ) তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—এর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'পার্সপেক্টিভ ইন দি থিয়েটার'।

এই সময়ের রিফর্মাস অব দি থিয়েটার বলে যাঁরা বিখ্যাত, তাঁদের নিজেদের ভেতর কিন্তু খুব পরিচয় ছিল না। এ্যাডলফ এপিয়া ছিলেন সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসী। ভাগনারের মিউজিক ড্রামা পড়ে তিনি মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চপ্রযোজনা ব্যাপারে উৎসাহিত হন। তাঁর এবং ক্রেগের চিন্তাধারার ভেতর অনেক ব্যাপারেই সাদৃশ্য ছিল—কিন্তু ১৯১৪ সালের বসন্ত কালের আগে এঁরা কেউ কারোর নাম শোনেন নি—ঐ সময় জুরিখে একটি থিয়েট্রিক্যাল ডিজাইনের একজিবিশন হয়—সেখানে পরস্পর পরস্পরের কাজের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

বিখ্যাত আমেরিকান ডান্সার ইসাডোরা ডান্কান বার্লিনে এলেন ১৯০৫ সালে। ইওরোপীয়ান আর্টের ওপর তাঁর যে কি বিরাট প্রভাব পড়েছিল, একথা কারও অবিদিত নয়। বার্লিনে ইসাডোরার একটি নৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গর্ডন ক্রেগ। এই নাচ দেখে ক্রেগ সংগে সংগেই বুঝতে পারলেন যে, ইসাডোরা ডান্কান সত্যিকার একজন জিনিয়াস, একথাও বুঝলেন তাঁদের দুজনেরই একই আদর্শ। এই আদর্শটি কি? কবি ইয়েটসের ভাষায় এটি হচ্ছে— the creation of "The Theatre of Beauty." ইসাডোরার সংগে ক্রেগের পরিচয় এবং ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা হল। দুজনে একসংগে সারা ইওরোপে ঘুরে বেড়ালেন—ইসাডোরা করলেন নৃত্য-প্রদর্শনী, আর ক্রেগ তাঁর মঞ্চের ডিজাইনিং-এর ভার নিলেন—bringing new courage to those who were turning away from the moribund theatre, the stage 'realism' and the dead wood of the past.

১৯০৬ সালে ক্রেগ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন—'ইসাডোরা ডান্কান—সিক্স মুভমেন্ট ডিজাইনস'। ইসাডোরা ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় নাচ দেখাতে যান। স্তানিসলাভস্কি এবং ফোকিন দুজনেই লিখেছেন যে, ইসাডোরার দ্বারা রাশিয়ান থিয়েট্রিক্যাল আর্ট যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল—বিশেষত ডায়াখিলেভ ব্যালে—এ ব্যালের সৃষ্টি হয় তিন বছর বাদে।

[ক্রমশ
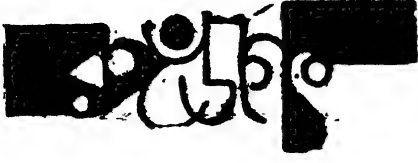
## . নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনীচিত্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনীচিত্র নির্মাণের ভার পরিচালক মৃণাল সেনের উপর দিয়েছেন ফিল্মস ডিভিশন। ছবিটি হবে পনের মিনিটের অর্থাৎ দেড় রীলের। মৃণাল সেন ঐ ছবি নির্মাণের প্রাথমিক কাজ সুরু করে দিয়েছেন। জানা গেছে, ঐ ছবির তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি শীঘ্রই জাপানে যাবেন।

## নগ্নতার পরিবর্তে রোমান্স

যৌন আবেদন যে সিনেমার উপজীব্য নয়, তা প্রমাণ করেছেন পশ্চিম জার্মানীর চিত্রজগতের নতুন জুটি উসচি গ্লাস আর রয় ব্ল্যাক। উসচি গ্লাস অবশ্য বহুদিন থেকেই চিত্রজগতে আছেন কিন্তু রয় ব্ল্যাক নবাগত। রয় ব্ল্যাক ছিলেন পপ্ গাইয়ে, সম্প্রতি সিনেমায় নেমেছেন। এঁদের প্রথম ছবি 'অলওয়েজ ট্রাবল্ উইথ টীচার্স' দর্শকদের অভিভূত করেছে। শীঘ্রই এঁদের দ্বিতীয় ছবি 'হেল্প, আই লাভ টুইন্স' মুক্তি পাবে। এই জুটির জনপ্রিয়তা এখন খুব উঁচুর দিকে।

## হামবুর্গে হেণ্ডেলের 'জুলিয়াস সিজার'

জর্জ ফ্রিডরিস হেণ্ডেল রচিত 'জুলিয়াস সিজার' প্রথম অভিনীত হয় লণ্ডনে ১৭২৪ সনে এবং তার পরের বছর হামবুর্গ অপেরায়।

আজকের দিনে হেণ্ডেলের অপেরা মঞ্চস্থ করা সাহসের কাজ, কারণ হেণ্ডেলের গীতিনাট্য সবই খুব কঠিন। সংগীত ও অভিনয়াংশ উভয়ই কঠিন। শ্রোতৃবর্গ এর সংগীতের মহত্ত্বে ও সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়।

বর্তমানে হামবুর্গ স্টেট অপেরায় এই গীতিনাট্যের পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন জেনারেল ম্যানেজার রল্ফ লিবেরম্যান, যিনি সারা দুনিয়ার সংগে হামবুর্গ স্টেট অপেরার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই গীতিনাট্যে অংশ গ্রহণ করছেন আন্তর্জাতিক গায়ক-গায়িকারা, যেমন ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় জোয়ান সাদারল্যাণ্ড, সিজারের চরিত্রে কানাডার গায়ক হিউগিউয়েট বোয়ানগু। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন অস্ট্রিয়ার লুসিয়া পপ (সেক্সটাস), ফিনল্যাণ্ডের টম ক্রাউজে (আচিলেস), জার্মানীর উরশুলা বোসে (কর্নেলিয়া) ও অ্যামেরিকার হাইজ ব্ল্যাকেনবুর্গ (নিরেনাস)।

মঞ্চ সংস্থাপনা, নির্দেশনা, আলোকসম্পাত, সাজ-সজ্জা ও সংগীত পরিচালনাতেও আন্তর্জাতিক কলাকুশলীদের সমাবেশ ঘটেছে।

## প্রথম জার্মান সঙ্গীতমুখর চিত্র

ফ্যানী হিল নামে একটি সংগীতমুখর ছবি তুলতে স্থির করেছেন পশ্চিম বার্লিনের সবচেয়ে কর্মিষ্ঠ নাট্য পরিচালক কার্ল হাইঞ্জ স্ট্রাকে। প্রথম এক বছর টেলিভিশনে দেখানো হবে এবং তারপর দু' বছর নিয়মিত মঞ্চে অভিনীত হবে। কাহিনী হচ্ছে কিভাবে গ্রামের সরলা স্কচ মেয়ে ফ্যানী হিল আস্তে আস্তে শহুরে মহিলা হয়ে উঠলো। সব ঠিক হয়ে গেলেও ফ্যানী হিলের চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, এখনও ঠিক হয় নি। তবে ব্রিজিত

পশ্চিম জার্মানীর চলচ্চিত্র তারকা উসচি গ্লাস আর রয় ব্ল্যাক। এ-দেশের নতুন ছবি 'অলওয়েজ ট্রাবল্ উইথ টীচার্স'-এ

বারদোত্, এলকে সোমের উসীচ পলস, গিলা ফল ইন্দাইটে সহাউসেন, দুনিয়া রাইটার, হিলডেগার্ট নেফ ও ক্রিশ্চিয়ানি রুগ—এ'দের মধ্যে থেকে কেউ একজন ফ্যানী হিলের চরিত্রে রূপ দেবেন।

## লোকায়নের নতুন নাটক

লোকায়নের প্রযোজনায় এবং অরুণ রায়ের নির্দেশনায় আগামী ৯ই ও ১৩ই মার্চ 'মিনার্ভা থিয়েটার' ও 'মুক্ত অঙ্গনে' সন্ধ্যে সাতটায় মঞ্চস্থ হবে লোকনাথ ভট্টাচার্যের "কলকাতা। কলকাতা। কলকাতা।" মঞ্চ ও নৃত্যে পরিকল্পনায় রয়েছেন যথাক্রমে রাজেন তরফদার ও শক্তি নাগ।

### ক্লাশ থিয়েটার

"ক্লাশ থিয়েটার" প্রথম পর্যায়ে শ্রীবনবিহারী পাহাড়ী রচিত একাংক নাটক "বিষাক্ত রজনী" অভিনয় করছে। মার্চ মাসে কলকাতায় তিনটি ও কলকাতার বাইরে চারটি শো হবে। ভারত-সম্রাট ঔরংজেবের শেষ জীবনের বহু বিনিদ্র রজনীর একটি রজনী এই নাটকের বিষয়বস্তু। পরিণামে দেখানো হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে ঔরংজেব খুব খারাপ ছিলেন না। এর পরে 'ক্লাশ থিয়েটার' অভিনয় করবে মিত্রারের, "কর্কট ক্রান্তি।" নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় আছেন শ্রীগোপাল পাহাড়ী। ব্যবস্থাপনায় ও গানে যথাক্রমে মলয় পাহাড়ী ও শিপ্রা দেব।

## লোকসঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন ঘোষ

প্রতিভার মৃত্যু নেই। আর প্রতিভার উন্মোধন হয় হয়তো বেদনাকর কোনো এক মুহূর্তে। বিধবা মা আর অবিবাহিতা বোনকে নিয়ে দশ বছরের কিশোর দ্বিজেন ঘোষের কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে যাচ্ছিল। ফেরি করতে করতে দ্বিজেন হারাল ট্রেনের চাকার তলে একটি হাত, একটি পা। জীবন-মৃত্যুতে টানাটানি। তার চেয়ে বেশি টানাটানি অভাবের সংসারে। প্রাণে বেঁচে গেল দ্বিজেন। [illegible] চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ গ্রামের ছেলেটিকে যুদ্ধি বেঁচে উঠার পর না খেয়ে প্রাণ দিতে হয়।
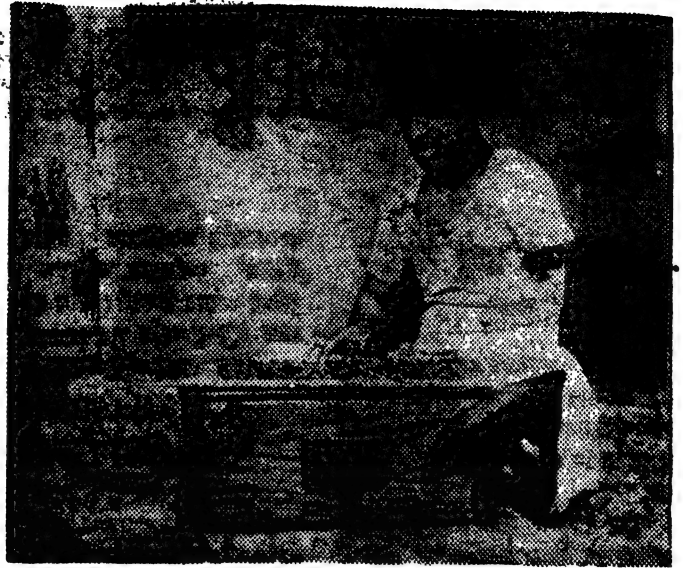
লোকসংগীতশিল্পী দ্বিজেন ঘোষ

এই মুহূর্তেই প্রতিভার স্বাক্ষর মিললো তাঁর কণ্ঠে। ওস্তাদ বেলায়েৎ আলীর কাছে শিখল চার বছর গান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গানের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পেল একাই চারটি পুরস্কার।

১৯৬১ সালে ২৪ বছর বয়সে ঢাকা বেতারে তার গান শুনে শ্রোতারা হলেন মুগ্ধ। তারপর চট্টগ্রামে বেতার স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বিজেনবাবু হলেন সেখানকার নিয়মিত শিল্পী। এখানেই শেষ নয়। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৭-র মধ্যে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ডে প্রচারিত হোল তাঁর চোদ্দটি গান। রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য, 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা, ধূলায় তাদের যতো হোক অবহেলা ; পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে'।

পূর্ববঙ্গের কণ্ঠশিল্পী এখন আমাদের কাছাকাছি। আকাশবাণী কলকাতা থেকেও তাঁর গান ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, ইদানীংকালে কোন শিল্পী শুধু সংগীতচর্চা করেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন না—যদি তিনি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট না হন। লোকসংগীতশিল্পী দ্বিজেন ঘোষের একমাত্র ভরসা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহৃদয় সমর্থন। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ পূর্ববঙ্গের এই শিল্পীকে সাদরে বরণ করে নিয়ে তাঁর মহৎ প্রতিভার যথাযথ মর্যাদা দেবেন। তাঁকে গ্রহণের মধ্যে দিয়েই হোক দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের নতুন পথে যাত্রা

## 'ত্রিসপ্তক'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

'ত্রিসপ্তক' সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী। শিক্ষার্থীদের সমবেত রবীন্দ্রসংগীত ও গীটারে সমবেত রবীন্দ্র-সুরের অনুরণন শ্রোতাদের আনন্দ দেয়। মোট কথা, শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। শ্রীপ্রিয়াঙ্ক মৈত্রের একক রবীন্দ্রসংগীত এবং শ্রীবিদ্যুৎ বসুর পরিচালনায় যন্ত্রসংগীতে রবীন্দ্র-সুরঝংকার প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের সুচারু রূপায়ণ পরিচালনা করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় নৃত্যপরিকল্পক : শ্রীশমিত চট্টোপাধ্যায় সংগীতাংশে সুচিত্রা মিত্র (শ্যামা) ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় (বজ্রসেন) শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে স্বপন গুপ্ত (কোটাল), শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় (উত্তীয়), ঋষিণ মিত্র (বন্ধু) রুমা দত্ত (সখী) তৎসহ ত্রিসপ্তকের ছাত্রীবৃন্দের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

### 'সুরবাহার' সঙ্গীতায়নের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সঙ্গীত সমারোহ

জনপ্রিয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন 'সুরবাহার' সম্প্রতি বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কসবা চিত্তরঞ্জন স্কুলের প্রেক্ষাগারে দু'দিন ধরে এক মিশ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় সঙ্গীতরসিকদের প্রশংসা অর্জন করে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদী, নজরুল-গীতি, পল্লীগীতি, আধুনিক, ভজন ও বিবিধ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ভাই-বোনেরা তাঁদের কৃতিত্ব দেখান। [illegible] 'সুরবাহার' সঙ্গীতগোষ্ঠী

সুরবাহার' আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে মঞ্জুলা মিত্র (সেতার), বিমল মিত্র (কণ্ঠ) ও বাণী সমাদ্দার (কণ্ঠ)।

পরিবেশিত সমবেত কণ্ঠে নজরুলের 'জাগো অনশন বন্দী' ও সলিল চৌধুরীর 'নওজোয়ান' সংগীতে সংহতির স্বাক্ষর রাখে। গীটারের পাশ্চাত্য ও অন্যান্য সুর বাজিয়ে শিক্ষার্থীরা সুরবাহারের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ধ্রুপদ, খেয়াল (যৌথ ও একক কণ্ঠে) রাগপ্রধান ও ভজন গানে শ্রোতাদের সমানভাবে আনন্দ দেন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া তবলা লহরার ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান এবং সেতারের অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

অনুষ্ঠান শেষ হয় সর্বভারতীয় খ্যাতিমান শিল্পী ও সুরবাহারের অন্যতম শিক্ষক বলরাম পাঠকের রাগেশ্রী রাগ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। শিল্পীর সাথে তবলার সহযোগিতা করেন যশস্বী সঙ্গতীয়া অনিল রায়চৌধুরী। উভয় দিনের অনুষ্ঠানে মেয়র প্রশান্তকুমার শূর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত প্রমুখেরা উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন।

## শিল্পী সংঘের রবীন্দ্রানুষ্ঠান

সম্প্রতি ইছাপুরের 'শিল্পী সংঘ' তাদের বার্ষিক উৎসব রবীন্দ্রানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করলেন ইছাপুর এ, টি, এস্‌ হলে। অনুষ্ঠানে একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা।"

বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে অংশ নিয়েছেন: নৃত্যে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় কুরূপা মঞ্জু দাস, সুরূপা শান্তা বোস। কণ্ঠ দিয়েছেন শ্রীমতী ভারতী দে ও শ্রীমতী ভারতী চক্রবর্তী। অর্জুনের ভূমিকায় নৃত্যে অংশ নিয়েছেন সুজনকুমার, কণ্ঠ দিয়েছেন শ্রীদিলীপনারায়ণ বিশ্বাস ও শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়। সংলাপ বলেছেন চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় শ্রীমতী স্বপ্না দত্ত-রায় ও অর্জুনের ভূমিকায় শ্রীপ্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রাঙ্গদার সখীগণের ভূমিকায় নৃত্যে অংশ নিয়েছেন কৃষ্ণা নিয়োগী, গায়ত্রী দাস, রীণা নিয়োগী, কল্যাণী ঘোষ ও ইতা চট্টোপাধ্যায়। কণ্ঠ দিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীমতী গৌরী মিত্র, শুভ্রা রায়, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুলা দে, তৃপ্তি ভট্টাচার্য ও হেনা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন: রমেন গুহ, সমীর দত্ত, দিলীপ রায়, দীপক রায়, শ্যামগোপাল মুখোপাধ্যায়, রবীন ঘোষ প্রমুখ। মদনের ভূমিকায় কণ্ঠ দিয়েছেন শ্রীপ্রশান্ত মুখোপাধ্যায়।

### ক্যালকাটা মিউজিক অ্যান্ড আর্ট সেন্টারের বার্ষিক উৎসব

সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হোল ক্যালকাটা মিউজিক অ্যান্ড আর্ট সেন্টারের দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নৃত্য-গীত ও বাদ্য পরিবেশন করেন। প্রধান আকর্ষণ ছিল মহিলাদের 'বাক্‌সিদ্ধ' নাট্যাভিনয়। নাটকের চরিত্র রূপায়ণে ছিলেন আরতি পাল, সুচিত্রা ঘোষ, লালিমা পাল, কল্পনা সাহারায়, আরতি ভট্টাচার্য, আইভি পাল, স্বপ্না ব্যানার্জী, উমা ধর ও চৈতালি ভৌমিক। নাটকটি পরিচালনা করেন পুলিনবিহারী চক্রবর্তী।

### পুরুলিয়া মেলা

সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া জেলার জন-জীবন ও জনমানসের সঙ্গে সকলের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত "পুরুলিয়া মেলা"র অনুষ্ঠান চলবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই মেলার উদ্বোধন করেন শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য। পুরুলিয়া মেলায় সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করে চিত্তাকর্ষক আলোচনাগুলি, যেমন 'গান্ধী ও লেনিন', 'পুরুলিয়া পরিচিতি' প্রভৃতি। এ ছাড়া মেলার বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সাধারণ আনন্দানুষ্ঠানের কার্যক্রম সহ পুরুলিয়ার লোক-সংস্কৃতিমূলক নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানগুলি বেশ সুন্দর। মেলার সভাপতি পার্থসারথি চৌধুরী এবং অন্যান্য কর্মীদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

### প্রমোদকর মুক্ত 'লেনিন' ও 'সূর্য সেন'

বাংলা দেশের যাত্রা জগতে তরুণ অপেরার 'লেনিন' ইতিমধ্যে জনসাধারণের অভিনন্দন লাভ করেছে। শহরে এবং গ্রামে সর্বত্রই 'লেনিন' এখনও বহু দর্শক সমাগমে অভিনীত হচ্ছে। তরুণ অপেরার 'লেনিন'কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রমোদকর মুক্ত করেছেন। তবে মাত্র তিন মাসের জন্য প্রমোদকর মুক্ত ঘোষিত হওয়ায় আগামী ২২শে মার্চ তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। লেনিন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তরুণ অপেরা আরো তিন মাসের জন্য প্রমোদকর মুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন।

সম্প্রতি ভারতী অপেরা অভিনীত 'সূর্য সেন'ও তিন মাসের জন্য প্রমোদকর থেকে রেহাই পেয়েছে বলে জানা গেল।

খেলার রাজা ক্রিকেট।

খেলার রাজাই বটে। ব্যাট-বলের এমন মধুর কলতান, পোষাক-আসাক, খানাপিনা, এমন কি চাল-চলনের এমন আভিজাত্য আর কোন খেলায় দেখা যায় নি। যাবেও না। কারণ ক্রিকেট—ক্রিকেটই। কিন্তু এই খেলাকে যাঁরা রাজার আসনে বসিয়েছেন তাঁদের অনেককেই আমরা চিনি না, তাঁদের অনেকের কথাই আমরা জানি না। অথচ তাঁদের না চিনলে, তাঁদের না জানলে খেলার রাজার রাজারাই থেকে যাবেন আমাদের অপরিচিত।

খেলার রাজার রাজা কারা? তাঁদের পরিচয় হয়তো নতুন করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের প্রতিভায় তাঁরা নিজেরাই ভাস্কর। তাঁদের ব্যক্তিত্ব, তাঁদের ক্রীড়াশৈলী, তাঁদের নিপুণতা, তাঁদের ধৈর্য এবং খেলোয়াড়ী মনোভাবের কথা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

কিন্তু আজ আমরা হয়তো অনেকেই জানি না তাঁদের কথা। তাঁদের নাম শুনেছি, একটু-আধটু শুনেছি তাঁদের কীর্তি-কাহিনীর কথাও, তবু আমরা ঠিক যেন তাঁদের চিনি না। আজও তাঁরা তাই রয়ে গেছেন অচেনা, অজানা জগতে। কিন্তু তাঁদের এই অচেনা, এই অজানা থাকাটা যে আমাদের কাছে কতো বড় লজ্জা, তা বলে শেষ করা যাবে না।

তাই ইতিহাসের পাতার মধ্যে থেকে খেলার রাজার রাজাদের বের করে এনে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। তবে সবার আগে আমরা বলবো আমাদের নিজেদের আপনার জনদের কথা। সবার আগে আমরা জানতে চাই সি. কে. নাইডু, নিসার, রাম সিং প্রমুখের কীর্তি-কাহিনীর কথা। এঁদের কথা না জেনে, এঁদের না চিনে কেন আমরা যাবো ডব্লিউ. জি. গ্রেস, জ্যাক হবস প্রমুখের বিষয় জানতে? তাই আমাদের এ পর্যায়ের আলোচনাগুলো প্রধানত থাকবে ভারতীয় ক্রিকেটের রাজাদের কেন্দ্র করেই।

তবে তারও আগে ক্রিকেট খেলার ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। যে খেলার রাজাদের নিয়ে আমাদের এই আলোচনা—সেই খেলা সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। কারণ খেলার কথা না জানলে খেলোয়াড়দের কথা বলে আর কি হবে?

ব্যাটবল খেলার মতো ক্রিকেট খেলার উৎপত্তি নিয়েও নানা মুনির নানা ম... তাই সেই মতামতের মধ্যে আমরা যা...

...ক্রি...

...জা লেখ... গেছে সেক্সপীয়রই ক্রিকেট খেলাকে সং... করে নিয়ে গেছে। আর ইংরেজরা ক্রি... খেলাকেই জাতীয় খেলা বলে স্বীক... করে।

সামান্য একটা তৈলচিত্র থেকে অ... কালের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে অ... কিছুই আঁচ করা যায়। ১৩৪৪ সা... আঁকা হয়েছিল ছবিটা। লণ্ডনের ক... লাইব্রেরীতে আছে সেই ছবিটা। ... চিত্রের বিষয়বস্তু হলো, একজন ... করছেন আর একজন একটা কাঠদ... নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ছবি... থেকেই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ মনে করেন ... সম্ভবত দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ শতা... থেকেই ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলার প্রচল... হয়।

তবে ঐতিহাসিকরা মনে করেন ... কেন্টের ওয়েল্ডে দুজন তরুণ মে... পালক 'যষ্টি আর গেণ্ডুয়া' হাতে নি... যে খেলায় মেতে উঠেছিল ১৩৩৬ সালে... কোন এক সময়ে সেই খেলাই ধা... খেলার রাজা ক্রিকেটের রূপ নে... মোটামুটিভাবে এ কথা আজ স্বীকৃ... ১৩৩৬ থেকে ১৪৩৯ সালের মধ্যে... ক্রিকেট খেলা চালু হয়, আর বেশ জ... প্রিয়তাও লাভ করে।

প্রথম দিকে এই খেলা বড় বেশ... জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তরুণদে... কাছে এই খেলার আকর্ষণই ছি... আলাদা। ফলে ক্রিকেট খেলা তাদের কা... কর্ম সব ভুলিয়ে দিল। শুধু তাই ন... ইংলণ্ডের সেই যুদ্ধের বছরগুলো... তরুণরা সেনাদলে নাম না লিখ... মাঠে-ময়দানে গিয়ে ক্রিকেট খেলতে শু... করলো। পাগল-করা এই খেলার আন... তখন সকলেই মশগুল। চারদিকে... শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট। ক্রিকেট ছা... ইংলণ্ডের তরুণরা যেন আর কিছু বো... না, আর কিছু চেনে না, আর কি... মানে না।

ফলে রাজ-রোষ পড়লো এই খেলা... ওপর। পাগল-করা এই খেলার নেশা... আতঙ্কিত ইংলণ্ডের রাজা চতু... এডোয়ার্ড ১৪৭৭ সালে ক্রিকেট খেলা... ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। আইন... মত ক্রিকেট খেলা তখন দণ্ডনীয়... ক্রিকেট খেললে রাজাজ্ঞা না মানার জন্যে... শাস্তি পেতে হবে।

তবে কি ক্রিকেট খেলা বন্ধ হলো... হলো না। ক্রিকেট খেলা যে নেশা... মতো। অপার আনন্দের খোরাক ... আছে এই খেলার মধ্যে। যে খেলে তা... আনন্দের চেয়ে কোন অংশেই কম থা... না তার আনন্দ, যে খেলা দেখে। ...

[illegible] চললো ক্রিকেট খেলা আর ক্রিকেট খেলা দেখার আনন্দ। এই খেলা দেখতে গিয়ে কিম্বা খেলতে গিয়ে প্রায়ই ধরা পড়তো কেউ-না-কেউ। রাজাজ্ঞা না শোনার অপরাধে তাদের শাস্তি পেতে হতো। কিন্তু কোন ভয়েই পিছিয়ে আসে নি ইংলণ্ডের তরুণরা। সকলের দৃষ্টির আড়ালে, নিভৃতে তারা কালজয়ী খেলা ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে চললো ভবিষ্যতের সোনালী রোদে ভরা দিনগুলোর উদ্দেশ্যে।

একদিকে রাজ-আজ্ঞা, আর একদিকে রাজ-আজ্ঞা মেনেও না মানার তীব্র প্রচেষ্টা। দু পক্ষের এই লড়াই চললো এক-আধ বছর ধরে নয়—এ লড়াই চলেছিল ২৭১ বছর ধরে। ১৪৭৭ সালে ক্রিকেট খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল, আর সেই আদেশ তুলে নেওয়া হলো ১৭৪৮ সালে।

ততোদিন ক্রিকেট খেলা কিন্তু পিছিয়ে ছিল না। রাজ-আজ্ঞা অমান্য করে নিভৃত নির্জনে যেমন চলেছিল ক্রিকেট খেলা, তেমনি চলেছিল ভবিষ্যতের খেলার রাজার ক্রমবিকাশ: সবাই জানতেন ক্রিকেট খেলা চলছে, কিন্তু কেউই যেন কান দিতে চাইতেন না। চাইতেন যে না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো ১৬৭৬ সালের ৬ই মে বৃটিশ রণতরী এ্যাসিসটেন্স দলের সংগে ব্রিস্টল ও রয়াল ওকের নাবিকদের সংগে ক্রিকেট ম্যাচটি। সিরিয়াতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচটা পৃথিবীর প্রাচীনতম ক্রিকেট খেলাগুলির অন্যতম বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই প্রসংগে একটা জিনিষ উল্লেখ করার মতো, বৃটিশ নাবিকরা যখন এই ম্যাচটা খেলেছিলেন তখনো কিন্তু ক্রিকেট খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল।

১৭৪৪ সালে অর্থাৎ ক্রিকেট খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার চার বছর আগেই ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন রচনার দায়িত্ব এসেছিল লণ্ডন ক্রিকেট ক্লাবের ওপর। অবশ্য তার অনেক আগে থেকে নিয়ম-কানুন, খেলার সাজ-সরঞ্জাম, খেলোয়াড়দের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারে হ্যাম্বলডন ক্লাবের ভূমিকাও বড় কম ছিল না। সেই সময়কার খেলার [illegible] নিয়ম বদলানো নিয়ে মজার মজার [illegible] ক্রিকেট খেলার [illegible] [illegible] আলো করে।

যেমন ১৭৪৪ সালে বলের ওজন বেঁধে দেওয়া হয়। বেঁধে দেওয়া হয় ক্রিকেট ব্যাটের মাপ। আজো সেই বলের ওজন আর ব্যাটের মাপ বজায় আছে। ১৭৮০ সাল থেকে মিডল স্টাম্প ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। তার আগে থাকতো দু'টো করে স্টাম্প। আর সব থেকে ভালো বলগুলো দু' স্টাম্পের মধ্যে দিয়ে গলে যেতো।

১৭৮৭ সাল মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব (এম· সি· সি) প্রতিষ্ঠিত হলো। আর তার পরই ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুর দায়িত্বই পড়লো তাদের ওপরে। এক কথায় বলা যায়, এম· সি· সিই হয়ে দাঁড়ালো ক্রিকেট খেলার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সেই সম্মান এবং সেই পদের অধিকারী আজো তারাই।

ইংলণ্ডের মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেন নি। জন কোল্লেটের 'মিস উইকেট এ্যাণ্ড মিস ট্রিগার' বই থেকে জানা যায় যে, ১৭৭৬ সালে ইংলণ্ডের মেয়েরা ক্রিকেট খেলেছেন। এবং তারপর থেকে তাঁরা ক্রিকেট খেলছেন।

কিন্তু তারও পর আছে। আর সেখানে আছি আমরা। তাহলে আমরা তখন কোথায় ছিলাম আর আমরাই বা তার পরে কি করলাম......? [চলবে]

সে যুগের ক্রিকেট খেলা

# সেন কমিশন

শেষ পর্যন্ত কে কে সেন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো, যে টুকু না বললে নয়, সেইটুকুই শুধু বলা হয়েছে রিপোর্টে পুলিশের দায়িত্ব সম্বন্ধে। এমনটি যে হবে, এ আঁচ আমরা আগেই দিয়েছিলাম। অতো বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল—কিন্তু সরকার রইলেন নিস্পৃহ। ক্রীড়ামন্ত্রী মুখে বড় বড় কথা বলে বাজার গরম করলেন, চাকরি দেবেন, নিহত পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ইত্যাদি নানা ধরনের কথা বলে লোকের মনে সহানুভূতি জাগিয়ে তুললেন। সি এ বি-ও আগ-বাড়িয়ে এসে নিহত যুবকদের পরিবারবর্গকে ছ' হাজার টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তারপর ক্রীড়ামন্ত্রীর মতো সি এ বি সম্পাদক শ্রীজালানও সে কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। মধ্যে পড়ে নিহত পরিবারগুলির আত্মীয়স্বজনরা ঘুরে ঘুরে হয়রান হলেন। হায়রে আমাদের দেশ! এ লজ্জা আমাদের জাতির কলঙ্ক! যাইহোক, কে কে সেন কমিশন জানিয়েছেন যে, কোন মৃতদেহে ঘোড়াপুলিশের ঘোড়ার পদচিহ্ন ছিল না। কমিশন সাক্ষ্য-প্রমাণ কিভাবে সংগ্রহ করেছেন জানি না, কিন্তু কমিশনের সুবিধের জন্যে আমরা দু'সংখ্যায় কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তাদের পূর্ণ নাম-ঠিকানা সহ ছেপেছিলাম। আমাদের আশা ছিল—তাঁদের অন্তত সাক্ষী হিসেবে ডাকা হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁদের মতামতের ওপর এতোটুকুও গুরুত্ব দেন নি কমিশন। তাঁরা সকলেই প্রায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন পুলিশ যদি সময়মত এগিয়ে আসতো, তাহলে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটতো না, যাঁরা ভিড়ের চাপে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের রক্ষা করতে পুলিশ তো আসেই নি, বরঞ্চ সেইদিকেই নিরীহ দর্শকদের তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল, পুলিশ কেন লাইন ভেঙে দিয়েছিল, সারারাত যখন হাজার হাজার দর্শক লাইন দিতে গিয়েছিলেন মাঠের বাইরে, সে খবর জানা সত্ত্বেও তখন কেন পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করা হয় নি এবং যার ফলশ্রুতি হিসেবে সারারাত নিরীহ জনতার সংগে সমাজদ্রোহীদের সংঘর্ষ হয় এবং অনেকেই অনেক কিছু হারান—আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে এ সব কিছুই পুলিশ জানতো না? তবু ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্যে পুলিশ পুরোপুরি দায়ী নন। তবে কি যাঁরা মারা গেলেন, তাঁরাই দায়ী?

—শান্তাশ্রয়
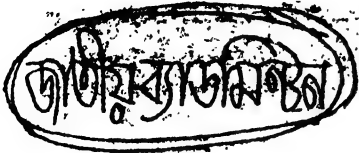
ইডেন উদ্যানে সম্প্রতি শেষ হয়ে গেল ৩৪তম জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আসর। এবারের প্রতিযোগিতার সেরা প্রতিযোগী হিসেবে দীপু ঘোষ শিরমুকুট লাভ করেছেন। শিরমুকুট লাভের সম্মান অর্জন করেছেন আরো একজন। মহারাষ্ট্রের মেয়ে মৌরিন ম্যাথিয়াস বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন আর মহিলাদের ডাবলস বিজয়িনী জুটির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি।

তবে এবার দীপু ঘোষেরই জয়জয়কার। কারণ এর আগে দীপু ঘোষ চারবার ফাইন্যালে উঠলেও জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। এই চারবারের মধ্যে একবার নন্দু নাটেকার আর অন্য তিনবার তিনি হেরে গিয়েছিলেন সুরেশ গোয়েলের কাছে। সেই সুরেশ গোয়েলকেই সরাসরিভাবে পরাজিত করে দীপু ঘোষ এবার হলেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান।

সুরেশ গোয়েল স্ট্রেট সেটে হেরে গিয়েছেন। কোন সময়ই তিনি দীপুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেন নি। ধরতে গেলে খেলাটা হয়েছিল একতরফা। ঐদিন দীপুর খেলা দেখে মনে হয়েছিল, তিনি যেন জেতার মন নিয়েই খেলতে নেমেছিলেন।

মেয়েদের সিংগলস ফাইন্যালও খুব একটা জমে নি। দময়ন্তী সুবেদারের বিরুদ্ধে শোভা মূর্তি ধরতে গেলে একদম সুবিধেই করতে পারেন নি। দুজনের মধ্যে দময়ন্তী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তাঁর খেলায় সব সময়ই সেই শ্রেষ্ঠত্বের মেজাজ বজায় ছিল।

তবে খেলা জমেছিল মেয়েদের ডাবলস খেলার সময়। একদিকে ছিলেন শোভা মূর্তি ও মৌরিন ম্যাথিয়াস আর অন্যদিকে দময়ন্তী সুবেদার ও জেমি ফিলিপস। প্রথম গেমে দময়ন্তীরা ১৫—৮ পয়েণ্টে জিতে যান। কিন্তু তারপরই যেন খেলার মেজাজ হঠাৎই পাল্টে যায়। শোভা আর মৌরিন দ্বিতীয় গেমে মন-প্রাণ দিয়ে লড়তে শুরু করেন। দু দলের মধ্যে চললো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দেখার মতো, মনে রাখার মতো, গল্প করার মতো খেলা খেললেন দু দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেক্কা দিলেন শোভা আর মৌরিন। প্রথম গেমে ১৫—৮ পয়েণ্টে হেরে যাবার পর, শোভা আর মৌরিন ১৭—১৬ ও ১৫—১১ পয়েণ্টে দময়ন্তী সুবেদার ও জেমি ফিলিপসকে [illegible] চ্যাম্পিয়ান হলেন।

পুরুষদের ডাবলস-এ দীপু ও রমেন ঘোষ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর সি ডি দেওরাশ ও এস গোয়েলকে খুব সহজেই হারিয়ে দিলেও খেলাটি মোটামুটিভাবে জমেছিল। বালিকাদের সিংগলস-এ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করতে মৌরিন ম্যাথিয়াসকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে হয়েছিল।

**ফলাফল :**

**পুরুষদের সিংগলস :** দীপু ঘোষ (রেল) ১৫—৫, ১৫—৬ পয়েণ্টে সুরেশ গোয়েলকে (রেল) পরাজিত করেন।

**মহিলাদের সিংগলস :** দময়ন্তী সুবেদার (এম পি) ১১—৪, ১১—৮ পয়েণ্টে শোভা মূর্তিকে (মহারাষ্ট্র) হারিয়ে দেন।

**বালকদের সিংগলস :** মলবিন্দার ধিলন (দিল্লী) ১৫—৪, ১৫—১১ পয়েণ্টে পি প্রকাশকে (মহীশূর) হারিয়ে দেন।

**বালিকাদের সিংগলস :** মৌরিন ম্যাথিয়াস (মহারাষ্ট্র) ১২—৯, ৪—১১, ১১—৮ পয়েণ্টে পাঞ্জাবের কনওয়াল ঠাকুর সিংকে পরাজিত করেন।

**পুরুষদের ডাবলস :** রেলের দীপু ও রমেন ঘোষ ১৫—১২ ও ১৫—১১ পয়েণ্টে হারিয়ে দেন রেলেরই সুরেশ গোয়েল ও সি ডি দেওরাশকে।

**মহিলাদের ডাবলস :** শোভা মূর্তি ও মৌরিন ম্যাথিয়াস (মহারাষ্ট্র) ৮—১৫, ১৭—১৬ ও ১৫—১১ পয়েণ্টে দময়ন্তী সুবেদার (ইউ পি) ও জে পি ফিলিপসকে (কেরল) হারিয়ে দেন।

**বালকদের ডাবলস :** এম ধিলন ও এম সিং (দিল্লী) ১৫—১৩ ও ১৫—৯ পয়েণ্টে এস ভকত ও এস পাঞ্জাবিকে পরাজিত করেন।

**মিক্সড ডাবলস :** আসিফ পারাপিয়া ও রাফিয়া লতিফ (মহারাষ্ট্র) ১৫—৪ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে জি ঠক্কর ও শোভা মূর্তিকে (মহারাষ্ট্র) হারান।

**ভেটারেন্স সিংগলস :** পঙ্কজ গুহ (রেল) ১৫—১২, ১৩—১৫ ও ১৫—১২ পয়েণ্টে দিল্লীর এস এল জইনিকে পরাজিত করেন।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার শেষে খেলোয়াড়দের যে ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে এঁরা স্থান পেয়েছেন—

**পুরুষ :** (১) দীপু ঘোষ (রেল), (২)

[ শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

## গল্প হলেও সত্যি

"১৯১১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে একটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা চলছিল ল্যাংকাশায়ার ও উসেস্টারশায়ারের মধ্যে। ঐ খেলাটিতে কোন এক সময় ল্যাংকাশায়ারের ডব্লু হাডল্স্টন ব্যাট করছিলেন। আর তাঁর বিপক্ষে বল করছিলেন আর জি বারোস্। হঠাৎ বারোসের একটি বলে হাডলস্টন সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হলেন। আর প্রায় সংগে সংগেই 'ক্লিন' বোল্ড। হাডলস্টন আউট।

এই সময় এক মজার ঘটনার সৃষ্টি হলো। ব্যাটসম্যান আউট হোলেও উইকেটের একটি বেলকে তখনি নিকটবর্তী কোন স্থানে পাওয়া গেল না। অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ঐ বেলটিকে উইকেট থেকে প্রায় ৬৭ গজ ৬ ইঞ্চি দূরে খুঁজে পাওয়া গেল।

প্রথম শ্রেণীর কোন খেলায় আজ পর্যন্ত এতটা দূরে কোন বেলকে ছিটকে যেতে দেখা যায় নি।"

* * *

"অনিশ্চয়তাই হলো ক্রিকেটের ধর্ম। আজ যে দল খুব ভালো খেলে নাম কিনছে, দুদিন পরেই হয়ত বা দেখা যাবে সেই দলটিই খুব খারাপ খেলছে। এ প্রসংগে একটি ঘটনার কথা বলছি।

১৯২৬-২৭ সালে মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলসের মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর খেলা হচ্ছিল। ঐ খেলাটিতে ভিক্টোরিয়ার ব্যাটসম্যানেরা বিপক্ষের সকল রকম বোলিং শক্তিকে তছনছ করে দিয়ে ১,১০৭ রানে তাঁদের ইনিংস শেষ করলেন। এত বিরাট সংখ্যক রানের ইনিংস প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এর আগে কোন দলই করতে পারে নি। আজও তা বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে।

যাই হোক, মাত্র চার সপ্তাহ পরেই ঐ দল দুটিই তাদের ফিরতি খেলায় মিলিত হলো। আর আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র কয়েকদিন আগেকার বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী ভিক্টোরিয়ারই সেই নিউ সাউথ ওয়েলসের কাছে প্রায় নাস্তানাবুদ হওয়ার যোগাড়! মাত্র ৩৫ রানেই তাদের ইনিংসও গেল শেষ হয়ে।

—সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
হালিসহর, ২৪ পরগণা
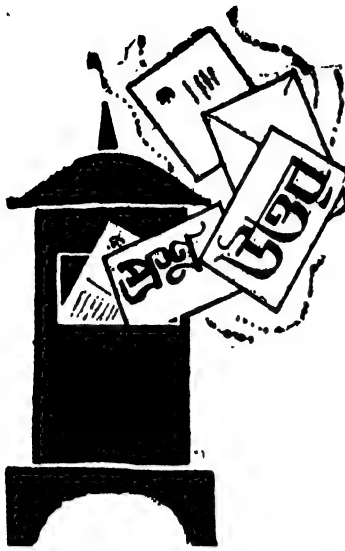
**সঞ্জীবকুমার ভট্টাচার্য** (নেকুড়মেনী, মেদিনীপুর)

**প্রশ্ন :** ক্রিকেটের কোন লীগের খেলায় দু'টো দলের পয়েন্ট যদি সমান হয় তখন কি রান এ্যাভারেজ দেখা হয়, না যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়?

**উত্তর :** এ ব্যাপারটা লীগ কমিটি আগে থেকেই ঠিক করে রাখেন। যদি না থাকে তাহলে দু' দলের মতামত নিয়ে হয় দু' দলের মধ্যে একবার খেলার ব্যবস্থা করা হয়, না হয় তো দু দ'টোকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা যেতে পারে।

**হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র** (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

**উত্তর :** আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম, "গত ৩১ সংখ্যায় পবিত্র সমাদ্দারের 'চুম্বক' পড়ে বিস্মিত হলাম। তিনি লিখেছেন, বাপু নাদকার্ণীর ১৯৬৩-৬৪ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় পর পর ১২৬টি বল ছিল রানহীন (২১ ওভার ক্রমান্বয়ে ঠিক)। কিন্তু নাদকার্ণীর পর পর ১৩১টি বল ছিল রানহীন, ১২৬টি বল নয়।"

**অশোককুমার মল্লিক** (বেলদা, মেদিনীপুর)

**উত্তর :** আপনাকে খুব শীঘ্রই ব্যক্তিগত-ভাবে উত্তর দেওয়া হবে।

**৭৪ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যায় সলিল মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন ছিল সোবার্স কি শূন্যে রানে আউট হয়েছেন, এর উত্তর ছিল কেউ জানলে জানিয়ে দেবেন।** আমি জানিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ, সোবার্স শূন্য রানে আউট হয়েছেন।

"১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার পঞ্চম টেস্টে দ্বিতীয় দফায় সোবার্স 'শূন্য' রানে আউট হন।

"আবার ১৯৬৮ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম দফায় সোবার্স 'শূন্য' রান করেন।

"আবার ১৯৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে দ্বিতীয় দফায় ও তৃতীয় টেস্টে প্রথম দফায় সোবার্স শূন্য রানে আউট হন।

"আবার ১৯৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে (ক্রিকেট) দ্বিতীয় দফায় সোবার্স 'শূন্য' রানে আউট হন।"

**হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র**
সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি।

[ ২১৭৫ পৃষ্ঠার পর ]

সুরেশ গোয়েল (রেল), (৩) রমেন ঘোষ (রেল), (৪) সতীশ ভাটিয়া (মহীশূর)

**মহিলা :** (১) দময়ন্তী সুবেদার (ইউ পি), (২) শোভা মূর্তি (মহারাষ্ট্র), (৩) জেমি ফিলিপস (কেরল)

**বালক :** (১) পি প্রকাশ (মহীশূর), (২) পি ত্যাগরাজ (মহারাষ্ট্র)

**বালিকা :** (১) মৌরিন ম্যাথিয়াস (মহারাষ্ট্র), (২) তুলসী ব্যানার্জী (বাংলা), (৩) জে ফিলিপস (কেরল), (৪) এস ভি জন (কেরল)

**পুরুষদের ডাবলস :** দীপু ঘোষ ও রমেন ঘোষ (রেল)

**মহিলাদের ডাবলস :** শোভা মূর্তি ও মৌরিন ম্যাথিয়াস (মহারাষ্ট্র)

## ক্রিকেটের খবর

**বিশ্বের অঘোষিত চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়া** দলটি যে সত্যিকারের শক্তিশালী দল নয়, এ কথা আমরা বারবার লিখেছি। ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে বারবার হেরেছে। অস্ট্রেলিয়া দলের জয়লাভের কৃতিত্ব কিন্তু তাদের নয়, ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই তাদের সাফল্যের কারণ। আর যাই হোক, প্রথম টেস্ট ম্যাচ ছাড়া বাকী চারটি টেস্টে ভারত যেভাবে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের তুর্কিনাচন নাচিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

যাই হোক, ভারতের বিরুদ্ধে রাবার জেতার পর অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে প্রথম টেস্টেই হেরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় টেস্টে তাদের ফলাফল হলো আরো খারাপ। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা এক ইনিংস ও ১২৯ রানে হারিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। অস্ট্রেলিয়ার নামী খেলোয়াড়রা প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই পরাজয় তাঁরা এড়াতে পারেন নি।

এই দু'টি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা সব দিক থেকেই নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছেন। ব্যাটিং এবং বোলিং—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারই হলো দক্ষিণ আফ্রিকার পর পর দু'টি টেস্টে জয়লাভ।

যাই হোক, দ্বিতীয় টেস্টে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিল ৯ উইকেটে ৬২২ রান। এর মধ্যে ছিল পোলকের (২৭৪) ডাবল সেঞ্চুরী ও রিচার্ডের (১৪১) সেঞ্চুরী।

এর উত্তরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করেছিল মাত্র ১৫৭ রান। ফলে তাদের বাধ্য হয়েই ফলো-অন করতে হয়। এই ফলো-অন করতে নেমে ইনিংস পরাজয় তারা কিছুতেই এড়াতে পারে নি। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩৩৬ রানের মাথায়। এই রানসংখ্যার মধ্যে রেডপাথের ৭৪ (নঃ আঃ), ওয়াল্টারসের ৭৪ ও স্টাকপোলের ৭১ রানই একমাত্র উল্লেখযোগ্য।

ফলে দু' ইনিংস মিলেও অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার চেয়ে ১২৯ রানে পিছিয়ে থেকে ইনিংসে পরাজিত হয়।

সম্পাদকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭৪ বর্ষ : ৩৫শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 26th February, 1970

# তার চুরির হিড়িক

কিছুকাল ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, এক শ্রেণীর লোক কিছু একটা ছুতো পেলেই শুধু মারমুখীই হয় না, আক্রমণ পর্যন্ত করে বসে। ঘটনার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যারা ঐ ধরনের কাজ করে বীরত্ব ফলায়, তাদের ওপর জনসাধারণের কোনো রকম সমর্থন থাকতে পারে না। কারণ, তাদের উক্ত ধরনের কাজের ফলে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষগুলিকে চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারীর সকাল দশটা থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারীর বিকেল তিনটে পর্যন্ত শিয়ালদহ ডিভিশনের সমস্ত ট্রেণ চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঐ ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্মীদের আকস্মিক কাজ বন্ধ রাখার ফলেই রেল লাইনগুলি স্তব্ধ হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্মীদের পক্ষে কাজ বন্ধ করে দেওয়া নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক একটা ছুতো খুঁজে পেলেই অশান্তি সৃষ্টির জন্য যে প্রয়াস চালাচ্ছে, তারই ফলে অন্তত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে রেলকর্মীদের পক্ষে স্টেশন বা ট্রেণ ছেড়ে না পালিয়ে গিয়ে গত্যন্তর কোথায়।

ছুতো সেই একটাই—অর্থাৎ বিলম্বিত লয়ে ট্রেণের আগমন। বস্তুত ট্রেণটা যে এসে পৌঁছে, সেটাও তো কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। যেদিন থেকে রেল লাইনের ওপর তার পাতা সুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই বোধ হয় সমাজবিরোধী ও দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকেরা আড়ি পেতে ছিল। টেলিফোনের তার, বহু শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার কোনো কিছুই দুর্বৃত্তদের জব্দ করতে পারে না। তারা আসে আর এক নিমেষে তামার তার চুরি করে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন শুধু এই যে, এই সব আর, পি, এফ ও রেলওয়ে পুলিশ কি তার কোন খবর রাখে না!

ঐ তার-চোরদের চুরির দায়ে শাস্তি ভোগ করতে হয় রেলের গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ও স্টেশন মাস্টারকে। একালের এটাই বুঝি হাল। রামের দায়ে শ্যামের শাস্তি। শাস্তির শেষ ঐখানেই নয়। রেলের স্টেশন তছনছ করা, ছিনতাই, পকেটমারা—এ সবের কোনোটাই বাদ যায় না। হিরোইজমের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে জাতীয় সম্পত্তি অবাধে বিনষ্টিকরণে। তার বিরুদ্ধে পুলিশের কোনো ভূমিকা নেই, জনসাধারণও নিশ্চুপ।

অথচ সব চেয়ে বেশি খেসারত দিতে হয় জনসাধারণকেই। কী দুরবস্থার মধ্যে দূরবর্তী যাত্রীদের স্টেশনের আশে-পাশে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হয়, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। মান্থলি টিকিট যাদের আছে, তাদের গচ্চা দিতে হয় বাস ভাড়া হিসেবে এবং বাসে আসা-যাওয়ার অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারাই উপলব্ধি করবে—পড়ি-মরি অবস্থায় কিভাবে বাড়ী বা আপিসে পৌঁছতে হয়। আর ট্রেণের অসংখ্য যাত্রী বাসগুলির পক্ষে বহন করা যে অসম্ভব—তা-ও বলা বাহুল্যমাত্র।

যাত্রীরা এতো সব কাণ্ড বুঝেও যেন নিরুপায়। যে অঘটন ঘটবে, তা রোধ করার কোনো ভূমিকা যেন তাদের হাতে নেই! ফলে, আপিসে যথাসময়ে পৌঁছতে পারে না এবং তাণ্ডবের ফলে আপিস কামাই কিম্বা কোনো দিন অনাহারে-অনিদ্রায় কলকাতার পথে-ঘাটে রাত কাটাতে হয়।

ট্রেণ বিলম্বের দরুণ সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে বিক্ষোভ থাকতে পারে, তবে তারা তাণ্ডব চায়, একথা আমরা মনে করি না। আর যে-কোনো সাধারণ তার চুরির ফলে বিলম্বের জন্য সাধারণ রেলকর্মীরা দায়ী নন।

এখন এক শ্রেণীর মানুষের একটা মারাত্মক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, চোরের পিছু ধাওয়া না করে, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে নির্দোষ লোকদের হেনস্থা করা। তাই তার-চোরেরা যখন ছাড়া পেয়ে যায়, তখন একটা ছুতো পেয়ে গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ও স্টেশন মাস্টারকে প্রহার করা হয়, জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়, এবং সাধারণ যাত্রীদের চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

ট্রেণ লেট হোক, এটা কারো কাম্য নয়। তাতে সাধারণ যাত্রীদেরই দুর্দশা বাড়ে। কিন্তু ট্রেণ লেট যাতে না হয়, তার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সর্বাগ্রে দরকার। আমরা আগেই বলেছি, তার-চোররা পাকা চোর। তবু পুলিশের পক্ষে তাদের খবর সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। দিনের পর দিন প্রকাশ্য স্থানে চুরি হবে আর তার প্রতিকার হবে না—একথা শুনতে আর কেউ রাজী নয়।

শোনা যাচ্ছে, তার চুরি প্রতিরোধ করার জন্য কড়া পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা হচ্ছে। পুলিশ আগেও ছিল, এখন হয়তো দ্বিগুণ হবে—তাদের কর্মতৎপরতার নৈপুণ্যেই গুণাগুণের প্রকাশ হবে।

জনসাধারণের কাছে আমাদের নিবেদন: আপনারাও সঙ্ঘবদ্ধ হোন, সতর্ক হোন এবং কোনো রকম হাঙ্গামা উৎপত্তির আশঙ্কা থাকলে তন্মুহূর্তে তা উৎপাটিত করুন। কারণ, শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে জীবনযাপনই সকলের কাম্য।

# আজকের মানুষ

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—এটা আজ কেবল প্রবাদবাক্যই নয়, পরীক্ষিত সত্য। ভারতবাসী সম্বন্ধে এ-অভিযোগও প্রায়শই শোনা যায় যে, তারা গুণের কদর করতে জানে না কিম্বা বড়জোর বিলম্বিত স্বীকৃতি জানায়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশবাসী প্রথমে চিনতে পারেন নি, তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন বিদেশীর চোখ দিয়ে। বিপুলা ভারতের সর্বংসহা মাটিতে ডঃ খোরানার ঠাঁই হয় নি, তাঁকে সুদূর মার্কিন মুলুকে গিয়ে আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়েছে, বিজ্ঞান সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে নিতে হয়েছে। দুটি নোবেল পুরস্কারই তো ভারতের পক্ষে যথেষ্ট, তৃতীয় পুরস্কার তাই ভারতীয় ডঃ খোরানার লাভে যেন ভারতের কোনো আগ্রহ নেই! মার্কিন নাগরিক হিসেবেই ভারতীয় বিজ্ঞানী খোরানা পুরস্কৃত হলেন। আমরা অতঃপর কিল হজম করে ডঃ খোরানাকে স্বদেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে আমন্ত্রণ জানাতে রাজি হলাম! উদ্যম আর কাকে বলে।

ভারতে যখন বিদেশী শাসন ছিল, তখন ব্রিটিশ সরকার প্রতি বছর ভারতীয়দের একটা লিস্টি বার করতেন—বশংবদ এবং খয়ের খাঁদের নামের তালিকা। এঁদের ওপর ব্রিটিশ সরকার দরাজহস্তে খেতাব বিতরণ করতেন—কেউ নাইট, কেউ কম্প্যানিয়ন অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, খানসাহেব, খানবাহাদুর ইত্যাদি। খেতাব দেবার রেওয়াজ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগে খেতাব দেওয়া হোত ভিক্টোরিয়া ক্রস, মিলিটারী ক্রস ইত্যাদি। পুলিশরাও সাহসিকতা বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখিয়ে মেডেল পেয়ে থাকেন। সুধী ও বিদগ্ধ সমাজে অবশ্য অভিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোক কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানের কদর বেশি। তবে আগেকার দিনে পণ্ডিতসভা এমন কি রাজা-মহারাজা, জমিদাররা স্তাবক বা চাটুকারদের ওপর যে খেতাব বর্ষণ করতেন, তার সামাজিক মূল্যও কিছু কম ছিল না। কিন্তু একবার সম্মান বা খেতাব দিয়ে আবার তা কেড়ে নিতে কেউ দেখেছে কি? এ ঘটনা যে একেবারে দেখা যায় নি তা নয়, খেতাব বর্জন যেমন হয়েছে, তেমনি কেড়েও নেওয়া হয়েছে। খেতাব গ্রহণে অস্বীকৃত ব্যক্তিও কি ভারত ভূমিতে নেই? ঋত্বিক

ঋত্বিক ঘটক

ঘটকের খেতাবটি এখন জোর করে কেড়ে নেবার চেষ্টা হচ্ছে।

এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি বাংলা দেশের বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজক শ্রীঋত্বিক ঘটককে পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সম্মানটি বিলম্বে এসেছে। কিন্তু এ-বিলম্বের জন্যে কারো পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ শোনা যায় নি, শোনা গিয়েছে তির্যক প্রশ্ন: কেন ঋত্বিক ঘটকের খেতাব প্রত্যাহার করা হবে না। কী ব্যাপার ঋত্বিকের অপরাধ কি? না, তিনি জাতির জনক গান্ধীজীর প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান প্রদর্শন করেছেন, গান্ধী শতবার্ষিকীতে তাই তাঁকে রাষ্ট্রপতি খেতাব দিতে পারেন না।

বাংলা দেশের চিত্র-জগতে ঋত্বিক ঘটক একটা উজ্জ্বল নাম হলেও লোকে তাঁকে প্রায় চোখের জলে বিদায় দিতে চলেছিল। শ্রীঘটকের মাথার ভয়ানক গোলমাল দেখা গিয়েছিল, অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন তিনি যাপন করছিলেন। বার বার তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছিল বটে, কিন্তু উন্নতি বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না। তার ওপর শত্রুপক্ষের অপপ্রচারের গুণে লোকে ধরে নিচ্ছিল যে, শ্রীঋত্বিক ঘটকের হাত থেকে আর কোনো ফিল্ম পাবার আশা করা বৃথা। শ্রীঘটকের মাথার যখন এই অবস্থা, তখন যাদবপুরের কিছু নকশালপন্থী ছাত্র তাঁর সঙ্গে ফিল্ম জগৎ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেখানে গান্ধীজীর প্রসঙ্গও ওঠে। শ্রীঘটক নাকি ওই ছাত্রদের কাছে গান্ধীজী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। পরে সে মন্তব্য যে ম্যাগাজিনে ছাপা হবে তা শ্রীঘটকের জানা ছিল না, তাঁকে বলা হয় নি। কিন্তু সেই অসুস্থমস্তিষ্ক-সঞ্জাত উক্তিকে পুঁজি করেই আজ এক শ্রেণীর প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ ফয়দা ওঠাতে কৃতসংকল্প হয়েছে। গান্ধীজী সম্পর্কে শ্রীঘটকের ধারণা কি তা তাঁর 'সুবর্ণরেখা' ছবিতেই ব্যক্ত হয়েছে। যিনি মানসিক অসুস্থ, তাঁর প্রলাপোক্তিকে কেন আতস কাঁচ দিয়ে দেখা হচ্ছে?

শ্রীঋত্বিক ঘটকের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ার সময় তিনি চিত্র-পরিচালক বিমল রায়ের চোখে পড়েন এবং সহযোগী করে নেন। শ্রীরায়ের 'তথাপি' ছবির সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিলেন শ্রীঘটকও। তারপর থেকে শ্রীঘটক এককভাবে চিত্র-পরিচালনা ও প্রযোজনা করতে থাকেন। কোমলগান্ধার, বাড়ি থেকে পালিয়ে, অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি ছবির জন্যে আজ [illegible] চিত্রামোদী তাঁকে হৃদয়রাজ্যে আসন দিয়েছে—সরকার তাঁর পদ্মশ্রী রাখুন আর ছাঁটুন।

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

## বসু ও জিন্না—(২)

আলিগড় আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে মুসলিম লীগের আবির্ভাব হয় ১৯০৬ সালে। লীগের উদয়ের সাক্ষাৎ কারণ অবশ্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ক্ষেত্র কিন্তু পূর্ববর্তী কয়েক দশকে ইংরেজ শাসকেরা প্রস্তুত করেছিল।

আলিগড় আন্দোলন আরম্ভ করার সময়ে স্যার সৈয়দ রাজনীতি থেকে গা বাঁচিয়ে চলতেন। পরেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংগে তিনি বিশেষ যোগ রাখেন নি। কংগ্রেসের দাবি বানচাল করার জন্য যেটুকু রাজনৈতিক নড়াচড়া করার প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি করতেন, থিয়োডর বেকের সহযোগিতায়।

হিন্দুদের রাজনৈতিক চেতনায় এবং শাসনকার্যে উত্তরোত্তর অধিকার দাবিতে বিচলিত হয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শাসক সম্প্রদায় কি ধরনের ভেদনীতির আশ্রয় নিয়েছিল, তার কিছু নমুনা দেওয়া যায়। ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা ভারতবাসী ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রতত্ত্ব শিখে রাজনৈতিক অধিকারের দাবি উপস্থিত করবে, সেই সংগে বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের বচন মুখস্থ বলবে—শাসিতের কাছ থেকে এর থেকে বড় আস্পর্ধা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইংরেজের স্নেহদুগ্ধ উথলে উঠে অতঃপর বঞ্চিত ওষ্ঠ সন্ধান করে মুসলমানদের লালনযোগ্য বিবেচনা করল ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা চলতে লাগল। ১৮৮৫-তে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের পরে বুকের জ্বালায় লণ্ডন টাইমস যে-মন্তব্য করেছিল, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার উপরে বৃটিশ রাজনীতির সুপরিচিত মুখোস পর্যন্ত সেঁটে দেবার চেষ্টা সে করে নিঃ

"But it was by force that India was won, and it is by force that India must be governed, in whatever hands the Government of the country may be vested. If we are to withdraw it would be in favour not of the most fluent tongue or of the most ready pen, but the strongest arm and the sharpest sword. It would therefore be well for the members of the late Congress to reconsider their position from this practical point of view."

ভারতশাসন যদি ছাড়তেই হয়, তা হলে অনর্গল বক্তৃতাবীর বা উদ্‌গ্রীব কলমধারীদের হাতে তাকে ছেড়ে যাব না, তাকে সঁপে দিয়ে যাব খরকরবালধারী সবলতম বাহুর অধিকারীদের হাতে—টাইমস পত্রিকার এই শুভেচ্ছার উত্তর দিতে গিয়ে যখন ভারতবাসী, বিশেষত ভারতীয় হিন্দুরা লেখনী ধারণের মতই অস্ত্রধারণের ব্যাপারেও যোগ্য হবার চেষ্টা করেছিল, তখন কী না বিপরীত আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল একই কণ্ঠ থেকে, সে নিয়ে ঐতিহাসিক কৌতুকবোধ না করে পারেন নি।(১)

যাই হোক, ইংরেজ রক্ষণশীলদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, রাজনীতিসচেতন হিন্দুদের তুলনায় (মূলত বাঙালী-হিন্দুদের তুলনায়) মুসলমানদের শক্তিশালী জাতিরূপে প্রচার করা এবং তারা যে সত্যই শক্তিশালী তার প্রমাণ

---

(১) "The Marathas and the Sikhs were certainly 'strong elements of Indian Society', and Gokhale and Tilak should have fulfilled the qualifications laid down by both Salisbury and Temple, but when the time came Gokhale never received the encouragement from the Government such as Sir Syed had enjoyed, and Tilak, who wanted to revive Hindu vigour, spent years in goal.

"Basically, Salisbury and the Tories were conducting a clever propaganda to project the picture of the Muslims as a virile, warlike Oriental people, strong, united and attached to the British Crown by the ties of the strongest loyalty, but contemptuous of the Babus (That is Hindus), and fearful lest democracy should place them under these poltroons." (A. K. Majumdar)

দিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাগুলি সেই শক্তির অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

এইকালে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে খুব আমোদবোধ করতেন না। "প্রজাদের মধ্যে জাতিবিদ্বেষের সাহায্যে বৃটিশ সরকার শাসন বজায় রাখবার চেষ্টা করবে, ঈশ্বর করুন, সে দিন যেন না আসে" —২৩ মার্চ, ১৮৮৮তে কলকাতায় বিদায়ী সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন। কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের পরে লর্ড ক্রসকে (ভারত-সচিব) তিনি লিখেছিলেন : "আমার মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও সন্দেহের বীজ বপন করার চেয়ে বড় ভুল আর কিছু আমরা করতে পারি না। ও-নীতির জালে ভবিষ্যতে আমরাই জড়িয়ে পড়ব।" লর্ড ডাফরিনের এই শুভবুদ্ধির অংশীদার লর্ড ক্রস একেবারেই ছিলেন না। বৃটিশ কূটনীতির সেই যোগ্য প্রতিনিধি ১৮৮৬-র কলকাতা কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমানে মত-সংঘর্ষ হওয়ার পরে উল্লসিত হয়ে ১৪ জানুয়ারী, ১৮৮৭তে ডাফরিনকে লিখেছিলেন : "ধর্মমতের ক্ষেত্রে এই ভেদচেতনা আমাদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক।" ইনিই বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড রীকে ৪ অক্টোবর ১৮৮৮তে লেখেন : "আমি খুবই খুশি যে, মুসলমানেরা পরিষ্কারভাবে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে স্পষ্টই তাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে।... আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, কংগ্রেসে যোগদানকারীদের সম্বন্ধে সরকার যদি ভ্রূকুটি ধারণ করে এবং যারা যোগদান করে নি তাদের সম্বন্ধে পোষকতার নীতি গ্রহণ করে, তা হলে (মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার) আন্দোলনে অবিলম্বে বেগসঞ্চার ঘটবে।"

লর্ড ক্রসের জায়গায় ভারত-সচিবরূপে লর্ড হ্যামিলটন এসে নির্লজ্জ কূটতায় পূর্ববর্তীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ৩ অক্টোবর, ১৮৯৫তে লর্ড এলগিনকে লিখেছেন : "স্যান্ডহার্স্ট আমাকে ধুলিয়ার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু সংবাদ পাঠিয়েছেন। মুসলমানেরা পরিষ্কারভাবে দোষী। ওই সব হাঙ্গামা শাসনকার্যের দিক দিয়ে দুঃখজনক, কিন্তু আমার বিবেচনায় এগুলি সাধারণভাবে আমাদের অবস্থা জোরদার করে, কারণ এগুলি দেখিয়ে দেবে, আমাদের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে ভারতের অবস্থা কী ছিল এবং ওবলুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অবস্থা কী হবে!" এলগিনকে লেখা ৭ মে, ১৮৯৭-র চিঠিতে তিনি একেবারে মুক্তকণ্ঠ। তাতে দেখা গেল, মহারাণীর ১৮৫৮-র মহাঘোষণার ধ্বজা তিনি আর উচ্চতে ওড়াতে চাইছেন না, কেন না তার মধ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। "ওসব হল ইংরেজিতে উত্তম সাহিত্য", হ্যামিলটন লিখেছিলেন, "কিন্তু গত ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে, জাতি-সমতার পুঁথিঘেঁষা বচনগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়া কত কঠিন।" ঐ চিঠিতে আরও খোলা কথা : "উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের কথা শুনে দুঃখিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনটি বাঞ্ছনীয় বলা শক্ত। (আমাদের কাছে) রাজনৈতিকভাবে (হিন্দু-মুসলমানের) ভাব ও কাজের ঐক্য মারাত্মক, অপরপক্ষে তাদের ভাব ও কাজের অনৈক্য শাসনগতভাবে অসুবিধাকর। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিচার করতে গেলে দ্বিতীয়টিতে ঝুঁকি কম, যদিও অকুস্থলে যাঁরা থাকেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁদের উপরে উদ্বেগের ও দায়িত্বের বোঝা চাপে।" কলকাতায় দাঙ্গা হলে লর্ড হ্যামিলটন তাই অখুশি হতে পারেন নি, তবে তাতে একটি "যথার্থ কুশ্রী ব্যাপার ছিল"—"দাঙ্গাটি গোড়ায় মুসলমানেরা পরিষ্কারভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আরম্ভ করলেও শেষের দিকে দু'পক্ষ মনে হল ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার দিকে ঝুঁকেছে।" ইংরেজরা কোন্ স্বার্থে ভেদনীতি চালিয়েছিল, তার এহেন মুক্ত স্বীকারোক্তি আমরা অল্পই পাব।

মুসলমান সমাজে সৈয়দ আহমদ যেমন প্রথম উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক নেতা, নবাব আমীর আলি খাঁ তেমনি প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক নেতা। সিপাহী বিদ্রোহের অল্প আগে 'মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়েছিল। তারপরে "হিন্দুরা যখন হিন্দুমেলা ও ন্যাশন্যাল সোসাইটি স্থাপন করল, তখন নবাব আমীর আলি কলকাতায় (১৮৪৭ সালে) 'ন্যাশন্যাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করেন, সর্বশ্রেণীর মুসলমানেরা যাতে নিজেদের কল্যাণের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে" এ ছাড়া ১৮৬৩ খৃীস্টাব্দে আবদুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানসঞ্চারের জন্য এবং আধুনিক বিষয়সমূহে তাদের ব্যুৎপত্তি বাড়াবার জন্য মহমেডান লিটারারি সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন।(২)

মুসলমানদের আনুগত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পরে ইংরেজ শাসকেরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নষ্ট করার কাজে

২ আমীর আলির পূর্বপুরুষ নাদির শাহের বাহিনীর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। আমীর আলি সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে' যোগ দেন নি, তার কারণ, ডঃ এ, কে, মজুমদারের অনুমান, তিনি ভেবেছিলেন যে, খাঁটি মুসলমান প্রতিষ্ঠান গঠন না করলে মুসলমানদের দাবি পুরো আদায় করে উঠতে পারবেন না। তিনি ভারতের নানাস্থানে তাঁর ন্যাশন্যাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশনের জন্য প্রচার চালান ও ৫৩টি শাখা স্থাপনে সমর্থ হন। ২৫ বছর ধরে আমীর আলি এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। "মুসলিম রাজনীতিতে আমীর আলির সুস্পষ্ট দান হল —মুসলমানদের তিনি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে, ইংরেজের কাছে তাদের আনুগত্য প্রমাণ করতে এবং মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে প্রচার করে বিভেদমূলক আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ইংলণ্ডে ঐ কাজে তাঁর বড় অংশ ছিল।" (এ, কে, মজুমদার)

সৈয়দ আমীর আলির সভাপতিত্বে ইংলণ্ডে বৃটিশ মুসলিম লীগের উদ্বোধনী সভা হয় ১৯০৮-এর ৬ই মে তারিখে। ইংলণ্ডের জনগণের কাছে ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দুবিরোধী মনোভাবের পরিচয় উদ্ঘাটিত করার ব্যাপারে

[illegible] মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। [illegible] যা তাঁর [illegible] মতই বলুন, শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করা হয় নি, বাঙালী হিন্দুদের রাজনৈতিক আন্দোলন নষ্ট করার জন্যই তা করা হয়েছিল। হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান— এই দুই অংশে বাংলাকে ভাগ করা হয় এবং হিন্দুপ্রধান বাংলায় হিন্দীভাষীদের জুড়ে রেখে বাঙালী হিন্দুদের প্রাধান্য খর্ব করার চূড়ান্ত ব্যবস্থাও করা হয়। গোড়ার দিকে অনেক মুসলমান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, বন্দেমাতরমের সঙ্গে আল্লা হো আকবর ধ্বনি একই [illegible] অনেক সমবেত কণ্ঠে উঠেছিল।৩ কিন্তু ক্রমে মুসলমান সমাজের একাংশকে শাসক ইংরেজ হাত করে ফেলে এবং তারা বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে আন্দোলন করতে থাকে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা বঙ্গবিভাগের সমর্থনে মুসলিম আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন, ভারত সরকারের কাছ থেকে তার পুরস্কারও তিনি পান। সে পুরস্কার বলা বাহুল্য সরকার বৃথা দেয় নি। কারণ বহু সভা-সম্মেলন থেকে বঙ্গবিভাগের সমর্থনে এবং বঙ্গবিভাগ রদবাদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চীৎকার উঠেছিল।৪

সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের এইকালে সরকার কিভাবে

---

আমীর আলির কার্যাবলী অতি উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন, তাতেই তাঁর মনের চেহারা খুলে গিয়েছিল:

"It is impossible for them (the Mussalmans) to merge their separate communal existence in that of any other nationality or strive for the attainment of their ideals under the aegis of any other organisation than their own." (ডঃ রমেশ মজুমদারের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড)।

৩ ঢাকার নবাব সলিমুল্লা, যিনি বঙ্গভঙ্গের প্রধান মুসলমান সমর্থক দাঁড়িয়েছিলেন, গোড়ার দিকে তাঁর পর্যন্ত ভিন্ন মত ছিল। ফরিদপুরের এক মুসলমান জমিদার পার্টিশানের মন্দ ফল সম্বন্ধে স্বধর্মাবলম্বীদের সতর্ক করে দেন। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত মুসলমান জমিদারকে সমর্থক পেয়েছিলেন। বরিশাল কনফারেন্সের সভাপতি এ, রসুল গোঁড়া স্বদেশী, ময়মনসিংহের আব্দুল হালিম গজনবী, বর্ধমানের আব্দুল কাসেম বা লিয়াকত হাসান প্রভৃতি তাই ছিলেন। স্বদেশী সভায় বহু মুসলমান যোগ দিয়েছেন, বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলেছেন, হিন্দুরাও আল্লা হো আকবর ধ্বনি তুলেছেন। মুসলমানেরা শিবাজী উৎসবে পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন। (রমেশ মজুমদার, ২য় খণ্ড)।

৪ ঢাকায় ১৯০৬ ডিসেম্বরে মুসলিম সম্মেলনে বঙ্গবিভাগ সমর্থনে এবং বয়কটের বিরুদ্ধে কড়া প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগ একই মর্মে প্রস্তাব নেয়। 'পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মুক্তি ঘটেছে যে-পার্টিশানের দ্বারা, তাকে যেন রদবাদ করা না হয়', সে কথা ঐ প্রস্তাবে সজোরে বলা হয়েছিল। "বঙ্গবিভাগের স্থির সিদ্ধান্তকে বাতিল করার জন্য যে বঙ্গজাতি-চেষ্টা চলেছে, তাতে সরকার যেন কান না দেয়"—লীগের ১৯০৮-এর অমৃতসর অধিবেশনে বলা হয়। ১৯১০ খৃস্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ বসু ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে পার্টিশান রদের কথা তুলতে গেলে মুসলমান

প্রশ্রয় দিচ্ছিল, তার চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর ব্যবহারে। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিনিধি-সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য লর্ড মিণ্টো একটি ছোট কমিটি গঠন করতে যাচ্ছেন—একথা ভারত-সচিব মর্লি হাউস অব কমন্স-এ বলেছিলেন। এই সংবাদ ঘোষিত হবার পরে আগা খাঁর নেতৃত্বে ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি প্রায় দু' বাহু বাড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান—"আসুন, হে রণ-অভিযানে বিজয়ীর দল, হে শাসকজাতির বংশধরগণ!" মুসলিম প্রতিনিধিবর্গের দাবির সীমা-সংখ্যা ছিল না: মুসলমানেরা ভারতবর্ষে সংখ্যায় নগণ্য নয়, এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি, জনজীবনে তাদের গুরুত্ব সংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশি, ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষায় তাদের ভূমিকা মূল্যবান, একশো বছর আগেও তারা শাসকজাতি ছিল, তার স্মৃতি এখনো মনে উত্তপ্ত সৌরভ বিকিরণ করছে, সুতরাং জেলা বোর্ড থেকে আরম্ভ করে সর্বপর্যায়ে তাদের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি সংরক্ষণ চাই, কদাপি যেন সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সে প্রতিনিধি-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা না হয়, কারণ সংখ্যাগুরু হিন্দুরা যদি হিন্দুদেরই মাত্র নির্বাচিত করে, তাতে দোষ দেবে কে, আর তারা যদি মুসলমানকে নির্বাচন করে, তা হলে তাদের অনুগত মুসলমানকেই নির্বাচন করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লর্ড মিণ্টো মুসলিম প্রতিনিধিদের বিবেচনাপূর্ণ ও ভক্তিপূর্ণ আবেদনের সামনে একেবারে গলে গেলেন। প্রতিনিধিরা যে বলেছেন, ইউরোপীয় ধরণের প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা ভারতের পক্ষে [illegible] এবং উপযোগী নয়—এহেন প্রাজ্ঞোক্তির কুণ্ঠা কেন? অতি উত্তম কথা, [illegible]—লর্ড মিণ্টো জানালেন,৫ সাধারণের অবাধ ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি-নির্বাচনের ব্যবস্থা করার কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই তাও জানালেন,৬ যদি শাসনতান্ত্রিক কোনো পুনর্গঠন হয়, অবশ্যই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে, তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হবে।৭

"লর্ড মিণ্টোর এই উত্তর ভারতে বৃটিশ শাসনের ক্ষেত্রে নূতন পলিসির সূত্রপাত করেছিল"—ডঃ রমেশ মজুমদার লিখেছেন। এই পলিসি ভবিষ্যতে ভারতীয় ইতিহাসে ইংরেজের মূল পলিসি হয়ে উঠবে বলে এ বিষয়ে ডঃ মজুমদারের বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করছি:

"ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানেরা কার্যতঃ দুই জাতি, তাদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক—এই বক্তব্যের উপরে প্রথমতঃ এখানে সরকারী স্বীকারোক্তির ছাপ পড়ল। দ্বিতীয়তঃ, সরকার কার্যতঃ প্রতিশ্রুতি দিল যে, মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি আসন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তাদের দেওয়া হবে। পরবর্তী মুসলিম রাজনীতি এই দুই নীতির উপরই গড়ে উঠেছে, ৪০ বছর পরে পাকিস্তানও তাই।"৮

লর্ড মিণ্টোর এই নীতির পিছনে ছিল একটি গভীর চক্রান্ত। মিণ্টো যখন সহাস্যে সানন্দে মুসলমান প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন, তখন আসলে তিনি নিজেই নিজের করমর্দন করছিলেন, কারণ পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন, এই প্রতি-

---

সদস্যেরা প্রবল আপত্তি করেন। তাঁকে সতর্ক করে বলা হয় যদি তিনি ঐ চেষ্টা করেন, তাহলে বৃটিশ জনসাধারণ উল্টো-পক্ষের কথা প্রবলভাবে শুনতে পাবে। 'পার্টিশনের কল্যাণকর বিধানকে যদি নাড়ানো হয়', সে-কাজ ইংরেজের পক্ষে চরম ভ্রান্তির কাজ হবে, তা প্রচণ্ড অসন্তোষ সৃষ্টি করবে—এসব কথাও সেখানে জানানো হয়েছিল। পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী মহম্মদ আলী বঙ্গভঙ্গের অতীব সমর্থক ছিলেন। (রমেশ মজুমদার, ২য় খণ্ড)।

৫ মিণ্টো বলেন: "You need not ask my pardon for telling me that 'representative institutions of the European type are entirely new to the people of India', or that their introduction here requires the most earnest thought and care. I should be very far from welcoming all the political machinery of the Western world among the hereditary traditions and instincts of Eastern races." (রমেশ মজুমদার, ২য় খণ্ড)।

৬ "I am as firmly convinced as I believe you to be, that any electoral representation in India would be doomed to mischievous failure which aimed at granting a personal enfranchisement regardless of the beliefs and traditions of the communities composing the population of this continent." (রমেশ মজুমদার, ২য় খণ্ড)।

৭ "In the meantime I can only say to you that the Mahomedan community may rest assured that their political rights and interests as a community will be safeguarded by any administrative reorganisation with which I am concerned, and that you, and the people of India, may rely on the British Raj to respect, as it has been its pride to do, the religious beliefs and the national traditions of the myriads composing the population of His Majesty's Indian Empire." (?)

৮ ২রা অক্টোবর, ১৯০৬-এর লন্ডন টাইমস মিণ্টোর উপরিউক্ত প্রতিশ্রুতিতে উল্লসিত হয়ে লেখে, বোঝা যাচ্ছে বঙ্গবিভাগ আর বরবাদ হবে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতির কথা শুনে টাইমসের সন্তোষের সীমা ছিল না। (অশোক মজুমদার)।

## অন্ধকার স্বপ্নগুলি

**বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

১

এ-পথে নিষেধ ও-পথে আঁধার,
কী আছে উপায় ঘরে ফিরবার?
যেই দিকে যাই ভালবাসাগুলি
অন্ধের মতো করে চিৎকার!

কোথা আশ্রয় রাত কাটাবার।

২

জানি রক্তস্নান ছাড়া জন্ম নেই তবু
রক্তপাত নিছক হত্যার
খেলা হ'লে, শ্রেণীহীন সমাজও-যে প্রভু,
বুকচাপা স্বপ্নের অন্ধকার!

## জীবনানন্দকে নিবেদিত

**জয়ন্তী সেন**

নক্ষত্রের আলো আর জলের গন্ধের ভিজে স্বাদ
এখনো হৃদয়ে মেখে স্বপ্ন পেতে আমাদের সাধ:
এখনো হিজল ছায়া, ধান ক্ষেত, সান্নিধ্য নারীর,
সুখভ্রষ্ট শঙ্খচিল, ধানসিঁড়ি নদীটির তীর—
আমাদের পৃথিবীকে ধ্বনি দেয়, করে আলোকিত।
নাগরিক চেতনায় ক্রমশই অনুভূতি মৃত
আক্ষেপ যথেষ্ট করি, স্বপ্নে তবু উদাস দুপুর
ব্যথিত নিশ্বাসে মিশে বুকে হয় আধ চেনা সুর
যা বাজে তোমার কণ্ঠে কবেকার বিশ্বস্ত আবেগে—
সূর্য যে সোনালি স্পর্ধা ঢেলেছিল ধূসরিত মেঘে—
তোমার প্রেরণা দীপ্ত! পথ হেঁটে হাজার বছরে
অন্তরঙ্গ কোন চোখ কাছাকাছি যদি আসে সরে
পাখির নীড়ের মতো—ভালোবাসা তাকে দিতে পারি,
যে উপমা জমা হয় দেহে মনে—সে শুধু তোমারি।

---

নিধি দলটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শাসকদের সাজানো ব্যাপার। লেডি মিন্টোর রচনাতেও তার প্রমাণ আছে। আলিগড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর্চবোল্ডের সঙ্গে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ডানলপ স্মিথের আলোচনায় ব্যাপারটা সমাধা হয়। সরকারের পক্ষ থেকেই আর্চবোল্ডকে জানানো হয়, ভাইসরয় মুসলমান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত। কতজন আসবেন, কোথা থেকে আসবেন, আবেদনপত্রে কারা সই করবেন, তাতে কী লেখা হবে, সবই আলোচনামুখে স্থির হয়েছিল, এবং তারপরে আর্চবোল্ড নবাব মহসিন-উল-মুলুককে অত্যন্ত তাগিদ দিয়ে লেখেন, হাতে একদম সময় নেই, যত তাড়াতাড়ি পারেন কাজ করুন, লেখার ভাষা বা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা নেই, আমি লিখে দেব, "ভালো ভাষায় আবেদন লেখার কায়দা আমি জানি", তবে আমি "পর্দার আড়ালে থাকতে চাই. বাইরে থেকে যেন দেখায় আপনারাই সব করছেন; আপনি তো জানেন মুসলমানদের ভালোর জন্য আমি কতখানি উদ্‌গ্রীব।"

চক্রান্তের জাল কতখানি ছড়ানো ছিল বোঝা যায় ১লা অক্টোবর, ১৯০৬-এর লণ্ডন টাইমসের সম্পাদকীয় পড়লে। ঐদিনই প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, এবং ভাইসরয় তাদের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিনিধিদলের আবেদনপত্র এবং ভাইসরয়ের উত্তর অনেক আগেই টাইমসের হাতে পেঁছে গিয়েছিল। কলকাতার কিছু হিন্দু রাজনৈতিকের বিক্ষোভের তুলনায় মুসলমান প্রতিনিধিদলের শান্ত বক্তব্য কী বিপরীত, এবং আনন্দদায়ক, সে কথা বলার পরে টাইমস আরও বলে, "ইংরেজরা যদি সত্যই ভারতে জনপ্রিয় প্রতিনিধি শাসন বলবৎ করতে চায়, তা হলে মুসলমান আবেদনকারীরা যে-নীতি উপস্থিত করেছে, তাকে মানতেই হবে। তাকে অগ্রাহ্য করলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখা হবে।" মুসলমান প্রতিনিধিদলের আবেদনপত্রে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের অনুপযোগিতার কথা যেখানে বলা হয়েছে, টাইমস অতঃপর তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলে, ইংরেজ রাজনৈতিকদের বুলিগুলিকে তোতাপাখীর মতো কংগ্রেসীরা আওড়ায়, তার পাশে এতদিনে এখানে সত্যই কিছু মৌলিক রাজনৈতিক চিন্তা দেখা গেল।৯

যেদিন মুসলিম প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সেদিন উল্লাসে অধীর হয়ে একজন সরকারী কর্মচারী লেডি মিন্টোকে লেখেন:

"একটি বিরাট—বিরাট ব্যাপার আজ ঘটে গেছে। রাজদ্রোহী বিরোধী দল থেকে সাড়ে ছয় কোটি লোককে সরিয়ে আনার চেয়ে কম কাণ্ড নয় তা!"

এই 'শয়তানী চক্রান্তে' সাধু-অসাধু সকলেরই অংশ ছিল। উদারনৈতিকরূপে সুখ্যাত, গ্ল্যাডস্টোনের জীবনীকার 'সংস্বভাব জন', অর্থাৎ ভারতসচিব মর্লি পরমানন্দে লিখেছিলেন, বাঁচা গেল, এর পরে এখানকার (ইংলণ্ডের) সমালোচকদল আর ভারত সরকারের সমালোচনা করে বলতে পারবে না যে, ভারতের গণ্ডগোলের মূলে ব্যুরোক্রাসির সঙ্গে জনগণের সংঘাত।

[ ক্রমশ ]

---

৯ টাইমস লিখেছিল:

"If Englishmen honestly desire to introduce popular representation into India, the principle for which Mahomedan Memorialists contend must be accepted; if it is neglected the strife between rival communities will be kept burning...For another reason the Mahomedan Memorial is a remarkable document; it is almost the only piece of original political thought which has emanated from modern India. All the proposals which have been put forward from time to time by the Congress are unimaginative reproductions of the ideas which form the stock-in-trade of English politicians."

(অশোক মজুমদারের গ্রন্থে উদ্ধৃত)
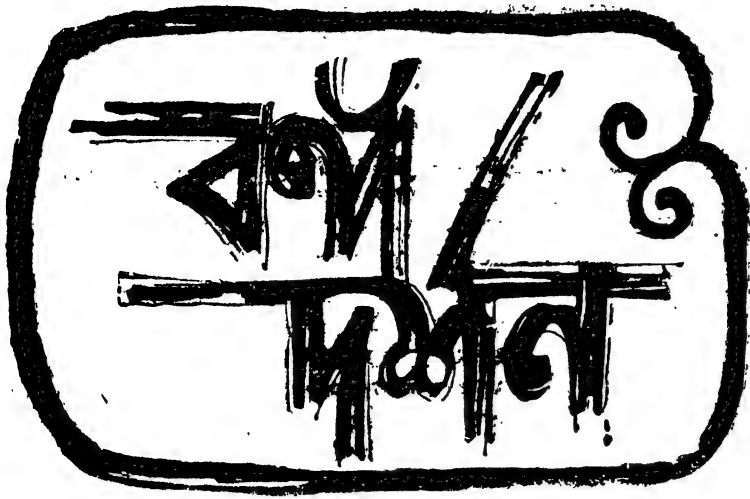
একটি সরকার প্রকৃতই কি করছে বা কি করতে ইচ্ছুক, তার প্রমাণ সরকারী ঘোষণায় পাওয়া যায় না, যদিও ঘোষণাগুলিতে অনেক সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটানো হয়। সরকার কি করতে চান, কোন্ খাতে কত অর্থ বরাদ্দ করা হবে, এগুলি কিন্তু আসলে নির্ভর করে বার্ষিক বাজেটের উপর। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ১৯৭০-৭১ সালের বাজেট পেশ করেছেন। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য মোট ব্যয় করা হবে ২৮৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৭৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, সুতরাং ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ১৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া গত বছরের দরুণ ২৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকার ঘাটতি এতাবৎ ছিল এবং তা ধরে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৪০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা।

এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার পূর্বে কয়েকটি আনুষঙ্গিক কথা বলে নেওয়া ভাল। মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট পেশ করার ব্যাপার নিয়ে রাজনীতির জল কিছুটা ঘোলা করার চেষ্টা কোন কোন রাজনৈতিক মহল থেকে করা হয়েছিল এবং কয়েকটি শরিক দলের নামে প্রচারিত গুজবে বলা হয়েছিল যে, মুখ্যমন্ত্রী এবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ না করে কিছুকালের জন্য একটা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করে নেবেন, যাকে বলা হয় ভোট অন অ্যাকাউন্টস। এই গুজব ছড়ানো হয়েছিল সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীকে লোকচক্ষে হেয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে, যেন যুক্তফ্রন্টের আয়ু আর বেশিদিন নেই--এ ভেবেই মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী আগামী বছরগুলির জন্য পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করায় সব সংশয়ের অবসান ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র চার-পাঁচ মাসের জন্য ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর প্রস্তাব করার কোন অভিপ্রায়ই মুখ্যমন্ত্রীর ছিল না। গুজবটা সম্পূর্ণই ভূয়া, রটনাকারীদের উর্বর মস্তিষ্কের ফল। বাজেট বক্তৃতার সঙ্গে প্রচারিত পুঁথিগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০৬, এগুলিতে সারা বছরের জন্য আনুমানিক খরচের বরাদ্দই তিনি পেশ করেছেন। ভিন্ন অভিপ্রায় থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এগুলি ছাপাবার আদেশ দিতেন না, আংশিক বরাদ্দের হিসাবগুলি ছাপাবার জন্য দু'-একদিন আগে আদেশ দিলেও শুক্রবার দুপুরের মধ্যে ১৯০৬ পৃষ্ঠার পুঁথিগুলি ছাপা-বাঁধাই শেষ করা সম্ভবপর হত না। অথচ এই বিষয়টি নিয়ে অনেক জল ঘোলা করা হয়েছে। আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি যে, রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত তৃতীয় স্তরের মানুষ হন। তাঁরা যে কি রকম গুজবনির্ভর এবং সস্তা ঘটনা জমাবার জন্য বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে নারাজ, তা এই গুজবের ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে দু'দলে ভাগাভাগি হয়ে যাবার ঘটনাতেই বোঝা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে কেন্দ্র ও পঞ্চম অর্থ কমিশনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের উপর অবিচারের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের অভিযোগ করে একটি স্থায়ী অর্থ কমিশনের প্রস্তাব করেছেন। পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যের বরাদ্দ বেড়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পঞ্চম অর্থ কমিশন যে দাবি করেছেন, তদনুরূপ-ভাবে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনাবহির্ভূত ব্যবধান মেটে নি। পরিকল্পনা কমিশনও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ এই অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে পঞ্চম অর্থ কমিশন সাত-সাতটি রাজ্যের ক্ষেত্রে এমন টাকা মঞ্জুর করেছেন—যা ওই সব রাজ্যে [illegible] উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করেছে। এই সাতটি রাজ্য [illegible] [illegible] গুজরাট, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ। পঞ্চম অর্থ কমিশন এমন-[illegible] [illegible] সুপারিশগুলি তৈরি করেছেন, যাতে একদিকে যখন সাতটি রাজ্যে ১,২৭১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে, তখন অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে ঘটেছে বিপুল ঘাটতি। এই সব উদ্বৃত্ত যেখানে কয়েকটি রাজ্যকে পরিকল্পনার বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সক্ষম করেছে, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্য চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া অনুযায়ী ৩২০·৫১ কোটি টাকার পরিকল্পনাও রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন যে, একটি স্থায়ী অর্থ কমিশন থাকা বাঞ্ছনীয়, যা মাঝে মাঝে রাজ্যগুলির পরিকল্পনা বহির্ভূত আর্থিক প্রয়োজনের সমীক্ষা করবে। এ না হলে উপরিউক্ত বৈষম্যগুলি থেকেই যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় সংবিধান সংশোধনের দাবি তুলেছেন। কেন না, ফেডারেশনপন্থী সংবিধানে রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ বণ্টনের দায়িত্ব অনুরূপ হওয়া উচিত। বর্তমান সংবিধানের আওতায় সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কৃত্যকগুলির ক্রমবর্ধমান দায়িত্বভার পড়েছে প্রধানত রাজ্য সরকারগুলির উপর, অথচ সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের যে সব উৎস বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগুলি মোটেই সম্প্রসারণশীল নয়। সংবিধান মূলত অধিকতর সম্প্রসারণশীল রাজস্বের উৎসগুলি, বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলসঞ্জাত উৎসগুলি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। সুতরাং পশ্চিম-বঙ্গের মত সমস্যাপ্রপীড়িত রাজ্যের ভবিষ্যৎটা কেন্দ্রীয় সরকার নেহাৎই যে অন্ধকারময় করে তুলেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান বাজেট এই কারণেই সত্যকারের উন্নয়নমূলক কোন কাজকর্মের প্রেরণা হতে পারবে না। বেতন কমিশন সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে যা সুপারিশ করেছেন, তা হয়ত কার্যকরী করা যাবে না, কোন উৎপাদনশীল প্রকল্পে হাত দেওয়া যাবে না। যে কথাটি দিয়ে আমরা বর্তমান নিবন্ধটি শুরু করেছিলাম, বর্তমান বাজেটে সরকারের সদিচ্ছা বহুলাংশে প্রকাশিত হলেও, সরকারের হাত-পা বাঁধা, কার্যকর কিছু হবার উপায় নেই। প্রশাসনিক ব্যয় মেটাতেই বাজেটের সিংহভাগ চলে যাবে, যে সামান্য অবশিষ্ট থাকবে, তাতে যেটুকু উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম হবে, বলাই বাহুল্য, তা দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

বস্তুত যেখানে চাবিকাঠিটি সর্বাংশেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং যতই রাজ্য সরকার যেখানে নিরুপায়, [illegible] এই বহু সমস্যা-প্রপীড়িত রাজ্যের

সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করাটাই সংগত ছিল। তার অনুকূলে পরিবেশও যে ছিল না তা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের আর সে দাপট নেই, নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই প্রধানমন্ত্রী ও শাসক কংগ্রেসের দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগে কিছুটা সমঝোতার প্রয়োজন আছে। এই অবস্থায় যদি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হত, তা হলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁরা সে পথে না গিয়ে নিজেদের দলের শক্তি বাড়ানো ও আত্মঘাতী হানাহানির প্রতিযোগিতায় পা দিয়েছেন, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমবেত সংগ্রামের পুরনো শ্লোগান বোধ হয় এতদিনে কবরস্থ হয়েছে।

## এ উন্মত্ততা বন্ধ হোক

গত কয়েক বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবনে একটা যে অত্যন্ত উচ্ছৃংখল আবহাওয়া বিরাজ করছে এবং তার পরিধি ও আকস্মিকতা যে কত ব্যাপক ও দ্রুত, তার একটি সাম্প্রতিক পরিচয় পাওয়া গেছে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে—একটা গোটা দিন শিয়ালদহ ডিভিশনের সমস্ত ট্রেন বন্ধ থাকার ঘটনাটির দ্বারা। চব্বিশ ঘণ্টার উপর ট্রেন বন্ধ থাকার দরুণ শিশু, নারী, বৃদ্ধ সহ লক্ষ লক্ষ মানুষকে যে ভয়াবহ দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে, সে কথা আশা করি বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন নেই। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে তার কাটা দিয়ে। অর্থাৎ তার কাটা ও অন্যান্য যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ট্রেন বিলম্বে এসেছে এবং এই বিলম্বের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কোন কোন স্টেশনে যাত্রীরা ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ডদের মারপিট করেছে, কোন কোন স্টেশনে তারা অফিসের আসবাবপত্র ও জানালা-দরজা ভেঙে দিয়েছে। ফলে প্রহৃত গার্ড, ড্রাইভার ও অন্যান্য কর্মচারিগণ নিরাপত্তার দাবিতে স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত ট্রেন চালাতে অস্বীকৃত হন।

আমাদের সমাজদেহে যে একটা জঘন্য ধরনের উন্মত্ততা কয়েক বছর ধরে দুরারোগ্য ব্যাধির মত গড়ে উঠেছে, বর্তমান ঘটনাটি তার একটি অতি উৎকট ধরনের বহিঃপ্রকাশ। কোন তরফকেই এক্ষেত্রে সাধু বা নির্দোষ সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। রেলযাত্রীদের একাংশের মধ্যে দায়িত্বহীনতা, ধৈর্যের অভাব ও গুণ্ডামীর প্রবণতা যে বিকটভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, [illegible] করার জন্য বেশিদূর যাবার প্রয়োজন নেই। এই শিয়ালদহ ডিভিসনের এক মাসের খতিয়ান নিলেই দেখা যাবে যে, অন্তত আট দিন রেলপথ কোন না কোনভাবে অবরোধ করে গুরুতর বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে। যে-কোন দাবিতে ট্রেন থামিয়ে দেবার মত বেআইনী কাজ হামেশাই ঘটছে। কিছুকাল আগে নৈহাটি স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করা হল। অপরাধ—ব্যাণ্ডেল-নৈহাটি লাইনের গাড়িটা বিলম্বে আসার দরুণ তার করস্পণ্ডিং নৈহাটি-শিয়ালদহ লোকালটি ছেড়ে গেছে। অতএব সারা দিনের ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দাও। তার দুদিন পরেই শ্যামনগর স্টেশনে অবরোধ। ব্যাপারটা কি? একটি থ্রু গাড়ি আছে, তা কেন ওই পরম পবিত্র স্থানে দাঁড়াবে না? শ্যামনগরের দেখাদেখি বেলঘরিয়াও একদিন ট্রেন আটক করে দিল, ওই একই কারণে। মুশকিল হয়েছে কি আজকাল সকলেই অত্যন্ত অধিকার-সচেতন হয়ে গেছে, দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ অবশ্য বাদ দিয়ে। পান থেকে চুন খসলেই দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। নতুবা খামোকা নিরীহ রেলের ড্রাইভার ও গার্ডকে প্রহার করার এই বীরত্বের প্রহসন কেন? রেলের কর্মচারীরা কি শ্রেণীগতভাবে যাত্রীদের চেয়ে পৃথক? সবাই জানে সিগনাল না পেলে গাড়ি যাবে না, ড্রাইভার বা গার্ডের পক্ষে নিজের ইচ্ছায় গাড়ি চালানো সম্ভব নয়, তা হতে পারে না। ট্রেন বিলম্বের দরুন তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই।

এর অর্থ এই নয় যে, সব দোষই যাত্রীদের এবং এ বিষয় রেল কর্তৃপক্ষ ও রেল কর্মচারীরা একেবারেই ধোয়া তুলসীপাতা। প্রথমত রেল কর্তৃপক্ষের কথাই বলা যাক। রেলওয়ে বাজেটে প্রতি বছর উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও যাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেবার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন না। শহরতলীর প্রাত্যহিক যাত্রীরাই রেলওয়েকে সবচেয়ে বেশি পয়সা দেন, অথচ তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি রেল কর্তৃপক্ষ চূড়ান্তভাবে নির্বিকার। উঁচুতলার মানুষদের জন্য চরম বিলাসবহুল রাজধানী এক্সপ্রেস নির্মিত হয়, পক্ষান্তরে যে লোকাল ট্রেনগুলির যে কামরায় তিরিশটি বসার আসন আছে, সেখানে তিনশোজন লোক আশ্রয় করে এবং এদের এই বাড়তি ভাড়াটা নির্দ্বিধায় রেলদপ্তর পকেটে পোরেন। পর্যাপ্ত ট্রেনের অভাবটা স্বেচ্ছাকৃত। যাত্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ট্রেনের সংখ্যা বাড়ে নি। এ ছাড়া ট্রেন চলাচল নিয়মিত নয়, কাজেই যাত্রীদের পক্ষে বিক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। রেলের বৈদ্যুতিক তার চুরির ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক, এর জন্য রেলওয়ে পুলিশ রয়েছে, [illegible] এবং রেল[illegible]-দের সক্রিয় সাহচর্য না থাকলে এই কর্মটি সম্ভব নয়। ওয়াগন ভাঙার যে ব্যাপকতম প্রকাশ সম্প্রতি দেখা গেছে, তার পিছনেও রেলকর্মীদের বেশ কিছুটা প্রশ্রয় আছে। কাজেই তার চুরির জন্য রেলের চলাচল ব্যাহত বা বিঘ্নিত হলে জনসাধারণেরও এই প্রশ্ন করার অধিকার আছে যে, এ সব ক্ষেত্রে রেলওয়ে পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ নির্বিকার কেন। জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হবার কারণ খুবই সংগত। তবে এক অন্যায় দিয়ে আর এক অন্যায়ের প্রতিকার করা যায় না। যাত্রীরা ড্রাইভার ও গার্ডকে প্রহার করে নিঃসন্দেহে ঘোরতর অন্যায় করেছেন, এ কথা যেমন সত্য, রেলকর্মীরাও আকস্মিকভাবে রেল চলাচল ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েও সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নি, বরং বলা চলে বৃহত্তর পাশবিকতা করেছেন।

## বাংলা প্রবর্তন সপ্তাহ ঃ জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোসের আবেদন

২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'বাংলা প্রবর্তন সপ্তাহ' পালনের জন্য 'বাংলা প্রবর্তন সমিতি' পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আমি একান্তভাবে কামনা করি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ব্যবসায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে পশ্চিম বাংলার অধিবাসী মাত্রই তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলাভাষাকে নিত্যকার কাজের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হবেন।

শুনলাম বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারি মহলে বাংলা প্রচলনের জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন! এরই মধ্যে সমস্ত দপ্তরকে বাংলা টাইপযন্ত্র কেনবার ও ব্যবহারের যে নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন, তাতে তাঁদের এ বিষয়ে ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। আমার একান্ত বিশ্বাস ও কামনা—সরকারি দপ্তর ও আইন-আদালতের সব কাজ বাংলায় চালিয়ে বর্তমান সরকার জনসাধারণের কাছে তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে দ্বিধা করবেন না। তাঁদের চেষ্টায় বাংলা ভাষা যদি এই মর্যাদা পায়, সারা দেশ তাঁদের সাধুবাদ জানাবে।

এই প্রসংগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কথা মনে আসে। সেখানে শোনা যায় মাতৃভাষা চালানোর প্রচেষ্টায় তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। অথচ নিজেদের ভাষা নিয়ে আমাদের গর্ব কম নয়। কিন্তু গর্ব যতটা, ততটা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক চেষ্টা নেই।

[শেষাংশ ২২০১ পৃষ্ঠায়]

আসা-যাওয়ার পথের মধ্যেই রাজনীতির বেসাতি। এ বাজারে উঠতি-পড়তি প্রায় শেয়ার বাজারের মতই দ্রুততার সঙ্গে ঘটে। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শ্রীযুক্ত গুলজারিলাল নন্দা ও শ্রীযুক্ত সঞ্জীবায়ার ফেরৎ আসাতে বেশ কিছু সময় লেগে গেছে। প্রথম জন ১৯৬৬ সনে, দ্বিতীয় জন ১৯৬৭ সনে দপ্তর ছাড়েন। নন্দাজীকে নানাভাবে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য বেশ কিছুকাল যাবৎ করে আসছিলেন। এতোদিনে সে প্রয়াস সার্থক হল। কংগ্রেস ভাঙাভাঙির ফলে কেন্দ্রে কিছু মন্ত্রীর পদত্যাগ ও তজ্জনিত শূন্যস্থান সৃষ্টি হওয়ায় নন্দাজীকে রেল দপ্তরে এবং সঞ্জীবায়াকে তাঁর পুরানো দপ্তর—শ্রম কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এখন বাকি রইল শ্রীসি এম পুনাচার পদত্যাগজনিত শূন্য আসনটির (ইস্পাত-হেভি এঞ্জিনীয়ারিং) জন্য ব্যবস্থা করা। বর্তমানে দপ্তরটি দেখছেন স্বর্ণ সিং। ডঃ রামসুভগ সিং-এর জায়গায় নন্দা এবং জে এল হাতির স্থানে সঞ্জীবায়া। উপরোক্ত তিনজন ছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয় ছিল মোরারজী দেশাইয়ের। তা সেটির ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। অর্থ দপ্তর সম্ভবতঃ তিনিই রাখবেন আরও কিছুকাল।

**বিহার ও উত্তরপ্রদেশ**

রাজনীতির চাকা বিহার ও উত্তরপ্রদেশে চরকির মতো ঘুরছে। কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর উত্তরপ্রদেশে যে সি বি গুপ্তের মন্ত্রিত্ব থাকবে না, এটা কাকপক্ষীতেও টের পেয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে আজ বলে নয়, গুপ্ত-ত্রিপাঠী টাসল অব পাওয়ার পুরোনো কাসুন্দী। কংগ্রেস ভাগ হওয়ায় এবং সি বি গুপ্ত গাপ্পাপন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে থাকায়। (তিনি তাঁর পথ ও লক্ষ্য অনুসারে অপেক্ষাকৃত প্রগতিপন্থী ইন্দিরা-কংগ্রেসে কিছুতেই মানাতে পারেন না) কমলাপতি ত্রিপাঠীর পক্ষে বড় শরিক চরণ সিং-এর বি কে ডিকে মন্ত্রিসভা গঠন করা সহজ হয়ে পড়ল। তথাপি শ্রীগুপ্তকে সরাতে যতটা টালবাহানা করতে হয়েছে, নিজলিঙ্গাপ্পা-কামরাজ-পাতিলরা যখন এক কংগ্রেস জাঁকিয়ে ছিলেন তখন ছুতোনাতায় অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভাঙতে কোনো বিচার-বিবেচনার জন্য তিলমাত্র কালহরণের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু হায়, রাজনীতির গতি বড় কুটিল পথে। আজ সংগঠনী কংগ্রেসের নেতা বলে সেই তাঁদেরই অভিযোগ করতে হচ্ছে যে, শ্রীমতী গান্ধীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপালদের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করে মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়া করেছেন। অদৃষ্টের পরিহাস কখনো কখনো এইভাবেই বুঝি অট্টহাস্য করে।

সাংগঠনিক কংগ্রেসের সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা আজ অসহায়ভাবে অভিযোগ করছেন যে, বিহারে দারোগা রাই ও উত্তরপ্রদেশে চরণ সিংকে অন্যায়ভাবে গদিতে বসানো হয়েছে। দুই রাজ্যের রাজ্যপালও কেন্দ্রের চাপে পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

নিজলিংগাপ্পা যাই বলুন, চরণ সিংকেই নেতা বানিয়ে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁর দলও যে মুখিয়ে ছিল তার প্রমাণ, চন্দ্রভান গুপ্ত পদত্যাগ করলে, সাংগঠনিক কংগ্রেস এবং তার লেজুড় এস এস পি ও জনসঙ্ঘ একযোগে বি কে ডিকে সমর্থন জানাতে উদ্‌গ্রীব ছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারী নিজের পদত্যাগপত্র দাখিল করে স্বয়ং সি বি গুপ্ত সেই পত্রে রাজ্যপালকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন বি কে ডি-নেতা চরণ সিংকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য রাজ্যপাল আহ্বান জানান। তখন যদি চরণ সিং ঘৃণ্য বিবেচিত না হয়ে থাকেন, গাপ্পাজী পরবর্তীকালে কী করে তাঁকে অসহ্য জ্ঞান করছেন! কিন্তু এই জাতীয় বালখিল্য গোসা নিয়ে আজকের ভারতীয় নেতৃত্ব মশগুল। চরণ সিং-এর ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা হওয়া মাত্র সাংগঠনিক কংগ্রেস নতুন নেতা ঠিক করলেন গিরিধারীলালকে। সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ আর সংযুক্ত (সোস্যালিস্ট?) পার্টি গিরিধারী-সমর্থক বনে গেলেন। শেষে চরণ সিং-এর গদি লাভ হল, গোসা হল তাই অনিবার্য কারণেই পাল্টা ব্রেকের।

আট মাস রাষ্ট্রপতির শাসনকালের অবসানে বিহারেও ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের নেতৃত্বে শ্রীদারোগা রাইকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে মন্ত্রিসভার দখল নেওয়া হয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের দারোগা রাই সমর্থন পাচ্ছেন ক্রান্তি দল, শোষিত দল এবং মিঃ জাঃ ঝাড়খণ্ড পার্টির। মন্ত্রিসভার বাইরে থেকে সমর্থন জানাচ্ছে সি পি আই ও পি এস পি। এই জোট ৩৫ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে রাজ্যোন্নতির শপথ নিচ্ছেন। ৩১৮ আসনের (দুটি শূন্য) মধ্যে রাই-সমর্থকদের সংখ্যা ১৭৩।

ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটে ছোড়া উড়ন্ত কর্কের মতো বিহার তিন বছরে ছয়-ছয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে যেতে-আসতে দেখল। দারোগা রাই সুতরাং ১৯৬৭-৬৯-৭০—এই সময়কালের মধ্যে সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী।

দশ মাস কুড়ি দিন রাজত্ব করে মহামায়াপ্রসাদ তাঁর জনক্রান্তি দলের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ফিরে গেছলেন।

মাত্র সাতচল্লিশটি দিন মুখ্যমন্ত্রিত্বের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন শোষিত নেতা বি পি মণ্ডল। এ-জন্য বহু কাঠ-খড়-কেরোসিন পুড়েছিল। তাঁকে গদিনসীন করার জন্য ১৯৬৮র ২৮শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত স্বল্পতম সময়কাল মুখ্যমন্ত্রিত্ব করে নিলেন সতীশপ্রসাদ সিংহ। বি পি মণ্ডল গদিতে বসলেন ১লা ফেব্রুয়ারী '১৯৬৮ সালে। এর পর এলেন সংযুক্ত বিধায়ক দলের ভোলাপাশওয়ান শাস্ত্রী। তাঁর মন্ত্রিত্ব ৯৫ দিন।

'৬৮'র ২৯শে জুন কায়েম হল রাষ্ট্রপতির শাসন। তারপর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পালা। কোন দলই বিহারে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারল না। বহু চেষ্টার ফলে গঠিত হলো একটি জোটবন্ধ মন্ত্রিসভা। সর্দার হরিহর সিং হলেন তদানীন্তন জোড়া কংগ্রেসের নেতা (বিধান সভায়) এবং সেই হিসেবে জোটবন্ধ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী। জোটে ছিল জনতা পার্টি, ঝাড়খণ্ড, শোষিত দল, স্বতন্ত্র আর বি কে ডি। দুজন নির্দলও ছিলেন সমর্থক।

কিন্তু তা-ও টিকল না। ১১৫ দিনের মাথায় পতন। ২০শে জুন পতনের পরই ভোলাপাশওয়ানের

[শেষাংশ ২১১১ পৃষ্ঠায়]

আফ্রিকা :

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্স পক্ষকালব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে আফ্রিকা এসেছেন। ইতিমধ্যে তিনি চারটি দেশ ঘুরেছেন, আরও ৬টি দেশ ঘোরা তাঁর এখনও বাকি আছে।

এর আগে আর কোন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব এত গুরুত্ব ও এতটা সময় দিয়ে আফ্রিকা সফর করেন নি। আফ্রিকার রাজনীতিতে মার্কিন আগ্রহেরই পরিচয় এটা। ১৯৬০-এ কঙ্গোর গোলমালে আপত্তিকর ভূমিকা গ্রহণের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকার রাজনীতিতে বেশ একটু কোণঠাসা হয়েছে। তাই অন্যান্য অঞ্চলের মত অতটা সরব নয় তারা এখানে।

এখনও যে আফ্রিকায় মার্কিন-বিরোধিতা কমেছে, তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মার্কিন সাহায্য পায় মরোক্কো ও তিউনিসিয়া। অথচ, এ দুটি দেশেই বিরূপ সম্বর্ধনা জুটেছে উইলিয়াম রজার্সের ভাগ্যে। মরোক্কো কোন রকম উৎসাহ দেখায় নি রজার্সের সফরে। আর তিউনিসে কয়েক হাজার ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে রজার্সের আগমনের প্রতিবাদে।

বলা হচ্ছে, মরোক্কো আর তিউনিসিয়া আরব দেশ। আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের পক্ষে। তাই এ দুটি দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মনোভাব প্রবল রয়েছে। কেবল ইজরায়েলের ব্যাপারে নয়, সাধারণভাবেই আজ এই সব দেশে মার্কিন-নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বেড়েছে, ডলার সাহায্য দিয়ে এই বিক্ষোভ চাপা দেয়া যাচ্ছে না।

ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি রজার্সকে যথেষ্ট খাতির করেছেন। কারণ, তাঁর এখন প্রচুর মার্কিন সাহায্য প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দিন ধরে সিংহাসনে বসে আছেন হাইলে সেলাসি। কিন্তু আজ তাঁরও সিংহাসন কেঁপে উঠেছে। দেশের অভ্যন্তরে চলছে বিক্ষোভ। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। উত্তর ইথিওপিয়ার বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সেখানকার অধিবাসীরা ইথিওপিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইরিত্রিয়া নামে এক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। তা ছাড়া, পাশের দেশ সুদান ও সোমালিয়ায় বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব মিলিয়ে হাইলে সেলাসি চিন্তিত, বিচলিত। তাই রজার্সের কাছে তিনি আরও মার্কিন অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য চেয়েছেন।

হাইলে সেলাসি সম্বর্ধনা জানালেও ইথিওপিয়ার সাধারণ মানুষ উইলিয়াম রজার্সকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এগিয়ে আসে নি।

নাইরোবিতে গিয়ে রজার্স কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়াত্তার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। এব পর তিনি জাম্বিয়া, কঙ্গো, ক্যামেরুন, নাইজিরিয়া, ঘানা ও লাইবেরিয়া যাবেন।

উইলিয়াম রজার্স আদ্দিস আবাবায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আফ্রিকা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। রজার্স-কথিত মার্কিন নীতিতে বলা হয়েছে :

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে বর্ণ-বৈষম্য এবং বর্ণবৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাসমূহের বিরোধিতা করবে:
(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকার সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দেবে:
(৩) আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'বিশেষ দায়িত্ব' (স্পেশাল অবলিগেশন) সম্পর্কে অবহিত থাকবে এবং,
(৪) আফ্রিকাকে বিশ্বের বৃহৎ শক্তি-সমূহের কলহের বাইরে রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করবে।

অনেকে রজার্সের এই ঘোষণায় আনন্দিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে এত কড়া কথা বলছে, রোডেশিয়ার বর্ণবৈষম্যবাদী সরকার এবং অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করবে। কিন্তু বরাবর দেখা গেছে, এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে সমর্থনের কথা বললেও কাজে কিছু করে না। রাষ্ট্র-সংঘের প্রস্তাব পর্যন্ত কার্যকরী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও উৎসাহ দেখায় নি।

অর্থনৈতিক সাহায্যও যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতটা দিতে পারবে, বলা শক্ত। সেনেট বিদেশে মার্কিন সাহায্যদানের ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি করছে। তবে রজার্স ভাবছেন, বেসরকারী পর্যায়ে মার্কিন শিল্পপতিরা হয়তো আফ্রিকায় আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে সম্মত হবেন।

আর একজন বিশিষ্ট নেতা বর্তমানে আফ্রিকা সফর করছেন। তিনি হলেন যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি জোশেফ ব্রজ টিটো। তিনি সস্ত্রীক ইথিওপিয়া, জাম্বিয়া, কেনিয়া ও তানজানিয়া সফর করেছেন।

টিটোর আফ্রিকা সফরের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ : প্রথম, আফ্রিকার দেশগুলিকে জোটনিরপেক্ষতার দিকে টেনে আনা। আর দ্বিতীয়, আফ্রিকার সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করা।

এপ্রিলে তানজানিয়ার রাজধানী দার-এস-সালামে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠক হবে। জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি শীর্ষ সম্মেলন ডাকা হবে কিনা, সে সম্পর্কেও দার-এস-সালামে আলোচনা করা হবে।

টিটো আফ্রিকায় ভাল সাড়া পেয়েছেন।

গ্রীস :

সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য পূর্ব য়ুরোপীয় কমিউনিস্ট দেশ স্থির করেছে, তারা গ্রীসের বর্তমান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। সম্প্রতি প্রাগে এই দেশগুলির প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে বসে এই সিদ্ধান্ত করেছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা করা হবে। গ্রীস ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দেশগুলিকে বিশেষ সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই গ্রীসের কাছে অনেক-গুলি বিদ্যুৎ শক্তির প্ল্যান্ট বিক্রি করা হয়েছে।

গ্রীসের বর্তমান সামরিক শাসকদের সঙ্গে সোভিয়েট য়ুনিয়ন তথা ওয়ারশ' গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির এই সহযোগিতায় পশ্চিমী দুনিয়ার বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষুব্ধ। গ্রীসে গণতন্ত্রের নামগন্ধ নেই। উগ্র স্বৈরাচারী সামরিক একনায়ক-

তন্ত্র চলছে সেখানে। গ্রীক শাসকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এত তীব্র যে, 'কাউন্সিল অব য়ুরোপ' থেকে গ্রীসকে বলতে গেলে 'বহিষ্কার' করা হয়েছে; বাধ্য হয়েছে গ্রীস সরে যেতে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টি। গ্রীসের বর্তমান সামরিক শাসক গোষ্ঠী উগ্র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে, বহু কমিউনিস্ট কর্মী জেলে আটক রয়েছেন, হাজার হাজার কমিউনিস্ট স্বেচ্ছা-নির্বাসনে বিদেশে রয়েছেন, আরও বহু হাজার কর্মী দেশের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে সামরিক একনায়কতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করছেন। গ্রীক কমিউনিস্টরা বাইরে থেকে চেষ্টা করছেন এই একনায়কতন্ত্রের অবসানের জন্য।

এই অবস্থায় গ্রীক সরকারের সংগে সোভিয়েটের সহযোগিতার অর্থ হল গ্রীক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং ফ্যাসিস্ত সরকারকে বাঁচিয়ে রাখা। কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা জনগণের স্বার্থের চেয়ে সামান্য অর্থনৈতিক সুবিধা সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশের কাছে বড় হল?

প্যারিস থেকে গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি বিবৃতিতে অত্যন্ত ক্ষোভের সংগে বলেছে: "প্রাগের সিদ্ধান্ত গ্রীসের নির্বাসিত উদ্বাস্তুদের সংগ্রামের প্রতি এক মস্ত আঘাত। সামরিক ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গ্রীক কমিউনিস্টদের সংগ্রাম যখন সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন সহযোগী পার্টিগুলির কাছ থেকে এই আঘাত অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ক্ষতিকর।" বিবৃতিতে প্রশ্ন করা হয়েছে: গ্রীক পার্টির কর্মীরা যখন চরম নির্যাতন সহ্য করছেন, তখন সোভিয়েট পার্টির এই অমিত্রসুলভ আচরণ কেন? তাঁদের মতে: এটা অন্যায় হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়।

**সিংহল:**

সিংহল সরকার চেষ্টা করছেন, এশিয়ার জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির একটি বৈঠকের জন্য।

সিংহলের পররাষ্ট্র দপ্তরের এশিয়া বিভাগের প্রধান বেন ফোনেসকো ৯টি এশীয় দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তাদের সংগে কথা বলার জন্য রওনা হয়েছেন। এই দেশগুলি হল: ভারত, বার্মা, আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, নেপাল, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুর।

এপ্রিলে তানজানিয়াতে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হবে। তার আগে কলোম্বোতে এশিয়ার জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক আহবান করতে চায় সিংহল।

এশিয়ার নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা হবে কলোম্বো বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। অধিকাংশ দেশই সিংহলের এই প্রস্তাবে সম্মত হবে বলে মনে হয়।

(২৩-২-৭০)

---

( ২১৮৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ )

পুনরভ্যুদয় ২২শে জুন অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীরূপে। কিন্তু ন-দিনের মাথায় জনসঙ্ঘের কৃপায় পাশওয়ানজীকে পুনরায় নেমে দাঁড়াতে হল। সুতরাং আবার রাষ্ট্রপতির শাসন ১৯৬৯-এর জুলাই মাস থেকে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস ভাঙল। এস এস পি মুখিয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য। দলের রামানন্দ তেওয়ারীকে নেতা করে সাংগঠনিক কংগ্রেসের সহায়তায় মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ শুরু হল। সুফল পরিপক্কতা লাভ করল না, দুঃখের বিষয়। বর্তমান মাসের ১৬ তারিখে তিন সদস্যের মন্ত্রিসভা সাজিয়ে নিলেন ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস নেতা শ্রীদারোগাপ্রসাদ রাই।

২১-২-৭

## সাহায্য করুন—

মরা মানুষকে হাসতে দেখেছেন কেউ? অথবা মরা মানুষকে কাঁদতে দেখেছেন কেউ? নিশ্চয়ই দেখেন নি। কিন্তু কেউ যদি মৃতের মুখে হাসি অথবা কান্না দেখতে চান, তবে চলে আসুন কলকাতার মহাকরণে—নয়ন মেলে দেখুন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মহাশয়দের। দেখবেন আপনি মৃত হলেও আপনার জীবন ফিরে আসবে, হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যাবে অথবা আপনি মৃত হলেও আপনাকে কান্নায় ভেঙে পড়তে হবে মহাকরণের মন্ত্রীদের আচরণ দেখে। আমার কথা কাউকে বিশ্বাস করতে বলি না, অথবা আমার কথা বিশ্বাস করে কোন মৃতদেহকে নিমতলা, কেওড়াতলা, কাশী মিত্তির ঘাটে না গিয়ে মহাকরণের সামনে আনতে বলবো না, কিন্তু খবর কাগজের ছাপা অক্ষরের সংবাদ বিশ্বাস নিশ্চয়ই করবেন আপনি। তা হলে এক কাজ করুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালের দৈনিক পত্রগুলির প্রথম সংবাদটি মৃতের কানের কাছে আপনি পাঠ করুন, তারপর ২০শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রগুলি পাঠ করুন, দেখুন, তাতে কি ফল পান। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ১৯শে ও ২০শে সংবাদপত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেটা পাঠ করলেই মৃতের প্রাণ ফিরে আসবে এবং মৃতের চোখে হাসি ও কান্না দেখা দেবে।

রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের অনেকের সম্পর্কে একটা কথা বলে সুরু করতে চাই, তা হল—বিশ্বে বহু মনীষী বহু মতবাদ বিশ্বজনকে উপহার দিয়েছেন আর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনেক প্রতিভাবান মন্ত্রী যা উপহার দিচ্ছেন, সেটা হলো "ভণ্ডামীবাদ"। মার্কসবাদ লেনিনবাদ, মাওবাদ, ট্রটস্কিবাদ, গান্ধীবাদ, সুভাষবাদ—কত মতবাদ রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে এইবার যুক্ত হবে ভণ্ডামীবাদ। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পরিষদীয় গণতন্ত্র, জনগণতন্ত্রের মত ভণ্ডামীতন্ত্রও একদা যখন প্রসিদ্ধিলাভ করবে, তখন আমরা গৌড়জন কত না অহংকার বোধ করবো এই ভেবে যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, আমাদের চোখের ওপর এই নতুন মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে, প্রসারলাভ করেছে। কাজেই রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনেক মন্ত্রী সম্পর্কে যদি বলি, তাঁরা দেশকে নিশ্চয়ই অনেক উপহার দিয়ে দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন এবং সেই সঙ্গে অমূল্য উপহার দিয়েছেন ভণ্ডামীতন্ত্র, তখন জানি না পাঠকরা কত না কটূক্তি বর্ষণ করবেন এই গরীবের প্রতি। কিন্তু তবুও একবার বলবো—ধৈর্য সহকারে শুধু একবার নয়ন মেলে আমাদের মন্ত্রীদের অনেককে দেখুন, তারপর মিলিয়ে নিন।

বৃহস্পতিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতের সংবাদপত্রে একটি সংবাদ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল—সেই সংবাদ হল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করবার কয়েক ঘণ্টা আগে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভোট অন এ্যাকাউন্টসের প্রস্তাব আনছেন। এই প্রস্তাব আনা নিয়ে বুধবারই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দুই-একজন মন্ত্রীর বেশ তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেছে। এর ফলশ্রুতি হল—বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভা বৈঠকে ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ আনবেন মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাব আনলে ভোটাভুটি হবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। সেই বৈঠকে কত ভোট কোন পক্ষে পড়বে তার হিসাব হল, মুখ্যমন্ত্রী অনাস্থার সম্মুখীন হবেন এমন কথা হল—সব মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পর্কে কি গুঞ্জন, কি কানাঘুষা, কত গবেষণা, কত টেলিফোন, এমন কি শেয়ার মার্কেটে পর্যন্ত ওঠা-নামা শুরু হয়ে গেল। খবর কাগজগুলি, যারা এই সংবাদ বহন করেছে, তারাও এর ফলো আপের জন্য স্ট্যাণ্ড বাই—কখন কি হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সামান্য সময়ের মধ্যে তাড়াহুড়ি যে সব আইটেম ছিল—তা পাশ হয়ে গেল, কেউ আর কোন প্রশ্ন তুলছেন না। কারণ সকলেই ভাবছেন, নির্দিষ্ট আইটেমগুলি হয়ে গেলেই তো মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ প্রস্তাব আনবেন, কাজেই যুদ্ধ হবে তখনই। এখন আজেবাজে কথায় এনার্জি লস্ করে লাভ কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকে হতাশ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ প্রস্তাব দূরে থাক, সেই সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। পরন্তু পুরো বাজেটের খসড়া কর্মসূচী রচনা হয়ে গেল। শুক্রবার সংবাদপত্রে পূর্ব দিনের হেড লাইন নিউজ মাঠে মারা গেল। তার ফলো আপ নিউজ যা বেরুলো, তার মধ্যে দুইজনের কথাই উল্লেখের দাবী রাখে। একজন পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী—যিনি বিধানসভার কার্য পরিচালনার দায়িত্বে আছেন আর অপর জন রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য—যাঁর কাজ হল সংবাদপত্রে যাতে রাজ্য সরকারের নীতি ও তথ্য সঠিকভাবে প্রচারিত হয় ও বক্তব্য প্রকাশিত হয় তা দেখা। শ্রীযতীন চক্রবর্তী মহাশয়কে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে প্রশ্ন করলো—"ভোট অন এ্যাকাউন্টস কি হল?" পরিষদীয় মন্ত্রী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ আবার কি? ওতো আপনাদের বুর্জোয়া কাগজের বানানো জিনিষ। এইভাবে কি আমাদের ঐক্য ভাঙতে পারবেন? (দৈনিক

২০শে ফেব্রুয়ারী, পঞ্চম পৃষ্ঠা, চতুর্থ কলম)।

এইবার শুনুন তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রীর কথা। বৈঠকের পর তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের পরিহাস করে বললেন—"আপনারা কত আশা করে এসেছিলেন, কিছুই হল না। আপনাদের দেখে আমার বড় করুণা হচ্ছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী, পঞ্চম পৃষ্ঠা, তৃতীয় কলম)

এইবার বলুন, পরিষদীয় মন্ত্রী আর তথ্যমন্ত্রীর কথা শুনে মরা মানুষ হাসবে কি না, মরা মানুষ কাঁদবে কি না? ভোট অন এ্যাকাউন্টসের কথা শুনে পরিষদীয় মন্ত্রী আকাশ থেকে পড়লেন। না, আকাশ থেকে তিনি পড়েন নি, আকাশ থেকে পড়েছেন রাজ্যের অগণিত সংবাদপত্র পাঠক আর পরিষদীয় মন্ত্রী বুর্জোয়া কাগজের বানানো জিনিষ বলে সংবাদপত্রকে এক হাত নিয়েছেন। সেই সংগে বলেছেন, তাঁদের ঐক্য ভাঙা যাবে না। আমি শুধু বিনীতভাবে আমার শ্রদ্ধেয় দাদাকে বলতে চাই—দাদা, বুর্জোয়া কাগজকে ঐক্য ভাঙবার জন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আপনি নিশ্চয়ই যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রক্ষার কাজ করেছেন, কিন্তু শুধু একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন যে, এই দিন মন্ত্রিসভায় যে সম্ভাব্য ঘটনার সংবাদ বেরিয়েছে, সেটা কি বুর্জোয়া সংবাদপত্রের বানানো, না ১৮ই ফেব্রুয়ারী আপনি, অন্য দু'জন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সংগে কথা বলে বেরিয়ে এসে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে এক বৈঠকের পর কোন একজন মন্ত্রীই সংবাদপত্রকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন? আর তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যের সাংবাদিকদের ওপর খুবই করুণা হয়েছে। নিশ্চয়ই করুণা হতে পারে এবং সাংবাদিকরা করুণার জীব, এই ব্যাপারে আমার কোনপ্রকার দ্বিমত নেই এবং পরিহাস তিনি যা করেছেন, সেটাও উপযুক্ত কাজ হয়েছে। কিন্তু মাননীয় তথ্যমন্ত্রী! রাজ্য সরকারের সঠিক তথ্য প্রকাশ এবং ভুল, বিভ্রান্তিকর তথ্য যাতে প্রকাশ না পায়, সেটা দেখাশুনা করা আপনার অন্যতম দায়িত্ব—সেই দায়িত্ব শুধু পরিহাস আর করুণা বর্ষণে শেষ হয় না। আপনার তো উচিত, কেন ভুল, বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশিত হয় তা খোঁজ করা, দেখা-শুনা করা—ভুল তথ্য বেরুলে তার প্রতিকারও আপনি করতে পারেন। এই তো কিছুদিন আগে একটি সংবাদপত্রে ভুল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে অভিযোগ তুলে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সেই সংবাদপত্রকে ছয় মাস রাজ্য সরকারের কোন বিজ্ঞাপন দেন নি, আপনিও সেই রকম কঠোর ব্যবস্থা করুন তিনি। সেটা করবার মত মনের বল ও বুকের সাহস আপনার নেই, কারণ আপনি জানেন, সরকার সম্পর্কে জনমনে এত বড় ভুল সন্দেহ ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হবার মূলে আপনার অবদানও কম নয়। আর মন্ত্রিসভার দায়িত্ব কখনও একক নয়, সেই দায়িত্ব হল যৌথ। কাজেই সেই যৌথ দায়িত্বের শরিক হয়ে আপনি জানেন, শুধু এই সংবাদই নয়, এমন বহু সংবাদই সৃষ্টি করেন মন্ত্রীরা স্বয়ং। কাজেই থুথু উপরে ছুড়লে নিজের মুখে পড়ে—সেইটুকু সতর্কতা আপনার থাকবে না, এমন ধারণা করা উচিত নয়।

কিন্তু এই কথা বললেই সব কথা বলা হয় না, কারণ এই ভোট অন এ্যাকাউন্টসের নাটকের সংগে আরো অনেক কাহিনী, আরো অনেক চরিত্র আছে—সেগুলিও বলা দরকার।

কারণ এই নাটকের সুরু যা শেষ ১৯শে মন্ত্রিসভার বৈঠকেই হয় নি—এর সুরুও যেমন অনেক আগে, শেষও হবে অনেক পরে। সেই ১১ই ফেব্রুয়ারীর কথা। খবর কাগজে বেরুলো, মুখ্যমন্ত্রী ভোট অন এ্যাকাউন্টসের প্রস্তাব আনতে পারেন। ব্যস, ১২ই তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকে সি-পি-এম দলের তিনজন মন্ত্রী হো-চি-মিন নগরের প্রেনাম ছেড়ে চলে এলেন। কিন্তু সেই দিনও সকালে হতাশ হলেন, মুখ্যমন্ত্রী কোন ভোট অন এ্যাকাউন্টসের কথা তুললেন না। এই দিনও সকলে প্রস্তুত। অন্যতম মন্ত্রী জনাব গোলাম ইয়াজদানী মালদায় ছিলেন, তাঁকে পুলিশের মাধ্যমে অয়্যারলেস করে খবর পাঠানো হল—দ্রুত চলে আসুন। তিনি সোজা মোটরে চলে এলেন মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দিতে, কিন্তু এই দিনও হতাশ হলেন সকলে। ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ প্রস্তাব এল না।

কিন্তু কেন এমন করে এমন একটা ঘটনা রটলো? এর মূলে কোথায়? এর ভিত্তি কি কিছুই নেই? আমি বলবো—ভিত্তি কিছু নেই এমন নয়। সত্যি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় দিল্লী থেকে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যোগ দিয়ে ফিরবার সময় মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীকে বলেছিলেন—অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে, তাতে ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ আনতে হতে পারে। শ্রীলাহিড়ী সেই কথা তাঁর অপর এক সহকর্মী মন্ত্রীকে বলেছিলেন। শ্রীলাহিড়ী যেদিন তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীকে বলেন, তার পর দিনই সংবাদপত্রে বের হয় মুখ্যমন্ত্রী ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ আনতে পারেন। সেই সংবাদ দেখে শ্রীলাহিড়ী ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত সংবাদের সংবাদপত্রের সাংবাদিককে ডেকে বললেন—আপনারা বড় রং ব্রীফড হন, যে মন্ত্রী আপনাদের বলেছেন তিনি সবটা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু এর পরও এই ঘটনা চলতে লাগলো। ১৯শে মন্ত্রিসভার বৈঠক—২০শে বাজেট পেশ হবে, অথচ কেউ ভাবলেন না, একদিন আগে এইভাবে ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ তৈরী হতে পারে না। এমন কি এই মন্ত্রীরা যদি একবার অর্থ দপ্তরে খোঁজ নিতেন ও বি জি প্রেসে খোঁজ নিতেন, তা হলেও জানতে পারতেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের না জানিয়েই ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ তৈরী করেছেন কি না। সংবাদ নিলে দেখা যেত অর্থ দপ্তর যেমন এই রকম কোন বিবৃতি তৈরী করেন নি আর বি জি প্রেসেও কিছু ছাপা হচ্ছে না, তবু তাঁরা ধরে নিলেন, ১৯শে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ আসছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের আলোচ্য সূচীতে এই রকম কিছু নেই, তবু মুখ্যমন্ত্রী আলোচ্য সূচীর পরোয়া না করে এজেন্ডা বহির্ভূতভাবেই এই প্রস্তাব আনবেন। অতএব রুখতে হবে ভোট অন এ্যাকাউন্টস্। ভাবখানা এই যে, ২৮শে মার্চ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন পর্যন্ত চালু রাখা হলেই সরকার বেঁচে থাকবে, নইলে পাঁচ-ছয় দিন আলোচনা করে যদি ভোট অন এ্যাকাউন্টস্ পাশ হয়, তবে বসিরহাট ও মেদিনীপুরে উপ-নির্বাচনের পর সরকার ভেংগে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সরকার ভাঙবার হাত ভেংগে দিতে বাজেট অধিবেশনকে দীর্ঘায়িত করতেই হবে। এই টাগ অফ ওয়ার-এর পরিণতি হল ১৯শে মন্ত্রিসভার বৈঠকের সম্পর্কে সংবাদের ভিত্তি। কিন্তু শেষ কি এইখানে? আরো আছে। সংবাদ হল এই যে, যেদিন শ্রীসুশীল ধাড়া মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করছেন, ঠিক সেই দিনই আবার মন্ত্রিসভার আরো প্রায় এক মাসের কর্মসূচী নিজেই মেনে নিচ্ছেন। এই ভোট অন এ্যাকাউন্টস্-এর আরো নেপথ্য চিত্র এবং শ্রীসুশীল ধাড়ার পদত্যাগের পরও মন্ত্রী হিসাবে কর্মসূচী গ্রহণের আরো নেপথ্য চিত্র আগামী সংখ্যায় উপহার দেব পাঠকদের; তার পর বিচার করবেন যে, রাজ্য রাজনীতির ভণ্ডামীতন্ত্র দেখে মরা মানুষ হাসবে কি না, কাঁদবে কি না? (চলবে)

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তীর বইখানি আনন্দর খুবই পছন্দ হয়েছিল বলে মনে হোলো। সেই প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে উনিশ শতকের গদ্য-পদ্য-নাটক বা অন্য কোনো ধারার কথাতেই সে যেন সরে যেতে নারাজ।

আমি বললুম—আচ্ছা, যথার্থ বিদ্রূপের ব্যবহারে বাংলার সাহিত্যিক মন —তোমার কি কতকটা উদাসীন বলে মনে হয়?

এ-প্রশ্নের মূলে সত্যিকার কোনো চিন্তা ছিল না। আমি শুধু তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম সেই আমাদের উনিশ শতকের মধ্যপর্বের পরবর্তী কোনো আলোচনায়—দীনবন্ধু বা অমৃতলালের কথায়,—ইন্দ্রনাথ বা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গেও আমার আপত্তি ছিল না।

কিন্তু আনন্দ ভাবছিল অন্য কথা। পকেট থেকে ছোটো একখানা খাতা খুলে সে বলতে লাগলো—শোনো, 'সমাজ-সংস্কারক রঘুনন্দন' বইখানির 'অবতরণিকা'য় নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মশাই কী লিখেছেন—

> 'যাঁহারা মীমাংসাশাস্ত্র সম্যক অবগত নহেন তাঁহারা যত বড়ই সংস্কৃতজ্ঞ হউন না কেন রঘুনন্দনের গ্রন্থ তাঁহাদিগের নিকট দুরধিগম্য। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ অভিমানী পণ্ডিত মনে করেন যে রঘুনন্দনের স্মৃতি নূতন কিছুই দান করে নাই। কেবল নবমীতে লাউ খাইবে না, চতুর্দশীতে বেগুন খাইবে না, এটা করিবে না, সেটা করিবে না—এইরূপ নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া তিনি অতি কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।'

আমি বললুম—সে ঠিক কথা। স্মৃতি-শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি আমাদের লোক-ধারণা বলতে এই ধারণাই বুঝিয়ে থাকে।

সে বললে—

> 'ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তাঁহারাই ঐ শাস্ত্র না পড়িয়া বা না বুঝিয়া উন্নাসিকতা অবলম্বনপূর্বক "রঘুনন্দন সমাজকে নানা নিষেধের দ্বারা অতি কঠোর বন্ধনে বাঁধিয়া দেশের সর্বনাশ করিয়াছেন" এইরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্মৃতিনিবন্ধের ধারা এবং সমাজ-সংস্কারে স্মৃতিনিবন্ধের দান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।'

হাতের খাতা পকেটে রেখে, আনন্দ বললে—দ্যাখো, এসব আলোচনার জন্যে বিস্তর মেহনত দরকার। রীতিমত গুরুর কাছে পাঠ নিতে হয়,—নিজেদেরও মাথা ঘামাতে হয়। এসব কাজ সস্তা নয়,—কিছু মনে কোরো না বাংলা বইয়ের রাজ্যে প্রধানত ঢিলেঢালা বাবুয়ানার চালটাই চলে গেছে,—অর্থাৎ হয় প্রেমের, না-হয় বিষাদের পদ্য লেখার মতোই সহজ ব্যাপারে আমাদের অভিরুচি! আমরা তো বই-বাছাইয়ের কাজে নেমে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ-বছরের অনেক রকম বাংলা বই দেখলুম। কিন্তু বাংলার ঐতিহ্যে-[illegible] [illegible] [illegible] যে-[illegible] যায় —ঐ শতকের শেষার্ধে,—দেশবাসীকে নানা-ভাবে আগ্রহী করে তুলতে চাইলেন, তার ফল কি সত্যিই বেশ ব্যাপক হতে পেরেছে? স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা বাংলায় কতোটুকু হয়েছে?

বললে—তুমি কি বৃহদ্ধর্মপুরাণ পড়েছ? ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ দেখেছ? রঘুনন্দনের আগের আমলের কারও কথা জানো?

পকেট থেকে সেই খাতাটি আবার বার করে সে বললে—

> 'নিবন্ধযুগে দেখা যায় পাল ও বর্মযুগে জিতেন্দ্রিয়, যোগ্লোক, বালক, ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহন অন্যতম। সেন সাম্রাজ্যে নিবন্ধকার-গণের মধ্যে অনিরুদ্ধ ভট্ট, বল্লাল সেন ও হলায়ুধ প্রসিদ্ধ। তারপর মুসল-মান যুগে শূলপাণি, বৃহস্পতিরায়-মুকুট, শ্রীনাথাচার্য চূড়ামণি, গোবিন্দা-নন্দ ও রঘুনন্দন সুবিখ্যাত।'

আনন্দ বললে—সমাজ ঠিক যেন রুচির নদী,—সে তো সব সময়েই ভাঙছে। তুমি যে বিদ্রূপের সাহিত্যের কথা বলছিলে, সেও তো এই ভাঙনেরই ইশারা! ব্যঙ্গ-রসিক ঠাট্টাবিদ্রূপ করে ব্যক্তিজীবনে বা সমাজ-জীবনে ধর্তব্য আদর্শের দিকটাই মনে করিয়ে দেন। স্মার্ত পণ্ডিতরা সেই কাজই আর একভাবে করে গেছেন। সন্দেহ, জড়তা ইত্যাদির বিরুদ্ধেই তাঁদের যুদ্ধ। কখনো বৃহস্পতি, কখনো শ্রীনাথ, কখনো রঘুনন্দন,—কখনো আবার রামমোহন বা প্যারীচাঁদকে সে কাজ করতে হয়েছে।

আমি বললুম—আনন্দ, স্মৃতি আর সাহিত্য দুটো যে এতো কাছাকাছি বিদ্যমান, সে আমি কখনোই ভেবে দেখি নি!

—তার কারণ, আমাদের ভাবনার গতিই অন্যরকম। আমরা আলাদা-আলাদা করে দেখি,—বিচ্ছিন্ন ভাবনা মাত্র। আমরা স্মৃতি-র কথা ভাবতে গেলেই কতকগুলো শুকনো সূত্র দেখতে চাই। অথবা স্মৃতি-কারদের কালগত ক্রম মনে পড়ে। তর্ক করি কে আগে, কে পরে? আগে গোবিন্দানন্দ,—না কি আগে রঘুনন্দন!

সেদিন আমরা যখন এই আলোচনায় নিযুক্ত ছিলুম তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে আনন্দের উৎসাহে তাই আমি ঠিক যোগ দিতে পারছিলুম না। লোকব্যবহারের ফিরিস্তি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে অগত্যা আমাকে বলতে হোলো—আনন্দ, এবার অন্য কথা হোক,—আকাশে যখন ঘন মেঘ দেখা দেয়, তখন মনের মধ্যেও কী রকম যেন মেঘলা করে আসে।

আমার সেই কথা শুনে সে বললে—[illegible]

মধ্যে আছে দেখছি। একে আমি বলতে চাই ভাবপঙ্ক,—এতে স্রোত মজে যায়। এ একরকম ভ্যাপসা রোমাণ্টিক মেজাজ। দ্যাখো—মেঘলা-দিনে মেঘদূত-আবৃত্তির স্বভাবটা অতঃপর বদলানো দরকার।

—তার মানে ?

—মানে, প্রকৃতি আমাদের সযত্নে ঘিরে রেখেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মায়ামোহের আটোপ ভেদ করবার মতো অন্যান্য ইন্দ্রিয় সেই আমরা অধিকার করছি। আমরা শুধু মুগ্ধ নই,—আমরা জিজ্ঞাসু, আমরা এক কালের সঙ্গে অন্য কালের তুলনাও ভালবাসি। আমরা রোমাণ্টিক এবং রিয়ালিস্ট, দুই-ই। যদি সাহিত্যের কথাই তুলতে চাও, তা হলে বরং তুমি যে ঐ ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলেছিলে, সেই দিকটাই ভাবা যেতে পারে।

আমি মনের গভীরে কতকটা আশ্বস্ত বোধ করলুম। রঘুনন্দনের প্রসঙ্গ থেকে তাকে যে অতঃপর আমাদের গৃহীত কালক্রম এবং কাঠামোর মধ্যে ফেরানো সম্ভব হবে, তারই ক্ষীণ আশা দেখা গেল।

বললে—মায়া, মোহ, ভক্তি—এ সবই গ্রাহ্য, কিন্তু ভক্তিরসের মধ্যেও তো আত্মদর্শনের সুযোগ আছে। স্মৃতির অনুশাসন আমার কাছে সেই সুযোগের ধারণাই জাগিয়ে তোলে।

আমি তাকে বললুম—কিন্তু আজ এই মেঘলা বেলায় কোন্ বৃহস্পতি বা শ্রীনাথ আমাদের সেই আনন্দ দিতে পারেন, যা কেবল কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ বা ঐরকম কোনো কবির পক্ষে সম্ভব?

সে বললে—আজ তোমাকে যা বলতে ইচ্ছে করছে, সে কোনোরকম সমর্পণের পদাবলী নয়,—আজ বরং বিদ্রূপদক্ষ একজন বাঙালী কবির কটাক্ষ শোনো—

কেন মন বেড়াতে যাবি ?
কারো কথায় কোথাও যাস নে রে তুই
মাঠের মাঝে মারা যাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন,
নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে করতে পারিস
মাঝগাঙেতে ভরা ডুবি।

ছত্রগুলির আবৃত্তি থামিয়ে সে বললে—মায়ার আবেশ ব্যাপারটা জীবনে মিথ্যে নয়, কিন্তু স্থূলে বাস্তব সংসারে মানুষের আচার-আচরণের ধারা দুচোখ মেলে দিয়ে দেখার আগ্রহটাই বা কম কিসে?

আমি বললুম—উনিশ শতকে বিহারীলালের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত সেই আগ্রহই তো প্রধান ছিল—তাই না?

—ছিল বটে, কিন্তু গদ্য-লেখকদের মধ্যে যতোটা রচনার জোর ছিল, কবিদের মধ্যে সেরকম ছিল না। কবিতার ক্ষেত্রে তাই নজর ছিল বড়ো বড়ো বিষয়ের ওপর কিংবা কাহিনীর দিকে। গদ্যে যেমন 'কমলাকান্ত' ছিলেন, পদ্যে তেমন কোনো দোসর ছিলেন কি,—কিংবা নাটকে?

আমি বললুম—প্রহসনগুলি?

সে বললে—নিশ্চয়। কিন্তু আজ ঠিক এই মুহূর্তে আমরা যদি কোনো উত্তেজিকা কাব্যবাণীর তৃষ্ণা বোধ করি, তা হলে সে কি হেমবাবুর 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' বা ঐ ধরনের অন্য কোনো কবির অনুরূপ কোনো উক্তি দিয়ে মেটাতে হবে?

আমি বললুম—না, না হেমচন্দ্রের কবিতায় তা নেই,—ডি এল রায় কতকটা মেটাতে পারেন,—কিন্তু ১৯৪০ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙে বসে সেই যে কথাগুলি লিখেছিলেন,—সে-রচনার চাল এবং চিক্কণতা দুই-ই অন্যরকম। হয়তো সে-সব শুনলে আজকের এই মেঘলা ভাবের আলসেমি আর জড়তা দূর হবে—অথচ সত্যেন দত্ত বা নজরুলের মতন বক্তৃতা এবং হুংকারের ভাবও তাতে নেই।

আনন্দ কোনো নির্দেশ দেবার আগেই আমি সেই ছত্রগুলি শুনিয়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলুম—

অন্যদেশে অসম্ভব যা
পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি
প্রায়শ্চিত্ত কর্ সে।
এর পরে দুই দলে মিলে
ইঁটপাটকেল ছোড়া—
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল,
কেউ বা হল খোঁড়া।
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে
বীরপুরুষের বড়াই
সমুন্দুরের এপারেতে
একেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে
চলছে নাচানাচি—
বাংলাদেশে তেঁতুল-বনে
চৌকিদারের হাঁচি।

সে বললে—সাবাস!

আমি নিশ্চিন্ত হলুম এই ভেবে যে, আনন্দকে অতঃপর উনিশ শতকের বাংলা বইয়ের রাজ্যে ফেরানো যাবে। কিন্তু ঠিক পর মুহূর্তেই সে আর একটি প্রশ্ন করে বসলো।

বললে—এই তো একালের বিস্তীর্ণ পটভূমি! এরই মধ্যে বাংলাদেশের তেঁতুলবন! বেশ। আচ্ছা। কিন্তু ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে গুপ্ত-কবির মৃত্যুর পরে আমাদের এই আঞ্চলিক মনের মধ্যে বিশ্বের হাওয়া বয়ে গেল প্রথম কোন্ কবির মধ্যে? সে কি মধুসূদন? মধুসূদনের কথাই ভাবা যাক তা হলে।

[ ক্রমশ ]

॥ ছয় ॥

সেদিন ফিরে এলে মা ও মায়ার সঙ্গে অনেক রাত অবধি কথাবার্তা হল। সে কথা-বার্তা, বলা বাহুল্য রাণীদির সম্পর্কেই। আমি আসার আগেই মায়ার মুখে মা সব শুনেছিলেন। সুতরাং বিস্ময়টা তাঁর মনে সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে বিস্ময়ের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে আমাকে অনেক কথাই বলতে হল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—এ'রা পরস্পরের এত কাছা-কাছি থাকেন, তবু সবাই সবায়ের কথা জানেন না। রাণীদির যে অত বড় একটা বে-আইনী আফিমের কারবার আছে, একথা মা বা মায়া, কারোরই জানা নেই। এটা একমাত্র আমারই আবিষ্কার।

অবশ্য আমার এ আবিষ্কারের কথা আমি মা বা মায়া কারোকেই কিছু বললাম না। কারণ, বলা আমার উচিত নয়। যে কথা এদের জানা নেই, সে কথা জানাবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া রাণীদি সম্পর্কে অনেক কথাই তো আমি জানি, যে কথাগুলি অন্যের কাছে একেবারে অজানা কাহিনী। ছেলেবেলা থেকে কখনও আমি সে সব কথা কারোকে বলি নি। কে জানে হয়তো ঠিক এই কারণেই আমি যখন তাঁর এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ-ভাবে জেনে ফেললাম, তিনি সেকথা কোথাও আমাকে বলতে নিষেধ পর্যন্ত করলেন না। এমন কি এ কথাটুকুও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না যে, 'বিজন ভাই, একথা তুই কারোকে বলিস নি যেন।' এ রাণীদির গভীর বিশ্বাস আমার প্রতি। তিনি জানেন আমার প্রকৃতি কোন্ ধরনের।

রাণীদির এই বিশ্বাসের মর্যাদা বরাবর আমি রেখে গিয়েছিলাম।

সেদিন সেই রাতে কিছুতেই আমার ঘুম আসেনিকো। কেবলই মনে পড়ছে রাণীদির কথা। ছেলেবেলার সেই দিন-গুলো আমার কাছে কোনদিন বিস্মৃতির ধুলোয় চাপা পড়ে যাবে না। তাঁকে বোধ করি আমি জ্ঞান হওয়ার আগে থাকতেই চিনেছিলাম। আমার অনুভূতির মধ্যে এখনও যেন ধরা রয়েছে একটি নরম বুক, সে বুকে আমি মাথা গুঁজে রয়েছি। কেমন এক উষ্ণ সৌরভে আচ্ছন্ন আমার মন, মহাকাল সেখানে কাজ করে যাচ্ছে গোপনে, অথচ কি সশব্দে। রাণীদির বুকে সে কি একটানা কলরোল, যেন উচ্ছলা নদী উধাও হয়ে ছুটেছে কোন্ অজানা সাগরের অনন্ত বিস্তৃতির দিকে। মাঝে মাঝে তাঁর বুক থেকে মুখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকাতাম। তারপর নিজের বুকের ওপর হাত দিয়ে উপলব্ধি করতাম, আমারও বুকে তো অনুরূপ প্রবাহধারা। তবে কি এরই নাম জীবন?

মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাণীদি বলে উঠতেন, 'কি দেখছিস্ রে দুষ্টু?'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকতাম। তিনিও অবাক হয়ে তাকাতেন আমার দিকে। তাঁর পলকহীন দৃষ্টি আমাকে আরও জিজ্ঞাসু করে তুলত। চোখের পাতাগুলো যেন তাঁর গোনা যেত, এত স্পষ্ট। ভ্রূ দুটো যেন দূর আকাশে উড়ন্ত কোন চিলের ডানা। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন দেখতাম আমার মায়েরই ছবিখানা তাঁর মুখে বসানো। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, তিনি আমার মুখে কি দেখবার জন্য, কি খোঁজ-বার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

তখন সেই শৈশবে বুঝিনিকো রাণী-দির চাওয়ার কথা। একটু বড় হয়েও কতবার মনকে জিজ্ঞাসা করেছি, রাণীদি আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে নিয়ে কি পেতে চেয়েছেন? কিন্তু হদিস্ আমি তার ঠিক করতে পারি নি। তবে কৈশোরে পা দিয়ে আমি যা উপলব্ধি করে-ছিলাম, সেই উপলব্ধিই আমার আজও মনে

গেছে। রাণীদি আমার শৈশবের মুখ-খানার মধ্যে খুঁজে বেড়াতেন আমারই মত একটি সন্তানকে—যে সন্তান হবে তাঁর আপন নাড়ী-ছেঁড়া ধন। অনেকবার রাণীদির কথার মধ্যে এ বেদনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

এই প্রসংগে মনে পড়ে রাণীদির সেই চিঠি লেখার কথা। তাঁর হাতের লেখা ছিল খুব খারাপ। জামাইবাবু নাকি তাঁর হাতের লেখা বুঝতে পারতেন না। তাই তিনি চিঠি লেখাতেন আমাকে দিয়ে। সে চিঠির মাঝে কতকগুলি কথা আজও আমার বেশ মনে আছে। তিনি বলছেন আর আমি লিখছি ঃ 'ফাল্গুনের বাতাসে যখন আমাদের ফুলগাছগুলোয় কুঁড়ি ধরেছে অজস্র, বাতাসে যখন মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ, তখন আমার মনে কত কথা ওঠে তা কি তুমি বুঝতে পারো না নিষ্ঠুর? বাবা তোমার মুখ দেখবেন না। তুমি যে কাজ করেছো তার কোন ক্ষমা নেই। কিন্তু তুমি আমাকে ফেলে গেলে কেন? কেন তুমি আমাকে নিয়ে গেলে না? আমি কি তোমার পথে বাধা হতুম? আমি একাকিনী তোমার কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে এইখানে শুধু কি বুকের আগুন বুকে চেপে রেখে জ্বলে-পুড়ে মরব? আর যদি আমার একটা সন্তানও থাকত, তা হলেও না হয় জ্বালাটা ভুলতে পারতুম, কিন্তু এ তুমি কি করলে?'...

শুধু কি সন্তানের বেদনাই রাণী-দির? জীবনটাই যেন তাঁর প্রত্যক্ষ এক বেদনার প্রতীক। অনেক দুঃখ রাণীদির। অনেক জ্বালা তাঁর। তাঁর বিয়ের ঠিক পরেই যে ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে গেল, অন্য মেয়ে হলে সে যে কি করত তা আমি জানি না, কিন্তু রাণীদিকে দেখেছিলাম তিনি যেন সব কিছুতেই অচলা অটলা। নীরব নিস্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর পর্বতের মত আপনার পরিবেশে আপনিই তিনি একান্ত। শুধু সেখানে একটি নির্ঝরিণী ধারা—সে ধারা বোধ করি মানুষের শাশ্বত-ধারা। সে ধারায় আমি ছিলাম নিত্যস্নাত সহচর তাঁর।

...সেই অসলারের আলো। সেই ডারহামের বাজনা। দূর থেকে অভ্যর্থনা করে আনা হচ্ছে বর আর বরযাত্রীদের। গোলাপজলের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেওয়া হয়েছে ময়ূরপঙ্খী গাড়ি থেকে। পথের দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ। অভিভূত হয়ে দেখছে সবাই। রাণীদির বাবা বড় সরকারী চাকুরে। সায়েবসুবো, আমলা-অফিসার, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট সব কত এসেছেন। রাণীদি সেদিন যেন সত্যিই রাণী। আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কতবার রাণীদিকে দেখে যাচ্ছিলাম। কাছে যেতে সাহস হচ্ছিল না। যদি কেউ কিছু বলে। রাণীদি-

মাঝে মাঝে আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। কয়েকবার সস্নেহে অল্প অল্প হেসেছিলেনও, কিন্তু কিছু বলছিলেন না। সমস্ত পরিবেশটাই সেদিন যেন অন্য-রকমের।

তারপর বর এল। হ্যাঁ, রাজপুত্তুরের মতই বর। সকলেই তারিফ করলেন। রাতে একবার শুধু দেখলাম রাণীদির সিঁথির সামনেটা আবিরের মত টকটক্ করছে একগাদা সিঁদুরে। মাথায় তাঁর সোনার মুকুট। ঝলমলে স্বর্ণখচিত শাড়ীর দীপ্তি পর্যন্ত বুঝি রাণীদির রূপকে সেদিন পাল্লা দিতে পারে নি। মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মত বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে বাঁধা, ধীরে ধীরে চলেছেন রাণীদি বাসরঘরে। তারপর আমি আর জানি না। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বিয়ে বাড়িরই এক কোণে। সকালে ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, আমি শুয়ে রয়েছি আমাদেরই বাড়িতে বাবার বিছানায়। নিশ্চয়ই কখন মা ঘুমন্ত আমাকে তুলে এনে শুইয়ে দিয়েছিল এখানে। তা না হলে এখানে আমি এলাম কি করে? চোখের সামনে আমার ভেসে উঠল গত রজনীর সেই মায়াপুরীর মত আলো-ঝলমল করা দৃশ্য। সম্রাজ্ঞীর মত বাসর ঘরে যাচ্ছেন রাণীদি। হঠাৎ মনটা কেন কি জানি আমার হু হু করে উঠল। তবে কি রাণীদি আজ চলে যাবেন—চলে যাবেন সম্রাজ্ঞীর মত অন্য কোন রাজ্যে?

বিছানা থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ছুটলাম আমি রাণীদিদের বাড়িতে। ফটক পার হতেই গাড়িবারান্দা। সেখানে যেতেই দেখা হয়ে গেল রাণীদির বোন বাণীদির সঙ্গে। বাণীদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বর-কনে চলে গেছে বাণীদি?'

'এখুনি যাবে কিরে? কুসুমডিঙা হচ্ছে যে—'

আমি একরকম প্রায় ছুটেই চললাম। দেখলাম গিয়ে ভিতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে বর-কনে। কতরকমের কি সব আচার-অনুষ্ঠান হচ্ছে। রাণীদিকে অদ্ভুত দেখিয়েছে যেন। সকালবেলার সদ্য ফোটা গোলাপের মত রাণীদির মুখখানা যেন বার বার করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কতদিন কত সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি রাণীদির এ মুখ আমি দেখেছি, কিন্তু এমনটি যেন আর কখনো দেখি নি। স্বর্ণমুকুটে বিচ্ছুরিত প্রভাতসূর্যের আলোর নিচে কোন শিল্পীর তুলিকার স্পর্শে অঙ্কিত এ মুখ। এ যেন আজই প্রথম সৃষ্টি হল। সেই টানা টানা ভ্রূ—দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া চিলের ডানার মত, সেই নিষ্পলক চোখের পাতায় কালো চুলের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, রূপপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ অপরিমেয় স্বাস্থ্যের অধিকারিণী রাণীদি যেন আজ আমার বিজয়িনীর বেশে কোন অজানা রাজ্যের অভিযাত্রী। ফুলের পাপড়ির মত নরম দুটি ঠোঁট তাঁর কেঁপে কেঁপে উঠছিল সংকল্পের দৃঢ়তায়।

আমি চুপ করে গিয়ে দাঁড়ালাম সামনে। একবার মুখ তুলে দেখলেন তিনি। তারপর কুসুমডিঙার কাজ শেষ হলে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেলে বললেন, 'কাল থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস দুষ্টু!'

রাণীদির বর এবার তাকালেন আমার দিকে। দিব্যি সুন্দর দীর্ঘ ঋজু দেহ তাঁর। রাণীদির বর হিসাবে ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে। তিনি, বোধ করি আমি রাণীদির খুব প্রিয় একথা উপলব্ধি করে, স্নেহভরে আমার কাঁধে হাত দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাও করে বসলেন, 'কি নাম তোমার?'

উত্তর দিলাম।

তিনি শুনে বললেন, 'বাঃ, বেশ নামটি তো তোমার!'

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম ও শেষ কথা। আর কখনো তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয় নি।

এই বিয়েরই কয়েকদিন পরের কথা। কি যে ঘটল রাণীদির জীবনে। গোটা

বাড়িটা তাদের যেন নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গেল। নেমে এল কেমন যেন একটা কালো ছায়া। শুনেছিলাম রাণীদির বর এসেছিলেন প্রথম শ্বশুরবাড়িতে। যাবার সময় নিয়ে গিয়েছিলেন রাণীদির ছোট বোন বাণীদিকে। তারপর আর না বাণীদি, না জামাইবাবু—কেউই আর ফিরে আসেন নি। জ্যাঠাবাবু অর্থাৎ রাণীদির বাবা অত্যন্ত রাশভারী কড়া-প্রকৃতির মানুষ। শুনেছিলাম তিনি গিয়েছিলেন জামাইবাবুদের বাড়ি। জামাইবাবুর মা-বাবা জ্যাঠাবাবুর মতই দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়াজনিত সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিছু করতে পারেন নি। জ্যাঠাবাবু পুলিশকেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার পুলিশ সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের পুলিশ, ইংরেজদের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে নি। সহানুভূতি বা দরদ দেশবাসীর প্রতি তাদের ছিল না। আর পাঁচটা অভিযোগের মত এ ব্যাপারটাকেও লালফিতার মধ্যে তারা শুধু আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে শুনতাম জ্যাঠাবাবু অস্ফুট স্বরে বলে উঠতেন, 'অমন জামাইয়ের আমি মুখদর্শন করতে চাই না।'

জ্যেঠিমা দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ছিলেন আচ্ছন্ন। তিনি বলতেন, 'শুধু জামাইয়েরই নয়—সে মেয়ের মুখও আমি দেখতে চাই না। কুলে কালি দিয়ে চলে যায় যে মেয়ে, সে-ও কি কম অপরাধী?'

জ্যাঠাবাবু বলতেন, 'মেয়ের আমার কি দোষ—তাকে আদর করে নিয়ে গেছে বলেই তো সে গেছে!'

'কিন্তু তার তো বোঝা উচিত ছিল', জ্যাঠাইমা যুক্তি দিতে চেয়েছেন।

জ্যাঠাবাবু বলেছেন, 'সে অসহায়

একটা মেয়ে। তাকে যদি কোথাও আটকে রাখে আর বুঝবে কি করে?'

বেশ কয়েক মাস পরের কথা। হঠাৎ রাণীদির চিঠি লেখার পালা সুরু হল। সম্ভবত রাণীদি ঠিকানা একটা পেয়েছিলেন জামাইবাবুর কাছ থেকে। তা যদি না হবে তো রাণীদি চিঠি লিখবেন কোথায়! কিন্তু তিনি সে কথা কারোকে ভাঙেন নি। এমন কি আমার কাছেও নয়। আমাকে দিয়ে তিনি শুধু চিঠিই লেখাতেন। একখানা চিঠির কথা এই প্রসংগে আমি কখনই ভুলব না। —সে চিঠিতে রাণীদির যেমনি ছিল অসীম ধৈর্য আর আশাবাদী মনের পরিচয়, তেমনিই আকাশের মত উদার মনের অভিব্যক্তি। তিনি আমায় বললেন, বেশ ভাল করে লেখ তো বিজন!

আমি লিখতে লাগলাম, 'দ্যাখো, এখনও সময় আছে। বাণী আমার ছোট বোন। তাকে তুমি বিয়ে করে নাও। তারপর এসো দুজনে, বাবা-মার পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। আমি সব রাস্তা বেঁধে রাখব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, ছোট বোনকে আমি স্নেহ করি, ভালবাসি, কোনদিন তার সংগে আমার বিরোধ হবে না। কিন্তু আমি স্বামী বর্তমানে স্বামীহীনা হয়ে থাকতে পারব না। আশা করি, তুমি আমার মনের কথা বুঝবে।'

এ চিঠির কোন উত্তর তিনি পেয়েছিলেন কিনা তা আমি জানি না। এরকম চিঠি আরও চার-পাঁচ বছর ধরে লেখালেখি চলে। হঠাৎ একদিন শুনলাম রাণীদি গৃহত্যাগ করে চলে গেছেন। যাবার আগে শুধু লিখে রেখে গেছেন, 'তোমরা ভেব না। আমার পথ আমাকে দেখে নিতে দাও।'

সে আজ বারো বছর আগেকার কথা।

দীর্ঘ বারোটা বছর কেটে গেছে। রাণীদির সম্বন্ধে আর কিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে আজও আমি বিশ্বাস করি তিনি তাঁর মনের সম্পদ হারান নি। এমন কি তাঁকে যদি কেউ কুলটা ভাবে, তাও আমি সমর্থন করি না। হয়তো তাঁর জীবনে এমন কোন রহস্য আছে—যা ভবিষ্যতে কোনদিন উদ্ঘাটিত হবে। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁকে আফিমের কারবার করতে দেখে। তা ছাড়া সবচেয়ে যেটা [illegible] লেগেছিল মন্টুর মত একটা ছেলেকে রাণীদি এই কাজে লাগিয়েছেন দেখে।

এই সব ভাবতে ভাবতে রাত কত হয়েছিল তা খেয়াল করতে পারি নি। বিনিদ্র রজনীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা। আর এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় একলাকেই। অন্যকে এ যন্ত্রণা উপশম করার পথে কোনরকমেই কাজে লাগানো যায় না। তা না হলে কয়েক হাত পাশেই নিদ্রিতা মা ও মায়া—ওঁদের ডেকেও কিছু গল্প করতে পারতাম। কিন্তু মন যেন সেদিকেও কোন সাড়া খুঁজে পাচ্ছিল না।

দূরে কোথায় যেন গান-বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। চিৎকারও দু-একটা উঠছিল এই বস্তির কোন কোন জায়গা থেকে। তা ছাড়া নামগোত্রহীন বস্তির কুকুরগুলোর যেন বিরাম ছিল না ঘেউ ঘেউ করার। রাত্রির দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকারের বুকে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল সুস্পষ্টভাবে।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দিলে কে। আমি চমকে উঠলাম। ভয়ও বোধ করি পেয়েছিলাম। চিন্তা ভারাক্রান্ত মানুষের দেহে ও মনে কখনও কখনও এমন শূন্যতা সৃষ্টি হয়, যখন সামান্যতম শব্দেও সে চমকে ওঠে এবং তা ভয়েরই নামান্তর। তবে সে ক্ষণিকের। ক্ষণিক ভয় যখনই সচেতনতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যায়, তখন আর তাকে ভয় বলে মনে হয় না। আমারও তাই হল। তা ছাড়া এই অল্প সময়ে এই রাজ্যে এসে পড়ে অনেক কিছুই তো আমার জানা হয়ে গেছে। কাজেই ভয়টা আর আমার কিসের? আমার এই চিন্তা-স্রোতের মধ্যেই আবার দরজায় ধাক্কা শোনা গেল। আমি বলে উঠলাম, 'কে?'

বিকৃত এবং জড়িত কণ্ঠস্বরে আগন্তুক জবাব দিলে, 'দ-র-জা-টা খো-লো!'

এত রাতে মাকে বা মায়াকে না ডেকে দরজা খোলাটা কি ঠিক হবে? বরং ওঁদের ডাকাই ভালো। তাই ডাকলাম, 'মা—ও মা?'

'কি বাবা', মা সাড়া দিলেন।

বললাম, 'কে যেন ডাকছে।'

'কে ডাকছে', মায়া ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল।

মা বললেন, 'দ্যাখ তো মায়া—'

মায়া এবার বলে উঠল, 'কে?'

বাইরে থেকে তেমনি কণ্ঠস্বরে উত্তর এল, 'আ-মি-রে। দ-র-জা-টা খোল!'

'মাধুদি?'

'হ্যাঁ।'

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বললে, 'দ্যাখো আবার কি বলে।'

মা বললেন, 'বলবে আবার কি। বোধ হয় মদ গিলেছে—এবার এসে জ্বালাবে!'

'মদ তো মাধুদি আর খায় না।'

'তবে কি করতে এসেছে এত রাতে!'

মায়া বললে যাক, উঠেছি যখন দেখি একবার।'

মায়া আগে কেরোসিনের লম্পটা

## সহজলভ্য ক্ষমা

[illegible]নির্ঝর হাইত

ওদের কাছে ভিক্ষে চাওয়া সহজ ছিল।
চাইলাম ফুল, পাতা পেলাম
মূলের ভিতর দৃষ্টি চালিয়ে আমাকে পাতাল রাজ্যের সন্ধান দিল।
ওদের কাছে নির্দেশ চাওয়া সহজ ছিল।
পাহাড়ের পথ খুঁজতেই ওরা সমুদ্রের ধারে এনে দিল
বৃষ্টির কথা বলতেই আমাকে আগুনে সেঁকে নিল
লণ্ঠন জ্বালব বলে কেরোসিন চাইতে চোখে ফুঁ দিয়ে দিল।
রাজকন্যের প্রয়োজন ভেবে ভিখারিণীকে এগিয়ে দিয়েছে
কাপড় চাইতে লজ্জা পেলাম, বিষ চাইতে সুধা পেলাম
মরখাদকের ত্রিশূলে গেঁথে আমাকে সটান শূন্যে ছুঁড়ে দিল

ওদের কাছে সহজলভ্য ক্ষমা চেয়েছিলাম॥

জ্বালালো। তারপর দরজাটা খুলল। দরজা খুলতেই মাধু ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে আরও চারটে প্রাণী লেজ উঁচু করে তড়াক করে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে এল। তারা মাধুর হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না।

মায়া বললে, 'কি ব্যাপাররে মাধুদি!—'

তারপর সে খানিকটা পিছিয়ে এসে বললে, 'ইস্, আবার তুই মদ খেয়েছিস্।'

'কি করব ভাই! কিছুতেই ছাড়লে না—জোর করে খাইয়ে দিলে তোর দাদা!'

মায়া সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আমার দাদা!'

মাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'শং-ক-র!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ', মাধু বলতে লাগল, 'জেল থেকে পালিয়ে এসেছে।'

এবার মা-ও ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললেন, 'জেল থেকে পালিয়ে এসেছে! কোথায়! কোথায় সে?'

তিন বছর আগে দশ বছর জেল হয়ে গিয়েছিল শংকরের। দীর্ঘকাল মা তাকে কাছে পান নি। সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে মায়ের সেই বেদনাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল। তিনি বলে উঠলেন, 'সে আমার এখানে এল না!'

'তোমার এখানে আসবে কি গো—আমি তার জন্যে তিনটে বছর বসে থাকি নি?'

মা বললেন, 'থাম হারামজাদি! সে আমার ছেলে—'

'তোমার ছেলে কিন্তু আমার মনের মানুষ', বলে মাধু নির্লজ্জের মত খিল খিল করে হেসে উঠল। মায়া ব্যাপারটা উপলব্ধি করে বললে, 'মা, থামো তুমি।' তারপর মাধুকে বললে, 'দাদা কি তোর ওখানে আছে মাধুদি?'

'না এই মাত্র ফুর্তিটুর্তি করে বসন্তু আর ওস্তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল।'

'ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু আমার কাছে আসতে পারল না!' বলে মা যেন যন্ত্রণায় ভেঙে পড়লেন। তার পর বললেন, 'আমি মা, আমি তাকে কত কষ্টে মানুষ করেছিলুম। সে-কথা কি সে ভুলে গেল?'

'আক্ষেপ করে কি লাভ মা!' মায়া বললে, 'সবই তো জানো! রাতে আসে নি, হয়তো অন্য সময় আসবে।'

'অন্য সময় আবার আসবে কি করে? এর পর তো পুলিশ পেছনে লাগবে। তখন আর কি আমার সঙ্গে দেখা হবে তার?'

মাধু বললে, 'বেশ তো, যাও না কেন ওস্তাদের আড্ডায়। দেখতেই যদি চাও—দেখে এসো না।'

কথাটা মাধু মন্দ বলে নি। মা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তাই—আমি তাই যাবো।'

মায়া বলে উঠল, 'তাই যাবো—তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি?'

'মাথা খারাপ তুই কাকে বলছিস মায়া', মা বললেন, 'মা হওয়ার জ্বালা তুই কি বুঝবি? আমি যাবো, নিশ্চয়ই যাবো—'

'এই এত রাতে তুমি ওখানে যাবে!' মায়া বললে, 'তুমি ওদের ওখানকার সব জানো কি? পথ চিনে ওখানে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব।'

'ছেলের জন্যে মা যমালয়ে পর্যন্ত যেতে পারে', মা বললেন, 'অসম্ভব বলে কিছু নেই। তুই আমার বাধা দিস্ নি মায়া!'

'বাধা আমি দিই নি', মায়া বললে, 'আমি শুধু তোমাকে রাতে যেতে দিতে চাই না। সকাল হলে বরং যেও—'

'আমি আর সময় পাব না হয়তো', মা অসহায়ের মত আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তুমি যাবে বাবা এক—আমার সঙ্গে?'

'উনি কি পথঘাট চেনেন ওদের আড্ডার?'

'ও না চিনুক, আমি চিনি। অনেক-দিন অনেকবার ওদের ওখানে যেতে হয়েছে আমাকে শুধু দিনান্তে তোদের মুখে দুমুঠো দিতে হবে বলে। সে সব দিনের কথা তোরা জানিস না, জানি শুধু আমি আর আমার অন্তর্যামী। অনেক দুঃখ, অনেক জ্বালা আমি পেয়েছি, কিন্তু এ শত্তুর আমাকে যে জ্বালা দিয়েছে, সে জ্বালা ভয়ানক জ্বালা!'

মায়ের মনের কথা না বোঝবার নয়। আমি বললাম, 'একটু ভেবে দেখলে হত না মা! মায়া যখন বলছে—'

'মায়া বুঝবে না বাবা, মায়া বুঝবে না', মা বললেন, 'শংকর মরণের পথ ধরেছে। এর পর পুলিশ আসবে। ওকে ধরতে যাবে, ওকে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। তারপর হয়তো গোলাগুলি কিছু ছুঁড়ে বসবে। আর তার ফল কি জানো তো—তার ফল হয় ওর ফাঁসি, নয় পুলিশেরই হাতে ওর মৃত্যু। ওকে সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকেই টেনে আনতে হবে বাবা, আমাকেই টেনে আনতে হবে। আমার আর কেউ নেই।' তারপর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি শুধু আমার সঙ্গে একটিবার চলো বাবা।'

এর পর আর কথা চলে না। সেই নিশুতি রাতে মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। যাবার সময় শুধু আমার কুলিটা নিয়ে গেলাম সঙ্গে। ঘরের চৌকাঠ পার হতেই পাঁচির মা মশারীর ভেতর থেকে শুধু বলে উঠল, 'কি হয়েছে গা?'

মা বললেন, 'কিছু না।'

তারপর সেই পথ।

[চলবে]

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শান্তিময় রায়, অধ্যাপক সুনীল দত্ত ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু শিক্ষাজগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ'দের কিছু কিছু বক্তব্যে বর্তমান কালের দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। শিক্ষাবিদগণ হয়তো এ'দের বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে নারাজ হতে পারেন, কিন্তু মূল বক্তব্যে আশা করি দ্বিমত হবেন না। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক বসু কিছু কিছু তীক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন, কারণ তা না করলে শিক্ষাজগতের অসহনীয় রূপটি ফুটে উঠত না। স্পষ্টবাদিতার জন্য এ'রা ধন্যবাদার্হ।

প্রঃ। ফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন এসেছে কি?

উঃ। **অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য** (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী): আসে নি। শিক্ষাব্যবস্থায় পচন ধরেছে অনেক কাল। আজও শিক্ষাব্যবস্থার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা দেখছি না। সেই অর্থে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী তাঁদের 'রোল' কি হওয়া উচিত, তা বুঝতে না পেরে সবাই বিভ্রান্ত। যুক্তফ্রন্টের সময়ে এই বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। আমরা কেউই বুঝতে পারছি না, কার কী কাজ।

**অধ্যাপক সুনীল দত্ত** (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়): দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। কলেজ শিক্ষকদের 'ইউনিফরম পে-স্কেল' হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি নূতন। আর্থিক দিক থেকে শিক্ষকদের কিছু উন্নতি হয়েছে। এর ফলে ভাল ছাত্রেরা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করবে আশা করা যায়। বিনা বেতনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই চেষ্টাকে বিপ্লবাত্মক বলা চলে। এর ফলে সমাজ-জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসবে। শিক্ষাবিদ-দের সংগে পরামর্শ করে সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আইনগুলি পরিবর্তিত করতে চাইছেন। সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে গণতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে তোলাই সরকারের উদ্দেশ্য।

**অধ্যাপক শান্তিময় রায়** (সিটি কলেজ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়): শিক্ষক-দের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। স্কুলে পরিচালক সমিতির হাত থেকে শিক্ষকরা রেহাই পাবেন, আশা করা যায়। কিন্তু 'এডুকেশন অ্যাজ সাচ্' কোনও পরিবর্তন হয় নি।

প্রঃ। প্রায় দুই শত বিদ্যালয়ে 'অ্যাড্-মিনিস্ট্রেটর' বসানো হয়েছে। এতে কি গণতন্ত্র রক্ষা পেল?

**অধ্যাপক সুনীল দত্তঃ** সরকারের এই কাজ আমি সমর্থন করি। দুর্নীতিগ্রস্ত স্কুল-কমিটিগুলিকে ভাঙ্গা হয়েছে। শিক্ষার সংগে যাঁদের কোনও যোগ নেই, এসব কমিটিতে সেই সব লোক ছিলেন। এ'দের কাজকর্ম শিক্ষক ও ছাত্র-স্বার্থ-বিরোধী। ব্যবসায়ীর মনোভাব নিয়ে এ'রা স্কুল পরিচালনা করতেন। অ্যাডমিনিস্ট্রে-টর খুব অল্পদিন স্কুল পরিচালনা করবেন। নতুন যে কমিটি তৈরি হবে, তা খুবই প্রগতিশীল বলে আমি মনে করি।

প্রঃ। স্কুল-কমিটি ভাঙ্গা হল বটে, কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি কেন?

উঃ। **অধ্যাপক দত্তঃ** সরকারের সত্বর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

প্রঃ। একটি বিশেষ দলের লোকেরাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়েছেন—এ অভিযোগ আপনি স্বীকার করেন কি?

উঃ। **অধ্যাপক দত্তঃ** না। এক্ষেত্রে 'পার্টি কনসিডারেশন' বড় হওয়া উচিত নয়।

**অধ্যাপক শান্তিময় রায়ঃ** এটা করার যে প্রয়োজন ছিল—তাতে সন্দেহ নেই। তবে পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা সদস্যরাই 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' হয়েছেন। তবে এসব অভিযোগ খুব একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

প্রঃ। পরীক্ষা আজ প্রহসনে দাঁড়িয়েছে। এ প্রহসন বন্ধ করার উপায় কি?

**অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যঃ** কলেজে তিন বা ছ' মাস অন্তর পরীক্ষা নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অল্প নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

প্রঃ। শিক্ষকদের সততা নির্ভরযোগ্য কি?

উঃ। **অধ্যাপক ভট্টাচার্যঃ** না। তবে অল্প কিছু সংখ্যকের আজও সততা আছে।

প্রঃ। শিক্ষকরা সততা হারালেন কেমন করে?

উঃ। **অধ্যাপক ভট্টাচার্যঃ** বৃটিশ যুগের আগে আমাদের যে শিক্ষক সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁদের একটা বিশেষ সামাজিক ভূমিকা ছিল। তাঁরা সাধারণত তাঁদের 'ধর্ম' থেকে বিচ্যুত হতেন না। হলে শাস্তি পেতেন। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল।

অক্সফোর্ড, হার্বার্ট বা লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও একটা বিশেষ 'রোল' আছে।

বর্তমানের আমরা কিন্তু ত্রিশঙ্কু। দেখছি, শিক্ষকরা টিউটোরিয়াল করছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র আগে-ভাগেই 'আউট' করে দিচ্ছেন। মানে বই লিখছেন। টিউশনী করছেন। এমন কি মুদি দোকানের মালিকও আছেন শিক্ষক-দের মধ্যে। কাজেই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা দারুণ অরাজকতা কোথাও আছে, যার ফলে এমন বৈপরীত্য সম্ভব হয়েছে।

**অধ্যাপক শান্তিময় রায়ঃ** ক্লাশ ওয়ার্কের' ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া দরকার। 'এসে' ও 'ভাইবা'র মাধ্যমে ছাত্রদের মান নির্ণয় করলে ভাল হবে।

অধ্যাপক সুনীল দত্তঃ এ অবস্থা চিরকালই ছিল। আজও আছে। পরীক্ষাকে জীবন-মরণ বলে মনে করে বলেই এরকম পূর্বেও হত, এখনও হচ্ছে। তবে পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার। 'টিউ-টরিয়ালের' ভিত্তিতে ছাত্রদের মান নির্ণয় হওয়া উচিত। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত এখনও যা আছে, তা বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষক-দের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আশু প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রঃ। 'টিউশনী' করার পদ্ধতি কি খুবই ক্ষতিকারক বলে মনে করেন?

উঃ। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)ঃ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের টিউশনীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক ক্ষতি স্কুল-শিক্ষক-দের টিউশনীতে এবং সবচেয়ে কম ক্ষতি কলেজ শিক্ষকদের টিউশনীতে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা টিউশনী করলে (যদি তাঁরা একই সঙ্গে প্রশ্ন করেন বা খাতা দেখেন) তাঁদের নিজেদের চরিত্র নষ্ট এবং কিছু সংখ্যক ছেলের লাভ অর্থাৎ মূলে ক্ষতি হয়।

কলেজ শিক্ষকরা প্রশ্ন করেন না এবং নিজেদের কলেজের খাতা দেখেন না বলে ব্যাপারটা দুর্নীতির কিছু নয়। অবশ্য অতিরিক্ত টিউশনীতে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির সম্ভাবনা; সুতরাং দক্ষতার হানি।

সবচেয়ে ক্ষতি স্কুলের ব্যাপারে। কারণ, (১) র‍্যাকেট তৈরি হয়েছে—এক দলের ছাত্র অপর দলের শিক্ষকের হাতে অবিচার পায়; (২) যেখানে একটি র‍্যাকেট—সেখানে অন্তর্ভুক্ত ছাত্রেরা বছরের পর বছর ক্লাশে পাশ করে যায় এবং জানে যে, এই হল দেশের রীতি—পরে যখন ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে যায়, মনোমত প্রশ্ন না পেলে সব ভেঙে চুরমার করে।

শিক্ষকরা সত্যই যে অর্থলোভী নন, সে-কথা প্রমাণ করা দরকার। 'পে-কমিশন' যে বেতন-হার শিক্ষকদের জন্য সুপারিশ করেছেন, যদি সরকার তা মেনে নেন, তা হলে এ-বি-টি-এ ও কলেজ-শিক্ষক সমিতির পক্ষে একযোগে শিক্ষকদের টিউশনী থেকে বিরত করার জন্য বিশেষ প্রস্তাব পাশ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

প্রঃ। শিক্ষকদের ব্যবসায়ীসুলভ কাজ এ-বি-টি-এ বা কলেজ-শিক্ষক সমিতি বন্ধ করতে পারেন না কি?

উঃ। অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যঃ এঁরা করেন না। কারণ কায়েমী স্বার্থ এখানেও আছে। আগামী দিনেও যে এ সম্বন্ধে কিছু করবেন—এমন কোনও সম্ভাবনা দেখছি না।

প্রঃ। ছাত্র-সংসদগুলি ছাত্রদের সং হতে বলে কি?

অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যঃ আমাদের দেশে মূল্যবোধের বিপর্যয় আগেও ছিল। এখন সেটা সঙ্কটের পর্যায়ে এসেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের পর এদেশে পরগাছার মত বিদেশী নানা ভাবধারা ও মূল্যবোধ গজিয়ে উঠল। আমাদের দেশীয় পুরনো মূল্যবোধের সঙ্গে ছাত্রদের কোনও যোগ নেই। গত বিশ বছরের সামাজিক ইতিহাসের পাতায় মূল্যবোধের কোনও স্থান নেই—শুধুই ভণ্ডামি। আবার নতুন মূল্যবোধের উপযুক্ত করে কোনও সামাজিক, অর্থনৈতিক বুনিয়াদও আমরা তৈরি করতে পারি নি। ফলে সব কথাই আজ 'তেজপাতা।'

অধ্যাপক শান্তিময় রায়ঃ সং হতে নিশ্চয়ই বলা উচিত। যাঁরা সং হতে বলেন, তাঁরাও খুব জোরের সঙ্গে 'কনভিক্‌শন' নিয়ে বলতে পারেন না। 'ইউনিয়ন' হারাতে হবে, সম্ভবত এই ভয়েই বলেন না।

প্রঃ। বর্তমানে শিক্ষার মান নেমে যায় নি কি?

অধ্যাপক সুনীল দত্তঃ নামা-ওঠা একদম আপেক্ষিক ব্যাপার। শিক্ষা যে বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে, এটা আশার কথা। উপাচার্যরা যা বলছেন, তা ঠিক নয়।

অধ্যাপক শান্তিময় রায়ঃ মান নেমেছে এটা ঠিক। কলেজ সম্পর্কে একথা যথার্থ বলে আমি মনে করি। শিক্ষার মান কি করে তুলতে হবে—এ প্রশ্নের সঙ্গে নানা সামাজিক প্রশ্ন জড়িত। বাড়িতে যেভাবে ছাত্ররা লেখাপড়া করে, তাতে মনোযোগ যতটা দেওয়া উচিত, তা দেওয়া সম্ভব হয় না। তবু এরই মধ্যে যেটুকু লেখাপড়া ওরা করে, আমার কাছে তা বিস্ময়কর বলে মনে হয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শিক্ষকরা যেভাবে ছাত্রদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন, সেরকম চেষ্টা আর এখন হচ্ছে না। 'সোস্যাল আইডিয়ালিজম' সামনে না রাখলে শিক্ষকরা কখনই ছাত্রদের তৈরি করতে পারবেন না। খুব সামান্য সংখ্যক শিক্ষকদের মধ্যেই এ আদর্শ আছে।

---

[ ২১৮৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

আমরা ধরে নিয়েছি, বাংলায় কাব্য-সাহিত্য চলতে পারে—মনের কথা বলা যেতে পারে—কিন্তু কাজের কথা ও-ভাষায় চলবে না। যে কাজ ভিন্ন ভাষায় করতে হয়, সে কাজে কখনও মন থাকতে পারে না। সেইজন্যে দুশ বছর ধরে ঐ ভাষাতে সব কাজ শিখেও তেমন কিছু গড়ে তুলতে পারি নি। আমাদের মনের ভাষা বাংলা ভাষাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হলে, তার উপর কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে। সেই ভাষায় কাজের চিন্তা করতে হবে। তবেই এ ভাষা কাজের ভাষা হয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এইভাবে আমাদের বিদ্বান পণ্ডিত, ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, কারিগর, কারবারী, সরকারি-আমলা যখন এই বাংলা ভাষাকে তাঁদের মুখের, মনের ও কাজের ভাষা করে দাঁড় করাতে পারবেন, তখনই বাংলা দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের নাড়ীর যোগ ফিরে পাবেন, বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে কাজকেও ভালোবাসবেন। সাধারণ মানুষও উপরতলাকার জ্ঞানভাণ্ডারের শরিক হয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।

বাংলা প্রবর্তন সমিতি চাইছেন, আর আর দেশের লোকদের মত আমরাও মাতৃভাষায় চিন্তা করি, মাতৃভাষা বলি, মাতৃভাষায় কাজ করি। এক সপ্তাহ ধরে তাঁরা দেশবাসীর কাছে বাংলা ভাষার এই দাবী পৌঁছিয়ে দেবেন। দেশের উপর-তলায় যাঁরা আছেন যদি তাঁদের মধ্যে মাতৃভাষা সম্পর্কে একটুও দরদ তাঁরা জাগিয়ে তুলতে পারেন, তবেই তাঁদের সপ্তাহব্যাপী এই প্রয়াস সার্থক হবে।

—সত্যেন বোস

[পূর্বানুবৃত্তি]

## বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

—সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের ভিতরে ও বাইরে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে এবং রাজ্যের কয়েক কোটি মানুষকে মুক্ত করতে কার্যকরী কোন পন্থা আপনারা ভেবেছেন কি?

—বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের সংকট এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে, জনসাধারণের মনে যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবে। আমরা অবশ্য তা মনে করি না। এবং একটা কথা বিশেষ করে বলতে চাই যে, যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের মতপার্থক্যের জন্য আজকের সংকটের সৃষ্টি হয় নি। বরং এই মতপার্থক্যগুলিকে দূর করার জন্য কিভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং বিভিন্ন উপায়ে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েও একই সাথে যুক্তফ্রন্ট কমিটি, যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং মূল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেদের ঐক্যকে অক্ষুণ্ন রাখা যায়, সেই পদ্ধতিটি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবই বর্তমান সংকট সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী। বৃহৎ দলগুলি যখন নিজেদের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে সিদ্ধান্তকে অপেক্ষাকৃত ছোট দলগুলির উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তখন আন্তঃপার্টি সংঘর্ষকে মেটানোর এই পন্থাকে আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি নি। সকলেই জানেন, যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন সভায় একে আমরা নীতিহীন বলে তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। আজকের অভিজ্ঞতা কি? যে দলগুলি সেদিন এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তারাই কি আজ পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে বিপন্ন করে তুলছে না? এটাই স্বাভাবিক। কেননা এটা ছিল একটা নীতিহীন পন্থা, কোনমতে একটা জোড়াতালি ব্যবস্থা এবং পাঁচ দলের পারস্পরিক সুবিধা লাভের একটা সুবিধাবাদী চুক্তি।

জেনে হোক, অজান্তে হোক, অথবা নিরুপায়েই হোক, এতদিন ধরে আমরা সবাই যুক্তফ্রন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ভুল কার্যপ্রণালী চালাতে দিয়েছি, বর্তমান সংকট সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেটাই বহুলাংশে দায়ী। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে এবং মুক্তি দিতে হলে যুক্তফ্রন্টকে এক দেহ (ওয়ান বডি) এবং মন্ত্রিসভাকে 'একসত্তা' (ওয়ান ম্যান) হিসাবে পরিচালনা করার যে নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব রেখেছি। সেই নীতি কার্যকর হলেই আমরা আমাদের শত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মূল শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় হাতিয়ার হিসাবে টিকিয়ে রাখতে পারবো।

—একদিকে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ এবং অন্যদিকে নিত্য-নৈমিত্তিক সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে কি?

—শরিকী সংঘর্ষ এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ যে কিছুটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে কেউ যদি বলেন, বাংলা দেশে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, তবে তা ভ্রান্ত এবং অতিরঞ্জন-দোষদুষ্ট। মূল কারণ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের মধ্যেই নিহিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতবাদকে সহ্য করার ধৈর্য আমরা যেন দিন দিন হারিয়ে ফেলছি। ফলে সহনশীলতার বদলে অন্ধতা এবং উগ্র দলীয় মনোভাব আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে সমাজবিরোধীদের কঠোর হাতে দমন করবার প্রস্তাব আছে। কার্যত তা হচ্ছে না। বরং নিজের দলের মুখের দিকে তাকিয়ে দুষ্কার্যের প্রতিরোধ না-করার মধ্য দিয়ে শাসনযন্ত্রকে সংকীর্ণ দলীয় কাজে ব্যবহারের প্রতিফলন ঘটছে। যুক্তফ্রন্টের 'এক দেহ'—'এক সত্তা' হিসাবে কাজ করার স্বার্থে, বত্রিশ দফা কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের স্বার্থে, বাংলা দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও আন্দোলনের স্বার্থে এসব বন্ধ হওয়া দরকার।

—সম্প্রতি সুন্দরবনাঞ্চলে গেছিলাম। গোসাবা, রাঙাবেলে, সাতজেলে, আমলামেথি, সূর্যবেড়ে, পাঠানখালি, কুমীরমারী, আমতলি, মৌল্লাখালি প্রভৃতি জায়গায় অনেক ধান লুঠ, ছিনতাই, মারপিট, অগ্নিসংযোগ এবং অল্প জমি দখল করে ধান কেটে নেবার ঘটনার কথা শুনেছি। শহর ও শিল্পাঞ্চলেও খুন, সংঘর্ষ, ছিনতাই হামেশা ঘটছে। রেলের তার চুরি, ওয়াগন ব্রেকিং তো আছেই, অনেকক্ষেত্রে গার্ড, ড্রাইভার, টিকিট-কালেক্টরদেরও অযথা নিগৃহীত

হুডে হচ্ছে। সামগ্রিক অবস্থাদৃষ্টে কি মনে হয় না যে, জনসাধারণের মধ্যে আইনভংগ করবার একটা প্রবণতা এসেছে?

—আইনভংগ করা দোষের নয়—যদি জনসাধারণের ন্যায়সংগত দাবি-দাওয়া অর্জনের জন্য ন্যায়সংগত গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে আইনভংগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রসংগে আমাদের নেতা ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। কথাটি হলো, প্রচলিত শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় যা আইনসংগত তা-ই ন্যায়সংগত নয়। বিপরীতক্রমে, যা বে-আইনী তা-ই অন্যায় ও অমানবিক নয়। প্রত্যেক যুগে সব দেশে সাধারণ মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্য, সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। তাই কোন আন্দোলন আইনের বিরুদ্ধে গেলেই তাকে নিন্দা করা চলে না। বিচারের মাপকাঠি আইন হবে না, হবে সামাজিক ন্যায়নীতি ও মানবিক মূল্যবোধ। বাংলা দেশের বহু বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে এই গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ কাজ করেছে। প্রত্যেক আন্দোলনকে তাই এই দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। তবে নিছক দাঙ্গাবাজী ও খুনখারাপির জন্য, লুঠ ও ছিনতাই-এর জন্য আইনভংগ নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য নয়।

—কৃষি ও শিল্পাঞ্চলে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের সমর্থকদের মধ্যে যে সকল রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়েছে, কোন কোন রাজনৈতিক নেতা তাকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে আপনার কি মত?

—যে সব জায়গায় কৃষকদের ন্যায়সংগত দাবী আদায়ের জন্য কৃষক ও ক্ষেতমজুর এগিয়ে গেছেন এবং সেই এগিয়ে যাবার জন্য জোতদার কিংবা তাদের দালালদের সংগে সংঘর্ষ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সে সংঘর্ষ শ্রেণী-সংঘর্ষ। কিন্তু বাইরে থেকে আমদানী-করা সমাজবিরোধীদের নিয়ে গিয়ে অন্য দলের সংগঠিত সংগ্রামী চাষী অঞ্চলে আক্রমণ করে নিজের দলের প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাকে এই বলে ব্যাখ্যা করতে গেলে সত্য কথা বলা হয় না। উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় আমাদের দলের নেতৃত্বে জোতদারী অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে কৃষক ও ক্ষেতমজুররা তাঁদের প্রিয় সংগঠন 'কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্থানীয় জোতদারদের সহযোগিতায় ও বাইরে থেকে কিছু বিরোধীদের নিয়ে গিয়ে বোমা-পিস্তলের সাহায্যে সেই সংগঠনকে ভাঙবার প্রচেষ্টা কোন কোন দল করেছে। এটা শ্রেণীসংগ্রাম নয়, সংগ্রামী চাষীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও জোতদারদের হয়ে হামলাবাজী করা।

—কিছুদিন ধরে পশ্চিমবংগে একটি বিকল্প মিনিফ্রন্ট সরকারের কথা শোনা যাচ্ছে। সে রকম হলে আপনার দলের ভূমিকা কি হবে?

—আমরা এ ধরনের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। কারণ এ রকম ফ্রন্ট বা সরকার গঠনের অর্থ হলো বর্তমান যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দেওয়া। দেশের মানুষ সাধারণভাবে তা চান না। আর যদি আমাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে পরবর্তী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দলের ভূমিকা দলীয় বৈঠকেই স্থিরীকৃত হবে।

## শ্রীসুধীর দাস

[পশুপালন ও পশু-চিকিৎসা মন্ত্রী]

আপনার কি মনে হয়, শরিকী সংঘর্ষই যুক্তফ্রন্টের বর্তমান অচলাবস্থার মূল কারণ?

—হ্যাঁ। বরং বলা ভাল প্রত্যক্ষ কারণ। গণতন্ত্রে হিংসাত্মক কাজের স্থান নেই। এই মূলগত নীতি থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি বলেই আজ সংকট ঘনীভূত হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের কোন কোন দল মনে করছেন, হিংসার মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দলের শক্তি বাড়ানো যায়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা বলে আমি মনে করি। হিংসাত্মক কাজকর্ম বন্ধ করেই যে গণতন্ত্রকে বাঁচানো সম্ভব, এই মৌলিক চিন্তাধারার সংগে কোন কোন শরিক দলের মতানৈক্য আছে এবং সেজন্য তারা হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছেন। যার ফলে যুক্তফ্রন্টের উপরে মানুষের যে ভাল ধারণা ছিল তা কিছুটা ম্লান হয়েছে। একদিকে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, অন্যদিকে পুলিশও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। দোষীকে প্রত্যক্ষ ধরা সত্ত্বেও জনতা পুলিশের হাত থেকে দোষীকে ছিনিয়ে নিতে সাহস পাচ্ছে, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে, আক্রমণ করছে। এস ডি ও, ডি এম প্রভৃতি প্রশাসনিক বড় অফিসারদেরও লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। ফলে সমস্ত প্রশাসনিক যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারও বিঘ্নিত হচ্ছে না। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে জনতার উপর রাজনৈতিক দলের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা উচিত। জনতাকে উত্তেজিত করলে এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। মন্ত্রিসভার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। সেই শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে না পারলে এই সংকট কাটবে না এবং কোন কাজে অগ্রগতিও হবে না। আমাদের দল (পি-এস-পি) কোথাও হিংসাত্মক কাজ বা শরিকী সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি, প্ররোচনাও দেয় নি। সরকারী ক্ষমতা হাতে পাবার পরেও এবং যুক্তফ্রন্টে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করা এবং বেনামী জমি দখল করা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পন্থা ও প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও কোন কোন দল তা অগ্রাহ্য করে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ বা শরিকী সংঘাত সৃষ্টি করেছেন।

—এ ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ শরিক দল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলকে দোষারোপ করেছেন। এটা পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয় না কি?

—আমরা লক্ষ্য করেছি, বেশীর ভাগ সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই সি-পি-এম জড়িত। এই সংঘর্ষ জোতদারের সংগে কৃষকের সংগ্রাম বলে যে কথা তাঁরা চালাতে চাইছেন, তা

মিথ্যে। কারণ আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, অসংখ্য জোতদার তাদের সঙ্গে কাজ করছেন। পি-ডি-এফ সরকারের আমলে যে জোতদারকে দেখেছি প্রফুল্ল ঘোষের গলায় মালা পরাতে, আজ তাকেই দেখি ঝাড়গ্রামে প্রমোদবাবুকে মাল্যদান করতে। এমন অসংখ্য নজীর দেখানো যায়। সুতরাং শ্রেণী সংঘর্ষের ধুয়ো মিথ্যে। আসলে এটা দল বাড়ানোর আগ্রাসী নীতি।

—এদেশে বৃটিশ আমল থেকে পুলিশ বিভাগ জন-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত ছিল। ১৯৬৭ সালে বাংলা দেশের প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। '৬৮ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে ময়দানে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রীরা পর্যন্ত পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। সেদিন কমিউনিস্ট নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী পুলিশের প্রতি হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা আবার ক্ষমতায় আসবো, তখন দেখা যাবে।' কিন্তু '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর জনগণ ভেবেছিলেন যে, দোষী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে এবার নিশ্চয়ই সরকার দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কার্যত কিন্তু কিছুই হলো না। বর্তমানে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশের যে সব লাঞ্ছনার কথা শোনা যাচ্ছে, সেগুলিকে সরকারের প্রতি জনগণের পুঞ্জীভূত অভিমানের নির্মম ফলশ্রুতি বললে কি অস্বাভাবিক হবে?

—সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে বহু ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং এর সঙ্গে সে সকল ঘটনার সংযোগ স্থাপন করে কিছু বলতে চাই না। আমি বহু জায়গার পুলিশ অফিসারদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে টেররিজমের অভিযোগ পেয়েছি। কাঁথি মহকুমায় পি-এস-পি দলের প্রভাব বেশী, অথচ সেখানে সি-পি-এম-এর এক কর্মী পুলিশকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে কোন ক্ষমতায়? আমি জ্যোতিবাবুর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে বলেছিলাম, লুঠতরাজ এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতি একটা যুক্ত বিবৃতি দেওয়া হোক। সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে এভাবে জনমত গঠন করা হোক এবং সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হোক যে, এই সব সমাজবিরোধীদের কঠোর হাতে দমন করা হবে। নীতিগতভাবে ওঁরা এটা মেনে নিলেও কার্যত কিন্তু কিছুই করা হলো না।

—বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যাগ্রহের ফলে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন কি? যদি হয়, তবে বাংলা কংগ্রেস তার কয়েকজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করবার নির্দেশ দিচ্ছেন কেন?

—সত্যাগ্রহের ফলে অবস্থার কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিছু লোকের অন্তত প্রতিবাদ জানাবার সাহস হয়েছে। কিন্তু এর ফলে রাজ্যের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ অথবা শরিকী সংঘাত বন্ধ হয়ে যাবে—এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। তা হয় নি। সি-পি-এম-এর অনমনীয় মনোভাবেরও পরিবর্তন হয় নি। এই কারণেই বাংলা কংগ্রেস মন্ত্রীরা (মুখ্যমন্ত্রী বাদে) পদত্যাগ করতে চলেছেন।

—কিন্তু এর ফলে যুক্তফ্রন্টের সংকট আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে না কি?

—হ্যাঁ। খুব স্বাভাবিকভাবেই সংকট বেড়ে যাবে।

—আপনি কি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অসভ্য সরকার বলে মনে করেন?

—এ বিষয়ে আমাদের একটা *high feelings* আছে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজ্য জুড়ে যে সমস্ত খুন ও সংঘর্ষ হয়েছে, তা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়। খুনের সম্পর্কে যে সব রিপোর্ট আমাদের হাতে আছে, তা এত নৃশংস যে, মনে হবে আমরা আদিম যুগে ফিরে এসেছি। আমার দপ্তরের একটা বেদনাদায়ক অবস্থার কথা বলি। ভেটেরিনারী কলেজে দিনের পর দিন ওষুধ বন্ধ হয়েছে, হাসপাতাল পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে, অথচ তার প্রতিকার করা যায় নি। চিকিৎসা বিভাগ ধর্মঘট বা ঘেরাও-এর আওতার বাইরে। তা সত্ত্বেও কতিপয় ছাত্র এই বিভাগে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার প্রতিকারের ক্ষমতাই যেন সরকারের নেই। বস্তুত, জনগণের জাগরণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় নি বলেই আজ এই অরাজকতা দেখা দিয়েছে।

—কিছুদিন ধরে বাংলা দেশে একটা 'মিনি-সরকারের' কথা শোনা যাচ্ছে। তার কি আদৌ কোন সম্ভাবনা আছে?

—এ সম্পর্কে এখনই আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না।

—যদি এ ধরনের কোন বিকল্প সরকার সত্যই গঠিত হয়, তা হলে সেক্ষেত্রে আপনার দলের ভূমিকা কি হবে?

—দলের ভূমিকা দলের সভায় নির্ধারিত হবে।

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

মহেশ বললে, "তোমার নবীন গোঁসাইয়ের চরে নতুন বসত্ সানো কর্তা—তাকে বসাবার ফন্দি বার করতে হবে। সে হবে।" তারপর ক্ষুব্ধ গলায় বললে, "আপসোস মোর এই—ওই হারামজাদী বেটির ঘরে যেয়ে সেই মোকেই এবার আখড়া জমাতে হবে।"

"খুব কি অপমান বোধ হচ্ছে ছোট মণ্ডল?"

"অপমান নয় সানো কর্তা—লজ্জা। লজ্জা করছে মোর। যে কাজে তুমি এবার এগিয়ে দিচ্ছ তাতে মান-অপমান আবার কী!" মহেশ গাঢ় গলায় বললে, "শুধু ওই ডাইনী বেটির কাছে মোর হার হয়ে গেল। বেটি পুরো ডাইনি—ওর অসাধ্য কিছু নাই।"

সানো চৌধুরী বললে, "লোকে বলে—এ চরের ছোট মণ্ডলেরও অসাধ্য কিছু নাই।"

মহেশ চুপ করে রইল।

সানো চৌধুরী চাপা গলায় বললে, "শুধু হুঁশিয়ার—নবীন গোঁসাই যমুনার গোঁসাই। এর বেশি যেন কাকপক্ষীতেও কিছু না জানে।"

"সে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো সানো কর্তা।"

তারপর কিছুক্ষণ কাবুর মুখে আর কোনো কথা নেই। নীরবে হাঁটতে লাগল। দুজনেই কিছু ভাবছে।

সানো চৌধুরী বললে, "এই স্কুলে সকলকে জোটাতে তোমার হয়তো প্রথমটায় একটু অসুবিধাই হবে—বুঝি।

"আমিও সেই কথাটাই ভাবছিলাম সানো কর্তা।" একটু হেসে মহেশ বললে, "তুমি ছল-চাতুরি করতে পারো, ডাক্তার করতে পারে, মায় তোমার নবীন গোঁসাই পর্যন্ত—আর আমি পারব নি।"

সানো চৌধুরী ওর কথার ধারা বুঝতে না পেরে বললে, "মানে?"

"আমিও ছল-চাতুরি জানি সানো কর্তা।"

"কি রকম?"

"সে দেখতে পাবে।"

পরের দিন চরের সবাই দেখলে—একেবারে মাথা মুড়ানো মহেশ, গলায় একগাছা তুলসীর মালা।

হাবুর মা বললে, "ই কী ছোট মণ্ডল!"

মহেশ বললে, "দীক্ষা নিলম হাবুর মা।"

"কার কাছে গো!"

মহেশ বললে, "যমুনার নবীন গোঁসাইর কাছে।"

হাবুর মা'র চোখ কপালে উঠল প্রায়। বললে, "শেষকালে যমুনার গোঁসাইর কাছে!"

"কাঁটা গাছে কি ফুল ফোটে না হাবুর মা!" মহেশ গম্ভীর মুখে শুধু বললে, "ভারি জবর গোঁসাই। যেমন শাস্ত্রজ্ঞান, তেমনি তেজ। ওকে দিয়ে মেয়েদের ভালো হবে।"

হাবুর চ্যালা-চামুণ্ডারা কেমন যেন আবাচ্যাকা খেয়ে গেল। হাবু বললে, "ছোট মণ্ডলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যমুনা দুটো ভালো ভালো গান গেয়েছে কি বাস্—ছোট মণ্ডলের মনের ভাব ঘুরে গেছে।"

সেদিন সন্ধ্যের পরে মহেশ তাকেই ডেকে বসল সবার আগে। বললে, "চল্ যাই গোঁসাইর আখড়ায়।"

হাবু এড়াবার জন্য বললে, "হাই দেখ—যাব কি ক'রে! মোর যে ভলাণ্টিয়ারদের সংগে করে সানো কর্তার কাছে যাওয়ার কথা ছোট মণ্ডল!"

মহেশ তার খুদে খুদে চোখ দুটোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুহূর্তকয়েকের জন্য হাবুর মুখের ওপর নিবদ্ধ করে রাখলে। তার পর আস্তে আস্তে বললে, "বেশ তো—চল্ না। আখড়ায় গেলে দেখা হয়ে যেতে পারে খোদ সানো কর্তার সঙ্গে।"

কথাটা বিশ্বাস হয় না। হাবু যেন আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললে, "সানো কর্তা যাবে আখড়ায়!"

"তবে?" হাবুর ঘাবড়ানো মুখের দিকে চেয়ে মহেশ একটু হাসল। বললে, "ছোট মণ্ডলের মানুষ চিনতে ভুল হয় নি রে হাবু—মাথাও তার খারাপ হয় নি। চল মোর সংগে। এ বড় জবর গোঁসাই—ঢের জিনিস জানে, ঢের জায়-গায় গেছে, ঢের জিনিস দেখেছে। তার দুটো কথা শুনলেও জ্ঞান-আক্কেল হবে।"

ছোট মণ্ডল মিথ্যা বলে নি। সেদিন হাবু আর তার ভলাণ্টিয়ার বাহিনী-চ্যালা-চামুণ্ডার দল স্তব্ধ বিস্ময়ে রুক্ষ চুল গেরুয়াধারী গোঁসাইটির দিকে চেয়ে কথা শুনতে লাগল। দু'-ধারটে ধর্মকথা

দিয়ে তার সুরু। তারপর কখন এসে গেল দেশের গৌরবময় অতীত কাহিনী—তার রাজা-রাজ্য রাজপাট, তার ঐশ্বর্য-বীরত্ব-বীর্য কাহিনী। তার দেশ-দেশান্তরগামী বাণিজ্য তরণী—তার সম্পদের পসরা। তার ওপরে কেমন করে এসে পড়ল পররাজ্যলোলুপ শকুনের পাল। পাঠান এল—মোগল এল—ইংরেজ এল। একদিন কেমন করে বাঙালীর খুনে লাল হয়ে গেল পলাশীর প্রান্তর।

কথার শেষ নেই—বেদনার্ত ইতি-হাসের বিরতি নেই। দিনের পর দিন। দু'টি-চারটি করে এসে জুটেছে জোয়ান-মরদের দল। গোঁসাই বড় ভালো কথক। এ চরের বুনো মানুষগুলোকে যেন সেই দুর্বার ইতিহাস কথা তাড়া করে নিয়ে চললো। যেন নেশায় পাওয়া। তার মধ্যে নিষ্ঠুর পীড়নের জমাট কান্না আছে—ক্ষোভ আছে—ক্রোধ আছে। আছে সদ্য গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠা মানুষের অধিকার-বোধ। একটা আসন্ন আন্দোলনের অদৃশ্য পটভূমিকায় সেগুলো যেন খণ্ড খণ্ড কালো মেঘের মত এসে জমতে লাগল মনে মনে।

একদিন ঘরে ফেরার পথে হাবু জিজ্ঞেস করলে, "ছোট মণ্ডল, এ সব কথা সত্যি?"

অন্যমনস্ক মহেশ বললে, "কি—কোনটা?"

"এই যে তাঁতীদের আঙুল কাটা, নীলকরের অত্যাচার—নিমক মহালের কাণ্ডকারখানা!"

মহেশ উল্টে জিজ্ঞেস করলে, "তোর নিজের মামুর কথা মনে নাই? হেই সেদিনের কথা তো!"

সেই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মামুর কথায় হাবুর মুখে যেন চাবুকের বাড়ি পড়ল।

মহেশ বললে, "নবীন গোঁসাই মিছা বলে না। মোদের কপালগুণে ওকে পেয়ে গেছি রে হাবু।"...একটু থেমে, সুযোগ বুঝে কথাটা পেড়ে বসল মহেশ, "সানো কর্তা বলেছিল—ইচ্ছা করলে গোঁসাইকে দিয়ে মোরা চরে পাঠশালা খুলতে পারি।"

"চরে পাঠশালা!" উদ্ভট কথা শুনে হাবুর বিস্ময়ের অবধি নেই। হাবুর চ্যালা-চামুণ্ডারা কলরব করে উঠল।

হাবু বললে, "পড়বে কে!"

মহেশ বললে, "মোরা।"

"মোরা!"

আবার একটা কলমুখর বিস্ময়।

মহেশ বললে, "মোদের ঢের জানার আছে। তোদের ব্যাটা-বেটিরাও পড়বে। সানো কর্তা বলেছিল। গোঁসাইও বলে-ছিল।"

এই বুনো জংলা চরে কে কবে ভেবেছিল সে কথা। সেই অসম্ভব ব্যাপারটা নিয়ে হাবুর সঙ্গীরা যেন দিশাহারা হয়ে গেল।

মহেশ গম্ভীর গলায় বললে, "সে পাঠশালা মোরা করবো।"

এ চরের ছোট মণ্ডলের দৃঢ় প্রত্যয়ের কণ্ঠ। হাবু জানে, তার সঙ্গী-স্যাঙাৎরা জানে—তার নড়চড় নাই। ছোট মণ্ডলকে দিয়ে তাদের নতুন এক ধারার জীবনের সুরু।

॥ চব্বিশ ॥

চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ।

প্রতীক্ষিত ঝড় যেন তার পাখা মেলে দিলে।

স্মারকলিপি চলে গেল সদরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে—মহকুমার এস, ডি, ও।

মস্ত একটা সভার আয়োজন হয়েছিল বটে সদরে ১৪৪ ধারা আর নহেলি অর্ডিনেন্সের সমস্ত বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে। সেপাই-সান্ত্রীর লাঠি-ডান্ডায় ভাঙা ভন্ডুল সেই সভা থেকে সুরু হয়ে গেল প্রতিরোধ।

গ্রামদেশে সভাও নেই, সমিতিও নেই, সেই সভা ভাঙার হট্টগোল। আছে শুধু একটা পরিব্যাপ্ত ঠাণ্ডা প্রত্যাখ্যান—'না।' একটা সংক্রামক মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামে।

নীল কোর্তা, তকমা আঁটা চৌকি-দাররা লাঠি কাঁধে ছুটতে লাগল হন্দায় হন্দায়। রসিদ বই হাতে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বৃথাই ঘুরতে লাগল এ গ্রাম-সে গ্রাম। ওদের দেখলেই চাষাভুষোরা লুকোয়—গৃহস্থ দেখা করে না। ট্যাক্স চাইবে কাকে! সর্বত্র নীরব প্রত্যাখ্যান। চৌধুরীদের বড় তরফের মতো শুধু আঙুলে গোণা কয়েকটা বিশেষ বড় বড় ঘর ছাড়া।

ল্যাঙটের নীচে লজ্জাবরণ নেই—চৌকিদারের নিচে চাকরি নেই। মাইনে মবলগে পাঁচ তঙ্কা। এক মাস তারা সেটাও পেলে না। জোট বেঁধে থানায় গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়ল।

কাঁটা মাসের আড়িমুড়ি ভেঙে থানা যেন আবার হাঁক-ডাক সুরু করে দিলে।

এমন দিনে দূরের এক হাট থেকে ফেরার পথে যমুনা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

কে যেন ডাকল পেছন থেকে নাম ধরে। গলাটা চেনা চেনা লাগে।

যমুনা পেছন ফিরে দেখতে লাগল। পথে হাট-ফেরতা লোকের অভাব নেই। তাদের মধ্যে চোখ চালিয়ে যমুনা লোকটাকে খুঁজতে লাগল।

হাট-ফেরতা লোকজনের দলা থেকে যে লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়াল তাকে দেখে সে যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। চোখ-জোড়া তার বিবর্ণ হয়ে গেল—যেন ভূত দেখেছে। অথচ সন্ধ্যেটাও তখনো হয় নি। সূর্য সবে অস্ত গেছে। দূরে গাছ-পালা শুধু কালো হয়ে উঠেছে।

লোকটা সামনে এসে হাসলো নিঃশব্দে।

"তুমি! চৌকিদার!" অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল যমুনা। হঠাৎ কেমন একটা অজানিত ভয়ে যেন বুক তার কেঁপে উঠল। গলা তার শুকিয়ে এল। বললে, "তুমি বেঁচে আছ!"

"এ যাত্রায় কোনো রকমে বেঁচে গেলম যমুনা।"

সেই দীর্ঘ দেহ। এতদিন হাস-পাতালে থেকে একটু রোগা হয়েছে—তাতে আরও যেন লম্বা দেখাচ্ছে। মাথায় আর সে বাবরী নেই, গালপাট্টা জুলপিও নেই—সব কামানো। যেন একটা গিরগিটি উঠে দাঁড়িয়েছে দু' পায়ে। বাঁ হাতে তার সেই হুন্দার লম্বা লাঠি। আর ডান হাতটা—

যমুনা আঁৎকে উঠল। সেটা নেই।

"ডান হাতটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে ডাক্তারবাবুরা।" সস্নেহে কাটা হাতটার দিকে চেয়ে বিষণ্ণ গলায় ভলু মাঝি বললে, "হেই দেখ মোর দশা।"

এখন এ লোকটার সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে যমুনা। বললে, "আমি যাই—ঢের রাস্তা যেতে হবে।"

কিন্তু ভলু মাঝি বললে, "চল—কথা বলতে বলতে যাই।"

নিরুপায় যমুনা। সঙ্গ এড়াতে পারল না।

ভলু বললে, "টাঙির যে কোপ ঝেড়ে-ছিল মুকুন্দ—একদম ঘাড় বরাবর—পবন খাঁর মতো দু' ফাল্লা হয়ে যেতম যমনা। বেঁচে গেলম শুধু মাথায় ধানের বস্তাটা ছিল বলে। দেড় মণ ধান কিনে বস্তা মাথায় করে ঘরে ফিরছিলাম। ভগবানের দয়া। টাঙি এসে পড়লো ধানের বস্তায়। বস্তা ফাল্লা করে তবু কাঁধের ওপরে দেবে বসল পল্লা ঘা। ঘুরে দাঁড়াতে ফের কোপ—হাত দিয়ে ধরতে গেলম অর টাঙি। হাতটা একে-বারে ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেই ঝুলন্ত হাত আর এক হাতে ধরে বরাবর ছুট থানা পর্যন্ত। রক্ত ছুটেছে পিচকিরির মত।"

যমুনা বললে, "মা গ'!"

"বোঝ তবে যমুনা!" ভলু বললে, "সেই অবস্থায় জগৎ ডাক্তারও মোকে ছুঁলো নি। নাক সিটকে বললে, 'ব্যাটা মহাপাপী।' তারপর আর মোর জ্ঞান নাই।"

"কবে ঘুরলে হাসপাতাল থেকে?"

"হেই তো দু' দিন।"

যমুনা আর কোনো কথা [illegible]

আবার মতলব ভাজবে, আমার জ্বালাবে। ওর প্রকৃতি সে জানে।
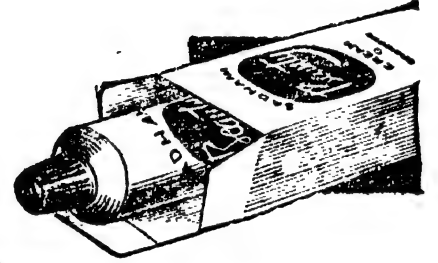
ভলু বললে, "মরণের মুখে দাঁড়িয়ে চিনে নিলম হেই জগৎ ডাক্তারকে, মোর নিজের বাপকে, হেই সারা দুনিয়াটাকে যমুনা।"

"বাপ!" যমুনা মেয়েলি কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলে, "সে আবার তোমার কি করল?"

"হাঁড়ি আলাদা করে দিয়েছে।"

"কেন?"

"বললে—তোর সঙ্গে থাকলে চরের লোকগুলান মোকেও কবে জবাই করবে।

"বুড়া মানুষ—ভয় ধরে গেছে চৌকিদার।" যমুনা বললে, "তা এখন রেঁধে দেয় কে?"

"নিজেই রাঁধি।"

"বিয়ে-সাদির কি হলো?"

"নিমাই মাঝিও এখন বেঁকে বসেছে যমুনা। বলে, শ্বি মোর নিঘ্ঘাৎ বিধবা হবে। না হয় অপঘাতে মরবে।"

"নয়ন কি বলে?"

"লুকিয়ে রাখালকে পাঠিয়েছিলম মুনা।" বিষণ্ণ ভাঙা গলায় বললে, "রাখালকে বলেছে—মুকুন্দ তার ছাড়পত্র দেয় নি।"

"আমি তো শুনেছিলম"—বলতে বলতে যমুনা চেপে গেল। সে শুনেছিল—মুকুন্দ ছাড়পত্র টিপ্ করে দিয়ে গেছে। যমুনা আর ও প্রসঙ্গে গেল না। কি জানি, কোথাকার কি কথা আবার কোথায় লেগে যায়। নীরবে হাঁটতে লাগল।

ক্ষোভে ভলু বললে, "ও সব বাজে কথা। ও হলো হারামজাদীর ছেনালপনা। অকেও আমি দেখে লুব যমুনা। আমি শুনেছি—মোর এই কাটা হাতের নাম করে ও থুৎকুড়ি ফেলেছে।" ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "তুই-ই বল ই হাত গেছে অর জন্যে। সেদিন যদি মরে যেতম—সে অর জন্যে! হেই দ্যাখ মোর ঘাড়ের কোপ—হেই দ্যাখ মোর হাতের দশা।"...

ভলু থমকে দাঁড়িয়ে দেখালে। বাঁ বগলের কাছে ঝুলে আছে নতুন গজানো শুধু একটা মাংসপিণ্ড, এখনও দগ্দগ্ করছে—পিঠের দিকে ঘাড়ের কাছাকাছি কাঁধ থেকে নেমে এসেছে একটা লম্বা ফালার দাগ।

ভলু গর্গর্ করে উঠল। বললে, "সক্কলের সব বদলা আমি লুব যমুনা—হেই বলে দিলম। মুকুন্দ ফেরার। তাকেও আমি খুঁজে বার করবো।"

যমুনা বললে, "শুনেছিলম সুন্দরবনে পালিয়েছে।"

"এসেই খবর নিয়েছিলম। উদিকে যায় নি।"

"থানা কি বলে?"

"মোর জন্যে তার গরজ কি যমুনা! ইদিক-উদিক উপর উপর দু-চার দিন খোঁজ-খবর করে আশা ছেড়ে দিয়েছে।"

যমুনা চুপ করে রইল।

আড় চোখে যমুনার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে বললে, "মোর মনে হয়—হেই শালার চরের লোকগুলান তাকে লুকিয়ে রেখেছে।"

যমুনা সাফ বলে দিলে, "মোর চোখে একদিনও পড়ে নি।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

ভলু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "খুঁজে অকে আমি বার করবো।"

যমুনা চুপ করে হাঁটতে লাগল।

ভলু বললে, "শুধু নিজের দুঃখের কথাই বলছি বকবক করে। তা তোর সব খবর ভালো তো যমুনা?"

"মোর আর খবর কি চৌকিদার।" যমুনা এড়িয়ে গেল। বললে, "ভিখ-মাগা দুখের কপাল মোর।"

"হেই শুনলম—তোর কে নতুন গোঁসাই এসেছে?" ভলু চোখ টিপে হাসলো।

এতক্ষণ এই ভয়টাই করছিল যমুনা। হঠাৎ তার বুক টিপ্ টিপ্ করে উঠল। বিরস গলায় বললে, "মোর গোঁসাইদের কথা ছেড়ে দাও চৌকিদার। তারা বাউল-বৈরাগী—আজ আছে, কাল নাই।"

"বুড়া?"

"যুবা।"

ভলু চোখ মট্কে হিহি করে হাসল। বললে, "যাব একদিন।"

হঠাৎ মুখ-চোখ কঠিন হয়ে উঠল যমুনার। যেন মরিয়া। বললে, "ভাল চৌকিদার। চরের লোকগুলান তোমার জন্যে ঢের দিন থেকে মুখিয়ে আছে। তার মধ্যে আবার হাবুর দল।"

"হাবুর দল!"...

"হাবুর মামুর জন্যে!" বলে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ভলুর মুখের দিকে। চাপা গলায় বললে, "জানো নি! জানো নি—তাকে তাড়া করে নিয়ে গেলে কোথায় না কোথায়। দু'দিন পরে তার লাস ভেসে উঠল দু-কোশ তফাতে—বোড়বির টাঁকায়।"

"সে আমি কি জানি!—সে তার কিসে কি হলো—"

"আমি জানি।"

"তুই!" ভলু গর্গর্ করে উঠল।

গর্গর্ করুক—চোখে-মুখে ওর ধরা পড়ার বিবর্ণতা।

সুযোগ পেয়ে, বুকে হাঁটা সাপ যেমন মুহূর্তে ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়ায়—তেমনি যমুনাও রুখে উঠলো, "জানো না—লোকে মোকে বলে ডাইনী! আমি সব জানি।"

"কি জানিস্ তুই!" যমুনার একটা হাত চেপে ধরে ভলু গর্গর করে উঠল।

"হাত ছাড়।"

"আগে তোকে বলতে হবে।"

"চিল্লাবো চৌকিদার।" দম্ চেপে যমুনা বললে, "হেই দেখ পিছন ঘুরে—হাটের লোক এখনো আসছে।"

ভলুর বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে গেল।

ঝট্কা মেরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে যমুনা বলে উঠলো, "এতদিন হাসপাতালে ছিলে চৌকিদার—জানো না, মানুষ-জন আগুন হয়ে আছে। বাপ হাঁড়ি ভাগ করে দিলে কেন—তাও বুঝলে না!"

"আচ্ছা"! দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে ভলু বললে, "তোর ওই চ্যাংড়া ক্ষ্যাপানী গানের কথা আমিও যেয়ে বলছি থানায়।"

"বলো যেয়ে।" যমুনা বললে, "কাঙাল ফকিরের গান মোর—যখনকার যেমন, তেমন গেয়ে ভিখ মাগি।"

সামনে তে-মাথার মোড়। বাঁয়ের রাস্তা চলে গেছে চরের দিকে—ডাইনে ভলুর গ্রামের রাস্তা। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে যমুনা বললে, "এখন ঘরে যাও চৌকিদার। আর চরে যদি কখনো যাও, হুঁসিয়ার হয়ে যেয়ো।"

যমুনা ছিটকে বেরিয়ে গেল বাঁয়ের রাস্তা ধরে।

ভলু মাঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে গজরাতে লাগল।

দুশমন! তামাম দুনিয়া তার দুশমন হয়ে গেছে। তবু বদ্লার জন্য ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।...

হোক সবাই দুশমন। তবু সময়টা তার অনুকূল।

থানা-পুলিশ-চৌকিদার-প্রে সি ডে ন্ট কিছুই করতে পারলে না। গ্রামে গ্রামে নীরব প্রতিরোধ। একটা পয়সা চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় হলো না। প্রথম মহড়ায় সরকারী ইজ্জৎ একেবারে ধুলোয় গড়াগড়ি গেল। চঞ্চল হয়ে উঠল সাম্রাজ্যের শ্বেতকায় খিদমদগারের দল। প্রশাসন বিচলিত। জেলা থেকে লাল ধুলোর ঝড় তুলে ছুটল ম্যাজিস্ট্রেটের সিডান বডি কার—মহকুমায়। মহকুমা থেকে থানায় থানায়।

একদিন হুস্ করে এসে গাড়ি থামল থানার কাছাকাছি ইনস্পেকসন বাংলোর সামনে। ইয়া কেঁদো এক সাহেব—গায়ে-গতরে গাট্টা-গোট্টা, পরণে খাকী হাফ প্যান্ট—গট্মট্ করে গিয়ে ঢুকল বাংলোয়। আর্দালী ছুটল থানার দিকে। থানা ছুটলো বাংলোর দিকে।

একেবারে 'সারপ্রাইজ ভিজিট'—বলা নেই, কওয়া নেই—এসেই থানা অফিসারকে এত্তেলা। [ক্রমশ]

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ চোদ্দ ॥

ছেটকালে দাদুর মুখে গান্ধারীর গল্প শুনতাম। গল্প কিছুই বুঝতাম না, শুধু একটা বিস্ময় বিদ্যুতের রেখার মত মনে আঁচড় কাটতো. গান্ধারী। শতপুত্রের জননী। কত পুত্র, না শত-পুত্র। হ্যাঁ মা হতে গেলে অমনি। আর সংগে সংগে ছুটে আসতাম বাগানে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম কাঁঠাল-গাছটিকে। আর কোন জায়গা খালি নেই। মায়ের বুক ভরে গেছে। কোল ভরে এসেছে সন্তান। দামড়া দামড়া কাঁঠাল এ-ওর ঘাড়ে চেপে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। ছোট বলেই সেদিন কাঁঠাল-গাছের মুখে মায়ের মুখের হাসিটি দেখতে পেতাম। কতো খুশি হয়েছে গাছটি, অহংকারে, ঠেকারে মাটিতে যেন পা পড়ে না, এই না হলে মা! কেউ জানতো না, এই কাঁঠালগাছটির মনে মনে নাম রেখেছিলাম 'গান্ধারী'।

এ গল্প কতদিন ভুলেছিলাম। আজ আবার এই হলুদ দুপুরে এই মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমার কতোদিনের ফেলে আসা শৈশব, একটি কাঁঠালগাছকে ঘিরে সেদিনের বিস্ময়, দাদুর সেই শুকনো ধাঁশপাতার মত মচমচে গলা, 'গান্ধারী, শতপুত্রের জননী', সব, সব ফিরে এসেছে আমার কাছে। কি ছিল এই মাঠ, আজ কি হয়েছে। ছিল শূন্য, খাঁ খাঁ, এদিক-ওদিকে দু'-চারটে নারকেল গাছ, চরে বেড়াতো গরু, মাঝে মাঝে আসতো মোষের দল, পাশেই পুকুর, গলাটা জল থেকে বাড়িয়ে আদিমকালের একটা বিস্ময় নিয়ে ওরা ঝিম মেরে থাকতো, গাছের গোড়ায় বসে কান থেকে বিড়ি নাবাতো রাখাল, চকমকি ঠুকে বিড়ি ধরাতো, একপাশে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতো পাঁচিলবাড়ি। আজ আর সে মাঠ নেই। সে মাঠ ভরে গেছে, তার কোলে-কাঁখে এসেছে সন্তান, একটা নয়, দুটো নয়, সত্তর-আশিটা, কিংবা তারও বেশি। নতুন খড়ের চালা উঠেছে, সেই চালার ওপর এসে পড়েছে দীর্ঘ বল্লমের মত রোদ্দুরের এক-একটি ফলা, শান্ত আকাশের নিচে জননী মাঠের এ কি অপূর্ব, গরবিনী রূপ। এ মাঠের ধারে দেখছি একটি সাইন বোর্ড। তাতে লেখা, 'সুকান্ত নগরী'।

মা, মাগো, আমার কাছে তোমার কিন্তু সেই চিরকেলে নাম, সেই দাদুর মুখে শোনা মহাভারতের গান্ধারী আর কি নামে তোমায় ডাকি, তোমার বুক যে আজ ভরা, তোমার রূপ যে আজ সম্পূর্ণ! কতোদিন এই পথ ধরে আসি-যাই। কোনদিন চোখে পড়েনি। হঠাৎ একদিন যেদিন চোখে পড়লো সেদিন অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে পথে পথে ঘুরি। সেদিনও ঘুরছি। কোথায় যেন গিয়েছিলাম। ফিরে আসছি। হঠাৎ যেন দেখলাম অন্ধকার প্রান্তরে হাত পনেরো অন্তর অন্তর তিরিশ-চল্লিশটা লম্প জ্বলছে। এখানে এতো আলো কোথা থেকে এলো। এরা কারা! আশ্চর্য, আবার ট্রানজিস্টারও বাজছে। এই ভয়ংকর ঠাণ্ডা, এই হিমকুয়াশায় কাঁথা-মুড়ি দেওয়া প্রান্তর, খোলা নিরেট অন্ধকার আকাশের নিচে কার এতো সখ! মনের এ বিস্ময় নিয়ে সেদিন চলে এসেছিলাম। দু'-চারদিন পর আবার এসেছি এই হলুদ দুপুরে, এই পথে। দেখছি সারি সারি ঘর। বনফুল দেওয়া বেড়া, খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়াল, কোন কোন দেয়াল বাঁশ-বাঁকারির, তাতে অতি নিবিষ্ট হয়ে একজনকে দেখলাম বেশ পুরু করে আলকাতরা মাখাচ্ছে।

ঢালু পাড় বেয়ে নেবে পড়লাম প্রান্তরে। এক-একটা করে খড়ের ছাউনী পার হচ্ছি, হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল, অপূর্ব সুরেলা, চিকন গলা, পড়ার ভংগিটা কথক ঠাকুরের মত, শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেলাম—

> বৈষ্ণব সভায় কেনে মহা মাতোয়াল।
> ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল॥
> নিত্যানন্দ বোলে আরো
> নাড়া বসি থাক।
> কিলাইয়া পাড়ো পাছে
> দেখাঙ প্রতাপ॥
> আরে বুড়া বামনা তোমার ভয় নাই।
> আমি অবধূত—মত্ত ঠাকুরের ভাই॥

আর পড়তে দিলাম না। গলা খাঁকারি দিয়ে কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ফোঁটা-তিলকধারী, গলায় কণ্ঠি, চোখ দুটোকে সরু করে আমাকে দেখে জিগ্যেস করলো, কাকে ডাকছেন?

হেসে বললাম, আপনাকে।

কণ্ঠিধারী রসিক মানুষ, বললে, কৃষ্ণপ্রেমসুধারসে মত্ত হয়েছিলাম। এমন সময় আপনি এলেন যেন আধখানি চাঁদ। জয় গৌর। সরকারী লোক, না পার্টির?

না, না। এমনি এসেছি। সরকারের তরফেরও নই। পার্টিরও নই। এই আপনাদের দেখতে এসেছি। কেমন আছেন, কেমন লাগছে এই সব।

ও বাবা, এ যে দেখছি হেঁসেলের খবর চায়। কণ্ঠিধারী হো হো করে হাসলে।

লোকে আমাকে নিমাই বলে। পাগ্‌লা নিমাই। আমিও ন'দের লোক। সেই তিনিও ন'দের লোক। জয় গৌর। তিনিও পাগ্‌লা। কিন্তু সেই পাগ্‌লাই ত' জগৎকে রাস্তা দেখালে। কি বলেন।

চুপ করে থাকি। মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। মানুষ এতো সুন্দর, মানুষের ভাষা এতো সুন্দর, এ আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। সেই পাগ্‌লাই ত' জগৎকে রাস্তা দেখালে। ভাগ্য, আমার ভাগ্য, ভাগ্যে না থাকলে এমন সব কথা কেউ শুনতে পায়।

কৃষক সমিতি করি' মশাই। দরকার হলে লাঠিও ধরি। আমার গৌরও ত' কম ছিলেন না গো। আপনি ত' সবই জানেন।

সেই যে, বলে কণ্ঠিধারী চিকন গলায় গান করলেন—

জননী কহেন বাপ শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর
মালা আনি গিয়া॥
আনি গিয়া যেই মাত্র শুনিল বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন॥
এখনি যাইবা তুমি মালা আনিবারে।
এতো বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিলা ঘরে॥
যতেক আছিল গংগাজলের কলস।
আগে সব ভাঙিলেন হই ক্রোধবশ॥
তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙা লই হাতে॥

আমার এই ইচ্ছাময় ভগবানকে কি যে শান্ত মনে হয়। 'হাতে ঠেঙা, হা—হা, কণ্ঠিধারী হাসলো, তারপর বলল: জয় গৌর।

আপনাকে একা দেখছি। আর কেউ নেই?

কণ্ঠিধারী এইবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, আছে এক মেয়ে। ওখানে পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে। কচি হাতে লাল রুলি পরে বাসন মাজে। একদিন আড়াল থেকে সে বাসনমাজা আমি দেখে এসেছি। রোগা, দুর্বল মেয়ে আমার। এই একপাঁজা বাসন কোনরকমে হাঁফাতে হাঁফাতে নিয়ে গিয়ে ফেলল পুকুরপাড়ে। তার পর পোষের হিমে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ঝামা দিয়ে ঘসে ঘসে মেয়ে আমার বাসন মাজতে লাগলো। ঘং ঘং করে কাশছে, দুপেয়রা বাঁশের মত চেহারা, আহা, এতোদূরে থেকেও এ আমি রোজ-রোজই দেখতে পাই, সেদিন পিপুলগাছের আড়াল থেকে বাপ হয়ে এ দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখতে পারি নি, চোরের মত [illegible]

পড়ে রইলো ন'দেতে আর আপনি এখানে, এতোদূরে।

আমিও ভাবি নিয়ে আসবো। কিন্তু কি করে নিয়ে আসি বলুন। এখানে আমি একটা জায়গায় কাজ করি। খুব সামান্যই পাই। তাতে একবেলা উপোস থাকতে হয়। ভাবি নিয়ে আসি তবু। এখানে আমি একা। সত্যি কত্তে দূরে ও প'ড়ে রইলো। বড় অসহায় ও। মা টাও যদি থাকতো! গত সনের আগের সনে আকালের দিন ও ত' পালালো। তা' সে বেঁচেছে। ভালোই হয়েছে। আমার কাছে থাকতে হলে ত' না খেয়ে মৃত্যু। সবচে আগে হচ্ছে বাঁচা, তা' সে ভীষণ বাঁচা বেঁচেছে, আমার কিছু বলার নেই। মেয়েটাকে নিয়েই ভাবনা। দিনের বেলা ততো বোঝা যায় না। রাতে আমার বুকের পাশটিতে শুয়ে ঘং ঘং করে কি কাশি। মনে হয় বুকের পাঁজরা ক'টা বুঝি ভেঙে যাবে। তবু এখানে ওকে আনি কি করে? সেই খাওয়ার কথাটাই আগে। কি খাবে এখানে এসে? কি খাবে? থাক তবু, পরের বাড়িতে লাথি ঝেঁটা খেয়ে ও ত' দুটি খেতে পাবে, সবচের আগে দরকারী—বাঁচাটা। কি বলেন? আপনারা আছেন বেশ, আপনাদের ত' খাওয়ার কথা ভাবতে হয় না, বাপের এ দুঃখু আপনি কেমন করে বুঝবেন? জানেন কাকে বলে বাঁচা—

কণ্ঠিধারী একটু চুপ করলো, তারপর বুক খালি করে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হয়তো কিছু জোগাড় যন্ত্র করে যেদিন যাবো সেদিন গিয়ে মেয়েটাকে আর দেখতে পাবো না।

হঠাৎ কণ্ঠিধারী ডুকরে কেঁদে উঠলো।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না, না তা' কেন হবে। এসব আপনি ভাববেন না। আমাকে ত' দু-চারদিনের মধ্যে ওদিকে একবার যেতে হবে। আপনি আপনার মেয়ের ঠিকানা দিন। আমি ঠিক তাকে খুঁজে বার করবো।

যাবেন আপনি? কণ্ঠিধারী তাকালো আমার দিকে। আমিও তাকালাম কণ্ঠিধারীর দিকে। কণ্ঠিধারী বলল, বেশ, বেশ। জয় গৌর। তারপর লিখে দিলে তার রোগা, দুর্বল মেয়ের ঠিকানা, এখান থেকে অনেক দূরে বড়লোকের বাড়িতে লাথি ঝেঁটা খেয়ে যে হাতে লাল রুলি পরে ঝি গিরি করে মরছে।

এ সব কি! ঘরের ভেতর তাকিয়ে দেখলাম এখানে-ওখানে দু' [illegible] পোস্টার। [illegible] এক পাশে শ্রীগৌরাঙ্গের একটা ফটো।

আমার চমকে উঠলে। কণ্ঠিধারী আমার বিস্ময় বুঝতে পারলো।

বললে হেসে হেসে, তিনি গড়েছিলেন এক নতুন নদে। আমরা এখানেও গড়বো নতুন নদে। আমরা এখানে যতো হিন্দু, মুসলমান, বাঙাল, ঘটি আছি সব এক জান এক প্রাণ। সকলের এক পতাকা, কৃষক সমিতির পতাকা। সবাই এক টুকরো করে জমি পেয়েছি। এখানে আমরা গরীবেরা নতুন শহর তৈরি করবো।

কি পেয়েছে এরা? মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে কতো কি প্রয়োজন, পেয়েছে ত' মাত্র এক টুকরো জমি, তাতে তুলেছে এক টুকরো ঘর, তাতেই কি আনন্দ, কি ভরসা, বলছে, নতুন শহর গড়বো। নতুন জনপদ গড়বো।

এক টুকরো ঘর, এক টুকরো জমি এর যে কি টান, কি যে মায়া, তা' কি আমি বুঝতে পারি, আমি বড়লোক নই, তবু আমার কিছু আছে, অন্তত একটা চাকরী আছে, ভালো না হতে পারে, মাস গেলে কিছু কড়কড়ে নোট আমার জোটে, যদি সে চাকরীও যায় তবু আছে দাদা, ভাই, তারা আমাকে একবারে জলে ফেলে দিতে পারবে না, যদি ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইও হয়, তবু আমি মারা যাবো না, আমি ভদ্রলোক, শিক্ষিত, আমাকে বাঁচাতে ভদ্রলোকেরা, শিক্ষিতরা দশ হাত বাড়িয়ে সেই জল থেকে ডাঙায় তুলবে, অন্তত চারটে ছেলে পড়িয়ে আমি না খেতে পাওয়ার মত ভয়ংকর অন্ধকার থেকে বেঁচে যেতে পারি, বেঁচে গিয়ে দু'চারটে সিনেমাও দেখতে পারি, আমি এইটুকু জমি, এইটুকু ঘরের কি দাম কি করে বুঝবো?

কি করে বুঝবো বাপ হয়ে কণ্ঠিধারী এই সুদূরে কি করে প'ড়ে থাকতে পারছে তার অবুঝ মেয়েটিকে ছেড়ে।

কি পেয়েছে এরা? পেয়েছে মাত্র এইটুকু, তবু এখানেই নাকি নতুন শহর গড়বে, নতুন জনপদ তৈরি করবে।

নদে শান্তিপুরে আমি কোনদিন যাবো কিনা জানি না। গেলেও সে মেয়ের ঠিকানা কি আমি খুঁজে বার করবো। আমার অতো কি দায়। আমি যা' মানুষ, নিশ্চয় ঠিকানা হারিয়ে ফেলবো। তা ছাড়া কে কার ধারে। কণ্ঠিধারী কি এতো দিনে একটা ব্যবস্থা করে নেবে না? আমি হয়তো কোনদিন গেলাম নদেতে। সেখানে গিয়েই কি আমার মনে পড়বে সেই মেয়েটির কথা। এমন ত' কতো বাপ আছে, কতো মেয়ে আছে, তা ছাড়া এ [illegible] আমার কতো কাজ, [illegible] সংকীর্ণ, তবু কণ্ঠিধারীর মত [illegible] করে লড়ে আছে

পুরো, সে একদিকের পৃথিবী হারিয়ে অপরদিকে পৃথিবী গড়তে চায়।

চলি।

আসুন।

কাণ্ডারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে আসছি। একটা লাল মোরগের ঝুঁটি। বাপ রে, কি প্যাঁক প্যাঁক লাগিয়েছে রে বাবা! ঝুঁটির দিকে তাকাতে দেখি একটা ছ'নে ছাওয়া ঘর, ঘরের দিকে তাকাতে দেখি জল-কুমুদী ভাসা পুকুর। পুকুরের দিকে তাকাতে দেখি কাঁচা ধানের মত মুখ, কাঁচা ধানের মত মুখের দিকে তাকাতে শুনি গুন গুন গুন, কে গায় রে, গান গায় এক মেয়ে তার নিটোল পাখানি দিয়ে বাসন মাজতে মাজতে—আমি স্বপ্ন দেখি মধুমালার মুখ রে.

স্বপ্ন যদি মিথ্যারে হইত...

গলার হার কি বদল হইত রে,
লোকজন!

স্বপ্ন যদি মিথ্যারে হইত

অংগুরি কি বদল হইত রে, লোকজন!

এ কোন মানুষে! এতো গান গায় এরা কেমন করে! কি এমন ভরসা, পেয়েছে এক টুকরো জমি ওর বাপ দাদা কেউ, তাতেই এই দুপুরে রসে ভাসছে, আনন্দে গান গাইছে, আর কি সেই গান, আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখরে! ধন্য ধন্য আমি। এ যে এক ফুলে চার রং ধরেছে। এক নদীর তিন বইছে ধারা। এক অজানা মানুষ ফিরছে দেশে তারে চিনতে হয়। সেই 'তারে' চিনতেই ত' পথে বেরিয়ে আসা। এতদিন ভাকা-ভুকোয় ভুলে-ছিলাম। আজ আমার একটু একটু করে চোখ খুলছে। আর বেশি দেরি নেই। আমি এখনো ঠিক 'চেনাল' পাই নি। তাই মনের ঢুকঢুকি ঘোচে নি। কিন্তু এসব দেখে-শুনে ভরসা হয় হয়তো মনের ঢুকঢুকি আমার ঘুচবে চিরতরে।

কে বলেছে বিস্ময়ের দিন শেষ? কারা এসব বলে? আমি ত' ঘাড় ফেরাতে না ফেরাতেই দেখছি নতুন নতুন বিস্ময়। বিস্ময় ছাড়া আর কী বলি।

তুমিই ত' সেই লোকটা কি বল?

আজ্ঞে। সাধুচরণ, নতুন ভিটের পাশে এক চিলতে যে জমি, সেই জমিতে কাজ করতে করতে বলল, আজ্ঞে সেই বটে। তবে এখন অন্যজনা।

ঠিক। অন্যজন বৈকি। মুখটা অবিকল সেইরকমই, কলমের কাটাকুটি খেলা। চেহারাটাও হতচ্ছাড়া, গিঁটপাকানো খেজুর গাছের মত। কিন্তু মানুষটা আর সেই নেই। ঠিকই, এখন অন্যজনা। ভিটে তোলার ঘর পাবার পর যে সামান্য জমি বেঁচেছে তাতে আর যাই হোক অতটুকু যায় না। কিন্তু সাধুচরণ করেছে কি, এই মাটি চষেছে, বীজ বুনেছে, ফলও ধরিয়েছে। হ্যাঁ, অনেকগুলি বাঁধা কপি দেখছি গায়ে গা দিয়ে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। কঞ্চির বেড়া দেওয়া মাপা জমির কিনারে এখনো কিছু কালো হয়ে যাওয়া গাঁদা ফুল। একটা মাটির কলসী। একটা মাটির পিদীম। বোঝা যায়, ভিটেলক্ষ্মীর পুজো হয়েছে ক'দিন আগে।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে একবার সাধুচরণ একবার এই সব উপকরণগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। সাধুচরণের কোন দিকে লক্ষ্য নেই কিন্তু। সে মাথা নীচু করে জমির কাজ করে যাচ্ছে। যেন পৃথিবীতে জন্মের দিন থেকে এই কাজ সে করে আসছে। আপাতত আশেপাশে যাই ঘটুক সে এই কাজই করে যাবে। মুখে লেগে রয়েছে শীতের রোদ্দুরের মত এক চিলতে হাসি। গুন গুন করে কি একটা গানও বোধ হয় গাইছে। এই সেই সাধুচরণ, কি ছিল কি হয়েছে!

এ গাঁয়ে আছি বেশ ক'দিন হল। অনেকের সঙ্গেই আলাপ। কিন্তু সাধু-চরণের সঙ্গে কোন আলাপ হয় নি। ভিখিরীর সঙ্গে আবার আলাপ কিসের? হ্যাঁ, ভিখিরী। সত্যিই ভিখিরী। ওকে দেখতাম কখনো গঞ্জে, কখনো খেতে কখনো স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে। ভিক্ষে ভিখিরীরা করে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সাধুচরণের ভিক্ষে চাওয়ার পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ অন্যরকম।

চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি। তাল-কানা বাজিয়ে ফাটা-ফুটো তবলায় ঘা মেরে মেরে যে আওয়াজ তোলে ওর গলায় অবিকল সেই আওয়াজ। ও এসে দাঁড়াবে, বলবে, আছেন কেউ, দয়া হবে? আছেন সবাই। শত শত লোক কিলবিল কিলবিল করছেন। কিন্তু দয়া হবে এমন কোন জন আছেন? ওর দয়া চাইবার বিশেষ ভংগিটির তাৎপর্য এই। যদি কেউ থাকেন তবে দয়া করুন। কি সেই দয়া? সেটিও ভারি অদ্ভুত। আমার কাছে এসে দুঃখের কাঁদুনি গাওয়া নয়। দুটো পয়সা চাওয়াও নয়। শুধু সাধুচরণ বলবে, খাচ্ছেন খান। ভগবান আপনাকে য্যাখন দিয়েছেন ত্যাখন খান। আমার এই টিনটায় শুধু একটু ঢেলে দেন। একটু। এক চুমুক। তার বেশি নয়। বলে অবলীলায় আমার মুখের সামনে ওর শীর্ণ, শিরাবহুল হাত কাটা টিনটা এগিয়ে দেবে। ওকে দিলাম। ও এক চুমুকে খেয়ে ফেলল। মুখে কোন কৃতজ্ঞতা নেই। চা-খাওয়ার আগে বরং এক ধরণের খুশি খুশি ভাব ছিল। চা খাবার পর মুখটা হয়ে যাবে শান্ত, দৃঢ়। তারপর ও সোজা চলে যাবে সামনে থেকে। না। কাজে কাজেই থাকবে। হঠাৎ শান্ত, দৃঢ় মুখটায় আবার সেই খুশি খুশি ভাব। চোখ দুটি চকচক করে উঠবে। কিছু একটা পেয়েছে বোধ হয়। হ্যাঁ, পেয়েছে। পেয়েছে একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো। ও টান দিচ্ছে। টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। তিন-চারটি টান দেবার পর মুখখানাকে কুৎসিত করে ওটা ফেলে দেবে। আশেপাশে বাড়ি-ঘর আছে। সাধুচরণকে লক্ষ্য করে করে দেখেছি, ও কখনো চাল বা আটা ভিক্ষে চায় না। ভাত কিংবা রুটি, এই ওর চাহিদা। চাল বা আটায় ঝঞ্ঝাট যথেষ্ট। চাল আনলে ফোটাতে হবে।...তার জন্যে নানা ব্যবস্থা করতে হয়। এতে সময়ও যায়। আটা আনলেও তাই। উনুন করো। লেচি করো। সেঁকো। চাটু জোগাড় করো। বিস্তর ঝামেলা। এমনও দেখেছি, কেউ খাবারের ঠোঙা ফেলে দিয়েছে। সাধু-চরণ সংগ্রহ করেছে সেই ঠোঙাটি। তার গায়ে হয়তো রসগোল্লার রস লেগে রয়েছে, অথবা মিষ্টির কুচি। সাধুচরণ চেটে চেটে খাচ্ছে। হয়তো খড় বিক্রীর গাড়ি ঘর ফিরছে। দুপুরবেলা। একটা গাছের নিচে তারা আণ্ডট কলাপাতায় ভাত, তরকারী খাচ্ছে। সাধুচরণ সামনে এসে দাঁড়াবে, কোন লজ্জা, সংকোচ নেই, সহজ, স্বাভাবিকভাবেই বলবে, যেমন খাচ্ছো খাও। ওই একটু যাহোক এই টিনটায় ফেলে দাও। বুঝলে?

শোওয়াটাও অদ্ভুত। এই দারুণ শীতেও দেখেছি নির্বিবাদে একটা গাছের নীচে ছেঁড়া কম্বল মাথামুড়ি দিয়ে জড়িয়ে সারা রাত পড়ে আছে। জিগ্যেস করে জেনেছি, ও এখানকার লোক নয়। কেমন করে নানা ঘাটে ভাসতে ভাসতে এখানে জুটে গেছে আর কী। ভিখিরী সম্বন্ধে এর বেশি কি জানার আছে? আমিও আর কিছু জানতাম না।

বাবু, আমি বলে দিতে পারি, আপনি কি ভাবতেছেন।

কি ভাবছি বলো ত'।

ভাবতেছেন সাধুচরণও আবার ঘর পেল।

ঠিক। আমি তখন থেকে ও কথাটাই ভাবছিলাম।

সাধুচরণ খেত থেকে উঠে এলো। তার হাতে মাটি লেগে রয়েছে। সেই মাটিমাখা হাতখানি দিয়ে ও ঘামেভেজা মুখটা পুঁছে নিলো। তারপর এক গাল হেসে বলল, সুধোলেন না ঘর কি করে তৈরি করলাম?

হ্যাঁ। তাই ত'। ঘর কি করে তৈরি করলে সাধুচরণ?

এই দেখুন। যদ্দিন ঘর ছিলো নি, ইদিক-সিদিক ভিখ মেঙে মেঙে পোড়া পেট

কইরতো। আপনিও কইরতেন। যাঁহা এই ঘরটো তুলেছি, মাথা গোঁজবার একটা জায়গা পেয়েছি, অমনি লোকের কথা বলার ঢংটিও পাল্টে গেছে। আপনিও আমাকে 'তুই তুই' বইলছেন না গো। বইলছেন তুমি। ব্যাপারটা বুইঝেছেন ?

বলতাম নাকি সাধুচরণকে তুই ? কে জানে হয়তো বলতাম। সাধুচরণ কেন মিথ্যে বলবে ? 'তুই' বলাই ত' স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আমি 'তুমি' বলছি। তুই থেকে তুমি তে প্রমোশন পেয়েছে সাধুচরণ। ঘর কি করে তৈরি করলে সাধুচরণ ?

সাধুচরণ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, হ্যাঁ, এই কথাটাই ত' চাইছিলাম আপনার ঠেঁয়ে। কি করে কইরলে? সাধুচরণ ভিখিরীর বেটা ভিখিরী, তুমি কি করে ভিটে টো তুললে? শুধু তাই না, আবার পুজো কইরলেত বামুন নে এসে। শুধু তাই না, জমিতে চাষ নাগালে! কি করে কইরলে হে? হ্যাঁ, নিচ্চয়, নিচ্চয় একথা জিগেস কইরতে পারেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ভারি খুশি আর ঝলমলে এখন দেখাচ্ছে সাধুচরণকে। গলগল করে কতো কথা বলে যাচ্ছে। একটা একটা কথা বলছি। ও জবাব দিতে গিয়ে চারটে চারটে কথা বলছে।

জমি দেলে সরকার। দখল নিলে কিষক সমিতি। সকলের সংগে আম্মোও পেলাম এক টুকরো। বুইঝলেন? তাবপর শালা গালে হাত দে বসে বসে ভাবছি এখন কি করি। আশপাশে যারা ঘর ছাইছেল তারা বললে, কি হে, বসে বসে কি ভাবছো ? কি আর বলি, বন্ধু, ভাবন লেগেছে হে, তাই ভাবছি। কিন্তু কতোক্ষণ ভাবা যায়। ইদিকে ওরা তাড়াতাড়ি ঘর তুলে ফেইলছে। আমার কান্ড দেখছে আর মিটি মিটি হাসছে। মন খারাপ করে বসে রইনু। তারপর ওদের ব্যাথন হয়ে গেল ত্যাখন কিছু বইলতে হল নি। এক-জন দুজন দেল খড়। কেউ দেল প্যাকাটি, গোবর, মাটি। কেউ দেল ঝাড়ের বাঁশ। এসব নে আমি কি করবো, বন্ধু ওদের, ওরা হাসলো, বলল, খালি বসে বসে গতরটিই করেছো, কোন কাজই জানো না, তা' না জানো, মাটি বইতে পারবে তো, বললাম, না পারবো কেনে। তবে তাই করো, ওরা বললে। একজন বুড়ো আবার বললে, আমি তোর ঘর নতুন খড় দে এমন ছেয়ে দোব দেখবি তোর ঘরটা রোদে চকচক করবে সবচে বেশি। বুঝলেন ?

তারপর একটু থেমে সাধুচরণ হেসে কেমন করে যেন বললে, এই ঘরটা ব্যাখন হল, কি বললেন, হ্যাঁ বাবু, ভিখিরী আমাকে আর বইলবেন না কি গো' বলুন আর বইল্‌বেন ?

আমি অভিভূত হয়ে ওর কথকতা শুনছিলাম। আমার শুক্‌নো চোখেও জল এসে গেল। কোনরকমে সামলে নিয়ে ধরা গলায় বললাম, না সাধুচরণ, তা' কেন বলবো ? আমি কেন, কেউ বলবে না। কেউ বলতে পারবে না।

তবে ? উল্লাসে সাধুচরণ উঁচু-নিচু মাটির ওপর একটা ডিগবাজী খেল। ওই ওদের রীতি। আনন্দ জানাবার অন্য ছলাকলা ওরা জানে না। এক্ষুণি হয়তো কোদাল দিয়ে একটা পড়ে থাকা গাছের কান্ডকে কেটে ফালা ফালা করে ফেলবে।

দূরে, মাথার ওপর, দিকচক্রবালে আজকের প্রসন্ন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বুক-ভরা সিঁদুরে দাগ নিয়ে জল-হারা মেঘ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে। কয়েকটি শাদা শাদা বক ধান-কাটা মাঠের পড়ন্ত রোদ্দুরে চুপচাপ বসে। পৃথিবীতে কোথাও ব্যস্ততা নেই। তাড়া নেই।

এই ছবি দেখে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে সাধুচরণকে বললাম, সাধুচরণ, যে ভিক্ষে নেয় সেই ত' ভিখিরী। যে দেয় সে ভিখিরী না। তোমাকে সবাই সব দিলে। কেউ দিলে উলুখড়, কেউ প্যাকাটি, গোবর। কেউ পরিশ্রম আর ঘাম। বুড়ো লোকটা আবার তোমার ঘরটাও ছেয়ে দিলে। এতসব সবাই দিলে। তুমি সবার কাছ থেকে নিলে। তুমি কি দিলে এসবের বদলে সাধুচরণ? কি দিলে ?

সাধুচরণ একটুয়ো ঘাবড়ালো না। আমার প্রশ্নটা ওপর ওপর যতো নিরীহই দেখতে হোক, ওর মধ্যে ছিল একটু বক্রতাও, আমার এ প্রশ্নের দাঁত আর নখ কম ছিল না।

কিন্তু সাধুচরণ জবাব দিলো গাঢ় কণ্ঠে, দিন তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ওরা চাইবার আগেই পাবে। কিষক সমিতির লোকজনেরা বইল্‌ছে সামনে ঝড় আস্‌তেছে। কোটালের বান। সেদিন নাকি আসল হিসেব নিকেশের পালা। আমি মুরুখ্যু মানুষ। ওদের কথা অতোশতো বুঝি না। কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছি। যাদের এই সব জমি-টমি যাচ্ছে তারা এখন চুপ করে থাকলেও, সাপের মত দাঁতে দাঁতে ঘসছে, সময় পেলেই মারবে ছোবল। সেদিনের জন্যে আমার এই জানটা জিম্মা রইলো মশাই। সাধুচরণ আর যাই হোক নিজের ভিখিরী নামটা ঘোচাবেই।

চিনি না। সম্পূর্ণ অন্যরকমের সাধুচরণ। সেদিন যে লোকটাকে আমি দেখেছি কুঁকড়ে মুকড়ে থাকতে, বিড়ি, সিগারেটের টুকরো জোগাড় করতে, এঁটো পাতায় চাটতে, আজ নিজের পায়ের ওপর সেই লোকটাই সোজা ভাবে দাঁড়াতে চাইছে, শুধু তাই না, বায়ু-কোণে যে অদৃশ্য মেঘ জমছে আকাশের স্তরে স্তরে; থেকে থেকে বিদ্যুত চমকাচ্ছে, সে সম্বন্ধে সে তার জ্ঞানবুদ্ধি মত হুঁশিয়ার আছে, আর সেদিনের মোকাবিলা করবার জন্যে সেও যে প্রস্তুত তার তীব্র অংগীকার বজ্ররবে সে আমাকে জানিয়েও দিলো, 'সেদিনের জন্যে আমার এই জানটা জিম্মা রইলো মশাই'.—অপূর্ব, অদ্ভুত!

ফিরে আসছি। আর একবার তাকালাম পেছন ফিরে।

গড়ানবেলায় পড়ন্ত রোদ্দুরের ছড়িয়ে পড়া আলোর নিচে নিস্তব্ধ খুশির মত দাঁড়িয়ে আছে খড়ের চালাচিত্রগুলি। পুকুরপাড়টি বেলাশেষেও এখনো জম-জমাট। মেয়েরা সুর তুলে তুলে বাসন মাজছে। কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে আঁকা-বাঁকা ভংগিতে। কেউ চান করছে। ছুটে ছুটে যাচ্ছে আলুথালু মা, তার আঁচল ধুলোয় লুটোয়, সে ডাকছে, ওরে দাস, ওরে যম, ওদিকপানে যাস নি বাবা, ছেলেটা টলতে টলতে হাসছে, হাসতে হাসতে টলছে, মুখে বলছে অনবদ্য ভংগিতে হাত নেড়ে, না, না, না। যে লোকটা ঘরের গায়ে একটু আগেও আলকাতরা মাখা-চ্ছিলো, কাজ শেষ করে সে পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে।

আর একটু পর বনঝোপের মাথার ওপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াবে ধূপছায়া সন্ধ্যা। একটু একটু করে নামবে অন্ধকার। দিনের সব কাজ শেষ করে মানুষ ফিরবে ঘরে। একটু রং তামাসা করবে। কেউ তাস খেলবে। কেউ পাশা। তারপর ঘুমোবে। তখন নিকষ কালো আকাশের নিচে সমস্ত চরাচর পাহারা দেবে নক্ষত্রেরা পাশ ফিরতে ফিরতে। মানুষ, আকাশ, নদী, নক্ষত্র, ঘাস, শিশির সমস্ত একাকার হয়ে যাবে।

আমি আরো একবার ফিরে তাকালাম। চারিদিকে এতো শান্তি, এতো সুখ দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এখানে এতো সুখ, এতো শান্তি এদের সইবে না। কাল সকালেই এখানে রক্ত ঝরবে।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

সকালবেলা বীট অফিসারের কোয়ার্টারে বসে আলাপ হচ্ছিল। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা কোয়ার্টারের সামনেই। নতুন পাতাগুলি যেন আলোয় ডগমগ করছে। উচ্ছল খুশিতে। বীট অফিসারের খাকী হাফপ্যান্ট পরনে, হাতে কব্জিঘড়ি। বেশ সুপুরুষ, চওড়া বুক। সুন্দর স্বাস্থ্য। বেলা আন্দাজ আটটা সাড়ে আটটা হতে পারে। বেশিও হতে পারে। ফরেস্টের মধ্যে সময় বোঝা যায় না। যেন পৃথিবী থেমে আছে। যেন একটা নৌকো নোঙর করে আছে। স্থির নৌকো। তার মধ্যে বসে বসে তীরের শোভা দেখছি।

সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছোট চারাটার দিকেই ছিল আমার নজর। আমি একটা ইজি চেয়ারে বসে ছিলাম। বীট অফিসার একটা বেতের মোড়ায়। হাতে চায়ের কাপ। বেশ ধোঁয়া উড়ছে। বীট অফিসার কিন্তু বড় বড় চুমুকে সেই গরম চা খেয়ে শেষ করে দিয়েছেন। এইমাত্র তিনি পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন নিচে।

আমার চুমুকে দেওয়া চলেছে। বললুম, ওই গাছের চারাটা কতদিনের হবে?

আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তিনি দেখলেন চারাটাকে। বললেন, ওটা কৃষ্ণচূড়ার চারা। বছর দুয়েক এখনো হয় নি। বোধ করি বছর দেড়েক হয়ে থাকবে।

ওতেই এত বড় হয়ে গেছে?

ফরেস্টের এসব অঞ্চলে গাছ একটু দ্রুতই বড় হয়। আর এরকমের গাছ ডুয়ার্সে পাবেন অনেক। বনে বনে তো পাবেনই, পথে-ঘাটেও অনেক দেখতে পাবেন। তা ছাড়া আরেক শ্রেণীর গাছ আছে—অনেকটা এই রকমই দেখতে। তাদের বলে রাধাচূড়া।

রাধাচূড়াও আমি দেখেছি।

কৃষ্ণচূড়ারই মত লাল ফুল ফোটে আরো একরকমের, বলুন দেখি কি হতে পারে?

আমি অনেক চিন্তা করে বললাম, ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন। গুলমোর। কেউ কেউ গোলমহরও বলেন। ভারি সুন্দর লাল। টকটকে আগুনের রঙ অথচ গাঢ় রক্তবর্ণ। ডুয়ার্সের অনেক জায়গাতেই দেখবেন এ-জাতীয় ফুল ফুটেছে রাশি রাশি। অনেকেই অবশ্য যাঁরা জানেন না তাঁরা এদের কৃষ্ণচূড়া বলে ভুল করেন।

একটু থেমে বললেন, বাস্তবিকপক্ষে বন থেকে কুড়িয়ে এনে যত্ন করে কেউ যদি এদের লোকালয়ে বসিয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয় তাঁদের সৌন্দর্য-দৃষ্টির প্রশংসাই করতে হবে। ডুয়ার্স বুনো অঞ্চল, গাছপালা আর বনজঙ্গল নিয়েই তার ষোল আনা ইতিহাস। মানুষ এসেছে তারপরে। তাঁদের রাস্তার জন্যে, বাড়ি লোকালয়ের জন্যে অনেক গাছপালা, বন-জংলা কাটতে হয়েছে। কিন্তু তবু যত্ন করে সেই গাছপালাই এনে লাগিয়েছে তার পথের ধারে ধারে, তার বাড়ির আশেপাশে।

আমার মনে আসছিল দিনকতক আগের কথা। সরস্বতীপুজোর দিনকয়েক আগে আমাকে একবার পলাশবাড়ির দিকে যেতে হয়েছিল। চলমান রাস্তার ধারে ধারে আমি দেখছিলাম প্রকৃতির অগাধ দাক্ষিণ্য। ফালাকাটা পার হয়ে আমাদের জীপগাড়ি চলেছে তখন পলাশবাড়ির দিকে। যেতে যেতে দেখলাম বড় বড় গাছে রাশি রাশি পলাশ ফুল ফুটে আছে। টকটক করছে রাঙাবরণ রৌদ্রে। চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। যেন আগুন লেগেছে গাছে গাছে। শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় সেই জ্বলন্ত মশালের জেল্লা। যত সব মরাগাছের ডালে ডালে, নাচে আগুন তালে তালে—আমার রবীন্দ্রনাথের গান মনে আসছিল। পলাশের রাঙাবরণ ফুলের আগুনে আমার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটছিল। একটা সিগারেটের দোকান দেখে আমাদের জীপ থেমেছিল। আমরা ক'জন নেমে গিয়ে ক'টি ফুলন্ত পলাশের ডাল ভেঙে এনেছিলাম।

আর শুধুই কি পলাশ?

সারাটা বসন্তকাল ধরে ধীরে ধীরে রং-বার মত দৃশ্য। বাসে যেতে যেতে দেখবেন দু'ধারে অগণিত বৃক্ষশাখায় ফুটেছে নানা রকমারী ফুল। তাদের কত বিচিত্র রঙের লাবণ্য! দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ফাল্গুনের শেষাশেষি আমাকে ধূপগুড়ির এক গ্রামে যেতে হয়েছিল। সারা ফাল্গুন জুড়েই ডুয়ার্সে নানারকমের ফুল ফুটছে। কালো জামগাছ কিছু আগেই জীর্ণ পাতা খসিয়ে ফেলে শুচি হয়েছে। কচি পাতাগুলি চকচক করছে ফাল্গুনের প্রথম দিক থেকেই। বনকাঞ্চনের ডাল ভরে ফুটেছে অজস্র কাঞ্চন ফুল। ছেয়ে গেছে পাহাড়ী প্রান্তরের চারদিক। হাঁটাপথে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে যাবেন হয়ত গভীর মধ্যাহ্নবেলায় কিংবা জ্যোৎস্না রাত্রে একটা ডাগর মিষ্টি গন্ধ ছুটে এসে মুহূর্তে আপনাকে বিহ্বল করে তুলবে। সে বনকাঞ্চনের গন্ধ। তোরসার ভাঙাচুরা পারে বসুন, জল এদিকে নেই বললেই চলে। পিছন দিকে তাকালেই চোখে পড়বে পাথরের উপরে রাশি রাশি বনকাঞ্চনের পাপড়ি। তাদের কোনটি সাদা, কোনটি বা লাল। রেন-ট্রি গাছগুলো পাতা ঝরিয়েছে মাঠের শেষ দিকেই। চৈত্রের শেষাশেষি ফুটবে রাধাচূড়া, গোলমোহর, কৃষ্ণচূড়া। হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখা যাবে রাস্তার ধারে ধারে সবুজ গাছে পাতায় একটি-দুটি লাল রঙের কলি জেগে উঠে চেয়েছে। যেন কেউ-না-কেউ এক-আধটি প্রদীপ দিয়েছে জেলে। তারপর ক'দিন যেতে-না-যেতেই ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে সব গাছের মাথায় মাথায় রক্তবর্ণ ফুলের মেলা। যেন রাশি রাশি খুন হয়ে গেছে। লাল—শুধু লাল রঙের বন্যা চারদিকে। অথবা কেউ যেন কাউকে সাবধান করে দিতে লক্ষ লক্ষ রক্তবর্ণ নিশান উড়িয়ে দিয়েছে।

বীট অফিসার বলছিলেন, এমন সুন্দর রঙের বন্যা খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। চোখের সামনে একদিনের পর একদিন যেন রঙ বদল হচ্ছে। আজ সকালে উঠে যতটুকু দেখেছেন, কাল সকালে মনে হবে তার চাইতে বেশি। যেন কেউ নিভৃত শিল্পী

আর তার শাখায় শাখায় যেন ক্যানভাসে ছুল বুলোচ্ছেন তিনি অদৃশ্যে থেকে।

হঠাৎ থেমে বললেন, আলিপুরদুয়ার গিয়েছেন?

বললাম, রাস্তা দিয়ে যাবার সুযোগ হয়েছে। থাকা হয় নি।

দেখেছেন তার রাস্তার ধারে ধারে কত কী গাছের মেলা? একটু থেমে তিনি বললেন, বেশির ভাগ গাছই কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ও গুলমোর শ্রেণীর। বসন্তে যখন ফুল ফুটতে শুরু করে, তখন আচমকা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ভুল করে কোনো জাপানী শহরে এসে পড়েছি।

আমি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি। বললাম, বসন্তকালে মধুবাগানের চেহারাটা দেখেছেন? চা-বাগানের সারি সারি কোয়ার্টারগুলির সামনে দিয়ে দীর্ঘ সারি কৃষ্ণচূড়া না গুলমোর।

এ সব কিছুতেই কিন্তু রুচির ব্যাপার। আর এই রুচির প্রথম প্রকাশ দেখিয়েছিল ডুয়ার্সের সাহেব-কর্মচারীরাই। এস-ডি-ও বলুন, ম্যাজিস্ট্রেট বলুন, শাসনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরাই বাড়তি এসবে ঝোঁক দেখাতেন। জীবনীশক্তিই ছিল তাঁদের আলাদা। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সাত-সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যাঁরা আসতেন, তাঁরা কিন্তু একেবারে চাকরি-সর্বস্ব মানুষ ছিলেন না। জীবনীশক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর ছিলেন ও'দের অনেকেই।

আমি বললাম, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও উৎসাহ হারিয়েছি। নিজের দেশকে আমরা ততটা দেশ বলেই ভাবি না। যেন দিনগত একটা চাকরির রক্ষার তাগিদে সময় কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া কিছু নয়।

বীট অফিসার বললেন, অনেকদিন পরে আজ আপনার সঙ্গে গল্প করতে বসে কী ভালোই যে লাগছে! অনেকদিন এমন মন খুলে কারো সঙ্গে কথা বলি নি।

কিন্তু আমাকে যেতে হবে আজই।

বসুন না আরো খানিক। আপনি তো যা জানালাম, দেখা যাচ্ছে আপনার চালচুলো কিছুই নেই। তবে আর এত তাড়ার কি আছে?

হেসে বললাম, না, আপনার উক্তির সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। চালই না হয় নেই, কিন্তু তা বলে চুলো নেই, একথা ভাববেন না। আমার মত ভবঘুরে লোকের ঘরে ঘরে চুলো আছে, তা জানেন?

উভয়ের গলা মিলিয়ে একসাথে উচ্চ অট্টহাসি।

হাসি থামলে তিনি বললেন, আপনার কি খুবই তাড়া আছে? তা যদি না থাকে তো থেকে যান না আজকের দিনটা। গৃহিণীর দৌলতে আমার ঘরেও চুলো জ্বলে, না, আটকাবেন না। আমাকে আজ বেরিয়ে পড়তেই হবে। একটু কাজের তাড়া আছে।

তা হলে যাবেন দুপুরের পর এখান থেকে খেয়ে-দেয়ে। আমি মোটরবাইকে করে নিজে আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসব।

অগত্যা স্বীকৃতি। চায়ের কাপ শেষ করে দিয়েছি। আরাম চেয়ারে পিঠ দিয়ে আয়েস করে বসলাম। বললাম, বলুন তা হলে। আপনি তো বনজঙ্গলের রাজা—আপনার কাছেই তা হলে বনজঙ্গলের কিছু শোনা যাক।

বীট অফিসার খানিক চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, দেখুন, বনজ প্রকৃতির কথা বলছেন। নিশ্চয়ই জানেন গাছপালা বন চিরকাল ছিল আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে। আম্রকুঞ্জ ছিল দেশে। পান্তাভাত খেয়ে দুপুরবেলা আম্রকুঞ্জে গিয়ে শুয়ে থেকেছি আমরা। বর্তমান সভ্যতার দান খরা ও শুষ্কতা। সন্ধ্যায় চামেলী ফুটত আমাদের বাগানে, ভোরবেলায় মল্লিকা। বুদ্ধগয়ায় ছিল অক্ষয়বট, পুরীর সিদ্ধ বকুল, বিক্রমপুরের রামপালের গজারী গাছটির কথাও অনেকে ভোলে নি বোধ হয়। যতদূর জানি অনেক গাছ বাইরে থেকেও এসেছে। যেমন ধরুন গুলমোরের কথা বলছিলেন। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যায়, গাছটি এসেছিল নাকি ম্যাডাগাস্কার থেকে। জংলি বাদাম যতদূর জানা যায় নাকি ব্রেজিল থেকে। রেনট্রিকে বাংলায় বলে বিলিতি শিরীষ—আসে মধ্য আমেরিকা থেকে।

আমি বললাম, ডুয়ার্সের বনে কি কি গাছ আছে?

গাছ অনেকরকম আছে। বলতে গেলে ডুয়ার্সের বনে নেই এমন গাছ খুব কমই আছে।

উনি এতক্ষণ পরে যত্ন করে পকেট থেকে একটি বিড়ি বার করে ধরালেন। কথার মধ্যেই বললেন, কিছু ভাববেন না। বিড়ি একটা টানতে না পারলে আমার মেজাজ খোলে না।

আমি বললাম, কুছ পরোয়া নেই। চলুক না।

তিনি ধোঁয়া ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে বলতে আরম্ভ করলেন, সব গাছই যে সমান দামী তা নয়। আর সব গাছের দিকে আমাদের তেমন দৃষ্টিও নেই। শুধু যেসব গাছ বেশি পেয়িং, সেগুলির দিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। ডুয়ার্সে আছে বহেরা, বোগারি, বট, চাপ, চেন্টনাট, ডবডাবি, গাব, গাম্বারি, গামারি, ঝাউ, খয়ের, খামারি, কিন্দু, লাম্পাতিয়া, লালি, মাদার, ময়না, নিম, জলপাই, পাকুড়, সিধা, সিমুল, শিশোদি, শিরীষ, সজনে, শিশু, সিন্দুরিয়া, তাল, তেতুল, টুন, উদাল, বোর প্রভৃতি নানাশ্রেণীর গাছ। ফলের গাছও আছে নানারকমের। আম, আনারস, সুপারী, কাটাল, তিস্তার চরে জন্মায় বাঁশি জাতীয় ফল। এ-ছাড়াও আছে বেলগাছ, চালতা, ডালিম, গোলাপজাম, জামির, জম্বুরা, জলপাই, কামরাঙ্গা, খরমোজা, কলা, আতা, কালোজাম, নানা রকমারি কাগচি লেবু, লিচু, কমলালেবু, পেয়ারা ইত্যাদি।

গাছের কথা গেল। এবারে আসছি অরণ্যের প্রাণিজগতের কথায়। ডুয়ার্সের বক্সা ফরেস্ট অঞ্চলে ও বক্সা পাহাড়ে আছে অনেক বানর। আলিপুরদুয়ার, ভালকা তহশিল এবং জলঢাকা নদীর পূর্বতীরবর্তী অরণ্যে আছে সাধারণ ভালুকের জাত, ইংরাজিতে যাদের বলা হয়েছে 'কমন ইণ্ডিয়ান স্লোথ বিয়ার'। এ ছাড়াও আছে 'হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার'—এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বলে ভাল্লু। 'হগ্-ব্যাজার'কে এ অঞ্চলের মানুষ বলে খুদখুদি ভালুক। ছোট পাহাড়ী নদীগুলির মধ্যে অনেক সময়ই আছে উদ, ইংরাজিতে বলে 'অটার'। এতদঞ্চলে সবচাইতে বেশি আছে বাঘ। 'লিওপার্ড' প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়—এরা বলে নক্রা বাঘ। বক্সা অঞ্চলের পাহাড়ে আছে আর একরকমের 'ক্লাউডেড্ লিওপার্ড'। হাপা নামে আছে 'লিওপার্ড ক্যাট্'। 'ভার-বেলি' বলে জংলি বেড়ালকে। হিংস্র বনকুকুরও আছে বনের মধ্যে। নেটিভ্ ভাষায় এদের বলে কুহক। এ-ছাড়া আছে খেঁকশিয়ালী। তিস্তার জলে অনেক সময় ভেসে বেড়াতে দেখা যায় শিশু—ইংরাজিতে যাদের বলে 'পরপাস্'। মুজনাই নদীতে এককালে ছিল খুবই বেশি পরিমাণে ঘড়িয়াল। খরগোসকে এখানে বলে শেশা। হয়ত শশক থেকে এসে থাকবে শব্দটা। এ অঞ্চলের বনে বনে মেলে হাতী। হাতীর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কি জানেন তো? 'এলিফাস্ ইণ্ডিকাস্'। রাইনোসেরাস প্রচুর আছে বনে বনে। ভয়ানক হিংস্র আর একগুঁয়ে। রাইনোসেরাসেরও বৈজ্ঞানিক নাম 'রাইনোসেরাস ইণ্ডিকাস্'। এগুলি আরো আছে কয়েকরকমের। এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা বলে কুকুগেরা। বড্ড রাফ্ এবং খুবই বদমেজাজি ধরনের। দলগাঁও ফরেস্টের ভিতরে রাইনোসেরাসের আরেকটি স্পেসিস্ দেখা যেত—'রাইনোসেরাস্ মালয়ান'—এ অঞ্চলের নাম ঢেপ্গচেঙ্গা গেরা। আকৃতির দিকে খাটো, কিন্তু এটিও খুব বদমেজাজি প্রাণী। জংলি শূকর আছে অনেক। অনেক উপজাতির মধ্যে এদের শিকার করে মাংস

পিগ্'-এর কথা। এ-ছাড়াও আছে 'পিগমি হগ্', তা-ও নাকি [illegible]—আলিপুর অঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। জলদাপাড়া নামে বন্যপ্রাণী-সংরক্ষিত বনগুলিতে বেশ আছে। তোর্সা এবং রায়ডাক নদীর অধ্যবর্তী পাহাড়-শ্রেণীর পাদদেশে থাকে এই জাতীয় শুয়োরো বনগুলো। জংলি মোষ এককালে খুব ছিল। এখন লোপ পাচ্ছে বলে মনে হয়। শম্বর আছে, আছে 'স্পটেড ডিয়ার' নামে চিতল হরিণের দল। এছাড়াও হরিণের আরো কয়েকটি শ্রেণী—'হগ্ ডিয়ার', 'সোয়াম্প ডিয়ার', 'বার্কিং ডিয়ার' ইত্যাদি।

বললাম, পাখিদের কথা কিছু বলুন।

শুনলুম, বললেন তিনি আমাকে। তারপর একটানা বলে যেতে লাগলেন, আছে ভারতীয় পাখি ময়ূর। জলদাপাড়া এবং তোর্সা নদীর পুব দিককার জঙ্গলে ময়ূর বেশি আছে বলে মনে করা হয়। বনে-জঙ্গলে আছে নানা রকমারি পায়রা, বনচিড়িয়া, চক্রচম্পা নামে এক জাতীয় পাখি—ইংরাজিতে বলে 'ইণ্ডিয়ান বাসটার্ড'। তিতির পাখি আছে, আছে রকমারি কোকিল, বনমুর্গী, জংলি রাজহাঁস, টীল্ জাতীয় পাখি—অর্থাৎ 'ব্লু-উইংড্ টীল্', 'সাধারণ টীল্', 'হুইস্লিং টীল্' এবং 'কটন টীল্'। হরিয়াল বা হরিতাল নামে পরিচিত পাখিও খুব দেখতে পাওয়া যায়—ইংরাজিতে বলে 'গ্রীন পিজন্'। হুর্কুস্ নামে এতদঞ্চলে পরিচিত 'ইম্পীরিয়্যাল পিজন্'ও এখানকার বনে বনে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় নদীর ধারে অথবা ঝিলের পাশে দেখতে পাবেন গাঙ্গ-তিতি। শীতে উড়ে আসে পাহাড় থেকে নানারকম পাখি। জলঢাকা, তোর্সা, রায়ডাক কিংবা তিস্তা নদীর চরে দেখতে পাবেন গাঙশালিক আর চখাচখির মেলা। মাথার উপরে সন্ধ্যেবেলা দেখবেন আকাশ-দরিয়া সাঁতরে চলেছে স্বাধীন টিয়ের ঝাঁক। থাকে-থাকে দল বেঁধে ওড়ে, আর এক আশ্চর্যরকমের ডাক শুনে চমকে উঠবেন।

শুনতে শুনতে আমি মনোরমার কথা ভাবি। মালবাজারের দিকে বিয়ে হয়েছে ওর। আজ অনেক বছর। স্বামী ওর কাজ করে এক চা-বাগানে। বাগানের কোয়ার্টার পাওয়া যায় নি তখনো। আগের ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন। কিন্তু পরিবারের লোক এখনো রয়েই গিয়েছেন বাগানে। মনোরমাকে তাই বাসা ভাড়া করে মালবাজারে থাকতে হচ্ছে। ইস্কুল আছে ওখানে। মনোরমার এক পিসতুতো ভাই সে স্কুলের মাস্টার। মনোরমার স্বামী তাঁরই অনুরোধে [illegible] দিয়েছে [illegible] এক-আধ দিনের জন্যে আসে [illegible]। আর বলে, দোষ, কোয়ার্টারগুলো [illegible] চলছে না। আমরা কিন্তু [illegible] তার গা-সওয়াই হয়ে আছে।

মনোরমার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু আজো সে একেবারে ছেলেমানুষ। রাতে শুয়ে তার ভয়-ভয় করে। আমাকে বলেছিল, জানেন দাদা, এখানে যে কী সব পাখি! রাতে তারা অদ্ভুত শব্দ করে। আর তা শুনতে-শুনতে প্রায় বুক কেমন করে।

পাখির ডাক আর মনোরমার।

একদিন অনেক রাতে কি কারণে বুঝি ঘুম ভেঙেছিল। স্বামী আর আসে নি। শেষরাতে একটা অদ্ভুত পাখিকে ডাকতে শুনল। অমন ডাক আর কখনো শোনে নি। অনেক দূর থেকে প্রথম ডাকটা শুনতে পাওয়া গেল। তখন অবশ্য আবছা ভোর-ভোর। গাছপালার অন্ধকার ফিকে হচ্ছে। ক্লুপ্ ক্লুপ্ ক্লুপ্ ক্লুপ্...ডেকে উঠল পাখিটা। তারপর হঠাৎ যেন পাখিটা ডাকতে-ডাকতে চলে গেল সবুজের পাশাপাশি এক চিলতে মাঠটায়। ডাকটাও আরো তীব্র। যতবার পাখিটা ডাকছিল, ততবারই কোন কাছে থেকে আরেকটা পাখি সাড়া দিচ্ছিল, ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্...। মনোরমা ভয়ে জড়সড় হয়ে শুয়েছিল। আমাকে পরে বলল, কী যে অদ্ভুত পাখিটা! অমন ডাক যদি কখনো শুনতেন!

বীট অফিসারের কথা শুনতে শুনতে আমি মনোরমাকে ভাবছিলাম। এক পলকের জন্যে।

আলিপুরের আমার এক বন্ধুর পিসিমার বাড়িতে এক রাত কাটাতে হয়েছিল। সেখানে শুনেছিলাম সন্ধ্যের ঠিক পর-পরেই রেললাইনের ওধারে অদ্ভুত একটা ডাক। অনেক দূর থেকেই অন্ধকারে শব্দটা উঠছিল। যেন তীক্ষ্ণ গলায় কোনো একটা অদ্ভুত হাসি। পিসিমা বলছিলেন, রাতবিরেতে জঙ্গলে হায়নার ডাক ওটা।

অদ্ভুত দেশ ডুয়ার্স। জঙ্গলে কত কী বিচিত্র প্রাণী। দিনে এখানে-ওখানে মানুষজনের বসতি। বাজার-হাট জমে। অফিস-কাছারী। আর রাত হলে বনে-জঙ্গলে অদ্ভুত পাখির ডাক। হায়নার হাসি। সন্ধ্যের পর আগে পথে লোক চলতে ভয় পেত। তখন জঙ্গল আরো গভীর ছিল। যেখানে-সেখানে বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। জীবন্ত ভাল্লুকের হাতে পড়তে-পড়তে কতজন অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছে।

আলিপুরের হাটে আমি নিজেই পড়েছিলাম গণ্ডারের মুখোমুখি। সন্ধ্যের ঠিক পরে-পরেই। গণ্ডারটা একেবারে সামনে দিয়েই [illegible] চলে গেল। গণ্ডার এখনো আছে। [illegible]। কিছুদিন আগে কাদম্বিনী নামের কাছাকাছি একটা গণ্ডার এসে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। গণ্ডারটা লোকালয়ে চলে এসে বেশ কিছু-দিন ছিল। কারুর অনিষ্ট করত না। এমন কি শিশুদেরও না। মানুষের দেওয়া খাবার খেত। এক আশ্চর্য কাণ্ড! কাগজে কাগজে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল। বাস্তব অনেক সময় কল্পনার চাইতেও চমকপ্রদ। বীট অফিসার বলছিলেন, এক ভয়ংকর জায়গা এই ডুয়ার্স। কোন্ কবি যে বলেছেন, সাপের-বাঘের পাহারাতে হচ্ছে বদল দিনে-রাতে। তা যদি সত্যি সত্যি দেখতে চান আসতে হবে ডুয়ার্সে।

সাপ কতরকম আছে?

আছে অনেকরকম। বীট অফিসার বলছিলেন, ইংরাজিতে যাকে 'কোবরা' বলে, এখানকার আদিবাসীরা তাকে বলে গোমা। সায়েন্টিফিক্ তারও একটা পরিভাষা আছে। বলে, 'নাজা ট্রিপুডিয়ান্স'। এর আবার অন্য ভ্যারাইটি আছে। ইংরাজিতে 'চেন ভাইপার'কে বলে চেমনা বোরা। সায়েন্টিফিক্ নাম 'ভাবোইয়া রাসেলি'। তিমাটিয়া বলে 'কমন্ গ্র্যাস স্নেক্'কে। 'ধামিন্' জাতীয় সাপকে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা বলে মহেয়া। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে 'টিয়াস মিউকোসাস্'। চকরিয়া বোরা আছে। অন্য জাতীয় সাপের মধ্যে চেংটিয়া বোরা। 'পিট্ ভাইপার'কে বলে খেরি। 'পাইথন'কে বলে পর্বতীয়া বোরা। এর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যতদূর মনে পড়ছে 'পাইথন মলিউরাস্'।

শুনতে-শুনতে বীট অফিসারকে বলছিলাম, আপনি দেখছি বনরাজ্যের আর কিছু বাকি রাখেন নি। এত মনে রাখেন কি করে?

শব্দ করে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, বন নিয়ে ঘর করি কিনা। বনের খবর না জানলে চলবে কি করে?

সে কথা একশ'বার!

এবার আমারও হেসে উঠবার পালা। বললাম, তাই তো আগেভাগে আপনাকে বনের রাজা বানিয়ে বসে আছি।

[ক্রমশ]

মানদার কিন্তু ভারি দুঃখ হয় ওর বাবুটির জন্য।

হ্যাঁ। সামান্য পনেরো টাকার ঠিকে-ঝি, যার কাজ হল মিত্তিরদের বাড়িতে ঘরদোর মোছা, ঝাঁট দেওয়া, কয়লা ভাঙা, মশলা পেষা, কাপড় কাচা এবং ওগুলিকে আবার শুকিয়ে গেলে বাড়ির যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা, সেই ঝি মানদা ওদের বাড়ির, নগদ কত লাখ টাকার যিনি মালিক তাঁকে সহানুভূতির চোখে দেখে। শুধু তাই নয়। মালিকের জন্য ওর বুকের ভেতর টনটন করে ব্যথা।

কেন?

তা মানদা কি ওঁকে অর্থাৎ মিত্তির বাড়ির বড়কর্তা যিনি সমস্ত সংসারের দণ্ডমুণ্ডের মাথা, সেই ত্রিলোচনবাবুকে অন্য চোখে দেখে? অর্থাৎ কিনা ওনার প্রতি মানদা কি আসক্তা!

রামঃ। ও কথা কানে শুনলেও যে জিভ কাটবে মানদা। আর বার বার তার ইষ্টদেবতার বা গুরুর নাম নেবে। ছিঃ ছিঃ এ কি প্রবৃত্তি! আর মানদার মত মেয়ের! বিশেষ করে এ বয়সে!

মানদা যদিও সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারে না ওর কতখানি বয়স হয়েছে। আর বলতে পারবেই বা কি করে? ও কি লেখাপড়া শিখেছে?

খালি ও বুঝতে পারে ওর বয়স কম হয় নি।

সেই যে বছর যখন এ পৃথিবীতে কি এক বড় যুদ্ধ বাধলো, মানদারা গাঁয়ে থেকে আভাসে শুনতে লাগল সকলি সে সব যুদ্ধের কথা, তখন মানদার বয়স আট বছর ছিল। ওর তখন বিয়েও হয়ে গেছিল। নাকে পেতলের নোলক লাগিয়ে, কপালে ও মাথাতে একগাদা ড্যাবডেবে মেটে সিঁদুর লাগিয়ে মাথায় বিরাট বড় ঘোমটা দিয়ে কাজ করত। ঐ কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পেত কলকাতাতে নাকি খুব বড় বড় বোমা পড়ছে। লোকেরা তাই ভয়ে পালাচ্ছে, যে যেদিকে পারে। যদি কলকাতা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে যে তাদেরও একদিন মরে যেতে হবে তাও শুনতে পেত। শুনে সেদিনের মানদা কিছু বুঝত না। কিন্তু "বোমা" নামটা শুনে ওর হাসি পেত। ও ফিক ফিক করে হেসে ফেলত। ওর হাসি কেউ দেখতে পেত না।

ঠিক সেই সময়কার মেয়ে ও।

সাত-আটটা ছেলেপুলেও হয়েছিল। সবগুলি বাঁচে নি। তবুও যারা বেঁচে আছে, তারা ও তাদের ছেলেপুলে নিয়ে কম নয়।

কাজেই সেই মানদার যদি এখনও আসক্তি আসে, তবে ও ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করবে না?

তবে কি ত্রিলোচনবাবু বিকলাঙ্গ? অকেজো? অসুখে ভুগে ভুগে কাঠি সার হচ্ছেন?

দূর তা হবে কেন? আর যদি ত্রিলোচনবাবুই বিকলাঙ্গ হন, তবে মিত্তির বাড়ির নাম ছড়াত কি করে! কি করেই বা পারত এত লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি গড়ে তুলতে! এই যে শ্বেত মর্মরের বাড়িটা যেখানে মানদা কাজ করতে আসে, তারই দাম কম নাকি! আর ঐ যে ঘরের সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার, তারই বা কম দাম নাকি! আর কি সুন্দর সেসব জিনিস! দেখলে চোখ ঝলসে যায়। ঘরের ভেতরে এইয়া বিরাট আলমারি। তাদের কাঠে কি বাহারী কাজ! দামী দামী কাঁচের ফল ও ফুল আঁটা তাতে। হঠাৎ দূরের থেকে বা আলোতে দেখলে মনে হবে বুঝি সোনা ঝলমল করছে। খাটগুলি কি সুন্দর। ভারী, ভারী। তার উপর সাদা ধবধবে বিছানা। সে বিছানাতে সুন্দর সুন্দর বাহারী বেড-কভার। সে খাটে বসলে সমস্ত কোমর পর্যন্ত ডুবে যায় গদিতে। মানদা তো প্রথম যখন দেখেছিল, তখন ও চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল। এত নরম, এত পুরু বিছানা! এ কি করে হল! ওর কতদিন ইচ্ছে হয়েছে সে বিছানা ধরে দেখতে। কিন্তু সাহস করে নি। বাড়ির গিন্নীমার কাছে শুনেছে ওটা নাকি ডানলোপিলোর গদি। কিনতে অনেক শো টাকা লাগে।

শুনে মানদা চক্ষু বড় বড় করেছিল। আর ঠিক বুঝতেও পারে নি 'ডানলো-পিলোটা' কি। খালি ওর অনেকদিন ধরে ইচ্ছে হয়েছিল ও একবার সেই গদিটা হাতে ধরে দেখবে।

তা ভগবান মিলিয়েও দিলেন সে সুযোগ।

একদিন মানদা ঘরে ঝাঁট দিতে ঢুকেছিল, হঠাৎ গিন্নীমাকে বাইরে খোকাবাবু ডাকাতে গিন্নীমা চলে গেছিলেন বাইরে। আর তখন মানদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেছিল খাটটার কাছে। ও যত এগুচ্ছিল, তত ওর বুক ঢিবঢিব করছিল, যদি কেউ এসে পড়ে ঘরে। আর জিজ্ঞেস করে, এখানে কি করছিলে? তবুও ও নিরস্ত করতে পারে নি ওর কৌতূহলকে। খুব আস্তে আস্তে খাটের কাছে গিয়ে নিজের ডানহাতটা আরেকবার পরনের শাড়িটাতে মুছে বিছানার উপর রেখেছিল। তারপর একটু এদিক-ওদিক কেউ কেউ আসছে কিনা দেখে নিয়ে জোরে হাতটা
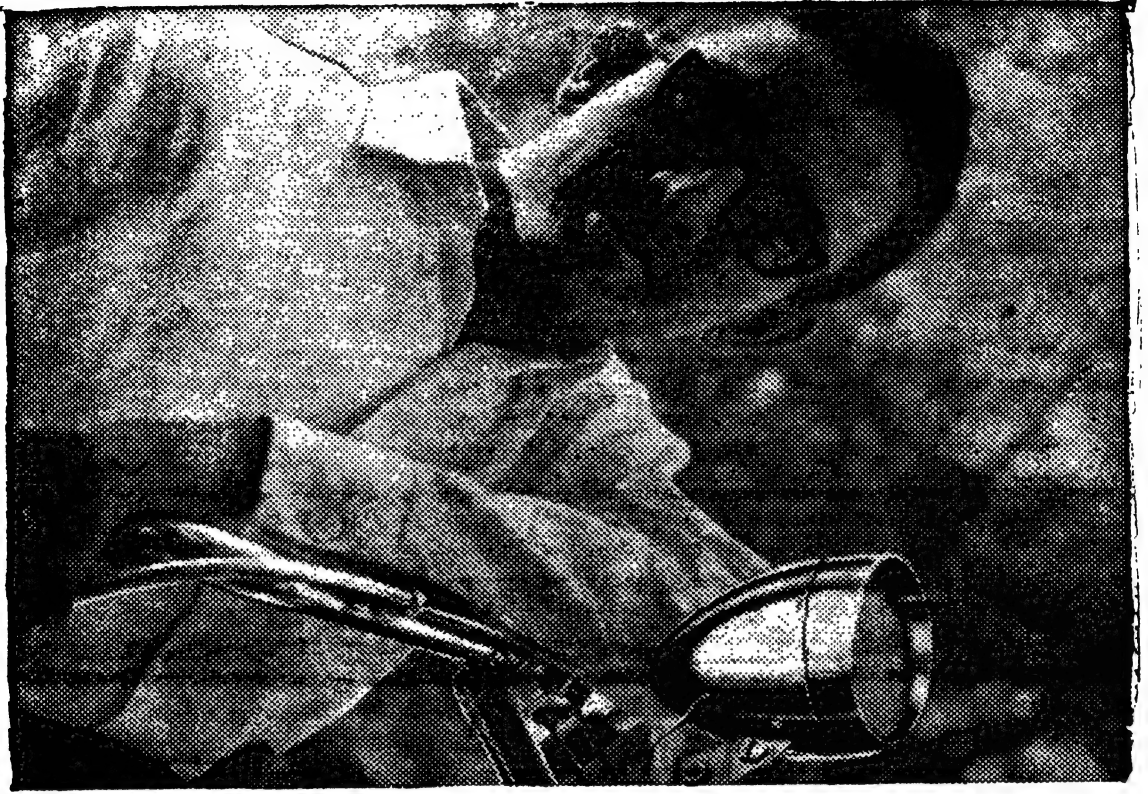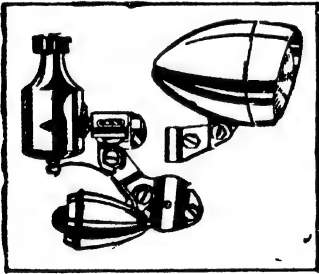
বিছানার মধ্যে গ‍ুঁজে দিয়েছিল, ঠিক সেই সময় বাইরে কারও পায়ের শব্দ পেয়ে হাত সরিয়ে নিয়েছিল। ঠিক গদিটা কেমন তা ব‍ুঝতে পারার আগেই সরিয়েছিল।

সেদিন সারাক্ষণ ওর সমস্ত শরীর সেই জন্য উত্তেজনাতে কেঁপে উঠেছিল। ওর নির্দিষ্ট কাজগ‍ুলি করতে বারবার ও ভুল করেছিল। তব‍ুও সেই উত্তেজনার মধ্যে যেন ওর একটা আনন্দ জাগছিল মাঝে মাঝে। সে আনন্দ হল ঐ ডানলোপিলো বিছানা কেমন তা হাত দিয়ে ছ‍ুঁয়ে দেখার জন্য।

শ‍ুধ‍ু খাট আলমারি নয়। এ ছাড়া আরও আছে। আছে ড্রেসিং টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ওয়াড্রোব, সাইড টেবিল। কত কি। প্রথম প্রথম মানদা এগ‍ুলির নাম জানত না। তা ছাড়া উচ্চারণও করতে পারত না। আজকাল পারে। এ ছাড়া ঘরের কোণে আছে বিলিতি পাথরের পরী। সে পরীদের হাতে ধরে থাকা ফ‍ুলদানী, ধ‍ুপদানী। ওগ‍ুলিকে প্রতিদিন ছোটদিদিমণি ফ‍ুল দিয়ে সাজায়। সে ফ‍ুল বাগান থেকেও আসে। আবার কখনও বাজার থেকেও। মানদা শ‍ুনেছে এ বাড়ির প্রতিটি জিনিস বড়কর্তা অর্থাৎ ত্রিলোচনবাব‍ু নিজে রোজগার করে করেছেন।

শ‍ুনে শ‍ুনে মানদা অবাক হয়েছে। একটি লোক এত টাকা রোজগার করেছে। এ যে বিশ্বাস হয় না।

তব‍ুও মানদা কি না এহেন বাব‍ুটির জন্য দ‍ুঃখ অন‍ুভব করে। তা মানদার দ‍ুঃখ লাগলে বলবে না? বলবে বৈকি।

তাই ও গিন্নীমার কাছে সক্রোধে বলে, মাগো আপনি বাব‍ুর দিকে একবার তাকান না। বাব‍ুটি ছেঁড়া খদ্দরের জামা গায়ে দিয়ে কাজে যান! সারাদিন ঐ নোংরা ছেঁড়া জামা পরেই ঘ‍ুরে বেড়াচ্ছেন। আমার খ‍ুব কষ্ট লাগে মা।

শ‍ুনে গিন্নীমা হেসে বলেছেন, তোমার বাব‍ু কি আর আমাদের কথা শ‍ুনে চলবে? চিরদিনই তোমাদের বাব‍ু এই ছেঁড়া খদ্দরের জামা পরে ঘ‍ুরে বেড়ান। আমরা বারণ করলেও শ‍ুনবে না।

বিস্ফারিত নেত্রে অবাক হয়ে মানদা শ‍ুধ‍ু বলেছিল, কেন মা শ‍ুনবেন না?

তা জানি না বাপ‍ু!

সেখানেই সেদিন ঘটনাটির যবনিকাপাত হয়েছিল।

কিন্তু মানদা এত সহজে চ‍ুপ করল না।

সত্যি ত' এ কেমন ব্যবহার! চারদিকে এত টাকাপয়সার ছড়াছড়ি, খাওয়াদাওয়া পোষাক-আষাক হতে পারে, কিন্তু বাব‍ুটির বেলাতে কারও নজর নেই!

বাব‍ুটি ভালমান‍ুষ বলে এত সয়ে যায়।

কিন্তু মানদা তা সহ্য করতে পারে না। পারবেও না।

তাই আবার একদিন গিন্নীমাকে বলল, মা বাব‍ুর জামাটা যে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গেছে। কাচতে ভরসা পাই না। কখন ছিঁড়ে যায়।

উত্তরে গিন্নীমা জর্দা আরেকট‍ু ম‍ুখে ফেলে দিয়ে বললেন, একট‍ু আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া কর।

শ‍ুনে মানদা মনে মনে বলল, মরণ।

বাইরে বলল, এটা ত' ফেলে দিলেই হয় মা।

যেন মানদা কি এক ভয়ংকর কথা বলে ফেলেছে এইভাবে গিন্নীমা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, খবরদার অমন করো না। তোমার বাব‍ু রেগে যাবে। এমনিতেই তোমার বাব‍ু ভাল খাওয়াদাওয়া করতে চায় না। আমি জোর করে মাছ-মাংস খাওয়াই, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ভাল জামা-কাপড় আর কিছ‍ুতেই পরবে না। যদি কিনেও দিই তাহলে বলবে, কত গরীব দ‍ুঃখী খালি গায়ে শীতের দিনে কষ্ট করে থাকে আর আমি সেখানে ভাল জামা-কাপড় পরে বাব‍ুগিরি করব।

গিন্নীমার ম‍ুখে সে কথা শ‍ুনে মানদা বলে, আহা বাব‍ুর আমার দয়ার শরীর। তাই ত' ঘরে যেন লক্ষ্মী উথলে পড়ছে। এরপর ও একট‍ু থামে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, তা আর কি করা যায় মা। যে যার কপাল নিয়ে আসে। গরীবরা জামা-কাপড় পরতে পারে না বলে কি আর বাব‍ু ভাল জামা-কাপড় পড়বে না? না, মা, এ তুমি ব‍ুঝিয়ে বল।

মানদার কথা শ‍ুনে উদাস নেত্রে অন্যদিকে তাকিয়ে বলেন, কিন্তু তোমার বাব‍ু যে হাজার চেষ্টা করলেও তা পারবে না। আর তাই ত' দেশের লোক তোমার বাব‍ুকে এত ভালবাসে। তোমার বাব‍ুকে দেশের মন্ত্রী করতে চাইছে। গিন্নীমা আরেকদফা জর্দা প‍ুরলেন ম‍ুখে।

আর মানদা শ‍ুনে অভিভূত হয়ে যায়। ম‍ুখে বলে, আহা। এমন মান‍ুষকে লোকে ভালবাসবে না! মন্ত্রী করতে চাইবে না! দেশের লোকের ত' আর চোখ দ‍ুটি কানা নয় যে বাব‍ুর দয়া-দাক্ষিণ্য ব‍ুঝতে পারবে না! —আমি ত' সবাইকে বলি আমার বাব‍ুর মত মান‍ুষ হয় না। বলতে বলতে আবেগে থর থর করে কেঁপে ওঠে মানদার গলা।

সেদিন থেকে মানদা আরও মনে মনে প‍ুজো করতে শ‍ুর‍ু করে ত্রিলোচনবাব‍ুকে।

তাই যেদিন ন্যাতা ন্যাতা হয়ে যাওয়া খদ্দরের সার্টটা আরও একট‍ু ছিঁড়ল, তখন মানদা মনে মনে বলল, না এ সার্ট ও আর পরতে দেবে না বাব‍ুকে।

কিন্তু কিছ‍ুক্ষণ পরে ভাবল বাব‍ু ওর কথা শ‍ুনবে কেন? আর ওই বা এত বড় কথা বলবে কি করে। ছোটলোক হয়ে ওর ম‍ুখে কি এ সব কথা শোভা পায়!

তাই ও উপায় ভাবতে লাগল। ও ঠিক করল, না সার্টটা ও ল‍ুকিয়ে রেখে দেবে। গিন্নীমা চাইলে বলবে, কোথায় আমি ত' জানি না। মানদার কথা ত' আর উনি অবিশ্বাস করতে পারবেন না। এই ত' আট মাস হতে চলল, কিন্তু এর মধ্যে কি একটা ক‍ুটোটিও ওকে কেউ নিতে দেখেছে? তবে আর ভয় কিসের? সেদিনই ও সার্টটা না কেচে ল‍ুকিয়ে রাখল।

অন্যান্যদিনের মত বিকেল বেলাতে যখন ও এ বাড়িতে কাজে ঢ‍ুকল তখন দেখল মিত্তিরদের বাড়িতে হ‍ুলস্থ‍ুল পড়ে গেছে। সমস্ত চাকর, রাঁধ‍ুনী, ঝি সার সার একতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওদের সামনে ত্রিলোচনবাব‍ু দ্র‍ুত পায়চারী করছেন। ম‍ুখটা প্রচণ্ড থমথমে। মানদা এ কমাসের মধ্যে কোনদিন বাব‍ুর এ রকম চেহারা দেখে নি। বারান্দার একপাশে গিন্নীমা চেয়ারে ম‍ুখ গম্ভীর করে বসে আছেন। দেখে, মানদার ব‍ুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। কোন অমংগল হয় নি ত'। ও তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। কিন্তু পা যেন ওর আর চলছে না।

ওকে দেখে ত্রিলোচনবাব‍ু গম্ভীর স্বরে বললেন, এদিকে এস। সে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ‍ুনে মানদা ভীতদৃষ্টিতে তাকাল গিন্নীমার দিকে।

তুমি আজকে খদ্দরের সার্টটা কেচেছিলে না? গিন্নীমা এবার প্রশ্ন করলেন।

—সার্ট? মানদা ঢোক গিলল। বলল, হ্যাঁ মা।

—তা বাব‍ুর সার্টটা কোথায় গেল? পাচ্ছি না কেন?

সে কথা শ‍ুনে মানদার ব‍ুক ধড়াস করে উঠল। একটা ঢোক গিলে আবার শ‍ুকনো গলাতে বলল, তারেই ত' শ‍ুকাতে দিয়েছিলাম মা।

যদি তারে দিয়ে থাক তবে সার্টটা গেল কোথায়? কঠিনকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন গিন্নীমা।

গিন্নীমার সে কঠিন কথা শ‍ুনে মানদার সমস্ত শরীর যেন হিমশীতল হয়ে গেল। ম‍ুখ পাংশ‍ু, বিবর্ণ হল। ঠক ঠক করে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। সেই অবস্থাতেই ত' একবার গিন্নীমার দিকে আরেকবার ত্রিলোচনবাব‍ুর দিকে তাকাল। দেখল সবাই গম্ভীর। তাঁদের চোখ দিয়ে যেন আগ‍ুন ঠিকরে পড়ছে। তাই দেখে মানদা বলতে পারল না, মা আমি [illegible] করে ল‍ুকিয়ে

রেখেছি। ওর গলা যেন কে চেপে ধরে রেখেছে।

কই কথা বলছ না কেন? উত্তর দাও। এবারে ত্রিলোচনবাবু ধমকে উঠলেন।

সে ধমক শুনে মানদা আর সামলাতে পারল না। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। আর সেই কান্না বিকৃত কণ্ঠে বলল, আমি জানি না বাবু। আমি জানি না।

তোমরা যখন কেউ সত্য কথা বলছ না তখন তোমাদের পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল।—গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন ত্রিলোচনবাবু। কিন্তু তা আমি করব না তবে তোমাদের আজ থেকে এ বাড়িতে আর কাজ করতে হবে না। তোমরা তোমাদের টাকা নিয়ে চলে যাও।

ওনার কথা শেষ হতে না হতে সম্মিলিত কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনী করে বলল, বাবু—আমাদের বাঁচান। চাকরি চলে গেলে আমরা খাব কি?

ত্রিলোচনবাবু সে কণ্ঠস্বরে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করলেন না। উনি সে স্থান ছেড়ে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীমাও।

একসময় কাঁদতে কাঁদতে মানদাও চলে গেল নিজের বাড়িতে। সে রাত্রে ও ঘুমতে পারল না। বার বার ও নিজের চাটাই-এর ওপর এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। আর মনে মনে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, একটা ছেঁড়া সার্টের জন্য বাবু অমন কেন করলেন? ওনার ত অনেক দয়া। তুচ্ছ এতগুলি লোককে উনি চাকরি ছাড়া করলেন! ইচ্ছে করলেই ত অনেক সার্ট আরও কিনতে পারেন উনি। তবে?

এ তবের উত্তর মানদা পেল না।

অবশ্য পাবার কথা নয়। হাজার চেষ্টা করলেও ও জানতে পারত না আসলে ঐ ছেঁড়া খদ্দরের সার্টটি ত্রিলোচনবাবুর ব্যবসার অর্থাৎ সমাজে আদর্শ সেবক হবার পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান এবং প্রধান অস্ত্র। ওঁর কোন গুণ কি আছে না আছে সেই সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তারা খালি মানুষের বাইরের চেহারাটাই দেখে। ওরা যখন দেখে লাখোপতি হয়েও ত্রিলোচনবাবু ছেঁড়া খদ্দরের সার্ট গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ান তখন বুঝতে পারে উনি সাধারণ ভোগলিপ্সু লোকের মত নন। ওঁর হৃদয় অনেক বড়। হৃদয় যদি না বড় হত তবে কি আর উনি গরীব-দুঃখীদের কথা ভেবে ছেঁড়া সার্ট পরতেন! এই ত দেশে আরও কত ধনী লোক আছে তারা ত' এমনটি করে না। সেজন্যই ত ওরা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে ত্রিলোচনবাবুকে জয়যুক্ত করেছে নিজেদের সম্মতিজ্ঞাপক ভোটপত্র তাঁর পক্ষে দিয়ে।

ত্রিলোচনবাবু জনসাধারণের এ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়েই ত তাই এ ছেঁড়া সার্ট ফেলে দেন নি।

ছেঁড়া খদ্দরের সার্টটি যে তাঁর ব্যবসার মূলধন। এরই কল্যাণে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির থেকে নানা উপায়ে কয়েক লক্ষ টাকা উপায় করেছেন। অবশ্য এ কাজ উনি অনেক সন্তর্পণে করেছেন বাইরের লোক যাতে চট করে কিছু বুঝতে না পারে।

কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির টাকাতে কি আর সব বাসনা মেটানো যায়! তাই ত চাই মন্ত্রিত্ব। উনি কল্পনার চোখে দেখেছিলেন, যখন এই আজকের কাঁধ ছেঁড়া খদ্দরের সার্ট পরে তিনি প্রত্যেকের বাড়িতে যেতে থাকবেন, তখন উনি কিছু বলবার আগেই সবাই বলবে, আপনি এত কষ্ট করে আসলেন কেন? আমরা কি আর আপনাকে জানি না! যিনি দুঃখীর দুঃখে কেঁদে অগাধ টাকার মালিক হয়েও ছেঁড়া সার্ট পরে ঘুরে বেড়ান তাঁর মত মহান নেতা আমরা পাব কোথায়?

অথচ আজ সেই চরম পাবার কাছাকাছি এসে সব ভেস্তে গেল। যাকে বলে তীরে এসে তরীডোবা! এখন উনি সেরকম সার্ট পাবেন কোথায়? রাগে ক্ষোভে কি আর এই মানুষের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে না? উনি শুধু চাকর-বাকরদের চাকরি ছাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্য লোক হলে হয়তো ব্যাটাদের চাবুক মেরে মেরে তক্তা করে ফেলত। তাই করাই উচিত ছিল।

কিন্তু এখনও তিনি ত মন্ত্রী হন নি তাই করতে পারলেন না। মন্ত্রী হলে ত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। তখন ত আর ওনার কাজ-কর্ম নিয়ে বড় একটা কেউ সমালোচনা করতে পারত না। আর করলেও তা টাকা ও ক্ষমতার জোরে চাপা দিতে কতক্ষণ! এ ত সবাইকে করতে হয়। নয় তো মন্ত্রী হয়ে সুখ কি! আর মানুষই বা মন্ত্রী হতে যাবে কেন?

# ভারতীয় মন্দিরশিল্পের গোড়ার কথা

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

ভারতীয় মনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে কঠোর সাধনা করে গেছেন, তা হল ভারতের বিরাট ও গভীর ঐক্য অন্তরে উপলব্ধি করবার সাধনা। বস্তুত, বিশাল-বিচিত্র এই ভারতভূমি নানা ভাষা ও নানা জাতির লীলাভূমি হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতই একটি অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়ে রয়েছে। ভারতের এই গভীর ঐক্যের প্রাণরস এসেছে কোথা থেকে?

বিশ্বে যতগুলি প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে, ভারতীয় সভ্যতা তার অন্যতম। সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতা কখনও পুরাতন সভ্যতাকে রেহাই দেয় নি। পুরাতন সভ্যতাকে বিলুপ্ত করে তার ধ্বংসস্তূপের ওপরই গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য দেশের নতুন সভ্যতা। বহু দেশের ইতিহাসেই এর নজীর রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই ঘটেছে। ভারতে পুরাতন কোন সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে নতুন কোন সভ্যতা গড়ে ওঠে নি। পুরাতন সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়েই সেখানে নতুন সভ্যতার জয়যাত্রা। তাই দেখি আর্য সভ্যতা অনার্য সভ্যতার মধ্যে লীন হয়েছে। ভারতে কোন প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্বই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। তাই আর্য সভ্যতা অনার্য সভ্যতার মধ্যে আপন সত্তাকে মিশিয়ে দিয়েছে। এই সহাবস্থানই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, এইখানেই তার বিরাটত্ব।

এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে যে আলোচনা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজী লিখছেন:

"তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? ......যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ। ..তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ—তোমাদের আফ্রিকা?

"আর ভারতবর্ষ তা কস্মিনকালেও করেন নি।......

"ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায় তলওয়ার।......"

ভারতে আর্য ও অনার্যের মিলন বহু কল্যাণের জন্ম দিয়েছে। আর্যদের ছিল তত্ত্বজ্ঞান, আর অনার্যদের অন্তরে ছিল রসবোধ ও রূপানুরাগ। এই দুয়ের সমন্বয়েই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-মনের সঙ্গে আর্য-মনের সংঘাত ও সম্মিলন ভারত-সভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ।" কবির ভাষায়, আর্য ও অনার্য এই দুটি ভিন্ন চিত্তবৃত্তিকে যেখানেই এক জায়গায় মিলানো সম্ভব হয়েছে, সেখানেই সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আর্য-অনার্য মিলনের ফলেই নৃত্য, গীত, কাব্য, নাটকাদি চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হয়েছে। আবার এই আর্য ও অনার্য মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল ঋগ্বেদের মহত্তম ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—যাকে ঋগ্বেদে প্রবেশিকা বলা যেতে পারে, যে গ্রন্থ আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে না এলে ঋগ্বেদের দুর্ভেদ্য গহন অরণ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হত। ঋষির ঔরসে শূদ্রা মাতার গর্ভজাত ঐতরের এ গ্রন্থের লেখক। ইতরার পুত্র হলেও ঐতরেয়ই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিলনেই হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু-সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু।"

আর্য-অনার্যের আচার-আচরণ, পূজা-প্রক্রিয়া, রীতি-নীতি মিলে-মিশে হিন্দু জাতির সৃষ্টি হল এবং ভারতে শান্তি, ঐক্য, সংহতি স্থাপিত হল।

ভারতীয় সভ্যতা ঐক্যমূলক ও মিলন-মূলক সভ্যতা। ভারত পর বলে তো কাউকে কখনও দূরে ঠেলে দেয় নি। সে সকলকেই আপন বুকে টেনে নিয়েছে অসংকোচে, সকলকেই স্বীকার করে নিয়েছে অন্তর দিয়ে। কত যুগ ধরে কত বিচিত্র বিভিন্ন জাতি ভারতের দেহে বিলীন হয়েছে—আর্য, দ্রাবিড়, তুর্ক, তাতা[illegible], মোগল, ইউরোপীয়, কত জাতির শোণি[illegible] এসে মিশেছে। তাদের বৈচিত্র্যের সু[illegible] ভারতের দেহ-শোণিতে ধ্বনিত-রণিত হচ্ছে। এদের সকলের স্পর্শে পবিত্র হয়েছে ভারতের মাটি-জল-বাতাস; ভারত হয়ে উঠেছে মহান্ তীর্থভূমি।

কিন্তু বাইরের বহু বিচিত্র বস্তুকে আপন সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তা প্রকাশ করতে হলে এক বিশেষ শৃঙ্খলা ও ঐক্যের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি: "যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ।" ভারতে এই শৃঙ্খলা ও ঐক্য আছে বলেই সে সমস্ত বৈষম্য ও বৈচিত্র্যকে অখণ্ড ঐক্যসূত্রে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে। ..এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার

করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।"

বৈচিত্র্যের মধ্যে স্বজাতীয় ঐক্য, বিবিধের মধ্যে মহান্ মিলনই ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মকথা। এই মিলনমূলক ও ঐক্যমূলক সভ্যতারই দান ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শিল্পবস্তুগুলি। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যে অজস্র প্রাচীন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের বনে-প্রান্তরে, পর্বতে-গুহায়, মঠে-মন্দিরে, চৈত্যবিহারে, সেদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেই ভারতীয় ঐক্যের প্রাণরসের উৎস-মূলে উপনীত হওয়া যায়। বৈচিত্র্যময়ী, ঐশ্বর্যময়ী ভারতের বর্ণাঢ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সমন্বিত নিদর্শন ভারতের অসংখ্য মন্দিরগুলি। মন্দিরগুলির মধ্যে যেন দেহরূপ লাভ করেছে ভারতের মর্ম-বাণী—সে বাণী শান্তি ও ঐক্যের বাণী। ভারতের এই মহৎ বাণী যুগ থেকে যুগান্তরে বহন করে নিয়ে এসেছে এই সমস্ত মন্দির। এই মন্দিরগুলি ভারতীয় জীবনতত্ত্বের রূপময় ও রসময় প্রকাশ। তাই এগুলি মহৎ সৃষ্টি। এই বিস্ময়কর মন্দিরশিল্পের সামনে এসে মানুষের সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, সমস্ত বিরোধ-বিক্ষোভ শান্ত হয়ে যায়।

বৈচিত্র্যময় এই মন্দিরগুলি নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের মনে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগায়—তা হল অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতি। সেই ঐক্য এক পূর্ণ আনন্দ সত্তার প্রকাশ। যে-কোন রস-সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে এই অনুভূতি আর ঐক্যবোধ। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর ভাষায় ও ভাবে রূপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে এইখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ—যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব হয় না।"

ভারতের চিরন্তন ঐক্যসূত্রটিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে নিয়ে এসেছে এই দেউলগুলি। এগুলি বর্তমানকে যুক্ত করেছে অতীতের সঙ্গে। অতীত আর বর্তমান প্রকৃতপক্ষে হাত ধরাধরি করে রয়েছে এই দেউলগুলির মধ্যে, এর কোথাও কোন বিচ্ছেদ নেই, বিভেদ নেই। এই দেউলগুলি ভারতীয় চিন্তাধারার অবিচ্ছিন্নতারই প্রমাণ। প্রত্নদর্শনবিদ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও একদিন ভারতীয় চিন্তাধারার এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। চিন্তাধারার এই ধারাবাহিকতাই সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে শক্তি জুগিয়েছে।

ভারতের মন্দিরশিল্প নানান দেশের নানান জাতির মানুষকে আকৃষ্ট করে নিয়ে এসেছে "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।" মন্দিরময় ভারতের এই বিচিত্র সুন্দর মন্দিরগুলি শুধু যে ভারতীয় ঐক্যের মর্মমূলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে তা নয়, আধুনিককালে এই সংঘাত-জর্জর হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে এক বিশ্ব ঐক্যের সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বারও তারা উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা পাষাণের বুকে সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্যবোধের যে অনুপম স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাতে তাঁদের শিল্পপ্রতিভা ও শিল্পদক্ষতা আমাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। শিল্পচেতনা কতখানি উচ্চস্তরে পৌঁছুলে যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভব হয়, তা চিন্তা করে গৌরবে মন ভরে ওঠে, আনন্দ-বিস্ময়ে কণ্ঠ নীরব হয়ে যায়।

কত না-বলা কথা সোচ্চার হয়ে রয়েছে এই সব পাষাণের মধ্যে। এই পাষাণের অব্যক্ত ভাষা যেন মানুষের মনকে আরও বেশি করে নাড়া দেয়, মানুষের হৃদয়ে তোলে ভাবের তরঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কথায় পাথরের এই ভাষা "বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া মূক বলিয়া হৃদয়ে আরও যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।"

বেদের কবি মন্ত্র রচনা করেছেন ছন্দে, হৃদয়ের ভক্তি উজাড় করে দিয়েছেন ভাষায়, দেবতার স্তব করেছেন বাণীমন্ত্র দিয়ে। আর মন্দিরে মন্দিরে শিল্পীর কোমল-কান্ত ভাষা বন্দী হয়ে রয়েছে কঠিন শিলার বুকে, শিল্পীর মন্ত্রবাণী সমুচ্চ হয়ে রয়েছে পাথরের গায়ে। তাই কবি বলেছেন, মন্দির হল "পাথরের মন্ত্র"। শিল্পীর সে মন্ত্রের ভাষা সরব নয়, নীরব। কিন্তু সে ভাষা অনেক শক্তিময়ী। কত যুগ, কত শতাব্দী পার হয়ে গেছে, কিন্তু আজও তা মানুষের অন্তরে ভাবের আন্দোলন জাগায়, ভক্তির মন্দাকিনী বইয়ে দেয়, আজও সে ভাষা রসের প্লাবনে মনকে আপ্লুত করে দেয়। কবির কথার প্রতি-ধ্বনি করে বলতে পারি, "মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে।...... (পাথর) স্পষ্ট কিছু বলে না......কিন্তু এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে।"

ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরব এই মন্দির-গুলির উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করতে হলে আমাদের সভ্যতার ইতিহাসের অনেকখানি পিছনে চলে যেতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে শিল্পের উৎপত্তির উৎস সন্ধান করতে হয়।

অনুভূতির প্রকাশই শিল্প। মন যখনই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তখনই জাগে এক অনুভূতি এবং সেই আনন্দানুভূতি থেকেই সত্যের প্রকাশ ঘটে। যা-কিছু শিব এবং যা-কিছু সুন্দর, তাই হল সত্য, তাই হল শিল্প। কাজেই শিল্পসৃষ্টির মূলে রয়েছে আনন্দ। বস্তুত, আনন্দের ধর্মই হচ্ছে প্রকাশ করা। উপনিষদের ঋষির সেই শাশ্বত বাণীঃ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসং-বিশন্তীতি। —আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বারাই সব কিছু বর্ধিত হয়, আনন্দেই সমস্ত লীন হয়।

এই বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টি আনন্দেরই প্রকাশ। উপনিষদের ঋষি এই কথাটাই আবার অন্যভাবেও বলেছেনঃ আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।—যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, তা সবই তাঁর আনন্দরূপ। অতি ক্ষুদ্র ধূলিরেণু থেকে অতি বিশাল পর্বত-সমুদ্র, সূর্য-চন্দ্র-তারকা পর্যন্ত বিচিত্র সুষমামণ্ডিত বিশ্বচরাচর ও বিশ্ব-প্রকৃতির সব কিছুই সুন্দর, সব কিছুই সত্য। যা সুন্দর তাই সত্য, যা সত্য তাই সুন্দর। Truth is beauty, beauty is truth. তাই এ সমস্তই আমাদের আনন্দ দান করে। এ সমস্তই আনন্দের রূপ। সত্যের এই আনন্দরূপ প্রাণে যে অনুভূতি জাগায়, সেই আনন্দানুভূতিকে প্রকাশ করাই শিল্পের কাজ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিঃ "সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে, অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, সেখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা মন্দির......।" এমনিভাবে মন্দির সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ-রূপের প্রকাশ হয়েছে।

আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর "Glimpses of World History"-তে লিখেছিলেন, একটা জাতির সত্যকার পরিচয় পেতে হলে বুঝতে হবে তার শিল্প ও সাহিত্যকে, তার সংস্কৃতিকে—তার বাহ্য কার্যকলাপের মধ্যে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত, মানুষের মনুষ্যত্বের লক্ষণ ও পরিচয় আছে তার শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যেই।

এই শিল্প-সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে আমরা গিয়ে উপনীত হই সিন্ধু সভ্যতার যুগে। সিন্ধু সভ্যতার যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খননকার্যের ফলে, তাতে আমরা খৃস্টজন্মের তিন হাজার বছরেরও অধিক পূর্বেকার

সভ্যতায় এসে পৌঁছেছি। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শন মাটির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে। খননের ফলে যেটুকু আমাদের দৃষ্টির সামনে এসেছে, তাতে দেখছি সেই সুপ্রাচীন কালেও নির্মাণশিল্প স্থানীয় অধিবাসীদের আয়ত্ত ছিল। তারা যে শুধু কূপ, স্নানাগার, সৌধ, পথঘাট নির্মাণ করেছিল তা নয়, মূর্তি নির্মাণেও তারা বেশ দক্ষ ছিল। তবে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি প্রমাণ ব্যতীত এ যুগের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এসে উপনীত হই বৈদিক যুগে। পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ হল বেদ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় যে সত্য "অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য" তাই বেদ। স্বামীজী আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, অতীন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা ঋষি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তার নাম বেদ। অর্থাৎ "অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি"-ই হল বেদ।

পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলার বেদের কাল ১২০০ খৃস্টপূর্বাব্দ বলে স্থির করেছেন। ডাঃ হগ বৈদেশিক সাহিত্যের কাল নির্ধারণ করেছেন ১৪০০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০০ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'দি ওরিয়ন' নামক বেদের কাল নির্ণায়ক গবেষণা গ্রন্থে নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করে বলেছেন, বৈদিক সাহিত্যের সবচেয়ে কর্মমুখর যুগ শুরু হয়েছে ৪০০০ খৃস্টপূর্বাব্দে।

লোকমান্য তিলকের মতে, ভারতীয় আর্য সভ্যতার প্রাচীনতম যুগ হল ৬০০০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০০ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। তিনি বলেন, আর্য সভ্যতার ইতিহাসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যুগ হল ৪০০০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এ সময় ঋগ্বেদের বহু সূক্ত রচিত হয়। পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ ২৫০০ থেকে ১৪০০ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে তৈত্তিরিয় সংহিতা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচিত হয়।

বেদের কথায় ফিরে আসা যাক।

বেদের দুটি অংশ। একটি অংশে কর্মের দিক, অন্য অংশে জ্ঞানের দিক আলোচিত হয়েছে। কর্মের অংশটিকে বলা হয় 'ব্রাহ্মণ'—এটি বেদের কর্মকাণ্ড। জ্ঞানের অংশটিকে বলে 'মন্ত্র'—বেদের জ্ঞানকাণ্ড। এই জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়েই বেদ। মন্ত্র-সাহিত্য হল সংহিতা। এ থেকেই বেদান্ত-দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। সংহিতায় ধর্ম, যাগযজ্ঞ, বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় ও বিধি-বিধানগুলির সূত্র ও মন্ত্র লিপি-বদ্ধ আছে; ধর্ম, কর্ম, অশৌচ, সংস্কার-কর্ম প্রভৃতির বর্ণনা আছে। আর ব্রাহ্মণে এই সব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতি, যাগযজ্ঞের নিয়মাবলী, ক্রিয়াকর্মে বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগবিধি, তাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শিল্প সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা অনুধাবন করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, শিল্পের সঙ্গে দেবতাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল সুপ্রাচীন কালেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে : ওঁ শিল্পানি শংসতি দেব-শিল্পানি।—শিল্পীরা তাঁদের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই দেবতার স্তব করেন। এমনি-ভাবে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্প, পূজার্চনার সঙ্গে মন্দির। কালক্রমে সমসাময়িককালের ধর্মবিশ্বাস ও পূজার্চনাপদ্ধতি মন্দির নির্মাণের ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় পূজার্চনা ও দেবোপাসনায় শিল্পের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। সৃজনশীল মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করত —নৃত্য, গীত, নাটক, কাব্যসাহিত্য, শিল্প-কলা—সবই সমর্পণ করত একমেবাদ্বিতীয় শ্রীভগবানের চরণতলে। বস্তুত, এগুলির প্রত্যেকটি কলাশিল্পের এক-একটি দিক। সমস্ত প্রকৃত শিল্পই এক ঐক্যসূত্রে বিধৃত। তাই ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শুধু নৃত্যের আলোচনাই নেই, নৃত্যের সঙ্গে সেখানে স্থান পেয়েছে কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, শিল্প ও সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের আলোকে শিল্পকে ধর্ম ও দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। ভারতীয় শিক্ষাদর্শে ধর্ম ও দর্শন কেবল কতকগুলি আচার ও বিধিমাত্র নয়, কতকগুলি পুঁথিগত তত্ত্ব-কথা মাত্র নয়—এগুলি ভারতের জীবন ও আত্মার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। শিল্প, ধর্ম, দর্শন—সব কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই এক স্রষ্টার চরণে আমাদের অন্তরের প্রণাম পৌঁছে দিচ্ছি। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "আমাদের সুখ-দুঃখ, বেদনা-আশা, সৌন্দর্য-প্রেম, মোহ-আকাঙ্ক্ষা সকলই এই দেবলোকে। যাহা কিছু মর্ত্য—নিতান্তই ঐহিক—তাহাও আমরা মর্ত্যলোকে সাহস করিয়া রাখিতে পারি নাই: দেবতাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" (সাধনা পত্রিকা, মাঘ, ১৩০০ সাল)

ধর্ম, দর্শন ও শিল্পের মধ্যে আত্মার মুক্তি। প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রকাশ শিল্প, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে। আবার প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞানের পথই আত্মোপলব্ধির পথ। তাই শিল্প, ধর্ম ও দর্শন আত্মোপলব্ধির সহায়ক। ভারতীয় সাধনক্ষেত্রে আত্মোপলব্ধি থেকেই ঈশ্বরোপলব্ধি জন্মায় বলা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিল্প, ধর্ম ও দর্শন ভারতের জীবন ও আত্মার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাই ভারতে ধর্মের মধ্যে শিল্প এবং শিল্পের মধ্যে দর্শনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখি।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের পূর্ণ প্রকাশ তার শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এগুলির মধ্যে দেখি মানুষের খণ্ড প্রকাশ। কোনটিতে মানুষের বুদ্ধি, কোনটিতে তার অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবার কোনটিতে বা তার অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। কিন্তু "যেখানে আমাদের বুদ্ধি, হৃদয়বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সব-গুলি গলে গিয়ে মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে", সেখানেই জন্ম হয়েছে শিল্প-সাহিত্যের, সেইখানেই মানুষের অখণ্ড ও পরিপূর্ণ রূপের প্রকাশ। মানুষের এই পূর্ণ সত্তারূপের সার্থক প্রকাশ দেখি মন্দিরগুলির মধ্যে—যেখানে ধর্ম, দর্শন ও শিল্প একই অঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে।

অতীতে একদা কবিরা সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশের স্থান হিসেবে বেছে নিয়ে-ছিলেন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মূর্তরূপ এই মন্দিরগুলি। এই মন্দিরের চত্বরেই তাঁরা তাঁদের নতুন সৃষ্টি এনে হাজির করতেন জনতার দরবারে, এখানেই মিলন হত শ্রোতার সঙ্গে স্রষ্টার। শুধু তাই নয়, ধর্মালোচনা ও বড় বড় দার্শনিক আলোচনার আসরও বসত এই মন্দির প্রাঙ্গণেই। আবার অন্যদিকে ধর্মোপাসনার ফাঁকে ফাঁকে থাকত নৃত্যগীতের ব্যবস্থা। ক্রমে নৃত্যগীতাদি হয়ে উঠেছিল পূজা-র্চনা ও দেবোপাসনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাজেই মন্দিরগুলি একদিকে যেমন ছিল সামাজিক মিলনভূমি, তেমনি ছিল ধর্মালোচনার স্থান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজজীবনের একটা বড় কর্মকেন্দ্র ছিল এই মন্দিরগুলি। ধর্ম ও কর্মের দিক, জ্ঞান ও ভক্তির দিক কোনটাই এখানে উপেক্ষিত হয় নি। সবগুলিরই সমন্বিত রূপ এই মন্দির। আর কবির কথাতেই বলতে পারি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ই ভারতের ইতিহাস। সুতরাং সমগ্র ভারত-ইতিহাস মূর্ত হয়ে রয়েছে মন্দিরগুলির মধ্যে।

আধুনিককালের দৃষ্টিতেও মন্দির-গুলি আর শুধুমাত্র ধর্মের পীঠভূমি হয়েই বিরাজ করছে না, এগুলি প্রধানত শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন-রূপেই এখন মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। ধর্ম ও শিল্প এখানে আর পৃথক পথের পথিক নয়, ভারতের জনপদ-প্রান্তরে তারা যেন শিল্পীভূত রূপ গ্রহণ করেছে দেউলগুলির মধ্যে।

অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য [illegible] যারা সমবেত হচ্ছে, মন্দিরগুলি শুধু যে তাদের মনে আধ্যাত্মিক আবেগ ও ভক্তি উদ্রিক্ত করছে তা নয়, অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পসুষমার নিদর্শন এই মন্দিরগুলি ভারতের তথা সারা বিশ্বের নরনারীর শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণতা দান করছে। বস্তুত, ভারতে শিল্প-স্থাপত্য ধর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে ধর্মকে অবলম্বন করেই ভারতে শিল্পের স্ফুরণ হয়েছে। মহান্ ঐশ্বর্যময় এই মন্দিরগুলি ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মের একটা স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতে ধর্মের ক্রমবিকাশের যে ধারাটি গড়ে উঠেছে, এই মন্দিরগুলির মধ্যে তার একটা ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। [ক্রমশ]
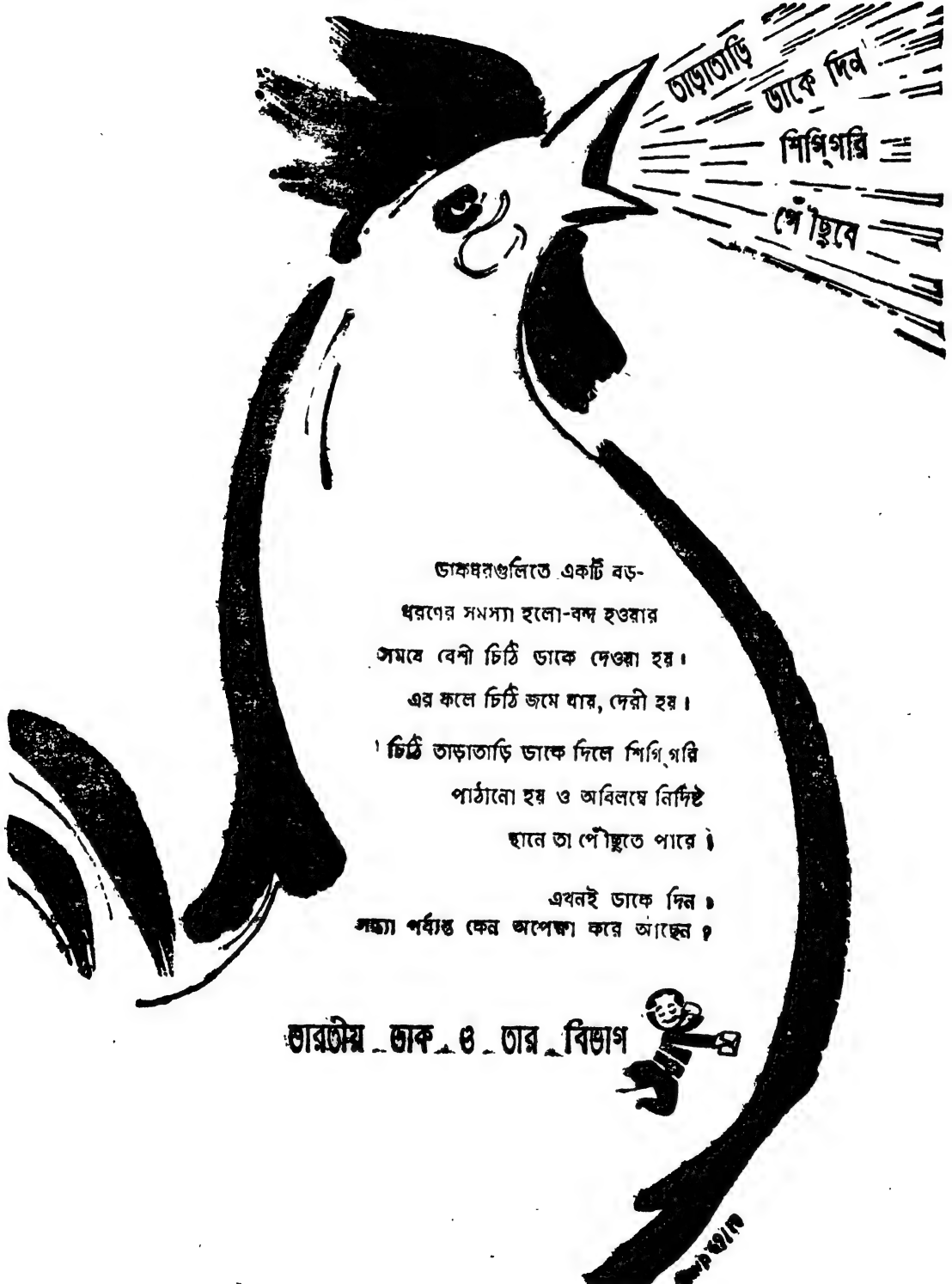
# লোকসংগীতের একাল না আকাল ?

**মুরশিদ**

## ময়মনসিংহ গীতিকার মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে

**গিয়েছিলাম** ' কলামন্দিরে' লোকভারতীর গীতিনাট্য 'মলুয়া' দেখতে। ঘোষিত প্রধান অতিথি নগরপাল এবং সভাপতি ডেপুটী নগরপালের অনুপস্থিতিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মহাজনদের প্রতীক্ষার বিলম্বটা সহ্য করতে বাধ্য হলেও ভাষণের নিগ্রহ থেকে তো বাঁচা গেলো। এ যুগের সুরের ভগীরথ স্বর সর—ভাষণ। সভাপতির অবর্তমানে যোগ্য ব্যক্তিই ভাষণ দিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে যা বললেন এবং যা বললেন না ইচ্ছা করেই —দুটোতেই ঠাণ্ডা ঘরে বসে শরীর আমার গরম হয়ে উঠলো। বক্তা হলেন লোকভারতীর বর্তমান সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্যের কর্ণধার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। 'মলুয়া' ও ময়মনসিংহ গীতিকার কথা বলতে গিয়ে তিনি বারে বারে কলিকাতা 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ করেন', 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেন' ইত্যাদি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করেন। কিন্তু ভুলক্রমে একবার ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের নামও উল্লেখ করলেন না। এরই নাম নীরবতার চক্রান্ত।

সকলেই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শক্তিশালী চক্র ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গৌরবকে ম্লান করবার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এর মধ্যে একদল ময়মনসিংহ গীতিকার মৌলিকতা ও প্রামাণিকতাকেই অস্বীকার করে বসলেন। আশুবাবু অবশ্য সেই দলে তখন যোগ দেন নি, তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বরদের কেউ ছিলেন না। কিন্তু পরে তিনিও দীনেশচন্দ্রকে ছোট-করার দলে যোগ দিলেন। দীনেশবাবু ময়মনসিংহের লোক নন, কাজেই কোনো কোন পারিভাষিক বিশ্লেষণে তাঁর ত্রুটির সুযোগ নিয়ে তাঁর মহান্ কীর্তিকে ম্লান করতে চেষ্টা করলেন। শুধু একটি [illegible]

"বাংলার লোকসাহিত্যের" প্রথম খণ্ড তৃতীয় সংস্করণের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "স্বর্গত সেন মহাশয় বাংলাদেশের এক স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসী এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকার' প্রকৃতি ও রূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন; অনেক স্থলে তিনি ইহাদের ভাষার অর্থও যে বুঝিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার লিখিত ভাষা-টীকা হইতেও জানিতে পারা যায়। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁহার সুগভীর অনুরাগ ও সহানুভূতি থাকিলেও, তিনি যে এই বিষয়ে 'ট্রেইন্ড ইনভেস্টিগেটর' ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। বর্তমানে যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে লোকসাহিত্যের সম্পাদন হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল না। তিনি এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য কোন অভিজ্ঞ গবেষকের সহায়তা বা পরামর্শ ব্যতীতই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নিজের মতে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে বক্তব্য এই যে, স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে যেভাবে গীতিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; সেইভাবেই সেগুলি প্রকাশিত করিয়া দিলে কিংবা কোন 'ট্রেন্ড ইনভেস্টিগেটর'-এর সহায়তায় তাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিলে ইহাদের যে মূল্য প্রকাশ পাইত, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহা প্রকাশিত হওয়ায় তাহাদের সেই মূল্য প্রকাশ পায় নাই।"

৯১ পৃষ্ঠায় তিনি আবার দীনেশচন্দ্র সেন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু লোকসাহিত্যের যথার্থ অনুশীলনের পথে দীনেশচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যেই কতকগুলি অন্তরায় ছিল। প্রথমত তিনি একান্ত আবেগপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন।...দ্বিতীয়ত তিনি লোকসাহিত্যের যথার্থ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাংলার পল্লীজীবন হইতে লোকসাহিত্যের কোন উপকরণই নিজে সংগ্রহ করেন নাই। সুতরাং লোকসাহিত্যের যথার্থ ক্ষেত্র যে কোথায় নিহিত আছে, তাহা তিনি আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।"...ইত্যাদি।

কাজেই 'ট্রেন্ড ইনভেস্টিগেটর' আশু- [illegible] 'আন-ট্রেন্ড ইনভেস্টিগেটর'

দীনেশবাবুকে ভুলে যাবেন, তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু মুরশিদের মত অসংখ্য আন্-ট্রেন্ড লোকসংগীতজ্ঞরাই শুধু আজ দীনেশবাবুর ভক্ত নন্—পাশ্চাত্ত্যের যে সব 'ট্রেন্ড ইনভেস্টিগেটর'দের যোগ্যতা সম্বন্ধে আশুবাবু অস্বীকার করতে সাহস পাবেন না, সেই ডক্টর হাইন্‌শ মোদে কিংবা ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেল প্রমুখ পণ্ডিতরা দীনেশবাবুর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরলোকগত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের উদ্যোগে ডঃ জ্‌বাভিতেলের 'বেঙ্গলি ফোক-ব্যালাডস' ফ্রম্ মৈমনসিংহ'-এর প্রকাশ বাংলা লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতে শুধু 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মাহাত্ম্য পুনর্প্রতিষ্ঠা হয় নি, ডঃ দীনেশ সেনের গৌরবও পুনর্প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক এবং বাংলার লোকসাহিত্যের উপর জার্মান ভাষায় একটি প্রামাণিক গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ হাইন্‌শ মোদে ডঃ দীনেশ সেনের উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ করে বলছেন, "বাংলার লোকসাহিত্য যদি ভারতীয় লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন বলে সারা পৃথিবীতে বিদিত হয়ে থাকে। তবে, তা হয়েছে একজন বাঙালী পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় ও প্রকাশনায় তিনি হলেন দীনেশচন্দ্র সেন। বাংলার লোকগাথা ও লোককথা উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যায় তাঁর উৎসাহ ও জ্ঞান, তাঁর সাগ্রহ নিষ্ঠা—জ্ঞানের এই ক্ষেত্রে যে যথার্থ ফাঁক থেকে গেছে, তা বহুলাংশে পূরণে সহায়ক হয়েছে।" কাজেই আশুবাবুর নীরবতা কিংবা বাগ-বিভূতির ধূম্রজাল ভাস্করের দীপ্তিকে ম্লান করতে পারবে না। তাই সেদিন আশুবাবুর স্বেচ্ছাকৃত নীরবতায় মুরশিদের দুঃখ হলেও দুশ্চিন্তা হয় নি কিছু।

বরঞ্চ তার চেয়েও বেশি অনিষ্টকর মনে হয়েছে সেদিন আশুবাবুর আরেকটি মন্তব্যে। 'মলুয়া' গীতিনাট্য উপস্থিত [illegible] হিসাবে

দর্শকের কাছে উপস্থাপনার আঙ্গিক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, "প্রাচীন গীতিকা যেভাবে করা হতো, নাগরিক পরিবেশে তা সম্ভব নয়। আজকাল শহরের রুচি অনুসারে তা করতে হবে।" একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? কিন্তু হঠাৎ মনে হলো এতো আশুবাবুর নতুন কথা নয়। আগেও বলেছেন একেবারে কালি-কলমে। "বাংলার লোক-সাহিত্যের" প্রথম খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন : "নাগরিক মন উচ্চতর সাহিত্য হইতেই রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চতর সাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গি এবং লোকসাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গি এক নহে। যদিও লোকসাহিত্যের মধ্যে একটি চিরন্তন আবেদন আছে সত্য, তথাপি সেই আবেদনটির বহিরঙ্গগত রূপ ক্রমে নাগরিক সমাজের মধ্যে অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য রূপকথা কিংবা উপকথার মধ্যে যে শাশ্বত আবেদনই থাকুক না কেন, তাহা আধুনিক সাহিত্য হইতে রস-সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত পাঠকের নিকট কোনও কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক রুচি ও রসবোধ অনুযায়ী লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া এই বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারিলে ইহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া সম্ভব।"

এবার সুধীজন করুন অবধান! আধুনিক নাগরিক "উচ্চসাহিত্য" রুচি ও রসবোধ থেকেই তো 'বিবর', 'অরণ্যের দিবা-রাত্রির' উৎপত্তি। কাজেই লোকসঙ্গীত বিকৃতির উপাসকদের 'দার্শনিক' আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সেই রসবোধের ভাটিখানায় যাবার জন্য লোকসঙ্গীতকেও পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছেন। যা হোক, এবার ময়মনসিংহ গীতিকার মঞ্চরূপায়ণের সমস্যা নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে চাই। আশুবাবু আবার লোকভারতীর উপস্থাপিত মলুয়ার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে, বর্তমানে বাংলার লোকসঙ্গীতের একজন প্রধান প্রচারক মলুয়ার পরিচালক স্থানীয় মূল সুর সংগ্রহ করে যথাযথ এই গীতি-নাট্যে সংযোজিত করেছেন। দেখা যাক, কতটুকু তা সত্য।

ময়মনসিংহ গীতিকার বিষয়বস্তু বা প্লট নিয়ে যাত্রা, চলচ্চিত্র, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি হয়েছে। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখতে হবে এগুলো কোনোটিই মূল গীতিকার কাছ দিয়েও যায় নি—নাগরিক দর্শকদের কাছে তা আকর্ষণীয় হলেও। ব্যালাড্-এর বাংলা যদি হয় গীতিকা বা গীতি-গাথা, তবে গাথার একটা নিজস্ব আঙ্গিক আছে এবং সে আঙ্গিকের মাধ্যমে তাকে উপস্থিত না করলে তার স্বাদ পাওয়া যায় না—যেমন কিছুদিন আগে চলচ্চিত্রে কবি চন্দ্রাবতী দেখেছিলাম। আর্থিক সাফল্য না হলেও সুরে, অভিনয়ে ও উপস্থাপনায় পরিচালক গাথার মৌলিক প্রাণটা ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। আমার ভালই লেগেছিল। কিন্তু তথাপি সেটা ছিল চলচ্চিত্র, গাথা নয়। মূল কাব্যের রস তাতে পাব কেন? যাত্রা দেখি নি, কাজেই এখানে মন্তব্য করবো না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জনী শাখার 'মহুয়া' দেখেছিলাম। নৃত্যনাট্য হিসাবে, সুরের মোটামুটি আবহাওয়া সৃষ্টিতে ও নৃত্য পরিকল্পনায় তা বেশ আকর্ষণীয়ই হয়েছিল, বলতে হয়। কিন্তু তা গীতিকা নয়, নৃত্যনাট্য। তারপর দেখলাম গ্রামীণ গীতিসংস্থার 'দেওয়ান ভাবনা' অবলম্বিত 'সুনাই-মাধব'—রবীন্দ্র-সদনে। যেমন বিদগ্ধ মঞ্চ, তেমন বিদগ্ধ পরিবেশনা। অভিনয়ের ও নৃত্যের দক্ষতায়, নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে এবং নেপথ্য সুললিত কণ্ঠের সমাবেশে নৃত্যনাট্যটি উপভোগ্য হয়েছিল। কিন্তু তাতে "ময়মনসিংহ গীতিকা" কোথায়? বিশেষ করে অত্যন্ত সুললিত নারী ও পুরুষ কণ্ঠে পল্লীগীতির রেশ কিছুই ছিল না। তা ছাড়া মূল কাব্যের স্বাদ যেটা কর্ণে শুনার, সেটা নৃত্যে চোখে দেখবো কি করে? গীতিকায় দেখবো মনশ্চক্ষে। তারপর দেখলাম লোক-ভারতীর 'মলুয়া'। এটাকে এক কথায় বলা চলে গীতিনাট্য। অভিনয়ে এবং নাট্য পরিকল্পনায় যদিও ভীষণ দুর্বল, তথাপি এ'দের একটি সাফল্য হলো সমস্ত চরিত্রই গান গাইতে পারেন। এখানে কতটা ভাল গায়ক তা বিবেচ্য নয়, যদি অভিনয় ও গীতের সুষ্ঠু সমন্বয় করা যায়। কাজেই লোকভারতীর 'মলুয়া'কে বলতে পারি গীতিনাট্য। তাঁরাও তাঁদের নিমন্ত্রণপত্রে একে বড় হরফে 'অপেরা' আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু সে যা হোক, ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প অবলম্বন করলেই তা থেকে 'গীতিকা'র স্বাদ পাওয়া যায় না। গীতিকা বা পালাগান একটি অত্যন্ত স্বকীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ 'আর্ট ফর্ম', লোক-সংস্কৃতির একটি অমূল্য শক্তিশালী আঙ্গিক—যা পুরানো হয় না এবং যার মাধ্যম ছাড়া ঐ সব গীতিকা উপস্থিত করা যায় না। গীতিকা বা পালাগানের মূল গায়েন বা বয়াতী তাঁর কয়েকজন দোহার 'পালি'কে নিয়ে যেভাবে তা মুক্ত অঙ্গনে চারপাশের শ্রোতার সামনে উপস্থিত করেন, তা আয়ত্ত করা একটি অতি কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার। বয়াতী একাধারে কবি, গায়ক, অভিনেতা, গল্পকার। তাঁর বাচন-ভঙ্গী, সুরেলা কণ্ঠে কাব্যিক 'ন্যারেশান' ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করার দক্ষতায় সে এক অসাধারণ শিল্পী। ডঃ জুবাভিতেল যেমন বলেছেন :

**'In folk-poetry generally the singer is an important figure. He is not a mere interpreter of the fixed literary text, but an active Co-creater with a greater or smaller share in moulding and modifying the work in the process of interpretation.'**

কাব্য সৃষ্টির দিক থেকে বয়াতীর বর্ণনায় যে অপূর্ব রসসৃষ্টি, তা "লোক-ভারতী" বা "গ্রামীণ গীতিসংস্থার" নৃত্য বা গীতিনাট্যে একেবারেই ছিল না। এমন কি ময়মনসিংহ গীতিকা এমনি পাঠ করার সময় যে রসে মন ভরে ওঠে—তার আংশিক স্বাদও আমি সেই সব 'মঞ্চস্থ গীতিকা'য় পাই নি। 'সুনাইর' বারমাসীতে যে প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলির স্পন্দন পাই—

পৌষ মাসে পোষা আন্ধি<br>
অঙ্গ কাঁপে শীতে।<br>
একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে॥<br>
পৌষ গেল মাঘরে গেল ফাল্গুন আইল,<br>
বসন্তে যৌবনজ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল॥<br>
চৈত মাসেতে দূতী বহিছে চৈতালী<br>
দেশে না আসিল বন্ধু হইলাম পাগলী॥<br>
............ইত্যাদি

কিংবা 'মলুয়া'র

বাড়ির সামনে পুষ্কনি জলে টলমল<br>
এক মায়ের এক পুত পরানের সম্বল।<br>
পাড়া পড়সি কয় মাও বড় ভাগ্যবতী—<br>
এক পুতের বরাতে তার<br>
দুয়ারে বান্ধা হাতী।।

এর সহজ সুরাশ্রিত আবৃত্তিতে যে রস, তা কি অভিনয়ে সৃষ্টি করা সম্ভব?

কিম্বা গীতিকায় যে পল্লীদৃশ্য বর্ণনায় 'ভিজুয়াল ইমেজ' সৃষ্টি করে—যার জন্য দীনেশচন্দ্র বলছেন, "বস্তুত এই গীতিকাগুলি পড়ার পর হইতে পূর্ব ময়মনসিংহ আমার মানসপটে পর পর ছবির উপর ছবি আঁকিয়া ফেলিয়াছে। সেই চিত্রকল্প কি মঞ্চসজ্জায় বা আলোক-সম্পাতে বা অন্যান্য কারিগরীতে সম্ভব? বাইরের নিসর্গ প্রকৃতি গীতিকায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, সে বিশেষ মানসিক ভাবা-সঙ্গের দ্যোতনায় অর্থবহ। আধুনিক মঞ্চের 'ন্যাচারালিস্টিক' অভিনয়ে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা হাস্যকর এবং মূল পালাগানের প্রহসন ছাড়া কিছু নয়।

"গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে

অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইড়া মরে॥
কিংবা
আশ্বিনে পুবের মেঘ পশ্চিমে ভাস্যা যায়।
ঘরে থাকা কান্দা মরে অভাগিনী মায়॥'

মঞ্চে যদি তখন আধুনিক আলোক-সম্পাতে চলন্ত মেঘ দেখানো হয় আর নেপথ্য শব্দ প্রক্ষেপ করে মেঘের গর্জন শুনানো হয়—তবে তার চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে?

সুরের দিক দিয়ে গীতিকার একটা নিজস্ব আঞ্চলিক ভঙ্গী আছে। এই সুর, কথা ও ছন্দের টানাপোড়েনে ও লয়ের সুষ্ঠু ব্যবহারে শ্রোতার মনে অনুরণন তোলে—কোথায়ও একঘেয়েমী আনে না। কিন্তু 'মলুয়া' নৃত্যনাট্যে মঞ্চের ও আধুনিক শ্রোতার কানে বৈচিত্র্য আনার তাগিদে কোনোও আঞ্চলিক 'বেসিক্ মেলোডি'তে দাঁড়াতে পারে নি বা চায় নি—পাঁচমিশেলী কারবার হয়ে গেছে—সঙ্গোয় মিউজিককে কর্ণপটাহে আঘাত করা হয়েছে। নৃত্যনাট্য আধুনিক মঞ্চে উপস্থিত করতে গিয়ে পরিচালক শুধু ময়মনসিংহ না-নিয়ে সারা বাংলার সুর রাগসঙ্গীত বা কীর্তনের আশ্রয় যদি নেন, তবে তাঁকে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আবার বলছি 'গীতিকা'র প্রাণস্পন্দন সেই সুর-সমাবেশে পাই নি এবং পাওয়া যেতে পারে না। আশুবাবু যে প্রথমেই স্থানীয় সুরের সাফাই গেয়েছেন—তাতে মনে হয়, তিনি লোকসাহিত্য কিছু চর্চা করেছেন বটে, কিন্তু লোকসঙ্গীত কিছুই বোঝেন না।

আরেকটা বড়ো দিক সামাজিক। দীনেশচন্দ্রের কাছে আমরা ঋণী। তিনিই প্রথম ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত হয়ে গ্রামের শোষিত শ্রেণীর দৃষ্টিতে এই গীতিকা-গুলির সার্থক সমীক্ষা করেছেন। তিনি দেখেছেন গীতিকাগুলিতে সমাজপাণ্ডাদের বিরোধিতা, জাতিভেদ ও গৌরীদানের বিরুদ্ধতা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের নিপেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মলুয়ার নিদারুণ অর্থকষ্টের এ ছবি—

"নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া
আষাঢ় মাস খাইল।
গলার যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল॥
শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে॥
..........................................
ছেঁড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে।
একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উবাসে॥
ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুইঠ খুদ।
দিনরাইত বাড়ে আরো মহাজনের সুদ॥"
...ইত্যাদি

আজো বাংলার গৃহবধূর এই একই ছবি। একে সার্থকভাবে কেউ মঞ্চে উপস্থিত করার চেষ্টা করেন নি। কলা-মন্দিরের জাঁকজমকী মঞ্চের পরিবেশে হয়তো তা আনা সম্ভব নয়। তবে অত্যা-চারী—সে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, সে অত্যাচারী—দীনেশচন্দ্রের এই কথাটি উপলব্ধি করেছেন মলুয়ার পরিচালক। তাই তিনি কাজীর চরিত্রকে রূপান্তর করে করেছেন হিন্দু জমিদার। শোষণের রূপটা যাতে সাম্প্রদায়িক রূপ না নিতে পারে, সেই জন্য পরিচালকের এই প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসনীয়। যা হোক, আমার মূল বক্তব্য হলো, গ্রাম্য জীবনের শোষণের ও শাসনের রূপটা নৃত্য ও নাট্যায়নের আড়ম্বরে চাপা পড়ে গেছে। আমার মূল বক্তব্য মঞ্চের পিছনে পট দিয়ে যা দেখানো সম্ভব নয়, মূল গায়েন বা বয়াতীর আবেগপূর্ণ সুরসমন্বিত কাব্যিক বর্ণনায় তা সহস্র লোকের মানসপটে দেখানো সম্ভব। এরই নাম গীতিকা বা পালাগান। কিন্তু 'ট্রেন্ড ইনভেস্টিগেটর' আশুবাবু তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তাই তিনি বলেন, গ্রামের জিনিস নাগরিক 'উচ্চতর রসপিপাসু' দর্শকের সামনে ওদের মতো করে উপস্থিত করতে হবে। যা'র নির্গলি-তার্থ হলো মৌলিক 'গীতিকা'র কায়দায় দেখালে আধুনিক নগরবাসী নেবে না। কাজেই আধুনিক মঞ্চায়নের সাহায্য নিতে হবে।

গ্রামের প্রাচীন ধরনের পালাগান যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন, পালাগাইয়ে কয়েকজন মাত্র সাথী নিয়ে কিভাবে কাহিনীকে রসাল করে তুলতে পারে—যে-জন্য গ্রাম্য শ্রোতারা রাতের পর রাত তা শুনেও একঘেয়েমি অনুভব করেন না। মনে পড়ে আমাদের গ্রামাঞ্চলে একজন সার্থক পালাগাইয়ের কথা। আমরা তাঁকে ডাকতাম মিস্ত্রীদাদা বলে। বাঁশ, বেত এবং চালাঘর তৈয়ারির কাজে যিনি দক্ষ—তাঁকে আমাদের অঞ্চলে মিস্ত্রী বলে। এ ধরনের দক্ষ লোক দুদশ গ্রামেও একটি পাওয়া যেত না। মিস্ত্রীদাদার আরেক ক্ষমতা ছিল পালাগান গাইবার। প্রতি শ্রাবণে তাঁকে আমাদের বাড়ি ডাকা হতো মনসামঙ্গল গাইবার জন্য। একজন ঢোলক বাজিয়ে, একজন করতাল বাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে তিনি মনসামঙ্গল গাইতেন। আজো মনে পড়ে তাঁর বর্ণনা, অভিনয়ের ও শ্রোতাকে ঘটনার সঙ্গে একাত্মীয় করে রাখার অসাধারণ ক্ষমতার কথা। কণ্ঠ যে খুব সুরেলা ছিল তা নয়, তবু সব কিছু মিলে মিস্ত্রীদাদা ছিল এবং আজো আমার কাছে আছে সাধারণ মানুষের মধ্যেকার এক অসাধারণ শিল্পী। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য যাঁরা মনে করেন এ ধরনের শিল্পী আধুনিক নাগরিক শ্রোতার সামনে অচল, তবে বুঝতে হবে পল্লীশিল্পী প্রতিভার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কিছুই নেই। মাত্র এক বৎসর আগেকার কথা।—একটি লোক-গীতি গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে অত্যন্ত ভদ্র ও বিদগ্ধ পরিবেশে অনুষ্ঠিত উত্তর-প্রদেশের গীতিকা 'আলহা' শুনতে গিয়ে-ছিলাম। বীর রোদলের কাহিনীকে অবলম্বন করে সেই আলহা গাওয়া হয়ে-ছিল। প্রধান গায়েন ডালহৌসী স্কোয়ারের এক মার্চেন্ট অফিসে দারোয়ানের কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে মাত্র দুজন সঙ্গতী দোহার ছিল। দেহাতী ভাষা আমরা সব বুঝতে পারছিলাম না। একজন বন্ধু মাঝে মাঝে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু গায়েন আঞ্চলিক উপভাষার প্রাচীর ডিঙিয়ে আমাদের অন্তরে পোঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুই ঘন্টা সকলে উত্তর ভারতের পল্লী সংস্কৃতির প্রস্রবণে স্নান করে সাময়িকভাবে হলেও বৈদগ্ধ্যের ধুলা গা থেকে পরিষ্কার করতে পেরেছিলেন।...

তা হলে দেখা যাচ্ছে, "উচ্চতর সাহিত্য-রসপিপাসু নাগরিক মন" লোক সংস্কৃতির মৌলিক উপস্থাপনার রস গ্রহণ করতে পারে—অবশ্য যদি সেই মন একেবারে গণ-বিমুখী না হয়ে থাকে।

লোকসাহিত্যের গল্প, উপকথা ও কিম্বদন্তী ইত্যাদি উপাদান নিয়েই বিশ্ব-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে। কাজেই এখানে যদি ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনী নিয়ে নাটক বা নৃত্যনাট্য করেন, তবে বলবার কিছু নেই। কিন্তু ঘোলে যে দুধের স্বাদ নেই, একথা কোলকাতার বিদগ্ধ দর্শককে জানাতে হয়। কারণ এ বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালীর মতো অন্য ভারতে আর কেউ নেই। রবীন্দ্রসদনে বসে পল্লীবাংলাকে দেখে ময়মনসিংহ গীতিকার আস্বাদ পেতে যাঁরা যান—তাঁদের উদ্দেশ্যেই আমার এই কথা। সুশিক্ষিত হয়, যদি কোনো রবীন্দ্র অধ্যাপক এই বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করেন।

"ঘাঘরাপরা সীতা-সাবিত্রীর" দেশে হঠাৎ পল্লীবাংলার জামদানীপরা 'মহুয়া'-মলুয়াকে আবিষ্কার করে দীনেশচন্দ্র একদিন ভাবাবেগে আকুল হয়েছিলেন। আশুবাবু বললেন, 'অন্ধ ভাবাবেগে' আচ্ছন্ন হওয়াতে দীনেশচন্দ্র সেন ভাল সমীক্ষক হতে পারেন নি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধি-নিষেধের কাঁটাগাছে আবৃত জনতার প্রতিভাকে আবিষ্কার করে দীনেশচন্দ্র আবেগ-আকুল হয়েছিলেন। কিন্তু আশুবাবু তাকে বলেছেন "অন্ধ ভাবাবেগ"। সে-জন্যই নাকি তিনি ভাল সমীক্ষক হতে পারেন নি। কিন্তু আমি বলব আবার—

"এই আকুলতা ও আকূতি—এই শ্রেণী দৃষ্টি ও শোষিত জনতার প্রতি গভীর মমত্ববোধের জন্যই দীনেশচন্দ্র আমাদের শ্রেষ্ঠ সমীক্ষক আমাদের পথপ্রদর্শক। সমীক্ষার কথা বলতে গেলে আশুবাবু যে লোকসাহিত্যের বিরাট বিরাট গ্রন্থ বের করেছেন, তার সব কয়টা হাতড়ালেও 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র যা লিখেছেন, তার প্রতিটি লাইনে যে চিন্তার ও বিশ্লেষণের স্বাক্ষর আছে, তার বিন্দুমাত্রও আশুবাবুর লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না। দীনেশচন্দ্র ছিলেন সংগ্রাহক, সমীক্ষক ও পথপ্রদর্শক। আশুবাবু কেবল সংগ্রাহক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফলাকাঙ্ক্ষী ছাত্রদের দিয়ে সংগ্রহ করানোর কাজটা আজ অতি সহজ হয়ে উঠেছে। দীনেশচন্দ্রকে সন্ধান করে বের করতে হয়েছিল চন্দ্রকুমারদের মতো সমর্পিত-প্রাণ সংগ্রাহককে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকামী ছাত্রকে নয়। পথিকৃৎ দীনেশচন্দ্রকে আশুবাবু যখন বক্রোক্তি করেন, তখন মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কণিকার ছড়া—

"ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।"

আমি সাপ্তাহিক বসুমতী'র দীর্ঘদিনের গ্রাহক। এই পত্রিকায় 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতদর্শন', 'সপ্তাহের বোঝা' প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি আমি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ বা রাজনৈতিক ভাষ্য যখন অতিরঞ্জিত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত হয়, তখন সাপ্তাহিক বসুমতীর এই বিভাগগুলির আশ্চর্য নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশনের বা মন্তব্য করার ধরনটির মূল্য দলনিরপেক্ষ পাঠকদের কাছে অনস্বীকার্য।

দুর্ভাগ্যবশত কিছুদিন যাবৎ সাপ্তাহিক বসুমতীর এ প্রবন্ধগুলিতে নিরপেক্ষতার নীতি কতটা বজায় থাকছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ ঘটেছে। বিশেষত ১লা মাঘ, ২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সপ্তাহের বোঝা'র মন্তব্যগুলি আমার কাছে একপেশে ঠেকেছে এবং মনে হচ্ছে আপনারা পূর্বেকার নীতি থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসেছেন।

যদিও গোটা রচনাটিতেই মার্কসবাদীদের ওপর একটি শ্লেষপূর্ণ আক্রমণ রচনা করা হয়েছে, তবুও আমার বক্তব্য আমি প্রবন্ধটির শেষের অংশটির ওপরেই সীমাবদ্ধ রাখব। শ্রীহেনা গাঙ্গুলীর বোনের কাছে শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন, আপনার দাদার পকেটে রিভলভার ছিল, আমরা রাজনীতি করি, রিভলভার লাগে না। রিভলভার থাকে ডাকাতের কাছে। ডাকাতের মৃত্যুর আবার তদন্ত কী? তদন্ত হবে না। 'সপ্তাহের বোঝা'র লেখক এর পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, রিভলভারও মারণাস্ত্র, তলোয়ার-বল্লমও মারণাস্ত্র। রাজনীতি করতে যদি রিভলভার না লাগে, তবে সড়কি-বল্লমও লাগবে না। এবং এই জিনিসগুলি যাদের কাছে থাকবে, শ্রীজ্যোতি বসুর থিয়োরী অনুযায়ী তারা ডাকাত। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মার্কসবাদীদের, যারা লাঠি-বল্লম নিয়ে ঘোরাফেরা করে বলে অভিযোগ, তাদের ডাকাত বলে কোন অন্যায় করেন নি। সুতরাং শ্রীবসুর সঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের তথা সি-পি-এম-এর সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের 'ডাকাত' বলা নিয়ে বিরোধ কোথায়।

আমি কিন্তু রিভলভার থেকে লাঠি-বল্লমে নেমেই থামতে চাই না। কাটারী, হাতুড়ী, কাস্তে, ছুরি—এগুলিও মারণাস্ত্র এবং লেখকের পাতি অনুযায়ী এগুলির অধিকারীকেও ডাকাত বলা উচিত। ঠিক পাড়াগাঁয়ের সেই ঝগড়াটে মেয়েটির মতো। যাকে এক পথিক একটু চুণ চেয়েছিল, উত্তরে মেয়েটি গালে হাত দিয়ে বলেছিল, আমি বিধবা মেয়ে, আমার কাছে চুণ চাইছ? তা হলে আমি পান খাই—তা হলে আমি দোক্তা খাই—তা হলে আমার আর [illegible] তুমি আমায় নষ্ট মেয়েমানুষ বলছ......! কথাটা তাই দাঁড়ালো নাকি?

কিন্তু এসব কথা থাক। লাঠি-বল্লম কি শুধু মার্কসবাদীরাই বয়ে বেড়ায়? সি-পি-আই, এস-ইউ-সি ইত্যাদি পার্টিগুলির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এই সেদিন বারাসত কনফারেন্সে ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থকরা যে বস্তু নিয়ে সেখানে হাজির ছিল, তাকে কি নিরামিষ লাঠি-বল্লম বলা হবে? শ্রীজ্যোতি বসু কথিত রিভলভার তথা মার্কসবাদীদের লাঠি-বল্লম থেকে এ লাঠি-বল্লমের ব্যবধান কি দুস্তর বলে বিবেচিত হবে? 'সপ্তাহের বোঝা'র লেখক এখানে একেবারেই নীরব।

ইডেনে ক্রিকেট দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসুর উক্তি উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন, রেল দুর্ঘটনা হলে রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। অন্তত লালবাহাদুর শাস্ত্রী করেছিলেন। ঠিক কথা। কিন্তু স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী নিয়ম নন। তিনি ব্যতিক্রম। ইডেন দুর্ঘটনা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি স্বচ্ছন্দেই করা চলত। কিন্তু কেউ করেন নি। কোন আন্দোলনও হয় নি। এর জন্যে সাহসের অভাব হবে কেন? যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পর জাতীয়তাবাদী বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি যদি তার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন অসত্য, অর্ধসত্য ও কুৎসামূলক সংবাদ প্রচারে সাহস পেয়ে থাকে, তবে সঙ্গত কারণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করতে সাহসের অভাব হবে কেন বুঝলাম না। শ্রীসীতেশ রায়ের উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। আসলে আমরা আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই ঘটনার বিচার করি—ঘটনার আসল গুণাগুণ দিয়ে নয়। কোনখানে চাপ দিলে কতটা রাজনৈতিক ফসল তোলা যাবে, তারই ওপর ঘটনার গুরুত্ব বা লঘুত্ব নির্ভর করছে। আর এই জন্যেই পারিবারিক বিবাদও শরিকী সংঘর্ষের রূপ পাচ্ছে। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারিও সি-পি-এম-এর জুলুম বলে প্রমাণিত হচ্ছে। জানি না সে দিন কত দূরে, যখন স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যেও রাজনীতির গন্ধ পাওয়া যাবে এবং তা ফলাও করে প্রকাশ পাবে। অন্তত সংবাদপত্রে প্রচারিত আরামবাগে ছাত্রদের সহপাঠীর একজন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শ্রীকৃত্তিবাস যতবড় সাংবাদিকই হোন না কেন, তাঁকে অনুরোধ, তাঁর থিয়োরীগুলি পাঠকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার আগে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর যেন কিছুটাও শ্রদ্ধা রাখেন।

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহরায়
আরামবাগ, হুগলী।

### পৌরসভা প্রস্তাবিত নাট্য-করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

কলকাতা পৌরসভার অর্থ-কমিটি একটি বিল পাশ করাতে চলেছে যে, অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলোকে রবীন্দ্রভারতীর পরিবর্তে পৌরসভার কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে এবং বছরে মাত্র একবার কর থেকে রেহাই দিয়ে পরবর্তী প্রতি অভিনয়ের জন্য ৪০ টাকা করে কর দিতে হবে পৌরসভাকে। এই সিদ্ধান্ত আমাদের স্তম্ভিত ও মর্মাহত করেছে। অতীতেও তিনবার নাটকের ওপর কর বসাবার চেষ্টা হয়েছিল এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রতিবারই সে সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছিল। সেদিনকার আন্দোলনের পাশে কিন্তু আজকের পৌরসভার ক্ষমতাসীন দলগুলোর অনেকেই ছিল। আশ্চর্য! ক্ষমতায় এসে আজ তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধা করছেন না, ঐসব বামপন্থী প্রগতিশীল দলগুলো এত সহজে কি করে ভুলে গেলেন গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্যের কথা—তাঁরা কেমন করে ভুলে গেলেন তাঁদের নির্বাচনী বৈতরণী পার করাতে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই সব অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলোর অবিস্মরণীয় প্রচেষ্টার কথা? আর পৌরসভা নাটকের ওপর কর বসাচ্ছেন কোন্ অধিকারে? নাট্যশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার বা পৌরসভা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? বাংলার নাট্যশিল্প আজ ভারতের গর্ব, এর জন্য নাট্যসংস্থাগুলোর জীবন-মরণ সংগ্রামই সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী—সরকার বা পৌরসভার এতে বিন্দুমাত্র দান নেই। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো কেমন করে ভুলে গেল যে, সংস্কৃতিকে বঞ্চিত করে, অবহেলা করে শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখা একান্তই অর্থহীন। পৌরসভাকে আমরা হুঁসিয়ার করে দিতে চাই যে, তাঁরা যেন সংযত হন—নাট্যসংস্থাগুলোর ওপর অন্যায় করের বোঝা চাপাবার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। ঐ কালাকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে উদ্বেল হয়ে রুখবই নাট্যশিল্পের ওপর আঘাত হানার চক্রান্তকে।

—ডালিম রায়
সম্পাদক, 'বৈশাখী',
কলকাতা—২৫

# এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

**[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]**

ক্রেগের মুভমেন্টের সম্পর্কে অনু- সন্ধিৎসা এবং ক্লাইটস্ অভ্ স্টেপ্স নিয়ে গবেষণা এই সময়েই আরম্ভ হয়। আর্কি- টেকচারের দিক থেকে উঠে-যাওয়া এবং নেমে-আসা এই ধাপগুলো 'সত্যিই নাটকীয়তার সৃষ্টি করতে পারে—ভেবে- ছিলেন ক্রেগ। তাঁর নিজের ভাষায় বলি— When this desire came to me was continually designing dramas wherein the place was architectural and lent itself to my desire. And so I began with a drama called The Steps.

এই স্টেপসের উপর ভিত্তি করে তিনি একটি নতুন স্কুল অভ্ প্রডাকসন তৈরি করলেন। একথা অনেকেই জানেন না যে, ক্রেগের মাস্ক অভ্ লণ্ডন Wapping Old Stairs, 1904) এই ডিজাইনটির অনুপ্রেরণায় ওয়াল্ট ডিজনির অনেক কল্পনামূলক ছায়াচিত্র রূপায়িত হয়েছে।

১৯০৬—৭ সালে ক্রেগ একটি ব্যালের পরিকল্পনা করেন—সাইকিকে বিষয়বস্তু করেই এই পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়ে- ছিল। কাউণ্ট কেসলার এটি নিয়ে ডায়া- ঘিলেভের কাছে যান। এই একবারই ডায়া- ঘিলেভ বললেন যে, তাঁর পক্ষেও এমন দুঃসাহসিক ব্যাপার গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ত্রিদিকিক মুভমেণ্টের অনুভূতি ও গভীর সংগীতানুরাগ ছিল গর্ডন ক্রেগের সহজাত গুণাবলী। এই জন্যই তিনি ছিলেন কোরিওগ্রাফিক ডিজাইনার এবং ব্যালেমেকার হিসাবে একমেবাদ্বিতীয়ম।

ফিলিবার্টো স্কারপেলি ছিলেন ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত আর্টিস্ট-আর্কিটেক্ট- ডেকোরেটর। তিনি এই সময় তাঁর বন্ধু সিসিলিয়ান অভিনেতা গিওভান্নি প্র্যাসোকে ক্রেগ বিষয়ে লেখেন: "গর্ডন ক্রেগ সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হয়েছে তুমি জানতে চেয়েছ। আমি মনে করি ক্রেগ অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রায় কোন কিছু বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেই তিনি তোমার চোখের সামনে বিস্ময়কর দৃশ্যের সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন। নিজের সৃষ্টির জন্য তাঁর তেমন কিছুর দরকার হয় না। কয়েকটি পর্দা এবং ইলেকট্রিক লাইটের সাহায্যেই তিনি অবিস্মরণীয় শিল্পের জন্ম দেন। ক্রেগ উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর, আর্কিটেক্ট এবং বড় কবি। আলোর সাহায্যে তিনি চিত্রাঙ্কন করেন। তাঁর স্থাপত্যের মূলে রয়েছে কার্ডবোর্ডের তৈরি কয়েকটি রেক্ট্যাঙ্গল। ক্রেগ গভীর অনুভূতির উৎপাদন করেন বর্ণ এবং রেখার অদ্ভুত সমন্বয়ের সাহায্যে। ক্রেগের থিয়েটার

স্বচক্ষে না দেখলে কল্পনা করা যায় না এ লোকটি কত জানেন এবং কি স্বর্গীয় শিল্পসৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে পারেন। আমার জীবনে এত সুন্দর শিল্পসৃষ্টি আর কখনও দেখি নি।"

১৯০৬—৭ সালে তাঁর দৃশ্যের এচিং- গুলো যেন ভবিষ্যতের কিউবিজমের আবি- র্ভাবেরই ইঙ্গিত দিচ্ছিল। এগুলো প্রথমে ফ্লোরেন্সে প্রদর্শনী করে দেখানো হয় এবং তারপরে লণ্ডনে। ১৯২৩ সালে অক্সফোর্ড প্রেস এগুলো বই আকারে প্রকাশ করে। এর ভূমিকা এবং চারটি সনেট লিখেছেন তখন- কার ইংলণ্ডের রাজকবি। একটি সনেটে তিনি মন্তব্য করেছিলেন:

> Here is the work. Who,
> greater than his age
> Will use this work to
> consecrate the stage?

কিন্তু কেউ সাড়া দেন নি। তাই ক্রেগের পরিকল্পনা তাঁর মানসপটে এবং

**হ্যামলেট: হ্যামলেট গ্রীটিং দি এ্যাক্টর্স**

স্টুডিওতেই সীমাবদ্ধ ছিল—রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত ক্ষেত্রে রূপায়িত হবার অবকাশ পায় নি।

১৯০৭—৮—৯ এই বছরগুলোই ছিল তাঁর জীবনের গৌরবোজ্জ্বল সময়। তাঁর প্রতিভা এই সময়টায় বহুরূপে বিস্ফারিত হচ্ছিল বহু দিকে। এই সময়ের ভেতরেই তিনি ম্যাকবেথের ডিজাইনগুলো করে- ছিলেন স্যার হার্বার্ট ট্রীর জন্য। ট্রীর জীবনের সব থেকে বড় কলঙ্ক হল এই যে, অন্যের কথায় ভয় পেয়ে গিয়ে তিনি আসল অভিনয়ের সময় ক্রেগের ডিজাইন- গুলো ব্যবহার করেন নি। বিয়রবম ট্রী এবং আরভিংয়ের তুলনা করতে গিয়ে আমার এক নাট্যরসিক বন্ধু সেদিন বল- ছিলেন যে, এঁদের প্রসঙ্গ উঠলেই আমার অহীন্দ্র চৌধুরী এবং শিশিরকুমারের কথা মনে হয়। আমি উত্তরে বললাম— ভায়া, একটা মস্ত ভুল করছ। আরভিং ট্রীর থেকে অনেক বড় অভিনেতা ছিলেন, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই; তবে ট্রীও প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাই ছিলেন। অহীন্দ্র- বাবু এবং শিশিরকুমারের সঙ্গে তুলনা করা মানে Molehill-এর সঙ্গে Mountain- এর তুলনা করতে যাওয়া। বন্ধুবর আমার উক্তির সমর্থনে উদাহরণ দিতে গিয়ে বললেন—নটসূর্যমশায় নিজেকে হারাকে খুঁজতে গিয়ে অনেক জায়গাতেই পরোক্ষে শিশিরকুমারের গায়ে কাদা ছিটোতে গেছেন। অথচ দুজনেরই অভিনয় তো স্বচক্ষে দেখেছি—অহীন চৌধুরীর মাই- কেল? মাইকেল, না রঘু ডাকাত? আর কি অনবদ্য ইংরাজী আবৃত্তি। আমি যেদিন মাইকেলের অভিনয় দেখছিলাম, সামনের সারিতে জনতিনেক সাহেব বসে- ছিল। নটসূর্যের To-morrow and To-morrow and To-morrow-র হুঙ্কারজাতীয় আবৃত্তি শুনে সাহেব তিনটে আঁতকে উঠেছিল। আর কি অরি- জিন্যাল ইংরাজী উচ্চারণ।

আর শিশিরকুমারের মাইকেল অভিনয় দেখতে গিয়ে মনে হত যেন রঙ্গমঞ্চের উপর স্বশরীরে কবি মধুসূদনকে দেখতে পাচ্ছি!

বললাম, জোনাকিকে কিছু লোক যদি সূর্য বলতে শুরু করে, তখন জোনাকিও ভাবতে থাকে 'নিজের জোনাকি রূপকে হারিয়ে খুঁজে পেলাম সূর্যরূপে।' তখন সে মনে করে সত্যকে, সুন্দরকে, শিবকে সে নিজের তেজে ভস্ম করে দেবে—কিন্তু আসল সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জোনাকির ক্ষুদ্র আলো, ক্ষুদ্র তেজ কোথায় মিলিয়ে যায়।

আবার ক্রেগের কথায় ফিরে আসি। কিছুদিন থেকেই ক্রেগ পরিকল্পনা কর- ছিলেন যে, একটি জার্নাল প্রকাশ করবেন। এই জার্নালে এনগ্রেভিং এবং লেখার সাহায্যে তিনি অন্যের কাছে নিজের মনের কথা তুলে ধরবেন। এর আগেই 'দি পেজ' নামে পত্রিকায় ১৮৯৮ থেকে ১৯০১ সাল অবধি ক্রেগ বহু সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই

হ্যামলেট : প্লেয়ার-কি এ্যাম্লিপ ইন দি অর্চার্ড, ১৯২৭
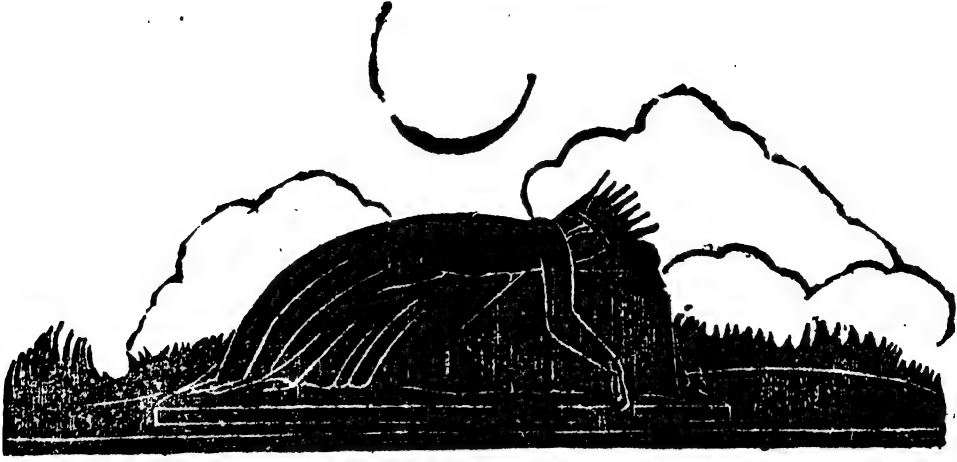
পত্রিকায় এযাবৎ তাঁর প্রায় দুশো ত্রিশটি স্বউড ব্লক প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এখন এমন কোন প্রকাশক পাওয়া গেল না —যিনি শুধুমাত্র থিয়েটারের জন্য একটি সিরিয়াস জার্নাল প্রকাশ করতে রাজী। একজন প্রকাশক এমন কথাও বললেন যে, এ জাতীয় পত্রিকা বের করতে হলে অন্ততপক্ষে দশ হাজার পাউন্ডের দরকার হবে।

এর পর ক্রেগ ঠিক করলেন যে, তিনি নিজেই মাত্র পাঁচ পাউন্ড ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করবেন। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে 'দি মাস্ক' পত্রিকার ভল্যুম ওয়ান, নাম্বার ওয়ান বাজারে আত্মপ্রকাশ করলো। ফুলস্কেপ সাইজের পাতলা মাসিক কাগজ—ফ্লোরেন্সে হাতে তৈরি কাগজে চমৎকারভাবে কালো মোটা টাইপে ছাপা হয়েছিল—মলাট ছিল সবুজ রং-এর। অতীত এবং বর্তমানের বহু সুন্দর সুন্দর উড্‌কাটের চিত্রে ম্যাগাজিনটি ভরা ছিল। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল মাত্র এক শিলিং। এই পত্রিকাটি এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, অল্পদিন বাদেই প্রতি মাসে দশ হাজার কপি করে ছাপা হচ্ছিল। আজকের দিনেও ইওরোপে কোন বইয়ের দোকানে যদি 'মাস্কের' কোন পুরনো সংখ্যা দেখা যায়, তা হলে তখুনি তা বিক্রি হয়ে যায়। এ কাগজের বিজ্ঞাপনগুলোও শিল্পানুমোদিত প্রথায় ছাপা হোত। তাই দেখতে হোত অতি সুন্দর। মাস্কের কয়েকটি সংখ্যা আমি বৃটিশ ড্রামা লীগে দেখেছিলাম ১৯৫৬ সালে—কিছু কিছু নোটও নিয়েছিলাম ওইসব পত্রকাগুলো থেকে।

চেয়ারিং ক্রশের বইয়ের দোকানগুলোতেও আমি দি মাস্কের পুরনো কপি কেনবার চেষ্টা করেছিলাম। একজন মাত্র দোকানদার আমাকে বলেছিল যে, সে কয়েকটি কপি আমাকে দিতে পারে, কিন্তু প্রতিটি সংখ্যার দাম হবে এক পাউন্ড করে। কিনবো কিনবো করেও অত দামের জন্য শেষ পর্যন্ত কেনা হয় নি।

দি মাস্ক থেকে যেসব নোট নিয়েছিলাম তার কিছু কিছু এবার উধৃত করবো :

About "The Mask"—by D. Nevile Lees first published in Florence in March, 1908—the only really serious journal in the English language devoted to the Art of the theatre. Founded by Mr. Gordon Craig —the one journal which has treated of the theatre in a serious and distinguished manner, according to it its rightful position among its sister arts.

It did not exist for its own sake but for an Idea, or a True Idea, and the activity of Truth is irrepressible, and a right principle, one set going, does not stop short upon the way.

The IDEA in obedience to which THE MASK was founded was that of a NEW THEATRE which should replace the existing one; an IDEA which, conceived rapidly, needs time to develop naturally; its purpose was to support and advance and link together that group of younger men in the European theatre who are devoting their lives to the realisation of that IDEA. Thus the Mask is not an isolated fact; it is part of an organic whole, another part of that whole being the School For the Art of the Theatre, also started in Florence, also brought into being for the realisation of the same IDEA ....the creation of a new Theatre.

Both work together towards this end: the one is a part of the other and the other is a part of the one, and their work is both destructive and constructive.

The Destructive Work of The Mask: Among the evils The Mask attacks are Realism, Vulgarity, Commercialism and the trade spirit, Pedantry, Theatricalism, the aggressive personality of the actor, the star-system, badly built theatres, the invasion of the theatre by other artists, the system of actor managers, the representation of ugliness, the acceptance of mere "effectiveness" as a substitute for thoroughness in all branches of the profession, the selfish apathy and cowardice which would oppose all progress of reform lest it should militate against personal prosperity and personal ease.

The constructive work of The Mask: To spread ideas among the young men—so that they shall know how to build up—how to evoke the new spirit, so that it may inhabit and vitalize the new forms

[ ক্রমশ

## প্রস্তাবিত নাটকাভিনয়-কর

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত নাট্য-করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। যদিও এই প্রতিবাদে এখন পর্যন্ত অধিক সংখ্যক প্রগতিশীল দল সমবেত হয় নি অথবা এই প্রতিবাদ এখনো আন্দোলনে রূপলাভ করে নি। পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি ও নাটকের দলগুলির সভায় প্রতিবাদের প্রস্তাব প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত নাট্য-করের কথা শুনে আমাদের মনেও প্রশ্ন উঠেছে, একদা যে নাট্য-করের প্রস্তাব কর্পোরেশন তুলে নিয়েছিল এবং প্রস্তাবটি তুলে নেবার ব্যাপারে যাঁরা নাটকের দলগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা যখন কর্পোরেশনে ক্ষমতাসীন, সে সময় আবার কি করে কর বসাতে পারে। পরিস্থিতির এমন কি পরিবর্তন হয়েছে, কয়েক বছর আগে যা অবাস্তব ছিল আজ তা বাস্তব হল?

এই কৌতূহল থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট নাট্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। আলোচনা করে মনে হল ব্যাপারটা তাঁরাও ভাল করে জানেন না। কিভাবে কর বসবে, কেন কর বসবে ও কাদের ওপর কর বসবে, তাঁরা এসব নিয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল বলে মনে হল না। তাঁরা শুনেছেন কলকাতায় নাটক করতে হলে ৪০ টাকা কর দিতে হবে, এ পর্যন্ত। বিস্তারিত খবর তাঁদের কাছ থেকে জানবার যদিও আশা ছিল, কিন্তু পরিষ্কার জানা গেল না। স্বভাবতই এতে প্রশ্ন আসে, তবে কিসের ভিত্তিতে সকল নাটকের দলকে আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানান হচ্ছে, কোন কোন বক্তা আক্রোশে ফেটে পড়ছেন, কেউ বা হতাশায় ভেঙে পড়ছেন। শ্রীমন্মথ রায় ও শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের মত নাট্যকার যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তার জন্যে এই করের বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আরো বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। শ্রীরায় ও শ্রীভট্টাচার্যের মত নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন, তখন সাধারণ মানুষ তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করবে, এটা স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের জনৈক বিশিষ্ট কাউন্সিলারের সঙ্গে এই করের বিষয়ে কথা বলেছিলাম, একই কৌতূহলে। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, অপেশাদার নাটকের দলগুলির উপর কেন কর বসান হচ্ছে? প্রশ্নের উত্তরে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কাগজে এত বিবৃতি ছাপা হচ্ছে, কিছু সংখ্যক নাটকের দলের সভা হচ্ছে, কিন্তু এসব সংস্থার প্রতিনিধিরা কর্পোরেশনে এসে ব্যাপারটা ভাল করে জেনে যাচ্ছেন না কেন? কেন তাঁরা পৌর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্ত সভায় বসে আলোচনা করছেন না? এদিক থেকে ঘটনাস্রোত দেখে তাঁরাও বিস্মিত! তাঁর কথায় মনে হল, প্রস্তাবিত এই কর সকল নাট্য সংস্থার উপর প্রযোজ্য হবে, এরূপ তিনি মনে করেন না। প্রগতিশীল আদর্শের কোন নাট্য সংস্থার উপর কর আরোপ করা যেতে পারে না। তবে যারা নাটক নিয়ে ব্যবসা করে, নাটক যাদের পেশা, তারা কেন কর দেবে না?—এই প্রশ্ন তিনি করলেন। আজকাল নাটকের ব্যবসায়ে দিন বদল হয়েছে। দর্শক প্রচুর বেড়েছে, মোটা বায়নায় যাত্রা-থিয়েটার হচ্ছে। যারা ৮।৯ শ' টাকায় হল ভাড়া করে টিকেট বেচে নাটক করতে পারে, তাদের পক্ষে কি ৪০ টাকা কর দেওয়া অন্যায্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত?

যারা দুই-আড়াই হাজার টাকার বায়নায় নাটক-যাত্রা করে, সে সকল দলের পক্ষে ৪০ টাকা কর দেওয়া মোটেই কঠিন নয়, অথবা যারা ৮।৯ শ' টাকা ভাড়া দিয়ে নাটক করে, তারাও কর দিতে পারে সত্যি কথা। কাউন্সিলার মহাশয়ের কথায় এই আশ্বাসও পাওয়া যাচ্ছে যে, প্রগতিশীল আদর্শে নাটক করে—এমন দলগুলিকে এই কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে। সুতরাং প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পথে এই কর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আজকাল নাটকের নামে একদল লোক যেভাবে ইউরোপ-আমেরিকার ক্ষয়বাদী চিন্তা প্রচার করছে, মুক্ত মেলার নামে অপসংস্কৃতি প্রচার করছে এবং প্রকৃতিবাদী নাটকের নামে অশ্লীলতা প্রকাশ করছে, তা আমাদের নাটকের ঐতিহ্যের বিরোধী। বাঙালীর ঐতিহ্যবিরোধী এই ধরনের নাটকের উপর যদি কর ধার্য করা হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। অথবা গলি আটক ক'রে নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনে অসুবিধা ঘটিয়ে যেভাবে সংস্কৃতি বা নাটক চর্চা করা হয়, এই কর যদি সেই 'সংস্কৃতি'কে সংকুচিত করে, তাতে অখুসী হবার কি আছে!

কিন্তু বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে বিচার করলে এই নাট্য-কর আরোপ করার আগে ব্যাপারটি নিয়ে আরো বিবেচনা করার দরকার আছে। কর আরোপ না করতে পারলেই আনন্দের কথা হত। যদি করতেই হয়, তা হলে নাটকের দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। —সুজন।

শিশিরকণা ধরচৌধুরী

# নাটকের কথা

## বৈতানিক-এর রবীন্দ্র নাট্যোৎসব

বৈতানিক-এর তৃতীয় রবীন্দ্র নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৬ই থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সদনে। এই রবীন্দ্র নাট্যোৎসব উদ্বোধন করেন আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান সস্ত্রীক।

এই নাট্যোৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য। উদ্যোক্তাদের ভাষায়—"রবীন্দ্রনাথের কথায় ও গানে শকুন্তলা নৃত্যনাট্য রচনার প্রচেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম।" আমাদেরও তাই ধারণা। এবং এই প্রথম প্রচেষ্টার জন্য বৈতানিক অভিনন্দনীয়। এই উদ্যোগ হয়ত সব-দিক থেকে সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও কথায়, গানে ও নাচে শকুন্তলা উপাখ্যানকে মঞ্চে উপস্থাপনার মধ্যে যে কৃতিত্ব আছে, সে কথা অনস্বীকার্য।

মহাকবি কালিদাসের চিরায়ত নাট্য-সাহিত্যের শকুন্তলা উপাখ্যান ভারতবাসী মাত্রেরই জানা আছে। তপোবন-কন্যা শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ রাজা দুষ্মন্তের গান্ধর্ব বিবাহ, বিচ্ছেদ ও উত্তর মিলনের এই কাহিনীর সৌন্দর্য ও কল্যাণ-রূপে যুগে যুগে মানুষ মুগ্ধ হয়েছে। এই কাহিনীকে নৃত্যনাট্যে রূপ দেওয়াতে যথেষ্ট শিল্প বুদ্ধি, দক্ষতা এবং সচেতন সমাজবোধের প্রয়োজন আছে। বৈতানিক-এর পক্ষে শকুন্তলার নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন শ্রীমতী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুধীর চট্টোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় শকুন্তলার নৃত্যরূপ দিয়েছে অলকানন্দা চাকলাদার। শকুন্তলার গানগুলি গেয়েছেন স্মৃতি চট্টোপাধ্যায়। এই দুজন শিল্পী প্রশংসনীয়। দুষ্মন্তের ভূমিকায় নেচেছেন সাধন গুহ। নৃত্যাংশে আর যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শান্তা পাণ্ডে, মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুশীলা সাহা, শম্পা মজুমদার, সুদেষ্ণা মুখার্জী, শিখা ঘোষ, শশী শর্মা, বিভা সিং, অলকা কালরা, প্রণতি গাঙ্গুলী, নন্দিনা আচার্য চৌধুরী, বীণা ভোরা, পরমজিৎ কর, অমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। নেপথ্যে সমবেত সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছেন সুদেবী ঠাকুর, ঝর্ণা ভদ্র, গীতিকা সাহা, রীণা চৌধুরী, শমিতা সিংহ, অনুরাধা রায়চৌধুরী, হিরণ্ময় গাঙ্গুলী, রাবণজিৎ নন্দী, সুবিদ ঠাকুর ও সুধীর চট্টোপাধ্যায়।

উদ্যোক্তরা বলেছেন, "আমরা কালিদাসের শকুন্তলার নয়, রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলার সমালোচনার ওপর নির্ভর করে, তাঁর ভাব অনুযায়ী গান সংযোজন করে শকুন্তলা নৃত্যনাট্যের রূপদান করেছি। কালিদাসের শকুন্তলার হুবহু অনুসরণ করা তাই এ নাটকের লক্ষ্য নয়।" কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, এই বক্তব্যটুকু না রাখলেই বোধ হয় নৃত্যনাট্যটি

[illegible] ছবি 'শিকড়'- এর একটি দৃশ্য

'জনতার আদালত' ছবির একটি দৃশ্যে রত্না ঘোষাল ও যূঁই ব্যানার্জী

ভাল হত। কারণ বক্তব্য আর নৃত্যনাট্য যথার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয় নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় শকুন্তলায় যেমন শান্তি ও সৌন্দর্য, মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধির এবং মর্ত্যকে স্বর্গের সঙ্গে সম্মিলিত করে দেবার কথা আছে, সেই সঙ্গে "প্রণয় ব্যবসায়ে রাজা পরিপক্ক ও কঠিন......", "দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল", "বহু বল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া অনাদরের অন্ধকারে......" ইত্যাদি কথাও আছে। নৃত্যনাট্য গতানুগতিক শকুন্তলা উপাখ্যানের ধারায় অগ্রসর হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার মেজাজের সঙ্গতি রক্ষা করতে যথার্থভাবে পারে নি। এছাড়া শিল্পীদের অনুশীলনের ব্যাপারে আরো সময় নিলে নৃত্যনাট্যটি মনোরঞ্জনের দিক থেকে সার্থক হত।

পরবর্তী দিনগুলিতে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'সামান্য ক্ষতি' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করা হয়েছে।

## চিত্রাঙ্গদা

সম্প্রতি বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে মহাজাতি সদনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করলেন কলেজের ছাত্রীবৃন্দ। রীণা ঘোষ, পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তি মাঝি ও মালবিকা ভৌমিকের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সকলকে আনন্দ দিতে সমর্থ হয়। চোখে লাগার মত নৃত্য প্রদর্শন করেন ডলি শীল (অর্জুন), চিত্রাঙ্গদার কুরূপার ভূমিকায় প্রদীপ্তা মালাকার, সঙ্গীতে সন্ধ্যা পোদ্দার প্রশংসনীয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন মহালয়া দাস, সাথী সরকার, শুভ্রা বাগচী। সংগীতে ছিলেন মানবী বসু মজুমদার, অলকা ঘোষ, শর্মিষ্ঠা বোস ও প্রদীপ দাশগুপ্ত।

## তিন পয়সার পালা

নান্দীকার-এর 'তিন পয়সার পালা' নাটকের পর্যালোচনা সাপ্তাহিক বসুমতীর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পর্যালোচনায় অনবধানবশত কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশিত হয় নি। তার মধ্যে দারোগার কন্যা লতুর চরিত্রে শ্রীমতী সীমন্তিনী দাসের (রায়চৌধুরী) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী দাস স্বাভাবিকভাবে চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন। পতিতাদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বীণা মুখোপাধ্যায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু ব্রহ্মচারী। স্মিথের ভূমিকায় দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয়। এই নাটকের মঞ্চসজ্জায় রাধারমণ তপাদারের এবং রূপসজ্জায় শক্তি সেনের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

### "দুটি মন" ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ

শ্রীমতী সুপর্ণা সেন প্রযোজিত এস এম ফিল্মসের "দুটি মন" ছবির চিত্রগ্রহণ গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে। বিনয় চ্যাটার্জী রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক পীযূষ বসু। হেমন্তকুমার মুখার্জী ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, হেমন্তকুমার ও আরতি মুখার্জী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে দিলীপরঞ্জন মুখার্জী ও বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী।

এই চিত্রকাহিনীতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন—উত্তমকুমার। আশা করা যায়, "দুটি মন" ছবিতে উত্তমকুমার অভিনীত দুটি চরিত্রে উত্তমকুমারের শিল্পীজীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত হবে। নায়িকার চরিত্রে রূপদান করেছেন নবাগতা সুপর্ণা সেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন কণিকা মজুমদার, অসিতবরণ, ছায়া দেবী, রবীন ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, সুব্রত সেন, সূর্য চ্যাটার্জী, সুনীলকুমার ও মাঃ পার্থ।

অপ্সরা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

শহর কলকাতায় চেক-চলচ্চিত্র ...বের উদ্বোধন।

...সিনে ক্লাবের প্রযোজনায় এবং ইন্দো-সংস্কৃতি সমিতি ও কলিকাতাস্থ ...নসুলেট-জেনেরালের যুক্ত উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজিত হয়েছে। ...শ থেকে ২৬শে সাতটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ... প্রদর্শিত হচ্ছে নিউ সিনেমা ...াগৃহে।

কলকাতা বর্তমান ফেস্টিভালে ...কটি বাছাই করা চেক ছবি দেখার ...গ পাবে। ছবিগুলি: এ ফানি ওল্ড ..., দি এন্ড অফ এ প্রিস্ট, ডেইজিস, ...স্ট এজ, স্ট্রিক্টলি সিক্রেট (ফাস্ট ...ম্যানস), আওয়ার হ্যাপী ফ্যামিলি ...স্কিড দেখানো হবে ক্রমান্বয়ে সাত-...দিনে।

**সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা**

...সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার উদ্যোগে ...১৭ই থেকে ১৬ই মার্চ ...সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি ...টি চেকোশ্লোভাক ছবি—'এ ফানি ...ম্যান', 'ডেইজিস', 'স্কিড', 'আওয়ার ...ী ফ্যামিলি' এবং 'দি এন্ড অফ এ ...ট' নিয়ে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

## স্মরণীয় লেনিনের স্মৃতিতে নিবেদিত চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু

ভি. আই লেনিনের স্মৃতিতে নিবে-...ক্ষ সপ্তাহব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব ...তি মস্কোয় শুরু হয়েছে। এ খবর দিয়েছে তাস—এ. পি. এন। মস্কোর মোট সিনেমা হলগুলির এক-তৃতীয়াংশ হলে, ৫০টি সিনেমাগৃহে এই সব চলচ্চিত্র দেখান হচ্ছে।

উৎসবে তিন ধারার ছবি দেখান হচ্ছে—"লেনিন চিরজীবী", "লেনিনের ভাবধারা জীবন্ত ও বিজয়ী" এবং "শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ সক্রিয়"। এই প্রতিটি ধারার ছবি দু'সপ্তাহ ধরে দেখান হবে। সোভিয়েত সিনেমা-দর্শকরা ভি. আই. লেনিনের জীবন ও কর্ম, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ঘটনাবলী, গৃহযুদ্ধ ও এ যুগে লেনিনের উত্তরাধিকারের সার্থক রূপায়ণের কাহিনী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখবেন। এ ছবিগুলি বিভিন্ন সময়ে তুলেছেন বিশিষ্ট সোভিয়েত চিত্র-পরিচালক মিখাইল রম, সের্গেই ইউতকেভিচ, মার্ক ডনস্কয়, ইউলি কারাসিক ও অন্যান্যরা।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানসূচীতে লেনিনের বাল্যকাল থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তাঁর জীবনের বহু ঘটনাবলীর তথ্যচিত্র দেখান হবে।

এদিক থেকে বিশেষ আকর্ষণীয় ছবি হল সার্গেই ইউতকেভিচের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র "চিরজীবী লেনিন" ছবিটি। বহু তথ্যমূলক নথিপত্রের সহযোগে এই ছবিটি তোলা হয়েছে।

উৎসবের সময় চলচ্চিত্র-দর্শকরা প্রবীণ কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদের সংগে সাক্ষাতের সুযোগ পাবেন। এঁদের অনেকেই লেনিনকে দেখেছেন ও তাঁর সংগে কাজ করেছেন। এই সব সাক্ষাৎকার, সভা ও বৈঠকগুলি মস্কোর সিনেমা, ক্লাব ও সংস্কৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

মস্কো ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের অংগ-প্রজাতন্ত্রগুলির রাজধানীতেও এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব হবে।

চিত্রমিতা প্রযোজিত 'মহাকবি কালিদাস' ছবির সংগীত গ্রহণে সংগীত পরিচালক বিজন পাল ও নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী প্রণব ঘোষ।

হিন্দী ছবির ...

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ইংরেজরা যে ক'টি ভালো জিনিষ ভারতবাসীদের উপহার দিয়ে গেছে তার একটি হলো ক্রিকেট খেলা।

ফুটবলের মতো ক্রিকেটও সাহেবদের হাত ধরে একদিন ভারতে এসেছিল। আর প্রথম দিকে কলকাতাতেই বসতো সাহেবদের ক্রিকেট খেলার আসরগুলো। তারপর এক সময় টুপ করে কলকাতার জায়গায় বম্বে হয়ে দাঁড়ালো ক্রিকেটের পীঠস্থান। অবশ্য সেদিক দিয়ে পার্শীরা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। কারণ ভারতীয়দের মধ্যে ওরাই শুধুমাত্র প্রথমে ক্রিকেট খেলতেই শুরু করে নি, ভারতে ক্রিকেট খেলার প্রতিষ্ঠার জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রমও করেছিল। কারণ পার্শীদের দেখাদেখিই হিন্দু, মুসলিম প্রভৃতি দলগুলো ক্রিকেট খেলতে এবং ক্রিকেট খেলার জন্যে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এগিয়ে আসে।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। পরের কথা পরে হবে, আগে আগের কথায় আসা যাক।

ইতিহাসের পাতা এবং পুরনো পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ১৭৯২ সাল নাগাদ ভারতে ক্রিকেট খেলা চালু হয়ে যায়। তবে সে খেলা ছিলো পুরোপুরিভাবে ইংরেজদের নিজেদের ব্যাপার। ঐ সময় ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সভ্যরা কলকাতার ইডেন উদ্যানে

ইডেন উদ্যানের সংগে সেকালের ইডেনের পার্থক্য ছিল আকাশ-পাতাল। তখন গাছপালা আর জংগলে ভরা ছিল শহর কলকাতা তথা গোবিন্দপুর সুতানুটি আর.........।

জংগল সাফ করে তখন শহর বাড়ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন পথঘাট, বাড়ি আরো কতো কি। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নবাব পুরোপুরিভাবে এসে গেছেন ইংরেজদের মুঠোর মধ্যে। বাংলার নবাব ইংরেজদের হাতের পুতুল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তখন বাড়বাড়ন্ত। বণিকের মানদন্ড তখন আস্তে আস্তে রূপ নিচ্ছে রাজদণ্ডে।

বাঘা বাঘা সাহেব আর সৈন্যাধ্যক্ষরা সাগর পেরিয়ে এসে গ্যাট হয়ে বসছেন কেল্লায়। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গই তখন সব। গঙ্গা পারের দুর্গ তখন দুর্গম জায়গা। তার আশেপাশে যাবার অধিকার পর্যন্ত ছিল না সকলের।

কিন্তু ঐ কেল্লার সামনে খোলা মাঠে তখন বসতো আজব সব খেলার আসর। সাধারণ বাঙালীর চোখে একটা হাওয়া বোঝাই চর্মগোলক নিয়ে লাথালাথি করা কিম্বা একটা ডান্ডা দিয়ে ছুড়ে মারা বলকে পেটানো নিঃসন্দেহেই আজব খেলা।

অথচ সেই আজব খেলাই দিনের পর দিন অনুষ্ঠিত হয়ে চললো। যতো দূর জানা যায়, ১৭৯৩ সালে রাজভবনের [illegible]

ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে ভারতে প্রথম ক্রিকেট ক্লাব হিসেবে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবই ১৭৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর কলকাতায়ই ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম অনুষ্ঠান কেন্দ্র।

১৭৯৭ সাল নাগাদ ভারতীয়রা সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। খেলাটা হয়েছিল বোম্বাই-এ। বোম্বাই-এর সেনাদলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বোম্বাই-এর বাছাই দল।

সেই শুরু। ভারতীয়দের ধারাই ঐ। প্রথমটায় কেউই শুরু করতে চায় না। কিন্তু একবার শুরু হলে আর দেখতে হয় না। তখন তার জের টেনে পুরোদমে চলে সেই প্রচলন—ফলে বোম্বাই-এ ভারতীয়দের সেই ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয়দের মধ্যে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে বোম্বে, কলকাতা, পুণা, মাদ্রাজ, সিমলা, লাহোর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ক্রিকেট খেলা রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

এর পর ভারতীয়দের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলতে শুরু করলেও সাহেবদের ক্রিকেট খেলা বেশ জমে উঠলো। ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব। বোম্বাই-এর পার্শীরা সাহেবদের মতো ক্লাব তৈরি করলেন। নাম দিলেন ওরিয়েন্ট ক্লাব। দু' বছর পরে ১৮৫০ সালে বোম্বাই-এ আর একটা ক্লাবের জন্ম হলো—তার নাম দেওয়া হয়েছিল জোরাস্ট্রিয়েন ক্লাব।

॥ রণজিৎ সিংজী ॥

বিস্ময়ে হতবাক ইংরেজরাও সেদি স্বীকার করেছিলেন যে ভারতেও এ ক্রিকেটারের জন্ম [illegible]

এরও ১৫ বছর পরে ১৮৬৭ সালে [illegible]-এর পার্শীরা কাঁধের ওপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে রাউন্ড আর্ম বোলিং-এর প্রথা চালু করলেন। অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেট তখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দিকে হাঁটতে শুরু করলো বেশ পাকা এবং পোক্তভাবে।

আর তারই জের টেনে ১৮৮৬ সালে পার্শীদের একটি দল প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে গেল ইংলন্ড ভ্রমণে। সেই সফরের একুশটি খেলার মধ্যে পার্শীরা পরাজিত হয়েছিল ১৯টিতে, বাকী দুটির একটিতে পার্শীরা জেতে অপরটি শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে।

ততোদিনে কিন্তু ক্রিকেট খেলা ভারতীয়দের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। খেলার রাজা ক্রিকেট ভারতবর্ষের রাজাদের খেলায় পর্যবসিত হয়ে শুরু করে সেই তখন থেকে। ভারতের রাজা-মহারাজারা এগিয়ে এলেন ক্রিকেট খেলতে, ক্রিকেট খেলাকে আরো বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে।

ঐ দিকে ১৮৮৯-৯০ সালে মিডিলসেক্সের জি এফ ভারননের নেতৃত্বে ইংলন্ড থেকে একটা দল ভারতে এলো। অর্থাৎ ক্রিকেট বিশ্বে ভারতের নাম মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

সেই ভারতীয় ক্রিকেটকে মর্যাদা দেবার জন্যেই যেন হয়েছিল রণজিৎ সিংজীর আবির্ভাব। ইংলন্ডে খেলতেন তিনি। কিন্তু ভারতীয় হিসেবে তিনি একাই ক্রিকেট বিশ্বে ভারতকে অনেক এগিয়ে দিয়েছিলেন। রণজিৎকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক ইংরেজরাও স্বীকার করেছিল যে ভারতীয়দের মধ্যেও এমন ক্রিকেটারের জন্ম সম্ভব।

১৯১২ সাল নাগাদ মুসলিমরা কোয়াড্রাঙ্গুলার খেলার ব্যবস্থা করে এবং পাশীরাই প্রথম বছরেই এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। ১৯২৫-২৬ সালে আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে এম-সি-সি সর্বপ্রথম ভারত সফরে আসে। ৩৪টি খেলার মধ্যে একটিতেও না হারলেও এম-সি-সি'কে বার বার বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সি কে নাইডু ১১টি ওভার বাউন্ডারী মেরে খুব তাড়াতাড়ি ১৫৩ রান করে প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে কোন বিদেশী দলের বিরুদ্ধে শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। আর ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় শতরান করার গৌরব অর্জন করেন সেই বছরই সর্বভারতীয় দলের

[২২৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

তখন ক্রিকেট খেলায় ব্যবহার করা হতো দুটি স্টাম্প। বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত 'মডেল' খেলার দৃশ্য।
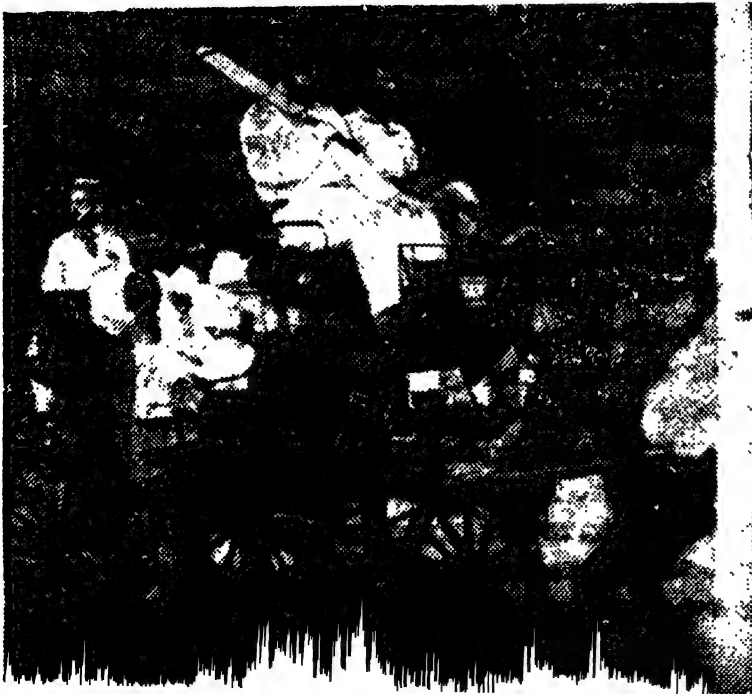
সে যুগে কলকাতার ইংরেজ খেলোয়াড়রা এইভাবে খেলতে যেতেন।

# দায় ও দায়িত্ব

সব কিছুর মতো খেলাধুলোরও একটা প্রচলিত রীতি আছে, ধরাবাঁধা নিয়মকানুন আছে আর আছে খেলা এবং খেলাবার যারা। প্রশিক্ষণ এবং তার প্রয়োগের ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। প্রশিক্ষকের তাই দায়িত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে ফুটবল খেলায় প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ওপরই খেলার ধারা আর টিম স্পিরিট কিংবা লাইন অফ এ্যাকশান—যাই বলা হোক না কেন বিশেষভাবে নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশের ফুটবল খেলার হর্তাকর্তা বিধাতারা বোধ হয় এ বিষয়টা মানতে চান না, কিম্বা মানলেও তার ওপর বিশেষ চাপ দিতে চান না। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। কয়েকদিন আগের কথাই ধরা যাক। এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা ফিরে পেয়েছে তার হারানো সম্মান। বাংলা দলের কোচ ছিলেন শ্রীঅচ্যুৎ ব্যানার্জী। বাংলা দলের সন্তোষ ট্রফি জয়ের পেছনে কোচ শ্রীব্যানার্জীর অবদানও বড় কম ছিল না। কিন্তু সেই অচ্যুৎ ব্যানার্জীকে এরই মধ্যে ভুলে বসে আছেন আই এফ এ কর্তৃপক্ষ। যাই হোক প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী জাতীয় চ্যাম্পিয়ান দল প্রত্যেক বছর তেহরণের ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত দল হিসেবে অংশগ্রহণ করতে যায়। এবার তাই বাংলা যাবে তেহরণে। আর বাংলা দলে তাঁদেরই থাকার কথা যাঁরা সন্তোষ ট্রফি জয় করে এনেছেন। আমরা আশা করবো যে, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি খেলোয়াড় এই দলে থাকবেন, কোচ হিসেবে জাতীয় প্রতিযোগিতার কোচেরই যাবার কথা। কিন্তু আই এফ এ-র হাব-ভাব ভালো মনে হচ্ছে না। বিদেশ ভ্রমণের নামে অনেকের মুখ থেকে লালা ঝরতে শুরু করে। এবারও যে এরই মধ্যে ও বিষয়ে তদ্বির শুরু হয়েছে সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু এই ব্যাপারে আই এফ এ-কে শুধু সতর্ক থাকলেই চলবে না, সৎও হতে হবে। দেখতে হবে যাতে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি খেলোয়াড়ই তেহরণে যাবার সুযোগ পান—সায় কোচও। কিন্তু মাত্র কদিন আগে কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জীর ওপর আই এফ এ কর্তৃপক্ষের বিমাতৃসুলভ আচরণ দেখে ভয় হচ্ছে—মনে হচ্ছে হয়তো বা কারো কারো ওপর তেহরণে যাবার ব্যাপারে অবিচার করা হবে। কারণ কর্তৃপক্ষ তাঁদের পেয়ারের খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দেবার জন্যে অনেক নোংরামিই করতে পারেন। এ ধরণের ঘটনার নজীর আগেও ঘটেছে। এবারও যে ঘটবে না তাই বা কে বলতে পারে। তবে আর যাই হোক এ ঘটনা ঘটলে যে ভালো হবে না একথা আমরা এখনই বলে রাখতে পারি।

## ফুটবল-ফুটবল

বাংলা দেশ তথা কলকাতার আসল খেলাই হলো ফুটবল। তাই সময়ে হোক কিম্বা অসময়ে হোক, ফুটবল খেলা সব সময়ই বাংলা দেশের খেলার বাজার মাৎ করে রাখে।

মাত্র ক'দিন আগে কলকাতায় ফুটবল জগৎকে আচমকাই যেন গরম করতে এসেও গরম করতে পারলো না চেক টিম ব্রাতিস্লাভা। আই· এফ· এ'র সংগে তাদের একটাই খেলা হয়েছিল। কিন্তু খেলার আকর্ষণ যেমন বিন্দু-বিসর্গও ছিল না, তেমনি খেলাটি কলকাতার দর্শকদের মন এতোটুকুও ভরাতে পারে নি। ব্রাতিস্লাভা দলের খেলা দেখে মনে হয় নি যে, দলটি খুব একটা শক্তিশালী। তবে ওদের খেলার ধারা এবং সূক্ষ্ম কলাকৌশল আমাদের চেয়ে অনেক ভালো।

তা হলেও তারা খুব একটা ভালো খেলতে পারে নি। অথচ আই· এফ· এ'ও পুরো শক্তি নিয়ে মাঠে নামে নি। কোচিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণ না করার জন্যে কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হয় নি। আর যাই হোক, একে নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ বলতেই হবে।

ব্রাতিস্লাভা শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে আই· এফ· এ'কে হারিয়েছিল বটে, কিন্তু খেলার ধারা সব সময়ই মাঝারি-য়ানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোন দল কখনোই উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারে নি। খেলাটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এ যেন কলকাতার প্রথম বিভাগের দুটো ছোট দলের খেলা।

চেক দল কলকাতা ময়দানকে গরম করতে পারে নি, কিন্তু ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের পালা শুরু হতে না হতেই ময়দানী আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। কোন দল যে কাকে দলে টানবেন, এই নিয়ে ভাবনা-চিন্তার যেন আর শেষ নেই ফুটবল উৎসাহীদের। আই· এফ· এ অফিসের সামনে এখন দারুণ ভিড়—প্রচণ্ড উত্তেজনা। এ উত্তে-জনা এখনো চলবে বেশ কিছুদিন ধরে।

ক্রিকেট মরশুম শেষ হয়ে এলো, হকি মাঠে নামবে নামবে করছে, অথচ এরই মধ্যে খেলোয়াড়দের দল বদলের পালাকে [illegible]-ফুটবল ময়দানী আবহাওয়া রীতিমত উত্তেজনা আর আলোচনার খোরাকে ভরে দিয়েছে।

## গল্প হলেও সত্যি

খুব মেরে খেলতেন তিনি। ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ফেলে তাঁর রানের গাড়ি দৌড়ে যেত। তিনি এত নির্দয়ভাবে বোলারদের পেটা-তেন যে, এই বিষয়ে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। যেমন ১৯০১ সালে "অবশিষ্ট ইংলণ্ডের" পক্ষ হয়ে খেলতে নেমে ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ২৩৩ রান করেন ১৩৫ মিনিটে। ১৯০৩ সালে গ্লস্টার্স-শায়ার দলের পক্ষে সাসেক্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ২৮৬ রান করে ফেলেন মাত্র ১২০ মিনিটের মধ্যে। এর পর ১৯০৪ সালে ঐ গ্লস্টার্সশায়ার দলের হয়েই খেলে নটিংহামের বিরুদ্ধে ১৪০ মিনিট খেলে করেন ২০৬ রান। আবার ১৯০৫ সালে ঐ দলেরই হয়ে সামারসেটের বিপক্ষে ২৩৪ রান করেন ১৩০ মিনিটে। তারপর ১৯০৭ সাল। ঐ বছরে গ্লস্টার্স-শায়ার দলের পক্ষেই সাসেক্সের বিপক্ষে ২৪০ রান করেন। এতে তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র ১৭৫ মিনিট।

এই মারকুটে খেলোয়াড়টি হলেন ইংলণ্ডের। নাম জি এল জেসপ। কাউন্টী ক্রিকেটে জেসপের ঐ রকম চোখ জুড়োনো রানের বাহার হলেও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকীর্তি হল ১৯০২ সালে স্থাপিত উজ্জ্বল ইনিংসটি। সে বছরে ওভাল মাঠে ইংলণ্ড-অস্ট্রে-লিয়ার মধ্যে এ্যাসেজের লড়াই হচ্ছে। দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্যে ইংলণ্ডের দরকার ছিল ২৬৩ রানের। কিন্তু ৪৮ রানেই তাদের পাঁচটি মূল্যবান উইকেট পড়ে যায়। জেসপ সে সময় একা উইকেটে দাঁড়িয়ে লড়াই করে-ছিলেন। তাঁর দলীয় রানসংখ্যা ১৩৯ হতেই দশম উইকেটটি পড়ে যায়। ইংলণ্ডের ঐ ১৩৯ রানের মধ্যে জি এল জেসপ একাই করে-ছিলেন ১০৪ রান এবং তা মাত্র ৭৫ মিনিটে। —পবিত্র সমাদ্দার

হালতু, ২৪ পরগণা

## সমাচার দর্পণ

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান এবং ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক লেন হাটন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। এর মধ্যে কলকাতাতেও ঘুরে গেছেন তিনি। ভারতে এসে হাটন ভারতীয় খেলো-য়াড়দের সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ভারতের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার অমর সিং সর্বকালের সেরা পর্যায়ের বোলার। মহম্মদ নিসার এবং অমর সিং-এর জুটি একসময় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছিল। স্যার লেন হাটন সর্ব-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছ'জন চৌকশ খেলোয়াড়ের নাম বলেছেন। তার মধ্যে আছে ভারতের ভিনু মানকাদের নাম। এ ছাড়া এই তালিকায় আছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারি সোবার্স, অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার, ইংলণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, উইলফ্রেড রোডস আর ফ্রাংক উলি। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বিজয় মার্চেন্ট ও বিজয় হাজারে-কে অসাধারণ বলে আখ্যা দিয়েছেন হাটন আর এখনকার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ফারুক ইঞ্জিনিয়ার আর পাতৌদির নবাবকে ভালো ব্যাটসম্যান বলে স্বীকৃতি দিয়ে-ছেন স্যার লেন হাটন।

*

তিস্তা আর পিনাকীর পর এবার সেনাবাহিনীর আটজন সদস্য পালতোলা দুটো নৌকো নিয়ে সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছেন আন্দামানের পথে। নৌকো দুটোর নাম রাজহংস ও অলবাএস।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকার তীব্র বর্ণ-বৈষম্য নীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে এখন বিশ্রী রকমের একটা জট পাকিয়েছে। তারই জের টেনে শেষ পর্যন্ত হয়তো বা দক্ষিণ আফ্রিকাকে একঘরে হতে হবে। ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতা থেকে হয়তো বা খুব শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাদ দেওয়া হবে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার আগামী ইংলণ্ড সফর নিয়ে যে কি হবে তা এখন বোঝা যাচ্ছে না। এই সফর নিয়ে এরই মধ্যে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে। মনে হচ্ছে আরো হবে। দেখা যাক, খেলার জগতে বর্ণবৈষম্যের শেষ ফয়সালা কোথায় এবং কিভাবে হয়।
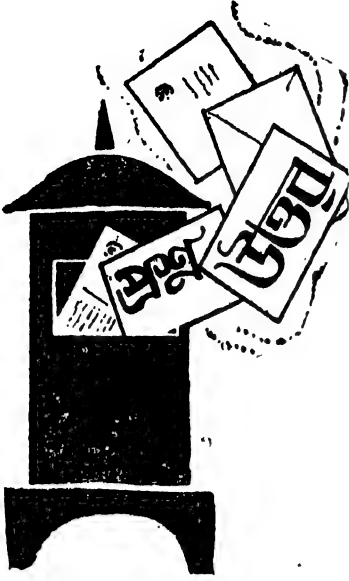
**বিধানচন্দ্র ঘোষ ও কল্যাণেশ্বর ঘোষ** (পুরুলিয়া, মুনসেফডাঙা)

**প্রশ্ন :** কোন বোলার যদি দুটো পা পপিং ক্রীজের বাইরে রেখে বল করে তবে কি সেটা নো বল? আর যদি সে একটি পা ভিতরে ও আর একটি পা বাইরে অথচ পা উঠিয়ে থাকে তবে সেটি কি নো বল?

**উত্তর :** বোলারকে সব সময় পপিং ক্রীজের পেছন থেকে বল করতে হবে। পপিং ক্রীজের বাইরে পা রেখে বল করলে নো বল হবে। আর একটা পা পপিং ক্রীজের বাইরে এবং অন্য পাটা বোলিং ও পপিং ক্রীজের মধ্যেও যদি থাকে এবং উঁচু থাকে তাহলে সেটিও নো বল হবে।

এল· বি· ডব্লিউ সম্বন্ধে আপনি যে দু'টি ক্ষেত্রের প্রশ্ন তুলেছেন সেই দু'টি ক্ষেত্রে আম্পায়ার যদি মনে করেন যে, বলটি উইকেটের সোজা-সুজি ছিল এবং পায়ে না লাগলে নির্ঘাত উইকেটে লাগতো ও বলটি লেগ স্টাম্পের বাইরে থেকে আসে নি, তাহলে তিনি ঐ দু'টি ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যানকে আউট দেবেন বা দিতে পারেন।

**জয়দেব দে সরকার** (কুচবিহার, নালকুঠি)

**উত্তর :** আপনার ধারণা কিন্তু সঠিক নয়। সোবার্স এবং কুন্দরণকে নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীতে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে, এমন কি ওঁদের দুজনের জীবনীও সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে।

**সমীরকুমার চট্টোপাধ্যায়** (ইকড়া, বর্ধমান)

**প্রশ্ন :** রাবার কি?

**উত্তর :** একটি বিশেষ অর্থবোধক প্রচলিত শব্দ। কোন টেস্ট সিরিজের বেশীর-ভাগ টেস্টে যে দল জেতে সেই দেশ 'রাবার' পেয়েছে বলা হয়। একমাত্র ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট লড়াই-এর সময় রাবারের জায়গায় 'এ্যাসেজ' বলা হয়।

---

[২২৩৭ পৃষ্ঠার পর]

পক্ষে এবং এম-সি-সি'র বিরুদ্ধে ডি বি দেওধর (১৪৮ রান)।

এম-সি-সি দলের এই সফরের সময়ই একটা সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো বোর্ড অফ কনট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইণ্ডিয়া। ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন মিঃ আর ই গ্রাণ্ট গোভান ও মিঃ এ এস মেলো।

এর চার বছরের মধ্যে এম-সি-সি ভারতীয় ক্রিকেটকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড ভ্রমণে ভারতকে টেস্ট খেলার সুযোগ দিলেন।

[চলবে]

সি এ বি'র সম্বর্ধনা সভায় সম্পাদক শ্রী এন এল জালান বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় লেন হাটনকে উপহার দিচ্ছেন। হাটনের পাশে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ও সি এ বি'র সম্পাদক শ্রী এন ঘোষকে দেখা যাচ্ছে।

---

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী রোটারী মেশিনে শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র





এ.সরকার এন্ড সন্স

# সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৩৬শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 5th March, 1970

# রাজ্যের শিক্ষানীতি

**শিক্ষা** সম্প্রসারণের জন্য অনেক বড় বড় কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, শিক্ষার জন্য অর্থের টানাটানি পড়ে। ইহজগতের প্রায় কোনো ব্যাপারই অর্থের অভাবে স্থগিত থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশে একমাত্র শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যই অর্থ জোটে না। স্বাধীন ভারতে এটুকু আশা আমাদের ছিল, দেশের সরকার শিক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবু দেখা গেল, শিক্ষার হার যা বৃদ্ধি পেয়েছে, জনবৃদ্ধি হারের তুলনায় তা নগণ্যমাত্র। তা সত্ত্বেও ভারতের দুটি রাজ্য—মাদ্রাজ এবং কেরল—শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং সেই শুভ প্রচেষ্টা বিফল হয় নি।

শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়, তবু মাদ্রাজ ও কেরল সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন নি। উক্ত দুটি রাজ্য যে চেষ্টা করেছে, অন্য রাজ্যগুলিই বা তা করতে পারবে না কেন? তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করলে, আমাদের ধারণা, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য রাজ্যগুলিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। কারণ সর্বজনীন শিক্ষার জন্য তো আমাদের সংবিধানেও সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে—যদিও তা পালন করা হয় নি। তবে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নৈতিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করতে পারবেন না, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আশা করা গিয়েছিল, বর্তমান বছর থেকেই হয়তো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু হবে। বাজেটে বরাদ্দ দেখে মনে হচ্ছে, ভাঁড়ে মা ভবানী। অতএব ঐ প্রতিশ্রুতি কার্যকর হচ্ছে কি না, তা বলা এখনো পর্যন্ত কঠিন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য না পেলে, সম্ভবত, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ এর সহজ অর্থ এই যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু হবে—এই আশায় অনেকেই দিন গুণছিলেন। কিন্তু শরিকী সংঘর্ষ যেখানে প্রাত্যহিক ব্যাপার, সেখানে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা নিয়ে কে এগিয়ে আসবে? অথচ যুক্তফ্রন্টের সব দল 'লোকহিত' করার জন্য তৎপর। বহুদিনের আশা—শিক্ষা সম্প্রসারণ যদি কার্যকর না হয়, ত হলে কিসের লোকহিত? কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে কখনোই লোকহিত করা যায় না বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শিক্ষার দাবি হবে সর্বাগ্রগণ্য। কারণ দেশবাসী যদি শিক্ষিত হন তা হলে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য তাঁদের চিত্ত জাগরিত হয়। বিপদের মুহূর্তে প্রকৃত ভরসা হন তাঁরাই। কারণ তাঁদের নতুন করে জাগাতে হয় না, তাঁরা অনেক আগেই জাগ্রত।

তবু অর্থাভাবই শিক্ষা সম্প্রসারিত না হবার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ শিক্ষার জন্য নতুন করে কর স্থাপন করা, বোধ হয়, সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর যদি তা সম্ভব করতে চান তা হলে সেই কর কাদের কাছ থেকে আদায় করা উচিত—সে ব্যাপারেও সরকার স্থির নিশ্চিত নন। অর্থাৎ আমাদের সাহসী সরকারের বাধাবিঘ্ন অনেক!

প্রসঙ্গত আমরা সেই কবে বলে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন, "কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুকুম পাশ হয়েছে প্রজাদের কান মলে শিক্ষা-কর আদায় করার এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের ওপরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে, শিক্ষা ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

"শিক্ষা-কর চাই বই কি, নইলে খরচ যোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না? সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর-ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না? পাট কলে যেসব বড় বড় বিলাতী মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনাফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনো দায়িত্বই নেই? যেসব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাশ নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজেদের তহবিল থেকে দিতে হবে না?

"একেই বলে শিক্ষার জন্য দরদ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু দিয়েও থাকি; আরো দ্বিগুণ-তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি। কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল। ইত্যাদি।"

এরপরও কি জনদরদী সরকারের কিছু করার নেই?

সম্পাদকী

# আজকের মানুষ

অনুন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা বিস্তর। ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত দেশের অগ্রগতি ধীর গতিতে হতে বাধ্য এজন্য যে, বিদেশী শাসকরা তাদের উপনিবেশকে শোষণের ক্ষেত্র করে রাখে, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি তাকে কখনই যোগায় না। দেশবাসীর পক্ষে আরো ক্ষোভের কারণ ঘটে এখানে যে, বিদেশী উপনিবেশবাদীর সঙ্গে কিছু স্বদেশী শোষণবাদী হাত মেলাতে দ্বিধা করেন না। এঁদের লক্ষ্য এক: মুনাফা লোটো, মানুষকে শোষণ করো। বলা বাহুল্য, শিল্পের একচেটিয়া মালিকের পক্ষে যতখানি নির্দয় হয়ে দোহন করা সম্ভব, অতখানি সুযোগ আর কারো নেই। সে মালিকের গায়ের চামড়া শাদাই হোক, আর কালোই হোক; শোষণের শিকার তার আপনিই হোক—শোষকের চরিত্র তাতে পাল্টায় না।

কিন্তু শোষিত জনতার রাজনৈতিক চেতনা জাগলেই শোষকের ঘটে বিপদ। কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষমতা নিজের হাতে না থাকার দরুণ শোষকের বিরুদ্ধে শক্তির লড়াইয়ে দাঁড়ানোর সাহস তখনও শোষিত জনগণ পায় না। কিন্তু আন্দোলন চলতে থাকে অব্যাহত ধারায়, দুর্বার গতিতে তার শক্তিও বৃদ্ধি ঘটে।

অনুন্নত দেশেরই আর একটি বৈশিষ্ট্য অভাবের পাশাপাশিই দেখতে পাওয়া যায়। যার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ—সে অভিযোগ কখনো অদৃশ্য দেবতা সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, কখনো সরকারের বিরুদ্ধে, কখনো কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, কখনো বা নিজেরই বিরুদ্ধে। সে অভিযোগের প্রতিকার যে সব সময় পাওয়া যায় না, সেকথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিযোগের সংখ্যা, যতই দিন গিয়েছে, ততই বেড়েছে। এমন কি, সব অভিযোগেরই যে পাকা ভিত্তি আছে, তারও কোন মানে নেই। যারে দেখতে নারি তার বিরুদ্ধে একটা নালিশ ঠুকে দিয়ে গায়ের ঝাল তো খানিকটা মেটানো যায়।

ভারতবর্ষে বিড়লারা একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন বললে কিছু অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে যে, বিড়লাদের শিল্প লাইসেন্স লাভের ব্যাপারে গুরুতর অনিয়ম ঘটেছে। অভিযোগকারী রাস্তার লোক বা সাধারণ কোন ব্যক্তি নন। লোকসভাতেই এ অভিযোগ সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকেও এর সঙ্গে জড়ানো হয়েছে।

অমলকুমার সরকার

অভিযোগের সত্য-মিথ্যা যাচাই হওয়ার আগে কোনো রায় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অভিযোগগুলির তদন্তের জন্যেও তেমনি পাকা অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রয়োজন। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীঅমলকুমার সরকারকে এ দায়িত্বভার দিয়ে সরকার ঠিকই করেছেন।

আইন বিষয়ে শ্রীসরকারের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সততা ও দৃঢ়তা সকল সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী এস আর দাশ এবং পরলোকগত প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসুর জুনিয়র হিসেবে আইন ব্যবসায় যোগদান করে শ্রীসরকার অল্প দিনের মধ্যেই পসার জমিয়ে নিয়েছিলেন। প্রথমে ব্যারিস্টারি করলেন তিনি চুটিয়ে। পরে ১৯৪৯ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে যখন শ্রীসরকার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম জজ নিযুক্ত হন, তখন তাঁর গুরু এস আর দাশই তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

শ্রীসরকারের জন্ম এক বিচারকদেরই পরিবারে। তাঁর বাবাও ছিলেন একজন প্রাদেশিক আইন অফিসার। বাঁকিপুর, কৃষ্ণনগর এবং কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়া শেষ করে শ্রীসরকার লণ্ডনের লিঙ্কন্স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। আইনজীবী মহলে তিনি স্বাধীনচেতা এবং সৎ আইনবিদ হিসেবে প্রশংসিত আবার বহুবার ডিসেন্টিং নোট বা ভিন্ন মতের রায় দেবার কারণে শ্রীসরকার কোর্ট পাড়ায় ডিসেন্টিং জজ হিসেবে খ্যাত। যথেষ্ট সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং সর্বোপরি চারিত্রিক দৃঢ়তা না থাকলে ভিন্ন মত পোষণের ঝুঁকি শ্রীসরকার নেন কী করে। অকৃতদার সরকারের নেশা আইনের বই ঘাঁটা, সাঁতার কাটা এবং চড়াই-উৎরাই ডিঙানো। বিড়লা শিল্পগোষ্ঠী সম্পর্কে যে এক-সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয়েছে, তার গুরুদায়িত্ব পালনে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির যে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না, তা এখনই বলা যেতে পারে। কারণ, দেখা গিয়েছে, শ্রীসরকারের এ-ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণেই উৎসাহ বেশি।

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

## শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

### বসু ও জিন্না—(৩)

মুসলমান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে লর্ড মিণ্টোর ব্যবহারের কথা এখানে বিস্তারিতভাবে বলার কারণ, এর আলোকে বোঝা যাবে কি জন্য মুসলিম সাম্প্রদায়িকরা ক্রমে তাদের দাবি বাড়াতে পেরেছিল। মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাতের সাফল্যকে স্থায়ী করবার জন্য উৎসাহিত সাম্প্রদায়িকরা মুসলিম লীগ স্থাপন করেছিল কয়েক মাসের মধ্যে। বাংলা দেশেই মুসলিম লীগ প্রথম গঠিত হয়।

ঢাকায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট মুসলমান সমবেত হয়েছিলেন। তার সুযোগে নবাব সলিমুল্লা মুসলমানদের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে ৩০শে ডিসেম্বর সভা আহ্বান করলেন। আমির আলির প্রতিষ্ঠান তখন মৃতকল্প। আরও কিছু ক্ষুদ্র মুসলিম সংগঠন ছিল। একদিকে তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন, অন্যদিকে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা, এই দুই উদ্দেশ্যেই যে কেন্দ্রীয় মুসলিম সংস্থা গঠনের আয়োজন, নবাব সলিমুল্লা সেকথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন নবাব ওয়াকার-উল-মুলুক। 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অতঃপর ভারপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র একটি কমিটি যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে তাকে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০৭ সালে করাচী সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। লীগের উদ্দেশ্য ও চরিত্র নিম্নোক্ত প্রকার :

(ক) ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বর্ধিত করা এবং সরকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যদি কোনো ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, তাকে দূর করা;

(খ) ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করা, বিস্তৃত করা, এবং তাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষাকে সসম্ভ্রমে সরকারের কাছে উপস্থিত করা;

(গ) মুসলমান ভিন্ন অপর সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোনো বিরূপতার সৃষ্টি হয়, তার বৃদ্ধি রোধ করা, ইত্যাদি।[10]

শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি যে শুধু লিখিত থাকার জন্য, কার্যকরী হবার জন্য নয়, তা পূর্বোক্ত নবাব ওয়াকার-উল-মুলুকের বক্তৃতার বয়ান থেকে বোঝা যায় : "আমাদের কলমের শক্তি নেই...কিন্তু তরবারি ধারণের শক্তি আমাদের বাহুতে আছে।"

তা সত্যই আছে প্রমাণ করতে দাঙ্গা বাধানো হল। এক্ষেত্রে কিন্তু আসল কলকাঠি নেড়েছিল বৃটিশ কর্মচারীরা পিছন থেকে। প্রথমত স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী মেলা নষ্ট করতে দাঙ্গাকারীদের উস্কানি দেওয়া হয়,[11] পরে সেটা হিন্দুদের ধনসম্পত্তি ও মর্যাদা লুণ্ঠনের প্ররোচনায় গিয়ে পৌঁছয়। ঢ্যাড়া দিয়ে বলা হয়েছিল, হিন্দুদের পীড়ন করলে বা তাদের সম্পত্তি লুঠ করলে ইংরেজ সরকার বা ঢাকার নবাব কোনই শাস্তি দেবেন না, বরং তাঁরা তাই করতে বলেছেন। মোল্লা-মৌলবীরা দলে দলে এই বার্তা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। দাঙ্গা সত্যই বাধলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে, কখনো-বা মুসলমানদের সংযমের প্রশংসায় মুখর হয়। বহু সংঘর্ষ হয়েছিল, তার মধ্যে ১৯০৭ মার্চের কুমিল্লার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পরে ময়মনসিংহের জামালপুরের দাঙ্গা সবচেয়ে বড়। কুমিল্লার দাঙ্গা নবাব সলিমুল্লার কুমিল্লা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বেধেছিল।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা কী চেহারা নিয়ে জেগে উঠেছিল 'লাল ইস্তাহারই' তার প্রমাণ। ১৯০৬-এর ডিসেম্বর মাসে পূর্বোক্ত ঢাকা শিক্ষা সম্মেলনে এই লাল ইস্তাহারের কথা প্রথম জানা যায়, ১৯০৭-এর মার্চ মাসে বরিশাল মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে তা প্রচারিত হয়, কিন্তু উভয়

---

১০ রমেশ মজুমদার, ২য়।

১১ সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য ১৯০৬ ডিসেম্বরে 'মহমেডান ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করা হয়, উদ্দেশ্য, স্বদেশী আন্দোলনকারীরা মুসলমানদের উপর কি ধরনের উৎপীড়ন করেছে, তার তথ্য সংগ্রহ করা। সরকারী কর্মচারীদের প্ররোচনাতেই এটি গঠিত হয়েছিল।

অনেকেই দায়িত্বশীল মুসলমানেরা ওটিকে চাপা দেন। তা হলেও ৬ মাস ধরে ঐ বিষাক্ত প্ররোচনামূলক পুস্তিকাটি পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। তার পরে যখন এই প্যামপ্লেটের প্রকাশক ইব্রাহিম খানের বিরুদ্ধে সরকার মামলা জুড়ল, তখন দেখা গেল, সে মামলা চালাতে সরকারের কোনই অভিপ্রায় নেই, শেষে মামলা তুলে নেওয়া হল এবং বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি পেল সেই ব্যক্তি। লর্ড মিন্টো পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন—"কাজটা বড়ই অবিবেচনার হয়ে গেছে।"১২

বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে। সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের কাছে ইংরেজের এই আচরণ বিশ্বাসঘাতকতার মত মনে হয়। ইংরেজের প্রতি যে অখণ্ড আনুগত্যের মন্ত্র মুসলমানদের জপ করানো হচ্ছিল ৪০ বছর ধরে, তাতে খানিক ভাটা পড়ল এবং কংগ্রেসী আন্দোলনের শক্তির চেহারাও দেখা গেল বঙ্গবিভাগের 'স্থির ব্যবস্থাকে' অস্থির করার মধ্যে।১৩ বঙ্গবিভাগ রদ হওয়ার পরে কংগ্রেসীদের বড় অংশ রাজভক্তিতে ভাসতে লাগল এবং সেই সুরচিত ভক্তি-মদ্যের তুলনায় মুসলমানদের অনুৎকৃষ্ট ভক্তি-সুরা সাময়িকভাবে পানসে ঠেকল। পূর্ববঙ্গের নব-

১২ লাল ইস্তাহারের কিছু অংশ ডঃ রমেশ মজুমদারের গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। যথা :

"হিন্দুরা নানা কৌশলে মুসলমানদের আয়ের প্রায় সব অংশ নিয়ে নিচ্ছে।"

"মুসলমানদের উন্নতির নানা উপায়ের একটি হিন্দুদের বয়কট করা।"

"হে মুসলমানগণ, ওঠো, জাগো, হিন্দুদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়ো না। হিন্দুর দোকান থেকে কিছু কিনো না। হিন্দুর স্পৃষ্ট কোনো জিনিস ছুঁয়ো না। কোনো হিন্দুকে চাকরি দিও না। হিন্দুর অধীনে কোনো অসম্মানজনক কাজ নিও না। তোমরা এখন অজ্ঞান, যদি জ্ঞান পাও, তা হলে সকল হিন্দুকে জাহান্নমে পাঠাতে পারবে। এই প্রদেশের বেশি লোক তোমরা। চাষীদের মধ্যে তোমরা সংখ্যায় বেশি। কৃষিই সম্পত্তির মূলে। হিন্দুদের নিজস্ব কোনো ধন নেই, তারা তোমাদের ধন হরণ করেই ধনী হয়েছে। যদি তোমরা যথেষ্ট জ্ঞানের আলোক পাও, তা হলে হিন্দুরা খেতে পাবে না এবং শীঘ্রই মুসলমান হয়ে যাবে।"

"হিন্দুরা অত্যন্ত স্বার্থপর। মুসলমানদের অগ্রগতি যেহেতু হিন্দুদের হামবড়াই ভাবের বিরোধী, তাই হিন্দুরা নীচ স্বার্থের জন্য মুসলমানদের উন্নতির বিরোধিতা করে।"।"

"হিন্দুদের বয়কট করতে একজোট হও। কোন্ বদমাইশি না তারা আমাদের সঙ্গে করেছে! আমাদের মানমর্যাদা ও টাকাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছে, আমাদের হররোজের রুটি কেড়ে নিয়েছে, এখন প্রাণ পর্যন্ত কেড়ে নিতে চায়।" (অনূদিত)

১৩ জিন্নার জীবনীকার পার্টিশান রোধ করার জন্য ইংলন্ডের তৎকালীন লিবারাল সরকারকে যথেষ্ট নিন্দা করেছেন। এ'র মতেঃ ঐ সরকার পার্টিশানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদকে সর্বভারতের মিলিত কণ্ঠস্বর ধরে নিয়ে খুবই অপরাধ করেছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮-তে যে ৬ জন নতুন সদস্য হাউস অব কমন্সে বক্তৃতা করেন, তাঁরা ভারতস্থ সকলকে 'ভারতবাসী' বলে সাটে ধরে দিয়েছিলেন—হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ যে ভিন্ন তা বলেন নি, অথচ ঐ সময়ে কংগ্রেসের ৭৫৬ জন সদস্যের মধ্যে মুসলমান সদস্য মাত্র ১৭। "এই কালে ওয়েস্টমিনিস্টারে যেসব বক্তৃতা হয়েছিল, ইংলন্ডের সংবাদপত্রসমূহে যেসব লেখা ছাপা হয়েছিল, তার থেকে ভারতের অধিবাসিগণ যে সকলে 'এক মনের মানুষ নয়' তা বুঝতে ইংরেজের অনিচ্ছা দেখিয়ে দেয়।" "There was talk of appearing the 'Indians' by cancelling the partition of Bengal, *immediately*—and act that would have robbed the Muslims of the only encouraging piece of legislation in their favour since the Mutiny. The vehemence of the Hindu protest in Congress, against the partition, convinced educated Muslims that they could be redeemed only if they created their own political force and their own leadership." (H. Bolitho)

মিন্টোর কাছে মুসলিম প্রতিনিধিদলের আবেদনের কথা আগে যথেষ্ট বলা হয়েছে। দলের নেতা ২৯ বৎসর বয়স্ক আগা খাঁ স্বধর্মাবলম্বীদের অবস্থার কথা জানাবার পরে "বঙ্গ বিভাগের দ্বারা যে-রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্বন্ধে মুসলিম অভিমত ব্যক্ত করেন" এবং আবেদন জানান—"হিন্দুদের দ্রুত এমন কোনো রাজনৈতিক সুবিধা যেন দেওয়া না হয় যার দ্বারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্য স্থাপনের পথ পরিষ্কার হয়ে পড়বে।"

পশ্চিমবঙ্গের আগামী বছরের বাজেট বিধানসভায় পেশ করার পর এই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা একান্তই হতাশাব্যঞ্জক। গত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে আমরা বাজেটের যে সারাংশ পরিবেশন করেছিলাম তাতেই দেখা গিয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবন্টনের ভ্রান্ত নীতির ফলে সাতটি রাজ্যে বিশেষ উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে, এবং বাকিগুলির ঘাটতির পরিমাণ দিনের পর দিন এরকম শোচনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, সেগুলি নিঃস্বতার শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সংগ্রহের মূল উৎসগুলি নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন, ফলে রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে নিজেদের রাজ্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করা রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য সব রাজ্যগুলির অবস্থা একরকম হয় নি, কেন হয় নি তা সংক্ষেপে বলা দরকার। ধরা যাক, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাগমের একটি প্রধান উৎস হচ্ছে আয়কর। সব রাজ্য থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর তোলেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশী আয়কর যে সকল রাজ্য থেকে তোলেন তার অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গ। এভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যত টাকা তোলেন, সেগুলির কিয়দংশ আবার রাজ্যগুলির মধ্যেই বন্টিত হয়। এই বন্টনের নীতি কি হবে তা স্থির করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একটি করে অর্থ কমিশন গঠন করেন। এই অর্থ কমিশনের কাজ হচ্ছে বন্টনের নীতি স্থির করা। এ পর্যন্ত পাঁচটি অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে, কিন্তু অর্থ বন্টনের যে নীতি এতকাল ধরে এই কমিশনের মারফৎ গ্রহণ করা হয়েছে তা কোন বাস্তবানুগ নীতি নয়। মূলত রাজ্যগুলিকে অগ্রসর অনগ্রসর এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এবং অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে বেশী আর্থিক সুবিধা দেওয়া মন্দ নয়, কিন্তু এই নীতি গ্রহণের ফলে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে দেখা যাক। এই নীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চয়ই অনগ্রসর রাজ্য নয়, কেন না পশ্চিমবঙ্গ মোটামুটি শিল্পসমৃদ্ধ, এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নানাসূত্রে প্রচুর অর্থ পেয়ে থাকেন, এবং ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান উৎস পশ্চিমবঙ্গ। কাগজে-কলমে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই অগ্রসর দেশ, কিন্তু কার্যত তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা ভারতের সকল রাজ্যের চেয়ে বেশী। দেশ বিভাগজনিত সবচেয়ে বড় ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গকেই বহন করতে হয়েছে, জনসংখ্যার ঘনত্ব, কর্মসংস্থানের অভাব, এবং হাজার সমস্যা মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য কোন রাজ্যের তুলনাই হয় না, তথাপি পূর্বোক্ত নিয়মের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশ বা হরিয়ানা অনগ্রসরতার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য পায় তার সিকি ভাগ পশ্চিমবঙ্গের বরাতে জোটে না। পঞ্চম অর্থ কমিশন সাতটি রাজ্যের ক্ষেত্রে এমন টাকা মঞ্জুর করেছেন যেখানে ওই সকল রাজ্যে ১,২৭১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে, তখন অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গসহ আরও কয়েকটি রাজ্যে বিপুল ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এই সব উদ্বৃত্ত উক্ত রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনার বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সক্ষম করেছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বর্তমান আর্থিক অবস্থায় চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া অনুযায়ী ৩২০.৫১ কোটি টাকার পরিকল্পনাও রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। সংবিধান মূলত অধিকতর সম্প্রসারণশীল রাজস্বের উৎসগুলি, বিশেষ করে শিল্পসঞ্জাত উৎসগুলি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে, কাজেই রাজ্যের পক্ষে রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারও প্রয়োজনীয় অর্থ পশ্চিমবঙ্গকে দেবেন না। এমতাবস্থায় একটি পথই খোলা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা। ক্ষমতা লাভের পর যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা খুব বড় গলায় বলেছিলেন, এবং এক সময় সে শক্তিও যে তাঁদের ছিল তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বর্তমানে দিল্লী দূর অস্ত্, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমবেত সংগ্রামের পরিবর্তে তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধেই লড়ছেন।

## বিশ্ববিদ্যালয়ে গেরিলা যুদ্ধের মহড়া !

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেরিলা যুদ্ধের যে মহড়ার দৃশ্য দেখা গেল তার পিছনের উদ্দেশ্যটা যে কি ছিল সেটাই বুঝে ওঠা দুষ্কর। এক তরফ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এবং অপর তরফ প্রত্যুত্তরে বোমা-বন্দুক-পিস্তলের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ফলে কারো প্রাণহানি না ঘটলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয়েছে তাঁদের, যাঁরা সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। এ রকম একটা ঘটনার আদৌ কি কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল ? আমাদের তা মনে হয় না। আসলে একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল শক্তির পরীক্ষায় নেমেছিলেন, সেটাই ছিল মুখ্য, এবং তাঁদের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষতি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সর্বাধিক ক্ষতি হল সেই কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর, যাঁদের পরীক্ষা ভণ্ডুল হল এই উপলক্ষে। জনৈক অধ্যাপকের লাঞ্ছনাকে কেন্দ্র করে এই ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত অধ্যাপককে যারা লাঞ্ছিত করেছে তাদের আমরা মোটেই সমর্থন করি না, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, অধ্যাপক লাঞ্ছনার ঘটনা এই কি প্রথম? প্রত্যহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপক, শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তি-নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে, যদি কেউ গোলে হরিবোল না দিয়ে নিজের কোন কথা বলেন, তাহলে তাঁর আর নিস্তার নেই। এবং সব জায়গাতেই যে নকশাল্পী ছাত্ররা করছে তা নয়। যে কোন অধ্যাপকই লাঞ্ছিত হলে এ রকম প্রোটেকশন নিশ্চয়ই পান না, কাজেই ধর্মঘটের ডাক যে দেওয়া হয়েছিল তা উক্ত লাঞ্ছিত অধ্যাপকের মর্যাদা রক্ষার জন্য মোটেই নয়, আসলে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করার মতলবটাই এখানে কাজ করেছে। ধর্মঘট না করেও অন্যভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা যেত, অথচ এমন সময় ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছিল, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষা চলছিল, এবং এবারে এম-এ পরীক্ষা নানা ঘটনাচক্রে এত বিলম্বে শুরু হয়েছে এবং

এক-৩ বছর ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে, এবং সেদিনের ঘটনায়ও অনেক পরীক্ষার্থীর নতুন করে ক্ষতি করা হল। এর অর্থ এই নয়, যারা বোমবাজি করেছে তাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সমর্থন আছে। তারা সর্বাংশে নিন্দনীয় এবং কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তাদের বর্তমান আচরণকে সমর্থন করবেন না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, ২৪শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাটি ছাত্র আন্দোলনের একটি কলঙ্কস্বরূপ এবং ছাত্র আন্দোলন যে কি রকম বিপথে চালিত হচ্ছে--এই একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু বললেই বিষয়টির সব বলা হল না। ছাত্রদের এই উচ্ছৃংখলতা, তাণ্ডব ও বোমাবাজি যুক্তফ্রণ্টের নেতারা শাসন ও সংযত করতে পারছেন না কেন? কেন নকশালপন্থী ছাত্ররা এই সরকারকে ও তাঁদের প্রশাসনকে গ্রাহ্য করে না? বলা বাহুল্য, এর জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার বহুলাংশে দায়ী। কেন না, চোখের সামনে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি পরস্পরের মাথা ফাটাচ্ছেন। জমি, চা-বাগান, ইউনিয়ন, মিছিল যে কোন একটি উপলক্ষ অবলম্বনে বিভিন্ন পার্টির সমর্থক বলে অভিহিত লোকেরা পরস্পর খুনোখুনির প্রতিযোগিতায় নেমেছে, এবং যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলি প্রকাশ্যেই এই সব ব্যাপারে প্ররোচনা যোগাচ্ছেন, কখনো প্রতিশোধের নামে, কখনো ন্যায় প্রতিষ্ঠার নামে, কখনো শ্রেণী-সংগ্রামের নামে। যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি প্রধান দল ইতিমধ্যে নিজেদের বাহিনী গঠন করেছেন। প্রতিটি মিছিল বা জনসভায় লাঠি, শরকি, ভাণ্ডা, বল্লম, তলোয়ার, তীর-ধনুক প্রভৃতি বহন করা যেন অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক পার্টির এই সশস্ত্র দৃষ্টান্ত অপর পার্টিও গ্রহণ করছে। যুক্তফ্রন্টের সরকারী নেতারা যখন নিয়মতান্ত্রিক মন্ত্রিত্বের গদীতে বসে বেআইনী কার্যকলাপের ও খুনোখুনির প্রশ্রয় দেন, তখন তাঁরা কার্যত নকশালপন্থীদের সহায়তা করেন। যে বিষবৃক্ষের চারা তাঁরা সজ্ঞানে রোপণ করেছেন তার ফল ভোগ তাঁদের একদিন না একদিন করতেই হবে।

## শুধুই সংঘর্ষ

বস্তুত পূর্ববর্তী নিবন্ধে যা বলা হয়েছে, তারই জের টেনে একথা বলা যায় যে, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটল, তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঠিক তার পরদিন, অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আসানসোলের বেনালী কোলিয়ারীতে সি-পি-এম-সি-পি-আই সমর্থকদের মধ্য এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ দমনে পুলিশের গুলী-বর্ষণের ফলে তিনজন এবং ওই সংঘর্ষের ফলে একজন মারা গেছেন। ওই দিনই শ্রীপুর কোলিয়ারীতেও সি-পি-এম এবং এস-এস-পি'র মধ্যে সংঘর্ষে গুলীতে চারজন ও তীরের আঘাতে একজন আহত হয়েছেন। ওই একই দিন কলকাতার বেলেঘাটা থানা এলাকায় সি-পি-এম ও ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে পনেরজন আহত হয়। একই দিনে রাণাঘাট, ক্যানিং, মথুরাপুর এবং দুর্গাপুরে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি পরস্পরের মধ্যে মাথা ফাটাফাটি করেছেন। রাণাঘাটে সংঘর্ষ হয়েছে সি-পি-এম এবং আর-এস-পি'র মধ্যে, মথুরাপুর এবং ক্যানিং-এ সি-পি-এম ও এস-ইউ-সি'র মধ্যে, দুর্গাপুরে সি-পি-এম ও ফরোয়ার্ড ব্লকে। এই সব সংঘর্ষের জন্য কে দায়ী বা কতখানি দায়ী, কে দোষী, কে নির্দোষ, তা নিয়ে চুলচেরা বিচার করার চেষ্টা করে লাভ নেই, শুধু এটুকু বলা যায় যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, ব্যক্তির নিরাপত্তা একেবারে লুপ্ত হয়েছে, পুলিশের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা দুরাশা মাত্র। ফ্রন্টের শরিকী বিবাদের সুযোগ সমাজবিরোধীরা পুরোমাত্রায় নিয়েছে কোন না কোন দলের জঙ্গী সমর্থক সেজে। সারা পশ্চিমবঙ্গই আজ কার্যত গুণ্ডাকবলিত। সাধারণ মানুষ একথা জানতে মোটেই আগ্রহী নয় যে কোন্ সমাজবিরোধী গোষ্ঠী কোন্ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত। যুক্তফ্রন্ট সমর্থক সাধারণ মানুষ চায় যে, দল-সম্পর্ক যাই থাক না কেন, গুণ্ডাদের কঠোর হাতে দমন করা হোক, আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা হোক এবং জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হোক। পশ্চিমবঙ্গে যে সমাজবিরোধীর দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেড়েছে, এটা স্বয়ং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুও স্বীকার করেন, কিন্ত তিনি পি ডি অ্যাক্ট উঠে যাওয়াই এর কারণ বলে যখন ঘোষণা করেন, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে প্রাক্তন কংগ্রেস শাসকদের বক্তব্যের পার্থক্য করাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। পি ডি অ্যাক্ট তো উঠেছে মাত্র সেদিন, তার আগে কি গুণ্ডাবাজির পরিমাণ বর্তমানের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম ছিল? একথা কি যুক্তফ্রন্টের নেতারাই স্বীকার করেন নি যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় সমাজবিরোধী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে? বস্তুত যাবতীয় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রাজনৈতিক রঙ পাচ্ছে, সমাজবিরোধীদের পারস্পরিক সংঘাত শরিকী সংঘর্ষ আখ্যা পাচ্ছে। নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে প্রথমবার হাঙ্গামা হবার পর বিবদমান দুই পক্ষ সি-পি-এম ও ফরোয়ার্ড ব্লক ওই হাঙ্গামাকে শরিকী সংঘর্ষ আখ্যা দিয়ে যুক্তভাবে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাঁরা এটা আপসে মীমাংসা করে নেবেন। কিন্তু তাঁদের যুক্ত বিবৃতি সত্ত্বেও হাঙ্গামাকারীরা থামে নি, পাল্টা বার বার আগুন জ্বলেছে। শুনেছি সি-পি-এম খুব ডিসিপ্লিণ্ড পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক নিজেদের সম্পর্কে অনুরূপ দাবি করে। তাই যদি হবে, তাহলে নারকেলডাঙ্গায় পুনরায় হাঙ্গামা হল কেন? পার্টি-ক্যাডাররা এমনই ডিসিপ্লিণ্ড যে, তারা নেতাদের নির্দেশ মানে না! এখনো সময় আছে অবস্থাকে সামাল দেবার। যুক্তফ্রন্টের নেতাদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন রঙীন চশমা চোখে না এঁটে ঘটনাগুলিকে দেখেন। এ অবস্থা বাস্তবিকই চলে না, চলতে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতাও নেই।

## যুক্তফ্রণ্ট সংবাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারীর বৈঠকে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ যে আপস মীমাংসার পথে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন, তা অনেকের কাছেই অন্ধকারের মধ্যে আলোর টিপ্‌-রূপে প্রতিভাত হয়েছে। বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে ফ্রন্টের সামনে যে সব সমস্যা ছিল তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল সব মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন, থানার উপর উপদেষ্টা কমিটি, এবং সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রথম প্রশ্নে সকলেই একমত হতে পেরেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নে ভোটাভুটি হয় এবং পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট পড়ে। আর তৃতীয় প্রশ্নে মোটামুটি সকলে একমত হয়ে বলেন যে, কোন কোন প্রশ্নে ভোটাভুটিতে সিদ্ধান্ত হতে পারে, কিন্তু কোন্ বিষয়ে হবে তা সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত করবেন। ফ্রন্টের আগামী বৈঠক হবে ৪ঠা মার্চ। যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিরসনকল্পে এস-ইউ-সি দল যে ১২টি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেগুলি অবলম্বনেই যুক্তফ্রন্টের আলোচনা চলেছিল। ওই বারোটি প্রস্তাবের মধ্যে দশটি সকলেই মেনে নেন। যে দুটি প্রস্তাব সভায় গ্রাহ্য হয় নি, তার মধ্যে একটি হল থানা কমিটি গঠন। বস্তুত এই থানা কমিটির প্রস্তাবটি একটি মর্যাদার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে গেছে। এই বিষয়টির একটি সুমীমাংসা হলেই যুক্তফ্রন্টের সংকট আপাতত কাটবে বলে মনে হয়। আগামী ৪ঠা মার্চের বৈঠকের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

(২৮-২-৭০)

রেল বাজেট নিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন শ্রীনন্দা

## ১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় ১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন। অর্থমন্ত্রী হিসাবে এটা তাঁর প্রথম বাজেট। কি অবস্থার মধ্যে কংগ্রেস দল দ্বিধাবিভক্ত হল এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজীকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভার নিলেন, তা কারও অজানা নেই। অর্থমন্ত্রী হিসাবে তিনি প্রথমেই ১৪টি বড় বড় ভারতীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করে যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তাতে তাঁর নতুন বাজেট সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। সকলেই আশা করেছিলেন, এবার বাজেটে ধনী-দরিদ্রের নিদারুণ বৈষম্য মোচনের চেষ্টা হবে এবং গরীব মানুষ কিছু সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা পাবেন। সেটা কতটুকু সফল হয়েছে, তা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

আলোচ্য বাজেটে মোট ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল ৩৫০ কোটি টাকা। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী নতুন কর ধার্য করে অতিরিক্ত ১৭০ কোটি টাকা আয়ের প্রস্তাব করার শেষ পর্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২২৫ কোটি টাকা। আগের বছরের ঘাটতির পরিমাণের চেয়ে এটা অনেক কম। বাজেট পেশ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, উৎপাদনী শক্তির সম্প্রসারণ এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ছাড়া যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্ভব নয়, সে কথা কারও অজানা নেই। কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে, যেন সমাজের দুর্বলতর অংশও তার সুফল থেকে বঞ্চিত না হয়। তাই তিনি এমনভাবে বাজেট তৈরি করেছেন, যাতে গরীবেরও কিছুটা মঙ্গল হয় এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনী শক্তিগুলোও জোরদার হয়ে ওঠে।

আলোচ্য বাজেটে ধনী ও সচ্ছল অংশের উপর করভার বৃদ্ধি করার চেষ্টা যে হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিভাবে সেটা হয়েছে, তা নিচে দেওয়া হল:—

(১) বার্ষিক ২ লক্ষাধিক টাকার ব্যক্তিগত আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়করের সর্বোচ্চ সীমা সম্প্রসারণ করে সাড়ে ৯৩ শতাংশে আনা হয়েছে। বর্তমানে সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে সাড়ে ৮২ শতাংশ (তাও আড়াই লক্ষাধিক টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে)।

(২) বার্ষিক চল্লিশ সহস্রাধিক টাকার আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়কর আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(৩) সম্পত্তিকরের হার যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে।

(৪) দানকরের ছাড়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

(৫) শহরের জমি এবং বাড়ির কর বাড়ানো হয়েছে এবং নতুন কর ধার্য হয়েছে।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত করগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেবার কারণ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে খোলাবাজারের চিনি, পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, সিগারেট, কস্টিক সোডা, সোডা এ্যাশ প্রভৃতি গরীবের নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্যের উপরও করের হার বাড়ানো হয়েছে। তা ছাড়া মানি অর্ডার, পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন, ফোনোগ্রাম, পোস্টাল পার্সেল প্রভৃতির মাশুলও বাড়ানো হয়েছে। তাতে গরীব লোকের পকেটে টান ধরতে বাধ্য। তবে মানি অর্ডারে ১৩৩ টাকা পর্যন্ত কোন অতিরিক্ত [illegible] দিতে হবে না এবং নিকৃষ্ট কেরোসিনের মূল্যও

[illegible] সঞ্চয় এবং লগ্নিতে উৎসাহ দেবার জন্য সরকারী [illegible] এবং ইউনিট ট্রাস্ট থেকে ডিভিডেন্ড হিসাবে প্রাপ্তব্য অর্থের ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়করমুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঐ খাতে ৩ হাজার টাকার বেশি আয় না হলে তার উপর কোন আয়কর ধার্য হবে না। কর্পোরেট ট্যাক্সও বাড়ানো হয় নি। ফলে বাজেট প্রকাশ হবার পর কলকাতার শেয়ার মার্কেট বেশ তেজী হয়ে ওঠে।

নতুন বাজেটে চায়ের রপ্তানি শুল্ক একেবারে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং পাটজাত কয়েকটি পণ্যের রপ্তানি শুল্ক যথেষ্ট হ্রাস করা হয়েছে। ঐ দুটি রপ্তানিমুখী প্রাচীন শিল্প বিশ্বের বাজারে দরের প্রতিযোগিতায় পেছু হঠতে বাধ্য হচ্ছিল। শুল্ক ছাড়ের ফলে তাদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। চা-শিল্পপতিরা চায়ের উপর উৎপাদন শুল্ক প্রত্যার্পণের দাবি করেছিলেন। বাজেটে তেমন কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁরা নাকি খুব খুশি হতে পারেন নি। অপর দিকে কার্পেট ব্যাকিং-এর রপ্তানি শুল্কে হ্রাস না হওয়ায় পাট শিল্পপতিরাও নাকি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

বাজেটে উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ চার শতাংশে সীমাবদ্ধ করে উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা বাড়ছে। গত বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ১৫ শতাংশ। রাজ্যগুলির পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ৬১৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়াচ্ছে। কেন্দ্র-শাসিত এলাকায় পরিকল্পনা খাতে ব্যয় ৬৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭৬ কোটি টাকা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পেন্সন এবং পারিবারিক পেন্সনের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৪০ টাকায় তোলা হয়েছে। যে-সমস্ত শিল্পশ্রমিক বেতনের ৮ শতাংশ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে থাকেন, তাঁদের মৃত্যুকালে এককালীন কিছু অর্থ প্রদান এবং পারিবারিক পেন্সন দেবার জন্য একটা পৃথক ভাণ্ডার খোলা হচ্ছে। তা ছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে সুদের হারও কিছুটা বাড়ানো হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী গান্ধী বলেছেন যে, গ্রামের গরীব মানুষদের জন্য কয়েকটি বিশেষ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে-জন্য বাজেটে কিছু অর্থও বরাদ্দ হয়েছে।

এবার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ১১২৪ কোটি টাকা। এত বেশি

লোকসভায় বাজেট পেশ করার আগে প্রধানমন্ত্রী বাজেটের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন

টাকা এর আগে কখনও এই খাতে ব্যয় হয় নি।

এই হল বাজেটের মোটামুটি চিত্র। মূলধন এবং রাজস্ব খাত মিলিয়ে বাজেটে মোট আয় দেখানো হয়েছে ৫১১৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৩৪০ কোটি টাকা। কাজেই ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ২২৫ কোটি টাকা।

সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, শ্রীমতী গান্ধী সমাজের স্বচ্ছল অংশের উপর করভার বৃদ্ধি করে গরীবদের কিছু কিছু রিলিফ দেবার চেষ্টা করলেও কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর করের হার বাড়িয়ে তিনি গরীবের অর্থ-সংকটও কিছুটা বাড়িয়ে তুলেছেন। সুতরাং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে এই বাজেটকে সর্বতোভাবে স্বাগত জানানো কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পার্লামেন্টে বাজেট পেশের পরই অর্থবিল (যাতে কর ধার্যের প্রস্তাব থাকে) পেশ করতে হয়। কিন্তু এস-এস-পি'র কয়েকজন সদস্য একটি বৈধতার প্রশ্ন তোলার পর যে হট্টগোল সৃষ্টি হয়, তাতে স্পীকারের অনুমতি পেলেও প্রধানমন্ত্রী অর্থবিল পেশ করতে পারেন নি। কিন্তু স্পীকারের ধারণা হয় যে, প্রধানমন্ত্রী অর্থবিল পেশ করেছেন। তাই তিনি অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী অর্থবিল পেশ করতে পারেন নি। ফলে স্পীকারের অনুরোধে রাত ১০টায় আবার লোকসভার অধিবেশন হয় এবং তখন প্রধানমন্ত্রী অর্থবিল পেশ করেন। এর আগে কখনও পার্লামেন্টে এমন ঘটনা ঘটে নি। সেই হিসাবে লোকসভায় এটা একটা নতুন নজীর সৃষ্টি হল। এই অস্বাভাবিক ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব স্পীকার নিজের কাঁধে নিয়ে সদস্যদের কাছে রাত দশটায় পুনরায় লোকসভার অধিবেশনে আসবার আহ্বান জানান এবং সদস্যরা তাতে সম্মত হন।

## রেল বাজেট

সাধারণ বাজেট পেশ হবার আগে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী নতুন রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দা লোকসভায় রেল বাজেট পেশ করেন। গত চার বছর ধরে রেলের বাজেটে ঘাটতি দেখানো হচ্ছিল। কিন্তু এবার শ্রীনন্দা রেলে যাত্রী এবং মালের মাশুলের সর্বব্যাপী বৃদ্ধির প্রস্তাব করে ৩১ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন। তাতে রেল বাজেটে ২২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থেকে পড়েছে। রেলে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সকল শ্রেণীর যাত্রিভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব তো করা হয়েছেই, উপরন্তু স্লীপার এবং প্লাটফরম টিকিটেরও মাশুল বাড়ানো হয়েছে। সংগে সংগে সর্বপ্রকার মালের মাশুলও বাড়ানো হয়েছে। ডেলি-প্যাসেঞ্জারের সিজন টিকিটও ভাড়া বৃদ্ধির হাত থেকে রেহাই পায় নি। এই ধরণের পাইকারী হারে রেল মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব দেশের সকল শ্রেণী এবং সকল অংশেই নিদারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক একাধিক সংগঠিত পার্টি স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, তাঁরা রেল বাজেটের বিরোধিতা করবেন। জল বেশ ঘোলা হয়ে উঠছে দেখে রেল বাজেট কিভাবে সংশোধন করা যেতে পারে, তাই নিয়ে সরকারী নায়ক বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতাদের সংগে আলাপ-আলোচনা করছেন। সেই সব আলোচনার গতিপ্রকৃতি দেখে অনুমান করা যাচ্ছে যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া বোধহয় আর বাড়বে না। আর কোন কোন মালের মাশুলের পরিমাণও পূর্ববৎ থাকবে। সংশোধিত রেল বাজেট কেমন দাঁড়াবে, সেটা এই সপ্তাহেই বোঝা যাবে।

## বিহারে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ

সপ্তাহ দুই আগে শ্রীদারোগা রাই তিনজন সদস্য নিয়ে বিহারে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। গত সপ্তাহে সেই মন্ত্রিসভায় আরও ১১ জন মন্ত্রী এবং ৬ জন রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী গ্রহণ করা হয়েছে। বিহারে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী), বি-কে-ডি এবং ঝাড়খন্ড পার্টি নিয়ে। এই মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাচ্ছেন কম্যুনিস্ট পার্টি, পি-এস-পি এবং শোষিত দল।

কোয়ালিশনের বি-কে-ডি এবং শোষিত দলে ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীণ কোঁদল বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। যে ৩৫ দফা কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিহারে কোয়ালিশন গঠিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি দফা হচ্ছে বিধান পরিষদের অবলুপ্তি। কিন্তু দারোগা রাইয়ের নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে একজন (শঙ্করদয়াল সিং) বিধান পরিষদের সদস্য। ব্যাপারটা বি-কে-ডি, শোষিত দল এবং কম্যুনিস্ট পার্টি—সকলের মধ্যেই অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সি-পি-আই এবং শোষিত দলের প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত ছিলেন। তাতে অনেকেই বিহারের কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন।

(২৮।২।৭০)

**লাওস ঃ**

ভিয়েতনামের যুদ্ধ আবার পার্শ্ববর্তী লাওসে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাক্তন ইন্দোচীনের অংশ লাওস, যেমন ভিয়েতনাম। জেনেভা সম্মেলন (১৯৬২) থেকে লাওসের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, এবং জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের অংশীদার ১৪টি দেশ সম্মিলিতভাবে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ। তথাপি, ভিয়েতনামের উত্তাপ বারে বারে এখানে এসে পড়ে এবং লাওসের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়।

এবারও তাই হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী অতর্কিত আক্রমণ করে উত্তর ভিয়েতনামের ছয় ব্যাটেলিয়ান সৈন্য লাওসের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা জারস্ সমতল অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। এই অঞ্চলের প্রধান বিমানঘাঁটি জিয়েং খোইয়াং ও উল্লেখযোগ্য শহর মউং সুই এখন উত্তর ভিয়েতনামীদের হাতে। উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদলের সঙ্গে স্থানীয় কমিউনিস্ট বিদ্রোহীরাও যোগ দিয়েছে। জারস্ সমতলে আক্রমণ পরিচালনার সময় উত্তর ভিয়েতনাম সোভিয়েট ট্যাঙ্ক পি. টি.-৭৬ ব্যবহার করেছে।

উত্তর ভিয়েতনাম এই অভিযানের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, উত্তর ভিয়েতনামের একজন সৈন্যও জারস্-এ নেই। তাদের বরং পাল্টা অভিযোগ ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জারস্ সমতলে প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করেছে,

সুভান্না ফুমা

এবং এই বোমাবর্ষণে তারা অতিকায় বি—৫২ বোমারু বিমান ব্যবহার করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে জারসে বোমাবর্ষণের কথা অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব মেলভিন লেয়ার্ড ২৭শে ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটনে বলেছেন, লাওসে উত্তর ভিয়েতনামের আক্রমণকারীদের শায়েস্তা করার জন্যই মার্কিন বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করেছে।

আসল কথা, উত্তর ভিয়েতনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উভয় পক্ষই এখানে এলাকা কমিউনিস্টদের দখলে ছিল। সম্প্রতি জেনারেল ভ্যাং পাও-এর নেতৃত্বে একদল লাওস সৈন্য এলাকাটি পুনরুদ্ধার করে এবং লাওস সরকারের কর্তৃত্ব এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। জেনারেল ভ্যাং পাও-এর পেছনে মার্কিন কর্তাদের সমর্থন ছিল। সম্ভাব্য কমিউনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সি. আই. এ. এখানকার মেও উপজাতিকে গেরিলা যুদ্ধে শিক্ষিত করেছে। এই গেরিলা সৈন্য ভ্যাং পাও-এর দলে কাজ করেছে।

কিন্তু ভ্যাং পাও-এর পক্ষে এই দখল বেশি দিন বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদের সাহায্যে এখানকার কমিউনিস্টরা আবার দখল করে নিয়েছে জারস্ সমতল। মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ মেও গেরিলাদের ওপর যে ভরসা করেছিলেন, তা সফল হয় নি। তারা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। তাই এখন চলছে প্রচণ্ড মার্কিন বোমাবর্ষণ।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষ থেকে লাওসে মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে একে 'বর্বর আচরণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

লাওসের নিরপেক্ষ সরকার জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি ব্রিটেন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের কাছে আবেদন করেছেন, জারস্ সমতল আক্রমণের ফলে লাওসের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়েছে, সুতরাং অনতিবিলম্বে এই বিষয় বিবেচনার জন্য জেনেভা সম্মেলনের মত একটি সম্মেলন আহ্বান করা হোক, জেনেভা সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলোচনা সুরু হোক।

লাওসের রাজা সাভাং ও প্রধানমন্ত্রী সুভান্না ফুমা জারস্ সমতল থেকে ফিরে এসে বলেছেন, উত্তর ভিয়েতনামীরা এই অঞ্চল দখল করে রয়েছে। এবং তার ফলে লাওসের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ব্রিটেন ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবে কি না, এখনও তা বোঝা যাচ্ছে না। জেনেভা সম্মেলন থেকে ভিয়েতনাম, লাওস, প্যাথেট লাও প্রভৃতির জন্য নিযুক্ত আন্তর্জাতিক তদারক কমিশনের সভাপতি ভারত পরিস্কার বলে দিয়েছে, এই মুহূর্তে তাদের কিছু করণীয় নেই। কমিশনের অপর দুই সদস্য পোল্যাণ্ড ও কানাডা। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং ২৫শে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় বলেছেন, জেনেভা সম্মে-

দলের সিদ্ধান্ত কোন পক্ষই মানছে না বলেই লাওসের বর্তমান সংকটের উদ্ভব হয়েছে। ভিয়েতনামের বিরোধকে লাওসে টেনে আনায় তীব্র নিন্দা করেছেন শ্রীদীনেশ সিং।

ভিয়েতনামের জন্যই লাওসের সমস্যার সমাধান হবে না। সবাই এখন ভিয়েতনাম বিরোধের কথাই ভাবছে, কোথায় লাওসের জারস্ সমতলে কি হল, তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? তা ছাড়া জারসে মার্কিন-উত্তর ভিয়েতনাম সংঘর্ষ কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, ভিয়েতনাম লড়াই-এর রণকৌশলের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

তাই, আপাতত জারস্ অপরের দখলে থাক। লাওস সরকারও প্রতিবাদ জানাতে থাকুক।

**গায়না ঃ**

আমেরিকা গোলার্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশ ব্রিটিশ গায়না ১৯৬৬ সালের ২৬শে মে স্বাধীনতা অর্জন করে। সাড়ে সাত লাখ লোকের এই দেশটি এখন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজধানী জর্জ টাউনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে গায়নাকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এই অঞ্চলে এই প্রথম ব্রিটেনের কোন উপনিবেশ প্রজাতন্ত্র হল। ১৪০ বৎসর পর আজ গায়না ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করল।

গায়নার বিদায়ী গভর্নর-জেনারেল স্যার এডওয়ার্ড লুকু প্রজাতন্ত্রী গায়নার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এডওয়ার্ড লুকু এদেশেরই মানুষ, ভারতীয় বংশোদ্ভূত। প্রধানমন্ত্রী ফরবেশ বার্নহাম। জাতীয় আইনসভায় মোট ৫০টি আসনের মধ্যে বার্নহামের দল পিপলস্ ন্যাশনাল কংগ্রেসের ৩০টি আসন আছে। আর ১৯টি আসন রয়েছে বিরোধী দল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ ছেদী জগনের পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টির হাতে। ডঃ ছেদী জগন ও তাঁর দল মার্কসবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, এবং প্রধানত ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাই তাঁর সমর্থক। বার্নহামের প্রধান সমর্থক নিগ্রোরা।

ইংরেজরা নিগ্রো-ভারতীয় বিরোধ জিইয়ে রেখে তাদের রাজত্ব ও শোষণ এখানে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। তবে এখন গায়নার দায়িত্বশীল নেতারা জাতিবিরোধকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন।

গায়নার নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'কো-অপারেটিভ রিপাবলিক অব্ গায়না'। প্রধানমন্ত্রী ফরবেশ বার্নহাম নামকরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, সমবায়ের ভিত্তিতে নতুন অর্থনীতি গড়ে তুলে গায়নার উন্নতির জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন।

ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও গায়না কমনওয়েলথের সদস্য থাকবে।

(২. ৩. ৭০)

## ট্রেন-দুর্ঘটনা—
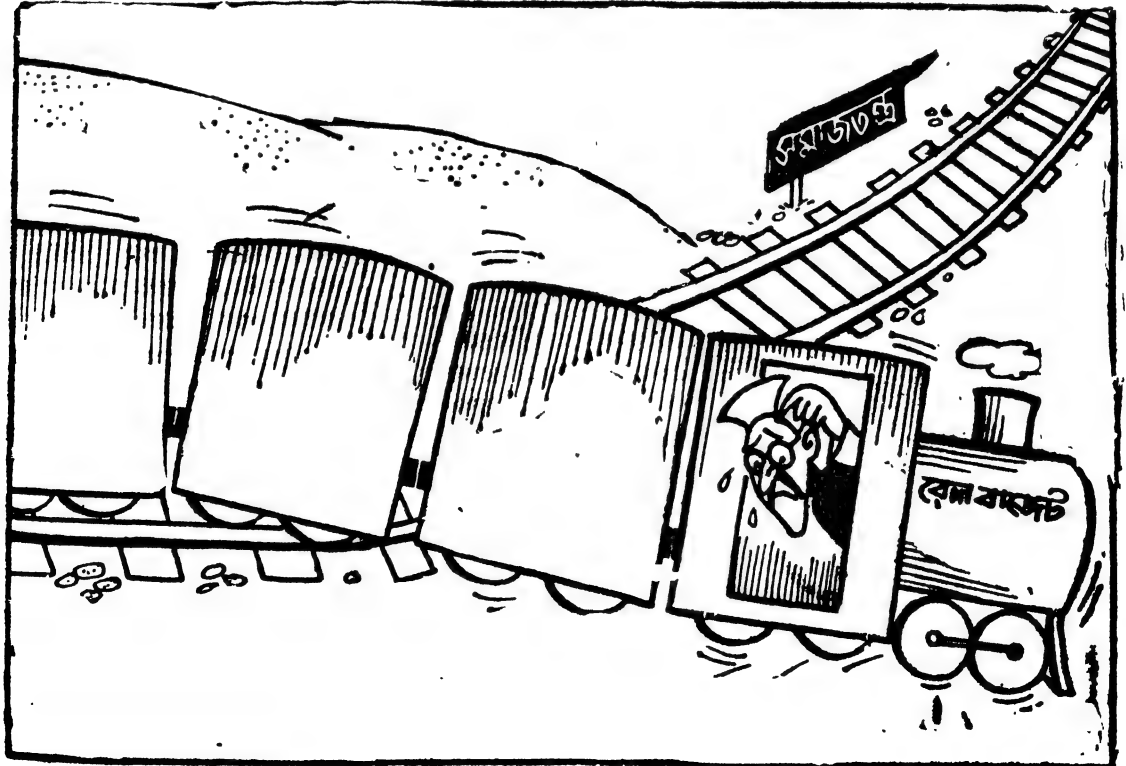
"মুখ সামলে কথা বলুন।"

"চাঁড়িয়ে তোর দাঁত খুলে ফেলবো হারামজাদা।"

এটা কোন আধুনিক অশ্লীল সাহিত্যের ছোট গল্পের লাইন নয়, এটা হল রাজ্যের দুই মন্ত্রীর কথোপকথনের অংশ, আবার এই কথোপকথনের স্থান অন্য কোথাও নয়, খোদ রাজ্য বিধান-সভা। এই দুজন সদস্য তথা মন্ত্রী আবার যে-সে মন্ত্রী নন। উভয়েই জীবনের বেশির ভাগ সময় হেড মাস্টার-রূপে কাটিয়েছেন, আজ কম-বেশি ষাট বৎসর বয়সে মন্ত্রী হয়েছেন এবং সর্বোপরি এই বাক্যালাপের একজন মন্ত্রী হলেন শিক্ষাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত।

গত সপ্তাহে ভণ্ডামীতন্ত্রের কথা লিখতে শুরু করায় তার ফল ভাল হয় নি। অনেকেই ক্ষেপে গেছেন। দোর্দণ্ড প্রতাপের কোন কোন মন্ত্রী অশেষ অনুগ্রহ করে লেখকের মত নগণ্য প্রাণীকেও দেখে নেবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার নিবেদন হল—জেহাদটা আমার উদ্দেশ্যে না হয়ে যদি ভণ্ডামীতন্ত্রের বিরুদ্ধে হত, তবে দেশের কিছু মঙ্গল হত। সমগ্র দেশের স্বার্থের তুলনায় কে কাকে দেখে নিল, সেটা বড় কথা নয়।



হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এর নামই হল ভণ্ডামীতন্ত্র, যেখানে দুই মন্ত্রী কথা বলতে গিয়ে একজন আর একজনের চাঁড়িয়ে দাঁত খুলে ফেলতে চান, তারপর আবার সাংবাদিকদের বলেন, শুধু এই কথা নয়, হারামজাদাও বলেছি লিখে দেবেন। আবার এই জীবনভর শিক্ষকতা করা শিক্ষক ও শিক্ষা-আন্দোলনের নেতারা যখন ছাত্র-দের অশালীন ব্যবহার দেখে দেশ গোল্লায় যাচ্ছে বলে হা-হুতাশ করেন, তখন সেটাই হল ভণ্ডামীতন্ত্র। কিছুদিন আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অনশন করলেন, আর উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অনশন করলে চারটে চাল বাঁচবে বলে কতই উপহাস করলেন। অথচ তার কয়েক মাস যেতে না যেতেই কেরলে জ্যোতিবাবুরই দলের লোক (তাঁরাও অনেকে প্রাক্তন মন্ত্রী ও এম-এল-এ) অনশন করলেন এবং সেখানকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ অনশনব্রতীদের লেবুর রস খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করালেন। কলকাতায় অনশনকে মার্কসবাদীরা বললো কার্জন পার্কের চিড়িয়াখানা, কিন্তু কেরলে সেই মার্কসবাদীরা দল বেঁধে অনশন করলো। এরই ক'দিন পরে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন—অনশনকে আমরা উপহাস করি না, কেন না স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আইনসঙ্গত দাবি আদায়ে অনশন উল্লেখযোগ্য অস্ত্র হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এরই নাম হল ভণ্ডামীতন্ত্র—যে কাজকে একজন উপহাস করেন, আবার তাঁর দলের লোকেরা সেই কাজকেই মর্যাদার কাজ হিসাবে বরণ করেন। এক দলের নেতা যে কাজকে তাঁর ভাষায় সমালোচনা ও উপহাস করেন, আবার সেই দলের অপর নেতা সেই কাজকে দাবি আদায়ের উল্লেখযোগ্য অস্ত্র হিসাবে প্রশংসা করেন। এক বিচারে রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়ালে অথবা তলোয়ার দিয়ে মুণ্ডু কেটে নিলে সমাজবিরোধী কাজ হয়, ডাকাতি বলে ধিক্কার দেওয়া হয়—আবার সেই কাজ যখন অন্য অস্ত্রে বা অন্যভাবে নিজের দলের লোকেরা করে, তখন তাকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলা হয়। এর নামই হল ভণ্ডামীতন্ত্র।

চলতে-ফিরতে গেলে দেখা যায়, চৌরঙ্গী-কার্জন পার্কের ওপর একটা তাঁবু সুদৃশ্যভাবে কয়েক মাস সাজানো রয়েছে। সেখানে বিদ্যুৎ আছে, জলকল আছে, এমন কি টেলিফোনও আছে। এইখানেই একদা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়

মুখোপাধ্যায় ও [illegible] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অনশন করেছিলেন। কিন্তু আজও কেন সেই মণ্ডপকে [illegible] করা হচ্ছে? তার একমাত্র কারণ হল, যে-কোন দিন আবার বাংলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাইটার্স-এর ঘর ছেড়ে এই তাঁবুতে এসে আন্দোলন শুরু করতে পারেন। এই হল ভণ্ডামীতন্ত্রের আর এক দিক। সরকারে থাকবো, সরকারের আইন-শৃঙ্খলা ভাঙবার সহায়ক হিসাবে শ্রেণী-সংগ্রামের নাম করে মাঠে-ময়দানে লড়াই করে দাবি আদায়ের নামে দাংগা করবো, লাঠালাঠি করবো, খুন-জখম করবো, আবার পুলিশ কেন কাজ করছে না বলে অভিযোগ করবো, অথচ পুলিশকেও শরিকী সংঘর্ষ বলে বসিয়ে রাখবো—এ যেমন এক ভণ্ডামী, তেমনি সরকারে থাকবো আবার সরকারী নীতি রূপায়িত হচ্ছে না বা সরকারী নীতি ভঙ্গ হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে অনশন করবো—এ-ও হল আর এক ভণ্ডামী। মন্ত্রী হয়ে গাছের খাবো, সরকারী দল হয়ে গাছের ডালে বসবো, আবার জনগণের নাম করে সেই দলেরই ঝাণ্ডা তুলে আন্দোলন, শ্রেণী-সংগ্রাম—আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলে তলারও কুড়াবো—এই যদি ভণ্ডামী না হয়, তবে ভণ্ডামী কাকে বলে।

বাংলা কংগ্রেস সেই ৬ই অক্টোবর থেকে একের পর এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যুক্তফ্রন্টের কোন কোন শরিক দলের ওপর তীব্র আক্রমণ চালালো, সর্বশেষে সরকারের নীতি-নিয়ামক শরিক হিসাবে থেকেও রাজ্যব্যাপী অনশন আন্দোলন করলো। তারপর তিনজন মন্ত্রী—শ্রীসুশীল ধাড়া, শ্রীচারুমিহির সরকার ও শ্রীভবতোষ সোরেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একখানা পত্র লিখলেন। কাগজে বেরুলো সেই পত্র নাকি তিন মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র। কিন্তু পত্রখানি তিনজনে লিখলেন একখানা পত্রে, পত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে সম্বোধন করলেন "অজয়দা" বলে, আর পত্রে কোথাও তাঁরা বললেন না যে, 'আমরা মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিচ্ছি—পদত্যাগ করছি।' কোন মন্ত্রী পদত্যাগ করলে তাঁকে কেউ ধরে রাখতে পারে না, আর ঐ তিনজন মন্ত্রী জানেন না এমন নয় যে, পদত্যাগ-পত্র এইভাবে একখানি যুক্ত-পত্রে লেখা বিধিসম্মত নয় এবং এটাও তাঁরা না জানেন [illegible] [illegible] তাঁরা মন্ত্রী, তাঁদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী দাদা নন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তবু এমনি একখানা পত্র লিখে পদত্যাগ করা হল—আসলে কিন্তু পদত্যাগ হল না, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতেই বললেন। এটাই অবশ্য স্বাভাবিক, মুখ্যমন্ত্রী নীতিগতভাবে যা করণীয় ছিল, তাই করেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন—এই পদত্যাগের তাৎপর্যটা কি এবং কোথায়? কারণ, এটাও তো জানা—খবরের কাগজে বেরিয়েছে ১৯শে ফেব্রুয়ারী, যেদিন তিন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন, সেই দিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে শ্রীচারুমিহির সরকার আর শ্রীসুশীল ধাড়া বিধানসভায় তাঁদের দপ্তরের আলোচনার দিন ঠিক করতে গিয়ে প্রায় এক মাস পরের দিন লিখেছিলেন। সেই লেখা এখনও পরিষদীয়মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তীর কাছে আছে। তাহলে পদত্যাগও করলেন আবার মন্ত্রী হিসাবে কাজ করার জন্য একমাস পরের দিনও দিলেন—এর কোনটা সত্য? দেখা যাচ্ছে, পরেরটাই সত্য—তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগও করেছেন, আবার মন্ত্রীও আছেন। এরই নাম হল ভাবের ঘরে চুরি। আমি এক ভদ্রমহিলাকে চিনি—যাঁর কোন এক ব্যক্তির সংগে বিয়ে ঠিক হবার পর বিয়ের ক'দিন আগে বাড়িতে চোর এসে ভদ্রমহিলার বিবাহের সব গয়না, থালা-বাসন, জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেল। এই ভয়ানক চুরির কারণে বিয়ের তারিখ স্থগিত রাখতে হলো। পরে সেই বিয়ে একেবারে ভেঙে গেল। এবারে আশ-পাশের একজনের সংগে বিয়ে হল ভদ্রমহিলার নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহে এবং আবার বিয়ে ভেঙে গেল। কিন্তু ফুলশয্যার দিন দেখা গেল ভদ্রমহিলা দিব্যি সুন্দর সেই চুরি-যাওয়া গয়না পরেই বসে আছেন বধূ হয়ে। বাড়ির লোক বুঝলো সব ব্যাপার। আজকের বরই সেই দিনের চোর, আর চোরের জন্য দরজা খুলে যে দিয়েছিল, সে হল আজকের বধূ। অর্থাৎ এক চরিত্রে অনিচ্ছার বিয়ে বন্ধ হল, আবার যার সংগে বিয়ে হলে এই সব গয়না, দানসামগ্রী পাওয়া যেত না, সেইগুলিও পাওয়া গেল। কিন্তু এই বর ও বধূ যে লাভই করে থাকুন না, জামাই কিন্তু শ্বশুর-বাড়িতে কখনও জামাইয়ের সম্মান পেতে পারেন না, মেয়েও বাপের বাড়িতে উমার আদর পেতে পারেন না। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের অনেকেই হলেন এই জাতীয় বর-বধূ। এ'রা পছন্দের বর চাইবেন, আবার চোরের জন্য দরজা খুলে দেবেন। এ'রা পছন্দের বধূ চাইবেন, আবার চোর হয়ে সিঁদকাঠি নিয়ে বেরুবেন। কিন্তু বরও হবেন, আবার চোরও হবেন—দুটো কাজ একসংগে হলেও হতে পারে, তবে বর শ্বশুরবাড়িতে চোরের চেয়ে বেশি মর্যাদা পেতে পারেন না।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের অনেকেই এই দিনে বর, রাতে চোর হয়ে যে ভণ্ডামী-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন, তাতে আপাত লাভ হয়তো হবে, কিন্তু আখেরে তাঁদের মর্যাদা ধুলোয় লুণ্ঠিত হবে। যে সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা তাঁরা প্রাপ্য বলে মনে করেন, সেই সম্মান তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। ভণ্ডামীতন্ত্রের এই পরিণতির দিকেই যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের বড় বড় দল অনেকে চলেছেন—এই কথা বললে যদি গালাগালি খেতে হয় খাবো, কিন্তু জনগণ তো চিনবেন কে চোর আর কে বর।

॥ সাত ॥

মা ও আমি চলতে লাগলাম পথে।

মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। এখানে-সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র। একে সরু গলি-ঘুঁজি আঁকা-বাঁকা পথ, তার ওপর ঘন অন্ধকার। আগেই বলেছি আমি ঝুলিটা নিয়েছিলাম। ঝুলি থেকে বার করলাম টর্চ। এক দল কুকুর কোথায় ছিল, ঘেউ ঘেউ করে পিছনে তেড়ে এল। আমি টর্চের আলো ফেলতেই তারা এক-সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

মা বললেন, 'যাক বাবা, আলোটা যে নিয়ে এসেচো—এ তুমি খুব উপকার করলে।'

'কি করব মা, সব সময়ে এগুলো কাছেই রাখি, কখন কি দরকারে লেগে যায়, বলা যায় না।'

'বেশ করেচো বাবা, বেশ করেচো।'

দেখলাম, আমি আগে আগে চলায় আমারও অসুবিধা হচ্ছিল, মায়েরও অসুবিধা হচ্ছিল। আমার অসুবিধা হচ্ছিল কারণ, আমি পথ চিনি না, তাই ইতস্তত করছিলাম প্রতিটা বাঁকের মুখে। আর মায়ের অসুবিধা হচ্ছিল, সামনে থেকে সব সময়ে পিছনদিকে আমি টর্চটা ফেলতে পারছিলাম না, ফলে আলো-আঁধারে তিনি ভয়ানক মুস্কিলে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাই বললাম, 'মা আপনি এগিয়ে আসুন। আমি পিছন থেকে বরং আলোটা ফেলি।'

'তাই করো বাবা—তাই করো।'

মায়ের মন তখন বোধ করি আর বারণ মানছিল না। তিনি যেন আর দেরিও করতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারলে তিনি যেন বাঁচেন। ছেলের জন্য মনে তাঁর ঝড় বয়ে চলেছে। স্বামী মারা গেলে দারিদ্র্য তার অনাহারে, আত্মীয়-স্বজনের অহেতুক আক্রমণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে একদা তিনি পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন ছেলেমেয়ের হাত ধরে। তারপর তিনি উঠে-ছিলেন এইখানে এসে। কত আশা ছিল



তাঁর, কত স্বপ্ন ছিল—এমনিতরো অবস্থার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর শংকরকে মানুষ করে তুলবেন। শংকর মানুষ হলে তাঁর সকল দুঃখ সকল জ্বালার আপনা-আপনিই অবসান হয়ে যাবে। কিন্তু হায়, কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল তা তিনি বুঝতেও পারলেন না। এবং আজ সেকথা ভাবলে তিনি শিউরে ওঠেন।

আজ সবই তাঁর গেছে। এখনও তবু ক্ষীণ আশা। আশার বিরুদ্ধে আশা। সমগ্র পরিস্থিতিটাকে যদি মায়ের অন্ধ-আগ্রহ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

সেদিন সেই রাতে পথ চলতে চলতে শুধু মায়ের 'পড়ি-কি-মরি' করে চলাটাই লক্ষ্য করেছিলাম, আর বিশেষ কিছু বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি, মায়ের আসল কথাটা কি। পথে বেরুবার আগে তিনি বলেছিলেন, 'শংকর মরণের পথ ধরেছে। এরপর পুলিশ আসবে। ওকে ধরতে যাবে, ওকে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে রুখে দাঁড়াতে হবে। তারপর হয়তো ও গোলাগুলী কিছু ছুঁড়ে বসবে। আর তার ফল কি হবে জানো তো—তার ফল হয় ওর ফাঁসি, নয় পুলিশেরই হাতে ওর মৃত্যু। ওকে সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকেই টেনে আনতে হবে বাবা, আমাকেই টেনে আনতে হবে।' শুধু কি এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার আগ্রহেই মায়ের এমন করে অন্ধকার রাত্রে ছুটে চলা? আর কিছু কি উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর?

সেই উদ্দেশ্য কি বুঝেছিলাম, তখন নয়, রাত্রিশেষে ফিরে এসে।

ঘরের একপাশে জ্বলছে কেরোসিন 'ল্যম্পটা'। মেঝেয় বসে কাঁদতে কাঁদতে বলে যাচ্ছেন আগাগোড়া সব কাহিনী। শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। হ্যাঁ, শুধুই প্রাণ ধারণের গ্লানি। 'তুমি সম্রাট—সম্রাট তুমি বাঁচাও আমার এই দুটি ছেলে-মেয়েকে।'

'বাঃ বেশ ফুটফুটে ছেলেটি তো তোমার মা!'

'হ্যাঁ—ও আমার শ্বশুরকুলের দেবতা।'

সম্রাট আপাদমস্তক দেখলে ছেলেটিকে। কে জানে তখন যদি সেই সম্রাটের সামনে আয়না থাকত, তাহলে সে যেমন করে তার মাধ্যমে মুখ দেখত, ঠিক তেমনি করে সম্ভবত মহাকালের আয়নায় একবার নিজের মুখখানাও দেখে নিত! হ্যাঁ, কপালে বলিরেখার ছায়া যেন। চিরকাল এই দুর্ধর্ষ জীবনের মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড কর-বিকিরণ করবে না। তার জন্য চাই নতুন সূর্য আরও নতুন। জিজ্ঞাসা করল—'নাম কি তোমার—খোকা?'

'শংকর।'

'শংকর', তারপর সম্রাট নিজের কাছে টেনে নিলে। পকেট থেকে দুখানা দশ-টাকার নোট বের করে শংকরের হাতে দিয়ে বললে, 'মাকে দাও।'

মা বললেন, 'অদ্ভুত তোমার দয়া বাবা।'

'দয়া', সম্রাট সেদিন কেমন যেন একটু জোরে জোরে হেসে উঠল।

তারপর প্রতিদিন লোকটা আসত। আসার সময় নিয়ে আসত প্রচুর খাবার। শংকর তো খেতই, তার ওপর মায়ার, এমন কি মায়েরও কোন কোনদিন খাওয়া হয়ে যেত। লোকটা এরপর প্রায়ই শংকরকে ডেকে নিয়ে যেত। ধীরে ধীরে এমন হল, শংকর আর আসতেই চাইত না লোকটার কাছ থেকে।

সে দেরি করে ঘরে ফিরলে বা না ফিরলে মা যখন কথাটা তুলতেন, তখন শংকর বলত, অদ্ভুত, অদ্ভুত খেলা শেখায় মা লোকটা—আসতে ইচ্ছে করে না।'

'কি খেলা রে?'

এই ধরো কেমন করে লোকের পকেট থেকে টাকা তুলে নিতে হয়, কেমন করে হাতের ঘড়ি খুলে নিতে হয়, কেমন করে ট্রেন-যাত্রীর বাক্স-প্যাটরা সরাতে হয়—এই সব খেলা।'

মা বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু তুলে বলতেন, 'এসব খেলা কিরে—এ তো চুরি শেখায় তোকে!'

শংকর বলত, 'চুরি তো আমি করি-না মা।'

'তা না হোক। তুই আর যাস নি বাপু।'

'কিন্তু না গিয়ে যে আমি থাকতে পারি না!'

'কেন থাকতে পারিস্ না?'

'সর্দার আমাকে খুব খাওয়ায় যে!'

'কি খাওয়ায়?'

'মিষ্টি-টিষ্টি কত কি খাবার। খাবার-গুলো এত ভালো যে, খেলেই আমার যেন কেমন নেশা লাগে। আমার আরও খেতে ইচ্ছে হয়। তারপর যত খাই, ততই কেমন যেন বুঁদ হয়ে পড়ি। তখন আমার শুয়ে থাকতে ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।'

......এসব কথা শুনে মা ভয়ে কেমন যেন অসাড় হয়ে যেতেন। মনে মনে প্রমাদ গুণতেন, এখানে এসে তিনি এ কি করলেন জীবনে। এক এক সময়ে মনে হত আর এখানে নয়—অন্য কোথাও, অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারলে তিনি যেন বাঁচেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যেত, উপায় কিছু নেই। ওরা সবাই মিলে তাহলে তাঁর পিছনে ধাওয়া করবে, আবার ধরে আনবে তাঁকে এইখানে। তা না হলে তিনি বেশ বুঝতে পারতেন যে, লোকটা খাবারের সঙ্গে তাঁর শংকরকে নিশ্চয়ই আপিম-টাপিম কিছু খাওয়ায়। আর খাওয়ায় এই জন্যেই হয়তো, তার পরবর্তী অধ্যায়গুলি তাকে দিয়ে সম্পন্ন করাতে হবে বলে। অর্থাৎ কেমন করে লোকের পকেট থেকে টাকা তুলে নিতে হয়, কেমন করে হাতের ঘড়ি খুলে নিতে হয়, আর কেমন করেই বা ট্রেন-যাত্রীর বাক্স-প্যাটরা সরাতে হয়—সেই কাজগুলোই এবার তাকে দিয়ে করাবে।

মা বলতেন, 'খাবারের সঙ্গে তোকে লোকটা নিশ্চয়ই আপিম খাওয়ায়।'

'হতে পারে মা', শংকর বলত, 'বোধ-হয় সেই জন্যেই সর্দার আমাকে খাবার-গুলো গিলে গিলে খেতে বলে।'

মা জিজ্ঞাসা করতেন, 'কোনদিন খেতে খেতে চিবিয়ে ফেলিস্ নি?'

'হ্যাঁ, চিবিয়ে ফেলিচি দু'-একবার।'

'কেমন লেগেছে তখন?'

'একেবারে তেতো হাকুচ।'

'তাহলে আমি যা ভেবিচি তাই। এই আপিমের কাজ চলে তোর দেহে—তাই তুই ওখানে না গিয়ে পারিস না!'

'সত্যি মা। তুমি ঠিক বলেছো। এক-একদিন দুপুরে তোমার কাছে বসে বসে যখন কথা বলি, তখন আমার খুব ভাল লাগে। মনে করি আর যাব না সর্দারদের আখড়ায়, কিন্তু তোমার কাছে বসে থাকতে থাকতে ক্রমশ আমার গা-হাত-পা এমন কামড়াতে থাকে যে, মনে হয় আর যেন বসে থাকতে পারছি না, আমাকে সব ফেলে তখন ছুটে যেতে হয় আখড়ায়। গিয়ে সে কি অবস্থা হয় আমার—কেবল সেই খাবারগুলো কোথায় আছে তা খুঁজে বেড়াই, একেবারে পাগলের মত খুঁজে বেড়াই। তারপর খাবারগুলো খেতে পেলে আমার মনে হয় আমি যেন বেঁচে গেলাম।'

মা অবরুদ্ধ নিশ্বাসকে আরও অব-রোধ করে বলে উঠতেন, 'ওরে শংকর, এ তোর বাঁচা নয়—এ তোর মৃত্যু, অপঘাত মৃত্যু।'

কি করবেন মা। শংকরের এ অপ-মৃত্যুর জন্য তিনিই তো দায়ী। কেন এসে-ছিলেন তিনি এখানে? এসেছিলেনই বা যদি—তবে হাত পেতেছিলেন কেন ঐ লোকটা, ঐ যাকে শংকর বলে সর্দার, মা যাকে মনে করেন, এ রাজ্যের সম্রাট,—সেই লোকটার কাছে? সে লগ্নী করে টাকা আর কেনে মানুষ, যে মানুষকে দিয়ে পরবর্তী সময়ে সে তার কারবার ফলাও করে! ফুটফুটে ছেলে দেখে লোভ হয়ে-ছিল তার। তাকে দিয়ে সে অনেক কাজ করাতে পারবে। কাজেই আর কখনো সে সুযোগ হারায়?

তবু মা একদিন চলে গিয়েছিলেন শংকর আর মায়াকে নিয়ে। বেলেঘাটা থেকে দমদম, দমদম থেকে বেলঘরিয়া,
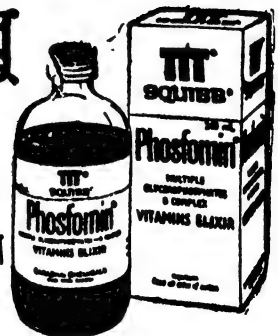
বেলঘরিয়া থেকে বারাকপুর, বারাকপুর থেকে আবার এদিকে. অর্থাৎ কলকাতায়। মা ভেবেছিলেন কোন বাড়িতে দাসীবৃত্তি কিম্বা রাঁধুনীর কাজ করে তিনি শংকর আর মায়াকে মানুষ করে তুলবেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, একদিন পুলিশ এসে এক বাড়ি থেকে তাঁদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল।

থানায় দেখা গেল বসন্তকে। বসন্ত—সর্দারের সাগরেদ বসন্ত। সেই লোকটা, কপালের ওপরটায় তার রামধনুর মত অর্ধবৃত্তাকার একটা কাটা দাগ, চোখগুলো ভাঁটার মত গোল গোল, সর্বদাই যেন জবা ফুলের মত লাল। মাথার বাবরি চুল। মোটাসোটা ঘাড়েগর্দানে জোয়ান চেহারা। হাতের গুলো অবধি আস্তিন গুটোনো জামা। হেঁড়ে গলায় সে বললে, 'কিরে শংকর পালাবি আর?'

অবাক হয়ে গেলেন মা। অবাক হবারই কথা। মা তাঁর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন কিন্তু কি অদ্ভুত, পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে এল! শুধু তাই নয়, সেখানে বসন্তকেও ডেকে আনল আবার। কে জানে এদের সঙ্গে পুলিশের কি সম্পর্ক। বসন্ত মাকে বললে, 'সর্দার তোমাকে মা বলে খাতির করেছিল আর তুমি তার সঙ্গে এই রকমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলে?'

মা বলেছিলেন, 'এর মধ্যে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কি দেখলে বসন্ত?'

'বিশ্বাসঘাতকতা নয়—এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কেবলই তো তোমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছো।'

'তোমার সর্দারের রাজত্বে বাস করি বলে কি কোথাও দু-দণ্ড বেড়াতে যাবারও আমাদের অধিকার নেই?'

'পাঁচশো বার আছে। কিন্তু বলে যাও নি কেন?'

আবার ভাগ্যে কি আছে সেই কথা ভেবে মা যেন কেমন শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া ওরা আবার কি করে বসবে সেই ভয়ে তিনি ওদের ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যেই বলে ফেললেন, 'ভুল হয়ে গেছে বাবা সেটা।'

বসন্ত বলেছিল, 'এ ভুল যেন আর কখনো না হয়।'

ভুল আর মায়ের কোনদিন হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য! থানায় বসে থানার দারোগার সামনে সেদিন এইসব কথাবার্তা এমনভাবে হতে লাগল দেখে মা চমকে গিয়েছিলেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বসন্তদের দলের সঙ্গে থানার বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশ সেদিন মাকে ও মায়াকে ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁরা আবার ফিরে এসেছিলেন অভিশপ্ত জগতে। কিন্তু শংকর আর ফিরে আসেনি।

মায়েরই চোখের সামনে শংকরকে পুলিশ হাজতে বন্ধ করল। বসন্ত তার সামনে গিয়ে বললে, 'এখন কিছুদিন তোকে টাইট দিই—তারপর বাইরে আসবি।' সেই প্রথম, শংকরকে থানা থেকে যেতে হল কোর্টে। কোর্ট থেকে ভবঘুরে আইনে-'ভ্যাগরান্টস্ হোমে।'

মা বলতে লাগলেন, 'সেটা একটা সাক্ষাৎ নরককুণ্ডু।'

সত্যিই। ভ্যাগরান্টস্ হোম তৈরি হয়েছিল নাকি ভবঘুরেদের এক জায়গায় রেখে তাদের বদ অভ্যাসগুলিকে সংশোধন করে সুস্থ সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজকে উপহার দেবার জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার বদলে সেখানে পাকা অপরাধী তৈরি করাই হয়। ভ্যাগরান্টস্ হোমের পরিচালক থেকে প্রহরী, কেরানী, সরকার সকলেই এক-একটা পাকা ক্রিমিন্যাল। মন্ত্রীরা বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন, এই খাতে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার সময় বড় বড় মানবিকতার বুলি আওড়ান। তারপর দেখা যায় যে, অব্যবস্থা ও যে অমানুষিকতা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল সেটাই একটানা চলতে থাকে। ভ্যাগরান্টস হোমে খাবার থেকে, ওষুধ থেকে, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, কনটিনজেন্সি এমন কি ডাক টিকিট পর্যন্ত কর্তৃপক্ষেরই কেউ না কেউ চুরি করে। সেখানে দেখার কোন লোক নেই। দীর্ঘকালের আমলাশাহী যে কায়েমী স্বার্থচক্রের সৃষ্টি করেছে তাকে ভাঙবে কে? প্রগতিশীল মানুষ হলে বড় জোর তাদের ধরতে পারেন কিন্তু প্রতিকার কিছু করতে পারেন না। কাউকে বরখাস্ত করলে তারা সুকৌশলে ধরাধরি করে রেহাই পেয়ে যায়। এছাড়া ভ্যাগরান্টস্ হোমগুলিতে প্রহরী, কেরানী, অফিসারদের মাধ্যমে গাঁজা, চরস, আপিম, কোকেন সব কিছুই বিক্রি হয়। ক্রিমিন্যাল গ্যাং শুধুমাত্র টাকার জোরে প্রহরীদের দিয়ে প্রয়োজনীয় ভবঘুরেদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। এটা ক্রিমিন্যাল গ্যাংদের একটা রিক্রুটিং সেন্টার।

এই পরিবেশের মধ্যে শংকরকে তিন মাস কাটাতে হল। বসন্ত আসত। তার সঙ্গে দেখা করে যেত। খাবার-দাবার, আপিম, গাঁজা, চরস দিয়ে যেত নিয়মিত। এখান থেকেই শংকরের জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। মুক্তির পর আর সে মায়ের কাছে যেতে পারল না—গিয়ে উঠল একেবারে আড্ডায়। অবশ্য মাঝে মাঝে যে সে বাড়ি আসত না তা নয়, কিন্তু সেও মায়ের জন্য নয়—ঐ মায়া মেয়েটার জন্যে। একদিকে সর্দার আর তার সাগরেদ—আরেক দিকে ঐ মায়া। মায়ের কাছে ফিরে আসার পথ তার বন্ধ।

তবু একদিন সে এল। সেই বোধ করি তার শেষ আসা। সেদিনটা মা ভুলতে পারেন না। কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলতে লাগলেন, সর্দার আর বসন্ত ওরা যে কি মানুষ তা ধারণা করা যায় না। সেদিন আধমরা অবস্থায় বসন্ত আর দলের কারা যেন সব চ্যাংদোলা করে ওকে মায়ের কাছে নিয়ে এল। সারা গায়ে চাবুকের দাগ, কপালে বড় বড় কালো-শিরার নীল-নীল ফুলো। মুখখানা প্রায় বিকৃত—থেঁতো হয়ে গেছে মনে হয়। মা আছাড় খেয়ে পড়লেন শংকরের বুকে। শংকর মায়ের গলা জড়িয়ে কেঁদে উঠল, 'আর আমি বাঁচব না মা।'

মাও কাঁদলেন তেমনি করে।

বসন্ত বললে, 'ভয় নেই, ভয় নেই, বাঁচবি।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে ওর এ অবস্থা হল—কে এমন নির্দয়ভাবে বাছাকে আমার মারল?'

বসন্ত হেসে বললে, 'কে আবার মারবে, আমিই মেরেছি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ আমি। ওরই ভালর জন্য আমাকে মারতে হয়েছে।'

'ভালর জন্য কেউ এমন করে মারে!' মা শিউরে উঠলেন। বসন্ত বললে 'এরপর পুলিশে ধরা পড়লে পুলিশ যখন ওকে নির্দয়ভাবে ঠেঙাবে তখন কি আর ও বাঁচবে। এটা তারই মহড়া শুধু।' কথাগুলো বলার পর টেনে টেনে হাসতে হাসতে বসন্ত তার অপরাপর সঙ্গীদের বললে, 'চলরে-চল্। শংকর এখন একটু মায়ের আদর খাক।'

অদ্ভুত এ অভিশপ্ত জগৎ।

অদ্ভুত এই শংকর। মায়ের আদরে একটু ভাল হতেই সে আবার পালিয়ে গেল ওদের আড্ডায়। মা বুঝলেন কি দুর্নিবার

আকর্ষণ ওদের। সে আকর্ষণের টানে মা, বোন, সমাজ-সংসার সব মিছে শংকরের কাছে।

সেই রাতেও শংকর সেই দুর্নিবার আকর্ষণের বেগেই আস্তার দিকে এসেছিল এবং তার সমগ্র অতীতের কথা ভেবে মা বোধ করি এত উতলা হয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যদি কোন রকমেও এখনো তাকে ফেরাতে পারেন। তিনি তাঁর আগ্রহকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবেন কি-না এবং সে ভরসা তাঁর আছে কি-না তা আমি বুঝতে পারলাম না—কিন্তু এটুকু বুঝতে পারলাম, মা অন্ধ-আবেগে এগিয়ে চলেছেন তাঁর পথে।

অনেক ঘুরে, অনেক গলি-ঘুঁজি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় এসে পড়লাম। দক্ষিণে ও বামে ছোট ছোট খোলায় ছাওয়া কতকগুলো দোতলা ঘর, সামনে একটা গলি। সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে মা বললেন, 'এখানটাতেই হবে।' আমি বুঝতে পারলাম, এমন জায়গায় আমি এলাম, যেখানে আমাকে প্রতিটা মুহূর্তেই প্রস্তুত থাকতে হবে যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে। সম্বল আমার কাঁধের ঝুলিটা আর তার ভেতরে আমার সযত্নে রাখা কতকগুলি জিনিস। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বুঝতে পারছেন?'

মা বললেন, 'মনে হচ্ছে তো এখানটাতেই।'

সম্ভবত আমাদের টের পেয়ে হঠাৎ সশব্দে সামনের বাড়িটার দরজা খুলে গেল। শক্তিশালী একটা টর্চের আলো পড়ল আমাদের মুখে-চোখে। লোকটা খাজখাঁই গলায় বলে উঠল, 'টুনটুনি জবাকুসুমটা নিয়ে আয়তো।'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। লোকটার ভাষা আমি বুঝতে পারলাম না এবং এখন কি কর্তব্য আমার তাও স্থির করতে পারলাম না। ভাবলাম মা বোধ-হয় লোকটাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন। কিম্বা হয়তো লোকটাও আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু এসবের কিছুই হল না—মুহূর্তের মধ্যে আমার হাতের আলোয় দেখলাম, একটা মেয়ে, বেশ সুন্দরী মেয়েই বলে বোধ হল, ছুটে এসে রুমালের মত কি একটা লোকটার হাতে দিলে আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা ছুটে এসে মায়ের মুখখানা চেপে ধরল। আমি এই সর্বপ্রথম ঝুলি থেকে বের করলাম, সিক্স চেম্বার্ড ওয়েব্লি রিভলভারটা। মা পড়ে গেলেন মাটিতে। বাতাসে দুর্গন্ধ। বুঝলাম টুনটুনির জবাকসুম মানে আর কিছুই নয়—ক্লোরোফর্ম।

কিন্তু এভাবে ক্লোরোফর্ম করার কারণ কি ওদের? ওরা কি শংকরের মাকে জানে না, না চেনে না, না এই মুহূর্তে চিনতে পারে নি—কোনটা? না, এখানে যে কেউ আসুক রাতে, তাকে ওরা এমনিভাবেই 'জবাকুসুম' দেয়? এবার নিশ্চয়ই আমার পালা। আমি রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরলাম। লোকটা পিছিয়ে গিয়ে, হাত তুলে বলে উঠল, 'ওরে শালা একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে। খবর দে টুনটুনি ওস্তাদকে, বসন্তকে—'

টুনটুনি দরজার দিকে যাবার আগেই আমি ছুটে গেলাম দরজার দিকে। আমার স্থির বিশ্বাস, শংকরের মাকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছে শুধু শুধু, একথা ওদের ওস্তাদকে আর বসন্তকে আমি বলতে পারলে নিশ্চয়ই আমার কোন বিপদ ঘটবে না। তাই ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ঘরের ভেতর দিয়ে আরেকটা ঘর—সেখানে যেতেই দেখলাম ডানদিকে লম্বা একটা বারান্দা। বারান্দার কতকগুলি বিছানা। অনেক-গুলি ছেলে চোখবাঁধা অবস্থায় শুয়ে রয়েছে সেই বিছানাগুলোয়। দেখে মনে হল স্থানটা যেন হাসপাতালের একটা অংশবিশেষ। হ্যাঁ ঠিক তাই। একদিকে অপারেশন থিয়েটার—সেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী আলো জ্বলছে। অকস্মাৎ দরজা ঠেলে আমার ভেতরে ঢুকে পড়ার শব্দে আগাগোড়া শ্বেত-শুভ্র এ্যাপ্রন পরা মুখে মাস্ক আঁটা ডাক্তার আর নার্স ছুটে বেরিয়ে এল।

আমি অবাক। এ কোন্ রাজ্যে আমি এসে পড়লাম। ডাক্তার মুখের ঢাকনাটা তুলে আমার দিকে এক ভয়-বিহ্বল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। দৃষ্টিটা যেন আমার খুব পরিচিত। কোথায় দেখেছি-দেখেছি বলে মনে হল। কিন্তু সময় নেই আমার—ওস্তাদের কাছে পৌঁছুতে না পারলে এখুনি হয়তো কোন অঘটন ঘটে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তারকে, ওস্তাদের ঘর কোন-দিকে?

ডাক্তার সত্যিই ভয় পেয়েছিল আমার হাতে রিভলবার দেখে। লোকটা সোজা ভেতরদিকে ইঙ্গিত করে আঙুল দেখালো।

ঠিকই দেখিয়েছে লোকটা। কারণ, ঐদিকের দোতলা থেকে পায়ে ঘুঙুর-বাঁধা কোন নর্তকীর নাচ আর গানের আওয়াজ আসছিল। সামনে একটা উঠোনমত। উঠোন পার হয়ে সিঁড়ি। আমি ছুটে গেলাম সেদিকে। দেখলাম টুনটুনির সেই ক্লোরোফর্ম দেওয়া লোকটা তখন ঘর থেকে একটা পাইপগান নিয়ে আমাকে তাক করতে করতে ছুটে আসছে।

আমি সিঁড়ির আড়ালে নিচু হতে হতে একছুটে গিয়ে দোতলায় যে ঘরে নাচ-গান হচ্ছিল সেই ঘরে ঝড়ের মত ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু এ-কি!

ঘরের মেঝেয় দামী কার্পেটের ওপর হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে একজন, পাশে তার তবলচি। সামনের সোফায় একটি পানোন্মত্ত মানুষ বসে—সাদা পাঞ্জাবীর ওপর কাজকরা এক মটকার জহরকোট তার গায়ে। সামনে তার ততোধিক পানোন্মত্তা এক নর্তকী ঘাঘরা ঘুরিয়ে নাচছে অপূর্ব ছন্দে। সশব্দে আমার ভেতরে ঢোকায় তারা সবাই সচকিত হয়ে এক-সঙ্গে বলে উঠল, 'কে!'

পিছনে আমার পাইপগান নিয়ে লোকটা ছুটে আসছে। মুহূর্তের বিলম্বতায় আমার বুকখানা গুলীবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই যেমনি আকস্মিকভাবে আমি ঢুকেছিলাম তেমনি আকস্মিকভাবেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু কি দেখলাম, কাকে দেখলাম, আমার সামনে!

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'রা-ণী-দি!'

রাণীদি ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'বি-জ-ন।'

ওস্তাদ ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পাইপগানধারীও তখন এসে পড়েছে। ওস্তাদ হাত নেড়ে তাকে ইসারা করল চলে যেতে। আমি বললাম, 'ঐ লোকটা শংকরের মাকে ক্লোরোফর্ম করেছে!' পাইপগানধারী তখনও চলে যায় নি। ওস্তাদ হাঁকলে, 'জ-গ-দী-শ! তুমি?'

'হ্যাঁ ওস্তাদ।'

'বুড়িকে বাড়ি দিয়ে এসো।'

দুরন্ত উত্তেজনার পর এই পরিবেশে এমনিভাবে রাণীদিকে দেখে আমি যেন হতবাক হয়ে গেলাম। [চলবে]

[পূর্বানুবৃত্তি]

'বিশ্বের হাওয়া' কথাটা যতো বেশি সংখ্যায় উচ্চারিত হয়, সে অনুপাতে ও-কথার উপলব্ধি কি সহজ?

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর ঠিক পরের বছর থেকে পাঁজিতে যে দশক সূচিত হয়, আমাদের দেশে সেই ১৮৬০-এর দশকের স্নাতকদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন,—সাহিত্যে অল্পবিস্তর আত্ম-প্রকাশ করেছেনও কেউ কেউ—রবীন্দ্রনাথ বিপুল পরিমাণে, বিবেকানন্দ কথঞ্চিৎ; কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক কি সত্যিই ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে সে-যুগে?

মধুসূদন সেই কালের কবি ছিলেন বটে,—তাঁর লেখাপড়ার বিস্তার এবং বৈচিত্র্যের দিক অনেকবার আলোচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অজস্র গদ্য নিবন্ধে অনেক পাশ্চাত্ত্য মনীষীর প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে। রামমোহন তো সেই দশক-সূচনার প্রায় তিন দশক আগেই লোকান্তরিত হয়েছেন। বিদ্যাসাগরের তখন পূর্ণ যৌবন,—সেই ১৮৬০ সালে তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ। রামকৃষ্ণ পরমহংস আর বঙ্কিম যেমন প্রায় সমবয়সী ছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ আর ব্রহ্মবান্ধবও সেইরকম—এঁদের দুজনেরই জন্মকাল গেছে ১৮৬১ সালে। উনিশ শতকের সূচনা থেকেই বিশ্বের হাওয়া ছড়িয়েছে বাংলায়,—সে-কথা ঐতিহাসিক সত্য; ১৯৬০ থেকে সাহিত্যে তারই ঢেউ ছড়িয়েছে নানাভাবে,—সেও ঠিক কথা। কতো যে মেধাবী মানুষ জন্মেছেন এই শতকের বাংলা দেশে। বিশ্বের সঙ্গে কত ধ্যানে-কর্মে তাঁদের যোগ ছিল! মধুসূদনের আত্মপ্রকাশ তো সেই সময়েই —তাঁর নাম করলেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সমন্বয়ের এক আদর্শ মনে পড়ে। 'বিশ্বের হাওয়া' কথাটার ইঙ্গিত কি সেই ব্যাপার?

আনন্দ বললে—বাংলা বইয়ের মেলায় কয়েকখানি ইংরেজি বইয়ের প্রসঙ্গ ওঠা উচিত। বিশেষত মধুসূদন-বঙ্কিমের প্রসঙ্গে এবং কতকটা ব্যাপকভাবে সারা উনিশ শতকের চিন্তার একটা মোটামুটি জরিপের কাজে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রকাশিত Freedom Movement in Bengal 1818–1904 এইরকম একখানি প্রয়োজনীয় বই। গত শতকের ষাটের দশকের কথা-প্রসঙ্গে আমাদের এই বর্তমান শতকের ষাটের দশকের (১৯৬৮) এই বইখানির কথা মনে পড়ছে। এ বই অবশ্য বাংলা সাহিত্যে বিশ্বমানব-মনের হাওয়া বিচারের বই নয়, তবে সংক্ষেপে একটা শতকের স্বাধীনতা-চিন্তার দিক আয়ত্ত করবার জন্যে পাঠক-মনকে যা সাহায্য করতে পারে,—এ হোলো সেই ধরনের বই।

আমি বললুম—আনন্দ, যতোদূর মনে পড়ছে ও বইয়ে উনিশ শতকের ১৫০ জন মনীষীর মধ্যে মধুসূদনেরও নাম আছে,—কারণ, মধুসূদন বোধ হয় ফ্রীডম মুভ-মেন্টের মধ্যেই ছিলেন। বিশ্বের হাওয়া বোধ হয় মনের সর্বস্তরে আমাদের সেই সুপ্ত ফ্রীডম-পিপাসাই জাগিয়ে তুলেছিল।

বললুম—রাজনারায়ণ বসু তো বাংলার গ্যেটে বলে গেছেন। কেউ বে তাঁর নিজের প্রীতির কথাও বলেছেন, তিনি হোমার-ভার্জিল-ট্যাসোর কাব্য পড়ে-ছিলেন,—রামায়ণ-মহাভারতও পড়েছিলেন, আবার বায়রন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থও তাঁর ভাল লাগতো। এইসব যোগ-অনুভবের নামই 'বাংলা দেশের তেঁতুল বনে'র সীমানা পেরিয়ে বাঁচা,—এরই নাম 'বিশ্বের হাওয়া'!

আনন্দ বলেছিল—নামোল্লেখ আর যোগ-অনুভব—দুটি পৃথক ব্যাপার। আদিতেই এই সত্যটি মেনে নিতে হবে। অনেকেই অনেকের নাম করে থাকেন, কিন্তু সেহ বাহ্য। মধুসূদনের এবং তাঁর সম-সাময়িক কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিপুল মানব-মনোরাজ্যের বিশ্ব এলাকাটা ধরা দিয়েছিল। ডিরোজিওর শিক্ষাই যে তার একমাত্র কারণ,—এরকম কোনো সহজ বা স্পষ্ট উত্তর দেওয়া এক্ষেত্রে সহজ নয়। ব্যাপারটি দৃশ্য-অদৃশ্য সুবিশাল ইতিহাস-ধারার সঙ্গেই জড়িত।

আমি তাকে বলেছিলুম—২৬শে জানুয়ারী, ১৮৬৫ তারিখে পারী থেকে গৌরদাস বসাককে তিনি যে চিঠি লিখে-ছিলেন তাতে বাঙালী সাহিত্যসাধকবে মাতৃভাষাতেই আত্মপ্রকাশের অনুরোধ ছিল এবং শুধু তাই নয়, তিনি লিখেছিলেন—"European scholarship is good, inasmuch as it renders us masters of the intellectual re-sources of the most civilized quarters of the globe; but when we speak to the world, let us speak in our own language."

সেই চিঠিতেই তিনি লেখেন—যে লোক নিজেকে 'শিক্ষিত' বলে, অথচ মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য নেই যার,—তার জন্মভূমির জন্যে আমার তরফ থেকে ঘৃণাই বিধেয়।

আনন্দ বললে—বিশ্বমানব সম্পর্কের চেতনাটা উনিশ শতকে এদেশে এই রূপ-রাগেই আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু অপর পক্ষে ছিল 'বাংলা দেশের তেঁতুল বন'।

বড়ো মনকে অনেক বাধার মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে নিতে হয় বটে। প্রতিভা বিরল ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পাটনীর সন্তানের মতো—'থাকে দুধে-ভাতে'। কিন্তু বড়ো মনকে বড়ো জায়গা দিতে হয়—লড়াই করবার মতন যোগ্য একটা ক্ষেত্র অন্তত থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সেও এদেশে যে 'তেঁতুল বন' তাঁকে দেখতে হয়েছে,—মধুসূদনের আমলে সে বন আরো কতো অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ভয়াবহ ছিল তাহলে? সেই বাধার মধ্যেও তাঁর

প্রতিভাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং মেরেওছে শেষ পর্যন্ত।

সাহিত্যিকেরও টাকার দরকার—এই সহজ কথাটা একালেও লোকে যথার্থ অনুভব করে না। মধুসূদন তাঁর বন্ধু গৌরদাসকে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন—"We are still a degraded people. The nobodies of Chore-bagan and Barrabazar are honourable people of the country, because they have money".

আনন্দ বললে—অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' নামে যে বইখানি লিখেছেন, সে বইয়ের কথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, এখানে আবার উল্লেখ করছি। গুপ্তমশাই লিখেছেন—'মধুসূদনের চিঠিপত্রের ভাষা ইংরেজী। বাংলা সাহিত্যের সীমায় তাই একে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এ ঘটনা দুঃখের।'

—দুঃখের কেন? মধুসূদনের চিঠিগুলোর ভাষা ইংরেজি বলেই বুঝি? দ্যাখো আনন্দ, ওসব দুঃখের কথা এখানে

ভুলো না—মধুসূদনের সেই ইংরেজি কবিতার ছত্রগুলি মনে পড়ছে—নির্মল সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত সেই ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' বইখানিতে যে ছত্রগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে—শোনো আরো প্রাসঙ্গিক মন্তব্য—

১৮৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 'লিটারারি গ্লীনার' পত্রিকায় প্রকাশিত মধুসূদনের ইংরেজি কবিতা 'King Porus—A legend of Old' থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃতি দেবার আগে এবং পরে যা লেখা হয়েছে, তার মূলকথা হোলো আলেকজান্ডারের সঙ্গে পুরুর যুদ্ধ-বিবরণ সম্বন্ধে মধুসূদনের আগ্রহের সত্যটি দেখিয়ে দেওয়া,—এবং ডিরোজিওর শিক্ষার এই বিশেষ দিকটির প্রতি পাঠককে অবহিত রাখা। বলা হয়েছে—'Though Anglicized, he was at heart an out and out Indian'.

আনন্দ বললে—বিশ্বের হাওয়া মধুসূদন বা বঙ্কিমের মধ্যে যেভাবে বয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অথবা তাঁর সমকালীন অনুবর্তীদের মধ্যেও ঠিক যে সেই একই-ভাবে বয়েছে, তা নয়। তবে, উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় লেখা নানা বইয়ের মধ্যে এই হাওয়ার প্রথম সূচনা ঘটেছিল। প্রতিভার আইন আর দেশকালের সম্পর্ক, দুই-ই এই ঘটনার মধ্যে ধরা যেতে পারে। শশাঙ্কমোহন সেনের লেখা 'মধুসূদন' নামে ছোটো বইখানি ১৯২১ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতার বিষয়। কিছুদিন আগে অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সে বই পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫৯)। সেই আলোচনায় শশাঙ্ক সেন প্রতিভার মূলতত্ত্বের ইশারা দিয়েছেন তিনটি গুণ দেখিয়ে—'গতি, দীপ্তি ও বিস্ফারিণী শক্তি'! মধুসূদনের মধ্যে এই তিন গুণই দেখা গিয়েছিল।

আমি বললুম—ও তো তিনে-এক, একে-তিন। 'তিন' সংখ্যাটা এ বিচারে বাহুল্য।

আনন্দ বললে—তা ঠিকই, গতি-দীপ্তি-বিস্ফারিণী শক্তি তো একই ব্যাপার, —কিন্তু শশাঙ্কমোহন যা বলেছিলেন সেই কথাগুলির মধ্যে বোধ হয় একটা তুলনার ইশারা আছে। তিনি মধুসূদনের গ্রাহিকা শক্তির প্রাচুর্য দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন—'এই শিশু অতি সহজে ইংরাজী ভাষাকে গিলিয়া বসিল',—এবং তাঁর সেই ছোটো বইখানির স্থানসংকোচ স্বীকার করে লিখেছেন—

'ভবিষ্যৎ কবির এ সমস্ত খেলার সংবাদ বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করার জন্য এ প্রসঙ্গে স্থান নাই; কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত না তুলিয়া পারি না। উহাতেই বুঝা যাইবে, বায়রণী-মাদকতা বালককে কি পরিমাণে পাইয়া বসে।'

আমি বললুম—এ তো মধুসূদনের ছেলেবেলার কথা।

—হাঁ, ছেলেবেলারই। শশাঙ্ক সেন বলে গেছেন—'মধুসূদনের এ বয়সের একটি কবিতা "শনিগ্রহে এক সন্ধ্যা" পাঠ করুন। উহার ভূমিকাটিও বিস্ময়জনক। বালকটির কত দম্ভ—কি বিজাতীয় অহংকার!'

একটু থেমে আনন্দ আবার বলতে লাগলো—রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় তাঁর কবিতার ঘর বেঁধেছিলেন 'অনন্ত এ আকাশের কোলে, টলমল মেঘের মাঝারে', —মধুসূদন বেঁধেছিলেন 'শনিগ্রহে'। শশাঙ্ক সেনের এই নিরীক্ষা মনে পড়ছে আজ।

আমি জিগ্যেস করলুম—এর তাৎপর্য কি?

আনন্দ চুপ করে কী যেন খুঁজতে লাগলো আপন মনে।

[ ক্রমশ ]

---

## সাপ্তাহিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য

১। প্রকাশের স্থান—কলিকাতা।
২। প্রকাশের কাল—সাপ্তাহিক।
৩। মুদ্রকের নাম—
সুকুমার গুহ মজুমদার,
জাতি—ভারতীয়,
ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
৪। প্রকাশকের নাম—
সুকুমার গুহ মজুমদার,
জাতি—ভারতীয়,
ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
৫। সম্পাদিকার নাম—
জয়ন্তী সেন,
জাতি—ভারতীয়,
ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
৬। বসুমতী প্রাঃ লিমিটেডের শতকরা ১ ভাগের অধিক মূলধনের মালিক—

(১) শ্রীকৃষ্ণকিশোর দত্ত
১৯বি, রমেশ মিত্র রোড,
কলিকাতা-২৫।

(২) শ্রীমুরারিমোহন দত্ত,
১১/বি, নিবেদিতা লেন,
কলিকাতা-৩।

(৩) শ্রীহৃষীকেশ আঢ্য,
৬১/৬এ, মুরে এভেনিউ,
কলিকাতা।

(৪) শ্রীমতী লতিকা সান্যাল,
১৬/১এ, ল্যান্সডাউন রোড,
কলিকাতা।

(৫) শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক,
১১১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা।

(৬) শ্রীশম্ভুনাথ মুখার্জী,
শ্রীশশাঙ্কশেখর মুখার্জী,
শ্রীকরুণেন্দু ভট্টাচার্য,
৫০এ, সুরী লেন,
কলিকাতা-১৪।

(৭) শ্রীএস, জি, মজুমদার,
শ্রীএস, রায়,
৪৫এ, কড়েয়া রোড,
কলিকাতা-১৭।

(৮) শ্রীপঙ্কজ চোংদার,
গুসকরা, বর্ধমান।

(৯) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস ও
শ্রীদেবকুমার চ্যাটার্জী,
৫, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট,
কলিকাতা।

(১০) শ্রীআদিত্যনারায়ণ রায় ও
শ্রীপ্রবোধ চ্যাটার্জী,
৭৯, আপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

(১১) শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত ও
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখার্জী,
১৩৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা।

(১২) কুমারী কৃষ্ণা সেন,
৯, রাইসিনা রোড,
নিউ দিল্লী।

(১৩) শ্রীমুকুল রায়চৌধুরী,
৩বি, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট,
কলিকাতা-৫।

(১৪) শ্রীবিজনকুমার সেন,
৭৭২এ, ব্লক-'পি',
নিউ আলিপুর, কলিকাতা।

(১৫) শ্রী এস, এন, বোস,
৬০এ, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ,
কলিকাতা।

আমি শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য।

১লা মার্চ, ১৯৭০

প্রকাশকের স্বাক্ষর
সুকুমার গুহ মজুমদার

না, আর কোনো আন্দোলনের প্রতি-শ্রুতিতেই বিশ্বাস নেই। ভালো কথাও তের হয়েছে। সেসবই তুবড়ির ফুলকারির মতই চমক দেয় এবং তারপরই সব শেষ। বিদ্যুৎ-ঝলকের পর আরও বেশি অন্ধকার।

অনেক লেখা হয়েছে দেওয়ালে, সারা কলকাতা জুড়ে: 'বাঙালী, গর্জে ওঠো।' ওঠে নি। কলকাতার বিমিশ্র বিচিত্র ভিড়ের মধ্যে শুনেছি বাঙালীর ক্ষীণ আর্তনাদ: 'বাংলা ছবি দেখাতে হবে, অন্য ছবি চলবে না।' ভিড়ের অট্টহাসিতেই তা মিলিয়ে গেছে। দাবি ছিল, নব্বই শতাংশ চাকরি দিতে হবে বাঙালীকে। জবাবে অবাঙালী শিল্পমহলে বহ্বাস্ফোট অকাল ফুঁড়ে উঠেছে।

বাঙালীর চীৎকারকে কেউ গ্রাহ্যও করে না; বাঙালী নিজেও করে না।

তবু অবস্থাটা এতই অসহনীয় যে, নিত্য রোগের যন্ত্রণা-কাতরোক্তির মতো বাঁচাও বাঁচাও করুণ ধ্বনিটা ওঠে, হঠাৎ কানেও আসে।

সর্বশেষ এমনি একটা আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি বা পরিত্রাণের আবেদন শোনা গেল ২১শে ফেব্রুয়ারী। বাংলা দেশে (যদিও পশ্চিম) 'বাংলা প্রবর্তন' বা তা নিয়ে আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি যে শ্রুতি-দাই, এই সামান্য (না, অসামান্য ?) লজ্জাও আমরা খুইয়েছি। বাংলা দেশে বাংলা প্রবর্তনের কথা শুনে যে-কোনো অবাঙালী বিদেশী প্রশ্ন করবে—বাধাটা কোথায় ?

সরকারী ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান ভারত সরকার কতখানি বাধা তা অজানা নয়; কিন্তু কেউ বুকে হাত দিয়ে একথা বলতে পারবে না যে, ঐটিই একমাত্র বাধা। সীমিত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কতখানি বাধা তাও অবিদিত নয়. বাংলা প্রবর্তন সমিতির অত্যন্ত সুলিখিত ও সবিস্তার খসড়া-পরিকল্পনা তার নিঃসংশয় প্রতিবিম্ব তুলে ধরেছে, তবুও কেউ বলতে পারবে না এইটিই একমাত্র বাধা। আরও পরিমিত পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় কতখানি অচলায়-তন তাই কি কারও অজানা? বাংলা প্রবর্তন সমিতির প্রধানতম ব্যক্তি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর লাঞ্ছনা পণ্ডিত-অধ্যুষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কীর্তি-রূপে কি অবিস্মরণীয় নয়? তবুও এইটিই একমাত্র বাধা নয়।

বাধা পশ্চিম বাংলার বাঙালীর সমগ্র-তায়, তার মানসিকতায়। বাংলা ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে হীন ধারণা আসলে একটা অপরাধ লুকোবার আবরণমাত্র। প্রধানত ইংরাজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবেশে অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যের লালনে বড় হওয়ার আদিতে যে বিদ্রোহের ঝাঁঝটুকু ছিল, তা গেছে নিঃশেষ হয়ে এবং

পরাধীনতার হীনমন্যতাই হয়ে উঠেছে এখন প্রবলতর। বাংলা ভাষা আবার একটা কাজের ভাষা নাকি? বিদ্রোহী নব্যবঙ্গ ডিরোজিও'র আমলেও এমন অশ্রদ্ধার কথা শোনা যায় নি। আজ স্পষ্ট করে শুনতে হচ্ছে এমন কথা এবং বাংলা প্রবর্তনের জন্য করজোড় সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে হচ্ছে বাঙালীদের কাছেই, সেই শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে, যাঁরা বাংলা বই ছেড়ে ইংরাজী বই কেনেন, রবীন্দ্ররচনাবলী ড্রয়িং-রুমে সাজান এবং বাংলা গ্রন্থকে প্রামাণ্য মনে করেন না। সেই শিক্ষিত বাঙালীর কাছে যাঁরা বাংলা ছবি ছেড়ে ইংরাজী ছবি দেখতেই ভালোবাসেন, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো গ্র্যান্ডপ্রিক্স পেলে দয়া করে বাংলা ছবি দেখেন। এবং সেই স্বল্প-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীর কাছেও যারা হিন্দী ছবিঘরে ভিড় জমায়, হিন্দী গান গায় এবং লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজোয় অভক্তির হিন্দী রেকর্ড বাজায়। সেই স্কুল-কলেজে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও, যারা বাংলা না পড়ে পাশ নম্বর কমাবার জন্য অধ্যক্ষ-উপাচার্যকে ঘেরাও করে।

এই সর্বজনীন বিজাতীয় অবাঙালী-মানসিকতায় বাংলার ঠাঁই কোথায়? পশ্চিম বাংলায় সেই পুরনো বৃটিশ স্টীল ফ্রেম বা কৃষ্ণাঙ্গ সাহেব আমলাদের নিয়েই স্বাধীন রাজ্য-মেলা প্রথম বসান কংগ্রেসীরা, তারপর ২২।২৩ বছর পরে মার্কসিস্ট ও তাঁদের সহচরেরা। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় দৃষ্টি তথা "অপ্রাদেশিকতা" পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসীরা যত বেশি সত্য বলে মেনেছেন ও আচরণে প্রয়োগ করেছেন এমন আর কোনো রাজ্যবাসী কংগ্রেসীরা করেন নি। ফলে, হিন্দু বাঙালী কংগ্রেসী নিজেকে হিন্দু বলতে যতটা সংকোচ বোধ করেন, বাঙালী বলতে ঠিক ততটা সংকোচ বোধ করেন। তাঁদের পক্ষে কিছুতেই 'বাঙালী বাঙালী' করা সম্ভব হয় নি; ফলে যা-কিছু বাঙালী তা লজ্জানতা সেকালের নববধূর মতো সর্বদাই অন্তরাল খুঁজেছে। বাঙালীকে চাকরি দিতে লজ্জা, বাঙালীর জন্য চাকরি চাইতে লজ্জা, পশ্চিম বাংলার উন্নতির জন্য বাঙালীসুলভ দৃষ্টিতে সচেতন সক্রিয় হওয়ায় লজ্জা, সর্বস্তরে—সরকারী কাজে, শিক্ষায়তনে বাংলা ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায়ও তেমনি লজ্জা। এসব কথা ইতিহাসের পাতায়ই আছে যে, একবার একান্তভাবে বাঙালী ড্রাইভারদেরই ট্যাক্সি দেওয়া ও রাজ্য পরিবহনে বাঙালীদের নিয়োগ প্রশ্নে অস্থির হয়ে একজন সর্ব-ভারতীয় নেতা দিল্লীর তক্ত ছেড়ে ছুটে এসেছিলেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে; সেই দিল্লীর ক্ষমতাসীন সর্ব-ভারতীয় নেতাই এর আগেও একবার ময়দার ভেজাল কারবারী এক অবাঙালী মিল-মালিককে রক্ষার জন্য রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীর পায়ের নীচের মাটি নিয়েছিলেন সরিয়ে। সুতরাং, সরকারীক্ষেত্র অপ্রা-দেশিকতার লজ্জা ঢাকতে পশ্চিম বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রী যদি জনৈক অবাঙালী শিল্পপতির তুষ্টি সাধনায় ভারত সরকারের কারুণ্য-পাওয়া মানভূমের একাংশ থেকে দুটি থানা প্রত্যর্পণ করে থাকেন তবে তা তিনি ঐ এক মানসিকতা থেকেই করেছেন। অপ্রাদেশিক হওয়ার আতিশয্যে যে তিনি বঙ্গ-বিহার মার্জারের প্রস্তাব করেছিলেন তার পুনরুক্তিও করে লাভ নেই। সর্ব-ভারতে বাঙালী কংগ্রেসীদের এই অবাঙালী অপ্রাদেশিক হবার উৎকণ্ঠাই পশ্চিম বাংলার স্বার্থসংশ্লিষ্ট সর্ববিষয়ে ও সর্বস্তরে প্রতিফলিত হয়েছে। যে-কোনোকাল থেকে পশ্চিম বাংলা সর্বভারতে গণ্য ও মান্য হতে পারত, তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য

রব তুলে দিল, পশ্চিম বাংলার বাঙালী ওরফে বাঙাল উদ্বাস্তুদের স্থান হবে না, কেন্দ্র যেন এদের যেখানে খুশি নির্বাসন দেয়। এরা ভিখিরী হবে, কি বিভূঁইয়ে মারা যাবে, তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-ভাষার কি হবে, তার জন্য লেশমাত্র উদ্বেগ নেই। সাহস হল না একথা বলার যে, যে-রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বাংলার বলি হয়েছে, তার জন্যই পশ্চিম বাংলার পক্ষে ভারত সরকার পাকিস্তানের কাছে বিতাড়িত, উৎসাদিত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু আনুপাতিক জমিও দাবি করুন। একবার পূর্বোক্ত সর্বভারতীয় নেতা এমন একটা বেফাঁস কথা বলেও ফেলেছিলেন, কিন্তু তাঁর সিনিয়ররা কথাটাকে চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘোষণা করলেন, না, না, ওসব কথা নয়। অবশ্য সে ও'দের কথা, ও'দের সে বোধ থাকলে ও'রা দেশ বিভাগেরই প্রতিরোধী হয়ে দাঁড়াতেন। পক্ষান্তরে, ও'রা যদি দেখেন 'বঙ্গাল কংগ্রেসী সরকার বাঙালদের তাড়াবার জন্য শেয়ালদা-হাওড়ায় লাঠিয়াল পুলিশ মোতায়েন করেন, তখন ও'দের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বাঙালীর বাঙালীর জন্য কোনো মমতা নেই, সুতরাং ঐ বাঙাল বঙালীগুলোকে নিয়ে যা-খুশি করা যেতে পারে। বাংলা ভাষাকে নিয়েও।

ময়দা-ভেজালের কারবারীরা যে ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনচ্যুত করেছিলেন, তাঁর একবার ইচ্ছে হয়েছিল রাজকার্য বাংলা ভাষায় চালাবেন এবং ঐ ভেজালকারীদের উদ্দেশে একথা বলারও স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন, এখানকার দানা-পানি খাচ্ছেন, 'কম-সে কম বাংলা তো শিখিয়ে'। অভিযোগের আকারে কথাগুলো যথাস্থানে পৌঁছেও গেছল। সুতরাং রাজকার্য বাংলাকরণও স্তিমিতগতি হয়েছিল, পরে বিলীন হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেসীদের যদি বা বাংলা বাদে সর্বভারতীয় দৃষ্টি অথবা নিঃস্বার্থ বাংলার ভারতসেবা, মার্কসীয়দের ভারত বাদে বিশ্বমনস্কতা, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভারতের বিশ্বসেবা বা আন্তর্জাতিকতা। তাদের দৃষ্টিতে বা বিচারে ভারতে বা বিগত 'ভারতবর্ষে' মানুষ জন্মায় নি বা জন্মায় না, মানুষ পেতে হলে যেতে হবে রুশিয়ায়, চীনে, ভিয়েৎনামে, কিউবায়, হয়তো আলবেনিয়ায়ও। ভারতের তুলনায় বাংলা বা পশ্চিম বাংলা যেখানে ক্ষুদ্রতর, আন্তর্জাতিকতা তুলনায় নিশ্চয়ই সেখানে বৃহত্তর। অর্থাৎ চোখে পড়বার মতই নয়। সেখানে তুচ্ছ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। যে জবরদখল রাজনৈতিক জমি ও নতুন আয়তনের মধ্যে পার্টি সম্প্রসারণের স্বপ্ন, তা লড়াই-শিবিরের পণ্যমাত্র, সেখানে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্ভব নয়। সুস্থ মার্কসীয় দর্শনের পথও যদি নিত এই বিকৃত চেতনা, তবু ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ভূমিকা নেবার অবকাশ ঘটত না এ'দের।

বাংলা প্রবর্তন সমিতিকে এই সামগ্রিক মানসিকতা বুঝে নির্ভরসায় সতর্ক হয়ে চলতে হবে। বর্তমান সরকারের কাছে সমিতির যদি কিছুমাত্র প্রত্যাশা থেকে থাকে, তবে যাত্রাপথে প্রতিবন্ধক দেখা দেবেই। প্রবর্তন সমিতির কর্মসূচী ও দাবি-দাওয়ার মধ্যে সরকারী পর্যায়ের ঘাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। সরকারী অবাঙালী মানসিকতা ও তা থেকে নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে মিশেছে বেসরকারী সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক মানসিকতা। প্রবর্তন সমিতি প্রতিবন্ধকের এই হিমালয় উত্তীর্ণ হতে পারবেন?

মনে রাখতে হবে তাঁরা যাত্রার সংকল্প নিয়েছেন প্রাণোৎসর্গের ২১শে ফেব্রুয়ারী। এটা এক সপ্তাহ বা পক্ষকালের একটা লোক দেখানো ব্যাপার নয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত, গভীরে সঞ্চারিত, সংস্কারের মতো অনতিক্রম্য মানসিকতায় একটা উথাল-পাথাল ভূমিকম্প না হলে প্রবর্তন সমিতির সাধু-সংকল্প কখনো সার্থক হবে না। পূর্ব বাংলায় বাঙালীরা ভাষার বেদীমূলে রক্ত দিয়েছে আজ ১৮ বছর, তবু সব ফিরে পায় নি এবং ও'দের সংগ্রাম চলছেই, প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, চলবেই। ও'দের সমুখে স্পষ্ট বাধা—দৃষ্টিগোচরে বাধা, আমাদের সমুখে বাধা অদৃশ্য—দৃষ্টির অগোচরে। তার নাম উদ্ভট সর্বভারতীয়তা ও বিকৃত আন্তর্জাতিকতা। বাঙালীর সত্তা সেখানে হারিয়ে গেছে।

ভাষা-আইনে যে ফাঁক রয়েছে, তার সুযোগ শুধু মিথ্যা ইংরাজী ভাষাজ্ঞান-দর্পী ও বাংলা ভাষা অনভিজ্ঞ আমলারাই নেয় একথা সর্বাংশে সত্য নয়। আমলারা কার্যক্ষেত্রে কঠিন সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিশ্রুতিধর্মী নির্বাচনপ্রার্থী ও মসনদাসীন ব্যক্তিগুলোও অসত্য নয়। শ্রেণী-সংগ্রামের নামে শরিকী সংঘর্ষে বা শরিকী সংঘর্ষের নামে শ্রেণী-সংগ্রামে যাঁদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, তাঁদের রাজকার্যে ভাষা-আইনের ফাঁকে দৃষ্টি দেবার সময় কই? ইতিমধ্যে একটা বছর গড়িয়ে যাওয়ার গার্হস্থ্য-[illegible] এই পশ্চিম বাংলায় কাজের ফিরিস্তি হাজির করেছেন তাঁরা, প্রবর্তন সমিতি ৩৬৫ দিনের এই কর্মব্যস্ততায় মাতৃভাষা সম্পর্কে একটাও অনুকূল লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন? যদি না করে থাকেন, তবে এই কোলাহলময় মহানগরীতে তাঁদের সাতটা দিনের ক্ষীণ আর্তনাদ বাঙালীর কাছে অশ্রুতই থেকে যাবে।

আইনের ফাঁক-পূরণটা এমন-কিছু নয়, পাশ করাতে দোষ নেই বলে ডানলোপিলোর আরাম আসনে বসে ঝিমোতে ঝিমোতেও রাজী হওয়া যায়, কিন্তু তাতে সোজা-উঠে-বসা অঙ্গীকার থাকে না। প্রথম যখন আইন হয়েছিল তখনো ছিল না এই অঙ্গীকার।

'মুক্ত স্বায়ত্তশাসিত' পশ্চিমবাংলায় তার প্রধান মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য (!) 'বাংলা ভাষা প্রবর্তন সমিতি' যে প্রস্তাব ও কর্মসূচী তুলেছেন, তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সুচিন্তিত এক দলিল বলা চলে। কিন্তু যদ্দিন না এ-রাজ্যে বাঙালী-সত্তায় সচেতন জাতীয় সরকার ও বেসরকারী বাঙালী গণমিছিলের মাতৃভাষা-মমতার প্রয়োগ-সঙ্গম ঘটছে, তদ্দিন বাংলা ভাষা প্রবর্তন সমিতির সব উদ্যোগ-উদ্যম জলরেখার মতো মুহূর্তেই মিলিয়ে যাবে। সুতরাং অনুকূল মানসিকতার জন্য বাংলাভাষা প্রবর্তন সমিতিকে কম-সে কম ২০ বছরের নিরলস সংগ্রাম করে যেতে হবে। পূর্ব বাংলার বাঙালীরা রক্ত-প্রাণ দিয়েও ১৮ বছরে মাত্র রবীন্দ্রসংগীতের পুনর্বাসন সম্ভব করেছে। আমরা একটিও প্রাণ দিই নি, এতটুকু রক্ত দিই নি। এবং আমাদের সব চাইতে বড় বাধা এই ভ্রান্ত ধারণা যে, কোনো বাধাই নেই। বাধা যে আছে তার একমাত্র নিঃসংশয় প্রমাণ যা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব তা সম্ভব হয় নি। আমাদের প্রথম প্রয়োজন তাই সেই অদৃশ্য ভূতটাকে দিবালোকে এনে দাঁড় করানো, যে আমাদের সহজ সরল পথটাকে এমন বাঁকা করে দিচ্ছে অথবা পদক্ষেপে পদস্খলন ঘটাচ্ছে। রাজ্য সরকারের আন্তরিকতা থাকলে আইন কেন তাঁরা খাদ্য, মৎস্য, কৃষির মতো একটা বাংলাভাষামন্ত্রকের সৃষ্টি করতে পারতেন।

সেদিন কথায় কথায় অজয়বাবু বলছিলেন—
"আজকাল প্রাণ
রাখতেই প্রাণান্ত।"

অকপট ভাষা-সংগ্রামে রাজ্যব্যাপী যে মাতৃভাষার মানকিজ্ঞা সৃষ্টি করতে পেরে-ছিলেন এবং যার ফলেই সর্বভারতীয় দৃষ্টিবিভ্রান্ত 'হিন্দীরাজী' কামরাজী কংগ্রেসকে উৎসাদিত করে "তামিলনাড়ু" রাজ্য কায়েম করেছেন, প্রবর্তন সমিতি কি মনে করছেন পশ্চিমবাংলায় সেই একনিষ্ঠ মানসিকতার কখনও সৃষ্টি হয়েছে এবং হতে পারে? এবং বর্তমান রাজ্য সরকার তারই মানস-সন্তান? অথবা প্রবর্তন সমিতি কি আমাদের এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, কোন বিজাতীয় জারজ-ভাবনা পশ্চিমবাংলার রাজনীতি-সচেতন প্রাগ্রসর বাঙালীকে অবসন্ন করে রাখে নি?

এর উত্তরের ওপরই প্রবর্তন সমিতির প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সার্থকতা নির্ভর করছে। সেখানে দৃষ্টি পরিক্রমা করব তখনই।

# পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কয়েকটি অভিমত

প্রতিবেদন : সাগর বিশ্বাস
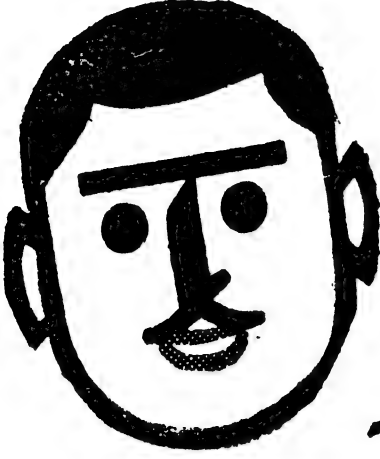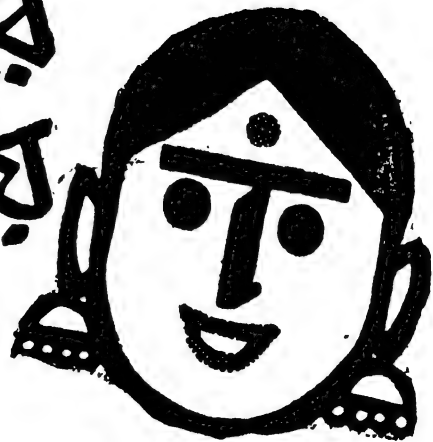
## দুই মন্ত্রীর দৃষ্টিতে

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, গত ২রা অক্টোবর তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে মহাকরণে মন্ত্রীদের দপ্তরে আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়া সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। সেই লেখা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য আমাকে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে মন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনের সেই মন্তব্য যে অন্য আর একজন মন্ত্রীর কনফিডেন্সিয়াল এ্যাসিস্ট্যান্টের দারুণ গোসার কারণ হয়েছিল সেটা বুঝেছিলাম গত ১৬ই জানুয়ারী। মহাকরণের সেই সি· এ· মহাশয়ের প্রগলভ আচরণে। 'আপনাদের চোখে আমরা তো আমলা। সেই অমলাদের কাছে আপনারা কেন আসেন' বলে ভদ্রলোক অভিমানে ফেটে পড়েছিলেন। আরো অনেক কথাই বলেছিলেন, চোখমুখ ঘুরিয়ে, শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে। আমার জনৈক সাংবাদিক বন্ধুকে বাঁ-হাতে চারমিনারের প্যাকেট অফার করার দৃশ্যটুকু আজও বেশ মনে আছে। বন্ধুটি বলেছিলেন, 'নো, থ্যাঙ্কস'। যা হোক, অক্টোবরের লেখার প্রতিক্রিয়া জানুয়ারীতে হজম করে সেদিন ফিরে এসেছিলাম এবং পরে সরাসরি মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছিলাম (সে সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে)।

এসব কথা প্রায় ভুলেই গেছিলাম। কিন্তু গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী আর একজন মন্ত্রীর দপ্তরে যে অভিজ্ঞতা হলো, সেই অভিজ্ঞতাই পুরনো ঘটনাকে মনে করিয়ে দিলো। ঘটনা পুরনো হলেও চরিত্রগত অমিল এর মধ্যে নেই।

সেদিন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তো হলোই না, উপরন্তু বারকয়েক অন্দরে খবর পাঠিয়েও কোন গ্রীন সিগন্যাল না পেয়ে তীর্থের কাকের মতো (তীর্থক্ষেত্রই তো বটে) পি· এ, সি· এ, এবং তাঁদের বহিরাগত আত্মীয়বান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে বসে থাকতে হলো। কিন্তু নীরবে বসে থাকার জন্য বিধাতা বোধ হয় আমাকে সৃষ্টি করেন নি। অজস্র উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নবাণ এক সময় আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো :

—আপনাদের পত্রিকার বিরুদ্ধে তো মামলা হয়েছে। ওয়ারেন্টও বেরিয়েছে।

বুঝলাম মামলার আগে ওয়ারেন্টের খবরও এঁরা পেয়ে যান।

—আপনারা তো দুর্নীতির খবর ছাপেন। আপনারা আমাদের দলের ইমেজ নষ্ট করতে চান। আপনাদের জব্দ করার পথ আমাদের জানা আছে। দুর্নীতি কি কেবল একটি দপ্তরেই আপনারা খুঁজে পেলেন? শিক্ষা, ভূমি, সেচ এসব দপ্তরে কি দুর্নীতি নেই? জানি সেসব আপনারা দেখবেন না। অমুকের চিঠি আপনারা ঠিকমত ছাপেন নি কেন?

প্রশ্নের যেন শেষ নেই। একা ক'জনকে আর উত্তর দেব? তবু দু'-চারটে কথা বললাম। আমার নির্ধারিত সময় থেকে এক ঘণ্টা কেটে গেল। মন্ত্রী মহাশয়ের ঘর থেকে সবুজ সংকেত তবুও এলো না। অথচ তক্ষুণি অন্যত্র জরুরী কাজ থাকায় টেলিফোনে মন্ত্রী মহাশয়কে আমার বিদায় নেবার খবর জানিয়ে আমি চলে এলাম। মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য এতে খুব লজ্জিত হলেন।

এটা স্বাভাবিক যে, দুর্নীতির গায়ে আঁচড় পড়লে অনেকেরই এলার্জি দেখা দেয়। দুর্নীতির খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীও অনেক সময় সেই বুর্জোয়া (?) পত্রিকার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে লেগে যান। কিন্তু আমরা এও জানি যে, সেই দুর্নীতির ধারাবাহিক তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ প্রকাশ বন্ধ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দলের নেতারা সেই বুর্জোয়া (?) পত্রিকার কর্তৃপক্ষকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবী দলের নেতাদের কাছে এসব . . . .

দোষের নয় আভ্যন্তরীণ খবর বাইরে
পাচার করা, দোষের নয় সংবাদপত্র
কণ্ঠরোধ করতে মালিকপক্ষকে প্রভাবি
করা। দোষ যেন শুধু কিছু
সাংবাদিকের, যাঁরা অপ্রিয় স
প্রকাশ করার সৎ সাহস রাখেন
সংশ্লিষ্ট সি· এ ও পি· এ-দের নিকা
আমার সানুনয় অনুরোধ—চোখমুখ ঘুরি
মেজাজ দেখাবার লোভ সম্বরণ করু
আগামীকাল মহাকরণের বিশেষ চেয়া
বসার অধিকার যে আপনাদের হারাতে হ
না—এমন গ্যারান্টি কি আছে? কিন্
আমরা যেখানে আছি, সেখানেই থাকব
মানুষের স্বার্থে আমাদের কথা চিরকা
কলমে ব্যক্ত হবে। তখন রক্তচক্ষু বৃথ
আস্ফালন করে মরবে।

## শ্রীহরে কৃষ্ণ কোঙার

### ভূমি ও ভূমির-জস্ব মন্ত্রী

—১৯৬৭ সালের চেয়ে ১৯৬৯ সা
যুক্তফ্রন্ট অনেক বেশি শক্তিশালী হও
সত্ত্বেও আজ যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংঘ
এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে
বর্তমান সরকারের টিকে থাকাটাই অস
বলে অনেকে মনে করছেন। এই অ
র্কলহের কারণ কি? এর ফলে জনগ
মনে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তি ম্লান হচ্ছে
কি?

—বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রাম-বাং
১৯৬৭ সালে যা করা সম্ভব হয়
১৯৬৯ সালে তাই আমরা করতে পেরে
১৯৬৭ সালেও খাস জমি বিলি ক
কর্মসূচী ছিল, কিন্তু তা ছিল সরকা
দায়িত্ব। এবারের চিত্রটি অন্যরকম। ১৯
সালে খাস ও বেনামী জমি দখলের অ
লনে সরাসরি গ্রাম-বাংলার কৃষক সমাজ
আমরা লিপ্ত করতে পেরেছি। সারা বাং
দেশে দশ লক্ষ বিঘা জমি কৃষকেরা জো
দার-মহাজনদের হাত থেকে ছি

নিয়েছে। মহাজন-মজুতদারদের কাছ থেকে ন্যায্য সুদে তারা ধান আদায় করেছে। আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোর্টের ইনজাংশন নিয়ে এতকাল যারা জমি রক্ষা করে আসছিল, গ্রামের সচেতন কৃষকেরা বহুক্ষেত্রে সেই সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আমাদের বক্তব্য ছিল, বে-আইনী জমি দখল করো এবং সঙ্গে সঙ্গে তা বণ্টন করে দাও। এ ব্যাপারে শনিবারটাই সব থেকে প্রশস্ত দিন। শনিবারে দখল করে রবিবারে বণ্টনপর্ব শেষ হলে বে-আইনী মালিকপক্ষ কোর্টের শরণাপন্ন হতে চাইলেও সোমবারের আগে তা পারবে না। বহুক্ষেত্রে এই 'ট্যাকটিক্স'-এ মজুরদের কর্মীরা কাজ করছে। জোতদার-মহাজনেরা এসব ব্যাপারে অতীতে পুলিশকে সহায়ক হিসেবে পেয়েছে, এখন তা পাচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলের এই শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন যুক্তফ্রন্টের মধ্যে হচ্ছে। বিভিন্ন মতাদর্শভিত্তিক যুক্তফ্রন্টে সেটাই স্বাভাবিক। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের আচরণে আমরা খুশি, কিন্তু বাংলা কংগ্রেস খুশি হতে পারেন না। তাই তাঁরা সারা রাজ্যে অরাজকতা দেখতে পান। তথাকথিত শরিকী সংঘর্ষও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে তেমন কোথাও হয় নি। তা হলে তাঁদের ক্ষোভের কারণ কি? যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট বা সংঘাতের কারণ হিসেবে এই দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎটাই সবচেয়ে বড় কারণ।

আর ইমেজ নষ্ট হবার কি আছে? যুক্তফ্রন্টের যেটা আসল চরিত্র, মানুষ সেটাই দেখতে পাচ্ছে। কৃষকের জমি পাওয়া, শ্রমিকের আর্থিক সুবিধালাভে যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকদলের খুশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি। এটাই হলো যুক্তফ্রন্টের আসল চরিত্র। জোতদার-মহাজনেরা '৬৭ সালে এত চটে নি, কারণ তারা জেনেছিলো এসব হতে পারবে না। আজ কৃষকের ক্রমবর্ধমান জয়লাভে তারা ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

—শরিকী সংঘর্ষ গ্রামাঞ্চলেই বেশি হয়েছে। আপনি কি মনে করেন নিম্নস্তরে যুক্তফ্রন্ট হলে এসব সংঘর্ষ অনেকাংশে এড়ানো যেতো?

—না। যুক্তফ্রন্ট কমিটির সঙ্গে এইসব সংঘর্ষের কোন সম্পর্ক নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জোতদার-মহাজনেরা স্বাভাবিক তাগিদে কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের আশ্রয় নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। কিছু কিছু স্থানে প্রকৃতপক্ষে শরিকী সংঘর্ষ হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা নয়। যে-সকল স্থানে বাস্তবিকপক্ষে শরিকী সংঘর্ষ ঘটেছে, যুক্তফ্রন্ট কমিটি করলে সেসব সংঘর্ষ এড়ানো যেতো বলে আমাদের মনে হয় না। এগুলি প্রধানত বড় রাজনৈতিক কর্মীদের সচেতনতার অভাবে। আমরা বলেছিলাম, কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে এইসব কলহ-বিবাদগুলি দলগুলির মধ্যে স্থানীয়ভাবে খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা করা হোক। স্থানীয়ভাবে না মিটলে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর জেলা কমিটির সাহায্য নেওয়া হোক। তবে এ কথা ত' ঠিক যে, সব জায়গায় যুক্তফ্রন্টের সব দলের প্রভাব একরকম নয়। ধরা যাক, বর্ধমানের কালনা এলাকা। এখানে আমাদের পার্টি একাধিপত্য বলা চলে। এক্ষেত্রে ঘোর বিবাদের বিষয়ে অন্য পার্টির ভূমিকা কি হবে? আমাদের গাইড-লাইন অনুসরণ করে অন্যান্য দলের বেশির ভাগ অঞ্চলে অনেক বিবাদ মেটানো সম্ভব হয়েছে। যেখানে সম্ভব হয় নি, সেখানে সংঘর্ষ ঘটেছে। সেই সংঘর্ষের চেয়ে বড় কথা এই, যে হয়েছে কৃষকের হাতে দশ লক্ষ বিঘা জমি এসেছে। ২৫টি প্রাণের বিনিময়ে এই বিরাট জয়লাভ কম কথা নয়।

—এইসব শরিকী সংঘর্ষকে আপনি শ্রেণী-সংগ্রাম বলে বিবেচনা করেন কি?

—অনেক ক্ষেত্রে এগুলি শ্রেণী-সংগ্রাম বৈকি? সবক্ষেত্রে অবশ্যই নয়। যেসব ক্ষেত্রে মূলত সংগ্রামটা হয়েছে মালিকের সঙ্গে মজুরের, জোতদারের সঙ্গে কৃষকের, সেসব ক্ষেত্রে এগুলি অবশ্যই শ্রেণী-সংগ্রাম।

—একদিকে সেই সনাতন অর্থনৈতিক সঙ্কট, অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের আত্মকলহের ফলে ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়িত হতে পারছে না। অনেকে এই কর্মসূচীকে নিছক রাজনৈতিক স্টান্ট বলে মনে করছেন। আমরা অবশ্য তা মনে করি না। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা বলা চলে কি?

৩২ দফা কর্মসূচীতে আমরা তো তা বলি নি যে, আমরা সব করে দেব! তবে এটুকু ঠিক যে, যতটা পারতাম, ততটা পারি নি। এর কারণ অনেকাংশে এই আত্মকলহ সন্দেহ নেই। শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে টাকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য—সেসব ক্ষেত্রে হয়তো কর্মসূচী সহজে রূপায়িত হতে পারে নি। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে ত' আমাদের বিলম্ব হয় নি। ভূমি, শ্রম এবং গণ-আন্দোলনে পুলিশ ব্যবহার না করার কর্মসূচী তো কার্যকরী হয়েছে। আত্মকলহ না থাকলে আমরা অনেক কিছুই রূপায়িত করতে পারতাম। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী এই একই কারণে ব্যাহত হয়ে রইলো।

—গ্রামাঞ্চলে ৭৫ বিঘার কম জমি আছে এমন অনেক পরিবারের জমিও কোন কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নেতৃত্বে দখল করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

—অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে বটে। এসব ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, ব্যক্তিগত রেষারেষি, নিছক উত্তেজনা প্রভৃতি কারণ থাকতে পারে। তবে এগুলি যে ভুল সেটা অস্বীকার করা চলে না। এবং অবিলম্বে এ ভুল সংশোধন করে ঐসব জমি ফেরৎ দেওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে এভাবে দখল-করা জমি আমরা ফেরৎ দিয়েছি। কিছু কিছু জায়গায় দেওয়াও যাচ্ছে না। যেমন, রাজারহাটে কিছু মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ির জমি এভাবে সি-পি-এম এবং ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীরা দখল নিয়েছে। এখন আমরা এটা ফেরৎ দিতে চাইলেও ফরোয়ার্ড ব্লক এতে রাজী হচ্ছে না।

—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে একটি কো-অর্ডিনেশন আশা করা গেছিলো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের খাস জমিদারী বলে অনেকে মনে করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস যেভাবে ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছে, তাতে তাঁদের প্রতি সাধারণের ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে না কি?

—মন্ত্রিসভার কোন অনুষ্ঠানে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ হয় নি। কিন্তু স্বার্থ ও অধিকারের যে সংঘাত হলো বা হচ্ছে, তা হচ্ছে ওই ধানকাটার মাঠে বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলা কংগ্রেস যে কাণ্ডগুলি করেছেন, জানি না তাঁরা কি ভেবে করেছেন। আমরা বারবার বলেছি, আসুন আলোচনা করি। কিন্তু ওঁদের ভাবটা হলো, ভিখিরী ফেরাবার অধিকার বোমার কি আছে?

—একদিকে সারা রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষ, অন্যদিকে সমাজবিরোধীদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যকলাপ। এর ফলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে কি?

**—অবনতি হয়ত সামান্য হয়েছে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে যাঁরা অনবরত চীৎকার করছেন, তাঁরা নির্ভেজাল মিথ্যে বলছেন। এই পরিস্থিতিতে কিছুই যে করবার নেই একথা আমরা বলি না। বাইশ বছরে অনেক সমাজবিরোধীকে প্রতিপালন করা হয়েছে। তারা তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এরা আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে থেকে উদ্দেশ্য সাধন করবার প্রয়াস পাবে, এটাই স্বাভাবিক। অথচ যুক্তফ্রন্টের অন্তর্কলহের ফলে এদের দমন করার কোন যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না।**

—ধরা যাক, যদি এই সব সমাজবিরোধীরা যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের আশ্রয়পুষ্ট হতে থাকে, তা হলে এই ক্রমবর্ধমান সমাজবিরোধী বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হবার কোন পথ আপনাদের থাকবে কি?

**—সেজন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে সচেতন থাকতে হবে।**

—সংবাদপত্র খুললেই আজকাল নিত্য নতুন উত্তেজনার খবর পাওয়া যায়। কোথাও তুচ্ছ কারণে মারামারি, খুন, জখম হচ্ছে, অকারণ রেলগাড়ি থামিয়ে কোথাও রেলকর্মীদের মারপিট করা হচ্ছে, রেলের সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে, কোথাও শিক্ষক-অধ্যাপক লাঞ্ছিত হচ্ছেন, কোথাও বা প্রকাশ্য রাজপথে উন্মুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুবশক্তি আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। সাধারণভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছেন কি?

**—একে প্রবণতা বলবেন কেন? এ জিনিস গ্রামে তো ঘটছে না। যেখানে যেখানে ঘটছে, সেখানে এ-সবের পেছনে সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের সক্রিয় হাত রয়েছে। একটা সমাজ-যখন ভাঙে, তখন সমাজবিরোধী শক্তি বাড়ে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন এক বক্তৃতায় বলছেন, আমরা ক্ষুধার বিরুদ্ধে, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। কিন্তু আমাদের এখন প্রয়োজন 'ওয়ার এগেইনস্ট ক্রিমিনালস'। তা হলে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্টও সে দেশের ক্রিমিনালদের সম্পর্কে রীতিমত ভাবিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এ থেকে কি একথা বলা যায় যে, আমেরিকায় আইন-শৃঙ্খলা নেই এবং আইনভঙ্গ করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে?**

—পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন ধরে একটা মিনিফ্রন্টের কথা শোনা যাচ্ছে। সি-পি-এম'কে বাদ দিয়ে এ ধরনের কোন ফ্রন্ট-সরকার গঠন করা কি আদৌ সম্ভব?

**—সম্ভব কিনা বলা মুস্কিল। তবে অসম্ভবই বা কেন? কেরালায় তো হয়েছে। অঙ্কের হিসেবে বাংলাদেশেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। তবে কংগ্রেস সহযোগিতায় সে ধরণের ফ্রন্ট গঠিত হলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সচেতন জনগণ তা সহ্য করবে না। যুক্তফ্রন্টের বিপদ এখনো কেটে গেছে বলে মনে করি না। এই কলহই বর্তমান যুক্তফ্রন্টের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য।**

—আপনারা যে শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের কথা বলছেন, সেটা কি?

**—সেটা এই নয় যে, বর্তমান ফ্রন্টকে ভেঙে অন্য কোন বিকল্প ফ্রন্ট গঠন করা হবে। দলমতনির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করাই শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের মূল কথা। শ্রমিকশ্রেণী আজ বিভিন্ন দলের অনুগত সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্ত দলমতনির্বিশেষে যদি জমি, মজুরী, এককথায় বাঁচার দাবিতে এদের ঐক্যবদ্ধ করা যায়, তবে, সেইটাই হবে শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট। এটা যত বাড়বে, বর্তমান যুক্তফ্রন্টও তত টিকবে, যুক্তফ্রন্টকে ভাঙার প্রচেষ্টাও ব্যাহত হবে। গ্রামে উদ্ধার-করা খাস ও বেনাম জমি যদি দলমতনির্বিশেষে বণ্টন করতে পারি, তা হলে মেহনতী মানুষের সংহতি বাড়ানো যায়।**

—কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কি সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য দেয় না যে, যে দল যেখানে জমি দখল করছে সে জমি সেই দলেরই অনুগত কর্মী ও কৃষকের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে?

**—এর কারণ হলো গ্রামে সাধারণত এক স্থানে একাধিক পার্টির আধিপত্য দেখা যায় না। এক-একটা এলাকায় প্রধানত এক-একটা পার্টি আধিপত্য বিস্তার করে। তবু যার যতটুকু আধিপত্যই থাক, আমাদের নীতি হলো, দলমতনির্বিশেষে সকল সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেই জমি বণ্টন হওয়া উচিত। এটা না হলে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের চিন্তা নিরর্থক হয়ে পড়বে।**

—আজ যেখানে ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থা ভাঙনের মুখে, যেখানে কৃষক বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত, যেখানে ছাত্র ও যুবশক্তি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত, এক কথায় সমাজের সর্বস্তরে যেখানে একটা বিরাট ভাঙনের পালা চলছে, সেখানে এই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের কথা কিছুটা অবাস্তব কল্পনাবিলাস নয় কি?

**—অবাস্তব কেন হবে? দলীয় স্বার্থে আবদ্ধ না রেখে যদি জীবনসংগ্রামের যাবতীয় দাবির ভিত্তিতে এদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে ভাঙনকেও রোধ করা যায়। ভাঙনটাও কৃত্রিম।**

## শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল

### বিচার ও আইনমন্ত্রী

—আপনার চোখে যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষের কারণ কি? আপনি কি মনে করেন যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের ফলে জনমনে তার ভাবমূর্তি ম্লান হয়েছে?

**—নির্বাচনের পরে শরিক দলগুলি ধরে নিয়েছিলো যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্রপটে কংগ্রেসের আর স্থান রইলো না। এই ধারণাই তাঁদের প্ররোচিত করলো নিজেদের দলীয় প্রভাব বিস্তার করতে। কংগ্রেসের মত নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভের জন্য শুরু হলো প্রতিযোগিতা। শরিকী সংঘর্ষের এইটাই মৌলিক কারণ। এর ফলে জনমনে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তি নিশ্চয়ই ম্লান হয়েছে।**

—আপনি এই শরিকী সংঘর্ষগুলিকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলবেন কি?

**—না। এগুলি স্পষ্টতই অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ। প্রকৃত শ্রেণী-সংগ্রামের পথে কোন দল এগিয়ে যেতে চাইলে আমরা সেই দলকে সহযোগিতা করবো—এটাই আমাদের নীতি। কিন্তু এই মেহনতী মানুষের সঙ্গে মেহনতী মানুষের আত্মঘাতী লড়াইকে যাঁরা শ্রেণী-সংগ্রাম বলছেন, তাঁরা মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছেন। শ্রেণী-সংগ্রাম যদি হয়, তবে কৃষকের শ্রেণীশত্রু জোতদার বা পুঁজিপতি মহাজনের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে না, অথচ সর্বহারা কৃষকের রক্তে মাটি ভিজে ওঠে কেন? এদিক থেকে বরং নকশালপন্থীদের কর্মপদ্ধতি অনেক স্পষ্ট। হঠকারিতা তাদের যা-ই থাক না কেন, শ্রেণী-শত্রু চিনতে তারা ভুল করে নি।**

—নিম্নস্তরে যুক্তফ্রন্ট হলে কি এই সব সংঘর্ষ এড়ানো যেতো?

**—না। যতক্ষণ না দল বাড়াবার আগ্রাসী**

জনোবৃত্তির পরিবর্তন হবে, ততক্ষণ কোন কর্মটিই সার্থক হতে পারে না।

—রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টের বাইরে তো বটেই, যুক্তফ্রন্টের ভিতরে এমন কি মন্ত্রী পর্যায়েও যথেষ্ট ঝড় বয়ে গেছে। আপনার কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়েছে?

—নিশ্চয়ই হয়েছে। সমাজবিরোধীরা বিভিন্ন দলে প্রবেশ করে অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলেছে। রাজনৈতিক দলগুলিও এদের প্রশ্রয় দিচ্ছে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার কথা ভেবে।

—শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি এভাবে সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে এক বিপুল সমাজবিরোধী বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি পাবার কোন পথ তাদের সামনে থাকবে কি?

—এদেরকে যত সত্বর সম্ভব সরাতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যাঁরা এদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাঁরাও অচিরে এটা বুঝতে পারবেন।

—এদের সরানোর কথা সকলেই বলছেন। কিন্তু বস্তুত সেজন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কি?

—তা হয় নি। তবে সমস্ত দলই এ সম্পর্কে কিছু একটা যে করা দরকার তা ভাবছে।

—সমাজবিরোধীরা আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। বর্তমানে হয়ত তাদের ক্রিয়াকলাপ কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু এই সংগে আর একটা জিনিষ লক্ষণীয়। তা হলো, অতি তুচ্ছ কারণে যেখানে-সেখানে মারামারি, খুন, জখম, অকারণ রেলগাড়ি থামিয়ে রেলকর্মীদের মারপিট রেলের সম্পত্তি ধ্বংসসাধন, শিক্ষক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতার লাঞ্ছনা, এমন কি যুবশক্তির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছে। সাধারণভাবে এর মধ্যে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার প্রবণতা লক্ষ্য করছেন কি?

—বর্তমান সমাজ কাঠামোকে ছাত্রসমাজ একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করছে। এই সমাজ কাঠামোর মধ্যে মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে না। তাই ছাত্রসমাজ যত শীঘ্র সম্ভব এই সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতে চাইছে। শিক্ষক, অধ্যাপক তাঁদের প্রাচীন মডারেট দৃষ্টিভংগীর ফলে ব্যাপারটিকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন না। তাই কোথাও কোথাও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাতের মধ্যে নানা মতে বিভ্রান্ত ছাত্রদের একটি সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসাই প্রকাশিত হয়।

আর সমাজবিরোধীরা এই বাস্তব পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে চলেছে। এটা দৃঢ়ভাবে দমন না করতে পারলে সমাজের অধোগতি রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে যে কো-অর্ডিনেশন আশা করা গেছিলো তার পরিবর্তে মন্ত্রীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক অবিশ্বাসই যেন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। সরকারী দপ্তরকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা যেন নিজেদের জমিদারী বলে মনে করছেন। এরকম চলতে থাকলে জনপ্রিয় মন্ত্রীদের প্রতি জনগণের ধরণার পরিবর্তন হতে পারে না কি?

—নিশ্চয়ই পারে এবং তা হচ্ছেও। এই সংকট এড়াতে হলে দপ্তর পরিবর্তন একান্তই আবশ্যক। দপ্তরগুলি মাঝে মাঝে হস্তান্তরিত হলে কোন মন্ত্রীরই আর তাঁর দপ্তরকে নিজস্ব জমিদারী বলে মনে করবার উপায় থাকবে না।

—পশ্চিমবংগে তথাকথিত মিনিফ্রন্টের সম্ভাবনা আর আছে কি?

—রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে এসব নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। তবে মিনিফ্রন্টের কথা বর্তমানে কেউ ভাবছেন বলে মনে হয় না। রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থাটার মোকাবিলা করবার কথা সকল দলই ভাবছেন, কিন্তু এ ধরনের কোন বিকল্প সরকারের কথা নিশ্চয়ই কেউ ভাবছেন না।

—কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক দল সি· পি· এম ত' এ ধরণের একটি বিকল্প সরকার গঠনের চক্রান্তের কথা বলে আসছেন?

—ওঁরা ত অশরীরী ভূত দেখছেন।

—মানসিক বিকার এবং দুর্বলতার জন্যই মানুষ ভূত দেখে। পশ্চিমবঙ্গে সি· পি· এম কি এতই দুর্বল?

দুর্বল কি না জানি না, কিন্তু কিছুটা বিকারগ্রস্ত বটে। রাজ্য জুড়ে তাঁরা যে অন্যায় করছেন তাকে ঢাকতেই তাঁরা কথার ধূম্রজাল বিস্তার করে আত্মরক্ষা করতে চাইছেন।

—যুক্তফ্রন্টের বর্ষপূর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু ৩২-দফা কর্মসূচী কতদূর রূপায়িত হয়েছে?

—এই কর্মসূচী রূপায়ণে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিধান পরিষদ বিলোপ সমেত কিছু কিছু কাজ নিশ্চয়ই সমাধা হয়েছে। আমার দপ্তর সম্পর্কে বলতে পারি, প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই পালন করেছি বা করতে চলেছি। সামান্য যেটুকু বাকী আছে, তার জন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন ছিল। অদূর ভবিষ্যতে তাও রূপায়িত হবে।

—আপনার দলের (ফরোয়ার্ড ব্লক) নীতি নির্ধারণে মার্ক্সবাদ এবং সুভাষবাদের মধ্যে একটি সমন্বয় -সাধনের প্রচেষ্টা চলছে কি?

—না, সমন্বয় নয়, সেটা হলো, সায়েন্টিফিক সোসালিজম্ বেসড্ অন মার্কসিজম্ ইন ইন্ডিয়ান ওয়ে। আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর আমাদের অবিশ্বাস নেই। কিন্তু ভারতের অগণিত শ্রমজীবী মানুষের জাতীয় প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তার মূল্যায়ন আমরা করি না। কমিউনিস্টরা কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতাকে বড় করে দেখলো বলে ভারতের ফ্রিডম্ মুভমেন্টের বিরোধিতাও করেছিলো। আমরা চাই ভারতের জনগণের প্রয়োজন বুঝেই সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে হবে, অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে। দৃষ্টি আমাদের নিবদ্ধ রাখতে হবে ভারতবর্ষের মাটিতেই। এর সার্থকতা একদিন ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাব।

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

ভুঁড়িতে বেল্ট কষে বাঁধতে বাঁধতে বড়বাবু এসে হাজির হলো বাংলোয়—সঙ্গে দুজন এ্যাসিসটেণ্ট ও জমাদার দীনদয়াল সিং। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। মধ্যাহ্নের বিশ্রাম থেকে উঠে আসা—চোখ-মুখ প্রায় সকলেরই ফোলা ফোলা—সদ্য ঘুম থেকে উঠে-আসা মানুষকে যেমন বোকা বোকা দেখায়। সাহেবের সামনে সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিলে।

সাহেবের খাড়া প্রশ্ন: What is vour collection ? Tax আদায় কত হৈল ?

"Only Big Choudhury Sir—"

বড়বাবু হাঁকপাক করতে লাগল। এ থানায় একমাত্র মুখরক্ষা করেছে চৌধুরী-দের বড় তরফ। আর সব ফক্কিকার। একদম disloyal—বেতমিজ। তামাম অঞ্চল—

সাহেব বললে, "ম্যাপ ডেখাও।"

ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে দীনদয়াল সিং অঞ্চল-নক্সাখানা হাতে করে এনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের সামনে টেবিলের সামনে মেলে ধরলে।

ম্যাপ তো নয়—সেই পুরনো চিতা। সর্বাঙ্গে প্রায় লাল পেন্সিলের ফুটকি। বৃটিশ সিংহের এক ক্ষুদে প্রতিনিধির সামনে আড়ে-দীর্ঘে তার ফুটকি-আকীর্ণ দেহটা মেলে দিয়ে সগৌরবে বিরাজ করতে লাগল।

সাহেব একবার চোখ বুলিয়ে বললে, "ডিসটার্বড এরিয়া—আই মিন......বদমাস অঞ্চলগুলি ডেখাও।"

বড়বাবুর মুখ শুকনো—গলা কাঠ। করুণ গলায় বলল, "এন্...এন্...এনটায়ার ম্যাপ স্যার।"......

অশান্ত। গোটা নক্সাখানা অশান্ত।

সাহেব একটা 'হুম্' শব্দ করে, পাইপ ঝেড়ে পাইপ ধরালে। ততক্ষণ বড়বাবু চোরের মত দাঁড়িয়ে রইল। অপরাধ যেন তার। শুধু তারই।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে বাংলোর মাঠে চৌকিদারদের ভিড় জমে গেছে। সেপাই-সান্ত্রী খাড়া পাহারায়। দু'-একটা চৌকি-দার বাংলোর দাওয়ায় উঠে নতুন ম্যাজি-স্ট্রেটকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখেও গেছে। গুলী খেয়ে মরা ম্যাজিস্ট্রেটের পর ইনি এসেছেন। তাই কৌতূহল।

সাহেব হুকুম দিলে, "দরওয়াজা আঁটিয়া দাও।"

দীনদয়াল দরজা বন্ধ করে দিলে।

পাইপের ল্যাজটা বড়বাবুর দিকে পিস্তলের মতো নিশানা করে সাহেব বললে, "লুক হিয়ার বাবু, সরকারের ইজ্জৎ নষ্ট হইতে পারে না।"

বড়বাবু তৎপর জবাব দিলে, "ইয়েস স্যার।"

"উহাদের সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।"

"ইয়েস স্যার।"

"ট্যাক্স দিবে না! —উহাদের ক্ষতি কর। জ্বালাইয়া দাও। Turn them to beggars. ভিক্ষুক বানাইয়া দাও।"

বড়বাবু ফুসফুসে বেশ খানিক বাতাস নিয়ে ভরাট গলায় বললে, "অলরাইট স্যার।"

"অর শুন—ট্যাক্স আদায় করিতে পিউনিটিভ পুলিশ আসিবে। যেমন করিয়া পার উহাদের রসদ সংগ্রহ কর—from all the swine. I mean সকল গ্রাম-বাসী। বেশ উচিত শিক্ষা দিয়া দাও—tax or no tax."

কথা তো নয়—ফরমান।

ঘণ্টাখানেক থেকে আরও দু'-একটা গুহ্য উপদেশাদি দিয়ে সাহেব বিদায় হলো।

ভুঁড়ির ওপরে আরও কষে বেল্ট বাঁধলে বড়বাবু। হুঙ্কার দিয়ে উঠলো বাংলার মাঠে, "এ্যাটেনসান।......"

সেপাই-সান্ত্রী সার দিয়ে দাঁড়াল।

চৌকিদাররা ব্যাপার-স্যাপার না বুঝে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল—বড়বাবু সামনে যাকে পেলে তার ওপরেই লাথি ছুঁড়লে, "খাড়া হও শালা।"......

ওরা আর কবে কুচকাওয়াজ করেছে! সাহেব কি বলে গেল—কে জানে। বড় দারোগার চোটপাট দেখে ভয়ে ভয়ে যে যেখানে পারল ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে গেল। এক জায়গায় যেন ঠেলাঠেলি এবং গুঁতোগুঁতি একটু বেশি।

বড়বাবু হুঙ্কার দিলে, "এ্যাইও...... এ্যাটেনসান।"......

সেই ঠেলাঠেলির দলার মধ্যে থেকে গুঁতোগুঁতি করে সামনে বেরিয়ে এল লম্বায় সকলের মাথা ছাড়ানো......হাত কাটা ভুলু মাঝি। সকলকে হটিয়ে যেন সামনে জায়গা করে নিলে।

ওকে দেখে বড়বাবুর কপাল কুঁচকে

উঠল। দীনদয়াল সিংকে বললে, "ওই হাত-কাটাটাকে এখনো রেখেছ!"

"গরীব আদমি বড়বাবু......সেদিন বহুৎ রোতে লাগল।"

"সময় খারাপ সিংজী—এখন ওসব খোড়াচোড়ার কাজ নয়।" বড়বাবু বললে, "আজ যদি সাহেবের চোখে পড়ে যেত? কি ভাবত? এই সব লোক নিয়ে আমরা কাজ চালাই। আর এদের মাইনে যোগাতে ট্যাক্সের জন্যে আমরা তুলকালাম করতে যাচ্ছি!"

দীনদয়াল সিং চুপ।

বড়বাবু বললে, "হটাও।" তারপর চেঁচিয়ে হুকুম দিলে, "এ্যাই......তুম্ শালা হটো......হটো......!"

ভলু বড়বাবুর দিকে বোকার মতো চেয়ে বললে, "আমি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি।"

অন্য চৌকিদাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। বিরস বদনে ভলু একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল। গায়ে তেমনি নীল কোর্তা, কোমরে তকমা, ডান হাতে ধরা লম্বা লাঠি। শুধু বাঁ হাতের শূন্যগর্ভ আস্তিনটা ফুর ফুর করে বাতাসে উড়ে উড়ে যেন খেলা করছে।

বড়বাবু স্বয়ং মার্চ করে থানার দিকে এগিয়ে গেল।

"লেফ্‌ট্‌ রাইট...লেফ্‌ট্‌ রাইট।..."

এর ক'দিন বাদেই এসে পড়ল পিউ-নিটিভ পুলিশের দল। ভারতের কতক-গুলো অঞ্চল এবং অনগ্রসর উপজাতি সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গদের মন্তব্য ছিল—'ক্রিমি-নাল।' এ দলের সংগ্রহ বোধ করি সেই ভান্ডার থেকে। পুলিশ তো নয়—যেন পিরান প্যান্ট পরা নেকড়ে। দেখতে দেখতে সারা অঞ্চলে সুখ্যাতি একেবারে ছড়িয়ে পড়ল।

সেদিন সন্ধ্যার পরে জীবেন যমুনাকে বললে, "আজ চৌধুরী মশায়কে একটু খবর দিতে হবে দিদি। বড্ড জরুরী দরকার।"

গভীর রাতে সানো চৌধুরী এসে হাজির হলো।

জীবেন বললে, "কাল আপনি জেলায় যাবেন?"

"সেই রকম তো কথা আছে গোসাই। কাল গোবিন্দের মোকদ্দমার দিন। উকিল যেতে লিখেছে। কেন কে জানে!" সানো চৌধুরী বললে, "তা মুকুন্দের দায় তো গিয়ে আমাকেই সামলাতে হবে।"

জীবেন বললে, "আমার একটু কাজ আছে।"

"বলো।"

জীবেন জেলা শহরের একটা জায়গার [illegible] বললে, "[illegible]—সেখানে একটা [illegible] আছে, উপেনবাবুর দোকান—উপেন সামন্ত। তাকে এই চিঠিটা দেবেন।"

"গোসাই কি নিজের ঠিকানা দিলে? শেষকালে বিপদ ঘটবে না তো?"

"বিপদমুক্তিই চাচ্ছি।" জীবেন হেসে বললে, "চিঠির বদলে আর একটা জিনিস পাঠাতে পারতাম আপনার হাতে—কিন্তু তাতে বড্ড ঝুঁকি। সে আপনাকে দিতে পারি না। জিনিসটা বড় মূল্যবান। আমার আর প্রয়োজন না থাকলেও দলের হয়তো আছে।"

বস্তুটার নামোল্লেখ না হলেও সেটা যে কি—সানো চৌধুরীর বুঝতে বাকি রইল না। বললে, "থাক—বুঝেছি।" হেসে বললে, "এ বয়সে আর ওই বস্তু নিয়ে ধরা পড়তে চাই না।" একটু থেমে গভীর গলায় আবার বললে, "প্রতাপ থাকলে হয়তো বলতো—বাবা ভীরু। যাক—এ চিঠিই ভালো। থানাতল্লাসের গেরোয় পড়লে নষ্ট করেও ফেলতে পারবো। না কি?"

"সে আর বলতে।" জীবেন হেসে বললে, "যাদের দরদ গভীর তারাই ওকে সযত্নে পার করে নিয়ে যাবে।"

সানো চৌধুরী গলা খাট করে বললে, "তা বস্তুটা রেখেছ কোথায়! এই ঘরে?"

জীবেন নিঃশব্দে হেসে বললে, "রেখেছে যমুনা দিদি।"

সানো চৌধুরী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যমুনার দিকে তাকাল।

যমুনা বললে, "হাঁড়ির ভিতরে মাটির তলায়।"

"বাস্!" সানো চৌধুরী উঠতে উঠতে বললে, "পিটুনী পুলিশ এসে ঘাঁটি গেড়েছে কি-না। তাই বলছিলাম।"

"আমিও তাই ভারমুক্ত হতে চাচ্ছি।" জীবেন বললে, "দেখেশুনে মনে হচ্ছে লড়াইটা জমবে ভালো। যদি ধরাই পড়ি—মূল্যবান বস্তুটা এই চরের খালপাড়ে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে। কারুর কাজেই লাগবে না।"

সানো চৌধুরী কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের জমাট অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ পঁচিশ ॥

বড়বাবুর এক নম্বর সহকারী মতি-লাল সাহা বড়বাবুর টেবিলে একটা লিস্ট ফেলে দিয়ে বললে, "এই দেখুন—ইউনিয়ন-গুলো থেকে প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎবাবুরা আপনার এই সব নামগুলো পাঠিয়ে দিয়ে কর্তব্য খালাস করেছে।"

বড়বাবু নামের লিস্ট দেখতে দেখতে গম্ভীর গলায় বললে, "কেউ এলো না?"

"থানার ত্রিসীমানায় ভিড়লে না।" মতিলাল বললে, "সবাই একটা-না-একটা অজুহাত দিয়েছে।"

"কাউয়ার্ডস!" মন্তব্য করে বড়বাবু বললে, "এ আমি আগেই জানতাম। অথচ এদেরই সাহায্য ছাড়া আমরাও অচল। এদিকে ওপরের কড়া নির্দেশ"—

মতিলাল বললে, "সেই নির্দেশ মতো শুধু ওই লিস্টের নাম কটা পেয়েছি। ছোট-বড় করে ওই ক'জন জোতদার—আর সম্পন্ন গেরস্থ।"

বড়বাবু বললে, "কিন্তু তাদের ঘর-গুলো আমরা চিনবো কি করে—চেনাবে কে?"

মতিলাল বললে, "এক প্রেসিডেন্টবাবু তো মুখের ওপরে সেদিন বলেই দিলে—'গ্রামে থেকে চালার গায় চালা লাগিয়ে ওই কাজটি পারবো না। গুণ্ডিসুদ্ধ পুড়িয়ে মেরে ফেলবে মশায়।' এর পর আর বলবো কি স্যার?"

"তো বোঝ—ওঁরাই যদি ভয় পান তো চৌকিদারদের দিয়ে কি হবে! তারা ঘর চেনাবে?" বড়বাবু হতাশ চোখে চেয়ে রইল।

"তারা থানায় আসা প্রায় বন্ধ করেছে স্যার।"

"তবে?"

ওপরের নির্দেশ মতো লিস্ট তৈরী, পিটুনী বাহিনী এ্যাকসনের জন্যে তাল ঠুকছে, পরিকল্পনা সুসম্পন্ন—শুধু অভাব চিনৎদারের। পরিকল্পনা মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ঘরগুলো চেনাবে কে?

এদিকে ওপরের কড়া নির্দেশ—স্টার্ট এ্যাকসন। এই মুহূর্তে ছুটিয়ে দাও হন্যে কুকুর।

মতিলাল বললে, "নতুন দলের মধ্যে ওই যে এক ছোকরা আছে—এ-এস-আই র‍্যাঙ্কে, স্পেশাল দারোগা হয়ে এসেছে—ছোকরা খুব দড় স্যার।"

"নলিনী রাহা?"

"তাই বোধ হয় নাম। খুব কম্পি-ট্যান্ট।"

"আর কম্পিট্যান্ট।"...

বড়বাবু হতাশার অথৈ সমুদ্রে ভাসতে লাগল।

দীনদয়াল সিং শেষ পর্যন্ত এক মতলব নিয়ে এল। যেন বয়া এগিয়ে দিলে বড়বাবুর সামনে। বললে, "হামার একঠো মতলব লিন বড়বাবু।"

"কি মতলব?"

"ভলু মাঝিকে চিনৎদার করিয়ে লিন।"

"সেই হাতকাটা!"

"হাঁ বড়বাবু। শালার নোকরি যাবে বলে মন খারাপ করে ঘুর ঘুর করছে।"

বড়বাবু চোখ বুজে [illegible] করে গল্

নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তার কাছে ক মণ আলু খেয়েছ দীনদয়াল?"

সিংজী বললে—এ সেই আগলি সালের কথা; শালা শিউনারায়ণ চুকলি করেছে। ঘন ঘন মাথা নাড়া দিতে দিতে বললে, "ইয়ে বড়বাবু—এক সের ভি নেহি। গরীবের নোকরিটা চলে যাবে! তার ডাহিন হাথটাই চলিয়ে গেল—এতদিন থানার কাম করলো।......তাই বলছিলম। অথচ হামাদের কাজে সে লাগতে পারে।"...

বড়বাবু বললে, "তার মানে তুমি তাকে চৌকিদারীতে লাগিয়ে রাখতে চাও? ওই ডান হাত কাটা"—

"না না বড়বাবু। শালার কোর্তা কাড়িয়ে লিব না!" সিংজী বললে, "ও হোবে চিনৎদার।"

"তনখা?"

"লুটের মাল।"

"হুম্।"—

খানিক চুপ থেকে বড়বাবু আবার ভারি গলায় বললে, "হুঁশিয়ার সিংজী। মোদ্দা কথা চৌকিদারীতে ওকে রেখ না। ওই যে পিটুনীর দলে কে একটা রাহা এসেছে—সে মহা ধড়িবাজ, আমাদের ওপরেও তার চোখ। ওপরে একটা খোঁচা লাগিয়ে দেবে তো—ব্যস।"...চোখের খোঁচা দিয়ে বড়বাবু পরিণামটা বুঝিয়ে দিলে।

সিংজী নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

বড়বাবু শেষ সিদ্ধান্ত করলে, "তবে ভিড়িয়ে দাও ওকে রাহার কাছে। পনেরো দিনের মধ্যে ওপরে অ্যাকসনের রিপোর্ট দিতে হবে।"

সিংজীর প্রস্তাব শুনে ভজু মাঝি হতাশার দরিয়ায় যেন একটা অবলম্বন পেল। থানার গায়ে লেগে থাকা তার একটা নোকরি চাই—বুকের জ্বালা মেটাবার শান্তি চাই, প্রতিশোধ চাই।

সিংজীর পা চেপে ধরে বললে, "তুমি মোকে প্রাণ দিলে সিংজী। না হলে ঠিক করেছিলম—থানাও ছুটি দিবে আর আমিও গাঙে ঝাঁপ দিয়ে জ্বালা জুড়াব। এ হাতকাটা জীবন রেখে লাভ কি জমাদারজী!" করুণ সস্নেহ চোখে কাটা হাতটার দিকে চেয়ে চেয়ে সক্ষোভে ভজু বললে, "গেল তো গেল—মোর ডান হাত—মোর কাজের হাতটা চলে গেল সিংজী।"

ওর চোখেও জল আসে।...

কাজের বার। ফালতু। শুধু তাই নয়—আরও গভীরে তার ছিঁড়ে গেছে জীবনের গ্রন্থি। এই দেশ—এই গ্রাম—এই চরের জমাট জীবন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে অনেক আগে। পরিত্যক্ত। জঞ্জাল।

এবং থানা তাকে কাজে লাগিয়ে নিলে।

বাঁ হাতে বুক ঠুকে নির্বোধ ভজু বললে, "এতদিন থানায় নিমক খেয়েছি—আমি হারামি করতে পারব না সিংজী। দেখে নিও।"

একটা পরিত্যক্ত মানুষের বাড়বানল তার চোখে—তার বুকে—তার সর্বাঙ্গে। জ্বলছে।

আর দিনগুলো বড় ভারি। যেন গুমোটে ভরা।

বেশ কয়েকটা পরগণা ইউনিয়ান নিয়ে এক-একটা বিশাল থানা এলাকা। বরিং যোগাযোগের কোনো সুবিধে নেই—যান্ত্রিক যোগাযোগের রাস্তা নেই। এক প্রান্তের খবর আর এক প্রান্তে পৌঁছতে পৌঁছতে ঢের কান্ড ঘটে যায়। বোধ করি সেই অসুবিধের দিকে চোখ রেখে নতুন নতুন ফাঁড়ি গজিয়ে উঠল এখানে-ওখানে। পিটুনী পুলিশের ফাঁড়ি। সারা মহকুমাকে যেন জাল পেতে চেপে ধরা।

ফাঁড়ি যেখানে বসলো—সেইখান থেকে শুরু হয়ে গেল সেই প্রত্যাশিত 'এ্যাকসন।' ছোট-বড় জোতদার গেরস্থের কাছে প্রথমে গেল চিঠি—'রসদ জোগাও।' কোনো উত্তর এল না। শুরু হলো জবরদস্তি সংগ্রহ। একেবারে নিচের তলা থেকে। জোর করে ধরে নিয়ে গেল চাষার হাঁস মুরগী ছাগল।

"ই তো ভারি মশকিল হলো সানো কর্তা।" মহেশ বললে, "বোধ হয় পিটনী-গুলান হিন্দু—গোরুটা ধরে টানছে না। হাঁস মুরগী ছাগল তো কদিনে শেষ করে দিল।"

সানো চৌধুরী বললে, "ঝটপট বেচে শেষ করে দে।"

কিন্তু সময় খারাপ। হাটে-বাজারে ওসব কেউ কেনে না।

সানো চৌধুরী বললে, "নিজেরা খা। আর যা না খাবি—দে সব জালপাই জঙ্গলে তাড়িয়ে।"

দেখতে দেখতে গ্রাম চরের গৃহপালিত পশুপাখী ফাঁকা হয়ে গেল।

তখনো মানুষজনের ওপরে হাত পড়ে নি।

আগের অভিজ্ঞতার ঘা দগ দগ করছে সকলের মনে। সকলেরই অনুমান—বুনো হাতীর পাল এখনো নামে নি। নামবে। কোথায় নামবে, কেউ জানে না।

তবু এবারের লড়াইয়ের মহড়া অন্য রকম। হৈ-হাল্লা নেই—পিকেটিং নেই, থেকে থেকে ভলান্টিয়ারদের আকাশ ফাটানো ধ্বনি নেই, মিছিল নেই। তবু লড়াই আছে। প্রতিটি কুঁড়ে থেকে পাকা বাড়ি আট তলা পর্যন্ত।—সর্বত্র একটা চাপা প্রতিরোধ—নীরব অস্বীকার: না।

দিনগুলো নিঃসাড়। রাতগুলো নিস্তব্ধ। গ্রাম চরের নিত্যকর্মপ্রবাহের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে বেঁধে শুধু প্রত্যাসন্ন আঘাতের ছায়া।

একদিন আঘাত এল।

ডাক্তারখানায় আজকাল রোগীরও ভিড় নেই সন্ধ্যের পরে। কম্পাউন্ডারবাবু তাড়াতাড়িই চলে যায়। বসে বসে গল্প-গুজব করে ডাক্তার আর সানো চৌধুরী।

তখনো রাত বেশি একটা হয় নি। হঠাৎ সেদিন ভারি বুটের শব্দ তুলে ডাক্তারখানার সামনে দিয়ে চলে গেল পিটুনী পুলিশের একটা দল।

সানো চৌধুরী উঁকি মেরে দেখে চাপা গলায় বললে, "সামনে কে? হাতকাটা না?"

"তাইত মনে হলো।" ডাক্তার অন্ধকারে অদৃশ্য দলটার দিকে চেয়ে রইল।

অন্ধকারে অদৃশ্য দলটা থেকে হঠাৎ তীব্র একটা টর্চের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

কে জানে ওটা কোনো ইসারা কি না। দেখতে দেখতে মনে হলো আর একটা দল আসছে। অপেক্ষাকৃত ছোট। দূরে অন্ধকারে যেন অপেক্ষা করছিল।

তারা গটমট করে এসে ঢুকলো সোজা ডাক্তারখানায়।

ওদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল একজন। বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, "আপনাদের দুজনকে অ্যারেস্ট করলাম।"

"অপরাধ?" সানো চৌধুরী কথা বলে উঠল।

"অপরাধ কতদিন ঢাকবেন চৌধুরী-মশায়?"

একটা অপরিচিত লোকের মুখে নিজের নাম শুনে সানো চৌধুরী বললে, "নামটাও জানেন না দেখচি। চৌধুরীমশাই উনি।" ডাক্তারকে দেখিয়ে দিলে।

অপরিচিত মুখ বললে, "উনি ডাক্তার জগৎ মিশ্র, নিবারণ মিশ্রের বাবা—সে আমি জানি। আপনাদের অপরাধ কোর্টেই প্রমাণিত হবে। চলুন।"

ডাক্তার শুধু বললে, "চলো সানো কর্তা, এবার ছেলেদের ডাক এসে গেছে। কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই।" বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হাসতে লাগল।

[ক্রমশ]

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

॥ পনের ॥

সাঁকোর ওপর বসে বসে বিকেল দেখছি। এখানে না এলে এমন করে বিকেল দেখা হত না। আমাকে এখুনি যদি কেউ জিগ্যেস করেন, 'এখানে কি করছেন একা একা?' আমি অসংকোচে বলে দোব, 'বিকেল দেখছি।' আমি যে শহরে থাকি সেখান থেকে আমাকে কলকাতায় পড়তে যেতে হত। ফেরার পথে ঊর্ধশ্বাসে ট্রাম ধরে ট্রেনে চাপতে হত। মাথার ওপর ইলেকট্রিকের তারে একটা আস্ত বিকেল ঝুলে থাকলেও বিকেলের দিকে তাকাবার উপায় ছিলো না। আমার মাথায় এখন ট্রাম, বাস, ট্রেন, এরা কিলবিল করছে। বিকেল দেখবো কি, আমি ত' পাগল হই নি। ট্রেন ছেড়েছে কি ছাড়েনি, দু'-চার মিনিট আসতে-না-আসতেই, ঐ যে সেই জায়গাটা, যেখানে সর্বদাই দু'-চারটি খালি ইঞ্জিন, আমি যখনই যাই না কেন, দেখতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় সাদা সাদা বাষ্প, নয়তো ভীষণ কালো, কালো, প্যাঁচানো, প্যাঁচানো ধোঁয়া ওগ্‌রাচ্ছে। সেই কালো, আর সাদা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম কে যেন বিকেলকে ছুরিকাহত করেছে, আকাশের গায়ে এখানে ওখানে রক্তের একটু একটু ছোপ। হায়! সে ছোপও লাল টকটকে নয়, বাসি, বর্ণহীন রক্তের ছোপ, আর সংগে সংগে মন খারাপ হয়ে যেত এই ভেবে যে এই শীর্ণ, পাণ্ডুর, অসুস্থ বিকেল, তাও দেখতে পেতাম না, কেননা গাড়ি আর দু'-এক মিনিট যেতে না যেতেই ও রক্ত আলোও নিভে যেত, বুকের ভেতরটা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতো, সমস্ত মনটা বিকেল বিকেল করে উঠতো। এ বেদনার ব্যথা এতোদিন চাপা ছিল। বিকেলের জন্যে মনটা একটু ব্যথা ব্যথা করা আমি তারপর অনেকদিন ভুলেছিলাম। আজ কতোদিন পর এখানে এসে এই বাঁকানো ভুরুর মত সাঁকোতে বসে বিকেলের জন্যে সেই পুরোন ব্যথাটা টের পাচ্ছি আর বুকের ভেতরটা কিরকম যেন করছে, টনটন টনটন! লক্ষ্য করে করে বুঝেছি এখানে সকালও প্রকাণ্ড, দুপুরও প্রকাণ্ড, বিকেল আর রাত্রিও, এরাও প্রকাণ্ড। শহরে থাকলে মনে হয় যেটুকু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, বিকেলটা বুঝি সেইটুকু জায়গার। কিন্তু এখানে সাঁকোর ওপর বসে বিকেল সম্বন্ধে আমার পুরোন ধারণাটা যেতে বসেছে। এখান থেকে যতোদূর চোখ যায়, শুধু দেখছি বিকেল। এ বিকেলের যেন শেষ নেই। এই সাঁকোর ওপর দুপুর ছাড়িয়ে চলে এসেছি সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে, যেখানে শুধু বিকেল। নিকোনো উঠোনের মত একেবারে মাজাঘসা আকাশ। দূরে, কাছে এক-আধটা জলহারা সাদা মেঘ টহল দিয়ে ফিরছে খুশিমুখে। বাদ-বাকিটা শুধু নীল, অফুরন্ত নীল। এখান থেকে প্রায় তিরিশ হাত নিচে ঐ তির-তির করে বয়ে যায় মেয়ে নদী। চওড়ায় হাত দশেকও হবে না। খানিকটা আবার মরে-হেজে গেছে। পুড়ে যাওয়া সনাগুলোর গায়ে কাল-সিটের দাগ পড়েছে। কিন্তু তবু কালচে, সাদা থোকা থোকা ফুল গেঁয়ো নদীর বুক আলো করে ফুটে আছে। অদূরে সবুজের শীষ ছড়ানো মাঠ। তার শেষ দেখা যায় না। কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে জানি না কিন্তু একেবারে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

এ পাশে ভাঙা, ফেটে রাস্তার ওপর দিয়ে টিকিয়ে টিকিয়ে, ধুঁকে ধুঁকিয়ে ঘরমুখো ফিরছে গরুর গাড়ি। কোথা থেকে ভেসে আসছে হেঁড়ে, চাষাড়ে গলার গান, 'এ এ এ কুল মজালি, কালি দিলি, কুলেতে কলংকিনী', আর শোনা যায় না, যা মুখর বাতাস, ঐ, ঐ আবার, 'জল করে জল আনতে যাওয়া, ঠাটের কথা ঘাটের কাছে'......বাজাও আমাকে বাজাও। আমার নিজেরও একটা বলার কথা ছিলো। এতোদিন আমি জানতাম না। আমার নিজেরও কিছু কিছু সুর ছিলো। আমি সেসব জানতাম না। আজ এই ছায়া-ভাসানো বিকেল এসব কথা আমাকে জানিয়ে দিলে। এই বিকেল আমাকে বাজিয়ে দিলে। কোথায় ছিলাম আমি মুখ থুবড়ে বাসি, বিবর্ণ এক শহরে। ভাগ্যিস এখানে এলাম। এসে বিকেল কাকে বলে নিজের চোখে দেখতে পেল্যম। এরকম সময় আমি ত' জানি শহরে থাকলে কি করতাম, কোথায় যেতাম। সেই যে সেই নোংরা চায়ের দোকানটা আমাদের গলি থেকে বেরোতেই, যার সামনে অষ্টপ্রহর হতচ্ছাড়া, ক্ষেপ গড়ানের বিশ্রী বাস হর্ন বাজাতে বাজাতে চলেছে, যার ভেতরে ঢুকেছে রাস্তার যতো রাজ্যের ধুলো, এরকম সময়, কোথায় আর যাবো, ঢুকতাম সেই চায়ের দোকান-টাতেই। সেখানে কাপে, কেটলিতে, গেলাসে চামচেতে সব সময় ঝন ঝন ঝন ঝন শব্দ। দিনের বেলাতেও সেই ধুলোমাখা, ঝুলন্ত ভুতুড়ে পঁচিশ পাওয়ারের বিবর্ণ আলো। আর 'আমার কেকের মাথা চাই', 'চুপ শালা, মারবে মুখে তিন জুতো, খদ্দেরের সংগে মুখে মুখে একবার', 'মালফাল আছে লুকোলে সুকোনো', এই সব অসাধারণ দরকারী, রসহীন কথা।

এ যদি না করি তবে হিন্দি সিনেমার সদর দরজা দিয়ে সোজা

ভেতরে ঢুকে খানিকটা আদিম রিপুর চর্চা করে আসা আর মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের জন্যে হাতব্যাগে বোমা লুকিয়ে নিয়ে সিনেমার পর্দা ফাটিয়ে কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করা, এ'ত আছেই।

অথবা যে যার পার্টি অফিসে বসে বসে বড়ো বড়ো রাজা-উজীর মারা, মাও সে-তুঙ এই বলেছেন, স্তালিন এই বলেছেন, নেতাজী এই বলেছেন, বড় বড় কোটেশন আওড়ানো, আর পাশের কারখানায় যখন লক-আউট হয়, ছাঁটাই হয় তখন পরিষ্কার, নক্সাদার পাঞ্জাবী আর পায়ের পাতা ডোবানো ধবধবে পায়জামা পরে সেজেগুজে, মুখে ক্রীম মেখে, ভালো করে খেয়ে, ঘুমিয়ে গাল ফুলিয়ে যেখানে ১৪৪ ধারা জারী করা নেই, অনেক নিরাপদ, অনেক ঠান্ডা জায়গা, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের চোঁয়া ঢেকুর তুলি আর যে যার পার্টিকে গালাগাল দিই, পার্টির কোন প্রোগ্রাম নেই, কোন গোল্ নেই, কোন মিশন নেই, নেতারা খালি আদ্দি উড়িয়ে রঙ্গি বক্তৃতার মধ্যে ডুবে আছে, এই সব করি আর কী।

অনেকদিনের পর এই নতুন বিকেলটা এসবের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু তাহলেও চায়ের তেষ্টাটা ভেতরে ভেতরে আমাকে টানছে যে। তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে। এ ত' শুধু ধু-ধু করছে মাঠ, আশেপাশে হু হু করছে বন, এর মধ্যে চায়ের দোকান? না, অসম্ভব নয়। আমি ট্রানজিস্টারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ঐ বনঝোপটা পেরোলেই বোধ হয় পাওয়া যাবে, কেননা রেডিওর হিন্দী গানের কলি, আমার চেনাজানা দু'-একটা দিল আর মহব্বতের গানের টুকরো কানে আসছে। অদ্ভুত। মাথার ওপর অঢেল আকাশ, এই অন্ত-হীন বিশাল বিকেল, এক গলা বন, এখানে বাজছে ট্রানজিস্টার। তাও হিন্দী গানের কলি, এখানে ঐসব কেন?

ঠিক। যা ভেবেছি তাই। চায়ের দোকানই বটে। তবে আর্সি ফিটকরা, সিনেমার পরী আঁকা, ক্যালেন্ডার ওড়ানো চায়ের দোকান নয়। সে উপায়ও নেই। সবটাই খোলামেলা। দুদিক দিয়ে ঢোকা যায়। চেরা বাঁশের বেড়া। চারটে খুঁটির ওপর দাঁড়ানো একটা টালির ছাউনি। এক কাপ চা চেয়ে যার পাশে বসলাম, সে লোকটার চেহারা দেখার মত। লোকটাকে অসুর বললে কম বলা হয়। এমন ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা বড় একটা দেখা যায় না। মাথার চুলগুলোতে কদম ছাঁট। চোখ দু'টো করমচার মত লাল। কথা বলতে নাকের নীচে গোঁফ জোড়াটার দু'টি প্রান্ত বেশ যত্ন করে মোচড়ানো। এক-মুখ দাড়ি। পরনের কাপড়খানা অসম্ভব ময়লা, বোধ হয় সারা বছর একদিনও না কেচে ঐ কাপড়টাই পরে আসছে। জামাটা কিন্তু মোটামুটি ফর্সা। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে ধেনোর গন্ধ বেরোচ্ছে। মাছি উড়ছে মুখের চারপাশে। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম লোকটার বুক পকেট অসম্ভব ঠেলে উঠেছে। চা খেয়ে লোকটা উঠে দাঁড়ালো। পা দু'টো তখনো তার টলছে। বুক পকেটে হাত দিয়ে বার করলো তিনশো কি চারশো টাকার একটা বান্ডিল। তার থেকে একটা ময়লা নোট খুঁজে খুঁজে বার করে দোকানীর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে, আমার মুখের কাছে মুখ এনে, 'লোতুন মনে হচ্ছে' বলে টলতে টলতে লোকটা চলে গেল। এসবে আমার কিছু বলার নেই। বরং আমি কৌতুক বোধ করি। কিন্তু লোকটার চেহারা আর সাজ-পোষাক আমাকে ভাবিয়ে তুলল। সাধারণত চাষী-দের গেঁজেতে টাকা থাকে। অমন বুক-পকেটে টাকার বান্ডিল থাকে না। তা ছাড়া লোকটার মেজাজও ঠিক চাষীর মত নয়। একটু উগ্র ধরনের। চাষীরা উটকো লোকের কাছে মুখ এনে 'লোতুন মনে হচ্ছে' বলে না। খুব বিনীত, নম্র একটি ভংগি আছে বাংলাদেশের চাষীর। ওরই মধ্যে একটু সাধু আর ভদ্র করে তোলে ভাষাটাকে। বেশ শুনতেও আরাম লাগে। 'কোথা থেকে আসছেন?' অথবা 'মহাশয়ের নিবাস' একজন থাকলেও 'আপনারা' দিয়ে জিগ্যেস করে, যেমন, 'আপনারা?' যদি বলি 'ব্রাহ্মণ', 'আরে বাপ, ভেতরে এসে বসুন। একটু জল-বাতাসা খান।' এ লোকটা কে? চাষী নয়। শহরের লোকও নয়, ওপরে শহরের চটক; কিন্তু ভেতরটা বুনো। বুক পকেটে অতোগুলো টাকা! যেভাবে ঠেলে উঠেছিলো তাতে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, অথচ, তেমন কোন সাবধানতা নেই। যেন, যার ইচ্ছে সে দেখে যেতে পারো। আমি হেঁজি-পেঁজি লোক নই হে। বান্ডিল বান্ডিল নোট নিয়ে ফিরি। পিঁপড়ের পেছন দিক টিপে রস খাই না, ভাবখানি এ রকম।

চা খেয়ে আবার সাঁকোর ধারে গিয়ে বসলাম। রাম আদকের কথা ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম। ও আমাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে কোশ তিনেক দূরের গ্রামে। ওখানে সমিতির লোকেরা কি রকম কাজ করছে দেখাবার জন্যে।

বসে আছি। সামনে দিয়ে রিক্সায় কলার কাঁদির পাহাড় চলেছে। এ অঞ্চল-বলে আলাদা একটা হাটও বসে, আর সেখানে শুধু বিক্রী হয় কাঁচা আর পাকা কলা। যাদের ভুঁই বলতে কিছু নেই তাদের ঐ একটাই অবলম্বন। না। ঠিক বলা হল না। আমের বাগানও রয়েছে বড় বড় এ অঞ্চলে। সেখানেও আমের সিজিনে জমিহারারা মজুর খাটে। এই সব কলার কাঁদি বোঝাই রিক্সা যাচ্ছে এখান থেকে কোশ চারেক দূরে জংশন স্টেশনে। ওখানে সারা মোকামের ছত্রিশ জাতের ফড়েদের আড়তদারদের ভীড়।

আরো খানিক পরে যখন অন্ধকার প্রায় নাবো নাবো, রাম আদক এসে বসলো পাশে।

'খুব দেরি হয়ে গেল কমরেড। চলুন।'

এই সব 'কমরেড' 'টমরেড', আমার ও সব অভ্যেস নেই। কেউ আমাকে ও রকমভাবে সম্বোধনও করে না। কোন বিশেষ পার্টি মহলে নিজেদের মধ্যে ঐ সম্বোধনটা চলতে আমি শুনেছি, কিন্তু আমাকে 'কমরেড' এ যাবৎ কেউ বলে নি, বলার কোন কারণ নেই বলেই।

আমি একটু অবাক হয়েই রাম আদকের মুখের দিকে তাকালাম। সকাল-দুপুর এখানে বেশ তেতে থাকে। কিন্তু শেষ বিকেল থেকে আবহাওয়াটা একটু অন্য-রকম লাগে। বাতাসে ঠান্ডা আমেজ। মাঝে মাঝে একটু-আধটু যে শির শির করে না তা নয়। ওকে দেখলাম কাপড়ের খুঁটটাকে খালি শক্ত, শক্ত পাথুরে কালো চেহারাটার গায়ে জড়িয়েছে। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত তোলা আধময়লা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা। কাঁধে একখানি লাল গামছা।

মুখে কমরেড সম্বোধন, কাঁধের গামছাখানি লাল, এর কি কোন যোগা-যোগ নেই? থাক। এই সব গ্রামের লোক, এমনিতে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। কিন্তু কখন যে এদের কোথায় লেগে যায় তা অনেক সময় বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে খুব সাবধানে কথা বলতে হয়। 'তোমার কি জাত?' একবার একজনকে জিগ্যেস করাতে সে মাথা চুলকে উত্তর দিয়েছিল, 'আজ্ঞে, আগুরি।' অর্থাৎ উগ্র ক্ষত্রিয়। আমি কিছু না ভেবেই মানে ক্ষত্রিয়ের সামনে উগ্র কথাটা থাকার দরুণ ওকে একটা শস্তা বাহাবা দেবার জন্যে বলেছিলাম, 'উগ্র ক্ষত্রিয় ত' বেশ ভালো। বেশ একটু 'বীর বীর' ভাব আছে,। সে এ কথার কোন জবাব দেয় নি। সারা পথ আমার সংগে নিজে থেকে কোন কথা কয় নি, যে কথাটা আমি জিগ্যেস করছি কেবলমাত্র তার উত্তর দিয়েছে দায়সারা-ভাবে। বোঝাতেও ছাড়ে নি যে, সে বেশ একটু চটেছে। পরে একজনকে জিগ্যেস

জানে। দেশের বীর। যে আর ধরে ধরে সকলের সামনে জুতো পেটায় তার জমি ভাগে পাবার জন্যে, যাকে সেই বাবুরই পা বেগারে টিপে দিতে হয় তাকে বীর বলা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা নয় কি?' অথচ এ সব কিছু ভেবে কথাটা আমি বলি নি।

সুতরাং মুখে কমরেড সম্বোধন আর কাঁধের গামছা এ সবের মধ্যে আর যোগসূত্র আমি না-ই খুঁজলাম।

রাম আদকের মুখে 'কমরেড' সম্বোধনে অবাক হবার দিন আমার গেছে। গ্রাম অঞ্চলে এ সম্বোধনটা এখন বিশেষ গৌরববাচক। এরা এ শব্দটার মানেও জানে। কিন্তু যে কথাটা বলছিলাম, আমার এ সব শব্দ শুনে অবাক না হবার কথা।

দিন দশেক আগে একজনের বাড়িতে খাবার বন্দোবস্ত হয়েছিলো। লোকটি মোটামুটি সম্পন্ন চাষী। ধান জমি যা আছে বেশি না হলেও সারা বছর ধান কিনে খেতে হয় না। আর তা ছাড়া

বাগান-টাগান মিলিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বিঘে মত জায়গা। তাতে কলাতে, আমেতে নেহাৎ উপায় কম না। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ভালোই হবার কথা। গোয়ালে দুধেল গরু রয়েছে গুটি তিনেক। পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আমার কেমন জিদ ধরে গেল। আমি যাঁদের হেপাজতে ছিলাম অর্থাৎ যাঁরা আমাকে গ্রাম চেনাতে সাহায্য করছিলেন তাঁদের আমি বললাম, 'একজন কিষেণের ঘরে আমাকে রাত্রে খাবার বন্দোবস্ত করে দিন। ওরা কি দিয়ে ভাত খায় আমি তা দেখবো।'

'আরে মশাই, দেখবেন আর কি? ওরা ভাতই খায় না।'

'তবে খায় কি?'

'খাবে আবার কি? ঘণ্টা। সকালে বাসি রুটি দু-তিনটি যার জুটলো ওদের মধ্যে সে বেটা ভাগ্যবান। ঐ রুটি আর চা, চা না বলে চায়ের অরুচি বলতে পারেন, দুধ-ফুধের বালাই নেই, ভেলি গুড় মেশানো খানিকটা কালসিটে রঙের পদার্থ, তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাওয়া। তার পর চষ্য তেতপুর বেলা পর্যন্ত পাট-কাচা হাতা দিয়ে বাগানের মাটি কুপানো। দুটো নাগাদ 'জলপান' মানে কোঁচড়ভর্তি মুড়ি কাউ কাউ করে চিবিয়ে চোয়াল শক্ত করা। কিষেণ খাটলেই যে বাবু সংগে সংগে টাকাটা দিয়ে দেবেন, বাবুদের সে চরিত্রই নয়। সব টাকাটা দেয়ও না। হাতে রেখে দেয় কিছু কিছু। পাছে কাজ থেকে ছুটিয়ে দেয়। কেননা কাজেরই যা অভাব কাজের লোকের ত' অভাব নেই, সেইজন্যে বাকি টাকাটা আর চাইতে পারে না। বাবুও কিষেণের সে দুর্বলতাটুকু জানে। আর যদি পুরো টাকাটা পায়, দু'তিন টাকার বেশি নয়; সেটা নিয়ে দোকান থেকে চাল—বেশির ভাগ দিন আটা কিনে নিয়ে যায়। ও ঘরে গেলে তবে চুলো ধরবে। খাওয়া হবে আসলে ঐ একবার। বাড়ির বৌ-ঝিরাও অবশ্য বসে থাকে না। ওদের পুরুষের মুরোদ ত' ওদের জানাই আছে। পাশের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরে বা বিলের জলে নেমে পড়ে। পরের বাগানে পড়েথাকা কলাগাছ চিরে থোড় বার করে নেয়। দু'-চারটে কলাও কেটে নেয় সুবিধে পেলে। পুকুরের ধার থেকে শাক-পাতারি কুড়িয়ে, গেরো বেঁধে পাশের হাটে চলে যায় ওগুলো বেচতে, কখনো কখনো কাঁকড়ার গর্তেও হাত ঢুকিয়ে দেয়—সাপে কামড়াতে পারে জেনেও।

'সাপে কামড়াবে জেনেও হাত দেয় কেন?'

আমার এই নির্বোধ সরলতায় মৃদু হাসা ছাড়া উপায় নেই। যিনি বলছিলেন তিনি একটু হাসলেন, কিছু বল্লেন না।

এ সব শোনার পরও গিয়েছিলাম। গিয়ে একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হল। গ্রামের একেবারে শেষের দিকে, যেদিকটায় শুধু বাঁশবন আর বাঁশবন, সেখানে একটা জীর্ণ, পরিত্যক্ত, ফাটল-ধরা ভিটে। ভিটেটার মুখেই একটা অতল খাদ, অন্ধকারে তাই মনে হচ্ছিলো, আসলে একটা শুকনো পুকুর। গ্রামের একটা হতচ্ছাড়া, ঘিয়েভাজা কুকুর আমার পেছন পেছন এসে আমাকে ওখানে পেঁৗছে দিয়ে গেল।

এমনি অন্যদিন ওরা অন্ধকারেই থাকে। নিজেদেরই একটা তালের গাছ আছে। সেখানে নিজেদেরই পাতা হাঁড়ি। সন্ধ্যের ঝোঁকে একটু তালের রস না খেলে গা-গতরের ব্যথা মরে না। সেটা খেতে হয়। কিছুদিন আগেও তালের রস খেয়ে ঝিম মেরে পড়ে থাকতো দুখে বাউরী। এখন অবশ্য রণপায়ে এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরছে পতাকা নিয়ে। সে যাক। কথা-টথা আর কি বলবে ওরা। ওদের কথা-টথাও বেশি নেই। অনেক কথা, মানে, প্রায় সব কথাই বোঝে, কিন্তু শব্দগুলো ওদের ঠিক ঠিক জানা নেই। তা ছাড়া জিভ আর দাঁত আর হাতের সংগে যে সব কথার সম্পর্ক সেটুকু জানলেই যথেষ্ট। প্রত্যেকটা দিন ওদের শুধু ভাবতে হয় খাওয়ার ব্যাপারটা। সব সময় ঐ চিন্তা-তেই আচ্ছন্ন। রোগ-ভোগকে বেশি কেয়ার করে না। ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একটার বেশি দুটো কাপড় অনেক দূরের স্বপ্ন। বেশির ভাগ সময় সন্ধ্যের পর, অন্ধকারে ওরা ঝিম মেরে পড়ে থাকে। কেবল যেদিন জ্যোৎস্না ওঠে আকাশে, মাঠ, ঘাট, বন সব জ্যোৎস্নার দুধে ভরে যায়, সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বাপ-পিতেমোর আমলের একটা ঢোল বা ধামশা আছে, সেটা ধরে ধরে পেটায়, কখনো হেঁড়ে গলায় যাত্রার আসরে শোনা বিবেকের গানের একটা-আধটা কলি বিকৃত উচ্চারণে চীৎকার করে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকে। ঠাকুমা-দিদিমা থাকলে রূপকথা বলে ছোট ছেলে-মেয়েদের।

আমি আসবো শুনে বোধ হয় সেদিন ওরা একটা লম্প জেলেছিলো। লম্পের লাল লাল শিষ অন্ধকার ঘরটার এখানে-ওখানে পড়ে মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিলো। অন্যদিন ছেলেমেয়েগুলো পা ছড়িয়ে একঘেয়ে সুরে না খেতে পেয়ে চেঁচায়। ওরাও বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, যে এসেছে তার সামনে তাদের খেতে না পেয়ে চেঁচানোর অধিকারটুকুও নেই। তাই ওরা নির্জীবের মত, বড় বড় চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। বাইরে প্রকাণ্ড বাঁশবনের ঘন অন্ধকার ছায়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো জীর্ণ পরিত্যক্ত সেই ভিটের ওপর।

একটা-দুটো বাদুর উড়ে উড়ে পালাচ্ছিলো। কাদের বাগানে কারা যেন 'ফট ফট' শব্দ করে বাদুর তাড়াচ্ছে রাত্রে। লম্পের লাল আলোটার দিকে চেয়েছিলাম। হঠাৎ লালচে একটা শিখা কাঁপতে কাঁপতে দেয়ালের কোণটা আলো-কিন্তু করলো, আমি সেখানে পাতা উনুনের ঠিক দু'-তিন হাত ওপরে একটা অবিস্মরণীয় ব্যাপার দেখলাম। একটা ক্যালেণ্ডার দুলছে। স্নানরতা কোন যুবতীর নয়, মা কালী, দেবী দুর্গা বা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী অথবা একালের নেতা বাপুজী অথবা নেতাজী কিংবা পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের ক্যালেণ্ডার নয়, লেনিনের ক্যালেণ্ডার। সত্যি বলছি, ঠিক এই জায়গায়, এইরকম অদ্ভুত এক রাতে, না মানুষ, না জন্তু এই যে একটা পরিবার এদের ঘরে, লম্পের কাঁপা কাঁপা লালচে শিস ওঠা আলোয়, যখন বাঁশবনের ছায়া প্রকাণ্ড হয়ে হেলে পড়েছে পরিত্যক্ত ভাঙা ভিটের ওপর, বাদুর উড়ে যাবার শব্দ হচ্ছে, তখন এই হতভাগা দুখী বাউরীর ঘরে এ জিনিষ আমি ভাবতে পারি নি।

আমি অবাক হয়ে দুখী বাউরীকে জিগ্যেস করছিলাম, আমার গলা দিয়ে স্বর স্পষ্ট করে বার হয়নি নিশ্চয়, কিরকম অদ্ভুত একটা গলা হয়ে গিয়ে-ছিলো আমার, আমি বলেছিলাম, 'এটা, এটা কার ছবি?'

দুখী বাউরী বোধহয় এতোক্ষণে একটা কথা খুঁজে পেল। ওর চোখমুখে আমি দেখলাম স্পষ্ট পরিবর্তন। দুখী বাউরী যেন বদলে যাচ্ছে, বদলে গিয়ে একটা অন্যরকম দুখী বাউরী হয়ে গেল, গভীর বিশ্বাস আর ভালোবাসা আর অতল শ্রদ্ধার সংগে মন্ত্রোচ্চারণের মত ভংগীতে বিড়বিড় করে বলল, 'কমরেড লিলিন।'

'এ ছবি এখানে কে টাঙিয়েছে?'

'থোড় বেচা পয়সায় এটা মেলাতলা থেকে কিনেছিনু, সে অ্যানেকদিন হয়ে গেল আজ্ঞে।'

'এ কে জানো?'

'কমরেড লিলিন।'

উচ্চারণ ঠিক করে দিতে গেলাম, বললাম, 'লিলিন নয়, বল লেনিন।' ও বলল বিড়বিড় করে, 'লিলিন, লিলিন।'

'এ কে তুমি জানো?' আবার জিগ্যেস করলাম।

ও বলল মন্ত্রোচ্চারণের মত বিড়বিড় করে, 'কমরেড লিলিন।'

এর বেশি ও জানে না।

[ ক্রমশ ]

**ডাক্তারখানা নয়, সেলুন**
**পুলিশ নয়, পুলটিস**

কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশ বড়িষা-শীলপাড়ার আঘাত কোনক্রমে সামলে নিয়ে রক্তাক্ত-অংগ কমল মিত্র শম্ভুনাথ পণ্ডিত? করনানি হাসপাতাল অবধি গাড়ি ছুটিয়ে গেছলেন ফার্স্ট এইডের আশায়। বলা বাহুল্য, প্রখ্যাত অভিনেতা কমলবাবুকেও হতাশ হতে হয়েছে। হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগ মুখের ওপর দোর বন্ধ করে দিয়েছিল এই বলে যে, সেখানে ডেটল নেই! কমলবাবু খুব দুঃখ পেয়েছেন, তাই খবরের কাগজে তাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতার রিপোর্টও দিয়েছেন।

সংবাদে প্রকাশ, ফলতায় অভিনয় সেরে 'পথের দাবি'র অলোয়ার কর-খ্যাত অভিনেতা কমল মিত্র ফিরতি মুখে কাঁড়ি পর খোকা গুণ্ডার দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছিলেন বড়িষা-শীলপাড়ার মুখে। গাড়ির ওপর প্রস্তর বৃষ্টির ফলে তিনি আহত হন। কিন্তু পুলিশ ফাঁড়ি এই আঘাতটুকুও ডায়রী লিখে রেকর্ড করতে চায় নি। বলেছে, এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে, ডায়রী করে আর কী হবে। মশাই, প্রাণে বেঁচে গেছেন এই-না অনেক!

অবশ্যই পুলিশ সমুচিত জবাবই দিয়েছে।

যেমন হাসপাতালে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা যে থাকে না, কমলবাবুর এ কথা জানা উচিত ছিল। না হলে আর তিনি শহর কলকাতার অধিবাসী কেন? হাসপাতালও সুতরাং উচিত জবাবই দিয়েছে। অপরাধ কমল মিত্রের, দুঃখ পেলে আর কি করা যাবে। তিনি ১৯৭০ সালে কলকাতা মহানগরী এবং তার উপকণ্ঠে গ্রেটার ক্যালকাটায় কাটা ঘায়ে প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেম, নাগরিক অধিকার। সুতরাং মুখের মত জবাব পেতেও তাঁর দেরি হয় নি।

আমি কিন্তু কলকাতা শহরের দু-একটা ইমারজেন্সি বিপদতারিণী ঘাট-ঘোঁত জেনে রেখেছি। এ শহরে সবই আছে। তবে ঐ, ফেল কড়ি মাখো তেল। হাসপাতাল, পুলিশ, ডাক্তারখানা, স্বস্থানে, টিপটাপ, যদি আপনি রীয়েল খদ্দের হন। না হলে পথ দেখুন। ফোকটে কারবার গুছিয়ে সরে পড়বেন, কলকাতা গ্রেটার ক্যালকাটাকে অত বুদ্ধু ভাববার কারণ নেই। কিন্তু নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। আর শহর কলকাতায় বাস করতে হলে সে সব খবর রাখতে হবে। যেমন আমি রাখি।

ধরুন ডেটল। কাউণ্টারে টাকা ফেলুন, ডাক্তারখানা শিশিটিকে ঝেড়ে-মুছে প্যাক করে আপনার হাতে তুলে দেবে। কিন্তু যদি কেটেকুটে ছড়ে-ছেঁচে যায় এবং জনবহুল, যানবাহন শহরে দুর্ঘটনা তো হামেশাই ঘটতে পারে, তবে ডাক্তারখানা নয়, হাসপাতাল তো দূরের কথা (কেন যে এদের ওপর বাধ্যতামূলক-ভাবে ফার্স্ট এইড সরঞ্জাম রাখার নির্দেশ নেই?) সোজা ক্ষৌরকার-বিপণি বা কাছে-পিঠের 'সেলুনটি'তে ঢুকে পড়ুন। একতুলো ডেটল অবশ্যই পাবেন। হাসপাতালে সার্জন না পেলে ওঁদের কাছে যান, নরুণ দিয়ে কাঁচের টুকরো, বাঁশের চোঁচ, গাড়ির লোহাচুর চেঁছে বার করে দেবে। এমন কি ঘাড়-পিঠ মচকে গেলেও বিনি পয়সার হাসপাতাল-ইমারজেন্সিতে না ঢুকে ঐখানেই ঢুকুন, মাসেজ করে দেবেন ওঁরা সযত্নে। কলকাতার নেই কি, সব আছে। কমলবাবু খেয়াল করেন নি, ঠিক জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পান নি।

কমলবাবু রাতের ট্রিপ দিচ্ছিলেন, যখন ক্ষৌরকারবর্গ সারাদিনের পরিশ্রমের পর আড্ডাতে রাত্র-নিদ্রার আয়োজন করছেন হয়ত। কমলবাবুর মতো রাত-বেরাতে ভদ্র-ডাকাতের(?) হাতে পড়লে (আক্রমণকারীরা পাতলুন পরিহিত বলে সংবাদ পড়লাম) অবশ্য গৃহচিকিৎসকই নির্ভরযোগ্য। তবুও এই কলকাতা নাকি শহর কলকাতা? আগে ছিল তামাম ভারতের রাজধানী, আজ টুকরো বাংলা দেশের!

ঠ্যাঙাড়েও আগে ছিল। মালকোঁচা এঁটে পাকা পাকা বাঁশের ঝাড়িতে পথিক-সুজনদের পথের মধ্যে আক্রমণ করত তারা। সে জায়গায় আজ আঁটা পাতলুন পরে ঠ্যাঙাড়েরা না হয় সোডার বোতল আর বোমা-পটকা ছুড়ছে। যারা আর একটু ডেয়ার ডেভিল, তারা গেঁজে ছোরা আর বন্দুক নিয়েছে কাঁধে! সেদিনও পুলিশ কাজে আসে নি, আজও আসছে না। নতুন কি!

সেই যে সেকালের সংবাদপত্র দুঃখ করে লিখেছিল, 'যে অবধি পোলীসের নূতন বন্দোবস্ত মত কর্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে।' সেই—এখনো সে শব্দই শ্রুতিগোচর হচ্ছে মাত্র। নতুন কিছু নয়।

আর চলিয়াছে একই ট্র্যাডিশন।

ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব কবে মরে ভূত হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সময়কাল থেকে পুলিশের বংশবৃদ্ধির সুবন্দোবস্ত ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়ে আসছে। সে পুলিশও ঠ্যাঙাড়ের হাত থেকে পথচারী-দের রক্ষা করতে পারে নি, এ পুলিশও খোকা গুণ্ডাদের কবল থেকে নাগরিকদের

রক্ষার দায়িত্ব পালনে অক্ষম। এককালে হার্মাদদের অত্যাচারে অবশেষে কলকাতা বিক্রী হয়ে গেছল। নবাবের সিপাহী-শান্ত্রী কাজে আসে নি। আজ গুণ্ডাবাজিতে কলকাতা টলমল করছে। পুলিশ ট্র্যাডিশন রক্ষা করে নির্বিকার।

শহর কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেন বিদেশী ক্রাইম ছবিতে দেখা টেক্সাস—কতকগুলি অসহায় নির্জীব মানুষের চোখের সামনে গুটিকয় ঘোড়-সওয়ার-হিরো এসে যে সব ছবিতে নির্বিঘ্নে রাহাজানি করে বেরিয়ে যায়। অবশেষে জনৈক ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ঘটে এবং চমকপ্রদ উপায়ে তিনি গুণ্ডা দমন করে শান্তি স্থাপন করেন। দর্শকদের জুগুপ্সা-জাগ্রত মন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিইয়ে যায়। সেখানে পুলিশের টুপিটিও দেখা যায় না। অথচ তা নিয়ে কেউ কখনো কোন্দল করেছে, এমন কাণ্ডও ও-সব ছবিতে চোখে পড়ে না। চৌরঙ্গী অঞ্চলের চিত্রগৃহগুলিতে এমন ছবি আকছার দেখানো হত—হচ্ছে। ছবি দেখে ছেলে-ছোকরারা যদি টেকসাস-হিরো (মাইনাস ত্রাণকর্তার ভূমিকা) বনবার জন্য উত্তেজনা বোধ করেন, জবাব নেই। আর ছবি দেখে পুলিশও যদি ভেবে বসে, টেকসাসে যেন গত স পন্থা। অর্থাৎ হামলায় হাজির হওয়ার হিম্মৎ পুলিশের থাকা অনুচিত, তবে টেকসাস-কলকাতায় তাঁদেরই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে?

ইদানিং আবার নতন উপসর্গ। কেবল ক্রাইমে আর ছবি কাটে না। তাই সেক্স-ক্রাইম আমদানি হচ্ছে। আর হওয়াই উচিত। কারণ, এদেশী বিশ্বজনের অতি-ইদানীংকালীন মত, সেক্স না হলে শিল্প হয় না। সেক্স চাই, "মোর সেক্স"। আর তাই সেন্সর বোর্ডের ওপর একজাতের সেক্স-পাগল শিল্পী প্রবন্ধ ফেঁদে অনবরত চাপ সৃষ্টি করছেন শহর কলকাতার সেক্স-সরব পত্র পত্রিকায়। কলকাতা শহরে, সুতরাং, ক্রাইম এবং সেক্স-ক্রাইম ছড়ালে, তদ্দ্বারা গ্রেটার ক্যালকাটা ভর-ভরন্ত হলে কলকাতার টেকসাসী সাধ পূর্ণ হয়। আবার লাখো-লোকের পাঠ্য পত্র-পত্রিকার প্রচারশ্রমও সার্থক হয়। সাহিত্য-শিল্প মুক্তির পাখা মেলে ময়দানের বাতাসে জ্বালা জুড়োতে পারে।

কিন্ত পরচর্চা থাক। কলকাতা চর্চায় দুটি জিনিস স্পষ্ট। এক, ডাক্তারখানা, হাসপাতালে ভরসা না থাক, শহরে অগুণতি 'সেলুন' আছে। দুই, পুলিশের দুয়ারে ব্যর্থ হলে টেকসাস-ত্রাণকর্তার স্মরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

দুঃখের বিষয়, দুই নম্বরে আস্থা কম। কারণ, কলকাতায় তাদৃশ ত্রাতা-হিরো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

তাই পুলিশ ব্যর্থ হলে অগত্যা অন্যতর পুলটিসের ব্যবস্থা করতেই হবে, নচেৎ শহর কলকাতার ধনপ্রাণ শিকেয় উঠবে খুব শিগগিরই।

আপাতত মেয়েরা কান-গলা-হাত-বাজু স্বর্ণমুক্ত করছেন। (মোরারজী সাহেবের বস্তুত দূরদৃষ্টি ছিল কিন্তু) শহরে প্লাস্টিক খেলনার মতো প্লাস্টিক গহনার অঢেল চালান এসেছে। সেই সঙ্গে গালা, কাঁচ এবং পুঁথির বিচিত্র ডিজাইন। গুণ্ডা-কলকাতার হাত থেকে রেহাই পেতে অতঃপর সকলেই স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হবেন। কিন্তু ছেনতাই অধুনা কান-গলা থেকে হাত-ব্যাগ, পকেট পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। সুতরাং, আরো ঢের করণীয় আছে।

জনৈক টেকসাস হিরো যখন দুর্লভ তখন ঐ ছাঁদে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার।

শীলপাড়া দিয়ে যখন শুরু করেছি তখন সেখানেই ফেরা যাক। বেহালা-বড়িষা-শীলপাড়ায় বহু শিষ্ট এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির বাস। বেশ কিছু অধ্যাপক-শিক্ষক তো আছেনই, আছেন সুকুমার বৃত্তিতে রত সাহিত্যসেবী ও আছেন অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। আর বেহালা টু বড়িষা এমন অঞ্চল, যেখানে প্রভাবশালীদের নাম বললে লোকে ঠিকানার হদিশ পর্যন্ত দিতে পারেন। অর্থাৎ এসব অঞ্চল শহুরে বটে, তবে কাটখোট্টা নয়। পরস্পরের সঙ্গে একটি বিনিসুতোর ঘনিষ্ঠতা আছে। এইসব প্রভাবশালী সামাজিক নাগরিকগণ যদি একজোট হয়ে শিষ্ট-বিশিষ্ট মানুষের নন-পলিটিক্যাল এবং দলাদলিহীন পীস-কমিটি গড়ে তোলেন আর রুখে দাঁড়ান উঠতি ভেজাল-কলকাতার সাবেক গুণ্ডাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বয়োজ্যেষ্ঠরা বুদ্ধি দেন এবং তাঁদের প্রভাব বিস্তার করে শিষ্ট তরুণ সমাজের মনে আস্থা-বিশ্বাস ও ভরসা জোগাতে পারেন, তবে গুণ্ডা খোকাদের অপকীর্তি অনেক পরিমাণে লাঘব হতে পারে। মহল্লায় মহল্লায় সামাজিক শ্রদ্ধেয়গণ এগিয়ে এলে শিষ্ট তরুণেরা নিশ্চয় আকর্ষণ বোধ করবেন। ভরসা পাবেন। আর খোকা গুণ্ডার দল ধীরে ধীরে গর্তে লুকোবে। কারণ দুষ্কর্ম চিরকালই ভীরু, রুখে দাঁড়ালেই মুখ লুকোবে।

প্রভাবশালীরা দোরের কপাট বন্ধ করে জানলার ফুটো দিয়ে পথচারীর ক্লেশ দর্শন করে আপনি বাঁচলে বাপের নাম নিয়ে পালঙ্ক-শায়িত না হলে পুলিশ, মন্ত্রী, রাজনীতিক, মেয়র, কাউন্সিলর, গভর্নর—সকলেরই টনক নড়বে। পুলিশ তখন যত দোষ নন্দ ঘোষ জ্যোতি বোসকে না দেখিয়ে মুক্ত-কচ্ছ হয়ে ছুটে আসতে বাধ্য হবে।

এক্সপেরিমেণ্টটা বেহালা, বড়িষা, শীলপাড়া থেকেই শুরু হোক না। সেখানে, আমার বিশ্বাস, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি (এবং উৎসাহীও) পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ স্পর্শের আওতায় আছেন। এঁদের মধ্যে সাহিত্যসেবী এবং অধ্যাপকরাই এগিয়ে আসতে পারেন প্রথম। তাঁরা সব চেয়ে নিরীহ, অথচ সবচেয়ে বলশালী। মানুষকে দু' কথা বুঝিয়ে বলার, সমাজ-কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং তরুণমনে প্রভাব প্রসারের বৃত্তিগত সুযোগ ও স্বভাব তাঁদের আছে। বেহালা-বড়িষায় তাঁরা চাক বেঁধে আছেন। একে অপরকে চেনেন নামে ও ঠিকানায়। একজোট হতে সুবিধেও অনেক। তাঁরা পথ দেখালে আরও ঢের পথের সৃষ্টি হবে। কলকাতা এক-একটা আন্দোলনের জন্য মুখিয়ে থাকে। প্রয়োজন শুধু সেই আন্দোলন সক্রিয়ভাবে চালু করে দেওয়ার। একবার চেষ্টা হক-না কেন।

মোল্লার হাতে পড়া গেছে বলেই একসঙ্গে খানা পাকাতে হবে, এমন কোন কথা নেই। পুলিশ না থাকে পুলটিসের ব্যবস্থা হোক।

আর শহরকে আপন প্রাণ বাঁচাতে এমন ব্যবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রেও তো করতে হয়েছে।

সম্প্রতি যা চালু আছে, তা হল মহল্লার চাঁদায় বেতনভুক নেপালী নাইট গার্ড। পুলিশ পাহারা দেওয়াটা তার কর্তব্যকর্ম হিসেবে ভুলে গেছে। দেখছি অনেক পাড়া তাই চাঁদা তুলে চোর-তাড়ুয়া নাইট গার্ডের ব্যবস্থা করেছে। এমন ঢের নজীর তুলে ধরা যায়, যেক্ষেত্রে পুলিশের বদলে পুলটিসের ব্যবস্থা হয়েছে। এটাও হোক।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ ছ'চল্লিশ ॥

বীট অফিসারের বৌ কৃষ্ণা। সুন্দর হাসিখুশি হাল্কা-পাৎলা মেয়েটি। স্বচ্ছন্দ একহারা গড়ন। প্রথম দর্শনেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে আসে। সে যেন গো তমালের ছায়াখানি। বাইরের পৃথিবীতে এখন যত রোদ্দুরই থাক, ডুয়ার্সের এই ঘন বনের মাঝখানে সব ছায়া-ছায়া। স্নিগ্ধ সুন্দর। বাইরে তাকালে চোখে পড়বে দূরে-কাছে সব সবুজ পাতায় ছাওয়া। সেই নিবিড় নীলিমাটুকুই যেন ছায়া হয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একহারা পাৎলা বৌটি যেন সেই বনেরই একটি ভাবমূর্তি। আর তার সিঁথিপুটে যেন কেউ একরাশ পলাশের আগুন ছুঁইয়ে দিয়েছে। নববিবাহের স্বাক্ষর। কৃষ্ণা ফর্সা না, বলা চলে শ্যামাঙ্গী। কিন্তু এক আশ্চর্য মেয়ে কৃষ্ণা। কথায় কথায় জানলাম কলকাতার মেয়ে। কলকাতার মেয়ে ছাড়া আর এমন মেয়ে কোন দেশে আছে ভাবা যায় না। কলকাতা মানে বাংলা দেশ। বাংলা দেশের হৃদয়। কলকাতাকে যাঁরা দুঃস্বপ্নের নগরী, মিছিলের দেশ মনে করেন তাঁরা ঠিক পরিচয় জানেন না কলকাতার। এমন প্রাণময়ী নগরী পৃথিবীতে খুব অল্পই আছে।

ডুয়ার্সের কথা লিখতে বসে কলকাতার কথা একটু বেশিই বকে ফেললাম মনে হচ্ছে। অপ্রাসঙ্গিক লাগতে পারে। আর তা লাগবেই বা কেন? একালের ডুয়ার্স কি কলকাতাকে বাদ দিয়ে? অতীতে যা-ই থাক, বর্তমান ডুয়ার্সের একটিমাত্রই পরিচয়—ডুয়ার্স বাংলা দেশ। এই বাংলা দেশের রূপ-বৈচিত্র্যের তুলনা নেই। দুঃখ হয় ভাবতে, এ বাংলা দেশের রূপ ফুটতেই পেল না সাহিত্যে। পূব বাংলার শ্যামশ্রী রূপ-কথার মত ফেরে মনে-মনে। প্রাচীন যুগ থেকে সাহিত্যের পাতায় পাতায় তার ঐশ্বর্য বর্ণনা আছে থরে থরে। রবীন্দ্রনাথের একযুগের সাহিত্যে বাংলা দেশের যে ভুবন-ভোলানো রূপ অনুস্মিত হয় তার মূলেও বিশেষ রসসিঞ্চন করেছে পদ্মা নদী। পদ্মাতীরবর্তী বাংলা দেশ। শরৎচন্দ্রের বাংলা দেশ মূলত রাঢ়ের। তারাশঙ্করের লেখায় বীরভূমের ছবি। কম-বেশী অনেকেরই। উত্তর বাংলার কথাও লিখেছেন কেউ কেউ। নারায়ণ গাঙ্গুলীর রচনাতেও আছে উত্তর বাংলা। ডুয়ার্স নিয়ে লেখেননি কেউ বিশেষ। তার কারণ ডুয়ার্সকে অত কাছে থেকে দেখেননি কেউ। ডুয়ার্স যে তিমিরপ্রান্ত। তাই সে-সম্পর্কে আশংকা আছে, উদ্বেগ আছে। পরিচয় হতেই বলেন, আরে, বলেন কী মশাই! সেখানে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত? তাঁদের দোষ নেই। যেখানে বাতাসে-বাতাসে উড়ে বেড়ায় মরণের বীজাণু, পায়ে-পায়ে ঘোরে আদিম অরণ্যের ভয়ংকর কপিশ-চোখো বাঘের জ্বলন্ত প্রতিহিংসা, যেখানে ঘাসে-পাতায় বন-জঙ্গলের বিষাক্ত কীট-কীটাণুর বংশ বাড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে, যেখানে ঝোরায় ঝোরায় ঝিলে ঝিলে বিষাক্ত সাপ-খোপ, প্রতি পদে পদে হিংস্র ব্যাধির প্রকোপ—সেখানে কি মানুষ যেতে পারে? যান তাঁরাই, যাঁদের উপায় নেই না-গিয়ে। মাপ করুন, মশাই। আগে প্রাণে বাঁচলে তবে তো সাহিত্য-সাধনা মশাই, কেউ কেউ হাত জোড় করেন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন উদ্যোগ-কর্তারা। আসুন, দেখুন আমাদের। আমাদের নিয়েও লিখুন—। একান্ত আহ্বান।

বলা বাহুল্য, সদিচ্ছা প্রচুর থাকলেও সাফ জবাব, বুঝলেন কিনা, যাব একদিন আপনাদের ওখানে—মনে ইচ্ছে রয়েছে—

আসেন কেউ কেউ এরোপ্লেনে উড়ে আকাশ-সীমানা পেরিয়ে, ভয়ে-ভয়ে, সংকোচে-সন্ত্রাসে; যেন বা পরদেশে যাচ্ছেন। যাবার কালে গৃহিণীর ছলছল দৃষ্টি, সকাতর অভিমান-জড়িত কণ্ঠ। পুত্র-কন্যা আত্মীয়-বন্ধুজনকে ডুবিয়ে যেন সত্যি সত্যি বনবাসী হতে যাচ্ছেন। আসলে তো বনই ডুয়ার্স। ভয়ে-ভয়ে থাকা। উদ্যোক্তাদের সংগে এক-আধটু কথা। জানালার পর্দা তুলে কদাচিৎ বাইরে নেত্রপাত। সময়বিশেষে ভয়ে ভয়ে।

চলুন স্যার। বন দেখিয়ে আনি। অনুষ্ঠান শেষে কেউ হয়ত বলেন।

মনে ভয় চেপে প্রশ্ন, কতদূরে বন? কতক্ষণ লাগবে?

বন তো ঘরের কাছেই রয়েছে। সে বন নয়, আসলে অরণ্যের আহ্বান।—এতদূরে এসে ফরেস্ট না-দেখে চলে যাবেন স্যার?

কৃষ্ণার কথা বলি। কলকাতার মেয়ে। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী। এম-এটা পাশ দিয়েছে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে। ভালো রেজাল্ট হ'ল না অবশ্য। পেয়ে গেল সাধারণ একটা সেকেন্ড ক্লাশ।

মামার আশ্রিতা হয়ে লেখাপড়া করেছে। কলকাতায় বাড়ি আছে মামার। আছে কিছু পৈতৃক বিত্তসম্পত্তি। আসলে চাকুরিজীবী। পাশ করার পর মামাকে ভারমুক্ত করা চাই। শুধুই কি ভারমুক্ত? মামাকে কিছু সাহায্য করাও চাই। মামীকে বলল, এবারে চাকরি চাই একটা।

মামা ভাবছিলেন অন্য কথা। ভাগ্নীকে ডেকে বলেওছিলেন একদিন, আমার বন্ধু রথীন আছে তো। ইউনি-ভার্সিটিতে আছে—তাকে বলে একটা রিসার্চ-ফিসার্চ করিস তো—

মামী ধমক লাগালে মামাকে, তুমি কী গো! শুধু পড়া-পড়াই করছ!

হ্যাঁ, তাইত! তাইত! মামা কেশ-বিরল মস্তক চুলকালেন বার কয়েক। নিভে গেলেন তারপর।

মামী বললে একদিন তারপর, শুনলে তো কৃষ্ণা চাকরি খুঁজছে!

চাকরি! সদানন্দ মামা হাসল, তা বেশ তো। ভালো কথা।

লে মজা! বিরক্তিকুঞ্চিত ফর্সা কপালে একটা ভাঁজ পড়ল মামীর, এমন মানুষ নিয়ে ঘর করতে যে কী জ্বালা!

ওদিকে মামার চোখ গোল-গোল!

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছেন মামা। দিব্যি বেরিয়ে গেল, তবে কি করতে বল?

এইবার ভাগনীর একটা বিয়ে দাও দিকিনি—

বিয়ে! বেশ তাই হোক।

তাই হোক না। দ্যাখ তুমি।

দেখব, বলে ব্যস্ত হয়ে মামা যেন তখুনি বেরিয়ে গেল।

মামী বলে, তবেই হয়েছে। এমন মামা যার, তার আর বিয়ে হবে না সাতজন্মে।

বিয়ের কথা যে ভাবেনি কৃষ্ণা তা নয়। তবে তাকে ভাবনা বলা চলে কিনা সন্দেহ। বিয়ে হবে, ঘর-সংসার করবে। সব মেয়েই যেমনটা ভাবে। তার বেশি আমল দেয়নি কোনদিন। চাকরির চেষ্টাটা চলতেই লাগল আন্তরিক।

এমন সময় যে এল, সে চাকরি না, বিয়ের একটি সম্বন্ধ। অমন কতই আসে।

ছেলেটি দেখতে-শুনতে ভালোই। বেশ স্বাস্থ্যবান। পাকাপোক্ত শরীর। চওড়া কব্জী। চওড়া কাঁধ। তবে কলেজের ওপরে আর পড়েনি। ইউনিভার্সিটির মুখ দেখেনি জন্মে। আর চাকরিও করে বাংলা দেশে না—বাংলা দেশের সীমান্তে একেবারে ডুয়ার্সে, যাকে বাংলা দেশ না-বলাই সংগত। এবং বলা বাহুল্য, তাও ফরেস্টে।

এ বিয়ে কি হতে পারে? না, না, তাড়াও। মামীর সাফ জবাব।

মামারও সেই ইচ্ছে। এই প্রথম দুজনের মধ্যে মতৈক্য হল।

কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে কৃষ্ণা। আত্মীয়-স্বজনের সব উদ্বেগ-আশংকা দূরে করে বিয়ে মালা দিল সেই ছেলেটিকেই।

সর্বনাশ! বনে কি মানুষ থাকে! সেখানে যাবি ঘর করতে? বন্ধুদের প্রশ্ন।

কেন, বনে কি মানুষ থাকে না?

বাঘ-ভালুকের বন—? বন্ধুরাও মানুষ। তাদেরও কুশল কামনা আছে। তাই উদ্বেগকাতর প্রশ্ন।

সেখানে যে মানুষ থাকে, এই ভদ্রলোকই তার প্রমাণ।

খুব যে ভালবাসা দেখি। বিয়ের আগেই পেটে-পেটে এত!

পড়াশুনোও তোর চাইতে কম।—একান্ত এক ঘনিষ্ঠতমার আর্তি।

পড়া দিয়ে কি ধুয়ে খাব।—বলা বাহুল্য, কৃষ্ণার সুস্পষ্ট উত্তর।

মামা-মামীকে রাজী করিয়ে, বিশ্বাস করবেন না, শেষ পর্যন্ত মালা দিলেন এ অধমকেই। কোয়ার্টারের চেয়ারে পিঠ দিয়ে বলেন বীট অফিসার। কৃষ্ণা রান্না বসিয়েছে উনুনে। মাঝে মাঝে এ-ঘরে এসে বসছে কুশনচেয়ারে। সুন্দর সাজানো ঘরটি। আমিও একটি চেয়ারে। বীট অফিসারের কথায় কৃষ্ণার মুখের মধ্যে লজ্জার আভা হড়ায় দ্রুতে।

ভদ্রলোককে বলি, তাহলে কবির ভাষায় আপনারও বলা উচিত ছিল—

আমি আজি ভাগ্যবান,
পেয়েছি তোমার দেখা।

সবাই হেসে উঠল।

হাসি থামলে কৃষ্ণা বলে, সেটা উভয়ত বলতে পারেন। একে তো কনের শ্রী এই। নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। না আছে ভুবন-ভোলানো রূপ, না-কিছু। উনি দয়া করে বিয়ে না-করলে হয়তো সারাজন্মই—

বললাম, আইবুড়ো থেকে যেতেন?

কত মেয়ে অমন থেকে যাচ্ছে জানেন তো? কৃষ্ণা আমার কথার উত্তরে বলে, আপনাকে সত্যি কথাই বলি, মামার ছেলেপুলে অনেক, নিজেরও একটি বড় মেয়ে আছে। তার উপরে আমাকে পড়াতে গিয়ে ধারে-দেনায় মামা ডুবে যাচ্ছিলেন—

বললাম, তাই বুঝি চাকরি খুঁজছিলেন?

কতকটা তাই। তা ছাড়া বিয়ে কর বললেই বা বিয়েটা করছে কে! আমার অনেক বড়লোকের ঘরের বান্ধবী চেষ্টা করেও বিয়েটা সারতে পারছে না। তাদের অর্থবিত্ত-ঐশ্বর্য কিছুরই অভাব নেই। তাছাড়া, যুগটা কী ভয়ংকরভাবে বদলাচ্ছে, ভাবাই যায় না। ছেলেরা বিয়েই করতে চায় না। উনি তো ওদের মধ্যে মহাদেব। চাকরি-বাকরি করছেন, থাকবার আস্তানা আছে—। দাঁড়ান, আসছি এক মিনিট।—চকিতে রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান। লাগোয়া একটি কক্ষ।

শুনতে হয়তো ভালোই লাগে। বীট অফিসার চেয়ারে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে বুজে শুনে যান আপনমনে। আমার সঙ্গে এরই মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ মিশুক। আপন করে নিতে পারেন। চোখ বুজে বুজেই বলল, কেমন লাগছে মহাদেবের অপর্ণাটিকে?

তার মানে তিনি নিজে মহাদেব, আর অপর্ণা তাঁর স্ত্রী।

আমি প্রাণপণে প্রতিবাদ করি। বলি মহাদেবকে লাভ করবার জন্যে সাধনা করে করে সামান্য পাতাটুকু পর্যন্ত দাঁতে কাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন পার্বতী—তাই তাঁর নাম অপর্ণা। আর এ-ক্ষেত্রে তো ওঁকে কোনো সাধনাই করতে হয়নি। আপনি নিজেই তাঁকে চাইছিলেন। তাহলে অপর্ণা হল কি করে?

কৃষ্ণা এসেছে ইতিমধ্যে। জানালায় গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছে। পর্দার উপর দিয়ে তাকাচ্ছে, আমার কথাটুকু শুনেছে। শেষ হতেই বলে স্বামীকে, নাও, হলো তো। কাঠের কারবারী কাঠ নিয়েই থাকুন মশাই, করবার বলি। তা কখনো শুনবে? বিদুষীকেই না-হয় বিয়ে করে এনেছ, তা বলে নিজের বিদ্যে কতটুকু।

বীট অফিসার বলেন, আমিও গ্রাজুয়েট মশাই।

একটু থেমে বলেন, তবে হ্যাঁ, লেখাপড়া করবো বলে কোনদিন করিনি। কলেজের ক্লাশগুলির বেশির ভাগই পালাতাম খেলার মাঠে। আর আমাদের কালে খেলার রেওয়াজ ছিল খুব, মহারাজাদের আওতায় ছিল তো তাই।

কোন্ মহারাজ?

কুচবিহারের মহারাজদের কথা বলছি। সবিনয়ে বলেন বীট অফিসার, আমি কুচবিহার জেন্‌কিংসের ছাত্র। মহারাজার দলে ক্রীকেট খেলেছি আমি।

থেমে থেমে বলেন বীট অফিসার, লেখাপড়া, খেলা দুই-ই ছিল কুচবিহারের। তার সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলাদা। আমি শুধু খেলায় হাত পাকিয়েছি। ইউনিভার্সিটির ব্লু হব এই ছিল ছাত্রজীবনের ইচ্ছা। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল—। ভাবী ইউনিভার্সিটির ব্লু বনে বনে শূকর তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

কৃষ্ণা বলে, তার জন্যে খুব দুঃখ আছে ওঁর। আমি বলি এ নিয়ে দুঃখ করবার কী আছে। যে যা চায়, জীবনে তার সবটাই যদি ঠিকঠাকমত ঘটে যেত, তবে আর জীবনের বৈচিত্র্য কি থাকত। সব রুটিন-টানা জীবন হয়ে যেত। থাকত না অপ্রত্যাশিতের চমক, না নতুনত্বের আস্বাদ!

ওঁর কথার যুক্তিটুকুতে আমার মন সাড়া দেয়। বুদ্ধিমতী মেয়ে কৃষ্ণা। অমন মেয়ে যে-ঘরে যায়, সে ঘরই হয় সুখের। সে চিন্তা করে নতুনভাবে। দশজনের মধ্যে আলাদাভাবে চিন্তা করে। অল্প সময়ের মধ্যেই এটুকু ধরা পড়ে গেছে। কৃষ্ণা বিশ্বাস করে, জীবন বিরাট। জীবন বিচিত্র।

তা বলে উচ্চাশা কি থাকবে না? তা আমি বলি না। কৃষ্ণা নিজেই বলল ফিরিয়ে, যতক্ষণ বাঁচা, ততক্ষণ আশা করা। তা বলে যা হয়নি তা নিয়ে দুঃখ করারও কোনো কারণ নেই।

দুঃখ আমিও করি না, বীট অফিসার বললেন কৃষ্ণার কথার সূত্রে, তবে মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে বৈকি। আফটার অল্ জঙ্গলের লাইফ কী ভীষণ রকমের একঘেয়ে।

আমার অবশ্য লাগত খুবই। কলকাতা থেকে এসে ইস্তক—কৃষ্ণা বলল সরলভাবে।

সে খুবই স্বাভাবিক। আমি তার কথায় উত্তরে স্বীকৃতি বিজ্ঞাপন।

এখন কিন্তু ভাবছি অন্যরকম—বলে বলেন, মনেরও একটি সহজ ছল আছে। এই চাকরির যে নেই তা কিন্তু ভাববেন না। দিব্যি দেখুন না। অমীরের মত এমন জীবন কাটাতে পারবেন কলকাতায়?

বীট অফিসার বললেন, সে-কথা একশবার ঠিক। কলকাতায় এখন এত লোক হয়ে গিয়েছে। পায়ে-পায়ে মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া ট্রাফিক্ জ্যাম্। আমি তো ফিনকডকের জন্যে গিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাই না। আপনি আবার ব্যাচিলর মানুষ মশাই। আর যাই করুন, শ্বশুর-বাড়ি যেন কখনও কলকাতায় করবেন না।

সচমকে বলি, বলেন কি মশাই! সে-কথা কি করে কবুল করি বলুন! শ্বশুর দেখে তো বিয়ে করা না, বিয়ে করা তার মেয়েটিকে। নাকে দুর্জয় লোমওয়ালা ভদ্রলোকেরও সর্বসুলক্ষণা-যুক্তা কন্যা থাকতে পারে। আবার অর বাড়ি—

কলকাতায় হওয়াও বিচিত্র না, প্রায় আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন বীট অফিসার। তাহলে আপনার কপালে বিলক্ষণ দুঃখ আছে মশাই। মানুষের ভিড়ে চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে পালাতে পথ পাবেন না।

কৃষ্ণা বলে স্বামীকে, কলকাতা তবু কলকাতাই মশাই। চিড়ে-চ্যাপ্টা হোক, ব্যাঙ-চ্যাপ্টা হোক, কাজের তাগিদে কলকাতা যেতেই হবে। আর ভিড়ের কথা বলছেন, কোথায় ভিড় নেই মশাই।

সে-কথা একশবার সত্যি, আমি ওঁকে সমর্থন করি. পার্টিশনের আগে যাই হোক. এখন মানুষ বেড়েছে হাজার-গুণ। একবার হিসেব করতে হবে তো ষোলটি জেলা ভেঙে এ-সব নতুন দেশে চলে এসেছে কতজন। তাছাড়া এই বাইশ-তেইশ বছরে, মানুষের জন্মও তো কম হয় নি।

তার চাইতে নিরিবিলিতে এই বেশ আছি। রেকর্ড প্লেয়ার কিনেছি একটা। রেডিও ওঁর আগেই ছিল। যখন হাতে কাজকর্ম থাকে না বাজাই। রান্নাবান্না দুজনের কতই না। দৈনিক কাগজটা অবশ্য একটু গোলমাল করে।

বললাম, বাজারপত্র কোথায় করেন?

সে অবশ্য বেশ খানিকটা দূরে, কৃষ্ণা আমাকে বলল—চাল-আলু এখানেই মেলে। মুরগী আছে আমাদের। মাংস-ডিম কিছুরই অভাব হয় না। দুধও খুব ভালো। বস্তির লোকেরা জোগান দেয়। একটু জল পাবেন না ওর মধ্যে।

বীট অফিসার বললেন, মাঝে-মধ্যে দরকার পড়লে বেরিয়ে পড়ি। রাজদূত আমার তৈরিই আছে। মানে, আমার মোটরবাইকটার কথা বলছি। মিসেসকে পিছনে বসিয়ে মেরে দিই। বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

বীট অফিসারের বৌ কৃষ্ণা হাসে। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না? জিজ্ঞেস করুন ওঁকে, এইতো সেদিন বীরপাড়ায় সিনেমা দেখে এলাম।

ভয় করেনি?

কিসের ভয়? কৃষ্ণার ঠোঁটে তবু হাসি। যেন দিগ্‌বিজয়িনী। বলে, ভয় আমি একটু কমই পাই। ভয় পেলে কি আর ফরেস্টের গলায় মালা দিতাম?

তবু কৃষ্ণার ভয় করে। দুপুরে খেতে বসে কথা হয় তিনজনের মধ্যে। একটা কাঠের টেবিলে পাশাপাশি বসেছি তিনজন। কৃষ্ণা মাঝখানে। চান সেরে একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে। সিঁদুর-বিন্দুটি টকটক করে কপালে। সিঁথি-তেও সিঁদুর। বেশ পরিচ্ছন্ন চারদিক। ছিমছাম। টেবিলে ফাউল কারী, ডিম-ভাজা, ডাল আর ভাত। সেই সঙ্গে ঘি।

[illegible] দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে মনে হয়, বিধাতা যে কার হাঁড়িতে কখন ভাত রেখেছেন। দিব্যি এসেছিলাম অপরিচিত। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা ছিল না। অকারণ ছুটোছুটিই আমার স্বভাব। তবু আমার ভাগ্যে দেখছি পথে-পথে বিধাতা অকৃপণ সুধার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। চিরকাল তাই দেখছি। কষ্টভোগ বিশেষ করতেই হয় না। কাল যখন কোনো কথা চিন্তা না করে একরকম আচমকাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখনো ভাবিনি, বনের মধ্যে এত আতিথ্য পাব। বাংলোর ভক্ত বাহাদুর পর্যন্ত আশ্চর্য ব্যবহার করেছে। আজ যখন বাংলো ছেড়ে দিয়ে সকালের দিকে এখানে রওয়ানা হয়ে আসি, তখন তাকে দুটি টাকা দিতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলাম। বলেছিলাম, তোমাকে আমি বকসিস্ দিচ্ছি বাহাদুর।

বকসিস্ কি হবে, সাব্? না, আমি নেব না।

আমি খুশি হয়ে দিচ্ছি—। নাও, তুমি নাও।

শত অনুরোধেও তাকে রাজী করাতে পারিনি। বলেছি, কাল তোমার জ্বর ছিল। আজ কিছু মিষ্টি কিনে খেও।

বাহাদুর বলেছে, আপনি খুশি হলেই আমি খুশি সাব্। তা বলে টাকা-পয়সা আমি কিছুতেই নেব না। আমার ব্যাগটা সে নিজেই বহন করে বীট অফিসারের বাংলোয় পৌঁছে দিল। এইসব ভাবি আর অভিভূত হই।

ঝোলমাখা মুরগীর ঠ্যাং কামড়ে চলেছেন বীট অফিসার। স্ত্রীটির দিকেও লক্ষ্য নেই। অতিথি তো দূর-স্থান। কৃষ্ণা বলে, দুপুরে আজ আপনার যাওয়াটা মাটি করে দিলাম। তারপর হঠাৎ থেমে বলে, ভালো কথা, আপনি একটু আগে আমার ভয়ের কথা বলছিলেন না?

বললাম, হ্যাঁ।

মোটরবাইকে ভয় করে না। জানেন, ভয় করে বনের মধ্যে।

কেন, ভয় কেন? আমি অবাক হয়ে তাকাই। পরমুহূর্তে সুর পাল্টে বলি, তা জীবজন্তুর ভয় তো করবেই।

অফিসার এতক্ষণ পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্বয়ং ফরেস্টকে বিয়ে করেও জীবজন্তুর ভয়! আপনি আমার মিসেসকে অপমান করলেন দেখছি!

বীট অফিসার যাই বলুন, অফিসার-পত্নী কিন্তু ঠাট্টার সুযোগ পেয়েও নেয় না। বলে, সত্যি কথা বলছি আপনাকে। ওঁর সঙ্গে মাঝে-মধ্যে বনে গিয়েছি। দুপুরবেলা। চারদিকটা কেমন নির্জন ছায়া ছায়া। আর ঠান্ডা বাতাস বইছে সর্বক্ষণ।

আর ঠান্ডা বাতাসের চাইতে আর কি ভয়ংকর হতে পারে বলুন! বীট অফিসার কৃত্রিম গাম্ভীর্যে গলা ভরিয়ে হঠাৎ আমাকে জানতে চাইলেন।

কৃষ্ণা বলে, জানেন, এই নিয়ে কী ঠাট্টাই যে উনি করেন! বুঝি ওঁর কথাই সত্যি। আমার ভয় পাওয়া উচিত না। কিন্তু তবু বনের ভিতরে গেলেই যেন গা ছমছম করে।

হয়ত এটা অনভ্যাসহেতু। মনে মনে ভাবি। পরীক্ষা করে দেখা চাই। খাওয়াদাওয়ার পর বীট অফিসারকে সঙ্গে করে যাই। কৃষ্ণাও আছে। বাংলোর পিছনেই অরণ্য। তবে ফাঁকা। তার ভিতর দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা ধরে এগোই। একরাশ পাখির কিচি-মিচি। বড় বড় গাছ। তলায় বেতঝোপ। ঝিঁঝির ডাক। বীট অফিসার বলেন, দেখুন, ওটা একটা হর্তুকি গাছ।

জীবনে হর্তুকি গাছ এই প্রথম দেখলাম। কী যে আছে, আর কী নেই এই বনের মধ্যে ভাবি।

কৃষ্ণা, ওই হর্তুকিটা ওঁকে দাও। বীট অফিসার দেখালেন।

হাত বাড়িয়ে নিই। নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আশ্চর্য, আমারও ভয়-ভয় করে দেখছি। বাংলো ছেড়ে ক' ফার্লং-ই বা ভিতরে এসেছি? তবু এর নির্জনতায় গা-ছমছম করে। বেলা দেড়টাও বাজেনি দেখছি হাতঘড়িতে। অথচ এখন মনে হচ্ছে বিকেল হয়ে গেছে।

মিসেসকে বললাম, আপনি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ। দেখুন না আমারও অবিকল একইরকম অনুভূতি।

অর্থাৎ আপনারো ভয় করছে! হো-হো করে হেসে উঠলেন বীট অফিসার।

বললাম, এটা নিছক অনভ্যাস। ভয় আপনার যে নেই তাতে কিন্তু যাদুর কিছু দেখছি না।

মজা পেয়ে কৃষ্ণা বলে, বোঝান—বোঝান দিকি ওই কথাটা ওঁকে।

বললাম, বোঝানো যাবে না।

কারণ উনি বুঝবেন না বলে পণ করে আছেন, একটু থেমে তারপর বললাম। দ্রুতগতি কাঁধ থেকে নামিয়ে নিলাম ক্যামেরাটা। আজ দুদিন ওটার সদ্ব্যবহার হয়নি। বললাম, দাঁড়ান দিকি দুজনে। চটপট্। বুনো দম্পতির একটা ছবি তুলে নিই। ওয়ান সেকেণ্ড প্লীজ। ওয়ান—টু—থ্রী!

শাটার ক্লিক করে উঠল।

কৃষ্ণা বলে স্বামীকে, তুমি কিন্তু আপত্তি করলে না গো। কোথায় এ আতিথেয়তা করলাম। তার বিনিময়ে কমপ্লিমেন্টস্-টা শুনলে তো? বুনো দম্পতি বানিয়ে দিলেন। [ক্রমশ

ঠিক সেই মুহূর্তেই খবরটা এল। কিংবা বলা যেতে পারে বার্তা পাওয়া গেল। ভয়ানক বার্তা। জংশন স্টেশনের বড়বাবু ফোন হাতে চমকে উঠলেন। চোখে-মুখে ভয়, আতঙ্ক। দীর্ঘ চাকরীর জীবনে এ ঘটনা ঘটেনি। নতুন, অভিনব। মুহূর্তে তিনি সংবাদটা জানালেন উপরওয়ালাকে। সেখান থেকে ফোন গেল অন্যত্র। তাঁরাও বসে রইলেন না। এমনিভাবে ফোনে ফোনে খবরটা শিকলের মত খোদ জায়গায় পেঁছিল। তাঁরা রিসিভারটা তুলে জি· আর· পি অর্থাৎ রেলের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে হুকুম দিলেন, "এখনি আর্ম ফোর্স চলে যাক ঘটনাস্থলে...এতটুকু বিলম্ব নয়।" জি· আর· পি'র হেডকোয়ার্টার থেকে সে নির্দেশ এই জংশন স্টেশনের পুলিশ-ক্যাম্পে এল, "এক্ষুণি স্পটে চলে যেতে হবে...কিন্তু পুলিশ দলের সঙ্গে থাকবে মালবাবু।"

স্টেশনের বড়বাবু খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। যাক্, নির্দেশ এসে গেছে! দায়িত্বটা অনেক হাল্কা।

সেই মুহূর্তেই মালবাবুকে ডাকিয়ে আনা হল। অল্পবয়সী সুঠাম স্বাস্থ্যের এক ছোকরা। ঢুকেই ব্যাপারটা শুনে একটু দমে গেল। আপন মনে বলল, সিরিয়াস। —অর্থাৎ ভয়ানক।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "কিন্তু স্যার, এই প্রায় আটটা বাজস...স্পটে যাবার উপায়?"

"উপায়?—স্টেশনমাস্টারও খানিকটা ভাবনায় পড়লেন। ক্যারেজ ডিপার্টমেণ্টে ফোন করে জানলেন কোন গাড়ি নেই।

'খালি মালগাড়ি?'

'নেই।'

'রিলিফ ভ্যান?'

'অকেজো।'

'জোড়াতালি দিয়ে কিছু?'

'তাও সম্ভব না'—

এবার স্টেশনমাস্টার ফোনে ধমকে উঠলেন। ক্যারেজ ডিপার্টমেণ্টকে বললেন, 'যেমন করে হোক দুটো বগী সহ একটা ইঞ্জিন পাঠাতে হবে...সন্ধ্যা নামবার আগেই স্পটে আমার ফোর্স পাঠান দরকার।' অতঃপর মিনিট পঁচিশের মধ্যে একখানা ইঞ্জিন এসে স্টেশনের সামনে দাঁড়াল। সঙ্গে দুটো বগী। একটা মালগাড়ির, দ্বিতীয়টা গার্ড ভ্যান।

চটপট প্রস্তুত হল সবাই। পিছনের বগী দুটোতে রইল আর্ম ফোর্স আর মালবাবু পরমেশ এসে উঠল ইঞ্জিনটার মধ্যে। সঙ্গে একজন ড্রাইভার ও ফায়ার-ম্যান।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা প্রায় নেমে এল। সূর্য ডুবু ডুবু। দূরে দূরে আবছা রহস্যময় অন্ধকার নামছে। গাড়ি চলল গন্তব্য স্থলে। এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরের এক স্টেশনে। ঘণ্টা চারেকের পথ। এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে সেখানে। ভয়াবহ। অতর্কিতে হানা দিয়েছে বর্গী। জঙ্গল থেকে নেমে এসেছে নদীর তীরের এ ছোট্ট স্টেশনটায়।...

সময়টা চলছিল তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। বৈশাখের কিংবা জ্যৈষ্ঠের শুরু—ঠিক মনে নেই। সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে দারুণ খাদ্যের অভাব। মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির, শস্যক্ষেত্র দগ্ধ, এমন কি ঘন অরণ্যও পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আকাশটা তামাটে, সারাটা দিন ধরে আগুনের ফুলঝুরি ঝরে। মাঠ, খাল, বিল শুকনো। সেই শীতের প্রারম্ভ থেকে একফোঁটা মেঘের আভাষ নেই। কেবলই লকলকে জিহ্বা দিয়ে ক্রুদ্ধ সূর্য ধরিত্রীকে চেটেপুটে খেতে চাচ্ছে। এর নাম খরা—যা দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছে। সমস্ত এলাকা তখন খরার করাল রুদ্ধগ্রাসে। চারদিকে খাদ্যের

অভাব। শুধু নাই, নাই, নাই। প্রথমে এটা-ওটা, তারপর সেটা—এমনিভাবে গরু, ছাগলের মত সাধারণ মানুষেরাও আনাচ-কানাচ আর জঙ্গল থেকে শুরু করে আধহাত মাটি পর্যন্ত খুঁড়ে বেড়াতে লাগল। কচু, কন্দ, মূলের দরকার। সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আক্রমণ থেকে বাঁচবার এক মরণপণ প্রচেষ্টা। কিংবা বলা যেতে পারে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মরণের জালে জীবন সমর্পণ। যাক্ সে কথা। যা বলছিলাম.. সেই দারুণ খাদ্যাভাবের ঢেউ দূরের সাঁওতাল অধ্যুষিত পাহাড়ী অঞ্চলটাতেও ভয়ানক আঘাত করল। যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা। এমনিতেই বারমাস এদের মরে টান, তারপর এবারের নতুন উপসর্গ—খরা। জীবনই টিকিয়ে রাখা দায়।

ওদের ক্ষুধার দিনগুলো যেন আর ফুরোয় না। ফাঁদে পড়া জন্তুর মত মানুষগুলো কেবলই ছটফট করে। বন-বাদাড় ঢোঁড়ে, পাহাড় থেকে নেমে শহরে হানা দেয় মেয়ে-পুরুষ দলে দলে।—

এমনি অবস্থায় ক্ষুধার তাড়নায় এক দল সাঁওতাল ঐ পাহাড় থেকে নেমে রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি নেকড়ের মত হানা দিল এই ছোট্ট স্টেশনটার ওপর। নদীর পারে স্টেশন; স্টীমার-ঘাটা আছে। এপারের মাল নদী বেয়ে চালান যায় ওপারে, সেখান থেকে আবার রেলগাড়ি বয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে। তাই এ ছোট্ট স্টেশনটার গুরুত্ব অনেক।

যেদিন এ ঘটনা ঘটে, সেদিন স্টেশনে সাইডিংসে দশ বগীর এক মালগাড়ি অপেক্ষা করছিল। প্রতি বগীতে চল্লিশটি বস্তা করে চাল। ক্ষুধার অন্ন। এপার থেকে মাল স্টীমারে তুলে দিয়ে ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে আবার রেলে বিভিন্ন প্রান্তে। তাই...

অন্ধকার চিরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। দুপাশে জনবসতিহীন উঁচু-নীচু ধু ধু মাঠ। মাঝে মাঝে পাহাড়ি টিলা,—শাল, মহুয়া আর ছোট ছোট ঘর-বাড়ি। সাঁওতাল কিংবা ও ধরনের লোকেরা থাকে।

ইঞ্জিনে দাঁড়িয়ে মালবাবু পরমেশ এ ঘটনাটা নিয়েই অনেক কিছু ভাবছিল। এলোমেলো তালগোল পাকান চিন্তা। উত্তেজনা, আতংক এবং কর্তব্যনিষ্ঠার রোমাঞ্চ তাঁর সমস্ত হৃদয়ে।

ছেলেটি নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, একেবারে কলেজ থেকে পাশ করেই। এখনও গা থেকে গন্ধ যায় নি। কিছুটা ভাবুক এবং আদর্শবাদী। তাই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল যেমন করেই হোক, যে ভাবেই হোক, এ লুঠতরাজ ঠেকান দরকার। দেশ, সমাজের পক্ষে এরাই হল দুষ্ট-ক্ষত—এই বগীঁরা। ছোটবেলা থেকেই মনে মনে পরমেশ এদের ওপর এক তীব্র ঘৃণা পোষণ করত। কোনপ্রকার আইন-ভঙ্গকারীকে সে সহ্য করতে পারত না। মাঝে মাঝে এ নিয়ে কলেজে সে দু'-চারটে বক্তৃতাও দিয়েছে। যারা আইন-ভঙ্গ করে, তারা দেশের শত্রু। বহুদিন সে কাগজে উচ্ছৃংখল, আইনভঙ্গকারী জনতাকে ছত্রভংগ করার জন্য পুলিশের গুলীচালনাকে স্বাগত জানিয়েছে। তাই আজ এমন একটা ঘটনার দায়িত্বে নিজেকে জড়াতে পেরে,—মনে তার গর্ব। যেমন করেই হোক বগীঁদের সে ঠেকাবে। জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের।...

হঠাৎ একটা বাধা। চিন্তার সুর গেল কেটে। অন্ধকার পথে, জঙ্গলের ফাঁক থেকে গাড়িটার ওপর তীর পড়তে লাগল বৃষ্টির মত। সট্ সট্। পড়েই আগুনের ফুলঝুরি ছোটে। পরমেশ চমকায়। আড়াল করে নেয় নিজেকে। কিন্তু অন্ধকারটা এতই জমাট—ঠিক কয়লার মত যে, তীরগুলোর দিক ঠাহর করতে পারে না সে। বুঝল, ওরা বাধা দিচ্ছে। বগীঁরা। পুলিশ সহ এ গাড়িকে স্টেশনে পৌঁছতে দিতে চায় না। কিংবা রাস্তায় যতটা সময় আটকে দেয়া যায়, সেটাই লাভ। সমস্ত চাল লুঠপাট করবে তারা। ক্ষুধা ওদেরকে উন্মাদ করে তুলেছে। নিজেরাই আইন হাতে নিয়েছে।

একটু বাদে চলন্ত গাড়ি থেকেও প্রতিবাদ গেল। আর্মড ফোর্স বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ চালাল বুম্ বুম্। অন্ধকার থেকে তীর এসে বগীর গায়ে ক্রোধে ঠিকরে পড়ে। আগুনের ফুলকি ছোটে চিক্ চিক্। ফাঁকা আওয়াজ যায় বুম্ বুম্। যেন বলে দেওয়া হয় 'খবর্দার, আর নয়! আমরাও প্রস্তুত।' এমনিভাবে বেশ কিছুটা পথ চলার পর গাড়িটা ব্রেক কষলো। স্স্-স্স্-স্। পরমেশ একটু হকচকিয়ে ড্রাইভারকে বলল, "কি ব্যাপার, থামাচ্ছেন যে! সামনেটায় দেখুন"---

ইঞ্জিনের সার্চলাইটটা পড়েছে সামনে। মালবাবু হাতলটা ধরে একটু ঝুঁকে পড়ল। সত্যিই গাড়ি আর এগোবে না। সামনে লাইনের ওপর জনা-পঁচিশেক অর্ধোলংগ প্রেত-ছায়া। হাতে মশাল। গাড়ির তীব্র আলোতে কারও চাউনিতে অবাক বিস্ময়। বোধ-কারও চাউনিতে অবাক বিস্ময়। বোধ হয় ক্ষুধার দৃষ্টি। কিম্বা খরার রুক্ষতা।

পরমেশ ঘাবড়ে যায়। স্টেশনটা প্রায় এসে গেছে, আর কয়েক মাইল মাত্র। এই সময় গাড়ি আটকে দিল। এরা বগী—আইন মানে না, কানুন জানে না, যা খুসী করে বসে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। এই জন-হীন, নিঃসীম অন্ধকারের বুকে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মিনিট মাত্র সে নিজেকে ভয়ানক অসহায় বোধ করেছিল। কি করবে সে? কিন্তু একটু বাদেই রেলের স্লিপারের খট্ খট্ আওয়াজ তুলে সার সার নেমে এল রেলরক্ষী। হাতে উদ্যত বন্দুক। ও ক'টা প্রেত-ছায়াকে যে কোন মুহূর্তে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে।

পরমেশও নেমে এল। চারদিক নিস্তব্ধ কেবল নানান জঙ্গলেপোকার বিচিত্র সুর এবং ইঞ্জিনের একটা ভৌতিক আওয়াজ। এই নিস্তরঙ্গ অন্ধকারে হাওয়া বোধহয় গুমোট মেরে গেছে। তাই ঊর্ধ্বশিখায় মশাল-গুলো জ্বলছিল। কোন কাঁপন নেই। প্রেত-ছায়ারাও স্থানু। কেবল মৃদু লয়ে খট্ খট্ খট্ আওয়াজ। বন্দুকধারীরা এগিয়ে চলেছে ওদের সামনে। মুখোমুখি এসে পরমেশ দাঁড়িয়ে পড়তেই, প্রেত-ছায়াদের চোখগুলো কেঁপে কেঁপে উঠল। কোন ভাষা নেই।

হঠাৎ এক বৃদ্ধা উঠল কেঁদে।

"মুদের চাল দে বাবু!......বাবু গো।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও ছ'-সাতজন প্রেতিনী। কিচির-মিচির করে কাঁদতে কাঁদতে এদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়।

'দে বাবু, বাবু গো!'

পরমেশ দু' পা পিছিয়ে আসে। সব মায়া-কান্না। তবে লুঠপাট করতে গেলে কেন! পুলিশরা এক পা নড়ল না, বন্দুক বাগিয়ে স্থির হয়ে রইল। দূরে দূরে অন্ধকারের ঢেউ, বোধহয় শালবন। যে কোন মুহূর্তে তীরের ঝাঁক এসে পড়তে পারে। তাই পুলিশরা সময় নষ্ট করতে নারাজ।'

'হঠ যাও।'—প্রথম গর্জন করে উঠল একজন রক্ষী। 'লাইনসে হঠ্ যাও।'

ওরা ভয় পেল না। ক্রমে মশাল-গুলো আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল। গোলাকারভাবে ঘিরে ধরেছে।

হঠাৎ একজন অফিসার বলল, "আপনি হুকুম দিন! এক্ষুণি..." রাই-ফেলটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিল সে।

কিন্তু এ যেন মিনতির বন্যা, ক্রন্দনের সমবেত সুর। একসঙ্গে সব ক'টা প্রেত-প্রেতিনী কেঁদে কেঁদে ভিক্ষে চায়। তাদেরকে দু' মুঠো চাল দেয়া হোক। কেউ একদিন, কেউ তিনদিন—কেউ কেউ দীর্ঘদিন ধরে ভাতের স্বাদ ভুলে ঘাস-পাতা সেদ্ধ করে খেয়েছে। তাই ইঞ্জিনটার আরও কাছে এসে ছেঁকে

ধরল সবাইকে। চাল না দিলে গাড়ি যেতে দেব না।...

ঘণ্টাখানেক ব্যয় হয়ে গেল। লাইনের 'পর শুয়ে পড়ল সবাই। 'বুকের ওপর দিয়ে যা।'—এবারও সেই কাঁদ কাঁদ স্বরে মিনতি। রক্ষীদের বড়বাবু এবার আর ধৈর্য রাখতে পারল না। কাছে এসে পরমেশকে প্রায় ধমকের সুরে বলল, "কি করতে চান?...এদের মতলবটা বুঝেছেন?" মতলবটা উনি বুঝিয়ে দিলেন। এমনিভাবে পথের মাঝে ট্রেনটা আটকে রেখে, স্টেশনের মালগুলো সমস্ত লুঠ-পাট করবে। এ সব কান্না, অনুনয়, পূর্বকল্পিত। বগীদের শিখিয়ে দেওয়া।

'স্পটে গিয়ে দেখব, এক কণা চাল নেই, বুঝলেন?' অফিসারের এ যুক্তি পরমেশের মাথায় ঢুকল এবার। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটাকে খানিক চেপে রেখে বলল, "বেশ! বলুন কি করার আছে?"

"এই মুহূর্তে গাড়ি চালাতে বলুন—"

"লাইন পরিষ্কার?"

"আমার দায়িত্বে।"

"বেশ।"

সমস্ত আর্ম ফোর্সকে গাড়িতে উঠতে বলা হল। পরমেশ আর ড্রাইভার গিয়ে উঠল ইঞ্জিনটায়। অফিসারটি লাইন থেকে নেমে পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে শক্তভাবে বাগান বন্দুক।

"এ্যা-ও"—বিকট একটা চীৎকার অন্ধকারে ভেসে আওয়াজ তুলল দূরের শালবনে। বগীদের আস্তানায়।

"লাইন সে আভি হট্ যাও...নেই তো"—প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দিল কথাগুলো।

"এ-ক"—কেউ ওঠে না।

"দো..."—পাঁচটি প্রেতিনী ড্যাবা-ড্যাবা চোখে মাথা তুলে বসল। আর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড। দূরে একটা রাত-জাগা পাখী হুতোম গলায় ডেকে উঠল "হু-য়া, হু-য়া, হু-য়া।"

"তি-ন"—

'দুরুম', 'দুরুম'। বারুদের গন্ধে ভরে উঠল বাতাস।

দু' দুটো লাশ পড়ে যেতেই সব মশাল পড়ি-মরি করে ছুটল পাশের জঙ্গলে, ঊর্ধ্বশ্বাসে। 'লহু, লহু'—অর্থাৎ রক্ত ঝরেছে। প্রেত-প্রেতিনীরা ভীত। চোখের পলকে যে যার সরে পড়তেই গাড়ি ছেড়ে চলল। ঘস্ ঘস্ ঘস্। যেন মুখ থুবড়ানো লাশ দুটো এক আঁজলা জলের আশায় কাতরাচ্ছে 'হাপ্স্', 'হাপ্স্' 'হাপ্স্'।

স্টেশনে এসে পৌঁছন গেল গভীর রাতে। বগীরা সবে সরে পড়েছে। নদীর ধারে স্টেশনের সাইডিংসে গাড়িটা দাঁড়ান। পরমেশ মাল ইনস্পেকসন করল। প্রতি বগি থেকে ছ' বস্তা লুঠ—মোট ষাট বস্তা। চারশ' থেকে এখন রইল তবে তিনশ' চল্লিশ।

একটু নির্জনে, নদীর ধারে একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ এসে দাঁড়াল পরমেশ। সমস্ত স্নায়ুগুলো তার চঞ্চল। একটু বিশ্রাম দরকার। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল মুখে। সমস্ত ঘটনাটা তার মনে ঘোড়-পাক খেতে লাগল। কর্তব্য, না হৃদয়? আইন, না অনুভূতি? এ দুয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে পরমেশ মনে মনে বলল, 'কর্তব্য।' সে তার কর্তব্য করেছে। এ কাজ তার নিজের নয়, দেশের—জনগণের। সে বগীদের হটিয়েছে। সে আইনকে স্থান দিয়েছে অনুভূতির ওপর। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে-ফিরে যখনই 'হাপ্স্ হাপ্স্'—করুণ আর্তনাদ তার কানে বেজেছে—মন কঠোরভাবে বলেছে 'আইন'। সে আইনকে রেখেছে ঠিক। তাই নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে সে একটু তৃপ্তিবোধ করছিল। ছেলেবেলায় কলেজে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেয়ার পর যেমন সে অনুভব করত।

হঠাৎ ডাক পড়ল। স্টেশন মাস্টার ডাকছেন। পরমেশ সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে দিয়ে হাতে হাত ঘসে নিল। গিয়ে একটা স্টেটমেণ্ট অর্থাৎ রেলের উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে বিবরণী দিতে হবে। কতটা মাল ছিল, কতটা লুঠ হয়েছে, বাকি রইল কত, এর একটা হিসাব। হয়ত এজন্যই স্টেশন মাস্টার ডেকেছে।

ঘরে ঢুকে দেখল বেঞ্চি, চেয়ারে অনেকেই বসা। স্টেশন মাস্টার, এ্যাসিস্টেণ্ট, আর্মফোর্স এবং আরও অনেকে। পরমেশ সবাইকে চেনে না। চেনারও তার কথা নয়। বোধহয় পথের ঘটনাটা নিয়ে সবাই মশগুল।

মালবাবু ঘরে ঢুকতেই সবার গলা একটু নেমে এল। স্টেশন মাস্টারকে বলল "স্টেটমেণ্টের জন্যে ত?...ফর্মটা দিন।"

সমস্ত ঘর স্তব্ধ। স্টেশন মাস্টার উঠে ফর্মটা এগিয়ে দিল। পরমেশ কলমের খাপটা খুলতে খুলতে মনে মনে হিসেব করল মোট চারশ' থেকে ষাট গেলে রইল তিনশ' চল্লিশ। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে জানান হচ্ছে যে, লুঠপাটের পর ষাট বস্তা চলে যাওয়ায় এখন চারশ' থেকে রইল তিনশ' চল্লিশ।...

ঠিক সেই মুহূর্তেই বন্দুকের শীতল নলটা পরমেশের বুকের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সামনে আর্ম ফোর্সের অফিসার। সেই 'এ-ক,' 'দো—', 'তি-ন' 'দুরুম, দুরুম'। সমস্ত ঘরময় যেন নেকড়ের থাবা। স্টেশন মাস্টারের টেবিলের 'পরে চকচকে ছুরির ফলাটা, পরমেশ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। এবার ঝলসে উঠল।

'লিখুন, এক কণা চাল নেই, সমস্ত বগীরা লুঠ করেছে।'

পরমেশের চোখ দুটো পাথর। কলম অচল।

"ভয় নেই, ভাগ আপনার পকেটেও যাবে।"

"কিন্তু ও মালগুলো!"

পরমেশের গা থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম বেরোতে থাকে।

এবার ইশারায় ঘরে ঢুকলো চারজন অচেনা। সমস্ত কিছু রহস্যময়। লেনদেন থেকে শুরু করে তাদের চলে যাওয়া পর্যন্ত।

যাওয়ার সময় শুধু শেঠজীরা বলে গেল "ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মাল খালাস হবে—আমাদের সব রেডি।"

ফর্মটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন একখানা হাতে ধরিয়ে দিল স্টেশন মাস্টার। পরমেশ লিখল কঠোরভাবে আইন রক্ষার চেষ্টা করেও কিছু বাঁচান গেল না। এমন কি একটি কণাও সাক্ষী দেয়ার জন্য পড়ে নেই। অন্ধকার জঙ্গল থেকে নেমে এসে সমস্ত কিছুই বগীরা...। মাথার মধ্যে 'হাপ্স্ হাপ্স্' আর্তনাদটা ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করায় লেখা থামিয়ে সে ঘরের ভায়াগুলোর দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর একবার তাকিয়ে নিল, কারণ শিরদাঁড়াটা তার ভয়ানক ব্যথা করছে।

---

**ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৯২৪)—** ভ্লাদিমির, মায়াকোভ্স্কি। সিদ্ধেশ্বর সেন অনূদিত (আগস্ট, ১৯৬৯)। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দাম ঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লেনিনের জীবনাবসানে বিপ্লবের চারণ কবি মায়াকোভ্স্কির রচিত ৪০০০ পংক্তি সম্বলিত 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' একালের একটি ঐতিহাসিক মহাকাব্য। লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘরূপে ৯, ১০ ও ১১ পর্বের কিছু অংশ বাদে প্রায় সমগ্র কাব্যটির বাংলা অনুবাদ কবি সিদ্ধেশ্বর সেন বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

অদম্য বিপ্লবী বীর্যাচারী কবি যোদ্ধা মায়াকোভ্স্কির (১৮৯৩—১৯৩০) কাব্য স্পর্ধিত, দৃপ্ত, বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত। 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' মহাকাব্যে সিঁড়িভাঙা পংক্তিতে পংক্তিতে শ্রুত হয় বিপ্লবের বজ্র-নির্ঘোষ এবং সৈনিকের জুতোর কুচকাওয়াজ।

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪, ২১শে ফেব্রুয়ারী) পর তাঁর শবাধারটি গোর্কি থেকে মস্কোয় নিয়ে এসে রাখা হয় ট্রেড ইউনিয়ন হাউসের হল অব কলামস্ কক্ষে। মহাশোকের এই মুহূর্ত থেকে মহাকাব্যের আরম্ভ। তারপর ক্রমে ক্রমে এসেছে ইতিহাসের বিবর্তনের কথা, পুঁজিপতিদের উত্থান ও পতন, রুশ বিপ্লবের জ্বলন্ত অধ্যায়গুলি, লেনিনের অবিস্মরণীয় আবির্ভাব, জনগণের ও নেতৃবৃন্দের বৈপ্লবিক চেতনা, সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

এই মহাকাব্যকে কবিতায় অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ জেনেই বোধ করি সিদ্ধেশ্বর সেন-এর আগে কেউ এ কাজে হাত দেন নি। 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন'-এর অনুবাদ বাংলা ভাষায় এই সর্বপ্রথম এবং অক্লান্ত নিষ্ঠা ও সততার সংগে অনুবাদক তাঁর গুরুকর্তব্যভার পালন করেছেন। মূল কাব্যের প্রাণতরঙ্গ অনূদিত কাব্যেও স্পন্দিত, প্রবাহিত। মনেই হয় না যে, অনুবাদ পড়ছি। একালেই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী ও উপমা নিয়ে, ভাঙা বাঁকা ছন্দের খেয়ালিপনা নিয়ে, ধ্বনি ঝঙ্কার নিয়ে, বিপ্লবের অগ্নি অক্ষর নিয়ে আমাদের মধ্যে জীবন্ত অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন ঃ

'হেঁটে যায়
কুচকাওয়াজে
সমগ্র শ্রমিক বিশ্ব,
সার্থক জীবন্ত
লেনিনের অস্তিত্ব।'

অথবা,

'বিশাল রসাল ফল
উঠবে পেকে
টসটসে বিপুল—
সে অঙ্কুর আজকেরই,
রক্তবর্ণ
অক্টোবর ফুল।'

অনুবাদক শুধু কঠোর শ্রম স্বীকারই করেন নি, আলোচ্য কাব্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যত্নের সংগে উপযুক্ত শব্দ চয়ন করেছেন, বাক্য বিন্যাস করেছেন, সংগে সংগে মায়াকোভস্কির উদাত্ত গম্ভীর ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাবসম্পদও যথাযথ বজায় রেখেছেন। দেখা যায়, তাঁর অনুবাদ সাবলীল, জীবন্ত ও সুষমাপূর্ণ, ইংরাজী অনুবাদের সমকক্ষ, সময় সময় ইংরাজী অনুবাদকেও ছাড়িয়ে গেছেন—

It's time that I bey an
the tale of Lenin,
but not because
no suffering yet remains.
It's time because
the bitter bewildered
complaints
are turned
to a mastered penetrated pain.
It's time to refashion
his words with their
stormy drive.
Shall we then
pour our spirits out.
No man is alive
as Lenin is still alive,
our knowledge, our power,
The weapon left in our keeping.
(Jack Lindsay
কৃত অনুবাদ)

এর সঙ্গে তুলনীয় ঃ

'সময় হয়েছে—
এখন এবার ধরি গাথা লেনিনের।
এ নয় এমন
দুঃখ এখন ক্রমঃক্ষয়ী
সময় এখন
যেহেতু তীব্র যন্ত্রণা
এ প্রাণের,
সময় হয়েছে
প্রমিত-গভীর
হৃদয়ের ক্ষতবাহী।
সময়, ছড়াও
লেনিন-স্লোগান
ঘূর্ণী প্রভঞ্জনী,
সাজে আমাদের
অশ্রুর ধারা
বর্ষণে ?
লেনিন
এখন জীবন্ততম জীবনের নাম—
ধ্বনি
আমাদের জ্ঞান,
অস্ত্র ও বল,
ক্ষমতা পরাক্রমে।

অথবা—

Lenin's forehead
was all you saw
and Nudezhda konstantinovna
behind
in the haze,
may be eyes less full of tears
could show me more..
It's through clearer eyes
I have looked on gludder days.
(Dorian Rottenberg
কৃত অনুবাদ)

এর সঙ্গে তুলনীয়ঃ

'এখন কি দেখা যায় ?
লেনিনের ললাট
বিশাল,
নাদেজ্দা কনস্তান্তিনোভনা
দাঁড়িয়ে দূরে নিষ্কম্প নিবাত
যেন কুয়াশায়.....
হয়তো বা,
অশ্রুবাষ্পহীন দৃষ্টি
আরও দূর ভবিষ্যতে ভেসে যায়—
এরকম চোখে আমি
কখনো করি নি দৃষ্টিপাত।'

গ্রন্থারম্ভে নাতিদীর্ঘ ভূমিকাটি মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। কাব্যটি অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করা হয়।

এই কাব্য অনুবাদ … … নিদ্ধেশ্বর তিনি তাঁকে অধিকতর … করলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অনূদিত কাব্য হিসাবে 'ভ্যাদিমির ইলিচ লেনিন' বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন। এমন একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করার জন্যে বাঙালী পাঠক সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। আমরা কবি অনুবাদক সিদ্ধেশ্বর সেনকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

**নেফা—সুন্দরী নেফা**ঃ বাসুদেব বসু। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্যঃ সাড়ে চার টাকা।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী। সংক্ষেপে নেফা। ভারতের উন্নততর অঞ্চলগুলি থেকে আমাদের দেশের এই অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনধারা, এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখ এবং ভয়-ভাবনার কথা কল্পনা করা যায় না। নেফার কামেং ডিভিসনে মনপাস, আকাস, সেরদুকপেনস আর মিকিস, সুবর্নসিরি অঞ্চলে ডফলাস এবং অন্যান্য অঞ্চলে আরও কতরকম উপজাতি আছে। বিচিত্র এদের জীবনযাত্রার প্রণালী। অরণ্য-সংকুল অঞ্চলগুলিতে কত বিপদ-আপদের মাঝে নেফার মানুষের জীবন কাটে। ঘরোয়া আলোচনার ভংগিতে লিখিত বাসুদেববাবুর এই গ্রন্থটি সুলিখিত এবং চিত্তাকর্ষক। নেফা নিবাসী বিশ্বনাথ … চক্রবর্তী, পোস্টমাস্টার, তাঁর পত্নী এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানীয় নরনারীর চরিত্র বিশেষ দক্ষতার সাথে চিত্রিত হয়েছে। এ রচনা সকলেরই ভাল লাগবে।

**প্রাচ্যবিদ্যাতরঙ্গিণী**. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সুবর্ণ-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, মূল্য ৬০ টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ১৯৬৯ সালে ৫০ বছর পূর্ণ হবার উপলক্ষে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রাচ্যবিদ্যাতরঙ্গিণী নামক যে সুবর্ণ-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে নানা কারণেই তা একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হবে। আলোচ্য গ্রন্থটির সম্পাদক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের পাণ্ডিত্য ও শ্রমনিষ্ঠার কথা সর্বজনবিদিত, তা নতুন করে বলার নয়। এই গ্রন্থটির সম্পাদনায় তিনি যে শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে আদর্শস্থানীয়। নিষ্ঠা, পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের গুণে সামান্য জিনিসও যে কত অসামান্য হয়ে ওঠে বর্তমান গ্রন্থটিই তার প্রমাণ।

সাড়ে পাঁচশো পৃষ্ঠার এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, ওই বিভাগের উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্রের বিস্তৃত ইতিহাস এবং সংশ্লিষ্ট ভারতীয় শিল্পকলার আশুতোষ মিউজিয়মের বিশদ বিবরণ। এই তিনটি রচনা বাংলাদেশে অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী প্রাচ্য-বিদ্যা তথা ভারততত্ত্ব অনুশীলনের বিবর্তন কিভাবে হয়েছে তার একটি নিখুঁত ও সর্বাঙ্গীণ চিত্র অঙ্কিত করেছে। এ ছাড়া প্রথম অংশে আরও দুটি প্রবন্ধ আছে, একটি হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত জার্নাল অফ এনসেন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা, অপরটি হচ্ছে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত একটি বিশেষ নিবন্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান স্মারক গ্রন্থটি স্যার আশুতোষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, মূলত যাঁর একক প্রচেষ্টায় একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগটি গড়ে উঠেছিল।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে আছে ষোলটি গবেষণামূলক রচনা। এইগুলির মধ্যে দুটি রচনা দুজন বিদেশী পণ্ডিতের। একটি রচনার নাম "সময় ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় ধারণা, লেখক ডঃ এ. এল. ব্যাসাম, যিনি ক্যানবারাস্থিত অস্ট্রেলীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপনা করেন। দ্বিতীয় রচনাটির নাম "মধ্য এশিয়া ও ভারতের মধ্যে প্রাচীন যোগা-যোগসমূহ", লেখক বিখ্যাত রুশ ভারততত্ত্ববিদ জি· এম· বনগার্ড লেভিন। বাকি রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দুটি লেখমালা সংক্রান্ত নিবন্ধ, একটির নাম "গোরথগিরি নগর" এবং অপরটি "জগমন্দ শিলালেখ", বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ এইচ. ডি. সাংকালিয়া পুণা জেলার পালা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত একটি ব্রাহ্মী লেখমালার উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ উপেন্দ্র ঠাকুর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত ভারতীয় অভিযাত্রী কৌণ্ডিন্যের পরিচয় ও তারিখের উপর তাৎপর্যপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার সাধু রাম রাজস্থানের চিতোরগড়ের মেনাল গ্রামে প্রাপ্ত ভাবসোমেশ্বরের একটি শিলালেখের পাঠ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্রে কর্মরত তিনজন গবেষকের তিনটি প্রবন্ধ বর্তমান সংকলনে স্থান পেয়েছে যেগুলি যথাক্রমে ডঃ সরযূপ্রসাদ সিং বিরচিত "চানাক গ্রামের প্রত্নতত্ত্ব", ডঃ এ· কে· চ্যাটার্জী বিরচিত "প্রাচীন ভারতে উৎকোচ ও ব্যভিচার" এবং ডঃ সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত "অর্ধনারীশ্বর ও একটি কণিষ্কের মুদ্রা"। বিখ্যাত ও· সি· গাঙ্গুলী একটি বিচিত্র ভারতীয় পাণ্ডুলিপির উপর একটি রচনায় বিশেষ আলোকপাত করেছেন। উড়িষ্যার উপর অনেকগুলি মূল্যবান রচনা বর্তমান সংকলনে স্থান পেয়েছে। সেগুলি হচ্ছে কাননগোপাল বাগচী রচিত "উড়িষ্যার সম্পদ ও জনসমাজ", ডি· পি· ঘোষ বিরচিত "উড়িষ্যার বৌদ্ধ শিল্প", জি· বি· ধাল রচিত "উড়িষ্যার ভাষাসমূহ ও বাক্‌ধারা", ভি· এস· আগরওয়ালা রচিত "হিন্দী সাহিত্যে কলিঙ্গ অঞ্চল" এবং ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল রচিত "মধ্যযুগে বাঙালী ওড়িয়া সম্পর্ক"। এগুলি ছাড়া স্বয়ং ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বিরচিত দুটি প্রবন্ধ আছে ঃ "রাজপুত ইতিহাসের সমস্যা" এবং "কুষাণ ইতিহাসের সমস্যা।"

প্রাচ্যবিদ্যাতরঙ্গিণীর তৃতীয় অংশে আছে জীবনী ও স্মৃতিকথা। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক এবং সেই সকল ছাত্র যাঁরা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের জীবনী বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মোট ৩৫ জনের জীবনী এখানে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁরা হচ্ছেন রাধাগোবিন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টেলা ক্রামরিশ, গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সরকার, অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শিশিরকুমার মিত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, নীরদবিন্দু সান্যাল, ত্রিদিবনাথ রায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, বিমলকান্তি মজুমদার, অতুলকৃষ্ণ সুর, বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনকুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার বসু, জীবেন্দ্রকুমার গুহ, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শচীন্দ্রকুমার মাইতি, উপেন্দ্র ঠাকুর, দেবকুমার চক্রবর্তী, চরণদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রেমধর চৌধুরী। গ্রন্থের সর্বশেষ অংশে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এম· এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। আরও একটি তালিকায় ওই বিষয়ে যাঁরা ডক্টরেট পেয়েছেন তাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

সর্বাঙ্গসুন্দর এই সংকলনটির ত্রুটি একটিই। বইটির মূল্য বড় বেশি করা হয়েছে।

বাণীর বিভিন্ন বিষয়ের প্রোগ্রামের, প্রসঙ্গত শিল্পী ও শিল্পকলা সম্পর্কে মাসিক বসুমতীতে পক্ষান্তরে আলোচনা করতেন "অগ্রহায়ন"। অনিবার্যকারণবশতঃ 'খবর বলছি' বিভাগটি কিছুদিন অনিয়মিত হয়ে পড়ে। অনিয়মিত হওয়ার দরুণ আমরা ঐ বিভাগটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখি। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিভাগটি বন্ধ রাখা হলেও, ক্রমাগত পাঠকদের কাছ থেকে পুনরায় বিভাগটিকে চালু করার জন্য আবেদন আসতে থাকে। এই বিভাগটি যে বেতারশ্রোতাদের একটি অত্যন্ত প্রিয় প্রসঙ্গ—তা অনুভব করে 'খবর বলছি' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল।

—সম্পাদিকা ]

## সংবাদ প্রচার

আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সংবাদ কি জাতীয় হবে?—এমন প্রশ্ন হয়তো উঠতে পারে। কারণ বেশ কিছুকাল ধরে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সংবাদের বিরুদ্ধে কোনো কোনো দল উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

আমরা এখানে কে কি বলেছেন, তা নিয়ে নতুন কোনো আলোচনার সূত্রপাত করা অবান্তর মনে করি। তবে, আকাশবাণী একচ্ছত্রাধিকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিরা একদা ভেবেছিলেন সংসারের হাল যাঁদের হাতে, তাঁদের গুণকীর্তন করলেই আকাশবাণীর মুখ রক্ষা পাবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একদলীয় আধিপত্য গেল, একদল—বহুদলে পরিণত হোল এবং ক্ষুদে ক্ষুদে দল-দলে মাথা তুলে দাঁড়াল।

এখন মুস্কিল হয়েছে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের। তাঁরা কার গুণগান করবেন? কারণ, এখন কম দুর্বল কেউ নন। সুতরাং আকাশবাণীর খবরদারী করার যুগ গেছে। তবু খবর তাঁদের বিলোতে হয়। তার নমুনা মাঝে-মধ্যে আপনাদের শোনাবার ইচ্ছে থাকল।

## হিন্দীর শূল

সংবাদ বিচিত্রায় একুশে ফেব্রুয়ারী কিছুটা স্থান পেয়েছিল নিছক তথ্য হিসেবে। কিন্তু আকাশবাণীর (কলকাতা) নীতি হিসেবে নয়। ভাষার ব্যাপারে আকাশবাণীর নীতি নির্ধারণ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ওপর। সে নীতি তো অনেকদিন আগেই ঠিক হয়ে গেছে। তাই কলকাতার আকাশবাণী ভবনে গেলে এখানের মাতৃভাষার দর্শন মেলে না, যা দেখা যায়—তা হচ্ছে ভবনটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিন্দীর লেবেল।

২৩শে জানুয়ারী, সোমবার গান্ধীজীর জীবনীর কিছু অংশ অনুবাদ ও পাঠ করে শোনালেন শ্রীক্ষিতীশ রায়। অনুবাদ ও পাঠ দুই-ই ভালো। কিন্তু সেদিন অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারীর রেশ ফুরোতে-না-ফুরোতে শোনা গেল এই ভারতে হিন্দীকে (হিন্দি+উর্দু) রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মহাত্মাজীর যুক্তিপূর্ণ বাণী!

মহাত্মাজীর কথা কোন্‌টাই বা থেকেছে? ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছে। ভারতবর্ষের একাংশে অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তানে এখন দুটি রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু। সুতরাং এই উপমহাদেশে মহাত্মাজীর কাম্য মাত্র একটিই রাষ্ট্রভাষা নয়, এখন তিনটি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠতা বহুবিশ্রুত। তবু গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে বার বার দাঁড়াতে হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা কি হবে, সেই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, দেউড়ির এক জায়গায় একটা আলো জেলে রেখে দিলে বাড়ির সব কোণে আলো গিয়ে পৌঁছয় না।

সব কোণে আলো না পৌঁছাক, হিন্দী ভাষার তো জয়জয়কার হবে! এরই নাম গণতন্ত্র!

১লা ফেব্রুয়ারীর স্মৃতির বুকে আকাশবাণী কলকাতা ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে যেভাবে হিন্দীর শূল দিয়ে বিদ্ধ করলেন, তার জন্যে আগামী বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসে আকাশবাণী, কলকাতা কিভাবে পুরস্কৃত হবেন—তা লক্ষ্য করার জন্য 'আমরা' অত্যন্ত আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকলাম।

## জনপ্রিয় কণ্ঠমাত্রেই ঐতিহ্যবাহী নয়

এবার আমরা একদিনের একটি অনুষ্ঠানের কথা পাড়ছি। অনুষ্ঠানটির নাম "মালঞ্চ"। মাঝে মাঝে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয় বলে এ থেকে নতুন নতুন সংগ্রহের রসাস্বাদ লাভ করা যায়। কিন্তু হঠাৎ সেদিন ২২শে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানটি বড়ই বেসুরো বাজল। ঐদিন পুরাতন নাটকের জনপ্রিয় কয়েকটি গান নির্বাচন করে শোনানো হোল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত, ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা এবং শিশির ভাদুড়ীর সীতা নাটকের গান বেছে নেওয়া হয়েছিল। এবং সেগুলি শুনিয়েছেন আধুনিক যুগের অর্থাৎ একালের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীরা। উদ্দেশ্য সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু উদ্দেশ্য কতোটা সার্থক হোল? দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, উত্তর-চাল্লিশ শ্রোতাদের নস্টালজিক চেতনায় সেদিন রসভঙ্গ হোল এবং হতাশার অনুভূতিই কেবল সংগৃহীত হোল। পুরনো গানের স্মৃতি জীবনের অন্যান্য স্মৃতির মতোই মহিমময় এবং মূল্যবান। অনেক সময় মনে হয়, সে আমলের 'হিট' হিসেবে পরিগণিত রেকর্ডগুলি সম্পর্কে আকাশবাণী, (কলকাতা) কর্তৃপক্ষ যদি সচেতন হন এবং তা সংগ্রহ করে শোনান তাহলে একালেও শ্রুতি বেশ সুখ অনুভব করতে পারে।

সেদিন 'মালঞ্চ' নামক অনুষ্ঠানটি শোনার সময় মনে হোল, আলিবাবার বিখ্যাত গান 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল, আমি বাদশা বনেছি', অথবা 'ঢের সহেছি আর তো সব না—চটুল হাল্কা প্রথায় গাওয়া হয় বলে এক রকম মানিয়ে গেছে। কিন্তু 'কানাকেষ্ট'র উদাত্ত উত্তাল সুরে গাওয়া 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' অথবা 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' এই গান দুটি মনে হয়েছে অন্য শিল্পী দিয়ে না শোনালেই ভাল হোত। বলা বাহুল্য, শিল্পীদের প্রতি ব্যক্তিগত কটাক্ষ আমরা করছি না। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধরনে নিজস্ব ধারায় যে সংগীত প্রচার করেন, সেখানে স্বমহিমায় তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত। ভুল হয়েছিল শিল্পী নির্বাচনেই। কোনো শিল্পী যদি 'পপুলার' হন, তাহলেও তাঁকে দিয়ে যে কোনো গান গাওয়ানো উচিত নয়। ঐ শিল্পীদের নামের মোহ বিস্তার করে এ যুগের ছেলেমেয়েদের ভোলানো যেতে পারে, কিন্তু বাংলা গানের ঐতিহ্যের কি হবে? তাই শিল্পী নির্বাচন সম্পর্কে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অব দি আর্ট অভ দি থিয়েটারে' শ্রেণ অভিনেতা, স্টেজ ম্যানেজার, দৃশ্যপট এবং গতিবিন্যাস সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার সারমর্ম তুলে দিচ্ছি :

**অভিনেতা**

মানুষ হিসাবে অভিনেতা অতি উচ্চস্তরের লোক। স্বভাবতই উদার হৃদয় এবং প্রকৃত কমরেডশিপের জন্য যা যা গুণের দরকার তা সবই এঁর মধ্যে পাওয়া যায়। ভাল অভিনেতার সাহচর্যও আনন্দদায়ক। রঙ্গমঞ্চে সবার মধ্যে একটা সাহচর্যের ভাব এঁরাই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক এবং অপরিণত অভিনেতাদের অকৃপণভাবে সবরকমে এঁরা সাহায্য করেন। এঁদের আলোচনা চলে বেশির ভাগ নিজেদের কাজের সম্বন্ধে। এঁদের আচার-ব্যবহারও অত্যন্ত চমৎকার। মঞ্চের যে কোন স্থানে দাঁড়িয়েও এঁরাই হয়ে পড়েন সেন্টার অভ এ্যাট্রাকশন।

বড় অভিনেতার কণ্ঠস্বরে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি থাকে যে তার দ্বারা অভিভূত না হয়ে কেউ পারে না। কিন্তু

হ্যামলেট—লাইটস্, লাইটস্, লাইটস্—১৯২৭

কণ্ঠ হিসাবে অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সঙ্গীত সম্বন্ধে সুধাকণ্ঠ কোকিলের জ্ঞানের মত। প্ল্যান বা ডিজাইন অনুসারে কোন কিছু করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর চরিত্রের সাধারণ ভাল দিকটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অভিনয়কালে তিনি ছাড়াও মঞ্চে আরও নটনটী আছে এবং সবার মধ্যে একটা ভাবের ঐক্য থাকা দরকার। কিন্তু যেহেতু এ বোধটি তিনি বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা না পেয়ে গুডনেচারড ইন্সটিংক্ট-এর দ্বারা পান, সেইজন্যই তাঁর অভিনয়ের ভেতর পজিটিভ ক্রিয়েশন-এর অভাব দেখা দেয়। ইন্সটিংকট এবং অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কয়েকটি জিনিস শেখেন যা অভিনয়ের কালে বার বার ব্যবহার করেন—"for instance, he has learned that the sudden drop from forte to piano has the power of accentuating and thrilling the audience as much as the crescendo from the piano into the forte. He also knows that laughter is capable of very many sounds, and not merely Ha, Ha, Ha."

মধ্যাভিনেতা জানেন যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে গেলে দুটি গুণ থাকা দরকার —জিনিয়ালিটি এবং বাবলিং পার্সন্যালিটি। কিন্তু যে কথা তিনি জানেন না, তা হচ্ছে এই যে—ইন্সটিংকট থেকে জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে যে সব জ্ঞান তিনি আহরণ করেছেন, তাদের দ্বিগুণ, চতুর্গুণ কার্যকরী করতে পারেন যদি সায়েন্টিফিক নলেজ অর্থাৎ আর্ট-এর দ্বারা পরিমার্জিত করে তাদের রূপায়িত করা হয়। অভিনেতা মনে করেন ইমোশান দিয়ে ইমোশান সৃষ্টি করা যায় এবং অভিনয়শিল্পে "ক্যালকুলেশনের" কোনই স্থান নেই। কিন্তু সমস্ত আর্টের মূলেই রয়েছে ক্যালকুলেশন এবং যে সব নট এ সত্যকে অগ্রাহ্য করেন তাঁরা কখনও সত্যিকার অভিনেতা হতে পারেন না। "Nature will not alone supply all which goes to create a work of art and it is not the privilege of trees, mountains and brooks to create works of art, or everything which they touch would be given a definite and beautiful form. It is the particular power which belongs to man alone and to him through his intelligence and his will."

হিংসার উন্মাদনায় মত্ত হয়ে শেক্সপীয়ার 'ওথেলো' নাটক রচনা করেন নি। 'ওথেলোর' বক্তব্য বিষয় তিনি ধীরভাবে ভেবেচিন্তে ঠিক করেছেন এবং তার সঙ্গে মিশিয়েছেন নিজের কল্পনাশক্তি। সুতরাং ওথেলো চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে যেমন একদিকে প্রকৃতিদত্ত অনেক গুণের অধিকারী হওয়া দরকার, তেমনি আবার গভীর কল্পনাশক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রাচুর্য থাকা চাই। যার বুদ্ধি যত বেশি তীক্ষ্ণ সে সেই অনুপাতে ভাবাবেগ সম্বন্ধে সাবধান। সে একথা বেশ ভালভাবেই জানে যে সৃষ্টির অনেকখানিই নির্ভর করে ভাবসংযমের উপর......

[ উপরের কথাগুলো ভেবে দেখলেই অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়ের সাজাহানের সঙ্গে শিশিরকুমারের সাজাহানের অভিনয়ের তফাৎটা বোঝা যায়। অহীন্দ্রবাবুর সাজাহানের চরিত্র রূপায়ণে না ছিল কোন ভাবসংযম, না ছিল কল্পনাশক্তি বা তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয়। সম্পূর্ণ ভাবাহত অবস্থায় তিনি হ্যাম-এ্যাকটিং করে এক বিশেষ শ্রেণীকে মাতিয়ে তুলতেন। কিন্তু তার দ্বারা সত্যিকার চরিত্রাভিনয় হোতো না। প্রফুল্ল-র রমেশের ভূমিকায় অহীনবাবু ও ছবি বিশ্বাস মশায়কে অভিনয় করতে দেখেছি বিভিন্ন সময়ে। অহীন্দ্রবাবু রমেশকে প্রায় কংসে পরিণত করতেন —ছবিবাবুর অভিনয়গুণে রমেশ হয়ে দাঁড়াতো ইয়াগো শ্রেণীর চরিত্র।

অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আত্মজীবনীতে বোধহয় এই কথাই প্রমাণ করতে চাইছেন যে, গিরিশচন্দ্রের পর তাঁর মত প্রতিভা আর বাংলার নাট্যমঞ্চে দেখা যায় নি। তাঁকে এই প্রসঙ্গে আমি ভোজরাজ ও বত্রিশ সিংহাসনের গল্পটা শুনিয়ে দিতে চাই।

ভোজরাজার লোকেরা একবার ভূগর্ভ খনন করে একটি চমৎকার সিংহাসন আবিষ্কার করল। এই সিংহাসনের চারপাশে বত্রিশটি পুত্তলিকা সাজানো ছিল। এক শুভদিনে ভোজরাজ সভাগৃহে এই সিংহাসনে বসতে গেলেন। অমনি প্রথম

পুত্তলিকা জানালো—'ভোজরাজ, এই সিংহাসন ছিল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের।' তারপর সে বিক্রমাদিত্যের নানা গুণ বর্ণনা করে ভোজরাজকে ঐ সিংহাসনে বসা থেকে সেদিনের জন্য নিরস্ত করল। এইভাবে বত্রিশ দিনে বত্রিশটি পুত্তলিকা ভোজরাজ মশায়কে বুঝিয়ে দিলে যে, প্রভূত গুণশালী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আসনে বসবার অধিকার তাঁর নেই। ভোজরাজ শেষ পর্যন্ত নিবৃত্ত হলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়কেও বলি—নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে হটিয়ে তাঁর সিংহাসনে বসবার চেষ্টা করবেন না। সে ক্ষমতা বা যোগ্যতা তাঁর নেই, কোনকালেই ছিল না। অতএব, শিশিরকুমার, রাধিকানন্দ প্রভৃতির আলোচনা ছেড়ে কংস, চাঁদসদাগরের ভূমিকায় তাঁর "অনবদ্য", "অতুলনীয়" অভিনয়ের কথা বলুন—সেটাই সব দিক দিয়ে ভাল হবে।]

ক্রেগ বলেছেন ঃ

"The actor who wishes to perform Othello must have not only the rich nature from which to draw his wealth but must also have the imagination to know what to bring forth and the brain to know how to put it before us. Therefore the ideal actor will be the man who possesses both a rich nature and a powerful brain. Of nature we need not speak. It will contain everything. Of his brain we can say that the finer the quality, the less liberty it will allow itself remembering how much depends upon its co-worker, the emotion, and also the less liberty will it allow its fellow-worker, knowing how valuable to it is its sternest control. Finally, the intellect would bring both itself and the emotions to so fine a sense of reason that the work would never foil to the bubbling point with its restless exhibition of actively but would create that perfect moderate heat which it would know how to keep temperate.

The perfect actor would be he whose brain could conceive and could show us the perfect symbols of all which his nature contains. He would not ramp and rage up and down in Othello, rolling his eyes and clenching his hands in order to give us an impression of jealousy; he would tell his brain to enquire into the depths, to learn all that lies there and then to remove itself to another sphere, the sphere of the imagination and there fashion certain symbols which, without exhibiting the bare passions, would none the less tell us clearly about them.

[ক্রমশ]

ভেনিস প্রিজার্ভড্ ঃ দি কন্‌স্পিরেটরস্—১৯০৪

# এবার 'মিস মিনি' প্রতিযোগিতা

কলকাতায় এখন 'মিনি' মরশুম শুরু হয়েছে। মিনি পত্রিকা গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত; এবার 'মিস মিনি' প্রতিযোগিতার আয়োজন চলছে। কিছু লোকের মাথায় হঠাৎ এত মিনি-প্রীতি কেন দেখা দিয়েছে বুঝা যাচ্ছে না। এতদিন আমরা সিনেমার পর্দায় মিনি ড্রেস মেয়ে দেখেছি। প্রথম প্রথম ভাল না লাগলেও এখন চোখসওয়া হয়ে গেছে। আর মিমি হলিউডের ডিটেক-টিভ ছবিগুলিতে নগ্ন নারীদেহ দেখাচ্ছে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে। তা দেখবার জন্য লোকের কি পরিমাণ লাইন, দেখলে থ' হয়ে যেতে হয়।

গত ক'বছর থেকে সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতার নামে এক ধরনের বাঁদরামী দেখা দিয়েছে। বক্ষদেশ, কটিদেশ আর ঊরুতে ফিতা মেপে সৌন্দর্য নির্ধারণের এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা প্রসাধন কোম্পানী আর বড়লোকের হোটেলগুলি। এই প্রতিযোগিতার পেছনে ওদের মতলব খদ্দের জোটানো, প্রসাধনীর প্রচার। অতি উগ্র আধুনিক বড়লোকের মেয়েরা যদি নিজেদের দেহের মাপ দিয়ে খুশী থাকে তা থাকুক, কিন্তু তাদের দেখা-দেখি মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক মেয়ে যে পতঙ্গের মত পুড়ে মরছে, সেখানেই ত ভাবনার কথা। নারীদেহে ফিতা মাপার এই বিকৃত সৌন্দর্যচর্চার পরে এবার শুরু হচ্ছে 'মিস মিনি' প্রতিযোগিতা কলকাতার কোন এক হোটেলে, যেখানে সমাজের পরগাছাশ্রেণী খানাপিনা করে, মদ খায়, তেমন এক আনন্দ বিনোদনের জায়গায় এই প্রতিযোগিতা হবে। তার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান হয়েছে—'মিনিরা এস'। ১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ মিনি পোষাকধারিণী নির্বাচন করা হবে। অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে, নগদ টাকাও দেওয়া হবে ইত্যাদি। মেয়ে-দের কত লোভ দেখান হয়েছে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য। এই সঙ্গে দর্শকদেরও লোভ দেখান হয়েছে। মিনি পোষাকপরা মেয়েদের প্যারেড হবে, মিনি পোষাকের মেয়েরা নাচবে, গাইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মিনি-সৌন্দর্য প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন যারা করছে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়েছে—প্লে বয়।

চেক ছবি 'দি বিগ এজ'-এর নায়িকা

মিস মিনি হওয়া যে একটা প্রতি-যোগিতার বিষয়, এবং এতে যে গর্বিত হবার মত কিছু আছে, এতদিন সমাজের তা জানা ছিল না। নারীর বিশেষ অঙ্গে কত সংক্ষিপ্ত আবরণ দেওয়া যায় তা দেখানোকে যারা প্রতিযোগিতার বিষয় করতে পারে তারা সত্যিই প্লে বয়। এরকম প্লে বয়রা আমেরিকা ইউরোপের অবক্ষয়ী চিন্তাধারার শরিক, সমাজের পরগাছা শ্রেণীর লোক। ওদের হয়ত খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, অন্যের অনুপার্জিত টাকায় হোটেল-মদে দিন কাটে। অথবা কালোটাকার ব্যাপারী, যে পথে টাকার হিসাব দিতে পারা যায় না। তাই ফিতা দিয়ে দেহ মাপা থেকে মিনি পোষাকধারিণীদের নিয়ে খেলা করাকে ওরা সৌন্দর্য চর্চা নাম দেয়। নারীদেহে ওদের চিন্তা নিবদ্ধ। নারী-দেহ ওদের খেলার জিনিষ। এই খেলা এখানে থামবে না। আজকের মিনিদের নিয়ে খেলা, আগামীদিনে বিবস্ত্র নর-নারীর (গোপন) সমাবেশে পৌঁছতে দেরী হবে না। আজকের মিনিরা সেদিন হবে নিরাভরণ। আমেরিকা ও ইউরোপের কোন কোন দেশে প্লে বয়দের এই খেলা চলছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলিতে এই প্লে বয়রা ক্যান্সারের মত সমাজদেহে দেখা দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই রোগ স্বাভাবিক। কারণ শোষণ, বঞ্চনা ও অপমানের উপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে সংস্কৃতির নামে বিকৃতরুচির কাজ-কারবার চলে। নারীদেহকে পশরা সাজিয়ে সংস্কৃতির নামে বেচা-কেনা চলে। তাই ম্যাক্সিম গর্কি বলেছিলেন : বুর্জোয়ারা সংস্কৃতির বোঝে কি? ইতর পশুবৃত্তি ছাড়া ওদের স্বভাবে কিছু নেই।

সাম্রাজ্যবাদীদের অনুকরণে আমাদের দেশেও নানারকম ইতর পশুবৃত্তি দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী বিকৃত বাস-নার প্রভাবে এদেশেও একদল জুয়াড়ীর সৃষ্টি হয়েছে। চিন্তা করার বিষয় এই জুয়াড়ীরা শুধু কি বিকৃত বাসনার মানুষ, অথবা সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়োজিত প্লে বয়। যারা কেবল নারীদেহ নিয়ে খেলে না, দেশ ও সমাজকে নিয়েও জুয়া খেলে। নগ্ন নারীদেহ ও মার্কিন গোয়েন্দাদের বাহাদুরীর চলচ্চিত্র, অশ্লীল সাহিত্য প্রচার, সমাজের নীতি-বোধ ভেঙে দেবার চেষ্টা, মুক্তমেলা থেকে মিনি প্রতিযোগিতার মধ্যে কি কোন যোগসূত্র আছে?

মিনি প্রতিযোগিতা ব্যবসা হতে পারে, সংস্কৃতি বা সৌন্দর্য চর্চা হতে পারে না। নাগরিক জীবনের সুস্থতার কথা বিবেচনা করে কলকাতা পৌরসভার, এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। —দুর্জন।

## 'শাস্তি'

রবীন্দ্রনাথের আর একটি ছোট গল্প চলচ্চিত্ররূপ লাভ করেছে। 'শাস্তি' গল্পটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বীরু মুখোপাধ্যায়; পরিচালনা করেছেন স্বদেশ সরকার। ছায়ালিপি প্রযোজিত এই ছবিটি সম্প্রতি মুক্তি লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্পের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থায় কৃষক-জীবনের একটা চিত্র দেখা যায়। যদিও তিনি স্পষ্ট করে গল্পের মধ্যে জমিদারকে দেখান নি কিন্তু জমিদারী শোষণে গ্রামের জীবন এই গল্পের ভিত। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সেই অস্পষ্টতাকে স্পষ্টতর করে দেখিয়েছেন দুই বিপরীত জীবনের স্বরূপকে প্রকাশ করার জন্য। চিত্রনাট্য অনুসারে দুঃখীরাম ও ছিদাম দু-ভাই চাষী। দুঃখীরাম পরিশ্রমী, ছিদাম আয়াসী। ছিদামের স্ত্রী চন্দরা, চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে, তার মধ্যে একটা কৌতুক ও কৌতূহলের ভাব আছে, হাসি-খুশি, ও গল্প করতে ভালবাসে। ছিদাম তাকে ভালবাসে। দাদার জমানো খাজনার টাকা ভেঙে সে বৌয়ের জন্য সোনার মাদুলী কিনে আনে। দুঃখীরামের বৌ রাধা সংসারের অভাব ও কাজের চাপে তিক্ত-বিরক্ত। দু-জায়ের মধ্যে বকাবকি, চেঁচামেচির শেষ ছিল না। কিন্তু রাধার অন্তরে চন্দরার জন্য একটা কোমল স্থান ছিল। বর্ষাকালের দুর্দিনের পরে দু-ভাই যখন ধান কাটতে যাবে, এমন সময় জমিদারের তলব আসে—কাছারি বাড়ির চাল ছেয়ে দিতে হবে। আপত্তি করলে পেয়াদার গলা ধাক্কায় যেতে বাধ্য হয়। জমিদার মদ-বাঈজী নিয়ে আমোদে মত্ত, দারোগা-পুলিশ নিয়ে ভোজ খাচ্ছে। ওদিকে দুঃখীরামের ঘরে উনুন জ্বলে নি। সারাদিনের কাজের পর অভুক্ত দুঃখীরাম ঘরে এসে ভাত চাইলে রাধা তুমুল ঝগড়া শুরু করে দেয়। ক্রোধোন্মত্ত দুঃখীরাম একটি দা নিয়ে রাধাকে আঘাত করে এবং রাধার মৃত্যু হয়। ভাইকে বাঁচাতে ছিদাম চন্দরাকে বলে হত্যার দোষ স্বীকার করতে। ছিদামের কথা—স্ত্রী গেলে স্ত্রী পাব কিন্তু ভাই গেলে ভাই পাব না, চন্দরার মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই একটি কথায় নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব এবং ছিদামের ভালবাসার দাম তার কাছে

'দি ফ্যানি ওল্ডম্যান' ছবিতে ভ্লাডিমির স্মেরাল
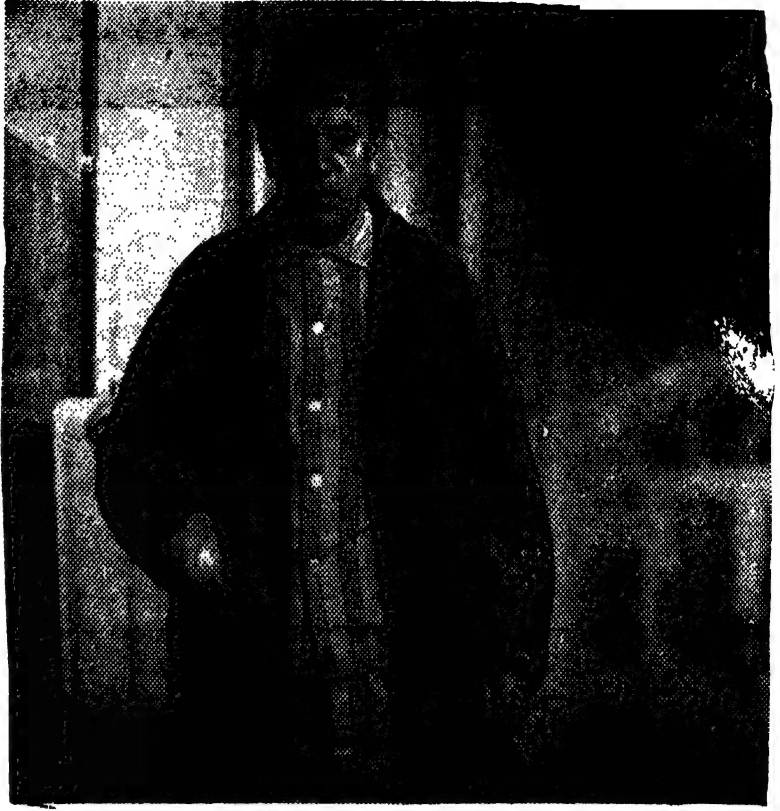
প্রকাশ হয়ে পড়ে। চন্দরা আদালতে গিয়েও সমস্ত দোষ নিজের ওপর নিয়ে চরম দণ্ড গ্রহণ করে। নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় তার মন তখন বিদ্রোহী। এই সমাজ ব্যবস্থায় ভালবাসা সম্পর্কে তার ধারণার পরিবর্তন হয়েছে।

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ-জীবন সম্পর্কে কোনরূপ ভ্রান্তি না রেখে, এই সমাজে নারীর আসল অবস্থাটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এই সঙ্গে চাষীদের জীবনে শোষণের রূপ এবং তাদের ঘাম-ঝরা অর্থে জমিদারের বিলাস ও লাম্পট্যের চেহারাটা প্রকাশ করেছেন। দুই বিপরীত চিত্রকে প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁদের কৃতিত্বে ছবিটি একালের মানুষের মনে সাড়া দেবে। আজ যদিও জমিদারী ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সেদিনের নিষ্ঠুরতার কথা মানুষ ভোলে নি। আজো জমিদারী ব্যবস্থার প্রভাব থেকে সমাজ মুক্ত হয় নি এবং এই ব্যবস্থার প্রভাব থেকে নর-নারীর জীবন এখনও মুক্ত হতে পারে নি। তাই ছবিটি কালোপযোগী এবং রূপায়ণ প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়।

পরিচালকের এই ছবি হয়ত প্রথম উদ্যোগ। এই উদ্যোগে তিনি প্রশংসনীয় শিল্প সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামের মেলা, কৃষকের বাড়ি এবং বর্ষার দিনে গ্রাম ইত্যাদিকে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু আদালতের দৃশ্যটিতে কিছুটা কৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে শেষ দৃশ্যে চন্দরা ছিদামের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছিল এবং ছিদামের সঙ্গে দেখা করবে কি-না জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল—'মরণ', কিন্তু চিত্রনাট্যকার সে রকম কঠোর হতে পারেন নি। তিনি ছিদামের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ দেখিয়ে—চন্দরাকে যথেষ্ট কোমল করেছেন। এই কোমলতায় পুরুষের প্রতি কষাঘাতের মূল ধ্বনি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।

'শাস্তি ছবির প্রধান চরিত্র 'চন্দরা'কে রূপদান করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তরুণী চন্দরার লাস্যময় অভিব্যক্তি, চাঞ্চল্য যেমন তিনি নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন, সেই সঙ্গে রাধার মৃত্যুর পর নারীত্বের অপমানে অপমানিতা কৃষক বধূ এবং আদালতে বিদ্রোহী মানসিকতাকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। দুঃখীরামের চরিত্রে কালী ব্যানার্জীর 'কৃষক' নিখুঁত। জমিদারের চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিদামরূপে দিলীপ রায়, রাধার চরিত্রে গীতা দে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে জ্ঞানেশ মুখার্জী, রমা দাস, আশাদেবী, রসরাজ চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনয় করেছেন। বাঈজীর চরিত্রে সুব্রতা চ্যাটার্জী।

ছবির আলোকচিত্রের কাজ প্রশংসনীয়। আশা করা যায়, ছবিটি চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে সমাদৃত হবে।

### চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে গত ২০শে থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী নিউ সিনেমায় চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে সহযোগী ছিল কলকাতার চেকোশ্লোভাক দূতাবাস এবং ভারত-চেকোশ্লোভাক সাংস্কৃতিক সমিতি। উৎসব উদ্বোধন করেছেন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শ্রীঋত্বিক ঘটক প্রধান অতিথি হিসাবে এবং চেক কনসাল জেনারেল মিঃ জারোস্লাভ কাফকা উপস্থিত ছিলেন।

এই চলচ্চিত্র উৎসবে সাতটি চেক ছবি ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হয়েছে। উদ্বোধন দিনে দেখান হয়েছে 'দি ফানি ওলডম্যান'। এই ছবিটি ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হয়েছিল এবং পরিচালক কারেল কাচিনা পরিচালনার জন্য পুরস্কার লাভ করেছেন।

ফানি ওলডম্যানের কাহিনী ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে নিয়ে। এই বৃদ্ধের হৃদযন্ত্রের অপারেশন হয়েছে। তার জন্য ডাক্তারের খ্যাতি হয়েছে, ডাক্তার চায় বৃদ্ধকে হাসপাতালের নিয়ম-কানুনের মধ্যে রাখতে, কিন্তু বৃদ্ধের মন অন্য জগতে। দূরের এক মহিলার কাপড় শুকোতে দিতে এসে এক ঝাঁক কপোত উড়িয়ে দেবার দৃশ্য তার মনকে টানে, নীচেরতলার কিশোরদের কাছে কাগজের খেলনা পৌঁছে দেওয়া তার খেলা। একদিন সমস্ত নিয়ম উপেক্ষা করে সে পালিয়ে যায় দূরের সেই মহিলাকে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখে তরুণীর তখন মুমূর্ষু অবস্থা। মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, কপোতগুলি উড়িয়ে দিয়ে সে মুক্তির স্বাদ লাভ করে। সে সময় হাসপাতালের ডাক্তার এসে তাকে নিয়ে যায়—তার তখন শেষ অবস্থা। এই আশায় নিয়ে যায় যে, মানুষের জীবনে একদিন রামধনুর উদয় হবে।

ছবিটি দুর্বোধ্য আঙ্গিকে ভরা। চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্বের ছায়া এতে পড়েছে। অপর দেশের আধিপত্য এবং আমলাতান্ত্রিকতার বিরোধী একটা বক্তব্য থাকলেও সমাজতান্ত্রিক নিয়ম-শৃংখলাকে যারা শৃংখল মনে করে সেই মানসিকতাও এতে রয়েছে। ছবিটি কলাকৌশলের দিক থেকে উচ্চাঙ্গের, বিশেষ করে প্রতীক-আশ্রয়ী রঙের ব্যবহারে।

শেষ দিনের ছবি 'স্কিড' একটি মনস্তাত্ত্বিক ছবি। এখানে মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব ও জটিলতাকে দেখাবার জন্য সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে ছবিটি নির্মিত। কলাকৌশলের দিক থেকে এটিও এক বিশেষ উন্নত ধরনের ছবি। এই ছবির নায়ক একজন বিদেশী চর। যে দেশ, মা, স্ত্রী, পরিজনকে ভুলে রয়েছে কেবলমাত্র নিজের সুখের জন্য, বিদেশের জাঁকজমক ও বিলাস তাকে আকর্ষণ করেছে এবং সে হয়েছে বিদেশী চর। চরের কাজে এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে সে দেশে এসেছে। তার চেহারা পাল্টে নিয়েছে প্লাস্টিক সার্জারী করে যাতে কেউ চিনতে না পারে। তার পরে সে স্ত্রী, মা, পুত্র সবার সঙ্গে দেখা করে।

এসময়ের তার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং বাল্যকালের স্মৃতিরেখার ব্যাপারে অভিনয় এবং ক্যামেরার কাজ অত্যন্ত উন্নত। যাতে দর্শকমাত্রই বিস্ময় ও আনন্দ লাভ করেছেন। বিদেশী চরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জিরি ভালা। ছবির পরিচালক জাইনেক ব্রাইনিচ্।

## একটি রবীন্দ্র সন্ধ্যা

### অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত অনুষ্ঠান

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস্-এ 'কৌশিকী'র উদ্যোগে রবীন্দ্রসংগীতের একক অনুষ্ঠানে ১৫টি গান গেয়ে শোনালেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। সহযোগিতায় ছিলেন বাঁশীতে কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ, সেতারে দীনেশচন্দ্র, দিলরুবায় রমেশচন্দ্র, তালযন্ত্রে জহর দে ও গীত পরিচিতিতে মণীন্দ্র গুপ্ত। ভাবগম্ভীর সুন্দর মনোজ্ঞ এক পরিবেশ রচিত হয়েছিল। জনপ্রিয় শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতের ভাব, কথা ও সুরের মূর্ছনায় পৌনে দুটি ঘণ্টা শ্রোতৃবর্গকে অভিভূত করে রেখেছিলেন। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাধনার অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। দরাজ তাঁর গলা—সুরের কারুকার্য বার বার তারিফ করার মতো। সবকটি গানই সুগীত—ছন্দে, আবেগে মন মাতিয়ে রেখেছিল। 'তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলেছিলে বলে,' আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', 'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি', 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তারে কেমনে' প্রভৃতি গানগুলি যেন তাঁর প্রাণোৎসারিত—অজস্র, অকুণ্ঠ সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। মরমী গায়ক ও বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সুরের সেতু দিয়ে যে আত্মিক সংযোগ সেদিন রচিত হয়েছিল, তার অনুরণন অনেকদিন বাজতে থাকবে। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি সর্বদিক দিয়ে সার্থকতা লাভ করেছে। এই সুন্দর সন্ধ্যাটির কথা মনে রেখে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

### বাটানগরে নৃত্য বিচিত্রা

বাটানগরে ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে ইয়োথ হোস্টেল এসোসিয়েশনের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনায়, নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যকলা প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। পূর্ণিমা হালদারের ভারতনাট্যম, রিঙ্কু ভাদুড়ী, অনীতা ঘোষ, রুণু সেনের নাগানৃত্য, নীরেন্দ্রনাথ, পানু কুমার ও বর্ণা বাগচীর জেলে-জেলেনী নৃত্য, পূর্ণিমা হালদার ও কৃষ্ণা হালদারের রাজস্থানী লোকনৃত্য দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীঅজয়কুমার গাঙ্গুলীর "হরবোলা" উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে আনন্দ দান করে। যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, নন্দদুলাল হালদার প্রমুখ।

### কিশোর ভারতী

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বেহালা বিবেকানন্দ পল্লীস্থিত "কিশোর ভারতী" রেজিস্টার্ড সোসাইটি পরিচালিত "কিশোর ভারতী" প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, সংগীত, নৃত্য ও সেবা বিভাগ—এই ছয়টি বিভাগের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব এবং কিশোর ভারতীর সপ্তদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস বিবিধ অনুষ্ঠানসূচীতে উদ্‌যাপিত হয়েছে।
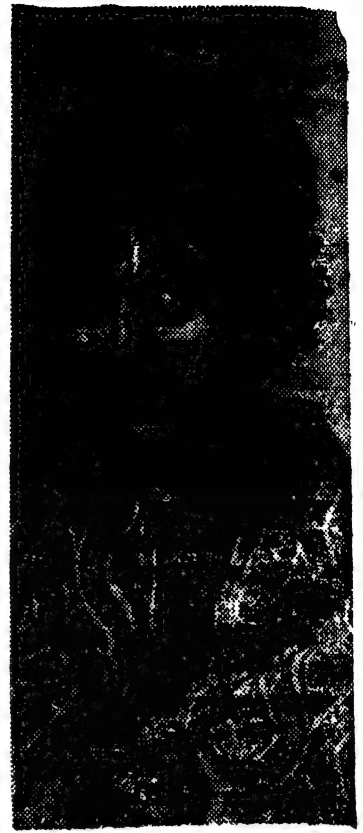
প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্লাস প্রমোশনে ও খেলাধুলায় কৃতিত্বের জন্য বহুসংখ্যক পুরস্কার বিতরণে পৌরোহিত্য করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। তৎপূর্বে বেহালার প্রাক্তন পৌরপাল শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় পূর্ব বৎসরাদি পরম্পরাক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পতাকা উত্তোলন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বৈকালিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বেহালা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অরবিন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক প্রশান্ত দত্ত।

'পদ্মগোলাপ' ছবিতে অপর্ণা সেন

তরুণ অপেরার 'লেনিন' যাত্রা পালায় নাম ভূমিকায় শান্তিগোপাল

প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক উভয় অনুষ্ঠানসূচীর প্রারম্ভিক ভাষণ প্রসঙ্গে কিশোর ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুভাষ সরকার সমবেত বিশিষ্ট অতিথিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করত প্রতিষ্ঠানের বর্ষের পর বর্ষ ক্রমোন্নতি ও উক্ত অঞ্চলের কিশোর ভারতীর সর্বাঙ্গীণ, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের বিবরণ প্রদান করেন।

পরিশেষে কিশোর ভারতীর সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীবিষ্ণুপদ দাস ও অরুণ-বরুণ-কিরণমালার (নৃত্যশিক্ষক—কিশোর ভারতী) শ্রীশম্ভু দাসের পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশিত সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় অনুষ্ঠানে সমবেত শত শত বালক-বালিকা ও অভিভাবকমণ্ডলীর আনন্দ বর্ধন করে।

### দমদমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী দমদমে নতুন পল্লীর স্থানীয় যুবকবৃন্দ বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভের জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক মনোজ বসু উপস্থিত ছিলেন। সম্বর্ধনা উপলক্ষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর মূকাভিনয় উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অসীম চাটার্জীর কণ্ঠে আধুনিক গান এবং প্রশান্ত মুখার্জীর যন্ত্রসঙ্গীত প্রশংসনীয়।

### ঋত্বিক ঘটক সম্বর্ধনা

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিলীপ চক্রবর্তীর সৌজন্যে ও কলিকাতা যুব সংঘের ব্যবস্থাপনায় সারারাত্রিব্যাপী একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান মাণিকতলা স্ট্রীট-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল পদ্মশ্রী ঋত্বিক ঘটকের সম্বর্ধনা। সংগীতাংশে ছিলেন—দ্বিজেন মুখার্জী, সুবীর সেন, তরুণ ব্যানার্জী, ইলা বোস, মাধুরী চ্যাটার্জী, দিলীপ চক্রবর্তী, অধীর বাগচী, গোরাচাঁদ মুখার্জী, মাঃ তপন ঘোষ, কমলেশ বোস, শম্ভু চৌধুরী, কুমকুম চক্রঃ, বিনোদ দে ও বশিষ্ঠ গাঙ্গুলী।

হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন সুনীল চক্রবর্তী। মূকাভিনয়ে তপন দত্ত। হরবোলা মন্টু ভট্টাচার্য। যন্ত্রসংগীতে নিমাই দাস ও সম্প্রদায়। তবলায় স্বপন মুখার্জী, বিপুল চক্র, মহীতোষ তেওয়ারী প্রমুখের নাম

## রঙ্গশ্রীর লেনিন শতবার্ষিক নাট্যোৎসব

খ্যাতনামা নাট্য সংস্থা রঙ্গশ্রী চার দিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের মাধ্যমে লেনিনের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছেন। এই উপলক্ষে এঁরা বীরু মুখোপাধ্যায়ের দিনান্ত, রমেন লাহিড়ীর বেনজু, আমিই লেনিন, এলেম নতুন দেশে ও মুলাটো এবং সঞ্জীব সরকারের চে গুয়েভারা নাটকগুলি মঞ্চস্থ করবেন বিশ্বরূপা মঞ্চে। এই উৎসবের প্রথম অভিনয় দিনান্ত ও বেনজু ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুর আড়াইটায়। নির্দেশনা রমেন লাহিড়ীর। রঙ্গশ্রী গোষ্ঠী ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সহযোগিতায় রমেন লাহিড়ীর আমিই লেনিন ও অস্তমিত গান মঞ্চস্থ করবেন ১লা মার্চ রামরাজাতলার আঞ্চলিক লেনিন শতবর্ষ যুব উৎসব উপলক্ষে।

### মৌসুমী মন

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'মৌসুমী মন' ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণ করা হল। দৃশ্যটি ছিল নতুন ও পুরাতনদের মধ্যে গানে গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর। এক পক্ষে পুরুষ আর এক পক্ষে নারী। পুরুষদের পক্ষে ছিলেন সর্বেন্দ্র, সৌরভ, অমরেশ প্রমুখ। নারীদের পক্ষে মিতা, অনিতা, জলি, রমা প্রমুখ।

ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা দে, মণি শ্রীমানী ও লক্ষ্মীছায়া। সমর চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিচালিত 'মৌসুমী মন' ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তির পথে। ছবিতে সুর দিয়েছেন অনিল দত্ত। গান গেয়েছেন মান্না দে ও কৃষ্ণা রায়।

পরিচালক অমল দত্তের 'আবীরে রাঙানো' ছবির একটি [illegible]
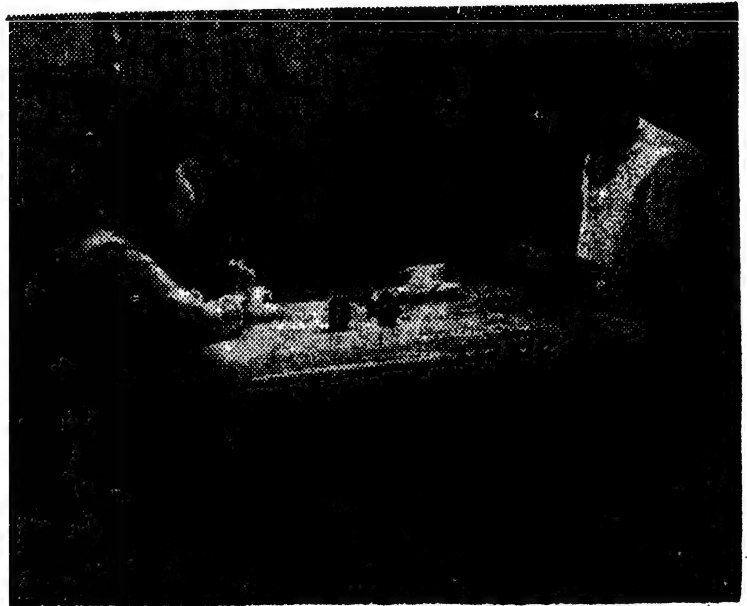
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভারতীয় ক্রিকেট যেন একলাফে শৈশবাবস্থা থেকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছিল।

ভারতীয় ক্রিকেটের রাজপুত্রেরা তখন দেশ-বিদেশে চলেছেন রাজ্য জয় করে। সে জয়ের পেছনে ছিল প্রাণের পরশ, ছিল অজানাকে জানবার—অচেনাকে চেনার একটা অদ্ভুত এবং আন্তরিকতায় ভরা প্রচেষ্টা।

একা রণজিৎ সিংজী যা করে গিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু রণজিতের পরই তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বড় তাড়াতাড়িই যেন এসে গেলেন রণজির ভাইপো দলীপ সিংজী আর পাতৌদির তরুণ নবাব। বিদেশের ক্রিকেটাঙ্গন এঁরা আনন্দ-হাসি-গানে ভরিয়ে তুললেন, আর তাঁদের সংগে পাল্লা দিয়েই যেন দেশের মাটিকে ক্রিকেটানন্দে মাতোয়ারা করে তুললেন সি কে নাইডু, প্রফেসর দেওধর প্রমুখের মতো খেলোয়াড়রা। ততোদিনে এসে গেছে মহম্মদ নিসার, এসে গেছেন অমর সিং-এর মতো বোলাররা।

ইংলণ্ডের মাটিতে রণজির উত্তরসূরী হিসেবেই বোধ হয় হয়েছিল দলীপ সিংজীর আবির্ভাব। সে এক নয়নাভিরাম, অপূর্ব অধ্যায়। যে দলীপ ব্যাট হাতে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেন—সেই দলীপই রণজির উপস্থিতিতে কেমন যেন হয়ে যেতেন। অস্বস্তিতে কুঁকড়ে যেতেন, মোটে খেলতেই পারতেন না। কাকা তাঁর খেলা দেখছেন মনে করলেই দলীপ সিংজী যেন মাটির সংগে মিশে যেতেন।

সেবারের কথাই ধরা যাক।

ইংলণ্ডের কাউন্টি খেলাগুলোয় দলীপ সেবার দারুণ খেলছেন। দলীপের প্রশংসায় ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকাগুলো পঞ্চমুখ। চেনা-জানার মুখে মুখে আর খবরের কাগজের প্রশংসা দেখে রণজি গেলেন দলীপের খেলা দেখতে। একেবারে ভারত থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে হাজির হলেন রণজি।

ওদিকে দলীপ সিংজীর অবস্থা কাহিল। তিনি যেন ভাবতেই পারছেন না যে, কাকা এসেছেন তাঁর খেলা দেখতে। অস্বস্তিতে ভরে উঠলো তাঁর মন-প্রাণ। ওঁর সামনে খেলা! অসম্ভব—ক্রিকেট খেলার কি জানেন দলীপ যে, রণজিকে দেখাবেন তাঁর খেলা!

খেলতে পারলেন না দলীপ। হাজার চেষ্টা করেও অস্বস্তি কাটিয়ে উঠে ব্যাট হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না তিনি। ঝটপট আউট হয়ে গেলেন অসহায়ের মতো। শুধু সেই খেলাটিতেই নয়, তার পরের খেলায়ও দলীপের একই হাল।

হতাশ হলেন রণজি। চেপে রাখতে পারলেন না তাঁর মনের কথা। সি বি ফ্রাইকে বললেন, "এই দলীপকে নিয়ে তোমাদের অতো বাড়াবাড়ি—তোমাদের বিচারে ও কি করে ভালো খেলোয়াড়, তা তো বুঝলাম না।"

কোন উত্তর দিলেন না ফ্রাই। শুধু মুখ টিপে হাসলেন। এতো নিরাশ হয়েছিলেন রণজি যে, ফ্রাই-এর হাসি লক্ষ্যও করলেন না। করলে অন্তত বুঝতেন যে, ঐ হাসির একটা কিছু মানে আছে।

ক'দিন পরে ফ্রাই এসে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গেলেন রণজিকে। মাঠে নিশ্চিন্ত মনে ব্যাট করছিলেন দলীপ। কাকা তো আসেন নি মাঠে। তাই বেমনখুশি পিটিয়ে খেলছিলেন তিনি। ওদিকে তাঁর কাকা রণজিৎ সিংজী যে সি বি ফ্রাই-এর সংগে মাঠের এক কোণে চুপটি করে বসে তাঁর খেলা দেখছেন, সে কথা কল্পনাও করতে পারেন নি দলীপ। তাই নিজের মনে খেলে চললেন।

আউট যখন হলেন তখন তাঁর রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭০-এ। লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্টে দলীপ করলেন ১৭৩ রান। আর রণজিৎ সিংজী লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলেন সেই খেলা। সি বি ফ্রাইও খুশি। বললেন, "বলেছিলাম না, তুমি মাঠে আছো জানলে দলীপ মোটে খেলতেই পারবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলে তো তোমার ভাইপো এগিয়ে চলেছে তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে।"

সত্যিই তাই। ইংলণ্ডের মাটিতে এবং ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলে প্রথমে রণজিৎ সিংজী, তারপর দলীপ সিংজী আর সব শেষে পাতৌদির নবাব ভারতীয়

॥ সি কে নাইডু ॥

ভারতীয় ক্রিকেটের [illegible] [illegible]

ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে চললেন যেন বড় তাড়াতাড়িই।
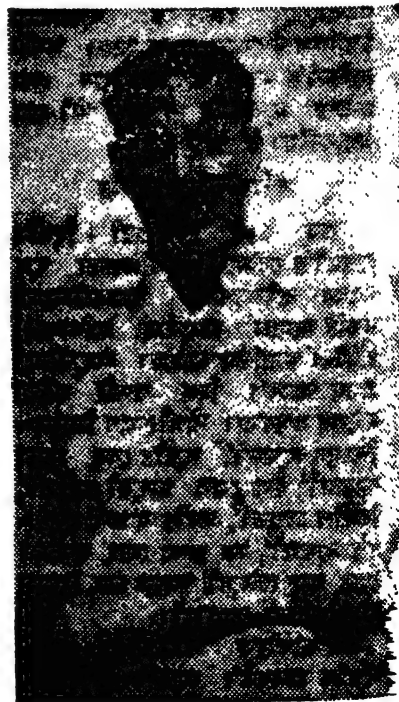
একা রণজিৎ সিংজী ভারতীয় ক্রিকেটকে যে প্রতিষ্ঠা এবং ঐতিহ্যের আসনে বসিয়েছিলেন, সেই ঐতিহ্য আর প্রতিষ্ঠাকে আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দলীপ সিংজী আর পাতৌদির নবাব।

ভারতে এঁরাও চুপ করে বসেছিলেন না। ১৯৩২ সালে ভারত সরকারীভাবে ইংলণ্ড সফরে গেল এবং প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেল। এখন সেই খেলার কথায় আসি আমরা। ১৯৩২ সালের জুন মাসের ২৫, ২৭ ও ২৮ তারিখে লর্ডস্ মাঠে প্রথম অনুষ্ঠানিক টেস্ট ম্যাচে ভারত অংশ গ্রহণ করে। সেই টেস্টে ভারত ১৫৮ রানে হেরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেই একটি টেস্টই ভারতকে ক্রিকেট জগতে এগিয়ে দিয়েছিল অনেকখানি।

নাইডু, নাজির আলী আর পালিয়ার মতো তিনজন সেরা খেলোয়াড় আহত থাকা সত্ত্বেও প্রথম টেস্টে শক্তিশালী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

ইংলণ্ড প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পায়, কিন্তু মাত্র ক'দিন আগে ১ম উইকেটে ৫৫৪ রান করে যাঁরা বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সাটক্লিক্ ৩ আর হোমস্ ৬ রান করে নিসারের বলে বোল্ড আউট হয়ে ফিরে গেলেন। ফ্রাঙ্ক উলী ৯ রান করে রান-আউট হলেন। ঐ সময় হ্যামণ্ড (৩৫), জার্ডিন (৭৯) আর এমস (৬৫) হাল না ধরলে ইংলণ্ডের নির্ঘাৎ ভরাডুবি হতো। কারণ মহম্মদ নিসার আর অমর সিং-এর বলে ইংলণ্ডের ব্যাটস্‌ম্যানরা মোটে দাঁড়াতেই পারছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড মাত্র ২৫৯ রানের মাথায় শেষ করলো তাদের প্রথম ইনিংস। সাটক্লিক্, হোমস্, উলী, হ্যামণ্ড, জার্ডিন, পেনটার, এমস, রবিনসন প্রমুখের মতো ব্যাটস্‌ম্যান যে দলে আছেন, সেই দলের টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত ভারতের বিরুদ্ধে ২৫৯ রান করা সত্যিই কিছুই নয়। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে নিসার ৫টা, অমর সিং ২টো ও নাইডু ২টো করে উইকেট দখল করেছিলেন।

ভারতীয় দল প্রথমে একটু বিপদে পড়লেও বেশ ভালোই খেলেছিল। ৩৯ রানের মাথায় প্রথম ও ৫০ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়লেও ওয়াজির আলী ও সি কে নাইডু খেলার ধারা পুরোপুরিভাবে বদলে দিলেন। ব্রাউনের বলে

[অবশিষ্টাংশ ২০০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

স্কোর বোর্ড :

## ইংলণ্ড

| প্রথম ইনিংস | | দ্বিতীয় ইনিংস | |
|---|---|---|---|
| সাটক্লিফ ব নিসার | ৩ | ক নাইডু ব অমর সিং | ১৯ |
| হোমস ব নিসার | ৬ | ব জাহাঙ্গীর খান | ১১ |
| উলী রাণ-আউট | ৯ | ক কোলাহ ব জে খান | ২১ |
| হ্যামণ্ড ব অমর সিং | ৩৫ | ব জে খান | ১২ |
| জার্ডিন ক নেভলে ব নাইডু | ৭৯ | নট-আউট | ৮৫ |
| পেনটার এল বি ডব্লিউ ব নাইডু | ১৪ | ব জে খান | ৫৪ |
| এমস ব নিসার | ৬৫ | ব অমর সিং | ৬ |
| রবিনস ক লাল সিং ব নিসার | ২১ | ক জে খান ব নিসার | ৩০ |
| ব্রাউন ক অমর সিং ব নিসার | ১ | ক কোলাহ ব জেওমল | ২৯ |
| ভোস নট-আউট | ৪ | নট আউট | ০ |
| বাউস ক নিসার ব অমর সিং | ৭ | ব্যাট করেন নি | |
| অতিরিক্ত | ১৫ | অতিরিক্ত | ৮ |
| | ২৫৯ | (৮ উই:) | ২৭৫ |

## ভারত

| প্রথম ইনিংস | | দ্বিতীয় ইনিংস | |
|---|---|---|---|
| নেভলে ব বাউস | ১২ | এল বি ডব্লিউ ব রবিনস | ১৩ |
| জেওমল এল বি ডব্লিউ ব রবিনস | ৩৩ | ব ব্রাউন | ২৫ |
| ওয়াজির আলী এল বি ডব্লিউ ব ব্রাউন | ৩১ | ক হ্যামণ্ড ব ভোস | ৩৯ |
| নাইডু ক রবিনস ব ভোস | ৪০ | ব বাউস | ১০ |
| কোলাহ ক রবিনস ব বাউস | ২২ | ব ব্রাউন | ৪ |
| নাজির আলী ব বার্ডস | ১৩ | ক জার্ডিন ব বাউস | ৬ |
| পালিয়া ব ভোস | ১ | নট-আউট | ১ |
| লাল সিং ক জার্ডিন ব বাউস | ১৫ | ব হ্যামণ্ড | ২৯ |
| জে খান ব রবিনস | ১ | ব ভোস | ০ |
| অমর সিং ক রবিনস ব ভোস | ৫ | ক ও ব হ্যামণ্ড | ৫১ |
| নিসার নট-আউট | ১ | ব হ্যামণ্ড | ০ |
| অতিরিক্ত | ১৫ | অতিরিক্ত | ৯ |
| | ১৮৯ | | ১৮৭ |

## ভারতের পক্ষে বোলিং

| | প্রথম ইনিংস | দ্বিতীয় ইনিংস |
|---|---|---|
| নিসার | ২৬-৩-৯৩-৫ | ১৮-৫-৪২-১ |
| অমর সিং | ৩১.১-১০-৭৫-২ | ৪১-১৩-৮৪-২ |
| জে খান | ১৭-৭-২৬-০ | ৩০-১২-৬০-৪ |
| নাইডু | ২৪-৮-৪০-১ | [illegible]-০-২১-০ |
| পালিয়া | ৪-৩-২-০ | ৩-০-১১-০ |
| জেওমল | ৩-০-৮-০ | ৮-০-৪০-১ |
| ওয়াজির আলী | ০-০-০-০ | ১-০-৯-০ |

## ইংলণ্ডের পক্ষে বোলিং

| | প্রথম ইনিংস | দ্বিতীয় ইনিংস |
|---|---|---|
| বাউস | ৩০-১৩-৪৯-১ | [illegible]-৫-৩০-২ |
| ভোস | ১৭-৬-২৩-৩ | ১২-৩-২৮-২ |
| ব্রাউন | ২৫-৭-৪৮-১ | ১৪-১-৫৪-২ |
| রবিনস | ১৭-৪-৩৯-২ | ১৪-৫-৫৭-১ |
| হ্যামণ্ড | [illegible]-০-১৫-০ | ৫.৩-৩-৯-৩ |

## ক্রিকেটের মান

ক্রিকেট খেলার মান কি দিন দিন নেমে যাচ্ছে? এ প্রশ্নটা আজ আর শুধু আপনার, আমার কিংবা রাম-শ্যাম, যদু-মধুর নয়। এ প্রশ্ন আজ জেগেছে সকলের মনে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাঙ্গনের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন। অবশ্য বেশি দূরেও যাবার দরকার নেই। ধরা যাক, অস্ট্রেলিয়ার কথাই। ইংলণ্ড আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া আজ অঘোষিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু সেই অস্ট্রেলিয়া দলের সত্যিকারের হালটা কি? না আছে ঢাল, না আছে তলোয়ার। অর্থাৎ ব্যাটিং বলুন কিংবা বোলিং বলুন—কোন দিকেই বিশেষ কোন ধার নেই অস্ট্রেলিয়া দলটির। অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ভারত দুর্বলই। অথচ সেই ভারতের বিরুদ্ধেও অস্ট্রেলিয়া একটুও সুবিধে করতে পারে নি। ভারত রাবার হারলেও প্রতিটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে তুর্কী নাচন নাচিয়ে ছেড়েছিল। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম টেস্টে ভারতই উল্লেখ করার মতো প্রাধান্য বিস্তার করে খেলতে পেরেছিল। অস্ট্রেলিয়ার নামী সব খেলোয়াড়রা কিছুতেই যেন থৈ পাচ্ছিলেন না। তাঁদের অসহায়তাই বড় বেশি করে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবু খেলার মাঠে তাঁরা যে কতো অসহায় তা আমাদের জানতে তখনো বাকী ছিল। জানা গেল, ভারত ভ্রমণ শেষ করে অস্ট্রেলিয়া যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া চারটি টেস্ট খেলবে। এখনো পর্যন্ত তিনটি টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এই তিনটি টেস্টের সবগুলিতেই অস্ট্রেলিযা হেরেছে। মনে হয়, এর পরেও কি আর কেউ অস্ট্রেলিয়াকে শক্তিশালী দল বলে স্বীকার করে নিতে রাজী হবেন? অস্ট্রেলিয়ারই যদি এই হাল হয়, তাহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ইংলণ্ড, ভারত, পাকিস্তান কিংবা নিউজিল্যাণ্ডের অবস্থাটা কি? তাই এই মুহূর্তে এ কথা বলতে আর ভাবতে হয় না যে, ক্রিকেট খেলা আজ একটা শোচনীয় অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। আর এ কথাও চোখ বুজে বলা যায় যে, ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ, ক্রিকেট যেভাবে এগুচ্ছে—তাতে আজকের এই রকেট, এ্যাটম বোমার যুগে ক্রিকেট কিছুতেই যেন পাল্লা দিতে পারছে না। ধৈর্যের খেলা ক্রিকেট আজকের এই অধৈর্যের যুগে সত্যিই কি অচল? অচল না হলেও ক্রিকেট খেলার মান যে দিন দিন নেমে যাচ্ছে, এ বিষয়ে আজ আর কারো সন্দেহ নেই। —শান্তিপ্রিয়

অস্ট্রেলিয়া আবার পরাজিত হলো। চার-টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার এটি তৃতীয় টেস্টে তৃতীয় পরাজয়। রাবার এখন চলে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার মুঠোর মধ্যে। খেলার এখন যেটুকু আকর্ষণ বাকী আছে, সেটি হলো চতুর্থ টেস্ট ম্যাচেও দক্ষিণ আফ্রিকা জিততে, অর্থাৎ সব ক'টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারে কি না দেখা।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার পর তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতলো ৩০৭ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের সংগে ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—কোনদিক দিয়েই পাল্লা দিতে পারেন নি অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা।

প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৭৯ রাণ করে। এর উত্তরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ২০২ রানের বেশি করতে পারলো না। এর মধ্যে ছিল ওয়ালটার্স-এর ৬৫ ও শীহানের ৪৪ রান। পোলক ৩৯ রানে ৫টি ও প্রোক্টর ৪৮ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা আবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন। ই বারলো ১২০, জি পোলক ৮৭ ও এল আরভিন ৭৩ রান করায় দক্ষিণ আফ্রিকার রান-সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৪০৮-এ। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে গ্লিসন ৫টি উইকেট দখল করেছিলেন ১২৫ রানের বিনিময়ে।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা দিলেন চরম ব্যর্থতার পরিচয়। রেডপাথ ছাড়া আর কেউ ব্যাট ধরে দাঁড়াতেই পারলেন না। ফলে মাত্র ১৭৮ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। এর মধ্যে রেডপাথ একাই করেছিলেন ৬৬ রান, কনোলী পিটিয়ে খেলে করলেন ৩৬ রান। বোলিং-এ প্রোক্টর ২৪ রানে ৩টি, গডার্ড ২৭ রানে ৩টি ও বারলো ১৭ রানের বিনিময়ে লাভ করলেন ২টি উইকেট।

ফলে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়া পরাজিত হলো। দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০৭ রানে তাদের হারিয়ে দিয়ে শুধু রাবারই লাভ করলো না, অর্জন করলো অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলকে পর পর তিনটি টেস্টে হারিয়ে দেবার কৃতিত্ব।

## অজানা খবর

সম্প্রতি সিডনীতে পেরেকের শয্যার ওপর ২৫ ঘণ্টা ৯ মিনিট শুয়ে থেকে ভারতের 'জেড আস্জার' একটি বিশ্বরেকর্ড করেছেন। ৩৭ বছর বয়স্ক জেড আস্জার স্থানীয় একটি বিপণিতে এই বিপজ্জনক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন।

এই কণ্টকশয্যার পূর্বে ১৬৭ মিনিটে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন আয়ারল্যান্ডের জনৈক অধিবাসী।

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো দৌড়বিদ চার্লি গ্রীন স্বদেশে নিগ্রোদের প্রতি আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ মেক্সিকো অলিম্পিকে শত মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করে তা সবার সমক্ষে বিশ্বের "কালা আদমীদের" উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেন।

কৃষ্ণকায় দৌড়কুশলীরা এর আগেও ঐ বিভাগে স্বর্ণপদক জয় করেছেন; কিন্তু তাঁরা এরকমভাবে তা উৎসর্গ করেন নি।

নির্মলকুমার ঘোষ
গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি

১৯৫২ সালে লীডস্ টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে কোন রান ওঠার আগেই চার-চারটি উইকেট পড়ে যাওয়ার কথা বোধ হয় অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর একটি খেলাতে শূন্য রানের মাথাতেই কি রকম অঘটন ঘটে গিয়েছিল, সে কথা শুনলে অনেকেই হয়ত আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

সেটা ছিল ১৮৭২ সাল। ক্রিকেট-তীর্থ লর্ডসে প্রথম শ্রেণীর খেলা চলছিল এম-সি-সি ও সারের মধ্যে। খেলাটিতে এক সময় এম-সি-সি ব্যাট করতে নামল। কিন্তু কি আশ্চর্য! স্কোর বোর্ডে কোন রান ওঠার আগেই এম-সি-সি'র ব্যাটসম্যানেরা একে একে ফিরে আসছেন আউট হোয়ে। আর এভাবে ঘন ঘন একটি দুটি তিনটি করে সাত-সাতটি উইকেট পড়ে গেল। বোর্ডে তখনও এম-সি-সি'র রানের ঘরের পাশে শূন্য। অবশেষে দু'টো রান সংগৃহীত হল! অবশ্য ঐ ইনিংসটিতে শেষ পর্যন্ত এম-সি-সি করেছিল ১৬ রান।

তবে শূন্য রানের মাথায় পর পর সাতটি উইকেট পতন ঘটবার নজির প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় আর কিন্তু দুটো নেই!

[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়
হালিসহর, ২৪ পরগণা

## সমাচার দর্পণ

জলন্ধরে এখন বসেছে পঞ্চবিংশ বার্ষিক জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর। এই ক্রীড়ানুষ্ঠান এক পক্ষকাল ধরে চলবে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের হয়ে যাঁরা জলন্ধরে গেছেন, তাঁরা হলেন—

**গোল :** এস মুখার্জী (ইস্টবেঙ্গল), জয়ন্ত দেব (ইস্টার্ন রেলওয়ে এ এ)

**ব্যাক :** গুরবক্স সিং ও জার্নাল সিং (মোহনবাগান), ই জেনিংস (ইস্ট-রেল এ এ)

**হাফব্যাক :** পরমপাল সিং (ইস্টার্ন রেল এ এ), রাজকুমার ও এ চ্যাটার্জী (মোহনবাগান) ই জেনিংস (ইস্ট-বেঙ্গল), আর কে চ্যাটার্জী (ইস্টার্ন রেল এ এ)

**ফরোয়ার্ড :** ডি ঘোষ (ইস্টার্ন রেল এ এ), বি প্রধান (কাস্টমস), টি শেরখাঁ ও গোবিন্দ (ইস্টবেঙ্গল), ইনাম-উর রহমান (অধিনায়ক, মোহনবাগান), ওসমান খাঁ (মোহনবাগান), আখতার আলি (ইস্টার্ন রেল এ এ) ও সেলিম বেগ (বি এন আর)

*

সিংহল থেকে দুটি দল ভারত সফরে আসছে—একটি পুরুষদের, অপরটি মহিলাদের দল। ভারত সিংহলের বিরুদ্ধে কয়েকটি হকি টেস্টে মিলিত হবে। কলকাতায় ৯ই ও ১০ই মার্চ পুরুষদের সংগে ও মহিলা দলটির সংগে ভারতীয় দলের ভলিবল টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

প্রণবকুমার সেন (রেল কলোনী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

**উত্তর :** সুভাষ ভৌমিকের জীবনী ফুটবল মরশুমে প্রকাশ করা হবে। ওঁকে আপনি C/o. ইস্টবেঙ্গল ক্লাব টেন্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা-২১—এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে চিঠির সংগে ঠিকানা লেখা খাম, ইনল্যান্ড কিম্বা পোস্ট-কার্ড দিতে হয়।

**দিব্যেন্দু, বাবলু, মিন্টু ও দাদু (হিলা চা-বাগান, নাগরাকাটা, জলপাই-গুড়ি)**

**প্রশ্ন :** কোন্ খেলোয়াড় টেস্ট খেলায় ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন—দলের অন্য সব খেলোয়াড়রা আউট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও? তিনি কোথাকার খেলোয়াড় এবং কোন্ দেশের বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন?

**উত্তর :** প্রায় ২৬-২৭ জনের নাম করতে হবে। অতো জায়গা তো এখন দেওয়া যাবে না। সুযোগ পেলেই জানাবো।

তবে এই অপরাজিতের তালিকার শেষ নামটি হলো বিল লরীর। তিনি এই মরশুমের দিল্লী টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস সূচনা করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন।

---

[ ২৩০১ পৃষ্ঠার পর ]

ওয়াজির আলী যখন এল· বি· ডব্লিউ হয়ে আউট হলেন, তখন ভারতের রান-সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১০-এ। এর পর ১৩১ রানের মাথায় নাইডু আউট হলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় ভারত ৪ উইকেট হারিয়ে করলো ১৫৩ রান।

কিন্তু লাঞ্চের পর খেলার ধারা একদম বদলে গেলো। কোলহা ১৬৫ রানে, নাজির আলী ১৬৫, লাল সিং ১৮১ রানে, জাহাঙ্গীর খান ১৮২ রানে, অমর সিং ১৮৮ রানে আর নিসার ১৮৯ রানে আউট হয়ে গেলেন। ফলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই ভারত ৭০ রানে পিছিয়ে থাকলো।

ঐ ৭০ রানে এগিয়ে থাকার সুযোগটা পুরোপুরিভাবে নিয়ে ইংলন্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭৫ রান করে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলো। জার্ডিন দ্বিতীয় ইনিংসেও সাংঘাতিক ব্যাটিং করলেন। ৮৫ রান করে তিনি থাকলেন অপরাজিত। জার্ডিন ছাড়া একমাত্র পেনটারই (৫৪) যা কিছু খেলেছিলেন। ভারতের জাহাঙ্গীর খান একাই চারটে উইকেট দখল করেছিলেন। অমর সিং পেয়েছিলেন ২টি আর মহম্মদ নিসার ১টি।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংসেও খুব একটা সুবিধে করতে পারলো না। এর কারণ হিসেবে অবশ্য ভারতের তিনজন ব্যাটসম্যানের আহত থাকার কথা উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত করলো ১৮৭ রান। এর মধ্যে পিটিয়ে খেলে অমর সিং করলেন ৫১ রান, লাল সিং ২১ আর ওয়াজির আলী ২১ রান। ফলে ভারত ১৫৮ রানে হেরে গেলো তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচে।

সম্পাদকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী ( প্রাঃ ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসদকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

## সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৩৭শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 12th March, 1970

# ছিনতাই, রাহাজানি, গুণ্ডামি ও পুলিশ বিভাগ

এদিকে যুক্তফ্রন্টের যখন অন্তিম দশা উপস্থিত এবং প্রশাসনিক যন্ত্র যখন ক্রমশ অচল হয়ে পড়ছে, তখন কলকাতার নাগরিকদের জীবন ক্রমাগত সশঙ্ক হয়ে পড়েছে বাটপাড়ি, রাহাজানি, আর ছিনতাই-এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে। এই সব সমস্যা যে শরিকদলগুলির পারস্পরিক ঝগড়ার চেয়ে আরো বেশি গুরুতর—প্রত্যেকটি শরিকদলের স্থিরমস্তিষ্কে সে কথা বিবেচনা করার আর সময় নেই, সে কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখন কোনো বিশেষ পার্টি কর্তৃক অপর পার্টির গায়ে থুথু ফেলার চেয়ে এটা ভেবে দেখা কি উচিত নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বহু আশায় যে-যুক্তফ্রন্টকে শাসন করার অধিকার দিয়েছে, সেই যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব রক্ষাই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনগণ চায় পরিচ্ছন্ন প্রশাসন। সেই প্রশাসন বোধ হয় এখন লাটে উঠতে বসেছে। জনগণের ওপর এখন খবরদারী সুরু করেছে এক শ্রেণীর গুণ্ডা।

প্রায় প্রত্যহ সংবাদপত্রে ছিনতাই, গুণ্ডামি বা ডাকাতির একটা না একটা খবর পাওয়া যাবেই। সেই আতঙ্কে কলকাতায় রাত্রির রাজপথ নির্জন হয়ে পড়ে এবং সিনেমা হলগুলিতে দর্শক সমাগম কম হয়। এই অবস্থা যুক্তফ্রন্টের শাসনকালীন অবস্থায় চলতে পারে—এমন কথা আমাদের অকল্পনীয় ছিল।

সম্প্রতি পি, ডি, অ্যাক্ট উঠে গেছে। সুতরাং পুলিশ বিভাগের পক্ষে সাফাই দেওয়া হয়তো সম্ভব যে, ঐ আইন চালু না থাকায় তারা নিরুপায়। প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ঐ রকম সাফাই দিয়ে কখনো সত্যকে ঢাকা যেতে পারে না। কারণ পি, ডি, অ্যাক্ট যখন চালু ছিল, তখন পুলিশ বিভাগ কতোটা [illegible] পরিচয় দিতে পেরেছেন। [illegible] আমরা ইতিপূর্বে ওয়াগন ব্রেকারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পুলিশ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, আর সে সময় পি, ডি, অ্যাক্ট বহাল তবিয়তে ছিল, তবু পুলিশ বিভাগের এমনই কর্ম-তৎপরতা যে, ওয়াগন ব্রেকারদের নির্মূল করা সম্ভব হয় নি, দিবারাত্র রেলের বৈদ্যুতিক তার চুরি হলেও, তা নিবারণ করা কি গেছে?

বেশ কিছুদিন ধরে যুক্তফ্রন্টের শরিক-দলগুলি পরস্পর পরস্পরকে গুণ্ডাদের আশ্রয়দাতা বলে অভিযুক্ত করছেন। হয়তো ঐ অভিযোগ কিছুটা সত্য, কারণ দু-একটি দল আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে স্বীয় দলকে গুণ্ডাদের কোনোরকম আশ্রয় দানের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। জানি না, ঐ সব গুণ্ডাই এখন ছিনতাই বা গুণ্ডামি করছে কি-না! তবে জনৈক পুলিশ মুখপাত্রের কথা থেকে জানা গেল যে, রাজনৈতিক দলগুলি যদি গুণ্ডাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকে, তাহলে পুলিশ বিভাগ গুণ্ডাদের এক নিমেষে শায়েস্তা করে দেবে।

উপরোক্ত কথা শুনে মনে হতে পারে, পি, ডি, অ্যাক্ট না থাকলেও গুণ্ডাদের জেল-হাজতে হাজির করা যায়—যদি রাজনৈতিক দলগুলি বাদ না সাধে।

ঐ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি, সেই সময়কার কথা—যখন রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে চালু ছিল। সে সময়কার সংবাদপত্রের পাতাগুলি উল্টে দেখলে কি মনে হবে, তখন ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি, লুঠ কিংবা হত্যাকাণ্ড ঘটে নি? ঘটেছে, তবু পুলিশ বিভাগ কোনো কিনারা করতে পেরেছে, এমন ধারণা হয় না। অথচ তখন পি, ডি, অ্যাক্ট ছিল, এখনকার মতো তখনো গোয়েন্দাবাহিনী ছিল। অতএব রাজনৈতিক দলগুলির ওপর সমস্ত দোষ না চাপিয়ে পুলিশ বিভাগ আত্মসমালোচনা করে জন-জীবনে [illegible] আনার [illegible] করবে, সকলে স্বস্তি অনুভব করবে। আর একথাটা পুলিশ বিভাগকে মনে রাখতে হবে, জন-সাধারণের ন্যায্য আন্দোলন দমন করতে তাদের বাহিনীর জন্য জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করা হয় না। পুলিশের কাজ হবে জনজীবনকে নির্বিঘ্ন করা। পুলিশ বিভাগ কি আমাদের জানাবেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার ঐ বিভাগকে চুরি, রাহাজানি, বোমাবাজি, ছিনতাই ও হত্যাকাণ্ড দমন করতে কোনো-রকম নিষেধ করেছেন কি-না? পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম এমনই ধারার যে, উগ্র-পন্থীদের দ্বারা সিনেমা হল আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দুটি সিনেমা হলের কর্তৃপক্ষ আগে জানালেও পুলিশ বিভাগ তা প্রতিরোধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করে নি। তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং। পুলিশ বিভাগের আচরণ সম্বন্ধে হতাশ হয়েই হয়তো স্বরাষ্ট্রসচিব জনসাধারণের প্রয়োজনে ও তাকে স্বয়ং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরি-কল্পনা গ্রহণ করেছেন।

এই সব ঘটনাকে তাচ্ছিল্য করা যায় না। জনসাধারণের স্বার্থে পুলিশ বিভাগকে গুণ্ডা দমনের কাজে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে। শোনা যাচ্ছে গুণ্ডাদের ধরার কাজে সাদা পোষাকে বহু পুলিশ নাকি সর্বত্রই সতর্ক রয়েছে। তবু অবাধে গুণ্ডারা এখনো পর্যন্ত জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে এবং একেকটি ঘটনা বহুজনকে আতঙ্কিত করে তুলছে। আমরা চাই, অবিলম্বে এর প্রতিবিধান হোক।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

চীনের সঙ্গে ভারতকে একটা অস্বস্তিকর সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হচ্ছে: এ সম্পর্ক না-যুদ্ধের, না-শান্তির; না বন্ধুত্বের, না শত্রুতার। কিন্তু এমন দিন গিয়েছে যখন চীন ও ভারতবর্ষ গভীর মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সেদিন চৌ-এন-লাই-জওহরলাল নেহরু ছিলেন হরিহর আত্মা। হিন্দি-চীনী ভাই ভাই। আবার এমন দিনও গিয়েছে যখন সেই ভাই ভাইয়ের উষ্ণ বক্ষে তীক্ষ্ম ছুরির ফলার বিদ্ধ করে অপার আনন্দ লাভ করেছে। সে হল ১৯৬২ সালের কথা। সেই থেকে চীন-ভারত বিরোধ চলে আসছে। যারা একে অপরকে না দেখলে থাকতে পারতো না, তাদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। একে অন্যের নাম শুনতে পারে না। আর পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা শুধু ছোড়াছুড়ি।

শত্রুর আসনে কেবল ভারতকে বসিয়েই চীন ক্ষান্ত হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুরু করে সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, এমন কি ইন্দোনেশিয়াকে পর্যন্ত চীন একদিন শত্রুর পর্যায়ে নিক্ষেপ করেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীন একদিন আন্তর্জাতিক আইন ও শিষ্টাচারকে পর্যন্ত ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু চীন যেন আজ রণক্লান্ত। পিকিঙের দেয়ালে-দেয়ালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভিজ্ঞানস্বরূপ পোস্টারের যে প্রলাপ দেখা যেত, এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। কিংবা বিদেশী দূতাবাস ঘেরাও, দূত বা বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধির গায়ে থুথু নিক্ষেপ, থাপ্পড় মারা ইত্যাদি ঘটনার পুনরাবৃত্তিও আজ আর হয় না। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা গোপন বোঝাপড়ার চেষ্টায় চীন আজ লিপ্ত হয়েছে বলে সংবাদ

আমেরিকার সঙ্গে যদি হাত মেলানো সম্ভব হয়, তবে পুরনো সুহৃদ ভারতের সঙ্গে নয় কেন? ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সঙ্গে চীনের উপরাষ্ট্রপতি কুয়ো মো-জোর করমর্দনের এটাই বোধহয় পটভূমি। কুয়ো মো-জো নেপালস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত রাজবাহাদুরকেও প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছেন এবং শত শত ক্যামেরাম্যানকে সে দৃশ্য রেকর্ড করে রাখতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন।

কুয়ো মো-জো

আর কিছুদিন আগেও এ-দৃশ্য অভাবনীয় ছিল। নেপালের যুবরাজের বিয়ে উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলেন। রাজা মহেন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যে পার্টি শ্রীগিরি দিয়েছিলেন, তাতে যথারীতি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন চীনা প্রতিনিধিরাও। আসবে না কেউ এ-কথা ধরে নিয়েই নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল। কারণ সাম্প্রতিক-কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, যা ভারত আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে-পার্টি চীন বর্জন করেছে। কিন্তু এবার নিমন্ত্রিতরা সত্যি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ভারতকে মর্যাদা দিয়েছেন। চীনা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে কুয়ো মো-জোর মত বুদ্ধিজীবী বিবেচক লোক ছিলেন বলেই কি এটা সম্ভব হল, না সত্যি চীনের নীতিতে উল্লেখনীয় পরিবর্তন আসছে?

৭৮ বছরের কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক কুয়ো মো-জো চীনের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা। মাও সে-তুঙের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। বিপ্লবের আগে তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে দেখা গিয়েছে। প্রথমে তিনি ছিলেন গণফৌজের রাজনৈতিক শাখার প্রধান। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এ-পদে থাকার পর তিনি নানকিঙ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন এবং ১০ বছরের জন্যে জাপানে নির্বাসিত হন। এখানে তিনি চীনের ইতিহাস ও সাহিত্য ভাল করে অধ্যয়ন করে পরবর্তীকালে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় কুয়ো মো-জো চীনে ফিরলেন। মাও তাঁকে সামরিক পর্ষদের প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান করেন। তারপর সাংস্কৃতিক কর্মপরিষদ, পলিটিক্যাল কনসাল্‌টেটিভ কমিটির জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যানের পদেও তাঁকে দেখা গেল। ক্ষমতা দখলের পর কুয়ো মো-জোকে দেওয়া হল প্রথমে সরকারী প্রশাসন পর্ষদের ভাইসচেয়ারম্যান, পরে জাতীয় গণপরিষদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির ভাইসচেয়ারম্যান পদ। ১৯৫২ সালে তিনি স্টালিন শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। চীন সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রের সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর সারা চীনে যথেষ্ট খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দৌলতে কুয়ো মো-জোর ওপরও চাপ এসেছিল,

# সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

## বসু ও জিন্না—(৪)

জাতীয়তাবাদী কিছু মুসলমান কংগ্রেসের প্রায় সূচনা থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন। বদরুদ্দিন তায়েবজি এক্ষেত্রে বিখ্যাত একটি নাম এবং আর এম সয়ানী ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পরে বিখ্যাত বরিশাল কনফারেন্সে সভাপতি ছিলেন এ রসুল। বেশ কিছু মুসলমান বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

আলিগড় আন্দোলনের বিরোধিতা করে মুসলমান সমাজে জাতীয়তা সঞ্চারে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও এইকালে দেখতে পাই। ভারতীয় মুসলমান পরিবারে আজাদের জন্ম; বাবরের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পুরুষ ভারতে এসেছিলেন। আজাদের জন্ম মক্কায়: রক্ষণশীল পিতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে অবিমিশ্র ইসলামী পদ্ধতিতে তাঁর শিক্ষা হয়েছিল, কিন্তু সৈয়দ আহমদের প্রভাব কৈশোরে তাঁর উপরে পড়েছিল, তার ফলে আধুনিক মননজীবনের প্রতি আগ্রহ এসেছিল, নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখে নিয়েছিলেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন, ধর্ম সম্বন্ধেই সংশয় এসে গিয়েছিল, বিদ্রোহী চেতনা ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করেছিল—সে ছদ্মনাম 'আজাদ' অর্থাৎ স্বাধীন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আজাদের মনকে নাড়া দেয়। আজাদ স্বীকার করেছেন, বাঙালী হিন্দুর রাজনৈতিক চেতনাই ভারতকে নাড়া দিয়েছিল। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সূত্রে আজাদ বিপ্লবী দলের সংস্পর্শেও আসেন, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দিতে চান, কিন্তু মুসলমান বলে তাঁকে সংশয়ের চোখে দেখা হয়, কারণ বিপ্লবীরা ঘোরতম মুসলমান-বিরোধী। আজাদ স্বীকার করেছেন, অকারণে তা নয়, ইংরেজরা জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করতে মুসলমান সমাজকে লাগিয়েছিল এবং উত্তর ভারত থেকে মুসলমানদের আমদানী করে পুলিশ বিভাগে ঢুকিয়ে দিয়েছিল; তারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করত। আজাদ বিপ্লবী দলকে বুঝিয়ে আস্থা অর্জনে সমর্থ হন এবং এমন কি, বাংলার বাইরে কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধিতে বিপ্লবীদের প্রণোদিত করতে পারেন। মুসলমান যুবকদের মধ্যেও তিনি কাজ আরম্ভ করেন।

অল্প দিনের মধ্যে আজাদ শিক্ষার জন্য ইরাক, ইজিপ্ট, সিরিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেন।১৪ তখন তাঁর বয়স কম-বেশি ২০। কলকাতায় বিপ্লবীদের সঙ্গে যে সম্পর্ক হয়েছিল, তাকে ঝালিয়ে নিতে পারলেন আরবী ও তুর্কী বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা। ঐসব বিপ্লবীরা শুনে হতবাক যে, ভারতীয় মুসলমানেরা জাতীয় আন্দোলনে যোগ না দিয়ে ইংরেজের তল্পীবাহক হয়ে আছে। তাঁদের ধিক্কার আজাদকে জাতীয় আন্দোলনে মনপ্রাণ সমর্পণ করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলল।

দেশে ফিরে মুসলমান জনমত সংগঠনের জন্য পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করলেন এবং ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে আল হিলাল নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করলেন। মুদ্রণে, সম্পাদনায় রচনাগুণে, এবং প্রেরণাময় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পত্রিকাটি অতি অল্পকালের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করল এবং তার দ্বারা উর্দু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই নবযুগের সৃষ্টি হল

---

১৪ আজাদ সম্বন্ধে পূর্বে প্রচলিত কয়েকটি ধারণা একেবারেই ভুল। তার একটি, আজাদ ইংরেজী জানতেন না, বলতেন না। দ্বিতীয় ভুল, যা জওহরলালও লিখিতভাবে করেছেন, আজাদ কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। আজাদ তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম'-এর মধ্যে ঐ ভ্রম সংশোধন করেছেন। মহাদেব দেশাই আজাদের জীবনীর মধ্যে ঐকথা লেখার পর থেকেই ভুলের সূত্রপাত। আজাদ জানিয়েছেন, তিনি একদিনের জন্যও আল আজহারে পড়েন নি, তার কারণ আর কিছু নয়, আজাদ যখন সেখানে গিয়েছিলেন, সেই ১৯০৮ সালে আজহারের শিক্ষাপদ্ধতি এতই দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, সেখানে শিক্ষা নেওয়ার কোনই ইচ্ছা আজাদের হয় নি। সেখানে "মনোগঠনের প্রচেষ্টা ছিল না কিংবা প্রাচীন ঐস্লামিক বিজ্ঞান ও দর্শন যথাযোগ্যভাবে শেখানো হত না।"

না, এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে নূতন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষও হল। ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতৃত্বের কাছে এতই ভয়াবহ মনে হল যে, আজাদকে খুন করে ফেলবার শাসানিও দেখানো হল। সরকারও কম আতঙ্কিত হল না, তার সকল বিভেদনীতিকে অসফল করার এই প্রয়াসকে ক্ষমা করল না, কয়েকবার পত্রিকাটির জামানত বাজেয়াপ্ত করেও যখন আজাদকে ঠান্ডা করা গেল না, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করে তাকে আটক রাখল ১৯১৬-র এপ্রিল থেকে ১৯১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত।১৫

একদিকে ইংরেজের দাক্ষিণ্যে কিছু সংকোচ এবং ব্যাপক বিশ্বে ইংরেজের মুসলমান-বিরোধী ভূমিকা, অন্যদিকে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কিছু জাতীয় চেতনার সঞ্চার—এই সমস্ত মিলিত হয়ে মুসলিম লীগকে নাড়া দিয়েছিল, কিছু নরম করেছিল, ফলে লীগ ইংরেজ সরকারের চিরদাসত্বের প্রতিজ্ঞা কিছু শিথিল করে ১৯১৩ খৃস্টাব্দে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল। এতেই শেষ নয়, ১৯১৬ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের সঙ্গে লখনৌয়ে একটা বোঝাপড়ায় পর্যন্ত এসেছিল—তারই নাম লখনৌ প্যাক্ট।

কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করে এসেছে এবং অনেক অসঙ্গত দাবি পূরণেও আগ্রহ দেখিয়েছে। কংগ্রেসে হিন্দুপ্রাধান্য স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান ছিল। প্রথমত ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, দ্বিতীয়ত ইংরেজী শিক্ষার সুযোগে জাতীয় চেতনা হিন্দুদের মধ্যে আগে এসেছিল এবং আন্দোলনে তারা বেশি সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল—কংগ্রেস সেই জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। শুধু সংখ্যার প্রাধান্য নয়, সূচনাপর্বে জাতীয় আন্দোলনে ভাবের দিক দিয়েও হিন্দু-চেতনার প্রাবল্য ছিল। তার কারণও বোধগম্য। জাতীয় আন্দোলনের পূর্বে এবং প্রথম পর্বে হিন্দুদের মধ্যে সংস্কার-আন্দোলন ও ধর্মান্দোলন হয়, হিন্দুধর্মের গৌরব বৃদ্ধিতে হিন্দুরা উদ্দীপিত হয়, ফলে জাতীয় আন্দোলন অনেকাংশে হিন্দুর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া জাগরণের জন্য যেসব রণধ্বনি বা উদ্দীপক সাহিত্য প্রভৃতি ব্যবহৃত হত, সেগুলি স্বতঃই হিন্দু-ঐতিহ্য আশ্রিত হয়েছিল, কারণ আন্দোলনকারীরা হিন্দু বলে হিন্দু-ভাবানুভূতির আশ্রয়ে তাদের সহজে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হত। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, গীতা, আনন্দমঠ বা বিবেকানন্দের উদ্দীপক রচনা বাঙালী হিন্দুকে (অবাঙালী হিন্দুকেও) প্রেরণা দিয়েছিল, মহারাষ্ট্র অধিকন্তু উদ্বুদ্ধ

১৫ ১৯২০-র ১লা জানুয়ারীতে মুক্তি পাবার পরে আজাদ খিলাফত আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন। আজাদের বৈপ্লবিক উত্তেজনা ইতিমধ্যে স্তিমিত হয়েছে—তিনি গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহের পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি কংগ্রেসের বড় কর্তাদের একজন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুসলিম জনগণের নেতা তিনি কোনোদিনই হতে পারেন নি, যা হয়েছিলেন মহম্মদ আলী, বা গফর খান বা জিন্না।

আজাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও গুণগ্রাহী পণ্ডিত জওহরলাল আজাদের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে। "আবুল কালাম আজাদ...গভীর পড়াশোনা এবং আরবী ও ফার্সীতে পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; তদুপরি যুক্ত হয়েছিল বহির্ভারতের মুসলিম জগতের সঙ্গে এবং সেখানকার সংস্কার আন্দোলনসমূহের সঙ্গে পরিচয়। ইউরোপীয় ঘটনাধারার বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি একদিকে ঐশ্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, অন্যদিকে তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—সেজন্য মুসলিম শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করতেন যুক্তির আলোকেই। ইসলামের ঐতিহ্যের রসে নিষিক্তচিত্ত, সেই সঙ্গে মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ইরাক এবং ইরানের বিশিষ্ট মুসলমান নেতা ও সংস্কারকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ,—তার ফলে ঐ সকল দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দ্বারা তিনি যতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেইরকম আর কোনো ভারতীয় মুসলমান হয়েছিলেন কি-না সন্দেহ। তুরস্ক যে সব যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেগুলি তাঁর মনে তীব্র আকর্ষণ ও গভীর সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তা হলেও প্রবীণতর মুসলমান নেতাদের সঙ্গে ঐ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদারতর এবং যুক্তিপূর্ণ, যা তাকে প্রবীণতর মুসলিম নেতাদের সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাকামী সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব থেকে দূরে রেখেছিল এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী করে তুলেছিল। তুরস্ক এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তার উন্মেষ তিনি দেখেছিলেন, সেই জ্ঞান তিনি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন।......বাইরের আন্দোলন সম্বন্ধে অন্য ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় কোনো সচেতনতাই ছিল না, তারা নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যেই মগ্ন হয়েছিল।...তারা নিছক ধর্মের দিক দিয়েই সব কিছু দেখত। যদি তারা তুরস্কের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখিয়ে থাকে, ধর্মীয় বন্ধনই তার মুখ্য কারণ। তুরস্কের প্রতি গভীর সহানুভূতি সত্ত্বেও তারা তুরস্কের জাতীয়তাবাদ এবং বহুলাংশে সেকুলার আন্দোলনের সুরে সুর মেলাতে পারে নি।

"আবুল কালাম আজাদ তাঁর সাপ্তাহিক আল হিলালের মধ্যে নতুন ভাষায় কথা বললেন।......পুরনো রক্ষণশীল মুসলমান নেতাদের প্রতিক্রিয়া সে বিষয়ে ভাল হয় নি; তাঁরা আজাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিতও আজাদের সঙ্গে পাণ্ডিত্যে ও বিচারে সমকক্ষতা করতে পারতেন না। তাঁদের থেকে আজাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও ঐতিহ্যবোধ অধিক ছিল। আজাদ মধ্যযুগীয় শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য, অষ্টা

[illegible] এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচিত্র মিশ্রণ।"

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

হয়েছিল শিবাজী উৎসবের মধ্যে। টডের 'রাজস্থানে'র কাহিনীতে বাংলার দেশাত্মবোধক সাহিত্য পূর্ণ ছিল, শিখের বা মারাঠার আত্মবলিদানের কাহিনীর ভূমিকাও কম ছিল না।১ স্থিরভাবে বিচার করলে এদের বিরুদ্ধে খুব দোষ দেওয়া যায় না. ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্নভাবে জাগরণ ঘটে, দোষের হয় যদি ঐসব জিনিসের প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পরেও তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। তিলককে অনেকে কংগ্রেসের হিন্দু-প্রবণতার জন্য দোষী করেছেন.। তিলকের পক্ষে একথা নিশ্চয়ই বলা যাবে, তিনি কালপ্রয়োজন মানতেন এবং প্রয়োজনের বাইরে কোনো বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন না। তথাকথিত উদারনৈতিক সমাজ-সংস্কারকেরা কংগ্রেস-অধিবেশনের প্যাণ্ডালেই হিন্দুর সমাজ-সংস্কার সভার অধিবেশন ঘটাতেন—তিলক তাকে বন্ধ করেছিলেন—হয়তো সমাজ-সংস্কারের ঐ ধরণের চেষ্টার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না বলেই বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু ভিতরের কারণ যাই হোক, তিলক অন্তত দেখিয়ে দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক ব্যাপারকে অন্য ব্যাপারের সংগে জড়িয়ে না ফেলাই উচিত। গান্ধীজী পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বহু চেষ্টা করেছেন, তার জন্য বহু দুর্বলতা দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি আবার হিন্দু-ঐতিহ্যের বহু শব্দ ও উপাদানকে জাতীয় আন্দোলনে ব্যবহার করে অহিন্দু বহু ভারতীয়কে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে গান্ধীজী ঘোষণা করেছেন—অতঃপর হরিজন আন্দোলনই কর্তব্যকর্ম—চমৎকৃত বিস্ময়ের সংগে মুসলমানদের দেখতে হয়েছে যে, জাতীয় নেতা হিন্দুসমাজের একাংশের উন্নয়ন করতে চান জাতীয় আন্দোলনের মূল্যে। গোরক্ষা আন্দোলন, অথবা উর্দুর বদলে উত্তর ভারতে হিন্দী প্রবর্তনের প্রয়াসও মুসলমানদের বিমুখ করেছে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্বে।২

কংগ্রেসে হিন্দুপ্রাধান্য যেমন ছিল, সে বিষয়ে সচেতনতাও যথেষ্ট ছিল এবং হিন্দু নেতারা উদার হতে কদাপি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁদের উদারতা দুর্বলতা বলে সমালোচিত হতে পারে। সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে কংগ্রেসের বিবেচনাবোধের প্রমাণ প্রথম থেকেই দেখা যায়। মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৮৭) জনৈক সদস্য গো-হত্যা বন্ধের প্রস্তাব তুলতে চাইলে মুসলমানদের মনোভাবের কথা বিবেচনা করে কংগ্রেস সে প্রস্তাব নেয় নি এবং সিদ্ধান্ত করেছিল, সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে অন্য সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকলে আপত্তিকারী সম্প্রদায় যদি সংখ্যালঘু হয়ও,

১ স্মরণ রাখতে হবে, মুসলমান সিরাজদ্দৌলাকেও জাতীয়-বীর করা হয়েছিল।

২ ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে বেনারসে উর্দুর বদলে হিন্দী প্রবর্তনের আন্দোলন হয়। জিন্নার জীবনীকার হেক্টর বলিথো'র প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এই ঘটনাই সৈয়দ আহমদকে স্থিরনিশ্চয় করে দেয় যে, হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায় কখনো সর্বান্তঃকরণে কোনো বিষয়ে যুক্ত হতে পারবে না: This episode convinced Syed Ahmed Khan that the two communities—Muslim and Hindu—would never 'join whole-heartedly in anything.' He made this statement to the British Divisional Commissioner (Mr. Alexander Shakespeare) at Beneras and added, 'at present there is no open hostility between the two communities, but on account of the so-called 'educated' people, it will increase immensely in future. He who lives will see'." সৈয়দ আহমদের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ বৃদ্ধিতে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাত সবচেয়ে বেশি ছিল, সন্দেহ নেই এবং সেই তথাকথিত শিক্ষিতদের কতজন সৈয়দ আহমদের 'আলিগড় স্কুলে'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার আলোচনায় আসারও প্রয়োজন নেই। সৈয়দ আহমদের উদারতার পক্ষে জওহরলালের দাবিকে নস্যাৎ করতে ঐতিহাসিকরা কি বলেছেন, তার কিছু উদ্ধৃত করেছি পূর্বে। এখানে জিন্নার জীবনীকার, দেশ ভাগের প্রথম প্রবক্তারূপে স্যার সৈয়দের প্রতি যে-গৌরব অর্পণ করেছেন, তার উল্লেখ না করে পারছি না:

"....Syed Ahmed Khan—the first Muslim in India who dared to speak of 'partition; the first to realise that, mutual absorption being impossible, the Hindus and Muslims must part. He was the father of all that was to happen, ultimately, in Mohammed Ali Jinnah's mind."

১৮৮৩ খৃস্টাব্দে প্রদত্ত স্যার সৈয়দের একটি বক্তৃতার অংশ তুলছি, যা একেবারে খুলে ধরেছে তাঁর মনকে:

"Now suppose that all the English .... were to leave India ... then who would be the rulers of India? Is it possible that under these circumstances, two nations—the Mohammedan and Hindu—could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable." (H. Bolitho)

...ন্দু সে বিষয়টি কংগ্রেস কর্তৃক বিবেচিত হবে না।৩ এই ...তি কংগ্রেসে বলবৎ ছিল সর্বসময়ে। কিন্তু তার দ্বারা ...সলমানদের উদ্ভট দাবি কমে নি। ১৮৮৮ কংগ্রেসে ...উম যখন বলেছিলেন, "ভারতে সবাই ভারতবাসী, সেখানে ...বার সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু প্রশ্ন ওঠে কেন?"—তৎক্ষণাৎ ...গ্রেসের অধিকাংশ মুসলমান সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ ...রেন; তাঁরা বলেন, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-...সলমান সদস্যসংখ্যা সমান হওয়া উচিত। জনৈক কংগ্রেসী ...সলমান তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে দাবি করে বসেন, কোনো ...উন্সিলে হিন্দু সদস্যদের তুলনায় মুসলমান সদস্যসংখ্যা ...নগুণ বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরকম ক্ষ্যাপা দাবি ...বশ্য সকল মুসলমান সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় ...। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, হিন্দুদের সঙ্গে ...শ্রেণীর সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত আসন সংরক্ষণ প্রয়োজন।৪

একই ধরণের ব্যাপার ঘটে ১৮৯৬-এর কলকাতা ...গ্রেসে। সেবার সভাপতি স্বয়ং মুসলমান—আর, এস, ...য়ানী। স্যার সৈয়দের বন্ধু হাজি মহম্মদ ইসমাইল ...ভাপতির কাছে প্রস্তাব করেন, সর্বপ্রকার প্রতিনিধিমূলক ...তিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমানের সদস্যসংখ্যা সমান হোক। ...ভাপতি সেকথা মানতে পারলেন না। সৈয়দ আহমদ পরে ...বন্ধযোগে জানান, ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই মাত্র মুসল-...মানেরা কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে।৫

কংগ্রেসী মুসলমানেরা এই ধরণের অস্বাভাবিক বৃহৎ দাবি অনেক সময়েই করেছেন এবং অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ...দায়ে বা ঐসব মুসলমানকে কংগ্রেসে ধরে রাখার তাগিদে কংগ্রেস মুসলমানদের বহু অযৌক্তিক দাবি মেনে নিয়েছে। অবশ্য কংগ্রেসী মুসলমানদের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাঁদের দাবির বহরকে অস্বাভাবিক মনে হবে না। দেশে যেখানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার যথেষ্ট প্রসার হয় নি, সেখানে তাঁরা হিন্দুপ্রধান একটি প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন, তার জন্য নিজ সমাজে (যে সমাজে স্বধর্মপ্রীতিতে আপোষহীন) প্রত্যক্ষে ,পরোক্ষে তাঁরা লাঞ্ছিত—সেই সমাজের কাছে নিজেদের মুখরক্ষা করতে হলে অবশ্যই তাঁদের দেখাতে হবে, নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিলিয়ে দেবার জন্য তাঁরা সেখানে যান নি, বরং সেখানে বর্তমান থেকেই তাঁরা অধিক মাত্রায় নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করছেন। নিজের বিবেকের কাছে কৈফিয়তের প্রশ্নও ছিল—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সত্যই তাঁরা কিভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য পীড়নের হাত থেকে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করবেন! এরই জন্য দেখা গিয়েছে, কংগ্রেসী মুসলমানেরা মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির বিশেষ বিরোধিতা করতে পারেন নি এবং ইতিহাস এই বিচিত্র কান্ডটি দেখেছে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের পরিস্ফীত স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেস-বিরোধী মুসলমানদের তুলনায় কংগ্রেসী মুসলমানদের ভূমিকা অল্প নয়।৬

[ক্রমশ]

৩ রমেশ মজুমদার, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪৮৮।

৪ অশোক মজুমদার, ৪৯ পৃঃ।

৫ রমেশ মজুমদার, ১ম, পৃ' ৪৮১।

৬ এখানে আদর্শবাদী, সংগ্রামী, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই হবে, যাঁরা স্বসমাজের বিদ্বেষ এবং হিন্দু সমাজের পিঠ-চাপড়ানির মধ্যে নিছক আদর্শবাদের জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় মুসলমানদের বৃহৎ অংশ নানা কারণে নিজেদের ভারতীয় মনে না করে মাত্র মুসলমান মনে করতেন। কেন করতেন, তার কিছু আলোচনা করেছি, অল্প পরে প্যান ইসলাম প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করব। এখানে আমরা জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্বে যেসব মুসলমান নেতা নিজেদের প্রথমে ভারতীয় মনে করতেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম করতে পারি—"বোম্বাইয়ের বদরুদ্দিন তায়েবজি, আর এম সয়ানী, মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর, বাংলার এ রসুল, বিহারের মৌলবী মজর-উল-হক প্রমুখ।" ডঃ রমেশ মজুমদার এই প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আব্বাস এস তায়েবজির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা উৎপীড়িত হতে পারে, এবং কংগ্রেস তার নিমিত্ত হবে, মুসলমানদের এই আশঙ্কার উত্তর দিতে গিয়ে তায়েবজি লিখেছিলেনঃ "আমি এই প্রশ্ন করতে পারি, গত ২৫ বছরে কংগ্রেস কি এমন কোনো দাবি করেছে যার ফলে মুসলমান-স্বার্থের বিনিময়ে হিন্দুরা লাভবান হবে? কংগ্রেস তা যদি করত, মুসলমান ভাই সব, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, পরলোকগত বিচারপতি তায়েবজি, নবাব সৈয়দ মহম্মদ এবং অন্যান্যরা কদাপি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না।" নবাব সাদিক আলি খাঁ বলেছিলেন, "বিভিন্ন শ্রেণী বা ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার চেয়ে দুষ্ট ব্যবস্থা হয় না।...হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ভিন্ন—এটা শেখা মুসলমানদের পক্ষে সৎশিক্ষা নয়।...মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বলছি, (পৃথক নির্বাচনের) ঐ রীতি বজ্জাতিতে ভর্তি।" মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হবার পরে অনেক বিচক্ষণ মুসলমান র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে ঐ পদ্ধতির বিষময় রূপের কথা বলেছিলেন, একথা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড স্বয়ং লিখে জানিয়েছেন। জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক মুসলমানদের পৃথক হওয়ার নীতির ভয়াবহতার কথা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন—"এর ফলে প্যানডোরার বাক্সের ডালা খোলা হচ্ছে।"

'রমেশ মজুমদার, দ্বিতীয় খন্ড।
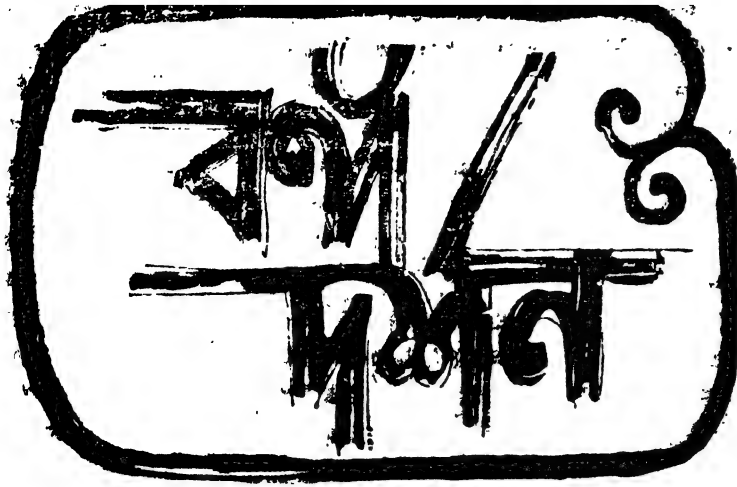
সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তটি অকস্মাৎ বাস্তবে পরিণত হল বা হতে চলল, অন্তত এই লেখা শুরু করার সময় থেকেই। 'অপ্রত্যাশিত' এবং 'অকস্মাৎ' এই দুটি শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ দেবার আছে। গত কয়েক মাস ধরেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সংবাদ-পত্রগুলি ক্রমাগত এই ধারণারই সৃষ্টি করেছিল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন আসন্ন, এবং কেন যে সেই সরকারের পতন হয় নি, কোন্ ঔষধের জোরে মরণোন্মুখ রোগী বার বার টিকে যাচ্ছিল, তা নিয়ে গবেষণা ও পরিতাপের অন্ত ছিল না। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করিনি যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটবে, কেন না তার কোন বাস্তব কারণ কদাপি দেখা দেয় নি, যদিও নানা বিষয় নিয়ে অনেক গোলমাল তোলা হয়েছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বাংলা কংগ্রেস ও সি· পি· এম-এর যে ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠেছিল, তার অনেকটা দূর হবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মারফৎ। সি· পি· এম-এর উগ্রতার নিরসন তখনই সম্ভবপর হত, যদি যুক্তফ্রন্টের মধ্য থেকেই চাপ সৃষ্টি করা যেত এবং বস্তুতই এই রকম একটি অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছিল। অন্তত চারটি দলকেও বাংলা কংগ্রেস স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছানুসারে বাংলা কংগ্রেস সরকার ও যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করল। বাংলা কংগ্রেসের কর্ম-পরিষদের এই সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিসংগত হয়েছে সে আলোচনায় এখন যাবার দরকার নেই, তবে আমাদের মনে হয়, এই রকম একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলা কংগ্রেস অবিবেচনাপূর্ণ কাজ করেছে।

বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদ মুখ্য-মন্ত্রীকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়ার যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি উভয় দলই মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে যথাসম্ভব শীঘ্র আর একটি সাধারণ নির্বাচনের দাবি করেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন, তেত্রিশ জন সদস্যের বাংলা কংগ্রেসকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়ার অধিকার কে দিয়েছে? শ্রীবসু যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে লাগাতার ধর্মঘট, হরতাল করার আহ্বান জানিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক অবশ্য বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এই পরিণতির জন্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করেছে। বাংলা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল নিজ নিজ দলের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে বসেন। সি· পি· এম-এর অধিকাংশ নেতা কল-কাতার বাইরে থাকায় তাঁরা এদিন কোন বৈঠকে বসেন নি।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয়, সি· পি· এম-এর অনবরত উস্কানি, অন্যান্য দলের উপর গুণ্ডা লেলিয়ে আক্রমণ করা, ওই দলের সংকীর্ণ দলীয় আচরণ আজ যুক্তফ্রন্টের এই সংকট সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বাংলা কংগ্রেসের এই একক সিদ্ধান্ত দুঃখজনক। সি· পি· আই-এর বিবৃতিতে এখনও বাংলা কংগ্রেসকে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা, এবং রাষ্ট্রপতির শাসন এড়িয়ে যুক্তফ্রন্টকে রক্ষার জন্য সি· পি· এম-এর কাছে তাদের ফ্রন্ট-বিরোধী উস্কানিমূলক আচরণ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদকমণ্ডলী এক প্রস্তাবে বাংলা কংগ্রেসের এককভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে জনগণের নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটাবার সামিল বলে এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য সি· পি· এম-এর যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী, সংকীর্ণ এবং অন্য দলের উপর প্রভুত্ব-স্থাপনসূচক আচরণ অনেকটা দায়ী। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সমস্যার সমাধান না করে সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে। আর· এস· পি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীত্রিদিব চৌধুরী বলেন, বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছে এবং যুক্তফ্রন্টকে অনিবার্যভাবে ভাঙনের মুখে এনে ফেলেছে। তিনি বলেন, আমি এখনো শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাংলা কংগ্রেসের বন্ধুদের কাছে আবেদন করছি, এখনো সময় আছে তাঁরা যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন।

এস· ইউ· সি-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে শ্রীনীহার মুখার্জী বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, এস· ইউ· সি বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারে না। বাংলা কংগ্রেসের সি· পি· এম-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে যুক্তফ্রন্টের সভায় তা নিয়ে মীমাংসায় আসার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ফ্রন্টের আহবায়ক শ্রীসুধীন কুমার বলেন যে, তিনি ফ্রন্টের দল-সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, যাতে ফ্রন্ট জরুরী বৈঠকে অবস্থা বিবেচনা করতে পারে। বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্ট ভাঙতে চায়, কিন্তু বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে গেলে ফ্রন্ট ভাঙবে না।

যা হোক, এখন ষোলই মার্চের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত কার্য-কর করার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। আমাদের পক্ষে আগামী ক'দিনের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রেখে যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে রাজ-নীতিতে সবই হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও সাতদিন সময় আছে, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলা কংগ্রেস সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারও করতে পারেন, কেন না রাজনীতিতে কিছুই অসম্ভব নয়। এবং সত্যই যদি ষোলই মার্চের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন, তাহলে কয়েকটি সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রথমটি হচ্ছে অজয়বাবুর নেতৃত্বে একটি মিনিফ্রন্ট সরকার অথবা সি-পি-এম-এর নেতৃত্বে একটি মিনিফ্রন্ট সরকার। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শাসন—হয় বিধানসভা ভেঙে না দিয়ে অল্পদিনের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন না হয় বিধানসভা ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন। সামগ্রিকভাবে ঘটনার বিচারে বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য যে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অবিবেচনাপ্রসূত হয়েছে, এবং এর দ্বারা সি· পি· এম-

## পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্প জগতে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাকে খুব স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না। এখানকার শিল্পপতি মহল সর্বদাই বলে আসছেন যে, ধর্মঘট, ঘেরাও কর্তৃপক্ষের ওপর হামলা এবং আইনশৃংখলার অবনতির জন্য পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানার নতুন প্রসার ঘটাতে ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, এই রাজ্যে শ্রমিক নেতারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁদের কার্যকলাপে শুধু শিল্পের নয়, গোটা দেশের ক্ষতি হচ্ছে। কলকারখানা, অফিস, এমন কি বাড়িতে পর্যন্ত ঘেরাও করার ফলে শিল্পপতিরা নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে মনে করে কলকারখানা বন্ধ করতে শুরু করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এই রাজ্য হতে অফিস অন্য রাজ্য স্থানান্তর করা হচ্ছে এবং এই রাজ্যে নতুন কলকারখানা না খুলে অন্য রাজ্যের দিকে তাঁরা ঝুঁকেছেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিরা যে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মধ্যে কাল কাটাচ্ছেন এবং শিল্পক্ষেত্রে যে সংকটের অবস্থা চলছে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানত শ্রমিক নেতাদের কার্যকলাপকেই দায়ী করছেন।

কিন্তু উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ঢালাওভাবে শ্রমিক নেতাদের বা শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করেন নি। এমন কি, অবস্থা শোচনীয় বলেও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, এই রাজ্য থেকে শিল্পসংস্থাগুলি অন্যত্র চলে যাক, এটা আমরা নিশ্চয়ই চাই না। ঘেরাও বা বাড়াবাড়ি কোথাও কোথাও ঘটেছে, কিন্তু সেটাই রাজ্যের সাধারণ অবস্থা তা বলা যায় না। তিনি বলেন, আমি একতরফাভাবে শ্রমিকদের ওপর দোষ দিতে পারি না। খোঁজ করে দেখতে হবে, কোন কারখানায় কি কারণে সংকট দেখা দিয়েছে এবং উভয়পক্ষের বৈঠকে তার মীমাংসা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী জনাব ফকরুদ্দীন আলির উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যদিও তিনি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-পরিস্থিতিকে শ্রমশিল্পের উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন তবু তাঁর মতে এই শ্রমিক অসন্তোষের জনাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে কলকারখানা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে, এ কথা সত্য নয়। বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে যে সব কলকারখানা চলে যাচ্ছে তা অর্থনৈতিক এবং কারিগরী কারণেই যাচ্ছে, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য নয়। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কলকারখানা সরিয়ে নেওয়া শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অন্যত্রও ঘটছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি মহারাষ্ট্রের নাম করেছেন। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্প স্থানান্তরের জন্য তিনটি আবেদন পান, এর মধ্যে দুটি আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং একটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৫টি নতুন শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে, ১৯৬৮ সালে মাত্র ২টি, ১৯৬৭ সালে ৭টি এবং ১৯৬৬ সালে চারটি নতুন শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

কিন্তু তৎসত্বে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যের পরিস্থিতি যে খুব আশাব্যঞ্জক নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। তার কারণ এক্ষেত্রে সরকারী ঔদাসীন্য। কোন সুসমঞ্জস শিল্পনীতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গড়ে তোলেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানকার শিল্পবাণিজ্যের সমস্যাকে নিছক শ্রম-বিরোধের সমস্যারূপেই দেখেছেন। কিন্তু এর যে গঠনমূলক একটা বহুলাংশে উদাসীন। যাকে বলা হয় প্রোডাক্টিভ এক্সপেণ্ডিচার—যুক্তফ্রন্ট সরকার তা খুব সামানাই করেছেন। সরকারী উদ্যোগে নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যদিও তা করা একেবারেই যে অসম্ভব ছিল, তা নয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ কোন মাথাঘামানো হয় নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের কার্যকলাপও খুব আশাপ্রদ নয়। সর্বোপরি মন্ত্রীদের মধ্যে কোন সমঝোতা না থাকায় এ বিষয়ে কোন ঐকান্তিক প্রয়াস ঘটানো হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা মূলধন বিনিয়োগ করতে চান, তাঁদের আকৃষ্ট করারও কোন প্রচেষ্টা হয় নি। বরং পর্যাপ্ত প্রচারের অভাবে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিরূপ চিত্র গড়ে তোলা হয়েছে। মন্ত্রীদের মধ্যেই কেউ কেউ যদি সরকারের নিন্দায় পঞ্চমুখ হন, তা হলে সারা ভারতে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, যদিও এ কথাটি কারো অজানা নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃংখলার অবস্থার সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের যোগ যৎসামান্য। আসলে সরকারের পক্ষে এ বিষয়ে যতটা সচেষ্ট হওয়া দরকার ছিল, তা হয় নি এবং মন্ত্রীদের সমবেত প্রচেষ্টার অভাবে এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রীতিমতই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৮ই মার্চ, ১৯৭০

### শ্রীমতী গান্ধীর সাফল্য

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় বাজেটের আলোচনাকালে আমরা বলেছিলাম, শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম বাজেট সত্যিই নানা-দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সিণ্ডিকেটপন্থী পাতিল, মোরারজী, তারকেশ্বরী, স্বতন্ত্র দলীয় মাসানী, জনসংঘের বাজপেয়ী এবং এস-এস-পি'র মধু লিমায়ে প্রমুখ দক্ষিণ-পন্থী এবং প্রায় দক্ষিণপন্থী নেতারা বাজেটের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছেন বটে, তবে সেটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। ধনতান্ত্রিক দেশে বিত্তবান শ্রেণী (সমাজের দক্ষিণপন্থী এবং রক্ষণশীল অংশ) বাজেটের ভালমন্দ বিচার করেন স্টক এক্সচেঞ্জের ওপর তার প্রতিক্রিয়া দেখে। শ্রীমতী গান্ধীর বাজেট অকস্মাৎ স্টক এক্সচেঞ্জকে এমন চাঙ্গা করে তুলেছে যে, ইন্দিরার বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী নায়কদের আক্রমণের ধার একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে। সিণ্ডিকেটের বাবুভাই চিমনাই তো বলেই ফেলেছেন, 'এটা সাহসী বাজেট'। তিনি নিজে একজন শিল্পপতি। কাজেই তাঁর এই বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। অপর দিকে বামপন্থী দলগুলোও এক নিশ্বাসে ইন্দিরাজীর বাজেটটিকে জনবিরোধী বলতে পারেন নি। জ্যোতির্ময়-মূর্তি (মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট) বলেছেন, বাজেটে বৃহৎ বাণিজ্যের ওপর আক্রমণের নামমাত্র চেষ্টা হয়েছে। হীরেন মুখার্জী (সি-পি-আই) বলেছেন, বাজেটটা খারাপ নয়। আর-এস-পি'র ত্রিদিব চৌধুরীও একই সুরে কথা বলেছেন।

বিরোধী পক্ষ বাজেটের [illegible] নিরুত্তাপ সমালোচনা আগে কখনও করেছেন বলে শোনা যায় নি। তার কারণটাও খুব সুস্পষ্ট। নতুন বাজেটে শ্রীমতী গান্ধী সর্বোচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি-দের আয়করের মাত্রা বাড়িয়েছেন এবং সম্পত্তির ওপর করধার্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নতুন করে করধার্য করেন নি। উপরন্তু পাট ও অন্যের রপ্তানি শুল্ক [illegible] দিয়ে তিনি শিল্পপতি-দের প্রতি যথেষ্ট [illegible] দেখিয়েছেন।

এ ছাড়া শেয়ারের ডিভিডেণ্ডজাত আয়ের প্রথম তিন হাজার টাকার ওপর আয়কর ছাড় দিয়ে তিনি লগ্নীকারকদেরও উৎসাহ বর্ধন করেছেন। কাজেই শিল্প-বাণিজ্য-পতিরা বাজেটে কোন গুরুতর আপত্তির কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

অপর দিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর পরোক্ষ করের সমালোচনা ছাড়া বামপন্থীরা বাজেটের নিন্দা করতে পারছেন না। কারণ বাজেটে সম্পত্তিশালী ধনী ব্যক্তিদের পকেটে হাত দেবার যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তা ছাড়া চা ও পেট্রলের ওপর যে নতুন কর বসাবার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাও প্রত্যাহৃত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তাতে বামপন্থী-দের সমালোচনার ধার আরও কমে যেতে বাধ্য।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজে অনভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী যে মাত্র কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় এমন ভারসাম্যমূলক বাজেট পেশ করতে পারবেন, তা আগে কেউ কল্পনাই করতে পারেন নি। তাই বাজেট পেশের পর ইন্দিরা গান্ধীর কর্মদক্ষতা দেখে বাম এবং দক্ষিণ—উভয়পন্থীরাই বেশ হকচকিয়ে গেছেন এবং পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধীর আসন আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রেল বাজেট সংশোধন হবে আগের সপ্তাহে যে আভাস দেওয়া হয়েছিল, তাও সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। গত [illegible] লোকসভায় রেল বাজেটের প্রথম দিনের আলোচনা শুরু হবার আগেই রেলমন্ত্রী শ্রী [illegible] ঘোষণা করেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের রেলভাড়া বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সিজন টিকিট প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং ভেণ্ডার টিকিটের ভাড়াও আর বাড়ছে না। [illegible] এবং দুধের ওপর রেল মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

রেলমন্ত্রীর এই [illegible] শ্রীমতী গান্ধীর গভর্নমেণ্ট আরও বেশি জন-প্রিয়তা অর্জন করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী [illegible] প্রতি যে [illegible] প্রকাশ করে

শ্রীমতী গান্ধী যে ইতিমধ্যেই তাঁর জনপ্রিয়তা কি রকম বাড়িয়ে নিয়েছেন, গত সপ্তাহে পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় সেটা প্রতিফলিত হয়েছে।

৫ই ফেব্রুয়ারী লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হয়েছিল। মূল প্রস্তাবের ওপর বিরোধী দলের ৯টি সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেকটিতেই সরকার পক্ষ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। পরিশেষে মূল প্রস্তাবটি ১৭০—৫০ ভোটে গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সুদীর্ঘ বিতর্কের পর শ্রীমতী গান্ধী লোকসভায় সেদিন বিরোধী পক্ষের সমালোচনার যে জবাব দেন, তা সত্যিই তাঁর মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর তীব্র ভাষণে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রয়োগ করে স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং সিণ্ডিকেটী সমালোচকদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন যে, উপরোক্ত তিনটি পার্টি রক্ষণশীলতার বিশ্বাসী। কিন্তু গত কয়েক মাসের ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশ পরিবর্তন এবং অগ্রগতির জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। তিনি (শ্রীমতী গান্ধী) পরিবর্তনকামী প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গেই থাকতে চান। জনসংঘের 'ভারতীয়করণ' নীতিকে তিনি ফ্যাসীবাদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, ভারতীয়দের মধ্যে কে ভারতীয় এবং কে অ-ভারতীয় তা স্থির করবে কে? সেটা স্থির করার ভার কি জনসংঘ পেতে চায়? তিনি আরও বলেন যে, দ্বিতীয় [illegible] শুরু [illegible] এবং আমেরিকার [illegible] কার্যকলাপের [illegible] উঠেছিল, তার সঙ্গে জনসংঘের 'ভারতীয়করণ' [illegible] তুলনীয়। উগ্র জাতীয়তাবাদের [illegible] প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ঢেকে রাখার একটা মুখোশ মাত্র।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বিতর্কের সময় পার্লামেণ্টের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেবার দাবি তোলেন। বামপন্থী বিরোধী দলের এই আওয়াজে কংগ্রেস সদস্যরাও অনেকে কণ্ঠ মিলিয়ে-ছিলেন। বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনার জন্য কেউ কেউ পৃথক গণপরিষদ আহ্বানের প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু সিণ্ডিকেট, স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ আলো-চনায় [illegible] বিরোধিতা করেন।

৬ই মার্চের ঘটনা। ভদ্রতা, শালীনতা এবং ভব্যতাবোধের জন্য সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ শহরে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধিবেশন বসেছে। রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের ফলে সভার আবহাওয়া বেশ উত্তেজনাপূর্ণ এবং থমথমে। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে সভায় পৌরোহিত্য করছেন ডেপুটি স্পীকার বাসুদেব সিং। তিনি অর্থমন্ত্রী বলবীর সিংকে বাজেট পেশ করবার আহ্বান জানালেন। সঙ্গে অনন্তরাম জয়সোয়াল উঠে দাঁড়িয়ে একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলতে চাইলেন। ডেপুটি স্পীকার অনুমতি দিলেন না। আর যাবে কোথায়। লেগে গেল হট্টগোল। জয়সোয়াল ডেপুটি স্পীকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে চেঁচাতে সুরু করলেন। সেই ফাঁকে তাঁর সহকর্মী শিবদাস তেওয়ারী এক লাফে স্পীকারের মঞ্চে উঠে ডেপুটি স্পীকারকে উত্তম-মধ্যম দেবার জন্য তাঁকে চেপে ধরলেন। সামনে উপবিষ্ট সদস্যরা এবং অর্থমন্ত্রী বলবীর সিং ডেপুটি স্পীকারকে হাসপাতালেই যেতে হত। যাই হোক এ যাত্রা ভদ্রলোক প্রাণে বেঁচে গেছেন। কিন্তু কতদিন যে বাঁচবেন তা বলা শক্ত। এর কয়েকদিন আগে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় সদস্যদের মধ্যে জুতো মারামারি হয়ে গেছে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দুই মন্ত্রী পরস্পরের মুখ ভেঙে দিতে চেয়েছেন। ঘটনাগুলো আর যাই হোক, ভারতবাসীর ঐতিহ্য এবং শালীনতাবোধের পরিচায়ক।

৮।৩।৭০

# ইনকাম ট্যাক্স ইনস্‌পেক্টর নিয়োগ

দি ডিরেক্টরেট অব ইনস্‌পেকশন (ইনকাম ট্যাক্স)—ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টের বিভিন্ন চার্জে ইনস্‌পেক্টর হিসাবে নিয়োগের জন্য নামের তালিকা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রার্থী মনোনয়নের জন্য ২৫ ও ২৫শে মে, ১৯৭০ তারিখে আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর, বোম্বে, কলিকাতা, এর্নাকুলাম, গৌহাটি, হায়দরাবাদ, জয়পুর, জম্মু, কানপুর, লখনউ, মাদ্রাজ, নাগপুর, নয়াদিল্লী, পাতিয়ালা, পাটনা এবং পুনায় একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। বেতন ২১০—১০—২৯০—১৫—৩২০—যোঃ বাঃ—১৫—৪২৫—যোঃ বাঃ—১৫—৪৮৫ টাকা। তদুপরি প্রচলিত ভাতাদি। ডিরেক্টরেট অব ইনস্‌পেকশন (ইনকাম ট্যাক্স)-এর ইচ্ছানুযায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র বদল হইতে পারে।

তপসিলী জাতি বা তপসিলী উপজাতির প্রার্থীর জন্য প্রাক্তন যুদ্ধ চাকুরিয়ার জন্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অধীন নন-গেজেটেড পদে নিয়োগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী রাজ্য সরকারের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ বলবৎ অর্ডার অনুযায়ী হইবে। অন্ধ্র প্রদেশের রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের নিয়োগ অন্ধ্র প্রদেশের হাইকোর্ট ১৯৬৯ সালের ৫৭০নং সিভিল মিসেলেনিয়াস পিটিশনে যে অর্ডার দিবেন তাহা সাপেক্ষেও হইবে।

প্রার্থিগণ যে ইনকাম ট্যাক্স কমিশনারের চার্জে মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সেই ইনকাম ট্যাক্স কমিশনারের নিকট নির্ধারিত দরখাস্ত ফরমে অবশ্যই আবেদন করিতে হইবে। দরখাস্ত ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ বা তাহার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইনকাম ট্যাক্স কমিশনারের নিকট অবশ্যই পৌঁছান চাই।

যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক বা রুল অনুযায়ী অন্যভাবে যোগ্য এবং কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী এবং ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যাহাদের ১৯ বৎসর বয়স হইয়াছে কিন্তু ২৩ বৎসর বয়স হয় নাই, তাঁহারা এই পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্য।

যে সব প্রার্থী ১৯৭০ সালের এপ্রিল/মে মাসে ডিগ্রী পরীক্ষা দিবেন, তাঁহারাও কলেজের প্রিন্সিপাল/বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বলে এই পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্য হইবেন। ঐসব প্রার্থী অন্যভাবে যোগ্য বিবেচিত হইলে এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন, কিন্তু ইহা অস্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাঁহাদের পরীক্ষা আরম্ভের পর যত শীঘ্র সম্ভব (এবং কোন ক্ষেত্রে দুই মাস পর নহে) পরীক্ষা পাসের প্রমাণপত্র না দেখাইতে পারিলে উহা বাতিল হইবে।

উপরোক্ত নির্ধারিত উচ্চতর বয়ঃসীমা কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য, উহার বিশদ বিবরণ রুলসে উল্লিখিত আছে।

দরখাস্ত ফরমের কপি ও পরীক্ষা সম্পর্কিত রুলস যাহা ২১-২-১৯৭০ তারিখের গেজেট অব ইণ্ডিয়া-এর পার্ট ৩, সেকসন ১-তে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ১ টাকা আদায় দিয়া কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স-এর নিকট পাওয়া যাইবে। উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স-এর হেড কোয়ার্টার্সে অবস্থিত কোন পোস্ট অফিসে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স-কে প্রদেয় রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে আদায় দিতে হইবে। পোস্টাল অর্ডারে ইস্যুকারী পোস্ট মাস্টারের স্বাক্ষর এবং ইস্যুকারী পোস্ট অফিসের পরিষ্কার স্ট্যাম্প থাকা চাই। দরখাস্ত ফরমের জন্য আবেদনকালে প্রার্থিগণকে তাঁহাদের ঠিকানা সহ একটি ডাকটিকেটযুক্ত খাম (২৩ সি এম × ১০ সি এম বা বৃহত্তর) পাঠাইতে হইবে।

এই পরীক্ষায় তিনটি বিষয়, যথা জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল নলেজ ও পাটিগণিতে এক লিখিত পরীক্ষা এবং তৎপরে ইনকাম ট্যাক্সের সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন শতকরা নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থীদিগের এক সাক্ষাৎকার থাকিবে। পূর্ববর্তী তিনটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, ভারত সরকারের প্রকাশিত পুস্তকের ব্যবসা করেন, এইরূপ অনুমোদিত পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত ফরমের জন্য প্রদেয় ১ টাকা ছাড়াও, প্রকৃতপক্ষে এই পরীক্ষার জন্য যাঁহারা দরখাস্ত করিবেন, সেই সকল প্রার্থীকে পরীক্ষা-ফি হিসাবে টাঃ ৬·৫০ পঃ (তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতির প্রার্থীদিগের ক্ষেত্রে ৮৭ পয়সা) আদায় দিতে হইবে। এই ফি-এর টাকাও উপরে উল্লিখিত ধরনে পোস্টাল অর্ডার মারফৎ পাঠাইতে হইবে।

পরীক্ষা দিবার জন্য অথবা সাক্ষাৎকারের জন্য কোন টি এ/ডি এ দেওয়া হইবে না।

পরীক্ষা সম্পর্কে সমস্ত চিঠিপত্রাদি সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স-এর শিরোনামে পাঠাইতে হইবে। এই বিষয়ে ডিরেক্টরেট কোন পত্রের জবাব দিবেন না।

ডি এ ভি পি ৫৩০(১২৫)/৬৯

### লাওস পরিস্থিতি

লাওসের জারস্ সমতল অঞ্চল উত্তর ভিয়েৎনামের সেনাবাহিনীর দ্বারা অধিকৃত হয়েছে—এই অজুহাতে মার্কিন বিমানবহর সেখানে ব্যাপকভাবে বোমা-বর্ষণ সুরু করে। উত্তর ভিয়েৎনাম জারসে প্রবেশের কথা সরকারিভাবে অস্বীকার করলেও সেই বোমাবর্ষণ বন্ধ হয় নি। লাওসের পেট্রিয়টিক ফ্রন্ট একটা পাঁচদফা প্রস্তাব পেশ করে দাবি করেছিলেন যে, কোন রাজনৈতিক মীমাংসার আগেই লাওসে সর্বপ্রকার মার্কিন সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে হবে এবং লাওস থেকে সমস্ত মার্কিন ফৌজী ব্যক্তিদের সরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। জারস থেকে ঘুরে এসে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, জারস উত্তর ভিয়েৎনামীদের দখলে চলে গেছে এবং তার ফলে লাওসের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে। তাই তিনি মার্কিন বোমাবর্ষণ সমর্থন করে বলেছেন যে, উত্তর ভিয়েৎনামের আক্রমণের ফলেই আমেরিকা তাঁর দেশে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সুরু করেছে। উত্তর ভিয়েৎনামীরা বিদায় নিলে উত্তর লাওসে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ হতে পারে।

ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, লাওস অতি দ্রুতগতিতে ভিয়েৎনামের পথে এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনবিরোধী তাঁবেদার সরকার নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখবার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীকে সে দেশে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। লাওসের প্রধানমন্ত্রী ফুমাও ঠিক সেই একইভাবে আমেরিকাকে তাঁর দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিয়েছেন।

জারস সমতল অঞ্চল যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি-আই-এর তাঁবেদারদের হস্তগত হয়েছিল, সেটা গত সপ্তাহেই বসুমতীতে প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি জায়গাটা আবার মার্কিন তাঁবেদারদের হস্তচ্যুত হতে চলেছে। কিন্তু কার দখলে আছে সেটা সঠিক বলা কঠিন। উত্তর ভিয়েৎনাম যখন ভিয়েৎনামেই আমেরিকার সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত, তখন তার পক্ষে লাওসে ঢুকে গোলমাল পাকানো কতটুকু সম্ভব তা ভেবে দেখবার বিষয়। মনে হয় স্থানীয় কমিউনিস্ট গেরিলারাই জায়গাটা দখল করে রেখেছে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল তাদেরই উত্তর ভিয়েৎনামী বলে চালাতে চাইছে। অন্তত উত্তর ভিয়েৎনাম জারস্-এ প্রবেশ করে নি বলে ঘোষণা করার পর সেই ধারণাই দৃঢ় হয়।

যাই হোক, জারসে আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণের ঘটনাটা এখনও রহস্যাবৃত। তবে একথা ঠিক যে, লাওসের ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। উত্তর ভিয়েৎনাম তেমন কিছু করে থাকলে তার কাজ নিশ্চয়ই নিন্দার্হ, কিন্তু একজন নিন্দনীয় কাজ করেছে বলে অপরকেও যে নিন্দনীয় কাজ করতে হবে তার কোন মানে নেই। উত্তর ভিয়েৎনাম অন্যায় করলে লাওসই তার প্রতিবিধান করতে পারে। রাষ্ট্রসঙ্ঘকেও সেখানে আহ্বান করা যেতে পারে। সেখানে আমেরিকার সশস্ত্র উপস্থিতি একটু অস্বাভাবিক বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। আমেরিকার অধিবাসীরাও ব্যাপারটা খুব ভাল চোখে দেখছেন না। ডেমোক্রাট সিনেটর স্টুয়ার্ট সিমিংটন বলেছেন, "লাওসস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রো-কন্সাল হয়ে গেছেন। তিনি সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করে সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করছেন।" মিঃ সিমিংটন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, কংগ্রেসের একটি প্যানেলের কাছে সাক্ষী দেবার জন্য উপরোক্ত রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক। পররাষ্ট্র দপ্তর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার পরে তিনি উপরোক্ত অভিযোগ করেন।

লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমা বলেছেন যে, লাওসে সোভিয়েত-বৃটিশ যৌথ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার যে প্রস্তাব বৃটেন করেছে, তাতে তাঁর পুরো সম্মতি আছে। তিনি বলেন, "১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তির পরিপূর্ণ প্রয়োগের পথে আমাদের এগোতেই হবে।"

প্রিন্স সুভান্না ফুমা বলেছেন যে, ঘোষণা করেছেন, সেটা মিথ্যা নয়। অন্তত ১লা জানুয়ারীতে সংখ্যাটা ঐ রকমই ছিল।

প্রেসিডেন্ট নিকসন জানিয়ে দিয়েছেন যে, মার্কিন ফৌজ স্বেচ্ছায় লাওসে যায় নি। ভিয়েনশিয়েন গভর্নমেণ্টের আমন্ত্রণেই তারা সেখানে হাজির হয়েছে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে পম্পিদু

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জর্জ পম্পিদু রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন। ওয়াশিংটনে পম্পিদু তিন দিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

পম্পিদু ও নিকসনের মধ্যে 'হৃদ্যতাপূর্ণ' আলোচনা হয়েছে, অনেকগুলি বিষয়ে ঐকমত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবু প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক প্রশ্নে উভয়পক্ষের মধ্যে গুরুতর মতভেদ থেকে গেছে। পশ্চিম এশিয়া ও ভিয়েৎনামের ব্যাপারে দুপক্ষের মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয় নি। আলোচনাশেষে নিকসন নিজেই বলেছেন, "আমরা সব ব্যাপারে একমত হতে পারি নি।"

জর্জ পম্পিদুর আমেরিকা সফরের সংবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। ফরাসী সরকার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরবদের পক্ষ সমর্থন করায় এই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি লিবিয়ার কাছে ফ্রান্স ১০০টি মিরেজ জেট বিমান বিক্রি করায় এই বিক্ষোভ আরও বেড়েছে। প্রধানত ইহুদীদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে পম্পিদু-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখে সাড়ে তিন হাজার মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশটি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পম্পিদু যখন মার্কিন কংগ্রেসের উভয়-কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেন, তখন প্রায় অর্ধেক সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভের প্রভাব কাটাবার জন্য নিকসন নিজে বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন এবং পম্পিদুর সম্মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

পম্পিদু অবশ্য বিচক্ষণতা ও সাহসের সঙ্গে সমগ্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। সাংবাদিকদের কাছেও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন, অস্বস্তিকর প্রশ্নে বিরক্ত হন নি।

ফ্রান্সের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে অনেকদিন ফাটল ধরেছে। চার্লস দ্য গল স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন-বিরোধী নীতি অনুসরণ করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি [illegible] জনসনও ফ্রান্স সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। ফলে জনসন-দ্য গল আমলে উভয় দেশের সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটে। পম্পিদু ক্ষমতায় আসার পরও পুরোনো নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। তথাপি পম্পিদু সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চান। নিকসনের দিক থেকেও সাড়া আছে এই ব্যাপারে।

এই দিক থেকে পম্পিদু-নিকসন সাক্ষাৎকার বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। উভয়পক্ষের মধ্যে সহজ কথাবার্তা সুরু হয়েছে। কেবল নিকসন আর পম্পিদুই নন, ওয়াশিংটনে দুই রাষ্ট্রপতির আলোচনার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ও মরিস সুমান নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

কয়েকটি বিষয়ে নিকসন ও পম্পিদু একমত হয়েছেন। ঠিক হয়েছে, পশ্চিম য়ুরোপে যে মার্কিন সৈন্য রয়েছে, তা অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকবে। 'ন্যাটো'ও থাকবে। এ ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে, জর্জ পম্পিদু দ্য গলের নীতির পরিবর্তন করলেন। দ্য গল 'ন্যাটো' থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরই চাপে প্যারিস থেকে 'ন্যাটো' বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র সরিয়ে নেওয়া হয়। 'ন্যাটো' ও মার্কিন সৈন্যের অবস্থান সম্পর্কে পম্পিদুর মনোভাবে নিকসন খুশি। সোভিয়েট য়ুনিয়ন, পূর্ব য়ুরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশ ও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করা উচিত এবং এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, এ বিষয়েও উভয়পক্ষ একমত।

কিন্তু গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার সংকট নিয়ে। ফ্রান্স মনে করে, আরব-ইজরায়েল বিরোধ মীমাংসার পূর্ব সর্তরূপে ইজরায়েলকে ১৯৬৭ সালে দখল করা সব আরবভূমি থেকে সরে যেতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করে না। পম্পিদু চান, বৃহৎ চতুঃশক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট য়ুনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) বৈঠকের মারফৎ পশ্চিম এশিয়ার সংকট সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হোক। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্কে যে আলোচনা হয়েছে, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ ভরসা নেই চতুঃশক্তি আলোচনার ওপর।

ভিয়েৎনামের ব্যাপারেও নিকসন ও পম্পিদুর মধ্যে মতভেদ হয়েছে। যেভাবে মন্থরগতিতে ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ করা হচ্ছে, তাতে পম্পিদু সন্তুষ্ট নন। তিনি চান, এখনই সব সৈন্য সরিয়ে আনা হোক। প্যারিস শান্তি আলোচনায় মার্কিন ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁর বিক্ষোভ আছে।

### রোডেশিয়াকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা

শেষ পর্যন্ত রোডেশিয়াকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হয়েছে। ২রা মার্চ থেকে রোডেশিয়ার সঙ্গে বৃটিশ রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কোন সম্পর্ক রইল না। রোডেশিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতি, নতুন পতাকা, নতুন জাতীয় সঙ্গীত, সব কিছুই করা হয়েছে।

সাধারণভাবে কোন পরাধীন দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে কিংবা রাজা-রাণীর শাসনের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র গ্রহণ করলে, তা আনন্দের সংবাদ হয় এবং সবাই তাকে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু রোডেশিয়ার ক্ষেত্রে তার বিপরীত ঘটেছে। সাড়ে চার বৎসর আগে ১১ই নভেম্বর, ১৯৬৫ সালে যখন রোডেশিয়া ব্রিটেনের অধীনতা ছিন্ন করে 'একতরফা স্বাধীনতা' ঘোষণা (য়ুনিল্যাটেরাল ডিক্লারেশন অব ইণ্ডিপেনডেন্স) করে, তখনও বিশ্বের প্রগতিশীল জনসাধারণ তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। আজও আবার প্রজাতন্ত্র ঘোষণার বিরুদ্ধে সবাই বলছেন।

কারণ, রোডেশিয়ার এই স্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্র, কোনটিই এখানকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী কৃষ্ণকায়দের স্বার্থে হয় নি, অতি মুষ্টিমেয় শ্বেতকায়দের বর্ণশাসন বজায় রাখার জন্য করা হয়েছে।

রোডেশিয়ার অর্ধ কোটি অধিবাসীর মধ্যে কৃষ্ণকায়দের সংখ্যা আটচল্লিশ লক্ষ, আর শ্বেতকায় য়ুরোপীয় বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা মাত্র সওয়া দু লক্ষের মত। অথচ এমনভাবে এখানকার সংবিধান তৈরি করা হয়েছে এবং সরকার গঠন করা হয়েছে যে, কৃষ্ণকায়দের সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথের নেতৃত্বে এক চরম বর্ণবৈষম্যবাদী শ্বেতকায় শাসনের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কৃষ্ণকায়দের বাদ দিয়ে শ্বেতকায় শাসনের ভিত্তিতে রোডেশিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া চলবে না, এই ছিল দাবি। বিশ্ব জনমতের চাপে ব্রিটেন এই দাবি মেনে নেয়। কিন্তু ব্রিটেনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ইয়ান স্মিথেরা যখন '৬৫ সনে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন এই অন্যায় 'স্বাধীনতা' দমনের জন্য ব্রিটেন বিশেষ কিছু করে নি। লোক দেখানো অর্থনৈতিক বয়কট করেছে ঠিকই, কিন্তু ইয়ান স্মিথদের বিদ্রোহ দমনের জন্য বলপ্রয়োগ তারা করে নি।

মাঝে (অক্টোবর, ১৯৬৮) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন জিব্রাল্টারে রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথের সংগে আলোচনা করেছিলেন। ধীরে ধীরে হলেও যাতে কৃষ্ণকায়দের সরকারে অংশগ্রহণের দাবি ইয়ান স্মিথ সরকার মেনে নেন, তার জন্য হ্যারল্ড উইলসন বলেছিলেন। অন্যভাবেও চাপ দেবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ইয়ান স্মিথরা কোন কথা শুনতে রাজী নন।

এবারের প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ইয়ান স্মিথদের আর একটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। কেবল রোডেশিয়া নয়, সমগ্র আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষ এতে ক্ষুব্ধ। তারা বৃটেনের দুর্বল নীতিকেই এর জন্য দায়ী করেছে। বিদ্রোহ দমনের জন্য, সংখ্যালঘু শ্বেতকায় শাসনের অবসানের জন্য ব্রিটিশ সরকার কার্যকরী কিছু করেন নি।

রোডেশিয়ার প্রজাতন্ত্র ঘোষণার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা আলোচনার জন্য 'আফ্রিকা ঐক্য সংস্থার (অরগানিজেশন অব আফ্রিকান য়ুনিটি) জরুরী বৈঠক বসেছিল আডিস আবাবায়। আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতারা রোডেশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৃহৎ শক্তিসমূহের নিকট অনুরোধ জানিয়েছে। যে-সব দেশ এখনও রোডেশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে, তাদের কাছে অবিলম্বে এই সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। ফ্রান্স, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, ইতালী, পর্তুগাল ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এখন রোডেশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ৩৮টি আফ্রিকীয় দেশের প্রতিনিধি অবিলম্বে রোডেশিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়েছেন।

(৯-৩-৭০)

কাঁচা ফোড়ায় ছুরি চালাবার বিপদ সম্পর্কে আমি অনেক আগেই সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু এক মাস যাবার আগেই দেখা গেল, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুশীল ধাড়া দু'জনেই ছুরি চালাতে প্রস্তুত এবং কেউই কালবিলম্ব করতে প্রস্তুত নন। বাংলা কংগ্রেস তার ছুরি চালিয়ে এক মাসে দুই বার যুক্তফ্রন্টের সভা বর্জন করলো আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এক মাসের মধ্যে দুইবার সরকার ভেঙে পড়ছে, মিনি ফ্রন্ট সরকার গঠিত হচ্ছে স্থির সিদ্ধান্তে সাধারণ ধর্মঘট, লাগাতার হরতাল ও আন্দোলন সংগঠনের প্রস্তুতির ডাক দিলেন। শ্রীসুশীল ধাড়া বলেছেন—জনগণ চায় বর্তমান সরকারের পরিবর্তন হোক, বর্তমান ফ্রন্টের বদলে নতুন ফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব নিক আর সেই ফ্রন্টে ১৪ দলকেই থাকতে হবে, এমন কথা নেই। আর ঠিক এই কথার জবাব দিয়েছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁর ৫ই মার্চের নির্দেশনামায়। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন—বাংলা কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা ১৫ই মার্চের মধ্যে বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে মিনি ফ্রন্ট সরকার গঠনের চেষ্টা সুরু করেছেন, অতএব পার্টি ক্যাডাররা প্রস্তুত হোন, প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য তৈরী হোন।

আমি কিন্তু বলছি শ্রীসুশীল ধাড়া মশায়, আপনার ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নি। তাই আপনি আপনার অস্ত্র ফিরিয়ে নিন। আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মশায়, আপনারও এবারের কলটা মাঠে মারা যাবে। পালে বাঘ পড়ছে, বাঘ পড়ছে বলে বারে বারে চিৎকার করে আসলে বাঘ পড়বার সময় আপনি কিন্তু ডাকবার সুযোগ পাবেন না, আর পেলেও তখন অনেকে অনেকবার ভুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে সত্যকার আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে আসবে না।

শ্রীসুশীল ধাড়া মশায় অনেক দিন ধরে বলে আসছেন—বর্তমান সরকারের বদলে সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার হতে পারে এবং সেই সরকার চলবেও। কেরলে চলছে, পশ্চিমবঙ্গে চলবে না কেন? কথাটা যুক্তিহীন নয়। কিন্তু মূল কথা হল সরকার চলাটাই কি বড় কথা! ধরেও নেওয়া যাক সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার হল এবং সেই সরকার গড় গড় করে চললও—তাতে হবে কি? এই সরকারের পরিবর্তে নতুন সরকার এলে পরিবর্তন কতটা হবে? আইন-শৃঙ্খলা ও শিল্প পরিস্থিতি কোন্‌টার উন্নতি করতে পারবে সেই সরকার? আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি কি আজ শুধু কোন দলকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করলেই হবে? কোন সরকারের একমাত্র অভীষ্ট যদি হয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, তা হলে তো অনেকের ধারণা, সামরিক শাসনের সামরিক আইনই পারে কড়া হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে। তবে শ্রীসুশীল ধাড়া তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বলতে পারেন—গণতান্ত্রিক শাসন দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না, তাই চাই আয়ুব বা ইয়াহিয়া খাঁর মত জবরদস্ত মিলিটারী প্রশাসক। তা হলে অনেক উৎপাত কমে যাবে। কিন্তু সেই কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। তাঁরা বলবেন গণতন্ত্র চাই, গণতান্ত্রিক শাসন চাই।

বাংলা কংগ্রেস অথবা সি-পি-এম উভয়ই গণতান্ত্রিক পথে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, সেই কথার খেলাপ করবার অধিকার তো কারো নেই। যুক্তফ্রন্ট ১৪ দল নিয়ে গঠিত হয়ে রাজ্যে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতিমত জনগণ সি-পি-এমকে যেমন ৮০টা আসন দিয়েছে, তেমনি বাংলা কংগ্রেসকে ৩৩টা আসন দিয়েছে। আজ যদি কেউ সেই যুক্তফ্রন্ট থেকে সি-পি-এম বা বাংলা কংগ্রেস কাউকে বাদ দিতে চায়, সেটা হবে কথার খেলাপ। বর্তমান যুক্তফ্রন্টের পরিবর্তন তখনই হতে পারে, যখন কোন দল ইচ্ছা করে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করে যাবে, নচেৎ নয়। কিন্তু শ্রীধাড়া সম্ভবত ভিন্ন মত পোষণ করে এগুচ্ছেন। শ্রীধাড়ার চিন্তার স্বপক্ষে যুক্তি কি আছে অথবা নেই, সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হল রাজ্যের জনগণের জীবনে সর্বস্তরে যে সংকট চলছে, তার পরিবর্তনের সর্টকাট পথ সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন নয়। সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সরকার ২২ বৎসর ছিল আর হালে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও তো কয়েক মাস সরকার চালালেন। তাতে রোগের কিছু নিরাময় হয়েছে কি?

শ্রীসুশীল ধাড়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করছেন তার দর্শনমত চলতে। সম্প্রতি তিনি দুইবার যুক্তফ্রন্টের সভা বর্জন করে যুক্তফ্রন্টের সমস্যা সমাধানে যে পথ নিলেন, এ হল তারই নমুনা। শ্রীধাড়াকে গত ৫ই তারিখ শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব ছিল শ্রীসুশীল ধাড়া আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঘরে দরজা বন্ধ করে বসুন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করুন। শ্রীধাড়া সেই প্রস্তাব বাতিল করে দেন, কারণ শ্রীধাড়া মনে করেন, সমস্যা কোন দুই দলের সমস্যা নয়, এটা হল সামগ্রিকভাবে যুক্তফ্রন্টের সমস্যা—সেই সমস্যার সমাধান করতে হলে যুক্তফ্রন্টে বসেই সকলে করতে হবে। শ্রীধাড়া যুক্তফ্রন্টে বসে সমস্যার সমাধানের কথা বলেন, অথচ যুক্তফ্রন্টের সভা বর্জন করেন। দুই পক্ষের আলোচনায় শ্রীধাড়ার সায় নেই, আবার যুক্তফ্রন্টে বা মন্ত্রিসভায় সকলের সঙ্গে সি-পি-এম'এর সঙ্গে বসতে মত নেই। এই দ্বৈত চিন্তার রাজনীতির পিছনে কাজ করছে অন্য রাজনীতি—যে রাজনীতি কোন প্রকার অংকের হিসাবে মিলছে না। অর্থাৎ শ্রীধাড়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়কে দলীয় নেতা হিসাবে রেখে তাঁর পাশে সকলকে এনে সি-পি-এমকে কোণঠাসা করতে চান। কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও এমন নয় যে, শ্রীধাড়ার চিন্তা সফল হবে। আমি সেটাকেই বলি কাঁচা ফোড়া। শ্রীধাড়া তাঁর তিনজন সহকর্মী সহ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন, শ্রীধাড়া তাঁর সমগ্র দলকে যুক্তফ্রন্টের সভার বাইরে রেখেছেন। কিন্তু এর কোনটাই কি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, কি যুক্তফ্রন্ট কোথাও এমন সংকট সৃষ্টি করতে পারে নি, যাতে শ্রীধাড়ার দিকের পাল্লা ভারী হয়ে উঠতে পারে। পরন্তু আমার মত কম বুদ্ধির মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সত্যকার বন্ধু যদি কেউ বাংলাদেশে থাকেন, তবে তিনি হলেন শ্রীসুশীল ধাড়া।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সত্যকার বন্ধু ও ত্রাতার মত উপকার যদি কেউ করে থাকে, তবে অতীতে করেছে কংগ্রেস—সে সেই, ডাঃ রায়ের আমল থেকে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের আমল পর্যন্ত। আর আজ করছেন শ্রীসুশীল ধাড়া। অতীতে কংগ্রেস বরাবর কম্যুনিস্ট পার্টিকে হিরো করে অর্থাৎ যা কিছু দোষ কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর চাপিয়ে অথবা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কম্যু-

নিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, আর আজও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বেশী নজীরের দরকার নেই। সি-পি-এম মাস দুই আগে থাকতে কি চিৎকার ও হল্লা সুরু করেছিল—আজই সরকার ভেঙ্গে যাচ্ছে, সরকার ভাঙ্গলো বলে, মিনি ফ্রন্ট সরকার হচ্ছে, সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার হবে, জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর এই সবের জন্য ছাত্ররা মিছিল করলো, যুবকরা মিছিল করলো, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি বি-পি-টি-ইউ-সি ময়দানে নামলো। সি-পি-এম মন্ত্রীরা রাত জেগে ফাইল পরিষ্কার করলেন, কিন্তু সময়মত দেখা গেল, সাপও মিথ্যে, স্বপ্নও মিথ্যে। শুধু ভয়ে ভয়ে বিছানায় প্রস্রাব করাই সার। প্রকৃতপক্ষে সি-পি-এম'এর সরকার ভেঙ্গে যাচ্ছে আওয়াজ হাস্যকর হয়ে গেল। পরিস্থিতির আরো পরিবর্তন হল। হো-চি-মিন নগরে প্লেনামের পর সকলেই লক্ষ্য করেছেন, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত একেবারে মুখে ছিপি এঁটে দিয়েছিলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তও একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেছিলেন। মেদিনীপুর আর বসিরহাটের নির্বাচনে সি-পি-এমকে আরো খারাপ জায়গায় নিয়ে গেছিল। যুক্তফ্রণ্টের সভাতেও সি-পি-এম একের পর এক প্রস্তাব কুইনিনের মত গলাধঃকরণ করাচ্ছিল। যেমন ধরুন—সরকার থাকবে, মিনি ফ্রণ্ট হবে না—প্রতিশ্রুতি না পেলে কোন আলোচনা হবে না, সেই কথা কেউ যুক্তফ্রন্টের সভায় তুলতে পারলো না। বিপরীত দিকে যে মন্ত্রিসভাভিত্তিক কমিটি কখনই মানবো না বলে জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু বলেছিলেন, সেই কমিটি মেনে নিয়েছিলেন, মেজরিটি ডিসিশন সেটাও প্রায় মেনে নিয়েছিলেন, এমন কি থানাভিত্তিক কমিটিও প্রায় হয়ে গেছিল। সর্বশেষে দেখা গেল শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিক সম্মেলন করে কত ভাল ভাল কথা বলছেন। এমন সময় শ্রীসুশীল ধাড়া যুক্তফ্রন্টের সভা বর্জন করে সব ইস্যু চাপা দিয়ে দিলেন। শুধু চাপা দিয়ে দেওয়া নয়, যে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত নীরব হয়ে গেছিলেন, তাঁকে অনেক সরব করে দ্বিগুণ বেগে মঞ্চে নিয়ে এলেন—যার পরিণতি হল শ্রীদাশগুপ্তের আহ্বান ১৫ই মার্চের মধ্যে সরকার ভেঙ্গে মিনি ফ্রন্ট সরকার গঠনের চেষ্টা হবে। অতএব, সব এগিয়ে আসুন, শ্রীসুশীল ধাড়ার রাজনীতিকে পরাস্ত করুন। যেখানে যুক্তফ্রন্টের আর মেদিনীপুর ও বসিরহাটে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের রাজনীতি ব্যর্থ হয়ে শ্রীদাশগুপ্তকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল, সেখানে শ্রীধাড়া নিজে এসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। তাই বলছিলাম, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের যদি বাংলা দেশে কোন সত্যকার বন্ধু থাকে, তবে তিনি হলেন শ্রীসুশীল ধাড়া।

এইবার শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের ১৫ই তারিখের আগে সরকার ভাঙ্গবার আওয়াজের কথায় আসা যাক। শ্রীদাশগুপ্ত একটি নতুন রোগের আমদানী করেছেন। সরকার থাকবে, কি ভাঙ্গবে, সেই কথা পরে, কিন্তু যে রোগে সরকার থাকা বা ভাঙ্গার প্রশ্ন আসে, সেই রোগের কথা বলা যাক। সেই রোগের নাম হলো সি-পি-এম।

সি-পি-এম একটা মস্ত বড় পার্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু সি-পি-এম রাজ্য-রাজনীতিতে একটা মস্ত বড় রোগও আমদানী করেছে। যে রোগে আক্রান্ত হলে অকাজ ও কুকাজের মধ্যেও শ্রেণীসংগ্রাম দেখা যায়, গণ-জাগরণ দেখা যায়। ন্যাবা রোগী যেমন চোখে সব কিছু হলদে দেখে, এই রোগে তেমনি সব কিছু লাল দেখা যায়। এই সব কিছুতে লাল দেখার বিপদ অনেক। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যের রাজনীতিতে অনেক অবদান জুগিয়েছেন, কিন্তু এই রোগটাও আমদানী করেছেন। এই কথা কটু ও দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য এবং সেই রোগের খেসারত অনেক নিরীহ দেশবাসীকে দিতে হচ্ছে।

—৬ই মার্চ, ১৯৭০

## চক্রান্তকারী থেকে সাবধান
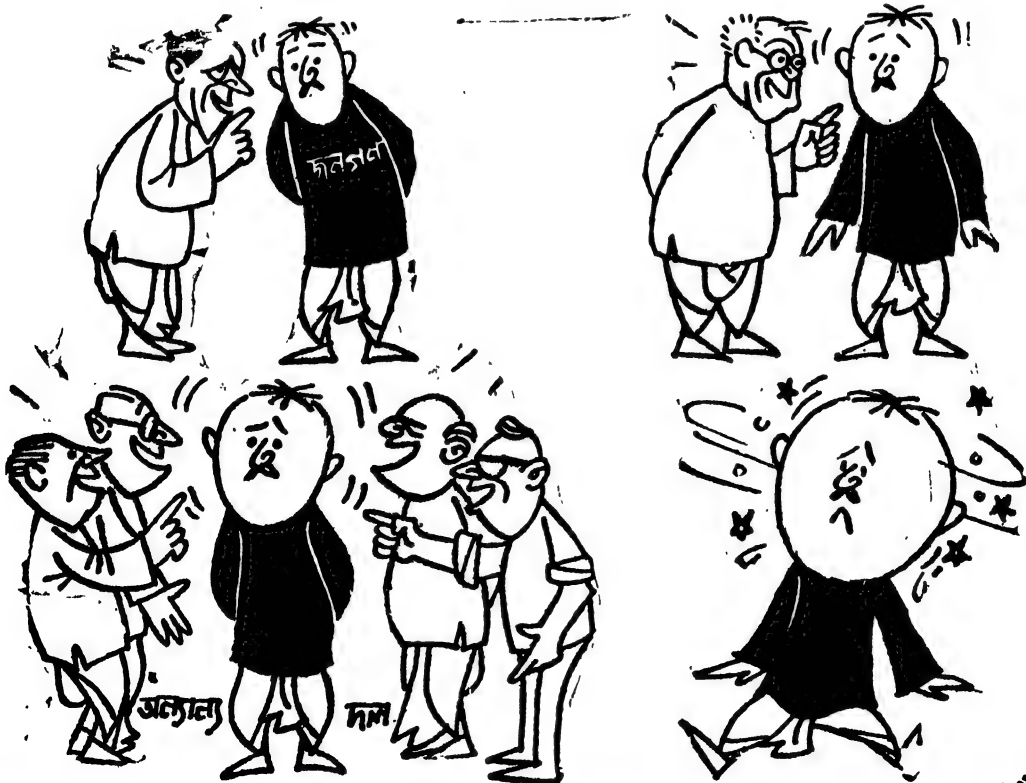
## দুই মন্ত্রীর দৃষ্টিতে

### শ্রীসত্যপ্রিয় রায়
শিক্ষামন্ত্রী

—আপনার মতে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্কলহ বা শরিকী সংঘর্ষের কারণ কি? নিম্নস্তরে যুক্তফ্রন্ট হলে গ্রামাঞ্চলের শরিকী সংঘর্ষ অনেকাংশে এড়ানো যেতো কি?

—একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে এ সব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ যদিও আমার কম, তথাপি আমার মনে হয় শ্রেণী-সচেতনতা বৃদ্ধিই এই সব সংঘাতের মূলীভূত কারণ। তবে তথাকথিত শরিকী সংঘর্ষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিছক অন্তর্দলীয় কলহ নয়। কায়েমী স্বার্থের সংগে শ্রমিক-কৃষক স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে শরিকী সংঘাতের রূপ নিয়েছে। তবে নিম্নপর্যায়ে কোন যুক্তফ্রন্ট কমিটি করে এ সংঘর্ষ এড়ানো যেতো বলে মনে হয় না। যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয়ভাবে যদি সংহত থাকে, তবে সেই কেন্দ্রীয় যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলের সংঘাত এড়ানো যায়। সাময়িকভাবে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে একটা অচলাবস্থার সূচনা হলেও এ অবস্থা বরাবর চলতে পারে না বলে আমার বিশ্বাস।

—একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে আপনি কি তথাকথিত ওইসব শরিকী সংঘর্ষকে শ্রেণীসংগ্রাম বলে মনে করেন?

—সামগ্রিকভাবে এগুলিকে শ্রেণীসংগ্রাম বললে যেমন ঠিক বলা হয় না, তেমনি নিছক শরিকী সংঘর্ষ বললেও ভুল বলা হয়। সব ঘটনাগুলি এক রকমের নয়। কোন কোন ঘটনার শ্রেণী-সংঘর্ষের সূচনা অবশ্যই আছে। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের পূর্ণ রূপ এটা নিশ্চয়ই নয়।

—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মধ্যে যে একটি পারস্পরিক সহযোগীসুলভ মনোভাব আশা করা গেছিলো, কার্যত তার পরিবর্তে এখন পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং অসহিষ্ণুতাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারী দপ্তরকে যেন কেউ কেউ নিজস্ব জমিদারীর মত ভাবছেন। এমন কেন হলো?

—একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গে চোদ্দ দলের এই সরকার একটা বিরাট রাজনৈতিক পরীক্ষা। ভারতবর্ষে এই প্রথম এতগুলি দলের একটি যুক্ত সরকার গঠিত হয়েছে। কাজেই মতাদর্শগত কিছু বিরোধ অবশ্যই এর মধ্যে থাকবে। কংগ্রেস বলতো, চোদ্দ দলের সরকার যুক্তভাবে কিছুই করতে পারবে না, আমরা বলতাম কংগ্রেসও যুক্ত থাকবে না। আজ কংগ্রেস ভেঙে গেছে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটিয়ে তাকে আরো সংহত করার প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সেই পথেই এগিয়ে চলেছে।

—সম্প্রতি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে নানা বাদানুবাদ চলছে। এমন কি সংসদেও পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকের 'উদ্বেগে'র কারণ হয়েছে। আপনার কি মনে হয়, এ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা সত্যই বিপন্ন?

—না। সামান্য অবনতি হয় নি, সে কথাও বলব না। তবে একটা পরিবর্তনের মুখে সেটুকু স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করাই ভাল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থমূলক দৃষ্টিভংগীর সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধীরা অনেক ক্ষেত্রে অশান্তির সৃষ্টি করছে। যুক্তফ্রন্ট আভ্যন্তরীণ কলহে মনোযোগ না দিয়ে সচেতনভাবে এর মোকাবিলায় এগিয়ে এলে এ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়া কিছু কঠিন নয়।

—বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রেও বেশ অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরীক্ষা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বহু স্থানে শিক্ষক, অধ্যাপক ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিতও হয়েছেন। কোথাও প্রকাশ্য রাজপথে একাধিক ছাত্রদলের মধ্যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। সামগ্রিক অবস্থাদৃষ্টে এ কথা কি মনে হয় না যে, ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার একটা প্রবণতা এসেছে?

—এটাকে ঠিক প্রবণতা বলা যায় না। তবে ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর অশান্তি আছে। তার কারণ এক কথায় বলতে গেলে ছাত্রদের সামনে কোন নির্দিষ্ট উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই। একটা হতাশাই এদের তথাকথিত নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের সহযোগিতা অপরিহার্য। আগে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে অনেকটা *patriarchal attitude* ছিল। এই মনোভাবের পরিবর্তন করে ছাত্রদের সহযোগীসুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা ভণ্ডুল কোন নতুন ব্যাপার নয়। আগেও হতো। তবে আগে বর্তমানের মতো সংবাদপত্রে সব ঘটনা ফলাও করে ছাপা হতো না। শিক্ষার সংগে সম্পর্ক থাকায় এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কথা বলছি। শিক্ষকদের লাঞ্ছনার ব্যাপারে প্রাপ্ত দু'টো ঘটনার রিপোর্ট সহ সংবাদপত্রে উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা যোগ করলে ৫০/৬০টির বেশী ঘটনা হবে না।

—এর কোন প্রতিকারের উপায় ভাবছেন কি?

—গভীরভাবে চিন্তা করছি।

—ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের বোঝা কমানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি?

—একজন শিক্ষক হিসাবে আমিও মনে করি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে র‍্যাশনালাইজ করা হয় নি। ছাত্রদের মাথায় নানান জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া

[illegible] সেই সেন্ট্রিমেন্টকেও বাদ দেওয়া হচ্ছে না। তবে খুব একটা হাল্কা সিদ্ধান্ত করার পক্ষপাতীও আমি নই।

—অনেকের মতে মাধ্যমিক স্তরে একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের চেয়ে সেই পুরনো দশম শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী ও সুবিধাজনক! বিশেষ করে নির্বাচনের পরে আমি বিধানসভার কিছু শিক্ষক সদস্যের কাছে এ প্রশ্ন রাখলে তাঁরা এই অভিমতই জানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

**—তাঁদের এ অভিমত নিতান্তই ব্যক্তিগত। তবে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা উঠেছিল এবং এখনো পর্যন্ত তা আলোচনাধীন থাকায় আমি কোন বিশেষ বক্তব্য রাখতে চাই না।**

—বিদ্যালয়ের নির্বাচনে ভোটার ক্যাটিগরীতে কিছু পরিবর্তন সাধন করায় বহু শিক্ষিত মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি কি? যেমন শিক্ষানুরাগী ক্যাটিগরীতে ভোটারের কিছু বিশেষ বৃত্তি (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইনবিদ্যা) নির্দেশ করায় বহু সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মচারী অথবা অন্য পেশাবলম্বী শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী মানুষ ভোটাধিকার হারিয়েছেন। এই সরকারী নির্দেশের তাৎপর্য কি?

**—নির্দেশ যদিও *person interested in education category*-র ভোটারদের কিছু পেশার উল্লেখ ছিল, তথাপি এর দ্বারা আমরা এটা বোঝাতে চাইনি যে, সরকারী-বেসরকারী অফিসের চাকরিজীবী বা উল্লিখিত পেশা-বহির্ভূত শিক্ষিত মানুষের ভোটাধিকার থাকবে না। পেশাগুলি কেবলমাত্র কয়েকটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু এর জন্য যদি প্রকৃত শিক্ষিত বা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন, তবে সেটা ভুলবশতই হয়েছে। এ ভুল অবশ্যই সংশোধন করতে হবে।**

—পশ্চিমবঙ্গে দুই শতাধিক বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি ভেঙে দিয়ে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগের ব্যাপারে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোর অভিযোগ কতটা সত্য?

**—এটা একটা অপপ্রচার। পশ্চিমবঙ্গের ছ' হাজারের বেশী স্কুলের মধ্যে মোট ২০৮টি স্কুলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ১৭০ জন ডিপার্টমেন্টাল অফিসার এবং ৬৮ জন স্কুল-শিক্ষক বা কলেজ-শিক্ষক। এই ৬৮ জনের মধ্যে নিশ্চয়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ থাকতে পারে।**

—যুক্তফ্রন্টের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্যের আর্থিক অসংগতি একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে অনেকেরই আশঙ্কা ছিল। তথাপি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকে র‍্যাশনালাইজড করার বিভিন্ন কর্মসূচীকে অনেকে স্টান্ট বলে মনে করছেন। আমাদের অবশ্য তেমন মনে করবার কারণ নেই। তবুও এইসব কর্মসূচী অদূর ভবিষ্যতে রূপায়িত হবে কি?

**—শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি কর্মসূচী রূপায়ণে আর্থিক প্রশ্ন ওঠেই না। যেমন ধরুন প্রাথমিক বিদ্যালয়। সারা রাজ্যে একইরকমের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা দরকার। কলকাতা কোন প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট-এর মধ্যে ছিল না। যুক্তফ্রন্ট এই সেখানেই এই অব্যবস্থা দূর করে একটা সাধারণ প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট প্রস্তুত করবে। সেই সংগে আরো হবে বর্ধমান এবং নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট। স্কুলবোর্ডগুলিতে দুর্নীতির বাসা আমরা অনেকটা ভাঙতে পেরেছি।**

**অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে আর্থিক অসংগতির কথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু এভাবে তো দায়িত্ব পালন করা হয় না। সমাজগঠনে শিক্ষার অগ্রাধিকার স্বীকার করলে এবং যুক্তফ্রন্টের মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে কোন বাধাই আসলে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না বলে আমার বিশ্বাস।**

## শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

**সেচমন্ত্রী**

বর্তমান যুক্তফ্রন্টের চরম সংকট এবং আইন-শৃংখলা ও শরিকী সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় একটি বিবৃতির মাধ্যমে বলেন : ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে আমাদের পার্টির রাজ্যপরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে, দুই কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাংলা কংগ্রেস সহ সমস্ত বামপন্থী দলকে নিয়ে কংগ্রেস এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলের বিরুদ্ধে একটি মোর্চা গঠন করা হোক। সি-পি-এম যদিও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে সংকীর্ণতাবাদ এবং সুবিধাবাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তথাপি এই মোর্চায় সি-পি-এম থাক, এটাই আমরা চেয়েছিলাম। যদিও বাংলা কংগ্রেস আমাদের থেকে দক্ষিণেই ছিল, তথাপি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে বাইরে এসে বাংলা কংগ্রেস বাঁ দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। তাই বাংলা কংগ্রেসকেও এই মোর্চায় আমরা চেয়েছিলাম। কারণ বাংলাদেশ কেন, সারা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে হটিয়ে গণতান্ত্রিক অগ্রগতি কোন একক দলের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এখনও সম্ভব নয়। কিন্তু সি-পি-এম আমাদের পার্টিকে ধ্বংস করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে রেখেছিল। তারা তাদের রাজ্যপরিষদ প্রচারিত পার্টি-চিঠিতে যে বক্তব্য রেখেছিল, তা হলো কংগ্রেসকে ঘায়েল করতে হলে আগে সি-পি-আই'কে ঘায়েল করা দরকার। অপরদিকে বাংলা কংগ্রেস যে গ্রামে-শহরে মধ্যবিত্তদের ওপর প্রধানত নির্ভর করে একটি গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে বামপন্থী দলগুলির দিকে হাত বাড়াচ্ছে, সেটা তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনা তারা ভেঙে দিয়েছে। যদিও চিরাচরিত সুবিধাবাদী কায়দায় তারা আসনের ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসকে দলে টেনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে কোণঠাসা ও জব্দ করতে ছাড়ে নি। তারা ভেবেছিল, '৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে সি-পি-আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেসকে তারা শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেবে এবং হয় তারাই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, অন্যথায় কংগ্রেস।

কিন্তু চিরকাল সংকীর্ণতাবাদী ও সুবিধাবাদী দলের বাস্তব বিচারে যে ভুল হয়, এ ক্ষেত্রেও সেই ভুলই হয়েছিল। আমাদের তারা পর্যুদস্ত করতে পারলো না। তাদের ধারণা মত তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে কংগ্রেস পাবে, এটাও ভুল প্রমাণিত হলো। বাংলাদেশের লোক আইনসভায় কংগ্রেসকে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করলো। এই পরিস্থিতিতে সি-পি-এম তাদের থিয়োরীর বিরুদ্ধেই যুক্তফ্রন্ট করতে বাধ্য হয়েছিল।

[ নেতাজীর অগ্নিময় আদর্শ ও তাঁর বজ্রবাণী নিশ্চিতই 'কবিতীর্থযাত্রীর স্মরণ-পত্র' অর্থাৎ উত্তরপ্রসঙ্গ, [illegible] ও পাথেয়। কিন্তু সেই কবি কারা? নিঃসংশয়ে তাঁরাই, যাঁরা সেই বীরের কীর্তির [illegible] অগ্নিমন্ত্রে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রনেতা সুভাষের মধ্যেই প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনুভব করেন অধ্যাপক ওটেন। এই স্ফুলিঙ্গ অনুসরণ করে প্রবীণ বয়সে ওটেন যে বহ্নিতীর্থে উপনীত হন, তার [illegible] করেন তিনি। অনুশোচনায় উত্তপ্ত ওটেন যেভাবে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তাই তাঁর কবিতাটি এখানে প্রকাশ করা হোল। —সম্পাদক ]

একবার তোমার হাতে আমার দুর্ভোগ হয়েছিল, না সুভাষ?
তোমার দেশভক্ত হৃদয় আজ স্তব্ধ! আমি ভুলে যেতে চাই!
এইটুকু শুধু মনে রাখি—সেদিনও,
যাকে একদিন তোমার দেশের মাটিতে রুখে দাঁড়িয়েছিলে
সেই রাজ ছিল পরাক্রান্ত; আইকেরস[1]-এর যোগ্য স্পর্ধায় উদ্যোগ
করেছিলে
যোদ্ধসজ্জায় ঝড়তুফান ও আসমানের মুখোমুখি হয়ে
ত্রিদিবের তুংগ প্রাকার ঝড়ের বেগে উড়িয়ে দিতে; চেয়েছিলে
মুক্তির ঋণস্বীকৃতির শোধবোধ ঋজু ও রক্ত দাবিতে।

উচ্চ আসমান নুয়ে পড়ল, কিন্তু যোগ্য মহিমায়
আইকেরস-এর মতই তুমি ধাবিত হলে সাগরের অভিমুখে;
বিহংগ, তোমার অংগ হতে বি-গলিত হল পক্ষদুটি "সূর্যতেজে";
উদ্দীপক দেশপ্রেমের আগুন প্রদীপ্ত হল
ভারতের বিশাল অন্তরে, আর শিখায় শিখায় বিচ্ছুরিত বহ্নিবন্যা
উৎসারিত হল তার "মুক্তিসেনা"র সহস্র সৈনিক হৃদয় থেকে;
তারই হল জয়।

* ওটেন-এর কাব্যগ্রন্থ 'Song to Aton and other Verses'এ সংকলিত মূল সনেটটির অনুবাদ।

১ গ্রীক পুরান অনুসারে আইকেরস সূর্যপ্রয়াসী প্রথম বিহংগ-মানব। সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর তেজে তাঁর পক্ষদ্বয় বি-গলিত হয় ও তিনি সাগরে পতিত হন। অনুবাদক : [illegible]

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে আসন সংখ্যা নিয়ে যখন তারা ফ্রন্ট প্রায় ভেঙে দেবার উপক্রম করেছিল, তখনও আমরা বলেছিলাম, ফ্রন্ট থাকলে সকলেরই লাভ হবে এবং সবচেয়ে বেশি লাভ হবে তাদেরই।

নির্বাচনের ফলাফল আবার তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিল। এক সময় লেনিন বলেছিলেন, সংকীর্ণতাবাদ সহজে মরে না। নির্বাচনের পর সি-পি-এম নেতৃত্ব থেকে বলা হলো, জনগণ তাদেরই প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে। যুক্তফ্রন্টের সাফল্যকে স্বীকার করবার মত এতটুকু বিনয় তাদের হলো না।

আমাদের পার্টি তখনই বলেছিল যে, সি-পি-এম'এর এই সংকীর্ণতাবাদ ও সুবিধাবাদী নীতির ফলে ভবিষ্যতে ফ্রন্টে এবং ফ্রন্ট সরকারে দারুণ সংকট সৃষ্টি হতে পারে, এমন কি ফ্রন্ট ভেঙেও যেতে পারে। সে জন্য তখনই ফ্রন্টের সভায় আমরা বলেছিলাম সি-পি-এম'এর শক্তি অনুযায়ী অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব তাদের দেওয়া হোক।

একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, বাংলা কংগ্রেস অথবা অপর কোন দল ফ্রন্টকে দক্ষিণ দিকে টেনে নিতে পারবে অথবা তার ৩২-দফা কর্মসূচী বানচাল করতে পারবে, এ সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র ছিল না, এখনও নেই। কারণ ফ্রন্টের বেশির ভাগ দলই ছিল বামপন্থী এবং তার মধ্যেও আবার কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্টদের কাছাকাছি। গত এক বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয়েছে যে, শ্রম আইন, ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনে [illegible] গরীব চাষী ও [illegible] শ্রেণীসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে বার বার যুক্তফ্রন্ট সমবেতভাবে তা স্বীকার করেছে। সম্মিলিত কার্যসূচীর মধ্যে যা কিছু কাজ হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দলই বাধা দিতে পারে নি, যার মনে যা-ই থাক না কেন। এইভাবে এগুতে পারলে যুক্তফ্রন্ট আরও অনেক সাফল্যলাভ করতে পারতো এবং তার মধ্যে গুরুতর কোন সংকট এত শীঘ্র দেখা দিত না।

কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, সি-পি-এম মোটেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুসরণে বিচার-বিশ্লেষণ করছে না। একটি দাম্ভিক গরম বুলি-কপচানো সুবিধাবাদী পেটি বুর্জোয়া দলের মতই কার্যকলাপ করছে। নিজেদের দলীয় শক্তিকে তাড়াতাড়ি বাড়াবার জন্য দরকার হলে কারখানার মালিকের সঙ্গে সমঝোতা করেও অপর দলের ইউনিয়ন ভাঙবার চেষ্টা করছে, জোতদার-মহাজনের সঙ্গে সমঝোতা করেও অপর বামপন্থী দলের নেতৃত্বে পরিচালিত ভূমিহীন চাষী-আন্দোলনকেও আঘাত করছে এবং এই কাজে সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের ব্যবহার করতেও তারা দ্বিধা করছে না। এইভাবে একদিকে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলির মধ্যে তারা দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের সৃষ্টি করছে, অপরদিকে সস্তায় কিস্তিমাত করে তাড়াতাড়ি দল বাড়াবার জন্য বহু ক্ষেত্রে গ্রামে-শহরে গরীবদের নিয়ে মধ্যবিত্তদের ওপরেও আক্রমণ চালিয়েছে, এমন কি সাধারণ গ্রাম্য-বিরোধ বা জ্ঞাতিশত্রুতাকেও তারা দলীয় স্বার্থে বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করছে।

আমরা একথা জানি যে, অনেক মধ্য-বিত্তের সঙ্গে গরীবদের স্বার্থের সংঘাত আছে। কিন্তু বড়দের বিরুদ্ধে যেভাবে সেই লড়াই পরিচালনা করতে হয়, ছোটদের বিরুদ্ধে সেভাবে করলে চলে না। দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী এবং বড় বড় জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে বাকী সকল শ্রেণীর কম-বেশি যে স্বার্থ আছে, সেই জনস্বার্থই বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক মোর্চার ভিত্তি। কিন্তু সি-পি-এম তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই নির্দেশ কোনদিনই মানে না।

নিছক দলবাজী করে আমাদের এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে [illegible] করবার জন্য সি-পি-এম যে [illegible] আক্রমণ চালিয়েছে, তা বন্ধ করার জন্য আমাদের এবং অন্যান্য দলের সম্মিলিত চেষ্টা, যুক্তফ্রন্টের সমস্ত সর্বসম্মত প্রস্তাব সব কিছুই এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে যুক্তফ্রন্টের স্বীকৃত নীতির বাইরে অরাজক কার্যকলাপও বন্ধ করা যায় নি। এরই জন্য আজ যুক্ত-ফ্রন্টে এই চরম সংকট দেখা দিয়েছে।

ভারতবর্ষে আজকে যে সংকট তার সুযোগ এবং [illegible] দুই-এরই সম্মুখীন হয়ে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ [illegible] সামনে এগুতে পারে। যদি তারা সর্ব-ভারতীয়ভাবে সর্বসম্মত কর্মসূচীর ভিত্তিতে মিলিত হতে পারে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত বামপন্থী গণ-তান্ত্রিক দলকে সেই ডাকই দিয়েছে। এই সর্বভারতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের এক বিরাট দায়িত্ব আছে। সি-পি-এম'এর মধ্যে যদি এতটুকু [illegible] দায়িত্ববোধ থাকে তা হলে এখনো যুক্ত-ফ্রন্টকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের ও অন্যদের [illegible] প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা উচিত।

—৭ই মার্চ, ১৯৭০

## ॥ আট ॥

শৈশবের সেই আমি যেন রাণীদির বুকের মধ্যে।

ঘটনার আকস্মিকতায় অপ্রকৃতিস্থা রাণীদি তখনও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মুখ থেকে তাঁর মদের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরুচ্ছে। যুগ-যুগান্তের সংস্কার তখন আমার বিস্ময়কে ছাপিয়ে যেন প্রবলবেগে নাড়া দিচ্ছিলো। মুখফুটে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হল, 'রাণীদি, তুমি এ কি করলে! কেন, কেন তুমি আমার সমস্ত স্বপ্নকে এমন করে ধূলিসাৎ করে দিলে, এই রাতে এমন করে নর্তকীর বেশে?' কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই ভাঙা গলায় তিনি বলতে লাগলেন, 'বিজন, কেন এখানে এলি—কেন এলি? বল তুই কেন এলি?' আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। মনের মধ্যে তখন আমার সংস্কারের ঝড়। রাণীদি, আমার স্বপ্নের রাণীদি, তাঁকে শৈশব থেকে আমি বসিয়ে রেখেছি সম্মানের এক উচ্চ আসনে। আমার চিরদিনের সশ্রদ্ধ দিদি তিনি। তাঁকে আমি মায়ের পাশাপাশি বসিয়ে ভালবেসেছি। এইভাবে মদ্যপায়ী এক নর্তকীর বেশে তাঁকে আমি দেখব, এ যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নি! এ যে আমার জীবনে কত বড় আঘাত, কত বড় শাস্তি তা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? কেউ যদি কখনো তোমরা আমার অবস্থায় পড়ো, মনে মনে ভেবে দেখো আমার কথাগুলো, অনুভব কোরো এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণার দুঃসহ ব্যথা। মুহূর্তের ভগ্নাংশে ভগ্নাংশে বুকের মধ্যে একটানা ব্যথার মীড় কেন সুরের লহর তোলে, শুধু একবার—একবার তোমরা স্মরণ কোরো। রাণীদিকে আমি দ্বিধাহীনকণ্ঠে বলেছিলাম অন্য কেউ তাঁকে অসতী, কুলটা মেয়ে মনে করলেও আমি কখনো তা করি নি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'তুমি বিশ্বাস করো রাণীদি, তুমি কলংকিনী নও।' আর ঘৃণা করা? ঘৃণা সম্পর্কেও আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'ঘৃণা করবো কেন—মানুষকে ঘৃণা করা মহা পাপ'! কিন্তু আমার সে দ্বিধাহীন কণ্ঠকে আজ এমন করে অবরুদ্ধ করে দিলে কে? এই মুহূর্তে কেন আমার কণ্ঠ এমন নীরব হয়ে গেল? কেন আমি রাণীদির দু'হাতের বেড়াজালে তাঁর বুকে আবদ্ধ অবস্থায় লৌহ-ভীমের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে বসেছি? রাণীদির সঙ্গে আমার তো কোন শত্রুতা ছিল না?

রাণীদি মদের খেয়ালে তেমনি করেই আমাকে বলতে লাগলেন, 'বল তুই কেন এখানে এলি—কেন এলি?'

আমার চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম হয়েছিল। আহত মন ও প্রচণ্ড অভিমানে, আবেগে আমি রুদ্ধস্বরে বলে উঠলাম, 'ছেড়ে দাও তুমি আমায়!'

'ছেড়ে দেবো—কিসের জন্যে ছেড়ে দেবো?'

যন্ত্রণায়, ব্যথায় ভেঙে পড়ে তেমনিভাবেই আমি বললাম, 'তোমাকে আমি এখানে এইভাবে দেখব, এ কখনো আশা করি নি। তুমি আমায় ছেড়ে দাও রাণীদি—'

'ছেড়ে দেবো—বলিস কিরে', রাণীদি বললেন।

ইতিপূর্বে তাঁর ঘরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির আড়ালে আফিমের কারবার প্রত্যক্ষ করেও যা আমার মনে হয় নি এবং যা আমি মেনেও নিয়েছিলাম, এখন রাণীদির এই অবস্থা দেখে সেটুকু মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, আমি যেন নেহাৎ ঘটনাচক্রে আমি এখানে এসে পড়েছি এবং এসে এই যে অবস্থা দেখছি, এতে সে মন আমি কোথায় পাবো, যে মনকে সংযত করে আমি এ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করব? এ পরিস্থিতি আমার কাছে ঝড়ের পরিস্থিতি, ভূমিকম্পের পরিস্থিতি কিংবা রাজ-ছত্র ভেঙে পড়ার মত এ আমার কাছে কোন স্বপ্নসৌধ ভেঙে পড়ার পরিস্থিতি।

আমার ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে বোধকরি রাণীদির কিছু একটা মনে হয় এবং তারপর লক্ষ্য করলাম তাঁর হাতের বাঁধনটাও কেমন যেন খানিকটা শিথিল হয়ে গেল। আমি এবার জোর করে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলাম, 'যেতে দাও আমাকে।

রাণীদি হঠাৎ যেন কয়েক পা টলে গেলেন। তারপর দৃঢ়ভাবে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'চলেই যদি যাবি তো এসেছিলি কেন?'

বললাম, 'ভুল করেছিলাম।'

'ভুল—না দেখতে এসেছিলি তোর রাণীদি কতখানি অসতী, কতখানি কুলটা কিংবা সে কি পরিমাণ কলংকিনী, না?'

রাণীদি অপ্রকৃতিস্থা। কিন্তু তবু তাঁর এসব কি কথা!

যে নারী গভীর রাতে অভিসারিকা নায়িকার মত নর্তকীর ভূমিকা পালন করে ঘাগরা পরে আর সুরা পান করে, তাকে আর আমি কেমন করে সে মর্যাদা দেবো, যে মর্যাদা তাঁকে আমি দিতাম আগে? তবু রাণীদির খোঁচাটাই আমার কাছে তখন রীতিমত পীড়াদায়ক বলে মনে হল এবং তারই জের টেনে আমি বললাম, 'আমার এখানে আসাটা দেখে কি তোমার সেই কথাই মনে হয়? চোখের সামনে তুমি দেখতে পেলে না জগদীশ না কি নাম—সেই লোকটা শংকরের মাকে ক্লোরোফর্ম করে তার পর আমাকে পাইপগান নিয়ে খুন করতে এসেছিল?'

এতক্ষণে রাণীদির খেয়াল হল যে, ঘরে আরও লোক আছে। তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন ওস্তাদের দিকে। ওস্তাদ বললে, 'হ্যাঁ, জগদীশ এসেছিল।'

'হঠাৎ?'

'জানি না।'

মদের খেয়ালে হয়ত কেউই ওরা খেয়াল করে নি ব্যাপারটা। তা না হলে শংকরের মা কেন এসেছিলেন সে কথা জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু তা না করে সম্ভবত আমার এসে পড়াটার যে আকস্মিকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যেই ওরা ডুবে গিয়েছিল। তাই আমিই বললাম, 'জগদীশ আসার কারণ শংকরের মা এসেছিলেন বলে। আর শংকরের

মা এসেছিলেন শংকর জেল থেকে পালিয়ে এসেছে শুনে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে—'

এবার ওস্তাদ যেন লাফ দিয়ে উঠল একেবারে। সে বলে উঠল, 'বল কি—শংকর জেল থেকে পালিয়ে এসেছে? আরে আমার ছোট ওস্তাদ—'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সে পালিয়ে এসেছে বলেই তার মা আর আমার এখানে আসা?'

'কোথায়—কোথায় সে,' ওস্তাদ উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

বললাম, 'এদিকেই এসেছে শুনেছি।'

'এদিকে', ওস্তাদ বললে, 'তাহলে নিশ্চয়ই বসন্তর ওখানে গিয়ে উঠেছে।' কথাটা বলেই লোকটা রাণীদির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি আসছি।' তারপর দ্রুতবেগে সে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতে হারমোনিমওয়ালা ও তবলচি বলল, 'আমরা আর কি করব দিদিমণি?'

'তোমরা এখন আসতে পারো।'

'বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা' বলতে বলতে লোকগুলো চলে গেল।

ওরা চলে যেতে রাণীদি আমাকে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে সোফার ওপর। তারপর নিজে বসে পড়ল আমার দিকে মুখ করে আমারই পাশে। আমি তখন নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বোধকরি আমার চোখে জলও এসে পড়েছিল। রাণীদি আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সহসা আমার ঘাড়ের দু'দিকে হাত দিয়ে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'মনে বড্ড লেগেছে—না রে!'

আমি কোন কথা না বলে জোর করে ঘাড়টা তাঁর বুক থেকে সরিয়ে নিলাম।

রাণীদি বললেন, 'এ কি—তুই তো আমায় ভালবাসতিস বিজন।'

যন্ত্রণাকাতরকণ্ঠে বলে উঠলাম, 'ভালবাসি ঠিক, কিন্তু তুমি মদ খাও। এ তো আমি জানতাম না।'

'মদ খেলে বুঝি খুব রাগ হয় তোর! রাণীদির কণ্ঠস্বরে কেমন যেন মমতা। আমি কোন কথা বললাম না। তিনি নিজেই বলে যেতে লাগলেন, 'মদ খাই কিন্তু কেন খাই—কই সে কথা তো তুই আমায় জিগ্যেস করলি না?'

মমতাপূর্ণ কথার পরই হঠাৎ তাঁর এমন একটা উক্তিতে মনটা কেমন যেন আমার ছাৎ করে উঠল। এ কথা তো মানুষের মুখ থেকে অমনি অমনি বেরোয় না—বরং গভীর ক্ষত-লাঞ্ছিত জীবনের চরম অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা উৎসারিত হয়ে আসে। তবে কি রাণীদির এই মদ খাওয়ার পিছনেও কোন ঘটনা আছে? থাকতেও পারে। কিন্তু কি জানি, তাঁকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। রাণীদি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এ কথাও যেমন ঠিক, তেমনিই হয়তো ঠিক তাঁর অধঃপতিত জীবনটাও। ইতিপূর্বে তাঁকে দেখেছি আমি বৈষ্ণবীর বেশে, দেখেছি বে-আইনী আফিমের কারবারীরূপে—এখানে দেখছি মাতাল নর্তকীর বেশে অপরের কামনার আগুনে ইন্ধন যোগাতে। রূপোপজীবিনীদের মতই এ পথ একটা ভ্রষ্টাচারের পথ, এ পথ মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়ের বহু চাটুকথা শোনারই পথ। তাই রাণীদিকে আমার মনে হল তিনি ভ্রষ্টা। হয়তো একদিন ছিল, যখন রাণীদি সংগ্রামই করে গিয়েছিলেন নিজের বিরূপ-ভাগ্যলিপির বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁর নিজের কথাতেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমি পারলুম না—আমি হেরে গেলুম'। কে জানে, এ কি তবে রাণীদির সেই পরাজিত জীবনের অপরিমেয় গ্লানি কিম্বা তার পঙ্কিল রূপ?

এর পর রাণীদি আমাকে প্রবলবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, 'বল, তুই চুপ করে রইলি কেন?'

বললাম, 'কি বলব তোমাকে?'

'বলবার কি কিছুই নেই রে?'

'কি রেখেছ তুমি আমার বলার?'

এবার রাণীদি কেমন যেন অনুযোগের সুরে বললেন, 'হ্যাঁ রে, আমি না হয় বলার কিছু রাখি নি কিন্তু তোরও কি চোখ নেই সবকিছু দেখার। তুই জ্ঞানী-গুণী, অনেক তোর লেখাপড়া, মানুষ চেনবার ক্ষমতাও তোর আছে কিন্তু তুই এ-সব কিছুই কি হিসেব করে দেখবি না?'

রুষ্টভাবে বললাম, 'কি হিসেব করে দেখতে বলছ তুমি?'

রাণীদি হঠাৎ হেসে উঠলেন। তারপর দ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'তুই আমাকে বেশি ভালবাসিস বলে কি বেশি শাস্তি দিবি বিজন? অপরে আমাকে কোন শাস্তি দিলে তুই এতক্ষণ হয়তো তুলকালাম লাগিয়ে দিতিস—আর নিজে যখন শাস্তি দিচ্ছিস, তখন কি তোর মনের মধ্যে আসল মানুষটা এতটুকু গর্জন করে উঠবে না?'

এ কোন্ ছলনাময়ী নারীর রহস্যময় জীবনের ততোধিক রহস্যময় কথা! এই রাতে এই চরম সমাজবিরোধী এক চক্রে, একেবারে তার মর্মমূলে বসে আমি এ সব কি শুনছি, কি দেখছি। অবাক হয়ে গেলাম রাণীদির এই পরিচয়ে! মনে পড়ে গেল শৈশবে এই নারীরই কোমল বুকে স্বর্গীয়-সৌরভের দ্রাণে আমি মানুষ হয়েছি, স্বপ্ন দিয়ে তাঁর মূর্তিকে বড় সুন্দর করে গড়েছি, আমি মনে মনে গড়ে তুলেছি। অথচ এই বীভৎস অভিশপ্ত জগতের মধ্যে যখন তাঁকে দেখলাম, তখন কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তবু তখনও আমার ধারণা পূর্ববৎই ছিল, তার কোন বিকৃতি ঘটে নি। যে মূর্তিকে আমি অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মর্যাদা দিয়ে গড়ে তুলেছি, তাকে আমি ভাঙতে দিই নি। কিন্তু এই মুহূর্তে রাণীদির এই সব জ্ঞানমার্গের দর্শনশাস্ত্রীয় কথা শুনে আমি যেন জ্বলে উঠলাম মনে মনে। এই তো সেই জগৎ—যে জগতে ভানু অন্ধ সেজে, নয়তো মাতৃদায়-পিতৃদায় বলে উত্তরীয় গলায় ভিক্ষা করে, মেনকা পাঁচির মা'র খোকাকে ভাড়া নিয়ে ছেলে সাজিয়ে অর্থ উপার্জন করে, মাধু হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নাদের আফিম খাইয়ে তালিম দেয় আর কোহিনুরকে দিয়ে আসে জেলখানায়—চিঠি, গাঁজা, চরস, কোকেন, আফিম স্মাগল করার উদ্দেশ্যে। যে জগতে কৃষ্ণ-রাধিকার যুগল মূর্তির সামনে ধূপ, চন্দন আর ফুল সাজিয়ে রেখে বে-আইনী আফিমের কারবার চালানো হয় নাকে তিলক কেটে, যেখানে শংকর জেল থেকে পালিয়ে এসে ওঠে আড্ডায়, যেখানে টুনটুনি জবাকুসুম নিয়ে আসে, জগদীশ ক্লোরোফর্ম করে, তার পর পাইপগান নিয়ে ছোটে মানুষ খুন করতে, যেখানে নাবালক শিশুদের চোখ উপড়ে নেয় ডাক্তার আর নার্স, তারপর তাদের অন্ধ করে দিয়ে বোধকরি পাঠায় অর্থ উপার্জনের ব্যবসায়, যেখানে গভীর নিশীথে উন্মত্ত রজনীর উৎসব চলে সুরা আর নারী নিয়ে, যেখানে নর-নারীর সম্পর্ক দেহ বিকিকিনির মধ্যে এসে পর্যবসিত হয়—সেখানে সেই চক্রের নায়িকার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রাণীদির এ-সব কথা আমার কাছে যেন কেমন উপহাসের মত শোনালো। একেবারে অভিনেত্রী হয়ে গেছে রাণীদি! রীতিমত রুদ্ধস্বরে আমি এবার বললাম, 'অনেক কথা বলেছো তুমি—আর নয়। তুমি আমাকে যেতে দাও।'

'সেই এক কথা', রাণীদি উঠেপড়ে বললেন, 'যেতে দাও, যেতে দাও, যেতে দাও।'

'হ্যাঁ আমার সেই এক কথা!'

হঠাৎ রাণীদির কি হল কে জানে। এক হিংস্র ক্রূর দৃষ্টি প্রসারিত করে আমার দিকে তিনি এগিয়ে এলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে একখানা ছোরা বের করে আমার দিকে তুলে ধরে বললেন, 'যাবি—যা দিকি!'

অদ্ভুত এক বিস্ময়কর দৃশ্য!

ঘরের প্রজ্বলিত আলোয় ছোরাখানা

[illegible] কোন ট্রিপীস মেয়ের মত ওড়না উড়িয়ে রাণীদি এ যেন কোন খুনির ভূমিকায় অভিনয় করছে বলে মনে হল। আমি এতটুকু ভয় পাই নি। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য রাণীদি আরও কিছু কসরৎ করার চেষ্টা করলেন এবং বলতে লাগলেন, 'আমার এ ছোরা অব্যর্থ—আমার অসম্মানের একমাত্র পরিত্রাতা!' কথাগুলো বলার সংগে সংগে পাকখানেক ঘুরে গিয়ে রাণীদি কেমন যেন এক বীভৎস হাসি হেসে উঠলেন!

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি কি তোমাকে অসম্মান করেছি বলে তুমি মনে করো?'

রীতিমত রুদ্ধকণ্ঠে রাণীদি বললেন, 'তুই আমাকে যেভাবে অসম্মান করছিস, এভাবে অসম্মান আমাকে কেউ কোনদিন করে নি। করতে পারবেও না'।

'এসব বাজে কথা তোমার রাখো', বলে উঠলাম, 'পথ ছাড়ো তুমি?'

'নাঃ', রাণীদি চীৎকার করে উঠলেন।

এবার আমি রুখে উঠে বললাম, 'তুমি আমাকে ছোরা দেখাতে পারো আর আমি তোমাকে কিছু দেখাতে পারি না?' বলে আমি ঝুলি থেকে পুনরায় আমার রিভলভারটা বের করলাম।

রাণীদি বললেন, 'হ্যাঁ, দেখছি তোর কাছে একটা পিস্তল আছে। কিন্তু তুই কি আমায় মারবি? মার দেখি'—বলে রাণীদি আমার সামনে বুক পেতে দিলেন।

আমি তাঁকে বললাম, 'আমি তো তোমায় মারব বলি নি বরং তুমিই তোমার ছোরা যে একেবারে অব্যর্থ, সেই কথাই আমাকে বলেছো!'

'ঠিকই বলেছি তো!'

'তবে, আমি তোমায় মারব, তুমি এ কথা বলছ কেন?'

সহসা রাণীদি ছোরাখানা ঘরের কার্পেটের ওপর ফেলে দিয়ে উচ্ছ্বসিত-ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওরে বিজন, তুই কি কিছু বুঝিস না? তুই-ই তো বলেছিলিস, তুই আমাকে কখনো ঘৃণা করবি না—কিন্তু, কিন্তু'... ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন তিনি। আমি রীতিমত মুস্কিলে পড়ে গেলাম। এ যেন এক অদ্ভুত জীবন-নাট্যের তুলনাহীন মুহূর্ত। মনের মণিকোঠায় যে পুঞ্জীভূত সহানুভূতি ও দরদ ছিল লুকিয়ে তা যেন দ্রবীভূত হয়ে এবার বাইরে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। বললাম, 'রাণীদি, ঘৃণা তোমায় আমি করি নি, তুমি আমার তৈরি করা প্রতিমাটাকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে দিয়েছ বলেই আমার রাগ, আমার অভিমান।'

'রাখ, রাখ তোর রাগ অভিমান, রাণীদি আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের এক-কোণে চলে গেলেন। তারপর সেখানে একটা আলমারী থেকে বার করলেন একটা মদের বোতল। আমি ছুটে গেলাম তাঁর দিকে। বলে উঠলাম, 'এ কি করছ রাণীদি। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি'?

'দে দে বিজন, আমায় পাগল হতেই দে। এ জীবন আর আমি সহ্য করতে পারছি না।'

ব্যথাটা বা বেদনাটা রাণীদির কোথায় তা আমি জানি। কিন্তু বর্তমানে তাঁর কি জ্বালা, কি দুঃখ তা আমার কোনক্রমেই বোধগম্য হল না। তবু আমি বুঝলাম নিশ্চয়ই আছে কোথাও কিছু একটা। আমি রাণীদির হাতখানা ধরে ফেলেছিলাম ইতিমধ্যে। বলে উঠলাম, 'রাণীদি, তোমার সব কথা আমি শুনব—শুধু তুমি একটি কথা আমাকে দাও—'

রাণীদির চোখ থেকে তখন টস্ টস্ করে ঝরে পড়ছে জল। আমি পুনরায় বললাম, 'বলো রাণীদি—তুমি আমায় কথা দেবে।'

অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে কি এক যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে রাণীদি সেই-খানে বসে পড়ে বললেন, 'কি—কি কথা তুই বলবি, বল বিজন। আজ পৃথিবীতে আমার কাউকে কোন কিছু দেওয়ার নেই —যদি পারি তোকেই তা আমি দিয়ে যাবো!'

'আমাকে তোমায় কথা দিতে হবে—কথা দিতে হবে এই যে, বলো তুমি আর কখনো মদ খাবে না?'

'না না না বিজন, ও কথা আমার কাছ থেকে তুই আদায় করতে চাস্ নি!'

'কেন—কেন তুমি এই কথাটুকু আমায় দিতে পারবে না?'

জীবনের সব সম্পদ যেন খোয়া যাবে, এমনিভাবে রাণীদি আমাকে বললেন, 'ওরে, এইটুকু আছে বলে আজও আমি ঠিকভাবে আমার পথে আছি। এ গেলে আমার সব যাবে।'

এ এক অদ্ভুত কথা। রাণীদি ভদ্র-ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। বিবাহিতা তিনি —বেদনার মধ্যে স্বামী তাঁর চরিত্রহীন লম্পট। জীবনের কাব্যে তিনি চির-উপেক্ষিতা। কিন্তু তাই বলে মদ না খেলে তাঁর চলবে না, তাঁর জীবনের সব কিছু চলে যাবে—এ কোন্ ধরণের কথা? আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। রাণীদি যেন ভিখারিণীর মত আমার দিকে চোখ দুটো তুলে বললেন, 'বিজন, তুই আমায় এ অনুরোধ করিস নি ভাই!'

'কিন্তু কেন সে কথা তোমায় বলতে হবে আমাকে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব বলব তোকে। তবে আজ আর নয়। আজ তুই আমাকে একটু একা থাকতে দে।'

এও আরেক আশ্চর্য। এতক্ষণ আমিই যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম এবং বার বার যেতেও চেয়েছিলাম এবং আমাকে এতক্ষণ যে লোক যেতে দেয় নি, সেই লোকেই এখন বলছে, আমাকে একটু একা থাকতে দে। এমনিই হয়তো মানুষের হয়। অন্যের জিদকে পরাস্ত করে নিজের জিদকে অপরের ওপর খাটানোতে মানুষ বোধকরি বরাবরই বেশি উৎসাহী। আমি মেনে নিলাম রাণীদির কথা। এখানে আসা অবধি প্রতিটি মুহূর্ত আমার কেটেছে অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে। মনোজগতের আঁকা-বাঁকা দুর্গম পথের যাত্রী হিসাবে চলতে চলতে আমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবু এখনও আমার অনেক কর্তব্য বাকি। শংকরের মা ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান হয়ে যান জগদীশের হাতে। ওস্তাদ তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছিল—তারপর তাঁর কি হয়েছে না হয়েছে, আমার আর কিছুই জানা নেই। মায়া রাতে বার বার এখানে আসতে নিষেধ করেছিল, পুত্রস্নেহে অন্ধ মা কিছুতেই মেয়ের কথা শোনেন নি। অথচ আসতেই তাঁর এই বিপদ ঘটে গেল। শুধু কি তাঁরই বিপদ? বিপদ তো আমারও ঘটেছিল। যদি পাইপগানের একটি গুলী এসে আমাকে লাগত, তা হলে চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে আমাকে বিদায় নিতে হত। এই অভিশপ্ত জগতের গোলকধাঁধার রহস্য ভেদ করে সে খবরটুকুও বোধহয় কোনদিন বাইরে কেউ জানতে পারত না। তা ছাড়া? তা ছাড়া রাণীদিকেও নিয়ে যা ঘটল সেও যে কি, তা বোঝা যাক বা না যাক, কিন্তু তা যে হৃদয়বিদারক, সে কথা বোধকরি না বললেও চলবে। ইতিপূর্বে রাগ ও অভিমানের বশে আমি চলে আসতে চেয়ে-ছিলাম, রাণীদি আসতে দেন নি—এখন

আমার রাগ বা অভিমান পড়ে এসেছে, সহজভাবেই যেন চলে আসব ভাবছিলাম। কিন্তু রাণীদির হঠাৎ 'আমাকে একটু একা থাকতে দে' বলায় আমি যেন কেমন একটু সংকুচিত হয়ে পড়লাম। তবে দেখলাম তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতের প্রতি-শ্রুতি অর্থাৎ তিনি আমায় সব কিছু বলবেন, তাই তাকেই সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম।

আবার সেই সিঁড়ি দিয়ে নামা, আবার সেই বারান্দায় সারি সারি বিছানায় চোখ-বাঁধা শিশুর দল, সেই অপারেশন থিয়েটার, সেই এ্যাপ্রন আর মাস্কপরা ডাক্তার আর নার্স। আমি এ-সবকে ফেলে রেখে পথে এসে নামলাম। কিন্তু আবার সেই হেঁড়ে গলায় চিৎকার। টুনটুনি, জবাকুসুমটা নিয়ে আয় তো!'

আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। লোকটা বোধহয় আমার পদশব্দে আন্দাজ করতে পেরেছে। টুনটুনি জবাকুসুম আনলেই আমায় ক্লোরোফর্ম করবে জগদীশ। তাই আমি বলে উঠলাম, 'জগদীশ আমি'—

জগদীশ তেড়ে বেরিয়ে এসে বললে, 'আমি—আমি কোন্ শালা?'

তারপর টর্চের আলোয় সে আমাকে চিনতে পেরে বললে, 'ও আপনি—আমি মনে করেছিলুম অন্য কেউ। যাক্ কিছু মনে করবেন না, আপনি যান।'

কিছু গিয়েছি কি না গিয়েছি—হঠাৎ ফিসফিস করে কাদের কণ্ঠস্বর শুনলাম যেন। আমি মাটির দিকে নিচু করে টর্চ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলতে লাগলাম। খানিকটা আসতেই আমি আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। আক্রান্ত অর্থে কেউ আমাকে কোন মরধোর করল না—চক্ষের নিমেষে কয়েকজন লোক আমাকে ধরে চোখ বেঁধে ফেলল। তারপর আমাকে ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

একজন বললে, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই সি-আই-ডি।'

আরেকজন বললে, 'তা না হলে ঠিক এই সময়ে আসবে কেন?'

আর সব কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কেউ বললে, 'দে শালাকে কম্বল ধোলাই।' কেউ বললে, 'আগে শালাকে জেরা কর। তারপর যদি কিছু বেরোয়—তবে একেবারে দে লাস করে।'

প্রথম যে লোকটা বলেছিল, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই সি-আই-ডি, বোধহয় সে-ই বলে উঠল, নিয়ে চ-ত বসন্তর কাছে। তারপর যা করবার তা করা যাবে।'

আমি খানিকটা যেন আশ্বস্ত হলাম। প্রথমত সেখানে শংকর আছে নিশ্চয়ই। অবশ্য শংকরের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু তা হলেও সব কথা খুলে বলার আমি সুযোগ পাবো। দ্বিতীয়ত কিছুক্ষণ আগে ওস্তাদ নিজে গেছে বসন্তর ওখানে। সে নিশ্চয়ই আমায় চিনতে পারবে—তা ছাড়া সে নিজেই দেখেছে আমি রাণীদির কতখানি প্রিয়পাত্র। সুতরাং ভয় আমার কিছু নেই। এমন কথা আমার মনে হল হয়তো লোক-গুলোই উল্টে তিরস্কৃত হবে।

আমি বেশ নির্ভয়েই ওদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। একটু পরেই একটা বাড়িতে এসে হাজির হলাম। সেখানে একটা ঘরে এনে আমার চোখ খুলে দেয়া হল। প্রশস্ত একখানা আলো-ঝলমল করা ঘর। দেখলাম মেঝেয় শুভ্র জাজিম পাতা। সেখানে বসে রয়েছে ওস্তাদ—ওস্তাদের পাশে প্রায় আমারই সমবয়সী একটা ঘরে এনে আমার চোখ খুলে দেওয়া না তাকে। কারণ মায়ার সঙ্গে তার মুখের বেশ একটা মিল ছিল। শুধু তাই নয়, ভানুও বসে রয়েছে একদিকে।

কাজেই এখানে আমার অপারেশনের দুর্ভোগ ভুগতে হবে না।

আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে যে লোকটা বলেছিল ব্যাটা নিশ্চয়ই সি-আই-ডি, সেই লোকটা বলে উঠল, 'দ্যাখো ওস্তাদ—'

ওস্তাদ বললে, 'এ কাকে ধরে এনিচিস,—'

'অন্ধকারে শালা ঝাড়ি পেতে ঘুরছিলো।'

ওস্তাদ বললে, 'ভাগ শালা—'

ভানু বলে উঠল, 'এ যে আমার দাদামণি!'

ওস্তাদ বললে, 'তুই চিনিস্ ভানু?'

'চিনি বৈকি। তুমি চেন না ওস্তাদ'?

'হ্যাঁ।'

ভানু বললে, 'এ শালারা কাকে ধরে আনতে কাকে এনেছে। দে শালারা ছেড়ে দে—'

ইতিমধ্যে সেই লোকটা কপালে যার রামধনুর মত অর্ধ-বৃত্তকার কাটা দাগ, চোখগুলো ভাঁটার মত গোল গোল আর জবাফুলের মত লাল—সেই লোকটা সেই বসন্ত এসে পড়ে বললে, 'কি হয়েছে--কি হয়েছে?'

কি হয়েছে আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা তার বর্ণনা দিতে লাগল। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যা দেখলাম তা এক অদ্ভুত ব্যাপার। মারোয়াড়ীর পাগড়ি, ফেজ আর গান্ধীটুপি—সকলেরই এক ধর্মনিরপেক্ষ সমাবেশ হয়েছে সেখানে। আর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার তোড়া, সোনা আর হীরে জহরতের পুঁটলি জমা নেওয়া হচ্ছে আগন্তুকদের কাছ থেকে।

ভানু তাদের একজনকে বললে, 'কিবে শালা কালোয়ার—ক'টা ওয়াগন আজ ভাঙলি?'

'আজ আর সুবিধে হয় নি।'

'ভাঙা কড়াও পাস নি একটা?'

'না।'

বসন্ত এসে আমাকে কি বলবে না বলবে তার আগেই ওস্তাদ বললে, 'সাধুজীকে আগে ছেড়ে দাও।'

হ্যাঁ, সেই ছাড়া পেয়েই আমি আবার এসে পড়লাম মায়াদের বাড়িতে। মায়ের তখন সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। এরপর তাঁর সঙ্গে কি কথা হয়েছিল তা আমি আগেই বলেছি। তবু সব কথা ছাপিয়ে সেদিন রাণীদির কথাই বারে বারে আমার মনে পড়েছে আর বাকি রাতটুকুও আমি ঘুমোতে পারি নি—কেবলই হাতড়ে হাতড়ে মানুষের জীবনের আসল দুঃখ অথবা সুখ কোথায়, তা খুঁজতে চেষ্টা করেছি।

[ চলবে ]

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমার দিকে চোখ তুলে আনন্দ আবৃত্তি শুরু করলে—

কোথা ব্রহ্মলোক!
কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন! যে দুর্লভ
লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে মানব আমি, ভব-মায়া-জালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষ-ধামে?
ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?

আবৃত্তি থামিয়ে সে বললে—দ্যাখো, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে সরস্বতী-বন্দনার পূর্বগামী এই কয়েক ছত্রে মধুসূদন নিজেকে খাঁচার বন্দী পাখির মতো দুর্বল ভেবেছিলেন। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে সে বই প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর ঠিক পরের বছর সেটা। বাংলা সাহিত্যে কবিতার ভাব, ভাষা, রূপ, আঙ্গিক, আদর্শ ইত্যাদি বলতে যা-কিছু বুঝিয়ে থাকে, মধুসূদন সেই সব ভূমি নিজের প্রাণ-মন দিয়ে স্পর্শও করেছেন, —আবার সে-সব পেরিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যাবার প্রবল গভীর ব্যাপক অভিযানও সার্থক করে গেছেন। শনির দৃষ্টি ছিল তাঁর সত্তার গতিতে। তিনি অমরতা চেয়েছিলেন। সেই কামনার দায়-সর্বস্ব!

এক নিশ্বাসে এই কথাগুলি বলে ফেলে একটু দম নিতে হোল আনন্দকে। তারপর আবার বললে—তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন সে-কালের বাংলাদেশেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা।

হয়ে যাচ্ছে, আনন্দ। তখন দেশ চলেছে ইংরেজের রাষ্ট্র-শক্তির প্রতাপে,—সেই ক্ষেত্র, আর মধুসূদন নামে একজন কবির যশোলিপ্সার ক্ষেত্র—দুটি আলাদা ব্যাপার। মধুসূদন ইংরেজ-রাজত্বের কবি বলেই ইংরেজিতে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর,—তাঁর যথার্থ কবি-মন ছিল বলেই শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর পরামর্শে মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশে আগ্রহী হন। তাঁর ইংরেজি বই 'ক্যাপটিভ লেডি' উপহার পেয়ে বেথুন সাহেব—যিনি তখনকার বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি ছিলেন,—সেই সাহেব গৌরদাস বসাককে যা বলেন,—গৌরদাস সে সব জানিয়েছিলেন মধুসূদনকে—

The taste and talents you have cultivated would redound much to the honour and advantage to your country, "if you will employ them in improving the standard, and adding to the stock of your own language, if poetry at all events you must write."

বললুম—শোনো এই শেষ কথাগুলি—"We do not want another Byron or another Shelley in English; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali

আনন্দ হাসতে হাসতে বললে—এই যে মিললো তা হলে—দেশের আকাঙ্ক্ষা আর কবির আকাঙ্ক্ষা—দুই-ই তখন ছিল পাশ্চাত্ত্য আদর্শে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। গুটিপোকা তখন শরতের নতুন রোদে-বাতাসে প্রজাপতি হতে চেয়েছে। টেকচাঁদের সেই লেখাটা মনে পড়ছে আমার।

আমি বললুম—আবার টেকচাঁদ প্রসঙ্গ কেন? তাঁর কথা তো বলা হয়েছে।

সে বললে—না, না, বাকি আছে দেখছি। এক কথার সঙ্গে অন্য কথা জড়িয়ে আছে—এমনি অনেক কথা এ রাজ্যে। মধুসূদনের যে সরস্বতী-বন্দনার উদাহরণ দেখা গেল,—বিহারীলাল বা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি তারই অনুবর্তন দেখতে পাও না? তেমনি প্যারীচাঁদ আর মধুসূদন এবং সে-কালের আরো অনেকে সংশ্লিষ্ট আছেন দেশব্যাপী, কালব্যাপী এক-একটি সূত্রে।

বললুম—কোন্ সূত্র?

গুটিপোকার প্রজাপতি হওয়ার সূত্র,—ভেলায় চড়ে—'কে পারে হইতে পার অপার সাগর?'

বৃহৎ দেশ-কালের মধ্যে মধুসূদনকে অন্বিত দেখাবার ঝোঁক সেদিন আনন্দকে পেয়ে বসেছিল। সে বললে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মধুসূদনের শব্দ, ছন্দ, বিষয়, বৈদগ্ধ্য ইত্যাদির বিচার করেছেন অনেকেই। ইস্কুল-কলেজে তাঁর বই পড়া হয়,—অর্থাৎ যথার্থ মনের আনন্দে আজকাল সে-সব বই বোধহয় আর কেউই পড়েন না। কিন্তু আমরা সে-আলোচনা করছি না। নির্মল সিংহ মশাই তাঁকে যে 'ফ্রীডম্ মুভমেন্টের' মানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন, সেই দিক থেকেই তাঁকে দেখছি এবং সেই কারণেই টেকচাঁদের কথা মনে এলো।

আনন্দ বললে—"গুটিপোকা প্রথমে ডিম্বস্বরূপ জন্মে, পরে ঐ ডিম্ব হইতে শুঁয়াপোকা উৎপত্তি হয়। অনন্তর ঐ শুঁয়াপোকা গুটিপোকা হইয়া চিত্র-বিচিত্র প্রজাপতিরূপে ঊর্ধ্বে গমন করে। মনুষ্য কি কেবল শুঁয়াপোকাভাবে থাকবে, না প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হবে?"

১৮৬৫ খৃস্টাব্দে ছাপা 'যৎকিঞ্চিৎ' নামে একখানি বইয়ের এক জায়গায় টেকচাঁদ এই প্রশ্নটি জানিয়েছিলেন। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' তাঁর ছদ্মনাম; আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮১৪ খৃস্টাব্দের ২২শে জুলাই কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ১৮৮৩-র ২৩শে নভেম্বর তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে।

গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের বাংলা গদ্যের সংগঠনে এবং

সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, টেকচাঁদ তাঁদেরই একজন। তাঁর গুণগ্রাহী বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন—"প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কিন্তু বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না।"

উনিশ শতকের মধ্য-পর্বের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নগরকেন্দ্রিক বাঙালী সমাজের স্বরূপ ফুটেছিল তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' বইখানির মধ্যে। সেই সময়ের কৃতী সামাজিক, শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক ছিলেন টেকচাঁদ। একাধারে জ্ঞানী এবং কর্মী ছিলেন তিনি। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির 'সাব-লাইব্রেরিয়ান' পদে তিনি প্রথম চাকুরিতে প্রবেশ করেন। ১৮৪৮-এ তাঁর পদোন্নতি ঘটে। ১৮৬৬ পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষের পদেই বহাল ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৩৯-এ কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে যুগ্মভাবে আমদানি-রপ্তানির কাজে যোগ দিতে হয় তাঁকে। দশ বছর পরে তাঁকে একাই সে কোম্পানির মালিক হতে হয়। তা থেকে তাঁর নাকি প্রচুর অর্থাগম হয়েছিল। কলকাতার তদানীন্তন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন তিনি—তারপর হলেন 'অনারারি জাস্টিস'। তা ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো', বাংলার অন্য পরিষদের সদস্য ইত্যাদি অন্যান্য সম্মানিত পদেও তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬০ সালে পত্নী বিয়োগের পরে তিনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনুশীলনের উৎসাহ পান। সেকালে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় এ-বিষয়ে যে সব প্রসিদ্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হোত, প্যারীচাঁদ সেই সব পত্রিকায় কিছু কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি

মহাশয় ওলকট কলকাতায় এসেছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে তাঁর এক সংবর্ধনা-সভা হয়। প্যারীচাঁদের ওপর সেই সভায় অভিনন্দনের ভার দেওয়া হয়। সেদিনকার সভায় মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার গূঢ় তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়। মাদাম ব্লাভাটস্কি, কর্নেল ওলকট প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্যারীচাঁদের গুণের সমাদর ছিলেন। তাঁরই সভাপতিত্বে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় 'বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটির' পত্তন হয়।

এসব তাঁর পরিণত জীবনের ঘটনা। আগের পর্বে, ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় প্যারীচাঁদ যখন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বছর। তাঁর বছর-পাঁচেক পরে, ১৮৪৩-এর এপ্রিল মাসে, ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের জন-জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গল বৃটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটীর' পত্তন হয়। প্যারীচাঁদ সেখানকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫১-তে বীটন সোসাইটি নামে যে সাহিত্য-সমিতি স্থাপিত হয়, সেই সমিতির সম্পাদক পদে তিনিই অধিষ্ঠিত হন। এ ছাড়া, পশু-ক্লেশ-নিবারণী সভা, বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান-সভা প্রভৃতি জনকল্যাণকর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। ১৮৪৭ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ভারতবর্ষীয় কৃষিসভারও উৎসাহী সদস্য ছিলেন প্যারীচাঁদ। এসব তাঁর সামাজিকতা ও বিদ্যোৎসাহিতারই নিদর্শন।

আনন্দ বললে—তাঁর জীবনে হিন্দু কলেজের পরিমণ্ডলে বাল্যশিক্ষার যে বিশেষ সুযোগ ঘটেছিল, তারই ফলে নানা বিষয়ে জ্ঞান চর্চার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তাঁর জীবনে। মনুষ্যের স্থূল সূক্ষ্ম,—ব্যবহারিক ও অতীন্দ্রিয়,—যাবতীয় লক্ষ্য এবং সম্পর্কের কথা তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। হুগলি জেলার পানিসেওলা গ্রামের গঙ্গাধর মিত্র ছিলেন প্যারীচাঁদের পিতামহ। আঠারো শতকের শেষাদিকে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাধর প্রথম যখন কলকাতায় বাস করতে আসেন, আমাদের পুরানো আমলের বাঙালী সমাজ তখন ব্যাপক এক পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে আরম্ভ করেছে। গঙ্গাধরের বড়ো ছেলে রামনারায়ণের আমলে ইংরেজ শাসনের সামাজিক প্রভাব আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই রামনারায়ণের পাঁচটি ছেলের মধ্যে প্যারীচাঁদ এবং তাঁর ছোট ভাই কিশোরীচাঁদ ছিলেন যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম। তাঁদের যখন যৌবনকাল, শিক্ষিত বাঙালির বোধ-বিশ্বাসের জগতে তখন তর্ক-বিতর্কের বিপুল এক ঝড় উঠেছিল। ১৮২৫—৩০ থেকে শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সেই উত্তেজনার [illegible] ধরলে কিছু অন্যায় হয় না। তাতে ভাঙনের বেগও ছিল, গঠনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিপর্যয় কম ঘটে নি, উদ্দীপনাও কম ছিল না। বহুকালের পাথর ভেঙে ভেঙে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা যেমন মাটিতে নেমে আসে, তখন তার এক রকম মূর্তি, সমতলে নেমে এলে হয় অন্যরকম। ১৮৫৪-তে প্যারীচাঁদ যখন 'মাসিক পত্রিকা' বের করেন,—১৮৫৮-তে যখন তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাপা হয়,—আজ দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, তখন আমাদের মনে মনে ভাঙনের নেশা কেটে গিয়ে শুভবুদ্ধির সংযম দেখা দিতে শুরু করেছে। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর কাছে পাঠ নিয়ে বাংলার যে যুবশক্তি উদ্দাম প্রগতিবাদী হয়ে উঠেছিল, তার কল্যাণের দিকটি ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। হয়তো প্যারীচাঁদ তাঁরই ছাত্র ছিলেন। প্রগতিবাদী উগ্র আধুনিকদের 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং 'বেঙ্গল স্পেকটেটার' পত্রিকা দুখানির পরিচালনায় তিনি এক সময়ে খুবই সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সেকালের প্রগতি-নিষ্ঠা নানাভাবে প্রত্যাসাৎ করেও জীবনের বিচিত্র কর্মসাধনা ও ভাবসাধনার পরিশেষে তিনি এক স্বাস্থ্যকর সমন্বয়ে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তাঁর কথা ভাবতে বসলে সেকালের মধুসূদনের এবং ভূদেবের কথা মনে পড়ে। বঙ্কিম বা মধুসূদনের মতো সুতীব্র উজ্জ্বলতা নেই তাঁর নামে,—বিদ্যাসাগরের মতো সুপ্রশস্ত দৃঢ়তাও হয় তো ছিল না,—দীনবন্ধুর মতন জনপ্রিয়তাই কি তিনি পেয়েছিলেন? 'আলালের ঘরের দুলাল' ঐ একখানি বইয়ের খ্যাতি-ভারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তাঁর পূর্ণতর কীর্তির স্মৃতি। তাঁর 'রামারঞ্জিকা', 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা' এবং 'বামাতোষিণী'র মধ্যে বাংলার নারী-জাগরণের আনুকূল্য-ব্রতী যে শিক্ষিত মনটির বিচিত্র উৎসাহ নিহিত আছে, সে বিশেষত্বের কথা জোরদার নয়।

আবার একটু থেমে, আনন্দ বললে—তাঁর রচনার মধ্যে সেকালের, একালের এবং চিরকালের মানুষের কথাই শোনা যাচ্ছে; 'মনুষ্য কি কেবল শুঁয়াপোকা ভাবে থাকিবে, না প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইবে?'

মধুসূদনের কবিতায় ভেলায় চড়ে সমুদ্র পার হবার চিন্তা,—তাঁর 'শনিগ্রহ' সম্পর্কিত চিন্তা,—তাঁর 'আত্মবিলাপ',—তাঁর খাঁচার অবশ পাখির ভাবনা—এ সবই সেই যুগের চিন্তা। [ক্রমশ]

# আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশা দেবী

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হলো—একথা অনস্বীকার্য। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাংলা এবং ইংরাজী সাহিত্যের ওপর অক্লান্ত গবেষণা করে গেছেন। সাহিত্যকে সরস করবার সহজাত ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। পাণ্ডিত্যকে রসের ধারায় সিক্ত করে পরিবেশন করায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ কখনও পড়তে ক্লান্তি বোধ হয় নি। তাঁর সুষমামণ্ডিত ভাষা বিদ্বদ্-সমাজে সব সময়েই আদৃত হয়েছে।

"বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা"কে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যায়। দীর্ঘদিন অনলস পরিশ্রমে তিনি এ সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থখানি রচনা করেন। তাতে যে চিন্তার দীপ্তি, মেধার উদ্ভাস এবং রসজ্ঞতা সন্নিবেশিত হয়েছে, তা অসামান্য প্রতিভাধরের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব। তিনি এই সুবিস্তীর্ণ আলোচনায়ও তৃপ্ত ছিলেন না। বইটি যতবার সংস্করণ হয়েছে ততবারই তিনি সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছেন। নিজের কাজে তিনি কখনই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সব সময়েই তিনি অতৃপ্ত। যে কোনও দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং গবেষকের বৈশিষ্ট্য এইঃ তাঁরা নিজের সৃষ্টিতে কখনও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এই অতৃপ্তিই মহত্ত্বের লক্ষণ। লেখক যদি নিজের লেখায় তৃপ্ত হয়ে যান তা হলে তিনি সেখানেই থেমে দাঁড়ালেন, তাঁর অগ্রগতিতে ছেদ পড়ল। তিনি সর্বকালের অনুসন্ধিৎসু গবেষক, চির-অতৃপ্ত মন নিয়ে সারা জীবন খুঁজে বেড়িয়েছে. নিজের জীবনের পরশমণিকে। এই বিশ্রামহীন খোঁজা তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সমানভাবে চলেছে।

[illegible] সহযাত্রী। আধুনিক যুগকে যেভাবে প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাতেই বোঝা যায় তিনি নতুন কালকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নতুন কাল প্রবীণেরা গ্রহণ করতে পারেন না. তাতে নবীন এবং প্রবীণের মধ্যে স্বতই ভাব-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়; কিন্তু তিনি উদারতা ও মুক্তবুদ্ধিতে একাধারে নবীন এবং প্রবীণের সমন্বয় সাধন করে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগকে তিনি নতুন করে ঢেলে সেজেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে এই বিভাগের। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে শাসন এবং সস্নেহ প্রশ্রয় দুটিই পেয়ে চমৎকৃত হয়েছে। আমার মনে আছে—তিনি প্রথম বাংলা বিভাগের ভার নিয়েই যাতে এ বিভাগে নতুন প্রাণবন্যার সঞ্চার হয় সেই কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। দীর্ঘকাল ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেও তিনি তাঁর মাতৃভাষাকে কখনও অবহেলা করেন নি। বাংলা ভাষার যাতে মর্যাদা বাড়ে তার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন তিনি। উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরাই ডিগ্রী পাক এবং অনুপযুক্তকে প্রশ্রয় দিলে মাতৃভাষারই পরোক্ষে অবমাননা করা হবে, একথা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাজে এবং সঙ্কল্পে একটুও শিথিলতা দেখা যায় নি কখনও।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই দেখেছি, তাঁর সেই নিচের ঘরটিতে বড় টেবিলটার সামনে নিরলস জ্ঞানযোগী তপস্যায় রত। সেই ঘরটি চিরদিনের মত খালি হয়ে গেল।

ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে যে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়ন এবং তুলনামূলক সমালোচনা করবার ক্ষেত্রে উভয় সাহিত্যিক মূল্যায়ন এবং তুলনামূলক করে চলেছে।

তাঁর বিয়োগে বাংলা এবং ইংরাজী সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষক এবং অসামান্য বক্তাকে আমরা হারালাম এবং এ ক্ষতি যে অপূরণীয় সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। তাঁর প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, গুণগ্রাহী এবং সুহৃদের মতই আমিও তাঁর শূন্যতাকে শোকার্তচিত্তে স্মরণ করছি।

## তিন অধ্যায়

॥ এক ॥

শ্রীযুত উইলিয়ম হিকি সাহেবের স্মৃতিকথায় কলকাতার একটি অহিংস রূপের চিত্র আঁকা আছে, কথাচিত্র। সময়টা অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ। বর্ণনীয় বিষয়, কলকাতার বুকে ১৭৮৯ সালের মন্বন্তর। অভুক্ত মানুষের কঙ্কালে কলকাতা তখন বিধ্বস্ত। বাঙলা-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্ষুধার্ত মানুষ আসছে কলকাতায়। দলে দলে, শয়ে শয়ে। মানুষের কঙ্কালে মাঠ-ঘাট ভর-ভর্তি। আর খুলে পথে পা ফেলতে শহুরে মানুষ ঠোক্কর খাচ্ছেন শবদেহে অথবা মৃত্যুপথযাত্রীর শরীরে। কাতর অন্ত্র থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে লবণাবিদ্ধ স্বর ছড়িয়ে পড়ছে বিষাক্ত বাতাসে। ইংরেজ কর্তারা ত্রাণকার্য শুরু করেছিলেন প্রথম চোট। কিন্তু মাস-সপ্তকের মধ্যেই বিদেশী বণিকেরও চক্ষুস্থির। মরবার মতো না কি এতো মানুষও আছে বঙ্গ-বিহারে! প্রাণের টাকা সদানে শুষতে শেষে কোম্পানী লাটে উঠবে। বন্ধ কর, বন্ধ কর! বাপে আর ধরিয়ে কাজ নেই। মানুষজন নিজ দায়িত্বে বৈতরণী পার হয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণার বাইরের জগতে পাড়ি দিক। আর চাই নোটিশ করে সাহায্য বন্ধ করে দিলেন ইংরেজরা। মরো বাপু, কত মরতে পারো। তা মরেও ছিল দৈনিক প্রায় বার শতজন হারে। . কিন্তু এতো লোক এমন নিঃশব্দে ভালোমানুষের মতো মরে গেল যে, হিকি সাহেব আশ্চর্য, নিঃশব্দে। কোনো অভিযোগ, বিক্ষোভ নেই।— দোকানপাট লুঠতরাজ নেই। এমন কি রাস্তাতে হানা কিংবা চেঁচিয়ে ভিক্ষে পর্যন্ত নেই। "এ বোধহয় ভারতের মতো দেশেই সম্ভব। এদেশের শান্তশিষ্ট অহিংস মানুষ অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে মরতে পারে।" (প্রখ্যাত গবেষক শ্রীবিনয় ঘোষের 'সুতানটি সমাচার' গ্রন্থে বাঙলাকৃত ও অনূদিত অংশ থেকে।)।

॥ দুই ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় চালু হয়েছে কর্ডন। ছেলে-বুড়ো, বৌ-ঝিরা দোকানে দোকানে লাইন লাগাচ্ছে চাল-চিনি-কয়লা-ময়দার জন্য। সদ্য বেকারীমুক্ত সিভিক গার্ডরা কোনো কোনো লাইনে কর্তাতি করে যাচ্ছেন এবং পার ক্যাপিটা কোঠার বাইরে যথা-প্রয়োজন মালও নিয়ে যাচ্ছেন স্বগৃহ এবং আত্মীয়-পরিজনের জন্য।· সেই তখনকার একটি কথাচিত্র বন্দী হয়ে আছে তরুণ কথাকার বীরেন্দ্র মিত্রের 'কাচের জানালা' উপন্যাসে (রচনা কাল ১৩৬৯ সাল)। তথাকার একটি চিত্র হুবহু তুলে ধরছি :

মেজর হ্যালডেন যুদ্ধকালীন কোনও এক মিলিটারী অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের চরিত্র (কল্পিত কিংবা বাস্তব, লেখক সে কথা বলেন নি)। এই হ্যালডেন সাহেবও পরমাশ্চর্যে লক্ষ করেছিলেন কলকাতার মানুষের নজরহীন দুর্লভ সহ্যশক্তি। ঘটনাটি এই রকম :

"একদিন হ্যালডেন তাঁর আসা-যাওয়ার পথে এই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি (কর্ডন সারবন্দী লোক সকাল-বিকাল দাঁড়িয়ে বসে ঝিমিয়ে কাটাচ্ছে)......

"—হোয়াট এ সীন!

"ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন গোলকদা। সারবন্দী মানুষগুলো রীতিমত পকেটের কড়ি দিয়েই চিনি-চাল সংগ্রহ করতে এসেছেন।

"—তবে এই দুর্ভোগ কেন?... যাবার পথে দেখলাম লোকগুলো পুবে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে, এখন দেখো, ওরা সব পশ্চিমমুখো। এই গ্রীষ্মে এমন করে সূর্যরেণু মাখবার কারণ? এরা নিতান্ত বোকা মনে হয়।

"—বোকা নয় সাহেব, অসহায়। দাঁড়ানোর ব্যাপারেও ওদের স্বেচ্ছাচার এখানে অসহ্য। মহামান্য দোকানীর ব্যবস্থানুসারেই এই প্রথা।

"—কিছু মনে করো না, তোমাদের দেশে আজ অবধি একটাও জ্যান্ত মানুষ দেখলাম না।

"গোলকদা বিনম্রভাবেই উত্তর দিয়ে-ছিলেন,—তা যা বলেছ সাহেব। জ্যান্ত মানুষ থাকলে তুমি কি আর অতিরিক্ত জেলা শাসকের জীপে বসে থাকতে। ও জায়গা আমার দেশের মানুষেই অলঙ্কৃত করত।

"—তোমাদের খুব ভাগ্য যে, তেমন দুর্দিন এখনো আসে নি। এলে বুঝতে এই লোকগুলো, যারা দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনো, তারা সবাই বুকে হেঁটে রাস্তা পার হত। দোকানীটা তো তোমারই দেশের লোক? সে তার ক্ষমতার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করছে কি, বল? আর লোকগুলো? কেন, ওরা দোকানটা লুঠ করে নিতে পারত না?"

সাহেব জাতটা যে কতবড় লুঠেল, ওপরে তার কেতাবী বিবরণ ধরে রাখলাম।

॥ তিন ॥

কিন্তু মা হিংসী : 'কলকাতা এমন করে কখনো লুঠতরাজ করেছে বলে স্মরণ হয় না। লুঠ অবশ্য আগেও হয়েছে এবং আজও যে হয় না তা নয়। কিন্তু কেউ কখনো শুনেছে যে, অসাধু ব্যবসায়ীর অসাধুত্ব অথবা অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতা কখনো লুঠ করেছে? কদাচ নয়। এসব ব্যাপারে কলকাতা অহিংস এবং ভেরি ইনোসেন্ট। ক্ষুধার্ত কলকাতা কখনো লুঠেরা হয় নি। অসাধু উপায়ে ফালতু মুনাফা লুঠেলদের কলকাতা কখনো শাস্তি দিয়েছে কি? উঁহু, শোনা যায় নি।

লুঠ যদি হয়ে থাকে, তবে লুঠ হয়েছে নিরীহ ব্যবসায়ীর দোকান। অতর্কিতে গরীব ব্যাপারী পথের ভিখিরী বনে গেছেন। কোনো প্রতিকার আন্দোলনের ফলে নয়। সব [illegible]

ঘাতিল। [illegible] [illegible] [illegible] মানুষের মনে বরং বিদ্রূপ উপেক্ষার স্ফুরণ দেখা গেছে।

কলকাতাই লুঠের সাম্প্রতিক নজির মনে পড়ছে একটা। চৌরঙ্গী-লোয়ার স্মরণীর মুখে মসজিদের রেইলিং-এর গায়ে কয়েকটি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সব ভায়লেন্সের ফলশ্রুতি। গত '৪৬ সালের 'রায়টে' শুধু নিরীহ দোকানীর দোকান লুঠেই কতলোক বড়লোক হয়ে গেছে। সেটা যথেচ্ছ লুঠোলুঠি লাঠালাঠির যুগ ছিল।

কিন্তু প্রতি বছর বাজেট প্রস্তাবের খবর যখন প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, যখন প্রস্তাবিত করভারগ্রস্ত বস্তু রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে চালান হয়ে যায় ছোট-বড় কালো গুদামে; কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির পর চড়া দামে সেই বস্তুই যখন ঘর্মাক্ত ক্রেতা সংগ্রহ করেন দোকানীকে ফালতু-মুনাফায় তুষ্ট করে, ফালতু-মুনাফা গ্রহণের প্রতিবাদের তখন কিন্তু প্রতিবাদে মিছিলে-সভায় সোচ্চার কলকাতা একটিবার কাঁৎরে কেঁদেও ওঠে না। লুঠতরাজ নয়, নয় ভায়লেন্স নয়, কিন্তু কলকাতায় মর‍্যালও এ সব ব্যাপারে চোট খায় না! সর্বংসহ কলকাতা বরং অম্লান করে ফালতু দাম ফেলে দিয়ে দোকানীকে উৎসাহিতই করে চড়া দামে মাল বেচার জন্য। আজব কলকাতার শিষ্টরূপ এ সব ক্ষেত্রে আহা মরি অহিংস ও নিরুত্তেজ। আজ বলে নয়, সহ্য করার অসীম ক্ষমতা সেই হিকি সাহেবের আমলের কিংবা আরও আগের আমলের।

গত পয়লা ফেব্রুয়ারী প্রভাতী সংবাদপত্র খুলেই বাজেটে আরব্ধ হয়েছিল শহর কলকাতার অভ্যস্ত সহনশীল চোখ। দাম বাড়ছে। ট্যাক্স বসছে। অবশ্য বসে নি। প্রস্তাব হয়েছে। বসল বলে।

তাড়াতাড়ি পা-জামার দড়ি আঁটতে আঁটতে ছুটলাম দোকানে। যদি দোকানীর চোখ তখনও সংবাদের হেড লাইনে বিধৌত হয়ে না থাকে, অন্তত একটি দিনের জন্য চা, চিনি, সিগারেটটা সংগ্রহ করে আনতে পারি। ক'দিন আগে কেরোসিন চড়েছে। এবার আর একদফা চড় চড় করে চড়বে। অন্তত লিটার দশেক মজুত করলে অর্ধ মাসের স্টোভ-জ্বালানী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত।

কাছা নেই পা-জামার। তাই 'মুক্তকচ্ছ' বলে গতির বেগটুকু বোঝাতে পারব না। দুদ্দাড়িয়ে ছুটেছিলাম। এক হাতে কেরোসিনের টিন, অন্য হাতে থলিয়া। পকেটে মাসশেষের শেষ ক'টি মুদ্রা।

তখনও আকাশবাণীতে সংবাদ শুরু হয় নি। চলছে বহুশ্রুত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] গেলো তাহাই গান। এখনও [illegible] [illegible], সাড়া জাগায়। উত্তেজিত কণ্ঠে নব [illegible] দুরন্ত সৈনিককে [illegible] ছোটাচ্ছেও কিন্তু সে গানের তালে তালে মন ছোটে না। নিতান্ত আধুনিক হতে হলে জীবনানন্দের রূপসী বাংলাকে সুরে ফেলে গেয়ে দেখলে কেমন হয়। আরো ঢের উৎকৃষ্ট মাতৃরূপ বন্দনার কাব্য-গাথা আজকের প্রখ্যাত কবিদের কলম থেকেও তো বার হয়েছে। সুরে ফেলে গাইলে ক্ষতি কি। কিন্তু ওরে ভাই শ্রমিক কৃষাণ, বলে ভোর সকালের উদাত্ত ডাক কানের ভিতর দিয়ে মরমে পরশ হানছে না)। তবু সেসব শুনতে শুনতেই দোকানী ভাই-এর দরজায় গিয়ে হাঁপাতে লাগলাম।

খুব আপ্যায়িত ভঙ্গিতে আমার বহু-পরিচিত প্রতিবেশী দোকানী রোজকার বরাদ্দ পাউরুটিটি এগিয়ে ধরলেন। আড়-চোখে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর সিগারেটের র‍্যাকটি হরতালের ট্রাম লাইনের মতো খাঁ-খাঁ করছে। গলার স্বর খাটো করে জানতে চাইলাম, চিনি? কেরোসিন? চা?

দোকানী অম্লান বদন। বললে, মাল নেই। দাম বাড়বে, সব মাল চেপে দিয়েছে।

কে?

উত্তর প্রসঙ্গান্তরে গেলো। জবাব পেলাম, কাল-পরশু পাবেন, দাম ঠিক হলে।

কিন্তু কি করে হবে? ট্যাক্স বসলে দাম বাড়বে ট্যাক্স বৃদ্ধির পরবর্তীকালীন স্টকের ওপর। আগের মালের দামটা ঠিক করবে কে? কিভাবে ঠিক করা হবে? উত্তরে শুধু মুচকি হাসি।

বলল,—প্রত্যেক বছর যারা করে। অন্যান্য বছর ঢের আগেই মাল উবে যায় দাদা। বাজেট ফাঁস হয়। এবছর তাও তো তবু বাজেটের খবর বার হতে......

—খবর পেয়ে গেছেন? কী সর্বনাশ! এখনো তো হকাররা হাজরা মোড় থেকে কাগজ টেনে আনছে।

দোকানী পুনর্বার মুচকি হাসল: আপনারা বাজেট পড়বেন, বিতর্ক-টিতর্ক করবেন। আমরা মশাই বাজেট কবে উঠবে তার জন্য ক্যালেণ্ডারে টিক মেরে রাখি। যার যা ব্যবসা দাদা।

—তা বেশ বেশ। কিন্তু সেগুলো-গুলো?......

—মিথ্যে বলব না দাদা, কাল রাত্রেই শেষ হয়ে গেছে। দেখি, নতুন মাল পেলে আনব।

বুঝলাম, আমার বিশ্বস্ত দোকানী-ভায়া ফালতু-মুনাফা রোজগার ভাবতে-না-ভাবতেই [illegible] মতো [illegible] খদ্দেরের কাছ থেকে উশুল নিতে সংকোচ বোধ করছেন। ব্যবসায়ীদেরও [illegible]

আমি একটি জিনিসই তৃপ্তি করে খাই বা পান করি। সিগারেট। হোটেল দা পাপার সদস্য থাকাকালীন দামী সিগারেটের ভোক্তা ছিলাম। বর্তমানে ড্যাডির স্যাড ডিমাইজের পর থেকে ড্যামন্ড মিডল ক্লাশ স্মোকার। কিন্তু বড় বড় প চালিয়েও আঞ্চলিক কোনো দোকানদারকে বেকুব বানিয়ে ন্যায্য দামে এক প্যাকেট সিগারেট সংগ্রহ করতে পারলাম না। অগত্যা ছুটলাম দক্ষিণ কলকাতার এব এজেণ্টের দোকানে। এ দোকানই ধূমপায়ীদের একমাত্র ভরসা। পাইকারি বিক্রিতে টান রেখে মহানুভব দোকানদার এসব সময় প্রকৃত ধূমপায়ীদের ন্যায্য দামে দু'-চার প্যাকেট বিতরণ করেন। যতদিন দামের লিস্টি প্রকাশিত না হয়, ততদিন পুরনো দামের মাল ওখানেই প্রাপ্তব্য। দেখি, বেশ ভিড় জমে গেছে। নিঃশব্দে খরিদ্দাররা আপনাপন কোটা নিয়ে পাতলা হয়ে যাচ্ছেন। আর তারই মধ্যে ফালতু-মুনাফা সন্ধানীরা লোক লাগিয়ে পার ক্যাপিটা কোটা বার বার তুলে নিয়ে গিয়ে গুদামজাত করছে। ঐ মাল তে-ডবল লাফায় ছেড়ে মাসখানেক দু' পয়সা কামিয়ে নেবে তারা। দু'-একজনকে তাই ধরে ফেলে হাঁকিয়ে দেওয়াও হচ্ছে। একই দোকানের জন্য নিযুক্ত সংগ্রাহক ধরা পড়ে যতখানি দাঁত বার করে হাসছে, তার চেয়ে ঢের বেশি হাসাহাসি করছেন জমায়েত খরিদ্দারবৃন্দ। এইসব ছোটো ছোটো চুরি-চুরি খেলা-গুলো বেশ রসিয়ে উপভোগ করায় স্পোর্টসম্যান স্পিরিট আছে শহর কলকাতার।

আমি নিজের কোটা পকেটে নিয়ে ফুটের কাণায় এসে দাঁড়ালাম। তরুণ এবং যুবক ধূমপায়ী-কলকাতা বাৎসরিক বাজেট ও আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ী ধূম্র-জালে কেমন ধুঁয়োটে আর সিঁটিকাঁচ্ছারি চেহারা নিয়ে ন্যায্য দামের আশায় এক ঠাঁই জড় হয়েছে, তারই দিকে তাকিয়ে দেখে একটা স্বস্তির নিশ্বাসও ত্যাগ করলাম। কী নির্বিরোধী মানুষজন। বিভিন্ন পাড়া থেকে ছুটে এসেছেন ন্যায্য মূল্যের মাল সংগ্রহ করতে। কোথাও বিক্ষোভ নেই। আছে সপ্রীত টুকিটাকি মন্তব্য। এর চেয়ে ভদ্র, এর চেয়ে নিরীহ আর কেমন করে হওয়া সম্ভব?

কে বললে, কলকাতা পাল্টেছে। হিকি সাহেবের কলকাতা, অজয় হ্যালডেনের কলকাতা আর মিত্রেনর কলকাতা একই রকম নরম-সরম।

মা হিংসী!

বস্তুত, এমন শহর কোথাও খুঁজে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] এই [illegible]

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

ডিসপেনসারির দরোজায় তালা লাগালে ডাক্তার।

তারপর ওরা সদলবলে নামল উঁচু দাওয়া থেকে।

সানো চৌধুরী কৌতূহল দমন করতে পারলে না—জিজ্ঞেস করলে, "আপনাদের আগের দলটি কোথায় গেল? আমাদের সঙ্গী হওয়ার মত আর কেউ আছেন নাকি?"

"জানি না।"

সানো চৌধুরী আবার বললে, "এক-বার ঘর থেকে ঘুরে আসা যেতে পারে কি?"

থাড়া জবাব এল, "হুকুম নেই।"

ডাক্তারবাবু হেসে উঠল। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। বললে, "ছেলেরা তো সে ঘর আগেই ভেঙে দিয়ে গেছে সানো কর্তা। আর মায়া কিসের!"

সানো চৌধুরী ডাক্তারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "কিন্তু মেয়ে!"

ডাক্তার ভারী গলায় বললে, "সে-ও একালের। তার দাগ তার গায়ে পড়বে না?"

দল এগিয়ে চলল থানার দিকে।

সানো চৌধুরীর মনটা শুধু খুঁতখুঁত করতে লাগল। আগের দলটা গেল কোথায়? বাতাসে কান খাড়া করে রইল। না, সাড়া-শব্দ কোথাও কিছু নেই। জেলা বোর্ডের সড়ক দিয়ে তারা চলেছে। উঁচু সড়কের কোল থেকে ডাইনে দূর দূরবিস্তীর্ণ আবাদী এলাকা—বাঁয়ে গ্রামের জলা। সাড়া-শব্দ কোনোদিকেই নেই। ঘন অন্ধকারে সব একাকার হয়ে গেছে। তুমি শুধু শুনতে পারো বুটের গট্‌মট্ শব্দ আর নিজের বুকের নিশ্বাস।

রাহা বললে, "এই হাতকাটা, আর কতদূর।"

অন্ধকারে জবাব এলো, "এই তো এসে-গেলাম হুজুর। তা আগে কোন্‌টায় যাবেন?"

"এক সঙ্গে দুটো।"

"আগে সানো চৌধুরীর ঘর। আরও খানিক যেয়ে ডাক্তার।"

"চল্।"—

সানো চৌধুরীর ঘরের সামনে একদল থেকে গেল। তাদের দলপতিকে মৃদু গলায়, ঠাণ্ডা মাথায় প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ দিয়ে আর এক দল নিয়ে ভলু মাঝির পেছনে পেছনে এগিয়ে চলল রাহার দল।

গ্রাম নিঃসাড়। একটিও আলোর চিহ্ন নেই কোথাও।

তারপর হঠাৎ মাঝরাতে যেন ডাকাত পড়ল। দমাদম দরোজায় লাথি। ভারী পাল্লা। কেঁপে কেঁপে উঠল ভারী বুটের দাপটে।

ভলু বললে, "পেছনে—খিড়কীর দিকে। ঢোকা সহজ হবে।"

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ নিঃসাড় ঘুমন্ত রাতকে যেন কাঁপিয়ে দিলে।

"কে—কে! মা!"—

"খোল্ দরওয়াজা হারামজাদী!"

দরোজার খিল ভেঙে দু'টুকরো হ[ligible] গেল। সশব্দে খুলে গেল পাল্লা।

ওদিকে খিড়কীর পথে পিল্‌পিল করে এসে ঢুকেছে পুলিশ। তারপর শু[illegible] হলো এক তাণ্ডবলীলা। ঘর থেকে সম[illegible] জিনিসপত্র ছিট্‌কে এসে পড়তে লাগ[illegible] উঠোনে। বিছানা তৈজস—কাপড়-চোপ[illegible] কিছুই বাদ গেল না। ভেঙে ফেল[illegible] লোহার সিন্দুক। হাতিয়ে নিলে যে [illegible] পেলে।

কাকে বাধা দেবে মাধুরী! —সে শু[illegible] ছুটোছুটি করছে। মা শক্ত হয়ে বসে আ[illegible] রান্নাঘরের দাওয়ায়।

উঠোনে কাঁড়ি জিনিসপত্র।

হুকুম গর্জে উঠলো, "লাগা আগ্[illegible]

ছুটে এলো মাধুরী।

"কখ্‌খনো না—আমি কখ্‌খনো হ[illegible] দেবো না।"

"আরে ছুঁড়ি বড্ড ঝামেলা করছে।" কজনকে চোখ ঠেরে দিলে রাহা।

দুজন সেপাই চেপে ধরলে মাধুরীকে ওইখানেই পেড়ে ফেলবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে।

"শয়তান! জানোয়ার!"

হ্যাঁ, জানোয়ার।

শুধু রাহা দয়া করে বললে, "যা [illegible] বে—বুড়িয়ার সামনেসে হাটা লে [illegible] বাহার।"—

মাধুরীকে টানতে টানতে নিয়ে চ[illegible] দল খিড়কীর দরজা দিয়ে।

"মা—"

উঠোনের [illegible] [illegible] [illegible] আগুনের শিখা লকলক্ করে উঠছে।

মা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। চোখ বুঝি তার বন্ধ। কান বুঝি বধির। হাত-পা শিথিল।

শুধু একটা মরদের চোখ জ্বলে উঠল জাগুয়ারের মত। শিরার টগবগানো রক্ত ধাক্কা মারলো হৃদয়ে। সজাগ হয়ে উঠলো সমস্ত স্নায়ু। গোয়ালের ভেতর থেকে দেখতে পেলে—মাধুরীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দুটো সেপাই খিড়কীর একটা ঝোপের দিকে। তার আশ্রয়দাত্রী। না, আর তার লুকিয়ে থাকা হলো না। অনেকদিন সে পুলিশের চোখের আড়ালে থাকতে পেরেছে। আজও নিঃশব্দে সরে যেতে পেরেছে। এখনও সে সরে যেতে পারে এ গোলমেলে বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে। যেমন অন্ধকারে আড়াল হয়ে গেছে পাড়াসুদ্ধ।

গোয়াল থেকে ছুটে সে বেরিয়ে এল —হাতে গোয়ালের আগড় বাঁধা বাঁশ।

লোক দুটো ঠেলে নিয়ে চলেছে মাধুরীকে। একজন চেপে ধরে আছে মুখ। ওরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত।

একটার মাথার সিধে পেছন থেকে বাঁশ উঠল। নামল।

"বাপ্।"

লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

আর একটা লোক হতচকিত। মুহূর্তে সে রুখে দাঁড়াল। সবল দু' হাতে চেপে ধরল দুশমনের হাতিয়ার।

হাতিয়ার ওই একটা। বহুদিন গোয়ালের ধোঁয়ায় পাকা বাঁশ। তার দুই প্রান্ত ধরে দুটো জোয়ান তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটাকে নিজের অধিকারে আনার চেষ্টা করতে লাগল। যেন দুটো 'বুনো বরা'—মাটি খুঁড়ে ফেলছে পায়ে। দুটো ভরাট বুকে হাপরের শব্দ। দু'জনেই জানে—এ হাতিয়ার হাতছাড়া হলে শেষ।

হতচকিত মাধুরী। এই সুযোগে যেন ছুটে পালাতেও ভুলে গেছে।

"তুমি পালাও মাধুরী দিদি—পালাও!" একজন চীৎকার করে উঠল।

মাধুরীর বুঝি এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এল। পালাবার জন্যে পা বাড়াল।

আর একজন—অন্ধকারে নিঃশব্দে খিড়কীর দরজার কাছে ব্যস্ত ছিল তার কাজে, হয়ত গয়না-বাসন ভরা একটা থলে। হঠাৎ সে গলার শব্দে চমকে ফিরে তাকাল এদিকে। চিনতে পারল। মুকুন্দ।

...অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তি যেন লড়াই করছে। হাতের থলেটা একপাশে সরিয়ে রেখে ঘরের ভেতরে সেপাইদের খবর দিতে ছুটল।

"দুশমন!"...

ভূতের মতো পিলপিল করে ছুটে এল কজনা। হাতেকাছে খবর দিয়েছে।

শুধু একটা দেহ লক্ষ্য করে পড়তে লাগল লাঠির পর লাঠি।

"মরো শালা শুয়োরকা বাচ্চা।"

শুয়োরকা বাচ্চা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

"লেড়কীঠো ভাগ গিয়া!"

"ভাগবে কোথায় সাহেব।" ভলু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ওই দিকে গেছে।"

দিক লক্ষ্য করে ছুটলো ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল।

উচিত শিক্ষার যখন কিছুই আর বাকি থাকল না, তখনি ওরা থামল। যেমন এসেছিল অন্ধকারে ভূতের মত—তেমনি দল বেঁধে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

একটা লোক শুধু যেতে যেতেও থমকে দাঁড়াল হঠাৎ—ফিরে গেল আবার খিড়কীর দিকে, যেখানে মুকুন্দ পড়ে আছে চিৎপাত হয়ে। তার নাকের কাছে কান পেতে শুনতে লাগল নিশ্বাসের শব্দ। বুকের কাছে হাত দিয়ে দেখলে—সেখানে একটা শব্দ যেন এখনও ধুক্‌পুক্ করছে। মুহূর্তে চোখ জ্বলে উঠল তার। শুধু একটা মাত্র হাত তার। সেই হাতের লম্বা লম্বা কঠিন আঙুলগুলো দিয়ে চেপে ধরলে অচেতন মানুষটার গলা। চাপ দিতে লাগল দেহের সমস্ত ওজন দিয়ে। অন্ধকারে দেখা গেল না—চোট-খাওয়া, রক্তে ভাসা, গোঁফ দাড়িতে ঢাকা একটা মুখের চেহারা তাতে কেমন হয়ে গেল। তারপর আবার তার বুকের ওপরে কান পেতে শুনতে লাগল। অর্ধোস্ফুট কণ্ঠে বিড় বিড় করে উঠল সোল্লাসে, "খতম!"...

হাতে রক্ত লেগেছিল বোধ করি। চট্‌-চট্‌ করছে। ভূলুণ্ঠিত লোকটার কাপড়ে ভাল করে হাত মুছে, পাশে নামিয়ে রাখা পেটমোটা চটের থলেটা আবার কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে পিটুনী পুলিশের দলে গিয়ে মিশে গেল।

তার গায়ে আজ নীল কোর্তা নেই।

॥ ছাব্বিশ ॥

আক্রমণটা অতর্কিত—আকস্মিক, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল না। ওদের শুধু জানা ছিল না—এবার ধরণটা কেমন হবে।

ধরণ-ধারণ দেখে মুহূর্ত কয়েকের জন্য ওরা বুঝি অভিভূত হয়ে গেল। এতদিন এ ধরণের আঘাত থেকে পার পেয়ে এসেছে গাঁ-ঘরের গেরস্থ মধ্যবিত্ত জোতদার। ওদের নোংরামীর চোট পড়েছে পবন থাঁর ঘরে—চাষাভুষোর ঘরে। আজকের আঘাত গাঁ-ঘরের সমস্ত মানুষকে [illegible] [illegible] সামিল করে দিল।

দেখ। তার পরিপাটি সাজানো সংসারের বহু[illegible]বর সামনে খুঁটিতে দড়ি বেঁধে রেখে গেছে সানো চৌধুরীর স্ত্রী হিরণ্ময়ীকে—যেন সাক্ষী বসিয়ে রেখে গেছে।

দেখ। মাধুরী পড়ে আছে কোন্ ঝোপের পাশে—অর্ধনগ্ন, অচেতন। সর্বাঙ্গে জানোয়ারের নখ আর দাঁতের দাগ। তার মা পড়ে আছে রান্নাঘরের দাওয়ায়। সামনে উঠোনে জ্বলছে ধিকি-ধিকি তার সারা সংসার।

দেখ। মুকুন্দ পড়ে আছে চিৎপাত হয়ে। মরে গেছে। হরিদাসী বসে আছে পাথরের মত ছেলের মাথাটা কোলে নিয়ে। অতো যে তার কান্না কথায় কথায় —আজ বোধ করি সব জমাট বেঁধে গেছে।

চরের ছেলে-ছোকরার দল—হাবুর ভলান্টিয়ার বাহিনী স্তব্ধ, হতবুদ্ধি। পিটুনির ভয়ে পালিয়ে ছিল পাড়া-পড়শী —মেয়ে মরদ, ফিরে এল একে একে। দাঁড়িয়ে গেল নির্বাক।

মহেশ মণ্ডল শক্ত মানুষ। ডেকে-হেঁকে মেয়েদের লাগিয়ে ঘরে তুলে নিয়ে গেল মাধুরীকে, তার মাকে। দড়ির বাঁধন খুলে দিলে হিরণ্ময়ীর। জল ঢেলে নিভিয়ে দিলে আগুন।

তারপর শেষ মুকুন্দের নিস্পন্দ দেহটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাবুকে মৃদু কণ্ঠে বললে, "একবার খবর দিবি নাকি হাবু?"

হাবু বুঝতে না পেরে বললে, "কাকে?"

মহেশ দ্বিধাজড়িত গলায় বললে,

"মুকুন্দের বৌকে। খবরটা দেওয়া উচিত নয় কি?"

ছোট মণ্ডলের রাগ আজ পড়েছে দেখে অতি দুঃখেও হাবুর মন খুশি হয়ে উঠল। বললে, "উচিত বৈকি ছোট মণ্ডল। আমি এখুনি ছুটে যাচ্ছি।"

"না, তুই থাক হেথায়। ছেলেছোকরা কাউকে পাঠা।"

মহেশ বললে, "তুই বরং সব খবরটা নবীন গোসাইকে দিয়ে আয়।"

নয়ন বৌয়ের কাছে লোক পাঠিয়ে হাবু ছুটল চরে।

খবর তো নয়—দুঃস্বপ্ন। মধ্যরাত্রি তখন পার হয়ে গেছে। সেই গভীর অন্ধকার রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো। জীবেন অভিভূতের মত বসে রইল কিছুক্ষণ।

হাবু ছুটে চলে গেল।

"আমি যাই গোসাই—খবরটা দিতে এসেছিলম।"...

"খবর...হ্যাঁ খবর..."

চোখের সামনে ভাসে জগৎ ডাক্তারের বাড়ি, তার আনাচ-কানাচ, সেই নির্জন একটা কোণার ঘর, নিবারণ...মা...মাধুরী ...যার কিছুই ভোলে নি জীবেন।

দেখতে দেখতে একটা রক্তের উচ্ছ্বাস যেন দুরন্ত বেগে ফেটে বেরুতে চায় তার চোখে-মুখে। কোথায় যেন একটা প্রতিশোধকামী উগ্র প্রতিহিংসা বিষধর সাপের মত তার মলিন মস্তিকশয্যা ছেড়ে মুহূর্তে ফণা তুলে দাঁড়ায় এই ছদ্মবেশী বিপ্লবীর মধ্যে। প্রাণপণে তাকে চাপতে গিয়ে কাঁপতে থাকে সে।

যমুনা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। একটা লোক যে এ রকম করে কাঁপতে পারে—এ সে কখনো দেখে নি।

জীবেন বললে, "যমুনাদি—চলো আমরা যাই।" জীবেন উঠে দাঁড়াল।

যমুনা সাতঙ্কে বললে, "সে কি গোসাই! সেখানে কত লোক জুটে গেছে এখন!"

জীবেন বললে, "তবু আমাকে আজ যেতে হবে।"



যমুনা বললে, "ছোট মণ্ডল যদি গোসা করে।"

জীবেন বিরক্ত হয়ে বললে, "ছোট মণ্ডল কি আমার অভিভাবক! তোমাদের কোনো মানা আজ আমি শুনবো না। সেখানে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতেই হবে।"

যমুনা ভয় পাওয়া করুণ মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবেন রুক্ষ গলায় বললে, "বুঝতে পারছ না যমুনাদিদি, সেখানে আজ তোমার সামাজিকতা নেই, ডাক্তার নেই। চলো—বেরিয়ে পড়ি।"

সে মুখের দিকে তাকিয়ে যমুনা আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বেরিয়ে পড়ল জীবেনের পেছনে পেছনে। একটা পা একটু টেনে হাঁটে এখন জীবেন—সেই অপারেশনের পর পা-টা জখম হয়ে গেছে।

প্রথমেই চোখে পড়েছিল সেই চৌকস লোকটার—মাকড়সার মতো চোখ যার ঘুরছে চারদিকে। ছুটে গিয়ে চাপা গলায় বলেছিল, "গোসাই—তুমি এলে!"

"এলাম ছোট মণ্ডল।" জীবেন বললে, "কই—মুকুন্দ কোথায়? তার সঙ্গে আলাপ করার বড় ইচ্ছা ছিল। বল—কোথায় সে।"

সেখানে কিছু লোক ভিড় করে আছে। ছোট মণ্ডল নীরবে সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

জীবেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সেই দিকে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। টিম্ টিম্ করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে তার মাথার কাছে।

এমন সময় একটা কাতর অনুসন্ধানী গলা শোনা যায় অন্ধকারে কোথায়।

"কই শিবু—কোথায় সে!"...

দেখতে দেখতে ভিড় ঠেলে ছিটকে এল নয়ন—এক পলক স্থির হয়ে দেখলে অসাড় দেহটা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বুকের ওপরে, হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ।

"এই লও...এই লও তোমার কাগজ। কেন তুমি মোকে দিয়েছিলে—কেন...কেন..."

"যমুনাদিদি চলো"—ফিস্ ফিস্ করে বললে জীবেন, "কাকীমা কোথায়...মাধুরী কোথায়..."

মহেশ ভারী গলায় বললে, "ইদিকে এসো গোসাই।"

সেই উঠোন...সেই দাওয়া...সেই ঘর। ...একান্ত পরিচিতের মতো উঠোন-দাওয়া পার হয়ে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জীবেন। কাকীমার ঘর। সে বলতো—ডাক্তার কাকীমা।

দরোজার সামনে বসে আছে হাবুর মা। ফিস্ ফিস্ করে হাবুর মা বললে, "আমাকে বার করে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল।"

"মাধুরী কোথায়?"

"কোণের ঘরে।" হাবুর মা দেখিয়ে দিলে।

সেই কোণের ঘর। যে ঘরে সে থেকে গেছে কিছুদিন।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "দেখ তো যমুনাদি।"

যমুনা দেখে ফিরে এল।

"জ্ঞান ফিরেছে।"

"ফিরেছে।"

"তুমি দাঁড়াও।"

জীবেন ঘরে ঢুকল। শুয়ে আছে মাধুরী। মাথার কাছে একটা সেজের বাতি জ্বলছে।

"মাধুরী!"

এ কার গলা! চেনা চেনা মনে হয়। বোজা চোখ খুলে সে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। গোঁফ-দাড়ি, মাথায় বড় বড় চুল, গায়ে গেরুয়া। কিন্তু গায়ের মেরজাইটা যে বড় চেনা মনে হচ্ছে! এ সেই বাবার তৈরি করানো—তার নিজের হাতে গেরুয়া রঙে ছোপানো।

"কে!"

"আমি নবীন গোসাই।"

কিন্তু সেই উজ্জ্বল চোখ—তীক্ষ্ণ নাক, গোমড়া মুখ...সেই গলা!...

"জীবেনদা!"

"চুপ্।" জীবেন বললে, "আমি নবীন গোসাই।"

দুই হাতে মুখ ঢাকলো মাধুরী। ফুঁপিয়ে উঠল, "এমন দিনে...এমন দিনে কেন এলে তুমি জীবেনদা। লজ্জায় ঘৃণায় আজ যে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

"তাই এলাম মাধুরী।" জীবেন চাপা ভারী গলায় বললে, "এই কথাটা শুধু বলতে এলাম—লজ্জা তোর ক্রোধ হোক। সেই ক্রোধ আর ঘৃণাকে তুই জীইয়ে রাখ মাধুরী—একদিন তার হিসেব নিতে ভুলিস নি।"

মাধুরী তেমনি মুখে হাত ঢেকে ফোঁপাতে লাগল।

জীবেন নিঃশব্দে ওর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

দরোজার ওপার থেকে যমুনা বোষ্টুমী তাড়া দিয়ে বললে, "ভোর যে হয়ে এল গোসাই।"

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

'কচি কদমে, বঁধু, হাত দিও না
পাকিলে কদম সবাই খাবে
বারণ করবে না
পিরীতি ফল কাঁচায় ভেঙো না...'

'কি হল হে? কচি কদম-টদম আবার কি?' রাম আদকের দিকে তাকালাম।

'আজ্ঞে, এই একটু গেয়ে দিলাম। তখন থেকে দেখছি চুপচাপ আছেন। মাথা নীচু করে চলছেন ত' চলছেন। 'রা' কাড়ছেন না। ত' ভাবলাম একটু গেয়ে দিলে মন্দ হয় না। তাই'...

'কিন্তু ব্যাপার বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না। কচি কদম-টদম এসব ত' ভালো কথা নয় হে।'

'বাদ দিন ওসব। বাদ দিন।'

'বাদ দিতে বলছো? আচ্ছা, বাদ দিলাম।'

রাম আদকের কচি কদমের উপাখ্যান না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু তখন থেকে শেয়াকুলের যে কাঁটাটা বুকে বিঁধে খচ-খচ, খচখচ করছে, তার কি করবো? আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না ঘন্টা-খানেক আগে দেখা চায়ের দোকানের সেই ঘাড়ে-গর্দানে লোকটাকে। লোকটার চোখ দুটো করমচার মত লাল। দৃষ্টিটা উগ্র। বুকপকেট ঠেলে উঠছে নোটের বাণ্ডিল। তারপর দোকানের মাঝখানে চায়ের দরুণ দশ পয়সা দেবার নাম করে নোটের সমস্ত বাণ্ডিলটা সকলের সামনে বের করার সেই নির্লজ্জ ভঙ্গিটা। কে, কে, কে এই লোকটা?

'রাম চেন এই লোকটাকে?'

'কার কথা বলছেন? কোন্ লোকটা?'

রাম আদককে বললাম।

শুনতে শুনতে ও গম্ভীর হয়ে গেল।

এমনিতে ওর বয়েস কমই। কিন্তু যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো ও শুনছে তাতে কোথাও যেন মেঘ জমছে, খানিক পরই যেন বাজ ডাকবে। একটু পরেই দেখলাম চেরা বিদ্যুতের ঝলক।

'মাটি জাগছে কমরেড, কিন্তু এমনি ধারা চোরাবালিতে আট্‌কে আট্‌কে যাচ্ছি। মা বসুমতীকে বলি, মাগো, একটু মাটি দাও। আমি ঘট বসাবো। মা তবু মাটি দেয় না। আমার ঘট বসানো হয় না।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যায় না। মাটির কাছে মাটির সন্তানের এ কোন্ প্রার্থনা?

কি কথা বলতে চায় ও?

কার কাছে যেন ওর জীবনভোর দেনা। সেই দেনা ও যেন মেটাতে চায়। আমার ঘট বসানো হয় না। এ কোন্ ভাষা?

আমি নিশ্চিত। ও ভেতরে ভেতরে কাঁদছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। মাটির কাছে—মাটির সন্তানের এ কোন্ প্রার্থনা? মাকে বলি মাগো, একটু মাটি দাও। আমি ঘট বসাবো। মা বসুমতী মাটি দেয় না। তাই ত' আমার বুকটা হুতোশে কাঁদে। আমার কথা কাঁদে। আমার পরাণটা ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদে গো।

'আমি লোকটাকে চিনি। লোকটা চাল ব্ল্যাক করে।'

'এখনো?'

'হ্যাঁ।'

'সমিতি?'

'সমিতি দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে। কিন্তু সব, সব যে কালো মেরে গেছে। গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্নে চলে গেল।'

খানিক চুপ করে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলো। আমি শহরের লোক। শহর থেকে এসেছি গ্রাম দেখতে। অনেক-দিনের শান্তভাবের পর একটা দমকা ঝড় উঠেছে। সেই ঝড়ে গ্রাম কি রকম ঝাঁকানি খাচ্ছে, গ্রামের মানুষ ভেঙে-চুরে, দুমড়ে যেতে যেতেও একটা নতুন সড়কে গিয়ে উঠছে, আমি দূর থেকে তাই দেখতে এলাম। দূরে থেকে আমি এসেছি, গোটা গ্রামের জন্যে রাম আদকের এ হাহাকার আমার কাছে অর্থহীন, আমি বুঝতে পারছি না এই মুহূর্তের রাম আদককে, এমন করে এই অন্ধকারে সে ককিয়ে উঠছে কেন? অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ওর কণ্ঠস্বর যেন ঝন ঝন করে বেজে উঠলো।

'জানেন, আমিও ব্ল্যাক করতাম।'

একটু হকচকিয়ে গেলাম বৈকি কথাটা শুনে। এই লোকটা এসব কি বলছে?

'তুমি না পতাকা নিয়ে এগ্রাম-ওগ্রাম ঘোরো?'

'সে ত' এখন। সেদিন ত' ঘুরতাম না। আমাদের বংশের মধ্যে আমিই আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি। সেদিনটা আমার মনে আছে। পর পর ছ' মাসের মাইনে বাকি পড়েছে। ক্লাসে ক্লাসে যখন নোটিশ আসতো আমার নাম কাটা বলে, তখন মনে হত বেঞ্চির তলায় মুখটা লুকোই। ভদ্দরলোকের ছেলেরা, কি সব তাদের সাজবাহার, টিফিনের সময় কত কী খেত তারা। ভগবান জানেন এ্যাতো পয়সা ওর কোথা থেকে পেত, এই আলুকাবলী খাচ্ছে, এই ঘুগনি খাচ্ছে, এই গুড়-ছোলা খাচ্ছে, আর আমি ত' কিছুই খেতাম না। খাবো কি করে, পয়সা কোথায়? আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম বা ওদের খাওয়া দেখতে দেখতে যখন পেটের খিদেটা ভয়ানক চাগিয়ে উঠতো, তখন ছুটে ক্লাসে চলে আসতাম। ওরা, অবশ্য সকলে নয়, দু'চারজন বলতো, শালা. মহা কিপটে। হ্যাঁ. কি একটা ইংরিজী বলতো. ই

পয়সার ফাদার-মাদার। এদের মাস্টার দপ্তরীর হাতের নোটিশ যখন টিচার পড়তো, তখন মনে হত সকলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মনে মনে হাসছে, টিটকারি দিচ্ছে, ভিখিরী ভাবছে আর আমার মনে হত আমি যেন সেই গরু, যে খুঁটিতে বাঁধা আর যাকে তেলচকচকে পিটে তোলা। পাচন করে পিটোচ্ছে কেউ আর বলছে, 'শালো, চুরি করে পরের ক্ষেতে ঢুকে ধানের শিষ খেয়ে খেয়ে পালাবি আর? ব্যাটা, তোরই একদিন কি আমারি একদিন'। হ্যাঁ, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতাম এই ইস্কুলে এসে বই পড়া আমার পরের ধানক্ষেতে চুপি চুপি ঢুকে ধানের শীষ খাওয়া ছাড়া আর কী! ওদের অধিকার আছে আমাকে পিটোনোর। বেধড়ক মেরে আমাকে অজ্ঞান করে দিলেও আমার বলার কিছু নেই। আমার মনে পড়তো একলব্যকে। গুরু দ্রোণাচার্য যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই ছোটজাত ছেল বলে। তার পয়সা দেবার ক্ষ্যামোতা ছেল না বলে। আমিই সেই একলব্য। ওরা আমাকে ঢুকতে দেবে না ওদের মন্দিরে। আমি রেগে উঠতাম। রেগে মাথার চুল ছিঁড়তাম। একা একা দুপুরবেলা বন-বাদাড়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতাম। আমি কি পারি না একলব্যের মত নিজের ঘরে বসে নিজে নিজে পড়তে? এ রকমও মনে হত সত্যি বলছি মশাই। তারপর একদিন ওরাই ছুটে আসবে, আমাকে দেখে ধন্য ধন্য করবে, আমার লেখাপড়ার তারিফ করবে। ওরা বলবে, এই জলা-জংলা জায়গায় কোথা থেকে ফুটলো এমন ফুল! সংগে সংগে চেঁচিয়ে উঠতাম, না, না, না। ওদের ঘেন্না, ওদের রাগ যতো ভয়ানক, ওদের প্রশংসাও ততো ভয়ানক। বাপরে, দ্রোণাচার্যের মত মানুষ, সে ত' খারাপ লোক ছেলনি, তবু তার কি অমানুষিক কান্ড! বলে কিনা, গুরুদক্ষিণা দাও, আবার যে সে গুরুদক্ষিণা নয়, হাতের বুড়ো আঙুলটি খুলে তুলে দাও আমার হাতে। শুনছেন?'

'শুনছি বৈকি।' এই অন্ধকারে চলতে চলতে শুনছি। এমন কোন দুঃখ মানুষের থাকতে পারে আমি তা' কোনদিন জানতাম না। ক্লাস থেকে নাম কাটা গেলে কি রকম লাগে তা' আমি কি করে জানবো? আমার ত' নাম কখনো কাটা যায় নি। বই যোগাড় করতেও তেমন কোন কষ্ট হয় নি। পুরোন বই হয়তো কিছু কিছু হাফ দামে কিনতে হয়েছে, তবু সব বই-ই পরীক্ষার আগে ঠিক যোগাড় হয়ে গেছে। দু' বেলা ভাত না জুটুক, কিন্তু কোনদিন উপোস দিতে হয় নি। প্রাইভেট টিউটর সারা বছরের জন্যে রাখতে পারি নি ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষার কিছু আগে বাবা যেমন করে হোক, আমার জন্যে প্রাইভেট টিউটরের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। আপেল, ন্যাসপাতি, আঙুর এসব শখ করেও কোনদিন খাই নি বটে, কিন্তু অসুখের সময় ঠিকই জুটেছে। টিফিনে খাবার জন্যে পয়সা মা দেয় নি, কিন্তু দুখানা করে শুকনো রুটি আর খানিকটা আখের গুড় আমার ঠিকই জুটেছে। বাবার পকেট হাতড়ে, মায়ের বিছানার তলা থেকে, কখনো রিং-এর চাবি চুরি করে সিন্দুক খুলে দু'-পাঁচ টাকা সরিয়েছি। সরিয়ে, স্কুল ফাঁকি দিয়ে সিনেমাও দেখেছি। রাম আদকের দুঃখ আমি কেমন করে বুঝবো? এসব আমার কি বোঝার কথা?

'সেদিনের কথা বলি।' রাম আদকের গলার স্বরে এখন আর কান্না নেই। আসন্ন একটা যুদ্ধের জন্যে যেন ও প্রস্তুত হচ্ছে। ওর গলার স্বর ক্ষমাহীন। ক্রোধ, দুঃখ, অবজ্ঞায় সম্পূর্ণ।

সেদিনটা ছেল মঙ্গলবার। আমি দাওয়ায় বসে পড়া দেখছিনু। মা গেছে পাশের বাবুদের পুকুরে জালির খ্যাপ নিয়ে মাছ ধরতে। বাবা গেছে, রোজই যেমন যায়, বাবুদের বাগানে, কুপোতে। খুব মন দিয়ে দুলে দুলে পড়ছি, হঠাৎ পশ্চিম দিকের জংলা বাঁশবন থেকে 'শালী, এক নম্বরের হারামী, মেয়েছেলে যে এমন মাছচুন্নী হয়, ছোচকা হয় জানতুম নি। তাই ত' বলি রোজ রোজ এতো মাছ যায় কুথায়। এবারে এসোনি আর একদিন, শালী তোমার শুকনো ঘাড়ে মারবো এক কোপ, হেনাজ মেয়েমানুষ', পরিষ্কার বাবুদের ছেলের গলা, আমারই সমবয়েসী। এতেও সোয়াস্তি নেই, আমাদের 'নাচ'-এর দুয়োরে দাঁইড়ে সে কি অশ্রাব্যি গালাগাল! আপনি শওরের লোক, আপনি ভাবতেই পারবেন না, সেসব খিস্তির কতো বড়ো দাঁত, নখ আর থাবা! ছেলে হয়ে মায়ের সেই অপমান সেদিন দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করেছি। আমার শরীরখানা ফুলে ফুলে উঠছেলো, মনে হচ্ছিলো, সেখানা সে ছুটে যাই, গিয়ে ওর ধড়মুণ্ডু নাবিয়ে দি, তারপর যা হয় হোক, না হয় ফেরার হয়ে যাবো, জাহান্নামে চলে যাবো, এ পৃথিবী আমাকে ত' চায় নি। কি হবে বেঁচে থেকে? কিন্তু কিছুই করতে পারলুম নি। আমি স্পষ্ট দেখলাম বাবা ওদেরই ভুঁয়ে কোদাল কুপোচ্ছে। আজ যদি কিছু একটা করে ফেলি, কাল বাবাকে ওরা কাজ দেবে না। চোখে আমার জল এসে গেল। তা ছাড়া ওদের দেওয়া মাপা চাল, ওদের দেওয়া এঁটো-কাটা খেয়েই ত' মানুষ। কৃতজ্ঞতাটা যাবে কোথায়? বাবু বলতে এখনো আমাদের জিভ দিয়ে লাল ঝরে। জানেন, এতো যে রাস্তি লেগেছে, মা বাসুকির কথা দুলতে লেগেছে, তবু দেখবেন এক গ্রাম থেকে কিষেণ গিয়ে অন্য গ্রামের জোতদারের বিরুদ্ধে ফাটাফাটি করছে, কিন্তু নিজের গ্রামের জোতদারের বিরুদ্ধে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না এখনো। যদি কেউ ওপুকার, তখন বলে, কর্‌গ্যে যাও, অত্যাচার। করুক লুটপাট। জীবনভোর ওরাই ত' দেখে এলো। অভাবে যখনই বাবুদের খোলায় গিয়ে দাঁইড়েছি, বাবু কোঁচড় ভর্তি করে দিয়েছে। হয়তো দশ আড়ি নিয়েছি, সাদা কাগজে টিপসই দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে বিশ আড়ি। মুরুখ্যু মানুষ, ঠকিয়ে নিয়েছে। কলম ত' ঠেলি নি, লাঙল ঠেলেছি, নিক ঠকিয়ে, তবু বানে খরায় ওরাই ত' দেখে!

যে কারণেই হোক, আমি কিছু করতে পারলাম না। বাবুর ছেলে চলে গেলে আমার পোড়াকপালী মা কোথা থেকে সর্বাংগে কাদা মেখে খানিকটা মাটি, মাটি থেকে খামচে তুলে, আমার মুখে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এই নে, মাছ খাবি, আর মাছ খাবি? ছাই খা, ছাই খা। উঃ, হাই মা, পেটের ছেলের পারা লন্দ, সে আমাকে খিস্তি করে গেল', তারপর ঝুপসি রান্না-ঘরে গিয়ে জ্বলন্ত উনুনটায় মাটির কলসীর সবটুকু জল ঢেলে দিলে। ও উনুনটা নিভে গেল। কিন্তু আমার বুকের ভিতরে যে উনুনটা আছে, সেটা ঝলসে উঠলো। দুত্তোর, রইলো তোর পড়া, ঘোড়ার ডিমের পড়া, এসব বড়লোকের ছেলেদের জন্যে, এই গুষ্টির পিন্ডি পড়া চটকে কি মায়ের এই অপমানের জবাব দিতে পারবো? শালা শুয়োরের বাচ্চার সব ক'টা দাঁত কি আমি খুলে নিতে পারবো? কিছুক্ষণ আগেও ভেবেছিনু আমি একলব্য হবো। না, এ যুগে আর একলব্য হওয়া যায় না। আমিই বা কিসে কম! আমার গতরেই কি কম শক্তি? সিবার 'আসুতির লড়াই'তে গ্রামের মধ্যে সব ক'টা জোয়ান ছেলেকে ফেলে দিয়েছিনু মাটিতে, শালা! আমিই বা কিসে কম? আমি, আমি, খুব বড়ো করে বুক ভর্তি নিঃশ্বাস নিলাম। আমি আম আদক, তখন ঐরকমই উচ্চারণ করতাম, রামকে বলতাম আম, রোজগারকে বলতাম ওজগার, শুনছেন?'

'শুনছি বৈকি।' কান পেতে শুনছি। সমস্ত শরীর, মন দিয়ে শুনছি। বৃষ্টিই কি শুধু ঝরে? রক্ত কি ঝরে না? এতো-দিন জানতাম রক্ত ঝরে না। শরীরের ভেতরে থাকে। কিন্তু এখন দেখছি রক্ত ঝরে।

রাম আদকের প্রত্যেকটা কথায় আছে রক্ত, আর সে রক্ত ঝরছে।

'আমি মনে মনে বললাম, চাই না, চাই না, একলব্য হতে চাই না। তা ছাড়া অনুপায়ক ত' হয়েছি, ওদের মতো

ভয়ানক, ওদের প্রশংসাও অজ্ঞাটা ভয়ানক। বলা ত' যায় না, চেয়ে বসবে হয়তো বুড়ো আঙুলের মত গুরুদক্ষিণা। তখন? শুনছেন?'

'শুনবো না? কি বলছো রাম আদক?' অন্ধকার তার একতারা বাজাচ্ছে। আজ চাঁদ নেই। আকাশের তারার চোখে জল। এমন করে কখনো কোন মানুষের গল্প শুনিনি।

'ছুটে গেলাম জংশন বাজারে। এর আগে অনেকবার এসেছি। তবে তখনকার আসা আর এখনকার আসা তফাৎ অনেক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। কলার পাহাড় জমেছে। মোটামুটি এ ব্যবসার তাগবাগ না জানা নেই। অনেক লোক আমাদের গ্রামের। দেখেশুনে ঠিক করনু ঘরই নোব একটা। কিন্তু ঘরের ভাড়া শুনে চিত্তির। দু'-চারদিন যেতে না যেতেই একটু ভাবসাব হয়ে গেল। সব আমাদেরই বয়েসী। চায়ের দোকানে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছিলো। বললাম তাদের। ওরা বলল, একা তুমি ভাড়া দিয়ে কূল পাবে না ভাই। দু'-তিনজনের শেয়ারে ঘর ভাড়া নাও। কলা পাকাবে ত'? বললাম, হ্যাঁ। ঐ যে সাঁকোটায় আপনি বসেছিলেন, সেই সাঁকোটায় পেরথম পেরথম বসে থাকতাম। রিক্সা বোঝাই কলার কাঁদি যেত। ওই তালমাফিক কিনে নিয়ে বাজারের ঘরে ঢোকাতাম। দুটো জালা পেতেছিলাম। সেখানে কারবাইড দিয়ে পাকিয়ে নিতাম। সন্ধ্যের সময় জালা সাজাতাম। সকালেই হয়ে যেত। তারপর বাতাস একটু খাওয়ালেই একেবারে সোনার গয়নার পারা, বুঝলেন? পড়তায় ঠিক পোষাচ্ছিলো না। একটু দূরের দিকে, মানে আপনি চিনবেন, ঐ কলার হাট থেকেই শেষে কলা কিনে আনতে লাগলাম। আমি বিক্রি করতাম পাইকিরিভাবে। খুচরো নয়। খুচরো নিয়ে বসলে শুধু কলায় চলে না, ওর সংগে আরো পাঁচটা জিনিস নিয়ে বসতে হয়, তা ছাড়া ঐ কলা নিয়েই থাকতে হয় সারাটা দিন। আমার ত' সে রকম মন না। আমি যা কারবার করবো তা ঐ একবেলার জন্যেই। তবে সন্ধ্যের দিকে এসে একটু সাজিয়ে যাবো ঘর। বাকি সময়টা অন্য শুলুক-সন্ধানের ফেরে কাটাতাম। কিন্তু লস খেয়ে গেলাম। এক শালো শান্তিপুরের হারামী ধার গেঁথে আমাকে বইসে দিয়ে গেল।'

'ধার দিলে কেন?'

'ব্যবসায় ধার না দিলে চলে না। ধার না দিলে আপনি পারবেনও না। মনে করুন একদিন এসে আপনি অনেকটা মাল নিয়ে গেলেন। বললেন, টাকাটা আবার যখন আসবো মাল কিনতে, তখন দিয়ে দোব। আর সত্যিই তাই করলেন। অনেক-বার এ রকম করতে আপনার ওপর একটা বিশ্বাসও এলো। আপনি আমার সংগে চায়ের দোকানে বসে গেলেন। আপনি চা খাওয়ালেন। আমি দিলাম বিড়ি। বাস্, বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এখন যদি আপনি আমার কাছে ধার চান, আপনাকে আমি কেমন করে ফেরাই?'

'শান্তিপুরের ব্যাপারেও বুঝি তাই হয়েছিলো?'

'হ্যাঁ। শালো আর এলো নি। আমার দু'শো টাকা জলে গেল। আমি পড়ে গেলাম। ব্যবসা লাটে উঠলো। যা দু'-চার ট্যাকা ঘরে আনছিনু তাও বন্ধ হয়ে গেল। সে বেটা আর এ অঞ্চল মাড়ালোই না। অনেকদিন তক্কে তক্কে বসে রইলাম যদি সুমুন্দিকে একবার পাই, শুধু আমার বসে থাকার দরুণ চা-বিড়িতে পয়সাই গেল, ওর টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। ওকে কি আর পাওয়া যায়? জানলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ছেঁড়া পাতার মতন ঘুরতে লাগলাম কতকদিন, পড়াও ছাড়লাম, কলাও ছাড়লাম, এখন কি করি, কোন্ দিকে যাই? যেদিকে তাকাই, সেদিকেই খাঁ খাঁ মাঠ আর গন্‌গনে রোদ্দুর, কোথাও কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যতোদূরে দেখছি শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। হঠাৎ একদিন বিকেল-বেলায় দেখলাম লাইনবন্দী সাইকেলের সার চলেছে পিঁপড়েদের মতন। প্রায় জনা-বিশেক হবে। সাইকেলের সামনে একটা বস্তা, আর পেছনে আর একটা বস্তা। কি যাচ্ছে? গ্রামের ছেলে। রোজ রোজই এসব দেখছি। না জানার কি আছে? চালের সাইকেল যাচ্ছে। সব কালো চাল। যাচ্ছে জংশনের বাজারে। অনেকক্ষণ বসে বসে লক্ষ্য করলাম। ভালো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওরা মাঠের রাস্তা ধরলো। ঠিক তার খানিক পরেই পাশ দিয়ে গেল একটা পুলিশ ভ্যান, যার নাম 'খাঁচাগাড়ি'। কি করে ওরা টের পেল? যদি এই রাস্তা দিয়ে যেত তাহলে ত' ধরা পড়তো নির্ঘাৎ। পেছনে ফেরবার উপায় ছিলো না। হঠাৎ মাঠের ওপর নামতেও পারতো না। রাস্তাটার দু' পাশের মাঠে এখন জল ভর্ ভর্ করছে। গাছও দু' হাত এক হাত উঠে গেছে।

তার পরের দিনও লক্ষ্য করলাম। আজ আবার অন্য আর একটা দল ঠিক ওই-ভাবেই সামনে-পেছনে বস্তা সাজিয়ে পিঁপড়ের সারের মত যাচ্ছে। লক্ষ্যও ঐ এক। জংশনের বাজার এলাকা। এতো লোক এতে নেবে পড়তে পারে আর আমি পারি না? কিসের ভয়? তা ছাড়া থাকুক না ভয়। আমার আবার যেখানে ভয় সেখানে ছুটে যেতে ভালো লাগতো। বুকের মধ্যে থেকে চলকানো রক্ত বলতো, যা, যা, ছুটে যা। আমি ঠিক করে ফেললাম যাবো, ওদের দলেই নাম লেখাবো। কিন্তু কেমন করে?

ওরা চলছে। আমি ঠিক করেই রেখে-ছিলাম একটা সাইকেল গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে। সাইকেলটা নিয়ে ওদের পেছন পেছন চলতে লাগলাম। প্রথমটায় ওরা গ্রাহ্য করে নি। তারপর দেখলাম ভয় পেয়েছে। ভাবলো বোধহয় পুলিশের লোক। দূর শালা, যাই ভাবুক, কেটে দু' আধখানা করে ফেলুক, আমি ওদের সংগ ছাড়বো না। ওদের চোখে চোখে ইসারা খেলে গেল। বুঝলাম কিছু একটা হতে যাচ্ছে। এদিকটা ফাঁকা! মানুষজনও যত একটা আসছে-যাচ্ছে না। কোন গোল-মালে পড়বো না ত'!

ওরা রাস্তা ছেড়ে বাঁশবনের ছায়ায় ছায়ায় যে পথটা গেছে ঐ পথ ধরলো। আমারো উপায় নেই। আমিও চাইলে দিলাম সাইকেল। খানিকটা গিয়ে, বেশ একটু নির্জন জায়গা, হঠাৎ ওরা ঝপ ঝপ সাইকেল থেকে নেবে পড়লো। আমিও নেবে পড়লাম। দেখি না ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। খুব একটা বিতিকিচ্ছির ব্যাপার না হলে ওরা সহজে খুনোখুনিতে মাতবে না, বিশেষ করে এতোখানি চাল নিয়ে।

এই ছোঁড়া শোন্। ডাকলো ওদেরই ভিত্তির একজন। পরে জেনেছিনু ওই দলের কাপ্তেন। ও চাল বেচে না। ও আগে আগে চলে সাইকেল নিয়ে। পুলিশ কখন কোন্ পথে আসছে তার হদিশ দেয়। থানা পুলিশ, দারোগার হাত থেকেও বাঁচায়।

কি মতলব তোর?

কোন কুমতলব নেই। আমি চাল বেচতে চাই।

কেন?

তোমরা বেচচো কেন?

তুই যে পুলিশের লোক ন'স প্রমাণ দে।

প্রমাণ কোথা থেকে দোব? দেখতেই পাবে একদিন তোমাদের সংগে সংগেই চাল বেচচি।

ঠিক আছে। পার্টির কাপ্তেন কি ভাবলো কে জানে। বোধহয় অনেকদিন এ লাইনে আছে। মানুষ নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করেছে। লোক চিনতে ভুল হয় নি।

ওরা চাল বেচে ফিরলো যখন তখন ওদের সংগ ধরলাম। এখন আর ওদের ভয় নেই। মাল ত' সব খালি করে দিয়ে এসেছে। আর ভয় কি? মাইল পনেরো ওদের সংগে সংগে চলে গেলাম। বেলা তখন অনেক। মাথায় চাঁদি ফাটিয়ে দিচ্ছে। সংগে একশো বাটটি ট্যাকা। গাছ

মেচো পয়সা। বাবুর আমলের আর। সম্পত্তি বলতে ঐ একটাই। তাও বেচে দিতে হল। বাবা হাউ-মাউ করে ছুটে এসেছিলো। ত' আমি তখন মরীয়া। হেঁসো নিয়ে বাবার দিকে তেড়ে গেছি। বাবা আমার মূর্তি দেখে জঙ্গলে পালিয়েছে।

পকেটে করকরে অতোগুলো টাকা, কিন্তু খাবার উপায় নেই। এসে গেছি অমন জায়গায়। এও গ্রাম। তবে অনেকটা ভেতরের দিকে। ওরা ঘর-গুলো চিনিয়ে দিলে। সব গেরস্থ-বাড়ি। তখন যুক্তফ্রন্টের ন' মাস। মনে রাখবেন চালের দর তখন কোন জায়গায় সাড়ে তিন, কোন জায়গায় চার, সওয়া চার। এ আবার মুসলমানদের গ্রাম। বেশির ভাগ ওরাই। মুসলমান হলে কি হয়, ফরফর করে ভেতরে ঢুকে গেলাম। গেরস্থঘরের দেয়ালের পাশে পাশে সব সাজানো। কাছ থেকে মনে হবে বোধহয় খোল, বিচালির বস্তা। সাজা-নোর এমন ধরণ। চাল চাইলুম। ঠিক যেমন করে মানুষ হ্যারিকেন তুলে ধরে অন্ধকারে ঠিকমত ঠাহর করবার জন্যে, অবিকল সেইভাবে লোকটা আমার দিকে তাকালো। ওরা বোধহয় তাকিয়েই সব বুঝতে পারে। অনেকদিন ঘুরে ঘুরে এটা আমি দেখেছি। দর-দস্তুর হল। মালও পেলাম কিছু। প্রথমটায় ওদের মতনই চাল তুলেছিনু। ওরাই বারণ করলো। বললে, পারবি না রে ছোঁড়া। ঐ এক মণই নে। তাতেই কাঁপ ছুটকে যাবে।

কিভাবে সাইকেলে চাল সাজাবো ওরাই বেঁধেবুধে তাও দেখিয়ে দিলে। যেই প্যাডেলে পা দিয়েছি, কি বলবো, খানিক যেতে-না-যেতে উল্টে যাই আর কি। ওরা হাসতে লাগলো মুখ টিপে। হাত দুটো অসম্ভব কাঁপছে। মাত্তর এক মণ, তাতেই। ওরা বলল, চালাতে চালাতে অভ্যেস হয়ে যাবে। ও পেরথম পেরথম আমাদেরও হত। তারপর আস্তে আস্তে বাড়িয়ে আড়াই-তিন মণও করে এখন চালাই। চালাতে কোন কষ্ট নেই। যেন দশ সেরা মাল নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা অনেকেই তাই বটে। প্রথম দিন বিশেষ কিছু হল না। পার্টির যে ক্যাপ্টেন সে প্রথমেই দু' টাকা ওর দস্তুরী আদায় করে নিলে। দেখলাম সকলেই চোখ টিপে সায় দিলে। বুঝলাম, এইটাই এ লাইনের রীতি। বেশ যাচ্ছি, কখনো মাঠে, চওড়া রাস্তা, কখনো নুড়িপথ, কখনো আলের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে, কখন পগার পার হয়ে। বেশ মেরে যাচ্ছিলাম, যেন এই সব অনেকদিন ধরেই করছি। আমি তো ঘাবড়েছিলাম, বাবা, এর জন্যেই আবার এতো চারদিকে জল খেতে খেতে যাব! ধুর, এ একটা কাজ নাকি?

কিন্তু আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল যখন নেনোর মোড়ে এলাম। এই-খানে রাস্তা সংক্ষেপ করতে হবে। শুধু সংক্ষেপ করবার জন্যেই নয়। ঘুরপথে যেতে গেলে অনেকটা, প্রায় মাইল পাঁচেক বড় রাস্তার ওপর দিয়ে যেতেই হবে। আর অতোখানি পথ কখনো বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়? নেনোর মোড়ে এসে দেখলাম আমাকে যেতে হবে এ-মুড়ো থেকে হাত ষাটেক একটা পুলের ওপর দিয়ে ও-মুড়োতে। গাঁয়ের মানুষ, পুল অনেক পার হয়েছি। বাঁশের তৈরী সাঁকোর মত পুল, সে-ও সাংঘাতিক, শহরের আপনারা পারবেন না মশাই, জল-কাদার সেও ভারি বেপদের, কিন্তু আমাদের কি সে সব গেরাহ্য করলে চলে! কিন্তু এ ব্যাপারটি দেখে কলজে শুকে গেল মশাই। শুনছেন?'

'হ্যাঁ, কলজে শুকিয়ে গেল।'

'পর পর চারখানি লম্বা লম্বা বাঁশে ওই রকম আরো চার-চারখানা অনেক বাঁশ বেঁধে লম্বা পুল তৈরি করা হয়েছে। পুল থেকে হাত পনেরো নীচুতে জল। এমনিতে অতোখানি রাস্তা ঐটুকু চওড়া বাঁশের ওপর দিয়ে যাওয়া রীতিমত শক্ত। বুকে কাঁপন লাগে না এমন জোয়ান তো দেখিনি। তার ওপর ওইরকম ওজনের চালের বস্তা, তাতে আবার সাইকেলে চাপিয়ে, সাইকেলটাকে ধরে ধরে পার করতে হবে, একটু পা এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই সাইকেল শুদ্ধু ঝুপ, হ্যাঁ, এক-বারে জলের ভিতর।

লুকোবো না মশাই, ভয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিনু। এই করে যদি আমার খেতে হয় তবে খাওয়া আমার মাথায় উঠুক। দেখলাম, দলের কাপ্তেন এগিয়ে এলো, বলল, 'ও পেরথম পেরথম এ রকম সকলেরি হয়। কিন্তু কাজটা তো তোকেই করতে হবে।' ও আমার কাছ থেকে সাইকেলটা নিয়ে নিলো। তারপর আগে আগে চলতে লাগলো। আশ্চয্যি! পারও হয়ে গেল। শুধু ঐ বা কেন, গোটা পার্টিটাই, পিঁপড়ের সারের মত একে একে পুল পার হয়ে গেল!

পনেরো-ষোল মাইল খানা, খন্দ, পগার, উটকো গলিঘুঁজি ঘুরে ঘুরে আমাদের চলতে যতো না কষ্ট হত, এই একটা জায়গায় তার দেড়া কষ্ট, উঃ, ভাবলে এখনও গা-টা কেমন করে!

এইভাবে চলতে চলতে আশেপাশের প্রত্যেকটা গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটা পথ, কোন পথটা গেছে মাঠ আর জলার ওপর দিয়ে, কোনটা পগারের ওপর দিয়ে, কোন পথটা গেছে একবারে ভয়ংকর জঙ্গলে, সে এক অসম্ভব কাণ্ড, এই করে করে সব পথ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো।

বেপদ কি একটা? পুলিশেরই কি শুধু বেপদ? পুলিশের বা বেপদ কি মশাই, পুলিশের সামনে মাল নিয়ে পড়লেই যা বেপদ। সাইকেল খাঁচাগাড়িতে তুলে নেবে। লক-আপে খোল-ভাত খাওয়াবে। সাইকেল থানা থেকে নীলামে চড়বে, কিন্তু সামনে না পড়লে ওদের কোন বেপদও নেই, ওদের লোকই আমাদের জানিয়ে দিতো আজ কোথা 'রেড' হবে। কোন দিক দিয়ে খাঁচাগাড়ি আসবে! তা দেবে না-ই বা কেন? শুনে আপনি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে হাসবেন, ই ই দেখুন, হাসিতে কেমন গা গুলুচ্ছে দেখুন!'

অন্ধকারে হাসি দেখা যায় না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম পুলিশের কাণ্ডের কথা মনে করতেই ও হেসে কুটো-পাটি হয়েছে।

'একবার কি রকম ভড়কে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি বিশজনের গোটা পার্টিটাই। থানার ভেতরে ঢুকেছি। সাইকেলগুলো সব বাঁশবনে রাখা। দারোগাবাবুর কথা-গুলো একটু মন দিয়ে শুনুন, শুনলে জ্ঞান হয়ে যাবে। যাকে বলে 'ব্রেহ্মোজ্ঞান', হ্যাঁ, তাই।

বড়বাবু বলছে, 'বলচো ত' বিশজন। আসলে হয়তো চাল্লিশ-পঞ্চাশজন। না না বাপু, এ ভারি ঝঞ্ঝাটের কাজ। তোমরা ভীষণ মিথ্যে বল। অতো কমে হবে না।'

পার্টির ক্যাপ্টেনটি তখন বলল, 'ঠিক আছে বড়বাবু। ওরে নেতাই, বাপ আমার, যাও দিনি, দশ টাকার ভালো মিষ্টি নে আয় দিনি। ঐ সংগে এক প্যাকিট কাঁচিও আনিস।' ব্যাপারটা বুঝলেন?

শুধুলো চালের বস্তা নিয়ে যতো ইচ্ছে যাও, তাতে আটকাচ্ছে না বড়বাবুর ধম্মে, বড়বাবুর আটকাচ্ছে চাল্লিশ-পঞ্চাশজনের জায়গায় কেন বিশজনের টাকা, মানে, ঘুষ পাচ্ছে? বুঝলেন? এদের আমরা ভয় খাবো? আমাদের নেতাই ত' ঐ হাতেম-পুরের এক সেপাইকে খোলাখুলি বলতো, দোব বেটা ঘুষখোরের পেটটা ফাটিয়ে, পেট দে তখন খালি বেরুবে কালো কালো টাকা। ছি ছি, কোন ভদ্দরনোক এদের নিয়ে চলতে পারবে? শুনেছিনু এরা নাকি জ্যোতি বসুর মুণ্ডু চেয়েছেল! তা আর চাইবে না? এরা এক-একখানি বস্তর, এদের খুরে নমস্কার।'

'বলছিলে না বিপদ একটা নয়?' আমি খেই ধরিয়ে দিলাম।

'সেই কথাই বলছি। হয়তো তেমন তেমন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, পুলিশ তাড়া লাগিয়েছে, সব আমরা যেন দুভাগ হয়ে

গেছি, আমি হয়তো সাইকেলটা এক জায়গায় নুকিয়ে মাল নিয়ে নেমে পড়েছি একেবারে এক হাঁটু ধানক্ষেতের মধ্যে, তেমন তেমন নোক হলে ধরবে আমার কলার চেপে, তখন দিয়ে দিতে হবে সব, ওর হাতে যে হাঁসুয়া ঝকঝক করছে! তা ছাড়া মনে করুন, যাচ্ছি এ গ্রাম-ও গ্রাম, যেতে যেতে সবাই কেমন চিনে ফেলে, বোধ হয় চাল চোরদের চেহারায় একটা ভেন্ন রকম ছাপ আছে। ত' যাচ্ছি চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে চারদিক তাকাতে তাকাতে, হঠাৎ দোকানের ভিতরে থেকে কে একজন ছেলে বলল, এই যে যাচ্ছে দুমুন্দি। ব্যস, জনা দশেক উঠে এলো। হয়তো তকে তক্কে ছেল। বলল, 'চাল নে যাচ্ছো যাও। কিছু বলবো নি। কিন্তু চাঁদা দিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্মীপুজো, বুইলে? দু' টাকা করে সবাই।'

দোব না দোব না করে দিয়েছিলাম দু' টাকা। মনে ভাবছি যদি এখন চার টাকাও চায় তাও দিয়ে দিয়ে রেহাই পাই, কেন না এই তক্কো জুড়লে আরো দশটা নোক জড়ো হবে, তারপর চাঁদা করে লুট। না, বাবা, ওর মধ্যে গিয়ে আর কাজ নেই। কিন্তু মুখে ভাবটা রাখতে হবে যেন দু' টাকা দিতে আমরক্ত বার হয়ে যাচ্ছে।

পুলিশের ভয়, পুল থেকে পড়ে যাবার ভয়, লুটের ভয়, এই সব ভয়-গুনোকে ধরুন। এই বার যোগ দিন অতোবড়ো বস্তা নিয়ে রোজ রোজ সাইকেল চালালে সাইকেলের কি থাকে। সাইকেল বাবদ দৈনিক খরচা আমরা ধরে রাখতাম দু' টাকা, তার পর মনে করুন শরীরও ত' মশাই অনেকটা যন্তরের মতই, যন্তরেরও তেল, মবিল লাগে; তা এই যে শরীরটা এতো ধকল সয়, এর একটা কোনু না টাকা দুয়েকের খোরাকি আছে, এ ছাড়াও আছে পুলিশের ঘুষ, পার্টির কাপ্তেনের টাকা, চাঁদার টাকা। তাহলে চালটা যখন জংশনের বাজারে নিয়ে যাই তখন এসব ভেবেই ত' কেনা দামের থেকে বিক্রির দাম চড়ে যায়। আমি কেন এক টাকার জায়গায় কম করে পনেরো-তিরিশ টাকা রোজগার করবো না এক-একটা ট্রিপে? ঐ চালটাই যখন, মনে করুন, আড়তদাররা বেচে দিচ্ছে পাঁচ কিলো-দশ কিলো করে তখন সেই বা কেন বাড়তি নাফা করবে না? তার পর মনে করুন পুলিশ ফাঁকি দিয়ে, বনবাদাড় ডিঙিয়ে ঐ দশ-পাঁচ কিলো যারা যারা আনছে তারাই বা কেন একটু বাড়তি লাভ করবে না? এই করে করে যুক্তফ্রন্টের আমলে চালের দরটা লাফিয়ে চার টাকা পাঁচ টাকায় উঠেছেল। বুঝলেন?'

'বুঝলাম। ত তুমি এ রকম লাভ-জনক ব্যবসাটা ছাড়লে কেন?'

অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যায় না। একটা বিড়ি মুখে খুব জোরে দেশলাই জ্বালালো। তারপর আমার দিকে একটা ঠেলে দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এ পয়সা থাকে না, বুঝলেন? উড়ে যায়। তা ছাড়া গ্রামের সবাই আমাকে ভালো চোখে দেখতো না। আমার হাতে এতো কাঁচা-টাকা, বাবুরা এসব ভাবতেই পারতো না। মুখে কিছু বলতে পারে না। কেন না আমি ত' তখন ওদের ধার আর ধারি না। ভেতরে ভেতরে জ্বলতো। আর মুখে খালি ধম্মোকথা আওড়াতো।

বলতো, এ সব রাস্তা ভালো নয় রে। ভালো নয়। কোনদিন বেঘোরে মারা যাবি।'

'বেঘোরে মারা যাবার ভয়ে ছেড়ে দিলে?'

'না।' এবার অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো রাম আদক। যতোক্ষণ বিড়ি খেল ততক্ষণ। তারপর সুতোর কাছটা ধরে ছুড়ে ফেলে বলল, 'আমি ছাড়তাম না ব্যবসা। আপনাকে সত্যি কথাই বলি। কিন্তু একদিন দেখলাম কি, বাড়ির বাইরে বাঁশবনের সামনে বাবাও একটা কোথা থেকে চাল-বওয়া সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। বাবার ঐ হাসিতে কি ছেল আমি তা জানি না, কিন্তু আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল চক্কর দিয়ে। শেষকালে আমার বাবাও, যে আমাকে এতো বড়োটা করেছে, বুকের কাছে নিয়ে বার বার বলেছে, সৎপথে থেকো বাবা, কখনো মন্দ পথে যেও না, কাউকে ঠকিয়ো না, মদ খেয়ো না, জুয়ো খেলো না, সেই বাবা শেষকালে চাল-বওয়া সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে? তারপর আর কিছু মনে নেই, ঝড়ের বেগে ছুটেছি, কে যেন আমাকে পেছন থেকে তাড়া করেছে আর আমি ছুটেছি দিকপাশ হারিয়ে, অপমানে মুখ কালো হয়ে গেছে, মনে এমনও হচ্ছে হাত-পা-গুলো আমার না, অন্য কারুর, যেন আমার ভীষণ অসুখ, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো জ্বলছে, মাথা ঘুরছে। একবার ডাক্তারখানায় গেলে হত, একটা মিকশ্চার, একটা বড়ি, ডাক্তারবাবু লিখে দিত, ওষুধের দোকান থেকে কিনে জল দিয়ে খেলে হতো। 'এই রাম, যাচ্ছিস কোথায়?' তাকিয়ে দেখলাম কখন মাঠের পথে উঠে এসেছি। 'বাঁকি'র ভুঁইতে আলু বসাচ্ছে তমিজুদ্দীন চাচা, 'ওর'ম পাঁড় কি মরি হয়ে ছুটেছিস কেনে?' কি যে জবাব দিলাম আমি নিজেই তা জানি না। ছুটতে ছুটতে একেবারে 'মাছরাঙা' গ্রামের সমিতির আপিসের সামনে গিয়ে হাজির। ভিতরিতে তখন জমাট ভীড়। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। একজন হাতের চেটোর ওপর ঘুসি মেরে কি বোঝাতে চাইছে, বাকিরা শুনছে, আমি পাগলের মত ওখানে গিয়ে বললাম, আমাকে বাঁচান। আমাকে উদ্ধার করুন আজ্ঞে।

ওরা এতোখ্খন তুমুল তক্কো করছিলো। হঠাৎ সবাই চুপ মেরে গেল।

তারপর কে একজন বলল, 'তুমি ত' চালের সাইকেল-বওয়া নোক। তা' এখেনে কি মনে করে?'

একবার মনে হল ফিরে যাই। সবাই জোট বেঁধেছে আমাকে জব্দ করতে। বাপটা দাঁত দেখিয়ে হাসছে। এরা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। কাজ নেই, ফিরে যাই। কিন্তু ফিরে কোথায় যাবো? আমার চোখে জল এসে গেল।

'আমি আর..., আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি আর চাল ব্ল্যাক করবো নি, যারা ব্ল্যাক করবে তাদের ধরবো। বিশ্বাস করুন, পাপটো আমি আর বইতে পারছি না, জাত মাহিষ্যের বেটা আমি, আমি আর পাপটা'...

কথাটা রাম আদক শেষ করতে পারলো না। অন্ধকারে রাম আদকের মুখ দেখা যায় না। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম আর এক নদীকে। রাগে, দুঃখে ফুলে ফুলে ফুঁসছে।

### ওয়ালী-মুজিবর-দৌলতানা আঁতাত কি আসন্ন?

পাকিস্তানে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মোটামুটি একটা সমঝোতা হয়েছে সত্যি, কিন্তু অনেক প্রশ্নে ওদের মধ্যে অন্তর অমিল খুবই প্রকট। সুতরাং অক্টোবর নির্বাচনের পর গঠিত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ওরা মিলে-মিশে যুক্তফ্রন্টের মতন হয়ে কাজ করবে কি না তা বলা শক্ত। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, আসন্ন জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেন না, আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সংখ্যা থাকবে অনেক বেশী।

সাম্প্রতিক পূর্ববংগে ছ' দফা দাবীর উদ্ভাবক আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আদর্শগত লড়াই করছে জাতীয় আওয়ামী দলের সংগে। উত্তর আর মধ্যবংগে মৌলানা ভাসানী পরিচালিত এই দলটির প্রভাব খুবই বেশী। এ ছাড়াও আরো তিনটি দল রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু জাতীয় জীবনে ওদের প্রভাব কম। কাজেই আসল লড়াইটা সীমাবদ্ধ থাকবে প্রথম দু'টি দলের মধ্যে।

হিসেব অনুযায়ী আওয়ামী লীগের পক্ষে ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ আসন পড়ার কথা। আর বাদবাকীগুলি যাবে জাতীয় আওয়ামী দলের পক্ষে।

শেখ মুজিবর বনাম মৌলানা ভাসানীর দ্বন্দ্ব যেভাবে বাড়ছে তা শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে নয়, সমস্ত পাকিস্তানের রাজনৈতিক রংগমঞ্চে পরিবর্তন আনতে পারে। এই দুই নেতার মধ্যে দ্বন্দ্বের শুরু হয় ১৯৫৭ সালে যখন সুরাওয়ার্দি পরিচালিত আওয়ামী লীগ ছেড়ে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি অংশ চলে আসে। ওদের বিক্ষোভের মূলে কারণ ছিল সুরাওয়ার্দি সরকারের পাশ্চাত্য-ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি। ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সচিব তখন শেখ মুজিবর। তিনি দাঁড়ালেন সুরাওয়ার্দির পক্ষে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি দলে ভাঙ্গন। যা হোক, পরে আস্তে আস্তে দলের নেতৃত্ব শেখ মুজিবরের হাতে চলে আসে।

ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ছাড়াও মুজিবর-ভাসানী দ্বন্দ্বের আর এক কারণ উভয়ের আদর্শগত বিভেদ। মৌলানা ভাসানী একজন বিদগ্ধ কৃষক নেতা। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। অনেকে তাঁকে কমিউনিস্ট বলে থাকে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হলেও সাম্প্রতিককালে তাঁর মতবাদ অনেকটা মাওবাদ-ঘেঁষা। কেন না, কৃষকদের নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

শেখ মুজিবর রহমান নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে দাবী করলেও মূলত তিনি উদারবাদে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক বিচরণক্ষেত্রে তিনি মধ্যপথের পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আজ যে জাতীয়তাবাদ জেগে উঠেছে সেটার অগ্রণী তিনিই। তাঁর পেছনে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলের সমর্থন প্রবল। তরুণ সম্প্রদায়ও তাঁর পতাকার তলে সমবেত। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তান আজ মুজিবরের নেতৃত্ব মেনে নেবার পক্ষপাতী। কাজেই শেখ মুজিবর রহমানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী পূর্ব পাকিস্তানে এতো জনপ্রিয়।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা হয়ে পড়ার কারণ হল পশ্চিম শাখার হাতে ওরা ক্রমাগত শোষিত, লাঞ্ছিত হয়ে এখন নিজ অধিকার ফিরে পাবার জন্য মরিয়া। হয়তো তাই শেখ মুজিবরের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। কিন্তু চরমপন্থীদের দাবী মেনে নিয়ে দেশের অনগ্রসর এলাকায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনা শেখ মুজিবরের পক্ষে অসম্ভব।

মধ্য পূর্ববংগ হচ্ছে শেখ মুজিবরের শক্ত ঘাঁটি। মৌলানা ভাসানীর সমর্থন মূলত গ্রাম্য এলাকার দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূমিহীন কৃষকরাই তাঁর দলের সমর্থক। জাতীয় আওয়ামী দলের শক্ত ঘাঁটি হল এই এলাকাগুলি—কুষ্ঠিয়া, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিং আর টাংগাইল। দেশের উত্তরভাগে অবস্থিত এই এলাকাগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক এলাকার চেয়ে অনগ্রসর।

এই এলাকাগুলিতে জাতীয় আওয়ামী দলের কৃষক শাখা—কৃষক সমিতির প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। কৃষক সমিতির নেতা হলেন মৌলানা ভাসানীর ডান হাত আবদুল হক। এখন পূর্ব পাকিস্তানে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ লক্ষের কাছাকাছি। চাল উৎপাদনের হার খুবই কম। দেশে মাথা পিছু বাৎসরিক আয়ের হার মাত্র ১৯৮। অবস্থা ১৯৪৮ সালের চেয়েও খারাপ। এই অবস্থার দরুণ পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলগুলির অবস্থা আজ বিস্ফোরণ-মুখী আগ্নেয়গিরির মতো। বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য কৃষক সমিতি আজ তৎপর।

জাতীয় আওয়ামী দল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক রংগমঞ্চে যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তা প্রতিরোধে শেখ মুজিবরের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। প্রথমত আগের চেয়ে তিনি এখন সমাজতন্ত্র আর রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বড় প্রবক্তা। দ্বিতীয়ত দলের ছাত্র শাখা—'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ' এখন বাঙালী জাতীয়তাবাদের দাবীতে সোচ্চার। বাঙালীদের মধ্যে যাতে কোন বিভেদ না আসে, তা লক্ষ্য করাই ছাত্র-নেতা তোফাইল আহমেদের উদ্দেশ্য। কেননা, যদি শহরে আর গ্রামে বিভেদ

বাড়ে, তবে ন্যাপের প্রভাব বাড়বার সম্ভাবনা থাকে।

ঢাকায় এক নির্বাচনী সভায় তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে পাট শিল্প, ব্যাংক আর বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হবে অবশ্যই।

বাঙালী জাতীয়তাবাদকে জাগানো হচ্ছে অনেক কারণে। আহবান জানানো হচ্ছে চরমপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের প্রচারে বিভ্রান্ত না হবার জন্য। বাঙালী জাতীয়তাবাদকে চূর্ণ করার জন্য চরমপন্থী ও দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি যাতে প্রভাব না বাড়াতে পারে, তার জন্য 'বাঙালী জাগো' আর 'জয় বাঙলা' এই দুটি আওয়াজ তুলেছেন আওয়ামী লীগ। প্রকাশ, সাম্প্রতিককালের উল্লেখযোগ্য প্রচার হল—'যাদের বাড় নকশালবাড়ী, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি।' এটা যে ন্যাপের চরমপন্থীদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

যা হোক, গত কয়েক সপ্তাহে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাপের প্রভাব অনেক কমেছে। তার কারণ, ভাসানীপন্থী দলে বিভেদ। অবশ্য কয়েক বছর আগে থেকেই ন্যাপ দু'দলে বিভক্ত—তলবীপন্থী (রিকুইজিশনিস্ট) আর ভাসানীপন্থী। তলবীপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হল পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান এলাকাগুলি। ওদের নেতা হলেন বাদশা খাঁর পুত্র ওয়ালী খান। পূর্ব পাকিস্তানে ওদের প্রভাব অনুল্লেখ্য। কিন্তু ভাসানীপন্থীদের মাঝে সাম্প্রতিক বিভেদ ন্যাপের মধ্যে সংকটের সূচনা করে। বিবাদের মূল কারণ আসন্ন নির্বাচনে যোগদানের প্রশ্ন।

ন্যাপের দু'জন শক্তিশালী নেতার নেতৃত্বে এক প্রভাবশালী অংশ আসন্ন নির্বাচনে যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ওঁরা হচ্ছেন ন্যাপের সাধারণ সচিব মহম্মদ তোয়া আর আবদুল হক। ওঁদের মতে : ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে দেশে চরম অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনা অসম্ভব। এর জন্য দরকার সংবিধান-বহির্ভূত উপায়। তাই ওঁরা পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগে নকশালবাড়ী ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

কিন্তু ন্যাপের ওয়ার্কিং কমিটি উক্ত প্রস্তাব মাত্র দুই ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাতিল করে। 'তোয়া-হক'পন্থীরা চেয়েছিল নির্বাচন 'বয়কট' করতে।

এই প্রসঙ্গে মৌলানা ভাসানীর মনোভাব লক্ষ্য করার বিষয়। প্রথমে তিনি নির্বাচনে নামতে নারাজ ছিলেন তাঁর স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব মানা হলে। অবশ্য পরে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে।

ন্যাপের মধ্যপন্থী অংশটি মনে করেন নির্বাচনে যোগদানের প্রশ্নটি প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় পরিষদে বিবেচনার জন্য নিয়ে যাওয়া উচিত। 'নির্বাচন 'বয়কট' করার পক্ষপাতী অংশ মনে করেন প্রাদেশিক পরিষদে হয়তো ওঁরা জয়লাভ করবেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদে কি হবে, তা বলা শক্ত। জয়ের সম্ভাবনা কম। কেননা, ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদ নির্বাচনে নামার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনে নামার পক্ষপাতী অংশটি মনে করেন, দলের বৈঠকে 'তোয়া-হক'-পন্থীরা হেরে গেলে ওরা ফিরে আসবে আবার সহযোগিতা করার জন্য। 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার খবরে প্রকাশ, যদি দলীয় বৈঠকগুলিতে চরমপন্থীরা হারে, তবে, ওরা দলত্যাগ করবে অবশ্যই; আর যদি জয়লাভ করে, তবে, নরমপন্থীদের বহিষ্কার প্রায় অনিবার্য। অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন ন্যাপের সংযুক্ত সচিব আনওয়ার জাহিদ।

এখন অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যদি জাতীয় আওয়ামী দলে ভাঙন ধরে, তা হলে আওয়ামী লীগের প্রভাব বাড়বার সম্ভাবনা থাকে। হয়তো তাই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের আসনগুলিতে ওদের এখন এক বিপুল পরিমাণ জয়ের সম্ভাবনা খুবই বেশী।

কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর যদি ন্যাপের চরমপন্থীরা সংবিধান-বহির্ভূত নকশালী কায়দায় আন্দোলন শুরু করে, তখন হয়তো বাধ্য হয়েই পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিক্ষেত্রে অশান্তি দূর করার জন্য মুজিবর-পন্থীদের পাঞ্জাবী পাঠান সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে হবে দমনের লক্ষ্য নিয়ে।

আবার যদি ন্যাপ সংযুক্তভাবে নির্বাচনে নামতে পারে, তবে, আওয়ামী দল অসুবিধায় পড়বে। জাতীয় আওয়ামী দল বেশ কিছু সংখ্যক আসন ছিনিয়ে আনতে পারলে শেখ মুজিবর-পন্থীরা বাধ্য হবে পশ্চিম পাকিস্তানের ক'টি রাজনৈতিক দল—মূলত পাঞ্জাবে দৌলতানা আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওয়ালী খানের সংগে রাজনৈতিক সমঝোতা (মোডাস ভিভেন্ডি) করতে। কারণ, একটি সুস্থির কোয়ালিশন সরকার গড়তে হলে এটা করা দরকার। কিন্তু এটা করার অর্থ হল পূর্ব-পাকিস্তানের ক'টি দাবী ছেড়ে দেওয়া। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি—স্বদেশে প্রভাব হারানো।

পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলই মূলত প্রাদেশিক। কাজেই কেন্দ্রে সুস্থির স্থায়ী কোয়ালিশন সরকার গড়তে হলে প্রাদেশিক দলগুলির একত্রে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এবং যে দল পূর্ব পাকিস্তানের আসনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে, ওঁদের ওপরেই বর্তাবে কোয়ালিশনের দায়িত্ব।

পত্রিকার খবরে প্রকাশ, শেখ মুজিবর রহমান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা ওয়ালী খানের মধ্যে রাজনৈতিক আঁতাত নাকি প্রায় আসন্ন। নির্বাচনের পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে নাকি ওদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে পর্দার অন্তরালে। যেহেতু উভয়েই স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার, ফলে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। ওদিকে জনাব ভুট্টোর দল পিপলস্ পার্টির বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দল 'সিন্দ্ যুক্তফ্রন্ট' নেতা বিদগ্ধ রাজনীতিক জি. এম. সৈয়দও উক্ত কোয়ালিশনে যোগদান করতে প্রস্তুত। অবশ্য কোয়ালিশনে ক্ষুদ্র অংশীদার হিসেবেই ওদের থাকার সম্ভাবনা বেশী।

তবে এ কথা মনে রাখা উচিত যে, কেন্দ্রের কোন কোয়ালিশন সুস্থির থাকবে না, যদি তাতে পাঞ্জাবীরা যোগদান না করে। কেননা আমলাতন্ত্র থেকে সামরিক বিভাগ ওদের কব্জায়। ওদেরকে বাদ দিয়ে কিছু করা অসম্ভব। সাম্প্রতিককালে পাঞ্জাবে দৌলতানার 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ', মৌলানা মাদুদির 'জামাত-ই-ইসলাম', নাসিরুল্লার 'পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি' আর জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'পিপলস্ পার্টি' সক্রিয়। ওদের মধ্যে দৌলতানার সংগেই শেখ মুজিবরের রাজনৈতিক আঁতাত হবার কথা। এর কারণ ঢাকায় আওয়ামী লীগের সংগে জামাত-ই-ইসলাম দলের সমর্থকদের সাম্প্রতিক সংঘর্ষ। হয়তো তাই দৌলতানা শেখ মুজিবরের এতো পছন্দের।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে জামাত-ই-ইসলাম দলের সংগে দৌলতানার বিরোধ অনেক, তা সত্ত্বেও তিনি আওয়ামী দলের ছ'দফা প্রস্তাবের সব মেনে নেবেন কি না তা বলা কঠিন। হয়তো গ্র্যান্ড কোয়ালিশনের অংশীদার হিসেবে তিনি থেকে যাবেন। যা হোক, অবস্থা যে দিকে চলছে, তাতে মনে হয় পাকিস্তানে ওয়ালী-মুজিবর-দৌলতানা অক্ষশক্তির রাজনৈতিক আঁতাত প্রায় আসন্ন।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

( সাতচল্লিশ )

**পট পরিবর্তিত হয়েছে।**

নতুনকালের ডুয়ার্স। নতুন দিনের মাটিতে।

রাস্তার ধারে-ধারে চোখ মেলুন, চোখ মেলুন বাজারে-বন্দরে—একশ বছর আগেকার চেহারা কল্পনাই করা যায় না।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, আগেকার ডুয়ার্স আর নেই মশাই। মরণের বীজাণু কিলবিল করত ডুয়ার্সের মাটিতে। এর জলে-বাতাসে ছিল মৃত্যুর বিষাক্ত পরোয়ানা। আদিবাসীরা ভয়ে-ভয়ে বাস করত। বাইরে থেকে যারা আসত এখানে, তারা আসত প্রাণটুকু হাতে নিয়ে। সর্বক্ষণ ধুক্-পুক্ করত।

জিজ্ঞাসা করি, এতই কি খারাপ জলবায়ু ছিল এখানে?

আমার কথা শুনে তাঁরা হাসেন। বলেন, ছিল না? তা হলে শুনুন মশাই। ডুয়ার্স প্রায় চেরাপুঞ্জীকে হার মানাবার ব্যবস্থা করেছিল। গড়ে একশ পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি বৃষ্টি হত মশাই। বক্সা, আলিপুরে আর ফালাকাটায় ছিল তখন বৃষ্টিপাত গণনার অফিস। আর জলবায়ুর কথা কী বলব। জ্বর-আমাশা, বাতব্যামো, বুকের অসুখ আর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাধি লেগেই থাকত। আর ছিল ভয়ংকর ব্ল্যাক ওয়াটার ফীভার। রক্ত-পেচ্ছাব করেই লোক পটল তুলত। দিনের পর দিন—বিশেষত ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত পুবাল বাতাসের ঝড় বইত এখানে। তাপমান যন্ত্রের পারদ পঁচাত্তর ডিগ্রির ওপরে উঠতেই পেত না। এই সব ভয়ংকর দিনগুলিতে নানারকমের অসুখবিসুখ, জ্বর ইত্যাদি লেগেই থাকত। আর এই বাতাসে তুলত ধুলোর ঝড়। জুন ও জুলাই—এই দু' মাস মাছির উপদ্রবে চোখে পথ দেখা যেত না, দিনের বেলায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হত। আবার জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিল ভয়ংকর রকমের গরম। শীতকালে গ্রাম-কে গ্রামে দেখা দিত কলেরা, এপ্রিল-মে মাসে বাতের তীব্র উপদ্রব। মোটের উপরে এ-সব অবস্থা আর নেই বললেই চলে।

এ অঞ্চলে স্বাস্থ্যের অবস্থা তা হলে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিশেষজ্ঞ বলেন, 'কোয়াইট্ এ হেল্ দি প্লেস্' জলবায়ুর হীনতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কর্মচারীদের মধ্যে এই সেদিনও ছিল ডুয়ার্স এলাউন্সের ঢালাও ব্যবস্থা। আজ আর নেই সেদিন। একেবারেই বদল হয়েছে।

ডুয়ার্স এলাউন্স তাহলে আর কেউ পাচ্ছেন না?

যাঁরা পেতেন, শুধু তাঁরাই পাচ্ছেন। চাকুরির নিয়মে নেহাৎ কাটা যাচ্ছে না বলেই—

মাঝখানেই এক সরকারী কর্মচারী বন্ধু বলে ওঠেন, তারও চেষ্টা যে হয় নি, তা কিন্তু বলতে পারবেন না।

বিশেষজ্ঞের দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর। একেবারেই সোজাসুজি আমার দিকে।—আপনি জানেন না বুঝি দাদা। প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সরকার—অবশ্য কংগ্রেসী আমলে।

চেষ্টাটা কি রকম?

হঠাৎ একদিন সার্কুলার এসে হাজির। 'হেন্সফোর্থ' ডুয়ার্স এলাউন্স বাতিল। যাঁরা পেতেন, তাঁদের চালু রইল বটে। আইনের পথে তা কাটানো গেল না বলে সরকার নতুন চাল চালতে লাগলেন। কর্মচারীদের বদলী করে করে নতুন জায়গায় ঘুরিয়ে নতুন করে এখানে ফিরিয়ে আনা। কিছুটা অগ্রসরও হয়েছিলেন সরকার। তাই নিয়ে এমন প্রতিবাদ হয়ে গেল যে, মাঝপথে এই প্রতিক্রিয়াশীল রীতিটা ছাড়তেই হল। এখন অবশ্য আর চক্রান্ত করে কাউকে বদল করা হচ্ছে না।

শুনে বলি, ভারী অদ্ভুত তো।

অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! বন্ধুটি বললেন, এখন অবশ্য যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকাল। এ-সব আর প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না বটে। তবে নতুন আর কেউ পাচ্ছেন না। অবশ্য এ নিয়েও বেশ আন্দোলন চলেইছে।

আন্দোলন। কথাটার দিকে লক্ষ্য রাখি। আন্দোলনেরই যুগ এটা। আন্দোলনের কথা আকাশে-বাতাসে। চারদিকেই আন্দোলনের সুর। আশাময় ভাষাময় আন্দোলনের তরঙ্গ এখন খুবই সোচ্চার।

ময়নাগুড়ির কাছাকাছি একটি গ্রামে দু'দিন থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে বলি ব্যাপারটা। সকালের দিকে গাড়ি ধরব বলে এসে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার ধারে। হঠাৎ দেখলাম আটপৌরে একটি চা'র দোকানের সাধারণ আসনে টেবিলের সামনে অনেক লোক। সবই সাধারণ মানুষ। বাবুশ্রেণীর মধ্যবিত্ত লোক নেই বললেই চলে।

এত লোক দেখে স্বভাবতই কৌতূহল। সামান্য গ্রামের একটি চা'র দোকানে কত ভিড় হতে পারে? জিজ্ঞাসা করতে জানলাম গ্রামের বয়স্ক লোকদের সভা হচ্ছে।

সভা কেন?

পুরানো গ্রাম-অধ্যক্ষের বিদায় চাই। তারই আলোচনা হচ্ছে।

কেন, বিদায় কেন?

ভদ্রলোক যিনি আছেন, তিনি গ্রামের মানুষজনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে নিতান্তই উদাসীন। অথচ তাঁকে ভোটের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচিত করা হয়েছে। তাই তাঁকে হটাতেই হবে।

কে আসবে তাঁর জায়গায়?

কেন, গ্রামেরই লোক আসবে। গ্রামের দশজনের সুখদুঃখের কথা যিনি ভালো বুঝবেন। যিনি দশের লোক—যাঁর আগ্রহ আছে, তাঁকে ছাড়া কাজ চলবেই বা কিরূপে।

তা হলে কথাটা এই। নয়া জমানা যে এটি। নতুন যুগ আসছে। অন্তত নতুন যুগের আগমনের আগের লক্ষণটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই কথাই মাসখানেক আগে বলেছিলেন জলপাইগুড়ির একজন প্রখ্যাতনামা বামপন্থী নেতা। কদমতলা রাস্তার চৌমাথায়। রাতে দাঁড়িয়ে আলোচনা হচ্ছিল, ইতিহাসে বিপ্লব আসবার আগে চিরকাল সব দেশে এমনটি হয়েছে। লোকের মনে বর্তমান শাসন ও অর্থ-

নীতির খাঁচাটার ভিতরে বিরাগ না এলে নতুনের আগ্রহ জাগবে কি করে?

কিন্তু এই অনিশ্চয়তা?

কোথায় অনিশ্চয়তা? তিনি বলছিলেন, জাতীয় চিত্ত এখন অস্থিরতায় সংক্ষুব্ধ। চিরাচরিত যা—যা কিছু চিরাগত—'ট্রাডিশানাল্ ভ্যালুস্', তাদের উপর শ্রদ্ধা লোপ পাচ্ছে। মানুষের অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে। আমরাও এটাই চাই। অস্বস্তি-অশান্তি বাড়তে বাড়তে লোক কখন বিপ্লবের আকারে ফুঁসে উঠবে। পায়ের তলায় একটা ভয়ংকর জীবন্ত আগ্নেয়গিরি—এর উপরে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘর-সংসার করে কি করে মানুষ! তাই সর্বত্র এক অফুরন্ত জাগরণ এসেছে।

বাসটা ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়ে ময়নাগুড়ির নিকটবর্তী সেই গ্রামের চা'র দোকানে গিয়ে বসেছিলাম। চা-খাবার নাম করে। উদ্দেশ্য আলোচনার গতিটা চলছে কোন্ স্তরে সেটি জানতে। তবে আশংকা ছিল হয়তো আমাকে দেখে ও'রা আলোচনায় ইতস্তত করবেন।

কিন্তু দেখা গেল যা ভেবেছিলাম, আদৌ তা নয়। একজন আমার নাম-পরিচয় শুধালেন মাত্র। খবর কাগজের লোক শুনে গভীর অন্তরঙ্গতায় আপন করে নিলেন।

ও'দের মধ্যে একজন, তাঁর নামটি টগর বর্মণ, তিনি আমাকে বললেন, দুনীতির গাছ শিকড়-শুদ্ধ উপড়ে ফেলছি আমরা। ঢের সয়েছি, আর একটি দিনও সইব না।

আপনারা কি করবেন?

কি করব তার বিচার করতেই মিলেছি। দশজনে যা সালিশ দেবেন, তাই হবে। বলে টগর বর্মণ বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। জাগ্রত জনচেতনা আজ দিকে দিকে। রাস্তায় যেতে-যেতে চোখে পড়ে পোস্টারের শোভাযাত্রা। পোস্টার আর পোস্টার রাশি-রাশি। ঘরের দেয়ালে, দেউড়িতে, বেড়ায়-বেড়ায়। সারা ডুয়ার্সের সর্বত্র। আন্দোলনের নেশায় পেয়েছে মানুষকে। প্রাণের অফুরন্ত উৎসবে নতুন যুগের আকুতি। বড়-ছোট নানা রকমারী হরফে। আলিপুরদুয়ারে বড়ো মস্ত বড়ো গাছটার কাণ্ডে চকিতে চোখে পড়ল গয়েরকাটায়। মস্ত-বড় হাট এ-অঞ্চলের' নিছক কৌতূহল-বশেই নেমেছিলাম হাট দেখে যাব বলে। বড় বড় অক্ষরে লেখা পোস্টারটায় চোখে পড়ল,

> এ লড়াই বাঁচার লড়াই।
> বাঁচতে হলে লড়তে হবে
> লড়াই করে বাঁচতে হবে।

যেন নতুন যুগের বেদ। অক্ষরে অক্ষরে ঘোষণা করছে বাঁচতে হলে আর কোনো পথ নেই। লড়াইয়ের মাঠে সামিল হতে হবে। সবাইকে মিলতে হবে সবার সঙ্গে। আন্দোলনের মাঠে জমায়েৎ চাই। স্বার্থপরের মত বাঁচার দুনিয়ায় চিড় ধরেছে।

আরেকটি পোস্টার। একটি দোকান-ঘরে। লাল কালিতে বড়-বড় হরফেঃ

> মেহনতি মানুষ জাগো।
> কাস্তে-হাতুড়ি তৈরি রাখো।

শ্রমজীবী কিষাণ-মজুরদের প্রতি অমর আহ্বান। দোলপূর্ণিমার দিন একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানেও একটি স্কুলের কাঠের দেয়ালে বড়-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছেঃ

> ভিয়েতনামের জবাব চাই।

একটি ছেলেকে বললাম, এখানকার ইস্কুলে পড়ো?

সে বললে, হ্যাঁ। তার পরণে অপেক্ষাকৃত সরু প্যান্ট, বুস সার্ট। হাতে চকচকে হাতঘড়ি।

বললাম, কোন্ ক্লাশে?

ক্লাশ ইলেভেনে। হায়ার সেকেণ্ডারী দেব।

বা, বা।

মুখে কথা সরে না। এইটুকু ছেলে। কী স্মার্ট!

তোমরা এ-গাঁয়ের ছেলে?

সে আবার মাথা ঝাঁকালে।

তা হলে তো ভালোই জানো তুমি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বলুন।

আমি বাইরে থেকে আসছি। গ্রাম দেখতে। আচ্ছা, এখানে কি দুপুর-বেলাটা কাটাবার মত কোনো আশ্রয় পাব?

আসুন না কেন।

কোথায়?

ওই যে আমাদের বাড়ি। খানিকটা দূরে আঙুল দিয়ে দেখাল।

তোমাদের অসুবিধে হবে না তো?

না, কিসের অসুবিধে!

সঙ্গে যেতে যেতে বলি, এই স্কুল কতদিনের?

সে ঠিক বলতে পারে না। বলে, অনেকদিনের। তারপর বলে, হেডমাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবেন।

তোমার বাবা বলতে পারবেন?

ছেলেটি হঠাৎ ম্লান হয়ে গিয়ে বললে, আমার বাবা নেই।

তবে তোমার কে আছেন?

মা আছেন। দাদা অবশ্য এখানে নেই।

দাদাও কি পড়ে?

না, দাদা। আমার চাইতে অনেক বড়ো। তিনি শিলিগুড়িতে একটা স্কুলে কাজ করেন।

মাস্টারী করেন?

একটু ইতস্তত করেছিলাম। বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই। আর কাছে গিয়ে কি হবে?

হঠাৎ রাস্তার মধ্যেই থেমে গিয়ে বলি, চলো না তা হলে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে ঘুরেই যাই।

আপনি ইতস্তত করছেন। মা আছেন বলে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। তিনি এখানকার মহিলা-সমিতির সেক্রেটারী। সবার সাথেই কথা বলেন:

আগ্রহ বেড়ে যায়। কেমন সেই মহিলা এই ছোট্ট গ্রামের মধ্যে যিনি মহিলা-সমিতি করে তার আবার সেক্রেটারী হয়েছেন। দেখতে কৌতূহল জাগে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি ভাই?

অপূর্ব। ভালো নাম তাই। সবাই অপু বলে ডাকে।

তা হলে ভাই, অপু, তোমরা এখানে অনেকদিন আছ নাকি?

অপু বলল, আমরা এ-গ্রামেরই মানুষ। জাতিতে মেচ। আমরা খৃস্টান।

তাদের সুন্দর কোয়ার্টারে দুপুরটা কাটল। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের নিচেই মনে হল। অপুর মতই স্মার্ট দেখলাম ও'কে। বি-এ পাশ করেছিলেন কুচবিহার কলেজ থেকে। আরো পড়বার ইচ্ছে ছিল। পড়া হয় নি। তার আগেই বিয়ে হল।

বেশ সুন্দর ঘর-গেরস্থালি। ছিমছাম। এই গ্রামের মধ্যে এমন সুন্দর পরিপাটি পরিচ্ছন্ন একটি গৃহসজ্জা কল্পনা করা যায় না। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার। কাচের আলমারীতে অনেক বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান চোখে পড়ল। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ফটো। সুভাষচন্দ্রের।

বাঁশ ও বেতের তৈরি সুন্দর কটি নিখুঁত শিল্পচর্চা চোখে পড়ল।

এগুলি কি কেনা?

না, এখানকার মেয়েদের তৈরি। আমাদের এখানে মহিলা-সমিতির মেয়েরা—।

কত সভ্যা হবেন?

সব মেয়েরাই।

মায়ের তৈরি হাতের কাজ দেখাল অপূর্ব। সুন্দর সূচীশিল্পের কাজ। একটি বেতের তৈরি পাত্র দেখাল অপূর্ব। শুধু বেত না, বাঁশও আছে। ওটি একটি তেলের চোঙা। বিশেষ কায়দায় তৈরি। যতবার উল্টো করা হবে, ততবারই এক ফোঁটা তেল পড়বে।

ভদ্রমহিলার চোখে সলজ্জ আভা। বললেন, এ কিছু নয়। কত ভালো জিনিস তৈরি করেন এখানকার মেয়েরা।

—এ পাত্রটি দেখে আমি কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি। এ একেবারে বিশেষ ধরনের শিল্প। আবার ইকনমি-ও বটে। তবে

এ-যুগের গৃহিণীদের যাঁরা জলের বদলে তেল দিয়ে রান্না করতে অভ্যস্ত, তাঁরা কিন্তু খুশি হবেন না।

বিকেলে ছেলেদের ক্লাব দেখলাম। বেশ অনেক বই রয়েছে। একটি যুবক, সে এ ক্লাবের সেক্রেটারী। আলিপুরদুয়ার কলেজ থেকে পাশ করেছে। বললে, এখানে সবরকমেরই কাগজ আসে। তবে রাস্তা-ঘাটের খুবই অসুবিধে। কাগজপত্র একদিন পর-পর পাই। বর্ষাকালে আরো অসুবিধে।

তবু তারা খুবই পরিশ্রমী। দেখলাম ক্লাবের লাইব্রেরীতে লেনিনের বই-ও আছে। আছে সুভাষচন্দ্রের তরুণের স্বপ্ন। এ-জাতীয় বেশ কিছু বই। ছেলেটি বলল, এখানকার হেডমাস্টার মশাই তাঁর নিজের সব বই লাইব্রেরীতে দিয়ে দিয়েছেন।

হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হল না। রাস্তায় ফিরতে ফিরতে দেখি বিকেলে হাট জমেছে। বিস্তর গরু-ছাগল-মুর্গী বিক্রি করতে জমেছে। কিছু কিছু ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কটি পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। এক দোকানে রেডিও বাজছে। ট্রানজিস্টর সেট।

একজন ট্যাক্সিওয়ালা বললে, আপনি যাবেন?

ইচ্ছে ছিল বাস-এ যাব। বাস আসতে দেরী। প্রায় একঘণ্টা। এ-সব রাস্তা এখন বেশ বাস চলে। আগে গরু-মোষের গাড়ি ছাড়া কিছু না বললেই চলে। ছিল ঝোপ-ঝাড়-জংগল। মানুষ থাকত জংগলে। দলবদ্ধ হয়ে চলত। এখন অনেক রাস্তা হয়ে গেছে ডুয়ার্সে। কত ঝকঝকে বাস রাস্তা আলো করে চলেছে।

ট্যাক্সিওলাকে বললাম, আর কতজন দরকার?

সাধারণত সাতজন যাবার কথা। তবে খায় অনেক বেশি। ট্যাক্সিওয়ালা অবশ্য এখন সাতজন পেলেই যাবে।

রাতে ফিরতে-ফিরতে দেখি ট্যাক্সি দাঁড়াচ্ছে জায়গায় জায়গায়। রেলওয়ে গুমটি বন্ধ। ড্রাইভার স্টিয়ারিং ছেড়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অসহিষ্ণু সিগারেটে টান দিচ্ছে ঘন ঘন।

এ-সব গুমটিগুলি বন্ধ থাকে কেন? বন্ধ রাখতেই হয়। কত রেললাইন হয়ে গেছে ডুয়ার্সে। রেল লাইনে-লাইনে পেঁচিয়েছে।

কতদিন আগেরই বা কথা। রেল-লাইন বলতে ডুয়ার্সে ছিল বি-ডি-আর। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম এই লাইন খোলা হয়। দোমহনী থেকে ডামডিম আর লাটাগুড়ি থেকে রাজগঞ্জ হিহাট সংযুক্ত হয়। ডামডিম-ওদলাবাড়ি-বাগ্রাকোটেতে আরওটা লাইন হয় ১৯০১-২ খ্রীস্টাব্দে। মাল-চালসা-চ্যাংমারি-দলগাঁও যুক্ত হয় এই লাইনে ১৯০৩-এর মধ্যে। ১৯১১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে ধীরে-ধীরে অন্য লাইন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে রেললাইন খোলা হয় আসামের দিকে। শিলিগুড়ি জংশন হয়ে এই নতুন রেললাইন শিবকের পথে ওদলা-ঝাড়ি - মালবাজার - মাদারিহাট - আলি-পুরদুয়ার জংশন ছুঁয়ে চলে গেল আসামের পথে। কুচবিহারের সঙ্গে রেললাইন এদিকে যুক্ত হয়েছিল আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত। সেটা ঘটেছিল আগেই। আসামের সাথে সংযোগরক্ষাকারী রেললাইনের নাম হয়েছিল নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে। পরে দাঁড়াল এন-এফ-আর। অর্থাৎ কিনা নর্থ ফ্রন্টিয়ার।

কিন্তু এই ব্যবস্থা যত দ্রুতগতিতেই সম্পন্ন হোক না কেন, এতে নানা অসুবিধে হচ্ছিল। ফলে নতুন রেলওয়ে লাইনের কথা ভাবতে হল। সম্প্রতি গড়ে তোলা হয়েছে নতুন ব্রডগেজ লাইন। তিস্তার ওপরে রেল সেতু এই ব্রডগেজ লাইনকে করেছে সহজসাধ্য। নতুন অনেক স্টেশন করতে হয়েছে এ-জন্যে। দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের কাজকে করেছে ত্বরান্বিত। ব্যবসা-বাণিজ্যকে। নতুন স্টেশান হয়েছে জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি রোড। ময়নাগুড়ি - ধূপগুড়ি - ফালাকাটার পথে চলেছে এই লাইন। ফলে অসংখ্য গুমটির সৃষ্টি হয়েছে।

তারাপদর কথা মনে আসে। রেল-লাইন তৈরির কাজে কন্ট্রাক্ট নিয়ে দীর্ঘ-দিন ছিল এইদিকে। তারাপদ সাহা। জটেশ্বরের দিকে একবার আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে।

তারাপদ বলে, বাঙালীর ছেলে। ক্যাম্পে থাকব, কোনদিন কি ভেবেছি? তা-ও থাকতে হল দাদা। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস।

বলে আর নতন কেনা গোল্ডফ্লেক্ সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরায়। টেরিলিনের প্যান্ট-সার্ট। হাতে চামড়ার সৌখিন অ্যাটাচি।

অনেক টাকা করেছে তারাপদ। তার জন্য থাকতে হয়েছে জংগলে। দিনের পর দিন কুলিদের পিছনে খাটতে হয়েছে অমানুষের মত। খাটছে কুলিরা। রাত জেগে জেগে আলো জ্বালিয়ে কাজ হয়েছে। বনের মধ্যে চলেছে ডাইনামো। ধকধক ধকধক শব্দে। ভয়ে বনের প্রাণী পালিয়েছে দূরে।

আর্থওয়ার্ক হয়েছে।

রেললাইন হয়ে যেতে দেখি, দু সারি লম্বা ইস্পাতি লাইন ঝকঝক করে জ্বলে রোদ্দুরে। ক্যাম্প উঠে যাচ্ছে। নতুন জায়গার কাজে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পলক পড়ে না।

গোল্ডফ্লেক সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে বলে তারাপদ, ওইখানে ছিল একটা মস্ত কদমগাছ।

প্রথম যখন আসি তখন থেকেই দেখেছি। বর্ষায় ভিজে ভিজে জল-হাওয়ার সঙ্গে কদমফুলের গন্ধ আসত। রাত্রে শুয়ে ঘুম আসত না। বৃষ্টির জন্য ক'দিন কাজ বন্ধ। ডাইনামো অবশ্য চলে। আজ দিনের বেলায় উঠে এসে দেখি কোথাও নেই গাছ। সব ধু-ধু করছে ফাঁকা। অমনি করেই সব কিছু ভেঙে পুরানোকে সরিয়ে তৈরি হয় নতুনকালের রাজপথ। নতুনেরা তাদের মনেও রাখে না। ঝকঝক শব্দে ওই পথে কতদিন যাবে ট্রেন। জানালার ধারে বসে কেউ ঝিমোবে। কেউ বা স্বপ্ন দেখবে। দূরের মানুষ যাবে নিকটে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে, স্বপ্ন নিয়ে। কাছের মানুষ যাবে দূরে অস্পষ্ট ঝাপসা চোখ নিয়ে। দেখবে অন্ধকার, দেখবে চাঁদের আলো, সকালের উজ্জ্বলতা। কদমগাছটার কথা ভুলেও কারু মনে আসবে না।

সংগ্রামের পথও যে তাই। মনে মনে ভাবি। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। একটা গুমটি। হয়ত গাড়ি আসবে। যতক্ষণ না আসে গাড়ির ভিতরে বসে মনে মনে ভাবি, সংগ্রামের পথও যায় অমনি করে পুরাতনের বুক দুমড়ে ভেঙে মাড়িয়ে। নতুনকালের স্টেশানে। পুরানকে ভেঙে জাগছে নতুন। নতুনকালে ডুয়ার্স।

জানালায় আকাশ দেখি। আলোগুলি জ্বলজ্বল করে নক্ষত্রের। একটু পরে ট্রেন চলে যেতে গাড়ি ছাড়ল। গুমটি খুলে দিয়েছে। কেউ কেউ যেন বলাবলি করছে গাড়ির ভিতরে, জানেন না দাদা, অনেক সময় হাতীর জন্যেও রাত-বিরেতে গুমটি বন্ধ রাখতে হয়।

কেউ একজন প্রশ্ন করলেন, কেন?

বক্তা বিড়ি ধরাচ্ছেন। সাবধানে হাওয়া আড়াল করে। বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। বললেন, ব্যাটাদের কাণ্ডখানাই ওই। সোজা পথ থাকতে ঘুরে যাবেন কেন? গাড়ি স্পীড দিয়েছে। হয়তো ড্রাইভার সময়টা পুষিয়ে নিতে চায়।

আমি আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। সামনের রাস্তার দিকে। এ-সব রাস্তায় অত দ্রুত দৌড়ানো অনেক সময় বিপজ্জনক। কিন্ত মানুষের রক্তের গতি তাকে স্থির থাকতে দেয় না।

এক জায়গায় মাটি থেকে অনেক উপরে তীব্র লাল আলোর ঝিলিক। বললাম, ওটা কি?

পাশে-বসা ভদ্রলোক বললেন, আসাম-বারৌনি পাইপ লাইন গেছে এ-পথে। মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট দূরত্বে আছে চেকপোস্ট।

চেকপোস্ট কেন?

যদি পাইপ লাইন ফাটে, কি কোনো কৃত্রিম কারণে—ভূমিকম্পে বা বন্যায় পাইপ লাইন ফাটে তো সময় মত চেকপোস্টের চাবী ঘ্নরিয়ে তাকে আটকাবে। খানিকটা ক্ষতি অবশ্য হবেই। চব্দ্ব সময়মতো সতর্কতাম্লক ব্যবস্থা।

লাল আলো কেন?

ওটাও সতর্কতাম্লক ব্যবস্থা সরকারী নির্দেশে। ওপরের কোনো হেলিকপ্টার কিংবা প্লেনের সঙ্গে যাতে পাইপ লাইনের চেক-স্টেশানের অত উঁচ্দ্ব খ্টিতে ধাক্কা না লাগে—

শ্দ্নতে শ্দ্নতে শিহরণ অন্দ্ভব করি। দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সির জানালায় হাওয়া ছ্দ্টে ছ্দ্টে এসে যেন উড়িয়ে দিতে চাইছে।

একটা জোনাকি উড়ে এল গাড়ীতে। জামায় বসেছে। জোনাকির গতি এখন কত? ঘন্টায় অন্তত পঞ্চাশ মাইলের কাছাকাছি।

কিন্তু—

ভাববার আগেই গাড়ির জানালা গলিয়ে লাফ দিল রাত্রির সম্দ্রে।
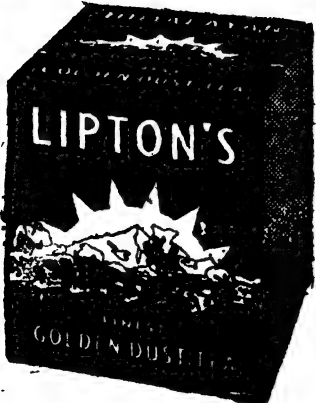
[ক্রমশ]

চাঁদের শান্তসাগরে রথীরা নামলেন সেদিন এবং তারপর ঝঞ্ঝাসাগরে আবার নামলেন। মহাকাশ-বিজয়ের পথে নতুন যুগের সূচনা হল সেই থেকে। মানুষ ভাবতে পারল, পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে অন্য কোন গ্রহে বা উপগ্রহে পাড়ি দেওয়া সম্ভব।

সম্প্রতি গ্রহান্তরে পাড়ির এই ভাবনাটা মানুষকে যেন পেয়ে বসেছে। যেন অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহেও না গেলেই নয় তার।

—সে যাবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা,—আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই মঙ্গল ও শুক্রে যাবে সে, বৃহস্পতির চাঁদে যাবে এবং এ ছাড়া হয়তো যাবে সৌর জগতের অন্য সব নতুন জগতে। আগামী পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যেই হয়তো আরও কতকগুলো ভিন্ন জগতে সে পাড়ি দেবে। বিজ্ঞানীরা যদি উঠেপড়ে লাগেন তো মাত্র বারো বছরের মধ্যেই মহাকাশে পাকাপাকিভাবে স্পেস-স্টেশন গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং এ স্টেশন সাতাকারের স্টেশন হয়ে উঠবে একটি। কারণ, মানুষ এ-থেকেই যাতায়াত করবে গ্রহান্তরে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষ-অধ্যুষিত এই রকম স্পেস-স্টেশন ১৯৭৫ সাল নাগাদ গড়ে উঠবে এবং ১৯৮২ সালের মধ্যেই তা পরিণত হবে প্রায় শ'খানেক বিজ্ঞানীর স্থায়ী গবেষণা-কেন্দ্রে।

বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানীরা চাঁদেও ধার মাত্র পাড়ি দেবেন এর মধ্যে। ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাদ হয়তো বা ওখানে এমন সব ঘাঁটি গড়ে তুলবেন, যেখানে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন নয়, দরকার হলে কয়েক মাস এবং এমন কি পুরো বছর অবধি থাকা যাবে।

মঙ্গল গ্রহে এত দীর্ঘদিন থাকার কথা কেউ অবশ্য ভাবছেন না, তবে, আগামী দশ-পনের বছরের মধ্যেই সেখানে কেউ কেউ যে পদার্পণ করবেন, সে-সম্বন্ধে অনেকেরই আজ আর কোনো সন্দেহ নেই।

আজ স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান সম্বন্ধেও অনেক নতুন কথা শোনা যাচ্ছে। মানুষ-বিহীন এই যানগুলো আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই মহাকাশে ছাড়া হবে এবং সৌরজগৎ সম্পর্কে অনেক নতুন খবর এদের দৌলতে আমরা জানতে পারবো। এরা কেউ যাবে মঙ্গল গ্রহের দিকে, গিয়ে হয় প্রদক্ষিণ করবে তাকে, আর না হয় তার বুকে নামবে; আবার কেউ যাবে বৃহস্পতিকে পাশ কাটিয়ে দূরের কোনো গ্রহ বরাবর। কেউ কেউ বুধ গ্রহে যাবে হয়তো, আবার কেউ হয়তো শুক্র গ্রহকে তাক করে ছুটবে।

এ ছাড়া, ১৯৭০ থেকে '৭৩ সালের মধ্যে চাঁদে আরও ৭টি অ্যাপোলো-মহাকাশযান যাবার কথা। এরা ভিন্ন ভিন্ন সব জায়গায় নামবে। চাঁদের দেশের পাহাড়-পর্বতের গায়ে নামবে কেউ, আবার কেউ নামবে কোপারনিকাস-জাতীয় গহ্বরের গায়ে।

কিন্তু চাঁদে বা গ্রহান্তরে অভিযানের ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য খুবই। একে আরও অনেক কম খরচায় আরও বেশি সহজসাধ্য ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে হবে এবং তা করতে হলে আমাদের চাই এমন সব রকেট, যারা পৃথিবী থেকে পৃথিবীর কক্ষপথে শত শত বার যাতায়াত করলেও অকেজো হবে না।

এদিকে স্যাটার্ন-৫ জাতীয় রকেটগুলো কিন্তু একবার মাত্র দায়িত্বপালন করেই নিঃশেষিত হচ্ছে। অথচ এদের এক-একটিকে গড়ে তুলতে খরচ পড়ছে ১৫, কোটি ডলার।

এত বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে মহাকাশে রকেট পাঠানো [illegible]

মাত্র ৪ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তোলা মঙ্গলগ্রহের এই [illegible] এক [illegible]। ([illegible]-৬ এই ছবিটি [illegible]।) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবতরণ [illegible]।

সেদিন কথায় কথায় দিলীপ বলছিলো—
“আমি জেতাতে মার সেকি আনন্দ যদি দেখতেন !”
Bournvita

নিয়মিতভাবে চালু রাখা, এমন কি ধনী দেশের পক্ষেও বেশিদিন সম্ভব নয়। তাই এ-ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাবার কথা ভাবছেন অনেকেই। অনেককেই এখন বলতে শোনা যাচ্ছে, রাসায়নিক উপকরণের সাহায্য নিয়ে দূর-দূরান্তরগামী রকেট গড়ে তোলা দারুণ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ কাজ। অথচ রকেট চালনার কাজে পারমাণবিক শক্তিকে যদি লাগানো যায় তো একদিকে ব্যয় যেমন কম হবে, অপরদিকে তেমনি রকেটও হবে বেশি শক্তিশালী।

পারমাণবিক শক্তিচালিত এই রকেটগুলো স্থায়িভাবে গড়ে তোলা স্পেস-স্টেশন থেকে তাদের আসল কার্যক্রম শুরু করবে। স্পেস-স্টেশন আবার নানাভাবে সাহায্য করবে আমাদের। গ্রহান্তর-যাত্রী রকেটদের যাত্রাস্থল হিসেবে তো বটেই, মূল্যবান সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজেও এই স্টেশন বিস্ময়কর এক ভূমিকা নেবে।

পৃথিবী থেকে রকেট নিয়মিতভাবে যাতায়াত করবে ওখানে। আর ওই রকেটগুলোর ভূমিকা হবে অনেকটা যেন বিমানের মতো।

ঠিক বিমানের মতোই পাখা থাকবে ওদের, পৃথিবীতে নেমে আসবে ওরা আড়াআড়িভাবে। তবে ওদের ওঠবার কায়দাটা বিমানের তুলনায় আরও সোজা এবং খাড়া হবে। স্পেস-স্টেশনে যাত্রী এবং মালপত্র পৌঁছে দিয়ে সোজা আবার পৃথিবীতে ফিরবে ওরা।

এদিকে ওরা যখন এইভাবে পৃথিবীতে ফিরবে, পারমাণবিক শক্তি-চালিত রকেটরা তখন ছুটবে চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের দিকে। কারণ, চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহ প্রদক্ষিণরত স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বটা শেষ অবধি ওদেরই ওপর গিয়ে পড়বে।

অবশ্য, সন্দেহ নেই, পারমাণবিক শক্তিচালিত এ-ধরনের রকেট চালু হতে সময় লাগবে এখনও। এর আগে আরও কিছু কাজ সেরে না নিলেই নয়। দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে মহাকাশে রেখে না করলেই নয় কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

স্থির হয়েছে, ১৯৭২ সাল নাগাদ স্যাটার্ন—৫ রকেটের তৃতীয় স্তরের শূন্য জায়গায় গড়ে তোলা হবে এক ল্যাবরেটরী।

দূর থেকে এই ল্যাবরেটরীকে দেখাবে সিলিণ্ডারের মতো। কিন্তু জায়গা ওতে যা থাকবে, তা দেখে ছোট-খাটো কোনো ডাকবাংলোর মালিক ঈর্ষান্বিত হতে পারেন।

প্রথম দফা পর্যবেক্ষণের সময় এই ল্যাবরেটরীতে যাত্রী থাকবেন মোট তিনজন। দীর্ঘ ২৮ দিন ধরে কক্ষপথ ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবেন ওঁরা।

দ্বিতীয় দফা প্রদক্ষিণ-পর্বে যাত্রীর সংখ্যা বাড়বে না; কিন্তু প্রদক্ষিণের সময়টা বেড়ে দ্বিগুণ হবে। মোট ৫৬ দিন ধরে চলবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই সব পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারবো, দীর্ঘদিন ধরে মহাশূন্যে বিচরণ করলে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দেহের ওপর কী কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং কী কী সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মহাকাশে স্থায়িভাবে কোনো স্পেস-স্টেশন গড়ে তোলা সম্ভব।

স্থায়ী স্পেস-স্টেশনে ১২ জন যাত্রী থাকবেন প্রথমে এবং তারপর যাত্রীর সংখ্যা ধীরেসুস্থে বাড়ানো হবে। পারমাণবিক শক্তি-চালিত রকেটকেও হাতের কাছেই প্রস্তুত রাখা হবে তখন।

অমিত শক্তিধর সেই রকেট গড়ার প্রস্তুতি এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। রকেটের মডেল তৈরি করে নেভাডা মরুভূমিতে হয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাসা'র অধীনস্থ 'অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন' জানিয়েছেন, সম্প্রতি এ নিয়ে যে পরীক্ষা হয়ে গেল, তাতে কিছুটা সাফল্যও অর্জন করা গেছে। এই পরীক্ষাকালে প্রতি পাউণ্ড জ্বালানীতে রাসায়নিক জ্বালানী-সমন্বিত সব চেয়ে শক্তিশালী রকেটের চেয়েও দ্বিগুণ শক্তি উৎপাদিত হয়েছে। অথচ মজা এই যে, শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রটি বড় নয় মোটেই; এমন কি গৃহস্থ বাড়ির একটি রেফ্রিজারেটার-এর চেয়েও বড় নয়। কিন্তু এ থেকে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে, তা যে কোনো একটি অতিকায় বাঁধের জলবিদ্যুৎ-শক্তিকে হার মানাতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পারমাণবিক শক্তি-চালিত রকেট গড়ে উঠতে সময় লাগবে। ১৯৮০ সাল পেরিয়ে যাবে হয়তো। এবং হয়তো বা এই বিশেষ ধরনের রকেটে করেই মানুষ মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেবে। দীর্ঘ ১ বছর ৮ মাস ধরে মহাকাশ-ভ্রমণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করবে সে।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই আমাদের অজানা। ১৯৬৯ সালের ম্যারিনার—৬ এবং ৭-এর দৌলতে অনেক নতুন তথ্য আমরা জানলেও ওখানে জীবন আছে কি না, তা কেউ বলতে পারে নি।

মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন খবর ১৯৭১ সালের ম্যারিনাররা দেবে। কারণ, ৬ এবং ৭-এর তুলনায় মঙ্গলগ্রহের আরও অনেক কাছে যাবে ওরা। গ্রহটিকে ওরা প্রদক্ষিণ করবে।

'ন্যাসা'র উদ্যোগে ১৯৭৩ সাল নাগাদ স্বয়ংক্রিয় দুটি মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করার কথা।

প্রতি দু' বছর অন্তর মঙ্গলগ্রহ আমাদের থেকে এমন এক অনুকূলে দূরত্বে আসে, যখন সেখানে যন্ত্রযান পাঠালেও পাঠাতে পারি আমরা।

এদিকে গ্রহটিতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রযানই শুধু নয়, মানুষবাহী মহাকাশযান পাঠাবার কথাও অনেকে ভাবছেন।

সম্প্রতি বলছেন অনেকেই যে, ২৫০ ফুট লম্বা দুটি মহাকাশযানকে পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে একই সঙ্গে আমরা মঙ্গলগ্রহে পাঠাবো। প্রতিটি মহাকাশযানের সঙ্গে তিনটি করে পারমাণবিক শক্তি-চালিত রকেট যুক্ত থাকবে। যান দুটির প্রতিটিতে যাত্রী থাকবেন ৬ জন করে।

যাত্রীদের মঙ্গলগ্রহে যেতে সময় লাগবে মোট ২৫১ দিন। যাত্রাপথে মহাকাশযান দুটির একটি অপরটিকে ছুঁয়ে থাকবে, যাতে কোনোরকম গোলযোগ দেখা দিলে নভশ্চররা সহজেই যান-পরিবর্তন করতে পারেন।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য ভরসা দিচ্ছেন। বলছেন, পরিবর্তনের দরকার হয়তো হবে না। কিন্তু দীর্ঘদিন শূন্য-মাধ্যাকর্ষণে থাকার ফলে নভশ্চররা কিছু কিছু অসুবিধে ভোগ করতে পারেন। তাই স্থির হয়েছে, মহাকাশযান দুটি মঙ্গলগ্রহের দিকে এগোবার সময় ঘুরবে ধীরে ধীরে; কেন্দ্রাতিগ শক্তি সৃষ্টি করবে এবং এরই ফলে ভারশূন্যতার জন্যে নভশ্চরদের অসুবিধে অন্তত কিছুটা পরিমাণে লাঘব হবে।

এদিকে নভশ্চররা মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে পৌঁছুবেন ১৯৮৪ সালের ৯ই জুন। মোট ৮০ দিন ধরে গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করবেন ওঁরা, তবে সবাই একসঙ্গে করবেন না। প্রদক্ষিণ শুরু করার কিছুদিন পরেই ৬জন অভিযাত্রী নেমে আসবেন মঙ্গলগ্রহের মাটিতে। ওখানে ওঁরা ১ মাস থাকবেন, বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন এবং তারপর কক্ষপথে ফিরে এসে মূল মহাকাশযান দুটির সঙ্গে মিলিত হবেন আবার।

১৯৮৫ সালের ২৫শে মে মোট ৬০১ দিন বাদে পৃথিবীর কক্ষপথে ওঁদের ফেরার কথা।

কক্ষপথ থেকে পৃথিবীতে আসাটা কষ্টকর হবে না মোটেই: বরং তা হবে 'সাটল' বাস ধরে ছোটখাটো কোনো দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার মতো।

তা হোক এবং যত বেশি নিশ্চিন্তেই ফিরে আসুন না-কেন নভশ্চররা, পৃথিবীর মানুষ কিন্তু ওঁদের কাছ থেকে নতুন [illegible] কিছু প্রত্যাশা করবে।

মালতীর প্রতিদিনই মনে হয় লাইন দুটো কারা যেন আস্তে আস্তে রেখে যায়, তারপরে উগরে ওঠে, সব শেষে সেই দানবের অত্যাচারে জ্বলে উঠেও মরে যায় না। ঝড় বওয়ার সাথে সাথে তারাও সমান তালে যুঝে চলে, আর যেন দ্রুত বলে ওঠে "দেখে নেব—দেখে নেব তোকে", "দেখে নেব—দেখে নেব তোকে"। প্রত্যুত্তরে সেই দানবটাও যেন জানিয়ে যায় "ঠিক আছে—আবার আসব", "ঠিক আছে—আবার আসব"।

এ আবিষ্কার সম্পূর্ণ মালতীর নিজের। প্রথম প্রথম আওয়াজ শুনে তার ভয় লাগত। ঘাবড়ে যেত। অবাক হত। দুকানে হাত দিয়ে কখনও কখনও ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকত। কিংবা সোজা রান্নাঘরে গিয়ে বড়দি, মেজদির কাছ ঘেঁষে বসে পড়ত। ওরা হাসত। ছোট বউয়ের ছেলে-মানুষীটা উপভোগ করত। কোন কোন দিন হয়ত মেজদি বলত,—"এত ভয় কেন লা? ওটা তো একটা যন্ত্রর গাড়ি। এ বাড়ির ছোট যন্তরকে তো একটুও"......। কথা শেষ না করেই হেসে গায়ে ঢলে পড়ত। বড়দি হয়তো বলত,—"এবারের ছুটিতে ঠাকরপো এলে তাকে বলব তোকে রেল-গাড়িতে চড়াতে"। আস্তে আস্তে মালতীর ভয় কেটেছে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা ছেড়ে এখন সোজাসুজি পিছ-দরজা [illegible] বেরিয়ে আসে। এসে দেখে কিভাবে রেলগাড়ি ধুকতে ধুকতে ছুটতে ঝম্ ঝম্ শব্দের মধ্যেও তারা যেন কি বলাবলি করে। সব আবিষ্কার করেছে সে।

রেলগাড়ি দেখে ফুলবাণী জেলার রিকপুর গ্রামের মেয়ের বিস্ময়ের ঘোর কাটলেও আকর্ষণ এতটুকু কমে নি। বরং যেন আরো বেড়েছে! কেমন একটা নেশায় যেন দাঁড়িয়ে গেছে এখন। তাই সময় হলেই কিংবা শব্দ শুনলেই টুক্ করে পিছ-দরজা খুলে বেরিয়ে এসে রেলগাড়ি দেখে মালতী। হাসিমুখে স্বপ্নাবিষ্টের মত অপসৃয়মাণ যাত্রীদের দেখে। গাড়ি দূরে না মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কোন দিন মিলিয়ে যাওয়ার পরেও দাঁড়িয়ে থেকে দেখে সামনের পাহাড়টা।

মাদ্রাজ এক্সপ্রেসটা বেরিয়ে গেল। লাইন থেকে এখনও তার শব্দ মিলিয়ে যায় নি। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মালতী বাসায় ঢুকে পড়ল এবং উঠোনে পা দিতেই দেখতে পেল বড়দি ভেজা-কাপড় তারে মেলে দিচ্ছে। বড়দির সাথে চোখাচোখি হতেই ধমক দিয়ে উঠল, "শীগ্গির স্নান সেরে নাও। দুপুর গড়াতে চলল"। মেজদি একবার এমন-ভাবে তাকাল যেন বলতে চাইল,—রেল-গাড়ির সখ এখনও মিটল না!

মালতী কাউকে কিছু বলল না। শুধু এক টুকরো হাসল। তার ফর্সা গালে টোল পড়ল। এবং পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খিল দিল মালতী। তারপরে চারদিকে একটু চোখ ফেলল। বাক্সের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে শাড়ির নিচে থেকে ফটোটা টেনে বের করল। নিকেল করা ফ্রেমে আটকানো একটা বলিষ্ঠ যুবকের ফটো। তার স্বামীর ফটো।—কী সুন্দর দেখতে! আর কত দিন এভাবে থাকতে হবে! তুমি কি আসবে না? সেই কত দিন ক—ত দিন আগে তোমাকে দেখেছি।...দেখতে দেখতে বিয়ের পর ন'টা মাস চলে গেল। আর তিনটে মাস থাকব কি করে বল তো?... তুমি এলে আমরা দুজনে একসাথে শহরে গিয়ে ফটো তুলব। আর রেলগাড়িতে চড়ব। আমি কোন দিন রেলগাড়িতে চড়ি নি।

—ঘরে কে? দরজা খোল।—মেজ-জা দরজায় ধাক্কা দিল। একটু সন্ত্রস্ত হল মালতী। চারদিক দেখে সামান্য ভেবে বলল,—আমি মেজদি কাপড় ছাড়ছি।—ফটোটাকে বুকের সাথে জোরে একবার চেপে ধরে তাড়াতাড়ি বাক্সের শাড়ির নিচে লুকিয়ে ফেলল। ডালাটা বন্ধ করে আস্তে উঠে এসে দরজা খুলে দিল।

স্নানের সময় কুয়ো থেকে জল তুলতে মালতী ভাবল আজ সে চিঠি লিখবে। তার স্বামীকে চিঠি লিখবে এবং সম্বোধন করবে 'মোর মনেরো গোপনো রাজাটি' বলে। তাতে কি ও রেগে যাবে? উঁহু —খুশি হবে। 'উর্বশীর চিঠি' থেকে কবিতার লাইন তুলে দিয়ে সে শহরের মেয়ের মত চিঠি লিখবে। তারপরে উত্তর

গোপন রাজাকে। আজ চিঠি লিখে কাল যদি ডাকে দেওয়া যায়, তাহলে ও চিঠি পাবে পাঁচদিন বাদে। সেই দিনই যদি উত্তর দেয়, তবে সে চিঠি পাবে তারও পাঁচ দিন পরে। মোট কথা দশ দিনের আগে সে কোনমতেই চিঠি পাবে না।—

উঃ, দ—শ দিন! দশটা কমে যদি তিনে দাঁড়াত তাহলে কেমন মজা হত!

দক্ষিণে ইচ্ছাপুরম আর উত্তরে বহরমপুর, দু'য়ের মাঝখানে গোলনথরা গ্রাম। ফুলবাণী জেলার দিকপুর গ্রামের সুনাবার মায়েকের মেয়ে মালতী যখন এ গাঁয়ে বউ হয়ে আসে, তখন প্রথম সে রেলগাড়ি দেখে। কেন না, তাদের জেলায় রেলগাড়ি নেই। সে দিনগুলির কথা ভাবলে এখনও হাসি পায় মালতীর। দুপুর বেলায় বাড়ির সামনে এসে গরুর গাড়িটা থেমেছিল। গাড়ি থেকে নামতেই ঘোমটার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে এক ঝলকে দেখেছিল অনেকগুলি মুখ আর গায়ে গায়ে লাগালাগি তেলেঙ্গাদের ঘর। বড় ভাশুর বিরশিনারায়ণের গম্ভীর হাঁক-ডাক শোনা গিয়েছিল। তখন মালতীর মনে পড়ছিল দিকপুরের কথা। তার বাড়ির কথা। তার বাবাকে, মাকে ও আর সবাইকে। এমন সময় হঠাৎ একটা বিরাট কানফাটানো আওয়াজে সে চমকে উঠে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ভিড়ের মাঝেও বড়-জা'র হাত শক্ত করে ধরতে চেয়েছিল। পরে বুঝেছিল ওটা ট্রেনের শব্দ। সেদিনই ছিল ওদের ফুলশয্যার রাত। সে রাতে ও কথা বলবার জন্যে অনেক সাধ্যসাধনা করেছিল। কিন্তু কিছুতেই বলে নি মালতী। লজ্জায় অজানা আশঙ্কায় কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে। ঐভাবে থাকতে থাকতে এক সময়ে তার ঘুম পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তীব্র হুইসলের শব্দে চমকে উঠে ভীষণ ভয় পেয়ে সোজা তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিল। শক্ত হাতে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। মুখ লুকিয়েও মালতী স্পষ্ট অনুভব করেছিল জানলা-দরজা-খাট সমস্ত কিছু যেন থরথর করে কাঁপছে। ট্রেনটার শব্দ যখন সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে গিয়েছিল, তখন মালতী আস্তে আস্তে তার বুকের কাছ থেকে সরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি।

পরদিন সকালে প্রথমেই মেজ-জা তাকে ধরেছিল,—কি ছোটবউ, কাল রাতে কেমন হল?

—কি মেজদি?—সরল চোখে প্রশ্ন করেছিল মালতী।

—কি আবার, বল না একটু—অত লজ্জা কেন?

—কি বলব মেজদি?

—ঢং করো না, বলে ফেল ক'বার পান সেজেছ। গুয়া কেমন?

ছিল। কেমন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে গেছে। ও চলে যাওয়ার পর থেকেই যেন সব ছন্দোহীন। সব সময়েই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ধানশূন্য গোলার মত খালি খালি ঠেকে।

একদিন ওরা তিন বউয়ে মিলে বড় ভাশুরের সাথে বহরমপুরে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। উৎকল টকীজে 'নুয়া বউ'। ফেরার পথে মালতী ট্রেনে চেপে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তখন কোন ট্রেন ছিল না। সেদিনটাও ভালই কেটেছিল। কিন্তু তবুও সেই তৃষ্ণাটা বুকের মধ্যে সর্বদাই যেন ছটফট করেছিল। ও যদি সঙ্গে থাকত, তাহলে—; একটা চাপা বেদনা এখনও অনুভব করে মালতী।

মাঝে মাঝে মালতী ভাবে, সে একবার ইছাপুরমে যাবে। ইছাপুরমে গেলেই কি সব ইচ্ছে পূর্ণ হবে? যদি নাই হয়, তবে ও রকম নাম হয়েছে কেন?—গোলনথরা গ্রাম থেকে আর কত দূরে হবে—খুব বেশি হলে আট-নয় মাইল। অতএব একদিন যেতে হবে। গিয়ে দেখতে হবে তার ইচ্ছে পূরণ হয় কি না। দশদিনের চিঠি দু'দিনে আসে কি না।

দুপুরে খেতে বসে মালতী অবাক হল!—আজ হঠাৎ এত মাছ কেন?

বড়-জা'ও ততোধিক বিস্ময়ে বলল,—কেন তুই জানিস না! আজকেই শেষ মাছ খাওয়া—আর এক মাস মাছ খেতে পাবি না। সেই বালিযাত্রার পর দিন ছাড়খাই। সেদিন থেকে আবার মাছ খাওয়া শুরু হবে।

মালতী তবুও কিছু বুঝল না। শুধু অস্ফুট উচ্চারণ করল,—বালিযাত্রা!

বড-জা এবারে হেসে ফেলল,—সত্যিই তো, তুই জানবি কি করে! এ উৎসব সমুদ্রের ধারের লোকেদের। তোদের ওদিকে হয় না। আজ আশ্বিনের পূর্ণিমা, আগামী কার্তিক পূর্ণিমার ভোরে বালিযাত্রা উৎসব। আমরা সবাই মিলে আগের দিন রাতে সমুদ্রের ধারে যাব।

—সমুদ্র! সে কত দূর?—মালতীর চোখের তারা উজ্জ্বল হয়।

—বেশি না, বহরমপুর থেকে নয় মাইল গোপালপুর।

সমুদ্র, সমুদ্র, নীল সমুদ্র। খুশিতে ঝলমল হয়ে সমুদ্র কেমন ভাবতে চেষ্টা করে মালতী।

মালতীর সময় কাটে ট্রেন দেখে আর সমুদ্র-যাত্রার দিন গুণে। প্রতি দিন সকালে উঠেই সে হিসেব করে বালিযাত্রার আর ক'দিন বাকী। কবে তারা রওনা হবে। এবারে বহরমপুর পর্যন্ত তারা রেলগাড়িতে যাবে, না বাসে যাবে। বালিযাত্রা-সমুদ্র-চিন্তা তার একঘেয়ে জীবনে যেন কিছুটা নূতনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে।

তবুও এর মাঝে দু'টি ঘটনা তার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে, সে কথা মনে হলেই তার চোখে জল চলে আসে। এক ধরনের গাঢ় বিষণ্ণতা হৃদয়ের কোথায় যেন ঘন হয়ে চেপে বসে। দু'-তিন দিন রাতে সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছেও।—এ পর্যন্ত সে তার স্বামীর কাছ থেকে কোন চিঠি পায় নি। অপেক্ষায় থেকে থেকে প্রতিদিনই হতাশ হয়েছে। তার বিষণ্ণতা দেখে মেজ-জা দুষ্টু হেসেছে, বড়-জা সান্ত্বনা দিয়েছে, বড়-ভাশুর মেজ-ভাশুর জোরে জোরে স্বগতোক্তি করেছে—"বোধহয় বাইরে গেছে, কাজে ব্যস্ত, তাই চিঠি দিতে পারছে না। চিন্তার কি আছে।"

মালতী আবার চিঠি দিয়েছে। কিছুটা অভিমানী সুরে। লিখেছে—কিছু ভাল লাগছে না। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? আমায় কি ভুলে গেলে? আর ক'দিন বাদে বালিযাত্রা। আমরা সমুদ্রের ধারে যাব। তুমি যদি থাকতে...। চিঠি দিও।

দ্বিতীয় ঘটনাটি মর্মান্তিক। দিন কয়েক আগে এখানে একটি রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা মালগাড়ী লাইন থেকে পড়ে গিয়েছিল। তার ইঞ্জিনটা একদম তাদের বাড়ির কাছে এসে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ইঞ্জিনের সব ক'টি লোকই তাতে মারা যায়। মালতী শব্দ শুনেই পিছু-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সেই বিধ্বস্ত ইঞ্জিন দেখেছিল এবং শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল। সেই বীভৎস দৃশ্য সে কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে পারে নি। তার ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখে বড়-জা তাকে টেনে নিয়ে এসে পিছু-দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। এবং পাঁচ দিন পরে সে তালা খুলেছিল।

মালতীর মন খারাপ দেখে মেজ-জা তাকে কাজ করতে দিয়েছিল,—অত চিন্তা করিস না বাপু। এই ধান ক'টা সেদ্ধ করে দে। একদিন দেখবি চিঠির বদলে আস্ত মানুষটাই এসে হাজির হবে। তখন তো আর মেজদির কথা মনেই থাকবে না।—কথা শেষ করেই পানের পিক ফেলে মেজ-জা চোখ টিপে হেসেছিল।

তার হাসি দেখে মালতীও হেসেছিল এবং উঠোনের এক পাশের উনুনে ধানের টিনটা চড়িয়ে দিয়েছিল।—ধান সেদ্ধ করতে করতে সেদিন বারে বারেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল মালতী। ঘুরে-ফিরে মনে পড়ছিল দিকপুরের কথা, বাবা-মা'র কথা, তার স্বামীর কথা, চিঠি না দেওয়ার কি কারণ হতে পারে সে কথা এবং বিধ্বস্ত ইঞ্জিনটার কথা। নিজের অজান্তেই বেশ কয়েকবার হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। এবং প্রতিবারেই ভেবেছিল আর দুশ্চিন্তা

করবে না। বালিযাত্রার আর কদিন বাকী হিসেব করেছিল। ছাড়খাইয়ের দিন বাড়িতে কি মাছ আনা হবে, সে কথাও চিন্তা করেছিল।—বালিযাত্রার আগের দিন রাতে হঠাৎ ও যদি এসে উপস্থিত হয় তাহলে কেমন হবে! সে কথা ভাবতেই সারা গা শির-শিরিয়ে উঠেছিল। সুখের নেশায় যেন চোখের পাতাগুলি আপনি বন্ধ হয়ে আসছিল।—সুখচিন্তায় কতক্ষণ যে বিভোর হয়েছিল মালতী তা সে নিজেই জানে না। তার স্বপ্নভংগ হয়েছিল মেজ-জার সরব আবিষ্কারে।—কি করেছিস ছোট বউ! তোর শাশুড়ী বেঁচে থাকলে আজ পিঠে চেলা-কাঠ ভেঙে আদর করত।—ও বড়দি দেখে যাও তোমার আদরের ছোট বউয়ের কীর্তি! ধান সেদ্ধ করে চাল বের করে একেবারে ভাত বানিয়ে ফেলেছে!

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে নিজের অপরাধ ঢাকতে পিছ-দরজা খুলে কলাবাগানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মালতী।

মালতী অনুভব করল রেল লাইন দুটো ক্রমে-ক্রমেই রেগে যাচ্ছে এবং তাদের ক্রোধ দ্রুত সরবে উচ্চারিত হচ্ছে। পুরী-ওয়াল্টেয়ার প্যাসেঞ্জারটা চলে এল। মালতী তাকিয়ে দেখল অপসৃয়মান ট্রেনটাকে আর তার ড্রাইভার, যাত্রী ও গার্ডকে।—প্রথম প্রথম ট্রেনের দিকে সোজাসুজি তাকাতেই তার লজ্জা লাগত। এখন লাগে না।

তার মনে হয়, মানুষগুলো কেমন নিশ্চিন্তে ট্রেনে বসে কতদূরে চলে যায়। অথচ যে কোন মুহূর্তে.....। হঠাৎ সেই চুরমার হয়ে যাওয়া ইঞ্জিনটার কথা মনে পড়ল মালতীর। এবং পরক্ষণেই সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে বড়-জার কাছে গিয়ে বসল।

অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। দুপুর থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বড়-জা, মেজ জা দু'জনেই জিনিষপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বড়-ভাশুর বিরিঞ্চিনারায়ণ সারা দুপুর বসে বসে কতকগুলো সোলার নৌকো আর ছোট ছোট রঙ-বেরঙের কাগজের পতাকা বানাল। বিকেলে মেজ-ভাশুর প্রফুল্লনারায়ণ বাগান থেকে কলাগাছের খোল কেটে অনেকগুলো ছোট ছোট ডোঙা তৈরি করল। মালতীও টুকটাক কাজ করল। কিন্তু মাঝে-মাঝেই সে বড় আনমনা হয়ে যেতে লাগল। বড়-জা সেটা লক্ষ্য করে এক-সময়ে তাকে নিভৃতে বলল,—আজ আর মন খারাপ করিস না ছোট বউ। কাল বালিযাত্রা। কত আনন্দের দিন, গৌরবের দিন আমাদের কাছে। এ উৎসব তো বলতে গেলে তোরই। তোর বর...

মালতী কেঁদে ফেলল,—আজ পর্যন্ত একটা চিঠি এল না কেন বড়দি?

—কি বোকা মেয়ে! এতে কাঁদার কি আছে? নে, চোখ মুছে ফেল। চল একটা পান খাবি। তোর বর তোকে মস্ত ব-ড় চিঠি দেবে, তাই দেরি করছে।

অনেকটা যেন হাল্কা মনে হল নিজেকে। মালতী ভাবল—না, সে আর মন খারাপ করবে না। কাল বালিযাত্রা। কাল সে সমুদ্র দেখবে। নীল সমুদ্র। রাশি রাশি ঢেউ, রঙ-বেরঙের ঝিনুক আর কত পাখী।

এবারেও রেলগাড়িতে চড়া হল না। একটু মনক্ষুণ্ণ হল মালতী। কিন্তু উৎসবের আনন্দে আর সমুদ্র দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় কিছুক্ষণ পরেই সব ভুলে গেল সে।—রাত দশটা নাগাদ গোলনথরা গ্রাম থেকে কয়েকটি গরুর গাড়ি রওয়ানা হল। মালতীদের গাড়ীও সেই গাড়ী-গুলোর চাকার সাথে বিচিত্র সুর মিলিয়ে চলতে লাগল।

আজ রাত শেষ হলেই বালিযাত্রা। সুদূর অতীতে উড়িষ্যার বীর নাবিকেরা পালতোলা জাহাজে চেপে পাড়ি দিত বালি, সুমাত্রা, জাভায়। বুকে দুর্জয় সাহস আর জাহাজে দামী পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করতে যাত্রা করত বালি দ্বীপে। কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে পুবমুখী হাওয়ায় শক্ত হাতে হাল ধরত তারা তাদেরই স্মরণে—সেই সব গৌরব-ময় দিনের স্মরণে প্রচলিত হয়েছে এই উৎসব।—গাড়ীর মধ্যে দুলতে দুলতে ঢুলতে ঢুলতে মালতী ভাবে, কখন পৌঁছবে তারা গোপালপুরে? রাত থাকতেই কি তারা সমুদ্র দেখতে পাবে?—কাল বালিযাত্রা। পরশু ছাড়-খাই।—আজ এ গাড়িতে ও যদি...... স্বামীর কথা মনে হতেই এক অদ্ভুত ধরনের গর্বিত-তৃপ্তি যেন অনুভব করে মালতী। খুশিতে বুকটা যেন একটু ফুলে ওঠে।......পতিঘরো জীবা বলি গরু-গাড়ী বসুচি....গানের লাইনটা যদি সত্যিই হত তাহলে কেমন...। আপন মনে হেসে ফেলে মালতী।

সার বেঁধে সশব্দে গাড়ী ক'খানা চলেছে। দু'পাশের গাছগুলোও মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। পাতার ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের আলো রাস্তার বুকে জাফরি কেটেছে।

মালতী দেখল, চারদিকে ফটফটে জোছনা। আশে-পাশে দূরে-কাছে তৃতীয় কেউ নেই। তাদের গাড়ীটা বহরমপুরের দিকে না গিয়ে ইছাপুরমের দিকে যাচ্ছে। সে হেসে বলছে,—আমরা এত তাড়াতাড়ি ইছাপুরমে যাচ্ছি কেন?

—তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে বলে।

—আমার ইচ্ছে তো ক-খ-ন পূর্ণ হয়েছে।

—না, হয় নি। চল আমরা ট্রেনে উঠে পড়ি।

—অনেক দূরে যাব। আমি জানলার ধারে বসে থাকব। তুমি আমার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমোবে।—...মেজদি অসভ্য হেসে ফিসফিস করে বলল,—আমি জানলার ফুটোয় কাগজ গুঁজে রেখেছি। তোরা ঘরে খিল দিলেই., মালতী... বলল,—আমরা এখন, সাগরের ধারে গিয়ে শোব।.....ও দু'হাতে জোরে কাছে টানল। মালতী লজ্জায় অবশ হয়ে গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজে ফেলল।...ও প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপরে জোরে জোরে ডাকতে লাগল...মালতী...মালতী ...মালতী, মালতী...

মালতী চোখ মেলে চাইল। দেখল বড়-জা তাকে ডাকছে। মেজ-জা যেন একটু অবাক হয়ে বলল,—শহর দেখলি না! কি ঘুম তোর ছোট বউ!—বড়-জা বাঁ-দিকে একটা বিরাট বাড়ি দেখিয়ে বলল,ডাক্তারদের কলেজ। এটা দেখানোর জন্যেই তোকে ডাকছিলাম।—মালতী বিশেষ খুশি হল না। তবুও পিছু তাকিয়ে বহরমপুর শহরের বাড়ি-ঘর-আলো দেখল। এবং একটা হাই তুলে বলল,—আর কত দূরে? বিরিঞ্চিনারায়ণ ছোট্ট উত্তর দিল,—অর্ধেক এসেছি।

এদিকের রাস্তা তত নির্জন নয়। মাঝে মাঝেই ট্রাক যাতায়াত করছে। তাছাড়া টাঙ্গা, রিক্সা, সাইকেলও চলছে।

আরোহীদের দেখে মনে হচ্ছে তারাও বোধহয় একই পথের যাত্রী।--বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর একটা কটু গন্ধ ভেসে এল। মনে হল কোথায় যেন মড়া পুড়ছে। ওরা তিনজনে নাকে আঁচল দিল। প্রফুল্লনারায়ণ তাই দেখে বলল,—ঝিনুক পোড়াচ্ছে। চুণের কারখানা।

একটু এগিয়েই বাঁ-দিকে চুণের কারখানাটি দেখা গেল। সেটাকে পিছু ফেলে কিছুটা পরেই রাস্তা ডান দিকে মোড় নিল।—বিরিঞ্চিনারায়ণ বলল,—এইবার আমরা গোপালপুরের রাস্তায় পড়লাম। আর ঐ রাস্তাটা ছত্রপুরের।

সব ক'খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সামনেই লেভেল ক্রসিং। দরজা বন্ধ। মাদ্রাজ মেল আসছে।

মালতী উৎসুক হয়ে লাইনের দিকে চাইল। এবং একটু পরেই বুঝতে পারল লাইন দু'টো আস্তে আস্তে রেগে যাচ্ছে। দূরে আলো দেখা গেল। অল্পক্ষণ বাদেই ঝড়ের বেগে ট্রেনখানা ফুঁসতে ফুঁসতে গজরাতে গজরাতে সব কিছু কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। মালতী আপন মনেই আওড়াল—'দেখে নেব, দেখে নেব তোকে', 'ঠিক আছে, আবার আসব'।

বড়-জার মৃদু ধাক্কায় মালতীর ঘুম ভাঙল। চোখ মুছে ঠিক হয়ে বসতেই মেজ-জা বলল,—আমরা এসে গেছি। ঐ দেখ বাতিঘর।—মালতী অবাক হয়ে দেখল ডান দিকে একটা পাহাড়ের মাথায় লাল্পে-শোনা ভূতুড়ে বাতির মত দপ দপ করে আলো জ্বলে উঠছে। সেটাকে পিছে ফেলে তাদের গাড়ী এগিয়ে ডান দিকে ঘুরল। এইবার প্রচুর লোকজন, আলো, সাইকেল গাড়ী দেখা গেল। নানা রকম হৈ-চৈ কোলাহল ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। মালতী ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেখতে লাগল শেষ রাতের এই মুখরিত জনপদকে। রাস্তার ধারে কয়েকটি খাবারের দোকানে ভীষণ ভিড়। সামনে রাস্তার দু'পাশেই গায়ে লাগা-লাগি বাড়ি। সেগুলির সামনে রাস্তার ওপর আলপনা দেখে মালতী নিশ্চিত বুঝল ওগুলো তেলেঙ্গাদের ঘর।—কিছুক্ষণ পর তাদের গাড়ী এক জায়-গায় গিয়ে থামল এবং ঝড়ো হাওয়ার সাথে ভীষণ শব্দ শোনা যেতে লাগল। কেউ বলে না দিলেও মালতী বুঝল ওটা সমুদ্রের গর্জন।

সাগর সৈকতে এসে মালতী অবাক। কি ভয়ংকর, কি বিশাল, কী সুন্দর! সমুদ্র দেখে আনন্দে নেচে উঠল মালতী। প্রবল হাওয়ায় তার আঁচল, চুল উড়তে লাগল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে হাসতে লাগল সে। বড়-জা চোখ বড় বড় করে নিঃশব্দে তাকে একটু শাসন করল। মালতী বুকের ওপর কাপড়টা তুলে দিল।—সৈকতে কয়েক হাজার লোক। কেউ স্নান করছে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ ছুটোছুটি করছে। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি ভয়ে ভয়ে সমুদ্রে নামছে—বিরিঞ্চিনারায়ণ বলল,—সূর্য ওঠার আগেই স্নান সেরে নিতে হবে।

আকাশ অনেকটা ফর্সা হয়ে এসেছে। আর একটু পরেই হয়ত সূর্য উঠবে। বিরিঞ্চিনারায়ণ আবার তাগাদা দিল।—সমস্ত শাড়ি, জামা-কাপড় ও বালিযাত্রা উৎসবের সরঞ্জাম সৈকতে একখানে রাখা হল।—মালতী একটু চিন্তিত হল, স্নানের পর কাপড় ছাড়া হবে কোথায়? এই হাওয়া আর এত লোকের মধ্যে......, আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল, নিকটে কোথাও কোন ঘর নেই।

বিরিঞ্চিনারায়ণ সাগরের জল মাথায় ঠেকিয়ে সমুদ্রকে ও পূর্ব আকাশকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। তারপরে একটা সোলার নৌকোর পতাকা উড়িয়ে ফুল দিয়ে সেটাতে অনেক কষ্টে একটা মাটির প্রদীপ জেলে জলে ভাসিয়ে দিল। একটু গিয়েই প্রদীপটা নিভে গেল। নৌকোটা ঢেউকে তুচ্ছ করে তার মাথায় চেপে ভাসতে লাগল। বিরিঞ্চিনারায়ণ স্নান করতে নেমে পড়ল।—প্রফুল্লনারায়ণ হাত জোড় করে চোখ বুজে প্রার্থনা সেরে ফুল দিয়ে দু'টো কলার খোলের ডোঙা ভাসাল। একটা দিব্যি ভাসতে লাগল কিন্তু আর একটা দু'টো ঢেউ কাটিয়ে গিয়ে তৃতীয় ঢেউয়েই উল্টে গেল। বিরিঞ্চিনারায়ণ সেটাকে কোনরকমে ধরে সোজা করে ভাসিয়ে দিল।

বড়-জা একটা সোলার-নৌকো ও দু'টো কলার খোলের ডোঙা হাতে নিয়ে ওদের তাড়া দিল। তারপরে তিন-টিকেই একে একে জলে ভাসিয়ে দিল। সব ক'টিই হেলতে-দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল।—বড়-জা ওদের দু'জনের গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। মালতী খিলখিল করে হেসে উঠল। একটা ঢেউ এসে ওর পা ভিজিয়ে দিল। জলটা নেমে যেতেই মালতী দেখল চকচকে বালিতে ছোট-বড় কাঁকড়া মুহূর্তমধ্যে গর্ত করে ঢুকে পড়ছে।—মেজ-জা বিড়বিড় করে কি সব বলে গোটা কয়েক নৌকো ভাসাল। সব কটিই কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেল।

বড়-জা আবার বলল,—মালতী তুই সেরে নে। তারপরে তিনজনে মিলে একসাথে স্নান করব।

মালতী একটা ডোঙা হাতে নিয়ে জলে পা ভিজিয়ে দাঁড়াল।—আঃ, সমুদ্র কী সুন্দর! এই ভয়ংকর সমুদ্রে আমি বীর নাবিকদের স্মরণে ও আমার প্রতি-বেশীদের মঙ্গল কামনায় এই ভেলা ভাসালাম।

মালতী হাসিমুখে তাকিয়ে দেখল, তার ভেলা আস্তে আস্তে ঢেউ কাটাচ্ছে।

—এই বিশাল সমুদ্রে আমি আমার শ্বশুর-জা সকলের মঙ্গল কামনায় নৌকা ভাসালাম।

এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে মালতী দেখল তার নৌকা ঢেউয়ের সাথে খেলতে খেলতে সাগরের ভেতরে ঢুকছে।

—এই দিগন্ত প্রসারিত গভীর সমুদ্রে আমি আমার বাবা-মা, ভাই-বোনের মঙ্গল কামনায় বজরা ভাসালাম।

এক তৃপ্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে মালতী দেখল তার বজরা ঢেউ ভেঙে যেন দূরে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে।

—এই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ স্বপ্নময় সুন্দর নীল সমুদ্রে আমি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন—আমার স্বামীর মঙ্গল কামনায় জাহাজ ভাসালাম।

এক স্বর্গীয় অনুভূতি নিয়ে মালতী তাকাল। আর পরমুহূর্তেই ডুকরে কেঁদে উঠল।

একটা বিশাল ভাঙা-ঢেউ তার জাহাজকে কোথায় যে তলিয়ে দিয়েছে তা আর দেখা যাচ্ছে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মালতী। তার কান্না দেখে অবাক হয়ে বড়-জা, মেজ-জা, বিরিঞ্চিনারায়ণ, প্রফুল্লনারায়ণ ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল। বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগল কি হয়েছে। মালতী কোন উত্তর দিতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে কাঁদতে লাগল।

প্রবল কান্নার মধ্যেও মালতী যেন সেই মুহূর্তে পরিষ্কার দেখতে পেল তার নাবিক স্বামীকে। আর সেই বিধ্বস্ত জাহাজটাকে।

নেতা জর্জ ডিমিট্রভের 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাশ অ্যাগেনস্ট ফ্যাসিজম' বইটির ওপরে সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় (২৮ সংখ্যা, ১৩৭৬) প্রকাশিত ডাঃ নরেন ভট্টাচার্যের 'যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব' নামের প্রবন্ধটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রীভট্টাচার্য আজিকার পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের গভীর সঙ্কটের পটভূমিকায় যুক্তফ্রন্টের মৌলিক প্রত্যয়গুলির ওপরে জোর দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি যুক্তফ্রন্টের গঠন, আদর্শ ও রাজনৈতিক কয়েকটি সংজ্ঞার ভাসা ভাসা এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, নিজেই স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়েছেন। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে জর্জি ডিমিট্রভ অনেক ক্ষেত্রে যা বলতে চান নি, শ্রীভট্টাচার্য তা নিজের সুবিধামত ডিমিট্রভের বলে উপস্থাপিত করেছেন।

শ্রীভট্টাচার্য এক স্থানে বলেছেন—'একজন কমিউনিস্ট হিসাবে ডিমিট্রভ নিশ্চয়ই আশা করেন না যে, যুক্তফ্রন্ট একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার, একটা এন্ড ইন ইটসেলফ। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাকে একটা অস্থায়ী ব্যাপার, নিছক দলীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার বলেও মনে করেন না।' মজার ব্যাপার হচ্ছে সমগ্র বইটির কোথাও ডিমিট্রভ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার' কিংবা হাতিয়ার নয়—এ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। তা হলে কি বলতে হবে যে, শ্রীভট্টাচার্য স্বেচ্ছায় নিজের মনের কিছু কথা ডিমিট্রভের বলে প্রচার করতে চাইছেন। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার বলে গ্রহণ করে ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায়, অফিস-কাছারী ও স্কুল-কলেজে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণী-সংগ্রাম দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব যে রাজনৈতিক দল সঠিকভাবে দিতে পারছে, আমাদের মনে হয়, সেই দলে মানুষ লাখে-হাজারে আসছে ও সংগ্রামে সামিল হচ্ছে। স্বভাবত অনেকগুলি সোস্যাল ডেমোক্রাট ও কমিউনিস্ট-বিরোধী রাজনৈতিক দলে তীব্র সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেইসব দলের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের অনুগামীরা সংগ্রামী নেতৃত্বের পতাকাতলে সামিল হচ্ছে। জর্জি ডিমিট্রভ এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু শ্রীভট্টাচার্য এই যুক্তিধারাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে ডিমিট্রভ বলেছেন: 'Only the existence of the definite and specific prerequisites can put on the order of the day the question of forming such a government as a politically necessary task. (পৃঃ ৬৮) এই specific prerequisites-গুলির সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'The differentiation and left-ward movement in the rank of social democracy and other parties participating in the united front must already have reached the point where a considerable proportion of them demand ruthless measures against the fascists and the other reactionaries struggle together with the communists against fascism and openly come out against the reactionary section of their own party which is hostile to communism.' অর্থাৎ কমিউনিজম-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভিতরের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিরুদ্ধে সেই দলের অনুগামীরা বের হয়ে আসবে। শ্রীভট্টাচার্য নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী, গান্ধীবাদী ও বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির সমন্বয়ে। যদিও ডিমিট্রভ পরিষ্কার বলেছেন যে, যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে 'in no way restricting the activity of the communist party and the mass organization of the working class.' সুতরাং যে দলগুলি 'hostile to communism'—তাদের মধ্যে দল-সংকট ও বেরিয়ে আসার বিপদ দেখা দেবেই। আর গণ-সংগ্রামের পুরোধা রাজনৈতিক দলের পতাকাতলে আসবে। এটাকে কি 'দলীয় স্বার্থ' বলা যাবে? মনে হয় ইদানীংকালে পশ্চিম বাংলায় 'আগ্রাসী নীতি' বা 'দলীয় রাজনীতি'র ওজর তুলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক কুৎসা প্রচার চলছে, শ্রীভট্টাচার্য তাই মনে রেখেই 'দলীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার' বা 'দলীয় স্বার্থের' কথা তুলেছেন। ডিমিট্রভের বিশ্লেষণই দেখিয়ে দিচ্ছে, আসলে এগুলি উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ছাড়া কিছু নয়।

শ্রীভট্টাচার্য পশ্চিম বাংলার তথা চরিত্র সম্পর্কে ভাসা ভাসা বক্তব্য রেখেছেন, যা বিভ্রান্তিকরও বটে। তিনি কংগ্রেস (সিন্ডিকেট ও ইন্ডিকেট) ও বাংলা কংগ্রেসকে সোস্যাল ডেমোক্রাট দল বলেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সোস্যাল ডেমোক্রাট দল হচ্ছে সেইগুলি, যার নেতৃত্বে থাকে জমিদার-জোতদার ও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের অনুচর ও যাদের কাজ হচ্ছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সংযত করা এবং এমনভাবে কাজ করা, যাতে তারা যেন কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের খপ্পরে না পড়ে। এরাই বুর্জোয়া শ্রেণীর এজেন্টের কাজ করে। জর্জি ডিমিট্রভও বলেছেন—'They want to show the bourgeoisie that it is they who can keep the discontented working masses under control and prevent them from falling under the influence of communism better and more skilfully than anyone else.' কমরেড লেনিনও এদেরকে সোস্যাল সোভিনিস্ট বলেছিলেন। তাঁর মতে—'Social chauvinists are our class enemies, they are bourgeoisie within the working-class movement. They represent a stratum or groups or section of the working-class which objectively have been bribed by the bourgeoisie (by better wages, position of honour etc.)' and which holds their own bourgeoisie to plunder and oppress small and weak peoples and to fight for the division of the capitalist spoils.' কংগ্রেস বা বাংলা কংগ্রেসকে কেন সোস্যাল ডেমোক্রাট দল বলা হয়েছে তা বোঝা নিশ্চয়ই কষ্টকর। এটা সকলেরই জানা আছে যে, কংগ্রেস নেতৃত্বে আছে আমাদের দেশের কোটিপতি ব্যবসাদার, মিল-মালিক, জমিদার ও জোতদার শ্রেণী। তাদেরকে ঐভাবে ঘুষ দেওয়া বা উচ্চপদের দ্বারা হাত করার কথা উঠতেই পারে না। যদি শ্রীভট্টাচার্যের সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সংজ্ঞা তর্কের খাতিরেও স্বীকার করি, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, জার্মানীতে হিটলারের নাজি দলও সোস্যাল ডেমোক্রাট দল। কারণ হিটলারের পিছনেও ছিল জার্মানীর জনসাধারণের এক বিরাট অংশের সমর্থন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি হিটলারের নাজি দল আসলে ছিল ফ্যাসিস্ট। সুতরাং কংগ্রেস যদি বৃহৎ বুর্জোয়া জমিদার ও জোতদারের দল হয়, তা হলে বাংলা কংগ্রেসের শ্রেণী-চরিত্রও অনেকটা তাই হবে। এই প্রসঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই মনে রাখব যে, কংগ্রেস থেকে যে

পরিচিত হয়েছে, তা আদর্শের জন্য নয়, গোষ্ঠীতন্ত্র ও কোটারী শাসনের প্রতিবাদে। প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনৈতিক দলের শ্রেণী-চরিত্র বিচার করতে হলে তার নেতৃত্বে কারা এবং সেই দলের অনুগামীই বা কারা—তার বিশ্লেষণ করতে হবে। এদিক থেকে বিচার করলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণী-চরিত্রের সঠিক ব্যাখ্যা শ্রীভট্টাচার্য করতে পারেন নি।

শ্রীভট্টাচার্য আবার শাসকশক্তির সঙ্কট ও ভাঙনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর বক্তব্য—'ডিমিট্রভ বলেছেন যে, আসলে সোস্যাল ডেমোক্রাটদেরও বিভিন্ন শিবির আছে এবং তাদের মধ্যেও প্রগতিশীল অংশ আছে, যারা বৃহত্তম জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করতে চায়। ভারতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ডিমিট্রভের এই বক্তব্য প্রযোজ্য, নতুবা আজ কংগ্রেস দুভাগে বিভক্ত হ'ত না।' অথচ তিনিই আবার তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন—'যদিও একথা মনে করবার কোন কারণ নেই, প্রধানমন্ত্রীর সমর্থক গোষ্ঠী রাতারাতি প্রগতিশীল হয়ে গেছে...।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীভট্টাচার্য কংগ্রেসের যে অংশকে প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত করছেন, আবার তাদেরই প্রগতিশীলতায় তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এটা অবশ্যই স্ববিরোধিতা। আসলে তাঁর বিশ্লেষণে ত্রুটি আছে। শাসকশক্তির (কংগ্রেসের) শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে ভুল ধারণাই এই ত্রুটির কারণ। দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণী-সংগ্রাম যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়, তখন তার মোকাবিলার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত—এই নিয়ে শাসকশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং সেই ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সকলেই জানেন এই পন্থা নিয়েই শাসকদলে ভাঙন সৃষ্টি হয় এবং ভারতে তাই ঘটেছে। এই সম্পর্কে কমরেড লেনিন বলেছেন—'The world-wide experience of bourgeoisie and land-owner governments has evolved two methods of keeping the people in subjection. The first is violence ... But there is another method, best developed by the British and French bourgeoisie, who learned their lesson in a series of great revolutions and revolutionary movements of the masses. It is the method of deception, flattery, fine millions and concessions of the unessential while retain-ing the essential (Selected Works, Vol. II, P. 29).

আসলে ডিমিট্রভ যে যুক্তফ্রন্টের কল্পনা করেছিলেন, তা শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, ভারতের কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।* ডিমিট্রভ বলেছেন—'In the struggle for the establishment of the United Front, the importance of the leading role. Of the Communist Party increases extraordinarily. Only the Communist Party is at bottom the initiator, the organizer and the driving force of the United Front of the working class.' (পৃঃ ৮১) একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারে Communist Partyকে driving force of the United Front বলে চিন্তা করা বোধ হয় বাতুলতার সামিল। বরং দেখা যাচ্ছে শুধু কংগ্রেস বা নকশাল নয়, মার্কস্‌বাদের নামাবলী গায়ে-দেওয়া দল বা গান্ধীবাদী দল—সকলেরই একমাত্র আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টি। যুক্তফ্রন্টের শরিক অন্য সব দলগুলির কাজে ও কথায় আশ্চর্য সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে। এদের মধ্যে কম-বেশি কেউ 'Legalist', কেউ বা 'Reformist"—কিন্তু সকলেই শ্রেণী-সমঝোতার পক্ষপাতী, কিন্তু মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই শ্রেণী সমঝোতার বিরোধী কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী। সংঘাতটা এখানেই। তাই যুক্তফ্রন্টের বর্তমান এই সংকট। ডিমিট্রভও consolidation of the Communist Parties and struggle for the political unity of the Proletariat' প্রসঙ্গে বলেছেন—'Already there are tendencies to reduce the role of the Comunist Party in the ranks of the United Front and to effect a reconciliation with Social-Democratic ideology. Nor must the fact be lost sight of that the tactics of the United-Front are a method of convincing the Social-Democratic workers by object lesson of the correctness incorrectness of the reformist Policy and that they are not a reconciliation with Social-Democratic ideology and practice. A successful struggle for the establishment of the United Front imperatively demands constant struggle in our ranks against tendencies depreciate the role of the Party, against legalist illusions..' (পা-৮৫) সুতরাং শ্রীভট্টাচার্য যে আশা প্রকাশ করেছেন, যে রাজ্যে রাজ্যে বা কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে এবং বঞ্চিত মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে তা ঠিক নয়। আসলে তিনি যে যুক্তফ্রন্টের কথা বলেছেন, সেটা আর যাই হোক, জর্জি ডিমিট্রভের নয়। তিনি হয়ত কেরেলার কথা তুলবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সমর্থনে ও সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে এবং তাদের অনুগ্রহের ওপরে তা টিকে আছে—সেটা কি জর্জি ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট সরকার? মোটেই নয়—কারণ শত্রু কে, কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম? বিহারে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে—যার এক শরিক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু মার্কস্-বাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কোন সরকার গঠিত হলে তারা যোগ দিতে রাজি নয়। অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের সঙ্গে একেবারেই রাজী নয়। এটাকেই শ্রেণী-সমঝোতা বলা হয়েছে। কারণ বিহারে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে সেখানে 'Communist Party' তো 'Driving force of the United Front' হচ্ছে না। তাই দেখা যাচ্ছে শ্রীভট্টাচার্য যে যুক্তফ্রন্টের কথা বলেছেন, তা নিজেরই মনগড়া, সেটা জর্জি ডিমিট্রভের নয়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ছাড়া যুক্তফ্রন্ট গঠিত হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে কমরেড মাও সে-তুং-এর বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—"To reject Communism is in fact to reject the United Front.' (নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ পৃঃ ৭৭)।

কুমার [illegible]

* সেজন্যই কোনদিন জাতীয়ভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের দাবি উঠেনি।

ক্রেগের মতে ঃ রঙ্গমঞ্চের সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছেন রিয়ালিস্ট এবং মেসিনিস্ট। বালতি বালতি জল তুলে সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলতে যাওয়ার প্রচেষ্টা যেমন বাতুলতার নামান্তর, তেমনি রিয়ালিজমের দ্বারাও জীবনের বিরাটত্বকে বুঝতে যাওয়ার চেষ্টাটাই অপরিণত মনের পরিচায়ক।

মেসিনিস্ট স্টেজের ওপর যেসব ভেল্কীর খেলা দেখিয়ে থাকেন, তার ভেতর একটা চমৎকারিত্বের আভাস পাওয়া যায় সত্যি, কিন্তু তা সৌন্দর্যের পর্যায়ে স্থান পায় না।

যিনি সত্যিকার শিল্পী, তিনি সাধারণ ব্যাপার এবং সাধারণ ঘটনার ভেতর থেকেই মারভেল্ আবিষ্কার করেন।

**Art is not imitation but vision.** মঞ্চের সম্বন্ধেও যে একথাটা কত সত্য, গর্ডন ক্রেগই তা প্রথম দেখিয়ে দেন নাট্যরসিকদের।

ক্রেগ তাঁর 'আর্ট অভ্ দি থিয়েটার' প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেনঃ

"আগামীকালের মঞ্চশিল্পীদের প্রতি—তোমাদের অবস্থাটা বোধহয় অনেকটা এই ধরনের—তোমরা চাও আকাশে ভেসে বেড়াতে; এমন একটা পরিবেশ তোমরা নিজেদের চারপাশে সৃষ্টি করতে চাও, বাস্তব জীবনের ছাঁচের সঙ্গে যার কোনই মিল খায় না—তোমরা যেন এক ধরনের নেশায় বিভোর হয়ে আছ—তোমরা চাও অন্য সবার মনের মধ্যেও এই ভাবটা সৃষ্টি করতে।

সকল রকমেই পরিচালকের কথা অনুযায়ী কাজ করে চলাই তোমাদের কর্তব্য—এ কারণে নয় যে, তিনি তোমাদের পয়সা দেন, কিন্তু তাঁরই অধীনে তোমরা কাজ করছ বলে। তাই বলে নিজেদের সত্তাকে হারিয়ে ফেলবে না। ভুলে যেও না, কিসের খোঁজে তোমাদের এই যাত্রা শুরু করেছিলে; কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ছুটে বেরিয়েছিলে কোন্ আলোকের সন্ধানে।

শিক্ষানবিশী কালে মঞ্চ এবং অভিনয় সম্বন্ধে পরিচালক যা-কিছু বলবেন বা দেখিয়ে দেবেন, মন দিয়ে তা শুনবে, দেখবে এবং নিজে আরও এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। যা তিনি দেখান নি, তাও জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করবে নিজে।

যেখানে দৃশ্যপট আঁকা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে ওদের কাজ ভালভাবে দেখবে। মঞ্চের আলোর ব্যবস্থা যারা করে, তাদের কাছে গিয়ে কিভাবে তারা ইলেকট্রিক ওয়্যার নিয়ে কাজ করে, তা বুঝতে চেষ্টা করবে। মঞ্চের নীচে গিয়ে দেখবে কি বিস্তৃত কনস্ট্রাকশন সেখানে করা হয়েছে। মঞ্চের ওপরে গিয়ে জানতে চাইবে কিভাবে দড়ি এবং চাকাগুলি ব্যবহার করা হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা অভিনয় এবং মঞ্চ সম্বন্ধে নানা তথ্য আয়ত্তের সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখবে থিয়েটারের জগতের বাইরে থেকেই মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে বেশি ইনস্পিরেশন পাওয়া যায়। বাইরের জগৎ বলতে প্রকৃতিকেই বোঝায়। আর যা জানতে চেষ্টা করবে, তা হচ্ছে সংগীত এবং স্থাপত্যশিল্প থেকে।

আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, পরিচালকের কাছে একথা শুনতে পাবে না। মঞ্চের লোকেরা মঞ্চের ভেতর থেকেই সবকিছু শিখতে চান। যদি বা সময় সময় দু'-একজন অভিনেতা প্রকৃতির সাহায্যের আশ্রয় নেন, সেটাও হয়ে পড়ে অত্যন্ত একপেশে—অর্থাৎ তাঁদের কৌতূহল শুধু প্রকৃতির সেই দিকটাকে নিয়ে which manifests itself in human being. এর একমাত্র ব্যতিরেক হচ্ছেন হেনরি আরভিং। অভিনেতা হিসাবে তিনি ছিলেন নিখুঁত। প্রকৃতিকে সমগ্র ভাবে তিনি জানতে চেষ্টা করতেন। আবিষ্কার করতে চাইতেন নানা ধরনের প্রতীক, যার মাধ্যমে সুষ্ঠুরূপে ভাবের অভিব্যক্তি করা যায়।"

ক্রেগ তাঁর 'অন দি আর্ট অভ্ দি থিয়েটারে' অভিনেতাকে উদ্দেশ করে বলেছেনঃ অভিনেতা হিসাবে কাজ করবার পর তোমাকে স্টেজ ম্যানেজার হতে হবে। এই নামটাই একটু গোলমেলে—কারণ, মঞ্চ পরিচালনার অধিকার তুমি পাবে না। একটা অদ্ভুত অবস্থায় গিয়ে পড়বে এবং যা-কিছু উপকার হবে, সে হচ্ছে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে। অবশ্য এ অভিজ্ঞতা খুব সুখপ্রদ হবে না বা তার দ্বারা যে থিয়েটারের মহা উপকার হবে, তাও মনে কোর না। স্টেজ ম্যানেজার নামটা অবশ্য খুব জমকালো—অর্থ করলে দাঁড়ায় "মঞ্চ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবজান্তা"।

প্রত্যেক থিয়েটারে একজন স্টেজ ম্যানেজার থাকে—কিন্তু শুনলে ভয় পাবে তাদের মধ্যে একজনও "মাস্টার অভ্ স্টেজ সায়েন্স" নেই।

স্টেজ ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে—রিহার্সাল দেখা, প্রপার্টি রুমের কাজ কিভাবে এগোচ্ছে সে বিষয়ে খবরদারি করা, সিন পেন্টিং রুম, কারপেন্টার্স রুম প্রভৃতির কাজের তত্ত্বাবধান করা—কিন্তু মজা হল এই তার নিজের ঠিক কোন কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা নেই। তাকে থাকতে হবে সদা প্রফুল্ল এবং প্রাণোচ্ছল হয়ে। **He rather plays the part of the tyre than the axle of the wheel of the stage.**

অদ্ভুত হলেও এ অভিজ্ঞতাকে খারাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যে

[illegible] মর্নিং—১৯০৫

দি মাস্ক অফ হাঙ্গার—১৯০৮
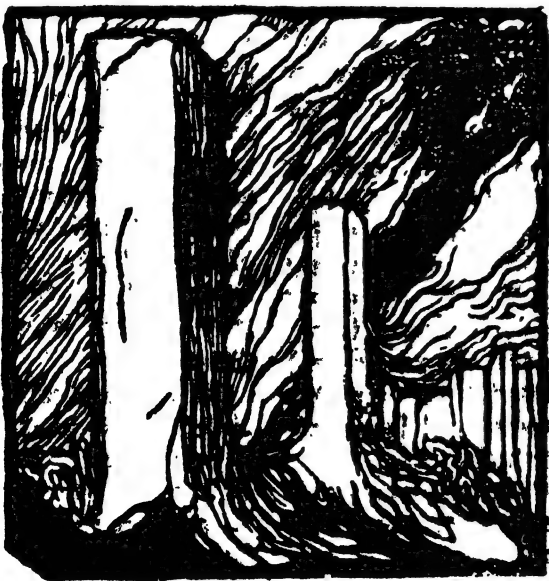
নয়, সে বেশ বুঝতে পারে, তার কাজে মঞ্চ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান থাকা দরকার। তার ফলে নিজে সে যখন পরিচালক বা ডিরেক্টর হয়, তখন অন্য স্টেজ-ম্যানেজার না রেখে নিজেই সুষ্ঠু-ভাবে সে কাজ করতে পারে। পাঁচ বছর অভিনয়ের পর দু-এক বছর স্টেজ-ম্যানেজারী করা ভাল। একথা কখনও ভুলো না যে, এ-কাজটার মান অনেক উন্নত ধরনের করা যায়।

আইডিয়াল স্টেজ-ম্যানেজার: কাজের প্রকৃতি অনুসারে তাকেই থিয়েটার-জগতে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত। যাতে এই ধরনের আদর্শ স্টেজ-ম্যানেজার হতে পার, সেইভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। আদর্শ স্টেজ-ম্যানেজার নিজেই নাটক নির্বাচন ও প্রডিউস করতে পারেন, অভিনয়ের মহলা দিতে পারেন, কোন্ অবস্থায় কে কিভাবে মুভ্ করবে—নির্দেশ দিতে পারেন, দৃশ্যপট বা সাজসজ্জা সম্বন্ধে ডিজাইন করতে পারেন এবং আলোক নিয়ন্ত্রণ বিষয়েও ইলেকট্রিশিয়ান-দের কি করতে হবে, কি না করতে হবে, বলে দিতে পারেন।

**দৃশ্যপট ও গতিবিন্যাস (মুভ্মেন্ট)**

কিভাবে মঞ্চের দৃশ্যাদি, নট-নটীর পোষাক প্রভৃতির ডিজাইনার হওয়া যায়, কিভাবে আর্টিফিসিয়াল লাইটের ব্যবহার শেখা যায়, কিভাবে অভিনেতাদের পরস্পরের মধ্যে, অভিনেতা এবং দৃশ্যাদির মধ্যে এবং বিশেষভাবে কি করে অভিনেতাদের ও নাট্যকারের চিন্তাধারার মধ্যে একটা সঙ্গতি এবং সমন্বয়ের ভাব আনা যায়?

এর জন্য সব থেকে বেশি দরকার নাটকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া এবং জানা। তারপর তৈরি হতে হবে মঞ্চ প্রয়োজনার জন্য।

শেক্সপীয়ারের চারটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডীর যে-কোনটির প্রস্তুতির জন্য এক বছর থেকে দু' বছর সময় লাগে।

দৃশ্যসজ্জা এবং গতিবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে, যার ফলে দর্শকের ওপর একটা লার্জ এবং সুইপিং ইম্প্রেশন তৈরি করে তোলা যায়। শেক্সপীয়ার যা যা বলে গেছেন, তাকে জ্বলজ্বলে করে তুলতে হবে জেনারেল এবং ব্রড্ এফেক্টস্-এর সাহায্যে। এর জন্য প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে দৃশ্যসজ্জার ওপর। দেখতে হবে কি-ভাবে রঙ্গস্থলটিকে মহাকবির চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং সঙ্গতি রেখে গড়ে তোলা যায়। ম্যাকবেথের উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। কিভাবে এ নাটকটি আমাদের মানসদৃষ্টি এবং বহিদৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে? দুটি বিষয় প্রথমেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে:

(১) খুব উঁচু খাড়া পাহাড়।

(২) জলভরা মেঘে ঢাকা রয়েছে পাহাড়ের চূড়া। অর্থাৎ এমন একটা জায়গা যেখানে ভয়ঙ্করদর্শন যোদ্ধারাই ঘুরে বেড়াতে সাহস পায়, অশরীরী আত্মাদের যেখানে বাসভূমি। পরিণতিতে প্রথমে এসে পাহাড়কে বিলুপ্ত করে দেবে, অশরীরী আত্মারা মানুষদের সর্বনাশ সাধন করবে। কিন্তু কিভাবে দর্শকদের চোখের সামনে জিনিসটাকে তুলে ধরা যাবে? একটা খুব খাড়া উঁচু পাহাড় তৈরি করতে হবে—চূড়ার কাছে দিতে হবে মেঘের সাজেস্চন্। এরপর আসে রং-এর কথা। প্রথমেই প্রকৃতির দিকে না তাকিয়ে নাটকটির ভেতর ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে। রং বলতে দুটি—পাহাড়ের জন্য মানুষ, আর মেঘের জন্য অশরীরী আত্মারা। এ ছাড়া অন্য কোন রংয়ের দরকারই নেই। সহজ সংক্ষিপ্ততার ভেতর দিয়েই আর্টের মূল্য বাড়ে। এর অভাবে সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত সিন-ডিজাইনারেরা একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে সব কিছু নষ্ট করে ফেলেন - শুধু পাহাড় আর মেঘ করেই তাঁরা তুষ্ট হন না—সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের শেওলা দেখাতে হবে, আগস্ট মাসের বিশেষ ধরনের বৃষ্টি দেখাতে হবে, দেখাতে হবে স্কটল্যাণ্ডের ফার্ন। ফলে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে কোন কথাই বলা হবে না। অথচ আভাসে-ইঙ্গিতে এ সবই করা যেতে পারে।

"By means of suggestion, you may bring on the stage a sense of all things—the rains, the sun, the wind, the snow, the hail, the intense heat—but you will never bring them there by attempting to wrestle and close with nature in order so that you may seize some of her treasure and lay it before the eyes of the multitude. By means of suggestion in movement you may translate all passions and the thoughts of vast numbers of people or by means of the same you can assist your actor to convey the thoughts and the emotions of the particular character he impersonates. Actuality, accuracy of detail is useless upon the stage.

Avoid the so-called "Naturalistic" in movement as well as in scene and costume. The Naturalistic stepped in on the stage because the artificial had grown finicking, insipid; but do not forget that there is such a thing as noble artificiality."

[ক্রমশ]

## কার কণ্ঠস্বর ?

ঋত্বিক ঘটককে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ অদ্ভুত মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। শ্রীঘটককে পদ্মশ্রী দেওয়ার বিরুদ্ধে খবরের কাগজে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেই এঁরা ক্ষান্ত হন নি, প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করা, এমন কি পার্লামেণ্টে প্রশ্ন পর্যন্ত তুলেছেন। একটি সংবাদপত্র রীতিমত জেহাদী প্রবন্ধ পর্যন্ত লিখে ফেলেছেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এতে গুরুত্ব আরোপ করে নি। শ্রীঘটককে কেন্দ্র করে এই জেহাদের মূল উদ্দেশ্য যুক্তফ্রণ্ট-বিরোধিতা। জেহাদীরা মনে করেছিল, পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বুঝি শ্রীঘটকের নাম সুপারিশ করেছিল। কিন্তু পরে জানা গেছে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সুপারিশ করা দূরের কথা, এ ব্যাপারে কিছুই জানত না। খোদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর নাকি শ্রীঘটকের নাম সুপারিশ করেছে। এই মিসফায়ার হওয়া সত্ত্বেও জেহাদীরা কিন্তু দমবার পাত্র নয় ; এই ঈর্ষাকাতর মানুষগুলি এমন চিৎকার শুরু করেছে, যেন ভারত রসাতলে যাচ্ছে।

জেহাদীদের বক্তব্য—শ্রীঘটক মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। যদিও শ্রীঘটক বলেছেন যে অসুস্থ অবস্থায় তা তিনি বলে থাকতে পারেন এবং তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা চেঁচামেচি শুরু করেছে, তারা থামবে না, কারণ ওরা নোংরা ঘাঁটবার মত একটা কিছু চায়।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট স্পষ্টভাবে এদের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—দেশ-বিদেশের বহু সমালোচক ঋত্বিক ঘটককে একজন সৃজনশীল শিল্পী বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই শিল্পসৃষ্টির জন্য তাঁকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন ও সব মন্তব্যে গান্ধীজীর কিছুই আসে যায় না, গোটা ব্যাপারটা ক্ষমার আদর্শে গ্রহণ করা উচিৎ।

প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটাকে এভাবে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন এবং ঋত্বিক ঘটক মানসিক অসুস্থ সময়ের কথা বলেছেন। কিন্তু যারা চেঁচামেচি করছে, তাদের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এর মধ্য দিয়ে। গান্ধীজীর নামটা একটা উপলক্ষ মাত্র ; আসল বক্তব্য হচ্ছে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং ওদের কাছে যা সনাতন আদর্শবাদ বলে পরিচিত, তার বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা চলবে না। সকলকেই একই আদর্শে, একই মতে চলতে বাধ্য করতে হবে। এই স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা গান্ধীজী নিজে সমর্থন না করলে কি হবে, এই গান্ধী 'ভক্ত'-রা বাজারে নেমেছে তাঁর সম্মান রক্ষা করতে। প্রধানমন্ত্রীর কথার মর্ম অনুসারে বলি, গান্ধীজী নিজগুণেই মহাত্মা, তাঁর সম্মান রক্ষা এই 'ভক্ত'-দের ওপর নির্ভর করে না।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শ্রীমতী গীতা মুখার্জী এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, ঋত্বিক ঘটক অসুস্থ অবস্থায় গান্ধীজী সম্পর্কে কি বলেছেন তা নিয়ে তাঁর পদ্মশ্রী খেতাব বাতিলের দাবি যাঁরা জানিয়েছেন, তাঁরা শ্রীবুদ্ধদেব বসুর ব্যাপারে নীরব কেন? শ্রীবসু তো আরো বড় খেতাব—পদ্মভূষণ পেয়েছেন। শ্রীবসু ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বছরে প্যারিসের 'টু-সিটিজ' কাগজে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে লিখেছেন এবং তাঁর উপন্যাস 'রাতভোর বৃষ্টি' অশ্লীলতার দায়ে বিচারের কাঠগড়ায়।

যাঁরা মহৎ শিল্পী, যাঁদের সৃজনী ক্ষমতা আছে, তাঁরা পদ্মশ্রী বা পদ্মভূষণ-এর মত সম্মানের আশায় কাজ করেন না। তার প্রত্যাশায় বসে থাকেন না। তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দেয় জনসাধারণ। মানুষের স্বীকৃতিই আসল সম্মান। এই জন-স্বীকৃতিকে যদি রাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারে, তবে মঙ্গল। তাতে গণতন্ত্রের পথ সুগম হয়। ঋত্বিক ঘটকের রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কথাগুলি দিয়ে বিচার হবে না, তাঁর শিল্পী-মানসের বিচার হবে 'সুবর্ণরেখা', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'নাগরিক', 'অযান্ত্রিক' প্রভৃতি ছবি দিয়ে। এই সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর সম্মান। যতদিন তিনি জনগণের পক্ষে সৃষ্টির পথে অবিচল থাকবেন, ততদিন মানুষের সম্মান তিনি পাবেন। সত্যিকার শিল্পীর সম্মান 'নেকড়ের চিৎকার'-এ কেড়ে নেওয়া যায় না। —সুজন।

বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র শিল্পী সাধনা

## হেলেনে ভাইগেল—হেলেনে কারেজ

মঞ্চাভিনয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল, বার্লিনের অঁসেম্বল-এর অধ্যক্ষা হিসাবে কুড়ি বছর। তাঁর হাত দিয়ে তৈরী হয়েছে প্রায় ৪শ জন শিল্পী। কাজেই হেলেনে ভাইগেলকে নিয়ে জুবিলি উৎসব করা যেতে পারে।

হেলেনে ভাইগেল সম্পর্কে নাট্য সমালোচকরা অনেক ভাল কথা বলেছেন, ব্রেখট স্বয়ং তাঁর বহু কবিতায় ভাইগেলের ছবি এঁকেছেন। উনি যে কী বিপুল পরিমাণ কাজ করেন, কী অফুরন্ত ওঁর কর্মোদ্যম তা ভাবলে মাথা নত হয়ে আসে। আমি ওঁকে প্রথম দেখি মঞ্চে মাদার কারেজের ভূমিকায়। সেই স্মৃতি আজও আমার কাছে মঞ্চ জগতের সব চেয়ে বড় স্মৃতি। বার্লিনের অঁসেম্বল-এ প্রথম এসে আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছিল এই ঘটনা যে ওঁর আপিস-ঘরের দরজা সকলের জন্য সব সময় খোলা। আমার ধারণায় ছিল থিয়েটারের অধ্যক্ষ থাকবেন বন্ধ দরজার পেছনে। ওঁর আপিস-ঘর যেন বৈঠকখানা। কি নেই ওখানে? ছেলেদের খেলনা থেকে পিকাশোর ছবি পর্যন্ত, আর প্রত্যেকটি জিনিষের সঙ্গে এক-একটি কাহিনী জড়িত।

তাঁর নাতি-নাতনীর সংখ্যা চার, চার জনেরই ফটো আছে ওঁর দেরাজের ওপরে। উনি যে মা, সে পরিচয় সব সময় পাওয়া যায়। শুধু নিজের

সন্তানদের বেলাতেই নয়, অভিনেত্রীদের বেলাতেও, যাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, অনেক সম্মান পেয়েছে। একটি ঘটনা মনে পড়ছে, মশালের মত, যার প্রদীপ্ত আলোকে এই মহিলার আশ্চর্য একটি পরিচয় পেয়েছি। নাটকের একটি চরিত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। আমার খুব ইচ্ছে ও'র চরিত্রে আমি অভিনয় করি। বললাম, 'আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ নির্ভর করছে এই চরিত্রে অভিনয় করার ওপরে।' উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, উত্তেজিত হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন, তারপরে ফেটে পড়লেন : 'আমার কথা ভাব তো, আনন্দ পাবার মত চরিত্র তো অনেক, কিন্তু আমি একটাতেই অভিনয় করতে পারি নি! অল্পবয়সী অসাধারণ মেয়ের চরিত্র ব্রেখট যে কটি সৃষ্টি করেছেন, সবাই আমার নাগালের বাইরে। আমি গ্রুসে (ককেশিয়ান চক সার্কল) হতে পারি নি, শিয়েনতে (গুড ওম্যান অব সেৎসুয়ান) হতে পারি নি। কেউ কি খোঁজ করেছে আমি জীবনের আনন্দ পাচ্ছি কি-না। জীবনের সেরা বছরগুলি আমি কাটিয়েছি বিদেশে, আশ্রয়প্রার্থী হয়ে, খাওয়াপরার কোন সংস্থান ছিল না, আর ক্ষমতা ছিল এমন একটি পেশায়, যার সঙ্গে ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিদেশে যার চর্চা সম্ভব নয়। বিদেশে আশ্রয় নিয়ে নাটক লিখতে গিয়ে ব্রেখট মাদার কারেজের মেয়েকে যে বোবা করেছিলেন তা কি কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই? তাঁর স্ত্রীর বয়স তখনো কম, হয়ত তিনি চেয়েছিলেন এই ভূমিকায় স্ত্রীকে অভিনয় করাতে, কে বলতে পারে! বিদেশে অভিনয় করাতে হলে ভাষার বাধাকে এভাবে এড়াতে হয়।

মঞ্চে অভিনয় করার সময় হেলেনে ভাইগেল কড়াকড়ি শৃঙ্খলা মেনে চলেন। নাটক শুরু হবার অনেক আগেই তিনি মঞ্চে উপস্থিত। সহ-অভিনেত্রীদের সঙ্গে দু-একটি কথা বলেন, তাঁদের উৎসাহ দেন। হেলেনে ভাইগেল মহৎ শিল্পী শুধু এ-কারণে নয় যে, চরিত্রে তিনি আরোপ করেন আশ্চর্য নমনীয়তা, বৃহৎ গতি ও ভঙ্গিমা, এ-কারণেও যে ও'র আবৃত্তি বড় সুন্দর, একবার শুনলে কখনো তা ভোলা যায় না। ও'র বহু আবৃত্তি রেকর্ড করা হয়েছে, প্রত্যেকটি রেকর্ড ও'র প্রতিভার নিদর্শন।

আরও একটি ব্যাপারে ও'র নৈপুণ্য অসাধারণ। নাটকের শেষে দর্শকদের প্রশংসা কি করে উদ্দীপ্ত করতে হয় তা উনি ভালোভাবেই জানেন। দর্শকদের
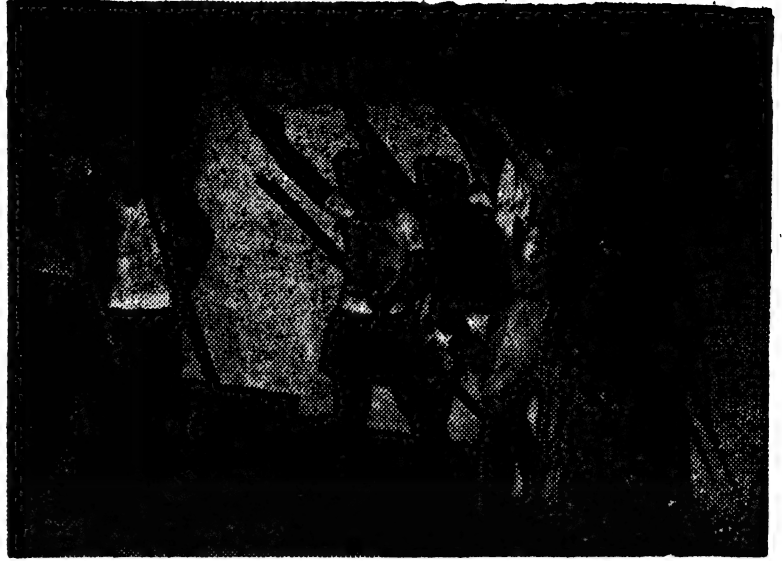
'সায়ন্তনী' প্রযোজিত 'বাগদীপাড়া দিয়ে' নাটকের একটি দৃশ্য

অভিবাদন জানাবার জন্য কোন শিল্পী কখন উপস্থিত হবেন, সেই হিসাবেও উনি অসাধারণ পাকা। বহু ঘটনা আমার মনে পড়ছে। নাটক শেষ হবার পরে দর্শকরা হাততালি দিতে শুরু করলেই এই হিসাবমত এক-একজন শিল্পীকে মঞ্চে পাঠাচ্ছেন, তাকে ফিরিয়ে এনে পরের জনকে। কাজটি করছেন রীতিমত হাঁক-ডাক তুলে।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে। মার্থা ফয়েকট্‌ভাঙ্গের কুড়ি বছর পরে ফিরে এসেছেন ইউরোপে। বার্লিনের অ'সেম্বল ঘরে দু-জনের দেখা। দু-জনেরই বয়স হয়েছে কিন্তু অল্প বয়স থেকেই দু-জনের বন্ধুত্ব। হঠাৎ দেখলাম পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে অল্পবয়সী দুই মেয়ের মত ওঁরা আচার-আচরণ করছেন। এমন কি পায়ে পায়ে ঠেলা-ঠেলি পর্যন্ত। বিখ্যাত দুই মানুষের দুই স্ত্রী, নিজেরাও বিখ্যাত, এই দুই মহিলার কাণ্ড-কারখানা দেখে আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

হেলেনে ভাইগেল সম্পর্কে আমি শেষ কথাটি বলতে চাই ও'র নারীত্ব সম্পর্কে। নারীর যে-সব গুণ থাকা উচিত, সবই ও'র মধ্যে পুরোমাত্রায়। কোন সমস্যায় পিছ-পা নন্। মায়ের মত গভীর অনুভূতি, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ বাছাই করে থাকেন। কখনো অবুঝ হন না। রাগ আছে, তবে সে-জন্যে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেন না। সংগ্রাম ও লড়াই করতে বিশ্বের সেরা বস্তুর জন্যে, শান্তির জন্যে তিনি অভ্যস্ত।

বার্লিনের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যে ফ্ল্যাটটিতে হেলেনে ভাইগেল থাকেন তা তাঁর স্বামী বের্টোল্ট ব্রেখটের সমাধি থেকে একশ' মিটার দূরে। স্বামীর কাজকেই তিনি আরও অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই তাঁর শক্তির উৎস, যে, উৎসে তারুণ্য ও নমনীয়তা বজায় রাখে।

—গিজেলা মে,
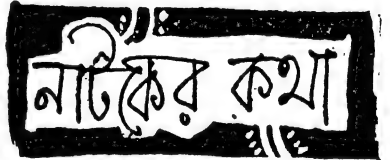
**অল্ ইণ্ডিয়া পাপেট্ ফেস্টিভাল**

ইউ পি সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমীর সহযোগিতায় লক্ষ্ণৌর লিটারেসী হাউস্ এবার অল্ ইণ্ডিয়া পাপেট ফেস্টিভাল-এর তিন দিনব্যাপী আয়োজন করেন। এই আসর চলে ৩১শে জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ-এর সুসজ্জিত 'রবীন্দ্রালয়ে'। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেক সংস্থা এই আসরে যোগদান করেন। বিষয়বস্তু—পুতুল নাচ ও আলোচনাচক্র ছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র দল যে এই আসরে যোগ দিয়েছিল তা কলকাতার ইউথ পাপেট থিয়েটার-ইণ্ডিয়া। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা গঠিত এই সংস্থা তাদের সুন্দর ও সুষ্ঠু পুতুল-নাট্য পরিবেশন

ক্ষুরে ... সমস্যের অকুন্ঠ-প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয় ওদের আকর্ষণীয় পুতুল নাচ 'রড্, গ্লাভস ও ম্যারিওনেটস' তিন বিভাগেই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখায় 'অল রাউন্ড বেস্ট পারফরমেনস্ ট্রফি' পুরস্কার পেয়ে বাংলায় সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে।

### উল্কা

এইচ জি আই এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব' তাঁদের প্রথম নাটক ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' মঞ্চস্থ করলেন—২২শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যায় হিন্দি হাই-স্কুলে। প্রধান অতিথির ভাষণে স্টেটস্-ম্যান পত্রিকার সংবাদ সম্পাদক শ্রীসত্যব্রত চ্যাটার্জী এঁদের প্রথম প্রয়াসের প্রশংসা করেন। সভাপতির ভাষণে ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য মহাশয় নাটকের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন ও সময়োপযোগী আরও সুন্দর নাটক ভবিষ্যতে উপস্থিত করার কথা বলেন। সংস্থার সভাপতি শ্রীশ্রীচাঁদ জৈন ফ্যাক্টরীর কর্মিবৃন্দের কাজ-কর্মের অবকাশে এই আনন্দ বিতরণের যে প্রচেষ্টা তা শুধু নিছক আনন্দদানই নয়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একে অপরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাবে, যা গড়ে তুলবে একটা সুন্দর আবহাওয়া।

অরুণাংশুর ভূমিকায় বিনয় চক্রবর্তী, রাজীবরূপী শিবেন চক্রবর্তী, কমলা ও মিলির ভূমিকায় যথাক্রমে স্বপ্না মিত্র ও ইন্দিরা দে চমৎকার অভিনয় করেন। জীবন ব্যানার্জী 'দাদুর' রূপদানে সুন্দর ও সরস অভিনয় করেছেন।

'সুরংগমা' আয়োজিত বসন্ত রাসলীলা নৃত্য-গীতাভিনয়ের একটি দৃশ্য

### অক্টোবর বিপ্লব

মহান অক্টোবর বিপ্লবের কাহিনী নিয়ে রচিত ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, সীমান্তিক শাখার গণ-প্রযোজনা 'অক্টোবর বিপ্লব' (নাটক ও পরিচালনা চিররঞ্জন দাস) আগামী ১৭ই মার্চ সন্ধ্যা সাতটায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে। সঙ্গীত পরিচালনা ও মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন যথাক্রমে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও খালেদ চৌধুরী।

## আদাব ও বাগ্দীপাড়া দিয়ে

সীমন্তনী নাট্যসংস্থা সম্প্রতি মঞ্চ অঙ্গনে তিনটি একাঙ্ক নাটক অভিনয় করেছে। এই তিনটি নাটক 'আদাব', 'বাগ্দীপাড়া দিয়ে' এবং 'বিরহী'।

'আদাব' সমরেশ বসুর একটি ছোট গল্প অবলম্বনে রচিত। এই নাটিকায় ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যখন হিন্দু-মুসলমান জানোয়ারের মত একে অন্যকে খুন করছে, তখন দুদিক থেকে আত্মরক্ষার জন্য পলায়মান দুজন মানুষ ঘটনাক্রমে এক জায়গায় এসে পড়েছে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের মধ্যে তারা নিজেদের পরিচয় জানল শ্রমজীবী মানুষ হিসাবে। একজন সুতাকল শ্রমিক, আর একজন নৌকার মাঝি। অবিশ্বাসের মধ্যেও তারা পরস্পরের বিশ্বাসভাজন হল এবং বুঝতে পারল শ্রমিকদের কোন জাত নেই, তাদের একমাত্র জাত শ্রমিক। একই-ভাবে তারা মেহনত করে এবং শোষিত হয়। দুজনারই শত্রু একই শ্রেণী। নাটিকাটি গভীরভাবে দর্শকদের মনে রেখাপাত করে এবং শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বক্তব্য স্পষ্ট করে তোলে। এরূপ নাটিকার বহু অভিনয় প্রয়োজন, বিশেষ করে শ্রমিক ও গরীবদের পাড়ায়। সীমন্তনী যথার্থ কৃতিত্বের সাথে নাটিকাটি অভিনয় করেছে। এই নাটিকার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মানব নন্দী, মিহির চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ চক্রবর্তী, অসিত চৌধুরী, কল্যাণ বসু, রণধীর সাহা, সমর চট্টোপাধ্যায়, অতুল সাহা ও অরুণ ঘোষ। 'আদাব'-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন মিহির সেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাগ্দীপাড়া দিয়ে' গল্পটি যে কি চমৎকারভাবে নাট্যরূপ লাভ করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দেখালেন এই নাট্যসংস্থা। শোষিত, অবহেলিত, খেটে-খাওয়া মানুষদের কুসংস্কার ও ধর্মের মোহজালে আটকে রেখে কিভাবে শোষকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, এই নাটিকায় সেই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। পরিচালনা ও অভিনয়গুণে আজকালকার অপেশাদার সংস্থার নাটকগুলির মধ্যে 'বাগ্দীপাড়া দিয়ে' এক উল্লেখযোগ্য মঞ্চাভিনয়। গণ-আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার সংগে সংগে আজকাল যেভাবে ধর্মের নামে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে, সেই পটভূমিকায় এই নাটিকাটি গ্রামে ও গরীবদের অঞ্চলে অভিনয় হওয়া প্রয়োজন। নাট্যরূপ দিয়েছেন মিহির চট্টোপাধ্যায়।

এই নাটকে অভিনয় করেছেন শিব-প্রসাদ চৌধুরী, সমর চট্টোপাধ্যায়, অসিত চৌধুরী, রঞ্জনী সরকার, অরুণ ঘোষ, সোমনাথ চক্রবর্তী, মানস নন্দী, মাণিক ভট্টাচার্য, নির্মল দত্ত এবং আরতি চট্টোপাধ্যায়।

### কলকাতায় পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল

কলকাতায় জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের এক চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল এসেছেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতা মিসেস রাথ লেওগার সাংস্কৃতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। প্রতিনিধি দলে আছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক মিঃ হর্স্ট সীমান, অভিনেত্রী মিস ট্রাউডেল কুলিকাউস্কি এবং পূর্ব জার্মান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ লাৎস কোয়েজার্ট।

এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার উদ্দেশ্যে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের কলকাতাস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তরের প্রধান মিঃ ও মিসেস এ. জেভার গত ২রা মার্চ সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি দল পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্র বিষয়ে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে জানোস ভেইকসি পরিচালিত 'ফ্রোজেন লাইটনিং' ছবিটি দেখান হয়।

গত ২রা মার্চ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ এবং বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি মিলিতভাবে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের প্রতিনিধি দলকে লাইট হাউস মিনিয়েচারে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল

### সুরঙ্গমার নৃত্য-গীতানুষ্ঠান

২১শে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সুরঙ্গমার নৃত্য-গীতানুষ্ঠানটি শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দদায়ক। কলকাতায় সচরাচর যে ধরনের অনুষ্ঠান আমরা ঘটতে দেখি, এ-দিনের অনুষ্ঠানটি তা থেকে স্বতন্ত্র। সঙ্গীত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও আদর্শকে সুন্দর রূপ দিয়ে দর্শকদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছিল। সুরঙ্গমার ছাত্র-ছাত্রীরা যে একদিন কৃতি হয়ে উঠবে, তার প্রমাণ তাদের নাচ-গান ও বাজনার বৈশিষ্ট্য। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয়, শিক্ষকদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও শিক্ষক এবং দর্শকদের কাছে ধরা পড়ার সুযোগ পায় এবং অভিভাবকরাও তাঁদের ছেলে-মেয়েদের যে নাচ-গান-বাজনা শেখাচ্ছেন তা ব্যর্থ হচ্ছে না সেটুকু বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

সুরঙ্গমার সুদক্ষ পরিচালক শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁর আলোচনায় এই কথাই বোঝাতে চাইলেন যে, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার পরিপূরক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা আশা করি, মজুমদার মহাশয়ের অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন অভিভাবকরা। অর্থাৎ রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষণের বৈজ্ঞানিক ধারাটির সঙ্গে যাতে পরিচয় হয়, শুধুমাত্র আসরে গাইবার জন্য কখানা গান জানা চাই—এই হাল্কা মনোভাবের দ্বারা যাতে অভিভাবকরা পরিচালিত হবেন না।

অনুষ্ঠানে ধ্রুপাদ ও খেয়াল গাওয়া হয় সম্মিলিতভাবে। কোন কোন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অরিজিন সম্পর্কেও আভাস পাওয়া গেল। টপ্পা (নিধুবাবু) গানের আমেজটিও মনে থাকবে বহুকাল। এসরাজ ও গীটারে শাস্ত্রীয় সুর ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূর্ছনা আমাদের আনন্দ দিয়েছে। শিশু শিল্পীরাও বাদ পড়ে নি। 'ছাড় গো তোরা ছাড় গো' গানটি অনবদ্য হয়েছিল তাদের কণ্ঠে।

পরিশেষে বসন্ত রাসলীলা নৃত্য-গীতাভিনয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে। সুরঙ্গমার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রধান। ভাড়াটিয়া শিল্পীদের সাহায্য নেওয়া হয় নি। প্রতিটি শিল্পী সুরঙ্গমার শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনী, এদের অনেকের ভবিষ্যৎ আমাদের মতে উজ্জ্বল বলে মনে হয়। আশা করি, সময় মতো আবার আমরা সুরঙ্গমার ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ-গান-বাজনার মধ্যে কৃতিত্ব ও অভিনবত্বের পরিচয় পাবো।

### 'মঞ্চ ভারতী'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্মীদের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'মঞ্চ ভারতী'-র দশম বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় 'স্টার' থিয়েটার মঞ্চে। সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডঃ রমা চৌধুরী এবং পদ্মভূষণপ্রাপ্ত শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এবারকার অনুষ্ঠানে এঁরা মঞ্চস্থ করলেন শ্রীশৈলেশ গুহনিয়োগীর 'গোলাপ কাঁটা'। অপেশাদার অফিস ক্লাবের পক্ষেও যে পেশাদারীদের সমকক্ষ অভিনয়-নৈপুণ্য এবং সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অভিনয় করা সম্ভব, তারই এক সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখলেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কর্মিগণ তাঁদের এই অভিনয়ের মাধ্যমে।

অভিনেতা হিসাবে প্রমোদের ভূমিকায় প্রদীপ পাল অনবদ্য। এছাড়া কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবনীর ভূমিকায় শ্রীতপন মিত্র, সতীশের ভূমিকায় শ্রীনীতীশ ব্যানার্জী, সমীরের ভূমিকায় বদ্রীনারায়ণ চ্যাটার্জী, কনস্টেবলের ভূমিকায় মিলন মুখার্জী, হরিদাসের ভূমিকায় বিমলেন্দু রায় এবং প্রবীরের ভূমিকায় শ্রীআশীষ সান্যালের অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় অরুণ দত্ত, হীরেন সোম, নারায়ণ দাস, নিরাপদ পাঠক ও যোগেন দত্তের অভিনয় যথাযথ।

অল রাউন্ড বেস্ট পারফরমেন্স ট্রফি সহ [illegible]
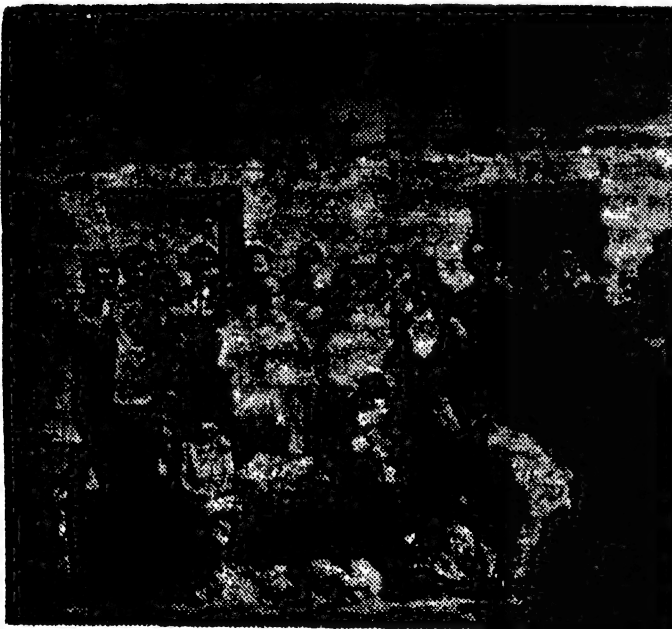
চব্বিশ পরগণা জেলার রাজপুরে একটি শিশু চলচ্চিত্রের চিত্র গ্রহণের সময় বসুমতী র ছোটদের সংসদের সদস্যদের চিত্র গ্রহণ করছেন শ্রীবিজন সেন।

স্ত্রী চরিত্রে 'লিপির' ভূমিকায় প্রতিমা পালের অভিনয় অপূর্ব। মেনকা দাস, তৃপ্তি দাস এবং হিমানী গাঙ্গুলীর অভিনয় প্রশংসনীয়।

নাটকটির সার্থক পরিচালনায় ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার শ্রীপিকলু নিয়োগী।

## নজরুল ও মুকুন্দ দাসের সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী 'গীতি মাল্য'-এর মাসিক অধিবেশন ১০২, এস এন ব্যানার্জী রোডস্থ ভবনে সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠিত হয়। এ-মাসের অনুষ্ঠানে নজরুল ও মুকুন্দ দাসের গান পরিবেশন করেন শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে এক ভাষণে নজরুলের গানের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—'বর্তমানে নজরুলের গান বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশিত হচ্ছে, প্রচার বাড়ছে—এটা খুবই আনন্দের কথা, তবে সব সময় ঠিক ঠিক পরিবেশিত হচ্ছে কি-না, সন্দেহের অবকাশ আছে।' তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আজকাল অনেকে তাঁর গানের সুর বিকৃত করেও পরিবেশন করছেন। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

জানা গেল শ্রীমুখোপাধ্যায় 'গীতি মাল্যের' সভ্যদের অভিনন্দন জানিয়ে দুই কবির গান আরম্ভ করেন। দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন তালে ও বিভিন্ন সময়ের রচিত বর্তমানে কদাচিৎ পরিবেশিত গানগুলি তিনি পরিবেশন করেন।

শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে এই দুই কবির গানের রস গ্রহণ করেন। এ-দিনের অনুষ্ঠানের শেষ গান 'কারার এ লৌহ কপাট' উপস্থিত শ্রোতাদের বহুদিন মনে থাকবে। সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন গৌর কর।

## লেনিন-জীবন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র

মস্কোর 'মসফিল্ম' ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের 'ডেফা' স্টুডিওর যুগ্ম প্রযোজনায় বর্তমানে লেনিনের জীবনের একটি ঘটনা সংক্রান্ত চলচ্চিত্র তোলা হচ্ছে। জার্মানীর খ্যাতনামা কমিউনিস্ট আলফ্রেড কুরেলার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের ভিত্তিতে তোলা এই ছবির নাম হল 'অন দি ওয়ে টু লেনিন'। এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ইয়েভগেনি গাব্রিলোভিচ ও হেলমুথ বেয়েবল এবং ছবির শিল্প-পরিচালনা করেছেন গুন্টুর রেইস্চ।

এ ছবির কাহিনী হল একজন তরুণ জার্মান শ্রমিকের। ব্যাভেরিয়ার জার্মান কমিউনিষ্টরা যে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন, তাঁদের একটি পত্র বহন করে তিনি লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সোভিয়েত রুশিয়ায় যান।

ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন জেড এইচ বোলোভোভা, এল দুরভ, এল কুগলি প্রমুখ। জি-ডি-আর ও লিথুয়ানিয়ায় দৃশ্য গ্রহণের পর এখন মস্কোয় ছবির দৃশ্য গ্রহণ চলেছে। ছবির প্রধান চরিত্র ভিক্টর ক্রেইস্ট ১৯১৮ সালে মস্কোয় এসেছেন লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতকারের জন্য। এ ভূমিকাটি অভিনয় করছেন লেইপজিগ নাট্য ইন্সটিটিউটের তরুণ শিল্পী। ২২ বছর বয়স্ক গটফ্রেড রিচটের। রিচটের বলেন, 'আমি যাঁর চরিত্রাভিনয় করছি, লেনিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতকারের ঘটনাটি রূপায়িত করা আমার পক্ষে সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। আমি সব সময়েই এই বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। চল্লিশ বছর আগের এই ঘটনাটি, লেনিনের সঙ্গে ক্রেইস্টের সাক্ষাৎ ও আলোচনা আমি কিভাবে জীবন্ত করে তুলবে।'

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম বলতে বললে রণজিৎ সিংজীর নাম বলতে বোধহয় কেউই ভুলবেন না। রণজি ছিলেন সে-যুগের ক্রিকেট জগতের বিস্ময় —অনন্য প্রতিভার অধিকারী।

ক্রিকেট খেলাকে আরো বেশি জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে রণজির চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তিনি বাঁধভাঙা স্রোতের মতো খেলতে চাইতেন, ব্যাট হাতে নিয়ে রানের প্লাবনে চাইতেন মাঠ ভাসিয়ে দিতে। দিতেনও। তাই ক্রিকেট খেলার ব্যাটিং করার প্রচলিত প্রথাকে তিনি মানতেন না। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে। তাই তাঁর হাত দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন এক মার।

ডান হাওয়ার্ড ছিলেন সেই সময়কার একজন নামকরা পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়। রণজির মাস্টারমশাই তাকে ফেনার পিচে' এনে ডান হাওয়ার্ড সাহেবের হাতে সঁপে দিলেন। রণজি প্রচলিত প্রথা অর্থাৎ কপি বুক ক্রিকেট মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু ডান হাওয়ার্ড সাহেব রণজির পুরনো অভ্যাসগুলো ত্যাগ করাতে না-পারলেও তাঁর খেলার কিছু কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিলেন। অনেক সময় রণজি উইকেটের সামনে থেকে ডান পাটা সরিয়ে এনে উইকেটটা পুরোপুরিভাবে উন্মুক্ত করে দিতেন বোলারের কাছে। ডান হাওয়ার্ড প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে রণজি উইকেটের সামনে থেকে ডান পাটা না সরিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলার কৌশল আয়ত্ত করে নেন।

কিন্তু আত্মরক্ষামূলক খেলার এই ধরনটা রণজির কিছুতেই যেন পছন্দ হতো না। চাইতেনও না ঐভাবে খেলতে। কিন্তু ডান হাওয়ার্ড সাহেবও নাছোড়-বান্দা। শেষকালে ডান হাওয়ার্ড সাহেবকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই ডান পাটা উইকেটের সামনে রেখে শরীর ঘুরিয়ে মারতে শুরু করলেন। ডান পা উইকেটের সামনে রেখে শরীরটাকে প্রয়োজন মতো ঘুরিয়ে মারতে শুরু করলেন আর এইভাবে মারা থেকেই আবিষ্কৃত হলো ক্রিকেটের একটি নয়নাভিরাম মার। ডান পা উইকেটের সামনে রেখে শরীরটাকে প্রয়োজন মতো ঘুরিয়ে বলটা লেগের দিকে এমনভাবে মারতেন যে, বলটা মুহূর্তের মধ্যে বাউন্ডারী সীমানার দিকে ছুটে যেতো। ইংলণ্ডের ডেলি টেলিগ্রাফ রণজির এই মারটির তীব্রতা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "....it goes to leg and boundary like a shell from a 7-pounder, immense, antacious, unstoppable....."

রণজিৎ সিংজীর এই নতুন মারটাই হলো ক্রিকেট খেলার নতুন আবিষ্কার লেগ গ্লান্স। লেগ গ্লান্সের সহজ-সরল ভঙ্গীমা আর মারের প্রচন্ড জোর—সেই সংগে পাল্লা দিয়ে এই স্ট্রোকটাও যেমন দর্শনীয়, তেমনি নয়নাভিরাম হিসেবে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের কাছে খুব অল্পদিনের মধ্যেই প্রিয় হয়ে উঠলো। অথচ এই লেগ গ্লান্সের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি রান তোলার জন্যে রণজিকে 'আনাড়ী' অপবাদও সহ্য করতে হয়েছে।

সেইটাই স্বাভাবিক, সেইটাই যেন অতি প্রত্যাশিত। মানুষের স্বভাবই প্রচলিত প্রথাকে, পুরনো ধারাকে আঁকড়ে থাকা—নতুন কিছু করতে যাওয়া কিংবা নতুন কিছুর দিকে পা বাড়ানো আমরা যেন সহজভাবে মেনে নিতে পারি না। আমরা ঈর্ষা করি, অপেক্ষা করি নতুন সেই পন্থাকে প্রচলিত প্রথায় রূপান্তরিত হবার জন্যে। তবু নতুন যুগের দিকে যিনি পা বাড়িয়েছেন কিংবা নতুন কোন পন্থা [illegible] প্রয়োজনেও আমরা ছাড়ি না।

তাই রণজিকেও তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই সমালোচনা রণজির মনোবল, রণজির সাহস আর রণজির ইচ্ছামত খেলার ইচ্ছেকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। যাঁরা 'কপি বুক ক্রিকেটে' অভ্যস্থ, তাঁরা রণজির সমালোচনা করলে কি হবে, ক্রিকেট-উৎসাহী দর্শকরা রণজির খেলা দেখার জন্যে তখন ছিলেন পাগল।

রণজি যখন খেলতেন, তখন সমস্ত মাঠে বইতো আনন্দ হাসি-গানের স্রোত। ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে রেখে রণজি এগিয়ে যেতেন হু হু করে। রানের পর রান, আরো রান আবার রান—শুধু বাউন্ডারীর ফোয়ারা। মারের বন্যায় ভেসে যেতো দর্শকদের মন। রণজি যে কতো তাড়াতাড়ি রান করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একদিনের সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা থেকে।

সেই সময় পার্কার পিচটা ছিল প্রকান্ড বড় একটা মাঠ। মাঠটা এতো বড় যে, একই মাঠে তখন একসংগে চলতে পারতো বেশ কয়েকটা ক্রিকেট ম্যাচ। সেদিন রণজি খেলতে গেছেন পার্কার পিচেই।

লাঞ্চের আগেই ১৩২ রান করে রণজি আউট হয়ে গেলেন। তাঁর দলের তখন ব্যাটিং চলছে। অনেকেই ব্যাট করবেন। তাই পাশের পিচে অনুষ্ঠিত খেলাটা দেখতে গেলেন রণজি। যে দল তখন ব্যাট করছে তাদের তখনো একজন খেলোয়াড় কম। তারা রণজিকে ধরে বসলো। তাদের হয়ে খেলে দিতে হবে। রণজিও এক কথায় রাজি। পরের উইকেটটা পড়লেই রণজি ব্যাট হাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন উইকেটের সামনে, তারপর শুধু রানের পর রান। অবোরোধানের [illegible]

রণজির হাতের ব্যাট। ব্যাটের আঘাতে বলগুলো বার বার ছুটে যেতে লাগলো বাউণ্ডারীর দিকে। খুব তাড়াতাড়ি শতরাণ পূর্ণ করে রণজি ফিরে এলেন নিজেদের খেলায়। তখনো চলছে তাঁদের ব্যাটিং। ব্যাটিং-এর ধারা দেখে বুঝলেন যে খেলাটা চলবে আরো অনেকক্ষণ। তাই রণজি গেলেন আর একটা খেলা দেখতে। সেখানেও সেই একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো রণজিকে। ফলে আবার ব্যাট হাতে নিয়ে তাঁকে নামতে হলো মাঠে। আবার সেই একই খেলা, একই রানের বন্যা। খুবই তাড়াতাড়ি রণজি করলেন শতরান—১২০ রান।

একই দিনে তিনটে খেলায় তিনটি শতরান করে রণজি করলেন বিশ্ব রেকর্ড। এ রেকর্ড কেউ বোধহয় কোনদিনই ভাঙতে পারবেন না। রণজি-প্রতিভার এ এক অসাধারণ সাক্ষ্য। আজ থেকে ৮০ বছর আগের সেই অবিশ্বাস্য তিনটি সেঞ্চুরীর কথা আজো ইংলণ্ডের এবং সারা বিশ্বের ক্রিকেট-রসিকদের কাছে কিংবদন্তীর মতো স্মরণীয় হয়ে আছে।

ক্রিকেট খেলার জনক ডব্লিউ জি গ্রেসের চরিত্রটি ক্রিকেট প্রতিভায় ভাস্বর। তিনি অতুলনীয়, তিনি ছিলেন সব কিছুর ঊর্ধ্বে। বুড়ো ডাক্তার গ্রেসের লম্বা-চওড়া বিরাট চেহারা আর দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখটা বোধহয় ছিল ক্রিকেটের শেষ কথা। সেই সময় ডব্লিউ জি মানেই ছিল ক্রিকেট আর ক্রিকেট মানেই ডব্লিউ জি গ্রেস।

কিন্তু সেবার সেই খেলায় বাধলো গোলমাল। মাঠের হাজার হাজার দর্শকরা রীতিমত উত্তেজিত। কাকে বেশি ভালো বলবেন তাঁরা! একদিকে ক্রিকেটের জনক গ্রেস আর অন্যদিকে তরুণ কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সাহসে ভরা ভারতীয় খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজী।

দুজনে খেলছেন একই সঙ্গে, কিন্তু দুজনের মধ্যে কে বেশি ভালো খেলছেন—এ প্রশ্নের কোন উত্তর সেদিন সেই মাঠের দর্শকরা খুঁজে পান নি।

সেদিন কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে এম সি সি'র হয়ে এক সঙ্গে ব্যাট করতে নেমেছিলেন ডাব্লিউ জি গ্রেস আর রণজিৎ সিংজী। স্মরণীয় দিনটি আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান নিলেও, সেই দিনটির কথা ক্রিকেট-রসিকরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না।

লর্ডস মাঠে সেদিন [illegible] রানের বন্যা। এক দিকে গ্রেস, অন্যদিকে রণজি। প্রথম ঘণ্টায় উঠলো একশ রান। দ্বিতীয় ঘণ্টায় ছাড়িয়ে গেলো দু'শর ঘর। লর্ডস মাঠে গ্রেস সেদিন তাঁর ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড ভেঙে স্থাপন করেছিলেন সর্বোচ্চ রান করার স্মরণীয় নজীর। গ্রেসের সেই রেকর্ড প্রতিষ্ঠায় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের পাতায় যিনি নিজের নামটা গ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিলেন, তাঁর নামই রণজিৎ সিংজী।

এম সি সি সেই খেলায় করেছিল ৫৯৪ রান। এর মধ্যে গ্রেস, রণজি আর গ্রেসের ছেলে—এই তিনজনে মিলে করেছিলেন ৩৪৪ রান।

সে এক অদ্ভুত, সে এক উৎসাহ উদ্দীপনায় আর আমোদে ভরা স্মরণীয় দিন। সে দিনের কথা, আমরা ভারতীয়রা কোনদিনই ভুলতে পারবো না, কারণ সেই দিন লর্ডস মাঠের দর্শকরা খেলা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ক্রিকেটের জনক ডব্লিউ জি গ্রেসের খেলার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ভারতেরই মানুষ, আমাদেরই একজন—রণজিৎ সিংজীর।

এ তো শুধু রণজিরই সম্মান নয়—এ যে আমাদের গর্বের বিষয়, এ তো ছিল আমাদেরই সম্মান, ছিল ভারতমাতার সম্মান......।

[ চলবে ]

রণজিৎ সিংজী

## হাটনের বর্ণ-বিদ্বেষ

দিন কয়েক আগে ব্যক্তিগত কাজে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ইংলণ্ডের প্রথম পেশাদার ক্রিকেট অধিনায়ক স্যার লেন হাটন। হাটন বড় ক্রিকেটার সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, হাটন সাহেব তাঁদেরই একজন, যাঁরা আজও বৃটিশ সিংহের সিংহত্বের মহিমায় এবং সাদা চামড়ার গর্বে গর্বিত। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, কলকাতা কিম্বা ভারতবর্ষের অন্য যে কোন শহরে হাটন সাহেবের বক্তৃতা আর সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া বাণীগুলোর কথা মনে করে—খোদ ইংলণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার সফরকে কেন্দ্র করে যে-সব ঘটনা ঘটছে, সেগুলো একটু খোলা মনে বিচার করলেই বেশ বোঝা যায় যে, ক্রিকেটের সেরা নায়ক হলেও বর্ণবৈষম্যের ঠাট হাটন সাহেবের মধ্যে যেন একটু বেশিই। ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ—যাঁরা তাঁদের গায়ের রং-এর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, তাঁরাই উঠেপড়ে লেগেছেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইংলণ্ড সফরে আনতে। হাটন সাহেবও ওঁদেরই একজন। তাই তিনি বলতে এতোটুকুও ইতস্তত করেন নি, যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার ইংলণ্ড ভ্রমণের ব্যাপারে বিরোধিতা করছেন, তাঁরা ক্রিকেটেরই সর্বনাশ ডেকে আনছেন, অর্থাৎ তাঁরা ক্রিকেটের শত্রু। সেই শত্রুবাহিনীকে রোখার জন্যে নাকি ক্রিকেট মাঠের পিচ সিংহের প্রহরায় রাখা হবে আর বর্ণবৈষম্য নীতির বিরোধীদের রোখার জন্যে একটা জবরদস্ত বাহিনী গড়ে তোলা হবে। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে, হাটন সাহেবও এ কথা শুনে নিশ্চয়ই দারুণ খুশি।

কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই হাটন সাহেব স্বীকার করবেন যে, 'ক্রিকেট তো শুধু একটা খেলা নয়, সে হল একটা মর্যাদাপূর্ণ আচরণ।' কিন্তু হাটন সাহেব নিজে এই আচরণের পরিচয় কতোটা দিয়েছেন? শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসুর লেখা থেকে তুলে দিই, "১৯৪৮ সাল। মিলারের সংগে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন হাটন। মিলার বললেন, লেন আমাকে অপছন্দ করে কেন, বুঝতে পারি না। ৮ বছর পরে ১৯৫৬ সালে লেন হাটন বললেন, কিথ! সেদিন তোমার সংগে মৌখিক ভদ্রতা রাখা সম্ভব ছিল না। তোমাকে পছন্দ করার পক্ষে তুমি অনেক ভাল বোলার ছিলে। তুমি এবং লিন্ডওয়াল আমার জীবন নরক করে দিয়েছিলে।" হাটনের জীবনের সংখ্যাতীত অভাবনীয় আচরণের মধ্যে তাঁর চরিত্র খুঁজতে যাবার দরকার নেই। সামান্য ঐ ঘটনাটিই হাটন-চরিত্রের একটা দিক সম্পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছে। হাটন ক্রিকেট খেলেন, কিন্তু খেলাকে কোন দিন খেলা হিসেবে নেন নি। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা তাঁর চোখে শত্রু। তাই ট্রুম্যানকে পেয়ে হাটন আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। ট্রুম্যানের মধ্যে (হাটনের ভাষায়) 'যথার্থ ফাস্ট বোলারের গুণ আছে। সে প্রতিপক্ষ-ব্যাটসম্যানকে ব্যক্তিগত শত্রু মনে করে।' এই হাটন, এই তাঁর পরিচয়। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে আর নতুন কি আশা করা যেতে পারে। বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে তিনি যদি কিছু বলতেন তাহলেই অবাক হতাম আমরা। হাটন সাহেব তাঁদেরই প্রতিভূ, যাঁরা আজ সব হারিয়েও সব ধরে রাখার জন্যে জেহাদ চালাচ্ছেন। কিন্তু দিন-কাল বদলে গেছে। বর্ণ-বিদ্বেষ আর চলবে না। যদি চলে, তাহলে আমরা জোর গলায় বলবো, "পৃথিবীর কালোরা এক হও। বিশ্ববিখ্যাত একজন কালো খেলোয়াড় দুঃখ করে বলেছিলেন,—সায়েবরা জর্জ হেডলি সম্বন্ধে বলে কালা ব্রাডম্যান,—ব্রাডম্যানকে সাদা হেডলি বললে কেমন শোনায়?" সেই কথা শোনার দিনই বোধহয় এইবার আসছে। আর সেই জন্যেই বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে আজ এই আন্দোলন—এই বিদ্রোহ......।

—শান্তিপ্রিয়

## সিংহত্বহীন সিংহবাহিনী

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির গোঁ বজায় রাখার জন্যে ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর ক্রিকেট উৎসাহীরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। মুখে তাঁরা যাই বলুন না কেন, তাঁরাও যে বর্ণবৈষম্য নীতির গোঁড়া সমর্থক, সে কথা বুঝতে আজ আর কারো বাকী নেই। কিন্তু আজ শুধু আর ইংলণ্ডের নয়, এই নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমস্ত পৃথিবীতেই দানা বেঁধে উঠেছে। সকলেই একযোগে এর প্রতিবাদ করছেন। তবু এম সি সি-র ইচ্ছের দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ড ভ্রমণে আসছে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের হাত থেকে পিচ আর মাঠ কি করে রক্ষা করা হবে, এই চিন্তায় এম সি সি-র কর্তাদের বোধহয় মাথা গরম হয়ে উঠছে। তাই তাঁরা স্থির করেছেন, খেলার মাঠের পিচগুলো সিংহদের দিয়ে পাহারা দেওয়াবেন। আমরা জানতাম, বৃটিশ সিংহের অনেকদিন আগেই সিংহত্ব লোপ পেয়েছে। কিন্তু কেশরের দম্ভ যে এখনো আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সিংহ দিয়ে পিচ পাহারা দেওয়ার খবরে। শুধু তাই নয়, বর্ণবৈষম্য নীতির বিক্ষোভ মোকাবিলায় সমর্থক বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে এম সি সি-র কতিপয় বর্ণ-দাম্ভিকের পরিচালনায়। কিন্তু এইভাবে ক্রিকেট খেলার উন্নতি হবে—না, ক্রিকেট খেলার কবর খোঁড়া হবে, সেইটাই শুধু [illegible] এখন আমাদের দেখার বিষয়।

• ক্রিকেট শেষ হয়ে আসছে, শুরু হয়ে গেছে হকি লীগের খেলা—ফুটবলের এখনো অনেক দেরি, তবু এরই মধ্যে ফুটবলই বাংলা দেশের ক্রীড়া উৎসাহীদের একমাত্র আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুটবল খেলোয়াড়দের দল-বদলের পালাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশ এখন জম-জমাট। সবার মুখে এখন একই কথা, একই আলোচনা। কে কোন্ ক্লাবে গেল, কে কোন্ ক্লাবে এলো, কিম্বা কে কোন্ ক্লাবে যেতে কিম্বা আসতে পারে—এ আলোচনার যেন আর আদি-অন্ত নেই।

প্রতি বছরই ফুটবল খেলোয়াড়দের দল-বদলের পালাকে কেন্দ্র করে পুরো বাংলা দেশটাই যেন জমে ওঠে। গড়ের মাঠে ক্লাবগুলোর টেন্টে টেন্টে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর তৎপরতা। আই এফ এ অফিসের সামনেটা এই সময় দেখার মতো হয়। ফুটবল উৎসাহীরা ভিড় জমান সেখানে। তারপর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন সেই মুহূর্তগুলোর জন্য, যখন তাঁদেরই প্রিয় খেলোয়াড়রা দল-বদল করতে আসেন আই-এফ-এ অফিসে।

নিজের দলে অন্য দলের প্রিয় খেলোয়াড়রা এলো তো আর কথাই নেই—আনন্দ-হাসি-গানে তাঁরা ভরিয়ে তোলেন চারপাশ, আবার নিজের দলের কেউ যদি অন্য দলের পক্ষে সই করতে আসেন, তাহলেই আর দেখতে হবে না। সমস্ত পরিবেশটাই যায় পাল্টে। হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে যায়।

এ তো প্রতি বছরের ঘটনা। ফুটবল উৎসাহীরা প্রতি বছরই খেলোয়াড়দের দল-বদলের এই সময় খুবই অস্বস্তির মধ্যে কাটান। ফুটবল খেলোয়াড়দের দল-বদলই এখন খবরের মতো খবর। তাই হকির ভরা মরশুমে এবং ক্রিকেট মরশুমের প্রান্তে ফুটবলই আসর মাৎ করেছে।

ক্রিকেট উৎসাহীদের মুখে মুখে এখন তাই শুধু ফুটবলের খবর—সবারই জানার আগ্রহ—কে কোন্ দলে যাচ্ছে, কে কোন্ দলে যাবে...।

## গল্প হলেও সত্যি

১৯০৪ সাল। টেন্টব্রীজ-এ ইংলণ্ডের সংগে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে আছে কতকগুলি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হওয়ার জন্য।

তা ছাড়া তখনো পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে ৬৫৮ রান ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ রান ছিল।

ইংলণ্ডের ৬৫৮ রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ৫টি উইকেট ১৫১ রানের মধ্যে পড়ে গেল। এর পরে এলেন ম্যাককেব্। তিনি বি· এ· বার্নেট, ও বেইলি ও ম্যাক্-করমিক্ এই তিন বাঁ-হাতি ব্যাটস্‌ম্যানদের সাহায্যে চার ঘন্টার কিছু কম সময়ে করলেন ২৩২ রান।

টেন্টব্রীজ-এর উইকেট অবশ্য ব্যাটস্‌ম্যানদের খুব সাহায্য করেছিল। সি· জে· বার্নেট ও লেন হাটন ইংলণ্ডের প্রথম উইকেট জুটিতে করেন ২১৯ রান। হাটন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী করে নেন। কম্পটন ১০২ ও সি· জে· বার্নেট করলেন ১০৬ রান। পেণ্টার ২১৬ রানে অপরাজিত রইলেন। ফলে প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের চারজনেরই সেঞ্চুরী হল। লাঞ্চের মধ্যেই সি· জে· বার্নেট ও লেন হাটন ১৬৯ রান করেছিলেন মাত্র ১২০ মিনিটে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৪১১ রানে সকলে আউট হয়ে গিয়ে ২৪৭ রানের ব্যবধানে পড়ে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে মন্থর গতিতে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া খেলাটি ড্র করে। ব্রাউন ৩০০ মিনিটে ১৩৩ রান করে আউট হন। ব্রাডম্যান ১৪৪ রান করে অপরাজিত থেকে ইংলণ্ডের জয়ের আশা নির্মূল করে দিলেন। খেলা ড্র হল বটে। কিন্তু হাটন, সি· জে· বার্নেট, ডেনিস কম্পটন, পেণ্টার, ইংলণ্ডের এই চারজন এবং ম্যাককেব্, ব্রাউন, ব্রাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার এই তিনজন, মোট ৭জন সেঞ্চুরী করে নতুন রেকর্ড তো করলেনই, নিজেরাও চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

—প্রশান্ত বসু
"কল্যাণী ভবন"—[illegible] রোড,
রাসডাঙা, আসানসোল।

## সালকিয়া এ এস স্কুল ও উষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ের স্পোর্টস

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সালকিয়া এ এস স্কুল ও উষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ রামপ্রতাপ চামেরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা ক্রীড়া-সাংবাদিক শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীগুপ্ত তাঁর ভাষণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কয়েকটি বিষয়ের সবিশেষ প্রশংসা করে ক্রীড়া পরিচালকের সুপরিচালনার তারিফ করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোবিন্দলাল সরকার পতাকা উত্তোলন ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। ক্রীড়া পরিচালক শ্রীবঙ্কিম ঘোষ ও শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। তপন মাঝি ও রীতা পাল ব্যক্তিগতভাবে ছেলে/মেয়েদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয়ের কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীসুশীলকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীনির্মল মুখার্জী এম-এল-এ ও শ্রীমতী প্রগতি ভারতী।

## সমাচার দর্পণ

জিমি এলিসকে হারিয়ে জো ফ্রেজার বিশ্বের চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধার স্বীকৃতিলাভ করেছেন। হেভি ওয়েটের এই লড়াইটি চতুর্থ রাউণ্ডেই শেষ হয়ে যায়। ক্যাসিয়াস ক্লে ১৯৬৭ সালে সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে অস্বীকার করায় তাঁর বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব কেড়ে নেওয়া হয়। এখন সেই জয়ের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হলো জো ফ্রেজারের মাথায়।

**সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** (হালিসহর, গোলাবাড়ি)

**উত্তর :** তোমার চিঠির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো : এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে খেলাধুলার ক্ষেত্রে সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ প্রসন্ন ও বেদীকে রাষ্ট্রপতি 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত করেছেন। টেস্ট খেলায় ওঁদের দুজনের ব্যাটিং ও বোলিং এ্যাভারেজ তুলে ধরলাম :

| ব্যাটিং | টেস্ট | ইনিংস | নঃ আঃ | রান | সর্বোচ্চ | ক্যাচ | গড় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রসন্ন | ২২ | ৩৮ | ৬ | ৩৬২ | ২৬ | ৯ | ১১'৩১ |
| বেদী | ১৯ | ৩২ | ৮ | ২০৪ | ২২ | ৯ | ৮'৫০ |

| বোলিং | বল | মেডেন | রান | ইনিংসে ৫টির বেশি উইঃ | উইঃ | গড় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রসন্ন | ৭৫৫৬ | ৩৪২ | ৩০৫৭ | ৯বার | ১১৩ | ২৭'০৫ |
| বেদী | ৫৫৪০ | ৩৩৭ | ১৭৯৮ | ৪ " | ৭০ | ২৫'৬৮ |

**তপনকুমার বসু** (কাঠালদহ, কুণ্টিকরী, হাওড়া)

**উত্তর :** আমাদের লেখা আপনার ভালো লেগেছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি। আপনি যাঁদের ব্যাটিং ও বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চেয়েছেন তাঁদের এ্যাভারেজ শীঘ্রই জানানো হবে।

**স্বপনকুমার রায়চৌধুরী ও নব চক্রবর্তী** (সিসাম অ্যাভেনিউ, গৌহাটি-১১)

**প্রশ্ন :** ভারতীয় দল হিসেবে প্রথম কোন্ দল আই· এফ· এ শীল্ড বিজয়ী হয়? মেডেন ওভার কি?

**উত্তর :** ভারতীয় দল হিসেবে মোহনবাগানই সর্বপ্রথম আই· এফ· এ শীল্ড লাভ করে।

যে ওভারে কোন রান হয় না অর্থাৎ একটি ওভারের ছ'টি বলের একটিও মেরে ব্যাটসম্যান যদি রান নিতে না পারেন তাহলে সেই ওভারটিকে মেডেন ওভার বলা হবে।

**সুকুমার সরকার** (বাঁকুড়া ক্রাস্টাইচার্চ কলেজ)

**প্রশ্ন :** ফ্লাইট বল কিভাবে করতে হয়? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট বোলার কে?

**উত্তর :** স্পিন বোলাররা মাঝে মাঝে ঝুলিয়ে বল করেন যেমন বলটা বেশ একটু উঁচু দিয়ে যায়—এই ঝুলিয়া দেওয়া বলকেই ফ্লাইট দেওয়া বলে। ফ্লাইট বোলার বলে তেমন বিশেষ কিছু নেই। স্পিনারদের মধ্যে লেগ স্পিন বোলাররাই ফ্লাইট পরিবর্তন করে নানাভাবে ব্যাটসম্যানকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেন।

---

**উত্তম সরকার** (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

**উত্তর :** বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে সোবার্সের নামই করতে হবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক আমাদের মতে রাশিয়ার লেভ ইয়াসিন। শ্রেষ্ঠ বোলার বললে তো কিছু বোঝা যাবে না—স্পিনার না ফাস্ট বোলার জানাতে হবে।

**উদয়লাল নায়ক** (নুংগী, বর্ধমান)

**উত্তর :** আমরা তো ভাই ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ছবি দিতে কিম্বা পাঠাতে পারবো না। আপনি বরং কোন প্রেস ফটোগ্রাফারের সংগে যোগাযোগ করুন।

**তপনজ্যোতি, জীবনজ্যোতি, দেবজ্যোতি ও প্রসেনজিৎ ঘোষ** (জোড়হাট—১)

**প্রশ্ন :** চন্দ্রে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা কি সম্ভব?

**উত্তর :** নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন ডিক্সনারী থেকে 'অসম্ভব' কথাটা তুলে দিতে! দেখুন আপনারাও পারেন কি-না......!

**কমল, জিতেন ও মাস্টার** (রামপুর, বাঁকুড়া)

**প্রশ্ন :** কর্নেল সি· কে· নাইডু কি আগে সৈন্য বিভাগে খেলতেন? যদি না খেলতেন তাহলে কর্নেল কি করে হলেন?

**উত্তর :** কর্নেল সি· কে· নাইডু সেনা বিভাগেই ছিলেন।

**অসিত সরকার** [গজু] (সরকার ভিলা, ইন্দা, খড়্গপুর)

**উত্তর :** আপনি যখন ধরেই নিয়েছেন তখন আপনার উত্তর দিয়ে আর কি লাভ? তাই দিলাম না। তবে সমাচার দর্পণ আরো বেশি করে ছাপার জন্যে আপনি যে প্রস্তাব রেখেছেন, সে বিষয়ে আমরা সচেষ্ট হবো।

**এম· জি· সেন** (গড়জয়পুর)

**উত্তর :** টেস্ট ক্রিকেটার পি· সেনের মৃত্যুতে আপনার শোক-সংবাদ 'প্রবীর সেনের পরিবারবর্গকে জানিয়ে দেওয়া হলো।

**রাজা পৈত্য** (মালিগাঁও রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটি—১১)

**উত্তর :** খেলাধুলার ওপর প্রকাশিত আমাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলো আপনার ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। যাই হোক, আপনি অন্য কোন লেখা পাঠাবেন। কারণ ক্রিকেটের (নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া প্রসংগে) অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

৩ বর্ষ : ৩৮শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 19th March, 1970

# চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে

যুক্তফ্রন্টের দলাদলিতে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের চিন্তারাজ্যে যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, বোধহয় বিগত বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনেও সে রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। জনসাধারণ বহু আশায় যুক্তফ্রন্টকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাসনের ভার দিয়েছিল। দেখা গেল, আত্মকলহে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে যুক্তফ্রন্ট নিজেই ছিন্নভিন্ন।

সুগভীর মতপার্থক্যে ছিন্নভিন্ন যুক্তফ্রন্টকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টাও কম হয় নি। দিল্লী থেকে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্য শ্রীকৃষ্ণমেনন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে গেছিলেন। আর-এস-পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভাঙন রোধের জন্য শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে ঘনঘন দেখা-সাক্ষাৎ করেছিলেন। শ্রীবসু দলের সম্মান রক্ষার জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিতে চান নি। কিন্তু তিনি যোগাযোগকারী নেতৃবৃন্দকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য সহ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হতে পারে। ঐ কমিটি প্রয়োজন হলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ প্রতিদিনই একটি বৈঠকে বসে পর্যালোচনা করতে পারেন। উপরন্তু ঐ কমিটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতীত কাজেরও তদন্ত করতে পারেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা শ্রীজ্যোতি বসুর ঐ কথায় আশান্বিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং শ্রীবসু অন্যান্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতেও রাজী, তাও জানান। কিন্তু শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের মতোই মুখ্যমন্ত্রী স্বীয় দলের নির্দেশে পদত্যাগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বাজেটের অধিবেশনের সময় (এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ) যুক্তফ্রন্টের দলগুলি এমন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, তা আমাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। ঐ বাজেট-ভাবনায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলে শোনা গেছে। মার্চ মাসের মধ্যে বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ পাশ না হলে রাজ্যের প্রায় সমস্ত কাজকর্মই অচল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ঐ অবস্থায় জনগণকে শুধু হাতে নয়, ভাতে মারার ব্যবস্থাও যুক্তফ্রন্ট করে গেলেন—যা হয়তো ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যদি মার্চের মধ্যে বাজেট পাশ করানো সম্ভব না হয়।

যুক্তফ্রন্টের প্রতি জনসাধারণের এখনো পর্যন্ত আশা আছে, যদিও পূর্বেকার সেই অন্ধ মোহ নেই। আপাতত দলবাজীর জন্য যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হলো, তার ফলে আগামীদিনের নির্ধারিত কর্মসূচীগুলির কী অবস্থা ঘটবে, তা দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।

যুক্তফ্রন্টের দলগুলি সবচেয়ে যে বড় কাজের এই মুহূর্তে দাবি করতে পারেন—তা হচ্ছে, লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর ওপর মানসিক উৎপীড়ন। পরীক্ষা এখন হবে কি, হবে না—এই দো-টানায় পড়ে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট দলগুলি দলবাজীতে মাতোয়ারা হয়ে যাওয়ায়, বাজারের যে কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য হু-হু করে বেড়ে চলেছে।

তা ছাড়া আর একটি বিষয় উল্লেখ্য, বর্তমান মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যয় করার অধিকার সরকারের থাকলেও শিক্ষকদের অনুদান না-কি মে মাসের আগে তাঁদের কাছে পৌঁছবে না। এর সরল অর্থ, রাইটার্স বিল্ডিংস্-এরও কাজকর্ম একরকম অচল হয়ে পড়েছে।

এই জাতীয় অবস্থায় পৌঁছবার আগে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত কি না, সে-কথা হয়তো যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত জনদরদী নেতৃবৃন্দের একাধিকবার ভাবা উচিত ছিল। তবু তা সম্ভব হয় নি, কারণ দলীয় নির্দেশ পালনই সব দলের নেতাদের শেষ বাঞ্ছা।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার পর সমস্যা সমাধানের দু'টি পথ খোলা আছে।

প্রথম পথ, রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান কর্তৃক বিধানসভায় সর্ববৃহৎ দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান। সেই ধরনের মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব কি না, তা এই প্রবন্ধ লেখার আগে পর্যন্ত আমাদের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা মুস্কিল। তবে পশ্চিমবঙ্গে আবার যে আয়ারাম-গয়ারামের রাজনীতির খেলা সুরু হতে পারে, এমন অনুমান কেউ কেউ করছেন। তবে জনগণের বিচারশক্তি বিবেচনা করে সে-পথে এগোতে গেলে অনেক ভাবনা-চিন্তা, কে কোন্ পথে যাচ্ছেন, সেদিকে গণ-দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় পথ, রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন। রাষ্ট্রপতির শাসন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বারবার চলুক, এমন অবস্থা কারোরই মনঃপূত নয়। তা ছাড়া পুনরায় অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য ব্যয় বহনের প্রশ্নও আছে। তবে দলগুলি যুক্তফ্রন্টের হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেভাবে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছিল, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার সংকল্পে তারা জনগণের দরবারে পুনরায় ভোট ভিক্ষাপ্রার্থী হতে পারে।

অবশ্য যে পথই গ্রহণ করা হোক না, তা সংবিধানসম্মত উপায়ে হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

সংবিধানে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে সামরিক পুরুষেরা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারবেন না। বস্তুত গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে এ-শর্ত অপরিহার্য। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যাঁদের ওপর অর্পিত, তাঁরা যদি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিতে থাকেন, তবে, অসামরিক সরকারের মর্যাদাই শুধু ক্ষুন্ন হবে না, দেশে ঘনঘন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটারও সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক পুরুষের পক্ষে অবশ্য রাজনীতি করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু রাজনীতি করার নামে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের দেশে তাঁরা মিলিটারি কম্যাণ্ডারের ভঙ্গীতে কথা বলতে পারেন কি? অথচ কারিয়াপ্পা সেই থেকে তাই করে আসছেন।

সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা বলেছেন যে, ভারতের এখন যা রাজনৈতিক সংকট তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সংবিধান বাতিল করে কিছুদিনের জন্যে সামরিক শাসন প্রবর্তন করা দরকার। তারপর কিছুদিন বাদে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচন করে নতুন সরকার গঠিত হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, জেনারেল কারিয়াপ্পার এই বিপজ্জনক উক্তিকে কেন্দ্র করে পার্লামেণ্টে এবং রাজ্য বিধানসভায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

১৯৫৩ সালে কাজ থেকে অবসর নেবার পর থেকেই জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা যেন অস্থির হয়ে ছটফট করে মরছেন। অখণ্ড অবসর সময় কাটাবার জন্যে নতুন পেশা হিসেবে নিয়েছেন রাজনীতিকে। বাস্তবিক, রাজনীতি ছাড়া সহজে খ্যাতি কুড়োনো যায় আর কোথায়? তা ছাড়া চাকরি যাবার পর নতুন করে যদি ক্ষমতা জুটে যায় তো মন্দ কি? সেই জন্যে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল দল জেনারেল কারিয়াপ্পাকে পিঠ চাপড়াতে শুরু করেছিল গোড়ায়, যখন তিনি ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে, সামগ্রিকভাবে ভারত সরকারকে সমালোচনা করে এবং সেই সঙ্গে প্রগতিশীল দলগুলিকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

জেনারেল কারিয়াপ্পার জন্ম পশ্চিম ভারতের কুর্গে, শিক্ষালাভ করেছেন মাদ্রাজে। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবে কারিয়াপ্পা ছোটবেলা থেকেই খুব সাহসী ও ডানপিটে ছিলেন। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সামরিক বাহিনীর লোক হিসেবে কারিয়াপ্পা বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে ইরাক, সিরিয়া, ইরান, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি যান। এ-কথা অনস্বীকার্য সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সংহত

জেনারেল কারিয়াপ্পা

করার কারণে ব্রিটিশ সরকার কারিয়াপ্পাকে বহু পুরস্কার দিয়েছেন।

ইন্দোরের ডালি কলেজ থেকে কমিশন পেয়ে কারিয়াপ্পা রাজপুত সেনাবাহিনীর সঙ্গে ওয়াজিরিস্তানে প্রেরিত হলেন। সেখানে ১৯২২-২৫ পর্যন্ত থাকার পর প্রথম ভারতীয় অফিসার হিসেবে ১৯৩৩ সালে কোয়েটার স্টাফ কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পেলেন। সেখান থেকে কৃতকার্য হবার পর কারিয়াপ্পাকে '৩৮ সনে দাক্ষিণাত্যের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের পদ দেওয়া হয়। দশম ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সিরিয়া, ইরাক, ইরান যাবার সুযোগ মেলে তাঁর '৪১ সালে। পরের বছর তিনি লেফটেনাণ্ট কর্নেল পদে উন্নীত হলেন এবং একটা ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব করার ডাক পেলেন। ভারতীয় হিসেবে এই ডাক কারিয়াপ্পার কাছেই প্রথম এসেছিল। '৪৩ সনে তিনি সেনাবাহিনীর সহকারী এ্যাডজুটাণ্ট এবং কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হলেন। '৪৪ সালে যে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়, কারিয়াপ্পাকে তার অন্যতম সদস্য পদ দেওয়া হয়। ইম্পিরিয়াল কলেজে যোগদানের জন্যে কারিয়াপ্পা বিলেত গেলেন '৪৬ সনে।

ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন স্বভাবতই কারিয়াপ্পার কপাল খুলে গেল। তাঁর পদোন্নতি ঘটতে লাগল দ্রুতলয়ে। প্রথমে তিনি পেলেন মেজর-জেনারেল, চীফ অফ জেনারেল স্টাফ, জি ও সি-ইন চীফ ওয়েস্টার্ন কম্যাণ্ড এবং লেফটেনাণ্ট জেনারেলের পদগুলি তিনি পর পর পেয়ে গেলেন একই বছরের (১৯৪৭) মধ্যে। '৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে লিজিয়ন অফ মেরিট খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৪৯-৫৩ সালে জেনারেল কারিয়াপ্পা ভারতের সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। অবসর নেবার পর তিনি প্রথমে অস্ট্রেলিয়া ও পরে নিউজিল্যাণ্ডে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কারিয়াপ্পার বয়স এখন ৭০। কিন্তু এখনো তিনি কর্মক্ষম রয়েছেন বলে 'কী করি, কী করি' ভাবের ঘোরে এক-একটা উদ্ভট উদ্ভট শ্লোগান আওড়ে রাজনৈতিক জগতে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছেন। কিন্তু ভারতের জাগ্রত জনমত প্রাক্তন জেনারেলের রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে কৌতুকই অনুভব করছে, দলে দলে তাঁর পেছনে সমবেত হয়ে তাঁকে নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করছে না। হায় জেনারেল, তোমার নির্দেশ পালন করার মত লোক আজ ভারতে কোথায়!

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## বসু ও জিন্না—(৫)

১৯১১ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত সময়কে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুবর্ণ-যুগ বলা যায়। এই দশ বছরের মধ্যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বাস্তব চুক্তি হয়েছে এবং মুসলমানেরা কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই দশ বছরেরও আবার দুই ভাগ—১৯১১ থেকে ১৯১৮ এবং ১৯১৯ থেকে ১৯২১। এই দুই পর্বে কংগ্রেসের পক্ষে দুই নেতা, তিলক ও গান্ধী, মুসলমানপক্ষে জিন্না ও মহম্মদ আলী।

১৯১৬ সালে লখনৌয়ে যে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি হয়েছিল, তাতে জিন্নার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। জিন্না তখনো কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লোকমান্য তিলক তখন ৬ বছরের অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। চরমপন্থী হলেও তিলক বাস্তববাবাদী হিসাবে রাজনৈতিক চুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। লীগ কেন তার একগুঁয়ে মনোভাব ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল, তার পটভূমিকা আগে বলেছি। ১৯১৬ সালের কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা একই প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন বিনা বিবাদে এবং জিন্নার উৎসাহে লীগ এগিয়ে এসেছিল চুক্তি করতে। কংগ্রেস ও লীগ মিলিত হয়ে ইংরেজ সরকারের কাছে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পর্যন্ত করেছিল।* অপরদিকে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিয়েছিল (যে-স্বীকৃতিকে সে পরে প্রত্যাহার করবে এবং তা নিয়ে সংঘাতের শেষ থাকবে না), এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকারও স্বীকার করেছিল (যার দ্বারা কংগ্রেস নিজেকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে দেখিয়ে দিয়েছিল)।**

লখনৌ প্যাক্টের কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটনা ঘটল, যাতে পটভূমিকা একেবারে বদলে গেল। ভারতের রাজনৈতিক

---

* "There was complete identity of views between the Moderates, Extremists and the League. This was partly due to the widespread belief that further constitutional advance was impending and in any case would be granted after the war. All but three of the Indian members of the Imperial Legislative Council submitted a memorandum to the Viceroy indicating the lines of constitutional reforms they would prefer, while the Congress and the League formulated their scheme which declared in its preamble that 'the time has come when His Majesty the King-Emperor should be pleased to issue a Proclamation announcing that it is the aim and intention of British policy to confer Self-Government on India at an early date.'"

(A. K. Majumdar, P.—70)

** ইংরেজের ভেদনীতি এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তার আক্রোশের চেহারা দেখা যায় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের বোম্বাই অধিবেশনের সময়ে। জিন্নার চেষ্টায় কংগ্রেসের অধিবেশনকালেই একই জায়গায় লীগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়, বোঝাপড়ার সুবিধার জন্য। লীগের বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন জাতীয়তাবাদী মজহারুল হোসেন, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় তিনি ঘোরতর বিরোধী। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার লীগের এই অধিবেশন ভাঙবার জন্য কিছু মুসলমানকে জড়ো করেন। জিন্না পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে এ ব্যাপারে সাক্ষাৎ করলে তিনি স্বীকার করেন, হ্যাঁ, সত্যই তিনি লীগ অধিবেশন যাতে না হয় সে জন্য উস্কানি দিয়েছেন। এমন কেন করেছেন, বিস্ময়কর সত্যবাদিতার সঙ্গে তা জানিয়েছিলেন : "যত দূর তিনি (পুলিশ কমিশনার) জানেন, কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের পাশাপাশি লীগের অধিবেশন ডাকার হেতু হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোয়ালিশন ঘটানো; মুসলমানদের বন্ধু হিসাবে তাঁর ধারণা মুসলমানদের মূল স্বার্থের পক্ষে ও-জিনিস একেবারে পরিপন্থী, ও-জিনিস মুসলমানদের পক্ষে

ইতিহাসে নতুন নেতৃত্ব ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদয় হল—সংগ্রামের পদ্ধতিও বদলে গেল—অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে তাড়িত মথিত হতে লাগল ভারতবর্ষ। প্লাবন যখন সরে গেল, বিস্ময়ে ও বেদনায় অনেকে দেখল, পলিমাটি অবশ্যই উর্বর করেছে মৃত্তিকাকে, যা অমৃতবৃক্ষের মতই বিষবৃক্ষকেও বাড়িয়ে তুলেছে। এই আন্দোলনের পরিণতিতে ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারত-বিভাগ।

খিলাফত আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটা মনে পড়বে, তা হল—প্যান ইসলাম। খিলাফত আন্দোলন আর কিছু নয়, মুসলমানদের ধর্মনেতা তুরস্কের খলিফার স্বার্থ-রক্ষার জন্য আন্দোলন। সুদূর তুরস্কের খলিফার স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কেন জড়িয়ে গিয়েছিল, সে এক বিচিত্র কাহিনী। তুরস্কের সুলতান প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগদান করেন। তার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের চিত্তসংকট ঘটে—একদিকে ইংরাজরাজের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে তুরস্কের ধর্মরাজের প্রতি ভক্তি। এই টানাপোড়েন থেকে ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তি দেবার সাধু ইচ্ছায় এবং অবশ্যই সাম্রাজ্যরক্ষার ইচ্ছাতে তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ৫ জানুয়ারী ১৯১৮ তারিখে এক বিবৃতিতে জানান, গ্রেট ব্রিটেন তুরস্ক সম্বন্ধে আক্রোশ-নীতি রাখবে না এবং "প্রধানত তুর্কী জাতি-অধ্যুষিত এশিয়া মাইনর ও থ্রেস-এর বর্ধিষ্ণু ও বিখ্যাত ভূমিখন্ড থেকে তুরস্ককে বঞ্চিত করবার জন্য মিত্রপক্ষ লড়াই করছে না।"১ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনও প্রকাশ্যে একই প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই আশার সঞ্চার হল—যুদ্ধের ফল যাই হোক, তুরস্কের সাম্রাজ্য নষ্ট হবে না।

ভারতীয় মুসলমানদের আশা যেমন বিচিত্র,২ ইংরাজদের প্রতিশ্রুতিও তাই। প্রতিশ্রুতিরক্ষায় সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ খ্যাতিসম্পন্ন নয়। সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে দেখা গেল, চুক্তির দ্বারা গ্রীস পেয়েছে থ্রেস, তুর্কী সাম্রাজ্যের এশিয়ার অন্তর্গত অংশগুলি হয়ে গিয়েছে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' এবং তুর্কীর সুলতানের সকল ক্ষমতা কার্যত হরণ করে তুরস্ককে মিত্রপক্ষ-নিযুক্ত হাইকমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের স্রোত বয়ে গেল এর ফলে—ক্ষোভে ও রোষে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠল।

সুদূর তুরস্কের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের এই বিস্ময়কর আবেগের মূলে ছিল প্যান ইসলাম চেতনা, যা যতখানি ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে সৃষ্ট, ততোধিক পরাজয়ের মনোভাবজাত। আগেই বলেছি, মুসলমানেরা ইংরেজ-অধিকারের আগে ভারতের প্রভু ছিল, একথা তাদের মন থেকে মুছে যায় নি, যার জন্য ইংরেজ-শাসনের প্রথম পর্বে তাদের মধ্যে প্রবল ইংরাজবিদ্বেষ ছিল। দ্বিতীয় পর্বে সৈয়দ আহমদ প্রভৃতির চেষ্টায় তারা যখন রাজানুগত্য বোধ করল এবং ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী হল, তখন দেখল ঐ পথে হিন্দুরা ইতিমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হিন্দুদের সংখ্যাগুরুত্বও তাদের কাছে আতঙ্ককর ঠেকল। রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে নেমে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার পক্ষে কংগ্রেস যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তাও ভীতিপ্রদ ব্যাপার, কারণ তাতে সংখ্যাগুরুর শাসন কায়েম হবে। তার ফলে মুসলমান সমাজের একাংশ একদিকে শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষাধিকারের দাবি তুলল, অপর অংশ মুসলিম সাম্রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর থাকতে চাইল। মুসলিম সাম্রাজ্য তখন নষ্ট হতে হতে তুর্কী সাম্রাজ্যে গিয়ে ঠেকেছে, তাই ভারতীয় মুসলমানদের যত কিছু ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সেই দিকে।৩ ভারতীয় মুসলমানদের তুরস্কপ্রীতির

---

আত্মহত্যার তুল্য, সুতরাং তা না করার পক্ষেই তাঁর মত।" জিন্না এইরকম সদুপদেশে কর্ণপাত না করে অধিবেশনের ব্যবস্থা করলে মুসলমান গুন্ডাদের দ্বারা সভা ভেঙে দেওয়া হয় এবং তা নিয়ে হৈচৈ করা হলে উত্তর হিসাবে সুপরিচিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বচনচাতুরী ও ভন্ডামীকে এগিয়ে দেওয়া হয়। (এ কে মজুমদার, পৃঃ—১০২-৩)

১ 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'।

২ ভারতীয় মুসলমানদের অদ্ভুত আবদার সম্বন্ধে এ কে মজুমদার লিখেছেন ঃ "তার অর্থ মেসোপোটেমিয়া সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, এবং আরবকে তাদের সকল ধর্মস্থানসহ তুরস্কের খলিফার শাসনাধীনে থাকতে হবে!"

৩ মহম্মদ আলি বা জিন্নার পূর্ববর্তী বড় মুসলমান নেতা আগা খাঁ। ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় তিনি ইংরাজের কাছে রাজনৈতিক আনুগত্য এবং তুরস্কের সুলতানের কাছে ধর্মীয় আনুগত্য—উভয়ের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। 'ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেনঃ

"The average Indian Muslim looked upon himself as a member of a universal religious brotherhood, so journing in a land in which a neutral Government, with a neutral outlook, kept law and order and justice... While his allegiance was to Queen Victoria, his political self-respect was satisfied by the existence of the Sultans at Constantinople and Fez, and of the Shah and Khedive at Teheran and Cairo. The fact that the British Government was the mainstay and support in the diplomatic arena of the independent Mahommedan States was naturally a source of continued gratification to him." (বলিথো'র গ্রন্থে উদ্ধৃত)

ইতিহাস প্রসঙ্গে জওহরলাল লিখেছেন : "ইতালি যখন ১৯১১-র ত্রিপোলি যুদ্ধে হঠাৎ তুরস্ককে আক্রমণ করে বসল, সেইকালে এবং পরে ১৯১২ ও ১৯১৩-র বলকান যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তুরস্কের জন্য বিস্ময়কর সহানুভূতির বন্যা বয়ে গেল। সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীই সহানুভূতি ও উদ্বেগ বোধ করেছিল, কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনুভূতিগত তীব্রতার শেষ ছিল না, ব্যাপারটা যেন ব্যক্তিগত শোকের পর্যায়ে উঠেছিল; অবশিষ্ট মুসলমান-শক্তি যে মুছে যাবার পথে, তাদের ধর্মবিশ্বাসের নোঙর বাঁধার স্থান বুঝি ভবিষ্যতে আর থাকবে না। ডাঃ এম এ আনসারি তুরস্কে বড় আকারে মেডিক্যাল মিশন নিয়ে গেলেন, তার জন্য দরিদ্র মুসলমানেরাও চাঁদা দিল। ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতির জন্য টাকা চাইলে যা পাওয়া যেত, তার থেকে অনেক তাড়াতাড়ি অর্থ সংগৃহীত হল, কারণ তুরস্ক যে অন্যদিকে!"

ভারতীয় মুসলমানদের সমস্ত ভাবাবেগকে আকর্ষণ করে নেতার আবির্ভাবও হল সেই কালে—তাঁর নাম মহম্মদ আলি।

মহম্মদ আলির পূর্ব ইতিহাস লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ঐ ভাবাবেগের নেতৃত্ব কেন তিনি করতে পেরেছিলেন। মহম্মদ আলি এবং তাঁর দাদা সৌকত আলি (আন্দোলনের দ্বিতীয় নেতা) উভয়েই অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েট, মহম্মদ আলি সাংবাদিকতা করতেন, সৌকত আলি ভারত সরকারের আবগারি বিভাগে উচ্চবেতনের অফিসার ছিলেন। উভয়ের জীবনযাত্রা এবং পোষাক-পরিচ্ছদ গোঁড়া মুসলমানের মত, যা তাঁদের মুসলমান জনগণের কাছে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছিল।৪ মহম্মদ আলি প্রথমাবধি আলিগড়-নীতির অর্থাৎ মুসলমানের বিশেষাধিকারের সমর্থক, বঙ্গবিভাগ হলে তিনি উল্লসিত হয়েছিলেন—ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের বাইরে আর একটি মুসলমানপ্রধান প্রদেশ সৃষ্টি হওয়ায় তাঁর বিচ্ছিন্নতা বোধ আশ্বস্ত হয়েছিল, বঙ্গবিভাগ রদ হওয়াতে তাঁর হতাশার শেষ ছিল না, যা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ সম্বন্ধে আশাহীন করে তোলে৫, সে নৈরাশ্য এবং ঘৃণা বেড়ে যায় পূর্বে উল্লিখিত ত্রিপোলি ও বলকান যুদ্ধের সময়ে, চূড়ান্তে পৌঁছয় জার্মানীর পক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের যোগদানে।৬ সুতরাং মহম্মদ আলি দেশ-বিদেশের মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গরল ও অনল উভয়ই বর্ষণ করতে লাগলেন। ১৯১২ খৃীস্টাব্দে তিনি ইংরাজিতে 'কমরেড' পত্রিকা বের করেছিলেন, তার পৃষ্ঠাগুলিতে তাঁর প্যান ঐস্লামিক আবেগ ও ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকাশ পেতে লাগল। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে তিনি ইংরেজদের উদ্দেশ্যে লিখলেন—'ইভ্যাকুয়েট ইজিপ্ট'; 'চয়েস অব দি টার্কস' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে তুরস্কের পক্ষে ইংরাজ সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করলেন। ফলে পত্রিকাটি বন্ধ করে দিয়ে সরকার তাঁকে ও তাঁর ভাইকে অন্তরীণ করে রাখল—যুদ্ধের শেষ অবধি।

যুদ্ধান্তে মহম্মদ আলি মুক্তি পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেও তিনি সর্বাংশে জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছিলেন, এমন মনে করার কারণ নেই। তিনি আদ্যন্ত বলে গেছেন, প্রথমে তিনি মুসলমান, পরে অন্য কিছু। "আফগানরা যদি ধর্মযুদ্ধের জন্য ভারত আক্রমণ করে", মহম্মদ আলি বলেছিলেন, "তাহলে ভারতীয় মুসলমানেরা শুধু তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য নয়, হিন্দুরা যদি সহযোগিতা না

---

৪ 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল।'

৫ নেহরু তাঁর 'ভারত আবিষ্কারে'র মধ্যে বঙ্গবিভাগ রদ হওয়ায় মহম্মদ আলির ক্ষোভের উল্লেখ করেছেন—"The annulment of the Partition of Bengal in 1911 had given him a shock and his faith in the bonafides of the British Government had been shaken."

ডাঃ রমেশ মজুমদার এই বিষয়ে স্যার শঙ্করণ নায়ারের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

"The Ali Brothers were active members of the Muslim League advocating Mahomedan interests in opposition to the Hindus in the old days of the Bengal Partition agitation. In their public speeches they emphasised the identity of the interests of the Muhammadans elsewhere in Tripoli and Algiria in preference those of the Hindus." (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৩)

৬ ত্রিপোলি ও বলকান যুদ্ধে ইংরেজদের আচরণে ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষোভের বিষয়ে আগে জওহরলালের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি। এ বিষয়ে একটু বিস্তৃততর ব্যাখ্যার দরকার। ডাঃ রমেশ মজুমদার লিখেছেন—

"The Muslims were further alienated from the British on account of the latter's hostility to Islam as evidenced by British occupation of Egypt, Anglo-French agreement with regard to Morocco, Anglo-Russian agreement with regard to Persia, and the invasion of Tripoli by Italy. The active part taken by the British in all these incidents, as well as their connivance at, if not actual support and sympathy to, the seizure of the Turkish province of Tripoli by Italy in 1911 and the loss of European provinces of Turkey in 1912, was interpreted as a definite move for the extinction of the power of Islam, both temporal, and indirectly, also spiritual." (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩২)

করে তাহলে তাদের সঙ্গেও লড়াই করতে বাধ্য।" মহম্মদ আলির সঙ্গে গান্ধীজীর ভাই-ভাইয়ের সীমা ছিল না। ১৯২৪ সালে মহম্মদ আলির বাড়িতে অনশন করার আগে গান্ধীজী এক বিবৃতির মধ্যে বলেছিলেন—"এই মহম্মদ আলি কে? অনশনের মাত্র দুদিন আগে তাঁর সঙ্গে গোপন এক বিষয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল; সেই সময়ে তাঁকে বলেছিলাম আমার যা-কিছু সবই তাঁর, তাঁর যা-কিছু সবই আমার।" এক বছর পরে একই মহম্মদ আলি বললেন, "মিঃ গান্ধীর চরিত্র যত পবিত্রই হোক, ধর্মের দিক দিয়ে তিনি আমার কাছে যে-কোনো মুসলমানের তুলনায়—সে মুসলমান চরিত্রহীন হলেও—নিম্নশ্রেণীর বলে গণ্য হবেন।"৭ মহম্মদ আলি যখন সরকারীভাবে সর্বাধিক জাতীয়তাবাদী, অর্থাৎ যখন তিনি ১৯২৩ সালে কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তিনি কংগ্রেস সম্বন্ধে মুসলমানদের বিরূপতা দূর করার জন্য তাদের জাতীয়তা-বোধের কাছে আবেদন করেন নি, বলেছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করে যখন ফল নেই, তখন আমাদের অমুসলমান ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সহযোগিতা করি না কেন? প্যান ঐস্লামিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই হিন্দুদের সঙ্গে হাত মেলানো দরকার—এই কথাটাই তিনি বোঝাতে চেয়ে-ছিলেন। সেই হাত মেলাবার প্রয়োজন যখন রইল না, তখন কয়েক বৎসর পরে আবার নিজ মূর্তি ধরে ১৯৩০ সালের এপ্রিলে বোম্বাইয়ে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সে' বলেছিলেন: "আমরা মিঃ গান্ধীর সঙ্গে (লবণ সত্যাগ্রহে) যোগ দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি, কারণ তাঁর আন্দোলন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন নয়, তাঁর উদ্দেশ্য সাত কোটি মুসলমানকে হিন্দু মহাসভার হাতে তুলে দেওয়া।"*

এহেন মহম্মদ আলি, বলাই বাহুল্য, খিলাফতের মত প্যান ঐস্লামিক আন্দোলনের উপযুক্ত নেতা। তুরস্কের পক্ষ সমর্থন করার জন্য তাঁর অন্তরীণ স্বভাবতঃই ভারতীয় মুসলমানদের কাছে তাঁকে নয়নমণি করে তুলেছিল। ১৯১৯-এর নভেম্বর মাসে মুক্তির পরে তিনি বীরনায়ক রূপে গৃহীত হলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধান্তে তুরস্ক সম্বন্ধে মিত্রপক্ষের কঠোর-নীতির দাঁত যতই খুলতে লাগল, খিলাফত আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগল ততই, এবং তা ব্যাপক আকারে ফেটে পড়ার মত হয়ে দাঁড়াল যখন গান্ধীজী তাতে যোগ দিলেন।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সংগ্রাম ভারতে তাঁকে যথেষ্ট পরিচিত করেছিল। অহিংস সত্যাগ্রহ নামক অভিনব অস্ত্র প্রয়োগ করে তিনি সেখানে কথঞ্চিৎ সাফল্য পেয়েছিলেন, তাকে ব্যাপকভাবে স্বদেশে প্রয়োগ করতে নিশ্চয়ই ঔৎসুক্য বোধ করছিলেন। কিন্তু প্রয়োগ করার সুযোগ তখনি মেলে নি—কারণ এই অত্যন্ত মডারেট মানুষটির রাজভক্তির সীমা ছিল না, আর বৃটিশ-রাজ তখন জীবন-মরণ [illegible] পড়েছে সঙ্গে। তখন গান্ধীজী ঘোরতর অহিংস হয়েও কোনো-রকম নৈতিক বাধা অনুভব না করে (যা রোমাঁ রোলাঁকে অবাক করে দিয়েছিল) ইংরেজের সহিংস সংগ্রামের জন্য সৈন্য সংগ্রহের উদ্যোগে লেগে গেলেন। ইংরেজের শুভ-বুদ্ধিতে তখন তাঁর অটল আস্থা। ইংরেজ ও আমেরিকান উভয় দেশের রাষ্ট্রনায়কেরাই জানিয়েছিলেন, তাঁরা গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য লড়ছেন—ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা মনে করেছিলেন, ঐ উচ্চ উক্তিতে তাঁদেরও ভাগ আছে—মূর্খ তারা, একথা বুঝতে পারেন নি যে, ইউরোপের চৌহদ্দির বাইরে ওকথাগুলি মূল্যহীন—বৃটিশ লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডস গান্ধী সহ ভারতীয় নেতাদের নির্বুদ্ধিতায় ধিক্কার দিয়ে বলেছেন। যুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের জন্য কিছু মিষ্ট বাক্য সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে হচ্ছিল, যার ফলে ভারতে অনটন বেড়ে যাচ্ছিল এবং বৃটিশ সৈন্য বহুলাংশে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দমন করাও কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। উল্টোদিকে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ভারতসচিব মণ্টেগু প্রকাশ্যে ভারত সরকারের কর্ণমর্দন করে বললেন, "ভারতে বড়ই কেঠো শাসন চলেছে।" তাকে সরস করবার জন্য তিনি স্বয়ং ভারতে এলেন, সদাচারে বিচলিত বিগলিত করলেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে, মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট বেরুল, তাতে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। উদ্বাহু হয়ে লিব্যারাল ভারতীয়রা বললেন, ঐ ঘোষণা আমাদের ম্যাগনাকার্টা। তারপরে ১৯১৯-এর অ্যাক্ট যখন বিধিবদ্ধ হল, তখন দেখা গেল, অতি অল্পমাত্রায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছে, যাকে আবার কৌশলে ধরে রাখা হয়েছে বিভিন্ন সংখ্যা-লঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ছাড়া-টানার অপূর্ব খেলা! তবু কংগ্রেস ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে অমৃতসরে সম্মেলনে বসে বলল, মণ্টেগুকে নমস্কার করি এই উদার ব্যবস্থার জন্য। বিরোধীদের সমালোচনার মুখে ঐ সমর্থন প্রস্তাব গান্ধীজীই গ্রহণ করিয়েছিলেন; ইয়ং ইণ্ডিয়া প্রবন্ধযোগে ইংরেজের ন্যায়বুদ্ধি এবং আন্তরিকতার ভূরিভূরি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। গান্ধীজী যখন ঐ রচনা লিখেছিলেন তার সাড়ে সাত মাস আগে জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে!

সে ইতিহাস পরিচিত ও পুরাতন। যুদ্ধশেষে একদিকে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মের ঢালাও ঘোষণা (বস্তু যদিও তাতে অল্প), অন্যদিকে রাউলাট অ্যাক্ট, যাতে বিনাবিচারে আটকের, বিনা জুরিতে শাস্তিদানের অবাধ অধিকার। রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পরি-প্রেক্ষিতেই জালিয়ানওয়ালাবাগ। [ক্রমশ]

৭ এ সি মজুমদার পৃঃ ১০০।

* শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় দেখেছি, মহম্মদ আলির ধারণা ছিল বোকা গান্ধীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মুসলমান করতে পারবেন। গান্ধী সেই পরিমাণে বোকা হতে রাজী না হওয়ায় মহম্মদ আলি খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

[illegible] পরিস্থিতির সঠিক ও [illegible] রূপটি প্রকাশ করার মত ভাষাই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিকে ইংরাজীতে বরং বলা যায় অ্যানার্কি এণ্ড কন-ফিউসন। প্রতি ঘণ্টাতেই পরিস্থিতি এক এক রকম মোড় নিচ্ছে। সাপ্তাহিক বসুমতীর এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে, তখন সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ১৬ই মার্চ তারিখটি পার হয়ে যাবে। এবং তার পর কি হবে সেকথা আজ বলা এক কথায় অসম্ভব। শুধু কি তাই, প্রতিদিন যে ঘটনাগুলি ঘটছে, তার সঙ্গে তাল রেখে বোধহয় সাংবাদিকেরাও পেরে উঠছেন না। এক একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এক এক রকম, কারোর সঙ্গে কারোর কোন মিল নেই। সে যাই হোক, ঘটনাচক্র কিভাবে এগুচ্ছে তার একটা ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু এখন করার নেই।

বৃহস্পতিবার ১২ই মার্চ তারিখে যুক্তফ্রন্টের সংকট ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অজয়বাবু এবং শ্রীসুশীল ধাড়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে যে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তাতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে দুই দফা আলোচনা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য বিশিষ্ট কয়েকজন মন্ত্রীকে টেলিফোনযোগে আহ্বান জানিয়েছিলেন নয়াদিল্লীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, কিন্তু জ্যোতিবাবুরা এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দিল্লী যেতে পারেন নি। অপর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও পার্লামেন্টের জরুরী কাজ ফেলে কলকাতায় আসা সম্ভবপর হয় নি। অন্যদিকে অজয়বাবুও তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে সম্মত হন নি। ফলে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট মীমাংসার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাবিনেট নেতাদের নয়াদিল্লীতে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তা কার্যত ব্যর্থ হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু নয়াদিল্লীর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের বৈঠকে পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি ১৬ই মার্চের মধ্যে পদত্যাগ করবেনই।

শুক্রবার ১৩ই মার্চ তারিখটি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তফ্রন্টের সংকট সমাধানে মধ্যস্থতার ভূমিকায় লোকসভা সদস্য শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন আপসসূত্রের সন্ধানে সারাদিনব্যাপী তৎপর ছিলেন। শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় শ্রীবসু তাঁকে জানিয়েছেন যে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের প্রস্তাবে তিনি রাজী আছেন। দ্বিতীয়ত, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের যুক্তফ্রন্টের বৈঠক যেখানে সমাপ্ত হয়, সেখান থেকে আবার শুরু করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, যেসব দল স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পর্কে অভিযোগ এনেছেন, তাঁরা বেছে বেছে যে কোন সাতটি অভিযোগ এনে যে কোন লোক দিয়ে এমন কি রাজ্যপালকে দিয়ে আরবিট্রেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এই আলোচনার পর শ্রীকৃষ্ণমেনন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন, এবং সেখানে সম্ভবত শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যগুলি পেশ করেন। এরপর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে, স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জীর সঙ্গে, ফরোয়াড ব্লক নেতাদের সঙ্গে এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দুপুরে রাজ্যপালের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের বৈঠকে মিলিত হয়ে সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

ঐ দিনই শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হবার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সেই অনুযায়ী ডঃ কানাই ভট্টাচার্য, শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং শ্রীনির্মল বসু জ্যোতিবাবুর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ বৈঠকের পর জ্যোতিবাবু বলেনঃ আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পর্কে একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠনে রাজী আছি। এই কমিটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ সম্পর্কে উপদেশ দেবে, পরিচালনায় সাহায্য করবে। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ তখন শ্রীবসুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর একটি শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব করেন। বিরোধের ক্ষেত্রকে সীমিত করতে সাহায্য করবে মনে করায় শ্রীবসুও এই বৈঠকে সম্মতি দেন। শ্রীবসু বলেন যে, উনি কি আমার কথা শুনবেন? সর্বশেষে শ্রীবসু বলেন যে, অন্য কোন দপ্তর না হোক স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়েই উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে দু' মাস কাজ চালিয়ে দেখা যাক। শ্রীবসুর সঙ্গে কথা বলে ফরোয়ার্ড ব্লকের তিন নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে আলোচনার সমস্ত বিবরণ রাখেন। অজয়বাবু সব কিছু শুনে যান, খুব বেশি জবাব দেন নি বা সওয়াল করেন নি। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ অতঃপর মহাকরণ থেকে সোজা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে চলে আসেন। সেখানে উপস্থিত সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি এবং পি এস পি দলের নেতৃবৃন্দকে শ্রীজ্যোতি বসুর প্রস্তাব সম্পর্কে জানান।

শুক্রবার আপস সূত্র সন্ধানে রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সি পি এম-এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেও আলোচনা চলে। সি পি এম মহল উক্ত ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা গড়ার দায়িত্ব নেবেন বলে সরাসরি জানিয়ে দেন। এদিনও তাঁরা অনেকগুলি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাঁদের ধারণা হয়েছে যে, কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া মন্ত্রিসভা গঠন করলে এবং সেই সরকার যদি আর এস পি-র কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তাঁরা আর এস পি-র সমর্থন পাবেন। এ ছাড়া সি পি এম মহল বাংলা কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যের সমর্থন লাভের আশা এদিনও প্রকাশ করেন। সি পি এম মনে

করছে যে, যুক্তফ্রন্টের পরিষদীয় দল এখনও (বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে গেলেও) সর্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে বৃহত্তম দল। অতএব যুক্তফ্রন্টের নেতা পদত্যাগ করলেও, সহকারী নেতা যদি মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান, তবে রাজ্যপালকে তার অনুমতি দিতে হবে। তাছাড়া বিধানসভা এখন সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখা হয়েছে। অতএব ইউ এফ পার্লামেন্টারী পার্টি বৃহত্তম দল আছে কি-না, তা বিধানসভার মধ্যে ভোটাভুটির দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে। আর ভোটাভুটিতে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হবে, তার পতন হলে সি পি এম কোন্ কোন্ দল তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক প্রচারে নেমে পড়বে। জ্যোতিবাবু প্রকাশ্যে সরকার গঠনের দাবি জানালেও, চোদ্দটি দলের মধ্যে আটটি দল পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, সি পি এম-এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভাকে তারা সমর্থন করবে না। অজয়বাবু এখনও প্রকাশ্যে বিকল্প সরকার গঠনের দাবির কথা বলেন নি। তবে রাজনৈতিক মহলের খবর হচ্ছে, পর্দার অন্তরালে সে রকম কিছু চেষ্টা বোধ হয় হচ্ছে।

ইতিমধ্যে রাজ্যপাল পশ্চিম বাংলার রাজনীতি বিশ্লেষণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন। শ্রীধাওয়ান তাঁর রিপোর্টে যুক্তফ্রন্টের এই সমস্যা সমাধানের জন্য নাকি একটা পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি নাকি নিজে মধ্যস্থ হতে চেয়েছেন। রাজ্যপাল মনে করছেন, অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবুর এই ঝগড়া মেটাবার জন্য আদালতের মত এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা দরকার। অর্থাৎ উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সহ তাঁদের বক্তব্য রাজ্যপালের নিকট রাখবেন। এবং যেহেতু রাজ্যপাল নিজে একজন প্রাক্তন বিচারপতি, তাই তাঁর পক্ষে এই বিবাদে রায় দেওয়া মোটেই অসুবিধা হবে না। অবশ্য তাঁকে এই কাজ সমাধান করতে



রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক সেরে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজভবন থেকে বেরিয়ে আসছেন।

হলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রয়োজন। শ্রীধাওয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস, এইভাবে চালাতে পারলে ফ্রন্টের ঝগড়ার মীমাংসা হতে পারে, তবে ধাওয়ানের রায় সকলকে মানতে হবে।

শনিবার চোদ্দই মার্চ যুক্তফ্রন্টের সংকট মোচনের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগের সিদ্ধান্তে অনড়-অটল জেনেও গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা চলে। দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন রাজ্যপাল থেকে শুরু করে একের পর এক নেতার সঙ্গে কথা বলেও সংকট অবসানের কোন সূত্র খুঁজে বার করতে পারেন নি।

রবিবার রাত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশমত বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া, শ্রীচারুমিহির সরকার ও শ্রীভবতোষ সরেনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা দ্রুততালে এগিয়ে চলে। উপমুখ্যমন্ত্রী ও মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসু শনিবার রাত্রে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে আসেন যে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলে তিনি সরকার গঠনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। রবিবার [illegible] দিন [illegible] সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করা থেকে বিরত করার প্রচেষ্টা চলে, সোমবার সকাল থেকে অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টা সেই চেষ্টাই চলবে। সোমবার ১৬ই মার্চ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের রাজ্যপালের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করার কথা।

মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবে অথবা বিকল্প সরকার গঠনের জন্য বিধানসভায় একক বৃহত্তম দল মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে ডাকা হবে, সে নিয়ে রবিবার সারা দিন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঘন ঘন শলা-পরামর্শ চলে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমতে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য শ্রীজ্যোতি বসুকে ডাকতে পারেন, তবে শ্রীজ্যোতি বসুর পক্ষে কারা আছেন তাও জানবার চেষ্টা করছেন। বিধানসভার প্রত্যেকটি দলের নেতাদের ডেকে যে তিনি তাঁদের মনোভাব জানতে চেষ্টা করবেন, তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। রবিবার রাত্রে শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানান।

—১৫ই মার্চ, ১৯৭০

## ক্যাসাবাদের নতুন মন্ত্রশিষ্য

জেনারেল কারিয়াপ্পা ভারতীয় স্থল-বাহিনীর একজন প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ। বৃটিশ শাসকদের অনুগত সৈনিক হিসাবে ইনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিশ্বস্তভাবে তাদের সেবা করার পুরস্কার হিসাবে সেনাবাহিনীর উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ইংরাজরা যখন বিদায় নেয়, তখন শ্রেফ সিনিয়রিটির জোরে ইনি ভারতীয় স্থলবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারপর যথা সময়ে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং যথারীতি পেনসন পেয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এখনও তিনি সরকারের বেতনভুক। আমাদের দেশে সরকারী অফিসারদের রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ। অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। কারিয়াপ্পা তাঁর চাকুরি জীবনের বারো আনাই কাটিয়েছেন বৃটিশ শাসকের সেবায়। সেই সময় উপরোক্ত নিয়ম তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কিন্তু স্বদেশী আমলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অবসর গ্রহণের পরই তিনি হঠাৎ রাজনীতি চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সারা জীবন যাঁর কেটেছে ইংরাজের দাসত্ব করে, তাঁর রাজনীতি যে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল হবে, তাতে কোন আশ্চর্য নেই। এতদিন ইনি স্বতন্ত্র এবং জনসঙ্ঘের সুরে সুর মিলিয়ে দেশ থেকে কমিউনিজম উচ্ছেদের ফর্মুলা দিচ্ছিলেন। তাঁর গলার আওয়াজে অনেক সময়ই হিটলারের সুর শুনতে পাওয়া যেতো। কিন্তু তা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় নি। তাতে আস্কারা পেয়ে ভদ্রলোক এবার ভারতে গণতন্ত্র উচ্ছেদের বাণী প্রচার করতে শুরু করেছেন।

গত ৭ই মার্চ ইনি ধানবাদে এক ভাষণে বলেছেন, "বিভিন্ন সংশোধনের ফলে ছিন্নভিন্ন" বর্তমান সংবিধানটিকে ছিঁড়ে ফেলা উচিত। তারপর কিছুকাল রাষ্ট্রপতির শাসন চালু রেখে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা দরকার। নূতন সংবিধানে ৩।৪টির বেশি রাজনৈতিক দল থাকতে দেওয়া উচিত নয়। তারপর শুধু-মাত্র শিক্ষিত লোককে ভোটাধিকার দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত। ......ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ করে দেওয়া দরকার। জেঃ কারিয়াপ্পা বিরস বদনে আরও জানিয়েছেন যে, এদেশে সামরিক ডিক্টেটরশিপ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন না, কারণ দেশটা প্রকাণ্ড এবং এর সেনাবাহিনীও নানা রাজ্যের লোক নিয়ে গঠিত। তা ছাড়া সেনাবাহিনীর তিনটি অংশ (স্থল নৌ ও বিমান) তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত।

কারিয়াপ্পার তথ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে ডিক্টেটরশিপ চালু করার তিনি পক্ষপাতী। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামরিক ডিক্টেটরশিপের অসুবিধা আছে বলেই তিনি "শিক্ষিত" লোকের ডিক্টেটর-শিপ চালু করার পক্ষপাতী। সংবিধানটিকে তিনি সেই ডিক্টেটরশিপের উপযোগী করে ঢেলে সাজবার পরামর্শ দিয়েছেন। ভারত-বর্ষে একমাত্র ধনী এবং স্বচ্ছল পরি-বারের লোকেরা ছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ খুব কম লোকই পেয়ে থাকেন। এদেশে অক্ষর পরিচয়হীন মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সেই কোটি কোটি মানুষ হয় দরিদ্র, না হয় নিঃস্ব। কিন্তু তাঁরা নির্বোধ নন। সেই অগণিত জনসাধারণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে শুধু 'শিক্ষিত' লোকের ওপর দেশের শাসনভার তুলে দেওয়ার আসল অর্থ যে ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের হাতে দেশটাকে তুলে দেওয়া, সেকথা বলাই বাহুল্য। কারিয়াপ্পা সেই প্রস্তাবই রেখেছেন।

কিন্তু এবার কারিয়াপ্পার চালে ভুল হয়ে গেছে। তাঁর কমিউনিস্ট বিদ্বেষ যখন গণতন্ত্র বিদ্বেষে রূপান্তরিত হল, তখন পার্লামেণ্টের সদস্যরা উদ্বেগ বোধ না করে পারেন নি। গত সপ্তাহে কারিয়াপ্পার আচরণ নিয়ে পার্লামেণ্টের উভয় ভবনে দারুণ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন লোকসভায় ঘোষণা করেছেন যে, জেনারেল কারিয়াপ্পার "বক্তব্যের মধ্যে বিপজ্জনক চিন্তার বীজ নিহিত আছে" এবং তিনি ঐ বক্তব্যের বিরোধী। তিনি আরও বলেন, "সামরিক শাসন যে-কোন দেশের পক্ষেই মস্ত পাপস্বরূপ এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।" চাবনের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কোন দ্বিমত হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, কারিয়াপ্পা সাহেব বৃটিশের অনুগত চর হিসাবে বিভিন্ন সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই ভদ্রলোক হঠাৎ ভারতবর্ষের মঙ্গলা-মঙ্গল নিয়ে বুড়ো বয়সে এত মাথা ঘামাতে শুরু করলেন কেন? তাঁর প্রাণে দেশপ্রেম উথলে ওঠার পেছনে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সংস্থার অনু-প্রেরণা নেই তা?

## নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কে তদন্ত

গত সপ্তাহে পার্লামেণ্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা ঘোষণা করেছেন যে, নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কে আবার তদন্ত হবে। শোনা যাচ্ছে, এবার তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহান্ জননায়ক। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের ধ্বনি দিয়েছিলেন বলে কংগ্রেসের আপসকামী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব তাকে কংগ্রেস থেকে বিদায় দিয়েছিল। কিন্তু জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে দমিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজী আত্মগোপন করে বিদেশে চলে যান এবং বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁর আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর বীর সৈনিকরা ভারতের বহু অঞ্চলে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করে যখন দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং পরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করবার জন্য নেতাজী ব্যাঙ্কক থেকে বিমানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তদবধি তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। কেউ বলছেন, তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, কেউ

বলছেন, তিনি জীবিত অবস্থায় পার্শ্ব-বর্তী কোন রাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।

ভারত সরকারের তৎকালীন নায়করা নেতাজীর মৃত্যু সংবাদকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে আর কোন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন নি। পরে জনসাধারণের পীড়াপীড়িতে আজাদ হিন্দ ফৌজে নেতাজীর সহকর্মী শা নওয়াজ খাঁর ওপর বিষয়টা তদন্তের ভার দেওয়া হয়। তিনি নানা দেশ ভ্রমণান্তে যে রিপোর্ট দেন, তাতেও মৃত্যু সংবাদ সমর্থিত হয়, কিন্তু সেই রিপোর্টের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ছিল। কাজেই জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি বিচার-বিভাগীয় তদন্তের দাবি ওঠে। এতদিন বাদে গভর্নমেণ্ট সেই দাবি মেনে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। নেতাজী ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের একজন মহানায়ক। বর্তমানে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করছি, তা মূলত নেতাজী এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজেরই অবদান। সুতরাং ইতিহাসের প্রয়োজনেই তাঁর অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। নেতাজী জীবিত, না মৃত এবং জীবিত থাকলে কোথায় কিভাবে আছেন, তা আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন, তা হলে কিভাবে কখন তাঁর মৃত্যু হল, তাও আমাদের জানা উচিত। নেতাজীর "চিতাভস্ম" বলে কথিত কোন দ্রব্য টোকিওর একটি মন্দিরে রক্ষা করা হচ্ছে, অপর দিকে কোন কোন মহল বলেছেন যে, জেনারেল ম্যাকার্থারের সৈন্যরাই নেতাজীকে নিহত করেছে। সাধারণ মানুষ এই সব পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব থেকে আসল সত্য উদ্ঘাটন করতে পারছেন না। কাজেই সে সম্পর্কে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যুক্তিযুক্তই হয়েছে। তবে অনেক দিন আগেই সেটা হওয়া উচিত ছিল। নেতাজীর সঙ্গে ভারত সরকারের তৎকালীন নায়কদের গুরুতর মতবিরোধ ছিল বলেই সম্ভবত এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহের অভাব ছিল। সেটা তাঁদের সংকীর্ণচিত্ততারই পরিচায়ক। ইতিহাস যাঁকে নেতৃত্বের শীর্ষে স্থান দিয়েছে, তাঁর প্রতি এই ধরনের ঔদাসীন্য ইতিহাস কখনও ক্ষমা করবে না।

## বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা

১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল ঘায়েল হবার পর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা প্রকট হয়ে ওঠে। ছোট-বড় অধিকাংশ রাজ্যেই অ-কংগ্রেসী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গড়ে ওঠে। তাতে কোথাও দক্ষিণপন্থীরা, কোথাও বামপন্থীরা, আবার কোথাও বা মধ্যপন্থীরা প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু কেরল ও ওড়িশা ছাড়া আর কোথাও সেই কোয়ালিশন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে মধ্যকালীন নির্বাচনের মাধ্যমে অবস্থা স্থিতিশীল করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তাতেও বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায় নি। মধ্যকালীন নির্বাচনের পরও বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। যাই হোক, গত সপ্তাহে ভারতের সব রাজ্যেই মন্ত্রিসভা চালু ছিল। অর্থাৎ কোথাও রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ ছিল না। কিন্তু তাতে ভরসা পাবার কিছু নেই। পশ্চিম-বঙ্গ বাদ দিয়ে ভারতে আরও চারটি রাজ্যের মন্ত্রিসভা পতনোন্মুখ। এই লেখা পাঠকের হাতে পড়বার আগেই হয়ত কাশ্মীর, ওড়িশায় রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

ওড়িশায় স্বতন্ত্র নেতা আর এন সিংদেওয়ের নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট চালু আছে। কিন্তু ব্যাপক দলত্যাগের ফলে সেই কোয়ালিশন ক্রমেই ক্ষীণায়ু হয়ে আসছে। সুতরাং যে-কোন মুহূর্তে সিংদেও-গভর্নমেণ্টের পতন ঘটলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাশ্মীরের অবস্থাও তথৈবচ। সেখানকার আইনসভায় সদস্য সংখ্যা মোট ৭১ জন। তার মধ্যে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬১ জন। জি এম সাদিকের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসী (ইন্দিরাপন্থী) মন্ত্রি-সভা রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু সাদিকের প্রধান প্রাক্তন সহকর্মী এবং বর্তমান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মীর কাসিমের নেতৃত্বে ৩৫ জন কংগ্রেসী সদস্য দলত্যাগ করেছেন। ফলে সাদিকের অবস্থা খুবই কাহিল। তাঁর অনুরোধে রাজ্যপাল আইনসভার অধিবেশন বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ৩১শে মার্চের মধ্যে বাজেট পাশ না করলেই নয়। তাই অবিলম্বেই সাদিককে আইনসভার সম্মুখীন হতে হবে। দলত্যাগীরা আবার দলে ফিরে না এলে সাদিকের গভর্নমেণ্ট বিদায় নিতে বাধ্য হবেন।

উত্তরপ্রদেশও কংগ্রেসের (ইন্দিরা-পন্থী) সমর্থনে সদ্যগঠিত বি-কে-ডি মন্ত্রিসভাও (মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং-এর) অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন।

বিহার দারোগা রাই-মন্ত্রিসভা সম্প্র-সারণের পর কংগ্রেস দলের মধ্যে এবং অন্যান্য সমর্থক দলের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তারও পরিণাম রাই-মন্ত্রি-সভার পক্ষে শুভ হবে বলে মনে হয় না।

হ রি য়া না য় বংশীলাল-মন্ত্রিসভা (ইন্দিরাপন্থী) আগেই দলত্যাগীদের দ্বারা বিব্রত হয়েছিলেন। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হবার পর সেখানেও আইনসভার অধিবেশন বন্ধ রাখা হয়েছে। আইনসভার পুনরধিবেশন শুরু হলে বংশীলাল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন, তা বলা শক্ত।

অন্ধ্রে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর গভর্নমেণ্ট তো অনেকদিন আগে থেকেই ঘরোয়া কোঁদলে বিব্রত হয়ে আছেন। এমন কি গুজরাট সরকারও খুব নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) সেখানে স্বতন্ত্র দলীয় গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করতে পারেন বলে জগজীবন রাম ঘোষণা করার পর হীতেন্দ্র দেশাইয়ের সিণ্ডিকেট মন্ত্রিসভা বেসামাল বোধ না করে পারবেন না।

মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডি পি মিশ্র নির্বাচনে দুর্নীতি অবলম্বনের অভিযোগে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্বা-চনে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সেই মামলার ফ্যাকড়া হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্যামাচরণ শুক্লার বিরুদ্ধেও অনুরূপ মামলা দায়েরের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেখানেও বর্তমান গভর্নমেণ্টের পরমায়ু কতদিন, বলা শক্ত।

দেখা যাচ্ছে, সারা ভারতে একমাত্র মাদ্রাজের ডি-এম-কে গভর্নমেণ্টই এখনও পর্যন্ত, সবচেয়ে নিরাপদ আছেন।

—১৫ই মার্চ, ১৯৭০

## লাওস পরিস্থিতি

**১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তি অগ্রাহ্য করে লাওসে বোমাবর্ষণের দ্বারা** আমেরিকা সেখানে আর এক ভিয়েৎনাম সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে গত সপ্তাহে সাপ্তাহিক বসুমতী যে আশংকা প্রকাশ করেছিল, খোদ আমেরিকাতেও সেই আশংকা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের বহু সদস্যই লাওসে আমেরিকার ভূমিকার সমালোচনা করে বলেছেন যে, আমেরিকা সেখানে ভিয়েৎনামের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চলেছে। দেশবাসীর এই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ দেখে নিকসন গভর্নমেণ্ট লাওসে আমেরিকা কতখানি জড়িয়ে পড়েছে, তার এক ফিরিস্তি দিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, গত চার বছর ধরেই মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান পূর্ব লাওসের হো চি-মিন সড়কের ওপর বোমা বর্ষণ করে আসছে। গত ৬ বছরে ৪ শতাধিক মার্কিন বৈমানিক লাওসে হয় নিহত, না হয় নিখোঁজ হয়েছেন। লাওসে অন্যান্য সামরিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত মার্কিন সৈন্যের সংখ্যাও কম নয়। সরকারের এই সংখ্যাতত্ত্বমূলক বিবৃতি কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের উদ্বেগ হ্রাস করতে পারে নি। তাঁদের ধারণা—আমেরিকা গোপনে গোপনে লাওসে ভিয়েতনামেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যাচ্ছে। যদিও প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন যে, লাওসে অবস্থানকারী মার্কিন নাগরিকদের জীবন রক্ষার খাতিরে যতটুকু করা দরকার, তার বেশি আমেরিকা সেখানে আর কিছু করবে না। কিন্তু তাতে কেউ ভরসা পাচ্ছেন না।

এই প্রসঙ্গে লাওসে মার্কিন ক্রিয়াকলাপের একটু পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৬২ সালে জেনেভা চুক্তির অল্পকাল পরেই বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী এবং নিরপেক্ষতাপন্থীদের নিয়ে ভিয়েনতিয়েনে একটি কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়েছিল। সেই গভর্নমেণ্ট কাজ শুরু করতে-না-করতে সর্বশক্তিমান মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি-আই-এ সেখানে তাদের চক্রান্তমূলক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে দেয়। তাদের মতলব ছিল লাওসে একটা গোলমাল পাকিয়ে তার মধ্যে আমেরিকাকে টেনে আনা। তারা প্যাথেট লাওয়ের প্রতিনিধির পক্ষে ভিয়েনতিয়েনে অবস্থান করা তো অসম্ভব করে তোলেই, উপরন্তু নিরপেক্ষতাপন্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুইনিম কোলমেনা এবং পুলিশ প্রধানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। প্যাথেট লাওয়ের সুফানু ভঙকে গ্রেপ্তার করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে ওঠে যে, কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট ভেঙে যায় এবং সুফানু ভঙ পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সেই কোয়ালিশন না

ভাঙলে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাওসকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হত না। কারণ নিরপেক্ষ গভর্নমেণ্ট আমেরিকাকে সেই রকম কোন সুযোগ দিতেন না। সেই কারণেই সি-আই-এ সেই গভর্নমেণ্টের সমাধি রচনা করে। অতঃপর লাওসের দক্ষিণপন্থীদের সংঘবদ্ধ করে আমেরিকা তাদের প্যাথেট লাওয়ের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী ফুমা আমেরিকার এই চক্রান্ত সম্বন্ধে নীরবতা পালন করায় তাঁর দলে ভাঙন দেখা দেয় এবং একাংশ প্যাথেট লাওয়ের সঙ্গে যোগ দেয়। অপর পক্ষ যোগ দেয় দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে। প্যাথেট লাও ফুমাকে প্রধানমন্ত্রী বলে স্বীকার করতে চায় না।

১৯৬৪ সালে জেনেভা সম্মেলনের দুই সহ-চেয়ারম্যান লাওসে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময় ফুমা আমেরিকার সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য আমেরিকা লাওসে ঘাঁটি গাড়বার সুযোগ পায়। তার বদলে ফুমা পান মার্কিন অর্থনৈতিক এবং অস্ত্র সাহায্য। এ ছাড়া আরও স্থির হয় যে, সি-আই-এ প্যাথেট লাওয়ের বিরুদ্ধে মেও উপজাতিদের নিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করবে এবং লাওসের গৃহযুদ্ধে ফুমাকে বিমান বাহিনী দিয়ে সাহায্য করবে। মার্কিন বিমান বাহিনীর সহায়তা নিয়ে মেও গেরিলারা জারস সমতল ভূমি দখল করেছিল। সম্প্রতি সেটা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে বলেই আমেরিকা আবার সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এখন আমেরিকাবাসীর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, জারস সমতল ভূমি দখলের পর প্যাথেট লাওয়ের মুক্তিফৌজ যদি আরও অগ্রসর হয়, তা হলে আমেরিকার পক্ষে আরও ব্যাপকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকবে কি?

### ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন

ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তার ফলে ফ্যাসিবাদী এবং রিপাবলিক-বিরোধী শক্তির পুনরাবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হচ্ছে বলে মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফ্যাসিস্টদের কর্মতৎপরতা অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তারা 'নিউ অর্ডার' নাম দিয়ে একটি দল তৈরি করেছে। কিছুকাল আগে প্যারীসে নিউ অর্ডার এক বৈঠক আহবান করে। তাতে পশ্চিম জার্মানীর দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল ডিমোক্রাটিক পার্টি, ইটালীর নিউ ফ্যাসিস্ট সোস্যাল মুভমেন্ট এবং স্পেনের ফ্যালাঙ্গিস্টদের যোগ দেবার কথা ছিল। কিন্তু বামপন্থীদের চাপে গভর্নমেণ্ট সেই সম্মেলন নিষিদ্ধ করে দেন।

ছাত্রদের মধ্যেই নাকি নিউ অর্ডার এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলোর কর্মতৎপরতা বেশি। বামপন্থী ছাত্রদের আগ্রাসী এবং হঠকারী ক্রিয়াকলাপের ফলে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে, তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে দক্ষিণপন্থীরা নাকি শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

৩১ বছর বয়স্ক আইনজীবী মিঃ গ্যালভেয়ার সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, গত নভেম্বর মাসে তাঁর অফিসেই "নিউ অর্ডারে"র জন্ম হয়েছে। অকসিডেন্ট নামে বে-আইনী ঘোষিত একটি দক্ষিণপন্থী সংস্থার প্রাক্তন সদস্যদের নিয়েই নিউ অর্ডারের জন্ম। যারা আলজিরিয়া এবং ইন্দোচীনকে ফ্রান্সের দখলে রাখবার জন্য লড়াই করেছিল, তারাই নিউ অর্ডারে যোগ দিয়েছে। নিউ অর্ডারের সদস্য সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৭০০ হয়ে গেছে। তাদের ৪০ শতাংশই মফস্বলের অধিবাসী।

মিঃ গ্যালভেয়ার বলেছেন, নিউ অর্ডার জাতীয়তাবাদী দল, তবে হিটলার-মুসোলিনীর মত উৎকট স্বাদেশিকতা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, "আমরা

ইউরোপভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আমরা ইউরোপীয় ঐক্য গঠন করব।"

নিউ অর্ডার পুঁজিবাদ এবং মার্কসবাদ—উভয়েরই বিরোধী। তাঁরা বাছা বাছা লোকেদের দ্বারা পরিচালিত শক্তিশালী রাষ্ট্র চান। জনগণের দ্বারা পরিচালিত গভর্নমেন্ট সম্ভব নয়, কারণ তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা নেই।

**সোভিয়েট ইহুদীরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে**

সম্প্রতি সোভিয়েটের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইহুদী বুদ্ধিজীবী মস্কোয় এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ইসরাইলের উৎকট ইহুদীবাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সহকারী প্রধানমন্ত্রী ভেনিয়ামিন ডিমসিটস, কমেডিয়ান আর্কেডি রাইকিন, একেডেমিসিয়ান গার্স বুদকার, ইতিহাসবিদ আইজাক মিণ্টস এবং দার্শনিক মার্ক মিটিনের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেন যে, সোভিয়েতে ইহুদীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় বলে পশ্চিমী দুনিয়ায় যে কথা রটানো হয়, তা সত্যি নয়।

তাঁরা বলেন, উৎকট ইহুদীবাদ অবস্থাপন্ন ইহুদীদের উগ্র স্বাদেশিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাম্রাজ্যবাদীরা আরবদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইহুদীদের কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করছে।

—১৪।৩।৭০

# সপ্তাহের বোঝা / কৃত্তিবাস ওঝা

অবশেষে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়লো। কালো রং, নাদুস-নুদুস চেহারা, কটা চোখ, মুখের দু'পাশে লম্বা গোঁপ। লোভার্ত বিড়ালের চোখ জ্বল জ্বল করছে, কারণ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মাছের মুড়োটা একেবারে সামনে এসে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সাত দিন সময় দিয়ে পদত্যাগের সংকল্প ঘোষণা, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের বোষ্টম বিনয়ে সি· পি· আই· অফিসে ডঃ রণেন সেন, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সহযোগিতা কামনা আর রাজভবনে দুপুরে, রাত্রে, ঝড়-জলে বা জ্যোৎস্না রাত্রে শ্রীসুশীল ধাড়া, শ্রীযতীন চক্রবর্তী, শ্রীঅপূর্ব মজুমদার, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের আনাগোনা, ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির ঝেড়ে কাশা প্রস্তাব—এই সব হল ঝোলা থেকে বেরিয়ে-পড়া লোভার্ত বিড়ালের রাজনীতি। যুক্তফ্রন্ট ভাঙার রাজনীতি এতদিন অনেক আঁকা-বাঁকা পথে চলে এইবার একটা লজিক্যাল কনক্লুশনে পৌঁছতে চলেছে। গত কয়েক দিনের অজস্র খবরের মধ্য থেকে লজিক্যাল কনক্লুশনের সূক্ষ্ম ধারাটা বের করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য, কিন্তু সেটা বুঝতে না পারলে আসল ব্যাপারটা বোঝা মোটেই সহজ হবে না। ফলে, চিন্তার ক্ষেত্রে আপনি যে-কারো ওপর অন্যায়ভাবে অবিচার করতে পারেন, আবার অপাত্রে প্রেম নিবেদন করতে পারেন। তাই এই জট-পাকানো, ঘোরালো প্যাঁচালো শত উত্তেজনার আবর্তের মধ্য থেকে আপনাকে বিড়ালের গতিবিধি বুঝতে হবে। বিড়ালের নিঃশব্দ পদক্ষেপ সতর্ক চড়াইপাখিও বুঝতে পারে না—সেই কথা মনে রেখে আপনি বিড়ালের গতিবিধি বুঝতে চেষ্টা করুন, নইলে একটু অসতর্ক থাকলে দেখবেন বিড়াল তার কাজ সেরে চলে গেছে এবং তখন আপনি শত চেষ্টা করলেও বিড়ালের আর পিছু ধরতে পারবেন না।

আগে বড় দল ও বড় শরিকের কথাটা বলা যাক। ১০ই মার্চ তারিখটা একেবারে লালকালিতে লিখে রাখবার মত দিন। কারণ এই দিন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সি· পি· আই অফিসে গিয়ে সি· পি· আই-নেতা ডঃ রণেন সেনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট রক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকে অবশ্য দু' দলের আরো দু'জন করে ছিলেন। কেউ বলবেন, মশাই—এর মধ্যে আর অভিনবত্ব, নতুনত্ব কি আছে যে ক্যালেণ্ডারে লালকালিতে লিখতে হবে? আমি বলি, আছে। আমার বেশ মনে আছে একদিন আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে বসে শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলবার সময় যুক্তফ্রন্টের সংকট সম্পর্কে বলতে যেয়ে শ্রীদাশগুপ্তকে বলেছিলাম—আমার ধারণা, আপনি যদি রাজ্য মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং আপনি যদি যুক্তফ্রন্টের সব সভায় উপস্থিত থাকেন, তবে যুক্তফ্রন্টের অনেক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে না এবং সৃষ্টি হলেও মিটে যায়। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে সেই দিনের সেই কথা ছিল নিতান্তই লঘু আলাপের অংশ, কিন্তু আমি সেই দিনও মনে করেছি এবং আজও মনে করি, শ্রীদাশগুপ্ত যদি যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন ও যুক্তফ্রন্টের দৈনন্দিন কাজের ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, তবে তিনি আকচার যে সব কথা বলে খেয়া নৌকোর পাগল যাত্রীকে নৌকোতে দোলা লাগাবার কথা মনে করিয়ে দেন, সেটা করতে পারতেন না।

শ্রীদাশগুপ্ত দু'বার যুক্তফ্রন্ট সরকার হবার পর একদিনের জন্যও মহাকরণে যান নি, আর দু'বার যুক্তফ্রন্ট শাসনের কালে ১৯৬৭ একবার মাত্র যুক্তফ্রন্ট গড়ার মুখে যুক্তফ্রন্টের সভায় যোগদান করেছিলেন এবং সেই সভায় বসে একটি মাত্র কথা বলেছিলেন—"একটু আগুন দাও" অর্থাৎ শ্রীদাশগুপ্তের চুরুটটা নিভে গেছিল, তিনি অপর একজনের কাছে দেশলাই চেয়েছিলেন। যা হোক, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যুক্তফ্রন্ট আমলে কি সরকার, কি ফ্রন্ট রাজনীতি—সব কিছুতেই পানিকৌড়ি পাখির মত দিন কাটিয়েছেন। জলের ওপর হেসেখেলে বেড়িয়েছেন, দরকার মত জলের গভীরে ডুব দিয়েছেন কিন্তু কখনও গায়ে জল

লাগতে দেন নি। এহেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যখন যুক্তফ্রন্ট রক্ষার জন্য কোন-দিন যুক্তফ্রন্টের সভায় যান নি বা যুক্তফ্রন্ট যে কারণে ভাঙছে, তা রোধ করবার জন্য কখনও যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের অন্যতম প্রধান সি· পি· আই নেতাদের সংগে বসেন নি, তখন ভাঙা যুক্তফ্রন্ট রক্ষার জন্য শ্রীদাশগুপ্ত গেলেন শোধনবাদীদের দপ্তরে। শ্রীদাশগুপ্তের এই দৌত্যের পিছনে যুক্তফ্রন্ট রক্ষার তাগিদ কতটা ছিল, সেই কথা অপেক্ষা বড় কথা হল শ্রীদাশগুপ্ত সি· পি· আই দপ্তরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে-কথাটা বলেছিলেন, সেটা হল বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে গেছে ও যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যুক্তফ্রন্টকে অনাথ হতে দেব না, যুক্তফ্রন্ট সরকার ও যুক্তফ্রন্ট রক্ষায় এইবার আমাদের কোমর বেঁধে লাগতে হবে। সি· পি· আই দলের সংগে সি· পি. এম নেতার এই বৈঠকের মূলে কথা হল অজয় মুখুজ্যে চলে যায় যাক, আমরা আছি। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস চলে গেলেও যেন যুক্তফ্রন্ট থাকে এবং সরকার রক্ষা করা হয়। এই উদ্দেশ্য সাধু এবং মহৎ—কেউ এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন না। বাংলা কংগ্রেস না থাকলে যুক্তফ্রন্ট থাকবে না, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় না থাকলে মন্ত্রিসভা থাকবে না—এই রকম যুক্তি থাকতে পারে না। যুক্তফ্রন্ট না হলেও পশ্চিমবংগে বামপন্থী যুক্ত মোর্চা বহুকাল থেকেই আছে, সেই ১৯৫২ সাল থেকে, তখন অজয়বাবু ও সুশীলবাবু কংগ্রেসের সুখ-পালংকে নিদ্রা যাচ্ছিলেন।

কিন্তু কথাটা সেই কারণে নয়—কথাটা হল সি· পি· এম দলের এই হাঁপ-ছেড়ে বাঁচার মনোভাব সম্পর্কে। সি· পি· এম মিনিফ্রন্ট গঠনের ভয়ানক বিরোধী এবং যুক্তফ্রন্ট থেকে একটা দল চলে গেলে যুক্তফ্রন্ট থাকে না, এই মতের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, কিন্তু সেই সি· পি· এম হঠাৎ ভাঙা যুক্তফ্রন্ট রাখতে ও বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মিনিফ্রন্ট গঠনে উৎসাহী হয়ে উঠলো কেন? শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যখন ডঃ রণেন সেনকে বললেন যে, বাংলা কংগ্রেস না থাকলে সরকার করতে হবে, তখন ডঃ সেন বলেছিলেন, সে কি মশায়, এতকাল আপনারা বলেছেন আমরা আপনাদের বাদ দিয়ে মিনিফ্রন্ট করবার ষড়যন্ত্র করছি, আজ যে আপনি বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মিনিফ্রন্ট গঠনের কথা বলছেন! শ্রীদাশগুপ্ত অবশ্য মিনিফ্রন্টের এক লাগসই ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। 'মিনিফ্রন্ট হল সেই ফ্রন্ট, যে ফ্রন্ট কংগ্রেসের সমর্থন নেয়। বাংলা কংগ্রেস তো স্বেচ্ছায় চলে গেছে, কাউকে বাদ তো দেওয়া হচ্ছে না।' খুবই সংগত কথা, কিন্তু এই সংগত কথাটা কেরলের বেলায় খাটছে না কেন? কেরলেও যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি কোন অনাস্থা এনে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে তাড়িয়ে দেন নি, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ মর্যাদার প্রশ্ন তুলে নিজেই চলে গেছেন। কেরলে শরিক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের চলে যাওয়া আর পশ্চিমবংগে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ তুলে চলে যাওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? আর কংগ্রেসের সাহায্য?

কেরলে অচ্যুত মেনন সরকার এখনও পর্যন্ত কোন প্রশ্নে কংগ্রেসের সাহায্য গ্রহণ করে সরকার রক্ষা করেন নি বা কংগ্রেসের সাহায্য নেন নি। কাজেই "কংগ্রেস-সাহায্য" কথাটা কেরলে এখন পর্যন্ত খাটে নি, তবু কেরল সরকার হল মিনিফ্রন্ট সরকার আর পশ্চিমবংগে ঠিক সেই একইভাবে একটা দলকে বাদ রেখে কংগ্রেসের সাহায্য না নিয়েও গঠিত সরকারকে মিনিফ্রন্ট সরকার বলতে পারা যাবে না কেন? মিনি-ফ্রন্টের একটা অর্থই আছে—সে হল যে ফ্রন্ট ছিল, তা থেকে সংখ্যা হ্রাস পাওয়াই হল ফ্রন্ট মিনি হয়ে যাওয়া; এর মধ্যে সুবিধামত যুক্তি লাগিয়ে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা বৃথা। যা হোক, শ্রীদাশগুপ্ত শুধু মিনিফ্রন্ট গঠনেই প্রস্তুত নন, মাইনরিটি সরকার গঠনেও প্রস্তুত—সেই কথা বলে দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতি শাসন এড়াতে তিনি যে কোন সরকার করতেই প্রস্তুত। উদ্দেশ্য সাধু! কিন্তু এই কথাগুলি অর্থাৎ কোন দলকে বাদ রেখে সরকার করতে চাই, মাইনরিটি সরকার করেও দেখতে চাই কারা আমাদের ভোট দিয়ে ফেলে দেয়—এই কথাগুলি যদি অন্য কোন পার্টি বলতো, তবে তাদের সম্পর্কে কি বলা হত, সেটাই প্রশ্ন। সি· পি· এম সরকার করলে বা বর্তমান যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলে সি· পি· এম-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকারে বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, সি· পি· আই, পি. এস পি, এস. এস· পি, গোর্খা লীগ, এস· ইউ. সি থাকবে না, আর· এস· পিও নিরপেক্ষ থাকবে, লোকসেবক সংঘও সম্ভবত তাই—তবু সি· পি· এম মন্ত্রিসভা গঠন করতে চায়। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলেছেন—বাঘও সময় সময় ঘাস খায়, নইলে কেউ সংগে নেই জেনেও সি· পি· এম ১৪১ জন সদস্যের ভরসায় সরকার করতে যাচ্ছে কোন্ আশায়? যা হোক, এই-ভাবেই বিড়ালের একটা ব্লগ ধরা পড়েছে।

ফরোয়ার্ড ব্লকও আর একটা বিড়ালের ধূর্ততায় ধরা পড়ে গেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটি প্রস্তাব নিয়েছে যে, সি· পি· এম স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিক, যুক্তফ্রন্টের সমস্যার সমাধান সহজ হবে। এই প্রস্তাবের উৎস অবশ্য ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছে শ্রীসুধীন কুমার ও শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। প্রকৃতপক্ষে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সি· পি· এম-এর কাছ থেকে নিয়ে নাও, এই কথা, বহুদিন থেকেই অনেকের মনে রয়েছে, অনেকেই বলি বলি করেও বলতে পারেন নি, রাজনীতির কারণ ও চক্ষু-লজ্জায় কথাটা বলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক সেই চক্ষুলজ্জা ভেঙে দিল অদ্ভুত ধূর্তামীর মধ্যে দিয়ে। শ্রীসুধীন কুমার ও শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সম্প্রতি ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীশম্ভু ঘোষ ও শ্রীকানাই ভট্টাচার্যের সংগে বাংলা কংগ্রেস বাদে সরকার গঠনের কথা বলতে গিয়ে বললেন—সি· পি· এম-এর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলে স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা দপ্তর পুনর্বণ্টনের কথা উঠবে ও আলোচনা হবে। অর্থাৎ তাঁরা প্রকা-রান্তরে বললেন—স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা দপ্তরে এমন কিছু আছে, যা নিয়ে হাত-বদলের কথা হতে পারে। ফরোয়ার্ড ব্লক ধরে নিল বাংলা কংগ্রেস সরকার থেকে চলে গেলে যদি স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা নিয়ে কথা হতে পারে, তবে বাংলা কংগ্রেসকে সরকারে রাখতে স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা দপ্তর নিয়ে কথা হবে না কেন? তাই সেই দিন যখন শ্রীত্রিদিব চৌধুরী ডাঃ কানাই ভট্টাচার্যকে ফোন করে বললেন, আমরা দুজনে বসি। সেই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ডঃ ভট্টাচার্য শ্রীচৌধুরীকে নিয়ে বসলেন। দুজনে আলাপ করে ঠিক করলেন তাঁরা অজয়বাবুকে বলবেন তাঁরা শেষ চেষ্টা করছেন, তিনি যেন ১৩ই মার্চের আগে পদত্যাগ না করেন। অজয়বাবু সেই কথায় রাজী হলেন, আর ঠিক হল ১২ই মার্চ যুক্তফ্রন্টের সভায় বেসরকারীভাবে আলোচনা করে তাঁরা একটা সূত্র বের করবেন, আর ১৩ই মার্চ সেই সূত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করবেন। সুরু হয়ে গেল কানাই-বাবু-ত্রিদিববাবুর দৌত্য। এই দৌত্যের একটি মাত্র প্রস্তাব এবং সেই প্রস্তাবটা কানাইবাবুরই যে, সি. পি. এম স্বরাষ্ট্র ছাড়তে রাজী কি-না। ত্রিদিব-বাবু শুধু এই কথারই বাহন হয়ে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে গেলেন ও রাখলেন। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এই প্রস্তাব বাতিল করবেন, সেটা যে কেউ জানতো, সেই ফলই হল। এক কথায় ১২ই মার্চ যুক্তফ্রন্টের কোন সভা বেসরকারী-

ভাবে বসলো না, কোন আপস সূত্রও পাওয়া গেল না। পরন্তু সরকার ভেঙে যাবার উদ্যোগই জোরদার হল। এর মধ্য থেকেই কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক একটা ইস্যু বের করে নিল, সে ইস্যু হল সি. পি. এম যখন একবার স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পর্কে একটা কথা বাজারে ছেড়েছে, তখন আর চক্ষুলজ্জার পরোয়া করার দরকার নেই। তাই যে কথাটা কেউ এত দিন মুখ ফুটে বলতে পারে নি, এমন কি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এতদিন ধরে 'আমি মুখ্যমন্ত্রী নই, মূর্খ মন্ত্রী, এই সরকার অসভ্য, বর্বর' এমনি আরো অনেক কথা বলেছেন, যার সার ও মূল কথা হল হোম না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে হোমলেস মনে করছেন এবং সুইট হোম না পেলে মন্ত্রিত্বে বিস্বাদ অনুভব করছেন, সেই হোমেরই একটা ইস্যু পাওয়া গেল। এই ইস্যু ধরেই ১৩ই মার্চ শ্রীশম্ভু ঘোষ, শ্রীকানাই ভট্টাচার্য ও শ্রীনির্মল বসু খোদ হোম মিনিস্টারের কাছেই হোম ছাড়ার প্রস্তাব দিলেন। শ্রীজ্যোতি বসু হোমের কথা বিবেচনা করুন, হোম ছাড়লে যদি সরকার থাকে চেষ্টা করুন—এই কথা শুধু ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ নয়, এ নিয়ে রাজ্যপালের কাছে কথা চালাচালি হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণমেনন তিন দিন ধরে কলকাতায় রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান থেকে সুরু করে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল ধাড়া সকলের কাছেই নানাভাবে হোমের কথা বলেছেন। শ্রীজ্যোতি বসু এক কথায় হোম ছাড়তে পারেন না বা হোমের মূল্য দিয়ে মন্ত্রিসভায় থাকতে পারেন না, এটা হল বাস্তব সত্য। তাই তিনিও হোম রক্ষার জন্য নানা যুক্তি খাড়া করছেন, এমন কি তাঁর হোমের কাজ বিচারে তিনি প্রাক্তন বিচারপতি রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানকে সালিশ মানতেও রাজী। এই অবস্থায় অনেক টালমাটালে শ্রীজ্যোতি বসু ফরোয়ার্ড ব্লকের মাধ্যমে প্রস্তাব দিলেন হোম ছাড়া নয়। হোম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা কমিটি হোক। এই প্রস্তাব কতদূর টিকবে, লেখা শেষ করার সময়ও সে কথার পুরো মীমাংসা হয় নি। একদিকে যখন হোম নিয়ে টাগ অফ ওয়ার চলছে, তখন কিন্তু দুই পক্ষই মিনিফ্রন্ট সরকার গঠনের তোড়জোড় পুরো চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা-তিনি পদত্যাগ করে চলে যেতে রাজী আছেন, কিন্তু তার পরিবর্তে যদি সি· পি· এম-এর নেতৃত্বে সরকার হয়ে যায়, তবে সে তো হলো জলের ভয়ে গরম তেলের কড়াইতে ঝাঁপ দেওয়া। একই কথা সি· পি· এম ভাবছে হোম রাখতে গিয়ে যদি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে হোমলেস হতে হয়, সেও হবে ঐ তেলের কড়াইতে ঝাঁপ। তাই তেলের কড়াইতে ঝাঁপ দেওয়া থেকে বাঁচতে দু' পক্ষই জোর তৎপর। শ্রীজ্যোতি বসু যুগান্তরের সংবাদমত শ্রীসিদ্ধার্থ রায়কে নাকি হোম দিতে রাজী আর সরকার গড়তে পি· এম· এল-এর জনাব নাসুরুল্লা খাঁ থেকে শ্রীসুকুমার রায় পর্যন্ত সকলের সংগে হাত মিলাতে রাজী, অপর দিকে বাংলা কংগ্রেসের সংগে আট পার্টি হাত মিলিয়ে শ্রীঅনাদি দাস সহ অনেক এম-এল-একে দাদা, বাবা, বাছা বলছেন। প্রকৃতপক্ষে এতদিন ধরে মিনিফ্রন্টের গোষ্ঠী তোষ্ঠী করে এখন সকলের ঝোলা থেকেই মিনিফ্রন্টের বিড়াল বেরিয়ে আসছে। অজয়বাবুর হাত থেকে বাঁচতে সি· পি· এম বলছে—মিনিফ্রন্ট জিন্দাবাদ আর জ্যোতিবাবুর হাত থেকে বাঁচতে বাংলা কংগ্রেস, সি· পি· আই, ফরোয়ার্ড ব্লক বলছে—মিনিফ্রন্ট জিন্দাবাদ।

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন ১৬ তারিখ পেরিয়ে যাবে। ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দিন। কাজেই এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে, তার মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট থাকছে, না মিনিফ্রন্ট সরকার হচ্ছে, না সকলের মুখে কদলী গুঁজে রাষ্ট্রপতি শাসন বকলমে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী শাসন রাজ্যের ভাগ্যে নেমে আসছে।
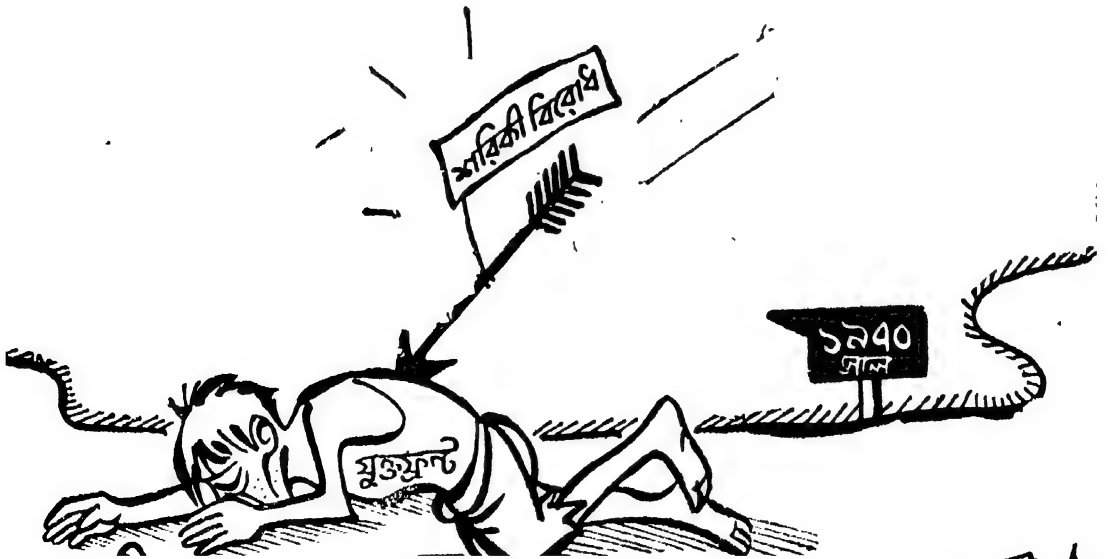
—১৪ই মার্চ, ১৯৭০

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আনন্দ সেদিন আমাকে বলেছিল—উনিশ বছর বয়সে, সেই ভেলায় চড়ে সমুদ্র পার হবার স্বপ্নবশেই মধুসূদন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন বলে আমার বিশ্বাস—আধ্যাত্মিক চর্চার পথ সুগম হবে বলে এ বিশ্বাসের যথার্থ কোনো গভীর টান নেই যে তিনি খৃস্টান হয়েছিলেন,—এরকম ধারণার সমর্থক কোনো তথ্য নেই তাঁর জীবনীতে। খৃস্টান হবার পরে তিনি যখন শিবপুর বিশপ্‌স্‌ কলেজে থাকেন, তখন কি তিনি ১৮৪৩-এর ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা তাঁর নিজের সেই কবিতার ছত্রগুলি মনে রেখেছিলেন—'ভাব ছত্রে তিনি ঈশ্বরকে জানান—

I've broke Affection's
tenderest ties
For my blest Saviour's
sake.

সত্যিই কি 'সেভিয়ারের' জন্যে তাঁর কোনো ব্যাকুলতা ছিল? তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ভাষার চর্চাতেই সে-সময়ে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তিনি বহুভাষাবিদ্‌ কবি ছিলেন—তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক অর্থে ধর্মসাধনার ঝোঁক ছিল না বিন্দুমাত্রও,—কবিত্বই তাঁর একমাত্র ধর্ম,—কবি হিসেবে যশস্বী হওয়াই তাঁর সর্বাধিক কাম্য ছিল। বাংলা কবিতার বা নাটক-প্রহসনের ভেলা ভাসিয়ে, বাধার সমুদ্র পেরিয়ে তিনি যশের শিখরে উঠে নিজের নাম লিখে রাখতে চেয়েছিলেন।

আমি বললুম—'সেভিয়ারের' প্রতি তাঁর ঐ উক্তি কিংবা তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা'—ধর্মভাবনা-সম্পর্কিত তাঁর সবরকম কবিতাই যে ভক্তি-সম্পর্কহীন কবিতামাত্র,—এ-কথাটা জোর দিয়ে বললে সত্যিই তার প্রতিবাদের জোড় মেলে না, বিশেষত তাঁর যে বইখানির কথা একটু আগেই এই আলোচনায় উঠেছিল, সেই 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের 'আইলা', 'পালাইলা', 'খেলিলা', 'উতরিলা', 'জাগিলা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের দৈন্য দেখলে তখনকার বাংলা ভাষা যে ভেলা-র চেয়ে শক্ত বাহন ছিল না, সেটাও মেনে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু একথা সংশয়াতীত যে, তিনি সংস্কৃত কাব্যভাষা থেকে অনেক উপকরণ পেয়েছিলেন,—প্যারীচাঁদের মতন শুধু লোকভাষার ওপর বা কলকাতার ভাষার ওপরেই নির্ভর করে থাকেন নি।

আনন্দ বোধ হয় আমার এই শেষ মন্তব্যটি উদাহরণযোগে প্রতিষ্ঠিত করবার আগ্রহেই আবার আবৃত্তি শুরু করলে—

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন
ধ্যানে;—
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
আরম্ভিলা মহাতপঃ মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম ভূত যত,
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা,
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাঙা পা দুখানি।

আমি বললুম—বুঝেছি।

সে বললে—শোনো আর একটু—শিল্পীর সাধনার দিকটা দ্যাখো—বিশ্বকর্মা সেই যে রাঙা দুটি পা গড়ে ফেললেন, তাতে—

বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে,
যেন লক্ষ রসবাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরু-দেশে আসি
করিলা বসতি।
দুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল
তাহাতে
......
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা।

আমি বললুম—আশ্চর্য! প্রাচীন অলঙ্কার এসব। কিন্তু পুরোনো মনে হচ্ছে না। খগোল নিতম্ব-বিম্ব—এ রূপক একটু বাড়াবাড়ি বটে, কিন্তু ও-ধারণা রসিকের মন যদি মানতে আপত্তি না করে,—অর্থাৎ ও-রস মন যদি বঞ্চিত না থাকে, তাহলে ছায়াপথকে মেখলা ভাবতে সত্যিই গভীর ভাল লাগে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের সমালোচনায় লেখেন—

তিলোত্তমার যে-কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায় তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্বত্রই সুচারু-রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাবসকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিল্টন প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই; তাঁহার মন হইতে অন্যের যে-কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না।

আনন্দ বললে—আর একটি কথা—লালিত্য এবং ওজোগুণ,—মধুসূদনের এই কাব্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র দুয়েরই স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—'বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই'।

আমি বললুম—বই-বাছাইয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত থেকে কথা বলতে হবে, আনন্দ। তিলোত্তমাসম্ভবের অনেক গুণ আছে সত্যি, কিন্তু সেকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র করেছিলেন তখনকার সাম্প্রতিক সাহিত্যের সমালোচনা,—সে সমালোচনায় তিলোত্তমা উৎরে গিয়েছিল; কিন্তু আজ এতোকাল পরে মধুসূদনের ও-কাব্য কি ঠিক সেকালের মতো আজও অভিনব মনে হচ্ছে?

সে বললে—সময়ের চলতি প্রথমে

তিলোত্তমা এক চিরস্থায়ী শতদল।
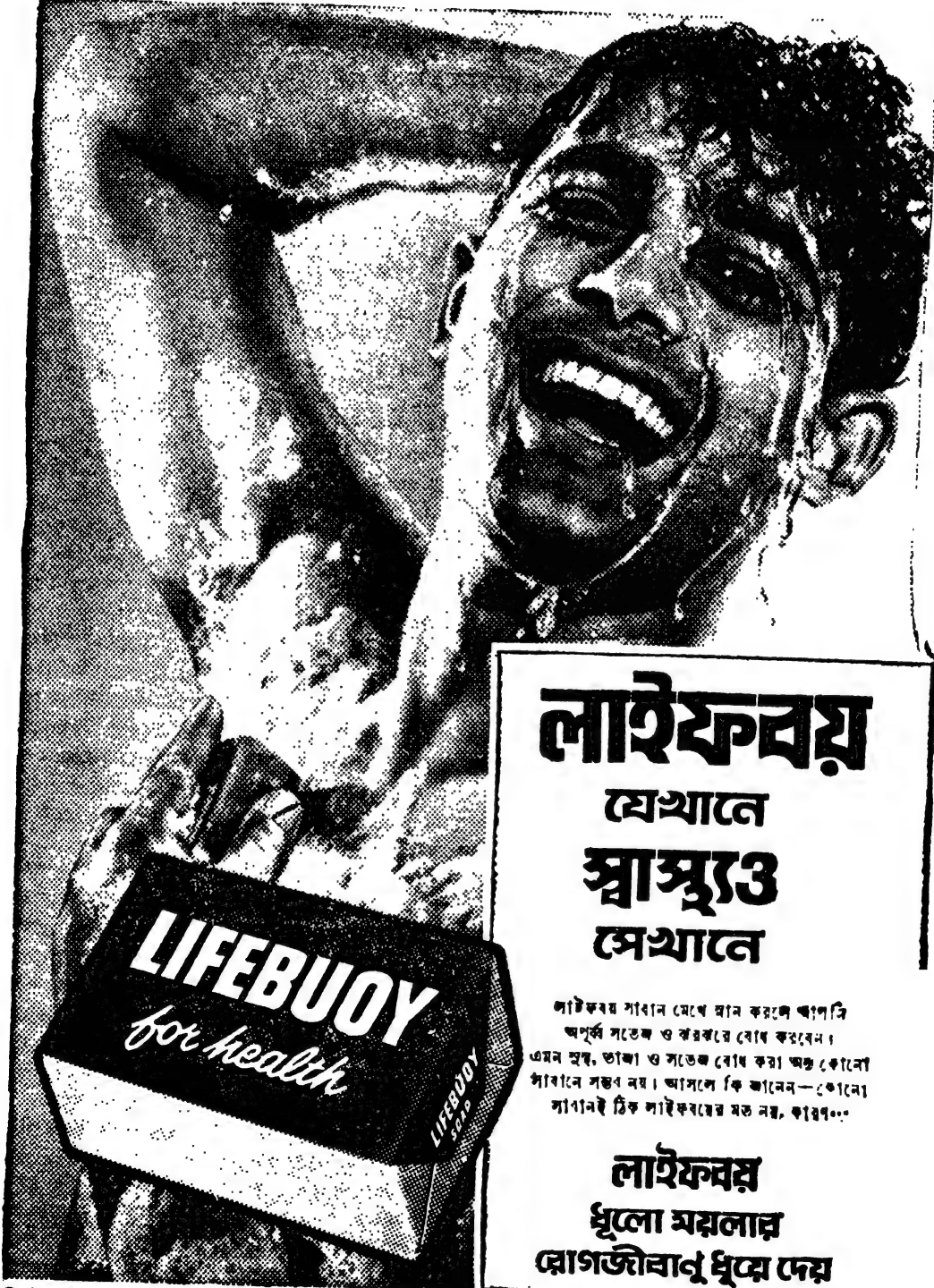
আমি বললুম—ও-কাব্য যদি এতোই ভাল লেগে থাকে তাহলে বরং 'চতুর্দল' বলো, কারণ ওতে শতদলের ঘ্রাণ বা রূপ পাওয়া যায় না,—ওতে আছে মাত্র চারটি সর্গ।

সে আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বললে—তাছাড়া ঐ কাব্যে মধুসূদনের পুরো কবি-ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখতে পাই। ভাষা, ভাব, আখ্যান, আঙ্গিক,—সকল দিকেই তিনি যে পথ খুঁজছিলেন, তার চিহ্ন ওতে স্পষ্ট।

নিজের এই অভিমতের ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েই বোধ হয় সে বলতে লাগলো—১৮৪৩ থেকে ১৮৪৮—শিবপুর বিশপ্‌স্‌ কলেজে তাঁর সেই ছাত্রাবস্থার মধ্যেই তাঁর ভাব-জীবনের গভীর নিঃসঙ্গতার পর্ব কেটেছে। তিনি পারমার্থিক কোনো সংশয়ে কাটিয়েছেন যে—তা নয়,—কবিতার চিন্তা, শিল্পভাষা আর শিল্পরীতির চিন্তাই তাঁর মন জুড়েছিল। প্রমথ বিশী তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন' নামে বইখানির আদিকান্ডে

[ শেষাংশ ২৩৯৩ পৃষ্ঠায় ]

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর সাক্ষাৎকারধর্মী এই ধারাবাহিক নিবন্ধ শুরু করার সময় বলেছিলাম যে, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের কিছু দায়িত্বশীল মন্ত্রিসমেত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্য তুলে ধরবার চেষ্টা করবো। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এত দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকলো এবং সরকারের অস্থিরতা এত প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো যে, খুব স্বাভাবিক কারণেই আমাদের দৃষ্টি কিছুটা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়লো সরকার এবং সংসদের বিভিন্ন শরিক রাজনৈতিক দলগুলির উপর। এর ফলে একদিকে যেমন একটা ঝুঁকির মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত মন্ত্রীদের সংগে আলোচনা চলতে লাগলো, অন্যদিকে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার অবকাশ হারাতে হলো। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টের সংকট বা রোগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো, যার ফলে আমরাও লিখতে বাধ্য হলাম, যুক্তফ্রন্টের প্রাণবায়ু আর কতক্ষণ আছে বোধ করি বিধাতারও তা বলবার সাধ্য নেই। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সামনে যুক্তফ্রন্ট সরকার একের পর এক যে ম্যাজিক দেখিয়ে চললেন, তার পুনরুক্তি করে কাজ নেই।

রাজ্যে সরকার আছে শৃংখলা নেই, মন্ত্রী আছে মন্ত্রণাসভা নেই, পার্টিগত বিধান আছে, সমষ্টিগত বিধানসভা নেই (মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করায় ১০ই মার্চ থেকে রাজ্য বিধানসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়েছে)। অন্তত এ-কথা যখন লিখছি তখনও পর্যন্ত এই হলো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দু'দিন পরে যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকবে, না মিনিফ্রন্ট সরকার হবে, না রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবে তা যুক্তফ্রন্টের নেতারাও জানেন না, রাষ্ট্রপতিও জানেন না, সম্ভবত বিধাতাও জানেন না।

যা হোক, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির অস্থিরতার মধ্যে একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রের সংগে কথা বলেছিলাম। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দু'টি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখায় সাক্ষাৎকার দু'টি প্রকাশে কিছু বিলম্ব হয়ে গেল, তথাপি যুক্তফ্রন্টের মৌলিক সংকটের উপর প্রতিষ্ঠিত বিবেচনায় এগুলি প্রকাশিত হলো। প্রথম সাক্ষাৎকারটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি নাথ এবং শ্রীহিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে। দ্বিতীয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের শ্রীসুধীশরঞ্জন রায় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), শ্রীমতী নিবেদিতা বিশ্বাস (আধুনিক ইতিহাস) এবং শ্রীমুক্তিরঞ্জন মিত্র (প্রাচীন ইতিহাস)-এর সংগে। সাক্ষাৎকার দু'টি যথাক্রমে (১) এবং (২) পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হলো।

(১)

প্রশ্ন : যুক্তফ্রন্টের আত্মকলহ বা শরিকী সংঘর্ষের মূল কারণ কি?

উত্তর : **শ্রীমৃণালকান্তি নাথ :** প্রথমেই একটা কথা আমি বলে নিতে চাই। সে হলো বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মন্তব্য আপনাদের পত্রিকার পক্ষে সহায়ক না হতে পারে। তবে বুর্জোয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের মতো যদি বক্তব্যকে বিকৃত করে না ছাপেন, তবে অবশ্যই আমি কিছু বলবো। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট নিছক সাম্প্রতিক নয়। এ সংকট শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকদের হাত থেকে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় থেকে, বস্তুত ভারতের কোটি কোটি মানুষ আজও পরাধীন। অর্থনৈতিক শৃংখলে আবদ্ধ বাংলাদেশের মানুষ চেয়েছিল অনেক, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের 'বিপ্লবী' নেতারা তাদের নির্বাচনমুখী করে সেই সনাতন সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় ধোঁকা দিচ্ছেন অথবা বোকা বানাচ্ছেন। নেতাদের মধ্যে একটি-মাত্র শ্রেণীস্বার্থ বিদ্যমান—সেটা হলো শোষকশ্রেণীর স্বার্থ। শরিকী সংঘর্ষ হলো মেহনতী মানুষের বিপ্লবী ঐক্যে ফাটল ধরাবার যুক্তফ্রন্টী চক্রান্ত। আসলে এ-সব চক্রান্তের মূলে কাজ করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। মার্কসবাদীরা যদিও মুখে শোধনবাদবিরোধী তথাপি আজ ইন্দিরা-চ্যবন-নন্দিভে-সুন্দরাইয়া-প্রমোদচক্র একই পথের পথিক। এই জাতীয়-সাম্রাজ্যবাদী চক্রের হাত থেকে মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলো কৃষি-বিপ্লব। আমার মতে সেই মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম স্বপ্ন শ্রীকাকুলাম।

উত্তর : **শ্রীহিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় :** এই আত্মকলহকে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত দিক থেকে না দেখে ইতিহাসগত দিক থেকে দেখা ভাল। সংকট সব দেশের ইতিহাসে দেখা যায়। বাংলাদেশের এই সংকট সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার যদিও জনগণের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি কেন্দ্রীভূত রূপ তথাপি এই যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীভিত্তিক মোর্চা। সুতরাং এই পরস্পরবিরোধী মতাদর্শ যেমন একদিকে অনেক প্রগতিবাদী নীতি গ্রহণ করছে—অন্যদিকে বিভিন্ন দলীয় সংকীর্ণতা সেই নীতি কার্যকরী হবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই যে রাজনৈতিক চেতনা আজ সাধারণ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তাকে ফ্রন্টের ভিতরের এবং বাইরের অনেক দলই ভাল চোখে দেখতে পারছে না। অনেকক্ষেত্রেই তুচ্ছ সংকীর্ণতা এবং দলীয় স্বার্থকেই বড়

করে দেখার জন্য সংঘর্ষের সূত্রপাত হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কি মনে হয় জেলা বা থানা স্তরে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে এ-সব সংঘর্ষ এড়ানো যেতো?

শ্রীনাথ ঃ না। যুক্তফ্রন্ট যে কোন স্তরেই গঠিত হোক না কেন, এর মূল কাজ হলো মানুষের বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করে দেওয়া। কাজেই এটা অনেকটা ইনএভিটেবল্—অনিবার্য। একটা কথা ঠিক ঃ "United front is based on arms struggle". তা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ জোতদার-জমিদার শ্রেণীস্বার্থে এই শরিকী সংঘর্ষ চলবে। এবং এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণী—যাঁরা বিপ্লবের মূলশক্তি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এক্ষেত্রে আমি শ্রীমিত্রের সংগে একমত। কারণ, যে সমস্যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে গভীরভাবে প্রবিষ্ট -যুক্তফ্রন্টের নামাবলী গায়ে দিয়ে তার সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে যতদিন না দেশে একটি প্রকৃত জনদরদী সরকার গঠিত হচ্ছে, ততদিন এ সমস্যার সমাধান হবে না। যিনি প্রকৃতপক্ষে কাজে ও কথায় জনগণকে ভালবাসেন, তিনিই দেশের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আমাদের সেই রকম নেতার দরকার যিনি এশিয়ার মানুষের দুঃখ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

প্রশ্ন ঃ ইতিহাস থেকে সেই রকম কোন নেতার নাম করবেন কি?

—হ্যাঁ, দুজনের নাম করতে পারি। একজন ভারতের মহাত্মা গান্ধী, আর একজন ভিয়েতনামের হো-চি-মিন। যদিও গান্ধীজী শেষ যুগে অনেকক্ষেত্রে আদর্শচ্যুত হয়েছেন তথাপি বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভাসে সেটা সমগ্র ভারতের শ্রমজীবী দরিদ্র জনসাধারণের গণবিক্ষোভেরই প্রতিভূ।

প্রশ্ন ঃ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শরিকী বিবাদ তাদের ৩২-দফা কর্মসূচী রূপায়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে কি?

শ্রীনাথ ঃ মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে জনসাধারণের প্রতি দরদে বিগলিত হয়ে ৩২-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা এক কথা আর রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন করা অন্য কথা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে এই ধরনের ৩২-দফা কর্মসূচীর দ্বারা হয়তো কিছু রিফর্ম করা যায়। কিন্তু লেনিন এইসব রিফর্মিস্টদের বলেছিলেন, "legal communists." এঁরা সকলেই রঙ-বেরঙের শোধনবাদী। শোধনবাদীরা চিরকালই বুর্জোয়াদের তল্পিবাহক। এঁরা কখনোই জনসাধারণের জন্য কিছু করেন না। ভারতের মতো আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে কৃষি-বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র-কাঠামোকে চূর্ণ না করে জনগণের সত্যিকার কোন মঙ্গল সাধিত হতে পারে না।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিঘ্ন নিশ্চয়ই ঘটেছে। কিন্তু তাই বলে এককথায় হাল ছেড়ে দিয়ে অতিবিপ্লবের রঙীন বুলি আউড়ে অথবা অন্ধকারের দেয়ালে আলকাতরায় বিপ্লবের 'স্ফুলিঙ্গ' ছড়িয়ে সমস্যার সমাধান করা যায় না। প্রগতি আকাশ থেকে পড়ে না। সেও একটা এভলিউশন। সুতরাং ৩২-দফা কমসূচী ব্যাহত হয়েছে ঠিক কথা কিন্তু একেবারে যে কিছু হয় নি বা হতে পারে না সে কথা ঠিক নয়। বিগত দু' বছরে বাংলাদেশের জনমনে যে রাজনৈতিক চেতনার সূচনা হয়েছে তাকে অস্বীকার করলে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হবে। আর এর পেছনে যুক্তফ্রন্টের অংশীদার দলগুলির অবদানও অনস্বীকার্য হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ অনশনের মাধ্যমে হিংসার অবলুপ্তি হতে পারে বলে আপনারা বিশ্বাস করেন কি?

শ্রীনাথ ঃ না। অনশন একটা শোধনবাদী কায়দা। এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের চরম হাতিয়ার। বর্তমানে রাজ্যব্যাপী যে 'হিংসা' হচ্ছে তা হলো কৃষকে কৃষকে অথবা শ্রমিকে শ্রমিকে হানাহানি। এর একমাত্র প্রতিকার হলো বিপ্লবী রাজনীতি। জনসাধারণকে সেই রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জ্যোতিবাবু প্রমোদবাবুরা অথবা বিশ্বনাথবাবু অজয়বাবুরা সেটা কখনোই করবেন না। কেন না সেই রাজনীতি হবে নকশালবাড়ী শ্রীকাকুলামের কষ্টিপাথরে ঘসা রাজনীতি। যতদিন তা না হবে– যুক্তফ্রন্টের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ইন্দিরা-চাবনের অঙ্গুলিহেলনে এই হানাহানি চালিয়ে যাবে তাদেরই শ্রেণী-স্বার্থে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বর্তমান যুগে অসম্ভব।

প্রশ্ন ঃ পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কতটা 'অসভ্য' বলে আপনাদের মনে হয়?

শ্রীনাথ ঃ এই গালাগালি অনেকটা বড় ভাইয়ের ছোট ভাইকে গালাগালি দেবার মত। যাঁরা 'অসভ্য' বলেছেন তাঁরা কিন্তু এখনো গদী অলংকৃত করে আছেন। কেন না গদীতে থেকেই তাঁদের শ্রেণী-স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব, জনসাধারণের আন্দোলন দমন করা সম্ভব, তাদের বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করে দেওয়া সম্ভব। ছেড়ে দিলে ত' নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করা হবে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ঃ অজয়বাবু চীৎকার করে বললেই সরকার অসভ্য হয় না। অথবা জ্যোতিবাবু তা অস্বীকার করলেই সরকার সভ্য হয়ে যাবে তেমনও কোন কথা নেই। সভ্যতা বা অসভ্যতার প্রকৃত বিচারক ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটের সুযোগে এক্ষেত্রে কোন মতামত দেবার অর্থই অর্থহীন হয়ে পড়বে। এর অর্থ এই যে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট যখন সভ্যতার ইতিহাস লিখেছিলেন দশ খণ্ডে, তখন তার শেষ খণ্ড এসে দাঁড়ায় রুশোর যুগকে কেন্দ্র করে। পরবর্তী যুগের ইতিহাস তিনি লেখেন নি 'too hot' বলেই। সুতরাং ১৯৭০ সালে দাঁড়িয়ে ১৯৭০ সালের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা একজন ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে অসম্ভব।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলে অভিহিত করা চলে কী?

শ্রীনাথ ঃ না। শ্রেণী-সংগ্রাম কাকে বলে? আমরা যারা ডায়ালেকটিক্সের ছাত্র বা ডায়ালেকস্ যারা মোটামুটি বুঝি, তারা বলবো, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য শোষকশ্রেণীর সংগে শোষিতশ্রেণীর যে সংগ্রাম সেটাই শ্রেণী-সংগ্রাম। যুক্তফ্রন্টের এই তথাকথিত শ্রেণী-সংগ্রাম কিন্তু শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়। তা প্রকারান্তরে শোষকশ্রেণীকেই রক্ষা করছে। মার খাচ্ছে শোষিত-শ্রেণী। জমিদার জোতদার শ্রেণী আড়াল থেকে তৃপ্তির হাসি হাসছে। জনতার বিরুদ্ধে জনতাকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে—শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রমিককে—কৃষকের বিরুদ্ধে কৃষককে। এ যদি শ্রেণী-সংগ্রাম হয় তবে মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-সে-তুঙ সব ভুল।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এই 'শ্রেণী-সংগ্রাম'কে প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে প্রকৃতপক্ষে এটা একটা জগাখিচুড়ী। একদিকে বিভিন্ন দল তাদের দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করছে যেটা ঐতিহাসিক নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক দল অতীতে করেছে তার মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। বর্তমানের অনেক সংঘর্ষ অবশ্য সম্পূর্ণভাবেই এই থিয়োরী-মুক্ত। অন্যদিকে গ্রামবাংলার কৃষকসমাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্পর্শে এসে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হয়েছেন। তাঁরা আজ সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছেন। এই সংগে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে

(১)

'বেলেঘাটার মশা-ই
সত্যিকারের মশাই।'

শুনে যাদবপুরে
মশারা বলে, 'খুরে
দণ্ডবৎ মশাই!'

(২)

রে! রে! রে!
শীতলাতলায়, শনির থালায়
পয়সা দিলি নে?

ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!
লটারি না কিনেই তোর
ভাগ্য ফেরাবি?

(৩)

জুয়ো!
রাস্তা জুড়ে, ফুটপাথে
খেলিস না তুই জুয়ো!

কেনরে জুয়ো খেলিস না?
জুয়ো খেলেন মন্ত্রীরা॥

---

অনেক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই লড়াই-এর সুযোগ গ্রহণ করছেন। সেটা যতদিন বন্ধ না হবে ততদিন এই সংগ্রাম কলঙ্ক-মুক্ত হতে পারবে না।

(২)

প্রশ্ন : আপনাদের চোখে যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষের কারণ কি?

উত্তর : —১৯৬৭ সালের তুলনায় ১৯৬৯ সালের বাংলা দেশের যুক্তফ্রন্ট অনেক বেশি সংঘবদ্ধ হয়েছিল। স্বভাবতই সকলের মনে হয়েছিল, এবারের যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরানো প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কিন্তু গ্রামে গ্রামে শরিকী সংঘর্ষের খবরে যুক্তফ্রন্ট-প্রিয় সকল মানুষ শংকিত হয়ে উঠেছেন। একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, শরিকী সংঘাত শহরে নয়—গ্রামাঞ্চলেই বেশি ঘটেছে। এই সংঘাত যে দলগুলির মধ্যে ঘটেছে সে দলগুলো হল মুখ্যত সি· পি· এম, সি· পি. আই, আর. এস. পি, এস. এস. পি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং এস· ইউ· সি—যারা প্রত্যেকেই মার্কসবাদের প্রবক্তা। এই সংঘাত যদি প্রতিক্রিয়াশীল দলের সংগে প্রগতিশীল দলের সংঘাত হতো তাহলে তেমন আশঙ্কার কিছু ছিল না কিন্তু এই সংঘাত প্রগতির সংগে প্রগতির। কিছু রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য কৃষককে কৃষকের সংগে, মেহনতী মানুষকে মেহনতী মানুষের সংগে লড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম আবিষ্কার করে কেউ কেউ আত্মতৃপ্তি পেতে চাইছেন কিন্তু আমাদের মনে হয় সেটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শগত পথ ছেড়ে ডাণ্ডার আশ্রয় নিলে যা হয় এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। আর এই সুযোগে শ্রমিক-কৃষক স্বার্থবিরোধী শক্তি এই সব দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে চলেছে। আর একটা কথা আমাদের মনে হয়, পল্লীস্তরে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে অনেক সংঘর্ষ এড়ানো যেত। যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন ৭-দফা কেন, ৫৭-দফা প্রস্তাবও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

প্রশ্ন : —এই শরিকী সংঘাত এবং সাধারণ সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ কি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করেছে।

উত্তর : —না। কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে আইন-শৃংখলা বিপন্ন বলে মনে করি না। যাঁরা নৈরাজ্যের কথা বলছেন তাঁরা বাড়াবাড়ি করছেন।

প্রশ্ন : —কেউ কেউ বলছেন, কেরালার মত বাংলাদেশেও একটি মিনিফ্রন্ট গঠিত হতে চলেছে। এই সম্ভাবনা এখন আছে বলে মনে করেন কি?

উত্তর : —যাঁরা এ কথা বলছেন, তাঁরা সম্ভবত একটা কথা মনে রাখেন নি যে, কেরালার মত অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে নয়। এখানে যুক্তফ্রন্টের কোন শরিক দলকে বাদ দিয়ে বিকল্প ফ্রন্ট গঠন করা সহজও নয়, সম্ভবও নয়। আর এ জাতীয় কোন প্রচেষ্টা চলছে বলেও আমাদের মনে হয় না। তেমন প্রচেষ্টা হলে আমরা ছাত্ররা তার জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন করবো।

প্রশ্ন : —বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক প্রতিরোধ আন্দোলন জনমনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়?

উত্তর : —জনসাধারণের মনে তেমন রেখাপাত করেছে বলে মনে হয় না তবে কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কার্জন পার্কে হামলা সেই প্রতিক্রিয়ারই ফলশ্রুতি।

প্রশ্ন : —বর্তমান যুক্তফ্রন্ট আমলে বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষাব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন এসেছে? ছাত্র-আন্দোলনের তীব্রতা কমেছে বলে মনে হয় কি?

উত্তর : —প্রথমত বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন তেমন কিছুই হয় নি। ছাত্ররা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। দ্বিতীয়ত, যুক্তফ্রন্টের শিক্ষানীতির যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না। শিক্ষা-ক্ষেত্রেও শরিকী প্রতিযোগিতা চরমে উঠেছে। গভর্নিং বডিগুলিতে দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বন্ধ হওয়া উচিত। সিলেবসগুলিকে রি-ওরিয়েন্ট করা দরকার। শিক্ষায়তনে পুলিশী অনুপ্রবেশ আইন করে বন্ধ করা প্রয়োজন। অনেক কিছুই হচ্ছে না যা হওয়া উচিত ছিল। ছাত্র-আন্দোলন থেমে নেই—তার তীব্রতাও কমে নি। সারা ভারতবর্ষব্যাপী কিছু নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে সম্প্রতি আমরা আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছয় ॥

কিন্তু মানুষের জীবনের দুঃখ-দুঃখের উৎস খুঁজে পাওয়াটা বোধ করি খুব সহজ নয়। ভোরের অন্ধকারে আমার কম্বল শয্যায় শুয়ে আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম। মায়া বুঝতে পেরেছিল, রাতভোর গোলমালের মধ্যে থেকে ফিরে এলেও, ক্লান্তিজনিত অবসাদের জন্য আমি ঘুমোতে পারি নি। তাই সে তার পুরনো কথাটার জের টেনে আমাকে বললে, 'কতবার আমি বারণ করেছিলুম বলুন তো! মা যদি শুনত তাহলে মায়েরও অমন বিপদ হত না, আর আপনিও অমন করে ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়তেন না।'

গম্ভীরভাবে আমি তার কথার সায় দিলাম, 'হুঁ।'

মা বললেন, 'আমি কি অতশত জানতুম!'

'জানতে না বলেই তো আমি তোমায় বলেছিলুম', মায়া বললে। মা বললেন, 'তোর কথাটা হয়ত শুনলেই তখন আমি জ্ঞান করতুম। কিন্তু তুই আর কতটুকু ওখানকার ব্যাপার জানিস—সে কথা ভেবেই তোর কথাগুলো আমি গেরাহ্যি করি নি।'

'কিন্তু আমি যে সবই জানি!'

'কি করে জানলি তুই?'

স্বাভাবিক আমারও মনে সেই প্রশ্ন—মায়া কি করে জানল ওখানকার কথা! আমার মনে যে প্রশ্নটা উঠতে পারে এটা আন্দাজ করে নিয়েই সে বললে, 'ভানুদার কাছ থেকে যে আমি প্রায়ই এসব কথা শুনতুম। পাছে কোনদিন আমি রাতে ওদিকে গিয়ে পড়ি সেই ভয়ে ভানুদা আমাকে রোজই সাবধান করে দিত।'

এবার আর মা নয় আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভানু কি তোমাকে এই সব কথা বলে সাবধান করে দিত!'

হ্যাঁ, বলে মায়া যে সব বর্ণনা দিতে লাগল তা প্রায় মিলে গেল। সারারাত এই অভিশপ্ত জগতে ওস্তাদের গোয়েন্দারা ঘোরে, টুনটুনি আর জগদীশ থাকে মাত্র আগলিয়ে, তারপর যথাযথ ব্যবস্থা করতে তাদের কোন দেরি হয় না। মাকে যে ওরা ক্লোরোফর্ম করেছিল চিনতে না পেরে কিংবা দুশমন ভেবে তা নয়—ওটা ওখানকার নিয়ম। আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে হাসিল করে নাও, তার পর অন্য ব্যবস্থা। সম্ভবত, সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই, আমাকেও ওরা এইভাবে ক্লোরোফর্ম করত। তারপর কি হত তা কল্পনা করতেও শিউরে উঠতে হয়। তখন আমার না ফেরত বাণীদির সঙ্গে পরিচয় অথবা আমার ক্যাম্পের বাণীদিরও থেকে যেত অজানা। কে জানে, হয়তো

আমাকে পিটিয়ে লাশই করে দিতো ওরা।

এইসব সাত-পাঁচ কথা হতে হতে হঠাৎ এক সময়ে মেনকার গলা পাওয়া গেল। সে ডাকছিল পাঁচির মাকে। পাঁচির মা'র মেজাজটা বোধ করি ভালই ছিল। সে বললে, 'আয়—'

ছেলেটাও ডেকে উঠল, 'মাস্তি—'

মেনকা বললে, 'কই—আমার বাবা কই রে?'

'এই যে,' মশারির ভেতর থেকে বোধ করি খোকাটা বলে উঠল।

আজ আর কোন গোলমাল হল না ছেলেকে নিয়ে। মা বললেন, 'ওরে একেবারে সকাল হয়ে গেছে।'

মায়া বললে, 'উঠে পড়ো তবে।'

ওরা উঠে পড়ল। আমার কেন আর কম্বল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করল না। আমি পড়ে রইলাম। মায়া বললে, 'দাদা আপনি বরং থাকুন—একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। রাতে একদম তো ঘুম যায় নি।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। চুপ করে পড়ে রইলাম।

কিন্তু চুপ করে পড়ে থাকতে গিয়ে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল যখন তখন একেবারে চারিদিকে কড়া রোদ ফুটে উঠেছে। দেখলাম গলার নিচে আমার ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। চোখ দুটো জ্বালা করছে অপরিমিত ঘুমে। ভাল করে চোখ চাইতে দেখলাম সেই গত রাতে যাকে ওস্তাদের পাশে বসে থাকতে দেখেছিলাম, সেই যাকে মায়ার মুখের মত আদল দেখে ধরে নিয়েছিলাম শংকর বলে—সে-ই বসে রয়েছে ঘরের মধ্যে ঘাড় নিচু করে আর মাথায় হাত দিয়ে। পাশেই বসে মা। দেখে মনে হল যেন মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত কোন এক অনুতপ্ত সন্তান তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে। অদ্ভুত হাড়ে-মাসে শক্ত-সামর্থ্য চেহারা শংকরের। চুলগুলো ওল্টানো। প্রশস্ত ললাট, টানা টানা চোখ। শক্ত চিবুক আর চওড়া বুক। এমন পৌরুষদৃপ্ত চেহারা যে মানুষের, সে মানুষ এমন স্বভাব-কয়েদী হল কি করে?

মা বলছিলেন, 'তোর কি একটুও মনে পড়ল নারে এই দুঃখিনী মায়ের কথা?'

শংকর নিরুত্তর।

মা আবার বলতে লাগলেন, 'তোর জন্যে হন্যে হয়ে সেই রাতে ছুটলুম কিন্তু কি পেলুম বদলে—'

'আমি শুনেছি,' শংকর বললে, 'তবে তোমার ওখানে না যাওয়াই উচিত ছিল।'

'কিন্তু আমি কি করব বলতে পারিস', মা বললেন, 'তুই যদি আসতিস তাহলে তো আমাকে যেতে হত না। আর গিয়ে আমাকে এভাবে পেহারও ভোগ করতে হত না।'

শংকর বলে উঠল, 'কিন্তু যাক ওসব কথা—তোমরা এখানে আমাকে বেশি দেরি করিও না। শালারা টের পেলে এখুনি আমাকে আবার টেনে নিয়ে যাবে।'

'এখন তো সেই ভয়ই আমার সবচেয়ে বড় ভয় হয়,' মা বলতে লাগলেন, 'এতদিন জেলে ছিলিস সে ছিল এক জ্বালা। এখন বাইরে এসেছিস, কখন

ধরা পড়বি, কখন কি হবে না হবে—সে আবার আমার আরেক জ্বালা।'

'যাক্ ওকথা ছাড় মা,' শংকর বলতে লাগল, 'কি খেতে দেবে দাও—আমি আর থাকতে পারব না।'

মা ডাকলেন, 'মায়া?'

মায়া দাওয়ায় তোলা উনুনে খাবার তৈরি করছিল। সে বললে, 'আরেকটু মা।'

এবার শংকর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'তা সাধু তো দেখছি বেশ তোমাদের বাড়িতে—কিন্তু সাধুটিকে আমদানী করলে কোত্থেকে?'

মা কিছু বলবার আগেই আমি বলে উঠলাম, 'আমাকে ভাই মা আমদানী করেন নি, আমি নিজেই আমদানী হয়েছি।'

'বাড়ি কোথায়?'

'সাধুর কি বাড়ি থাকে।'

'কিন্তু আপনাকে দেখে তো সাধু বলে মনে হয় না।'

'তবে আমি চোরও নই।'

'কিন্তু চোর নয় কোন্ শালা', এবার শংকর নিজমূর্তি ধরে বললে, 'সব শালা চোর। দেশের রাজা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত সব শালাকেই আমি দেখলুম।'

'কিন্তু ভাই শংকর, যারা রাজাও নয় চৌকিদারও নয় তারা চোর হতে যাবে কেন?'

'হ্যাঁ তারা সুযোগ পায় নি তাই চোর হয় নি। তা নাহলে—'

'অবশ্য কথাটা তোমার ঠিকই। সুযোগ পেলে তারাও হয়ত তাই হোতো। আমার সম্বন্ধে তুমি সেই রকম একটা কিছু নিশ্চয়ই মনে করতে পার।'

'আপনি আমাদের বাড়ি এলেন কি করে?'

ঘটনাটা আমি বললাম। শংকর বললে, 'সেই থেকেই তাহলে এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'খাওয়া-দাওয়া করেন কোথায়?'

'এখানেই।'

'খরচ দেয় কে?'

'আমিই খরচ করি।'

'তা একরকম ভাল,' শংকর বললে, 'কিন্তু টাকা পান কোত্থেকে?'

'আমার নিজের টাকা আছে।'

'নিজের টাকা?'

'হ্যাঁ নিজের রোজগার করা টাকা।'

'সাধু মানুষ আপনি রোজগার করেন কি করে?'

'রোজগার এখন করি না—আগে করতাম।'

'অর্থাৎ সাধু হবার আগে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন।'

'তা ছাড়া আর কি করব?'

'এখানে টাকা সঙ্গে নিয়ে বাস করতে ভয় করে না?'

'ভয় করবে কেন?'

'এরা যদি আপনাকে টাকার লোভে খুন করে?'

'এরা মানে কারা?'

'মানে আমাদের দলের লোকেরা।'

'তোমাদের দলের লোকেরা আমার এই সামান্য টাকায় লোভ করবে কেন ভাই,' আমি বললাম, 'তোমাদের লোকেরা বড় বড় ব্যাপারে আছে, তারা এই ছোট ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসবে কেন?'

আমার কথায় বোধ করি শংকর কেমন যেন একটু ঠোক্কর খেলে বলে মনে হল। পরে আমি শুনেছিলাম তার এই ঠোক্কর খাবার কারণ। আমারই মত সামান্য একজন মানুষের কাছে ছিল যৎ-সামান্য কিছু টাকা, কিন্তু ভুল করে তার কাছে অনেক টাকা আছে ভেবে তাকে খুন করতে গিয়ে শংকর পড়েছিল বিপদে এবং সেই অভিযোগেই তার কারাদণ্ড হয়েছিল দশ বছরের। আমার

---

**সবিনয় নিবেদন**

**অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় 'মিত্রেন'-এর 'শহর কলকাতা' প্রকাশ করা গেল না।**

**—সম্পাদিকা**

---

এই সামান্য টাকাতেও যে আমি খুন হওয়ার মত বিপদে পড়তে পারি, সে কথা তার চেয়ে আর বেশি কে জানবে—তাই বোধ হয় সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করে বসল। তার এই একটি কথায় আমি বুঝতে পারলাম, তার চোখে তার দল কিরকম আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে টাকা নিয়ে বসবাস করার সময়ে আমিই বা কিরকম অসমসাহসী। অর্থাৎ আমি বুঝলাম, শংকরের মনে কোথাও আমার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু স্বীকৃতি সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর সে আমাকে প্রশ্ন করে বসল, 'আপনি কি এখন এখানেই থাকবেন?'

'থাকতে আমি আসি নি ভাই,' বললাম, 'এমনিই পথে একটা লোকের সঙ্গে পরিচয় হল তারি সঙ্গে এসে পড়লাম। জানি না কতদিন থাকব, আর কবেই বা চলে যাব।'

'মায়াকে আপনি বোন বলেই মেনে নিয়েছেন?'

'তোমার কি মনে হয়?'

'মনে আর কি হবে', শংকর বলল, 'আমি তো বিশেষ কিছুই জানি না আপনার সম্বন্ধে।'

এবার আমি হাসতে হাসতে বললাম 'আমি কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সব কথাই জানি প্রায়।'

শংকর রীতিমত ওয়াকিবহালের মত বললে, 'সে আর এমন কথা কি—মা কিংবা মায়ার কাছে আপনি সবই জানতে পারবেন।'

বললাম, 'শুধু মা আর মায়া কেন—ভানুর কাছেও শুনেছি।'

'তাই নাকি—' ভানুর সঙ্গে তা হলে আপনার বেশ জানাজানি হয়েছে!'

'হ্যাঁ।'

'তবে তো সবই জানবেন আপনি।'

ইতিমধ্যে মায়া খাবার তৈরি করে এনে দাদার সামনে একটা ডিসে করে রাখল। তারপর আমাকে বললে, 'দাদা আপনি মুখ-হাত ধুয়ে আসুন না—আপনাকেও অমনি খেতে দিই কিছু।'

মায়াকে বললাম, 'যা করছ করো—আমার জন্যে এখন তোমাকে ভাবতে হবে না।' তারপর আমি উঠে পড়লাম!

মায়ের সেই চিরন্তন মূর্তি—সন্তানকে সস্নেহে খাওয়ানো। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন, 'কতদিন পরে আবার তুই আমার সামনে খেতে বসিছিস্ বাবা!' তারপর অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই ছিল আমার স্বপ্ন—কিন্তু কোথা দিয়ে যে আমার কি হয়ে গেল। সবই আমার ভাগ্যরে......নে বাবা সবটুকু খা, খেয়ে নে।'

অপাংগে একবার মা ও ছেলের দিকে তাকিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

বাইরে আসতেই দেখি মাধু আর তার বাহনেরা। মাধুকে রাতে একরকম দেখেছিলাম—কিন্তু এখন দেখলাম সম্পূর্ণ অন্য মূর্তিতে। সদ্যস্নাতা মাধু, চুল-গুলো এলোকেরা। সেই চুলেরই পাশ দিয়ে আঁচলের কাপড়টা উঠে গেছে মাথায়। কপালে তার সিঁদুরের টিপ—জ্বল্ জ্বল্ করছে যেন প্রভাতসূর্যের মত। আমি। তার দিকে তাকাতেই স্মিতহাস্যে সে আমাকে যেন তার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করল। সত্যিই মাধুকে অদ্ভুত সুন্দর দেখিয়েছে। বিগত রজনীর ক্লান্তি নেই তার মুখে-চোখে, নেই কোন গ্লানি অথবা কোন ব্যথা ও বেদনার ছায়া। জীবনে যেন তার সব পাওয়ার পরিপূর্ণতা ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত কলকল-ছল-ছল গভীর প্রশান্তিতে ভরা। আমি কিছু বলার আগেই সে গলায় আঁচল জড়িয়ে আমাকে প্রণাম করতে এল।

'ওকি—ওকি মাধু,' আমি একটু পিছিয়ে আসতে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে মাধু আমার পা-দুটো ছুঁয়ে ফেলেছে। তারপর আমার পা-ছোঁয়া হাতখানা মাথায় ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আপনাকে কি শুভক্ষণে আমি দেখেছিলুম জানি না

—তারপরই ও ফিরে এসেছে। আপনি আশীর্বাদ করুন ওর যেন কোন বিপদ-আপদ না হয়।'

গত রাত্রিতে মদের ঝোঁকে মাধু বলেছিল তিন বছর সে অপেক্ষা করে থেকেছে শংকরের জন্যে। সে কথায় তখন আমি তেমন গুরুত্ব আরোপ করি নি কিন্তু এখন দেখছি তার সে-কথা কতখানি সত্যি তার কোন তুলনা নেই। এরা এখানে এই অভিশপ্ত জগতের বাসিন্দা, এখানে সমাজ নেই, সংসার নেই, এখানে নেই কোন নিয়ম-কানুন, নেই ভদ্র আচার বিচার—উঞ্ছবৃত্তি আর অসামাজিক কার্য-কলাপের মধ্যে জীবনধারা এদের গণ্ডি-বন্ধ। তবু যখন তার মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এই সব নরনারী যুবক-যুবতীর সন্ধান পাচ্ছি তখন চমকে উঠছি। সর্বপ্রথমে দেখেছি মায়াকে, (দেখেছি ভানু আর মণ্টুকে) তারপর দেখেছি মেনকাকে, এখন দেখছি মাধুকে। রাণীদির কথা আমি নাই বা বললাম। রাণীদি অনন্ত রহস্যময়ী, ছাইচাপা আগুন, দাহিকা শক্তিও যেমন আছে তাঁর, তেমনি মমতাময়ী প্রশান্তির পরিপূর্ণ প্রতীকও তিনি। তাই এ অভিশপ্ত জগতের কোথায় যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছি আমি। সেই আকর্ষণে বিস্মিত আমি মাধুকে বললাম, 'আমার কথা যদি ফলে মাধু তা হলে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।'

মাধু ঘাড় নিচু করে শান্ত মেয়েটির মত দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'যাও ভেতরে যাও।' কথাটা বলেই কিন্তু মনটা আমার কেমন যেন খচ্ করে উঠল। গত রাত্রিতে মা তো তাকে ভালভাবে গ্রহণ করেন নি বরং মাধুর দাবির সঙ্গে তাঁর দাবির প্রতিযোগিতা করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মাধুকে কেমন যেন তিরস্কার করেছিলেন। যদি তিনি সেইভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহার করেন! মনে আমার যেন ভয় হল। একদিকে মাধুর প্রতি আমার সমবেদনা, অন্যদিকে মায়ের প্রতি আমার উঁচু ধারণা দুদিকটাতেই তা হলে গোলমাল হয়ে যাবে। তাই মাধু ঘরে ঢুকতেই আমি বাইরে দাওয়া থেকে সরে গেলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। মা যেন তাকে বিরূপ অভ্যর্থনা না করেন।

আশ্চর্য। মা দেখলাম কোন বিরূপ অভ্যর্থনা করার বদলে 'আয়' বলে সস্নেহে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। ওঃ আমি যেন বাঁচলাম। সত্যিই স্নেহময়ী মা। এই-ভাবেই মায়েরা হয়তো ছেলেমেয়েদের ভালবাসার ধনকে স্বাগত জানান। দাওয়া থেকে নামতে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি মণ্টুর আবির্ভাব।

স্মিতহাস্যে মণ্টু বললে, 'মামাবাবু আপনি কি এখনও তৈরি হন নি?'

'তৈরি! তৈরি কিসের?'

'বাঃ রে এরি মধ্যে ভুলে গেছেন! মামী যে আপনাকে—'

'ও হো হো,' আমি বললাম, 'আজ খেতে যেতে বলেছেন তো—'

'হ্যাঁ।'

'তা এরি মধ্যে?'

'এরি মধ্যে কি, বেলা হয় নি?'

'কিন্তু আমি যে এখনও মুখ পর্যন্ত ধুই নি।'

'বলেন কি?'

'সারারাত না ঘুমিয়ে শেষদিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' কথাটা বলেই কেমন ভয় হল আমার। যদি মণ্টু জিজ্ঞাসা করে কেন সারারাত ঘুমোন নি আপনি, কি করেছিলেন কিংবা কোথায় গিয়েছিলেন—তা হলে তাকে আমি কি উত্তর দেবো। বিগত রজনীর স্মৃতি যে আমার কাছে কি ভয়ানক পীড়াদায়ক তা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে। তবু সেই মর্ম-পীড়াকে চেপে রেখে আমাকে রাণীদির 'খেতে বলা'র আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে। উঃ কি যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেই না আমি পড়েছি! মণ্টুকে বললাম, 'আচ্ছা মণ্টু দাঁড়াও একটু আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

তারপর দেখলাম, 'শংকর ঘর থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। মাধুও দ্রুত তার পিছন পিছন প্রায় ছুটতে লাগল। ব্যাপারটা কি হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। [ চলবে ]

[ ২০৮৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ ]

কথাটা বেশ বুঝিয়ে লিখেছেন,—লিখেছেন —"এই সময় তাঁহার আর্থিক বা পার-মার্থিক কোন উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না, বরং বিপরীত তথ্যই পাওয়া যায়।' প্রমথবাবু এই সময়েই মধুসূদনের ভাষা-সন্ধানের প্রয়াস সম্বন্ধে লিখেছেন—"পরবর্তী জীবনে তিনি 'জ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী সভা'র সভ্যদের মুখে যে অদ্ভুত বাংলা বুলি দিয়াছিলেন, সেই বাংলা এই সময়ে শেখা।"

একদিন গির্জায় জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে এক পাদ্রীর বাংলা বক্তৃতা শুনে তিনি হেসেছিলেন,—বলেছিলেন সেই 'বিলাতী বাংলা' হাস্যকর!

আমি বললুম—সে যাই হোক, তিলোত্তমা আমাদের এই বাছাইয়ে জায়গা পাবে কি না, বলো?

সে বললে—কোন্ মন্তব্যে তুমি সুখী হবে?

আমি বললুম—যা সত্য, যা সঙ্গত,—সেইরকম মন্তব্যে।

—শোনো তাহলে—মধুসূদনের তিলোত্তমা সম্ভবে বাংলায় যে অমিত্রাক্ষরের সূচনা ঘটেছিল, সেটাও ভোলবার নয়। প্রমথ বিশী লিখেছেন—"সুয়েজ খাল খননের আগেও ইউরোপের সঙ্গে ভারত-বর্ষের সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু পথের দীর্ঘতায় জন্য সে সম্বন্ধ ছিল ঘাটের সম্বন্ধ; সুয়েজ খাল খননে এই দীর্ঘতার মধ্যে ছয় হাজার মাইল উড়িয়া গেল—ঘাটের সম্বন্ধ ঘরের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইল।"

আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে, আনন্দ তিলোত্তমার গুরুত্ব মানিয়ে নিতে চায় আমাদের সকলকে দিয়ে। চুপ করে রইলুম। তার সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব হোলো না আমার পক্ষে। আমি জানি দু'খানি প্রহসন আর মেঘনাদবধ কাব্য—এই তিনখানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। আনন্দ তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলির প্রশংসা করলেও আমি অবশ্য বাধা দেবো না—কিন্তু দেখা যাক তার কী মনে হয়। [ ক্রমশঃ ]

## রোমান্স ও বাস্তব

দ বাড়ে ডি রেন কুড়ি কানায়। শির্‌হিঘুটু আত্নতেক-ইদিলেদেয়া। ইদি দ গিদার এঞঃ রেগেক ইদিলেদেয়া। মঁড়ে গেলে গিদার-এঙ্গাৎ ক্‌াতে ক বাগিআকা-দেয়া। আঃচ্‌ইচ্‌ হেরেল ঝাদে দ বছর গে মাল হির্লা গিদার পিদার বাগি হটুকাতে নামাল এ চালাঃআ। নামাল রেদ ভোর ছাড়্‌য়ী, ডাঙগুয়া কুড়ি ক সাঁও রড় লান্দা, থুতি-ভামাসা লব্‌তে ঝাদে দ বছরগে আষাঢ় আষাঢ় নামালে চালাঃগোয়া। বাহুতেৎ মাল দ অনাক. রেনাঃশুনশুনি মুনমুনি গে বায় বাডায় জংকান তাঁহেনা; এন্তেৎ আঃচ্‌ দয় মনলে দা নাপায় অকচ্‌তে অড়াঃ সংসার লাগিৎ নামাল ঝামালঃ দ বাং বাড়িচ্‌আ, আর অনা হঁ বার্‌ হড় মত রেদ, কড়া হপনগে চালা। দাজাঃআ।....................."

বাংলা লিপিতে লেখা হলেও কোনো বাঙালীর পক্ষেই এর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কারণ এ ভাষাটা বাংলা নয়। লিপির সাদৃশ্য থাকলেও অসমীয়াও নয়। এর পাঠোদ্ধার শুধু তিনিই করতে পারবেন, যিনি সাঁওতালী ভাষা জানেন। হ্যাঁ, এটি একটি সাঁওতালী গল্পের ভগ্নাংশ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ থেকে প্রকাশিত সাঁওতালী পাক্ষিক পত্রিকা "পচ্ছিম্‌ বাংলা" থেকে উদ্ধার করা। ১৫ই জানুয়ারীর সংখ্যায় ৮৭ পৃষ্ঠায় "নামাল টাকা" শিরোনামায় গল্পটি বেরিয়েছে। লিখেছেন শ্রীগোমস্থাপ্রসাদ সোরেন।

চাষের সময় সাঁওতালেরা হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানে দলে দলে আসে মজুর খাটতে। সম্ভবত এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নাম[illegible] বিস্তৃত বলে সাঁওতালরা বলে নামাল; আর সেখানে যে রুজি-রোজগার হয় তার নাম দিয়েছেন লেখক 'নামাল টাকা'।

গল্পটিতে একটি করুণ নৈতিক ইঙ্গিত আছে। কাজের জায়গায় কাজের সূত্রে ওদের অবাধ মেলামেশা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই অবাধ মেলামেশার মধ্যে অকস্মাৎ বক্ষমাঝে আলোড়নের সৃষ্টি হতে পারে।

"অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে
চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।"

তখন আর তো উপায় নেই চির নিঃসঙ্গ পুরুষের; তাকে তখন মুনিদের মতই ধ্যান ভেঙে তপস্যার ফলও নিবেদন করতে হয় মায়ার পায়ে।

এমনি হয়েছিল ঝাদের বেলারও। ঝাদে হচ্ছে নায়কের নাম। সে ঘরে রেখে এসেছে তার স্ত্রী মালোকে। ছেলেপুলেও আছে। এমন সময় এই বিপর্যয়। উদ্ধৃত অংশটুকু বাংলাভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

"মালো বাড়োডি গ্রামের মেয়ে। শিরি-ঘুটু গ্রামে তাকে নিয়ে যায় (মানে, বিয়ে হয়)। ছেলেবেলাতেই নিয়ে যায় তাকে। কিন্তু সে যখন পাঁচটি সন্তানের মা, তখন ওদের বিয়ের বাঁধন ছিঁড়ল। তার স্বামী ঝাদে ফি বছরই মালোর কাছে ছেলেমেয়ে-দের রেখে নামালে রুজি-রোজগারের জন্য যেতো। সেখানে বিয়ের বাঁধন-ছেঁড়া (বা স্বামী পরিত্যক্ত) স্ত্রীলোক, কুমারী মেয়েদের সঙ্গে খোসগল্প, হাসি-ঠাট্টা-মস্করার লোভে সে ফি বছর আষাঢ় মাসে যেত নামালে। মালো এসব কিছুই জানত না। কারণ, সে মনে করত সংসার চালাবার জন্য নামালে গিয়ে টাকা রোজগার করা অন্যায় কিছু নয় এবং যেখানে তারা দুজন, সেখানে পুরুষেরই যাওয়া সাজে।......"

আমাদেরই নিত্যকার প্রতিবেশী। সাঁওতালভাষী বাঙালী। কিন্তু কতটুকু খবর রাখি আমরা তাঁদের? তাঁদের নিয়ে কালবৎ সাহিত্য হয়েছে। কিন্তু সে কি [illegible] প্রকৃতির অন্যান্য বস্তু নিরীক্ষণ করার চাইতে বেশি কিছু নয়। বাঙালী কবি-সাহিত্যিক নিশ্চয়ই দরদ দিয়ে লিখেছেন বা লিখতে চেষ্টা করেছেন তাদের কথা। সেখানে কতখানি কৌতুক কতখানি কৌতূহল এবং সফেসটিকেটেড হৃদয়ের দাক্ষিণ্য প্রতি-ফলিত হয়েছে, কতখানি তা বাস্তব [illegible], তার বিচার সম্ভবত বাঙালী চিত্ত ও বিচারবুদ্ধি নিয়ে যিনি পড়লেন, তিনি করতে পারেন না; আমাদেরই মধ্যে আমাদের অন্তস্থ সাঁওতালীভাষী বাঙালীরাই তা করতে পারেন। সাহিত্যি-কের কাজ বাইরেকার আভাসিত, 'অসং' বা অবিদ্যাপ্রসূত মায়া রিপোর্ট করা নয়; তা যতই নির্ভুল হোক, সাহিত্যিকের সাঙ্গ রবীন্দ্রনাথের মতো ভয়াবহদর্শন কাবুলি-ওয়ালার পরিচ্ছদ অন্তরালে বুকে সংর-লালিত পিতৃস্নেহ রেখায়িত হাতে ছাপটা দেখাও। দরদ নিশ্চয়ই, কিন্তু [illegible] হৃদয়াবেগকে আবিষ্কার করতে মানুষ-টাকেও অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বাংলা সাহিত্যে তার কতটা সত্য সার্থক, সে খবর উপেক্ষার নয়। কল্পনা রসোত্তীর্ণ হওয়াই যথেষ্ট নয়, রসোত্তীর্ণ কল্পনা অসত্যের ক্ষতদুষ্টি ঘটিয়ে আমাদের অন্তস্থ প্রতিবেশীর যন্ত্রণার কারণ না হয় সে দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে সাহিত্যস্রষ্টাকে।

আমার যতদূর মনে পড়ে, তাঁদের কাছে কাগজটা এক্ষুণি খুঁজে পেলাম না, প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিন রাত্রি' সম্পর্কেও এর[illegible] শিক্ষিত সাঁওতালী প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন, সাঁওতালী রমণী শুধু উপ-ভোগের সামগ্রী নয়, তারও জীবন-যন্ত্রণা, আনন্দ, সমস্যা, উচ্ছ্বাস, ধর্ম-বিশ্বাস আছে, তার কিছু তো কৈ প্রতিফলিত হতে দেখা যায় নি। হয়তো এর জবাব হবে, সাঁওতালী জীবনের প্রামাণ্য চিত্র এ তো নয়, এ শুধু ঘটনাক্রমে তাদের জীবনের এক ভগ্নাংশ। তবু বলব, আর্ট সব আর্টস সেক হোক বা চিত্রনির্মাণ গল্পানু-সারী হোক, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের স্পর্শকাতরতা ও গোঁড়ামিকে যদি আমরা ভয়ে ভয়ে শ্রদ্ধা করে চলে থাকি, তবে এই স্বল্পভাষী সংখ্যালঘুদের সম্পর্কেও আমাদের অসতর্ক থাকা উচিত নয়।

সারা পশ্চিমবাংলায় সাঁওতাল ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বারো লক্ষের কিছু বেশি। এবং তাঁদের বেশির ভাগ আছেন মেদিনী-পুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুরে। গ্রামাঞ্চলে তাঁদের সংখ্যা হচ্ছে ১১,৮১,৭৮৯, শহরাঞ্চলে ১৮,২৭০। বঙ্গভাষাভাষী বাঙালীরাও অবশ্য বেশির ভাগ থাকেন গ্রামাঞ্চলে, কিন্তু সে অনেকটা ভাগ্যক্রমে'

নতুবা সভ্যতার আলোক মুঠি মুঠি সর্বাঙ্গে মেখে তাঁরা মানসিকতায় বহুলাংশে শহরমুখীন। ইট-পাথর, বিদ্যুতালোকের মাঝে মাঝে দুটো-একটা ক্যাকটাসের বা ড্যালিয়ার টব দৃষ্টিবৈচিত্র্যের জন্য সমাদৃত হয়তো হয়, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড মোটামুটি প্রকৃতি থেকে দূরে। সংখ্যায় প্রবল হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু তুলনায় সাঁওতালীদের প্রকৃতি-সাযুজ্যের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। প্রকৃতির ওপর সভ্যতার ওপর অপ্রাকৃত তাণ্ডবে কোণঠাসা হয়েও এঁরা যেভাবে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এসেছেন তাতে এঁদের রক্তধারায় প্রাণ-প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আচার-আচরণ, ধর্ম-বিশ্বাসে আমাদের ব্যাপক কনভার্সান যত দ্রুতগতি হয়েছে, মিশনারীদের আপ্রাণ অনুকূলে সাহচর্য সত্ত্বেও ওদের কিন্তু তেমন সহসা বদলানো যায় নি; বিরল-স্খলন এই মানুষকুলের আদমসুমারিই তার প্রমাণ। ব্যাপক শহর-মুখীনতা এখনও এদের স্থানচ্যুতি ঘটায় নি। সেখানে শহরের যন্ত্রণাদায়ক স্বাচ্ছন্দ্য বা নয়নজ্যোতিহরা তড়িতালোর সমারোহ নেই; কিন্তু আপাতদৃশ্যমান পর্ণকুটির বা মাটিময় কণ্টকর জীবনের মধ্যেও নির্ভুল রয়েছে তাঁদের প্রাণখোলা অদম্য অকৃপণ হাসির মুক্তাশুভ্র দাঁতগুলো।

সুখের কথা, আমরা এমন একটা পরিবর্তনশীল জগতে এগিয়ে চলেছি যেখানে আমরা প্রত্যেক জাতি প্রজাতিকে রক্ষা করে চলতে চাই, যারা যেটুকু স্বেচ্ছায় দিতে চায় সেইটুকুমাত্রই তাদের দিয়ে যেটুকু তারা আগলে রাখতে চায় তা তাদের রক্ষা করতে দিতে চাই; প্রত্যেকে যেন আপনাতে আপনি, স্ব-প্রতিভায় বিকশিত হয়ে ওঠে। "ইণ্ডিয়ান হান্টিং", "কাফ্রি শিকার", কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গের বৈষম্য ও শ্বেতাঙ্গের মুরুব্বিয়ানা আমরা অতীত ইতিহাসের যাদুঘরে তুলে দিতে চাইছি। তার বাহিরক বর্ণ যাই হোক, তাকে মনুষ্যত্বের মূল্য দিতে চাই; খেয়াল-খুসীর স্যাংচুয়ারির মতো নয় যে, বিলাস-ভ্রমণের একটা দ্রষ্টব্য হয়ে থাকবে মাত্র: আপন মহিমায় তার মনুষ্যত্ব অভ্রভেদী হোক এই প্রত্যয়ে।

এমনি এক সত্যাবিষ্কারের মতোই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক অবিস্মরণী ঘোষণা রাখলেন এবং আমার নিঃসংশয় বিশ্বাস যে মাতৃভাষা-পক্ষপাতী মাত্রেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রেস নোটটির প্রতি সানন্দ অভিনন্দন জানাবেন ঃ

> "The Government of West Bengal have decided that Santhali should be the medium of instruction in Primary Schools located or to be established in the areas inhabited predominantly by the Santhals or in Primary Schools having 40 or more children belonging to the Santhali Community."

বলা বাহুল্য, প্রেস নোটটি ইংরাজীতে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজভাষা দুটি, বাংলা ও নেপালী। সাঁওতালী ভাষা রাজভাষা নয়, কিন্তু রাষ্ট্রানুকূল্য পাচ্ছে এই প্রেস নোটটিতে সেই ইঙ্গিত নিহিত। প্রেস নোটটি এই তিন ভাষীর উদ্দেশেই প্রচারিত; কিন্তু তাঁদের কারো ভাষাতেই নয়। কেননা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার—কি কংগ্রেস কি মার্ক্সিস্ট—ইংরাজী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না। যাঁরা সরকার গড়েন তাঁরা সরকার গড়বার আগে নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটদাতাদের বিচিত্র ভাষায় বক্তৃতা দেন বটে, কিন্তু সে শুধু ভোট কুড়িয়ে সরকারে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। সরকার হবার পর একটি ভাষাতেই ভাবনাচিন্তা করতে হয়। বাংলা-নেপালী-সাঁওতালীভাষীদের গরজ থাকে ওরা অনুবাদ করে নিক। ২২।২৩ বছর আগে ইংরাজ ছিল এদেশের রাজা; তখন রাজভাষা ছিল ইংরাজী। আজও কার্যত রাজভাষা ইংরাজীই। ইংরাজরা যে কথা কইতেন ইংরাজীতে, স্বপ্নও দেখতেন ইংরাজীতে, তাঁদের রেখে-যাওয়া আমলারাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

তবু স্বীকার করব, ইংরাজী ভাষার বর্ম ভেদ করেও যে মর্মার্থ পাচ্ছি তা যদি সত্য ও আন্তরিক হয়, ক' বছর পর নিছক ভোট কুড়োবার চাল যদি এ না হয়, তবে, এই সরকার (ভাঙনের মুখেও) একটা অবিস্মরণীয় মানবিক কাজ করলেন; কেননা, পশ্চিমবাংলায় সমগ্রভাবে বাঙালীর আত্মোন্নয়নে এর প্রয়োজন ছিল। নেপালী ভাষা ইতিমধ্যেই রাজ-চক্রবর্তীর তিলক পেয়েছে, সাঁওতালী ভাষা রাষ্ট্রানুকূল্য পেলো।

সাঁওতালী-ভাষাভাষী বাঙালীরা এতে যে কি খুশী হয়েছেন এবং এ যে তাঁদের কি প্রেরণা জুগিয়েছে, একজন শিক্ষিত সাঁওতালীর সঙ্গে আলাপ করে তা উপলব্ধি করেছি। তিনি আমাদেরই মতো য়্যাংলো-বেঙ্গলী শিক্ষায় শিক্ষিত: আমাদের তবু মাতৃভাষায় বাংলার স্পর্শ ছিল, ওঁর তাও ছিল না। তিনি প্রসঙ্গত বলছিলেন, এক শিক্ষক একটি সাঁওতালী শিশু-ছাত্রকে 'ধ্রুবতারা' সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। ধ্রুবতারা শব্দটি বাংলা। ছাত্রটি জবাব দিতে পারে নি। যখন তাঁকে সাঁওতালী প্রতিশব্দে প্রশ্ন করা হল, সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল। বললেন, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ অনেক সহজ। আমাদেরই মতো য়্যাংলো-বেঙ্গলী শিক্ষালাভ করলেও আজ তাঁর মাতৃভাষার এই রাষ্ট্রানুকূল্য তাঁকে উৎসাহে উজ্জ্বলতর করেছে।

আমি আমার মাতৃভাষা বাংলাকে একান্ত করে ভালোবাসি বলে ওঁর ঐ মাতৃভাষার ভালোবাসাকে বুঝতে আমার কষ্ট হল না। মাতৃভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতি মানুষের অন্তস্থল পর্যন্ত আলোড়িত করে, নতুন এক প্রত্যয় ও প্রেরণা জাগে মনে।

সাঁওতালী ভাষার এখনও কোন সর্বজনীন স্বতন্ত্র লিপি নেই; প্রচলিত লিপি তিনটি; বাংলায় বাংলা, বিহারে দেবনাগরী এবং মিশনারীদের হাতে রোমান। বইয়ের সংখ্যা এখনও শ' চারেকের বেশি নয়; কিন্তু অভিধান আছে।

একথাটাও স্বীকার করতে হবে, খোদ বাংলাভাষার মতো, কেরিম্যানের মতো, পি ও বোডিং সাঁওতালী ভাষাকে করেছেন আবিষ্কার, সুনিশ্চিত করেছেন তার স্থিতি। তিনি পাঁচখণ্ডে সাঁওতালী অভিধান লিখেছেন।

এ ব্যাপারে সাঁওতাল পরগণার বেনাগারিয়া মিশন প্রেস ("বেনাগারিয়া মিশন প্রেস")-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের একটি সাঁওতালী শিক্ষা পর্ষদ আছে। তাঁরা রোমান লিপিতে কিছু পাঠ্যবই রচনা করেছেন--প্রথম পাঠ থেকে দশম মান অবধি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ব্যবস্থা ছিল, সাঁওতালী ছাত্র সংস্কৃতের বদলে সপ্তম মান থেকে দশম মান অবধি সাঁওতালী নিয়ে সাঁওতালী পরীক্ষা দিতে পারত। আমার বন্ধুটি তাই দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর বাড়ি, কিন্তু পরীক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীরামপুর থেকে।

ঐ বেনাগারিয়া মিশন প্রেস থেকে কিছু কিছু গল্পের, ইতিহাসের বইও বেরিয়েছে এবং বাইবেলেরও অনুবাদ হয়েছে সাঁওতালী ভাষায়।

স্বতন্ত্র সাঁওতালী লিপির আদৌ যে চেষ্টা হয় নি তা নয়। এবং এই প্রচেষ্টায় পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর নাম করতেই হয়; তাঁর লিপি-রেখা ওড়িয়া প্রভাবিত। এই লিপিতে ময়ূরভঞ্জে কিছু বইও বেরিয়েছে। তবে সর্বত্র এটি স্বীকৃতি পায় নি। পশ্চিম বাংলায়ও এ নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে, ভাষা-কমিশনের নির্দেশমতই পশ্চিম বাংলায় সাঁওতালী ভাষার

জন্য বাংলা লিপি বা অক্ষরই গ্রহণ করা উচিত।

পশ্চিম বাংলায় একটিমাত্র সাঁওতালী স্কুল আছে; মেদিনীপুরে ভীমপুর সাঁওতাল হাই স্কুল, ম্যাট্রিকুলেশন অবধি। ১৯২৫-এ এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেস নোটের নির্দেশটি বলবৎ হলে সাঁওতালীদের মাতৃভাষার শিক্ষালাভের একটা মস্ত অভাব দূর হবে। তাঁদের এই সুবিধে হবে যে, তাঁরা বাংলা ভাষার মতো একটি সমৃদ্ধ ভাষার সান্নিধ্য পাবেন এবং যদ্দিন না সাঁওতালীদের মধ্যে মৌলচিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটছে, (ঘটবেই নিঃসন্দেহে) তদ্দিন প্রধানত বাংলা থেকে তাঁরা সাহিত্য ইত্যাদি আহরণ করতে পারবেন।

ফ্রন্ট সরকারে বনমন্ত্রী শ্রীভবতোষ সোরেন সাঁওতালী। শ্রীঅমিরকুমার কিস্কু ছিলেন বহরমপুর বি-টি কলেজের অধ্যক্ষ। এখন এম-পি। শ্রীনিতাই হেমরম বি, আর্ক, শ্রীকালীরাম সোরেন, মেদিনীপুরে ট্রাইবাল এ্যাফেয়ার্সের স্পেশ্যাল অফিসার। শ্রীভগবৎ হাঁসদা তারই ডেপুটি ডাইরেক্টর। এঁরা সবাই বাংলার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছেন। বাংলার সঙ্গে এঁদের গভীর পরিচয় আছে। এঁরা উদ্যোগী হলে সাঁওতালী ভাষা (ও সাহিত্য) দ্রুত উন্নতি করবে, সন্দেহ করিনে।

ইতিমধ্যেই ফ্রন্ট সরকার যে পাক্ষিক পত্রিকা ' পশ্চিম বাংলা' বের করছেন, তার উৎসাহী চাঁদাদাতার সংখ্যা এখন ৮০০; ছাপানো হয় দেড় হাজার। কোটি কোটি বাঙালী পাঠকের তুলনায় বারো লক্ষ মানুষের মধ্যে ৮০০ লোক চাঁদা দিয়ে পত্রিকা কেনেন শুনলে বাহবা দিতে হয়।

যে শ'-চারেক বইয়ের কথা বলেছি, তার মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাই বেশি। এও বলেছি যে, এসব বই তিনটি লিপিতেই লেখা। 'ছাট্‌কা' নামে একটি সাঁওতালী প্রাথমিক পাঠ আছে রোমান হরফে; লিখেছেন পি বি বাস্‌কে। 'ছাট্‌কা' মানে উঠোন বা আঙিনা। ঐ উঠোন বা আঙিনা পেরিয়ে সাঁওতালী শিক্ষামন্দিরে স্থান পাওয়া যায়। এন জেকব এবং ও সোরেন লিখেছেন 'আকিল ডাহার' (জ্ঞানের পথ), প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সাঁওতালী লিটারেরি বোর্ড এর প্রকাশক। এমনি আর একখানি বই 'আকিল হর হাটিন' (জ্ঞানের পথ)। ডাহার ও হর মানে পথ। ঐ জেকব-সোরেনেরই আছে জ্ঞানোদয়, যার সাঁওতালী নাম 'বুজ-রাকাপ'। একখানি পাঠ্যপুস্তকের নাম 'বাহা ডালোয়া', মানে ফুলের সাজি।

এ ছাড়া আছে, পি ও বোডিং-এর 'খর কাহিনী কো' (সাঁওতালী লোকগাথা)। সাঁওতালী বিদ্রোহের এক কাহিনী রোমান হরফে লিপিবদ্ধ করেছেন আর এক মিশনারী। বিদ্রোহী দলের এক সাঁওতালী আসামে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তাঁর কাছ থেকেই শোনা এ কাহিনী, নাম: 'ছটরাই দেশমাঝি রেয়াক্ কাথা'। নিঃসন্দেহে মূল্যবান গ্রন্থ। রঘুনাথ মুর্মু বাংলা লিপিতে লিখেছেন: 'বিদু চাঁদো'। একজনের কাহিনী। মঙ্গলচন্দ্র সোরেনের বাংলা লিপিতে লেখা 'জনসিম বিনতি'। রোমান অক্ষরে লেখা 'হড় কোরেন মারে হাপড়াম কো রেয়াক্ কাথা' (সাঁওতালদের সংস্কার ও প্রথা)। ইতিহাসও আছে। লিখেছেন চৈতন্য হেমব্রম কুমার রোমান হরফে: 'সাঁওতাল পরগনা, সাঁওতাল আর পাহাড়ী কোয়া: ইতিহাস।"

এঁদেরকে বাইরে থেকে জানবার এই উপকরণগুলো সামান্য নয়। অরণ্যের আলো আবছায়ায় এই প্রকৃতির সন্তানদের স্খলিতপদ আলোকসম্পাতে দৃষ্টিগোচর

**************************

**একটি ঘোষণা**

**আগামী সংখ্যা থেকে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'প্রাতের সঙ্গে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।**

**************************

করার রোমান্স থেকে যদি আমরা একটু সরে আসতে পারি, নিশ্চয় জানতে পারব মহামহিমময় মানুষকে। সভ্যতার গর্ব যেন না আমাদের চোখে ছানি ফেলে দেয়। এঁরা বাঙালী, কিন্তু সাঁওতালীভাষী, এঁরা সাঁওতালীভাষী, কিন্তু বাঙালী, একথা যেন না আমরা বিস্মৃত হই। আমাদের সর্বাঙ্গ সুস্থ রাখতে গেলে এঁদের সকল বিষমুক্ত করে ও'দের মায়ের ভাষাকে মর্যাদায় বলিষ্ঠ করতে হবে নিশ্চয়ই। যেমন করতে হবে নেপালীভাষী বাঙালীদেরও। এঁরা সবাই মিলে বঙ্গবাসী, ভাষা কখনো বাধা হয় না, ভাব ও লক্ষ্য এক হলে।

আর যদি নিছক বাংলা সাহিত্যের কথাও একান্তভাবে ভাবি, তবে সাঁওতালী-বাঙালী, নেপালী-বাঙালীদের আত্মোন্নয়ন, ভাষার অগ্রগতি, আমাদেরই আত্মোন্নয়ন, আমাদেরই অগ্রগতি। বাংলা ভাষার ভূগোলও হবে বিস্তারিত, যখন আমরা তাঁদের স্বাধিকারে তাঁদের বুঝতে শিখব: দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে। ও'দের সাহিত্য হবে যেমন ও'দের দর্পণ, আমাদের সাহিত্যেরও উপকরণ, সামগ্রী পাবো ও'দের আপন সামানায়। তখনই বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার সাঁওতালী বা পাহাড়িয়া চরিত্র আমাদের কাছে সজীব ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। ও'রা বুঝে নিন আমাদের, আমরা বুঝে নেব ও'দের। আমার কোনো সন্দেহ নেই, ও'দের ভাষার সমৃদ্ধিতে আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি ঘটবে, অনেক পাহাড়িয়া, সাঁওতালী শব্দসম্ভার আমরা পাব, আর পারব জানতে ও'দের মনকে।

আজকে আমরা যেমন জানতে চাইছি পূর্ব বাংলার বাঙালীকে—কি ও'রা ভাবছেন? কি ও'রা লিখছেন? বাংলা ভাষার সমগ্রতায়ও কি নেই চাটগাঁ, সিলেট, ঢাকা, বরিশাল, যশোর, কোচবিহার, শান্তিপুরের ডায়লেক্ট তারতম্য? বাংলা সাহিত্যে কথোপকথনে তারাও কিছু কিছু সলজ্জ বধূর মতো অনুপ্রবেশ করছে (মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়—প্রমাণ): অথচ এ অনস্বীকার্য যে, বাংলারই কোন কোন অঞ্চলের কথা কোন কোন অঞ্চলে সর্বতোভাবে দুর্বোধ্য; কিন্তু এক বন্ধন বাংলা ভাষা—বাঙালী, বঙ্গ-সত্তা। বাংলা দেশে আরও যে দুটি পৃথকভাষী বাঙালী আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের এমটা অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে, সেটি দৃঢ়তর অবিচ্ছিন্ন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে তখনই, যখন ও'দের জন্মগত অধিকারকে শ্রদ্ধা করতে শিখব। ও'রাও যে শ্রদ্ধা করেন বাংলা মাকে। 'পশ্চিম বাংলা'র ঐ সংখ্যাতেই সাঁওতালী কবি লিখেছেন: 'জন্মস্থানে রামচাঁদের প্রার্থনা':

> বঙ্গ জননি, আমার প্রার্থনা শোনো
> দেশের ভাইরা আমার দোষ ক্ষমো
> ধর্ম সেবা শক্তিতে সতত নেব যত্ন
> পিছোব না আমরা দুঃখ-কষ্টের
> মাঝেও।

তাই, আবারও বলি, এঁরা শুধু দূরাবস্থিত বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে রোমান্সের চশমায় দেখার বস্তুমাত্র নয়; এঁরা অন্তরঙ্গ, বাংলার, বাংলা ভাষার, বাঙালীর।

**বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর** (১৩৭৬) আশাদেবী। ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম : সাড়ে তিনটাকা।

কমলাকান্তের দপ্তর নিয়ে এর আগে অনেক আলোচনা হয়েছে। তবু হঠাৎ এই বই কেন? ডক্টর আশাদেবী এই গবেষণামূলক বইটিতে নতুন তথ্য ও বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন যা বিদগ্ধ চিত্তকে আলোড়িত করবে। এ একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এবং গবেষকের এই উদ্যম সার্থক হয়েছে বলে মনে করি।

কমলাকান্তের দপ্তর কারো অনুসরণে কিনা—সে প্রসঙ্গে বহু যুক্তি প্রমাণ সহ যে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে, ইতোপূর্বে আর কেউ তা' করেন নি। বরং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ, সত্যনিষ্ঠ তথ্য ও ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে আগেকার অনেক পাকাপোক্ত মতকে তিনি খন্ডন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রচনা ও প্রবন্ধ কি, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কমলাকান্তের দপ্তর কোন্ জাতীয় রচনা আলোচনা সহকারে তার প্রমাণ দিয়েছেন। কমলাকান্তের দপ্তর-এর সংযোজন স্বরূপ কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জবানবন্দীরও সারগর্ভ আলোচনা স্থান পেয়েছে, দপ্তর ও পত্রের মৌল তফাৎ-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি রচনার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এক-একটি বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েও তার গভীরতায় পৌঁচেছেন। কোন্ রচনায় দেশীবিদেশী কোন্ সাহিত্যিকের প্রভাব পড়েছে, বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বঙ্কিম সাহিত্যে লেখিকার অসামান্য দখল ও ফরাসী ভাষায় তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় আছে। মতান, ডি কুইন্সী, চার্লস ল্যাম, র‍্যাবলা, মার্কটোয়াইন, বার্নার্ড শ', হোগার্থ, রেমব্রান্ট, হেনরি মার্লে, লী হান্ট, অ্যান্টন চেকভ প্রমুখ বিদেশী সাহিত্যরথীদের সঙ্গে প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা এসে গেছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্য-সমালোচকদের মতামত উল্লেখ করে আলোচনা তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

'বুকের রক্তে ফোটানো রক্ত-গোলাপ' এই রচনাগুলোর মধ্যে বঙ্কিম মানস বিধৃত। মানুষই তাঁর কাছে বড়। কমলাকান্তের দপ্তর-এর মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনই শুধু নয়, তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক ধারণারও স্বচ্ছ যথার্থ চুলচেরা বিচার ও বিশ্লেষণ দেখতে পাই।

কমলাকান্তের দপ্তর কি লিরিকধর্মী? শেষ প্রবন্ধটিতে এই সম্পর্কে বিশদ মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। ডঃ আশাদেবী এক জায়গায় বলছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার এইটিই (কমলাকান্তের দপ্তর) যে শ্রেষ্ঠ ফসল,' অধিকাংশ বাঙালী পাঠকই আজ আর এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন না।'

বস্তুত বঙ্কিম সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে বাংলাভাষার অনুরাগী পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই তথ্যবহুল মূল্যবান গবেষণামূলক বইটি অপরিহার্য বিবেচিত হবে। 'বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের অন্যতম সোপান। এবং সোপান অতিক্রমের জন্য ডঃ আশা দেবীর গ্রন্থই বর্তমানে একমাত্র উল্লেখযোগ্য।

**বাংলা উপন্যাসে নারী চরিত্রের বিবর্তন** —শিবানী পাল (গুহ)। ডি লাইট বুক কোং, ১৭৩।৩ বিধান সরণি, কলকাতা—৬। দাম—পাঁচ টাকা।

স্বল্পপরিসরে এরূপ একটি বৃহৎ গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় লেখিকা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রন্থান্তর্গত কোন অধ্যায়ই সুসম্পূর্ণ হয় নি। ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে বিভিন্ন সমালোচকের উদ্ধৃতি বেশি। গবেষণায় বিষয়বস্তু যেমন ব্যাপক, তাতে বিস্তৃত আলোচনাই প্রত্যাশিত ছিল। 'আধুনিক উপন্যাসে নারী চরিত্রের বিবর্তন' প্রসঙ্গটি এত সংক্ষিপ্ত যে, মনে হয়, গ্রন্থকার এ অধ্যায়ের প্রতি অবিচারই করেছেন। তথাপি খুব সংক্ষেপে একটা সামগ্রিক পরিচয় এই বইয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

**প্রফেসর :** যোসেফ মুন্ডশশেরী (নিলীনা আব্রাহাম অনূদিত) : সাহিত্য আকাদেমী, নিউদিল্লী। মূল্য : ৬.০০ টাকা।

বিশেষজ্ঞের মতে যোসেফ মুন্ডশশেরী মালায়লম সাহিত্যের সবচেয়ে নামজাদা সমালোচক। তাঁর হাতে সমালোচনা সৃজনধর্মী সাহিত্যের মানে উন্নীত হয়েছে। মুন্ডশশেরী যে সময় সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে আরম্ভ করেন বর্তমান উপন্যাসটি সে যুগে রচিত। তাঁর বে-সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। তিনি যখন কলেজে কাজ করতেন তখন অধ্যাপকদের কাজের কোন স্থিরতা ছিল না, বেতন ছিল খুবই সামান্য, এমন কি কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ পর্যন্ত করতেন না—। এই পটভূমিকায় প্রফেসর লিখিত। এই উপন্যাসে নিরর্থক কল্পনার জালবুনন নেই, আছে বাস্তবভিত্তিক এবং সত্যাশ্রয়ী সামাজিক সমস্যার নানা কথা। এ সমস্যা প্রধানত কেরালার খৃস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কিত, কিন্তু লেখকের মুন্সীয়ানায় তা সাহিত্যরসে উত্তীর্ণ হয়েছে।

**শ্রীমাধব মাধুর্য মঞ্জুষা :** (১৩৭৬)—মণীন্দ্রনাথ গুহ। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : চার টাকা।

বেদবেদান্ত উপনিষদের কঠিন তত্ত্ব আলোচ্য বইটিতে শ্রীরাধামাধবের কোমল লীলাকথার মধ্যে দিয়ে সহজ করে 'শ্রীমাধব মাধুর্য মঞ্জুষা' প্রিয় ও পবিত্র গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। লীলা আস্বাদনে ভক্তমন মাধুর্যের স্পর্শে নির্মল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

**Excel:** Issued by Excel Industries Limited, Jogeswari, Bombay, India. Vol. 3, No. 2, 1969.

এক্সেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এই হাউস জার্নালের মাধ্যমে তাঁদের বিবিধ গঠনমূলক এবং কৃষ্টিমূলক কর্মের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই সংখ্যাটি পড়ে জানা গেল যে, ১৯৪১ খৃস্টাব্দে সামান্য মূলধন নিয়ে কাজ শুরু করার পর আজ এই প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। অক্জ্যালিক এ্যাসিড প্লান্টের আয়তন বৃদ্ধি, ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন প্লান্টের সাফল্য প্রশংসনীয়।

ব্যাংক জাতীয়করণ আইন সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল হয়ে যাবার ফলে প্রশ্ন উঠেছে যে, সংবিধানের মধ্যকার সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাটি তুলে দেওয়া দরকার। তা না হলে জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি অন্তরত বাধাপ্রাপ্ত হবে। পুরনো আইন বাতিল হলেও কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিনান্স জারী করে ব্যাংক জাতীয়করণকে বহাল রেখেছেন, এটা ভাল কথা। কিন্তু মূল প্রশ্নের সমাধান তাতে হয় নি, কেন না, অর্ডিনান্স আইনের টেকনিকাল ত্রুটির দিকটির প্রতিই মাত্র নজর দেওয়া হয়েছে এবং তা করতে গিয়ে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধিই হয়েছে এবং আরো কিছু সুযোগও ব্যাংক-মালিকের হাতে দিতে হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থ বনাম ব্যাংক-মালিকের স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রশ্ন তুললে, ব্যাংক-মালিকের চাহিদা আরো একটু বেশি পূরণ করে তবেই আইনের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। ব্যাংক জাতীয়করণ আইনের বিরোধিতা যারা প্রথম থেকেই করে এসেছে এবং এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে মামলা যারা দায়ের করে, তাদের আপত্তির প্রধান ভিত্তিই ছিল সম্পত্তি সংক্রান্ত সংবিধানের মৌলিক অধিকার। সংবিধানের এই ধারার আশ্রয়েই তাদের বরাবরের সংগ্রাম। তাদের সেই আশ্রয়স্থলটিকে এখনও স্পর্শ করা হয় নি। এটাও লক্ষণীয় যে, শহরের সম্পত্তির উচ্চসীমা নির্ধারণের যে প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন ছিল, ব্যাংক জাতীয়করণ আইন বাতিল হয়ে যাবার পর সে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত সাংবিধানিক ধারা লঙ্ঘন হয়ে যেতে পারে এই ভয়েই যে কেন্দ্রীয় সরকার পিছিয়ে গিয়েছে, তা বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হবার নয়। কাজেই সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারার পরিবর্তনের প্রশ্নটির সমাধান আজ আর এক মুহূর্তের জন্যও দেরি করা চলে না।

ব্যাংক জাতীয়করণ আইন বাতিল হয়ে যাওয়ায় যারা উল্লসিত, তাদের সকলেই যে একেবারে একসুরে কথা বলছে তা নয়। কেউ সম্পত্তির অধিকার রক্ষার আনন্দটা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করছে, আবার কেউ সম্পত্তির অধিকারের কথাটা অনুচ্চারিত রেখেই আইনটি বাতিল হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, দুইয়েই এক জায়গায় দাঁড়াতে চায়। স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘ ও সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর কথাগুলো লক্ষ্য করা যাক। স্বতন্ত্র পার্টির বোম্বাইয়ের সভা স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, সম্পত্তির মৌলিক অধিকার যে রক্ষিত হয়েছে, এটাই মূল কথা। স্বতন্ত্র নেতা মাসানী ঘোষণা করেন যে, তাঁর পার্টি পার্লামেণ্টের ভেতরে ও বাইরে ব্যাংক জাতীয়করণের বিরোধিতা করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন অর্ডিনান্স জারী হচ্ছে সংবিধানের ব্যভিচার। এটাও জানান হয়েছে যে, এই সমস্ত কাজ একটা সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগ্রামেরই অঙ্গ, যে-সংগ্রাম হচ্ছে ইন্দিরা সরকারকে উৎখাত করা ও তার জায়গায় স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও সিণ্ডিকেট জোটের সরকার প্রতিষ্ঠিত করা। ব্যাংক জাতীয়করণের সরাসরি বিরোধিতা করার মতো স্পষ্ট কথা সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী বলছে না বলে মাসানী সমালোচনা করেছেন। জনসঙ্ঘের সুর স্বতন্ত্র পার্টির মতো অতটা নির্লজ্জ না হলেও উদ্দেশ্যটা একই। ১৫ই ফেব্রুয়ারী জনসঙ্ঘের সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বলে সাবধান করেছেন যে, "সম্পত্তির মূল অধিকার সঙ্কুচিত হতে পারে এরকম কোনো চেষ্টাকে তাঁর পার্টি প্রবলভাবে বাধা দেবে।" সংবিধান সংশোধন করে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাটিকে উঠিয়ে দেবার প্রশ্নের বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে, জনস্বার্থে বিধিনিষেধ কিছু আরোপ করা যেতে পারে, কিন্তু তা 'যুক্তিসঙ্গত' হওয়া চাই। পরবর্তী খবরে প্রকাশ, 'পার্লামেণ্টে ব্যাংক জাতীয়করণ প্রশ্নে জনসঙ্ঘের মনোভাব এই যে, ব্যাংক জাতীয়করণের সময় এখনও আসে নি।'

অন্যদিকে, বাহ্যত দেখলে, সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী সরাসরি ব্যাংক জাতীয়করণের বা সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারার পরিবর্তনের বিরোধিতা করছে না। ইন্দিরা সরকারের তাড়াহুড়া কাজকেই তারা নিন্দা করছে এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় যে ইন্দিরা সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে এতেই তারা আনন্দিত। কিন্তু সিণ্ডিকেটের যে ধুরন্ধররা তাঁদের 'লাইন' ঠিক করেন, তাঁদের কথা এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা একটু বেশিই বলছেন। উদাহরণ-স্বরূপ, মোরারজী দেশাই ১২ই ফেব্রুয়ারী বলেছেন যে, সংবিধানের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের, সে-দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্ট ভালভাবেই পালন করেছে। এই সঙ্গেই তিনি বলেছেন যে, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করাটাই যথেষ্ট ছিল, জাতীয়করণের কোনো দরকার ছিল না।" সিণ্ডিকেট-নেতা নিজলিঙ্গাপ্পা বাহ্যত ব্যাংক জাতীয়করণের বিরোধিতা করেন নি, কেন না যুক্ত কংগ্রেসের সমর্থন তাতে ছিল। কিন্তু ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, "আজকের প্রধান কাজ মৌলিক অধিকার রক্ষা করা", "যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বিলোপ করতে চায়, তাদের সঙ্গে তিনি হাত মেলাবেন না" এবং "তাঁর পার্টি কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত (ইন্দিরা সরকারকেই তিনি এই আখ্যা দেন) পার্টিগুলিকে ক্ষমতা থেকে চ্যুত করার জন্য স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে মিলিত হতে তিনি ইতস্তত করবেন না।" (স্টেটসম্যান) সুতরাং, সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী কার্যত স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘের লাইনেই যে চলবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, সুপ্রীম কোর্টের রায় সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল পার্টিগুলিকে সমস্যার মূলে যে সাংবিধানিক ধারা, তার পরিবর্তনের।

এশেন প্রায় এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। প্রত্যেকেই যে হুবহু একই দাবি তুলছে বা তুলবে, তা বলা যায় না, কিন্তু মূল প্রশ্ন যে সকলেই তুলে ধরেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সি-পি-আই, সি-পি-এম থেকে পি-এস-পি, এস-এস-পি পর্যন্ত সকলেই দাবি করেছে যে, সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাটি সংশোধন করার অধিকার যে পার্লামেন্টের আছে, সে-সিদ্ধান্ত অবিলম্বে নেওয়া দরকার; তা না হলে সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সমস্ত আইনই বানচাল হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একটি মামলায় ১৯৬৭ সালে সুপ্রীম কোর্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছিলেন যে, মৌলিক অধিকারের ধারার কোনো পরিবর্তনের অধিকার অতঃপর পার্লামেন্টের থাকবে না। পার্লামেন্টের এই অধিকারই যদি স্বীকৃত না হয়, তবে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারা তুলে দেওয়ার কথাই ওঠে না। কাজেই প্রথম এই মূল প্রশ্নের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে পার্লামেন্টকে এবং তারপর এই অধিকারের বলে সংশ্লিষ্ট ধারাটির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। মৌলিক অধিকার থেকে সম্পত্তির অধিকারকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন অনেক বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবেই তোলা হয়েছে। ডি-এম-কে নেতাদের পক্ষ থেকে, ইন্দিরা সমর্থক কংগ্রেসেরও একাংশ থেকে সংবিধান সংশোধনের দাবি উঠছে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের মন্ত্রী আর. কে. খাদিলকর বলেছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের রায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাংক-কর্মচারীরা, এ-আই-টি-ইউ-সি প্রভৃতি সকলেই সংবিধান সংশোধনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। মোটের উপর, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর দেশের জনমত [illegible] বরে দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে—একটা শিবির সংবিধানের নাম করে জনস্বার্থের প্রতিবন্ধক ব্যবস্থাগুলি বজায় রাখতে উদ্যোগী, অন্য শিবির জনস্বার্থকে সংবিধানের চেয়ে বড় মনে করে প্রতিবন্ধক ব্যবস্থাগুলি দূর করায় উদ্যোগী। সামনের দিনগুলিতে এই দুই শিবিরের দ্বন্দ্বই দেশের রাজনীতির প্রধান ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। বলা বাহুল্য, সংবিধান সংশোধনের পক্ষের শিবিরই যে বেশি শক্তিশালী, তা অত্যন্ত প্রকট।

ঠিক এই জন্যই এরকম একটা প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছে, যাতে বিষয়টিকে সংবিধান সংশোধনের রাস্তায় টেনে না নিয়ে গিয়ে মাঝরাস্তায় আটকে দেওয়া যায়। স্বভাবতই এই চেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করবে তারা, যারা সুপ্রীম কোর্টের রায়ে উল্লসিত এবং যারা সম্পত্তির অধিকার বজায় রাখতে চায়। এইরকম একটা প্রচেষ্টার নমুনা দেখা যায় ১৩ই ফেব্রুয়ারীর স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত ডি. ডি. পুরীর একটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংবিধানের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাটি তুলে দেওয়ার যে কথা উঠছে, তা অযৌক্তিক। কেন না, সম্পত্তির অধিকারের ধারাটি বাদ দিয়ে বিচার করলেও সুপ্রীম কোর্টের উল্লিখিত বৈষম্যমূলক ব্যবহারের কথাটি থেকে যায়। জাতীয়করণ ও কম ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্পর্কে এই বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্টের এ অধিকার সুপ্রীম কোর্ট চ্যালেঞ্জ করে নি, সুপ্রীম কোর্ট যা বলেছে তা শুধু ক্ষতিপূরণের একটা সুনির্দিষ্ট ও স্বীকৃত নীতি অনুসরণ সম্বন্ধে। এই সব কথা বলে প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে যে, একটু ভাল করে বিবেচনা করে আইনের খসড়া তৈরি করলে আর কোন অসুবিধাই হত না। স্পষ্টতই এই বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক ধারাটিকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং এটাকে বজায় রাখা। যারা স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘের মতো অতটা স্পষ্ট কথা বলে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হতে চায় না, সেই মহল এই রাস্তা ধরেই যে চলবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, নিছক আইনের কূটতর্কের মধ্য দিয়ে চলতে যারা উৎসাহী, তারাও এই রাস্তায় সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে। সুতরাং, এই মহলকে নিরস্ত্র করা আগে দরকার।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ কথাটা শুনেই যদি সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারত, তাহলে এই সব তর্ক স্বীকার করতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু জাতীয়করণ কথাটাই তো যথেষ্ট নয়, জনস্বার্থের যে প্রয়োজন মেটানর জন্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দরকার, সে-প্রয়োজন হচ্ছে অর্থনীতি ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের পথ রুদ্ধ করে অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করা। এই জন্যই বামপন্থী দলগুলির দাবী শুধু ১৪টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ নয়, বিদেশী ব্যাঙ্ক সমেত সমস্ত ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ। বৈষম্যমূলক আচরণ চলবে না—সুপ্রীম কোর্টের এই নির্দেশের ফলে যদি ১৪টি জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক-মালিকদের নতুন করে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় চালাবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তো তারা আবার তাদের অর্থের রাজত্ব কায়েম করতে পারবে এবং তখন নতুন করে আবার সরকারী নিয়ন্ত্রণের কথা তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের প্রশ্নটি নতুন গুরুত্ব অর্জন করেছে। তাছাড়া, ক্ষতিপূরণের স্বীকৃত নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে বাজার দর ও অন্যান্য বিষয়ের হিসাব করে ২৮ কোটি টাকা মূলধনের মালিকদের বিরাট বাৎসরিক মুনাফা-লাভের উপরও যদি নতুন করে ৮৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার দরকারই বা কি ছিল? জাতীয়করণের মূল নীতিটা কী? মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি দখলের ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা দূর করাই আসল কথা। সুতরাং বৈষম্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রশ্ন অবান্তর।

সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক ধারাটি এইবার তলিয়ে বিচার করা যাক। সকলেই জানেন যে, এই ধারাটি বরাবরই কায়েমী স্বার্থের লোকেরা ব্যবহার করে আসছে জনস্বার্থমূলক সমস্ত সরকারী ব্যবস্থাগুলোকে বানচাল করার জন্য। প্রধানত জমিদারী দখল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জমিদারী-স্বার্থের পক্ষ থেকেই সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারার সুযোগ নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার সংবিধানের এই ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হয়েছে। ১৯৫১-তে সংবিধানের প্রথম সংশোধন হয়, তারপর ১৯৫৫-তে চতুর্থ সংশোধন হয় এবং অনেক রাজ্যের অনেকগুলো আইনকে সংবিধানের নবম সেডিউলে অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধান-সম্মত করতে হয়। এইরকম আইনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪। এত কাণ্ডকারখানা করে তবে যে-অধিকারের অপব্যবহার ঠেকাতে হয়, সে-অধিকারটি নিশ্চয়ই সংগত মৌলিক অধিকার হতে পারে না। মৌলিক অধিকারের অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে তুলনা করলেই অবস্থাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

১৯ ধারায় যে মৌলিক অধিকারগুলি আছে তা হচ্ছে: (১) বক্তব্যের স্বাধীনতা (২) সম্মিলিত হওয়ার স্বাধীনতা (৩) সংগঠনের স্বাধীনতা (৪) যাতায়াতের স্বাধীনতা (৫) দেশের যে কোনো জায়গায় অবস্থানের স্বাধীনতা (৬) সম্পত্তির অধিকার (৭) যে কোনো পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা। এর মধ্যে সম্পত্তির অধিকারের বিষয়টি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কি এমন জটিলতা হয়েছে যাতে বার বার সে-অধিকারের সঙ্গে জনস্বার্থের সংঘাত বেধেছে এবং সে-অধিকারের সীমা নির্ধারণের জন্য

সংবিধান সংশোধন ও নতুন নতুন আইনের আশ্রয় নিতে হয়েছে? এই সব মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে আদালতে মামলা উত্থাপনের ঘটনা কিছু কিছু থাকলেও, কোনো ক্ষেত্রেই এই অধিকারগুলি প্রগতিমূলক ব্যবস্থার প্রতিকূলে হয় নি, বরং হয়েছে তার অনুকূলে। বক্তব্যের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই। ইংরাজ আমলে কথায় কথায় লোকে রাজ-দ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হত। মৌলিক অধিকারের ফলে সে-অবস্থার অবসান ঘটেছে। মৌলিক অধিকারের পরিচ্ছেদের অন্যান্য ধারাগুলির মধ্যে রয়েছে ধর্ম, জাতি, বর্ণের বৈষম্য না করা, অস্পৃশ্যতা দূর করা, মানুষ নিয়ে ব্যবসায় বন্ধ করা, ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীনতা, প্রত্যেকের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা প্রভৃতি। এগুলির সবই হচ্ছে বহুদিনের অনুসৃত অন্যায় প্রথাগুলির অবসানের জন্য। কিন্তু সম্পত্তির অধিকারটা কি চিরাচরিত সামাজিক অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করে? মোটেই না। বরং চিরা-চরিত যে-প্রথায় যথেচ্ছভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার সুযোগ এতদিন ছিল, সেই পুরনো প্রথারই ভিত্তিটা এর দ্বারা রক্ষিত হয়। অন্য সমস্ত অধিকারের থেকে সম্পত্তির অধিকারের এটাই মূলগত পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৭-তে যে মামলায় সামান্য সংখ্যা-গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিলেন যে, অতঃপর মৌলিক অধিকারের কোনো কিছু সংশোধন করার অধিকার পার্লামেন্টের থাকবে না, সেই মামলাতেই অন্যতম বিচারক হেদায়তুল্লা তাঁর মন্তব্যে বলেন যে, সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা অন্যায়, কেন না এটা হচ্ছে মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে দুর্বলতম অধিকার। একজন বিচারকের এরূপ মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, সম্পত্তির অধিকারটার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা কত অযৌক্তিক। শুধু তাই নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যায়ে কোনো সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্পত্তির অধিকার রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। রাউন্ড টেব্‌ল্‌ কনফারেন্সে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, জাতীয় গভর্নমেণ্ট যদি কোনো সম্পত্তিকে অধিকার করার দরকার মনে করে, তাহলে তা বিনা-ক্ষতিপূরণেই করা হবে, কেন না ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে সে-অর্থ আরেকজনের কাছ থেকেই আদায় করতে হবে। ১৯২৮-এর নেহরু-কমিটির রিপোর্টে যে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছিল, তাতেও সম্পত্তির অধিকারের কথা ছিল না। বিখ্যাত করাচী-কংগ্রেসের কর্মসূচীতেও সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করা হয় নি: শুধুমাত্র বলা হয়েছিল যে, সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে হলে তা আইন করে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং, সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাটি মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেবার যে প্রশ্ন উঠেছে, সেটা মোটেই একটা সাংঘাতিক বামপন্থী দাবী নয়। অত্যন্ত সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবী এটা।

যাঁরা এই সংস্থার বিরোধী, তাঁরা হয়ত প্রশ্ন তুলবেন যে, 'পাবলিক পারপাসে' অর্থাৎ জনস্বার্থের প্রয়োজনে সম্পত্তির অধিকার চ্যুত করার ব্যবস্থা যখন রয়েছে, তখন এই অধিকারের চরিত্রটাই তো বদলে যাচ্ছে। কিন্তু তা নয়। প্রথমে মৌলিক অধিকার হিসাবে রয়েছে সম্পত্তির অধিকার, তারপর আসছে সম্পত্তির অধিগ্রহণের শর্ত। শর্তটার চেয়ে মৌলিক অধিকারটা বড় বলেই বার বার শর্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এবং শর্তকে নিখুঁত করার জন্য বার বার সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে; কিন্তু এত করেও এখনও এই শর্তের জোরেই আইন বানচাল হয়ে যাচ্ছে। 'পাবলিক পারপাসে' সম্পত্তি অধিগ্রহণ যদি আইনসম্মত হল, তবু রয়ে গেল ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন। কম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতাটা যখন রাষ্ট্রের হাতে বর্তাল, তখন, এসে গেল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি ও পদ্ধতির প্রশ্ন। এই প্রশ্নই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বাতিলের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এবং এরই জন্য আরো ১৫ কোটি টাকা দিতে হচ্ছে। জমিদারী দখলের জন্য ৬৪২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও প্রতিটি রাজ্যের জমিদারী দখল আইনকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করা হয়েছিল। এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ১৯৬৭-তে একটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, মৌলিক অধিকার আর সংশোধন করতেও পার্লামেণ্ট পারবে না। অর্থাৎ শর্ত-গুলোর প্রতিবন্ধকতা তো সদা-সর্বদা আছেই, তার চেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সম্পত্তির মূল অধিকারটা, যা শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের সার্বভৌম ক্ষমতাকে পর্যন্ত সংকুচিত করে দিতে বসেছে। এই রায়ের ফলে এরকম প্রশ্নও উঠেছে যে, হয়ত নতুন করে কনস্টিটুয়েন্ট এসেমব্লি ডেকে তার মধ্য দিয়ে নতুন সংবিধান রচনা হওয়াই দরকার।



আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহরের সম্পত্তির উচ্চসীমা নির্ধারণের প্রশ্নটি ধামাচাপা পড়েছে। যদি আবার এটা ওঠেও, তাহলেও কত সমস্যা যে দেখা দেবে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাটি থেকে তা আন্দাজ করাই যায়। গ্রামের জমির উচ্চসীমা নির্ধারণের প্রশ্নটির মধ্যেও রয়ে গিয়েছে অনেক জটিলতা। এক এক রাজ্যে জমির উচ্চ-সীমা এক এক রকম এবং অধিকাংশ রাজ্যেই উচ্চসীমা যথেষ্ট কমান দরকার। তার উপর রয়েছে ব্যক্তিভিত্তিকের বদলে পরিবারভিত্তিক সীমা নির্ধারণ। এই সব কাজ করতে গেলেই সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত সব কটি ধারার অজস্র প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়াবে এবং সহস্র সহস্র কোটি টাকা নতুন ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও এসে যাবে। মূল অধিকার যদি ঘোষণা করা না হত এবং ভিন্ন পরি-প্রেক্ষিতে যদি সম্পত্তি অধিগ্রহণের শর্ত দেওয়া হত, তাহলে শর্তগুলির আক্রমণ এত প্রচণ্ড হতে পারত না।

এ তো গেল একদিককার কথা। আর একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটি জনস্বার্থের আরো বড় বাধা বলে গণ্য হওয়া উচিত। সেদিকটা হচ্ছে সংবিধানের নির্দেশক নীতি। নির্দেশক নীতিটা যদিও আইনের আওতায় আসে না, তবু সরকারী কাজের পথ-নির্দেশক হিসাবেই সংবিধানে এটা স্থান পেয়েছে। নির্দেশক নীতির ৩৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, "যে নীতিগুলি এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে তা দেশ-শাসনের দিক থেকে মৌলিক বলে বিবেচিত হবে এবং রাষ্ট্রকে আইন-প্রণয়নে এই নীতি প্রয়োগ করতে হবে।" কোনো কোনো সংবিধান-বিশেষজ্ঞের মতে সংবিধানের কোনো বিধানের দ্ব্যর্থবোধকতা দেখা দিলে নির্দেশক নীতির সাহায্যে তার সঠিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯ ধারার মৌলিক অধিকার সম্বন্ধেও মহাজন ও শেঠীর সংবিধান সংক্রান্ত বইতে বলা হয়েছে যে, অধিকার-সংকোচন যুক্তিসঙ্গত কি না তা বিবেচনা করা যেতে পারে নির্দেশক নীতির দ্বারা। সুতরাং, আইনের আওতায় আসে না বলেই নির্দেশক নীতিটা শুধু কথার কথা নয়, তার গুরুত্ব যথেষ্ট।

এই নির্দেশক নীতির ৩৯(খ) ও (গ) ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রনীতি এমন-ভাবে পরিচালিত হবে যাতে (১) সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য বণ্টিত হয় ও (২) অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার পরিচালন যাতে জন-স্বার্থবিরোধীভাবে সম্পদের ও উৎপাদন-উপকরণের কেন্দ্রীভবন না ঘটায়। এই নির্দেশক নীতি অনুযায়ী কাজ করতে হলে জমিদারী বিলোপই হোক আর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণই হোক, কোনটাই শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক মালিকানা পরি-বর্তনের একটা ব্যবস্থা হতে পারে না, তার অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য সাধনের, অর্থাৎ সম্পদের কেন্দ্রীভবন বন্ধ করার কার্যকরী পদ্ধতি হিসাবেই তা হতে হবে। কাজেই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন বা ব্যবসায় চালানর সুযোগের দিক থেকে বৈষম্য না করার প্রশ্ন, কোনটাই স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য হতে পারে না, মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিয়েই তা বিচার করতে হবে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ফলে জনসাধারণের অর্থই যদি আবার মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় বা অবাধে ব্যবসায় চালাতে দেওয়ার ফলে যদি আবার সম্পদের কেন্দ্রী-ভবন হবার আশংকা থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই তা নির্দেশক নীতির বিরোধী হবে। জমিদারী দখলের ফলে যে ৬৪২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে তার উপরও আরো হাজার কোটি টাকা চলে যাবে জমির উচ্চসীমা কমিয়ে আনতে। এই বিপুল অর্থের অধিকাংশই মুষ্টি-মেয়ের হাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ও হবে। যে ১৪টি ব্যাঙ্ক প্রতি বছরে তাদের প্রদত্ত মূলধনের প্রায় ২০ শতাংশ হিসাবে মুনাফা করেছে, তাদেরই হাতে দেওয়া হচ্ছে আরো ৮৭ কোটি টাকা। এবং তার উপরও তাদের অবাধ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আবার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় চালাবার। এর দ্বারা কি সম্পদের কেন্দ্রীভবন বন্ধ হচ্ছে, না কেন্দ্রীভবনের একটা দরজা বন্ধ করে আর একটা দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে?

সুতরাং, সম্পত্তির অধিকারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শুধু মৌলিক অধিকারের একটা ব্যতিক্রম স্বরূপই নয়, নির্দেশক নীতির সামনেও একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই ধারার মূল কাঠামোটি ঠিক রেখে শুধু কিছু শব্দের পরিবর্তন বা সংযোজন করে যে সমস্যার সমাধান হয় না, তা এতদিনে নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। কেন না, এই সব শব্দের অর্থ নির্ধারণের শেষ ক্ষমতা তো আদালতের, আইনসভার নয়। কাজেই প্রশ্নটির মৌলিক সমাধানই আজ দরকার, গোঁজামিল দিয়ে কিছু হবে না।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

আপনি কখনো ভয় পেয়েছেন?

ছোটবেলার ভয়ের কথা বাদ দিলে অন্য কোন ভয় আমি কোনদিন পাইনি।

আঁকা-বাঁকা, দীর্ঘ প্রসারিত আলের অনিবার্য প্রভাব কি না জানি না, আমি একটা লম্বা সেন্টেন্স গড় গড় করে বলে দিলাম।

আগে আগে হ্যারিকেন নিয়ে চলেছেন হারান মাস্টার। পেছন পেছন আমি। অন্ধকার তেমন নেই। আকাশে চাঁদ জ্বলছে। কিন্তু কার্তিকের হিমে ভারী, জমাট আর রহস্যময় ঘোলাটে নিষ্পলক চোখে কিছু যেন নিরীক্ষণ করছে। সামনে, পিছনে জোনাকির ধ্বনি, প্রতিধ্বনি। নিস্তব্ধ, মৌন দু'পাশের বিরাট মাঠ জুড়ে এই রাত্রে ব্যাঙ-ব্যাঙানির রক্তের উচ্ছ্বাস শোনবার মত। দিগন্তের দিকটা, বরাবরই যেমন দেখতে, তেমনি একটু ভোরবেলার আভাস।

মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছি আল থেকে। কিন্তু আমি পড়ে যাচ্ছি এ কথা বলা কি ঠিক হল? আমাকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এইটাই কি ঠিক নয়? কই, হারান মাস্টার ত' পড়লেন না একবারও। উনি পড়বেন না। ওঁকে কেউ ঠেলে ফেলে দেবে না। আমি ঈর্ষান্বিত চোখে হারান মাস্টারের সটান, উদ্ধত, চলমান, কম্পিত ছায়াটার দিকে তাকালাম। আমার অপরাধটা কোথায়? জীবনের যে নতুন উদ্ভাস এখানে ঘটছে তা ঠিকমত দেখে যেতে এসেছি। এসেছি এই তরংগ, এই উচ্ছ্বাসকে বুঝে নিতে। কেন তবে বাধা? মাঠের দেবতা, আলের দেবতা কেন তবে ক্ষমাহীন? এ মাটির সংগে কোন যোগ নেই বলে? আমার যে সেই গানের দশা হ'ল। সেই যে গানে আছে, ওপারে বন্ধুর বাড়ী, ই-পারে মুই অধম নারী, মধ্যে আছে চিরল নদীর ধারা। সেই মধ্যের চিরল নদীর ধারাটা কি এখনো ঘোচে নি? আমি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মাঠের দিকে ও আলের দিকে তাকালাম। কার্তিকের হিমে ভেজা মাঠ আর আল তবু উত্তরবিহীন।

আপনি ভয় পান নি?

না।

কিন্তু মহেশ আচার্য ভয় পেয়েছেন।

মহেশ আচার্য কে আমি তা' জানি না। তবে আমি ভয় পাইনি কোনদিন, যে ধরনের ভয়ের আপনি ইঙ্গিত করছেন।

না। সত্যিই ভয় পাইনি। কেন ভয় পাবো? কোন বিপদের মুখোমুখি ত' কখনো হইনি। আমার বাবা ডাক্তার। উনি বলতেন, কোন্ রোগ হলে কিভাবে প্রিকসন্ নিতে হবে এটা না ভেবে রোগ হবার সমস্ত সম্ভাবনা আগে থেকে দূর করা উচিত। শরীরটাকে মজবুত, রোগ-প্রতিষেধকরূপে গড়ে তুললে রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অসুখের ব্যাপারে না হোক, ভয়ের ব্যাপারে বরাবর আমি বাবার উপদেশ মেনে চলেছি। বিপদ আসবে কি জীবনে? যখনই দেখেছি বিপদের সম্ভাবনা তখনি তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে নি। উনিশ শো চুয়াত্তর আমিই বাংলা দেশের বোধহয় একমাত্র কলেজী যুবক—যে কখনো স্ট্রীট কর্নার মিটিং করেনি দেয়ালে পোস্টার মারেনি। কাটা টিনের চোঙ হাতে মহল্লায় মহল্লায় ঘোরেনি। মিছিলে-মিটিং-এ যোগদান করেনি। বক্তৃতা দেয়নি। হ্যান্ডবিল লেখেনি। কলেজের ইলেক্শনে নাম লেখায়নি। সর্বদা উত্তেজনা, অস্থিরতা থেকে দূরে থেকেছে। মাঝে মাঝে যুবকদের উচ্ছ্বাস আর আবেগ যখন নক্ষত্র ছুঁতে চেয়েছে, তখন আমি অন্য এক স্বপ্নের আরকে মনকে ভিজিয়েছি। পথে গুলী চলেছে, ব্যাটন মারতে মারতে আমারই সংগীকে হয়তো প্রিজন ভ্যানে তুলেছে, তখনো আমি সিনেমার হলে নির্বিকার থেকেছি, হাতের পুরো সিগারেটটির শেষ টান আরাম করে দিতে ভুলিনি, সংগীতের জলসায় এনটারটেনমেন্ট খুঁজেছি, কলেজের হোস্টেলের দেয়ালে মেয়েদের অশ্লীল, উন্মাদনাময় ছবি টাঙিয়ে রেখেছি, টেলিস্কোপিক রাইফেল হাতে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর তেজোদীপ্ত মূর্তি, ঘাতকের হাতে চে গুয়েভারার নির্মম মৃত্যু, বিশাল চোখের অনবদ্য শান্ত মূর্তি হো-চি-মিন, চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের তুলনাহীন লং মার্চ, এ সব আমার মনে কোন দাগই কাটেনি। আমি কোনদিন বুঝতেও পারিনি এসব নিয়ে যুবকেরা, এমন কি মেয়েরাও কেন হৈ-চৈ করে, ক্রিকেট, ফুটবলে কেন রস পায় না তেমন, সারা জীবন আমি একটা সরল রেখার পেছন পেছন ছুটে গেছি, একটা কাল্পনিক সরল রেখা।

পাইনি বটে, তবে ছুটে গেছি, আমার আশা একদিন পেয়েও যাবো, আমার ফুসফুসে যথেষ্ট তাজা বাতাস, কোন বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই।

না। ভয় পাইনি হারানদা।

হতে পারে, যখন বলছেন। কিন্তু মহেশ আচার্য ভয় পেয়েছেন।

কে তিনি!

প্রত্যেক গাঁয়েই এ'রা ছিলেন। তবে এখন আর থাকছেন না।

থাকছেন না ত' ভয় পেয়েছেন বলছেন কেন? বলুন ভয় পেয়েছিলেন।

থাকছেন না। ভয়ও পেয়েছেন।

আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

মহেশ আচার্য ভয় পেয়েছেন। হারান মাস্টার জ্বলন্ত হ্যারিকেনটা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, কিরকম ভয় জানেন? একা, নিরস্ত্র কোথাও ওঁর ঘোরাফেরার উপায় নেই। সব সময় সন্দেহ, এই বুঝি কেউ ওঁর দিকে তাকাচ্ছে শান দেওয়া চোখে, বেতআছড়া সাপের মত এই বুঝি অন্ধকার থেকে সন্ত্রাস ঝাঁপিয়ে পড়বে গায়ে, আজকাল ত' দেখছেন, শহর থেকে গ্রামের হৃৎপিণ্ডে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পাঁচের রাস্তা একবার গিয়ে এই রাস্তার বাঁকের মুখে দাঁড়াবেন বেলা দশটা নাগাদ, দেখবেন মহেশ আচার্যকে। একা নয়, আছে কিছু লোক সবসময়, ফেরার সময়েও দেখবেন সংগে ওরাই, হাটতলায় যাবেন, একা সেখানেও নেই, যখন ফিরবেন তখনো তাই, বাড়িতে গিয়ে দেখবেন ওঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসা পুরু একটা জটলা, চোখ দুটোর দিকে তাকাবেন, ওরা দুদণ্ড স্থির নয়, সর্বদা ঘুরছে চরকিবাজীর মত, এমন কি নিজের পাড়ায় একবারে দিনের বেলায় গিয়ে দেখবেন সেখানেও মহেশ আচার্যের একা একা দাঁড়াবার জাটি নেই, সেখানেও দু'-চারজন, শুধু ঘুমোবার সময় ছাড়া, তখন যে বস্ত আছে। গ্রাম্য একটা রসিকতা জুড়ে দিয়ে হেসে উঠলেন হারান মাস্টার।

হারান মাস্টার হাসলেন বটে, কিন্তু হাসিটা কেমন গম্ভীর বিশাল হয়ে দীর্ঘ প্রসারিত অন্ধকার মাঠের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল।

...অতোবড়ো একটা জমিদারবাড়ি, তার জায়গায় জায়গায় ফাটল, একটু হাওয়া দিলেই ঝুপ ঝুপ করে চুণ-বালি খসছে, আস্তর খসছে, বড় বড় কড়ি-বরগা, ভেতর থেকে উই ফোঁপরা করে দিয়েছে। ওদিকের পেছনের বিরাট দেয়ালটা একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। অন্ধকারে টর্চ হাতে মহেশ আচার্য খট খট খড়ম পায়ে ঘুরে ঘুরে দেখছেন, ওঁর খড়মের শব্দ চকমেলানো, ফাটলধরা দালানের এ-মোড় থেকে ও-মোড় ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, উনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।

জমিদারবাড়ি ভেঙে যাচ্ছে?

হ্যাঁ। উনি ভয় পেয়েছেন।

আপনার এই ভয়ের গল্পটা আমি বুঝতে পারছি না।

হারান মাস্টার উত্তর দিলেন না। আগে আগে লণ্ঠন হাতে আলের ওপর দিয়ে সটান হন হন করে চলেছেন। ওঁর দীর্ঘ কালো ছায়া পড়েছে আল থেকে ছিটকে ধানখেতে। সেটাও চলছে সংগে সংগে। কোন্ গাছ থেকে কে জানে, একটা তক্ষক ডেকে উঠলো।

মানুষ এভাবে থাকতেও পারে? হারান মাস্টার আমার দিকে ফিরলেন।

এতো ভয় নিয়ে, এভাবে? উঠতে বসতে এতো ভয় নিয়ে আমি হলে চলতে পারতাম না। হয় আমি আত্মহত্যা করতাম, না হলে লড়ে যেতাম, এতো ভয় নিয়ে চলতাম না।

এতো ভয় কেন?

হারান মাস্টার এ কথার উত্তর দিলেন না।

ওঁর খালি ভয় এই বুঝি ওঁকে একা পেয়ে কেউ মাথায় ডাণ্ডা মারলো। কেউ বুঝি বুকের ভেতর ছোরা বসিয়ে দিলো। এই বুঝি কেউ জামার কলারটা ধরে......।

ভয় ত' পেতেই হবে। ওঁরা কিরকম লোক জানেন? যেদিন যে ঘটনাটা ঘটে, সেদিন সেই ঘটনাকেই ওঁরা শেষ বলে জানেন। আমাদের সংগে এইখানেই তফাৎ। আমরা কোন ঘটনা—সেটা যতোই জবরদস্ত হোক, শেষ ভাবি না। ঘটনার ভেতর যে ঘটনা আছে, তাকে ওঁরা পড়তে পারেন না। তার ফলে ভয় পেতে হয়। হারান মাস্টার থামলেন। সামনে-পেছনে জমাট অন্ধকার। মাথার ওপর কার্তিকের হিম। পায়ে লাগছে ভিজে ঘাস। ধানগাছের গোড়া পায়ে লাগলেই সর্বাংগ শিরশির শিরশির করে উঠছে। সাপ নাকি?

একদিন যা খুশি তাই করেছেন। ধরে আনতে বললে ওঁদের লোক বেঁধে এনেছে। সে জুলুম আপনি শহরের মানুষ কল্পনাও করতে পারবেন না। গাঁয়ের মধ্যে যেদিন মোটরসাইকেলে হাঁকিয়ে পুলিশ ঢুকলো, সেদিন ওঁদের চালচলন দেখে কে। এই ডি· আই· জি আসছে, এই এস· পি আসছে, এই পুলিশ কমিশনার আসছে, ভট ভট ভট ভট...... মোটরসাইকেলের শব্দ, বাতাসে পোড়া পেট্রোলের গন্ধ, সংগে আসছে খাঁচা গাড়ি, গণ্ডায় গণ্ডায় লাঠি হাতে পুলিশ, সেদিন ওঁদের মেজাজ দেখে কে। ইলেকট্রিক ঢোকেনি, কারবাইট দিয়ে অন্ধকার রাত আলো করা হয়েছে, গাঁয়ের মানুষ দলে দলে এসেছে সেই আলো দেখতে, যে বাড়িতে রাত্রে এই-রকম আলো জ্বলে, সে বাড়ি একটা দেখার বস্তু, নিজেদের অন্ধকার ঘরে ফিরে যেতে যেতে ওরা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভেবেছে, বাপ্পোরে, রাতকে দিন করে দেয় গা, কতো ক্ষ্যামতা, মেলাই ট্যাকা, হাই গো আমাদের ঘরে একটা টেমিও জ্বলে না......

সত্যিই খুব বড়লোক?

একসময়ে ছিল। এখন পড়ন্ত জমিদার। সে রবরবা আর নেই।

শরিকে শরিকে শত জীর্ণ।

...বিশাল সেকেলে ধাঁচের চক-মেলানো বাড়ি। সামনেই সেইরকম মাপের পেতলের গুল্-আঁটা দরজা। মাথার ওপর রাস্তার দিকে ঝুঁকে আছে বিরাট দরদালান। তার জায়গায় জায়গায় ইঁটের দেওয়ালে অশথ গাছ গজিয়েছে। আপনি তারাশংকরের 'মন্বন্তর' পড়েছেন? পড়েছেন সেখানে মেজকর্তাদের বংশানুক্রমিক ব্যাধির কথা? অবিকল সেই বৃত্তান্ত। ছোট-বড়ো মিলিয়ে পনেরো ঘর শরিক। প্রায় প্রত্যেকেরই একটা না একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। কারুর ঠোঁটটা বেঁকে গেছে। কারুর নাকটা বসে গেছে উৎকট সিফিলিসে। অত্যধিক মদ্যপানে এই বয়সেই কেউ লোলচর্ম। কারুর হাতে লেপ্রসি। সবাই যখন বিয়ে বা শ্রাদ্ধ বা বাৎসরিক কোন অনুষ্ঠানে মজলিসে বসেন এক-সংগে তখন সে একটা দৃশ্য। যেন নরকের দরজা খুলে গেছে। সেখানে আকণ্ঠ পাঁকের মধ্যে গলা ডুবিয়ে গোঙাচ্ছে কতকগুলো বিকলাংগ, মূর্তি-মান বিভীষিকা। কখনো চোখে উন্মাদের মত দৃষ্টি। কখনো ঠোঁটে ক্রূর হাসি। ভোঁতা গর্বে সাদায় পাকায় মেশানো সতর্ক গোঁফজোড়া কখনো খাড়া হয়ে উঠেছে। ওদের মেয়েদের, বোদেরও কখনো কখনো দেখা যায়। কি সব দেখতে। চোখ-মুখ কি। আর গায়ের রং। সেটা দেখবার। নব্বই বছরের বুড়ি, এই বাড়ির কর্তামা। এখনো বেঁচে। মাজা বেঁকে গেছে। রাস্তায় প্রায় মাথা ঠেকিয়ে হাঁটে। বুড়ির সব গেছে। যাবেই ত'। কিন্তু রঙটা যায়নি। এখনো ধবধবে সাদা থান পরলে কোন্‌টা বেশি ফর্সা, গায়ের রংটা না ঐ সাদা থানটা, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে সেটা ভাবতে হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সব ক'টা বৌকে, হঠাৎ হঠাৎ, আড়াল-আবডাল থেকে দেখলে মনে হয়, সীতা মনে হয় শাপভ্রষ্ট, স্বামীর ভ্রষ্টাচারের কুৎসিত কলংক বিনা কারণে ভোগ করে যাচ্ছে, প্রায় কোন ছেলেটাই এদের বাঁচে না, যেগুলো বাঁচে সেগুলোর অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়, গলায় মাদুলি, হাতে তাগা, কোনটার জন্যে কালীঘাটে, কোনটার জন্যে বাবা তারকেশ্বরের থানে, কোনটার জন্যে জগন্নাথের শরণাপন্ন হতে হয়েছে, বড় বড় চোখে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে, দু'-একটা আবার কথাও বলতে পারে না, বলুন ত', এ অপরাধের শাস্তি কি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, এই যে এতোগুলো সুন্দর দেবশিশু, ওরা কেন অপরের পাপ বয়ে বেড়াবে, কেন ওদের

দেখতে শ্মশান-অন্ধকারের মত, কারা এর উত্তর দেবে, কারা, বলুন, চুপ করে রইলেন কেন, অন্তত কিছু একটা বলুন?

আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে হারান মাস্টার ক্রোধে, দুঃখে আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর আক্রোশে ফেটে পড়ে বললেন, দেখবেন, ওরাই একদিন এর শোধ নেবে। রাবণের মৃত্যুবাণ লুকিয়ে ছিলো রাবণের প্রাসাদের মধ্যেই। ওরাই একদিন এই অভিশপ্ত বাড়ির শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেবে, এ আমি স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছি, দধীচির মত শুধু হাড় দেবে না, ওরা জাহান্নমের আগুনে এ সমস্ত পাপ, অনাচার, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দূষিত রক্ত, সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। সেদিনই হবে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

হারান মাস্টার থামলেন। কিন্তু পায়ের গতি বেড়ে গেল। উনি হন হন করে হাঁটছেন উত্তেজনায়। হাতের লণ্ঠন দুলে উঠছে জোরে জোরে। আর আমি পৃথিবীর শেষ নিশাচর প্রাণীর মত মাথার ওপর সেই অদ্ভুত চাঁদটাকে সাক্ষী রেখে সন্তর্পণে যেন সেই আসন্ন, শেষ হিসেব-নিকেশের দিনটিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছি।

...কিন্তু কালেরও নিজস্ব একটা নিয়ম আছে। প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত এদের উত্তরাধিকারীরা কবে সাবালক হয়ে আরম্ভ করবে, সেদিনের দিকে নিঃসহায়ের মত শুধু তাকিয়ে কাল বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে না। আসন্ন যুদ্ধের দিনকেই সে শুধু এগিয়ে আনে না। ভেতরে ভেতরে জীর্ণ করে দেয় প্রাচীনকে।

আমার এ ধারণার সাক্ষী মহেশ আচার্যদের ঐ ভুতুড়ে বাড়িটার সামনে দাঁড়ানো প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির সমান তিনপুরুষের জবুথবু রথটা। রথটার একটা জৌলুস ছিলো, বিদেশী পথিক কেউ এলে সম্ভ্রমের সংগে তাকাতো। আমরাও ছেলেবেলায় রথটাকে খুব জীবন্ত মনে করতাম, ভয়ও পেতাম, কাঠের এতোবড়ো আয়োজন, ঐ তিনতলা বাড়ির সমান ওর উচ্চতা। তা ছাড়া বেঢপ, বিশালকায় গড়ন, এ সবের আলাদা একটা আকর্ষণ থাকেই, এই রথ তখন চলতে আরম্ভ করতো, মহেশ আচার্যদের বাড়ির সন্তানরা রথের দড়ি ধরতেন আর কর্তা-বাবা, মাথায় একজন বরকন্দাজ ধরেছে হেমছত্র, উনি খালি পায়ে, ক্ষৌম বস্ত্র পরে, গায়ে তসরজাতীয় প্রায় নামাবলী ধরনের কিছু একটা চাপানো, আগে আগে চলেছেন, মনে আছে আমরা কেমন অভিভূত হয়ে যেতাম, আমাদের মনের ভেতর কিছুটা এদিক-ওদিক ঘুরতো, সেই রথও একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, খোঁড়া হয়ে গেছে। কে বা কারা যেন ওর কাঠের চাকাগুলো খুলে নিয়েছে। আর একদিন দেখলাম রথের গায়ের সংগে লাগানো ঘোড়াগুলো আর নেই। মনে হল রথটা হঠাৎ খুব বেঁটে হয়ে গেছে। বয়স হয়ে গেছে। রোদে আর জলে রং ফিকে হয়ে গেছে। এইবার মুখ থুবড়ে পড়বে। এখনো পড়েনি। তারও কিছুদিন পর দেখলাম তাই হয়েছে। আশ্বিনে সেবার প্রবল ঝড় উঠলো। সকালে পথ দিয়ে বিচুলীহাটায় যেতে গিয়ে দেখি মহাকায় সেই রথ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। আচার্য-বাড়ির ভিন্ন ভিন্ন শরিকেরা সদলে বেরিয়ে এসেছে। মহেশ আচার্যের বাবাকে দেখলাম, বৃদ্ধ চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর মুখে কোন বাক্য নেই, একেবারে স্তব্ধ, পাথর। চোখের ভেতর হয়তো অনেক জল, কিন্তু চোখের পাতায় কোন জল নেই। কিন্তু মহেশ আচার্য হাঁকডাক পাড়ছেন, কান পেতে শুনলাম, বলছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুলচেরা হিসেব হবে। কেউ বাদ যাবে না। সকলে পাবে।

বৃদ্ধের ঠোঁট দুটো অকস্মাৎ নড়ে উঠলো, উনি এতোক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, ঐ ত' রোদে পোড়া, পোকায় কাটা হাড় কখানা, ওর আর ভাগ-বাটোয়ারা কেন?

কেন নয়? অন্য শরিকেরা একবারে মারমুখী, যেন মহেশ আচার্যের বাবা ভয়ানক একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছেন, আর বলে ফেলেছেন যখন তখন আর রেহাই নেই। কেন ভাগ হবে না, দস্তুরমত চুলচেরা ভাগ হবে।

মহেশ আচার্য হাত তুলে গোলমাল থামালেন।

বললেন, ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বাবা আপনি সেকেলে মানুষ। ভেতরে যান। ছেলে-ছোকরাদের এসব কাণ্ডের মধ্যে নাই থাকলেন। আধখানা কাঠও বেশি কেউ পাবে না।

তারপর আরম্ভ হল সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা।

অতোবড়ো রথটাকে চেরা সহজ ব্যাপার নয়। দশ-বারোজন লোক কোদাল, সাবল হাতে নেবে পড়লো হৈ-হৈ করে। শরিকেরা সব বাইরের রোয়াকে পা দুলিয়ে বসলো। প্রকাশ্য দিবালোকে হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো চোলাইয়ের বোতল। মুখে মুখে সিগারেট। ভেতর থেকে আসতে লাগলো ঘন ঘন চা। বাইরে একটা ভিড় জুটে গেল। আর অনবরত প্রায় গোটা দিনটা জুড়ে শুধু কাঠ চেরার শব্দ, খট, খট, খটাং, এক-একটা করে লম্বা লম্বা কাঠ চেরা হচ্ছে, আর সংগে সংগে আওয়াজ উঠছে, এটা আমি নোব, এই এতে হাত দেবে না, ভালো হবে না বলছি, আবার খট খট খটাং, আবার চিৎকার, কোন শালা বাড়তি নিলে তার জিভ টেনে বার করবো, মহেশ আচার্য ধেই ধেই করে গেলাস হাতে প্রেতের মত নাচছে, দিনের শেষে দেখা গেল রথের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধু জীর্ণ কাঠের গায়ে যে সব সাদা পোকা থাকে সেগুলো কিলবিল কিলবিল করছে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে। হারান মাস্টার হাসলেন। সে হাসি নির্বিকার, নিষ্ঠুর, যেন ওঁর সেই 'কালে'রই মতো, বিদ্রূপে ভরা, অস্তিত্বের গভীরে আছে যে রক্ত, তার মত নিশ্চিন্ত সেই প্রচণ্ড হাসি, প্রাক্তনের প্রতি দারুণ অবজ্ঞায় ক্ষমাহীন।

...ওই রথেরই দগ্ধ অভিশাপ ওরা বহন করছে, এই সব শরিকেরা।

এখনো যার ভাগে যেটুকু সম্পত্তি আছে, সেটুকুকে বাড়াবার কোন চেষ্টা নেই, কোন উদ্যোগ নেই, কাজের মধ্যে কাজ খালি এর নামে, তার নামে মামলা ঠোকা, পোকায় কাটা দলিল আর ঘেমো আঙুলের দাগ লাগা পরচা নিয়ে অনবরত মতলব ভাঁজা আর অবসর সময় বাইরের দিকের দালানে বসে রং-পীরিতের ছড়া কাটা, সম্পত্তি একে একে যাচ্ছে, কুমড়োর এক এক ফালির মত সম্পত্তি ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু মামলার আর বিরাম নেই, কোন একটা সময় এদের পূর্বপুরুষেরা যে চলমান একটা নদীর মত ছিলো, তা' এখন এই পাঁকে পচায় গাঁজিয়ে ওঠা বদ্ধ জলাটার দিকে তাকালে মনেই হয় না।

মহেশ আচার্য অবশ্য একটু অন্য ধরনের। এ যেন এক রাবণের বিশটা হাত। সব ক'টা হাতই অন্যায় করবার জন্যে উদগ্রীব। আমি একবার কলকাতার চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটা ঘর আছে। তার নাম রেপটাইল হাউস। ঘরটায় সাপ বোঝাই। ডাইনে, বাঁয়ে যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই কাঁচের শো-কেসে সাজানো, যত্ন করে রাখা অসংখ্য সাপ। সেই অসংখ্য সাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার শুধু মহেশ আচার্যকে মনে পড়ে যাচ্ছিলো।

সালটা ঠিক মনে নেই। ১৯৫৪-৫৫' হবে, সেটেলমেন্টের এক খোকরা অফিসার এখানে এসেছিল। আমারও তখন বয়েস অনেক কম। সদ্য এম· এ· পাশ করে বেরিয়েছি। পাড়ায় যথেষ্ট সুনাম। সবাই বলে হীরের টুকরো ছেলে। আরও ধন্য ধন্য পড়ে গেল যখন সবলে অবাক হয়ে দেখলো আমি বাইরে কোন চাকরি নিলাম না, থেকে গেলাম এই গাঁয়ে এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। রক্তও তখন যথেষ্ট গরম। সেটেলমেন্টের অফিসারটিও বি· এ· পাশ। ওঁর মেশবার আর লোক কই এখানে? আমাদের স্বাধীন দেশের অফিসারদের আমরা কিরকমভাবে তৈরি করেছি দেখুন। উনি আর ওঁর উপযুক্ত লোক খুঁজেই পান না। শেষে আমিই ভদ্রলোককে উদ্ধার করলাম। ওঁর সংগে কয়েকবার ওঁর কলকাতার বাড়িতেও গেছি। সেখানে ভদ্রলোকের বাবা জীবিত, অবিবাহিতা বোনও আছে। উনি তখনো বিয়ে করেন নি। অনেকদিন থেকেই কিরকম একটা সন্দেহ হচ্ছিলো। প্রায়ই দেখতাম মহেশ আচার্যের কালো অ্যামবাসাডারখানা ওঁর ক্যাম্পের কাছে এসে দাঁড়ায়। মহেশ আচার্য আর তার কালো অ্যামবাসাডার এর মধ্যে সাদা, শুধু কোন ব্যাপারই নেই। সবটাই কালো। কোন সন্দেহ নেই। লোক লাগিয়েছিলাম। সে খবর দিলে মহেশ আচার্য চন্দননগরে ওঁর যে রক্ষিতা আছে তার ঘরে সেটেলমেন্টের অফিসারকে নিয়ে আজকাল যাতায়াত করছেন। ব্যস, মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

তার পরের দিনই ক্যাম্পে গেলাম। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। আপনি এতোটা অধঃপাতে নেমে গেছেন। ইউনিভার্সিটিতে আপনি এই সব শিখেছিলেন? এ যে আমার লজ্জা। দাঁড়ান, আমি আপনার বাড়িতে যাবো, সমস্ত গিয়ে বলবো আপনার বোনকে, আপনার বুড়ো বাপকে। কতোবড়ো সর্বনাশ আপনি করেছেন জানেন? ঐ স্কাউণ্ড্রেলটা এমনি এমনি আপনাকে জালা জালা মদ গেলায় নি। এমনি এমনি ওর রক্ষিতার কাছে আপনাকে নিয়ে যায় নি। এ গাঁয়ের কতো লোকের সম্পত্তি, কতো লোকের জমির দাগরক্ষা আপনি করেছেন বলুন, নইলে আপনাকে আমি ছাড়বো না।

বলে অফিসারটার টাইটা আমি চেপে ধরেছিলাম। ভয়ে, আতংকে তখন ভদ্রলোকের অবস্থা কহতব্য নয়।

উনি কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, দোহাই আপনার। যা' হবার তা' হয়ে গেছে। আপনি আমার বাড়িতে যাবেন না। এরা যদি সব জানতে পারে তাহলে মহা কেলেংকারী। মিনু, আমার বোন, ওর এক বন্ধুর সংগে আমার আগামী মাসে বিয়ে। সব ভেস্তে যাবে। খুব বড়লোক শ্বশুর। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি দিন পনেরোর মধ্যে আমি এখান থেকে চলে যাবো। নিশ্চয় যাবো। আপনি ত' আমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবেন না, না।

রেগে গিয়ে বলেছিলাম, ন্যাকামো করবেন না। যথেষ্ট ধাষ্টামী করেছেন।

মহেশ আচার্য এইভাবে সম্পত্তি বাড়িয়েছেন?

শুধু ঐ একভাবেই নয়। আরো নানাভাবে। খাঁটি ভাবুক মানুষ। ওঁদের নিত্য নতুন নতুন ভাব।

কেউ কিছু বলেনি?

বলবে কি করে? প্রত্যেকেই ত' এক-একটি আস্ত উজবুক। গাঁয়ে যাদের দাপট আছে, লোভে ছোঁক ছোঁক করে অথচ পয়সায় কুলোয় না, তাদের দলে ভিড়িয়ে নিলেন, বলে দিলেন, এ আমার ওদেরই এক স্যাঙাতের মুখে শোনা, রাত ন'টার পর চলে আসবে আমার বাড়ি। ভিজে ছোলা, আদার কুচি আর গেলাস ভর্তি খেনো, যে যতোটা পারো, সব ফ্রি, ফ্রিতে পাবে। কই পরোয়া নাহি। আরে ভাই দু'দিন মাত্তর আছি। তারপর ত' সব ফক্কা। কে কোথায় চলে যাবো শালা, এমন দেশে হয়তো জন্মো নিলাম, ধরো, ল্যাপল্যাণ্ড, ভগবানের লীলায় ঝকমারি, যেখানে শুধু বরফ আর বরফ, যতো ইচ্ছে বরফ খাও, মদের তেষ্টায় টাগ্‌রা শুকিয়ে কাঠ, সমস্ত দেহখানি দেহি মদ, দেহি মদ বলছে, তবু খট খট লবডংকা, সেদিনের কথা ভেবে আজ যতো পারো ফুর্তি লুটে নাও।

মহেশ আচার্যের বাড়িতে শুধু যে ওঁর বয়সী লোকই জুটতো তা' নয়, ওঁর থেকে দশ-বিশ বছরের ছোটরাও আসর জমাতো। উনি খিক খিক করে হাসতেন। বলতেন, খেয়ে যাও, খালি খেয়ে যাও। পিও, পিও প্রাণ ভরকে।

ওঁর অদ্ভুত একটা নীতিজ্ঞানের কথা বলি।

নিজের দলের মেয়েদের দিকে উনি চোখ তুলে তাকাতেই জানতেন না। এ দোষ ওঁকে কেউ দিতে পারেনি। কিন্তু দলের বাইরে আর কোন কিছুতেই বস্তু-বিচার নেই। মা আর মেয়ে, এমনও দেখা গেছে। তেমন তেমন হলে দুজন-কেই ওঁর প্রয়োজন, কোন বিকার নেই, শুদ্ধ যোগী, একটা 'ভাওয়াইয়া' সর্বদা লেগে থাকতো ওঁর মুখে, নদীর (মদ খেলে 'নদী' আবার 'লদী' হয়ে যেত) বসন্তকালে ভাঙিয়া নামায় মাটি, নারীর বসন্তকালে পুরুষ গলার কাঁটি, বৃক্ষের বসন্তকালে পাতা আসি-আসি, নারীর বসন্তকালে মুখৎ মুচকি হাসি, মাছের বসন্তকালে করে উজোন-ভাটি ..

আর মনে নেই, বলতেন, রাই-কিশোরী হলেই ভালো (যদিও ওঁর মেয়েটির বয়স তখন আর কিশোরীর কোঠায় নেই। তার গায়ে তখন যৌবনের ছাপাছাপি জল।) আমার সাধনার ভারি উপকার হয়েছে, আহা, বৃন্দাবনের সেই রাধা, সেই কবে পীরিত করিয়াছিল, দ্যাখ, আজো তাহার জন্য মনটা বড়ই ঝুরিতেছে হে, আজো আমি কাঁদি, আমার সে রাধা কই, সে রাধা কই, আর গেলাসের পর গেলাসে চুমুক।

আর একটা নীতিজ্ঞান সেটা আবার এর চেয়ে অদ্ভুত।

ওঁর থেকে যাঁরা বয়সে বড়ো, তাঁরাও জুটে যেতেন মাঝে মাঝে। একসংগে বসেই চলেছে মদ, কাঁকড়া ভাজা, কিন্তু সিগারেট মহেশ আচার্য এ'দের সামনে খাবেন না কিছুতেই। উনি বলতেন সাধু-চলিত মিশিয়ে, বলার ঢংটা ওইরকমই ছিলো, বাপ রে, তা কি পারি, ওঁয়ারা যে গুরুজন, ওঁদের সামনে কি সিগারেট টানতে পারি বকাছেলের মত ফক ফক করিয়া? মদ, সে আলাদা কথা, কিন্তু সিগারেট, রামচন্দ্র! সেইজন্যে ও এক আসরেই হাতের আড়াল দিয়ে (যদিও মহেশ আচার্যের সিগারেট খাওয়া দেখতে কারুর অসুবিধা হচ্ছে না) উনি সিগারেট টানতেন। মাঝে মাঝে নেশার ঝোঁকে বলতেন, দাদা, ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন না ত', বুঝুন কি রকম ভড়ং।

কাল কিন্তু চুপ করে বসে নেই। দেশে-গাঁয়ে যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চার হয়েছে। চোত মাসের দুপুরে চালের খড়ের চেয়েও লোকে তেতে আছে। কিন্তু আমরা, আবহাওয়া যথেষ্ট গরম হাওয়া সত্ত্বেও এতোটা বুঝতে পারি নি।

দেখতে পাচ্ছেন আকাশের কাল-পুরুষ!

হারান মাস্টার আমার দিকে ফিরে তাকালেন। ওঁর দেখাদেখি আকাশের

দিকে তাকালাম। চাঁদ ঢেকে গেছে। একটা মেঘ তিজে ফেলেছে। এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকার। ওঁর আঙুলের ইশারা লক্ষ্য করে দেখলাম কয়েকটি নক্ষত্রের প্রান্ত চলাফেরা, এক জায়গায় একটু আগুনের রেখা, একটা অস্পষ্ট নীহারিকা আর এক অনবদ্য, অসামান্য অন্ধকার।

কই দেখতে পেলাম না।

আপনার চোখ নেই।

হারান মাস্টার আমার উত্তর বোধহয় শুনলেন না। উনি চলতে লাগলেন। চলতে চলতে অনেকটা অসংলগ্নভাবে বললেন, সাল ১৯৬৯। বাংলাদেশের সে এক দারুণ সময়। মুহূর্তে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন, বাদুড়িয়া, বসির-হাট, কৃষ্ণনগর দাউ দাউ করে জ্বলছে, এক চাল থেকে আরেক চালে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে, শহরে তখন দারুণ অবস্থা। একদিন চুপিচুপি শহর দেখতে বেরিয়ে-ছিলাম, স্টেশন থেকে নেবেই শুনলাম শহরে নাকি কারফিউ। রাস্তায় কোন লোক নেই। দোকানগুলোর ঝাঁপ ফেলা। চেরা আলোর রেখা এসে পড়েছে রাস্তায়। হন হন করে যাচ্ছি। একজন হাত চেপে ধরলে, বললে, কোথায় যাচ্ছেন? পাগল হয়েছেন? এমন দিনে কেউ আত্মীয়ের বাড়ি যায়? শহরে এখন দারুণ উত্তেজনা। ছাত্ররা সব হাতবোমা নিয়ে তৈরি। এই-মাত্র একটা পুলিশভ্যান চলে গেল। যে কোন মুহূর্তে গুলী চলতে পারে। পালান, চলে যান।

আমার আর যাওয়া হল না। ঠিক তখনি 'দুম' করে একটা শব্দ শুনলাম। কোথায় একটা বোমা ফেটেছে। পরক্ষণেই গুলীর শব্দ। একটা 'আঁ, আঁ' চীৎকার। আর শুনিনি। ছুট, ছুট। বাদুড়িয়া, বসিরহাট, কৃষ্ণনগর এ-সব পার হয়ে একদিন আগুন এসে পড়লো আমাদের গায়েও। আমার মনে আছে, আমি ক্ষ্যাপার মত চড়া রোদে মাঠের আলে আলে ঘুরছি, আমি মশাই পার্টি-ফার্টির লোক নই, তবে আর সবার মত দেশকে ভালো-বাসি, আমার গায়ে মানুষের রক্ত আছে, চুপ করে থাকতে পারলাম না যখন আমার স্কুলের ছেলেরা বলল, আমরাও এখানে একটা শহীদ বেদী করবো, হুকুম দিয়ে দিলাম, করো, এতো কোন অন্যায় নয়, আর মা বসুমতীকে প্রাণ ভরে ডেকেছি, মাগো, শক্তি দে, শক্তি দে, অসুরের মত শক্তি দে, লাল সিঁদুরে ভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে বলেছি, সিঁদুরের টিপ কে আমার পোড়া কপালে উল্কির মত লাগিয়ে দেবে, দমকা বাতাসের মত ছুটে গেছি এ-পাড়া ও-পাড়া, দু'হাত তুলে বলেছি, বান আসছে। বান আসছে। জাগন থাকো ভাই সব জাগন থাকো। মানুষের মত জাগন থাকো। প্রাণ কিছু নয় রে। এ প্রাণের কি মূল্য। দেশ যদি চায় কেন দিতে পারবো না প্রাণ। আমার বাংলা জুড়ে সোনার শিশুরা আজ ধুলোয় লুটোয়। আমার নরেন্দ্র, বড় আদরের, বড় ভালোবাসার সোনার নরুরে আমার, আমি, আমরা তোকে কেমন করে ভুলি...

হারান মাস্টারের দিকে তাকালাম। আমি কঠিনচিত্ত, উদাসীন। কোন কিছুই আমার মনে দাগ কাটে না। আবেগ-টাবেগে আমার কিছু হয় না। কিন্তু হারান মাস্টারের কথাগুলো আমাকেও নাড়িয়ে দিলো।

......আমার ছেলেরা একটা শহীদ বেদী এখানে করলো। এই তিনমাথার মোড়ে মহানিমগাছের নিচে একটা চুল আনিয়ে কালো কাপড় বিছিয়ে। কিন্তু খানিক পরে এলো পুলিশের গাড়ি। লাঠি হাতে পুলিশ এক জন।

আমাকে বললে, এ-সব হাটিয়ে দিন। সময় বেশি নেই। কুইক।

আমি বললাম, আমি তা পারবো না। আমি এ-সব রাজনীতি-টীতি বুঝি না। বুঝতেও চাই না। একটা ছেলে মরেছে। তার নাম নরেন্দ্র। এরাও ছেলে। ওকে স্মরণ করছে। বাপ হয়ে আমি কেমন করে তা বারণ করবো?

আমি কেঁদে ফেললাম। কিন্তু শয়তানটা শুনলো না, এতোবড়ো আস্পর্ধা, আমার মুখে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলো। আমি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। তারপর আর ছেলেদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশের দিকে ছুটে গেল। যে যা হাতে পেয়েছে তাই নিয়ে। ধুলো আর ইঁটের মধ্যে, এদিক-ওদিক খানচারেক লাঠি ছড়িয়ে, ইউনিফরম ফেলে মুহূর্তের মধ্যে ওরা পালিয়ে গেল।

কিন্তু যে কথা বলবার জন্যে এতো কথা বললাম সেইটা এইবার বলতে হয়। সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য। জীবনে কখনো ভুলবো না। যতো দিন যাচ্ছে মনের মধ্যে সেই ছবিটা ততো গাঢ় হয়ে বসে যাচ্ছে। আর কি এক অবসাদে মনটা ভারী হয়ে যায়। তা হলে আমরা কি জন্যে এতো পড়াশুনো করলাম? কি জন্যেই বা এতো যত্ন করে ছেলে তৈরি করছি? এ-সবই কি বৃথা! মনুষ্যত্বের আর এক কণাও কি কোথাও অবশিষ্ট নেই, আপনি বলুন, আপনি কিছু বলুন।

না। প্রচণ্ড ক্রোধে আমি এই প্রথম আত্মসংযম হারালাম। আমি কিছু বলবো না। আমি বাংলাদেশের লেখক-দের দিকে তাকালাম।

হে আমার দুর্ভাগা দেশের জ্যেষ্ঠ লেখকেরা, মুক্তধারার মত আপনাদের কুশলী কলম আজ অনর্গল এক অবক্ষয়ের চাপ চাপ অন্ধকার কাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কি কখনো কান পেতে শুনেছেন চাঁদ-লাগা নিঃসীম এই প্রান্তরে, শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের জন্যে একজন মধ্য-বয়সী হারান মাস্টারের রুদ্ধকণ্ঠের আর্তনাদ? দুর্ভাগ্য আমারও, আমি কোন লেখকই নই, লেখার জগতে সত্যি সত্যি আমি এক অজন্মা আগাছা, বাংলা-দেশের উঠোন থেকে যেদিন ইচ্ছে যে কেউ তুলে ফেলবে, আমি সেই ক্ষয়ে যাওয়া মনুষ্যত্বের জন্যে এক আশ্চর্য বুকফাটা হাহাকার শুধু রেখে যেতে পারি।

আপনি বলে যান হারানদা। থামবেন না। আমার গলায় আবেগ এই প্রথম গম গম করে উঠলো।

......ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি এসে আস্তে আস্তে আমাদের পাশে এসে থামলো।

চারিদিক ধুলোয় আকীর্ণ। স্তূপা-কার ইঁটের টুকরো। দু-চারটে ছড়িয়ে থাকা পুলিশের লাঠি। এর মাঝে, আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, মহেশ আচার্য কোলা ব্যাঙের মত ভরপেট মদ খেয়ে থপ থপ করে নাবলো গাড়ি থেকে, তারপর ও-রকমই ফোলা চেহারা, সে-ও নেশায় চুর হয়ে টলে টলে নাবলো বুনো শুয়োরের মত, পর পর আরো দু'জন, সংগে একটা মেয়ে, মহেশ আচার্য কঁপা এগিয়ে গিয়ে-ছিলো, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, আধ-বোজা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের দিকে খানিকক্ষণ দেখলো, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে 'ওয়াক থুঃ' করে থুতু ফেলল কয়েক সেকেণ্ড, বলল, 'বিপ্লব হচ্ছে, হুঁ ঘোড়ার ডিম হচ্ছে', তারপর মেয়েটার কাছে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে 'এ্যাই মাগী' বলে ওর

হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। ওর সংগের লোকেরাও চলে গেল পিছু পিছু কোলা ব্যাঙের মত থপ থপ করতে করতে।

চুপচাপ আমরা এ দৃশ্য সেদিন কেমন করে দেখেছিলাম আজও তাই ভাবি। লাঠিধারী এক ডজন পুলিশকে আমরা গাঁ থেকে তাড়াতে পারলাম চোখের নিমিষে, আর এই কদর্য নাটক, তার অভিনয় হয়ে গেল আমাদের সামনে, একটু আগে যখন একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে, মন সকলের তৈরি, গা গরম, কিন্তু ও পার পেয়ে গেল অনায়াসে, তাচ্ছিল্য করে হেসে গেল, যা পুলিশও কখনো করে নি, অথচ ওকে আমরা যেতে দিলাম, জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেললাম না? এই রকমই বোধহয় হয়। আমরা সবাই চমকে গিয়েছিলাম। এমন দিনে এরকম যে কোন কাণ্ড হতে পারে এর জন্যে মন প্রস্তুত ছিলো না। মনুষ্যত্বের এতোখানি অপচয়, আমি, হারান মাস্টার সেদিন ভাবতে পারিনি।......

তারপর? পুলিশে খবরটা কি দিয়েছিলো মহেশ আচার্য?

কোন সন্দেহ আছে? এ-সবই ত' ছিলো ওদের কাজ। একে তড়পাচ্ছে, ওকে তড়পাচ্ছে। ওকে ভাগে জমি দোবো না বলে জমি থেকে হটিয়ে দিচ্ছে। ঘন ঘন থানায় যাচ্ছে। এর নামে ওর নামে সত্যি-মিথ্যে লাগাচ্ছে। গাঁয়ের মানুষ হাট-তলায় কলা বেচতে গেছে। কিছুই সে জানে না। তার অপরাধ আমাকে খুব মান্য করে। আমি মশাই রাজনীতিও করি না। ও-সব বুঝিও না। তা ছাড়া সময় নেই। ছেলে পড়াই। একটু চাষ-বাস দেখি। আর সময় কোথায়? আমারও অপরাধ প্রচণ্ড। ওর নোংরা কাজের আমি কড়া সমালোচক। আর যাবে কোথায়। তা ও কলা বেচতে গেছে। পেছন থেকে পুলিশ এসে কোমরে দড়ি বেঁধে ওকে নিয়ে গেল। পরে ওর কলারও কোন হদিশ পাওয়া গেল না। এরকম অত্যাচার। মোটমাট মানুষ যে একটু সুখের ভাত স্বস্তিতে খাবে তার কোন উপায় বাখেনি সেদিন এই মহেশ আচার্য আর তার ভূত-প্রেতের দল।

......আমার ভাইটা মুখ্খু, আমি এম-এ হলে কি হয়। চার ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে। সে এখন বলে, জমানা পাল্টে গেছে দাদা। আমি ত' একটা মাত্তর লোক। আমার মাগ-ছেলে নেই। এক-বার শুধু আমার হাতটা ছেড়ে দাও, দ্যাখ, ঐ মহেশ আচার্য আর তার চামচিকেদের কি রকম হাঁড়ির হাল করি। ওরা এখনো ঘুরে বেড়াতে পারছে। এখনো হাসতে পারছে। সিনেমা যেতে পারছে। মদ খেতে পারছে। কিন্তু রাজত্বটা যদি বদলে না যেত, তা'লে, তুমি ঘুমোতে পারতে বাড়িতে? তোমার চালে আগুন পড়তো না? তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারতে? সিনেমা দেখতে পারতে? ছেলে পড়াতে পারতে? ওরা এতো এতো অন্যায় করেও আজো ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। একবার তুমি ছেড়ে দাও। মনে নেই সেবার, পরাণদার বাড়ির ব্যাপারটা, পরাণদা নিখোঁজ, পুলিশ পেছন পেছন ঘুরছে, মহেশ আচার্যের লোক কি কাণ্ড করেছিলো মনে নেই? মদ খেয়ে টইটম্বুর হয়ে ঘরে ঢুকে, তখন পরাণদার বৌ, একলা ঘরে, মনে নেই? তুমি কি মানুষ? এখনো চুপ করে আছো? আমি মুখ্খু মানুষ। তোমার মত এতো লেখাপড়া জানি না। আমার রক্ত নেচে উঠছে। আমি কেমন করে তাকে ধরে রাখবো? আমি মহাভারতের দ্রৌপদীর কান্না শুনতে পাচ্ছি, পরাণদার বৌ, আমার বৌদি কাঁদছে, আঃ, মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি ছুটে যাই, চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি মহেশ আচার্যকে, সেই দুঃশাসনটার বুকের ওপর ভীমের মত বসে......, একবার আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ছাড়িনি, ওকে যেতে দিই-নি। ওর রাগ যে কতো খাঁটি তা দেশ-গাঁয়ে কে না জানে, তবু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করেছি, এরকম করে শোধ নেওয়া যায় না রে বোকা, এটা আক্‌চা-আকচির ব্যাপার না, ওর সংগে লড়তে হবেই, তবে লড়াইটা হবে অন্য ধরনের।

'ধ্যুত্তেরি' বক্তিতা?'. ....বলে হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছে, তারপর কি কি করেছে ভগবান জানেন।

তা হলে স্বীকার করছেন মহেশ আচার্যদের ওপর আপনারা সরকার বদলে গেছে বলে শোধ নিচ্ছেন?

হ্যাঁ। অন্যায় কিছু কিছু হচ্ছে না তা বলি কি করে। কিছু কিছু হচ্ছে। এ গাঁয়ে না হোক অন্য গাঁয়ে, কেউ কেউ গাঁয়ে ঢুকতে পারছে না। দু'এক বাড়ির বৌ-ঝিরা আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ছে, একটা বিহিত করুন মাস্টার মশাই। আমাদের কোন বেইজ্জৎ করছে না বটে, তবে রোজ রোজই আমাদের কত্তাদের ভয় দেখাচ্ছে. বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাঁশবন থেকে বলে উঠছে, সতীশ রায়ের মুণ্ডু চাই, যতে চক্কোত্তির মুণ্ডু নিয়ে ভাঁটা খেলবো, এই সব যদি রোজ রোজ করে তা হলে বাস করি কি করে বলুন?

আমি বলেছি, ওরা যাদের যাদের নাম করছে তারা কি ধোয়া তুলসীপাতা:

বৌরা বলেছে, কে কি রকম লোক মাস্টার মশাই আপনার ছামুতে আর লুকোবো না। হাড় আমাদের কালি করে দেলে। এমন ঘরে পড়বো জানলে বাপকে বলতাম, দাও, আমাকে দড়ি কলসী কেনার পয়সা দ্যাও। খালি একে ঠকাচ্ছে। ওকে ঠকাচ্ছে। খালি কুচক্কুরের মত প্যাঁচ আর প্যাঁচ। আর পরের বাড়ির বৌ-ঝি-দের দিকে নজর। থাক্ না মুখপোড়ারা দু'এক ঘা লাঠি, উচিত শিক্ষে হোক, কিন্তু পরাণটা নিয়ে নেবে, ইটা কি কতা, তাই ত' আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

আমি বলেছি, ঠিক আছে। আমি যতোটা পারি বলে দোব। আর এদের সব বদ মতলব ছাড়তে বলো।

এখন আর বলতে হবে নি। সব বাপের সুপুত্তুর হয়ে গেছে। এখন শুধু সাধন-ভজনে মন দেলেই হয়।

মাঠ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এটা পার হলেই ওঁর গ্রাম। আজ ওঁর বাড়িতেই আমি অতিথি। জ্যোৎস্না আরও অস্পষ্ট। কুয়াসা ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে মাঠটা ভাসছে। হারান মাস্টার আগে আগে চলেছেন। পেছনে আমি।

......ওই ডি-এস-পি, এস-পি, থানা ইনচার্জ এখন আসছেন আমার কাছে। এসে বারবার করে বলছেন, দিন না বেটা মহেশ আচার্যকে ধরিয়ে। ওপরওলার সংগে ওর যোগ ছিলো বলে ওর অনেক বাঁদরামি একদিন সহ্য করেছি। ওর জন্যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কম বদনাম হয়েছে! দিন না বেটাকে ধরিয়ে। কিছু না পারেন, কেউ ওর গায়ে একটু মদ ঢেলে দিয়ে বলুক, পুকুরঘাটে মেয়েরা যখন চান করছিলো তখন সেখানে মদ খেয়ে বাঁদরামি করতে গিয়েছিলো, এরকম ত' ও অনেক করেছে, করে দিন না, তার-পর দেখবেন শালাকে আমি কেমন উঠতে-বসতে ঝোল্-ভাত খাওয়াই। ওকে কেউ সাপোর্ট করবে না।

আমি হাতজোড় করে বলেছি, তা আমি পারি না। এ সব ত' কখনো করি নি, যা পারেন আপনারা করুন। আমি মাস্টার মানুষ। মানুষ যে বদলায় এ সত্যে আজো আমি বিশ্বাস হারাই নি।

আমি স্তব্ধ হয়ে হারান মাস্টারের দিকে তাকালাম। এইবার রাস্তা। এখন আমি অনায়াসে হারান মাস্টারের পাশাপাশি চলতে পারি। একবার ইচ্ছেও হল। কিন্তু না। আগে আগে যান হারান মাস্টার লণ্ঠন হাতে পথ দেখাতে দেখাতে। পেছন পেছন আমি চলি। আজ এ ধরনের কাহিনী লিখছি বটে। কাল ত' এই কাহিনীটাকেই উল্টো করে যার এখনো অবিচলিত বিশ্বাস আছে, লিখে দিতে পারি। মনুষ্যত্বের আদর্শে সেই হারান মাস্টার আমার সামনেই থাকুক। আমি বরং পেছন পেছন হাঁটি। হাঁটতে আমার এতে সুবিধাই হবে।

[ক্রমশ]

# ভারতীয় মন্দিরশিল্পের গোড়ার কথা

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

## ॥ দুই ॥

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুদের মধ্যে মন্দিরে উপাসনার প্রচলন কেমন করে হল, এখানে তা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এদেশে মন্দিরে পূজার্চনার ইতিহাস গড়ে উঠেছে বিগত দু' হাজার বছর ধরে। তবে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে ভারতের মন্দিরগুলি ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, মিশর ও গ্রীসের প্রাসাদোপম মন্দিরসমূহের উত্তরসাধক বলা যায়। এই বিকাশধারার একটা উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র পাওয়া যায় ভারত ও প্রতীচ্যের প্রাচীন সভ্যতার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মধ্যে। ৩২৭ খৃস্টপূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে ভারতে পদার্পণান্তে পাঞ্জাবের অধিকাংশ জয় করার ফলে এবং পরবর্তীকালে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকদের অভিযানের ফলে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক যে সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে অনুমান করা হয় যে, গ্রীকেরা যে সময় ভারত অভিযান করেছিল তখন ভারতের ধর্মব্যবস্থায় মন্দিরোপাসনার বিশেষ কোন স্থান ছিল না। বেদোক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই তখন আধিপত্য ছিল উত্তর ভারতে।

বেদের পূজার্চনারীতি ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের ভিত্তিতে ভারতে সর্বপ্রাচীন যে ধর্মমত গড়ে উঠেছিল, তাকেই বলা হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরাই ছিলেন এই বৈদিক ধর্মের মেরুদণ্ড। বস্তুত চীনা, সুমের, ব্যাবিলনী, মিশরী, ইরানী, আর্য প্রভৃতি সমস্ত জাতির অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে সমাজের নেতৃত্ব ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বা পুরোহিতদেরই হাতে। ভারতেও যে সে যুগে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরই প্রতিপত্তি ছিল, সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এই প্রমাণ পাওয়া যায় মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে। দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কিছুকাল পরে আনুমানিক ৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দে সেলুকাসের দূতরূপে মেগাস্থিনিস এ দেশে পদার্পণ করেছিলেন এবং বেশ কিছুকাল এখানে অবস্থান করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এখন আর সে গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই। তবে আরিয়ান ও ডিওডোরাস এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছিলেন এবং আরও কয়েকজন রোমান পণ্ডিতের রচনায় এই গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। জনৈক জার্মান পণ্ডিত এই সমস্ত সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। তারই ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন ম্যাকরিনডেল। ম্যাকরিনডেলের অনুবাদে মেগাস্থিনিসের লেখা ভারত বিবরণী যেটুকু পাচ্ছি, তাতে দেখি সে সময়ে সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের। এমন কি মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় জানা গেছে গর্ভে থাকার সময় থেকেই ব্রাহ্মণের যত্ন ও পরিচর্যা হত অপরিসীম।

বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হত মুক্তাকাশতলে যাগযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। এই যজ্ঞস্থলকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল বৈদিক সংস্কৃতি। সে যুগে যজ্ঞস্থলই ছিল শিক্ষাস্থল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতের ইতিহাসকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল সত্য, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, এটি আর্য বংশোদ্ভূত এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই ধর্ম ছিল।

খৃস্টজন্মের প্রায় দু' হাজার বছর আগে আর্যদের ভারতে আগমনের ফলে ভারতে বসবাসকারী দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত অগণিত মানুষ এদিক থেকে আদৌ প্রভাবিত হয় নি। তারা আদিম পূজাপদ্ধতিই মেনে চলত। মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ কোন দেব-দেবীর পূজার্চনায় তারা বিশ্বাসী ছিল না, পরন্তু তারা মৃত পূর্বপুরুষদের এবং ভূত ও পরীদের পূজা নিবেদন করত। এ ছাড়া নদী, গাছ, পাহাড়, জীবজন্তু ও সর্প পূজাও প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে।

মূর্তি পরিকল্পনার আদি সূত্র অনুধাবন করা একটা গবেষণার বিষয়। ঐশী প্রভাব চর্ম চক্ষে অনুভব করা যায় না, তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধির বিষয়। এ উপলব্ধি প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ না হলে তো মানুষের শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই। মানুষ তাই এই উপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার জন্য মূর্তির পরিকল্পনা করেছে। ঈশ্বরোপলব্ধির রূপময় প্রকাশই হল দেবমূর্তি আর মূর্তিপূজাকে পুতুলপূজা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ বিবেকানন্দের ভাষায়, "মানুষমাত্রেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক।"

বস্তুত, বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও মূর্তিপূজা আদৌ অবৈজ্ঞানিক নয়। কারণ মূর্তি একটা প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সাধনার প্রথম অবস্থায় কোন-না-কোন একটা প্রতীক

অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। চরম আধ্যাত্মিক মার্গে পৌঁছুতে গেলে প্রাথমিক স্তরে এইরকম একটা প্রতীক অবলম্বন করতেই হবে।

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ
পূজাঽধমাধমা।

অর্থাৎ, বাহ্যপূজা—মূর্তি পূজা প্রথমাবস্থা; মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর। এটি কিছুটা উন্নত অবস্থা। কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা।

বিবেকানন্দ বলছেন, "ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব-ধারণা করিবার চেষ্টাস্বরূপ।"

স্বামীজীর রচনার বহুস্থানে সাধনক্ষেত্রে প্রতীকের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে অজস্র যুক্তি রয়েছে। তিনি বলেছেন, "অনন্ত নীলাকাশ বা অসীম সমুদ্রের মধ্য দিয়ে আমরা অনন্তের ধারণা করি। এখানে নীলাকাশ ও সমুদ্র মানুষের কাছে অনন্তের প্রতীক।" সেইরকম "আমরা স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণা গির্জা, মসজিদ বা ক্রুশের সহিত যুক্ত করিয়া থাকি। হিন্দুরা পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।"

পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় মানুষ প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক রূপের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মকে ধরবার চেষ্টা করছে। এ হল মূর্তের মধ্য দিয়ে অমূর্তকে লাভের সাধনা। স্বামীজী বলছেন ঃ "খ্রীস্টানরা মনে করেন, ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন উহাই ঠিক।...... ইহুদীরা মনে করেন, দুইদিকে দুই দেবদূত বসানো সিন্দুকের আকৃতি একটি মূর্তি নির্মাণ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই। .... মুসলমানেরা মনে করেন, প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া 'কাবা' নামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকৃতি চিন্তা করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই।"

বস্তুত, মূর্তি বা কোন প্রতীক চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সাধন মাত্র।

দেবদেবীর মূর্তিপূজা প্রচলনের পরই মন্দির নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। কারণ দেবদেবীর অধিষ্ঠান মন্দিরেই। কাজেই মূর্তিপূজার সঙ্গে মন্দিরের একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য অনেক সময় হিন্দু মন্দিরে দেবমূর্তির পরিবর্তে শিবলিঙ্গ এবং বৌদ্ধমন্দিরে পূতাস্থি বা অন্য কোন প্রতীক দেখা যায়। মনে রাখতে হবে এগুলি দেবতার প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই দেবমূর্তি বা দেবতার প্রতীকের অধিষ্ঠানের জন্যই মন্দিরের পরিকল্পনা।

পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী বলেছেন, সম্ভবত দ্বিতীয় খৃস্টপূর্বাব্দ বা তার কিছু আগেও ভারতে মন্দির ও দেবমূর্তির অস্তিত্ব ছিল। বিষয়টি আলোচনাযোগ্য।

অতি আধুনিক কালেও উত্তর ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে লিঙ্গপূজার যে প্রচলন দেখা যায়, তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখছি ঋগ্বেদে তো "শিশ্নদেবে"র উল্লেখ রয়েছেই, কিন্তু আর্যদের এ দেশে আগমনের অনেক—অনেক বছর আগেও এর প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গেছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে ৩,০০০ খৃস্টপূর্বাব্দেও লিঙ্গপূজা এ দেশে পরিচিত ছিল।

মহেঞ্জোদারোতে অসংখ্য ছোট-বড় মূর্তিও পাওয়া গেছে। এগুলির কোনটি মাটির, কোনটি বা চূণাপাথরের তৈরি। এতে বোঝা যায়, সিন্ধু সভ্যতার যুগে মূর্তিপূজা এদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। মহেঞ্জোদারোর খননকার্যের ফলে নানা অট্টালিকা, স্নানাগার, কূপ, পয়ঃপ্রণালী ও পথ-ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হলেও কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং মনে হয়, এই সব দেবদেবীর মূর্তি বা প্রতীক পারিবারিক পূজার্চনাতেই ব্যবহৃত হত। আর্যরা মূর্তিপূজার সমর্থক না হওয়া সত্ত্বেও আর্য-পরবর্তীকালেও তা কিন্তু প্রচলিত হয়েছে সহজেই।

তবে ভারতে পূর্ণাঙ্গ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্ভবত গ্রীকেরাই করেছিল। বিশ্বের প্রাচীন শিল্পস্থাপত্যের মধ্যে মিশরীয় স্থাপত্য রূপলাভ করেছিল কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু গ্রীকস্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পাথরের কঠিন বুকে শিল্পের ছন্দ তুলে। গ্রীকস্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান হল তার মন্দিরগুলি। এথেনা দেবীর মন্দির পার্থেনন গ্রীক গৃহনির্মাণ-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। গ্রীক খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রতিমা পূজার প্রচলনও ছিল খুব বেশি।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করে পণ্ডিতেরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, স্বয়ং আলেকজাণ্ডার এখানকার মৃত্তিকায় দেবী নির্মাণ করে গ্রীক দেব-দেবীর পূজা করেছিলেন। কাজেই তিনি হয়ত কিছু মন্দিরও নির্মাণ করে থাকতে পারেন। তক্ষশিলার খননকার্যের পর এ তথ্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রায় ৬০ খৃস্টাব্দ নাগাদ কুশান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরও উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক সভ্যতার জের চলেছিল। তক্ষশিলায় প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, যা গ্রীক রীতির একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।

বস্তুত, শিল্পে ও ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাব বহু দেশের ক্ষেত্রেই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ঃ "যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশ শাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।"

খৃস্টীয় যুগ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে গ্রীকেরা ভারতে পদার্পণ করার পর পাঞ্জাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তক্ষশিলার খননকার্যে তাই গ্রীক প্রভাবের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয়রা মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা যে গ্রীকদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছিল, এ কথা অবশ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আজকাল স্বীকার করেন না। তবে এইসব পণ্ডিতের অভিমত মেনে নিলেও একথা বলতে কোন সঙ্কোচের কারণ নেই যে, গ্রীকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই প্রাচীন ভারতীয়রা দেবমূর্তি নির্মাণের কাজে নতুন উদ্দীপনা লাভ করেছিল। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা ও শীলমোহরে যে সকল দেবমূর্তি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে প্রাচন যুগে গ্রীকদের মুদ্রায় খোদাই করা দেবমূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। তক্ষশিলার মন্দিরের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

## ॥ তিন ॥

হিন্দুদের যেমন মন্দির, বৌদ্ধদের তেমনি স্তূপ। বৌদ্ধযুগে স্তূপ প্রবর্তনের কথা এখানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বেদের যুগে ব্রাহ্মণদের সন্দেহাতীত প্রাধান্যের বিষয় আমরা আগেই বলেছি। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ, ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন বাইরের আড়ম্বর ছিল, তেমনি তা ছিল সূক্ষ্ম নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। বৈদিক অনুষ্ঠানের এই জটিল-কঠোর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এত বাড়াবাড়ি ছিল যে সে যুগের চিন্তাশীল মানুষেরা ক্রমেই যেন একে অন্তর থেকে অনুমোদন করতে পারছিলেন না। মুক্তি-লাভের অন্য পথের সন্ধান তাঁরা করতে লাগলেন। উপনিষদকারেরা তাই জ্ঞানের পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলে প্রতিপন্ন করলেন।
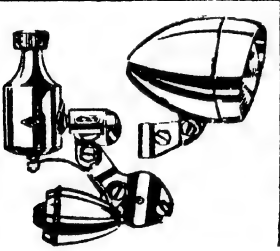
লক্ষ্য করতে হবে, দুটি বিপরীত শাও চখন সমাজে প্রবল হয়ে উঠে সমাজজীবনে ও ধর্মে একটা পরিবর্তন আনার কাজে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। বৈদিক যুগে শক্তিশালী পুরোহিতকুলের নেতৃত্বে কাজের বিভাগ অনুসারে সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়েছিল। কৃষিকার্য, বাণিজ্য, যুদ্ধ ও দেবপূজা—এই ছিল মোটামুটি বিভাগ। সমাজের এই কঠোর শ্রেণীবন্ধন বেশ একটা শক্ত ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রাজ্ঞ তত্ত্বদর্শী উপনিষদকারেরা এই নিয়ম-নিগড়ের ঊর্ধ্বে উঠে সত্য প্রচার করেছিলেন। একদিকে সমাজের শ্রেণীবন্ধনের পাকা ভিত গড়ে উঠছে, অন্যদিকে এই ভিত্তি-মূলে আঘাত হানবার চেষ্টা করছেন উপনিষদের জ্ঞানীরা। সাধারণ মানুষ পড়ল এক দোটানায়। ধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন তারা সুস্থ নিশ্বাস মোচনের অবকাশ পাচ্ছে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানীর দার্শনিক ব্যাখ্যার জটিলতায়ও তারা বিভ্রান্ত। এ হেন যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন ভগবান বুদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"ভারতে পুরোহিত ও ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল, বুদ্ধ তার মূর্তিমান বিজয়রূপে দেখা দিলেন।"

প্রেম, তিতিক্ষা ও ত্যাগের আদর্শে বুদ্ধদেব এক নতন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এই ধর্মমতে বাহ্য প্রকরণ অপেক্ষা চারিত্রিক উন্নতির দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল। তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, কামনাকে জয় করতে পারলে তবেই মানুষের মুক্তি। ব্রাহ্মণদের প্রাণহীন কঠোর আচার-অনুষ্ঠান ও জটিল পূজা পদ্ধতি বৌদ্ধ-দেব মতে নিরর্থক। বৈদিক ধর্মের সংস্কার সাধনই ছিল বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য। এই ধর্মের প্রভাবে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতাপ অনেকখানি কমে গেল। অবশ্য রাজা অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম জন-গণের কাছে তার পরিপূর্ণ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতে পারে নি।

ভারতে গ্রীক আধিপত্যের ফলে প্রাচীন বৌদ্ধদের ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ধর্মনীতির মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। রাজা অশোক খৃস্টজন্মের ২৫০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধধর্মকে রাজ্যের প্রধান ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, পূজার্চনার জন্য স্তূপ-পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন।

রাজা অশোক ভারতের সর্বত্র বহু-সংখ্যক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। মূলত স্তূপ হল একটি গোলাকার বা চতুষ্কোণ ভিতের ওপর ইঁট বা পাথরে তৈরি একটি নিরেট গম্বুজবিশেষ।

রাজা অশোকের সময় এই স্তূপ পরিণত হয়েছিল মন্দিরে। এই স্তূপের মধ্যে থাকত বুদ্ধের পূতাস্থি, নতুবা ভস্ম, কোথাও বা প্রতীকস্বরূপে ভিক্ষা-পাত্র, আবার কোন কোনটি বা শুধুমাত্র স্মৃতিসৌধরূপেই অস্তিত্ব বজায় রেখে-ছিল। অবশ্য কালক্রমে স্তূপের অভ্যন্তরস্থ এই সকল বস্তুর গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং শুধু স্তূপটাই প্রধান হয়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হয়ে ওঠে এই স্তূপ। তাই পরবর্তীকালে এই স্তূপ শুধুমাত্র স্মৃতিসৌধরূপেই এর অস্তিত্ব বজায় রাখে নি, তা জীবনের চরম লক্ষ্য বৌদ্ধত্ব লাভের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এশিয়ার সর্বত্র বৌদ্ধ-ধর্মের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্তূপেরও নানারকম বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। তবে এর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় সাঁচী ও ভারহুতে।

সাধারণত একটি গোলাকৃতি বা চতুষ্কোণ বেদীর ওপর গড়ে ওঠে স্তূপ। এই বেদীকে ঘিরে চারদিকে কিছুটা স্থান খালি রাখা হয়। এটি 'প্রদক্ষিণ পথ'। এর চতুর্দিক ঘিরে থাকে রেলিং বা 'বেড়িকা'। বেড়িকার চারটি ভাগ থাকে। প্রথমটি এর ভিত্তি বা অবলম্বন। একে বলা হয় 'আলম্বন'। দ্বিতীয়টি হল 'স্তম্ভ'। সারিবদ্ধ স্তম্ভগুলির প্রত্যেকটির গায়ে আড়াআড়িভাবে প্রবিষ্ট থাকে বীম। এগুলিকে বলা হয় 'সূচি'। সবার ওপরে থাকে বেড়িকার শীর্ষটি বা 'উষ্ণীষ'। উষ্ণীষটি সাধা-রণত নিরাভরণ থাকে।

স্তূপের চারদিক ঘিরে থাকে একাধিক 'তোরণ' বা প্রবেশদ্বার। এই-গুলিই বৌদ্ধস্তূপের প্রধান আকর্ষণ। এই তোরণগুলি সাধারণত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক শুচিসুন্দর নিদর্শন। কথিত আছে রাজা অশোক নাকি সারা ভারতে ও আফগানিস্থানে এই রকম ৮৪ হাজার স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন, তবে তার প্রায় সবগুলিই কাল-কবলিত হয়েছে। এদের মধ্যে যে কয়টির অস্তিত্ব এখনও বজায় রয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতনামা হল ভূপালের সাঁচীতে অবস্থিত স্তূপ।

প্রধান সাঁচী স্তূপের বেদীটি উচ্চ-তায় ১৪ ফুট। গম্বুজটির উচ্চতা প্রায় ৪২ ফুট এবং এর ব্যাস ১০৫ ফুট। সব-কিছু নিয়ে স্তূপটি মোট উচ্চতা প্রায় ৮২ ফুট। পাথরের প্রায় বৃত্তাকার যে প্রাচীরটি এর চারদিক ঘিরে রয়েছে পূর্ব-পশ্চিমে তার ব্যাস ১৪৩ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৪৭ ফুট এবং উচ্চতা ২১ ফুট। অবশ্য স্যার জন মার্শালের মতে অশোকের তৈরি মূল স্তূপটি ছিল ইঁটের এবং তার আয়তন সম্ভবত এর অর্ধেক ছিল। প্রায় এক শতাব্দী পরে এর ওপর পাথরের আবরণ লাগানো হয়েছে। সম্ভবত নীচের রেলিংটিও এই সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে। নয়নমনোহর তোরণ চারটি সম্ভবত আরও পরবর্তীকালের। অশোকের অন্যান্য স্তূপও এইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সাঁচী স্তূপের শীর্ষদেশে বৌদ্ধদের প্রতীক ছাতা লক্ষ্য করা যায়। এই স্তূপের তোরণগুলির কারুকার্য ভুবনবিখ্যাত।

যাই হোক, রাজা অশোক এই সকল স্তূপে বুদ্ধের পূতাস্থি বিতরণ করে এমন এক ধর্ম আন্দোলন সৃষ্টি করলেন, যা অচিরেই পূতাস্থি পূজার মধ্যে রূপলাভ করল এবং পরবর্তীকালে স্বয়ং বুদ্ধই দেবতায় পরিণত হলেন।

প্রা চী ন ত ম বৌদ্ধমন্দিরগুলিতে কতকগুলি প্রতীকের মধ্য দিয়ে বুদ্ধের উপস্থিতিকে অনুভব করার চেষ্টা করা হত। এই প্রতীকগুলি হল স্তূপ, ছাতা, সিংহাসন বা অন্য আর কোন প্রতীক। বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা আরও পরবর্তীকালের। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অজন্তা, নাসিক প্রভৃতি গুহা-মন্দিরে। এগুলি সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম ও দ্বিতীয় খৃস্টপূর্বাব্দে। ক্রমে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবল প্রসার হল ভারতে, বৌদ্ধ-মঠ ও মন্দির ছড়িয়ে পড়ল ভারতের সর্বত্র এবং দ্বিতীয় খৃস্টাব্দ থেকে সপ্তম খৃস্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্মের রূপ গ্রহণ করল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় তক্ষশিলায়। এখান থেকেই শিল্পকলা ও ধর্মের প্রসার হয়েছিল তুর্কীস্থানে, চীনে-জাপানে এবং তিব্বত, জাভা, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে।

॥ চার ॥

এখানে আর একটা কথা বলে দেওয়া ভাল। হিন্দুদের আদি মন্দিরগুলির অঙ্কুর যে প্রাচীন বৌদ্ধ গুহামন্দিরের মধ্যে নিহিত ছিল না, এমন কথা জোর

করে বলা যায় না। কিন্তু কিছু প্রাচীন মন্দির এইরকম পাহাড় কাটা গুহার মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এরকম মন্দিরের নিদর্শন বিহারে ও বোম্বাইয়ের নিকট কারলিতে পেয়েছি।

খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কীর্তি লোমস ঋষি গুহামন্দিরটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। গয়ার নিকট বরাবর পাহাড়ের এই গুহামন্দিরটি ভারতের প্রাচীনতম গুহামন্দিরগুলির অন্যতম। এটি মৌর্য যুগের সৃষ্টি। হিন্দু মন্দিরের ছাপ এতে রয়েছে।

এইসব গুহার অভ্যন্তরভাগ বেশ প্রশস্ত। অভ্যন্তর প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত : মন্দিরের কেন্দ্রস্থল ও পার্শ্ববর্তী দরদালান। অনেকগুলি স্তম্ভই অভ্যন্তরকে এই দুটি ভাগে ভাগ করেছে। দেখা যাচ্ছে, এর মূল গঠন পরিকল্পনার সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু মন্দির পরিকল্পনার খুব বেশি পার্থক্য নেই। দ্বারললাটে ক্ষোদাইও লক্ষ্য করা যায়।

মন্দির-শিল্পের আলোচনায় এইসব গুহামন্দিরের একটা বিশেষ স্থান আছে। ডাঃ কুমারস্বামীর মতে ভারতে গুহা-মন্দিরের সংখ্যা বার শতেরও বেশি। এর মধ্যে প্রায় নয় শ' বৌদ্ধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-গুহাও আছে প্রায় শ'খানেক। অবশিষ্ট-গুলি জৈন।

জৈনেরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। তাঁরা জাতিভেদ মানেন না, বেদকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন না। তাঁরা তীর্থঙ্করদের পূজা করেন। তীর্থঙ্করেরা সিদ্ধপুরুষ। জৈনধর্মে বলা হয়েছে—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়, সর্বক্ষেত্রে জয়ী হতে পারেন সেই সকল 'জিন' বা সিদ্ধপুরুষ অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ পন্থা হল অহিংসা ও ইন্দ্রিয়জয়। তীর্থ-ঙ্করেরা স্বীয় সাধনায় বন্ধনমুক্ত হয়ে জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হন। সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভই জৈনধর্মের অন্যতম মূলকথা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ মিল আছে। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ভগবান বুদ্ধেরই সমসাময়িক। বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর জীবনের অনেক মিল আছে। উভয়ের জন্মও একই প্রদেশে।

হিন্দুরা যে অতীন্দ্রিয় জীবনের সাধনা করে, বৌদ্ধ ও জৈনরা সেই জীবনকে অতিক্রম করে নির্বাণলাভের সাধনায় ব্রতী। জ্ঞান-পুরুষ, জননেতা, মহান প্রচারক মহাবীর বলেছেন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, মনুষ্যত্ব দ্বারা প্রাণসত্তার পরমানন্দ-ময় অবস্থা লাভ করা যায়। জৈনধর্মমতে অহিংসা, দুঃখভোগ, স্বার্থত্যাগ ও প্রেম মনুষ্যত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়।

কিন্তু জৈনশিল্পের কাঠিন্য ও অনমনীয়তা একে হিন্দু ও বৌদ্ধশিল্প থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে এনেছে। জৈন-মূর্তিতে অন্তরের প্রাণস্পন্দন যত স্ফূর্ত না হোক, বিশালত্ব দিয়ে সেই অভাবকে ঢাকবার চেষ্টা সুপরিস্ফুট। মন্দির ও মূর্তি উভয় সম্পর্কেই একথা সত্য।

জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তিগুলি নিখুঁত। হাত-পায়ের অবস্থান, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন মাপজোখ করে তৈরি। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সামঞ্জস্য-বিধানের একটা নিদারুণ প্রচেষ্টা প্রকট। মূর্তিগুলিতে চাকচিক্যের কোন অভাব নেই। অভাব কেবল প্রাণের। যে প্রাণের প্রকাশ দেখি বৌদ্ধ ও হিন্দুমূর্তির মধ্যে জৈনমূর্তিতে তার অনুপস্থিতি। মূর্তির মধ্যে মানবোচিত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হলে মুখমণ্ডলে যে মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে হয়, তা কোথায় জৈনমূর্তিতে? কেবল বিশালত্ব দিয়ে বিস্ময় উদ্রেক করার প্রয়াস। তীর্থঙ্করদের মূর্তির নিরুত্তাপ মুখে সে মেজাজের কোন চিহ্নই নেই। যোগাপ-বেশন ভঙ্গিতেই হোক, অথবা কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতেই হোক, মূর্তিগুলিতে আড়ষ্টতা প্রকট।

মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে জৈনরা হিন্দুদের ঐতিহ্য অনুসরণের চেষ্টা করলেও বিশালত্ব ও জাঁকজমকের দিকে তাদের ঝোঁক ছিল খুব বেশি। রাজ-পুতানায় আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দির, আর জৈনতীর্থ পালিতানায় শত্রুঞ্জয় পাহাড় ও গিরনার পাহাড়ের বহু মন্দির এর দৃষ্টান্ত। এর একটা কারণও ছিল। জৈনরা মনে করত মন্দির নির্মাণ মুক্তি-লাভের অন্যতম উপায়। তাই শিল্পকর্মে সূক্ষ্মতা অপেক্ষা শিল্পকে বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলা ও বহু বিশাল মন্দিরের একত্র সমাবেশ করাকে তারা পুণ্য কাজ মনে করত। তাই দেখি গিরনার আর শত্রুঞ্জয়ে কী অসীম অধ্যবসায় ও অমানুষিক পরিশ্রমে সুউচ্চ পাহাড়ে মন্দিরনগরী গড়ে তোলা হয়েছে।

# ত্রিপুরা সমাচার

সমস্যাসংকুল ত্রিপুরার প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দেশ ভাগের আগে এই রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লক্ষ। এখন এই জনসংখ্যা ১৭ লক্ষ হয়েছে। প্রধানত পাকিস্তান, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম জেলার লোকই এখানে অধিক সংখ্যায় এসেছে। মুসলমান আমলে উভয় ত্রিপুরা একটি বৃহৎ জেলা ছিল। ইংরেজ আমলে বৃটিশ ত্রিপুরা ও স্বাধীন ত্রিপুরা—এই দুই ভাগে ত্রিপুরা রাজ্য বিভক্ত হয়। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজারা অন্যান্য সামন্ত নৃপতিদের মত হলেও তাঁদের দেশপ্রেমও ছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-সাধনায় এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের জন্য এই পরিবারের যথেষ্ট অবদান আছে। নেপালের রাজ-পরিবার ও রাজস্থানের রাজপুত পরিবারের সঙ্গে এঁদের অধিকতর আত্মীয়তা ছিল। বর্তমানে রাজপরিবারের ছেলে-মেয়েদের ঐসব কৌলীন্য আর নেই—এখন বাঙালী পরিবারের সঙ্গেই তাদের আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্যান্য রাজন্যবর্গেরই মত এই রাজ্যের নৃপতিদেরও কলকারখানা গড়ার দিকে তেমন নজর ছিল না। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনেও এই রাজ্যে আশানুরূপ শিল্পায়ন হয় নি। শিল্পায়নের প্রধান অসুবিধা হোল এই রাজ্যে বিদ্যুতের অভাব এবং প্রাকৃতিক খানিকটা অসুবিধাও আছে। অতীতে এই রাজ্য অধিকতর পার্বত্যময় ছিল, উদ্বাস্তু জনস্রোত পার্বত্য ভূমিকে সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত করে চাষের উপযোগী করছে। ভারতের অন্যান্য ইউনিয়ন টেরিটরি ও রাজ্যগুলির মত ত্রিপুরাও মুখ্যত কৃষির ওপর নির্ভর-শীল। দেশ ভাগের আগে পর্যন্ত এই রাজ্য খাদ্যে স্বয়ম্ভর ছিল। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলেই এই রাজ্য একটি ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। প্রথম পরি-কল্পনার আগে ত্রিপুরার একরপ্রতি উৎপন্ন ফসলের গড়পড়তা পরিমাণ খুবই কম ছিল এবং চাষের উন্নত প্রথা ছিল অজ্ঞাত। অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনের কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট না ধরেই প্রথম পরি-কল্পনাকালে ব্যাপক চাষের একটি পরি-কল্পনা রূপায়ণ করা হয়। রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেও তিনি কাজ করেছেন, কাজেই তিনি খানিকটা বাস্তববাদী ও পরি-কল্পনার প্রতি তাঁর আগ্রহ আছে। স্বাস্থ্য ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীতড়িৎ দাশগুপ্তও একজন পুরনো রাজনৈতিক নেতা। দীর্ঘদিন আমরা ইংরেজের আমলে একই জেলে কাটিয়েছি। বর্তমানে শ্রীসিংহ ও শ্রীদাশগুপ্তের মধ্যে মনান্তর হওয়ায় রাজ্যের অগ্রগতি যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অথচ উভয়েই ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসী। বাম কমিউনিস্টদের চীন-ঘেঁষা নীতির জন্য গত নির্বাচনে তাদের শক্তি কমে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। ত্রিপুরা উপজাতি-দের মধ্যে বাঙালী-বিরোধী প্রচারমূলক একটি হ্যান্ডবিল মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায় ছড়িয়ে দেন। উদ্বাস্তুরা তাতে ভয় পান। একবার এখানে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে—তারপর যদি ত্রিপুরীরা আলাদা সিডিউল দাবি করে, তাদের তাড়ায়, সে-সব আতঙ্কে তারা বাম কমিউনিস্টদের ভোট দেয় নি। ফলে, ৩০টি বিধানসভার আসনের মধ্যে বাম কমিউনিস্টদের আসন মাত্র ৩টি এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আসন ১টি। গত সাধারণ নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক অংশ গ্রহণ করে নি। কিন্তু বর্তমানে তরুণ শ্রেণীর মধ্যে ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক ক্রমেই সংঘবদ্ধ হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যেও তাদের সংগঠন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাগা, মিজোজাতীয় উপদ্রব যাতে এখানে বৃদ্ধি না পায় এবং বাইরের প্রভাবে এই রাজ্যের স্বাধীনতায় যাতে আঘাত না আসে, সেদিকে এখন সকলেরই দৃষ্টি

**কমিউনিস্টদের শক্তিই অধিক।**

**বিভিন্ন পরিকল্পনায় বীজাগার স্থাপন অনাবাদি জমি উদ্ধার, কর্ষণযোগ্য জমির প্রসারের জন্য ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ফলের চাষ বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিকল্পনা-গুলির দ্বারা রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যার খানিকটা সুরাহা হয়েছে। জাপানী প্রথায় চাষের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।**

ত্রিপুরায় বন্যার প্রকোপ মোটেই বন্ধ করা যায় নি। এটা ত্রিপুরা সরকারের ব্যর্থতার অন্যতম নিদর্শন। উদ্বাস্তুরা অতি কষ্টে ঘরবাড়ি নিজেরাই নির্মাণ করেছে—তাতে সরকারী সাহায্য বিশেষ নেই। কিন্তু বার বার বন্যা হওয়ায় তাদের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকারের যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ত্রিপুরার শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্পশিক্ষণ সংস্থা, পশিক্ষণ কেন্দ্র, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটগুলিকে সাহায্য-দান এবং স্থানীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, হস্তশিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের যদিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তবু এই রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যার তুলনায় এই প্রচেষ্টা খুব অধিক নয়।

ত্রিপুরার বাঁশ-বেতের শিল্প নিদর্শন খুবই উল্লেখযোগ্য। বাঁশ-বেতের এমন মনোজ্ঞ কারুশিল্প অন্যান্য রাজ্যে বিরল। অবিভক্ত বাংলায় ত্রিপুরা রাজ্যের আশে-পাশের প্রতিটি জেলার মুসলমান কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী এখানকার বাঁশ-বেত ও শনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ-সব দরিদ্র মানুষের এই উপজীবিকাটিই এখন নষ্ট হয়ে গেছে। ত্রিপুরার তাঁতশিল্পও খুব উন্নত। পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাজী হ্যান্ড-লুম, পাওয়ার লুম ইত্যাদি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অথচ ত্রিপুরার তাঁত-শিল্প আরও উন্নত ধরনের।

মাত্র ১০ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ত্রিপুরার ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন লিমিটেড চালু করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এটা নগণ্য। এই কর্পোরেশন ত্রিপুরার শিল্পগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করছে। শিল্পের মান উন্নয়নের জন্য বিপণন প্রচার, সাহায্যকৃত হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরার শিল্পকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে না পারলে এই রাজ্যের শিল্প বিস্তারের অসুবিধাগুলি থেকেই যাবে। বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এবং সীমিত সম্পদের জন্য এই রাজ্য কেন্দ্রের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই

ব্যাপারে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত এই রাজ্যকে সুরক্ষিত করে না রাখলে সারা দেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত আসতে পারে। এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের নতুন প্রচেষ্টা দরকার। রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও পরিব্যাপ্ত করে বেকার-সমস্যা সমাধানের সার্থক প্রচেষ্টা করতে হবে। সংগীত, চারুকলা প্রভৃতিতে এই রাজ্য বহু আগে থেকেই ঐতিহ্য অর্জন করেছে। এই রাজ্যের শিক্ষাও ক্রমেই বিস্তারলাভ করছে। আসল সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। কেন্দ্রীয় তেল ও পেট্রোলিয়াম-মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এই রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত। তিনি এখানে একটি তেল শোধনাগার স্থাপনের চেষ্টা করছেন। নতুন তেল সম্পদ-কেন্দ্রের সন্ধান চলছে। চা ও রবার বাগানের প্রসার, কাজু বাদামের উন্নয়ন, অরণ্য সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও আহরণ দ্বারাও এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের খানিকটা সুরাহা হবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও এই রাজ্যের আর একটি প্রধান সমস্যা। পশু-পালন ও দুগ্ধ সরবরাহ প্রভৃতি প্রকল্পেরও অধিক রূপায়ণ প্রয়োজন।

—ধীরেন ভৌমিক

**বিরাম** নেই, বিশ্রাম নেই, রোজই নাকে দড়ি পরে ভালুকটা হাঁটে। চারপায়ে থপ্ থপ্ করে নিঃশব্দে মনিবের পিছু পিছু চলে। গলার ঘুঙুরটা একটানা টিং টিং করে বাজে। পথচারীরা থমকে দাঁড়ায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, বাচ্চারা ছুটে আসে। কিন্তু এত কাছে থেকেও ভালুকটা যেন ঘুঙুরের আওয়াজ শোনে না, কেবল একমনে মুখ নিচু করে মনিবের পায়ের দাগের ওপর পা রেখে চলে।

গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে তেতে পথের মাংস গলতে থাকে। খালি পায়ে সে পথে চলা দায়। টায়ারের চটি পরে মনিব হাঁটে, থেকে থেকে এ-বাড়ি, ও-বাড়ির দিকে তাকিয়ে হেঁড়ে গলায় হাঁকে—"নাচ দেখে যান, ভালুকের নাচ।" তখন সেই উত্তপ্ত পথের বুকে চারপায়ে দাঁড়িয়ে ভালুকটা হাঁপায়। থাবার নরম মাংসে গরম পিচ্ অসংখ্য ছুঁচ ফোটানোর জ্বালা ধরায়। মাঝে মাঝে উবু হয়ে থাকা শরীরটা কেঁপে ওঠে। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। পিছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চায় জন্তুটা। যেন নিজেকে ফিরে পেতে চায়, ফিরে যেতে চায় সেই অতীতে, সেই অরণ্যে, যেখানে সে স্বাধীন ছিল, সহজ ছিল, উদ্দাম ছিল। যেখানে তার জন্য অফুরন্ত খাদ্য, অফুরন্ত আনন্দ ছিল। যেখানে তার আলাপের, বিলাপের সাথীরা আজও তাকে খোঁজে। যেখানে সুউন্নত শালের মূল, ভূমি ছুঁয়ে ফুটে ওঠা বাসফুল তার দু' চোখে কোনও বিস্মিত জিজ্ঞাসার জন্ম দিত।

কিন্তু এখানে, সম্পূর্ণ বিপরীত এক পরিবেশে বিশেষ কিছু করার আগেই একটা চামড়ার ছিলা বিদ্যুতের মত ছুটে এসে তার পিঠে আছড়ে পড়ে। লোমচটা, শীর্ণ পিঠ বেয়ে রক্তের ক্ষীণ ধারা নামে। বেত খেয়ে আবার শান্ত হয়ে যায় সে।

ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে কুঁই কুঁই করে। তাকে দেখে পাড়ার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো নিরাপদ দূরত্বে থেকে চিৎকার করে। আশ্চর্য! কুকুরের চিৎকারে ভালুকটা মারের ব্যথা ভুলে গিয়ে মনিবের গা ঘেঁষে কাঁপে। তখন আর অতীতকে মনে পড়ে না ওর। ও তখন বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত। শান্ত, অনুগত লোমশ দেহটা যেন মনিবের পায়ের ওপর ভেঙে পড়ে, আশ্রয় চায়। আজ সামান্য ক'টা কুকুরও ওকে ভয় দেখাতে পারে!

কুকুর আর মনিবের চিৎকারে একটি-দুটি করে জানালা খুলতে থাকে, জানালার শিকে ফোলা গাল রেখে মেয়েরা অর্থহীনভাবে বাইরের দিকে তাকাতে গিয়ে অবাক হয়ে যায়—ও-মা ভাল্লুক! দেখ্ সেজদি, দেখ্, ভালুক এসেছে। সে উচ্ছ্বসিত আহ্বানে ভালুকওয়ালা জানালার নিচে এসে দ্বিগুণ জোরে ডুগ-ডুগী বাজায়। ভালুকটাও যেন নড়েচড়ে তৈরি হতে থাকে। কেন না সে বুঝতে পেরেছে যে, প্রত্যহ বেশ কয়েকবার এই অদ্ভুত দৌড়ঝাঁপ এবং হাঁকডাকের সাথে তার খেতে পাওয়ার একটি বিশেষ যোগা-যোগ আছে। তাই মনিবের থেকে তাকে যেন অনেক বেশি উৎসাহী মনে হয়। মনিব তার এই উৎসাহের কারণ বুঝতে না পেরে একে তার প্রতি আনুগত্যের লক্ষণ বলেই মনে করে। বলে—সাবাস, কার্ত্তিক সাবাস, বেটা আমার আরবী ঘোড়া, বেটা আমার আফ্রিকার সিংঘ, বেটা আমার সুন্দরবনের টাইগার, বেটা আমার......কথা খুঁজে না পেয়ে তাল বজায় রাখতে আরও জোরে ডুগডুগী বাজায় মনিব। ঘুঙুর নাড়িয়ে ভালুকটা নাচ শুরু করে। বাড়ির জানালায়, বারান্দায়, ফুটপাতে ধীরে ধীরে ভিড় জমাট বেঁধে ওঠে। এক টুকরো রুটি বা একটা কলার স্বাদ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভালুকটা নির্ভুল খেলা দেখায়। দেখায় সে মানুষের মতই স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ে, রাজনীতি করে, বক্তৃতা দেয়, বিয়ে করে, বউকে গান শোনায় এবং আশ্চর্য, এই সব খেলা সে একা একাই করে! নিজেই মাস্টার, নিজেই ছাত্র, নিজেই বর, নিজেই বউ, সে

এক অথচ একা নয়। যেন আর কেউ পাশেই আছে তার।

মাটিতে পেতে-রাখা তেলচিটে ছেঁড়া গামছাটার ওপর পয়সা গড়াতে থাকে। ডুগডুগী বাজাতে বাজাতে মনিব আড়-চোখে গোণে, খেয়াল রাখে সিকি বা আধুলি পড়ে কি না, পড়লে উৎসাহে লাফিয়ে উঠে সেলাম করে, গলা খুলে চেঁচিয়ে বলে—কাত্তিক বাবুকো সেলাম দো। দু' পায়ে দাঁড়িয়ে ভালুকটা সেলামের ভঙ্গি করে। সবাই উল্লাসে হৈ হৈ করে ওঠে। মেয়েরা অবাক—দেখেছেন বৌদি! কেমন কথা বোঝে, ঠিক যেন মানুষ, না!

খেলার শেষে ঘুঙুর দুলিয়ে চারপায়ে হেঁটে পাড়া ছেড়ে যায় ভালুকটা। মনিবের হাতের ডুগডুগী ঢিমে তালে বাজে, সে তখন মনে মনে হিসেব কষে—কত হোল, ক'জন দিল, ক'জন সেরেফ ফাঁকি দিল, এবার কোন্ পাড়ায় যাবে ইত্যাদি। আর ভালুকটা পিচের গায়ে নাক লাগিয়ে রোদের তাপ কমল কি না পরীক্ষা করে। কেন না সে জানে যখন পথ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে আসে, চারপাশের আলো নিভে যায়, তখন মনিব ডেরায় ফেরে আর সেই বহু প্রত্যাশিত রুটি, কলা আর জল পাওয়ার সময় হয়।

শ্রাবণের বর্ষণে কোন কোনদিন সারা শহর ভিজে কাঁথার মত সপ্‌সপ্ করে। সবাই ঘরমুখো, এমন কি যারা আপিসে আসে বা কাজে বেরোয়, তাদের মনও সেই পরিচিত আশ্রয়েই পড়ে থাকে, সাথে আসে না, যেন ছুটি নেয়। বাঘা-মুখো বড়বাবুও সেদিন জানালা দিয়ে সকালের পৃথিবীটা দেখে, যে পৃথিবী থেকে সে এতদিন স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছিল। কান খাড়া করে বড়বাবু কি যেন শোনে, কে যেন তার নাম ধরে ডাকে—এমন দিনেও বাইরে থাকতে আছে! কিন্তু এমন দিনেও ছুটি মেলে না একজনের। একটি প্রাণীর। জল ঠেঙিয়ে মালিকের পিছু পিছু কোনও এক পাড়ায় চলে আসে ভালুকটা, যে পাড়ায় অনেকেই সেদিন বাইরে যাবে না,—কেন না পাড়া ছেড়ে বেরোলেই হাঁটু ছাপিয়ে জল। —থাকগে, কাজ নেই গিয়ে। একটা দিন তো মোটে! ভালুকের মনিবও তাই বেছে বেছে সে পাড়ায় যায়। ডুগডুগীর আওয়াজে হঠাৎ ছুটি পাওয়া লোকগুলো কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, ছেলে থেকে বুড়ো, মেয়ে থেকে পুরুষ সবাই! ডাকাডাকি করে পরস্পরকে জানায়—ভালুক এসেছে, ভালুক, দিনটা মন্দ কাটবে না মনে হচ্ছে, ডাকুন লোকটাকে। লোকটা নিজেই আসে। পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে গামছাটা পাতে। তারপর উবু হয়ে বসে হাতে গুটিয়ে রাখা দড়িটা ছাড়তে থাকে। অভ্যস্ত ভালুকটা বোঝে এরপর কি হবে বা কি করতে হবে তাকে। কিন্তু একটানা বৃষ্টিতে ভিজে লোমগুলো দেহের সাথে সাপটে আছে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় নাচের তাল ভুল হয়ে যায়। দামী পোষাকে মোড়া অতিকায় এক মাড়োয়ারীকে দেখে মনিব ব্যস্ত হয়ে বেত চালায়, বলে—শালা বেল্লিক, বেয়াড়াপনা হচ্ছে, নাচ ঠিক করে! ধীরে ধীরে ভালুকের নাচ ছুটির সকাল মেতে ওঠে। ছেঁড়া গামছাটার ওপর একগাদা খুচরো জমে। মনিব সেদিন একটা আস্ত বোতল কেনার কথা ভাবে।

শীতের সন্ধ্যায় নির্জন বি-টি রোড ধরে ভালুকটা ডেরায় ফেরে। আগে আগে মনিব, একটা তুলোর কম্বলে আপাদ-মস্তক মোড়া, যেন এক টুকরো সজীব অন্ধকার। বিড়ি টানে আর গুনগুন করে মনিব। লঘু পায়ে চলে। পেছনে জন্তুটা ঠাণ্ডায় কুঁই কুঁই করে। অনাহারে, অযত্নে অনেক লোম ঝরে গেছে, শীতে কুঁকড়ে উঠছে শরীটা, তবুও সেই কয়লা-ঘুঁটে রাখবার ঘুপচী ঘরের উষ্ণতা, একটু রুটি আর জলের তাগিদে সে নিবিষ্ট মনে হাঁটে। মাঝে মাঝে অভ্যাসের বশে মনিব তার পিঠের ওপর সজোরে বেত কষিয়ে বলে—জোরে চল শুয়ার, জোরে চল।

খুব ভোরে যখন মহাপৃথিবীর ঘুম তরল হয়ে আসে অথচ ভাঙে না, তখন জেগে উঠে চারপাশের নীরবতায় ভালুকটা কি যেন খোঁজে। টিনের ঠাণ্ডা দেওয়ালে নাক রেখে কি যেন শোঁকে। দু' পায়ে ভর দিয়ে ভেঙে-যাওয়া অংশটায় মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে। বোধহয় ওর সেই আরণ্যক অতীতের অনুসন্ধান করে, যেখানে কালো পাথরের আড়ালে বসে ঝরণা গান গায়, যেখানে মহুয়ার গন্ধে বাতাস ভরে থাকে, যেখানে গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে তার প্রেমের সাথী তাকে ডাকে, মিলনের নেশায় ছুটে এসে তাকে বুকে জাপটে ধরতে চায়। এই ঘুপচী ঘর, এই দড়ির বন্ধন, এই অনাহারের অবসান ঘটানোর প্রতিজ্ঞায় ভালুকটা টিনের গায়ে সজোরে থাবা মারে। পাশের ঘরে মনিবের তন্দ্রা জড়ানো ডাক শোনা যায়—এই কাত্তিক, চোপ্! অতবড় দেহটা নিমেষে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়! জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে ভালুকটা। কুতকুতে চোখ মেলে মাটির ওপরে ঠিক্‌রে-পড়া আলোর রেখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু মনিবও কি কিছু খোঁজে না, কিছু চায় না, কোনও স্বপ্ন দেখে না? তার চোখের পাতায় কি লেগে নেই একই ছবি?

অঘোরের কথা

মনিব অঘোর বলে—পারুল আমি রোজ রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখি। দেখি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তুমি চুল বাঁধছ। আমি কাছে যেতেই ডাকছ, বলছ—ঘরে আসবে না? ঠোঁট বাঁকিয়ে পারুল বলে—মরে যাই মরে যাই, ঐ তো চেহারা, ঐ তো সুরত, তোমায় ডাকব না তো কাকে ডাকব শুনি? এদিক-ওদিক তাকিয়ে খপ্ করে পারুলের একটা হাত চেপে ধরে অঘোর, ফিসফিসিয়ে বলে—বিশ্বাস কর, তোমায় ভালবাসি আমি, তোমায় নিয়ে ঘর করতে চাই। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেয় পারুল। পানের পিক ফেলে বলে—হেঃ! ভালুকের নাচ দেখিয়ে বেড়ায় যে তার আবার ঘর বাঁধার শখ! বয়ে গেছে আমার তোমায় বিয়ে করতে। অপমান গায়ে মাখে না অঘোর, মুখে জোর করে হাসি এনে বলে—তবু তো খেটে খাই, স্বাধীনভাবে থাকি, দশটা-পাঁচটায় ডিউটি দেই না, ভিক্ষে করি না। তুমি এলে অন্য কিছু করব, না হয় অন্য কোনও ব্যবসা। পারুল অবিচল,

বলে—ধ্যুৎতোর, চাটুজ্যেগিন্নীর বাড়ি যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, একগাদা বাসন পড়ে আছে, পথ ছাড়। পারুল হন হন করে বেরিয়ে যায়। অঘোর তবুও দাঁড়িয়ে থাকে। যেন বাতাসে পারুলের গায়ের গন্ধ শোঁকে। কেউ দেখছে তো দেখুক। অঘোর মরিয়া। অঘোর পারুলকে চায়। পারুলকে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে, সুখের ঘর, লক্ষ্মীর ঘর।

কিন্তু পারুল অঘোরকে চায় না। বেঁটে, মোটা, মিশকালো ডালুকওয়ালা অঘোর হবে তার মত মাসে চল্লিশ টাকা রোজগেরে সোমত্ত মেয়ের বর। পাগল নাকি। তবু অঘোর হাল ছাড়ে না। পেছনে পেছনে ঘোরে, ফাঁক পেলেই মনের কথা বলে, টুকটাক এটা-সেটা কিনে আনে, পারুলের হাতে তুলে দেয়। উপহার নিতে পারুলের আপত্তি নেই কিছু।

বস্তির লোকেরা হাসে। তবে দু-চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধু উপদেশ দেয়, বলে—অঘোর, তুই ও মেয়ের আশা ছাড়, ও তোকে চায় না, কেন ওর জন্যে অত কেনাকাটা করিস, অত ফুট-ফরমাস খাটিস, তার চেয়ে একটা বিয়ে-থা কর, ওর দাঁত ভেঙে যাবে। অঘোর শোনেই না সে সব কথা। শিবের মত নির্লিপ্ত হয়ে পরামর্শগুলো উপেক্ষা করে। বেশি কিছু বললে দাঁত বার করে হাসে। বন্ধুরা রাগ করে চলে যায়। অঘোরের হাসি আরও বাড়ে। পারুলের প্রতি আকর্ষণ একমাত্রাও কমে না তার।

গ্রীষ্মের কোনও উত্তপ্ত দুপুরে যদি পারুল বলে—আঃ! আজ যদি কেউ আমায় তরমুজ খাওয়াতো! শুনেই অঘোর লাফিয়ে ওঠে—খাবে তরমুজ, আনব? যেন অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অঘোরকে দেখতে চায় পারুল। তাচ্ছিল্যের সাথে বলে—হেঃ ডালুকওয়ালা খাওয়াবে তরমুজ, তবেই হয়েছে। নিজের পেট চলে না, উনি আমায় তরমুজ খাওয়াবেন! অঘোর ততক্ষণে রাস্তায় নেমে গেছে।

বেশ খানিক বাদে বিরাট একফালি তরমুজ নিয়ে ফেরে অঘোর। পারুলের ঘরের কাছে যেতেই অম্লানবদনে হাত বাড়িয়ে দেয় সে। অঘোরের মুখে কৃতার্থের হাসি ফোটে। খোসমেজাজে ডালুকটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আবার। মনে মনে ভাবে—এক শিশি অগুরু এনে দিলে কেমন খুশি হবে পারুল, নাকি এক কৌটো পাউডার দেবে। এদিকে পারুল তার সইদের নিয়ে তরমুজ খায় আর বলে—ব্যাটা রামবোকা। সইদের মধ্যে একজন তাকে খুশি রাখার জন্যে বলে—ওকে বর কত্তে হবে না, নোকর রাখলেই ধন্যি হয়ে যাবে। বাকী সবাই সায় দেয় তার কথায়।

পারুল জানে যে অঘোর আছে, কিন্তু অঘোর জানে না যে পারুল নেই। পারুল অঘোরকে ব্যবহার করে অঘোর ভাবে এটাই ভালবাসা। পারুল অঘোরকে বিদ্রুপ করে, অঘোর ভাবে আর কি পারুলের মধু এবার গলে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুই হয় না। কাঠের পুতুলের মত অঘোর পারুলের কথায় ওঠে বসে, রোজগারের একটা মোটা অংশ প্রতি মাসে পারুলের জন্যে খরচা করে। বস্তির লোকেরা বলে—শালা একদম পাগল। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে শালার। পারুলকে কেউ কিছু বলে না, কেন না পারুল তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলে তাদের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। শুধু বলে—মেয়েটা খেলুড়ে বটে।

প্রতি রাতে অঘোর বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। বার বার উঠে জল খায়, বিড়ি টানে, মাঝে মাঝে হাউ হাউ করে কাঁদে, ছেঁড়া, তেলচিটে বালিশটাকে তালগোল পাকিয়ে মুখের কাছে চেপে ধরে ডাকে—পারুল, পারুল, কতদিন আর কতদিন এমনি করে থাকব, বল? বলা বাহুল্য তার আর্তনাদ বা বিলাপ কখনই পারুলের কানে যায় না। পারুলের ঘর অনেকটা দূরে এবং তার ঘুমও বেশ গাঢ়। এক সময় ক্লান্ত অঘোরও ঘুমিয়ে পড়ে, হয়ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পারুলের স্বপ্ন দেখে, কেন না

সে সময় সে হাসে আর বিড়বিড় করে। এর পর যথানিয়মে ভোর হয় এবং অঘোর জেগে ওঠে।

এক সন্ধ্যায় পারুল হঠাৎ অঘোরের ঘরে এসে ঢুকল। ডাকল—এই, কি করছ? অঘোরের চোখ যেন ভূত দেখেছে। খানিকক্ষণ তো কথাই বলতে পারল না, তারপর যাও বা বলতে লাগল, তার মাথা-মুণ্ডু নেই। পারুল বলল—অঘোরদা আমার ভীষণ বিপদ, তুমি না দেখলে মরেই যাব আমি? অঘোর লাফিয়ে উঠল—কি হয়েছে বল, আমি তো আছি।

পারুলকে এমন নরম হতে, এত নিবিড়ভাবে কাছে ঘেঁষে দাঁড়াতে সে আর কোনদিনও দেখে নি। পারুল বলল—পরে বলব সব কথা। আগে তুমি আমায় গোটা ষাটেক টাকা দিতে পার? দেশে বুড়ী মাকে পাঠাবে বলে কিছু টাকা রেখেছিল অঘোর, তার অনেক কষ্টের সঞ্চয়। কোনও কিছু না ভেবেই টাকাটা বার করে আনল সে, বলল—এই যা আছে, আর তো নেই! এতে হবে? পারুলের যেন দাঁড়াবারও সময় নেই।

টাকাটা হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিতে নিতে বলল—ওতেই হবে। পারুল হন হন করে বেরিয়ে গেল। অঘোরের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা এতই আকস্মিক এবং অদ্ভূত ঠেকেছিল যে, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বেশ কিছু সময় বাদে প্রতিবেশী গণেশ মান্না দৌড়ে এল—অঘোর শীগ্‌গির এস, তোমার পাখী পালাচ্ছে। অঘোর আরও অবাক। প্রথম ধাক্কা না সামলাতেই দ্বিতীয়টি হাজির। গণেশ মান্না বলল—চটপট বাইরে এস, চাটুজ্যেদের ছোট ছেলে পারুলকে নিয়ে পালাচ্ছে। অঘোর এই প্রথম কথা বলল—আমি কি করব? —গণেশ খিঁচিয়ে উঠল—আমি কি করব? বেটা আস্ত বোকা, তোমার টাকা-পয়সা উড়িয়ে অন্য লোকের সাথে পারুল চলে যাচ্ছে, তুমি বসে বসে তাই দেখবে? সম্বিত ফিরল বুঝি অঘোরের।

গলির দিকে ছুটল সে। পেছনে গণেশ।

রাস্তার মোড়ে পারুল আর চাটুজ্যেদের ছোট ছেলেটা একটা ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় অঘোর হাঁপাতে হাঁপাতে এল, ডাকল—পারুল, পারুল। পারুল ট্যাক্সির ভেতরে উঠে মুখ বার করে ভেংচী কাটল—খোঁৎ বেটা ভালুক! যা না। ঘরে তো তোর দোসর বসেই আছে। চাটুজ্যেদের ছেলেটা হো হো করে হেসে উঠল, বলল—সর্দারজী চালাও।

অঘোরের গায়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল।●

"সবিনয় নিবেদন,

আমরা মফস্বলের মানুষ। দৈনিক খবরের কাগজের মুখ সচরাচর দেখতে পাই না। নির্ভর করি আমরা আকাশবাণী প্রচারিত বাংলা সংবাদের উপর। কোন সংবাদটা ঠিক-বেঠিক সে রকম যাচাই করার সুযোগ আমাদের কম। তবে ঘটনার ফলাফল দেখে বুঝি কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, কোন দলটাকে মাথায় তোলা হোল, কোনটাকে বা নামানো হোল। অভ্রবাহন মশাই এ-সবের আলোচনা আপনি করুন। আমরা তা হলে আকাশবাণীতে খবর পরিবেশনের রীতিনীতি বুঝতে পারব।

আজ কিন্তু আমার বক্তব্য অন্য রকম। সংবাদ পাঠের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ, কণ্ঠস্বরের দিকে নজর দেন না। কী কলকাতা, কী দিল্লী দু' জায়গা থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ শোনার সময় কখনো কখনো মনে হয় এর চেয়ে কি ভালোভাবে সংবাদ প্রচার করা যায় না। সংবাদ শুনতে শুনতে যদি কান বিরক্ত হয়ে ওঠে, তা হলে মনও যে তিক্ত হয়ে ওঠে।

আশা করি, এই সম্পর্কে আপনার মন্তব্য দেবেন। ইতি—

বিনীত

**ভোলানাথ দাস**

গ্রাম ঃ বেলেন্ডা

পো ঃ শ্রীপাট পুরুলীয়া

জেলা ঃ বাঁকুড়া।"

গত ৪ঠা মার্চ এই পত্রটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। চিঠির বক্তব্য সম্বন্ধে আপাতত আমরা কোনো মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ উপর্যুক্ত অভিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে আমরা মনে করি।

**মালঞ্চ**

পক্ষকাল পূর্বে 'মালঞ্চ' অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করেছিলাম। বলা বাহুল্য, অনুষ্ঠানটি সুপরিবেশিত বলেই ঐ সম্পর্কে আমরা আমাদের মন্তব্য উপস্থাপিত করেছিলাম—যাতে 'মালঞ্চ' সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

এবারেও সেকালের জনপ্রিয় নাটকগুলির কিছু গান শোনানো হোল। আনন্দের কথা, দু'-একটি গান এবার গেয়েছেন সেই জাতের শিল্পীরাই—যাঁরা বিশেষ জাতের সঙ্গীতেই বাংলাদেশের হৃদয় জয় করেছেন।

**শিল্পী-সাহিত্যিকদের পারিশ্রমিক**

এবার আমরা একটি জরুরী প্রশ্ন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির করতে চাই, প্রশ্ন হচ্ছে এই—আকাশবাণীর শিল্পীরা এখন যে পরিমাণ অর্থ পারিশ্রমিক হিসেবে পান, তা দশ-বারো বছর আগে প্রদত্ত পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি কি না। অর্থাৎ 'ক' বাবু দশ-বারো বছর আগে যদি কোনো দিনের সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য যদি এক টাকা পারিশ্রমিক পেতেন, তা হলে তিনি এখনো কি ঐ হারে পারিশ্রমিক পান? শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে দু-একটি অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। তাঁদের অভিযোগ এই যে, দশ-বারো বছর আগে তাঁরা যে পরিমাণ অর্থ পারিশ্রমিক পেতেন, এখনো সেই পরিমাণ অর্থ পারিশ্রমিক পান।

গত দশ-বারো বছরে প্রায় সর্বত্রই, টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে, প্রত্যেকেরই পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্য অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু সামান্য আয়-বৃদ্ধির তুলনায় ব্যয়ের বহর অনেক বেশি।

এই ব্যয়ের হাত থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকরাও মুক্ত নন। তবে তাঁরা দাবি আদায়ের জন্য চড়াও হন না অন্যদের মতো—এখানেই শুধু তফাৎ। তাঁদের মুখসর্বস্ব মনে হলেও, হিসেব-নিকেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মুখচোরা। অথচ ট্রামে-বাসের ভাড়াও এখন তাঁদের আগেকার তুলনায় বেশি দিয়ে আকাশবাণী ভবনে যেতে হয়।

তাই আমাদের নিবেদন, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ শিল্পী-সাহিত্যিকদের পারিশ্রমিক দানের ব্যাপার নিয়ে একটু চিন্তা করুন।

**বেতার জগৎ**

'বেতার জগৎ' পত্রিকাটি শুধু অনুষ্ঠান প্রচারের পত্রিকা নয়, এতে কিছু ভালো জিনিসও থাকতে পারে সম্পাদক মহাশয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন দেখে আমরা আনন্দিত। বেতার জগতের ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যার (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০) প্রচ্ছদপটে জীবনানন্দের প্রতিমূর্তি (স্কেচ) এবং তাঁর পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র সুন্দর।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতাকে যেভাবে চরমোৎকর্ষ দান করেছেন, তা বিস্ময় উৎপন্ন করে। তবে বাংলা কবিতাও অনেক এগিয়ে গেছে। বেতার জগতের ঐ সংখ্যাতেই পড়লাম দু'টি কবিতা। আমরা দু'জন কবির দু'টি কবিতা থেকেই কয়েক পঙ্‌ক্তি করে তুলে দিচ্ছি। আশা করি, আপনারা অনুমান করে নিতে পারবেন, জীবনানন্দের পর কবিতা এখন চরমোৎকর্ষের কোন্ জগতে বিচরণ করছে।

(১) "—যা একান্ত সত্য ছিল এতদিন—
পরাজিত হলো আমার হঠাৎ ফিরে
পাওয়া
এই হারানো সুরটির কাছে।"

(হারানো সুর)

* * *

(২) "আমার সবে-ধন-নীলমণি
তন্ময় হয়ে আয়নায় দেখেছিল
নিজেকে।"

(শঙ্করাচার্য)

হায় জীবনানন্দ, তোমার উত্তরসাধকদের হাতে গজিয়ে ওঠা এই কবিতার ফসল?

—অভ্রবাহন

**লোকসংগীতের একাল না আকাল প্রসঙ্গে**

৭৯ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যার "লোকসংগীতের একাল না আকাল" প্রবন্ধটির জন্যে মুরশিদকে ধন্যবাদ। তাঁর এ প্রবন্ধটি আমায় সেই গ্রাম্য গল্পটি মনে করিয়ে দিল। কোন গ্রাম্যবধূকে কেউ একজন একটু চুণ চাইলে সে পর পর উত্তর করে যায় - 'আমি বিধবা, আমার কাছে 'চুণ'? অর্থাৎ আমি পান খাই? আমি ভ্রষ্টা? আমার চরিত্র নিয়ে কথা বলার স্পর্ধা তো কম নয়?' ইত্যাদি- আশুবাবু নীরব ছিলেন, তাই তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে নীরবতার চক্রান্ত করেছেন বলে ধরে নিলেন এবং নানা জায়গা থেকে দীনেশবাবু সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য তুলে ধরলেন এবং প্রমাণ করলেন দীনেশবাবুকে আশুতোষ ভট্টাচার্য আরেকবার অপমান করার জন্যই যেন "ময়মনসিংহ গীতিকার মূল্যায়ন' করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং এক জায়গায় তাঁর কটু মন্তব্য ঃ 'তাতে মনে হয়, তিনি লোকসাহিত্য কিছু চর্চা করেছেন বটে, কিন্তু লোকসংগীত কিছুই বুঝেন না।' মনে হয় লেখকের বিদ্বেষ-বিষ চিত্ত থেকে উৎসারিত। কোন পত্রিকায় যে তা ছাপা যায়, ভাবা যায় না। জানি না, এ প্রতিবাদপত্রের কি গতি হবে। যে পত্রিকায় নোংরামী ছড়ায়, তাতে প্রতিবাদপত্রের জায়গা সাধারণত হয় না, তবু সাংবাদিক সততা না। অন্য পত্রিকায় প্রতিবাদপত্র দেয়া অসোজন্যমূলক, তাই পনেরটা পয়সার ঝুঁকি নিতে হল।

প্রথমত আশুবাবু লোক-সাহিত্য কিছুটা যে চর্চা করেছেন তার দুটি প্রমাণ ঃ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিশেষ পত্র হিসেবে 'লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ; দ্বিতীয় তাঁর লেখা এই বিষয়ে 'বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থাবলী'।

অপর তিনি জানেন তাঁর সীমা কতটুকু। তাই বাংলা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত "বাংলার লোকগীতির সুর বিচার" প্রবন্ধটি। ডঃ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সংগীতাচার্যের প্রবন্ধটি থেকেই তাঁর গুণী সম্মানদানের বিবেচনা বোধের বিচার করা যায়। দীনেশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর নীরবতার ষড়যন্ত্র তিনি বাংলা লোকসাহিত্যের গ্রন্থাবলীতে করতেও পারতেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল, লোকসাহিত্য সংগ্রহের ত্রুটিগুলির দিকে যা দীনেশচন্দ্রের মত প্রতিভার পক্ষেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলা লোকসাহিত্য—শুধু লোকসাহিত্য কেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের পথিকৃৎ ডঃ দীনেশচন্দ্রের সম্মান অম্লান। কিন্তু কি ইতিহাসে, কি বিজ্ঞানে পথিকৃতের ভুলত্রুটিগুলির পঞ্জরাস্থির ওপর দিয়েই পরবর্তীকালের পথিকেরা অগ্রসর হয়। মুরশিদ কি ভাবেন, সুয়েজখাল কেটে ভাস্কোডাগামাকে অপমান করা হয়েছে, না বাতাস 'যৌগিক' পদার্থ বলায় যিনি বাতাসকে 'মৌলিক' পদার্থ বলেছিলেন, তাকে অপমান করা হয়েছে? চাঁদে গিয়ে পদাঘাত করা হয়েছে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবোধকে—কারণ—চাঁদ দুই ধর্মেরই দেবস্থানীয়। তবে ত' হাতে খন্তা-কুড়ুল নিয়ে আবার গুহায় ফিরতে হয়। যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য ও তত্ত্ব নতুন নতুন আসবে এবং পুরনো ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপেই আবার গড়ে উঠবে নতুন ইতিহাস—যা নিজেও অক্ষয়—অব্যয় নয়। সেখানে পথিকৃতের আলোচনা আসবেই এবং তা মধুর নাও হতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রামাণ্যতা নিয়ে নিজেই বারংবার পূর্ব সিদ্ধান্ত বদলেছেন। মুরশিদ কি মনে করেন যে, ডঃ সেন নিজেকেই বারংবার অপমান করার উদ্দেশ্যে তাই করেন? আবার নতুন যুগের উত্তরসূরী ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্পর্কে বলেন, 'ডঃ সেন তাঁহার গ্রন্থের নানা সংস্করণে সন—তারিখ কতবার বদলাইয়া ফেলেন যে, তাঁহার কোন মতকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।" (পৃঃ ২৯৭, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ), সে কি তাঁর অধ্যাপককে অপমানের জন্য, না ইতিহাসের খাতিরে? মুরশিদ নামে মুরশিদ হয়ে কাজে কাফের হলেন। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন, তাকে সার্থক করার জন্যই বোধ হয়। না কি রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি কবিতার মতে—তারকার মুখে ছাই দেবার জন্য!

নিতু চক্রবর্তী
স্ট্রীট নং ২৩/৩৬বি,
পোঃ চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান।

**ডাঃ মাধুরী বোস প্রসঙ্গে**

গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীতে "স্বাস্থ্য বিভাগের [illegible] প্রিভেণ্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিন বিভাগে ডাঃ মাধুরী বোসের প্রমোশন বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য ও বিভ্রান্তিকর।

(১) ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী ডাঃ মাধুরী বোসের প্রমোশন পাওয়ার কোন যোগ্যতা নাই বলিয়া যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা ঠিক নহে। আই-এম-সির নিয়মানুযায়ী তাঁহার বর্তমানে রীডার পদে প্রমোশন পাইবার যথোচিত যোগ্যতা আছে।

(২) সরকারী আদেশ অনুযায়ী প্রিভেণ্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিন বিভাগে সহকারী প্রফেসর পদে প্রমোশন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ও মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ডাঃ মাধুরী বোসের আছে। সহকারী প্রফেসর পদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ৫ বৎসরের জন্য ডিমন্সট্রেটর থাকার প্রয়োজন। তিনি ৫ বৎসরের অধিককাল ঐ পদে বহাল আছেন। সোস্যাল মেডিসিনে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী তাঁহার আছে।

(৩) সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রমোশন নির্ধারিত হইবে সিনিয়রিটি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। ঐ প্রবন্ধে সিনিয়রিটির কোন উল্লেখ না থাকার জন্য আমরা দুঃখিত। ডাঃ গুরুদাস রায়ের সঙ্গে ডাঃ বোসের তুলনামূলক বিচারটি ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছিল। ডাঃ বোসের নাম সিনিয়রিটি অনুযায়ী ডাঃ রায়ের নামের চাইতে অন্ততঃ ৬ শত নামের উপরে।

—জনৈক পাঠক

**লেখকের বক্তব্য**

ডাঃ মাধুরী বোস বা অপর কোন ডাক্তার প্রমোশনের "অযোগ্য"—এমন কথা আমার প্রবন্ধে কোথাও খুঁজে পেলাম না। পত্রপ্রেরকরা কোথায় পেলেন, তাও আমি বুঝতে পারছি না। বস্তুতপক্ষে আমার লেখায় কারও যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলা হয় নি। প্রমোশনের ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক পৃথক সুপারিশের অসংগতিই তাতে আলোচিত হয়েছিল। তার বেশি আর কিছুই নয়। ডাঃ মাধুরী বোস যদি রীডার পদের যোগ্য হন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সেই পদ পাওয়া উচিত। অন্যান্য ডাক্তারদের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল, যোগ্যতা বিচারের মানদণ্ড একটিই হওয়া উচিত। এক-এক জনের যোগ্যতা এক-এক রকমের মানদণ্ডে বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করি, পত্রপ্রেরকেরা এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন না।

# এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ক্রেগ তাঁর 'দি মাস্ক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ভূমিকাতে লিখেছিলেনঃ অসুন্দরকে জনপ্রিয় করা, সুন্দরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া—এই সবই হচ্ছে রিয়ালিস্টিক থিয়েটারের কাজ। আমার ইচ্ছা যে, আমার স্কুল এবং পত্রিকা আধুনিক থিয়েটারের অরাজকতার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ সবার সামনে তুলে ধরবে।

আধুনিক বাস্তববাদী রঙ্গমঞ্চ শিল্পের সমস্ত নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র সাময়িক ব্যাপারের প্রতিচ্ছবি দেখাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সাময়িক ব্যাপারেরও অতি সামান্যই ঐ সব প্রতিচ্ছবিতে পরিস্ফুট হয়। রঙ্গমঞ্চের পর্দা অপসারিত হলে মানুষ এবং তার জীবনের একটা উত্তেজনাপূর্ণ ক্যারিকেচারই মাত্র আমরা দেখতে পাই, সে মানুষের আচার-আচরণ যেমন স্থূল তেমনি ভয়াবহ।

এ ধরনের থিয়েটার জীবনের সত্যিকার ছবি নয়—এর ভেতর শিল্পসৌন্দর্যও কিছু থাকে না। অসুন্দরকে আরও বেশি অসুন্দর করে দেখানো কোনকালেই শিল্পের উদ্দেশ্য নয়। বরং সুন্দরকে সুন্দরতর করে তোলাই শিল্পের প্রধান কাজ। দুর্বলতাপ্রসূত জীবনের তীব্রতম দুঃখের আঘাত থেকে সৌন্দর্যের প্রভাবে আমাদের রক্ষা করবার জন্যই শিল্পের সৃষ্টি।

আধুনিক বাস্তববাদী থিয়েটার মানুষের মনে অস্থিরতার সৃষ্টি করে আর এই অস্থিরতাই হচ্ছে আমাদের জীবনের সব থেকে বড় শত্রু।

থিয়েটারের কর্তব্য হচ্ছে (কলা এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে) আমাদের মনে স্থিরতা, শান্তি এবং জ্ঞানের আলো জাগিয়ে তোলা। সৌন্দর্য পরিবেশনের মাধ্যমেই এ সবের সৃষ্টি হয়।

ফোটোগ্রাফিক এবং ফোনোগ্রাফিক (ধ্বনি সংক্রান্ত) রিয়ালিজম মানবমনের দারুণ ক্ষতিসাধন করে। দৃশ্যজগৎ এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ ভুল এবং বিভীষিকাপূর্ণ আলেখ্য দেয়। এ সব আলেখ্যের ভেতর জীবনের সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব এবং স্বর্গীয় সুষমার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

কি বিষয়বস্তু নিয়ে শিল্পী কাজ করছেন সেটা বড় কথা নয়। তাঁর কাজ হল যা কিছু তিনি স্পর্শ করবেন তাকে উজ্জ্বল করে তোলা অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিকে স্বর্গীয় আলোকমণ্ডিত করে গড়ে নেবার দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর। মহান শিল্পীদের সৃষ্টির উপর একবার চোখ বোলালেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

বাস্তববাদী রঙ্গমঞ্চ মহান শিল্পীদের মহৎ কাজ দেখেও কিন্তু তাঁদের কথায় কান দেয় না।

রিয়ালিজমের ভেতর অন্তর্নিহিতভাবে রয়েছে বিদ্রোহের বীজ। যে জিনিস মনকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে দেয় তার থেকে ক্ষতিকর বিষ আর কি থাকতে পারে! মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী বাস্তববাদিতা হচ্ছে কল্পনাশক্তির পক্ষে সব থেকে ক্ষতিকারক। রিয়ালিস্টিক থিয়েটার আমাদের বাধ্য করে অসুন্দরের পায়ে দাসখত লেখাতে। দুঃসাহসিক এবং বিপজ্জনক এই বাস্তববাদ হচ্ছে থিয়েটার-শিল্পের সমগ্র নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহস্বরূপ।

দুঃসাহসিক, কারণ প্রকৃতির অনুকরণ একটা অসম্ভব ব্যাপার।

বিপজ্জনক, কারণ নিয়মের দ্বারা পুষ্ট মানবজীবনের সবকিছুকে বাস্তববাদ ধ্বংস করে দিতে চায়।

Each whisper of Revolt finds an echo in the Theatre of Realism—the gloomy expressions, the shuffling movements—the dark and closed-in scenes—the spasmodic exclamations of the actors—the strange muffled atmosphere—all these things lend themselves to form one sinister impression.

Alas! all this is false & unworthy of the theatre, both as an institution of the realm and as an Art.

With the Freedom of the Theatre—free to select what it shall show—free from the tutorship of the other arts as to how it shall show—comes new hope.

ভেনিস প্রজেক্ট : দি কনস্পিরেটর্স—১৯০৪

**Only by its freedom can its health be restored.**

আমার স্কুল কি চায় : ক্রীড়াবিদ এবং কারিগরী শিল্পে পারদর্শী লোক।

ক্রীড়াবিদ, যাঁরা শিল্পের যাদুবিদ্যা আরত্ত করতে চান তাঁরা সময় সময় মনে করেন "কাজকে" না ভালবেসেও এ বিদ্যা অর্জন করা যায়। কিন্তু যাদুবিদ্যা শেখবার একটিই মাত্র পন্থা, সেটা হল "কাজকে" অন্তর থেকে ভালবাসতে হবে আর এই ভালবাসা হবে প্রবল আবেগ-পূর্ণ।

শ্রমিকদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) যারা হাতের সাহায্যে কাজ করে, (২) যারা মাথা খাটিয়ে কাজ করে, (৩) যারা আত্মার প্রেরণায় কাজ করে।

হাতের কাজ সবাই শিখতে পারে। তোমার বুদ্ধি দিয়ে তুমি যা শিখেছ, তা অন্যকে শেখাতে পার। কিন্তু তোমার আত্মা যে জ্ঞান লাভ করে সেটা ঈশ্বরদত্ত। সে জ্ঞান উপলব্ধিগত পরকে শেখানো যায় না।

সমস্ত শিল্পই এক শ্রেণীর খেলা। ধাবনকারী (অর্থাৎ যে দৌড়ায়) এবং শিল্পী যেন সহোদর ভাইয়ের মত। শিল্পকে খেলার থেকে আলাদা করে ধরা হয় বলেই আজকের দিনে শিল্প একটা অতি সাধারণ বাজার দরে যাচাই করা জিনিসের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এ জন্যই নবীনের দল শিল্পকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে।

ক্রিকেট খেলাকে যে দৃষ্টিতে দেখ, ঠিক সেইভাবেই শিল্পকেও দেখবে।

খেলার সময় তুমি প্রাণপণ চেষ্টা কর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দিতে—অবশ্য রুলস অভ দি গেম অনুসরণ করে। কিন্তু সেইভাবেই কি পেইন্টিং, থিয়েটার বা আর্কিটেকচারের অনুশীলন করা হয়? মোটেই না। বরং এর উল্টোটাই করা হয়।

শিল্পকে আজকাল খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে দেখা হয় না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা আজকাল আগেই বসে ঠিক করে ফেলেন কিভাবে দ্রুতগতিতে দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে—দূরপাল্লার দৌড়কে কিভাবে কমিয়ে আনা হবে, যার ফলে দর্শকরা বুঝতে পারবে না, কি কৌশলে এমনটা করা সম্ভব হল। আসলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ঠিক করে ফেলেন সমস্ত ব্যাপারটাকে এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে মনে হয় এর ভেতর কোন ফাঁকি নেই—এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বাস্তব। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, তাঁদের ব্যবস্থাপনায় তৈরী জিনিসটা প্রতিভাত হয় "এরেঞ্জড হামবাগ" হিসাবে।

এই কারণেই সমস্ত শিল্পের মান অনেক নেমে এসেছে। আধুনিক শিল্প-সৃষ্টির পদ্ধতিগুলো কোন দেশেই অর্থাৎ যে সব দেশের লোকের মনে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি আছে—সত্যিকার প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয় না।

আমার স্কুলে আমি চাই স্পোর্টসমেন—তাহলেই তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে ক্র্যাফটসমেন হিসাবে গড়ে তুলতে পারবো। এরপর হয়তো এদের ভেতর থেকে একজনও সত্যিকার শিল্পীর আবির্ভাব হতে পারে।

শিল্পীমাত্রেই স্পোর্টসম্যান—এর ব্যতিরেক হয় না—হতে পারে না। সেই জন্যই আমি সর্বপ্রথমে চাই স্পোর্টসম্যান-দের।

**ক্র্যাফটসমেন বা কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী : পাবলিক কি চায়?**—বিরক্ত থিয়েটার-ম্যানেজাররা বলবেন—"কে জানে?" একথা তাঁদের একবারও মনে হয় না যে, পাবলিকের কথা ভাবার কোনই দরকার নেই। পাবলিক নিজেও চায় না যে তাদের কথা চিন্তা করে সেই অনুসারে শিল্প সৃষ্টি করা হোক।

সমগ্র শিল্পের ইতিহাসে কোনদিনই পাবলিকের কথা মনে রেখে বড় শিল্পের সৃষ্টি হয় নি। একজন ভাল কমেডিয়ান বা একদল প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার কাছ থেকে আমরা যা পাই, পাবলিক কোন-দিনই তার যথার্থ মূল্য দিতে পারে না—ওই জাতের শিল্পীদের মুখেও কখনও শুনবেন না যে, পাবলিকের কথা মনে রেখে তাঁরা তাঁদের শিল্পসৃষ্টি করছেন।

আধুনিক থিয়েটারের পরিচালনার দায়িত্ব ভাল কমেডিয়ানদের হাতে নয়—ম্যানেজারদের হাতে। এই জন্যই থিয়েটার শিল্পের এই দুর্গতি।

আধুনিক থিয়েটারে সত্যিকার শিল্প-সৃষ্টি তো হয়ই না—ব্যবসায়িক সাফল্যও আসে না।

থিয়েটারের অসাফল্য বা সাফল্য, কোনটার জন্যই পাবলিক দায়ী নয়। থিয়েটারের ব্যাপার নিয়ে আসলে পাবলিক মাথা ঘামাতে চায় না। তারা চায় ভাল শো হোক এবং সেটা যেন সহজ স্বাভাবিকভাবে হয়—যেন কোন ঝামেলা না হয়।

মাদাম ডুজে যখন বলেন : "To save the Theatre, the Theatre must be destroyed; the actors and actresses must all die of the plague",—লোকে ভাবে যে এই মহীয়সী অভিনেত্রী বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় প্রলাপোক্তি করছেন। কিন্তু আসলে তিনি অনেক কিছু জেনে শুনে এবং দেখেই থিয়েটারের সত্যিকার ভালর জন্যই ঐ কথা বলেছেন।

থিয়েটার হচ্ছে জনসাধারণের এবং তাদের ক্র্যাফটসম্যানদের জন্য।

**These are to many Napoleons of the Theatre. It is not Conquerors that are needed, it is Constructors—Builders—Craftsmen who only can create good Theatre.**

[ক্রমশ]

'অথ ও রৌদ্র' ছবিতে হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়

## সংবাদ ও তথ্যচিত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংবাদচিত্রের সঙ্গে দর্শকরা পরিচিত। বিভিন্ন সিনেমায় ছবিগুলি দেখান হয়। ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত ছবিগুলিও পশ্চিমবঙ্গের সিনেমায় দেখান হয়। এই ছবিগুলি দেখানো সিনেমাগুলির পক্ষে একরকম বাধ্যতামূলক। সংবাদপত্র পড়ে যেমন সারা ভারতের খবর জানা যায়, তেমনি সংবাদচিত্র প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে। তথ্যচিত্র দেখে ভারতের নানা রাজ্যের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক স্থান, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক তথ্য ইত্যাদি জানা যায়। তথ্য ও সংবাদচিত্র গণশিক্ষার এক শক্তিশালী মাধ্যম। অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত মানুষ এই ছবিগুলি দেখে সারা দেশের ঘটনাবলী এবং তথ্য ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। সংবাদপত্রগুলি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ পরিবেশন করে, কিন্তু সরকারী সংবাদ ও তথ্যচিত্র যদি যথার্থভাবে নির্মিত হয় তা হলে সঠিক সংবাদ ও ঘটনাবলী দর্শকরা চোখের সামনে দেখে বুঝতে পারে কি ঘটেছিল, কেমন করে ঘটেছিল। এদিক থেকে সংবাদ ও তথ্যচিত্রের গুরুত্ব অসাধারণ।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সংবাদ ও তথ্যচিত্র নির্মিত হয় এবং সেগুলি কেবল সিনেমায় নয় টেলিভিশনে ঘরে ঘরে দেখান হয়। আমাদের দেশে টেলিভিশন এখনো চালু হয় নি, সিনেমা দর্শকের সংখ্যাও পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় খুবই কম। কয়েক বছর আগের সমীক্ষায় জানা গেছে ভারতের জনপ্রতি গড়পড়তা আড়াইটে ছবি দেখা হয় মাত্র। সাধারণত শহরাঞ্চলের মানুষ ছবি দেখে, গ্রামের মানুষের সে সুযোগ নেই।

যাঁরা ছবি দেখেন তাঁরা ভারত সরকারের ছবি যে হারে দেখতে পান সে হারে পশ্চিমবঙ্গের ছবি দেখতে পান না। যে কোন সিনেমায় গেলে ফিল্ম ডিভিশনের একটা সংবাদচিত্র দেখা যাবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ছবি দেখা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদচিত্রগুলি সাধারণত এক সপ্তাহ কলকাতার সাত-আটটি সিনেমায় দেখাবার পরে মফস্বলের সিনেমায় দেখান হয়। তারপরে আবার কলকাতায় ফিরে আসলে তখন আর সংবাদের মূল্য থাকে না। এই ব্যবস্থায় যে-সব সিনেমায় বাংলা ছবি দেখান হয় কেবলমাত্র সেই দর্শকরাই বাংলার সংবাদ ও তথ্যচিত্র দেখেন, কিন্তু হিন্দী বা ইংরেজী ছবি যেখানে দেখান হয় দর্শকরা বাংলার সংবাদচিত্র দেখতে পান না। এতে বিরাট সংখ্যক দর্শক পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলী ও তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন না। তাঁরা ফিল্ম ডিভিশনের ছবির মারফৎ ভারতের অনেক ঘটনাবলী দেখেন, কিন্তু নিজ দেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ঠিকভাবে জানতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ ও তথ্যচিত্রের স্বল্পতা এর কারণ। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদচিত্র প্রতিমাসেও একটি নির্মিত হয় না। সাধারণত দু-মাসে একটি ছবি নির্মিত হয় বলা চলে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আগে আরো কম ছবি নির্মিত হত। যুক্তফ্রন্টের আমলে তথ্য ও সংবাদচিত্রের সংখ্যা বেড়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে দর্শকদের বৈচিত্র্য উপভোগের সুযোগ হয়েছে, সেই সঙ্গে ছবি নির্মাণ করা যাঁদের পেশা তাঁদের কাজ পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে হারে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র নির্মাণ হয় তাতে সকলের কাজ পাবার সুযোগ থাকে না। টেকনিশিয়ানদের অধিকাংশকে বেকার বসে থাকতে হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারী তথ্য ও সংবাদচিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে এই বেকার টেকনিশিয়ানদের কাজ পাবার সুযোগ উপস্থিত হয়। যুক্তফ্রন্টের আমলে কিছু সংখ্যক টেকনিশিয়ান কাজ পেয়েছেন, যদিও এই সুযোগ আরো বিস্তৃত হওয়া উচিত।

একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ফিল্ম ডিভিশনের ছবি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক সিনেমায় দেখান বাধ্যতামূলক, কিন্তু তার পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গের কয়টি ছবি ফিল্ম ডিভিশন কিনে থাকে এবং ভারতের শহরগুলিতে পরিবেশন করে? কেন্দ্র রাজ্যের ছবি কিনে আর্থিক উৎসাহ জোগাবে না কেন, পশ্চিমবঙ্গের তথ্যচিত্রগুলির সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের মানুষের পরিচয় ঘটবে না কেন? বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পরিচয় বিনিময়ে কেন্দ্র এভাবে সহায়তা করতে পারে। এই ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মীদের কাজের সুযোগ আরো বাড়বে, এবং পশ্চিমবঙ্গের সঠিক পরিচয় পাবার জন্য ভিন্ন রাজ্যের মানুষকে গুজবের উপর নির্ভর করতে হবে না।

—সুজন।

## চিত্র আলোচনা

### আলেয়ার আলো

পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী

ইউনিট প্রোডাকসন্স অব ইণ্ডিয়ার "আলেয়ার আলো" কলকাতার বিভিন্ন সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। এই ছবির কাহিনী এক শিল্পপতি পরিবারের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে। যেমন জমিদারদের সময়ে জমিদারী নিয়ে শরিকী বিবাদের নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে এবং তা নিয়ে অনেক গল্প, উপন্যাস ও নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও দীপনারায়ণ ও অনুগ্রহনারায়ণ দু ভাইয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ। অনুগ্রহনারায়ণ কুচক্রী এবং মদ্যপ। সে চক্রান্ত করে দীপনারায়ণকে খুন করে সম্পত্তি হাতাবার জন্য। কিন্তু বিশ্বস্ত নায়েবের চেষ্টায় তার বিধবা এবং পুত্র উত্তরাধিকার লাভ করে। এবার দেখা গেল নাটকীয় রহস্যাবৃত ঘটনার সূত্রপাত। দীপনারায়ণের পুত্র প্রদীপ আকস্মিক পরিচয়ের মাঝে শিখাকে ভালবাসল। তাদের যখন বিয়ের কথা প্রায় পাকা হয়ে উঠেছে, এমন সময় শিখা জানতে পারল

তার জন্মকথা রহস্যময়, যাকে সে মা বলে জেনেছে সে তার মা নয়; আর প্রদীপও শুনেছে যেন অন্য এক রহস্য—রহস্যময়, সে দীপনারায়ণের সন্তান নয়। এ সময় তাদের কয়লাখনিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের মধ্যে প্রদীপ জানতে পারে তার পিতৃপরিচয়, শিখা আশ্রয় পায় তার মায়ের কোলে।

ছবিটি সমাজের ধনীশ্রেণীর সম্পত্তি কাড়াকাড়ি, ঈর্ষা ও সম্পত্তি দখল রাখার জন্য অন্যের ছেলেকে নিয়ে এসে উত্তরাধিকারে বসাবার যে সব গল্পের সঙ্গে কমবেশি আমরা পরিচিত তারই পুনরাবৃত্তি। বড়লোকের সমাজের হিংসা ও দীনতার পরিচয় নিয়ে কাহিনী হলেও কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা দীনহীনভাবে চিত্রিত নয়। বরঞ্চ দীপনারায়ণ থেকে প্রদীপ পর্যন্ত সকলকেই মহৎ করেই দেখান হয়েছে। কয়লাখনির মালিক প্রদীপ খনির কল্যাণের জন্য চিন্তিত, শ্রমিকদের প্রতি দরদী ইত্যাদি। বরঞ্চ কর্মচারীরা যেন তার অপেক্ষাও কম সচেতন—খনির নিরাপত্তা সম্পর্কে। নায়ককে ভাল লোক দেখাতে হবে—এই মনোভাব থেকে সিনেমায় বড়লোকদের শোষকশ্রেণীর পরিচয়টা গোপন করার চেষ্টা হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এতে সমাজের সত্যিকার পরিচয় এবং যা প্রতিদিন ঘটছে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। বড়লোকদের প্রতি কিছুটা মোহ সৃষ্টির সহায়তা করা হয়ে থাকে। আমাদের চিত্রপ্রযোজকরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করেন না।

'আলেয়ার আলো' ছবিতে পরিচালক কাহিনীর রহস্যময়তা সব সময় বজায় রাখতে পেরেছেন এবং প্রদীপ ও শিখা সম্পর্কে শেষ সময়ে কৌতূহল সৃষ্টি যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। রহস্যছবির রীতিতে তিনি ধীরে ধীরে ঘটনাকে প্রকাশ করেছেন। যাতে দর্শকমনে চমক লাগে। ছবিটিতে কয়লাখনির ভিতরের কিছু দৃশ্য রয়েছে। খনি, খনি শ্রমিক এবং বাঘ শিকারের দৃশ্যটির সম্পাদনা প্রশংসনীয়।

"আলেয়ার আলো"র চিত্রগ্রহণের কাজ ভাল। চিত্রগ্রহণ পরিচালনা করেছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। গোপেন মল্লিক পরিচালিত গানগুলি সুগীত।

অভিনয়াংশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, শেখর চ্যাটার্জী, মঞ্জু দে, অজিতেশ ব্যানার্জী, কালী ব্যানার্জী, অনুপকুমার প্রমুখ যথাযথভাবে চরিত্র রূপায়ণ করেছেন। অন্যান্য ছোট চরিত্রগুলিতে দেখা গেছে সাধনা রায়চৌধুরী, বনানী চৌধুরী, তরুণ ব্যানার্জী ও আরো অনেককে।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এপার-ওপার' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন।

## পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্র উৎসব

১৩ই মার্চ, শুক্রবার থেকে কলকাতায় জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেছেন কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। সমাগত অতিথিদের স্বাগত জানান চলচ্চিত্র শিল্পী ও পরিচালিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী। জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের কলকাতাস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধি মিঃ আন্দ্রে রেডার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কলকাতার রফি আহমদ কিদোয়াই রোডস্থিত ম্যাজেস্টিক সিনেমায় সাতদিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসব হবে। ভারত সরকার ও পূর্ব জার্মান সরকারের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের চুক্তি অনুসারে এই উৎসব হচ্ছে। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ভারত সরকারের বেতার ও তথ্যমন্ত্রী দপ্তর। সাত দিনের চলচ্চিত্র উৎসবে সাতটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী চিত্র এবং সাতটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হবে। ১৯শে মার্চ পর্যন্ত ছবিগুলি দেখান হবে।

### একটি পূর্ব-জার্মান ছবি

এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে 'ট্রেস অব দি ফ্যালকন' অন্যতম। ছবিটি উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, হলিউড বা মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজকরা 'রেড ইন্ডিয়ান'দের নিয়ে আমাদের দেশে যে রকম ছবি দেখায়, সে-সব ছবির তুলনায় এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মার্কিন ছবিগুলিতে রেড ইন্ডিয়ানদের নির্মমভাবে হত্যা করার যুক্তি উপস্থিত করে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে গোপন করে দেখায়। রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যাকারীরূপে দেখিয়ে সাদা আমেরিকানদের শান্তিকামীরূপে দেখায়। এই একই মানসিকতায় আমেরিকানরা ভিয়েতনাম, কোরিয়া থেকে পৃথিবীর সর্বত্র দেশে দেশে স্বাধীনতা হরণ করে নিজেদেব শান্তিকামী বলে জাহির করছে। 'ট্রেস অব দি ফ্যালকন' ছবিতে দেখান হয়েছে ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ ঘটনা। আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের বাসস্থান কেড়ে নেবার জন্য, তাদের স্বাধীনচেতা মনকে অবনত করার জন্য সাদারা কিভাবে কাজ করেছে এবং সাদা বণিককুলের স্বার্থে সৈন্যবাহিনী সহায়তা করেছে, সে কাহিনী এই ছবিতে যথেষ্ট সতর্কতা এবং সচেতন বিশ্লেষণী

সলিল সেন পরিচালিত 'রাজকুমারী' ছবিতে তনুজা

## নাটকের কথা

### লেনিন ঃ যাত্রাপালার দেড়শ রজনী স্মারক উৎসব

তরুণ অপেরার 'লেনিন' যাত্রাপালার দেড়শ' রজনী স্মারক উৎসব গত ৫ই মার্চ মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েত কনসাল জেনারেল মিঃ ভি এ

শান্তিতে দেখান হয়েছে। এখানে দেখা গেছে রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও প্রবীণ ও নবীন দুই মানসিকতা। প্রবীণরা সাদা বণিকদের চুক্তিতে বিশ্বাস করে তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু সাদারা সে চুক্তিকে মূল্য দেয় নি। নবীনরা গোড়া থেকে বুঝেছে সাদাদের লোলুপ বাসনার কথা—তাই তারা অস্ত্র ধরে দেশরক্ষার কথা বলেছে। সাদাদের মধ্যেও সাম্রাজ্য-বাদী মানসিকতার লোক যেমন আছে, আবার এমন লোকও ছিল—যারা রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতায় বিশ্বাসী। সৈন্যরা বণিককুলের স্বার্থরক্ষার প্রহরী, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অনেক সৈনিক এ ব্যাপারটা বুঝতে পারে। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে রেড ইন্ডিয়ান-দের বিজয়ীর মত নিরাপদস্থানে চলে যাওয়ার ঘটনায় ছবির শেষ।

আমেরিকার ইতিহাসে যদিও রেড ইন্ডিয়ানরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে পরিচালক রেড ইন্ডিয়ানদের উপস্থিত করেছেন সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে। মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় অবশ্যম্ভাবী—এই বাণী তিনি রেখেছেন। ছবিটির প্রতিটি সংলাপ এবং চরিত্র অর্থপূর্ণ। ছবিতে কয়েকটি উপ-কাহিনী রয়েছে। তার মধ্যে রেড ইন্ডিয়ান নায়কের ছোট্ট প্রণয় কাহিনী অত্যন্ত সংযত ও শিল্পীর দক্ষতায় দেখান হয়েছে। এক কথায় ছবিটি চমৎকার। সংঘর্ষ, রোমাঞ্চ এবং শ্রেণী-দৃষ্টিতে ঘটনাকে উপস্থিত করার নৈপুণ্যে একটি চমৎকার ছবি। সে ছবি দেখাবার সার্থকতা আছে।

ছবিটির পরিচালক ডঃ গটফ্রিড কলডিংস্। অভিনয়ে রয়েছেন গোজকো মিটিক. হানস্কো হেস. বারবারা রাইলস্কা।
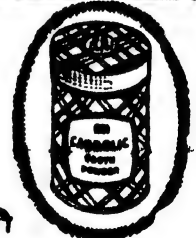
ব্যাহত। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, লেনিন জন্মশতবর্ষ উৎসবের কালে তরুণ অপেরা শ্রদ্ধা ও সাহস দুই-এরই পরিচয় দিয়েছেন। 'লেনিন' যাত্রাপালার নায়ক ও শিল্পীদের কর্তৃপক্ষের পক্ষে পুরস্কার দান করেন নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। অতিথি ও সমাগত দর্শকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীশিব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানান্তে 'লেনিন' অভিনীত হয়।

### বরাহনগরে নাট্য-উৎসব

বরাহনগরের জীবনধন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে চারদিনব্যাপী নাটকানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ২২শে মার্চ বরাহনগর সাংস্কৃতিক পরিষদের 'আবাদ', ২৩শে মার্চ তরুণ অপেরার যাত্রা 'হিটলার', ২৪শে মার্চ তরুণ অপেরার 'লেনিন' এবং ২৫শে মার্চ বরাহনগর পিপলস থিয়েটারের 'আবর্ত' অভিনয় হবে।

### লেক স্কুলের নাট্যাভিনয়

গত ১লা, ২রা এবং ৩রা মার্চ পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে লেক বালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষিকা এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের সহযোগিতা এবং পরিচালনার কৃতিত্বের সঙ্গে সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল, ইংরেজী নাটিকা 'অন্ধ আকার' ও মাইকেলের অর্ণ্যকাব্য মঞ্চস্থ করে। এঁদের মঞ্চ-পরিকল্পনা, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত—সবই সমবেত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

যাদুকর ডি· পুষ্পা

বসুমতী নাট্য—যান্ত্রিক রূপদান হচ্ছে

### রাজা দেবীদাস যাত্রাভিনয়

গত ৮ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউর রাসযাত্রা উপলক্ষে বাঁকুড়ার নিকটবর্তী জগদল্লা গ্রামে জগদল্লা রাধামাধব অপেরা পার্টির অষ্টম নিবেদন ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'রাজা দেবীদাস' যাত্রাভিনয় হয়। পুরুষ ভূমিকায় দলগত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন মিহিরলাল চৌধুরী, নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব চট্টরাজ, চিত্তরঞ্জন চৌধুরী (ছোট), জবর মণ্ডল, নিবারণ সূত্রধর, নারান পরামাণিক, মদনগোপাল পাল, মিতন সূত্রধর, ডাঃ চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, শংকর পাল, কুচিল কর্মকার এবং স্ত্রী-ভূমিকায়—হীরালাল চৌধুরী, সন্তোষ চট্টরাজ, অজিত সাঁট ও মিতন মণ্ডল। সঙ্গীত ও যাত্রাভিনয় পরিচালনা করেন শ্রীবীরবল বাগ এবং ডাঃ চিত্তরঞ্জন চৌধুরী।

### গভর্নমেণ্ট ইন্সপেক্টর

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের টিকিট চেকিং শাখার সাংস্কৃতিক সংস্থা রূপারোপ গত ৩রা মার্চ মিনার্ভা মঞ্চে প্রমথনাথ বিশীর অনুবাদ নাটক 'গভর্নমেণ্ট ইন্সপেক্টর' মঞ্চস্থ করে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন নীলকণ্ঠ। দলগত প্রয়োগনৈপুণ্যের নিরিখে সৌখীন দল হিসেবে 'রূপারোপ' বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। আলোচ্য অনুষ্ঠানেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে স্ব স্ব ভূমিকায় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে সামগ্রিক অভিনয় সাবলীল গতি লাভ করেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জীবনকৃষ্ণ ঘটক, রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর চন্দ্র, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, আদিত্য চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রমোহন নাগ, সুধীরকুমার রায়, মিহিরপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না মিত্র ও বেবী ঘোষ।

### প্রতীর্থ'র নাটকাভিনয়

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বালুরঘাটের বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা "প্রতীর্থ" তাদের নিজস্ব মঞ্চ রঙ গোবিন্দ অঙ্গনে রতন-

মূকাভিনেতা তপন দত্ত

কুমার ঘোষের "অমৃতস্য পুত্রাঃ" নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি সুন্দর পরিচালনা এবং প্রযোজনার গুণে প্রচুর জনসমাদর লাভ করেছে। সনাতনের চরিত্রে শ্রীঅমিতাভ সেন, সজনের ভূমিকায় হরিমাধব মুখার্জী, বনোয়ারিলালের চরিত্রে প্রভাস সমাজদারের অভিনয়ে মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। এ ছাড়া প্রতিটি চরিত্রে নিপুণ রূপদান করেছেন শ্রীছানা গুহ, সুবীর দে, সত্য তালুকদার, কানাই দত্ত, রীতা দত্তগুপ্তা, সান্ত্বনা গুহ, চন্দ্রিকা গুহ, অজিত দে, সুনির্মল সরকার, ব্রজবল্লভ সাহা, বিশু ঘোষ, ভোলা মুখার্জী, পংকজ বিশ্বাস, দীপিকা সেনগুপ্ত ও আরও অনেকে।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী শিলিগুড়ি এন· এফ রেলওয়ে আয়োজিত ৫ম বর্ষ নাট্য উৎসবে উক্ত নাটকটি মঞ্চস্থ করে প্রচুর জনসমাদর লাভ করেছে।

#### রূপসী

অরুণ রায়চৌধুরীর প্রযোজনায় ও অজিত গাঙ্গুলীর পরিচালনায় 'রূপসী' ছবির কাজ এগিয়ে চলেছে। এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করছেন সুরশিল্পী অনিল বাগচী। চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন সন্ধ্যা মজুমদার (রায়), কালী ব্যানার্জী, সঞ্জিত ভঞ্জ, অনুভা ঘোষ, সুলতা

চৌধুরী, অপেন চ্যাটার্জী, রবি ঘোষ, যূই ব্যানার্জী, সুতপা চক্রবর্তী, হরিধন মুখার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, মণি শ্রীমানী। ছবিটি প্রধানত বহির্দৃশ্যপ্রধান হবে। এই দৃশ্যগুলি তোলা হচ্ছে শান্তিনিকেতন, ইলামবাজার, সিউরীতে। ছবিটি সংগীত-প্রধান। এতে থাকবে ঝুমুর, কবির লড়াই, বাউল ইত্যাদি।

### আউটডোরে 'আবিরে রাঙানো'

পরিচালক অমল দত্ত তাঁর দলবল নিয়ে সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং ও দীঘার মনোরম দৃশ্যে তাঁর নবতম প্রয়াস 'আবিরে রাঙানো'র চিত্রগ্রহণ করতে বেরিয়ে পড়েছেন। এই আউটডোরে ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে ৮ই মার্চ। ছবির মুখ্য চরিত্রে আছেন নতুন শিল্পী সুচন্দ্রা, অনিল ও সলিল ঘোষ। সংগীত পরিচালনা করছেন সত্যদেব চ্যাটার্জী। সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণে আছেন রমেশ যোগী, সুবোধ ব্যানার্জী।

'উত্তরায়ণ' ছবির একটি দৃশ্যে কণিকা মজুমদার ও পার্থ মুখার্জী

### কাকদ্বীপ

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সুন্দরবন মিউজিক্যাল কনফারেন্সের উদ্যোগে বৈদ্যনাথ রায়ের পরিচালনায় কাকদ্বীপ অমর টকীজের পাশের মাঠে সারারাত্রিব্যাপী বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেলো। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, উৎপলা সেন, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। হাস্য-কৌতুকে সুশীল চক্রবর্তী। কৌতুক গীতি দুই বেচারা। যন্ত্রসংগীতে ভি· বালসারা এবং মূকাভিনেতা তপন দত্তের মূকাভিনয়।

### মালদহ

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার মালদহ টাউনে রামকৃষ্ণ পল্লী ব্যায়াম সমিতির পরিচালনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে কলিকাতার সংগীতশিল্পী দিলীপ চক্রবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে সংগীত পরিবেশন করে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। এ ছাড়া আরও আকর্ষণ ছিল মূকাভিনেতা তপন দত্তের মূকাভিনয়। শ্রীদত্ত দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাক অভিনয় পরিবেশন করে প্রচুর জন-স্বীকৃতি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন ফীচারের মাধ্যমে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এই সঙ্গে স্থানীয় শিল্পী মণি মুখোপাধ্যায় প্রশংসার দাবী রাখেন।

## সংবাদ-কনা

### লেনিনের জীবন বিষয়ক তথ্যমূলক চলচ্চিত্র

লেনিনের জীবনী বিষয়ক তথ্যমূলক চলচ্চিত্র "অমর লেনিন" অচিরেই মস্কোয় মুক্তিলাভ করছে। এ খবর দিয়েছে এ· পি· এন। এই নতুন তথ্যচিত্রটি কেন্দ্রীয় ডকুমেন্টারি ফিল্ম স্টুডিওতে তোলা ও তা পরিচালনা করেছেন শ্রীমতী মারিয়া স্লাভিনস্কাইয়া।

লেনিনের জীবদ্দশায় তাঁর মাত্র ৩৮টি শট তোলা হয়। ভি· আই· লেনিন নিজে তাঁর ছবি তোলা পছন্দ করতেন না ও ক্যামেরার মধ্যে তাঁকে ধরা কঠিন কাজ ছিল। ১৯৪৮ সালে পরিচালক মিখাইল রম ও শ্রীমতী স্লাভিনস্কাইয়া এই সব শট থেকে প্রথম লেনিন-বিষয়ক এক তথ্যচিত্র সম্পাদন করেন। নতুন তথ্যচিত্রটিতে সমস্ত শট যোগ করে এক সম্পূর্ণ তথ্যমূলক চিত্রে রূপ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে আরও আবিষ্কৃত নতুন শটও যোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে লেনিনের সংগে এক মার্কিন ফটোগ্রাফার ভিক্টর হিউজের তোলা কয়েকটি শট।

নতুন তথ্যচিত্রটির ধারাবিবরণী লিখেছেন বিশিষ্ট সোভিয়েত কবি এ· সুরকভ ও সুর রচনা করেছেন এ· খোলমিনভ।

### যাদুকর পুষ্পা

৭ই মার্চ '৭০ কলিকাতা নেতাজী প্রদর্শনীর নেতাজী মঞ্চে যাদু-শ্রেয়সী ডি· পুষ্পার যাদু প্রদর্শনী প্রায় আড়াই ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে পঁচিশটি খেলার মাধ্যমে যাদুকরী দক্ষতার পরিচয় দেন। প্রতিটি খেলাই প্রশংসনীয়। কয়েকটি খেলা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, শূন্যে ভাসমানা বলিকা তরুণী দ্বিখণ্ডন, বেনারসের মন্দির, পুতুলের ঘর, ভৌতিক বাক্স, এ ছাড়া মায়া ছবি ও সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব-এর খেলা দুইটি প্রশংসনীয়। যন্ত্র সংগীত ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় দর্শকবৃন্দের ঘন ঘন করতালিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

### যাদুকর রঞ্জনকুমার

যাদুকর রঞ্জন মহাজাতি সদনে, সিমুলিয়া এ্যাথলেটিক ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে, পাঞ্জাব ক্লাবে ও আরমেনিয়ান ক্লাবের শিশু উৎসবে এবং আই· টি· এফ প্যাভিলিয়নে, বেঙ্গল বক্সিং এ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক উৎসবে—প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ভারতীয় ব্রহ্মসূতিকা, হিন্দু ল্যাকিটেশন, কালি ও লাল যাদু, সাহারার বালি, অদৃশ্য লিমনের নতুন ধারা প্রভৃতি নতুন সংযোজিত খেলাগুলি দর্শকদের বিস্মিত করে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৮৯৬ সাল।

বছরটি শুধু ইংলন্ড নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসেও বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। ক্রিকেট প্রতিভায় ভাস্বর রণজি তখন ইংলন্ডের ক্রিকেট জগতের একটি স্মরণীয় নাম। সে নামের মাদকতায় মুগ্ধ জনগণ যে মাঠে রণজি খেলেন সেইখানেই ছুটে যান।

সত্যি কথা বলতে কি, রণজির প্রতিভা ছিল প্রতিভাবানদের কাছেও বিস্ময়কর। অথচ সেই প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে প্রথমটায় রাজী হন নি এম· সি· সি'র বর্ণদাম্ভিক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জনগণের দাবীকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কোন দেশে কখনই কারো হয় নি। তাই ইংলন্ডের ক্রিকেট উৎসাহীদের প্রতিবাদের ঝড়ে দুলে উঠলো ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের মন। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরাও জনগণের দাবী স্বীকার করে।

সে দাবী ছিল রণজিকে ইংলন্ড দলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেবার। সে বছর ইংলন্ড সফরে এসে-ছিল অস্ট্রেলিয়া। সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, সেই রণজিকে বাদ দিয়ে ইংলন্ড দল গঠন করা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবই সম্ভব হলো। একজন কালা-আদমিকে দলে নিতে চাইলেন না টেস্ট খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী। বাদ পড়লেন রণজি।

কিন্তু খবরের কাগজে ইংলন্ড দলের খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশিত হবার পর সমস্ত দেশের চেহারাই বদলে গেলো। সমস্ত দেশটা যেন বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। কলকাতায় যেমন একবার 'না মুস্তাক নো টেস্ট' আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তেমনি প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ শুরু হলো সমস্ত দেশ জুড়ে। তাদের একমাত্র দাবী রণজিকে ইংলন্ড দলে নিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত এম· সি· সি'র সভাপতি লর্ড হ্যারিসের গোঁড়ামিও ঠাঁই পেল না। মাথা নত করতে তিনি বাধ্য হলেন জনমতের চাপে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে খেলার জন্য রণজিকে আহবান জানানো হলো। লর্ড হ্যারিস তাঁকে যে 'কালা আদমি' বলে ছোট করতে চেয়েছিলেন—সেই অপমানের প্রতি-শোধের জবাব তিনি খেলার মাঠেই দেবেন বলে স্থির করলেন।

তাই তিনি শুধু জানতে চেয়ে-ছিলেন যে, ইংলন্ড দলের পক্ষে খেললে, অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকে কোন আপত্তি উঠবে কি না?

আপত্তি তো উঠলোই না, বরঞ্চ অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ট্রট বললেন, 'রণজির মতো কুশলী খেলোয়াড়ের সংগে খেলার এবং তাঁর নয়নাভিরাম খেলা দেখার সুযোগ পেলে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবো।'

দ্বিতীয় টেস্টে ইংলন্ডের পক্ষে খেলতে নামলেন রণজি। মনে তাঁর দুর্জয় প্রতিজ্ঞা—অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। সাদা-কালোর ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিতেই হবে। দুর্বার সংকল্প মনে নিয়ে রণজি তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামলেন।

খুব সহজ-সরলভাবে খেলে প্রথম ইনিংসে রণজি ব্যাট করে চললেন। কিন্তু ৬২ রানের মাথায় হঠাৎ আউট হয়ে গেলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করলো অনেক রান। ইংলন্ডের সামনে তখন রীতিমত সমস্যা।

সেই সমস্যা বাড়িয়ে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হতে না হতেই আউট হয়ে গেলেন ডব্লিউ· জি গ্রেস, স্টোভার্ট প্রমুখের মতো কয়েকজন নামকরা ব্যাটসম্যান। স্কোর বোর্ডে তখন উঠেছে সামান্য কয়েকটি রান। ইংলন্ড তখন নির্ঘাৎ পরাজয়ের সম্মুখীন। কিছুই যেন তখন আর করার নেই। সবাই মেনে নিয়েছেন পরাজয়।

কিন্তু মানেন নি একজন। তিনি তখন পরম নিশ্চিন্তে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে সাবলীল ভঙ্গীতে খেলে চলেছেন। খেলছেন ধরতে গেলে তিনি একাই। অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ বোলারদের মুখোমুখি হচ্ছেন তিনি একাই। অন্য ব্যাটসম্যানরা যাতে বিপদে না পড়েন, সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ন নজর।

সে এক দিন! সে এক পাগলকরা খেলা।

সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের আনন্দ রণজির চোখে-মুখে। ভঙ্গী তাঁর দুরন্ত। অভাবনীয় আত্মবিশ্বাসে ভরা নয়নাভিরাম তাঁর সেই খেলা দর্শকদের আনন্দে বিভোর করে তোলে।

দেখতে দেখতে এক সময় শতরান পূর্ণ হয়ে গেলো রণজির। জীবনের প্রথম টেস্টে শুধু শতরানই করলেন না তিনি—নিলেন সব অপমানের, সব অব-মাননার প্রতিশোধ।

কিন্তু ইংলন্ডের বিপদ তখনো কাটে নি। তখনো পরাজয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই রণজি তখনো অবিচল। তাঁর ওপর যে রয়েছে গুরু দায়িত্ব। পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হবে ইংলন্ডকে। অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন রণজিকে আউট করার জন্য। জোন্স বল করতে লাগলেন খুব জোরে, গ্রিফিন দিতে লাগলেন ফুলটস বল আর অধি-নায়ক ট্রট নিজে ঝুলিয়ে বল দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু রণজি নির্বিকার। জোন্সের সেই সাংঘাতিক বলগুলোর কোনটাকে তিনি তাঁর স্বভাবজ মার 'লেগ গ্লান্স' করে বাউন্ডারীতে পাঠাতে লাগলেন, আবার কোনটাকে ক্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে কব্জির কায়দায় অন সাইড দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে পাঠাতে লাগলেন বাউন্ডারীতে।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আর বোলার-

দের সমস্ত ছলাকলা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রত্যেকদিনের মতো ক্রিকেটে অবস্থান করতে লাগলেন রণজিৎ সিংজী। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেলো খেলা, অতিবাহিত হয়ে গেলো খেলার নির্ধারিত সময়। অপরাজিত রণজি ইংলণ্ডকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন বুক ফুলিয়ে, মুখ উঁচু করে—স্কোর বোর্ডে তখন তাঁর নামের পাশে তিন অংকের রান সংখ্যা ১৫৪ অপরাজিত।

এম· সি· সি'র তখনকার সভাপতি লর্ড হ্যারিসের মুখের ওপর জবাবের মতো জবাব সেদিন দিয়েছিলেন রণজিৎ সিংজী।

পরের দিনের খবরের কাগজগুলোয় শুধু রণজি আর রণজিৎ সিংজীর খেলার কথা ভরা। ডেলি নিউজ লিখলো,

"....There is little display in his methods—an Oriental calm with an Occidental swiftness, the stillness of the panther with the suddenness of its spring....If the supreme art is to achieve the maximum result with the minimum expenditure of effort, then Ranji is in a class by himself...."

সে বছর রণজি ভেঙে দিলেন ডব্লিউ· জি· গ্রেসের রেকর্ড।

অনেকদিন আগে প্রতিষ্ঠিত গ্রেসের সেই রেকর্ডের আশেপাশেও যেতে পারেন নি ইংলণ্ডের কোন ব্যাটসম্যান। কিন্তু সেই অসাধ্য সেই বছর সাধন করলেন রণজি।

সেবার ২,৭৮০ রান করে রণজি ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাটিং এ্যাভারেজে প্রথম স্থান লাভ করলেন। ইনিংস প্রতি গড়ে তিনি করেছিলেন ৫৭·৪৪। এক মরশুমে মোট রান সংগ্রহে তিনি ভেঙে দিলেন ক্রিকেটের জনক ডব্লিউ· জি· গ্রেসের রেকর্ড।

রণজির জীবনের ঘটনাগুলো অদ্ভুত। ছোট-বড় সব ঘটনাগুলোকে বিচার করলে রণজি চরিত্রের ব্যাপ্তির পরিচয় ভালোভাবে পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, রণজি ছিলেন খাঁটি ক্রিকেটার। ক্রিকেটই ছিল তাঁর জীবন। তাই ক্রিকেট শব্দের আভিধানিক অর্থের সেরা পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর জীবন দিয়ে। তিনি ছিলেন খেলোয়াড়, নিখুঁত ছিল তাঁর খেলা। তবু রণজি বিশ্বাস করতেন যে, জানার আর শেখার কোন শেষ নেই। বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার—সময় আর বয়সের সংগেই অভিজ্ঞতা বাড়বে। অভিজ্ঞতাই ক্রিকেটকে জানার, ক্রিকেট খেলা শেখার সব চেয়ে বড় সহায়ক।

এ কথা রণজি শুধু বিশ্বাসই করতেন না, মনে-প্রাণে সেই বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। তাই সেদিনের সেই ঘটনায় রণজি চমকে উঠেছিলেন ভীষণভাবে। প্রথমটায় তিনি যেন বিশ্বাসই করতে চান নি। কিন্তু তারপর যখন বুঝলেন যে, মন্তব্যটা তাঁকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বহুকাল বাদে আবার তাঁকে নামতে হলো মাঠে।

রণজির তখন বয়স অনেক। বয়সের ভারে নুয়ে পড়ার লোক তিনি ছিলেন না ঠিকই। কিন্তু তখন তাঁর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য চোখের দৃষ্টিশক্তিও কমের দিকে—এ সেই ১৯১৫ সালের কথা।

শরীর খারাপ, তার ওপর আছে নানা রকমের রাজকাজ, তবু প্রায় প্রতিদিনই রণজি সময় করে জামনগরের ক্রিকেট মাঠে আসতেন। খেলা দেখতেন, খেলা শেখাতেন, আর তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতেন। সেইরকম এক দিন রণজি মাঠে এসেছেন। আর তখনই ঘটলো ঘটনাটা।

একজন তরুণ বোলার এসে বললো যে, সে এখন এতো ভালো বল করতে পারে যে, দু'-এক ওভারের মধ্যে যে কোন নামী ব্যাটসম্যানকে আউট করে দেবার ক্ষমতা তার আছে।

কথাটা যে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে, এ কথা বুঝতে রণজির এতোটুকুও দেরী হলো না। প্রথমটায় ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলেন রণজি। দুঃখও পেলেন খুব। কিন্তু সেই সংগে ঐ বোলারটির গর্ব চূর্ণ করার প্রয়োজনও অনুভব করলেন তিনি। কারণ আর যাই হোক, এ ধরনের অহমিকা তো ভালো নয়।

রণজি তখন ঐ বোলারটিকে চারটি স্টাম্প আর একটা বল নিয়ে মাঠে নামতে বললেন। তার পর তিনটে স্টাম্প পুঁতে অপর স্টাম্প হাতে নিয়ে রণজি তাকে বল করতে বললেন। বোলারটি বোলিং শুরু করলো আর রণজি সেই স্টাম্পটি দিয়ে প্রত্যেকটি বল নিখুঁতভাবে লেগ গ্লান্স, লেট কাট, ড্রাইভ প্রভৃতি করে তাকে দেখিয়ে দিলেন যে, ক্রিকেট খেলা অতো সহজ নয়। কোন বোলারই কখনই বলতে পারে না যে, সে বলে বলে ব্যাটসম্যানদের আউট করে দিতে পারে। এ কথা মনে আসাই পাপ, এ কথা মনে আনাই অন্যায়। অহঙ্কার মনে এলে খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়ী জীবনের ওপরে নেমে আসবে সব হারানোর সর্বনাশ। [চলবে]

## নতুনরূপে এল· বি· ডব্লিউ

আগামী ১৫ই ও ১৬ই জুলাই লণ্ডনে বসবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আলোচনা চক্রের আসর। এই আলোচনা চক্র এম. সি. সি'র এল. বি. ডাব্লিউ সম্বন্ধে যে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে চলেছেন—সেই বিষয়ে আলোচনা হবে। তা ছাড়া 'লেগ বাই'-এর রান পুরোপুরি-ভাবে যে এম· সি· সি'কে সমর্থন করবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিশেষজ্ঞ কমিটির এক সভায়। এই কমিটিতে ছিলেন বিজয় মার্চেন্ট, আর· এস· মোদী, কে· কে· তারাপোর, সন্তোষ গাঙ্গুলী ও ভি· এন· সি· রাও।

**এল· বি· ডব্লিউ-এর নতুন নিয়মে বলা হয়েছে যে, "আম্পায়ার যদি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন যে, ব্যাটসম্যান ইচ্ছে করেই তাঁর ব্যাট দিয়ে না খেলে পায়ে বল লাগিয়েছেন, তাহলে বলটা যদি অফ স্টাম্পের বাইরেও পিচ খায়, কিন্তু আম্পায়ার বোঝেন যে বলটা নির্ঘাৎ উইকেটে আঘাত করতো, তাহলে প্রতিপক্ষ দলের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি ব্যাটসম্যানকে এল· বি· ডব্লিউ নিয়ম অনুসারে আউট দেবেন।"**

এই বিষয়ে আম্পায়ারদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মতে, অনেক সময় ব্যাটসম্যান ইচ্ছে করে ব্যাট দিয়ে খেলতে গিয়েই পা দিয়ে বল আটকাবেন। ফলে এই নিয়ে গোলমাল হতে পারে খেলার মাঠে। কিন্তু এম· সি· সি'র বিশেষজ্ঞ কমিটি ব্যাটসম্যানদের এইভাবে আউট দেবার ব্যাপারে আম্পায়ারদের ওপর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন—তাঁদের মতে আম্পায়াররা যা ভালো বুঝবেন তাই হবে।

**এল· বি· ডব্লিউ সম্বন্ধে এম· সি· সি'র নতুন নিয়ম হলো :**

"The striker is out L.B.W. if with any part of his person except his hand, he intercepts a ball which has not first touched his bat or hand and which, in the opinion of the umpire, would have hit the wicket provided that either (A) the ball pitched in a straight line between wicket and wicket, or (B) the ball pitched outside the batsman's off-stump and in the opinion of the umpire, he made no genuine attempt to play the ball with his bat."
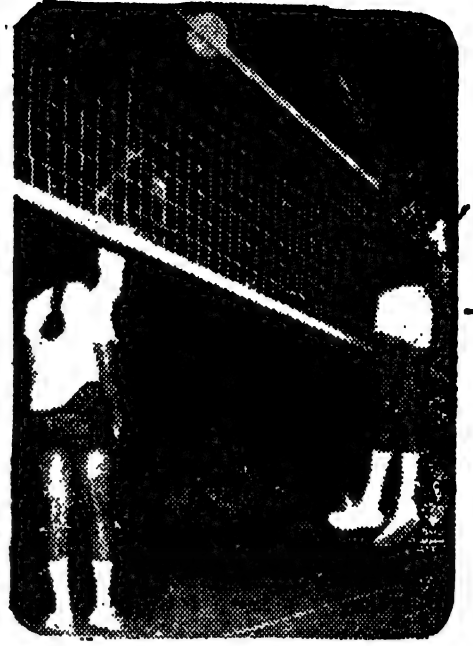
# অবহেলা

বাংলাদেশ তথা কলকাতার হকি মরশুম শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু ক্রিকেটের শেষে আর ফুটবলের আগে হকি যেন কিছুতেই খেলার বাজার মাত্ করতে পারে না। ফুটবলানন্দে বাংলা-দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেমন মেতে ওঠেন, ক্রিকেটের বড় আসরকে কেন্দ্র করে উৎসাহীরা টিকিট সংগ্রহের জন্যে যেমন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান—তেমনি দৃশ্য কিন্তু চোখে পড়ে না। হকির ছোট, মাঝারি কিম্বা বড় খেলার আসরকে কেন্দ্র করে। হকি খেলা বাংলাদেশের ক্রীড়া উৎসাহীদের মন কোনদিনই পেল না। তাই হকি খেলা বাংলাদেশে উপেক্ষিতই। অথচ আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে আজো হকি খেলাই আমাদের, তাবৎ ভারতবাসীর একমাত্র গর্বের বিষয়। কিন্তু সেই হকি খেলার দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। বাংলাদেশের ক্লাবগুলো যেমন হকি খেলা সম্বন্ধে খুব একটা উৎসাহ দেখান না—তেমনি বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরাও হকি খেলাকে ঠিক যেন পাত্তা দিতে চান না। তাই বাংলাদেশের স্কুল-কলেজগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে হকি খেলার প্রচলন আছে। ফুটবল-ক্রিকেটের যেখানে ঢালাও ব্যবস্থা, সেই সব স্কুল-কলেজেও হকি খেলা একেবারেই অবহেলিত। তাই বাংলা দল (যদিও বাংলা দলে অবাঙ্গালী খেলোয়াড়ের সংখ্যাই বেশি) ও বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা হকি খেলায় বিশেষ কিছুই করতে পারেন না।

কিন্তু এইভাবে তো আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। হকি খেলার আন্তর্জাতিক আসরে ভারত পিছিয়ে পড়ছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব বড় বেশিভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। খেলোয়াড়রা যেন ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ বেড়াতে আর আনন্দ-স্ফূর্তি করতেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যান। কারো কারো আবার স্ফূর্তির বহর এতো বেড়ে যায় যে, খেলার মাঠে নেমেও তাল ঠিক রাখতে পারেন না। বেতাল হয়ে যান। ফলে যাদের এক সময় ভারত বলে বলে গোল দিতো, তারাই ভারতকে হারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অথচ এতেও লজ্জা নেই আমাদের। থাকলে আর যাই হোক সেই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর কথা ফলাও করে কেউ জাহির করতে যেতেন না। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। আমরা এখন সেই সীমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছি। তবে অসীমের সন্ধানে নয়—আমাদের গতি অন্ধকারের দিকেই। কিন্তু এভাবে আর কতো-কাল চলবে? মিউনিক অলিম্পিকের দিন এগিয়ে আসছে। সেদিকে কি আমাদের নজর আছে? আমরা চাই, সব ভুলে এখন হারানো সম্মান ফিরে পাবার জন্যে ভারতের হকি খেলোয়াড়রা, কর্মকর্তারা এগিয়ে আসুন। অনুশীলন আর আন্তরিকতার মাধ্যমে আমরা যেন ফিরে পাই আমাদের হারানো সম্মান—অলিম্পিকের স্বর্ণপদক।

—শান্তিপ্রিয়

# আমরা পারবো কি ক'রে

বিপ্লব তালুকদার

[illegible]

[illegible] বলছিলাম [illegible]—পর পর পাঁচটা আর পর পর চারটে টেস্ট হারার অভিজ্ঞতা আমাদের অর্থাৎ ভারতের আছে। এবার সে কৃতিত্ব (!) অর্জন করলো অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চার টেস্ট সিরিজের প্রত্যেকটিতেই অস্ট্রেলিয়া হেরে ভূত হয়েছে।

ভারত যখন পর পর পাঁচটা টেস্টে হেরে গিয়েছিল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তখন সমালোচনার ঢেউ-এ আমাদের কানপাতা দায় হয়ে উঠেছিল। কেউ বলেছিলেন, ভারত পাঁচ দিনের টেস্ট খেলার যোগ্য নয়—আবার কেউ বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে তিন দিনের টেস্ট খেলা উচিত—ইত্যাদি ...ইত্যাদি। কিন্তু এবার যখন অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পর পর সব কটা টেস্টে হেরে গেল, কই, তখন তো আর উঠলো না সমালোচনার ঢেউ!

যাই হোক, পোর্ট এলিজাবেথের চতুর্থ ও শেষ টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৩২৩ রানে হারিয়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পর পর চারটি টেস্টে জয়লাভ করে রাবার লাভ করেছে। অস্ট্রেলিয়া এর আগে আর কখনো এইভাবে পর পর টেস্ট ম্যাচে পরাজিত হয় নি।

প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিল ৩১১ রান। এর মধ্যে ছিল বি রিচার্ডের ৮১, ই বারলোর ৭৩ ও ডি লিণ্ডসের ৪৩ রান। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে একমাত্র কনোলীই সাফল্যলাভ করেছিলেন। কনোলী ৬টি উইকেট দখল করেছিলেন ৪৭ রানের বিনিময়ে।

এর উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হলো ২১২ রানের মাথায়। শিহান (৬৭) আর রেডপাথ (৫৫) ছাড়া আর কেউ ব্যাটই করতে পারেন নি। পোলক ৪৬ আর প্রোক্টর ৩০ রানের বিনিময়ে ৩টি করে উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার রিচার্ডস করলেন ১২৬ রান, আরভিন ১০২, বাচার ৭৩ আর লিণ্ডসে করলেন ৬০ রান। ফলে ৮ উইকেটে ৪৭০ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলো।

জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার তখন দরকার ৫৭০ রান। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে টেনেটুনে অস্ট্রেলিয়া করলো ২৪৬ রান। লরি ৪৩, রেডপাথ ৩৭, শিহান ৪৬ আর টেবার অপরাজিত থেকে করলেন ৩০ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রোক্টর ৭৩ রানে ৬টি ও বারলো ৬৬ রানের বিনিময়ে লাভ করলেন ২টি উইকেট। ফলে অস্ট্রেলিয়া পরাজিত হলো ৩২৩ রানে।

আগামী তেহেরান গেমে প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলা দল।

নিঃসন্দেহে প্রতিটি ক্রীড়ানুরাগীর কাছে আনন্দ সংবাদ, সেই সঙ্গে অভিনন্দনযোগ্যও। কিন্তু তারপর? বর্ষণক্লান্ত আকাশের বুকে এ যেন আলোর ঝলকানি। পরিশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত কলঙ্কের কালিমা মেখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, আর কর্মকর্তাদের নানা ফিরিস্তি।

একদিন যে দেশ ছিল এশিয়ার ফুটবলের সিংহভাগে, কালের যাত্রাপথে সে সম্মান আজ বিলীন হতে চলেছে। ভাবতে অবাক লাগে, চুনী-জার্নাল-বলরাম-প্রদীপের তৈরি ভারতীয় ফুটবলের সেই বীরত্বের কাহিনী আগামী দিনের পদাতিকরা ইতিহাস বলে গ্রহণ করবে। জাকার্তার সাফল্যই আমাদের বুঝি শেষ সাফল্য। এর পর সাফল্যের মাদকতা, সাফল্যের সম্মান যে কি তা আমরা ভুলতে চলেছি।

বিজ্ঞানভিত্তিক ফুটবলে ভারত ভিন্ন দেশের সঙ্গে এঁটে না উঠতে পারার প্রধান কারণ আমাদের মনে হয়, খেলোয়াড়দের আন্তরিকতার অভাব এবং তার সঙ্গে আমাদের তথাকথিত তকমা আঁটা কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা। এই সমস্ত কর্তৃপক্ষ ট্রেনিং-এর নামে যা কিছু করছেন তা "প্রহসন" ছাড়া আর কিছু নয়। বল মাথায় আর পায়ে রেখে কিছুক্ষণ দৌড়ঝাঁপ, তারপর কিছু 'পি টি' হলো ট্রেনিং-এর গতানুগতিক কোর্স। ফুটবলের যেটি অমূল্য সম্পদ—টিম স্পিরিট। সেটা কজন খেলোয়াড় এই ট্রেনিং থেকে গ্রহণ করেন? ফুটবলের অবিচ্ছেদ্য দুটি জিনিস "রিসিভিং" এবং "ডিস্ট্রিবিউশন" কজন খেলোয়াড়কে সঠিকভাবে শেখানো হয় আর কজনই বা শেখেন?

দোষ শুধু খেলোয়াড়দেরই নয়, যাঁরা খেলান তাঁদেরও। এটা ভেজালের যুগ—ভেজালই চরম সত্য। তাই বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্তিতেও ভেজাল?

এবারের তেহেরান গেমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আসছে বর্মা। এই বর্মা অনুশীলন করেছে ৪ বছর ধরে। অর্থাৎ সাফল্যের জন্য তারা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করেছে এক হাজার চারশ ষাট দিন। আর আমরা সেই তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি মাত্র কয়েক দিনের শিক্ষা নিয়ে। আর এ লড়াইয়ে কারা জিতবে, সেকথা বোধ করি স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে না। তাই বলছিলাম আমরা ওদের সঙ্গে পারব কি করে?

কিন্তু তবুও আশা করছি যে, বাংলা যদি তেহেরানে যায়, তবে খুব একটা নৈরাশ্যজনক ফল নিয়ে সে আসবে না, কারণ এই দলের প্রশিক্ষণের ভার পড়েছে অচ্যুৎ ব্যানার্জীর উপরে। যিনি স্বজনপোষণ নীতি কাকে বলে জানেন না এবং বিভিন্ন সম্ভবামিদের সুযোগদাতা। আর এই আদর্শের ফলেই বাংলার ঘরে সন্তোষ ট্রফি এসেছে।

আশা জাগছে এই কারণে যে, অচ্যুৎবাবু একটি নতুন কথা শুনিয়েছেন। বাংলা-দলের কোচ নির্বাচিত হবার পর সহাস্যে তিনি বললেন, "দেশের ফুটবলের জন্য আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু অর্পণ করবো। যে সম্মান আমায় কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন তা যাতে রক্ষিত হয়, তার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করব।"—ভারতীয় ফুটবলের এই তামসিকতায় বজ্রপাতের মত এমন দু'-চারটে কথা শুনে আশায় বুক বাঁধতে দোষ কি।

দল বদলের পালায়
মোহনবাগানের
দুই সেরা খেলোয়াড়
যোগ দিলেন
ইস্টবেঙ্গল দলে।
আগে এসেছিলেন হাবিব
এবার এলেন নঈম॥

# প্রশ্ন উত্তর

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় (ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১)

**প্রশ্ন :** সেণ্টার থেকে বিপরীত দিকের গোলে সরাসরি শট করলে বলটা যদি গোলে বিনা স্পর্শে প্রবেশ করে তাহলে কি সেটা গোল হবে?

**উত্তর :** না! গোল হবে না।

**মণি ভট্টাচার্য** (এম এল সি ব্লক নং ১, কাঁচরাপাড়া)

**উত্তর :** আপনি যাঁদের জীবনী জানতে চান, সম্ভব হলে পরিচীয়তে বিভাগে তাঁদের পরিচিতি প্রকাশ করা হবে। অন্য প্রশ্নটির উত্তর সেই সময়ই পাবেন।

**ছীরেন্দ্রমোহন ভদ্র** (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

**প্রশ্ন :** ক্রিকেট খেলায় বাঁ হাতের অফ স্পিন ও লেগ স্পিন বোলার হিসেবে কে কে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ জানাবেন।

**উত্তর :** বাঁ হাতের কে সেরা আর ডান হাতের কোন্ বোলার শ্রেষ্ঠ তা তো বলতে পারবো না।

**পরিতোষ নাগ** (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

**প্রশ্ন:** টেস্ট ক্রিকেটের আসরে কতোবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন? টেস্ট খেলায় শূন্য রানে সব চাইতে বেশিবার কে আউট হয়েছেন?

**উত্তর :** তা তো বলতে পারবো না। তবে কেউ জানালে জানিয়ে দেবো।

**বলরাম ব্যানার্জী** (মোনিকপাড়া, মেদিনীপুর)

**প্রশ্ন :** পাতৌদির নবাব ও বিল লরীর ঠিকানা জানতে চাই।

**উত্তর :** আমি জানি না।

**জ্যোতি দত্ত** (মতিগঞ্জ, ২৪ পরগনা)

**উত্তর :** আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। সোবার্স কতোবার শূন্য করেছেন তার উত্তরে আর একজনের চিঠি ছাপা হয়েছে। তাই আপনারটা আর প্রকাশ করা হলো না।

**অঞ্জন ব্যানার্জী** (পঃ পুটিয়ারী, কলকাতা-৪১)

**উত্তর :** আপনি যাঁদের বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চেয়েছেন তাঁদের সকলের এ্যাভারেজই আগে প্রকাশ করা হয়েছে, তাই আবার দিলাম না।

**সেখ কামাল** (মার্কাস স্কোয়ার, কলকাতা-৭)

**উত্তর :** টেস্ট খেলায় যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ত্রিশতাধিক রান করেছেন, তাঁদের নাম এর আগেই একবার প্রকাশ করা হয়েছে। তাই আর দেওয়া হলো না। আপনি অন্য প্রশ্ন করবেন। আপনার আগের চিঠিটা আমরা পাই নি।

## গল্প হলেও সত্যি

টেস্ট খেলায় শতরান করা যে কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষেই গৌরবের বিষয়। এ পর্যন্ত টেস্টে শতরান অনেক খেলোয়াড়ই করেছেন।

কিন্তু এ কথা ঠিক যে, শতরান করার আগের মুহূর্তে 'নড়বড়ে নব্বুইয়ের' কোঠায় পৌঁছে অনেক বাঘা বাঘা খেলোয়াড়কেও অনেক সময় 'দুর্ভাগ্যে'র শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ক্লিম হিলের মতন 'দুর্ভাগ্য' বোধ করি আর কারো হয় নি। একমাত্র ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেই টেস্ট খেলায় তিনি পাঁচবার এই নব্বুয়ের ঘরে আটকে পড়েছেন।

এর মধ্যে ১৯০১-০২ সালের সিরিজেই তিনি উপর্যুপরি তিন ইনিংসে একেবারে শতরানের মুখে পৌঁছেও ব্যর্থ হয়েছেন। ঐ তিনটি ইনিংসে তাঁর রানসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৯, ৯৮ ও ৯৭ রান। বাকী অন্য দুটি ইনিংসে—১৮৯৭-৯৮ সালে ৯৬ রান ও ১৯১১-১২ সালে ৯৮ রান করে প্রতিবারেই 'দুর্ভাগ্যে'র শিকার হয়েছিলেন। ব্যাপারটা হিলের কাছে সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক ও আমাদের কাছে বেশ আশ্চর্যজনক, তাই নয়......!

—সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
হালিশহর, গোলাবাড়ী

**অপূর্ব সেন** (বি টি রোড, অশোক-গড় পূর্ব, কলকাতা-৩৫)

**উত্তর :** বাংলায় বক্সিং-এর ওপর কোন পত্রিকা নেই। ইংরেজীতে সম্ভবতঃ আছে—আপনি পত্রিকা সিণ্ডিকেট, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। বক্সিং-এর ওপর ইংরেজীতে খুব ভালো ভালো অনেকগুলো বই আছে। ঐখানেই খোঁজ পেতে পারেন।

**শ্যামানন্দ দত্ত** (শহীদনগর, ঢাকুরিয়া কলকাতা-৩১)

**প্রশ্ন :** সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের কোচের নাম জানাবেন। তাঁর ঠিকানাটাও চাই

**উত্তর :** অচ্যুৎ ব্যানার্জী। ওঁকে C/o. আই. এফ. এ অফিস, সুতারকিন স্ট্রীট, কলকাতা-১—এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

**চন্দ্রশেখর, মিনতি ও মণি** (ঠিকানা নেই)

**উত্তর :** আপনাদের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, একটু স্পষ্ট করে লিখবেন। ঠিকানা না থাকলে কিন্তু আর উত্তর দেওয়া হবে না।

**অমলেন্দু দত্ত** (সি টি টি হোস্টেল, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)

**উত্তর :** তোমাকে শীঘ্রই ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেওয়া হবে।

**রতন দাস ও কৃষ্ণা দাস** (শহীদনগর, কাঁচরাপাড়া)

**প্রশ্ন :** ক্রিকেট খেলায় কোন খেলোয়াড় যদি রান আউট হয়ে যায়, তবে যে বোলার বল করে, সেই আউটটা তার উইকেট বলে গণ্য করা হয় না কেন?

**উত্তর :** কারণ রান আউটের ক্ষেত্রে বোলারের কোন কৃতিত্বই নেই। যিনি রান আউট করলেন সব কৃতিত্ব তাঁরই—তাই রান আউটের বেলায় বোলারের উইকেট বলে গণ্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র





এ.সরকার এণ্ড সন্স

# সূচীপত্র

৩ বর্ষ ঃ ৩৯শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১২ই চৈত্র ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 26th March, 1970

# বর্ধমানের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর সি পি এম কর্তৃক যে হরতাল আহ্বান করা হয়, সেই হরতালের সাফল্য তারা চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বুকে রক্তগংগা বইয়ে দিয়ে। হরতালের দিনটি স্মরণ করলেই চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে অগণিত অসহায় জনগণের আতংক, আর্তনাদ এবং চারদিকে বিভীষিকার তান্ডবলীলা। দলের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য হরতালের দিন সারা রাজ্যে সি পি এম যে নারকীয় কার্যকলাপের স্বাক্ষর রেখেছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হাড়ে হাড়ে তার ফল ভোগ করছে। সি পি এম দল নৃশংসতম আচরণের দ্বারা আজ সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের ঘৃণা ও ক্রোধের পাত্র হয়ে উঠেছে। সি পি এম অতীতে দল রক্ষার জন্য যা কিছুই করুক না কেন, আমাদের ধারণা ছিল, তারাও মানুষ, তাদেরও আছে হৃদয়। কিন্তু বর্ধমানে তারা যে কাজ করেছে, ইতিহাসে তার কোনো নজীর নেই।

১৭ই মার্চ হরতালের দিন সি পি এম-এর নেতৃত্বে বর্ধমানে যে ঘটনা ঘটে গেছে, তার ভয়াবহতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ঐদিন বর্ধমান শহরের তেলমারুই রোডে সি পি এম-এর সমর্থকরা তিনজন কংগ্রেসকর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই তিনজনের নাম মলয় সাঁই, প্রণব সাঁই ও জিতেন রায়। যেভাবে এদের বর্শা, ছোরাছুরি কুড়ুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে সে-কথা কল্পনা করাও যায় না। শুধু তাই নয়, ঐ পরিবারের বড় ভাই নবকুমার সাঁই-এর চোখ দুটি সি পি এম-এর জহ্লাদরা উপড়ে ফেলে এসিড ঢেলে দেয়। হতভাগ্য নবকুমার এখন জীবন্মৃত অবস্থায় বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালে আছেন। এমন কি, মা মৃগনয়না দেবী জহ্লাদদের কাছে পুত্রদের প্রাণভিক্ষা চেয়ে পেয়েছেন নিহত সন্তানদের রক্তের ছিটে ও নানা লাঞ্ছনা। অভাগিনী মা-ও এখন মুমূর্ষু অবস্থায় মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে রয়েছেন বিজয়চাঁদ হাসপাতালে।

বর্ধমান শহরের সি পি এম-এর দুজন নেতার নেতৃত্বে এই পৈশাচিক বর্বর হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই ঘণ্টা ধরে ঐ তান্ডব চলে। পুলিশ এবং মহকুমা শাসক ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি। সি পি এম-এর জহ্লাদরা সাঁই পরিবারের বসতবাটীর চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দেয়, দরজা-জানলা ভেঙে চুরমার করে এবং বর্শা-কুড়ুল হাতে একের পর একেকে আক্রমণ করে রক্তের স্বাদ মেটায়।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের ঐ নৃশংস হত্যাকান্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্ষোভ ও বেদনাসজল চোখে বলেছেন, বিপ্লবের মানে বুঝি, কিন্তু সন্তানকে মায়ের সামনে খুন করে সন্তানের রক্ত মায়ের দেহে ছুঁড়ে ফেলা সে কি বিপ্লব? শ্রীমুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের কাছে পত্র লিখে এই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং দোষী অফিসারদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানিয়েছেন। নব কংগ্রেসের নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, যারা জনতার নামে এই ঘৃণ্য হত্যাকান্ড এবং সারা বাংলাদেশে ব্যাপক তান্ডবলীলা চালিয়েছে, জনতার রায় নিঃসন্দেহে তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। নব কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী ও সি পি এম বাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সি পি এম-এর এই পৈশাচিক কাজের তীব্র নিন্দা করে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রীভূপাল বসু সি পি এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে এই হত্যাকান্ডের জন্য একইভাবেই দায়ী বলে মনে করেন এবং ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে এঁদের বিচার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেছেন।

সি পি এম-এর যথার্থ স্বরূপ আজ উদ্‌ঘাটিত। তারা তাদেরই যোগ্য আচরণ করলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের শয়তানী রূপটির প্রত্যক্ষ পরিচয় এবার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের আপামর মানুষের সঙ্গে আমরাও চাই, বর্ধমানের হত্যাকান্ড সম্পর্কে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত। আর যে-সব প্রশাসনিক কর্মকর্তা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বিভৎসতম হত্যাকান্ডে পরোক্ষে ইন্ধন যুগিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক—ইহাই আমাদের দাবি। বিচার বিভাগীয় তদন্ত সুরু হওয়ার পূর্বেই জেলা শাসক ও মহকুমা শাসককে অপসারণ করার যে দাবি উঠেছে, আমরাও তার সঙ্গে একমত। এঁদের উপস্থিতি নিরপেক্ষ তদন্তকার্য ও জহ্লাদদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

ভারতের সংবিধানটি বড়ো মজার, বড়ো অদ্ভুত।

এখানে বলা হয়েছে, প্রতি রাজ্যে একজন করে রাজ্যপাল থাকবেন। তিনিই হবেন সমস্ত দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি করে মন্ত্রিসভা থাকবে। এই মন্ত্রিসভার প্রধান হবেন মুখ্যমন্ত্রী। কার্যত দাঁড়িয়েছে কি? রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল পরিহার্য অলংকারমাত্র, কেবল শোভাবর্ধক একজন পদাধিকারী। রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম মন্ত্রিসভাই করেন, তবে রাজ্যপালের নামে। সরকার বা মন্ত্রিসভা যে সিদ্ধান্ত নেন, রাজ্যপালকে ঘাড় নেড়ে তাতে সম্মতি জানাতে হয়। নির্বাচিত মন্ত্রিসভার সঙ্গে যে রাজ্যপালের মতের গুরুতর অমিল হয়, তাঁর পক্ষে গদিতে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের নির্দেশিত পথে সরকার চালান কিন্তু সরকার-নিরপেক্ষ কোনো ভূমিকাই তাঁর নেই। কিন্তু এই ঠুঁটো জগন্নাথই সক্রিয় সব্যসাচী হয়ে ওঠেন, সরকারের যদি পতন ঘটে। তখন রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যে সর্বেসর্বা। অবশ্য উপদেষ্টা তখনো থাকে, তবে তাঁরাও কেন্দ্রীয় সরকারেরই মনোনীত ব্যক্তি!

কিন্তু তাই বলে নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্যে শ্রীধাওয়ান যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন কামনা করেন নি। বরং তিনি চেয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে ১৪ দলের ফ্রন্ট পরীক্ষা সার্থক হোক। বস্তুত অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান এখানে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এ জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হলো, তাঁর পূর্ববর্তী রাজ্যশাসক শ্রীধরমবীর রাজ্য-রাজনীতিতে তথা বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে যে ভুল করেছিলেন, শ্রীধাওয়ান সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে রাজি হন নি। শ্রীধাওয়ান তাঁর কর্তব্য ও অধিকারের সীমা সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক, সে সীমা লঙ্ঘন করে তিনি এখনো বিতর্কের ঝড় তোলেন নি। এখনো রাজ্যপাল ধাওয়ান দলীয় বা গোষ্ঠী রাজনীতির ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষতার ভূমিকা নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে পালন করছেন।

বাস্তবিক শ্রীধরমবীরকে নিয়ে দু'-বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এতখানি ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল যে, তাঁর জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্বভার নিতে কেউ এগিয়ে আসতে চাইছিলেন না। অথচ ধরমবীরকেও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার বরদাস্ত করতে রাজি নন। রাজ্যপালকে তাঁরই সরকার যখন সামাজিকভাবে বর্জন করতে লাগলেন, যখন তাঁর কর্তৃত্ব কার্যও অস্বীকার

এস এস ধাওয়ান

করলেন, তখন তাঁর পক্ষে গদি আঁকড়ে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকাই বা সম্ভব কী করে। সেদিন যদি শ্রীধাওয়ান পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক সমুদ্রে ডিঙি বাইতে সাহসী হয়ে থাকেন তো তার মূলে ছিল তাঁর নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং সাধারণ মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান ছিলেন বিলেতে ভারতের হাই কমিশনার। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না তিনি, তবুও প্রধান রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল নেহরুর ছিলেন প্রিয়পাত্র। অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শ্রীধাওয়ানের জন্ম। লাহোর কলেজ ও ফরমান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করার পর তিনি গেলেন বিলেতে। কেম্ব্রিজের ইম্যানুয়েল কলেজ থেকে ইতিহাস ও আইনে ট্রাইপস্ নিয়ে পড়তে থাকলেন। তারই সঙ্গে চলতে লাগলো রাজনীতিতে দীক্ষা। ফেবিয়ান সোশ্যালিজমের ঢেউ বইছে তখন বিলেতে। বিখ্যাত কমিউনিস্ট রজনী-পাম দত্তের সংস্পর্শেও এলেন ধাওয়ান। সেদিনকার রক্ষণশীল কলেজে স্রেফ বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিকতার জোরে ছাত্র সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মিডলটন টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ধাওয়ান দেশে ফিরলেন।

আইন ব্যবসা দিয়েই কর্মজীবন সুরু। তারই সঙ্গে চলতে লাগলো কিছু কিছু রাজনীতি, বিলেতে যার হাতেখড়ি হয়েছিল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দলে নাম লেখালেন ধাওয়ান। নেহরুই ছিলেন ধাওয়ানের আদর্শ পুরুষ, নিজেও তো সমাজতন্ত্রে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। এর পরে একটানা ১৪ বছর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনা করলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলেন ধাওয়ান ১৯৫৮ সালে। তার আগে অবশ্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল ছিলেন। ১৯৬৭ সালে শ্রীধাওয়ান বিলেতে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীধাওয়ান বামপন্থী রাজনীতিতে আস্থাশীল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর একাধিক ভাষণে জনদরদ প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর জঞ্জাল সাফাই, বস্তিতে থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ, সাধারণ লোকের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে বক্তৃতার গুরুত্ব কেবল প্রতীকী নয়। শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান যথার্থ অর্থেই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেন।

শ্রীধাওয়ানের স্ত্রীও সদালাপিণী। তাঁদের ছেলেও বিলেতের কলেজে মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে।

যা অনিবার্য ছিল না, তাকে অনিবার্য করে তোলা হল। মার্চ মাসের গোড়াতেও ভাবা যায় নি যে, রাষ্ট্রপতি-শাসন ক'দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ওপর বর্তাবে। অবশ্য ঘটনাচক্র আপনার-আমার ইচ্ছাতেই আবর্তিত হয় না, কাজেই বিলাপ করে কোন লাভ নেই। রাষ্ট্রপতি-শাসনকে আমরা মোটেই খুব আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করি না, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের পর বিভিন্ন দলীয় পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়ে গেছল যে, এ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মিনিফ্রন্ট গঠনের মত পরিস্থিতিও যেমন অনুপস্থিত ছিল, বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বেও তা করার মত পরিস্থিতি ছিল না। অতএব রাষ্ট্রপতি-শাসন ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যাসংকুল রাজ্যে রাষ্ট্রপতি-শাসন একটি অভিশাপ বিশেষ, তার কারণ রাষ্ট্রপতি-শাসনে শুধু কায়ক্লেশে প্রশাসন ব্যবস্থাকেই চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই সম্ভবপর নয়, উন্নয়নমূলক কোন কাজের অবকাশ এখানে নেই। মাত্র কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছিলেন, বিভিন্ন খাতে যে সব ব্যয়বরাদ্দ হবার কথা ছিল, সে সব শিকেয় উঠবে, লোকসভা পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা কাজ চালানো বাজেট পাশ করবে, যার দ্বারা শুধু শাসনকার্যটুকুই চলবে, তার বেশি কিছু নয়। রাজ্যপালের হাত-পা বাঁধা, নিজের থেকে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার, তার জন্য কেন্দ্রের কাছে অর্থের সংস্থান করার বা তা রূপায়ণ করার কোন ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই, কেন না রাষ্ট্রপতির শাসনকে সংবিধান অনুযায়ী একটি একান্ত অস্থায়ী ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়। যদিও সংবিধান অনুযায়ী ছয় মাসের বেশি রাষ্ট্রপতি-শাসনের মেয়াদ থাকার কথা নয়, তথাপি সর্বত্রই তা ঘটনাচক্রে দীর্ঘকাল টিকে থাকে, আর ১৯৭২-এর সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান রাষ্ট্রপতি-শাসন দু' বছরও থাকতে পারে। এর অর্থ এই যে, অন্যান্য রাজ্য উন্নয়নক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে দু' বছর এগিয়ে থাকবে। অপেক্ষাকৃত অল্প সমস্যা যে সব রাজ্যে, যেমন বিহার বা উত্তরপ্রদেশ, সেখানে রাষ্ট্রপতি-শাসনে খুব অসুবিধা হয়ত হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যাক্লিষ্ট রাজ্যের পক্ষে, যে রাজ্যকে দিনের সংস্থান দিনেই করতে হয়, সেখানে রাষ্ট্রপতি-শাসন সত্যই অভিশাপ। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল নিঃসন্দেহে সৎ, দক্ষ ও প্রগতিশীল ব্যক্তি, আর পাঁচজনের মত নিছক কর্তাভজা সরকারী কর্মচারী নন, বর্তমান অবস্থায় এ ভিন্ন তাঁর অন্য কিছু করারও ছিল না, এবং যাঁর নিরপেক্ষতা আমাদের বিচারে সন্দেহের অতীত, অজস্র সদিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য, তার শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য কার্যকর কিছু করাই সম্ভব নয়। সংবিধান তাঁকে সে অনুমতি দেয় না, বড়জোর তাঁর আমলে আইন-শৃঙ্খলার কিছুটা উন্নতি হতে পারে এইমাত্র।

কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙলো কেন? পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটল কেন? আজ থেকে কয়েক বছর পর যদি স্কুল-কলেজে ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে এই প্রশ্নটির উত্তর ছাত্রদের লিখতে দেওয়া হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের কারণ কি, তাহলে সেই উত্তরটা কি হবে? দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সত্যই কি কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল? এই সরকারের পতনের মূলে কি কোন অর্থনৈতিক কারণ ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর একটিই হওয়া সম্ভব। তা হচ্ছে এই যে, যুক্তফ্রন্টের পতনের কারণ দুই ব্যক্তির মর্যাদার লড়াই, একজন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, অপর জন শ্রীসুশীল ধাড়া। বস্তুত কোন রাজনৈতিক কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে নি। বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, সি পি আই প্রভৃতির মতে যুক্তফ্রন্টের পতনের জন্য দায়ী সি পি এম, আবার সি পি এম-এর মতে এর জন্য আসলে দায়ী সি পি আই। অর্থাৎ যে যার শত্রু তার ওপর যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দলগুলি চাপিয়ে দিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট কেন ভাঙল তার কোন উত্তর নেই, কে বা কারা ভেঙেছে, যার জন্য প্রত্যেকটি দল কোন না কোন শরিক দলকে দায়ী করেছে। কিন্তু কি সেই কারণ? সি পি এম-এর যুক্তি অনুসারে, যুক্তফ্রন্টের প্রগতিশীল কর্মসূচী বাংলা কংগ্রেস ইত্যাদি "প্রতিক্রিয়াশীল" দলগুলির কাছে এবং সি পি আই প্রমুখ ছদ্ম প্রগতিশীল দলগুলির কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল, কেন না এই দলগুলির শ্রেণীচরিত্রই হচ্ছে কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে। জমি দখলের আন্দোলন, শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন, সব কিছুর গতি দেখে এরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিল এবং তারই পরিণতি হিসাবে যুক্তফ্রন্ট-শাসনের অবসান ঘটেছে। এ যুক্তি মেনে নেওয়া যেত, যদি সত্যই এ বিষয়ে কোন প্রমাণ থাকত। বাস্তবে কিন্তু প্রমাণাভাব। বত্রিশ দফা কর্মসূচী নিয়ে কোন বিরোধই মন্ত্রিসভায় ঘটে নি, বা যুক্তফ্রন্টের প্রগতিশীল কাজকর্মে কোন শরিক দল বাধার সৃষ্টি করেছে বলে আমাদের জানা নেই। জমি দখল বাংলা কংগ্রেসের পতাকাতলেও হয়েছে এবং যদি তর্কচ্ছলে ধরেও নেওয়া যায় যে, বাংলা কংগ্রেস জোতদার-কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহক, তাহলেও জমি দখলের ক্ষেত্রে যে সব সংঘর্ষ হয়েছে, তার বেশির ভাগের হওয়া উচিত ছিল বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এম-এর। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, শরিকী সংঘর্ষে বাংলা কংগ্রেসের গায়ে কোন আঁচ না লাগা সত্ত্বেও তারাই এই নিয়ে সবচেয়ে বেশি হৈ চৈ করেছে। যুক্তফ্রন্টের প্রগতিশীল কাজকর্ম বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক বা এস ইউ সি-র কাছে অসহ্য হয়ে গিয়েছিল তারও কোন প্রমাণ নেই। এরা যে যুক্তফ্রন্টের প্রগতিশীল নীতিসমূহ রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করেছে, তারও প্রমাণাভাব। অর্থাৎ বাস্তবে আমরা দেখছি বত্রিশ দফা কর্মসূচী বা তার রূপায়ণের ব্যাপার নিয়ে কোন দ্বন্দ্বই দেখা যায় নি। এবার যারা সি পি এম-কেই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করে তাদের বক্তব্যের মোদ্দা বিষয়টা অনুধাবন করে দেখা যাক। বাংলা কংগ্রেস দলের মতে পশ্চিমবঙ্গের

আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছিল এবং বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আরও কয়েকটি দল ক্রমাগত বলে এসেছে যে, সি পি এম দলীয় স্বার্থে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছে, জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্র-দপ্তর ও পুলিশ বিভাগকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এ বিষয় নিয়ে বাংলা কংগ্রেস রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযান চালিয়েছে এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি, যারা সি পি এম-এর বিরোধী, এই প্রচার অভিযানকে নিজেদের দলীয় স্বার্থে নিঃসংকোচে ব্যবহার করেছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা নিয়ে বাইরে যত ঝড়ই তোলা হোক না কেন, মন্ত্রিসভার ভিতরে এ নিয়ে কোন আলোচনা কোনদিনই হয় নি, বা কি করলে এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব, তা নিয়ে কেউই আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে যান নি।

আসল কথা কোন রাজনৈতিক কারণে যুক্তফ্রন্টের পতন হয় নি, তা হয়েছে অন্য প্রশ্নে। এই বঙ্গদর্শনে আমরা একটি কথা বারবার লিখে এসেছি, বাংলাদেশের রাজনীতি এখনও বিশুদ্ধভাবে কয়েকজন ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রিত, তা অমুকবাবু বা তমুকবাবুর ব্যাপার। এই অমুক বা তমুকবাবুরা বিভিন্ন দলের শীর্ষে বসে আছেন দীর্ঘকাল ধরে, এবং এই সকল দলনেতারা, যাঁরা যে কোন উপায়েই হোক চূড়ায় পৌঁছে গেছেন, দলের ওপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বজায় রাখেন ক্যাডারদের সবচেয়ে ব্রুট অংশের ওপর নির্ভর করে। একটু স্মরণ করলেই মনে পড়বে, মন্ত্রিসভায় গোড়ার দিকে টিম ওয়ার্কের অভাব ছিল না, এমন কি বাইরে যখন অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবু পরস্পরের মুণ্ডপাত করছেন, ক্যাবিনেটের বৈঠকে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র, সেখানে তাঁরা দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবেই কাজকর্ম, আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু গণ্ডগোল তবে থেকেই শুরু হয়েছে, যবে থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত, অশোক ঘোষ, রণেন সেনেরা রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেছেন। আমরা পূর্বে বহুবার একটি কথা বলেছি, মন্ত্রীরা যেন সকলে ঘুড়ি হয়ে উড়ছেন এবং আসল লাটাইটি থাকছে দলীয় নেতাদের হাতে, যাঁরা প্রয়োজন বোধ করলে ঘুড়ির সুতো ছাড়ছেন, মন্ত্রীরা একে অপরের কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে আবার ঘুড়ির সুতো গুটিয়ে নিচ্ছেন, দুটি ঘুড়ির ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠছে। আসলে যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে কম-বেশি প্রতিটি বড় দলের মনোভাব ছিল অনান্তরিক। প্রত্যেকটি দলই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে গেছেন শেষদিন পর্যন্ত, চোদ্দ পার্টির যুক্তফ্রন্ট যে চোদ্দ মাসও টিকবে না, কোন কোন দলের তরফ থেকে এ ভবিষ্যদ্বাণী তো বহু আগেই করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক মাস পূর্বে আমাদের পত্রিকায় জনৈক লেখক যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত একটি রচনায় স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে শরিক দলগুলির মনোভাব সম্পূর্ণ অনান্তরিক, কেউই চায় না এই সরকার টিকুক, তবে যতদিন সরকার আছে ততদিন কাজ হাসিল করে যাও, এই মওকায় নিজেদের সমর্থক বাড়াও, এই মওকায় প্রতিপক্ষকে খতম কর। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দলনেতাদের অনান্তরিক স্থূল স্বার্থসংযুক্ত মনোভাব, যে মনোভাব এই পার্টি নেতাদের শিখিয়েছে যে, বাংলাদেশের ভাগ্যবিধাতা তাঁরাই, হাতের সুখে তাঁরাই গড়তে পারেন, পায়ের সুখে তাঁরাই ভাঙতে পারেন।

যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিষয় এমন কিছু গুরুতর ছিল না, যা আলাপ-আলোচনায় এবং আন্তরিক কার্যকলাপে আরোগ্যলাভ করতে পারত না। আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি সত্যই হয়েছিল, কিন্তু তা রোধ করার ক্ষমতা যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ছিল না, তা মানা যায় না। যাঁরা দু ঘণ্টায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত গুরুতর বিষয়কে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছিলেন, তাঁরা আইন-শৃঙ্খলাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না, একথাটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। বরং বলা যায় যে, যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলি আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সুযোগ নিয়ে একহাতে আখের গুছিয়েছেন, আবার কেউ কেউ ঐ আখের গুছানোর সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির দোহাই দিয়ে আসর মাৎ করারও চেষ্টা করেছেন। পাঠক-পাঠিকার নিকট অনুরোধ—কোন বিশেষ দলের রঙীন চশমা চোখে এঁটে বর্তমান নিবন্ধটি পড়বেন না, কেন না এখানে আমরা কোন দলকেই সমর্থন করছি না, বা কোন দলকে সাধু বানাবার চেষ্টাও করছি না। "যে আমার সঙ্গে নেই, সে নিশ্চয়ই আমার বিপক্ষে আছে"—এই মতবাদ রাজনৈতিক কর্মীদের মূলমন্ত্র হয়ত হতে পারে, কিন্তু তাদের বাইরেও জগৎ ও জীবন আছে। বস্তুত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই যুক্তফ্রন্টের আমলে কি রকম ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী তৈরী করেছেন, তার নিদর্শন শুধু গত সতেরই মার্চ তারিখের ধর্মঘটের দিনের ঘটনাগুলো দেখলেই বোঝা যাবে, অতীতের শরিকী সংঘর্ষের কথা আর নাই বা তুললাম।

বর্ধমানের সেই পৈশাচিক ঘটনার কথাই ধরা যাক না, যেখানে একটি গোটা পরিবারকেই নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের চোখের সামনে, কাটারি, কুড়ুল, বল্লম দিয়ে দুজনকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, সকলের চোখের সামনে। শিশুপুত্রকে আগুনের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, একজনের দু'চোখে এ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়েছে, মাকে ঘরের খুঁটিতে বেঁধে রেখে তাঁর চোখের সামনে তাঁর পুত্রকে কুপিয়ে মারা হয়েছে—এর নাম শ্রেণী সংগ্রাম!

হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার কথাই ধরুন না কেন? সেখানে কত লোককে যে নৃশংসতম উপায়ে হত্যা করা হয়েছে, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে তবেই তা প্রকাশিত হবে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ মারা হয়েছে, এবং সে নিহতের সংখ্যা কত, তার কোন হিসাব নেই, যাকে বলা যায় ব্যাপক গণহত্যা।

আমাদের জিজ্ঞাস্য, এইভাবে যাদের হত্যা করা হল, তারা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? তারা তো খেটে খাওয়া মানুষ, যাদের জীবনধারা আদ্যন্ত প্রায় অনশনের লাইন ধরেই চলে, বরং প্রায় তা লাইনের নিচে নেমে যায়, কিন্তু কদাচ উপরে ওঠে না। এরা বুর্জোয়া? এরা প্রতিক্রিয়াশীল? এরাই কি শোষক শ্রেণী? এই হত্যা কেন? কাদের রক্তে হত্যাকারীদের হাত রাঙা? কই, যুক্তফ্রণ্টের আমলে কোন সমাজবিরোধী বা কালোবাজারীকে তো পিটিয়ে মারা হয় নি? নেতারা যে কি রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন, তা তাঁদের হরতাল আহ্বান এবং হরতাল-বিরোধিতার পাল্টা আহ্বান দ্বারাই কি প্রমাণিত হয় নি? যাঁরা হরতাল আহ্বান করেছিলেন এবং যাঁরা হরতালের বিরোধিতা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁরা কি জানতেন না—এর দ্বারা রক্ত ঝরবে গরীব কৃষকের, গরীব শ্রমিকের?

## বর্ধমানের বর্বর হত্যাকাণ্ড

বিগত হরতালের দিন বর্ধমান শহরে সি পি এম-এর কর্মীরা একটি পরিবারকে যেভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, তার বিবরণ পাঠ করে যে-কোন মানুষই স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। এ নৃশংসতা জাত-অপরাধীদের দ্বারাও করা বোধহয় সম্ভবপর নয়। বর্ধমান শহরে তৈলমারী

বর্ধমানে সি পি এম-এর পৈশাচিক তান্ডবের বলি

রোডের একটি বাড়ি আক্রমণ করে একসঙ্গে তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত যুবকদের নাম—মলয় সাঁই, প্রণব সাঁই ও জিতেন রায়। যেভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এদের হত্যা করা হয়েছে, তা কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব, একথা যেন কল্পনা করাও যায় না। শুধু তাই নয়, বড়ভাই [illegible]কুমার সাঁই-এর দুটি চোখই উপড়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর সেই উৎপাটিত চোখের ওপর এসিড ঢেলে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির নারীরা পর্যন্ত রেহাই পান নি; এমন কি মায়ের সামনে ছেলেদের অমানুষিকভাবে হত্যা করে তাঁর গায়ে ছেলেদের রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। হতভাগিনী মা এখন হাসপাতালে উন্মাদ অবস্থায় আছেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে কয়েক হাজার লোক এই নারকীয় তান্ডব চালিয়েছে, কিন্তু পুলিশ ও স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ নির্বিকার থেকেছে।

আমরা রাজ্যপালের জরুরী দৃষ্টি বর্ধমানের এই নারকীয় হত্যাকান্ড সম্পর্কিত ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতি আকর্ষণ করছি এবং জল্লাদদের গ্রেপ্তার ও আদালতে অভিযুক্ত করার জন্য এবং সেই সঙ্গে নিষ্ক্রিয় স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানাচ্ছি।

## রাজ্যপালের বেতার ভাষণ

১৯শে মার্চ তারিখে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান যে তাৎপর্যপূর্ণ বেতার ভাষণ দেন, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেছেন, যুক্তফ্রন্ট আজও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং "রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে আমি শরিক দলগুলির মধ্যে আপস আলোচনা চালিয়ে যুক্ত-ফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করে যাব সব সময়। আমি আশা করি, যখন মিটমাট হয়ে যাবে ও পুনরুজ্জীবন ঘটবে, তখন সব শরিক দলই অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নেবেন। কোন কোন সময় প্রাথমিক বিচ্যুতি চূড়ান্ত সাফল্যের পথ করে দেয়।

শ্রীধাওয়ান বলেন, এক স্বীকৃত সাধারণ কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য যুক্ত-ফ্রন্ট অংশীদাররা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ওই কর্মসূচী কি করে কার্যকর করা হবে সে সম্পর্কে চুক্তিতে কোন উল্লেখ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ তিনি ৩২ দফা কর্মসূচীর ৫নং দফার উল্লেখ করেন, যেখানে লেখা হয়েছে বাগিচা এলাকায় সমস্ত বেনামী জমি খুঁজে বের করে, তা উদ্ধার ও বিতরণ করা, মেছো ভেড়ীকে জমিদারী দখল ও ভূমি সংস্কার আইনের আওতায় আনা এবং স্থায়ী ভিত্তিতে ভূমিহীন ও দুঃস্থ কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ সহ ভূমি সংস্কারের এক ব্যাপক কর্মসূচী যুক্তফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করবেন। কিন্তু কি করে এই সরকারের কাজ করা হবে, সে সম্পর্কে কর্মসূচীতে কোন উল্লেখ নেই। অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকরা নিজেরাই দখল করে নেবেন, না আইনসম্মতভাবে নিযুক্ত সরকারী ব্যবস্থাপকেরাই এই কাজ করবেন? এই সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। ফলে জমি দখলের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এবং স্থানীয় দলনেতাদের সমর্থনে বিভিন্ন বিরোধী দাবিদারের মধ্যে বিপজ্জনক সংঘর্ষ দেখা দেয়।

শ্রীধাওয়ান বলেন, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল এই যে, যুক্তফ্রন্টের সমঝোতায় ফ্রন্টের কোন সদস্যের ক্ষমতার অপ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল না। আইনজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, অংশীদারত্ব চুক্তিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে—কোন অংশীদার নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদার অপব্যবহার করলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা। আমি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে, যিনি অত্যন্ত সজ্জন ও সর্বজনসম্মানিত, এই মারাত্মক ত্রুটির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন যে, এরকম একটা অবস্থার উদ্ভব হবে, তাঁরা তা পূর্বে ভাবতেই পারেন নি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—মাত্র এক বছর আগে প্রায় একই কারণে যুক্তফ্রন্ট যখন প্রায় ভেঙে পড়ল, তখনই কেন আপনারা এটা উপলব্ধি করেন নি?

শ্রীধাওয়ান আরও বলেন, উপ-মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অত্যন্ত সুদক্ষ ব্যক্তি। বিশ্বের যে-কোন দেশের সরকারের পক্ষে তিনি গৌরবের হতেন। তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনার শেষ দিকে আমি বলেছিলাম, যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করার জন্য ফ্রন্টের কোন সদস্যের পক্ষে খুব একটা আন্তরিক প্রয়াস চালানো হয় নি। আমি তাঁকে বললাম, অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট দল অন্যান্য শরিক দলের প্রতি বড়ভাইসুলভ মনোভাব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমার আক্ষেপ এই যে, আপনার দল ঠিক উল্টোটাই করেছে, অর্থাৎ অন্যান্য দলের প্রতি বড়ভাই-এর মনোভাব গ্রহণ করেন নি। আমি বললাম, যৌথ পরিবারে বাবা অথবা বড় ভাইকে পরিবারের সংহতি রক্ষার জন্য অনেক ছোটখাট ব্যাপারে পরি-বারের ছোট সদস্যদের কাছ থেকেও অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হয়। শ্রীজ্যোতি বসু জানান, ফ্রন্টের কয়েকজন সদস্য যেভাবে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং তাঁর দলকে হেয় করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর দলের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। আমি তাঁকে ১৯১৮ সালে ব্রেস্ট লিভো-স্ককে লেনিন শান্তি আলোচনার সময় যে মনোভাব ও কৌশল দেখিয়েছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

ভাষণের শেষ অংশে রাজ্যপাল বলেন যে, বর্তমানে তাঁকে রামায়ণের ভরতের ভূমিকাই নিতে হবে, কেন না রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর ভূমিকা নিছক তত্ত্বাবধায়কের "পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ সাহায্য যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য আমি চেষ্টা করব। আমার দৃঢ় ধারণা, এতদিন পর্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গের জনগণ যে ব্যবহার পেয়েছেন, তার চেয়েও ভাল ব্যবহার পাবার তাঁরা যোগ্য। এই প্রাণোচ্ছল জাতির ভাগ্য নিষ্ঠুর। আমার এই ছমাস কার্যকালের মধ্যেও বুঝতে পেরেছি বাঙলা দেশের মানুষ কতটা স্নেহপ্রবণ ও প্রাণোচ্ছল হতে পারে।

## পশ্চিম উপকূলে তৈলানুসন্ধান

খনিজ তৈল উৎপাদনে ভারতবর্ষ কোনদিনই আত্মনির্ভরশীল ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত একমাত্র আসামের ডিগবয় ছাড়া দেশের অন্য কোথাও খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। ডিগবয়ে যেটুকু তৈল পাওয়া যেতো, তাতে দেশের মোট চাহিদার একটা সামান্য অংশ পূরণ হত মাত্র। বাকী তৈল আসত বিদেশ থেকে বিদেশী কোম্পানী মারফৎ। কিন্তু এ যুগে তৈলের অভাবে যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেতে পারে। যে কোন রাষ্ট্রকে বাঁচতে হলে তৈলের অব্যাহত সরবরাহ চাই। আর যুদ্ধবিগ্রহ বেধে গেলে তো তৈল না পেলে এক পাও এগোনো যায় না।

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত তৈল উৎপাদনে ভারতবর্ষ যে অনেক পেছিয়ে ছিল, সেটার জন্য ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী দায়ী নয়। আসলে বৃটিশ শাসকরা এদেশে তৈলানুসন্ধানের কোন চেষ্টাই করে নি। বিদেশী কোম্পানীগুলো ভারতবাসীর কাছে তৈল বেচে দু'হাতে মুনাফা লুটছিল। ভারতভূমিতে তৈলের সন্ধান পাওয়া গেলে সেই মুনাফা থেকে তাদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই বিদেশী শাসকরা সে রকম কোন চেষ্টাই করে নি।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের নেতাদের পক্ষে এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় নি। তাঁরা দেশের সর্বত্র তৈলানুসন্ধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সে ব্যাপারে সোভিয়েট রুশিয়া, রুমানিয়া এবং কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় আসামে আরও কিছু তৈল খনি আবিষ্কৃত হয় এবং পশ্চিম উপকূলের গুজরাটেও তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই সেখানে তৈল উৎপাদন সুরু হয়ে গেছে। কিছুকাল আগে ভূ-তত্ত্ববিদরা অনুমান করেন যে, গুজরাটের ভবনগর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরবর্তী আলিয়াবেতে ক্যাম্বে উপসাগরের তলায় প্রচুর তৈল আছে। ভারত সরকারের তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন সেখানে পরীক্ষামূলক তৈল-কূপ খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী গত ১৯শে মার্চ সেখানে প্রথম পরীক্ষামূলক কূপ খননের কাজ সুরু হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে এই প্রথম সমুদ্রগর্ভে তৈলকূপ খননের চেষ্টা হচ্ছে। সেটা সত্যিই দেশের পক্ষে খুবে আনন্দের কথা। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, ভারতের তৈলানুসন্ধান প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে গোড়ায় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে, তৈলের জন্য আমরা চিরকালই পরনির্ভরশীল হয়ে থাকি। কিন্তু সেই সব সন্দেহবাতিক লোকের কথায় কান না দিয়ে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট সেই কাজে নেমে পড়েন। আঙ্কলেশ্বরে সেই প্রচেষ্টা তাদের সফল হয়। এবার উপকূলের তৈলানুসন্ধান প্রচেষ্টা সফল হলে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। শ্রীমতী গান্ধীর এই বক্তব্যের সঙ্গে কারও দ্বিমত হবার সম্ভাবনা নেই। ভারতের প্রতিভাবান তরুণ ইঞ্জিনীয়ার এবং বিজ্ঞানীরা যে সুযোগ পেলে যে-কোন বড় কাজই করতে সক্ষম, ক্যাম্বে উপসাগরে তৈলানুসন্ধান প্রচেষ্টা তারই জ্বলন্ত নিদর্শন।



## নেপাল-ভারত সম্পর্ক

সম্প্রতি নেপালের যুবরাজের বিবাহ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে রাজ-অতিথিরা সেখানে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন। বউভাতের ভোজসভায় নেপালের রাজা মহেন্দ্র হঠাৎ অতিথিদের সামনে অভিযোগ করে বলেন যে, নেপালের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পুরোপুরি স্থলপথের উপর নির্ভরশীল। সরাসরি সমুদ্র অথবা নদীপথে নেপালে যাতায়াত করা যায় না। পার্শ্ববর্তী দেশ ছাড়া অন্যদেশে মাল চালান দিতে গেলে নেপালের পক্ষে পার্শ্ববর্তী দেশের সহযোগিতা অপরিহার্য কিন্তু নেপাল সেই সহযোগিতা পাচ্ছে না। নেপালের বৈদেশিক বাণিজ্য পুরাপুরি ভারতের ওপরেই নির্ভরশীল। কাজেই নেপাল কোন দেশের নাম না করলেও সমাগত অতিথিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, নেপালরাজার অভিযোগ ভারতের বিরুদ্ধেই কিন্তু ভারত গভর্নমেন্ট এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী স্থল পরিবেষ্টিত (ল্যান্ড লক্‌ড্) দেশ পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্য দিয়ে মাল আদান-প্রদান এবং লোক যাতায়াতের যে সুবিধা পেয়ে থাকে, নেপাল ভারতের কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পায়। নেপালকে ভারতের মধ্য দিয়ে সমস্ত মাল আমদানীর অবাধ সুযোগ তো দেওয়া হয়ই, উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকেও ভারতের মধ্য দিয়ে নেপালে মাল আমদানির অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার নেপালকে সড়ক-পথে কলকাতা বন্দর থেকে সরাসরি নেপালে মাল নেওয়ার অবাধ

সুযোগ দিতেও অনিচ্ছুক নন। তবে সেই মালপত্র বাক্সবন্দী করে নিয়ে যেতে হবে। কারণ তা না হলে পথে সেই মালপত্র চুরি হয়ে যেতে পারে।

নেপালের সংগে ভারতের যে বাণিজ্য-চুক্তি বলবৎ আছে, তার মেয়াদ ৩১শে অক্টোবর শেষ হয়ে যাবে। নতুন চুক্তির আলোচনা সুরু করার জন্যও ভারত প্রস্তুত হয়ে আছে।

কিন্তু নেপালের ক্রোধের আসল কারণ অন্য। ভারতে আমদানি-রপ্তানি কঠোর-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে বহু ভারতীয় বণিক নেপাল গিয়ে আমদানি-রপ্তানির কারবারে নেমে পড়েছেন। তাদের আসল কাজ হচ্ছে ভারত থেকে নিষিদ্ধ দ্রব্য চোরা-পথে নেপালে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ভারতের পথেই বিদেশে চালান দেওয়া এবং একইভাবে নিষিদ্ধ জিনিষ নেপালে আমদানি করে চোরাপথে ভারতে চালান দেওয়া। ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে মারাত্মক এই আন্তর্জাতিক চোরাকারবার বন্ধ করবার জন্য ভারত সরকার নেপালের রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত মালের হিসাব চেয়েছিলেন। তাতেই নাকি নেপালের মহারাজা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। হবারই কথা। কারণ এই আন্তর্জাতিক চোরাকারবারে ভারতের যতই ক্ষতি হোক, নেপালের লাভ ষোলো আনা। চোরা কার-বারীরা নেপালের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কৃত্রিম প্রসার ঘটিয়ে নিজেরা যেমন রাতারাতি লাখপতি-ক্রোড়পতি হচ্ছে, তেমনি নেপালের রাজস্বও ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠছে।

কিন্তু নেপাল যতই উষ্মা প্রকাশ করুক এবং যারাই সেই উষ্মায় ইন্ধন যোগাক না কেন, ভারত নিজের অর্থনীতিকে ক্ষতি-গ্রস্ত করে নেপালকে খুশি করার চেষ্টা করবে না, সেটা করা উচিতও নয়। স্থল-পরিবেষ্টিত দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী নেপাল ভারতের কাছ থেকে যে সুবিধা পাবার অধিকারী, তার বেশি তাকে কিছু দেওয়া (বিশেষত নিজের ক্ষতি করে) নীতিবিগর্হিত কাজ হবে বলেই মনে হয়।

## কেরালায় আবার মন্ত্রিত্বসঙ্কট

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে কেরালা যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ (মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট) পদ-ত্যাগ করায় কম্যুনিস্ট পার্টির অচ্যুত মেনন মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। সেই মন্ত্রিসভা গত মাসে কোনক্রমে একটি অনাস্থাসূচক প্রস্তাব কাটিয়ে উঠেছিলেন বটে, তবে গত সপ্তাহে পাঁচজন সরকার-সমর্থক সদস্যের দলত্যাগের ফলে সেই মন্ত্রিসভার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। বেগতিক বুঝে মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন বাজেট বরাদ্দের আলোচনা স্থগিত রেখে বিধানসভায় একটা আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তার আলোচনার তারিখ ধার্য হয়েছে ২০শে এবং ২৩শে মার্চ। ইতিমধ্যে বাজেট আলোচনা স্থগিত আছে। এখন স্পীকারকে নিয়ে দুই পক্ষের সদস্য সংখ্যা সমান ভাগে (৬৫ জন করে) ভাগ হয়ে গেছে। আস্থা প্রস্তাবের আলো-চনা সুরু হবার আগে যে সময় পাওয়া গেছে, তাতে দু'পক্ষই দল ভাঙাভাঙির খেলায় মত্ত হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। স্টেটসম্যানের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, "ওয়াকেবহাল মহলের সংবাদ অনুযায়ী কংগ্রেস (সিন্ডিকেটী) নেতা ডাঃ জর্জ টমাস এবং মনোনীত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য এস পি লুইজ মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট-দের সক্রিয় যোগসাজসে অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভা ভাঙবার আয়োজন করেন। এ'দের দু'জনই টাকা পয়সা দিয়ে সদস্যদের হাত করার ক্ষমতা রাখেন।" অপর পক্ষও যে চুপচাপ বসে থাকবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কাজেই কেরালায় এম-এল-এ কেনা-বেচার খেলা চলছে। সেই খেলার ফলাফল এই লেখা বেরুবার আগেই প্রকাশ হয়ে পড়বে। কাজেই বিষয়টা পরের সপ্তাহেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে।

—১০-৩-৭০
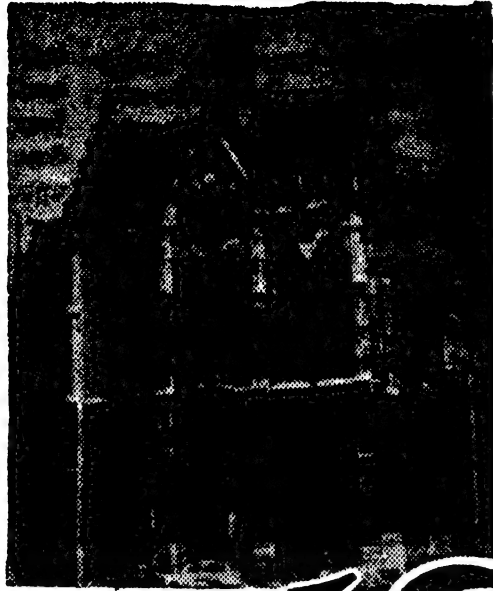
# আন্তর্জাতিক

ব্র্যান্ডট্-স্টফ সাক্ষাৎকার

**জার্মানী :**

১৯৪৯ সালে জার্মানী ভেঙে দুই জার্মানী—পশ্চিম জার্মানী (জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র) ও পূর্ব জার্মানী (জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) হবার পর, এই প্রথম দুই রাষ্ট্রের প্রধান নেতারা একটি বৈঠকে মিলিত হলেন।

পূর্ব জার্মানীর বনাঞ্চলে অবস্থিত এরফুর্ট শহরে পশ্চিম জার্মানীতে চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ডট্ ও পূর্ব জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী উইলি স্টফ্ ১৯শে মার্চ তারিখে ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন।

বিগত সাধারণ নির্বাচনে কিসিঙ্গারের ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টিকে পরাজিত করে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা উইলি ব্র্যান্ডট্ ওয়াল্টার শিলের ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর থেকেই পশ্চিম জার্মানীর পক্ষ থেকে পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন সহ সমগ্র কমিউনিস্ট জগতের সঙ্গে নতুন মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সুরু হয়েছে।

পূর্ব জার্মানীর কমিউনিস্ট সরকারের খুব একটা আগ্রহ ছিল না পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে এভাবে আলোচনা সুরু করার। তাদের দাবি, কোনরূপ আলোচনার আগেই পূর্ব জার্মানীকে পৃথক রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করে নিতে হবে। পশ্চিম জার্মানীর এতে ঘোর আপত্তি। তারা এখনও জার্মান ঐক্যে বিশ্বাসী—পূর্ব জার্মানীর পৃথক রাষ্ট্রসত্তা মানতে তারা প্রস্তুত নয়। তবে বর্তমান বাস্তবকে স্বীকার করে উভয় 'দেশের' মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার জন্য তারা প্রস্তাব করেছে।

শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট য়ুনিয়নের একান্ত আগ্রহে উভয় দেশের নেতাদের বৈঠক বসেছে। দুই দেশের সাধারণ মানুষও একে স্বাগত জানিয়েছে। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক সহজ হবে, সীমান্তের দুই পারের জার্মান জনসাধারণ পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে।

এই এরফুর্টের প্রায় একশ' বছর আগে প্রুশিয়া, হ্যানোভার ও স্যাক্সনির রাষ্ট্রনায়কেরা জার্মান ঐক্যের সন্ধানে মিলিত হয়েছিলেন। এবারও এরফুর্টে মিলনের ভিত্তি স্থাপিত হবে, এমন আশা করা যায়। এক বৈঠকেই নিশ্চয়ই সব সমস্যার সমাধান হবে না। তবে আলোচনা সুরু হলে তা এগিয়ে চলবে। এর পর উইলি স্টফ পশ্চিম জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকে আসবেন উইলি ব্র্যান্ডটের সঙ্গে আর এক দফা আলোচনার জন্য।

মস্কোতে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে উইলি ব্র্যান্ডটের দক্ষিণহস্তরূপে পরিচিত ইগন বারের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে। এই আলোচনার ফলে সম্ভবত দুই দেশের মধ্যে বলপ্রয়োগ পরিহারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

এদিকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সোভিয়েট য়ুনিয়নের কাছে প্রস্তাব করেছে, বার্লিন সমস্যার সমাধানের জন্য চতুঃশক্তি বৈঠক আহবান করা হোক।

সব দেখে মনে হচ্ছে, বার্লিন ও জার্মানীকে কেন্দ্র করে সমগ্র য়ুরোপে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিশ বৎসরের অধিককাল যা য়ুরোপের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে, এখন তার প্রশমন হতে চলেছে।

**কম্বোডিয়া :**

এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন।

১৮ই মার্চ কম্বোডিয়া পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ রয়্যাল কাউন্সিল ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী এক যুক্ত অধিবেশনে মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করে, কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে প্রিন্স নরোদম সিহানুককে অপসারিত করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের বিধিমতে পার্লামেন্ট স্থির করে, নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সভাপতি চেন হেং রাষ্ট্রপ্রধানরূপে কাজ করবেন।

রাজধানী নমপেনে যখন এই কাণ্ড ঘটেছিল, প্রিন্স নরোদম সিহানুক তখন মস্কোতে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি দেশে নেই। চিকিৎসার জন্য তিনি প্যারিসে ছিলেন। সেখান থেকে লণ্ডন হয়ে সোভিয়েট য়ুনিয়ন গিয়েছিলেন। সোভিয়েট য়ুনিয়নে আটদিন কাটিয়ে

পিকিং যাবার মুখে মস্কো বিমানবন্দরে সোভিয়েট নেতাদের কাছ থেকে তিনি তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির সংবাদ পান।

অবশ্য এমন একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে, প্রিন্স নরোদম সিহানুক তা আগের থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী সরকারের সৈন্যরা কিছুদিন ধরে কম্বোডিয়ার ভেতরে অনুপ্রবেশ করে গোলমাল করছিল। প্রিন্স নরোদম সিহানুক কিংবা তাঁর সরকার মোটেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন নন, বরং মার্কিন-বিরোধী বলেই তাঁদের খ্যাতি। নরোদম সিহানুক বারে বারে উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবীদের কাছে অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি। কমিউনিস্ট গেরিলারা কম্বোডিয়ার সীমানা লঙ্ঘন করেছে, খেমের এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তারা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং লিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছে। নরোদম সিহানুকের এবার মস্কো ও পিকিং যাবার উদ্দেশ্যই হল, সোভিয়েট ও চীনা নেতাদের দিয়ে তিনি তাঁর দেশ থেকে কমিউনিস্টদের সরাবেন।

প্যারিসে সাংবাদিকদের সংগে কথা বলার সময় প্রিন্স নরোদম সিহানুক ক্ষোভের সংগে বলেছিলেন, কমিউনিস্টরা তার কথা শুনছে না। বারে বারে আপত্তি করা সত্ত্বেও হ্যানয় আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করছে। কম্বোডিয়ার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরপেক্ষতা নষ্ট হচ্ছে এবং এর ফলে হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁকেই ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে।

সিহানুকের আশংকা বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হল। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন। ১৩ই মার্চ কম্বোডিয়া সরকারের পক্ষ থেকে উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী সরকারের কাছে অবিলম্বে কম্বোডিয়া ভূমি থেকে সকল সৈন্য সরিয়ে নেবার দাবি জানানো হয়। ১৫ই মার্চ নমপেনে এই দুই সরকারের দূতাবাসে কাম্বোডিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। প্রধানত ছাত্ররাই ছিল এই বিক্ষোভে। বিক্ষোভকারীরা দূতাবাস দুটি পুড়িয়ে ফেলে, তারপর, ১৮ই মার্চ পার্লামেণ্ট সিহানুককে অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে ১৫ই মার্চের বিক্ষোভকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় এবং বলা হয়, উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী সরকার অর্থাৎ ভিয়েৎকং যেভাবে কম্বোডিয়ার সার্বভৌমত্ব নষ্ট করেছে, তাতে কাম্বোডিয়ার মানুষ মাত্রেরই বিক্ষুব্ধ হবার সংগত কারণ আছে।

চেন হেং নতুন রাষ্ট্রপ্রধান হলেও, প্রকৃত ক্ষমতা থাকল প্রধানমন্ত্রী জেনারেল লন নলের হাতে। লন নল কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রীও। অপর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হলেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সিসোয়াথ সিরিক মাতাক। এঁরা চিন্তাধারার দিক থেকে দক্ষিণপন্থী বলে পরিচিত। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের অনেক নীতির সংগেই নাকি এঁরা একমত নন।

নতুন সরকার ইতিমধ্যেই কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। সকল অনুপ্রবেশকারীকে অবিলম্বে কম্বোডিয়া থেকে বিতাড়নের জন্য সৈন্যবাহিনীর প্রতি কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক সহজে তাঁর ক্ষমতাচ্যুতি মেনে নেবেন না। তিনি বলেছেন, তিনি স্বদেশে ফিরবেন। গ্রেপ্তারের আশংকাকে অগ্রাহ্য করেই তিনি ফিরবেন এবং ক্ষমতা ফিরে পাবার চেষ্টা করবেন। সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও চীন এখনও প্রিন্স নরোদম সিহানুককেই কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরূপে স্বীকার করছে। সরকারী ইস্তাহারে সেই কথাই বলা হয়েছে। এমন সম্ভাবনা আছে, সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও চীনের সমর্থনে তিনি আপাতত বিদেশে সরকার গঠন করে নিজের শাসন চালিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন।

কম্বোডিয়ার নতুন শাসকগোষ্ঠী এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত। রাষ্ট্রপ্রধানরূপে চেন হেং আদেশ জারি করেছেন, নরোদম সিহানুকের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ক্ষমতা পুনর্দখলের সকল প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক দীর্ঘ পনেরো বৎসর ধরে কম্বোডিয়ার শাসন পরিচালনা করেছেন। আজ কম্বোডিয়ার যে সমৃদ্ধি, তার মূলে সিহানুকের অবদান কম নয়। সিহানুকের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি (মাঝে মাঝে একটু কমিউনিস্ট-ঘেঁষা হলেও তিনি মোটামুটি নিরপেক্ষ নীতিই অনুসরণ করেছেন) ভিয়েৎনামের উত্তাপ থেকে কম্বোডিয়াকে রক্ষা করেছে।

আজ সিহানুকের অপসারণ ও দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতা দখলের ফলে মার্কিন মহল উল্লসিত হতে পারে, কিন্তু কম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধ ও ভিয়েৎনামের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশংকা যে বৃদ্ধি পেল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে নরোদম সিহানুকের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। তারা নিছক সৈন্যবাহিনীর ভয়ে দক্ষিণপন্থী শাসন মেনে নেবে বলে মনে হয় না।

**রোডেশিয়া :**

রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকার বিশ্ব-জনমত অগ্রাহ্য করে রোডেশিয়াকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করার পর অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও রোডেশিয়া সরকারের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। সালিসবেরী থেকে মার্কিন দূতাবাস তুলে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রোডেশিয়ার ইয়ান স্মিথ সরকারের পতন তথা গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করবে না, বরং সর্বতোভাবে তাতে বাধা দেবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী প্রস্তাব এনেছিলো, ইয়ান স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে অস্ত্রধারণ করতে হবে। প্রস্তাবটি ৯-২ ভোটে পাশ হয়। রাষ্ট্রসংঘ সনদ অনুসারে পক্ষে ৯টি ভোট পড়লেই প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে ৫টি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে কেউ যদি বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তবে সে-প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে এবং তারই নাম 'ভেটো'।

রোডেশিয়ায় বলপ্রয়োগের দাবি জানিয়ে যে প্রস্তাব এবার নিরাপত্তা পরিষদে প্রয়োজনীয় ৯টি ভোট পেয়েছিল, তা বাতিল হয়ে গেল স্থায়ী সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভোট দেবার জন্য। অপর স্থায়ী সদস্য সোভিয়েট য়ুনিয়ন, এমন কি চিয়াং চীন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ফ্রান্স ভোটদানে বিরত ছিল।

এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়ান স্মিথদের বাঁচিয়ে দিল।

আরও উল্লেখযোগ্য, এই প্রথম রাষ্ট্রসংঘের ২৫ বৎসরের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে 'ভেটো' প্রয়োগ করল এবং তা সংখ্যালঘু বর্ণবৈষম্যবাদী একটি ফ্যাসিস্ত বর্বর শ্বেতাঙ্গ শাসনের পক্ষে। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী।

ইতিপূর্বে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ১০৫ বার, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ৪ বার করে এবং চীন (চিয়াং) ১ বার 'ভেটো' প্রয়োগ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবারই প্রথম 'ভেটোর' সাহায্য নিল। এর থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, আগের মত নিরাপত্তা পরিষদে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাকে এখন 'ভেটো'র সাহায্যে অপছন্দ প্রস্তাব আটকাতে হয়।

(২১. ৩. ৭০)

# সপ্তাহের বোঝা

## কৃত্তিবাস ওঝা

নেহর্ ও জিন্না

সব কথা বলা শেষ। হ্যাঁ, আর সব আশারও শেষ। এখন শুধু হা-হুতাশ করার পালা। একটা যুগসন্ধিক্ষণের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাজ্যের মানুষকে সঠিক পথের নেতৃত্ব না দিয়ে অমাবস্যার অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দিল। সেই ১৯৪৬-৪৭ সালে সারা ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব যে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছে, আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একইভাবে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়ে রাজ্যের অগণিত মানুষকে ভুল ও এক অনিশ্চিত পথে ছেড়ে দিল। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ দেশ-ছাড়া হবার মুহূর্তে সেইদিনের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ইংরেজের সঙ্গে আপস করে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সাফল্যের মুখে দাঁড়িয়ে ফিরিয়ে এনে যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলেন, ১৯৭০ সালে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দল-নেতাগণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতি সেই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

১৯৪৭ সালে যখন নৌ-বিদ্রোহ, পুলিশ-বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের অভ্যুত্থানে দেশব্যাপী গণ-জাগরণ, গান্ধীজীর "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" আর নেতাজীর "আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব"—সব মিলিয়ে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল, তখন যদি ক্রিপস্ মিশন, র‍্যাড-ক্লিফ রোয়েদাদ জাতীয় বিভেদপন্থী ও আপসমুখী পথে আত্মসমর্থন না করে, জাতীয় নেতৃত্ব গণ-জাগরণকে পুঁজি করে ইংরেজকে ভারত মহাসাগর পার করে দিত, তবে আজ এই খণ্ডিত ভারত, দীন-হীন ভারত নিজের ভারে নিজে ভেঙে পড়ত না।

কিন্তু সেই দিন নেহর্-জিন্না, প্যাটেল-লিয়াকত অখণ্ড ভারতের ৪০ কোটি মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এই জাতীয় নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেম কারো চেয়ে কম ছিল না, নেহরুর মত দেশপ্রেমিক অথবা জিন্নার মত মুসলমান-দরদী বিশ্বের ইতিহাসে বিরল, তাই তাঁদের নিজেদের জীবন ও আচরণে কোথাও কালির চিহ্ন ছিল না। কিন্তু তাঁরা যে কাজ করলেন, সেই কাজই রূপ নিল বিশ্বাসঘাতকতার, যে কাজের ফলই হল জনগণের বিশ্বাস-ভঙ্গের।

আজ সেই দিনের সারা ভারতের পটভূমিকা মনে রেখে যদি পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রূপের তুলনা করি, তবে সেই সারা ভারতের ক্ষেত্রে নেহরু-জিন্না যা করেছিলেন, আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে অজয় মুখার্জী-জ্যোতি বসুও তাই করলেন। অজয়বাবু আর জ্যোতিবাবু বাংলা দেশের মঙ্গল চান না, বাংলা দেশের মানুষদের শুভ পথে চালিত করতে চান না—এই কথা যাঁরা বলবেন বা বলেন, তাঁরা অন্ধ, তাঁরা কুৎসার পূজারী। কিন্তু অজয়বাবু আর জ্যোতিবাবু যা করলেন, তার ফল কিন্তু হল মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। অজয়বাবু আর জ্যোতিবাবু খুব মহৎ দেশপ্রেমিক, জন-নেতা, জন-দরদী, কিন্তু তাঁদের দুই-জনের কাজের যে ফলশ্রুতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আজ ভোগ করতে হবে, সেটা হল—তাঁরা প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটিয়েছেন আর প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটিয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাসহন্তার কাজ করেছেন। এই কথায় অনেকেই কৃত্তিবাসের বাপান্ত করবেন অথবা তাঁর মুখে থুতু দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু যদি একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেন, তবে

যেমন, মানুষের প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটিয়ে সেহেদ-জিয়া যেমন ভাই ভাই, তেমনি আজকের পটভূমিকায় অজয়-জ্যোতি ভাই ভাই।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অনেক পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন হয়ত আসবে। সেটা হল—যখন দৈনিক কাগজগুলি সকলে, এমন কি সরকারী দলের নেতারাও অনেকে দিন-ক্ষণ দিয়ে বলে দিতেন, সরকার পড়ছে অথবা পড়লো বলে, তখনও আমি বলতাম সব হিসাবের গোলমাল করে দিয়ে, সব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা করে দিয়ে সরকার এখনও টিকে যাবে। জগতে অনন্তকাল স্থায়ী কোন কিছু হয় না. কাজেই রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট চিরস্থায়ী হবে এমন কথা আমিও কখনও ভাবি নি। কিন্তু আমার কাছে একটা সত্য ছিল, সে সত্য হল অজয়বাবু আর জ্যোতিবাবু অত সহজে রাজ্যের মানুষের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার ভুলতে

পারবেন না, তাঁদের প্রতি মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা গড়ে উঠেছে, তাকে অত সহজে পদদলিত করতে পারবেন না—তাই তো পাঁড়-পাঁড় করে এই সরকার এতদিন বেঁচে ছিল। অনাহারী ক্ষুধাতুর দীন-দুঃখী মানুষের সামনে আশার অন্ন-ব্যঞ্জনের থালা সাজিয়ে যখন সেই ক্ষুধার অন্ন তুলে মুখে দিতে যাবে, তখনই কুকুর ডেকে সেই থালার অন্ন কুকুরের ভোগে দিতে অত সহজে পারবেন না এই দুজন—এই ভরসা ছিল বলেই এতদিন এত জোর করে বলেছি, এই সরকার এত সহজে পড়বার নয়, এই সরকার এত সহজে যাবার নয়—কারণ ওঁরা যে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক - মধ্যবিত্ত - শিক্ষক - কর্মচারী-ছাত্র-যুবক সকলের সামনে ক্ষুধার অন্ন তুলে ধরেছেন, সেই অন্ন মুখে তুলে নেবার সুযোগ না দিয়ে, ওঁরা কখনও সেই অন্ন-ব্যঞ্জনের থালা আত্মকলহের পূতিগন্ধময় নর্দমায় ফেলে দিতে পারবেন না। আমি যা ওঁরা পারবেন না বলে দৃঢ় বিশ্বাসে ছিলাম, আমার সেই বিশ্বাস সবটুকু না হলেও অনেকটা মিথ্যা হয়েছে। তবুও সবটুকু মিথ্যা হয়েছে বলছি না কেন, কারণ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও স্বল্প জ্ঞানে আজও দেখতে পাই "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—উপনিষদের এই বাণী আজও সত্য। সেইদিন এই বাণী ছিল ভগবৎ-পথের নিশানায়, আজ হল ভারতের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মঙ্গলপথ রচনায়—এই পথ যুক্তফ্রন্টের পথ। যুক্ত মোর্চা আর যুক্তফ্রন্ট ছাড়া পথ নেই।

৮ই মার্চ সকালের কথাটা আমার বারে বারে মনে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে ফেরাবার সব চেষ্টা শেষ হয়ে গেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন—আমার লোকসভায় বাজেট অধিবেশন চলছে, বড় বিপদ, অজয়বাবু আপনি মাত্র ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করুন, তারপর যা করবার করবেন। সেই অনুরোধে কাজ না হওয়ায় বা যখন তাঁরা বুঝলেন অজয়বাবু চাইলেও অজ্ঞাত শক্তির কারণে পারছেন না, তাঁরা তখন অজয়বাবুর পিছনের শক্তি এবং তারও উৎস বলে যাকে মনে করেন, তার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সেই উৎসকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল—তোমার হাতের বাণ তূণে তুলে নাও, কিন্তু সেই উৎস নাকি বলেছিল—বেশ তো আমার বিরুদ্ধে সি· বি· আই-এর মামলাগুলি তুলে নাও, আমিও আমার বাণ ফিরিয়ে নিচ্ছি।

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানও চেষ্টা করেছিলেন অনেক। একদিন শ্রীধাওয়ান অজয়বাবুর সঙ্গে শ্রীসুশীল ধাড়াকে ডেকে পাঠালেন। সুশীলবাবু বললেন—মুখ্যমন্ত্রী আর রাজ্যপালে কথা হবে, এর মধ্যে আবার আমায় কেন? রাজ্যপাল হেসে বলেছিলেন, "বিকজ ইউ আর দি ব্যাড ইভলস্ বিহাইন্ড অজয়বাবু"। কথাটা বলে সামলে নিয়ে শ্রীধাওয়ান বলেছিলেন, "আদার পার্টিস্ সে সো" (তুমি হলে অজয়বাবুর পিছনে অশুভ ছায়া, যদিও বিভিন্ন দল এই কথা বলে)। যা হোক ৮ই মার্চ বাংলা কংগ্রেসের শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, আজই সেই সিদ্ধান্ত হল মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন। রাজ্যের জনৈক প্রখ্যাত নেতার বাড়িতে গেছি, নিতান্তই আজকের দিনে কি খবর হবে, তার কিছু আভাস সংগ্রহ করতে। মানুষ সমুদ্রে ডুববার সময় যেমন একখণ্ড খড়কে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়, এই নেতাও হঠাৎ আমায় সেইভাবে অবলম্বন করে বললেন—একটা কাজ করবেন?

বলুন।

একবার অজয়বাবুর বাড়ি যাবেন?

কেন?

আজকেই তো সব শেষ হচ্ছে, যদি আজকের দিনটা উনি কোন সিদ্ধান্ত না নেন।

কিন্তু আমি কি করতে পারি?

দেখুন, ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর অজয়বাবুকে ফেরাতে শ্রীসুশীল ধাড়া অনেক কাজ করেছিলেন, কিন্তু এইবার তো সুশীলবাবুই অজয়বাবুকে এগিয়ে দিচ্ছেন আর সেইবার অনেক কাজ করেছিলেন সতীশদা (সতীশ সামন্ত, এম·পি) এবং অজয়দার বৌদি, কিন্তু এবার কেউ নেই।

কিন্তু আমি কি করবো?

বাড়ি না যান, আপনি টেলিফোনে একটু বলে দেখুন না। জানেন তো—অনেক সময় যখন বড় বড় রাজবৈদ্য ব্যর্থ হয়, তখন কখনও কখনও টোটকা ওষুধে কাজ হয়।

আমি আর কথা বাড়ালুম না এবং দেখলাম এমন একজন বাস্তব রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন এমন নাছোড়বান্দা, তখন একটা ফোন করতেই হবে। অন্য কারণে না হোক, নিউজ সোর্স-এর মনতুষ্টির কারণেও করতে হবে।

ফোন করলাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বিপরীত দিক থেকে ফোন ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। প্রথমে বেশ কিছু সময় এই কথা সেই কথা—এত সকালে হঠাৎ ফোন করছি কেন, কারণ আমরা তো মাঝ রাত্রেই ফোন করে থাকি ইত্যাদি কথার পর বললাম উক্ত নেতার শেখানো কথাটা। যুক্তফ্রন্টকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। এখনও সময় আছে, সব মান-অভিমান, রাগ-দুঃখ ভুলে, দেশের মানুষের কথা ভেবে যুক্তফ্রন্টকে বাঁচান।

মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথার মধ্যে যে কথা বললেন—তার সার কথা হল যুক্তফ্রন্টকে গলা টিপে খুন করা হয়ে গেছে, আজ সেই মৃতদেহ নিয়ে জীবনদানের গবেষণা চলছে। তিনি এর মধ্যে নেই। খুনীরা মৃতদেহকে বাঁচাবার চেষ্টা তখনই করে, যখন বোঝে এই খুন ধরা পড়লে খুনী হিসাবে তার ফাঁসি হবে, মৃত মানুষের প্রতি দরদ ভালবাসায় নয়, নিজের প্রাণের প্রতি দরদেই এই কাজ করে। কাজেই আমি খুনও করি নি আর ফাঁসির ভয়ে মৃতকে বাঁচাবার জন্য আমার কোন তাগিদও নেই। আমি আর যুক্তফ্রন্টে যাবো না, যুক্তফ্রন্টকে বাঁচাবার চেষ্টাও করবো না।

মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় সৎ-সরল দেশপ্রেমিক, কিন্তু সেই সঙ্গে গোঁয়ার। এই গোঁয়ার মানুষটাকে নানাভাবে দেখেছি। তাই জানি—অদ্ভুত সহনশীল, অদ্ভুত ধৈর্যশীল, কিন্তু যখন গোঁয়ার্তুমী পেয়ে বসে, তখন মানুষ হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ পালটে যান। বহুবার বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা দেখেছি। প্রথম যখন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সব কিছু সহ্য করে চুপ করে থাকতেন, তখন এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন—জানেন, কেউটে সাপের লেজ দিয়ে কানের খোল পরিষ্কার করতে গিয়ে ঠকেছিলেন অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেন, একইভাবে ঠকবেন জ্যোতি বসু-প্রমোদ দাশগুপ্ত। আজ যাঁকে দিয়ে কানের খোল পরিষ্কার করছেন, একদিন যখন সেই সাপ গলা জড়িয়ে ছোবল দেবে, সেইদিন কোন হল্লা, চিৎকারে কাজ হবে না। হ'ল না, সেই ঘটনাই ঘটলো—সব হল্লা, চিৎকার, কান্না, রাগ, দুঃখ, অভিমান, তিরস্কার সবই ব্যর্থ হয়ে গেল।

যাক এই সব কথায় যেতে চাই না, এখন বলতে চেয়েছিলাম প্রত্যাশার মৃত্যুর কথা, সেই কথায় আসা যাক। আজ যুক্তফ্রন্ট খুন হয়ে গেছে, এই খুনের দায়িত্ব কার, কে কার ওপর কতটা খুনের দোষ চাপাবেন, তা নিয়ে নানা চেষ্টা চলছে। হরতাল, ধর্মঘট, বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি—সবই হল এই খুনের দায় অন্যের ওপর চাপাবার চেষ্টা

দায়। কিন্তু এই চেষ্টার মূতে প্রাণ পাবে না, সে শ্রেণী-ভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট হোক আর সংগ্রামী অর্থসংগ্রামীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টই হোক। কিন্তু কাকে আনলেন অজয়বাবু আর জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু আর সুশীলবাবু।

রাজ্যের মানুষ সবেমাত্র ২০।২২ বৎসর পর স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, মানুষের অধিকার পেয়েছে। আজ আর মালিকের হুকুমে অথবা বড়লোকের নির্দেশে পুলিশ শ্রমিককে ঠেঙাতে পারে না, কৃষককে উৎখাত করতে পারে না, মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষ জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম করতে পারে। এই জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে উৎসাহিত মানুষ আজ লক্ষ লক্ষ একর চোরা, অন্যায়ভাবে রক্ষিত ও শত বঞ্চনার মজুত জমি দখল করে নিয়েছে। তাদের আশা, আগামী দিনে বিধানসভার এই চলতি অধিবেশনে তারা ঐ দখলের জমির মালিকানা পাবে, পাবে জমি, কৃষক পাবে বাস্তু।

কিন্তু আজ যুক্তফ্রন্ট চলে যাবার পর, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে কোথায় যাবে এই লক্ষ লক্ষ একর জমি, কোথায় যাবে রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার স্বপ্ন। যে কৃষক চৈতন্যপুরের রায়েদের বন্দুকের গুলী আর দক্ষিণের নস্কর-সাঁপুই সরকারের লাঠি অগ্রাহ্য করে জমি দখল করেছে, কোথায় যাবে সেই দখল। পারবে উপযুক্ত আইনের রক্ষাকবচ ছাড়া দখল করা জমির অধিকার রাখতে কৃষকরা ? হয়ত পারবে—সব না হলেও কিছু হয় ত পারবে, কিন্তু তার জন্য যে প্রাণের মূল্য দিতে হবে তার দাম দেবে কে?

কৃষকের পর শ্রমিক। যে শ্রমিক অন্যায়ভাবে ছাঁটাই হলে মালিকের কাছ থেকে খেসারত পাবার অধিকার পেতে চলেছিল, শ্রমিক ছাঁটাই বে-আইনী ঘোষিত হবে, বেকাররা ভাতা পাবে—এমন সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শুধু শ্রমিক-কৃষক-বেকার যুবক নয়, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হবে, শিক্ষকরা পাবেন মানুষের অধিকার। পে-কমিশনের রায় কার্যকরী হবে, শহরের সম্পত্তির সীমা বাঁধা হবে, এমনি কত পরিকল্পনা, যা মাতৃগর্ভে দশ মাস দশ দিন পরে ধরণীর স্পর্শ লাভ করতে চলেছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের মানুষ সবেমাত্র শিকল ভাঙতে সুরু করেছে, চারিদিকে রব উঠেছে—মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি! পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মুক্তির দরজা খুলে দিয়েছে, তাই তো পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট আদর্শ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সারা ভারতে. তারপর একদিন [illegible] [illegible] হবে যুক্তফ্রন্ট।

কিন্তু শেষ, সব শেষ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই লেখা যখন লিখতে বসেছি, তখন প্রথম ঘোষণা হল শ্রীধাওয়ান দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েমের সুপারিশ করেছেন, তারপর কিছু বিরতিতে সন্ধ্যার বাংলা সংবাদে বলা হল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে বসে রাজ্যপালের সুপারিশ বিবেচনা করছেন। তারপর রাত্রে বিশেষ ঘোষণায় বলা হল—রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হয়েছে। তখন রাত পৌনে নয়টা। পবিত্র মহরমের রাত্রি।

বেতারে রাষ্ট্রপতি-শাসন কায়েমের ঘোষণা শেষ হতেই তাকিয়ে দেখি, রাস্তা দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে। [illegible] লোকজন, বুক চাপড়ে বলছে—হায় কি হল! বাংলার পিপাসাকাতর মানুষ মুক্তিবারি পান করতে চায়, কিন্তু তাদের সমুদ্রের পথে নিয়ে যাবার পরিবর্তে মরুভূমি প্রান্তরে এনে ফেলা হল। এখন নেমে আসবে অগ্নিবৃষ্টি, তার পর মুণ্ডচ্ছেদের জন্য তরবারি। তারপর, তারপর সব শেষ। রচিত হবে বিষাদসিন্ধু-অমরকাব্য। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্যের মানুষকে আজ বিষাদসিন্ধুর তীরে এনে দাঁড় করালেন—প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটিয়ে জাতির প্রতি বিশ্বাসহন্তার কাজ করলেন।

—১৯শে মার্চ, ১৯৭০

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বসু

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আনন্দ বললে—চুপ করে আছ কেন? কিছু বলো এখন মাইকেলের কবিতার মূল্যায়ন সম্বন্ধে।

বললুম—আগে তোমার কথা শেষ হোক—তাছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে বিশদ পর্যালোচনার আসর নয় তো এটা; আমাদের এই বাছাইয়ে তাঁর কোন্ কোন্ বই বিশেষভাবে জায়গা পাবে, সে-বিষয়ে পয়লা নম্বর প্রস্তাব তো তোমার আলোচনা থেকেই শুনলুম। এইবার তাঁর অন্যান্য বইয়ের নাম করো—পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হোক। সে-পর্বের অন্যান্য লেখকদের অন্যান্য বইয়ের কথা বলতে হবে—বড়ো বেশি জায়গা নিচ্ছেন একা মধুসূদনই।

—তাহলে সংক্ষেপেই এই কথাটা বলা দরকার যে উনিশ শতকের বাংলা কবিতার বই-বাছাই করতে গেলে মধুসূদনের প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ দাঁড়ানো দরকার। বাংলা নাটকের এবং প্রহসনের আলোচনাতেও তথৈবচ।



অতঃপর পাংলা নীল মলাটের একখানি বই খুলে আনন্দ বললে—১৯৪১ খৃস্টাব্দে বেরিয়েছিল 'শতাব্দী ও সাহিত্য'—লেখক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। এই সেই-বই। 'মাইকেলের কাব্য' নামে এ-বইয়ের একটি প্রবন্ধের শেষ কয়েক ছত্রে নন্দগোপাল লিখেছিলেন—

'আজকের পাঠক আমরা মাইকেলকে পেয়েছি দূর থেকে—একপারে তিনি, অন্যপারে আমরা, মাঝখানে অর্ধশতাব্দীব্যাপী রবীন্দ্র-সাহিত্যের একাধিপত্যের যুগ। তাই থেকে থেকে আজ কথা ওঠে, মাইকেল বিগত দিনের কবি, তিনি লিখেছেন উপাখ্যান-কাব্য, তাঁর সাহিত্যে নেই প্রাণধর্মের সূক্ষ্ম আবেদন।...

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা যে কুসুমিত পথে প্রবল প্রাণবেগে প্রবাহিত হয়ে গেছে, সেই পথকে এককভাবে গড়ে তুলেছেন কে? মধুসূদন এবং মধুসূদন ছাড়া আর কেউই নন! বাংলা কবিতায় সরীসৃপ শরীরে ছিল না মেরুদণ্ড, ভূলুণ্ঠিতা লতার মতো তা শুধু কেঁদেই আসর মাৎ করেছে—তাকে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াবার, সতেজে উপলব্ধির পথে অবাধ গতিতে ধাবিত হবার শক্তি মধুসূদনই দিয়েছেন।'

আমি জানি, আনন্দ যখন একটা কিছু বিশ্বাস করে, তখন তার সে-বিশ্বাস অবাধে ব্যক্ত হতে দেওয়াই তাকে যথাকথায় নিয়ে যাবার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। আমি বিশ্বাস করি না যে রবীন্দ্রনাথের পথ এককভাবে মধুসূদনের কলমেই তৈরি হয়েছিল। মধুসূদন সম্বন্ধে নন্দগোপালবাবু তাঁর ঐ প্রবন্ধটি বোধ হয় মধুসূদনের কোনো স্মৃতি-সভার জন্যে লিখেছিলেন। ঐ ধরনের অনুষ্ঠানে একটু উচ্ছ্বাস আসা স্বাভাবিক। মধুসূদন যে অবিস্মরণীয় প্রতিভাধর কবি ছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কই? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা সেই তাঁর ছেলেবেলার মধুসূদন-সম্পর্কিত আলোচনা,—তারপর বুদ্ধদেব বসুর বহু-বিতর্কিত মধুসূদন-প্রসঙ্গ আমাদের পাঠকদের মতো আমিও পড়েছি। আনন্দও নিশ্চয় সে-সব পড়েছে। কিন্তু—

হঠাৎ আবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। নন্দগোপালের প্রবন্ধ থেকে আনন্দ পড়ছে—

'মাইকেলের কাব্যবিচারে যখন আমরা প্রচলিত দৃষ্টি, বুদ্ধি ও সংস্কারের সমর্থন পাই না এবং না পেয়ে তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভার সমালোচনায় তৎপর হয়ে উঠি, তখন আমরা ভাবতে ভুলে যাই যে মাইকেলের মতো প্রতিভা বহু-শতাব্দীতে এক-একটা জন্মান।'

আবার সেই প্রবন্ধেরই অন্য জায়গা থেকে পড়তে লাগলো—

'স্বচ্ছল পরিবেষ্টিত হয়ে নিশ্চিন্ত আনন্দে পসার জমিয়ে তোলার সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল, বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য পরহিতব্রতীদের প্রদত্ত সাহায্যকে starting money হিসাবে গ্রহণ করে, শিষ্ট সংযত ও মিতব্যয়ী গৃহস্থ জীবন যাপনের সুযোগ তাঁর এসেছিল...'
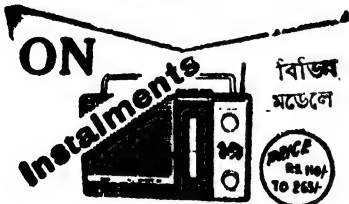
আমি বললুম—তবু প্রতিভার দুর্বোধ্য প্রতিবাদবশেই তিনি তা করেন নি—এই তো বক্তব্য?

আমার কণ্ঠস্বরে আনন্দ বোধ হয় বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করেছিল। সে বললে—হাঁ তাই। তার বলবার সেই সংক্ষিপ্ত ভঙ্গি থেকেই তার ক্ষোভ বোঝা গেল। বাধা পেয়ে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

আমি আস্তে আস্তে বললুম—এসব তাঁর ব্যক্তিত্বের আলোচনা। আমরা বই-বাছাইয়ের কাজে নেমেছি—তিলোত্তমার পরে তাঁর কোন্ বই ধর্তব্য, সেটাই আসল কথা।

—আমিও সেই কথাই বলছি—তাঁর সব বই—তাঁর প্রতিটি বই-ই।

—সে কী কথা? তাঁর প্রত্যেক বই-ই যদি সমান নির্বাচনযোগ্য হয়, তাহলে তাঁর মেঘনাথবধ আর বজ্রাঙ্গনা বা হেক্টর-বধও যে একই পংক্তিতে বসবে? না, না, তুমি আর একটু শান্ত হয়ে দেখবার চেষ্টা করো।

—নন্দগোপাল ঠিকই বলেছেন—তাঁর কা'বার বিচার করবে কে? উচ্ছৃঙ্খলতাই তাঁর স্বরূপ! তিনি স্বভাব-বিদ্রোহী।

বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি শব্দ শুনলেই আজকাল অনেকের মতো আমিও একরকম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। শেলিও প্রতিভা, এলিয়টও প্রতিভা—কিন্তু আমি জানি এলিয়টকে বা জর্জ বার্নার্ড শ'কে কেউ কখনো কোনো ব্যাপারেই শেলির মতো অনিয়ন্ত্রিত বলবেন না। মধুসূদনের রচনার মধ্যে বেশ কয়েক জায়গায় যে অনিয়ন্ত্রিত ব্যাপার আছে, সে-কথা অস্বীকার করবো কেন? সেই সব অংশের বাছাই চলবে না কেন? নজরুলের কবিতায় যেমন তেজ ছিল, মাধুর্য ছিল—এবং অনেক জায়গাতেই দুর্বলতাও বিদ্যমান, সে-কথা উপেক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু তা অস্বীকার করবো কেন?

বললুম—আনন্দ, বিদ্রোহী যিনি, তাঁর সব দোষই গুণ বলে মানতে হবে—এ এক-রকম অযৌক্তিক বলপ্রয়োগ—বই-বাছাইয়ের কাজে এরকম ডেস্‌পটিজম্ চলতে দেওয়া ঠিক হবে না।

সে হাসতে হাসতে বললে—তোমার ভেতরকার বুর্জোয়া বেড়ালটি এবার ফোঁস্ ফোঁস্ করছে।

আমি বললুম—মধুসূদনও বুর্জোয়া-প্রতিনিধি!

—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

—তবে?

—তবে তোমার বক্তব্যই বলো, শুনি।

প্রসঙ্গ দিক-পরিবর্তনে উদ্যত দেখে আমি কী যে বলবো তার হদিস পেলুম না। আমি আলোচনা যতো সংহত রাখতে চাই, আনন্দ ততোই সব যেন ছড়িয়ে দিয়ে যায়। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র—এবং তাঁদের কাছাকাছি,—তাঁদেরই সহযোগী আরো অনেকে অপেক্ষা করছেন। এ সময়ে আনন্দ কথায়-কথায় এ কোন্ অবান্তর প্রসঙ্গ নিয়ে এলো? আমাকে বিচলিত দেখে সে বললে—নন্দিনীর কথা মনে পড়ছে। নন্দিনীও কারো রচনায় কোনো রকম বেয়াদপি পছন্দ করে না। প্রতিভার প্রবল ভাস্কর্যেই তার আস্থা,—সে তারল্য উচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে নেশার ঘোর বলে থাকে। একদিন বলেছিল—১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জননী জাহ্নবী দেবীর মৃত্যু হয়। তখন তিনি মাদ্রাজে বাস করেন,—তখনো কবি হিসেবে খুব একটা নাম হয় নি তাঁর—যদিও ১৮৪৮ সালেই 'ক্যাপটিভ লেডি' বেরিয়ে গেছে, এবং অ্যাডভোকেট-জেনারেল নর্টন সাহেব তাঁর বন্ধু ছিলেন বলেই বোধ হয়, পাত্রীর আত্মীয়স্বজনের আপত্তি সত্ত্বেও রেবেকা ম্যাকটাভিসকে তিনি কতকটা রোখের বশেই বিয়ে করে ফেলেন। এই রোখই তাঁর কাল! তিনি মিল্টন হতে চেয়েছিলেন,—মিল্টন কি শেলির মতো? তিনি বায়রণ পছন্দ করতেন,—বায়রণ আর মিল্টন কি কবিমনের একই দ্যুতি? নন্দিনী বলেছিল—সেই তাঁর মাতৃ-বিয়োগের,—তাঁর মাদ্রাজ-প্রবাসের সময়েই অন্য দেশের এক শান্ত ভাবুক আপন মনে নিজের জার্নালে কয়েকটি কথা লিখেছিলেন—সে-কথাগুলি তাঁরই কথা—বাংলাদেশের কবি মধুসূদনের সঙ্গে সে-সব কথার কোনো সম্পর্কই নেই—তবু নন্দিনী বলে, সব প্রতিভার কাছেই—এবং সেই সূত্রেই মধুসূদনের কাছেও তার দাবি সেই আদর্শ—

—কোন্ আদর্শ?

—শুনবে?

—বলো।

আলমারি থেকে 'এমিয়েলের জার্নাল' টেনে এনে আনন্দ বললে—২৮শে এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের উক্তি :

> Do no violence to yourself, respect in yourself the oscillations of feeling. They are your life and your nature; One wiser than you ordained them. Do not abandon yourself altogether either to instinct or to will. Instinct is a siren, will a despot.

কথাগুলি অপরিসীম ভাল লাগলো। আনন্দকে বললুম—নন্দিনীকে আমার নমস্কার জানিও।

[ ক্রমশ ]

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

॥ দশ ॥

মণ্টুকে বললাম বটে, দাঁড়াও, একটু তৈরি হয়ে নিচ্ছি, কিন্তু তৈরি হতে আমার বেশ রীতিমত সময় লাগল। বস্তির ভেতরে সেই ছোটখাটো শ্যাওলাপড়া মাঠ, মাঠের দক্ষিণে সেই টিউবওয়েল, যার চারিপাশটা কর্দমাক্ত, একপাশে ছাইয়ের গাদা, ছেঁড়া কলাপাতা আর ভাঙা ভাঁড়ের স্তূপীকৃত অস্তিত্ব, যেখানে বাসনমাজা থেকে মোষ নাওয়ানো পর্যন্ত সব কিছুই হয়, যেখানে দাঁতনের ছিবড়ে, গয়ের সিকনি কিছুরই অভাব নেই—সেইখানে বালতি হাতে এলাম চান করতে।

মায়া পিছন পিছন এল আমার যাতে না কষ্ট হয় সেজন্যে। হাতে তার একখানা পিঁড়ি। পিঁড়িখানা কলতলায় পেতে দিয়ে সে বললে, 'আমি হাতলটা টানছি, আপনি বসে বসে চান করুন ভাল করে।'

বললাম, 'আমি নিজেই তো পারতাম মায়া, পাম্প করে জল তুলতে।'

মায়া বললে, 'তাতে কি হয়েছে?'

চান করতে করতে রাণীদির ওখানে যাবার কথাটা ভাবছিলাম। মণ্টু অপেক্ষা করছে আমার জন্য। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল রাণীদি শুধু তো আমাকেই খেতে বলেন নি, মায়াকেও বলেছিলেন। আমি বললাম তাকে, 'রাণীদির ওখানে যাবে না মায়া?'

'নেমতন্ন খেতে?'

'হ্যাঁ। রাণীদি তো আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে বলেছিলেন?'

'তা বলেছিলেন।'

'তবে—?'

'দেখি, মাকে জিগ্যেস করে।'

রাণীদির ওখানে মায়াকে নিয়ে যাবার জন্যে আমি যেন কেমন বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। গতকাল রাতে যে পরিস্থিতির মধ্যে রাণীদি ও আমার দেখা হয়েছিল, সেই পরিস্থিতির পর আজ যেন তাঁর সামনে আমার একলা যাবার কোন আগ্রহ নেই। যখনই রাণীদির ওখানে যাব তখনই তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে। চোখোচোখিও হবে। মনে পড়ে যাবে বিগত রাত্রির সেই সুরাপায়ী নর্তকীরূপিণী রাণীদির কথা, তাঁর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার কথা, অদ্ভুত নাটকীয় সংলাপ আর ঘাত-প্রতিঘাতের কথা। তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতেও বোধ হয় সংকোচ হবে আমার। আর রাণীদি—রাণীদিরও কি মনে পড়ে যাবে না সে সব কথা? তাঁরও মনে কি হবে না কোন সংকোচ, দ্বিধা কিংবা কোন লজ্জা? নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে

[illegible]

তিনিই বা আমাকে সহ্য করবেন কি করে? তাই এই অস্বাভাবিক আর অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে তৃতীয় একজন কেউ থাকলে বোধ করি ব্যাপারটা কিছুটা সহজ হতে পারবে এবং সেই ভেবেই আমি মায়ার যাওয়াটা যে একান্ত অপরিহার্য, তা উপলব্ধি করেছিলাম। আর তারই জন্য তাকে রাণীদির কথাটা মনে করিয়েও দিলাম। কিন্তু সে মাকে জিজ্ঞাসা করার কথা বলাতে আমি যেন বেশ খুশি হতে পারলাম না তার ওপরে।

তাই চান করে ফিরতেই আমি কথাটা পেড়ে বসলাম মায়ের কাছে। মা বললেন, 'যখন ওকে যেতে বলেছে তখন ও যাবে না কেন? যাক্ না—'

মায়া খুশি হয়ে বললে, 'আমি তো যাব না বলি নি।'

'তাহলে তৈরি হয়ে নাও' বলে আমিও আমার গেরুয়া পরে তৈরি হয়ে নিলাম। মণ্টু এতক্ষণ ঘরের মেঝেয় বসেছিল, আমরা তৈরি হয়ে নিতেই সে

[illegible] আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আবার সেই পথ। পথে কয়েক পা আসতেই যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে যার-পর-নাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাধু তার দরজার সামনে রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে একখানা বঁটি হাতে চিৎকার করে বলছে, 'মুখপোড়ারা তোমরা এখানে আসামী খুঁজতে এসেছো—না মেয়েমানুষ খুঁজতে এসেছো। ঝাঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব না আমি—'

সামনে দু'-তিনজন লোক। দু'জন ইউনিফর্ম পরা। একজন স্যুট পরিহিত। শেষোক্ত লোকটি বললেন, 'তুমি চেঁচালে কি হবে? আমি জেলের বড় সায়েব, যাকে বলে সুপার—সেই সুপার আমি। বহু কয়েদীকে আমি জেল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছি—পালিয়ে এসে তারা তাদের মেয়েমানুষের ঘরে এসেই ওঠে। তুমি ভালয় ভালয় ঘরটা আমাদের দেখতে দাও—আমরা শুধু একবার দেখেই চলে যাবো।'

মাধু ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, 'যাকে খুঁজতে এসেছো—আমি কি তার মেয়েমানুষ?'

ইউনিফর্ম পরা লোক দু'জনের একজন বললে, 'তোমাকে তো মোলাকাৎ করতে যেতে দেখেছি শংকরের সঙ্গে।'

'তা দেখবে না কেন?'

'তবে?'

'তাহলেই কি আমি তার মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষ কাকে বলে রে মুখপোড়ারা?'

ইউনিফর্ম পরিহিত অপর লোকটি বললে, 'তুমি তার মেয়েমানুষ নও?'

মাধু দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, 'না।'

'তবে তুমি জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে কি জন্যে?'

মাধু আরও দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'আমি তার স্ত্রী বলে।'

জেল সুপার দেখলেন, মেয়েছেলে যদি কারো স্ত্রী হয়, তবে বাজারের ভাষা তার ওপর প্রয়োগ করলে সে চটবেই, কারণ সেখানে নারীর মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। তাই তিনি কথার ধারা পরিবর্তন করে বললেন, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে মা—তুমি কিছু মনে কোরো না। শংকর জেল থেকে পালিয়ে আসতে আমরা খুব মুস্কিলে পড়েছি। আমাদের চাকরী নিয়ে টানাটানি হবে। সে যদি ফিরে যায় তাহলে আমরা [illegible], সেও বাঁচবে। আমি এজন্য তাকে বা তোমাকে কিছু পুরস্কারও দিতে রাজি আছি। তা' ছাড়া আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা, স্পেশাল রেমিশন দিয়ে আমি তাকে তাড়াতাড়ি খালাস করে দেবো। তুমি একটু দয়া করো মা!'

'জেলসুপার', 'স্পেশাল রেমিশন'—এসব কথা জেরো ইন্টারভিউ করতে দিলে

গিয়ে মাধুর সম্ভবত জানা হয়ে গেছে। কারণ, দেখলাম কথাগুলো সে বেশ রীতিমত উপলব্ধি করল বলে মনে হল। এবং এও দেখলাম জেল সুপারের ব্যবহারে মাধু কেমন যেন খানিকটা শান্তও হয়ে এল। সে বললে, 'জেল থেকে যে সে পালিয়েছে, তা আমি কেমন করে জানব বলুন তো—কথাটা তো আমি এইমাত্র আপনাদের কাছ থেকেই শুনছি!'

সুপারসাহেব বললেন, 'ঠিক বলছ না?'

'আপনাকে আমি বেঠিক কথা বলতে যাব কেন, যখন ব্যাপারটাই আমি জানি না?'

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলাম মাধুকে। ভাবলাম ঠিক এই জন্যেই বোধ হয় শংকর আর মাধু কিছু আগে মায়ের কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছিল। কেমন করে যে ওরা টের পেয়েছিল তা ওরাই জানে—আমরা অতোগুলো লোক কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারি নি। মায়ার দিকে আমার চোখ পড়ল। দেখলাম মুখখানা তার বর্ণহীন পান্ডুর হয়ে গেছে। দাদাকে ধরতে এসেছে, কি জানি তার ভাগ্যে কি ঘটবে, তাই ভয়ে সে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস্ এরা পুলিশ নয়, জেলের অফিসার, তাই রক্ষা—নইলে তার মুখ দেখে পুলিশ অনায়াসেই বুঝতে পারতো এ মেয়েটা নিশ্চয়ই সব জানে। কিন্তু সে যাই হোক, আমার মনে এই কথাটাই প্রসংগক্রমে উঠে পড়ল, জেল-পলাতক আসামীকে ধরবার জন্য পুলিশ না এসে জেলের অফিসাররা এলেন কেন? কথাটা জিজ্ঞাসা করব করব ভাবছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এবার জেলসুপার বলে উঠলেন, 'তাহলে চলো অম্বিক শংকরের বাড়ির দিকে একবার যাই।'

'বাড়ির দিকে গিয়ে কি হবে স্যার?'

'পাব না বলছ?'

'আমার তো সেইরকমই মনে হয়।'

'তাহলে পুলিশকে ইনফর্ম করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।'

'কিন্তু পুলিশকে তো জানেন স্যার!'

'তা জানি।'

এ কথার অর্থ কি। মনে আমার জিজ্ঞাসার তরঙ্গ উঠল। কিন্তু সে জিজ্ঞাসার জবাবও পেয়ে গেলাম সুপার-সাহেবের কথায়। তিনি বললেন, 'যতবার এস্কেপের খবর জানিয়েছি পুলিশকে ততবারই ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু যেই নিজেদের সূত্রে খোঁজ করেছি সেই আসামী ধরা পড়েছে।'

'স্যার ক্রিমিন্যাল গ্যাং-এর সঙ্গে ওদের সমঝোতা, লেনদেন—কাজেই কেন ওরা আপনার আমার কথা ভাববে?'

'হ্যাঁ আজকালকার যুগই হয়েছে এই-রকম।'

সবই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। গত রাত্রে কি না দেখেছি আমি! রাণীদির ডেরা থেকে বেরিয়ে পথে আসতেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। তারপর সেই বসন্তর আড্ডা। সেখানে মারোয়াড়ীর পাগড়ি, ফেজ আর গান্ধীটুপি, সবরকমের সমাবেশই দেখেছি আমি। আর দেখেছি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার স্তূপ, সোনা হীরে জহরৎ প্রভৃতির লেনদেন, ওয়াগন ভাঙা কালোয়ারদের ভিড়। এসব দেখলে দেশে কোন শাসন আছে, না পুলিশ আছে বলে মনে হয়? অথচ সবি আছে—দেশে শাসনও আছে, পুলিশও আছে। পুলিশ কি জানে না—অবাধে এই সব কারবার চলেছে? ইংরেজ আমলে দেখেছি কোথায় কোন্ বাড়িতে গোপন অস্ত্রশস্ত্র বা রাজনৈতিক পুস্তকাদি আছে তার তারা সন্ধান করতে পারতো, কংগ্রেস আমলেও দেখছি—কোথায় কোন্ কমিউনিস্ট নেতা আত্মগোপন করে আছে, তাকে ধরে আনছে—অথচ নাকের ওপর দিয়ে সভ্যজগতের আড়ালে আরেকটি অভিশপ্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানকার কোন খবরই তারা রাখতে পারছে না, এ কথা কি বিশ্বাস করতে হবে? জেলসুপার আর তাঁর বিভাগীয় লোকদের এই কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আরেকবার আমার সেই কথাই মনে পড়ে গেল।

জেলসুপার আর তাঁর দলবল এবার সম্ভবত মায়াদের বাড়ির দিকেই যাবেন বলে মনে হল। তা ছাড়া জেলসুপার বলেও ফেললেন, 'চলো অম্বিক—এসিছি যখন একবার দেখে যাই ওদের বাড়িটা।'

'কিন্তু বাড়ি কি চিনতে পারব আমরা?'

'মেয়েটাকেই জিগ্যেস্ করো না।'

অতঃপর অম্বিক মাধুকে জিজ্ঞাসা করতে গেল। সে বললে, 'বাছা তুমি যখন শংকরের স্ত্রী, তখন তার বাড়িটা অন্তত কোথায় আমাদের একবার দেখিয়ে দাও দিকি—'

'এইটেই তো তার বাড়ি', মাধু বললে।

অম্বিক বললে, 'কিন্তু তার মা-বোন সবাই কি এখানে থাকে?'

'তারা কোথায় থাকে তা আমি কি করে জানব?'

'সে কি কথা—তুমি তাদের বাড়ির বউ, আর তারা কোথায় থাকে তা তুমি খবর রাখ না?'

'এই দুনিয়ায় কে কার খবর রাখে মশাই—বলে আপনি বাঁচলে বাবার নাম।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম মাধুর অভিনয়ে। আশ্চর্য, এরা কিরকম দক্ষ অভিনেত্রী তা বোধ করি চোখে না দেখলে আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারতাম না। লোকগুলো বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। মায়া বলে উঠল, 'উঃ বাঁচা গেল!'

মাধু বললে, 'বাঁচা গেল বলে বাঁচা গেল!'

মায়া মাধুকে তারিফ করে বলে উঠল, 'তোর কি সাহস মাধুদি!'

'সাহস না দেখালে উপায় আছে', মাধু কেমন যেন বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল, ওরা আমার ঘরের মানুষকে দিনের পর দিন আটকে রেখে দেবে জেলখানায়, তাকে একটিবার আসতে দেবে না আমার কাছে, এ কি আমার কম যন্ত্রণা! ও না হয় অপরাধ করেছে, ওকে না হয় শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু আমি কি করেছিলুম যে আমাকেও তার সঙ্গে শাস্তি দেবে, দিনরাত, মাস, বছর ধরে আমাকে তুষের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে বলতে পারিস মায়া?

অদ্ভুত কথা মাধুর।

আইনে অপরাধীদের শাস্তি বা সাজা দেবার অনেক ব্যবস্থাই আছে জানি, কিন্তু মাধুর মত নিরপরাধিনী মেয়েদের যে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাওয়া তাকে প্রশমিত করার জন্য আইনে বিধান কই? আইনের কি অধিকার আছে এদের শাস্তি দেওয়ার? আইনের মধ্যে কি মানবিকতার কোন স্পর্শ থাকবে না? আইন কি শুধু নিষ্করুণ কতকগুলো অক্ষরের

আঁকিবুঁকি আর তাকে কার্যকরী করার জন্য কিছু হৃদয়হীন মানুষের জাগ্রত কর্তব্যবোধ—তার বেশি আর কিছু নয়? কেন, যদি অপরাধী কোন ব্যক্তিকে আটক করে রাখা হয়, তবে তার জন্য গার্হস্থ্য জীবনযাপনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে বাধাটা কোথায়? পুলিশ রাষ্ট্রপতিকে পাহারা দিতে পারে, রাজ্যপাল, মন্ত্রী প্রমুখকে পাহারা দিতে পারে, জাতীয় সম্পত্তি অথবা দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে পারে। কিন্তু মানুষের মমতাবোধ, স্নেহ, দয়ামায়া, মানবিক ধর্মকে পাহারা দেবার কোন ব্যবস্থা করতে পারে না কেন —একথা ভাবতেও কেমন যেন বিস্মিত হতে হয়। বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, এগুলি জাতীয় সম্পত্তি, দেশের সীমান্ত রক্ষার চেয়ে কি কম মূল্যবান জিনিস বলেই মনে করেন দেশের শাসক শ্রেণী? বার বার গোটা পৃথিবীর অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজসেবী, রাজনৈতিক নেতা অনেকেই একথা বলেছেন। কিন্তু তবু আজ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাগুলি হয় নি? কিন্তু কেন? শুনেছি সমাজতান্ত্রিক দেশে এরকম কিছু কিছু ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়েছে। যদি সে সব দেশে এরকম ব্যবস্থা হতে পারে, তবে আমাদের দেশেই বা হতে পারবে না কেন? এখানেও বোধ করি সেই পুরনো কথা—শাসনযন্ত্রের মধ্যে চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দেশে শোষণ, পীড়ন, দমননীতি হচ্ছে, প্রশাসনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য, সে দেশে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আসবে কি করে? যে দেশে ধনতন্ত্রবাদ কোটি কোটি মানুষের রক্ত, অশ্রু আর কংকালের ওপর আপন সভ্যতার অভ্রভেদী সৌধ নির্মাণ করে, সে দেশে এই অমানবিক প্রবাহধারা প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক। যদি কোনদিন এর জড় উপড়ে ফেলতে পারে এদেশের মানুষ, তবে এই মানবিকতার আবির্ভাব সেইদিনই ঘটবে, তার আগে নয়। মাধুর কথাগুলো আমার কানে তখনও যেন বাজছিলঃ ওকে না হয় শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু আমি কি করেছিনুম যে আমাকেও তার সঙ্গে শাস্তি দিতে হবে? দিন-রাত-মাস-বছর ধরে আমাকে তুষের আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেবে, বলতে পারিস মায়া?

মায়া স্বভাবতই কোন উত্তর দিতে পারে নি।

এতক্ষণ যেন মাধুর খেয়ালই ছিল না, সকলের সঙ্গে আমিও রয়েছি। কিছুক্ষণ আগে সে তার অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমাকে নিবেদন করে এসেছে মায়াদের বাড়িতে, যেহেতু আমার দর্শনের পরই সে ফিরে পেয়েছে তার আপন মানুষটিকে। এবারেও তার বিপদের জাল কেটে যেতে ঠিক তেমনিভাবেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে এসে আমার পদধূলি গ্রহণ করে বললে, 'এ বিপদ আমার কাটল শুধু আপনারই আশীর্বাদে।'

মানুষের আন্তরিক বিশ্বাসকে কখনো উপহাস করতে নেই, আর তা আমি শিখিও নি কোনদিন। কিন্তু তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, এটা মাধুর ভিত্তিহীন একটা অহেতুক বিশ্বাস আমার ওপর। হয়তো মাধু বিশ্বাস করে, গেরুয়ার অলৌকিকতায়, আর তার সঙ্গে সেই গেরুয়া আমার অঙ্গে আছে বলে আমাকেও। কিন্তু আমি তো জানি কত দূরে মিথ্যে একথা। মাধুর কাণ্ড দেখে আমার সেই পুরনো প্রবচন মনে পড়ে গেল, ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।'

মন্টু এতক্ষণ চুপচাপই ছিল। সে বলে উঠল, 'মাধুমাসি সাবাস্ তুমি। তোমাদের ওস্তাদ শুনলে তোমায় তারিফ করবে। কিন্তু শংকরমেসো পালালো কোথা দিয়ে বলদিকি?'

মন্টু হাসতে হাসতে বললে, 'সে এখন ওস্তাদের সাগরেদ বসন্তর আড্ডায়। সেখান থেকে আর তাকে ধরে নিয়ে যেতে হচ্ছে না। ডি-সি সেন্ট্রালের সেখানে প্রতিপত্তি।'

আবার চমকে উঠলাম এবং সুপারসাহেবের মুখে যা শুনেছিলাম তাই ইংরেজীতে যাকে বলে 'করোবোরেটেড' হওয়া তাই হল।

অতঃপর আমরা মন্টুর সঙ্গে রাণীদির বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম।

রাণীদির সেই ঘর। সেই বেশ। সেই নাকে তিলক-কাটা বৈষ্ণবী তিনি। আমাদের দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা দেরি করতে পারিস তোরা! সেই কখন থেকে খাবারদাবার সাজিয়ে নিয়ে বসে আছি।'

এ যেন সে মানুষই নয়—গত রাতে যে মানুষটিকে আমি দেখেছি। অত্যন্ত সহজ সুন্দর—মা যেমন ছেলে-মেয়েদের খাবারদাবার সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে, যেমন তাদের দেরিতে অনুযোগ করে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবেই তিনি আমার সঙ্গে ব্যবহার করলেন, কোথাও কোন সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই। বলা বাহুল্য, তিনি যতখানি সহজ হলেন আমার কাছে আমি ঠিক ততখানি সহজ হতে পারলাম না তাঁর কাছে। আমি সেই মুহূর্তে কোন কথাই বলতে পারলাম না তাঁর সামনে।

মন্টু অবশ্য বলে উঠল, 'দেরি হবে না কেন—মামাবাবু চান করতে গেলেন, চান করে কাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে আসতে ও'র দেরি তো হলই, তা ছাড়া পথে আবার গোলমাল—'

রাণীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মন্টুর দিকে তাকালেন। মন্টু বললে, 'জিগ্যেস করো না মায়াকে।'

মায়া যথাযথ বিবরণ দিলে। শংকরের জেল থেকে পালিয়ে আসার ব্যাপারটাও যেমন কিছু নয়, তেমনি তাকে জেলসুপারের ধরতে আসার ব্যাপারটাও কিছু নয়—এমনি সহজভাবেই আর পাঁচটা ব্যাপারের মত রাণীদি শ্রোতা যেমন শুনে যায় তেমনিভাবেই শুনে গেলেন শুধু। তারপর ঘরের মেঝেয় দু'খানা আসন পেতে সেই জায়গাগুলোয় মন্টু আর মায়াকে বসতে বললেন। তারপর আমার জন্য একদিকে একটা আসন পেতে বললেন, 'বিজন তুই এখানটায় বোস্।'

হয়তো এই আসনটাই আমার বৈশিষ্ট্য। আমার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করে মায়া বলে উঠল, 'মাসি নিজের ভাইকে যত্ন করে খাওয়াবে বলে আলাদা আসন দিচ্ছে।'

রাণীদি বললেন, 'তা তো বলবি লো পোড়ারমুখী।'

মায়া খিল খিল করে হেসে উঠল।

অনেক কিছু রেঁধেছিলেন সেদিন রাণীদি। অনেক অনুরোধ উপরোধ করে তিনি আমাকে সেদিন খাইয়েছিলেনও। ঠিক আগেকার দিনে যেমনভাবে খাওয়াতেন—এমন কি ইতিপূর্বে, গতকালও তিনি যেমনভাবে খাইয়েছিলেন নিজে হাতে তেমনিভাবেই খাইয়েছিলেন। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে যে কথাটা ফুটে উঠছিল—এইদিনকার আয়োজনটার পরিকল্পনা যখন তিনি করেছিলেন, তখন ওস্তাদের আড্ডায় দৈবক্রমে রাণীদিকে আমি দেখে ফেলব এটা তিনি ভাবেন নি। সেই ঘটনাটাই যেন খাওয়ানোর আনন্দের মধ্যে খোঁচার মত খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল বিঁধছিল রাণীদিকে আর বিঁধছিল আমাকে। মন্টু বা মায়া কারোরই এসব কথা জানার নয়। কিন্তু তবুও তারা মাঝে মাঝে আনন্দস্রোতের মাঝখানে আড়ষ্টতা উপলব্ধি করে, কখনও রাণীদির মুখের দিকে, কখনো বা আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে তারা কি বুঝছিল তা জানি না—তবে আমার কাছে খুবই কষ্টদায়ক বলে মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা।

খেয়েদেয়েই চলে আসা যায় না। আমি আসতে চাইলেও রাণীদি যে আসতে দেবেন না তা আমি জানতাম এবং ঠিক সেই কারণেই আমি বিছানার ওপর একটু বসলাম। মায়া আমাকে বসতে দেখে বলে উঠল, 'দাদার এবার বিশ্রামের পালা শুরু হবে বোধ হয়—'

আমি বললাম, 'ঠিক বিশ্রাম নয়—খেয়েদেয়েই চলে যাব, তাই একটু বসে থাকছি।'

মন্টু বললে, 'মামাবাবুকে এবার আমরা এখানে ধরে রাখব—তোদের ওখানে যেতে দেবো না।'

'বললেই অমনি হল', মায়া বললে, 'তোদের এখানে থাকলে দাদার সংগে আমি আর জীবনে কথাই বলব না।'

'তুই কথা না বললে তো মামাবাবুর বড় বয়েই যাবে!'

'বয়ে যাবে কিনা জানি না—তবে দাদার দিক থেকে সধম্মো হবে।'

আমি এবার হেসে ফেললাম। বললাম, 'ওটা কিন্তু মায়া তোমার আর মণ্টুর ঝগড়া। আমি ওর মধ্যে নেই।'

'নেই তা আমি জানি', মায়া বললে, 'মণ্টু আমাকে অমন করে বলবে কেন।'

রাণীদি বোধকরি পাশের রান্নাঘরে খাওয়া-দাওয়া সারছিলেন। খানিক পরে এসে বললেন, 'তোরা সব এতক্ষণ একটু শুয়ে নিতে পারিস নি মন্টু?'

'শোব কি মাসি, মন্টু বললে, 'আমাকে এখুনি তো বেরুতে হবে—'

'কদ্দুর যাবি?'

'জানো না?'

'ও!' যেন মনে পড়ে গেল একটা ভুলে যাওয়া কথা। তারপর রাণীদি তাঁর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে কয়েকটা ধুপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে বললেন, 'তারপর বিজন, দিদির কাছে খেয়ে তৃপ্তি হল তো?'

সহসা এরকম কথার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে কি না হয়েছে, একথা কেন রাণীদির মুখে? খেলে পেটই ভরে মানুষের। আগে পেট ভরার কথাটাই জিজ্ঞাসা করে মানুষ। কিন্তু তৃপ্তির কথাটা কেন? তৃপ্তি তো উদরের বিষয়বস্তু নয়, তৃপ্তি হল মনের জিনিস। তাহলে কি রাণীদি আমাকে এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তির প্রসংগ তুলে আমার কাছ থেকে গত রাতের কথাটা পর্যন্ত জেনে নিতে চাইছেন? গত রাতে যদি তাঁর কাণ্ড দেখে আমি তাঁকে ঘৃণা করে থাকি মনে মনে, তাহলে নিশ্চয়ই আমার খেয়ে তৃপ্তি হবে না, আর তৃপ্তি না হলে আমি যে তাঁকে গত রাতে ঘৃণাই করেছি সেই কথাটাই আমার কাছ থেকে তিনি বের করে নেবেন। আমি বুঝলাম তাঁর উদ্দেশ্যটা। আমি তাঁকে বললাম, মন্টুকে আর মায়াকে জিজ্ঞাসা করো না।'

মায়া বললে, 'বাঃ রে আমাকে কেন?'

'তাহলে তোমার খেয়ে তৃপ্তি হয় নি মায়া', আমি জিজ্ঞাসা করলাম। মণ্টু বললে, 'প্রশ্নটা তো মাসি আপনাকে করেছিলেন মামাবাবু। আপনি আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন?'

বললাম, 'তোমাদের ঘাড়ে আমি চাপাতে চাই নি। তোমাদের দিয়েই আমি উত্তরটা তোমার মাসিকে দিতে চেয়েছিলাম'—আমার কথাটা শোনামাত্রই সহজ-সরল মায়া বলে উঠল, 'সত্যিই খুব তৃপ্তির সংগে আমি খেয়েছি। মাসির রান্নাটাও এত সুন্দর।' মন্টু বললে, 'আমার কিন্তু এত খাওয়া এক সংগে ভাল লাগে না।'

আমি এবার রাণীদির দিকে তাকালাম। রাণীদি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন বলে মনে হল। তবু তিনি বললেন, 'বিজনকে আজ খেতে বলেছিলুম, কিন্তু শুধু খাবার জন্যেই খেতে বলি নি। ওকে খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে ওর সংগে অনেক গল্প করব মনে করেছিলুম। আমার যে কত ভাল লাগে সেই সব পুরনো গল্প—কিন্তু কি করব, ও এল যেন আজ একেবারে গম্ভীর সন্ন্যাসী-ঠাকুরটি। মানুষের মনের কথা ও বুঝতেও পারলে না।'

চাবুকের আঘাত পিঠে পড়লে যেমন মানুষ সহসা যন্ত্রণায় চমকে ওঠে, আমি প্রায় সেইরকম ভাবেই চমকে উঠলাম। বিশেষ করে মন্টু ও মায়ার সামনে এ আঘাতটা যেন কেমন আমায় বেসামাল করে দিলে। মন্টুর কোথায় যাবার কথা ছিল, সে বেরিয়ে গেল। তার দেখাদেখি মায়াও বলে উঠল, 'তোমরা ভাই-বোনে গল্প করো মাসি—তারপর এক সময় আবার আসব।'

ওরা চলে যেতে আমি শুধু বলে উঠলাম, 'এমন করে ওদের সামনে আমাকে চাবুক মারার কি দরকার ছিল রাণীদি।'

রাণীদি এবার সেই আগেকার চাপা দীর্ঘশ্বাসটা বাইরে ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বুঝি রে বিজন বুঝি—পুরুষমানুষ তুই। মেয়েদের সম্বন্ধে তোরা একটা কথাই শিখে রেখেছিস, আর সে কথাটা তার অসম্মানের কথা, তার নিচে নামার কথা। মেয়েরা যে পাঁকেও পদ্মফুলের মত ফুটে ওঠে—সে কথা তোরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারিস না।'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'অথচ এমন দিন আসে বা আসতে পারে, যখন হয়তো...না, না থাক্ সে সব কথা আজ আর তুলে তোকে ব্যথা দেবো না। কাল যা জেনেছিস তাই সত্যি হোক আমার জীবনে, আর তোরও জীবনে!'

প্রথমে আমি আশ্চর্য হই নি। বরং বুঝেছিলাম রাণীদি আজ সুযোগ পেলেই গত রাত্রির কথা তুলবেন। কিন্তু আশ্চর্য হলাম পরে, গত রাত্রির কথা তিনি এই-ভাবে নিয়ে আসলেন দেখে। সেদিন আরও অনেক কথাই হয়েছিল। সে কথা যদি কখনও সুযোগ আসে বলব, কিন্তু শুনতে শুনতে আমি সহ্য করতে পারি নি—উঠে পালিয়ে এসেছিলাম রাণীদির কাছ থেকে। রাণীদি চাপা গলায় ডেকেছিলেন অনেকবার কিন্তু আমি আর ফিরে চাই নি।

কঠিন যন্ত্রণায় মানুষ যেমন কথা বলতে পারে না, তখন আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

[ চলবে ]

[ ধারাবাহিক উপন্যাস ]

"The stream and the broken pottery ; what was any art but an effort to make a steath, a mold in which to imprison for a moment the shining, elusive element which is life itself—life hurrying past us and running away, too strong to stop, too sweet to lose" ?

—*Willa Cather*

॥ এক ॥

**শেষ** রাত্রির বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে সেই বাতাস এসে মশারি দোলাচ্ছিল, মশারির ভেতরে ঘামের গন্ধ-ভরা গুমোটটা স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর তার ফলে ঘুমন্ত প্রবীরকুমার ব্যানার্জি চমৎকার ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখছিল একটা।

স্বপ্নটা দেখছিল এই জন্যে যে, আপাতত একজোড়া জুতোর অত্যন্ত দরকার ছিল তার। সম্প্রতি যে জুতো-জোড়া তার পাদপদ্ম আলো করছে—ভাঙা টাইমপীস থেকে খালি শিশি-বোতল এবং পুরোনো জুতো পর্যন্ত কিনতে যারা দরজায় দরজায় হাঁক দিয়ে বেড়ায়—ছ' মাস আগেই ওই জোড়াকে তাদের হাতে অক্লেশে সমর্পণ করতে পারত সে। কিন্তু শ্রীপ্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সংকল্পে অটল। কাঁটা উঠে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাক, সেলাই করতে গিয়ে মুচি হতাশ নয়নে তাকিয়ে থাকুক, আরো মাস তিনেক ওই জুতোকেই চালাতে হবে তাকে। অর্থাৎ ওই জুতোয় আরোহণ করেই পার হতে হবে ঘনঘোর বর্ষার জলধারা, তরল কাদার রোমাঞ্চকর প্রলেপ।

মুশকিল হল, রবারের জুতো একেবারেই পরতে পারে না সে। মিনিট পাঁচেক পায়ে রাখলেই অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা শুরু হতে থাকে মাথায়, মেঘের মতো ভার নামতে থাকে কপালে। ডাক্তার বলেন, অ্যালার্জি। ওই একটা চমৎকার শব্দ আমদানি করেছেন ডাক্তারেরা—যখন কোনো কিছুর হদিস মেলে না, তখন ওই পরম বাক্যঃ 'অ্যালার্জি।'

মোটের ওপর, প্রবীরের একজোড়া জুতো দরকার এবং মাসতিনেক আগে সেটা কেনা যাচ্ছে না। ফলে, শোবার আগে গোড়ালি দুটোয় হাত বুলিয়ে দেখেছিল সবটা বেশ চষা মাঠের মতো আর এখানে-ওখানে চিনচিনে ব্যথার বিদ্যুৎ। শেষ রাত্রে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে মশারির ভেতর খানিকটা স্নিগ্ধ আমেজ ছড়িয়ে দিলে, অতএব ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নটা বেশ নিবিড় হয়ে উঠল।

তখন প্রবীরের পায়ে ভাইসরয় কিংবা অ্যাম্বাস্যাডর জাতীয় নামের একজোড়া অতি কুলীন জুতো। সেইটে পায়ে দিয়ে সেই অতীব মসৃণ কোনো পথ বেয়ে (যে-রকম পথ মাত্রেই স্বপ্নেই মেলে, যাদবপুর থেকে চিড়িয়ার মোড় পর্যন্ত যার অস্তিত্ব কোথাও নেই) সে পরম সুখে হেঁটে যাচ্ছিল। তার গান গাইতে ইচ্ছে করছিল এবং মনে হচ্ছিল এ-রকম জুতো পায়ে থাকলে তিন মাসে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আসা যায়।

স্বপ্নটা নিবিড় হচ্ছিল, স্বাপ্নিক পথের দু' ধারে বসন্তকালের পাখিরা ডাকছিল-টাকছিল, প্রবীর যেন কোত্থেকে এক ঠোঙা গরম চীনেবাদামও পেয়ে গিয়েছিল। সুখের আবেশটা আর একটু ঘন হলে তার পাশে একটি নায়িকার আবির্ভাবও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে রাত ভোর হল, বাইরের বুড়ো নিমগাছে খ্যা-খ্যা ক'রে বেয়াড়া গলায় কাক ডাকল, আর মা ঘরে এলেন।

মা-র সারা রাত ঘুম হয় নি। ছেলের সামনে পারেন না—তাই লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকবার কেঁদেছেন। আর পারা গেল না, ভোরের আকাশ শাদা হল, মা আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা ঠেলে ছেলের ঘরে এলেন।

'ভুলু!'

প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক-নাম। এখনকার চোয়ালভাঙা কড়া চেহারা নয়, ছেলেবেলায় ফর্সা গোলগাল ছিল দেখতে আর জন্মকালীন পোশাক পরে সারা গায়ে ধুলো মেখে ঘুরে বেড়াত। দিদিমা নাম দিয়েছিলেন ভোলানাথ। সেই থেকেই ভুলু।

মা আবার ডাকলেন, 'ভুলু!'

মশারির মধ্যে নড়ে উঠল প্রবীর। স্বপ্ন বিলীন হল হাওয়ায়, ভাইসরয় কিংবা ফিল্ড মার্শাল জুতো উপযুক্ত পায়ের উদ্দেশে উধাও হয়ে গেল, বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে চিনচিন করে উঠল ব্যথার বিদ্যুৎ। ময়লা মশারি আর ঘামের গন্ধ-ভরা বিছানায় প্রবীর চোখ মেলল।
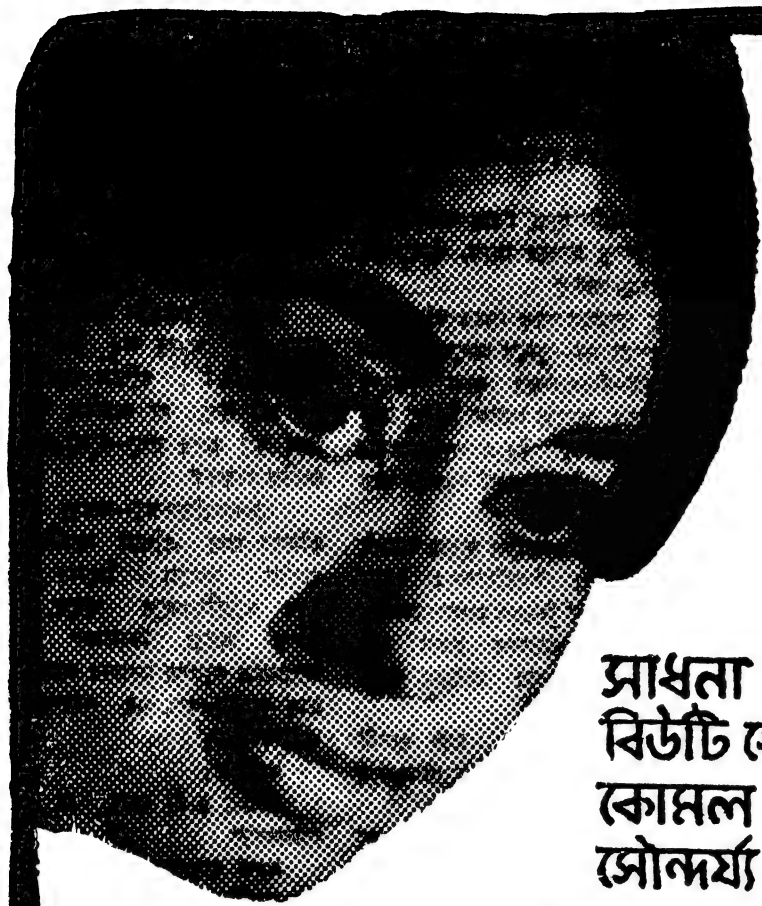
সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

ঘর ছায়া-ছায়া। মা দাঁড়িয়ে। মশারির আবরণ থেকে কেমন সুন্দর মনে হয় তাঁকে। মা-র রোগা শরীরটাকে আরো শীর্ণ, আরো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে এখন। স্বপ্নের মতোই মাও যে-কোনো সময় ছায়ার ভেতরে হারিয়ে যেতে পারেন। মমতার একটা ছোঁয়া লাগল চকিতের জন্যে।

মা খুব ভীরুর মতো ডাকলেন, 'তোর ঘুম ভেঙেছে ভুলু?'

'ভেঙেছে।'

'চা-টা খেয়ে—' সংকোচে মা একবার থামলেন : 'একটু সকাল-সকালই যাবি নাকি মুরারিবাবুর কাছে?'

সব বিস্বাদ হয়ে গেল, মাথাটা জ্বালা করে উঠল। বিছানার পাশে, খোলা জানলার পাল্লার ওপর বসে সেই সময় একটা কাক চাঁছা গলায় ডেকে উঠল খ্যা-খ্যা করে।

এক বন্ধুর কাছ থেকে এক সময় দিন কয়েক যোগ-ব্যায়ামের তালিম নিয়েছিল প্রবীর। মা-র কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল শরীরটা—শবাসনের ভঙ্গিতে হাত-পা মেলে দিয়ে মরা ব্যাঙের মতো চিৎ হয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর তড়াক করে উঠে বসল বিছানার ওপর।

মা একটু পেছিয়ে দাঁড়ালেন।

মশারির বাইরে এসে প্রবীর মা-র দিকে তাকালো। ঘর ছায়া-ছায়া। তবু মা-র শীর্ণ শাদা মুখটাকে দেখা যায়, কঙ্কালের মতো লাগে। মার ওপর মিথ্যেই রাগ করা—সব চেয়ে নিরুপায়কে আরো বেশি কষ্ট দেওয়া। সমস্ত জীবন একটানা দুঃখই পেয়েছেন। বাবার ধারণা ছিল তিনিই শেষ গ্র্যাজুয়েটদের একজন—যাদের পরে আর কেউ ইংরিজি শেখে নি। অফিসের নতুন ছেলেদের লেখায় ভুল ইংরিজি—আর্টিকল কিংবা প্রিপোজিশনের গুণে—এই সব আবিষ্কার করতে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করতে একটা হিংস্র উল্লাস ছিল তাঁর। তিনি নিজেকে এম-এ, পি-এইচ-ডি ইত্যাদির চাইতেও অনেক বেশি ইন্টেলেকচুয়াল বলে জানতেন, আর—

আর মহাকালী পাঠশালায় ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া মা-কে সম্পূর্ণ ইডিয়ট ভাবতেন। 'তোমার মতো গাধাকে নিয়ে সংসার করা—' এইরকম সিদ্ধান্ত প্রায়ই শোনা যেত তাঁর মুখ থেকে।

মা শান্ত, মা সরল, মা ঝগড়া করতে জানতেন না। খাওয়া চলে না, এমনি এক সংসার থেকে এসেছিলেন। কাজেই নিঃশব্দে মেনে নিয়েছেন বাবার সিদ্ধান্ত। গাধার মতো খেটেছেন, গাল খেয়েছেন, ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞা কুড়িয়েছেন। না—ছিল না তাঁর। যা কিছু করার তা বাবাই করে গেছেন, কারণ প্রতুল নিচের ক্লাসে বার দুই ফার্স্ট হওয়ার পরে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল, এই ছেলে ভবিষ্যতে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনকে ছাড়িয়ে যাবে। তারপর—

তারপর এখন যেতে হবে মুরারি হালদারের কাছে। যে লোকটার নাম শুনলেও সকালবেলাটা অশুচি হয়ে যায়।

আবার ছায়ার ভেতর থেকে মা-র গলা ভেসে এল।

'আমি জানি বাবা, তোর কত খারাপ লাগছে। কিন্তু হাজার হোক, টুলু তো তোর আপন ভাই।'

টুলু প্রতুলের ডাক নাম। 'টোলানাথ' থেকে নিষ্পন্ন নয়—ভুলুর অনুকার শব্দ। আপন ভাই—নিঃসন্দেহ! বাবা বিদ্রূপ করে বলতেন, 'ভুলুর মগজে কিছু নেই, শেষে পাস-কোর্সে বি-এ পাশ করল। টুলুকে আমি এশিয়ার বেস্ট স্কলার করে ছাড়ব।'

বেস্ট স্কলারের নমুনা মৃত্যুর আগেই বাবা কিছু দেখে গিয়েছিলেন। বেঁচে থাকলে আজ পূর্ণ বিকাশ দেখতে পেতেন তার। নিষ্ঠুর কৌতুকের মতো কী একটা নিজের ভেতরে অনুভব করল প্রবীর।

মা আবার বললেন, 'সেই জন্যেই বলছিলুম, একটু তাড়াতাড়ি মুরারিবাবুর কাছে গেলে—'

মা-র ওপর রাগ করা উচিত নয়, তবু বিরক্তিটা ঠেকানো গেল না কোনো মতে।

'তোমার-আমার গরজে তো হবে না মা। ও-সব বড়োলোক ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না।'

'কী বলছিস তুই—ন'টা পর্যন্ত ঘুমুতে পারে কেউ!'

'বড়োলোকের অসাধ্য কাজ নেই মা, সব পারে।'

ছেলে ঠাট্টা করছে কিনা, মা বুঝতে চাইলেন একবার। তারপরে আবার তাঁর চোখে জল এল।

'তা হোক বাবা, তুই একটু তাড়াতাড়িই যা!'

'কিছু ব্যস্ত হয়ো না মা, বাজারটা সেরে দিয়ে তারপর যাব।'

'বাজার আজ না হলেও চলবে বাবা।'—মার গলা কাতর হয়ে এল : 'ছেলেটা থানার হাজতে আটকে রইল, হয়তো ওকে মারধোর করছে—'

নাঃ, অসম্ভব, মা-র ওপরে সহানুভূতি জাগিয়ে রাখা অসম্ভব। শুধু জৈবিক অন্ধ স্নেহ একটা। মা কি জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও কঠিন হতে পারেন না কখনো? একটা নির্জীব মেয়েলিপনার মতো সংসারের বোঝা টানলেন, নিস্তেজ চোখ মেলে বাবার ইংরিজি-বাংলা মেশানো বাছা-বাছা গালাগালগুলো আত্মসাৎ করলেন, আর ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞা কুড়িয়ে গেলেন। একবারও কি মাথা তুলে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারতেন না? তা হলে—তা হলে হয়তো সব অন্যরকম হতে পারত। অন্তত ঠিক এ-রকমটা হতে পারত না।

তক্তপোষ থেকে নেমে চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে তীক্ষ্ণ অধৈর্য স্বরে প্রবীর বললে, 'যাচ্ছি—যাচ্ছি। গিয়ে না হয় দশটা পর্যন্তই বসে থাকব হালদারের দারোয়ানের পাশে।'

নির্জীব, মেয়েলি মা-র কান্না এবার আর রাশ মানল না। টপ করে গাল বেয়ে একটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

ধরা গলায় মা বললেন, 'তুই বিরক্ত হলে কী করব বল্—টুলু তো আমার পেটের ছেলে।'

'হুঁ—কুলতিলক!'—আরো কতগুলো বীভৎস কথা এগিয়ে আসছিল ঠোঁটে, প্রবীর সামলে নিলে। বললে, 'যাব মুরারিবাবুর কাছে, যাচ্ছি। কিন্তু আরো দিনকতক পুলিশের হেপাজতে থাকলে তোমার ছেলের ক্ষতি হবে না মা—বরং ওর স্বাস্থ্যের জন্যেই ওটা দরকার।'

মা চুপ।

'একটু চা-টা দেবে, না, এইভাবেই দৌড়োব?'

ব্যস্ত হয়ে মা বললেন, 'চা দিচ্ছি, তুই মুখটুখ ধুয়ে নে।'

অতএব ভোরের স্বপ্নে পাওয়া জুতো নয়, যে জুতোজোড়াকে ছ' মাস আগে অনায়াসে বিদায় দেওয়া চলত, সেইটে পায়ে পরে, গোড়ালিতে কয়েকবার চিনচিনে ব্যথা অনুভব করতে করতে এবং কোনো এক ফাঁকে মুচিকে দিয়ে কয়েকটা উঠতি-গজাল ঠুকে নিতে হবে, এই কথা ভাবতে ভাবতে—বেলা সাড়ে সাতটা নাগাদ মুরারি হালদারের বাড়ির দিকে রওনা হল প্রবীর।

কারণ আর কিছু নয়—থানার ও-সি গৌর বাবুর সঙ্গে মুরারি হালদারের অত্যন্ত খাতির আছে। তিনি একটু বলে দিলে ছেলেটা হয়তো ছাড়ান পেয়ে যেতে পারে। আর কিছু না হোক, পুলিশের ঠ্যাঙানি বন্ধ হতে পারে অন্তত।

এই ঠ্যাঙানি যে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য, এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সংশয় নেই প্রবীরের। আজ তিন বছর ধরে রিহার্সাল দেবার পরে প্রতুল এখন পাড়ার বিশিষ্ট মস্তান। এশিয়ার ব্রাইটেস্ট স্কলার হায়ার সেকেন্ডারী আর দেয় নি, ফীজের টাকা

# কান পেতে শুনি

শান্তনু দাস

কারা যেন দরজা খুলে ভেতরে আসবে বলে
এলো না
হাজার বছর ধরে কারা যেন কড়া নেড়ে যায়
শার্সিগুলো নড়ে চড়ে : কান পেতে শুনি :
আমি কান পেতে শুনি
দোর খোলো।
প্রচণ্ড শব্দের ঝাঁকে বজ্রের তোপধ্বনি নেই,
পাল্লা ভেঙে পদাতিক ঝড়,
আলো
কখনো এলো না
অথচ এ—অশরীরী আত্মা নড়ে চড়ে
বৃষ্টিতে ভেজানো মুখ, গীর্জার ঘণ্টার শব্দে
পাখি উড়ে যাওয়া...
নরম জ্যোৎস্নার বুকে জলাভূমি,
গান,
আমি কান পেতে শুনি :
আমি কান পেতে শুনি
দোর খোলো।
স্মৃতিরা শব্দহীন নুলিয়ার মতো—
পানকৌড়ি টুপ টুপ ডুবে উঠে
দিনান্তে বেলায় মাথা রাখে :
বেদনার অরণ্যে কোন চন্দ্রডুবি হয়
গর্ভের যন্ত্রণা থেকে জন্ম নেয় আরেক সকাল
আমি কান পেতে শুনি:
দোর খোলো।
অথচ আসবে বলে
কারা যেন দরজা খুলে ভেতরে এলো না
হাজার বছর ধরে কারা যেন কড়া নেড়ে যায়
আমি কান পেতে শুনি
আমি কান পেতে শুনি
দোর খোলো।

# সাঁকো পেরোলেই

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

সাঁকো পেরোলেই ধু ধু মাঠ
জলা জমি, আমের বাগান
চাষীর কুটীরে
ধোঁয়া ওঠে
বারুণী নদীর জল মনে হয় আঁকাবাঁকা সুদীর্ঘ পরিখা।

হলুদ শৈশব দিন কেটে গেছে
সব পেয়েছির দেশ
খুঁজে খুঁজে
যৌবনের প্রান্তে আজ
রক্তাক্ত যুবক
আগ্নেয়গিরির শত জ্বালা মুখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

ঘরে ও বাইরে বড় রৌদ্রহীন গাঢ় দুঃসময়
পদতলে চৌচির পৃথিবী
আতপ্ত তৃষ্ণায় মরু বক্ষোদেশ
হলুদ শৈশব ঝরে গেছে
বিক্ষুব্ধ রক্তের স্রোতে দেখি তাই তীব্র প্রতিরোধ।

সাঁকো পেরোলেই আজো সবুজ স্বপ্নের মাঠ
ফলভার বৃক্ষের উদ্যান
উদয় দিগন্ত পারে
বারুণী নদীর জল ধরে আছে সৌরলোক
সম্রাটের তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

গিয়েছিল। সেইবারে বাবার প্রথম স্ট্রোক।

দ্বিতীয় স্ট্রোক একটি বালিকা-ঘটিত ব্যাপারে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে ছুরির খোঁচা খেয়ে প্রতুল হাস-পাতালে গিয়েছিল। বাবা সে স্ট্রোক আর সামলাতে পারেন নি। কারণ সে ভদ্রলোক এশিয়ার উঠতি বেস্ট্ মস্তানের জন্যে মনে মনে আদৌ তৈরি ছিলেন না খুব সম্ভব।

তারপর থেকে টুলুর বিবিধ কীর্তির ইতিহাস। মারামারি তো আছেই, কয়েকটা বোমাবাজীর সঙ্গেও সে জড়িত ছিল, এইরকম জনশ্রুতি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এতদিন পুলিশের নজর পড়ে নি তার ওপর। কিন্তু যে সিগারেটের দোকানটার সামনে টুলু এবং তার কটি বন্ধুর আস্তানা ছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে অদূরের কোনো মহিলা কলেজের ছাত্রী-দের তারা নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করত—কী কারণে সেই সিগারেটওলার ওপরেই খেপে গেল তারা। ফলে দোকান লুট, সোডার বোতল ছোড়াছুড়ি, তারপর টুলু এবং তার দু-একটি বন্ধুর হাজত-যাত্রা।

আর এরপরেই মা-র সমস্ত রাত ঘুম নেই। এর জন্যেই মা-র ছায়া-ছায়া শরীরটা আরো অস্পষ্ট। চুল রুক্ষ, চোখের দুধারে শুকনো জলের দাগ। অথচ, এই টুলু মা-কে কী বলত?

'ইউ শাট আপ। অয়েল ইয়োর ওন মেশিন।'

প্রবীর হয়তো চেঁচিয়ে উঠল : 'এই টুলু!'

দাদাকে কোনোদিন খুব ভক্তি করবার দরকার হয় নি প্রতুলের। কারণ, বাবাই বাণী দিয়েছিলেন: 'ও পাস-কোর্সের বি-এ, ওর মগজে কিছু নেই।' সুতরাং দাদার কথার কোনো জবাব না দিয়ে—তার স্কিন-টাইট ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে শিস টানতে টানতেই হয়তো বেরিয়ে গেল সে।

চলতে চলতে প্রবীর ভাবল, অদ্ভুত। এই টুলুর জন্যেই মা কাল সারাটা দিন কেঁদেছেন, কাল রাতে ঘুমুতে পারেন নি; আর প্রবীর চলেছে মুরারি হালদারের কাছে, সকালবেলা যে লোকটার নাম করলেও দিনটা বিশ্রী হয়ে যায়!

মুরারি হালদার কী করবে?

থানার ও-সি গৌর বাবুর সঙ্গে খাতির আছে তার। অনুগ্রহ করে সে যদি একখানা চিঠি দেয়, তা হলে চিঠিটা নিয়ে প্রবীর থানায় দৌড়োবে। তারপর এশিয়ার বেস্ট্ স্কলার হয়তো ছাড়া পাবে, হয়তো দারোগা বলবেন, 'আচ্ছা—ওকে আর পিটব না। আর যদি নিতান্তই ঠ্যাঙানোর দরকার পড়ে, একটু ধীরে-সুস্থে পেটাতে বলব।'

সকালের রোদ নরম। আকাশে হালকা হালকা মেঘ। দিনটা স্নিগ্ধ। যে-কোনো একটা স্বপ্নের পথ ধরে গাছের পাতার শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চলার মতো দিন।

কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে প্রতুলের জন্যে মুরারি হালদারের কাছে। আর বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে থেকে থেকে যন্ত্রণার চমক। [ক্রমশ]

# সাগর-সমাচার

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

অনেক তো শুনলাম। দেখলামও অনেক। আর নয়,—সাগরের নাম শুনলেই ভ্রূ কুঁচকে বলতে পারেন কেউ কেউ।

কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলতে পারেন, —এ যুগ তো মহাকাশ-বিজয়ের যুগ। চাঁদে পাড়ি দিয়ে নুড়ি কুড়োবার যুগে। এ যুগে সাগর নিয়ে কেউ নাকি আবার মাথা ঘামায়? দূরের মহাকাশকে নিকট না ভেবে নিকটের মহাসাগরকে নাকি দূর ভাবে?

অস্বীকার করবো না, রসিকদের এসব জিজ্ঞাসার পেছনে অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু 'অ-রসিক' যাঁরা, উল্টো পথটাকেই যাঁরা পথিক হবার আদর্শ জায়গা বলে ভাবছেন, পুরোপুরি অযৌক্তিক তাঁরাও নন। কারণ, মূল্যবান পদার্থ চাঁদের তুলনায় সাগরে অনেক বেশি আছে এবং সাগরতলে মানুষের পদার্পণ চাঁদে পদার্পণের চেয়ে খুব একটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কিন্তু অনন্ত রত্নসম্ভবা, চিররহস্যময়ী যে সাগরপুরী, তার রুদ্ধ-দুয়ার কোনোদিন কি খুলতে পারবে মানুষ? আবিষ্কারের জীয়নকাঠির স্পর্শে আদ্যিকালের সম্পদপরিকীর্ণা সাগর-রাজকন্যের ঘুম ভাঙাতে পারবে? —সম্প্রতি সাগর-সন্ধানী বিজ্ঞানীরা এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন খুব। বলছেন,—হ্যাঁ, পারবে। এই ১৯৭০ সাল থেকেই শুরু হবে নতুন নতুন সব অভিযান।

১৯৮০ সাল নাগাদ মানুষ গিয়ে সাগরের তলায় বসবাস করবে। কাজকর্ম করবে দস্তুরমত। সাগরের ২০,০০০ ফুট নীচে নেমে রীতিমত একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলবে এবং এমন কি চাষবাসও করবে সেখানে। ডাঙায় চলে ধান-গমের চাষ; আর ওখানে চাষ চলবে চিংড়ির। গলদা চিংড়ির সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতের সব মাছের খবর শুনে অনেক চাষীই ওখানে যেতে প্রলুব্ধ হবে।

আর শুধু চাষী কেন, ধাতুবিজ্ঞানীদেরও ওটা হবে স্বর্গরাজ্য। নামমাত্র খরচে সাগরের মূল্যবান ধাতুগুলোকে কী করে আহরণ করা যায়, বিজ্ঞানীরা ওখানে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অতি সত্বর তা জানিয়ে দেবেন।

ওদিকে ভূ-বিজ্ঞানীরাও তৎপর হবেন সম্ভবত। কারণ, সাগরের ২০,০০০ ফুট তলায় গেলে পৃথিবীর মহাদেশগুলো কী করে পরস্পরের কাছ থেকে একদিন সরে গেল, এ সম্পর্কে নতুন তথ্য কিছু জানা যাবে।

আর জানা যাবে,—বলছেন আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা, — পৃথিবীর আবহাওয়া-সম্পর্কিত কিছু আগাম খবর। দিন-সাতেক আগেই পূর্বাভাস দেওয়া চলবে আবহাওয়ার এবং জনসাধারণ এ থেকে প্রচুর উপকৃত হবে।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা উপকার আহরণের চেষ্টা করছেন অন্যভাবে। সাগরের তলায় গিয়ে ৪০ দিন বসবাস করার উদ্দেশ্যে এক অদ্ভুত পরিকল্পনা এরই মধ্যে গ্রহণ করে ফেলেছেন ওঁরা।

এই পরিকল্পনার নাম হল 'প্রজেক্ট সী হাউস' বা 'সাগর-বাড়ি প্রকল্প'। যদি কাজ ঠিকমতো চলে তো বিজ্ঞানীরা বছর দুয়েকের মধ্যেই এই প্রকল্প অনুযায়ী সাগরের তলায় বাড়ি গড়তে পারবেন।

বাড়ির জায়গা ঠিক হয়ে গেছে এরই মধ্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানীদের বসবাসের আয়োজন। ঠিক হয়েছে, সাগরতলে ৯ হাজার ফুট উঁচু এক পর্বতের চূড়ায় ওঁরা থাকবেন। ওই চূড়াটি আছে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১২০ ফুট নীচে।

ওখানে থাকবার সময় বিজ্ঞানীরা গবেষণায় তৎপর হবেন। পর্বতটির গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়ায় যেসব জীবজন্তু, তাদের খবর নেবেন। আর এ ছাড়া, বাতাস সাগর-জলে যেসব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সাধ্যমতো সেগুলো সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হবেন।

এদিকে কাজ বসে নেই, এগিয়ে চলেছে। ১৯৬৯ সালেও হয়েছে অনেক কাজ। ডুবোজাহাজ বেন ফ্রাংকলিন সাগরের নীচে গেছে, প্রায় এক মাস ধরে তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং ছবিও তুলেছে রাশি রাশি।

এই ডুবোজাহাজটির ৬ জন বিজ্ঞানী সাগরের ৬৫০ ফুট নীচেকার অজানা সব কোরাল পর্বতমালার খবর দিয়েছেন আমাদের। বলছেন, ওদেরই জন্যে সাগরের ভেতর-মহলে তরংগ সৃষ্টি হয়।

অবিশ্যি সাগর-তরঙ্গের খবর ছাড়াও বিজ্ঞানীরা নতুন খবর আরও কিছু সংগ্রহ করেছেন। ধাতব পদার্থের খোঁজে সাগরতলে অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং তেল-সংগ্রহ করবেন বলে সেখানকার মাটি

চিলির সমুদ্র-নিকটে একটি [illegible] তিমি। কয়েক মাস আগে এটি [illegible] পড়ে
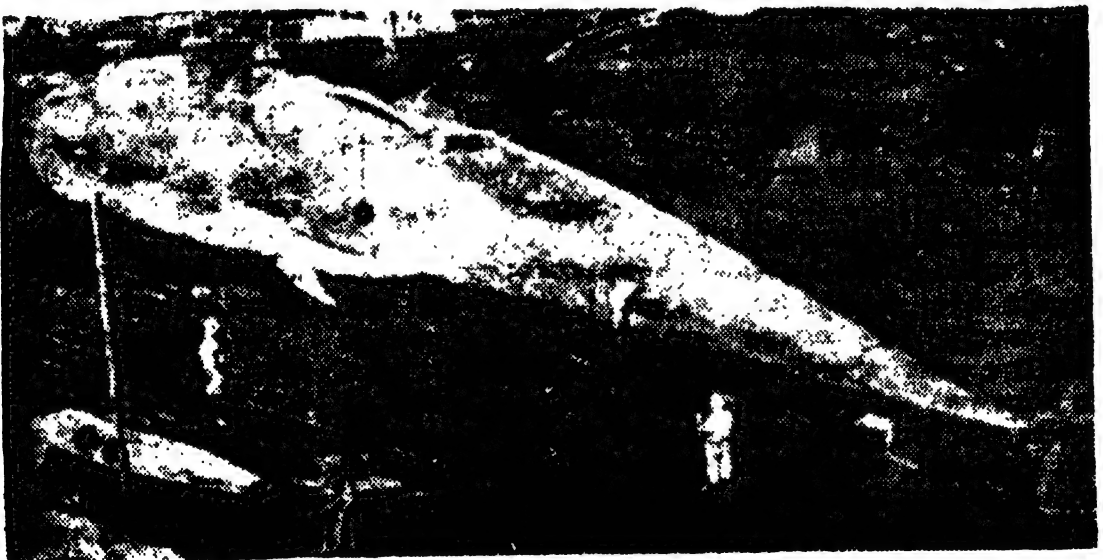
খুঁজবার উদ্যোগ করেছেন জায়গায় জায়গায়। এ ছাড়া, সাগরের মাছ সম্পর্কেও খুবই কৌতূহলী ও'রা। মাছের আস্তানাগুলোকে খুঁজে বের করতে ও'রা বদ্ধপরিকর।

এই মাছ সম্পর্কে নতুন অনেক খবর এরই মধ্যে ও'রা সরবরাহ করেছেন এবং এই খবরগুলো যদি সত্যি হয় তো শুধু মাত্র ঐ সব মাছের দৌলতেই পৃথিবীর অনেক বভুক্ষু প্রাণে বাঁচবে।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হৈ-চৈ। নিউ ইয়র্কে যখন চান্দ্রযান তৈরি হচ্ছে, ওয়েস্টিং হাউস কর্পোরেশন তখন 'ডীপস্টার' নামে নতুন এক ধরনের জলযান নির্মাণে তৎপর। এই 'ডীপস্টার'রা সাগরের ২০ হাজার ফুট অবধি নীচে নামতে পারবে।

কিন্তু শুধু নামলেই কাজ হল না; নেমে থাকতে হবে সেখানে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। মার্কিন নৌ-বাহিনীর বিজ্ঞানীরা তাই এমন এক ধরনের জলযান তৈরি করছেন, যা সাগরের ২০ হাজার ফুট অবধি নীচে তো নামবেই, উপরন্তু থাকবেও ৩০ ঘণ্টা অবধি।

আমেরিকার 'মেরিন সায়েন্স কমিশন' এতেও খুশি নন। সাগর-উপকূল

[illegible] অগভীর অঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের একটি কারখানা গড়ে না তোলা অবধি কিছুতেই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না ও'রা।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, নিশ্চিন্ত হতে আরও নাকি ১০ বছর সময় লাগবে। কারণ, ২৩ কোটি ডলার ব্যয়ে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের যে প্রকল্পটি ও'রা হাতে নিয়েছেন, তার স্থান সংগ্রহ করাই এক দুরূহ কাজ। এ ছাড়া, সাগর উপকূলের কাছাকাছি জায়গায় এ ধরনের কারখানা স্থাপন করলে তেজস্ক্রিয়তার সম্ভাবনাকেও একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এই সম্ভাবনা প্রায় নির্মূল হবে গভীর সাগরে কারখানা স্থাপন করলে।

সাগরে কী নেই! সোনা, রুপো, হীরে, প্ল্যাটিনাম থেকে শুরু করে লোহা, গন্ধক, টিন, তেল প্রভৃতি অনেক কিছুই আছে। এদের মধ্যে আবার শেষোক্ত সম্পদটি সংগ্রহের কাজে অনেকেই উঠেপড়ে লেগেছেন। তেল-সংগ্রহকারকদের কেউ কেউ বলছেন, পৃথিবীতে এখন প্রতি বছর গড়ে ১২৬০ কোটি ব্যারেল তেল উৎপন্ন হয়। এই তেলের শতকরা ১৬ ভাগই পাওয়া যায় সাগর-জঠর থেকে।

এদিকে তেলের উৎপাদন বাড়ছে ক্রমেই এবং অনেকেরই মনে ক্রমে ক্রমে এই আশা দানা বাঁধছে যে, ১৯৭১ সাল নাগাদ পৃথিবীর তেল উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় চারগুণ বেড়ে যাবে এবং ঐ তেলের এক-তৃতীয়াংশই আসবে সাগর থেকে।

আর শুধু কি তেল! ধাতব পদার্থের ব্যবহারও পৃথিবীতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, ১৯৬৪ সালে যে পরিমাণ ধাতব দ্রব্য ব্যবহার করেছে মানুষ, ১৯৮০ সালে করবে তার তিনগুণ। বাড়তি ধাতুর বেশির ভাগই আসবে সাগর থেকে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী ১০ বছরের মধ্যে সাগরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় হবে আরও। মানুষ সাগর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানবে। সমুদ্রতল আসলে কেমন, কী কী সব উপাদান দিয়ে তা গড়া, কেন ভূমিকম্প হয় সেখানে এবং কেনই বা ধাতব পদার্থগুলো সাগরের এক-একটা বিশেষ জায়গায় এসে জড়ো হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মানুষ সেগুলো আগের তুলনায় আরও অনেক ভালভাবে জানবে। মানুষ জানবে, সমুদ্রতলের বিস্তার ঘটছে কীভাবে এবং কীভাবেই বা মহাদেশগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

মহাদেশ সরে-যাওয়া সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা এখনও অবিশ্যি পুরোদমেই চলছে। হামেশাই বলতে শোনা যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের, ভূগর্ভের গলিত পদার্থগুলো সাগরতল ফুঁড়ে ওপরে উঠতে গিয়ে শক্ত হতে থাকে ক্রমেই এবং আগে উঠে-আসা পদার্থগুলো যখন শক্ত হয়, নতুনরা তখন আবার উঠতে শুরু করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে ভূগর্ভ থেকে উঠে-আসা উপাদানগুলোর দৌলতেই সমুদ্রতলের বিস্তার ঘটছে ক্রমশ এবং ক্রমশই সমুদ্রগর্ভে নতুন নতুন সব পর্বত সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য খুবই ধীরে ধীরে ঘটছে এ প্রক্রিয়া। কিন্তু এরই দরুণ যে মহাদেশগুলোর একটি অপরটি থেকে দূরে সরছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সন্দেহ এদিকে আগ্নেয়গিরিদের উদ্ভব সম্পর্কেও নেই। কারণ, বিশেষজ্ঞরা সাগর নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওদের জন্ম সম্পর্কে সম্প্রতি নতুন কিছু তথ্য অবগত হয়েছেন। ও'রা জেনেছেন, পদার্থরা ভূ-কেন্দ্রের দিক থেকে ওপরেই শুধু উঠে আসছে না, ওপর থেকে কেন্দ্রের দিকেও এগোচ্ছে। ঠিক কেন্দ্র না হলেও এগোচ্ছে 'ম্যানটেল' স্তর অবধি। এই 'ম্যানটেল' আছে ভূ-কেন্দ্রের ঠিক উপরিভাগে। ভূ-কেন্দ্র থেকে নির্গত উপাদানগুলোর অনেকাংশই মহাদেশগুলোর ধারেকাছে আসতে আসতে আবার এই স্তর অবধি ফিরে যায় এবং এরই ফলে হয় আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি।

বিশেষজ্ঞদের এই সিদ্ধান্ত যদি সত্যি হয় তো সমুদ্র-জঠরে যেসব পর্বত রয়েছে, তাদের কাছাকাছি পললের স্তরগুলো খুব পাতলা হওয়ার কথা; আর মহাদেশসমূহের কাছাকাছি অঞ্চলের স্তরগুলোর হওয়ার কথা খুবই পুরু।

কিছুদিন আগে 'গ্লোমার চ্যালেঞ্জার' নামে একখানি জাহাজ আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে গবেষণা চালায়। 'চ্যালেঞ্জার'-এর গবেষণা থেকে উপযুক্ত সিদ্ধান্তটি আরও জোরদার হয়েছে। সমুদ্রের তলাকার মোট ৮০টি অঞ্চল থেকে পললের নমুনা সংগ্রহ করে 'চ্যালেঞ্জার'। উপসাগরগুলোর জন্ম কবে হল, বয়স কত হল, তা জানবার উদ্দেশ্যেই 'চ্যালেঞ্জার' এসব করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই বয়স জানাজানির কাজটা সারতে খরচ হবে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ডলার। এদিকে সাগরমহলের অগভীর এলাকাগুলো নিয়েও গবেষণায় তোড়জোড় চলছে। অনেকগুলো দেশ এগিয়ে এসেছে এ-ব্যাপারে। সকলেই জানতে চাইছে, বিভিন্ন মহাদেশ কবে থেকে এবং কীভাবে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরছে। এ ছাড়া, সাগরগর্ভের পেট্রোলিয়াম এবং অন্য সব ধাতব পদার্থ সম্পর্কেও সব্বাই খুব কৌতূহলী।

সাগর সম্পর্কে আমাদের ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের জনসাধারণের কৌতূহলের পেছনে অন্য কারণও রয়েছে। আমরা মনে করি, সাগরের সাহায্যে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান খাদ্য-সমস্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়ছে অতি দ্রুত এবং অনুন্নত বা অর্ধোন্নত দেশগুলোই এ-ব্যাপারে উন্নতদের টেক্কা দিচ্ছে। লোকসংখ্যা যদি এই হারে বেড়ে চলে তো আগামী ২০ বছরের মধ্যে খাদ্যের উৎপাদন শতকরা আরও ৫০ ভাগ বাড়াতে হবে। এই বাড়তি খাদ্যের চাহিদা সাগর থেকে ধরা মাছ দিয়ে অনেকখানি মেটানো যেতে পারে।

এখন সাগর থেকে প্রতি বছর গড়ে ৫ কোটি মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়। এর মধ্যে অবশ্য তিমি থেকে শুরু করে হেরিং, কড্ অবধি অনেক কিছু পড়ে। কিন্তু এ নাকি সাগরের মোট মৎস্য-সম্পদের তুলনায় খুবই নগণ্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মৎস্যবহুল এলাকাগুলোর ঠিক ঠিক নিশানা পেলে এবং শিকার-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করলে সাগর থেকে ধরা মাছের পরিমাণ ৫ কোটি মেট্রিক টন থেকে বেড়ে গিয়ে ২০ কোটি মেট্রিক টনে দাঁড়াবে!

দাঁড়াক, আমরা বলি,—ভবিষ্যতে মাছের ঝোল অন্নে না হোক, রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত মাছের গুঁড়ো খেয়ে অন্তত বাঁচবো।

**রূপনারাণের কূলে—প্রথম খণ্ড,** কৈশোরক : গোপাল হালদার : মনীষা গ্রন্থালয়, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ : মূল্য ছয় টাকা।

বাংলা দেশের মননশীল সাহিত্য এবং প্রগতিশীল রাজনীতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গোপাল হালদার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর আটষট্টি বছরের জীবনে তিনি মুহূর্তের জন্যও চোখ খুলে রাখতে ভোলেন নি। নিজের দেশ এবং বিদেশের মানুষের সামাজিক, রাজনীতিক এবং সংস্কৃতিক জীবনের যা কিছু জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে তা তিনি বিনা দ্বিধায় জেনে নিয়েছেন। কোন প্রকার বিদ্বেষের ভাব এসে তাঁর ইতিহাস সন্ধানী মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে নি। তাই তাঁর সর্বপ্রকার ভাবনার মধ্যে স্পষ্টতা এবং পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও সুস্থ ও রুচিসম্মত একটি মনের নির্দিষ্ট পরিচয় পাই। আজকের দিনের বহু সমালোচকের চেয়ে যে কারণে তাঁকে অনেক বড় মনে হয় তা হল, তাঁর সাহিত্যকীর্তির মাঝে নানারসের সন্ধান পাওয়া গেলেও আত্মবিজ্ঞপ্তির অহংকারে রুচিহীনতার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমান গ্রন্থটি আত্মজীবনী শ্রেণীর রচনা হলেও এটিতে কোনপ্রকার আত্মপ্রশস্তি স্থান পায় নি। নিজের কথা তিনি পিছনে ফেলে রেখেছেন। যেসব মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, বলেছেন তাঁদের কথা। যে-পরিবেশ থেকে তাঁরা উঠে এসেছিলেন, তার কথা লিখেই, তাঁদের পুরোপুরি বুঝাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম খণ্ডে তেরটি অধ্যায় আছে। এগুলিতে পরিচিত-অপরিচিত বহু নরনারীর কথাই তিনি লিখেছেন। এর মধ্যে তাঁর বাবা শ্রীসীতাকান্ত হালদারের সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে যা লিখেছেন তাতে দেখতে পাওয়া যায় আজ থেকে একশ' বছর পূর্বে যাঁর জন্ম এমনই এক সুপণ্ডিত ধর্মনিষ্ঠ বাঙালী ব্যবহার-সাধনায় যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে হিন্দুধর্মের সর্বপ্রকার গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারকে অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন। গোপালবাবু লিখেছেন—'গীতাতেই গতি, কিন্তু মতিটা "সায়েন্স অব লাইফ" আর "শেক্সপীয়রে"ও।' দাদা রঙ্গীন হালদার সম্পর্কে বহু অমূল্য উক্তি করেছেন গোপালবাবু। একটি জায়গায় আছে :—'দু'-একটা কথা স্কুলে শুনেছিলাম শিক্ষকদের মহলে—রবি ঠাকুরের কবিতা বোঝা যায় না, আর তিনি "স্বদেশী"র বিরোধী, হিন্দু সমাজেরও। এ কথাগুলি আমাদের বিমুখ করবার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু হতে পারে নি। কারণ—আমার দাদা রঙ্গীন হালদার।' আরেক জায়গায় লিখেছেন—'যে দু'-চারজন মানুষ আমার কাছে অপরিমেয় তিনি তাঁদের মধ্যে একজন।......একটা কথা অস্পষ্টভাবে এখনো স্মৃতিতে আছে। দাদা তখন বোধহয় কলেজে পড়েন, কিম্বা স্কুল শেষ হয় নি। তাঁর থেকে বড়ো তাঁর সমবয়কার একদল কলেজ-পড়া ছাত্রের সঙ্গে খেলার মাঠের নিকটের পোলটার উপর দু'-সারে বসে তাঁদের তর্ক হচ্ছে—"চোখের বালি" কেমন বই। সকলে বলছেন, ভাল নয়; হিন্দু বিধবাদের আদর্শ ছোট করা হয়েছে। আর দাদা বলছেন "না। এতে আঁকা হয়েছে মানুষের চরিত্র,—সাইকোলজিক্যাল উপন্যাস।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তির সমীক্ষা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত হালদার বলেছেন, জাতীয় আত্মমর্যাদার পাদপীঠ হিসাবে বঙ্কিম যে সাংস্কৃতিক ভূমি রচনা করতে চেয়েছিলেন তা অতি দুঃসাধ্য। 'কোঁৎ-মিল-স্পেনসার'-এর সঙ্গে তাল ঠুকে তিনি দেখালেন পাশ্চাত্য কালচারের যা শ্রেষ্ঠ আদর্শ তা আমাদের গীতাতে বহু পূর্বে ঘোষিত, আর কৃষ্ণচরিত্রে চিরদিনের মত মূর্ত। মনীষার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাতে বঙ্কিম, নিজের

যে ধ্বনিরাজ্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তা শুধু শব্দ দিয়ে তৈরি নয়, কেমন একটা ভাবের মোহও সেই সঙ্গে তাঁর চোখে লেগেছিল। 'শুধু ধ্বনি নয়, ধ্বন্যালোকেরও' তা ক্ষীণাভাস।'

'স্বদেশীর স্রোতাবর্ত' এবং 'অগ্নি-স্পর্শ' প্রভৃতিতে এ দেশের ইতিহাসের বহু অবিস্মরণীয় কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। লেখক বারো বছর বয়সে বাঙলা লেখার মধ্য দিয়েই প্রথমে পেয়েছিলেন 'বিবেকানন্দের স্পর্শ—আগুনের পরশমণি।' তিনি বলেছেন, বাংলা দেশে যাকে অগ্নিযুগ বলে থাকে তার অগ্নি-মন্ত্র কেউ যদি জাগিয়ে থাকেন সে বিবেকানন্দ।

বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে এটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আনন্দের কথা এটির পরবর্তী খণ্ডগুলিও অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে।

**রম্যাণি বীক্ষ্য : কর্ণাট পর্ব :** শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ : মূল্য নয় টাকা মাত্র।

বাঙালী পাঠকের কাছে 'রম্যাণি বীক্ষ্য' একটি সুপরিচিত গ্রন্থ। উপন্যাস রসসিক্ত এই ভ্রমণকাহিনীর বিভিন্ন পর্ব পাঠ করে বহু পাঠক-পাঠিকাই নিজেদের দেশের নানা স্থান এবং নানা শ্রেণীর মানুষের সম্বন্ধে কত নতুন নতুন কথা জানতে পেরেছেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে দেখবার মত যা কিছু আছে, লেখক অতি অপূর্ব ভাষায় তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ধারাবাহিকভাবে ভারত দর্শনের যে মনোজ্ঞ কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তারই ফলে বাংলা সাহিত্যে তিনি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য পর্বগুলির মত এই গ্রন্থটিতেও কেবলমাত্র ভারতের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পরিচয়ই নেই। পৌরাণিক কাহিনী এবং সাংস্কৃতিক আলোচনাও গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। কর্ণাট পর্বে আছে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার কাহিনী। কেরালা থেকে নীলগিরি, সেখান থেকে মহীশূর রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে হায়দ্রাবাদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নীলগিরির আদিবাসী টোডাদের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা অদ্ভুত মুন্সীয়ানার সাথে বর্ণনা করেছেন লেখক। তাঁর এই গল্প-বলার ভঙ্গিতে লেখা ও রঙ্গলের ইতিহাস আলোচনাও ভারি সুন্দর হয়েছে। চারমিনারের আদি ইতিহাস, বিভিন্ন রাজা ও সুলতানের জীবনকাহিনী ও কীর্তিকলাপ যেমন সুখপাঠ্য তেমনি জ্ঞানগর্ভ। এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হল তাপ্তির চরিত্রটি।

**নেতাজী প্রদর্শনী**

দিল্লী আমি যাই নি। লালকেল্লাও দেখি নি। লালকেল্লার একটি সুন্দর নকল দেখালেন ফরোয়ার্ড ব্লক, কলকাতার ময়দানে নেতাজী প্রদর্শনীর প্রবেশ পথে নকল লালকেল্লার ফটক তৈরি করে। ফটকের ওপর সারিবদ্ধ লাল পতাকা পত্ পত্ করছে।

ফটকের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। মনে পড়ে, সুভাষচন্দ্রের আজীবনের সংকল্প আর শ্লোগানঃ চলো দিল্লী? বিদেশী প্রভুর দেমাক গুঁড়িয়ে দিয়ে অধিকার কর লালকেল্লা। সেই সুভাষ-স্বপ্ন সুভাষচন্দ্রের নিজের জীবনে ফলবতী হয় নি বটে, তবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরাক্রান্ত আক্রমণের পরেই বৃটিশ লালকেল্লা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র হারিয়ে গেলেন বিশ্বযুদ্ধের দামামা আর ডামাডোলের ধূম্রছায়ার অন্তরালে। তবু তাঁর স্বপ্নই সফল হয়েছিল। কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র লালকেল্লায় যেতে চেয়েছিলেন কেবলমাত্র বন্দিনী জননীকে বিদেশীর শোষণ-শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। লালকেল্লার অধিকার নিয়ে ক্ষমতা ভোগ করার বাসনা তাঁর ছিল না। ভারতের মুক্তিই তাঁর লক্ষ্য। নির্লোভ এই মহাত্যাগী দেশপ্রেমিক বহির্বিশ্ব থেকে ভারতের ক্ষমতালিপ্সুদের আশ্বস্ত করে একটি বেতার-ঘোষণায় জানানঃ ক্ষমতার লোভ তাঁর নেই। ভারতকে মুক্ত করতে পারলেই তিনিও মুক্ত পুরুষ। তিনি রাজনীতি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে দ্বিধা করবেন না।

তবু ভারত থেকে তিনি কোনো সহযোগিতা পান নি, বরং উল্টে কেউ কেউ তাঁকে বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হায় কি সন্দেহ!

সেই নেতাজীর নামে প্রদর্শনী আর ঠিক তার প্রবেশ পথটি লালকেল্লার মডেলে সাজিয়ে ধরায় অতীতের ইতিহাস যেন কলকাতার ময়দানে তার সবচেয়ে উজ্জ্বল অথচ ঈর্ষান্বিত, বিমর্ষ এবং বিষন্ন পরিচ্ছেদটিই উন্মুক্ত করে ধরেছে। আর তাই নেতাজী প্রদর্শনীর প্রবেশ দ্বারেই এইভাবে সেদিনের সে ইতিহাসকে হাজির করার জন্য ফরোয়ার্ড ব্লকের সুচিন্তিত পরিকল্পনার পক্ষে সাধুবাদ বর্তমান রচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সোচ্চার হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। আমার মনে হয়, প্রদর্শনীর অর্ধেক কৃতিত্বের দাবিদার ঐ লাল ফটক, যার ঠিক পশ্চিমে যষ্টিধারী গান্ধীজী পিছন ফিরে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর অহিংস পথে।

কানে বাজে, কানে বাজে বন্ধ নেতার বিষণ্ণ উক্তিঃ সুভাষের জয়, আমার পরাজয়।

কনট্রাস্ট। সেই ঐতিহাসিক কনট্রাস্টও ধরা পড়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লককে ধন্যবাদ, একেবারে প্রবেশদ্বারেই ইতিহাসের পাতাকে উল্টে মেলে ধরেছেন তাঁরা। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র আর প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র—নেতাজী প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারেই সেই সব দিনের স্মৃতি আমাকে ভারাক্রান্ত করে প্রদর্শনীর ভিতরে টেনে নিয়ে যায়।

কিন্তু প্রবেশমাত্রেই যা চক্ষু পীড়ার কারণ ঘটায়, তা একটি সুপরিকল্পিত মেলার চেহারা। যে সুরে মন বাঁধা হল সে সুরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। প্রদর্শনীর পরিকল্পনায় এই হোচট-খাওয়ানো ত্রুটি সম্ভবত ফরোয়ার্ড ব্লকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে অন্যতর কারণে। সে কারণ ধরা পড়ে আরও পেছনে গেলে, একেবারে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের কোল বরাবর। ঐখানে এসে বুঝতে পারি, শুধু মেলা নয়, আরও কিছু যেন প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। নেতাজী মণ্ডপ, লেনিন মণ্ডপ, বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের স্মৃতিমণ্ডপ আর স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মারক মণ্ডপে সেই সব বিপ্লবী দুরন্ত ছেলেদের শস্ত্র প্রদর্শনী, যাঁরা একদিন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের দাম্ভিক বুটের আঘাত ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল পিস্তল আর রিভলবারের পাল্টা আঘাত হেনে।

স্বাধীনতাকামী সিরাজ, সংগ্রামী বাঙালী বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিবর্তনের ধারাটি দর্শকমণ্ডলীকে ইতিহাস সচেতন করে তোলে। নেতাজীর মানব প্রেম—দেশপ্রেম এবং বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে মহান মানবদরদী বিপ্লবী লেনিনের কর্মময় জীবনকে স্মরণপথে এনে এ প্রদর্শনী সার্থক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় সেই ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দ? কৈ সেই সর্বত্যাগী দেশবন্ধু? শরৎ বসু, নেতাজীর চলার পথে যিনি নেপথ্যে সাহায্য স্নেহ এবং সহযোগিতা দান করে গেছেন চিরকাল কোথায় সেই শরৎ বসু? নেতাজী মণ্ডপে দেশবন্ধু, শরৎ বসু আছেন, কিন্তু আরও আশায় তাঁদের স্বতন্ত্র মণ্ডপ আমি খুঁজেছি, হতাশ হয়েছি। স্বামীজীকে বাদ দিয়ে যে নেতাজী হয় না, সি আর দাশ ছাড়া সর্বত্যাগী বিপ্লবী বাঙলার রূপচিত্র যে অসমাপ্ত আর শরৎ বসুকে পাশে সরিয়ে রাখলে নেতাজীর নেতাজী হয়ে-ওঠার মস্তবড় একটা দিকই যে বাদ পড়ে যায়। গান্ধীমেলা বসিয়ে রনট্রাস্টের দিকে অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণই কি উপযুক্ত তিন প্রধানের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে? কিন্তু তাও তো নয়। গান্ধী মেলা কোনো কনট্রাস্ট টানার জন্য আয়োজিত হয় নি। গান্ধীজী অভিপ্রেত কুটীর শিল্পোদ্যোগের চেহারাটাই সেখানে মুখ্য। নেতাজী গান্ধীজীর আদর্শগত সংঘাতের ইতিহাসটুকু নেতাজী মণ্ডপেও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসের যে মডেল সেখানে দেখলাম, তাতে গান্ধীজীর দক্ষিণহস্ত যেন সুভাষচন্দ্রকে তাঁর পবিত্র আশীর্বাদে আচ্ছন্ন করছে। নেতাজী মণ্ডপে নেতাজীর পত্রাবলীতে বরং সুভাষচন্দ্রের বেদনা অনেক বেশি মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দর্শক সমাগমের অত্যধিক চাপে জিজ্ঞাসু কি সেই পত্রাবলী পাঠের সুস্থির সুযোগ পাবেন? অথচ সুভাষচন্দ্রের এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন বিবর্তনে কংগ্রেস

থেকে সুভাষ বিতাড়ন অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণ ফরোয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি সে কারণ অমন নমঃ নমঃ করে সারা হল কেন মডেলে চিত্রে। তার জন্যই কি স্বতন্ত্র মণ্ডপের দাবি নেই?

কিন্তু যা বলছিলাম, প্রবেশ করেই মেলার চেহারায় হোঁচট খেয়েছিলাম। প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে খেদ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছিল। কিন্তু এমনটা ঘটল কেন? কেন শুরু থেকেই নেতাজীর স্মৃতিতে ডুবে গিয়ে হাঁটবার সুযোগ পেলাম না, মেলার ঠেলায় হারিয়ে গেলাম?

কারণটা বোধহয় ফরোয়ার্ড ব্লকের নবতম প্লেনারি অধিবেশন। অধিবেশনের স্থানটির কাছেই মণ্ডপগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক ঠিকই করেছেন, তবে সমগ্র প্রদর্শনী সাজাবার পরিকল্পনায় ত্রুটি থেকে গেছে। মেজাজ তৈরি হয় নি ঠিকমত। ফরোয়ার্ড ব্লক রাজনীতি করে। প্রদর্শনী মণ্ডপ পরিকল্পনার (বিশেষ এই উদ্যোগ যেহেতু প্রথম) ত্রুটি থাকতেই পারে; কিন্তু এফ বি-র প্রদর্শনী সাজাবার দায়িত্ব শুনেছি অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল, তবু এই সুর-ছেঁড়া পরিকল্পনা কেন?

অধ্যাপক নির্মল বসু মহাশয়ের কাছে আবেদন, এখনো বেশ কিছু দিন প্রদর্শনী যদি চালু থাকে তবে প্রবেশ পথের ঠিক পরেই আরও তিনটি মণ্ডপ তৈরি হোক। স্বামীজী, দেশবন্ধু এবং শরৎ বসু মণ্ডপ।

নেতাজী প্রদর্শনীর যতটুকু মেলা—বিজ্ঞাপন, দোকান, বাজার, কেনা-কাটা, সেটুকু দর্শক আকর্ষণের একটু দর্শক চিত্ত বিনোদনের বিষয়। আপাতত নেই মূল্য সুর যদি অজানা থাকে। কলকাতা বড় ক্ষুধার্ত। ছোট্ট মেয়ের মতো ইট-কাঠ-পাথরের চাপে শ্বাসরুদ্ধ। তাই সে উৎসব আর মেলা খুঁজে বেড়ায়। কলকাতার সব থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণ বেড়াবার জায়গা নেই। ময়দানে ভিড়ের গন্ডার ধারে বসে উঁচুতে আছে যা মাঝেমাঝে করে। নেতাজী প্রদর্শনীর মধ্যে একটি মুক্তিকামনা মেলা-প্রাঙ্গণ (যতটুকু তার মেলা) বরং কলকাতাকে দুদণ্ডের শান্তি দেয়। যতক্ষণ টিনের প্রাচীরের ভেতরে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত।

প্রদর্শনীতে জানবার বিষয়ও কম নেই জুতো সেলাই থেকে কৃষিবিদ্যা, ইঞ্জিনীয়ারিং, এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়। ইতিহাসের দিকটুকু তো আগেই বলা হয়েছে। দেশের প্রজেক্টও পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে ছোটদের বুড়োদের চাক্ষুষ-শিক্ষা (ভিজুয়াল এডুকেশন) যেমন প্রদর্শনীতে মিলবে, শিশুদের মনের খোরাক এবং আনন্দের যোগান তেমনি এই প্রদর্শনীই অঢেলভাবে সাজিয়ে ধরেছে। কিশোর বাহিনীতে দেখলাম, উৎসাহে এবং উদ্দীপনায় উচ্ছল হয়ে উঠেছে তারা। ঐতিহাসিক মণ্ডপগুলি যেভাবে আকর্ষণ করেছে তাদের, সেইভাবেই এবং তারও থেকে বেশি মজাদার বলেই আকৃষ্ট হয়েছে তারা। ভারতীয় রেলপথ আয়োজিত রেল গাড়ির চলন্ত মডেলগুলির প্রতি। পাম্পের নল থেকে যখন রঙিন জল চৌবাচ্চায় সাবানের ফেনার মতো অজস্র ফেনা বানায়, মায়ের হাত ধরে কিশোর-কিশোরীরা তখন আর নড়তে চায় না সেখান থেকে। অথচ প্রকাণ্ড ময়দানের এক বিরাট অংশ জুড়ে এই প্রদর্শনী। একদিনে দেখা শেষ হয় না। সব জানা মনোমত হয় না। দুপুরে তিনটের পরিবর্তে প্রদর্শনী গেট দুটোয় খুললে হয়ত বহু দর্শকদের সুবিধে হত।

কলকাতার বুকে এ পর্যন্ত যতগুলি ব্যবসায়ী প্রদর্শনী হয়ে গেছে, নেতাজী প্রদর্শনী তার মধ্যে অনন্য। ত্রুটি যেটুকু আছে, সেটুকু সংশোধনের উপায় নেই এমন নয়। এখনো ঢের জমি পড়ে আছে, যেখানে আরও একটি নেতাজী মণ্ডপ তৈরি করে সেই মহান বিপ্লবীর অন্তর্ধান মুহূর্ত থেকে বৃটিশ ভারতের বুকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পতাকা সংস্থাপনা পর্যন্ত ঐতিহাসিক পর্বটি বিস্তারিত করা যায় ছবি মডেল চার্ট ও ম্যাপের সাহায্যে। ভারতের বিভিন্ন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাগুলিরও একটি চিত্রল ইতিহাস উপস্থাপিত করার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে, নেতাজীকে যে ভারতীয় মনোভাব সহ্য করতে পারে নি, সেই পঙ্গু মনোভাবকে তুলে ধরার।

কলকাতায় এমন দু-চারটি প্রদর্শনীর প্রয়োজন আছে। নেতাজী প্রদর্শনী সেই প্রয়োজনকেই সর্ব প্রথম মনে পড়িয়ে দিল।

[illegible] পার্কের রোগশয্যাপার্শ্বে সুভাষচন্দ্র

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রোজ দু'বেলা নতুন খেলা। এ যেন চেনার দেশে সবাই অচিন সেজেছে। এ আজগুবি চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। যা হচ্ছে তা' 'টকি'। এ কার হেকমতি জানি না, কিন্তু এখন সেই গান, নদী হইল, কানাই, হুলাস্থুল রে। ঝোড়ো হাওয়ায় দুলছে মাস্তুলহীন খোল। চাবুক হাঁকছে শক্ত আকাশ। রী রী করে ফুঁসছে মেঘ। আর বন্ বন্ বন্ করে ঘুরছে চরকিপাকের এক আজব নাগরদোলা।

অদৃশ্য থেকে যেন বাজছে এক বিশাল দামামা। যে যেখানে ছিল, সে সেখানে আর থাকছে না। সেখান থেকে ছিটকে পড়ছে। স্থির কিছুই নেই। যা' স্থির তাকে চূর্ণ করো। কখন কে যে বিদ্ধ হবে, কেউ জানে না। সবাই বলছে, চিনে নাও। কে কি র'ম মাল চিনে নাও। জয়পাল চিনে নিচ্ছে গোবিন্দ বাউরীকে। গোবিন্দ বাউরীই বা পিছিয়ে থাকে কেন? সে বলছে, আম্মো বা কমটা কিসে? তোমার হাতে ট্যাকা আছে বেস্তর, আমার হাতেও আছে কেস্তে হে, আম্মো তোমায় ছাড়বো না। জীবন মাইতি চিনে নিচ্ছে জম্মো-হাঘরে কেলে বান্দীকে। কেলে বান্দী চিনে নিচ্ছে জীবন মাইতিকে। স্টুডেন্ট চিনে নিচ্ছে চাষীকে। চাষী চিনে নিচ্ছে স্টুডেন্টকে। এ কার হেকমতি জানি না। অদ্ভুত এক চেনা-চেনির হাওয়া বইছে। আর তাতেই চেনা মানুষ হয়ে যাচ্ছে অচেনা। বন্ বন্ করে ঘুরছে চরকিপাকের নাগরদোলা। এখন সেই গান, নদী রইল, কানাই, হুলাস্থুল রে......

কে যে কোন তালে আছে, কে কার শুকনো ঘাড়ে কোপ মারছে, বোঝা দায়। ডাংডায় নিচে মুখ লুকোলেও রেহাই নেই। ঠিক সনাক্ত করে ফেলছে দাগী আসামী। তারপর পড়ছে ডাণ্ডা। গায়ের লাল আংরাখা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দিচ্ছে। তেমাথার মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে সকলের 'ছামুতে' একবারে উদোম, ল্যাংটো করে দিচ্ছে, শালো, এতোদিন চেনা দাও নি, এবরে সবাই দেকুক তুমি কি মাল!

বড় বড় কথা বলে, ভেল্কিবাজী দেখিয়ে, বুকনি কপচিয়ে, পত পত করে পান চিবিয়ে, জামার বাঁ পকেটে ফুল-কোঁচা গুঁজতে গুঁজতে 'মার্কস বলেছেন...' বলে বিপ্লবের চোঁয়াঢেঁকুর তুল্লেও আর রেহাই নেই, একটু ইদিক ওদিক করলেই, 'মার শালোকে কোঁৎকা', সত্যিই হয়তো কোঁৎকা আরম্ভ হয় নি কিন্তু হল বলে, পালাবার কোন পথ নেই, হয় ছাড়ো বুকনি বচনবাগীশ, না হয় ধরো কাস্তে শক্ত হাতে, উপায় নেই মাঝপথে-থাকা উদাস হে, বেছে নাও পথ, কোনদিকে যাবে তুমি, চিনে নাও কাঁচ আর কাঞ্চন, হো— ঐ দ্যাখো, কারা যায়, শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে নিশান টাঙিয়ে! যা হচ্ছে তা 'টকি'। এ সেই গপ্প, আমি একটা কথা শুনে আলাম তিরপুনীর ঘাটে হে, একটা ছেলে জম্মো নিলো তিন পোয়াতির পেটে হে!

আমি পণ্ডিত নই। পড়াশুনো জানি না। ইতিহাস আর জনগণ সম্বন্ধে আমার খুব খারাপ ধারণা। কিন্তু চোখ মেলে যা' দেখছি তার বুঝি তুলনা নেই। এ যদি রঙীন নেশা হয় হোক, হোক দু'দিনের মরীচিকা, তবু আমিও আর থামবো না। কেননা থামতে চাইলেও থামা চলে না। কোথাও একটা অদৃশ্য দামামা বেজে চলেছে নিরন্তর। রক্ত, আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ক্ষিপ্র খুশির হাওয়া লেগেছে আমার চোখে-মুখে। আমার অজান্তেই আমার পা নাচতে আরম্ভ করেছে, মন তো বোঝে না রে, চিক্কণ কালার বাঁশীর স্বরে জিউ নাই মানে, বংশী হায় হায় রা, মন তো মানে না রে!

এই ভয় ওঠে মনে এই ভয়, বুঝি চোখে হারাই। ছুটে ছুটে যাই। কি হচ্ছে হে ওখানে? ওখানের কথা আর বইলবেন না। সে ময়দানবের কাণ্ড। বাপের কালে শুনি নাই। ছুট ছুট। গেলাম দেখতে। ততোক্ষণে এখানেও আমার অনু-পস্থিতিতে আর এক কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। এখানকার লোক তক্ষণে বলতে আরম্ভ করেছে, ওখানের কথা আর বইলবেন না। সে এক আজব কাণ্ড মশাই। চক্ষে না দেইখলে পেত্যয় যাবেন না গো। আমি কোনটা রাখি, কোনটা ধরি!

লেগে যাচ্ছে। সকলের সঙ্গে সকলের। এরা যে সবাই সবাইয়ের শত্রু তা' নয়। কিন্তু লেগে যাচ্ছে। কি যে এক ঢ্যাম কুড় কুড় বাদ্যি বেজেছে......

যে সব স্টুডেন্টদের বড় সাধ চাষী-দের মাঝে কাজ করবে, তাদের মাঝখানে গেলেই, দু'-চার মিনিট পর শুনতে হবে, এ এক অদ্ভুত জাত। খালি তালে ঘুরছে। কোথায় একটুকরো জমি, কোথায় এক-টুকরো জমি। তার সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরছে। কোন কাজ করতে দেবে না। এই সন্ধ্যের দিকে আসবেন আমাদের অফিসে। দেখবেন, জমি পাবার জন্যে নাম লেখানোর কি হিড়িক! জমি পেয়েও স্বস্তি নেই। বলবে এখন পেয়ে আমার এমন কি লাভ হল! গরু ছেল গরু গেল। জমি ছেল জমি গেল। লাঙল ছেল, লাঙল গেল। ঘটি-বাটি ছেল, ঘটি-বাটি গেল। এখন পেলাম জমি। তাও এক বিঘে কি দু' বিঘে। এতে তিন মাসের খোরাকিও হয় না। ত' ঘটি-বাটি, গরু

# যে মুখখানির দিকে সবাই তাকিয়ে আছে তিনিই বলবেন

## কারণটা ঃ

# হেজ্‌লীন স্নো

হেজ্‌লীন স্নো-র মোলায়েম হাল্কা পরশ সেরা বিভার্ট ক্রীমেরই মতন। আপনার মুখখানিকে দিব্যি সুন্দর নিটোল লাবণ্যে ভ'রে দেয়। অপরূপ তরুণ কোমল কান্তিতে আপনার মুখখানি নির্মল হয়ে ওঠে। ছোটোখাটো দাগ অতি স্বচ্ছন্দে ঢাকা পড়ে যায়···আপনার মুখে ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আভা।

আজই আপনার হেজ্‌লীন স্নো-র সঙ্গে পরিচয় হোক···দিনের পর দিন সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে ফুলের মত সহজ সুন্দর ক'রে তুলবে :

**হেজ্‌লীন স্নো-তরুণের স্বপ্নমাখানো স্বাভাবিক কান্তির উৎস**

লাঙল ফিরবে। যে বেশি জমির লোভ দেখাবে তার পেছু পেছু ছুটবে। কিন্তু একটু রাজনীতির কথা বলুন। তিন হাত দূর দিয়ে যাবে। বলুন, অমুক কারখানায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে। তোমাদের তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিতান্ত যাদের সঙ্গে আমাদের নিত্য দেখাশুনো, শুধু সেই ক'টা চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুড়ি চিবুতে চিবুতে হাজির হবে। চলার ভঙ্গি গরুর গাড়ির সেই মান্ধাতা আমলের ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলা, একটু স্মার্টনেস নেই, মিলিটারী মিলিটারী ভাব নেই, এ যেন যাত্রা দেখতে যাচ্ছে দল বেঁধে কিংবা যাচ্ছে কোন মেলায়, এলোমেলো পা, এদিক-ওদিক চাউনি, গায়ে চাদর জড়ানো কিম্ভুত কিমাকার এক একটা জড়পিন্ড, এদের নিয়ে কখনো বিপ্লব হয়!

স্টুডেন্টরা চাইছে 'বিপ্লব', ওরা নাকি চাইছে 'জমি', তাই মেজাজ খারাপ স্টুডেন্টদের। এতো মানুষ আমাদের পক্ষে তবু বিপ্লব হচ্ছে না কেন? স্টুডেন্টরা চারি চিন্তিত।

চাষীরা আবার এই সব স্টুডেন্টদের সম্বন্ধে কি বলে শুনুন। ওরা সব প্যান্টালুন পরে। চাষী উদ্ধার করতে এসেছেন। ধান গাছ চেনেন না। দেখা হলে আর উপায় নেই। খালি খাওয়াও। বিড়ি, বিড়িই সই। তাই মশাই উড়িয়ে দেবে এক বান্ডিল। চা, চাই সই। সেই চাই খাবে দশ-বারো কাপ। 'না' করলে বলবে, তুমি কি র'ম কমরেড হে। কমরেড খেতে চাইছে, খাওয়াচ্ছো না। দুটো পয়সা বার করতে মরে যাচ্ছো, এখখুনি তো কলার একটা কাঁদি সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে হাটে যাবে, দশ বারো টাকা লাভ করবে, তোমরাও কম শয়তান নও। এক টাকার চাঁদার বিল ধরিয়ে দিয়ে বলবে, সব ক'টা বিল ভর্তি করে আনবে তাড়াতাড়ি। এক টাকার বিল পল্লী গেরামে কে নেবে মশাই? দশ, পনেরো পয়সা হয়তো নিতে পারে। এমন জ্ঞান দেশের মানুষের সম্বন্ধে। বলে জমি দখলের সময় লোক জোটে, পার্টির মিটিং দু'দশ মাইলের মধ্যে হলে লোক জোটে না। জুটবে কি করে? আমাদের পেটে কি ভাত থাকে যে গায়ে জোর পাবো? এক মাইল হাঁটতে গেলে ত' ঝিমুই। অতো হাঁটবে কে ট্যাঙস ট্যাঙস করে? তাই বলি ট্রেনে করে যাই। বেশি লোকজন উঠলে ট্রেনে ত' পয়সা লাগে না। ট্রেন ত' ফ্রি। তারপর স্টেশন থেকে না হয় হেঁটে যাবো। তা হলে ত' নেতাগিরি হয় না। দেখানো চাই তো, কেমন হাজার হাজার লোক নিয়ে চারদিকে সোর তুলতে তুলতে নিয়ে যাচ্ছে! একটা মাঠে ক'টা চৌবাচ্চা লাগে তাই জানে না, চাষীর হয়ে কাজ করতে এসেছে!

সমিতির অপিসে যেতে হয় যাই, হাঁটুর বয়েসী ছেলে মুখের সামনে ভক্ ভক্ বিড়ি টানবে তা'ও আমাদের পয়সায়, এ সব কি সহ্য হয়! ধুতির সঙ্গে প্যান্টালুন কি মেলে?

ধুতির সঙ্গে প্যান্টালুন মেলে না, তাই লেগে যাচ্ছে। লেগে যাচ্ছে নাগাড়ে কিষেণ গোবিন্দ বাউরীর সঙ্গে মধ্যম চাষী কার্তিক রায়ের। আমি টেপ রেকর্ড করিয়ে রেখেছি। এই চালিয়ে দিলাম। গলাটা শুনতে পাচ্ছেন? কি বললেন? শুনতে পাচ্ছেন। ভালো করে শুনুন। মশাই, জমি টো এখন বোঝা হয়ে দাঁইড়েছে। দশ বিঘে যার ছেল দশ পনেরো বছর আগে এখন তার অন্দাঅন্দি—মানে কথা পাঁচ বিঘে তে গিয়ে দাঁইড়েছে। আমাদের কি জানেন? এ হয়েছে অনেকটা বাজী ফেলা। রেস খেলেন? ঘোড়া? এ-ও অনেকটা তাই, এই চাষবাস। আলু বসালাম ভালো খরচপাতি করে, গত বছর আলুর ভালো দর ছেল। আলুতে লাভ হোল নি। দেখি পাটে। যা নিয়ে পাট বসালাম। পাটে লাভ হোল নি। দেখি ধানে। ধানেতে লাভ হোল নি যখন, তখন মাথায় হাত। এই ত' অবস্থা। এর মন্দে কিষেণদের মানে গোবিন্দ বাউরীদের তপ্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তোরা আর অল্প রেটে মজুরী খাটবি নে। তোদের পাওনাগন্ডা তোরা বুঝে নে। সরকার তোদের পেছনে। বুঝুন। তা' বুঝে নিক ওদের পাওনাগন্ডা তা' বলে আমাদের মত গরীব মেরে? আমাদের মেরে কিষেণ বাঁচবে? না আমরা বাঁচলে কিষেণ বাঁচবে? কোন কথাটা ঠিক? ভাদ্দর মাসে ঝড় হল। কলাবাগান শুইয়ে দিয়ে গেল। খোল খাইয়ে সাত কাঠা বেগুন তোয়ের করলাম। সে বেগুন পোকায় মেরে দিলে। কুয়াশা ধরে আমের বোল নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের কোথায় সুখ বলতে পারেন? আর আমার এই নাগাড়ে কিষেণটিকে দেখুন। গলায় লাল ন্যাকড়াটি ঠিক আঁটা আছে। এবার সখ করে লাল জামা কইরেছে। কালো চেহারায় যা' চেকনাই খুলেছে যে, সে আর কহতব্য নয়।

খালি ঘুরছে এ-গাঁ ও-গাঁ ব্রণ-পায়ে। শুধোলে বলবে, মিটিন ছেল। খালি মিটিন, চোপর দিন মিটিন, হ্যাঁ রা? এ কথা শুনে তেরিমেরি হয়ে মারতে আসবে, হ্যাঁ গা দেশ বড়ো না তোমার জমি বড়ো! গরীবকে আর দাবানো যাবে না বুঝলে? কাল থেকে আমার বৌ আর তোমার বাড়ি গোয়াল কাড়তে যাবে ন। মাসে চার টাকায় পোষায়? শুধু গোয়াল কাড়াই নয়, বাসি কাপড় পর্যন্ত কাচিয়ে নাও তা' কি জানি না? একটা কিছু বললেই চোখ রাঙায়, বলে লোক জড়ো করে ফেলবো! ইদিকে নিজের সংসার ত' জম্মো-হাঘরের সংসার। না আছে ঝাঁটপাট, না একটু গোবর ছড়া। নিজের সংসারটি আছে লুটপাটের ওপর। আজ এর দশ বিঘের ধান কেটে নিচ্ছে, কাল এর তিন বিঘের ধান কেটে নিচ্ছে; সবি নাকি পার্টির নামে। কোথায় যাবো বলুন ত'!

এ ত' গেল কার্তিক রায়ের কথা। অন্য দিকেরও একটা কথা আছে। গলায় লাল ন্যাকড়া আঁটা গোবিন্দ বাউরীর কথকতাটাই বা বাদ যায় কেন?

কিষেণ না বাঁচলে কেউ কি বাঁচবে? কেউ বাঁচবে না। আমি যদি মরে যাই না খেতে পেয়ে কাত্তিক রায় কি বেঁচে থাকবে ভবভবিয়ে? আমাদিগে খাটাচ্ছে, সেই আমরাই যদি মরে হেজে যাই, তা'লে কাত্তিকের কোঠা উঠবে? ইদিকে ত' কোঠাবাড়ির স্বপন। খালি শুইনে শুইনে বইলবে, জানিস গোবিন্দ, একটা কোঠাবাড়ি না তুলে আমি মরচি না, ওই বাবুদের পারা, অতো বড়ো না হোক, অতো পয়সা কোথায় বাপ, কিন্তু মেটে ঘরে আর পারি না বাপু! বাঁধটার নামোতে, তলায় ফাঁকা আছে কাঠা দশ জমি ব্যানা বন হয়ে, তার উপরে পুব সাইটে সেই বাঁধটো পোকুর পাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে। সেটা চাড়ালে পরে আরো বিঘে দেড়েক বেইরে আসে খাসের জমি। এই জমি কাত্তিক রায় আমাদিগে দখল নিতে দিচ্ছে না। রেট বাড়াবে না কিছুতে। আমরাও ঠিক করেছি, ওর জমিতে আর যাবো না। ও যে কতো কম্মের নোক তা' ত' জানি। কাজের ধারা দেইক্‌লে শেয়ালেও হাসবে মশাই। সব ঝোঁকের মাথায়। ঝোঁকের মাথায় নাঙল চষলো খানিক। ও বড়নোক, পারবে কেনে আমাদের মত! এক ঘন্টা যায় নি তাতেই হেঁপে অস্থির, চক্ষু অন্তবন্ন, পায়ে ভূঁইকম্প। বাড়ি চলে গেল। ন'টা দশটার সময় আমার 'জলপান' নে গেল মাঠে। ভীষণ সংসারী। ঐটুকু সময় জমিকে কেন জিরেন দেয়? বলে, এই নে তিন আঁজলা মুড়ি। খা বসে বসে বাপ। আমি একটু তাড়াই।

এসবও ঝোঁকের মাতায়। ঐ দশ পনেরো মিনিট। তার পর চলে গেল বাগানে। একটা দু'টো কলাগাছ নে এলো। বসে বসে গরুর 'খোরাক' করতে নাগলো। এই ত' ক্ষ্যামতা! আমরা না চইষ্‌লে ও কোথায় যায়। আবার হুমকী ছাড়ছে, বিদেশী কিষক আনবো। দেখি তেরের কতো বাড়। এতো দেকেও বুইঝ্‌তে শেকেনি বাড়টা আমাদের ক্যানে। বলে, খালি অশান্তি খালি

অশান্তি। আমরা বলি, তোমাদের অশান্তি, কিন্তুক আমাদের খুব শান্তি। আমরা আগের থেকে ভালো আছি। সকলের শান্তি, সকলের ভালো কি এক সঙ্গে হয়, কোতাও হয়েছে? যেদিন তোমাদের শান্তি ছেল সেদিন আমাদেরও কি শান্তি ছেল? তা' বাদে, অশান্তি ত' এই আরম্ভ, বুঝলে! এক বিঘে জমিতে কি কারো পোষায়? এক এক বিঘে করে জমি পেয়েছি। নিজের একটা ঘর পেয়েছি। কিন্তু এতেই তোমাদের অশান্তি। কিন্তুক চেরটা কাল ত' এটা থাকবে না। এক বিঘে জমিতে কি আমাদের সংসার চলে? কেরমে কেরমে আমরা এক বিঘে থেকে দশ বিঘেতে চলে যাবো না? দশ বিঘে থেকে দু'শো বিঘে? দু'শো বিঘে থেকে গোটা দেশটা? এই অশান্তিতেই মাতায় হাত! সেদিন তো হাজার গুণ অশান্তি বাড়বে, সেদিন কি পাছার কাপড় খুইলে ধেই ধেই করে নেত্য কইরবে? তোমাদের অশান্তিতে আমাদের খুব শান্তি, বুইঝলে'

তরজা কেমন জমেছে? বল হরি হরি বল হে! 'মার্কস' যতোদিন কেতাবে ছিলেন ততোদিন জমে নি। এই সদ্য 'মার্কস' মাটিতে পা ঠেকিয়েছেন কেতাব পেছনে ফেলে, অমনি ধাক্কাধাক্কি, অমনি ষাঁড়াষাঁড়ির বান, জোর তুফান, পরান যায় যায়! আহা তরজা বেশ জমেছে!

জীবন মাইতি বলছে, ওরে, নৌকো বুঝি এবার ডোবে। ওরে কাকে কান্ডারী হল, শকুন হল ভান্ডারী। নৌকো এবার বুঝি ডোবে। কিন্তু কেলে বাগ্দী বলছে, 'লা'খানি ডুইববে ক্যানে? এক বাদাম ছিল 'লা'য়ে এখন জোর বাদাম। উজান ধরে 'লা'খানি এখন মারমার করে একদিনের পথ এক ঘন্টায় যায় গ। হো—ঐ দ্যাখো, নিশান টাঙিয়ে 'লা'খানি এখন মাঝদরিয়ায় যায়। 'লা' ডুইববে ক্যানে?

লেগে গেছে। এই কেলের সঙ্গে লেগেছে জীবন মাইতির। দুদিন আগেও এ ভাবা যেত না। একই ঝান্ডার তলায় দু'জন এই সেদিনো ছিলো। আজ ফারাক হয়ে গেছে।

দু'দিন আগেও জীবন মাইতি একদিন গর্ব করে বলেছিলেন, গ্রামে এসেছেন। কেলে-কে দেখে যান। কেলে আমারই হাতে তৈরি।

আজ ও'র সঙ্গে দেখা হলে উনি বললেন, আমি যত্ন করে ময়না পুষলাম। সে শেষকালে হল গিয়ে ভুতোম প্যাঁচা। এই ছিল কপালে! কেলে বাগ্দীকে জিগ্যেস করলাম, কি ব্যাপার ভাই?

কেলে বললে, জীবনদাদা আর ছুটতে পারছে না। মসলা ফুরিয়ে গেছে মশাই। এখন খালি হুতোশ। আমার কি দোষ? কোন রসিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে। চিত্ত আর 'সমুদ' মানছে না। এ কার আড়নয়নের চাউনি হে পরাণ ধরিয়া টানে। আমি কি করি?

কেলে দু' হাঁটুতে চাপড় মেরে হা-হা করে হাসলো। পাশের বাঁশবনে শুকনো পাতা সে হাসি শুনে ঝরে পড়লো।

অদ্ভুত প্রাণ শক্তিতে ভরা এক দুরন্ত যৌবন, কেলে বাগ্দী নয় যেন মুকুন্দরামের সেই কালকেতু, দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু! আমি অবাক হয়ে ওর কথা, ওর প্রচন্ড হাসি শুনছিলাম।

বইলতে পারেন সে কোন ঘোরযুবতী যার রসে মাখা তনুখানি দেখে আমার 'যৈবন' মিছে পাগল?

বললাম, তেমার 'যৈবন' ত' মিছে পাগল। এদিকে সব যে ভেসে যায়। এ কথা শুনে আমার কালকেতু আমাকে ধর্মকথা শোনালে।

হ্যাঁ—ধর্মকথা, বাগ্দীর ছেলে বলছে।

সুধা এমনিতে কি মেলে বলুন? মন্থনের কালে দেবাসুরে মিলে কত কান্ড কইরলে, কত কষ্ট কইরলে, তবে না সুধা উঠে ছেল? বটে কি না? কিন্তু সেদিন বিষ কি ওঠে নাই? বলুন, চুপ করে রইলেন ক্যানে? সুধা এমনি মেলে? কতায় বলে, সুধা-বিষ, ওরা গায়ে গায়ে জড়ানো।

কিন্তু জীবন মাইতি—

জীবন দাদা সত্যিই একদিন এ গাঁয়ের রাজা ছেল। দেখেছেন ত' রাজার মত চেহারাখানি। সাদা গায়ে যখন ধবধবে পাঞ্জাবী পরেন, তখন কোনটা যে বেশি ফরসা, গাখানি, না পাঞ্জাবীখানি, ভেরমো খেতে হয় ঠাহর করতে। তার উপরি একখানি শাল চাপালে শালা সাক্ষাৎ নটবর। আর তেমনি কাজের মানুষ, বাপ্পোরে বাপো, তেভাগা চোখে দেখি নাই, গপ্প শুনেচি, সে এক আজব গপ্প, আমার মা বলে, ঘুরঘুট্টি নিশুতি রাত, রান্নাঘরের পাশ থেকে অতো রেতে কে ডাকে, পুরুষের গলা, বৌদি, অ-বৌদি, আমি ত' ডরাই, একে পুরুষ, তাতে মাঝরাত, তোর বাপ গেছে ভিন গাঁয়ে, ত্যাখনো ফেরে নাই, ফের ডাক উঠলো, বৌদি, বৌদি, সাহসে বুক বেঁধে কেস্তে হাতে চেঁচে কমু, ক্যা রে ড্যাকরা, সামনে আয়, যদি থাকে বুকের পাটা! তখন জীবন দাদা বললে, আমি গ আমি। মা বললে, কে জীবন, কি ব্যাপার? ভিতরি আয়।

না গ ভিতরি যাবো না। চারদিকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। আমার রিভলবারটা তুমি রাখো। মাটিতে চাপা দিয়ে রাখবে। আর চাট্টি ভাত দাও। থালা আনতে হবে না। হাতের আঁজলায় ফেলে দাও। আজ দু'দিন খ ই নি।

এমনি কতো কতো গপ্প জীবন দাদাকে নিয়ে। জীবন দাদাকে নে আমাদের কতো গর্ব, আমাদের লীডারখানি কম নাকি! কিন্তু এই নতুন তেভাগাতেই দাদা আমার পিছে পড়ে গেল! পারলে না!

আমি তাকালাম কেলে বাগ্দীর দিকে। কেলের চোখে জল। দাদাই আমাকে পার্টিকে এনেচে। ন' ক্লাস পর্যন্ত পড়েচি মশাই। আমাকে তাড়াবার জন্যে এই মুকুন্দোবাবু, গাংগুলীবাবুদের কতো যতন, কতো চেষ্টা! ওরাই ত' সব কমিটির মেম্বর। ইদিকে লোক দেখানে দয়া দাক্ষিণ্য খুব। বাবুদের নাচ দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াই ছেঁড়া তেনা পরে। বাবুদের দয়ার শরীর। কেউ দেয় পরনের প্যান্ট। কেউ দেয় জামা। কেউ চাদরখানি কিনে দেন। কেউ বই কেনার পয়সা দেন। আর গিন্নীমারা বলে, বাপ, একটু গরুর খোরাকটো করে দিয়ে যা। দুটো কলাগাছ কেটে আনতো বাপ। বাপ আমার, পুজোর বাসন ক'টা মেজে দে। আর হাঁ, ও বেলা এখানে খাবি, বুঝলি? কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতাম না, এদিকে দয়া দাক্ষিণ্য অবশ্য মাগনায় নয়, আবার উ দিকে আমাকে সহ্য করতে পারছে না। আমার অপরাধ আমি ক্লাসে ফার্স্ট হই। ভালো বাঁশী বাজাতে পারি। স্পোর্টে ফার্স্ট হই। সাঁতারে, সাইকেলে, ছোটায় কেউ আমার সঙ্গে পারে না।

বামুনরা মুখে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু মুখ দেইক্লে বোঝা যায় যেন বলচে শালা ছোটোলোকের ছেলে, বাগ্দীর বেটো আমাদের এ'টো খেয়ে মানুষ, সে কি না সবেতে ফাস্ট আর আমাদিগের নন্দদুলালেরা বাড়িতে দুটো দুটো করে টিচার রেখেচি তাতেও ধ্যাড়াচ্ছে! বামুন-কায়েত পিছে পড়ে রইলো আর বাগ্দীটা গেল এগুগে। চন্দ, সুয্য ঠিক ঠিক উঠচে ত'! ভাবখানা এই।

ইদিকে এক কাণ্ড ঘটলো। আমাকে জীবন দাদা একদিন ডাক দিলো। বলল দেবতা আর অসুরে লড়াই লেগেছে। তোর এই ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা নিয়ে, এতো গুণ নিয়ে তুই কোন দিকে যাবি? মানুষের মরণ একবার হয় কিন্তু জন্ম বার বার।

অদ্ভুত সব কথা, কথাগুলো তখন বুইঝতাম না। কিন্তু মনে যেন গেঁথে গেল। মানুষের মরণ হয় একবার কিন্তু জম্মো বার বার। কি অদ্ভুত কথাখানি। তাই তো গাছতলায় বসে কখনো গালে হাত দিয়ে ভাবি, কখনো চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে, তাই তো গ, এ তো জীবন দাদা ঠিক বইলছে, যে আমি আগে ছিলাম সে আমি এখন আছি কি? নেই, বেবাক নেই। হঠাৎ মশাই নিজেকে যেন বুইঝতে পারলাম। বুইঝলাম আমার মধ্যেও আছে পাথর। চকমকি ঠুকলে ঠিক আগুন বেরুবে। বললে পেতায় যাবেন না গ, আমি জীবন দাদার সঙ্গে কলকাতার মিটিনে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলাম। আমার ত' কিছুই নাই, পুঁজিদারের জানের ভয়। মানের ভয়। আমি পুঁজিদার নই। আমার কোন ভয় নাই। জানের ভয় নাই। মানের ভয় নাই। আমি নিপ্পুঁজির দলে।

দেকুন এসব বলা এক কথা কিন্তু করা আর এক। মিটিন থেকে ফিরে এসেচি দুদিন হঠাৎ গাংগুলীবাবু বটগাছের তলায় আমাকে ধরলে, হাঁরা, পরশু কোতায় গেছিলি, ট্রেনে দেকলাম!

ভয় পেয়ে গেলাম। কি অদ্ভুত এই ভয় জিনিসটা। [illegible] যে খুব ভয়ের বস্তু তা' জানতাম না। কিন্তু এখন কুকুরের মত গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। ঢোক গিলে আমতা আমতা করে রইলাম, এমনি এই একটু ওতোর-পাড়ায়, ঐ নন্দ ঘরামি বললে যা কেনে, তাই—

চুপো। মারবো মুখে তিন জুতো। ছোটোলোক। নন্দ ঘরামি বললে যা কেনে? লজ্জা করে না বামুনের সামনে মিছে বলতে? জানিস আমি শাপ দিলে তোর কি গতি হবে?

ঘোড়ার ডিম হবে। পরশুর মিটিনের 'গরম' ছেল গায়ে। তা'ছাড়া শালা, টালা আমাকে কেউ করে না কখনো। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। চেঁচে বললাম, মিটিনে গেছলাম গ জীবন দাদার সঙ্গে!

নিজের মুখে বললি হাঁরা, বলতে পারলি? চোখ দিয়ে যেন বামুনের আগুন ঠিকরে বেরু হল। এখন মনে কইরলে হাসি পায়। আর দাঁড়ালো না গাংগুলীবাবু। শন্ শন্ করে চলে গেল। তার পরের দিন গেচি মুকুজ্জে বাড়িতে। পুজোর বাসন মাজার কথা ছেল। বললাম কই গ মা, বাসন ক'খানা দেন।

মা বেইরে এলেন। মুখ যেন তোলা হাঁড়ি। গম্ভীর হয়ে বললেন, বাবুর বারণ তোকে দিতে।

ক্যানে?

তা' জানি না।

অ।

পেটে খিদে চনমন করছে। কাল রেতে ভাত জোটে নি। দু'খানা মাইলোর রুটি আর একটু চা খেয়েচি। এখন পেট খোঁচাচ্ছে। ভেবেছিনু, কাজটা করে মুকুজ্জে বাড়িতে পাত পাড়বো, তা' আর হোল নি।

ছুটে ছুটে গেলাম ভট্টাচায বাড়ি। ভট্টচায গিন্নীর দয়ার শরীর। এর আগে যাখনই গেচি ত্যাখনই কিছু না দিয়ে ফেরান নি। পুজোয় ফি-বার একখানা করে চাদর দেন। ওতেই আমার শীত নিবারণ চলে। গিয়ে দাঁড়ালাম ছামুতে, জননী গ, পেসাদ দেন।

না বাপু। কত্তার বারুন। তুই নাকি ভগমান মানিস না?

ভগবান মানি না? অদ্ভুত ব্যাপার। এ আবার কি অভিযোগরে বাবা। বললাম, সে কি মা! সেদিনে ত' গম্ভীরা গেয়েচি।

জল বন্দ, স্থল বন্দ, আদ্যের গম্ভীরা বন্দ। ডাহিনে ডংগর বন্দ বামে বীর হনুমান। সিংহাসনে ভগবতী আছেন, তাঁর চরণে আমার প্রণাম।

বলে সুর করে গেয়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে কপালে দু'হাত ঠেকালাম। চোখ দিয়ে টস টস করে জল ঝরতে লাগলো। বিনা কারণে এরা আমাকে তিরিস্কার করবে? আর এতদিন ধরে এনাদের খাটা! ভগমান যদি থাকে তবে সে এতো একচোখো ক্যানে?

তুই অভিমানী। কিন্তু করি কি বল। কত্তার বারুন।

বুঝলাম সেই মিটিনে যাওয়াই আমার কাল। ওরা কেউই, ঐ মুকুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে, ভট্টাচায, গাঙ্গুলীবাবুরা, কেউ চায় নি আমি জীবন দাদার দলে ঘুরি। বুঝলাম, ওরা আর আমাকে কাজ দেবে না। ধান দেবে না। আমার বাপকে চষাখোঁড়ার জমি দেবে না। কাজ থেকে ছাইড়ে দেবে। পেয়াদা দিয়ে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করবে। কোর্টে নালিশ জারি করবে। ভয়ে আমি সিঁটিয়ে গেলাম। ছুটে গেলাম জীবন দাদার কাছে। জীবন দাদা সব শুনে বললেন, ঘাবড়াস না। তুই এখন থেকে যা হয় চাট্টি আমার বাড়িতে খাবি। ওরা ভদ্দরলোকেরা যেমন জোট বেঁধেচে, তোরাও তেমনি জোট বাঁধ না। একা ত' তোর বাপকে ওরা জমি ছাড়া করবে না। এর মধ্যে কতো লোককে ওরা জমি ছাড়া করেচে। সব এক হ। আমি আচি তোদের সঙ্গে। আমার পার্টি আছে।

বিশ্বাস করবেন না ঐ মুকুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জেরা কত নিচ! আমার পাড়াটাও ওদের আর সহ্য হোল নি। একটা মেয়ের সঙ্গে আমার নাম জইড়ে আমাকে ইস্কুল থেকে বের করে দিলে। তখন আমি জাগলাম—বলে কেলে বাগ্দী আমার দিকে ফিরে তাকালো। সে তাকানোর ভঙ্গী খুব পরিষ্কার। দুটো চোখ নয় যেন দুটো কালকেউটে চক্র ধরে স্থির হয়ে আছে।

সে এক ভীষণ জাগরণ মশাই। হাঁ—তারপর থেকে আর ঘুম হোলো নি। এক দিকে জোট বাঁধি। অন্যদিকে জীবন দাদাকে ধরি। বলি, বুঝিয়ে দাও। বুঝতে পারছি না।

জীবন দাদা অদ্ভুত। জীবন দাদা বললে, আমি কি তোকে শেকাবো রে। তুই ত' আমাকে শেকাবি। তুই মাটির কাছের মানুষ। মাটির কাছে যা পাবি মাটিই তোকে শেকাবে।

সত্যি। এ একেবারে সাচা কতা। মাটি আমাকে ক্রেমে ক্রেমে সব একটু একটু করে শিক্যে চে। কিন্তু রগড় দেকুন।

কি রগড়?

রগড় নয়? অতো বড়ো নেতা, আমরা দেশপতি বলে খাতির করি, এ কি যে সে লীডার আমাদের, বার বার জেলে গেচে, পুলিশের লাঠি খেয়েচে, সব সময় গরীবের সাথে সাথে আচে, তবু দেকুন শেষ পর্যন্ত জীবন দাদা পিছিয়ে গেল, অনেকটা পথ এগিয়েও পিছিয়ে গেল, আমায় একদিন ত' বোঝালে এই মাটি।

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বেশ কিছুদিন [illegible] দেখছিলুম জীবন দাদা ঠিক আগেকার মত [illegible] ভাব করে না। কিছু যেন লুকোতে চায়। আমরা ত' সবাই জানি জীবন দাদাই নেতা। সব ব্যাপারে জীবন দাদাই আগে। কিন্তু আমরা কি কিছু নই? মিটিং হবে। কে বলবে? জীবন দাদা? নিশ্চয়। তা' ছাড়া আরো ত' কেউ কেউ। অনেকে আমাকে চায়। আমি যেই বললাম, আমি কিছু বলি জীবন দাদা। তো জীবন দাদা বললে, ধুর, তুই কি বলবি? তুই জানিস কি? না বলতে দিক আমাকে। লীডার যা ভালো বোঝে বুঝুক। কিন্তু আমাকে অযথা খোঁচানো কেন? এ ভাবটো আগে কখনো দেকি নি। এ সব্বি নতুন নতুন। জে এল আর ও অপিসে গেনু। আমি হয়তো আগ বাইড়ে কিছু বলতে গেলাম। জীবন দাদা ভুরু কুঁচকে কইলবে, লীডারী হচ্ছে! আমি কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছিলুম না। শেষে মাটিই আমাকে সব জাইনে দেলে।

মাটি? মাটি কি জানালে? আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিতে তাকালাম।

চারদিকে জমি দখলের হিড়িক পড়ে গেল। পড়া পতিত কিছু বারাবোনি। পার্টিতে, সমিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হল। সব জমিতে হানা দি। কিন্তু কোল্ড স্টোরেজের জমির কতা আর জীবন দাদা বলে না। অথচ ঐ দোকানে জীবন দাদা ওর মালিকের সঙ্গে বসে বসে কতা বলে, চা খায়, বিড়ি খায়, তাস-পাশাও চলে মাঝে মধ্যে।

একদিন জিগেস করলাম, কি ব্যাপার?

তো জীবন দাদা ভ্রূ কুঁচকে বললে, সেই পুরোনো কতা, লীডারী হচ্ছে? লীডারী ক্যানে? গাঁয়ের সবাই জানে কোল্ড স্টোরেজের পেছুকার কিছু জমি সরকারী খাসের। অথচ দখল নেওয়া হচ্ছে না।

তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?

কতার ধরন দেখে বললাম, সকলকেই দিতে হবে। দখল নিতে বলচো না ক্যানে?

জানিস, কোল্ড স্টোরেজের মালিক আমাদের পার্টিতে মোটা চাঁদা দেয়।

ওটা ত' ঘুস। ঘুস তুমি ন্যাও ক্যানে?

বেশ করি নি। তা' ছাড়া ও জমিতে নানা ভজকট। আইনের অনেক ঘোর-প্যাঁচ।

আইন মানলে আইন। না মানলে নেই। এই আমি তোমায় সাফ বলে গেনু ও জমি আমরা দখল নোবই।

বলে আর দাঁড়ালাম না।

তার পরের দিন ক'জনা মিলে কোল্ড স্টোরেজের [illegible] [illegible] [illegible] ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে এনু।

জীবন দাদা খপর পেয়ে এল। খুব বকা ছকা করলো। যা তা গালাগাল দেল। প্রথমে কিছু বললাম না। হাজার হোক, লীডার। দেশপতি। আমাদের [illegible] হার। হয়তো কোন কারণে চটেছে। হয়তো কোন একটা উদ্দেশ্য আচে। আমাদের কাচে খুলে বলচে না।

হাসতে হাসতে বললাম, তুমি মালিকের সঙ্গে বসে চা খাও। একসঙ্গে বিড়ি খাও। গপ্প, রসিকতা করো। তুমি পারবে ক্যানে ও জমি দখল নিতে? হাজার হোক চক্ষু-লজ্জা আচে না? আমরা ছোটোলোক মোটোলোক, অতো চক্ষুলজ্জা আমাদের নেই। তোমাকে আর কষ্ট দিলুম না।

হাসতে হাসতেই বলেছিনু তো রেগে কাঁই হয়ে, আর একটি কতাও না বলে জীবন দাদা চলে গেল। সেই চলে যাওয়াই জীবন দাদার শেষ চলে যাওয়া।

তার মানে?

জীবন দাদাকে পার্টি থেকে তাইড়ে দেলে।

ভয়ানক চমকে গেলাম। বলে কি। এক একটা জায়গা আমি ত' জানতাম এক একজন লীডারের জমিদারী। সেখানে সেই সব। তাকে উচ্ছেদ করবে কে, এ্যাতো ক্ষ্যামোতা কার?

কেন? কেন তাড়িয়ে দিলে?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল কোল্ড স্টোরেজের যে জমি সরকারের, সেখানে জীবন দাদারও অংশ আছে মালিকের সঙ্গে। বলে কেলে বাগ্দী অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসলো।

তারপর বললে, মাটি কি সব নয়? মাটিই ত' আমাকে চেনালে কে ঝুটো, কে খাঁটি। নাইলে আর আমি কেমন করে জানবো!

আমি তাকালাম নতুন কালের নতুন নেতার দিকে। দূর থেকে কানে আসছে নদীর কল্লোল। বিপুল সাঁতার জল নিয়ে নদী ছুটছে সাগরে। এই তুফানে চলতে গেলে জাত পাটুনী চাই। পারবে কেলে বাগ্দী?

কেলের দুরন্ত যৌবন। কেলের অদ্ভুত প্রাণশক্তি। কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয় স্পষ্ট। কেলে জীবন মাইতির কথার উত্তরে যা বলেছিলো সে কথাগুলোকে আমি আর একবার স্মরণ করলাম।

ভা'খানি ডুইববে ক্যানে? এক বাদাম ছেল, 'লা'য়ে এখন জোর বাদাম। উজান ধরে ভা'খানি মারমার করে এক দিনের পথ এক [illegible] যায় গ। হো—ঐ দ্যাখো, নিশান উড়িয়ে ভা'খানি এখন মাঝ দরিয়ায় যায়। 'ভা' ডুইববে ক্যানে?

[ক্রমশ]

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

॥ আটচল্লিশ ॥

রাত দুপুরে বিজলী আলো জ্বলে। কলের পাইপে আসে জল। যখন খুশি হোক, যত রাত্রিই হোক। সভ্যতা এসে গেছে ডুয়ার্সের এতদূরে বনের ভিতরেও। বিজ্ঞানের দান। বাইরে অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। শাঁ-শাঁ করছে বন-জঙ্গলে স্তূপীকৃত আঁধার। হিংস্র জীব-জন্তু চলাফেরা করছে অবাধে। শুকনো শালপাতার রাশ জমে আছে বনের মধ্যে। গাছতলায়। প্রাণীর পায়ের শব্দে সর্ সর্ করে ওঠে। ক্বচিৎ হাওয়ায় ওড়ে শালপাতা। থেকে-থেকে অন্ধকার ককিয়ে ওঠে। বাদুর ওড়ে নিথর নিস্তব্ধ কালো রাত্রে শুকনো নিষ্পত্র গাছের শাখা থেকে। কিংবা পত্রবহুল বৃক্ষের শাখান্বিত অরণ্য থেকে কর্কশ শব্দে প্যাঁচা ডেকে ওঠে। মাঝরাতে সহসা হিংস্র বাঘের গর্জন সচকিত করে তোলে চারদিক। সভয়ে শিউরে ওঠে অতিবড় সাহসী নাইট-গার্ডেরও বুক। বন্দুকটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসে আর ওঠে। কাঠের বেড়ার ঘরে নেপালী গ্যাং-ম্যান ঝটিতি পাশ-কোমরে হাত দিয়ে দেখে নেয়। ধারালো কুকরিটার স্পর্শ অনুভব করে চাঙ্গা হয়ে নেয়। অকাতরে হয়তো তখনও দড়ির খাটিয়ায় ঘরের ভিতরে ঘুমায় তার যুবতী বৌ। সাইলি কিংবা মাইলি। পুরুষটার হাতের মধ্যেকার বিড়ি ধরাবার দেশলাই কাঠির আগুনে চকিতের জন্য আলোকিত হয়ে ওঠে সঙ্গিনীর মুখ। নাক-পাশাটা অল্প-অল্প কাঁপছে নিশ্বাসের মৃদু ওঠা-নামার ছন্দের টানে-টানে। চক্ষু পরিপাটি ঘুমে নিশ্চিন্ত। ছড়িয়ে পড়েছে ফণিনীর মত কালো কুন্তল। ঈষৎ শিথিল ঠোঁট। অবশ বাহুখানি এলায়িত।

হয়তো বা তখন দুরন্ত শীতের রাত্রি ডুয়ার্সের। পুব দিক থেকে আসা একটা হাওয়ার উতলা টানে টানে মৃত্যুবীজের মত সহস্র শীতের দুর্দান্ত-পনা নামিয়ে দিচ্ছে। কে জানে কোথায় বরফ পড়ছে দূরে ভুটানে। কত দূরেই বা ভুটান!

ভাবতে হাসি পায় আজ। ভুটান তো ছিল এইখানেও। শক্তিমান ইংরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পিছিয়ে গেল পায়-পায়। ডুয়ার্সের সঙ্গে কত দূরত্বই বা তার। ভুটানের পাহাড়ে-পাহাড়ে যখন তেজালো শীতের দুরন্ত-পনা নিয়ে বাতাস করে মাতামাতি, জমিয়ে দেয় রাশি রাশি বরফ প্রস্তরপুঞ্জে, পাহাড়ে-গুহায় আগুন জ্বালিয়ে বসে মদ খেয়ে খেয়ে বুনো পশুর আগুনে-ঝলসানো মাংসের উত্তপ্ত আস্বাদের মধ্যেও থেকে-থেকে কেঁপে-কেঁপে ওঠে সীমান্তের ওই দুর্ধর্ষ মানুষগুলো. ডুয়ার্সেও তখন শীতের পর্দা নামে পুরু হয়ে। ঘন গভীর আস্তরণে। কনকনে শীতের হাওয়ায় কাঁপে মাঠের জংলা বনের বাতাস। মুঠো মুঠো ঝরে কুয়াশা। বেতবনের নবপত্রপল্লবের তলায় ঘাসের মধ্যে বুক ডুবিয়ে তার তীব্রতার মধ্যে আত্মরক্ষা করে হয় তো পাখি-পাখালি। লক্ষ লক্ষ কুড়ির অলস শাখা-প্রশাখা বেয়ে ঝোলে ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ। নিরীহ হরিণের নরম মাংসে ঝাঁপিয়ে পড়ে জংলি চিতা। পাথরের ফাটলের মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গে গা এলিয়ে শুয়ে থাকে বুনো পাইথন। আর রাতের আঁধারে ধেয়ে আসে জংলি হাতীর দল।

অরণ্যময় ডুয়ার্স এক ভয়ংকর পুরী। এক আশ্চর্য রাজত্ব।

কিন্তু তার ঘন বনের ভিতরেও দাঁড়িয়ে থাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্টার। বিজ্ঞানের পদসঞ্চার ঘটেছে সেখানেও। আধুনিক সভ্যতার আরাম-বিরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের হাত প্রসারিত হয়েছে সেখানেও।

রাত দুপুরে টুক্ করে জ্বলে বৈদ্যুতিক আলো। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটিয়ে আসে জীপ গাড়ি। কর্ম-ক্লান্ত ফরেস্ট অফিসার ইচ্ছেমত স্নান সেরে নেন শীতল জলে। মস্তবড় জলের চৌবাচ্চায় অবগাহনের আনন্দেরও কমতি নেই। রেডিওগ্রাম, রেডিওতে বাজে গান। টেলিফোন বাজে মিষ্টি সুরের শব্দতরঙ্গে। —হ্যালো, হ্যালো, হাউ ডু য়্যু ডু?

সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতির খেয়ালে এখানে-ওখানে কবে দাঁড়িয়ে উঠেছিল ফরেস্ট। অবারিত বনের দাক্ষিণ্য। প্রকৃতির অফুরন্ত উচ্ছ্বাস। গাছ-পালা বনে-জঙ্গলে মানুষ শুনেছিল প্রাণের আহ্বান। সৃষ্টির অমোঘ মন্ত্র মর্মরিয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। ঋষিরা শুনেছিলেন কান পেতে সেই বনের আহ্বান। তাই তাঁরা তপোবনের সৃষ্টি করেছিলেন। আশ্রম তৈরি করেছিলেন প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে।

মাঝে মাঝে অবশ্য তবু নীরবতা ভঙ্গ হত। রথচক্রের ঘর্ঘর রবে কেঁপে কেঁপে উঠত দূর্বাদল, ঘাস। মৃগয়া-লোলুপ দুষ্মন্তের দল উদ্ধত মদগর্বভরে ধেয়ে আসত বনপ্রকৃতির ভিতর অবধি। নিঃসংকোচে আশ্রমকন্যা শকুন্তলাদের স্বপ্নভঙ্গ করে যেত।

সে-যুগে অবশ্য ছিল না আজকের মত রাষ্ট্রতন্ত্রের এত হাঁক-ডাক, উদ্যোগ-আয়োজন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ছিল কি না সন্দেহ। ছিল না ডি-এফ-ও, এ-এফ-ও, রেঞ্জার বন-পালকের দল। এত চাপরাশি গার্ড-ওয়াচার কুলীগ্যাং। ব্যস্ত-সমস্ত অফিস-কাছারী। টেলি-প্রিন্টার টাইপরাইটারের খট্‌খট্।

ডুয়ার্সে দেখছি বনের ভিতরে যেতে-যেতে ক্বচিৎ চোখে পড়ে নতুনকালের বন-পালকদের বাংলো। ঝকঝকে, তকতকে বাড়িগুলি। স্বপ্নের মত। রঙ-বেরঙের দেয়াল। মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে দামী কাঠের বাড়ি। শিরিষ কাঠই বেশি। কাঠের উপরে নানা রঙের উজ্জ্বলতা। কাচের জানালাগুলি ঝক্‌ঝক করে দিনের-বেলায়। রঙিন পর্দা ওড়ে। টিনের চালের উপরে লতিয়ে-ওঠা ফুলের ডাল-পালাগুলি। বারান্দায় বারান্দায় ঝুলন্ত অর্কিড।

একটি-দু'টি ঘর, বেশ ক'টি বাড়ি। ছমছাম। সুন্দর। পাশাপাশি চলেছে। ফুলের কেয়ারী। বন-ঝাউ দু'-একটা।

আগে ছিল না বিদ্যুৎ আলো। টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলত টেবিলে। ইংরেজ আমলে ছিল বড় বড় টেবিল লাইট, চর্বির আলোও ছিল। তখন বন আরো ভয়ংকর ছিল। মস্ত গোঁফ-ওয়ালা ভারিক্কী ফরেস্ট অফিসার তখন হয়তো সারা তল্লাটে একজনই থাকতেন। গোটা বক্সা ডিভিশনের মালিক ছিলেন শ্বেতকায় ডি-এফ-ও সাহেব। সুদূর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাহেব। সাত-সমুদ্র তেরো নদীর প্রান্তে। ঢেউয়ের [illegible]-চূড়ায় জাহাজ কাঁপত। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস।

এ দেশ যে অসভ্য দেশ! শুধুই কি [illegible] আদমি নেটিভের দল? শাসন [illegible] অসভ্য এ দেশীয় হিংস্র অসভ্য [illegible]কেও। বনে-জংগলে কাটত দিবারাত্রি। শিকারের পর শিকার সন্ধানে। [illegible] হুইস্কি—বোতলের পর বোতল। [illegible]। চারধারে বন জংগলের [illegible] ছিল আজকের চাইতে [illegible]গুণ বেশি। গাছপালার [illegible] [illegible] অন্ধকার থাকত চারদিক। পথ-[illegible] ছিল না। ছিল না [illegible]কের মত [illegible] মনোরঞ্জন। ওল্ড টাইমারদের প্রিয় [illegible] ছিল মদ্যপান ও শিকার। [illegible]ফেলের অব্যর্থ গুলীতে বাঘের খুলি [illegible] দিয়ে চৌচির করে হাসত।

চলে গেছে সে-সব দিন। ওল্ড টাইমাররাও বিগত। আজ নতুন যুগের আলো ঝলমল করছে সর্বত্র। রাত্রির ডুয়ার্সের ভয়ংকর চেহারা যাই হোক, দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত লোকজনের আনাগোনা। পোষা দু'টি হাতী নিশ্চিন্ত-মনে দাঁড়িয়ে কদলীকাণ্ড চর্বনরত, মাহুত অল্প দূরে নিরীক্ষণরত। এই সব চিত্র স্বতই চোখে পড়ে।

তাছাড়াও আছে নতুন জীবনের বৈচিত্র্য। কোয়ার্টারে কারো বাড়িতে যদি সত্যনারায়ণের পুজো হয়, তবে তার সিন্নি খেতে আসে পাশাপাশি আর সব বাড়ির লোকেরাও। কর্মজীবনের পদ ও পদবী যাই হোক, কালীপুজো উপলক্ষে আনন্দোৎসব আয়োজনের বাধা হয় না।

সতেরো মাইল জীপ ছুটিয়ে আসবার পর এ-বনে থামা গেল। চালক স্বয়ং ডি-এফ-ও সাহেব। সাহেব, কিন্তু জাতে বিদেশী নন, এ-দেশীয় কৃষ্ণকায় সন্তান। বাড়ি বর্ধমান অঞ্চলে। মধ্য-বিত্ত ঘরের সন্তান। বয়স আন্দাজ আঠাশ-তিরিশ। পদমর্যাদার তুলনায় নিতান্তই ছেলেমানুষ বলতে হবে।

সেণ্ট্রাল ডুয়ার্সের এক ক্লাবে পরিচয় হয়েছিল। তিনি গিয়েছিলেন পাঞ্জাবী এক টি-গার্ডেন ম্যানেজারের সঙ্গ দিতে। আলাপ হতে বনরাজ্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ কৌতূহল প্রকাশ করেছিলাম। বলেছিলাম, বেশ আছেন আপনারা। সত্যযুগের রাজা-মহারাজাদের মত।

ডি-এফ-ও দেখালেন বাগানের ম্যানেজার সাহেবকে। উপরন্তু প্রশ্ন যোগ করলেন, কেন, এ'রাই বা মন্দ আছেন কি?

বলেছিলাম, না, আদিতে যাই হোক, ওঁদের বর্তমান অবস্থাটা খুব সুখকর বলতে বাধে।

কিসের বাধা?

ছিল সেই এক যুগ। যখন ছিলেন ওঁরা দিল্লীশ্বরের মত স্বাধীন। এখন অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে।

হয়েছে নাকি?

ম্যানেজার আমাকে সমর্থন করে-ছিলেন। মোটা চুরুটটা দাঁতে কামড়ে ধরতে ধরতে বলেছিলেন, রাইট য়্যু আর। ডি-এফ-ও'র দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, He is cent percent correct.

বর্তমান যুগ যে শ্রেণী-সংঘর্ষের যুগ, চা-বাগানগুলি তার প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্ব দিয়ে তা প্রমাণ করছে আজ। প্রতিটি বাগানে শ্রমিক-বিক্ষোভ লেগেই আছে। কথায় কথায় ধর্মঘট-লক আউট। শ্রমিকরা মালিকদের আর মানতে চায় না।

তা যদি বলেন, আমরাই বা কী ভালো আছি! ডি-এফ-ও সাহেব বলেছিলেন, ওল্ড টাইমারদের যুগে যা ছিল তা দিয়ে আজকের দিনের বিচার সম্ভব নয়।

গাড়িতে আসতে আসতে উনি বলছিলেন সেই কথা, ওল্ড টাইমারদের যুগ ও জীবনের চেহারাই ছিল আলাদা। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও পার্থক্য ছিল। সে-যুগে অধিকাংশ ফরেস্টাররাই ছিলেন বিদেশী মানুষ। বলতে কি, সাহেব ছাড়া কেউ তখন এই সব র‍্যাংকে আসতেনই না। আর এত ফরেস্ট ডিভিশনও তখন ছিল না। মস্ত মস্ত বনের এলাকা নিয়ে থাকতেন। হুইস্কি খেতেন, মস্ত মস্ত ঘোড়ায় চড়তেন। শিকার করতেন। বেশ কেটে যেত দিন। কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিল না। বৃটিশ-রাজের ভয়ে চারদিকে টুঁ শব্দটি হত না। শৃংখলাভংগ করত না কেউ। দূরে দূরে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা খেতেন, বেড়াতেন ইচ্ছেমত। মাঝেসাঝে লাট-সাহেবরা শিকারে আসতেন। সে-ও সাদা চামড়ারই জাত। কাজেই তত ভাবনা-চিন্তা কিছু ছিল না। দোর্দণ্ড দাপটে রাজত্ব চালিয়ে গেছেন।

শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হচ্ছিলাম। বাইরে বিকেলের ডুয়ার্স। সূর্যতাপ কমে যাচ্ছে। কিছু কিছু পাখি-পাখালি গাছপালার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আর একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। চওড়া পীচবাঁধানো রাজপথ। দু'ধারে বিশাল শাখা-প্রসারিত বৃক্ষ-গুলি। অধিকাংশই বেন-ট্রী। মাঝে মাঝে শিমুলও আছে। গাড়ির চাকায় দ্রুত গতিবেগের চাঞ্চল্য।

একটু আগে রাস্তায় গোটাকতক রেলওয়ে গুমটি পেরিয়ে এলাম। এ-অঞ্চল দিয়ে গেছে নর্থ-ফ্রণ্টিয়ার রেলের লাইন। কত দিনেরই বা কথা। দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের দেশগুলির সাথে সংযোগের ভাবনায় চিন্তিত হতে হল দেশনায়কদের। রাতারাতি তৈরি হল শিলিগুড়ি থেকে নতুন ফ্রণ্টিয়ার লাইন। বন-জংগলের ভেতর দিয়েই এ'কেবে'কে গেছে পথ। ঝিল-ঝোরা, পাহাড়ী, বুনো নদী।

গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিতে দিতে ডি-এফ-ও সাহেব বলছিলেন, কি দেখে আপনার ধারণা হল যে আমরা খুব সুখে আছি জানি না। এইসব বাড়ি দেখে নিশ্চয়।

বললাম, লোকালয় নেই। লোক-জনের হাঁক-ডাক-ব্যস্ততা নেই।

হ্যাঁ, সাহেবের অস্থিরতা-চঞ্চলতা নেই বটে, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, এইসব দিক

থেকে ভালোই আছি বটে, কিন্তু অন্য-বিধ সমস্যাও আছে। আর নির্জনতার কথা বলছেন বটে, আজকাল বনে-জংগলেও নীরবতা নেই। আদিবাসীরা আছে বনে-জংগলে, শ্রমিকদের মধ্যে তারাই সর্বাধিক। এখন তাদেরো নানা দাবী-দাওয়া। তারপর হয়েছে আরেক উপদ্রব। কথায় কথায় ঘেরাও তো আছেই। তীর-ধনুক, লাঠিসোটা-টাঙ্গি নিয়ে আসে যখন-তখন।

এখানেও ঘেরাও চলছে? কৌতূহলের সংগে শুধিয়েছিলাম।

চলছে বটেই। সারাটা দুনিয়া টোল খাচ্ছে, ভাঙছে-মোচড়াচ্ছে, আর এ-দেশেরই মধ্যেকার বনের ভেতরে তার সাড়া জাগবে না, এ আপনি কি করে ভাবলেন? যদি একে পরিবর্তন বলেন তো সে-পরিবর্তন এখানেও জাগছে। তাই প্রতি মুহূর্তেই সতর্ক থাকতে হয়। তাছাড়া—

তাছাড়া?

তাছাড়া রাজনৈতিক পার্টিগুলির দাক্ষিণ্যও আছে এ-ব্যাপারে। তরুণ ডি-এফ-ও'র গলা গম্ভীর শোনাচ্ছিল।

আগে এক জীবনে যখন চাকরি নিয়ে আসি, অনিশ্চয়তার দ্বিধার সংগে সংগে খানিকটা তৃপ্তিও ছিল। আর যাই হোক, নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটে চাকরি করতে পারব! তাই বনের ভেতরে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও সভ্যতার স্পর্শ-বর্জিত জীবনকেও একরকম বরণীয় মনে' হয়েছিল। অবশ্য সময় কাটানো চিরকালই ছিল সমস্যা। কাজে-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখা—কাগজপত্রও তো নেই বললেই চলে!

সব ফরেস্ট ডিভিশনই কি বনের মধ্যে?

না, তা নয় গাড়িটাকে আস্তে বাঁ-দিকে মোড় ফেরাচ্ছিলেন ডি-এফ-ও। এক সেকেন্ড, বললেন, ডিভিশন অফিস শহরেই বেশিরভাগ আছে বটে। তবে ডুয়ার্সের এই ডিভিশনটি কিন্তু একেবারে বনের মধ্যে।

গাড়ি ভিতরে ঢুকছিল। কাঠের মস্ত সদর দরজার পাল্লা দুটো খুলে ধরেছে জংলিমত একটি লোক। জীপের হর্ন শুনেই ছুটতে ছুটতে আসছে। কোথায় ছিল ও-দিকে।

গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢোকা গেল। পিছনের চাকায় ধুলো উড়ল কিছু। শুকনো পাতা মোটরের ভারী চাকায় মড়মড়িয়ে উঠল। বাঁয়ে স্টেজ—বাংলো। সোজা কথায় যাকে সার্কিট হাউস বলা চলে। ডাইনে এক ঝাঁক বোগেনভিলাই ফুটেছে। ঘন পত্রপুঞ্জে ফিকে লালচে রঙের বোগেনভিলাই-এর পুষ্পিত শাখাগুলি বিকেলের আলোয় কিছু ম্রিয়মাণ ও ম্লান মনে হল।

গাড়ি থামল। ব্রেক কষলেন সাহেব।

আমাকেও কি নামতে হবে? ইতস্তত করছি ভেবে।

নামুন, প্রসারিত আহবান ডি-এফ-ও'র।

আমি আর যাই কেন? কণ্ঠস্বরে দ্বিধা জড়িয়ে বললাম, এখনও কিছু সময় আছে। দু'-দশ মিনিট দাঁড়ালেই বাসটা পেয়ে যাব।

বাস অনেক পাবেন। না-পেলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। আসুন।

আপনি এলেন ক্লান্ত হয়ে।

সেই ক্লান্তিটাই তো কাটাতে চাইছি আপনার সংগে কথা বলতে বলতে দু' পেয়ালা কফি খেয়ে।

কফির আহবান এড়ানো দায় হল। কিন্তু ওদিকে ধূসর রাত্রি আসন্ন। মৃদু বসন্তের আমেজ আকাশে-বাতাসে। গাছে-পাতায়। ঝিরঝিরে একটা বাতাস দিয়েছে। পাতাগুলি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আর আধ ঘণ্টার বেশি দিনের আলো আছে কি না সন্দেহ। সূর্যাস্তের ফিকে লালের আবেশে গাছপাতা রক্তাভ।

কফি খেতে নেমে যাওয়া গেল। মস্ত কোয়ার্টারখানাই সুদূর ইংলন্ডের পল্লীভবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারী-ভারী দামী কাঠের দরজা-জানালা। দোতলায় ওঠবার ঘোরানো সিঁড়ি।

বারান্দায় কাঠের চেয়ারে গা এলিয়ে বসা গেল। কথায় কথায় জানা গেল, এ কোয়ার্টারটির জন্মকাল প্রায় পঞ্চাশ বছর। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। কথাটি উল্লেখ করামাত্রই ডি-এফ-ও হেসে বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে আপনারা ঠিক যে-ভাবে বোঝেন আমরা ততটা বুঝি কি না সন্দেহ। গাছপালা বন-জংগলের সৌন্দর্য প্রায় চোখেই পড়ে না বলতে গেলে। আমাদের চোখই অন্যরকম হয়ে গেছে। গাছের দিকে তাকালেই চোখে ভেসে ওঠে তার ক্লাসিফিকেশন, কিউবিক মেজার, বর্গ-ইঞ্চি এই সব আর কি! বলে তিনি আবার দিলখোলা দরাজ গলায় হেসে উঠলেন।

কফি খেয়ে পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললাম, বেশ কাটল আপনার সংগে বিকেলটা কথাবার্তায়।

বন-জংগল সম্পর্কে আপনার খুবই আগ্রহ আছে দেখছি।

কিছুই না, কিছুই না। লজ্জিত-ভাবে আমি বলি, নিতান্তই কৌতূহল। একটু থেমে বললাম, ডুয়ার্সে হয়ে গেল বহুদিন। এ-অঞ্চলে আর আছেই বা কী। টী আর ট্রী—এই দুই-ই তো সম্বল। তাই জানতে কৌতূহল হয়।

বেশ রাতে ডি-এফ-ও'র জীপেই বেঞ্জামিন ড্রাইভার আমাকে পৌঁছে দিয়ে যায়। রাত হয়েছে। বনের ভিতর দিয়ে পীচ-ঢালা পাকা পথে চলেছে স্বচ্ছন্দগতি গাড়ি। জংগলের মাথায় চাঁদ উঠেছে একফালিতে। মিঠকুমড়োর ফালির মত।

ফিরতে ফিরতে ভাবি, কতদিন ডুয়ার্সে এই সব বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করছি। এই সব বনের ভিতরেই আছেন খোদ ডি-এফ-ও সাহেবের নিম্নবর্তী বিভিন্ন অফিসারের দল। ফরেস্ট রেঞ্জারেরা। বীট্-অফিসারদের দল। গার্ডরা। কচিৎ বনের ভিতরে সুন্দর বাড়ির সামনেকার সাইনবোর্ড। Forest Research Centre লেখা রয়েছে স্পষ্টাক্ষরে। এ-ছাড়াও আছে ফরেস্ট-ব্যারাক। ফরেস্টারদের ট্রেনিং সেন্টার বনে বনে। নানাজাতীয় গাছপালার সংগে পরিচয় ঘটানোর কাজ। সুন্দর-সুন্দর পোষাকে চকচকে সব ছেলেরা। সৌন্দর্য মূর্তির ধ্যান করতে নয়, এদের শিক্ষা বৈষয়িকতার প্রয়োজনে। কেন না, ডুয়ার্সের বন-জংগলের আছে আলাদা জাত। তার দাম কাঞ্চন-কৌলিন্যে। রূপের টানে নয়, রূপেয়ার দামে তার বিচার। তামাম বেণিয়া জেনে গেছে তার গুরুত্ব। আর সরকার? সেও তো বেণিয়া ছাড়া আর কী বলব! সভ্য মানুষের চাইতে বড়ো আক্রমণকারী আর কে আছে? একেক সময় মনে হয়, সভ্যতাই সবচেয়ে বড়ো আততায়ী। জীবজন্তুরা সরতে-সরতে পিছিয়ে গেছে মানুষের ভয়ে। মানুষ কাটছে তার ডালপালা। ছিন্নভিন্ন করছে শক্ত হাতে তার শাখা-প্রশাখা। লোভের, লাভের প্রয়োজনে।

বেঞ্জামিনের হাতে স্টীয়ারিং। স্পীডোমিটারের গতির অভ্রান্ত নির্দেশ। জোরালো আলো পড়েছে ডুয়ার্সের কালো চকচকে রাস্তায়। গাছপালা-গুলি তাদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে আজ রাতে যেন ঝুঁকে পড়েছে মাথার ওপরে। ডাইনে-বাঁয়ে। বন-জংগলের একটা তীব্র গন্ধ ছুটে ছুটে এসে যেন পাগল করে দিচ্ছে। বেঞ্জামিন ড্রাইভারকে বললাম কিসের গন্ধ ওটা?

ছাতিমের ফুল ফুটেছে, বলে সে জীপের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল।

[ক্রমশ

# ভারতীয় মন্দিরশিল্পের গোড়ার কথা

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

## ॥ পাঁচ ॥

বৌদ্ধধর্মের নবীন প্রাণশক্তি ও জনপ্রিয়তা যেমন মৌর্য রাজবংশকে ভারতের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, তেমনি আবার সমগ্র বিশ্বে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে মৌর্য রাজবংশের অবদানও কম নয়।

বৈদিক ধর্ম যেমন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছিল, বৌদ্ধধর্ম কিন্তু তা পারে নি। বৌদ্ধধর্ম একদিকে যেমন উদার, অন্যদিকে তেমনি অপরের ভাল যা কিছু তা নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে সে পরাঙ্মুখও নয়। এর ফলে কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে যায়। ক্রমে বৈদিক ধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে হটে যেতে লাগল। বৈদিক ধর্ম এই সময় কিছুটা উদারতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছে এবং বৌদ্ধধর্মের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। বিবেকানন্দ লিখেছেন : "বৈদিক সম্প্রদায়...বিশেষ বিবেচনার সহিত মূর্তি উপাসনা, মন্দিরে শোভাযাত্রা প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবাদির প্রভূত পরিবর্তন সাধন করিয়া যথাসময়ে পতনোন্মুখ ভারতীয় বৌদ্ধধর্মকে এককালে নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত" হয়েছে।

এইভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে খৃস্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পেতে আরম্ভ করল। তারপর কেমন করে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হল স্বামীজীর ভাষায় তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, বৌদ্ধধর্ম একদা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিল। "কিন্তু কালক্রমে তাহাদের তত্ত্বজাতিসুলভ ইন্দ্রিয়াসক্তিবহুল উপাসনার প্রলোভন আর্যগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষেই মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে সংযোগ দীর্ঘতর কালের জন্য স্থায়ী হইলে আর্যসভ্যতা নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হইত। ইহার পর স্বভাবতই আত্মরক্ষার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং নিজবাসভূমিতে স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়রূপে বৌদ্ধধর্ম আর টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

"সেই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন উত্তরে কুমারিল্ল এবং দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহু মত, বহু সম্প্রদায়, বহু পূজা-পদ্ধতি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুধর্মে তাহার শেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।"

এইভাবে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হল এবং এরই স্বাভাবিক ফলস্বরূপ ভারতের দিকে দিকে নয়নমনোহর মন্দিরের সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দুধর্ম মতে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাড়ি তৈরি করা অন্যায়। এর মধ্যে স্বার্থপরতার পরিচয় আছে। কেবলমাত্র দেবতা ও অতিথিদের বাসস্থলরূপেই বাড়ি নির্মাণ করা ধর্মসঙ্গত। তাই হিন্দুরা দেবদেবীর বাসস্থলরূপে মন্দিরাদির পরিকল্পনা করেছে।

যে সকল কারণে প্রাচীনযুগে ভারতে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়েছিল ও মন্দির নির্মাণে জোয়ার এসেছিল তার অন্যতম হল, সে যুগে ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের অসামান্য জনপ্রিয়তা। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে এই সকল মহাকাব্য নতন করে লিখিত ও সম্পাদিত হল, যার ফলে কৃষ্ণ ও রাম হয়ত মূলত ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণিত হয়েছেন এবং তাঁদের পূজাও প্রচলিত হয়েছে।

খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে পুরাণ সাহিত্য লিখিত হতে থাকে। পুরাণে এক একজন কল্পিত শক্তিমান দেবতার গৌরব-মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ এই যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার জন্য নিজেকে সাধারণের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তাই বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের কথা বিবেচনা করে হিন্দুর দেবতাদেরও আর দেবলোকে মানুষের কাছ থেকে দূরে দেবাসনে বসিয়ে রাখা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয় নি। তাঁদেরও নামিয়ে আনা হয়েছিল এই ধূলার ধরণীতে। তাঁদের কথা নিয়েই লেখা হল পুরাণ-সাহিত্য। এমনি করেই হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল পৌরাণিক যুগে।

চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ ভারতে মন্দির-পূজা সুপ্রতিষ্ঠিত আসন লাভ করল। পুরাণোল্লিখিত অসংখ্য দেব-দেবীর বাসগৃহ গড়ে উঠল ভারতের সর্বত্র মন্দিরের রূপ নিয়ে। এই সমস্ত মন্দিরের দেয়ালগাত্রে সুনিপুণ ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে দেবকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ক্রমে এই সকল দেবমন্দিরকে ঘিরে নানা উৎসবের সূচনা হয়েছে এবং যে সকল স্থানে এই দেবমন্দিরগুলি গড়ে উঠেছে, কালক্রমে সেগুলি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

## ॥ ছয় ॥

ভারতে মন্দিরনির্মাণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রেরণা লাভ করেছে গুপ্তযুগে। বস্তুত, এ-যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, মৃৎশিল্প প্রভৃতি শিল্পের সর্বক্ষেত্রেই সমতা, সামঞ্জস্য ও প্রকাশের

স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অনন্য শিল্পসৃষ্টির জন্য গুপ্তযুগ ইতিহাসে অক্ষয় আসনের অধিকারী হয়েছে।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকেই বাংলাদেশে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুপ্ত রাজাদের আধিপত্য ছিল ষষ্ঠ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত। তবে তাঁরা শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, তার প্রভাব অব্যাহত ছিল ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ, এমন কি সপ্তম শতাব্দীরও মাঝামাঝি পর্যন্ত। তাই শিল্পক্ষেত্রে গুপ্তযুগ বলতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বুঝতে হবে।

কুশান সাম্রাজ্যের পতনের পর চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজত্বে উত্তর ভারতের বেশ একটা বড় অংশ দেশীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে এসে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল এবং এই সুযোগে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য পূর্ণতা লাভ করেছিল। এই যুগে ভারতীয় শিল্পরীতি সুসংস্কৃত হয়ে উঠেছিল। মাধুর্য ও কমনীয়তা গুপ্তযুগের কলা ও স্থাপত্যে একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল।

গুপ্তযুগ ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণ-যুগ। সে যুগের মানুষে রাজ-সহায়তায় ও পরিবেশের প্রভাবে গভীরভাবে শিল্প-সচেতন হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একটা আদর্শ অবস্থা দেখা দিয়েছিল। তাই শিল্পক্ষেত্রের সকল শাখাতেই যেমন দেখা গিয়েছিল সমৃদ্ধির স্পর্শ, তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল এক অভাবনীয় পরি-পূর্ণতা। বস্তুত গুপ্তযুগে শিল্প ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। মথুরা, সারনাথ, পাটলি-পুত্র সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দো-লনের পীঠভূমি হয়ে উঠেছিল।

গুপ্তযুগের বিশিষ্ট শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করা যেতে পারে অজন্তার ফ্রেস্কো চিত্রাবলী। আবার দেখি ভারতের বহু প্রখ্যাত শিল্পসৌধ রচনার মূলেও রয়েছে গুপ্তযুগের প্রেরণা। এ যুগে যেমন পেয়েছি অজন্তার শিল্পকলার মত ঐশ্বর্য, তেমনি পেয়েছি কালিদাস ও বাণভট্টের মত যুগ-প্রবর্তক অমর কবিদের সৃষ্ট মহান্ কাব্যসম্পদ, যা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে বিশ্বসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করেছে।

গুপ্তযুগে শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উন্নতি ও প্রসার সম্পর্কে আলো-চনার পূর্বে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস যেমনি ঘটনাবহুল, তেমনি বহু-বিচিত্র। কুশানশক্তির পরাজয়ের পর প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন) আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তিনি রাজত্ব করতেন পাটলি-পুত্র বা পাটনার নিকটবর্তী অঞ্চলে। তিনি বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করেছিলেন। ৩২০ খৃস্টাব্দ নাগাদ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে এলাহাবাদ পর্যন্ত এবং ৩২৫ খৃস্টাব্দ থেকে পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে তাঁর পুত্র প্রথম সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের সাম্রাজ্য পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রসারিত করলেন, আবার দক্ষিণেও বিজয় অভিযান চালালেন।

সমুদ্রগুপ্তই ছিলেন গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। ঐতি-হাসিকেরা সমুদ্রগুপ্তকেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে গঙ্গা নদী থেকে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল পর্যন্ত, আবার উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল তাঁর সাম্রাজ্য।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য আরও প্রসারিত করে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং পশ্চিম উপকূলের সাহায্য নিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এইভাবে গ্রীক ও চীনের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপিত হল। এই সূত্রে চীনা পর্যটকেরা এলেন ভারতে। ভারতের রাজা ও কূটনীতিকেরাও প্রাচ্য ও ইউরোপের দেশে দেশে ভ্রমণ করলেন। এমনিভাবে অন্য দেশের প্রভাব এল ভারতে। রোমক-দের মুদ্রার ধরনে গুপ্ত-রাজারা মুদ্রা নির্মাণ করালেন। গ্রীক অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ভারতে প্রবর্তিত হল। বিদেশী প্রভাবে গুপ্ত আমলে নানাদিক থেকে ভারতের উন্নতি হতে লাগল।

পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই উন্নতিতে ছেদ পড়ল। এ সময়ে শ্বেত হূণ দল ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হানা দিয়ে কাবুল ও গান্ধার অধিকার করল। অবশ্য ষষ্ঠ দশকের তৃতীয় দশকে গুপ্ত-সম্রাট বালাদিত্যের হাতে এরা পরাস্ত হল। এমনিভাবে বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ, নানা দেশী-বিদেশী প্রভাব এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের কালে বহু বিদেশী সংস্কৃতি ও রীতিনীতির আদান-প্রদানের ফলে ভারতীয় শিল্পকলা একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

গুপ্তযুগে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্র-কলা যেমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি মূর্তিশিল্প ও পোড়ামাটির শিল্পেও এ যুগের শিল্পীদের প্রতিভার পরিচয় মিলেছে।

গুপ্তযুগে মূর্তিশিল্পের যা কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে দেখি, এ যুগের শিল্পীরা প্রধানত পুরাণবর্ণিত কাহিনী ও উপকথাকেই রূপদান করে-ছেন। মূর্তিশিল্প নিয়ে পৃথকভাবে বলবার চেষ্টা করলেও ভাস্কর্য থেকে একে মোটামুটিভাবে পৃথক করা যায় না। এ যুগের শিল্পীরা পৌরাণিক চরিত্র ও পৌরাণিক কাহিনীকে শুধু মাটির সাহায্যেই রূপদান করেন নি, পাথরে ও চিত্রপটেও রূপায়িত করেছেন। এ যুগে ভাস্কর্যে এর নিদর্শন পাই অনন্তশয়নে বিষ্ণু মূর্তির মধ্যে। ভাস্কর্য অনেক সময় স্থাপত্যকলার মধ্যেও মিশে গেছে, আমরা জানি। গুপ্তযুগে এর নিদর্শন রয়েছে মন্দিরসমূহে প্রতীকধর্মী দ্বারপথে।

খৃস্টীয় প্রথম তিনটি শতাব্দীতে শিল্প এক নতুন প্রেরণা লাভ করল। এ সময়ে সাধারণভাবে শিল্প ও বিশেষ করে মূর্তিশিল্পীর ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা হতে লাগল, নানা গঠনমূলক পরি-কল্পনার সৃষ্টি হল। এ সময়ে বু[illegible] মূর্তি আবিষ্কারের ফলে এক নবযুগে[illegible] সূচনা হল। এতে মূর্তি গড়ার দি[illegible] অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মনেও অনুপ্রেরণা এল। বিশেষ করে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ[illegible] থেকে খুবই অগ্রসর হয়ে গেল। [illegible] কুশান যুগে বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, [illegible] লক্ষ্মী, সরস্বতী, সপ্তমাতৃকা প্র[illegible] মূর্তি নির্মিত হতে দেখি প্রচুর সংখ্যা[illegible]।

কুশানদের পরবর্তীকালে গুপ্তযুগে শিল্পীদের দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া [illegible] বিষ্ণু ও শিবমূর্তি রচনায়। এযুগে [illegible] মূর্তি রূপায়ণের দিকে প্রভূত ঝোঁক দেখা গেছে। কৃষ্ণ-কাহিনীর সার্থক রচনা দেখা যায় রামগড় মন্দিরে। কুশান যুগে মথুরা[illegible] ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর অনেকেরই উপস্থি[illegible] লক্ষ্য করা গেলেও কৃষ্ণমূর্তির অনুপ-স্থিতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু গুপ্তযুগে দেবগড়ে কৃষ্ণ-জীবনের বহু কাহিনী দেখা যায়। তা ছাড়া রামায়ণের অনেক কাহিনী দেবগড় মন্দিরে খোদি[illegible] রয়েছে, যেমন—অহল্যা উদ্ধার, রা[illegible] লক্ষ্মণ ও সীতার বনগমন, লক্ষ্মণ কর্তৃ[illegible] সূর্পনখার নাসিকা কর্তন।

গুপ্তযুগের সাহিত্যেও এইসব দে[illegible] দেবীর কাহিনী পাই। কালিদাসে[illegible] কাব্যে, নাটকে ও বাণভট্টের কাদম্বরী[illegible] এইসব দেব-দেবী স্থান লাভ করেছেন।

মথুরায় দেওয়াল গাত্রে যেমন রাব[illegible] কর্তৃক কৈলাস আন্দোলিত করার কাহি[illegible] খোদাই দেখি, তেমনি কালিদাসের মেঘদূ[illegible] কাব্যেও তার প্রতিরূপ পাই।

শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি গুপ্ত-যুগের বিশিষ্ট ভাস্কর্য। যদিও এর আ[illegible]

কুশান যুগেই এর পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল, কিন্তু এর সার্থক রূপারোপ সম্ভব হয়েছিল পরবর্তীকালে গুপ্তযুগের ভাস্করদের হাতে। অর্ধনারীশ্বর মূর্তি এ যুগের এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। এ মূর্তি পরমতসহিষ্ণুতার প্রতীক, সমন্বয়ের প্রতীক—ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের মধ্যে সমন্বয়, চিন্তা ও কার্যের মধ্যে সমন্বয়।

পাশাপাশি শিব ও বিষ্ণুর পূজার মধ্যেও প্রমাণিত হয় গুপ্তযুগে মানুষ ধর্মের ক্ষেত্রে কতখানি সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। এ যুগে শিবের মন্দিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিষ্ণুর মন্দিরও গড়ে উঠেছে সমান সংখ্যায়। সম্রাটেরা গরুড়ধ্বজ নির্মাণ করে বিষ্ণুর বাহন গরুড় তথা বিষ্ণুর গৌরব গান করেছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিবের প্রতিও ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিচয় রাখতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। মধ্যভারতে প্রাপ্ত একমুখী শিবলিঙ্গ গুপ্তযুগের মূর্তিশিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। এই শিবলিঙ্গের এক পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে শিবের মুখাবয়ব। বর্তমানে মূর্তিটি রয়েছে এলাহাবাদের পৌর যাদুঘরে। পৃথকভাবে শিবলিঙ্গ ও শিবমূর্তির অস্তিত্ব কুশান যুগেও দেখা গেছে। কিন্তু ঐ দুয়ের যুক্ত অস্তিত্ব গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্য।

যাই হোক, ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগে যেমন শিব ও বিষ্ণুর পাশাপাশি অধিষ্ঠান দেখি, তেমনি সে যুগের সাহিত্যেও তার পরিচয় রয়েছে। কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব কাব্যে এই দুই দেবতার প্রতিই কবির সমান ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

কুশান যুগে মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিষ্ণুপূজার প্রচলন ছিল ঠিকই, কিন্তু গুপ্তযুগে বিষ্ণুপূজা এক নতুন প্রেরণা লাভ করল। বিষ্ণুমূর্তির বহুল প্রচলন হল গুপ্তযুগে। শুধু বিষ্ণুমূর্তি নয়, বুদ্ধমূর্তিরও সৃষ্টি হল। এ যুগে বিষ্ণু মন্দিরে যেমন বিষ্ণুমূর্তি দেখা যায়, তেমনি বৌদ্ধ চৈত্যে দেখি বুদ্ধমূর্তি। যেমন পাই দেবগড় মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তি, তেমনি আবার পাই অজন্তা গুহামন্দিরের বুদ্ধমূর্তি।

এ ছাড়া গঙ্গা ও যমুনা দেবীর মূর্তি সৃষ্টিও গুপ্তযুগে শিল্প ও সাহিত্যের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উদয়গিরির পর্বতগাত্রে (৪০০ খৃঃ অঃ) গঙ্গা ও যমুনার জন্মকাহিনী খোদিত আছে। এখানে গঙ্গা ও যমুনাকে দেখি যথাক্রমে তাঁদের বাহন মকর ও কচ্ছপের পৃষ্ঠে আরূঢ়া।

গুপ্তযুগের শিল্পের আর একটি উল্লেখণীয় শাখা হল পোড়ামাটির শিল্প। পোড়ামাটির শিল্প সে যুগে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। শুধু যে নিছক প্রয়োজনের দায় মেটাতেই এর আদর ছিল তা নয়, প্রকৃত শিল্পের সম্মানও এ লাভ করেছিল। চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি প্রমুখদের সমান মর্যাদা লাভ করেছিল সে যুগের মৃৎশিল্পীরা। বাণভট্টের "কাদম্বরী"তে মৃৎশিল্পীকে প্রকৃত শিল্পীরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাণভট্ট প্রেমাতুর বৈশম্পায়নের স্থানুবৎ মূর্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি যেন—

স্তম্ভিত ইব, লিখিত ইব,
উৎকীর্ণ ইব, পুস্তময় ইব।

অর্থাৎ, তিনি যেন কোন ইমারতের স্তম্ভের মত, চিত্রপটে আঁকা ছবির মত, পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত, আর মৃত্তিকা দিয়ে গড়া মূর্তির মত।

গুপ্তযুগে ঘর সাজাবার উপকরণ হিসেবেও পোড়ামাটির তৈরি মিথুন মূর্তি বা অন্যান্য সুন্দর সুন্দর শিল্প-নিদর্শন প্রচুর ব্যবহৃত হত। এগুলি যেমন অল্পব্যয়সাধ্য ছিল, তেমনি নির্মাণ করাও সহজসাধ্য ছিল।

বিবাহাদি উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'লেপ্যকার' বা মৃৎশিল্পীদের ডাক পড়ত। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবাহ উপলক্ষে সে যুগের রীতি ও আচার অনুসারে পোড়ামাটি দিয়ে মাছ, কচ্ছপ, কুমীর, কলা, নারিকেল, পান প্রভৃতি গড়বার জন্য বহুসংখ্যক মৃৎশিল্পী নিয়োগ করা হত।

গুপ্তযুগের বিষ্ণু, কার্তিকেয়, গঙ্গা, যমুনা প্রমুখ দেব-দেবীর পোড়ামাটির মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে, পোড়ামাটির তৈরি নানা আকৃতির মৃৎপাত্র বা তৈজসপত্রেরও অভাব ছিল না।

গুপ্তযুগের আর একটি সম্পদ এর অনুপম ভাস্কর্য-শিল্প।

কুশান যুগের ভাস্কর্যে ছিল যৌনধর্মিতা, আবার প্রাক্ মধ্যযুগের ভাস্কর্যে ছিল প্রতীকধর্মিতা। কিন্তু গুপ্তযুগের ভাস্কর্য এ দুয়ের প্রভাবমুক্ত হয়ে মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিয়েছে। গুপ্তযুগের শিল্পীরা ছিলেন প্রকৃত সংযমী। নারীমূর্তিকে যৌন আবেদন সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যে নীতিবিরুদ্ধ কাজ, এ তাঁরা মনেপ্রাণে অনুভব করতেন। তাঁদের সচেতন ও সুস্থ নীতিবোধ এ বিষয়ে তাঁদের নিয়ন্ত্রিত করেছে। ফলে, গুপ্তযুগের শিল্পে নগ্নতার প্রকাশ মানুষের শিল্পিপ্রাণ ও চোখকে পীড়িত করে নি।

গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি ভাস্কর্যের এক অনিন্দ্য নিদর্শন। ওই যুগের বুদ্ধমূর্তির মধ্যে বাইরের রূপের সঙ্গে আন্তর রূপের যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় তা আর কোথাও দেখা যায় না। সারনাথের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আর মথুরা যাদুঘরে রাখা পঞ্চম শতাব্দীর দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি এ যুগের উজ্জ্বল শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সারনাথের বুদ্ধমূর্তিতে এক স্বর্গীয় ভাবের প্রকাশ, প্রশান্ত হাসি ও এক ভাবগম্ভীর মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের হাত দুটিতে ব্যাখ্যান মুদ্রা, অর্থাৎ শিক্ষাদানের ভঙ্গি। এই মূর্তিটি পঞ্চম শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি সময়ে সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের আমলের।

ভিনসেন্ট স্মিথ গুপ্তযুগের ভাস্কর্য ও শিল্পকলা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি গান্ধার রীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও মুক্ত।

খৃস্টীয় যুগ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধশিল্পের বিস্তার হতে লাগল ত্রিধারায়। একটি ধারা আত্মপ্রকাশ করল উত্তর-মধ্য ভারতে মথুরার শিল্পে, অপরটি প্রায় সমান্তরালভাবেই গড়ে উঠল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গান্ধার রীতির মধ্যে, আর তৃতীয় ধারাটি সার্থক হল দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের দাক্ষিণাত্যে অমরাবতী রীতির মধ্যে।

পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আলেকজান্ডার দি গ্রেটের কয়েকজন গ্রীক সেনাপতি প্রাচ্যে তাঁদের রাজ্য স্থাপন করলেন। ফলে মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য এদের প্রভাবাধীন হল। এদের প্রভাবে গ্রীক শিল্প সীমান্তে ব্যাকট্রিয়া ও সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারলাভ করল। প্রথম খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে প্রথম খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শক ও পরে কুশানদের অভ্যুত্থান হল। ব্যাকট্রিয়া ও পাঞ্জাব তাদের অধিকারে এল। গ্রীকদের প্রতাপ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। কুশানদের প্রভাবেই ক্রমে ক্রমে গ্রীক-শিল্পের রূপান্তর ঘটল গান্ধার রীতির মধ্যে। এই রীতির প্রধান কেন্দ্র ছিল পেশোয়ারে।

বৌদ্ধমূর্তি শিল্পে এক নবজাগরণ এসেছিল গান্ধার রীতির মধ্য দিয়ে। এ রীতি যেমন ছিল চমকপ্রদ, তেমনি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আমদানী করা কতকগুলি নতুন কৌশলও প্রবর্তিত হয়েছিল এই রীতির মূর্তিতে। এমনিভাবে গান্ধার রীতির শিল্পীরা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের শিল্পে একটা বিশিষ্টতার ছাপ এনে দিয়েছিলেন। তাঁদের নিজস্ব রীতিতে তাঁরা প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

[পূর্ব আফ্রিকার অন্যতম দেশ "কেনিয়ার" স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে 'মাউ-মাউ' কথাটি জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে—যেমন আমাদের দেশে "কংগ্রেস"। যদিচ আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত অসহযোগ ও অহিংসার ভেতর দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছিল, কিন্তু কেনিয়ার সে দুর্গম পথের প্রথম দিকে ছড়িয়ে আছে কিছুটা হত্যা ও প্রতিহত্যা, রক্ত—আফ্রিকান ও ইউরোপীয়ানদের। যাঁরা এই সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা সবাই আজ মূক। যাঁরা রয়ে গেলেন এই জ্বলন্ত কাহিনীর সাক্ষীরূপে—কঠিন কারাদণ্ড এবং আরও অনেক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করবার পরও। "মাউ-মাউ বন্দী" একজন ভুক্তভোগী কেনিয়া আফ্রিকানের লিখিত সেই অস্থির দিনগুলির বিশেষ করে ১৯৫২ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যেকার বিস্তারিত কাহিনী।

লেখক মোয়াংগী কারিয়ুকি কেনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি কিকুয়ুদের এক যুবই সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল এক ইউরোপীয়ান চাষীর বিরাট খামারে কাটাবার পর লেখাপড়া করার জন্য কেনিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত উগান্ডা দেশে চলে যান, সেখানে বৃটিশ সরকার তখন সে দেশের নাবালক রাজার "হয়ে" তাঁর রাজত্বের দেখাশোনা করছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই যুবক কারিয়ুকির মন চঞ্চল হয়ে উঠে দেশের দুরবস্থার কথা ভেবে এবং তিনি মনে-প্রাণে নিজেকে সমর্পণ করেন কেনিয়ার সর্বপ্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা জোমো কেনিয়াট্টার চরণে, তাঁর কর্মী হিসাবে। ঘটনাচক্রে যেদিন কারিয়ুকি লেখাপড়ার শেষে উগান্ডা থেকে ট্রেনে কেনিয়ায় ফিরে আসেন, ঠিক সেই দিনই বৃটিশ সরকার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে দেশে "সংকটকালের" আইন জারী করেন—যার ফলে যে-কোন আফ্রিকানকে বিনাবিচারে আটক করবার ক্ষমতা তাদের হাতে বর্তায়। বেচারা কারিয়ুকি প্রাণ বাঁচাবার জন্য আত্মগোপন করেন তাঁর বিধবা মার কাছে পৌঁছবার আগেই। তারপর ধীরে ধীরে তিনি জড়িয়ে পড়েন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এবং কয়েক বছর কারাগারেও কাটাতে বাধ্য হন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি তাঁর গুরু জোমো কেনিয়াট্টার "নিজস্ব সহকারী"রূপে কাজ করেন কিছুদিন, তারপর ভার নেন "যুব-সংস্থা"র। সেখান থেকে উপমন্ত্রীর কাজ করে বর্তমানে তিনি দেশের সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

"মাউ-মাউ বন্দী" প্রথম প্রকাশিত হয় বিলেতে ইংরেজী ভাষায় ১৯৬৩ সালে। লেখক বইটির মূল রচনা করেন বিলাতের লেবার পার্টির স্বনামধন্যা কর্মী শ্রীমতী মারগারী পেরহ্যামের সাহায্যে—তাঁরই সুন্দর বাগানবাড়িতে স্নিগ্ধ তরুছায়ার তলে বসে।

এই বইটির রাশিয়ান ভাষায় তর্জমা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বাংলার অনুবাদক ডক্টর বিশ্বনাথ ঘোষ সরকারী কার্যোপলক্ষে কেনিয়ায় ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল অবধি কাটান। তারপর যান উগান্ডায় অবস্থিত "পূর্ব আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে" কৃষিযন্ত্র বিভাগে অধ্যাপনার জন্য ও সেখানে ১৯৬৮ অবধি কাজ করেন। উপস্থিত তিনি মিশরে বিশ্ব সংস্থার কাজে নিযুক্ত। পূর্ব আফ্রিকার প্রকাশকালীন সেখানকার বিষয় লিখিত অন্যান্য বই-এর ভেতর "মাউ-মাউ বন্দী" তাঁর মনে রেখাপাত করে ও তিনি লেখকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পান।]

প্রথম অধ্যায়

## সংকটের আগের দিনগুলো

আমি কেনিয়ার "কিকুয়ু"। আমাকে বৃটিশ সরকার স্বাধীনতার আগে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬০ সাল অবধি দেশের চৌদ্দটি রাজনৈতিক কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। সেই সময়কার অভিজ্ঞতা দিয়েই এই কাহিনী রচিত। এই কাহিনী লেখার মূলে নেই কোন রকম প্রতিহিংসার প্রেরণা বা তিক্ততা। আছে শুধু আমার আগে যা কেউ লিপিবদ্ধ করেনি—সেই ভয়াবহ, অথচ সত্য ঘটনাগুলি লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরা। আমার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে এইগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেনিয়ার প্রত্যেকটি উপজাতির ভাষার ভেতরেই এমন "মানিয়্যানি" বলে যে শব্দটি বিশেষভাবে মিশে গেছে, সেই "মানিয়্যানি" হলো কেনিয়ার সব থেকে বড় রাজনৈতিক বন্দিশালার নাম। এতে একসময় আমাদের মত ৩০,০০০ হতভাগ্য লোক একসঙ্গে বন্দিজীবন কাটিয়েছে। এখনকার আফ্রিকানদের রাজনৈতিক মনোভাব ঠিকমত বুঝতে হলে ঐ সময়কার আশি হাজারেরও বেশী বন্দীদের জীবনের কিছুটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রথমেই পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর সেই উদ্দেশ্যেই এই কাহিনীর অবতারণা। এ ছাড়া অবশ্য এই দুর্দিনের কথা লেখবার আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। এখনও আফ্রিকার যে সব জায়গায় ঔপনিবেশিক রাজত্বের ভয়াবহ চাপ জারি আছে, সেখানকার হতভাগ্য ভাইবোনেরা যদি এই কাহিনী পড়ে একটুও অভিজ্ঞতা লাভ করে বা পায় একটু সমবেদনা, তা হলেই এ

কাহিনী বলা আরম্ভের সর্বপ্রথমেই আমার নিজের জীবনের ও এমারজেন্সির (সংকটের) আগের দিনের বিষয় কিছুটা বলে নিলে আমার মতে বক্তব্যটি পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে।

আমার জন্ম হয়েছিল ১৯২৯ সালের ২৯শে মার্চ, কেনিয়ার বিখ্যাত রিফ্‌ট ভ্যালি প্রদেশের বাহাটি জঙ্গলের কাছে "কাবাটি-ইনি" নামক গ্রামে। আমার জন্মের এক বছর আগে আমার মাতা-পিতা তাঁদের "নেয়েরী" রিজার্ভের অন্তর্গত "চিঙ্গা" গ্রাম ত্যাগ করে "মুটুরী" নামক একজন ইউরোপী-য়ানের ফার্মে আসেন ও "স্কোয়াটার" হিসাবে বসবাস আরম্ভ করেন। এইখানে আফ্রিকান রিজার্ভ সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। কেনিয়া বৃটিশ সরকারের পদানত হবার পর দেশটাকে একটা ইউরোপীয়ান উপনিবেশ হিসেবেই গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল ও বহু সংখ্যক ইউরোপীয়ানকে অনেক সুবিধার লোভ দেখিয়ে এদেশে এনে বসবাস করতে সাহায্য করা হয়েছিল। যে সমস্ত জায়গাগুলি কৃষিকর্মের পক্ষে সুবিধাজনক সেগুলি অবশ্য ইউরোপী-য়ানদের দেওয়া হয় এবং সেই জন্য দেশের সেরা জায়গাগুলি কেবল সাদাদের জন্য রেখে দিয়ে বাকি যেখানে আফ্রিকানদের বসবাস বেশী, সেগুলি "আফ্রিকান রিজার্ভ" নামে অভিহিত করা হয়। এই নামকরণের ফলে আফ্রিকানরা শুধু তাদের রিজার্ভের ভেতরই স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারত। এক রিজার্ভ থেকে অন্য রিজার্ভে যেতে হলে জেলা শাসকের অনুমতির প্রয়োজন হত। যাক, এ বিষয় পরে আবার বিশদ বিবরণ দেবার ইচ্ছা রইল।

কিকুয়ু ভাষায় "মুটুরী" শব্দের অর্থ হল কারিগর এবং এই ইউরোপীয়ান চাষার অসাধারণ কারিগরী ক্ষমতার ফলেই তার ফার্মে অবস্থিত আফ্রিকান স্কোয়াটাররা তাকে ঐ নামে অভিহিত করত। এ ছাড়া তার যা আসল নাম তা আমি কোনদিন শুনি নি। ইউরোপীয়ান ফার্মে আফ্রিকান "স্কোয়াটারদের" চাষবাসের জন্য সামান্য একটু জমি ও কিছু সংখ্যক ছাগল-ভেড়া-গরু রাখবার অনুমতি দেওয়া হত এবং তার বদলে তারা সপরিবারে মালিকের প্রয়োজনমত তার ফার্মে জন খাটত। তারা মাইনে হিসাবে যা পেত তা নেহাতই সামান্য এবং বলা বাহুল্য যে, এই বন্দোবস্তের সব অসুবিধাটুকু ভোগ করত আফ্রিকান স্কোয়াটাররা। কিন্তু অসহায় আফ্রিকানদের আর্থিক চাহিদা মেটবার জন্য যে সময় এই অসুবিধা ভোগ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অন্য সব কিকুয়ু ও নায়ানজে আফ্রিকান উপজাতিদের মত আমার মাতা-পিতাও এই বন্দোবস্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের পক্ষে আর একটি অসুবিধার কারণ হল : কফি, চা ও পাইরিথ্রাম নামক ফসল আফ্রিকান রিজার্ভে ফলান ন্যায়বিরুদ্ধ এবং এক-মাত্র এই সব ফসলই বিক্রি করতে পারলে টাকা (শিলিং) পাওয়া যেত। যে সমস্ত ইউরোপীয়ান ফার্মে আফ্রিকানরা স্বেচ্ছায় গিয়ে স্কোয়াটারের জীবন স্বীকার করে নিতো, তাদের এক-একটির আয়তন অনেক ক্ষেত্রেই এক-একটি আফ্রিকান রিজার্ভের বেশী। একটি আফ্রিকান রিজার্ভে হয়ত ষাট হাজারের বেশী লোক একসঙ্গে কষ্টে জীবন যাপন করার চেষ্টা করতো, আর হয়তো তার থেকে বেশী আয়তনের ফার্মের মালিক একজন মাত্র ইউরোপীয়ান।

আমাদের পাঁচজন ভাইবোনের মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র ভাই, আমার আগে দুই ও পরে দুই বোন। আমার ঠিক পরের ওয়াংগেচি নামের বোনটি অবশ্য তিন বছর বয়সেই মারা যায়। কিন্তু আমার অন্য তিন বোনই এখন বিয়ে-থা করে নিজের নিজের সংসার করছে। আমার মা, মেরি ওয়ানজিকু মুটুরীর ফার্মে আসার সময় তাঁর বৃদ্ধ বাবাকে চিঙ্গা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আমার দাদু গুকা মুগো ওয়াবিরা ছিলেন উচ্চতায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি এবং সেই অনুপাতেই ছিল তাঁর দেহের পরিধি। কেনিয়ায় বৃটিশের আগমনের আগে তিনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা বলে পরিচিত ছিলেন এবং তখনকার প্রথা অনুযায়ী গরু, ছাগল ও নারীহরণ উপলক্ষে যে লড়াই হত, তাতে তিনি কখনও কিকুয়ু এবং কখনও মাসাই উপজাতির হয়ে যুদ্ধ করেছেন। এইসব লড়াইতে তাঁর সেনাপতি ছিলেন মুগো ওয়ানডিগা নামক এক বিখ্যাত কিকুয়ু, যাঁর কথা ইউরোপীয়ান লেখক জন বয়েসের (জোন বয়েজ) "অগি-কিয়ুর রাজা" (কিং অফ দি অগিকিয়ু) নামক বইতে আছে। আমার দাদু মুটুরীর ফার্মে আসার সময় তাঁর প্রায় চার হাজার ভেড়া ও ছাগলের অর্ধেক সঙ্গে করে এনেছিলেন। এই দু' হাজার ভেড়া-ছাগল রাখা ছিল ফার্মের নিয়মের বাইরে, কিন্তু তাদের অন্য সমস্ত স্কোয়াটারদের ভেতর কৌশলে বিলিয়ে দেওয়ার ফলে এই নিয়মভঙ্গের অপরাধ কোনদিনই মুটুরীর চোখে পড়ে নি। মুগো ওয়া-বিরার মৃত্যু হয় ১৯৪৭ সালে এবং তাঁর মৃত্যুতে আমরা বৃটিশের আগেকার সময়ের একজন বিখ্যাত আফ্রিকানকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি।

কিকুয়ু উপজাতির মুংগারী বংশের অধীনস্থ মাহিষ বংশের (মাবারী য়া মবোগো) অধস্তন পুরুষ আমরা, যাদের কর্মক্ষমতা, বৈবাহিক নিয়মানুবর্তিতা ও অতিমাত্রায় শর্করাজাতীয় খাদ্যের প্রতি লোভ বংশপরম্পরায় সুবিদিত। আমাদের বংশের স্থাপিকা মুংগারীর মার নাম ছিল ওয়ানগারী। ইনি কিকুয়ু উপজাতির জনক গিকিয়ু ও জানকী মুম্বির নয় কন্যার একজন ছিলেন। এই নয় কন্যাই কিকুয়ু উপজাতির নয় বংশের স্থাপিকা। গিকিয়ু ও মুম্বির আদি বাসস্থান ছিল "মুকুরওয়ে—ইনি য়্যা গাথানগা" নামক জায়গায়, যেখানে তাঁরা ভগবানের ইচ্ছায় প্রেরিত হয়েছিলেন। কিকুয়ু উপজাতির ভগবানের (মোওয়েনে নেয়াগা) অধিষ্ঠান ১৯০০০ ফিটেরও বেশি উঁচু মাউন্ট কিরিনয়াগা বা মাউন্ট কেনিয়ার হিম-শীতল বরফের চূড়ায়। পূর্ব আফ্রিকার অন্য সব উপজাতিদের মত কিকুয়ুদের ভেতরও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, পূর্বকালে আমাদের উপজাতিকে শাসন করতেন নারীরা। পুরুষেরা অবশেষে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং একই সময় নিজ নিজ স্ত্রী ছাড়াও যতগুলি সম্ভব নারীকে ছলে-বলে-কৌশলে সন্তান-বতী করে তোলেন। ফলে যখন সমস্ত নারীজাতি স্বাভাবিক নিয়মবশে ভাবী সন্তানের আগমনের প্রাক্কালে দেহভারে জর্জরিতা, সেই সময় পুরুষেরা জোর করে শাসনক্ষমতা নিজেদের হস্তগত করে নেন। অন্যান্য উপজাতিদের মত আমাদের ধমনীতেও কিছু পরিমাণ মাসাই রক্ত প্রবাহিত। কারণ পুরাকালের প্রথানুযায়ী গরু, ছাগল, ভেড়া হরণের সময় বিজিত উপজাতির নারীদের হরণ ও পরে তাদের সন্তানবতী হওয়া স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত ছিল।

আমার পিতা কারিয়ুকি কিগেনি, ১৯৪০ সালে আমাদের আদি বাসস্থান চিঙ্গায় তাঁর দ্বিতীয় নববিবাহিত যুবতী বধূ গাথোনিকে নিয়ে বসবাস করতে যান এবং আমার মা ও আমরা সব ভাই-বোনেরা রিফ্‌ট ভ্যালিতে মুটুরীর ফার্মেই থেকে যাই। আমার মা তারপর জাকারিয়া নডংগুর সঙ্গে ঘর করতে যান ও আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে যান। জাকারিয়া আমাকে তাঁর পুত্র বলে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেন। তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী প্রিসিলা ও তাঁর গর্ভজাত পাঁচ কন্যাকে নিয়ে নজোরো শহরের কাছে অবস্থিত কাঠের গোলায় বাস করছেন। আমার মার জাকারিয়ার সঙ্গে একত্র বসবাস করার সময় থেকেই আমি তাঁকে নিজ পিতার মতই সম্মান করেছি এবং এখনও যথাসম্ভব তাঁর দেখা-

শোনা করি। আমার নিজ পিতা ক্যারিয়ুকির সঙ্গে আমার আর কখনও চাক্ষুষ দেখা হয় নি। তিনি চিঙ্গায় ফেরবার পর তাঁর জীবনের শেষ ছয় মাস কাল পাগলের মত ঘোরাঘুরি করে ১৯৪০ সালে দেহত্যাগ করেন। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, আমাদের বংশের অন্য কয়েকজন লোক আমার পিতার ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হাতুড়ে ডাক্তারকে (উইচ ডাক্তার) দিয়ে তাঁকে পাগল করে দেন। আমার দুই দিদি, ন্যায়িকিও এবং নজোকি পিতার শবদেহের সংকারের বন্দোবস্ত চিঙ্গাতেই করেন। আমার মা আমাকে চিঙ্গায় গিয়ে পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনরকম খোঁজখবর করা থেকে নিরস্ত করেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, আমার ওপরও হয়তো ঐরকম নৃশংস আচরণ করা হবে এবং তিনি আরও বলেন যে, আমি তখন এই রকম এক বিপদসংকুল কাজে যাবার মত বড় হই নি।

আমার সাত বছর বয়স অবধি আমি তখনকার অন্য সব কিকুয়ু বালকদের মতই জীবনযাপন করি। তাদের মত আমি রাখাল বালকের কাজ করেছি, আমার দাদু ঠাকমাদের কাছ থেকে কিকুয়ু সমাজের জনশ্রুতি শুনে শুনে আমাদের সামাজিক নিয়মকানুনগুলি শিখেছি আর আমার বয়োজ্যেষ্ঠদের নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি। চুরি করে অনেক আখ ও ভুট্টা ক্ষেত থেকে এনে খেয়েছি এবং আমার দুই দিদি ও তাদের বান্ধবীদের স্নেহপরিবৃত হয়ে যথেষ্ট পরিমাণে অনুচিত ও গর্হিত কাজকর্ম করে উচ্ছন্নেও গেছি। আমার সবচেয়ে প্রিয়বস্তু ছিল আমার দাদুর হাতে-তৈরি সূচীকর্ম করা একটি ছাগলের চামড়ার বহির্বাস বা ক্লোক। এই বহির্বাস পরবার সুবিধা এই ছিল যে, সেটি গায়ে থাকা অবস্থায় কেউ আমাকে ধরতে চেষ্টা করলে শুধু বহির্বাসটিই তার হাতে থেকে যেত আর আমি পালিয়ে যেতে পারতুম তার ভেতর থেকে। কয়েকবারই আমার দুষ্কর্মের জন্য কেউ আমাকে ধরতে এলে তাকে এইভাবে আমি ফাঁকি দিয়েছি।

১৯৩৬ সালে আমার সাত বছর বয়সে মুটুরী আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাকে তাঁদের রান্নাঘরের সহায়কের পদে নিযুক্ত করাতে মার আপত্তি আছে কি না। মুটুরী বলেন যে, অন্যান্য আফ্রিকান বালকদের অপেক্ষা আমার ইউরোপীয়ন ভীতির অভাব দেখেই তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। আমার মাইনে ছিল প্রতি মাসে তিন শিলিং (দুই টাকার মত) ও আমার খাওয়া। এ ছাড়া প্রতি শনিবার মুটুরীর স্ত্রী আমাকে অল্পকিছু চিনি ও লবণ আমার মাকে দেবার জন্য দিতেন। আমার সেই ছাগল চামড়ার বহির্বাসটি মুটুরীর বাড়িতে পরা নিষিদ্ধ ছিল এবং তার বদলে মুটুরী আমাকে একজোড়া হাফপ্যাণ্ট ও একটা শার্ট কিনে দেন। প্রথম প্রথম এই হাফপ্যাণ্ট পরে থাকা আমার পক্ষে এক বিষম দুঃসাধ্যকর জিনিস ছিল, বিশেষ করে যখন প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ ঘরে ছুটতে হতো। যতদূর সম্ভব এই প্রয়োজন বোধের বহু পূর্বেই আমি নিজেকে এই হাফপ্যাণ্টের কবল থেকে মুক্ত করে গন্তব্য স্থানের দিকে ছুট দিতাম। আমার কাজ ছিল বাসনপত্র ধোয়া, তিনটে পোষা কুকুর ও তিনটে বেড়ালের দেখাশোনা করা এবং হাঁস-মুরগীর পালকে খাবার-দাবার দেওয়া। সবথেকে ছোট কুকুরটি আমার বিশেষ আদরের ছিল এবং আমরা তাকে নাম দিয়েছিলাম "মাথা", যার শোয়াহিলিতে অর্থ হল গোদ (এলিফ্যানটাইয়াসিস)। কারণ মাথার পাগুলি ছিল ছোট, মোটা ও নরম। সবথেকে বড় কুকুরটার নাম ছিল "কুরমি"। তার গায়ের চামড়ায় কয়েকটা চিতাবাঘের মত গোল গোল দাগ ছিল এবং স্বভাবেও সে ছিল চিতাবাঘের মত হিংস্র ও খ্যাঁকখ্যাকে। কিকুয়ু ভাষায় একটি প্রচলিত গল্প আছে যে, চিতাবাঘের বাচ্ছারা যখন খুব ছোট থাকে তখন তাদের মা তাদের ফেলে রেখে চলে যায়, তারপর খানিক পরে আবার হঠাৎ করে ফিরে আসে ও তার নিজের বাচ্ছাদেরই খ্যাঁক খ্যাঁক করে ভয় দেখায়। যে বাচ্ছাগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় তাদের বলা হয় কুরমি : আর যারা ভয় না পেয়ে বীরবিক্রমে লড়াই করার জন্য এগিয়ে যায় তারাই বড় হয়ে চিতাবাঘ হয়। আমাদের কুরমির অবশ্য চিতাবাঘের অনেক খারাপ ও হিংস্র ভাবই বর্তমান ছিল।

মুটুরীর রান্নাঘরে আমার ওপরওলা ব্যক্তির নাম ছিল বেনসন* (আফ্রিকান), সে ছিল মুটুরীর প্রধান পাচক। আমি অনেকবার অবাক হয়ে বেনসনের অতি গরম খাবার নির্বিচারে গলাধঃকরণের ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে দেখেছি এবং আমার মনে হয়েছে যে, তার গলার চামড়া নিশ্চয়ই ঝলসে গিয়ে গরম বোধশক্তির বাইরে চলে গেছে। সে ছিল খুব ভাল রাঁধিয়ে। একরাত্রে মুটুরীর কয়েকজন অতিথি রাত্রিভোজের পর বেনসনের সুস্বাদু রান্নার প্রশংসা করেন ও তাকে অভিনন্দিত করার জন্য দেখতে চান। কেনিয়া এবং অন্যান্য সব দেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের পাচকের সঙ্গে বেনসনের এ বিষয় একমত যে, মালিকের খাবার থেকে কিছু অংশ নিজের উদরস্থ করাটা নিয়মবিরুদ্ধ বা দূষণীয় নয়। সেদিন রাত্রে সে যখন নিশ্চিন্ত মনে রান্নাঘরে বসে একটি খুব গরম রোস্টেড ছাগলের ঠ্যাং-এর সদ্ব্যবহার করছিল, সে সময় হঠাৎ শুনতে পেলো তার মনিবের ভারী পায়ের আওয়াজ—যদিও তার আগের অনেক দিনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মনিবের তখন আরামকেদারায় বসে কফি-পানের কথা। চুরি করা মাংসের টুকরা কোথায় তাড়াতাড়ি লুকোবে তা ঠিক করতে না পেরে বেচারা শেষকালে পুরা ঠ্যাংটা তার মাথার ওপর রাখে এবং তাড়াতাড়ি তারই ওপর তার ধবধবে সাদা বড় পাচকের টুপিটা পরে নেয় মাংসটাকে ঢাকা দেবার জন্য। গরম মাংসের তাপ তার মাথার খুলি ভেদ করে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল এবং বেচারা অতি কষ্টে মুটুরীর অতিথির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রশংসা-বাণীগুলো হজম করে চলেছিল। এমন সময় দৈবের দুর্বিপাকের মতই সে টের পেল যে, তার মাথার ওপর অবস্থিত মাংস থেকে গরম ঘিয়ের ফোঁটা তার গাল বেয়ে চুইয়ে পড়ছে। মুটুরীর একজন অতিথিরও সেটি চক্ষুগোচর হয় এবং তিনি অস্ফুট আর্তনাদ করে বলে ওঠেন মুটুরীকে যে, তার কর্মঠ পাচক এই শীতের রাতেও এত ঘামছে। শুধু তাই নয়, তিনি দয়াপরবশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পকেট থেকে ধবধবে সাদা রুমাল বার করে এগিয়ে গেলেন বেনসনের গালের ঘাম মুছে দিতে। রুমালের চাপে বেচারার মাথার টুপি গেল বেসামাল হয়ে এবং সুন্দর কার্পেটের ওপর হতবাক মুটুরী ও তাঁর অতিথিদের সামনে ঝুপ করে পড়ল বেনসনের মাথাস্থিত ছাগলের ঠ্যাং! কিছুক্ষণের জন্য সবাই নিশ্চল! তারপর বেচারা বেনসনই প্রথম নিচু হয়ে ঠ্যাংটি তুলে নিয়ে তার রান্নাঘরের দিকে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল। অতিথিরা চলে যাবার পর মুটুরীর ক্রোধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। তার কারণ এই নয় যে, বেনসন মাংস চুরি করেছিল বলে—তার কারণ হল অতিথিদের সামনে মুটুরীর অসম্মান। তারা বুঝে গেল যে, চাকর-পাচকদের মুটুরী যথেষ্ট মাইনে দেয় না বলেই তারা নিজেদের উদরপূরণার্থে এই রকম কারসাজীর সাহায্য নেয়। মুটুরীর ফার্মে অবস্থিত সবাই এই ব্যাপারটি জানতে পারে ও অনেকদিন

---

* এই বইয়ের অনেক অংশে এমন কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বিষয় হয়ত আমি বিরুদ্ধভাবে লিখেছি। সেজন্য তাদের আমি একটা ছদ্মনামে অভিহিত করেছি। বাকি সব নামই আসল। —লেখক।

অবধি ঘটনাটি সবাইকে হাসির খোরাক যোগায়।

মটুরী ও তাঁর স্ত্রীকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। তাঁরা আমাকে স্নেহ করতেন, খেলবার জন্য জিনিস ও ছবির বই দিতেন। তাঁরা আমার মাকেও যথেষ্ট সাহায্য করতেন। শুধু এই ভেবে এখন আমার আক্ষেপ হয় যে, তাঁরা আমাকে লেখাপড়া শেখবার জন্য কোনরকম উৎসাহ দেন নি বা এর প্রয়োজনীয়তাও বুঝিয়ে দেন নি।

১৯৩৮ সালে একদিন ওবাডিয়া মন্নানকি নামে আমার মার এক আত্মীয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি নেয়েরী শহরের চার্চ মিশনারী সংস্থার দ্বারা চালিত এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর সুন্দর চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়, পালিশ করা জুতা, হাত-ঘড়ি ও নতুন ঝকঝকে সাইকেল আমাকে অত্যন্ত পরিমাণে আকৃষ্ট করেছিল। আমি তখনই মনস্থির করে ফেলি যে, আমাকেও যে কোন প্রকারেই হোক না কেন, এই রকম একটা সাইকেল জোগাড় করতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার ধারণা হল যে, এই আর্থিক সচ্ছলতার মূলে এসেছে তাঁর বিদ্যা বা জ্ঞান এবং এই দেখে আমারও লেখাপড়া শেখার খুব আগ্রহ হয়। আমার মা এই সময়—প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে লেখাপড়া শেখার জন্য ইভানসন নগামাও নামে এক কিকুয়ুর দ্বারা পরিচালিত সান্ধ্য-ক্লাশে যোগদান করেন। তিনি নিজের নাম লিখতে ও এক থেকে দশ অবধি গুণতে শিখেছিলেন। যদিও এর থেকে খুব বেশি উন্নতি তাঁর হয় নি, তবুও এটাই আমার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক বলে মনে হত এবং আমি তাঁকে এই নবলব্ধ জ্ঞান আমাকে দান করার জন্য হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করি। মা আমাকে একটি শেলট ও পেন্সিল কিনে দেন ও দিনান্তে কাজের পর আমরা দুজনে এক সঙ্গে পাঠাভ্যাস করতাম। মটুরীর বাড়িতে আমার সর্বক্ষণের চেষ্টা ছিল সমস্ত জিনিসপত্রের ইংরাজী নামগুলো জানবার ও পড়বার।

ওবাডিয়ার আগমনের প্রায় দু' মাস পরে আমার মা আমাকে কাজ ছেড়ে দিয়ে ইভানসনের দিবা স্কুলে ভর্তি হতে বলেন। তিন মাসের একটি "টার্মের" জন্য মাহিনা ছিল পনেরো সেণ্ট (প্রায় দশ নয়া পয়সা)। মটুরী তার নিজের পয়সায় স্কুলটি তৈরি করিয়ে দেন, আর ছাত্রদের মাইনে থেকে আসতো মাস্টারদের ভরণপোষণের অর্থ। আমি এগার বছর বয়সে প্রথম ইভানসনের স্কুলে যোগদান করি ও শীঘ্রই ক্লাসের সেরা ছাত্র হয়ে উঠি। মটুরীর বাড়িতে কাজ করার ফলে আমার সাধারণ জ্ঞানও ছিল অন্যান্য ছাত্রদের থেকে অনেক বেশি, যেমন প্যাণ্ট, শার্ট ইত্যাদির ব্যবহার, হাত-পায়ের নখ পরিষ্কার রাখা আর লিখতে পড়তে তো আমি মার কাছে আগেই কিছুটা শিখেছিলাম। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা আমার থেকে সব বিষয়েই অনেকটা পিছিয়ে ছিল। আমরা প্রায় চল্লিশজন একসঙ্গে পড়তাম আর আমাদের শেখান হত গান, নাচ, আঁকা, এক দুই গোণা, অক্ষর পরিচয় ইত্যাদি। সব দিক থেকে ঐ স্কুল একেবারে আদর্শনীয় না হলেও সেখানকার তিন বছরের অভিজ্ঞতা আমায় পরবর্তী জীবনে খুবই সাহায্য করেছে।

১৯৩৯ সালের বিশ্বযুদ্ধ মটুরীর ফার্মে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এক বছর পরে কিন্তু বিশেষ জনরব ছড়িয়ে পড়ে যে, ইউরোপ থেকে হিটলার নামক একজন লোক আমাদের সবাইকে হত্যা করতে আসছে এবং অনেকেই এই ভয়ে ভীত হয়ে নদীর ধারে সুবিধামত জায়গায় গর্ত খুঁড়ে রাখে, যাতে কিনা তার মধ্যে লুকিয়ে তারা হিটলারের ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। শেষের দিন অবধিও বৃটিশ সরকার মটুরীর ফার্ম থেকে সিপাহী সংগ্রহ করে নি; খাওয়া-দাওয়ার জিনিসেরও বিশেষ কোন অকুলান ঘটে নি এবং এই মহাযুদ্ধের আসল কারণ সম্বন্ধে ফার্মের কোন আফ্রিকানই বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিল না। ইভানসনের স্কুল ছাড়বার পর কেনিয়ার কয়েকটি স্কুলে আমি লেখাপড়া শিখি, কিন্তু সব থেকে সমস্যাজনক হয়ে উঠেছিল স্কুলের ক্রমবর্ধিত মাইনে যোগান। আমার লেখাপড়া শেখার মায়ের খুবই উৎসাহ ছিল এবং তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব আমার জন্যই খরচ করতেন, যার ফলে প্রায়ই তাঁর খাবার এবং আমার বোনেদের পরনের কাপড় জুটতো না। আমার মায়ের কয়েকটি "ওয়াটল" গাছ (পাইন জাতীয়) ছিল এবং আমি তার গায়ের খোলস ছাড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে আসতাম। এই ছাল থেকে নিঃসৃত রস জন্তু-জানোয়ারের চামড়া ট্যানিং-এর কাজে লাগে। ১৯৪১ সালে আমি বাহাটি জঙ্গলের এক স্কুলে যোগদান করি; এখানকার প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল জেমস গিটেনি, তিনি কিয়াম্বু অঞ্চলের এক মিশনারি সংস্থায় লেখাপড়া শেখেন ও খুব অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই স্কুলের ব্যবস্থাপনার ভার ছিল "স্বাধীন কিকুয়ু শিক্ষা সংস্থার" (কিকুয়ু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্কুল এ্যাসোসিয়েশন) হাতে, যেটি গড়ে উঠেছিল ১৯২৯ সালে স্কটল্যাণ্ড চার্চ মিশনের ডক্টর আর্থারের সঙ্গে আফ্রিকান মেয়েদের সুন্নত করার ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হবার পর স্বাধীনচেতা কিকুয়ু নেতাদের দ্বারা। এ ছাড়া অবশ্য "কিকুয়ু কারিঙ্গা শিক্ষা সংস্থা" নামক আর একটি দল তৈরি হয় এবং এই দুই দল মিলে তখনকার আফ্রিকান-ব্যবস্থিত শিক্ষাসদনগুলি চালু রেখেছিল। এই স্কুলগুলি সংকটের সময় সরকারের তরফ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, কিন্তু তার আগেই অনেক আফ্রিকান ছাত্র-ছাত্রী এদের সাহায্যে শিক্ষালাভ করে, যারা হয়ত কোনদিনই কেবলমাত্র সরকারী কমিশন সংস্থাগুলির সাহায্যে শিক্ষিত হতে পারত না। আমাদের এখনকার অনেক রাজনৈতিক নেতাই এক সময় এই দুই সংস্থার সাহায্যে শিক্ষালাভ করেন। জেমস গিটেনি এই স্কুলের শিক্ষকের পদ বেছে নেন, কারণ এখানকার মাহিনা যে কোন মিশনারী স্কুলের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

কেনিয়ায় স্কুল স্থাপন ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথমে মিশনারীরাই চালু করেন এবং এর ফলে ধর্ম প্রচার ও শিক্ষার যোগাযোগ বরাবরই সুদৃঢ়। বাহাটির এই স্কুল স্বাধীন আফ্রিকান পেণ্টিকোস্টাল চার্চের অধীনস্থ ছিল, যার স্থাপনা করেন জোহানা কুনহিয়া নামে এক নেয়েরী অঞ্চলের প্রসিদ্ধ আফ্রিকান নেতা। ইনি ১৯৬১ সালে বৃটিশ সরকারের এম. বি. ই. পদবী পান। রিফট ভ্যালি অঞ্চলে এই চার্চের প্রতিনিধি ছিলেন পেটরো মচান গারিবা, তিনি প্রায়ই আমাদের স্কুলে ধর্মপ্রচারের জন্য আসতেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক বক্তা এবং প্রায়ই ইউরোপীয়ানদের দ্বারা আফ্রিকান জমি হরণ ও সাদা এবং কালো মানুষদের ভেতর প্রভেদ-নীতির বিষয় বক্তৃতা দিতেন। সংকটের সময় পেটরোকেও বন্দী জীবনযাপন করতে হয়। এই সময় অবশ্য আফ্রিকান জনসাধারণ রাজনীতি বড় একটা বুঝত না, যদিও রাত্রে কুঁড়েঘরে ধোঁয়ার ভেতর বসে আমরা আমাদের জমি হরণের কথা আলোচনা করতাম।

[ক্রমশ]

হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল।

কান খাড়া করল অমল—শব্দটাকে বোঝার জন্যে।

হুঁ, ঠিকই। শব্দই তো একটা। গোঁ গোঁ করছে। বড্ড গম্ভীর। কান দুটোকে আরও একটু সতর্ক করলো। শব্দটা বাইরে। দূরেও। অনেক দূরে। কিন্তু, সেই দূর থেকে ক্রমে এগিয়ে আসছে কাছে। বড্ড কাছে। বুকের মধ্যে ভয়ের টিপটিপিনি শুরু হলো। আশংকা আর আতঙ্কে শিউরে উঠলো অমল। উপায়? এখনই তো প্রলয় ঘটে যাবে। হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সব। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখন তা হলে কি করবে সে?

ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়।

সবাই ঘুমুচ্ছে। রাত নিশুতি।

এখন সময় কত? ক'প্রহর হলো?—কিছুই ঠাহর করতে পারল না। ডাকবে? ডাকবে পাড়ার সকলকে—যারা সারাদিনের রক্তজল-করা পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে ঘুমুচ্ছে? অমলের মতো আর কারো কি ঘুম ভাঙে নি? এখনও কি আর কেউ টের পায় নি তার মতো—কত বড় একটা বিপর্যয় ঘটতে চলেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে!

সকালের খবরের কাগজে এমনি একটা বিপদের সম্ভাবনার কথা ছিল 'আবহাওয়া-বার্তা'র কলমে। হ্যাঁ, সেটা পড়েছিল অমল। রেডিওতেও বেশ অনেকবার এই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল—'স্পেশাল ওয়েদার বুলেটিন'-এ। তা-ও শুনেছিল সে। তারপর প্রত্যেকবারই মনে মনে হেসেছিল—'হাওয়া অফিস'-এর ফোরকাস্ট তো!

কিন্তু তাদের সেই পূর্বাভাস ব্যর্থ হলো না এবার। তাই ফুঁসে এগিয়ে আসছে শব্দটা।

শব্দ নয়, ঝড়।

প্রচন্ড বেগে একটা প্রলয়ংকর ঝড় এগিয়ে আসছে ক্রমে তাদের গাঁ-এর দিকে। তারই শব্দ শুনতে পাচ্ছে অমল। হয়তো আর কিছুক্ষণ—কিছুক্ষণ পরেই ঐ দামাল ঝড়টা এসে সশব্দে ভীষণ জোরে ধাক্কা মারবে এই সব ঘুমন্ত কুঁড়েগুলোর ওপর। তারপর—

তারপরই মড়মড় করে ভেঙে পড়বে কুঁড়েগুলো—উড়ে যাবে খড় আর টালির চাল। তার সঙ্গে যদি বৃষ্টি হয়—সব ভিজিয়ে ভাসিয়ে দেবে। তখন? ঘুমের মধ্যে কত জন ঘর চাপা পড়বে। মরবে। হয়তো টের পাবে, কিংবা পাবে না। তারপর?

তারপর আর ভাবতে পারে না অমল।

নিশ্চিহ্ন হওয়া একটা গোটা গাঁ-এর ছবি ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। সেই সঙ্গে অসংখ্য মৃত মানুষের শবদেহ—অসংখ্য মানুষের আর্ত পরিত্রাহি চিৎকার। কান্না—

ভয়ে চোখ বন্ধ করে, দু' হাতে দুটো কানই চেপে ধরে সে।

শব্দটা অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে।

গোঁ গোঁ করে ফুঁসছে—ক্ষ্যাপা হাতীর মতো।

টিম্‌টিম্ করে টেঁপিটা জ্বলছে ঘরের এক কোণে। তেল বোধ হয় কমে এসেছে। না কমলেও বা কি! আর কিছুক্ষণ পরেই তো ওকে নিভে যেতে হবে ঝড়ের দাপটে।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে যেন শব্দ হলো। তবে কি—

বিছানায় বসেই ঘরের বেড়ায় আর খুঁটিতে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো ঘরটা নড়ছে কি না। নড়ে উঠলেই সর্বনাশ।

ঠিক বোঝা গেল না।

পাশে তাকাল। তিন মাসের কচি-বাচ্চাটাকে কোলের কাছে নিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে তার বৌ। ধাক্কা দিলো বৌকে। সে টেরও পেল না। গাঢ় ঘুমের মধ্যে ডুবে আছে এখনও। সারাদিন সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম করে বড়ই ক্লান্ত। তারও পর কোলের বাচ্চার ঝক্কি! ঘুম আর মরণ—দুই-ই এখন ওর এক! তার বুকের মধ্যে গুটিশুটি হয়ে বাচ্চাটাও ঘুমে অচৈতন্য। তাহলে?

শব্দটা এবার এগিয়ে এসেছে কাছে। গাছের সব পাতাগুলো ঝড়ের দাপটে ঝটপট করে চেঁচামেচি শুরু করেছে। ওরা ভয় পেয়েছে যেন। টালির চালে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার শব্দও শোনা গেল। ঝড়ের ধাক্কায় মচ্‌মচ্ করে উঠলো বেড়াটা। না, না! আর তো দেরি করা যায় না। যা করবার এখনই করে ফেলতে হবে—এই মুহূর্তে! সময় নষ্ট করা যাবে না আর এক তিলও।

দু' হাতে বৌকে ধরে ঝাকুনি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো অমল—এই, ওঠো—ওঠো এখনই।

কাঁথা জড়িয়ে বাচ্চাটাকে নিজের কোলেই তুলে নিলো অমল। এক হাতে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলো নিবিড় করে। আর এক হাতে বৌকে ঠেলতে লাগলো—ওঠো, ওঠো। উঠে পড়! আর ঘুমুলে মরতে হবে। তাড়াতাড়ি কর—

আর একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘরটা যেন দুলে উঠলো। দিশেহারা হয়ে পড়ল অমল। ছুটে গিয়ে এক হাতেই তাড়াতাড়ি করে কোন রকমে খুলে ফেললো ঘরের দরজা। খুলে ফেললো সদর।

বাইরে বেশ বৃষ্টিও হচ্ছে ঝড়ের সংগে। মাতামাতি করছে গাছপালা। ওরাও ভয় পেয়েছে। ভীষণ ভয়। এখনো কি করে ঘুমুচ্ছে বৌটা! আশ-পাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকায়। ঐ সব বাড়ির লোকগুলোও কি ঘুমুচ্ছে তার বৌ-এর মতো? ঝড়-বৃষ্টির আওয়াজে কোন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। এমন কি ওরা যে জেগেছে, তেমন কিছুও তো টেরও পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে কি, অমলের মতো এই ঝড়কে ওরা ভয় পায় না! এই ঝড়ের দাপটে ওদের ঘর কি ভেঙে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই! খুঁটিগুলো কি ওদের যথেষ্ট মজবুত! হতেও পারে। সত্যিই তো, ওরা তো অমলের মতো নয়। ঘরগুলোকে ওরা বেশ মজবুত করেই বানিয়েছে। প্রয়োজন হলে বছর বছর সংস্কার করে। মজবুত রাখে। কিন্তু অমল? না, সে হাজার চেষ্টা করেও পারে না। খালি ভাবে—ঘরগুলোকে মজবুত করতে হবে। পুরনো বাঁশ-খুঁটিগুলো বদলাতে হবে। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাতে হবে তার এই ঘরকে। কিন্তু পারে না। কিছুতেই পেরে ওঠে না তার ভাবনাকে কাজে পরিণত করতে।

শুধু ঘরের ব্যাপারেই নয়। আরও অনেক কিছুর বেলাতেও তাই হয়েছে—হয়ে আসছে। কত কিই তো ভাবে সে—কিন্তু কিছুই তো আর করা হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত। এই তো দিন-তিনেক আগে অশ্বত্থ তলার মাঠের মিটিং-এ ওরা সবাই শপথ নিলো: এবার যে করেই হোক, জোতদারদের ঘরে ধান তোলা ওরা বন্ধ করবেই। ধান উঠবে চাষীর ঘরে। তার জন্যে প্রয়োজন হলে যে কোন রকম লড়াই-এ নামতেও ওরা প্রস্তুত। তখন ওদেরই একজন হয়ে উঠেছিল সে। অথচ মিটিং থেকে ফিরে এসে সেই সিদ্ধান্তের, শপথের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করেছে অনেক। তার জন্যে সে-রাতে ভাল করে তার ঘুমও হয় নি। কি জানি লড়াইটা যদি তেমন কোন সাংঘাতিক রকমের হয়ে ওঠে! রক্তা-রক্তি খুনোখুনিতে যদি বড় ধরনের কোন বিপদ ঘটে যায়। সেই বিপদটা কার ওপর কেমনভাবে এসে পড়বে বলা যায় না। তার প্রতিক্রিয়াই বা কেমন হবে? হয়তো কতজনের ঘর-সংসার ভেঙে পুড়ে তছনছ হয়ে যেতে পারে! তখন? মনে মনে ভীষণ ভয় পায় অমল। তার সংসারের ওপর দিয়েও তো তেমন কিছু ঘটে যেতে পারে! তার সুখের সাধের সাজানো সংসার, ঘর, বৌ—তিন মাসের ছোট্ট কচি বাচ্চা, বাবু সোনা ওরা যদি সবাই হারিয়ে যায়! ভাবতে ভাবতে ভয়ে প্রায় কুঁকড়ে গিয়েছিল সে। মনে মনে ঠিক করেছিল ও-সবের মধ্যে ও যাবে না। তেমন বুঝলে এ-গাঁ ছেড়ে সে চলে যাবে—দূরে—অন্য কোথাও। তার সংসারকে সে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। ছেচল্লিশের ঘায়ের ব্যথা এখনো সে ভোলে নি। আর তার পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। কিছুতেই না।

কিন্তু পারে নি সে শেষ পর্যন্ত গ্রাম ছাড়তে।

পরদিন যথারীতি সে তার নির্দিষ্ট কাজকর্ম করেছে। সন্ধ্যের পর মিটিং শুনেছে গোষ্ঠতলার মাঠে। আগামী দিনের সংগ্রামের সমর্থনের বক্তৃতা শুনেও আবারও উত্তেজিত হয়েছে। ঐ লড়াই-এ অংশ নেবার কথাও ভেবেছে মনে মনে। সবাই যদি লড়াই করে, ও-ই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? তারপর, নিজের অজান্তেই, সবার পেছনে থেকে কখন যে মিছিলের সংগে চলতে শুরু করেছে—শ্লোগান দিয়েছে টেরও পায় নি। এমনি করে ঘুরেছে সারা পাড়া। রাত করে বাড়ি ফিরেছে। খেয়েছে। পরের দিনের কাজের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েছে।

সাইরেণ বেজে ওঠে।

জোরে—খুব জোরে। থেমে থেমে—বিপদের আশংকায় দুলে দুলে। ভয় বাড়ে অমলের। সাইরেণের আওয়াজে এত ভয় সে এর আগে আর কখনো পায় নি।

ঘরের ভেতর ছুটে যায় সে। ধাক্কা দেয় বৌকে। সাড়া না পেয়ে, তার একটি হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয় বিছানার ওপর। হকচকিয়ে যায় বৌ।

কি? কি হয়েছে?—

তার প্রশ্ন শেষ হতে পায় না। কোন উত্তরও দিতে পারে না অমল। তার আগেই ঝড়ের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় এক সঙ্গে চালের অনেকগুলো টালি উড়ে যায়। হু হু করে সেখান দিয়ে জল ঢোকে ঘরে। বুকের মধ্যে আরও জোরে, আরও শক্ত করে চেপে ধরে অমল তার বাচ্চাকে। আর এক হাতে বৌকে টেনে নেয় ঘরের বাইরে যাবার জন্যে।

হুড়মুড় করে দুলে ওঠে সারা বাড়িটা।

বৌকে জোরে টানতে থাকে অমল।

ঘুম চোখে বৌ বলে—দাঁড়াও, আমার জিনিসপত্র—

থাক্।—আর্তস্বরে প্রায় ধমকে ওঠে অমল।

বৌকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে থাকে।

সদর পেরোবার আগেই আর একটা ধাক্কা।

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ঘরের চাল। কাৎ হয়ে যায় সমস্ত বাড়িটা! কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় বৌ। ভাঙা টালি এসে পড়ে অমলের পিঠে। বৌ আর অমল দুজনেই একই সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে—উঃ মাগো—

অমলের বুকে জড়ানো বাচ্চাটাও কেঁদে ওঠে 'ট্যাঁ' করে।

ছিটকে সদরের বাইরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় অমল। বুকের বাচ্চাটাকে চেপে ধরে আরও জোরে। বাচ্চাটা আবার কেঁদে ওঠে—ট্যাঁ।

উঠোনে অনেক জল জমে গেছে। বৃষ্টিও হচ্ছে মুষলধারে। তেমনি ঝড়।

বাচ্চাটার কান্না থামাবার জন্যে তাকে দুলিয়ে অমল বলে—না, না—বাবু সোনা, না—কাঁদে না—

কান্নার আর কোন শব্দ নেই বাচ্চাটার গলায়। অমল নিশ্চিন্ত হয়।

বৌ—বৌ—দুবার চিৎকার করে ডাকে অমল।

কোন উত্তর নেই।

তবে কি—

বাচ্চাটাকে জলের মধ্যেই মাটিতে শুইয়ে বৌকে বাইরে আনতে ঘরে ঢোকে অমল।

বৌ—বৌ—

অনেক কষ্টে—টালি সরিয়ে—বেড়া সরিয়ে—বাঁশ-খুঁটির মধ্যে হাঁচা করে বৌকে ছোঁয় সে। মুখ থুবড়েই পড়ে আছে। জলে ভেসে যাচ্ছে সব জায়গাটা। দাওয়ার চালটা পড়েছে ওর গায়ের ওপর। নরম গাটা তার বাঁশ-বাখারির চালের চাপে পিষে গেছে।

বৌ—বৌ—, প্রায় চিৎকার করে ওঠে অমল,—হা ভগবান!

তখনো বেজে চলেছে সাইরেণ—ঝড়ের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্নার শব্দও ভেসে আসে অমলের কানে।

ভেঙেছে—ভেঙেছে আরও অনেকের ঘর। অমলের মতো।

উঃ—ক্ষীণ কণ্ঠের একটা টুকরো শব্দ কানে এলো অমলের। একটু যেন নড়েও উঠলো বৌ।

বৌ—বৌ—, ডাকল অমল।

জল—

এত জলের মধ্যেও জল চাইছে বৌ! আশ্চর্য! এ-জলে তাহলে কারো তৃষ্ণা মেটে না; এত ঝড়েও কারো বুকের জ্বালা জুড়োয় না! তবে কেন এমন সগর্ব হুংকারিত আয়োজন এত ঝড়-জলের! কেন?

হা ভগবান! এ তোমার কেমন খেলা? কোটি কোটি দুঃখ কষ্ট বুকে চেপে—তোমার দেওয়া ভাগ্যকে না মেনে—তোমার দেওয়া বিধানকে অস্বীকার করে আমরা যে বেঁচে থাকতে চাইছি তাই কি তোমার এত আক্রোশ? তাই কি প্রতিশোধ নিতে চাইছো এমনি করে?—কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করলো অমল।

জল—

অনেক কষ্টে মাথা তুলে একটু জল চাইছে বৌ।

বৃষ্টির জল আঁজলা করে ধরে তার মুখে দেবার চেষ্টা করে অমল। সে জল তার মুখে যায় না। জিভ্ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে জলের স্বাদ পাবার চেষ্টা করে সে।

বাঁশ-বাখারির চালটাকে তুলে বৌকে বের করার চেষ্টা করে অমল। খানিকটা উঠেছে চালটা। এক হাতে চালটাকে ধরে অন্য হাতে বৌকে টানে—

হচ্ছে না।

আরও খানিকটা তোলা দরকার। তোলে—

কড় কড় কড়াং—

কয়েকটা বাখারি ভেঙে যায়।

উঃ মাগো—, ককিয়ে ওঠে বৌ।

ভাঙা বাখারি ঢুকে গেছে তার নরম পিঠে। হাত দিয়ে জায়গাটা দেখতে গিয়ে গরমের ছোঁয়া পায় অনেকক্ষণ পর। গরম! গরম রক্ত।

বৌরে—একি করলুম আমি!

আমাকে বার কর—মরে গেলুম—উঃ—

উঠোনের জলের মধ্যে কি যেন ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে উঠলো।

বাবু সোনা—, বৌয়ের ক্ষীণকণ্ঠে কোন রকমে উচ্চারিত হলো শব্দ দুটো।

সাইরেণের শব্দ জোর বাড়ছে—

বৌকে ফেলে বাইরে উঠোনে নেমে এলো অমল।

বাবুসোনা! বাবু সো-না—

এখানেই তো তাকে রেখে গিয়েছিল। এখন নেই! এদিক-ওদিক হাতড়ালো। নেই! কোথায় গেল? তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু হলো। নেই। পাগল হয়ে উঠলো অমল—

বাবু সো-না—বা-বু সো-না—

তার চিৎকার, ঝড়ের গোঙানি, বৃষ্টির আওয়াজ আর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে তার পা ফেলা—সব একাকার হয়ে গেল। একটা শক্ত ইটে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল অমল।

সব কিছু শেষ হয়ে গেল অমলের। নিমেষে—এক ঝড়ের দাপটে। ঘর-সংসার, বৌ বাচ্চা—সব—স-ব।

কেঁদে উঠলো অমল।

নিঃশব্দ বুক-ফাটানো সে কান্না। অঝোর ধারায় শুধু অশ্রু গড়াচ্ছে তার চোখ দিয়ে—মুখে কোন শব্দ নেই।

শুধু জল—

বৃষ্টির জল আর অমলের চোখের নোনা জল।

আস্তে আস্তে যেন থামছে সাইরেণটা।

কান্নায় চোখ দিয়ে তার যত জল গড়ায়—গলাটা ততই শুকিয়ে আসে। বুকে পাষাণ-ভার বাড়ে। ততই ধীরে ধীরে তার ঘুমের গাঢ়-রঙ্ হয়ে আসে ফিকে।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেল অমল। লেপটে আছে বিছানায় উপুড় হয়ে। বালিশটা ভিজে গেছে। কতক্ষণ ধরে সে কাঁদছে কে জানে? ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে তাকায়—পাশে তার বৌ তখনও ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে—তার বুকের মধ্যে রয়েছে বাচ্চাটা। জানালা আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকেছে ভোরের আলো। উঠে বসে অমল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়—সব ঝটঝটে। কোথাও ঝড়-জলের কোন চিহ্নই নেই। খালি লালকালিতে লেখা কতকগুলো পোস্টার জ্বল জ্বল করছে—পাশের পাকাবাড়ির দেওয়ালে।

দরজা খোলার শব্দে বৌয়ের ঘুম ভেঙে যায়।

ওমা! এ যে দেখি সকাল হয়ে গেছে। আমাকে না ডেকেই যে উঠে পড়লে বড়!

এমনি। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছিলে—

আহা! রোজ যেন ক্লান্ত হই না—তাই রোজই ডাক, না?

ততক্ষণে বাইরের আলোয় দাঁড়িয়ে একটা বুকখোলা স্বস্তির শ্বাস ফেলে অমল। পাড়ার বাচ্চারা সাজি নিয়ে ওর বাগান থেকে ফুল তুলছে ঠাকুর সাজাবে বলে। আর খুশির আমেজে হাসছে খিল খিল করে।

**গত ১৩ই নভেম্বরের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীসুনীল ঘোষ লিখিত "স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য" নামক প্রবন্ধটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।**

(১) প্রকাশিত তালিকায় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী পদোন্নতির যোগ্যতা হিসেবে (৯ নং সারিতে) দেখানো হয়েছে যে, ডঃ মাধুরী বোস, ডঃ সন্তোষ দাশগুপ্ত, ডঃ রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও ডঃ রবীন্দ্রনাথ মিত্রের পদোন্নতির কোন যোগ্যতা নেই। কিসের ওপর ভিত্তি করে এটা লেখা হয়েছে, তা জানা নেই। আই-এম-সি'র নিয়ম অনুযায়ী "যদি কেউ কোন মেডিকেল কলেজে প্রিভেণ্টিভ ও সোসাল মেডিসিন বিভাগে ডিমনস্ট্রেটর হিসেবে তিন বৎসর কাজ করেন" অথবা "ঐরূপ দুই বৎসর ডিমনস্ট্রেটর হিসেবে কাজ করেন এবং দুই বৎসর পাবলিক হেলথের ক্ষেত্রে (ফীল্ড) অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন", তা হলে রীডার/এসিঃ প্রফেসর পদের জন্য তাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অতএব, উপর্যুক্ত মেডিকেল অফিসারদের সকলেরই আই-এম-সি'র সুপারিশ অনুযায়ী রীডার-পদে উন্নতিন যোগ্যতা আছে।

ঐ তালিকার ডঃ সন্তোষ দাশগুপ্ত ও ডঃ সরিৎকুমার চ্যাটার্জি'র যোগ্যতার তুলনামূলক বিচারটি ঠিক নয়। বলা হয়েছে যে, ডঃ সরিৎকুমার চ্যাটার্জি সাড়ে তিন বছর ডিমনস্ট্রেটর হিসাবে কাজ করার জন্য আই-এম-সি'র নিয়ম অনুযায়ী লেকচারার হিসাবে কাজ করবার উপযুক্ত কিন্তু ডঃ সন্তোষ দাশগুপ্ত তিন বছর ছয় মাস ডিমনস্ট্রেটর হিসাবে কাজ করে লেকচারার হবার উপযুক্ত হন নি।

(২) সরকারী আদেশ অনুযায়ী পদোন্নতির যোগ্যতা (৮ নং সারি) বিচারেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারী আদেশে বলা হয়েছে : (ক) লেকচারার হওয়ার জন্য তিন বছরের ও সহকারী প্রফেসর হওয়ার জন্য পাঁচ বছরের ডিমনস্ট্রেটর হিসাবে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। (খ) প্রিভেণ্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিনে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব আছে, কাজেই সেখানে নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ১ নং (অর্থাৎ লেকচারার হবার) নিয়ম শিথিল করা যেতে পারে। (গ) পদোন্নতির জন্য মফস্বলে চাকরির প্রয়োজনীয়তা ক্লিনিকাল বিষয়ে থাকবে, নন-ক্লিনিকাল বিভাগে নয়। (ঘ) লেকচারার থেকে সহকারী প্রফেসর পদে উন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসারের গবেষণা এবং রচনার অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

উপর্যুক্ত নিয়মগুলির সবই আলোচ্য প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হয়েছে প্রিভেণ্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিন একটি নন-ক্লিনিকাল বিভাগ এবং এই বিভাগে পদোন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক গ্রাম্য সার্ভিসের যে প্রয়োজন নেই, তা সম্ভবত লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

(৩) প্রবন্ধে প্রকাশিত তালিকায় সিনিয়রিটির কোন উল্লেখ নেই। প্রিভেণ্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে দেশী বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাও প্রকাশ করা হয় নি। অথচ এই দু'টি বিষয়ে বিশেষ জোর দেবার কথা সরকারী আদেশে বলা হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন অফিসারদের তুলনামূলক সিনিয়রিটির একটি হিসেব দিচ্ছি। নামের পাশে সংখ্যাটির গ্রেডেশান লিস্ট (১৯৬৭)-এ অফিসারদের নামের ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করছে।

(ক) ডঃ নীহাররঞ্জন মুখার্জী—৪০, (সম্প্রতি ইনি সিলেকশন গ্রেডে প্রমোশন পেয়েছেন)

(খ) ডঃ সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত—৬০—ঐ

(গ) ডঃ রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য—২৫৭—ঐ

(ঘ) ডঃ মাধুরী বসু—৩২০

(ঙ) ডঃ গুরুদাস রায়—৯৩১।

বর্তমানে যাঁরা প্রিভেণ্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ মণিময় গাঙ্গুলী ও ডঃ সন্তোষ দাশগুপ্ত এম-ডি (লক্ষ্ণৌ), ডঃ অশ্বিনী মণ্ডল ডি-ফিল (কলিকাতা), ডঃ এম আর সেনগুপ্ত পি-এইচ-ডি (এডিন) এবং ডঃ মাধুরী বোস পি-এইচ-ডি (এডিন)। বাকী সকলেই শুধুমাত্র ডি-পি-এইচ ডিপ্লোমাধারী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডঃ গুরুদাস রায়ের নাম চাকরীজীবনের সিনিয়ররিটিতে ডঃ মাধুরী বোসের চাইতে ৬০০ (ছয় শত) জনের চেয়েও বেশি অফিসারের নিচে এবং কোন মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ গুরুদাস রায়ের কোন অবদান নেই ও অন্যান্য সহকর্মীদের মতন তাঁর নিজস্ব বিভাগে কোন "ডক্টরেট" ডিগ্রী নেই।

ডঃ গুরুদাস রায় চাকরিতে যোগ দিয়েছেন ৮-৪-৬১ তারিখে। তালিকায় বলা হয়েছে তাঁর গ্রাম্য সার্ভিস ছয় বছর ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা পাঁচ বছর সাত মাস।

(৪) বর্তমানে প্রিভেণ্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিন বিষয়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডঃ গৌরহরি সেন শুধুমাত্র ডি-পি-এইচ ডিপ্লোমাধারী হয়েও প্রফেসর পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন এ কথা সত্য। তবে তাঁর উদাহরণ অনুকরণ করে ডঃ অমলকৃষ্ণ পালকে প্রফেসর পদে প্রমোশন দেওয়া উচিত কিনা, সেটা তর্কের বিষয়।

(৫) সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে উন্নতির জন্য রীডার হিসাবে দুই বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। সরকারী নির্দেশে এটাও বলা হয়েছে যে, রীডার অথবা তার ওপরের পদে নিয়োগের সময় দেখতে হবে যেন নিযুক্ত অফিসার পূর্ববর্তী যোগ্যতার স্তরগুলো যথারীতি অতিক্রম করেন। কোন একটি মধ্যবর্তী স্তর লাফ দিয়ে অতিক্রম করলে চলবে না। ডঃ এম এম গাঙ্গুলী বর্তমানে সহকারী প্রফেসর পদে আছেন। তাঁর রীডার না হয়ে সরাসরি এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হওয়া উপর্যুক্ত সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী যে সম্ভব নয়, তা কারও পক্ষে বোঝা শক্ত নয়।

(৬) প্রবন্ধের মধ্যে ডঃ অশ্বিনীকুমার মণ্ডলের প্রমোশন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই—এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যদি তালিকা অনুযায়ী ৩/৪ বছর হয়, তা হলে তিনি কি করে রীডার হবার উপযুক্ত হলেন তা আমাদের বোধগম্য হলো না। ডঃ মণ্ডল দু' মাস আগে ডিমনস্ট্রেটর পদ থেকে লেকচারার পদে প্রমোশন পেয়েছেন। সেলের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি যে দিন থেকে লেকচারার হয়েছেন, সেদিন থেকেই সহকারী প্রফেসর হয়ে গেলেন এবং আগামী ১--৪-৭০ তারিখ থেকে তিনি রীডার হয়ে যাবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন এই জাতীয় প্রমোশনের সুপারিশ করা হয়েছে, সেখানে একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং তা হলো সেই অফিসারকে বাঁকুড়ায় দীর্ঘদিন থাকতে হবে। ডঃ মণ্ডলের ক্ষেত্রে কিন্তু সেরূপ কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী দুই বছর সহকারী প্রফেসর হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে রীডার হওয়া যায় না। ডঃ মণ্ডলের ক্ষেত্রে সেই সরকারী আইন শিথিল করা হলো কেন তা আমরা বুঝলাম না। ১৩ই নভেম্বরের সাপ্তাহিক বসুমতীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল

কাউন্সিলের আইন অনুযায়ী ডি-ফিল ডিগ্রী লাভের পরে তিন বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন ব্যক্তিকে রীডারের পদ দেওয়া যায় না (১২৫২-৫৩ পৃষ্ঠা)। ডঃ মণ্ডল ডি-ফিল হয়েছেন ১৯৬৮ সালে।

(৭) সহকারী প্রফেসর পদে উন্নতির জন্য সরকারী আদেশ অনুযায়ী ডিমন-স্ট্রেটর হিসাবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। ডঃ মাধুরী বোস ও ডঃ গুরু-দাস রায় উভয়েরই পাঁচ বছরের ঐরূপ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং দুজনেই সহকারী প্রফেসর পদে উন্নীত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন। ডঃ গুরুদাস রায়ের ডি-পি-এইচ কোন ডক্টরেট ডিগ্রী নয়—এই অজুহাতে যদি তাঁকে সহকারী প্রফেসর না করা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেমন করে ডঃ গৌরহরি সেন প্রফেসর ও ডঃ অমলকৃষ্ণ পাল এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদ অলংকৃত করে আছেন?

—জনৈক চিকিৎসক
কলকাতা-৪

### 'সপ্তাহের বোঝা' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৪ই ফাল্গুন, ৩৫শ সংখ্যায় পাঠকমনে প্রকাশিত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের একটি পত্রের প্রতিবাদ না করে পারছি না। ওঁর মতে সাপ্তাহিক বসুমতীর রাজনৈতিক প্রবন্ধ-গুলো এখন নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখছে না। এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণই (একমাত্র 'সপ্তাহের বোঝা' সম্বন্ধে যে প্রমাণ তিনি হাজির করেছেন, তাও নেহাৎ কল্পনাপ্রসূত) তিনি পেশ করতে পারেন নি। তাই এই ধরনের মন্তব্যের কোন মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না। একথা নিঃসন্দেহে জোর গলায় বলা যায় যে, নিতান্ত একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই এই চিঠিটা লেখা হয়েছে।

চিঠিটা পড়ে মনে হয় শ্রীসিংহরায় কিছুটা গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গেছেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'লাঠি-বল্লম কি শুধু মার্কসবাদীরাই বয়ে বেড়ায়?' জানি না, শ্রীওঝা কবে, কোথায় মার্কস-বাদীদের সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য পেশ করেছেন; তাই এখানে শ্রীসিংহরায়ের দেওয়া ফরোয়ার্ড ব্লকের উদাহরণটাও নিষ্প্রয়োজন। শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা ১লা মাঘের সাপ্তাহিক বসুমতীতে কেবলমাত্র 'ডাকাত' কথাটা ব্যবহার নিয়ে শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যের সঙ্গে শ্রীঅজয় মুখার্জীর বক্তব্যের কোন গরমিল নেই, সেটাই দেখাতে চেয়েছেন মাত্র।

রিভলবার থাকলেই যদি ডাকাত হয় (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে) তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকে যে রিভলবারের ব্যবহার [illegible] তখন, যে ছাত্ররা রিভলবার ব্যবহার [illegible] তারা ডাকাত—এই [illegible] দেখলাম না। না, কেননা [illegible] যে কথা বলা যায়, [illegible] সেই কথা বলার সাহস আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর নেই! তাই তো আমরা দেখতে পাই, 'রাজ্যব্যাপী যে শরিকী-সংঘর্ষ আর হানাহানি সেই সঙ্গে আওয়াওনাদা-বাহিনীর হাতে মানুষের ধন-জীবন-প্রাণের সব ক্ষমতা চলে যাওয়াকে শ্রেণী সংগ্রাম, জনতার জাগরণ বলে চালাবার চেষ্টা।

জনগণের যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে যখন ইডেন দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সামাজিক দায়দায়িত্বহীনের মতো মন্তব্য করতে দেখি, তখন দুঃখ, হতাশায় মনটা আচ্ছন্ন হয় বৈকি। মানুষ মরণশীল—এ কথাটা সবাই জেনে আজও কিন্তু শোক-প্রস্তাব, শোকবার্তা প্রভৃতির ব্যবহার বন্ধ করে দেন নি। আর তা ছাড়া, ইডেনের দুর্ঘটনার জন্য পুলিশ দপ্তর দায়ী সেটা কি শ্রীসিংহরায় মশাই অস্বীকার করতে পারেন?

সবশেষে, নির্ভীকভাবে চলার জন্যে কৃত্তিবাস ওঝাকে জানাই ধন্যবাদ ও সাপ্তাহিক বসুমতীর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

—শ্রীদিলীপ দত্ত,
উল্টাডাঙ্গা, কলি-৪

### কালিদাসের কাব্যে "শতরূপা-উপাখ্যান" প্রসঙ্গে

১লা মাঘ, '৭৬ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত "কালিদাসের কাব্যে শতরূপা-উপাখ্যান" প্রবন্ধের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। এরকম রসঘন গবেষণামূলক লেখা পড়বার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়।

লেখিকা কালিদাসের কাব্যে পুরাণে বর্ণিত 'শতরূপা'র কথা বলেছেন এবং মৎস্য পুরাণের কাহিনীর উত্থাপন করে-ছেন। কোনও মূল পুরাণ পাঠ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক বাংলা পদ্য ছন্দে রচিত কালিকা পুরাণে ব্রহ্মার মানস কন্যার বিষয় পাওয়া যায়। এই কন্যা অপরূপ রূপসী এবং সন্ধ্যা নামে পরিচিতা। কামদেব ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া বর পরীক্ষা করার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মার উপরই পঞ্চশর নিক্ষেপ করেন। এর ফলে আপন মানস কন্যা সন্ধ্যাকে দেখে বিধাতার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কিন্তু স্বয়ং শিব তাঁকে এজন্য তিরস্কার করেন এবং ব্রহ্মা সম্বিত ফিরে পান। সন্ধ্যা [illegible] পিতার এই মনোবিকলনে খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং কুমারী জীবনযাপন করে চন্দ্র-ভাগা তীরে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হলে [illegible] জীবনের এই করুণ পরিণতি অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক, কাজেই ব্রহ্মার এই মানস কন্যার রূপের সঙ্গে তুলনা করে কোনও নায়িকা সৃষ্টি কতদূর রসোত্তীর্ণ তা চিন্তনীয় যে কারণ এ রূপের প্রভাব বড়ই বিচিত্র ও উন্মাদনাদায়ক। লেখিকা এ বিষয়ে আরও একটু আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

পরিশেষে আর এক বক্তব্য—এক-একটি পুরাণ তৎকালীন দেশ ও সমাজের ইতি-হাস, যেমন প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুর—কামরূপের (বর্তমান আসাম) ইতিহাস জানতে হলে 'কালিকা পুরাণ' অপরিহার্য। তাই প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানতে হলে বিভিন্ন পুরাণের বহুল প্রচার কাম্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণ পাঠকের উপযোগী এরকম কোনও গ্রন্থ বা প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা নগণ্য বললেই চলে। তাই অনুরোধ, লেখিকা বন্দনা চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে এগিয়ে এসে একটা বড় অভাব দূর করুন।

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত
দিল্লী-৭

### খাটাল অপসারণের আবেদন

অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বাড়ীর লোকই ছিলাম। নিয়তির পরিহাসে অজ্ঞাতসারে কপর্দক-হীন অবস্থায় উদ্বাস্তু শিবিরে বর্তমান আশ্রয়।

বাসঘরের পাশেই এক বিরাট খাটাল। খাটাল ও তার সংশিলষ্ট লোকজনের অত্যাচারে সমস্ত পরিবার অতিষ্ঠ। দুর্ভোগের শেষ নেই, ২৪ ঘণ্টা পশু ও দুগ্ধ ক্রেতা ও বিক্রেতার হৈ-হল্লা, বেড়া ও গাছপালা ধ্বংস। শিশুদের পড়াশুনা ও শেষ রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত। বর্ষাকালের দৃশ্য আরও ভয়াবহ।

এই খাটাল থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্বাস্থ্য ও পশুপালন দপ্তরে বহুবার আবেদন-নিবেদন করেছি। সাড়া না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই। কিছুদিন বাদে তাঁর সচিব শ্রীকন্দু পত্রে জানালেন যে, আমার ব্যাপার স্বাস্থ্য বিভাগে পাঠানো হয়েছে। আশেপাশের লোকেরাও খাটালের মালিককে ভয় করে। আগস্ট মাসে এক জনস্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার তদন্তে এসে রাস্তায় খাটালের মালিকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে হৃষ্টচিত্তে ফিরে চলে যান। তাঁর কার্যকলাপকে চ্যালেঞ্জ করে আমি মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর সচিব ও স্বাস্থ্যদপ্তরে জানাই। দীর্ঘকাল অতি-বাহিতে। জানি না কে মুক্তি দেবে?

—[illegible] ভট্টাচার্য,
৪/১৪৫, বিজয়গড়,
কলকাতা—৩২

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

'দি মাস্ক' শুধু ভবিষ্যতের থিয়েটার নিয়েই আলোচনাকে সীমিত করে ফেলতো না—অতীতের মূল্যবান তথ্যগুলোর দিকেও এর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। সেভেনটিজে ই এম গডউইন 'দি আর্কিটেক্ট' পত্রিকায় আর্কিটেক্টদের এবং সেক্সপীয়ারের প্লে'র পোষাক সম্বন্ধে কয়েকটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এসব প্রবন্ধ আবার ক্রেগের 'দি মাস্ক' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই গডউইন ছিলেন ক্রেগের বাবা—যদিও এলেন টেরীর সঙ্গে তাঁর আইনমত বিয়ে কখনও হয় নি।

ক্রেগের এগারো বছর বয়সের সময় তিনি প্রিন্সেস থিয়েটার 'ক্লডিয়ান' নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে বাবাকে কাজ করতে দেখেছিলেন। গডউইন ছিলেন একাধারে আর্কিটেক্ট, থিয়েটার ক্রিটিক, আর্কিওলজিস্ট এবং স্টেজ সেটিং ও কস্টিউম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ভবিষ্যতে ক্রেগ যে ঐ সব বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে স্টেজ-হিস্ট্রী তৈরি করেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ, তাঁর প্রতিভার মূল উৎস ছিলেন তাঁর বাবা ই এম গডউইন। 'মাস্ক' ছিল মাসিক পত্রিকা—প্রতি মাসে থিয়েটার সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হত। বেশির ভাগ প্রবন্ধই লিখতেন গর্ডন ক্রেগ নিজে—কিন্তু বিভিন্ন ছদ্মনামে। সে সময়ের ইউরোপে—শুধু সে সময়ই বা বলবো কেন, বরং আজ পর্যন্ত বললেই ঠিক বলা হবে—থিয়েটার বিষয়ে এ ধরনের মূল্যবান এবং তথ্য সম্বলিত পত্রিকা আর কখনও প্রকাশিত হয় নি। এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা দেওয়া যেতে পারে ১৭৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হ্যামবুর্গ ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারা প্রকাশিত The Hamburgische Dramaturgic পত্রিকাটির। এ পত্রিকাটির পরিচালনায় দায়িত্ব ছিল গট্‌হোল্ড এস্‌রায়েম লেসিং-এর (১৭২৯—৮১) ওপর। বিদগ্ধ সমালোচকদের মতেঃ লেসিং-এর পত্রিকাটি এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকসের পাশে স্থান পাবার যোগ্য।

'দি এ্যাক্টর এ্যাণ্ড দি উবের ম্যারিওনেট'—এই নাম দিয়ে ক্রেগ একটি প্রবন্ধ লেখেন ১৯০৬ সালে—পরে প্রবন্ধটি ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর "অন্ দি আর্ট অভ্ দি থিয়েটার" বইতেও ছাপা হয়। এ প্রবন্ধটি প্রবল বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করেছিল, থিয়েটার মহলে। ক্রেগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে, অভিনেতা-অভিনেত্রী সমাজকে বাদ দিয়ে তিনি কাঠের পুতুল দিয়ে মঞ্চাভিনয় করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রবন্ধের সূচনায় ক্রেগ উদ্ধৃত করেছিলেন বিখ্যাত ইতালীয়ান অভিনেত্রী এলিয়ে নোরা ডুজের উক্তি—"থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে, থিয়েটারকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে; অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল মহামারিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া দরকার......কারণ তাঁদের দ্বারা শিল্প সৃষ্টি হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার।" বহু বছর বাদে অর্থাৎ ১৯২৪ সালের 'অন্ দি আর্ট অভ্ দি থিয়েটারের' নতুন সংস্করণের নতুন ভূমিকায় ক্রেগ তাঁর সমালোচকদের অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"আমি নিজেও রক্তমাংসের অভিনেতাদের বদলে কাঠের পুতুল চাই নি; বিখ্যাত ইতালীয়ান অভিনেত্রী ডুজেও চান নি সত্যি সত্যিই তাঁরা মারা যাক। উবের ম্যারিওনেট বলতে আমি চেয়েছিলাম the actor plus fire, minus egotism : the fire of the gods and demons, without the smoke and steam of mortality."

ক্রেগের যৌবনের প্রথমদিকে, যখন তিনি ছিলেন প্রায় অপরিচিত, তখন যে সামান্য কয়েকজন লোক তাঁর প্রতিভাকে সম্যকরূপে বুঝতে পেরেছিলেন তার ভেতর ছিলেন বিখ্যাত আইরিশ কবি ডব্লিউ বি, ইয়েটস্। ইউস্টোন রোডের ধারে তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে বসে ইয়েটস্ অনেক সময়েই ক্রেগকে কাব্যনাট্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতেন—আর ক্রেগ নিবিষ্টমনে তা শুনতেন। ইয়েটসের খুব ইচ্ছা ক্রেগ তাঁর নাটকগুলো প্রোডিউস করুন—সেই কারণেই ১৯১০ সালে তিনি এবং লেডী গ্রেগরী যখন ডাবলিনে বিখ্যাত আইরিশ এ্যাবে থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলেন, ক্রেগ তখন তাঁর জন্য তৈরি করে দিলেন —গুলো স্ক্রীন এবং ডেয়ারস্ট্রী। 'দি আওয়ার গ্লাস, অন্ বেইলস্ স্ট্র্যাণ্ড প্রভৃতি নাটকের সব ডিজাইন।

সাধারণ এ্যাক্টর ম্যানেজারদের পক্ষে ক্রেগের প্রতিভাকে বুঝে ওঠা সে সময় সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি তো তাঁদের অর্ডারমাফিক বা বুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে রাজী ছিলেন না। তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভার সম্যক কদর করেছিলেন মস্কো আর্ট থিয়েটার এবং কোপেনহেগেনের রয়াল থিয়েটার—ক্রেগও তাই তাদের হয়েই নিজের মতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন।

ক্রেগের যেসব বিখ্যাত কাজ ভেস্তে গেছিল, তার ভেতর সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়েছিল বিয়রবম্ ট্রীর ১৯০৯ সালে হিজ ম্যাজেস্টিস থিয়েটারের ম্যাকবেথের প্রডাকসনের ব্যাপারটা! সিন্ পেণ্টার জোসেফ হার্কার গর্বভরে তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন যে, তিনিই ট্রীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্রেগের মডেলগুলো বাতিল করিয়েছিলেন। ডেজমণ্ড ম্যাকার্থী হার্কারের বইটি পড়ে লিখেছিলেনঃ "হতভাগ্য হার্কার, তোমাকে ভবিষ্যতের লোকেরা মনে রাখবে শুধু এই ভেবে যে, তুমি সেই বিশেষ শ্রেণীর পেশাদারী লোক যারা সত্যিকার প্রতিভাবান শিল্পীর সামনাসামনি হয়েও তাকে চিনতে পারো না—তার সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে শিল্পসৃষ্টির পরম মুহূর্তকে তোমরা ধ্বংস করে ফেল।"

স্তানিসলাভস্কির আমন্ত্রণে ক্রেগ এরপর রাশিয়া যান মস্কো আর্ট থিয়েটারের তরফে একটি নাটক প্রডিউস করতে। ক্রেগ ঠিক করলেন এদের দিয়ে হ্যামলেট মঞ্চস্থ করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলবার আগে স্তানিসলাভস্কির কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার। সৌখিন নট হিসাবেই কনস্তানটিন স্তানিসলাভস্কি অভিনয় করতে শুরু করেন। ক্রমশ পেশাদারী অভিনয়ের দিকে

মঞ্চসজ্জার একটি নক্সা: ১৯০৮

তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। স্যালভিনি, রস্‌সি, ইয়ার্মালোভা, স্যাডোভস্কি, লেনস্কি প্রমুখের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে তিনি এঁদের প্রত্যেকের অভিনয়-ধারাকে বিশ্লেষণ করে দেখেন এবং এঁদের সাফল্যের মূল কারণ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। ভডেভিল, ওপ্‌রেটা, ড্রামা, কমেডী সবেতেই তিনি এরপর অংশ গ্রহণ করতে থাকেন এবং এক সময় মনে হয়েছিল যে, ওপেরাকেই তিনি ক্যারিয়ার হিসাবে বেছে নেবেন। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে কমিসারজেভস্কি ও ফেডোটোভের সহযোগে তিনি সোসাইটি অভ্‌ লিটরেচার এবং আর্ট-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কলাবিদদের একত্রিত করে সবার সহযোগে ভাল ভাল নাটক প্রডিউস করা। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে তিনিই প্রথম রাশিয়ান স্টেজে টলস্টয়ের দি ফ্রুটস অভ এনলাইটেনমেণ্ট ও ডস্টয়ভস্কির সেলা স্টেপানচিকভ। (নাটকে রূপায়িত করে) মঞ্চস্থ করেন। এতেই তিনি প্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর পরের প্রডাকসনগুলোতে তিনি যথেষ্ট যশ অর্জন করেন।

এই সময় স্তানিসলাভস্কির ওপর সব থেকে বেশি প্রভাব ছিল ওখানকার মেনিনজেন কোম্পানীর। ঐতিহাসিক সাজসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রডাকসনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেইলসের ওপর নজর দেওয়া, বিশেষত জনতার দৃশ্যগুলিতে—এসবের জন্য মেনিনজেন কোম্পানী ছিল বিখ্যাত। এদের থেকেই তিনি শেখেন ঐতিহাসিক সত্যকে ঠিকমত মর্যাদা দিতে, অদ্ভুতভাবে মঞ্চে জনতার দৃশ্য সৃষ্টি করতে এবং নাট্য-প্রযোজনার সময় একটা সামগ্রিক ঐক্যের ভাব বজায় রাখতে। এই সম্প্রদায়ের আবৃত্তির ঢং-এর অভিনয়কে বর্জন করে স্তানিসলাভস্কি চেষ্টা করলেন অভিনয়ধারাকে সহজ স্বাভাবিকতার দিকে মোড় ফেরাতে। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে কনস্তানটিন স্ট্যানিসলাভস্কি ও নেমিরোভিচ দানসেংকোর যুগ্ম প্রচেষ্টায় মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু রাশিয়াতে নয়, সমগ্র বিশ্বের নাট্যাভিনয়ের ক্রমবিবর্তনে এ যেন এক নতুন যুগের প্রবর্তন করলো।

স্ট্যানিসলাভস্কির জীবনীকার ডেভিড ম্যাগারশ্যাক লিখেছেন : "এই সময় স্ট্যানিসলাভস্কি ইউরোপের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং মৌলিক প্রডিউসার গর্ডন ক্রেগের সাহায্য, উপদেশ এবং সহযোগিতা লাভের প্রত্যাশায় মস্কো আর্ট থিয়েটারকে ক্রেগকে দিয়ে 'হ্যামলেট' প্রডিউস করবার প্রস্তাব করেন।

১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে ক্রেগ মস্কোতে আসেন। কিছুকাল আলাপের পরই স্ট্যানিসলাভস্কি বুঝতে পারলেন ক্রেগের সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাঁর সম্পূর্ণ মতের ঐক্য আছে।

And in May 1909, after Craig had already discussed with him the proposed production of Hamlet, Stanislavsky wrote to Gurevich : 'Not only have we not grown disappointed in Craig, but we are now convinced that he is a man of genius. The entire theatre has been placed at his disposal, and I myself, as his closest assistant, have put myself entirely at his command, and I am proud of it. It will take a long time before even a few people begin to understand Craig. For he is half a century ahead of us all. He is a five poet and a wonderful artist—a producer of the most refined taste and knowledge."

ক্রেগ মঞ্চশিল্প বিষয়ক তাঁর প্রধান মতামতগুলো এবং আর্ট অভ মুভমেণ্ট সংক্রান্ত তাঁর যে সমস্ত আবিষ্কার—এই সব বিষয়ে স্ট্যানিসলাভস্কির সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। নতুন আর্ট সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, স্কেচেস—যেমন অদ্ভুত আকারের রেখা, উড়ে যাওয়া মেঘ এবং পাথরের টুকরো, অর্থাৎ যা দেখলেই মনে একটা ঊর্ধ্বগতির ভাব আসে—এসব দেখালেন। স্ট্যানিসলাভস্কি বেশ বুঝতে পারলেন যে, এসবের ভেতর যথেষ্ট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে। ক্রেগের সঙ্গে তিনিও এক মত হলেন যে, অভিনেতার three dimensional figure-এর পাশে two dimensional painted canvas রাখলে অভিনয়ের সমস্ত সমতা যায় নষ্ট হয়ে এবং এ কারণেই স্টেজে স্কাল্পচার, আর্কিটেকচার এবং থ্রি ডিমেনশ্যনাল অবজেকটস্‌-এর প্রয়োজন। ক্রেগ মত প্রকাশ করেন যে, মঞ্চে শুধু দূরের ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসাবে আর্কিটেকচারেল স্ট্রাকচারস্‌-এর মধ্যেকার শূন্যতার পরিপূরকরূপে পেণ্টেড ক্যানভাস ব্যবহার করা যেতে পারে।

Both felt what they wanted was a much more simple background with which they thought they could create a multiplicity of moods by a combination of lines, spots of light and so on.

[ক্রমশ]
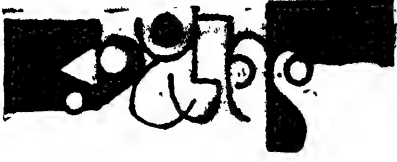
## চলচ্চিত্র-শিল্পের সমস্যা---২

যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবসান হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবসানে পশ্চিমবঙ্গে ফিল্ম-শিল্পের পক্ষে উদ্বেগের কারণ আছে। গত এক বছরে যুক্তফ্রন্টের তথ্য-মন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য চলচ্চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন ব্যাপারে যেভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন, তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্প ভয়ংকর এক মুমূর্ষু অবস্থা থেকে প্রাণ ফিরে পাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পে আশার সঞ্চার হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্টের আমলে সেন্সার তারিখ-ভিত্তিক চলচ্চিত্র মুক্তির ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় একচেটিয়া সিনেমা ব্যবসায়ী-দের রাহুগ্রাস থেকে চলচ্চিত্র কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। ছোট ছোট প্রযোজকের যে ছবিগুলি গুদামের অন্ধকারে পড়ে-ছিল এবং যার জন্য প্রযোজকের লগ্নী টাকা আবদ্ধ হয়ে ছিল—সেই ছবিগুলিও একে একে মুক্তিলাভ করে। এইভাবে সেন্সার তারিখ অনুযায়ী মুক্তির ফলে সিনেমাতে চোরাপথে টাকা দেবার এবং নেবার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। নতুন নতুন প্রযোজকরা ছবি তৈরি করতে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসেন। গত কয়েক বছরের তুলনায় ১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি সংখ্যার দিক থেকে বেশি : স্টুডিওগুলিতেও তুলনামূলক-ভাবে ছবির কাজ বেড়েছে।

বেকার টেকনিশিয়ানদের কাজ দেবার ব্যাপারে তথ্যমন্ত্রী দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পরিচালকদের নামের তালিকা তৈরি করে তথ্য ও সংবাদ-চিত্র নির্মাণের কাজ দেওয়া হচ্ছিল। এই ব্যবস্থায় গত বছর কয়েকজন পরিচালক কাজ পেয়েছেন, যাঁরা প্রায় দু-তিন বছর বেকার ছিলেন। নতুনদের মধ্যেও কয়েক-জন কাজ পেয়েছেন। এই ব্যবস্থায় পরিচালকরা অন্তত বছরে কয়েক হাজার টাকা কামাতেও পেরেছেন। তথ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা ছিল সরকারী ছবির সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে, যাতে অন্তত মাসে সংবাদ-চিত্র করা যায় এবং অনুপাতিক হারে তথ্যচিত্রের সংখ্যা বাড়ানো চলে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে সিনে টেকনিশিয়ানদের কাজের সুযোগ আরো বৃদ্ধি হত।

সংবাদ ও তথ্যচিত্রের ধরন-ধারণেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। আগের মত গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছবি তৈরি হয় নি। বারীন সাহাকে দিয়ে 'ভাসা'র মত ছবি তৈরি করানো, 'মানুষের জয়যাত্রা'র মত ছবি কিনে নেওয়া, তথ্য দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষণ। 'বরশূল', 'চারজন', 'ইন্টারভিউ' ছবিগুলি গতানু-গতিক দৃষ্টির ঊর্ধ্বে। সরকারী সংবাদ ও তথ্যচিত্রগুলি দায়সারা না হয়ে সমাজের কাজে লাগানো যেতে পারে এই ছবিগুলিতে, তা প্রমাণ হয়েছে। আগের আমলে এরকম ছবি করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সে কারণে তখন সিনেমার দর্শকরা সরকারী ছবির বিষয়ে আগ্রহী ছিল না।
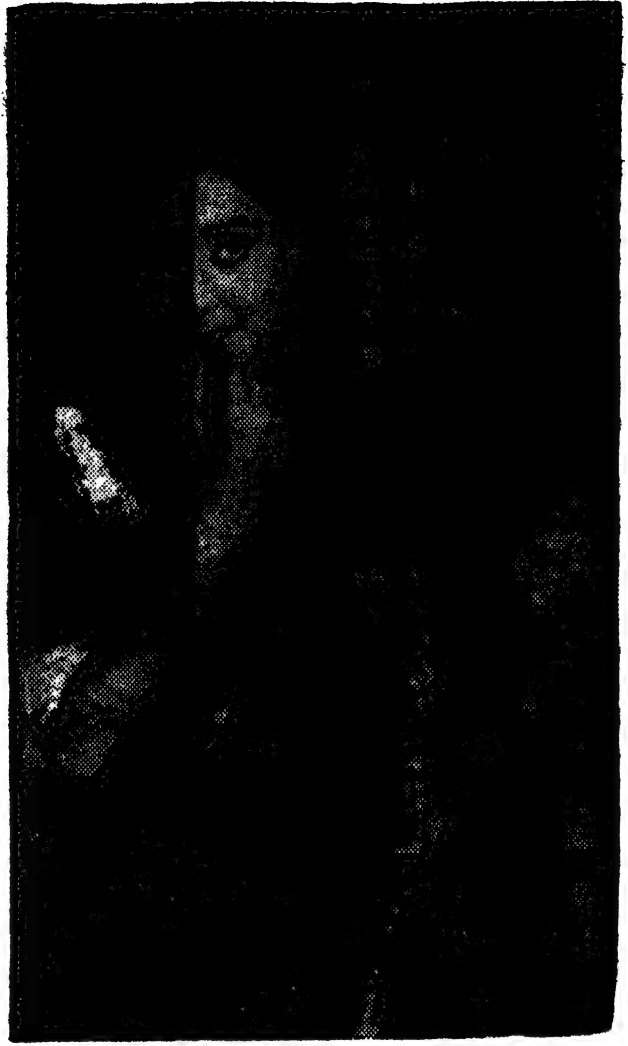
গত বছর চলচ্চিত্র উপদেষ্টা বোর্ড গঠন পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র উন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চলচ্চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই পর্ষদ গঠিত হয়েছে এবং পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ অনুযায়ী চলচ্চিত্র-শিল্পের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা সম্ভব ছিল না। এই পর্ষদের কাজকর্মের ফলে চলচ্চিত্র নিয়ে আমলা এবং বড় ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি কিছু পরিমাণে বন্ধ হয়েছিল। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কমিটি ইত্যাদিতে সদস্য গ্রহণ করার ব্যাপারে তথ্য-মন্ত্রী গণতান্ত্রিক বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। আগে যেমন সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের সদস্য করে কমিটির শোভা বৃদ্ধি করা হত মাত্র, কমিটির সভায় সদস্যরা উপস্থিত থাকতেন না, থাকলেও আমলাদের পরামর্শমত স্বাক্ষর করে চলে আসতেন। আসলে কমিটি বা বোর্ডগুলি আমলাদের মর্জিমত পরিচালিত হত। যুক্তফ্রন্টের আমলে কমিটিগুলিতে এমন লোককে গ্রহণ করা হয়েছে যাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি এবং ফিল্ম-শিল্প ও তার তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই ব্যবস্থার ফলে ছবির মনোনয়নে এবং বিষয়বস্তু জনস্বার্থের উপযোগী গ্রহণ করার পক্ষে চেষ্টা দেখা গেছে।

ফিল্ম নির্মাণে আর্থিক সাহায্য, সম-বায় ভিত্তিতে কাজ করার বিষয়ে উৎসাহ

অশোক চ্যাটার্জী পরিচালিত 'মহাকবি কৃত্তিবাস' ছবিতে নবাগতা কল্যাণী মণ্ডল

দান ইত্যাদি ব্যাপারেও তথ্যমূলক চিন্তা করেছিলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নয়নে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থাগুলি থাকবে কিনা। যদি না থাকে, তবে চলচ্চিত্র-শিল্প আবার সেই অন্ধকারের দিকে নেমে যাবে। যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল তা যেন আমলাদের খেয়ালে অচল না হয়ে যায়। স্বভাবতই দুর্নীতি-নির্ভর যারা, তারা চাইবে গৃহীত ব্যবস্থাগুলিকে অচল করে দিতে। এই পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র -শিল্পের কর্মীদের সজাগ প্রহরার, ওপর নির্ভর করবে—ব্যবস্থাগুলি থাকবে কিনা। যা পাওয়া গেছে তা যেন বাতিল বা অচল হয়ে না যায়, চলচ্চিত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। —সুজন

পূর্ব জার্মানীর প্রেস অব দি ফ্যালকন ছবির একটি দৃশ্য

## সমাজতান্ত্রিক রীতির জার্মান ছবি

গত ১৩ই মার্চ থেকে ম্যাজিস্টিক সিনেমায় জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত ও পূর্ব জার্মান সরকারের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়-চুক্তি অনুসারে এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেছেন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীজ্যোতি বসু। শ্রীবসু ও শ্রীশূর পূর্ব জার্মানীকে ভারত সরকার স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা বলেন, ভারত সরকার নিজেকে নিরপেক্ষ বলেন অথচ পশ্চিম জার্মানীর সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু জনমতকে উপেক্ষা করে পূর্ব জার্মানীর সরকারকে স্বীকৃতি দেন নি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের বাণিজ্য প্রতিনিধি মিঃ এ· রেডার বক্তৃতা করেন।

এই উৎসবে সাতটি পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখান হয়েছে। ছবিগুলি দেখার সময় আমাদের বার বার গত বছর অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানীর ছবিগুলির কথা মনে হয়েছে। একই জার্মানীর দুটি অংশের ছবির মধ্যে কত তফাৎ। পশ্চিম জার্মানীতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; সেই অংশের ছবিতে দেখা গেছে কেবল যৌনক্ষুধার তাড়না এবং ব্যক্তির খেয়াল ও নৈরাশ্য। আর পূর্ব জার্মানীর ছবিতে দেখা গেছে সমষ্টি জীবনের প্রতি আগ্রহ, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বাধীনতার বাণী এবং আশাবাদের ধ্বনি। পশ্চিম জার্মানীর ছবি দেখে আমাদের মন পীড়িত হয়ে উঠেছিল, পূর্ব জার্মানীর ছবি দেখে আশাবাদের প্রেরণা জেগেছে।

### টাইম টু লিভ

আশাবাদ এবং সমাজ ও মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধের একটি ছবি 'টাইম টু লিভ'। ছবিটি নতুন ধরনের। এই ধরনের বিষয়বস্তু ও ছবির মেজাজের সংগে আমাদের দেশের দর্শকরা পরিচিত নন্। ছবিটি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রীতিতে বলিষ্ঠ ও আশাবাদের বক্তব্যে গঠিত। এই ছবির নায়ক সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মান রাষ্ট্রের একটি বৃহৎ শিল্পের অন্যতম পরিচালক। তাঁর অতীতের জীবন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উজ্জ্বল। তাঁর স্ত্রী ফ্যাসিস্টদের দ্বারা নিহত হয়েছিল। সেই স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে তিনি কাজে ডুবে আছেন। ছবিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের রীতিনীতি, যৌথভাবে দায়িত্ব পালন, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, শিশুদের প্রতি দায়িত্ব ইত্যাদির সংগে ব্যক্তি জীবনে প্রেম ও জীবনবোধ ইত্যাদি ছোট ছোট দৃশ্য উপস্থিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ কাজের পাগল, কাজের কোন ছোট-বড় নেই। নায়ক বলেছেনঃ কমিউনিস্ট সমাজে হাতের পরিবর্তে যন্ত্র কাজ করবে, আর মানুষ সময় পাবে চিন্তা করার, নতুন উদ্ভাবন করার, সৃষ্টি করার। আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার সমালোচনা করা হয়েছে ছবিতে। কাজ আর আনন্দে আন্দোলিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেই নতুন জীবনের রঙে ছবিটি রঙিন। ছবিতে মুড রচনার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণভাবে রঙের ব্যবহার

করা হয়েছে। সম্পাদনাও চমৎকার। অভিনয় এবং দৃশ্য-বৈচিত্র্য মনোরঞ্জক। হর্স্ট সীমান পরিচালিত এই ছবিটিতে নতুন জার্মানীর মানসচেতনা উপলব্ধি করা যায়। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অনবদ্য অভিনয় করেছেন লিও নিস্লেমমিক, জাট্টা হফম্যান, জার্গেন হেন্ৎশ, ট্রাউডল কুল্লিকাউস্কি।

### হাউ টু ম্যারী এ কিং

একটি জার্মান রূপকথা অবলম্বনে নির্মিত ছবি 'হাউ টু ম্যারী এ কিং' কিশোরদের উপভোগ্য ছবি। ছবিটি কিশোরদের জন্য হলেও বড়দেরও শেখার আছে। এক কৃষক-কন্যা নিজের বুদ্ধির জোরে এক রাজাকে বিয়ে করেছিল। রাজার তিনটি ধাঁধার জবাব দিতে পারলে রাজা তাকে বিয়ে করে। কিন্তু এ রাজা ইতিপূর্বে যাদের বিয়ে করতে চেয়েছিল, তারা প্রত্যেকই কোন দোষে পরিত্যক্তা হয়েছে। কিন্তু কৃষকমেয়ের কাছে রাজা হেরে যায়। কিন্তু রাণী হয়েও মেয়েটি নিজের জনদের ভোলে না। সব সময় সে থাকত গরীবদের পক্ষে। একবার রাজা একটি ভুল বিচার করে। রাণী কৃষককে এমন এক বুদ্ধি শিখিয়ে দেয়, যাতে রাজা বুঝতে পারে যে, তার বিচার ভুল হয়েছে। রাজা নিজের ভুল বুঝল কিন্তু কৃষকের পক্ষ নেওয়ার জন্য রাণীকে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে বলল, এতদিনের সুখের জীবনের কথা মনে করে রাজা বলল তোমার যা প্রিয় তা নিয়ে যেতে পার। কৃষকমেয়েটিও এই কথার সুযোগ নিয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন রাজাকেই নিয়ে গেল বাপের বাড়িতে। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজা দেখে কৃষকের বাড়িতে রয়েছে। তখন রাণী এসে বলে, তুমি বলেছিলে যা সব চেয়ে প্রিয়, তা নিয়ে যেতে, তাইতো আমি তোমাকে নিয়ে এলাম। এবারও রাজা হেরে গেল এবং রাণীকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

পরিচালক রাইনার সাইমন সহজ রীতিতে গল্প বলার ঢংঙে, প্রচুর হাসির মধ্যে কাহিনীটি সাজিয়েছেন, যাতে সবাই বুঝতে পারে, যে অবস্থায় থাক না কেন, নিজের সমাজ ও মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

'ট্রেস অব দি ফ্যালকন' ছবিটির কথা গত সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। সেই ছবিটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যে চমৎকার। পূর্ব জার্মানীর এই ছবিগুলি বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে প্রদর্শিত হবে আশা করি।

এই উৎসবে 'শটস্ আন্ডার দি গ্যালোজ', 'লাভস কনফিউশন', 'দি বেস্ট ইয়ার্স', 'আই ওয়াজ নাইনটিন' প্রদর্শিত হয়েছে।

এই উৎসবের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এবং রিজিওন্যাল ফিল্ম সেন্সার অফিসার। ব্যবস্থাপনা ত্রুটীমুক্ত ছিল না।

অগ্রগামী পরিচালিত 'বিলম্বিত লগ্ন' ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

### কর্ণার্জুন ও কালিন্দী

গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী জংগীপুর মহকুমা অফিসের নবনির্মিত রঙ্গমঞ্চে 'কর্ণার্জুন' ও 'কালিন্দী' নাটকাভিনয় হয়েছে। স্থানীয় মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত অভিনয়ের প্রারম্ভে ভাষণদান করেন। মহকুমা শাসক অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। দুটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন দীনেশ সিংহ, বিমলা চক্রবর্তী, হরিপ্রসাদ মুখার্জী, অজিত রক্ষিত, সুধীর দাস, ইন্দু গোস্বামী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, চিন্তেশ্বর মজুমদার, উমানন্দ সাহা, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না নিয়োগী, মীনা বসু, অলকা গাঙ্গুলী, গীতা চক্রবর্তী প্রমুখ। নাটক দুটি পরিচালনা করেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ও হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

### টিপু সুলতান

সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে ট্রাক্টর ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যগণ মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপু সুলতান' নাটক অভিনয় করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনীল মুখার্জী, বেঞ্জামিন গোমেশ, নির্মলকুমার ঘোষ, অজিতকুমার মজুমদার, অমল চট্টোপাধ্যায়, জি পাণিকর, দেবকীনন্দন চৌধুরী, হৃষীকেশ রায়, আরতি ঘোষ, স্বপ্না মিত্র, কুমারী রিতা রায়, মাস্টার সুব্রত মিত্র, সুশীলকুমার বসু প্রমুখ।

### শেষ বিচার ও পঞ্চমিত্র

গত ২৭শে জানুয়ারী লোকতীর্থ নাট্যসংস্থা রতন ঘোষের 'শেষ বিচার' এবং সুনীত মুখার্জীর 'পঞ্চমিত্র' মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় করেছে। শেষোক্ত

[illegible]টকে সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন [illegible]কণ্ঠ শিল্পী প্রভাত[illegible]।

### রাজা বদল

গত ১৩ই জানুয়ারী সেন্ট্রালাইজড ক্যাশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ বিশ্বরূপা মঞ্চে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজা বদল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। অভিনয় করেছেন শিবদাস ব্যানার্জী, মেনকা দেবী, [illegible]পাধ্যায়, করুণাময় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

### কালিন্দী

হাওড়ার ঐকতান নাট্যসংস্থা গত ১৩ই মার্চ বিভু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কালিন্দী" নাটকটি স্থানীয় শিশির নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন। রামেশ্বরের ভূমিকায় পরিচালক স্বয়ং এবং অহীনের ভূমিকায় শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্যের অভিনয় দর্শকদের প্রশংসার দাবি রাখে। আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত-এ পরিচালকের আরও নিষ্ঠা এবং চিন্তার অপেক্ষা রাখে।

[illegible]পুর মহকুমা শাসকের অফিস-কর্মচারীদের দ্বারা অভিনীত 'কালিন্দী' নাটকের একটি দৃশ্য।

### কসবা ইয়ুথ এসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী উৎসব

কসবা ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উৎসব ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী সঙ্ঘের শেষরক্ষা, সত্যম্বর অপেরা কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগ, থিয়েটার ইউনিটের জন্মভূমি, লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া নৃত্যনাট্য ও পাহাড়ী নাচ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী-সমন্বয়ে জলসা এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিভিন্ন দিনে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রশান্ত শূর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

[illegible] পরিচালিত 'জনতার আদালত' ছবিতে শুভেন্দু চ্যাটার্জী ও নবাগতা [illegible] দত্ত।

### জনতার আদালত

জনতা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রথম ছবি মধুকর পরিচালিত 'জনতার আদালত' প্রায় সমাপ্তির পথে। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বাপী লাহিড়ী।

চিত্রতীর্থ-এর 'ঠিকানা' ছবির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে প্রায় শেষ পর্যায়ে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কানু রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নীতা সেন। গানগুলি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত। গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী ও শ্যামল মিত্র। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন কালী ব্যানার্জী, অঞ্জনা ভৌমিক, তরুণকুমার, অনুভা দেবী, হরিধন মুখার্জী, নিভাননী, আরতি দাস।

দক্ষিণ কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলনে সরোদ বাজাচ্ছেন ওস্তাদ বাহাদুর খান

**সোভিয়েট কূটনীতিবিদ্‌ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র**

বিশিষ্ট সোভিয়েট চলচ্চিত্র-পরিচালক জর্জি নাটানসন সম্প্রতি "সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত" নামে একটি চলচ্চিত্র তুলছেন। বিখ্যাত সোভিয়েট কূটনীতিবিদ্‌ শ্রীমতী আলেকসান্দ্রা কোলনতাই-এর জীবনের ভিত্তিতে রচিত নাটক অবলম্বনে এই ছবি তোলা হচ্ছে—মস্কো থেকে এ-পি-এন এ খবর দিয়েছে।

ছবির নায়িকা এলেনা কোলোত-সোভার চরিত্রটি শ্রীমতী কোলোনতাইয়ের অনুরূপভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। লেনিনের নেতৃত্বে যে সব মহিলা বিপ্লবী কাজ করেছিলেন, তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী ছবির নায়িকার চরিত্রে বর্তানো হয়েছে।

ছবিটিতে শ্রীমতী কোলনতাইয়ের জীবনের যে একটি ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে, তাতে বিপ্লবের স্বার্থে নিবেদিত তাঁর জীবন সংগ্রামের সত্যটি ফুটে ওঠে।

এই ছবির বৈশিষ্ট্য হল এতে গত যুদ্ধ ও অব্যবহিত যুদ্ধ-পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক তথ্যচিত্রের ব্যবহার।

কোলোতসোভার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী ইউলিয়া বোরিসোভা। অন্যান্য ভূমিকায় বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা রয়েছেন।

সুইডেন, ক্রিমিয়া, তাল্লিন ও রিগায় ছবির দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। পরিচালক ও তাঁর সহকর্মীরা এখন মসফিল্ম স্টুডিওতে ছবির সম্পাদনার কাজে ব্যাপৃত আছেন।

অর্ধেন্দু মুখার্জী পরিচালিত 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ছবিতে চিত্রিতা মণ্ডল ও অনিল চ্যাটার্জী।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"ক্রিকেট জগতে রণজি তখন একটা নাম।

সে নামে মোহ আছে, সে নামে মাদকতা আছে আর সে নামের আছে দর্শকদের আকর্ষণ করার অভাবনীয় ক্ষমতা। রণজি কোথাও খেলছেন শুনলে দর্শকরা স্বয়ং ডব্লিউ· জি· গ্রেসের খেলা ফেলেও ছুটে যেতেন সেখানে। তাঁদের সেই ছুটে যাওয়া কখনই ব্যর্থ হয় নি। ব্যাট হাতে নিয়ে উইকেটের সামনে যখন রণজি উপস্থিত থাকতেন, তখন মুহূর্তগুলো অনন্যরূপে হয়ে দাঁড়াতো অনন্যসাধারণ।

রণজির সেই অসাধারণ ক্রিকেট প্রতিভায় ভাস্বর খেলার কথা শুনলে যেন ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না, দেখলেও যেন মনে হয়—ঠিক দেখেছি তো!

তথাকথিত কালা আদমী রণজি তখন ইংলণ্ডের ক্রিকেটেই শুধু নয়—ক্রিকেট-বিশ্বে সৃষ্টি করেছেন নতুন অধ্যায়। নতুন মারের কায়দায় ক্রিকেটকে নতুন রূপে, নতুন ভাবে সাজিয়ে তুলছেন তিনি।

ঠিক সেই সময়ই ১৮৯৭-৯৮ সালে ইংলণ্ড ক্রিকেট দল চললো অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে। রণজিও আছেন সেই দলে।

ইংলণ্ড দল অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছলে রণজি সেখানকার জনগণের কাছ থেকে পেলেন স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন। মাঠে-ঘাটে-বাটে যেখানেই যান রণজি, ভীড় জমে যায় সেইখানেই। সবাই রণজিকে দেখতে চান, সবাই রণজির সংগে কথা বলতে চান, সবাই চান রণজির সংগে করমর্দন করতে—আর সব থেকে বড় চাওয়া হলো, সকলেই চান রণজির খেলা দেখতে।

তা খেলার মতো খেলা দেখালেন বটে রণজি। এডিলেড মাঠের প্রথম খেলাতেই অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের প্রত্যাশা ভরে দিয়ে রণজি রাখলেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর। ঝড়ের গতিতে রান তুলে করলেন ১৮৯ রান। এতোদিন যাঁরা রণজির খেলার কথা শুনে কিম্বা পত্র-পত্রিকায় পড়ে পাগল হয়েছিলেন, এবার তাঁরা নিজের চোখে রণজির খেলা দেখে রীতিমত দিশাহারা হয়ে গেলেন।

কিন্তু এর পরই রণজি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পুরনো রোগ হাঁপানী তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

অস্ট্রেলিয়ার সেরা ফাস্ট বোলার জোন্সের বোলিং রণজির একদম ভালো লাগে নি। রণজির মনে হয়েছিল জোন্স বল ছোড়েন। এ ধারণা রণজি চেপে রাখেন নি। 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় এ কথা লিখেই দিলেন।

তারপর সমস্ত অস্ট্রেলিয়া জুড়ে উঠলো প্রতিবাদের ঝড়। পত্র-পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে সকলেই বলতে লাগলেন যে, জোন্সের বলে খেলতে রণজি ভয় পান, তাই তিনি বলেছেন এমন কথা, তাই তিনি চলে গেছেন সকলের দৃষ্টির অন্তরালে। সংবাদপত্রে এ কথা পড়ায় কিম্বা লোকমুখে এ কথা শোনার পর আর স্থির থাকতে পারলেন না রণজি।

অসুস্থ শরীরে মাঠে এসে হাজির হলেন রণজি। নির্বাচকমণ্ডলী আর সহ-খেলোয়াড়দের অনুরোধে কান না দিয়ে রণজি দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে খেলতে নামলেন।

অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের কাছে, অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের কাছে রণজি প্রমাণ করে দিতে চান যে, তিনি কোন বোলারকেই পরোয়া করেন না। জোন্স অস্ট্রেলিয়ার সেরা ফাস্ট বোলার হলেও তাঁর কাছে যে কিছুই নন—এ কথা প্রমাণ করার জন্যেই অসুস্থ শরীরে বিছানা থেকে উঠে এসে জোর করে ব্যাট হাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন উইকেটের সামনে।

তারপর শুরু হলো ব্যাট-বলের সেই স্মরণীয় লড়াই। একদিকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট প্রতিভা ভারতের খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজী আর অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার তখনকার সেরা ফাস্ট বোলার জোন্স।

জোন্স বল করতে শুরু করলেন। আর রণজি খুব সহজভাবে তাঁর বলগুলো পাঠাতে লাগলেন বাউণ্ডারী সীমানার বাইরে। প্রত্যেকটা বল ব'লে বলে তিনি যেন বাউণ্ডারীতে পাঠাচ্ছেন জোন্সকে তাঁর নিজের বলের কদর বুঝিয়ে দেবার জন্যেই।

জোন্স উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁর বলগুলোর অবস্থা দেখে তিনি উত্তেজনায় ফুঁসে ওঠেন। আরো জোরে বল দেন। গতির প্রচণ্ডতায় বলগুলো মুহূর্তের মধ্যে এসে পড়ে ব্যাটসম্যানের কাছে। কিন্তু ব্যাটসম্যান তো জামসাহেব রণজিৎ সিংজী। তাই সে বলগুলো আবার ব্যাটের আঘাতে ছুটে যায় বাউণ্ডারীর দিকে।

অস্ট্রেলিয়ার দর্শকরা বিস্ময়ে হতবাক। তাদের সেরা ফাস্ট বোলার জোন্সের অবস্থা আর রণজির খেলা দেখে তাঁরা থ'। নিজেদের চোখকেও তাঁরা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'আহা! কি দেখিলাম, জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।'

ঝড়ের গতিতে রান তুলে রণজি স্থাপন করলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড।

১৭৫ রান করে প্যাভেলিয়নে ফিরে এসেই জ্ঞান হারালেন রণজি। অসুস্থ শরীরে পারলেন না অতোটা ধকল সইতে। স্ট্রেচারে করে তখনই হাসপাতালে পাঠাতে হলো তাঁকে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-প্রেমিকেরা [illegible] কল্পনায় মুখর হয়ে [illegible] স্বীকার করলেন, [illegible] এ কথা [illegible] পারেন, একমাত্র রণজির [illegible] শুধু ও কথা বলা নয়, এমন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব!

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের আগে রণজির অসুখ আরো বাড়লো। তবু তিনি খেলবেনই। কারো কথাই শুনতে রাজী নন রণজি—এমন কি ডাক্তাররাও তাঁকে নিরস্ত করতে পারলেন না। শেষকালে খেলার দিন সকালে তাঁর গলায় ছোট্ট একটা অপারেশন করে একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়লেন ডাক্তাররা।

অসুস্থ রণজি দুর্বল শরীরে ব্যাট করতে নামলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বল করছেন অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ বোলাররা। কিন্তু রণজিকে কেউই পারলেন না আউট করতে। প্রথম দিন ৪০ রান করে অপরাজিত থাকলেন তিনি। হাজার চেষ্টা করেও দ্বিতীয় দিন রণজি পারলেন না তাঁর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে।

তবু রান উঠতে লাগলো। অস্ট্রেলিয়ার সেরা বোলাররা তাঁর বিরুদ্ধে বল করতে এসে অসহায় হয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে এক সময় পূর্ণ করলেন শতরান, একশ' পঞ্চাশ রানও হয়ে গেলো এক সময়। তারপর ১৮৬ রানের মাথায় এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

সেবারের সেই অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যাটিং এভারেজে রণজির নামটাই ছিল সবার ওপরে। ২০টি ইনিংস খেলে তিনি করেছিলেন মোট ১,১৫৭ রান। ইনিংস প্রতি যার গড় হিসেব হলো ৬০·৮৯।

অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষে রণজি এসেছিলেন ভারতে। দেশের বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরলো না। অস্ট্রেলিয়া তখন গেছে ইংলন্ড ভ্রমণে। রণজিকে বাদ দিয়ে ইংলন্ড দলের কল্পনাও তখন কেউ করতে পারেন না। তাই ডাক এলো ইংলন্ড থেকে।

অনেকদিন খেলেন নি। তাই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে তিনি কিছুতেই খেললেন না। কয়েকদিন অনুশীলন করে নেবার পর দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামলেন তিনি। ক্রিকেটের জনক ও ইংলন্ডের অধিনায়ক ডব্লিউ. জি. গ্রেস আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, সেইটাই হবে তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচ।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের শেষ দিনে ইংলন্ড বেশ একটু বে-কায়দায় পড়লো। রণজি যখন ব্যাট করতে নামলেন, তখনো খেলা শেষ হতে বাকী আছে ১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট। আর জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ৩০০ রান। দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানদের অনেকেই আউট হয়ে [illegible] ইংলন্ডের তখন পরাজয় [illegible] তবে রণজি তখনো উইকেটে আছেন—এই যা সান্ত্বনা।

রণজি তখন হাওয়ার্ডকে নিয়ে খেলছিলেন। মিনিটে এক রান হিসেবে প্রথম ঘণ্টায় তাঁরা করলেন ৬২ রান। কিন্তু তারপরই আউট হয়ে গেলেন হাওয়ার্ড। খেলা শেষ হতে তখনো চল্লিশ মিনিট দেরি, অথচ......অর্থাৎ ইংলন্ডের পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা খুবই কম।

কিন্তু রণজি অবিচল। তিনি একাই বার বার মুখোমুখি হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার সেই তীব্র আক্রমণের। সহ-খেলোয়াড়কে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছেন। দেখতে দেখতে তীব্র সেই সংগ্রামের সময় শেষ হয়ে গেল। সহ-খেলোয়াড়কে নিয়ে রণজি যখন প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত রান-সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩-এ। নির্ঘাৎ পরাজয়ের হাত থেকে সেবার ইংলন্ডকে বাঁচালেন রণজিৎ সিংজী। বাঁচালেন ডব্লিউ. জি. গ্রেসকে। তাঁর জীবনের শেষ খেলায় পরাজয়ের জ্বালা সইতে হলো না তাঁকে।

॥ ডাব্লিউ· জি· গ্রেস ॥

রণজির জন্যেই গ্রেসকে তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট খেলায় পরাজয়ের জ্বালা সইতে হয় নি।

মাছ ধরার ছিল রণজির ভীষণ আগ্রহ। সাংঘাতিক সে নেশা। সারা রাত ধরে তিনি চুপটি করে বসে মাছ ধরতেন। কিন্তু দুর্বল শরীরে অতোটা অত্যাচার সহ্যও হতো না। তাই সর্দি, জ্বর, কাশি তাঁর লেগেই থাকতো।

সেবার রণজির মাছ ধরা নিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটলো। পরের দিন সমারসেটের সঙ্গে তাঁদের দলের কাউন্টি খেলা। [illegible] একদিন [illegible] ক্যাম্পিয়নশিপের প্রথম অনেকাংশে নির্ভর করছিল।

কিন্তু প্রথম দিনের খেলায় সমারসেট আগে ব্যাট করে অনেক রান করেছে। পরের দিন রণজিদের ব্যাটিং। রাত্তিরে খেতে বসে দলের অধিনায়ক মার্ডক সকলকে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে বললেন, যাতে পরের দিন সকালে সকলে পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে নামতে পারেন।

রণজিকে চিনতেন মার্ডক। জানতেন রণজির মাছ ধরার নেশার কথা। রাত্তিরে যে সকলকে লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ ধরতে যেতেন রণজি, এ-কথাও ছিলো মার্ডকের জানা। আর এ-কথাও জানা ছিল যে পরের দিনের খেলায় সাফল্যের প্রায় সবটাই নির্ভর করছে রণজির ওপর।

তাই খাওয়া-দাওয়ার পরে তিনি নিজে রণজিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। তারপর গায় লেপ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে নিজে শুতে গেলেন। রণজি কিন্তু ঘুমোন নি। তিনি ঘাপটি মেরে ছিলেন।

আকাশ-ভরা চাঁদের আলো। মাছ ধরার পক্ষে আদর্শ রাত্তির। রণজি কি পারেন সেই রাত্তিরে পরম নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে থাকতে?

তাই সকলে শুয়ে পড়ার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন তিনি। তারপর যখন বুঝলেন অধিনায়ক মার্ডকও ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর সারা রাত ধরে মাছ ধরে ভোর রাতে ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন নিজের ঘরে। কেউই জানতে পারলো না তাঁর মাছ ধরার কথা।

খেলতে নেমেই রণজি ধারণ করলেন নিজমূর্তি। বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাবার পরই বলগুলো ছুটে ছুটে যেতে লাগলো বাউন্ডারীর দিকে। রানের বন্যায় ভেসে গেলো মাঠ। দেখতে দেখতে রণজি পূর্ণ করলেন শতরান, একশ' পঞ্চাশ রান, দু'শ' রান, দু'শ' পঞ্চাশ রান......তারপর হঠাৎ ঝমঝমিয়ে এলো বৃষ্টি। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। রণজির ব্যক্তিগত রান সংখ্যা তখন ২৮৫।

রণজি প্যাভেলিয়নে ফিরে এলে দলের খেলোয়াড়দের শুনিয়ে মার্ডক বললেন, "রণজিকে কাল তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিয়েছিলাম কেন তা দেখলে তো আজকের খেলায়......"

কিছু বললেন না রণজি। মুখ টিপে শুধু হাসলেন তাঁর অধিনায়ক মার্ডকের কথা শুনে।

[ চলবে ]

## আকাশবাণী ও খেলাধুলা

**আকাশবাণীর** কেন্দ্রগুলি থেকে খেলাধুলার ধারা-বিবরণী এবং খেলাধুলার ওপর নানা রকম আলোচনা, কথিকা প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ সকলেই একমত। আকাশবাণীর মাধ্যমে খেলাধুলাকে শুধু মাত্র আরো জনপ্রিয়ই করে তোলা যায় না—যায় ছোট-বড় সকলকে মাঠের দুনিয়ায় টেনে এনে সুস্থ আর সবল করে গড়ে তোলা। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে আকাশবাণীর দায়িত্ব অনেক। কিন্তু সে দায়িত্ব আকাশবাণী কতোটা পালন করছেন? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো যে, আকাশবাণী সযত্নে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মাধ্যমে কাজ সারতে চাইছেন। স্বজন-পোষণ নীতি চালু হয়েছে আকাশবাণীর খেলাধুলা বিভাগটিকে নিয়ে—এমন কথা বলবো না, কিন্তু আবার এ কথাও স্বীকার করতে রাজী নই যে, ঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে সকলকে ধারা-বিবরণী কিম্বা ক্রীড়া পর্যালোচনায় সুযোগ দেওয়া হয়। ঘুরে-ফিরে সেই একই মুখ, সেই একই গলা। কারণ এ'দের অধিকাংশ বড় বড় দৈনিক পত্রিকার সংগে যুক্ত। অবশ্য এ'দের মধ্যে শ্রীঅজয় বসুর মতো দক্ষ, বিচক্ষণ ক্রীড়া-সাংবাদিকরাও—যাঁরা কথনে, বলনে অদ্বিতীয়, কিন্তু এ'দের দক্ষতার পুরো সুযোগ কখনই নেওয়া হয় না। আবার আরো কেউ কেউ আছেন, যাঁরা রিডিংটা পর্যন্ত ভালোভাবে পড়তে পারেন বলে মনে হলো না সম্প্রতি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খেলাধুলার বিষয়ে একটি সমীক্ষা শুনে। সমীক্ষাটিতে বক্তব্য কিছুই ছিল না, সংবাদপত্রের খবরকে একটু এদিক-ওদিক করে বললেই কি সমীক্ষা হয়? অবশ্য তা নিয়ে বোধহয় আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের কোন মাথা ব্যথা নেই। কারণ বড় কাগজের সংগে যুক্ত একজনকে দিয়ে সমীক্ষাটি তো তাঁরা পাঠ করিয়েছেন। যেমন তাঁরা বছরখানেক আগে এমন একজনকে দিয়ে তিনটি খেলার বই-এর সমালোচনা করিয়েছিলেন, যিনি কোন খোঁজ-খবরই রাখেন না। রাখলে তিনি কিছুতেই বলতে পারতেন না যে, মাত্র কয়েক বছর ধরে বাংলা ভাষায় খেলাধুলার বই-এর প্রকাশ ও প্রচার হতে আরম্ভ হয়েছে। এই ধরনের কিছু তিনি বলেছিলেন। কিন্তু তিনি জানেন না আর বোধহয় জানার প্রয়োজনও বোধ করেন না যে, তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই বাংলা ভাষায় খেলা-ধুলার ওপর বই প্রকাশিত হচ্ছে, আর সেই বইগুলোর (এখন পাওয়া যায় না) অনেকগুলোই সাঙ্ঘাতিক রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সে সময়ে। শুনেছি বেতারে প্রচার করার আগে স্ক্রীপটি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ পড়ে বিচার করে দেখেন। এ' দু'টি ক্ষেত্রে তাঁরা কি তাই করেছেন? যদি করে থাকেন, তা হলে তাঁদের দক্ষতা এবং কুশলতার ওপরও যে সন্দেহ জাগে।

—শান্তিপ্রিয়॥

## হকির মাঠে

এবারের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব আর রেল দল যুগ্মভাবে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। দু'দিনের ১৮৫ মিনিট খেলায় কোন দলই গোল করতে পারে নি।

গত বছরও জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠেছিল এই দু'টি দল। গত বছর পাঞ্জাবের ভাগ্যে জুটেছিল বিজয়ীর সম্মান আর রেল হয়েছিল রানার্স আপ। তাই এবারের ফাইন্যাল খেলাটা ছিল মর্যাদার লড়াই। সে লড়াই-এ শেষ পর্যন্ত কাউকেই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে হয় নি। যুগ্ম বিজয়ীর সম্মানে পাঞ্জাবের মন না-ও ভরতে পারে। কারণ তারা যুগ্মভাবে বিজয়ী হলো এই প্রথম। তবে রেল দল এবার নিয়ে মোট তিনবার যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। তবে তাদের দুঃখ হয়তো অন্য কারণে—জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান, রঙ্গস্বামী কাপ প্রথম ছ' মাস থাকবে পাঞ্জাবেরই হাতে। আর এ সিদ্ধান্ত টসের মাধ্যমে হয় নি। হয়েছে উভয় দলের খেলোয়াড়ী মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। আম্পায়ারের কতকগুলো সিদ্ধান্তে রেল দলকে বিক্ষুব্ধ বলে মনে হয়েছিল। আর সেটা ঠিক ভালো মনে মেনে নিতে পারেন নি কর্তৃপক্ষ। তাই তাঁরা পাঞ্জাবকেই প্রথম ছ' মাস কাপটি রাখার অধিকার দেন।

পাঞ্জাব এবং রেল দলে বেশ কয়েকজন করে অলিম্পিক খেলোয়াড় থাকায় ফাইন্যাল খেলাটা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। উভয় দলই গোল করার মতো সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত সময় নিয়ে দু' দিনের মোট ১৮৫ মিনিট খেলায় কোন দলই গোল করতে পারেন নি। এই দিন খেলার শেষে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগুরনাম সিং পুরস্কার বিতরণ করেন এবং হকি খেলার উন্নতির জন্যে দশ হাজার টাকা দান করেন।

ভারতীয় হকি দল কিছুদিন পরে ইউরোপ সফরে যাবে। বিদেশ ভ্রমণকারী দল গঠন করার জন্যে বোম্বাই-এ একটা কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট ৪০ জন খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই ক্যাম্পে যোগদানের জন্যে। বাংলা থেকে একমাত্র গোবিন্দ মনোনীত হয়েছেন। একমাত্র ওঁকেই বা কেন এই ক্যাম্পে ডাকা হলো, সেইটাই বিস্ময়ের ব্যাপার! ডাক পাবার মতো বাংলা দলে সত্যিই কি আরো কেউ ছিলেন না...?

॥ অশোক চ্যাটার্জী ॥
তেহরাণগামী আই· এফ· এ দলের নেতৃত্বের ভার পড়েছে অশোক চ্যাটার্জীর ওপর।

### গল্প হলেও সত্যি

খেলার রাজা ক্রিকেট। তাই খেলার রাজাকে কেন্দ্র করে কোন্ টেস্ট খেলা সব থেকে বেশিদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন, কোন্ বোলার সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন, সাধারণত ক্রিকেটরসিকরা এইসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করে থাকেন; কিন্তু কোন্ টেস্ট ক্রিকেট সবচেয়ে কম দিনে শেষ হয়েছিল, তা বোধহয় অনেকেরই অজানা।

১৯৫৮ সালের ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি স্থায়িত্বের দিক দিয়ে বোধহয় সবচেয়ে কমের রেকর্ড। পাঁচ দিনের হলেও খেলাটি আড়াই দিনের বেশি টেকে নি। দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির ফলে খেলা আরম্ভ হতে ৩ ঘণ্টা দেরি হওয়ায় মোট স্থায়িত্বকাল দু'দিনও বলা যেতে পারে।

উক্ত আড়াই দিনে কোন্ দল কখন ব্যাট করেছিলেন তা হলোঃ প্রথম দিনে ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে ২৩৭ রান করে। দ্বিতীয় দিন তিন ঘণ্টা পরে খেলা শুরু হয়। চা-পানের সময় ২৬৯ রানে ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয়। এর পর এই দিনই নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৭ রানে শেষ হয়ে যায়। এইদিন নিউজিল্যান্ড এক ঘণ্টা ৫০ মিনিট ব্যাট করে। তৃতীয় দিন নিউজিল্যান্ড ফলো অন করে দ্বিতীয় দফায় ৩ ঘণ্টার মধ্যে ৭৪ রানে সকলে আউট হয়ে যান। —হীরেন্দ্রমোহন রায়,
সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি

## সমাচার দর্পণ

আমরা যা আশা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হলো। তেহরাণগামী আই· এফ· এ দলে এবারের জাতীয় ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের সকলের স্থান হলো না। অধিনায়কের দায়িত্বও শান্ত মিত্রর ওপর থেকে তুলে নিয়ে দেওয়া হয়েছে অশোক চ্যাটার্জীর ওপর। আঠারো জন খেলোয়াড় সম্বলিত এই দলটি ২৮শে কিম্বা ২৯শে মার্চ যাত্রা করছে। আই· এফ· এ দল তেহরাণে এশিয়ার চ্যাম্পিয়ান দলের ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে। আই· এফ· এ দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলেন—বলাই দে, কানাই সরকার; সুধীর কর্মকার, সি প্রসাদ, শান্ত মিত্র, ভবানী রায়, কল্যাণ সাহা, অশোক ব্যানার্জী, সুনীল ভট্টাচার্য, প্রিয়লাল মজুমদার, কাজল মুখার্জী ও কালন গুহ; অশোক চ্যাটার্জী (অধিনায়ক), বিমান লাহিড়ী, হাবিব, এস ভৌমিক, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার ও সর্দার খাঁ।

* * *

মার্টিন পিটার্সের তুঙ্গে এখন বৃহস্পতি। ইংলণ্ডের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর দামই এখন সব চেয়ে বেশি। পিটার্সের বয়স এখন ছাব্বিশ। ১৯৬৬ সালে বিশ্ব কাপ বিজয়ী ইংলণ্ড দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু এ বছর তিনি যা পেলেন, তা ছিল তাঁর কল্পনাতীত। ওয়েস্টহ্যাম দল ছেড়ে পিটার্স এবার যোগ দিলেন টটেনহাম হটস্পার দলে। এই দল-বদলের জন্যে তিনি পাচ্ছেন দু' লক্ষ পাউণ্ড। টাকার হিসেবে যার মূল্য ছত্রিশ লাখের কাছাকাছি।

* * *

আগামী জুলাই মাসের ১৬ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত এডিনবার্গে অনুষ্ঠিত হবে এবারের কমনওয়েলথ গেম। অন্যান্য দেশগুলির সংগে এই প্রতিযোগিতায় ভারতও যোগদান করবে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের দশজন এ্যাথলেট অংশগ্রহণ করবেন। অন্য দেশগুলির মতো আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ থেকে কখনো প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় না। হ'লে নিঃসন্দেহে ভারত আরো ভালো ফল দেখাতে পারতো। কিন্তু এবারও সেই আগের মতো সার্ভিসেস, রেল, পুলিশ প্রভৃতি বিভাগ থেকে ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছে। চিরাচরিত এই প্রথা কবে যে বদলাবে, কে জানে!
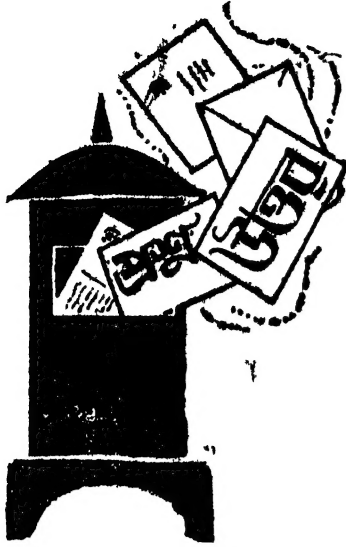
**হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র** (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ী)

**উত্তর** : তোমাদের 'ময়দান' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা পেয়েছি। দারুণ হয়েছে। যিনিই দেখবেন কিংবা পড়বেন, তাঁরই ভালো লাগবে।

**নির্মলকুমার দত্ত** (কলাবাড়ি চা-বাগান, জলপাইগুড়ি)

**প্রশ্ন** : ব্যাটসম্যান মারার পর যদি ক্যাচ ওঠে আর যদি একজন ফিল্ডার-এর হাতে লেগে মাটিতে পড়ার আগে অপর একজন খেলোয়াড় ধরে ফেলেন —তা হলে কি হবে?

**উত্তর** : ক্যাচ আউট হবেন ব্যাটসম্যান।

**প্রশ্ন** : বোলার বল করলো। ব্যাটসম্যান জোরে মারলো, কিন্তু বলটি ব্যাটের কোণায় লেগে উইকেটের দিকে গড়িয়ে আসতে লাগলো, তখন যদি ব্যাটসম্যান (যিনি মেরেছিলেন) বলটা থামিয়ে দেন, তা হলে কি তিনি আউট হবেন?

**উত্তর** : ব্যাট দিয়ে কিংবা পা দিয়ে থামালে আউট হবেন না। ব্যাটসম্যান কিন্তু কোন সময়ই হাত দিয়ে বলটা ধরতে কিংবা থামাতে পারবেন না—তা হলে তিনি 'হ্যান্ডল্ড দি বল' নিয়মানুসারে আউট হয়ে যাবেন।

**প্রদীপ [illegible]** (লেবং, দার্জিলিং)

**উত্তর** : আমাদের রঞ্জি ট্রফির মতোই অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ভিক্টোরিয়া, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস প্রভৃতি দলগুলো।

**এ. কি. [illegible]** (গেড়ুজরপুর, পুরুলিয়া)

**প্রশ্ন** : ভারতের বিবি নিম্বলকার কোন টেস্ট খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন কি?

**উত্তর** : না।

**তাপস মুখার্জী** (এভিনিউ নর্থ রোড, যাদবপুর)

**উত্তর** : আপনার প্রশ্নটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

**লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ** (মেচ্যা, মেদিনীপুর)

**উত্তর** : আপনার চিঠি ও লেখা পেয়েছি। কিন্তু দু'পাতায় (এপিঠ-ওপিঠে) লেখার জন্যে প্রকাশ করা তো সম্ভব হবে না। আপনি সাদা কাগজের একদিকে লিখে লেখা পাঠাবেন। আশা করি, এই বিষয়ে আপনি আমাদের অসুবিধাটুকু বুঝবেন।

**ব্রজকিশোর অধিকারী, শংকর ও প্রণব** (বেলদা, মেদিনীপুর)

**প্রশ্ন** : কোন্ ভারতীয় বোলার এক ওভারে সব চেয়ে বেশি উইকেট লাভ করেছেন—কতো সালে এবং কোন্ দলের বিরুদ্ধে?

**উত্তর** : আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, কেউ জানলে যদি জানান, তা হলে জানিয়ে দেবো।

**[illegible]** ([illegible])

**প্রশ্ন** : কোন্ কোন্ ব্যাটসম্যান টেস্ট খেলায় ধীর গতিতে রান তুলেছেন, কোন্ দলের বিরুদ্ধে, কোন্ সালে এবং কতো রান জানাবেন?

**উত্তর** : ১৮ রান ১৯৪মিঃ—নিউজিল্যান্ডের পেইলে ১৯৫৮ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লীডস টেস্ট। ১৮ রান ১৮০মিঃ—নিউজিল্যান্ডের র‍্যাবোনে, ১৯৫৪-৫৫ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ডুনেডিন টেস্টে। ১৯*-১৫০মিঃ—অস্ট্রেলিয়ার মার্ডক ১৮৮২-৮৩ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে মেলবোর্ন টেস্টে। ২০ রান ১৯৫মিঃ—পাকিস্তানের হানিফ ১৯৫৪ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লর্ডস টেস্টে। ২৮*-১২০মিঃ—অস্ট্রেলিয়ার বার্কে ১৯৫৮-৫৯ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ব্রিসবেন টেস্টে। ৩১ রান ২৬৬মিঃ—অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকাই ১৯৫৬ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লর্ডস টেস্টে। ৩৪ রান, ২২৫মিঃ—ইংলন্ডের স্কটন ১৮৮৬ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ওভালে। ৩৮ রান ২৬০মিঃ—ইংলন্ডের বেইলী ১৯৫৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লীডসে। ৪০ রান ২৯৫মিঃ—অস্ট্রেলিয়ার কলিন্স ১৯২১ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ম্যানচেস্টারে। ৬৮ রান ৪৫৮মিঃ ইংলন্ডের বেইলী ১৯৫৮-৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে। ৭৪ রান ৩১৩মিঃ—ভারতের জয়সী ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলকাতায়। ৮২ ৩৬০মিঃ—ইংলন্ডের স্কটন ১৮৮৪-৮৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এডিলেডে। ৮৮ রান ৪১৫মিঃ ইংলন্ডের বোলাস ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসদানন্দ [illegible] মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।